ইসলামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

ইসলামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী

অনুবাদকমণ্ডলী

মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)
মাওলানা আকবর শাহ খান নজীবাবাদী
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন : ২০৫/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২০৮৬/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1229-8

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউস সানি ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

ISLAMER ITIHASH (The History of Islam Part-1): Written by Maulana Akbar Shah Khan Najeebabadi in Urdu and translated by Maulana Abdul Matin Jalalabadi, Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi and Maulana Muhammad Hasan Rahmati into Bangla and published by Muhammad Shamsul Haque Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.
June 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 200.00 ; US Dollar : 5.00

প্রকাশকের কথা

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকায়িদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং আল্লামা ইবনে কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিরচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এরই ধারাক্রমে এবার প্রকাশ করা হলো বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী প্রণীত 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড।

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে সাবধানী হয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। ইতিহাসকে জাতির বিবেক বলা চলে। এটা একটা জাতির দিক-দর্শন যন্ত্রের মতও কাজ করে।

ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। এরপর আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছে খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে। যার ফলে গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে বিজ্ঞ গ্রন্থকার ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদক জনাব মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং মাওলানা হাসান রহমতীকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। মুবারকবাদ জানাই দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনাকারী মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীকে, যিনি প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত অনেক ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দিয়েছেন। প্রুফ দেখার মত শ্রমসাধ্য কাজটি আনজাম দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই জনাব মোহাম্মদ মোকসেদকে। গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলকেও জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থখানি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কিংবা আন্তরিকতায় কোন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করা হয়নি। তবু সুধীজনের নজরে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পূর্বকথা.....১৯
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্.....১৯
হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ২০
মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি ২৩
ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্য..... ২৫
ভূমিকা..... ২৭
ইতিহাস ২৭
ইতিহাসের প্রয়োজন এবং এর উপকারিতা.....২৭
ইতিহাস পাঠের উপকারিতা..... ২৮
ইতিহাসের মাধ্যমে সামরিক বৈশিষ্ট্যাদি সংরক্ষণ.....২৮
ইতিহাস ও বংশ কৌলীন্য..... ২৯
ইতিহাসবেত্তা ২৯
ইতিহাস পাঠক ৩০
ইতিহাসের উৎস..... ৩১
ইতিহাসের প্রকরণ ৩১
ইতিহাসের যুগসমূহ..... ৩২
ইসলামের ইতিহাস ৩২
ইতিহাসের ইতিহাস..... ৩৩
ইতিহাসের সূচনা..... ৩৩
ইতিহাসের সত্যিকারের সূচনা ৩৪
সাম্রাজ্যের ইতিহাস ৩৪
ব্যক্তিতন্ত্র ও গণতন্ত্র ৩৬
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র..... ৩৮
ব্যক্তিশাসন ও রাজতন্ত্র..... ৩৯
ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকার.....৪১
যেখান থেকে শুরু..... ৪৩
ইতিহাস ও ভূগোলের পারস্পরিক সম্পর্ক ৪৩

প্রথম অধ্যায়

আরব দেশ

অবস্থান ও প্রকৃতি.....৪৫
আবহাওয়া ও অধিবাসী ৪৬

আরবের প্রাচীন অধিবাসী ৪৭
আরবে বায়িদা ৪৭
আরবে 'আরিব ৪৮
সামের বংশতালিকা ৫০
বনী কাহ্তানের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জি নিম্নরূপ ৫১
আরবে মুস্তাআরিবা ৫২
আদনানী গোত্রসমূহ ৫৩
আদনান ৫৫
আবদুল মুত্তালিব নামকরণের কারণ ৫৬
আবদে মানাফের খান্দান ৫৬
আরবের নৈতিক অবস্থা ৫৬
ফিহ্র ইব্ন মালিক (কুরায়শ) ৫৭
বংশগরিমা ৫৮
শান্তির মাসসমূহ ৫৯
ধর্মীয় অবস্থা ৬০
মূর্তিপূজা ৬০
কুরবানী ৬১
নক্ষত্র পূজা ৬১
কিহানত (ভবিষ্যত বলা) ৬২
ফাল–ভাগ্যপরীক্ষা ৬২
যুদ্ধপ্রীতি ৬২
প্রেম-প্রীতি ৬৩
কাব্যচর্চা ৬৩
শিকার ৬৪
পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবার ৬৪
লুণ্ঠন ও রাহাজানি ৬৫
দাম্ভিকতা ৬৫
বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা ৬৫
শোক বিলাপ ৬৬
কুসংস্কার ৬৬
কন্যা হত্যা ৬৮
জুয়াখেলা ৬৮
জাহিলিয়াতের যুগে আরব ও সমসাময়িক বিশ্ব ৬৯
ইরান ৬৯

রোম ও গ্রীস ৭০
খ্রিস্টানদের অধঃপতন ৭১
মিসর ৭১
ভারতবর্ষ ৭২
চীন ৭২
নবী প্রেরণের জন্যে আরবকে কেন নির্বাচন করা হলো ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

ভোর হলো ৭৫
দ্বিতীয় যবীহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ৭৭
প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা ৭৮
বাল্যকাল ৮০
আবদুল মুত্তালিবের ওফাত ৮২
আবূ তালিবের ক্রোড়ে ৮২
প্রথম সিরিয়া সফর ৮২
ফিজারের যুদ্ধ : প্রথমবারের মত যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৮৩
বাণিজ্যে গমন ৮৪
হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর প্রস্তাব ৮৪
সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর ৮৫
শাদী মুবারক ৮৫
সাদিক ও আল-আমীন খিতাব ৮৫
হিলফুল ফুযুল ৮৬
কুরায়শ কবীলাসমূহের মধ্যে বিবাদ মীমাংসাকারী হিসেবে ৮৭
গরীবদের লালন-পালন ৮৮
যায়দ ইব্ন হারিছার প্রতি স্নেহ ৮৮
আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ ৮৯
সূর্যোদয় ৯০
হযরত খাদীজা (রা)-এর ঐতিহাসিক সান্ত্বনা বাণী ৯১
ইসলাম প্রচারের সূচনা ৯২
সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথম সত্য ঘোষণা ৯৩
প্রকাশ্য প্রচার ৯৪
ইসলামের প্রথম মাদরাসা-দরস্গাহ ৯৫
কুরায়শদের বিরোধিতা ৯৫

নবী করীম (সা)-এর সাথে ধৃষ্টতামূলক আচরণ ৯৬
দ্ব্যর্থহীন জবাব ৯৭
আবূ তালিব সকাশে কুরায়শ প্রতিনিধি দল ৯৮
আবিসিনিয়ায় হিজরত ১০০
আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট কুরায়শদের আবদার ১০২
জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবের মর্মস্পর্শী ভাষণ ১০২
হযরত আমীর হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১০৩
হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১০৪
বয়কট ১০৭
শোকবর্ষ : নবুওয়াতের দশম সাল ১০৯
তায়িফ সফর ১১০
তায়িফবাসীদের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ ১১১
মক্কায় প্রত্যাবর্তন ১১২
হযরত আয়িশা (রা)-এর সাথে শাদী মুবারক : মি'রাজ ১১৩
বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম প্রচার ১১৩
সুয়াইদ ইব্‌ন সামিত ১১৪
আনাস ইব্‌ন মু'আয (রা) ১১৪
যিমাদ ইযদী (রা) ১১৫
তুফায়ল ইব্‌ন আমর দুওসী (রা) ১১৫
হযরত আবূ যর গিফারী (রা) ১১৬
ইয়াছরিবের সৌভাগ্যবান ছয়জন ১১৭
আকাবার প্রথম বায়'আত ১১৮
মদীনায় মুসআব ইব্‌ন উমায়রের সাফল্য ১১৯
আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত ১২১
মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি ১২৩
দারুন নাদওয়ায় কুরায়শদের পরামর্শ সভা ১২৫
সফরের আয়োজন ১২৬
ছওর গিরি গুহায় আফতাব (সূর্য) ও মাহতাব (চাঁদ) ১২৮
হিজরতের সফর ১৩০
সফরের সমাপ্তি ১৩২
মদীনায় প্রবেশ ১৩৪
হিজরী সন ১৩৬
হিজরী প্রথম বর্ষ ১৩৬
প্রথম শাসনতান্ত্রিক সনদ ১৩৮

মুনাফিকীর উদ্ভব ১৩৯
হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ ১৪০
বদর যুদ্ধ ১৪১
এ যুদ্ধে মুসলমানদের সরঞ্জাম ছিল নিম্নরূপ.....১৪৩
যুদ্ধ শুরু ১৪৩
যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকীদ.....১৪৭
যুদ্ধবন্দীদের সংক্রান্ত নীতি ১৪৭
মক্কায় কাফিরদের প্রতিশোধস্পৃহা ১৪৮
হিজরী তৃতীয় বর্ষ ১৪৯
ইয়াহূদীদের শত্রুতামূলক আচরণ ১৫০
ইয়াহূদী গোত্র বনী কায়নূকা ১৫১
উহুদের যুদ্ধ ১৫২
মুনাফিকদের ঔদ্ধত্য ১৫৪
যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো ১৫৫
হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদত বরণ.....১৫৬
যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল! ১৫৬
নবুওয়াত দীপের পতঙ্গকুল ১৫৮
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দৃঢ়তা ১৫৯
যুদ্ধের ময়দানের দৃশ্য.....১৬০
শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা.....১৬৩
হিজরতের চতুর্থ বছর ১৬৩
মর্মান্তিক ঘটনা ১৬৫
প্রতিশ্রুতি পালন ১৬৬
ইয়াহূদীর দুরভিসন্ধি ১৬৬
বনূ নাযীরের দেশান্তর ১৬৭
গাযওয়া যাতুর রিকা' ১৬৭
গাযওয়া সাবীক ১৬৮
হিজরতের পঞ্চম বছর.....১৬৯
গাযওয়া বনূ মুসতালিক ১৭০
মুনাফিকদের ধৃষ্টতা ১৭১
যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি ১৭৩
ইয়াহূদীর শাস্তি ১৭৩
খন্দকের যুদ্ধ.....১৭৩
বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ১৭৭

পঞ্চম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা ১৭৯
হিজরতের ষষ্ঠ বছর ১৭৯
ইসলাম প্রচার ১৮০
মুনাফিকদের একটি হিংস্র ঘটনা ১৮০
হুদায়বিয়ার সন্ধি ১৮১
হুদায়বিয়া প্রান্তর ১৮২
বায়আতে রিযওয়ান ১৮৩
রাসূল আকরাম (সা)-এর প্রতি সাহাবাদের প্রাণপূর্ণ ভালবাসা.....১৮৪
শর্তসমূহ ১৮৫
সন্ধিচুক্তির প্রতিক্রিয়া ১৮৫
সুস্পষ্ট বিজয়.....১৮৬
হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল..... ১৮৬
আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন.....১৮৭
খায়বার বিজয়..... ১৮৮
হিজরতের সপ্তম বছর..... ১৮৮
খায়বার বিজয়ের পর ১৯০
দাওয়াতী চিঠিপত্র ১৯২
মক্কায় আগমন.....১৯৩
আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৯৪
হিজরতের অষ্টম বছর ১৯৪
মূতার যুদ্ধ.....১৯৫
হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ্ (রা) ১৯৭
কুযাআ যুদ্ধ.....১৯৮
মক্কা বিজয়.....১৯৯
আবূ সুফিয়ানের মদীনায় আগমন ২০০
মক্কার পথে যাত্রা ২০১
আবূ সুফিয়ানের মর্যাদা বৃদ্ধি ২০৩
নবী করীম (সা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ২০৩
সত্য সমাগত বাতিল ভূ-লুণ্ঠিত..... ২০৪
হুনায়ন যুদ্ধ..... ২০৫
তায়িফ অবরোধ..... ২০৮
আনসারদের রাসূল-প্রেম ২০৯
মক্কার প্রথম আমীর ২১০
হিজরতের নবম বছর.....২১১

তাবূক যুদ্ধ ২১২
ইসলামী লশকরের যুদ্ধযাত্রা.....২১৩
তাবুক.....২১৪
মসজিদে যিরারে অগ্নি-সংযোগ ২১৫
তায়িফবাসীদের ইসলাম গ্রহণ ২১৬
আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর প্রথম প্রতিনিধি ২১৭
বিদায় হজ্জ.....২১৮
মুসায়লামা কাযযাব ২১৯
মুবাহালা..... ২২০
বিদায় ভাষণ ২২১
হযরত আলী (রা)-কে সান্ত্বনা দান ২২২
নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতা.....২২২
হিজরতের একাদশতম বছর.....২২২
রোগশয্যা থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ২২৩
রোগ বৃদ্ধি ২২৩
হযরত আবূ বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ ২২৪
ওফাতের কিছু পূর্বে ২২৪
ওফাত ২২৫
হযরত উমর (রা)-এর অবস্থা..... ২২৫
হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃঢ়তা.....২২৬
সাকীফা বনূ সায়িদা.....২২৬
সালাতে জানাযা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা ২২৭
হুলিয়া মুবারক..... ২২৭
সন্তান-সন্ততি ২২৮
স্বভাব-চরিত্র ২২৮
পরম সুচরিত্র..... ২৩০
সরলতা ২৩২
মধ্যপন্থা..... ২৩৩
হাস্য-কৌতুক..... ২৩৪
পরম প্রশংসিত চরিত্র..... ২৩৪

তৃতীয় অধ্যায়
খিলাফতে রাশিদা

খিলাফত ও খলীফা ২৩৬
খিলাফতের অধিকার..... ২৩৭

ইসলামী খিলাফত ২৩৯
খিলাফত প্রশ্নে মতানৈক্য ২৪০
দীনী খিলাফত ও জাগতিক সালতানাতের পার্থক্য ২৪১
কোন জাতি, গোত্র বা পরিবারের সাথে খিলাফতের সম্পর্ক ২৪২
খিলাফত ও পীর-মুরীদী ২৪৪
হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (রা) ২৪৫
নাম ও নসব ২৪৫
জাহিলিয়াত যুগ ২৪৫
ইসলামী যুগে ২৪৬
বীরত্ব ২৪৭
দানশীলতা ২৪৮
জ্ঞান-বুদ্ধি ২৪৮
সুসামাজিকতা ২৪৯
সিদ্দীকী খিলাফতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২৫১
সাকীফা বনূ সাইদা ও বায়'আতে খিলাফত ২৫১
বায়'আত ২৫১
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণ ২৫৫
উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ২৫৬
উসামা (রা)-কে উপদেশ দান ২৫৭
উসামা (রা)-এর সাফল্য ২৫৮
ধর্মত্যাগীদের ফিতনা ২৫৯
সিদ্দীক আকবরের ফরমান ২৬১
মুরতাদদের মূলোচ্ছেদ ২৬৩
আবূ বকর সিদ্দীকের ঘোষণা ২৬৩
তুলায়হা আসাদী ২৬৪
সাজাহ্ ও মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ্ ২৬৬
মিথ্যুক মহিলা নবীর বিবাহ ২৬৭
মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার হত্যা ২৬৮
মুসায়লামা কাযযাব ২৬৯
জাতীয়তার পথভ্রষ্টতা ২৭০
ঘোরতর যুদ্ধ ২৭১
হুতাম ইব্‌ন জুনায়আহ ২৭৩
লাকীত ইব্‌ন মালিক ২৭৪
মুহরার অধিবাসীদের ধর্মত্যাগ ২৭৫

ইয়ামানবাসীর ধর্মত্যাগ ২৭৫
ইসলাম ত্যাগের পূর্ণ মূলোচ্ছেদ ২৭৬
রোম ও ইরান ২৭৮
মুসলমানদের কর্মকুশলতা ২৮৩
গাযওয়ায়ে যাতুস-সালাসিল বা জিঞ্জির পরা যুদ্ধ ২৮৩
কারিনের যুদ্ধ ২৮৪
দুল্‌জা'র যুদ্ধ ২৮৫
লায়সের যুদ্ধ ২৮৫
হীরা বিজয় ২৮৫
খালিদ (রা)-এর পয়গাম ২৮৬
দ্বিতীয় সাধারণ ঘোষণার বিষয়বস্তু ২৮৬
আম্বার বিজয় বা জঙ্গে যাতিল উয়ূন ২৮৬
আয়নুত্-তামার বিজয় ২৮৭
উচ্চ ইরাক ২৮৭
দুমাতুল জান্দাল বিজয় ২৮৮
হাসীদ যুদ্ধ ২৮৮
মাযীখ যুদ্ধ ২৮৯
ফিরায যুদ্ধ ২৯০
সিরিয়ায় খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ২৯১
ইয়ারমুক যুদ্ধ ২৯৪
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল ২৯৬
সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর শেষ ভাষণ ২৯৭
হযরত আলী (রা)-এর প্রতিক্রিয়া ২৯৯
সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতের কর্মকর্তাবৃন্দ ৩০০
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ৩০০
হযরত উমর ফারূক (রা) ৩০১
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ৩০১
কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৩০১
হযরত উমর ফারূক (রা)-এর গঠনাকৃতি ৩০৪
ফারূকী খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ৩০৪
হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতি ৩০৬
নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের নির্বাসন ৩০৯
দামিশ্‌ক বিজয় ৩০৯
ফুহলের যুদ্ধ ৩১২

বীসান বিজয়.....৩১২
সায়দা, আরকা, হাবীল ও বৈরূত বিজয়.....৩১৩
ইরাকের সংঘর্ষসমূহ.....৩১৩
হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর প্রথম কীর্তি.....৩১৩
কসকর বিজয়.....৩১৫
বাকশিয়ার যুদ্ধ.....৩১৫
হযরত আবূ উবায়দ মাসঊদ সাকাফী (রা)-এর শেষ কীর্তি.....৩১৬
বুয়াইবের যুদ্ধ.....৩১৮
বুয়াইবের পরাজয়.....৩১৯
ইরানীদের বিরুদ্ধে স্বয়ং ফারূকে আযম (রা)-এর সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংকল্প.....৩১৯
হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ইরাকে উপস্থিতি.....৩২১
ইসলামী প্রতিনিধি দল.....৩২২
হযরত কায়স ইব্‌ন যারারাহ (রা)-এর ভাষণ.....৩২৩
কাদিসিয়া যুদ্ধ.....৩২৬
বাবেল ও কূছী বিজয়.....৩৩০
বাহরাশীর বিজয়.....৩৩১
তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ভরা নদীতে.....৩৩২
মাদায়েন বিজয়.....৩৩৩
জালূলার যুদ্ধে.....৩৩৪
সিরিয়ার যুদ্ধ.....৩৩৫
হিম্‌স বিজয়.....৩৫৫
কিন্নাসরীন বিজয়.....৩৩৬
হল্‌ব (আলেপ্পো) ও ইনতাকিয়া বিজয়.....৩৩৬
বাফ্‌রাস, মারআশ ও হারস বিজয়.....৩৩৭
কায়সারিয়া (কায়সারাহ) ও আজনাদীন বিজয়.....৩৩৮
বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়.....৩৩৮
হযরত ফারূকে আযমের ফিলিস্তীন সফর.....৩৩৯
খ্রিস্টানদের জন্য নিরাপত্তা সনদ.....৩৪০
তিকরীত ও জাযীরা বিজয়.....৩৪০
ইয়াদ গোত্রের প্রত্যাবর্তন.....৩৪১
হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদমর্যাদা হ্রাস.....৩৪২
বসরা ও কূফা.....৩৪৪
আহওয়ায বিজয় এবং হরমূযানের ইসলাম গ্রহণ.....৩৪৪
হযরত উমর (রা)-এর চমৎকার ব্যবহার.....৩৪৬

মিসর বিজয় ৩৪৬
নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ..... ৩৪৭
বিভিন্ন অনারব অঞ্চল অধিকার ৩৪৯
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ৩৫১
ফারূকী আমলে বিজিত দেশসমূহ ৩৫৩
হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদত বরণ..... ৩৫৩
হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ৩৫৫
ফারূকে আযম (রা)-এর উদ্ভাবিত বিধানসমূহ..... ৩৫৬
ফারূকে আযম (রা)-এর আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যাদি ৩৫৬
বিজয় অভিযানসমূহ : একটি পর্যালোচনা ৩৬০
খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্থ..... ৩৬১

চতুর্থ অধ্যায়
(খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধ)
হযরত উসমান গনী (রা)

নাম ও বংশ-পরিচয় ৩৬৩
গুণাবলী ও প্রকৃষ্টতা..... ৩৬৩
মুবারক আকার-আকৃতি ৩৬৪
নির্বাচন..... ৩৬৪
হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে প্রথম ভূমিকা..... ৩৬৮
বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর বা কর্মকর্তা..... ৩৬৯
উসমানী খিলাফত আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ..... ৩৭০
ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) বিজয় ৩৭০
আর্মেনিয়া বিজয় ৩৭১
মিসরের ঘটনা-বিচিত্রা ও পরিবর্তনসমূহ..... ৩৭২
আফ্রিকা বিজয় ৩৭৩
কাবরিস (সাইপ্রাস) ও রোডস বিজয়..... ৩৭৬
ইরানী শাসন ব্যবস্থায় রদবদল ৩৭৮
ইরানীদের বিদ্রোহ ও ইসলামী বিজয় অভিযান..... ৩৭৮
হিজরী ২৯ সনের হজ্জ..... ৩৭৯
হিজরী ৩০ সন ৩৮০
হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর ঘটনা ৩৮১
হযরত নবী করীম (সা)-এর আংটি ৩৮২
তাবারিস্তান বিজয়..... ৩৮৩

পবিত্র কুরআন প্রচার..... ৩৮৩
হিজরী ৩১ সনের ঘটনাবলী..... ৩৮৩
ইয়াযদিজার্দের পতন..... ৩৮৪
হিজরী ৩২ সনের ঘটনাবলী..... ৩৮৫
হিজরী ৩৩ সনের ঘটনাসমূহ..... ৩৮৫
আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা..... ৩৮৬
হিজরী ৩৪ সনের ঘটনাসমূহ..... ৩৯০
হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশ..... ৩৯৩
আপত্তি উত্থাপন..... ৩৯৪
হিজরী ৫২ সনের ঘটনাসমূহ..... ৩৯৬
আবদুল্লাহ ইবন সাবার ষড়যন্ত্র..... ৩৯৭
ফিত্না সৃষ্টিকারী কাফেলাসমূহের মদীনা তাইয়িবা যাত্রা..... ৩৯৭
হযরত আলী (রা) আপন পোষ্যের (সমর্থকের) জন্য সুপারিশ করেন..... ৩৯৯
হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর ইমামতি..... ৪০০
মারওয়ান ইব্ন হাকামের ধৃষ্টতা..... ৪০১
হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদত বরণ..... ৪০২
এক নযরে উসমানী খিলাফত..... ৪০৬
হযরত উসমান গনী (রা)-এর চরিত্র ও গুণাবলী..... ৪১২
কয়েকটি জরুরী কথা..... ৪১৩
বিক্ষোভকারীদের হাতে মদীনা শরীফের শাসন ক্ষমতা..... ৪১৪
হযরত আলী (রা)..... ৪১৬
নাম ও বংশ-পরিচয়..... ৪১৬
তাঁর বৈশিষ্ট্য..... ৪১৬
তাঁর গুণসমূহ..... ৪১৭
হযরত আলী (রা)-এর বিচার-মীমাংসা ও বাণীসমূহ..... ৪১৭
তাঁর হিকমতপূর্ণ বাণীসমূহ..... ৪২০
হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী..... ৪২২
খিলাফতের বায়'আত..... ৪২২
খিলাফতের দ্বিতীয় দিন..... ৪২৩
দাঙ্গাবাজদের অবাধ্যতা..... ৪২৪
হযরত মুগীরা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সুপরামর্শ..... ৪২৪
কর্মকর্তা ও প্রশাসক নিয়োগ..... ৪২৬
হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর আত্মপক্ষ সমর্থন..... ৪২৭
সাবাঈদের গোমরাহী..... ৪২৭

সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি ৪২৭
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ ৪২৮
মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতি ৪২৮
হযরত আয়িশা (রা)-এর মক্কা থেকে বসরা যাত্রা ৪৩০
বসরার গভর্নরের বিরোধিতা ৪৩২
সম্মুখসমরের আয়োজন ৪৩৩
হযরত আলী (রা)-এর বসরা যাত্রা ৪৩৪
ইয়াহূদী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা ৪৩৪
মুহাম্মদদ্বয়ের কূফা যাত্রা ৪৩৫
আশ্‌তার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কূফা যাত্রা ৪৩৬
আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও হাসান ইব্‌ন আলীর কূফা যাত্রা ৪৩৬
আপোস প্রচেষ্টা ৪৩৮
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ৪৩৯
উষ্ট্রের যুদ্ধ ৪৪০
হযরত যুবায়র (রা)-এর আপোসকামিতা ৪৪৪
হযরত তালহা (রা)-ও সরে পড়লেন ৪৪৫
সাবাঈ দলের আর একটি দুষ্কর্ম ৪৪৮
কূফায় রাজধানী স্থানান্তর ৪৫০
মিসরের গভর্নর পদে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর নিযুক্তি ৪৫১
মুআবিয়া (রা)-এর কাছে আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর উপস্থিতি ৪৫৪
সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পটভূমি ৪৫৬
সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সূচনা ৪৫৯
বিরতিকালীন পুনরায় আপোস-মীমাংসার চেষ্টা ৪৬০
আলী (রা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ৪৬১
সিফ্‌ফীন যুদ্ধের এক সপ্তাহ ৪৬২
সিফফীন যুদ্ধের শেষ দু'দিন ৪৬৩
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ৪৬৭
অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধকরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন ৪৬৯
খারিজী ফিতনা ৪৭১
আযরাজ নামক স্থানে সালিশদ্বয়ের সিদ্ধান্ত ৪৭৪
সিদ্ধান্ত ঘোষণা ৪৭৬
খারিজীদের বিশৃঙ্খলা ৪৭৯
নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ ৪৮১
মিসরের অবস্থা ৪৮৩

অন্যান্য প্রদেশও দখলের চেষ্টা ৪৮৫
ইরাক ও ইরানেই আলী (রা)-এর খিলাফত সীমিত হয়ে পড়লো..... ৪৮৬
বসরা থেকে ইবন আব্বাস (রা)-এর বিদায় ৪৮৭
তিন নেতার হত্যায় খারিজীদের ভয়ংকর পরিকল্পনা ৪৮৮
আলী (রা)-এর কবর অজ্ঞাত ৪৯০
স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা ৪৯১
একনযরে আলী (রা)-এর খিলাফতকাল.....৪৯১
হযরত ইমাম হাসান (রা) ৫০০
নাম, বংশ-পরিচয়, দৈহিক গঠন ইত্যাদি..... ৫০০
অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্য..... ৫০০
ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৫০১
ইমাম হাসান (রা)-এর উপর কূফরী ফতওয়া..... ৫০২
সন্ধিপত্র..... ৫০৪
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ৫০৬
বিষ প্রয়োগের কলাকাহিনী..... ৫০৭
এক নযরে ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত ৫০৭
খিলাফতে রাশিদা সম্পর্কে কিছু কথা..... ৫০৯
হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) ৫১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পূর্বকথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَمَّا بَعْدُ . رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ .

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

বিশ্ব ইতিহাসের প্রতি নযর বুলালে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে যত আম্বিয়ায়ে কিরাম, সংস্কারক ও ধর্ম প্রবর্তক এসেছেন তাঁদের সবাই এক মহান সত্তার (স্রষ্টার) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সকলেই তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। হযরত আদম (আ), হযরত নূহ্ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়কালের মধ্যে শত শত হাজার হাজার বছরের ব্যবধান বা দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সবাই এক আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদের মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন।

কৃষ্ণজী, রামচন্দ্রজী, গৌতম বুদ্ধ ও গুরু নানক ভারতবর্ষে, কায়কোবাদ ও জরথুস্ত্র ইরানে, কনফুসিয়াস চীনে, হযরত লুকমান গ্রীসে, হযরত ইউসুফ (আ) মিসরে, হযরত লূত (আ) সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সকলের শিক্ষায়ই আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের শিক্ষা অভিন্নভাবে বিদ্যমান।

নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে ইয়াহূদী-খ্রিস্টান প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকলেই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। স্বল্পসংখ্যক লোক এমন যারা কোন দিকেই গণ্য নয়। এমন কিছু লোকও থাকতে পারে, যারা বাহ্যত আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও তাদের অন্তর আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও স্বীকার করতে হয় যে,

এই কার্যকারণের পেছনেও একজন কুশলীর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে। সেই কুশলী ইচ্ছাময়ের নামই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা।

কবির ভাষায় :

به لوح گر هزار ان نقش پید است

نیاید بے قلمزن یك الفت راست

পৃথিবীর এ বিপুল ঐকমত্যকে অস্বীকার করা এবং বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানীগুণী দার্শনিকদের সর্ববাদীসম্মত আকীদা-বিশ্বাসকে ভুল প্রতিপন্ন করা পাগল ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়।

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

সুবিশাল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার অর্ধপাশবিক আইন-কানুনও বিকৃত হয়ে তার নিপীড়ন ও ত্রুটিসমূহকে বর্ধিত এবং পূর্ব থেকেই যাতে গুণের পরিমাণ ছিল খুবই অল্প তা দিন দিন অবলুপ্ত করে ফেলেছিল। ইরানের শাহানশাহী জুলুম ও বিবাদের গুদামে পরিণত হয়েছিলো। চীন ও তুর্কিস্তান হয়ে উঠেছিল রক্তপাতের এক-একটি নিরাপদ ঘাঁটি। ভারতবর্ষে মহারাজা অশোক এবং রাজা কনিষ্কের যুগের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের কথা তখন কেউ চিন্তাও করতে পারতো না। বৌদ্ধ রাজত্বের কোন নমুনাও তখন বিদ্যমান ছিল না। বৈদিক ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শনও তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তথাগত বুদ্ধের নাম যারা ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করতো, তাদের অবস্থাও এতই শোচনীয় ছিল যে, রাজত্বের মোহ, ভোগস্পৃহা ও বিশ্বাসগত দুর্বলতার দরুন যে কোন লজ্জাকর কাজ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করতো না। শ্রীকৃষ্ণের নাম জপকারীদের অবস্থা ছিল এই যে, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে বৃক্ষলতা ও জড় পদার্থের সম্মুখে অবনত মস্তকে প্রণিপাত করতে তারা একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। ইউরোপ ছিল এক ব্যাঘ্র-সঙ্কুল বিভীষিকাময় প্রান্তর আর তার অধিবাসীরা ছিল রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের চাইতেও ভয়ঙ্কর জীব। আরব ছিল সমস্ত নৈতিকতা বিগর্হিত ও শান্তি বিনষ্টকারী কার্যকলাপের অভয়ারণ্য। সেখানকার অধিবাসীরা জীব-জন্তুরও অধম জীবন-যাপন করতো। মোটকথা, পৃথিবীর কোন দেশে কোন ভূখণ্ডে মানুষ মানবীয় মহত্ত্ব ও গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিল না। জল-স্থল অন্তরীক্ষে এক শোকার্ত করুণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। গোটা বিশ্ব যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তখন ভারতবাসীর কর্তব্য ছিল শ্রীকৃষ্ণ মহারাজের সেই বাণীটি স্মরণ করা, যাতে তিনি বলেছেন :

> হে অর্জুন! যখন ধর্মের হানি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায়, তখন আমি পুণ্যবানদেরকে রক্ষা করি এবং পাপের বিনাশ সাধন করে ধর্মকে কায়েম রাখি।

ইরানবাসীদের কর্তব্য ছিল জরথুস্ত্রের বাণী অনুসারে কেবল পথ প্রদর্শকের অনুসন্ধান করা। ইয়াহূদীদের কর্তব্য ছিল ফারানের পর্বতশীর্ষ থেকে আলো বিকীরণের প্রতীক্ষা করা এবং খ্রিস্টানদের কর্তব্য ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ এবং মসীহ-এর সুসমাচারকে আশা-ভরসার স্থল বানানো। কিন্তু বিশ্বজোড়া ফিতনা-ফাসাদ ও যুগের অন্ধকার সর্বত্র বিবেকসমূহকে

এমনি আচ্ছন্ন এবং চোখসমূহকে এমন অন্ধ করে রেখেছিল যে, কারো এতটুকু হুঁশও ছিল না। যে, নিজেদেরকে রুগ্ন জ্ঞান করবে এবং চিকিৎসার জন্য যত্নবান হবে।

এমনি যুগসন্ধিক্ষণে আরব দেশের মতো ভূখণ্ডে হাদীয়ে বরহক, রাসূলে রাব্বিল 'আলামীন, খায়রুল বাশার, শাফীউল মুযনিবীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিরকের-ভ্রষ্টতা, মূর্তিপূজার অন্ধকার, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, পাপাচারিতা ও অশ্লীলতার ক্লেদ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর বুলন্দ আওয়াজ তুলে মানুষরূপী অমানুষগুলোকে প্রকৃত মানুষে ও চরিত্রবান মানুষে এবং চরিত্রবান মানুষকে আল্লাহওয়ালা মানুষে রূপান্তরিত করে দুনিয়ার যুগ-যুগান্তের জমাট অন্ধকাররাশিকে হিদায়াত, আলো, শান্তি ও পুণ্যে রূপান্তরিত করেন অর্থাৎ পথভ্রষ্ট মূর্তিপূজারী ও পাপাচারী লোকদেরকে মুসলমান বানাবার গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

হযরত নূহ (আ) ইরাকের পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সাধনায় শত শত বছর তাবলীগ করার পর অবশেষে (رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا) "প্রভু। এ পৃথিবীতে কাফিরদের একটি ঘরও আর অবশিষ্ট রেখো না" (৭১ : ২৬) রূপী তরবারি প্রয়োগে সকলের কিস্‌সা খতম করতে বাধ্য হন। হযরত মূসা (আ) মিসরবাসী এবং তাদের মদমত্ত বাদশাহদেরকে সুপথে আনার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাই চালান। কিন্তু অবশেষে মূসা (আ)-ও বনী ইসরাঈল সেই দৃশ্যও অবলোকন করলেন যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ .

আমি ফিরাউনের দলবলকে ডুবিয়ে মারলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। (২:৫০)

ভারতবর্ষে মহারাজা রামচন্দ্রজীকে লঙ্কায় অভিযান চালাতে হয় এবং রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজকে কুরুক্ষেত্রে সমরাঙ্গনে অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করে কুরুদের পাপাচারী দলকে পাণ্ডবদের হাতে ধ্বংস করতে হয়। ইরানে জরথুস্ত্রকে ইসফান্দিয়ারের বাহুবল ও রাজত্বকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এ ব্যাপারে জ্ঞানীগুণীরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহামতি ধর্ম প্রবর্তকগণ এবং সত্য সাধকদের জীবনে এ নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না যে, মাত্র পঁচিশ বছরের স্বল্প সময়ে আরবের অজ্ঞ বেদুঈনদের মত একটি জাতি সমস্ত সভ্য দুনিয়ার শিক্ষক, সর্বাধিক সভ্য ও চরিত্রবান জাতিতে পরিণত হয়েছে। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে কেবল আশিটি বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত ধর্মের অনুসারীরা আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অর্থাৎ চীনের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত অন্য কথায় সমস্ত সভ্যজগত জয় করে নেয়। এ বিস্ময়কর ও অলৌকিক সাফল্যের কোন নযীর পৃথিবীতে নেই।

ইসলামের নীতিমালার সৌন্দর্য যদি সমস্ত ধর্মের নীতিমালার সৌন্দর্যের সমাহার হয় এবং এর শিক্ষাবলী যদি সকল ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইতে উত্তমই হয়, তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মানবশ্রেষ্ঠ, খাতিমুন নাবিয়্যীন এবং রাহমাতুল্লিল 'আলামীন তথা গোটা বিশ্বজগতের জন্য করুণা ও রহমত হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ের কী থাকতে পারে? পৃথিবীর কেইবা সাহস করতে পারে যে, তাঁরই আনীত কিতাব কুরআন মজীদের এ অনন্য বিশেষণ আরোপ এবং অনস্বীকার্য দাবী তথা আল্লাহ্‌র দাবীর প্রতিবাদ করবে, যাতে তিনি বলেছেন :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ .

নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণ করবো। (১৫ : ৯)।

বিভিন্ন জাতিকে উন্নতি ও প্রগতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে এবং তাদেরকে অধঃপতন ও অবনতি থেকে রক্ষা করতে ইতিহাস একটি অত্যন্ত কার্যকর ও মূল্যবান মাধ্যম। কোন জাতি যখন অধঃপতনের নিম্নতম স্তর থেকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে তখন ইতিহাসকেই সে তার প্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎসরূপে পেয়েছে। কুরআনুল কারীম আমাদেরকে এও শিখিয়েছে যে, মানুষের সৌভাগ্য এবং দীন-দুনিয়ার সাফল্য অর্জন করতে হলে ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য। তাই কালাম মজীদে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে স্থানে স্থানে বিগত জাতিসমূহের অবস্থাদি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে যে অমুক জাতি নিজেদের অনিষ্টকর কার্যকলাপের জন্যে ধ্বংস হয়েছে এবং অমুক জাতি তাদের সৎ কর্মসমূহের বদৌলতে কেমন করে সৌভাগ্য ও সাফল্য অর্জন করেছে।

হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) প্রমুখ নবী-রাসূলের ঘটনাবলী, ফিরাউন, নমরূদ, 'আদ, ছামূদ প্রভৃতির বর্ণনা কুরআনুল করীমে এ জন্যে উল্লিখিত হয়নি যে, আমরা এগুলো উপভোগ করবো বা আমাদের ঘুমপাড়ানীর কাজে এগুলো লাগবে, বরং এসব সত্য কাহিনী এজন্যে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে যেন আমাদের মধ্যে পুণ্য কাজের সাহস সঞ্চিত হয় এবং পাপাচার থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থাকে উন্নত ভবিষ্যতের মাধ্যমরূপে গড়ে তুলতে পারি।

মানব জাতির সবচাইতে উপকারী, সর্বাধিক কল্যাণকামী এবং সৃষ্ট জীবসমূহের প্রতি সর্বাধিক সংবেদনশীল দরদী বন্ধু নবী-রাসূলগণ (আ) যখনই কোন জাতিকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর এবং তাদেরকে সম্মান ও সাফল্যের অধিকারী করার জন্যে যত্নবান হয়েছেন, তখনই তাঁরা তাঁদের জাতিসমূহকে অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি অতীত ইতিহাস ও অতীত যুগের ঘটনাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত ও কর্মোদ্দীপ্ত হননি। এজন্যেই প্রত্যেক বাগ্মী বক্তাই তাঁদের বক্তৃতায় অবশ্য অবশ্যই অতীতের স্মৃতি মন্থন ও অতীত যুগের মহামানবদের ঘটনাবলী রূপী চাটনীর সংমিশ্রণ দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিজেদের ইচ্ছেমত উদ্দীপ্ত করে থাকেন। অতীত যুগের খ্যাতনামা পুরুষদের মধ্যে যাঁদের সাথে আমাদের ধর্মীয়, জাতীয় বা দেশীয় মিল থাকার দরুন নিকট সম্পর্ক থাকে, তাদের ঘটনাবলী আমাদেরকে অধিকতর প্রভাবিত করে থাকে। রুস্তম, ইসফান্দিয়ার বা গশ্‌তাসিপও নওশেরওয়ার দ্বারা একজন পারস্যবাসীর অন্তরে যতটুকু ধর্মবোধ, বীরত্ব ও ন্যায়বোধ জাগিয়ে তোলে কোন চীনদেশীয় বা ভারতীয় ব্যক্তির মধ্যে তা ততটুকু করবে না। ভীম, অর্জুন, পৃথ্বীরাজ বা বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিন্দুদেরকে যতটুকু অনুপ্রাণিত করবে, একজন খ্রিস্টানকে তা ততটুকু অনুপ্রাণিত করবে না। এজন্যেই আজ যখন বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও তার প্রভাব সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন জাতিকে জীবন্ত করে তুলতে বা জীবন্ত রাখতে সেই জাতির অতীত ইতিহাসই হচ্ছে সবচাইতে মোক্ষম অস্ত্র, তখন আমরা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি যে, যে সমস্ত জাতির তেমন

কোন মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত ইতিহাস নেই, তারাও ইতিহাসের নামে কল্পকাহিনী রচনায় ব্যস্ত রয়েছে এবং সেসব স্বকপোলকল্পিত কাহিনীকে ইতিহাসের জামা পরিয়ে তাদের নতুন প্রজন্মকে উপহার দিচ্ছে যেন তারা এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। মিথ্যার এ বেসাতির আশ্রয় নিতে এ সব জাতি এজন্যে বাধ্য হচ্ছে যে, জাতিসমূহের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে এরূপ একটা প্রতীতি সৃষ্টি ব্যতিরেকে তাদের লোকজনকে সক্রিয় ও কর্মোদ্দীপ্ত করে তোলার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। আর এ জন্যে যে জাতি অপর কোন জাতিকে তাদের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তারা ঐ জাতির লোকজনকে তাদের গৌরবময় ইতিহাসকে বিস্মৃত বা বিকৃত করে তাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে তাদেরকে অজ্ঞ রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে মুসলমানই একমাত্র জাতি যার রয়েছে সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য। জাতি তাদের মহৎ ব্যক্তিদের কীর্তিসমূহ সম্পর্কে এমনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যা সকল প্রকার সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত। মুসলমানদের হোমারের এলিয়ড অথবা হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারতের কল্পকাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেননা এসব কল্পকাহিনীর চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর ও গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর বাস্তব উদাহরণ তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে, অথচ ঐ সব কল্পকাহিনীর মিথ্যাচারিতা ও অবিশ্বস্ততার ছোঁয়াও তাতে লাগেনি। মুসলমানদের ফেরদৌসীর শাহ্‌নামা অথবা স্পার্টাবাসীদের কল্পকাহিনীরও কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে রুস্তম ও স্পার্টার ছড়াছড়ি। মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়া বাদশাহ্ বা হাতেম তাঈর গল্পেরও কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের সত্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় অসংখ্য হাতেম ও নওশেরওয়া বিদ্যমান। মুসলমানদের এরিস্টটল, বেকন, টলেমী বা নিউটনেরও কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের পূর্বপুরুষদের মজলিসে এমন সব দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছেন–যাঁদের পাদুকাবহনকেও উল্লিখিত যশস্বী লোকেরা গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

কতই আক্ষেপ ও বিস্ময়ের ব্যাপার, আজ যখন বিশ্বের তাবৎ জাতি নিজেদেরকে বিশ্বদরবারে সমুন্নত করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, তখনও সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানগণ নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন ও নির্বিকার। মুসলমানদের যে শ্রেণীটাকে অনেকটা শিক্ষিত ও সচেতন মনে করা হয়, তারাও তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রবন্ধাদিতে কোন মহৎ ঘটনার উদারহণ দিতে চান তখন মনের অজান্তেই তাঁদের মুখ ও কলম দিয়েও কোন ইউরোপীয়ান বা খ্রিস্টান মনীষীর নামই নির্দ্বিধায় বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তার চাইতেও হাজার গুণ উল্লেখযোগ্য কোন মুসলিম মনীষীর নাম তাঁর জানা থাকে না। এ সত্যকে কে অস্বীকার করতে পারে যে, মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানদের বক্তৃতা-বিবৃতি বা রচনাদিতে নেপোলিয়ান, হ্যানিবল, শেক্সপিয়ার, বেকন, নিউটন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর নাম যত নিতে দেখি, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, সালাহউদ্দীন আইয়ূবী, হাসসান ইব্‌ন ছাবিত, ফেরদৌসী, তূসী, ইব্‌ন রুশদ, বূ-আলী, ইব্‌ন সীনা প্রমুখ মুসলিম মনীষীর নাম ততো নিতে দেখা যায় না। এর একটি মাত্র কারণ আর তা হচ্ছে বর্তমান যুগে মুসলমানরা তাদের নিজ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বিকার। মুসলমানদের এই অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণ হচ্ছে প্রথমত এমনিতেই অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমানদের জ্ঞানস্পৃহা

কম। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ ও অবকাশও তাদের নেই। তৃতীয়ত, সরকারী কলেজ ও মাদরাসাগুলো ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোকে ভারতবর্ষে প্রায় অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। চতুর্থত মুসলমানদের যে শ্রেণীটিকে সাধারণত শিক্ষিত বলা হয়ে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য করা হয় তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষায়তনসমূহে লেখাপড়া করে এসেছেন—যেগুলোতে ইসলামের ইতিহাস পাঠ্যভুক্ত নয়, আর তা পাঠ্যভুক্ত থাকলেও ইসলামের ইতিহাস পদবাচ্য নয়-অন্য কিছু, অথচ তাকে ইসলামের ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কলেজ থেকে ডিপ্লোমা হাসিল করার পর না জ্ঞানার্জনের বয়স বাকী থাকে আর না তার তেমন কোন অবকাশ বা সুযোগ থাকে। মোটকথা আমাদের শিক্ষিত মুসলমানদেরকে সেই ইসলামের ইতিহাসের উপরই নির্ভর করতে হয় যা ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা বিকৃত করে তাদের ইংরেজী পুস্তকাদিতে লিখেছে।

মুসলমানদের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির এ সৌভাগ্য হয়নি যে, ইতিহাসকে একটা সঠিক ভিত্তির উপর রীতিমত একটা শাস্ত্ররূপে দাঁড় করাবে। তাঁদের কেউই তাদের পূর্বপুরুষদের সঠিক ইতিহাস রচনায় সমর্থ হননি। ইসলামের পূর্বে ইতিহাস রচনার মান যে কেমন ছিল বাইবেলের পৃষ্ঠাসমূহ বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলো পাঠই তা উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট। মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনায় যে কঠোর সতর্কতা ও নিয়মানুবর্তিতার স্বাক্ষর রেখেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নযীর নেই। 'উসূলে হাদীস' ও 'আসমাউর রিজালের' মত শাস্ত্রগুলো কেবল হাদীসে নববীর হিফাযত ও খিদমতের উদ্দেশ্যে তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। রিওয়ায়াত বা বর্ণনাসমূহের বাছ-বিচার ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য যে সুদৃঢ় নীতিমালা তাঁরা উদ্ভাবন করছেন পৃথিবী তার সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালে কোন দিন তা প্রত্যক্ষ করেনি।

মুসলমানদের ইতিহাস সংক্রান্ত সর্বপ্রথম কীর্তি হচ্ছে ইল্‌ম হাদীসের বিন্যাস ও সংকলন। ঠিক সেই নীতিমালার ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁদের খলীফাগণ, আমীর-উমরা ও সুলতানগণ, বিদ্বজ্জন ও মনীষিগণের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এসবের সমাহার হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস। মুসলমানদের ইতিহাস হয় না পৃথিবীর জন্যে এক অভাবিত, অভূতপূর্ব অথচ অপরিহার্য উপাদান। অন্যান্য জাতি যেখানে তাদের বাইবেল ও মহাভারত প্রভৃতিকেই তাদের গৌরবজনক 'ঐতিহাসিক' সম্পদ বলে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত ছিল, তখন বিশ্বের মানুষ সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল যে, মুসলমানরা খতীবের 'তারীখ' বা ইতিহাস গ্রন্থকে তাদের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের আলমারী থেকে বের করে সরিয়ে রাখছে। আজ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদেরকে ইতিহাস শাস্ত্রের অনেক খুঁটিনাটি তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা যায়। মুসলমানরা তা দেখে অনেকটা হকচকিয়ে যান এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাদের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের একথাটিও জানা নেই যে, উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী জনৈক স্পেনীয় আরব বংশোদ্ভূত মুসলমান ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদূনের ইতিহাসের ভূমিকা 'মুকাদ্দামায়ে তারীখ'-এর উচ্ছিষ্ট ভোগই গোটা ইউরোপ তথা গোটা বিশ্বকে ইতিহাস শাস্ত্র সম্পর্কে এমনি জ্ঞানদান করেছে যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণাকর্মকে ইব্‌ন খালদূনের মাজারের ঝাড়ুদারকে অর্ঘ-স্বরূপ বিনীতভাবে পেশ করা চলে। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকদের ইতিহাসকর্ম যে কত উঁচুমানের ছিল তা' এ থেকেই অনুমিত হয় যে, মুসলিম বিজ্ঞজনের মজলিসে ইব্‌ন

খালদূনের অনন্যসাধারণ 'মুকাদ্দামা' বাদ দিলে তাঁর আসল ইতিহাসের তেমন কোন মূল্য নির্বিবাদে স্বীকৃত হয়নি।

ইব্‌ন হিশাম, ইবনুল আছীর, তাবারী, মাসউদী প্রমুখ থেকে নিয়ে আহ্‌মদ ইব্‌ন খাওন্দশাহ এবং যিয়াউদ্দীন বারনী পর্যন্ত বরং মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা এবং মোল্লা বদায়ূনী পর্যন্ত হাজার হাজার মুসলিম ঐতিহাসিকের বিপুল গবেষণা কর্ম যে বিশালায়তন ভলিউমসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে, এদের প্রত্যেকটি মুসলমানদের বিস্ময়কর অতীত ইতিহাসের এক একটি খণ্ডচিত্র এবং এদের প্রত্যেকের লিখিত ইসলামের ইতিহাস এমনি উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানরা তা' অধ্যয়ন করে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় যে, আজ শতকরা একজন মুসলমানও নিজেদের জাতীয় ইতিহাস জানার জন্যে ঐসব মনীষীর রচনাবলী পাঠের এবং তার মর্ম উপলব্ধি করার সামর্থ্য রাখে না। অথচ সেই তুলনায় মিল, কার্লাইল, ইলিয়ট, গিবন প্রমুখের লিখিত ইতিহাস পাঠ করার এবং তার মর্ম উপলব্ধি করার মত যোগ্য মুসলমানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ যেহেতু আরবী ও ফার্সীতে রচিত আর ভারতবর্ষের শতকরা একজন মুসলমানও আরবী-ফার্সীতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন নয় বলে সেসব গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। তাই মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হলে জনসাধারণের ভাষায় ইসলামের ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিপূর্বে এ অভাবটির কথা অনেক পূর্বেই অনুভূত হয়েছে এবং অনেকে উর্দু ভাষায় ইসলামের ইতিহাস লিখেছেনও, কিন্তু আজ পর্যন্ত উর্দু ভাষায় এমন একখানি ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত পুস্তক এ বিষয়ে লিখিত হয়নি যাতে স্বল্প অবসরের অপেক্ষাকৃত স্বল্প আগ্রহী লোকেরাও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্বাদি জেনে নিতে পারে।

যদি এ জাতীয় আরো দু'চারটি বই লিখিতও হতো তবুও ইসলামের ইতিহাস এমনি একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আরো লেখকদের তাতে নিজ নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুসারে লেখার অবকাশ রয়েই যেতো। এখন আমি আমার দীনহীন প্রচেষ্টা নিয়োগ করে এ পুস্তকখানি পাঠক সমীপে উপস্থাপিত করছি। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশস্ত হৃদয় লোকদের জন্যে এ বিষয়ে যোগ্যতর রচনাকর্ম পেশের সুযোগ রইলো। আমার ধারণা, মাতৃভাষায় যত অধিক ইসলামের ইতিহাস রচিত হবে মুসলমানরা ততই এ দিকে আকৃষ্ট হবেন।

ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্য

ইসলামের ইতিহাস আসলে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যা বা বিজ্ঞান। এ বিষয়ে হাজার হাজার যোগ্য ঐতিহাসিকের রচিত রচনাবলী মওজুদ রয়েছে। সাধারণত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ নিজেদের সমসাময়িক সুলতানগণ অথবা কোন একটি রাষ্ট্র, জাতি, রাজবংশ বা একজন সুলতানের অথবা কোন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার ইতিহাস ভিন্ন ভিন্নভাবে রচনা করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক কেবল উলামায়ে ইসলামের, কেউ মুসলিম দার্শনিকদের, আবার কেউ কেউ মুসলিম সূফী-দরবেশদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। মোদ্দাকথা, এ জাতীয় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ বিশাল ভাণ্ডার নিয়েই গড়ে উঠেছে ইসলামের ইতিহাস তথা ইসলামের ইতিহাস বিজ্ঞান। যুগ পরিক্রমার সাথে সাথে এ ভাণ্ডার স্ফীত থেকে স্ফীততর

হয়ে চলেছে। ইসলামী সালতানাত ও ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যাও এতই অধিক যে, যদি এক-একটি ইসলামী সালতানাতের ইতিহাস স্বতন্ত্র সংক্ষিপ্ত সংকলনাকারে রচিত হয় তবে সে নির্বাচিত সংকলনগুলোর জন্যেও দু'চারটি আলমারী নয়। পাঠাগারের বেশ কয়েকটি কক্ষেরই প্রয়োজন হবে। একটি মধ্যম অবয়বের ইসলামের ইতিহাস রচনার অর্থ হচ্ছে ঐ সবের সারমর্ম অতি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা। কোন বড় দৃশ্যের ফটো একই কাঠে উঠিয়ে নেয়া অথবা একটা বিরাট প্রাসাদের চিত্র কোন তসবীহ দানার ছিদ্রে পুরে দেয়া একটি অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ, কিন্তু একটি দু' হাজার পৃষ্ঠায় বইয়ে গোটা ইসলামের ইতিহাস পুরে দেয়া নিঃসন্দেহে একটি সুকঠিন কাজ। এজন্যে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে, এ কাজে আমি কতটুকু সফল হয়েছি। একমাত্র পাঠকগণ এ ব্যাপারে ফয়সালা করতে পারবেন যে আমার এ পুস্তকটির মান কি এবং মুসলমানদের জন্যে কতটুকু উপাদেয় হয়েছে।

ঘটনাবলীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট ঘটনার এবং সমসাময়িক যুগের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে সে ঘটনা সম্পর্কে একটি ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করেছি। আমার সেই বদ্ধমূল ধারণাকেই পরে নিজ ভাষায় যথাসম্ভব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছি। যে ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মতবিরোধ রয়েছে এবং কোন একজনের মতকে প্রাধান্য দেয়া সুকঠিন মনে হয়েছে সেখানে প্রত্যেক ঐতিহাসিকের বক্তব্য হুবহু অনুবাদ করে দিয়ে তার বরাত উদ্ধৃত করেছি এবং এ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তও নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছি এবং এ ঘটনার ফল কী দাঁড়িয়েছে তাও ব্যক্ত করেছি। যেহেতু বইটি উর্দু ভাষায় রচিত, তাই উর্দুভাষী হিন্দুস্থানী মুসলমানরাই এ দ্বারা সাময়িক উপকৃত হবেন। এজন্যে আমি ঐসব ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে একটু আলোচনা করেছি—যাদের সাথে ভারত এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকতর সম্বন্ধ রয়েছে অথবা যাদের সম্পর্কে ভারতবাসী অধিকতর জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও যেসব ইসলামী রাষ্ট্র অথবা মুসলিম রাজবংশ সম্পর্কে ভারতবাসী তেমন জ্ঞাত নন বা স্বল্প জ্ঞাত তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করতে এবং ইসলামের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ নক্শা তুলে ধরার ব্যাপারে মোটেই কার্পণ্য বা অবহেলা করিনি। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং পরবর্তী যুগে এমন সব মনীষী সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে—যাঁরা কোন না কোন ইসলামী সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে এমন ধরনের বিবরণ পরিহার করা হয়েছে। তাই বলে সঠিক ইতিহাস রচনায় বা ঐতিহাসিক হিসাবে আমার দায়িত্ব পালনেই ত্রুটি হয়ে যায় তেমন সতর্কতার আশ্রয় আমি নেই নি। আমি ইবাদত ও ইসলামী খিদমত মনে করেই এ ইতিহাসটি প্রণয়ন করেছি এবং এ জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে এর পুরস্কারেরও আশা রাখি।

আমি আমার জ্ঞানগত দীনতার কথা স্বীকার করে নিয়েই বলছি, পদে পদে হোঁচট খাওয়াটাই স্বাভাবিক এবং ভুলত্রুটি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকা এটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে। যারা ভুলত্রুটি নিরসনের উদ্দেশ্যে এর সমালোচনা করবেন, আমি তাঁদেরকে উপকারী বন্ধু বলেই মনে করব। আর যারা বিদ্বেষবশত ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হবেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করছি।

আকবর শাহ্ খান নজীবাবাদী
১লা মুহাররম, ১৩৪৩ হিজরি

ভূমিকা

ইতিহাস

আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় 'তারীখ' বাংলাতে 'ইতিহাস'-এর পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে ঐ বিদ্যা যার মাধ্যমে রাজা-বাদশাহ, নবী-রাসূল, বিজেতা ও বিখ্যাত মনীষিগণের জীবনকাহিনী এবং অতীত যুগের বড় বড় ঘটনা ও রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং যা বিগত যুগসমূহের সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে। কেউ কেউ 'ইতিহাস'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

মানুষের একত্রে বসবাসকে 'তামাদ্দুন' (সংস্কৃতি) এবং সেই সমাজবদ্ধ জনপদকে 'মদীনা' (নগর) বলে। এদের উপর দিয়ে স্বভাবসিদ্ধভাবে অবস্থাদি অতিক্রান্ত হয় তাকে 'তারীখী ওয়াকিয়াত' (ঐতিহাসিক ঘটনাবলী) এবং পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মুখ থেকে শুনে শুনে সে ঘটনাবলীকে সঙ্কলিত করা এবং শিক্ষণীয় উপদেশ স্বরূপ তা পরবর্তীদের জন্যে রেখে যাওয়াকে 'তারীখ' বা ইতিহাস বলে। কেউ কেউ বলেন, আসলে আরবী 'তাখীর' (تاخير) শব্দটিকে উল্টিয়ে 'তারীখ' (تاريخ) শব্দটি বানানো হয়েছে। তাখীর অর্থ পরবর্তীতে নিয়ে আসা, পূর্ববর্তী যুগকে পরবর্তী যুগের দিকে সম্পর্কিত করা। যেমন বলা হয়, অমুক ধর্ম বা অমুক সাম্রাজ্য বা অমুক যুদ্ধের উদ্ভব অমুক সময় হয়েছিল। যে বিশেষ ঘটনাবলী সে যুগটাতে ঘটেছিল, সে সবের শুরু বা সূচনাই হচ্ছে সে সময়টি। মোদ্দাকথা, তারীখ বা ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে এরূপ অনেক বিশেষণ রয়েছে। তার সবকটির সারমর্ম হচ্ছে প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটি। আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, যে সকল অবস্থা ও ঘটনাবলী কাল নির্দেশ করে লিখিত হয়, তাকেই ইতিহাস বলা হয়ে থাকে।

ইতিহাসের প্রয়োজন এবং এর উপকারিতা

ইতিহাস আমাদেরকে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের কাহিনীসমূহ সম্পর্কে অবহিত করে আমাদের মন-মস্তিষ্কে একটি শুভ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। মানুষের প্রকৃতিতে একটা বিশেষ ধরনের পিপাসা এবং স্পৃহা থাকে যা অজানা দেশে ভ্রমণের, বাগবাগিচা ও পুষ্পোদ্যান বিচরণে এবং দুর্গম গিরি-পর্বত ও মরুপ্রান্তরে পরিভ্রমণে উদ্দীপ্ত করে। এই সহজাত প্রবৃত্তিই শিশুদেরকে রাতের বেলা পাখ-পাখালীর গল্প শোনায়, যুবকদেরকে তোতা-ময়নার উপাখ্যান শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ .

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (২১ : ৭)

আল্লাহ্‌র এই সুস্পষ্ট হুকুম তামীল করার মধ্যেই ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রবৃত্তিসমূহের স্রষ্টা আসমানী কিতাবসমূহে

মধুময় আস্বাদন রেখে দিয়েছেন। বনী ইসরাঈলের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বজনবিদিত। এমনকি তারা নিজেদেরকে نحن ابناء الله واحبائه (আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তার প্রিয়জন, নাউযুবিল্লাহ্) বলে অভিহিত করতো। কিন্তু এমন একটি জাতিই যখন নিজেদের পূর্বপুরুষদের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলো তখন তারাও দিন দিন অধঃপতনের দিকে তলিয়ে যেতে লাগলো। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বারবার এই বলে সম্বোধন করেছেন :

يَا بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ الذْكُرُوْا .

"হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর" ... পূর্বপুরুষদের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাস পাঠের উপকারিতা

ইতিহাস পাঠে পাঠকের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়। সৎকর্মের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের প্রবণতা হ্রাস পায়। ইতিহাস পাঠে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। বহুদর্শিতা, সৎসাহস ও সতর্কতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও চিন্তাক্লিষ্টতা দূরীভূত হয় এবং নব-উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে সত্যান্বেষণের এবং সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবল সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে ধৈর্যস্থৈর্য বৃদ্ধি পায় এবং মনমগজ সর্বদা সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে। মোদ্দাকথা, ইতিহাস শাস্ত্র হচ্ছে হাজার হাজার ধর্মোপদেশ বিতরণকারীর মধ্যে অন্যতম এবং শিক্ষা গ্রহণের সর্বোত্তম মাধ্যম। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে পাঠক সর্বদা নিজেকে রাজা-বাদশাহ, দিগ্বিজয়ী নবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া, জ্ঞানীগুণী, দার্শনিক, পণ্ডিত ও কৃতী মনীষীদের দরবারে উপবিষ্ট দেখতে পায় এবং এসব মনীষীদের নিকট থেকে সে অহরহ জ্ঞানার্জন করতে থাকে। বড় বড় রাজা-বাদশাহ, উযীর-উজারা ও সেনাপতিদের দ্বারা সংঘটিত ভুলত্রুটিসমূহের কথা অবগত হয়ে সে নিজেকে এ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। অন্য কোন বিদ্যা পাঠ মানুষ এত সানন্দে ও অবসন্নতামুক্ত হৃদয়ে অব্যাহত রাখতে পারে না, যতটুকু পারে ইতিহাস পাঠে।

ইতিহাসের মাধ্যমে সামরিক বৈশিষ্ট্যাদি সংরক্ষণ

যে জাতি নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং অতীতের গৌরবজনক অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে, তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যাদিও অক্ষুণ্ন থাকে। সে জাতির কোন ব্যক্তি অন্য জাতির মুকাবিলায় কোন ক্ষেত্রেই সাহসহারা বা হৃতবল হয়ে পিছপা হয় না বরং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয় এবং তাতে তারা সাফল্যও অর্জন করে। যে ব্যক্তি তার বাপ-দাদার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে সুযোগ হাতে পেলেই খিয়ানতের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু যার তা জানা আছে যে, অনেক সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও আমার বাপ-দাদা লাখ লাখ টাকার লোভ সম্বরণ করে পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে সম্মান অর্জন করে গেছেন, তার পক্ষে খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গ করা দুষ্কর। অনুরূপভাবে বাপ-দাদার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি সমরক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাঁচাকে পসন্দ করবে। কিন্তু যার একথা জানা থাকবে যে, আমার বাপ-দাদারা অমুক অমুক যুদ্ধক্ষেত্রে অটলভাবে অবস্থান করে সম্মান অর্জন করেছিলেন, সে কখনো সমরক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষার চিন্তা করতে পারবে না বরং বাপ-দাদার স্মৃতি তখন তার পায়ের জিঞ্জির হয়ে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে

বিশ্বস্ততা, সত্য ভাষণ, সচ্চরিত্রতা, লজ্জাশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতির ব্যাপারেও পূর্বপুরুষের ইতিহাস সম্পর্কে অবগতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ অবগতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে থাকে। সম্ভবত একথা চিন্তা করেই আমাদের প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব কোন গৌরবজনক ইতিহাস না থাকলেও মনগড়া রূপকথা ও মিথ্যা কাহিনীসমূহকে ইতিহাসের রূপ দিয়ে কার্যোদ্ধারের প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাঁরা একটু পরোয়া করেন না বা ভেবেও দেখেন না যে, এ মিথ্যাচারের মাধ্যমে সত্য কথনে আদালতের কাঠগড়ায় বা ঐতিহাসিকদের দরবারে তারা কত খাটো ও হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন হবেন।

ইতিহাস ও বংশ কৌলীন্য

ইতিহাসে যেহেতু সৎলোকদের সততার কথা এবং অসৎলোকদের অনাচারের কথা লেখা হয়, তাই কোন নীচ বংশজাত লোকদের কাছে ইতিহাস খুব একটা প্রিয়বস্তু হতে পারে না। পক্ষান্তরে সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের পিতৃপুরুষের গৌরবজনক কীর্তিগুলোকে স্মরণ করে থাকে এবং নিজেদের কৌলিন্য বজার রাখার জন্যে তারা এগুলো অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইতর জাতির কাল-পরিক্রমায় নিজেদের পূর্বপুরুষদের গৌরবজনক কীর্তিগুলোও বিস্মৃত হয়ে যায়। যে জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকদের পিতৃপুরুষরা ধর্মপরায়ণতা, শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-গরিমা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাদের অধঃস্তন পুরুষরা তা কখনো বিস্মৃত হতে পারে না। তাদের পূর্বপুরুষদের এসব গৌরবজনক কীর্তির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে করিয়ে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হবার জো নেই। এজন্যেই ইতিহাসের রসবোধ সাধারণত কুলীন সম্ভ্রান্ত বংশজাত লোকদের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। কোন নীচ বংশজাত লোক, নাস্তিক অথবা কাপুরুষতার জন্য কুখ্যাত ব্যক্তি এ যাবত প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিকদের নেতা হতে পারেনি।

ইতিহাসবেত্তা

একজন যথার্থ ধার্মিক এবং সঠিক চিন্তাধারার লোকই একজন সত্যিকারের ইতিহাসবেত্তা হতে পারেন। তিনি শুধু তা-ই লিখবেন যা' সত্যি সত্যি ঘটেছে। তিনি কোন কিছু গোপনও করবেন না বা নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়িয়েও লিখবেন না। যেসব ক্ষেত্রে স্বল্পবুদ্ধির লোকদের হোঁচট খাওয়ার আশংকা থাকে বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় সেসব ক্ষেত্রে তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই দেবেন বরং এটা ঐতিহাসিকের একটা দায়িত্বও বটে। ইতিহাসবেত্তা কারো অহেতুক তোষামোদও করবে না। আবার বিদ্বেষবশত কারো বিরুদ্ধেও তিনি কিছু লিখবেন না। ইতিহাসবেত্তার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি হবে একান্তই সাদাসিধে, অনাড়ম্বর, সহজবোধ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। ছান্দসিক ভাষা প্রয়োগ ও ভাষার অলংকরণের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক সময় ইতিহাসের আসল বক্তব্যই হারিয়ে যায়। আর এজন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বিরচিত ইতিহাসগুলো নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে প্রতিপন্ন হয়নি। ইতিহাসবেত্তার জন্যে বিশ্বস্ততা হচ্ছে অপরিহার্য গুণ। সত্য ভাষণ ও সদাচারে তাকে অবশ্যই অন্য দশজনের তুলনায় অনন্য হতে হবে। মিথ্যাচার ও বাচালতা থেকে তাকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। ইতিহাসের বিন্যাসে একজন ঐতিহাসিককে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। তারপরও সঠিক তত্ত্ব হস্তগত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তর সংক্রান্ত বিদ্যা, সমাজবিদ্যা এবং পৃথিবীর নানা ধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়াও ইতিহাসবেত্তাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং যুগপৎভাবে কথাশিল্পীও হতে হয় যাতে আপন বক্তব্য তিনি অনায়াসে গুছিয়ে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। এতসব সত্ত্বেও এমন কিছু সমস্যা রয়েই যায় যেগুলোর সমাধান প্রায় অসম্ভব মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, কোন ব্যক্তির থিয়েটারে যাওয়ার কথা একজন রাবী বা বর্ণনাকারী রিওয়ায়াত করলেন। এ রিওয়ায়াতটির দ্বারা বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অথচ নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল যে এগুলোর কোন একটিও যথার্থ বা অযথার্থ। হতে পারে :

১. যে লোকটি থিয়েটারে গিয়েছিল, সে গানের বড় অনুরাগী।
২. গানের অনুরাগী ঠিক সে নয়, তবে সৌন্দর্য অনুরাগী।
৩. আসলে সে সৌন্দর্য অনুরাগীও নয়, ঘটনাচক্রে জনৈকা অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।
৪. আসলে কারো প্রেমিক সে হয়নি, কোন এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের মানসেই সে থিয়েটারে গিয়েছিল।
৫. থিয়েটার সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন ছিল বিধায় সে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল।
৬. থিয়েটারের বিরুদ্ধে কোথাও লোকটির একটি বক্তৃতা করার কথা ছিল, তাই স্বচক্ষে তার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো অবলোকন করার জন্যেই গিয়েছিল।
৭. লোকটির চাকরি ছিল গোয়েন্দা পুলিশের। অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের জন্যেই সে সেখানে গিয়েছিল।
৮. আসলে সে নিজে থিয়েটার দেখা পছন্দ করে না, বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়েই গিয়েছিল।
৯. লোকটি আসলে একজন ধার্মিক আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক ছিল। লোকজনের ভক্তি বিশ্বাসের দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যেই সে এমনটি করেছে।
১০. কেবল পকেটমারার সুবিধার জন্যেই সে থিয়েটারে গিয়েছিল।

মোটকথা, এরূপ একটি রিওয়ায়াত থেকে শত শত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসতে পারে। তারপর একটি সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে অন্যান্য উপাদান থেকে সাহায্য ও সমর্থন নিতে হয়। সে সহায়ক উপাদানের মধ্যেও আবার নানারূপ সংশয় সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ইতিহাস লেখক যদি নিরপেক্ষমনা না হন এবং পূর্ব থেকেই কোন এক নির্দিষ্ট পক্ষের প্রতি তার দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে তার বিরোধী সব দলীল-প্রমাণকে সে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে উপেক্ষা করে যাবে এবং তার স্বপক্ষের দলীল-প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করতে থাকবে। এভাবে নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে।

ইতিহাস পাঠক

ইতিহাস লেখা বা তার বিন্যাস যেমন একটা সুকঠিন কাজ তেমনি তা পাঠ করা বা তা থেকে যথার্থভাবে উপকৃত হওয়াও কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ইতিহাস পাঠকের উচিত অতীত ইতিহাসকে শিক্ষণীয় ব্যাপাররূপে গণ্য করা, অতীতকালের লোকদের অনাচার ও ভুলভ্রান্তির পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেসব অনাচার ও ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত

রাখবার সংকল্প অন্তরে পোষণ করা। সদাচারের সফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেগুলো আত্মস্থ করার জন্যে যত্নবান হবে। দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে এমন কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা কোন পুরুষোচিত কাজ নয়। বিগত দিনের কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, তার জন্যে দু'আ করা বা তার ভুলভ্রান্তির একটা সদার্থ করার চেষ্টা-চরিত্র চালানো কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ, শহর-বন্দর, নগর, পাহাড়-পর্বত, মরুপ্রান্তর বিয়াবানের সফর করার সাথে ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠের মধ্যে একটা বড় রকমের সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে একটা পার্থক্য হলো একজন পর্যটক সারা জীবনের ভূ-পর্যটনের দ্বারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন একজন ইতিহাস পাঠক ততোধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একদিনের বা এক সপ্তাহের অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম। ইতিহাস পাঠক যতবেশী পক্ষপাতদুষ্ট মনমানসিকতার শিকার হবে ইতিহাস থেকে তার উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ততই কম।

ইতিহাসের উৎস

ইতিহাসের উৎসসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে :

১. লিপিবদ্ধ নিদর্শনাদি : যথা পুস্তকাদি, স্মারকলিপি, অফিসিয়াল কাগজপত্র, পরোয়ানাসমূহ, ফায়সালা বা রায়সমূহ, দস্তাবেজ, ফরমান প্রভৃতি।

২. শ্রুতি নির্ভর নিদর্শনাদি : যথা লোকশ্রুতি, লোক কাহিনী, কবিতা ও প্রবাদবাক্য প্রভৃতি।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি বলতে প্রাচীন যুগের নিদর্শনাদি বোঝায়। যথা বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ, দুর্গসমূহ, ঘরবাড়ি, বিভিন্ন ইমারতের শিলালিপি, পাথরের ছবি ও মূর্তিসমূহ, প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, পাত্র প্রভৃতি।

কিন্তু এ উপাদানত্রয় থেকে উপকৃত হওয়া এবং ইতিহাস বিন্যস্ত করা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তীক্ষ্ণ প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, উদ্যম ও অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিরেকে এসব উপাদান একান্তই তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্যমূলক আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, রূপ-রেখা ও ভৌগোলিক অবস্থাদিও ইতিহাসবেত্তার জন্যে সহায়ক প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

ইতিহাসের প্রকরণ

বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করলে ইতিহাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন পরিমাণ পরিমিতির দিক থেকে ইতিহাস দ্বিবিধ হতে পারে ঃ

(১) সাধারণ ইতিহাস ও (২) বিশেষ ইতিহাস। সাধারণ ইতিহাস হচ্ছে সেই ইতিহাস যাতে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মানুষের ইতিহাস বিধৃত হয় আর বিশেষ ইতিহাস হচ্ছে সেসব ইতিহাস যা কোন বিশেষ জাতি, রাষ্ট্র বা রাজবংশের ইতিহাস।

আবার অবস্থার দিক থেকেও ইতিহাস দু'রকমের হতে পারে ঃ

(১) বর্ণনা ভিত্তিক (২) বুদ্ধি ও অনুমান ভিত্তিক।

১. বর্ণনা ভিত্তিক ইতিহাস হচ্ছে ঐগুলো যাতে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াত বা বর্ণনা ঐতিহাসিকের হস্তগত হয়েছে। অথবা ইতিহাসবেত্তা নিজে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ

জাতীয় ইতিহাসই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও উপাদেয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় ইতিহাসে আন্দাজ অনুমানের ঘোড়া দৌড়াবার বা নিছক আন্দাজ-অনুমানমূলক বাস্তব ইতিহাসের রূপ দেবার প্রয়াস চালানোর প্রয়োজন হয় না বরং এ জাতীয় ইতিহাস অনুধাবনের ব্যাপারে ভুলত্রুটি হয়ে গেলে তার নিরসনও হয়ে যায়।

২. বুদ্ধিভিত্তিক ইতিহাস হচ্ছে সেগুলো যা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির শ্রুতিনির্ভর নিদর্শনাদি এবং নিছক আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়ে থাকে এবং ইতিহাসবেত্তার বর্ণনাকারীর সমসাময়িক কোন ব্যক্তির বর্ণনা আদৌ হস্তগত হয় না। যেমন প্রাচীন মিসর, প্রাচীন ইরাক এবং প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস সম্প্রতিকালে লিখিত হয়েছে। এসব ইতিহাস থেকেও প্রভূত উপকার লাভ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে নিশ্চিত জ্ঞান কোনমতেই অর্জিত হতে পারে না।

ইতিহাসের যুগসমূহ

১. প্রাচীন যুগ
২. মধ্য যুগ
৩. শেষ যুগ

প্রাচীন যুগ হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ যুগ পর্যন্ত। মধ্য যুগ হচ্ছে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ যুগ থেকে দ্বিতীয় সুলতান মুহাম্মদের যুগে কনস্টান্টিনোপল বিজয়কাল পর্যন্ত যুগ।

পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর দ্বারা পরবর্তী বা পূর্ববর্তীকালের অন্যান্য ঘটনার কাল নির্দেশ করার রেওয়াজ আছে। যথা আদম (আ) সৃষ্টির এত বছর পর, নূহ (আ)-এর প্লাবনের এত বছর পূর্বে বা পরে, ঈসা (আ) অথবা বিক্রমাদিত্যের জন্মের এত বছর পূর্বে বা পরে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের বা কোন রাজা বাদশাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণের দ্বারাও বর্ষ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আজকাল পৃথিবীতে ঈসায়ী সন (খ্রিস্টাব্দ) ও হিজরী সনের প্রচলনই সর্বাধিক।

ইসলামের ইতিহাস

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র মুসলিম জাতিই এমন একটি জাতি এবং ইসলাম ধর্মই এমন একটি ধর্ম যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আনুপূর্বিক সুসংরক্ষিত রয়েছে। এর কোন একটি অংশ বা অধ্যায়ও এমন নয়–যাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ আছে। মুসলমানরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদাসীনতা প্রদর্শন করেন নি। মুসলমানদের জন্যে এটা সঙ্গতভাবেই গর্বের কারণ যে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রত্যেকটি ঘটনার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার সাহায্যে তাঁরা বিন্যাস ও রচনা করতে পারেন এবং সেসব সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনা অনস্বীকার্য ধারাবাহিকতাও তাঁরা সপ্রমাণিত করতে পারেন। মোদ্দাকথা, পৃথিবীতে কেবল মুসলমানই এমন একটা জাতি যারা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। দুনিয়ায় অন্য কোন জাতি এ ব্যাপারে মুসলমানদের সমকক্ষ নয়। ইসলামের ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে এতই সতর্কতা অবলম্বন

করেছেন যে, প্রতিটি ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে নিজেরা মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা তাতে সন্দেহ হতে পারতো যে, ইতিহাস লেখকের নিজস্ব খেয়ালখুশী ও প্রবণতার ছাপ পড়ায় পাঠকের মনে তার প্রভাব পড়েছে এবং ঘটনা সম্পর্কে তার নিরপেক্ষ বিচারের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। ফলে মনের অজান্তেই পাঠক ইতিহাস লেখকের বিশেষ প্রবণতার অন্ধ অনুসারী সেজে বসেছে। ইসলামের ইতিহাসের মাহাত্ম্য এখন অন্তরে আরো বেশি রেখাপাত করে যখন দেখা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়কে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করলেও তাতে কোনরূপ ত্রুটি বৈকল্য বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র পাওয়া যায় না।

ইতিহাসের ইতিহাস

বাবেল ও নিনোভার ধ্বংসাবশেষ, নজদের মরুভূমিতে 'আদ ইরামের স্তম্ভরাশি, মিসরের পিরামিড ও নারীমূর্তিসমূহ দর্শনে স্বভাবতই মানুষের মনে এগুলোর নির্মাতাদের সম্পর্কে জানবার কৌতূহল জন্মে। অনেকে বাবেলীয়দের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধিবিবেচনা খাটিয়ে অনেকে বর্ণনাও সংকলিত করেছেন। অত্যাশ্চর্য ধরনের লিপিমালা এবং মিসরীয় সংকেতসমূহ অবলম্বনে পিরামিড নির্মাতাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

যেন্দাবেস্তা, দসাতির, সফরঙ্গ, বর্তমানে বিদ্যমান আসমানী কিতাবাদি এবং বাইবেল, বাল্মিকীর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এমন সব গ্রন্থ যেগুলো সম্পর্কে ভুল শুদ্ধ কিছু না কিছু ইতিহাস জানা যায়। প্রত্যেক ভাষার বাকবিধি, প্রবাদবাক্য, প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি, স্বর্ণ-রৌপ্য ও তাম্রনির্মিত গহনাপত্র, প্রস্তরমূর্তি, মিসরের মমিকৃত সুসংরক্ষিত শবদেহসমূহ, অশোকের স্তম্ভসমূহ, রুস্তমের সিংহাসন, চীনের মহাপ্রাচীর প্রভৃতি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয় এবং এগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বের ইতিহাস যদিও অবগত হওয়া নাও যায়, তবুও এগুলোর দ্বারা ইতিহাসের উপর বেশ কিছু আলোকপাত হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয়দের সত্য মিথ্যা কাহিনীসমূহ, মিসরীয়দের প্রাচীন শিলালিপিসমূহ, চীনাদের প্রাচীন লোক কাহিনীসমূহ, পারসিকদের প্রাচীন ইমারতসমূহের ধ্বংসাবশেষ, গ্রীকদের লিপিসমূহ বিশেষত হিরোডোটাসের রচনা, ইসরাঈলী রিওয়ায়াতসমূহ, প্রভৃতি মিলিয়ে ইতিহাসের অপরিহার্য এবং প্রাথমিক উপাদান।

ইতিহাসের সূচনা

রোমীয় এবং গ্রীকদের আমল বিশেষত আলোকজান্ডারের বিজয়সমূহের দ্বারা ইতিহাসের সেই অংশের সূচনা হয়েছে–যা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ইতিহাস এমনিভাবে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরছে যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তারপর খুব কমই বিঘ্নিত হয়েছে। সাধারণত সেই থেকেই ঐতিহাসিক যুগের সূচনা বলে গণ্য হয়ে থাকে। গ্রীস, মিসর ও ইরানের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে আগ্রহী ইতিহাস পাঠকরা যেমন আনন্দিত ও উৎসাহিত হন, তেমনি ভারতের ইতিহাস পাঠকালে তারা এই লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হন যে, এই ঐতিহাসিক যুগেও ভারতবর্ষকে ঘন তমসাচ্ছন্ন মনে হয়। এখানকার লোকদের এই উদাসীনতার জন্যে পৃথিবীর ইতিহাস লেখকগণ কঠিন সমস্যায় নিপতিত হন যখন তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এখানকার লোকেরা যতসব রূপকথা ও কল্পকাহিনীকে ইতিহাসের রূপ দিয়ে বসে আছে। এরা কোন দিন

যথার্থ ইতিহাস সরল ভাবে উপস্থাপিত করতে পারে নি। এই শস্য-শ্যামল ও জনাকীর্ণ দেশ ভারতবর্ষের ঠিক বিপরীত আরবের মরু রাজ্য তাদের বর্ণনার বিশুদ্ধতা, স্মরণশক্তির প্রখরতা, বংশপঞ্জি সংরক্ষণে নিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আনুপূর্বিক যথার্থভাবে উপস্থাপনের অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে–যদ্দরুন সেই অসাধারণ জাতিগুলোও ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ইতিহাসের সত্যিকারের সূচনা

এবার কুরআনুল কারীম নাযিল হতে লাগলো। আরবরা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত সভ্যতা-সংস্কৃতি আরব সংস্কৃতির মুখে খড়কুটো বা ধূলোবালি প্রতিপন্ন হলো। সত্যিকারের ইতিহাস এবার শুরু হলো। হাদীস রিওয়ায়াতের যাচাই-বাছাই এবং 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রের উদ্ভাবনের অনন্য সাধারণ কীর্তিদ্বয়ের কথা বাদ দিলেও মুসলমানদের মধ্যে এমন শত শত হাজার হাজার ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা ইতিহাস প্রণয়নে এমন অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন যে, পাঠক মাত্রকেই তা অভিভূত করে। সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির এমন কোন দিক নেই, যে ব্যাপারে মুসলিম ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাস প্রণয়ন করেন নি। ইতিহাসের প্রাণ হচ্ছে তার রিওয়ায়াত বা বর্ণনার বিশুদ্ধতা। এ ব্যাপারটি মুসলমানরা এতই নিষ্ঠার সাথে সংরক্ষণ করেছেন যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতি তার উদাহরণ দেখাতে ব্যর্থ। এমনকি অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতির ইতিহাস প্রণয়নেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাদের মেধা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয় করেছেন।। ইতিহাসকে একটা শাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত করা মুসলমানদেরই কার্তি। ইতিহাসের মূলনীতির উদ্‌গাতা ইব্‌ন খালদূন চিরদিন ঐতিহাসিকদের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করতে থাকবেন। যখন মুসলিম জাতির পতন শুরু হলো এবং মুসলিম ঐতিহাসিকের মধ্যে পূর্ববৎ উৎসাহ-উদ্দীপনা আর তেমন অবশিষ্ট রইল না 'তখন থেকে তাদেরই ছাত্র ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাদের সে আরদ্ধ কাজ সমাপ্ত করার কাজে ব্রতী রয়েছেন।

সাম্রাজ্যের ইতিহাস

পশুর তুলনায় মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পশুকে যেখানে সীমাবদ্ধ শক্তি-সামর্থ্য দেয়া হয়েছে যা সহজাতভাবে তার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান, সেখানে মানুষকে এমন সম্ভাবনার অধিকারী করা হয়েছে যে, সে তার শক্তিকে যতই বৃদ্ধি করতে চায় ততই তার শক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে। এ কথাটি এভাবেও বলা যায়, মানুষ সর্বদা উর্ধ্বগামী। সে সর্বদা নীচ থেকে উপরের দিকে আরোহণ করার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে অনেক বেশী উর্ধ্বে সমাসীন হয়ে যায়, অন্যদেরকে সে যেহেতু অনেক নীচে দেখতে পায়, তাই নিজে পরিপূর্ণ না হলেও আপেক্ষিকভাবে নিজেকে অনেক পরিপূর্ণ দেখতে পায়। কিন্তু সাথে সাথে তার এ পূর্ণতা যেহেতু আপেক্ষিক এবং তার উন্নতির অবকাশ থেকেই যায় তাই তার চাইতে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর লোকদের তুলনায় নিজেকে সে অপূর্ণই দেখতে পায়। অপর কথায় বলা যায়, মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই উবুদিয়্যত বা দাস্যভাব বিরাজমান। সে তার শক্তি সামর্থ্যদাতা উপকারী সত্তার কাছে স্বভাবজাতভাবেই বিনীত।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ .

আমি জিন ও মনবজাতিকে সৃষ্টিই করেছি ইবাদত করার জন্যে। (৫১ : ৫৬)

যে মানুষটিকে সকলের শীর্ষে ও উর্ধ্বদেশে সমাসীন দেখা যায় তাই স্বভাবত অন্যরা তার কাছে মাথা নত করে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এটাই হচ্ছে বাদশাহীর মৌল দর্শন আর এ থেকেই সেই বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির তাৎপর্য বোধগম্য হয়, যাতে বলা হয়ে থাকে যে, বাদশাহ্ বা শাসক হচ্ছে রূপকভাবে আল্লাহ্র ছায়াস্বরূপ। এখানে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, বাদশাহ্ বা শাসক প্রকৃতই কামেল বা পরিপূর্ণ সত্তা নয়, এ কেবল আপেক্ষিক পূর্ণ মাত্র-যাকে কেবল রূপক অর্থেই পূর্ণ বলা চলে। কেননা, প্রকৃত পূর্ণ সত্তা কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি সকল সীমাবদ্ধতা, সমকক্ষতা, নশ্বরতা ও অপূর্ণতার উর্ধ্বে সমাসীন একক অবিনশ্বর স্বয়ম্ভূ ও অপরিহার্য সত্তা, সমস্ত গুণের আঁধার। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, শাসক, হাকিম, সার্বভৌমত্বের অধিকারী একক বিধানদাতা। মোটকথা মানুষ যেহেতু স্বভাবজাতভাবে সর্বদা তার আপন সত্তায় অনেক দীনতা ও অপূর্ণতা দেখতে পায়, তাই আনুগত্য ও মাথা নত করার সহজাত প্রবৃত্তিও তার মধ্যে নিহিত এবং এর স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে তাকে বারণ করা হয়েছে :

اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِىْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ .

আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকেরও। (৪ : ৫৯)

রূপকভাবে আইন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী কেবল সেই বাদশাহ্ বা রাজন্যই হতে পারেন, যিনি আপেক্ষিকভাবে অন্যদের তুলনায় পূর্ণত্বের অধিকারী। তাই বলা যায়, প্রত্যেক পূর্ণ ও শক্তিমানই তার চাইতে অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ এবং শক্তিহীনকে তার কর্তৃত্বাধীন বা প্রভুত্বাধীন দেখতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু মানব চরিত্রে তার স্বভাব-বিরোধী কাজ করার এবং আপন প্রতিভা ও শক্তির বিকাশের পরিবর্তে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হওয়ার এবং শক্তির অপচয়ের প্রবণতা ও সুযোগও বিদ্যমান রয়েছে, এজন্যে এটাও অপরিহার্য ছিল যে, কখনও দেখা যাবে, কোন ব্যক্তি এক সময়ে অন্যদের তুলনায় অনেক অপরিপূর্ণ ও পশ্চাৎগামী হওয়া সত্ত্বেও আপন স্বভাবধর্মের বিপরীতে সে সেই ক্ষমতা ও যশই কামনা করবে যা কোনমতেই তার প্রাপ্য নয়, বরং তা কেবল পূর্ণ সত্তারই প্রাপ্য হতে পারে। বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ এখানেই নিহিত। কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রধান হেতু দু'টিই হতে পারে; প্রথমটা রূহানী বা আধ্যাত্মিক, অপরটি দৈহিক বা বাহ্যিক। অন্য কথায় প্রথমটি হচ্ছে নবুওয়াত এবং দ্বিতীয়টি সালতানাত বা রাজত্ব।

সালতানাত বা জড়বাদী রাজত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট পূর্ণতার বর্ণনা তালূত এবং হযরত দাঊদ (আ)-এর রাজত্বের বর্ণনায় এভাবে রয়েছে :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا .

তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তালূতকে বাদশাহ্ মনোনীত করেছেন। (২ : ২৪৭)

বনী ইসরাঈল তালূতকে বাদশাহ মনোনীত হওয়ার সংবাদে প্রতিবাদ বা আপত্তি উত্থাপন করলে জবাবে বলা হলো :

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ .

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের উপর রাজত্বের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাকে বিদ্যাবুদ্ধি ও দেহাবয়বে তোমাদের মধ্যে সেরা ব্যক্তি করেছেন। (২ : ২৪৭)

তারপর দাউদ (আ) সম্পর্কে বললেন :

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .

এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করলেন এবং তাঁর অভিপ্রায়-অনুযায়ী তাকে জ্ঞান দান করলেন। (২ : ২৫১)

ইতিহাস পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কোন জাতির গোত্রপ্রীতি ও জাত্যাভিমানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পেরেছে এবং জ্ঞানবুদ্ধি, স্বাস্থ্য বা দেহসৌষ্ঠবে অন্যদের তুলনায় প্রাধান্য অর্জন করেছে সে-ই-তার জাতির নেতা ও রাজন্যপদে অনায়াসে বরিত হয়েছে। আজ থেকে তিন হাজার বছর পূর্বেও দৈহিক শক্তিমত্তা রাজত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে–যার সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিগত প্রাধান্যও অপরিহার্য উপাদানরূপে বিবেচিত হয়েছে। তারপর শনৈ শনৈ মানব জাতির মধ্যে যতই নতুন নতুন গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে ততই রাজন্যের গুণাবলী ও পূর্ব শর্তের পরিধিও বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে চলেছে। মোদ্দাকথা চিরকালই রাজা-বাদশাহ্ বা রাজন বলতে মূল্যবান ও গুণধর ব্যক্তিরাই বিবেচিত হয়ে এসেছেন। আর যখনই এর ব্যতিক্রমে অযোগ্য লোকেরা এ শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে তখনই নানারূপ ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও পাওয়া যায় না। প্রতিটি মানুষ যেহেতু জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং অধ্যবসায় সাপেক্ষে লভ্য যে মাহাত্ম্য ও গুণাবলী মানুষকে রাজা-বাদশাহর মর্যাদায় উন্নীত করে তাতে সকলেরই সমান অধিকার।

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى .

যে যতটুকু চেষ্টা করবে সে ততটুকুই কর্ম লাভ করবে।

প্রতিটি জাতির সবচেয়ে গুণধর ব্যক্তি তার স্বীয় গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের দ্বারা আপন সমগোত্রীয় বা সমজাতীয়দের রাজার আসনে সমাসীন হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের মোড়ল তার গ্রামের রাজাস্বরূপ। আর এটা হচ্ছে আদি মানবগোষ্ঠীর রাজত্বের নমুনা-যা আজো আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। আজো আমরা এ ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নির্দেশ করতে পারবো না। হাঁ, তা তখনই পারবো যখন যোগ্যতর ব্যক্তির স্থলে অযোগ্য ব্যক্তি শাসক পদে বরিত হয় বা কোন গ্রাম বা মহল্লার মোড়ল-মাতব্বর (মেম্বার-চেয়ারম্যান) সেই গ্রাম বা জনপদের যোগ্যতর ব্যক্তিটি না হবে।

ব্যক্তিতন্ত্র ও গণতন্ত্র

মানুষ যেমন সৃষ্টির সেরা এবং গোটা বিশ্বের সবকিছুর সেবা সে লাভ করছে, তেমনি এটাও তার স্বভাবজাত যে, কোন উচ্চতর শক্তির কাছে সে মাথা নত করে তারই দ্বারা সে পরিচালিত হয়। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার প্রেরণা যোগায় এবং সমস্ত বাতিল উপাস্যকে বর্জন করে একক লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শয়তান যে ব্যাপারে মানুষকে সবচাইতে বেশি ধোঁকায়

ফেলেছে তা হলো শাসক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কথা বিস্মৃত মানুষ উত্তরাধিকার ও বংশগত সম্পর্ককে এর একটি অপরিহার্য পূর্বশর্তরূপে মেনে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অযোগ্য লোকেরা কেবল পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহর সন্তান বা উত্তরাধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে রাজা-বাদশাহ বনে গিয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদেরকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করার সুযোগ লাভ করেছে। মানব জাতির এ ভুলের দরুন পৃথিবীতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে এবং এজন্যে মানব জাতিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

কুরআনুল কারীম নাযিল হয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নবীরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীবাসীকে তাদের এ বিশ্বজোড়া বিভ্রান্তি ও পর্বততুল্য ভ্রান্তির অপনোদন করেছেন। এর সমস্ত মানবীয় গুণের অধিকারী নবী করীম (সা) স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করে নবুওয়াত ও রিসালতের গুরুদায়িত্ব পালনের সাথে সাথে পার্থিব রাজ্য পরিচালনার প্রকৃষ্ট নমুনাও বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্যের শাসক কেমন হতে হয় এবং তার দায়িত্ব ও ইখতিয়ারের গণ্ডি কি ? তাঁর অব্যবহিত পরে তাঁর সাহচর্য ধন্য এবং তাঁরই হাতে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত, তাঁর হাতে গড়া সর্বোত্তম মানব শ্রেণী অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম তাঁর শিক্ষা অনুসারে সর্বোত্তম ব্যক্তিটি অর্থাৎ শাসক হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তিটিকে তাঁদের শাসকরূপে নির্বাচিত করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর ইতিহাসে শয়তানের সেই ভোজবাজিটির অবসান ঘটলো যে, শাসক হওয়ার জন্যে অবশ্যই পূর্ববর্তী শাসকের উত্তরাধিকারী বা সন্তান হতে হবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পর হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নির্বাচনও যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয় এবং তাঁর পরে হযরত উছমান গনী (রা)-এর নির্বাচন যদিও বংশগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে হয়নি, তবুও মুসলমানদের কোন কোন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মনে এ ব্যাপারে কিছুটা অনীহার ভাব বিদ্যমান ছিল এবং উসমান (রা) তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছিলেন।[১] তাই তাঁর শাসনামল বিক্ষোভমুক্ত ছিল না। তাই বলা যায়, হুযূর (সা) রাসূল হিসাবে যেভাবে দীর্ঘ তেইশ বছরকাল তাঁর আপন জীবনকে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি ১ম হিজরী থেকে ২৩ হিজরী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য শাসনের আদর্শও সুদীর্ঘ ২৩ বছরকাল বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যেভাবে হুযূর (সা)-এর জীবনের নবুওয়াতী জীবনের তেইশটি বছর মানবজাতির অনুকরণীয় আদর্শ, ঠিক তেমনি তাঁর মাদানী জীবন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফত কালব্যাপী তেইটি বছর বিশ্বের রাজন্যবর্গের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্বরূপ।

খিলাফতে রাশিদার পর মানবীয় দুর্বলতা এবং শয়তানী ভোজবাজি আবার উত্তরাধিকার সম্পর্কে শাসক হওয়ার জন্যে অপরিহার্য পূর্বশর্তের মর্যাদা দিয়ে দিল এবং আবার শাসক হওয়ার জন্যে যোগ্যতর লোকের স্থলে অযোগ্য পাত্ররাই পূর্ববর্তী শাসকের উত্তরাধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে শাসক হওয়ার যোগ্যপাত্র বলে বিবেচিত হতে লাগলো। ফলে যোগ্য শাসকদের

---

১. সত্যিকারের ইতিহাস বিচারে এ বক্তব্য আংশিক সত্য মাত্র। যেমন, হযরত উসমান (রা) তাঁর যেসব আত্মীয় ও স্বগোত্রীয়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে, তাঁদের অধিকাংশই তাঁর খিলাফত আমলের পূর্ব থেকেই গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোত্রীয় জিহালত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই এসব প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল—অনুবাদক।

অযোগ্য উত্তরাধিকারীরাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে লাগলো। এ অযোগ্য লোকদেরকে পদচ্যুত করতে প্রচুর মেধাক্ষয় এবং কষ্ট ও নির্যাতন স্বীকার করতে হতো। অবশেষে এসব নির্যাতনে উত্যক্ত হয়ে লোকজন সেই গণতন্ত্রের দ্বারস্থ হলো—যা আজকাল ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দৃষ্ট হয়ে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে বংশগত উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্র যেমন মানবজাতির জন্যে অনিষ্টকর ছিল, তেমনি এসব গণতন্ত্রও মানব জাতির জন্যে উপাদেয় ও আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারে না। মানব জাতির স্বভাবধর্মের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল এবং সর্বপ্রকারে উপাদেয় কেবল সেই রাজ্যশাসন পদ্ধতিই যা হিজরী শতকের প্রথম চতুর্থাংশ বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল—যা গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সাধারণ ভোটে তিন অথবা পাঁচ বছরের জন্যে কোন এক ব্যক্তিকে তাদের শাসক নির্বাচিত করে—যাকে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। একজন মানব দরদী রাষ্ট্রপতির যতটা শক্তি থাকা প্রয়োজন সাধারণত এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সে ক্ষমতা থাকে না। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এ ব্যবস্থার রাষ্ট্রপতিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেন রাষ্ট্রের সত্যিকারের কোন কেন্দ্রীয় পরিচালকের শক্তি নেই এবং মূল শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যত এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি খুবই চমকপ্রদ ও জনপ্রিয়। কেননা, এতে জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ হাতে পায় এবং স্বৈরতন্ত্রের শক্তিকে দুর্বল দেখতে পেয়ে আনন্দবোধ করে। কিন্তু এতে তারা নিজেদের অনেক ক্ষতিও সাধন করে থাকে। বল্গাহারা স্বাধীনতা এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন আস্থা মানবীয় মর্যাদা রক্ষার অনুকূল প্রতিপন্ন হয় না। এ কারণেই ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে আধ্যাত্মিকতা উৎসন্নে গেছে। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের শিক্ষাশ্রিত উঁচুদরের নৈতিকতা এমন কোন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না, যেখানে গণতন্ত্রের তরঙ্গমালা উপচে পড়ছে। গণতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে এমনি বল্গাহীন করে তোলে যে, তা মানুষের বেশীক্ষণ আল্লাহ্‌মুখী ও আল্লাহ প্রেমিক হিসাবে কায়েম থাকতে দেয় না। নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার চারণভূমি। মরুভূমিতে যখন শস্য উৎপন্ন হতে পারে না, পানি থেকে বের করে নিলে মাছ যেমন জীবন ধারণ করতে পারে না, অন্ধকার স্যাতসেঁতে স্থানে মানুষ যেভাবে সুস্থ থাকতে পারে না, তেমনি নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনা, বিধি-নিষেধ ও ইবাদত-বন্দেগীর বিকাশ ঘটতে পারে না এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা সেখানে বেশীক্ষণ জীবন্ত থাকতে পারে না। ধর্মের প্রাণ হচ্ছে আনুগত্য এবং সত্য ধর্মের আনুগত্য মানব চরিত্রের সেই মৌলিক স্পিরিটকে অক্ষুণ্ন রাখে যে, প্রত্যেক সম্মানার্হ ঊর্ধ্বতম সত্তাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু সর্বোচ্চ সত্তা এবং নিরংকুশ কামালিয়ত বা পূর্ণতা কেবল তাঁরই, তাই তাঁর দরবারে সিজদারত হয়ে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'এর স্বীকারোক্তি করা উচিত। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী-রাসূল পথ-প্রদর্শকই এ সঙ্গত দাবীই করেছেন যে, হে মানব জাতি। আমার বিধি-নিষেধ মেনে নাও, আমার আনুগত্য কর। আর এটা অনস্বীকার্য যে, এ নবী-রাসূল, পথ-প্রদর্শকদের নিঃশর্ত অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমেই মানব জাতি চিরদিন মঙ্গল ও সাফল্য লাভ করেছে এবং সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এ উন্নত ব্যবস্থার জন্যে বিষতুল্য এবং মানুষকে বল্গাহারা করে

দিতে প্রেরণা যোগায়, তার ফলাফল মানবজাতির জন্যে কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না। পৃথিবীর প্রতিটি পিতা তার সন্তানের আনুগত্য আশা করে এবং সন্তানের জন্যেও তার পিতার আনুগত্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। প্রতিটি শিক্ষক তার শাগরিদের আনুগত্য চায়। প্রত্যেক পীর তার মুরীদের আনুগত্য চায় এবং শাগরিদ ও মুরীদের জন্যে তাদের শিক্ষক ও পীরের আনুগত্যেই মঙ্গল নিহিত। প্রতিটি নেতা তার দলীয় কর্মীর আনুগত্যের প্রত্যাশী এবং কর্মীর মঙ্গল নেতার আনুগত্যেই নিহিত। প্রতিটি সিপাহসালার যুদ্ধক্ষেত্রে তার সৈনিকের আনুগত্যের প্রত্যাশী এবং সৈনিকের মঙ্গলও তার সেনাপতির নিঃশর্ত আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। গণতন্ত্রের সামগ্রিক প্রভাবে পুত্র তার পিতার, শাগরিদ তার উস্তাদের, মুরীদ তার পীরের, জনতা তার নেতার, সৈনিক তার সিপাহসালারের আনুগত্যকে একটি বোঝাস্বরূপ মনে করে এবং ধীরে ধীরে সে আনুগত্যের প্রবণতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে মানুষ নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে যা তাকে মানবতার গণ্ডি থেকে বের করে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিতে চায়। গণতন্ত্রের ব্যবস্থা যেহেতু ধর্ম বিরোধী প্রতিপন্ন হয়েছে তাই এ ব্যবস্থা দ্বারা ধর্মের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে, সুখ-শান্তি সেই পরিমাণই রাষ্ট্র ও জাতি থেকে বিদায় নেবে। কেননা, সত্যিকারের রাজনীতি ও সুখ–শান্তি কেবল ধর্মের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোনদিনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি। আপন বাড়ীর গণ্ডিতে, নির্জন স্থানে বিজন বন বা মরুভূমিতে, পথে-ঘাটে প্রান্তরে মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা পুলিশের আওতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। এ সব ক্ষেত্রে মানুষকে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপাচার থেকে একমাত্র ধর্মই নিবৃত্ত রাখতে পারে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বের মানুষ যদি ধর্মহীন হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবী চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি পাপাচারে পূর্ণ একটি জাহান্নামের রূপ পরিগ্রহ করবে।

ইউরোপ আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এমন কোন সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই না যদ্দরুন সঙ্গতভাবে আমরা ঈর্ষা করতে পারি। এসব দেশে ধর্মহীনতার জয়জয়কার। এদের সমাজ অশ্লীলতায় পূর্ণ। প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা প্রভৃতি তাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন নেপোলিয়ন, কায়সার, উইলিয়াম, জুলিয়াস সীজার, তৈমুর, হ্যানিবল, সালাহউদ্দীন, সুলায়মান কানুনী, শেরশাহ, আলমগীর কস্মিনকালেও সৃষ্টি হতে পারে না বা সৃষ্টি হলেও বেঁচে থাকতে পারে না। এমন ব্যবস্থায় কোন খালিদ ইবন ওয়ালীদের জন্মগ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের প্রতারিত হওয়ার এবং হীনম্মন্যতার শিকার হওয়ার সম্ভবত এটাই সর্বনিকৃষ্ট নমুনা যে, আজ আমরা অনেক মুসলিম সন্তানকেও পাশ্চাত্যের ঐ গণতন্ত্রের প্রত্যাশী লক্ষ্য করছি। অথচ এ ব্যবস্থাটি হচ্ছে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং মানব জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মুসলমানদের এ প্রবণতার মূলে রয়েছে তাদের কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতা। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কুরআন হাদীস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করার ফলেই এ হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যক্তিশাসন ও রাজতন্ত্র

যখন কোন ব্যক্তি রাজ্যের বা সিংহাসনের মালিক বনে বসে তখন রক্ত ও বংশের সম্পর্ক এবং সহজাত প্রবৃত্তি তাকে এ জন্যে উদ্বুদ্ধ করে যেন সে তার সন্তানকে তার ব্যক্তিগত সম্পদরাশির উত্তরাধিকারী করার সাথে সাথে তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী

করে যায়। কিন্তু আসলে এটা তার ভুল বৈ কিছু নয়। কেননা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল না বরং এটা ছিল একটা আমানত—যা দেশ ও জাতি তার উপর অর্পণ করে রেখেছিল। এ আমানতে খিয়ানত করে অপর কাউকে স্বেচ্ছায় তা হস্তান্তরিত করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে ? আমানত তার প্রকৃত মালিকের হাতেই প্রত্যর্পণ করতে হয়। তাই ঐ শাসকের পর শাসন ক্ষমতায় অন্য কাউকে আসীন করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জাতির দায়িত্ব তা ঐ শাসকের দায়িত্ব নয়। কিন্তু বাদশাহ, খলীফা বা শাসক যেহেতু শক্তির সমস্ত উৎস ও কেন্দ্রের উপর ক্ষমতাবান থাকে তাই তাকে তার খিয়ানত থেকে বিরত রাখার জন্যে বিপুল সৎ সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন। ইসলাম তার প্রতিটি অনুসারীর মধ্যে সেই সৎ সাহস ও মনোবল সৃষ্টি করতে চায় এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনুল কারীম সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তা সৃষ্টি করেও ছিলেন। মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা থেকে যতই দূরে সরে যেতে লাগলো ততই তাদের মধ্যে সেই সৎ সাহসের অভাব দেখা দিতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তারা তা হারিয়ে ফেললো-যা দ্বারা তারা শক্তিমান শাসকদেরকে খিয়ানত থেকে বিরত রাখতে পারতো। ফলে তারা শাসকদের খিয়ানতের কাছেই আত্মমর্পণ করে বসলো। অবশেষে খিলাফতে রাশিদার সোনালী যুগে মিটে যাওয়া ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটলো মুসলিম সমাজে। এ বদ রুসূমের কাছে আত্মসমর্পণের কুফলও অনেকবারই মুসলমানদেরকে হাড়ে হাড়ে ভুগতে হয়েছে। উত্তরাধিকারীদেরকে শাসনভার হস্তান্তরের এ কুপ্রথার ফলে অনেক সময় এমন সব অযোগ্য অকর্মণ্য লোক মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে যাদের মামুলী ভদ্রলোকদের দরবারে বসার মত যোগ্যতাও ছিল না। অবশ্যই মুসলমানদের এমন একজন সুলতান বা খলীফা হওয়া উচিত-যিনি হবেন সমস্ত মুসলিম সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি বা অধিকাংশ মুসলমানের বা সকলের সমর্থনপুষ্ট ও সকলের দ্বারা নির্বাচিত। কোন ব্যক্তির সুলতান বা উত্তরাধিকারী হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই তার খলীফা হওয়ার যোগ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ হতে পারে না।

মুসলমানদের মধ্যে যদি উত্তরাধিকারীদেরকে রাজ্যক্ষমতা হস্তান্তর তথা রাজতন্ত্রের এ কুপ্রথা জারি না হতো এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের মতো পবিত্র আমানতের মর্যাদা নিয়ে অবশিষ্ট থাকতো তাহলে আজ ইসলামী হুকুমত ও মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা আমাদের দেখতে হতো না। কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্যী বুঝি এরূপই ছিল এবং অদৃষ্টের সে লিখনই বাস্তবায়িত হলো। মুসলিম সমাজ যদি গোড়াতেই এর বিরোধিতা করতো এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারটিকে সুসংরক্ষিত রাখতে ত্রুটি না করতো তা হলে প্রথম প্রথম হয়তো তাদেরকে এজন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হতো, তারপর কোন শাসকের এরূপ দুর্গতি হতো না যে নিজের পরে সে তার পুত্রকে শাসক মনোনীত করতে বা যুবরাজ বলে ঘোষণা করতে পারে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর একাধিক পুত্র রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে যেহেতু উমর ফারূক (রা)-ই মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচিত হয়েছেন, তাই তিনি তাঁকে শাসক নিযুক্তির পক্ষেই মুসলমানদেরকে সুপারিশ করেন। হযরত উমর (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর নিঃন্দেহে মুসলমানদের খলীফা হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) যেহেতু রাজতন্ত্রের কুপ্রথাকে

নির্মূল করতে আগ্রহী ছিলেন, তাই তিনি ওসীয়ত করে যান যেন অবশ্য তাঁর পুত্রকে খলীফা নির্বাচিত করা না হয়।

লোকে মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার দরুন ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের কুফলাদি দর্শনে তার মৌল কারণ সম্পর্কে না জেনে সাধারণভাবেই এর বিরুদ্ধাচরণ করে গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের যত কুফল আমাদের চোখে পড়ে তার মূল কারণ হচ্ছে রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হয়ে পড়ে এবং শাসক নির্বাচিত করার জনগণের অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাই যুক্তির কথা হলো, আমরা অকল্যাণের আসল হেতু বা উৎস উত্তরাধিকারকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেবো না এবং পিতার পর পুত্র যদি প্রকৃতপক্ষে সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি না হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তাকে আমাদের শাসক হতে দেবো না। আর যদি প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিটিই রাজ্যের বা জাতির যোগ্যতম ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে জনসাধারণের সম্মতি বা রায় পাওয়ার পরই কেবল শাসকরূপে বরণ করা হবে। এটা কোথাকার বুদ্ধিমানের কথা যে, একটি ভুলের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আরেকটি ভুলের শিকার হতে হবে! ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রে জনসাধারণের সৎ সাহসের অভাবের দরুনই বাদশাহদের জনগণকে শোষণ ও অত্যাচার করার সাহস বেড়ে যায়। কাউকে যোগ্যতম ব্যক্তি জেনে তার আনুগত্য করা এবং তার জুলুমের ভয়ে তার আনুগত্য করার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একথাটি হয়তো এভাবে বোধগম্য হতে পারে যে, হযরত উমর (রা)-এর কোন কোন প্রাদেশিক গভর্নর বলেন, আমাদের কাছে এরূপ মনে হতো, হযরত উমর (রা)-এর এক হাত আমাদের উপরের চোয়ালের উপর, এর অপর হাত আমাদের নীচের চোয়ালের উপর রয়েছে। মনে হতো, আমরা যদি একটুও ব্যতিক্রম করি, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের উভয় চোয়াল টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিবেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আদেশ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলো। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রধান সেনাপতির পদ থেকে মামুলী সৈন্যের পর্যায়ে নেয়ে গেলেন। আর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মতো বিজয়ী বীর বিনা বাক্য ব্যয়ে তা তাৎক্ষণিকভাবেই মেনে নিচ্ছেন! আবার অন্য দিকে দেখুন, প্রকাশ্য মিম্বরে উমর ফারূক (রা)-এর মত জাঁদরেল শাসককে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, আর মামুলী প্রজা তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা নিচ্ছে। জনৈক অবলা মহিলা মোহরানার ব্যাপারে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খুতবা শুনে নিঃসংকোচে আপত্তি উত্থাপন করছে আর খলীফাও মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন যে, মদীনার রমণীরা যদি এভাবে তাঁকে ভুল ধরিয়ে দেয়, তবে তিনি অবশ্যই তাদের সঙ্গত আপত্তির মর্যাদা রক্ষা করবেন। এবার চিন্তা করুন, এ কেমন ধরনের আনুগত্য-যা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর জনগণ তাঁর সাথে দেখিয়েছে! অপরদিকে পরবর্তী যুগের মোগল বাদশাহদের প্রতি প্রজা-সাধারণের আনুগত্যের নমুনাও লক্ষ্য করুন। কেবল পাঞ্জাব, সিন্ধু, দাক্ষিণাত্য ও বাংলার মত দূরবর্তী অঞ্চলের স্বাধীনচেতা জনগণই তাদের ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, বরং আগ্রা, এলাহাবাদ ও দিল্লীতেও শাহী ফরমানের যথার্থ তামিল হতো না।

ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকার

ইসলাম যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছে এবং যে ব্যবস্থার নমুনা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে পেশ করেছে তাকে ব্যক্তি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা যেতে পারে। একে রাজতন্ত্র

ও গণতন্ত্রের মাঝামাঝি রূপ বলা যেতে পারে। খলীফা নির্বাচনে সর্বস্তরের মুসলমানদের রায় প্রদানের সুযোগ থাকে। যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সম্ভাব্য সকল পন্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে–যাতে যোগ্যতম ব্যক্তিটির নির্বাচন সুনিশ্চিত হতে পারে। কোন নতুন শাসনতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় আইন রচনার প্রয়োজনই মুসলমানদের নেই। কেননা কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে নববী তাদের কাছে রয়েছে। তাই যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করাও তাদের জন্যে তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। যে ব্যক্তি কুরআন হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর জীবন কুরআন-হাদীসের রঙে অনুরঞ্জিত তিনিই মুসলমানদের নেতা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। কুরআন হাদীসের শিক্ষার আলোকে জাতি ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা এবং সমাজ জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-নিষেধ কার্যকরী করাই হচ্ছে শাসকের দায়িত্ব। মুসলমান যদি তার নেতাকে বা শাসককে কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখে তখনই সে তার ত্রুটি নির্দেশ করতে এবং তাকে রীতিমত বাধা দিতে পারে। কিন্তু তাঁর কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী নয় এমন সব বিষয় মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চিন্তা-ভাবনাও মনে আনা উচিত নয়। মুসলমানদের শাসক যদি কুরআন হাদীসের অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আল্লাহকে ভয় করে চলেন এবং সদিচ্ছার পরিচয় দেন, তবে তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী, দেশ ও জাতি-হিতৈষী সৎ লোককে কেবল এজন্যে অপসারণ বা পদচ্যুত করা যে, ইতিপূর্বে তার শাসনামলের তিন বা পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—চরম বোকামী বৈ কিছুই নয়। মুসলমানদের খলীফা প্রকৃতপক্ষে তাদের খাদিম, প্রহরী ও আমানতদার। তিনি যদি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যেতে পারেন তাহলে কেন অযথা তাঁকে অপসারিত করতে যাবো এবং নবাগত অপর একজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝামেলায় পড়তে যাবো ? মুসলমানরা তাদের খলীফার দ্বারা আইন প্রণয়ন করায় না। মুসলমানরা আপন অর্থে খলীফাকে আয়াসে লিপ্ত হবার সুযোগও দিতে চায় না। মুসলমানদের খলীফা একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে আমীর-উমরা তথা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রয়োজন অনুসারে ধনসম্পদ উশুল করে গরীব-মিসকীন, ইয়াতীম-অনাথদের ভরণ-পোষণে তা ব্যয় করবেন। মুসলমানদের রাজকোষের সমস্ত অর্থ মুসলিম জনগণের যৌথ মালিকানাধীন আর তা তাদের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে। খলীফা বা সুলতানের এটা ব্যক্তিগত মালিকানা নয় যে, তিনি যথেচ্ছভাবে তা ব্যয় করতে পারবেন। মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় যেহেতু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে একটি সঙ্গত হারে কর উশুল করা হয় এবং তা অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তাই এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিই হতে পারে না—যা গোটা পাশ্চাত্যকে আজ গ্রাস করে রেখেছে।

মুসলমানদের খলীফা একাধারে তাদের প্রহরী ও অভিভাবক। তিনি মুসলিম জনতার পিতাও, আবার পীর বা উস্তাদও। মুসলমানদের খলীফা একাধারে তাদের গৃহশিক্ষক এবং সিপাহ্‌সালারও। তিনি তাদের সেবক, আবার শাহানশাহ্‌ও। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয়, যেমন কোন দেশ আক্রমণের বা কোন জাতির সাথে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়, কোন জাতির সাথে সন্ধি করতে হয়, কারো সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং দেশের নিরাপত্তার জন্যে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় তবে মুসলমানদের খলীফা অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করবেন। কেননা কুরআনুল

কারীমে এরই নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এ পরামর্শের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সাধারণ মানুষ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে খলীফার বা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তকে অচল করে দেবে এবং তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে, বরং এ পরামর্শের উদ্দেশ্য হবে, খলীফা যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সাহায্য লাভ করতে পারেন। অর্থাৎ খলীফা সকলের মতামত শুনবেন এবং পক্ষ-বিপক্ষের দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং অবশেষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করে দেবেন।

وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله .

এবং তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে পরামর্শ করবে এবং যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করে কার্যক্রম শুরু করে দেবে।

ইসলাম উপরিউক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পক্ষপাতী। খিলাফতে রাশিদায় তাঁরই নমুনা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। খিলাফতে রাশিদার পর মুসলমানদের শাসন-ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য এবং ইসলামী চরিত্রের প্রতিফলন অধিকাংশ রাষ্ট্রে এবং রাজবংশে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা যে সুন্দর রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছে অন্যত্র তা পরিদৃষ্ট হয় না। ইউরোপ আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কস্মিনকালেও ইসলামের এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মুকাবিলা করতে পারবে না।

যেখান থেকে শুরু

সাধারণত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইসলামের ইতিহাস প্রণয়নে আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে বরং কেউ কেউ পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে লিখতে শুরু করেছেন। আমি আমার ইতিহাস হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করছি। কেননা, হুযূর (সা)-এর পূর্বেকার ইতিহাস সর্বতোভাবে সন্দেহমুক্ত নয়। তাঁর যুগের পূর্বে পৃথিবীতে ইতিহাস রচনার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না। সাধারণত নবী করীম (সা) থেকেই ইসলামের ইতিহাসের সূচনা বলে ধরা হয়। কেননা, সাধারণ্যে হুযূর (সা)-কেই ইসলামের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং তাঁরই অনুসারীদেরকে মুসলমান বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সময় থেকেই-ইসলাম দুনিয়াতে মওজুদ রয়েছে এবং এভাবেই চলেও আসছে।

ইতিহাস ও ভূগোলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইতিহাসের সাথে নিঃসন্দেহে ভূগোলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই সাম্প্রতিক কালে ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকদের অনুসরণে যেসব ইতিহাসগ্রন্থ লিখিত হয়েছে সেগুলোতে ইতিহাসের সাথে ভূগোলও জুড়ে দেয়া হয়েছে। হুযূর (সা)-এর সীরাত রচয়িতাগণও আরবদেশের ভূগোলের ব্যাখ্যা প্রদান প্রতিপাদ্য বিষয়ের বুঝবার সুবিধার্থে সন্নিবেশিত করাকে জরুরী জ্ঞান করে থাকেন। কিন্তু আমি যেহেতু ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে মনস্থ করেছি তাই ভাবলাম আমি যদি এর সাথে ভূগোলও জুড়ে দেই তাহলে গোটা বিশ্বের ভূগোলই তাতে সন্নিবেশিত করতে হবে। কেননা, মুসলমান এবং তাদের রাজত্ব প্রায় গোটা বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত। সংক্ষেপে তা গ্রন্থবদ্ধ করা সুকঠিন ব্যাপার। তাই আমাকে এ সুধারণারই আশ্রয় নিতে হয়েছে যে, এ গ্রন্থের পাঠক নিশ্চয়ই ভূগোল সম্পর্কে সম্যক ওয়াবিফহাল এবং পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশের মানচিত্র নিশ্চয়ই তাঁদের হাতের কাছে মওজুদ আছে বা তাঁরা তা জোগাড় করে নিতে পারবেন। তবুও ইচ্ছা আছে স্থানে স্থানে কোন কোন দেশ ও প্রদেশের মানচিত্র সন্নিবেশিত করে দেব। জাহিলিয়াতের যুগ, আরবের বিভিন্ন জাতি, যেমন কুরায়শ, জাহিলিয়া যুগের প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যাপারও এ গ্রন্থে ততো বিস্তারিত আলোচিত হবে না।

হুযূর (সা)-এর জীবনী প্রণয়নে আমি সর্বাধিক নির্ভর করেছি হাদীসের প্রখ্যাত ছয়খানি গ্রন্থ সিহাহ্ সিত্তাহ্র উপর। হাদীসের কিতাবসমূহকে এ ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থসমূহের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে তারীখে তাবারী, তারীখুল কামিল, ইব্ন আসীর, তারীখে মাসউদী, তারীখে ইব্ন খালদূন, তারীখুল খুলাফা, সুয়ূতী প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে সাধারণভাবে যা বিবৃত হয়েছে তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি এবং এভাবে ইতিহাসের সর্বোত্তম সারবস্তু লিখে দিয়েছি। আব্বাসী খিলাফতের দুর্বলতা ও পতনের সূচনাতে যেসব দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে, সেসবের পৃথক পৃথকভাবে সমসাময়িক যুগের ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাদি থেকে লিখে দিয়েছি। কোন কোন স্থানে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের বরাতও দিয়েছি এবং তাদের হুবহু পাঠও উদ্ধৃত করে দিয়েছি। কিন্তু তা' কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যে সাক্ষ্য স্বরূপই উদ্ধৃত করেছি। সাধারণভাবে আমার বিশ্বাস, খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থাদি মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাদির তুলনায় নেহাতই মামুলী ও ভাসাভাসা ধরনের। আমাদেরকে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের এবং মনের সান্ত্বনা খোঁজার জন্যে তাদের দিকে তাকানো আদৌ উচিত হবে না। কেননা, খ্রিস্টান ঐতিহাসিক মাত্রই রিওয়ায়াত বা বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অত্যন্ত বেপরোয়া এবং সীমাহীন অসতর্ক প্রতিপন্ন হয়েছেন। অপরদিকে তাঁরা সমস্ত মেধা ও যোগ্যতাকে সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যয়িত করে ইতিহাসকে উপন্যাস ও কল্পকাহিনীতে পর্যবসিত করতেই ব্যস্ত থাকেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আল্লাহ্র ফযলে এ প্রবণতা থেকে অনেকাংশেই মুক্ত। আর এজন্যেই তাঁরা বিশ্বস্ত সাক্ষ্যের মত আমাদেরকে অনেকটা সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

এ ইতিহাস গ্রন্থখানি দ্বারা মুসলিম পাঠকগণ কিভাবে উপকৃত হবেন এবং এতে কোন্ কোন্ অংশ একটু মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে এবম্বিধ অনেক জরুরী ব্যাপারে পাঠক ধারণা অর্জন করতে পারবেন, যা পুস্তকটির উপসংহারে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রইলো। আল্লাহ্ই তাওফীক দাতা।

প্রথম অধ্যায়
আরব দেশ

আরবের একটা মোটামুটি আলোচনা সর্বপ্রথমে এ জন্যই আবশ্যক যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এই আরবেরই প্রসিদ্ধ মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অপর বিখ্যাত নগরী মদীনাতে হিজরত করেন এবং তা-ই হয় শেষ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের আদি রাজধানী। আরবই সেই দেশ যার প্রায় সকল অধিবাসীই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সে আরব-যেখানে সর্বপ্রথম ইসলামের বিজয় কেতন উড়েছিল। এই আরবের ভাষাতেই পূর্ণাঙ্গ ওয়াহী এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়—যা' দেশ, জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে সকলের কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্য পূর্ণাঙ্গ দিক-দিশারী। এই আরবের মাটি থেকে পৃথিবীর দশ দিগন্ত ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। এ দেশেই রয়েছে পবিত্র কা'বা ঘর—পৃথিবীর প্রতিটি দেশ থেকে প্রতিবছর মুসলমানরা যেখানে ছুটে আসে দলে দলে, আরাফাতের ময়দানে সকলে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার স্তুতি ও মুনাজাতে নিমগ্ন হয়। সেখানে রাজা-প্রজা ও আমীর-ফকীর সকলেরই একই বেশ, একই অবস্থা। আসমান যমীনের স্রষ্টার মহিমা ও আধিপত্যই সকলের মনমগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই সে আরব—যা গোটা বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এর গোটা বিশ্বের জন্যে দিক-দিশারী ও হিদায়াতের দীপ্ত শিখা প্রতিপন্ন হয়।

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি

এশিয়ার মানচিত্রে দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে একটি বিশাল আয়তক্ষেত্রের মত উপদ্বীপ চোখে পড়ে। এরই নাম জাযীরাতুল আরব—আরব উপদ্বীপ বা আরব দেশ।

দেশটির পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর ও ভারত মহাসগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সুয়েজখাল, উত্তরে সিরিয়া।

আরব দেশের আয়তন বার-তের লক্ষ বর্গমাইল যার মধ্যে পাঁচ লাখ বর্গমাইল কেবল ঊষর মরু অঞ্চল যেখানে কোনো বসতি নেই। সর্বাধিক খ্যাত মরুভূমিটি আল রাবউল খালী বা আল-দাহ্না' নামে পরিচিত। এর আয়তন আড়াই লাখ বর্গমাইল। এ বিশাল মরুভূমির উত্তরে বাহ্রায়নের আল-হাসায়া প্রদেশ। রাবউল খালীর দক্ষিণ-পূর্বে ওমান প্রদেশ। এর রাজধানী ও সর্বাধিক বিখ্যাত শহর হচ্ছে মাস্কট। এ প্রদেশটি ওমান উপসাগরের তীরে অবস্থিত। রাবউল খালীর দক্ষিণ-পূর্বে হাদরামাউত ও মাহ্রা প্রদেশ অবস্থিত। এগুলো আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা। রাবউল খালীর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসিদ্ধ ইয়ামান প্রদেশ অবস্থিত। এ প্রদেশটির সর্বাধিক বিখ্যাত শহর হচ্ছে সাফার। এ প্রদেশটি ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত। এডেন ও হাদীদা বন্দর এ প্রদেশেই অবস্থিত। রাবউল খালীর

পশ্চিমে এবং ইয়ামার উত্তরে নাজরান প্রদেশ অবস্থিত। লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে এ প্রদেশটির অবস্থান। ইসলামের অভ্যুদয় কালে এ প্রদেশটি ছিলো গোটা আরব দেশে খ্রিস্টানদের পাদপীঠ। রাবউল খালীর পশ্চিমে এবং নাজরানের উত্তরে আসীর প্রদেশ—যা লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত। নাজরান এবং আসীর প্রদেশদ্বয় ইয়ামানের অংশ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আসীরের উত্তরে লোহিত সাগরের কূলে একটি ছোট এলাকা হচ্ছে তিহামা—যা হিজাযের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তা হিজাযের দক্ষিণাংশ বলে গণ্য হয়ে থাকে। রাবউল খালীর উত্তরে বর্গাকৃতির বিশাল নজ্‌দ প্রদেশ অবস্থিত। এর পূর্বে বাহরায়ন প্রদেশ, পশ্চিমে হিজায প্রদেশ এবং উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি অবস্থিত। নজদের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের নাম হচ্ছে ইয়ামামা। নজদের পূর্বে এবং লোহিত সাগরের পশ্চিমে হিজায প্রদেশ অবস্থিত। মক্কা, মদীনা এবং জিদ্দা ও ইয়াম্বু বন্দরদ্বয় এই প্রদেশে অবস্থিত। হিজাযের পশ্চিমে এবং নজদের দক্ষিণ-পূর্বে একটি ছোট এলাকা হচ্ছে খায়বার। সিরিয়া, হিজায ও নজদের মধ্যবর্তী একটা এলাকা হচ্ছে হজ্‌র। রাবউল খালীর মধ্যে হাদরামাউত ও ইয়ামামার মধ্যে আল-আহকাফ হচ্ছে একটি প্রসিদ্ধ অনাবাদী ভূমি—যা' একদা আরব জাতির বাসস্থান ছিল। মানচিত্রে উপরিউক্ত স্থানসমূহের দিকে নযর বুলালে আরব দেশের প্রদেশসমূহ ও মশহুর এলাকাসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে।

আবহাওয়া ও অধিবাসী

আরব দেশে কোন প্রসিদ্ধ বা উল্লেখযোগ্য নদ-নদী নেই। প্রায় গোটা দেশটাই ঊষর মরু ও অনুর্বর ভূমি নিয়ে গঠিত। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে কিছু কিছু তরুলতা ও মানুষের বসবাস পরিলক্ষিত হয়। পানিশূন্যতা দেশটির মধ্যবর্তী এলাকাসমূহকে মানুষ বসবাসের অনুপযোগী এবং জীবন যাপন দুর্বিষহ রেখেছে। সমস্ত জনপদ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে অবস্থিত। কেবল নজদের বিশাল প্রদেশটিই এর ব্যতিক্রম—যা রাবউল খালীর উত্তরে দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। নজ্‌দ হচ্ছে একটি মালভূমি -যাতে বিশালায়তন মরুভূমিসমূহও রয়েছে। নজদের এ মরুভূমিসমূহ একেবারে সিরিয়ার বিশাল মরুভূমিসমূহে গিয়ে মিশেছে। আরব দেশে স্থানে স্থানে পর্বতমালাও রয়েছে। কিন্তু তার একটিতেও তরুলতা নেই। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ইয়ামান ও হিজায প্রদেশদ্বয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিকতর শস্য-শ্যামল। সমগ্র আরব দেশের মোট জনসংখ্যা সোয়াকোটি বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায় দেশটির প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দশজন লোকের বসবাস। রৌদ্রের প্রখরতা খুব বেশি। এত প্রচণ্ড লু-হাওয়া দেশটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যে, এ হাওয়াকে সাইমুম বা বিষাক্ত বায়ু বলা হয়ে থাকে। মানুষ তো মানুষ, মরু হাওয়া যে প্রাণীটির একান্তই গা সওয়া সেই উটও এ হাওয়ার সম্মুখে তিষ্ঠাতে পারে না। লু-হাওয়ার এক ঝটকাতেই উট প্রাণ হারায়। উট সেখানে অত্যন্ত উপকারী পশু। শত শত মাইলের মধ্যে পথিকরা পানির নাম নিশানা পর্যন্ত পায় না। উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ। এর পিঠে চড়েই বড় বড় সফর করতে হয়। খেজুর ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ফসলও হয় না। সে দেশের অধিবাসীরা উটের দুধ ও খেজুর খেয়েই জীবন ধারণ করে। অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ যাযাবর জীবন যাপন করে। এজন্যে দেশটিতে বড় বড় শহরের সংখ্যা নগণ্য। কবি হালী দেশটির চিত্র অংকন করেছেন এভাবে :

এক উপদ্বীপ ছাড়া আরব কিছুই ছিলো না তো
কোনো দেশের সঙ্গে তার সংযোগ ছিলো না তো

কারো উপর ছিলো না যে তার শাসন-অধিকার-
সাধ্যও ছিলো না কারো তাকে শাসন করবার
তমুদ্দুনের কোনো ছায়া তখনো তাতে পড়েনি
প্রগতির পদচিহ্ন একটুও তাতে পড়েনি।
ছিলো না তার আবহাওয়াতে প্রাণের কোনো রেশ
হয়নি তাই সেখানটাতে সবুজের উন্মেষ
ছিলো না সেখানে এমন কোনো পাত্র গুণাধার
পারতো ঘটাতে হৃদয় মাঝে বিকাশ প্রতিভার
ঊষর মরু প্রান্তরে নেই শ্যামল পেলবতা
নেই বৃষ্টি অঝর ধারায় নেই নদী বহতা
দেশ ভরা কঙ্কর মাটি-বহে আগুন হাওয়া
লু-ঝড়ে অতিষ্ঠ জীবন যায় না কিছু পাওয়া
পাহাড় টিলায় দেশটি ভরা বিজন বিয়াবান
খেজুর বনের সমারোহ আছে নেই তাতে প্রাণ
খেত-খামারের চিহ্ন নেই, নেই শস্যের লেশ
সব মিলিয়ে এই তো ছিলো সেদিন আরব দেশ।

পুস্তকের কলেবর আরবের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে আর অধিক লেখার অনুকূলে নয় বিধায় এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

আরবের প্রাচীন অধিবাসী

আরবদেশে প্রাচীনকাল থেকেই হযরত নূহ আলায়হিস সালামের পুত্র সামের বংশধরদের বাস ছিল। কাল হিসাবে ঐতিহাসিকগণ আরবের অধিবাসীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. আরবে বায়িদা, ২. আরবে আরিবা ও ৩. আরবে মুস্‌তারিবা।

আরবে বায়িদা বলতে সেসব জাতির লোকজনকে বোঝায় যারা প্রাচীনকালে আরবের আদি অধিবাসী ছিল। তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কোন বংশধর পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। অনেকে আরবে আরিবা ও আরবে মুস্তারিবা এ উভয় গোষ্ঠীকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করে এদের সম্মিলিত নাম দিয়েছেন আরবে বাকিয়া। তাঁদের মতে আরবের অধিবাসীরা দুই শ্রেণীভুক্ত : ১. আরবে বায়িদা ও ২. আরবে বাকিয়া।

আরবে বাকিয়া হচ্ছে তারা যারা এখনো আরব দেশে বাস করছে। তাদেরও দু'টি শ্রেণী, তারা 'আরিবা ও মুস্‌তারিবা নামে অভিহিত। কেউ কেউ আরববাসীদেরকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : ১. আরবে বায়দা বা আরবে আরিবা, ২. আরবে মুস্‌তারিবা, ৩. আরবে তাবিয়া ও ৪. আরবে মুস্‌তা'জিমা।

আরবে বায়িদা

আরবে বায়িদা হচ্ছে ঐসব প্রাচীন অধিবাসী যাদের গোত্রগুলোর নাম হচ্ছে 'আদ, ছামূদ্ আবীল, আমালিকা, তাসাম, জাদীস, উমায়ম, জুরহাম, হাদরামাউত, হাযুর, আবদে যাখাম প্রভৃতি। এরা সকলেই হযরত নূহের পৌত্র লায ইব্‌ন সামের বংশধর ছিল। গোটা আরব

উপদ্বীপে তাদের রাজত্ব ছিল। এদের কোন কোন নৃপতি মিসর পর্যন্ত জয় করেছিলেন। এদের বিশদ বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে নজদ, আহ্কাফ, হাদরামাউত ও ইয়ামানে এমন প্রাচীন তাদের ইমারতসমূহ, প্রত্নতত্ত্ব, পাথর স্তম্ভ, অলংকারাদি ও কাটা প্রস্তরাদি পাওয়া যায় যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের যুগে তারা অত্যন্ত শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল। এদের মধ্যে 'আদ গোত্রটি ছিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এরা আহ্কাফ সমতলে বসবাস করতো। সামের প্রপৌত্র 'আদ ইব্ন আউস ইব্ন ইরাম ছিলেন এদের প্রথম নৃপতি—যার নামে গোটা গোত্রটি খ্যতিলাভ করে। তার ছিল তিন পুত্র : ১. শাদ্দাদ, ২. শাদীদ ও ৩. ইরাম। এরা একের পর এক রাজ্যর অধিকারী হন। আল্লামা যামাখশারী এই শাদ্দাস ইব্ন 'আদ সম্পর্কে লিখেন যে, সেই আদন মরুভূমিতে ইরাম নগরীর পত্তন করেছিল। কিন্তু তার কোন নিদর্শনই এখন আর অবশিষ্ট নেই। কুরআন শরীফেও ইরামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা' আরাম নগরী বা ইরাম বাগিচা নয়, তা হচ্ছে ইরাম গোত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ .

তুমি কী দেখনি তোমার রব 'আদ-ইরামের লোকদের সাথে কি আচরণ করেছেন-যাদের শারীরিক গঠন অবয়ব ও শক্তি-সামর্থ্য এমনি অদ্বিতীয় ছিলো যে, পৃথিবীর অন্য কোন জনপদে এমনটি সৃষ্টি করা হয়নি। (৮৯ : ৬-৮)

ঐতিহাসিক মাসউদী লিখেন : 'আদের পূর্বে তার পিতা 'আসও বাদশাহ ছিল। এ বংশেরই জনৈক নৃপতি জীরূন ইব্ন সাআদ ইব্ন 'আদ ইব্ন আওস দামেশ্ক বিজয় করে মর্মর পাথর এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান পাথর দিয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল যার নামকরণ সে করেছিল ইরাম। ইব্ন আসাকিরও তাঁর তারীখে দামিশ্ক বা দামেশ্কের ইতিহাস গ্রন্থে জীরূনের উল্লেখ করেছেন। হযরত হূদ আলায়হিস সালাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঐ 'আদ জাতির প্রতি নবীরূপে আবির্ভূত হন তখন তারা তাঁর অবাধ্যতা করে আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংস হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন শরীফে রয়েছে। 'আদের পর আবীল আমালিকা, ছামুদ, আবদে যাখাম প্রভৃতি কবীলা রাজত্ব করে। অবশেষে ইয়ারিব ইব্ন কাহ্তান এদেরকে উৎখাত করে নতুন এক যুগের সূচনা করেন। ছামূদ গোত্র বা ছামূদ জাতির প্রতি নবী হয়ে আসেন হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালাম। ছামূদ জাতির বাস ছিল হাজ্র এলাকায়। তাসাম এবং জাদীস কবীলাদ্বয়ের বাস ছিল ইয়ামামায়, আমালিকারা বাস করতো তিহামায়। জুরহাম গোত্র থাকতো ইয়ামানে। ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, আরবের সকল গোত্রই হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্র সামের বংশধর। তাই এ গোত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্যে ৫৪ নং পৃষ্ঠায় এদের বংশপঞ্জির রেখা সন্নিবেশিত হলো :

আরবে 'আরিবা

এরা কাহ্তানের বংশধর বলে গণ্য হন। কাহ্তানের পূর্ববর্তী নূহ (আ) পর্যন্ত এ বংশের কেউই আরবী ভাষী ছিলেন না। কাহ্তানের অধঃস্তন বংশধররাই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা

বলতে শুরু করেন। আর এ ভাষা তারা শিখেছিলেন আরবে বায়িদা থেকে। কাহ্তানের বংশধররা দু'ভাগে বিভক্ত : ১. ইয়ামিনিয়া ও ২. সাবাইয়া।

কাহ্তানের বংশপঞ্জি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ইনি আবির ইব্ন শালিখ ইব্ন আরাফাখশাদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ-এর পুত্র এবং ফালিগ ও ইয়াকতানের ভাই ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে তার কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য ফালিগ ও ইয়াকতানের উল্লেখ তাওরাতে রয়েছে। কারো কারো ধারণা কাহ্তান ইয়াকতানেরই আরবী রূপ। অন্য কথায় যাকে ইয়াকতান বলা হয়েছে তিনিই কাহ্তান। কারো কারো ধারণা, ইয়ামান ইব্ন কীদার ইব্ন ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র ছিলেন কাহ্তান। ইব্ন হিশাম বলেন, ইয়ারিব ইব্ন কাহ্তানকে ইয়ামানও বলা হতো এবং তাঁরই নামানুসার ইয়ামান দেশের নামকরণ করা হয়েছে। কাহ্তান যদি ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর সাব্যস্ত হন, তাহলে গোটা আরবের অধিবাসীরা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর প্রতিপন্ন হন। কেননা, আদনান এবং কাহ্তান এ দু'জনই আরব জাতির আদি বংশধর। কিন্তু গবেষণা দ্বারা প্রতীয়মান হয় এবং এটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত যে, কাহ্তান এবং ইয়াকতান অভিন্ন ব্যক্তি। আর কাহ্তান ইসমাঈল বংশীয় নয়। আরব দেশে আরিবা বা কাহ্তানী বংশের বেশ কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ হয়েছেন-গোটা আরব উপদ্বীপ জুড়ে যাদের রাজত্ব ছিল। কাহ্তানের পুত্র ইয়ারিব আরবে বায়িদার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দেন এবং তাদের গোটা বংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। বনী কাহ্তানের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জি ৫১ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হলো।

সামের বংশ তালিকা

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম

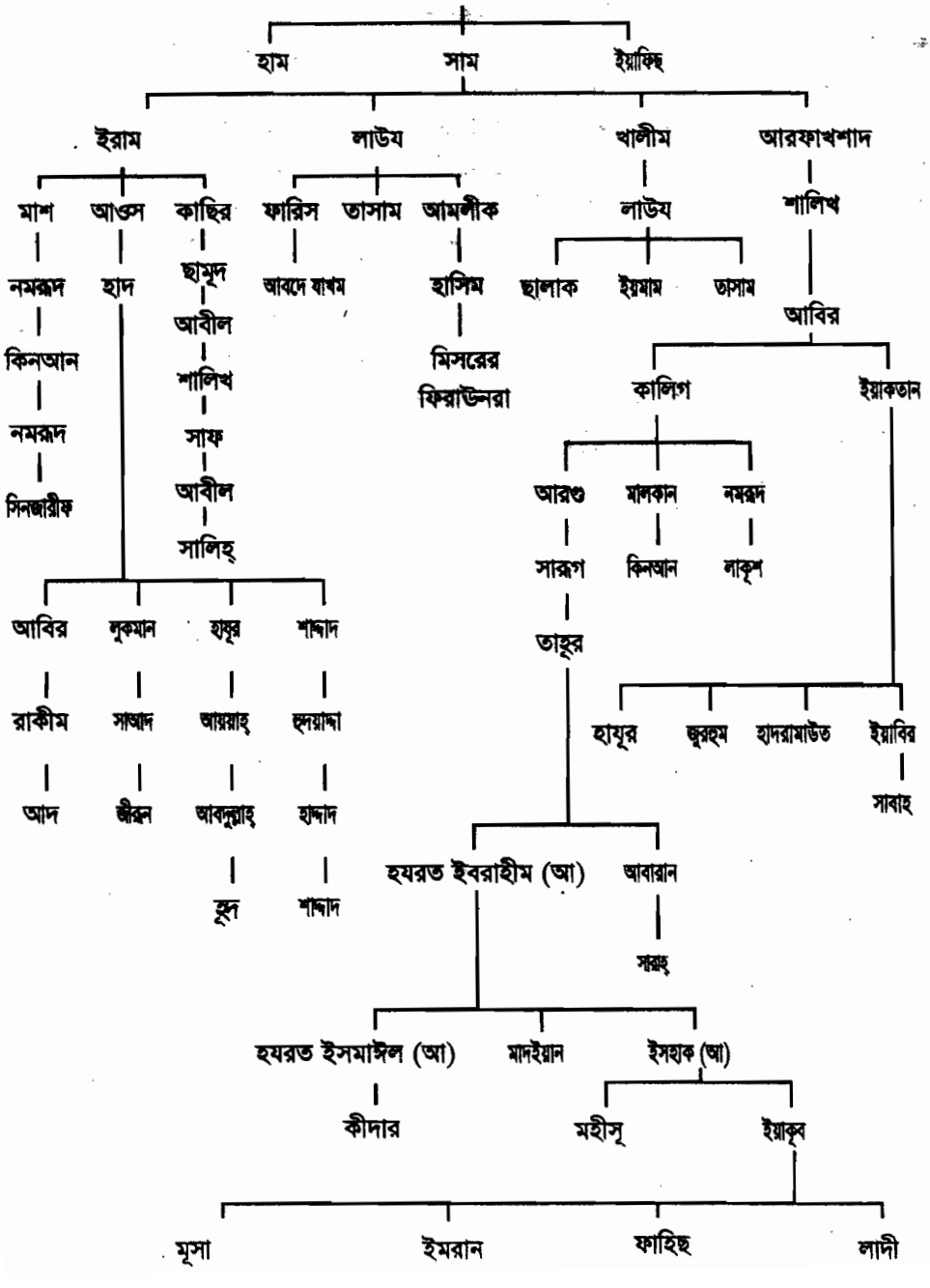

বনী কাহ্‌তানের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী নিম্নরূপ

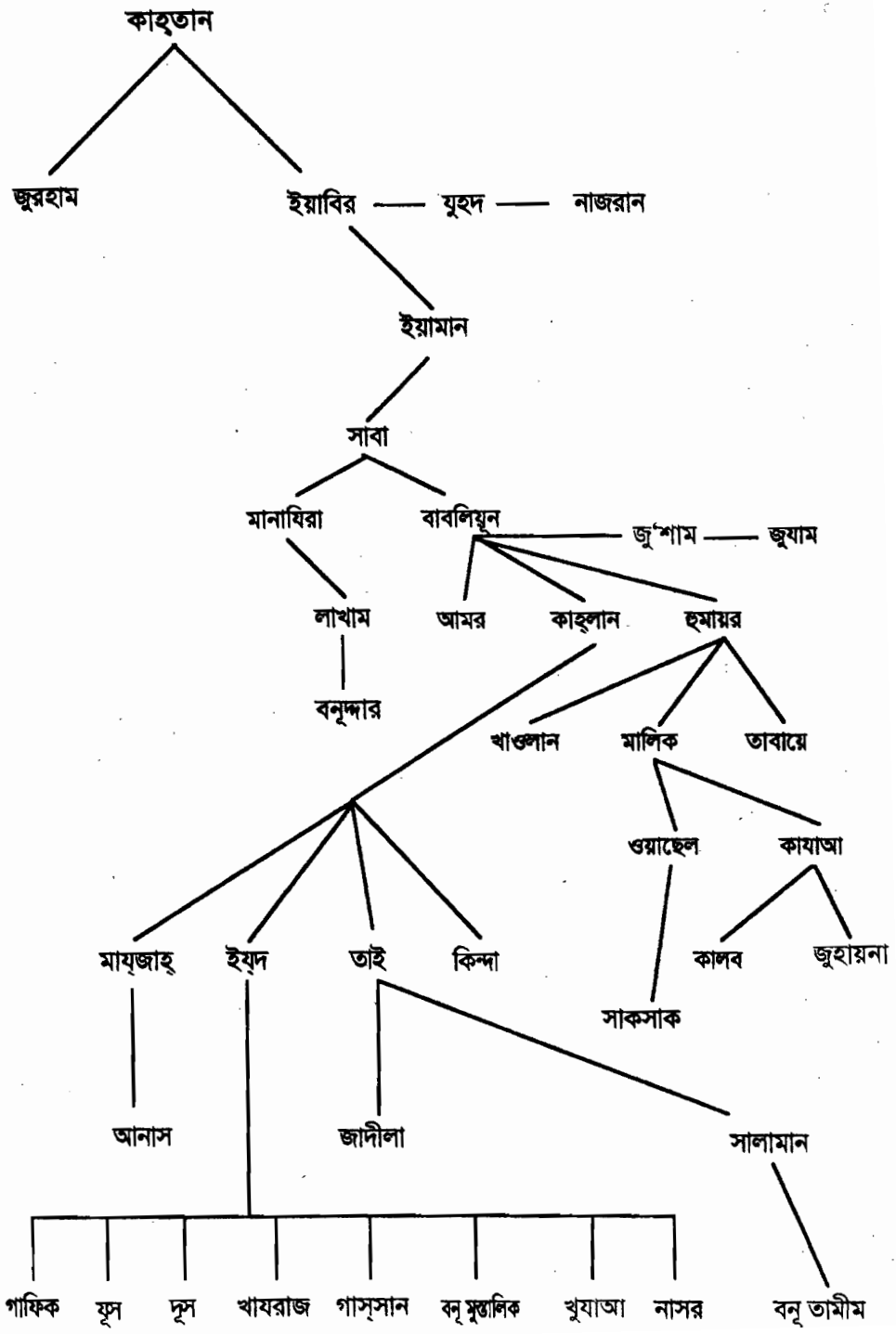

কাহ্‌তানী গোত্রসমূহের কেন্দ্রভূমি বা আদি নিবাস ইয়ামান ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে হিময়ারী ও ইযদী গোত্র অত্যন্ত বিখ্যাত বলে গণ্য হতো। সাবা শহর এবং দক্ষিণ আরবে ইযদীদের রাজত্ব ছিল। ইয়ামান দেশের সমৃদ্ধি সাধনে এরা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সমসাময়িক বিলকীস রানী এদেরই বংশের লোক ছিলেন। ইয়ামান ও হাদরামাউতের শাসক মালকূক তাবাইয়াও এদেরই লোক ছিলেন। ইযদের একটি গোত্র মদীনায় এসে বসবাস শুরু করে এবং সেখানে তাদের রাজত্ব গড়ে তোলে। খোযাআ গোত্রীয়রা মক্কার দিকে মনোনিবেশ করে এবং সেখানে পূর্ব থেকে রাজত্বকারী জুরহাম গোত্রকে পরাভূত করে। ইযদের পুত্র নাসর তিহামা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। খোযাআর এক পুত্র ইমরান ওমানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তার বংশধর ইযদে ওমান নামে খ্যাতি লাভ করে। তার অপর পুত্র গাস্‌সান সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সীমান্তবর্তী কবীলাসমূহকে পরাস্ত করে সেখানে স্বীয় রাজত্ব গড়ে তোলে। ইয়ামান কাহ্‌তানী বাদশাহদের রাজত্ব ঈসায়ী সপ্তম শতক পর্যন্ত কায়েম ছিল। গাস্‌সানের কাহ্‌তানী রাজত্বের সীমা রোমান সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর দিকে হীরার কাহ্‌তানী রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী ছিল। ইসলামের আবির্ভাবকালে কাহ্‌তানী গোত্রগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং গোটা আরব তারাই দাপটের সাথে শাসন করতো।

আরবে মুস্‌তাআরিবা

বনু আদনান ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর এ নামে পরিচিত। এরা বাহির থেকে এসে আরবে বসতি স্থাপন করেন। এজন্যেই এদেরকে আরবে মুস্‌তাআরিবা বা মিশ্র আরব নামে অভিহিত করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাতৃভাষা ছিল আজমী তথা ফার্সী। তিনি যখন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তার মা হাজেরাসহ মক্কা মুয়ায্‌যমায় (হিজাযে) রেখে যায়, তখন তিনি কাহ্‌তানী গোত্রের শাখা গোত্র জুরহামের নিকট থেকে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। এরা তখন মক্কায় বসত করতো। পরবর্তীকালে এই আরবীই হয় ইসমাঈল বংশীয়দের ভাষা। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পনের বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর মা হাজেরার ইন্তিকাল হয়। মায়ের মৃত্যুর পর হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে চলে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু জুরহাম গোত্রের লোকজন পরামর্শক্রমে তাঁকে মক্কাত্যাগ থেকে বিরত রাখেন এবং আমালিকা গোত্রের আমারা বিন্‌ত সাঈদ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন আকীলের সাথে তাঁর বিবাহ করিয়ে দেন। কিছু দিন পরেই সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আগমন করলেন এবং তাঁরই ইঙ্গিতে পুত্র ইসমাঈল তাঁর উক্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। তারপর তিনি জুরহাম গোত্রের সাইয়িদা বিন্‌ত মাদাদ ইব্‌ন আমরের পাণি গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত আদম (আ)-এর যুগের ভিতের উপর খানা কা'বা নির্মাণের কাজ শুরু করেন, এভাবে যে হযরত ইবরাহীম (আ) গাঁথুনী দিচ্ছিলেন আর হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর ও মসলাদি তাঁকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন। উভয়ে তখন এভাবে দু'আ করছিলেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

হে আমাদের রব। আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন! নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (২ : ১২৭)

ফলে দেওয়াল কিছুটা উঁচু হলো এবং পুনঃ নির্মাণ কাজ কিছুটা কষ্টকর হয়ে উঠলো। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে লাগলেন। যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ) কাজ করছিলেন, তা-ই মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত। খানা কা'বা নির্মাণ যখন সমাপ্ত প্রায়, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বললেন, আচ্ছা একখণ্ড পাথর নিয়ে এসো, যাতে তা মাকামে রুকনের উপর রেখে দিয়ে লোকজনের জন্যে তা চিহ্নিত করে দিতে পারি। তখন হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশনা অনুসারে বূ-কুবায়স পাহাড় থেকে হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে নিয়ে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তা মাকামে রুকন-এর উপর স্থাপন করে দিলেন। এটাই সেই বিখ্যাত হাজরে আস্ওয়াদ বা কাল পাথর—তাওয়াফের সময় যার চুমু খাওয়া হয়। খানা কা'বা পুনঃ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি যে সমস্ত লোক ঈমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে মিনা ও আরাফাতের মাকামসমূহের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা কুরবানী করলেন এবং খানা কা'বার তাওয়াফ করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) শাম দেশের দিকে চলে যান এবং যতকাল জীবিত ছিলেন প্রতিবছর খানা কা'বার যিয়ারত ও হজ্জের জন্যে আসতেন। খানা কা'বা পুনঃ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ) শেষ জীবন পর্যন্ত মক্কা মুয়ায্যমায়ই বসবাস করেন। বনী জুরহাম কবীলা (এরা জুরহাম সাথী নামে অভিহিত) মক্কা মুয়ায্যমায় এবং আমালিকা কবীলা মক্কার আশেপাশে বসবাস করতো (এরা আরবে বায়িদাভুক্ত আমালিকা নয়)। এ কবীলাদ্বয়ের কিছু লোক হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। অনেকে তাদের পূর্বতন কুফরী ও নাস্তিকতায় লিপ্ত ছিল। তাওরাতের বিবরণ অনুযায়ী হযরত ইসমাঈল (আ) একশ' সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বারজন পুত্র ছিলেন। এঁদের বংশধরদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেলো যে মক্কায় তাদের আর স্থান সঙ্কুলান হলো না। তাঁরা গোটা হিজাযে ছড়িয়ে পড়লেন। কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও মক্কার কর্তৃত্ব সর্বদা এঁদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র কীদারের বংশধরদের মধ্যে আদনান নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। বনী ইসমাঈলের প্রায় প্রত্যেকটি মাশহুর কবীলা এদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। এজন্যে আরবে-মুস্তাআরিবা বনী ইসমাঈলকে আলে-আদনান বা আদনানের বংশ বলা হয়ে থাকে। আদনানের পুত্রের নাম মাআদ এবং পৌত্রের নাম নাযার ছিল। নাযারের চার পুত্র থেকেই আদনানী বংশের বিস্তার ঘটে। এ জন্যে আদনানী কবীলাকে মাআদী এবং নাযারীও বলা হয়ে থাকে। ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বংশপঞ্জি থেকে আদনানী বংশের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায়।

আদনানী গোত্রসমূহ

আদনানী গোত্রসমূহের মধ্যে আয়াদ, রবীআ ও মুদার গোত্রসমূহ সমধিক বিখ্যাত। এদের মধ্যেও শেষোক্ত দু'টি গোত্রের খ্যাতি বেশী। মানে মর্যাদায় এরা ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। মুদারী গোত্রসমূহের অন্যতম গোত্র বনূ কিনানা গোত্রের ফিহ্র ইব্ন মালিকের অপর নাম ছিল কুরায়শ। উক্ত কুরায়শের বংশধরগণের মধ্যে অনেক কবীলার উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে বনী সাহম, বনী মাখযুম, বনী হুমাহ্, বনী তায়েফ, বনী আদী, বনী আবদেদার, বনী যুহরা, বনী আবদে মানাফ সমধিক বিখ্যাত। আবদে মানাফের ছিল চার পুত্র, আবদে শামস্, নাওফিল,

মুত্তালিব এবং হাশিম। হাশিমের বংশধরদের মধ্যে আমাদের নবী করীম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের যাবৎ মুসলমান তাঁরই উম্মত এবং তিনি আখেরী যামানার নবী। এ গ্রন্থে তাঁরই উম্মতের বিবরণ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। আবদে শামসের পুত্রের নাম ছিল উমাইয়া। বনী উমাইয়ারা তাঁরই বংশধর। আদনানী গোত্রের লোকজন যখন বনী খোযায়ার হাতে পরাস্ত হয়ে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো, তখন তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। বনী বকর বাহরায়নে, বনী হানীফা ইয়ামামায়, বনী তাগলিব ফোরাত নদীর অববাহিকায়, বনী তামীম আলজাযীরায়, বনী সুলায়ম মদীনার আশেপাশে, বনী ছাকীফ তায়িফে, বনী উর কূফার পশ্চিম পাশে এবং বনী কিনানা তিহামায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বনী আদনানের কবীলাসমূহের মধ্যে কেবল কুরায়শ গোত্রসমূহই মক্কা ও তার আশেপাশে রয়ে যায়, কিন্তু তাদের মধ্যেও তেমন ঐক্য-সম্প্রীতি ছিল না। এরা ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব এদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে) এমনি শক্তিশালী করে তোলেন যে, তারা কেবল মক্কায়ই নয়, গোটা হিজাযের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। খানা কা'বার ব্যবস্থাপনা আবার বনী আদনানের করতলগত হয়। কুসাঈ খানা কা'বা মেরামত করে এবং নিজের জন্য একটি মহল নির্মাণ করেন। ঐ মহলের একটি বিশালায়তন কক্ষ সামাজিক পরামর্শ কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। এ কক্ষটির নাম রাখা হয়েছিল দারুন নাদওয়া। দারুন নাদ্‌ওয়ায় বসেই কুসাঈ রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং কুরায়শ-সর্দাররা এখানেই পরামর্শের জন্যে জমায়েত হতেন।

কুসাঈ হজ্জের সময় মক্কার তীর্থযাত্রী হাজীদেরকে তিন দিন পর্যন্ত পানাহারে আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং এর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কুরায়শদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। মোদ্দাকথা, কুসাঈ মক্কা তথা গোটা হিজাযের দীনী ও দুনিয়াবী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসেন। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে কুসাঈ পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র আবদুদ্‌দার তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে মক্কার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আবদুদ্‌দারের মৃত্যুর পর তার পৌত্রদের এবং তাঁর ভাই আবদে মানাফের পুত্রদের মধ্যে মক্কার শাসনক্ষমতা নিয়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রভাবশালী লোকেরা মধ্যস্থতা করে এভাবে এর ফায়সালা করে দেন যে, আবদে মানাফের পুত্র আবদে শাম্‌স পানি বিতরণ, চাঁদা ও কর উশুল এবং হাজীদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন আর আবদে দারের পৌত্রগণ সামরিক ব্যবস্থাপনা, কা'বা ঘরের হিফাযত এবং দারুন্ নাদওয়ার দেখাশোনা করবেন। কিছুদিন পর আবদে মানাফের পুত্র আবদে শাম্‌স তার অনুজ হাশিমকে তাঁর রাজত্ব ও সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দেন। হাশিম তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ ও বদান্যতার জন্যে মক্কাবাসীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি কুরায়শদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং তার সুযোগ করে দিয়ে তাদের প্রভূত উপকার সাধন করেন।

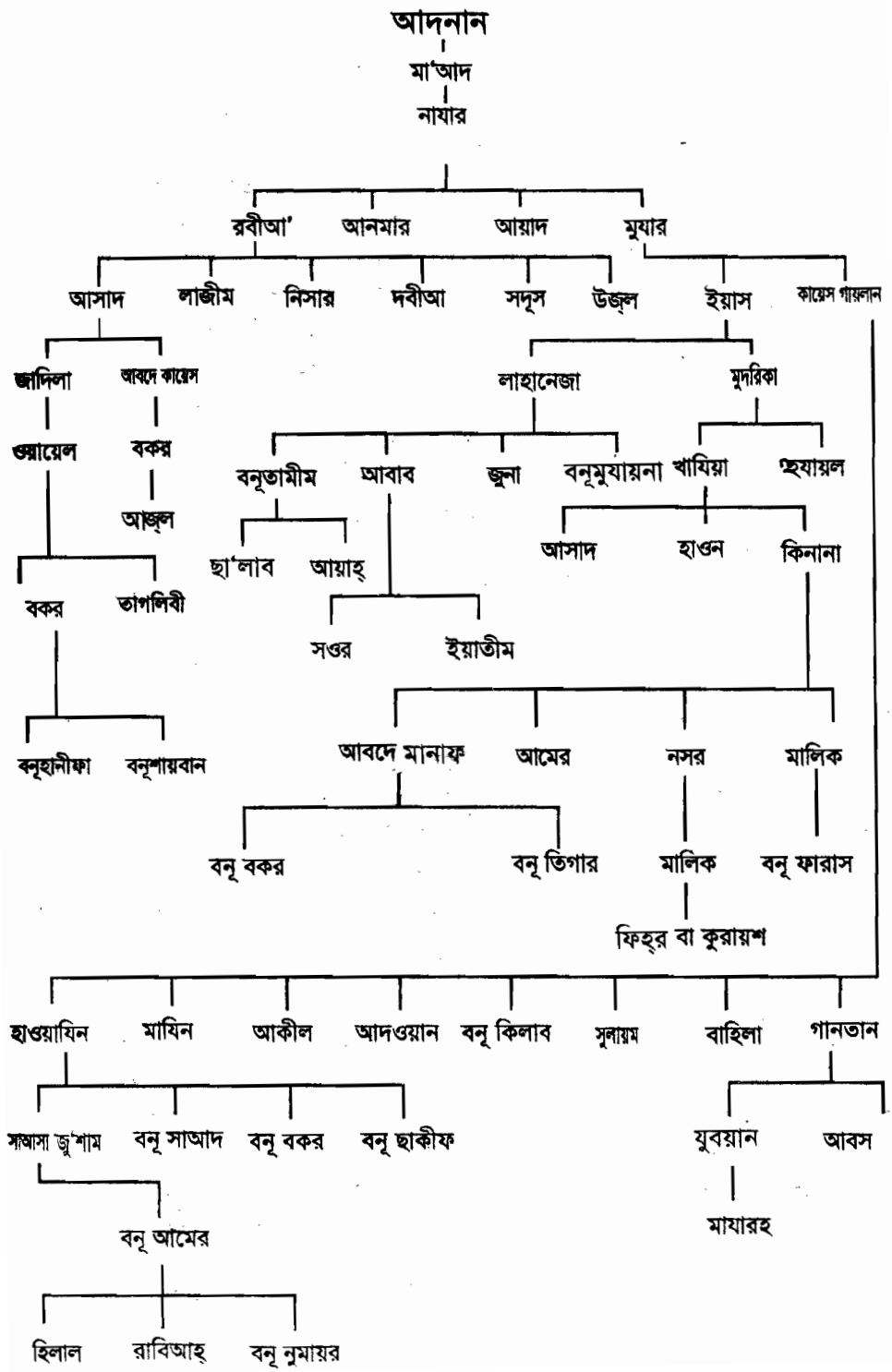
আদনান
মা'আদ
নাযার
রবীআ'
আনমার
আয়াদ
মুযার
আসাদ
লাজীম
নিসার
দবীআ
সদূস
উজ্ল
ইয়াস
কায়েস গায়লান
জাদিলা
আবদে কায়েস
লাহানেজা
মুদরিকা
ওয়ায়েল
বকর
বনূতামীম
আবাব
জুনা
বনূমুযায়না
খাযিয়া
হুযায়ল
আজ্ল
ছা'লাব
আয়াহ্
আসাদ
হাওন
কিনানা
বকর
তাগলিবী
সওর
ইয়াতীম
বনূহানীফা
বনূশায়বান
আবদে মানাফ
আমের
নসর
মালিক
বনূ বকর
বনূ তিগার
মালিক
বনূ ফারাস
ফিহ্র বা কুরায়শ
হাওয়াযিন
মাযিন
আকীল
আদওয়ান
বনূ কিলাব
সুলায়ম
বাহিলা
গানতান
সাআসা জু'শাম
বনূ সাআদ
বনূ বকর
বনূ ছাকীফ
যুবয়ান
আবস
বনূ আমের
মাযারহ
হিলাল
রাবিআহ্
বনূ নুমায়র

আবদুল মুত্তালিব নামকরণের কারণ

হাশিম মদীনার জনৈক সর্দারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নবজাতকের নাম রাখা হয় শায়বা। শায়বার শৈশবেই তার পিতা হাশিমের মৃত্যু হলে হাশিমের সহোদর মুত্তালিব মক্কার শাসক হন। হাশিমের শিশুপুত্র শায়বা মদীনায় প্রতিপালিত হন। শায়বার যৌবনে পদার্পণের সংবাদ পেয়ে মুত্তালিব তাঁর ভাতিজাকে নিয়ে আসার জন্যে মদীনায় যান। তিনি যখন তাঁর ভাতিজাটিকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন মক্কার লোকে ভাবলো এ যুবকটি বনী মুত্তালিবের গোলাম হবে। মুত্তালিব তাদের এ ভ্রমের কথা অবগত হয়ে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, যুবকটি আমার ভাই হাশিমের পুত্র, আমার ভাতিজা। কিন্তু লোকজন তাকে আবদুল মুত্তালিব বা মুত্তালিবের গোলাম নামেই অভিহিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শায়বা ইব্‌ন হাশিম আবদুল মুত্তালিব নামেই মশহুর হয়ে যান। উন্নত চালচলনে, মানে-মর্যাদায়, দানে বদান্যতায় আবদুল মুত্তালিব নিজেকে তাঁর পিতা হাশিমের সুযোগ্য পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু উমাইয়া পুত্র হারবের তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ্য হলো না। তিনিও তাঁর পিতার মত আবদুল মুত্তালিবকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলেন। এবারও যথারীতি সালিশ বসলো। সালিশের রায় আবদুল মুত্তালিবের পক্ষেই হলো। এ রায় বনী হাশিম ও বনী উমাইয়ার মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করলো। আবদুল মুত্তালিবের সময় হাবশার সৈন্যরা আবরাহা নামক সেনাপতির নেতৃত্বাধীন মক্কা আক্রমণ করে। এ বাহিনীই ইতিহাসে আসহাবুল ফীল বা হস্তীবাহিনী নামে অভিহিত হয়। আল্লাহ্‌র গযব তথা আসমানী আযাবে এ বাহিনী ধ্বংস হয়। কুরায়শদের পারস্পরিক সম্পর্ক ৫৭ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশপঞ্জি থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাবে।

আবদে মানাফের খান্দান

আবদে মানাফ গোটা আরব দেশে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বলে গণ্য হতেন। তার পরে তাঁর পুত্রগণও গোটা আরবে শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য হতেন। আবদে মানাফের আসল নাম ছিল মুগীরা। তাকে কমর ও সাইয়িদ নামেও অভিহিত করা হতো। যেহেতু তাঁর অপর দুই সহোদরের নামে ছিল আবদে দার ও আবদে উজ্জা, তাই লোকে তাকে আবদে মানাত বলে ডাকতে থাকে।[১] তারপর আবদে মানাত থেকে কালক্রমে তা আবদে মানাফে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আরবের নৈতিক অবস্থা

পূর্বেই বলা হয়েছে, আরবদেশ প্রাচীনকাল থেকেই সামী খান্দান তথা সেমিটিক জাতির প্রতিপত্তি ছিল। প্রাথমিক যুগে আরবদের তথা আরবে বায়িদার বিবরণ খুব কমই জানা যায়। তাতে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না যে, সমসাময়িকদের বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় আরবে বায়িদার নৈতিক অবস্থা কী ছিলো। তবুও অনুমিত হয় যে, সেকালে গোটা বিশ্বের লোকসংখ্যা যখন মনুষ্য বসতির সংখ্যা ছিলো একান্তই অল্প তখন সকল জাতির অবস্থা প্রায় অভিন্নই ছিলো। বনী ইসমাঈল-এর উন্নতির পূর্বে আরবে বায়িদার পর কাহ্‌তানী

---

১. দার, উজ্জা ও মানাত আরবদের প্রাচীন আমলের মশহুর দেবদেবী। পাশাপাশি এদের নাম উচ্চারিত হতো বলে উক্ত দুই দেবতার পাশাপাশি মানাতের নাম যোগ করে তাকে আবদে মানাত বলা হতো। –অনুবাদক

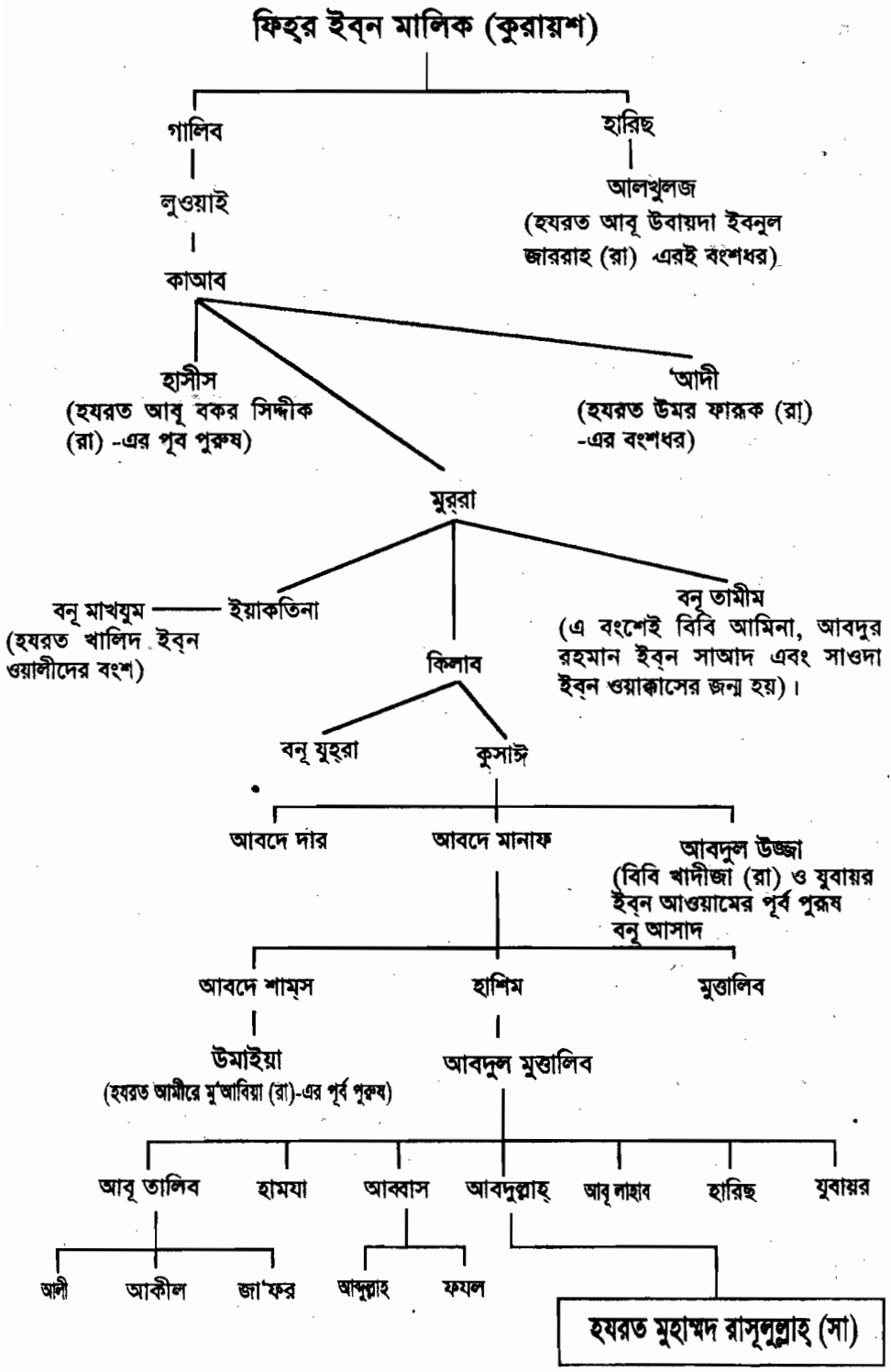
ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক (কুরায়শ)
গালিব
হারিছ
লুওয়াই
আলখুলজ
(হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) এরই বংশধর)
কাআব
হাসীস
(হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) -এর পূব পুরুষ)
'আদী
(হযরত উমর ফারূক (রা) -এর বংশধর)
মুররা
বনূ মাখযুম
ইয়াকতিনা
(হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের বংশ)
বনূ তামীম
(এ বংশেই বিবি আমিনা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সাআদ এবং সাওদা ইব্‌ন ওয়াক্কাসের জন্ম হয়)।
কিলাব
বনূ যুহ্‌রা
কুসাঈ
আবদে দার
আবদে মানাফ
আবদুল উজ্জা
(বিবি খাদীজা (রা) ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের পূর্ব পুরুষ
বনূ আসাদ
আবদে শাম্‌স
হাশিম
মুত্তালিব
উমাইয়া
(হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা)-এর পূর্ব পুরুষ)
আবদুল মুত্তালিব
আবূ তালিব
হামযা
আব্বাস
আবদুল্লাহ্‌
আবূ লাহাব
হারিছ
যুবায়র
আলী
আকীল
জা'ফর
আব্দুল্লাহ
ফযল
হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)

আরবদের যুগে আরবদেশে অনেক রাজ্য ও রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কোন যুগেই গোটা আরব একই শাসনকর্তার অধীনে ছিল না। এক এক প্রদেশে এক একটি রাজবংশের বা রাজার রাজত্ব ছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ যশস্বীও হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনচেতা বেদুঈন পরিবারসমূহের উটের পিঠে তাঁবু ও গৃহসামগ্রী নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমাবার দৃশ্যও সাধারণভাবে পরিদৃষ্ট হতো পানি ও শস্য-সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা আরবদেরকে আবহমানকাল থেকেই মরুচারী, কষ্ট-সহিষ্ণু যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত করে রেখেছে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের অপর্যাপ্ততা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। ফলে তাদের সমাজ জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন বা সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি। বৈচিত্র্যহীন জীবনধারা ও নৈসর্গিক দৃশ্য তাদের জীবনকে একান্তই একঘেয়ে ও দুর্বিষহ করে রেখেছিল। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি, উৎপন্নজাত দ্রব্যাদির স্বল্পতা, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর অভাব, জনসংখ্যা ও জনপদের স্বল্পতার দরুন বহির্বিশ্বের কোন দিগ্বিজয়ী শাসক বা বিজেতা জাতি কোন দিন আরব জয়ে প্রলুব্ধ হয়নি। পর্যটক বা বণিকদেরকে আকর্ষণ করার মত কোন সামগ্রীও এ উপদ্বীপে বর্তমান ছিল না। ফলে বহির্বিশ্বের জাতিসমূহের উন্নতি-প্রগতি সম্পর্কে আরবরা সাধারণভাবে অনবহিত ছিল। এজন্যে তারা অন্য কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিতও হয়নি।

কবি হালী যথার্থই তাদের সম্পর্কে লিখেছেন :

نہ وہ غیر قوموں پہ چڑھ کر گیا تھا
نہ اس پر کوئی غیر فرماں روا تھا

অপর জাতির তারা করেনি শাসন
অপরও পায়নি তার শাসক-আসন।

বংশগরিমা

এমতাবস্থায় আরবদের মধ্যে স্বভাবতই দু'টি বস্তুর প্রসার ঘটে। দীর্ঘ অবসর ও রাতের উন্মুক্ত আকাশের নীচে কর্মহীন দীর্ঘ আকাশ তাদের মধ্যে কাব্যচর্চার উন্মেষ ঘটায়। দ্বিতীয়ত, স্বাধিকার রক্ষার অব্যাহত অনুশীলন ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস তাদেরকে যুদ্ধবাজ ও কথায় কথায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহকে জিইয়ে রাখার জন্যে তারা আত্মপ্রশংসা ও বংশগৌরব প্রকাশের দিকেও অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ে। অহমিকা প্রকাশ ও নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যে বীরত্ব ও বদান্যতা ছিল দু'টি আকর্ষণীয় ব্যাপার। নিষ্ক্রিয়তা ও কাব্যিকতা তাদেরকে প্রেম নিবেদনে এবং তাদের সচ্ছল লোকদেরকে মদ্যপানে উদ্বুদ্ধ করে। বীরত্ব ও বদান্যতা তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর অতিথিপরায়ণ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অভ্যস্ত করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। জুয়া, তীরন্দাজী, মুশায়েরা (কবিসভা), বংশমর্যাদার অহমিকা প্রকাশ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি ছিলো তাদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। মোদ্দাকথা, আরবের নিঃসর্গ ও আবহাওয়া মনের অজান্তেই তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্র গড়ে তুলেছিলো। আরবে বায়িদার প্রতি হযরত হূদ আলায়হিস সালাম, হযরত সালিহ আলায়হিস সালাম প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হন। এসব আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আনুগত্য না করায় সেই পর্যায়ের জনগোষ্ঠী উজাড় ও ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয়

পর্যায়ের অর্থাৎ কাহ্তানী আরবদের প্রতিও কতিপয় হিদায়াতকারী প্রেরিত হন। কিন্তু আরববাসীরা খুব কমই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেছে। ফলে পাপাচার, অবাধ্যতার জন্যে বারবার তাদের উপর ধ্বংস নেমে এসেছে। সেদেশের অধিবাসীদের পাপাচার ও বশ্যতাহীন প্রকৃতি তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা থেকে অনুগৃহীত হতে দেয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিও দেশের খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলো। তাদের বংশ নিয়ে অহমিকা এবং আত্ম-গৌরবের অভ্যাস ধর্মের ব্যাপারও তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রশস্তির দিকে ঠেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের নামের প্রতিমাপূজায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল। যখন কাহ্তানী কবীলাসমূহের প্রতিপত্তি লোপ পাচ্ছিল এবং বনী ইসমাঈল বা আদনানীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখন খুযায়া গোত্রের মক্কা আক্রমণ এবং জুরহাম গোত্রের বিপর্যয় আদনানী গোত্রসমূহকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয়ের সন্ধানে ছড়িয়ে দিয়ে হিজাযে বনী ইসরাঈলদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করে। ফলশ্রুতিতে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ও প্রদেশে আদনানী ও কাহতানী কবীলাসমূহকে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করে। এভাবে গোটা আরব উপদ্বীপে ছোট ছোট গোত্রীয় রাজ্য ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্য আর অবশিষ্ট থাকলো না। যদিও আরবের বড় বড় রাজ্যও অরাজকতামুক্ত ছিল না এবং কোন আরব শাসকেরই প্রজাদের উপর তেমন শক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল না যা পারস্যের কোন সাধারণ সামন্তরাজের বা রাজকর্মচারীর পারসিক প্রজাদের উপর নিয়ন্ত্রণের সাথে তুল্য ছিল। তখন ঐ অরাজকতা এবং কবীলাদের বল্গাহীন আযাদীর ঐ যুগে আরবদেশে সামাজিক অনাচার ও চারিত্রিক ব্যাধির দ্রুত প্রসার ঘটে। আরব দেশে ইসলামের অভ্যুদয় না ঘটা পর্যন্ত চারিত্রিক ব্যাধি ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার লাভ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

আরববাসীদের বেশীর ভাগ লোকই যাযাবর জীবন-যাপন করতো এবং তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই শহরে জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। আরববাসীরা তাদের বংশপঞ্জি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতো। পিতৃপুরুষের নামধাম ও কীর্তি তারা গর্বসহকারে প্রকাশ করতো এবং একেই তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে বীরত্ব প্রদর্শন ও উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতো। দেশের আবহাওয়ার প্রভাবেই হোক বা বংশপঞ্জি মুখস্থ রাখার আগ্রহেই হোক আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কয়েক শ' পংক্তির কবিতা তারা দু' একবার শুনেই অনায়াসে মুখস্থ বলে দিতে পারতো। কাব্যচর্চা তাদের ভাষাকে এমনি উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই তারা অনারবদেরকে আজমী বা বোবা বলে অভিহিত করতো। কোন গোত্রের কেউ যদি অপর গোত্রের হাতে নিহত হত তার স্বগোত্রীয়ের কারো রক্তের বদলা নিতে না পারতো, তাহলে তার অস্থিরতার অবধি থাকতো না। হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে নির্বিকারভাবে বসে থাকা তাদের নিকট ছিল রীতিমত অপমানজনক ব্যাপার। খানা কা'বার সাহায্য করা এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় থাকা তাদের সমাজে একটি বড় গুণ বলে গণ্য হতো। কাপুরুষতা ও কৃপণতাকে তারা সর্বাধিক ঘৃণা করতো।

শান্তির মাসসমূহ

বছরে এক বা একাধিক মাস তারা শান্তিকাল বলে নির্ধারিত করে রাখতো যখন যুদ্ধবিগ্রহ করাকে তারা অবৈধ জ্ঞান করতো। এ সময় সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ মুলতবি থাকতো। এ অবকাশে

বসতো বড় বড় মেলা। অনুষ্ঠিত হতো মুশায়েরা বা কবিসভা। এ সুযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যও তারা করে নিতো। এ-ই ছিল সেকালের আরব সমাজের গুণের দিক। এবার মুদ্রার অপর পিঠটাও দেখা যাক।

ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, কোন কোন গোত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না। তাদের কেউ কেউ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও পরকালে এবং হিসাব-নিকাশে তারা বিশ্বাস করতো না। মূর্তিপূজক ও নক্ষত্র পূজারীদের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। কোন কোন গোত্রের মধ্যে অগ্নি উপাসনারও প্রচলন ছিলো। খানা কা'বাকে তারা মূর্তিপূজার কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিলো এবং সেখানে তারা তিন শ' ষাটটি মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিলো। সিরিয়ার দিক থেকে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী এসে আরবে বসবাস করতে থাকে। হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই এরা আরবে এসে বসবাস করতে শুরু করে। বনী কুরায়যা, বনী নযীর, বনী কায়নূকা প্রভৃতি ইয়াহূদী গোত্র ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও আরব দেশে বসবাস করতো। এদের নিবাস ছিল গাস্সান ও নাজরানে। বনী খুযায়ার কিছু সংখ্যক লোকও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলো।

মূর্তিপূজা

আরবের সর্বত্র ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজার প্রকাশ্য প্রচলন ছিলো। নবী করীম (সা)-এর চার শ' বছর পূর্বে পারস্য সম্রাট শাপূরের শাসনামলে হিজাযের বাদশাহ্ আমর ইব্ন লুহায়্যি, সর্বপ্রথম খানা কা'বার ছাদে হুবল নামের মূর্তি এবং যমযম কূপের ধারে আসাফ ও নায়িলা নামের দু'টি মূর্তি রেখে সেগুলোর পূজার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করে। ঐ ব্যক্তি কিয়ামত বা পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না। এ ছাড়াও ইয়াগূছ, ইয়াউক, নসর, উদ্দ, সুওয়া প্রভৃতির দেবমূর্তির পূজা করতো বিভিন্ন কবীলার লোকজন। প্রত্যেক কবীলার নিজস্ব স্বতন্ত্র দেবমূর্তি ছিলো। উদ্দের আকার ছিল পুরুষের। নায়িলার অবয়ব ছিল নারীর। সুওয়াও ছিল নারীমূর্তি। ইয়াগূছের অবয়ব ছিলো সিংহের। ইয়াউকের অবয়ব ছিল ঘোড়ার এবং নসর ছিল শকুনাকৃতির। তাসাম এবং জাদীসের দেবমূর্তি ছিল অভিন্ন। কালব গোত্র উদ্দের পূজারী ছিল। এটা দূমাতুল জান্দালে অবস্থিত ছিলো। বনূ তামীম পূজা করতো তায়মের। হুযায়ল গোত্রের পূজা ছিল সুওয়া'। মুযজাহ এবং ইয়ামানের গোত্রসমূহ পূজা করতো ইয়াগূছের। হিমইয়ারের যুলকিলা' গোত্র পূজা করতো শকুনাকৃতির নসর দেবমূর্তির। হামদানরা ইয়াউক দেবমূর্তির আর বনী ছাকীফ গোত্র তায়িফে লাতের পূজা করতো।

বনী ছাকীফের একটি শাখাগোত্র বনী মুগীছ লাত দেবতার দ্বাররক্ষী নিযুক্ত ছিলো। কুরায়শ ও বনী কিনানা উয্যার পূজারী ছিলো। বনূ শায়বা ছিলো উয্যার দ্বাররক্ষী। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পূজা করতো মানাফের। বনী হাওয়াযিন জিহার, বকর ও তাগলিব আউয়ালের, বনী বকর ইব্ন ওয়ায়িল মুহ্রিকের, বনী মালকান ইব্ন কিনানা সাআদ-এর, বনী আনতারা সাঈদ-এর, বনী খাওলান উমিয়ানূসের, বনী তাঈ রিযা-এর এবং দূওস গোত্র যুল-কাফ্ফায়নের পূজো করতো। উপরোক্ত দেবমূর্তি ছাড়াও জারীশ, শারিক, আয়িম, মাদান, আওফ, মান্নাফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি কোন-না-কোন গোত্রের দ্বারা পূজিত হতো। খানা কা'বায় যখন

মূর্তিপূজারীদের সমাবেশ হতো। তখন কোন গোত্রের লোক নির্ধারিত দিনে কা'বায় পৌছতে না পারলে তারা দাওলার নামে একটি প্রস্তর স্থাপন করে তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতো। আরব দেশে খানা কা'বার মত আরো কয়েকটি মূর্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। গাতফান গোত্র একেবারে কা'বার আকৃতির একটি তীর্থকেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছিল। তারা এর নাম রেখেছিল লাইস। সেখানেও তারা হজ্জ পালনও করতো। বনী খাশআম যুলখালিসা নামে অপর একটি তীর্থকেন্দ্র নির্মাণ করেছিল। সেখানেও অনুরূপ হজ্জ পালিত হতো। উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সাঈদা নামক একটি উপাসনালয় ছিল। আরবের মূর্তিপূজারীরা তারও হজ্জ পালন করতো। রবীআ গোত্রের উপাসনালয়ের নাম ছিল যু'ল-কা'বাত। তারও তাওয়াফ করা হতো। নাজরানেও একটি গোত্রীয় উপাসনা মন্দির বিদ্যমান ছিল–যা তিন শ' চর্ম দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ওটাকে বলা হতো নাজরানের কা'বা। আরবের মূর্তিপূজারীরা কা'বার মতো ওটারও যিয়ারত করতে ছুটে যেতো। অধিকন্তু তারা ওটাকে হারামও বানিয়ে রেখেছিল, অর্থাৎ কোন হত্যাকারী ব্যক্তি ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করলে ওখানে সে নিরাপদে থাকতে পারতো। খানা কা'বার ছাদে হুবল ব্যতীত শামস নামক অপর একটি মূর্তিও ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মারয়াম (আ)-এর মূর্তিও খানা কা'বায় পূজিত হতো।

কুরবানী

পৌত্তলিকরা যখন হজ্জে আসতো, তখন তারা কুরবানীর জন্যে উটও নিয়ে আসতো। সেসব উটের গলায় পরিচিতিস্বরূপ তারা জুতা লটকিয়ে দিতো এবং সেগুলোর কুঁজ যখম করে দিতো। তা দেখলেই লোকে বুঝতে পারতো যে এগুলো কুরবানীর উট। তখন কেউ আর এগুলোর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতো না। উটের বাচ্চা, ভেড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু তারা মূর্তির নামে উৎসর্গ করতো। কোন কোন গোত্রের লোকজন এসব মূর্তির জন্যে নরবলি পর্যন্ত দিতো।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আরবের মূর্তিপূজারীরা তাওহীদেও বিশ্বাসী ছিলো এবং এক আল্লাহ্‌কে জানতো। তারা উক্ত মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশকারী জ্ঞানে পূজো করতো। এদের মধ্যে কোন কোন কবীলার লোকজনের এরূপ বিশ্বাস ছিলো যে কোন মৃত ব্যক্তির কবরে উটনী যবাই করে দিলে সেই উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে উত্থিত হবে। তাদের এ বিশ্বাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পুনরুত্থানে এবং শেষ বিচারে হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিল।

নক্ষত্র পূজা

জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে নক্ষত্র পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই যে, আরব, মিসর, গ্রীস ও ইরান এ চারটি দেশের নক্ষত্রপূজারীদের মধ্যে কোন্ দেশের নক্ষত্রপূজারীরা উস্তাদ ছিল আর বাকী কোন্ তিনটি দেশের নক্ষত্রপূজারীরা তাদের শাগরিদ ছিল। মোটকথা, একথা বলা মুশকিল যে, নক্ষত্রপূজার প্রথাটি আরব দেশে বাহির থেকেই এসেছিল, নাকি তারাই এর মূল উদগাতা। হামীর গোত্র সূর্যের, কিনানা গোত্র চাঁদের, তামীম গোত্র ওহরানের, লুখাম ও জুযাম গোত্র বৃহস্পতি গ্রহের, তাঈ গোত্র সুহায়ল নামক নক্ষত্রের, কায়স গোত্র লুব্ধক নক্ষত্রের এবং আসাদ গোত্র বুধ গ্রহের পূজা করতো। অধিকাংশ গোত্রের দেবমূর্তির গ্রহ-নক্ষত্রের নামে নামকরণ করা হতো। প্রস্তর

নির্মিত মূর্তিগুলো এবং বিখ্যাত গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর পূজা বিভিন্ন গোত্র যৌথভাবেই করতো। গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্তের উপরই তাদের উল্লেখযোগ্য গোছের কাজগুলো করা নির্ভর করতো। মরুভূমির খোলা আকাশের নীচে বসতকারীদের জন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি এরূপ ঘনিষ্ঠতাবোধ করা, এগুলোর কোন কোনটার পূজায় লিপ্ত হওয়াটা বিচিত্র কিছু ছিলো না। কুরআন শরীফের সূরা নূহ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ (আ)-এর যুগে ইরাক-আরবে ইয়াগূছ, ইয়াউক, উদ্দ, নসর, সুওয়া প্রভৃতির পূজা হতো। গ্রহ-নক্ষত্রের নামানুসারেই এসব দেবমূর্তির নামকরণ করা হয়েছিলো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নক্ষত্রপূজা প্রাচীনকাল থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। নক্ষত্রপূজারীদের মধ্যে চাঁদের পূজারী সংখ্যাই ছিলো সর্বাধিক এবং চাঁদই ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় উপাস্য।

কিহানত (ভবিষ্যত বলা)

আরবে কাহিন বা গণৎকারের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। কাহিন বলা হতো ঐ সব লোককে যারা গুপ্ত রহস্য ও অদৃশ্য জগতের সংবাদাদি জানার দাবী করতো। যারা অতীতে সংঘটিত ব্যাপারসমূহের সংবাদ দিতো তাদেরকে কাহিন এবং যারা ভবিষ্যতের সংবাদ দিতো তাদেরকে আর্রাফ বলা হতো। অদৃশ্য জগতের সংবাদ যারা দিতো তাদের মধ্যে নারীপুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলো। আফআ, জাযীমা, আবরাশ, শিক, সাতীহ্ প্রমুখ ছিলো সেকালের আরবের নামকরা গণৎকার। গণৎকারদের একটি শ্রেণী ছিলো যাদেরকে নাযির বা দ্রষ্টা বলা হতো। এরা দর্পণে বা পানিভর্তি পাত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অদৃশ্য জগতের সংবাদ বলে দিতো অথবা পশুপক্ষীর অস্থি, যকৃত প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। এদের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপকারী এবং বীজ নিক্ষেপকারী গণৎকারও ছিল। কিন্তু এদের মর্যাদা আর্রাফ এবং কাহিনদের চাইতে কম বলে গণ্য হতো। তাবীয বা ঝাঁড়ফুঁককারীদের মর্যাদা তাদের চাইতেও নীচে ছিলো।

ফাল-ভাগ্যপরীক্ষা

অন্ধকার যুগে আরবদেশে সুলক্ষণ এবং কুলক্ষণ পরীক্ষা করার বহুল প্রচলন ছিলো। কাককে তারা খুবই কুলক্ষুণে জ্ঞান করতো এবং একে বিচ্ছেদের হেতু বলে মনে করতো। আরবী ভাষায় কাককে যেহেতু গুরাব বলা হয়ে থাকে তাই মুসাফিরীকে তারা গুরবত এবং মুসাফিরকে গরীব বলে অভিহিত করে। অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিলো যে, কাকের প্রভাবেই মানুষ বিরহ-বিচ্ছেদের কবলে পড়ে দুর্ভোগের শিকার হয়ে থাকে। তারা পেচাকেও অত্যন্ত অলক্ষুণে জ্ঞান করতো। তাদের ধারণা ছিলো যে, পেচা শব্দ করলে মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংস অনিবার্য। তারা হাঁচি দেওয়াকেও কুলক্ষুণে জ্ঞান করতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক যাদুকরও ছিল। তারা একে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতো। অসাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে শয়তানকে বশীভূত করার জন্যে তারা অনেক কঠোর সাধনায় লিপ্ত হতো।

যুদ্ধপ্রীতি

অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হতো। আর একবার যুদ্ধের সূত্রপাত হলে তখন কয়েক পুরুষ এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে চলতো। তাদের যুদ্ধসমূহের মধ্যে এমন কোন যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না, যা কোন সঙ্গত কারণে বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছিল। জাহিলিয়াত যুগের আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের

মধ্যে শ' সোয়াশ' যুদ্ধ অত্যন্ত বিখ্যাত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বুআসের যুদ্ধ, কিলাবের যুদ্ধ, ফাতরাতের যুদ্ধ, নাখলার যুদ্ধ, কার্নের যুদ্ধ, সুবানের যুদ্ধ, হাতিবের যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সব যুদ্ধে কোন পক্ষেরই কোন লাভ হয়নি, বরং উভয় পক্ষই জানে-মালে উৎসন্ন হয়েছে।

আরব জাহিলিয়াতের এটাও একটা রেওয়াজ ছিল যে, যখন তারা প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হতো এবং তাদের স্ত্রীপুত্র-পরিজনকে বন্দী করতো তখন তারা নির্দ্বিধায় ঐসব অসহায় বন্দীকে হত্যা করতো। কিন্তু বন্দীদের কেউ যদি তাদের আহার্য থেকে কিছু খেয়ে নিত, তাহলে সে রক্ষা পেতো, তাকে আর হত্যা করা হতো না। তারা যাকে মুক্তি দিতে চাইতো প্রথমে তার মাথার চুল মুণ্ডন করে দিত। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বহুল প্রচলন ছিল। সারিবদ্ধভাবে লড়াইয়ের রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল না। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়ার দেখাশোনায় তারা খুবই মনোযোগী ছিল। অসি চালনা, তীরন্দাজী ও বল্লম নিক্ষেপে কৃতিত্বের অধিকারীদের সমাজে খুবই সম্মান ছিল। এ ধরনের লোকদের ডাকনাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো। যুদ্ধ কৌশল ও যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার জন্যে কোন কোন গোত্রের খুবই খ্যাতি ছিল। বিশেষ বিশেষ তলোয়ার, বল্লম, ধনুক, ঘোড়া প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হতো এবং ঐ নামে এগুলো গোটা দেশে পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ হারছ ইব্‌ন আবূ শামর গাস্‌সানীর তলোয়ারের নাম ছিল খাযূম। আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের তলোয়ারের নাম আতশান এবং মালিক ইব্‌ন যুবায়েরের তলোয়ারের নাম ছিল যুন-নূন।

এসব দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আরবরা যুদ্ধ-বিগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। এজন্যে ঘোড়া ও তরবারির আরবী প্রতিশব্দ হাজারটি পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে।

প্রেম-প্রীতি

আরব জাহিলিয়াতে পর্দার কোন বালাই ছিলো না। তাদের মহিলারা যথাযথভাবে পুরুষদের সম্মুখে আনাগোনা করতো। জীবন যাত্রার উপায়-উপকরণ ও ব্যস্ততার অভাব, বল্গাহীন চরিত্র ও মেজায, প্রচুর অবসর, কাব্যিকতা ও বংশগৌরব, উপরন্তু উত্তপ্ত আবহাওয়া ও নিঃসর্গ তাদের মধ্যে এ ব্যাধিরও জন্ম দেয়। জাহিলিয়াত আরব সমাজে ঐ ব্যক্তি চরম নীচ ও অভদ্র বলে বিবেচিত হতো যার কোন রমণীর সাথে কোন দিন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। আরবের কোন কোন কবীলা প্রেমলীলার জন্যে বিখ্যাত ছিলো। উদাহরণস্বরূপ আয্‌রা গোত্রের কথা বলা যেতে পারে। তাদের প্রেমলীলা এতই মশহুর ছিলো যে, আরবের একটি প্রবাদবাক্য অত্যন্ত মশহুর তা হলো : عشق من بنى عذرة। অর্থাৎ অমুক প্রেমলীলায় বনী উযরাকেও মাত করে দিয়েছে। জনৈক বেদুঈনকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলেছিলো, আমি এমনি এক গোত্রের লোক যারা প্রেম করলে অনিবার্যভাবে সে প্রেমের জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। জনৈক কিশোরী তা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করলো : عذرى ورب الكعبة অর্থাৎ কা'বার প্রভুর কসম, তুমি অবশ্যই আযরা গোত্রের লোক হবে।

কাব্যচর্চা

আরব জাহিলিয়াতে এমন কোন লোক ছিলো না, যার মধ্যে কাব্যিকতা ছিল না। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কিছু না কিছু কাব্যিকতার অধিকার ছিল যেন তারা মাতৃগর্ভ থেকেই কবি হয়ে আসতো। জন্মগতভাবেই তারা ছিল অলংকারসমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী।

সাধারণত তাদের কবিতা হতো তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতা রচনার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা বা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নেয়ার তাদের আদৌ প্রয়োজন হতো না। তাদের ভাষাসৌকর্য ও কাব্যিকতার এমনি গর্ব ছিল যে, গোটা বিশ্বের তাবৎ অনারব লোককে তারা বোবা জ্ঞান করতো। কিন্তু কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়ে আরবদের সে দর্পকে চিরতরে চূর্ণ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই কাব্যিকতা ও ভাষা সৌকর্যের জন্যে দর্পকারী আরবরা আল্লাহ্‌র বাণীর অভূতপূর্ব ভাষাসৌকর্য ও লালিত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

বার্ষিক মেলা উৎসব এবং হজ্জের সময় অনুষ্ঠিত মজলিসে মুশায়েরা বা কবিসভায় যার কবিতা সর্বোত্তম বলে সাব্যস্ত হতো রাতারাতি সে বিপুল মান-সম্মান ও যশের অধিকারী হয়ে পড়তো। একজন কবির সম্মান সে সমাজে একজন বীরপুরুষ বা রাজা-বাদশাহর সমান বা তার চাইতেও অধিক ছিল। আসলেও গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া, কোন গোত্রকে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা, যুদ্ধ অব্যাহত রাখা বা তার অবসান ঘটানো ছিল কবিদের বাম হাতের খেলা স্বরূপ। সর্বোত্তম কাসীদাগুলো খানা কা'বায় লটকিয়ে দেয়া হতো। এমনি সাতটি কাসীদা 'সাবয়ে' মুআল্লাকা' বা ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক নামে বিখ্যাত। ইমরাউল কায়েস ইব্‌ন হাজার কিন্দী, যুবায়র ইব্‌ন আবূ সালমা মুযানী, লবীদ ইব্‌ন রবীআ, উমর ইব্‌ন কুলছুম, আন্‌তারা আবসী প্রমুখ কবির দ্বারা এগুলো রচিত হয়।

শিকার

জাহিলিয়াত যুগের আরবরা ছিলো অত্যন্ত শিকার প্রিয়। এজন্যে আরবী ভাষায় শিকারের অনেক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যে শিকার ডান দিক থেকে এসে বাম দিকে চলে যেতো তাকে বলা হতো সালিখ; আবার যে শিকার বাম দিক থেকে এসে ডান দিকে চলে যেতো তাকে বারিহ বলা হতো। যে শিকার সম্মুখ দিক থেকে আসে তাকে নাতিহ্ আবার যে শিকার পিছন দিক থেকে আসে তাকে 'কাঈদ' বলা হত। শিকারের জন্য শিকারী যেখানে ওঁৎ পেতে থাকে তাকে কুরাহ বলা হতো। আবার বাঘ শিকারের জন্যে যে গর্ত খনন করা হতো তাকে বলা হতো যাবিয়া। শিকার জন্তু লক্ষ্য করে পেটের উপর ভর দিয়ে মাটি কামড়ে এগিয়ে যাওয়াকে তালবুদ এবং শিকারীর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসাকে আখদাক বলা হতো। তারা যা-ই শিকার করতো তা-ই নির্বিচারে খেয়ে নিত। হালাল হারামের কোন বাছ-বিচার করতো না। ইসলাম হারাম-হালালের শর্ত আরোপ করে এবং শিকারের মধ্যে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবার

আরব দেশে রেশম বা তুলা কিছুই উৎপন্ন হয় না। যদিও বা কোন প্রদেশে উৎপন্ন হয়, তাও পরিমাণে এতই অল্প যে দেশবাসীর প্রয়োজন তা মেটাতে পারে না। ইয়ামানে প্রাচীনকাল থেকেই বস্ত্র বয়ন হয়ে আসছে। সাধারণভাবে আরববাসীদের লেবাস-পোশাক অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর ছিল। মোটা কাপড়ের জামায় চর্মের তালি লাগিয়ে পরা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কেউ কেউ চামড়ার ছোট ছোট টুকরাকে সূচের দ্বারা ঢেকে নিয়ে চাদর বানিয়ে নিত। এ চাদর নির্দ্বিধায় তারা চাদর ও বিছানারূপে ব্যবহার করতো। উট ও ভেড়ার লোম দিয়েও কাপড় হতো। ঢিলেঢালা লম্বা কোর্তা ও লুঙ্গি এবং মাথায় রুমাল ও পাগড়ী ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সুবাসিত কাঠ, আম্বর, লোবান ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত ছিল।

আরবদের আহার্যও ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরবিহীন। নিরস বিস্বাদ খাদ্যেই তারা তৃপ্ত থাকতো। গোশ্‌ত ছিল তাদের সবচাইতে প্রিয়, মূল্যবান ও সুস্বাদু খাদ্য। দুধ, গোশ্‌ত, চীনা প্রভৃতি ছিল দেশের সাধারণ খাদ্য। পনীর, যবের ছাতু, খেজুর, যয়তূন তৈল, হারীর প্রভৃতির ব্যবহারও চালু ছিল। টিড্ডি, ফড়িংও তারা খেতো–যা ঐ দেশে প্রচুর পাওয়া যেতো। আটা চালুনীতে ছেঁকে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বিনা ছাঁকা আটার রুটিও তারা রান্না করে খেতো। মরুভূমির শুশুকও তারা রান্না করে অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যরূপে খেতো। পানাহারের রীতিনীতিও ছিল একান্তই সাদাসিধে। পানাহার সংক্রান্ত নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহে বর্ণিত বিধি-নিষেধসমূহ পাঠে সে সম্পর্কে একটি ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যাতে অনেক প্রকার অশিষ্ট আচরণ করা হয়েছে। তাতে অধিক ভোজন, নির্লজ্জতা, নোংরামী এবং বাজে বকা থেকে বারণ করা হয়েছে।

লুণ্ঠন ও রাহাজানি

উপরেই বলা হয়েছে আরবদেশে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত ও যাযাবর এ দু'শ্রেণীর লোক বাস করতো। আর এদের মধ্যে যাযাবরদের সংখ্যাই ছিল অধিক। শহুরে লোকদের মধ্যে যদিও প্রতিবেশীর অধিকার সচেতনতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণ ছিল, তথাপি ব্যবসায় প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। বেদুঈন শ্রেণীর লোকেরা ডাকাতি, রাহাজানি ও তস্করবৃত্তিতে ছিলো অত্যন্ত পাকা। পথচারীদেরকে লুটপাট করে তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করা ছিলো সকলের সাধারণ অভ্যাস। কোন পথচারীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পেলে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তারা তাকে দাসরূপে বিক্রি করে দিত। পথিপার্শ্বের কূয়ো তৃণ গুল্মাদি দিয়ে এ উদ্দেশ্যে ঢেকে রাখা হতো যাতে পথিক পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করে আর তার মালপত্র নির্বিবাদে হস্তগত করা যায়। তস্করবৃত্তিতে তারা ছিল পাকা উস্তাদ। কেউ কেউ তো চুরি বিদ্যায় এমনি পাকা ছিল যে, তাদের নাম প্রবাদ বাক্যের মত মশহুর ছিল। এদেরকে আরবের নেকড়ে বলা হতো।

দাম্ভিকতা

দম্ভ ও অহংকারের নীচ প্রবৃত্তি জাহিলিয়াতের আরব সমাজে চরমে পৌঁছে ছিল। জাযীমা আবরাশের অহংকারের অবস্থাটি এই যে, সে কাউকে তার মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা পারিষদ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। সে বলতো, আকাশের তারকারা হচ্ছে আমার সভাসদ, অন্য কোন সভাসদের আমার প্রয়োজন নেই। বনী মাখযুম গোত্রের লোকেরাও অহংকারের জন্য বিখ্যাত ছিল। অনুরূপভাবে আরও অনেক গোত্রের এ কুখ্যাতি ছিল। তৎকালীন আরবের কোন একটি গোত্রও এ ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতাই তাদের নবী-রাসূল হিদায়াতকারীদের ওয়ায-নসীহত শ্রবণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কোন হিদায়াতকারীর আনুগত্যকে দোষাবহ জ্ঞান করতো।

বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা

যদি কোন হত্যাকারী বা প্রতিপক্ষের জীবদ্দশায় তাকে বাগে না পাওয়া যেতো, তাহলে তার পুত্র, পৌত্র বা নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেয়া হতো এবং প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত অস্থিরতার অন্ত থাকতো না। শত্রুতার হেতু স্মরণ না থাকলেও শত্রুতা যে আছে

তা কিন্তু বিলক্ষণ স্মরণ থাকতো। অনেকে শুধু এজন্যেই নিহত হতো যে, হত্যাকারী গোত্রের সাথে তাদের গোত্রীয় শত্রুতা আছে, কিন্তু সে শত্রুতার হেতু কি তা তারা বলতে পারতো না।

শোক বিলাপ

যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হতো তখন তার নিকটাত্মীয়রা ললাট ঘর্ষণ করে এবং মাথার চুল ছিঁড়ে হায় হায় করে বিলাপ করতো। মহিলার চুলের বেণী খুলে মাথায় মাটি মেখে শবদেহের পিছু পিছু চলতো-যেমনটি ভারতের হিন্দুরা তাদের মৃতজনকের শোকে চুল ও গোঁফ দাড়ি মুণ্ডন করে শোক পালন করে থাকে। জাহিলিয়াতের যুগে আরবে মাতমকারিণী মহিলাদেরকে ভাড়া করে বিলাপের জন্যে নিয়ে আসা হতো। তারা অত্যন্ত জোরেশোরে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতো। দাফন কাফন শেষ করে বিলাপকারিণীদেরকে উত্তমরূপে আপ্যায়িত করা হতো। ইসলাম এসে সেসব জাহিলিয়াতের প্রথা-পদ্ধতির অবসান ঘটায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে দশমী, চল্লিশতম দিনে চেহলাম, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক শোক উৎসব করার কুসংস্কার এখনো চালু রয়েছে। আরব জাহিলিয়াতের প্রতিচ্ছবি আজো আমরা আমাদের চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কুসংস্কার

জিন-পরী, দৈত্য-দানবেও জাহিলিয়াতের আরবরা বিশ্বাস করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পরীরা পুরুষ লোকের প্রেমে পড়ে এবং জিন্‌রা নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। জিনদেরকে তারা অদৃশ্য জীবন বলে বিশ্বাস করতো। আবার সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করতো যে, অশরীরী আত্মার সাথে মানুষের জড়দেহের মিলনেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, জুরহাম মানুষ ও ফেরেশতার মিলনের ফসল ছিল। অনুরূপ ধারণা তারা সাবার রানী বিলকীস সম্পর্কেও পোষণ করতো। আমর ইব্‌ন ইয়ারবূ' সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ ও প্রান্তরের ভূতের মিলনে তার জন্ম হয়েছিল। যে উষ্ট্রীর পাঁচটি শাবক হতো এবং তার পঞ্চমটি নর হতো তারা তার কান ছিদ্র করে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতো। সে উষ্ট্রী যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াতে এবং যা ইচ্ছা খেতে পারতো, কেউ তাকে বাধা দিতো না। এমন উষ্ট্রীকে তারা 'বহীরা' বলে অভিহিত করতো। ভেড়ার নর শাবক হলে তারা তা' দেবতার নামে বলি দিত। পক্ষান্তরে মাদী হলে তারা তা নিজেদের জন্যে রেখে দিতো। যদি ভেড়ার দুটো শাবক নর ও মাদী এক সাথে জন্মগ্রহণ করতো তবে এগুলো তারা কুরবানী দিতো না। তারা একে وصيلة নামে অভিহিত করতো। যে উষ্ট্রের সহবাসে দশটি উষ্টছানার জন্ম হতো, তারা সেটাকে খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখতো। তারা তাতে মাল বোঝাই করতো না বা নিজেরা তাতে আরোহণ করতো না এবং ষাঁড়ের মতো স্বাধীন ছেড়ে দিতো। তারা এর নামকরণ করতো 'হাম' (حام) বলে। তারা মূর্তির সম্মুখে বা মূর্তিশালার দেউড়ীতে তিনটি তীর রেখে দিতো। তার একটাতে 'না' ও একটাতে 'হাঁ' লেখা থাকতো। এ তীরগুলো একটা তূণে থাকতো। যখন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তারা তূণ থেকে একটা তীর উঠিয়ে দেখতো তাতে কি লেখা আছে। যদি তাতে 'না' লিখিত তীর উঠতো তবে তারা সে কাজ থেকে বিরত রইতো। আর 'হাঁ' লিখিত তীর উঠলে তাকে দেবতার সম্মতি আছে

বলে তারা ধরে নিত। যদি তৃতীয় তীরটি উঠতো–যাতে কিছু লিখিত থাকতো না, তাহলে তারা পুনরায় তীর উঠাতো এবং যতক্ষণ 'হাঁ' লিখিত তীরের দ্বারা এভাবে দেবতার ইচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারতো ততক্ষণ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করে যেতো।

কখনো কার্যব্যাপদেশে বাইরে যেতে হলে তারা 'রতম' নামক একটি বৃক্ষের ছোট্ট শাখায় একটা গাঁট দিয়ে যেতো এবং ফিরে এসে দেখতো যে, সে গাঁটটা ঠিক আছে, নাকি খুলে গেছে। ঘটনাক্রমে সে গাঁটটি কোন ভাবে খুলে গেলেই তারা ধরে নিত যে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। গাঁটটি পূর্ববৎ থাকলেই কেবল স্ত্রীর সতীত্ব বহাল আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তারা তার কবরে তার উষ্ট্রীকে চোখ বন্ধ করে বেঁধে রাখতো এবং উষ্ট্রীটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তাকে বেঁধে রাখতো। অথবা ঐ উষ্ট্রীর মাথা পিছনের দিকে টেনে তার বুকের সাথে বেঁধে দিত এবং এভাবেই উষ্ট্রীর মৃত্যু হতো। তাদের ধারণা ছিল যে, তাতে পরকালে যখন ঐ মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উত্থিত হবে তখন সে এ উষ্ট্রীটিতে আরোহণ করেই উঠতে পারবে। তাদের বিশ্বাস ছিল, যদি কোন ব্যক্তি কোন জনপদে গিয়ে সেখানকার মহামারী সম্পর্কে ভীত হয় আর সে ব্যক্তি সেই জনপদের দ্বারপথে দাঁড়িয়ে গাধার সুরে চিৎকার করে, তাহলে সে মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পাবে। যখন কোন ব্যক্তির উটের সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করতো তাহলে পালের মোটা ষাড়টার দু'টি চোখ উপড়ে ফেলা হতো। তাদের ধারণা ছিল যে, এতে উটের পাল বদনযর থেকে রক্ষা পাবে। যখন কোন উটের খোস-পাঁচড়া হতো তখন সেই অসুস্থ উটের পরিবর্তে তারা সুস্থ উটের গায়ে দাগ দিতো এবং তাদের ধারণা ছিল যে, এভাবে অসুস্থ উটটির রোগ সেরে উঠবে। এ ব্যাপারে কবি নাবেগার উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে :

حَمَلْتُ عَلَىَّ ذَنْبَهُ وَتَرَكْتَهُ
كَذَا الْعَزَّ بِكَوِىْ عَيْرَهُ وَهُوَ رَائِعٌ

তার দোষের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে তুমি তাকে ছেড়ে দিলে—যেমনটি পাঁচড়া রোগাক্রান্ত উটকে ছেড়ে দিয়ে চারণক্ষেত্রে বিচরণরত সুস্থ উটকে দাগ দেয়া হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে যখন কোন গাভী পানি পান না করতো তখন তারা ষাঁড়কে ধরে বেদম পিটাতো। তাদের ধারণা ছিল, ষাঁড়ের উপর জিন সওয়ার হয়ে গাভীকে পানি পানে বাধা দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা ছিল যে, কোন নিহত ব্যক্তির রক্তের বদলা না নিলে তার মাথার খুপড়ী থেকে একটি পাখি বের হয়ে অস্থিরভাবে চীৎকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে আমাকে পানি পান করাও, আমাকে পানি পান করাও এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার রক্তের শোধ নেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। তারা উক্ত কল্পিত পাখির নাম ঠাউরিয়েছিল 'হামা'। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি মানুষের পেটে একটি করে সাপ থাকে। যখন সে সাপটি ক্ষুধার্ত হয় তখন পাঁজরের হাড় থেকে সে গোশ্‌ত খুলে খুলে খায়। তাদের ধারণা ছিল যে, যদি কোন মহিলার গর্ভজাত সন্তান মারা যায়, তাহলে সে মহিলা যদি কোন সম্ভ্রান্তধর্মী ব্যক্তির লাশকে উত্তমরূপে পদদলিত করে, তবে তার সন্তান বাঁচতে শুরু করবে। তাদের ধারণা ছিল যে,

জিন-ভূতেরা খরগোশকে ভীষণ ভয় করে। তাই জিন-ভূতের কুপ্রভাব থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তারা খরগোশের হাড্ডি শিশুদের গলায় তাবীযস্বরূপ ঝুলিয়ে দিত।

কন্যা হত্যা

বনী তামীম এবং কুরায়শদের মধ্যে কন্যা হত্যার সমধিক প্রচলন ছিল। তারা এজন্যে রীতিমত গর্ববোধ করতো এবং একে তাদের জন্যে সম্মানের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। কোন কোন পরিবারে এ পাষণ্ডতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মেয়েরা যখন বেশ বড় হয়ে যেতো এবং মিষ্টি কথা বলতে শুরু করতো, তখন পাঁচ ছ'বছর বয়সে তাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করে পিতা তাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেতো। পাষণ্ড পিতারা পূর্বেই সেখানে গিয়ে গর্ত খুঁড়ে আসতো এবং পরে মেয়েকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত। অবোধ মেয়ে তখন অসহায় অবস্থায় চীৎকার করে করে বাপের সাহায্য চাইতো, কিন্তু পাষণ্ড পিতা তার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তাকে হত্যা করতো বা জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে নিজ হাতে কবর সমান করে দিয়ে নির্বিকারে ঘরে ফিরে আসতো এবং এভাবে আপন কলিজার টুকরো সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার জন্যে সে রীতিমত গর্ববোধ করতো। বনী তামীমের জনৈক কায়স ইব্‌ন আসিম এভাবে একে একে তার দশটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে। কন্যা হত্যার এ অমানুষিক বর্বরতা থেকে আরবের কোন কবীলাই মুক্ত ছিল না। তবে কোন কোন কবীলায় এটি অনেক বেশী হতো, আবার কোন কোন কবীলায় তা কম হতো।

জুয়াখেলা

জাহিলিয়াতের যুগে আরবের অধিবাসীরা জুয়াখেলায় অত্যন্ত আগ্রহী ও অভ্যস্ত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আযলামের সাহায্যে জুয়াখেলা হতো। আযলাম ছিল জুয়াখেলার তীর বিশেষ। তাতে পালক সংযোজিত থাকতো না। সে তীরের সংখ্যা হতো দশটি। প্রত্যেকটি তীরের স্বতন্ত্র নাম থাকতো। নামগুলি ছিল এরূপ : (১) গুয, (২) তাওয়াম, (৩) রকীব, (৪) নাফিস, (৫) হাল্‌স, (৬) মুবাল, (৭) মুআল্লা, (৮) ফসীহ (৯) ফাইহী (১০) ওগাদ। প্রত্যেকটি তীরের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাগ নির্ধারিত থাকতো। যেমন গুযের এক ভাগ, তাওয়ামের দু'ভাগ। এভাবে সপ্তম তীর পর্যন্ত এক এক ভাগ করে বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তম তীরের ভাগ সংখ্যা থাকতো সাতটি। অবশিষ্ট তিনটি তীরের কোন ভাগ ছিল না। দশজন ধনী ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্ট দেখে দশটি ছাগল কিনে এনে এগুলোকে যবাই করে আটাশ ভাগে বিভক্ত করতো। সমস্ত তীর একটি তূণে রেখে এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হতো এবং সে প্রত্যেককে একটি করে তীর দিতো। তারপর যার তীরে যত ভাগের চিহ্ন থাকতো সে তত ভাগ করে গোশত পেতো এবং শেষোক্ত তিনটি তীর যাদের হাতে পড়তো, তারা কিছুই পেতো না। তারা বঞ্চিত রইতো। খানা কা'বার মধ্যে হুবল দেবতার সম্মুখে এ জুয়া খেলা হতো। জুয়ার আরেকটি পদ্ধতি ছিল এই যে, কিছু বালি এনে কোন বস্তু তার মধ্যে গোপন করা হতো। তারপর উক্ত বালির স্তূপকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হতো, এবার বল দেখি বস্তুটি কোন্ স্তূপের মধ্যে রয়েছে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তা সঠিকভাবে বলে দিতে পারলে সে জুয়ায় জিতে যেতো, নতুবা সে হেরে যেতো।

জাহিলিয়াতের যুগে আরব ও সমসাময়িক বিশ্ব

উপরে ইসলামের অভ্যুদয় ও নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত লাভের প্রায় এক শ' বছর পূর্বে আরবের অধিবাসীদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা)-এর আগমন পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান ছিলো। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করে দেখুন, যাদের মধ্যে নবী করীম (সা) প্রেরিত হলেন আর যারা ছিলো ইসলামের প্রথম সম্বোধিত মানবশ্রেণী, তাদের অবস্থা কত শোচনীয় ছিলো। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে রাসূলে আরাবীর শিক্ষাবলী এবং ইসলামের প্রভাবে আরবদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিবরণ পাঠ করে তারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, নবী করীম (সা)-এর আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের প্রভাব কী বিপুল শক্তির নাম। তাদের এ উপলব্ধি আরো যথার্থ হবে যখন তারা নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের সমসাময়িক যুগের বিশ্বের প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখবেন যে, ইসলাম গোটা বিশ্বের বুকে বিস্তার লাভ করে পৃথিবীর বুকে কী পরিবর্তন সাধন করেছে। তাই আরবদের উল্লিখিত বিবরণ প্রদানের পর জাহিলিয়াতের যুগে আরবদের সমসাময়িক বিশ্বের একটি মোটামুটি চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি।

ইরান

ইরান বিশ্বের অত্যন্ত প্রাচীন একটি সম্ভ্রান্ত দেশ বলে গণ্য হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এদেশে মাহ্ আবাদী ধর্ম প্রচলিত ছিল। ঐ প্রাচীন ধর্মটির অনেক সংস্কারকও সেদেশে জন্মগ্রহণ করে তাদের ধর্মের সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। এর প্রথম পর্যায় শেষ না হতেই যরথুস্ত্র নতুনভাবে অগ্নি উপাসনার ধর্ম চালু করেন। এ ধর্মটিকে 'মাহ্ আবাদী' ধর্মেরই নতুন সংস্কারকৃত রূপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। যরথুস্ত্র সত্য ধর্মের প্রচারক বলে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এ ধর্মটি ইরানী জনসাধারণ ও রাজ-রাজড়ার ধর্মে পরিণত হয়। সম্ভবত ইরানীরাই পৃথিবীতে সর্বাধিক উন্নতি লাভ করে। তাদের চরম উন্নতির যুগে তাদের রাজ্য ভূমধ্যসাগর এবং মিসর থেকে শুরু করে চীন ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এবং হিমালয় পর্বত ও পারস্য উপসাগর থেকে খাযর হ্রদ ও আলতাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে তাদের সংস্কৃতির জয়-জয়কার ছিলো। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতা এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতির কাছে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত তাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো যে, শিরকে লিপ্ত হওয়ার দরুন তারা একে একে তাদের সৌন্দর্য ও সকল সৌকর্য হারিয়ে বসেছিলো। যরথুস্ত্র খোদায়ী গুণসমূহে গুণান্বিত ধরে নিয়ে তারা তাকেও তাদের বাতিল উপাস্যদের তালিকায় শামিল করে নিয়েছিলো। মঙ্গল ও অমঙ্গলের দেবতারূপে তারা ইযদান ও আহরিমন নামে দুইজন দেবতার পূজা করতো। প্রকাশ্যে এবং অত্যন্ত জোরেশোরে আগুনের পূজা হতো। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। দেশব্যাপী চুরি-রাহাজানিরও বেশ প্রকোপ ছিলো। ব্যভিচার এতই চরমে উঠেছিলো যে, মুযদাক নাহিনজার প্রকাশ্য রাজদরবারে ইরান সম্রাটকে তার রাজমহিষীর সাথে সঙ্গম করার পরামর্শ দেয়, অথচ ইরান অধিপতি তার অসঙ্গত ও নির্লজ্জ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। পারস্পরিক অনৈক্য ও

হিংস্রতা, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, সবলদের দুর্বলদেরকে পশুর চাইতে অধম জ্ঞান করার মত সামাজিক অনাচারগুলো তাদেরকে দুর্ভাগ্য ও পতনের দিকে এমনিভাবে ধাবিত করছিল যেমনটি বন্যার পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। ইরান যেনো তখন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি শূন্য হয়ে পড়েছিলো। ফলে যে দেশটি একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, তাই যেন তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। সে সময় দেশে কেবল যে নক্ষত্রপূজা ও অগ্নিপূজাই হতো তাই নয় বরং বাদশাহ, মন্ত্রীবর্গ, সিপাহসালার এবং আমীর-উমারারা পর্যন্ত নিরীহ প্রজাসাধারণ থেকে পূজা আদায় করে নিত। এ লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও তমসারাশি থেকে ইরানী রাষ্ট্র ও জাতি নিষ্কৃতি পেল তখনই যখন মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে ইরান সীমায় প্রবেশ করলো।

রোম ও গ্রীস

ইরানী সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় পৃথিবীর অপর সর্বাধিক শক্তিধর শক্তি ছিল রোমান সাম্রাজ্য। রোম ও গ্রীসের সভ্যতা-সংস্কৃতিও অনেক-প্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিশ্বজোড়া। চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশ গ্রীসের মুকাবিলা করতে পারেনি। এদেশেই সুকরাত[১], বুকরাত লুকমান, আফলাতূন এবং আরাস্তূর মত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং সিকান্দরের মত দিগ্বিজয়ীর জন্ম হয়েছিল। গ্রীসের কায়জার, যাঁর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, শুধু দেশের বাদশাহই ছিলেন না-একাধারে তিনি বাদশাহ ও ধর্মীয় নেতা বলে গণ্য হতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও জড়বাদী দিক থেকে এত উন্নতি অগ্রগতি সত্ত্বেও ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের রোম ও গ্রীস অধঃপতনের এমনি অতল তলে চলে গিয়েছিল যে, ইরানের অধঃপতনকে তার তুলনায় বেশী বলা চলে না। ইরানের খাতকরা যেমন আত্মবিক্রি করে মহাজনদের ঋণ শোধ করতো, তেমনি গ্রীসেও ক্রীতদাস কয়েক ধরনের ছিল। তন্মধ্যে এক ধরনের ক্রীতদাস ছিল তারা যাদেরকে দেশের বাইরে নিয়ে বিক্রি করা চলতো না। কিন্তু সাধারণত ক্রীতদাসদেরকে বহির্দেশে নিয়ে ঠিক তেমনি বিক্রি করা হতো যেমনটি বিক্রি করা হতো গরু, বকরী, উট, ঘোড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু। মনিব ঠিক তেমনি ক্রীতদাসকে হত্যা করতে পারতো যেমনটি পারে কোন ব্যক্তি তার নিজের পশুপালের যে কোন পশুকে যখন ইচ্ছে যবেহ করতে। পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে যথেচ্ছ বিক্রি করে দিয়ে অপরের গোলাম বানিয়ে দিতে পারতো। রোম ও গ্রীসে দাসদের বিয়ে করার অধিকার ছিলো না। তাদের এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে আইনগত কোন সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃত হতো না।

খ্রিস্টানদের অধঃপতন

হযরত ঈসা (আ)-এর দু'শ বছর পর পর্যন্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে রাহিব বা সন্ন্যাসীদের কোন নাম-গন্ধ ছিলো না। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিরিয়া, গ্রীস ও রোমে এদের এতই আধিক্য দেখা

---

১. টীকা : উর্দু-ফার্সী আরবী ভাষায় নামগুলো এভাবেই পরিচিত। আমাদের বাংলাভাষীরা ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতার প্রভাবে এগুলোর ইংরেজি জানার সাথেই পরিচিতি বিধায় আমাদের কাছে এ নামগুলো হচ্ছে : ১. সক্রেটিস, ২. হিপোক্র্যাটস, ৩. প্লেটো ৪. (এরিস্টটল) ও ৫. আলেকজান্ডার—অনুবাদক।

দিলো যে, যে কেউ মান-সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্যে লালায়িত হতো, সে-ই রাহবানিয়াত বা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতো। এরপর ধীরে ধীরে এ প্রবণতা নারীদের মধ্যেও সংক্রামিত হতে লাগলো। ফলে রাহিব পুরুষ ও রাহিব রমণীদের বাসস্থান গির্জাগুলো লজ্জাজনক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হলো। রাহিবদের কেউ কেউ প্রান্তরেও বাস করতো। নারীদের প্রাপ্য সম্ভ্রম ও অধিকার এবং পিতামাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা একেবারেই উঠে গিয়েছিলো। চুরি, ব্যভিচার, প্রতারণা সমাজে এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কেউ এগুলোকে দূষণীয় বলেও মনে করতো না। এটা ছিলো রাহবানিয়াত বা সন্ন্যাসব্রতের বিস্তৃতিরই ফল। তওহীদ ও খোদাপরস্তির নাম-নিশানাও ছিলো না। সংসার ত্যাগী ধর্মীয় নেতা ও সন্ন্যাসীদের সন্তুষ্টি বিধানেই মুক্তির গ্যারান্টি বা সার্টিফিকেট হাসিল করা হতো। আমীর শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের সেবক এবং গোলামরূপে ব্যবহারের বৈধ অধিকারী বলে মনে করতো। বাদশাহ ও সিপাহ্সালাররা জনসাধারণকে পশুর চাইতে অধিক মর্যাদা দিতো না। তারা নিঃসংকোচ চাষীদেরকে কেবল প্রাণরক্ষা উপযোগী আহার্য দিয়ে তাদের মেহনতের ফসল নিজেরা পুরোপুরিই গ্রাস করতো।

মিসর

মিসরীয় সভ্যতা যে কত প্রাচীন এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে কত মাহাত্ম্যপূর্ণ ও শানদার তা উপলব্ধি করার জন্যে মিসরের পিরামিডসমূহ আব্দুল হাওল বা স্ফিংক্স-মূর্তি এবং সম্প্রতিকালে ভূগর্ভস্থিত কক্ষগুলো থেকে উদ্ধারকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী বেশ সহায়ক। মিসর যেহেতু একটি কৃষিপ্রধান দেশ, তাই প্রাচীন মিসরের শক্তিতে যখন একটু ভাটা পড়লো, তখন দেশটি বহিরাক্রমণের শিকারে পরিণত হতে লাগলো। ইরানী, গ্রীক ও রোমানরা বারবার দেশটির উপর হামলা করতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত দেশটি দখল করে রাখে। এসব হামলাকারীদের তাহযীব-তমুদ্দুনও মিসরীয় সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব ফেলে মিসরীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে, এটা মনে করাটাই স্বাভাবিক। রোমানদের শাসনামলে খ্রিস্ট ধর্ম মিসরে প্রবেশ করে। দেশটির অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেছিলো। কিন্তু মিসরীয়দের ইসলামে প্রবেশের পূর্বে দেশটির অবস্থা সবদিক দিয়েই অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। খ্রিস্টীয় ধর্মের অবস্থাও মিসরে মূর্তিপূজার চাইতে উন্নততর ছিলো না। মিসরীয় মূর্তি পূজারীদের অবস্থা অন্য যে কোন দেশের প্রতিমা পূজারীদের চাইতেও নিকৃষ্টতর ছিলো। রোমান ও গ্রীক বিজেতা জাতিসমূহের মধ্যে যেসব ব্যাধি বিদ্যমান ছিল মিসরীয়দের মধ্যে সেগুলো নিকৃষ্টতর রূপ নিয়ে অনুপ্রবেশ করে। দাসপ্রথা তার নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অমানুষিকরূপে সেখানে চালু ছিল। ব্যভিচার ও রাহাজানির প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক আইন-কানুন বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। নরহত্যা ছিল তাদের জন্যে নেহায়েত মামুলী উপভোগের ব্যাপার। নারীদের আত্মহত্যার জন্যে উৎসাহিত করা হতো। মোদ্দাকথা, মিসরের অবস্থা অন্য কোন জাতির চাইতে কম শোচনীয় ও তমসাচ্ছন্ন ছিলো না। উন্নত সভ্যতা ও রুচিবোধের নিদর্শন মিসরীয়দের আচার-আচরণ ও চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছিল এবং সর্বদিক থেকে দেশটি তিমিরে ছেয়ে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষ

অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যের মতো বড় বড় রাজা-মহারাজা ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংক, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে ভারতীয়দের কৃতিত্ব ছিল গৌরবজনক। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও গৌতম বুদ্ধের মত ধর্ম প্রবর্তকদের কথা এবং রামলীলা ও মহাভারতের শৌর্যবীর্য কাহিনীও তাদের স্মরণ ছিল। কিন্তু যে যুগের বিশ্বকে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি ঐ যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছিলো। ধীরে ধীরে তার স্থান দখল করে নিচ্ছিলো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ভারতবর্ষের কোন বড় প্রদেশেই তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। সর্বত্র প্রতিমা পূজার জয়-জয়কার ছিলো। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মেই প্রতিমাপূজা সমানভাবে মুক্তির উপায় বলে স্বীকৃত ছিলো। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধদের দেবমূর্তি অধিকাংশ মন্দিরেই পাশাপাশি স্থান পেতো এবং অত্যন্ত ভক্তি সহকারে ভক্তদের দ্বারা পূজিত হতো। চীনা পরিব্রাজক লিখেন যে, ভারতবর্ষের কোন একটা ঘরও কসম খাওয়া দেবমূর্তি থেকে মুক্ত ছিলো না। বৈষ্ণবদের ঘৃণ্য ও নির্লজ্জ মতবাদ দেশের সর্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। ব্যভিচারের জন্য মিসরীয়দের মতো আইন-কানুন প্রণীত হয়ে তা রীতিমত আইনসিদ্ধ ও ধর্মভুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সিন্ধুর রাজাদের মধ্য সহোদরা বিবাহের দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। যখন স্বয়ং রাজ-রাজড়াদের অবস্থাই যখন এই, তখন প্রজা-সাধারণের অবস্থা যে কত শোচনীয় হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। পুরাণ ও ধর্মীয় গ্রন্থাকারে সে যুগের যে সমস্ত রচনা আজো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয়দের চরিত্র ও নৈতিকতা অত্যন্ত নীচ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো। ঐগুলো সে যুগের সমাজব্যবস্থার অত্যন্তনগ্ন লজ্জাজনক চিত্রই তুলে ধরে। গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, সর্প, প্রস্তর ও লিঙ্গের পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিলো। এর দ্বারাই সেকালের ভারতবর্ষের অধঃপতন ও তমসার কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

চীন

উপরে আরবের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত যে দেশগুলোর অবস্থা বিবৃত হয়েছে সে যুগে এগুলোই বিখ্যাত, উন্নত ও সভ্য জাতি বলে গণ্য হতো। এগুলো ছাড়া অপর যে সভ্য জনাকীর্ণ ও শস্য-শ্যামল দেশের নাম নেয়া যায় তা হলো চীন। চীনের অবস্থা উপরিউক্ত দেশগুলোর চাইতেও শোচনীয় ছিল। কনফুসিয়াস, তাও ও বৌদ্ধ ধর্মত্রয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণে সে দেশের তাহ্‌যীব-তমুদ্দুন ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঠিক ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যেমনটি হয়ে থাকে সোডা ও টারটারিক এসিডের সংমিশ্রণে। এ অবস্থার পরিবর্তন কেবল তখনই হয়েছিল যখন মুসলমানদের একটি জামাআত চীনে প্রবেশ করে বসবাস করতে শুরু করে এবং নিজেদের চারিত্রিক নমুনা দ্বারা প্রতিবেশীদেরকে প্রভাবান্বিত করে। তুর্কিস্তান, রুশ, ব্রহ্মদেশ, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানেও মনুষ্য বসতি বিদ্যমান। কিন্তু সেকালে হয় এসব দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে বিশ্ববাসীরা অনবহিত ছিল নতুবা তারা মানবেতর জীবন যাপন করতো। মোদ্দাকথা তাদের তেমন কোন মানবীয় গুণের কথা জানা যায়নি, যা নিয়ে ঈর্ষা করা চলে।

মোদ্দাকাথা, উপরিউক্ত বিবরণ পাঠে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং তাঁর আবির্ভাবের যুগে গোটা পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। অজ্ঞতার অন্ধকার তখন বিশ্বব্যাপী এমনিভাবে ছেয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তখন একটি নিভুনিভু আলোও পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না।

ইতিপূর্বে পৃথিবীব্যাপী কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যে, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মারিফাতে ইলাহী একই সাথে বিলুপ্ত হয়ে গোটা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূল হিদায়াতকারীরা উপর্যুপরি এসে সেসব দেশে বিরাজিত তমসারাজিকে বিদীর্ণ করে রাতের পর দিনের আগমনের মতো সেসব দেশকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। কিন্তু এবার যেহেতু গোটা বিশ্বের জন্যে একই হাদীকে প্রেরণ করার পালা ছিল, তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে সমস্ত হিদায়াতকারী এবং সকল দেশের পথপ্রদর্শকদের দ্বারা প্রচারিত শিক্ষার যুগকে একই সাথে খতম করে দুনিয়ায় সর্বত্র এক নতুন হাদীর প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। গোটা বিশ্ব সমকণ্ঠে আর্তনাদ করে এক নতুন হাদীর জন্যে আকুল আকুতি প্রকাশ করছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সেই কামিল হাদী ও সর্বশেষ রাসূলকে প্রেরণের জন্যে আরবভূমিকে বেছে নিলেন এবং গোটা ভূ-ভাগের নিশ্চিদ্র অন্ধকার রজনীর অবসান ঘটিয়ে মক্কা মুআয্যমায় নবুওয়াত-সূর্যের উদয় ঘটালেন। সে সূর্য উদিত হয়ে গোটা বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করে তুললো। আমাদের এ গ্রন্থের সূচনা সেই সূর্যোদয় থেকেই হওয়ার কথা। কিন্তু তার পূর্বে একটি প্রশ্নের জবাব বাকী রয়ে গেছে আর তা' হলো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের জন্যে আরবের মাটিকেই কেন বেছে নেয়া হলো, অন্য কোন দেশে কেন তাঁকে প্রেরণ করা হলো না।

নবী প্রেরণের জন্যে আরবকে কেন নির্বাচন করা হলো

এ প্রশ্নেরই সবচাইতে সঙ্গত, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও মোক্ষম জবাব হচ্ছে, আখিরী যামানার নবী যে দেশেই জন্মগ্রহণ করতেন, সে দেশ সম্পর্কেই এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারতো যে, সে দেশকে কেন এজন্যে নির্বাচিত করা হলো ? কেননা, নবী তো শেষ পর্যন্ত কোন একটি দেশেই জন্মগ্রহণ করতেন এবং অন্যান্য দেশ এ গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকতোই। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অবান্তর।

দ্বিতীয় জবাব হলো, দুনিয়ার অন্যান্য দেশ প্রাচীন আমলের কোন-না-কোন পর্যায়ে একবার না একবার উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে তারা তখন গোটা বিশ্বকে তাদের বিজয়ডংকা শুনিয়েছে। সকল জাতিই ইতিহাসের কোন না কোন পর্যায়ে অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে বা অপরের বশ্যতা স্বীকার করেছে। উপরন্তু পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ভাষা ততটা উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। আরবী ভাষা, সে দেশের ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক অবস্থা এবং তার অধিবাসীদের প্রচুর অবকাশের জন্য উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়েছিলো। আরব ছাড়াও অন্য কোন দেশে যদি এ কামিল নবীর জন্ম হতো তাহলে তার প্রথম সম্বোধিত জাতি যেহেতু ইতোপূর্বে অন্যান্য জাতিকে দুর্দান্ত প্রতাপে শাসন করেছে তাই এ নবীর হিদায়াত ও তাঁর হিদায়াতনামা পূর্ণ প্রভায় উদ্ভাসিত হতো না বরং সংশ্লিষ্ট জাতির এক বিরাট অংশ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয়েই পরিচিত রয়ে গিয়েছিলো। এ কামিল নবীর শিক্ষার দ্বারা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র শুদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিরাট কীর্তি সাধিত হতো তাও ঐ দেশ ও জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের অবদান বলে গণ্য হয়ে আখেরী যামানার নবী ও শেষ আসমানী কিতাবের বাহকের পূর্ণ প্রভা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। কামিল হিদায়াতনামা নাযিলের জন্যে প্রয়োজন ছিল ঐ ভাষার যা' পৃথিবীর যাবৎ ভাষার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতার শীর্ষে

আরোহণ করেছে। আরবী ছাড়া এ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন হিদায়াতনামার উপযোগী অন্য কোন ভাষা ছিল না এ পৃথিবীতে—যা' কিয়ামতকাল পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতিকে পথ প্রদর্শন করবে। এজন্যেই মহানবী (সা)-এর আরবদেশে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। আরববাসীরা না কোন দিন অন্য কোন জাতির দ্বারা শোষিত হয়েছে, আর না তারা কোন দিন অন্য কোন জাতিকে শাসন-শোষণ করেছে। তাই আরবদের জন্যে গোটা বিশ্বের সকল দেশ সকল জাতি ছিল একই সমান। তারা যখন ইসলামের আলোকবর্তিকা নিয়ে বেরিয়েছে তখন হিস্পানিয়া অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে চীন তথা চীন সাগরের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত গোটা সভ্য দুনিয়া সকল দেশ সকল জাতি তাদের দৃষ্টিতে সমান ছিলো। তারা সকলের কাছেই পর ছিলেন আর সকলেই তাদের নিকট পর ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যখন গোটা বিশ্বের জন্য এক অভিন্ন ধর্ম সাব্যস্ত করলেন তখন ঐ ধর্ম তিনি এমনি একটি জাতির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রচার করলেন, যারা সবার জন্যে সমান এবং একান্তই নিরপেক্ষ। আরবের নৈতিকতা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির যেহেতু ইতোপূর্বে মোটেই উন্নতি হয়নি তাই ঐ বিশ্বজনীন ধর্ম রাতারাতি তাদেরকে সর্বাধিক শুদ্ধিশুদ্ধ, সর্বাধিক সভ্য ও নৈতিকতামণ্ডিত ও সকল জাতির শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকে রূপান্তরিত করে এ সত্যকে সপ্রমাণিত করলো যে, আরবের এ বিস্ময়কর উন্নতির হেতু ইসলামের শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহানবী (সা) এমনি বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী যে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশ প্রতিটি জাতি সব যুগে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। উপরন্তু পৃথিবীর সকল হাদী সকল পথপ্রদর্শক সকল নবী-রাসূল বিভিন্ন জাতির জন্যে যেসব শিক্ষা ও হিদায়াতনামা নিয়ে এসেছিলেন সেসবের মূলনীতিই কুরআন শরীফের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে :

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ .

আর উম্মী লকবধারী আরবী নবী (সা)-এর মহান সত্তা সমস্ত পূর্ণতার আঁধার।

ফার্সী কবির ভাষায় :

انچه خوياں همه دارند توتنها داری

তাদের সকলে যত সৌন্দর্য-সৌকর্যের অধিকারী ছিলেন হে মহানবী! আপনি একাই সে সবের অধিকারী।

এই শেষোক্ত বাক্যগুলোকে হয়ত ঐতিহাসিকের গণ্ডির বাইরের বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যেহেতু আমি এ ইতিহাস গ্রন্থটি মুসলমান পাঠকদের অধ্যয়নের জন্যই প্রণয়ন করেছি আর আমি আশা করি যে, মুসলমান পাঠকরাই এ গ্রন্থটি বেশী অধ্যয়ন করবেন, আর আমি নিজেও আল্লাহ্র শোকর মুসলমানই। তাই হুযূর (সা)-এর জীবনকথা বিবৃত করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বাক্যগুলো বেরিয়ে এসেছে, তা আমি প্রত্যাহার করতে পারতাম না। এটা যদি ঐতিহাসিকদের মজলিসে একটা দোষাবহ কাজ হয়েই থাকে, তা হলে আমি এজন্যে অবশ্যই খুশী যে, ঐতিহাসিকদের দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করে দিলেও মুসলমানদের দলে তো আমি অবশ্যই শামিল বলে গণ্য হবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

ভোর হলো

সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পূর্ব গগনে হালকা আলোর আভা দেখা দিতে শুরু করে। উপরেই বর্ণিত হয়েছে, গোটা বিশ্ব তখন অজ্ঞতা ও কুফরের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। সেই বিশ্বজোড়া ঘন আঁধার রাতের অবসানে সূর্যোদয়ের শুভবার্তা ঘোষণার জন্যে ভোরের প্রথম আভা দেখা দিল। যে আরব ভূমি অন্ধকারের কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিলো আর মরুপ্রান্তরে শির্ক ও পাপের জোর তুফান বয়ে চলছিলো। সেই আরব ভূমিতেই এমন কিছু আলামত জাহির হতে লাগলো যার দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, অচিরেই নবুওয়াত-সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে।

আরবের জাতিসমূহ হাজার হাজার বছর ধরে লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা, অজ্ঞতা ও গোমরাহীর মধ্যে জীবন-যাপন করে আসছিল। কিন্তু মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত লাভ নয় বরং তাঁর জন্মগ্রহণের সময় থেকেই আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অভিজাতসুলভ প্রবণতা এবং পাপাচার ও নীচতার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হতে শুরু করে। ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা, উসমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ ইব্‌ন আসাদ, যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (উমর ইবনুল খাত্তাবের চাচা), উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি একত্রে সম্মিলিত হয়ে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা ও চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। অবশেষে সকলেই এ ব্যাপারে একমত হন যে, পাথর ও গাছপালার পূজা বর্জনীয়। তাঁরা তখন সঠিক ইবরাহীমী দীনের খোঁজে বিভিন্ন স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়েন।

ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল খ্রিস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ সমতে অটল থাকেন। অর্থাৎ দীনে হানীফ তথা সত্য ধর্মের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত তাঁর এ অনুসন্ধিৎসা অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি খ্রিস্ট ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। উসমান ইব্‌ন হুওয়ায়রিছ রোম সম্রাটের দরবারে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়েন। যায়দ ইব্‌ন আমর ইয়াহূদ-নাসারাও হলেন না। আবার মূর্তিপূজায় যোগ দিলেন না। তিনি রক্ত এবং মৃত জন্তু ভক্ষণ নিজের জন্যে হারাম করে নেন। তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নরহত্যা থেকেও বিরত থাকেন। যখন কেউ তাঁকে ধর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন করতো তখন তিনি জবাব দিতেন আমি ইবরাহীম (আ)-এর প্রভুর উপাসনা করি। তিনি মূর্তিপূজার নিন্দাবাদ করতেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে ভর্ৎসনা করতেন এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিতেন। তার মুখে প্রায়ই শোনা যেতো :

اَللّٰهُمَّ اَوْ اِنِّى اَعْلَمُ اَىَّ الْوَجْهِ لاَ اَحَبَّ اَلَيْكَ لِعِبَادَتِكَ وَلٰكِنَّ لاَ اَعْلَمُ .

হে আল্লাহ্! যদি আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারতাম যে, কিভাবে তোমার ইবাদত করতে হবে তবে আমি অবশ্যই তোমার ইবাদত করে তোমার সন্তুষ্টি হাসিল করতাম। কিন্তু আমি তো সে সম্পর্কে অজ্ঞ।

এ কথাগুলো বলেই তিনি সিজদায় চলে যেতেন। গণৎকার ও জ্যোতিষীরাও বলাবলি করতে লাগলো যে, আরব দেশে এক মহান নবীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। অচিরেই তাঁর রাজত্বের সূচনা হবে।

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, আরব দেশে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরাও বসবাস করতো। তাদের ধর্ম-যাজকরাও তাওরাত, ইনজীলের সু-সমাচার জনসমক্ষে বর্ণনা করতে লাগলেন যে, অচিরেই আরব ভূমিতে আখিরী যমানার নবীর অভ্যুদয় হতে যাচ্ছে।

স্বল্পকালের জন্যে ইয়ামান দেশ আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত থাকে। আবদুল মুত্তালিবের আমলেও ইয়ামান এলাকাটি উক্ত সম্রাটের অধীনে ছিলো। সে সময় আবরাহা ছিলো আবিসিনিয়া রাজ্যের পক্ষ থেকে ইয়ামানের শাসনকর্তা। সে ইয়ামানে একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে আরববাসীদেরকে কা'বার পরিবর্তে তার সে উপাসনালয়ে হজ্জ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য সফল হলো না বরং সুযোগ বুঝে কেউ একজন তার সে উপাসনা-মন্দিরকে অবমাননার উদ্দেশ্যে সেখানে মলত্যাগ করে। তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আবরাহা মক্কা আক্রমণ করে এবং খানা কা'বা ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হয়। তার সেনাদলে হাতিও ছিল বিধায় আরববাসীরা সে বাহিনীর নামকরণ করে আসহাবুল-ফীল এবং সে বছরের নাম দেয় আম-আলফীল বা হস্তীবর্ষ। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে আবরাহা যখন তাঁবু স্থাপন করলো তখন মক্কাবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। কেননা, সে বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য তাদের ছিল না। তারা সকলে একত্র হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার দরবারে গিয়ে তার একটা বিহিত করার জন্যে গিয়ে ধরলো। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর আভিজাত্যের ছাপমাখা গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা দর্শনে এবং তাঁর সর্দারীর পরিচয় পেয়ে আবরাহা অভিভূত হলো এবং তাঁকে মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট করে তাঁর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করলো। সে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলো। জবাবে তিনি বললেন : আপনার সৈন্যরা আমার (চল্লিশটি, মতান্তরে দু'শ'টি) উট নিয়ে এসেছে। দয়া করে তা ফিরিয়ে দিন। আবরাহা বিস্ময়ের সাথে বললো : আমি তো আপনাকে একজন বিজ্ঞ লোক বলে মনে করতাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার সে ধারণা ভুল। আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি খানা কা'বা ধ্বংস করার জন্যে এসেছি। আপনি নিজের উট উদ্ধারের জন্যে বেশ সচেষ্ট, কিন্তু কা'বা রক্ষার কোন তদবিরই আপনি করছেন না। আবদুল মুত্তালিব মুখের উপর জবাব দিলেন।

انا رب الا بل وللبيت رب يمنعه .

আমি তো কেবল আমার উটের প্রভু। ঐ ঘরেরও একজন প্রভু আছেন। তাঁর ঘর রক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন।

জবাব শুনে আবরাহা ক্ষেপে গেলো। সে বললো, "আচ্ছা, দেখা যাবে মালিক (রাব্বুল বায়ত) কি করে আমাকে বিরত রাখে আর কিভাবে সে তাঁর ঘর রক্ষা করে।"

তারপর তাঁর বাহিনীর উপর ধ্বংস নেমে এলো এবং তারা ভক্ষিত তৃণের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। আবরাহার প্রতি উচ্চারিত আবদুল মুত্তালিবের এ জবাব এবং তারপর তার এ শিক্ষাপ্রদ ধ্বংস ছিলো আরববাসীদের জন্যে এক বিরাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ঘটনা আরববাসীদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করে। লোকজন এবার অত্যাচার অবিচার খুন-খারাবি করতে রীতিমত ভয় পেতে লাগলো।

আসহাবুল ফীল বা হস্তী বাহিনীর এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ইয়ামান আবিসিনিয়া অধিপতির শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়। এবার সাইফ ইব্‌ন যী-ইয়াযন ইয়ামানের শাসন ক্ষমতা দখল করলেন। আবদুল মুত্তালিব কতিপয় কুরায়শ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে ইয়ামানে গিয়েছিলেন।

সাইফ ইব্‌ন যী-ইয়ামন তার জ্ঞানানুসারে আবদুল মুত্তালিবকে এ সুসংবাদ দেন যে, আখিরী যামানার যে নবীর আগমনের জন্যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ প্রতিটি জাতি উন্মুখ হয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে তিনি হবেন তোমারই বংশধর। একথাটি ব্যাপকভাবে প্রচার হয়ে যায়। প্রতিনিধিদলের প্রতিটি সদস্য ভাবতে থাকেন যে, সেই প্রতীক্ষিত নবী তারই বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। তারা আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে আখিরী যামানার নবীর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে খুঁটিনাটি ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকে। উমাইয়া ইব্‌ন আবী খালফের ধারণা হয় যে, এই আখিরী নবী বুঝি তিনি নিজেই হবেন। তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবকে সঙ্গে নিয়ে শাম দেশের দিকে যাত্রা করেন এবং কোন একজন ধর্মযাজকের নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু সেখান থেকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক জবাব আসে।

দুনিয়ায় যখনই কোন বড় নবী-রাসূলের নবুওয়াত লাভ বা জন্ম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে তখনই আকাশে ঘন ঘন এবং অস্বাভাবিক হারে নক্ষত্র পতনের দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রাক্কালে অনুরূপ ঘন ঘন ও অস্বাভাবিক হারে নক্ষত্র পতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ তখন একে আখিরী যামানার নবীর আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ বলে অভিহিত করেন। সত্যি সত্যি হস্তীবর্ষের ৯ই রবিউল আউয়াল মুতাবিক পারস্য সম্রাট কিসরার চল্লিশতম অভিষেক বর্ষে মুতাবিক ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল সোমবার সুবহে সাদিকের পর ও সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন।

দ্বিতীয় যবীহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব

যমযম কূপের উৎপত্তি হয়েছে হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে যখন তিনি আর তাঁর জননী হযরত হাজেরা মক্কার মরুপ্রান্তরে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সেখানে পানির প্রস্রবণ নির্গত হয়। হযরত হাজেরা তার চারপাশে বাঁধ দিয়ে সে পানিটুকু ধরে রাখেন। এভাবে তা একটি কূপের রূপ পরিগ্রহ করে। কিছু কাল পর তা মাটি ভরাট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লোকমুখে যমযম কূপের কথা শোনা যেত, কিন্তু তা কোথায় কেউ বলতে পারত না। যখন আবদুল মুত্তালিবের উপর হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পিত হলো, তখন তিনি যমযম কূপের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি আর তাঁর পুত্র হারিছ যমযমের সন্ধানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হন। কুরায়শ

বংশের একটি লোকও এ ব্যাপারে তাদের কোনরূপ সহযোগিতা করলো না বরং উল্টো এজন্য তারা পিতাপুত্রকে নিয়ে উপহাস করতো।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা

একদিন আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে যমযম কূপের সন্ধান পেয়ে গেলেন এবং সে অনুসারে খননকার্য শুরু করলেন। ঐ স্থানটিতেই আসাফ ও নায়লার মূর্তিদ্বয়ের অধিষ্ঠান ছিল। তাই কুরায়শরা এ খননকার্যে তাঁদেরকে বাধা দিল। এমনকি তারা তাঁদের সাথে লড়তে উদ্যত হলো। পিতা পুত্র দু'জন ছাড়া অপর কেউ তাঁদের সমর্থক ছিল না। কিন্তু সকলে মিলেও তাঁদের সাথে এঁটে উঠলো না। তাঁরা খননকার্য চালিয়ে গেলেন। এ সময় আবদুল মুত্তালিব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলেন যে, তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ। তখন তিনি মানত করলেন, আল্লাহ যদি তাঁকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন আর যমযম কূপের সন্ধানও তিনি পেয়ে যান তাহলে তাঁর একটি পুত্রকে তিনি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই যমযম কূপ বেরিয়ে আসলো আর আবদুল মুত্তালিবও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একে একে দশটি পুত্র সন্তানের পিতা হলেন। যমযম কূপ উদ্ধারের দরুন আবদুল মুত্তালিবের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সকলেই তাঁর সর্দারী ও আধিপত্য মেনে নেয়। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা যখন যৌবনে পদার্পণ করলো তখন তিনি তাঁর মানত পূরণ করতে মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর দশ পুত্রকে নিয়ে কা'বা ঘরে উপস্থিত হলেন। হুবল দেবতার সম্মুখে তীর নিক্ষেপ করে দশ ছেলের নামে লটারী করলেন। ঘটনাচক্রে লটারীতে প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠলো। আবদুল মুত্তালিব মানত পুরা করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। অগত্যা তিনি আবদুল্লাহকে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। আবদুল্লাহ্‌র সমস্ত ভাই-বোন এবং কুরায়শ বংশের সর্দাররা হায়! হায়! করে উঠলো। তারা তাঁকে আবদুল্লাহকে কুরবানী করতে বারণ করলেন। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব নাছোড়বান্দা। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ব্যাপারটি সাজা নাম্নী এক জ্যোতিষী মহিলার কাছে উত্থাপিত হলো। তিনি বললেন, তোমাদের সমাজে একজন লোকের রক্তপণ হচ্ছে দশটি উট। তোমরা একদিকে দশটি উট আর অপরদিকে আবদুল্লাহ্‌কে রেখে লটারী করে দেখ লটারীর ফলাফল কী দাঁড়ায়। যদি লটারীতে উটের নাম আসে তাহলে দশটি উট যবাহ করে দাও। আর যদি আবদুল্লাহ্‌র নামই উঠে, তাহলে আরো দশটি উট যোগ করে বিশটি উটের নামে পুনরায় লটারী করো। এভাবে প্রতিবারে দশটি করে উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে লটারী চলতে লাগলো। কিন্তু প্রতিবারই লটারীতে আবদুল্লাহর নাম উঠতে লাগলো। অবশেষে যখন একদিকে একশ' উট আর অপরদিকে আবদুল্লাহ্‌র নাম দিয়ে লটারী করা হলো, তখন একশ' উটের নামই উঠলো। সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্যে আবদুল মুত্তালিব আরো দু'বার করে লটারী করলেন। কিন্তু না প্রতিবারেই উটের নাম আসতে লাগলো। তখন একশ'টি উট যবাহ করা হলো। আর সেদিন থেকেই রক্তপণ একশ'টি উট বলে সাব্যস্ত হলো। আবদুল মুত্তালিবের ঔরসে মোট তেরজন পুত্র এবং ছ'জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের বংশপঞ্জি ৭৯ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হল :

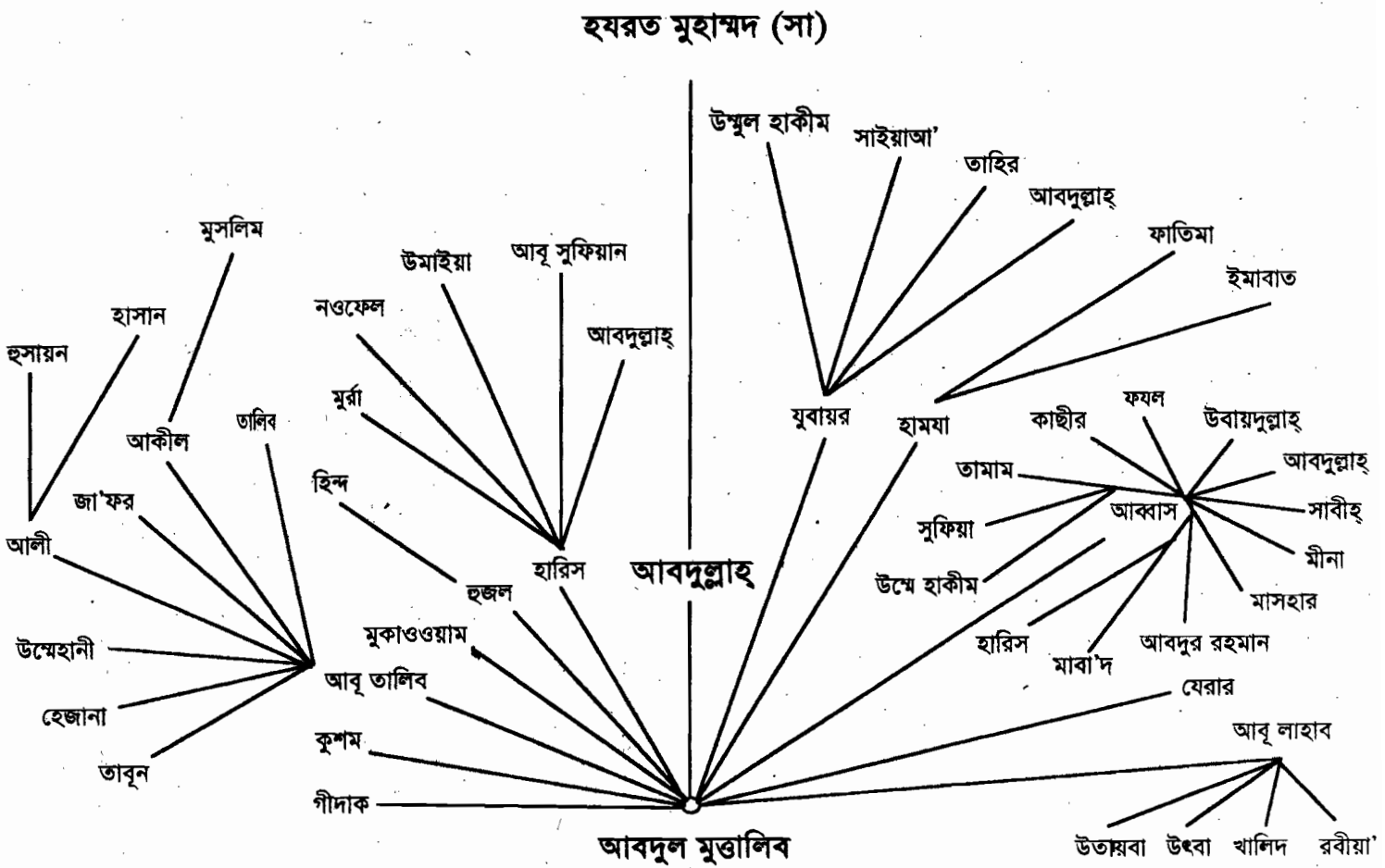
হযরত মুহাম্মদ (সা)
আবদুল্লাহ্
আবদুল মুত্তালিব
উম্মুল হাকীম
সাইয়াআ'
তাহির
আবদুল্লাহ্
ফাতিমা
ইমাবাত
যুবায়র
হামযা
ফযল
কাছীর
উবায়দুল্লাহ্
তামাম
আবদুল্লাহ্
আব্বাস
সাবীহ্
সুফিয়া
মীনা
উম্মে হাকীম
মাসহার
হারিস
আবদুর রহমান
মাবা'দ
যেরার
আবূ লাহাব
উতায়বা
উৎবা
খালিদ
রবীয়া'
আবূ সুফিয়ান
আবদুল্লাহ্
উমাইয়া
নওফেল
মুর্রা
হারিস
হিন্দ
হুজল
মুকাওওয়াম
আবূ তালিব
কুশম
গীদাক
তালিব
মুসলিম
আকীল
জা'ফর
আলী
উম্মেহানী
হেজানা
তাবূন
হাসান
হুসায়ন

হস্তীবর্ষের কয়েকদিন পূর্বে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে কুরায়শের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা আমিনা বিন্‌ত ওয়াহাবের সাথে বিয়ে দেন। সে সময়ে আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিল চব্বিশ বছর। ঐ সময়েই আবদুল মুত্তালিব নিজেও আমিনার নিকটাত্মীয় হালা বিন্‌ত উহায়েবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই হালার গর্ভেই হযরত হামযা (রা) ভূমিষ্ঠ হন। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে ব্যবসা ব্যাপদেশে বাণিজ্য কাফেলার সাথে শাম দেশে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে অসুস্থ হয়ে তিনি মদীনায় আত্মীয়-স্বজনের ওখানে উঠেন এবং পিতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে লোক মারফত আপন অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রিয়তম পুত্রের অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত আবদুল মুত্তালিব তাঁর সংবাদ নেয়ার এবং তাঁকে মক্কায় সযত্নে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে অপর পুত্র হারিছকে মদীনায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু হারিছ মদীনায় পৌছাবার পূর্বেই আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন এবং মদীনায় তাঁর আত্মীয় বনী নাজ্জার বংশের গোরস্তানে সমাহিত হন। হারিছ মক্কায় ফিরে এ হৃদয়বিদারক সংবাদ আবদুল মুত্তালিবকে অবহিত করলেন। মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ্ পরিত্যক্ত সম্পদরূপে রেখে যান কয়েকটি উট, কয়েকটি ছাগল এবং একটি দাসী উম্মে আয়মনকে।

আমিনা তখন সন্তানসম্ভবা। আল্লাহ্‌র নবী (সা) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই পিতৃহারা হয়ে গেলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে আবদুল্লাহ্‌র ইন্তিকাল হয়। আসহাবুল ফিল বা হস্তীর ঘটনার বায়ান্ন বা পঞ্চান্ন দিন পর আল্লাহ্‌র নবী ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর মাতৃগর্ভে থাকাকালেই আমিনা স্বপ্নে দেখেন যে, একজন ফেরেশতা এসে তাঁকে বলছেন গর্ভস্থিত সন্তানের নাম যেন আহ্‌মদ রাখা হয়। এজন্যে মা নবজাতকের নাম রাখলেন আহ্‌মদ। আবদুল মুত্তালিব তাঁর আদরের এ পৌত্রটির নাম রাখলেন মুহাম্মদ। ঐতিহাসিক আবুল ফিদার বর্ণনা অনুসারে, লোকজন বিস্ময়ভাবে আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করেন যে, বংশের প্রচলিত নামসমূহ বাদ দিয়ে তিনি পৌত্রের এরূপ নামকরণ করলেন কেন ? জবাবে আবদুল মুত্তালিব বলেন যে, তাঁর এ নাতিটি যেন বিশ্বজোড়া সকলের প্রশংসার উপযুক্ত হন এজন্যই তিনি তাঁর এরূপ নামকরণ করেছেন। ইব্‌ন সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সাধারণত নবজাতকের দেহের সাথে যেসব ময়লা আবর্জনা মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে থাকে সেরূপ কিছু মহানবী (সা)-এর প্রসবকালে পরিদৃষ্ট হয়নি। তিনি খাৎনা করা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন।

ঐতিহাসিকরা এও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হন ঠিক সেই মুহূর্তে পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার রাজপ্রাসাদে ভূমিকম্প উপস্থিত হয় এবং তার চৌদ্দটি চূড়া ভেঙ্গে পড়ে। অস্তাখরের (পারস্যের) বিখ্যাত অগ্নিকুণ্ড অকস্মাৎ নিভে যায়। তাঁর জন্মের আনন্দে সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব পশু কুরবানী করে সমস্ত কুরায়শকে দাওয়াত করে আপ্যায়িত করেন।

বাল্যকাল

জন্মের পর প্রথম সাতদিন আবূ লাহাবের আযাদকৃত দাসী ছুওয়াইবিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্তন্যপান করান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য হামযাকেও এই ছুওয়াইবিয়া স্তন্যদান করেছিলেন। এ সূত্রে ছুওয়াইবিয়ার পুত্র মাসরূক এবং হযরত হামযা তার দুধ ভাই ছিলেন। জন্মের অষ্টম দিনে আরবের অভিজাত খানদানসমূহের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে হাওয়াযিন গোত্রের বনী সাআদ বংশের ধাত্রী হালীমার হাতে অর্পণ করা হয়, যাতে তিনি তাকে স্তন্যদান এবং লালন-পালন

করেন। অভিজাত আরবরা এজন্যেও আপন সন্তানদের বেদুঈন ধাত্রীদের হাতে তুলে দিতেন যেন মরুভূমির মুক্ত হাওয়ায় অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে শিশুরা পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠে এবং তাদের মুখে সুললিত ভাষাও ফুটে ওঠে। কেননা শহরের ভাষার তুলনায় মরুপল্লীর ভাষা অনেক সুললিত ও মার্জিত হতো। হালীমা সা'দিয়া বছরে দু'বার করে অর্থাৎ প্রতি ছ'মাস অন্তর অন্তর মা আমিনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবকে তাঁদের আদরের শিশু মুহাম্মদকে দেখিয়ে আনতেন। শিশু নবী দু'বছর পর্যন্ত হালীমার দুধপান করেন এবং অতিরিক্ত আরো দু'বছর অর্থাৎ চার বছর পর্যন্ত হালীমার ঘরে বনী সাআদ কবীলায় লালিত-পালিত হন। যখন তাঁর বয়স চার বছর হলো তখন মা আমিনা তাঁকে মক্কায় রেখে দিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর আম্মাজান তাঁকে নিয়ে মদীনায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যান। একমাস সেখানে কাটিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ইন্তিকাল করেন। এবার দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের ভার আপন হস্তে তুলে নেন। কোন কোন রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিশু নবী হালীমার কাছে চার বছর নয়, পাঁচ বছরকাল পর্যন্ত লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং আপন মায়ের কাছে কেবল এক বছর কয়েকমাস সময়ই কাটাবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন যখন তিনি তাঁর দুধ-ভাই দুধ-বোনদের সাথে মরুভূমিতে ছাগল চরাচ্ছিলেন, তখন তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। ইব্‌ন হিশাম রচিত 'সীরাতে রাসূলুল্লাহ্' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হালীমা বিন্‌ত আবূ যুওয়ায়ের বর্ণনা করেন যে, একদা আমার পুত্র দু'টি দৌড়ে আমার কাছে এসে বললো, দু'জন শ্বেত পোশাকধারী আমাদের কুরায়শ ভাইটিকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তারা তার বুক চিরে ফেলেছে। আমি এবং আমার স্বামী (হারিছ ইব্‌ন আবদুল উযযা) দু'জন তখন দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম এবং কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন : দু'জন শ্বেত বসনধারী আমার নিকটে এসে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে আমার বুক চিরে দিলেন। তাঁরা আমার হৃৎপিণ্ড বের করলেন এবং তাথেকে কি যেন বের করলেন। হালীমা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেও কোন ক্ষত বা রক্তের চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। তিনি ভাবলেন বোধ হয় জ্বিন ভূতের আছর হয়েছে। তাই এভাবে আর বেশীদিন তাঁকে তাঁর নিজের কাছে রাখা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে তাঁর আম্মার কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন এবং সাথে সাথে এও বললেন, আমার ধারণা, ছেলের উপর জ্বিন-ভূতের আছর হয়েছে। সব শুনে হযরত আমিনা বললেন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমার এ ছেলে ধরাপৃষ্ঠে মহাসম্মানের অধিকারী হবে। সে হবে অসাধারণ। সমস্ত বিপদাপদ থেকে আল্লাহ্ তাঁকে হিফাযত করবেন। কেননা, সে যখন আমার গর্ভে ছিলো, তখন স্বপ্নে ফেরেশতারা তাঁর সম্পর্কে অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর অনেক অলৌকিক ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

সহীহ্ মুসলিম হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি মক্কায় ছেলেদের সাথে খেলছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর সকাশে উপস্থিত হলো এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড থেকে একটি রক্তবিন্দু বের করে দিয়ে বললেন যে, এটা ছিলো শয়তানের অংশ। তারপর সোনার তশতরীতে যমযমের পানিতে ধুয়ে যথারীতি তা দেহে পুনঃ সংযোজিত করেন।

আবদুল মুত্তালিবের ওফাত

দু'বছর পর্যন্ত আবদুল মুত্তালিবের আদর যত্নে প্রতিপালিত হয়ে তিনি যখন আট বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও পরলোক গমন করলেন। আবদুল মুত্তালিবের শবাধার যখন গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন তিনিও অশ্রুসজল চোখে তার অনুগমন করছিলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আপন পুত্র আবূ তালিবকে ডেকে বিশেষভাবে ওসীয়ত করে যান যে, এ ছেলেটির অর্থাৎ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের যত্ন-আত্তিতে তিনি যেন কোনরূপ ত্রুটি না করেন। আবূ তালিব ছাড়াও তাঁর আরো চাচা অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের আরো অনেক পুত্র ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ আবদুল মুত্তালিব এজন্যেই তাঁকে আবূ তালিবের হস্তে অর্পণ করেন যে, আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ্ ছিলেন একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। তাই আবদুল্লাহ্র সন্তানের জন্যে তাঁর দরদই সবচাইতে বেশী থাকার কথা। আবদুল মুত্তালিবের এ ধারণা কালে যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছিলো। আবূ তালিব অক্ষরে অক্ষরে পিতার অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়িত করে যোগ্য সন্তানের পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

আবূ তালিবের ক্রোড়ে

আবূ তালিব নিজের সন্তানদের চাইতেও শিশু নবীকে বেশী আদর-যত্ন করতেন এবং তাঁকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। তিনি কখনো তাঁকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। এমন কি রাতের বেলায়ও তিনি তাঁকে নিজের কাছেই শোয়াতেন। তাঁর শিশুকাল আরবের অন্যান্য শিশুদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলো। ছেলেদের সাথে খেলাধুলা বা পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস তাঁর আদৌ ছিলো না বরং তিনি তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলতেন এবং নির্জনতাই অধিকতর পসন্দ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যাবতীয় কু-অভ্যাস থেকে হিফাযত করেন। তাঁর শৈশব কালের একটি ঘটনা। কয়েকজন কুরায়শ কিশোর একদিন তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এক বিয়ের মজলিসে। সেখানে নৃত্যগীতের বেজায় ধুমধাম চলছিল। তিনি মজলিসে উপস্থিত হতেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সারা রাত এভাবে তাঁর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। রাত্রি শেষে যখন নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান শেষে লোকে যার যার ঘরে চলে গেলো তখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো। এভাবে তিনি একটা ঘৃণিত মজলিসের অপকার থেকে বেঁচে গেলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাত বছর বয়ঃক্রমকালে কুরায়শরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণ কার্যে হাত দেয়। এ সময় তিনিও অন্যদের সাথে মিলে পাথর কুড়িয়ে এনে দিচ্ছিলেন। চলতে ফিরতে ও পাথর উঠাতে এ সময় লুঙ্গি অনেকটা বাধার সৃষ্টি করছিলো। সাত বছরের একটা বালকের উলঙ্গ হওয়াটা সে সমাজে কোন দূষণীয় ব্যাপার ছিলো না, তাই তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে কিছু না বলেই এক ঝটকা টানে অতর্কিত তাঁর পরনের লুঙ্গি খুলে ফেললেন। শিশু নবী (সা) এতই লাজুক ছিলেন যে, এ অতর্কিত তুচ্ছ ঘটনায়ই তিনি মূর্ছা গেলেন। তাঁর এ অভাবিত লজ্জাশীলতা দর্শনে উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হলো।

প্রথম সিরিয়া সফর

প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন বারো বছর। আবূ তালিব এক বাণিজ্য কাফেলার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যেতে মনস্থ করলেন। কিশোর নবীকে

তিনি মক্কায়ই রেখে যেতে চাইলেন। কিন্তু আবূ তালিবের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার গোটা সময়টায় যেহেতু তিনি চাচার সাথে সাথে রয়েছেন, তাই এবার চাচাকে ছেড়ে একা মক্কায় থাকতে কোন মতেই তাঁর মন মানছিল না। আবূ তালিব তাঁর ইয়াতীম ভাতিজার মনের কথা টের পেলেন এবং যাতে তাঁর মনের কষ্ট না হয় সেজন্যে তাঁকেও সাথে নিয়েই যাত্রা করলেন। সিরিয়ার দক্ষিণাংশে বসরা নামক স্থানে যখন তাঁরা উপনীত হলেন, তখন সেখানে বসবাসকারী খ্রিস্টান রাহিব বা ধর্মযাজক বাহীরা তাঁকে দেখেই আখিরী যামানার নবী বলে তাঁকে শনাক্ত করেন। তিনি আবূ তালিবের নিকট এসে বলেন যে, আপনার এ ভাতিজাটি নবী হবেন। তাওরাত ও ইনজীলে আখিরী যামানার নবীর যেসব নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, সেসবই এর মধ্যে বিদ্যমান। আপনি একে নিয়ে ইয়াহূদীদের দেশে যাবেন না। তারা তাঁর ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাহীরা রাহিবের কথা শুনে আবূ তালিব সতর্ক হলেন এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তার মালপত্র ওখানেই বিক্রি করে দিয়ে ভাতিজাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। আবূ তালিব এ যাত্রায় সিরিয়ার শহরসমূহে না গিয়েও প্রভূত মুনাফা অর্জন করলেন। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ তালিব বাহীরা রাহিবের কথা শুনে কিশোর নবীকে সেখান থেকেই মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন আর নিজে কাফেলার সাথে সিরিয়ায় যান।

ফিজারের যুদ্ধ : প্রথমবারের মত যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ওকাযে জমজমাট মেলা বসতো প্রতিবছরেই। সেখানে মুশায়েরা বা কবিসভা হতো। ঘোড়-দৌড় হতো, হতো কুস্তি ও সমরকৌশলের প্রতিযোগিতা। আরবের প্রতিটি কবীলাই ছিলো চরম যুদ্ধবাজ। কথায় কথায় তলোয়ার বের হয়ে আসতো খাপ থেকে। ওকাযের মেলায় কী একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে হাওয়াযিন ও কুরায়শ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। প্রথমে তো উভয় কবীলার বিচক্ষণ লোকেরা মধ্যে পড়ে কথা বাড়তে দেননি। ঝগড়া সেখানেই রফা হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিটি জাতির মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকই সংখ্যায় বেশী থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। ফলে একটা মীমাংসিত ব্যাপারও মীমাংসিত রইলো না। পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। মারামারি কাটাকাটি হানাহানিতে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। এ যুদ্ধটি মুহাররম মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এটা হরবুল ফিজার বা অন্যায় যুদ্ধ নামে অভিহিত হয়। কেননা আরবদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মুহাররম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ অত্যন্ত পাপের কাজ ছিল। তাই পূর্ব থেকে চলে আসা যুদ্ধও এ মাসে মুলতবি হয়ে যেতো। এ যুদ্ধটি ছিল চারটি বড় বড় যুদ্ধের এক অবিশ্রান্ত ধারা। এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতা হতো অনেক বেশী। কেননা হাওয়াযিন কবীলার পক্ষে কায়স আইলানের সমস্ত শাখা গোত্র এবং কুরায়শের পক্ষে কিনানা কবীলার সমস্ত শাখা গোত্র এসে যুদ্ধে যোগদান করে। ফলে যুদ্ধটি বিস্তৃত হয়ে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। চতুর্থ বা সর্বশেষ যুদ্ধটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ যুদ্ধে অনেক সর্দার নিজ নিজ পায়ে এজন্য জিঞ্জির বেঁধে নেন যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে। এই শেষ বা চতুর্থ যুদ্ধে আমাদের মুহাম্মদ (সা) প্রথমবারের মতো অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বনূ কিনানার প্রতিটি কবীলার ভিন্ন ভিন্ন সিপাহসালার ছিল। সে হিসাবে বনূ হাশিমের সিপাহসালার ছিলেন তাঁর চাচা যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং বৃহত্তর বনূ কিনানা বংশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ছিলো তখন পনের বছর। তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল চাচাদেরকে তীর কুড়িয়ে

এনে দেয়া। সরাসরি কারো সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। যুদ্ধের প্রথম দিকে বনী হাওয়াযিনের পাল্লা ভারী ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনী কিনানাই জয়ী হয় এবং কায়েস বংশীয় কবীলাসমূহ পরাস্ত হয়। ইব্‌ন খালদূনের রিওয়ায়ত অনুসারে ফিজার যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা)-এর বয়স ছিল দশ বছর মাত্র। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হলো ফিজার যুদ্ধ ৫৮১ খ্রিস্টাব্দে[১] সংঘটিত হয় আর তখন তাঁর বয়স ছিলো এগার বছর।[২]

বাণিজ্যে গমন

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যৌবনে পদার্পণ করলে তিনি ব্যবসা করতে মনস্থ করলেন। চাচা আবূ তালিবও তাঁর জন্যে এ পেশা পসন্দ করলেন। তিনি কয়েক বারই ব্যবসাপণ্য নিয়ে যাত্রা করেন এবং প্রতিবারেই ব্যবসায়ে বেশ মুনাফা হয়। এ সব সফরে লোকজন তাঁর বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও চমৎকার লেনদেন প্রত্যক্ষ করে। মক্কা শহরেও যাদের সাথেই তাঁর লেনদেন বা ব্যবসায়িক আদান-প্রদান হয়েছে সকলের কাছেই তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও চমৎকার চরিত্রের লোক বলে প্রতিপন্ন হন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল হামসা (রা) বলেন, নবুওয়াত পূর্বের ঐ সময়টাতে একবার হযরত নবী (সা)-এর সাথে আমার একটি ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের কথা হচ্ছিলো। এমন সময় কোন একটি কাজে একটু বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তাই কথা শেষ না করেই "আমি একটু আসছি, আপনি অপেক্ষা করুন" বলেই চলে যাই। তারপর তাঁর সাথে আমার এ ওয়াদার কথা আমি ভুলে যাই। তৃতীয় দিনে যখন সেখান দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি তখনো সেখানে এক ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই কেবল এটুকুই বললেন, তুমি আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছ। আমি এ পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে তোমার অপেক্ষাই করছি। অনুরূপভাবে সাহাবী হযরত সায়েব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন কেউ কেউ হুযূর (সা)-এর নিকট তাঁর প্রশংসা করছিলেন। তখন হুযূর (সা) বললেন : আমি সায়েবকে তোমাদের চাইতে বেশী চিনি। তখন হযরত সায়েব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক ! একবার ব্যবসায়ে আমি আপনার অংশীদার ছিলাম। আপনার লেনদেন ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর প্রস্তাব

বনূ আসাদ কবীলার সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদীজা বিন্‌ত খুয়ায়লিদ কুরায়শ বংশের একজন ধনাঢ্য মহিলা বলে গণ্য হতেন। তিনি ছিলেন বিধবা এবং ইতিপূর্বে দু'জন স্বামীর ঘর করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী অনেক ধনসম্পদ রেখে যান। খাদীজা (রা) কর্মচারীদের মাধ্যমে সর্বদা শাম, ইরাক ও ইয়ামানে ব্যবসা পণ্য পাঠাতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার খ্যাতির কথা শুনে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কাতীহা মারফত প্রস্তাব দিয়ে পাঠান যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ব্যবসা পণ্য দিয়ে শাম দেশে তাঁর ব্যবস্থাপকরূপে পাঠাতে চান। তিনি চাচা

---

১. এ পুস্তকে প্রদত্ত জন্মসাল (৫৭১ খৃ.)-কে বিশুদ্ধ মেনে নিলে ৫৮১ খৃ. কোনক্রমেই নবী (সা)-এর বয়স এগার বছরের বেশী ছিলো না। তবে এ যুদ্ধটি দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত চলেছিলো বিধায় যুদ্ধের শেষ দিকে চতুর্থ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স পনের বছর হতে পারে।–অনুবাদক

২. কারো কারো মতে ৫৮৪ খৃ.-৫৮৯ খৃ. হরবে ফিজার সংঘটিত হয়।–সম্পাদক

আবূ তালিবের সাথে পরামর্শক্রমে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। খাদীজা তাঁর জন্য সঙ্গত পারিশ্রমিক ধার্য করেন। যথাসময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) খাদীজার ব্যবসার ব্যবস্থাপকরূপে তাঁর ব্যবসা পণ্য নিয়ে শাম দেশের দিকে যাত্রা করেন। এ সময়ে খাদীজার ক্রীতদাস মায়সারা এবং জনৈক প্রিয়জন হাকীম ইব্‌ন হিযামও প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর

হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসাপণ্যসহ বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা) শাম দেশে প্রবেশ করে একটি উপাসনালয়ের নিকট তাঁবু স্থাপন করেন। এ উপাসনালয়ে নাস্তুরা নামক একজন ধর্মযাজক বাস করতেন। নাস্তুরা তাঁকে দেখতে পেয়েই তাঁর উপাসনালয় থেকে কয়েকটি আসমানী কিতাব নিয়ে এলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দেহাবয়ব ও চেহারা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি একবার কিতাবের দিকে আর একবার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে দেখতে লাগলেন। তিনি হযরত নবী (সা)-এর চেহারার সাথে কিতাবের বিবরণ মিলিয়ে দেখছিলেন। তাঁর এ অদ্ভুত হাবভাব লক্ষ্য করে, খুযায়মার মনে সন্দেহ দেখা দিলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন ইয়া আলে গালিব ! অর্থাৎ হে গালিব বংশীয়রা ! বাঁচাও ! বাঁচাও !! তার এ চীৎকার শুনে কুরায়শরা চতুর্দিক থেকে এসে সমবেত হলো। কুরায়শদেরকে এভাবে তেড়ে আসতে দেখে নাস্তুরা রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে তার উপাসনালয়ের ছাদে উঠলেন। সেখান থেকেই তিনি কাফেলার লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি আসমানী কিতাবসমূহের সাথে তোমাদের সঙ্গীটির অবস্থা মিলিয়ে দেখলাম। আখিরী যামানার নবীর যেসব নিদর্শনের কথা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার সবক'টি নিদর্শনই এর মধ্যে বিদ্যমান। শুনে সকলে আশ্বস্ত হলেন। এ যাত্রায়ও কাফেলার পণ্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা হলো। এভাবে কয়েকবারই খাদীজার ব্যবসা পণ্য নিয়ে তিনি বাহ্‌রায়ন, ইয়ামান ও সিরিয়ায় যাত্রা করেন এবং প্রতিবারই ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয়।

শাদী মুবারক

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা, উন্নত চালচলন ও নিষ্কলুষ চরিত্রের কথা হযরত খাদীজা (রা)-এর কাছে গোপন ছিলো না। মক্কার প্রতিটি ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে শাদী করার জন্যে অত্যন্ত লালায়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে নুফায়সা নাম্নী মহিলার মাধ্যমে এবং অন্য রিওয়ায়াত অনুসারে আতিকা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে শাদীর প্রস্তাব পাঠালেন। চাচা আবূ তালিবও এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তিনিই শাদীর খুতবা পড়ালেন। এ শাদীর মজলিসে আমর ইব্‌ন আসাদ, ওয়ারাকা ইব্‌ন সাওফিল প্রমুখ, হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-র সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনরাও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স পঁচিশ বছর এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স চল্লিশ বছর ছিল। হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তিন পুত্র এবং চার কন্যার জন্ম হয়।

সাদিক ও আল-আমীন খিতাব

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সততা, সদাচরণ, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রের খ্যাতি মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে গোটা আরবে এতই ছড়িয়ে পড়ে যে, কেউ কেউ আর তাঁকে নাম

ধরে ডাকতো না। সকলেই তাঁকে আস-সাদিক অথবা আল-আমীন বলে ডাকতো। গোটা আরবে এ নামটি বলতেই সকলে তাঁর কথাই বুঝতো এবং এ নামেই লোকে তাঁকে এক ডাকে চিনতো বা স্মরণ করতো। নিখিল ভারত থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা মিসেস এনি বেসান্ত লিখেন :

> শ্রেষ্ঠ নবীর [হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর] যে গুণটি আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার করেছে, তা হলো তাঁর সেই অনন্য বিশেষণ যা তাঁর স্বদেশবাসীকে তাঁকে আল-আমীন (পরম বিশ্বস্ত) নামে অভিহিত করতে বাধ্য করেছিল। মুসলিম অ-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে এর চাইতে বেশী অনুসরণযোগ্য ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। যাঁর গোটা সত্তা সততা ও সত্যবাদিতার প্রতিমূর্তি, তিনি যে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সত্যের পয়গাম-বাহক কেবল এমন ব্যক্তিই হতে পারেন।

হিলফুল ফুযুল

প্রাচীনকালে আরবের কতিপয় মহৎ ব্যক্তি মিলে এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন :

আমরা সর্বদা মজলুমদের সাহায্য করবো এবং জালিমদেরকে প্রতিরোধ করবো।

ঘটনাচক্রে যারা এ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন এদের প্রত্যেকের নামই ছিল ফযল শব্দযুক্ত। এজন্যে তাঁদের এ প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি 'হিলফুল ফুযূল' নামে খ্যাতিলাভ করে। এ সংগঠনটির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আলোচনা তখনও লোকমুখে প্রচলিত ছিলো। ফিজারের যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মনে এ চুক্তি তথা সংগঠনটিকে পুনর্জীবিত করার প্রেরণা দেখা দেয়। কতিপয় মহৎ ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাদআনের বাড়ীতে একত্রিত হয়ে এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন :

"আমরা সর্বদা জালিমদেরকে প্রতিরোধ করবো এবং মজলুমদেরকে সাহায্য করবো।"

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স তখন অল্প হলেও তিনিও এ চুক্তিতে শামিল ছিলেন। তারপর তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তিনি অধিকাংশ কবীলার সরদার এবং বিজ্ঞ লোকদেরকে দেশের প্রচলিত অরাজকতা, পথচারীদের লুণ্ঠিত হওয়া, দরিদ্রদের প্রতি ধনী ও আমীর ব্যক্তিদের অত্যাচার–অনাচারের কথা বলে তাদেরকে এ অবস্থায় নিরসনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে বনূ হাশিম, বনূ আবদুল মুত্তালিব, বনূ যুহরা ও বনূ তামীমের লোকদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিটি সদস্যকে অঙ্গীকার করতে হয় :

(ক) আমরা দেশের অরাজকতা ও অশান্তি দূর করবো।

(খ) আমরা পথিকদের জানমালের হিফাযত করবো।

(৩) আমরা নিঃস্ব দরিদ্রদেরকে সাহায্য করবো।

(ঘ) সবলদেরকে দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করা থেকে বিরত রাখবো।

এ সংগঠনের দ্বারা জনগণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। নবুওয়াত লাভের পরও হুযূর (সা) বলতেন : যদি আজো কেউ আমাকে সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাহায্যার্থে আহবান করে তবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো।

কুরায়শ কবীলাসমূহের মধ্যে বিবাদ মীমাংসাকারী হিসেবে

একদা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কা'বা ঘরে আগুন ধরে যায় এবং এর ফলে কা'বা ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দেয়। কুরায়শরা ইমারতটি ভেঙ্গে ফেলে নতুনভাবে তা নির্মাণ করতে মনস্থ করে। সকলে তো এ মর্মে সম্মতি দিলো কিন্তু কেউই এ ইমারতটি ভাঙ্গতে সাহসী হলো না। অবশেষে কুরায়শ সরদারদের মধ্যে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা এ কাজটি শুরু করেন। তাঁর দেখাদেখি এ অপসারণ কার্যে অন্যান্য কবীলার লোকেরাও অংশগ্রহণ করলো। এ সময় জেদ্দা বন্দরের নিকটে একটি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। সংবাদ পেয়ে কুরায়শরা লোক পাঠিয়ে তা খরিদ করে এবং উটে বোঝাই করে তার কাঠ মক্কায় নিয়ে আসে। এ কাঠ কা'বা ঘরের ছাদের জন্যে কেনা হয়েছিল।

কা'বা ঘরের প্রাচীর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যখন ইব্রাহীমী ভিত্তির গোড়া পর্যন্ত তারা পৌঁছে গেল, তখন পুনর্নির্মাণের কাজ তারা শুরু করলো। ছাদের কাঠ যেহেতু পরিমাণে কম ছিল তাই সেবার তারা কা'বা ঘর ইবরাহীমী ভিতের উপর পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারলো না বরং একদিকের কিছু অংশ তারা বাদ দিয়ে দিল। প্রাচীরের কাজ যখন হাজরে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত পৌঁছলো তখন কুরায়শ কবীলাসমূহের মধ্যে এক বিরাট সংঘাত দেখা দিল। প্রত্যেক কবীলার সর্দার নিজ হাতে এ পবিত্র কাল পাথরটি কা'বা প্রাচীরে স্থাপন করার জন্যে লালায়িত ছিলো। এ নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বাঁধবার উপক্রম হলো। প্রত্যেক গোত্রের লোক তলোয়ার কোষমুক্ত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। বনূ আবদে-দার এজন্যে প্রয়োজন হলে মরতে বা মারতে প্রস্তুত বলে কসম খেয়ে বসলো। এ কলহে পাঁচ দিন পর্যন্ত নির্মাণ কার্য মুলতবি রইলো। অবশেষে কুরায়শ কবীলাসমূহ এর একটা সুরাহা করার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরে সমবেত হলো। আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা প্রস্তাব করলেন : সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটি কা'বা ঘরে প্রবেশ করবেন তাঁকেই এর ফায়সালার ভার অর্পণ করা হোক। এমনি সময় লোকজন দেখতে পেলো হুযূর (সা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সকলেই 'আল-আমীন' 'আল-আমীন' বলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো। তারা জানালো যে, তিনি এ ব্যাপারে যে ফায়সালা করবেন, 'তাতেই সকলে রাযী থাকবে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য, যে মর্যাদাটি লাভের জন্য প্রতিটি কবীলা লালায়িত ছিল এবং রক্তভর্তি পেয়ালায় অঙ্গুলি ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে যুগের প্রথামত যে সম্মানটি অর্জনের জন্যে সকলেই মরতে এবং মারতে কসম খেয়ে বসেছিল সে মহাসম্মানের ফায়সালার ভার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সমর্পণ করতে কারো কোন দ্বিধা ছিল না। এ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরতের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি সকলেরই অগাধ আস্থা ছিল। ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ সে কলহ দূর করে দিলেন। কুরায়শ বংশের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্যন্ত তখন তাঁর এ অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতা দেখে অভিভূত হয়ে যান এবং সকলেই মারহাবা বলে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তিনি এর ফায়সালা করেন এভাবে, একটি চাদর বিছিয়ে স্বহস্তে তাতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেন এবং সকল কবীলার সরদার সে চাদরের চতুর্দিকে ধরে পাথরটি বহন করে নিতে বলেন। কুরায়শ সরদাররা তাঁর কথামত চাদরের চতুর্দিকে ধরে পাথরটি যথাস্থানে বয়ে নিয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখন আপন হস্তে তা উঠিয়ে প্রাচীরে স্থাপন করে দেন। এতে সকলেই খুশী হলো এবং কারো বলার কিছু রইলো না। এ ঘটনায় উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আবদে শামস,

আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উজ্জা, আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখদূম এবং কায়স ইব্‌ন আদী আস্‌-সাহামী অগ্রণী ছিলেন। এরা যেমন করেই হোক এ ব্যাপারটির একটি সুরাহা কামনা করছিলেন। হযরত নবী (সা)-এর এ ফায়সালায় তাঁরা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ঘটনাচক্রে এ নিয়ে যদি যুদ্ধ বাঁধতো তাহলে এ হতো জাহিলিয়াত যুগে সংঘটিত এ যাবৎ কালের সবচাইতে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হাজরে আসওয়াদের সমস্যা সমাধানকালীন এ ঘটনার সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ছিলো পঁয়ত্রিশ বছর।

গরীবদের লালন-পালন

মান-মর্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সম্ভবত তিনিই ছিলেন মক্কার শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। কেউ তাঁর শত্রু ছিল না। সকলেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো এবং ভালবাসতো। তাঁর বিচক্ষণতা, সুন্দর চালচলন, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। ব্যবসা তাঁর পেশা ছিলো। খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে শাদী হবার পর বেশ সচ্ছলতার সাথেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো। একবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁর চাচা আবূ তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল বেশী। খান্দানের প্রবীণতম ব্যক্তি এবং বনী হাশিম গোত্রের সরদার রূপে তাঁর প্রভূত সম্মান ছিল। কিন্তু সাংসারিক সচ্ছলতার অভাবে খুব কষ্টেই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো। চাচার এ অর্থকষ্ট লক্ষ্য করে একদিন তিনি তাঁর অপর চাচা আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকাল দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। আবূ তালিবের সংসার বড়। তাঁর পুত্রকে আপনি আপনার সংসারে নিয়ে যান আর একজনকে আমি আমার সংসারে নিয়ে আসি। এভাবে তাঁর সাংসারিক বোঝা বেশ হালকা হয়ে যাবে। তাঁর এ পরামর্শ আব্বাসের খুবই মনঃপূত হলো। তাঁরা দু'জনে তখন আবূ তালিবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রস্তাব তাঁর কাছে পাড়লেন। জবাবে আবূ তালিব বললেন : আকীলকে তো আমার কাছে থাকতে দাও আর অন্যদেরকে ইচ্ছে হলে তোমরা নিয়ে যেতে পার। সে মতো হযরত জা'ফরকে হযরত আব্বাস নিয়ে গেলেন আর হযরত আলীকে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর নিজ ঘরে নিয়ে আসলেন। এটা ঐ বছরেরই ঘটনা, যে বছর কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এটা কা'বা নির্মাণের সময়কার উপরোক্ত ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনা। তখন হযরত নবী (সা)-এর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর আর হযরত আলী (রা)-এর বয়স ছিলো পাঁচ বছর।

যায়দ ইব্‌ন হারিছ-এর প্রতি স্নেহ

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর ভাতিজা হাকীম ইব্‌ন হিযাম কোথা থেকে যেন একটা ক্রীতদাস কিনে এনে তাঁর ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-কে দান করেন। হযরত খাদীজা (রা) তাকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খিদমতে সমর্পণ করেন। এরই নাম ছিল যায়দ ইব্‌ন হারিছা। আসলে ইনি একজন স্বাধীন খ্রিস্টান বংশের সন্তান ছিলেন। কোন এক লুটপাটের সময় তিনি ধৃত হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হয়ে যান। কিছুদিন পর তাঁর পিতা হারিছা এবং চাচা কাআব যখন জানতে পারলেন যে, তাদের ছেলে যায়দ মক্কার কোন একটি পরিবারে দাসরূপে বসবাস করছেন, তখন তাঁরা উভয়ে মক্কায় এসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা জানান যে, তাদের ছেলেটিকে যেন তিনি মুক্ত করে দেন। হযরত মুহাম্মদ

(সা) তৎক্ষণাৎ তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বলেন যে, যায়দ যদি তোমাদের সাথে চলে যেতে চায়, তবে আমার পক্ষ থেকে তার অনুমতি রইলো। সাথে সাথে যায়দকে ডাকানো হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এদেরকে চিনতে পারছো ? জবাবে যায়দ বললেন, জ্বী হাঁ। এরা হচ্ছেন আমার পিতা ও চাচা। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, এরা তোমাকে নিতে এসেছেন। আমার পক্ষ থেকে তোমার যাবার অনুমতি আছে। জবাবে যায়দ বললেন : আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তখন তাঁর পিতা হারিছ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুই কি স্বাধীনতার উপর গোলামীকেই প্রাধান্য দিচ্ছিস ? যায়দ মুখের উপর বললেন, জ্বী হাঁ। আমি মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছি যে, তাঁর মুকাবিলায় আমি পিতাকে কেন, সারা পৃথিবীরও প্রাধান্য দিতে পারি না। হযরত মুহাম্মদ (সা) যায়দের মুখে এ জবাব শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত ধরে কা'বা ঘরে উপস্থিত হলেন এবং চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, "লোক সকল ! তোমরা সাক্ষী থেকো, আজ থেকে আমি যায়দকে মুক্ত করছি এবং তাকে আমার ছেলে রূপে গ্রহণ করছি।" সে হবে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী। যায়দের পিতা ও পিতৃব্য তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং যায়দকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে খুশীমনেই রেখে গেলেন। সেদিন থেকে যায়দ ইব্‌ন হারিছ হলেন যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ (সা)। কিন্তু হিজরতের পর যখন মহানবীর প্রতি ওয়াহী নাযিল হলো যে পালক পুত্রকে পুত্র বলা যাবে না, তখন থেকে আবার সকলে তাঁকে যায়দ ইব্‌ন হারিছা নামেই ডাকতে থাকেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে পূর্ববৎ ভালবাসতে থাকেন বরং তাঁর এ অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনা দ্বারাই বোঝা যায় যে, নবুওয়াতের পূর্বেও মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র কত উন্নত ছিল।

আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ

বত্রিশ অথবা পঁয়ত্রিশ বছর বয়ঃক্রমকালে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহ্‌তে অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি অত্যধিক নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি প্রায়ই একটি জ্যোতি (নূর) দেখতে পেতেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। এ জ্যোতির মধ্যে কোন আকার দেখা যেতো না বা কোন আওয়াজও শোনা যেতো না। আরবের মুশরিকী প্রথা-পদ্ধতির প্রতি তিনি সর্বদাই বিমুখ ছিলেন। একদা মক্কায় প্রতিমা পূজারীরা কোন উৎসব উপলক্ষে তাঁর সম্মুখে দেবমূর্তির প্রতি উৎসর্গীকৃত খাবার রেখে দেয়। তিনি সে খাবার যায়দ ইব্‌ন আমরের দিকে ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনিও তা খেলেন না, বরং প্রতিমা পূজারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা দেবমূর্তির নামে উৎসর্গিত খাবার খাই না। ইনি হচ্ছেন সেই যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল, যার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং যিনি হযরত উমর (রা)-এর চাচা ছিলেন। তিনি নির্জনতার মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিলীলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ্‌র গুণগানে রত থাকতেন। মুশরিকী কার্যকলাপ ও প্রথা-পদ্ধতি থেকে পুরোপুরি দূরে থাকতেন। বয়স চল্লিশ বছরের যতই নিকটবর্তী হতে লাগলো তাঁর নির্জনবাস ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রায় সময়ই তিনি ছাতু ও পানি নিয়ে হেরা পর্বতের গুহায় চলে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত যিকির-আযকার ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। যখন ছাতু ও পানি শেষ হয়ে যেতো তখন ঘরে এসে পুনরায় ছাতু ও পানি নিয়ে যেতেন এবং পুনরায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। হেরা গুহা হলো হেরা পর্বতের একটি গুহা। হেরা পর্বতকে

আজকাল 'জাবালে নূর' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে মিনায় যেতে এ পাহাড়টি বাঁয়ে পড়ে। এ গুহাটি দৈর্ঘ্যে চার গজ এবং প্রস্থে দুই গজ। এ অবস্থায় তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। পরদিন প্রত্যূষে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী তিনি রাত্রে স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করতেন। এভাবে দীর্ঘ সাতটি বছর তাঁর আল্লাহর ইবাদতের সাধনায় অতিবাহিত হয়। শেষে দু'টি মাস এভাবে কাটে যে তিনি যেন ইবাদতের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান। হেরা পর্বতের গভীর নির্জনতায় তিনি এ সময়টা পুরোপুরিই নিমগ্ন থাকেন এবং এ সময় উপর্যুপরি তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

সূর্যোদয়

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। হিদায়াতের রবি এবার উদয়াচলে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি যখন চরমভাবে বিকশিত হলো, ইবাদত, সিয়াযত ও নির্জন সাধনায় পূর্ণতা লাভ করে যখন তিনি ওয়াহী বহনের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করলেন তখন একদা হেরা গিরি গুহায় ফেরেশতার আবির্ভাব ঘটলো।

ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : اِقْرَأْ-অর্থাৎ "আপনি পড়ুন!"

তিনি জবাব দিলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ –"আমি তো পড়তে জানি না।"

তারপর তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে জোরে চাপ দিলেন এবং বললেন : اِقْرَأْ

তিনি আবার জবাব দিলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ

তিনি আবার তাঁকে আলিঙ্গন করে জোরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন : اِقْرَأْ পুনরায় তিনি জবাব দিলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ

এবার তৃতীয়বার ফেরেশতা তাঁকে আলিঙ্গন করে জোরে চাপ দিয়ে বললেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পড় সেই রব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যিনি জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার রব-ই সবচাইতে সম্মানিত ও মহান। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (৯৬ : ১-৫)

প্রিয়নবী (সা) পাঠ করলেন। ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরলেন এবং খাদীজা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ "আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।" হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে দিলেন। তিনিও রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন যে, ব্যাপার কী! কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি কিছুটা শান্ত হলেন, তখন তিনি সমস্ত বিবরণ আনুপূর্বিক খাদীজাকে শোনালেন এবং বললেন : لقد خشيت على نفسى "আমার তো ভয় হচ্ছে আমি বুঝি আর বাঁচবো না।"

হযরত খাদীজা (রা)-এর ঐতিহাসিক সান্ত্বনা বাণী

জবাবে হযরত খাদীজা (রা) বললেন :

كلا البشر فوالله لا يحزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق .

"কখনো তা হতে পারে না। আপনি শান্ত হোন! আল্লাহ্ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত অপদস্থ করতে পারেন না। কেননা–

(ক) আপনি সর্বদা আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করেন (তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন না বা অনাত্মীয়সুলভ আচরণ করেন না।)

(খ) সর্বদা সত্য কথা বলেন।

(গ) অপরের বোঝা বহন করেন (কর্জ প্রভৃতি শোধ করেন।)

(ঘ) নিঃস্বদের দেখাশোনা করেন।

(ঙ) অতিথিদের সেবা-যত্ন করেন।

(চ) বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন এবং সত্যের সহায়তা করেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার পর তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের কাছে যান। তিনি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের কাছে সবকিছু আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন : ইনি হচ্ছেন সেই মহান ফেরেশতা যিনি মূসা (আ)-এর কাছে এসেছিলেন। হায়, যদি আমি যুবক হতাম এবং ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার স্বজাতি আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। হুযূর (সা) তখন বললেন :

او مخرجوهم

"কি, তারা আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?"

ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল বললেন, "জ্বী হাঁ। এ পৃথিবীর যিনিই রাসূল এসেছেন, তিনিই একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, লোকে প্রথমে তাঁদের সাথে শত্রুতাই করেছে।" তারপর যথারীতি তিনি হেরা গুহায় যাতায়াত করতেন। কিছুদিন পর্যন্ত আর তাঁর কাছে কোন ওয়াহী আসে নি। এ সময়টাকে ফাতরা বা বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে।

অবশেষে একদিন তিনি হেরাগুহা থেকে বাড়ীতে ফিরছেন এমন সময় তিনি সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন এবং ঘরে এসে বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এ সময় তাঁর কানে এ গুরুগম্ভীর আওয়াজ এলো ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ. قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠো এবং লোকদেরকে (আল্লাহ্র শাস্তি থেকে) সতর্ক কর। এবং তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা শির্ক ও খারাবি থেকে দূরে থাক। (৭৪ : ১-৫)

তারপর একের পর এক ওয়াহী আসা অব্যাহত থাকে। একদা হযরত জিবরাঈল আমীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যান। তাঁর সম্মুখে নিজে ওযূ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাঁর দেখাদেখি অনুরূপ ওযূ করেন। তারপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে নামায পড়ালেন।

ইসলাম প্রচারের সূচনা

তাওহীদ প্রচারের হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওহীদের তথা ইসলামের প্রচারকার্য শুরু করেন। লোকজনকে শির্ক থেকে বিরত রাখার এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের দাওয়াতের কাজ তিনি নিজ ঘর থেকেই শুরু করেন। সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এবং যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) প্রথম দিনই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। এরা সবাই ছিলেন তাঁর ঘরের মানুষ। তাঁর বন্ধু হযরত আবূ বকর (রা)-ও ঈমান আনয়ন করেন। সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, একজন চাচাতো ভাই, একজন আযাদকৃত ক্রীতদাস আর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বলা বাহুল্য, এদের প্রত্যেকেই তাঁর আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং তাঁর জীবনের কোন দিক এদের কাছে গোপন ছিলো না। এদের সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন তাঁর উন্নত চরিত্রের একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ। প্রথমে তিনি তাঁর এ প্রচারকার্য গোপনে গোপনে নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। প্রথম পর্যায়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর বন্ধুমহল কুরায়শদের মধ্যে অনেক বিস্তৃত ছিলো। তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা), হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (আ), হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) প্রমুখ ঈমান আনয়ন করেন। এরপর হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা), হযরত আবূ সালামা (রা), হযরত আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল (রা), হযরত উছমান ইব্ন মাজউন (রা), হযরত কুদামা ইব্ন মাজউন (রা), হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা), হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নি হযরত ফাতিমা (রা) প্রমুখও ইসলামে দাখিল হন। এঁদের পরে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের সহোদর হযরত উমায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা), হযরত জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) প্রমুখ ঈমান আনয়ন করেন এবং এ ভাবে মুসলমানদের একটি ছোটখাট জামাআত তৈরী হয়ে যায়। এঁদের মধ্যে নারী-পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধা সর্বশ্রেণীর লোক ছিলেন। মুশরিকদের ভয়ে মুসলমানরা মক্কার বাইরে পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের প্রচারকার্য এভাবে গোপনে গোপনেই হতে থাকে এবং শনৈঃ শনৈঃ লোকজন শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে বিমুখ হয়ে ইসলামে দাখিল হতে থাকে। এ তিন বছর পর্যন্ত কুরায়শদের প্রতিটি মজলিশে এ নতুন ধর্মের কথা আলোচিত হতে থাকে। মুসলমানরা যেহেতু নিজেদের নবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রচার করতেন না, তাই তাদের নিজেদের মধ্যেও একে অপরকে মুসলমান বলে সম্বোধন করতে পারতেন না। কুরায়শরা প্রথম দিকে এ নতুন ধর্মকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা মারাত্মক কিছু বলে মনে করেনি। তাই তারা এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এবং মুসলমানদেরকে মৌলিকভাবে কষ্ট দিতো। সামগ্রিকভাবে এ নতুন ধর্মকে উৎখাত করার জন্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকজন সক্রিয় হয়ে উঠেনি। কুরায়শের কোন কোন দুষ্ট লোক ফাঁক পেলেই দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানদেরকে

দৈহিক নির্যাতন করতেও ছাড়তো না। একবার হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) মুসলমানদের একটি ঘাঁটিতে সালাত আদায় করছিলেন। অতর্কিতে সেখানে কয়েকজন মুশরিক মক্কাবাসীর আগমন ঘটলো। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে মুসলমানদেরকে সালাত আদায়ে বাধা দিলো। হযরত সাআদ (রা)-ও অত্যন্ত শক্তভাবে তার মুকাবিলা করেন। একজন বিধর্মী হযরত সাআদ (রা)-এর তরবারির আঘাতে আহতও হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় এটাই ছিলো মুসলমানদের সর্বপ্রথম তরবারি চালনা।

একদিন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আলী (রা) একটি ঘাঁটিতে সালাত আদায়ে রত ছিলেন। এমন সময় কোথা থেকে আবূ তালিব এসে সেখানে উপস্থিত। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করলেন। তারপর যখন তাঁদের সালাত শেষ হলো, তখন তিনি বললেন : এ কোন্ ধর্ম তোমরা গ্রহণ করলে ? হযরত মুহাম্মদ (সা) নির্বিকারে জবাব দিলেন : এটাই হচ্ছে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম। সাথে সাথে তিনি চাচাকেও এ ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। জবাবে আবূ তালিব বললেন : আমি তো আমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবো না। কিন্তু হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ করে বললেন : বেটা, তুমি কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে না। আমার গভীর আস্থা রয়েছে যে, মুহাম্মদ তোমাকে পুণ্য ছাড়া কোনদিন পাপের উৎসাহ দিবেন না। মোদ্দাকথা, ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকে শুরু করে তিন বছরকাল পর্যন্ত ইসলামের প্রচারকার্য নীরবে নিভৃতে চলতে থাকে এবং সৌভাগ্যবানরা ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন।

সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথম সত্য-ঘোষণা

এবার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো ওয়াহীর মাধ্যমে :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

(হে রাসূল!) আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন।

এ নির্দেশ আসার পর প্রিয়নবী (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং এক একটি করে কবীলার নাম ধরে সবাইকে উচ্চৈঃস্বরে আহবান জানাতে লাগলেন। আরবের তৎকালীন প্রথা অনুসারে লোকজন এসে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হলো। তখন তিনি বললেন :

اخبرتكم ان العدو مصبحكم او ممسكم اما كنتم

হে কুরায়শ, আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে অথবা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রুর আক্রমণ হবে। তাহলে কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে ?

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো : "আলবৎ, আমরা সব সময় আপনাকে সত্যকথা বলতে শুনেছি।" এবার হযরত মুহাম্মদ (সা) বলে উঠলেন :

"আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, আল্লাহ্‌র শাস্তি অতি নিকটবর্তী। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করো, যাতে করে তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারো।"

তাঁর কথা শুনে কুরায়শরা হেসে উঠলো। আবূ লাহাব বলে উঠলো, "তোমার জন্য ধ্বংস আসুক : এজন্যেই কি তুমি আমাদেরকে ডেকে এনেছো ?"

এরপর সমাবেশ ভঙ্গ হয়ে গেলো। লোকজন যার যার ঘরে নানা কথা বলাবলি করতে করতে চলে গেলো। আবূ লাহাব উঠে যেতেই নাযিল হলো : تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ সূরা। আরো কয়েকদিন পর নাযিল হলো :

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন (হে রাসূল!)।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে একটি যিয়াফতের আয়োজন করতে বললেন। হযরত আলী (রা) নির্দেশ মাফিক যিয়াফতের আয়োজন করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত করলেন। প্রায় চল্লিশজন আত্মীয়-স্বজন এলেন। যখন সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো তখন তিনি কিছু বক্তৃতা করতে চাইলেন। কিন্তু আবূ লাহাব এমনি আজে-বাজে কথাবার্তা শুরু করে দিলো যে, লোকজন একে একে চলে গেলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বলার কোন সুযোগই আর হয়ে উঠলো না। পরদিন আবার সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

> দেখো, আমি তোমাদের নিকট এমন উত্তম কথা নিয়ে এসেছি যার চাইতে উত্তম কথা কেউ কোনদিন তার স্ব-সম্প্রদায়ের জন্যে নিয়ে আসেনি। বলো, তোমাদের মধ্যে কে কে এ কাজে আমাকে সাহায্য করবে ?

একথা শুনে সকলেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। কারো মুখেই কোনো জবাব শোনা গেলো না। এমনি সময় হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন :

> যদিও আমি বয়সে সবার চাইতে ছোট এবং সবচাইতে দুর্বল,
> আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি।

তাঁর এ কথা শুনে সবাই হেঁসে উঠলো এবং ঠাট্টা-মশকরা করতে করতে প্রস্থান করলো।

প্রকাশ্য প্রচার

এবার রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকাশ্যে লোকজনকে তাওহীদ ও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। এ সময়েই তাঁর উপর এবং তাঁর ছোট দলটির উপর দুর্ভোগ নেমে এলো। মেলায়, মজলিসে, বাজারে, বৈঠকখানায় তথা ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি লোকজনকে তাওহীদের সৌন্দর্য বোঝাতে লাগলেন এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করতে লাগলেন। তিনি ব্যভিচার, জুয়া, মিথ্যা কথন, বিশ্বাসভঙ্গ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অনাচারের পথ থেকে লোকজনকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কুরায়শরা ছিলো ভীষণ দাম্ভিক প্রকৃতির। তাদের বাপদাদার ধর্ম ও আচার-আচরণের নিন্দাবাদ শুনে যাওয়া তাদের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। তাদের মধ্যে মনিব ও গোলামের পার্থক্য বা ভেদাভেদ ছিলো একটা স্বীকৃত ব্যাপার। ইসলাম মনিব ও গোলামের এ পার্থক্যকে মিটিয়ে দিয়ে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করে ছিলো। এ সাম্যও তাদের মনঃপূত ছিলো না। কুরায়শ ও মক্কাবাসীদের মর্যাদা গোটা আরবে স্বীকৃত ছিলো। তাঁদের এ মর্যাদা ছিলো সেই মূর্তিগুলোর জন্যে যেগুলোর পূজার জন্যে গোটা আরব থেকে বিভিন্ন কবীলার লোক মক্কায় ছুটে আসতো এবং মূর্তি পূজার আনুষ্ঠানিক উৎসব

পালন 'করতো। ইসলাম ছিল মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। যার ফলশ্রুতিতে তাদের মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হওয়া ছিল অনিবার্য। বড় বড় সরদাররা কোনমতেই একথা মেনে নিতে রাযী ছিলো না যে, মহানবীর আনুগত্য মেনে নিয়ে তারা তাদের নিজ নিজ সরদারী থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। কুরায়শদের অধিকাংশ কবীলার লোকজন এমনিতেই বনূ হাশিম গোত্রের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করতো। এজন্যে তারা একথা কোনমতেই মেনে নিতে পারছিল না যে, একটা প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের একজন লোককে নবীরূপে স্বীকার করে নিয়ে তারা তাঁর আনুগত্য করবে। এ প্রকাশ্য প্রচারের ফলে সমস্ত কুরায়শ বংশ তাঁদের শত্রুতায় অবতীর্ণ হলো এবং তারা ইসলাম ও তার নবী (সা)-এর মূলোৎপাটন করার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠলো। কুফ্‌র ও ইসলামের এ প্রকাশ্য সংঘাত নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে অত্যন্ত জোরে-শোরে শুরু হয়ে যায়।

ইসলামের প্রথম মাদরাসা-দরস্‌গাহ

এ সময়েই হযরত নবী (সা) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আরকাম ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর বাড়ীকে ইসলামের দরস্‌গাহ বা শিক্ষাগাররূপে ব্যবহার করতে শুরু করেন। নবদীক্ষিতরা এ বাড়ীতে এসে ইসলামের শিক্ষা দিতেন, তা'লীম দিতেন। এ বাড়ীতে সর্বদা মুসলমানদের ভিড় লেগেই থাকতো। হযরত মুহাম্মদ (সা) এখানে বসেই সকলকে ইসলামের শিক্ষা দিতেন এবং এখানেই সকলে মিলে একত্রে সালাত আদায় করতেন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত পুরো তিন বছর এই দারুল-আরকামই ছিলো প্রিয় নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল এবং ইসলামের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। এ তিন বছরে যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে আদি পর্যায়ের মুসলমানদের মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নামই হচ্ছে সর্বশেষ নাম। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা দারুল আরকাম থেকে মুক্তাঙ্গনে বেরিয়ে এলেন। কুরায়শরা যখন হযরত রসূল (সা) ও তাঁর দলের মূলোৎপাটনকে একান্তই অপরিহার্য বলে বিবেচনা করলো, তখন তারা নির্যাতনের নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করলো।

কুরায়শদের বিরোধিতা

ঈমান আনয়ন করে যাঁরা মুসলমান হলেন, তাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা ক্রীতদাস। আর কিছু লোক এমনও ছিলেন যাঁরা কবীলা বা গোত্রের বল বা আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা প্রচুর না থাকায় সমাজে অত্যন্ত দুর্বল বলে বিবেচিত হতেন। এমন লোকদেরকে ইসলামচ্যুত করার জন্যে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদেরকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করতে শুরু করলো। যাঁরা কোন কবীলাভুক্ত ছিলেন তাদেরকে নির্যাতন করলে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে এরূপ আশঙ্কায় তারা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকেই ইসলাম গ্রহণকারী নিকটাত্মীয়দেরকে শাস্তি দিয়ে ও নির্যাতন চালিয়ে ধর্মচ্যুত করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। যাতে কেউ ইসলাম গ্রহণে সাহসী না হয় তজ্জন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার এবং তাদেরকে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো। এদিকে হযরত রাসূল (সা)-ও ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারকার্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। ওদিকে কুরায়শরাও পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিরোধিতার জন্যে কোমর বাঁধলো। হযরত বিলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া ইব্‌ন খালফের ক্রীতদাস। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে উমাইয়া তাঁকে

নানারূপ পীড়া দিতে থাকে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। বেত্রাঘাতে গোটা দেহ জর্জরিত করা হতো। ভুখা রাখা হতো। গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তাঁকে তুলে দেয়া হতো। তারা তাঁকে মক্কার অলিতে-গলিতে, শহরে-বাইরে, পাহাড়-পর্বতে ও মরুপ্রান্তরে টেনে নিয়ে ফিরতো এবং বেদম মারপিট করতো। হযরত বিলাল (রা) এ সব নির্যাতনই সহ্য করে যেতেন আর মুখে 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ করতেন।

হযরত আম্মার (রা) তার পিতা ইয়াসির এবং মাতা সুমাইয়ার সাথে একত্রে মুসলমান হন। আবূ জাহেল তাঁদেরকে নানারূপে ক্লেশ দিতো। জালিম আবূ জাহেল হযরত সুমাইয়া (রা)-কে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বর্শার আঘাতে শহীদ করে। হযরত যুবায়র (রা)-কে আবূ জাহেল এতই প্রহার করে যে, প্রহারের ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। এমন গোলাম-বাঁদীর সংখ্যা প্রচুর যাঁদেরকে এত কঠোর ও অমানবিক নির্যাতন করা হয় যে, এগুলো কল্পনা করতেও শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু ইসলাম এমনি এক শক্তি যে, ঐ নিষ্ঠুর নরপিশাচের এতরূপ নির্যাতন করেও কোন একটি মুসলমানকেও ইসলামচ্যুত করে মুরতাদ বানাতে সমর্থ হয়নি।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন বনী উমাইয়া গোত্রের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর চাচা রশি দিয়ে তাকে বেঁধে বেদম প্রহার করে এবং নানাভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়। হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা)-কে তাঁর চাচা চাটাইর উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর নাকে ধোঁয়া দিতো। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-কে কুরআন পড়তে শুনে কুরায়শরা এরূপ প্রহার করে যে, তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায় এবং তিনি ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তারা তাঁকে প্রাণে বধ করতেই উদ্যত হয়েছিল। এমন সময় হযরত আব্বাস (রা) এই বলে তাদেরকে বাধা দেন যে, এ হচ্ছে বনী গিফার গোত্রের লোক। তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা চলার পথেই এদের বাস। এরা তোমাদের নাকে দম এনে তবে ছাড়বে। অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলার পথ রুদ্ধ করে অর্থনৈতিকভাবে তোমাদেরকে অবরোধ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কেও অনুরূপভাবে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রহার করতে করতে তারা বেহুঁশ করে ফেলে। অনুরূপভাবে হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরাতকে তারা নানাভাবে নির্যাতন করে। একবার জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁর বুকের উপর চেপে বসে যাতে তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে না পারেন। তাঁর কোমরের চামড়া ও গোশত পুড়ে গিয়ে কাবাব হয়ে যায়। কোন কোন সাহাবাকে গরু বা উটের কাঁচা চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে দিত। কাউকে কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে জ্বলন্ত আগুনে এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ফেলে দিতো।

নবী করীম (সা)-এর সাথে ধৃষ্টতামূলক আচরণ

হযরত মুহাম্মদ (সা) একদিন খানায়ে কা'বায় সালাতরত ছিলেন। এমন সময় উক্‌বা ইব্‌ন আবী মু'আইত তাঁর গলায় চাদর ফেলে এভাবে পেচাতে লাগলো যে, তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সংবাদ পেয়ে হযরত আবূ বকর (রা) দৌড়ে আসলেন এবং তাঁকে দুষ্টের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। সাথে সাথে তিনি কুরায়শদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ .

তোমরা কি এক ব্যক্তিকে কেবল এ অপরাধেই হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ্ ?

তখন কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তো ছেড়ে দিলো কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-কে ঘিরে ফেললো এবং তাঁকে বেদম প্রহার করলো।

একবার কা'বা প্রাঙ্গণে কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হয়। হযরত হারিছ ইব্ন আবী হালা (রা) সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসে সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে দুষ্টদের কবল থেকে রক্ষার প্রয়াস পান। কাফির নরপিশাচরা তাঁকে সেখানেই শহীদ করে ফেলে ! কিন্তু আর তাঁর গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হয় নি। রাতের বেলা হযরত রাসূল (সা) যে পথ দিয়ে চলাফেরা করতেন, তাঁকে কষ্ট দেওয়ার মানসে সে পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হতো।

একবার প্রিয় নবী (সা) কা'বা প্রাঙ্গণে সালাত আদায়ে রত ছিলেন। কুরায়শরা তখন সেখানে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় আবূ জাহেল বলে উঠলো, অমুক স্থানে উট যবাহ হয়েছে। তার ভুঁড়ি সেখানে পড়ে আছে। কেউ একজন তা উঠিয়ে নিয়ে এসে মুহাম্মদের উপর ফেলে দাও। উকবা ইব্ন আবী মুআইত উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে এলো এবং যখনই তিনি সিজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁর পিঠের উপর ফেলে দিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) তো তখন আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন বিধায় তা টেরও পেয়ে উঠেন নি, কিন্তু কাফিররা পৈশাচিক উল্লাসে ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাফিরদের ভিড় দেখে তিনি কিছু করতে সাহস পেলেন না। ঘটনাচক্রে হযরত ফাতিমাতুয্ যুহরা (রা) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি তখন বালিকা মাত্র। তিনিই অগ্রসর হয়ে পিতার পিঠ থেকে বহুকষ্টে উটের ভুঁড়ি সরালেন এবং এ সময় তিনি নরপিশাচ কাফিরদেরকে আচ্ছা করে ভর্ৎসনা করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঘরে প্রায়ই ঢিল পাথর ছোঁড়া হতো। নানারূপ আবর্জনাও নিক্ষিপ্ত হতো তাঁর বাসগৃহে। একবার তিনি ভর্ৎসনার সুরে বললেন : হে বনূ আবদে মানাফ। প্রতিবেশীর উত্তম হকই তোমরা আদায় করছো! কখনো তাঁকে শায়ের বা কবি, আবার কখনো সাহের বা যাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হতো। কখনো তাঁকে জ্যোতিষীর খেতাব দেয়া হতো, আবার কখনো জিনগ্রস্ত বা উন্মাদ বলে অভিহিত করা হতো। মোদ্দাকথা, মক্কার কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদেরকে নির্যাতন করতে এবং তাঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। এ জন্যে হেন কোন পন্থা নেই-যা তারা অবলম্বন করেনি। হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও পূর্ণোদ্যমে সাহস ও প্রত্যয়ের সাথে তাঁর প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। কাফিররা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হতে চলেছে এবং এতসব করেও বিন্দুমাত্র সাফল্য অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তখন তারা বাধ্য হয়ে অন্য পথ অবলম্বন করলো।

তীন জবাব

বার কুরায়শরা সমবেত হয়ে পরামর্শ করলো এবং উত্বা ইব্ন রবীআকে তাদের প্রতিনিধিস্বরূপ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পয়গাম দিয়ে পাঠালো। উতবা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত নম্র ভাষায় বললো :

মুহাম্মদ! তুমি অত্যন্ত ভদ্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। তোমার বংশও অত্যন্ত অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সম্প্রদায়কে এক মহাপরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছো। শেষ পর্যন্ত তোমার অভীষ্ট কি বল দেখি! যদি তুমি ধন-সম্পদেরই প্রত্যাশী হও, তা' হলে আমরা তোমার জন্যে এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের সংস্থান করবো যে, তুমিই হবে আরবের সবচাইতে বনাঢ্য ব্যক্তি। আর যদি সরদারী ও রাজত্বই তোমার কাম্য হয়ে থাকে, তবে আমরা তোমাকে সরদার বানাতে এবং তোমার প্রাধান্য মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদি কোন সুন্দরী রমণীই তোমার কাম্য হয়, তবে আমরা সবচাইতে অভিজাত খানদানের সব চাইতে সুন্দরী তন্বীকেই বধুরূপে তোমার হাতে তুলে দেবো। যদি এসবই তোমার কাম্য হয়ে থাকে, তবে এসবের সংস্থান করে দিয়ে আমরা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত! তুমি আমাদেরকে তোমার অভীষ্ট সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত করো।

উতবা যখন তার বক্তৃতা শেষ করলো তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) সূরা হা-মীম সিজদা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছলেন :

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ .

—তবু এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, 'আদ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ (৪১ : ১৩)।

তখন উতবার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে তখন হুযূর (সা)-এর মুখে হাত দিয়ে বললো : "এমনটি বলো না।" হুযূর (সা) সিজদা করলেন এবং সিজদা থেকে উঠে বললেন : "তোমরা আমার জবাব শুনলে তো?"

উতবা তখন সেখান থেকে প্রস্থান করে কুরায়শদের কাছে এসে বললো : আমার অভিমত হচ্ছে একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং তোমরা এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। যদি সে গোটা আরবের উপর বিজয়ী হয় তাহলে সে তো তোমাদেরই ভাই, তার সাফল্য হবে তোমাদেরই সাফল্য। আর যদি সে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তোমরা নির্বিঘ্নে বেঁচে গেলে।

তার এরূপ বক্তব্য শুনে কুরায়শরা উতবাকে বলে উঠলো : মুহাম্মদ (সা) তোমাকে যাদু করে ফেলেছে। জবাবে উতবা বললো : তোমরা যা' ইচ্ছে বলতে পারো। আমি আমার মত তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম।

আবূ তালিব সকাশে কুরায়শ প্রতিনিধি দল

উতবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে উতবা, শায়বা, আবুল বুখতারী, আসওয়াদ, ওয়ালীদ, আবূ জাহেল প্রমুখের একটি প্রতিনিধি দল আবূ তালিব সকাশে উপস্থিত হয়ে অনুযোগ করলো, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলা থেকে বিরত হতে অনিচ্ছুক। আপনি তাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন এবং এ কাজ থেকে তাকে বিরত করুন।

আবূ তালিব এ প্রতিনিধি দলকে সঙ্গত জবাব দেন। তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, তোমরাও তো নির্যাতনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে চলেছো। সেদিনের মতো তারা আবূ তালিবের কাছ থেকে উঠে চলে গেলো। পরদিন শলা-পরামর্শ করে তারা আবার এসে হাযির হলো। আবূ তালিব তাদের আসার পর হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের সম্মুখেই ডেকে

আনলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই কথোপকথন শুরু হলো। কুরায়শ সরদাররা উতবার মাধ্যমে প্রেরিত তাদের প্রস্তাব পুনরায় পেশ করলো। পূর্বে এ প্রস্তাব উতবা একা এসে পেশ করেছিলো।

তারা বললো : মুহাম্মদ (সা)! আপনাকে কয়েকটি জরুরী কথা বলার জন্য ডাকা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, কোন ব্যক্তি তার নিজের কওমকে এতটুকু বিপদে ফেলেনি, যতটুকু বিপদে আপনি আপনার কওমকেই ফেলেছেন। যদি আপনি এ নতুন ধর্ম দিয়ে ধন-সম্পদ উপার্জনে আগ্রহী হন, তবে আমরা এত ধন-সম্পদ আপনার জন্য সংগ্রহ করে দেবো যে, আর কারো কাছে এতো সম্পদ থাকবে না। যদি মান-মর্যাদার খায়েশ হয়ে থাকে, তবে আমরা আপনাকে এখনই আমাদের সরদার স্বীকার করে নিচ্ছি। যদি রাজত্বই এর দ্বারা আপনার কাম্য হয়, তবে আমরা আপনাকে সমগ্র আরবের বাদশাহ মেনে নিতে প্রস্তুত। যদি কোন জিনভূতের আছরের জন্যে আপনি এরূপ করে থাকেন, তবে আমরা ওঝা-বদ্যি ডেকে চিকিৎসা করাবো।

তিনি তাদের এসব বক্তব্যের জবাবে কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। যদি তোমরা আমার শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে নাও, তবে তোমাদের দীন-দুনিয়ার কল্যাণ হবে, আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যানই করো, তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে তাঁর ফায়সালা কি হয় তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করবো।

তাঁর এ কথা শুনে কাফিররা বলে উঠলো, আচ্ছা, যদি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূলই হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এ পাহাড়গুলোকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দিন এবং মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল করে তুলুন তো দেখি! আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পুনর্জীবিত করে দেন। তাঁদের মধ্য থেকে কুসাই ইব্‌ন কিলাবকে অবশ্যই উঠাতে হবে। তিনি যদি পুনর্জীবিত হয়ে আপনাকে রাসূলরূপে সনাক্ত করেন, তাহলে আমরা আপনাকে রাসূলরূপ স্বীকার করে নেবো।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন : এসব কাজের জন্যে আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়নি। আমার কাজ হলো, আমার প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্ তা'আলার বিধান আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেবো এবং উত্তমরূপে তা বুঝিয়ে দেবো। নিজ এখতিয়ারে আমি কিছুই করতে সক্ষম নই।"

এরূপ কথোপকথনের পর কুরায়শ সরদার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে চলে গেলো। যাবার সময় তারা আবূ তালিবকেও মুকাবিলা ও বিরোধিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলো।

কুরায়শ সরদারের প্রস্থানের পর আবূ তালিব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : "ভাতিজা, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। কুরায়শদের মুকাবিলা করবার মতো শক্তি এখন আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। এমন শক্ত বোঝা তুমি কাঁধে চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি-সামর্থ্য তোমার এ দুর্বল চাচার নেই। তোমার দীনের প্রচার এবং দেবমূর্তিসমূহের প্রকাশ্য সমালোচনা তোমার ছেড়ে দেয়াটাই সমীচীন বলে আমি মনে করি।" সব শুনে তিনি বললেন : "চাচাজান! এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তবুও আমি আমার কাজ থেকে বিরত হবো না।" আবূ তালিবের কথায় তাঁর সন্দেহ হলো, এবার চাচাও বুঝি আমাকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবেন। আবূ তালিব মক্কার কুরায়শ সরদারদের

মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বনূ হাশিম কবীলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা বলে তিনি গণ্য হতেন। তাঁর কারণে আক্রমণকারীরা তাঁর উপর আক্রমণ করতে অনেকটা দ্বিধাবোধ করতো। তাদের আশঙ্কা ছিলো, বনূ হাশিম কবীলার সকলে মিলে যদি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা বেশ সঙ্গীন ও নাযুক হয়ে দাঁড়াবে। তাই আবূ তালিবের সমর্থন তাঁর জন্যে বেশ সহায়কই ছিলো। এবার তাঁর এ নৈরাশ্যব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে তিনি বললেন : চাচাজান! আমি আমার কাজ ত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র কাজ পূর্ণ হয়, কিংবা এই কাজ করতে করতে আমি নিজেই কুরবান হয়ে যাই।—একথা বলেই তিনি আবূ তালিবের নিকট থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দৃঢ়চেতা ইয়াতীম ভাতিজাটির কথায় আবূ তালিব অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে এনে বললেন : তুমি অবশ্যই তোমার কাজ চালিয়ে যাবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন আমি তোমাকে সাহায্য করেই যাবো এবং কোনদিনই তোমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবো না।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরায়শদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তারা তাওহীদের প্রচারকার্য অব্যাহত গতিতে চলতে দেখে রীতিমত প্রমাদ গুণলো। তারা লক্ষ্য করলো যে, যে আন্দোলনকে তারা শিশু বলে তুচ্ছ জ্ঞান করছিলো, তা এখন বিকশিত হয়ে এমনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, তার মূলোৎপাটন আর এখন মোটেই সহজ নয়। তারা সর্বাত্মক চেষ্টায় মেতে উঠলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খানায়ে কা'বায় প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করলো। শহরের বখাটে ছেলেদেরকে হযরত রাসূল (সা) ও মুসলমানদেরকে দেখামাত্র সমবেতভাবে হাত তালি দেয়া ও গালিগালাজ করবার জন্য নিযুক্ত করলো। এখন থেকে এদের কাজ হলো রাস্তাঘাটে, অলিতে-গলিতে মুসলমানদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, বাইরের কোন আগন্তুককে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে না দেয়া এবং যখন যেখানে যেভাবে পারা যায় দুর্বল মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা। ফলে মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমনতরো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সা) মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান শাসিত আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দান করেন। সে অনুসারে নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন নারী আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। পনেরো সদস্যের এ কাফেলাটি রাতের আঁধারে গোপনে মক্কা ত্যাগ করে। ঘটনাক্রমে জিদ্দা বন্দরে এসে তারা নোঙর খুলে ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন অবস্থায় জাহাজ পেয়ে গেলেন। তাঁরা সেই জাহাজে করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপনীত হন। সেই প্রথম হিজরতকারী দলের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন :

১. হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)।
২. হযরত উসমান (রা)-এর সহধর্মিণী রুকাইয়া বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)।
৩. হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা (রা)।
৪. হযরত উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)।
৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)।

৬. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)।
৭. হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)।
৮. হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)।
৯. হযরত আমির ইব্‌ন রবীআ (রা)
১০. হযরত সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা (রা)।
১১. হযরত আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ (রা)।[৩]
১২. হযরত আবূ সাবুরা ইব্‌ন রেহেম আমিরী (রা)।
১৩. হযরত হাতিম ইব্‌ন আমির (রা)।
১৪. হযরত উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া (আবূ সালামার স্ত্রী যিনি আবূ সালামার মৃত্যুর পর নবী-সহধর্মিণী হয়েছিলেন)।
১৫. হযরত সাহ্‌ল বিন্‌ত সুহায়ল আবূ হুযাফা (রা)-এর সহধর্মিণী—সীরাতে মুস্তফা জিলদে আউয়াল পৃঃ ২৪১-৪২ এর বরাতে (অনুবাদক)।

এঁরা কুরায়শদের মশহুর ও শক্তিশালী কবীলার লোক ছিলেন, যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ পর্যায়ে অত্যাচার কেবল গোলাম-বাঁদী বা দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা সকল দুর্বল নির্বিশেষে সকল কবীলার ও সকল শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিই নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। উপরন্তু এটাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের এত দূরদেশে হিজরত করে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সফর-সামানও ছিল না যে, তাঁরা এত দূরবর্তী দেশে সফরে যাবেন।

কাফিররা যখন মুসলমানদের হিজরত ও আবিসিনিয়ার দিকে যাত্রার সংবাদ পেলো, তখন তারাও তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু কাফিরদের জিদ্দায় পৌঁছাবার পূর্বেই জাহাজ জিদ্দা থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। আবিসিনিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা স্বস্তির সাথে জীবন যাপন করছিলো। তারপর একে একে আরো অনেক মুসলমানই আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে থাকেন। হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবও আবিসিনিয়ায় মুসলমান ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হন। ফলে এ পর্যন্ত আবিসিনিয়া মুসলমানদের সংখ্যা তিরাশিতে উন্নীত হলো।

মুসলমানদের আবিসিনিয়ার উপস্থিতির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা গুজব শুনতে পেলেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে বা তাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হয়ে গেছে। এখন আর মক্কায় মুসলমানদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এ গুজব শুনে মুসলমানদের কেউ কেউ আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরেও যান। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হতেই তাঁরা জানতে পারল যে, ঐ সংবাদ আসলে ছিল গুজবমাত্র। তাই কেউ কেউ রাস্তা থেকেই আবিসিনিয়ায় ফিরে যান, আবার কেউ কেউ কোন প্রভাবশালী কুরায়শী ব্যক্তির জামানত নিয়ে মক্কায় আসেন। এঁরা মক্কায় এসে আরও মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় আবিসিনিয়ায় যাত্রা করল। এটাকে আবিসিনিয়া মুসলমানদের দ্বিতীয় হিজরত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা একশ'তে উন্নীত হয়।

৩. প্রথমবার আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী অপর পাঁচজন হচ্ছেন ক্রমিক নম্বর ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত।

আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট কুরায়শদের আবদার

মক্কার লোককে মুসলমান হয়েই আবিসিনিয়ায় হিজরত করে চলে যেতে দেখে এবং সেখানে আরামে জীবন-যাপন করতে দেখে মক্কার কাফিররা প্রমাদ গুণলো। এভাবে ক্রমে ক্রমে তাদের বিরাট শক্তি মুসলিম শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বাইরে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হতে পারে। এসব ভেবে তারা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো।

তাই তারা মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুচরবর্গের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো এবং মক্কার দু'জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমর ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রবীআকে দূত রূপে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করলো। পূর্ব থেকেই মক্কার কুরায়শবর্গ এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের মধ্যে একটা বাণিজ্যচুক্তি বর্তমান ছিলো আর সে অনুসারেই আবিসিনিয়া ও মক্কার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিলো। এ দু'জন দূতের নিকট তারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের জন্যে বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদিও দিয়েছিলো। শুধু আবিসিনিয়ার সম্রাটের জন্যেই নয়, তার পারিষদবর্গের জন্যেও তারা মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করলো। কুরায়শ দূতদ্বয় আবিসিনিয়ায় পৌঁছে আবিসিনিয়ার রাজদরবারে এসব উপঢৌকন পেশ করলো। তারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের পারিষদদেরকেও নিজেদের সমর্থক বানিয়ে নিয়ে এভাবে তাদের দাবী উত্থাপন করলো :

> রাজন! আমাদের কিছু ক্রীতদাস বিদ্রোহী হয়ে আপনার দেশে এসে পৌঁছেছে এবং নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তারা এক অভূতপূর্ব নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই এ ক্রীতদাসদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেয়া হোক।

সম্রাট তাদের আবেদন শুনে বললেন : আগে আমি এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখি। তারপর তোমাদের দাবী বিবেচনা করা হবে। পারিষদরাও কুরায়শ দূতদেরকে সমর্থন জানালো। কিন্তু সম্রাট নাজাশী সেদিকে কর্ণপাত না করে মুহাজির মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা যে ধর্ম গ্রহণ করেছো সেটা কোন্ ধর্ম ? মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) অগ্রসর হয়ে নাজাশীর দরবারে নিম্নধারার ভাষণ দেন।

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের মর্মস্পর্শী ভাষণ

> বাদশাহ্ নামদার! আমরা ছিলাম অজ্ঞ ও মূর্তিপূজারী। মৃত জন্তু ভক্ষণকারী, অসামাজিক কার্যকলাপ ও প্রতিবেশীদেরকে নির্যাতনে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের সবল ব্যক্তিরা দুর্বলদের অধিকার গ্রাস করতো। এমন সময় আল্লাহ্ আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদা, সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পূর্বেই আমরা অবগত ছিলাম। তিনি আমাদের এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসীতে পরিণত করে মূর্তিপূজা থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, সত্য বলতে, আমানত রক্ষা করতে ও নেক আমল করতে হুকুম করেছেন এবং পাপাচার, মিথ্যা কথন এবং পিতৃহীনদের সম্পদ গ্রাস করতে তিনি আমাদেরকে বারণ করেছেন। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও প্রতিবেশীর প্রতি সৌহার্দমূলক আচরণের নির্দেশ দান করেছেন। তিনি আমাদের হত্যা ও রাহাজানি থেকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং আল্লাহ্র

ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সেই রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনুগত্য অবলম্বন করি। এজন্যে আমাদের স্বজাতি আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আমাদেরকে নানারূপে নির্যাতন করে। অগত্যা আমরা দেশত্যাগ করে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নেই। আমাদের এ প্রতীতি রয়েছে যে, আপনার দেশে আমাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

এ ভাষণ শুনে নাজাশী বললেন : তোমাদের নবীর প্রতি আল্লাহ্‌র যে কালাম নাযিল হয়েছে তার কিছুটা শোনাও দেখি। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়াম তিলাওয়াত শুরু করলেন। কুরআনুল কারীমের আয়াত শুনে নাজাশী এবং পারিষদবর্গের চোখে পানি এসে গেলো। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়ামের প্রথম দিকের আয়াতগুলো পড়ে শোনাতেই নাজাশী বলে উঠলেন: হযরত মূসা (আ)-এর তাওরাতের আর এ কালামের ধরন তো একই। উভয়টি অভিন্ন মনে হচ্ছে।

কুরায়শ দূতেরা বলে উঠলেন : এরা কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-এরও বিরোধী। একথাটির দ্বারা তারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আবিসিনীয় রাজাকে মুসলমানদের প্রতি ক্ষেপাতে চেয়েছিলো। হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : মিথ্যে কথা বরং

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَكَلِمَةٌ اَلْقَهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ .

তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহ্‌র বাণী যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর আদেশ।

নাজাশী বলে উঠলেন : তোমাদের এ বিশ্বাস যথার্থ। ইনজীল কিতাবের মর্মও ঠিক তাই। তিনি কুরায়শ দূতদ্বয়কে ব্যর্থ মনোরথ ফিরিয়ে দিলেন এবং স্পষ্ট বলে দিলেন, আমি এঁদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। সাথে সাথে কুরায়শদের দেয়া উপহার সামগ্রীও তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন। ফলে তাদের অপমানের অন্ত রইলো না। এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ সালের ঘটনা। নাজাশীর দরবারে কুরায়শদের এ ব্যর্থতা মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ আরো বাড়িয়ে তুললো।

হযরত আমীর হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কার কুরায়শরা নবী করীম (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষে পাগল হয়ে উঠেছিলো। একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা এর পাদদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় সেখানে আবূ জাহেল এসে উপস্থিত। হযরত মুহাম্মদ (রা)-কে দেখতে পেয়েই সে প্রথমে তো ভীষণ কর্কশ ও অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করলো। তিনি এ সবের জবাব মাত্র না দিয়ে নির্বিকার রইলেন। তখন সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাতে আহত হলেন এবং তাঁর পবিত্র দেহ থেকে লহু মুবারক নির্গত হতে লাগলো। তিনি চুপচাপ বাড়িতে চলে আসলেন। আবূ জাহেল কা'বা প্রাঙ্গণে আলাপরত লোকদের সাথে এসে বসে তাদের সাথে আলাপে মেতে উঠলো।

হযরত আমীর হামযা (রা) ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আপন চাচা। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি তখনও মুশরিকদের

দলভুক্ত। তিনি প্রতিদিন ভোরে তীর-ধনুক নিয়ে শিকারে বের হতেন এবং সারাদিন শিকারের সন্ধানে ঘোরাফিরা করে শিকার করে সন্ধ্যায় ফিরতেন। ফিরেই সর্বপ্রথম তিনি কা'বায় গিয়ে তাওয়াফ করতেন। তারপর ঘরে ফিরতেন। ঐ দিনও শিকার করে আপন অভ্যাস মতো তিনি ফিরছিলেন। পথেই আবূ জাহেলের বাঁদীর সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। বাঁদী তাঁকে বলল, আবূ জাহেল হযরম মুহাম্মদ (সা)-কে গালাগালি দেয় এবং পাথর মেরে জখম করে কিন্তু মুহাম্মদ (সা) ধৈর্য ধারণ করে চুপ থাকে।

হযরত হামযা (রা) শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর দুধ-ভাইও। রক্ত ও দুধের সম্পর্ক তাঁকে অধীর করে তুললো। তিনি প্রথমে খানায়ে কা'বায় গেলেন। তাওয়াফ শেষ করেই তিনি সোজা ঐ মজলিসের দিকে রওনা হলেন যেখানে বসে আবূ জাহেল আলাপ-আলোচনায় মত্ত ছিলো। হযরত হামযা (রা) ছিলেন বীর পাহ্‌লোয়ান। তিনি একজন যোদ্ধা ও বীর পুরুষ বলে গণ্য হতেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই ধনুক দিয়ে আবূ জাহেলের মাথায় এমনি জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে দর দর করে রক্ত প্রবাহিত হলো। তারপর মুখে বললেন : আজ থেকে আমিও মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তিনি যা বলে থাকেন আমিও তাই বলি। বলো দেখি হতভাগা তোর কি বলার আছে? আবূ জাহেলের লোকজন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার স্বপক্ষে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আবূ জাহেল হামযাকে তাঁর বীরত্বের জন্য ভয় করতো। তাই সে নিজেই তাদেরকে সংযত করলো এবং বললো, "আসলেও আমার পক্ষ থেকে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিলো। হামযা যদি তাঁর ভাজিতার অপমানের প্রতিশোধ না নিতেন তাহলে এটা তাঁর আত্মমর্যাদার পরিপন্থী হতো।" সম্ভবত হযরত হামযার কথা শুনেই আবূ জাহেলের মনে আশংকা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, পাছে এর রাগ ও জেদের বশে তিনি মুসলমানই না হয়ে যান। আর এজন্যেই সে হযরত হামযা (রা)-কে শুনিয়েই কথাগুলো বলছিলো যেন ব্যাপারটির এখানেই ইতি ঘটে আর তিনি ইসলামের দিকে ঝুঁকে না পড়েন।

আবূ জাহেলের সাথে বোঝাপড়া করে হযরত হামযা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : ভাতিজা, তুমি শুনে আনন্দিত হবে যে, আবূ জাহেলের নিকট থেকে আমি তোমার প্রতিশোধ এরই মধ্যে নিয়ে নিয়েছি।

জবাবে হযরত নবী (সা) বললেন : "চাচা! এ জাতীয় ব্যাপার আমাকে আনন্দ দেয় না। হ্যাঁ, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তা আমাকে অপার আনন্দ দেবে।" এ কথা শুনে হযরত হামযা (রা) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে বিপর্যস্ত মুসলমানদের শক্তি ও মনোবল অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এটা ছিলো নবুওয়াতের ষষ্ঠ পর্যায়ের কথা। সে সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আরকাম (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করতেন। মক্কার কুরায়শরা তাঁর সাথে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করে দিয়েছিলো। হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে তারা অনেকটা সংযত হলো এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শানে গোস্তাখী করার ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়ে গেলো।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে কুরায়শদের দুশ্চিন্তা ও বিদ্বেষের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও নানারূপ ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো।

হযরত উমর ফারূক (রা) ছিলেন হযরত হামযা (রা)-এর মতো আরবের বিখ্যাত বীরপুরুষ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদেরকে নির্যাতন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে তৎপরতায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। তিনি মুসলমানদেরকে ধরে এনে বেদম প্রহার করতেন এবং প্রহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে থামতেন এবং বিশ্রাম নেওয়ার পর পুনরায় উঠে মারধর শুরু করতেন। মোটকথা, মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে মুরতাদ বানানোর জোর কোশেশ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে একদিন তিনি শেষ সিদ্ধান্ত নেন এবং কাফিরদের মজলিসে অঙ্গীকার করেন যে, এবার তিনি একাই কুরায়শদের উপর আপতিত এ ফিতনার মূলোচ্ছেদ করবেন অর্থাৎ এ ফিতনার প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা)-এর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবেন।

আবূ জাহেল তাঁর এ ঘোষণা শুনে সোৎসাহে ঘোষণা করলেন : সত্যি সত্যি তুমি যদি এ কাজটি করে আসতে পার, তাহলে তোমাকে একশ'টি উট এবং এক হাজার উকিয়া পরিমাণ রৌপ্য বখশিশ স্বরূপ প্রদান করা হবে।

আর যায় কোথায়! কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে উমর তক্ষণি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পথে সাআদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি হে উমর ! এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ ? জবাবে উমর বললেন : মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করতে যাচ্ছি, কেননা, আজ আমি সংকল্প করেছি যে, কুরায়শ কওমকে আপদমুক্ত করবো এবং তাদের রকমারি তদবিরকে সহজ করে দেবো। হযরত সাআদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন : বনী হাশিম-এর প্রতিশোধের ভয় কর না ? জান না যে, মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করা চাট্টিখানি কথা নয়? জবাবে উমর বললেন : আমার হাতে এ কোষমুক্ত তলোয়ারখানা থাকতে আমি কাউকে পরোয়া করি না। তারপর হযরত সাআদ (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : তুমিও বুঝি তার সমর্থক বনে গেছো? তাহলে প্রথমে তোমাকেই শেষ করছি ! সাআদ (রা) বললেন : আমাকে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে পরেই বধ করো হে ! আগে নিজের খবর নাও। তোমার বোন যে মুসলমান হয়ে গেছে আর ইসলাম তোমার নিজ ঘরেই ঢুকে পড়েছে, সে খবর রাখ?

হযরত সাআদ (রা)-এর এ জবাব হযরত উমর (রা)-এর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো বিধলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বোনের বাড়ীর দিকে ছুটলেন। তিনি বেরিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করার সংকল্প নিয়ে। রাস্তায় গিয়ে পথ ধরলেন বোনের বাড়ীর। সেখানে যখন তিনি পৌছলেন তখন হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) উমরের বোন ফাতিমা (রা) এবং তাঁর স্বামী হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করলেন এবং যে পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন শরীফের আয়াত লিখিত ছিলো তাড়াতাড়ি তাও লুকালেন। তিনি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি পড়ছিলে ? তারপর ভগ্নিপতি সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ধরেই ফেলে দিলেন এবং বেদম প্রহার করতে লাগলেন এবং বললেন : তোমরা কেন মুসলমান হতে গেলে? স্বামীকে ভাইয়ের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে বোন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভাইকে জাপটে ধরলেন। জাপটাজাপটিতে ফাতিমা (রা)-এর মাথায় এমনি আঘাত লাগলো যে দরদর করে তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। উমর (রা) বোন এবং ভগ্নিপতির দু'জনকেই বেদম প্রহার করলেন। অবশেষে বোনটি বেপরোয়া হয়ে উঠলেন এবং বললেন :

قَدْ اَسْلَمْنَا وَتَابَعْنَا مُحَمَّدًا افْعَلْ مَا بِذَالِكَ .

হাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য অবলম্বন করেছি। এ জন্যে তুমি যা' করতে পার কর !

বোনের এ বেপরোয়া জবাব শুনে হযরত উমর (রা) যখন বোনের দিকে নজর তুলে তাকালেন তখন তাঁর রক্তাক্ত দেহের উপর চোখ পড়তেই তাঁর রাগ অনেকটা পানি হয়ে গেলো। বোনের রক্তমাখা দৃশ্য ভাইয়ের মনে পরিবর্তনের সূচনা করলো।

এবার অনেকটা শান্তস্বরে তিনি বোনকে বললেন : আচ্ছা, এই মাত্র তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও এবং পড়ে শোনাও যার আওয়াজ আমি ঘরে ঢুকবার সময় শুনতে পাচ্ছিলাম। উমর (রা)-এর কণ্ঠ অনেকটা শান্ত দেখে বোন আরো সাহসী হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন : এ পবিত্র কিতাব পড়তে হলে প্রথমে তোমাকে গোসল করতে হবে। উমর (রা) তৎক্ষণাৎ গোসল করলেন। গোসল সেরেই কুরআন শরীফের আয়াতগুলো যে পৃষ্ঠাগুলোতে লিখিত ছিলো তা' পড়তে লাগলেন। মাত্র কয়েকটি আয়াত পড়তে না পড়তেই মনের অজান্তে বলে উঠলেন : কী মধুর বাণী ! এ বাণী আমার অন্তরে রেখাপাত করছে।

হযরত খাব্বাব (রা) ভেতরে লুকিয়েছিলেন। একথা শোনা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এসে বলে উঠলেন : হে উমর (রা) ! মুবারক হো। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'আ তোমার পক্ষেই কবূল হলো দেখছি। আমি কালই হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে দু'আ করতে শুনেছি, "হে আল্লাহ ! উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবূ জাহেল এ দু'জনের একজনকে তুমি মুসলমান বানিয়ে দাও ! তারপর হযরত খাব্বাব (রা) সূরা ত্বা-হার প্রথম রূকূ তিলাওয়াত করে শোনালেন। হযরত উমর (রা) সূরা ত্বা-হার এ তিলাওয়াত শুনতে শুনতে অঝোরধারায় কাঁদছিলেন। তিনি হযরত খাব্বাব (রা)-কে বললেন : আমাকে এক্ষুণি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চলো ! সত্যি সত্যিই তিনি তাঁকে নিয়ে দারে আরকামের দিকে রওয়ানা হলেন। তখনো কোষমুক্ত তলোয়ারখানা তাঁর হাতে ছিলো। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি সে তলোয়ারখানা নিয়ে বোনের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন সে উদ্দেশ্য আর এখন ছিলো না।

আরকামের বাড়ীতে পৌঁছে হযরত উমর (রা) দরজায় করাঘাত করলেন। উমরের হাতে কোষমুক্ত তলোয়ার দেখে সাহাবায়ে কিরাম প্রথমে দরজা খুলতে দ্বিধাবোধ করেন এবং হুযূর (সা)-কে জানান যে, উমর (রা) খোলা তলোয়ার হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। হুযূর (সা) বললেন : দরজা খুলে দাও ! হযরত হামযা (রা)-ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আসতে দাও। সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকলে তো ভাল, নতুবা তারই তলোয়ারে তার শির উড়িয়ে দেবো।

দরজা খুলে দেয়া হলো। হযরত উমর (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করতেই হযরত মুহাম্মদ (সা) অগ্রসর হয়ে তাঁর জামার এক প্রান্ত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বললেন : কী হে উমর ! আর কতদিন বিরোধিতা করে চলবে? তুমি কি এখনো বিরত হবে না? জবাবে হযরত উমর (রা) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! ঈমান আনার জন্যেই আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি ! একথা শুনতেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে হযরত (সা) উচ্চকণ্ঠে

"আল্লাহু আকবার" বললেন। অমনি দারে আরকামে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণও গগনবিদারী কণ্ঠে সমবেতভাবে আল্লাহু আকবর উচ্চারণে মক্কার পাহাড়-পর্বত প্রকম্পিত করে তুললেন।

হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের শক্তি অনেক গুণে বৃদ্ধি পেলো। হযরত উমর (রা) মুসলমান হয়েই সোজা আবূ জাহেলের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দরজায় করাঘাত করলেন। সে বের হয়েই আহলান ওয়া সাহ্লান এবং মারহাবা বলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলো। হযরত উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল বলে মেনে নিয়েছি। কথাটি শুনেই আবূ জাহেল রাগান্বিত হয়ে অন্দরে চলে গেলো। হযরত উমর (রা)-ও ফিরে আসলেন। তাঁর ইচ্ছেই ছিলো ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রুকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে আসবেন।

হযরত উমর (রা) মুসলমান হয়েই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিবেদন করলেন : আমাদের এখন আর গোপনে ঘরে সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্যে খানায়ে কা'বাতেই আমাদের সালাত আদায় করা উচিত। সত্যি সত্যি তাই করা হলো। প্রথম প্রথম কুরায়শদের পক্ষ হয়ে যারাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো হযরত উমর (রা) তাদের মুকাবিলা করতেন। শেষ পর্যন্ত সকল বাধাই অপসারিত হলো এবং মুসলমানগণ বিনা বাধায় সেখানে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইসলাম এখন মক্কায় প্রকাশ্যে পালিত হতে লাগলো। এটা হচ্ছে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষের শেষ মাসের কথা। হযরত উমর (রা)-এর বয়স তখন ছিল ৩৪ বছর। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের সময় মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশে। আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুসলমান এর বাইরে ছিলেন।

বয়কট

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে কুরায়শরা দারুণ আঘাত পেলো। এদিকে মুসলমানরা প্রকাশ্যে খানায়ে কা'বায় সালাত আদায় করতে লাগলেন। অনেক মুসলমান নাজাশীর দেশে চলে গিয়েছিলেন যাদের উপর কুরায়শের কোন জারিজুরিই চলতো না। হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর বর্তমানে মক্কার মুসলমানদের গায়েও নির্বিবাদে হাত দেয়ার সাধ্য ছিলো না। এ অবস্থা দেখে নবুওয়াতের সপ্তম বছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ মুহাররম মাসে কুরায়শরা একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি যে একটা সংকটরূপে দেখা দিয়েছে তাও মজলিসকে অবহিত করা হলো এবং সে সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও সলা-পরামর্শ করা হলো। অবশেষে সকলে একমত হলো যে বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের সকলেই যদিও মুসলমান হয়নি, তবু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ সমর্থন ও পাশে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকবে না। তাই প্রথমে আবূ তালিবকে বলা হোক যে, আপনি আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা)-এর পাশ থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন! যদি তিনি তাতে সম্মত না হন, তাহলে বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের সাথে বিয়ে-শাদী, মেলামেশা, সালাম-কালাম সব বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের কাছে কোন বস্তু বেচাকেনা করা বা তাদের কাছে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য পৌঁছতে দেয়া চলবে না। যতদিন পর্যন্ত তারা মুহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে না দেবে ততদিন পর্যন্ত এ প্রাণান্তকর বয়কট চলতেই থাকবে।

এ বয়কট সম্পর্কে একটা চুক্তিনামাও লেখা হলো। কুরায়শ সরদারদের সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাতে সই করলো। সইকৃত চুক্তিপত্র খানায়ে কা'বায় ঝুলিয়ে রাখা হলো। আবূ তালিব বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের সবাইকে নিয়ে মক্কার অদূরবর্তী এ গিরিসংকটে স্বেচ্ছাবন্দী হলেন। ইতিমধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, তারাও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। বনূ হাশিমের একটি মাত্র লোক এর ব্যতিক্রম ছিল, সে হচ্ছে আবূ লাহাব। সে কুরায়শদের পক্ষে ছিল। বনূ হাশিম যে খাদ্যদ্রব্যাদি সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন তা অল্প কয়েক দিনেই নিঃশেষিত হলো। দারুণ খাদ্যাভাবে তাঁদের ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। গিরি-সংকট থেকে বেরোনোর একটি মাত্র সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল। কারো বাইরে যাওয়ার সাধ্য ছিলো না।

বনী হাশিমের লোকজন ও মক্কার মুসলমানগণ দীর্ঘ তিন বছর ভীষণ কষ্টে অতিবাহিত করেন। শি'বে আবী তালিব নামক উক্ত গিরিসংকটে তাঁরা সে সময় যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেন তা কল্পনা করতেও গা' শিউরে ওঠে। কেবল হজ্জের মওসুমে এ অবরুদ্ধ লোকগুলো বাইরে আসতে পারতেন। আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ঐ সময়টিতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করতো। কেউ কারো সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না। ঐ সুযোগে তাঁরা নিজেদের আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে সঞ্চয় করে নিতেন। ঐ সুযোগে হুযূর (সা) বাইরে বের হতেন এবং বহিরাগত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন। কিন্তু কুরায়শরাও তাঁর সাথে সাথে লেগে থাকতো এবং যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই লোকদেরকে তাঁর কথা শোনা থেকে বারণ করতো। তারা তাঁকে পাগল ও যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে তাঁর দিকে কাউকে মনোযোগী হতে দিতো না। শি'বে আবূ তালিবের তিন বছর ব্যাপী নির্যাতনের কথাটি চিন্তা করলে এ কথাটি বোধগম্য হয় যে, গোত্রীয় টান ও বংশের নৈকট্যানুভূতিও এমনি একটি শক্তি যে বনূ হাশিমের লোকেরা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও শুধু এ টানের জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সমর্থন ও সাহায্য করতে এতদূর কষ্ট বরণ করতে বাধ্য করেছিল। অপর দিকে গিরিসংকটে ঐ বন্দিত্বের সময়টাতে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অতি নিকট থেকে অবলোকনের এবং তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দর্শনে প্রভাবান্বিত ও ইসলামকে জানার সুযোগ পায়। এ বংশগত আভিজাত্যবোধ এভাবে তাঁদেরকে (বনূ হাশিমকে) সঙ্গতভাবেই সম্মানের যোগ্য করে তোলে। তিন বছরের এ নিবর্তনমূলক বন্দিত্ব এবং বনূ হাশিমের দুঃখকষ্ট অবশেষে কুরায়শদের কোন কোন ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

বনী হাশিমের ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছটফট করা এবং ক্ষুধার্ত পিতামাতার সম্মুখে তাদের কচি সন্তানদের আর্ত চীৎকার সেই অসহনীয় অবস্থা মক্কার কুরায়শরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতো। যুবায়র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা বনী হাশিমের এ যাতনা এজন্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করল যে, আবূ তালিব ছিলেন তাঁর মামুজান। যুবায়র প্রথমে মুত'ঈম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন আবদে মানাফকে আত্মীয়তা বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ চুক্তি ভঙ্গের জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর আবুল বুখতরী ইব্‌ন হিশাম এবং যুমআ ইব্‌ন আসওয়াতকে তিনি তাঁর সমর্থক বানান। মোটকথা, বনী হাশিমের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ কয়েক ব্যক্তি বনী হাশিমের ভোগান্তির কথা উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে বলাবলি শুরু করেন। এমনি একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ তালিবকে বললেন, আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়েছে যে, ঐ চুক্তিপত্রে লেখাগুলো পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবল যেখানে

যেখানে আল্লাহ্‌র নাম আছে, সে স্থানগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে। আল্লাহ্ নাম ছাড়া বাকী সমস্ত অক্ষর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একথা শুনে আবূ তালিব ঘাঁটি থেকে বেরোলেন এবং কুরায়শদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে তো মুহাম্মদ (সা) এরূপ অবহিত করেছেন তোমরা চুক্তিপত্র পরীক্ষা করে দেখো। যদি তাঁর দেয়া সংবাদ যথার্থ হয়ে থাকে, এবং সত্যি সত্যি চুক্তিপত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে থাকে তবে এ বয়কটের অবসান হওয়া উচিত। তাঁর কথা শুনে কুরায়শরা তৎক্ষণাৎ খানায়ে কা'বায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং লক্ষ্য করলো যে, সত্যি সত্যি পোকায় চুক্তিপত্রটি খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে, কেবল আল্লাহ্ শব্দটি যেখানে যেখানে লিখিত ছিল তা'ই অক্ষত রয়েছে। তাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না এবং তৎক্ষণাৎ তারা বয়কট অবসানের কথা ঘোষণা করে দিল। বনী হাশিম এবং মুসলমানরা দীর্ঘ তিন বছর বেরিয়ে এসে মক্কায় নিজ নিজ ঘরে পুনরায় বসবাস শুরু করেন। শি'বে আবূ তালিবে অধিকাংশ সময়ই মুসলমানদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে গাছের পাতা খেতে হতো। কারো কারো অবস্থা এমন সংগীন হয়ে উঠে যে, কোথাও একটু শুকনো চামড়া পাওয়া গেলে তাই ধুয়ে একটু নরম করে আগুনে সিদ্ধ করে চিবুতেন। হাকীম ইব্‌ন হিযাম মাঝে মাঝে নিজ গোলামকে দিয়ে আপন ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-এর জন্যে গোপনে খাদ্য পাঠাতেন। একবার আবূ জাহেল তা জানতে পেরে গোলামের হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয় এবং কঠোর প্রহরা বসিয়ে দেয়।

শোকবর্ষ : নবুওয়াতের দশম সাল

হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন শি'বে আবূ তালিব থেকে বের হলেন, তখন নবুওয়াতের দশম বর্ষ শুরু হয়ে গেছে। এবার মুসলমানদের সাথে কুরায়শদের ব্যবহার অনেকটা মার্জিত ও নম্র হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না, মুসলমানদের দুঃখকষ্ট এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিপদ পূর্বের তুলনায় আরো বেড়ে গেলো। শীঘ্রই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে, এ বছরটি মুসলমানদের কাছে শোকবর্ষ নামে খ্যাতিলাভ করে। রজব মাসে আবূ তালিব অসুস্থ হয়ে অশীতিপর বয়সে পরলোকগমন করেন। আবূ তালিবের মৃত্যুর সাথে সাথে কাফিরদের সাহস বৃদ্ধি পায়। আবূ তালিবই ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব এবং বনী হাশিমের এমন একজন প্রভাবশালী সরদার যাকে সকলে ভয় করতো এবং সমীহ করে চলতো। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বনী হাশিমের সেই পূর্বের প্রভাব আর মক্কায় বাকী রইলো না। মাঠ খালি পেয়ে কুরায়শরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যদৃচ্ছা অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতে শুরু করলো।

এ বছরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও মক্কায় কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করার ইরাদা করলেন। তিনি মক্কা থেকে বেরিয়েও পড়লেন। মক্কা থেকে চার মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে তিনি বিরকুল গিমাদ নামক স্থানে উপনীত হলেন। কারা কবীলার সরদার ইবনুদ দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ইবনুদ দাগিনা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন! হযরত আবূ বকর (রা) জবাবে বললেন : আমার কওম আমাকে অত্যাচারে এমনি অতিষ্ঠ করে তুলেছে যে, এখন আমি ইরাদা করেছি মক্কার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবো এবং আমার রব-এর ইবাদত করবো। ইবনুদ দাগিনা বললেন : আপনি তো এমনি এক ব্যক্তি যার নিজেরও মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া সমীচীন হবে না আর আপনার স্বজাতিরও আপনাকে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। আমি আপনাকে আমার আশ্রয়ে নিচ্ছি। আপনি ফিরে চলুন এবং মক্কাতে

থেকেই নিজের রব-এর ইবাদত করুন! তাঁর কথায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মক্কায় ফিরে এলেন। ইবনুদ দাগিনা কুরায়শ সরদারদের ডেকে একত্র করে তাদের ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন : তোমরা এমন এক সৎগুণের অধিকারী ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছো যার উপস্থিতি যে কোনো কওমের জন্য গর্বের হেতু হতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) তার বাড়ীর আঙিনায় একটি ছোট চবুতরা মসজিদরূপে বানিয়ে সেখানে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজে মহল্লার মহিলা ও শিশুরা অভিভূত হয়ে যেতো। কুরায়শদের কাছে তাও ছিলো অসহনীয়। ইবনুদ দাগিনা তাঁকে এরূপ করতে বারণ করলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন : আমি তোমার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ই অবলম্বন করছি। তাঁর আশ্রয়ই আমার জন্যে যথেষ্ট। তবুও কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতে পারবো না।

আবূ তালিবের ওফাতের প্রায় দুই মাস পরে নবুওয়াতের দশম বছরে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-ও ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজা (রা)-কে হুযূর (সা) অত্যন্ত ভালবাসতেন। সমস্ত দুঃখ-কষ্টে তিনি ছিলেন হযরত নবী (সা)-এর সহধর্মিণী। সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। সব সময়েই তিনি তাঁকে সাহস যুগিয়েছেন। বিপদে আপদে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এমন দু'জন সঙ্গী ও সহমর্মী ছিলেন যে, তাঁদের মৃত্যু হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ভীষণ শোকার্ত করে তোলে। সাথে সাথে কুরায়শদের অত্যাচার-উৎপীড়নও বৃদ্ধি পায়। একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) পথ অতিক্রম করছিলেন—এমন সময় কোন এক দুরাচার তাঁর উপর কাঁদা নিক্ষেপ করে। তাঁর মাথার চুল, দেহ মুবারক, কাপড়-চোপড় কর্দমাক্ত হয়ে গেলো। এই অবস্থায় ঘরে ফিরলে হযরত ফাতিমা যুহ্‌রা (রা) তা দেখে দৌড়ে পানি নিয়ে আসলেন। তিনি পিতার এই হাল দেখে কেঁদে ফেললেন এবং পানি এনে মাথা ধুয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : কেঁদো না মা! আল্লাহ্‌ই তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন।

একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) খানায়ে কা'বায় গেলেন। সেখানে মুশরিকদের অনেকেই উপবিষ্ট ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দেখে আবূ জাহেল উপহাসের স্বরে বলে উঠলো : হে আবদে মানাফের বংশধররা! দেখো দেখো, তোমাদের নবী এসে গেছেন! উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ বলে উঠলো, কেউ নবী হোক, কেউ ফেরশতা বনে যাক, তাতে আমাদের কি! হযরত মুহাম্মদ (সা) উতবাকে সম্বোধন করে বললেন : তুমি কোনো দিনই আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ সমর্থন করোনি। নিজের জেদ নিয়েই অটল রয়েছো। এরপর আবূ জাহেলকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার জন্যে সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন তুমি হাসবে অল্পই, কাঁদবে অনেক বেশী। তারপর উপস্থিত মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : সেদিন বেশী দূরে নয় যখন তোমরা এ দীনের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে, যে দীনকে আজ তোমরা অস্বীকার করছ।

তায়িফ সফর

কুরায়শদের জেদ ক্রমেই বেড়ে চললো। শি'বে আবূ তালিবের বন্দিত্বের জীবনেই হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন হজ্জের মওসুমে বেরিয়ে আসতেন, তখন মক্কায় আগত বাইরের তীর্থ যাত্রীদের কাছে ইসলামের তাবলীগ শুরু করে দিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সে প্রচারকার্যে

তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। এখন মক্কাবাসীদের ইসলামের প্রতি সীমাহীন বিরাগভাব লক্ষ্য করে তিনি তায়িফবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে মনস্থ করেন।

তায়িফ ছিলো মক্কা থেকে তিন মন্‌যিল অর্থাৎ ষাট মাইল দূরবর্তী মক্কার মতোই বড় শহর। ছাকীফ গোত্র সেখানে বাস করতো। ওরা ছিলো লাতের পূজারী। সেখানে লাতের মন্দির ছিলো। গোটা শহরের লোক ছিলো সে মন্দিরের ভক্ত পূজারী। নবুওয়াতের দশম বছর শওয়াল মাসে অর্থাৎ হযরত খাদীজা (সা)-এর ইন্তিকালের এক মাস পরে হযরত মুহাম্মদ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়িফ গিয়ে উপনীত হন। সেখানে পৌঁছবার পূর্বে রাস্তায় তিনি ইব্‌ন বকর কবীলায় গিয়ে উঠেন। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এরাও মক্কাবাসীদের সমধর্মী ও সহমর্মী তখন তিনি কাহ্‌তান বংশীয়দের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন যে, এরাও নিষ্ঠুরতার কোন অংশে মক্কাবাসীদের চাইতে কম না তখন তিনি তায়িফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তায়িফে পৌঁছে সর্বপ্রথম তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তায়িফের সরদারদের মধ্যে আবদে ইয়ালীল ইব্‌ন উমর এবং তার দুই ভাই মাসউদ ও হাবীব বনী ছাকীফের নেতৃস্থানীয় সরদার ও সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বপ্রথম এদের সাথে দেখা করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এরা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক ও অহংকারী। তাদের একজন বললো : আল্লাহ্ যদি তোমাকে নবীই বানাতেন, তবে কি আর এমন করে জুতা চটর চটর করে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে ? দ্বিতীয় জন বলল : আল্লাহ্ বুঝি তোমাকে ছাড়া নবী বানাবার জন্যে আর কোন লোক খুঁজে পেলেন না ? শেষ পর্যন্ত তিনি তোমাকেই নবী বানালেন।

لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ . (٣١ : ٤٣)

তৃতীয় জন বললো : আমি তোমার সাথে বাক্য ব্যয় করতে চাই না। কেননা, তোমার দাবী অনুসারে সত্যিই যদি তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাক তাহলে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা বিপজ্জনক হবে। আর যদি তুমি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে থাক, তবে এমন ব্যক্তির সাথে বাক্যালাপ না করাই শ্রেয়।

তায়িফবাসীদের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ

হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন আবদে ইয়ালীল ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : আচ্ছা, আপনারা আপনাদের এ চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন, অন্যদেরকে আর এসব কথা বলবেন না। সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তিনি তায়িফের অন্যান্য লোকের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু আবদে ইয়ালীল ও তার ভাইয়েরা নিজেদের গোলামদেরকে এবং শহরের ছেলে-পিলে ও গুণ্ডা বদমায়েশদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল। তিনি যেখানেই যেতেন, তারাও পিছু পিছু গালি দিতে দিতে এবং ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলতে লাগলো। তাঁর বিশ্বস্ত খাদিম যায়দ ইব্‌ন হারিছ (রা) তাঁর সাথে সাথে চলছিলেন এবং তাঁকে দুরাচারদের ঢিল ও আক্রমণ থেকে হিফাযত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাথর ও ঢিলের আঘাতে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও যায়দ উভয়েই রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের তায়িফে অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠলো। অগত্যা তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন।

তায়িফের গুণ্ডা-বাদমায়েশেরা দল বেঁধে পাথর আর ঢিল নিক্ষেপ করতে করতে তাঁদের পিছু পিছু ছুটে চলেছিলো। তাঁরা যখন তায়িফের সীমা পেরিয়ে বের হয়ে গেলেন তখনো তারা তাঁদের পিছন ছাড়ছিল না। দীর্ঘ তিন মাইল পর্যন্ত তারা তাঁদের পিছু পিছু ছুটতে থাকে। তাঁর পদযুগল তাঁদের পাথরের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল। আহত পদযুগল থেকে প্রবাহিত রক্তে জুতা পর্যন্ত ভরে উঠলো। এরূপভাবে সারা দেহই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠেছিলো। তিনি নিজে বলেন : আমি তায়িফ থেকে তিন মাইল দূর চলে আসি। তখনো আমার হুঁশ ছিল না যে, কোথা থেকে আসছি আর কোথায় যাচ্ছি! তায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার জনৈক সরদার উতবা ইব্‌ন রবীআর একটি বাগান ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন। তায়িফের গুণ্ডা-বদমায়েশেরা তখন তায়িফে ফিরে চললো। তিনি তখন উক্ত বাগানের দেয়ালের ছায়ায় বসলেন এবং নিজের অসহায় অবস্থার জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে ফরিয়াদ জানালেন :

"ইলাহী, অসহায় ও দুর্বলদের তুমিই হিফাযতকারী
আমি তোমারই দরবারে মদদ কামনা করছি।"

উতবা ইব্‌ন রবীআ তখন বাগানে উপস্থিত ছিলো। সে তাঁকে এ অবস্থায় দূর থেকে দেখতে পেলো। আরবের আভিজাত্যবোধ ও অতিথিপরায়ণতা তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। একটি রেকাবীতে আঙুরের কয়েকটি থোকা রেখে সে তার গোলাম আদ্দাসের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলো। গোলামটি ছিলো নিনোভার অধিবাসী একজন খ্রিস্টান। হযরত মুহাম্মদ (সা) আঙুর খেতে খেতে গোলামটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। গোলাম আদ্দাসের অন্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা দাগ কাটলো। সে মাথা নিচু করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দান্ত মুবারকে চুমু খেলো। উতবা দূর থেকে গোলামের এ চুমু খাওয়ার দৃশ্যটি লক্ষ্য করলো। আদ্দাস ফিরে গেলে উত্‌বা তাকে বললো, সাবধান! ঐ লোকটির কথায় কান দিও না; তার চেয়ে তো তোমার ধর্মই উত্তম। হযরত মুহাম্মদ (সা) কিছুক্ষণ উতবার বাগানে বিশ্রাম নিলেন। তারপর সেখান থেকে চলে গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে নাখলা নামক স্থানে এক খেজুর বাগানে এসে উপনীত হলেন। সেখানে জিন সরদাররা তাঁকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে শুনে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে।

মক্কায় প্রত্যাবর্তন

নাখলা থেকে রওনা হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) হেরা পর্বতে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করে কুরায়শ সরদারদের কারো কারো কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তারা যেনো তাঁকে তাদের জামানতে বা আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু কেউই তাতে সম্মত হলো না। মুত'ঈম ইব্‌ন আদীর কাছে যখন তাঁর পয়গাম পৌঁছলো তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি মুশরিক ও কাফির হওয়া সত্ত্বেও তার আরবী আভিজাত্য এবং গোত্রীয় টান তাঁর মধ্যে এমনিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা হেরা পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং হযরত নবী (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। মুত'ঈমের পুত্র তখন উন্মুক্ত তরবারি হাতে খানায়ে কা'বার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলেন। তারপর মুত'ঈম এবং তাঁর পুত্রগণ উন্মুক্ত তরবারির প্রহরায় তাঁকে নিরাপদে

বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলেন। কুরায়শরা মুত'ঈমকে জিজ্ঞেস করলো : মুহাম্মদের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? মুত'ঈম জবাব দিলেন : সম্পর্ক কিছুই নেই, তবে আমি তাঁর একজন সমর্থক। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার আশ্রয়ে আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। মুত'ঈমের এ দৃঢ় সমর্থন ও নির্ভীক আচরণে কুরায়শরা অনেকটা স্তব্ধ হয়ে গেলো।

একটি রিওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন তায়িফে কাফির-মুশরিকদের কংকর আঘাতে জর্জরিত তখন জনৈক ফেরেশতা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন যে, যদি আপনি নির্দেশ দেন তবে আমি পাহাড় উত্তোলন করে তায়িফবাসীদের উপর নিক্ষেপ করবো। তাতে তারা পিষে মরবে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) জবাবে বলেন : না, তা কখনো হতে পারে না। আমি আশা করি, এরা যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে, তবে এদের সন্তানরা অবশ্যই ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করবে। তাদের পরবর্তী গোটা প্রজন্ম ইসলাম গ্রহণ করবে। আমি তাদের ধ্বংস কামনা করি না।

হযরত আয়িশা (রা)-এর সাথে শাদী মুবারক : মি'রাজ

এ বছরই অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বর্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আয়িশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত সাওদা বিন্ত যামআ (রা)-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ বছরই তিনি মি'রাজে গমন করেন। মি'রাজ সম্পর্কে তাবারীর অভিমত হচ্ছে তা' ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রথম বর্ষের ঘটনা, যখন নামায ফরয হয়েছিল। ইব্ন হাযমের মতে, তা দশম হিজরীর ঘটনা।

কোনো কোনো রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মি'রাজ মদীনায় হিজরতের পরে ঘটেছিল। যেভাবে বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে কোন কোন আলেমের ধারণা যে তা' একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে তেমনিভাবে মি'রাজ সম্পর্কেও কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা যে, তাও একাধিকবার হয়েছে। মোটকথা, এ বিতর্কের স্থান এটা নয়। এজন্যে স্বতন্ত্র পুস্তক এবং তাফসীর ও হাদীসের কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম প্রচার

মক্কাবাসীদের প্রতি নিরাশ হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) তায়িফ গমন করেছিলেন। সেখানকার লোক মক্কাবাসীদের চাইতেও জঘন্যতর আচরণ করলো। মক্কাবাসীদের ঘৃণ্য ও জিদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহস হারালেন না। তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মক্কার আশেপাশে বসবাসরত গোত্রসমূহের কাছে যেতে এবং তাদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সে অনুসারে বনূ কিন্দা ও বনূ আবদুল্লাহ গোত্রদ্বয়ের আবাসস্থলেও তিনি গমন করেন। বনূ আবদুল্লাহ্ গোত্রকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন : হে বনূ আবদুল্লাহ গোত্রের লোকজন! তোমাদের আদি পুরুষ ছিলেন আবদুল্লাহ, আল্লাহ্র দাস। সুতরাং তোমরাও সত্যিকারের আল্লাহ্র দাস হয়ে যাও! বনী হানাফিয়ার আবাসভূমিতেও তিনি গমন করেন। কিন্তু সে জালিমরা গোটা আরবের মধ্যে তাঁর সাথে সবচাইতে জঘন্য ও নিষ্ঠুর পন্থায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

বাইরে থেকে যেসব পথচারী মক্কায় আসতো বা হজ্জের সময় দূর-দূরান্ত থেকে যেসব কাফেলা আসতো হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতেন।

কিন্তু আবূ লাহাব তাঁর বিরোধিতার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতো। এসে সর্বত্র তাঁর পিছু পিছু লেগে থাকতো এবং বহিরাগতদেরকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে বারণ করতো। হযরত নবী করীম (সা) একে একে বনূ আমির, বনূ শায়বান, বনূ কাল্‌ব, বনূ মাহারিব, ফাযারাহ, গাস্‌সান, সুলায়ম, আবাস, হারিছ, আযারা, ফাহল, মুর্‌রা প্রভৃতি গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

যখন তিনি বনূ আমিরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গেলেন তখন তাদের মধ্যকার ফার্‌রাস নামক এক ব্যক্তি বললো : আচ্ছা, আমরা যদি মুসলমান হয়ে যাই আর আপনি দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন, তাহলে আপনি কি আমাকে আপনার খলীফা মনোনীত করে যাবেন ? জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : এটা তো আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছে আমার খলীফা বানাবেন। এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলে উঠলো : বাঃ! এখন তো আমরা আপনার অনুসারী ও সমর্থক হয়ে নিজেদের গলা কাটাবো, আর যখন আপনি কৃতকার্য হয়ে যাবেন, তখন অন্যরা শাসন ক্ষমতার মজা লুটবে! যান, আমাদের আপনার দরকার নেই।

সুয়াইদ ইব্‌ন সামিত

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষ তখন শুরু হয়ে গেছে। মদীনাবাসী আওস গোত্রের জনৈক সুয়াইদ ইব্‌ন সামিত মক্কায় এলো। লোকটি তার স্বগোত্রে কামিল খিতাবে মশহুর ছিলো। ঘটনাচক্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তাঁর মুলাকাত হলো। তিনি লোকটাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বললো, সম্ভবত আমার কাছে যা' আছে আপনার কাছেও তা-ই আছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখন জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কী আছে হে! সে বললে : লুকমানের হিকমত বা জ্ঞানরাশি। তিনি বললেন : আচ্ছা, তা থেকে একটু শোনাও তো দেখি! সে তা পড়ে শোনালে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : এটা ভালো বাণী! কিন্তু আমার কাছে রয়েছে কুরআন মজীদ, এর থেকে উত্তম ও শ্রেয় এবং এটা হচ্ছে হিদায়াত ও নূর। তারপর তিনি তাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শোনালেন। সে তা' শুনে স্বীকার করলো যে, সত্যিই এ হিদায়াত ও নূর। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে যে, সে মুসলমান হয়নি বটে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরোধিতা মোটেই করেনি। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত এক যুদ্ধে সে নিহত হয়।

আয়াস ইব্‌ন মু'আয (রা)

ঐ দিনগুলোতে আনাস ইবন রাফি' তার স্বগোত্রে ইব্‌ন আবদুল আশহালের কতিপয় লেখকসহ মদীনা থেকে মক্কায় আসে। উদ্দেশ্য ইব্‌ন খাযরাজের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সহযোগিতা লাভের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ প্রতিনিধি দল আসার সংবাদ পেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বপ্রথম তাদের কাছে গেলেন। কুরায়শ নেতাদের সাথে তখনো তারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলে সারেননি। তিনি গিয়েই তাদেরকে বললেন : আমার কাছে এমন বস্তু আছে যাতে (তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে) তোমরা রাযী থাকলে আমি তা তোমাদের কাছে তুলে ধরতে পারি। তারা বললো : বেশ তো, আপনি তা উপস্থাপন করুন! তিনি বললেন : মানবজাতির হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি

শির্ক করতে নিষেধ করি এবং কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে থাকি। আমার উপর আল্লাহ তা'আলা কিতাব নাযিল করেছেন। তারপর তিনি একে একে ইসলামের মূলনীতি তাদের সম্মুখে তুলে ধরেন এবং কুরআন শরীফ পড়ে তাদেরকে শোনান। মদীনায় এ প্রতিনিধি দলে আনাস ইব্‌ন রাফির সাথে আয়াস ইব্‌ন মুআয নামক এক যুবকও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা এবং কুরআনের বাণী শুনে তিনি তাঁর স্বগোত্রীয়দেরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! তোমরা মদীনা থেকে যে উদ্দেশ্যে এসেছ আল্লাহ্‌র কসম, তার চাইতে এটাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হয়।" প্রতিনিধি দলের নেতা আনাস ইব্‌ন রাফি' তাঁকে ধমক দিয়ে বলল : ওহে! এ কালাম শোনার জন্যে আমরা এত দূর থেকে এখানে আসিনি। আয়াস তখন চুপ হয়ে গেলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও চুপ করে সেখান থেকে উঠে চলে আসলেন। ফলশ্রুতিতে মদীনার এ প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মক্কা থেকে ফিরে আসে। কুরায়শ এবং তাদের মধ্যে আর কোন চুক্তিই হলো না। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছু দিন পরই হযরত আয়াস ইব্‌ন মুআয (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর ঈমান আনয়ন ও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দেন।

যিমাদ ইযদী (রা)

যিমাদ ইযদী ছিলেন আরবের মশহুর যাদুকর। তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তিনি একবার মক্কায় আসলেন। তিনি কুরায়শদের কাছে শুনতে পান যে, মুহাম্মদ (সা)-এর উপর জিন ভূতের আছর আছে। তিনি বলে উঠলেন : আমি আমার মন্ত্র প্রয়োগে এক্ষুণি তাঁর চিকিৎসা করে দিচ্ছি। সত্যি সত্যি ঐ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে আমার মন্ত্র শোনাচ্ছি। হযরত নবী করীম (সা) বললেন : প্রথমে আমারটা শুনে নাও, তারপর তোমার মন্ত্র শুনিয়ো। তারপর তিনি তাঁর খুতবার ভূমিকা অংশ এভাবে শুরু করলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُوْا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

এতটুকু উচ্চারণ করতেই যিমাদ চীৎকার করে বলে উঠলো : আচ্ছা, এ কথাগুলো আবার বলুন তো! পুনঃ পুনঃ কয়েকবার তিনি এ বাক্যগুলো তাঁর মুখে উচ্চারণ করিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন : আমি অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর ও কবিকে দেখেছি এবং তাদের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু এমন ব্যাপক অর্থবোধক অলংকারসমৃদ্ধ কথা আমি কারো মুখে কোনো দিন শুনিনি। তারপর তিনি বললেন : আপনি হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে মুসলমান হচ্ছি এবং ইসলামের জন্যে বায়'আত হচ্ছি।

তুফায়ল ইব্‌ন আমর দুওসী (রা)

ইয়ামানে দুওস কবীলার বাস ছিলো। সেই কবীলার সরদার তুফায়ল ইব্‌ন আমর ইয়ামানের বিখ্যাত রঈসদের অন্যতমরূপে গণ্য হতেন। তুফায়ল তাঁর জ্ঞানবত্তা ছাড়াও একজন বড় কবি ছিলেন। ঐ বছর অর্থাৎ একাদশ নববী বর্ষে তিনি ঘটনাক্রমে মক্কায় আগমন করেন। তুফায়ল

ইব্‌ন আমরের আগমন সংবাদে মক্কার সরদারগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মক্কার বাইরে এগিয়ে যায়–এবং অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা দ্বারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তারা তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসে। কুরায়শদের ভয় ছিল পাছে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তুফায়লের সাক্ষাৎ না হয়ে যায় আর তিনি তাঁর উপর তার যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে না বসেন। তাই তুফায়লের মক্কা প্রবেশের সাথে সাথে তুফায়লকে বলে যে, আমাদের এ মক্কায় আজকাল এমন এক যাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে–যে গোটা শহরকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তার কুপ্রভাবে পিতা তার পুত্র থেকে, পুত্র তার পিতা থেকে, ভাই তার ভাই থেকে, স্বামী তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আপনি যেহেতু আমাদের সম্মানিত অতিথি, তাই এর ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন এবং এ যাদুকরের অর্থাৎ মুহাম্মদের মুখ থেকে কোন কথা শুনবেন না। কুরায়শদের বার বার সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনে তুফায়ল এতই ভীত হলো যে, তিনি তাঁর দুই কানে তুলা ঠেসে দিলেন–যাতে কোনক্রমেই ঐ যাদুকরের কথা তার কর্ণমূলে প্রবেশ করতে না পারে।

একদিন ভোরবেলা তুফায়ল স্বীয় কানে তুলো দিয়ে খানায়ে কা'বায় প্রবেশ করলেন। হযরত নবী করীম (সা) তখন সেখানে ফজরের নামায পড়ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নামাযের নিয়ম পদ্ধতি চোখে দেখে তুফায়লের কাছে ভালই ঠেকলো। তিনি তাঁর আরো নিকটবর্তী হলেন। সেখানে তাঁর কিরাতের ধ্বনি অল্প অল্প তাঁর কানে ঢুকছিলো। তারপর তুফায়ল ভাবলেন, আচ্ছা, আমি নিজেও তো একজন কবি মানুষ। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক আছে। ঐ ব্যক্তির কথা ভাল হলে মেনে নেবো, মন্দ হলে প্রত্যাখ্যান করবো। একথা মনে আসতেই তিনি কান থেকে তুলো খুলে ফেলে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) নামায শেষে যখন ঘরের দিকে পা বাড়ালেন তখন তুফায়লও পিছে পিছে তাঁর সাথে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে তাঁর বাণী শোনাবার আবেদন জানালেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে শোনালেন। সাথে সাথে তুফায়ল ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করুন, আমার মাধ্যমে যেন আমার গোটা গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন। তুফায়ল মক্কা থেকে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর গোত্রের লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তুফায়ল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন যে, মক্কাবাসীরা আপনাকে জ্বালাতন করে। আপনি হিজরত করে আমাদের ওখানে চলুন। জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিজরত করার আদেশ দিবেন, তখনই আমি হিজরত করবো। তিনি যেখানে হিজরত করার নির্দেশ দেবেন, সেখানেই আমি হিজরত করবো।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)

হযরত আবূ যর (রা) ছিলেন গিফার গোত্রের লোক। তিনি মদীনার (ইয়াছরিবের) উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খবর সুয়িদ ইব্‌ন সামিত ও আয়াস ইব্‌ন মুআযের মাধ্যমে পৌঁছে এবং এরকম একটা উড়ো খবর হযরত আবূ যরের কান পর্যন্ত পৌঁছে। সাথে সাথে তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্যে তাঁর কবি ভাই আনিসকে মক্কায় পাঠালেন। আনিস মক্কায় গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মদীনায় ফিরে তিনি ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এমন এক ব্যক্তি যিনি

সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজের বারণ করেন। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আবূ যরের মন ভরলো না। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে মদীনা থেকে মক্কায় গেলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ খানায় কা'বায় উপস্থিত হয়ে কুরায়শের সম্মুখে প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পাঠ করেন এবং ততক্ষণে যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত রপ্ত করেছিলেন তা তিলাওয়াত করে সবাইকে শোনালেন। কুরায়শরা মার মার রবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কুরায়শদের বেদম প্রহারে তিনি চৈতন্য হারালেন। হযরত আব্বাস তখনো কুরায়শদের দলে ছিলেন। তিনি তখনো মুসলমান হননি। তিনি এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। কাণ্ড দেখে তিনি চীৎকার করে বললেন : সর্বনাশ, এ কী কাণ্ড ! এ যে গিফারী গোত্রের লোক, যেখান থেকে তোমরা খেজুর ক্রয় করে এনে থাক ! একথা শোনা মাত্র লোকজন কেটে পড়লো। চৈতন্য ফিরতেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে ছুটে এলেন। পরদিন আবার তিনি পূর্বদিনের মতো প্রকাশ্যে এবং উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পাঠ করলেন। আবার কুরায়শরা তাঁকে প্রহার করলো। এভাবে মক্কায় ইসলামের ঘোষণা দিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইয়াছরিবের সৌভাগ্যবান ছয়জন

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শেষ মাসের কথা। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার সেই বিখ্যাত লড়াই যার প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্ত বনী আশহাল গোত্রের প্রতিনিধিদল মক্কায় এসেছিলো- যা ইতিহাসে বুআছ যুদ্ধ নামে খ্যাত এবং যাতে গোত্রদ্বয়ের বড় বড় সর্দাররা নিহত হয়েছিল- তখন তা' শেষ হয়েছে। কা'বা ঘরে হজ্জের জন্যে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক আসা তখন শুরু হয়ে গেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) ঐ সব কাফেলার কাছে গিয়ে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আবূ জাহেল, আবূ লাহাবরা-তাঁর পিছু পিছু গিয়ে বহিরাগতদেরকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে মানা করতো। দুষ্টদের এ দুষ্টামী থেকে বাঁচবার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) অধিকাংশ সময় রাতের অন্ধকারে দুই তিন মাইল পায়ে হেঁটে বহিরাগতদের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছতেন। তিনি তাদের কাছে বসতেন। মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনা করে তাদেরকে বোঝাতেন এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের পানে তাদেরকে আহবান জানাতেন। এভাবে এক রাতে মক্কায় কয়েক মাইল দূরবর্তী আকাবা স্থানে তিনি কয়েকজন তীর্থযাত্রীকে আলাপ করতে শুনতে পেলেন। তিনি তাদের নিকটবর্তী হলেন। লক্ষ্য করলেন তারা ছয়জন। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলেন যে, এরা ইয়াছরিব থেকে হজ্জ করতে এসেছেন। এরা খাযরাজ বংশের লোক। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কুরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। তারা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঈমান আনয়ন করলেন। ইয়াছরিববাসীরা তখন প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগ ছিল ইয়াহূদী, অন্যভাগে মূর্তিপূজারী মুশরিকরা। এ মুশরিকদের মধ্যে আওস ও খাযরাজ কবীলা দু'টি ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও মশহুর কবীলা।

এরা ইয়াহূদীদের মুখে শুনে আসছিলেন যে, একজন মহান নবীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। তিনি সকলের উপর বিজয়ী হবেন। কথাগুলো যেহেতু আগে থেকেই তারা শুনে আসছিলেন তাই তাঁকে নবীরূপে বরণ করতে তাঁরা আর দেরী করলেন না। সকলের আগে ভাগেই তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ ছ'জনের নাম হলো :

১. আবূ উমামা আসআদ ইব্‌ন যুরারা–(ইনি ছিলেন বনী নাজ্জারের লোক এবং ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়ও ছিলেন। এদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।)
২. আওফ ইব্‌ন হারিছ
৩. রাফি ইব্‌ন মালিক
৪. কুতবা ইব্‌ন 'আমির
৫. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্
৬. উকবা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন নাবী

হযরত মুহাম্মদ (সা) উক্ত ছ'জনের মধ্যে রাফি ইব্‌ন মালিককে ঐ পর্যন্ত নাযিলকৃত আয়াতসমূহের একটি লিখিত কপি প্রদান করলেন। ঐ ছোট্ট কাফেলাটি মুসলমান হয়ে ওখান থেকেই মদীনায় ফিরে গেলো। যাবার সময় তারা ওয়াদা করে যায় যে, নিজেদের গোত্রে গিয়ে তাঁরা ইসলাম প্রচার করবেন। সত্যি সত্যি মদীনায় ফিরেই তাঁরা ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করে দিলেন। মদীনার অলি-গলি ইসলামের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো।

আকাবার প্রথম বায়'আত

মক্কার নবুওয়াতের একাদশ বর্ষ অতিবাহিত হলো। দ্বাদশতম বর্ষটিও দেখতে দেখতে এমনিভাবে কেটে গেলো। কুরায়শদের বিরোধিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বছরটি কেটে গেলো। কেননা, মদীনায় ঐ ছ'জন ভক্ত মুসলমানের কথা বার বার তাঁর মানসপটে উঁকি দিচ্ছিল যাঁরা তাঁর কাছে স্বদেশে ইসলামের তাবলীগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। সুদূর মদীনায় দীর্ঘ এক বছর কালের মধ্যে সে প্রচার কাজের কি প্রতিক্রিয়া হলো তা' তিনি জানতেই পারলেন না। অবশেষে দ্বাদশতম নববী বর্ষের শেষ মাসে অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসে তিনি মিনার নিকটবর্তী উক্ত আকাবা নামক স্থানে গিয়ে ইয়াছরিব কাফেলার খোঁজ করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সত্যি সত্যি তিনি তাঁর সেই ভক্তদের দেখা পেলেন যারা গত বছর তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দেখতে পেলেন এবং সাগ্রহে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বারজন। গতবছরের সেই ছয়জনের অতিরিক্তরা এবার নতুন এসেছেন। এরা আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোক। ঐ বারজনের নাম হলো :

১. আবূ উমামা
২. আওস ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন রিফাআ
৩. রাফি ইব্‌ন মালিক ইবনুল আজলান
৪. কুতবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদবা
৫. উকবা ইব্‌ন আমির
৬. মুআয ইবনুল হারিছ
৭. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ
৮. খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক
৯. ইবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স

১০. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন ফাযালা (উক্ত দশজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের)
১১. আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (ইনি ছিলেন বনূ আবদে আশহাল গোত্রের)
১২. উয়িম ইব্‌ন সায়িদা (শেষোক্ত দু'জন আওস গোত্রভুক্ত ছিলেন)।

উক্ত বারোজন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়'আত হন। এটা যেন ছিলো আকাবার প্রথম বায়'আতের ছয়জনের দাওয়াতের ফসল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে এরা তাদের সাথে একজন কারী বা মুবাল্লিগ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। তিনি হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি মদীনায় গিয়ে আস'আদ ইব্‌ন যুরারার ঘরে অবস্থান করেন এবং ঐ বাড়ীটিতেই ইসলাম প্রচারের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন।

আকাবার প্রথম বায়'আতের সময় মুহাম্মদ (সা) যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ :

১. আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবো না।
২. আমরা চুরি-ব্যভিচারের কাছেও যাবো না।
৩. নিজেদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করবো না।
৪. কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেবো না।
৫. চোগলখুরি করবো না।
৬. সৎ কাজে নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য করবো।

মদীনায় মুসআব ইব্‌ন উমায়রের সাফল্য

মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) মদীনায় পৌঁছে অত্যন্ত উদ্যম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়ায় মদীনাবাসীদের সৌভাগ্য সূর্য উদিত হলো। তাই তারা দলে দলে গোত্রে গোত্রে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। মদীনায় আওস গোত্রের শাখা গোত্রসমূহের মধ্যে বনূ যুফার অত্যন্ত মশহুর ও শক্তিশালী গোত্র ছিল। সা'দ ইব্‌ন মুআয বনূ আবদে আশহাল কবীলার সরদার হওয়ার সাথে সাথে সকল গোত্রের মধ্যে প্রধান সর্দার বলে গণ্য হতেন। বুআছ যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর আওস গোত্রসমূহের মধ্যে যিনি সর্বাধিক গণ্যমান্য বলে বিবেচিত হতেন তিনি হলেন আসআদ ইব্‌ন যুরারা—যার বাড়ীতে মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন সাআদ ইব্‌ন মুআযের খালাতো ভাই।

একদিন মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) ও আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা) বনী আবদে আশহালের মহল্লায় কূপের পাশে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সাআদ ইব্‌ন মুআয তার মহল্লায় তাঁদের আগমন ও ইসলাম প্রচার পসন্দ করতেন না। সা'দ উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রকে ডেকে বললো, আমার খালাতো ভাই বলে আমি একটু সতর্কতা অবলম্বন করছি, তুমি গিয়ে কঠোর ভাবে বলে দাও ওরা যেন আর কখনো আমাদের মহল্লায় না আসে। ওরা আমাদের লোককে পথভ্রষ্ট করে বিধর্মী বানাতে আসে। তার কথামত উসায়দ তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে আসআদ ও মুসআবের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন এবং তাঁহাদের বেশ কষে গালিমন্দ দিলেন। তিনি

তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ধমকালেন। তাঁরা বললেন : আপনি যদি দয়া করে একটু বসে আমাদের দু'টি কথা শোনেন, তাতে আপনার তো কোন ক্ষতি হবে না।

তারপর আপনি যা ইচ্ছে আদেশ দেবেন, আমাদের বলার কিছু থাকবে না। উসায়দ বললেন বেশ তো, তারপর তিনি তাঁদের কাছে বসে পড়লেন। মুসআব তাঁকে ইসলামের তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন এবং কুরআন মজীদ পড়ে শোনালের। উসায়দ চুপচাপ তা শুনে যাচ্ছিলেন। মুসআবের কথা শেষ হতেই উসায়দ বলে উঠলেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। একথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসায়দ (রা) বললেন : আরও এক ব্যক্তি আছে তাঁকে যদি আপনারা মুসলমান বানাতে পারেন তাহলে আপনাদের বিরোধিতা করার মতো কেউ থাকবে না। আমি এক্ষুণি গিয়ে তাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। উসায়দ সেখান থেকে উঠে সাআদ ইব্‌ন মুআযেব কাছে গেলেন। সা'দও এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় ছিলেন। বললেন : বলো হে ! তুমি তাদেরকে কী বলে আসলে ? উসায়দ (রা) বললেন : তাঁরা অঙ্গীকার করেছেন যে, তোমাদের মতের বিরুদ্ধে তাঁরা কিছুই করবেন না। কিন্তু সেখানে আরেকটি কাণ্ড ঘটে গেছে। বনূ হারিছের কতিপয় যুবক কোথা থেকে সেখানে এসে পৌঁছেছে। তারা আসআদ ইব্‌ন যুরারাকে হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এ কথাটি শোনামাত্র সা'দ ইব্‌ন মুআয উঠে দাঁড়ালেন এবং তলোয়ার হাতে ওখানে গিয়ে উপনীত হলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন আসআদ ও মুসআব অত্যন্ত শান্ত শিষ্টভাবে নির্বিকারে সেখানে বসে আছেন। তা দেখে তাঁর সন্দেহ হলো উসায়দ বুঝি আমাকে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দিয়ে এদের কাছে পাঠিয়েছেন যাতে আমিও তাদের কথা শুনি। সাথে সাথে তিনি দু'জনকে গাল দিতে দিতে আসআদকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি কেবল আত্মীয়তার খাতিরে চুপ করে আছি, নতুবা তোমার কি সাধ্য ছিল যে, আমার মহল্লায় এসে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। মুসআব বললেন : আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন ! আমাদের দু'টি কথা শুনুন। যদি শোনার মত হয় শুনবেন, নতুবা শুনবেন না, প্রত্যাখ্যান করবেন। এ ব্যাপারে কেউ কি আপনাকে জোর করতে পারবে ?

সা'দ তলোয়ারখানা রেখে দিয়ে বসে পড়লেন। মুসআব সা'দকেও ঠিক তা-ই শোনালেন যা একটু আগে উসায়দকে শুনিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কী মর্যি, সা'দও তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কবীলায় ফিরে এসে তিনি সকলকে একত্রিত করে বললেন, তোমাদের আমার সম্পর্কে কী ধারণা ? তারা সমস্বরে বললো, আপনি আমাদের সর্বজনমান্য সর্দার। আপনার নির্দেশ আমরা সর্বদা মেনে আসছি। এবার সা'দ বললেন : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। একথা শোনা মাত্র আবদে আশহাল গোত্রের সবাই একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলো। অনুরূপভাবে মদীনায় অন্যান্য গোত্রেও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটতে লাগলো। এটা ছিল নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর। এদিকে মুসআব ইব্‌ন উমায়র একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছিলেন; ওদিকে মক্কায় মুসলমানদের প্রতি কুরায়শদের অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে অসহনীয় হয়ে উঠছিলো।১৩তম নববী সালের যিলহাজ্জ মাসে হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) মদীনার ৭২ জন মুসলিম নর-নারীর একটি কাফেলা নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মদীনার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ এই কাফেলাকে এজন্য প্রেরণ করে যে, তাঁরা প্রিয়নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মদীনায় তশরীফ আনার জন্য মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত করবে।

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত

হযরত মুহাম্মদ (সা) এ কাফেলার আগমন সংবাদ আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। রাতের বেলায় তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় চাচা আব্বাসের সাথে দেখা। আব্বাস (রা) তখনো মুসলমান না হলেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁর প্রতি হামেশা সমমর্মী ছিলেন। কুরায়শদের ব্যাপক বিরোধিতার মধ্যেও পর্দার অন্তরালে তিনি যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল, তা হযরত মুহাম্মদ (সা) জানতেন। হুযূর (সা) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। দু'জন রাতের আঁধারে আকাবা উপত্যকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।। মদীনা থেকে আগত কাফেলাটি সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখানে শুধু মদীনা থেকে কেবল মুসলমানরাই হজ্জ করতে আসেননি, প্রাচীন প্রথা অনুসারে সেখানকার মুশরিকরাও হজ্জ করতে এসেছে। তারাও এসে মক্কার বাইরে তাঁবু গেড়েছিলো। কিন্তু আকাবার ঘাঁটিটি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। সেখানে কেবল মদীনা থেকে আগত মুসলমান এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতশীল এবং ইসলামকে পসন্দ করতো এমন কিছু অমুসলিম ছিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। মদীনার অন্যান্য মুশরিক আকাবার এ সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতো না। তারা তাদের মূল অবস্থান স্থলে ঘুমোচ্ছিল। তিনি আকাবায় পৌঁছে প্রতীক্ষারত মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের সাথে আলাপকালে তাঁর মদীনায় চলে যাওয়ার আগ্রহের কথা শুনতে পেয়ে হযরত আব্বাস (রা) সময়োপযোগী ও জরুরী একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন :

> হে মদীনাবাসীরা ! মুহাম্মদ (সা) এখানে তাঁর স্বগোত্রের সাথে আছেন। গোত্রের লোকজন তাঁর দেখাশোনা ও হিফাযত করে থাকে। তোমরা তাঁকে নিয়ে যেতে চাও ভাল কথা কিন্তু মনে রেখো, তোমাদেরকে তাঁর দেখাশোনা ও হিফাযত করতে হবে। এ কিন্তু সহজসাধ্য কথা নয়, বলে রাখছি। তোমরা যদি বিরাট যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পার, তাহলেই কেবল তা সম্ভবপর। তোমরা যদি এরূপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, তাহলে কেবল তাঁকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নতুবা তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার কথাটিও উচ্চারণ করো না।

হযরত বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : আব্বাস ! আমরা আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এখন আমরা চাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এ ব্যাপারে কিছু বলুন ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-ও ভাষণ দিলেন। তিনি কুরআন মজীদের আয়াত পড়ে শোনালেন।

তাঁর ভাষণে হক্‌কুল্লাহ এবং হক্‌কুল ইবাদের বর্ণনা করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মদীনাবাসীদের উপর কি কি দায়িত্ব বর্তাবে তাও বর্ণনা করলেন। বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) সব শুনে বললেন : আমরা এ সবের জন্যে প্রস্তুত। আবুল হায়ছামা ইবন তায়্যিহান (রা) বললেন : আপনি এটা অঙ্গীকার করুন যে, আপনি আমাদেরকে ত্যাগ করে স্বদেশে আবার চলে আসবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : না, আমার বেঁচে থাকা এবং আমার মরে যাওয়া তোমাদের সাথে হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা বললেন : এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো ইয়া রাসূলাল্লাহ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : জান্নাত এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আবদুল্লাহ বলে উঠলেন : ব্যস, সওদা হয়ে গেছে। এখন আপনিও কথা থেকে সরতে পারবেন না। আমরাও আমাদের কথা থেকে সরবো না। তারপর সকলে মিলে বায়'আত হলেন। এ বায়'আতে বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) ছিলেন সকলের অগ্রগামী। এটাই আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত নামে বিখ্যাত। বায়'আত সম্পন্ন হওয়ার পর আসআদ ইব্‌ন যুরারা সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : লোক সকল! মনে রেখো, এ প্রতিজ্ঞার অর্থ হচ্ছে আমরা গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত! সকলে সমস্বরে বলে উঠলো : প্রস্তুত। আমরা খুব ভাল করেই জানি যে, আমাদেরকে গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তারপর হুযূর (সা) তাঁদের মধ্যকার বারো জনকে নির্বাচিত করলেন এবং তাঁদেরকে ইসলাম প্রচারের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে নিজের নকীব নিযুক্ত করলেন। তাঁদের নাম হলো।

১. হযরত আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)
২. হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা)
৩. হযরত আবূল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (রা)
৪. হযরত বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা)
৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)
৬. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)
৭. হযরত সা'দ ইবনুর রবী' (রা)
৮. হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)
৯. হযরত রাফি' ইব্‌ন মালিক (রা)
১০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা)
১১. হযরত সা'দ ইব্‌ন হায়ছামা (রা)
১২. হযরত মুনযির ইব্‌ন আমর (রা)

এ বারোজন সরদারের মধ্যে নয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, আর বাকী তিনজন ছিলেন আওস গোত্রের। এ বারোজনকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন :

"যেভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারিগণ যিম্মাদার ছিলেন, ঠিক তেমনি আমিও তোমাদেরকে তোমাদের স্বজাতিকে শিক্ষা দানের যিম্মাদারী অর্পণ করছি। আর আমি নিজে তোমাদের সকলের যিম্মাদাররূপে রইলাম।"

যে সময় আকাবার ঘাঁটিতে এ বায়'আত কার্য সম্পন্ন হচ্ছিলো তখন পর্বতশীর্ষ থেকে একটি শয়তান মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বললো : দেখ, দেখ, মুহাম্মদ ও তার দলবল তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও মুসলমানগণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না। যখন সবকিছু চূড়ান্তভাবে ঠিকঠাক হয়ে গেলো, তখন হযরত মুহাম্মাদ (সা) মদীনায় হিজরতের দিনকাল নির্ধারণের ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের উপর ছেড়ে দিলেন। তারপর একজন করে তাঁরা নীরবে সে স্থান ত্যাগ করতে লাগলেন- যাতে কেউ তাঁদের এ সমাবেশ ও পরামর্শের কথা টের না পায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-ও মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু ভোর না হতেই দেখা গেলো যে, রাতের এ পরামর্শের

কথা কুরায়শদের কাছে জানাজানি হয়ে গেছে। তারা তৎক্ষণাৎ মদীনাবাসীদের তাঁবুতে গিয়ে উপনীত হলো এবং জিজ্ঞেস করলো যে, রাতের বেলা মুহাম্মদ (সা) কি তোমাদের কাছে এসেছিলেন? মুশরিকরা নিজেরাই রাতের এ সমাবেশের ব্যাপারটি অবগত ছিলো না। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সুলূলও ছিলো—যে পরবর্তীকালে মুনাফিকদের সর্দার হয়েছিল। সে সবিনয়ে বললো : মদীনাবাসীরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আর আমি তা ঘুণাক্ষরেও টের পাবো না এমনটি তো হতে পারে না। কুরায়শরা তাতে সন্দেহমুক্ত হলো এবং সেখান থেকে ফিরে এলো।

মদীনাবাসীরা তখনই রওয়ানা হয়ে গোলো। কুরায়শরা মক্কায় ফিরে এসে বিশ্বস্ত সূত্রে পুনরায় রাতের সলা-পরামর্শের কথা জানতে পারলো। তারা পুনরায় সশস্ত্র হয়ে আকাবায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু তখন মদীনার কাফেলা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। কেবল হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এবং হযরত মুনযির ইব্ন আমর (রা) কোনো প্রয়োজনে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। হযরত মুনযির (রা) কুরায়শদেরকে দেখেই স্থান ত্যাগ করলেন। ফলে তারা তাঁর নাগাল পেলো না। কিন্তু হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তাদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। কুরায়শরা তাঁকে প্রহার করতে করতে মক্কায় নিয়ে এলো। হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এ সম্পর্কে বলেন যে, মক্কাবাসীরা যখন আমাকে প্রহার করছিলো তখন লাল ও সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে আমি আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম এ লোকটির কাছে হয়তো সদয় ব্যবহার পাবো।..... কিন্তু সে কাছে আসতেই আমাকে সজোরে একটা চপেটাঘাত করলো। তখনই আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে, এদের মধ্যে কোন ভাল লোক নেই- যার কাছে মানবতা বা বিবেকপূর্ণ ব্যবহার আশা করা যেতে পারে। এমন সময় আর এক ব্যক্তি এসে বললো, কি হে ! কুরায়শদের মধ্যে তোমার কোন পরিচিত লোকজন নেই ? আমি বললাম, হাঁ। যুবায়র ইব্ন মুত'ঈম এবং হারিছ ইব্ন উমাইয়া- দু'জনেই আবদে মানাফের পৌত্র-আমার পরিচিত। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন : তাহলে ঐ দুজনের নাম ধরে তুমি সাহায্য প্রার্থনা করছ না কেন ? আমাকে এ বুদ্ধি বাতলে দিয়ে তিনি ঐ দুই ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, খাযরাজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে বেদম প্রহার করা হচ্ছে আর লোকটি তোমাদের নাম নিয়ে নিয়ে সাহায্যের জন্যে ফরিয়াদ করছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন লোকটির নাম কি? ঐ ব্যক্তি বললেন : ওর নাম সা'দ ইব্ন উবাদা। ... তখন তাঁরা দু'জনে বললেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তির যথেষ্ট ঋণ আমাদের উপর রয়েছে। আমরা ব্যবসা উপলক্ষে মদীনা গেলে ওর ওখানেই উঠি এবং সে আমাদের দেখাশোনা করে। তারপর ঐ দুজন এসে আমাকে মারমুখী কুরায়শদের হাত থেকে উদ্ধার করে। আমি তক্ষণি ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতের বহু পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে প্রিয় নবী (সা)-কে হিজরত করতে হতে পারে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এমন কি স্বপ্নে তিনি খেজুর গাছের সারি ঘেরা এক জায়গায় হিজরত করছেন দেখতে পান। পরে তিনি নিশ্চিত হন যে জনপদ হচ্ছে ইয়াছরিব (মদীনা)।

মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতের পর মক্কার মুসলমানদের উপর কুরায়শদের অত্যাচারের মাত্রা এতোই বৃদ্ধি পেলো যে, মক্কায় তিষ্টানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। হযরত

মুহাম্মদ (সা) তাদের সীমাহীন-অত্যাচার উৎপীড়ন লক্ষ্য করে মক্কার মুসলমানদেরকে তাঁদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এ অনুমতি পেয়েই মুসলমানরা নিজেদের বাড়িঘর ফেলে দিয়ে আত্মীয়-পরিজনের মায়া কাটিয়ে মদীনায় হিজরত করতে শুরু করলেন। কুরায়শরা যখন দেখলো যে, এরা বাড়িঘর ত্যাগে প্রস্তুত এবং মদীনায় গিয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন-যাপন করবে তখন এটাও তাদের সহ্য হলো না। তারা হিজরতকারীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলো।

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমার স্বামী আবূ সালামা (রা) হিজরত করতে মনস্থ করলেন। আমাকে তিনি উটের পিঠে চড়ালেন। যখন আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম, তখন গোত্রের লোকেরা এসে আবূ সালামাকে ঘিরে ফেললো। তারা বললো, তুই যেতে চাস, যেতে পারিস, কিন্তু আমাদের গোত্রের এ মেয়েকে আমরা তোর সাথে নিয়ে যেতে দেবো না। এমন সময় আবূ সালামার গোত্রের লোকজনও এসে উপস্থিত হলো। তারা এসে বললো, তুই যেতে চাস্ যা, কিন্তু এ শিশু আমাদের গোত্রেরই একজন। তাকে নিয়ে যেতে আমরা তোকে দেবো না। ফলে বনূ আবদুল আসাদ শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। বনূ মুগীরা উম্মে সালামাকে কেড়ে নিলো। অগত্যা আবূ সালামা একাকীই মদীনায় হিজরত করলেন। উম্মে সালামা তাঁর স্বামী ও শিশু সন্তান উভয়কেই হারালেন। আবূ সালামা স্ত্রী ও পুত্র উভয়ের মায়া কাটিয়ে একাকী হিজরত করে সওয়াবের ভাগী হলেন।

হযরত সুহায়ব রূমী (রা) যখন মক্কা থেকে বেরোলেন, তখন তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ মক্কাবাসীরা লুটে নিলো। হাজার হাজার টাকার সম্পদ তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিতান্তই রিক্তহস্তে তাঁকে তারা মদীনায় হিজরত করতে দিলো। হযরত হিশাম ইব্ন 'আস (রা) যখন হিজরত করতে মনস্থ করলেন তখন সংবাদ পেয়ে মক্কার কুরায়শরা এসে তাঁকে বন্দী করলো এবং তাঁকে নানারূপ নির্যাতন করতে লাগলো। হযরত আয়িশা (রা) হিজরত করে মদীনায় গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। আবূ জাহেল তাঁর পিছু পিছু মদীনায় গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে থেকে তাঁকে ধোঁকা দিয়ে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে বন্দী করলো।

এ জাতীয় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এক এক, দুই দুই জন করে বহু মুসলিম হিজরত করে মদীনায় গিয়ে উপনীত হন। সেখানে এই মুহাজিরগণ মদীনায় মুসলমানদের মেহ্মান হন। মক্কা থেকে আগত এ মুসলমানরা মুহাজির এবং মদীনায় তাঁদের মেজবান মুসলমানরা আনসার নামে খ্যাত হন। এরপর থেকে আমরা তাঁদেরকে এ নামেই উল্লেখ করবো।

নবুওয়াতের চতুর্দশ বছর তখন শুরু হয়ে গেছে। মক্কায় তখন কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), এবং হযরত আলী (রা) এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের হিজরত করা বাকী। আর রয়েছেন এমন কতিপয় দুর্বল মুসলমান যাদের হিজরত করার মতো সামর্থ্য ছিলো না। অন্যান্য মুসলমান সকলেই মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গিয়েছেন। মক্কায় মুসলমানদের আবাস স্থলগুলো একদম জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখনও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেননি। কেননা তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওয়াহীর নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তিনি পথসঙ্গীরূপে পাবার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশক্রমে তখনো মক্কাতেই আছেন।

দারুন নাদওয়ায় কুরায়শদের পরামর্শ সভা

কুরায়শরা যখন রক্ষ্য করলো যে, মুসলমানরা একে একে প্রায় সকলেই চলে গিয়েছে এবং এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক মদীনায় গিয়ে উপনীত হয়ে এখন এক শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছে যা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, তখন তাদের ভবিষ্যত সংকটের আশংকা মনে মনে দেখা দিলো। তারা স্পষ্টই দেখতে পেলো যে, তাদের সম্ভ্রম ও জীবনের নিরাপত্তা মুসলমানদের পূর্ণ মূলোৎপাটনের উপরই নির্ভরশীল। যেহেতু মক্কা থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর সমর্থকদের প্রায় সকলেই তখন চলে গেছেন, বলতে গেলে তিনি এখন একান্তই একাকী। তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাদের জন্যে খুবই সহজ ছিল যে, সেখান থেকে ধর্মের প্রবর্তককে খতম করে দেয়াই একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে এবং এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেননা মুহাম্মদ (সা) যদি মক্কা থেকে বেরিয়ে যান এবং মদীনায় গিয়ে তাঁর সমর্থকদের সাথে মিলিত হয়ে যান তাহলে এ নতুন ধর্মের সংকট মুকাবিলা করা সহজসাধ্য থাকবে না, দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। একথাটি কুরায়শের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখে মুখে এবং এ চিন্তা তাদের প্রতিটি লোকের মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। দেখতে দেখতে মক্কার সমস্ত গোত্রের মধ্যে এ সর্বনাশা নিষ্ঠুর চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়লো। অবশেষে নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের সফর মাসে বনূ হাশিম ছাড়া কুরায়শের অন্যান্য গোত্রের সকল উল্লেখযোগ্য সরদাররা এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করার জন্যে দারুন নাদওয়ায় একত্রিত হলো। এ পরামর্শ সভায় কুরায়শদের মশহুর ও উল্লেখযোগ্য যেসব সরদার সমবেত হয়েছিলো তারা হলো :

১. আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম (বনী মাখযূম-এর পক্ষ থেকে)
২. নাবিলা (তারা দু'জনেই হাজ্জাজের পুত্র, এরা বনূ সাহমের লোক)
৩. মুনাব্বাহ (বনূ জুমাহ-এর প্রতিনিধি)
৪. উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ
৫. আবুল বুখতরী ইব্‌ন হিশাম
৬. যুমআ ইব্‌ন আসওয়াদ (বনূ সাহমের প্রতিনিধি)
৭. হাকীম ইব্‌ন হিযাম
৮. উমাইয়া নযর ইব্‌ন হারিছ (বনূ আবদে দার-এর প্রতিনিধি)
৯. উত্‌বা (এরা দু'জনই রবীআর পুত্র)
১০. শায়বা
১১. আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব (এরা বনূ উমাইয়া গোত্রের লোক)
১২. তায়মা ইব্‌ন আদী
১৩. জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম
১৪. হারিছ ইব্‌ন আমির (এরা বনী নাওফিল-এর লোক)

উল্লেখযোগ্য, উক্ত লোকদের ছাড়াও আরো অনেক সরদার এ পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলো। জনৈক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ নজ্‌দবাসী শয়তানও এ মজলিসে উপস্থিত ছিলো। ঐ বৃদ্ধটিই ছিলো ঐ মজলিসের সভাপতি। এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, ভাবী সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। এখন বিবেচ্য বিষয় ছিলো তাঁর সাথে কী

আচরণ করা হবে ? একজন বললো, মুহাম্মদকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে একটি কুঠরিতে বন্দী করে রেখে দিলেই হয়। দৈহিক কষ্ট এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। নজদের সেই বৃদ্ধটি বললো : এ অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা, তার আত্মীয়-পরিজন এবং অনুসারীরা তাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হবে এবং তাতে ফ্যাসাদ বাড়বে বৈ কমবে না। অপর একজন বললো, মুহাম্মদকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে পুনরায় ঢুকতে না দিলেই হয়। নজদী বৃদ্ধ এ অভিমতকেও যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে নাকচ করে দিল। মোটকথা, নানা জনে নানা প্রস্তাবই উত্থাপন করলো আর নজদী বৃদ্ধ প্রত্যেকটি প্রস্তাবই নাকচ করে দিল। অবশেষে আবূ জাহেল তার প্রস্তাব উত্থাপন করলো। সে বললো, আমার মতে আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন অসি চালক বেছে নেয়া দরকার। এরা একযোগে চতুর্দিক থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করবে। ফলে মুহাম্মদের রক্তপণ আদায়ের দায়িত্ব যৌথভাবে সকল গোত্রের উপর বর্তাবে। বনূ হাশিম একা এতগুলো গোত্রের মুকাবিলাও করতে পারবে না। ফলে তারা রক্তের বদলা নেওয়ার পরিবর্তে রক্তপণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। আর এ রক্তপণ আদায় করায় তেমন কোন বেগও পেতে হবে না। সবাই মিলে সব গোত্র থেকে চাঁদা উঠিয়ে সহজেই তা পরিশোধ করা যাবে। আবূ জাহেলের এ প্রস্তাবই নজদী বুড়োর খুবই মনঃপূত হলো এবং সভার সকলেই তা একবাক্যে মেনে নিলো। এদিকে দারুন নাদওয়ায় এ সলা-পরামর্শ চলছিল। ওদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে কাফিরদের সব সলা-পরামর্শের কথা জানিয়ে দিলেন এবং হিজরতের হুকুম নাযিল করলেন।

সফরের আয়োজন

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) ভরা-দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রীষ্মের মওসুমে দুপুর বেলা লোক রৌদ্রের উত্তাপ ও লু-হাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়। রাস্তা-ঘাট থাকে জনশূন্য ও নিরিবিলি। হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই অসময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আসতে দেখেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর বুঝতে বাকী রইলো না যে, হিজরতের আদেশ নাযিল হয়ে গেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ঘরে বাইরের কেউ নেই তো ? যখন জানতে পারলেন যে, আবূ বকর (রা) এবং তাঁর কন্যাদ্বয় আসমা ও আয়িশা ছাড়া অপর কেউই এখন ঘরে নেই তখন তাঁকে তিনি বললেন যে, ইয়াছরিবে (মদীনায়) হিজরতের হুকুম এসে গেছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখন জিজ্ঞেস করলেন : সফরসঙ্গী কে হবে ? হযরত নবী করীম (সা) বললেন : তুমিই হবে আমার সফরসঙ্গী। শুনে আবূ বকর (রা) এতই আনন্দিত হলেন যে, খুশিতে তাঁর চোখ দু'টি থেকে টপটপ করে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পূর্ব থেকেই দু'টি উটনী খরিদ করে খুব ভাল করে খানা-দানা দিয়ে মোটা তাজা করে রেখেছি। তার একটি আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, আমি তার মূল্য শোধ করবো। অগত্যা হযরত আবূ বকর (রা) মূল্য নিতে বাধ্য হলেন। ঠিক তক্ষুণি হিজরত করার আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) ছাতুর থলে এবং খাবার-দাবার ঠিক করতে লেগে গেলেন। হযরত আয়িশা (রা)-র বয়স তখন খুবই কম। হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে

সংবাদ দিয়েই নিজ ঘরে ফিরে আসলেন। সামনের রাতটিই ছিলো মুশরিকদের আগের রাতের প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রাত। আজই তারা তাঁকে হত্যা করবে। সন্ধ্যার সময়ই তারা তাঁর বাড়ি অবরোধ করলো। তারা অপেক্ষায় রইলো যে, যখন তিনি রাতের বেলা নামাযের উদ্দেশ্যে বের হবেন তখন একযোগে হামলা করে তাঁকে হত্যা করবে। তিনি ওয়াহীর নির্দেশ অনুসারে হযরত আলী (রা)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। মক্কাবাসীদের যেসব গচ্ছিত দ্রব্য তাঁর কাছে রাখা ছিলো তাও তিনি হযরত আলী (রা)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, সকালে উঠেই এ গচ্ছিত দ্রব্যগুলো মালিকদের বুঝিয়ে দিও। তারপর তুমিও মদীনায় চলে এসো। এসব সম্পন্ন করে রাতের আঁধারে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সর্বপ্রথম তিনি সূরা ইয়াসীনের শুরুর দিকের আয়াতসমূহ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত পড়ে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁক দিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাদের সম্মুখ দিয়েই অকপটে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু কাফিরদের কেউই তাঁকে দেখতে পেলো না।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ .

স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন; আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। (৮ : ৩০).

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বাহন উটনী দুটো আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতের হাতে ন্যস্ত করেন। উক্ত আবদুল্লাহ্ যদিও মুসলমান ছিলো না কিন্তু নির্ভরযোগ্য ছিলো বিধায় মদীনা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যখন আবূ বকর (রা) তাকে পথ প্রদর্শক নিয়োগ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে গেলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতীক্ষায়ই ছিলেন। কাল-বিলম্ব না করে উভয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন এবং মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়ে চার মাইল দূরে অবস্থিত ছওর পর্বতের গুহায়-যা ছওর গুহা নামে বিখ্যাত-গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁরা সেখানে আত্মগোপন করে রইলেন।

এ দিকে মক্কায় হযরত আলী (রা) সারারাত ধরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিছানায় নিদ্রা গেলেন। মক্কার কাফিররাও সারা রাত ধরে বাড়ি অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা হযরত আলী (রা)-কে শায়িত দেখে নিশ্চিত রইলো যে, হযরত মুহাম্মদ তো বিছানায়ই শুয়ে আছেন। তারা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলো। ফজরের সময় যখন হযরত আলী (রা) নামায পড়ার জন্যে ঘুম থেকে জেগে উঠলো তখন তারা জিজ্ঞেস করলো : মুহাম্মদ কোথায় ? হযরত আলী (রা) বললেন : আমি তার কি জানি ?

জানার কথা তো তোমাদের! কেননা তোমরা পাহারায় ছিলে। আমি তো সারা রাত শুয়ে কাটিয়েছি। কাফিররা হযরত আলী (রা)-কে পাকড়াও করলো। তারা তাঁকে প্রহার করলো এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে বন্দী করে রাখলো। তার পর ছেড়ে দিলো। হযরত আলী (রা) ধীরে সুস্থে সমস্ত গচ্ছিত দ্রব্য মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন।

এখানে লক্ষণীয়, কাফিররা হযরত নবী (সা)-এর প্রাণের বৈরী ছিল, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি এতই আস্থাশীল যে, তাদের মূল্যবান সোনা-দানা অলংকারাদি তাঁরই কাছে গচ্ছিত রাখতো। তিনিও মক্কা ত্যাগের সময়ও তাঁর এ বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্যে সেই প্রিয় চাচাতো ভাই, যাকে তিনি আপন পুত্রসম প্রতিপালন করছিলেন, শুধু এজন্যে একাকী মক্কায় রেখে যাচ্ছেন যেন তিনি সেই গচ্ছিত দ্রব্যাদি যথারীতি মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করে আসেন।

কাফিররা তখন আলী (রা)-কে ছেড়ে সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। দরজায় করাঘাত করতেই হযরত আসমা (রা) বেরিয়ে এলেন। আবূ জাহেল জিজ্ঞেস করলো, হে বালিকা! তোর পিতা কোথায় ? তিনি বললেন : আমি তা জানিনে। বলতেই দুরাচার এমনি জোরে তাঁকে চপেটাঘাত করলো যে তাঁর কানের বালি (দুল) নীচে পড়ে গেল। তারপর তারা মক্কার আনাচে-কানাচে তন্ন-তন্ন করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সন্ধান করতে লাগলো, কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পেলো না। অবশেষে তারা ঘোষণা করলো : যে কেউ মুহাম্মদ (সা)-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দেবে তাকে একশ' উট পুরস্কার স্বরূপ দান করা হবে। এ পুরস্কারের ঘোষণা শুনে অনেকেই মক্কার চতুর্দিক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো।

ছওর গিরি গুহায় আফতাব (সূর্য) ও মাহতাব (চাঁদ)

রাতের অন্ধকারে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ যখন ছওর গুহার নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রথমে আবূ বকর (রা) গুহার অভ্যন্তরে ঢুকলেন। তিনি তার অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করলেন এবং গুহার ছিদ্রসমূহ খুঁজে বের করে পরনের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেগুলো বন্ধ করতে লাগলেন। এভাবে সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করার পর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে গুহার ভিতরে নিয়ে গেলেন। এ চন্দ্র ও সূর্য পূর্ণ তিন দিন তিন রাত এ গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। কুরায়শদের বড় বড় সর্দাররা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে নিজেরাও সন্ধানী লোকদের সাহায্যে পায়ের চিহ্ন ধরে এগুতে এগুতে ছওর গুহার মুখ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলো। সন্ধানীরা জানালো, এরপর তো আর পায়ের কোনো চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না, হয় মুহাম্মদ এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন, নতুবা এখান থেকে সোজা আসমানে উঠে গেছেন। একজন বললো, তাহলে এ গুহার অভ্যন্তরে গিয়েই দেখা যাক না। দ্বিতীয়জন বললো, এত অন্ধকার বিভীষিকাময় গুহায়ও মানুষ ঢুকতে পারে নাকি ? আমরা তো বহুকাল ধরে এগুলোকে এভাবেই দেখে আসছি। তৃতীয়জন বললো, দেখ, দেখ, এ গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছেন। কেউ যদি একান্তই এখানে ঢুকতোই তবে এ জাল অবশ্যই ছিন্ন হয়ে যেতো। চতুর্থজন বললো, ঐ দেখ, ওখান থেকে কবুতর উড়ে যাচ্ছে। তার ডিমও দেখা যাচ্ছে-যাতে বসে তা দিচ্ছিল। সকলেই তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, গুহায় আর কোন লোক নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই অন্য দিকে পথ ধরলো। কাফিররা গুহার এতই নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর (রা) তাদের পা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। তাদের কথাবার্তার আওয়াজও স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিলো। এমন বিপজ্জনক অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন : হুযূর! কাফিররা তো এসেই গেল! এখন উপায় ? হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন :

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

ভীত-বিহবল হয়ো না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে রয়েছেন।

তারপর তিনি বললেন :

وما ظنك باثنين الله ثالثهما

সে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা?

কাফিররা তাদের খোঁজাখুজিতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। একে একে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কাফিররা একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়লো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইতিপূর্বেই বলে রেখেছিলেন যে, কাফিরদের অবস্থা ও তাদের সারাদিনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তিনি যেন রাত্রে এসে অবহিত করে যান। অনুরূপভাবে তদীয় গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ছাগলপালকে সারা দিন এদিক-সেদিক চরিয়ে রাতের বেলা তিনি যেন মেষটাকে চরাতে চরাতে ছওর গুহার কাছে নিয়ে আসেন। আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা)-এর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছিলেন যে, আহার্য দ্রব্যাদি সযত্নে প্রস্তুত করে রাতের বেলা যেন তা গুহাবাসীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আবদুল্লাহ ও আসমা ভাইবোন দু'জন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যখন ঘরে ফিরতেন তখন আমির ইব্ন ফুহায়রা ছাগল দোহন করে এবং গুহাবাসীদেরকে তা পান করিয়ে ছাগলপাল নিয়ে অধিক রাতে মক্কায় প্রবেশ করতেন। এভাবে আবদুল্লাহ্ ও আসমার পদচিহ্ন ছাগলপালের চলাচলের দ্বারা মুছে যেতো। যখন মক্কাবাসীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ার সংবাদ জানা গেলো তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতের কাছে সংবাদ পাঠানো হলো যেন প্রতিশ্রুতি অনুসারে উটনী দু'টি নিয়ে ছওর পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হন। এখানে আবদুল্লাহ্, আসমা ও আমির ইব্ন ফুহায়রার গোপনীয়তা রক্ষায় প্রশংসা না করলে নাও করতে পারেন, কেননা তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতের গোপনীয়তা রক্ষা, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা ও ধৈর্য-স্থৈর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না–যে নিছক একজন শ্রমিকই ছিল আর সে ব্যক্তি মুসলমানও ছিল না। তার এসব গুণের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে আরবদের জিদ, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় আভিজাত্যবোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিত উক্ত দু'টি উটনী এবং তার নিজস্ব একটি উট নিয়ে ছওর পাহাড়ের পাদদেশে ছওর গুহার নিকট রাতের বেলা এসে উপনীত হলেন। রাতটি ছিল রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম রাত। হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা)-ও সফরের জন্যে ছাতু প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক ছওর গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একটি উটনীতে হযরত মুহাম্মদ (সা) আরোহণ করলেন। সে উটনীটির নাম ছিলো কাসওয়া। অপর উটনীতে হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা আরোহণ করেন। পথ প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিত তাঁর নিজস্ব উটে আরোহণ করলেন। চার ব্যক্তির এ সংক্ষিপ্ত কাফেলাটি সাধারণ পথ এগিয়ে মদীনার অন্য পথে এগিয়ে চললো। যেহেতু তখনো পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা ছিল, তাই যাত্রা শুরুর পূর্বে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো এই যে, হযরত আবূ বকর-তনয়া আসমা ছাতুর যে থলে ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তা লটকানোর জন্যে কোন

ফিতে বা রশি নিয়ে আসননি। হযরত আসমা তখন কালবিলম্ব না করে আপন কোমরের ফিতা খুলে অর্ধেক কোমরে বেঁধে বাকী অর্ধেক দিয়ে তা উটের হাওদার সাথে বেঁধে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) তার এ তাৎক্ষণিক ও সময়োপযোগী কাজটি দেখে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁকে 'যাতু'ন-নিতাকায়ন বা দুই ফিতাধারিণী' বলে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে হযরত আসমা এ খেতাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের জননী। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) যাত্রা শুরুর সময় তাঁর ঘরের সমুদয় নগদ অর্থ সম্পদ, যার পরিমাণ ছিল পাঁচ ছয় হাজার দিরহাম, সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর পিতা আবূ কুহাফা তখনো কুফরের উপর অবিচল ছিলেন এবং অন্ধ ছিলেন। তিনি ঘরে তাঁর নাতনীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আবূ বকর নিজেও গেল এবং সমুদয় অর্থ-সম্পদও নিয়ে গেল। হযরত আসমা বললেন : দাদাজান, আব্বা আমাদের জন্যে অনেক অর্থ রেখে গেছেন। বলেই তিনি একটি বস্ত্র খণ্ডে অনেক কাঁকর মুড়িয়ে ঠিক সেই স্থানে নিয়ে রেখে দিলেন, যেখানে সাধারণত টাকার থলে রাখা হতো। তিনি দাদার হাত ধরে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি হাতড়ে দেখে নিয়ে ধারণা করলেন যে, আসলেও অর্থ সেখানে আছে। তখন তিনি নাতনীদেরকে বললেন, তাহলে আবূ বকর গেছে, তজ্জন্য চিন্তা নেই।

হিজরতের সফর

হযরত মুহাম্মদ (সা) কাসওয়ার পিঠে চড়ে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মক্কার দিকে অত্যন্ত বিষাদ মাখা কণ্ঠে বললেন :

"হে মক্কা! তাবত শহরের মধ্যে তুমিই আমার প্রিয়তম শহর। কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিলো না।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন : "এরা আপন নবীকে দেশছাড়া করলো। এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ঐ সময়েই নাযিল হলো আল-কুরআন-এর এই আয়াত :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম। (২২ : ৩৯)

এখানে প্রণিধানযোগ্য, এ অবধি যারা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কীভাবে ইসলামের সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কতো হৃদয়বিদারক যাতনা ও পর্বত-প্রমাণ বিপদাপদের মুকাবিলা করে এসেছেন। এ মুসলমানদের সম্পর্কে এ ধারণা করা যেতে পারে যে তাঁরা প্রলোভন বা ভীতির দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন ? তা কখনো হতে পারে না। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর এবার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো যখন দুরাচারদের এবং সত্য ধর্মের প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হত্যা ও লুণ্ঠন থেকে যারা বিরত না থাকে তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং সত্যের প্রচারের পথ থেকে বাধা-বিপত্তি দূর করার অনুমতি পাওয়া গেলো। এবার ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন আর প্রত্যক্ষ করুন, কিভাবে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এ ছোট্ট কাফেলাটি রাত্রের প্রথম ভাগেই সফর শুরু করে। পরবর্তী দিন অর্থাৎ নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের প্রথম রবিউল আউয়াল তারিখের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত একটানা পথ চলতে থাকে। তৃতীয় প্রহরে তাঁরা উম্মে মা'বাদের খিমায় গিয়ে পৌছেন। উম্মে মা'বাদ ছিল খুযাআ গোত্রের এক অতিথিপরায়ণা বৃদ্ধা। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা) বকরীর দুধ পান করেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলতে নির্দেশ দেন। অল্প একটু পথ চলতেই লক্ষ্য করলেন সুরাকা ইব্‌ন মালিক তাঁদের পিছু পিছু ধেয়ে আসছে। সুরাকা ছিল মক্কার কুরায়শদের একজন বীর যোদ্ধা। সুরাকার ঘটনাটি এরূপ :

"সুরাকা কয়েক ব্যক্তির সাথে বসে মক্কায় গল্পগুজবে রত ছিল। কাকডাকা ভোরে এক ব্যক্তি এ মজলিসে এসে বললো, আমি তিনজন উষ্ট্রারোহীকে পথ অতিক্রম করতে দেখেছি। তারা ঐ দিকে যাচ্ছিলো। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মদ আর তাঁর সঙ্গীরাই হবেন। সুরাকা ইঙ্গিতে ঐ লোকটিকে চুপ করতে বলে বললো, তিনি ছিলেন অমুক ব্যক্তি। তিনি আজ রাতেই যাত্রা করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, আমিই তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবো। অন্য কেউ যেন একথা শুনে লাফিয়ে না উঠে। নতুবা একশ' উটের বিরাট উপহারটি আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। একটু পরেই সুরাকা সেখান থেকে উঠে নিজ ঘরে চলে আসে। সে চুপিসারে তার ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজেও লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে আসে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সে ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং উটসমূহের পায়ের দাগ ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে যায়। অল্প কিছুদূর এগুতেই তার ঘোড়াটি হোঁচট খায় এবং সুরাকা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর আবার সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে এবং পুনরায় যাত্রা শুরু করে। তার মনে মনে আশা ছিল, আমি মুহাম্মদকে গ্রেফতার বা হত্যা করে একশ' উট উপহার স্বরূপ লাভ করবো। যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের উট দেখা যাচ্ছিলো, তখন তার ঘোড়াটি পুনরায় হোঁচট খেয়ে ভূমিতে পড়ে গেলো এবং তার ঘোড়ার সামনের দু'টি পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেলো। সুরাকা ঘোড়ার জীন থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর উঠে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো এবং পথ চলতে শুরু করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উটনীর একেবারে নিকটে পৌছে তার ঘোড়াটি পেট পর্যন্ত মাটির নীচে প্রোথিত হয়ে গেল। সুরাকা আবার ভূমিতে ছিটকে পড়লো। এ অবস্থা দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং স্পষ্ট বুঝতে পারলো, আমি এ মহাত্মার গায়ে হাত দিতে পারবো না। তাই সে তার বাহন ঘোড়াটিকে থামিয়ে দিল। সে বললো, আমি তো আপনাকে গ্রেফতার করতেই এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ফিরে চলছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দিন এবং ক্ষমা করে দিন। ফিরে যাবার কালে আরো যারা আপনার পশ্চাতে একই উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে তাদেরকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। সত্যি সত্যি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অথবা তাঁর খাদিম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা উটের উপর বসে বসে একটি নিরাত্তাপত্র লিখে তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সে ঐ পত্রখানা নিয়ে মক্কার দিকে ফিরে চললো। পথে যাদেরকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধানে আসতে পাওয়া গেল সবাইকে সে এই বলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যে, এদিকে তাঁর তো কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মক্কা বিজয়ের সময় সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রদত্ত উপরোক্ত নিরাপত্তাপত্রকেই তিনি তাঁর দলীল বা প্রমাণপত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ছওর গিরিগুহা তথা নিম্ন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে আবদুল্লাহ ইবন উরায়কিত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সমুদ্রোপকুলের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেন। 'আসফান নামক স্থান থেকে সামান্য দূর এগিয়ে সাধারণ চলাচলের পথ ডিঙ্গিয়ে উমাজ নামক স্থানের নিম্নভাগে কাদীদ পর্যন্ত তাঁরা এগিয়ে যান। তারপর আবার রাজপথ ডিঙ্গিয়ে খার্রার প্রান্তর তাঁরা অতিক্রম করেন। সানাতুল মুররা, লাফত, মুদলিজা, মাখাজ প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে যুল-আযওয়াইন অঞ্চল পেরিয়ে যী-মুসলিম মরুভূমির মধ্য দিয়ে আল-আবাবীদ, আল-আ'রাজ প্রভৃতি স্থান তাঁরা অতিক্রম করেন। আল-আ'রাজের নিম্নভূমি অতিক্রমকালে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উটনী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। সেখানে আসলাম গোত্রের জনৈক আওস ইব্‌ন হাজারের নিকট থেকে একটি উট নেন। আওস ইব্‌ন হাজার তাঁর একটি গোলামকেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে দিয়ে দেন। সেখান থেকে এ কাফেলাটি মুছান্নাতুল-গায়ের-এর রাস্তায় রীম প্রান্তরে এসে পৌছেন। রীম প্রান্তর অতিক্রম করে দুপুর বেলা তাঁরা কুবার নিকটে এসে পৌছেন।

সুরাকা ইব্‌ন মালিকের প্রত্যাবর্তনের পর সামান্য পথ অতিক্রম করতেই হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ। তিনি তখন সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় ফিরছিলেন। যুবায়র ইব্‌ন আওআম হযরতের খিদমতে পরিধেয় বস্ত্র পেশ করলেন এবং জানালেন যে, তিনিও মক্কায় ফিরেই কালবিলম্ব না করে মদীনায় চলে আসবেন। এ সফরে যেখানেই লোকের সাথে সাক্ষাৎ হতো, তারা হযরত আবূ বকর (রা)-কে চিনে ফেলতো। কেননা, ব্যবসা ব্যাপদেশে প্রায়ই তাঁর এ পথে আসা-যাওয়া ছিল। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লোকে চিনতো না। তাই তাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো, আপনার আগে আগে পথ অতিক্রমকারী এ ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিতেন : هذا يهدينى السبيل "ইনি আমার পথ প্রদর্শক।"

সফরের সমাপ্তি

আট দিন পথ চলে হযরত নবী (সা) ৮ই রবিউল আউয়াল ১৪ নববী সালে দুপুর বেলা কুবার নিকটে এসে পৌছেন। কুবা মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এবং এটি মদীনারই একটি পল্লী বলে বিবেচিত হতো। সেখানে বনী আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের প্রচুর লোক বাস করতো এবং তাঁরা ইসলামের আলোকে ইতিপূর্বেই আলোকিত হয়েছিলেন। মক্কা থেকে নবী (সা)-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ মদীনায় কয়েক দিন পূর্বেই পৌছে গিয়েছিল। এজন্যে মদীনার আনসারগণ প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় জনপদের বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁদের আশা ছিলো এভাবে নবী করীম (সা)-এর শুভাগমনের দৃশ্য বহু দূর থেকেই তাঁরা দেখতে পাবেন। যখন সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়ে সহ্যসীমার বাইরে চলে যেতো, কেবল তখনই তারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতেন।

জনৈক ইয়াহূদী মুসলমানদেরকে এ ভাবে বিপুল সংখ্যায় ভিড় করে থাকতে প্রতিদিনই দেখতে পেতো। সে জানতো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কা থেকে আসছেন এবং এরা প্রতিদিন তাঁরই প্রতীক্ষায় ভিড় করে। ঘটনাক্রমে ঐ ইয়াহূদীটি সেদিন তার ঘরের ছাদের উপর উপবিষ্ট ছিল। সে দূর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ আনছেন দেখতে পেলো। তাই সে চীৎকার করে বললো :

يا معشر العرب يا بنى قيله هذا جدكم قد جاء

ওহে আরবরা! ওহে দুপুরে বিশ্রামকারীরা!! ঐ যে তোমাদের অভীষ্ট আগন্তুক, তোমাদের সৌভাগ্যের হেতু এসে পড়েছেন!

আওয়াজটি শুনতেই লোকজন যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গোটা কুবা পল্লীতে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আনসাররা লক্ষ্য করলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি খেজুর বাগানের দিক থেকে আসছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল কোনজন তা' চিনতে যেন কারো বেগ পেতে না হয় তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চট করে উঠে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আপন চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া দান করতে লাগলেন। ফলে কে মনিব আর কে তাঁর ভক্ত তা চিনতে কাউকে আর বেগ পেতে হলো না।

মহানবী (সা) কুবা পল্লীতে প্রবেশ করছিলেন আর আনসার বালিকারা মনের আনন্দে আবৃত্তি করছিলো :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالأَمْرِ الْمُطَاعِ

পূর্ণ শশীর উদয় আজি মোদের আঙিনায়
ছানিয়াতুল বিদা-য় তোরা দেখবি যদি আয়
ওয়াজিব হলো মোদের তরে শোকর আদায়
যাবৎ কেউ ডাকিবে লোকে ডাকিতে খোদায়
হে মহান সত্তা তুমি প্রেরিত হেথায়
শিরোধার্য তব আদেশ যদিও প্রাণ যায়।

—(অনুবাদক)

[এখানে 'ছানিয়াতুল বিদা' বলতে ঐ স্থানটিকেই বোঝানো হয়েছে যেখান পর্যন্ত মদীনাবাসীরা মক্কায় হজ্জযাত্রীদেরকে বিদায় দেয়ার সময় বিদায় অভিনন্দন জানাতে অগ্রসর হতো। আজ সেই বিদায়-অভিনন্দনের স্থান দিয়েই নবুওয়াত-সূর্য মদীনায় প্রবেশ করছিলেন মক্কা থেকে এসে। তাই এ অভিনন্দন কাব্যে শব্দের কবিত্বের সাথে সাথে ভাবের একটা চমৎকার কাব্যিকতাও বিদ্যমান।—অনুবাদক]

হযরত নবী (সা) সোমবার দিন কুবায় প্রবেশ করেন এবং শুক্রবার পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। হযরত নবী (সা) কুলছুম ইব্‌ন হাদামের ঘরে এবং হযরত আবূ বকর (রা) হাবীব ইবন আসাফের ঘরে অবস্থান করেন। মজলিস হতো সাআদ ইব্‌ন খায়ছামা (রা)-এর বাড়িতে। অর্থাৎ সেখানে লোকজন এসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং সেখানেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমিয়ে থাকতেন। এ কয়দিনের মধ্যেই তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। তারপর ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার তিনি কুবা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন। তিনি কুবায়

থাকতেই হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু মক্কা থেকে এসে তাঁর খিদমতে উপনীত হন। মক্কা থেকে মদীনার এ দীর্ঘ পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন সওর গিরিগুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি মক্কায় অবস্থান করে লোকজনের গচ্ছিত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করছিলেন। ঘটনাচক্রে যেদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) সওর গিরিগুহা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন ঐ দিনই হযরত আলী (রা)-ও মক্কা থেকে মদীনার পানে রওয়ানা হন। কিন্তু হযরত আলী (রা) যেহেতু একাকী ছিলেন তাই রাতের বেলায় তিনি সারারাত ধরে পথ চলতেন এবং দিনের বেলায় কোথাও আত্মগোপন করে পড়ে রইতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বজনপরিচিত রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে দূরত্বটুকু অতিক্রম করেন এবং তাতে কুবা পৌঁছতে তাঁর আটদিন সময় অতিবাহিত হয়। হযরত আলী (রা) পরিচিত রাস্তা দিয়েই আসেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন, তাই কুবায় পৌঁছতে তাঁর তিন চার দিন বেশী সময় লাগে।

মদীনায় প্রবেশ

শুক্রবার দিন হযরত মুহাম্মদ (সা) কুবা এবং কুবার অধিবাসী বনী আমর ইব্‌ন আওয়াফ গোত্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মদীনার প্রতিটি মহল্লার প্রতিটি পরিবার সর্বান্তঃকরণে কামনা করতো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যেন তাদেরই ঘরে গিয়ে বসবাস করেন। তিনি বনী সালিম ইব্‌ন আওফের মহল্লায় পৌঁছতেই জুমুআর সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি খোলা মাঠে একশত জন ভক্তদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করেন। এটা ছিল মদীনায় তাঁর প্রথম জুমুআ এবং প্রথম খুতবা। এখানেও একটি মসজিদ নির্মিত হলো।

জুমুআর সালাত অন্তে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর উটনীতে চড়ে বসলেন। বনী সালিম ইব্‌ন আওফ-এর লোকেরা এসে তাঁর উটের বল্গা ধরে বসলো এবং তাঁকে তাদের ওখানেই থাকার জন্য আবদার জানালো। অন্যান্য কবীলার এবং অন্যান্য মহল্লার লোকেরাও তাঁকে তাদের ওখানে নিয়ে যেতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করলো। এভাবে তাদের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : আমার উটনীকে তোমরা থামিও না ! তার লাগাম ছেড়ে দাও ! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে নির্দেশ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। যেখানে আমার উটনীটি বসে পড়বে সেখানেই আমি অবস্থান করবো। উটনীর লাগাম তাই ছেড়ে দেয়া হলো এবং সে এগিয়ে চললো। সমস্ত আনসার ও মুহাজির তার অগ্র-পশ্চাতে ও ডানে-বামে সাথে সাথে এগিয়ে চললেন। হযরত নবী (সা) লাগাম ঢিলা দিয়ে দিলেন এবং সে তার নিজ খুশিতে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। সকলেই অধীর আগ্রহে অপলক নেত্রে উটনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সকলেই পরম কৌতূহল—শেষ পর্যন্ত সে কোথায় গিয়ে থামে এবং কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তা-ই দেখবেন। উটটি যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে বনূ বায়াদিয়া গোত্রের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হলো তখন সেই গোত্রের সর্দার যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ এবং উরওয়া ইব্‌ন আমর অগ্রসর হয়ে উটনীর লাগাম ধরতে উদ্যত হন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) বলে উঠলেন :

دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ

একে ছেড়ে দাও। কেননা সে ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়ে গেছে।

তারপর উটনীটি বনূ সাঈদা গোত্রের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হয়। বনু সাঈদা গোত্রের সরদার সা'দ ইব্‌ন উবাদা এবং মুনযির ইব্‌ন আমর উটনীকে বাধা দিতে চাইলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) আবারও বললেন :

دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ

একে ছেড়ে দাও, কেননা ইতিমধ্যেই সে সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়ে গেছে।

তারপর উটনীটি বনু হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হলো। এখানে সা'দ ইবনুর রবীঈ, খারিজা ইব্‌ন যায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা থামাতে চাইলেন। তাঁদেরকেও পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞাটি শোনানো হলো। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে উটনীটি বনূ আদী ইবনুল নাজ্জারের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হলো। এটি যেহেতু আবদুল মুত্তালিবের নানার গোত্র ছিল এজন্য তাদের দাবী ছিল এই যে, আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিন্‌ত আমর যেহেতু আমাদেরই গোত্রের মেয়ে ছিলেন, তাই হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদেরই সাথে থাকবেন। সাথে সাথে বনূ আদী গোত্রের সর্দার সলীত ইব্‌ন কায়েস ও আসীরা ইব্‌ন খারিজা অগ্রসর হয়ে উটনীর লাগাম ধরেও বসলেন, কিন্তু তাদেরকেও হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : উটনীকে যেতে দাও ! কেননা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়ে গেছে। তারপর উটনী বনূ মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় গিয়ে একটি অনাবাদী জমির উপর বসে পড়লো। একটু পরে উঠেই আবার কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হলো। তারপর আবার ফিরে এসে পূর্ববর্তী স্থানে এসে বসে পড়লো। এবার উটনীটি বসে গা ঝাড়া দিল, ঘাড় নীচু করে ফেললো এবং লেজ দোলাতে লাগলো।

সেই অনাবাদী জমির পাশেই ছিল হযরত আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা)-এর বাড়ী। তিনি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে হযরত নবী করীম (সা)-এর সামান-পত্র বহন করে নিজের ঘরে নিয়ে উঠালেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সেখানেই অবস্থান করলেন।

ঐ পতিত জমিটি ছিলো সাহ্‌ল ও সুহায়ল নামক দুটি ইয়াতীম বালকের। সেখানে কয়েকটি খেজুর গাছ দাঁড়িয়েছিল। মূর্তিপূজারীদের কয়েকটি কবরও ছিল সেখানে। পশুপাল এসে এখানে বসতো। হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এ জমিটি কার ? মুআয ইব্‌ন আফরা আরয করলেন : জমিটা আমার দু'টি ইয়াতীম আত্মীয়ের ছেলের। এরা আমারই ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে। আমি তাদেরকে রাযী করে ফেলবো-। আপনি আপনার খুশিমত এখানে মসজিদ বানাতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : আমি তা মূল্য দিয়ে কিনতে চাই। বিনা মূল্যে তা' আমি কোন মতেই গ্রহণ করবো না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখনই তার মূল্য পরিশোধ করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশক্রমে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো। মূর্তিপূজারীদের কবরগুলোকে ভূমির সাথে সমান করে দেয়া হলো এবং মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। মুহাজিরীন ও আনসার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ কাজে লেগে থাকতেন। মসজিদের দেয়ালের গাঁথুনী পাথর ও কাঁদামাটির দ্বারা দেয়া হলো। খেজুর গাছের কাণ্ড ও পাতা দিয়ে তার ছাদের কড়িকাঠ ও চাল ছাওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হলো। মসজিদ এবং তার পাশে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাসস্থান নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি হযরত আবূ আইয়ূব

আনসারী (রা)-এর ঘরে তাঁর মেহমানরূপে অবস্থান করেন। ইনি সেই ইতিহাস বিখ্যাত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) যাঁর মাযার কনস্টান্টিনোপলে রয়েছে। তিনি ৪৮ হিজরীতে হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে ইন্তিকাল করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এগারো মাস কয়েকদিন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে নির্মিত এ মসজিদটি হযরত উমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত ঐরূপই ছিলো। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মসজিদটি আরো প্রশস্ত করেন। হযরত উছমান (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মসজিদের দেয়ালগুলো পাকা করান। তারপর ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের আমলে তা আরো প্রশস্ত করা হয় এবং নবী সহধর্মিণিগণের হুজরাসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদ মসজিদের শোভা বর্ধন করেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়ীতে অবস্থানকালেই হযরত মুহাম্মদ (সা) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত ও আবূ রাফি'ঈ (রা)-কে মক্কা পাঠিয়ে হযরত ফাতিমা (রা) হযরত উম্মে কুলসূম (রা), হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম্‌আ (রা), হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) এবং তার মা হযরত উম্মে আয়মন (রা)-কে মদীনায় আনিয়ে নেন এবং তাঁদের সকলের আসার পর হুযূর (সা) তাঁর নব নির্মিত হুজরায় গিয়ে উঠেন।

হিজরী সন

এ যাবত আমরা সন তারিখ উল্লেখ করতে নববী সন তারিখ ব্যবহার করে এসেছি। এর অর্থ ছিলো উক্ত ঘটনার সময়টি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির এত বছর পরের ঘটনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চান্দ্রমাসের প্রচলিত ক্রম ও নাম প্রাচীনকাল থেকে আরবে যেভাবে চলে আসছিল সেভাবেই আছে। তাই নববী সনের প্রথম বর্ষটি কয়েক মাস পরেই শেষ হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদীনা প্রবেশকে ১৪তম নববী বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে কিন্তু তখন নবুওয়াতের বা রিসালাত প্রাপ্তির মাত্র সাড়ে বার বছর কাল অতিক্রান্ত হয়েছিল। আর এভাবেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদীনা গমন থেকে হিজরী সন গণনা আরম্ভ করা হয়। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা) বারই রবিউল আউয়াল তারিখে মদীনায় আগমন করেছিলেন, তাই প্রথম হিজরী বর্ষটি সাড়ে নয় মাস পরেই সমাপ্ত হয়ে যায়। ১লা মুহাররম থেকে হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের সূচনা হয়। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা) দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন বলে বুঝে নিতে হবে।

হিজরী প্রথম বর্ষ

হিজরী প্রথম বর্ষের ঘটনাবলীর মধ্যে মসজিদে নববী নির্মাণ, নবী করীম (সা)-এর বাসস্থান নির্মাণ, মক্কার অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ উমামা আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর মৃত্যুর ঘটনাটিও উল্লেখের দাবী রাখে। আবূ উমামার কোন রোগ-শোক ছিলো না। অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ খবরটি পাওয়া মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন, বিধর্মীদের এ কথা বলার সুযোগ এসে গেলো যে, এ কেমনতর রাসূল যে, তার বন্ধুদের একজন আকস্মিকভাবে মারা গেলো। তাঁর ইন্তিকালের পর বনূ নাজ্জার-এর লোকজন এসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে

বললো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ উমামা আমাদের সরদার ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে আমরা সরদার শূন্য হয়ে গেলাম। আপনি আমাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দিন।"

জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : বনূ নাজ্জারের তোমরা তো আমার মামু। এজন্যে আমি নিজেও তোমাদেরই একজন। আমি নিজেই তোমাদের নকীব বা সরদাররূপে রইলাম। এ কথা শুনে বনূ নাজ্জারের লোকদের খুশির সীমা-পরিসীমা রইলো না। তারা আনন্দে বাগ বাগ হয়ে গেলো। তাদের মধ্য থেকে কাউকে নেতা নিযুক্ত করলে নেতৃত্ব প্রয়াসী অন্যরা হয়তো তাকে সহজে মেনে নিতে পারতো না। ফলে সাময়িকভাবে হলেও গোত্রটির মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এ বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে সে আশংকা দূর হয়ে গেল। এভাবে গোত্রটির সাহস ও ঐক্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধিই পেলো।

হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় এসে সর্বপ্রথম যে ব্যাপারটির প্রতি মনোযোগী হলেন তা হলো শহরের নিরাপত্তা বিধান এবং নাগরিকদের পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ বৃদ্ধি। তিনি মদীনায় পৌঁছেই উপলব্ধি করেন যে, মক্কা থেকে মুহাজিরগণ যেন মদীনাবাসীদের কষ্টের কারণ ও সমস্যা হয়ে না দাঁড়ান। সাথে সাথে দীনের খাতিরে সীমাহীন কষ্ট অকাতরে গ্রহণকারী এবং নিজেদের প্রিয় ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, অর্থ-সম্পদ, জমি-জমার মায়াত্যাগী মুহাজিরগণও যাতে কোনরূপ মর্মযাতনার শিকার না হন, সেদিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। তাই তিনি সমস্ত আনসার ও মুহাজিরকে একটি সমাবেশে একত্রিত করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদেরকে উপদেশ দিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপন করেন। প্রায় সকল মুহাজিরই কোন-না-কোন আনসারের ভাইয়ে পরিণত হলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দীনী ভাই হলেন খারিজা ইব্‌ন যুবায়র আনসারী (রা)। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হলো হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয আনসারী (রা)-এর সাথে। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর ভাই হলেন সা'দ ইব্‌ন রবী' আনসারী। হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব হলো সালামা ইব্‌ন সালামা (রা)-এর সাথে। হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) ছাবিত ইব্‌ন মুনযির আনসারী (রা)-এর ভাই হলেন। অনুরূপভাবে হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) ও হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা), হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) ও হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা), আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মোটকথা এক এক জন মুহাজির এক একজন আনসারীর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মদীনার আনসারগণ এ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের যে মর্যাদা প্রদর্শন করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। মুহাজিরগণকে আনসারগণ তাঁদের সত্যিকারের ভাই বলেই গ্রহণ করেন এবং নিঃসংকোচে নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁদের হাতে তুলে দেন। কোন কোন আনসার ভাই তো তাঁর মুহাজির ভাইয়ের মনতুষ্টির জন্য নিজের দু'টি স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে অগ্রসর হন। মুহাজিরগণও এমনি সতর্ক ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের ব্যয়ভার আনসার ভাইদের উপর চাপানো থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেন এবং এভাবে তাঁরা নিজেদের জীবিকা কায়িক শ্রম দ্বারা নির্বাহ করতে শুরু করেন। এভাবে তাঁরা তাদের আনসার ভাইদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রথম শাসনতান্ত্রিক সনদ

হিজরী প্রথম বর্ষের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনাবাসী ইয়াহূদী ও মূর্তিপূজারী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মদীনাবাসীদেরকে নিয়ে একটি চুক্তিনামা প্রণয়ন করেন। সকল পক্ষই সন্তুষ্টচিত্তে এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিপত্রে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে ছিলো :

(ক) যখন মদীনায় কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হবে, তখন সকলে মিলে তা প্রতিরোধ করবে।

(খ) মদীনার ইয়াহূদীরা মক্কার কুরায়শ কিংবা তাদের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ মুসলমানদের কোন শত্রুকে আশ্রয় দিবে না।

(গ) মদীনাবাসীরা কেউ কারো ধর্ম বা জানমালে হস্তক্ষেপ করবে না।

(ঘ) মদীনাবাসীদের কোন দুই পক্ষের মধ্যে যদি কলহ উপস্থিত হয় এবং তারা নিজেরা এর সমাধান করতে সমর্থ না হয়, তা হলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই তার ফায়সালা করবেন। এতে কোন পক্ষের আপত্তি থাকবে না।

(ঙ) যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বা লাভের মধ্যে সমস্ত মদীনাবাসীরা সমানভাবে অংশীদার থাকবেন।

(চ) যে সমস্ত গোত্রের সাথে মদীনার ইয়াহূদীদের চুক্তি বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, ঐ গোত্রসমূহ মদীনার মুসলমানদেরও মিত্র বলে গণ্য হবেন এবং বন্ধুত্বমূলক আচরণ তাদের প্রাপ্য হবে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত গোত্রের সাথে মুসলমানদের মিত্রতা রয়েছে, মদীনায় ইয়াহূদীরা তাদেরকে মিত্ররূপে গণ্য করবে এবং তারা তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে।

(ছ) মদীনার সীমানার মধ্যে খুনাখুনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

(জ) অত্যাচারিতের সাহায্য করা সকলের সাধারণ কর্তব্য বলে গণ্য হবে, ইত্যাদি।

এ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনার আশেপাশের গোত্রসমূহকেও এ চুক্তিতে শামিল করতে প্রয়াসী হন- যাতে করে হত্যা, হানাহানি ও অশান্তির মূলোৎপাটন হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'উসফান' নামক স্থান সফর করেন এবং বনী হামযা ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদে মানাফ গোত্রকে এ চুক্তির মধ্যে শামিল করে তাদের সরদার আমর ইব্‌ন মাখশীর স্বাক্ষর আদায় করেন। বাওয়াত পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকেও তিনি এ চুক্তিতে শামিল করেন। ইয়াম্বুঈর দিকে অবস্থিত যিল-আশারা নামক স্থানেও তিনি গমন করেন এবং বনূ মুদলিজ গোত্রকেও এতে স্বাক্ষর করান। হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেই শান্তি-শৃংখলা বিধান ও জনসেবামূলক কার্য তৎপরতার দ্বারা এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করেন যাতে মানুষ দীন-ইসলামকে বুঝে শুনে তা গ্রহণ করতে পারে। হযরত নবী (সা)-এর এ প্রচেষ্টা যখন অব্যাহত গতিতে চলছিল, তখন মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বসবাসকারী সকল গোত্র পুরোপুরি এতে শামিল হওয়ার পূর্বেই মদীনার ভিতরে ভিতরে এবং মদীনার বাইরে থেকে প্রকাশ্যেই শত্রুরা হামলা চালাতে শুরু করলো।

মুনাফিকীর উদ্ভব

মদীনায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য ইব্‌ন সলূল নামক একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও ধুরন্ধর লোক বাস করতো। আওস ও খাযরাজ গোত্রে তার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সকলেই তাকে নেতা বলে গণ্য করতো। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় এর কিছু দিন আগেও বুআছের যুদ্ধে একে অপরের মুকাবিলা করছিল। এ যুদ্ধে উভয় গোত্রেরই বাছা বাছা সরদাররা নিহত হন এবং গোত্রদ্বয় অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য এ পরিস্থিতির সুযোগ নেয় এবং উক্ত দু'টি গোত্রে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেয়নি। মদীনাবাসীরা তাকে তাদের সর্বসম্মত নেতারূপে ঘোষণার উপক্রম করছিল। এমন কি তার অভিষেকের উদ্দেশ্যে তারা একটা মুকুটও তৈরী করে ফেলেছিল। এমনি সময় মদীনায় ইসলাম ও তাঁর নবীর আবির্ভাব ঘটে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদীনায় আগমনের সাথে সাথে মুসলমানরাই মদীনার সবচাইতে বড় শক্তি বলে বিবেচিত হতে লাগলো। অবশেষে উপরোক্ত চুক্তিপত্রে সকলে সই করে দিয়ে তাদের সে শক্তি ও আধিপত্যকে সকলেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যর বাড়াভাতে ছাই পড়লো। তার বাদশাহী ও সরদারীর স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেল। কিন্তু লোকটি যেহেতু অত্যন্ত ধুরন্ধর ছিল, তাই হযরত নবী (সা)-কে তার পরম শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করলেও সে মনোভাবের প্রকাশকে নিরর্থক মনে করে সে তা মনে মনেই চেপে রইলো। আওস ও খাযরাজের যেসব লোক তখনো মূর্তিপূজারী ছিলো তাদের উপর তার আধিপত্য তখনো পূর্ববৎ অটুট ছিল। মক্কার কুরায়শরা যখন জানতে পারলো হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুচরগণ মদীনায় গিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছেন এবং দিন দিন ইসলামের প্রসার ঘটছে, তখন সর্বপ্রথম তারা যে দুষ্টামিটি করলো তা হলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য এবং মদীনার মুশরিকদেরকে তারা এ মর্মে একটি সতর্কবাণী পাঠালো যে, আমাদের লোকদেরকে তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের ওখানে থাকতে দিচ্ছ। তোমাদের এখন উচিত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া। যদি তোমরা তা না কর তবে আমরা সুসজ্জিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করবো। তোমাদের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের রমণীদেরকে আমরা হস্তগত করবো।

এ খবর পাওয়া মাত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য মদীনার মুশরিকদেরকে একত্রিত করলো এবং তাদেরকে মক্কাবাসীদের এ বার্তাটি সম্পর্কে অবহিত করে সকলকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করলো। ঘটনাচক্রে হযরত মুহাম্মদ (সা) তার এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমাবেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সেই সমাবেশকে লক্ষ্য করে বললেন : "মক্কার কুরায়শরা তোমাদেরকে প্রতারিত করতে চাচ্ছে। যদি তোমরা তাদের প্রতারণার জালে ধরা দাও এবং তাদের হুমকিকে আমল দাও, তাহলে তোমরা দারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের জন্যে সমীচীন হবে এই যে, তোমরা তাদেরকে সাফ জবাব দিয়ে দেবে এবং আমাদের সাথে কৃত তোমাদের চুক্তির উপর অটল থাকবে। যদি একান্তই কুরায়শরা মদীনা আক্রমণ করেও তবে তাদেরকে প্রতিরোধ করা এবং তাদের সাথে লড়াই করা আমাদের জন্যে খুব সহজই হবে। কেননা, আমরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করবো। পক্ষান্তরে যদি তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তাহলে নিজ হাতে তোমরা নিজেদের পুত্র, ভাই ও নিকটাত্মীয়দেরকে

হত্যা করবে এবং এভাবে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করবে।" হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথাগুলো উপস্থিত সকলেই সমর্থন করলো এবং তৎক্ষণাৎ সভা বন্ধ হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য তা নীরবে প্রত্যক্ষ করলো।

এ বছরই মুসলমানদেরকে মসজিদে আহবান করার জন্যে আযানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। এ বছরই ইয়াহূদীদের একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। ঐ বছরই হযরত সালমান ফারসী (রা) যিনি প্রথমে মজুসী বা অগ্নি উপাসক ছিলেন তারপর খ্রিস্টান হন এবং ইয়াহূদী-নাসারাদের কিতাবাদি অধ্যয়ন করে আখিরী যামানার নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন— তিনি হযরত নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। এ বছরই যাকাতও ফরয হয়।

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা থেকে সহি-সালামতে তাশরীফ নিয়ে চলে যাওয়াটাকেই কাফির মুশরিকরা মস্ত পরাজয় বলে মনে করছিলো। এবার থেকে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা মুসলমানদের উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় নিয়োজিত হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করাটাই ছিলো তাদের সর্বাগ্রগণ্য ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের তুলনায় অন্যান্য কাজ ছিলো তাদের কাছে গুরুত্বহীন। এজন্যে তারা তাদের নিজেদের মধ্যকার খুঁটিনাটি মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা এ কাজে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিলো। মক্কা ও মদীনার দূরত্ব ছিলো প্রায় তিন শত মাইলের। মদীনার উপর আক্রমণ চালাতে হলে তাদের বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো। মদীনায় যেতে যেসব গোত্র পথে পড়ে সেসব গোত্র এবং আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজেদের পক্ষে টানা বা কমপক্ষে তাদের সহানুভূতি লাভও জরুরী বলে বিবেচিত হচ্ছিলো। একজন বিচক্ষণ নেতা এবং দূরদর্শী সিপাহ্সালাররূপে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও এ অবশ্যম্ভাবী সংকটের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতিও তিনি ইতিমধ্যেই লাভ করে ফেলেছিলেন। দীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামে প্রবেশকারীদের পথের অহেতুক অন্তরায় দূর করাও ছিল একটি জরুরী কাজ। এদিকে মদীনায় মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা তিন চার শ'র বেশী ছিলো না। যদিও সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের দিক থেকে তারা দুর্বল ছিলেন, কিন্তু কাফিরদের দুষ্টামি ও সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখে তাদের আরবী জিদ এবং বীরত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। তাঁরা বারবার কাফিরদের মুকাবিলা করার এবং তীর তলোয়ার দিয়ে তাদের সমুচিত জবাব দানের অনুমতি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দরবারে পেশ করছিলেন। এখন যেখানে ইসলামের সভ্যতা এবং ঈমানের শক্তি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে, মুসলমানরা হৃদয়বিদারক অত্যাচার-অবিচারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে দুনিয়ার সম্মুখে ইসলামের প্রতি আসক্তি যে সর্বপ্রকার ভীতি ও প্রলোভনের উর্ধ্বে তা সুপ্রমাণিত করে ফেলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দুরাচারদেরকে শাস্তি দানের এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি লাভের পর অনুমতিও এসে গেছে, তারপরও ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার প্রতি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে যে, হযরত নবী করীম (সা) সব সময়েই যুদ্ধের উপর শান্তিকে এবং প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের উপর ক্ষমাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মক্কার জনৈক কাফির নেতা কুরয ইব্ন জাবির একটি দলকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে এসে মদীনার

সন্নিহিত চারণ ভূমিতে হানা দিয়ে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক উট নিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা এ সংবাদ জানতে পেয়ে সাফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু শিকার তখন হাতছাড়া হয়ে গেছে। তারা আর শত্রুর দেখা পেলেন না। অগত্যা তারা ফিরে আসেন। এটা ছিল মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে খোলা চ্যালেঞ্জ ও যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। তারা মদীনাবাসীদেরকে বুঝিয়ে দিল যে, আড়াইশ' মাইল দূর থেকে এসে আমরা মদীনায় তোমাদের ঘরে হানা দিয়ে তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিতে পারি। আনুসঙ্গিক অন্যান্য প্রচেষ্টা থেকেও তারা হাত গুটিয়ে ছিল না। তারা একদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যর সাথে এবং অপর দিকে মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে রীতিমত চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংযাগ রক্ষা করে চলছিলো এবং ভিতরে ভিতরে এদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল।

এ বছরেরই শা'বান মাসে কিবলা পরিবর্তনের আদেশ নাযিল হয়। এর কয়েকদিন পরেই শা'বান মাস শেষ হওয়ার আগেই রমযানের সওম ফরয হয়। রমযানের শুরুতেই মদীনায় এ খবরটি পৌছলো যে, মক্কাবাসীদের একটা কাফেলা শামদেশ থেকে আসছে এবং মদীনার পাশ দিয়ে তা অতিক্রম করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কাবাসীদের মনে এক প্রকার ভীতি সৃষ্টি এবং কুরয ইব্ন জাবিরের হামলার জবাব স্বরূপ মুহাজির ও আনসারদের একটি জামাআতকে মক্কাবাসীদের এ কাফেলাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন, যাতে করে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, মদীনাবাসীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, এমন কি এতে সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্যপথ বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এ কাফেলাটি আদৌ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়নি–নিছক খবরদারী ও হুশিয়ারী প্রদানই এর উদ্দেশ্য ছিল বিধায় সামরিক গোপনীয়তাও তাঁদেরকে প্রেরণের সময় রক্ষিত হয় নি। ফলে, তাদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ সাথে সাথেই মক্কাবাসীদের কাছে পৌছে যায় এবং তারা সতর্ক হয়ে যায়। কাফেলার সর্দার আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত সন্তর্পণে কাফেলাকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সে যামযাম ইব্ন আমর গিফারীকে পারিশ্রমিক দিয়ে রাস্তা থেকেই মক্কায় সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে হামলার আশংকা রয়েছে, সুতরাং নিজেদের বাণিজ্যসম্ভার রক্ষার্থে সাহায্যের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও। সংবাদ পাওয়া মাত্র আবূ জাহেল সাতশ' উট ও তিনশ' ঘোড়াসহ এক হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মক্কা থেকে বের হলো। এ বাহিনীর প্রতিটি সৈন্যই ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং বর্ম পরিহিত। গায়ক-সংবাদ পাঠকরাও তাদের সাথে ছিল। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, উত্বা ইব্ন রবীআ, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ, নযর ইব্ন হারিছ, আবূ জাহেল ইব্ন হিশাম প্রমুখ তেরজন খাদ্য পরিবেশনকারী ছিল। আবূ সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে মক্কায় উপনীত হলো। মুসলমানদের যে দলটি কেবল কাফেলাওয়ালাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল তাঁরা মদীনায় ফিরে চললেন।

বদর যুদ্ধ

আবূ সুফিয়ান আবূ জাহেলের কাছে সংবাদ পাঠালো যে, আমরা নিরাপদে মক্কায় পৌছে গিয়েছি। সুতরাং তোমরা ফিরে এসো। কিন্তু আবূ জাহেল তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর জন্যে গর্বিত

ছিলো। এমনি ফিরে যাওয়াটা তার মনঃপূত হলো না। আসলে আবূ জাহেল কেবল কাফেলার হিফাযতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে সদলবলে বেরোয়নি, বরং কুরায়শদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বতনে নাখলার দিকে হযরত নবী (সা)-এর প্রেরিত কয়েকজন মুসলমানের হাতে নিহত কুরায়শদের জনৈক মিত্র আমর ইব্‌ন হাযরামীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ছলে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিলো। যামযাম ইব্‌ন আমর কাফেলাওয়ালাদের পক্ষ থেকে সাহায্যের অনুরোধ পৌঁছানো মাত্র সে সদলবলে বেরিয়ে পড়ে এবং মারমার রবে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কুরায়শ বাহিনীর যাত্রার সংবাদ হযরত নবী (সা) যথাসময়েই পেয়ে যান। তিনি এও জানতে পারলেন যে আবূ জাহেল, উত্‌বা, শায়বা, ওয়ালীদ, খাকলা, উবায়দা, 'আসী, হুরছ, তুআয়মা, যামআ, আকীল, আবুল বুখতারী, মাসঊদ, বানিয়্যা, মুনাব্বা, নাওফিল, সাইব, রিফাআ প্রমুখ বড় বড় কুরায়শ সরদাররা এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি পরামর্শ সভা আহবান করে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন যে, মক্কা তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে তোমাদের দিকে রওয়ানা করে দিয়েছে। এদের সাথে মুকাবিলা করার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত মিকদাদ (রা) একে একে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত তেজোব্যঞ্জক ও বীরত্বপূর্ণ ভাষায় বললেন : আমরা ঐ বনী ইসরাঈলদের মতো নই যারা হযরত মূসা (আ)-কে বলে দিয়েছিল :

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

আপনি আর আপনার প্রভু দু'জনে গিয়ে ফিরাউনের সাথে যুদ্ধ করুন! আমরা এখানে বসে বসে তা উপভোগ করবো।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা) আবার বললেন : কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত ? দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিলো আনসারদের অভিমত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, উপরিউক্ত তিনজনই ছিলেন মুহাজির। আনসারগণ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অভিলাষ উপলব্ধি করলেন। তাই তাঁদের পক্ষ থেকে হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার এ প্রশ্নের উদ্দিষ্ট বোধ হয় আমরা আনসাররাই ? জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : হাঁ, তাই। হযরত সা'দ (রা) তখন বললেন :

আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি। এটা কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্যে নির্গত হবেন আর আমরা ঘরে বসে থাকবো ? এই কাফিররা তো আমাদের মতো মানুষই! আপনি যদি নির্দেশ দেন যে, ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়, তা'হলে আমরা নিঃসংকোচে আপনার সে নির্দেশও পালন করবো এবং অকাতরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) এ মর্মে আশ্বস্ত হলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, তখন তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করতে মনস্থ করলেন। যুদ্ধে যাবার মতো উপযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিলো মোট তিন শ' দশ, অথবা তিন শ' বার অথবা তিন শ' তের জন, শহর থেকে বেরিয়ে যখন তিনি তাঁর বাহিনীর পর্যালোচনা করলেন তখন লক্ষ্য

করলেন তিন শ' তেরজন লোক। এর মধ্যেও কেউ কেউ বয়সে এতোই কম ছিলো যে, যারা যুদ্ধ করার মতো উপযুক্ত হয়নি। তিনি তাদেরকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তাঁরা ফিরে যেতে রাযী হলেন না, অনেক কাকুতি-মিনতি করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি হাসিল করলেন।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের সরঞ্জাম ছিল নিম্নরূপ

দুটো মাত্র ঘোড়া—যেগুলোতে হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত মিকদাদ (রা) সওয়ার ছিলেন। উট ছিলো সত্তরটি—এর প্রত্যেকটিতে তিন তিন জন চার চার জন করে আরোহী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) যে উটটিতে সওয়ার ছিলেন, তার পিঠেও আরো দু'তিনজন আরোহী ছিলেন। তারপরও অনেকে সওয়ারী হীন ছিলেন। এ ইসলামী বাহিনীটি যখন বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলো, তখন দেখা গেলো যে, কাফিররা ইতিপূর্বেই সেখানকার উঁচু ভূমিতে এসে তাঁবু গেড়ে ফেলেছে। অগত্যা মুসলমানদেরকে নীচু ও বালুময় অংশেই অবস্থান নিতে হলো। কিন্তু বদরের পানির ঝরনাগুলো মুসলমানদের অংশেই পড়লো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর বাহিনীর লোকদেরকে বলে দিলেন, কাফিরদের কেউ পানি নিতে আসলে তাদেরকে বাধা দিও না। সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সা)-এর জন্যে একটি ছোট ঝুপড়ি তৈরী করে দিলেন। তিনি সেখানে ইবাদত ও দু'আ করতেন। সংখ্যায় সাহাবায়ে কিরাম তো কুরায়শদের এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন, কিন্তু সাজ-সারঞ্জামের দিক থেকে তাঁরা তাদের এক–শতাংশও ছিলেন না। কাফিরদের সবাই ছিলো বর্ম পরিহিত এবং প্রত্যেকে বয়সে ছিলো যুবক। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা ছিলো তাঁরা ক্ষুধা কাতর, দুর্বল, অসুস্থ ও ক্ষীণকায়। সকলের কাছে মামুলী হাতিয়ারও পুরোপুরি ছিলো না। কারো কাছে হয়তো তলোয়ার আছে, কিন্তু বল্লম বা ধনুক নেই, কারো কাছে হয়তো বল্লম আছে, কিন্তু তলোয়ার নেই। মুসলমানগণ সেনা ছাউনী স্থাপন করলেন। ওদিকে কুরায়শরা উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব জামূহীকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালো। মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা জানার জন্য তারা তাকে পাঠিয়েছিলো। উমায়র ফিরে গিয়ে জানালো যে, মুসলমানদের সংখ্যা তিন শ' দশের বেশী নয় এবং এদের মধ্যে কোন দু'জন অশ্বারোহী আছে। কাফিরদের দর্প যে কী পরিমাণ ছিলো তা এর দ্বারাই অনুমেয় যে, উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ মুসলমানদের এ সংখ্যাস্বল্পতার কথা শুনেই বলে উঠলো, এ অল্প কয়টি লোকের সাথে যুদ্ধ করে কাজ নেই, চল আমরা যুদ্ধ না করেই ফিরে যাই। কেননা, আমাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে এত বেশী যে, এ হবে এক অসম যুদ্ধ। এতে বাহাদুরীর কিছুই নেই। কিন্তু আবূ জাহেল তাতে সম্মত হলো না। সে বললো : হোকগে, এদের মূলোৎপাটন করাই হবে আমাদের কাজ।

যুদ্ধ শুরু

অবশেষে পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান রণক্ষেত্র জেগে উঠলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রথমে তাঁর ইবাদতের সেই ছোট্ট ঝুঁপড়ীতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ فَلاَ تُعْبَدُ فِىْ الْاَرْضِ اَبَدًا

হে আল্লাহ, যদি ঈমানদারদের এই দলটিকে তুমি ধ্বংস করে দাও, তবে যমীনে তোমার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না।

তারপর তিনি দু'রাকাআত নামায পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য তিনি তন্দ্রাগ্রস্ত হলেন। তারপরই মুচকি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললেন :

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ .

কাফির বাহিনী পরাজিত হবে এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যুদ্ধের সূচনা তোমরা করবে না। মুসলমানদের মধ্যে আশিজন অথবা তার চাইতে আরো দু'তিনজন বেশী সংখ্যক মুহাজিরীন এবং অবশিষ্টরা আনসার ছিলেন। আনসারদের মধ্যে আওস গোত্রসমূহের একষট্টিজন ও ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যরা সারিবদ্ধ হলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে একটি তীর ছিল। তিনি সেই তীরের ইংগিতে সারিগুলোকে বিন্যস্ত করছিলেন। তারপর আরবের প্রথা অনুসারে কাফিরদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম রবীআর পুত্রদ্বয় উত্‌বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো এবং মুসলিম সৈন্যদের তিনজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহবান জানালো। এদের মুকাবিলা করার জন্যে আনসারদের মধ্য থেকে আফরার পুত্রদ্বয় আওফ ও মুআব্বিয এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বেরিয়ে এলেন। উত্‌বা জিজ্ঞেস করলো من انتم-তোমরা কারা হে ? তাঁরা জবাব দিলেন : رهط من الانصار আমরা আনসার অর্থাৎ মদীনাবাসী মুসলমান। উতবা অত্যন্ত দর্পের সাথে শ্লেষাত্মক সুরে বলে উঠলো :

ما لنا بكم من حاجة

তোমাদের সাথে আমাদের লড়বার প্রয়োজন নেই।

তার পর চীৎকার করে বললো :

محمد اخرج الينا احفاءنا من قومنا

হে মুহাম্মদ! আমাদের স্বজাতীয় এবং সমকক্ষদেরকে আমাদের সাথে মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করো!

হযরত মুহাম্মদ (সা) উতবার মুকাবিলায় হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে, শায়বার মুকাবিলায় হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা)-কে এবং উতবার পুত্র ওয়ালীদের মুকাবিলায় হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে অবতীর্ণ হতে আদেশ দিলেন। উতবা এ তিন জনের নাম কি কি জিজ্ঞেস করলো। অথচ এঁদেরকে সে খুব ভাল করেই চিনতো। এঁদের নাম শুনে বললো : হাঁ, তোমাদের সাথে আমাদের লড়াই হতে পারে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। হযরত হামযা (রা) এবং হযরত আলী (রা) প্রথম আঘাতেই উত্‌বা এবং ওয়ালীদ পিতাপুত্র উভয়কে পরাভূত ও কতল করলেন। শায়বার মুকাবিলায় হযরত উবায়দা (রা) আহত হলেন। যখম ছিল মারাত্মক, তাই সে আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত আলী (রা) তখন অগ্রসর হয়ে শায়বাকে হত্যা করলেন এবং উবায়দা (রা)-কে উঠিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। তারপর কাফিররা সারিবদ্ধ হলো। এদিকে মুসলমানরাও সক্রিয় হলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো। ফলাফল দাঁড়ালো এই যে, কাফির পক্ষ তাদের সত্তর জন

বীরের শবদেহ এবং নব্বই জনকে বন্দী অবস্থায় রেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হুযূর (সা) একটি ছায়াযুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং নিজ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, কুরায়শদের সাথে আগত বনী হাশিম-এর লোকজন যেহেতু স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, কুরায়শদের চাপের মুখে এসেছেন তাই তাদের প্রতি যেন কঠোরতা প্রদর্শন না করা হয় এবং আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে যেন হত্যা করা না হয়। অনুরূপভাবে আবদুল বুখতরী সম্পর্কেও তিনি বলে রেখেছিলেন যে, তার ব্যাপারেও যেনো তেমন কঠোরতা অবলম্বন না করা হয়। এ নির্দেশ শুনে আবূ হুযায়ফা বলে উঠলেন : এটা কেমন করে হতে পারে যে, আমি আমার সহোদরকে হত্যা করবো এবং আব্বাসকে ছেড়ে দেবো। আব্বাস যদি আমার মুকাবিলায় আসেন, তাহলে তো নির্ঘাত তাঁকে আমি হত্যা করবো, একটুও দ্বিধাবোধ করবো না। পরবর্তীকালে হুযায়ফা এজন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং এজন্যে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন। মাহ্যার ইব্ন যিয়াদের মুকাবিলা হয় আবুল বুখতরীর সাথে। মাহযার ইব্ন যিয়াদ বলেন যে, আমাদের প্রতি তোমার সাথে লড়তে নিষেধ আছে, তাই তুমি আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও! আবুল বুখতরী তার এমন একজন সাথীকে বাঁচাতে প্রয়াস পায়–যাকে মাহযার ইব্ন যিয়াদ হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। এ প্রয়াস চালাতে গিয়ে আবুল বুখতরী নিহত হয়। উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ এবং তার পুত্র আলী ইব্ন উমাইয়া নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করছিলো। উমাইয়া ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে বন্ধুত্ব ছিলো। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাকে এ অবস্থায় দেখে নিজের হিফাযতে নিয়ে নেন এবং উমাইয়ার হাত ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। এমন সময় হযরত বিলাল (রা) তাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে আনসার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সবাই মিলে পিতাপুত্র দু'জনকে হত্যা করেই তবে ছাড়েন। হযরত উমায়র ইব্ন হুমাম আনসারী (রা) নামক এক সাহাবী খেজুর খেতে খেতে হুযূর (সা)-এর কাছে এসে আরয করেন : যদি আমি কাফিরদের সাথে লড়তে লড়তে মারা যাই তা হলে কি সাথে সাথে জান্নাতে চলে যাবো ? প্রিয়নবী (সা) বললেন : হাঁ। তখন ঐ সাহাবী হাতের খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে দুশমনদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

লড়াই যখন খুব জোরসোরে চলছিল তখন হুযূর (সা) এক মুষ্টি ধূলো মাটি নিয়ে তাতে দম করে তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে কাফির সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। ঘটনাক্রমে এক আনসারী তরুণ হযরত মুআয ইব্ন আমর (রা)-এর সাথে আবূ জাহেলের মুকাবিলা হয়। আবূ জাহেলের দেহ লৌহ বর্মাদির দ্বারা পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিলো। হযরত মুআয ইব্ন আমর (রা) এক ফাঁকে আবূ জাহেলের পা খোলা দেখে সেই বরাবর এমন জোরে কোপ দিলেন যে, পা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আবূ জাহেলের পুত্র ইকরামা পিতার এ শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে মুআয ইব্ন আমর (রা)-এর উপর এমনি এক আঘাত হানলো যে, তাঁর বাম হাত স্কন্ধের নিকট থেকে কেটে গিয়ে ঝুলে পড়লো। হাতটি তখন কেবল চামড়ার উপরই লটকে ছিলো। হযরত মুআয (রা) সারা দিন এ অবস্থাতেই লড়াই করে যেতে লাগলেন। ঝুলন্ত হাতটি যখন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি নিজেই হাতটি পায়ের নীচে রেখে টান দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর আনসারের অপর এক তরুণ মুআব্বিয ইব্ন

আফরা আবূ জাহেলের নিকটবর্তী হয়ে এমনি এক আঘাত হানলেন যে, সে অর্ধমৃত হয়ে গেলো। কাফিররা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালালো আর মুসলমানেরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ জাহেলের শবদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে কিনা তদন্ত করে দেখতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে শবদেহগুলো পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলো। আবূ জাহেলকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তার বুকের উপর চেপে বসে বললেন : আল্লাহর দুশমন, দেখ, আল্লাহ্ তোকে কিভাবে অপদস্থ করলেন! আবূ জাহেল জিজ্ঞেস করলো, যুদ্ধের ফলাফল কী হলো ? হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন : মুসলমানদের জয় এবং কাফিরদের পরাজয় হয়েছে। একথা বলেই তিনি তার শির কাটতে উদ্যত হলেন। আবূ জাহেল বললো : আমার গলাটি কাঁধের একেবারে নিকটে এমনভাবে কাটবে যেনো অন্যান্য কাটা শিরের তুলনায় তা একটু দীর্ঘ বলে মনে হয় এবং স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটা সরদারের শির। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তার শির কেটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কদম মুবারকের নিকট তা ফেলে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ জাহেলের কর্তিত শির দেখে আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন। এ যুদ্ধে মোট চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। এঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মুহাজির এবং আটজন আনসার। যুদ্ধান্তে হযরত মুহাম্মদ (সা) শহীদদের লাশ দাফন করলেন। মুশরিকদের লাশ একটি বড় গহবরে বা কূপে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হলো। কেবল উমাইয়া ইব্ন খালফের লাশ শতধাবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উঠিয়ে নিয়ে কূপে নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়নি। তার লাশ যেখানে ছিলো, সেখানেই মাটি চাপা দেয়া হয়।

কাফিররা এমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে মাঠ পরিত্যাগ করেছিল যে, তাদের অর্ধমৃত নেতা আবূ জাহেলকে পর্যন্ত তারা রণক্ষেত্রেই আহত অবস্থায় ফেলে যায়। হারিছ ইব্ন যামআ, আবুল কায়স ইবনুল ফাকিহ, আলী ইব্ন উমাইয়া ও 'আস ইব্ন খাবআ ছিল বয়সে তরুণ। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানের সময় এঁরা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন অথবা সম্ভবত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাসন করে এবং মুরতাদ হওয়ার প্ররোচনা দেয়। প্রাণ রক্ষার্থে বাহ্যিকভাবে তাঁরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পর্ক ত্যাগের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং কাফির বাহিনীর সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। মক্কার যেসব বড় বড় সরদার এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রায় সবাই নিহত হয়। পরাজিত এ কাফির বাহিনী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠে। হযরত নবী করীম (সা) যুদ্ধলব্ধ সমস্ত গনীমতের মাল একত্রিত করে বনূ নাজ্জার বংশীয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'বের হাতে অর্পণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে মদীনার উঁচু ও নীচু এলাকায় যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ দানের জন্যে প্রেরণ করলেন। হযরত উসামা ইব্ন যায়দ–যাঁকে হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় তাঁর নায়েবরূপে রেখে এসেছিলেন, তিনি বলেন যে, যুদ্ধজয়ের এ সুসংবাদ ঠিক ঐ সময় আমাদের কাছে পৌঁছলো যখন আমরা নবীনন্দিনী ও হযরত উসমান (রা)-এর সহধর্মিণী হযরত রুকাইয়া (রা)-কে দাফন করছিলাম। মদীনায় ১৮ই রমযান তারিখে এ সুসংবাদটি পৌঁছে।

যুদ্ধশেষে বদরের যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে হযরত নবী করীম (সা) মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। সাফরা নামক স্থানে এসে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সমস্ত গনীমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে নযর ইব্‌ন হারিছের প্রাণদণ্ডাদেশ দান করলেন। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আরকুয যাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়ত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লায়তের প্রাণ দণ্ডাদেশ দান করলেন। বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে এরা দু'জন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ইসলামের সঙ্গে চরম শত্রুতা করতো এবং বিবাদ ও ষড়যন্ত্র করার ব্যাপারে আবূ জাহেলের সমকক্ষ ছিলো। নযর ইব্‌ন হারিছকে সাফরা নামক স্থানে হযরত আলী (রা) এবং উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়তকে আরকুয যাবিয়া নামক স্থানে হযরত আসিম ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা) কতল করেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা) বন্দীদেরকে এবং তাদের প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনীকে পিছনে রেখে দ্রুত মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তার একদিন পরে বন্দীরাও মদীনায় পৌঁছে।

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকীদ

যুদ্ধবন্দীরা মদীনায় পৌঁছলে হযরত নবী করীম (সা) তাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ দিলেন। বন্দীদের মধ্যে আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র যুদ্ধে কাফির বাহিনীর পতাকাবাহক ছিলো। এ দিকে সে হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর ভাইও ছিলো।

স্বয়ং আবূ আযীযের বর্ণনা : যখন মুসলমানরা আমাকে বন্দী করে বদর থেকে মদীনার দিকে নিয়ে চলেছিলো তখন আমি আনসারদের একটি দলের প্রহরাধীন ছিলাম। ঐ আনসার দলটি যখন খাবার খেতে বসতেন, তখন তাঁরা আমাকে রুটি খেতে দিয়ে নিজেরা খেজুর খেয়েই দিন কাটাতেন। আমি লজ্জায় তাদের কোন একজনের দিকে রুটি ঠেলে দিলে সে ব্যক্তি পুনরায় আমাকে তা ফিরিয়ে দিতো। মদীনা পৌঁছার পর আবূ আযীয আবূ বশীর আনসারীর ভাগে পড়লো। হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) আবূ বশীর আনসারীর সাথে দেখা করে বললেন : একে খুব দেখে শুনে রাখবে এবং এর সাথে খুবই কঠোর ব্যবহার করবে। এর মা খুবই ধনাঢ্য মহিলা। আবূ আযীয যখন লক্ষ্য করলো যে, তার আপন ভাই তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য তার রক্ষাবেক্ষণকারীকে তাকীদ দিচ্ছেন, তখন সে বলে উঠলো : ভাইজান, এই কি ভাইয়ের প্রতি আপনার শুভ কামনা ? হযরত মুসআব (রা) জবাব দিলেন : তুই আমার ভাই না। আমার ভাই হচ্ছে তোর রক্ষণাবেক্ষণকারী-ই। আবূ আযীযের মা চার হাজার দিরহামের মুক্তিপণ পাঠিয়ে ছেলেকে মুক্ত করেন। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌঁছলে যেভাবে কাফিররা বিষন্ন হলো, ঠিক তেমনি যেসব মুসলমান হিজরত করে আসতে পারেননি বরং নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা গোপন করে মক্কায় বসবাস করছিলেন তাঁরা এ সংবাদে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন। আবূ লাহাব কোন কারণে এ যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। সে যখন মক্কার বড় বড় সরদারদের নিহত ও কুরায়শদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ জানতে পারলো তখন এতই মর্মাহত হলো যে, এর এক সপ্তাহ পরে সে মারাই গেলো।

যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত নীতি

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হযরত নবী করীম (সা) মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) বললেন : আমার

অভিমত হচ্ছে, বন্দীদের মধ্যে আমাদের যার যে নিকটাত্মীয় রয়েছে সে তাকে নিজ হাতে হত্যা করবে যাতে করে মুশরিকরা উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, আমাদের অন্তরে আমাদের নিকটাত্মীয়দের চাইতে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অনুরাগ অনেকগুণ বেশী রয়েছে এবং ইসলামের মুকাবিলায় আত্মীয়তা বন্ধন আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন : আমার অভিমত হচ্ছে ফিদয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণ করে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে মুসলমানরা যেমন কিছু অর্থ লাভ করে যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি কিনে নিতে পারবে, অপরদিকে যুদ্ধবন্দীদের অনেকেই হয়তো পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক লাভ করবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভিমতকেই হযরত নবী করীম (সা)-এর মনঃপূত হলো। কোনো কোনো বন্দীকে বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি দেয়া হলো। মাথা প্রতি চার হাজার দিরহাম থেকে নিম্নতম এক হাজার দিরহাম মুক্তিপণ পাঠিয়ে মক্কাবাসীরা তাদের বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেয়। যে সমস্ত বন্দী লেখাপড়া জানতো আর মুক্তিপণ আদায়ের সামর্থ্য তাদের ছিল না, তাদেরকে বলা হলো দশটি করে মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শিক্ষা দিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নাও। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা যয়নাব (রা) তখনো মক্কায় তাঁর স্বামী আবুল 'আসের সাথে বসবাস করতেন। আবুল 'আসও বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত যয়নাব (রা) তাঁর গলার হার খুলে আবুল 'আসের মুক্তিপণরূপে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে বললেন : তোমরা যদি সঙ্গত মনে করো তা হলে যয়নাবের হারটি ফিরিয়ে দাও। কেননা এটা তার মা খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর স্মৃতিরূপে তাঁর কাছে রয়েছে। সবাই খুশীমনে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং আবুল 'আসকে ছেড়ে দিলেন। আবুল 'আস মক্কায় গিয়েই হযরত যয়নাব (রা)-কে মদীনায় হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার দীর্ঘ ছয় বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মক্কায় কাফিরদের প্রতিশোধস্পৃহা

মক্কায় এ পরাজয়ের পর যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হয় অতি সংগোপনে। নিহতদের উত্তরাধিকারীরা উচ্চৈঃস্বরে কোন বিলাপ করেনি। কেননা এ সংবাদে মুসলমানরা উল্লসিত হতো। সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া তার নিহত পিতা উমাইয়া ও সহোদর আলীর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে উমায়র ইব্ন ওয়াহবকে মদীনায় গিয়ে গোপনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করার জন্যে প্ররোচিত করে। উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব বিষমাখা তলোয়ার নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে হাযির হলো। তাকে দেখে কেন যেন হযরত উমর (রা)-এর মনে সন্দেহ হলো। তিনি উমায়রের তলোয়ারের হাতল ধরে তাকে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত নবী (সা) বললেন, উমর! তুমি উমায়রকে ছেড়ে দাও! তারপর তিনি উমায়রকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন : বল তো, তুমি কেন এসেছিলে ? জবাবে উমায়র বললো : আমার ছেলে আপনাদের হাতে বন্দী, তাকে মুক্ত করার জন্যে এসেছি। দয়া করে তাকে আপনি মুক্ত করে দিন ! হযরত নবী করীম (সা) বললেন : সত্যি কথা বলছো না কেন, আমাকে হত্যা করার জন্য সাফওয়ান তোমাকে প্ররোচনা দিয়ে পাঠায়নি ? তিনি সাফওয়ান ও উমায়রের গোপন পরামর্শের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে দিলেন। উমায়র তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন : আমি এক্ষুনি মুসলমান হচ্ছি এবং স্বীকার করছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। কেননা, এ ব্যাপারটি সাফওয়ান ও আমি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ঘুণাক্ষরেও কিছু জানা ছিলো না।

বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেন। ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা স্বয়ং কুরায়শরা মক্কায় গিয়ে বর্ণনা করে। মদীনার কোন কোন মুশরিক যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে পাহাড়ের উপর বসেছিল অথবা ঘটনাচক্রেই তারা সেসব পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলো। তাদের বর্ণনা: আমরা ঠিক যুদ্ধের সময় আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটি মেঘখণ্ড যুদ্ধের দিকে যেতে দেখলাম। সে মেঘখণ্ড যখন আমাদের অতি নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন আমরা তাতে ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি শুনতে পাই। কেউ একজন তখন বলছিলো, দ্রুত অগ্রসর হও ! বর্ণনাকারী বলেন, এ আওয়াজ শুনে আমরা এতই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লাম যে, ভয়ে আমার চাচাতো ভাই ঘটনাস্থলেই মারা গেলো।

বদর যুদ্ধশেষে ২২শে রমযান হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় আসেন। এ রমযান মাসের শেষ দিকে সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। ঈদের নামাযদ্বয় এবং কুরবানীও এ বছরই ধার্য হয়। এ বছরই হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলছুম (রা)-কে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে শাদী দেন এবং তিনি 'যিন্‌নূরায়ন' বলে অভিহিত হন। এ বছরই বদর যুদ্ধের পরে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর শাদী হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পাদন করেন।

মক্কার কাফিরদের মনে দ্রুত প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলে উঠলো। বদর যুদ্ধের ছ'মাস পর আবূ সুফিয়ান দুইশ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধার্থে মক্কা থেকে বের হলো। এরা মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছতেই হযরত নবী করীম (সা) সংবাদ পেয়ে গেলেন। তিনিও মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবূ সুফিয়ান খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়ে পলায়ন করলো। সাথে সাথে শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানে আগত দুই ব্যক্তিকে তারা হত্যাও করে যায়। ঐ নিহত দু' ব্যক্তির একজন হলেন হযরত সাঈদ ইব্‌ন আমর আনসারী (রা) এবং অপরজন তাঁর একজন চুক্তিবদ্ধ মিত্র। মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেতেই কাফির বাহিনী পালিয়ে গেল। তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে সাহস পায়নি। পলায়নপর কাফির বাহিনী দ্রুত পলায়নের উদ্দেশ্যে ছাতুর বস্তাসমূহ ফেলে দিয়ে যায়। মুসলমানরা কিদর নামক স্থান পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং স্থানে স্থানে তাঁরা ছাতুর বস্তা পান। হযরত নবী (সা) সদলবলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আরবী ভাষায় ছাতুকে সাবীক বলা হয়ে থাকে। তাই এ যুদ্ধ পত্রটি সাবীক অভিযান নামে খ্যাত হয়। সাবীক অভিযানটি দ্বিতীয় হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকে পরিচালিত হয়। যিলহাজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় অবস্থান করেন এবং আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ বছর ঘটেনি।

হিজরী তৃতীয় বর্ষ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য ইব্‌ন সলুলের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনাবাসীরা তাকে তাদের বাদশাহ বানাতে উদ্যত ছিলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর মদীনা আগমনে তার সে বাদশাহীর স্বপ্ন ভণ্ডুল হয়ে যায়। তাই মুসলমানদের প্রতি সে অন্তরে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতো। কিন্তু যেহেতু সে ছিল ধুরন্ধর ব্যক্তি, তাই সে তা তার অন্তরে গোপন রাখে। তারপর তলে তলে মক্কাবাসীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনাবাসীদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তাও পণ্ড হয়ে যায়। মুসলমানদের বদর যুদ্ধ বিজয় প্রত্যক্ষ

করে সে ভীত হয় এবং বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তরে যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতো, তাই এ বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণে তার কোনই উপকার হয়নি বরং তার অন্তরে লালিত এ বিদ্বেষ মুসলমানদের জন্যে পূর্বের চাইতে বেশী মারাত্মক প্রতিপন্ন হয়। তার নেতৃত্বাধীন ইয়াহূদীটি বলে উঠলো : অধঃপাতে যাও ! মক্কাবাসীরা হচ্ছে আরবদের বাদশাহ এবং অভিজাত শ্রেণী। হযরত মুহাম্মদ (সা) যদি তাদেরকেই পদানত করে ফেলে, তবে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন।

এ সংবাদটির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে গেল। মক্কায় গিয়ে বদর যুদ্ধে নিহতদের শোকগাথা লিখতে এবং লোকদেরকে শোনাতে লাগলো। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সে তাদেরকে এসব শোকগাথা শোনাতে শোনাতে তাদের প্রতিশোধ কামনাকে তীব্রতর করার কাজে ব্যস্ত রইলো। তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের নিন্দাসূচক কবিতা লিখে বিষোদগার করতে লাগলো। ইয়াহূদীদের গোটা সম্প্রদায়ই ছিলো সুদখোর এবং বড় বড় মহাজন। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তথা মদীনায় গোটা আনসার সম্প্রদায় ছিলো তাদের খাতক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা তাদের উপর নির্ভরশীল। নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং ধুরন্ধর বুদ্ধির জন্যে তাদের গর্বের অন্ত ছিলো না। তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণী এবং আশেপাশের প্রতিবেশী গোত্রসমূহের অশিক্ষিত ও গবেট মনে করে তাদেরকে পাত্তাই দিতো না। বদর যুদ্ধের পর তারা মক্কার কুরায়শদের পূর্ণ সমর্থক ও সহযোগী শক্তিরূপে সক্রিয় হয়ে উঠলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য ও ইয়াহূদীদের মধ্যে সখ্যতা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব মুশরিক এ পর্যন্ত শির্‌ক, মূর্তিপূজা এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় অবিচল ছিল, তাদেরকেও সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দেয় এবং এ শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্বে সে আসীন থাকে। এরাই মুনাফিক বলে কুখ্যাতি অর্জন করে। এই মুনাফিকদের সাথে কিছু ইয়াহূদীও এসে যোগ দেয় এবং বাহ্যত তারাও ইসলাম গ্রহণ করে ফায়দা লুটতে থাকে।

ইয়াহূদীদের শত্রুতামূলক আচরণ

মুসলমানদের কর্তৃত্ব এবং ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারকে ইয়াহূদীরাও সুনজরে দেখত না। তারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যর চাইতেও অধিকতর শত্রুতা করতে থাকে। মদীনার আশেপাশের এলাকাসমূহে ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো। তারা নিজেদেরকে পৃথক পৃথক দুর্গ বানিয়ে রেখেছিলো। গোত্র তিনটি ছিলো : (১) বনী কায়নুকা, (২) বনী নযীর ও (৩) বনী কুরায়যা। হযরত নবী (সা) মদীনা আগমনের অব্যবহিত পরে যে সনদ প্রণয়ন করেন এতে ইয়াহূদীদের এ গোত্রগুলোও শামিল ছিলো। কুরায়শরা যেভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তেমনি এ ইয়াহূদী গোত্রগুলোকেও সমর্থনে নেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ইয়াহূদীরা যেহেতু মুসলমানদের উন্নতি দু'চোখে দেখতে পারতো না, তাই তারা কুরায়শদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের জন্যে অহরহ সচেষ্ট থাকে। এবার বদর যুদ্ধের পর তাদের সে শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং বিদ্বেষের বহ্নিতে জ্বলে তারা কাবাব হয়ে যাচ্ছিলো। তাই বদর যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ নিয়ে হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন কা'ব ইব্‌ন আশরাফ নামক মদীনার মুনাফিকরাও ইয়াহূদীদের নিয়ে বিরাট বিরাট ও মারাত্মক ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো। মক্কায় কুরায়শদের

অভিযানসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব এবার যেন তারাই নিজ হাতে গ্রহণ করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাবকে মুছে ফেলার জন্যে সাধারণভাবে তারা নানারূপে কুবাক্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ শুরু করে দিল। এমন কি তারা তাঁর মজলিসে পর্যন্ত উপস্থিত হয়ে অপমানজনক কথাবার্তা বলতে ও শুনতে লাগলো। আস্‌সালামূ আলায়কুম (তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) এর ন্যায় কুশল বাক্যের স্থলে তারা আস-সামু আলায়কুম (তোমার মৃত্যু হোক), رَاعِنَا (আমাদের প্রতি একটু নেক নজর দিন বা আমাদের কথাটুকু শুনুন) رُعُنَ (নির্বোধ) প্রভৃতি মূর্খতাব্যঞ্জক শব্দ তারা ব্যবহার করতে শুরু করলো। মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা মিলে এ পরিকল্পনাও তৈরি করে যে, প্রথমে বাহ্যত মুসলমান হয়ে যেতে হবে, তারপর এই বলে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হতে হবে যে, আমরা মুসলমান হয়ে দেখলাম, এ ধর্মটি ভালো না। এভাবে অনেক মুসলমানও হয়ত প্রভাবান্বিত হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তাদের ঐক্য ক্ষুণ্ন হবে। মোদ্দাকথা, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মুসলমানদের জন্য মদীনায় নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) ইয়াহূদীদের সভাসমিতি ও সমাবেশসমূহে গিয়ে তাদেরকে এ মর্মে বোঝাতে লাগলেন যে, তোমরা উত্তমরূপেই অবগত আছ যে, আমি আল্লাহ্‌র সত্য নবী। তোমরা নিজেরাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। সর্বপ্রথম তোমরাই আমার সত্যতার অনুমোদন করবে এবং তোমাদের আসমানী কিতাবসমূহ লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ খুঁজে দেখা ছিল তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমরা বিরোধিতার ক্ষেত্রই তৈরি করে যাচ্ছ! আল্লাহ্‌র গযবকে ভয় কর ! এমন যেন না হয় যে, আবূ জাহেল, উতবা প্রমুখের মত তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসে। এরা বদর প্রান্তরে অত্যন্ত লাঞ্ছনাগ্রস্ত হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ইয়াহূদীরা উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে তাঁকে উল্টো জবাব দেয় এবং বলে যে, কুরায়শরা যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আমাদের সাথে যখন মুকাবিলা হবে তখন মজাটা টের পাবেন। আমাদেরকে কুরায়শদের মতো মনে করবেন না।

ইয়াহূদী গোত্র বনী কায়নূকা

ইয়াহূদীরা নানা ধরনের অসঙ্গত ও কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলাবলি করতে লাগলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের অশ্রাব্য কথাবার্তা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনতে থাকেন এবং এভাবে এ হতভাগাদেরকে চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে প্রায় চুক্তিভঙ্গ করতে দেখেও তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান সমীচীন বোধ করেননি। তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিলো যে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উপদেশ দিয়ে তাদেরকে সুপথে আনয়ন করবেন এবং এ উদ্ধতদেরকে আপন ঔদার্য, ভদ্র আচরণ ও ক্ষমাপরায়ণতা দিয়ে জয় করবেন। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করলো। একদিন বনী কায়নুকা বস্তিতে একটি মেলা বা বাজার বসেছিলো। সেখানে আনসারের জনৈক রমণী দুধ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। দুধ বিক্রির পর তিনি স্বর্ণকারের দোকানে একটি অলংকার ক্রয় করতে বা বানাতে যান। ইয়াহূদী স্বর্ণকারটি উক্ত মুসলিম রমণীটিকে উত্যক্ত করে। বাজারে আগত জনৈক আনসারী সাহাবী আনসারী মহিলাকে অপদস্থ হতে দেখতে পেয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। আশেপাশের ইয়াহূদীরা এসে উৎপীড়নকারী ইয়াহূদীর পাশে দাঁড়ায় এবং তারা একযোগে উক্ত আনসারী সাহাবীর উপর হামলা করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর হাতেও একজন ইয়াহূদী প্রাণ হারায়। এ সংবাদ পেয়ে বাজারে উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানও

এসে পৌঁছেন। ইয়াহূদীরা তাঁদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। সংবাদটি মদীনায় হযরত নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছে। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ইয়াহূদীদেরকে সশস্ত্র ও যুদ্ধংদেহী অবস্থায় দেখতে পান। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো এবং পরিস্থিতি এ পর্যন্ত গড়ালো যে, বনূ কায়নুকার সাত শ' যোদ্ধা যাদের মধ্যে তিনশ' বর্ম পরিহিত ছিলো, নিজেদের সংরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হলো। বনূ কায়নুকার সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের কুটুম্বিতা ছিলো। মুসলমানরা সে দুর্গ অবরোধ করলেন। পনের ষোল দিনের অব্যাহত অবরোধের ফলে মুসলমানরা দুর্গের আধিপত্য লাভ করলেন এবং বনী কায়নুকা গোত্রের সমস্ত লোককে বন্দী করলেন। আরব দেশে যুদ্ধবন্দীদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। মক্কাবাসীদের তো বিস্ময়ের সীমা ছিলো না যখন তারা লক্ষ্য করলো যে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে সভ্যতা-ভব্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রমকারী চরম দুরাচার দু'জন মাত্র বন্দীকেই হত্যা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকলকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এমন কি বনী কায়নুকার সাতশ' লোক এক সাথে বন্দী হওয়ায় সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিলো যে, এবার আর কারো রক্ষা নেই, সমস্ত বন্দীকে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সলূল যে বাহ্যত মুসলমানদের মধ্যেই শামিল ছিলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে ইয়াহূদীদেরকে হত্যা না করার সুপারিশ করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য-এর উপর্যুপরি অনুরোধে তিনি তাদেরকে প্রাণে রেহাই দেন। হযরত উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) তাদেরকে খায়বার পর্যন্ত বের করে দিয়ে আসলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য পর্দার অন্তরালে ইয়াহূদীদের মিত্র ছিল। এজন্যে সে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রাণে রক্ষা করে তাদের মিত্রের হক আদায় করে।

কা'ব ইব্ন আশরাফের কথা উপরেই বলা হয়েছে। এখন সে প্রকাশ্যে মুসলমান ললনাদের নাম তার প্রেমের কবিতায় ব্যবহার করতে লাগলো। এতে মুসলমানরা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হতেন। তারপর সে হযরত নবী (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এতটুকু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দিল যে, রাতের বেলায় তিনি ঘর থেকে বেরোতে খুবই সতর্ক থাকতেন। তার দৌরাত্ম্য যখন সীমা অতিক্রম করলো তখন জনৈক সাহাবী মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট থেকে তাকে হত্যার অনুমতি নিয়ে কয়েকজন সহচরসহ তার বাড়িতে যান এবং তাকে হত্যা করে আসেন। কা'ব ইব্ন আশরাফের পর সালাম ইব্ন আবূ হাকীক ঐ একই ধরনের দৌরাত্ম্যে লিপ্ত হলো এবং সে কা'ব ইব্ন আশরাফের চাইতেও অধিকতর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। কা'বকে যেহেতু আওস গোত্রীয়রা হত্যা করেছিলেন, তাই এবার বনী খাযরাজের আট ব্যক্তি খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং তাকে তার বাসস্থানে হত্যা করে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

উহুদের যুদ্ধ

(হিজরী তৃতীয় বর্ষ)

বদর যুদ্ধের পর একদিকে তো স্বয়ং মক্কাবাসীদের অন্তরে প্রতিশোধ বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছিলো, অপর দিকে মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা তাদেরকে উত্তেজিত করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। অপরদিকে আবূ সুফিয়ানের পত্নী হিন্দাও তাকে ভর্ৎসনা করে উত্তেজিত করে

চলেছিল,-যার পিতা ও ভাই বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। মক্কার সমস্ত বড় বড় সরদার নিহত হওয়ার পর আবূ সুফিয়ান তখন মক্কার প্রধান সরদার। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হলো। শামের যে বাণিজ্য কাফেলা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে নিরাপদে মক্কায় পৌছেছিল তাতে পাঁচ হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও এক হাজার উট মুনাফা স্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল। এ মুনাফা মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হলো না এবং এর পুরোটাই যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয়িত হলো। আরবের বিভিন্ন গোত্রে কবিদেরকে প্রেরণ করে তাদেরকে কুরায়শদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হলো। এর চমৎকার ফলও পাওয়া গেলো। গোটা বনী কিনানা এবং তিহামাবাসী কুরায়শদের সাথে মিলিত হলো। কুরায়শদের সমস্ত মিত্র গোত্র তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো। মক্কার হাবশী গোলামদেরকেও সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বীর গাথা গায়ক পুরুষ এবং বীরত্বের জন্যে উদ্বুদ্ধকারিণী নারীদেরকেও সাথে নেয়া হলো। মোটকথা, পূর্ণ একটি বছর মক্কাবাসীরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় করলো। এ প্রস্তুতি গ্রহণে মদীনায় ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা গোপনে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করে এবং পরামর্শ দিয়ে দিয়ে কুরাযশদের সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে।

মোটকথা তিন হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। বদর যুদ্ধে নিহত সরদারদের জায়া-কন্যারাও এ উদ্দেশ্যে সাথে রওয়ানা হলো যে, তাদের প্রিয়জনদের হত্যাকারীদের নিহত হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করবে। কবিরাও সাথে চললো। তারা তাদের কবিতাদি শুনিয়ে গোটা রাস্তায় সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দান করছিলো। কুরায়শদের অভিজাত মহিলাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন্ত উতবা মহিলাদের সেনাপতিরূপে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, যেমনটি আবূ সুফিয়ান ছিল পুরুষদের সেনাপতি। জুবায়র ইব্ন মুতঈম-এর ওয়াহ্শী নামক একটি হাবশী ক্রীতদাস ছিলো। ছোট বল্লম চালনায় সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তাকেও সাথে নেয়া হলো। তার লক্ষ্য বড় একটা ভ্রষ্ট হতো না। জুবায়র ইব্ন মুতঈম তাকে বলে যে, তুই যদি হামযাকে হত্যা করতে পারিস, তা হলে তোকে আমি মুক্ত করে দেবো। আবূ সুফিয়ান-পত্নী ও উতবা-তনয়া হিন্দা বললো, তুই যদি আমার পিতার হন্তা হামযাকে হত্যা করতে পারিস তাহলে তোকে আমার সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে দেবো। কোন কোন ইতিহাসে এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজার ছিলো বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে এটা যে, বাহিনী তিন হাজার যোদ্ধা নিয়েই গঠিত হয়েছিলো। ললনার এবং যুদ্ধ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা তার অতিরিক্ত হয়ে থাকবে।

কাফির বাহিনী মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ সংবাদ পেয়েই সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন। মুসলমানদের মধ্যে গণ্য বলে পরিচিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য মুনাফিকও সে মজলিসে উপস্থিত ছিলো। রাসূল আকরাম (সা)-এর অভিমত ছিল এই যে, আমরা মদীনার শহরাভ্যন্তরে অবস্থান করেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবো। তাঁর এ অভিমতের একটি কারণ এও ছিল যে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তলোয়ারের কিছুটা ধার কমে গিয়েছে। তাই তিনি (সা) এ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা ক্ষতির আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি দেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর পবিত্র হাত তাঁর বর্মের মধ্যে রাখলেন। বর্মের ব্যাখ্যা তিনি মদীনা শহর বলে স্থির করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যরও অভিমত ছিল এই যে, মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। সম্ভবত

নিজের বিশেষ কোন স্বার্থে সে এ অভিমত পোষণ করতো। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী শত্রুরা যেন মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে বলে সন্দেহ না করে এজন্যে শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মদীনার শহরাভ্যন্তর থেকে আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যুবকদের তা মোটেই মনপূত ছিলো না। এটা হচ্ছে ১৪ই শাওয়াল শুক্রবারের কথা। এ পরামর্শ অনুষ্ঠানের পর তিনি জুমুআর নামায আদায় করেন। নামায পড়ে তিনি ঘরে চলে যান এবং সেখান থেকেই বর্ম পরিহিত অবস্থায় যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর যুবক সাহাবায়ে কিরামের ভাবনা হলো, আমরা নবী করীম (সা)-এর মতের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁর অবাধ্য বলে না গণ্য হয়ে যাই। তখন তাঁরা আরয করলেন : আপনি যদি মদীনার অভ্যন্তর থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করাই সমীচীন মনে করেন তবে তাই করুন, এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এবং পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করাটা এজন্যে সমীচীন বোধ করেন নি যে, এ মর্মে তিনি ওয়াহীযোগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হননি। বদর যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারেননি তাদের মনরক্ষাও এর একটা উদ্দেশ্য ছিলো। কেননা, তাঁরা তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের একটা সুযোগ লাভের জন্যে উন্মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর নামাযের অব্যবহিত পরেই সদলবলে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মদীনায় তাঁর অনুপস্থিতিতে নামাযের ইমামতির ও মদীনার দেখাশোনা করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম সাহাবীকে রেখে গেলেন। এক হাজার লোক হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন।

মুনাফিকদের ঔদ্ধত্য

মদীনা থেকে বেরিয়ে দেড় দু'মাইল যেতে না যেতেই এক হাজার লোকের মধ্যে তিন শ' জনকে নিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য মদীনায় ফিরে চললো। সে বললো, আমাদের মতামত অনুসারে যেহেতু কাজ করা হয়নি এজন্যে আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে লড়তে প্রস্তুত নই। এ তিন শ' মুনাফিক দলত্যাগ করায় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কেবল সাত শ'তে এসে দাঁড়ালো। এ সাত শ'র মধ্য থেকেও অল্প বয়স্কদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফেরত পঠিয়ে দিলেন। দিনের অল্প কিছু সময় বাকী থাকতেই তিনি সদলবলে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছলেন। তাঁরা পৌছেই দেখতে পেলেন যে, কাফির বাহিনী ইতোপূর্বেই সেখানে পৌছে ছাউনি স্থাপন করেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় কোন পক্ষই যুদ্ধের কোন লক্ষণ দেখালো না। রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ পাহাড়কে পিছনে রেখে ছাউনি স্থাপন করলেন। রাত নির্লিপ্তভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর পরদিন ১৫ই শাওয়াল ৩ হিজরী রোজ শনিবার উভয় পক্ষ সক্রিয় হয়ে উঠলো। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে হযরত নবী করীম (সা) পঞ্চাশ জন দক্ষ তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে পিছনের ঘাঁটিতে এই আদেশ দিয়ে মোতায়েন করেন যে, যুদ্ধের অবস্থা যাই হোক না কেন, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। ব্যাপার ছিলো এই যে, ঐ সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে শত্রুর পাহাড়ের পিছন দিক থেকে এসে হামলা করার আশংকা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান দেখেই রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাপারটি অনুধাবন করেছিলেন। এজন্যে

শত্রুপক্ষের সে সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি এদেরকে ঐ স্থানে মোতায়েন করেছিলেন।

যোদ্ধাদেরকে সারিবদ্ধ করে নবী করীম (সা) ডানের বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর উপর এবং বামের বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত মুনযির ইব্‌ন আমর (রা)-এর উপর ন্যস্ত করেন। হযরত হামযা (রা)-কে বাহিনীর অগ্রভাগে অগ্রপথিক সেনানী নিযুক্ত করেন এবং পতাকা হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর হাতে দেন। নবী করীম (সা) তাঁর নিজ তলোয়ার হযরত আবূ দুজানা (রা)-কে দেন। তিনি এ তলোয়ার নিয়ে গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লাসের সাথে গর্বভরে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তাঁর এতাদৃশ আচরণে তিনি বলেন যে, এরূপ পদক্ষেপ আল্লাহ পসন্দ করেন না। কিন্তু কাফিরদের সঙ্গে মুকাবিলা করতে যেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে চলা জাইয।

অপর দিকে কুরায়শরাও তাদের সারি বিন্যস্ত করলো। তারা একশত জন অশ্বারোহী সৈন্যে সম্বলিত ডান বাহিনীর নেতৃত্ব খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাতে অর্পণ করে (তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি)। কুরায়শের পতাকা বহনের দায়িত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বনী আবদে দার-এর উপর ন্যস্ত ছিল। আবূ সুফিয়ান বনী আবদে দারকে উত্তেজিত করার জন্যে বললো, যদিও প্রাচীনকাল থেকেই তোমরা কুরায়শদের পতাকা বহন করে আসছো, কিন্তু বদর যুদ্ধে তোমাদের পতাকা বহনের অলক্ষুণে প্রভাবের কথাটি স্মরণ হলেই ইচ্ছে হয় যে, পতাকা বহনের দায়িত্ব অন্য কোন গোত্রকে অর্পণ করি। তোমরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, পতাকা বহনের গুরুদায়িত্ব তোমরা প্রাণপণে পালন করবে তাহলে পতাকা তোমাদের কাছে রাখ, নতুবা তা ফিরিয়ে দাও। বনূ আবদের দার গোত্র পতাকা ফেরত দিল না বরং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অঙ্গীকার করলো। উক্ত দু'জন অশ্বারোহী ছাড়া দুইশ রিজার্ভ ঘোড়া প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য তৈরী রাখা হয়। মুশরিকদের তীরন্দায বাহিনীর সরদার ছিলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবীআ। ওদিকে কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের বাছাই করা অন্তত তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্যের দুর্ধর্ষ বাহিনী আর এদিকে সাতশ'রও কম সৈন্য হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনী ছিল। এ বাহিনীতে পনের বছরের কম বয়সের বালকরাও ছিল। মুসলিম বাহিনীতে ঘোড়া ছিল কেবল দু'টি। মোটকথা সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানরা এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিলেন এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের অনুপাত ছিল তার চাইতে অনেক গুণ কম।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো

যুদ্ধের সূচনা হয় এভাবে যে, সর্বপ্রথম আবূ আমির রাহিব কাফির বাহিনীর পক্ষ থেকে মাঠে অবতীর্ণ হয়। লোকটি ছিলো মদীনার অধিবাসী এবং আওস গোত্রের লোক। আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সে একজন জ্ঞানীগুণী সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতো। মদীনায় মুসলমানদের আগমনে সে তীব্র অন্তর্জ্বালায় ভুগতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মক্কায় গিয়ে বসবাস করতে থাকে। সে এই ভেবে কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলো যে, আওস গোত্রের লোকদেরকে সে বিরুদ্ধপক্ষে টেনে নিতে পারবে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেই আওস গোত্রীয়দেরকে আহবান করে, কিন্তু আওস গোত্রীয় আনসারগণ তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সে অত্যন্ত অপদস্থ হয়।

তারপর উভয় পক্ষ একে অপরকে আক্রমণ করে। হযরত হামযা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবূ দু'জানা (রা) প্রমুখ বীর সাহাবায়ে কিরামে যুদ্ধে যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন তাতে প্রতিপক্ষের সাহস উবে গেল। আবূ দুজানা (রা) শত্রুদেরকে কতল করতে করতে তাদের ব্যূহ ভেদ করে আবূ সুফিয়ান পত্নীর এতই নিকটে পৌঁছে গেলেন যে, সে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে চলে আসলো। তাকে হত্যার উপক্রম করতেই মহিলাটি প্রাণভয়ে চীৎকার করে উঠলো। নারীকণ্ঠের আওয়াজে আবূ দুজানা হকচকিয়ে যান। এ যে নারী! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারি নারীরক্তে কলুষিত করা চলে না। এভাবে হিন্দা বিন্ত উতবার প্রাণ বেঁচে গেলো।

হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদত বরণ

হযরত হামযা (রা) আক্রমণ চালিয়ে মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহাকে হত্যা করেন। তিনি বীরবিক্রমে অসি চালিয়ে মুশরিকদেক ব্যূহ ভেদ করে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হাবশী গোলাম ওয়াহশী তাঁকে অগ্রসর হতে দেখে একটি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে থাকে। কাফিরদের হত্যা করতে করতে যখন তিনি আরো সম্মুখে অগ্রসর হন তখন সুযোগ বুঝে সে তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তা তাঁর নাভিমূলে আঘাত হেনে পার্শ্বদেশ ভেদ করে চলে যায়। তিনি শাহাদত লাভ করেন। ওয়াহশী হিন্দা বিন্ত উতবার নিকট গিয়ে হযরত হামযার শাহাদত লাভের খবর শোনায়। হযরত হানযালা (রা) আক্রমণ চালিয়ে কাফির-দের সম্মুখ হতে হটিয়ে দিয়ে আবূ সুফিয়ানের নিকট পৌঁছে যান। তিনি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলে শাদ্দাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-লায়ছী পেছন থেকে এসে তাঁকে আঘাত করে। ফলে তিনি শহীদ হন। এ যুদ্ধে হযরত নযর ইব্ন আনাস এবং সা'দ ইবনুর রবী তরবারি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে কুরায়শদের বারজন পতাকাবাহী পর পর মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এদের মধ্যে আটজনকে হযরত আলী (রা) একাই ধরাশায়ী করেন। এদের একজন নিহত হওয়ার পর পতাকা মাটিতে পতিত হলে আর একজন এসে তা উত্তোলন করতে থাকে। এমনিভাবে যখন তাদের শেষ পতাকাবাহী সওয়ার নিহত হয় তখন আর কেউ পতাকা উত্তোলন করার সাহস করেনি এবং তা ভূমিতেই পড়ে থাকে।

মুসলমানদের ব্যূহ ভেদকারী আক্রমণ এবং বীরত্বপূর্ণ তরবারি যুদ্ধ নৈপুণ্যে তিন হাজার বীর সৈন্যের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। দুপুরের কাছাকাছি কাফিররা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। প্রথমে তারা উল্টো পায়ে যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটতে থাকে। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকে, এমন কি তারা নিজেদের সীমানার বাইরেও চলে যায়। যেসব কুরায়শ নারী পেছনে পেছনে দফ বাজিয়ে এবং কবিতা আবৃত্তি করে তাদের পুরুষ সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছিল মুসলমানেরা দেখলো তারাও সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ফেলে নিজেদের পলায়নপর সৈন্যদের সাথে মিলিত হচ্ছে। মুশরিকদের জেনারেল হিন্দা বিন্ত উতবাও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের সমস্ত সামান ময়দানে ফেলে পালিয়ে যায়।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল!

মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয় প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠলো। কাফির সৈন্যরা যখন পিছটান দিচ্ছিলো তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পলায়নপর কাফির সৈন্যদের পলায়নের দৃশ্য এবং কাফির বাহিনীর পতাকা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে

ঘাঁটিতে মোতায়েন তীরবন্দাজবাহিনীর মনেও স্পৃহা জাগলো যে, আমরা কাফির সেনাদেরকে ধাওয়া করায় অংশ গ্রহণ করি। তাদের সরদার হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র আনসারী তাদেরকে অনেক করে বললেন যে, মহানবী (সা)-এর পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দ এবং কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের অতি আগ্রহ তাঁদেরকে তা শুনতে দেয়নি। ফলে তাঁরা স্থান ত্যাগ করলেন। কুরায়শদের ডান বাহিনীর পরিচালক খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এ ঘাঁটির গুরুত্ব যে কত অধিক তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর এক শ' সৈন্যসহ এক মাইল পথ ঘুরে পশ্চাৎ দিক থেকে ঐ ঘাঁটি দিয়ে এসে মুসলমানদের আচমকা হামলা চালালেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা) এবং তাঁর অল্প ক'জন সঙ্গী সে আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলেন। কেননা, তাঁর অধীনস্থ অন্য সকলে ইতিপূর্বেই স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন। এ আকস্মিক হামলাটি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগে মুসলমানদের মধ্যে বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মুসলমানরা এবার কাফির সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে দিলেন।

মুসলমানদের এ বিব্রতকর অবস্থা লক্ষ্যে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেল তার অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে নিয়ে অন্যদিক থেকে হামলা চালালো। সাথে সাথে ইতিপূর্বে ময়দান পরিত্যাগ করে পলায়নকারী আবূ সুফিয়ান ও পলায়নপর কুরায়শ সৈন্যদেরকে নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। কাফির বাহিনী এবার নব উদ্যমে মুসলমানদের উপর হামলা চালালো। মুসলমানদের উপর অতর্কিতে এবং উপর্যুপরি এ সব হামলা পরিচালিত হয়। ফলে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে কাফির বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তারা ছত্রভঙ্গ ও দিশাহারা হয়ে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, স্থানে স্থানে গুটি কয়েক মুসলমান বিরাট বিরাট কাফির দলের অবরোধের মধ্যে পড়ে গেলেন। তারা পরস্পরের সংযোগ হারিয়ে ফেললেন এবং এ অবস্থায় চতুর্দিক থেকে তাদের উপর তরবারি বর্ষিত হচ্ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) মাত্র বারজন সঙ্গীসহ কাফিরদের এক বিরাট দলের মধ্যে পড়ে গেলেন। হযরত মুসআব পতাকা হাতে ধরে তাঁর নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। কাফির বাহিনীর জনৈক নামজাদা অশ্বারোহী ইব্ন কুমাইয়া লায়ছী আক্রমণ চালিয়ে হযরত মুসআব (রা)-কে শহীদ করে দিলো। হযরত মুসআব (রা)-এর অবয়ব যেহেতু দেখতে অনেকটা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবয়বের মতো ছিলো তাই সে ধারণা করলো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। সে একাই উঁচু স্থানে আরোহণ করে সে মুহূর্তেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো : قَدْ قَتَلْتُ مُحَمَّدًا আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। তার এ ধ্বনি শুনে মুশরিকদের মনোবল অনেক গুণে বৃদ্ধি পেলো। তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মুসলমানদের জন্যে এ ধ্বনিটি ছিল প্রাণান্তকর। তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। এমন সময় হযরত কা'ব্ ইব্ন মালিক (রা)-এর দৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নিবদ্ধ হলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন : "মুসলমানরা! শুনে সুখী হও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত এবং সুস্থই রয়েছেন।" তখনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চৈঃস্বরে আহবান জানাল :

اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

"আল্লাহ্র বান্দারা, আমার দিকে এগিয়ে এসো; আমি আল্লাহ্র রাসূল।

এ ধ্বনি উচ্চারিত হওয়া মাত্র মুসলমানরা তা শুনতে পেয়ে চতুর্দিক থেকে এসে জমায়েত হতে শুরু করলেন। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের হামলা প্রতিরোধ করে, তাদেরকে মারতে মারতে তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটে আসতে লাগলেন। ওদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সে আওয়াজ কাফিরদেরকেও তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিলো। ফল দাঁড়ালো এই যে, তারাও সেদিকে মনোনিবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানস্থল যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো। মুসলমানদের কিছু সংখ্যক সৈন্য এমন স্থানে এবং এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। তাঁরা এদিক-সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এই বিশৃংখল অবস্থায় আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটে এসে সজোরে তরবারির এমন একটি আঘাত হানে যে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশে অক্ষির নিচের অস্থির মধ্যে ঢুকে পড়লো। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) আপন দাঁত দিয়ে তা' সজোরে টেনে বের করে আনেন। এতে নবী করীম (সা)-এ দু'টি দন্ত মুবারক উঠে আসে। কাফির বাহিনী তাঁর উপর আক্রমণ পরিচালনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

নবুওয়াত দীপের পতঙ্গকুল

এদিকে কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চতুর্দিকে একটি ব্যূহ রচনা করে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত আবূ দুজানা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর দিকে মুখ করে তাঁর নিজ পিঠকে ঢাল বানিয়ে ফেললেন। যদি মুখ কাফিরদের দিকে আর পিঠ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে থাকতো তবে হয়তো তীর আসতে দেখলে স্বাভাবিকভাবে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতায় একটু সরে দাঁড়িয়ে আপন দেহকে বাঁচাবার প্রশ্নটা আসতো, কিন্তু এ অবস্থায় সে প্রশ্ন আর ছিলো না। পাছে তীর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র দেহ স্পর্শ করে বসে এজন্যেই তাঁর এ সতর্কতা! তাঁর পিঠ তীরের পর তীরে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। তবু তিনি একচুলও নড়লেন না। হযরত সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা), হযরত আবূ তালহা (রা) ও হযরত 'আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত রসূল আকরাম (সা)-এর চারপাশে লৌহপ্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে যান এবং তীর ও তলোয়ার দিয়ে শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে থাকেন। হযরত তালহা (রা) দুশমনদের তলোয়ারের আঘাত আপন হাত দিয়ে প্রতিহত করেন, এমন কি তাঁর দু'টি হাত যখম হতে হতে অচল হয়ে যায়। হযরত যিয়াদ ইব্ন সাকান আনসারী (রা) তাঁর পাঁচজন সঙ্গীসহ হযরত (সা)-এর হিফাযত করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। হযরত উমারা ইব্ন যায়দ (রা)-ও হুযূর আকরাম (সা)-এর হিফাযত করতে গিয়ে পতঙ্গের মত প্রাণ দান করে শহীদ হয়ে যান। উম্মে আমারা, যাঁর নাম ছিল নসীবা বিন্ত কা'ব (রা), যুদ্ধের অবস্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর পিছু পিছু ছুটে আসেন। দুপুরের পর যখন যুদ্ধের গতি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল যখন দূরাত্মা ইবন কামিয়্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তলোয়ারের আঘাত হানলো তখন তিনি উপর্যুপরি ইব্ন কামিয়্যার উপর তলোয়ার হানতে থাকেন। কিন্তু সে দু' দু'টি বর্মে সজ্জিত ছিলো বলে তাঁর সেসব আঘাত তার গায়ে লাগেনি। সে উম্মে আমারাকে একটি আঘাত হানলে স্কন্ধের নীচে তাঁর হাতটি যখমী হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দৃঢ়তা

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিলো, তখন একটি দুরাচার দূর থেকে তাঁর প্রতি একটি পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঠোঁটে আঘাত লাগে এবং তাঁর নীচের একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে যায়। এ অবস্থায়ই তাঁর কদম মুবারক একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং তিনি পড়ে যান। হযরত আলী (রা) তাঁর হাত ধরেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত তালহা (রা) তাঁকে উঠিয়ে বের করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে যখন সাহাবায়ে কিরামের একটি ছোটো খাটো দল এসে সমবেত হয়ে গেলো এবং তাঁরা প্রাণপণে লড়তে লাগলেন তখন কাফিরদের হামলার তীব্রতা হ্রাস পেলো। সাহাবায়ে কিরাম এবার কাফিরদেরকে মেরে মেরে হটিয়ে দিলেন। এ অবস্থায় নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে পাহাড়ের দিকে যেতে বললেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে পাহাড়ের বেশ উঁচু অংশে আরোহণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো কাফিরদের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাহাড় পিছনে রেখে যুদ্ধের জন্য একটি ব্যূহ রচনা করা। এ কার্য প্রণালীটি অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে সুবিধামত অবস্থান গ্রহণ অত্যন্ত উপাদেয় প্রতিপন্ন হয়। মুসলমানদেরকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থান নিতে দেখে আবূ সুফিয়ানও পাহাড়ে আরোহণের প্রয়াস পায়। সে কাফিরদের একটি বাহিনী নিয়ে ভিন্ন পথে উচ্চতর অবস্থানে আরোহণ করতে প্রয়াস পাচ্ছিলো। এমন সময় নবী করীম (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে তাদেরকে উচ্চভূমিতে আরোহণে বাধাদানের নির্দেশ দিলেন। হযরত উমর (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ তৎক্ষণাৎ সেদিকে অগ্রসর হয়ে আবূ সুফিয়ানের দলকে নীচে অবতরণে বাধ্য করেন।

এবার মুসলমানরা দ্রুত এগিয়ে চললেন। যারা ইতিপূর্বে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরাও পাহাড়ের ঐ উচ্চ স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারপাশে এসে সমবেত হয়ে গেলেন। এবার আর কাফিররা মুসলমানদের উপর হামলা করতে সাহস পেলো না। কিন্তু পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক কাফির উবায়্য ইব্ন খাল্ফ তার আপন ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর হামলা করলো। তাকে আসতে দেখেই আল্লাহর রসূল (সা) বললেন, একে নিকটে আসতে দাও! সে কাছে এসে হামলা করতে উদ্যত হতেই হযরত নবী করীম (সা) জনৈক সাহাবী হারিছ ইব্ন সুম্মা (রা)-এর হাত থেকে বল্লম নিয়ে তার উপর আঘাত হানলেন। বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলা তার স্কন্ধের নীচের হাড়ে স্পর্শ করলো। বাহ্যত এ আঘাত ছিল মামুলী, কিন্তু এ আঘাতেই সে দিশাহারা হয়ে ছুটে পলালো। সে যখন আক্রমণ করতে এসেছিল তখন চীৎকার করে করে বলছিল, আমি আজ মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবই। এবার যখন দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল তখন মুশরিকরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। এ আঘাতেই হতভাগা উবায়্য ইব্ন খাল্ফ ফেরার পথে মক্কায় পৌছবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।

আবূ সুফিয়ান চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো : افى القوم محمد -তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ রয়েছে ? হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহাবাদেরকে এর উত্তর দিতে বারণ করলেন। তারপর সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলো : তোমাদের মধ্যে কি আবূ বকর রয়েছে ? এবারও কোন জবাব মিললো না। তারপর সে প্রশ্ন করলো, তোমাদের মধ্যে কি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রয়েছে ? তারও কোন জবাব দেওয়া হলো না। তখন সে স্বগতোক্তি করলো : ধোঁকা পেলো এদের কেউই আর বেঁচে নেই, সবাই নিহত হয়েছে। এবার হযরত উমর ফারূক (রা) আর চুপ করে

থাকতে পারলেন না। তিনি চীৎকার করে বললেন : "হে আল্লাহ্‌র দুশমন! এঁদের সকলেই জীবিত রয়েছেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবি তুইই।" এ জবাব শুনে সে আচমকা থতমত খেয়ে গেলো এবং অনেকটা গর্বের সুরে বলে উঠলো : اَعْلُ هُبَلُ اَعْلُ هُبَلُ "জয় 'হবলের, জয় 'হবলের-

হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন : এর জবাবে বল : اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ "আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মর্যাদসম্পন্ন।" আবূ সুফিয়ান হযরত উমর (রা)-এর কণ্ঠে একথা শুনে বললো لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ

"আমাদের উজ্জা দেবী রয়েছে, তোমাদের কোন উজ্জা দেবী নেই।" হযরত উমর ফারূক (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর কথামতো জবাব দিলেন :

اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ .

"আল্লাহ আমাদের মওলা, তোমাদের কোন মওলা নেই।" আবূ সুফিয়ান বললো : এ যুদ্ধটি বদর যুদ্ধের সমান সমান হয়ে গেলো। অর্থাৎ আমরা এবার বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় নিয়ে নিলাম। হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথামতো জবাব দিলেন : না না, সমান সমান হয়নি। কেননা, আমাদের নিহতরা জান্নাতে এবং তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে। তারপর আবূ সুফিয়ান চুপ হয়ে গেলো। তারপর সে চীৎকার করে বললো : আবার আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে বোঝাপড়া হবে। হযরত রসূল (সা) আদেশ করলেন বলে দাও :

نَعَمْ هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدٌ .

হাঁ, এ চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম!

আবূ সুফিয়ান এরূপ বলাবলি করে এবং জবাব শুনে প্রস্থান করলো। নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাদের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্যে পিছু পিছু পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, লক্ষ্য রাখবে যদি তারা উটের উপর হাওদা বাঁধে এবং ঘোড়াগুলোকে আরোহী শূন্য রাখে তবে বুঝে নিতে হবে যে এরা মক্কায় ফিরে চলেছে। পক্ষান্তরে যদি তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং উটের উপর হাওদা না বেঁধে থাকে তবে বুঝে নিতে হবে যে, এরা মদীনায় হামলা চালাতে উদ্যত হয়েছে। যদি তারা একান্তই মদীনায় হামলা করতে উদ্যত হয় তবে আমরা এ মুহূর্তে তাদের উপর আঘাত হানবো। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আলী (রা) ফিরে এসে জানালো যে, এরা উটের পিঠে হাওদা বেঁধে ঘোড়াগুলোকে আরোহী শূন্য অবস্থায় রেখেছে। অর্থাৎ সত্যি সত্যি তারা মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানের দৃশ্য

এরপর নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন। যুদ্ধের ময়দানে শহীদানের লাশগুলো দাফন করা হলো। ৬৫ জন আনসার এবং ৪ জন মুহাজির শাহাদত বরণ করেছিলেন। কাফিররা কোনো কোনো শহীদের লাশ টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন্‌ত উতবা সুযোগ পেয়ে হযরত আমীর হামযা (রা)-এর লাশের 'মুছলা' করলো। অর্থাৎ তাঁর নাক, কান প্রভৃতি কেটে চেহারা বিকৃত করে ফেলেছিল। চক্ষু বের করে নিয়েছিল।

বুক চিরে কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে চিবালো। কিন্তু গিলতে পারলো না। উগরে ফেলে দিলো। এজন্য সে 'কলিজাখোর' নামে কুখ্যাত হলো। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর মাতা এবং হযরত হামযা (রা)-এর সহোদরা ভগ্নী হযরত সাফিয়্যা (রা) তাঁর ভাইয়ের লাশ দেখার জন্য এলেন। হযরত নবী করীম (সা) যুবায়র (রা)-কে বললেন, সাফিয়্যা (রা)-কে লাশের কাছে যেতে বারণ করো। তিনি বারণ করলে হযরত সাফিয়্যা (রা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আমি বিলাপ করতে আসিনি, আমি সবর করবো এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করবো। নবী করীম (সা) একথা শুনে অনুমতি দিলেন। সাফিয়া (রা) তাঁর ভাইয়ের লাশ ও তাঁর কলিজার টুকরোগুলো মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে নীরবে সবর করলেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লেন। মাগফিরাত কামনা করলেন এবং চলে এলেন। ইসলামের পতাকাবাহী হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর কাফনের জন্য কেবল একটি চাদর ছিল। এটি এতই ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা উদোম হয়ে যেতো এবং পা ঢাকলে মাথা উদোম হয়ে যেতো। পরিশেষে মাথা ঢেকে দেয়া হয় এবং পায়ের উপর ইযখির ঘাস দ্বারা আবৃত করা হয়। বিনা গোসলে এক একটি কবরে দু' দু'জন করে শহীদকে দাফন করা হয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা ফেরার সময় পথে হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়েরের স্ত্রী হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা)-এর সাথে দেখা হল। তাঁকে তাঁর মামা হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদতের খবর জানানো হলো। তিনি ইন্না লিল্লাহ ... পড়লেন। এরপর তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা)-এর শাহাদতের খবর দেয়া হলো। তিনি ইন্না লিল্লাহ ... পড়ে তাঁর মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর তাঁর স্বামী মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়া হলো। একথা শুনে তিনি দিশেহারা হয়ে যান এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই হাল দেখে বললেন, মেয়েরা স্বামীদের প্রতি অধিকতর প্রীত থাকে।

আনসারদের এক গোত্রের এক মহিলার পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী তিনজনই শহীদ হয়েছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর শাহাদতের গুজব শুনে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা করেন। পথে তাকে কেউ খবর দিল যে, তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তিনি বললেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) সুস্থ আছেন কিনা–তাই বলো। তারপর তাকে বলা হলো, তোমার ভাইও শহীদ হয়েছেন। তিনি এ খবর শুনে ঐ একই কথা বললেন : আমাকে হযরত নবী করীম (সা)-এর খবর শোনাও। তিনি নিরাপদ আছেন কিনা। তারপর তাঁকে বলা হলো, তোমার স্বামীও শহীদ হয়েছেন। তিনি এ খবর শুনেও সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন : হযরত নবী করীম (সা) কেমন আছেন, তাই বলো। ইতিমধ্যে হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মহিলাকে বলা হলো–ঐ তো তিনি আসছেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখে মহিলা বললেন : আপনি যখন সুস্থ আছেন তখন সব মুসীবতই তুচ্ছ। এ যুদ্ধ মদীনা থেকে মাত্র তিন-চার মাইল দূরে সংঘটিত হয়। চুক্তিপত্র অনুসারে মদীনা মুনাওয়ারার ইয়াহূদীদের মুসলমানদের পক্ষে এবং মক্কা মুয়াযযামার কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা উচিত ছিল।

আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য-এর ফিরে আসার দরুন লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পর কোন কোন সাহাবী নবী করীম (সা)-কে বলেছিলেন ইয়াহূদীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে। কিন্তু

হযরত রাসূল করীম (সা) ইয়াহূদীদের নিকট সাহায্য চাওয়া পসন্দ করলেন না। সুতরাং ইয়াহূদীরা পরম আনন্দে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করলো এবং যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় থাকলো। ইয়াহূদীদের মধ্যে মুখায়রিক নামক জনৈক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়কে বললো যে, মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করা তোমাদের উপর ফরয। তারা বললো, আজ শনিবার, তাই আমরা যুদ্ধ করতে পারি না। মুখায়রিক বললেন, এটা আল্লাহ্‌র নবী ও কাফিরের মধ্যে যুদ্ধ। এতে শনিবার অন্তরায় হতে পারে না। একথা বলে তিনি তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন এবং সোজা যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন। যাবার সময় ঘোষণা করে গেলেন : 'আমি মারা গেলে মুহাম্মদ (সা)-কে দোষারোপ করবে না।' যুদ্ধে শরীক হলেন এবং নিহত হলেন। হযরত নবী (সা) শুনে বললেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি ছিল। হারিছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ নামক জনৈক মুনাফিক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে মুজযির ইব্‌ন যিয়াদ (রা) ও কায়স ইব্‌ন যায়দ (রা) নামে দু'জন মুসলমানকে শহীদ করে মক্কার দিকে পালিয়ে গেল। এর কিছুদিন পর সে মদীনায় ফিরে এলো এবং গ্রেফতার হয়ে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর হাতে নিহত হলো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো এই যে, তারা মুনাফিকদের ভাল করে চিনতে পেরেছেন। শত্রু ও মিত্রের মধ্যে তফাৎ করার সুযোগ হলো। মদীনায় পৌঁছার পর দিন অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের রোববার হযরত নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, কেবল তারাই কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য যেন বের হয়। উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেনি এরূপ নতুন কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে নেয়ার অনুমতি ছিল না। শুধু হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে তিনি সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবী এমনকি আহতরাও নবী (সা)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হলেন। তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে আট মাইল চলার পর হামরাউল আসাদ নামক স্থানে তাঁবু গাড়েন এবং তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে মক্কাগামী মা'বাদ ইব্‌ন আবী মা'বাদ খুযাঈ মক্কার দিকে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রূহা নামক স্থানে পৌঁছে মুশরিকরা ভাবলো, এ যুদ্ধে আমাদের মুসলমানদের মুকাবিলায় কোনো বিজয় হয়নি। বড়জোর সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা চলে। কেননা, আমরা যদি বলি যে, আমরা বিজয়ী বেশে ফিরে এসেছি, তবে লোকেরা বলবে যে, তোমাদের সাথে মুসলমান বন্দীরা কোথায় ? তারপর জিজ্ঞেস করবে, গনীমতের মাল কোথায় ? কাজেই আমাদের নিকট যখন কোন বন্দী নেই, গনীমতের মালও নেই এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন আদী, আবূ উমাইয়া ইব্‌ন আবী হুযায়ফা, হিশাম ইব্‌ন আবী হুযায়ফা, উবায়্য ইব্‌ন খালাফ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমায়দ আসাদী, তালহা ইব্‌ন আবী তালহা, আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবী তালহা, মাসাফি' ও জিলাস নামক তালহার দুই পুত্র, আরতাত ইব্‌ন শারজীল প্রমুখ সতের জন বিখ্যাত কুরায়শ নেতা এবং পাঁচ-ছয়জন অপর বাহাদুর ব্যক্তিকে হারিয়ে এলাম, তখন আমাদেরকে বিজেতা বলবে কে ? অন্যদিকে, আমরা কেবল হামযা (রা), মুসআব (রা) প্রমুখের মতো তিন-চারজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকেই কতল করতে পেরেছি। একথা চিন্তা করে সবার মত পাল্টে গেলো। নতুন করে আবার যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি চললো। আবূ সুফিয়ান সমুদয় সৈন্য নিয়ে 'রূহা' থেকে মদীনার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিল। ইত্যবসরে মা'বাদ ইব্‌ন আবী মা'বাদ রূহায় এসে পৌঁছলো। সে আবূ সুফিয়ানকে

তথ্য সরবরাহ করল যে, মুহাম্মদ (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে তোমার পশ্চাদ্ধাবনে এগিয়ে আসছেন। হামরাউল আসাদে আমি তাদের সেনাবাহিনী দেখতে পেয়েছি। সম্ভবত খুব শীঘ্রই তাঁরা তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবেন। এ খবর শোনা মাত্রই কাফির বাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে সেখান থেকে সোজা মক্কার দিকে ছুটে চললো। মক্কায় পৌঁছে তারা যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো। হযরত নবী করীম (সা) যখন নিশ্চিত হলেন যে, কাফিররা হতবুদ্ধি হয়ে মক্কার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। তাঁর এ যুদ্ধযাত্রা 'গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' নামে খ্যাত। এর ফলে কাফিরদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় দৃঢ় হয় এবং মদীনা তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। উহুদ যুদ্ধে তীরন্দাজদের রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ পালনে ভুল বুঝাবুঝির দরুন মুসলিম পক্ষে বিপদ দেখা দেয়। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণভাবে মশহুর হয়ে আছে যে, মুসলিম পক্ষ পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত বিরাট ভুল। মুসলমানগণ কাফিরদেরকে তাদের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং কাফিররা পরাস্ত হয়েছিল। পরে তারা পুনরায় আক্রমণ করে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেননি। কাফিররাই পরবর্তী বছরের জন্য যুদ্ধ মুলতবি করে এবং মুসলিম বাহিনী তাদের যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়। ময়দান থেকে প্রথমে কাফিররা মক্কার দিকে রওয়ানা হয়। তারপর মুসলমানগণ সেখান থেকে মদীনায় রওয়ানা করেন।

হামরাউল আসাদে মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে কাফিররাই হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করে। তবে এটা ঠিক যে, নিহত কাফিরদের তুলনায় মুসলিম শহীদদের সংখ্যা বেশী ছিল। এ হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ ঘটনা। এই যুদ্ধের পর যিলহাজ্জ মাস পর্যন্ত এ বছর আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। এ বছরই রমযান মাসের প্রায় মাঝামাঝি হযরত হাসান ইবন আলী (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের আঘাত প্রাপ্তির দরুন মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা খুব খুশী হয় এবং তাদের স্পর্ধা বেড়ে যায়। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা) তাদের উপেক্ষার চোখেই দেখতে থাকেন।

শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা

হিজরতের চতুর্থ বছর

চতুর্থ হিজরীর পয়লা মুহাররম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট খবর পৌঁছলো যে, কুতন নামক স্থানে বনূ আসাদ গোত্রের বহু সন্ত্রাসী সমবেত হয়েছে। তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার পাঁয়তারা করছে। তালহা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ও সালামা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ তাদের দলপতি। এই খবর পেয়ে নবী (সা) আবূ সালামা মাখযুমীকে দেড়শত মুসলমান সমভিব্যাহারে তাদের শাস্তি বিধানকল্পে প্রেরণ করেন। আবূ সালামা (রা) কুতনে পৌঁছে জানতে পেলেন যে, শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে পূর্বেই পলায়ন করেছে। শত্রুপক্ষের কিছু গবাদিপশু মুসলমানদের হস্তগত হলো। সেগুলো নিয়ে আবূ সালামা (রা) মদীনায় ফিরে এলেন। আরাফাত উপত্যকার অদূরে আরাফা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে সুফিয়ান ইব্‌ন খালিদ হাযলী নামক এক কট্টর কাফির বাস করতো। সে কাফিরদের একত্রিত করে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলো। তাদের এই প্রস্তুতির খবর হযরত নবী

করীম (সা)-এর নিকট ধারাবাহিকভাবে পৌছতে শুরু করলো। তিনি চতুর্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম সুফিয়ান ইব্‌ন খালিদ হাযলীর উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা) দিবাভাগে লুকিয়ে থেকে এবং রাতের বেলায় চলতে চলতে আরাফায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত হয়ে কৌশলে তার মস্তক কর্তন করেন এবং সেই মস্তক নিয়ে নিরাপদে চলে আসেন। আঠার দিন পর চতুর্থ হিজরীর ২৩ শে মুহাররম তিনি মদীনায় পৌছেন এবং মস্তকটি হযরত নবী করীম (সা)-এর কদম মুবারকের কাছে রেখে দেন। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে মক্কার কুরায়শরা 'আযাল ওকারা'র (বনূ আসাদের ভ্রাতৃ গোষ্ঠী) সাত ব্যক্তিকে অপকৌশল এঁটে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তারা মদীনায় পৌছে নবী করীম (সা)-কে বললো যে, আমাদের গোটা গোত্র ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি আমাদের সাথে কয়েকজন মুআল্লিম (শিক্ষক) প্রেরণ করুন যাতে তাঁরা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে পারেন। তিনি দশজন সাহাবী এবং ইব্‌ন খালদূনের মতে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠান। মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ গানাবী বা আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবিনে আফলাহ্‌কে এই শিক্ষক দলের নেতা নিযুক্ত করেন। চলতে চলতে যখন তাঁরা হুযায়ল গোত্রের রাজী নামক পুকুর পাড়ে পৌছেন, তখন ঐ বিশ্বাসঘাতকরা হুযায়ল গোত্রের দু'শ' যুবককে ডেকে আনলো। এই গোত্রটিও প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানগণ যখন নিজেদেরকে কাফিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ দেখতে পেলেন, তখন তারা সহসা সাহস সঞ্চার করে নিকটবর্তী পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং সেখান থেকেই তাদের মুকাবিলা শুরু করেন। কাফিররা এই দশ ব্যক্তিকে সহজে বন্দী করা কঠিন ভেবে প্রতারণার আশ্রয় নিলো। তারা বললেন, আমরা তোমাদের পরীক্ষা করে দেখলাম যে, মক্কাবাসী যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে রত হয়, তবে তোমরা তাদের মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে, কি পারবে না। মুসলমানরা তাদের উক্তি ও অঙ্গীকার বিশ্বাস করলো না। অবশেষে মুসলমানদের দুই ব্যক্তিকে জীবিত বন্দী করতে সক্ষম হয়। অন্যরা কাফিরদের সাথে লড়াই করে শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

এই দু'জন বন্দী সাহাবীর নাম ছিল হযরত খুবায়ব ইব্‌ন আদী ও হযরত যায়দ ইব্‌ন দাছনা (রা)। এই দু'জনকেই তারা মক্কায় নিয়ে গেলো। কুরায়শরা গ্রেফতারকারীদেরকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে দু'জনকেই হারিছ ইব্‌ন আমিরের গৃহে কয়েক দিন অভুক্ত অবস্থায় আবদ্ধ করে রাখলো। একদিন হারিছের একটি ছোট্ট শিশু ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে হযরত খুযায়ব (রা)-এর কাছে এসে পৌছলো। তিনি শিশুটিকে তাঁর উরুর উপরে বসালেন এবং ছুরিটিকে একটু দূরে সরিয়ে রাখলেন। শিশুর মা যখন দেখলো যে, শিশুটি তাদের বন্দীর নিকট পৌছে গেছে এবং ধারালো ছুরিও সেখানে বিদ্যমান, তখন সে জ্ঞানহারা হয়ে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলো। হযরত খুবায়ব (রা) বললেন, আমি তোমার শিশুকে কস্মিনকালেও হত্যা করবো না। তুমি নিশ্চিত থাক। এর কয়েক দিন পর হযরত যায়দ (রা)-কে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া নিয়ে গেলেন এবং তার পিতার (যে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল) রক্তের বদলা নেয়ার জন্য তার গোলাম নিসতাসের হাতে দিয়ে বললো, যাও, একে হরম এলাকার বাইরে নিয়ে হত্যা করবে। সে হযরত যায়দ (রা)-কে বাইরে নিয়ে গেলো। কুরায়শ ও মক্কাবাসী এই হত্যালীলা উপভোগ করার জন্য দলে দলে এসে সমবেত হলো। উপভোগকারীদের মধ্য থেকে আবূ সুফিয়ান

সামনে অগ্রসর হয়ে বললো, যায়দ! এখন তুমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় নিহত হতে যাচ্ছ। তুমি কি এটা পসন্দ করবে যে, এ সময় তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আরামে থাকবে, আর আমরা তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (সা)-এর গর্দান মারবো (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত যায়দ (রা) অতি ইস্পাত কঠিন ভাষায় ও বীরদর্পে জবাব দিলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটা কখনো পসন্দ করবো না যে, আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাকবো আর হযরত নবী করীম (সা)-এর শরীরে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ পর্যন্ত কারো এমন কোন বন্ধু দেখিনি যেমনটি দেখলাম মুহাম্মদ (সা)-এর বন্ধুকে। এরপর হযরত যায়দ (রা)-কে শহীদ করা হলো। হযরত খুবায়ব (রা)-কে নিয়েছিল হুজায়র ইব্‌ন আবী আবাব।

হযরত যায়দ (রা)-এর পর হযরত খুবায়র (রা) বধ্যভূমিতে নীত হলেন। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন এবং অনুমতি লাভ করলেন। তিনি উযূ করেন এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। সালাতের পর তিনি মুশরিকদের বললেন : আমার সালাত অনেক দীর্ঘ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমরা বলবে যে, আমি মৃত্যুকে ভয় করছি এবং মৃত্যুভয়ে সালাতকে বাহানা হিসাবে দীর্ঘায়িত করছি। তাই আমি দ্রুত সালাত শেষ করে ফেলেছি। মুশরিকরা হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলের উপর ঝুলিয়ে দিল এবং চতুর্দিক থেকে বল্লম দিয়ে তাঁর শরীরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিদ্র করতে থাকলো। এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে এক সময় তাঁর প্রাণবায়ু নশ্বর দেহ ত্যাগ করলো। হযরত খুবায়ব (রা) যে বীরত্বের সাথে জীবন দান করলেন, তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যাবে না।

মর্মান্তিক ঘটনা

কয়েক দিন পর চতুর্থ হিজরীর এই সফর মাসেই আবূ বারা' আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সাআ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণও করলো না আর ইসলামকে ঘৃণার দৃষ্টিতেও দেখলো না। বরং বললো, আমি আমার গোত্রের কথা ভাবছি। আপনি কয়েকজন লোক আমার সাথে প্রেরণ করুন। তারা নজদে গিয়ে আমার গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন ও শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি বললেন, আমি নজদবাসীদের তরফ থেকে মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা করছি। আবূ বারা' বললেন, আপনি এ বিষয়ে মোটেই আশংকা করবেন না। আমি এঁদের আমার পৃষ্ঠপোষকতা দান করবো। নবী (সা) মুনযির ইব্‌ন আমর সামিদীকে সত্তরজন সাহাবীসহ প্রেরণ করেন। এঁরা সবাই ছিলেন কারী ও কুরআন করীমের হাফিয।

এঁরা যখন বনূ আমির ও বনূ সুলায়মের মধ্যবর্তী বীরই মাউনায় পৌঁছেন, তখন হযরত নবী (সা)-এর চিঠি হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা)-এর মাধ্যমে আমির ইব্‌ন তুফায়লের নিকট পৌঁছলো। এই আমির ইব্‌ন তুফায়ল ছিল উপরোক্ত আবূ বারা' আমির ইব্‌ন মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। সে এই চিঠিটা পাঠ পর্যন্ত করল না বরং হযরত হারাম ইব্‌ন মিলহানকে শহীদ করে দিলো। তারপর তার স্বগোত্র বনূ আমিরকে ঐসব মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। কিন্তু বনূ আমির তাতে রাযী হলো না। তখন সে বনূ সালীমকে তাঁদের হত্যা করতে বললো।

বনূ সুলায়ম নেতা গাল্ল, যাকওয়ান ও উমাইয়া প্ররোচিত হলো এবং বিনা দোষে এই দুর্বৃত্তরা সবাইকে শহীদ করে দিলো। আবূ বারা' আমির ইব্‌ন মালিক এই দুর্ঘটনায় খুব মর্মাহত হলেন। কারণ, তার আমান (নিরাপত্তা) দানের মধ্যে তার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। এই মনোকষ্টে তিনি কয়েক দিন পর মারা গেলেন। আমির ইব্‌ন তুফায়ল হযরত আমর ইব্‌ন উমাইয়া হামারীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাঁর দাড়ি মুণ্ডিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেননা, তার মা একটি গোলাম আযাদ করার মানত করেছিল। আমির ইব্‌ন তুফায়েল এই মানত পুরা করার জন্য তাঁকে ছেড়ে দিলো। তিনি যখন মুক্তি পেয়ে বীর-ই মাউনা হয়ে মদীনা আগমন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে বনূ আমিরের দু'জন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমর ইব্‌ন উমাইয়া হামারী (রা) তাদেরকে দুশমন মনে করে এবং সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করলেন। মদীনা উপস্থিত হয়ে নবী করীম (সা)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তিনি একমাস পর্যন্ত ঐ নরঘাতকদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন। আমির ইব্‌ন তুফায়ল এক মাস পর প্লেগে মারা গেলো।

প্রতিশ্রুতি পালন

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লাম যখন আমর ইব্‌ন উমাইয়া কর্তৃক পথিমধ্যে ঐ দুই ব্যক্তিকে হত্যা করার কাহিনী শুনলেন, তখন বললেন, ঐ দু'ব্যক্তি তো আমাদের যিম্মায় ছিল এবং আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন তাদের রক্তপণ দেয়া আবশ্যক। ইয়াহূদীদের বনী নাযীর গোত্র ছিল বনূ আমির গোত্রের মিত্রপক্ষ। এদিকে মুসলমানদের সাথেও ছিল তারা সন্ধিবদ্ধ। তাই রক্তপণ আদায়ে তাদের সাহায্যে করা ছিল কর্তব্য। এ জন্য হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই রক্তপণের ব্যাপারে বনূ নাযীরের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের মহল্লা বা বস্তিতে স্বয়ং উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা)-ও গেলেন। বনূ নাযীর তাঁর আগমনের বাহ্যত রক্তপণে শরীক হতে প্রস্তুত বলে মত প্রকাশ করলো। তাঁকে তাদের দুর্গপ্রাচীরের ছায়ায় বসালো এবং মানুষজন সংগ্রহ ও ডাকার অজুহাতে এদিক-ওদিক চলে গেলো। তারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এমন এক স্থানে বসিয়েছিল যে, ঐ স্থান বরাবর দুর্গপ্রাচীরের উপর একটি মস্তবড় পাথর দেয়ালের মতো খাড়া করে রাখা ছিল। তারা তাঁর থেকে দূরে গিয়ে পরামর্শ করলো যে, এটা একটা মোক্ষম সুযোগ। কোন এক ব্যক্তি দুর্গের উপর আরোহণ করে উপর থেকে এই পাথরটি ধাক্কা দিয়ে যদি ফেলে দেয় তাহলেই মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর তিন সঙ্গী পিষ্ট হয়ে যাবে।

ইয়াহূদীর দুরভিসন্ধি

জনৈক আমর ইব্‌ন মুহাসিন ইব্‌ন কা'ব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের উপর পাথর গড়িয়ে ফেলার জন্য তৎক্ষণাৎ উপরে আরোহণ করলো। সে পাথর গড়িয়ে না ফেলতেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামকে ওয়াহীর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। ইয়াহূদীরা তাঁকে পুনরায় ডেকে পাঠালো। তিনি বললেন, তোমরা আমাদের হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছ। এখন তোমাদের

উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। ইয়াহূদীরা তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকারও করলো না, অনুতাপও প্রকাশ করলা না। হযরত নবী (সা) মদীনায় পৌঁছে তাদের কাছে বার্তা পাঠালেন। পুনরায় চুক্তিপত্র লিখে নাও। তারা চুক্তিপত্র লিখতে অস্বীকার করলো। তিনি পুনরায় তাদের নিকট বার্তা পাঠান : চুক্তিপত্র না লিখলে তোমরা মদীনা থেকে দশ দিনের মধ্যে দেশান্তরিত হয়ে অন্যত্র চলে যাও। বনূ নাযীর এর প্রত্যুত্তরে দেশান্তরিত হতে অস্বীকার করলো এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাদের উপর চড়াও হলেন। বনূ নাযীর তাদের দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তিনি অবরোধ করে রাখলেন। পনেরো দিন পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত থাকলো। মদীনার মুনাফিকরা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য বনূ নাযীরের কাছে বার্তা পাঠালো, আমরা তোমাদের শরীকদার। তোমরা যদি দুর্গ থেকে বের হয়ে ময়দানে যুদ্ধ কর, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলে মুসলমানদের হত্যা করবো। তোমরা যদি দেশান্তরিত হতে চাও, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে মদীনা ত্যাগ করে দেশান্তরে চলে যাবো।

বনূ নাযীরের দেশান্তর

মুনাফিকদের এই পৃষ্ঠপোষকতা ও উস্কানি প্রদানে বনূ নাযীরের শক্তিও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে পনেরো দিনের অবরোধ ও মুকাবিলায় ফল এই দাঁড়ালো, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালো যে, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দান করলে আমরা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন–অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া তোমরা তোমাদের যে মাল আসবাব উটের উপর করে নিয়ে যেতে পার তা নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাও। সে মতে তারা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যে পরিমাণ মাল উটের উপর বহন করে নিতে পারলো নিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় তারা তাদের ঘরদোর নিজেরাই ভেঙে ফেললো এবং ঘরের মটকা প্রভৃতি তৈজসপত্র চূর্ণবিচূর্ণ করলো। মদীনা থেকে বের হয়ে তারা কতক খায়বার চলে গেলো এবং কতক সিরিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। হযরত নবী করীম (সা) তাদের অবশিষ্ট মালামাল, সহায়-সম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আনসারদের মধ্য থেকে শুধু হযরত আবূ দুজানা (রা) ও সাহল ইব্ন হুনায়ফ এই মালে গনীমতের অংশ পেলেন। কেননা এই দু'জনও খুব গরীব ও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে ইয়ামীন ইব্ন উমায়র (রা) ও সাঈদ ইব্ন ওয়াহব (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এজন্য তাদের মাল-আসবাব ও যুদ্ধাস্ত্রের উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হলো না। এ যুদ্ধ গাযওয়া বনূ নাযীর নামে প্রসিদ্ধ। এটি চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের পূর্ণ ছয় মাস পর সংঘটিত হয়। সূরা হাশ্‌র এই যুদ্ধের সময়ই অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পর হযরত নবী করীম (সা) মাসাধিককাল মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন।

গাযওয়া যাতুর রিকা'

এই সময় বনূ মাহারিব ও বনূ ছা'লাবা (গাতফান গোত্রের দু'টি শাখা) সম্পর্কে উপর্যুপরি খবর আসলো যে, তারা সন্ত্রাসে প্রবৃত্ত ও আক্রমণ প্রস্তুতিতে লিপ্ত। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-কে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করে মাত্র চারশ' সাহাবাসহ তাদের মুকাবিলায় বের হলেন। প্রতিপক্ষ একটি খেজুর বাগানে সমবেত হয়েছিল। ইসলামী

লশকর যখন তাদের নিকটবর্তী হলো, তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। কোনো যুদ্ধ হলো না। এ অভিযানের নাম গাযওয়া যাতু'র রিকা'। চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে এটি সংঘটিত হয়। 'যাতু'র রিকা' নামকরণের কারণ হলো, পার্বত্য ও কংকরময় যমীনে সফর করার দরুন সাহাবায়ে কিরামের পা যখম হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা পায়ে কাপড় বেঁধে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, যাতু'র রিকা' একটি পাহাড়ের নাম। হযরত নবী (সা) নজদে গিয়ে এই পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। তখন কাফিররা তাঁকে দেখে পলায়ন করেছিল।

গাযওয়া সাবীক

নজদের এই অভিযান থেকে ফিরে এসে প্রায় তিন মাসকাল হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। আবূ সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধে বলে গিয়েছিল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার যুদ্ধ হবে। মুসলমানগণ সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। মদীনার মুনাফিকরা রাত-দিন মুসলমানদের ক্ষতি করার চিন্তায় লিপ্ত থাকত। তারা নাঈম ইব্‌ন মাসঊদকে মক্কায় প্রেরণ করলো। উদ্দেশ্য কুরায়শদের উহুদের প্রস্তাব স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। নাঈম আবূ সুফিয়ানকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো। মক্কায় ঐ বছর কিছুটা দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন ছিল। আবূ সুফিয়ান বললো, আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটি কাজ করবে। মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা শোনাবে এবং মুসলমানদের মনে ত্রাস সঞ্চার করবে যাতে তারা মদীনা থেকে বের না হয় আর এ বছর যুদ্ধ না হয়। তুমি যদি এ কাজটি করতে পার, তাহলে তোমাকে বিশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে। নাঈম মদীনায় এসে খুব ফলাও করে কুরায়শদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা সর্বত্র প্রচার করতে শুরু করলো। এই প্রচারণা শ্রবণ করে মুসলমানরা কতকটা চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল! তবু মুসলমানরা এই খবর শুনে ঘাবড়াচ্ছে কেন ? হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, একজন লোকও যদি আমার সাথে না যায়, তবু আমি একাকী ওয়াদা মতো কাফিরদের মুকাবিলায় বদর প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হবো। এরপর তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং বদরের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে দেড় হাজার সাহাবা ছিলেন। রওয়ানার সময় তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এবার তিনি তাঁর বাহিনীর ঝাণ্ডা সোপর্দ করেছিলেন হযরত আলী (রা)-কে। সমগ্র বাহিনীতে এবার দশটি ঘোড়া ছিল। আবূ সুফিয়ান যুদ্ধ থেকে জান বাঁচাতে ও পাশ কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে যখন নবী করীম (সা)-এর মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পারলো, তখন মক্কা থেকে দু'হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলো। দুর্ভিক্ষের কারণে ঐ সৈন্যদের কাছে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সামান্য ছাতু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এজন্য ঐ সৈন্যবাহিনীর নাম 'জায়শু'স সাবীক' (ছাতু বাহিনী) নামে মক্কায় প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আবূ সুফিয়ানের বাহিনীতে এবার পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার ছিল। এই দু'হাজার সৈন্য যখন 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন জানতে পারল যে, মুসলিম বাহিনীতে দেড় হাজার জানবাজ সৈন্য রয়েছে। মক্কাবাসী বদর ও উহুদ যুদ্ধে দেখেছিল যে, এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ মুসলমানের কাছেও তাদের পরাজয় মানতে হয়েছে। এবার যদিও মুসলমান সংখ্যায় কম অর্থাৎ মাত্র তিন-চতুর্থাংশ ছিল, কিন্তু এই সংখ্যার কথা শুনে কাফিরদের আক্কেল

গুড়ুম হয়ে গেলো এবং 'উসফান' থেকেই এই কথা বলে মক্কা প্রত্যাবর্তন করলো যে, আমরা দুর্ভিক্ষের সময় যুদ্ধ করা পসন্দ করি না। এই বাহিনী যখন রাস্তা থেকেই মক্কায় ফিরে গেলো, তখন মক্কার মহিলারা বললো, তোমরা কেবল ছাতু খাওয়ার জন্যই গিয়েছিলে। যুদ্ধ করার জন্য গিয়ে থাকলে ফিরে এলে কেন ?

হযরত নবী করীম (সা) বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে আট দিন পর্যন্ত কাফিরদের অপেক্ষা করলেন। অষ্টম দিন মা'বাদ ইব্ন আবী মা'বাদ খুযাঈ এসে জানালো, আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে উসফান নামক স্থানে পৌঁছে পুনরায় মক্কায় ফিরে গেছে। হযরত রাসূলে করীম (সা) একথা শুনে বদর থেকে মদীনা মুনাওয়ারা চলে এলেন। চতুর্থ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিকে এ ঘটনা ঘটে। এই অভিযান 'গাযওয়া বদর মাওয়িদ', 'গাযওয়া বদর ছানী', 'গাযওয়া বদর সুগ্‌রা' ও 'গাযওয়া বদর উখরা' নামে মশহুর। এ অভিযানে মুসলমানরা গনীমতের মাল না পেলেও এই সময় যেহেতু বদর প্রান্তরে মেলা বসার প্রচলন ছিল তাই তারা তেজারতের মাধ্যমে লাভবান হলেন।

হযরত নবী (সা) শা'বান মাসে মদীনায় ফিরে এলেন। এই বছরই ইমাম হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই মদ হারাম হয়। এই বছরই হযরত নবী করীম (সা)-এর দৌহিত্র আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান (রা) ছয় বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এই শিশুটির মৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, মোরগে চোখের মধ্যে থাবা মেরেছিল। আর যন্ত্রণা থেকে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই বছরই উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিন্‌ত খুযায়মা ইনতিকাল করেন। এই বছরই হযরত নবী করীম (সা) আবূ সালামা মাখ্‌যূমীর ইনতিকালের পর তার বিধবা স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন। হযরত ফাতিমা বিন্‌ত উসায়দ (রা) হযরত আলী (রা)-এর মাও এই বছর ইনতিকাল করেন।

হিজরতের পঞ্চম বছর

গাযওয়া বদর ছানী থেকে প্রত্যাবর্তন করে হযরত নবী করীম (সা) ছয়-সাত মাস মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। এ সময় কোনো উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। পঞ্চম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে হযরত নবী করীম (সা) জানতে পারেন যে, দূমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা আকীদার ইব্ন মালিক ঈসায়ী মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করার জন্য এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে এবং মদীনা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলাকে পথিমধ্যে লোপাট করেছে। এই নয়া দুশমন অধিক মারাত্মক হতে পারে এবং তাদের হামলার ফলে মুনাফিক, ইয়াহূদ ও আশেপাশের আরব গোত্রগুলো মুসলমানদের সংকট আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে এই আশংকায় হযরত নবী করীম (সা) এই ফিতনাকে মাথাচাড়া দেয়ার আগেই দমন করা প্রয়োজনবোধ করলেন। তিনি মদীনায় সাব্বা' ইব্ন আরফাতা গিফারী (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করে স্বয়ং এক হাজার মুসলিম সৈন্য সমভিব্যাহারে দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করলেন। দুমাতুল জান্দাল দামেশক থেকে পাঁচ মনযিল ও মদীনা থেকে দশ মন্‌যিল দূরে দামেশক ও মদীনার মধ্যবর্তী সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত ছিল। বান আয্‌রার নামক জনৈক ব্যক্তিকে তিনি পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিলেন। এ অভিযাত্রায় তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন ও দিনের বেলা তাঁবুতে অবস্থান করতেন। যখন দুমাতুল জান্দালে পৌঁছতে আর মাত্র

একরাতের পথ বাকী ছিল, তখন পথ প্রদর্শক বললো, দুশমনের চারণভূমি এখান থেকে নিকটেই। তাদের পশুগুলো এখনি করায়ত্ত করা উচিত। হযরত নবী (সা) অনুমতি দিলেন। দুমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা আকীদর ইব্‌ন মালিক যখন এ খবর জানতে পারলো, তখন মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো। হযরত নবী (সা) পরদিন সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন ময়দান একেবারেই শূন্য। মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (রা) একজন কাফিরকে বন্দী করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে পরিষ্কার বলে দিল, হযরত নবী করীম (সা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে তারা সবাই পালিয়ে গেছে। তিনি সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে ছোট্ট ছোট্ট বাহিনী এদিক-ওদিক প্রেরণ করলেন। কিন্তু কেউ মুকাবিলা করতে এগিয়ে এলো না। এভাবে সিরিয়া সীমান্তে ভীতি কায়েম করে তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে এক আরব সরদার এসে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমার এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুন ঘাস তৃণলতা পাওয়া যাচ্ছে না। মদীনায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, তাই সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার পশুগুলো মদীনার চারণভূমিতে চরানোর জন্য পাঠিয়ে দেবো। তিনি তাকে সানন্দে অনুমতি দেন। এই আরব সরদারের নাম ছিল উয়ায়না ইব্‌ন হুসায়ন। এই গাযওয়া দুমাতুল জান্দাল নামে পরিচিত। এবার মদীনায় ফিরে আসার পর প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশ পায়নি। হযরত নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের তরবিয়াত (প্রশিক্ষণ) দান ও তাবলীগের কাজে মশগুল হন।

গাযওয়া বনূ মুসতালিক

পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে খবর পৌঁছলো, বনূ মুসতালিকের সরদার হারিছ ইব্‌ন দারার যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আরবের অন্যান্য গোত্রকেও সে তার দলভুক্ত করছে। মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য সে তাদেরকে আহবান জানাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সা) প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য হযরত বুরায়দা ইব্‌ন হাসীব আস্‌লামী (রা)-কে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। হযরত বুরায়দা (রা) ফিরে এসে জানালেন যে, হারিস ইব্‌ন দারার ইসলাম ও মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য বদ্ধপরিকর। সে বহু গোত্রকে নিজের দলভুক্ত করেছে এবং কোন মতেই যুদ্ধ ও আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে নারায। প্রায় একই সাথে খবর আসলো যে, হারিস তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করছে। হযরত নবী করীম (সা) কালবিলম্ব না করে মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং মদীনায় হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে প্রশাসক নিযুক্ত করে মুসলিম বাহিনীর সাথে রওয়ানা হলেন। এ বাহিনীতে ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। মুহাজিরদের দশটি এবং আনসারদের বিশটি। মুহাজির ও আনসারদের পৃথক পৃথক ঝাণ্ডা ছিল। আনসারদের ঝাণ্ডা ছিল হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর হাতে এবং মুহাজিরদের নিশানবরদার ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মুকাদ্দামাতুল জায়শ (অধিনায়ক) নিযুক্ত করা হলো। যেহেতু উপর্যুপরি কয়েকটি অভিযানে মুসলমানদের বিজয় লাভ করতে দেখা গিয়েছিল, তাই এবার গনীমতের মালের লোভে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যও তার দলসহ শরীক হলো।

এ মুনাফিকরা যেহেতু নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবী করতো, সেহেতু তাঁরা সমস্ত ইসলামী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো এবং মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করার ক্ষেত্রেও এদের

নিষেধ করা হতো না। এই প্রথমবারের মতো আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য ও তার মুনাফিক দল মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা করলো। উহুদ যুদ্ধে তো এরা যাত্রাপথ থেকেই ফিরে এসেছিল এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। হারিস ইব্‌ন দারার একজন গুপ্তচর প্রেরণ করেছিল। এই গুপ্তচরটি পথিমধ্যে হঠাৎ মুসলিম বাহিনীর নাগালে এসে পড়লো এবং গ্রেফতার হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হলো। তার গুপ্তচর হওয়া যখন নিশ্চিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করতেও সে অস্বীকার করলো, তখন আরবের প্রচলিত রীতি ও যুদ্ধনীতি অনুযায়ী তাকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করা হলো। সে নিহত হলো। হারিস যখন তার গুপ্তচরের নিহত হওয়া ও নবী করীম (সা)-এর সান্নিকট পৌঁছার খবর পেলো, তখন সে খুব অস্থির ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

অবশেষে হযরত নবী করীম (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে বললেন যে, তুমি সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দাও। হযরত উমর ফারূক (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে তা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। এরপর উভয় পক্ষ থেকে হামলা শুরু হলো। কাফিরদের পতাকাধারী হযরত আবূ কাতাদা (রা) কর্তৃক নিহত হলো। পতাকাধারী ধরাশায়ী হওয়ার সাথে সাথেই কাফিরদের পা ফসকে গেল এবং তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে মুসলমানদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করলো। কাফিরদের মধ্যে যারা বন্দী হলো, তাদের মধ্যে প্রধান সেনাপতির কন্যা জুওয়ায়রিয়াও ছিল। গনীমতেরও অঢেল মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। ইয়াহূদ বনূ মুসতালিকের সাথে 'মারীসী'তে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা ছিল মদীনা মুনাওয়ারা হতে নয় মনযিল দূরে অবস্থিত।

মুনাফিকদের ধৃষ্টতা

ফেরার পথে মুনাফিকরা তাদের গোপন শত্রুতাবশত এমন কিছু কূটকৌশল অবলম্বন করলো যে, কোন কোন মুহাজির ও আনসারের মধ্যে মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য আনসার ও মুহাজিরের প্রশ্নটি খুব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুললো এবং এমনকি সে এরূপ মন্তব্যও করে বসলো যে, মদীনায় গিয়ে এইসব মুহাজিরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হবে। এই অভিযানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে গেল। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-ও হযরত নবী করীম (সা)-এর সফরসঙ্গিনী ছিলেন। একটি মনযিলে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিলো। সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাওদা উটের উপর রেখে দেয়া হলো। তিনি হাওদার মধ্যে আছেন, কি নেই তা অনুমান করা হয়নি। অথচ তিনি তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কিছুটা দেরী হয়ে যায়। তিনি তাঁর সহোদরার একটি হার পরেছিলেন। ঘটনাচক্রে ঐ হারের সুতা কোন এক ঝোপে আটকে গিয়ে ছিঁড়ে যায় এবং মুক্তাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। অপরের জিনিস বলে তিনি একটু বেশী মনোযোগ দিলেন। যমীনের উপর থেকে মুক্তাগুলো কুড়িয়ে নিতে বেশী লেগে গেলো। কিন্তু লোকজন ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে, মনযিল একেবারে ফাঁকা। খুব চিন্তিত ও বিচলিত হলেন। ইত্যবসরে হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল (রা)-কে দেখা গেলো পেছন দিক থেকে তার উট নিয়ে চলে আসতে। হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল (রা)-এর প্রতি নির্দেশ ছিল সবার

পেছনে অবস্থান করার এবং কাফেলা প্রস্থান করার পর মনযিল পরিদর্শন করে রওয়ানা করার, যাতে কারো কোন জিনিস পড়ে থাকলে তা তুলে আনতে পারেন এবং কারো কোন প্রকার ক্ষতি না হতে পারে। হযরত সাফওয়ান (রা)-কে এই দায়িত্ব দেয়ার কারণ হলো তিনি ছিলেন বেশী ঘুম-কাতুরে লোক। তিনি দেরীতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। নিয়মানুসারে হযরত সাফওয়ান (রা) অবস্থানস্থল পরিদর্শন করতে করতে চলে আসছেন। ইত্যবসরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে দেখতে পেয়ে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর উট থেকে অবতরণ করে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-কে উটের উপর বসালেন। তারপর তিনি উটের রশি ধরে পথ চলেন এবং বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনি যখন এইভাবে বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন এবং লোকেরা এই ঘটনা জানতে পারলো, তখন তারা সবাই দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করলো। মুনাফিকরা কথা বানানো ও অপবাদ রটানোর এক মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেলো। তারা নানা রকম কথা বানিয়ে লোকজনের মধ্যে এক তুফান সৃষ্টি করলো। হযরত নবী (সা) খুব কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও নীরব হয়ে গেলেন।

মোটকথা, মুনাফিকরা এবার মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করে মুসলমানদেরকে নিজেদের ধৃষ্টতা ও কুটিলতা দ্বারা বিচলিত করার বিরাট সুযোগ পেলো। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর নামে মুনাফিকরা যে অপবাদ রটনা করলো, তার ফলে তিনি প্রায় দেড়মাস পর্যন্ত তাঁর পিত্রালয়ে অবস্থান করেন এবং মুসলমানদের সাধারণভাবে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর সতীত্ব, সচ্চরিত্রতা ও নির্যাতিতা হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। একমাস পর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর পুণ্যশীলতা ও পবিত্রতার রায় অবতীর্ণ হলো এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে সিদ্দীকা হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এর পূর্বে আরো একজন সিদ্দীকা অর্থাৎ হযরত মারয়াম সিদ্দীকার নামেও এরূপ অপবাদ ইয়াহূদীরা রটনা করেছিল। তারাও ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এই সিদ্দীকাকে অপবাদ দানকারীদের পরিণামও ধ্বংস ও বিনাশই হলো।

এ অভিযানে মুনাফিকরা যেসব দুরভিসন্ধি এঁটেছিল হযরত নবী করীম (সা) তা সবই ধীরে ধীরে অবগত হতে থাকলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহাবী মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যর কটুক্তির উল্লেখ করেন এবং সাক্ষী পেশ করে দাবী তোললেন যে, তাকে হত্যা করার আদেশ জারি করা হোক। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য যেহেতু নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে, তাই তাকে হত্যা করা হলে [illegible] বলবে মুহাম্মদ (সা) তাঁর বন্ধুদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছে। আবদুল্লাহ্ ইব্[illegible] খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লা[illegible] ইব্ন আবদুল্লাহ্ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা[illegible] তখন তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর [illegible] উবায়্য অর্থাৎ আমার পিতাকে [illegible] নিজেই তার শিরশ্ছেদ[illegible] নবী করীম [illegible] (রা) [illegible] ডপর হামলা করার [illegible] গুহায় এসে পৌছলো। সে আবূ সুফিয়ানকে

প্রবেশ করতে দেবো না, তখন নবী (সা) তা জানতে পেরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যকে মদীনায় আসতে অনুমতি দিলেন।

যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি

বনূ মুসতালিকের সরদার হারিসের কন্যা হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা) সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-এর ভাগে পড়লেন। হারিস কয়েক দিন পর মদীনায় আগমন করে তাঁর কন্যাকে মুক্ত করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলো। হযরত নবী করীম (সা) জুওয়ায়রিয়াকে নিজে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করিয়ে দিলেন। জুওয়ায়রিয়া পিতার সাথে যাওয়ার চাইতে হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে থাকা অধিকতর পসন্দ করলেন। তখন তিনি জুওয়ায়রিয়ার ইচ্ছা অনুসারে এবং হারিসের সম্মতিক্রমে জুওয়ায়রিয়াকে বিবাহ করলেন। এই বিবাহের ফলে সাহাবায়ে কিরাম বনূ মুসতালিকের সমুদয় বন্দীকে এই বলে মুক্ত করে দিলেন যে, যে গোত্রের লোক হযরত নবী করীম (সা)-এর আত্মীয় হয়ে গেছেন, আমরা তাদেরকে বন্দী অথবা দাস বানিয়ে রাখতে পারি না। একই সাথে সমুদয় মালে গনীমতও তাঁরা ফিরিয়ে দিলেন। এভাবেই ইয়াহূদীদের একটি গোত্রের সাথে এই বিবাহের ফলে শত্রুতার স্থলে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো।

ইয়াহূদীর শাস্তি

এখানে স্মর্তব্য যে, বনূ নাযীর যখন দেশান্তরিত হয়ে খায়বার ও সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল, তখন থেকেই তারা অনবরত তাদের তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত রেখেছিল। তাদের তৎপরতার কারণেই আরবের মুশরিক ও ইয়াহূদী গোত্রগুলো যত্রতত্র মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য অনুপ্রণিত হতে থাকে এবং তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে খ্রিস্টান বাহিনীও সিরীয় সীমান্তে মুসলমানদেরকে আশংকার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব দেশ ও সমগ্র আরব গোত্রকে বিক্ষুব্ধ করে তোলা হয়েছিল এবং যত্রতত্র সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের মূলোৎপাঠন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, তাই হযরত নবী করীম (সা) দেশের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি গোত্র সম্পর্কে অবহিত থাকার চেষ্টা করতেন। আর যেখানেই বিপদ ও গণ্ডগোল মাথাচাড়া দেয়ার আশংকা দেখা দিতো নিজ মুসলিম বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি সঞ্চয় করার পূর্বেই দমন করতেন। এই পরিস্থিতিতে উপরে বর্ণিত ছোট ছোট অভিযানগুলো পরিচালিত হয়েছিল।

খন্দকের যুদ্ধ

বনূ নাযীরের হুই ইব্ন আখতাব ছিল সবচেয়ে বড় ফেতনাবাজ ও কলহপরায়ণ। সে এবং বনূ নাযীর গোত্রের বড় অংশটি খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল। হুই ইব্ন আখতাব, সালাম ইব্ন আবিল হাকীক, সালাম ইব্ন মাশকাম, ইব্ন কিনানা ইব্ন রবীঈ প্রমুখ বনূ নাযীর নেতৃবৃন্দ এবং হূদ ইব্ন কায়স ও আবূ আম্মারা প্রমুখ বনূ ওয়ায়িল নেতৃবৃন্দ একত্র হয়ে প্রথমে মক্কায় গেলো। চাঁদার তহবিলও খুললো। কুরায়শরা খুব বেশী বেশী যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা দিলো। এখানে যখন খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হলো, তখন মক্কার কুরায়শদের পরামর্শক্রমে তারা গাতফান গোত্রগুলোর কাছে গেলো এবং তাদেরকেও এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করতে সফল হলো। বনূ কিনানা গোত্রগুলোও উদ্বুদ্ধ হলো। এরপর যেসব ইয়াহূদী

তখন পর্যন্ত মদীনায় বসবাস করছিল (অর্থাৎ বনূ কুরায়যা), তাদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু হলো। অথচ বনূ কুরায়যা তখনো পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল এবং চুক্তিপত্র অনুসারে মুসলমানদের সাহায্য করা তাদের কর্তব্য ছিল। বনূ সুলায়ম, ফাযারা, আশজা', বনূ সা'দ ও বনূ মুররা প্রভৃতি কুরায়শ গোত্র এবং বনূ নাযীর ও গাতফান প্রভৃতি গোত্রের নেতৃবর্গ যাদের সংখ্যা পঞ্চাশের কম ছিল না, কা'বা ঘরে গিয়ে কসম করলো যে, আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পরাঙমুখ হবো না এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করতে কোন সুযোগই হাতছাড়া করবো না। বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিরাট ষড়যন্ত্রে সীমাতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। আর এ জন্যই হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলাম বিরোধীদের এই বিরাটতম ষড়যন্ত্রের সংবাদ চরম মুহূর্তের পূর্বে পৌঁছতে পারে নি। প্রথমে আবূ সুফিয়ান কুরায়শ ও তার সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রসমূহের চার হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কা থেকে যাত্রা করলো। মাররুয্-যাহ্‌রান নামক স্থানে বনূ সুলায়মান ফৌজও এসে মিলিত হলো। এভাবে সবগুলো গোত্র পথিমধ্যে এসে এসে এই বাহিনীতে শামিল হতে থাকলো। বনূ নাযীরের অধিনায়ক ছিল হুই ইব্‌ন আখতাব এবং গাতফান গোত্রগুলোর অধিনায়ক ছিল উআয়না ইব্‌ন হিসন। সমগ্র কাফির বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। মদীনার কাছে পৌঁছে সমুদয় শত্রুসেনার সংখ্যা দাঁড়াল বিভিন্ন বর্ণনা মতে ন্যূনপক্ষে দশ হাজার এবং ঊর্ধ্বপক্ষে চব্বিশ হাজার। এই বিশাল বাহিনীতে ছিল সাড়ে চার হাজার উট ও তিনশ' ঘোড়া।

হযরত নবী করীম (সা) যখন এই বিপুল বাহিনীর আক্রমণের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি মজলিসে শূরার বৈঠক ডাকলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, মদীনার ভেতরে থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। হযরত সালমান ফারসী (রা) পরামর্শ দিলেন যে, শত্রুবাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অবরুদ্ধ বাহিনীর চতুর্দিকে খন্দক (পরিখা) খনন করতে হবে। আরবরা এরূপ খন্দক খননের ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। হযরত নবী করীম (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর এই প্রস্তাব পসন্দ করলেন। একদিকে ছিল ছোট ছোট পর্বতমালা এবং আরেক দিকে মদীনা মুনাওয়ারার আবাস গৃহের দেয়ালগুলো প্রাচীরের কাজ করছিল। যে দিকটি খোলা ছিল এবং যে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ হতে পারতো, সেদিকে খন্দক খনন শুরু করা হলো। পবর্তমালা ও খন্দকের মাঝখানে একটি ডিম্বাকৃতির ময়দান সৃষ্টি হয়ে গেলো। এটিই যেন মুসলমানদের দুর্গ ছিল। এর মাঝখানে ছিল হযরত নবী করীম (সা)-এর তাঁবু। খন্দক পাঁচ গজ চওড়া ও পাঁচ গজ গভীর খনন করা হলো। খন্দকের গোটা দৈর্ঘ্য- সমান ভাগ করে দশ দশজন লোককে এক একটি অংশ খনন করার জন্য দেয়া হলো। হযরত নবী করীম (সা)-ও একটি অংশের খননকার্যে শামিল ও খন্দক খননে নিয়োজিত হলেন। খন্দক খননের সময় এক স্থানে একটি বিরাট পাথর দেখা গেলো। সবাই শক্তি পরীক্ষা করলেন কিন্তু পাথর ভাঙ্গতে পারলেন না। হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করা হলো যে, খন্দকটি এই জায়গা থেকে ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে খনন করার অনুমতি দিন। তিনি যে জায়গায় খন্দক খনন করছিলেন সেখান থেকে তাঁর কোদাল নিয়ে চললেন। পাথরের স্থানে পৌঁছে খন্দকে নেমে তাঁর কোদাল দ্বারা আঘাত করতেই পাথরটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হলো। তিনি আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। সাহাবায়ে

কিরামও তাঁর অনুসরণে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললেন। তিনি বললেন, আমাকে শাম দেশের (সিরিয়ার) চাবি দান করা হয়েছে। এরপর তিনি পাথরটিতে দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন। এবার আরো খণ্ডিত হলো। এবারের আঘাতেও একটি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হলো। সুতরাং অনুরূপ আল্লাহু আকবার ধ্বনি উত্থিত হলো। তিনি বললেন, আমাকে পারস্যের চাবি দান করা হয়েছে। তৃতীয় আঘাতে পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং পূর্বের মতো আলোকরশ্মি বের হলো। এবারো আল্লাহু আকবার ধ্বনি বুলন্দ হলো। তিনি বললেন, আমাকেই ইয়ামেনের চাবি দান করা হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, আমাকে জিবরাঈল আমীন জানালেন যে, এই দেশগুলো আপনার উম্মতের করায়ত্ত হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, চব্বিশ হাজার সশস্ত্র শত্রুসেনার মুকাবিলায় মুষ্টিমেয় মুসলমান তাদের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত। গোটা আরবদেশ দুশমনীতে লিপ্ত ও রক্তপানে উদ্যত। বাহ্যত ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এ সময়ও ইরান, রোম ও ইয়ামন দেশের রাজত্ব লাভের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে। এ কাজ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হতে পারে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ এরূপ খবর দিতে পারেন না।

এই অবস্থায় হযরত নবী করীম (সা) খবর পেলেন যে, বনূ কুরায়যা প্রধান কা'ব ইব্ন উসায়দ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুসেনাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে এবং হুই ইব্ন আখতাব বনূ কুরায়যার দুর্গে প্রবেশ করে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। তিনি ঘটনা তদন্ত ও তাদের নিবৃত্ত করার জন্য সা'দ (রা) ইব্ন মুআয (রা) ও সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে বনূ কুরায়যার নিকট প্রেরণ করলেন। এই দু'জন মনীষীই তাদেরকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হলেন না। বনূ কুরায়যা খুব ঔদ্ধত্যভরে জবাব দিলো যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে চিনি না। তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তিও নেই।

কাফির বাহিনী যখন খন্দকের নিকট এসে পৌঁছলো, তখন খন্দক দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং চিন্তায় পড়লো। কেননা, ইতিপূর্বে আরবরা এ ধরনের খন্দক কখনো দেখেনি। কাফিরদের বিরাট বাহিনী মদীনা অবরোধ করলো। এ হামলা ছিল কাফিরদের শক্তি ও সামর্থ্যের চূড়ান্ত প্রকাশ এবং ইসলামের মুকাবিলায় কুফরের সবচেয়ে বড় প্রয়াস। মুসলমানরা তাদের বিবি-বাচ্চাদের মদীনার একটি বিশেষ সুরক্ষিত গর্তের মধ্যে হিফাযত মানসে রেখে দিয়েছিলেন। মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহূদীদের তরফ থেকে সর্বদা হামলার আশংকা ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সাথে বসবাসকারী মুনাফিকদের তরফ থেকেও বড় ভয় ছিল। কাফিরদের তরফ থেকে একাধিকবার খন্দক পার হওয়ার প্রয়াস চললো। কিন্তু তারা খন্দক পার হতে পারলো না। খন্দকের এক স্থান দিয়ে প্রশস্ততা একটু কম ছিল। একবার দু'তিনজন কাফির সেনা সেখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। তন্মধ্যে আমর ইব্ন আবদ উদকে দুই হাজার পুরুষের সমান মনে করা হতো। সে ছিল আরব দেশের প্রখ্যাত বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করলেন। অন্যরা পলায়ন করলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তীর দ্বারা যুদ্ধ চলতো। মুসলমানরাও কাফিরদের যথাযোগ্য জবাব দিতেন। প্রায় এক মাস পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। শত্রুদের অবরোধ ছিল বড় কঠোর। তারা অনবরত বাইরে থেকে সব ধরনের সাহায্য পাচ্ছিল। না রসদপত্র তাদের কম ছিল, না তাদের জনশক্তির কোন কমতি ছিল। মুসলমানদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোথাও থেকে রসদপত্র যোগাড় করা যেতো না। উপোসের পর উপোস চলছিল। একবার এক সাহাবী তাঁর উপোসের কথা

জানালেন এবং জামা উঠিয়ে দেখালেন পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। যাতে ক্ষুধার কারণে কোমর ঝুঁকে না পড়ে। হযরত নবী করীম (সা)-ও তাঁর জামা উঠালেন। দেখা গেলো তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

রাতে যেহেতু হামলার ভয় ও খন্দক রক্ষা করা আবশ্যক ছিল, সেহেতু রাতভর সবাইকে ময়দানে বিনিদ্র থাকতে এবং দিনভর দুশমনের মুকাবিলা করতে হতো। মুসআব ইব্‌ন কুশায়র নামক জনৈক মুনাফিক বললো, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বন্ধুদেরকে সিরিয়া, ইরান ও ইয়ামন দেশ শাসন করার সুসংবাদ দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা তো দেখছি যে, তিনি মদীনায়ও এখন থাকতে পারবেন না। কেউ কেউ বলতো, ঘর থেকে বের হয়ে পায়খানা করতেও যেতে পারছে না, অথচ কায়সার ও কিসরার দেশ ইরান ও রোম দখলের স্বপ্ন দেখছে। মোটকথা, মুনাফিকদের বিদ্রূপ, রাতের শিশির, দিনের রৌদ্র, ক্ষুৎ-পিপাসা, কাফিরদের মুকাবিলা, বনূ কুরায়যার আশংকা, মুনাফিকদের ভয়, কাফিরদের সংখ্যাধিক্য, মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা—এই সামগ্রিক অবস্থায় মুসলমানরা যে সাহস ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা এতেই অনুমিত হয় যে, কাফিররা যখন মুসলমানদের কাছে অপমানকর সন্ধির প্রস্তাব করলো, তখন তারা তা সরাসরি নাকচ করে দিলেন। এই অবস্থায়ও ভাগ্যবানেরা বের হয়ে আসতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতেন। যেমন নাঈম ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন আমির নামীয় জনৈক ব্যক্তি গাতফান গোত্রের সৈন্য থেকে বের হয়ে হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট এসে হাযির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি বললেন, আমি বনূ কুরায়যা ও কাফির বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেবো। সুতরাং তিনি প্রথমে বনূ কুরায়যার কাছে গেলেন। তারপর গেলেন আবূ সুফিয়ানের কাছে। তিনি এমন এমন কথা বললেন যাতে বনূ কুরায়যা ও কুরায়শরা উভয়েই পরস্পর থেকে নিজ নিজ নিরাপত্তা দাবী করলো। তার ফল এই দাঁড়ালো যে, বনূ কুরায়যা কুরায়শদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ্যে কোন জঙ্গী তৎপরতা চালাতে বিরত থাকলো। নাঈম ইব্‌ন মাসউদ দুই তরফেই তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। এ জন্য তাঁর পরামর্শ দুই তরফেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো।

যখন অবরোধের সাতাশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন একদিন রাতের বেলা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হলো। তাঁবুসমূহের পেরেকগুলো উপড়ে গেলো। চুলোর উপর থেকে ডেগচিগুলো উল্টে পড়ে গেলো। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا (এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম এবং এমন এক বাহিনী, যা তোমরা দেখতে পাও নি (৩৩ : ৯)। এই ঘূর্ণিবায়ু ও ঝঞ্ঝাবাত্যা বিরাট কাজ করলো। সর্বত্র তাঁবুগুলোর আগুন নিভে গেলো। মুশরিকরা আগুন নিভে যাওয়াকে অশুভ লক্ষণ ভাবলো এবং রাতের মধ্যেই ডেরা-তাঁবু উঠিয়ে পলায়ন করলো। কাফিরদের পলায়নের খবর হযরত নবী করীম (সা)-কে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো। তখনই তিনি হযরত হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)-কে খবর নেয়ার জন্য অকুস্থলে পাঠালেন। তিনি এসে খবর দিলেন যে, কাফিরদের সৈন্যস্থল ফাঁকা পড়ে আছে এবং তারা পলায়ন করছে। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, এরপর কুরায়শরা আমাদের উপর আর কখনো আক্রমণ করবে না। মুসলমানরা আনন্দের সাথে মদীনায় প্রবেশ করলেন। এ ঘটনা পঞ্চম হিজরীর যুল-কাদাহ মাসে সংঘটিত হয়। নবী করীম (সা) যখন কাফিরদের মুকাবিলায় মদীনার বাইরে খন্দকের দিকে অবস্থান করছিলেন, তখন ইব্‌ন উম্মে

মাকতূমকে মদীনার শাসক নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। মদীনায় ফিরে এসে তিনি খুব অল্প সময় অবস্থান করলেন এবং যোহরের সালাত আদায় করে হুকুম দিলেন যে, আসরের সালাত যেন এখানে কেউ আদায় না করে। তাঁরা আসরের সালাত বনূ কুরায়যার মহল্লায় গিয়ে আদায় করলেন। কোন কোন সাহাবা হাতিয়ারও খুলে রাখতে পারেন নি, ইত্যবসরে এই নির্দেশ জারি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বনূ কুরায়যার দিকে গমন করলেন।

বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-যিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় বনূ কুরায়যাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সঠিক পথে রাখার জন্য তাদের নিকট তাদের দুর্গের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তারা অত্যন্ত রুক্ষভাবে তাঁকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল–বনূ কুরায়যার সাথে চুক্তিবদ্ধ ও তাদের সুহৃদ ছিলেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় তীরের আঘাতে যখম হয়েছিলেন। তাঁকে মসজিদে নববীর নিকটে তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাই তিনি বনূ কুরায়যার মহল্লার দিকে মুসলিম মুজাহিদদের সাথে যেতে পারেন নি। হযরত আলী (রা)-কে হযরত নবী করীম (সা) ঝাণ্ডা দান করেন এবং অগ্রবর্তী দল হিসাবে আগে পাঠিয়ে দেন। মদীনায় ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কেই যথারীতি শাসক হিসাবে বহাল রাখেন। হযরত আলী (রা) যখন বনূ কুরায়যার দুর্গের কাছে পৌঁছেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন যে, বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি-গালাজ করছে। মোটের উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনকি ইশার সালাত পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম আসতে থাকেন। যাদের কোন কারণে রওয়ানা হতে দেরী হয়ে যায়, তারা ইশার সময় এসে পৌঁছেন। তাঁরাও আসরের সালাত বনূ কুরায়যার মহল্লায় গিয়ে ইশার সময়ই আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এ কাজকে জাইয রাখেন। বনূ কুরায়যার দুর্গে হুই ইব্ন আখতাবও উপস্থিত ছিল। আবূ সুফিয়ান ও আরব কাফিররা যখন খন্দকের যুদ্ধ থেকে পলায়ন করলো, তখন হুই ইব্ন আখতাব বনূ কুরায়যার দুর্গে চলে এসেছিল। সে তাদেরকে মুসলমানদের সাথে লড়াই ও মুকাবিলার জন্য উস্কানি দিয়েছিল। মুসলমানরা বনূ কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। এই অবরোধ পঁচিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। বনূ কুরায়যার সরদার ছিলেন কা'ব ইব্ন আসাদ। হুই ইব্ন আখতাব বনূ কুরায়যার সাথে অবরুদ্ধ ছিল। কা'ব ইব্ন আসাদ যখন দেখলেন, তাঁর গোত্র মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারছে না, তখন তিনি তাঁর গোত্রকে এক স্থানে সমবেত করে বললেন, মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্র নবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর সম্পর্কে আমাদের আসমানী কিতাব তাওরাতে পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রতীক্ষিত নবী। কাজেই তাঁকে মেনে নিয়ে আমাদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করাই শ্রেয়। বনূ কুরায়যা এ পরামর্শের বিরোধিতা করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। এরপর কা'ব ইব্ন আসাদ বললেন : আমার দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের মেরে ফেলো এবং দুর্গ থেকে বের হয়ে খোলা ময়দানে মুসলমানদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করো। বিজয় লাভ করলে বিবি-বাচ্চা আবার যোগাড় হয়ে যাবে। মারা গেলে লজ্জা-শরমের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে মারা যাবে। বনূ কুরায়যা এ পরামর্শও গ্রহণ করলো না। কা'ব ইব্ন আসাদ বললেন, আমার তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে, শনিবার রাতে মুসলমানদের উপর হামলা করো। কেননা, ঐ দিন আমাদের কাছে হত্যা ও হামলা করা নাজাইয। মুসলমানরা ঐ রাতে আমাদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও গাফিল

থাকবে। তাই আমাদের আক্রমণ সফল হবে এবং আমরা মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবো। এ ব্যাপারেও বনূ কুরায়যা সম্মত হলো না এবং বলল, আমরা শনিবারের সম্ভ্রম হানিও করতে চাই না। বনূ কুরায়যার তিনজন শরীফ ব্যক্তি ছা'লাবা ইব্ন সাঈদ, আসাদ ইব্ন উবায়দ ও উসায়দ ইব্ন সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। আমর ইব্ন সা'দ নামক এক ব্যক্তি বললেন, আমার গোত্র বনূ কুরায়যা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি এই বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের অংশীদার হতে চাই না। এই কথা বলে তিনি দুর্গের বাইরে চলে যান। মুসলিম বাহিনীর অন্যতম নেতা মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)-যিনি প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন–তাকে দুর্গ থেকে বের হতে দেখলেন। তার পরিচায় ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ার পর বের হতে দিলেন এবং গ্রেফতার করলেন না। শেষে একদিন সকালে বনূ কুরায়যা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট বার্তা পাঠালো : আমরা আমাদেরকে আপনার হাতে এই শর্তে সোপর্দ করছি যে, সা'দ ইব্ন মুআয (রা) আমাদের জন্য যে শাস্তির বিধান করবেন, আমরা তাই মাথা পেতে নেবো। তিনি এই শর্ত কবূল করলেন। বনূ কুরায়যা যখন নিজেদেরকে মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করলো, তখন বনূ আওসের আনসার মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন যে, জাহিলিয়া যুগে যখন আওস ও খাযরাজের মধ্যে লড়াই হতো, তখন বনূ কুরায়যা আমাদের অর্থাৎ বনূ আওসের পক্ষ সমর্থন করতো। আপনি বনূ কায়নুকাকে বনূ খাযরাজের আনসারদের মর্যীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবার আমাদের পালা। সুতরাং বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে বিচারক নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, আমরা প্রথমেই তোমাদের বনূ আওসের নেতা সা'দ ইব্ন মুআযকে বিচারক মেনে নিয়েছি। বনূ কুরায়যাও সা'দ ইব্ন মুআযকে তাদের তরফ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি বানিয়েছে। একথা শুনে বনূ আওসের সকল আনসার খুশী হলেন এবং ঐ সময়ই আনসারগণ মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সা'দ ইব্ন মুআয (রা) আহত ও চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁকে পাল্কি বা ঐ ধরনের কোন বাহনে করে মুসলিম বাহিনীর দিকে আনয়ন করা হলো। পথে তাঁকে লোকেরা বলতে বলতে আসছিল যে, আপনার রায়ই চূড়ান্ত সাব্যস্ত হবে। এখন বনূ কুরায়যার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার সুযোগ আপনার হাতে এসেছে। সা'দ ইব্ন মুআয (রা) যখন এই রকম কথাবার্তা তাঁর গোত্রের লোকদের মুখে শোনলেন, তখন তিনি বললেন, আমি ইনসাফ ও ন্যায়বিচার অনুযায়ী ফায়সালা করবো এবং কারো নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র হবো না। হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর বাহন যখন অদূরে এসে পৌছলো, তখন নবী (সা) উপস্থিত আনসারদের বললেন যে, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াও। সবাই তাঁকে স্বাগত জানালেন। এরপর হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-কে বলা হলো যে, নবী করীম (সা) আপনার পুরানো বন্ধুদের অর্থাৎ বনূ কুরায়যার ব্যাপারটি আপনার হাতে ন্যস্ত করেছেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁর গোত্রের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলাকে হাযির-নাযির জেনে অঙ্গীকার করো যে, আমার ফায়সালা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে এবং কোন উচ্চবাচ্য করবে না। সবাই অঙ্গীকার করলো যে, আমরা আপনার রায়ের উপর সন্তুষ্ট থাকবো। তারপর হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা) একই অঙ্গীকার হযরত নবী করীম (সা) ও মুহাজিরদের নিকট থেকেও নিলেন। নবী (সা) সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর রায় মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করলেন। এরপর হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা) বললেন : আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বনূ কুরায়যার সকল পুরুষ লোককে

হত্যা করা হোক। তাদের বিবি-বাচ্চাদের সাথে যুদ্ধবন্দীদের মতো ব্যবহার করা হোক এবং তাদের ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এই রায় ঘোষণার পর বনূ কুরায়যাকে দুর্গ থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাদেরকে পাহারা দিয়ে মদীনায় আনয়ন করা হলো। তাদের পুরুষদের হত্য করা হলো এবং তাদের আবাসগৃহগুলো মুসলমানদের বাস করার জন্য দেয়া হলো।

পঞ্চম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা

পঞ্চম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (রা) রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে 'সীফুল বাহ্‌র' অভিমুখে তিনশ' মুহাজির সহ রওয়ানা হন সেখানকার জুহায়না গোত্রের হাল-অবস্থা জানার জন্য। কেননা, সেদিক থেকে আশংকাজনক খবর এসেছিল। হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এই অভিযানে পানাহারের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। শুধু দুই দুই, তিন তিনটি শুকনো খেজুর খেয়ে এক একটি দিন অতিবাহিত করতে হতো। শেষে সাগর সৈকতে একটি মস্তবড় মাছ পাওয়া গেলো। যা সবার জন্যই যথেষ্ট হলো।

বনূ কিলাব সম্পর্কে খবর এলো যে, তারা বিদ্রোহ করার সঙ্কল্প করছে। তাই পঞ্চম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসেই মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ত্রিশজন লোকের একটি দলের সাথে সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। বনূ কিলাব তাদের মুকাবিলা করলো। বনূ কিলাবের দশজন লোক মারা গেলো এবং অন্যরা পলায়ন করলো। পঞ্চাশটি উট ও তিন হাজার বকরী মুসলমানদের হস্তগত হলো।

অনুরূপভাবে আক্কাশা ইব্‌ন মুহসিনকে মক্কা অভিমুখে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হলো এবং একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নজ্‌দ অভিমুখে পাঠানো হলো। এরা ছুমামা ইব্‌ন আছালাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। ছুমামা ইব্‌ন আছালা খাঁটি দিলে খুশী মনে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্বদেশ ইয়ামামায় গিয়ে সেখান থেকে মক্কায় খাদ্যশস্য সরবরাহে বাধা দিলেন। মক্কার কুরায়শরা যখন খাদ্যাভাবে কষ্ট পেলো, তখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করলো। তিনি নির্দেশ জারি করলেন যে, মক্কায় খাদ্যশস্য পূর্বের মতোই যেনো সরবরাহ করা হয়। ঐ বছরই তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরদের মদীনায় ডেকে পাঠান। কিন্তু মুহাজিরদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আবিসিনিয়ায় থেকে গেলো।

হিজরতের ষষ্ঠ বছর

ইতিপূর্বে পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, গাযওয়া দুমাতুল জান্দাল থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় পথিমধ্যে উয়ায়না ইব্‌ন হুসায়ন নবী (সা)-এর নিকট থেকে মদীনার চারণভূমিতে তার উট চরানোর অনুমতি লাভ করেছিল। এই অনুমতি থেকে সে এক বছর পর্যন্ত অবাধে ফায়দা উঠালো এবং এই অনুগ্রহের প্রতিদান ঐ অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড এইভাবে দিলো : একদিন সুযোগ বুঝে সে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের উপর হামলা করলো এবং বনূ গিফারের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে উটের সাথেই নিয়ে গেলো। আসলামা ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আকওয়া (রা) সর্বপ্রথম এই ঘটনা জানতে পান। তিনি মদীনায় উচ্চৈঃস্বরে লোকদেরকে জানিয়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ দুর্বৃত্তদের পশ্চাদ্ধাবনে ছুটে যান। আসলামা (রা)-এর আওয়াজ শুনে নবী (সা) উয়ায়নাকে গ্রেফতার ও পশ্চাদ্ধাবনে সওয়ার হলেন। তাঁর রওয়ানা

হওয়ার পর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা), আব্বাস ইব্‌ন বিশর (রা), সাআদ ইব্‌ন যায়দ (রা), উককাশ ইব্‌ন মুহ্‌সিন (রা), মুহাররিয ইব্‌ন ফাযল আসাদী (রা), আবূ কাতাদা (রা) প্রমুখ রওয়ানা হন এবং তার সাথে মিলিত হন। হযরত নবী (সা) সাআদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে নেতা নিযুক্ত করে সাহাবাদের এই দলটির সাথে অগ্রে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে 'যূকারাদ' ঝরনার কাছে অবস্থান করেন। হযরত আসলামা ইব্‌ন আমর (রা) শেষে ঐ দুর্বৃত্তদের ধরে ফেলেন। এদিকে এই পশ্চাদ্ধাবনকারী দলটিও গিয়ে পৌঁছলো। উয়ায়না ইব্‌ন হুসায়নের সাহায্যেও তার দলবল ছুটে এলো। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। একজন সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ পরাস্ত হলো। তারা সবাই পলায়ন করলো এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুসলমানগণ নিজেদের উট ছাড়া শত্রুদের উটগুলোও হস্তগত করলেন এবং নিরাপদে গনীমতের মালসহ যূ-কারাদ ঝরনার কাছ ফিরে এলেন। হযরত নবী (সা) শত্রুদের একটি উট ঐ জায়গায় যবাহ করলেন এবং এক রাত এক দিন অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বছরই নবী (সা)-এর নিকট খবর এলো যে, বনূ বকর খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনা আক্রমণ করতে চায়। তিনি হযরত আলী (রা)-কে দু'শ মুজাহিদসহ বনূ বকরকে দমন করার জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে বনূ বকরের একজন গুপ্তচরকে মুসলিম মুজাহিদরা গ্রেফতার করলেন। গুপ্তচর বললো, তোমরা আমার জীবনের নিরাপত্তা দাও, আমি তোমাদেরকে বনূ বকরের মিলন-স্থানের সন্ধান দেবো। হযরত আলী (রা) তার দ্বারা শত্রুর ঠিকানা অবগত হলেন এবং ওয়াদা মতো তাকে মুক্তি দিলেন। শত্রুপক্ষ ফাদাক নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল। হযরত আলী (রা) হামলা করলেন। শত্রুপক্ষের সাথে জোর মুকাবিলা হলো। অবশেষে তারা সবাই পলায়ন করলো। মালে গনীমত হিসাবে পাঁচশ' উট ও দু' হাজার বকরী মুসলমানদের হস্তগত হলো। গনীমত নিয়ে হযরত আলী (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাগমন করলেন।

ইসলাম প্রচার

ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে দুমাতু'ল জান্দাল এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এখানকার অধিবাসীরা তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাদের এক সরদার উসায়গ ইব্‌ন আমর কাল্‌বী খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর তাবলীগের ফলে উসায়গ ইসলাম গ্রহণ করলেন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই এই সরদারের অনুসরণ করলো। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারা জিযয়া কর দিতে রাযী হলো। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর সাথে উসায়গের কন্যা তামাসুরের বিবাহ হলো। তাঁরই গর্ভে আবূ সালামা (র) নামক ফিকাহবিদ ও শ্রেষ্ঠ তাবিঈর জন্ম হয়।

মুনাফিকদের একটি হিংস্র ঘটনা

উরায়না একটি উন্মুক্ত উপত্যকার নাম। সেখানকার বনূ উকুলের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় এসে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলো এবং কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে অভিযোগ করলো যে, আমরা গবাদি পশুর দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করি। অন্যবিধ খাদ্যদ্রব্য আহার করতে

আমরা অভ্যস্ত নই। তাই মদীনায় থাকার ফলে আমাদের শরীরে খোস-পাঁচড়া হয়েছে। আমরা মারাত্মক শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত। হযরত নবী করীম (সা) তাদের তাঁর উটের চারণভূমি কুবা উপত্যকায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে দুধ খেয়ে খেয়ে যখন তারা খুব স্বাস্থ্যবান ও মোটাতাজা হলো, তখন ইয়াসার নামক নবী (সা)-এর একজন খাদিম ও উটরক্ষককে একাকী পেয়ে অতি নির্দয়ভাবে হত্যা করলো। তার হাত-পা কর্তন করলো, চোখের মধ্যে বাবলা কাঁটা ফুঁড়লো, হাত-পা কাটা লাশটি একটি গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলো এবং সমুদয় উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এ খবর যখন মদীনায় পৌঁছলো, তখন নবী (সা) কুরয ইব্‌ন খালিদ আল-ফিহ্‌রীকে বিশজন অশ্বারোহীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করলেন। দুর্বৃত্তরা পথিমধ্যেই গ্রেফতার হলো। গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসার পর তাদের হত্যা করার নির্দেশ জারি হলো। এইভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

আরবদেশে যদিও ইবরাহীমী দীনের প্রচলন ছিল এবং আরবরা শির্‌ক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু কা'বাঘরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করতো এবং সর্বদা কা'বাঘরের হজ্জ পালন করতো। হজ্জের দিনগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহও মুলতবি করে দিতো। ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে নবী করীম (সা) স্বপ্নে দেখলেন, সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে তিনি কা'বাঘরে প্রবেশ করছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও নবী করীম (সা)-এর কা'বাঘর তাওয়াফ ও যিয়ারত করার বাসনাও ছিল। এই স্বপ্ন দ্বারা তা আরো চাঙ্গা হয়ে উঠলো। নবী করীম (সা) উমরা অর্থাৎ কা'বা যিয়ারতের সঙ্কল্প করলেন। ষষ্ঠ হিজরীর যুল-কাদাহ মাসে তিনি এক হাজার চারশ' সাহাবা সমভিব্যাহারে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করলেন। উমরার ইহরাম বাঁধলেন এবং কুরবানীর জন্য সত্তরটি উট সঙ্গে নিলেন। ইহরাম বাঁধা এবং কুরবানীর উট সঙ্গে নেয়া থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে বের হননি বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিছক বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত করা। মক্কার কুরায়শদেরও কোন অধিকার ছিল না কা'বাঘরের যিয়ারত থেকে কাউকে বিরত রাখার।

যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে নবী করীম (সা) বনূ খুযাআর এক ব্যক্তিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করলেন। তিনি আসফান নামক স্থানে ফিরে এসে নবী করীম (সা)-কে খবর দিলেন যে, কুরায়শরা আপনার আগমন সংবাদ পেয়ে মস্ত এক বাহিনী মুকাবিলার জন্য সমবেত করেছে। তারা আপনাকে কা'বাঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেবে। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আমরা উমরার নিয়ত করে এসেছি–যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। কিন্তু কেউ যদি আমাদের ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে বাধ্য হয়ে তার সাথে লড়াই করা উচিত। হযরত নবী করীম (সা) এই রায় শুনে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মক্কার কুরায়শরা মুসলমানদের বাধা দেয়ার জন্য খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে একদল অশ্বারোহী কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করলো। নবী (সা) আসফান থেকে রওয়ানা হয়ে রাস্তা থেকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং দ্রুত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নিকটে পৌঁছলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ মুসলমানদের এই হঠাৎ আগমনে হতবুদ্ধি হয়ে মক্কার দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং মক্কাবাসীকে মুসলমানদের অদূরে পৌঁছে যাওয়ার সংবাদ

দিল। হযরত নবী করীম (সা) অগ্রসর হতে হতে সেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যেখান থেকে অপরদিকে অবতরণ করলে মক্কা নগরীর মাঠ শুরু হয়ে যেতো। তাঁর উটনী ঐ জায়গায় বসে গেলো। লোকেরা বললো, উটনী ধোঁকা দিয়েছে। নবী করীম (সা) বললেন, উটনী ধোঁকা দেয়নি। আল্লাহ্‌র মর্যীর বিরুদ্ধে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হতে পারে না।

হুদায়বিয়া প্রান্তর

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলতে চাচ্ছিলেন যে, বায়তুল্লাহ্ ও মক্কা মুকাররমায় যে 'বালাদূল হারাম' অবস্থিত, তার উপর হামলা করা কা'বাঘরের সম্ভ্রম বিরোধী। এজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে থামিয়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি উটনীকে ধমক দিলেন। সে বসা থেকে উঠে চলতে আরম্ভ করলো। নবী করীম (সা) হুদায়বিয়া নামক স্থানের কূপের কাছে অবস্থান নিলেন। ঐ কূপের মধ্যে খুব সামান্য পানি ছিল। একটু পরেই তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। লোকেরা পানির কষ্টে পড়লো। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর তূণীর থেকে একটি তীর বের করে হযরত বারা' ইব্‌ন আযিব (রা)-কে দিয়ে বললেন, এই তীরটি কূপের মধ্যে ফেলে দাও। তীরটি কূপের মধ্যে ফেলে দিতেই কূপের পানি বেড়ে গেলো। মুসলিম বাহিনীর আর পানির কষ্ট হলো না। হযরত নবী করীম (সা) হুদায়বিয়ায় অবস্থান নিলেন। তখন মক্কার কুরায়শদের পক্ষ থেকে বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈ তাঁর কাছে কয়েকটি গোত্রের লোকজনসহ এসে উপস্থিত হলো এবং তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, কাফেলার সামনে কুরবানীর উটগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা ইহরাম বেঁধে আছি ? বুদায়ল একথা শুনে ফিরে চলে গেলো এবং মক্কার কুরায়শদের বললো, তোমরা অহেতুক শোরগোল করছো। মুহাম্মদ (সা) তো কেবল বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করতে এসেছেন, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। কুরায়শের কলহপরায়ণ লোকেরা বললো, আমরা তাদেরকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার জন্যও আসতে দেবো না। কিন্তু তাদের সমঝদার লোকেরা একটু নিশ্চুপ হয়ে চিন্তা করতে লাগলো। তারপর মক্কাবাসী আহাবীশ গোত্রগুলোর প্রধান সরদার উলায়স ইব্‌ন আলামা কিনানীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করলো। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট পর্যন্তও এলেন না বরং কুরবানীর উটগুলোকে দেখে রাস্তা থেকেই ফিরে গেলেন এবং বললেন, মুসলমানরা যুদ্ধ করার জন্য আসেনি, বরং উমরাহ্ করতে এসেছে। কা'বাঘর যিয়ারতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার কারো নেই। একথা শুনে কুরায়শরা বললো, তুমি জংলী মানুষ, কিছুই জান না। আমরা মুসলমানদেরকে কস্মিনকালেও মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না। তাতে আমাদের বড় বেইজ্জতি হবে। উলায়স একথা শুনে চটে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা যদি মুসলমানদেরকে উমরাহ করতে না দাও, তাহলে আমি আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এই অবস্থা দেখে কুরায়শরা উলায়সের গোস্‌সা ঠাণ্ডা করলো এবং অনুনয়পূর্বক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করলো। তখন নবী (সা) খিরাশ ইব্‌ন উমাইয়া খুযাঈ (রা)-কে তাগালুব নামক উট দিয়ে মক্কার কুরায়শদের নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু কা'বাঘর যিয়ারত করা এবং কুরবানী করা। হযরত খিরাশ (রা) এই বার্তাটি কুরায়শদের নিকটে পৌঁছে দিলেন। কুরায়শরা খিরাশের উটটিকে যবেহ করলো এবং খিরাশকেও মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু উলায়স ও তাঁর লোকজন খিরাশকে মক্কার কুরায়শদের কবল থেকে

উদ্ধার করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এরপর কুরায়শের একদল উগ্র নওজোয়ান মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য মক্কা থেকে বের হয়ে উপত্যকায় এলো। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে দেখে ফেললেন এবং সবাইকে গ্রেফতার করলেন। কিন্তু পরে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এবার নবী (সা) ইরাদা করলেন যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মক্কাবাসীদের নিকট পাঠাবেন। হযরত উমর ফারূক (রা) বললেন, মক্কাবাসীদের নিকট যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মক্কায় আমার গোত্র বনূ আদী ইব্‌ন কা'বের এমন কোন লোক নেই, যে আমাকে তার যিম্মায় নিতে পারে। সুতরাং আমার যাওয়াটা আশংকার কারণ হতে পারে। আমার চেয়ে ভাল হচ্ছে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। কেননা তাঁর গোত্রে বনূ উমাইয়ার বহু প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোক বর্তমান আছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-এর এই প্রস্তাবটি খুব পসন্দ করলেন এবং হযরত উসমান গনী (রা)-কে দূত হিসাবে আবূ সুফিয়ানের নিকট প্রেরণ করলেন। মক্কায় হযরত উসমানের সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হলো আবান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আল-'আস-এর। আবান সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তার যিম্মায় নিয়ে নিলো এবং আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরায়শ সরদারের নিকট নিয়ে গেলো। কুরায়শ সরদারগণ হযরত উসমান গনী (রা)-এর নিকট হযরত নবী করীম (সা)-এর বার্তা শ্রবণ করে বললো, আমরা শুধু তোমাকে কা'বাঘর তাওয়াফ করার অনুমতি দিচ্ছি। হযরত উসমান (রা) বললেন, আমি হযরত নবী করীম (সা) ছাড়া একা তাওয়াফ করতে পারি না। একথা শুনে কুরায়শরা অসন্তুষ্ট হলো এবং হযরত উসমান (রা)-কে আটকে রাখলো।

বায়আতে রিযওয়ান

হযরত উসমান (রা)-এর ফিরে আসতে যখন দেরী হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে এই খবর রটে গেলো যে, উসমান (রা)-কে মক্কাবাসীরা শহীদ করে দিয়েছে। এই খবর শুনতেই নবী কারীম (সা) বললেন, উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা এখান থেকে একটুও নড়বো না। তিনি তখনই একটি গাছের নীচে বসে পড়লেন এবং সমস্ত সাহাবা থেকে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার বায়'আত নিলেন। এই বায়'আতই বায়'আতে রিযওয়ান নামে খ্যাত। কুরআনুল করীমে এর উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। (৪৮ : ১৮)

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই হযরত উসমান গনী (রা) মক্কা থেকে চলে এলেন এবং তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুরূপ বায়'আত গ্রহণ করলেন। মক্কার কাফিরদের দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান লোকেরা লড়াই করা অপসন্দ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ছিল কলহপরায়ণ। এক্ষণে মুসলমানদের রণ-প্রস্তুতি দেখে এই ফাসাদী লোকেরাও কিছুটা সন্ধি ও সমঝোতার দিকে ঝুঁকলো। তাই মক্কাবাসীরা বনূ সাকীফের সরদার উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদকে হযরত নবী (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলো। উরওয়া এসে বললো, মুহাম্মদ (সা)! কুরায়শের গোত্র তোমাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত। তোমার সাথে যেসব লোক আছে মুকাবিলার সময়

তারা সবাই তোমাকে একাকী রেখে পলায়ন করবে। কুরায়শদের সামনে তারা কস্মিনকালেও তিষ্টাতে পারবে না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উরওয়ার এই কথা শুনে অতি কঠোর ভাষায় দাঁতভাংগা জবাব দিলেন। উরওয়া নীরব হয়ে গেলো। হযরত নবী করীম (সা) উরওয়াকে বললেন, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, উমরাহ্ করার জন্য এসেছি। কিন্তু মক্কাবাসী যদি লড়াই করতে চায়, তবে আমি আমার নবুওয়াতের কাজের জন্য আমার হাড় থেকে গোশত বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আল্লাহ্ তাঁর ফায়সালা ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করবো। মক্কাবাসী যদি চায়, তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার সাথে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করতে পারে। এই সময়ে তারা আমাকে ইসলাম প্রচার করতে দেবে আর ইচ্ছা হলে স্বয়ং নিজেরাও ইসলাম গ্রহণ করে চিরতরে যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ করে দেবে।

রাসূল আকরাম (সা)-এর প্রতি সাহাবাদের প্রাণপূর্ণ ভালবাসা

উরওয়া যখন নবী করীম (সা)-এর সাথে কথা বলছিল, তখন সে তার হাত বিস্তার করে করে তাঁর দাড়ির কাছে নিয়ে যেত। হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) তার এই আচরণ বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি তাঁর তরবারির হাতল উরওয়ার হাতের উপর মারলেন এবং তাকে আদবের সাথে কথা বলতে বললেন। উরওয়া মক্কার কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি রোমের কায়সার ও পারস্যের কিসরার দরবার দেখেছি, কিন্তু আমি কোন বাদশাহকে তাঁর সহচরদের মধ্যে এতো প্রিয় ও মর্যাদাবান পাইনি, যেমনটি মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর আসহাবদের মধ্যে প্রিয় ও মর্যাদাবান পেলাম। মুহাম্মদ (সা)-এর আসহাবদের অবস্থা এই যে, তাঁরা মুহাম্মদ (সা)-এর ওযূর পানি মাটিতে পড়তে দেন না। তিনি যখন কথা বলেন, তখন সবাই চুপ করে শোনেন এবং শ্রদ্ধাবশত তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান না। এঁরা কোনক্রমেই মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবে না। মুহাম্মদ (সা) যে প্রস্তাব তোমাদের সামনে পেশ করেছে, তা কবূল করে নেওয়া এবং তাঁর সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। এরপর মক্কার কুরায়শরা সুহায়ল ইব্ন আমরকে তাদের সর্বময় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করলো এবং তাকে বলে দিলো যে, সন্ধি কেবল এভাবেই হতে পারে যে, এ বছর মুহাম্মদ (সা) তাঁর সহচরদের নিয়ে ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর এসে উমরাহ করবেন। নবী করীম (সা) যখন দূর থেকে সুহায়লকে আসতে দেখলেন তখন বললেন, ব্যাপার এবার 'সহল' (সহজ) হয়ে গেলো। কুরায়শরা যখন ঐ ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে, তখন তারা সন্ধি করারই নিয়ত করেছে। সুতরাং সুহায়ল সন্ধির শর্তাবলী পেশ করলো। নবী (সা)-ও সে শর্তগুলো মেনে নিলেন এবং তখনই হযরত আলী (রা)-কে সন্ধিপত্র লেখার জন্য ডেকে পাঠালেন। হযরত আলী (রা) সন্ধিপত্রের শীর্ষে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখলেন। সুহায়ল বললেন, আমরা رحمن-কে চিনি না। তুমি আমাদের রীতি অনুসারে باسمك اللّٰهم লিখ। নবী (সা) বললো, ঠিক আছে, ঐভাবেই লিখ। এরপর হযরত আলী (রা)-এর নাম محمد رسول اللّٰه লিখলেন, তখন সুহায়ল তার উপরও আপত্তি করলো এবং বললো, আমরা যদি তাঁকে রাসূলই মানতাম, তবে তো ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়াতোই না। তুমি শুধু محمد بن عبد اللّٰه লিখ। নবী (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল, তোমরা তা মান বা না মান। তারপর হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, সুহায়লের ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ শব্দটি কেটে দাও। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি আমার কলম দিয়ে رسول اللّٰه শব্দ কাটতে পারবো না। তিনি বললেন,

দাও, আমি আমার হাত দিয়ে কেটে দিচ্ছি। এই বলে তিনি স্বয়ং তাঁর হস্ত মুবারক দিয়ে ঐ শব্দটি কেটে দিলেন।

শর্তসমূহ

সন্ধিপত্র বা চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ ছিল এরূপ :

১. মুসলমানরা এ বছর উমরাহ্ করবে না, আগামী বছর এসে উমরাহ করবে। মক্কায় প্রবেশকালে তরবারি ছাড়া কোন হাতিয়ার তাদের নিকট থাকবে না। তরবারিও কোষবদ্ধ থাকবে। আর তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করবে না।

২. সন্ধির সময়কাল হবে দশ বছর। এই সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের জান ও মালের উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পরস্পর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে।

৩. আরবের প্রতিটি গোত্র ও প্রতিটি সম্প্রদায় যে কোন পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। ঐ চুক্তিবদ্ধ গোত্র ও সম্প্রদায়ের উপরও এই সন্ধিপত্রের শর্তসমূহ একইভাবে প্রযোজ্য হবে। উভয় পক্ষেরই অন্যান্য গোত্রকে নিজেদের দলভুক্ত করার এখতিয়ার থাকবে।

৪. যদি কুরায়শদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের নিকট চলে যায়, তবে তাকে কুরায়শদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোন মুসলমান কুরায়শদের কাছে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

সন্ধিচুক্তির প্রতিক্রিয়া

এই চুক্তির চতুর্থ শর্তটি সাহাবায়ে কিরামের নিকট অসহনীয় ঠেকছিল। ঘটনাক্রমে চুক্তিপত্র লেখার সময়ই খোদ সুহায়লের পুত্র আবূ জান্দাল (রা) যিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং এই অপরাধে তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল–কোনক্রমে কয়েদ থেকে বের হয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকটে পালিয়ে এলেন। হযরত আবূ জান্দাল (রা)-কে কাফিররা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতন করেছিল। তাঁর শরীরে তখনো যখমের দাগ ও তাজা ঘা দগদগ করছিল। তিনি তাঁর সেই যখম দেখিয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট ফরিয়াদ করলেন যে, আমাকে অবশ্যই আপনার সাথে মদীনায় নিয়ে যাবেন। সুহায়ল বললো, চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসারে আবূ জান্দালকে আমরা ফেরত পাবো। নবী করীম (সা) সুহায়লকে বোঝালেন কিন্তু সে সম্মত হলো না। শেষে আবূ জান্দালকে সুহায়লের নিকটে সোপর্দ করা হলো। সুহায়ল সেখান থেকেই আবূ জান্দালকে মারতে মারতে মক্কার দিকে নিয়ে গেলো। এই দৃশ্য দেখে হযরত উমর (রা) অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সত্য নবী নন? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী। হযরত উমর (রা) বললেন, আমরা কি মুসলমান নই? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুসলমান। হযরত উমর (রা) আবার বললেন, তারা কি মুশরিক নয়? তিনি বললেন, তারা অবশ্যই মুশরিক। হযরত উমর (রা) বললেন, তাহলে আমরা দীনের ব্যাপারে এত অপমান কেন সহ্য করবো? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তাই তাঁর হুকুমের বরখেলাফ ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। তিনি আমাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। এরপর যখন হযরত উমর

(রা)-এর রাগ ঠাণ্ডা হলো, তখন তিনি তাঁর এই স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যের জন্য খুবই লজ্জিত হলেন। সারা জীবন তওবা ও ইস্তিগফার করতেন এবং গোলাম আযাদ করতে থাকেন।

সুস্পষ্ট বিজয়

সন্ধিপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম (সা) ও মুসলমানগণ হুদায়বিয়ায় কুরবানী করলেন। ইহ্রাম খুললেন এবং ক্ষৌরকার্য করালেন। এই সন্ধিপত্র বা চুক্তিপত্রের পর বনূ খুযাআ নবী করীম (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর বনূ বকর চুক্তিবদ্ধ হলো মক্কার কুরায়শের সাথে। বনূ খুযাআ ও বনূ বকরের মধ্যে বহুকাল ধরে শত্রুতা চলে আসছিল। এরা উভয়েই যেহেতু এক এক পক্ষের চুক্তিবদ্ধ মিত্র বনে গেল, সেহেতু নবী করীম (সা) ও কুরায়শের মধ্যে যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার চুক্তি হলো তেমনি ঐ দুই গোত্রের মধ্যেও সন্ধি হয়ে গেলো। নবী করীম (সা) যখন হুদায়বিয়া থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা ফাত্হ নাযিল হলো এবং সাহাবায়ে কিরাম যে সন্ধিকে এক রকম পরাজয় মনে করছিলেন আল্লাহ তা'আলা তাকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' ঘোষণা করলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধি ইসলামের জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ই ছিল। সাহাবায়ে কিরামের এই সন্ধিকে পরাজয় ভাবার কারণ ছিল, বাহ্যত এর কোন কোন শর্তের মধ্যে তাঁদের হার ও দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই জানা গেল যে, ঐ দুর্বল শর্তগুলোই ছিল অপরিসীম কল্যাণকর শর্ত। ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল যুদ্ধবিগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিরতা লাভ। ইসলাম যতখানি শান্তি ও নিরাপদ অবস্থায় তার গণ্ডি বিস্তার করতে পারত, লড়াই ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থায় ততখানি বিস্তার হতে পারত না। ইসলামের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ায় মানুষ শান্তি ও নিরাপদ জীবন যাপন করবে। ইসলামকে লড়াইও করতে হয় এই শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করার জন্যই। ইসলামের যুদ্ধ যুদ্ধের জন্য নয়, বরং যুদ্ধ মিটানো ও শান্তি কায়েম করার জন্য। তাই দেখা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মাত্র দু'বছরের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল

সাহাবায়ে কিরামের নিকট চুক্তির চতুর্থ শর্তটি সবচেয়ে বেশী অসহনীয় মনে হয়েছিল। এখন সেই শর্তের ফলাফল দেখুন : কয়েক দিন পর আবূ বাসীর (রা) নামক এক ব্যক্তি যিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন–মক্কার জীবন যাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পলায়ন করলেন এবং মদীনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কুরায়শরা দু'জন লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট পাঠালো এবং চুক্তি মুতাবিক আবূ বাসীর (রা)-কে ফেরত চাইল। তিনি আবূ বাসীর (রা)-এর ইচ্ছার উপর চুক্তির পাবন্দীকে প্রাধান্য দিলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তির সাথে আবূ বাসীরকে ফেরত পাঠালেন। আবূ বাসীর (রা) মক্কায় ফিরে যাওয়াকে মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করছিলেন। তাই যুল-হুলায়ফা পৌঁছে তিনি একটি মুক্তি-পথ খুঁজলেন। তিনি তাঁর রক্ষীদের মধ্য থেকে একজনকে বললেন, তোমার তলোয়ারটি খুব উন্নত মানের মনে হচ্ছে। অপর রক্ষী একথা শুনে তার সঙ্গীর তলোয়ারটি অনাবৃত করে হাতে নিলো এবং প্রশংসা করতে লাগলো। আবূ বাসীর (রা) বললেন, আমাকে একটু দেখাও তো! সে সরল মনে তলোয়ারটি আবূ বাসীরের হাতে দিয়ে দিল। আবূ বাসীর (রা) তলোয়ারটি হাতে নিয়েই এমন সুনিপুণভাবে আঘাত হানলেন যে, এক আঘাতেই তাদের একজনের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। আর অপরজন দ্রুত উঠে পলায়ন করলো। আবূ বাসীর (রা) তলোয়ার নিয়ে তার পিছে পিছে ছুটলেন। সে সেখান থেকে সোজা

মদীনার দিকে পালালো এবং আবূ বাসীরের আগেই মদীনায় প্রবেশ করে বোধশূন্য অবস্থায় মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো। তারপর নবী করীম (সা)-কে তার সঙ্গীর নিহত হওয়ার ঘটনা বিবৃত করলো। সে যখন ঘটনা বর্ণনা করছিল, তখন আবূ বাসীরও তলোয়ার হাতে সেখানে উপস্থিত হলেন। নবী করীম (সা) আবূ বাসীরকে দেখে বললেন, এই লোকটি যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায়। একে সাহায্য করা হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাঁর পবিত্র যবানে এই কথা শুনে আবূ বাসীর (রা) নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, মদীনায় তার অবস্থান করা কঠিন। তিনি নবী করীম (সা)-কে বললেন যে আপনি তো আপনার চুক্তি পালন করেছেন এবং আমাকে সেই মুশরিকদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আবার মুক্ত করেছেন। আপনি আপনার চুক্তি পালনার্থে আমাকে আবার মুশরিকদের হাতে অর্পণ করবেন। তাই আমি চললাম। এই কথা বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। কুরায়শ লোকটি মক্কায় চলে গেল এবং সকল বৃত্তান্ত মক্কার কুরায়শদের শোনালো। আবূ বাসীর (রা) মদীনা থেকে প্রস্থান করে সমুদ্র উপকূলের অদূরবর্তী 'ঈশ' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করলেন।

আবূ জান্দাল (রা) ইব্‌ন সুহায়লের বৃত্তান্ত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আবূ বাসীরের কাহিনী শুনে মক্কা থেকে পালিয়ে সোজা আবূ বাসীরের নিকট ঈসে চলে গেলেন। তারপর একের পর এক যে ব্যক্তিই মক্কায় মুসলমান হতেন, তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে আবূ বাসীরের দলে শরীক হতেন। ক্রমে ক্রমে তাদের একটি প্রকাণ্ড দল ঈসে গড়ে উঠলো। তখন এই দলটি মক্কার কুরায়শদের সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক কাফেলার উপর হামলা করতে শুরু করলো। মক্কার কুরায়শদের জন্য এই দলটি এতই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো যে, তাদের নাকে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে শেষে বিনয় সহকারে নবী করীম (সা)-এর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠালো যে, "আমরা চুক্তির চতুর্থ দফাটি বাতিল ঘোষণা করলাম। এখন থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদীনায় যাবে, আমরা তাকে কখনো ফেরত নেবো না এবং অনুগ্রহ করে আপনি ঈসের মুসলমানদের অর্থাৎ আবূ বাসীরের দলকেও আপনার নিকট মদীনায় ডেকে নিন।" নবী করীম (সা) মক্কার কুরায়শদের এই দরখাস্ত মনযূর করলেন এবং আবূ বাসীরকে বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার জামাআতসহ মদীনায় চলে এসো। নবী করীম (সা)-এর এই বার্তা যখন ঈসে গিয়ে পৌঁছলো, তখন আবূ বাসীর (রা) রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি আবূ জান্দাল (রা)-কে ডেকে বললেন যে, তোমরা এই নির্দেশ পালন করো। এরপর আবূ বাসীর ইনতিকাল করলেন এবং আবূ জান্দাল (রা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় চলে এলেন। আবূ বাসীর (রা)-এর উল্লিখিত ঘটনা হুদায়বিয়ার চুক্তি প্রসঙ্গে এখানে ধারাবাহিক বর্ণিত হলো। অন্যথায় এর সম্পর্ক হচ্ছে ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনারাজির সাথে।

আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে নবী করীম (সা) আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) দামরীকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট একটি পত্র দিয়ে পাঠালেন। উদ্দেশ্য-হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব ও সকল মুসলিম মুহাজিরকে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা। উক্ত পত্রে তিনি নাজাশীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। নাজাশী পত্র পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রচুর হাদিয়া তোহ্‌ফাসহ মুসলমানদের মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (সা) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে যুলহাজ্জ মাসে মদীনায় পৌঁছলেন। সপ্তম

হিজরীর মুহাররম মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করলেন। ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইট ও ঘোড়দৌড়ের রীতি প্রবর্তন করেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর আম্মা এই বছরই ইনতিকাল করেন এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই বছরই মুসলমান হন।

খায়বার বিজয়

হিজরতের সপ্তম বছর

হুদায়বিয়া সন্ধির পর নবী করীম (সা) মক্কার মুশরিকদের তরফ থেকে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মদীনা এসে জানা গেল যে, খায়বার এলাকায় মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ ও মদীনা আক্রমণের আয়োজন সম্পন্ন হতে চলছে। মদীনা থেকে বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা দেশান্তরিত হয়ে খায়বারেই বসতি স্থাপন করেছিল। এইসব ইয়াহূদীর অন্তরে মুসলমানদের শত্রুতার অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তারা খায়বারের ইয়াহূদীদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্রুত সংগঠিত করে ফেললো। মক্কার পরে তখন মুসলমানদের বিরোধিতা ও শত্রুতার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল খায়বার। তারা ইয়াহূদীদের প্রায় সবগুলো শক্তিশালী গোত্রকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে ব্যাপৃত ছিল। এখন তারা মুসলমানদের মুকাবিলা ও মূলোৎপাটনের রণ-প্রস্তুতি আরম্ভ করলো। আরবের বনূ গাতফানকে তারা মদীনার অর্ধেক ফসলদানের শর্তে নিজেদের সাথে শরীক করলো।

ইয়াহূদীদের রণ-প্রস্তুতি সামান্য ছিল না বরং তার পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত ও তাদের ষড়যন্ত্র ছিল অতি ভয়াবহ। তারা মদীনার মুনাফিকদেরকে তাদের দোসর বানিয়ে নিয়েছিল। ঐ মুনাফিক গুপ্তচরদের মাধ্যমে তারা খায়বারের দূর প্রদেশে বসেও মুসলমানদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত থাকতো। হযরত নবী করীম (সা) ইয়াহূদীদের এইসব আয়োজনের কথা শুনে সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে পনেরশ' সাহাবা নিয়ে—যাদের মধ্যে দু'শ' ছিলেন আরোহী-মদীনা থেকে খায়বারের দিকে যাত্রা করলেন এবং মদীনায় হযরত সাব্বাআ ইব্‌ন আরফাতা (রা)-কে শাসক বানিয়ে রেখে গেলেন। তিনি খায়বারের কাছাকাছি পৌঁছে খায়বার ও বনূ গাতফানের মধ্যবর্তী রাজী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। বনূ গাতফান আশংকা করলো যে, মুসলমানরা তাদের বস্তির উপর হামলা করতে পারে। তাই তারা নিজেদের ঘরেই প্রতিরোধ ও মুকাবিলার জন্য অবস্থান করলো, খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যার্থে যেতে পারলো না।

খায়বার এলাকায় ইয়াহূদীদের নিকট পরস্পরের কাছাকাছি ছয়টি বিশাল দুর্গ ছিল। ইয়াহূদীরা ইসলামী সৈন্য পৌঁছার পর ময়দানে বের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করলেন। তাদের মধ্যে মারহাব ও ইয়াসির নামক দুইজন মস্ত বড় বাহাদুর ও হস্তী-বপু যোদ্ধা ছিলেন। তারা যখন ময়দানে বের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করলো, তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ও হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) সামনে এলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) মারহাবকে এবং যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) ইয়াসিরকে হত্যা করলেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে মারহাব হযরত আলী (রা) কর্তৃক নিহত হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানে ইয়াহূদীরা মুসলমানদের মুকাবিলা করা কঠিন ভাবলো। তাই তারা কিল্লাবন্দী ও দুর্গাশ্রয়ী হওয়া শ্রেয় মনে করলো। এই দুর্গগুলোর মধ্যে মাআব ইব্‌ন মু'আযের দুর্গটি সবচেয়ে বেশী মজবুত ও এমন স্থানে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে অন্য সবগুলো দুর্গে সাহায্য পৌঁছে যেতো। মুসলিম বাহিনী সর্ব প্রথম নাঈম দুর্গে আক্রমণ করলেন এবং কঠিন পরিশ্রম ও মুকাবিলার পর নাঈম দুর্গ দখল করলেন। এই দুর্গ আক্রমণ করার সময় হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-এর উপর দুর্গবাসীরা উপর থেকে পাথরের একটি যাঁতা ফেলে দিয়েছিল এবং তাতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। তারপর আবুল হাকীক ইয়াহূদীর কামূস দুর্গ আক্রমণ করা হলো। এ দুর্গটিও মুসলমানদের দখলে এলো। এই দুর্গ থেকে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুই ইব্‌ন আখতাব ও অন্যান্য বহু কয়েদী মুসলমানদের করায়ত্ত হলো। সাফিয়্যা বিন্‌ত হুই'র বিবাহ কিনানা ইব্‌নুর রবীঈ ইব্‌ন আবিল হাকীক-এর সাথে হয়েছিল। গ্রেফতারের পর তিনি হযরত দাহ্‌য়া কালবী (রা)-এর ভাগে পড়েছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত নবী করীম (সা) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেন। তারপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কামূসের পর সাইব ইব্‌ন মুআযের দুর্গ বিজিত হলো। এরপর খায়বারের চতুর্থ দুর্গও মুসলমানদের দখলে এলো।

অবশেষে ওয়াতীহ্‌ ও মুসলিম নামক দু'টি দুর্গ বাকী থাকলো। মুসলমানরা সে দু'টিকে দশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন। অবরুদ্ধ ইয়াহূদীরা যখন অবরোধের তীব্রতার দরুন কাবু হয়ে পড়লো, তখন তারা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট বার্তা পাঠালো যে, খাজনা (খারাজ) হিসাবে অর্ধেক ফসল নেয়ার শর্তে যদি আমাদেরকে আমাদের জমির মালিক রাখা হয়, তাহলে আমরা আপনার আনুগত্য মেনে নিতে প্রস্তুত। সেমতে ঐ সব ইয়াহূদীকে কৃষি ভূমি ও বাগানের অর্ধেক ফসল খাজনা (খারাজ) দেয়ার শর্তে প্রজা হিসাবে তাদের ভূ-সম্পত্তি দখলে রাখতে ও বসবাস করতে দেয়া হলো। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত খায়বারে তারা বসবাস করে।

খায়বারের এই যুদ্ধে পনের জন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন : চারজন মুহাজির ও এগার জন আনসার। আর ৯২ জন ইয়াহূদী নিহত হয়। এই যুদ্ধেই গৃহপালিত গাধার গোশত মুসলমানদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধে মুত্‌আ বিবাহ চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়। ইয়াহূদীদের এক সরদার সালাম ইব্‌ন মাশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতুল হারিছ বিষ মিশ্রিত একটি আস্ত ভুনা বকরী নবী করীম (সা)-কে হাদিয়া স্বরূপ দান করেছিল। তিনি এবং তাঁর সাথে হযরত বিশর ইবনুল বারা' ইব্‌ন মারূর সেটি খেতে আরম্ভ করলেন। হযরত নবী করীম সেটি মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলেন এবং বললেন, এই বকরীর হাড়গুলোই আমাকে বলছে যে, এতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে। কিন্তু হযরত বিশর (রা) সেটির কিছু গোশ্‌ত চিবিয়ে গিলে ফেলেছিলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শাহাদত বরণ করলেন। ইয়াহূদী নারী যয়নাবকে ডাকা হলো। সে বিষ মিশ্রণ করার কথা স্বীকার করলো। তাই তাকে হযরত বিশর (রা)-এর ওয়ারিছদের হাতে সোপর্দ করা হলো। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করলেন না। কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তখন খায়বার থেকে মদীনায় ফিরে আসার প্রস্তুতি চলছিল। এই সময় আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের কাফেলা আবিসিনিয়া সম্রাটের চিঠি ও হাদিয়া নিয়ে হযরত নবী

করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। এই কাফেলায় হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা), তাঁর স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা), তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা), আওন (রা), মুহাম্মদ (রা) এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল 'আস ইব্‌ন উমাইয়া (রা), তাঁর স্ত্রী আমীনা বিনত খুলাফা ও তাঁর পুত্র সাঈদ (রা) এবং হযরত উম্মে খালিদ (রা), হযরত আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা), হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), হযরত জাহ্‌ম ইব্‌ন কায়স (রা), হযরত হারছ ইব্‌ন খালিদ (রা), হযরত মুহায়না ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন আমর, হযরত মুআম্মার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা), হযরত আবূ হাতিব ইব্‌ন আমর (রা), হযরত মালিক ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন কায়স (রা) ও হযরত আমর ইব্‌ন উমাইয়া দামরী (রা)– যিনি এঁদেরকে আনতে গিয়েছিলেন– শামিল ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) এই মু'মিনদের মাঝে মিলিত হয়ে খুব খুশী হলেন।

খায়বার থেকে ফেরার পথে অদূরেই ফাদাক নামক স্থান। সেখানকার ইয়াহূদীরা বার্তা পাঠালো যে, আমাদেরকে শুধু আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দান করা হোক, আমাদের ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত নবী করীম (সা) তাদের এই আবেদন মনযূর করলেন। তাই ফাদাক আক্রমণ করা হলো না এবং তাদের উপর কোন আরোহী ও পদাতিকের অসি ও বর্শা চালানোর কোন সুযোগ মেলেনি। তাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে ঐ ধন-সম্পদগুলোকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পদ মনে করা হলো এবং সেগুলো বায়তুল মালের সম্পদরূপে গণ্য হলো।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুসলিম বাহিনী ওয়াদিল কুরা' চলে এলেন। সেখানকার ইয়াহূদীরা মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তাই তাদেরকেও অবরোধ করা হলো এবং অবশেষে খায়বারবাসীদের মতো অর্ধেক ফসল খাজনা (খারাজ) দেয়ার শর্তে আনুগত্য স্বীকার করলো। ওয়াদিল কুরায় মাত্র একজন সাহাবী হযরত মুদআম (রা) শহীদ হন। ওয়াদিল কুরার অদূরে তায়মা নামক একটি স্থান ছিল। সেখানকার ইয়াহূদীরাও ওয়াদিল কুরার অধিবাসীদের মতোই আনুগত্য স্বীকার করলো।

খায়বার বিজয়ের পর

খায়বার জয় করে ফেরার সময় একটি মনযিলে ভোর বেলা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কারোই ঘুম ভাঙ্গলো না। সকল মুসলিম মুজাহিদ ঘুমিয়ে রইলেন। এদিকে সূর্য উপরে উঠে গেলো। সবার আগে হযরত নবী করীম (সা)-এরই ঘুম ভাঙ্গল। তিনি সবাইকে জাগালেন এবং সেখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে তিনি ও সকল সাহাবা ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি বললেন, এইভাবে যদি তোমাদের ঘুম না ভাঙ্গে, তবে যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখনই তোমরা সালাত আদায় করবে।

ইয়াহূদীরা খুব বিত্তশালী ছিল। খায়বারের যেসব জমি ইয়াহূদীদের অধিকারে ছিল, তাও ছিল খুব উর্বর ও মূল্যবান। খায়বার জয়ের মালে গনীমত ও কৃষিজমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার পর মুহাজিরদের দুরবস্থা ও দারিদ্র্য দূর হয়ে গেল। মুহাজিরগণ সম্পদশালীও হয়ে গেলেন এবং আনসারদের আর্থিক সাহায্য দ্বারাও তাঁরা অভাবমুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত নবী করীম (সা) তখনো পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত খরচপত্র ও পরিবার-পরিজনদের জন্য কোন সাহাবীকে কষ্ট দেননি। আনসার বা মুহাজিরদের তরফ থেকে কোন হাদিয়া আসলে তিনিও নিজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে হাদিয়া পাঠাতেন। খায়বারের যমীন থেকে হযরত নবী করীম

(সা)-এর ভাগে পড়েছিল ফাদাকের সম্পত্তি। এর দ্বারা তিনি তাঁর মেহমানদের মেহমানদারী এবং বনূ কুরায়যার যমীন থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও গরীব মুসলমানদের প্রতিপালন করতেন। মক্কার মুশরিকরা যখন মুসলমানদের খায়বার আক্রমণের খবর পেলো, তখন তারা অধীর হয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রইল। হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত সালমী (রা) নামক জনৈক মক্কাবাসী খুব বিত্তশালী ছিলেন। তিনি ভ্রমণের অজুহাতে বের হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং খায়বারের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বিজয়ের পর তিনি তাঁকে বললেন, এখন পর্যন্ত মক্কাবাসী আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। আপনি অনুমতি দিলে আমি মক্কায় গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে রক্ষিত অর্থ এবং লোকদের দেয়া ঋণ আদায় করে নিয়ে আসতে পারি। তিনি অনুমতি দিলেন। হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত (রা) মক্কায় পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, মক্কাবাসী খায়বারের খবর জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তিনি মক্কাবাসীদের সাথে এক আজব কৌতুক করলেন। তাদের কাছে খায়বারের আসল খবর বর্ণনা না করে তাঁর অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে সবার সাহায্য নিলেন। সমস্ত অর্থ বুঝে নিয়ে এবং কেবল হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বিদায়ের সময় খায়বার বিজয়ের আসল সংবাদ শুনিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা দিলেন। এরপর কাফিররা যখন হাজ্জাজের মুসলমান হওয়া এবং খায়বারে মুসলমানদের জয় লাভ করার খবর জানতে পারলো, তখন তারা আফসোসে হাত কচলাতে লাগলো এবং হাজ্জাজের এইভাবে সকল সম্পদসহ নির্বিঘ্নে কেটে পড়ার দরুন আরো হা-পিত্যেশ করতে লাগলো।

খায়বার থেকে মদীনায় ফিরে এসে হযরত নবী করীম (সা) যেসব গোত্র মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের উচিত শিক্ষাদান ও ভীতির সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করলেন; যাতে কোন বড় বিদ্রোহ ও ভয়ানক ষড়যন্ত্র পল্লবিত হতে না পারে। নজদের ফাযারা গোত্রের দিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) ও অন্যান্য সাহাবার সাথে প্রেরণ করলেন। হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-কে ত্রিশজন আরোহীর সাথে প্রেরণ করা হলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে ত্রিশজন উষ্ট্রারোহীর সাথে বাশীর ইব্ন দারাম ইয়াহূদীকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠানো হলো। এই ব্যক্তিই খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাশীর ইব্ন সাআদ আনসারী (রা) ত্রিশজন আরোহীর সাথে বনূ মুর্‌রাকে দমন করার জন্য প্রেরিত হলেন। হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে একটি দলের সাথে জুহায়না সম্প্রদায়ের হাররাকাত গোত্রের প্রতি পাঠানো হলো। হযরত গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ কুলায়নীকে একটি দলের সাথে বনূ মালূহকে শাস্তিদানের জন্য পাঠানো হলো। হযরত আবূ দারদা সাল্‌মী (রা)-কে মাত্র তিনজন লোকের সাথে জু'শাম ইব্ন মুআবিয়া গোত্রের সরদার রিফাআ ইব্ন কায়সকে দমন করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আবূ কাতাদা (রা) ও মুহাল্লাম ইব্ন জুছামাকে আন-নাআম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হলো। এই সবগুলো সেনাদলই জয় লাভ করে ফিরে এলো এবং সর্বত্রই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য অর্জিত হলো। হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) যখন যুদ্ধকালে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য অসি উত্তোলন করলেন, তখন সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো। কিন্তু হযরত উসামা

(রা) তাকে হত্যা করলেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণিত হলো। তিনি খুব নাখোশ হলেন। হযরত উসামার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হলো। তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি ভণ্ডামি ও জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পাঠ করেছিল। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে সে ভণ্ডামি করে কালেমা পড়েছিল ? হযরত উসামা (রা) তাওবা করলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের ভুল করবেন না বলে ওয়াদা করলেন। অনুরূপভাবে হযরত আবূ কাতাদা (রা) ও মুহাল্লাম ইব্‌ন জুছামা পথ চলছিলেন। এমন সময় আশজা' সম্প্রদায়ের আমির ইব্‌ন আযবাত নামক জনৈক ব্যক্তিকে তার মালপত্রসহ যেতে দেখলেন। আমির ইব্‌ন আযবাত এই মুসলিম বাহিনীকে দেখে ইসলামী কায়দায় আসসালামু আলায়কুম বলে সালাম দিলো। মুসলমানরা শত্রু সম্প্রদায়ের লোককে এইভাবে সালাম করতে দেখে মনে করলেন যে, সে তার জান বাঁচানোর জন্য আসসালামু আলায়কুম থেকে ফায়দা হাসিল করতে চায়। তাই তার জবাব দান ও ওয়া আলায়কুমুস সালাম বলতে সবাই ইতস্তত করলেন এবং মুহাল্লাম ইব্‌ন জুছামা তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করলেন। এই যুদ্ধযাত্রীরা যখন মদীনায় ফিরে এলো এবং নবী করীম (সা) এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং মুহাল্লামকে বললেন যে, তুমি একজন মু'মিন ব্যক্তিকে কেন হত্যা করলে ? তারপর তিনি আমির ইব্‌ন আযবাতের ওয়ারিশদের পঞ্চাশটি উট রক্তপণ দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং মুহাল্লাম ইব্‌ন জুছামা (রা) কিসাস হতে অব্যাহতি পেলেন।

দাওয়াতী চিঠিপত্র

ঐ বছরই হযরত নবী করীম (সা) আরবদেশ ও বহির্দেশসমূহের রাজা-বাদশাহদের নিকট চিঠিপত্র প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান জানান। আবিসিনিয়ার বাদশাহর কাছে যে পত্র তিনি প্রেরণ করেছিলেন, তার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষণে তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট হযরত দাহইয়া ইব্‌ন হুনায়ন কালবী (রা)-কে, মিসর ও ইসকান্দারিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট হযরত হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা' (রা)-কে, বাহ্‌রায়নের বাদশাহ মুন্‌যির ইব্‌ন সাওযা'র নিকট হযরত আলা' ইব্‌ন হায়দামী (রা)-কে, আম্মানের বাদশাহ্‌র কাছে আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে, ইয়ামামার বাদশাহ হাওযা ইব্‌ন আলীর নিকট হযরত সুলায়ত ইব্‌ন আমিরী (রা)-কে, দামেশকের বাদশাহ হারিছ ইবনুছ-ছামার গাস্‌সানীর নিকট হযরত শুজা' ইব্‌ন ওয়াহাব (রা)-কে, জাবালা ইব্‌ন আয়হামের নিকটও শুজাআ ইব্‌ন ওয়াহাব (রা)-কে, ইয়ামেনের বাদশাহ হারছ ইব্‌ন আব্‌দ্‌ কালাল হুমায়রীর নিকট মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া মাখযূমীকে ও পারস্য সম্রাট কিস্‌রার নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা সাহ্‌মীকে ইসলামের দাওয়াতী চিঠি দিয়ে প্রেরণ করলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর দূতের সাথে ভদ্র ব্যবহার করেন। তাঁর চিঠির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু সম্রাট থাকার লিপ্সা ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতার ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে পারলেন না। মিসর সম্রাট মুকাওকিসও তাঁর পত্র ও দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং অতি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর পত্রের উত্তর দেন। পত্রের সাথে একটি খিলাআত, একটি খচ্চর ও দু'টি দাসীও তাঁর নিকট উপহার পাঠান। অনুরূপভাবে মুন্‌যির ইব্‌ন সাওয়াও তাঁর পত্র ও দূতের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। আম্মানের বাদশাহ তাঁর পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা তাঁর পত্রটি ছিঁড়ে ফেললো এবং হযরত

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা (রা)-এর সাথে অভদ্র ব্যবহার করলো। হযরত নবী (সা) শুনে বললেন, কিস্‌রার সাম্রাজ্যও ঐভাবে ছিন্নভিন্ন করা হবে। সুতরাং তাই হয়েছে।

মক্কায় আগমন

সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ নাগাদ হযরত নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করলেন। অষ্টম হিজরীর যুলকা'দা মাসের শুরুতে তিনি পূর্বের বছর তাঁর সাথে যেসব সাহাবা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবাইকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং তাঁরা ও অন্যান্য সাহাবাও উমরাহ করার জন্য তৈরি হলেন এবং সর্বমোট দু' হাজার লোক নিয়ে তিনি উমরাহ আদায় করার জন্য মদীনা থেকে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। মদীনায় হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-কে প্রশাসক নিযুক্ত করে গেলেন। পূর্বের বছর যে সন্ধিপত্র হুদায়বিয়ায় লিখিত হয়েছিল, তাতে শর্ত ছিল যে, "মুসলমানরা এ বছর উমরাহ আদায় ছাড়াই ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে উমরাহ আদায় করবে।" সুতরাং সেই শর্ত অনুসারেই হযরত নবী করীম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছে তিনি এবং সকল মুসলমান শুধু নিজ নিজ তলোয়ার সঙ্গে রাখলেন এবং বাকী সমস্ত হাতিয়ার খুলে ফেললেন। মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্‌র মুখোমুখি পৌঁছে হযরত নবী করীম (সা) মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের স্কন্ধকে অনাবৃত করে নাও এবং ইহ্‌রামের কাপড় বগলের নীচ থেকে বের করে গর্দানে পেঁচিয়ে নেয়ার পর সুনিপুণভাবে সাঈ করতে করতে দ্রুত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানদের এই তাওয়াফের তামাশা দেখার জন্য মক্কায় যেসব মুশরিকের সমাগম হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের উদ্যমশীলতা, শক্তি ও শৌর্যের প্রকাশ ঘটানো। মক্কার বহু মুশরিক মক্কার বাইরের আখড়া ও উপত্যকাসমূহে চলে গিয়েছিল যাতে মুসলমানদের তাওয়াফ করতে দেখে মনে দুঃখ পেতে না হয়। হযরত নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় তিন দিন অবস্থান করলেন। উমরার আরকান আদায় করার পর নবী করীম (সা) আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মে ফযলের বোন মায়মূনা বিন্‌ত হারিছকে বিবাহ করলেন।

চতুর্থ দিন সকাল বেলা মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইব্ন আমর ও হুওয়ায়তিব ইব্ন আক্‌দিল উযযা নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বললো, আপনার তিন দিন শেষ হয়ে গেছে। এক্ষণই মক্কা থেকে চলে যান। হযরত নবী করীম (সা) তখন আনসারদের মজলিসে বসে সাআদ ইব্ন উবাদা (রা)-এর সাথে কথা বলছিলেন। তিনি সুহায়লকে বললেন, তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? আমি নিজেই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। কিন্তু তোমরা কি জানো যে, আমি এখানে একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি? এখনো তার রুখসতি হয়নি। তোমরা অনুমতি দিলে আমি এখানে বৈবাহিক ভোজের আয়োজন করবো এবং সমস্ত মক্কাবাসীদের দাওয়াত করে খাওয়াবো। তারপর এখান থেকে চলে যাবো। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। সুহায়ল বললো, আমরা তোমার খাবারের মুখাপেক্ষী নই। তোমরা চুক্তির পাবন্দী করো এবং এখান থেকে এখনই চলে যাও। সুতরাং নবী করীম (সা) তখনই বিদায়ের আয়োজন করতে বললেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কার বাইরে চলে গেলেন। হারাম শরীফের সীমানার বাইরে গিয়ে তিনি সারাফ উপত্যকার ভিতর দিকের ময়দানে অবস্থান নিলেন। এখানেই মায়মূনা বিন্‌ত হারিছ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি যখন মক্কা থেকে

রওয়ানা করলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা আম্মারা যিনি তখন ছোট্ট শিশু ছিলেন–চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এসে বললেন, আমাকেও আপনার সাথে করে মদীনায় নিয়ে যান। হযরত আলী (রা) তৎক্ষণাৎ ঐ মেয়েটিকে উঠিয়ে তাঁর হাওদায় বসালেন। তখন হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছাও ঐ মেয়েটির দায়িত্ব গ্রহণ ও প্রতিপালনের দাবী করলেন। প্রত্যেকেই চাচ্ছিলেন এই মেয়েটিকে তার তত্ত্বাবধানে রেখে লালন-পালন করতে। যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) বললেন, হযরত হামযা (রা) আমার দীনী ভাই ছিলেন, তাই আমার দাবী অগ্রগণ্য। হযরত জা'ফর (রা) বললেন, এটি আমার চাচাত বোন। আর আমার স্ত্রী হচ্ছেন, তার খালা। নবী করীম (সা) সবার বক্তব্য শুনে আম্মারাকে হযরত জা'ফরের নিকট সোপর্দ করলেন এবং বললেন, খালা হচ্ছেন মায়ের সমতুল্য। তাই তার লালন-পালন জা'ফরের ঘরেই হওয়া উচিত। হযরত আলী (রা) এবং যায়দ (রা)-কেও তিনি এ ব্যাপারে সম্মত করালেন।

আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার পর নবী করীম (সা) মাত্র গুটি কতক দিন অতিবাহিত করেছিলেন। মক্কায় হযরত আমর ইবনুল 'আস মুসলমান হয়ে হিজরত করার ইরাদা করলেন। আমর ইবনুল 'আস সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কুরায়শরা তাঁকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিল, যাতে মুসলমান মুহাজিররা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিতে না পারে। নাজাশীর দরবারে তাঁকে অপমান ও ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছিল। এই অপমান ও ব্যর্থতাই তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতার মোহর মেরে দিয়েছিল। এই প্রভাব অবিরাম ভেতরে ভেতরে তার ক্রিয়া করতে থাকে। আর পরবর্তী ঘটনাবলী তার সমর্থন ও সত্যায়ন করলো। সুতরাং তখন আমর ইবনুল 'আস আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হুদায়বিয়া অভিযানে গাযবান নামক স্থানে রাতের বেলা ইশার সালাতে নবী (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের অন্তর নরম হয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকেই তিনি ইসলামকে ভালবাসতেন। আমর ইবনুল 'আস খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের কাছে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদও তখনই আমর 'ইবনুল আসের সহযাত্রী হতে প্রস্তুত হলেন। এরপর উভয়ে মিলে তাদের তৃতীয় বন্ধু উসমান ইব্‌ন তালহাকে তাঁদের সংকল্পের কথা জানালেন। তিনিও নির্দ্বিধায় তাদের সঙ্গ দিতে তৈরি হয়ে গেলেন। কুরায়শের এই তিনজন সরদারই মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় হযরত নবী (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের শক্তি অনেক বেড়ে গেলো। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ও আমর ইবনুল 'আস (রা) মুসলমান হওয়ার সময় যখন জানতে পারলেন যে, ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁদের পেছনের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, তখন খুব খুশী হলেন।

হিজরতের অষ্টম বছর

আরবদেশে তখন ইসলামের প্রকাশ্য কোন বড় বিপদ আর ছিলো না। ইসলাম গ্রহণ করা ও শির্‌ক পরিহার করার মধ্যে জানমালের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো একের পর এক সবাই নিজ নিজ ক্ষমতা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় করে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ইসলাম আরবদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা

যতই স্বীকৃত হতে চললো, আরবদেশে ফিতনা-ফাসাদ ততই হ্রাস পেতে লাগলো। এতদ্‌সত্ত্বেও মক্কার কুরায়শরা-যারা সারা আরবদেশে বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল–তখনো পর্যন্ত কুফর ও শির্‌কের উপর প্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানদের বিরোধিতায় সরগরম ছিল। মদীনার মুনাফিক, খায়বারের ইয়াহূদী ও মক্কার কুরায়শ–এই তিনটি শত্রু আরবদেশের আন্তঃ গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে করে প্রতিবারই যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা পারস্য ও রোমের সম্রাট ও অধিকর্তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করার প্রয়াস ও ষড়যন্ত্র শুরু করলো। হযরত নবী করীম (সা)-ও এ বিবাদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তিনি আরবদেশের আশেপাশের সমস্ত রাজা-বাদশাহর নামে দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করলেন। এই দাওয়াতী চিঠিপত্র অধিকাংশ রাজ-দরবারে খুবই সুপ্রভাব সৃষ্টি করলো এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করে দিল। কিন্তু কোন কোন রাজা-বাদশাহ শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামী দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে আরো বেশী বিরোধিতা ও শত্রুতা করা আরম্ভ করে দিল। ফলে এইসব বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়লো। কোন বৈদেশিক বাদশাহ যদি মদীনার উপর আক্রমণ করতে সক্ষম হতো, তাহলে সমগ্র আরবদেশ কর্তৃক নবোদ্যমে শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া এবং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ছিল অবধারিত।

মূতার যুদ্ধ

হযরত নবী করীম (সা) যে দাওয়াতী চিঠিপত্র রাজা-বাদশাহদের নামে লিখেছিলেন, তন্মধ্যে একটি চিঠি হারিছ ইব্‌ন উমায়র আযদী (রা) মারফত বসরার শাসনকর্তার নামে প্রেরণ করেছিলেন। হারিছ ইব্‌ন উমায়র আযদী (রা) রওয়ানা হয়ে বসরা যাওয়ার পথে সিরিয়া সীমান্তের সন্নিকটবর্তী মূতা নামক স্থানে পৌছতেই সেখানকার শাসনকর্তা শুরাহবীল ইব্‌ন উমর গাস্‌সানী যিনি রোম সম্রাটের তরফ থেকে ঐ এলাকার গভর্নর ছিলেন–তাঁকে গ্রেফতার করলেন এবং ইনি বসরার শাসনকর্তার নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন–একথা অবগত হয়ে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। হারিছ ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর অহেতুক হত্যাকাণ্ডের খবর যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছল তখন মুসলমানগণ প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। হযরত নবী করীম (সা) এই উদ্ধত গাসসানী সরদারকে শায়েস্তা করার জন্য একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। এই অভিযান প্রেরণে যদি বিন্দু মাত্র বিলম্ব হতো, তাহলে সিরিয়ার পক্ষ থেকে মদীনা আক্রান্ত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। হযরত নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে হারাক নামক স্থানে সমবেত হতে বললেন। সুতরাং তিন হাজার ইসলামী সৈন্য হারাক নামক স্থানে সমবেত হলো। নবী করীম (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে এই দলের সৈনাপত্য দান করে বললেন–যায়দ ইব্‌ন হারিছা যদি শহীদ হয়, জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব এই দলের সেনাপতি হবে। জা'ফরও যদি শহীদ হয়, তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা সেনাপতি হবে। সেও যদি শহীদ হয়, তবে তারপর সেনাদল যাকে পসন্দ করবে, তাকে সেনাপতি বানিয়ে নেবে। হযরত নবী করীম (সা) এই দলটিকে কিছুদূর পর্যন্ত বিদায় জানাতে গেলেন। তারপর মদীনায় ফিরে এলেন।

হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে মাআন নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। মাআনে পৌছে সংবাদ পাওয়া গেলো মূতার শাসনকর্তা শারজীল ইব্‌ন আমর মুসলমানদের

মুকাবিলার জন্য একলাখ সুদক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং এক লাখ সৈন্যসহ মূতা থেকে কিছুদূর পিছনে অবস্থিত বাল্‌কা' উপত্যকায় স্বয়ং রোম সম্রাট ডেরা ফেলে রয়েছেন। এই খবর শুনে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভাব দেখা দিলো। মুসলিমপক্ষ দু'দিন পর্যন্ত মাআনে অবস্থান করলো এবং পরস্পরের মধ্যে এরূপ সলা-পরামর্শ চলতে লাগলো যে, নবী করীম (সা)-কে এ ব্যাপারে চিঠি লিখতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ ও সাহায্যের অপেক্ষা করতে হবে। তখনো কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত স্থির হয়নি। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চকণ্ঠে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

> তোমরা শাহাদতের অন্বেষণে বের হয়েছো। কাফিরদের সাথে আমরা লোক গণনা অর্থাৎ সংখ্যা, শুমার ও শক্তি দ্বারা যুদ্ধ করি না বরং আমরা সেই দীনের জন্য যুদ্ধ করি, যা আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন। কাজেই তোমরা মূতা ও হিরাক্লিয়াস বাহিনীর দিকে অগ্রসর হও এবং নিজ বাহিনীর মায়মানা (ডান পার্শ্ব) ও মায়সারা (বাম পার্শ্ব) ঠিক করে কাফিরদের মুকাবিলা করো। এর পরিণাম এই দুই পুণ্যের যে কোন একটি অবশ্যই হবে : হয় আমরা জয়লাভ করবো, অথবা শাহাদত লাভ করবো।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর এই বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ শ্রবণ করে হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) এক হাতে বর্শা ও অন্য হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত মুসলমানের মধ্যে জোশ ও শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো। মুসলিম বাহিনী মাআন থেকে রওয়ানা হলো। মাশারিফ নামক একটি গ্রামের কাছে শত্রুপক্ষের একটি বিরাট দল সামনে দেখা গেলো। কিন্তু মুসলমানরা সেখানে তাদের মুকাবিলা করা উপযোগী মনে করলেন না। তারা সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে মূতার দিকে অগ্রসর হলেন যাতে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ময়দান হস্তগত হয়। অবশেষে মূতা ময়দানে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হলো। একদিকে ছিল এক লাখ বীর যোদ্ধা। অপরদিকে ছিল তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ। এই মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-ও শামিল ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের পক্ষ থেকে এই প্রথম বারের মতো তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। রোমের কায়সার ও মুসলমানদের মধ্যে এটা ছিল প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের প্রথম যুদ্ধও বলা যেতে পারে। যদিও সিরীয় সীমান্তের কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য লড়াইগুলোর মধ্যে এটি ছিল সর্বপ্রথম লড়াই, যা মুসলমানরা সিরিয়া সীমান্তে লড়েছিলেন। হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে কলব (মধ্যবর্তী বাহিনী)-এর সামনে সবার আগে ছিলেন। মায়মানা (রাইট উইং) কুতায়বা ইব্‌ন কাতাদা 'উযরীর উপর ন্যস্ত ছিল। মায়সারায় (লেফট উইং) ছিলেন আবায়া ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা)। যায়দ ইবন হারিছা (রা) লড়াই করতে করতে এবং কাফিরদের কতল করতে করতে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। কাফিররা চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেললো। তিনি শাহাদত বরণ করলেন। তিনি শহীদ হওয়ার পর হযরত জা'ফর (রা) ঝাণ্ডা তুলে নিলেন এবং বহু কাফিরকে হত্যা করলেন। শেষে তাঁর ঘোড়াটি যখমী হয়ে পড়ে গেলো এবং তিনি পদাতিক শত্রুর সাথে লড়তে লাগলেন। শত্রুরা তাঁকেও ঘেরাও করে ফেললো। তাঁর ডান হাত কেটে পড়ে গেলো। কিন্তু তিনি বাম হাত দিয়ে ঝাণ্ডা সামলে নিলেন। যখন বাম হাতও কেটে পড়ে গেলো, তখন গর্দানের সাথে ঝাণ্ডা লাগিয়ে সীনা দ্বারা তা উচিয়ে রাখলেন। এই অবস্থায়ই তিনি শাহাদত

বরণ করলেন। তাঁর শাহাদতের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডা তাঁর হাতে নিলেন। কিছুক্ষণ লড়াই করে তিনিও শহীদ হলেন এবং ইসলামের ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ে গেলো। মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতার চিহ্ন দেখা দিল। হযরত ছাবিত ইব্ন আকরাম (রা) চট করে সামনে অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন :

হে মুসলমানগণ! তোমরা সম্মিলিতভাবে কোন একজনকে তোমাদের সেনাপতি বানিয়ে নাও।

ইসলামী লশকরের তরফ থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো رضينابك (আমরা তোমার সৈনাপত্যেই সন্তুষ্ট!) হযরত ছাবিত ইব্ন আকরাম জবাব দিলেন :

مَا اَنَا بِفَاعِلٍ فَاتَّفِقُوْا عَلٰى خَالِدِ بْنِ وَلِيْدٍ .

(আমি এ দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। তোমরা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে সেনাপতি বানিয়ে নাও)। ইসলামী লশকরের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ উচ্চারিত হলো–আমরা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সৈনাপত্য মেনে নিলাম। একথা শুনেই হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তৎক্ষণাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে হযরত ছাবিত ইব্ন আকরামের হাত থেকে ঝাণ্ডা গ্রহণ করলেন এবং রোমক বাহিনীর উপর আঘাত হানলেন। তখনো পর্যন্ত রোমক বাহিনী বিজয়ী ও মুসলিম বাহিনী পরাজিত দৃষ্ট হচ্ছিল। কোন কোন মুসলিম সেনা এই অবস্থা দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েই মুসলিম বাহিনীকে হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধের আহবান জানালেন এবং ধিক্কার দিয়ে বীর-বিক্রমে যুদ্ধের জন্য নতুনভাবে প্রস্তুত করলেন। তারপর এমন সুনিপুণভাবে বিশাল শত্রুবাহিনীর উপর উপর্যুপরি আঘাত হানলেন যে, রোমকরা হতচকিত হয়ে গেলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) কেবল নিজেই বীর-বিক্রমে লড়াই করেননি বরং তাঁর সৈন্যের বিন্যাস ও গতিবিধিকেও অতি দক্ষতার সাথে তাঁর আয়ত্তে রাখেন। তিনি কখনো মায়সারাকে সামনে অগ্রসর করান, কখনো মায়মানাকে পিছে হটান। নিজেও হামলা করতেন এবং নিজ বাহিনীর বিভিন্ন অংশ দ্বারাও শত্রুদের আক্রমণ করাতেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বিদ্যুতের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে চমকাচ্ছিলেন এবং ইসলামী লশকরের প্রতিটি অংশকে স্বয়ং সাহায্য করছিলেন। মোটকথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর তিন হাজার সৈন্যকে রোমের এক লাখ বীর সেনার সাথে যুদ্ধরত রাখলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তখন রোমকরা মুসলমানদের মুকাবিলা থেকে পলায়নের গ্লানি স্বীকার করলো এবং ভগ্নোৎসাহ হয়ে পিঠটান দিলো। মুসলমানরা কিছুদূর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং কিছু মালে গনীমতও হস্তগত হলো। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে মোট বারো জন সাহাবী শহীদ হন। নিহত কাফিরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।

হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ্ (রা)

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক দক্ষতার কথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় স্বীকারোক্তি ছিল–স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে তিনি 'সায়ফুল্লাহ্' খেতাবে বিভূষিত হন। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এরূপ : যেদিন মূতা ময়দানে ইসলামী লশকর মদীনা থেকে হাজারো ক্রোশ দূরত্বে যুদ্ধরত ছিল, সেদিন নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় বসেই ইলহামে ইলাহীর মাধ্যমে যুদ্ধের সমুদয় ঘটনা অবগত হলেন। তিনি

তখনই তামাম মুসলমানকে জড়ো করলেন এবং মিম্বরের উপর উঠে বললেন, তোমাদের মুজাহিদ বাহিনীর খবর হচ্ছে, তারা শত্রুদের মুকাবিলা করেছে। যায়দ শহীদ হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। তারপর জা'ফর ইসলামী ঝাণ্ডা তার হাতে তুলে নিলো। শত্রুরা তাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেললো। সেও শহীদ হলো। আল্লাহ্ তাকেও মাফ করে দিয়েছেন। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ইসলামী ঝাণ্ডা হাতে নিলো। সেও শত্রুদের সাথে লড়াই করে শহীদ হলো। এদের সবাইকে জান্নাতে তুলে নেয়া হয়েছে এবং সোনার সিংহাসনে তারা অবস্থান করছে। এই তিন জনের পর ইসলামী ঝাণ্ডা سيف من سيوف الله (আল্লাহ্র তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার) অর্থাৎ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ধারণ করলো এবং যুদ্ধের অবনতিশীল পরিস্থিতি সামলে নিলো।

সেদিন থেকেই হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সায়ফুল্লাহ্ (আল্লাহ্র তলোয়ার) নামে অভিহিত হতে থাকেন। হযরত জা'ফর (রা)-এর গৃহে তখনই মাতম শুরু হয়ে গেলো। অর্থাৎ তাঁর পরিবার-পরিজন শোকের আতিশয্যে ক্রন্দন করতে লাগলো। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর ঘর থেকে খানা পাক করে হযরত জা'ফর (রা)-এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যখন তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে মদীনার অদূরে এসে পৌঁছলেন, তখন হযরত নবী (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত স্বাগত জানাতে গেলেন এবং হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে 'সায়ফুল্লাহ' খেতাবের খোশখবরী দিলেন। এক সাহাবী স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত জা'ফর (রা) জান্নাতের মধ্যে তাঁর দুই ডানা দ্বারা উড়ে বেড়াচ্ছেন। সেদিন থেকেই তাঁর নাম জা'ফর তাইয়াররূপে প্রসিদ্ধ হয়। একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সা) বলেন, জা'ফরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি ডানা দান করেছেন। এই দুটি ডানা দিয়ে সে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন থেকেই তিনি 'যুল-জানাহায়ন' ও 'তাইয়ার' লকবে ভূষিত হন। মূতা যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

কুযাআ যুদ্ধ

এই যুদ্ধের একমাস পর মদীনায় খবর এলো সিরীয় সীমান্তের কাছে কুযাআ সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে তিনশ' মুহাজির ও আনসার সৈন্যের সেনাপতি বানিয়ে সেখানে প্রেরণ করলেন। আমর ইবনুল 'আস (রা) রাতে সফর ও দিনে গোপন স্থানে অবস্থান করতে করতে পথ চললেন। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে জানা গেলো যে, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা অনেক বেশী। তাই মদীনায় একজন দূত পাঠানো হলো। এখান থেকে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে সাহায্য দিয়ে পাঠালেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) পৌঁছার পর মুসলিম বাহিনী হামলা করলো। শত্রুপক্ষ মুকাবিলা করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো।

মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলের কাছে জুহায়না গোত্র বিদ্রোহ করে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। হযরত নবী করীম (সা) অষ্টম হিজরীতেই একথা জানতে পারলেন। তাই তিনি হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তিনশ' মুহাজির ও আনসারের সাথে সেখানে প্রেরণ করলেন। এই বাহিনী কোন মুকাবিলা ও যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে আসলো। শত্রুপক্ষ এই অভিযানের কথা শুনেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে মক্কা মুকাররমায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বনূ খুযাআ ও বনূ বকর হুদায়বিরার সন্ধিপত্র অনুসারে নিজেদের শত্রুতা ভুলে গিয়ে হযরত নবী করীম (সা) ও মক্কার কুরায়শদের মিত্র বনে গিয়েছিল। তারা তখন একে অপরের উপর হামলা করতে পারতো না। কিন্তু বনূ বকরের নিয়ত বদলে গেলো এবং তাদের সরদার নাওফিল ইব্‌ন মুআবিয়া বনূ খুযাআর উপর প্রতিশোধ নিতে চাইল। মক্কার কুরায়শদের কর্তব্য ছিল তাদের মিত্র বনূ বকরকে এই সঙ্কল্প থেকে বিরত রাখা এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর মিত্র বনূ খুযাআর উপর হামলা করতে না দেয়া। কেননা, হুদায়বিয়ায় দশ বছরের জন্য সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কুরায়শরা বনূ বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো এবং কুরায়শের মধ্য থেকে সাফওয়ান ইব্‌ন আমর প্রমুখ বনূ বকরের সাথে হামলায় শরীক হলো। বনূ বকর কুরায়শ সরদারদের সঙ্গে নিয়ে বনূ খুযাআর উপর চড়াও হলো এবং আচানক তাদের কতল করা শুরু করলো। বনূ খুযাআ যখন রাতের বেলা বেঘোরে ঘুমাচ্ছিলো, তখন তারা এই হামলা করলো। বনূ খুযাআ মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় নিলো। জালিমরা সেখানেও তাদের রেহাই দিলো না। বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈর গৃহে প্রবেশ করে তার সমস্ত মালপত্র লুণ্ঠন করলো। এই হামলায় বনূ খুযাআর বিশ/বাইশজন লোক নিহত হলো। এদের কয়েকজনকে বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে হত্যা করা হয়। বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা ও আমর ইব্‌ন সালিম বনূ খুযাআর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা করলেন। উদ্দেশ্য, হযরত নবী (সা)-এর নিকট বনূ বকর ও কুরায়শের এই চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করা। যে রাতে মক্কায় সন্ধিচুক্তির এরূপ নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটানো হচ্ছিল, বনূ খুযাআর কয়েকজন লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট ফরিয়াদ জানালো–হে খাতামুন্‌-নাবিয়্যীন! আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের ফরিয়াদ শুনুন!! বনূ বকর আমাদের উপর জুলুম করেছে!! হযরত নবী (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর গৃহে তখন উযূ করছিলেন। তিনি মক্কার বনূ খুযাআর লোকদের এই ফরিয়াদ মদীনায় বসে শুনতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে 'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক' বললেন। হযরত মায়মুনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি 'লাব্বায়েক' বললেন কার কথার উত্তরে ? তিনি বললেন, এইমাত্র বনূ খুযাআর লোকদের ফরিয়াদ আমার কানে এসে পৌঁছলো। আমি তার উত্তর দিলাম। আরো আশ্চর্য এই যে, বনূ খুযাআর লোকরাও তাদের ফরিয়াদের উত্তরে হযরত নবী করীম (সা)-এর জবাব শুনতে পেলো। ভোর বেলা তিনি হযরত আয়িশা (রা)-কে বললেন যে, রাতে মক্কায় বনূ খুযাআর লোকদেরকে বনূ বকর ও কুরায়শরা মিলে হত্যা করেছে। হযরত আয়িশা (রা) বললেন, আপনি কি মনে করেন যে, কুরায়শরা চুক্তি ভঙ্গ করবে ? তিনি বললেন, তারা নির্ঘাত চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং অচিরেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে তাঁর হুকুম জারি করবেন। কয়েকদিন পর বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা ও আমর ইব্‌ন সালিম খুযাঈ মদীনা পৌঁছেন। তারা মক্কার কুরায়শদের চুক্তিভঙ্গ ও জুলুমের অভিযোগ করলেন। আমর ইব্‌ন সালিম খুযাঈ অতি করুণ কাব্যে তাঁদের মজলুম হওয়ার কাহিনী শোনালো। ঐ কাব্যের কয়েকটি পংক্তি এরূপ :

اِنَّ قُرَيْشَ اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَ * وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُوَكَّدَا

কুরায়শরা আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আর তারা আপনার সাথে যে মজবুত ওয়াদা করেছিল, তা ভঙ্গ করেছে।

وَجَعَلُوْا لِىْ فِىْ كَدَاءٍ رَصَدًا * وَزَعَمُوْا اَنْ لَيْسَتْ اَدْعُوْا اَحَدًا

আমাদেরকে শুকনো ঘাসের মতো পদদলিত করেছে। আর তারা মনে করেছে যে, আমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই।

وَهُمْ اَذَلُّ وَاَقَلُّ عَدَدًا * هُمْ بَيَّتُوْنَ بِالْوَتِيْرِ هَجَدًا

তারা অতি নীচ ও সংখ্যায় অতি অল্প। তারা ওয়াতীল মহল্লায় আমাদের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা করেছে।

হযরত নবী (সা) বনূ খুযাআর ঐ লোকদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিলেন এবং বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসবো। তাদেরকে তিনি মদীনা থেকে মক্কার পথে বিদায় করে দিলেন। তারা মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত নবী করীম (সা) বললেন, আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে সন্ধি ও চুক্তি মজবুত করার জন্য রওয়ানা করেছে। কিন্তু সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে।

মক্কাবাসীরা যখন তাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পেলো, তখন তারা ভীত হয়ে পড়লো এবং মদীনায় গিয়ে সন্ধির শর্তাবলী নবায়ন করার জন্য আবূ সুফিয়ানকে প্রেরণ করলো। এদিকে হযরত নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে সফর ও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করার জন্য নির্দেশ দিলেন। একই সাথে তিনি যুদ্ধের এই প্রস্তুতির কথা গোপন রাখার জন্যও তাকীদ করলেন। অপরদিকে বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা তার সঙ্গীদের নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল এবং আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করছিল। পথিমধ্যে উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কোথেকে আগমন করছো। তারা জবাব দিলেন আমরা এই উপত্যকায় এসেছিলাম। আবূ সুফিয়ান মনে করেছিল যে, তখন পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট মক্কার এ ঘটনার খবর পৌঁছেনি। তাই সে অতিসত্বর সন্ধিপত্রের নবায়ন করাতে চাইল।

আবূ সুফিয়ানের মদীনায় আগমন

আবূ সুফিয়ান মদীনায় এসে হযরত নবী করীম (সা), হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত আলী (রা)-এর সাথে পৃথকভাবে কথা বলতে চাইল। কিন্তু কেউই তাকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি নিরাশ হলেন। শেষে হযরত আলী (রা) তার সাথে একটু কৌতুক করলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি বনূ কিনানার সরদার। মসজিদ-ই-নববীতে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দাও যে, আমি সন্ধির সময়সীমা বৃদ্ধি এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার মজবুত করছি। আবূ সুফিয়ান তদ্রূপ দণ্ডায়মান হয়ে মসজিদে ঘোষণা করলো এবং তৎক্ষণাৎ মদীনা থেকে প্রস্থান করলো। সে যখন মক্কা পৌঁছলো, তখন মক্কার কুরায়শরা তাকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো এবং বললো, আলী তোমার সাথে কৌতুক করেছেন। সন্ধিচুক্তি কি কখনো এভাবে হয়? আবূ সুফিয়ান তার এই আহাম্মকির জন্য খুব লজ্জিত হলো। আবূ সুফিয়ানের প্রস্থানের পর হযরত নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করার নির্দেশ দিলেন। তখন পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা একথা কেউ-ই জানতেন না যে, ইসলামী লশকর কোন দিকে রওয়ানা হবে এবং কোন কওম বা এলাকার উপর হামলা হবে। হযরত নবী করীম (সা)-এর এই সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে কুরায়শরা পূর্বাহ্নেই

এই হামলার খবর জানতে না পারে। হাতিব ইব্‌ন আবী বাল্‌তাআ নামক জনৈক সাহাবী কুরায়শদের উপর মুসলমানদের হামলার খবর জানানোর জন্য এক মহিলার মাধ্যমে তাদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। হযরত নবী করীম (সা) ওয়াহীর মাধ্যমে তা জেনে ফেললেন। তিনি হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ও হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে ঐ মহিলাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা রওযা-ই-জানাহ্-এ পৌঁছে তাকে গ্রেফতার করলেন। তার সমস্ত আসবাবপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু পত্রের সন্ধান পেলেন না। হযরত আলী (রা) বললেন, এটা হতেই পারে না যে, নবী করীম (সা) ভুল সংবাদ পেয়েছেন। পত্র অবশ্যই তার কাছে আছে। তিনি মহিলাকে ভয় দেখালেন ও ধমকালেন। তখন সে তার চুলের খোঁপার মধ্য থেকে চিঠি বের করে দিলো। পত্র পাঠ করে দেখা গেলো পত্রটি হাতিব ইব্‌ন আবী বাল্‌তাআর লেখা। পত্রসহ মহিলাটিকে নবী করীম (সা)-এর নিকট আনা হলো। হাতিবকে তলব করা হলো। তিনি বললেন, মক্কায় আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাই আমি মক্কাবাসীদের উপর একটু দয়া করতে চাইলাম এবং তাদের উপর আসন্ন হামলার খবর জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, যাতে তারা কৃতজ্ঞতাবশত আমার আত্মীয়-স্বজনের উপর অত্যাচার না চালায়। একথা শুনে হযরত উমর ফারূক (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আদেশ দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, উমর! হাতিবের ভুল ক্ষমার্হ। হযরত হাতিব (রা)-এর ত্রুটি মার্জনা করা হলো। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

মক্কার পথে যাত্রা

অষ্টম হিজরীর ১১ই রমযান হযরত নবী করীম (সা) দশ হাজার সাহাবা সমভিব্যাহারে মদীনা থেকে রওয়ানা করলেন। কুরায়শরা আবূ সুফিয়ানের অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসায় খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। তারা মুসলমানদের সংকল্প সম্পর্কে কোন খবর পায়নি। কোন গুপ্তচর ও মিত্র গোত্রও তাদের কোন সংবাদ জানায়নি। হযরত নবী করীম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে খুব ত্বরিত গতিতে মক্কার পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। তিনি যখন জুহফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁর চাচা হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা) পরিবার-পরিজনসহ মুসলমান ও মুহাজির হয়ে মদীনার পথে এসে মিলিত হলেন। নবী করীম (সা) তাঁর পরিবার-পরিজনকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং হযরত আব্বাস (রা)-কে তাঁর সঙ্গে নিলেন। ইসলামী লশকর অগ্রসর হতে হতে মক্কার অদূরবর্তী মাররুয্-যাহ্‌রান উপত্যকায় (মক্কার চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত) পৌঁছে গেলো। মক্কাবাসী তখনো বেখবর ছিল। তারা এও জানতো না যে, মুসলমানরা তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কি শাস্তি দেবে আর কি কর্মপন্থা গ্রহণ করবে? মাররুয-যাহরানে সন্ধ্যার সময় ইসলামী লশকর পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। রাতে গো-রক্ষকদের মাধ্যমে খবর পৌঁছলো যে, মাররুয্-যাহ্‌রানে এক বিশাল বাহিনী শিবির স্থাপন করেছে। এ খবর শুনে আবূ সুফিয়ান অনুসন্ধান করতে বের হলো। বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা ও হাকীম ইব্‌ন হিযামও তার সাথে ছিল। এদিকে হযরত নবী (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল টহল সেনা নিয়োগ করেন যাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুপক্ষ অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। হযরত আব্বাস (রা)-এর মন তাঁর কওমের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তিনি জানতেন যে, প্রত্যূষে যখন ইসলামী লশকর মক্কা আক্রমণ করবে, তখন কুরায়শ ও মক্কার নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি কামনা করতেন কোন প্রকারে মক্কাবাসী মুসলমান হয়ে যাক। তাই তিনি

রাতের বেলায় নবী করীম (সা)-এর দুলদুল নামক খচ্চরে আরোহণ করে শিবির থেকে বের হয়ে মক্কার পথে গমন করলেন। ইসলামী লশকরগাহে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে হাজার হাজার সেনাগুচ্ছ পৃথক পৃথক ছাউনি স্থাপন করেছিল এবং সবাই আগুন জ্বেলে রেখেছিল।

আবূ সুফিয়ান দূর থেকে আগুন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লো। এত বড় বাহিনী কোথা থেকে এলো ? বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈ বললো, এটি খুযাআ বাহিনী। আবূ সুফিয়ান শুনে অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলো, বনূ খুযাআর কি ক্ষমতা আছে এত বড় বাহিনী সমাবেশ করার ? তারা তো একটি দীন-হীন ও ছোট্ট গোত্র মাত্র।

রাতের অন্ধকারে হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানের কথার আওয়াজ চিনে ফেললেন। তিনি এ উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন যে, মক্কার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে এই বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে বলে দেবেন যে, এ মুহূর্তে মুসলমান হয়ে যাওয়াই তোমাদের জন্য শ্রেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ আবূ সুফিয়ানকে আওয়াজ দিলেন এবং বললেন যে, এ বাহিনী মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনী। এরা প্রত্যূষে মক্কা আক্রমণ করবে। আবূ সুফিয়ান হতবুদ্ধি হয়ে গেলো এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললো, এখন উপায় কি! হযরত আব্বাস (রা) বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে খচ্চরের উপর আরোহণ করো। আমি তোমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে তুমি নিরাপত্তা পেতে পারো। আবূ সুফিয়ান নির্দ্বিধায় খচ্চরের উপর আরোহণ করলো এবং তার অন্য দুই সহচর মক্কায় চলে গেলো। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানকে তাঁর পশ্চাতে আরোহণ করিয়ে যখন ইসলামী লশকরগাহের দিকে ফিরে চললেন, তখন পথে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সাথে দেখা। তিনি আবূ সুফিয়ানকে চিনে ফেললেন এবং কতল করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) খচ্চর দাবড়িয়ে ত্বরিতগতিতে সটকে পড়লেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন পদাতিক। তিনিও পিছনে পিছনে তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন। হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রথম পৌছলেন। তার পরপরই হযরত উমর (রা)-ও পৌছে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই কাফির বিনাশর্তে আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে। আদেশ করুন, গর্দান উড়িয়ে দিই। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আমি আবূ সুফিয়ানকে আমান দিয়েছি। হযরত উমর (রা) পুনরায় অনুমতি চাইলেন। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, উমর! তোমার বংশের কোন ব্যক্তি হলে তুমি তাকে হত্যা করার জন্য এত পীড়াপীড়ি করতে না এবং এত উদ্‌গ্রীবও হতে না। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আব্বাস (রা)-এর কথার উত্তরে বললেন, আব্বাস! তুমি মুসলমান হওয়ায় আমি যত খুশী হয়েছি, আমার পিতা মুসলমান হলেও তত খুশী হতাম না। কেননা, আমি জানতাম যে, নবী করীম (সা) তোমার মুসলমান হওয়া কামনা করতেন। এই দুই মনীষীর মধ্যে এরূপ কথোপকথন চলছিল। তখন নবী (সা) বললেন, আচ্ছা! আবূ সুফিয়ানকে একরাত সময় দেয়া গেলো। তারপর হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন, আবূ সুফিয়ানকে তুমিই তোমার তাঁবুর মধ্যে রাখ। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানকে সারা রাত নিজের কাছে রাখলেন। সকাল বেলা আবূ সুফিয়ান মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হযরত (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবূ সুফিয়ানের মর্যাদা বৃদ্ধি

হযরত আব্বাস (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আবূ সুফিয়ান মর্যাদাপ্রিয় লোক। আপনি তাকে বিশেষ কোন মর্যাদা দান করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, যে ব্যক্তি কা'বাঘরে আশ্রয় নেবে, তাকে আমান (নিরাপত্তা) দেয়া হবে। যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকেও আমান দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তার আপন ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, সেও আমানে থাকবে। আর যাকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া যাবে, তারও কোন অসুবিধা ঘটানো হবে না। আবূ সুফিয়ান তাঁর এই মর্যাদা বৃদ্ধি দেখে খুব খুশী হলেন।

তখনই ইসলামী লশকর অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে মক্কার দিকে ধাবিত হলো। ইসলামী লশকরের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন নিশান ছিল। আবূ সুফিয়ান উপত্যকার শীর্ষদেশে এক উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে ইসলামী লশকরের দৃশ্য অবলোকন করলেন এবং সবার আগে মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি কা'বাঘরে কিংবা আমার ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ থাকবে। নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা ছিল মক্কায় রক্তপাত না হওয়া। তিনি একদিন নিঃসম্বল অবস্থায় এই মক্কা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। আর আজ শাহী মর্যাদা ও বিশাল বাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। একথা স্মরণ করে তিনি বারবার আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছিলেন। তিনি মক্কায় বিনা বাধায় সাড়ম্বরে প্রবেশ করে কা'বাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সওয়ারীর উপর বসে সাতবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহ্‌র সমস্ত প্রতিমা বাইরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর কা'বার দ্বার-রক্ষক উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা (রা)-এর নিকট থেকে চাবি নিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন। চাশ্‌ত সালাত আদায় করলেন। তারপর কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। মক্কাবাসীও সেখানে মাথা নীচু করে ভয় ও লজ্জায় তাঁর সামনে অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল।

নবী করীম (সা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

"আল্লাহ্ এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং সকল সম্প্রদায়কে পরাভূত করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বৈধ নয়। এখানকার কোন সবুজ বৃক্ষ কাটাও বৈধ নয়। আমি জাহিলী যুগের সমস্ত রসম-রেওয়াজ পদদলিত করেছি। কিন্তু কা'বার আশপাশের লোক ও হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর ব্যবস্থা বহাল রাখা হবে। হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ্ জাহিলী অহংকার ও বংশের গৌরব করতে নিষেধ করেছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ) থেকে এবং আদম (আ) মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ .

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে

পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। (৪৯ : ১৩)

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা কি জান, আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব?"

এই প্রশ্নমূলক বাক্যটি শুনে কুরায়শ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বললো, "আমরা আপনার কাছে মঙ্গল প্রত্যাশা করি। কেননা, আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতুষ্পুত্র!" হযরত নবী (সা) এই উত্তর শুনে বললেন :

"আচ্ছা, আমিও তোমাদের সেই কথাই বলছি যা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

আজ তোমাদের প্রতি কোন ভর্ৎসনা নেই; যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

এই ভাষণ শেষ করে তিনি সাফা পর্বতে গিয়ে বসলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর লোকদের বায়'আত গ্রহণ শুরু করলেন। পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ শেষ করে তিনি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে নারীদের বায়'আত নেয়ার জন্য আদেশ করলেন এবং তিনি স্বয়ং তাদের জন্য ইসতিগফার করতে লাগলেন। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া মক্কা বিজয়ের পর প্রাণের ভয়ে ইয়ামন পলায়ন করলো। ঐ গোত্রের উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সাফওয়ানের জন্য আমান প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে আমান দিলেন এবং এই আমানের নিশ্চয়তাস্বরূপ মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় যে পাগড়িটি বাঁধা ছিল, সেটি তাকে দান করলেন। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব (রা) সাফওয়ানকে ইয়ামনের সন্নিকট থেকে ফিরিয়ে আনলেন। সে নবী করীম (সা) থেকে দুমাসের সময় প্রার্থনা করলো। তিনি চার মাসের সময় দান করলেন। সাফওয়ান মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করার সময় বাধা দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধ করতে না পেরে পলায়ন করেছিল। একই অবস্থা ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেলেরও হলো। তাকেও নবী করীম (সা) ক্ষমা করে দিলেন। এ দু'জনই হুনায়ন যুদ্ধের পর সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সত্য সমাগত বাতিল ভূ-লুণ্ঠিত

কা'বাঘরে মূর্তি ভাঙ্গা সমস্ত আরবদেশের মূর্তি ভাঙ্গার শামিল ছিল। অনুরূপভাবে মক্কার কুরায়শদের ইসলামের দাখিল হওয়া এবং ইসলামের আনুগত্য অবলম্বন করা সারা আরবদেশের অনুগত হওয়ার সমতুল্য ছিল। কেননা, সমস্ত আরবের দৃষ্টি ছিল মক্কার কুরায়শদের প্রতি, তারা ইসলাম গ্রহণ করে কিনা। মক্কা বিজয়ের পর বহু কুরায়শ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনেকে তাদের কুফর ও মূর্তিপূজায় অটল রইল। কাউকে জোর করে মুসলমান বানানোর চেষ্টা আদৌ করা হয়নি বরং লক্ষ্য ছিল শুধু শান্তি-নিরাপত্তা কায়েম করা এবং ফিতনা-ফাসাদ ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করা। এখন সে আশংকা আর নেই এবং জনগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থায় মূর্তিপূজকদের ইসলামকে জানা ও বুঝার সুযোগ হলো এবং তাঁরা একের পর এক অতি দ্রুত সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। এমনকি অল্পদিনের মধ্যেই সবাই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হলো।

মক্কা বিজয় সমাপ্ত করে হযরত নবী করীম (সা) মক্কা শহরে ঘোষণা করলেন যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা তাদের গৃহে কোন মূর্তি রাখতে পারবে না। তারপর তিনি মক্কার

আশপাশের মশহুর মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে এবং দেবালয়গুলো ধ্বংস করার জন্য ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। একটি খেজুর বাগানে স্থাপিত বনূ কিনানার উয্যা নামক মূর্তিটি ভাঙ্গার জন্য হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ত্রিশ হাজার আরোহীসহ প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) গিয়ে উয্যাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং তার মন্দিরটি বিধ্বস্ত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে হুযায়ল-এর সুআ' নামক মূর্তিটি ভেঙে ভূমিসাৎ করার জন্য প্রেরণ করা হলো। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) যখন মন্দিরের নিকট পৌঁছলেন, তখন পূজারীরা বললো, তোমার কি ক্ষমতা আছে ? হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) বললেন, তোমরা দেখতে থাক। একথা বলে মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিটি টুকরো টুকরো করে ফেললেন। পূজারীরা তৎক্ষণাৎ মূর্তিপূজা থেকে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলো। হযরত সা'দ ইব্ন যায়দ আশহালী (রা)-কে 'মানাত নামীয় মূর্তি ভাঙার জন্য কুদায়দ নামক স্থানে পাঠানো হলো। সেখানকার পূজারীরাও বিশ্বাস করত যে, মুসলমানরা কখনো মূর্তি ভাঙতে পারবে না। কিন্তু তারা দেখতে পেলো যে, মুসলমানরা সেখানে গিয়েই সেটি ভেঙেচুরে মন্দির মিসমার করে ফেললো। অনুরূপ আরো অনেক মন্দির ধ্বংস হলো। এরপর কোন কোন গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত নবী করীম (সা) প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বনূ জুযায়মা গোত্রে প্রেরিত হলেন। তাঁকে রক্তপাত করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঘটনাচক্রে হযরত খালিদ (রা)-কে যুদ্ধ করতে হলো এবং বনূ জুযায়মার কয়েকজন লোক নিহত হলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যখন তাদের ধন-সম্পদ মালে গনীমত হিসাবে মক্কায় নিয়ে এলেন, তখন হযরত নবী করীম (সা) এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর মাধ্যমে বনূ জুযায়মার মাল-পত্র ও তাদের নিহতদের রক্তপণ তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কা মুআয্যমায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং সালাতে কসর আদায় করতে থাকেন। মক্কায় তাঁর অনির্দিষ্টকাল অবস্থানে আনসারদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। তারা ভাবলেন, সম্ভবত তিনি মক্কায়ই বসবাস করবেন এবং মদীনায় ফিরে আসবেন না।

হুনায়ন যুদ্ধ

মক্কা বিজয় ও অধিকাংশ কুরায়শের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে যেসব গোত্র মুসলমানদের মিত্র ছিল না, তারা অস্থির ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র ছিল তাদের অন্যতম। এরা তায়িফ ও মক্কার মাঝামাঝি স্থানে বাস করত এবং কুরায়শের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই গোত্রগুলো না মুসলমানদের মিত্র ছিল, না মক্কার কুরায়শদের। তারা ভাবলো, মুসলমানরা মক্কার পর এখন আমাদের উপর হামলা করবে। বনূ হাওয়াযিনের সরদার মালিক ইব্ন আওফ বনূ হাওয়াযিন ও বনূ সাকীফের সবগুলো গোত্রকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে নিজের চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত করলো। নাসর, জুশাম, সা'দ প্রভৃতি গোত্রও অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে শরীক হলো। আওতাস নামক স্থানে এই বিরাট বাহিনী সমবেত হলো। হযরত নবী করীম (সা) মক্কায় বসে যখন এই বিরাট সৈন্য সমাবেশের খবর পেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামীকে গুপ্তচররূপে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, শত্রুদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তারা যুদ্ধের জন্য এখন প্রস্তুত। হযরত নবী করীম (সা) তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। দশ হাজার মুহাজির ও

আনসার তাঁর সাথে মদীনা থেকে এসেছিলেন। তারা সবাই এবং দু' হাজার মক্কাবাসীসহ মোট বারো হাজার লশকর তাঁর সঙ্গে মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। মক্কাবাসী দু' হাজার লোকের মধ্যে কিছু নও-মুসলিম ছিলেন। আর কিছু লোক ছিল যারা তখনো মুশরিকসুলভ মূলতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।

অষ্টম হিজরীর পহেলা শাওয়াল ইসলামী লশকর তিহামা উপত্যকা অতিক্রম করে হুনায়নে পৌঁছলো। শত্রুপক্ষ ইসলামী লশকরের নিকটবর্তী হওয়ার খবর পেয়ে হুনায়নের উভয় দিকের গোপন ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করলো।

মুসলমানগণ উপত্যকার শাখা-প্রশাখা ও অলিগলি ঘুরে নিম্নভূমিতে অবতরণ করছিলেন। সুব্হে কাযিবের অন্ধকার তখন সুবিস্তৃত। অকস্মাৎ শত্রুবাহিনী গোপন ঘাঁটি থেকে বের হয়ে তীর-নিক্ষেপ ও তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। এই আকস্মিক আপতিত বিপদ ও অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুসলিম পক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মক্কাবাসী দু'জাহার লোকই সর্বপ্রথম দিশেহারা হয়ে পলায়ন করলো। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও যে যে দিকে পারলো ছুটাছুটি করতে লাগলেন। হযরত নবী করীম (সা) ছিলেন উপত্যকার ডান দিকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত ফযল ইব্ন হাইয়ান (রা), আবূ সুফিয়ান (রা), ইবনুল হারিছ ও সাহাবায়ে কিরামের একটি ক্ষুদ্র দল। তিনি তাঁর দুলদুল নামক সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) তার লাগাম ধারণ করেছিলেন। এই কঠিন বিপদ ও সংকটাবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন :

اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبُ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

আমি (আল্লাহ্র) নবী একথা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর জানবেন নিশ্চয়।

হযরত নবী করীম (সা)-এর এরূপ দৃঢ়তা ও বীরত্ব মুসলমানদের হিম্মত বাড়িয়ে দিলো। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তিতে হামলা করছিল আর এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক তাদের সাথে লড়াই করছিল। হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন-মুসলমানদের এদিকে ডাক দাও। হযরত আব্বাস (রা) প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাক দেয়া শুরু করলেন : 'তোমরা এদিকে এসো।' এই ডাক শুনে মুসলমানগণ এই ডাকের দিকে এমনভাবে ছুটে এলো, যেমনিভাবে গো-শাবক তার মায়ের ডাক শুনে তার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর নিকট মাত্র শ' খানেক লোক পৌঁছতে সক্ষম হলো। অন্যরা শত্রুপক্ষ মাঝখানে অন্তরায় হওয়ার দরুন তাঁর নিকট পৌঁছতে পারেনি। সেখানে থেকেই তারা লড়াই চালাতে লাগলো। তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে তাঁর দুলদুল খচ্চরকে শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত করলেন এবং ঐ শ' খানেক লোকের ক্ষুদ্র দলটি এমন তীব্র আক্রমণ চালালো যে, সম্মুখ থেকে শত্রুরা সরে গেলো। এরপর তারা শত্রুপক্ষের লোকদের গ্রেফতার'করা শুরু করলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর না'রা-ই-তাকবীর শুনে এবং শত্রুদের উপর তাঁকে হামলা করতে দেখে মুসলমানরাও চতুর্দিক থেকে জড়ো হয়ে শত্রুপক্ষের উপর না'রা-ই-তাকবীর দিয়ে হামলা করলো। ফলে অনতিবিলম্বেই যুদ্ধের মোড় পাল্টে গেলো। শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হলো। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মক্কাবাসী

মুশরিকদের কারণে প্রথমে মুসলিমপক্ষের পরাজয় হয়েছে। কেননা, তারা নিজেরা পলায়ন করে অন্যদের কদমও নড়বড়ে করে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা)-এর অসীম বীরত্ব ও দৃঢ়তা অত্যল্প কালের মধ্যেই মুসলমানদের সামলে নিলো এবং শত্রুপক্ষ চরম পরাজয় বরণ করলো।[১] যুদ্ধ পরিস্থিতি যখন জটিল হয়ে উঠেছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন মক্কার এক ব্যক্তি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো—যাক, আজকে জাদুর পরিসমাপ্তি ঘটলো। আরেকজন বললো, মুসলমানদের পরাজয় আর ঠেকানো যাবে না। এরা এভাবেই পালাতে পালাতে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত চলে যাবে। শায়বা নামক এক ব্যক্তি বললো, আজ আমি মুহাম্মদ (সা) থেকে প্রতিশোধ নেবো। এই বলে সে হযরত নবী করীম (সা)-এর দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু রাস্তার মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে হাওয়াযিন গোত্রের বহু লোক নিহত হলো এবং অবশেষে তারা ময়দান থেকে পলায়ন করলো। তাদের পর ছাকীফ গোত্রের লোকেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র উত্তপ্ত রাখলো। শেষে তারাও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে বাধ্য হলো। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বড় বড় সরদার ও বাহাদুর ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। কিন্তু তাদের প্রধান সেনাপতি মালিক ইব্‌ন আওফ পলায়ন করলো এবং তায়িফের দিকে চলে গেলো। আর বিরুদ্ধবাদী লোকেরা এই পলায়নকারীদেরকে আশ্রয় দিয়ে শহরের দরজা বন্ধ করে দিলো। পলায়নকারীদের একটি অংশ আওতাস নাম স্থানে সমবেত হলো এবং আরেকটি অংশ আশ্রয় নিলো নাখ্‌লা নামক স্থানে।

---

১. ইতোপূর্বে সংঘটিত বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ আর বিরুদ্ধ পক্ষ কাফির মুশরিকরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রথম মুসলমানরা এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল যারা ছিল তাদের তুলনায় সংখ্যাশক্তিকে লঘিষ্ঠ। ফলে কিছু কিছু মুসলমান নিজেদের এই বিপুল সংখ্যাশক্তিতে বিভ্রান্ত ও গর্বিত হয়ে বলে ওঠেন ঃ আজ আর আমরা সংখ্যায় কম নই বিধায় আমাদের পরাজিত হবার কোন আশংকা নেই। বিজয় তো আমাদের হাতের মুঠোয়।

বিষয়টি সকল কিছুর যিনি নিয়ামক, যিনি জয়-পরাজয়ের মালিক, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পছন্দ হয় নি। কেবল আল্লাহ্‌র সাহায্যই যে মুসলমানদের প্রতিটি বিজয়ের পেছনে ক্রিয়াশীল, সংখ্যা কিংবা অস্ত্রশক্তি নয় একথা তিনি মুসলমানদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে চাইলেন। মুসলমানদের প্রতি সাহায্য-সমর্থনের প্রসারিত হাত তিনি যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় গুটিয়ে নিলেন। ফলে হাওয়াযিন গোত্রের অতর্কিত আক্রমণের মুখে মুসলমানরা ঘাবড়ে গিয়ে এমনভাবে পেছনে ফিরলেন যে, কেউ কারো দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন নি কে কোথায়। এমনকি এ সময় তাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা) কোথায় সেদিকেও কারও খেয়াল ছিল না। কেবল স্বল্প সংখ্যক সাথী নিয়ে এমনতরো সংকটময় মুহূর্তেও যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্‌র রাসূল সুস্থির দাঁড়িয়ে।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যতটুকু শিক্ষা দেবার এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য যেটুকু সতর্ক করার দরকার ছিল যা তিনি চেয়েছিলেন তা হয়ে গেল। সংখ্যাধিক্য তাদেরকে যতটুকু উৎফুল্ল করেছিল, আত্মপ্রসাদে উজ্জীবিত করেছিল আল্লাহ তা'আলা (মক্কা) বিজয়ের মিষ্টতা উপভোগের পর পুনরায় পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ চাখালেন যাতে তাদের ঈমান অধিকতর মজবুত হয়, বিজয়ে তাদের ভেতর আত্মশ্লাঘা এবং পরাজয়ে কোনরূপ হতাশা সৃষ্টি না হয়। সেজন্য তিনি তাদেরকে পুনরায় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় পৌছে দিলেন এবং আপন রাসূল ও সকল মুসলমানের উপর এক ধরনের প্রশান্তি (সকীনা) নাযিল করলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্য এক সেনাবাহিনী পাঠান তাঁর প্রিয় রাসূল ও মু'মিনদের সাহায্যার্থে। অতঃপর মুহূর্তেই যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়। হাওয়াযিনদের পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানরা জয়লাভে সক্ষম হন। কুরআন করীমের সূরা তাওবার ২৫-২৬ নং আয়াতে এরই স্বীকৃতি মিলে।

"আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল।"—সম্পাদক

হযরত নবী করীম (সা) তাদের পশ্চাদ্ধাবনকল্পে আওতাস ও নাখলায় সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং উভয় স্থানেই মুকাবিলা ও হতাহত হলো। কিন্তু মুসলিম পক্ষ উভয় স্থানেই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন এবং মালে গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরে এলেন। হযরত নবী করীম (সা) সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও মালে গনীমত জি'রানা নামক স্থানে জমা করার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত মাসউদ ইব্‌ন উমর গিফারী (রা)-কে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করে তায়িফের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এই যুদ্ধে ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চুয়াল্লিশ হাজার উট, চুয়াল্লিশ সহস্রাধিক মেষ-বকরী, চার হাজার উকিয়া (প্রতি উকিয়া এক তোলা সাত মাশা পরিমাণ) রৌপ্য মুসলমানদের হস্তগত হলো। এই যুদ্ধ হুনায়ন যুদ্ধ নামে খ্যাত। সবগুলো সাকীফ গোত্র তায়িফে একত্রিত হয়েছিল এবং তায়িফবাসী তাদের সমব্যথী বনেছিল।

তায়িফ অবরোধ

হুনায়ন থেকে তায়িফ গমনকালে পথিমধ্যে মালিক ইব্‌ন আওফ-এর দুর্গ। হযরত নবী করীম (সা) এই দুর্গটি বিধ্বস্ত করান। তারপর আতাম দুর্গ। সেটিকেও বিধ্বস্ত করা হয়। তায়িফের অদূরে পৌঁছে তিনি তায়িফবাসীকে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত দেখতে পান। তিনি তায়িফ অবরোধ করলেন। বিশ দিন পর্যন্ত তায়িফের অবরোধ অব্যাহত থাকলো। এই বিশ দিনের মধ্যে তায়িফের আশেপাশের এলাকাসমূহ থেকে অধিকাংশ গোত্র স্বেচ্ছায় আগমন করে এবং কোন কোনটি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মুসলমান হতে থাকলো। হুনায়ন যুদ্ধে মাত্র চারজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তায়িফ অবরোধকালে বারোজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। এ অবরোধেও মুসলিম পক্ষের বিরাট লাভ হয়। তায়িফের আশেপাশের গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত নবী করীম (সা) তখনই তায়িফ বিজয় আবশ্যক মনে না করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জি'রানা পৌঁছে যুদ্ধবন্দী ও মালে গনীমত বণ্টন করেন।[১]

---

১. তায়িফ বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে হয়নি বরং এ বিজয় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর ফল ও ফসল। তায়িফ অবরোধ প্রায় একমাসকাল স্থায়ী হয়। এ সময় কাফিরদের তীর বর্ষণে কয়েকজন মুসলমান শাহাদত লাভ করেন। দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও তায়িফের লোকেরা নতি স্বীকার না করায় অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) অবরোধ প্রত্যাহারপূর্বক ফিরে যাবার ঘোষণা দেন। এতে লোকেরা শোরগোল শুরু করে এবং তায়িফ জয় না করে ফিরে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। তাঁরা বলতে থাকে : আমরা তায়িফ জয় না করে কিভাবে ফিরে যেতে পারি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমরা লড়াই করি। তারা লড়াইয়ের সূচনা করেন এবং পরিণতিতে চরম আঘাত খান। অতঃপর তাদের বোধোদয় ঘটলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দেন আমরা কাল ভোরে ইনশাআল্লাহ ফিরে যাব। মুসলমানরা এই ঘোষণা শুনে খুশী হন এবং সফরের প্রস্তুতিতে লেগে যান। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এই দৃশ্যে হাসতে থাকেন।
হাসার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে যখন ফেরার কথা বলা হয়েছিল, তখন সকলেই ফিরতে ইতস্তত ও অনীহা প্রকাশ করেছিল কিন্তু চপেটাঘাত পড়তে তারা খুশী হয়ে সফর প্রস্তুতি শুরু করে। মানব স্বভাবের এই ভোজবাজিতে তিনি হেসে ফেলেন।
এ সময় সাহাবায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার জন্য বললে তিনি দো'আ করলেন اللهم ثقيفا وائت بهم হে আল্লাহ! তুমি সাকীফকে হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দাও।
এরপর সাকীফ গোত্র থেকে গোত্র প্রধান ওরওয়া ইবন মাসউদ সাকাফী ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে মদীনায় আগমন করেন এবং ইসলাম কবূল করেন। অতঃপর ওরওয়া (রা) ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিলের পর তাঁর কওমের মধ্যে ইসলামের প্রচারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি অনুমতি প্রদান করেন, সেই সঙ্গে এই আশংকাও ব্যক্ত করেন যে, তোমার কওম তোমাকে হত্যা না করে বসে। ওরওয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওম আমাকে এত ভালবাসে যতটা একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ভালবাসে।

এই স্থানেই হাওয়াযিন গোত্রের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং হালীমা সা'দিয়ার দোহাই দিয়ে ক্ষমার আবেদন করে। তিনি বললেন, তোমরা যুহরের সময় যখন সমস্ত মুসলমান সালাতের জন্য একত্রিত হবে, তখন আমার সামনে তোমাদের আবেদন পেশ করবে। তারা তাই করলো। হযরত নবী করীম (সা) হাওয়াযিন প্রতিদিধিদলকে বললেন, তোমাদের যে পরিমাণ বন্দী আমার ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের অংশে পড়েছে, তাদের সবাইকে আযাদ মনে করো এবং সাথে করে নিয়ে যাও। একথা শুনে সকল মুহাজির ও আনসার বললো–مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (আমাদের অংশও রাসূলুল্লাহ্‌র অংশ) একথা বলে সবাই সকল হাওয়াযিন বন্দীকে আযাদ করে দিলেন। এইভাবে প্রায় ছয় হাজার বন্দীকে সামান্য সময়ের ব্যবধানে আযাদ করে দেয়া হলো। এই বন্দীদের মধ্যে হযরত নবী করীম (সা)-এর দুধবোন শায়মা বিন্‌ত হালীমা সা'দিয়াও ছিলেন। তিনি যখন তার দুধবোন হওয়ার দাবী করলেন, তখন নবী করীম (সা) তার প্রমাণ পেশ করতে বললেন। তিনি বললেন, আমার পিঠে তোমার দাঁতের চিহ্ন আছে। তুমি ছোট্ট সময় কামড় দিয়েছিলে। তিনি বললেন, যথার্থ। এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং তার উপরে তাকে বসালেন। তারপর বললেন, তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, তবে আমি তোমাকে আদরযত্নে রাখবো। আর যদি আপন গোত্রে ফিরে যেতে চাও তবে তাও যেতে পারো। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তখন নবী করীম (সা) তাকে নিজের মালিকানা থেকে বহু ধন-মাল, একটি দাসী, একটি গোলাম দান করে বিদায় করেন। শায়মা এই দাসী ও গোলামের মধ্যে বিবাহ দিয়ে দেন। শোনা যায়, তাদের বংশধারা এখনো অবশিষ্ট আছে।

আনসারদের রাসূল-প্রেম

হযরত নবী করীম (সা) জি'রানা নামক স্থানে মালে গনীমত বন্টনকালে মক্কাবাসী মুআল্লাফাতুল কুলূবদের বেশী অর্থ প্রদান করেন এবং কেউ কেউ তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী মালে গনীমত লাভ করেন। অধিকাংশ মক্কাবাসী যেহেতু কুরায়শ তথা নবী করীম (সা)-এর আত্মীয় ও স্বদেশী ছিলেন, তাই এ নিয়ে কোন কোন তরুণ আনসারের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, নবী করীম (সা) তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশীদেরকে প্রাপ্য অংশের চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে সাধারণ অংশের চেয়ে এতটুকু বেশী দেননি। অথচ দান-দক্ষিণার বেশী হকদার ছিলাম আমরাই।

এই গুঞ্জরণ এক কান দু'কান হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর পবিত্র কান পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তিনি সমস্ত আনসারকে এক স্থানে সমবেত করলেন। সবাই সমবেত হওয়ার পর তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এরূপ কথা বলেছো। আনসারদের পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হলো, হাঁ, আমাদের তরুণরা এরূপ কথা অবশ্যই বলেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন পরিপক্ক, সম্মানিত ও সমঝদার ব্যক্তি এমন কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি, ভাবতেও পারে না।

ওরওয়া (রা) তাঁর কওমের মাঝে ফিরে আসেন এবং সর্বপ্রযত্নে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারের শুরুতেই তিনি জনৈক পাপাত্মা কর্তৃক লিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে শাহাদত লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)–এর দু'আর সঙ্গে ওরওয়া (রা)-র শহীদি খুন তায়িফবাসীদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে থাকে নি। এর অল্প দিনের মধ্যেই সাকীফ গোত্রের একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌঁছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম কবূল করে।—সম্পাদক

হযরত নবী করীম (সা) একথা শুনে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়। একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা বিপথগামী ছিলে ? আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন ? আনসারগণ বললেন, অবশ্যই! আমাদের উপর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের দান অপরিসীম! তারপর তিনি বললেন, একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা পরস্পরে একে অপরের শত্রু ছিলে, আমার মাধ্যমে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছ ? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। আপনি আমাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। এরপর তিনি বললেন, একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা দরিদ্র ছিলে এবং আমার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধনী করেছেন ? আনসারগণ বললেন, অবশ্যই! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের উপর বড় দয়া করেছেন। এরপর তিনি বললেন, না! তোমরা আমাকে এ উত্তর দিতে পারো যে, সারা দুনিয়া যখন আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমরা তখন আপনাকে সত্যায়ন করেছি। সবাই আপনাকে ত্যাগ করেছে, আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আপনি অভাবী ছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আমি তোমাদের এসব কথাই স্বীকার করবো। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এটা পসন্দ করবে না যে, লোকেরা উট-বকরী নিয়ে তাদের ঘরে যাবে! এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণ অজ্ঞাতে কেঁদে ফেললেন। অশ্রুপ্রবাহে তাঁদের দাড়ি ভিজে গেলো। তারপর হযরত নবী করীম (সা) বললেন, হিজরত যদি একটি ঐশী নির্দেশ না হতো, তবু আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আনসাররা যদি একপথে চলে আর অন্যরা ভিন্নপথ অবলম্বন করে, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের পথ অবলম্বন করবো। হে আল্লাহ্! আনসার এবং আনসারদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের উপর তুমি রহমত বর্ষণ কর।-একথা শুনে আনসারদের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং তাঁরা যে কি পরিমাণ উৎফুল্ল হয়েছিলেন, আমরা শুধু তা কল্পনাই করতে পারি–ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। এরপর তিনি আনসারদের এই মর্মে বুঝ দিলেন যে, এইসব লোক সদ্য মুসলমান হয়েছে। এদের মনোরঞ্জনের জন্য বেশী ধন-মাল দেয়া হয়েছে। একথা নয় যে, তাদের প্রাপ্য বেশী।

মক্কার প্রথম আমীর

এরপর তিনি জি'রান দিয়ে গমনকালে উমরার নিয়ত করলেন। মক্কায় প্রবেশ করে উমরার আরকান সমাপ্ত করে বিশ বছরের কিছু বেশী বয়সের আত্তাব ইব্ন উসায়দ নামক জনৈক যুবককে মক্কার শাসক নিযুক্ত করলেন এবং কুরআন ও দীনের আহকাম শিক্ষাদানের জন্য মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে সেখানে রেখে মুহাজির ও আনসার সমভিব্যাহারে মদীনা যাত্রা করলেন। আত্তাব ইব্ন উসায়দকে শাসক ও মক্কার আমীর নিয়োগ করার কারণ হলো তাঁর দীনী জ্ঞান লাভ করার খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হয়, যাতে তিনি কারো মুখাপেক্ষী না থাকেন। অষ্টম হিজরীর ২৪ শে যীকাআদা হযরত নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামসহ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। হযরত আত্তাব ইব্ন উসায়দ সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামে আমীর হয়ে হজ্জ করেন। এ বছর মুসলমানরাও হজ্জ আদায় করেন এবং মুশরিকরাও তাদের নিয়মে হজ্জ আদায় করে। মুশরিকরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলেনি, মুসলমানরাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এই মেলামেশার ফলে মুশরিকরা মুসলমানদের সৎকার্যাবলী ও উত্তম আখলাক পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট সুযোগ পেলো। অজ্ঞাতেই তাদের মুখে মুখে মুসলমানদের প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হতে লাগলো।

অষ্টম হিজরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হযরত নবী (সা) মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা করেন। বিরুদ্ধপক্ষীয় অন্যতম সরদার উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ তায়িফ অবরোধকালে তায়িফে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন এবং অবরোধ তুলে নেয়ার পর তায়িফে এসেছিলেন। তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা করার খবর শুনে তাঁর পিছনে যাত্রা করেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট আর্জি পেশ করেন যে, ফিরে গিয়ে আমার কওমের মধ্যে ইসলাম প্রচার করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।' তিনি বলেন, 'তোমার কওমের অহংকার হচ্ছে, মুসলমানরা তাদের পরাজিত করতে পারবে না। তুমি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। হযরত উরওয়া (রা) বললেন, আমার কওম আমাকে খুব ভালবাসে এবং আমার কথা মেনে চলে। আমি আশা করি, তারা কখনো আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি পীড়াপীড়ি করায় হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি তায়িফ আগমন করলেন এবং একটি উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে তায়িফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তায়িফবাসী এ কথা শুনেই তাঁর উপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। তিনি শাহাদত বরণ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর পরিবার-পরিজন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তোমার রক্ত সম্পর্কে কি বলছো ? আমরা তাঁর প্রতিশোধ নেব কিনা, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম রহমতে আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করেছেন। এখন আমার একমাত্র বাসনা হচ্ছে, তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই আসহাবদের পাশে দাফন করবে, যাঁরা এখানে অবরোধকালে শহীদ হয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন। হযরত নবী করীম (সা) উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর শাহাদতের কাহিনী শ্রবণ করে বললেন, সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত ইসলাম প্রচারক ব্যক্তি তাঁর কওমের মধ্যে যেমনটি ছিল, উরওয়ার অবস্থাও তাঁর কওমের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ।

এই বছরই হযরত নবী করীম (সা)-এর সাহেবযাদা ইবরাহীম ভূমিষ্ঠ হন। সাহেবযাদা ইবরাহীম হযরত মারিয়্যা কিবতিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই তাঁর সাহেবযাদী হযরত যয়নাব (রা) ইনতিকাল করেন। এই বছরেরই শেষ দিকে তাঁর জন্য কাঠের মিম্বার তৈরি করা হয়। এই মিম্বারে বসে তিনি খুতবা দান করতেন। এই বছরই বাহরায়নের শাসনকর্তা মুনযির ইব্‌ন সারি– যিনি নবী করীম (সা)-এর পত্র দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর লিখিত নির্দেশক্রমে ইয়াহূদী ও মাজুসীদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করা শুরু করেন।

হিজরতের নবম বছর

মক্কা বিজয় ও হুনায়ন যুদ্ধের পর হযরত নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন। তখন আরবদেশের মুশরিক লোকেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো। নবম হিজরী শুরু হতেই আরব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে হযরত নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। এ বছর অত্যধিক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে এবং আরব জাতি-গোষ্ঠী সমানে মুসলমান হতে থাকে। এজন্য নবম হিজরী আমূল উফুদ বা প্রতিনিধির বছর নামে খ্যাত। তখন জাগতিক দিক থেকেও হযরত নবী (সা) আরবের শাহানশাহের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয ছিল। যেসব গোত্র তখনো মুসলমান হয়নি,

তাদের নিকট থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থ জিযিয়া হিসাবে আদায় করা হতো। এই যাকাত বা জিযিয়াই ছিল সেই খারাজ বা কর, যা হযরত নবী করীম (সা)-এর সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ থেকে আদায় করা হতো। যাকাত আদায়ের জন্য তিনি সর্বত্র সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করে পাঠান। প্রথম প্রথম যাকাত আদায় নিয়ে কিছুটা জটিলতাও দেখা দেয়। কোন কোন কর্মচারীও শহীদ হন। কোন কোন গোত্রকে এই ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য তিরস্কারও করা হয় এবং অবশেষে এই ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তাবুক যুদ্ধ

মূতা যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গাস্সানী বাদশাহ এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। হিরাক্লিয়াস চল্লিশ হাজার বাহাদুর সৈন্য গাস্সানী বাদশাহর সাহায্যে প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজেরও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পশ্চাতে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প করলেন। পূর্বোক্ত খ্রিস্টান ধর্মযাজক আবূ আমির মক্কা থেকে রোম সম্রাটের নিকট চলে গিয়েছিল। মদীনা আক্রমণের জন্য রোম সম্রাটকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার কাজ ও লক্ষ্য। এ দিকে সে মদীনার মুনাফিকদের সাথেও বরাবর গোপন যোগাযোগ অব্যাহত রাখলো। তারই পরামর্শক্রমে মুনাফিকরা মসজিদে যিরার নির্মাণ করা শুরু করেছিল। মোটকথা, সিরীয় সীমান্তে খ্রিস্টান বাহিনীর সমাবেশ ও রোম সম্রাটের মদীনা আক্রমণের খবর অনবরত মদীনায় পৌঁছা শুরু হলো। হযরত নবী করীম (সা) এই খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সিরিয়া সীমান্তেই বাধা দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। কেননা, আরব দেশের অভ্যন্তরে রোমক বাহিনী ঢুকে পড়লে গোটা আরবদেশেই নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তাছাড়া সীমান্তে এত বিরাট বাহিনীর সমাবেশ এমন কোন ব্যাপার ছিল না যে, নবী করীম (সা) তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নীরব থাকতে পারতেন। তিনি সাধারণভাবে সমস্ত গোত্র-গোষ্ঠীকে জানিয়ে দিলেন যে, হিরাক্লিয়াস বাহিনীর মুকাবিলার জন্য সবাইকে এক জায়গায় সমবেত হতে হবে। মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় একত্রিত হতে লাগলো। মুনাফিকদের দল মদীনায় উপস্থিত ছিল। তারা মুসলমানদের সর্বদা বিভ্রান্ত ও ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তৎপর ছিল।

ইতিপূর্বে হযরত নবী করীম (সা) যখনই কোন দিকে সৈন্য পরিচালনার সংকল্প করতেন, পূর্বাহ্নে তিনি তা কাউকে অবহিত করতেন না, যাতে মুনাফিকরা আপত্তি করা এবং মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করার সুযোগ পায়। যথাসময়ে মুসলমানরা ঠিকই জানতে পারতো তারা কোথায় যাচ্ছে। এবার যেহেতু বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করতে হবে এবং তার উপায়-উপকরণও যোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার, তাই তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, হিরাক্লিয়াস বাহিনীর মুকাবিলার জন্য সিরিয়া সীমান্তে মুসলমানদের যেতে হবে। গত বছর যেহেতু দুর্ভিক্ষ ছিল, তাই লোকদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। এ বছর ফসল ও শস্যাদি ভাল হয়েছে এবং ফসল কাটার সময়ও আগত। তাই লোকেরা তাদের শস্যক্ষেত্রে রেখে যাওয়াটা স্বভাবতই একটু অপসন্দ করলো। হিরাক্লিয়াস ও তাঁর পারিষদবর্গ তাদের এই আক্রমণ-প্রস্তুতি পর্বে মদীনার মুনাফিকদেরকে পূর্বেই তাদের দোসর বানিয়ে নিয়েছিল। মদীনার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকাদি মুওয়ায়লিম নামক ইয়াহূদীর ঘরে প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হতো। বারো জন মুনাফিক মিলে তাদের জন্য একটি পৃথক মসজিদ তৈরি করলো। উদ্দেশ্য ছিল : এই মসজিদে ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকাদি এবং ইসলাম

বিরোধী যাবতীয় সলা-পরামর্শ হবে। আর এই মসজিদের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির উপকরণ তৈরি করা হবে। এই মুনাফিকরা যখন দেখলো, মুসলমানরা যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন নিরুৎসাহমূলক কথাবার্তা আরম্ভ করলো এবং গ্রীষ্মকালের এই দীর্ঘ সফরের কষ্ট-ক্লেশের কথা লোকদের শোনাতে লাগল। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য ছিল হিরাক্লিয়াস বাহিনী দ্বারা মদীনা আক্রমণ করানো। মুসলমানরা সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে পূর্বাহ্নেই হামলা করে খ্রিস্টান বাহিনীর সয়লাব আরবদেশে প্রবেশ করা প্রতিরোধ করুক মুনাফিকরা তা চাইত না।

হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় সমস্ত সাহাবাকে প্রস্তুত হতে এবং মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শরীক হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সাথে পথের সম্বল সওয়ারী। অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের অর্থের খুব প্রয়োজন ছিল। তাই চাঁদার জন্যও সাধারণ আহবান রেখেছিলেন। মুনাফিকরা লোকদের বিভ্রান্ত ও মুসলমানদের জন্য সংকট সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য করেনি। হযরত উসমান গনী (রা) তাঁর বাণিজ্যিক মালামাল সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেগুলো ইসলামী লশকরের সরঞ্জাম তৈরীর জন্য চাঁদা হিসাবে দান করলেন। এর পরিমাণ ছিল–নয়শত উট, যুদ্ধের সরঞ্জামসহ একশত ঘোড়া ও এক হাজার স্বর্ণ দীনার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর গৃহের সমস্ত মাল আসবাব এনে চাঁদা হিসাবে দান করলেন এবং বললেন, পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছি। হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদের অর্ধেক আল্লাহ্‌র রাস্তায় পেশ করলেন আর অবশিষ্ট অর্ধেক পরিবার-পরিজনের জন্য রাখলেন। যারা খুব গরীব ছিলেন এবং মেহনত মযদূরী করে দিন গুযরান করতেন, তাঁরাও খুব সাহসিকতার সাথে সাধ্য অনুযায়ী যা পারলেন দান করলেন। মুনাফিকরা এ চাঁদার মধ্যেও অংশগ্রহণ করল না। ত্রিশ হাজার সৈন্য মদীনায় সমবেত হলো। ফৌজী সরঞ্জামের মধ্যে কেবল এতটুকুই যোগাড় হলো যে, প্রত্যেক সৈন্য তার জুতা বানাতে পারলো। নবী করীম (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা প্রত্যেকে জুতা বানিয়ে নাও। কেননা, পায়ে জুতা পরা থাকলে মানুষ সওয়ার বা আরোহী বিবেচিত হয়।

ইসলামী লশকরের যুদ্ধযাত্রা

মোটকথা, নবম হিজরীর রজব মাসে হযরত নবী করীম (সা) ত্রিশ হাজার লশকর নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। মদীনা থেকে এক ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত বী-রাওয়াঁ নামক বস্তিতে পৌঁছার পর মুনাফিকরা এসে তাঁকে বললো, 'আমরা একটি মসজিদ বানিয়েছি। আমাদের বাসনা যে, আপনি সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করুন। তাহলে এ মসজিদটিও ভক্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। তিনি বললেন, আমি এক্ষণে যুদ্ধযাত্রায় ব্যস্ত, ফেরার পথে দেখা যাবে। তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে ছানিয়াতুল বিদা' নামক পাহাড়ের উপর ছাউনি স্থাপন করলেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা আনসারী (রা)-কে মদীনার শাসক নিযুক্ত করলেন। মুনাফিকদের প্রধান সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যও তার দলবলসহ শহর থেকে বের হয়ে ছানিয়াতুল বিদা' পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু গাড়লো। এতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সেও যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু পরে জানা গেলো যে, তার উদ্দেশ্য ছিল লোকদেরকে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে যেতে বাধা দেয়া। তিনি যখন লশকরসহ সামনে অগ্রসর হলেন, তখন মুনাফিকরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যর সাথে মদীনায় ফিরে এলো। অবশ্য কোন কোন মুনাফিক গোয়েন্দাবৃত্তি চালিয়ে খ্রিস্টানদের সাহায্য করার জন্য ইসলামী লশকরে মিশে গেলো।

হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্য মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। মদীনায় মুনাফিকরা হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগলো যে, হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে পরোয়া করেন না। তিনি তাকে অপসন্দ করেন, তাই তাঁকে রেখে গেছেন। হযরত আলী (রা) এ কথা শুনে সহ্য করতে পারলেন না। সশস্ত্র হয়ে মদীনা থেকে চলে গেলেন এবং মদীনা থেকে ক্রোশখানেক দূরে অবস্থিত মাজরাফ নামক স্থানে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, মুনাফিকরা আমার সম্পর্কে এরূপ কথা বলছে, তাই আমি আপনার নিকট চলে এসেছি। তিনি বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্য তোমাকে মদীনায় রেখে এসেছিলাম। যাও, তুমি মদীনায় চলে যাও। আর তাঁর মনোসন্তুষ্টির জন্য বললেন, তুমি আমার সাথে ঠিক তদ্রূপ, যেমনটি হারূন ছিলেন মূসার সাথে। কিন্তু তফাৎ এতটুকু যে, আমার পর কেউ নবী হবে না। হযরত আলী (রা) সেখান থেকেই পুনরায় মদীনায় ফিরে এলেন। অলসতা বা দুর্বলতার কারণে যারা হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে রওয়ানা হতে পারেননি, তারা তাঁর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন এবং পথিমধ্যে মনযিল ও বিরতিস্থানগুলোতে ইসলামী লশকরে যোগ দিলেন। যেসব মুনাফিক মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামী লশকরের মধ্যে মিশেছিল, তারা রাস্তার বিভিন্ন মনযিল থেকে কেটে পড়তে লাগলো। কিন্তু তাদের এই অযৌক্তিক কাণ্ড দেখে মুসলমানগণ মোটেও প্রভাবিত হননি। হযরত নবী করীম (সা) কারো কার্যকলাপে কোনরূপ আপত্তি তোলেননি এবং পথিমধ্যে যারা কেটে পড়লো, তাদেরও কোন পরোয়া করলেন না। যাত্রাপথে ছামূদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তি নজরে পড়লো। এই অঞ্চলের নাম ছিল হিজর। ইসলামী লশকর এই এলাকায় প্রবেশ করার পর হযরত নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা এ স্থানটি ইসতিগফার পড়তে পড়তে দ্রুত অতিক্রম করো আর এখানকার কূপের পানিও পান করো না। এই হিজর অঞ্চলের সীমানার মধ্যেই একটি রাত অবস্থান করতে হলো। হযরত নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন, কোন ব্যক্তি একাকী শিবির থেকে বের হবে না। তিনি দুর্গত অঞ্চলের ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে নিলেন, সওয়ারীকে মেহমীয লাগিয়ে দাবড়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন কোন জালিম ও পাপীদের বসতি অতিক্রম করবে, তখন ইসতিগ্‌ফার পড়তে পড়তে অতিক্রম করবে। মনে করবে, হয়তো আমাদের উপরও মুসীবত নাযিল হতে পারে।

তাবুক

ইসলামী লশকর সীমান্তের তাবূক প্রস্রবণের নিকট অবস্থান নিলেন। হিরাক্লিয়াস হযরত নবী করীম (সা)-কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি যখন তাঁর আগমন সংবাদ পেলেন, তখন ভয়ে পিছু হটে যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন। খ্রিস্টান বাহিনী ও গাসসানী বাদশাহ ইসলামী বাহিনীর খবর পেয়ে এদিক-সেদিক চলে গেলো এবং ময়দান খালি পড়ে রইল। তাবূক মদীনা থেকে চৌদ্দ পনেরো মনযিল দূরে অবস্থিত। এখানে হযরত নবী করীম (সা) প্রায় বিশ দিন অবস্থান করলেন। এই সময়ে আতিয়্যার শাসনকর্তা বুহায়না ইব্‌ন রাবিআ আনুগত্য প্রকাশের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হল। তিনি জিযিয়া আদায় করার শর্তে তার সাথে সন্ধি করলেন। আতিয়্যার শাসনকর্তা জিযিয়ার অর্থ তখনই আদায় করে দিলেন। এরপর জারবা নামক স্থানে লোকেরা এলো। তারাও জিযিয়া আদায় করার ওয়াদা করলো। হযরত নবী করীম (সা) তাদের

সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। তারপর আওরাখ নামক স্থানের অধিবাসীরা এলো। তারাও জিযিয়া আদায় করার চুক্তিতে সন্ধিপত্র লাভ করলো।

তাবুকের অদূরে ছিল দুমাতুল জান্দাল এলাকা। সেখানকার শাসক আকীদর ইব্‌ন আবদিল মালিক ছিল বনূ কিন্দা গোত্রের লোক। সে ছিল খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো না; ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলো। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন এবং বললেন, আকীদরকে তুমি নীল গাভী শিকাররত দেখতে পাবে। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। হযরত খালিদ (রা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রওয়ানা করলেন। রাতভর সফর করার পর প্রাতকালে আকীদরে দুর্গের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে আকীদর আশ্চর্য একটি ঘটনার সম্মুখীন হলো। গ্রীষ্মকাল। জ্যোস্না রাত। আকীদর তার স্ত্রীসহ মহলের ছাদে আরাম করছিল। একটি নীল গাভী জঙ্গলের দিক থেকে এসে মহলের দরজা তার শিং দ্বারা খোঁচাতে লাগলো। আকীদরের স্ত্রী আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আকীদর তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়া প্রস্তুত করিয়ে তার ভাই হাস্‌সানকে সঙ্গে নিয়ে ঐ নীল গাভী শিকার করার জন্য বের হলো। সে নীল গাভীর পেছনে পেছনে কিছুদূর যেতেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তাকে ঘিরে ফেললেন। আকীদর ও তার ভাই মুকাবিলা করলো। কিন্তু আকীদর জীবিত গ্রেফতার হলো এবং তার ভাই নিহত হলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আকীদরের রেশমী সুন্দর কাবা খুলে তৎক্ষণাৎ সেটি ঘোড় সওয়ারের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজে তাকে (আকীদরকে) তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। হযরত নবী (সা) তার প্রাণ রক্ষা করলেন। সে আনুগত্য ও জিযিয়া প্রদান করার অঙ্গীকার করলো। স্বীয় দুর্গে ফিরে এসে দু'হাজার উট, আটশ' ঘোড়া, চারশ' বর্শা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপঢৌকন পাঠালেন এবং সন্ধিপত্র লিখিয়ে নিরাপদ হলো।

মসজিদে যিরারে অগ্নি-সংযোগ

সিরীয় সীমান্তবর্তী শাসক ও সরদারদের নিকট থেকে আনুগত্য, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অঙ্গীকার নিয়ে হযরত রাসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। সবাই মত প্রকাশ করলেন যে, এখন আর এখানে অবস্থান ও অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। হিরাক্লিয়াস ও তাঁর সেনাবাহিনী ভীত হয়ে পড়েছে। তাদের সাহস থাকলে মুকাবিলা করতে আসতো। শেষে হযরত (সা) তাবূক থেকে মদীনা রওয়ানা করলেন। যখন মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছলেন এবং মদীনা পৌঁছতে মাত্র এক ঘন্টার পথ বাকী রইল তখন তিনি মালিক ইব্‌ন ওয়াখ্‌শাম সালিমী ও মাইন ইব্‌ন আদী আজলীকে মুনাফিকদের তৈরী মসজিদে অগ্নি-সংযোগ ও ভূমিসাৎ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কেননা, ঐ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছিলেন :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا.....

এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তারা অবশ্যই শপথ করবে। 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি'; আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯ : ১০৭)

আর এভাবে মুনাফিকদের ধোঁকা সম্পর্কে নবী করীম (সা) অবগত হয়েছিলেন। সুতরাং মসজিদে যিরারের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হলো। হযরত নবী করীম (সা) নবম হিজরীর রমযান মাসে মদীনায় প্রবেশ করলেন। এই সফরে অর্থাৎ গাযওয়া তাবূকে দু'টি মাস অতিবাহিত হয়।

হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক, মারারা ইব্‌ন রবী'ঈ, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া–এই তিনজন সাহাবী ছিলেন নেক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিছক আলস্যের কারণে আজ-কাল করে সফরের সামান যোগাড় করেন নি। এমনকি ইসলামী লশকর মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর অলসতার দরুন রওয়ানা হতে পারলেন না। হযরত নবী করীম (সা) তাবূক থেকে মদীনা ফিরে এলে ঐ তিনজন সাহাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অকপটে নিজেদের ভুল স্বীকার করলেন। তাঁদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি হলো যে, কেউ যেনো তাঁদের সাথে কথাবার্তা না বলে। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁরা অনবরত তাওবা-ইস্‌তিগফার করতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হুকুম নাযিল হলো যে তাঁদের তাওবা কবূল হয়েছে। যে পর্যন্ত তাঁদের তাওবা কবূল না হয়েছে, তাবত তাঁদের পরিবার-পরিজনও তাঁদের কোন কথার জবাব দিতেন না। তাঁদের সালামের জবাবও দিতেন না। জীবন তাঁদের জন্য অসহ্য ও দুর্বিষহ ছিল। এই ঘটনা যখন প্রসিদ্ধি পেতে পেতে গাস্‌সানী বাদশাহর কান পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তিনি তার দূত মারফত কা'ব ইব্‌ন মালিকের নিকট এই মর্মে একটি পত্র লিখে পাঠান যে, আপনি একজন সরদার ও শরীফ লোক। আপনার সাথে মুহাম্মদ (সা) খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। আপনি আমার নিকট চলে আসুন। আমি আপনাকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দান করবো। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিকের নিকট যখন এই পত্র পৌঁছলো, তখন তিনি এই পত্র পাঠ করে চুলোয় নিক্ষেপ করলেন এবং দূতকে বললেন, যাও, এটাই হচ্ছে তার জবাব। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিকের তাওবা যখন কবুল হলো এবং হযরত নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে মুবারকবাদ দিলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র নামে দান করে দিলেন।

তায়িফবাসীদের ইসলাম গ্রহণ

তায়িফবাসী যখন নবী করীম (সা)-এর গাযওয়া তাবূক থেকে ফিরে আসার খবর পেলো, তখন তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, মুসলমানদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তায়িফে শাহাদত প্রাপ্ত হযরত উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবুল মালীহ (রা) ও তায়িফের অন্য কয়েকজন লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন আমর তায়িফবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিস্বরূপ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। তিনি তাদের জন্য মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করলেন। আব্‌দ ইয়ালীল ও তার সঙ্গীরা ইসলাম কবূল করলেন এবং তাদের কওমের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তিনি উসমান ইব্‌ন আবিল 'আস (রা)-কে তাদের শাসনকর্তা করে এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে লাত প্রতিমা ও মন্দির ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা তায়িফে পৌঁছে লাত প্রতিমা ও মন্দির ভেঙ্গে ফেললেন। প্রতিমা গৃহের কর থেকে যে সম্পদ আমদানী হলো, তা দ্বারা প্রথমে হযরত উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ঋণ পরিশোধ করা হলো এবং অবশিষ্টাংশ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। হযরত নবী করীম (সা) তাবূক থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করার সাথে

সাথে পুনরায় প্রতিনিধিদল আগমনের সিলসিলা শুরু হলো। অনবরত প্রতিনিধিদল আসতো, ইসলাম গ্রহণ করতো, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বায়'আত গ্রহণ করতো এবং ইসলাম শিক্ষা দানের জন্য সঙ্গে করে মুবাল্লিগ নিয়ে যেতো। হযরত নবী করীম (সা) প্রতিটি প্রতিনিধিদলকে বিদায় দেয়ার সময় উপঢৌকন ও পারিতোষিকও অবশ্যই প্রদান করতেন। তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করে তিনি হযরত আলী (রা)-কে একটি সেনাদলসহ তাঈ শহরে প্রেরণ করলেন। হযরত আলী (রা) তাঈ শহরের নিকটে পৌঁছে হামলা করলেন। আদী ইব্‌ন হাতিম পলায়ন করে সিরিয়া চলে গেলেন। হযরত আলী (রা) হাতিম তা'ঈর কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন এবং তাদের মন্দির থেকে দু'টি তলোয়ার লুট করে নিয়ে এলেন। তলোয়ার দু'টি হারছ ইব্‌ন আবী উমর লটকিয়েছিল।

হাতিম তাঈর কন্যা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট দয়া প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, আমি তোমাদের উপর দয়া করলাম অর্থাৎ তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। কিন্তু তুমি যাওয়ার জন্য খুব তাড়াহুড়া করো না। কোন বিশ্বস্ত ও সম্মানিত লোক পেলে আমি তোমাকে তার সাথে তোমার দেশে পাঠিয়ে দেবো। ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে কয়েকজন লোক আসলো। তিনি তাদের সাথে ঐ কন্যাকে কিছু কাপড়-চোপড় ও পাথেয় দিয়ে বিদায় করলেন।

এই কন্যা যখন তার ভাই আদী ইব্‌ন হাতিমের নিকট পৌঁছলো, তখন আদী তার বোনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে (মুহাম্মদ (সা)) কিরূপ পেয়েছ ? সে বললো, তিনি সাক্ষাতের যোগ্য, অতি চরিত্রবান ও পরম দয়ালু। আদী একথা শুনেই উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে খুব সম্মান দিলেন এবং মসজিদে নববী থেকে নিজের সাথে ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় বসালেন। একটি স্ত্রীলোক পথিমধ্যে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে কিছু কথা বলতে চাইলো। তিনি তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আদী ইব্‌ন হাতিমকে হযরত নবী করীম (সা)-এর এই চরিত্র খুবই প্রভাবিত করলো। এরপর তিনি আদী ইব্‌ন হাতিমকে কিছু উপদেশ দিলেন। আদী ইব্‌ন হাতিম তার হাত বাড়িয়ে দিলেন, বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং মুসলমান হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর প্রথম প্রতিনিধি

তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করার পর প্রতিনিধি দলগুলোর কাণ্ড এরূপ ছিল যে, হযরত নবী করীম (সা) মদীনা থেকে কোথাও যেতে পারতেন না। কেননা, আরব গোত্রগুলো অনবরত এসে এসে ইসলামে প্রবেশ করছিল। হজ্জের মওসুম এলে তিনি তাঁর স্থলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের আমীর বানিয়ে রওয়ানা করে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিশটি উট কুরবানী করার জন্য তাঁর সাথে প্রেরণ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) কুরবানী করার জন্য নিজের পক্ষ থেকেও পাঁচটি উট দিলেন। তিনশ মুসলমানের কাফেলা রওয়ানা হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রওয়ানা হওয়ার পর সূরা বারাআতের চল্লিশটি আয়াত নাযিল হলো। এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, এ বছরের পর মুশরিকরা মসজিদে হারামের নিকট যেতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর যার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন চুক্তি করেছেন, তা সেই সময় পর্যন্ত পূর্ণ করা হবে। হজ্জের সময় এই কথাগুলো ঘোষণা করা জরুরী ছিল।

হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে এই আয়াতগুলো দিয়ে তাঁর উটনীর উপর সওয়ার করিয়ে রওয়ানা করে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, হজ্জের পর কুরবানীর দিন দাঁড়িয়ে সবাইকে এই আয়াতগুলো শুনিয়ে দেবে। হযরত আলী (রা) রওয়ানা হলেন এবং দাওমাতুল হুলায়ফা নামক মনযিলে গিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমীর হয়ে এসেছো, না মা'মূর (অধীন) হয়ে ? হযরত আলী (রা) জবাব দিলেন, আমি মা'মূর হয়ে এসেছি। আমীর আপনিই থাকবেন, আমাকে শুধু এই আয়াতগুলো শুনিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁরা মক্কা পৌঁছলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমীর হিসাবে হজ্জের রুকনগুলো আদায় করলেন। তারপর হযরত আলী (রা) সূরা বারাআতের আয়াতগুলো শুনিয়ে দিলেন।

এ বছর নবী করীম (সা)-এর কন্যা উম্মু কুলছুম ইনতিকাল করেন। এ বছরই হজ্জ ফরয হয়। এ বছরই হজ্জ মুসলমানদের পরিচালনাধীনে আসে। হযরত আবূ বকর (রা) লোকদেরকে আরকানে হজ্জের তা'লীম দেন। এই হজ্জের পর সকল মুশরিককে মাত্র চার মাসের সময় দেয়া হয় এবং ঘোষণা দেয়া হয় যে, চার মাসের পর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের বেলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত। এই ঘোষণা শুনে মক্কায় যেসব লোক তখনো শিরকের উপর দৃঢ় ছিল, তারাও ইসলামে প্রবেশ করলো এবং সর্বদিক থেকে বিভিন্ন গোত্র দলে দলে এসে মুসলমান হতে লাগলো। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেন, এই বছরই তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করে নবী করীম (সা) ইরানের বাদশাহ কিসরার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। এই বছরই মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য মারা যায়।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরীর মুহাররম থেকে বছরের শেষ পর্যন্তই প্রতিনিধিদলের আগমন ও আরব গোত্রগুলোর ইসলাম গ্রহণের ধারা অব্যাহত রইল। রবীউস-সানীতে নবী করীমে (সা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে চারশ' সাহাবার সাথে নাজরান ও তার আশেপাশের লোকদের কাছে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, লোকদেরকে তিনবার ইসলামের দাওয়াত দেবে এবং তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন ইসলামের তা'লীম দেবে– লড়াই করবে না। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে বনূ হারছ ইব্ন কা'বও শামিল ছিল। হযরত নবী করীম (সা) হযরত খালিদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমর ইব্ন হুযায়মকে সেখানে ইসলাম শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করলেন। দশম হিজরীর রমযান মাসে তিন সদস্য বিশিষ্ট গাস্সানী প্রতিনিধিদল এলো। তারা নবীর দরবারে হাযির হয়ে খুশীমনে ইসলাম কবূল করলো এবং আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো। কিন্তু তাদের সম্প্রদায় ইসলাম কবূল করলো না। দশম হিজরীর শওয়াল মাসে সাত সদস্য বিশিষ্ট সালমান প্রতিনিধিদল আগমন করলো। প্রতিনিধিদলে তাদের সরদার হাবীব ইব্ন আমরও ছিলেন। এরাও মুসলমান হলো এবং দীনের জরুরী বিষয়গুলোর তা'লীম নিয়ে ফিরে গেলো। আরেক দিন হাবীব ইব্ন আমর হযরত নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উৎকৃষ্টতম আমল কি ? তিনি বললেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' এই দিনগুলোতেই দশ সদস্য বিশিষ্ট আয্দের প্রতিনিধি দল আগমন করলো। এরাও সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং এদের তাবলীগে তামাম কবীলা ইসলাম

গ্রহণ করলো। আয্দ গোত্র ও জার্শ গোত্রের মধ্যে এই ইসলাম গ্রহণ নিয়ে যুদ্ধ হলো। জার্শ্বাসী যুদ্ধে আগে তাদের দু'ব্যক্তিকে নবী করীম (সা)-এর অবস্থা জানার জন্য মদীনা প্রেরণ করেছিল। এরা দু'জন যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট এলো, তখন তিনি তাদের বললেন যে, জারশবাসীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এবং জারশবাসী পরাজিত হয়েছে। এরা দু'জন যখন ফিরে গেলো এবং ঘটনা বর্ণনা করলো, তখন সমস্ত জারশ গোত্র মুসলমান হয়ে গেলো। এই বছরই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামন প্রেরণ করলেন সেখানকার লোকদেরকে মূর্তিপূজার অপকারিতা ও তাওহীদের উপকারিতা বোঝানোর জন্য অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের জন্য। হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম প্রচারের ফলে ইয়ামনের বিখ্যাত হামাদান গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর ইয়ামনের সবগুলো গোত্র একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং তাদের প্রতিনিধিদলসমূহ মদীনা মুনাওয়ারায় এসে নবী করীম (সা)-এর সাথে মুলাকাত করলো। এই বছরই মুরাদ গোত্রের প্রতিনিধি দল কিন্দা রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে মদীনা আগমন করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গেলো। এই বছরই কবীলা আবদ কায়সের প্রতিনিধিদল জারূদ ইব্ন আমরের নেতৃত্ব আগমন করলো। এরা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল। সবাই মুসলমান হয়ে ফিরে গেলো এবং স্বীয় গোত্রের সবাইকে মুসলমান করলো।

মুসায়লামা কাযযাব

এ বছরই ইয়ামামা থেকে বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল আগমন করলো। প্রতিনিধিদলে মুসায়লামা ইব্ন হাবীব কায্যাব, জুরজান ইব্ন আনহাম, তাল্ক ইব্ন আলী, সালমান ইব্ন হানযালা প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা মদীনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করলো। পনের দিন অবস্থান করে উবায়্য ইব্ন কা'বের নিকট কুরআন মজীদ শিখতে থাকলো। এই প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সবাই প্রায়ই হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হাযির হতো, কিন্তু মুসায়লামা অনুমতি নিয়ে অবস্থানস্থলে আসবাবপত্র হিফাযত করার জন্য থাকতো। এই বছরই বনূ কিন্দা'র দশ বা ততোধিক সদস্যের প্রতিনিধিদল আগমন করলো। এই সময়ই কিনানার প্রতিনিধিদলের সাথে হাদরামাওতের প্রতিনিধিদলও আগমন করলো। এরা সবাই আনন্দচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলো। এই সময়ই ওয়ালিদ ইব্ন হুজর হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে মুসলমান হলো। হযরত নবী করীম (সা) তার ইসলাম গ্রহণের দরুন খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে নির্দেশ দিলেন ওয়ায়িল ইব্ন হুজরকে নিয়ে গিয়ে অবস্থান করাতে। ওয়ায়িল ইব্ন হুজর ছিলেন আরোহী এবং হযরত মুআবিয়া (রা) ছিলেন পদাতিক। হযরত মুআবিয়া (রা) পথিমধ্যে বললেন, আপনি আপনার পাদুকা দু'টি আমাকে দিয়ে দিন। আমার পা দু'টি মাটির গরমে জ্বলে যাচ্ছে। ওয়ায়িল বললেন, আমি আমার পাদুকা দেবো না। কেননা, আমি তা পরিধান করেছি। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন, তবে আপনি আপনার সওয়ারীর পিছনে আমাকে বসিয়ে নিন। ওয়ায়িল জবাব দিলেন, তুমি বাদশাহ্র সাথে সওয়ারীর উপর বসতে পারবে না। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন, আমার পা দুটি তো জ্বলে যাচ্ছে। ওয়ায়িল বললেন, আমার উটনীর ছায়ায় চলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এই ওয়ায়িলই মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফত কালে তাঁর নিকট প্রতিনিধি হয়ে গেলে তিনি তাকে খুব সম্মান করেছিলেন। এই বছরই মাহারিবের তিন সদস্যের এবং নাদ্হাজের পনের সদস্যের

প্রতিনিধিদল আগমন করলো। তারা কুরআন পাঠ শিখলো এবং ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা করে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে গেলো।

মুবাহালা

এই বছরই নাজরানের খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করলো। এই দলে সত্তরজন আরোহী, মতান্তরে চৌদ্দজন আরোহী ছিল। তাদের সরদার আবদুল মাসীহ ও তাদের প্রধান ধর্মযাজক আবূ হারিছাও ছিলেন। তারা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিলো। ইতিমধ্যে সূরা আলে-ইমরানের প্রথম আয়াত ও আয়াতে মুবাহালা নাযিল হলো। হযরত নবী করীম (সা) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললে তারা অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করলো। তিনি তাদের বললেন, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট ঠিক তেমনি ছিলেন, যেমনি ছিলেন আদম (আ)। আর আদম (আ) ছিলেন মাটি দ্বারা সৃষ্ট। খ্রিস্টানরা বললো : না, বরং ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। তিনি বললেন : তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে আমার সাথে ময়দানে চলো। আমার প্রিয় পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনও আমার সাথে থাকবে। উভয় পক্ষ পৃথক স্থানে বসে বলবে, যে মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হোক। এ কথা শুনে তারা নীরব হয়ে গেলো। পরদিন সকালে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা), হযরত ফাতিমা (রা), হযরত হাসান (রা), হযরত হুসায়ন (রা)-কে সাথে নিয়ে ময়দানে হাযির হলেন এবং ঐ খ্রিস্টানদের বললেন যে, আমি যখন এই দু'আ করবো যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হোক, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। হযরত নবী (সা)-এর এই প্রস্তুতি দেখে খ্রিস্টানরা ভীত হয়ে বললো, আমরা মুবাহালা করবো না। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, মুবাহালা না করলে ইসলাম কবূল করো এবং মুসলমান হয়ে যাও। তারা বললেন : আমরা জিযিয়া দেবো। নবী করীম (সা) বলেন : তারা যদি মুবাহালা করতো, তবে দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান থাকতো না। যাওয়ার সময় খ্রিস্টানগণ তাদের জন্য একজন আমীন (তহসীলদার) নিযুক্ত করতে বললেন। তিনি হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌নূল জার্‌রাহ (রা)-কে তাদের সাথে পাঠালেন। কিছুদিন পর নাজরানের সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেল।

ইয়ামনের প্রায় সবগুলো গোত্র এবং ইয়ামনের বাদশাহ বাযান মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) গোটা ইয়ামন দেশের শাসনভার বাযানকেই সোপর্দ করেছিলেন। এই বছরই বাযান ইনতিকাল করেন। হযরত নবী করীম (সা) বাযানের ইনতিকালের পর শাহ্‌র ইবন বাযান, আমির ইব্‌ন শাহর হামদানী (রা), আবূ মূসা আশআরী (রা), আলী ইব্‌ন উমাইয়া (রা), মুইয ইব্‌ন জাবাল (রা) প্রমুখকে ইয়ামন দেশের এক একটি অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলী (রা)-কে অন্যান্য কয়েকজন সাহাবীসহ ইয়ামন প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে এই মর্মে তাকীদ করলেন যে, যে পর্যন্ত কেউ মুকাবিলা শুরু না করবে, তোমরা অস্ত্র ধারণ করবে না। হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামন দেশে থাকতে ও সাদাকা ওয়াসিল করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই সব ঘটনার পর যূ-কাআদা মাস এলো। হযরত নবী করীম (সা) দশম হিজরীর যূ-কাআদা মাসে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার জন্য রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও আরব নেতৃবৃন্দের একটি জামাআত এবং কুরবানীর একশ' উট ছিল। মক্কায় তিনি যুলহাজ্জ মাসের রোববার প্রবেশ

করলেন। হযরত আলী (রা) যিনি ইয়ামনে যাকাত ওয়াসিলের জন্য গিয়েছিলেন– মক্কায় তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন এবং হজ্জ আদায় করলেন।

বিদায় ভাষণ

হযরত নবী করীম (সা) এবার লোকদেরকে হজ্জের আহ্কাম শিক্ষা দেন এবং আরাফাতে একটি ভাষণ দান করেন। হাম্দ ও ছানার পর তিনি বলেন : জনমণ্ডলী! আমার কথা শ্রবণ করো। কেননা, আমি আগামী বছর কিংবা তারপর এই জায়গায় তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো বলে মনে হয় না। জনমণ্ডলী ! আজকের এই দিন ও এই মাস যেমনি হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জান-মালও তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ মুসলমানের জান-মালের হিফাযত প্রত্যেক মুসলমানের করা উচিত। আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া উচিত। অন্যের উপর জুলুম করবে না, তাহলে তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না। সুদ হারাম। এই সরযমীনে শয়তানের পূজা করা হবে না। শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে। তবে ছোট ছোট বিষয়ে তার আনুগত্য করা হবে। সুতরাং শয়তানের আনুগত্য থেকে তোমরা দূরে থাকবে। হে লোকসকল ! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করবে। আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি আল্লাহ্র কিতাব, অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত। যে পর্যন্ত তোমরা কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করবে, পথভ্রষ্ট হবে না। মুসলমান একে অপরের ভাই। একজন মুসলমানের সম্পদ আরেকজন মুসলমানের বিনা অনুমতিতে ভোগ করা বৈধ নয়। তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করবে না। তারপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহ্র বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছে দিইনি ? সবাই সমবেতভাবে উত্তর দিলো, হাঁ, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র বিধান আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি সাক্ষী থাক!

তিনি এই ভাষণে এমনিভাবে কথাগুলো বললেন যেমনিভাবে কেউ কারো থেকে বিদায় গ্রহণ করে কিংবা বিদায় দান করে। এজন্য এই হজ্জের নাম হুজ্জাতুল বিদা' বা 'বিদায় হজ্জ' নামে পরিচিত। তিনি এ বছর খুতবার মধ্যে বিশেষভাবে ইসলামী আহকাম প্রচার করেন। তাই এই হজ্জকে 'হুজ্জাতুল-বালাগ' নামেও নামকরণ করা হয়। এই ভাষণ শেষ হওয়ার পরই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাতা এক পিয়ালা দুধ পাঠিয়ে দেন। তিনি তা পান করেন। এই হজ্জে লক্ষাধিক মুসলমানের সমাবেশ হয়। কারো কারো মতে, এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবা এইবার তাঁর সাথে হজ্জ করেন। তিনি ঐদিন এও বলেন যে, ইতিপূর্বে সকল নবী যা কিছু বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে—

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

(আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান)।

আরাফাতের দিন নবী করীম (সা) মক্কায় থাকতেই

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا .

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (সূরা মায়িদা : ৩)।

উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াত শ্রবণ করে অনেক সাহাবী খুশী হন। দীন-ইসলাম আজ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মতো রহস্যবিদ সাহাবা অশ্রুসজল নয়নে বললেন, এ আয়াত থেকে বিচ্ছেদের গন্ধ আসে। কেননা, দীন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর নবীর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। হজ্জ সমাপন করে নবী করীম (সা) মদীনা রওয়ানা করেন।

হযরত আলী (রা)-কে সান্ত্বনা দান

হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে আগমন করে হজ্জে শরীক হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু অভিযোগ করেছিল, যা ইয়ামনবাসীর কিছু ভুল বোঝাবুঝির দরুন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি এই অভিযোগ শুনে গাদীরে খুম নামক স্থানে এক বক্তৃতা দিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসা করলেন। বক্তৃতায় তিনি বললেন, যে আমার বন্ধু, সে আলীর বন্ধু। যে আলীর শত্রু, সে আমার শত্রু। হযরত উমর (রা) তাঁর এই বক্তৃতার পর হযরত আলী (রা)-কে মুবারকবাদ দিলেন এবং বললেন, আজ থেকে আপনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু। মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার পর হযরত নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করেন।

নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতা

হিজরতের একাদশতম বছর

একাদশতম হিজরীর মুহাররম মাসে হযরত নবী করীম (সা) জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ক্রমে জ্বর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়লে কোন কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুসায়লামা, তুলায়হা, খুওয়ায়লিদ, আসওয়াদ, সাজাহ বিন্ত হারিছ পৃথক পৃথকভাবে নবুওয়াতের দাবী করলো। তারা মনে করলো যে, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কামিয়াব হয়েছেন, তেমনিভাবে তারাও কামিয়াব হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম (সা)-এর সত্যতার উপর আরেকটি সীল মেরে দিলেন। এদের সবাই ব্যর্থ, অপদস্থ ও পরাভূত হয়। এদের মধ্যে মুসায়লামা কায্যাব ইয়ামামায় এবং আসওয়াদ ইব্ন কা'ব আনাসী ইয়ামেনে খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। হযরত নবী করীম (সা) পীড়িতাবস্থায় একদিন বাইরে বের হলেন। মাথাব্যথার কারণে তাঁর মাথায় একটি পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি বললেন, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতের কবযীতে দু'টি সোনার কঙ্কন। আমি ঐ দু'টিকে অবাধ্য ভেবে ছুঁড়ে মেরেছি। এই স্বপ্নের আমি ব্যাখ্যা করেছি, এই কঙ্কন দুটিই ঐ দু'জন কাযযাব (মিথ্যাবাদী)। অর্থাৎ ইয়ামামাবাসী (মুসায়লামা কাযযাব) ও ইয়ামনবাসী (আসওয়াদ কাযযাব)।

আসওয়াদ কায্যাব নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ফিরোয নামক একজন সুপুরুষের হাতে নিহত হয়। আর মুসায়লামা কায্যাব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত হামযা হন্তা ওয়াহ্শীর হাতে নিহত হয়। ওয়াহ্শী প্রায়ই বলতেন যে, আমি কাফির অবস্থায় একজন উৎকৃষ্ট মানুষকে এবং মুসলমান অবস্থায় একজন নিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করেছি।

রোগশয্যা থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৬ তারিখ রোগ থেকে কিছুটা উপশম অনুভব করলেন। হযরত নবী করীম (সা) সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সীমান্তসমূহের সংবাদাদি শ্রবণ করে মুসলমানদেরকে রোম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। কেননা, ইয়ামামা ও ইয়ামনের গোলযোগ-বিশৃঙ্খলা এবং আরবের খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র -শত্রুতা রোমকদেরকে পুনরায় আরব দেশের প্রতি মনোযোগী করেছিল। তিনি পরদিন হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে প্রধান সেনাপতি করে বললেন, তুমি তোমার পিতার বধ্যভূমিতে এমনভাবে ছুটে যাবে যে, সেখানকার লোকেরা যেন তোমার আগমন-সংবাদ জানতে না পারে। ইনশাআল্লাহ্ তুমি বিজয় লাভ করবে। একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৮ তারিখ তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলো। ঐ রুগ্নাবস্থায়ই তিনি তাঁর নিজ হাতে উসামার (রা) ঝাণ্ডা ঠিক করে বাহিনী বিদায় করলেন এবং প্রবীণ ও জ্ঞানতাপস সাহাবাকে হযরত উসামা (রা)-এর সাথে গমন করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা) সবাইকে উসামা ইব্‌ন যায়দের নেতৃত্বাধীন রওয়ানা করানো হলো। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি উসামার অনুমতিক্রমে হযরত হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-কে শুশ্রূষার জন্য মদীনায় রেখে দিলেন। অন্যসব সাহাবায়ে কিরাম উসামার সাথে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। হযরত উসামা (রা) মদীনা থেকে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে জারাফ নামক স্থানে অবস্থান করলেন। সেখান থেকে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) উসামা (রা) থেকে অনুমতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমনাগমন করতেন। উসামা (রা) লশকর নিয়ে জারাফে পড়ে রইলেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতা দেখে রওয়ানা করতে পারলেন না। হযরত নবী করীম (সা)-ও এ অবস্থায় তাঁকে রওয়ানা করার আদেশ দিলেন না। লশকরসহ তাঁকে জারাফে অবস্থান করতে অনুমতি দিলেন। উসামার নেতৃত্বের প্রশ্নে কারো কারো মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হলো। কেননা, উসামার পিতা যায়দ (রা) ছিলেন গোলাম। নবী করীম (সা) এই মন্তব্য শ্রবণ করে লোকদেরকে ডেকে বললেন, এর পিতা একজন সেনাপতি ছিল। সুতরাং এর সৈনাপত্যে আপত্তি কি ? তারপর বললেন, যায়দ (রা) প্রথম যুগের মুসলমান। ইসলামে তার মর্যাদা অনেক উচ্চে। মোটকথা, আপত্তিকারীরা লজ্জিত হলো এবং সানন্দে তাঁর সৈনাপত্য মেনে নিলো।

রোগ বৃদ্ধি

রোগ দিন দিন বাড়তে লাগলো। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর পবিত্রাত্মা স্ত্রীদের নিকট হযরত আয়িশা (রা)-এর কক্ষে অবস্থান করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সবাই সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা)-এর গৃহে গেলেন। তারপর বাইরে বের হয়ে তিনি মুসলিম সমাবেশে একটি বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হিদায়াত করুন। আমি তাঁকে তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি। আর তোমাদেরকে তাঁর হাতে সোপর্দ করছি। আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সাবধান করছি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা গর্ব ও অহংকার করবে না। জান্নাত তারাই পাবে, যারা অহংকার ও ফাসাদ করে না। আখিরাতের কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্য। অহংকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম। তারপর তিনি বললেন : আমাকে

আমার নিকট-আত্মীয় গোসল করাবে। এরপর বললেন : আমার লাশ আমার কবরের কাছে রেখে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা দূরে সরে থাকবে, যাতে ফেরেশতারা আমার জানাযা পড়তে পারে। এরপর দলে দলে আমার জানাযা পড়বে। প্রথমে আমার খান্দানের পুরুষরা জানাযা পড়বে। তারপর তাদের স্ত্রীলোকরা। রোগের শেষাবস্থায় তিনদিন পর্যন্ত তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ

হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁর স্থলে মসজিদে নামাযের ইমামতি করার জন্য নিযুক্ত করলেন। আয়িশা (রা) বললেন, আমার পিতা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবেন না। কেননা, তিনি বেশী নরম-দিল। আপনি হযরত উমর (রা)-কে ইমাম নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন : না, আবূ বকরই ইমামতি করবে। হযরত আবূ বকর (রা) মসজিদে নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) কিছুটা আরোগ্যবোধ করে মসজিদে গমন করলেন। নামায চলাকালে তিনি মসজিদে উপস্থিত হলে হযরত আবূ বকর (রা) ইমামের স্থান তাঁর জন্য খালি করতে এবং নিজে পিছনে হটতে মনস্থ করলেন। হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে কাঁধের কাছে ধরে সেখানেই দণ্ডায়মান রাখলেন এবং নিজে তাঁর ইকতিদা করে নামায আদায় করলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উক্ত হয়েছে, হযরত নবী করীম (সা) হযরত আয়িশা (রা)-কে বললেন, তুমি তোমার পিতা ও ভাইকে ডেকে আন। আমি তোমার পিতার জন্য খিলাফতনামা লিখে দেবো। তারপর বললেন : থাক, তাঁর প্রয়োজন নেই। কেননা, মুসলিম সমাজ তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতা নিয়োগ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাও তাই। অনুরূপ সহীহায়নে এও উক্ত হয়েছে যে, একদিন রোগশয্যায় বসে তিনি কাগজ ও কলম-দোয়াত চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু তখন রোগ প্রকট ছিল বিধায় হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁকে কষ্ট দিতে বারণ করলেন। বললেন, কুরআন মজীদই আমাদের জন্য যথেষ্ট। হযরত নবী করীম (সা)-ও তাই বলেছেন। তবু কোন কোন সাহাবা বললেন : না, নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা উচিত তিনি কি লিখতে চেয়েছিলেন। নবী করীম (সা) তাদের এই কথাবার্তা অপসন্দ করলেন। তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি লেখাতে চান বলুন! তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও এবং বাইরে চলে যাও। ঐ সময় নবী করীম (সা) তীব্র রোগ-যন্ত্রণা ও কষ্ট অনুভব করছিলেন। তাই হযরত উমর (রা) এই অবস্থায় তাঁকে কষ্ট দিতে চাননি। একটু পরেই নবী করীম (সা) কিছুটা আরাম বোধ করলে সবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, কোন প্রতিনিধি দল আগমন করলে তাঁদেরকে ইনআম ও উপঢৌকন দিয়ে অবশ্যই খুশী করবে। মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। উসামার বাহিনীকে অবশ্যই অভিযানে পাঠাবে। আনসারদের সাথে সদাচরণ করবে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেবে। সহচর হিসাবে আবূ বকরের চেয়ে কাউকে উৎকৃষ্ট মনে করবে না। এরপর পুনরায় রোগ বৃদ্ধি পেলো এবং তিনি আবার সংজ্ঞা হারালেন।

ওফাতের কিছু পূর্বে

হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), ফযল ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) প্রমুখ এই রোগাক্রান্তের দিনগুলোতে প্রায়ই নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত থাকতেন। পাঁচ/ছয়টি দীনার তাঁর কাছে মওজুদ ছিল। হযরত আয়িশার

তহবিলে তা রাখা ছিল। তিনি সেগুলো সাদাকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যেন দুনিয়ায় তিনি কোন বস্তু রেখে না যান। হযরত আলী (রা)-কে তিনি সালাত ও সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে গাফিল না থাকতে উপদেশ দিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা) অসুস্থ থাকাকালে তেরো ওয়াক্ত সালাত পড়িয়েছেন। একাদশ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার ফজর সালাতের সময় নবী করীম (সা) মাথায় পট্টি বেঁধে বাইরে বের হলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) লোকদেরকে ফজরের সালাত পড়াচ্ছিলেন। তিনি এবারও পিছনে সরে আসার ইরাদা করলেন। নবী করীম (সা) আবার তাঁকে নিজ হাতে বাধা দিলেন এবং ডানপাশে বসে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর তিনি লোকদেরকে কিছু ওয়ায-নসীহত করলেন। তিনি যখন তাঁর ওয়ায শেষ করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র ফযলে আজ আপনাকে প্রফুল্লচিত্ত মনে হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন এবং হযরত আয়িশার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। হযরত আবূ বকর (রা) নিশ্চিন্ত হয়ে এবং নবী করীম (সা)-কে আজ খুব সুস্থ অবস্থায় দেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট আপন গৃহে গমন করলেন। এই সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) একটি তাজা মিসওয়াক হাতে নিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী করীম (সা) তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন। হযরত আয়িশা (রা) বুঝে ফেললেন যে, তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। তাই তিনি তাঁর ভাইয়ের হাত থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলেন। তিনি সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন। তারপর সেটি রেখে দিয়ে তাঁর মাথা হযরত আয়িশার বুকের উপর রেখে পা বিছিয়ে দিলেন।

ওফাত

এরপর নবী করীম (সা)-এর কাছে একটি পানিভর্তি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। তিনি তাতে তাঁর হাত ভিজিয়ে চেহারার উপর হাতে বুলাতেন এবং বলতেন-اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (হে আল্লাহ! মৃত্যু যাতনায় আমাকে সাহায্য করো)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বারংবার তাঁর চেহারার প্রতি তাকাচ্ছিলেন। সহসা লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর চক্ষু স্থির ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাঁর পবিত্র মুখে তখন اَلرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى مِنَ الْجَنَّةِ উচ্চারিত হচ্ছিল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার প্রায় দুপুরের সময় এই নশ্বর জগত থেকে তিনি জান্নাতবাসী হন। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরের কাছাকাছি সমাহিত হন। তাঁর ইনতিকালের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উপস্থিত ছিলেন না। তিনি 'সানাহ' নামক স্থানে আপন গৃহে পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়েছিলেন। এই খবর যে শুনত, সে-ই অস্থির ও হতভম্ব হয়ে পড়ত।

হযরত উমর (রা)-এর অবস্থা

হযরত উমর ফারূক (রা)-এরও হুশ ও চেতনা অটুট ছিল না, তিনি তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করে উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন–

اِنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ زَعَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَاِنَّهُ ذَهَبَ اِلٰى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ مُوْسٰى وَلَيَرْجِعَنَّ فَيَقْطَعْنَ اَيْدِىَ رِجَالٍ وَّاَرْجُلَهُمْ ·

কিছু সংখ্যক মুনাফিক মনে করছে রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, যেমনিভাবে হযরত মূসা (আ) গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং লোকদের হাত-পা কর্তন করবেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) উত্তেজনা ও ক্রোধবশে এই ধরনের কথা বলছিলেন। তাঁকে তাঁর তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে বলবে এরূপ কারো সাহস ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের একটু পরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এসে পৌঁছলেন এবং সোজা হুজরা মুবারকে গমন করলেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর কোল থেকে তাঁর মাথা তুলে গভীরভাবে দেখে বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক। নির্ঘাত আপনি আপনার সেই মৃত্যু-স্বাদ আস্বাদন করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। এরপর আর কখনো মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করবে না। তারপর اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করে বাইরে চলে এলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃঢ়তা

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে ঐ কথাই বলতে শোনলেন এবং তাঁকে বললেন, চুপ থাক। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাতে কর্ণপাত করলেন না। তখন হযরত আবূ বকর (রা) পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। হযরত উমর (রা)-এর পাশে যারা জড়ো হয়েছিলেন, তারা তাঁকে একাকী রেখে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট চলে এলেন। হযরত আবূ বকর (রা) হামদ ও ছানার পর বললেন, "জনমণ্ডলী! তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-কে পূজা করে থাক, তবে মুহাম্মদ (সা) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলাকে যদি পূজা করে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে জীবিত আছেন এবং তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তারপর তিনি কুরআন করীমের এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ –اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ · وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا – وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ·

মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায়, অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (৩ : ১৪৪)

হযরত আবূ বকর (রা) কুরআন মজীদের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেই তৎক্ষণাৎ জনতার মধ্য থেকে অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো। হযরত উমর (রা) বলেন, প্রথমে আমি আবূ বকরের কথায় কর্ণপাত করিনি। কিন্তু তিনি যখন এই আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন আমার মনে হলো যেন এই আয়াত ঐ সময়ই নাযিল হয়েছে। ভয়ে আমার পা কেঁপে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেছেন।

সাকীফা বনূ সায়িদা

এখানে মসজিদে নববীতে এই কথাবার্তা চলছিল। ইত্যবসরে খবর এলো যে, সাকীফা বনূ সায়িদায় আনসাররা সমবেত হয়েছেন এবং তারা সবাই সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর হাতে

বায়'আত হতে চাচ্ছেন। কোন কোন আনসার এ কথাও বলছেন যে, مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْ قُرَيْشٍ اَمِيْرٌ (একজন আমাদের মধ্যে আমীর হবে, আরেকজন কুরায়শের মধ্যে আমীর হবে)। এ খবর শুনে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) একদল মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে এই অনভিপ্রেত অবস্থার সংশোধন ও প্রতিরোধকল্পে সাকীফা বনূ সায়িদার দিকে গমন করলেন এবং নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত মুতাবিক তাঁর নিকটাত্মীয় হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত উসামা (রা), হযরত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখকে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য মোতায়েন করে গেলেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে গোসল দিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ও তাঁর উভয় পুত্র পাশ ফিরাতেন এবং হযরত উসামা (রা) পানি ঢালতেন।

সালাতে জানাযা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা

হযরত নবী করীম (সা)-কে কাফন পরানোর পর তাঁর দাফন করার স্থান নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ কেউ বলছিলেন তাঁর গৃহে দাফন করতে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শোনেছি, প্রত্যেক নবীকে তাঁর জান কবয করার স্থানে দাফন করা হয়েছে। লোকেরা একথা শোনা মাত্র যে বিছানায় নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেছিলেন, সেটি তুলে ফেললো এবং ঐ স্থানে কবর খনন করা হলো। কবর বাগ্‌লী কায়দায় খনন করা হলো। কবর তৈয়ার হওয়ার পর সালাতে জানাযা পড়া আরম্ভ হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর বালকরা জানাযা সালাত পড়লেন। কেউ কারও ইমামতি করলো না। নবী করীম (সা)-এর রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং তারপর তাঁর ইনতিকালের খবর শুনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ও তাঁর গোটা বাহিনী মদীনায় ফিরে এসেছিল এবং ফৌজী ঝাণ্ডা হুজরা মুবারকের দরজায় খাড়া করে রাখা হয়েছিল। সালাতে জানাযা হযরত আয়িশা (রা)-এর হুজরায় পড়া হলো। কেননা, এখানেই নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন এবং এখানেই তাঁর কবর তৈরী হয়েছিল। তাই এটা স্পষ্ট যে, মদীনায় যেসব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, তারা সবাই একসাথে সালাতে জানাযা পড়তে পারতেন না। আবার এ সালাতে জানাযা কারো ইমামতিতেও অনুষ্ঠিত হয়নি বরং পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করা হয়। কাজেই মদীনার সমস্ত মুসলমান, গোটা উসামা বাহিনী, সমস্ত নারী, বালক ও গোলামদের দলে দলে হুজরায় এসে সালাতে জানাযা আদায় করা কিংবা তাঁর ইনতিকালের পর তৎক্ষণাৎ তাঁকে দাফন করা সম্ভবপরই ছিল না। সালাতে জানাযার সিলসিলা নিশ্চিতরূপেই পরের দিন পর্যন্ত অনবরত চালু ছিল। আর তাই এতে এতোটুকুও আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয় যে, নবী করীম (সা)-এর ওফাত হলো সোমবার এবং তাঁকে দাফন করা হলো তার পরের দিন মঙ্গলবার। কোন কোন দুর্বল রিওয়ায়াতে এও উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (সা)-কে মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে দাফন করা হয় যা ইসলামী হিসাব মতে বুধবারের রাত ছিল। তবু এটা কোন বিস্ময়কর ও আশ্চর্যের ঘটনা নয়। কেননা, নবী করীম (সা)-এর ওফাত ও তাঁর দাফনের মধ্যে এভাবে ঊর্ধ্বপক্ষে ৩৬ ঘন্টার দূরত্ব মানা যেতে পারে। আর এটা উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বেশী কিছু নয়।

হুলিয়া মুবারক

হযরত রাসূলে করীম (সা) অতি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খর্বকায়ও ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে অন্য মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মনে হতো। তিনি লাবণ্যময় রক্তিমাভ উজ্জ্বল গম-রং

বিশিষ্ট ছিলেন। পবিত্র মস্তক সামান্য বড়, ঘন ও ভরপুর দাড়ি, কেশরাশি কালো ও কিঞ্চিৎ-কুঞ্চিত, চক্ষুদ্বয় গোল ও ডাগর, কৃষ্ণ, উজ্জ্বল। মাথার চুল প্রায়শ কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত, কখনো কাঁধ পর্যন্ত এবং কখনো কানের নিম্নভাগ থেকেও উপরে থাকতো। ভ্রূযুগল পরস্পর সম্মিলিত এবং মধ্যস্থলে একটি সরু শিরা ছিল। ক্রোধের সময় তা দৃষ্ট হতো। চক্ষুর শ্বেতাংশে লাল ডোরাও ছিল। মুখমণ্ডল কোমল ও মাংসল ছিল। মাথায় তৈল দিতেন এবং চোখে সুরমা লাগাতেন। দন্ত মুক্তার মতো সাদা ও উজ্জ্বল ছিল। মুচকি হাসি ছাড়া কখনো খিলখিল করে হাসতেন না। তিনি প্রফুল্ল মুখ, মিষ্টভাষী, বাকপটু, সাহসী ও সমস্ত মানবিক গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর দু'বাহুমূলের মধ্যস্থলে মুহরে নবুওয়াত ছিল। তিনি তাঁর নিজের কাজ নিজ হাতেই করতেন। কারো প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতেন না।

সন্তান-সন্ততি

হযরত মারইয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভজাত ইবরাহীম ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অন্য সব সন্তান হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম হযরত কাসিম ভূমিষ্ঠ হন। চার বছর বয়সে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর নামানুসারেই নবী (সা)-এর উপনাম (কুনিয়াত) হয় আবুল কাসিম। তাঁর পর হযরত যয়নাব (রা), এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) ভূমিষ্ঠ হন। এই আবদুল্লাহ্র লকবই তাইয়িব ও তাহির ছিল। তারপর যথাক্রমে হযরত রুকাইয়া (রা), হযরত কুলছুম (রা) ও হযরত ফাতিমা যুহ্রা (রা) ভূমিষ্ঠ হন। পুত্রগণ সবাই ছোট সময়ই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কন্যারা সবাই যুবতী হন এবং তাঁদের বিবাহ-শাদী হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) ছাড়া আর কোন কন্যা থেকে বংশধারা চালু হয়নি। হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দুই পুত্র হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) এবং দুই কন্যা হযরত যয়নাব (রা) ও হযরত উম্মু কুলছুম (রা)।

স্বভাব-চরিত্র

নবী করীম (সা)-এর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে জানা যায়, তিনি মাতৃগর্ভেই ইয়াতীম হয়েছিলেন। তাঁর জীবন ইয়াতীম ও অসহায় অবস্থায় শুরু হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি তামাম আরব জাহানের শাহানশাহ ছিলেন। আরবের এমন কোন প্রদেশ ছিল না, যেখানে তাঁর জাগতিক শাসন ও রাজত্ব কায়েম হয়নি। এই সমুদয় অবস্থা ও সমগ্র জীবন-পরতে তাঁর সরল জীবনযাত্রা একইরূপ দৃষ্ট হয়। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কখনো নিজেকে জাগতিক কর্মকাণ্ডে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেননি বরং তোমরা যেভাবে তোমাদের আবাসগৃহে নিজ নিজ কাজ করে থাক, তেমনি তিনিও করতেন। তিনি নিজেই নিজের বকরীগুলোর দুধ দোহন করতেন এবং নিজেই নিজের পাদুকা সেলাই করতেন। মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী নির্মিত হচ্ছিল। তিনি সব কাজেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি সাধারণ মযদুরের ন্যায় তিনিও ইট তুলে তুলে বয়ে আনতেন। আহযাবের যুদ্ধে তিনিও খন্দক খননকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। নিজ হাতে মাটি তুলতেন এবং পাথর ভাঙ্গতেন। তিনি সাধারণত যবের রুটি খেতেন। তাঁর ঘরে চালুনি ছিল না। ফুঁক দিয়ে ভূষি উড়িয়ে দেয়া হতো। কখনো একাধারে দু'দিন এই যবের রুটিও পেটভরে খেতে পেতেন না।

কোন কোন সময় মাসকে মাস পর্যন্ত তাঁর উনুনে আগুন জ্বলতো না। নিছক খেজুর ও পানি দ্বারা তিনি ও তাঁর পরিবার-পরিজন জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি কখনো কোন খাদ্যকে খারাপ বলেননি। তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটিও আবিষ্কার করেননি। যা কিছু পাওয়া যেতো তাই আহার করতেন। ক্ষুধা না থাকলে কিংবা খেতে ইচ্ছা না থাকলে হাত তুলে নিতেন।

হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস কা হলো, আপনার গৃহে নবী করীম (সা)-এর বিছানা কিসের তৈরী ছিল। তিনি বললেন, চামড়ার। তার মধ্যে খেজুরের বাকল ভরা ছিল। একই প্রশ্ন হযরত হাফসা (রা)-কেও জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এক টুকরো চট ছিল। আমরা সেটিকে দুই ভাঁজ করে দিতাম। একদিন রাতে আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে দিতে চাইলাম, যাতে নবী করীম (সা) একটু বেশী আরামবোধ করেন। সুতরাং তাই করা হলো। ভোরবেলা তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে তুমি আমার জন্য কি বিছিয়েছিলে ? আমি বললাম, আপনার সেই চটটিই বিছিয়ে ছিলাম। তবে সেটিকে চার ভাঁজ করেছিলাম যাতে আপনি একটু বেশী আরামবোধ করেন। তিনি বললেন, না! তুমি সেটিকে সেইরূপ করে দাও যেমন পূর্বে ছিল। ঐটি রাতে আমাকে তাহাজ্জুদ সালাত থেকে বিরত রেখেছে। ওফাতের পূর্বে তিনি বলেছিলেন, আমার ওয়ারিশরা আমার ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে অর্থকড়ি প্রভৃতি নগদ কিছু পাবে না। জনৈক ইয়াহূদীর নিকট ত্রিশ দিরহামের বিনিময়ে নবী করীম (সা)-এর একটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখা হয়েছিল। সেটি ছাড়িয়ে আনার মতো তাঁর নিকট অর্থ ছিল না। তিনি ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে তাঁর হাতিয়ার, একটি খচ্চর ও একটি বর্ম রেখে যান। এসব জিনিসও দান–খয়রাত করার নির্দেশ ছিল। যারা বলছেন যে, নবী করীম (সা) (নাইযুবিল্লাহ) ব্যক্তিগত স্বার্থ, উচ্চাভিলাষ, ধন-দৌলত লাভ ও দেশজয়ের জন্য তাঁর কওমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তারা কি অন্ধ নয় ? হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি আট বছর বয়সে নবী করীম (সা)-এর নিকটে আসি এবং একাধারে দশ বছর তাঁর নিকট থাকি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখন একবারও তিনি আমার কোন কাজে বিরক্তি প্রকাশ করেননি এবং একথা বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করেছ আর ঐ কাজটি কেন করনি। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে কখনো কোন অশ্লীল ও অনর্থক বাক্য বের হয়নি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার লোকেরা নবী করীম (সা)-কে বললো, মুশরিকদের জন্য বদ্‌দু'আ করুন। তিনি বললেন, আমি অভিশাপ দেয়ার জন্য আসিনি, বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর স্বভাবে কোন বেহুদাপনা ও অনর্থকতা ছিল না। তিনি শিশুদেরকে তাঁর কোলে বসাতেন এবং তাদের সাথে খেলা করতেন। রোগীদের শুশ্রূষা ও পরিচর্যার জন্য তিনি শহরের প্রত্যন্ত পল্লীতে চলে যেতেন। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথমে তিনিই সালাম করতেন। কেউ তাঁর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলে তার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন এমনটি কখনো ঘটেনি। শ্রদ্ধাবশত তিনি তাঁর সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকতেন না বরং কোন কুনিয়াত ধরে ডাকতেন এবং স্নেহমিশ্রিত পসন্দনীয় নামে তাদের স্মরণ করতেন। তিনি কারো কথা শেষ হওয়ার পূর্বে নিজের কথা শেষ করতেন না। অবশ্য কেউ যদি অশোভন কথা বলতো, তবে তিনি তাকে বাধা দিতেন কিংবা উঠে দাঁড়াতেন যাতে সে নিজেই বিরত হয়।

পরম সুচরিত্র

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছের উক্তি : আমি কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) অপেক্ষা অধিক সুচরিত্রবান দেখিনি। নবী করীম (সা) বলেন, বীর সেই ব্যক্তি নয়, যে লোকদেরকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, বরং বীর সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী ব্যক্তি। একবারের ঘটনা। মদীনাবাসী হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শত্রুর আক্রমণের মতো শোরগোল শুরু হয়। লোকেরা সেই শোরগোলের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু তারা দেখতে পেলো যে, নবী করীম (সা) সেই দিক থেকে ফিরে আসছেন। তিনি সবার আগে ঘোড়ার শূন্য পৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই দিকে গিয়েছিলেন। তিনি লোকদের বললেন, ঘাবড়িও না, কোন ভয় ও আশংকার কারণ নেই। বারা' ইব্ন আযিব (রা) বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন লোকেরা পলায়নপর ছিল আর এদিকে নবী করীম (সা) এই রিজ্য (কবিতার ছন্দ) পাঠ করছিলেন : اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ সেদিন তাঁর চেয়ে বড় বাহাদুর ও সাহসী আর কোন লোককে দেখা যায়নি। যুদ্ধ যখন খুব তুমুল আকার ধারণ করতো, তখন আমরা তাঁর আশ্রয় খুঁজতাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর ও বীর সেই ব্যক্তি বিবেচিত হতো, যে যুদ্ধের ময়দানে নবী করীম (সা)-এর বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো। হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর সহযাত্রী হয়েছিলাম। তিনি তখন একটি মোটা পাড়ের চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন। জনৈক বেদুঈন চাদরের আঁচল ধরে এমন জোরে টান দিলো যে, চাদরের পাড়ের ঘর্ষণে তাঁর কাঁধ ও ঘাড়ে দাগ পড়ে গেল। তিনি তার দিকে তাকালে সে বললো : হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্র সেই সম্পদ থেকে যা তোমার নিকট গচ্ছিত আছে, আমার দু'টি উটের উপরও কিছু বোঝাই করে দাও। কেননা তার মধ্য থেকে তুমি আমাকে যা দেবে, তা তোমার বা তোমার বাবার সম্পত্তি নয়। এই তিক্ত ও রূঢ় কথা শুনে প্রথমে তিনি পরম ধৈর্য ও কৃপায় নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, নিঃসন্দেহে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র এবং আমি তাঁর বান্দা। কিন্তু তুমি বলো, তোমার সাথেও কি ঐ রকম আচরণই করা হবে, যা তুমি আমার সাথে করেছো ? সে বললো, না! তিনি বললেন, কেন নয় ? সে বললো, কেননা, তুমি মন্দের বদলে মন্দ করো না। একথা শুনে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর তিনি ঐ ব্যক্তির এক উটের উপর যব ও আরেক উটের উপর খেজুর বোঝাই করে দিতে আদেশ করলেন।

একবার যায়দ ইব্ন সু'আনী নামক জনৈক ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিজের দেয়া কিছু ঋণের তাগাদা দিতে এলো এবং অনেক রকম বকাঝকা করতে লাগলো। বললো, তোমরা, আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা কখনো ঋণ পরিশোধ করো না এবং ওয়াদা পালন করো না। তার এই অবাধ্যাচরণ দেখে নবী করীম (সা) মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাকে ধমক দিয়ে এরূপ অবান্তর উক্তি করতে বাধা দিতে চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, উমর! আমাদের দু'জনের ক্ষেত্রে তোমার যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা তুমি করতে ব্যর্থ হয়েছো। ওকে ধমক দেয়া তোমার উচিত হয়নি, বরং তাকে ভদ্র ও নম্রভাবে তাগাদা করার উপদেশ দেয়া এবং আমাকে ওয়াদা পালন ও ঋণ পরিশোধ করতে বলা উচিত ছিল। এরপর তিনি ঐ ইয়াহূদীর ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং ধমক ও ভর্ৎসনার বিনিময়ে অতিরিক্ত বিশ সা 'অর্থাৎ আরো দেড় মণ যব দিয়ে দিতে বললেন। অথচ

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ তখনো তিনদিন অবশিষ্ট ছিল। ইয়াহূদী লোকটি মেয়াদ শেষ না হতেই তাগাদা করতে এসেছিল। দয়া-ধৈর্যের এই সুচরিত্র দেখে ইয়াহূদী মুসলমান হয়ে গেলো।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে আবূ সায়ফ কর্মকারের নিকট গেলাম। তাঁর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দুধ পান করাতো। ইবরাহীমের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তাঁর এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা)-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তাঁকে অশ্রুসজল দেখে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনিও অধৈর্য প্রকাশ করছেন ? তিনি বললেন : হে ইব্‌ন আওফ ! এ অশ্রু স্নেহ-মমতার কারণে; অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞতার কারণে নয়। অন্তর অবশ্যই ব্যথিত হয় আর চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু আমরা এমন কোন কথা উচ্চারণ করি না, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ কুড়ায়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আনসারদের কিছু লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু চাইল। তিনি তাদেরকে তা দিলেন। তারা আরো চাইল। তিনি তাদের আরো দিলেন। এমনকি তাঁর কাছে যা ছিল সবই দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু আসে, তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। তবে যে ব্যক্তি নিজকে ভিক্ষার অপমান থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে সেই অপমান থেকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দেন। ধৈর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম কোন দান আল্লাহ্ কাউকে দান করেননি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বারংবার বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পর্বতের সমান স্বর্ণও থাকে, তবু তা তিনদিন অতিক্রম করার পূর্বে বণ্টন করে দেয়ার মধ্যেই আমার আনন্দ। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য আমি যা তুলে রাখি সেগুলো ছাড়া। কখনো কখনো তাঁর নিকট যখন কিছু থাকতো না এবং কোন অভাবগ্রস্ত এসে পড়তো, তখন ঋণ করে হলেও তার অভাব দূর করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। সাধারণত তিনি এই ধরনের ঋণই করতেন। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য তিনি কখনো ঋণ করতেন না।

জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি এক যুদ্ধে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে পিছনে পড়ে গেলো। ইত্যবসরে নবী করীম (সা) এসে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জাবির ! তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আমার উটকে একটি তসমা (চামড়ার লম্বা টুকরো দ্বারা) মারলে সেটি খুব দ্রুত চলতে লাগলো। তারপর আমরা উভয়ে কথা বলতে বলতে চললাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই উটটি বিক্রি করবে ? আমি বললাম, হাঁ।

তিনি সেটি আমার নিকট থেকে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি আগে চলে এলেন এবং আমি কিছুটা বেলা বাড়ার পর পৌঁছলাম। আমি উট মসজিদের দরজায় বাঁধলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, উট রেখে দাও এবং মসজিদে এসে দু'রাকাআত সালাত আদায় করো। আমি সালাত শেষ করলে তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে উটের মূল্য পরিশোধ করতে বললেন। আমি মূল্য নিয়ে রওয়ানা হলাম। তিনি আবার আমাকে ডাকলেন। আমি আমার উট ফিরিয়ে দেয়ার আশংকা করলাম। কিন্তু আমি কাছে এলে তিনি বললেন, উটটিও নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও তোমারই থাকবে।

একবার নবী করীম (সা) একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে একজন লোক ছিল। তিনি মাটি খুঁড়ে দু'টি মিসওয়াক বের করলেন। একটি সোজা ছিল, আরেকটি বাঁকা। নবী করীম (সা) বাঁকাটি নিজে রাখলেন আর সোজাটি তাঁর সঙ্গীকে দিলেন। সঙ্গী বললেন, সোজাটি আপনি রাখুন। কিন্তু তিনি সেটি নিলেন না। বললেন, যে ব্যক্তি কারো সাহচর্যে থাকে, তা মুহূর্তের জন্যই হোক না কেন, কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সাহচর্যের দাবী তুমি পালন করেছিলে কিনা ?

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইয়াহূদী ও বিশর নামীয় জনৈক মুনাফিক মুসলমানের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিবাদ বাঁধে। তারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলো। তিনি উভয়ের অবস্থা তদন্ত করে ইয়াহূদীকে সত্যবাদী পেলেন এবং তার পক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। বাইরে এসে বিশর বললো, এ রায় ঠিক হয়নি। চলো আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট যাবো। সুতরাং তারা হযরত উমর (রা)-এর নিকট এলো। ইয়াহূদী এসেই বললো : আমরা দু'জনে নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন, কিন্তু সে তা মানেনি এবং আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। এখন আপনি যে ফায়সালা করবেন তাই মান্য করা হবে। হযরত উমর (রা) বিশরের দ্বারা ইয়াহূদীর এই বর্ণনায় সত্যতা যাচাই করলেন। বিশর বললো : হাঁ, সে (ইয়াহূদী) সত্যই বলেছে। আমরা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাঁর রায়ের উপর আপনার রায়কে প্রাধান্য দেই। হযরত উমর (রা) বললেন : তোমরা উভয়ে একটু দাঁড়াও। আমি এখনই ফায়সালা করে দিচ্ছি। একথা বলে তিনি অন্দরে চলে গেলেন এবং তলোয়ার নিয়ে এসে মুনাফিক বিশরের শিরোচ্ছেদ করলেন। বললেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মানে না, আমি তার ফায়সালা এভাবেই করে থাকি। এতে তার সঙ্গের মুনাফিকরা অনেক শোরগোল করলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে হযরত উমর (রা)-এর এই কাজকে সমর্থন করলেন এবং সেদিন থেকেই তাঁর লকব হলো 'ফারূক'।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। বনূ মাখযূমের ফাতিমা বিনতুল আসওয়াদ নাম্নী জনৈক মহিলা চুরির অপরাধে গ্রেফতার হলো। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর নবী করীম (সা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কুরায়শের অভিজাত মহল এটা তাদের জন্য লজ্জাকর ভাবলো। তারা সুপারিশ করে ঐ মহিলাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চাইল। কিন্তু সুপারিশ করার সাহস হলো না। শেষে হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে অনেক ধরাধরি করে রাযী করালেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট সুপারিশ করলেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন : উসামা ! তুমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সুপারিশকে স্থান দিচ্ছ ! তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন : জনমণ্ডলী ! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এজন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কোন অভিজাত পরিবারের কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহ্ সাক্ষী, ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মদ (সা)-ও যদি চুরি করতো, আমি নির্ঘাত তার হাত কেটে ফেলতাম।

সরলতা

একবার হযরত নবী করীম (সা) বলেন, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনভাবে নাসারারা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম-কে সীমার অধিক বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি তো আল্লাহ্‌র একজন বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আবদুল্লাহ্ ওয়া রাসূলুহু (আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল) বলবে।

একবার তিনি বাইরে আগমন করলে সাহাবায়ে কিরাম সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, আনারবরা যেরূপ একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ায়, তোমরা সেরূপ দাঁড়াবে না। (শিফা, কাযী আয়ায)। তিনি তাঁর আসহাবদের সাথে সম্পূর্ণ মিলেমিশে থাকতেন এবং মজলিসের যেখানে জায়গা পাওয়া যেতো, সেখানে বসে পড়তেন। তিনি চাকরদের কাজে অংশ নিতেন এবং তাদেরকে নিজের কাছে বসাতেন।

বহুবার এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন ব্যক্তি কোন ইয়াহূদীর কাছে ঋণী হয়েছে এবং ইয়াহূদী কড়া তাগাদা দিয়েছে। তখন ঐ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসেছে। তাঁর কাছে কিছু থাকলে তিনি তা দিয়ে দিয়েছেন। নতুবা ঐ ইয়াহূদীর নিকট তিনি নিজে গমন করেছেন এবং তাকে আরেকটু সময় দেয়ার জন্য বলেছেন। কিন্তু ইয়াহূদী ব্যক্তি তাঁর প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করত না। তখন তিনি এদিক-সেদিক চেষ্টা করে যেভাবে সম্ভব হতো ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করে দিতেন। তিনি বলেন, ক্ষুধার্ত ও গরীব-মিসকীনের জন্য তৎপর ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী, রাতভর ইবাদতকারী ও দিনভর সাওম পালনকারীর সমান মর্যাদা সম্পন্ন।

এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। জান্নাত লাভের আমল কি ? তিনি বললেন : সিদ্‌ক (সততা)। কেননা, মানুষ যখন সৎ হয় তখন নেক কাজ করে। আর যখন নেক কাজ করে, তখন ঈমানের নূর পয়দা হয়। আর যখন ঈমানদার হয়, তখন জান্নাতে প্রবেশ করে।

অন্য এক উপলক্ষে তিনি বলেন, খবরদার ! সৎ থাকো। সত্যের মধ্যে যদি তুমি ধ্বংসও দেখতে পাও। কেননা, মুক্তি তাতেই নিহিত। মক্কা থেকে বদর প্রান্তরে আসার সময় পথিমধ্যে আহ্‌নাস ইব্‌ন শুরায়ক আবূ জাহেলকে বললো, হে আবুল হাকাম ! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। এখানে আমাদের দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি আমাদের কথা শ্রবণকারী নেই। তুমি আমাকে সত্যি সত্যি বলো, মুহাম্মদ (সা) মিথ্যাবাদী, না সত্যবাদী ? আবূ জাহেল জবাব দিল, আল্লাহ্‌র কসম ! অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং সে কখনো ভুল তথ্য পরিবেশন করেনি।

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, হযরত নবী (সা) শরীফ পর্দানশীন কুমারী বালিকার চাইতেও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। কোন কথা যদি তাঁর অপসন্দ হতো, তবে তা আমরা সহসা তাঁর চেহারা থেকে বুঝে ফেলতাম। কারো কথা যদি তাঁর ভাল না লাগতো তবে তিনি তা ইশারা-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতেন যাতে সে লজ্জিত না হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম ও সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি কারো তোয়াক্কা করতেন না।

মধ্যপন্থা

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সা) যদি কারো কোন অপসন্দনীয় কথা জানতে পারতেন, তবে তিনি তার নাম নিয়ে বিশেষভাবে কিছু বলতেন না বরং এভাবে বলতেন সেই ব্যক্তি কেমন লোক, যে এরূপ কথা বলে ! তিনি বেশীর ভাগ সময়ই নীরব থাকতেন এবং বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট কথা বলতেন। এত

দীর্ঘও নয় যে, তাতে কোন অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কথা থাকতো। আবার এত সংক্ষিপ্তও নয় যে, কোন কাজের কথা বাদ থেকে যেত কিংবা বুঝে আসতো না। তাঁর চলনভঙ্গিও খুব পরিমিত ছিল। এত ধীরগতিও ছিল না যে, সহযাত্রীদের উপর বোঝা মনে হতো। আবার এত ত্বরিতগতিও ছিলেন না যে, শ্রান্তি ও ক্লান্তি আসতো। মোটকথা, ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা তাঁর প্রতিটি কাজ থেকেই পরিস্ফুটিত হতো।

হাস্য-কৌতুক

হযরত নবী করীম (সা) কখনো কখনো হাস্য-কৌতুকও করতেন। যেমন একবার তিনি কাউকে একটি উট দেয়ার ওয়াদা করেন। সে উট নিতে আসলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেবো। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললো আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কি করবো ? তিনি বললেন, উট যদি উটনীর বাচ্চা না হয়, তবে কার বাচ্চা ? তিনি কৌতুক করে উটকে উটনীর বাচ্চা বলেছিলেন। ঐ ব্যক্তি বুঝেছিল, সম্ভবত তিনি কমবয়সী ছোট বাচ্চা দিতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি হাস্য-কৌতুক করতেন বটে, কিন্তু হাস্য-কৌতুকের মধ্যে সত্য ও বাস্তব ছাড়া তাঁর মুখ থেকে কোন অবাস্তব বা মিথ্যা কথা বের হতো না। তিনি লোকদেরকে খেলাধুলা বা নির্দোষ আনন্দফূর্তি করতেও নিষেধ করতেন না।

পরম প্রশংসিত চরিত্র

হযরত নবী করীম (সা) যখন বসতেন, তখন মানুষের মধ্যে এরূপ মিলেমিশে বসতেন যে, কোন নবাগত ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পারতেন না এবং জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো যে, নবী কোন্ ব্যক্তি। যে বস্তু খাইলে মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তিনি তা পসন্দ করতেন না। তালিদার কাপড়ও পরিধান করতেন এবং ভাল কাপড় পাওয়া গেলেও তা ফেলে দিতেন না। তাঁর পোশাক সাদা কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিন কয়েক বার করে মিসওয়াক করতেন। তাঁর নিকট উপবেশনকারীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর শরীর, পোশাক বা মুখ থেকে কখনো গন্ধ আসেনি। যেখানে মার্জনায় সংশোধন হতো, সেখানে তিনি মার্জনা করতেন। কিন্তু যেখানে শাস্তির প্রয়োজন হতো, সেখানে শাস্তিও প্রদান করতেন। কেননা, যে দুষ্টরা তাদের দুষ্টামি থেকে বিরত থাকে না, তাদেরকে শাস্তি না দেয়া মন্দের সাহায্য করার নামান্তর।

মুসলমানদের দান-খয়রাতকে তিনি মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি, খ্রিস্টান, ইয়াহূদী, মুশরিক সবার সাথে বদান্যতা দেখাতেন। তাঁর উপর যতবড় বিপদই আসুক না কেন তিনি তা সহজেই সহ্য করে নিতেন। কিন্তু অন্যের বিপদ দেখলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। তিনি উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতেন এবং ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিতেন। ফলাফল প্রত্যাশা বিরোধী হতে পারে এমন আশংকায় তিনি ভীত হতেন না। তাঁর মধ্যে বিনয় ছিল, কিন্তু নীচতা ছিল না। ভীতি ছিল, কিন্তু রুক্ষতা ছিল না। বদান্যতা ছিল কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁর সামনে হঠাৎ আগমন করতো, সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়দ। আর যে কাছে এসে বসতো, সে ভক্ত বনে যেতো। সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখতেন। সুস্থ ব্যক্তিদেরকে সাবধান থাকার নির্দেশ দিতেন। মূর্খ ডাক্তারকে ডাক্তারী করতে নিষেধ করতেন। হারাম বস্তুকে ওষুধরূপে ব্যবহার করা অপসন্দ করতেন। কোন ব্যাপারে যখন দু'টি পন্থা সামনে আসতো, তখন সহজ পন্থাটি অবলম্বন করতেন। যুদ্ধবন্দীদেরকে মেহমানদের মতো তত্ত্বাবধান করতেন। তীরন্দাযী, চাঁদমারি, ঘোড়াদৌড় প্রভৃতি পুরুষোচিত শারীরিক ব্যায়ামেও তিনি অংশ গ্রহণ করতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উপরে আলোচিত হলো। এতদ্‌সঙ্গে তাঁর খাতামুন-নাবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আউয়ালীন ওয়ালা আখিরীন হওয়ার দলীল-প্রমাণও সন্নিবেশিত করার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, কুরআন করীমের সর্বশেষ কিতাব হওয়া, নূর ও হিদায়াত এবং পূর্ণাঙ্গ হিদায়াতনামা হওয়াও প্রমাণিত করা আবশ্যক ছিল। এই জরুরী বিষয় দু'টি হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবনী লেখক প্রত্যেক ঐতিহাসিকই অবশ্য লিখতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু যেহেতু ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র, দর্শন একেকটি স্বতন্ত্র বিষয়, তাই ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়গুলোকে অন্যদের জন্য রেখে দিয়েছেন আর এটাই ছিল সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। হুজ্জাতুল ইসলাম নামক গ্রন্থে আমি কুরআন ও নবুওয়াত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক সেটি দেখে নিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

খিলাফতে রাশিদা

খিলাফত ও খলীফা

খলীফা অর্থ স্থলবর্তী এবং খিলাফত অর্থ স্থলবর্তিতা। কিন্তু শরীআতের পরিভাষা ও ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় খলীফা অর্থ বাদশাহ বা সম্রাটের কাছাকাছি। ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত বৃত্তান্ত আরম্ভ করার পূর্বে খলীফা বা খিলাফত শব্দের আলোচনায় নিজের ও পাঠকদের সময় ব্যয় করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে জরুরী নয়। কিন্তু যেহেতু হযরত নবী করীম (সা)-এর স্থলবর্তিতার বিষয়টি একটি নৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়ে দু'টি কওমের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এই বিবাদ ঐতিহাসিকগণ, ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ, ঐতিহাসিক রচনাবলী ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনাভঙ্গিতেও তার প্রভাব রেখেছে—যার ফলে একজন প্রতিবেদকের কাজ কতকটা কঠিন হয়ে পড়েছে—তাই ইতিহাস পাঠকারীদেরকে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য খিলাফত বিষয়টি সম্পর্কে আপন মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাস প্রথমেই বর্ণনা করে দেয়া এবং এরপর খিলাফতে রাশিদার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা ইসলামের ইতিহাস লেখকদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কুরআনুল করীমে যেখানে যেখানে 'খলীফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার পরে 'আল-আরদ' (পৃথিবী) শব্দও অবশ্য এসেছে। আর اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম অর্থাৎ বনী আদমকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। বনী আদমের আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া স্পষ্ট এবং মানব জাতির সৃষ্টিজগতের উপর শাসনকর্তা হওয়া পরিষ্কার ব্যাপার। তাই এই পার্থিব মানব-খিলাফত নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র খিলাফত এবং মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহ্র খলীফা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এক অনুপম সত্তা। তিনি সবার স্রষ্টা ও মালিক। সার্বিকভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে যে আশরাফুল মাখলুকাতই হোক না কেনো— তাঁর স্থলবর্তী অর্থাৎ খলীফা হওয়া সম্ভব নয়। তাই মানব জাতিকে আল্লাহ্র আংশিক খলীফা ভাবতে হবে। আর তা এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত বাদশাহ ও হুকুমকর্তা, তেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে কেবল মানব জাতিকেই অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টির উপর বাহ্যত শাসক দৃষ্ট হয় এবং মানুষই প্রতিটি বস্তু ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি দ্বারা তার আনুগত্য করিয়ে নেয়। অতএব প্রমাণিত হলো আয়াতে-اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -এর মধ্যে খলীফা অর্থ শাসনকর্তা, অন্য কিছু নয়। কুরআন করীমের এক স্থানে বলা হয়েছে—

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ –

তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (৬ : ১৬৫)

এখানে মানবের সেই সাধারণ খিলাফতের মধ্যে বিশেষত্ব বিদ্যমান। অর্থাৎ তোমাদের জাতিকে শাসক জাতি বানিয়েছেন। অন্যান্য মানব শ্রেণী তোমাদের অধীনস্থ এবং তোমরা শাসক জাতি। এখানেও সেই খলীফা শব্দই বিদ্যমান, যার অর্থ শাসক ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে :

يٰدَاوٗدُ اِنَّ جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ ·

হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। (৩৮ : ২৬)

এখানেও একজন ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এখানেও খলীফা শব্দটি বর্তমান যার অর্থ বাদশাহ বা সম্রাট ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত দাউদ (আ)-এর এই রাজত্ব ও সাম্রাজ্য সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে– وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ (আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। (৩৮ : ২০) অতঃপর বিশিষ্ট মুসলমানগণ বিশেষত সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ·

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।" (২৪ : ৫৫)

অর্থাৎ যেমনিভাবে পৃথিবীতে আমি অন্যান্য লোককে শাসক বানিয়েছিলাম, তেমনিভাবে তোমাদের মধ্য থেকে (নবী (সা)-এর সম্বোধিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান আনবে এবং সংকর্ম করবে, তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করা হবে।

খিলাফতের অধিকার

কুরআনুল করীম অধ্যয়ন করলে একথাও দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পৃথিবীতে রাজত্ব ও সালতানাত তথা খিলাফত প্রদান করা কিংবা রাজত্ব ও সালতানাত কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ কাজ। যদিও প্রত্যেক কাজের প্রকৃত কর্মকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, কিন্তু তিনি খিলাফত ও সালতানাত প্রদানকারীরূপে সর্বত্র নিজকে নিজেই জাহির করেছেন। এ কার্যকে রূপকভাবেও অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করা হয় নি। এক স্থানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ·

বলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করো এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও (৩ : ২৬)।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন লোককে খিলাফত বা রাজত্ব দান করেন। অর্থাৎ যারা খিলাফত লাভ করেন, তাদের স্বতন্ত্র নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য কি ? আদম

বা বনী আদম যে পৃথিবীবাসীর উপর রাজত্ব লাভ করেছে, তার কারণ কুরআনুল করীম অধ্যয়ন করলে যা জানা যায় তা হচ্ছে, ইল্‌ম বা জ্ঞান। وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন (২ : ৩১)। ফেরেশতারা রক্তপাত ও ফাসাদ সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র খিলাফত লাভের পরিপন্থী ভেবেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার গুণকীর্তন করাকে খিলাফতের অধিকার ও নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করছি, মানব জাতি নিছক প্রশস্ত জ্ঞানের দরুনই অন্যসব সৃষ্ট বস্তুর উপর রাজত্ব লাভ করেছে। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর চেয়ে মানুষ যদি অধিক জ্ঞানী না হয়, তবে বাতাসের একটু ধাক্কা, পানির একটি ঢেউ, গাছের একটি পাতা ও জড় পদার্থের একটি অণুও মানুষকে কাবু করতে পারে এবং তাকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের বদৌলতে বাঘ, হাতি, নদী, পাহাড়, বাতাস, আগুন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সবকিছুকেই মানুষের সেবা, আনুগত্য ও আরামদানের জন্য প্রস্তুত ও গোলামের মতো অনুগত দৃষ্ট হচ্ছে। কুরআনুল করীমের উপর চিন্তা করলে দেখা যায় তালুতের রাজত্বের উপর যখন লোকেরা আপত্তি তুললো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে আপত্তিকারীদের জবাব দিলেন যে,

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ·

আল্লাহ্‌ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। (২ : ২৪৭)

হযরত দাঊদ (আ)-কে রাজত্ব ও খিলাফত দান করে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করলেন যে, فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়ালখুশীর অনুকরণ করো না। (৩৮ : ২৬)

আবার অন্যত্র বলেছেন :

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ · ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ·

তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ করো, তা দেখার জন্য। (১০ : ১৩-১৪)

কুরআনুল করীমে এই ধরনের হাজারো আয়াতের সন্ধান পাওয়া যায় যাতে খলীফা অর্থ শাসক এবং খিলাফত অর্থ রাজত্ব। আর রাজত্ব ও রাজ্য শাসনের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে জ্ঞান, সুবিচার, শক্তি, সংস্কার ও জনকল্যাণ, রাজা-বাদশাহ ও খলীফাদের জন্য যা সব সময় আবশ্যক ছিল এবং এসব শর্ত ও গুণ ছাড়া কোন বাদশাহ বা কোন সুলতান তার রাজত্ব ও সালতানাত টিকিয়ে রাখতে পারেন না। এই উত্তম গুণাবলী পয়গাম্বর ও রাসূলদের শিক্ষা

থেকেই লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক রাসূল ও প্রত্যেক পয়গাম্বর অবশ্যই রাজা-বাদশাহও হবেন। খিলাফতের জন্য যদি নিছক ইবাদত ও আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-কীর্তন করাই জরুরী হতো, তবে কেবল পয়গাম্বর বা ফেরেশতাকেই পৃথিবীতে শাসকরূপে দেখা যেতো এবং তাদের ছাড়া অন্য কেউ সালাতানাত বা রাজত্ব লাভ করতে পারতো না। কিন্তু পর্যবেক্ষণ তা সমর্থন করে না। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই ফল বেরিয়ে আসলো যে, খিলাফত মূলত রাজত্ব ও সালতানাত ধৈর্য ছাড়া আর কিছু নয়। খলীফা বা রাজা-বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বানান এবং যখন কোন শাসক জাতি জাতিগতভাবে জুলুম-অত্যাচারে নেমে আসে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে রাজত্ব বা খিলাফত ছিনিয়ে নেন এবং অন্য যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

ইসলামী খিলাফত

মানব জাতির সমগ্র উন্নতি-উৎকর্ষ এবং মানুষের সমস্ত জ্ঞানগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব মূলত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর শিক্ষাবলীরই ফল। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) পৃথিবীতে কখনো শিক্ষক হিসাবে আগমন করেছেন–যেমন, হযরত ঈসা (আ)। আবার কখনো বাদশাহ হিসাবে এসেছেন-যেমন হযরত দাঊদ (আ)। বাদশাহ নবীর শরীআত শিক্ষক-নবীর শরীআতের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ ও বৃহৎ। শিক্ষক-নবী তাঁর উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের জীবনের জন্য একটি আদর্শ পেশ করেন। কিন্তু বাদশাহ নবী আদর্শ পেশ করা ছাড়াও ঐ আদর্শের উপর লোকদেরকে আমলকারী বানিয়ে তোলেন। অর্থাৎ তাঁর আনীত শারীআতকে প্রায়োগিক আইনের মর্যাদা দেয়া হয়। শিক্ষক-নবী যখন তাঁর মিশন শেষ করে এই দুনিয়া থেকে চলে যান, তখন নবুওয়াত কার্যে অন্য কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কেননা, নবী আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পেয়ে বান্দাদের নিকট খবর পৌঁছান। অর্থাৎ তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হয়। এখন এই কাজে কেউ যদি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তাহলে তার উপরও ওয়াহী নাযিল হওয়া উচিত এবং নবী যে কাজ করতেন, তিনিও তাই করবেন। এমতাবস্থায় খোদ ঐ স্থলাভিষিক্তকেও নবী বলা হবে এবং তার মধ্যে ও তার পূর্ববর্তীর মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। প্রথম নবী দুনিয়া থেকে তখনই বিদায় হন, যখন নবুওয়াতের কার্য সমাপ্ত করে ফেলেন, তাই তাঁর জন্য কোন স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ অন্য কোন নবীর আদৌ প্রয়োজন হয় না। আর এ কারণেই সে নবী শুধু শিক্ষক-নবী ছিলেন, তাঁর কোন স্থলাভিষিক্ত ছিল বলে শোনা যায় না। কিন্তু বাদশাহ-নবী যেহেতু নবী হওয়া ছাড়া বাদশাহও হয়ে থাকেন, তাই তাঁর তিরোধানের পর নবুওয়াত কার্যে তাঁর কোন স্থলাভিষিক্ত হন না বটে, কিন্তু সালতানাত কার্যে অবশ্যই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বাদশাহ-নবীর স্থলাভিষিক্তও বাদশাহ্ হন এবং যেহেতু তিনি নবী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পূর্ণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, সেহেতু তাঁর সালতানাত ও রাজত্বের নমুনা আরও উৎকৃষ্টতম হয়ে থাকে। এই স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নবীর আনীত শরীআতে তিল পরিমাণও পরিবর্তন সাধন করতে পারেন না। কেননা, নবুওয়াতকার্য অর্থাৎ শরীআতের কাজ তো নবীই শেষ করে গেছেন। রাসূলের এই খলীফার কাজ হচ্ছে কেবল আপন রাসূলের পূর্ণ তরীকা মতো রাজত্ব ও সালতানাতের কাজ চালানো। এ জন্যই তাঁর রাজত্ব ও সালতানাত অন্যান্য রাজত্ব থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও শ্রদ্ধার্হ বিবেচিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেহেতু পূর্ণ, পরিণত ও শেষ রাসূল ছিলেন এবং পরিপূর্ণ নির্দেশপত্র নিয়ে এসেছিলেন, সেহেতু তিনি বাদশাহ-নবী

ছিলেন। তাঁর রাজত্ব ও সালতানাত দুনিয়ার তামাম রাজত্ব ও সালতানাতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উৎকৃষ্টতম আদর্শ–যেমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর জীবন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জন্য উৎকৃষ্টতম জীবনাদর্শ। নবী করীম (সা)-এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই সালতানাতের কার্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এই স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি নবী করীম (সা)-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন, তাঁরা সালতানাতের খলীফা ছিলেন, তাঁরা সালতানাত ও রাজত্বকে নবী করীম (সা)-এর রাজত্ব ও সালতানাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল রাখার অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতা রাখতেন। সুতরাং তাঁদের রাজত্ব ও সালতানাত খিলাফাতে রাশিদা নামে অভিহিত হয়েছে। তারপর যতই নবী করীম (সা) থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে খিলাফতের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যে ততই তারতম্য ঘটেছে।

খিলাফত প্রশ্নে মতানৈক্য

মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও সৃষ্টি হয়েছে, যারা নবী করীম (সা)-এর খলীফাগণ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তগণ সম্পর্কে উদ্ভট উদ্ভট আপত্তি উত্থাপন করেছে। কাউকে অপরাধী ও জালিম এবং কাউকে নিষ্পাপ ও মজলুম সাব্যস্ত করেছে। অথচ খিলাফত সম্পর্কে কোন মানুষের কোন অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর রাজত্ব ও খিলাফতকে কাউকে দান করা বা কারো নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কাজটি কেবল নিজের সাথেই সম্পৃক্ত রেখেছেন। বাহ্যিক বা রূপকভাবেও খিলাফত দান বা তা ছিনিয়ে নেয়ার কাজকে কোন মানুষের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেননি। আর এ কারণেই স্বয়ং নবী করীম (সা)-ও খলীফার নির্বাচন ও নিযুক্তি সম্পর্কে কোন নির্দেশ দান করেননি। কুরআনুল করীম বলে দিয়েছে খলীফাকে কি কাজ করতে হবে, কোন্ কাজ থেকে বিরত ও ভীত থাকতে হবে। কোন সৎকর্ম খিলাফতের উপযুক্ত বানায় তাও বলে দিয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খলীফা অর্থাৎ তাঁর পরে মুসলমানদের শাসক কে হবে–একথা বলেনি। সাওম, সালাত, হাজ্জ, যাকাত এবং বান্দার হক ও আল্লাহ্র হকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ও ইসলামী শরীআত স্পষ্ট ও প্রমাণসিদ্ধরূপে বর্ণনা করেছে। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা খিলাফত দান করেন এবং স্বয়ং তিনিই খিলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর খিলাফত লাভের উপকরণ যুগিয়ে দেন–এর মধ্যে এই গূঢ় রহস্যই নিহিত ছিল। খিলাফত লাভের কাজ যেহেতু মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মানবীয় ফন্দি-কৌশলের উর্ধ্বে, তাই মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম খিলাফতের উপযুক্ত কে ছিলেন এবং তারপর কে ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর কার্য দ্বারা তা বাতলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে লড়াই-ঝগড়া করা ও প্রশ্ন তোলা একেবারে অবান্তর এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নামান্তর। নবী করীম (সা)-এর পর কার খলীফা হওয়া উচিত ছিল ? তার জবাব পরিষ্কার : যিনি খলীফা হয়েছেন, তাঁরই। একথা বলা ঠিক নয় যে, যিনি খলীফা হয়েছেন, তিনি খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না। অন্য দৃষ্টিকোণে একথা বলার অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, খলীফা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বানাননি। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে খলীফা বানাতে চেয়েছিলেন, তাকে বানাতে পারেন নি এবং মানবীয় ফন্দি-কৌশলের কাছে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তা'আলা পরাজিত হয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি তুলেছে,

তাদের অবস্থা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো, যে বিচারকের আদালত থেকে নিজের প্রত্যাশা বিরোধী রায় শ্রবণ করে আদালত থেকে বের হয়ে আসে এবং বাইরে এসে বিচারককে গালাগাল করে। কিন্তু বিচারক তবু বিচারকই থাকেন এবং এই অপরাধী অপরাধীই থাকে। বিচারকের রায় এই অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অসন্তোষ রদ করতে পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা খিলাফত সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং যাকে খলীফা বানাতে চেয়েছেন, তাকেই খলীফা বানিয়েছেন। এখন আল্লাহ্‌র এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তবে হোক।

وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ

এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।

দীনী খিলাফত ও জাগতিক সালতানাতের পার্থক্য

খিলাফত সম্পর্কে উপরে যা উল্লিখিত হয়েছে তাতে এ সন্দেহ হতে পারে যে, খিলাফত বলা হয় নিছক রাজত্ব ও সালতানাতকে। এই হিসাবে প্রত্যেক রাজা-বাদশাহকেই খলীফা বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, ধর্মের সাথে খিলাফতের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একথা জ্ঞাত থাকা উচিত যে, মুসলমানদের মধ্যে খলীফা কেবল সেই রাজা-বাদশাহ বা শাসককেই বলা যেতে পারে, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সালতানাতের উত্তরাধিকারী এবং সালতানাতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রূপে দীনী কার্যাবলী অর্থাৎ সালাত, ফাতওয়া, কাযা, আদালত, ইহতিসাব, জিহাদ প্রভৃতির বন্দোবস্ত ও শরীআতের আহকাম পালনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন। ইসলামী শরীআত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণের বাহক। একজন অমুসলিম ও ইহলৌকিক রাজা-বাদশাহ্‌র দ্বারা মানব জাতির যে সেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্ম সাধিত হয়, তার চেয়ে অনেক উত্তমভাবে এ কাজটি সমাধা হয় খলীফা অর্থাৎ রাসূলের আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীর দ্বারা। ইসলামী শরীআত যেহেতু তার অনুসারীকে প্রতিটি পার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী করে তোলে, তাই যে রাষ্ট্র ইসলামী শরীআত অনুযায়ী পরিচালিত হবে, সেটিই মানব জাতির জন্য অধিক কল্যাণকর ও উত্তম বলে বিবেচিত হবে। ইসলামী শরীআত এও কামনা করে যে, মুসলিম জনগণ সেই রাষ্ট্র ও সালতানাতের অধীনেই জীবন যাপন করবে যা ইসলামী শরীআত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, ইসলামী শরীআতের সাথে খিলাফতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের সাথে খিলাফতের কোন সম্পর্ক নেই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। যে রাষ্ট্র ও সালতানাত শরীআতী আহকাম অনুযায়ী কায়েম হয়, আর যে রাষ্ট্র ও সালতানাত জোরজবরদস্তি তথা মানবীয় কলা-কৌশলের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, তা কখনো মানব জাতির জন্য ততটা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক প্রমাণিত হতে পারে না, যতটা শরীআতী কানুন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র মানব জাতির জন্য কল্যাণের কারণ হয়। শরীআতী কানুন অনুযায়ী যে রাষ্ট্র দুনিয়ায় কায়েম হয়েছিল, তা ছিল নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের রাষ্ট্র। দুনিয়ায় এর পূর্বে কিংবা এর পর এমন কোন রাষ্ট্র দেখা যায় না, যা নবী করীম (সা)-এর আসহাবদের রাষ্ট্র থেকে উত্তম এবং মানব জাতির জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত করা যেতে পারে। সেই হুকুমাত ও সালতানাতেরই নাম খিলাফতে রাশিদা। তারপর যদিও খিলাফতের নামে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু তাতে অল্প বিস্তর পার্থিব রাজা-বাদশাহদের রীতি-নীতি যোগ হতে থাকে এবং সেই হারেই শরীআতী রাষ্ট্র ও শরীআতী

কানুনের রূপ পাল্টে যেতে থাকে।

কোন জাতি, গোত্র বা পরিবারের সাথে খিলাফতের সম্পর্ক

কুরআনুল করীমে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

يَاَيُّهَ النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (১৫ : ৯)

ইসলাম দুনিয়ায় মানুষের খান্দানী অহমিকা এবং গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য দূর করে একই জাতি বানাতে চেয়েছে। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই) বলে সমস্ত ভ্রাতৃসংঘকে একই ভ্রাতৃসংঘ এবং সমস্ত জাতিকে একই জাতি বানিয়ে দিয়েছে। আর এ জাতির নাম হচ্ছে মুসলমান বা মু'মিন জাতি।

সারা দুনিয়ায় জাতি গোষ্ঠী ইসলামী শিক্ষা অনুসারে কেবল দু'টিই হতে পারে : এক, মু'মিন ও মুসলিম, দ্বিতীয় কাফির ও মুশরিক। তাওহীদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে জাতিগত বিভিন্নতা তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। জাতি ও গোত্র-গোষ্ঠীর বিভিন্নতা দ্বারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে চিনা-পরিচয়ের সুবিধা হয়–এ ছাড়া এর ভিন্ন কোন তাৎপর্য নেই। ইযযত, সম্মান, রাষ্ট্রক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বদা ইযযত-সম্মানের যোগ্য লোকদেরই প্রদত্ত হয়ে থাকে। সে যে কোন গোত্র, গোষ্ঠী ও জাতিরই হোক না কেন। সম্মানের অধিকারী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে তাকওয়া ও ঈমান। রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও খিলাফতের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি (কেননা, সুস্থ জ্ঞান সর্বদা সুস্থ শরীরেই থাকে), তাকওয়া, সুবিচার, সংস্কার প্রভৃতি শর্ত জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর শর্ত কখনো আরোপ করেননি। ইসলাম আনসারকে মুহাজিরদের ভাই বানিয়েছে। ইসলাম আবূ জাহেলের মতো কুরায়শকে মদীনাবাসী যুবকদের দ্বারা নিহত করিয়েছে। ইসলাম হাবশী বিলালকে আরব অভিজাতদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। ইসলাম উসামা ইব্ন যায়দকে উমর ফারূক (রা)-এর নেতা ও অনুসরণীয় বানিয়েছে। ইসলাম বাদশাহ ও গোলামকে পাশাপাশি এক কাতারে দাঁড় করিয়েছে।

ইসলাম নবী করীম (সা)-এর দ্বারা ঘোষণা করিয়েছে যে, ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বারাও যদি চৌর্যবৃত্তি সংঘটিত হতো, তবে তাঁর হাতও তেমনিভাবে কাটা হতো, যেমনিভাবে অন্য কোন নারীর। ইসলাম হযরত নবী করীম (সা)-এর দ্বারা ঘোষণা করিয়েছে যে, জনমণ্ডলী! কোন সাধারণ হাবশী গোলামও যদি তোমাদের শাসক বা খলীফা নিযুক্ত হয়, তবে তোমরা তার আনুগত্য করবে। ইসলামই হযরত উমর ফরূক (রা)-এর দ্বারা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে বলিয়েছে যে, আজ যদি আবূ হুযায়ফার গোলাম সালিম জীবিত থাকতো, তবে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করতাম। মোটকথা, ইসলাম গোত্রীয় ও বংশীয় অহমিকার প্রতিমাকে টুকরো টুকরো ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এটা নিতান্তই বিরাট ও

মূল্যবান খিদমত ছিল যা ইসলাম মানব জাতির জন্য আঞ্জাম দিয়েছে। আজ ইসলাম দুনিয়ার সমস্ত ধর্মমত ও আইন-কানুনের কাছে এই মর্মে গর্ব করতে পারে যে, তার কোনটি থেকেই খান্দানী অহমিকার ভয়ানক প্রতিমা তার স্থান থেকে হঠানো হয়নি। কিন্তু ইসলাম তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার ধূলি বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

কি আশ্চর্যের ব্যাপার! আজ ইসলাম ও ইসলামী আইন অনুসরণের দাবীদার কিছু মুসলমানকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ইসলাম নির্দেশ দিয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশ ও কামনা ছিল খিলাফত কেবল কুরায়শ বংশ বা বনূ হাশিম গোত্র কিংবা হযরত আলী ও আলীর সন্তানদের মধ্যে সীমিত থাকবে, অপর অন্য কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই খিলাফতের হকদার হতে পারে না। এমন যদি হতো, তবে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল মজীদে তা পরিষ্কারভাবে বলে দিতেন এবং নবী (সা) সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আহকাম ঘোষণা করে যেতেন। যদি বলা হয় যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ এ সম্পর্কীয় আহকাম নাযিল করেছিলেন এবং সে আহকাম চালাকী করে খিলাফত ছিনতাইকারীরা গোপন করে ফেলেছে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদী (নাউযুবিল্লাহ) প্রতিপন্ন হন। যিনি ওয়াদা করেছিলেন যে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۔

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক। (১৫ : ৯)

আর নাউযুবিল্লাহ! নবী করীম (সা)ও ফরয প্রচারকার্যকে কখনো পূর্ণভাবে আঞ্জাম দেননি। বিদায় হজ্জের ভাষণেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও খিলাফত বনূ হাশিমের মধ্যে সীমিত থাকা সম্পর্কে কিছু বলেননি। অথচ এই ভাষণ শেষে তিনি সোয়া লাখ মানুষের সমাবেশে স্বীয় প্রচারকার্য পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা করেন। উপস্থিত জনতার কাছে তার সত্যায়ন চান। তারপর অন্তিমকালে তিনি প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও ওসীয়ত করেছেন। কারো কাছে এক দিরহাম বা এক দীনার ঋণী থাকলেও তিনি তা পরিশোধ করেন। কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে এই বিরাট খিলাফত-ঋণটি পরিশোধ করেননি।

বস্তুত তিনি জানতেন যে, খলীফা বানানোর কাজ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এবং এ কাজটির জন্য তিনি নবীকে আদৌ কষ্ট দেননি। হাঁ, নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে এটা অবশ্যই জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, আমার পর আল্লাহ্ তা'আলা কাকে তাঁর খলীফা বানাবেন। তাই তিনি তাঁর অন্তিম রোগাক্রান্ত অবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সালাতের ইমামতির জন্য স্বীয় স্থলাভিষিক্ত বানান এবং ওসীয়ত প্রসঙ্গে মুহাজিরদের বলেন যে, তোমরা আনসারদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের জন্য এইভাবে সুপারিশ করাই প্রমাণ করে যে, তিনি অবগত হয়েছিলেন তাঁর পরে তাঁর খিলাফত আনসাররা নয়, বরং মুহাজিররা লাভ করবে। তিনি এও বলেন যে, الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك (আমার পরে ত্রিশ বছর খিলাফত, তারপর রাজতন্ত্র।) তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে এও অবগত হন যে, الائمة من قريش (ইমাম কুরায়শের মধ্য থেকে হবে)। এসব ছিল তাঁর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, নির্দেশ ছিল না। এখন কেউ যদি الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك (আমার পরে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। তারপর রাজতন্ত্র চালু হবে।)-কে নির্দেশ সাব্যস্ত করে, তবে সেটা

হবে একটি মস্ত প্রতারণা। প্রকৃত সত্য নয়। الائمة من قريش-এর অবস্থাও তদ্রূপ। নিঃসন্দেহে সেখানে কুরায়শের মধ্যেই সমুন্নত মেধা ও সমুন্নত জ্ঞান ও তাকওয়া বিদ্যমান ছিল এবং এই সব সৎ গুণের মধ্যেই নিহিত ছিল অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করেন। তারপর যখন তাদের সেই অবস্থা আর থাকলো না, তখন অন্য লোকদের মধ্য থেকে যাকে খিলাফত পদের জন্য উত্তম মনে হতো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে খিলাফত ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা দান করেন। সে যা হোক, খিলাফত বা রাষ্ট্র ও সালতানাত কোন বিশেষ খান্দানের সম্পত্তি নয়, এটি আল্লাহ তা'আলার একটি দান। এটি সচরাচর তারাই লাভ করে, যারা নিজেদেরকে তার উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারে। আবার তারা যখন অযোগ্য ও অনুপযুক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট থেকে ঐ দান ছিনিয়ে নেন এবং অন্যদেরকে দান করেন। আর এটাই আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রত্যাশা করা উচিত ছিল।

খিলাফত ও পীর-মুরীদী

কেউ কেউ মনে করেন, সূরা নূরের খিলাফত দান সংক্রান্ত আয়াতে যে খিলাফতের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে পীর-মুরীদীর সিলসিলা। আমার মতে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পীরও তাঁর মুরীদদের শাসক। কিন্তু এই শাসন ও খিলাফতের ফরমান জারির মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ। কোন পীরকে পৃথিবীর শাসক ও পৃথিবীর বাদশাহ কখনো বলা যেতে পারে না। কুরআনুল করীম খলীফার অর্থ বোঝানোর জন্য হযরত আদম (আ) ও হযরত দাউদ (আ)-এর নাম উচ্চারণ করে এবং তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের সুযোগই অবশিষ্ট রাখেনি। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কুরআনুল করীমের পরিভাষাই গ্রহণ করতে হবে। কুরআনুল করীম তার শব্দের অর্থ সে নিজেই বলে দেয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (রা)

নাম ও নসব

তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কুহাফা ইব্ন আমির ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তামীম ইব্ন মুররাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাদর ইব্ন কিনানা। মুররাহ পর্যন্ত গিয়ে তাঁর নসবনামা নবী করীম (সা)-এর নসবের সাথে মিলে যায়। পূর্বপুরুষের দিক থেকে তিনি একই স্তরের ছিলেন। কেননা, দুই দিক থেকেই মুররাহ পর্যন্ত ছয় ছয় পুরুষের দূরত্ব ছিল। তাঁর মাতার নাম সালমা বিন্ত সাকার ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ। ইনি আবূ কুহাফার চাচাত বোন ছিলেন এবং উম্মুল খায়র নামে পরিচিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিতা আবূ কুহাফা (রা)-এর নাম উসমান। জাহিলী যুগে তিনি আবদুল কা'বা নামে পরিচিত ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তাঁর এক নাম আতীকও ছিল। কিন্তু জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহমাতুল্লাহ আলায়হি তারীখুল খুলাফায় লিখেন, জমহূর উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, আতীক তাঁর নাম নয়, বরং লকব ছিল। কেননা, হাদীস শরীফ মতে তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে আতীক বা মুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, সৌন্দর্যের কারণে তিনি আতীক নামে অভিহিত হন। কারো কারো মতে, যেহেতু তাঁর নসবনামায় দূষণীয় কোন বস্তু নেই, তাই তিনি আতীক নামে পরিচিত।

তাঁর লকব ছিল সিদ্দীক। এ ব্যাপারে সকল উম্মতে মুহাম্মদী একমত। কেননা, তিনি নির্ভীকভাবে হযরত নবী করীম (সা)-কে নির্দ্বিধায় সমর্থন করেন এবং নিজেকে সত্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেন। মি'রাজ সম্পর্কেও তিনি কাফিরদের মুকাবিলায় অনমনীয়তা প্রদর্শন করেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর উক্তিসমূহ সমর্থন করেন। তিনি হযরত নবী করীম (সা) থেকে দু'বছর দু'মাস ছোট ছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হযরত নবী করীম (সা) থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি বাইরেও গমন করতেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন এবং মদীনায়ই তিনি ইনতিকাল করেন।

জাহিলিয়াত যুগ

জাহিলী যুগে কুরায়শের আভিজাত্য ও নেতৃত্ব ছিল দশটি পরিবারের মধ্যে সীমিত ও বিভক্ত। ঐ সম্ভ্রান্ত নেতৃ-পরিবারগুলো হচ্ছে এই :

(১) হাশিম, (২) উমাইয়া, (৩) নাওফিল, (৪) আবদুদ দার, (৫) আসাদ, (৬) তামীম, (৭) মাখযূম, (৮) আদী, (৯) আজ্জ, (১০) সাহ্ম। এদের মধ্যে বনূ হাশিমের দায়িত্ব ছিল সিকায়া-অর্থাৎ হাজীদেরকে পানি পান করানো। বনূ নাওফিলের দায়িত্ব ছিল নিঃসম্বল হাজীদেরকে অন্নদান ও পথ খরচা দেওয়া। বনূ আবদু'দ্-দার এর দায়িত্বে কা'বাগৃহের চাবি ও পাহারাদারি, বনূ আসাদের দায়িত্বে পরামর্শ ও পরামর্শ সভার বন্দোবস্ত করা, বনূ তামীম–

রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, বনূ আদী-দৌত্যকার্য ও কওমী আভিজাত্য রক্ষা, বনূ 'আজ্জ-ভাগ্য-তীর সংরক্ষণ, মাখযূম–প্রতিমার নৈবেদ্য সংরক্ষণ। বনূ তামীমের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণের ফায়সালা করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যা মেনে নিতেন, গোটা কুরায়শ বংশ তাই মেনে নিতো। কেউ যদি অন্য কিছু স্বীকার করতো, তবে কেউই তা সমর্থন করতো না। অনুরূপভাবে বনূ আদীর মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব দৌত্যকার্য আঞ্জাম দিতেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি দূত হিসাবে গমন করতেন এবং মুকাবিলার মধ্যে কওমী আভিজাত্য বর্ণনা করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কেবল তাঁর গোত্রের সরদার ও কুরায়শী দশ নেতার অন্যতমই ছিলেন না, তিনি বিত্ত-বৈভবের দিক থেকেও বিরাট ঐশ্বর্যশালী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি কুরায়শদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। বিপদে ধৈর্যশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। মানুষ তাদের সমস্যার ব্যাপারে তাঁর নিকট এসে পরামর্শ গ্রহণ করতো এবং তাঁকে একজন উঁচুদরের সুবিচারক মনে করতো। আর এ কারণেই তিনি যখন মক্কা থেকে বিদায় হয়েছিলেন, তখন ইব্নুদ-দাগিনা তাঁকে পথিমধ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, পূর্বেই সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বংশাবলী ও আরব তথ্য বিশারদ ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি অন্যায় অপকর্ম ও নোংরামি থেকে দূরে থাকতেন। জাহিলী যুগেও তিনি কোন প্রকার মদ্যপান করেন নাই। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কখনো শরাব পান করেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন, নাউযুবিল্লাহ, কখ্খনো নয়। সে জিজ্ঞেস করলো, কেন পান করেননি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার শরীর থেকে গন্ধ আসুক এবং মনুষ্যত্ব অপসৃত হোক, তা আমি চাইনি। একথা নবী করীম (সা)-এর মজলিসে উত্থাপিত হলে তিনি দু'বার বলেন, আবূ বকর সত্য বলেছেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সুঠাম, সুডৌল, ভদ্র, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এ কারণেই নবী করীম (সা) তাঁকে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তিনি এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেননি। তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন এবং সাহায্য-সহায়তার অঙ্গীকার করেন। সে অঙ্গীকার খুব সৌকর্যের সাথে পালন করেও দেখান। হযরত নবী করীম (সা) বলেন, আবূ বকর সিদ্দীককে আমি ইসলামের দাওয়াত দিলে সে তা গ্রহণ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। একবার হযরত নবী করীম (সা) বলেন, নবী ছাড়া আবূ বকরের চেয়ে আর কোন ভাল ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ঘটেনি। তিনি যেহেতু কুরায়শদের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাই তাঁর প্রচারণায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা), হযরত তাল্হা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ও হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ ব্যক্তিত্বও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলামী যুগে

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর উপর ঈমান আনেন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেন, তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। মায়মুন ইব্ন মিহ্রান-এর নিকট কেউ প্রশ্ন করলো যে, আপনার মতে আলী (রা) উৎকৃষ্ট, না আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ? একথা শুনে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আমার এটা জানা ছিল না যে, আমি এই দু'জনের মধ্যে তুলনা করার সময় পর্যন্ত

বেঁচে থাকবো। আরে! এ দু'জন তো ছিলেন ইসলামের মাথা স্বরূপ। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা) ঈমান আনেন। আর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদীজাতুল-কুবরা (রা)।

আলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ছাড়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ছেড়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে হিজরতের গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে ছিলেন। বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত আলী (রা)-কে বলেন, তোমাদের একজনের সাথে আছেন জিবরাঈল এবং আরেকজনের সাথে আছেন মীকাঈল। বদরের যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) মুশরিকদের লশকরে শামিল ছিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার পর তাঁর পিতা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললেন, বদরের দিন আপনি কয়েকবার আমার তীরের আওতায় এসেছিলেন, কিন্তু আমার হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি যদি এরূপ সুযোগ পেতাম, তবে আমি তোমাকে লক্ষ্যস্থল না বানিয়ে ছাড়তাম না।

বীরত্ব

হযরত আলী (রা) একবার লোকদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মতে বীরশ্রেষ্ঠ কোন্ ব্যক্তি? সবাই জবাব দিলো–আপনি। তিনি বললেন, আমি সর্বদা আমার সমপর্যায়ের জুড়ির সাথে লড়াই করি। এটা কোন বীরত্ব নয়। তোমরা বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম বলো। সবাই বললো, আমরা জানি না। হযরত আলী (রা) বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। বদর দিবসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি ছাউনি বানিয়েছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে কে থাকবে ? তাঁর উপর মুশরিকদের হামলা কে প্রতিহত করবে ? আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্যে কেউ সাহস করলো না। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক উলঙ্গ তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাউকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। যে ব্যক্তিই নবী করীম (সা)-এর উপর হামলা করেছে আবূ বকর সিদ্দীক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

একবার মক্কা মুআয্যামায় মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হেঁচড়াতে লাগলো এবং বলতে লাগলো যে, তুমিই হচ্ছো সেই ব্যক্তি, যে এক খোদার প্রবক্তা। আল্লাহ্র কসম! কাফিরদের মুকাবিলা করার সাহস কারো হলো না। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এগিয়ে এলেন। তিনি কাফিরদের মারতে মারতে হটিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, হায় আফসোস! তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন যে, আমার আল্লাহ্ এক ও একক। একথা বলে হযরত আলী (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, এখন তোমরা বলো, ফিরাউনের স্ত্রী উত্তম মু'মিন, না আবূ বকর (রা) ? কিন্তু লোকেরা যখন কোন উত্তর দিলো না, তখন তিনি বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন ? আল্লাহ্র কসম! আবূ বকরের এক মুহূর্ত তার হাযার মুহূর্ত অপেক্ষা উত্তম। তিনি তো ঈমান গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু আবূ বকর (রা) ঈমান প্রকাশ করে দিয়েছেন।

দানশীলতা

তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَا لَهٗ يَتَزَكّٰى আর তা (জাহান্নাম) থেকে বহুদূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য (৯২ : ১৭-১৮)।

এ আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছেন তিনিই। তাই হযরত নবী করীম (সা) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের সম্পদ দ্বারা আমার যতখানি উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা ততখানি হয়নি। একথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (সা) ক্রন্দন করে বললেন, আমি আর আমার সম্পদ বলতে কিছুই নেই–সব কিছুই আপনার বদৌলতে। অন্য এক হাদীসে আছে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্পদ নিজের সম্পদের মতোই ব্যবহার করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন তাঁর নিকট চল্লিশ হাযার দিরহাম ছিল। তিনি তাঁর সবটাই হযরত নবী করীম (সা)-এর জন্য ব্যয় করেন। একদিন হযরত উমর ফারূক (রা) জায়শে উসরত বা তাবূক যুদ্ধের চাঁদার কথা উল্লেখ করে বলেন, হযরত নবী করীম (সা) যখন আমাদেরকে চাঁদা দান করার আদেশ করলেন, তখন আমি হযরত আবূ বকরের চাইতে বেশী চাঁদা দেয়ার সঙ্কল্প করলাম এবং আমার অর্ধেক সম্পদ দান করলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখেছেন ? আমি বললাম, বাকী অর্ধেক ! ইতোমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক তাঁর সমুদয় সম্পদ নিয়ে উপস্থিত। হযরত নবী (সা) তাঁকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট। আমি এই অবস্থা দেখে বললাম, আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে কোন ব্যাপারেই অগ্রগামী হতে পারবো না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সা) বলেন, আমি সবার অনুগ্রহ পরিশোধ করেছি, কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর অনুগ্রহ অবশিষ্ট রয়েছে। তার বিনিময় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দেবেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্পদ দ্বারা আমার যতখানি উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা ততখানি হয়নি।

জ্ঞান-বুদ্ধি

তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণধী ছিলেন। কোন ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ হতো, তখন সে বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে উপস্থিত করা হতো। তিনি সে সম্পর্কে যে রায় দিতেন তাই সঠিক হতো। কুরআনুল মজীদের জ্ঞান ছিল তাঁর সব সাহাবীর চেয়ে বেশী। এ কারণেই হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে নামাযের ইমাম বানিয়েছেন। সুন্নাতের জ্ঞানও ছিল তাঁর পরিপূর্ণ। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম সুন্নাতের মাসাইলের ব্যাপারে তাঁর দ্বারস্থ হতেন। তাঁর স্মরণশক্তিও ছিল প্রখর। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি নবূওয়াতের শুরু থেকে ওফাত পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেন। খিলাফতকালে যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হতো তখন তিনি তা কুরআন মজীদে তালাশ করতেন। কুরআন মজীদে না পাওয়া গেলে হযরত নবী করীম (সা)-এর কথা ও কাজ অনুসারে সমাধান করতেন। যদি এরূপ কোন কথা ও কাজ পাওয়া না যেতো, তবে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ সম্পর্কে কোন হাদীস শ্রবণ করেছ ? কোন সাহাবী যদি এরূপ কোন হাদীস বর্ণনা না করতেন, তখন

তিনি সুবিখ্যাত সাহাবীদেরকে একত্রিত করতেন এবং তাঁদের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাধারণতভাবে সারা আরব এবং বিশেষভাবে কুরায়শের বড় নসববিদ ছিলেন। এমন কি জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ঈম– যিনি আরবের অন্যতম নসববিদ বা কুলপঞ্জি বিশারদ বলে পরিচিত ছিলেন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করতেন এবং গর্ব করে বলতেন যে, আমি নসবশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় নসববিদের নিকট শিক্ষা লাভ করেছি। স্বপ্নের তা'বীর শাস্ত্রেও তিনি সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। এমনকি হযরত নবী করীম (সা)-এর যুগেও তিনি স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করতেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হলেন স্বপ্নের সবচেয়ে বড় তা'বীর বর্ণনাকারী। তিনি সবচেয়ে বড় বাগ্মী ছিলেন। কোন কোন আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বাকপটু ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা)। সমস্ত সাহাবীর মধ্যে তাঁর জ্ঞান ছিল পূর্ণ এবং মতের সঠিকত্ব ছিল স্বীকৃত।

হযরত আলী (রা) বহুবার বলেছেন, এই উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। একবার হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে, তাকে আমি দোররা মারবো। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকরের উপর রহম করুন ! তিনি তাঁর কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছেন, আমাকে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা)-এর উপর রহম করুন। তিনি হক কথা বলেন, তা যতই তিক্ত হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত উছমান (রা)-এর উপর রহম করুন! তার প্রতি ফেরেশতারাও লজ্জা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলী (রা)-এর উপর রহম করুন! হে আল্লাহ্ ! আলী যেখানেই থাকুক, হককে তার সঙ্গে রেখো।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, লোকেরা সিদ্দীক আকবরকে সর্বসম্মতভাবে খলীফা বানিয়েছেন। কেননা, তখন ভূপৃষ্ঠে তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। মুআবিয়া ইব্‌ন ফার্‌রাহ (রা) বলেন, হযরত আবূ বকরের খিলাফত সম্পর্কে সাহাবাদের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো না। তাঁরা সর্বদা তাঁকে খলীফাতুর রাসূল বা রাসূলের খলীফা বলতেন। আর সাহাবীরা কখনো কোন ভুল বা গোমরাহীর উপর একমত হতেন না।

সুসামাজিকতা

'আতা ইবন সাইব (র) বলেন, খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের পরদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দুটি চাদর নিয়ে বাজারে রওয়ানা হন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন, বাজারে। হযরত উমর (রা) বললেন, এখন আপনি এই ধান্দা ছেড়ে দিন। আপনি মুসলমনদের আমীর হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আমি ও আমার পরিবার-পরিজন কি খাবে ? হযরত উমর (রা) বললেন, এ কাজটি হযরত আবূ উবায়দাকে সোপর্দ করুন। তারপর দু'জনই হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন যে, আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের খরচপত্র মুহাজিরদের নিকট থেকে আদায় করে দাও। সব জিনিসই সাধারণ মানের হতে হবে। গ্রীষ্ম ও

শীতের পোশাকেরও প্রয়োজন হবে। ছিঁড়ে গেলে আমি তা জমা দেবো এবং নতুন পোশাক নেবো। হযরত আবূ উবায়দা (রা) প্রতিদিন তাঁর ঘরে অর্ধ বকরীর গোশত পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আবূ বকর ইব্‌ন হাফস (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকালের সময় হযরত আয়িশা (রা)-কে বলেন, মুসলমানদের কাজ করার পারিশ্রমিক হিসাবে আমি পাই পয়সার ফায়দাও গ্রহণ করিনি।– সাদামাঠা গোছের খাওয়া-পরা ব্যতীত। এ মুহূর্তে এই হাবশী গোলাম, উটনী ও পুরাতন চাদরটি ছাড়া মুসলমানদের আর কোন মালামাল আমার কাছে নেই। আমার মৃত্যুর পর এগুলোকে হযরত উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিও।

হযরত ইমাম হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকালের সময় আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন, আমার মৃত্যুর পর এই উটনীটি যার দুধ আমি পান করছি, এই পিয়ালাটি যাতে করে আমি পান করতাম এবং এই চাদরটি উমরের নিকট পাঠিয়ে দেবে। কেননা এগুলোকে আমি খলীফা হিসাবে বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলাম। হযরত উমর (রা)-এর নিকট এগুলো পৌঁছার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকরের উপর রহম করুন, আমার জন্য তিনি বহু কষ্ট করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রায়তুল মালে কখনো কোন সম্পদ জমা হতে দেননি। যা-কিছু আসতো মুসলমানদের জন্য তা ব্যয় করে ফেলতেন। ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিতেন। কখনো ঘোড়া ও হাতিয়ার খরিদ করে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করে দিতেন। কখনো কিছু পোশাক যোগাড় করে গরীব-মিসকীনদের দান করতেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত উমর (রা) যখন অন্যান্য সাহাবাসহ বায়তুল মালের হিসাব-নিকাশ দিলেন, তখন তা সম্পূর্ণ শূন্য পেলেন। মহল্লার মেয়েরা তাদের বকরী নিয়ে তাঁর নিকট আসতো এবং তাঁর দ্বারা দুধ দোহন করে নিয়ে যেতো। সিদ্দীকে আকবর (রা) অনেক লোকের মধ্যে এমনভাবে মিলেমিশে বসতেন, কেউ চিনতেই পারতো না এদের মধ্যে খলীফা কে !

সিদ্দীকী খিলাফতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

সাকীফা বনূ সাইদা ও বায়'আতে খিলাফত

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীতে সিদ্দীকে আকবর (রা) বক্তৃতা করে লোকদের বিস্ময় দূর করেছিলেন। সাকীফা বনূ সাইদায় আনসারদের সমবেত হওয়া এবং মুহাজিরদের পরামর্শ ছাড়া কোন আমীর বা খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করার খবর তাঁর কাছে পৌঁছলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর এ ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় দুর্দিন। এই খবর শুনে যদি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নীরব থাকতেন এবং এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করতেন, তবে মুহাজির ও আনসারদের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব অচিরেই বিনষ্ট হয়ে ইসলামী ঐক্য চুরমার হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু নিজেই তাঁর দীনের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী, তাই তিনি সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে হিম্মত ও দৃঢ়তা দান করলেন। যাবতীয় আশংকা ও বিপত্তি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তির সামনে বিজয় ও সংশোধনে রূপান্তরিত হলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর পবিত্র শক্তি সমস্ত মুসলমানকে একই জাতি ও একই পরিবার বানিয়ে দিয়েছিল এবং ঈমানের নূরের বিস্ময়কর প্রভাবে গোত্র, পরিবার ও দেশের পার্থক্য সম্পূর্ণ মিটে গিয়েছিল। গোত্র ও পরিবারের নাম দ্বারা মানুষের পরিচয় ও ঠিকানা দান সহজ হওয়া ছাড়া এগুলো আর কোন তাৎপর্যই বহন করতো না।

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাত এবং এই মহান আত্মার উর্ধ্বজগতে গমন করার পর মুহূর্তের জন্য এই জাতিগত বিভেদের বিপত্তির পার্শ্ব পরিবর্তন করা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। লক্ষণীয় যে, সাহাবায়ে কিরামের পূত-পবিত্র জামাআত এই মুসীবতকে নিজদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের কারণ বানিয়েছেন, ধ্বংসের উপকরণ নয়।

এই সার কথার ব্যাখ্যা এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় মুহাজিরদের সংখ্যা আনসারদের চেয়ে কম ছিল। কিন্তু আনসারও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আওস ও খাযরাজ ইসলামের পূর্বে প্রাচীনকাল থেকেই একে অপরের বৈরী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এইভাবে মদীনা মুনাওয়ারার তৎকালীন মুসলমানদেরকে তিনটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত মনে করা যেতো। আওস, খাযরাজ ও কুরায়শ বা মক্কার মুহাজিরগণ। খাযরাজ গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা। তাঁর গৃহ-সংলগ্ন একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা ছিল। যার আকৃতি ছিল এরূপ : একটি প্রশস্ত চত্বর। তার উপরে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সংযুক্ত ছিল। এটিকেই 'সাকীফা বনূ সাঈদা' বলা হতো।

বায়'আত

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শুনে একদিকে মসজিদে নববীতে লোকজন জমা হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন মুহাজির। কেননা, মুহাজিরদের ঘরদোর ঐ মহল্লায়ই ছিল বেশী। এখানে আনসার অনেক কম ছিল। অপর দিকে বাজার সংলগ্ন সাকীফা বনূ সাইদায় ছিল মুসলমানদের আরেকটি সমাবেশ। এই সমাবেশের প্রায় সকলেই ছিলেন আনসার। ঘটনাক্রমে দু'একজন মুহাজিরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের সূচনা ও তার ক্রমবিকাশ, শত্রুদের অপচেষ্টা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ডামাডোল, শিরকের পরাজয় ও বিলুপ্ত হওয়া এবং ইসলামী আইন-কানুনের সামনে সকলের মাথা নত করা– এসব

কিছুই ছিল তাঁদের দৃষ্টিপথে দেদীপ্যমান। তাঁরা এত জানতেন যে, হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর এই ব্যবস্থা কেবল তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে কায়েম থাকতে পারে।

মসজিদে নববীতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর প্রেমিকসুলভ ভাবাবেগ লোকদেরকে খিলাফত বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগই দেয়নি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শুনে যদি দ্রুত এখানে না পৌঁছাতেন, তবে আল্লাহ্ জানেন মসজিদে নববীতে রাসূল-প্রেমিকগণের এই চিত্তচাঞ্চল্য ও অস্থিরতার ভাব কতক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। পক্ষান্তরে অপর সমাবেশটির—যা হযরত সা'দ ইব্ন উবাদার বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—অবস্থা তদ্রূপ ছিল না। সেখানে খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা হলো। এই সমাবেশ ছিল আনসারদের জনৈক গোত্রপতির বৈঠকখানায় যিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সরদার। আর খাযরাজ গোত্র ছিল জনসংখ্যা ও ধন-দৌলতে আনসারদের অপর গোত্র আওস থেকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাই এই সমাবেশের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছিল, হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে খলীফা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত বানাতে হবে। মুহাজিরদের লোকসংখ্যা যদিও মদীনায় আনসারদের চেয়ে কম ছিল, কিন্তু তাঁদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আনসারদের অন্তরে এতই প্রবল ছিল যে, হযরত সা'দ (রা) যখন খিলাফত আনসারদেরই প্রাপ্য বলে প্রমাণ করতে চাইলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বাধা দিয়ে বললেন, মুহাজিরগণ আনসারদের খিলাফত কিভাবে মেনে নেবেন ? এর উত্তরে অপর একজন আনসার বললেন, তাঁরা যদি মেনে না নেন, তাহলে আমরা তাঁদের বলে দেবো যে, তোমরা তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন খলীফা বানিয়ে নাও, আর আমরা আমাদের আনসারদের মধ্য থেকে একজন খলীফা বানিয়ে নিয়েছি। হযরত সা'দ (রা) বলেন, না, এটা এক ধরনের দুর্বলতা। অন্য একজন আনসার বললেন, মুহাজিররা যদি আমাদের খলীফাকে মেনে না নেয়, তাহলে আমরা তাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে মদীনা থেকে বের করে দেবো। ঐ সমাবেশে যে ক'জন মুহাজির ছিলেন, তারা উচ্চকণ্ঠে আনসারদের বিরোধিতা করলেন। এইভাবে ঐ সমাবেশে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। এমনকি এই অপ্রীতিকর অবস্থা বাড়তে বাড়তে যুদ্ধ ও সংঘাতের আশংকা দেখা দিলো।

এই ভয়াবহ রূপ দেখে হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে নববীতে এসে সাকীফা বনূ সাইদার ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ দিকে মসজিদে নববীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর বক্তৃতা শেষ করে কাফন-দাফনের উপকরণ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই আতঙ্কজনক খবর শুনে হযরত উমর ফারূক (রা) ও হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে সাকীফা বনূ সাইদার দিকে গমন করেন এবং হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবাকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করতে বলে গেলেন। তখন যদি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এতটুকু বিলম্ব করতেন, তাহলে আল্লাহ্ জানেন কি ভয়াবহ পরিস্থিতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। এই তিন বুযুর্গ যখন ঐ সমাবেশে পৌঁছলেন, তখন এক আশ্চর্য হুলস্থুল গোলমাল চলছিল। হযরত উমর ফারূক (রা) সেখানকার ঐ সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও শালীনতার সাথে বক্তৃতা করলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একটু আগেই হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আত্মহারা অবস্থা অবলোকন করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে অসি হাতে চক্কর দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, হযরত নবী করীম (সা)-এর মৃত্যু হয়েছে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আশংকা করলেন যে, এখানেও তিনি চরম উত্তেজনা ও গভীর শোকে এরূপ কোন মন্তব্য করে না ফেলেন। তাই তিনি নিজেই সমাবেশকে সম্বোধন করে বক্তৃতা শুরু করলেন এবং তখন এরই প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, প্রথমে মুহাজিরগণ আমীর হবেন এবং আনসারগণ হবেন ওয়াযীর। তাঁর বক্তব্য শুনে হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযির ইব্‌নুল জামূহ (রা) বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচিত হওয়াই উত্তম। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত হুবাব আনসারীর কথার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, হযরত নবী করীম (সা) মুহাজিরদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আনসারদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার করবে। আনসারদের তিনি মুহাজিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দেননি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, হুকুমত ও খিলাফত মুহাজিরদের মধ্যে থাকবে। হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযির (রা) তৎক্ষণাৎ হযরত উমর ফারূক (রা)-এর উক্তি খণ্ডন করলেন এবং তাদের স্বপক্ষে কিছু বলতে লাগলেন। ফলে, হযরত উমর ফারূক (রা) ও হযরত হুবাব (রা) উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে লাগলেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) উভয়কেই থামতে ও চুপ করাতে চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে হযরত বাশীর ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হযরত নবী করীম (সা) নিঃসন্দেহে কুরায়শ বংশের ছিলেন। সুতরাং তাঁর কওম অর্থাৎ কুরায়শের লোকই খিলাফতের বেশী হকদার। আমরা নিঃসন্দেহে দীন-ইসলামের সাহায্য করেছি এবং আমরা অগ্রবর্তী মুসলমান। কিন্তু আমাদের ইসলাম গ্রহণ এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া নিছক আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ছিল। তার প্রতিদান আমরা এ দুনিয়ায় চাই না। আর না আমরা খলীফা ও আমীর হওয়ার ব্যাপারে মুহাজিরদের সাথে কোন ঝগড়া করা পসন্দ করি। হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযির বললেন, বাশীর ! তুমি এখন কাপুরুষের মতো কথা বলছো ! আর একটি গুছিয়ে আনা কাজকে নষ্ট করে দিতে চাচ্ছো। হযরত বাশীর (রা) বললেন, আমি কাপুরুষতা প্রকাশ করিনি বরং যে কওম খিলাফতের হকদার আমি এ বিষয়ে তাদের সাথে বিবাদ করা অপসন্দ করছি। হে হুবাব! তুমি কি শোননি যে হযরত নবী (সা) বলেছেন : الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ।

অর্থাৎ "নেতা কুরায়শদের মধ্য থেকে হবে !"

হযরত বাশীর (রা)-এর এ উক্তিকে অন্য কয়েকজন আনসারও সমর্থন করলেন। আর এইভাবে এই আল্লাহ্ পোরস্ত কওম তাদের পার্থিব ও বৈষয়িক খিদমতকে তাদের দীনী ও রূহানী প্রেরণার উপর বিজয়ী হতে দিলেন না। হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযিরও একথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন।

তিনি চুপ করার সাথে সাথে গোটা সমাবেশের উপর নীরবতা নেমে এলো এবং খিলাফত সম্পর্কে মুহাজির ও আনসারদের ঝগড়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেলো। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, এখানে হযরত উমর ও হযরত আবূ উবায়দা উপস্থিত আছেন। তোমরা এ দু'জনের একজনকে বেছে নাও। হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও হযরত উমর (রা) বললেন,

না, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুহাজিরদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি গুহার মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। সালাতের ইমামতি করানোর ক্ষেত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। অথচ সালাত হচ্ছে দীনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল। কাজেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্তমানে অন্য কোন ব্যক্তি খলীফা ও আমীর হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। একথা বলেই সর্বপ্রথম হযরত ফারূক (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত করলেন এবং তারপর হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও হযরত বাশীর ইব্ন সা'দ আনসারী (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন। এরপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, চারদিক থেকে লোকজন বায়'আত গ্রহণের জন্য ভেঙে পড়লো। এ খবর বাইরে পৌঁছে গেলো এবং লোকেরা শোনা মাত্র ছুটে এলো। মোটকথা, তামাম মুহাজির ও আনসার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বিনা মতানৈক্যে সর্বসম্মতভাবে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

আনসারদের মধ্যে কেবল হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এবং মুহাজিরদের মধ্যে যারা কাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা ঐ সময় সাকীফা বনূ সাইদায় বায়'আত গ্রহণ করতে পারেন নি। হযরত সা'দ (রা) কিছুক্ষণ পর ঐ দিনই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আলী (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত তালহা (রা) চল্লিশ দিন পর্যন্ত বায়'আত গ্রহণ করেননি। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সাকীফা বনূ সাইদার বায়'আত অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে কেন ডাকা হলো না !

হযরত আলী (রা) একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আমি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও খলীফা হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর নিকটবর্তী আত্মীয়। আপনি সাকীফা বনূ সাইদায় আমাদের পরামর্শ ছাড়া কেন লোকদের নিকট থেকে বায়'আত নিলেন ? আপনি যদি আমাদেরকেও সেখানে ডেকে পাঠাতেন, তাহলে সর্বপ্রথম আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করতাম।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়বর্গের সাথে সদ্ব্যবহার করা আমি আমার নিজের আত্মীয়বর্গের সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতেও অধিক পসন্দ করি। আমি সাকীফায় বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাইনি বরং মুহাজির ও আনসারদের ঝগড়া মীমাংসা করা অত্যাবশ্যক ছিল। উভয় শ্রেণীই লড়াই করে মারতে ও মরতে প্রস্তুত ছিল। আমি কাউকে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে বলিনি বরং উপস্থিত জনতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। ঐ সময় যদি আমি বায়'আত গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতাম, তবে এই আশংকা ও বিপত্তি পুনরায় ততোধিক শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দেয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তুমি যখন কাফন-দাফনের সাজে মশগুল ছিলে, তখন আমি এই ত্বরিত কাজে তোমাকে কিভাবে সেখান থেকে ডেকে পাঠাতে পারতাম ! হযরত আলী (রা) এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন এবং তারপর দিন মসজিদে নববীতে সবার সামনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণ

বায়'আতে সাকীফা থেকে ফিরে এসে তার পরদিন হযরত নবী করীম (সা)-এর কাফন-দাফন শেষ করে মসজিদে নববীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিম্বরের উপর উপবেশন করে

সাধারণ লোকদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তারপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দেন এবং হামদ ও না'ত-এর পর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

> আমি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। সুতরাং আমি যদি সৎকাজ করি, তবে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাকে সাহায্য করা। আর যদি আমি কোন ভুল পথ অবলম্বন করি, তবে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সোজাপথে প্রতিষ্ঠিত করা। সত্যবাদিতা ও সত্যকথা বলা একটি আমানত এবং মিথ্যা কথা হচ্ছে একটি খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী—যে পর্যন্ত আমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিই। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আমার নিকট দুর্বল—যে পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে প্রাপ্য বুঝে না নিই। তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে না। যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে, সে জাতি অপমানিত হয়। আমি যতদিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো, ততদিন তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করি, তবে তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করবে। কেননা, তখন তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা ফরয নয়।"

ঐ দিন ৩৩ হাজার সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

বায়'আতে সাকীফার পর সদীনা মুনাওয়ারা এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সেই মতবাদের লেশমাত্রও কোথাও ছিল না, বায়'আতের কয়েক মিনিট পূর্বেও মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যা বিদ্যমান ছিল। সবাই পূর্বের মতই অভিন্ন হৃদয় ও পরস্পর ভাই ভাই ছিল। হযরত নবী করীম (সা)-এর শিক্ষালয় থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে পূর্ণভাবে দুনিয়ার উপর দীনকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এটাও তার এক সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। দুনিয়ার কোন দল বা জামাআতই তাঁদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। যখন একথা চিন্তা করা হয় যে, ৩৩ হাজার সাহাবা একদিনে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন এবং সারা আরবদেশ ও সমস্ত মুসলমান তাঁকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফা মেনে নিয়েছেন, তখন খিলাফতে সিদ্দীকী থেকে বড় অন্য কোন ইজমায়ে উম্মাত পরিদৃষ্ট হয় না।

উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে ইয়ামন ও নজদ এলাকায় আসওয়াদ ও মুসায়লামার ফিতনা দেখা দিয়েছিল। ঐসব দেশের অধিবাসীরা ছিল সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী। এখনো তারা পূর্ণরূপে ইসলাম এবং ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। ইতিমধ্যে ভণ্ড নবীদের শয়তানী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এই নও-মুসলিমরা তাদের প্রতারণার শিকার হয়। নজ্‌দ অঞ্চলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পূর্বেই আসওয়াদ আনাসীর দফা রফা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইয়ামান অঞ্চলের বিষাক্ত ক্রিয়া ও ফিতনার কারণ তখনো সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর সারা আরব উপমহাদেশে অতি দ্রুত ও তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং ছড়াতে লাগলো। এই খবর একদিকে নতুন ইসলাম ও শিক্ষার মুখাপেক্ষী গোত্রগুলোর ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন সৃষ্টি করলো, অপরদিকে ভণ্ড নবীদের দুঃসাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে তাদের কর্মকাণ্ডে শক্তি ও তরক্কী দান করলো। সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধপ্রিয় ও ফিতনাবাজ লোকেরাও যুগে যুগে ইন্ধনই যুগিয়েছে। এই ধরনের লোকদের নতুনভাবে তাদের দুষ্টামির জন্য উপযুক্ত সুযোগ মেলে। খ্যাতি অন্বেষী ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষমতালোভী গোত্রগুলোও তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতার জন্য সুযোগ সন্ধান করতে লাগলো। ফলে, সব দিক থেকেই ধর্মত্যাগের খবর আসা শুরু হলো। এইসব খবরাখবর এতো উপর্যুপরি ও অধিক মাত্রায় মদীনায় এলো যে, যেগুলো শুনে শুনে সাহাবায়ে কিরামের চোখের সামনে যেনো ঘোর বিপদ ও দুঃখ-বেদনার পাহাড় ছিল। আর তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর এতই বোঝা চেপেছিল যে তাঁরা যদি হযরত নবী করীম (সা)-এর শিক্ষালয় ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ধৈর্য ও দৃঢ়তার শিক্ষা না পেতেন, তাহলে তাঁদের ও ইসলামের ধ্বংস ছিল বাহ্যত নিশ্চিত। মদীনা, মক্কা ও তায়িফ এই তিনটি স্থান ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত আরব উপমহাদেশে ধর্মত্যাগের অগ্নিশিখা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। একই সাথে এ খবরও পৌঁছলো যে, মদীনা মুনাওয়ারার উপর সবদিক থেকে হামলা করার প্রস্তুতি চলছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে সিরিয়া অভিমুখে রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীসহ প্রেরণ করেছিলেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর রোগ বৃদ্ধির কারণে এই বাহিনী যাত্রা বিরতি করেছিল। এক্ষণে হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) এই বাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম সব দিকে ধর্ম ত্যাগের খবর শুনে এবং মদীনার উপর হামলা করার আশংকা দেখা দেয়ায় এই বাহিনী প্রেরণ স্থগিত রাখার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট অনুরোধ করেন। সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ঈমানী শক্তি, মনোবল, হিম্মত ও সাহসিকতা, উদ্যম ও দৃঢ়তা পরিমাপ করুন ! তিনি সবাইকে সাফ জবাব দিলেন, আমাকে যদি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তাও প্রদান করে যে, এই বাহিনী প্রেরণ করার পর আমাকে মদীনায় কোন হিংস্র জন্তু একাকী পেয়ে ছিঁড়ে ফেলবে তবু আমি একটি বাহিনী

প্রেরণ কখনো মুলতবি করবো না। কারণ এ বাহিনী স্বয়ং নবী করীম (সা) প্রেরণ করেছিলেন। অতএব তিনি এই মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, উসামা বাহিনীতে যেসব লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা যেন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মদীনার বাইরে সেনা শিবিরে দ্রুত সমবেত হয়।

এই নির্দেশ পালনার্থে সাহাবায়ে কিরাম হযরত উসামার ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হন। হযরত উসামা (রা)-এর পিতা যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ছিলেন নবী (সা)-এর মুক্ত গোলাম। তাই কোন কোন লোকের মনে তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ ছিল। হযরত উসামা (রা)-এর বয়স ছিল তখন সতের বছর। তাই কারো কারো ইচ্ছা বয়স্ক কোন কুরায়শী নেতা নির্ধারণ করা হোক। যখন সমস্ত লশকর মদীনার বাইরে সমবেত হলো, তখন হযরত উসামা (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে (তিনিও এই বাহিনীর একজন সৈন্য ছিলেন) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর নিকট এই পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন যে, বড় বড় লোক সবই আমার সঙ্গে রয়েছেন, আপনি তাঁদেরকে আপনার কাছে ডেকে নিন এবং আপনার কাছে রেখে দিন। কেননা, আমি আশংকা করছি যে, মুশরিকরা হামলা করে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে। হযরত উমর (রা) সেনা ছাউনী থেকে সেনাপতির পয়গাম নিয়ে যখন রওয়ানা করছিলেন, তখন আনসাররাও একটি পয়গাম হযরত উমর (রা)-এর মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। পয়গামটি ছিল এরূপ : আপনি এই বাহিনীর অধিনায়ক এমন কোন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করুন, যিনি হবেন উসামা থেকে বয়সে বড় ও শরীফ বংশের। হযরত উমর (রা) এসে সর্বপ্রথম আনসারদের পয়গাম পেশ করলেন। তখন হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বললেন, এই বাহিনী প্রেরণ করার দরুন যদি সমস্ত বস্তি খালি হয়ে যায় এবং আমি স্বয়ং একাকী থেকে যাই আর হিংস্র জন্তুরা আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তবুও এই বাহিনী প্রেরণ মুলতবি হতে পারে না। তারপর আনসারদের পয়গাম শুনে বললেন, তাদের অন্তরে এখন পর্যন্ত গর্ব ও অহংকারের চিহ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেছে। একথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ঐ বাহিনীকে বিদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে মদীনার বাইরে সেনা নিবাস পর্যন্ত চলে গেলেন। হযরত উসামাকে বাহিনীসহ বিদায় করলেন এবং নিজে হযরত উসামা (রা)-এর ঘোড়ার পাশে থেকে আলাপ করতে করতে চললেন। হযরত উসামা (রা) বলরেন, হয়তো আপনি আরোহণ করুন অথবা আমি সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলবো। সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন, আমি আরোহণ করবো না এবং তোমারও সওয়ারী থেকে নিচে নামার প্রয়োজন নেই। আর আমি যদি কিছু দূর আল্লাহর রাস্তায় বিদায় সম্বর্ধনাকারী হিসাবে তোমাদের ঘোড়ার সাথে পায়ে হেঁটে চলি, তাতে আমার কি ক্ষতি হবে ? সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর এই কার্য পদ্ধতিই ছিল আনসারদের উপরোক্ত পয়গামের মোক্ষম জবাব। উসামা (রা)-এর ঘোড়ার পাশাপাশি তাঁকে এইভাবে পায়ে হেটে চলতে দেখে গোটা বাহিনীই হতবাক হয়ে পড়লো এবং সবার অন্তরের সেই কুণ্ঠাবোধ দূর হয়ে তদস্থলে আনুগত্য ও একনিষ্ঠতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গেলো।

উসামা (রা)-কে উপদেশ দান

তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর সওয়ারীর সাথে সাথে হাঁটতে হাঁটতে দশটি উপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন :

(১) খিয়ানত করবে না। (২) মিথ্যা কথা বলবে না। (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। (৪) শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করবে না। (৫) কোন ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, জ্বালাবে না।

(৬) আহারের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া উট, বকরী, গাভী প্রভৃতি যবেহ করবে না। (৭) কোন জাতির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের নম্রভাবে ইসলামের দাওয়াত দিবে। (৮) কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে তার মর্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। (৯) তোমাদের সামনে কোন আহার্য এলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আহার শুরু করবে। (১০) ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের যেসব লোক পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করে তাদের উপাসনালয়ে অধিবাস অবলম্বন করেছে, তাদের উত্যক্ত করবে না। হযরত নবী করীম (সা) তোমাদেরকে যেসব কাজ করার আদেশ করেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করবে না। আল্লাহ্‌র পথে কাফিরদের সাথে লড়াই করবে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উসামা (রা)-কে এই নসীহতগুলো করে জারাফ নামক স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি হযরত উসামা (রা)-কে বললেন, "তুমি অনুমতি দিলে আমার সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আমি উমরকে রেখে দিতে পারি।" হযরত উসামা (রা) তৎক্ষণাৎ হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মদীনায় থাকার অনুমতি প্রদান করলেন। হযরত উমর (রা) ঐ বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে মদীনায় ফিরে এলেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, খলীফা তাঁর আপন নির্দেশবলে হযরত উমর (রা)-কে রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি হযরত উসামা (রা)-এর নিকট থেকে রীতিমত অনুমতি লাভ করা প্রয়োজন মনে করলেন। এটাও ঐ বাহিনীর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ছিল। খলীফা তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই উপদেশটি প্রদান করলেন।

উসামা (রা)-এর সাফল্য

হযরত উসামা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে জর্দান ও বলকান উপত্যকায় পৌঁছে রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রোমকদের পরাজিত করে এবং বেশুমার মালে গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে চল্লিশ দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন। এই বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা বাহ্যত অতি ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার ফলাফল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুব ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। দেশের এই শোরগোল ও নিরাপত্তাহীনতার সময়ও মুসলিম বাহিনীর এরূপ রোমকদের উপর হামলা করা যেন সকল মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের একথা জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমরা তোমাদের এই বিদ্রোহ ও প্রস্তুতিকে এতটুকু পরোয়া করি না। এই সাহস ও শক্তির কার্যকর ঘোষণা বিদ্রোহীদের আশাহত ও নিরুৎসাহিত করে চিন্তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। তারা মুসলমানদের মূলোচ্ছেদকল্পে সবাই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে নিজ নিজ স্থানে বসে এরূপ চিন্তা করতে লাগলো যে, মুসলমানদের আদৌ পরাভূত করা যাবে কিনা ? আর এ কারণেই তুলায়হা আসাদী ও মুসায়লামা কায্‌যাব প্রমুখ নবুওয়াতের দাবীদাররা নিজ নিজ এলাকার বাইরে কদম রাখতে পারেনি এবং যাকাত অস্বীকারকারী বিদ্রোহী গোত্রগুলো ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। হযরত উসামা (রা)-এর রোমান বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করা এবং নিরাপদে মালে গনীমতসহ ফিরে আসা আর এই সংবাদ দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করা আরো ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। যেহেতু এই যুদ্ধে প্রচুর মালে গনীমত হস্তগত হয়েছিল তাই ভাবী বিদ্রোহীদের দমন করা এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল করার ক্ষেত্রে এই মালে গনীমত দ্বারা মুসলমানদের বিরাট সাহায্য মেলে এবং সামরিক বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রে সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

ধর্মত্যাগীদের ফিতনা

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর মদীনা, মক্কা ও তায়িফ ছাড়া সমগ্র আরবদেশ এরূপ মুরতাদ হয়ে যায় যে, লোকেরা তাওহীদ ছেড়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ্‌র স্থলে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ এটা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবতাবর্জিত। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, মিথ্যাবাদীরা অর্থাৎ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদাররাও সালাত প্রভৃতি ইবাদতকে অস্বীকার করতো না। তারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফর ও শির্‌কও গ্রহণ করেনি, বরং ইসলামের কোন কোন রুকন বিশেষ করে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। এ অস্বীকারের কারণ ছিল আরব জাতি-গোষ্ঠীর প্রাচীন লাগামহীনতা ও উচ্ছৃংখলতা। ইসলাম মানুষের উপর যাকাত ফরয করেছিল। এটা ছিল ট্যাক্স বিশেষ। মালের পরিমাণ হিসাবে সাহেবে নিসাব লোকদেরকে তা (ট্যাক্স) আদায় করতে হতো। এই ট্যাক্স বা খাজনাকে স্বাধীনচেতা লোকেরা তাদের জন্য একটি বোঝা স্বরূপ মনে করতো। যারা তখনো ভাল মতো ইসলামের স্বাদ আস্বাদন করেনি, তারা এই ইসলামী খাজনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। অবশিষ্ট ইসলাম ধর্মকে তারা অস্বীকার করেনি। যাকাত অস্বীকার যেহেতু জাতি-গোষ্ঠীর মেজায ও বৈষয়িক স্বার্থের অনুকূল ছিল, তাই এই অস্বীকৃতির মধ্যে এক এক করে গোটা দেশ শরীক হয়ে যায়। কিন্তু এটা যেহেতু একটি বিদ্রোহ ছিল, তাই নও-মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে মুসায়লামা ও তুলায়হা প্রমুখ মিথ্যাবাদী নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার এবং আর্থিক ইবাদত ছাড়া দৈহিক ইবাদতের মধ্যেও লাঘব ঘটিয়ে নিজ নিজ নবুওয়াত মানানোর সুযোগ পায়।

যাহোক, শির্‌ক ও মূর্তিপূজার বিষয়টি আদৌ আলোচনাধীন ছিল না। কিন্তু দীন-ইসলাম মানব জাতির মধ্যে যে নিয়ম-শৃংখলা ও বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল, তা বাহ্যত ওলট-পালট হতে বসেছিল। এই ঘোর বিপদের চিকিৎসা ছিল মুশরিক ও কাফিরদের যুদ্ধবাজি থেকেও অধিক শক্ত ও কঠিন। কেননা, যাকাত অস্বীকারকারীদের সংকল্প ও ঘোষণা শোনামাত্রই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত করেন। সভায় কোন কোন সাহাবা এই মত প্রকাশ করেন যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে মুশরিক ও কাফিরদের ন্যায় যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। কিন্তু এ অভিমতটিও ছিল ঠিক তেমনি দুর্বল, যেমন উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার বিরুদ্ধে কোন কোন লোক প্রকাশ করেছিল। আর যে ভাবে এই অভিমত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মানেননি, তেমনিভাবে এই দুর্বল মতটিও তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! যাকাতের একটি জন্তু বা একটি শস্যকণাও যদি কোন গোত্র পরিশোধ না করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।"

মুরতাদদের প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করে আবেদন করেছিল : সালাত আমরা আদায় করছি, যাকাত আমাদেরকে মাফ করে দিন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থেকে ঐ সাফ জবাব শুনে তারা নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে ফিরে গেল। তৎক্ষণাৎ সারা দেশে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই দৃঢ় সংকল্পের খবর পৌঁছে গেলো এবং মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীরা মুকাবিলা ও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। প্রদেশসমূহের আলিমগণ তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের লোকদের বিদ্রোহী হওয়া এবং

যাকাত আদায় না হওয়ার সংবাদ পাঠান। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পূর্ণ প্রস্তুতি, পূর্ণ সাহস ও স্থৈর্যের সাথে একজন সজাগ-মস্তিষ্ক ও রাষ্ট্রনায়ক শাহানশাহরূপে আলিমদের প্রতি যথাযথ নির্দেশনামা এবং গোত্রপতিদের নামে পত্র প্রেরণ করেন। একদিকে উসামা বাহিনী রোমকদের সাথে যুদ্ধরত ছিল, অন্যদিকে মদীনার আশেপাশে সমবেত মুরতাদগণ মদীনার উপর হামলা করার হুমকি দিচ্ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেমন দূর-দূরান্তের মুরতাদদের নিকট চরম হুমকিমূলক পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি আশেপাশের বিদ্রোহীদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি মদীনা মুনাওয়ারার তদানীন্তন মুসলমানদের যুদ্ধযোগ্য লোকদেরকে মসজিদে নববীর সামনে সর্বক্ষণ উপস্থিত ও প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন এবং হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশ পাহারা দেওয়ার জন্য আদিষ্ট করে রেখেছিলেন, যাতে মদীনার উপর কোন গোত্র আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট পৌঁছতে পারে। আবরাক নামক স্থানে আব্স গোত্র এবং যুল-কিসসা নামক স্থানে যুবয়ান গোত্র অবস্থান করছিল। বনূ আসাদ ও বনূ কিনানারও কিছু লোক তাদের মধ্যে ছিল। আব্স ও যুবয়ান গোত্রদ্বয় যখন জানতে পারলো যে, মদীনা মুনাওয়ারায় তখন স্বল্প সংখ্যক লোক অবশিষ্ট রয়েছে এবং যাকাত মাফ করার কথা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন, তখন তারা একমত হয়ে মদীনার উপর হামলা করলো। এই হামলাকারীদেরকে হযরত আলী (রা) মদীনার বাইরেই প্রতিরোধ করে মদীনায় সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। এদিক থেকেও অনতিবিলম্বে সাহায্য প্রেরিত হলো। মুসলমানরা যূ-খাশাব পর্যন্ত তাদেরকে হটিয়ে দিলেন। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো বটে, কিন্তু ভিন্ন পথে দফ ও নানারকম বাজনা বাজাতে বাজাতে ফিরে এলো। এতে মুসলমানদের উটগুলো ভয় পেয়ে মদীনায় পালিয়ে আসে। এই অবস্থা দেখে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নিজে মদীনা থেকে বের হলেন এবং শত্রুর উপর হামলা করেন। পাঁচ-ছয় ঘন্টার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুরতাদরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং মুসলমানদের হাতে বহু লোক নিহত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা) ও ছোট্ট একটি দলের মাধ্যমে গনীমতের মাল মদীনায় প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে যুল-কিসসা নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে শত্রুদের একটি বিরাট দল ধোঁকা দিয়ে এবং দৃষ্টি এড়িয়ে মদীনা আক্রমণ করলো। তারা কতক মুসলমানকে শহীদ করলো এবং মালে গনীমত পুনরুদ্ধার করে চলে গেল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ফিরে এসে এই ঘটনা শ্রবণ করে যারপরনাই দুঃখিত হলেন এবং শপথ করলেন যে, মুরতাদদের হাতে যতজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন, ততজন মুরতাদ হত্যা না করে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না। তিনি এই সংকল্প ও আয়োজনে রত থাকাবস্থায়ই হযরত উসামা (রা) মালে গনীমতসহ মদীনায় প্রবেশ করেন। তিনি উসামা (রা) ও তাঁর বাহিনীকে সফরের ক্লান্তি দূরীকরণার্থে মদীনায় আরাম করার জন্য রেখে খোদ মদীনার মুসলমানদের ছোট্ট দলটি নিয়ে যুল-খাশাব ও যুল-কিসসার দিকে বের হয়ে পড়লেন। আবরাক নামক স্থানে আব্স, যুবয়ান, বনূ বকর, ছা'লাবা ইব্ন সা'দ প্রভৃতি গোত্র মুকাবিলায় প্রবৃত্ত হলো। ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। শেষে মুরতাদরা পরাজিত হয়ে

পলায়ন করলো। আবরাক নামক স্থানে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) অবস্থান করলেন এবং বনূ যুবয়ানের জায়গাগুলো মুসলমানদের প্রদান করলেন। তাদের চারণভূমিগুলো মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য ওয়াক্‌ফ করলেন। এরপর সেখান থেকে তিনি যুল-কিসসা নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং দুশমনদের ইচ্ছামতো কানমলা দিয়ে মদীনায় প্রত্যাগমন করেন। এতক্ষণে উসামা বাহিনীরও ক্লান্তি দূর হয়েছিল।

আরবদেশে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেসব লোকের সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ করেছিলেন, তারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম, সেসব লোক–যারা নজ্‌দ, ইয়ামান, হাযরামাউত প্রভৃতি এলাকায় মুসায়লামা, তুলায়হা, সাজা প্রমুখ মিথ্যা নবুওয়াতদাবীকারীদের সাথে একমত হয়ে গিয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে কোন সাহাবীর দ্বিমত ছিল না। দ্বিতীয় সেসব গোত্র-যারা যাকাত পরিশোধ করতে অস্বীকার করতো। এদের সাথে যুদ্ধ করা কোন কোন সাহাবী সমীচীন মনে করেননি। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রায় প্রদানের পর সব সাহাবীই তাঁর রায়ের সাথে একমত হন। এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য তো অবশ্যই ছিল, কিন্তু মুসলমানরা যখন উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা সমান জরুরী সাব্যস্ত করেন, তখন ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য ও তফাৎ অবশিষ্ট ছিল না। আর প্রকৃত ঘটনাও এই যে, এই উভয় শ্রেণীই দুনিয়াদারী ও জড়বাদিতার একই সয়লাবে ভেসে গিয়েছিল যাদেরকে সিদ্দীকী কৌশল ও আধ্যাত্মিকতা ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং এই ধ্বংসকারী তুফান থেকে নাজাত দিয়ে আরব সেনাবাহিনীকে বিজয়ের শীর্ষে নিরাপদে পৌঁছে দেয়।

সিদ্দীক আকবরের ফরমান

সিদ্দীকে আকবর (রা) মদীনায় আগমন করেই সর্বপ্রথম একটি ফরমান লিপিবদ্ধ করেন এবং তার বিভিন্ন কপি করিয়ে দূত মারফত প্রত্যেক মুরতাদ গোত্রের নামে এর এক-একটি কপি প্রেরণ করেন। দূতকে বলা হলো যে, সর্বপ্রথম গিয়ে গোটা গোত্রের লোকদেরকে একটি সমাবেশে ডেকে এই ফরমান শুনিয়ে দিতে হবে। এই ফরমান বা ঘোষণার সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফা আবূ বকরের তরফ থেকে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রতি, যার নিকট এই ফরমান পৌঁছবে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকুক বা ইসলাম ত্যাগ করে থাকুক। জানা আবশ্যক যে,

فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامن بما جاء واكلر من ابى واجاهده . اما بعد .

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। যিনি সুসংবাদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী এবং হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াত কবূল করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিদায়াত দান করেন এবং সাফল্যের সোজা পথ প্রদর্শন করেন। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে জিহাদের মাধ্যমে বশ্যতা ও আনুগত্যের প্রতি ফিরিয়ে আনা হয়। আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করা, মুসলমানদের নসীহত করা এবং স্বীয় কর্তব্য ও প্রচার কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার পর হযরত নবী করীম (সা) এ দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্

তা'আলা এ খবর কুরআন মজীদে পূর্বেই দান করেছিলেন। اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ (তুমিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল) (সূরা যুমার, আয়াত ৩০)।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۔ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۔

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবনদান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৪)

এবং মুসলমানদেরকে এরূপ সম্বোধন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ۔ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۔

মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)।

কাজেই যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে পূজা করতো, (তার জেনে রাখা উচিত যে,) মুহাম্মদ নিঃসন্দেহে ইনতিকাল করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একক আল্লাহ্‌র উপাসনা করতো, তার আল্লাহ্ জীবিত ও বর্তমান আছেন। তিনি না মৃত্যুবরণ করেছেন, না তাকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে। তিনি তাঁর নির্দেশ রক্ষা করেন এবং আপন দলের মাধ্যমে শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করা, নবীর আনীত নূর ও আল্লাহ্‌র রহমতে অংশ গ্রহণ করা, ইসলামের হিদায়াত কবূল করা এবং আল্লাহ্‌র দীনের মযবুত রশি আঁকড়ে ধরার উপদেশ প্রদান করছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করেননি, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর যাকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেননি, সে বিপদে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে সাহায্য করেন না, সে এক ও একাকী এবং বন্ধুহীন ও অসহায়। মানুষ যতক্ষণ ইসলামকে অস্বীকার করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন আমল কবূল হতে পারে না। আমি অবগত হয়েছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করা ও তার আজ্ঞা ও নির্দেশাবলী পালন করার পর আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে মূর্খতা ও শয়তানের আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে তোমাদের দুশমন শয়তান ও তার সন্তান-সন্ততিকে বন্ধু বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ আল্লাহ্ বলছেন, শয়তান তোমাদের শত্রু। তাই তোমরাও তাকে তোমাদের শত্রু জ্ঞান করো। কেননা, তারা তো তাদের দলকে তোমাদের দোযখী বানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। আমি তোমাদের প্রতি মুহাজির ও আনসার বাহিনীকে প্রেরণ করছি। তারা সত্যের অনুসারী। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছাড়া কারো মুকাবিলা করবে না। আমি আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি ইসলাম কবূল করবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকবে, নেক কাজ বর্জন করবে না, তাকেই সাহায্য করবে। আর যে ইসলামকে অস্বীকার করবে, তার মুকাবিলা করবে তাকে মোটেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে না, আর ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করবে, সে কল্যাণ লাভ করবে, অন্যথায় সে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না। আমি আমার কাসিদকে নির্দেশ

দিয়েছি যে, আমার এই ঘোষণাকে প্রত্যেক জনসভায় পাঠ করে শোনাবে। ইসলামী লশকর যখন তোমরা নিকট পৌঁছে যাবে এবং তাদের মুআযযিন আযান দেবে, তখন তোমরাও তাদের মুকাবিলায় আযান দেবে। এতে প্রতীয়মান হবে যে, তোমরা ইসলাম কবূল করেছো। তখন তোমাদের উপর আক্রমণ করা হবে না। আর তোমরা যদি আযান না দাও, তবে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং অস্বীকার করলে তোমাদের উপর হামলা করা হবে।"

মুরতাদদের মূলোচ্ছেদ

এই ফরমানগুলো দূতদের মাধ্যমে প্রেরণ করার পর সিদ্দীকে আকবর (রা) এগারটি ঝাণ্ডা তৈরি করেন এবং এগারজন দলপতি নির্বাচিত করে একেকটি ঝাণ্ডা একেকজন দলপতির হাতে সোপর্দ করেন। এরপর প্রত্যেককে একেক দল সৈন্য প্রদান করে নির্দেশ দিলেন যে, মক্কা ও তায়িফ প্রভৃতি স্থান থেকে যেখানে যেখানে ইসলামের উপর দৃঢ়পদ গোত্র পাওয়া যাবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঐ গোত্র ও তাদের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্য রেখে দেবে এবং কিছু লোক নিজ বাহিনীতে শরীক করে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। প্রথম ঝাণ্ডাটি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, সর্বপ্রথম তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ আসাদীর উপর আক্রমণ করবে। এই অভিযান শেষ হওয়ার পর বার্তা নামক স্থানে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার উপর আক্রমণ করবে। দ্বিতীয় ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় হযরত ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেলকে। তাকে ইয়ামামার মুসায়লামা কায্‌যাবের উপর হামলা করতে বলা হয়। তৃতীয় ঝাণ্ডা শোরাহবীল ইব্‌ন হাসানাকে সোপর্দ করা হয়। তাকে বলা হয় যে, তুমি ইকরামাকে সাহায্য করবে এবং ইয়ামামা অভিযান সম্পন্ন করে হাদরামাউতের বনূ কিন্দা ও বনূ কাযার উপর হামলা করবে। চতুর্থ ঝাণ্ডা হযরত খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) ইব্‌ন আসী লাভ করেন তাঁকে নির্দেশ দান করা হয় যে, সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছে সেখানকার গোত্রগুলোকে শায়েস্তা করবে। পঞ্চম ঝাণ্ডা হযরত আমর ইব্‌নু'ল 'আস (রা)-কে প্রদান করে হুকুম দেযা হয় যে, তুমি বনূ খুযাআর মুরতাদদের নিকট চলে যাও। ষষ্ঠ ঝাণ্ডা হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন মুহসিন (রা)-কে দিয়ে আম্মান অভিমুখে যাত্রা করতে বলা হয়। সপ্তম ঝাণ্ডা আরফাজাহ্ ইব্‌ন হারছামাহ্ (রা)-কে প্রদান করে মুহ্‌রাবাসীদের দিকে যেতে বলা হয়। হুযায়ফাহ্ ও আরফাজাহ্‌কে আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে, উভয়ে একসাথে থাকবে। আম্মানে থাকাকালে হুযায়ফা আমীর ও আরফাজাহ্ তার অধীনে থাকবে। আর যখন মুহরায় থাকবে, তখন আরফাজাহ্ আমীর হবে এবং হুযায়ফা তার অধীনে থাকবে। অষ্টম ঝাণ্ডা তুরায়ফা ইব্‌ন আজিযকে প্রদান করা হয়। তাঁকে বলা হয় যে, বনূ সুলায়ম ও তাদের মিত্র বনূ হাওয়াযিনের দিকে যাত্রা করো। নবম ঝাণ্ডা সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুকাররিনকে প্রদান করা হয়। তিনি ইয়ামান (তিহামা) যাওয়ার নির্দেশ লাভ করেন। দশম ঝাণ্ডা আলা' ইব্‌ন হাদরামী-কে প্রদান করা হয়। তাঁকে বাহ্‌রায়নের দিকে যেতে বলা হয়। একাদশ ঝাণ্ডা মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়াকে দেয়া হয় এবং তাকে সানাআ অভিমুখে যাত্রা করতে বলা হয়।

এই দলপতিদের প্রেরণ করার সময় তাঁদের প্রত্যেককে একই বিষয়বস্তুর একেকটি ফরমান লিখে দেয়া হয়। এই ফরমানের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ :

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘোষণা

"এই চুক্তিপত্র আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা আবূ বকরের তরফ থেকে অমুক দলপতিকে প্রদান করা হচ্ছে– যখন তাকে ইসলামী লশকরের সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য

প্রেরণ করা হচ্ছে। ঐ দলপতির নিকট থেকে আমরা অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে আপন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজের ব্যাপারে ভয় করতে থাকবেন। আমরা তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার পথে মুরতাদদের সাথে তিনি লড়াই করবেন। কিন্তু সর্বপ্রথম দোষ এড়ানোর জন্য তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা সে দাওয়াত কবূল করে, তবে লড়াই থেকে বিরত থাকবেন। আর যদি তারা কবূল না করে, তবে তাদের উপর হামলা করবেন– যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম কবূল করে। তারপর তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন। তাদের যা দেয়া কর্তব্য, তা তাদের নিকট থেকে আদায় করবেন এবং তাদের যা প্রাপ্য তা তাদেরকে প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে কারো প্রতি কোনরূপ প্রশ্রয় বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করা চলবে না। মুসলমানদেরকে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধা দেয়া হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান অমান্য করবে, তার সাথে লড়াই করা হবে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করবে, তাকে নির্দোষ জ্ঞান করা হবে। আর যে ব্যক্তি মৌলিক স্বীকারোক্তির পর অন্তরে অন্য কোন আকীদা পোষণ করবে, তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট থেকে নেবেন। যে লোক অমান্য করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন, এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া তার সমস্ত মালে গনীমত বন্টন করে দেয়া হবে। আর এক-পঞ্চমাংশ আমাদের কাছে প্রেরণ করা হবে। আমরা আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, দলপতি তাঁর সঙ্গীদেরকে তাড়াহুড়া ও নৈরাজ্য সৃষ্টি থেকে বিরত রাখবেন এবং অপর কোন লোককে তার দলের মধ্যে স্থান দেবেন না– যে পর্যন্ত তাকে উত্তমরূপে জেনে-বুঝে না নেবেন। তাহলে গুপ্তচরের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবেন। তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, মুসলমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। ভ্রমণ ও অবস্থানকালে লোকদের সাথে কোমল ব্যবহার করবেন এবং তাদের উপর দয়া প্রদর্শন করবেন। ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় পরস্পরের প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতা রক্ষা করবেন।

এই দলপতি একাদশ হিজরীর জুমাদিউল আউয়াল মাসে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে এবং নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে গিয়ে কর্মে নিয়োজিত হন।

তুলায়হা আসাদী

তুলায়হা ছিল একজন গণক ও জাদুকর। এই অবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা)-এর শেষ জীবনে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বয়ং নিজে নবী হওয়ার দাবীদার সাজে। বনী ইসরাঈলের কোন কোন গোত্রও তার দলে শামিল হয়। তাকে দমন করার জন্য হযরত যিরার ইব্নুল-আযওয়ার (রা) গমন করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন না করতেই হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাই হযরত যিরার (রা) এই অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। তুলায়হা এই অবসরে তার শক্তি সংহত ও দলবল বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ পায়। গাত্ফান ও হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্র যারা যুল-কিসসা ও যুল-খাশাব-এ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দ্বারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল– তুলায়হার নিকট গিয়ে তার দলভুক্ত হয়েছিল। নজ্দের বিখ্যাত বাযাখা কূপের কাছে তুলায়হা তার ক্যাম্প স্থাপন করে। তার আশপাশে গাত্ফান, হাওয়াযিন, বনূ আমির, বনূ তাঈ প্রভৃতি গোত্রের বিরাট সমাবেশ ঘটে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন একাদশ দলপতি নির্বাচিত করে প্রেরণ করতে চাইলেন, তখন হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর রওয়ানার পূর্বে তাঁর তাঈ গোত্রের দিকে রওয়ানা হন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনেন। এই গোত্রের যেসব লোক তুলায়হার দলভুক্ত হয়েছিল, তাদের নিকট তাঈ গোত্রের লোক পাঠিয়ে বলেন, তোমরা খালিদ (রা)-এর হামলার পূর্বে নিজ গোত্রের লোকদের সেখান থেকে ডেকে নিয়ে আসো। সুতরাং বনূ তাঈ'র সমস্ত লোক তুলায়হার দল থেকে চলে এলো এবং সবাই ইসলামে ফিরে এসে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর দলে যোগ দিলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) বাযাখার ময়দানে পৌঁছে তুলায়হা বাহিনীর উপর হামলা করেন। ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলিম বাহিনীর দুই বাহাদুর হযরত উক্কাশা ইব্‌ন হিস্‌ন (রা) ও হযরত ছাবিত ইব্‌ন আকরাম আনসারী যারা নৈশ প্রহরায় রত ছিলেন শত্রুর হাতে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ছাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে এবং বনূ তাঈর মধ্যে আদী ইব্‌ন হাতিমকে দলপতি নিয়োগ করে শত্রুর উপর হামলা করেন। তুলায়হা বাহিনীর সেনাপতি ছিল তার ভাই। আর তুলায়হা একটি চাদর মুড়ি দিয়ে লোকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য আলাদা এক পাশে ওয়াহীর অপেক্ষায় বসেছিল। লড়াই খুব জোরেশোরে শুরু হলো।

মুরতাদ বাহিনীর উপর যখন বিপর্যয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো, তখন তুলায়হা বাহিনীর জনৈক নেতা উয়ায়মা ইব্‌ন হিস্‌ন তুলায়হার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোন ওয়াহী নাযিল হয়েছে কিনা ? তুলায়হা বললো, এখনো হয়নি। কিছুক্ষণ পর উয়ায়মা আবার জিজ্ঞেস করলো এবং ঐ একই জবাব পেলো। তারপর ময়দানে গিয়ে সে যুদ্ধ করতে লাগলো। তখন প্রতি মুহূর্তে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হতে যাচ্ছিল এবং মুরতাদদের কদম দুলে উঠছিল। উয়ায়মা তৃতীয় বার পুনরায় তুলায়হার নিকট গেলো এবং ওয়াহী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, হাঁ, জিবরাঈল আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে, তোমার জন্য তাই হবে, যা তোমাদের ভাগ্যে লেখা আছে।" উয়ায়মা একথা শুনে বললো, লোক সকল! তুলায়হা মিথ্যাবাদী! আমি চলে গেলাম। একথা শোনামাত্রই মুরতাদরা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করলো। অনেকে নিহত, অনেকে পলাতক ও অনেকে বন্দী হলো। অনেকে তখনই মুসলমান হয়ে গেলো। তুলায়হা সস্ত্রীক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলো এবং সিরিয়া গমন করে খুযাআ গোত্রে আশ্রয় নিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন সমস্ত গোত্র মুসলমান হয়ে গেলো এবং স্বয়ং তার গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তুলায়হাও মুসলমান হয়ে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে মদীনায় আগমন করলো এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলো। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নও বন্দী হয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামনে এলো। তাকে হযরত খালিদ (রা) সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নিকট মদীনায় প্রেরণ করলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইসলাম পেশ করলেন। সে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে নিহত হলো।

তুলায়হা বাহিনী যখন বাযাখা নামক স্থানে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো, তখন পলায়নকারীদের মধ্যে গাত্‌ফান, সুলায়ম, হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্রের লোক হাওয়াব নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হলো। সেখানে তারা সালমা বিন্‌তে মালিক ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর

ইব্‌ন জা'ফরকে তাদের নেত্রী বানালো এবং মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে আত্মনিয়োগ করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এ ঘটনা অবগত হয়ে সেদিকে রওয়ানা হলেন। সালমাও তার বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এলো এবং একটি উটনীর উপর সওয়ার হয়ে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে লাগলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হামলা করলেন। ঘোর যুদ্ধ হলো। সাল্‌মার উটনী রক্ষা করতে গিয়ে একশ' মুরতাদ নিহত হলো। শেষে সালমার উটনী যখমী হয়ে ভূমিতে পতিত হলো এবং সালমা নিহত হলো। তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে মুরতাদরা পলায়ন করলো এবং নিমেষের মধ্যে ময়দান শূন্য হয়ে গেলো।

এদিকে এই হাঙ্গামা চলছিল, আর ওদিকে মদীনা মুনাওয়ারায় বনু সুলায়মের এক দলপতি আল-ফুজাত ইব্‌ন আব্‌দ ইয়ালীল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো যে, আমি একজন মুসলমান। আপনি যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। আমি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে যুদ্ধোপকরণ প্রদান করে মুরতাদদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সে মদীনা থেকে বের হয়ে স্বীয় মুরতাদ হওয়ার কথা ঘোষণা করলো এবং বনূ সুলায়ম ও বনূ হাওয়াযিনের যেসব লোক মুসলমান হয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়সকে প্রেরণ করেন। তিনি এই ধোঁকাবাজ মুরতাদদেরকে পথিমধ্যেই পাকড়াও করলেন এবং সংঘাত ও সংঘর্ষের পর আল-ফুজাত ইব্‌ন আব্‌দ ইয়ালীলকে বন্দী করে সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর নিকট মদীনায় হাযির করা হলো এবং তাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হলো।

সাজাহ্ ও মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ্

বনূ তামীম কয়েকটি গোত্রে অন্তর্ভুক্ত এবং কয়েকটি বস্তিতে বসবাস করতো। এদের এলাকায় হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় এদেরই নিয়োগকৃত কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। তারা হলো মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ, ওয়াকী ইব্‌ন মালিক, সাফওয়ান ইব্‌ন সাফওয়ান, কায়স ইব্‌ন আসিম প্রমুখ। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর পেয়ে কায়স ইব্‌ন আসিম মুরতাদ হয়ে গেলো। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহও এই খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ করলো। সাফওয়ান ইব্‌ন সাফওয়ান ইসলামের উপর বহাল রইল এবং কায়স ও সাফওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। ইত্যবসরে তাগলিব গোত্রের সাজাহ্ বিনতুল হারছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ নবূওয়াতের দাবী করলো এবং বনূ তাগলেবের সরদার হুযায়ল ইব্‌ন ইমরান, বনূ তামারের সরদার উক্‌বা ইব্‌ন হিলাল ও বনূ শায়বানের সরদার সুলায়ল ইব্‌ন কায়স তার নবুওয়াতের দাবী মেনে নিলো। সাজাহর চারপাশে প্রায় চার হাজার লশকর সমবেত হলো। সে এই লশকর নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। বনূ তামীমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ সাজাহ'র সাথে সন্ধি করে তাকে পরামর্শ দিলো বনূ তামীমের অন্যান্য গোত্রের উপর হামলা করতে। আর এইভাবে বনূ তামীমকে বাধ্য করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করতে সাজাহ বনূ তামীমের উপর হামলা করলো। বনূ তামীম মুকাবিরা করে তার লশকরকে পরাস্ত করলো। কিন্তু পরিশেষে সন্ধি হলো।

এক্ষণে সাজাহ মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী ইব্‌ন মালিককে সঙ্গে নিয়ে চললো। কিছু দূর গমন করে এবং কি চিন্তা করে ফেরত চলে গেলো। সাজাহ তার বাহিনী নিয়ে সামনে

অগ্রসর হলো। সাজাহ তার অনুসারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায অপরিহার্য রাখলো ও শূকরের গোশ্ত খাওয়া, শরাব পান করা ও জিনা করা জায়েয সাব্যস্ত করেছিল। বহু খ্রিস্টানও তাদের ধর্ম ত্যাগ করে সাজাহ'র দলভুক্ত হয়েছিল।

বনূ তামীমের বস্তিগুলো পার হয়ে সাজাহ জানতে পারলো যে, খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) ইসলামী লশকর নিয়ে এদিকে আগমন করছেন। এদিকে মুসায়লামা কায্যাবের বিরাট বাহিনীর কথা শুনে তার সন্দেহ হলো, না জানি সেও নবুওয়াতের দাবীদার হওয়ার কারণে শত্রুতা ও বিরোধিতায় লেগে যায়। মুসায়লামা কায্যাব যখন সাজাহ বাহিনীর কথা শুনলো, তখন সেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলো। একদিকে ইসলামী লশকরের আশংকা, আর অপর দিকে সাজাহ বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করেছে। তারা যদি এদিকে মনোনিবেশ করে, তবে বিরাট সংকট দেখা দেবে। এদিকে ইক্রামা (রা) ও শুরাহবীলও তাঁদের বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার নিকটবর্তী পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং মুসায়লামা ও সাজাহকে পরস্পরের দোসর ভেবে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে মুসায়লামা সাজাহকে এই মর্মে পত্র লিখলো যে, তোমার অভিপ্রায় কি ? সাজাহ উত্তর দিলো যে, আমি মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করতে চাই। আমি একজন নবী এবং শুনেছি আপনিও একজন নবী। তাই আমাদের উভয়কে সংঘবদ্ধভাবেই মদীনা আক্রমণ করা উচিত। মুসায়লামা সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম পাঠালো যে, যতদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবিত ছিলেন, ততদিন অর্ধেক রাজ্য তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অর্ধেক রাজ্য আমি আমার নিজের এলাকা মনে করতাম। এখন তাঁর ওফাতের পর গোটা রাজ্যের উপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু তুমিও নবুওয়াত দাবী করছো তাই আমি অর্ধেক পয়গাম্বরী তোমাকে দিয়ে দেবো। উত্তম এই যে, তোমার লশকর ওখানে রেখে একাকী আমার নিকট চলে এসো, যাতে তোমার সাথে পয়গাম্বরী বন্টন ও মদীনা আক্রমণ সম্পর্কিত যাবতীয় আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মিথ্যুক মহিলা নবীর বিবাহ

সাজাহ এই পয়গাম পেয়েই মুসায়লামার নিকট গমন করলো। সে তার দুর্গের সামনে একটি তাঁবু স্থাপন করলো। সাজাহকে সেখানে অবতরণ করালো। উভয়ের কথোপকথন হলো। সাজাহ মুসায়লামার পয়গাম্বরী মেনে নিলো। তার উপর ঈমান আনলো। তারপর উভয়ের বিবাহ হলো। বিবাহের পর সাজাহ তিন দিন পর্যন্ত মুসায়লামার নিকট থাকলো। সেখান থেকে বিদায় হয়ে তার লশকরের মধ্যে এলো। লশকররা বললো, বিবাহের মোহর কোথায় ? বিনা মোহরে তুমি কিরূপে বিবাহ করলে ? তারপর সে মুসায়লামার নিকট গেলো। মুসায়লামা বললো, আমি তোমার মোহরের বিনিময়ে তোমার দলের জন্য দুই ওয়াকত নামায অর্থাৎ ঈশা ও ফরয মাফ করে দিলাম। সাজাহ সেখান থেকে বিদায় হয়ে এলো। হুযায়ল ও উক্বাকে ইয়ামামার অর্ধেক ফসল আদায় করার জন্য নিয়োগ করে যাত্রা করেছিল। ইত্যবসরে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যিনি বনূ তামীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিলেন, সামনে পড়ে গেলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের লশকর দেখেই সাজাহ'র সঙ্গীরা পলায়ন করলো। আর সে অতিকষ্টে আপন বনূ তাগ্লিব গোত্রের জাযীরা নামক স্থানে পৌঁছে অজ্ঞাত জীবন যাপন করতে লাগলো।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বনূ তামীম এলাকায় পৌঁছে যারা ইসলামের উপর বহাল ছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা গ্রেফতার ও নিহত হলো। মুরতাদ ও মুসলমানের পরিচয় হতো আযানের মাধ্যমে। যেমন পূর্বে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফরমানে আলোচিত হয়েছে। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার বস্তিগুলোর উপরও আযানের পরই হামলা হয়েছিল।

মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার হত্যা

মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সাজাহ'র সাথেও সে আপোস রফা করেছিল। কিন্তু পরে তার লশকর থেকে পৃথক হয়ে চলে গিয়েছিল। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা যখন গ্রেফতার হয়ে এলো এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামনে তাকে পেশ করা হলো, তখন কোন কোন মুসলমান বললো, মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার বস্তি থেকে প্রত্যুত্তরমূলক আযানধ্বনি এসেছিল। তাই তাকে হত্যা করা উচিত নয়। কেউ কেউ বললো, তারা প্রত্যুত্তরে আযান বলেনি। তাই তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী হত্যা করা ওয়াজিব। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যতটুকু তথ্য তালাশ করেছেন, তাতে এ ব্যাপারে কোন বিশ্বাসযোগ্য ও নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রমাণ হস্তগত হয়নি। আরও আশ্চর্য এই যে, মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা যখনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে কথাবার্তা বললো, তখন তাঁর মুখ থেকে আলোচনার সময় কয়েকবার এরূপ কথা বের হলো যে, তোমাদের সাহিব এরূপ বলেছিলেন, কিংবা তোমাদের সাহিব এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি। 'তোমাদের সাহিব' কথাটি দ্বারা সে হযরত নবী করীম (সা)-কে বুঝিয়েছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এই শব্দটি শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, "তিনি কি তোমার সাহিব ছিলেন না ?" মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তাবারীর রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত যিরার ইব্‌ন আযওয়ার (রা) এ সময় অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর ইঙ্গিতে তার শির উড়িয়ে দিলেন। এ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা। কিন্তু ঐতিহাসিকদের এই ঘটনাটি বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করতে হয় যে, ঐ সময় হযরত আবূ কাতাদাও হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর ফৌজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেসব লোকের অন্যতম, যারা মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার বস্তি থেকে আযানধ্বনি শোনা যাওয়ার প্রবক্তা ছিল। তাই তাঁর মতে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করা অনুচিত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক একথাও লিখেন যে, মালিক ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হত্যা করেননি বরং তিনি অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে প্রকৃত ঘটনা তদন্তের জন্য মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে যিরার ইব্‌ন আযওয়ার (রা)-এর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেছিলেন এবং ঘটনাচক্রে রাতের বেলা প্রতারণামূলকভাবে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা যিরার ইব্‌ন আযওয়ারের হাতে নিহত হয়। যা হোক, হযরত আবূ কাতাদা (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশার্থে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রুদ্ধ হয়ে মদীনায় চলে আসেন এবং এখানে এসে অভিযোগ দায়ের করেন যে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ মুসলমানদেরকে হত্যা করছেন। হযরত উমর ফারূক (রা) ও মদীনার অন্যান্য সাহাবা যখন একথা শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন যে, খালিদকে বরখাস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। মদীনা

মুনাওয়ারার খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে সাধারণ অসন্তোষ এজন্যও ছড়িয়ে পড়লো এবং মুসলিম হত্যার অভিযোগ তাঁর উপর আরো এজন্য দৃঢ় হলো যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পরবর্তী সময় মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সব কথা শ্রবণ করে খালিদের অনুমতি ছাড়া তাঁর লশকর থেকে চলে আসার জন্য হযরত আবূ কাতাদাহ (রা)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো ফেরত চলে যেতে এবং খালিদের লশকরে শামিল হয়ে তাঁর যাবতীয় নির্দেশ পালন করতে। সুতরাং তাকে ফিরে যেতে হলো। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর ফারূক (রা) ও অন্যান্য সাহাবাকে বোঝালেন যে, খালিদের উপর বড়জোর একটি ইজতিহাদী ভুলের অভিযোগ আরোপ হতে পারে। সামরিক ব্যবস্থা ও যুদ্ধনীতি দৃষ্টে আল্লাহ্‌র অসি খালিদের ক্ষেত্রে কিসাস ও বরখাস্ত কোন দণ্ডই প্রযোজ্য নয়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার রক্তপণ বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করে দিলেন। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের শত্রুদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও কি পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁরা একজন সাধারণ মানুষের জন্য একজন উঁচুদরের সিপাহসালারকেও সত্য ও ন্যায়ের সম্ভ্রম রক্ষার্থে হত্যা করা ও মৃত্যুদণ্ড দেয়া জরুরী মনে করতেন।

মুসায়লামা কাযযাব

মক্কা বিজয়ের পর বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে মুসলমান হয়েছিল তাদের মধ্যে মুসায়লামা ইব্‌ন হাবীবও বনূ হানীফার প্রতিনিধি দলে শামিল ছিল। নবীযুগের বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সে যখন তার স্বদেশ ইয়ামামায় ফিরে গেলো ঠিক সেই সময়ই নবী করীম (সা)-এর রোগাক্রান্ত হওয়ার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুসায়লামা তখন নবুওয়াতের দাবী করলো এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট এই মর্মে কে পত্র প্রেরণ করলো যে, "নবুওয়াতের মধ্যে আপনি ও আমি উভয়ই অংশীদার। সুতরাং অর্ধেক রাজ্য কুরায়শের এবং অর্ধেক রাজ্য আমার। নবী করীম (সা) তার উত্তরে লিখলেন :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى - اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ·

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের তরফ থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। যে ব্যক্তি হিদায়াতের অনুসরণ করে, তার উপর সালাম। এরপর সমস্ত পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর পরিণাম এক মাত্র মুত্তাকীদের জন্যই।

এই উত্তর পাঠানোর পর হযরত নবী করীম (সা) বনূ হানীফার জনৈক সম্ভ্রান্ত রিজাল ইব্‌ন 'আনফুহ্‌কে—যিনি হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং হিজরত করার দরুন তাঁর গোত্রের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল—মুসায়লামার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে ইসলামের পথে কায়েম রাখতে পারেন।

রিজাল ইয়ামামায় পৌঁছে মুসায়লায়মাকে সমর্থন করলেন এবং তার অনুগত হয়ে গেলেন। ফলে মুসায়লামা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর মুসায়লামা কাযযাবের তাৎক্ষণিক প্রতিকার সম্ভব হয়নি। কেননা, সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মনোযোগ বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লকে মুসায়লামা কাযযাবের শাস্তি বিধান কল্পে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁর পিছনে শুরাহবীল ইব্ন হাসানাকে সাহায্যকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। ইকরামা (রা) মুসায়লামার নিকট পৌঁছে শুরাহবিলের শরীক হওয়ার পূর্বেই সহসা আক্রমণ করে পরাজিত হন। এই খবর শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইকরামা (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, তুমি এখন মদীনায় ফিরে আসবে না। বরং হুযায়ফা ও আরফাজার নিকট গমন করবে। আর তাদের অধীনে মুহ্রা ও আম্মানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারপর এই অভিযান যখন শেষ হবে, তখন তুমি তোমার সৈন্যসহ ইয়ামন ও হাদরামাউতে মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়ার নিকট গমন করবে। আর শোরাহবীল ইব্ন হাসানাকে লিখলেন যে, তুমি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের প্রদেশগুলোর দিকে গমন করে সেখান থেকে কোযাআর দিকে চলে যাবে এবং আমর ইব্নুল 'আসের সাথে মিলিত হয়ে সেখানকার মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বাতাহ অঞ্চল অর্থাৎ বনূ তামীম অঞ্চলের অভিযান শেষ করেছিলেন। তিনি তাঁর অভিযান পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে খলীফার দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই পেশ করতে হলো। হযরত উমর ফারূক (রা) যদিও হযরত খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন ও শাস্তি বিধান করা জরুরী মনে করতেন, কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁকে নিরুপায় ও নির্দোষ দেখে শাস্তিযোগ্য মনে করেন নি বরং স্বীয় সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে সসম্মানে মুহাজির ও আনসারদের একটি সেনাদল প্রদান করে মুসায়লামা কাযযাবের প্রতি প্রেরণ করলেন।

জাতীয়তার পথভ্রষ্টতা

মুসায়লামার চারপাশে রবীআ গোত্রের চল্লিশ হাজার যোদ্ধা সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও ছিল যারা মুসায়লামাকে মিথ্যুক নবী মনে করতো। কিন্তু স্বজাতীয়তার দরুন তার সাফল্য কামনা করতো। তাদের বক্তব্য ছিল-মুসায়লামা মিথ্যুক এবং মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী বটে। কিন্তু আমাদের কাছে রবীআ গোত্রের মিথ্যুক নবী মুদার গোত্রের সত্য নবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে বিদায় করার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সাহায্যার্থে আরো সৈন্য প্রেরণ করেন, যারা পথিমধ্যে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সেনাদলে গিয়ে শামিল হতে থাকলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট তেরো হাজার। ইয়ামামা শহর যখন একদিনের দূরে ছিল, তখন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) একটি ক্ষুদ্র দলকে অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রেরণ করেন।

ঐদিনই মুসায়লামা মুজাআ ইব্ন মুরারাকে বনূ তামীমের উপর হামলা করার জন্য ষাট জনের একটি দলসহ প্রেরণ করলো। ইসলামী অগ্রবর্তী দলের সাথে মুজাআর মুকাবিলা হলো। ফলে, সমস্ত মুরতাদ নিহত হলো এবং তাদের সরদার মুজাআকে গ্রেফতার করে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট হাযির করা হলো। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়ামামা শহরের নিকটবর্তী হলেন। মুসায়লামা ইয়ামামা শহর থেকে বের হয়ে শহর

তোরণ সন্নিহিত একটি উদ্যানে–যার নাম রেখেছিল যে হাদীকাতুর রহমান-তাঁবু স্থাপন করলো। এই উদ্যানের বাউন্ডারী ছিল খুব মযবুত ও দুর্গ সদৃশ। মুসায়লামা বাহিনীর সৈনাপত্য ছিল রিজাল ইব্‌ন আনফুহ ও মাহ্‌কাম ইব্‌ন তুফায়লের হাতে ন্যস্ত।

ঘোরতর যুদ্ধ

তাদের চল্লিশ হাজার বীর সৈনিক খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর তেরো হাজার সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ হামলা ছিল অতি ভীষণ ও প্রলয়ংকারী। মুসলিম পক্ষ অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এই হামলা প্রতিরোধ করলো। অতঃপর চতুর্দিক থেকে কুঞ্চিত হয়ে এবং নিজেদেরকে সামলে নিয়ে শত্রুর উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো আক্রমণ করলো। ফলে মুসায়লামা বাহিনীর কদম দুলে উঠলো। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ছত্রভঙ্গ ও পলায়ন করলো। মাহকাম ইব্‌ন তুফায়ল তার লশকরের এই অবস্থা দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললো, "ওহে বনূ হানীফা! তোমরা উদ্যানে প্রবেশ করো। আমি তোমাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী আক্রমণকারীদেরকে প্রতিরোধ করছি।" এই আহ্বান শ্রবণ করে পলায়নকারীরা সবাই উদ্যানে প্রবেশ করলো। মাহকাম ইব্‌ন তুফায়ল অল্প কিছুক্ষণ যুদ্ধরত ছিল। কিন্তু শেষে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরের হাতে নিহত হলো। কিন্তু তখনো জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়নি। মুরতাদরাও নিজেদেরকে সামলে নিয়ে পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। উভয় পক্ষ থেকেই বীর বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মুসলিম পতাকাবাহী ছাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) শহীদ হলেন। হযরত যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) পতাকা তাঁর হাতে তুলে নিলেন। মুসলমানরা এমন সামরিক বীরত্ব প্রদর্শন করলো যে, শত্রুপক্ষ পিছনে হটতে হটতে উদ্যান প্রাচীর প্রান্তে পৌঁছে গেলো। উদ্যান ফটকেও কিছুক্ষণ লড়াই চললো। শেষে মুসলমানরা উদ্যান-ফটকও ভেঙে ফেললো এবং এখানে-ওখানে প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন। লোকেরা মুসায়লামাকে জিজ্ঞেস করলো যে, "তোমার খোদা তোমার সাথে যে বিজয়ের ওয়াদা করেছে, তা কখন পূর্ণ হবে?" সে উত্তর দিলো, "এখন এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সময় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার পরিবার-পরিজন রক্ষার জন্য লড়াই করা উচিত।" উদ্যান-অভ্যন্তরেও যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা জোরে-শোরে শুরু হলো, তখন মুসায়লামা বাধ্য হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হলো এবং তার লোকদেরকে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু সে যখন চতুর্দিকে মুসলমানদেরকে সবল ও শক্তিশালী দেখলো, তখন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সংগোপনে উদ্যান থেকে বের হয়ে যেতে লাগলো। ঘটনাক্রমে উদ্যান-ফটকের অদূরেই ওয়াহ্‌শী [হামযা (রা)-এর হন্তা] দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করলে তা মুসায়লামার লৌহবর্ম ফেটে তার উদর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেলো। অবশেষে শত্রুপক্ষ যে যেদিকে পারলো পলায়ন করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমান ছাড়া মুরতাদদের কাউকে আর দেখা গেলো না। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সতের হাজার লোক মুসলিম মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় এবং এক হাজারের কিছু বেশী মুসলমান শাহাদত বরণ করেন।.... কিন্তু মুসলিম পক্ষের আহতদের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। শাহাদতবরণকারীদের মধ্যে কুরআনের হাফিযও ছিলেন অনেক। তিনশ' ষাটজন আনসার ও তিন শ' ষাটজন তাবিঈন এই যুদ্ধে শহীদ হন। যুদ্ধশেষে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) মুজাআ ইব্‌ন মুরারা–কে যে বন্দী ছিল–সঙ্গে নিয়ে লাশ পরিদর্শন করেন। আর মুসায়লামা বাহিনীর নেতৃবর্গ ও স্বয়ং মুসায়লামার লাশ শনাক্ত করলো মুজাআ ইব্‌ন মুরারা।

বনূ হানীফা অর্থাৎ মুসায়লামা বাহিনীর জীবিত ব্যক্তিরা এদিকে-ওদিক পলায়ন করেছিল। ইয়ামামার শহর ও দুর্গে নারী ও শিশু ছাড়া কোন পুরুষ লোক অবশিষ্ট ছিল না। তাই আহতদের সেবা-শুশ্রূষা জরুরী ভেবে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ঐ দিনই ইয়ামামা শহর দখল করা প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল পরদিন ভোরে শহর দখলের পদক্ষেপ নেবেন মুজাআ ইব্‌ন মুরারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করলো না। সে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে বললো, আমাদের নেতৃবর্গ মুসায়লামাসহ মারা গেছে বলে আপনি মনে করবেন না যে, আপনি আপনার অভিযান পূর্ণ করে ফেলেছেন। এখানে তাদের চাইতে অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধা জীবিত রয়েছে।

আর তারা শহরের মযবুত প্রাচীর ও রসদ সামগ্রী তথা যুদ্ধ-উপকরণের বিপুল ভাণ্ডারের সাহায্যে আপনাকে পরাভূত করে ছাড়বে। তাই উত্তম এই যে, আপনি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ছেড়ে দিন। আমি শহরে গিয়ে তাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে আসবো এবং এইভাবে শহরকে তাদের সম্মতিতে সন্ধির মাধ্যমে আপনার হাতে ন্যস্ত করিয়ে দেবো। হযরত খালিদ মুজাআকে বললেন, আমি তোমাকে বন্দীত্ব হতে মুক্ত করে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে তোমার সম্প্রদায়কে সন্ধির জন্য সম্মত করাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিচ্ছি যে, আমি কেবল তাদের প্রাণের জন্যই সন্ধি করবো।

মুজাআ মুসলিম বাহিনী থেকে রওয়ানা হয়ে শহরে গেলো এবং শহরের নারীদেরকে সশস্ত্র হয়ে নগর-প্রাচীরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে যা কিছু বোঝানোর ছিল বুঝিয়ে এলো। সে ফিরে এসে বললো, আমার সম্প্রদায় নিছক তাদের প্রাণের জন্য সন্ধি করতে সম্মত নয়। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) শহরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সমস্ত নগর-প্রাচীর তলোয়ার ও বর্শা-বল্লমে চিকচিক করছে এবং সশস্ত্র লোকের আধিক্য সম্পর্কে মুজাআ যে বর্ণনা দিয়েছিল তার যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আহতদের আধিক্য ও অভিযান দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সন্ধি করা উত্তম ভেবে এই মর্মে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন যে, অর্ধেক মাল আসবাব, অর্ধেক ফল-ফসলাদি ও অর্ধেক যুদ্ধবন্দী বনূ হানীফাকে ছেড়ে দেবেন। মুজাআ পুনরায় শহরে গেলো এবং ফিরে এসে বললো,তারা এতেও সম্মত নয়।আপনি এক-চতুর্থাংশ মাল-আসবাব ইত্যাদি নিয়ে সন্ধি করতে পারেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এক-চতুর্থাংশ মাল-আসবাব নিয়েই সন্ধি করলেন এবং সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। এরপর দরজা খুলে যখন শহরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে নারী ও শিশু ছাড়া একটি পুরুষ লোকও দেখতে পেলেন না। হযরত খালিদ তখন মুজাআকে বললেন, তুমি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছো। মুজাআ বললো, আমার সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতো। আমার কর্তব্য ছিল আপন সম্প্রদায়কে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত খালিদ (রা) নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। চুক্তিপত্রের বরখেলাপ করার চিন্তা পর্যন্তও তাঁর অন্তরে উদয় হলো না। এর কিছুক্ষণ পরই মুসায়লামা ইব্‌ন ওয়াকাশ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর একটি পত্র নিয়ে এসে পৌঁছলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, তুমি যদি বনূ হানীফার উপর বিজয় লাভ করতে পারো, তবে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের হত্যা করবে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করবে। কিন্তু এই পত্র পৌঁছার পূর্বেই সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং তাঁর হুকুম পালন করা সম্ভব হয়নি। অঙ্গীকার পালন ও ওয়াদা পূরণ করার দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে এ ঘটনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বনূ হানীফার একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সমীপে প্রেরণ করলেন। একটি পত্রও তিনি খলীফার নামে লিখে তাদের হাতে দিলেন। এই পত্রে বিজয়ের বিস্তৃত কাহিনী ও বনূ হানীফার পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিপিবদ্ধ ছিল। সিদ্দীকে আকবর (রা) এই প্রতিনিধি দলকে সসম্ভ্রমে সাক্ষাৎ দান করেন এবং সহৃদয়ে তাদের বিদায় দান করেন। ইয়ামামা যুদ্ধ ১১ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে সংঘটিত হয়।

হুতাম ইব্‌ন জুনায়আহ

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আলা ইব্‌ন আল-হাযরামী (রা)-কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একটি সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করে বাহরায়নে প্রেরণ করেছিলেন। বাহরায়নে বনূ আবদুল কায়স, বনূ বকর ইব্‌ন ওয়াইল তাদের শাখা-প্রশাখাসহ এক বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল। আপনারা এও পাঠ করেছেন যে, হযরত জারূদ ইবনুল-মুআল্লা (রা) তাঁর গোত্র বনূ আবদুল কায়স-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর পেয়ে বনূ আবদুল কায়সের লোকেরা একথা বলে মুরতাদ হয়ে গেলো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যদি নবী হতেন, তবে তিনি কখনো ইনতিকাল করতেন না। হযরত জারূদ ইবনুল মুআল্লা (রা) তাঁর গোত্রকে এক স্থানে সমবেত করলেন এবং বললেন যে, আমি তোমাদের কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করবো। যে তার উত্তর অবগত আছে, সে চুপ থাকবে। এরপর তিনি তাঁর গোত্রকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা বলো, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বেও দুনিয়ায় কোন নবী এসেছিলেন কিনা ? সবাই বললো, হাঁ, এসেছিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁরা সবাই সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করে ইহধাম ত্যাগ করেছেন কিনা ? সবাই বললো, হাঁ, তাঁরা সবাই তাঁদের মিশন সম্পন্ন করে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এরপর হযরত জারূদ (রা) বললেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁর মিশন শেষ করে পরলোক গমন করেছেন। একথা বলে তিনি বললেন–

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ·

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল) এ দৃশ্য বনূ আবদুল কায়সের মনে এরূপ ক্রিয়া করলো যে, তারা তৎক্ষণাৎ তাওবা করলো এবং ইসলামের উপর কায়েম হয়ে গেলো।

বনূ আবদুল কায়স তো হযরত জারূদ ইব্‌নুল-মুআল্লাহর তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টায় এইভাবে বেঁচে গেলো। কিন্তু বনূ বকর ইব্‌ন ওয়াইল মুরতাদ হয়ে হুতামকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলো। হুতাম বনূ বকরের বিরাট বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং উতায়ফ ও হাজরের মাঝখানে ডেরা ফেললো। আর কিছু লোককে বনূ আবদুল কায়সের প্রতি প্রেরণ করলো তাদেরকে মুরতাদ বানিয়ে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বনূ আবদুল কায়স পরিষ্কারভাবে মুরতাদ হতে অস্বীকার করলো। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। এরপর হুতাম মাগরূর ইব্‌ন সুওয়াদকে একটি সেনাদল প্রদান করে আশেপাশের মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানো কিংবা তাদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করলো। এই অবস্থায় হযরত আলা ইবনুল হাদরামী (রা) সসৈন্যে বাহ্‌রায়নে প্রবেশ করলেন। তিনি হযরত জারূদ ইবনুল মুআল্লার নিকট-যিনি দারায়ন নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন–নির্দেশ পাঠালেন যে, বনূ আবদুল কায়সকে সঙ্গে

নিয়ে হুতামের উপর হামলা করো। এই নির্দেশ পৌঁছা মাত্র এবং এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আশেপাশের সকল মুসলমান হযরত আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-এর নিকট এসে সমবেত হলো। আর যেসব মুরতাদ ও মুশরিক এই এলাকায় ছিল, তারা সবাই হুতামের দলে এসে জড়ো হলো। হযরত আলা ইবনুল-হাদরামী (রা) তাঁর লশকরসহ সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুতামের সেনাছাউনির সন্নিকটে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হুতাম তার সেনাছাউনির চারপাশে একটি পরিখা খনন করিয়েছে। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। এক মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে যুদ্ধ অব্যাহত রইল। কোন পক্ষই বিজয় লাভ করতে পারলো না। যখন পূর্ণ একটি মাস এই অবস্থায় অতিবাহিত হলো, তখন হযরত আলা ইবনুল-হাদরামী (রা) মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে এক প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন এবং মুসলিম বীর সেনারা পরিখা পার হয়ে কাফিরদের সেনাছাউনিতে ঢুকে পড়লো। হযরত কায়স ইব্ন আসিম (রা)-এর হাতে হুতাম নিহত হলো। বহু মুরতাদ নিহত হলো। অন্যরা পলায়ন করলো। পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করা হলো। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সবাই ইসলামে ফিরে এলো। উপরোক্ত যুদ্ধে বহু গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। ফলে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা খুব ভাল হলো।

লাকীত ইব্ন মালিক

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত হুযায়ফা ইব্ন হিস্ন (রা)-কে আম্মান এবং হযরত আরফাজা ইব্ন হারছামা (রা)-কে মুহরাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং উভয়কে একসাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শুনে আম্মানে লাকীত ইব্ন মালিক নবুওয়াত দাবী করলো। আম্মানবাসী ও মুহরাবাসীরা মুরতাদ হয়ে গেলো এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে যে সরকারী কর্মকর্তা সেখানে নিযুক্ত ছিলেন, তাকে বের করে দিলো। হযরত হুযায়ফা ইব্ন মিহ্সান হুমায়রী (রা)-কে সিদ্দীকে আকবর (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথমে আম্মানে যেতে এবং সেখানকার অভিযান শেষ করে মুহ্রার দিকে গমন করতে। ওদিকে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেলকেও–যিনি ইয়ামামা প্রেরিত হয়েছিলেন–নির্দেশ দান করা হয়েছিল আম্মানে গিয়ে হুযায়ফা ও আরফাজার সাথে মিলিত হতে। সে মতে এই তিন নেতাই আম্মান প্রান্তরে মিলিত হয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। লাকীত ইসলামী লশকরের খবর পেয়ে সৈন্য সমাবেশ করলো এবং ওবা শহরে এসে সব রকম যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসলামী লশকরের মুকাবিলায় বের হলো। ইসলামী লশকরে ইকরামা (রা) ইব্ন আবী জাহেল ছিলেন মুকাদ্দামাতু'ল-জায়শ (অগ্রবর্তী বাহিনী)। সৈন্যব্যূহের ডান পাশে (রাইট উইং-এ) হুযায়ফা (রা), বাম পাশে (লেফট উইং-এ) আরফাজা (রা) এবং মাঝখানে ছিলেন আম্মানের সেই নেতৃবৃন্দ যারা ইসলামের উপর অটল ছিলেন এবং ইসলামী লশকর আগমনের খবর পেয়ে লশকরে শামিল হয়েছিলেন।

ফজরের সময় যুদ্ধ শুরু হলো। ইসলামী লশকর ছিল নিম্নভূমিতে। আর শত্রুপক্ষ সুযোগ পেয়েছিল উচ্চভূমিতে থাকার। প্রথমে যুদ্ধের গতিধারা ছিল মুসলমানদের বিপক্ষে এবং পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। লাকীত খুব বীরত্বের সাথে ইসলামী লশকরের উপর হামলা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি পাল্টে গেলো এবং মুসলমানরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে শত্রুদের পিছনে হটিয়ে দিলো। শত্রুপক্ষ মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করলো এবং মুসলমানদের

বিরাট বিজয় সাধিত হলো। এই যুদ্ধে দশ হাজার শত্রুসেনা নিহত হয় এবং চার হাজার গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের বন্দীত্বে আসে। সেই অনুপাতে সৈন্যরা মালে গনীমত নিয়ে মদীনায় আগমন করে এবং হযরত ইকরামা (রা) মুহরা গমন করেন। এর কয়েকদিন পর গোটা আম্মানে ইসলাম কায়েম হয়ে গেলো।

মুহরার অধিবাসীদের ধর্মত্যাগ

মুহরায় আম্মানের কিছু লোক অবস্থান করছিল। তাছাড়া বনূ আবদুল কায়সও সেখানে বিদ্যমান ছিল। আয্দ্ ও বনূ সা'দ ইত্যাদি গোত্র সেখানে বসবাস করছিল। এরা সবাই মুরতাদ হয়ে রাজত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়েছিল। হযরত ইকরামা (রা) মুহরায় পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। একদল ইসলাম গ্রহণ করলো। অপর দল-যাদের নেতা ছিল মুসীহ–ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি ও ইসলাম ত্যাগে অটল থাকতে জিদ ধরলো। হযরত ইকরামা (রা) মুসলিম দলটি সঙ্গে নিয়ে মুরতাদদের উপর আক্রমণ করলেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের দলপতিকে হত্যা করলেন। এই বিজয় আশপাশের উপর বিশেষ প্রভাব ফেললো। ফলে আশেপাশের গোত্রগুলো সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। হযরত ইকরামা (রা) মালে গনীমতসহ ইসলামী দেশ জয়ের বিশদ কাহিনী লিখে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে জবাব এলো, 'তুমি ইয়ামন গমন করে মুহাজির (রা) ইব্ন উমাইয়ার বাহিনীতে যোগদান কর।'

ইয়ামনবাসীর ধর্মত্যাগ

আসওয়াদ আনাসীর কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। সে ইয়ামন দেশে নবুওয়াত দাবী করে প্রায় গোটা দেশেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই নিহত হয়ে স্বীয় অপকর্মের শাস্তি ভোগ করেছিল এবং ইয়ামন দেশে ইসলাম ত্যাগের পর পুনরায় ইসলামের প্রসার ঘটছিল। কিন্তু দিকচক্রবাল পুরাপুরি মেঘশূন্য না হতেই হযরত নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন। এই খবর প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই গোটা ইয়ামন দেশে পুনরায় ইসলাম ত্যাগ মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়লো। এবার ইয়ামনের মুরতাদদের দু'জন বিখ্যাত নেতা ছিল। এক -কায়স ইব্ন মাকশূহ, দ্বিতীয়–আমর ইব্ন মা'দীকারাব। ইয়ামনের মুসলমানদেরকে সেখানকার মুরতাদরা বহু কষ্ট দিতে শুরু করলো। ছোট ছোট লড়াই চলতে লাগলো। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইয়ামন দেশের সানআ অঞ্চলে মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়া (রা)-কে একটি সেনাদলসহ প্রেরণ করেছিলেন। মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়া (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা করে পথিমধ্যে মক্কা ও তায়িফ হতে মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে অতি দ্রুত নাজরানে প্রবেশ করে তাঁবু স্থাপন করলেন। কায়স ও আমর মুহাজিরের হামলার কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। তারাও নাজরানে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। আমর ইব্ন মা'দীকারাব একজন বিখ্যাত নেতা ছিল, যার শত্রু হনন ও বীরত্বগাঁথা সারা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মুহাজির (রা) শত্রুদের অপরিমেয় ও অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে নিজকে নিজে অবরুদ্ধ দেখতে পেয়ে স্বীয় সহচরগণকে লজ্জা ও ধিক্কার দিয়ে উৎসাহ যোগালেন। তারপর মুরতাদদের উপর হামলা করলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হলো। শেষে ইসলামের জয় হলো। কায়স ও আমর উভয় নেতা গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের বন্দীত্বে এলো। বহু সংখ্যক মুরতাদ

নিহত, গ্রেফতার ও অবশিষ্টরা পলায়ন করতে বাধ্য হলো। কায়স ও আমরকে মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা হলো। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে উভয়ে তাদের ইসলাম ত্যাগের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলো এবং সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে বন্দীদশা হতে মুক্ত হলো। পরিশেষে অনুমতি নিয়ে ইয়ামন প্রত্যাবর্তন করলো।

মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া (রা) নাজরান যুদ্ধে ইয়ামনের মুরতাদদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং সানআয় পৌঁছে মুকাবিলার জন্য আগত সেখানকার মুরতাদদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে গোটা এলাকাকে শত্রুমুক্ত করেন। ঐ স্থানেই ইকরামা (রা) (ইব্‌ন আবী জাহল) এসে ইসলামী লশকরে যুক্ত হন এবং এখান থেকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশক্রমে উভয় নেতা বনূ কিন্দাকে শাস্তি দানের জন্য অগ্রসর হন। বনূ কিন্দা আশআছ ইব্‌ন কায়সকে তাদের নেতা বানিয়ে ইসলামী লশকরের মুকাবিলার জন্য বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল এবং দিন দিন তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করে মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া (রা) ইসলামী লশকরের মধ্য থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের একটি ইউনিট নির্বাচন করে নিজের সাথে নিলেন এবং বাকী লশকর ইকরামা (রা) (ইব্‌ন আবী জাহেল)-এর নেতৃত্বাধীন রেখে অতি দ্রুত ও তড়িৎ গতিতে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মুহাজ্জারে–যেখানে আশআছ ইব্‌ন কায়স মুরতাদ বাহিনীসহ অবস্থান করছিল–পৌঁছেন এবং অতর্কিতে অপ্রতিরোধ্যভাবে মুরতাদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুরতাদরা এই হামলার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ইতস্তত পলায়ন করলো। আশআছ সেখান থেকে পলায়ন করে বুহায়র দুর্গে আশ্রয় নিল। অন্য মুরতাদরাও সেখানে গিয়ে দুর্গবদ্ধ হলো। মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া (রা) দুর্গ অবরোধ করলেন। এই সময় ইকরামা (রা) (ইব্‌ন আবূ জাহেল) ও ইসলামী লশকরসহ এখানে এসে পৌঁছেন। অবরোধের কঠোরতা এবং সাহায্য ও রসদপত্র আমদানী থেকে নিরাশ হয়ে আশআছ সন্ধির আবেদন করলো। এই আবেদন এতই বিনয় ও মিনতিপূর্ণ ছিল যে, সে তার সম্প্রদায়ের শুধু নয়জন লোকের জন্য তাদের পরিবার-পরিজনের প্রাণভিক্ষা ও মুক্তি প্রার্থনা করলো। মুহাজির এই আবেদন মঞ্জুর করলেন। আশ্চর্য এই যে, আশআছ ভুলক্রমে ঐ নয় ব্যক্তির তালিকায় তার নিজের নাম উল্লেখ করতে ভুলে গেলো। সেমতে ঐ নয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাকী সবাইকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলেন। এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আশআছ ইব্‌ন কায়সও শামিল ছিল। এরা যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে মদীনায় নীত হলো, তখন আশআছ তার অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতপ্ত হলো এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে বললো, আপনি আমার ইসলাম গ্রহণ করুন। আমি আনন্দচিত্তে ইসলামকে পসন্দ ও গ্রহণ করলাম। সিদ্দীকে আকবর (রা) কেবল আশআছকেই নয়, বরং বনূ কিন্দার সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এবং শুধু এতটুকুই বললেন যে, আমি আগামীতে তোমাদের তরফ থেকে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই কামনা করি না।

ইসলাম ত্যাগের পূর্ণ মূলোচ্ছেদ

মোটকথা, এগার হিজরীর সমাপ্তি এবং বারো হিজরী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরব দেশের মুরতাদ সমস্যার

উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করেন। এগার হিজরীর মুহাররম মাসে আরব উপদ্বীপ মুশরিক ও মুরতাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয়েছিল এবং উপদ্বীপের কোন অঞ্চল ও অংশের উপর শির্ক ও মুরতাদ হওয়ার কোন কালিমা অবশিষ্ট ছিল না। একদিকে কয়েক মাস পূর্বেকার এই অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করুন যে, মদীনা, মক্কা ও তায়িফ ছাড়া গোটা দেশের দিকচক্রবাল ছিল ধূলিতে আচ্ছন্ন। আর এই ধূলিমেঘ থেকে তলোয়ার-নেযা ও তীর-ধনুকের ঝড় বইতে দেখা যাচ্ছিল। অবস্থা এরূপ ছিল যে, প্রস্তর মোমের মতো গলে যেতে পারতো এবং ইস্পাতের তার কাঁচা সুতার মতো ছিঁড়ে যেতে পারতো। পর্বতের চেয়েও অধিক হিম্মত নদীর পানির মতো বয়ে যেতে পারতো এবং আকাশের মতো উচ্চ ও উন্মুক্ত উদ্দীপনা সংকীর্ণ ও অবনত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের অতল গহীনে হারিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু মুহাম্মদী পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হিম্মত ও সাহসের পরিমাপ করুন! তিনি একাকী এইসব ঝড়-ঝঞ্ঝার মুকাবিলার জন্য যে পরাক্রম ও বীরত্বের সাথে ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেন আমরা তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ না ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের নাম উল্লেখ করতে পারি, না রুস্তম ও ইস্‌ফান্‌দিয়ার (পারস্য সম্রাট)-এর নাম উচ্চারণ করতে পারি। বন্য-ব্যাঘ্র ও পারস্য বীর রুস্তম-হৃদয়ে যদি সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হৃদয়শক্তির এক-শতাংশও বিদ্যমান থাকতো, তাহলে আমাদের কোন দৃষ্টান্ত অন্বেষণে হয়রান হতে হতো না। কিন্তু এখন আমরা এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, খায়রুল-বাশার (মানবোত্তম) নবী (সা)-এর কর্তব্যপরায়ণ শিষ্য, খাতামুন্‌-নাবিয়্যীনের প্রথম খলীফা যথার্থই তাঁর মর্যাদা মাফিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ঐশী শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে কাজ গ্রীক-সম্রাট আলেকজাণ্ডার, রোম-সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও পারস্য-সম্রাট কায়খসরু একত্রিত হয়েও সম্পন্ন করার সাহস করতেন না হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তা কয়েক মাসের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে সিদ্দীকী বাহিনীতে খালিদ (রা), ইকরামা (রা), শুরাহবিল (রা), হুযায়ফা (রা) প্রমুখের ন্যায় অতুলনীয় বীরগণ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এটাও ভেবে দেখুন যে, সিদ্দীকে আকবর (রা) কিভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় বসে থেকে দেশের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি অঞ্চলের পরিস্থিতি অবহিত ছিলেন এবং কিভাবে সেনাদলের কাছে তাঁর নির্দেশাবলী পৌঁছে যেতো। চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, প্রতিটি সেনাদল ও প্রতিটি সেনাপতি ছিলেন আরব শতরঞ্জীর উপর এক একটি দাবার গুটির মতো এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর দক্ষ অঙ্গুলি যে গুটিটি যে-স্থানে চালা উপযোগী হতো, সেখানেই চালতো। বাহ্যত মনে হচ্ছে, ঐ এগারটি ইসলামী সেনাদল সর্বত্র অভিযান চালিয়ে আরবদেশ থেকে মুরতাদ সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, রাসূলের খলীফা মদীনায় বসে বসে সিরিয়া ও নজ্‌দ হতে মাসকাত ও হাদরামাউত পর্যন্ত এবং পারস্যোপসাগর হতেই ইয়ামন ও আদন (এডেন) পর্যন্ত গোটা সাম্রাজ্যটিকে একা তাঁর কৌশল ও বুদ্ধি দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা ও জঞ্জালমুক্ত করেন। এই ফিতনার প্রারম্ভে সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে তার পরিসমাপ্তি দেখতে পারতো এবং কেবলমাত্র সিদ্দীকে আকবরই সেই তেজোদীপ্ত ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যার বলে তিনি না উসামা বাহিনী প্রেরণ মুলতবি করা সমীচীন ভাবেন, না মসজিদে নববীতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর হাত-পা অবশকারী উক্তিতে প্রভাবিত হন, না যাকাত অস্বীকারকারীদের দাবী-দাওয়াকে তিনি তৃণতুল্যও মূল্য দেন। এখন

আপনি চিন্তা করুন ও ভাবুন, হযরত নবী করীম (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত ও নবী করীম (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শাহানশাহ সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া আর কে হতে পারতেন ?

রোম ও ইরান

হযরত নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবকালে দুনিয়ায় দু'টি সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বড়। ঐ দু'টি সাম্রাজ্যই প্রায় গোটা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি রোম সাম্রাজ্য এবং দ্বিতীয়টি ইরানী (পারস্য) সাম্রাজ্য। তখনকার দুনিয়ায় কেবল দুটি সভ্যতাই বর্তমান ছিল। অর্ধেক দুনিয়ায় রোমান সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল এবং অর্ধেক দুনিয়ায় ইরানী। আরবদেশ ছিল তখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হলেন। ইসলামের মাধ্যমে একটি নতুন সাম্রাজ্য ও নতুন সভ্যতার পত্তন হলো। সারা দুনিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, আরব অথবা ইসলামী সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে গেলো এবং গোটা দুনিয়া ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে জীবন যাপন করতে লাগলো। এসব কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পরে বর্ণনা করবো। এখন যেহেতু আরব সাম্রাজ্য এবং রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্যের শক্তি পরীক্ষা শুরু হবে আর অতিদ্রুত আমরা ইরান ও রোমকে আরবের মুকাবিলায় টুকরো টুকরো হতে দেখবো, সেহেতু ঐ দু'টি বিখ্যাত ও সংস্কৃতিবান সাম্রাজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা বাঞ্ছনীয়।

কোন এক সময় ইরানী সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর, পারস্যোপসাগর, সিন্ধুনদ, কাশ্মীর, তিব্বত, আলতাই পর্বত ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কায়ানী বংশের (কায়ান নামক সম্রাটের নামানুসারে এই বংশের পত্তন হয়। এই বংশের চারজন বিখ্যাত বাদশাহর নাম-(১) কায়কাউস, (২) কায়খসরু, (৩) কায়কোবাদ ও (৪) কায়লাহ্‌রাসপ্ (অনুবাদক)। রাজত্ব এবং রুস্তম যাবুলিস্তানের (সীস্তান) বীরত্ব-যুগ অতিক্রম করার পর গ্রীক আলোকজান্ডার ইরানী সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইরানী সভ্যতা তখনো অবশিষ্ট ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্বে আরদ্‌শের বাবকান সাসানী বংশের পত্তন করেন। সাসানী বংশ কায়ানীদের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পারস্যোপসাগর, ফুরাত নদী, কাস্পিয়ান সাগর, সিন্ধুনদ ও জায়হুন নদের মাঝখানে একটি বিস্তৃত ও নিবিড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গোটা এশিয়া মহাদেশের নেতৃত্ব লাভ করলো।

রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ইটালীর রোম শহর। এখানে সম্রাট জুলিয়াস সিজার, সেন্ট আনমুস্‌তিস প্রমুখ বাস করেন। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় গোটা ইউরোপ মহাদেশ এবং মিসর ও মধ্য এশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল পর এই রোমক সাম্রাজ্য দু'টুকরো হয়ে গেলো। পশ্চিমাংশের রাজধানী রোম শহরই ছিল। কিন্তু পূর্বাংশের রাজধানী হলো কনস্টানটিনোপল শহর। কনস্টানটিনোপলের কায়সারকেও (কায়সার প্রাচীন রোম সম্রাটদের উপাধি) রোমের কায়সার নামেই অভিহিত করা হতো; যাঁর শাসনাধীনে ছিল মিসর, আবিসিনিয়া, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, মধ্য এশিয়া ও বলকান রাজ্যসমূহ। এই পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের শান-শওকত ও শক্তি-প্রভাবের কাছে পশ্চিম রোমের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মধ্য এশিয়া ও ইরাকের প্রান্তরসমূহে এই দুই সাম্রাজ্য অর্থাৎ রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্যদ্বয়ের সীমারেখা কোন নৈসর্গিক বস্তু অর্থাৎ পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতি না হওয়ার দরুন কখনো কখনো একে অপরের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ারও নিমিত্ত ঘটতো।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মগ্রহণের সময় ইরানের শাহানশাহ ছিলেন সাসানী বংশের ন্যায়বিচারক নওশেরওয়ান। হযরত নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত লাভের সময় ইরানে ক্ষমতাসীন ছিলেন নওশেরওয়ানের পৌত্র খসরু পারভেয। তখন কনস্টানটিনোপলে কায়সার ফুকাস-এর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও দেশের প্রজা-সাধারণ ফুকাশকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে হত্যা করলো এবং অধিকৃত আফ্রিকীয় অঞ্চলে গভর্নর অর্থাৎ মিসরের শাসনকর্তাকে কনস্টানটিনোপলের সিংহাসনে বসানোর আহ্বান জানালো। আফ্রিকার গভর্নর বার্ধক্যের কারণে যেতে পারলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যবান যুবক পুত্র হিরাক্লিয়াস কনস্টানটিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। হিরাক্লিয়াসের শাসন কর্তৃত্ব সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারাও সানন্দে মেনে নিলেন। নিহত কায়সার ফুকাস ও খসরু পারভেযের মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। তাই খসরু পারভেয রোমক সম্রাট অর্থাৎ হিরাক্লিয়াসের উপর হামলা করলো-এমন এক ব্যক্তির ক্ষমতাসীন হওয়ার পর, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। এটা ছিল ইরানীদের জন্য রোমক সাম্রাজ্যের উপর হামলা করার একটি উত্তম সুযোগ। ইরানী ও রোমকদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ ছয়-সাত বছর অব্যাহত ছিল। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের অষ্টম বছর ইরানীরা সিরিয়া জয় করে বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করলো এবং খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ক্রুশ ছিনিয়ে নিলো। একই সাথে তারা ফিলিস্তীনের গোটা দেশ জয় করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

মক্কার মুশরিকরা ইরানীদের এই দেশ বিজয়ের খবর শুনে বেশ আনন্দ উদযাপন করলো। কেননা, রোমকরা ছিল কিতাবধারী, আর ইরানীরা ছিল মুশরিক। অপরদিকে মুসলমানরা ছিলেন মুশরিকদের বিপরীত কিতাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই এই খবরে মুসলমানরা ব্যথিত হলো। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা রূমের আয়াত নাযিল করলেন। তাতে সংবাদ দিলেন যে, যদিও রোমকরা এবার পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কয়েক বছর পরই তারা জয়লাভ করবে। আর মুসলমানরা তখন আনন্দিত হবে। অতএব, তাই হলো। হিরাক্লিয়াস ছয়-সাত বছর পর্যন্ত অনবরত সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত রইলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর দেশের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধানেও পূর্ণ সক্ষম হন। এরপর তিনি ইরানীদের সীমান্ত অতিক্রম ও পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হলেন এবং পরিশেষে সিরিয়া প্রান্তরে রোমক বাহিনী ইরানীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করলো। ইরানীরা পলায়ন করলো এবং রোমের কায়সার নিজেদের এলাকা পুনর্দখল করা ছাড়াও ইরানীদের কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করলেন।

এদিকে রোমকরা ইরানীদের উপর বিরাট বিজয় লাভ করলো, ওদিকে বদর প্রান্তরে মুসলমানরা মক্কার কাফিরদেরকে মারাত্মকভাবে পরাস্ত করলেন। আর এইভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো। এরপরও ইরানী ও রোমকদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। সপ্তম হিজরীর শুরুতে রোমক ও ইরানীদের মধ্যে সন্ধি হলো এবং ইরানীরা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যে ক্রুশ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা রোমকদের ফিরিয়ে দিলো। এই সন্ধি হিরাক্লিয়াসের দেশ বিজয়কে একদিকে সম্পূর্ণ করে দিলো, আর অন্যদিকে ইরানীরা তাদের হারানো এলাকা ও প্রদেশগুলো রোমকদের নিকট থেকে ফেরত নিলো। সুতরাং ইরানী ও রোমক উভয় দরবারেই সাবধানতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল এবং উভয়েই নিজ নিজ উন্নতি ও মযবুতীর জন্য উপযুক্ত উপায় গ্রহণে মশগুল হয়েছিল। এই বছরই হযরত মুহাম্মদ (সা) রাজা-বাদশাহদের

নামে পত্র প্রেরণ করেন। কায়ানী যুগে ইরানীদের রাজধানী ছিল ইস্‌তাখার, গ্রীক আলেকজান্ডার যাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই-ভস্মে পরিণত করেছিলেন। তখন সাসানী বংশের রাজধানী ছিল মাদায়েন। ওদিকে হিরাক্লিয়াস তাঁর দেশ বিজয় ও ক্রুশ ফেরত পাওয়ার আনন্দে যিয়ারতের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পত্র খসরু পারভেযের নিকট মাদায়েনে এবং হিরাক্লিয়াসের নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেছিল। খসরু পারভেয তাঁর পত্রখানি ছিঁড়ে ফেললো এবং হিরাক্লিয়াস শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর পত্রখানি গ্রহণ করলেন। হযরত নবী করীম (সা) ইরানী বাদশাহর অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা শুনে বললেন : ইরানী বাদশাহর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। খসরু পারভেয কেবল হযরত নবী করীম (সা)-এর চিঠি ও কাসিদের সাথে দুর্ব্যবহারই করলো না বরং তার ইয়ামনী গভর্নর বাযানকে লিখে পাঠালো যে, এই আরবী পয়গাম্বর (মুহাম্মদ (সা)-কে গ্রেফতার করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। বাযান দু'জন লোক মদীনায় প্রেরণ করলো। তারা হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হলো এবং খসরু পারভেযের আদেশ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন : তোমরা যাকে তোমাদের খোদা মনে কর অর্থাৎ খসরু পারভেয–সে গতরাতে তার পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছে। একথা শুনে তারা যখন বাযানের নিকট ফিরে গেলো, তখন সেখানে মাদায়েন থেকে সংবাদ এলো যে, খসরু পারভেযকে তার পুত্র শায়রুয়া হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ড ঠিক সেই রাতেই সংঘটিত হয়েছে, যে রাতের কথা হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন। ইয়ামনের গভর্নর বাযান মুসলমান হয়ে গেলেন। আর এইভাবেই ইয়ামন দেশে অতিদ্রুত ইসলাম প্রসারিত হলো। হযরত নবী করীম (সা) বাযানকেই ইয়ামানের গভর্নর রাখলেন। শায়রুয়া অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে আরব ও মুসলমানদের প্রতি মনোযোগ দেয়ার ফুরসতই পেলো না। কিছুদিন পর তার স্থলে তার স্বল্প বয়স্ক পুত্রকে ইরানের সিংহাসনে বসানো হলো। যার নাম ছিল আরদেশীর। এই স্বল্প বয়স্ক আরদেশীরকে ইরানী সিপাহসালার শাহরিয়ার কয়েক মাস পর হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর কয়েক দিন পর সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারা তাকে হত্যা করে শায়রুয়ার-এর ভগ্নী ও খসরু পারভেযের কন্যা বুরানকে সিংহাসনে বসান। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তার শাসনামলেই হযরত নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন। বুরানের পর কয়েকজন বালক ও নারী পরপর ক্ষমতাসীন হন। অবশেষে ক্ষমতায় বসেন ইয়ায্‌দগর্‌দ, যার শাসনামলে ইরান মুসলমানদের অধিকারে আসে। মোটকথা, যেদিন খসরু পারভেয হযরত (সা)-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল, সেদিন থেকেই ইরানী সাম্রাজ্যের উচ্চ প্রাসাদ প্রাকৃতিকভাবে ভূলুণ্ঠিত হওয়া আরম্ভ করেছিল এবং ইরানের সিংহাসনে দেশবিজয়ী ও বীরবিক্রমে বাদশাহদের স্থান বালক ও নারীরা অধিকার করেছিল। ইরানী সাম্রাজ্যের দখল থেকে তার একটি প্রদেশ অর্থাৎ মূলকে ইয়ামন বের হয়ে গিয়েছিল। এজন্য ইরানীরা মুসলমানদের প্রতি আরো বেশী শত্রুতা পোষণ করতো।

ইরানীরা মুশরিক হওয়ার কারণে খুব অহংকারী ও উদ্ধত ছিল। তাই তারা আরবদেরকে খুব ঘৃণিত মনে করে তাদের শক্তি ও দৃঢ়তার খবর শুনে শুনে অতি বিচলিত ও মুসলমানদেরকে সমূলে বিনাশ করার সংকল্প করেছিল। কিন্তু প্রকৃতি তাদেরকে এমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল ও রাজা-বাদশাহ্‌দের উত্থান-পতনের মুসীবতে লিপ্ত করলো যে, আরবদেশের প্রতি সহসা

মনোযোগ দিতে পারলো না। মদীনার মুনাফিক ও দেশান্তরিত ইয়াহূদীরা উপর্যুপরি মাদায়েনের রাজদরবারে তাদের বাকপটু ও চতুর দূতদের প্রেরণ করে করে ইরানীদেরকে মদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেছিল। অপরদিকে তারা হিরাক্লিয়াসের দরবারেও একই ধরনের তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল।

হিরাক্লিয়াসের দরবার যেহেতু অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে মুক্ত ছিল, তাই তারা সেখানে অধিক সফলতা লাভ করলো। সিরিয়ার দক্ষিণাংশে আরব জাতির লোকেরা বসবাস করতো এবং তাদের অনেকগুলো ছোট ছেটে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরব লোকেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই তারা 'আরবী খ্রিস্টানরূপে পরিচিত ছিল। আরবী খ্রিস্টানদের স্বাধীন রাজ্যগুলোর সাথে হিরাক্লিয়াসের ছিল বন্ধুত্বসুলভ ও সহানুভূতিমূলক সম্পর্ক। যখনই ঐ আরব খ্রিস্টানদের রাজ্যগুলো। ইরানীদের দ্বারা আক্রান্ত হতো, কনস্টানটিনোপলের কায়সার এসে তাদের সাহায্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। এজন্যও তারা তাদেরকে রোমের কায়সারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাখতে বাধ্য হতো। যেহেতু আরব বংশের লোক হওয়ার কারণে এরা খুব বাহাদুর ছিল, তাই রোমের কায়সার এদের অস্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতো এবং প্রয়োজনের সময় তাদের যুদ্ধংদেহী যোগ্যতা দ্বারা ফায়দা উঠাতো। আরবদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। এই ইসলামী রাষ্ট্র ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা ছিল আরব খ্রিস্টানদের স্বাধীন রাজ্যগুলো। যেহেতু এই রাজ্যগুলো ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, তাই বলা যেতে পারে যে, রোমক ও আরবদের মাঝখানে তো একটি সীমারেখা ছিল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও খ্রিস্টান রাজ্যের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যখন খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ও মুসলমানদের মধ্যে মুকাবিলা ও সংঘাত শুরু হলো, তখন একদিকে এই আরব খ্রিস্টানগণ হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্যের আবেদন করলো, অপরদিকে মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র হিরাক্লিয়াসকে মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করতে অনুপ্রাণিত করলো।

হযরত নবী করীম (সা) যে সময় হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তখন বসরা ও দামেশকের সরদারদের প্রতিও পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু তারা উভয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর দূতদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বসরার শাসনকর্তা শুরাহবীল তো হযরত নবী করীম (সা)-এর দূত হারিছ (রা)-কে শহীদ করেই ফেলেছিল। হযরত নবী করীম (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছ (রা)-কে শুরাহবীল ইব্‌ন আমর গাস্‌সানীর বিরুদ্ধে হযরত হারিছ (রা)-এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। মূতা যুদ্ধে হযরত যায়দ (রা), হযরত জা'ফর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) শহীদ হন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যুদ্ধ পরিস্থিতি সামাল দেন। এই যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস বাহিনী শুরাহবীল গাস্‌সানীর সমর্থনে মুসলমানদের মুকাবিলা করে। রোমকরা এরপর আরব দেশের উপর চড়াও হয় এবং স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা)-কে তাবূক প্রস্রবণ পর্যন্ত লশকর নিয়ে যেতে হয়। তখন রোমকরা সামনে থেকে সরে গেলো। আর কোন বড় যুদ্ধ হলো না। বরং ঐ আরব খ্রিস্টান রাজ্যগুলো থেকে জিযিয়া নিয়ে এবং তাদের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে হযরত নবী করীম (সা) ফিরে এলেন। এই সময় খবর এলো হিরাক্লিয়াস আরব দেশের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে সেদিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর রোগ বৃদ্ধির কারণে এই বাহিনী মদীনার বাইরে গিয়ে থেমে রইল। এরপর

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হয়ে এই বাহিনীকে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এই বাহিনী সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত গেলো এবং সেখানকার অবাধ্য ও বিদ্রোহী সরদারদের দমন করে ফিরে এলো।

হিরাক্লিয়াস বাহিনীর সাথে মুকাবিলা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরব খ্রিস্টান সরদারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সানন্দচিত্তে ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। হিরাক্লিয়াস এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল যে, সীমান্ত রাজ্যগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছে, না খ্রিস্টধর্মের উপর বহাল থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত! নিছক এই রাজ্যগুলোর কারণেই–যারা একাধিকবার ইসলামী শক্তির প্রদর্শনী অবলোকন করেছিল এবং ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দরুন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মনে হচ্ছিল–হিরাক্লিয়াস যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজেও ইসলামের সভ্যতাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই একদিকে মুসলমানদের উন্নতি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংসের স্বরূপ এবং তিনি মুসলমানদের শক্তিকে আশংকার পূর্বেই মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তাঁর পরিণাম ও পরিণতি সন্দেহপূর্ণ মনে হওয়ায় আগামীতে উত্তম সুযোগের অপেক্ষায় তিনি যুদ্ধ মুলতবি রাখতে চেয়েছিলেন। যা হোক, যে হিরাক্লিয়াস ইরানীদের বিশাল সাম্রাজ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন, তিনি আপাদমস্তক ইসলামী শক্তিকেও ধ্বংস করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কোন উপযুক্ত সুযোগকেই হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না।

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর গোটা আরবদেশে যে বিশৃংখলা ও গোলমাল সৃষ্টি হয়, তা একদিকে ইরানীরা এবং অপরদিকে রোমকরা বড় প্রসন্ন ও সন্তোষ সহকারে শ্রবণ করে। দুনিয়ায় এই প্রথমবারের মতই গোটা আরব উপদ্বীপ একটি সাম্রাজ্য ও একটি সম্মিলিত শক্তি আকারে নিজকে নিজে উদ্ভাসিত করেছিল। আর এ কারণেই রোমক ও ইরানীদের রাজ-দরবারগুলো, এদেশটিকে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে দেখেছিল এবং এই উভয় সাম্রাজ্যই স্বস্থানে স্বতন্ত্রভাবে এই নবতর আরবী শক্তি অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রকে মিটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিল। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শোনা মাত্রই মুরতাদ হওয়ার হিড়িক ঐ দুই সাম্রাজ্যকে বাতলে দিয়েছিল যে, আরবদেশকে পদদলিত করা ও ভবিষ্যত আশংকা দূর করার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং একদিকে হিরাক্লিয়াস বাহিনী সিরিয়ায় এবং অপরদিকে ইরানের সেনাবাহিনী ইরাকে সমবেত হতে লাগলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পরিণাম চিন্তা, দূরদর্শিতা, সুযোগ-সচেতনতা ও প্রয়োজনানুরূপতার এভাবেও পরিমাপ হতে পারে যে, তিনি মুরতাদ সমস্যাকে অতি দ্রুত মিটিয়ে ফেলেন। আর এই ফিতনা দমন করার পর একটি দিনও নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ রোমক ও ইরানীদের প্রতিরোধ করার জন্য গোটা আরবদেশকে প্রস্তুত করে ফেলেন। যদি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) আর কয়েকটি দিন মুরতাদ সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম না হতেন কিংবা মুরতাদ সমস্যা মিটে যাওয়ার পর কয়েকটি দিন আলস্য ও নির্লিপ্ততায় কাটিয়ে দিতেন, তবে মদীনাতুন্নবী (সা) অর্থাৎ ইসলামের রাজধানী রোমক ও ইরানীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে মুসলমানদের জীবনকাল সংকীর্ণ করে তুলতো। বিস্মিত হতে হয় যে, সিদ্দীকে আকবর (রা) কি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিরূপ সঙ্গীন ও সীমিত সময়ের মধ্যে কত সতর্কতা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। আর ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্যকে কত আড়ম্বর ও

শক্তিমত্তার সাথে অক্ষুণ্ন রাখেন। এখন সামনের দিকে রোমক ও ইরানীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। যে অবস্থা সিরিয়ার ছিল–তার দক্ষিণাংশে আরব খ্রিস্টানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, সম্পূর্ণ একই অবস্থা ছিল ইরাক ও আরবেরও। এখানেও আরবদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার অধিকাংশই ছিল ইরানী সাম্রাজ্যাধীন এবং কোন কোনটিতে ইরানী রাজ-দরবার থেকে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতো এবং শাসন করতো।

মুসলমানদের কর্মকুশলতা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন উসামা বাহিনীকে সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি ইরানীদের ব্যাপারেও গাফিল ছিলেন না। তিনি এই ভয়াবহ অবস্থা ও দুশ্চিন্তাপূর্ণ সময়ে–যখন স্বয়ং মদীনা মুনাওয়ারার নিরাপত্তা ও আরবের প্রদেশসমূহের মুরতাদ সমস্যা নিরসনকল্পে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল অপরিসীম–একটি ক্ষুদ্র বাহিনী উপরোক্ত এগারটি বাহিনী প্রেরণের পূর্বে মুছান্না ইবন হারিছা শায়বানী (রা)-এর নেতৃত্বে ইরাক প্রেরণ করেছিলেন এবং মুছান্নাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ইরাকে পৌঁছে কোন স্থানেই স্থির হয়ে যুদ্ধ শুরু করবে না বরং অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে ইরাকী সরদারদের সন্ত্রস্ত করতে থাকবে। এর দ্বারা সিদ্দীকে আকবর (রা) (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল, যে পর্যন্ত আরবের মুরতাদ সমস্যা অবদমিত না হবে, সে পর্যন্ত যেনো ইরানীরা আরব আক্রমণ করার সাহস না পায় এবং তারা মুসলমানদের অস্থিরতা ও বিপদ সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত হতে না পারে। একই উদ্দেশ্য সিদ্দীক আকবর (রা) উসামা বাহিনী দ্বারাও হাসিল করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ রোমকরা যেন আরব আক্রমণ করার আদৌ দুঃসাহস করতে না পারে। যখন নজ্‌দ্ ও ইয়ামামার অবস্থা আয়ত্তে এসে গেলো, তখন সিদ্দীকে আকবর (রা) আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-কে যিনি নজদে অবস্থান করছিলেন–লিখে পাঠালেন যে, যেসব মুসলমান মুরতাদ হয়নি এবং ইসলামের উপর কায়েম রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ ইরাকে হামলা করবে এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে যিনি ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন– লিখে পাঠালেন যে, তুমি স্বীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে নিম্ন ইরাকে চলে যাবে। পথে যেসব গোত্র বা গোত্রপতি পড়লো, তারা সবাই সানন্দে মুসলমান হলো বা ইসলামী নেতৃত্বে প্রবেশ করলো। সিদ্দীকী নির্দেশের মর্ম অনুযায়ী উব্‌লা নামক স্থানে হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) উভয়ে এসে মিলিত হলেন।

গাযওয়ায়ে যাতুস-সালাসিল বা জিঞ্জির পরা যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) উবলা নামক স্থানে ইসলামী লশকরের হাযিরা নিলেন। মোট আঠার হাজার লোক ছিল। তাঁর সামনে ছিল ইরাকের সেই ইরানী প্রদেশ– যার নাম ছিল হুদায়র। ইরানের রাজ-দরবার থেকে ঐ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত ছিল হরমুয নামক জনৈক বাহাদুর ও যুদ্ধবাজ সরদার। এই হরমুযেরই ভীতি গোটা আরব, ইরাক ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা, সে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে হিন্দুস্তানের উপকূলেও আক্রমণ চালাতো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বিবাদ মিটানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে হরমুযকে একটি চিঠি লিখে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। হরমুয এই চিঠি পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ইরানের রাজদরবারকে

তা অবহিত করলো এবং স্বয়ং সৈন্য সমাবেশ করে হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অগ্রসর হলো। ওদিকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর লশকর তিন ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগের নেতৃত্ব সমর্পণ করলেন হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা)-কে। দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করলেন হযরত কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা)-কে এবং তৃতীয় ভাগকে স্বীয় অধীনে রেখে তিন নেতাই ডান-বামে এক দিনের দূরত্ব বজায় রেখে হুদায়র অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইরানী বাহিনীর কাছে পৌছে তিন ইসলামী নেতাই একত্রিত হলেন। ইরানীদের বিপরীত দিকে ইসলামী লশকর তাঁবু স্থাপন করলো। প্রথমে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ময়দানে উপস্থিত হলেন এবং হরমুযকে মুকাবিলার জন্য আহবান করলেন। হরমুয হযরত খালিদ (রা)-এর ডাক শুনে ময়দানে এলো। দুই নেতাই ঘোড়া থেকে নিচে নেমে পদাতিক হলেন। প্রথমে হযরত খালিদ (রা) আঘাত হানলেন। হরমুয চকিতে পিছে হটে এবং রণকৌশল পরিবর্তন করে আঘাত থেকে বাঁচলো। তারপর অতি ক্ষিপ্রতার সাথে হযরত খালিদের উপর আঘাত করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হঠাৎ বসে পড়ে সামনে কুঁচকে গিয়ে হরমুযের কবজি ধরে তলোয়ার ছিনিয়ে নিলেন। হরমুয তলোয়ার ছিনতাই হতেই হযরত খালিদকে লেপ্টে ধরলো এবং কুস্তি শুরু হলো। হযরত খালিদ (রা) হরমুযের কোমর ধরে উপরে উঠালেন এবং যমীনের উপর এমন জোরে আছাড় মারলেন যে সে আর নড়চড় করতে পারলো না। খালিদ হরমুযের বুকের উপর উঠে বসলেন এবং শির কর্তন করে ছুঁড়ে মারলেন। ইরানীদের একটি সেনাদল তাদের সেনাপতিকে পরাস্ত হতে দেখে তার সাহায্যার্থে আক্রমণ করলো। এদিকে কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের বাধা দিলেন। এরপর উভয় বাহিনী সামনে বাড়লো। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইরানী বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালালো। বহু হতাহত ও বন্দী হলো। হরমুযের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র হযরত খালিদ (রা) হস্তগত করলেন। হরমুয ছিল ইরানী রাজদরবারের এমন একজন সরদার, যার মাথায় সর্বদা মুকুট পরিহিত থাকতো। তার মুকুটের মূল্য ছিল এক লাখ দীনার যা হযরত খালিদ (রা)-এর হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে ইরানী বাহিনীর একটি অংশ তাদের পায়ে জিঞ্জির বেঁধে নিয়েছিল, যাতে আরবদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে না পারে। কিন্তু তারপরও তাদের জিঞ্জির ভেঙ্গে পালাতে হলো। এই জিঞ্জিরের কারণেই এই যুদ্ধ 'জঙ্গে যাতিস্-সালাসিল' (জিঞ্জির যুদ্ধ) নামে পরিচিত।

হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে হিস্‌নুল মারাআত (حصن المرأة) অবরোধ করেন এবং এই দুর্গটি জয় করেন। সেখানকার শাসনকর্তা নিহত হলো। তার স্ত্রী মুসলমান হলো এবং হযরত মুছান্না (রা)-কে বিয়ে করলো।

কারিনের যুদ্ধ

হরমুযের সাহায্যের আবেদন যখন ইরানের রাজদরবারে পৌছলো, তখন সেখান থেকে হযমুযের সাহায্যার্থে কারিন নামক এক মস্তবীর একদল বীর সেনাসহ যাত্রা করলো। কিন্তু তার পৌছার পূর্বেই হরমুযের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। পথিমধ্যে কারিনের সাথে হরমুযের পরাভূত বাহিনীর সাক্ষাৎ হলো। এদিক থেকে মুসলিম বাহিনীও সামনে অগ্রসর হলো। যুদ্ধ হলো। কারিন, আনুশ্‌জান ও কুবাদ নামক তিনজন বড় বড় সরদার মারা গেলো। ইরানীরা তাদের

তিন হাজার লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পলায়ন করার সময় নদীতে ডুবেও অনেকে মারা গেলো। বহু সংখ্যক বন্দী হলো। এই যুদ্ধের পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এই প্রদেশের প্রজাদেরকে কোন রকম কষ্ট-ক্লেশ না দিয়েই জিযিয়া আদায়ে উৎসাহিত করে সেখানে ইসলামী শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। ইরানের প্রজাবৃন্দ ইসলামের প্রজা হয়ে অনুভব করলো যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

দুল্‌জা'র যুদ্ধ

কারিন প্রমুখের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে ইরানের রাজদরবার থেকে আ'দায্‌গর নামক জনৈক বিখ্যাত অশ্বারোহীকে একদল বাহাদুর লশকরসহ প্রেরণ করা হলো। এই বাহিনী মাদায়েন থেকে রওয়ানা হয়ে দুল্‌জা নামক স্থানে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে পেছন থেকে বাহমান জাদওয়ায়হ নামক আরেক মস্ত সরদারকে এক বিরাট বাহিনীসহ মাদায়েন থেকে প্রেরণ করা হলো। দুল্‌জা নামক স্থানে পৌঁছে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইরানী বাহিনীর উপর হামলা চালালেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইরানী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। তাদের সরদারও প্রচণ্ড পিপাসায় যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলো। বাহমান জাদওয়ায়হ লায়স নামক স্থানে পৌঁছামাত্র পলায়নপর ইরানীরা তার লশকরে গিয়ে শামিল হলো। এই যুদ্ধে বহু খ্রিস্টান আরব ও ইরানী বাহিনীতে এসে শরীক হয়েছিল। বাহমান জাদওয়ায় ইরানী ও আরবদের এই বিরাট বাহিনীকে লায়স নামক স্থানে রেখে স্বয়ং মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা করলো। কেননা, সেখানে তার প্রয়োজন ছিল না।

লায়সের যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যখন জানতে পারলেন যে, লায়স নামক স্থানে এক বিরাট বাহিনী অবস্থান করছে, যারা মুসলমানদের উপর হামলা চালাবে, তখন তিনি নিজেই লায়স অভিমুখে রওয়ানা করলেন এবং সেখানে পৌঁছে যুদ্ধ শুরু করলেন। প্রথমে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ময়দানে একা সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্‌বান করলেন। প্রতিপক্ষ থেকে মালিক ইব্‌ন কায়স মুকাবিলা করতে এলো এবং এসেই খালিদ (রা)-এর হস্তে প্রাণ হারালো। এরপর ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। সত্তর হাযার শত্রুসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারালো।

হীরা বিজয়

লায়স যুদ্ধ সম্পন্ন করে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরা অবরোধ করলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর শহরবাসী হতাশ হয়ে পড়লো। হীরার শাসনকর্তা আমর ইব্‌ন আব্‌দিল মাসীহ অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সমীপে হাযির হলো। ইরানী সরদার ও ইরানী লশকর– যারা হীরায় অবস্থান করছিল– আরদেশীর কিসরার মৃত্যুখবর শুনে প্রথমেই পলায়ন করেছিল। আবদুল মাসীহ প্রায় দুই লাখ রূপী খারাজ (কর) স্বীকার করে সন্ধি করলো। হীরা জয়ের পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যিরার ইব্‌নুল আয্‌ওয়ার (রা), যারার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা), কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা), মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা), উআয়না ইব্‌নুল শাম্মাস (রা) প্রমুখ সেনাপতিকে হীরার আশেপাশে ছোট ছোট সেনাদলসহ প্রেরণ করলেন। প্রতিটি গোত্র এবং প্রতিটি বস্তি জিযিয়া কিংবা ইসলাম কবূল করলো। আর এই

ভাবে দজ্‌লা পর্যন্ত গোটা এলাকা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে বিজিত হলো। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরায় অবস্থান করে তার আশেপাশের অভিযানগুলো পরিচালনা করতে থাকেন।

খালিদ (রা)-এর পয়গাম

হীরা থেকে হযরত খালিদ (রা) ইরানী রঈসদের নিকট পত্র লিখেন এবং ইরাকের যেসব আমীর জমিদার ও জায়গীরদারের মর্যাদা রাখতো এবং তখনো পর্যন্ত আনুগত্য স্বীকার করেনি, তাদের প্রতি একটি সাধারণ ফরমান জারি করেন। ইরানী রঈসদের নিকট তিনি যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেন :

> অতঃপর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাদের জীবনব্যবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের ধূর্তামিকে পর্যুদস্ত করেছেন। তোমাদের ঐক্যজোটকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমরা যদি তোমাদের দেশ আক্রমণ না করতাম তবে তোমাদের পক্ষে অমঙ্গল হতো। এখন উত্তম এই যে, তোমরা আমাদের আনুগত্য করবে। তাহলে আমরা তোমাদের এলাকা ছেড়ে দেবো এবং অন্যত্র চলে যাবো। আর তোমরা যদি আমাদের অনুগত না হও, তবে তোমরা এমন লোকদের পাল্লায় পড়বে যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালবাসে যেমনি তোমরা জীবনকে ভালবাস।

দ্বিতীয় সাধারণ ঘোষণার বিষয়বস্তু

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি তোমাদের অহমিকা দমন করেছেন। তোমাদের একতা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তোমাদের শান-শওকত মিটিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা ইসলাম কবূল করো, শান্তিতে থাকবে। অথবা আমাদের তত্ত্বাবধানে এসে যিম্মি বনে যাও ও জিযিয়া প্রদান করো। নতুবা আমি তোমাদের উপর এমন জাতিকে লেলিয়ে দেবো, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালবাসে যেমনি তোমরা মদ্যপানকে ভালবাস।

এইসব পত্র ও ফরমানের প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, ইরানের রাজদরবারে বাদশাহ সম্পর্কে যে বিবাদ চলছিল, তা সহসা মিটে গেলো এবং দরবারের আমীরগণ তৎক্ষণাৎ তাদের একজন বাদশাহ নির্বাচনে একমত হয়ে গেলো, যাতে আরববাসীদের মুকাবিলা সহজেই হতে পারে।

আম্বার বিজয় বা জঙ্গে যাতিল উয়ূন

ইরানীরা আম্বারে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ করে সাবাতের শাসক শেরযাদকে এই বাহিনীর সিপাহ্‌সালার বানিয়েছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরায় এই সেনা সমাবেশের সংবাদ পেয়ে হীরা থেকে আম্বার অভিমুখে রওনা করলেন। শেরযাদ আম্বার প্রাচীর বাইরে মাটির দমদমাও তৈরি করিয়েছিল এবং তারা আরব বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল। হযরত খালিদ (রা) যখন আম্বার অবরোধ করলেন, তখন অবরুদ্ধরা দমদমা থেকে একযোগে তীরের বৃষ্টিবর্ষণ শুরু করলো। ফলে ইসলামী বাহিনীর এক হাজার মুজাহিদের চোখ তীরের আঘাতে যখমী ও নষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু ইসলামের লশকর ও তার সিংহ হৃদয় সিপাহসালারকে তীরের বৃষ্টি দমাতে পারে নি। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দুর্বল ও কৃশ উটগুলো যবেহ করিয়ে খন্দকে (পরিখায়) ফেলে দিলেন। আর এইভাবে যখন খন্দক পার হবার রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো, তখন মুসলমানরা প্রথমে দমদমা দখল করলো।

তারপর শহর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে রক্তের নদী বইয়ে দিলো। ইরানীরা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বড় সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটালো। কিন্তু মুসলমানদের বিপরীতে তা কোন কাজেই আসলো না। শেরযাদ যখন দেখলো যে, শহর মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে হযরত খালিদ (রা) সমীপে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। হযরত খালিদ (রা) প্রত্যুত্তরে বলে পাঠালেন যে, শেরযাদ তার কয়েকজন বিশিষ্ট সহচরসহ শুধু তিন দিনের রসদ নিয়ে যদি শহর থেকে বের হতে চায়, তবে আমরা তাকে চলে যেতে দেবো। সুতরাং তাই হলো। শেরযাদ শহর ছেড়ে চলে গেলো। হযরত খালিদ (রা) বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। ইরানীরা ইসলামী লশকরের মুকাবিলা করার জন্য সর্বত্র সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। আম্বারে জানা গেলো, আয়নুত্ তামার' নামক স্থানে মাহ্রান ইব্ন বাহরাম চব্বিশ হাজার ইরানীর একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে এবং উক্বাহ ইব্ন আবী উক্বাহ আরববাসীদের এক বিরাট দলসহ যুদ্ধের জন্য ডেরা ফেলেছে। আশেপাশের আরব গোত্র তাগলিব ও আবাদ প্রভৃতিও ইসলামী লশকরের মুকাবিলার জন্য দল বেঁধে এসেছিল। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (র) যীবিরকান ইব্ন বদরকে আম্বার শহরের শাসক নিযুক্ত করে স্বয়ং 'আত্-তামার অভিমুখে রওয়ানা করলেন।

আয়নুত্-তামার বিজয়

উক্বাহ ইব্ন উক্বাহ হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে ইরানী সিপাহ্সালার মাহরান ইব্ন বাহরামকে বললো, আরবদের লড়াই সম্পর্কে আরবরাই ভাল জানেন। সুতরাং আপনি প্রথমে আমাদেরকেই ইসলামী লশকরের মুকাবিলা করতে দিন। মাহরান এ প্রস্তাব সানন্দে মনযূর করলো। উক্বাহ সর্বপ্রথম ময়দানে অবতীর্ণ হলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাকে সঙ্গে সঙ্গে জীবিত বন্দী করলেন। উক্বাহ বন্দী হওয়ার সাথে সাথে উক্বাহর সমস্ত লশকর পলায়ন করলো। বহু পলায়নকারীকে মুসলমানরা বন্দীও করলেন। মাহরান ইব্ন বাহরাম এই দৃশ্য অবলোকন করে এতই ভীত হয়ে পড়লো যে, সে দুর্গ ছেড়ে বিনা মুকাবিলায় পলায়ন করলো। উক্বাহর পলায়নপর সৈন্য ইরানীদের খালি দুর্গ দেখে তাড়াতাড়ি দুর্গে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। আর এইভাবে তারা দুর্গ বন্ধ করে বসে থাকলো। চারদিন অবরোধের পর দুর্গের উপরও ইসলামী লশকরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। মজুসীদের সাথে মিলে যে আরব খ্রিস্টানরা লড়াই করছিল, তারা নিহত হলো এবং তাদের মাল-আসবাব মুসলমানদের দখলে এলো।

উচ্চ ইরাক

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইয়ায ইব্ন গানাম (রা) উচ্চ ইরাকে হামলা করেছিলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে তো অতিশীঘ্রই আরব গোত্রসমূহ ও গোত্রপতিদের ছেড়ে ইরানী সরদার ও ইরানী বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছিল। যদিও আরব সরদার ও খ্রিস্টান গোত্রগুলোও যুদ্ধরত ছিল, কিন্তু তারা ইরানীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। হযরত ইয়ায ইব্ন গানাম (রা) যিনি উচ্চ ইরাক আক্রমণ করেছিলেন, তিনিও তখন পর্যন্ত স্বাধীন খ্রিস্টান সরদারদের মুকাবিলা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনি যে এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন, সে এলাকা ছিল ইরাক, জাযিরা, ইরান ও সিরিয়া সংযুক্ত। আর এ কারণেই তাঁর যুদ্ধ চালনার প্রভাব যতটুকু ইরানী রাজ-দরবার পড়তো,

ততটুকুই হিরাক্লিয়াসের দরবারেও পড়ছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যখন আয়নুত্-তামার জয় করেন, তখন হযরত ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) আরবের মুশরিক ও খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে দমনকল্পে দূমাতুল জান্দালের শাসকদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। দুমাতুল জান্দালে দু'জন রঈস ছিলেন। একজন আকীদর ইব্‌ন আব্‌দিল মালিক (নবী-জীবনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে যার নাম উল্লিখিত হয়েছে), দ্বিতীয় জন জূদী ইব্‌ন রবীআ। এই দুই রঈসই একজোট হয়ে হযরত ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-এর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন এবং তারা আশেপাশের সকল খ্রিস্টান গোত্রকে নিজেদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শরীক ও যুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) আয়নুত্-তামারে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট একটি পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি লিখলেন : আমাকে সাহায্য করুন। শত্রুপক্ষের বিপুল সৈন্য ও শক্তির মুকাবিলা আমাদের স্বল্প সংখ্যক লোক দ্বারা সম্ভবপর নাও হতে পারে।

দুমাতুল জান্দাল বিজয়

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা)-কে হীরায় স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে অগৌনে দূমাতুল জান্দাল রওয়ানা করলেন। হযরত খালিদ (রা)-এর আগমন সংবাদ শুনে আকীদর ইব্‌ন আব্‌দিল মালিক জূদী ইব্‌ন রবীআ ও অন্যান্য খ্রিস্টান সরদারকে বললেন, মুসলমানদের সাথে সন্ধি করা উচিত। কিন্তু তারা এই প্রস্তাব অপসন্দ করলো। আকীদর তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে একা কেটে পড়লো। তার এইভাবে কেটে পড়ার খবর মুসলমানরাও জানতে পারলো। একটি ছোট্ট বাহিনী তাকে বন্দী করতে চাইলো। কিন্তু সে লড়াই করে প্রাণ হারালো।

দূমাতুল জান্দালের অদূরে পৌঁছে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রথমে খোঁজ নিলেন যে, ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) কোন্ দিকে যুদ্ধরত আছেন। তার বিপরীত দিক দিয়ে হযরত খালিদ (রা) হামলা শুরু করলেন। খ্রিস্টান বাহিনীর সিপাহসালার জূদী ইব্‌ন রবীআ তার বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-কে মুকাবিলার জন্য পাঠালো আর দ্বিতীয় ভাগ নিজে নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। হযরত খালিদ (রা) ব্যূহ থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ময়দানে সেনাপতি জূদীকে উচ্চৈঃস্বরে ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং নিজের সাথে লড়াই করতে আহ্বান জানালেন। জূদী ময়দানে উপস্থিত হয়ে খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। হযরত খালিদ (রা) তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করে ফেললেন। জূদীর সহচরগণ এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করতে শুরু করলো। ঘটনাক্রমে সেই সময়ই ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টানদের পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। উভয় দিকের পলায়নকারীরা বিতাড়িত হয়ে দুর্গে প্রবেশ করলো এবং দরজা বন্ধ করে দিলো। হযরত খালিদ (রা) দুর্গ অবরোধ করে দুর্গবাসীদের সামনে জূদীকে হত্যা করলেন এবং দুর্গ আক্রমণ করে তলোয়ারের জোরে দুর্গ দখল করলেন। যে বাধা দিলো তাকে কতল করলেন। যে নিরাপত্তা চাইল, তাকে নিরাপত্তা দিলেন।

হাসীদ যুদ্ধ

পারস্যবাসী যখন দেখলো হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরা প্রদেশ ত্যাগ করে দূমাতুল জান্দাল গমন করেছেন, তখন তারা হীরা ফিরে পাবার জন্যে এবং ইসলামী কর্মকর্তাদের

ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার জন্য অগৌন জোর প্রয়াস চালায়। হীরাস্থ আরব গোত্রগুলোও তাদের নেতা উক্‌বাহ ইব্‌ন উক্‌বাহর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নবোদ্যমে সামরিক প্রস্তুতি তড়িঘড়ি সম্পন্ন করে ফেললো। ইরান থেকে যরমেহের ও রোযিয়াহ নামক দু'জন খ্যাতনামা সরদার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করলো। হযরত কা'কা ইব্‌ন আমর (রা) এই হামলার কথা শুনে উপস্থিত মুসলমানদের দু'টি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন। একটি বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত আবূ লায়লা (রা)-কে সমর্পণ করলেন এবং অপর বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন হযরত কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) নিজেই। তারপর হীরা থেকে রওয়ানা হয়ে হাসীদ নামক স্থানে ইরানীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। ইরানের উভয় সরদার ও অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। অন্যরা পলায়ন করে খানাফিশ নামক স্থানে চলে গেলো। সেখানে ইরানীদের এক মস্ত সিপাহ্‌সালার বাহ্‌বুযান এক বিরাট বাহিনীসহ অবস্থান করছিল। আবূ লায়লা (রা) ঐ পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবনে খানাফিশ পর্যন্ত গমন করলে বাহবুযান খানাফিশ থেকে পলায়ন করে মাযীখ নামক স্থানে চলে গেলো–যেখানে হুযায়ল ইব্‌ন ইমরান অন্যান্য আরব সরদারসহ বিরাট আরব বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল। এখানে এসব কাণ্ড চলাকালে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দূমাতুল জান্দাল থেকে অভিযান শেষ করে হীরা প্রত্যাবর্তন করলেন।

মাযীখ যুদ্ধ

মাযীখে হুযায়ল ইব্‌ন ইমরান ছাড়া রবীআ ইব্‌ন বুহায়র তাগ্‌লিবীও বনূ তাগ্‌লিবসহ মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কা'কা' ও আবূ লায়লাকে দুই ভিন্ন দিক থেকে নির্দিষ্ট তারিখে মাযীখ অভিমুখে প্রেরণ করে নিজেও সেই দিকে একা তৃতীয় দিক দিয়ে রওয়ানা করলেন। নির্দিষ্ট তারিখে সেখানে পৌঁছে তিন বাহিনী একযোগে হামলা করে শত্রুসেনাদের নিধন করা শুরু করলেন। হুযায়ল তো মুষ্টিমেয় লোকসহ আপন প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো, কিন্তু অপর সরদার ও অসংখ্য লোক নিহত হলো। নিহতদের মধ্যে আবদুল আযীয ইব্‌ন আবী রিহাম ও লাবীদ ইব্‌ন জারীরও ছিলেন, যারা মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু চাপে পড়ে শত্রুদের সঙ্গে ছিলেন। এই দু'জনের নিহত হওয়ার খবর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অবগত হলেন, তখন তিনি উভয়ের রক্তপণ পরিশোধ করলেন। আর তাঁদের পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহারের কড়া নির্দেশ দিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করার জন্য পূর্ব থেকেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবার আবদুল আযীয ও লাবীদ নামক দুই ব্যক্তিও মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার তালিকায় শামিল হলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কাছে এ ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত তলব করলেন না। বরং বললেন, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে থাকবে, তার এরূপ পরিণতিই ঘটবে। রবীআ ইব্‌ন বুহায়র তাগ্‌লিবীও বেঁচে গিয়েছিল এবং একটি বিরাট দল সংগ্রহ করে পারস্যবাসীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হুযায়ল পলায়ন করে ইয়াসীর নামক স্থানে আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ-এর নিকট চলে গিয়েছিল। এখানে আত্তাব ইব্‌ন উসায়দও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো করছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) রবীআর পশ্চাদ্ধাবনে কা'কা' (রা) ও আবূ লায়লা (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং হুযায়লের পশ্চাদ্ধাবনে স্বয়ং নিজে গমন করলন।

সুতরাং রবীআ ও তার সকল সঙ্গী ইয়াসীরে নিহত হলো এবং আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ ও হুযায়ল উভয়ে তাদের অধিকাংশ সঙ্গী সাথীসহ মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারালো। এরপরই জানা গেলো যে, রিফাযায় বিলাল ইব্‌ন উক্‌বা নিজের আশেপাশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। হযরত খালিদ (রা) অবিলম্বে ইয়াসীর থেকে রিফার অভিমুখে রওয়ানা করলেন। সেখানে খালিদ (রা)-এর আগমন সংবাদ শুনে শত্রুপক্ষ পলায়ন করলো এবং পালিয়ে রিযাব ও ফিরাযের দিকে চলে গেলো। এই স্থানগুলো দূমাতুল জান্দালের সংলগ্ন এবং পারস্য, সিরিয়া ও আরবের সংযোগ স্থলে অবস্থিত ছিল। এখানে বনূ তাগ্‌লিব, বনূ তামার ও বনূ আয়াদের পূর্ব থেকেই সমাবেশ ছিল এবং রোমক বাহিনী তাদের সাহায্যার্থে আগমন করে অদূরেই তাঁবু ফেলেছিল। এইভাবে ইরাকের নিম্নভূমি থেকে যে যুদ্ধের সিল্‌সিলা শুরু হয়েছিল, তা ইরানী বাহিনী অতিক্রম করে মধ্যবর্তী গোত্র ও রঈসদের মাধ্যমে রোমক বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

ফিরায যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ফিরাযে পৌঁছে যুদ্ধের প্রস্তাবনা পেশ করলেন। এই স্থানটি ছিল ফোরাত নদীর কূল ঘেঁষে। অপর পারে রোমক সৈন্য তাঁবু ফেলেছিল। রোমক সৈন্য বার্তা পাঠালো যে, হয়তো তোমরা ফোরাত নদীর এপারে এসো, অথবা আমাদেরকে ওপারে যেতে দাও যাতে আমরা এবং তোমরা একে অন্যের মুখোমুখি হতে পারি।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) জবাব দিলেন, তোমরাই এপারে এসো। সুতরাং রোমক বাহিনী নদী পার হয়ে . . . .ইসলামী লশকরের মুখোমুখি হলো। ইসলামী লশকর উপর্যুপরি সফর ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রোমকরা ছিল সম্পূর্ণ সতেজ ও শ্রান্তিহীন। জনশক্তির দিক দিয়েও তারা আট-দশগুণ বেশি ছিল। যুদ্ধ শুরু হলো। সারা দিন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তুমুল যুদ্ধ চললো। অবশেষে রোমক বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হলো এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একলাখ মৃতদেহ রেখে মুসলমানদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করলো। এই যুদ্ধ শেষ করে ১২ হিজরীর ২৫শে যিলকাদ হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) শাজারা ইব্‌নুল আগার সহকারে গোটা বাহিনীকে হীরা অভিমুখে ফেরত পাঠালেন এবং নিজে কয়েকজন সহচর নিয়ে নিঃশব্দে ফিরায থেকে প্রস্থান করে মক্কা মুআযযমা পৌঁছে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জে শরীক হলেন।

হজ্জ সমাপন করে তৎক্ষণাৎ তিনি হীরা অভিমুখে গমন করলেন। হীরা পৌঁছে যখন তিনি লশকরে শরীক হলেন, তখন কেউ ধারণাও করতে পারেননি তিনি হজ্জ করে এসেছেন। ঘটনাচক্রে এই খবর গোপন রইল না। ক্রমে ক্রমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কানে পৌঁছে গেলো। তিনি খালিদ (রা)-কে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং কিছুটা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করলেন। এই বছর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ আদায় করেন এবং হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে মদীনা মুনাওয়ারায় স্বীয় স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরায় ফিরে এসে সেখানকার অবশিষ্ট ছোট ছোট স্থানগুলো দখল করলেন।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ১৩ হিজরীর রবীউল আউয়াল পর্যন্ত হীরায় অবস্থান করেন। ১২ হিজরীর মুহাররমের শেষ দিকে তিনি ঐ এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পায়ে পায়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন এবং বিশটি রক্তক্ষয়ী বড় যুদ্ধ

পরিচালনা করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তার সৈন্যসংখ্যা কম এবং শত্রুপক্ষের সৈন্য কয়েকগুণ বেশী ছিল। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করেন। কোন স্থানেই তিনি পরাস্ত ও পরাভূত হননি। ইরানীদের অহংকারী মনে ও শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তরে তাঁর বাহুবল ও দৃঢ়চিত্ততার বদৌলতে ভীতি সৃষ্টি হলো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে বিশাল দেশ ও বড় বড় গোত্র-গোষ্ঠী বশীভূত করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে সহজে পাওয়া যাবে না। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর অতুলনীয় বীরত্ব ও যোগ্যতাপূর্ণ সৈনাপত্যের জন্য তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাতে আমরা বাধ্য। কিন্তু এই সমুদয় খালিদী কৃতিত্বের একটি মূলতত্ত্ব ও প্রাণশক্তি রয়েছে। সেই মূলতত্ত্ব ও প্রাণশক্তিও আমাদের খুঁজে বের করা উচিত। সেটা হচ্ছে, সিদ্দীকী নির্বাচন, সিদ্দীকী প্রশিক্ষণ্ ও সিদ্দীকী দিক-নির্দেশনা। মদীনা মুনাওয়ারা ও ইসলামী লশকরের মধ্যে অহরহ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতো। প্রত্যেকটি ঘটনার খবরাখবর অতিদ্রুত রাসূলের খলীফার নিকট পৌঁছে যেতো। আর এইভাবে সামান্য সামান্য ব্যাপারেও রাসূলের খলীফার তরফ থেকে দিক-নির্দেশনা পৌঁছাতে থাকতো।

সিরিয়ায় খারিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)

ইরানীদের তরফ থেকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছিল এবং খুব শীঘ্র তারা মদীনা মুনাওয়ারায় সৈন্য চালনার স্বপ্ন দেখবে সে আশংকাও ছিল না। আরবের সর্বত্র যখন মুরতাদ সমস্যা দমিত হলো এবং ইরানী আশংকার গুরুত্বও কোন দ্রুততার দাবী করলো না, তখন সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সিরিয়ার শৃংখলা বিধান ও ঐদিক থেকে রোমক ও গাস্‌সানী আশংকা প্রতিরোধ করা। শুরাহবীল ইব্‌ন আমর নামক গাসসানী বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রাষ্ট্রদূতকে শহীদ করে ফেলেছিল, যার পর মু'তা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর রোমক ও গাসসানীরা মিলে মদীনা মুনাওয়ারায় সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি নেয়। সেই খবর শ্রবণ করে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাবূক পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত খ্রিস্টানরা পূর্ণভাবে এতবড় আরবী ও ইসলামী লশকরের মুকাবিলা করার সাহস করতে পারেনি। তাই হযরত নবী করীম (সা) সিরীয় সীমান্তে ভীতিসঞ্চার করে প্রত্যাগমন করেন। এরপর পুনরায় খবর এলো যে, সিরীয় সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি চলছে। তখন হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর সিরীয় সীমান্তে গমন করেন এবং মুকাবিলাকারীদের পরাস্ত করে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন কেননা, দেশের অভ্যন্তরে তখন মুরতাদ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছিল। মুরতাদ সমস্যা নিরসন করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে এগারটি বাহিনী গঠন করে পাঠান তার একটি বাহিনী হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে দিয়ে বলে দিলেন যে, তুমি সিরীয় সীমান্ত অভিমুখে গমন কর। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও সিরীয় আশংকা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মুরতাদ সমস্যা মিটানোর ক্ষেত্রে সিরীয় আশংকাকে খুব দৃষ্টিগোচর রেখেছিলেন। তারপর মুরতাদ সমস্যা থেকে যখন নিশ্চিত হওয়া গেলো, তখন ইরানী আশংকা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইরাকে প্রেরণ করেন। আর আরবের সর্বত্র রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক গোত্র থেকে সৈন্য তলব করেন। উদ্দেশ্য ছিল, আরবের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা রোমক ও ইরানী সম্রাটের মুকাবিলা করা–যাতে চিরতরে খ্রিস্টীয় ও মজুসী আশংকা থেকে আরবরা মুক্তি পায়। দ্বিতীয়ত, আরবের

যেসব যুদ্ধবাজ গোত্র চুপ করে বসে থাকায় অভ্যস্ত ছিল না, তাদেরকে দেশের সর্বত্র থেকে খুঁজে এনে অমুসলিম শত্রুদের মুকাবিলায় সিরিয়া ও ইরাকে পাঠিয়ে দেয়া–যাতে আরবের ঐক্য ও শক্তি এবং ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তির জন্য কোন অভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা অবশিষ্ট না থাকে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুরতাদ সমস্যাও ইসলামের বিজয় অভিযানের একটি বড় কারণ ছিল। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বুদ্ধি-কৌশল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বিকাশের সেই কাজটিই করেছিলেন, যা একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান মালি তার ফুল বাগানের সজীবতা ও শ্যামলিমার জন্য করতে পারেন।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে খুব কম লোক ছিল। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যত মুসলমান সম্ভব সঙ্গে নিয়ে চললেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে নির্দেশ দান করা হয়েছিল যে, যতটা সম্ভব মুরতাদদের শায়েস্তা করবে। খ্রিস্টান বাহিনী মুকাবিলা করতে এলে যতটা সম্ভব ঝটিকা আক্রমণ করবে। এক জায়গায় স্থির হয়ে যুদ্ধ করবে না। এরপর নির্দেশ দানের কারণ ছিল, সিদ্দীকে আকবর (রা) সর্বপ্রথম আরবকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছিলেন এবং যে পর্যন্ত মুরতাদ সমস্যা পুরোপুরি মিটে না যায়, তখন পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস ও কিসরা বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করতেন না। যেমনিভাবে অন্যান্য সেনাপ্রধানের সাথে খলীফার দরবার থেকে পত্র-বিনিময় চলছিল, তেমনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর গতিবিধি সম্পর্কেও সিদ্দীকে আকবর (রা) ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং নিয়মিত হযরত খালিদ (রা)-এর কাছে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নির্দেশাবলী পৌঁছতে থাকতো।

হিরাক্লিয়াস সিরীয় সীমান্তে ইসলামী লশকরের উপস্থিতির কথা শুনে প্রথমে সীমান্তবর্তী গোত্রসমূহ ও রঈসদেরকে মুকাবিলার জন্য উস্কানি দিলেন। কিন্তু এই ছোট ছোট রঈস ও আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলো যখন ইসলামী লশকরের মুকাবিলায় হেরে যাচ্ছিল, তখন রোমের কায়সার হিরাক্লিয়াস মাহান নামক রোমক সেনাপতিকে এক বিরাট বাহিনীসহ মুকাবিলার জন্য পাঠান। যখন খ্রিস্টান ও ইসলামী লশকরের মুকাবিলা হলো, তখন মাহান বাহিনী পরাজিত হলো এবং বহু মালে গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হলো। এই পরাজয়ের খবর শুনে হিরাক্লিয়াস স্বয়ং কনস্টানটিনোপল সাম্রাজ্য থেকে রওয়ানা হয়ে সিরিয়ায় এলেন এবং সমুদয় সৈন্য একত্রিত করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার তিনি সরাসরি নিজের হাতে তুলে নিলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পত্র মারফত এই সমুদয় বৃত্তান্ত সিদ্দীক আকবর (রা) অবগত হলেন, যা তিনি পূর্ব থেকেই অনুমান করেছিলেন। ঘটনাক্রমে যেদিন এই পত্র মদীনায় এসে পৌঁছলো, ঐ দিন হযরত ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেল তাঁর অভিযান শেষ করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন। একই সঙ্গে দেশের সর্বত্র আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিভিন্ন গোত্রের আগমন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সিদ্দীকে আকবর (রা) ইকরামা (রা)-কে তৎক্ষণাৎ হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাহায্যে প্রেরণ করলেন। তাঁর পর হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ও তাঁর সহচরদের সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তীনের পথে আক্রমণ করার জন্য। এরপর আগত গোত্রসমূহের একটি বাহিনী গঠন করে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে অধিনায়ক করে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা দামেশকের দিক থেকে আক্রমণ করবে। এরপর আরেকটি বাহিনী গঠন করে তার

অধিনায়ক বানালেন হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে। তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি হিম্সের দিকে গমন করে হামলা করবে। ঐ সময়ই শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা) ইরাক থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা) আরেকটি বাহিনী গঠন করে তার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা)-কে। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি জর্দানের দিক থেকে আক্রমণ করবে। এইভাবে সিদ্দীকে আকবর (রা) সিরিয়া আক্রমণ করার জন্য ১৩ হিজরীর মুহাররম মাসে চারটি বাহিনী গঠন করে চার দিক থেকে প্রেরণ করলেন।

এই চারটি বাহিনী যখন সিরীয় সীমান্তে পৌছলো এবং হিরাক্লিয়াস জানতে পারলো যে, আরবরা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চার জায়গায় হামলা করার সংকল্প করেছে, তখন তিনিও তার চারজন সেনাপতিকে চারটি বিরাট বাহিনী দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রেরণ করলেন। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর মুকাবিলার জন্য তিনি তাঁর সহোদর তাযারুককে নব্বই হাজার সৈন্য দিয়ে ফিলিস্তীনের দিকে প্রেরণ করলেন। জর্জ ইব্ন নুযারকে চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের মুকাবিলায় দামেশকের দিকে প্রেরণ করলেন। রাকিস নামক অধিনায়ককে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ শুরাহবীল ইব্ন হাসানার মুকাবিলায় জর্দানের দিকে এবং বফীকার ইব্ন নিস্তরাসকে ষাট হাজার সৈন্যসহ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্র মুকাবিলায় হিমসের দিকে প্রেরণ করলেন। হিরাক্লিয়াস তাঁর চারজন সেনাপতির অধীনে সর্বমোট দুই লাখ চল্লিশ হাজার সৈন্য মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। অথচ মুসলমানদের বাহিনী চতুষ্টয়ের সর্বমোট সৈন্য ছিল ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য পূর্ব থেকেই কত বিরাট আয়োজন করে রেখেছিলেন। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং হিরাক্লিয়াস ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি যুদ্ধ পরিহার ও যতটা সম্ভব মুসলমানদের সাথে সম্পর্কহীন থাকতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর সমুদয় সভাসদ, মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতিগণ ও গভর্নরগণ ছিলেন আরবদেশ আক্রমণ করার জন্য আপাদমস্তক প্রস্তুত। অন্য কথায়, হিরাক্লিয়াস যুদ্ধ করতে না চাইলেও রোমান সরকার পরিপূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং রোমান সরকারের শাহানশাহ হিসাবে হিরাক্লিয়াসকে সব রকম উদ্যোগ আয়োজন একজন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ পরিচালকের মতই করতে হয়েছিল।

মুসলিম সেনাপতিগণ যদিও পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে অভিযাত্রা করেছিলেন, কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী একে অপরের অবস্থা অবহিত ও পারস্পরিক খবরাখবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। সিরীয় সীমান্তে প্রবেশ করার পর যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, প্রতিটি মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় তার আটগুণ রোমক সৈন্য সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আগমন করছে, তখন একদিকে সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে এ সংবাদ প্রদান করলেন, অপরদিকে তাঁরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করা সমীচীন মনে করলেন। ঘটনাক্রমে এদিকে চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুকের এক জায়গায় সমবেত হলেন। ওদিকে সিদ্দীকে আকবর (রা) রোমক সৈন্যের আধিক্য ও প্রস্তুতির কথা শুনে একদিকে সেনাপতি চতুষ্টয়কে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে মুকাবিলা করার নির্দেশ পাঠালেন, অপর দিকে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, তুমি হীরা

প্রদেশে তোমার স্থলে মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে ওখানকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বানিয়ে অর্ধেক সৈন্য মুছান্নার কাছে রেখে বাকী অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া গমন করো এবং সেখানকার সমস্ত ইসলামী সৈন্যের দায়িত্বভার প্রধান সেনাপতি হিসাবে তুমি নিজ হাতে গ্রহণ করো। সিদ্দীকে আকবর (রা) দেখেছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইরানী বাহিনীকে কিভাবে পরাভূত করে এক বিশাল এলাকা ইরান সাম্রাজ্য থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই ভয়াবহ অবস্থায় সার্থকভাবে রোমকদের মুকাবিলা করার জন্য খালিদের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কেউ ছিল না। তিনি এ কথাও জানতেন যে, খালিদের সবচেয়ে বড় ও সর্বপ্রথম কীর্তি ছিল মূতা যুদ্ধ। তিনি মূতা যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যের বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে সামলে নিয়েছিলেন, যার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি 'সায়ফুল্লাহ্' (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাই সিদ্দীকে আকবর (রা) অতি জাঁদরেল সেনাপতি চতুষ্টয়ের কাছে সায়ফুল্লাহকে প্রেরণ করা এবং তাঁদের উপর তাঁকে প্রধান সেনাপতি করা অতীব ফলপ্রদ হবে বলে মনে করলেন। সেমতে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দশ হাজার সৈন্য মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর নিকট রেখে বাকী দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হলেন।

ওদিকে হিরাক্লিয়াস যখন দেখলেন যে, ইসলামী বাহিনী চতুষ্টয় এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে, তখন তিনিও তাঁর সেনাপতি চতুষ্টয়কে নির্দেশ দিলেন এক জায়গায় হয়ে মুকাবিলা করার। রোমক বাহিনী চতুষ্টয় একত্রিত হয়ে ইয়ারমুক প্রস্রবণের অপর পাড়ে এমন এক ডিম্বাকার ময়দানে তাঁবু ফেললো, যা পশ্চাৎ দিক থেকে পাহাড় ও সম্মুখ দিক থেকে পানি বেষ্টিত ছিল। এই দুই লাখ চল্লিশ হাজার রোমক সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিল হিরাক্লিয়াসের সহোদর তাযারুক। হিরাক্লিয়াস তাকে লিখলেন যে, আমি আরো একটি বড় বাহিনী তোমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করছি। সে মতে মাহান নামক সেনাপতিকে ইয়ারমুকের দিকে প্রেরণ করলেন। ইসলামী লশকর ইয়ারমুকের এপারে খোলা ময়দানে পড়েছিল। তারা স্বীয় সংখ্যাল্পতার দরুন রোমকদের উপর আক্রমণ করতে পারছিল না। ওদিকে এক প্রাকৃতিক প্রাচীরে ঘেরা রোমক বাহিনীও বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

ইয়ারমুকে যখন উভয় লশকর একত্রিত হলো, তখন ছিল সফর মাস। ঐ সময় কিংবা তার দু'চার দিন পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইরাক থেকে তাঁর দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়ারমুক অভিমুখে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে কয়েক স্থানে শত্রু গোত্র ও শত্রু রঈসদের সেনাবাহিনী বাধা দিলো : প্রত্যেক স্থানেই খালিদ (রা) লড়াই করে শত্রুদেরকে বিতাড়িত ও সামনে থেকে অপসারিত করে ১৩ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ইয়ারমুকে পৌঁছলেন। ইয়ারমুকে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে আরো কয়েকজন সেনাপতি সামরিক সাহায্য সহকারে রোমানবাহিনীতে যোগদান করেছিল। হযরত খালিদ (রা)-এর আগমনের পূর্বে যদিও ছোট খাটো ঠোকাঠুকি উভয় বাহিনীর মধ্যে বেঁধে গিয়েছিল, কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বড় যুদ্ধ তখনো হয়নি।

ইয়ারমুক যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একজন অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। একদিন রাতে তিনি অনুভব করলেন যে, ভোর বেলা রোমক বাহিনী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে। তিনি রাতের বেলায়ই সমস্ত মুসলিম সৈন্যকে–যাদের সংখ্যা

বর্ণনা করা হয়েছে চল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ হাজার–বহু ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য এক একজন অভিজ্ঞ বাহাদুর ব্যক্তিকে প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করলেন এবং বাছা বাছা বাহাদুরদের একটি ছোট্ট দল স্বীয় সাহচর্যের জন্য নির্ধারিত করে অতি সুনিপুণভাবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তার কর্তব্য সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করলেন। রোমক বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রথম চল্লিশ হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী আক্রমণ করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তার মুষ্টিমেয় সহচরসহ সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ বাহিনীটি বিতাড়িত করলেন। এরপর জর্জ ইব্‌ন যায়দ নামক রোমক সেনাপতি এগিয়ে এলো এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে কিছু কথা বলার জন্য আহবান করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর নিকট গেলেন। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁকে অতি সুন্দরভাবে ইসলামের মূলতত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে একা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সঙ্গে ইসলামী লশকরে চলে এলেন এবং মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে রোমক বাহিনীর উপর হামলা করলেন। ঐ যুদ্ধেই জর্জ (র) ইব্‌ন যায়দ অতি বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন।

উভয় দিক থেকে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম সেনাপতিদের বিস্ময়কর বীরত্ব মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও কোন সৈন্যের অন্তরে হিম্মতহারা ও হতোদ্যম হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত উদয় হতে দিলো না। উৎসাহ উত্তেজনার অবস্থা এরূপ ছিল যে, ইসলামী লশকরের নারীরাও লড়াই করে কাফিরদের হত্যা করতে যোগ দিলো। আবূ সুফিয়ান রাজায (যুদ্ধের কবিতা) পাঠ করে করে অন্তরে জোশ ও যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছিলেন। হযরত ইকরামা (রা) উচ্চকণ্ঠে বললেন : কে আছো আমার হাতে মৃত্যুর জন্য বায়'আত করবে ? তৎক্ষণাৎ যিরার ইব্‌ন আযওয়ার ও অন্যান্য চারশ' লোক বায়'আত করলেন যে, হয়তো আমরা শহীদ হয়ে যাবো, অথবা বিজয়ী বেশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবো। এরপর এই দলটি রোমক বাহিনীর মধ্যে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত মিকদাদ (রা) উচ্চকণ্ঠে সূরা আনফাল তিলাওয়াত করে মুসলিম যোদ্ধাদের মনে শাহাদতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা), আবূ উবায়দা (রা) ইব্‌ন জাররাহ, শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা (রা), আমর ইব্‌ন আস (রা), হারিছ (রা), যিরার (রা), জর্জ (রা) ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ মুসলিম বীর যে কীর্তি আঞ্জাম দিলেন, তা আজ পর্যন্ত আকাশের সূর্য অবলোকন করেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তলোয়ার ও খঞ্জর এবং তীর ও বর্শার ব্যবহার অতি তীব্র ও ক্ষিপ্রতার সাথে চালু ছিল। জুহর ও আসরের নামায মুসলিম যোদ্ধারা নিছক ইশারা-ইঙ্গিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে আদায় করেছেন। দিন শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলো না।

অবশেষে রোমকরা সারা দিনের কষ্ট-ক্লেশে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় তিষ্টিতে পারলো না। পিছনে হটলো এবং হটতে হটতে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু মুসলমানরা তাদের সাথে সাথে অগ্রসর হতে হতে এবং ঠেলতে ঠেলতে সামনে চলে গেলেন। যখন পিছনে হটা ও পলায়ন করার জায়গা রইল না, তখন এদিক-ওদিক দিয়ে চুয়ে চুয়ে তাদের স্রোত বইলো। তবু মুসলমানরা তাদের পেছন ছাড়লো না। বহু পানিতে ডুবে, বহু খানা-খন্দকে পড়ে মারা গেলো। এক লাখ ত্রিশ হাজার রোমক প্রাণ হারালো। অন্যরা তাদের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো। পলায়নকারীদের মধ্যে অশ্বারোহীই বেশী ছিল। পদাতিকরা প্রায়

সবই মারা গেলো। যুদ্ধ সারা দিন ও সারা রাত চালু থেকে পরদিন ভোর বেলা মুসলমানদের বিজয় আকারে শেষ হলো। রোমক সৈন্য থেকে ময়দান সম্পূর্ণ শূন্য দেখা গেলো। রোমক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিরাক্লিয়াসের সহোদর তাযারুকও মারা গেলো। আরও কতিপয় সেনাপতি মারা গেলো। মুসলমানদের তিন হাজার বাহাদুর শহীদ হলেন। এই তিন হাজারের মধ্যে নও-মুসলিম জর্জ (রা), ইব্‌ন যাযদ ইকরামা (রা), আমর ইব্‌ন ইকরামা (রা), সালামা ইব্‌ন হিশাম (রা), আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা), আবান ইব্‌ন সাঈদ (রা), হিশাম, ইবনুল আসী (রা), হিবার ইব্‌ন সুফিয়ান (রা), তুফায়ল ইব্‌ন আমর (রা) প্রমুখ শহীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়ারমুক যুদ্ধ ১৩ হিজরীর রবীউল আউয়াল বা রবীউস সানীতে সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এটা সঠিক বলে মনে হয় না। ইয়ারমুক যুদ্ধ নির্ঘাত জুমাদিউস ছানীর শেষ দিনগুলোতে সংঘটিত হয়েছে। রোমক সৈন্য ইয়ারমুকে আসার আগে মুসলমানরা বসরা প্রভৃতি স্থান জয় করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত ইয়ারমুক বিজয়ের খবর মদীনায় পৌঁছেনি। ইয়ারমুক বিজয়ের খবর দুই আড়াই মাস পর্যন্ত মদীনায় না পৌঁছা অসম্ভব ছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল

শামদেশে (সিরিয়ার) ইয়ারমুকের যুদ্ধ কায়সার হিরাক্লিয়াসকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ইয়ারমুকের পলাতক সৈন্যরা যখন হিমসে হিরাক্লিয়াসের নিকট-যেখানে তিনি যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষা করছিলেন-পৌঁছলো, তখন তিনি তার কয়েক লাখ লৌহ সৈনিকের মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে তছনছ হওয়ার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ হিম্‌স থেকে রওয়ানা হয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন। যাওয়ার সময় এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, দামেশক ও হিম্‌স্ শহরকে ভালভাবে দুর্গবেষ্টিত ও সুদৃঢ় করতে হবে। মুসলমানগণ ইয়ারমুক থেকে অগ্রসর হয়ে দামেশক অবরোধ করেছিলেন। শামদেশ যেনো মুসলমানরা দখল করেই ফেলেছিলেন কিংবা দখল করার উপক্রম করেছিলেন। হিরাক্লিয়াসের কোমর ইয়ারমুকে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন আরবের দিকে চোখ তুলে তাকানোর চাইতে রোমকদের চোখে স্বয়ং নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসই ভেসে উঠেছিল। অনুরূপভাবে ইরাকের উর্বর ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের দখলে এসেছিল। ইসলামী রাষ্ট্র আরব দেশে সুদৃঢ় ও সুস্থির হয়ে ইরান ও রোমের সীমানাকে পেছনে হটানো এবং নিজে বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিল।

১৩ হিজরীর জমাদিউস-সানীর শুরুতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। একনাগাড়ে ১৫ দিন মারাত্মক জ্বর ছিল। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, নিদানকাল ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে ডেকে খিলাফত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, উমর সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন, উমরের মেজাযে কঠোরতা বেশী। তিনি বললেন, উমরের কঠোরতার কারণ হচ্ছে আমি কোমল স্বভাবের ছিলাম। আমি স্বয়ং অনুমান করতে পেরেছি যে, আমি যে বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করতাম, তাতে উমরের অভিমত কঠোরতার দিকে আসক্ত মনে হতো। কিন্তু যেসব ব্যাপারে আমি কঠোরতা অবলম্বন করেছি, তাতে উমর সর্বদা কোমলতার দিক অবলম্বন করতো। আমার ধারণা, খিলাফত তাকে নিশ্চিতরূপেই নরম-দিল ও সংযত বানাবে। এরপর তিনি হযরত উছমান গনী (রা)-কে ডেকে একই প্রশ্ন

জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন যে, উমরের অন্তর তার বহির্ভাগ অপেক্ষা উত্তম। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। তারপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে এই প্রশ্নই তাঁকেও জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও ঠিক সেই জবাবই দিলেন, যা হযরত উছমান গনী (রা) দিয়েছিলেন। তারপর হযরত তালহা (রা) আগমন করলেন। তিনি তাঁর সামনেও বললেন : আমার ইচ্ছা যে, উমর ফারূককে মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত করে যাবো। হযরত তালহা (রা) বললেন, আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে কি জবাব দেবেন যে, আপনি প্রজাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? একথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও। অতঃপর তাঁকে বসানো হলো। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে জবাব দেবো, আমি তোমার সৃষ্ট জীবের উপর তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেছি। একথা শুনে হযরত তালহা (রা) চুপ হয়ে রইলেন। তারপর তিনি হযরত উছমান গনী (রা)-কে ডেকে ওসীয়তনামা লেখার নির্দেশ দিলেন। রোগের প্রকোপের দরুন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেমে থেমে কথা বলছিলেন এবং হযরত উছমান গনী (রা) তা লিখে যাচ্ছিলেন। যে ওসীয়তের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ

"এটা হচ্ছে সেই চুক্তি, যা খলীফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ইহলৌকিক জীবনের শেষ সময় এবং পারলৌকিক জীবনের প্রথম সময় করেছেন। এরূপ অবস্থায় কাফির ব্যক্তিও ঈমান আনয়ন করে এবং কাফির (পাপী) ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি তোমাদের উপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে নিযুক্ত করেছি এবং আমি তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে ত্রুটি করিনি। অতএব উমর যদি সুবিচার ও সবর দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তা হবে তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার ফল। আর যদি সে অন্যায় ও অবিচার করে, তবে আমি গায়ব সম্বন্ধে অবহিত নই। আমি তো মঙ্গল ও কল্যাণই কামনা করেছি। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।

সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর শেষ ভাষণ

যখন এই ইচ্ছাপত্র (Will) লিপিবদ্ধ হলো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেটি জনগণকে পাঠ করে শোনাতে বললেন। তারপর তিনি সেই মারাত্মক পীড়িতাবস্থায়ই বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং মুসলিম জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

"আমি আমার কোন প্রিয় আত্মীয়কে খলীফা বানাইনি। আর আমি কেবল আমার নিজের মত অনুসারেই হযরত উমর ফারূক (রা)-কে খলীফা বানাইনি বরং বিজ্ঞজনদের পরামর্শ নিয়েই খলীফা বানিয়েছি। এখন তোমরা কি এই ব্যক্তির খলীফা হওয়াতে সন্তুষ্ট, যাকে আমি তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছি ? একথা শুনে জনতা বললো, আমরা আপনার নির্বাচন ও আপনার রায় পসন্দ করছি। তারপর সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন : তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে উমর ফারূকের কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা। সবাই তা মেনে নিলো।

এরপর উমর ফারূক (রা)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন :

হে উমর! আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের জন্য আমার প্রতিনিধি বানালাম। তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ভয় করতে থাকবে। হে উমর! আল্লাহ্

তা'আলার কিছু হক আছে, যা রাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা তিনি দিনে কবুল করবেন না। অনুরূপ কিছু হক দিনের সাথে সম্পৃক্ত–যা তিনি রাতে কবূল করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা নফলসমূহ কবূল করবেন না, যে পর্যন্ত ফরযসমূহ আদায় করা না হবে। হে উমর! যার সৎকর্ম কিয়ামতে ভারী হবে, সে-ই মুক্তি পাবে। আর যার সৎকর্ম কম হবে, সে বিপদগ্রস্ত হবে, হে উমর! মুক্তির পথ কুরআন মজীদের উপর আমল ও ন্যায়ের অনুসরণ দ্বারা লাভ করা যায়। হে উমর! তুমি কি জান না যে, উৎসাহ দান ও ভয় দেখান এবং ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদদানের আয়াতসমূহ কুরআন মজীদে পাশাপাশি নাযিল হয়েছে। যাতে মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হে উমর! কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন জাহান্নামীদের আলোচনা আসিবে, তখন তুমি দু'আ করবে–হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না। আর যখন জান্নাতীদের আলোচনা আসবে, তখন দু'আ করবে–হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করো। হে উমর! তুমি যখন আমার এই উপদেশগুলো অনুসরণ করবে, তখন আমাকে যেনো তোমার কাছেই বসা দেখতে পাবে।

এই ইচ্ছাপত্র ও উপদেশ প্রভৃতি কার্যক্রম ১৩ হিজরীর ২২ শে জমাদিউস-সানী সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। ২২ শে এবং ২৩ শে জমাদিউস-সানীর মধ্যবর্তী রাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত বাদ মাগরিব ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ইশার পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়। সোয়া দু'বছর তিনি খিলাফত চালান। মক্কার গভর্নর আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা)-ও মক্কায় ঐদিনই ইনতিকাল করেন। যেদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের জন্য ইচ্ছাপত্র লিপিবদ্ধ করান এবং মুসলমানদেরকে তা অবহিত করেন সেটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন। এদিনই ইচ্ছাপত্র লেখার পর হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা যিনি হীরা (ইরাক) থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করেছিলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। সেখানকার (ইরাকের) অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) স্বয়ং অর্ধেক সৈন্য নিয়ে এবং অর্ধেক মুছান্না ইব্ন হারিছার নিকট রেখে যখন সিরিয়া গমন করেছিলেন, তখন ইরানী সিপাহসালার বাহমান জাদুওয়ায়ং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদেরকে ঐ দেশ থেকে বিড়াড়িত করা সহজ ভেবে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এলো। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) হীরা থেকে অগ্রসর হয়ে ব্যাবিলনের নিকট ঐ ইরানী বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। বহু রক্তারক্তি ও হতাহতের পর ইরানীরা চরম পরাজয় বরণ করলো। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) মাদায়েনের কাছাকাছি পর্যন্ত ইরানীদের ধাওয়া করে হীরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এই পরাজয়ের পর ইরানীরা তাদের অভ্যন্তরীণ ঝগড়া মুলতবি রেখে এবং ইরানী সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গ তাদের শত্রুতা ভুলে গিয়ে পুনঃপ্রস্তুতি আরম্ভ করলো। সারা দেশ ও প্রদেশসমূহে রণ-উন্মাদনা উথ্লে উঠলো। ইরানী জাতি-গোষ্ঠী ও দেশের নেতৃবর্গ সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে এবং লড়াই করে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। হযরত মুছান্না (রা) যখন ইরানীদের সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি তাঁর সৈন্য-স্বল্পতা চিন্তায় বিচলিত হলেন। তিনি বাশীর ইব্ন খাসাসা (রা)-কে তাঁর স্থলবর্তী করে স্বয়ং মদীনা ছুটে গেলেন। উদ্দেশ্য, খলীফাতুর-রাসূলকে মৌখিকভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব ও নাযুকতাকে উপলব্ধি করানো। হযরত মুছান্না (রা) যখন মদীনায়

পৌঁছলেন, তখন সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর জীবনের মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল। তিনি মুছান্নার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-কে বললেন, তুমি সৈন্য সমবেত করে মুছান্নার সাথে অবশ্য এবং দ্রুত রওনা করবে। হযরত উমর (রা) যখন তাঁর নিকট থেকে বাইরে গেলেন, তখন সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন : হে আল্লাহ! আমি উমরকে মুসলমানদের কল্যাণ ও ফিতনা-ফাসাদের আশংকা দূর করার জন্য আমার পরে খলীফা নির্বাচিত করেছি। আমি যা করেছি, মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য করেছি। তুমি অন্তর্যামী। অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। আমি মুসলমানদের পরামর্শও নিয়েছি এবং তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম, শক্তিমান, মঙ্গলকামী বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাদের শাসক বানিয়েছি। অতএব, তুমি আমার খলীফাকে তাদের মধ্যে কায়েম রাখো। তারা তোমার বান্দা এবং তাদের কপাল তোমার হাতে। তাদের শাসকদেরকে সৎ বানিও। আর উমরকে উত্তম খলীফা বানিও এবং তার প্রজাদেরকে তার জন্য উত্তম প্রজা বানিও।

হযরত আলী (রা)-এর প্রতিক্রিয়া

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওফাতের খবর যখন মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো, তখন গোটা শহরে ক্রন্দন ও বিলাপের উচ্চরোল পড়ে গেলো এবং নবী করীম (সা)-এর ওফাত দিবসের চিত্র পুনরায় মানুষের চোখে ভেসে উঠলো। হযরত আলী (রা) এই খবর শুনে কেঁদে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর [আবূ বকর (রা)] গৃহে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন :

"হে আবূ বকর! আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আপনি তামাম উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেছেন এবং ঈমানকে আপনার চরিত্র বানিয়েছেন। আপনি সর্বাধিক (ঐশ্বর্যশালী) ও সবচেয়ে নবীর নিরাপত্তা বিধানকারী। আপনি সবচেয়ে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ও মঙ্গলকামী ছিলেন। আপনি স্বভাব-চরিত্র, দান-জ্ঞান ও হিদায়াতের ক্ষেত্রে ছিলেন নবী করীম (সা)-এর নিকটতর। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। অন্যরা যখন নবী (সা)-কে মিথ্যাবাদী বলেছে, আপনি তাঁকে তখন সত্যবাদী বলেছেন। অন্যরা যখন আল্লাহ্র রাসূলকে অবজ্ঞা করেছে, আপনি তখন তাঁকে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মানুষ যখন সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত ছিল, আপনি তখন উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র রাসূলের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর কিতাবে 'সিদ্দীক' বলে আখ্যায়িত করেছেন–

وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ

'যে সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনেছে' (সূরা যুমার : ৩৩)। আপনি ছিলেন ইসলামের আশ্রয়স্থল ও কাফিরদের বিতাড়নকারী। না আপনার কোন যুক্তি ভিত্তিহীন হয়েছে, না আপনার দৃষ্টি শক্তিহীন হয়েছে। আপনার আত্মা কখনো ভীরুতা দেখায়নি। আপনি পাহাড়ের মতো দৃঢ় ছিলেন। ঝঞ্ঝাবায়ু না আপনাকে উপড়াতে পেরেছে, না টলাতে পেরেছে। আপনার সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন : তুমি দুর্বলদেহী, মযবুত ঈমানদার, কোমলহৃদয়, আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদাশীল, যমীনে সম্মানিত, মু'মিনকুল শ্রেষ্ঠ। না তোমার সামনে কারো লালসা হতে পারে, না কামনা। দুর্বল আপনার কাছে সবল এবং সবল ছিল দুর্বল। যে পর্যন্ত না আপনি দুর্বলের হক বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং সবলের নিকট থেকে হক বুঝে নিয়েছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মৃত্যু-সংবাদ শুনে বললেন : হে খলীফাতুর রাসূল! তুমি তোমার পরে জাতিকে বড় কষ্ট দিলে! তাদেরকে বিপদে ফেলে গেলে। তোমার ধূলিকণা পর্যন্ত পৌঁছাও খুব কষ্টকর। আমি তোমার সমান কিভাবে করতে পারি!

সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতের কর্মকর্তাবৃন্দ

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে আমীরুল মিল্লাত হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) বায়তুল মালের কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন হযরত ফারূকে আযম (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত উছমান (রা)-কে 'কিতাবত' (পত্র লিখন) ও অফিস পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ অনুপস্থিত থাকলে, যিনি উপস্থিত থাকতেন তিনিই তাঁর দায়িত্ব আন্‌জাম দিতেন। হযরত আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ (রা) ছিলেন মক্কা মুয়ায্‌যমার কর্মকর্তা। তিনি এবং হযরত আবূ বকর (রা) একই দিনে ইন্তিকাল করেন। তায়িফের কর্মকর্তা ছিলেন হযরত উছমান ইব্‌ন 'আস (রা)। হযরত মুহাজির ইব্‌ন উমাইয়া (রা) সানআর এবং হযরত যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ (রা) হাদরামাউতের কর্মকর্তা ছিলেন। ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) খাওলান প্রদেশের, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) ইয়ামনের, হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) জুনদের, হযরত আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) বাহরায়নের, হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) দূমাতুল জান্দালের এবং হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) ইরাকের কর্মকর্তা অথবা প্রশাসক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-কে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়ায় পাঠানো হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা), আমর ইব্‌ন 'আস (রা) এবং শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা (রা) ও সিরিয়ার বিভিন্ন ফ্রন্টে সেনাপতিত্বের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সিদ্দীকে আকবর খিলাফতকালে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কায়কাউস ও কায় খসরুর সাম্রাজ্যের সাথে একজন সেনাপতি হিসাবে রুস্তমের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, খিলাফতে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সাথে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এরও ছিলো সেরূপ সম্বন্ধ।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিলো কাতীলাহ্ বিন্‌ত আবদুল উযায়রী (রা)। তাঁরই গর্ভে প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা), তারপর আসমা বিন্‌ত আবূ বকর [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মা]-এর জন্ম হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিলো উম্মে রূমান। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) এবং হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)।

যখন হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে রূমান ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পরও হযরত আবূ বকর (রা) দু'টি বিবাহ করেন। ওদের একজনের নাম ছিল আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা)। তিনি ছিলেন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর বিধবা স্ত্রী। তাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)। তাঁর অপর স্ত্রী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের হাবীবা বিন্‌ত খারীজাহ্ আনসারিয়া (রা)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁরই গর্ভে কুলছুম নাম্নী একটি মেয়ের জন্ম হয়।

হযরত উমর ফারূক (রা)

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

হযরত উমর (রা) ছিলেন কুরায়শের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জাহিলিয়া যুগের দূতের কাজের দায়িত্ব তাঁরই গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। অর্থাৎ যখন কুরায়শের সাথে অন্য কোন বংশের যুদ্ধ হতো তখন তাঁরই গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে ঐ বংশের কাছে পাঠানো হতো। কখনো বংশ-পরিচয়কে কেন্দ্র করে পরস্পর গর্ব প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে সর্বাগ্রে তাঁরই গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সে কাজ সম্পাদনের জন্য বের হতেন। তাঁর বংশ-তালিকা হলো উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন রিবাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই। কা'বের দুই ছেলে। একজন 'আদী এবং অপরজন মুররাহ্। মুররাহ্ ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রপিতামহগণের অন্যতম। অর্থাৎ অষ্টম স্তরে হযরত উমর (রা)-এর বংশ-তালিকা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশ-তালিকার সাথে মিলিত হয়েছে। উমর ফারূক (রা)-এর পিতৃ পরিচায়ক পারিবারিক খণ্ডনাম ছিল আবূ হাফ্‌স। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে 'ফারূক' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি উট চরাতেন। যৌবনে পৌঁছার পর আরবের ঐতিহ্য অনুযায়ী কুল্‌জী-বিদ্যা (বংশ-পরিচয় বিদ্যা), সমর বিদ্যা, অশ্বারোহণ ও মল্লযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জাহিলিয়া যুগে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন।

কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য

হযরত ফারূকে আযম (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'উকায নামক স্থানে, যেখানে বিষয় বিশেষজ্ঞদের বার্ষিক সমাবেশ হতো এবং এক বিরাট মেলা বসতো, সেখানে ভূমিতে প্রায়ই মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তখন তাঁকে আরবের অন্যতম বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হতো। অশ্বারোহণে তিনি এতই পারদর্শী ছিলেন যে, এক লাফে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এরূপ স্থির হয়ে বসতেন যে, তাঁর দেহ মোটেই এদিক ওদিক হত না। 'ফুতুহুল বুলদান'-এর বর্ণনামতে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রকাশের সময় কুরায়শ বংশে শুধু সতের জন লোক লেখাপড়া জানতেন। আর হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চল্লিশ জন পুরুষ ও এগার জন মহিলার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, উনচল্লিশ জন পুরুষ ও তেইশজন মহিলা, আবার কারো কারো মতে, পঁয়তাল্লিশজন পুরুষ ও এগারজন মহিলার পর তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। তিনি 'সাবিক্বীন' (ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী ব্যক্তিবৃন্দ) ও 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি)-এর অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্বশুর। তিনি আলিম ও যাহিদ (ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ) হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর থেকে পাঁচশ'

উনচল্লিশখানি হাদীস বর্ণিত আছে, যা তিনি হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), সা'দ (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা), আবূ যার (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা), আনাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আমর ইব্‌ন 'আস (রা), আবূ মূসা আশ'আরী (রা), বারা ইব্‌ন আযিব (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে দিন হযরত উমর ফারূক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন মুশরিকরা বলেছিল, 'আজ মুসলমানরা আমাদের থেকে কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। ঐদিন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয় :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৮ : ৬৪)

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত : যেদিন হযরত উমর ফারূক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে ইসলামের সম্মান ও প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল যেন ইসলামের জয়ের প্রতীক। তাঁর হিজরত ছিল যেন একটি নুসরাত বা বিরাট সাহায্য। তাঁর ইমামত বা নেতৃত্ব ছিল একটি রহমত। কা'বা শরীফে গিয়ে সালাত আদায় করব সে সাধ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু যখন হযরত উমর ফারূক (রা) ঈমান আনেন, তখন তিনি মুশরিকদের সাথে এমন বাক-যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন যে, আমাদের জন্য কা'বা শরীফে সালাত আদায়ের বাধা অপসারিত হয়। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন থেকে হযরত উমর ফারূক (রা) ঈমান আনেন, তখন থেকে ইসলাম যেন একজন ভাগ্যবান মানুষের রূপ নেয়। প্রতিটি পদে সে উন্নতি লাভ করতে থাকে। আর যখন তিনি শাহাদত বরণ করেন, তখন ইসলামের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ নেমে আসে এবং প্রতি পদেই উন্নতি ব্যাহত হতে থাকে।

হযরত ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, যখন হযরত উমর (রা) ঈমান আনেন, প্রকৃতপক্ষে তখনই ইসলাম প্রকাশ লাভ করে। তখন হতে আমরা কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে, মুশরিকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে এবং তাদের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করি। ইব্‌ন আসাকির হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই গোপনে হিজরত করেছে, কিন্তু যখন হযরত উমর (রা) হিজরত করতে মনস্থ করেন, তিনি এক হাতে মুক্ত তরবারি নেন এবং অপর হাতে তীর ও পিঠে ধনুক ঝুলিয়ে পবিত্র কা'বা ঘরে আসেন, সাতবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। তারপর কুরায়শ নেতাদের একটি সমাবেশে যান এবং একের পর এক তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমাদের সর্বনাশ হোক, যে কেউ আপন মাকে নিঃসন্তান এবং স্ত্রীকে বিধবা দেখতে চায়, সে আমার মুকাবিলা করুক।' তখন কেউই তাকে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস করেনি।

ইমাম নববী (র) বলেন, হযরত উমর (রা) প্রত্যেকটি যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধে তিনি স্বীয় স্থানে অটল থাকেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি স্ত্রীলোক জান্নাতের একটি প্রাসাদের পাশে বসে ওক করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? জানতে পারলাম, এটা উমরের। তারপর তিনি হযরত

উমর (রা)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, তোমার 'গায়রাত' (মর্যাদাবোধ)-এর কথা আমার মনে পড়ল এবং আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। হযরত উমর (রা) কান্নায় ভেংগে পড়েন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে আমার কিসের গায়রাত ? একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি দুধ পান করেছি এবং তার সজীবতা আমার নখ পর্যন্ত পৌছেছে। তারপর আমি সে দুধ উমরকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হুযূর! এর তাবীর (ব্যাখ্যা) কি ? তিনি উত্তর দিলেন, দুধ অর্থ জ্ঞান। এক সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে কিছু লোক হাযির করা হয়েছে এবং তারা কামীস (জামা) পরে আছে। তাদের কারো কারো কামীস বক্ষদেশ পর্যন্ত, আবার কারো কারো কামীস তার চাইতেও অধিক লম্বা। কিন্তু উমরের কামীস এতই লম্বা যে, তা মাটি হেঁচড়ে যায়। লোকেরা আরয করল, এখানে কামীস দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, 'দীন' (ধর্ম)। এক সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে জানালেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি যে রাস্তা দিয়ে যাবে শয়তান কখনো সে রাস্তা মাড়াতে পারবে না, বরং সে অন্য রাস্তা ধরবে। একবার নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে নিশ্চয় উমরই হতো। একবার নবী (সা) ঘোষণা করেন, উমর ফারূক (রা) জান্নাতবাসীদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ। আরেকবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মন্তব্য করেন, উমর যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে থাকবেন ততক্ষণ বাহুল্য ও বাড়াবাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে। নবী (সা) ঘোষণা করেন, আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা উমরকে সমীহ করে এবং যমীনের প্রত্যেক শয়তান তাকে ভয় করে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসিত হলেন, যত নবী আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের উম্মতের মধ্যে একজন 'মুহাদ্দাছ' অবশ্যই ছিলেন। যদি আমার মধ্যেও কেউ মুহাদ্দাছ হতে পারেন, তাহলে তিনি উমর (রা)। লোকেরা আরয করল, 'মুহাদ্দাছ' কাকে বলে ? তিনি জবাবে ইরশাদ করেন, যার মুখ দিয়ে ফেরেশতারা কথা বলে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, এ পৃথিবীতে আমার কাছে উমর (রা)-এর চাইতে আদরের কোন ব্যক্তি নেই। হযরত আলী (রা) বলেন, মহান আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূলের পরে আমরা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকেই অধিক প্রতিভাবান পেয়েছি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, যদি দুনিয়ার সমগ্র জ্ঞান তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় রাখা হয় এবং হযরত উমর (রা)-এর জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে হযরত উমর (রা)-এর পাল্লাই ভারী হবে। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান হযরত উমর (রা)-এর কোলে পড়ে আছে। অথচ হযরত উমর (রা) ভিন্ন এরূপ কোন ব্যক্তি নেই, যে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মহান আল্লাহ্র পথে বিশ্রী গালিগালাজ শুনেছে। হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা)-কে বস্ত্রে জড়ানো অবস্থায় দেখে বললেন, বস্ত্রে জড়ানো এ ব্যক্তির চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কেউ নেই। জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) সংকল্পের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও বীরত্বে ভরপুর। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর প্রকৃষ্টতার কথা এ চারটি ঘটনা থেকে জানা যায়। এক বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে তিনি হত্যা করার প্রস্তাব দেন। তারপর এ আয়াত নাযিল হয় :

لَوْ لاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

আল্লাহ্‌র পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সেজন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো। (৮ : ৬৮)

দুই. তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের পর্দা করার জন্য বলেন। তারপর পর্দার আয়াত নাযিল হয়। এজন্যই হযরত উমর (রা)-কে তাঁরা বলেছিলেন, ওয়াহী তো আমাদের ঘরে নাযিল হয়, কিন্তু তোমার অন্তরে পূর্বেই তা ঢেলে দেওয়া হয়। তিন. হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ দু'আ–'হে আমাদের প্রতিপালক। উমরকে মুসলমান করে ইসলামকে সাহায্য কর। চার. সর্বাগ্র হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে তাঁর বায়'আত করা। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা প্রায়ই একথা বলাবলি করতাম যে, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে শয়তান বন্দী ছিল এবং তার ইন্তিকালের পর সে বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছে। হযরত আবূ উসামা (রা) বলেন, তোমরা তো জানই হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) কে? তাঁরা ইসলামের জন্য পিতামাতা তুল্য। হযরত জাফর সাদিক (র)-এর উক্তি, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট, যে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর প্রতি অশিষ্ট।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর গঠনাকৃতি

ফারূকে আযম (রা)-এর গায়ের রঙ সাদা-লাল মিশ্রিত; তবে লালের ভাগ বেশী। তিনি দীর্ঘাঙ্গী। পায়ে হেঁটে চলার সময়ে মনে হত যেন তিনি কিছুর উপর আরোহণ করে দ্রুত চলেছেন। তাঁর গণ্ডদ্বয়ে গোশতের পরিমাণ ছিল কম। শ্মশ্রু ঘন এবং গোঁফগুলো বড় বড়। মাথার সম্মুখ দিকের চুল উঠে গিয়েছিল। ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট দেহের অধিকারী। তাঁর বর্ণে লালিমার ভাগ বেশী। তার গণ্ডদ্বয় চাপা এবং গোঁফগুলো বড় বড় ও লালিমা মিশ্রিত। তার মা ছিলেন আবূ জাহেলের বোন। এ সম্বন্ধের কারণে তিনি আবূ জাহেলকে 'মামা' বলে ডাকতেন।

ফারূকী খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

হিজরী ১৩ সনের ২৩শে জুমাদা উখরা মঙ্গলবার মুসলমানগণ কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই ফারূকে আযম (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। তার আগের দিন ২২শে জুমাদাল উখরা সোমবার মুছান্না ইব্‌ন হারিছা মদীনা শরীফে আসেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধের অবস্থাদি শোনার পর হযরত উমর (রা)-কে ডেকে পাঠিয়ে যে নির্দেশ দেন তা ছিল নিম্নরূপ :

আমার দৃঢ় আশা যে, আমি আজই মারা যাব। কাজেই, আমার মৃত্যুর পর আগামীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই লোকদেরকে মুছান্নার সাথে যুদ্ধের জন্য রওনা করে দেবে। কোন প্রকার বিপদই যেন তোমাকে তোমার এ দীনী দায়িত্ব ও আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে উদাসীন করে না রাখে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, তা তুমি দেখেছ। অথচ, তা ছিল তখন সবচেয়ে বড় বিপদ। যখন সিরীয়দের উপর বিজয় অর্জিত হবে, তখন ইরাকবাসীদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দেবে। কেননা ইরাকবাসীরা ইরাকেরই কাজসমূহ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে পারে। আর ইরাকেই তাদের মন সুপ্রসন্ন থাকে।

তাঁর নির্দেশের এ ভাষা থেকে একথাও খুব ভালভাবে বোধগম্য হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর যা কিছু করেছেন, দীনী কাজ ও দীনী

লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করেই করেছেন। মৃত্যুকালেও তাঁর মনে দীনী কাজেরই চিন্তা ছিল। তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য কোন ওসীয়ত (উইল) করে যাননি। ফারূকে আযম (রা) খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের পর মানুষকে জিহাদের প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের আহবান জানান। কিন্তু এতে জনগণের মধ্যে কোন ঔৎসুক্য বা ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হয়নি। হযরত উমর ফারূক (রা) জনগণকে একত্রিত করে তিন দিন পর্যন্ত জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তবুও জনগণ নির্লিপ্ত থাকে। চতুর্থ দিন হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ সাকাফী (রা) ইরাক-যুদ্ধের জন্য নিজের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন, তারপর সা'দ উবায়দ আনসারী (রা), সালীত ইব্‌ন কায়স (রা) এবং আরো অনেক লোক একের পর এক দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য নিজেদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। এভাবে ইরাকের জন্য একটি বাহিনী গড়ে উঠে। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কেই, যিনি সর্বাগ্রে নিজের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছিলেন, ঐ বাহিনীর নেতা মনোনীত করে মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর সাথে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন।

তিনদিন পর্যন্ত জনগণের নির্লিপ্ত থাকার বিষয়টি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁরা এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ফারূক (রা) যেহেতু প্রথম দিনই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির নির্দেশ লিখে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই জনগণ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর এ কারণেই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সত্ত্বেও তারা উদ্বুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত ও অমূলক। মদীনা শরীফে কেউই হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশের এমন বিরোধিতা করেন নি, যার ফলে বিষয়টি সাধারণ মানুষ জেনে ফেলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যদি প্রথম দিনই হযরত ফারূক আযম (রা)-এর প্রতি মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত, তাহলে তা একটি মা'মুলী ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হত না। ঐতিহাসিককে সে সম্পর্কে অবশ্যই কিছু না কিছু লিখতে হত এবং ঐ অসন্তুষ্টি দূর হওয়ার কারণসমূহও তাঁদেরকে বর্ণনা করতে হত। এটি এমন এক ভ্রান্ত ধারণা, যা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মারাত্মক অশিষ্টতা প্রদর্শনেরই শামিল। কেননা তাঁরা এমন ছিলেন না যে, কোন মতপার্থক্যের কারণে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শনকে হেয় নযরে দেখবেন। মোদ্দাকথা, জিহাদের জন্য সবাই প্রস্তুত ছিলেন। তবে এর দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তারা ইতস্তত করছিলেন এবং একে অপরের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই মনে করতেন, আমার চাইতেও অধিক যোগ্য ও অধিক সম্মানিত লোক রয়েছেন। তারাই খলীফার এ সম্বোধনের জবাব দেবেন। এভাবে প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষায় ছিলেন। কোন কোন সময় বিরাট বিরাট জনসমাবেশে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। আমরা আমাদের যুগের এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকি। এটা মানুষের এক প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। এ কারণেই নেক কাজ সম্পাদন ও দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে, (লোক দেখানো থেকে বাঁচার জন্য) একদিকে যেমন গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তা প্রকাশ্যে করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এ থেকে অন্যরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং নীরবতার কারণে এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। খিলাফতের বায়'আত নেওয়ার পর পরই হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর প্রথম ভাষণে ও প্রথম বৈঠকে সবাইকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কাজেই তিনি যদি তাঁর খিলাফতের প্রথম দিনই হযরত

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির নির্দেশনামা লিখে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর এ ভাষণে এবং উদ্বুদ্ধকরণের পরই তা লিখেছিলেন। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর এ প্রথম আহবানের প্রতি জনগণের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি কেন ? তার জবাব হলো, কোন কোন সময় কোন শিক্ষক স্কুলের পাঠকক্ষে যখন তার ছাত্রদেরকে নির্দেশ দেন, ডাষ্টার দিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডটি পরিষ্কার করে ফেল কিংবা লেখাগুলো মুছে ফেল'–তখন সাথে সাথে কোন ছাত্র তাঁর সে নির্দেশ পালন করে না। তার কারণ এই নয় যে, ঐ শিক্ষকের নির্দেশ পালন করাকে ছাত্ররা জরুরী মনে করে না বরং যে শিক্ষক নির্দেশ দিয়েছেন, যদি সেই শিক্ষকই কোন একজন বা দু'জন ছাত্রের নাম ধরে সেই একই নির্দেশ দিতেন তখন সাথে সাথেই তার সে নির্দেশ পালিত হত। মোটকথা, জনগণের তিন দিন পর্যন্ত নীরব বা নির্লিপ্ত থাকাটা আর যে কারণেই হোক–নিশ্চয়ই এ কারণে নয় যে, তারা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পদচ্যুতি সম্পর্কিত নির্দেশের কারণে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা, খোদ মদীনা শরীফেই আনসারগণের মধ্য এমন এক বিরাট দল বিদ্যমান ছিল যারা মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার ব্যাপারে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলেও আনসারগণ নিশ্চয়ই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে কোন্ জিনিসটি তাদেরকেও তখন নীরব বা নির্লিপ্ত রাখলো ?

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতি

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একজন বিরাট যোদ্ধা ও অসম সাহসী বীর সেনাপতি ছিলেন। ইরাকেও তখন পর্যন্ত হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-ই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর বীরত্ব ও সামরিক যোগ্যতা ইরানী ও সাসানী সাম্রাজ্যকে বিস্ময়াভিভূত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। রোমান সাম্রাজ্যকেও এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য প্রথম দিকে একটি শক্ত ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। কাজেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র অসি)-কে প্রধান সেনাপতি করে সিরিয়ার দিকে পাঠান এবং তাঁর সে অনুমান অত্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সিরিয়ায় উপনীত হয়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে এমন শক্ত ধাক্কা লাগান যে, তাতে রোমান সাম্রাজ্যের মাজা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং রোমান সম্রাট কায়সারের পরাক্রম ও প্রতাপের উপর দিয়ে এক প্রলয়ংকরী ঝড় বয়ে যায়। প্রথম দিকের এ সমস্ত যুদ্ধের পর ইরান ও রোমের আবাদকৃত সবুজ শ্যামল প্রদেশসমূহ মুসলিম বাহিনীর দখলে আসার এবং ঐ দুই সাম্রাজ্যের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এমতাবস্থায় ইসলামী সেনাবাহিনীকে শুধু একজন দিগ্বিজয়ী সেনাপতিরই নয়, বরং একজন বিচক্ষণ ও সুকৌশলী অফিসারের কতৃর্ত্বাধীনে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজন ছিল।

হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক যোগ্যতার কথা অস্বীকার করতেন না, তবে তাঁকে তিনি কিছুটা অসতর্ক ও হঠকারী মনে করতেন। প্রথম থেকেই তাঁর এ আশংকা ছিল যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর অসাবধানতার কারণে না যেন আবার মুসলিম বাহিনী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন না। তবে, ইরাক ও সিরিয়ার প্রাথমিক যুদ্ধসমূহে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলীর মুকাবিলায়

খুঁতগুলোর পরিমাণ খুবই কম। আর তাই তিনি বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দু'টি সাম্রাজ্য (ইরান ও রোম)-এর সামনে 'সায়ফুল্লাহ'র বীরত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শনকে জরুরী বলে মনে করেছিলেন। যেহেতু তাঁর এ লক্ষ্য ইতিমধ্যে অর্জিত হয়ে গিয়েছিল, তাই এখন আর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রধান সেনাপতি থাকার প্রয়োজন ছিল না। এখানে ঐ কথাগুলো পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে, যা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইরাকের মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন এবং যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত ফারূকে আযম (রা) সর্বদা বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অজস্র ধারায় রহমত নাযিল করুন। কেননা, তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বের দোষক্রটি গোপন করে গেছেন। তিনি আমাকে হযরত খালিদ (রা)-এর সংগীদের সম্পর্কে তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু, তিনি তাতে হযরত খালিদ (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল না। আর এটা কিভাবে সম্ভব যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) খলীফা হওয়ার সাথে সাথে সর্বপ্রথম সে কাজই করবেন যা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইচ্ছা ও বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে একেবারে শুরুতেই একথাও ভুলে যান যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে উসামা (রা)-এর বাহিনী থেকে পৃথক করে নিজের কাছে এজন্য রেখে দিয়েছিলেন যাতে খিলাফত সংক্রান্ত কার্যাবলীতে তিনি তাঁর পরামর্শ (থেকে সাহায্য) গ্রহণ করতে পারেন। আর হযরত সিদ্দীকে আকবরের খিলাফতের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ফারূকে আযম (রা)-ই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিবেচনা না করে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) কোন কাজই করতেন না। বিশ্বের অনেক লোকেরই দৃষ্টি স্থূল ও ভাসাভাসা। তারা তাদের বুদ্ধির অপরিপক্কতার কারণে মহান ব্যক্তিদের প্রতি এমন কিছু কথা আরোপ করতে মোটেই সতর্ক নয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কোন কোন অসতর্কতামূলক কাজের প্রতি অবশ্যই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল যে পর্যন্ত শরীআত এবং তাঁর গবেষণা-পর্যালোচনা ইজতিহাদের সম্পর্ক ছিল। এ অসন্তোষ প্রকাশ বিদ্বেষ ও শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না এবং প্রকৃত পক্ষে পৌঁছেও নি। যে ফারূকে আযম (রা) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নির্দ্বিধায় এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে যে যার আত্মীয়কে হত্যা করবে–তার সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করা যে, হযরত খালিদ (রা)-এর প্রতি তাঁর কিছুটা বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল–সরাসরি জুলুম এবং নেহায়েত স্থূল ও অমূলক ধারণা বৈ কিছু নয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে পদচ্যুত করে মুসলিম উম্মাহকে এক বিরাট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেন এবং একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার প্রদানের এবং দীনী খিদমতের মুকাবিলায় আপন সত্তাকে হেয়

জ্ঞান করার দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম হযরত খালিদ (রা)-এর নামই স্মরণ করি। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি থাকতেন তবুও তিনি বীরত্ব ও সামরিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশী খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না যা আজ তাঁর রয়েছে। কিন্তু, এ পদচ্যুতির ঘটনা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্যের সাথে এমন এক বিরাট মর্যাদা সংযোজন করে দিয়েছে যার সামনে তাঁর সেনাপতিত্ব ও বীরত্বের মর্যাদা ম্লান হয়ে পড়ে। আমরা একদিকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর উপর গর্ব করি। অন্যদিকে প্রশংসা করি মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতার এবং 'উলুল আমর' বা খলীফার প্রতি কায়মনোবাক্যে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শনের।

কোন কোন ঐতিহাসিক এক্ষেত্রে তাদের একটি সূক্ষ্ম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর তা হলো, যেহেতু হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয় লাভ করছিলেন, তাই জনসাধারণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সেনাপতিত্বই এসব বিজয়ের কারণ। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণের সাফল্য ও বিজয় কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং এর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং ইসলামের বরকত। এ বর্ণনার সত্যতা এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) যেভাবে সিরীয় বাহিনীর সেনাপতিত্বে পরিবর্তন ঘটান সেভাবে পরিবর্তন ঘটান ইরাকী বাহিনীর সেনাপতিত্বেও। তিনি হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছাকে পদচ্যুত কর তাকে আবূ উবায়দা ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর অধীনস্থ করে দেন। আজো যদি মুসলমানগণ ইসলামের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে তারাও সেই বিজয় ও সাফল্য লাভ করতে পারবে যা প্রথম যুদ্ধের মুসলমানগণ করেছিলেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য যেসব সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ ছিল তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সিরিয়ার মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্ব থেকে পদচ্যুত করে হযরত আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে সে পদে অধিষ্ঠিত করেন। এ আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়। তারপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর অধীনে আত্মোৎসর্গ ও কাফির নিধনের ক্ষেত্রে শুধু পূর্বের চাইতে অধিক তৎপরতাই দেখান নি, বরং হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে সর্বদা যুদ্ধ সম্পর্কিত অত্যন্ত উপকারী পরামর্শও দিতে থাকেন। তা হলো, সেই বৈশিষ্ট্য যা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) মর্যাদা ও সম্মানকে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে অনেক বড় করে তুলে ধরে এবং বিশ্বের এমন একজন অতুলনীয় সেনাপতি ও বিশুদ্ধচিত্ত খাঁটি মুসলিম হিসাবে প্রতিপন্ন করে, আর একথাও প্রতিপন্ন করে যে, তাঁর অন্তরে ছিল শুধু মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের স্পৃহা! তাতে না ছিল সুখ্যাতি অর্জন বা লোক দেখানোর নাম-নিশানা। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দ্বিতীয় কাজ ছিল, তিনি হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে একটি বাহিনীসহ ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে ইরাকে অবস্থানকারী সমগ্র মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে যাত্রা করিয়ে দেয়ার পর হযরত ফারূকে আযম (রা) তৃতীয় যে কাজটি করেছিলেন তা হলো, তিনি হযরত ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-কে ইয়ামানের দিকে রওয়ানা করিয়ে নেন যাতে

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই অন্তিম উপদেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে যাতে তিনি বলেছিলেন, 'আরব দেশে মুসলমান ব্যতীত কোন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান যেন না থাকতে পারে।' যেহেতু মুসলমানগণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সোয়া দু'বছরের খিলাফত কালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়নের সুযোগ তারা তখন পর্যন্ত পান নি।

নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের নির্বাসন

হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা)-কে নির্দেশ দেন, 'তুমি ইয়ামনে গিয়ে নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের বলো, তোমরা এ দেশ ছেড়ে দাও। আমরা তোমাদেরকে আরব-সীমান্তের বাইরে সিরিয়ায় তোমাদের এ জমির চাইতে অধিক পরিমাণ উর্বর জমি দেব। আর আমরা তোমাদেরকে কোনরূপ আর্থিক বা দৈহিক কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাই না। এখন থেকে আরব দেশে শুধু মুসলমানগণই থাকবে। কাজেই অমুসলিম থাকা অবস্থায় এখানে তোমাদের অবস্থান সম্ভব নয়।

কোন কোন স্থূল বুদ্ধির লোক নাজরানের খ্রিস্টানদের এ নির্বাসনকে অন্যায় বলে ঘোষণা করে নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু তারা একথা ভুলে যায় যে, মদীনার ইয়াহূদীরা মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে রোমানদেরকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর এখন নাজরানের খ্রিস্টানরাও মুসলমানগণের মধ্যে অবস্থান করে রোমান সাম্রাজ্যকে যার সাথে নিত্যদিন মুসলমানগণের সংঘর্ষ চলছিল গুপ্তচর বৃত্তিসহ ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র সফল করার কাজে সহায়তা করছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের খ্রিস্টানদের প্রতিবেশী থেকে এজন্য রক্ষা করতে চাইছিলেন যাতে তাদের ঐ সমস্ত গর্হিত স্বভাব-চরিত্র মুসলমানগণের মধ্যে সংক্রামিত হতে না পারে। তাই তিনি নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে যে অঙ্গীকার পত্র সম্পাদন করেছিলেন তাতে একটি শর্ত ছিল যে, ঈসায়ীরা সুদ খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করবে। আর এ কারণেই তিনি ওসীয়াত করেছিলেন, যেন আরব দেশে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা বসবাস করার সুযোগ না পায়। নাজরানে খ্রিস্টানরা রোমান-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করে এবং সুদ খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ না করে নিজে থেকেই সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তাদেরকে নির্বাসন দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। আজকালও আমরা পত্র-পত্রিকায়ই ইয়াহূদীদের দেশ থেকে দেশান্তরে নির্বাচিত হওয়ার খবর পড়ে থাকি। তাতে ইউরোপের সুসভ্য দেশসমূহ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নির্বাসিত হওয়ার এবং সেখানে আক্ষেপের বিবরণ থাকে। এতে প্রমাণ হয় যে, নাজরানের খ্রিস্টানদের নির্বাসন তাদের বিপদ নয় বরং সুযোগই ছিল।

দামিশ্‌ক বিজয়

ইয়ারমূক যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং 'ফুহল' নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হয়। হিরাক্লিয়াস এমন নির্দেশাদি জারি করেন, যাতে করে ফুহল এবং সেই সাথে দামিশ্‌ক ও রোমান বাহিনী মুসলমানগণের মুকাবিলা করতে উদ্যত হয়। দামিশ্‌ক নগরীকে খুব সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করে তোলা হয় এবং প্রয়োজনের সময় যাতে দামিশ্‌কবাসীদেরকে ফিলিস্তীন ও হিমসের দিক থেকে আরো সাহায্য পাঠানো যায় সে ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

দামিশ্‌ক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিরাক্লিয়াস নাস্‌তাস ইব্‌ন নাসতূরাসকে সেখানে মোতায়েন করেন। মাহান নামীয় বিৎরীক (পাদ্রী) দামিশ্‌কের গভর্নর হিসাবে প্রথম থেকে সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। ইসলামী বাহিনী তখন ইয়ারমূকেই অবস্থান করছিল। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ্‌ (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হাশিম ইব্‌ন উতবাকে ইরাকের সেই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন যারা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে ইরাক থেকে এসেছিল। তারপর তাকে ইরাকের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেন। একটি বাহিনী (ব্রিগেড)-কে ফুহলের দিকে প্রেরণ করা হয়। বাহিনীর বাকী সৈন্যগণকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিক প্রেরণ করেন। 'যুলকিলা' (রা)-এর নেতৃত্বে একটি অংশকে এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হয়, যাতে তারা দামিশ্‌ক হিম্‌সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করত হিরাক্লিয়াস প্রেরিত বাহিনীকে বাধা প্রদান করে। আর একটি অংশকে ফিলিস্তীন ও দামিশকের মধ্যে মোতায়েন করা হয়, যাতে তারা রোমান বাহিনীকে ফিলিস্তীনের দিক থেকে দামিশ্‌কের দিকে আসতে না দেয়। বাকী সৈন্য নিয়ে খোদ হযরত আবূ উবায়দা (রা) দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। দামিশ্‌কে পৌঁছার পূর্বে তিনি 'গূতা' জয় করেন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১৩ সনের রজব মাসে মুসলিম বাহিনী দামিশ্‌ক ঘিরে ফেলে। শহরের মধ্যে যথেষ্ট সৈন্য ছিলো, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে মুসলমানগণের মুকাবিলা করার মত সাহস রোমানদের ছিল না। তারা শহরের সুদৃঢ় প্রাচীর এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা সামগ্রীর আশ্রয়ে থাকাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) 'বাবুল জাবিয়া'য় তাঁবু ফেলেন। আর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ও হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) অবতরণ করেন বাবে তূমায়।

হযরত শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন হাসানা (রা) ফারাদীসে এবং ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ান বাবে সাগীর ও বাবে কায়সানে অবতরণ করেন। এভাবে ইসলামী বাহিনী দামিশ্‌ককে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অভ্যন্তরে আটক শত্রুরা প্রাচীরে আরোহণ করে কখনো 'মিনজানীক' (পাথর নিক্ষেপ যন্ত্র)-এর সাহায্যে মুসলমানগণের প্রতি অনবরত পাথর নিক্ষেপ, আবার কখনো ধনুকের সাহায্যে মুষলধারে তীর বর্ষণ করতে থাকে। মুসলমানগণও যথাযথ উত্তর দিতে থাকে। এভাবে মুসলমানগণের এ অবরোধ হিজরী ১৩ সনের রজব থেকে হিজরী ১৪ সনের মুহাররম পর্যন্ত মোট ছয়মাস থাকে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস দামিশ্‌কবাসীদের সাহায্যার্থে হিম্‌স থেকে যেসব বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যুলকিলা' (রা) পথিমধ্যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করায় সেগুলো দামিশ্‌কে এসে পৌঁছতে পারে নি। কেননা, তিনি (যুলকিলা') এ কাজের জন্যই দামিশ্‌ক ও হিম্‌সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন। যখন এভাবে ছয়মাস অতিক্রান্ত হলো তখন দামিশ্‌কবাসীরা হিরাক্লিয়াসের সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে গেল। সেই সাথে যুদ্ধ করার উৎসাহ-উদ্দীপনাও তারা হারিয়ে বসল। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা) এ পরিস্থিতির আলোকে দীর্ঘ ঘেরাও বহাল রাখা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে চারিদিকে অবস্থানকারী বাহিনীসমূহের সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আগামী কালই শহরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে।

মুসলমানগণের এ যুদ্ধ প্রস্তুতি ও আক্রমণ পরিচালনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে দামিশ্‌কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক প্রতিনিধিদল 'বাবে তূমার' দিক থেকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাদেরকে এক

আশ্রয় পত্র (Deed of Trust) লিখে দেন এবং কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই শহরে প্রবেশ করেন। তিনি দামিশ্‌কবাসীদেরকে যে আশ্রয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

"খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দামিশ্‌কবাসীদেরকে এ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, যখন ইসলামী বাহিনী দামিশ্‌কে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। তাদের জানমাল ও গির্জাসমূহের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। দামিশ্‌কের দুর্গ-প্রাচীর কিংবা কোন ঘরবাড়িও ধ্বংস করা হবে না। ইসলামী বাহিনীর কোন ব্যক্তিই শহরবাসীদের কোন ঘরে অবস্থান করবে না। মুসলমান এবং তাদের খলীফা দামিশ্‌কবাসীদের সাথে শুধু সদ্ব্যবহার করবেন, কোনরূপ দুর্ব্যবহার করবেন না যতক্ষণ তারা জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) দিবে। হযরত খালিদ (রা) এক দিক থেকে যখন শহরে প্রবেশ করেন ঠিক তখনি অন্য দিক থেকেও ইসলামী বাহিনীর সেনাপতিরা দুর্গ প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে এবং দরজাসমূহ ভেংগে চুরমার করে বীর দাপটে শহরে প্রবেশ করেন। শহরের মধ্যস্থলে হযরত খলিদ (রা) ও আবূ উবায়দা (রা)-এর মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে। তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) বলেন, আমি অস্ত্রবলে শহর জয় করেছি, আর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বলেন, আমি আপোস চুক্তির মাধ্যমে শহর অধিকার করেছি। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিৎরীক হাসান একদিকে খোদ দামিশ্‌কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে পাঠিয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কাছ থেকে একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে নিয়েছিল এবং অপর দিকে সে মুসলমানগণের আক্রমণের তীব্রতা ও তার ফলশ্রুতি প্রত্যক্ষ করতে চাচ্ছিলো। অর্থাৎ মুসলমানগণ যদি তাদের সম্মিলিত আক্রমণে ও অন্তিম প্রচেষ্টায় বিফল হয় এবং তরবারির জোরে দামিশ্‌কে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে আগামীতে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা হবে এবং হযরত খালিদ (রা)-এর চুক্তিপত্রের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করা হবে না। অপর দিকে মুসলমানগণ যদি তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলকাম হয় এবং শক্তিবলে শহরে ঢুকে পড়ে তাহলে হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে তাদের ঐ সমস্ত আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, যা অস্ত্রবলে কোন শহর বিজিত হওয়ার পর সমরনীতি অনুযায়ী সে শহরের অধিবাসীদের সাথে করা হয়। কাজেই একদিকে হযরত আবূ উরায়দা (রা) তরবারির বলে শহরে প্রবেশ করেন এবং অপরদিকে খোদ দামিশ্‌কবাসীরা দরজা খুলে দিয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে শহরের ভিতর ডেকে নিয়ে আসে। মোটকথা, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু একটা ঘটে থাকবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আপোস চুক্তির মাধ্যমে এবং হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা) তরবারির জোরে দামিশ্‌কে প্রবেশ করেছিলেন।

শহরের মধ্যস্থলে যখন উভয় সেনাপতি পরস্পরের সাথে মিলিত হন, তখন দামিশ্‌ককে অস্ত্রবলে জয় করা হয়েছে, না আপোস চুক্তির মাধ্যমে অধিকার করা হয়েছে, সে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন না, তাই তাঁর ঐ চুক্তিকে বৈধ মনে করা হবে না।

এ ধরনের চুক্তিপত্র শুধু হযরত আবূ উবায়দা (রা)-ই লিখে দিতে পারেন। কিন্তু হযরত আবূ উবায়দা (রা) বললেন, না, মুসলিম বাহিনীর একজন সাধারণ সৈন্যও কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে সমগ্র বাহিনীকেই সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। কাজেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সম্পাদিত চুক্তিকে বৈধ মনে করা হবে। শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব উত্থাপিত

হয় যে, শহরের মধ্যস্থল থেকে 'তূমা' পর্যন্ত অর্ধেক শহর অস্ত্রবলে অধিকৃত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু সে প্রস্তাব হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর মনঃপূত হয় নি। তাই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র শহর অধিকৃত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) তাঁর চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্তের উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হয়। আল্লামা ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তরবারি চালিয়ে যখন 'তূমা'র দিককার সিংহদ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন, তখন শহরবাসীরা বাকি সব সদর দরজার সম্মুখবর্তী সরদারদের সাথে আপোস আলোচনা করে অবিলম্বে অপোস চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানগণকে শহরের ভিতরে নিয়ে যায়। যা হোক, মুসলমানগণ দামিশ্‌কবাসীদের সাথে আপোসমূলক আচরণ করেন। ফলে তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট, যন্ত্রণা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা) হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সূফিয়ানকে দামিশ্‌কের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং রোমান সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যদেরকে দামিশ্‌ক থেকে বের হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবার অনুমতি প্রদান করেন।

ফুহলের যুদ্ধ

হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা) হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ দামিকে রেখে ফুহল অভিমুখে রওয়ানা হন, হিরাক্লিয়াসের বিখ্যাত সেনানায়ক সাক্‌লার ইব্‌ন মিখরাক কয়েক লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ এখানে অবস্থান করছিলেন। দামিশ্‌ক থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর 'মুকাদ্দামাতুল জায়শের' (সম্মুখ বাহিনী) শুরাহবীল হাসানাকে মধ্যভাগের, হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-কে ডান পাশের বাহিনী, হযরত আয়ায ইব্‌ন গানামকে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং নিজে বাম পাশের বাহিনীর দায়িত্বে থাকেন। ফুহলের সন্নিকটে পৌঁছার পর ইসলামী বাহিনীসমূহ নিজ নিজ সেনাপতিদের অধীনে সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু ফেলেন। মধ্যরাতে রোমানরা মুসলমানদের মধ্যবর্তী বাহিনীর উপর হামলা চালায়। শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানা তাদের মুকাবিলা করতে থাকেন। রণধ্বনি শুনে সকল মুসলিম সেনাপতিও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ফলে অত্যন্ত জোরে-শোরে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত রাত-দিন সে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আশি হাজার রোমান সৈন্যসহ তাদের প্রধান সেনাপতি সাকলার মুসলমানদের হাতে নিহত হন। অবশিষ্টরা কোন মতে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। মুসলমানগণ বিপুল পরিমাণ মালে গনীমতের অধিকারী হয়। ফুহল জয়ের পর মুসলিম বাহিনী বীসান অভিমুখে রওয়ানা হয়।

বীসান বিজয়

মুসলিম বাহিনী বীসানের নিকটবর্তী হয়ে জানতে পারল যে, সেখানেও কাফিরদের সাথে তীব্র মুকাবিলা হবে। ইসলামী বাহিনী অনতিবিলম্বে শহর ও দুর্গ ঘিরে ফেলে। এমতাবস্থায় সংবাদ পাওয়া গেল যে, জনৈক রোমান সেনাপতি দামিশ্‌ককে মুসলমানগণের কবজা থেকে মুক্ত করার জন্য একটি তুখোর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। এ সংবাদ শোনামাত্র হযরত আবূ উবায়দা (রা) এক অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে

দামিশ্‌কের দিকে প্রেরণ করেন। রোমান সেনাপতি যখন দামিশ্‌কের নিকটবর্তী হন, তখন সেখানকার কর্মকর্তা হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) তাদের মুকাবিলা করার জন্য বহির্গত হন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ঠিক সে মুহূর্তে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পিছন দিক থেকে রোমান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে রোমান বাহিনীর একটি লোকও পলায়ন করার সুযোগ পায় নি। সবাইকে মুসলমানগণের হাতে অঘোরে প্রাণ দিতে হয়। এ অভিযান সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর কাছে ফিরে যান। বীসানবাসীরা প্রথম প্রথম মুসলমানদের মুকাবিলা করতে এবং তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদেরকে ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলার অযোগ্য বিবেচনা করে সন্ধির আবেদন জানায় এবং ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করেন। জিযিয়া আদায়ের জন্য সেখানে একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত আবুল আ'ওয়ার আসলামী (রা)-কে একটি বাহিনী নিয়ে তাবারিয়ার দিকে পাঠিয়েছিলেন। তাবারিয়াবাসীরা বীসানবাসীদের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে এক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে আবুল আওয়ারের হাতে তাদের শহরের অধিকার অর্পণ করে।

সায়দা, আরকা, হাবীল ও বৈরূত বিজয়

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) দামিশ্‌কের প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পর আপন সহোদর হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা) আরকা জয় করতে সক্ষম হন। তারপর হযরত ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) সায়দা, হাবীল ও বৈরূত জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং ছোট-খাটো সংঘর্ষের পর ঐ সমস্ত স্থান দখল করেন। এভাবে দামিশ্‌ক এবং সমগ্র জর্ডান এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে চলে আসে।

ইরাকের সংঘর্ষসমূহ

ইয়ারমূক বিজয়ের পর মুসলিমগণ উল্লিখিত এলাকাসমূহ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে। তারপর তারা হিমসের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কায়সার হিরাক্লিয়াস তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সিরীয় ও রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যেসব সংঘর্ষ হয়েছিল সেগুলোর বিবরণ পেশ করার পূর্বে আমরা ইরাকের তৎকালীন ঐ সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি, যা ফারূকী খিলাফতের সূচনা থেকে তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। কেননা, যদি আমরা শুধু সিরিয়ার ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করতে থাকি তাহলে সময়কালের দিক দিয়ে ইরাকের অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা অনেক পিছনে পড়ে যাবে। ফলে এগুলো অধ্যয়ন করার মধ্যে সে স্বাদ পাওয়া যাবে না, যা সিরীয় ও ইরাকী সংঘর্ষসমূহের সমান্তরাল অধ্যয়ন এবং সমসাময়িক স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর প্রথম কীর্তি

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম সপ্তাহে হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা), সা'দ ইব্‌ন উবায়দ (রা), হযরত সালীহ ইব্‌ন কায়স (রা)

এবং হযরত আবূ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) উল্লিখিত সেনাপতিদের সাথে একই সময়ে মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন বটে, তবে যেহেতু হযরত আবূ উবায়দ ইবন মাসঊদ (রা) (যাকে ইরাকে মোতায়েন সমগ্র মুসলিম বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছিল) পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে মুসলিম বাহিনীতে লোক নিয়োগ করে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর এক মাস পর ইরাকে গিয়ে পৌঁছেন। হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) হীরায় উপনীত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, ইরানীরা ইরাকের সকল নেতৃস্থানীয় লোককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ফেলেছে। তাছাড়া খুরাসানের গভর্নর রুস্তম ইরানের রাজধানী মাদায়েনে এসে মজবুত হয়ে বসেছেন। তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি সুদৃঢ় করা ছাড়াও বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। সাওয়াদ ও হীরার প্রতিপত্তিশালী লোকগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা ইরাকে উপনীত হতেই রুস্তম এক দুর্ধর্ষ বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং অপর এক বিরাট বাহিনী নারসী নামক রাজ-পরিবারের একজন অভিজ্ঞ বীর সেনানীর সেনাপতিত্বে কসকরের দিকে পাঠান। তিনি তৃতীয় আর এক বিরাট বাহিনী জাবান নামক একজন দলনেতার অধীনে ফুরাতের নিম্নভূমির দিকে প্রেরণ করেন। তারা নামারিক নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেলে। হযরত মুছান্না (রা) হীরা থেকে বের হয়ে 'খাফান' নামক স্থানে অবস্থান নেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তিনি মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করে খাফানেই মোতায়েন করেন এবং নিজে নামারিক পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে জাবানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ উবায়দ (রা) নিজেই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুলে ইরানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সারির পর সারি ছিন্ন ভিন্ন করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হন। ইসলামী বাহিনীও তাদের নেতাকে অনুসরণ করে ইরানী বাহিনীর উপর বীরোচিত হামলা চালায়। ইরানীরা টিকতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। মাতার ইব্‌ন ফায়যা রাবীঈ নামক ইসলামী বাহিনীর জনৈক বীর সেনানী 'সেনাপতি জাবান' বন্দী করে ফেলেন। ইনিই যে 'সেনাপতি জাবান' তা তার জানা ছিল না। জাবান তাকে বললেন, তুমি আমাকে বন্দী করে রেখে কি করবে ? আমি তোমাকে অত্যন্ত দামী দু'টি ক্রীতদাস দেব, সেগুলোর বিনিময়ে তুমি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান কর। মাতার তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং মুক্ত করে দেন। যখন সে ছাড়া পেয়ে চলে যাচ্ছিলো তখন অপর একজন মুজাহিদ তার সঠিক পরিচয় জানতে পারেন এবং তাকে পুনরায় বন্দী করে হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে নিয়ে যান এবং বলেন, সে ইরানী সেনাপতি। সে ধোঁকা দিয়ে আমাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা আদায় করে নিয়েছে। হযরত আবূ উবায়দ (রা) মাতার ইব্‌ন ফায়যাকে ডেকে পাঠিয়ে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন 'হাঁ, আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তখন বলেন, যখন একজন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন সে প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ হবে না। তিনি জাবানকে নিরাপত্তা সহকারে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় দেন। জাবান

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পলায়নপর বাহিনীসহ কসকর নামক স্থানে গিয়ে সেনাপতি নারসীর সাথে মিলিত হন।

কসকর বিজয়

নারসী ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ব থেকেই কসকরে অবস্থান করছিলেন। এবার জাবান এবং তার পরাজিত বাহিনীও তার সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ইরানের রাজদরবারে যখন জাবানের পরাজয়ের সংবাদ গিয়ে পৌছল, তখন রুস্তম জালীনূস নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে নারসীর সাহায্যার্থে এক বিশাল বাহিনী কসকরের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু জালীনূস সেখানে পৌছার পূর্বেই হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসঊদ সাকাফী (রা) সাকাতিয়া'র ঢালু ভূমিতে নারসীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নারসীর সাথে রাজপরিবারের আরো দু'জন উপসেনাপতি ছিলেন। এ রাজকুমাররা তাদের বাহিনীর মধ্যবর্তী এবং ডান ও বাম পার্শ্বস্থ সেনাদলের পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যবর্তী সেনাদল পরিচালনার দায়িত্ব হযরত আবূ উবায়দ (রা) স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ ইব্‌ন উবায়দ (রা)-এর উপর ডান পার্শ্ববর্তী সেনাদলের এবং হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) উপর 'মুকাদ্দামাতুল জায়শ' তথা অগ্রবর্তী বাহিনীর পরিচালনাভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত জোরেশোরে লড়াই শুরু হয়। হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) যখন দেখেন যে, লড়াই দীর্ঘায়িত হতে চলেছে তখন তিনি আপন সেনাদলকে পৃথক করে নিয়ে চার ক্রোশ আয়তনের একটি চক্কর কেটে ইরানী বাহিনীর পশ্চাৎদিক দিয়ে তাদের উপর হামলা চালান। সেনাপতি নারসী এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সেদিকে আপন বাহিনীর একটি দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরত সা'দ ইব্‌ন উবায়দ (রা) বীরবিক্রমে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আগে বেড়ে একেবারে নারসীর মাথার উপর পৌছে যান। হযরত আবূ উবায়দ (রা) ও শত্রুবাহিনীর সারির উপর সারি বিদীর্ণ করে ইরানী সেনা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবর" ধ্বনি তুলে দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে ইরানী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। নারসী হযরত সা'দ ইব্‌ন উবায়দ (রা)-এর মুকাবিলায় টিকতে না পেরে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। তার পলায়নের সাথে সাথে তার সমগ্র বাহিনীও পলায়ন করতে থাকে। হযরত মুছান্না (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বাকী সৈন্যরা বন্দীদেরকে সামলে নিয়ে ইরানীদের তাঁবু এবং বাজারসমূহ দখল করে নেয়। তারপর হযরত আবূ উবায়দ (রা), হযরত মুছান্না (রা), হযরত আসিম (রা) এবং হযরত সালীত (রা)-কে এক এক বাহিনীর সৈনাপতি নিযুক্ত করে আশেপাশের ঐ সমস্ত এলাকায় প্রেরণ করেন যেখানে ইরানী সৈন্যরা অবস্থান করছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। এ সেনাপতিগণ প্রত্যেক স্থানে বিজয় লাভ করে সমগ্র সাওয়াদ এলাকা মুসলমানগণের অধীনে নিয়ে আসেন।

বাকশিয়ার যুদ্ধ

জালীনূস কসকর পৌছার পূর্বেই নারসী দারুণ ভাবে পরাজয় বরণ করেন। এ সংবাদ শুনে জালীনূস বাকশিয়ায় থেমে যান। হযরত আবূ উবায়দ (রা) সাকাতিয়া এবং কসকর থেকে রওয়ানা হয়ে বাকশিয়ায় পৌছে জালীনূসের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। জালীনূস সে আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে একেবারে মাদায়েনে চলে যান।

হযরত আবূ উবায়দ মাসঊদ সাকাফী (রা)-এর শেষ কীর্তি

জালীনূস পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যখন মাদায়েন গিয়ে পৌঁছেন, তখন সমগ্র রাজধানী ও রাজদরবারে ভয়ানক আতংকের সৃষ্টি হয়। প্রধান মন্ত্রীর রুস্তম দরবারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এমন বীর কি কেউ আছে, যে আরবদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারে এবং এ যাবত ইরানীরা যে সমস্ত পরাজয় বরণ করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে ? উপস্থিত সবাই একবাক্যে বলল, বাহমান জাদাওয়ায়হ ছাড়া আমরা দ্বিতীয় কোন অভিজ্ঞ ও বীরোত্তম নির্ভরযোগ্য সেনাপতি দেখছি না, এবার রুস্তম তিন হাজার সৈন্য, তিনশ' জঙ্গী হাতি এবং সেই সাথে সর্বপ্রকার সামরিক উপকরণ ও রসদ সামগ্রী দিয়ে বাহমান জাদওয়ায়হকে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তার সাহায্যের জন্য জালীনূসকে মনোনীত করেন। বাহবান জাদওয়ায়হকে বলেন, যদি এবারও জালীনূস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তাহলে তার গর্দান যেন অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাহমান জাদভিয়াকে সেই ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় পতাকাও প্রদান করা হল, যে পতাকা সম্পর্কে ইরানীদের এ বিশ্বাস ছিল যে, যে বাহিনীর সাথে এ পতাকা থাকে সে বাহিনী কখনো পরাজিত হয় না। বাহমান জাদওয়ায়হ যাবতীয় যুদ্ধ-সামগ্রী নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মাদায়েন থেকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি যতগুলো শহর, জনবসতি ও গ্রাম-পল্লী অতিক্রম করেন সেখান থেকেই সেনাভর্তি করেন। সাথে সাথে স্থানীয় জনসাধারণকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ফুরাত নদীর তীরবর্তী 'কিসসে নাতিফ' নামক স্থানে অবস্থান নেন। অপর দিকে হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এ বিশাল বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে কসকর থেকে রওয়ানা হন এবং ফুরাত নদীর অপর তীরবর্তী মারূহা নামক স্থানে অবতরণ করেন। যেহেতু ফুরাত নদী মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই উভয় বাহিনীই কিছুদিন পর্যন্ত নীরব নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনীর সম্মতিক্রমে ফুরাত নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতু নির্মিত হলে বাহমান জাদওয়ায়হ হযরত আবূ উবায়দ (রা)-এর কাছে এ মর্মে এক পয়গাম পাঠান : তুমি নদী অতিক্রম করে এপারে আসবে, না আমি নদী অতিক্রম করে ওপারে যাবো ? যদিও অন্যান্য সেনাপতিরা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইরানী বাহিনীকেই এপারে আসার আহবান জানানো উচিত, কিন্তু হযরত আবূ উবায়দ (রা) সে অভিমত পসন্দ করলেন না। তিনি বললেন, আমরাই ওপারে গিয়ে ইরানীদের মুকাবিলা করবো। যাহোক তিনি ইসলামী বাহিনীকে ওপারে নিয়ে গেলেন। ওপারে ইরানী বাহিনী ও ফুরাত নদীর মধ্যখানে ছিল একটি ক্ষুদ্র মাঠ, তাই ইসলামী বাহিনীকে সেখানে একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থায় দাঁড়াতে হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে। বাহমান জাদওয়ায়হ তার হস্তী বাহিনীকে মূল বাহিনীর সম্মুখভাগে রেখেছিলেন এবং তীরন্দাজরা সেগুলোর উপর চড়ে বসেছিলো আর মুসলিম বাহিনীর উপর অনবরত তীর নিক্ষেপ করছিলো। মুসলমানগণের ঘোড়া ইতিপূর্বে কখনো হাতি দেখেনি। তাই মুসলিম অশ্বারোহিগণ যখন আগে বেড়ে ইরানীদের হামলা করল তখন তাদের ঘোড়াগুলো হাতি দেখে শিউরে উঠল এবং বেকাবু হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো। যুদ্ধের এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত আবূ উবায়দ (রা) হুকুম দিলেন ঘোড়া থেকে নেমে হামলা কর। অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সাথে অনুরূপ হামলা চালানো হল, কিন্তু শত্রুপক্ষের হাতিসমূহ যখন ইসলামী বাহিনীর সারিসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে মুসলিম

যোদ্ধাদেরকে দলিত-মথিত করতে শুরু করল, তখন সারিবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভাংগন ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। হযরত আবূ উবায়দ (রা) উচ্চৈঃস্বরে তাঁর বাহিনীকে উৎসাহ জুগিয়ে চললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তরবারি চালিয়ে হাতির শুঁড় দ্বিখণ্ডিত করে ফেল। তিনি নিজেও হাতিগুলোকে আক্রমণ করলেন এবং পরপর কয়েকটি হাতির শুঁড় ও সামনের পা কেটে সেগুলোকে ভূলুণ্ঠিত করে তাদের উপরস্থ আরোহীদেরকে হত্যা করলেন।

নিজেদের সেনাপতির এ অতুলনীয় বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে মুসলিম সেনাগণও ইরানী হাতিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এভাবে রণক্ষেত্র যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তক্ষুনি একটি ইরানী হাতি মুসলিম সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে আক্রমণ করে বসে। হযরত উবায়দ (রা) অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তরবারি চালিয়ে হাতির মাথা থেকে তার শুঁড়টি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও হাতিটি এগিয়ে এসে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তার বুকের উপর পা রেখে তাকে এমনভাবে দলিত-মথিত করে যে, তার অস্থি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। হযরত আবূ উবায়দ (রা) শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তার ভাই হযরত হাকাম (রা) আগে বেড়ে ইসলামী পতাকা নিজ হাতে তুলে নেন। কিন্তু তিনিও হাতির আক্রমণ চালিয়ে হযরত আবূ উবায়দ (রা)-এর ন্যায় শাহাদত বরণ করেন। তারপর বনূ ছাকীফ গোত্রের ছয় ব্যক্তি একের পর এক ইসলামী পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেন, কিন্তু তাদেরকে একইভাবে শাহাদত বরণ করতে হয়। অষ্টম ব্যক্তি যিনি পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, তিনি হলেন হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)। পতাকা হাতে নিয়েই তিনি দৃঢ়তার সাথে শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃসাহসিক পরিচয় দেন। কিন্তু মুসলিম সেনাগণ একের পর এক তাদের সাতজন সেনাপতিকে নিহত হতে দেখে এবং হাতিগুলোর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পলায়নপর হয়ে উঠেছিল। তাদেরকে নিরস্ত করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মারসাদ ছাকাফী সেতুর তক্তাগুলো বিচ্ছিন্ন করে এবং রশিসমূহ কেটে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন : হে লোক সকল ! এবার পলায়নের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই যেভাবে তোমাদের ভাই ও তোমাদের সেনাপতি শাহাদত বরণ করেছেন, তোমরাও সেভাবে শাহাদত বরণ কর। সেতু ভেঙ্গে ফেলার কারণে এ অসুবিধা দেখা দিয়েছিল যে, মানুষ এবার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। এমতাবস্থায়ও হযরত মুছান্না (রা) আবূ মিজহান ছাকাফী (রা) প্রমুখ দলনেতার সহায়তায় অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে সামলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যান। সেই সাথে সেতুটিও পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। উপরন্তু তিনি সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রচার করে দেন : আমি ইরানী বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছি। কাজেই আমাদের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। হযরত মুছান্না (রা) অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে ইরানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। যখন মুসলিমগণ নদী অতিক্রম করে অপর পারে চলে যায়, তখন তিনিও একেবারে সবার শেষ সেতুপথ দিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন। ঐ যুদ্ধে মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল নয় হাজার। তার মধ্যে চার হাজার এবং কোন কোন বর্ণনা মতে ছয় হাজারই শাহাদত বরণ করেন। হযরত সামীত ইব্‌ন কায়স, উতবা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স, উবাদা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাসকান, আবূ উমাইয়া ফাযারী (রা) প্রমুখ সাহাবাও ঐ শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইরানী বাহিনীরও ছয় হাজার লোক নিহত হয়। কিন্তু ইতিপূর্বেকার সব যুদ্ধের অনুপাতে এ যুদ্ধেই মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো সবচাইতে বেশী। এ যুদ্ধে এমন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি

হয়েছিল যে, ইরানীদের মুকাবিলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু যারা এ কর্মটি করেছিল তারা আজীবন এতই লজ্জা ও অপমানবোধ করত যে, কাউকে নিজের চেহারাটি পর্যন্ত দেখাতে চাইত না। মুসলমানগণ সংখ্যায় অতি অল্প এবং মানসিক ও দৈহিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহমান জাদওয়ার এমন সাহস হয়নি যে, সেতু অতিক্রম করে এপারে এসে মুসলমানগণকে পুনরায় আক্রমণ করে। কাজেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা মাদায়েনে প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

বুয়াইবের যুদ্ধ

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কাছে যখন হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ ছাকাফী (রা)-এর শাহাদত এবং মুসলমানগণের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ইরানীদের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত পাঠালেন এবং জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ফলে বেশ কয়েকটি গোত্রের লোক তার খিদমতে হাযির হল এবং তিনি হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছার (রা) সাহায্যের জন্য মদীনা শরীফ থেকে ইরাক অভিমুখে এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। ইতিমধ্যে হযরত মুছান্না (রা)-ও আরব-অন্তর্ভুক্ত ইরাক এলাকা থেকে সেনাদলে লোক ভর্তি করে ইরাকী আরবদের একটি নতুন বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

ইরানীদের কাছে যখন মুসলমানগণের এ প্রস্তুতির সংবাদ পৌঁছলো, তখন ইরানের প্রধানমন্ত্রী (সমর মন্ত্রীও বটে) রুস্তম, মাহরান হামাদানীকে সেনাপতি করে বার হাজার বাছাইকৃত সৈন্যের একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হামাদানীকে সেনাপতি মনোনয়নের কারণ, তিনি আরবদেশেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাই আরব বাহিনীর শক্তির সঠিক মূল্যায়ন তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। হযরত মুছান্না (রা) মাহরান হামাদানীর আগমন-সংবাদ শুনে আপন সমগ্র বাহিনীকে ফুরাত নদীর তীরে বুয়াইব নামক স্থানে একত্রিত করেন। মাহরানও বুয়াইব বরাবর ফুরাতের অপর তীরে এসে তাঁবু খাটান। তিনি হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর কাছে পয়গাম পাঠান, হয় তুমি নিজে ফুরাত অতিক্রম করে এপারে চলে আস, নতুবা আমাকে সুযোগ দাও যাতে আমি নদী অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে তোমার মুখোমুখি হতে পারি। হযরত মুছান্না (রা) যেহেতু গত যুদ্ধে ফুরাত নদী অতিক্রম করার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই এবার তিনি উত্তরে বলে পাঠালেন, তুমিই ফুরাত অতিক্রম করে এপারে চলে আস। কাজেই মাহরান জঙ্গী হাতিগুলোসহ সমগ্র ইরানী বাহিনী নিয়ে নদী অতিক্রম করে এপারে চলে এলেন। তিনি সর্বাগ্রে পদাতিক বাহিনীকে দাঁড় করালেন, তারপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন হাতিগুলোকে। হাতির পিঠে বসেছিলো তীরন্দাজরা। ডানে বামে বাহিনীও ইরানীদের মুকাবিলা করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইরানীরা প্রথমে হামলা প্রতিহত করে। তারপর শুরু হয় এক ভীষণ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ইরানীরা মুসলিমগণের হাতে পরাজয় বরণ করে। যখন ইরানীরা পালাতে শুরু করে, তখন মুসলিম সেনাপতি হযরত মুছান্না (রা) দৌড়ে গিয়ে সেতু ভেঙ্গে ফেলেন, যাতে ইরানীরা সহজে নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে না পারে। এর ফলে অনেক ইরানী সৈন্য নিহত হয় এবং অনেকে পানিতে ডুবে মারা যায়। মাহরান হামাদানীও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনামতে, ঐ যুদ্ধে ইরানী বাহিনীর

যে সমস্ত সৈন্য পলায়ন করেছিল মুসলমানগণ সাবাত' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এ যুদ্ধের পর সাওয়াদ থেকে দজলা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে চলে আসে। এ যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনের ১৩ই রমযান সংঘটিত হয়।

বুয়াইবের পরাজয়

মাহরান হত্যা এবং দুর্ধর্ষ ইরানী বাহিনীর বিপর্যস্ত হওয়ার সংবাদ শুনে শুধু ইরানী রাজদরবার নয় বরং সমগ্র ইরান সাম্রাজ্য প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এক লক্ষ ইরানী এবং মাত্র একশ' আরব নিহত হয়েছে এ সংবাদ শুনে ইরানী মাত্রই হতভম্ব হয়ে পড়ে। মোটকথা, আরবদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা ইরানীদের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঐ সময় সাম্রাজ্যের পরিচালনার ভার রুস্তম ইব্‌ন ফাররূখ যাদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও, 'নামকে ওয়াস্তে ইরানের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেখানকার রাজ-পরিবারেরই জনৈক মহিলা। এ শোচনীয় পরাজয় ও বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ শুনে ইরানীরা বলাবলি করতে শুরু করল যে, মহিলার রাজত্বে সেনাবাহিনীর জয়লাভ করা খুবই কঠিন। কাজেই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সভাসদবৃন্দ ইয়ায্‌দেজিরদ নামক শাহী বংশের জনৈক যুবককে খুঁজে বের করে উক্ত মহিলার স্থলে তাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রাজদরবারে রুস্তম ও ফিরূয নামক দু'ব্যক্তির প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। তবে তারা ছিল পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন এবং একে অন্যের কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের মধ্যে একটি সমঝোতার ভাব গড়ে তোলা হলো। সিংহাসনে আরোহণকালে ইয়ায্‌দেজিরদের বয়স ছিল একুশ বছর। ইয়ায্‌দেজিরদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সভাসদবৃন্দ নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিরোধিতার কথা ভুলে গিয়ে দেশ তথা সাম্রাজ্য রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইরানী রাজদরবারের অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার কারণে যে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইতিমধ্যে নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন তারা আবার আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। মোটকথা, ইরান সাম্রাজ্য আরবদের বিরুদ্ধে বেশ আলোড়ন দেখা দিল। ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রদেশ ও শহর মুসলমানগণের অধিকারে চলে গিয়েছিল সেগুলোতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। ইরানী সেনানিবাসসমূহ সেনাবাহিনীতে ভরে উঠলো। দুর্গসমূহ সুদৃঢ় করা হলো। ইরানীদের প্রশ্রয় পেয়ে যে সমস্ত এলাকা ইতিমধ্যে মুসলমানগণের দখলে চলে গিয়েছিল সেখানকার অধিবাসীরাও মুসলমানগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

ইরানীদের বিরুদ্ধে স্বয়ং ফারূকে আযম (রা)-এর সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংকল্প

যুলকাদা মাসে হযরত ফারূকে আযম (রা) উপরোক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি তক্ষুনি হযরত মুছান্না ইবন হারিছা (রা)-এর নামে এ মর্মে এক নির্দেশ পাঠান : রাবীআ ও মুদার গোত্র, যারা ইরাক ও মদীনা শরীফের মধ্যস্থলে বসবাস করে তাদেরকে তোমার কাছে সোজাসুজি ডেকে পাঠাও এবং তাদের মাধ্যমে তোমার বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোল। আর যে সমস্ত এলাকায় কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে সেখান থেকে আরব সীমান্তের দিকে পিছিয়ে এসো। এর সাথে তিনি সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নামেও এ মর্মে নির্দেশ পাঠান : 'প্রত্যেক এলাকা থেকে যোদ্ধা লোক বাছাই করে মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য অবিলম্বে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। এ সমস্ত নির্দেশ পাঠানোর পর তিনি হজ্জে বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। হজ্জ সমাপনের পর তিনি যখন মদীনা শরীফে

ফিরে আসেন, তখন দেশের চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক মদীনায় আসতে শুরু করে। মদীনা শরীফের মাঠ-প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত তালহাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর, হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামকে ডান পাশের বাহিনীর এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে বাম পাশের বাহিনীর নেতা মনোনীত করেন এবং নিজে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংকল্প নেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে পাঠিয়ে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তার সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে চাশ্‌মে যারায়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। সমগ্র বাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কেননা, খোদ খলীফাই যে হচ্ছেন মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কিন্তু উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন : স্বয়ং আপনার ইরানে গমন আমার কাছে সমীচীন মনে হয় না। তখন ফারূকে আযম (রা) বাহিনীর সকল সেনাপতি এবং সাধারণ যোদ্ধার এবং বিরাট বাহিনীর সভায় সকলের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক খলীফারই অনুরূপ মত পোষণ করে। অর্থাৎ মুজাহিদগণ প্রধান সেনাপতিরূপে খোদ খলীফার ইরান গমনকে সমীচীন মনে করেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আউফ (রা) বললেন, আমি এ মতের বিরোধিতা করি। কেননা, খোদ খলীফার মদীনা তায়্যিবাহ ছেড়ে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সেনাপতি পরাজিত হলে খলীফা অতি সহজেই তা তদারক করতে পারেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ না করুন, যদি যুদ্ধে খোদ খলীফার একটা কিছু হয়ে যায় তখন মুসলমানগণের শাসনকার্য পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়বে। একথা শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আলী (রা)-কেও মদীনা তাইয়িবা থেকে ডেকে পাঠান এবং নেতৃস্থানীয় সকল সাহাবায়ে কিরামের সাথেও এ সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করেন। হযরত আলী (রা) এবং সকল গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর অভিমতকেই গ্রহণ করেন। তখন ফারূকে আযম (রা) পুনরায় সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বলেন, "আমি তোমাদের সাথে ইরাকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরাম মাত্রই আমার এ উদ্যোগকে অপসন্দ করেন। কাজেই আমি অনন্যোপায়। এবার অন্য কোন ব্যক্তি সেনাপতি হয়ে তোমাদের সাথে যাবেন।" এবার সাহাবায়ে কিরামের বৈঠকে এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয় যে, এখন কাকে সেনাপতি করে ইরাকে পাঠানো হবে। হযরত আলী (রা) সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হযরত আবূ উবায়দা এবং হযরত খালিদ (রা) তখন সিরিয়ায় যুদ্ধরত ছিলেন।

এ আলাপ-আলোচনা চলাকালে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, "আমি আপনাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির নাম বলছি, যার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তির কথা কেউ বলতে পারবে বলে আমি মনে করি না।" তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন। হযরত উমর (রা)-ও এ কথায় সায় দেন। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মামা এবং অতি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন একজন সাহাবী। ঐ সময়ে হযরত সা'দ হাওয়াযিন গোত্রে সাদকা আদায়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তক্ষুণি তাঁর কাছে পত্র লিখে অবিলম্বে তাঁকে মদীনায় আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি কয়েক দিন পর মদীনা শরীফে এসে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর

খিদমতে হাযির হন। সেনাবাহিনী তখন যারার নামক স্থানে অবস্থান করছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে সেনাপতি মনোনীত করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তাঁকে ইরাকে প্রেরণ করেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যেন তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে (ফারূকে আযমকে) অবহিত রাখেন। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) চার হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। তিনি আঠারো মনযিল পথ অতিক্রম করে ছা'লাবাহ নামক স্থানে অবতরণ করেন। হযরত সা'দ (রা) রওয়ানা হওয়ার পর পরই হযরত ফারূকে আযম (রা) দু'হাজার ইয়ামানী ও দু'হাজার নজদী মুজাহিদের এক বাহিনী তাঁর সাহায্যে প্রেরণ করেন। তারা অবিলম্বে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন। মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) আট হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে 'যীকার' নামক স্থানে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ফুরাতের দিকে অগ্রসর হওয়া। হযরত মুছান্না ইবন হারিছা (রা) জাস্‌রের ঘটনায় (পুলের যুদ্ধে) আহত হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় আকার ধারণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যখন ছা'লাবাহ্ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন এ দুঃসংবাদ আসে যে, হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) আর ইহজগতে নেই।

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ইরাকে উপস্থিতি

হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত বশীর ইব্ন হুসামাকে (রা) আপন বাহিনীর নেতা মনোনীত করেছিলেন। তখন তাঁর বাহিনীতে আট হাজার সৈন্য ছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে এবং কোন্ কোন্ মনযিলে অবতরণ করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি প্রতিদিনই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতে থাকেন এবং সেই সাথে মুসলিম বাহিনীর দৈনন্দিন অবস্থাদি সম্পর্কেও অবহিত হতে থাকেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যখন ছা'লাবা থেকে সীরাফের দিকে অগ্রসর হন, তখন পথিমধ্যে বনী আসাদ গোত্রের তিন হাজার মুজাহিদ তাঁর বাহিনীতে এসে মিলিত হন। তারা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে হযরত সা'দ (রা)-এর অপেক্ষা করছিলেন। হযরত সা'দ (রা) যখন সীরাফে গিয়ে পৌঁছেন, তখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আশআস ইব্ন কায়েস (রা) তাঁর গোত্রের দু'হাজার মুজাহিদসহ মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। হযরত মুছান্না (রা)-এর ভাই মুআন্না ইব্ন হারিছা শায়বানী (রা) এখানে এসে হযরত সা'দ (রা)-এর বাহিনীর সাথে মিলিত হন। হযরত সা'দ (রা) এবার গণনা করে দেখেন যে, সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বিশ ও ত্রিশ হাজারের মধ্যে। এর মধ্যে তিনশ' সাহাবায়ে কিরাম এমনও রয়েছেন, যাঁরা বায়'আত রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। এমন কি সত্তর জন সাহাবায়ে কিরাম এমনও রয়েছেন যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সীরাফেই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁর নামে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ আসে : 'কাদিসিয়ার দিকে অগ্রসর হও এবং সেখানে পৌঁছে এমন জায়গায় ব্যূহ রচনা কর যে, ইরানের সমভূমি তোমাদের সম্মুখে এবং আরবের পাহাড় তোমাদের পিছনে থাকে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয়ী করেন তাহলে যতটুকু ইচ্ছা

এগিয়ে যাও। মহান আল্লাহ্ না করুন, যদি পরিস্থিতি এর বিপরীত হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পাহাড়ে আশ্রয় নিবে। তারপর খুব কৌশলের সাথে শত্রুদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাও।'

নির্দেশ অনুযায়ী সা'দ (রা) সীরাফের দিকে রওয়ানা হন। তিনি হযরত যুবায়র ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাতাদা (রা)-কে অগ্রবর্তী বাহিনীর, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মু'তাসিম (রা)-কে ডান পাশের বাহিনীর, হযরত শুরাহবীল ইব্ন সামাত কিনদী (রা)-কে বাম পাশের বাহিনীর, হযরত আসিম ইব্ন আমর তামীমী (রা)-কে পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) বাহিনীর রসদ সামগ্রীর প্রধান কর্মকতা, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন রাবীআ (রা) বিচারক ও কোষাধ্যক্ষ, হযরত হিলাল হাজরী (রা) অনুবাদক এবং হযরত যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) কাতিব বা সচিব ছিলেন। মুসলিম বাহিনী সীরাফ থেকে কাদিসিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। পথিমধ্যে 'গাদীর' নামক একটি স্থানে ইরানীদের অস্ত্রাগার ছিল। হযরত সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস সেটা দখল করে কাদিসিয়ায় গিয়ে উপনীত হন। কাদিসিয়া পৌঁছার পর তিনি আনুমানিক দু'মাস পর্যন্ত পারস্য বাহিনীর অপেক্ষায় বসে থাকেন। এ সময়ে ইসলামী বাহিনীর যখন কোন রসদ সামগ্রীর প্রয়োজন হত, তখন রাতের বেলায় কয়েকটি ক্ষুদ্র বাহিনী ইরানের বিভিন্ন এলাকা থেকে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসত।

ইসলামী প্রতিনিধি দল

এ সময় হযরত নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা), হযরত কায়স ইব্ন যারারাহ্ (রা), হযরত আশআস ইব্ন কায়স, ফুরাত ইব্ন হিব্বান (রা), আসিম ইব্ন উমর (রা), আমর ইব্ন মা'দীকারিব (রা), হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ, মুআন্না ইব্ন হারিছা (রা), উতারিদ ইব্ন হাজিব (রা), হযরত বশীর ইব্ন রুহাম (রা), হান্যালাহ ইব্ন রাবী (রা) এবং হযরত আদী ইব্ন সুহায়ল (রা)-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি মুসলিম প্রতিনিধি দলকে কাদিসিয়া থেকে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা অশ্বারোহণে পথিমধ্যে অবস্থানকারী রুস্তম-বাহিনীকে অতিক্রম করে সোজা মাদায়েনে গিয়ে পৌঁছেন, ইয়ায্দেজিরদ এ প্রতিনিধি দলের আগমনবার্তা পেয়ে স্বীয় দরবারকে সুসজ্জিত করেন। ইসলামী প্রতিনিধিদল অতি সাদাসিধে কাপড় পরে সিপাহীবেশে রাজদরবারে প্রবেশ করে। তা প্রত্যক্ষ করে রুস্তমের সভাসদ ও অমাত্যবর্গ যারপরনাই বিস্মিত হয়। প্রথমে ইয়ায্দেজিরদ তাদেরকে সাধারণ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। মুসলিম প্রতিনিধিদল তার সন্তোষজনক উত্তর দেন। এবার ইয়ায্দেজিরদ প্রশ্ন করেন, আমাদের মুকাবিলা করার দুঃসাহস তোমরা পেলে কোথেকে ? আর তোমরা কী করেই বা এ কথা ভুলে গেলে যে, তোমাদের জাতিকে বিশ্বের এক লাঞ্ছিত ও পশ্চাৎপদ জাতি হিসাবে গণ্য করা হয় ? তোমরা কী করে একথা ভুলে গেলে যে, যখনই তোমাদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যেত তখন আমরা আমাদের সীমান্তবর্তী কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দিতাম যেন তারা তোমাদেরকে শায়েস্তা করে দেয় এবং তারা ঠিক ঠিকই তাই করত ? ইয়ায্দেজিরদের একথার উত্তরে হযরত নু'মান ইব্ন মুকারিরন (রা) বললেন, আমরা দুনিয়া থেকে পৌত্তলিকতা অংশীবাদিতা (শিরক) নির্মূল করার চেষ্টা করছি এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে ইসলাম পেশ করছি যাতে তারা এর মাধ্যমে ইহ্-পরকালে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তার উচিত নিজেকে মুসলমানগণের হিফাযত ও নিরাপত্তায়

সমর্পণ করা এবং তার বদলে মুসলমানগণকে জিযিয়া প্রদান করা। যদি সে ইসলাম গ্রহণ ও জিযিয়া প্রদান উভয়টি অস্বীকার করে, তাহলে একমাত্র তরবারিই তার ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারটি মীমাংসা করবে।

হযরত কায়স ইব্‌ন যারারাহ (রা)-এর ভাষণ

ইয়ায্‌দেজিরদ হযরত নু'মান (রা)-এর কথা শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে বলেন : তোমরা তো অসভ্য জংলী লোক। তোমাদের জনসংখ্যাও অনেক কম। তোমরা আমাদের ভূখণ্ডের প্রতি লিপ্সা করো না। হাঁ, আমরা তোমাদের প্রতি এতটুকু সদয় ব্যবহার করতে পারি যে, আমরা তোমাদের আহারের জন্য খাদ্য এবং পরণের জন্য বস্ত্র প্রদান করবো এবং তোমাদের উপর এমন একজন শাসক নিয়োগ কর যিনি তোমাদের সাথে শালীন ব্যবহার করবেন। একথা শুনে হযরত কায়স ইব্‌ন যারারাহ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, এখানে যারা তোমাদের সামনে বিদ্যমান তারা আরবের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত শ্রেণীর লোক। আর আরবের অভিজাতেরা এ ধরনের বাজে কথার উত্তর দিতেও লজ্জাবোধ করে। যাহোক, আমি তোমার কথার জবাব দিব এবং তাঁরা সবাই আমার কথা সমর্থন করবেন। শোন, তুমি আরব ও আরববাসীদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছ, আমরা তার চাইতেও খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার করুণাগুণে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন। এ নবী আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, ন্যায় ও সত্যের শত্রুদেরকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়ায় হবে আমাদেরই জয়জয়কার। কাজেই তোমাদের জন্য এই সমীচীন যে, তোমরা হয় জিযিয়া প্রদান কর, নয়ত ইসলাম গ্রহণ কর। যদি এর কোনটিই না কর, তাহলে আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারটির ফায়সালা একমাত্র তরবারিই করবে।

ইয়ায্‌দেজিরদ একথা শুনে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়লেন এবং চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, যদি প্রতিনিধিদের হত্যা করা বৈধ হত, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। তারপর তিনি তার ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন : এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে এস এবং যে লোকটি এদের নেতা তার মাথায় তুলে দিয়ে এদের সবাইকে মাদায়েন থেকে বের করে দাও। তারপর তিনি মুসলিম প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন : রুস্তম শীঘ্রই তোমাদেরকে কাদিসিয়ার গর্তে দাফন করবে।' ইতিমধ্যে মাটি ভর্তি ঝুড়ি এসে গেল। হযরত আসিম (রা) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ঝুঁড়িটি কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, আমিই এ প্রতিনিধি দলের নেতা। যাহোক মুসলিম প্রতিনিধি দল ইয়াযদেজিরদের দরবার থেকে বের হয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে মাটি ভর্তি ঐ ঝুড়িটি সঙ্গে নিয়ে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে হাযির হন এবং শ্লোগান তুলে : 'ইরান সাম্রাজ্যের বিজয় শুভ হোক। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম পদক্ষেপেই আমাদেরকে ঐ দেশের মাটি দান করেছেন।" ইয়াযদেজিরদ প্রদত্ত মাটি দ্বারা প্রতিনিধি দলটি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাতে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-ও অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হন।

এ প্রতিনিধি দলটি ফিরে আসার পর ইরানের শাহী দরবার থেকে সাবাতে অবস্থানকারী রুস্তমের কাছে একটি জরুরী নির্দেশ এল এবং সেই সাথে এক সহায়ক বাহিনীও এসে পৌঁছল। ষাট হাজার সৈন্যের সিংহভাগ রুস্তমের অধীনে ছিল। অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি

ছিলেন জালীনূস। তার বাহিনীতেও চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল। পশ্চাদবর্তী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। ত্রিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত ডান পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হরমুযান এবং অপর ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মাহরান ইব্‌ন বাহ্‌রাম। এভাবে ইরানী সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ আশি হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। এছাড়াও রুস্তমের সাথে মধ্যবর্তী বাহিনীতে ত্রিশটি যুদ্ধহস্তী ছিল। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আসবাব সামগ্রীর সাথে রুস্তম সাবাত থেকে যাত্রা করে 'কুছ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানেই তাঁবু খাটান। কাদিসিয়া এবং মাদায়েনের মধ্যে দূরত্ব ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ ক্রোশ। কাজেই ইরানী ও ইসলামী বাহিনীর দূরত্ব অনেকটা হ্রাস পেল। এবার রসদ সামগ্রী লুট করার জন্য প্রত্যেক দিনই উভয় পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীসমূহ একে অন্যের উপর আকস্মিক হামলা চালাতে থাকে। রুস্তম যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। তাই, তিনি মাদায়েন থেকে কাদিসিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে ছয় মাস সময় লাগিয়ে দেন। কুছা নামক স্থান থেকে যাত্রা করে রুস্তম কাদিসিয়ার সম্মুখবর্তী 'আতীক' নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন। ইরানে শাহী দরবার থেকে বারবার রুস্তমের কাছে এ মর্মে তাকীদ আসছিলো : শীঘ্রই আরবদের মুকাবিলা ছাড়াই কাজ সেরে নিতে। কাদিসিয়ায় পৌঁছে তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠান যে, সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য যেন তার কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত রিবঈ ইব্‌ন আমের (রা)-কে দূত হিসাবে রুস্তমের কাছে প্রেরণ করেন। ঐ দিন রুস্তম অত্যন্ত শান-শওকত ও জাঁকজমকের সাথে তার দরবার সজ্জিত করেন। সোনার সিংহাসন স্থাপন করা হয় এবং তার চারপাশে রেশমী ও রোমান কার্পেট বিছানো হয়। তাকিয়া ও সামিয়ানাসমূহের ঝালর ছিল মণি-মাণিক্যের। যাহোক হযরত রিবঈ ইব্‌ন আমের (রা) এ জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে প্রবেশ করেন। কার্পেটের শেষ প্রান্তে যে বিরাট তাকিয়াটি পড়েছিল তিনি তার সাথেই আপন ঘোড়াটি বাঁধেন এবং তীরের ফলা ঠুকতে ঠুকতে এবং রুস্তমের বিছানো মহামূল্যবান কার্পেটের উপর ছিদ্র ও ক্ষতের সৃষ্টি করতে করতে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হন এবং একেবারে রুস্তমের পাশে গিয়ে বসেন। লোকেরা হযরত বিবঈ (রা)-কে সিংহাসন থেকে নামাতে এবং তার কাছ থেকে হাতিয়ারসমূহ কেড়ে নিতে চাইলো। তখন রিবঈ (রা) তাদেরকে বললেন, আমি নিজের কোন দাবী নিয়ে এখানে আসিনি, তোমরাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ। আমাদের ধর্মে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ যে, এক ব্যক্তি খোদা হয়ে বসবে এবং বাকি সবাই ক্রীতদাসের মত হাত জোড় করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। রুস্তম নিজেই তার লোকদেরকে সতর্ক করে দিলেন যেন কেউ একে বিরক্ত না করে। কিন্তু হঠাৎ কি যেন চিন্তা করে রিবঈ (রা) নিজেই রুস্তমের নিকট থেকে উঠে যান এবং সিংহাসন থেকে নেমে আপন ছোরা দ্বারা বিছানো কার্পেটটি কেটে খালি ভূমির কিছু অংশ বের করে তাতে উপবেশন করেন। তারপর রুস্তমকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার ঐ জাঁকজমকপূর্ণ শয্যার কোন প্রয়োজন আমার নেই। মহান আল্লাহ্‌র বিছানো মৃত্তিকা শয্যাই আমার জন্য যথেষ্ট। তারপর দোভাষীর সাহায্যে রুস্তম হযরত রিবঈ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের এ যুদ্ধ-বিগ্রহের লক্ষ্য কি ? হযরত রিবঈ (রা) উত্তরে বলেন :

> আমরা মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে পরকালের বিশালতার দিকে নিয়ে যেতে চাই এবং বাতিল ধর্মসমূহের পরিবর্তে ন্যায়, সত্য তথা ইসলামের প্রচার ও

প্রসার কামনা করি। যে ব্যক্তি ন্যায়, সত্য ও ইসলামের উপর কায়েম থাকবে আমরা তার দিকে, তার দেশের দিকে এবং বিষয় সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকাবো না। যে আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না শাহাদত বরণ করে জান্নাতে গিয়ে উপনীত হই, কিংবা জয়লাভ করি। যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হও, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব এবং তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসব এবং তোমাদের জান ও মালের হিফাযত করব।

এ সমস্ত কথা শুনে রুস্তম প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মুসলমানদের নেতা ? হযরত রিবঈ (রা) জবাব দিলেন, না, আমি নেতা নই, বরং আমি একজন সাধারণ সৈনিক। কিন্তু আমাদের একজন সাধারণ লোকও নেতৃস্থানীয় লোকের পক্ষ থেকে কোন কিছুর অনুমোদন দিতে পারে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিই প্রতিটি ব্যাপারেই স্বাধিকার রাখে। একথা শুনে রুস্তম ও সভাসদরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর রুস্তুম বললেন, তোমার তরবারির খাপ একেবারে জীর্ণ, মলিন। হযরত রিবঈ সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে তরবারি বের করে বললেন, এটাকে এই মাত্র তেজ করা হয়েছে। তারপর রুস্তম বললেন, তোমার বর্শার ফলা খুবই ছোট ; যুদ্ধে কি কাজে আসবে ? হযরত রিবঈ (রা) জবাব দিলেন, এ ফলা শত্রুদের বক্ষ ভেদ করে একবারে এপার-ওপার হয়ে যেতে পারে। তুমি দেখনি যে, আগুনের একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও সমগ্র শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে? এ ধরনের খোঁচা-খুঁচি কথাবার্তার পর রুস্তম বললেন, আচ্ছা, আমরা তোমার কথাগুলো ভেবে দেখব এবং আমাদের উপদেষ্টাদের সাথে এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করব। তারপর রিবঈ (রা) সেখান থেকে উঠে অশ্বারোহী সোজা হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে চলে যান।

পরদিন রুস্তম হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে পুনরায় পয়গাম পাঠালেন, আজও আপনার দূতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। এবার হযরত সা'দ (রা) হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন মুহসিন (রা)-কে পাঠান। হযরত হুযায়ফা (রা)-ও আজ সেইরূপ বেপরোয়া ভঙ্গিতে রুস্তমের দরবারে গিয়ে হাযির হন, যেরূপ গতকাল হযরত রিবঈ (রা) গিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি রুস্তমের সামনে পৌঁছা সত্ত্বেও ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন না, বরং ঘোড়ার পিঠে বসেই তার সিংহাসন ঘেঁষে দাঁড়ালেন। যখন রুস্তম বললেন, এর মধ্যে কি কারণ থাকতে পারে যে, আজ তোমাকে পাঠানো হয়েছে এবং গতকালকের ঐ ব্যক্তিকে পাঠানো হয়নি? হযরত হুযায়ফা জবাব দিলেন, আমাদের নেতা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ। তিনি প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সুযোগ দিয়ে থাকেন। গতকাল ঐ ব্যক্তির পালা ছিল। আজ আমার পালা এসেছে। রুস্তম বললেন, তুমি আমাদেরকে কত দিনের অবকাশ দিতে পার? হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন, আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত। রুস্তম এ কথা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সোজা ইসলামী বাহিনীর কাছে ফিরে এলেন। আজ হযরত হুযায়ফা (রা)-এর এ বেপরোয়া ভাব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রত্যক্ষ করে রুস্তমের সভাসদবৃন্দ আরো বেশি স্তম্ভিত হল। পরদিনও রুস্তম ইসলামী বাহিনীর একজন দূতকে ডেকে পাঠান। আজ হযরত মুগীরা ইবন শুবাহ (রা)-কে পাঠানো হয়। হযরত মুগীরা (রা)-কে রুস্তম একাধারে প্রলোভিত ও ভীতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। এতদসত্ত্বেও হযরত মুগীরা (রা) অত্যন্ত কড়া ও যথাযথ জবাব দেন। তাতে রুস্তম রাগান্বিত হয়ে বলে উঠেন, আমি তোমাদের সাথে

কখনো সন্ধি করব না, বরং তোমাদের সকলকে হত্যা করব। তখন হযরত মুগীরা (রা) সেখান থেকে উঠে মুসলিম বাহিনীর দিকে চলে আসেন।

কাদিসিয়া যুদ্ধ

হযরত মুগীরা (রা) ফিরে আসার সাথে সাথে রুস্তম তার বাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে একটি নদী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রুস্তম সে নদীর উপর সেতু নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশ সাথে সাথে কার্যকর হয়। পরদিন ভোর বেলা রুস্তম হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে পয়গাম পাঠান : তুমি নদীর এপারে এসে লড়বে, না আমরাই ওপারে আসবো? হযরত সা'দ (রা) বলে পাঠান : তোমরাই নদীর এপারে চলে এসো। কাজেই সমগ্র ইরানী বাহিনী নদী অতিক্রম করে রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালো। ডান পাশের বাহিনী বাম পাশের বাহিনী, অগ্রবর্তী বাহিনী, পশ্চাদবর্তী বাহিনী তথা সমগ্র বাহিনীর প্রত্যেকটি অংশকে রুস্তম জঙ্গী হাতি ও বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুললেন। তিনি নিজে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান নেন। ইরানী বাহিনীর সংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও অধিক। তাছাড়া ইসলামী বাহিনীর তুলনায় ইরানী বাহিনী ছিল রণ-সজ্জায় অধিকতর সজ্জিত। ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) 'ইরকুন্ নিসা' (উরু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত অসহ্যকর ব্যথা) রোগাক্রান্ত ছিলেন বলে না ঘোড়ার উপর আরোহণ করতে পারছিলেন, আর না চলাফেরা করতে পারছিলেন। রণক্ষেত্রে ইসলামী বাহিনীর ঠিক সম্মুখভাগে প্রাচীন যুগে নির্মিত একটি দালান দাঁড়িয়েছিল। হযরত সা'দ (রা) স্বয়ং ঐ দালানের ছাদে উঠে একটি বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়েন এবং আপন জায়গায় হযরত খালিদ ইব্‌ন আরফাতা (রা)-কে যুদ্ধক্ষেত্রের নেতা মনোনীত করেন, তবে যুদ্ধের ছক প্রণয়ন এবং যুদ্ধ কৌশল রদবদলের যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজ হাতেই রেখে দেন। সে অনুযায়ী তিনি সব সময় হযরত খালিদ ইব্‌ন আরফাতার কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রেরণ করতে থাকেন। যা হোক ইরানী বাহিনীর প্রস্তুতির সংবাদ শুনে ইসলামী বাহিনীর মধ্যেও সাজ সাজ রব পড়ে যায়। হযরত সা'দ (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আমর ইব্‌ন মাদীকারিব (রা), হযরত আসিম ইব্‌ন আমর (রা), হযরত রিবঈ (রা), হযরত আমের (রা) প্রমুখ নেতা সমগ্র ইসলামী বাহিনী পরিক্রম করে মুসলমানগণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তোলেন। কবিরা রণসঙ্গীত গাইতে থাকে এবং কারী সাহেবরা সুমধুর সুরে যুদ্ধের বর্ণনাসম্বলিত সূরা 'আনফাল'-এর আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে এক অতুলনীয় প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

মোটকথা, উভয় বাহিনী যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সর্বপ্রথম ইরানী বাহিনীর পক্ষ থেকে হরমুয নামীয় একজন রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে আসে। তার মাথায় ছিল সোনার মুকুট। সে ছিল ইরানের বিখ্যাত বীরদের অন্যতম। তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনী থেকে হযরত গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) এগিয়ে যান এবং মুহূর্তের মধ্যে হরমুযকে বন্দী করে নিয়ে এসে হযরত সা'দ (রা)-এর হাতে সমর্পণ করেন। তারপর আর একজন বীর অশ্বারোহী পারস্য বাহিনী থেকে এগিয়ে আসে। তার মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনী থেকে হযরত আসিম (রা) এগিয়ে যান। উভয় পক্ষের মধ্যে দু'একটি সংঘাত হতে না হতেই ইরানী অশ্বারোহী পলায়ন করে। হযরত আসিম (রা) তার

পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং পারস্য বাহিনীর সম্মুখসারির নিকটবর্তী হতেই তার (প্রতিপক্ষের) ঘোড়ার লেজ টেনে ধরে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তারপর জাপটে ধরে নিজের ঘোড়ার উপর বসিয়ে বন্দী করে নিয়ে আসেন। হযরত আসিম (রা)-এর এ বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে ইরানী বাহিনীর আর একজন বীর রৌপ্য নির্মিত একটি বিরাট গদা নিয়ে এগিয়ে আসে। তার মুকাবিলায় হযরত আমর ইব্‌ন মাদীকারিব (রা) এগিয়ে যান এবং চোখের পলকে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রুস্তম তার বেশ কয়েকজন সেনাপতিকে এভাবে বন্দী হতে দেখে সমগ্র বাহিনীকে একসাথে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। প্রথমে সারিবদ্ধ রণহস্তীদেরকে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। বুজায়লা গোত্র হস্তীদের এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তবে এজন্য তাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। হযরত সা'দ (রা) যিনি অত্যন্ত গভীরভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, বনী আসাদ গোত্রের লোকদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তারা অতি শীঘ্রই বুজায়লা গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে যায়। বনী আসাদ সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং বীরদর্পে হস্তী বাহিনীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অবস্থাও যখন নাজুক হয়ে পড়ে তখন হযরত সা'দ (রা) কিনদাহ গোত্রকে সে দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বনূ কিনদাহ্ এমনভাবে হস্তী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, ইরানীরা অনন্যোপায় হয়ে পিছনে হটতে থাকে। রুস্তম এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তার সমগ্র বাহিনীকে একসাথে মুসলমানদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। শত্রুদের এ সম্মিলিত আক্রমণ লক্ষ্য করে হযরত সা'দ (রা) উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি তোলেন। সমগ্র মুসলিম বাহিনীও তাঁর অনুসরণে তাক্‌বীর ধ্বনি তুলে এবং ইরানীদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতি আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন দু'টি সমুদ্র পরস্পরের উপর আছড়ে পড়ছে বা দু'টি পর্বত পরস্পরকে সজোরে ধাক্কা মারছে। শীঘ্রই দু'টি বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পরের সাথে মিশে গেল। এমতাবস্থায় ইরানী জঙ্গী হাতিরা ইসলামী বাহিনীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে থাকে। হযরত সা'দ (রা) তীরন্দাজদেরকে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন যেন তারা হাতি ও হাতির আরোহীদের উপর অবিলম্বে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। হযরত আসিম (রা) বর্শা দিয়ে হাতির শুঁড় ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করলেন। মুসলিম তীরন্দাজরা এমন ভয়ানকভাবে তীর বর্ষণ করল যে, হাতির উপর আরোহী ইরানী তীরন্দাজরা তাদের তীর নিক্ষেপের অবকাশই পেল না। ফলে হস্তীবাহিনী পিছনে হটতে থাকে এবং এ সুযোগে মুসলিম বীরেরা তাদের তরবারি চালনার অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে, পরদিন ভোর পর্যন্ত যুদ্ধ আপনা আপনি স্থগিত হয়ে যায়। তা হলো হিজরী ১৪ সনের মুহাররম মাসের রোববারের ঘটনা।

পরদিন ফজরের নামাযের পর হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) শহীদগণকে কাদিসিয়ার পূর্ব প্রান্তে দাফনের ব্যবস্থা করেন। শহীদগণের সংখ্যা ছিল পাঁচশ'। রাতের বেলায়ই আহতদের ক্ষতস্থানে মলম পট্টি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। শহীদগণের দাফন সম্পন্ন করে ইসলামী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। ইরানীরাও অবস্থান গ্রহণ করে। যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি। এমন সময় সংবাদ এলো যে, সিরিয়া থেকে যে মুসলিম বাহিনী পাঠানো হয়েছিল, তারাও কাদিসিয়ার সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা), হযরত হাশিম ইব্‌ন উতবা (রা)-এর নেতৃত্বে ঐ বাহিনী ইরাক থেকে পাঠিয়েছিলেন। এর সম্মুখভাগের

দায়িত্বে ছিলেন হযরত কা'কা ইবন আমর (রা)। তিনি তাঁর ভাগের এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে সর্বপ্রথম কাদিসিয়ায় পৌঁছেন এবং হযরত সা'দ (রা)-কে অবশিষ্ট বাহিনীসমূহেরও আগমন সংবাদ দিয়ে তাঁরই অনুমতিক্রমে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যান এবং প্রতিপক্ষের কাছে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠাবার আহবান জানান। তাঁর সাথে মুকাবিলা করার জন্য বাহমান জাদওয়ায়হ এগিয়ে আসে। দীর্ঘক্ষণ আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলে। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'কা' (রা)-এর হাতে বাহমান নিহত হয়। অনুরূপভাবে আরো কয়েকজন নামকরা ইরানী যোদ্ধা একের পর এক হযরত কা'কা' (রা)-এর হাতে ধরাশায়ী হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে এবার রুস্তম তার সমগ্র বাহিনীকে একজোটে মুসলমানদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। জোরে লড়াই শুরু হয়। পথিমধ্যে হযরত হাশিম ইব্ন উতবা (রা) যখন এ ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ পান, তখন তিনি তার বাহিনীর ছয় হাজার সৈন্যকে অনেকগুলো ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেন এবং কিছুক্ষণ পর পর এক একটি দলকে তাকবীর ধ্বনি তুলে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে মুজাহিদগণের এক এক খণ্ড বাহিনীর মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হতে থাকে। আর মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে এভাবে একটির পর একটি বাহিনী আসতে দেখে ইরানীদের অন্তরে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়।

আজও হস্তীবাহিনী মুসলমানগণকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখে। কিন্তু তারা আজ একটি নতুন কোশল অবলম্বন করে। তারা তাদের উটের উপর থলের মত করে লম্বা লম্বা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। ফলে উটগুলোও হাতির মত ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। আর তা দেখে ইরানী ঘোড়াগুলো ভীতিগ্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটে পালাতে শুরু করে। ফলে ইরানী হাতি দ্বারা এতক্ষণ ইসলামী বাহিনী যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এখন মুসলিম বাহিনীর কৃত্রিম হাতি দ্বারা ইরানী বাহিনীও সেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। আর এ সুযোগে হযরত কা'কা' (রা) শত্রুপক্ষের অনেক পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহীকে হত্যা করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। এদিন মোট এক হাজার মুসলমান এবং দশ হাজার ইরানী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে ফজরের নামায আদায় করেই হযরত সা'দ (রা) প্রথমে শহীদগণের লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন। আহত সৈন্যদের দায়িত্ব মহিলাদের উপর অর্পণ করা হয়। মহিলারা আহতদের ক্ষতস্থানে মলম-পট্টি লাগাবার ব্যবস্থা করে। তারপর উভয় বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে একে অন্যের মুখোমুখি হয়। আজও ইরানীরা হাতিগুলোকে সম্মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু হযরত কা'কা' ও হযরত আসিম (রা) সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে জঙ্গী হাতিদের সরদার সাদা হাতিটিকে বধ করে ফেলেন। তারপর অন্য একটি বিরাট হাতিকে বধ করে ফেলেন। তারপর অন্য একটি হাতিকে আক্রমণ করা হয় এবং সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে হাতিটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। আর ঐ পলায়নপর হাতিটিকে অনুসরণ করে অন্য হাতিরাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। এভাবে আজ হাতিদের দ্বারা ইসলামী বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে ইরানী বাহিনীই উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কেননা, হাতিগুলো পিছন ফিরে পালাবার সময় ইরানী বাহিনীকে দলিত-মথিত করে যাচ্ছিলো। এদিনও ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য উভয় বাহিনী পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারপর তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাগরিবের সময় থেকে শুরু করে ভোর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত

থাকে। সারারাত ব্যাপী এমনভাবে হৈ চৈ চলে যে, হযরত সা'দ (রা) কিংবা রুস্তম কেউই যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারছিলেন না। মোটকথা, এটি ছিল একটি বিস্ময়কর রাত। ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত সা'দ (রা) সারা রাত দু'আর মধ্যে কাটিয়ে দেন। মধ্যরাত্রির পর যুদ্ধক্ষেত্রের হৈ চৈ-এর মধ্যে তিনি হযরত কা'কা' (রা)-এর আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তাঁর লোকদেরকে বলছিলেন : সব দিক গুটিয়ে নিয়ে মধ্যবর্তী বাহিনীকে আক্রমণ কর এবং রুস্তমকে বন্দী কর। এ আওয়াজ শুধু হযরত সা'দ (রা)-কে আশ্বস্ত করেনি, বরং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে। সারাদিন এবং সারারাত লড়াই করে মুসলিম মুজাহিদরা একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক গোত্রের সরদার নিজ নিজ লোকদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। পুনরায় মুসলমানরা নব উদ্যমে তরবারি চালাতে শুরু করে। হযরত কা'কা' (রা) তাঁর সেনাদল নিয়ে সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান, যে স্থানে রুস্তম একটি সোনার সিংহাসনে বসে আপন বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন। মুসলিম আক্রমণকারীরা রুস্তমের নিকটবর্তী হতেই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে স্বয়ং লড়তে শুরু করেন। কিন্তু কিছুটা আহত হওয়ার সাথে সাথে পিঠটান দেন। তখন হযরত হিলাল (রা) বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। ফলে তার (রুস্তমের) মাজা টুটে যায় এবং তিনি নদীতে গড়িয়ে পড়েন। হিলাল সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে রুস্তমের পা দু'টি টেনে ধরেন। তারপর তাকে উপরে তুলে এনে হত্যা করেন। এবার তিনি রুস্তমেরই সিংহাসনে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : মহান আল্লাহ্‌র শপথ, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী বাহিনীতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উঠে। ফলে ইরানীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। ইরানী বাহিনীতে অশ্বারোহীদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার–এদের মধ্য থেকে শুধু ত্রিশ জন সেদিন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাকী সবাই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। হযরত যেরার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইরানের রাজকীয় পতাকাটি দখল করে নেন এবং তা ত্রিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ পতাকাটির মূল্যমান ছিল দু'লক্ষ দশ হাজার দীনার। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সর্বমোট ছয় হাজার মুজাহিদ শাহাদত বরণ করে। হযরত সা'দ (রা) রুস্তমের সমগ্র সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র হযরত হিলাল ইব্‌ন আলকামা (রা)-কে প্রদান করেন। হযরত কা'কা' (রা) ও হযরত শুরাহবীল (রা)-কে ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এর আগেও হযরত যুহরা ইব্‌ন হাওয়াহ একদল মুজাহিদসহ পলায়নপর ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি জায়গায় জালীনূস পলায়নপর ইরানী যোদ্ধাদেরকে একত্র করছিলেন। হযরত যুহ্‌রা (রা) তাকে হত্যা করেন এবং তার পরিত্যক্ত যাবতীয় আসবাব-সামগ্রীসহ হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে নিয়ে যান। জালীনূসের আসবাব-সামগ্রী হযরত যুহ্‌রা (রা)-কে প্রদানের ব্যাপারে হযরত সা'দ (রা) কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য খলীফার দরবারে পেশ করা হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) যুহরা (রা)-এর এ বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন এবং জালীনূসের যাবতীয় আসবাব-সমগ্রী তাঁকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

রণক্ষেত্রের হাঙ্গামা নিবৃত্ত হলে পর হযরত সা'দ গনীমত-সামগ্রী একত্র করেন এবং এ বিজয়-সংবাদ জানিয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন। একটি

দ্রুতগামী উট-সওয়ারের মাধ্যমে পত্রটি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। মদীনা তাইয়িবায় তখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ অবস্থা ছিল যে, তিনি প্রত্যহ ভোর বেলা মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন এবং সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাদিসিয়ার দূতের অপেক্ষা করে দুপুরের পর মদীনা শরীফে ফিরে আসতেন। একদিন যথারীতি মদীনা শরীফের বাইরে গিয়ে তিনি দূতের অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় অনেক দূরে একটি উট-সওয়ার তাঁর নজরে পড়ে। তিনি তার দিকে দ্রুতবেগে ছুটে যান এবং নিকটে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোত্থেকে আসছো। সে উত্তর দিল, আমি কাদিসিয়া থেকে এ সংবাদ নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে যুদ্ধের অবস্থা এবং বিজয়লাভের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন এবং উট সওয়ারের জীনের রেকাব টেনে ধরে তাঁর সাথে ছুটতে ছুটতে মদীনায় প্রবেশ করেন। উট সওয়ার হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কাছে যুদ্ধের অবস্থাদি বর্ণনা করতে করতে উটের পিঠে বসেই দরবারে খিলাফতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শহরে দাখিল হওয়ার পর উট সওয়ার দেখতে পেলেন যে, প্রতিটি লোক সামনে এগিয়ে এসে তার সাথের লোকটিকে সালাম করছে এবং 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করছে। তখন সে বুঝতে পারে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে হেঁটে আসছেন তিনিই মুসলমানদের খলীফা। এটা বুঝতে পেরেই তিনি ভীত হয়ে উট থেকে অবতরণ করার চেষ্টা করেন। এতে হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন : তুমি যুদ্ধের অবস্থাদি বর্ণনা করতে থাক এবং উটের পিঠে বসেই সামনের দিকে এগিয়ে চল। এভাবে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর মসজিদে নববীতে গিয়ে লোকজনদের জড়ো করে এ বিজয় সংবাদ প্রদান করেন। ঐ সমাবেশে তিনি একটি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন এতে তিনি এও বলেছিলেন–

> ভাইসব ! আমি বাদশাহ নই ; আমি তোমাদেরকে আমার গোলামে পরিণত করতে চাই না। আমি নিজেই তো মহান আল্লাহ্র গোলাম। তবে খিলাফতের দায়িত্বে এমনভাবে আঞ্জাম দিই যে, তোমরা শান্তির সাথে নিজ নিজ ঘরে বসবাস করতে পার তাহলে তা হবে আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। মহান আল্লাহ্ না করুন, যদি আমার অভিলাষ হয় যে, তোমরা আমার দরজায় এসে ধর্না দাও– তাহলে তা হবে আমার জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই এবং উপদেশ দেই– তবে শুধু বাক্য দ্বারা নয়, কর্মের দ্বারাও।

বাবেল ও কূছী বিজয়

ইরানীরা কাদিসিয়া থেকে বাবেলের দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখানেই অবস্থান নেয়। পরে কয়েকজন ইরানী সেনাপতি পলাতক সৈন্যদের একত্র করে পুনরায় মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হযরত সা'দ (রা) কাদিসিয়া যুদ্ধের পর সেখানে দু'মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি আপন পরিবার-পরিজনকে কাদিসিয়ায় রেখে স্বয়ং ইসলামী বাহিনীর সাথে মাদায়েনের দিকে যাত্রা করেন। তিনি হযরত যুহরা ইব্ন হাইওয়াকে অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং তাকে পূর্বাহ্নেই মাদায়েনের দিকে পাঠিয়ে দেন। হযরত যুহরা (রা) শত্রুদেরকে মেরে তাড়িয়ে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকেন এবং বাবেলের সন্নিকটে গিয়ে

পৌঁছেন। হযরত সা'দ (রা)-ও তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে সেখানে হাযির হন। ইরানী বাহিনী যখন হযরত সা'দ-এর আগমনের কথা জানতে পারে তখন তাদের কেউ কেউ বাবেল ত্যাগ করে মাদায়েনের দিকে, আবার কেউ কেউ হাওয়াযিন ও নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রা করে। যাবার সময় তারা রাস্তার সকল সেতু ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের জন্য দজলা ও তার শাখা নদীসমূহ অতিক্রম করার কোন পথ বাকী থাকেনি। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইরানীদের পলায়ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ শুনে হযরত সা'দ (রা) হযরত যুহরা (রা)-কে আগেই মাদায়েনের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে প্রধান বাহিনী নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। হযরত যুহরা (রা) যখন কূছী নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন জানতে পারেন যে, সেখানে ইরানীদের বিখ্যাত সেনাপতি শাহরিয়ার তার মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে আছেন। কূছী হচ্ছে সেই স্থান যেখানে নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্দী করে রেখেছিল। শাহরিয়ার যখন জানতে পারলেন যে, হযরত যুহরা (রা) তার সন্নিকটে পৌঁছে গেছেন, তখন তিনি ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে নিজ বাহিনীকে মুসলমানদের মুখোমুখি করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান। তারপর স্বয়ং আগে বেড়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : তোমাদের বাহিনীর মধ্যে যে বীরশ্রেষ্ঠ সে আমার মুকাবিলায় আসুক। হযরত যুহরা (রা) উত্তর দেন ঃ 'আমি নিজে তোমার মুকাবিলার জন্য তৈরী ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার এ অসার লম্ফঝম্প দেখে আমি নিজে না এসে এ বাহিনীর একজন নগণ্য গোলামকে পাঠালাম। সে-ই তোমার সব জারিজুরি খতম করে দেবে।' এ বলে তিনি বনূ তামীম গোত্রের গোলাম হযরত নায়িল ইব্‌ন জু'শুম আ'রাজ (রা)-কে ইঙ্গিত প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত নায়িল (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শাহরিয়ারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান। শাহরিয়ার হযরত নায়িল (রা)-কে খুবই শীর্ণকায় দেখে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসেন এবং তার ঘাড় ধরে এমন জোরে হেচ্‌কা টান দেন যে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এবার শাহরিয়ার তার বুকের উপর চড়ে বসেন। ঘটনাচক্রে শাহরিয়ারের অনামিকা হযরত নায়িলের মুখের নাগালের মধ্যে এসে যায় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা এমন জোরে কামড়ে ধরেন যে, শাহরিয়ার যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠে। আর সেই সুযোগে হযরত নায়িল ঝট করে তার বুকের উপর চড়ে বসেন এবং খঞ্জর বের করে তার পেট একেবারে বিদীর্ণ করে দেন। শাহরিয়ার নিহত হওয়ার সাথে সাথে ইরানী বাহিনী প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। শাহরিয়ারের বর্ম, মূল্যবান পোশাক, সোনার মুকুট, অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুই হযরত নায়িলের ভাগে পড়ে। হযরত সা'দ (রা) কূছী পৌঁছে শাহরিয়ার হত্যা এবং তার বাহিনীর পলায়ন সংবাদ পান। তিনি সেই স্থানটি পরিদর্শন করেন যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তারপর তিনি হযরত নায়িল (রা)-কে নির্দেশ দেন যেন সে শাহরিয়ারের পোশাক পরে এবং তার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার সামনে আসে। নায়িল (রা) তাই করেন এবং মুসলিম বাহিনী এ দৃশ্য দেখে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসায় মেতে উঠে।

বাহরাশীর বিজয়

বাহরাশীর মাদায়েনের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। সেখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ও একটি শহর ছিল। বাহরাশীরে শাহী বডিগার্ডের একটি দুর্দান্ত অশ্বারোহী দল এবং রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষার্থে একটি বিরাট রক্ষীবাহিনী মোতায়েন ছিল। দজলা নদী মাদায়েন ও বাহরাশীরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। দজলার এ পারে ছিল বাহরাশীর এবং ওপারে ছিল

মাদায়েন। ইরানের শাহানশাহ কখনো কখনো বাহরাশীরেও বসবাস করতেন। তাই সেখানেও শাহী দরবার ও শাহী কাজ-কারবার বিদ্যমান ছিল। যাহোক, ইসলামী বাহিনী কূছী থেকে অগ্রসর হয়ে বাহরাশীর পৌঁছা পর্যন্ত বেশ কয়েক জায়গায় ইরানীদের মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী বাহরাশীর অবরোধ করে এবং এ অবরোধ তিন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইরানীরা বাধ্য হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে মনস্থ করে এবং দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। সংঘর্ষ শুরু হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক ইরানী নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। এবার ইসলামী বাহিনী বিজয়ী বেশে বাহরাশীরে প্রবেশ করে। বাহরাশীর বিজিত হওয়ার সাথে সাথে ইয়াযদেজিরদ মাদায়েন থেকে পালিয়ে যেতে মনস্থ করেন এবং সেখানকার ধন-সম্পত্তিও সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। আর ধন-সম্পদসহ ইয়াযদেজিরদ যদি মাদায়েন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন তাহলে তো মুসলমানদের বিপদাশংকা পূর্বের মতই থেকে যায়।

তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ভরা নদীতে

যতশীঘ্র সম্ভব মাদায়েন জয় করা ছিল হযরত সা'দ (রা)-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু দজলা নদী যে মাঝপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানীরা পালাবার সময় যাবতীয় সেতু ধ্বংস করে গিয়েছিল। উপরন্তু তারা দূরা-দূরান্ত পর্যন্ত একটি নৌকাও অক্ষত রেখে যায়নি। এমতাবস্থায় দজলা অতিক্রম করা ছিল খুবই কঠিন। দজলার অপর পারে ইরানী বাহিনী অবস্থান করছিলো। কিন্তু নদীর কারণে তাদেরকে আক্রমণ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। পরদিন হযরত সা'দ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করে নেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : তোমাদের মধ্যে এমন বীর সেনাপতি কে আছে, যে আপন সেনাদলসহ আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়ার সময় সে আমাদেরকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবে? হযরত আসিম ইব্ন আমর (রা) সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছয়শত তীরন্দাজের একটি দল নিয়ে দজলা নদীর এপারে একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান নেন। হযরত সা'দ

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ·

(আমরা মহান আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করি, তাঁর উপর ভরসা রাখি, মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক, সমুন্নত ও মহান আল্লাহ্ সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস)-এ বলে আপন ঘোড়াটি নদীতে ছুটিয়ে দেন। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্যরা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিল এবং দেখতে দেখতে ইসলামী বাহিনী তরঙ্গমুখর দজলা অতিক্রম করে অপর পারের দিকে ছুটে চলল। ইসলামী বাহিনী এভাবে অর্ধেক নদী অতিক্রম করেছে এমন সময় ইরানী তীরন্দাজরা তাদেরকে লক্ষ্য করে অবিরাম তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। এদিক থেকে হযরত আসিম (রা) ও তাঁর দলবল নিয়ে ইরানী তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করতে থাকেন। এতে ইরানীদের অনেকেই হতাহত হয় এবং নিজদের প্রাণ রক্ষায় এতই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে যে, ইসলামী বাহিনীকে নদী পার হওয়া থেকে রুখে রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। আর এ সুযোগে মুসলমানরা অপর তীরে পৌঁছে ইরানীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে।

মাদায়েন বিজয়

মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছার আগেই ইয়াযদেজিরদ মাদায়েন থেকে আপন পরিবার-পরিজন ও ধনরত্ন অন্যত্র সরিয়ে ফেলার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কাসরে আব্‌ইয়ায (শ্বেতপ্রাসাদ) এবং রাজধানীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়ে গিয়েছিল। ইসলামী বাহিনীর নদী পাড়ি দেবার খবর পেয়ে ইয়ায্‌দজিরদ মাদায়েন ছেড়ে পালিয়ে যান। মুসলমানগণ চতুর্দিক থেকে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করে। মুসলমানদের পৌঁছার পূর্বেই শহরের অধিবাসীরা রাজপ্রাসাদ লুট করতে শুরু করেছিল। হযরত সা'দ (রা) যখন কাসরে আব্‌ইয়ায়েয় প্রবেশ করেন, তখন আপনা আপনি তাঁর মুখ থেকে নিম্নের আয়াতে কারীমা বেরিয়ে আসে :

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ . كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ .

ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, যা ওদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (৪৪ : ২৫-২৮)

হযরত সা'দ (রা) সেখানেই এক সালামের সাথে আট রাকাআত 'সালাতুল ফাত্‌হ' (বিজয় উপলক্ষে শুকরিয়া নামায) আদায় করেন। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। কাসরে আব্‌ইয়াযের' যে জায়গায় কিসরার (ইরানের শাহানশাহের) সিংহাসন ছিল সেখানে মিম্বর স্থাপন করা হয় এবং প্রাসাদের ভিতরেই জুমুআর সালাত আদায় করা হয়। এটাই ছিল ইরানের রাজধানীতে প্রথম জুমুআর সালাত আদায়। ঐ প্রাসাদে যে সমস্ত ছবি ও মূর্তি ছিল তা অবিকল সেই অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হয়। হযরত সা'দ (রা) সেগুলোকে ভাঙ্গাননি বা অন্যত্র সরিয়েও ফেলেননি। "ইকামা (অবস্থান)-এর নিয়্যত থাকায় নামাযের মধ্যে 'কসর' (সংক্ষিপ্তকরণ)-ও করা হয়নি। ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য যুহরা ইব্‌ন হাইওয়াকে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পাঠানো হয়। মালে গনীমত একত্র করার কাজে হযরত আমর ইব্‌ন মুকাররিন (রা)-কে এবং তা বন্টনের কাজে সুলায়মান ইব্‌ন রাবী'আ বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। হীরা-জহরতের মূর্তি, কিসরার রাজকীয় পোশাক, মণি-মাণিক্য-খচিত রাজমকুট, বর্ম এবং এ ধরনের আরো অনেক জিনিস মুসলমানগণ ঐ সমস্ত লোকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় যারা রাজপ্রাসাদ থেকে সেগুলো নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে ও যাদুঘরে খাকানে চীন (চীন সম্রাট) কায়সারে রূম (রূম সম্রাট), দাহির শাহ্ (সিন্ধুর রাজা), বাহরাম গোর, নুমান ইব্‌ন মুনযীর, কিসরা (পারস্য সম্রাট) হরমুয, ফিরূয প্রমুখ রাজা-বাদশাহদের ব্যক্তিগত বর্ম, তরবারি ও খঞ্জর পাওয়া যায়। পুরাতাত্ত্বিক বস্তু হিসাবে শাহীভাণ্ডারে সেগুলো সংরক্ষিত হয়ে আসছিল এবং ইরানীরা তা নিয়ে গর্বোবোধ করত। যাহোক, এসব জিনিস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত কা'কা' (রা) রূম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের তরবারিটি উঠিয়ে নেন। তারপর হযরত সা'দ (রা) নিজের পক্ষ থেকে হযরত কা'কা' (রা)-কে বাদশাহ 'বাহরাম গোর'-এর বর্মটিও দান করেন।

হযরত সা'দ (রা) 'খুমুস' (মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ যা রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত) ছাড়াও দরবারে খিলাফতে প্রেরণ করেন দুষ্প্রাপ্য বস্তুরাজি। কিসরার 'বাহার' নামক একটি

শয্যা ছিল ঐ সমস্ত বস্তুর অন্যতম। শয্যাটির দৈর্ঘ্য ছিল নব্বই গজ এবং প্রস্থ ছিল দশ গজ। তাতে ফুল, পাতা, কালি, গাছ, নদীসহ অনেক ধরনের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছিল এবং সবগুলোই ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরা জহরতের তৈরী। বসন্ত বিদায় অনুষ্ঠানে বাদশাহ এ শয্যার উপর বসে মদ্যপান করতেন। যখন ঐ সমস্ত জিনিস মদীনা শরীফে গিয়ে পৌঁছে তখন তা দেখে জনসাধারণের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। হযরত ফারূকে আযম (রা) যাবতীয় দ্রব্য জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে দেন। শাহী শয্যা সম্পর্কে সাধারণ অভিমত এ ছিল যে, তা বন্টন না করে যেন অক্ষত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত আলী (রা) দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠেন : না, এটাকেও বন্টন করা উচিত। কাজেই ফারূকে আযম (রা) হযরত আলী (রা)-এর মতানুযায়ী তা কেটে টুকরো টুকরো করে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হযরত আলী (রা)-এর ভাগে যে টুকরাটি পড়েছিল তা খুব আকর্ষণীয় না হলেও তিনি তা ত্রিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেছিলেন।

জালূলার যুদ্ধ

যখন মাদায়েনের উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইয়াযদেজিরদ মাদায়েন থেকে হালওয়ানে পলায়ন করেন। রুস্তম ইব্ন ফাররূখ যাদ-এর ভাই খারযাদ ইব্ন ফাররূখযাদ মুসলমানগণের মুকাবিলা করার জন্য জালূলা নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। তিনি দুর্গ ও শহরের চারপাশে পরিখা খনন করেন এবং মুসলিম বাহিনীর আগমন ও আক্রমণের পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে রাখেন। এ যুদ্ধের পরিস্থিতি ও সৈন্য সমাবেশ এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বিষয়টির প্রতি ইরানীরা যেমন আশার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো তেমনি মুসলমানগণের সতর্ক দৃষ্টিও সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে অবহিত করেন। দরবারে ফারূকী থেকে নির্দেশ এলো হাশিম ইব্ন উতবা বার হাজার সৈন্য নিয়ে যেন জালূলা অভিযানে বহির্গত হন, আর হযরত কা'কা' (রা)-র হাতে যেন অগ্রবর্তী বাহিনীর, হযরত মা'শারা ইব্ন মালিক (রা)-এর হাতে বাম পাশের বাহিনীর এবং আমর ইব্ন সুররাহকে পশ্চাৎ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত হাশিম (রা) মাদায়েন থেকে রওয়ানা হয়ে চতুর্থ দিন জালূলায় গিয়ে পৌঁছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরটি ঘিরে ফেলেন। এ ঘেরাও বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঐ সময়ে ইরানীরা মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলিমদের উপর ব্যর্থ হামলা চালাতে থাকে।

জালূলা অবরোধ চলাকালে মুসলমান ও ইরানীদের মধ্যে বহুবার অনুরূপ সংঘর্ষ হয় এবং প্রত্যেক বারই ইরানীরা পরাজিত হয়। জালূলায় যেখানে ইরানী যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। ইরানীরা তাদের জনশক্তির আধিক্য এবং যুদ্ধাস্ত্রের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরানীদেরকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়। ঐ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে প্রায় একলক্ষ ইরানী নিহত হয় এবং তিন কোটি দীনার মূল্যের মালে গনীমত মুসলমানদের হাতে আসে। জালূলার পতন-সংবাদ যখন হাল্ওয়ানে অবস্থানরত ইয়াযদেজিরদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তখন সেখানে একটি বাহিনীসহ খাসরা শানূমকে রেখে 'রাই'-এর দিকে পালিয়ে যান। জালূলার যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে কা'কা' (রা) হাল্ওয়ানের দিকে যাত্রা করেন। খাসরা

শানূম হালওয়ান থেকে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। এরপর কা'কা' (রা) হাল্ওয়ান অধিকার করে নেন।

হযরত সা'দ (রা) এ বিজয় সংবাদ এবং সেই সাথে মালে গনীমতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) হযরত যিয়াদ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে পাঠান এবং ইরানের দিকে আরো অগ্রসর হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত যিয়াদ (রা) মালে গনীমত নিয়ে সন্ধ্যার সময় মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। ফারূকে আযম (রা) তাঁর কাছ থেকে মোটামুটিভাবে বিজয় সংবাদ শ্রবণ করে জনসাধারণকে একত্র করেন। তারপর তাকে (যিয়াদকে) নির্দেশ দেন, যেন তিনি বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের অবস্থাদি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। যিয়াদ অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় জনসাধারণের সামনে মুসলিম বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো তুলে ধরেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) মালে গনীমত মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত করে রাখেন এবং তা পাহারার ব্যবস্থা করেন। পরদিন ফজরের পর তিনি জনসাধারণের মধ্যে মালে গনীমত বন্টন করে দেন। তাতে সোনা, রূপা ও হীরা-জহরতের অলংকার এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা) সেগুলো দেখে কেঁদে ফেলেন। যখন হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ তো শুকরিয়া জ্ঞাপনের সময়, অথচ আপনি কাঁদছেন ? হযরত ফারূকে আযম (রা) জবাব দেন, আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে পার্থিব সম্পদ দান করেন তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং তা থেকে দলাদলির সৃষ্টি হয়। সে কথা চিন্তা করেই আমি এখন কাঁদছি।

তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে নির্দেশ পাঠান : মুসলমানগণ যেহেতু একাধারে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, তাই আপাতত তাদেরকে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করতে দাও।

হিজরী ১৬ সনে জালূলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনাকালে ইচ্ছাকৃতভাবেই সন-তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। কেননা, কোন কোন ঘটনায় সন-তারিখ একদল ঐতিহাসিক একরূপ বলেছেন, তো অন্যদল বলেছেন অন্যরূপ। অর্থাৎ অনেক ঘটনারই সন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কাজেই, সন তারিখ বর্ণনার পরিবর্তে ঘটনার ধারাবাহিকতা বর্ণনার উপরই আমরা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি। হিজরী ১৬ সনে জালূলার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ইরাকে ঘটনাসমূহ যেভাবে ঘটেছিল, উপরে ঠিক সেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। এবার আমরা ইরাকের ঘটনাবলীর পরিবর্তে সিরিয়ার ঘটনাবলী বর্ণনায় মনোনিবেশ করবো।

সিরিয়ার যুদ্ধ

ইতিপূর্বে আমরা ইরাকের যুদ্ধসমূহের বিবরণ পেশ করেছি। এবার সিরিয়ার যুদ্ধসমূহের বিবরণ পেশ করতে গেলে আমাদেরকে দু'বছর পিছন থেকে অর্থাৎ দামিস্ক, ফুহল ও বীসান জয়ের পরবর্তী অবস্থা থেকে শুরু করতে হবে।

হিম্স বিজয়

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হযরত আবূ উবায়দাহ্ ইব্ন জার্রাহ (রা) হিমস জয়ের উদ্দেশ্যে যুলকিলা' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। যুলকিলা' হচ্ছে সিরিয়ার ছয়টি জেলার অন্যতম। যুলকিলা মূলত একটি শহরের নাম। এ শহরকে কেন্দ্র করেই উক্ত জেলা গঠিত হয়েছিল।

ইংরেজীতে হিম্‌সকে য়্যামেসা' বলা হয়। ঐ শহরে সূর্য-দেবতার মন্দির ছিল। তাই পৌত্তলিকরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসে সমবেত হত। জর্ডান ও দামিশ্‌ক জয় করার পর মুসলিম বাহিনী হিম্‌স, ইনতাকিয়া, বায়তুল-মুকাদ্দাস প্রভৃতি সেসব বিখ্যাত স্থান যেগুলো তখন পর্যন্ত মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়নি সেগুলোর দিকে রোখ করলেন। যখন ইসলামী বাহিনী যুলকিলা' নামক স্থানে পৌঁছে তখন হিরাক্লিয়াস কূযার বাতরীক নামক জনৈক সেনাপতিকে তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। শাম্‌স বাতরীককেও তার সাহায্যে পাঠান। উভয় বাতরীক (প্যাট্রিয়ক) মিলে ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত রোমান বাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয় এবং শাম্‌স্ বাতরীক হযরত আবূ উবায়দার হাতে নিহত হন। যে সমস্ত রোমান সৈন্য কোন না কোন মতে রক্ষা পেয়েছিল তারা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। পলায়নপর সৈন্যরা যখন হিম্‌সে গিয়ে পৌঁছে, তখন সেখানে অবস্থানরত হিরাক্লিয়াস হিম্‌স ত্যাগ করে আলরাবার চলে যান। হযরত আবূ উবায়দা (রা) এবার হিম্‌স্ ঘেরাও করেন। হিরাক্লিয়াস হিমসবাসীকে সাহায্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কোন সাহায্য হিমস্‌বাসীদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দামিশ্‌কবাসীদের ন্যায় বাধ্য হয়ে হিম্‌সবাসীরাও সন্ধির মাধ্যমে হিমসকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়। হিম্‌স দখলের পর মুসলমানগণ হিম্‌স ও কিন্নাসরীনের মধ্যবর্তী হামাতের দিকে অগ্রসর হয়। হামাতবাসীরাও জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুসলমানের সাথে সন্ধি করে। তারপর মুসলিমগণ শীরয্ ও মুয়াররাহ দখল করেন। তারপর আরো অগ্রসর হয়ে লায্‌কিয়াহ শহরে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খ্রিস্টানরা তাদের মুকাবিলা করে এবং পরাজিত হয়। লায্‌কিয়ার পর সাল্লামিয়াও মুসলমানগণ অস্ত্রবলে দখল করে নেয়।

কিন্নাসরীন বিজয়

সাল্লামিয়াহ্ বিজয়ের পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নির্দেশে তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে কিন্নাসরীনের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে মীনাস নামক জনৈক রোমান সরদার, হিরাক্লিয়াসের পর যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, আগে বেড়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর মুকাবিলা করেন। হযরত খালিদ (রা) জোর আক্রমণ চালিয়ে মীনাসকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য করেন। মীনাস কিন্নাসরীনের দুর্গে প্রবেশ করেন। সঙ্গে হযরত খালিদ (রা)-ও আগে বেড়ে কিন্নাসরীন ঘেরাও করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্নাসরীনও মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এ বিজয় সংবাদ পাওয়ার পর হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তার অধিকার ও সেনাপতির আওতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে নেন।

হল্‌ব (আলেপ্পো) ও ইনতাকিয়া বিজয়

কিন্নাসরীন বিজয়ের পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) হল্‌বের দিকে অগ্রসর হন। হল্‌বের নিকটবর্তী হতেই তাঁর কাছে সংবাদ আসে যে, কিন্নাসরীনবাসীরা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) সঙ্গে সঙ্গে কিন্নাসরীনের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। কিন্নাসরীনবাসীরা অবরোধের মধ্যে পড়ে পুনরায় মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং প্রচুর পরিমাণ জরিমানা দিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হল্‌বের সন্নিকটে অবস্থান নেন এবং অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-কে হল্‌ব ঘেরাও করার নির্দেশ দেন। হলববাসীরা অন্যান্য

বিজিত শহরের অধিবাসীদের ন্যায় কয়েকটি শর্তাধীনে তাদের শহরটিও মুসলমানগণের হাতে সমর্পণ করে। হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি হযরত আবূ উবায়দা (রা) অনুমোদন করেন এবং নিজের স্বাক্ষরে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন।

হল্‌ব বিজয়ের পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) ইনতাকিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ইনতাকিয়া ছিল হিরাক্লিয়াসের এশীয় রাজধানী। সেখানে রাজকীয় প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়েছিল। একটি রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তার সব কিছুই সেখানে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই বিভিন্ন স্থান থেকে পলায়নপর খ্রিস্টানরা ইনতাকিয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। হলবেরও অনেক খ্রিস্টান ইনতাকিয়ায় চলে এসেছিল। মুসলমানগণ ইনতাকিয়ার নিকটবর্তী হলে খ্রিস্টানরা শহর থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানগণের মুকাবিলা করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে পুনরায় শহরে ঢুকে পড়ে। ইসলামী বাহিনী ইনতাকিয়া ঘেরাও করে এবং কিছুদিন পর শহরবাসীরা বাধ্য হয়ে জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুসলমানগণের সাথে সন্ধি করে। কোন কোন খ্রিস্টান স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে নি। তারপর সংবাদ আসে যে, খ্রিস্টানরা হলবের নিকটবর্তী 'মুআর্‌রা মাসরীন' নামক স্থানে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) সেদিকে রওয়ানা হন। সেখানে খ্রিস্টানদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে অনেক খ্রিস্টান ও রোমান নেতা নিহত হন। শেষ পর্যন্ত মুআররা মাসরীনের অধিবাসীরাও হলববাসীদের ন্যায় মুসলমানগণের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এ সন্ধির ব্যাপারটি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই ইনতাকিয়া-বাসীদের বিদ্রোহ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের খবর আসে। অবশ্য আয়ায ইব্‌ন গানাম ও হাবীব ইব্‌ন মাসলামা (রা) সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে পুনরায় শহরটি নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন। এ বিদ্রোহ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পর ইনতাকিয়াবাসীরা পুনরায় ইতিপূর্বেকার শর্তানুযায়ী মুসলমানগণের সাথে সন্ধি স্থাপনের আবেদন জানায় এবং আবূ উবায়দা (রা) তাদের ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন।

বারবার খ্রিস্টানদের এ বিদ্রোহ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে এ মর্মে একটি পত্র লিখেন : বার বার খ্রিস্টানদের ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে কোন কোন সময় মুসলিম বাহিনীকে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই ওদের সাথে বিশেষ ধরনের কি আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন। হযরত ফারূকে আযম (রা) জবাবে লিখেছেন : খ্রিস্টানদের যেসব বড় বড় শহর ও জনবসতি তোমরা ইতিমধ্যে জয় করেছ সেগুলোর প্রত্যেকটিতে স্থায়িভাবে এক একটি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কর। বায়তুল মাল থেকে ওদের বেতন ভাতার ব্যবস্থা করব। যা হোক, ইনতাকিয়া জয়ের পর আশেপাশের প্রত্যেকটি জনবসতিই স্বেচ্ছায় মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বাফ্‌রাস, মারআশ ও হারস বিজয়

সিরিয়ার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে এবং প্রত্যেকটি শহরে ও জনবসতিতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে হযরত আবূ উবায়দা ফিলিস্তীন জয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং মায়সারা ইব্‌ন মাসরূকের নেতৃত্বে বাহিনী বাফ্‌রাম (ইনতাকিয়া অঞ্চলের এশিয়া মাইনর সীমান্তে অবস্থিত একটি স্থান)-এর দিকে পাঠান। সেখানে গাস্‌সান, তানূখ, ইয়াদ প্রভৃতি

আরব গোত্র বসবাস করত। তারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল বিধায় ইনতাকিয়া বিজয়ের অবস্থাদি শুনে হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যাবার প্রস্তুতি নিতেছিল। হযরত মায়সরা ইব্‌ন মাসরূক (রা) সেখানে পৌঁছেই তাদের উপর হামলা চালান। খ্রিস্টানরাও পাল্টা হামলা চালায়। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত মালিক ইব্‌ন আশতার নাখঈ (রা)-কে হযরত মায়সারা (রা)-এর সাহায্যার্থে ইনতাকিয়া থেকে প্রেরণ করেন। এ নতুন বাহিনী সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে যায় এবং হতবুদ্ধি হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মারআশে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার খ্রিস্টানরা স্বেচ্ছা-নির্বাসনের অনুমতি নিয়ে শহরটি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে সমর্পণ করে। অনুরূপভাবে হযরত হাবীব ইব্‌ন মাসলামা (রা) একটি বাহিনী নিয়ে হারস দুর্গে গিয়ে পৌঁছেন এবং তা অধিকার করে নেন।

কায়সারিয়া (কায়সারাহ) ও আজনাদায়ন বিজয়

যে সময়ে ইসলামী বাহিনী ইনতাকিয়াহ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করছিল ঠিক সেই সময়ে দামিশ্‌কের কর্মকর্তা হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আপন ভাই হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে কায়সারিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে আশি-হাজার খ্রিস্টান মুসলমানগণের হাতে নিহত হয় এবং কায়সারিয়া মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

'মারজেরূম' অভিযান এবং বীসান বিজয়ের পর হিরাক্লিয়াস আরতাবূন নামীয় বাতরীককে, যিনি একজন বীরবর ও বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন, আজনাদায়ন নামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন। আরতাবূন সৈন্য সংগ্রহ করে একটি বিরাট বাহিনী আজনাদায়নে নিজের কাছে রাখেন এবং একটি বাহিনী রামাল্লায় ও অপর একটি বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসে মোতায়েন করেন। এ বাহিনীগুলো সব ধরনের সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী মুসলমানদের অপেক্ষা করতে থাকে। হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) যিনি ঐ অঞ্চলের মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন, হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আলকামা ইব্‌ন হাকীম ফারাসী ও মাসরূর ইব্‌ন আল্‌-আকীকে বায়তুল্‌ মুকাদ্দাসের দিকে এবং হযরত আবূ আইয়ুব মালিকীকে রামাল্লায় প্রেরণ করেন। তিনি নিজে আরতাবূনের মুকাবিলায় আজনাদায়নের দিকে রওয়ানা হন। আজনাদায়নে ইয়ারমূক যুদ্ধের ন্যায় এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আরতাবূন হযরত আমর (রা)-এর কাছে পরাজিত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে পলায়ন করেন। হযরত আলকামা ইব্‌ন হাকীম ফারাস, যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সুযোগ দেন। আরতাবূন বায়তুল মুকাদ্দাসে ঢুকে পড়েন এবং হযরত আমর (রা) আজনাদায়ন দখল করে নেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

আরতাবূন বায়তুল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার পর হযরত আমর (রা) গাযওয়া, সুবুত, নাবলুস, লুদ্দ, আমওয়াস, জাবরীন, ইয়াফা প্রভৃতি স্থান দখল করেন। তারপর বায়তুল-মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী সমগ্র এলাকা দখল করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করেন। বায়তুল-মুকাদ্দাস-এর অধিবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘেরাওকারীদের মুকাবিলা করেছিল। হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর আগমন সংবাদ শুনে তাদের সাহস কিছুটা দমে যায়

এবং তিনি সেখানে পৌঁছার পর তাঁর সাথে দূত-বিনিময় শুরু করেন। সন্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপত্তির কিছু ছিল না। তাছাড়া মুসলমানগণ যেসব সন্ধিশর্ত পেশ করত, সেগুলো সরল ও সুনির্দিষ্ট ছিল যে, খ্রিস্টান মাত্রই সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু বায়তুল-মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানরা এবার সন্ধির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়। আর তা ছিল, খোদ মুসলমানদের খলীফা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে অঙ্গীকার পত্র লিখে দিবেন। ইতিমধ্যে আরতাবূন বাতরীক বায়তুল-মুকাদ্দাস থেকে মিসরের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন শুধু শহরের অভিজাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মুসলিম বাহিনীকে কোন মতে প্রতিহত করছিলেন। তাই শহর দখল করাটা এখন খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা) যথাসম্ভব রক্তপাত বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং যুদ্ধের উপর সন্ধিকেই প্রাধান্য দিতেছিলেন। তাই এ মর্মে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনি এখানে আগমন করলে বিনা যুদ্ধে বায়তুল-মুকাদ্দাস আমাদের দখলে চলে আসতে পারে।" পত্র পেয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নববীতে আহবান করেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, খ্রিস্টানরা এখন পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মুকাবিলার বা প্রতিরোধের শক্তি বা সাহস কোনটিই নেই। আপনি বায়তুল্-মুকাদ্দাস সফরে যাবেন না। আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদেরকে আরো লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত বিনা শর্তে ফিলিস্তীন শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন, আমার মতে আপনার ফিলিস্তীনে যাওয়া খুবই জরুরী। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আলী (রা)-এর অভিমতই গ্রহণ করেন।

হযরত ফারূকে আযমের ফিলিস্তীন সফর

এক থলে ছাতু, একটি উট, একজন ভৃত্য ও একটি কাঠের পেয়ালা সঙ্গে নিয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) ফিলিস্তীনের দিকে রওয়ানা হন। হযরত উসমান গনী (রা)-কে তিনি মদীনা শরীফে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে যান। তাঁর এ সফরের আড়ম্বরহীনতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা ইতিহাস-খ্যাত। কখনো ভৃত্য উটের রশি ধরে পথ চলত এবং ফারূকে আযম (রা) উটের উপর সওয়ার হতেন। আবার কখনো ভৃত্য উটের উপর সওয়ার হত এবং স্বয়ং হযরত ফারূকে আযম (রা) উটের রশি ধরে হেঁটে চলতেন। এ ছিল সেই পরাক্রমশালী মহান বাদশাহ্‌র সফর, যাঁর সেনাবাহিনীর ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে অতি সম্প্রতি কায়সার ও কিসরার রাজপ্রাসাদ, রাজসিংহাসন এবং রাজমুকুট দলিত-মথিত হয়েছে। হিজরী ১৬ সনের রজব মাসে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ সফর শুরু হয়। এর কিছুদিন পূর্বেই মুসলিম বাহিনী মাদায়েন ও ইনতাকিয়া দখল করেছিল। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তিনি এ সম্পর্কে দামিশ্‌ক্ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদেরকে অবহিত করেন। বায়তুল-মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা), তারপর হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা), তারপর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিহিত অবস্থায় এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দেখে তিনি যারপরনাই বিচলিত ও রাগান্বিত হন এবং বলে উঠেন : তোমরা দেখছি মাত্র দু'বছরের মধ্যেই অনারবদের সব ঠাট্‌বাট্ গ্রহণ করে নিয়েছ। কিন্তু যখন নেতৃবৃন্দ বললেন, আমাদের এ জাঁকজমকপূর্ণ ঢিলা

জামার নীচে যুদ্ধাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে, অন্যথায় আমরা আরব চরিত্রের উপরই কায়েম আছি, তখন তিনি আশ্বস্ত হন।

খ্রিস্টানদের জন্য নিরাপত্তা সনদ

হযরত ফারূকে আযম (রা) জাবিয়াহ্ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানেই বায়তুল মুকাদ্দাসের নেতৃবর্গ তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি তাদের জন্য নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তা সনদ লিখে দেন।

এ হলো সেই নিরাপত্তা সনদ, যা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা) ইলিয়াবাসীদের জন্য প্রদান করছেন। তার মাধ্যমে ইলিয়াবাসীদের জান, মাল, গির্জা, ক্রশ সবকিছুকে এবং সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকেও নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। ঐ সমস্ত গির্জাকে আবাসস্থলে পরিণত করা হবে না, ধ্বংস করা হবে না, এমন কি সেগুলোর সীমানা প্রাচীরও নষ্ট করা হবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না এবং কেউ কারো ক্ষতি করতে পারবে না। ইলিয়ায় ওদের (খ্রিস্টানদের) সাথে ইয়াহূদীরা থাকতে পারবে না। ইলিয়াবাসীদের কর্তব্য হলো, জিযিয়া প্রদান করা এবং গ্রীকদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া। তবে গ্রীক তথা রোমানদের মধ্য থেকে যারা শহর ছেড়ে চলে যাবে, তাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, যতক্ষণ না তারা একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যায়। যদি কোন রোমান ইলিয়ায় থাকা পসন্দ করে তাহলে তাকে শহরের অন্যান্য নাগরিকদের মত জিযিয়া দিতে হবে। আর যদি ইলিয়াবাসীদের কেউ রোমানদের সাথে চলে যেতে চায়, তাহলে তারও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, যতক্ষণ না সে একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে। যা কিছু এ নিরাপত্তা সনদে লিপিবদ্ধ করা হলো, তার দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল, খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সমগ্র মুসলমানগণের উপর বর্তাবে, তবে তা এ শর্তে যে, ইলিয়াবাসীরা নির্ধারিত জিযিয়া পরিশোধ করতে কখনো অস্বীকার করবে না।

ঐ নিরাপত্তা সনদের উপর সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা), হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) ও মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)। বায়তুল-মুকাদ্দাসবাসীরা অবিলম্বে জিযিয়া প্রদান করে শহরের দরজা খুলে দেয়। এভাবে রামাল্লাহ্বাসীরাও চুক্তির মাধ্যমে তাদের শহরটি মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করে। হযরত ফারূকে আযম (রা) খালি পায়ে বায়তুল্-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। তিনি সর্বপ্রথম মসজিদে আকসায় যান। মিহ্রাবে দাউদে পৌঁছে সিজদা-ই-দাউদের আয়াত পড়ে সিজদা করেন। তারপর খ্রিস্টানদের গির্জায় যান এবং তা পরিদর্শন করে ফিরে আসেন। বায়তুল-মুকাদ্দাস জয়ের পর হযরত ফারূকে আযম (রা) ফিলিস্তীন প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগের উপর হযরত আলকামা ইব্ন হাকীম (রা)-কে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং তাঁকে রামাল্লায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। অপর ভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন হযরত আলকামা ইব্ন মুহরিয (রা)-কে এবং তাঁকে বায়তুল-মুকাদ্দাসে অবস্থানের নির্দেশ দেন।

তিকরীত ও জাযীরা বিজয়

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে হিজরী ২৬ সনের রজব পর্যন্ত সিরিয়া ও ইরাকে সংঘটিত ইসলামের ইতিহাদের ঘটনা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাবে। এবার রোম ও ইরানের অন্যান্য

ঘটনা বর্ণনার পূর্বে তিকরীত বিজয় ও মুসলিম বাহিনী কর্তৃক জাযীরা প্রদেশ দখলের ঘটনাবলী বর্ণনা করা প্রয়োজন। কেননা, তিকরীতে রোমান ও ইরানী বাহিনী সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের ইরাকী ও সিরীয় উভয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে জাযীরা মুসলমানগণের দখলে এসেছিল। তাছাড়া উল্লিখিত ঘটনাসমূহের পরপরই তিকরীত ও আল-জাযীরার ঘটনাবলী ঘটেছিল।

তিকরীতে একজন ইরানী সুবাদার (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) থাকতেন। তিনি যখন শুনলেন, মুসলমানগণ মাদায়েন দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি রোমানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যেহেতু রোমানদের উপরও মুসলিম বাহিনী আঘাত হেনেছিলো তাই ওরা সহজেই ঐ সীমান্তবর্তী সুবাদারের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সাথে সাথে আয়াদ, তাগলিব, নাহার প্রভৃতি আরব বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান গোত্রগুলোও রোমানদের প্ররোচনায় তিকরীতের শাসকের সাথে যোগ দেয়। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতঈমকে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ তিকরীতের দিকে প্রেরণ করেন। ইসলামী বাহিনী তিকরীত ঘেরাও করে ফেলে। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রোমান ও ইরানীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আরব বংশোদ্ভূত অধিকাংশ গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। অতি অল্প সংখ্যক ইরানী ও রোমান সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাকীরা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে এত বিরাট পরিমাণ 'মালে গনীমত' মুসলমানদের হস্তগত হয় যে, খুমূস (রাষ্ট্রীয় পঞ্চমাংশ) বের করে নিয়ে যখন অবশিষ্ট মাল-সম্পদ মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করা হয়, তখন একজন অশ্বারোহীর ভাগে পড়ে তিন তিন হাজার দিরহাম।

জাযীরা প্রদেশ কখনো রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন থাকত, আবার কখনো ইরানী সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে যেত। জাযীরাবাসীরা ইসলামী বিজয় অভিযানের পর্যালোচনা করে হিরাক্লিয়াসের কাছে লিখলো : আপনি সিরিয়ার পূর্ব সীমান্তের শহরসমূহের দিকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করুন। আমরা সকলে মিলে আপনাকে ও আপনার বাহিনীসমূহকে সাহায্য করবো। হিরাক্লিয়াস জাযীরাবাসীদের এ আবেদনকে একটি গাইবী মদদ মনে করে পূর্ব সীমান্তবর্তী শহরসমূহের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে লিখেন : জাযীরাবাসীদেরকে প্রতিরোধ কর, যেন তারা বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। অপর দিকে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে লিখেন : কায়সারের বাহিনী রুখে রাখ, যাতে তারা হিমস্ ও কানসারীনের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। ইরানী ও সিরীয় উভয় বাহিনী-ই যেন নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করে। ফলে কয়েকটি ছোট খাটো যুদ্ধের পর সমগ্র জাযিরা প্রদেশ, হযরত আয়াস ইব্‌ন গানাম (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম অধিকারে চলে আসে। এ হলো হিজরী ১৭ সনের ঘটনা।

ইয়াদ গোত্রের প্রত্যাবর্তন

ঐ বছর যখন সমগ্র জাযীরা প্রদেশ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয় তখন ইয়াদ নামক সেখানকার একটি খ্রিস্টান স্বেচ্ছায় স্বদেশ ছেড়ে হিরাক্লিয়াসের দেশে চলে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হিরাক্লিয়াসকে লিখেন :

আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে, আরব বংশোদ্ভূত একটি গোত্র আমাদের দেশ ছেড়ে তোমাদের শহরসমূহে চলে গেছে। যদি তুমি ঐ আরবদেরকে তোমার দেশ থেকে বের করে না দাও তাহলে আমাদের দেশে যত খ্রিস্টান বসবাস করছে আমরা তাদের সকলকেই দেশ ছাড়া করে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

হিরাক্লিয়াস হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ পত্র পাঠমাত্র ইয়াদ গোত্রের যে চার হাজার লোক তার এলাকায় অবস্থান করছিল, তাদের সকলকে সেখান থেকে বের করে দেন। তারা সিরিয়া ও জাযীরায় ফিরে এসে পুনরায় বসতি স্থাপন করে। হযরত ফারূকে আযম (রা) ইরাকের অনারব এলাকার উপর হযরত হাবীব ইব্‌ন মাসলামাহ (রা)-কে এবং আরব এলাকার উপর হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উক্‌রা (রা)-কে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। আরব বংশোদ্ভূত ইয়াদ গোত্রের খ্রিস্টানরা দেশে ফিরে এলে তিনি হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রা)-কে লিখেন : এদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করো না। যদি তারা জিযিয়া দিতে সম্মত হয় তাহলে তা গ্রহণ কর। যে এলাকায় শুধু মাত্র ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন গ্রহণ করা হবে না, তা হলো পবিত্র মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী আরব উপদ্বীপ এবং ইয়ামেন! তবে তাদেরকে এ শর্তটি অবশ্যই মানতে হবে যে, যে সমস্ত ছেলে মেয়ের পিতামাতা মুসলমান হয়ে গেছে তাদেরকে তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবে না। অর্থাৎ যে সন্তানাদির পিতামাতা মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে যেন তারা খ্রিস্টান বানাবার চেষ্টা না করে এবং যে মুসলমান হতে চায় তাকে যেন বাধা প্রদান না করে।

হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবাহ (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ঐ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কিছু দিন পর ইয়াদ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল পবিত্র মদীনায় এসে আবেদন জানায়, যেন জিযিয়া হিসাবে কোন অর্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করা না হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাদের ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাদের কাছ থেকে 'সাদাকাত' নামে জিযিয়ার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ আদায় করার জন্য ওখানকার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। ইয়াদ গোত্রও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ঐ নির্দেশ সানন্দে মেনে নেয়। কিছুদিন পর ইয়াদ গোত্র হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযাগ পেশ করলে হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে পদচ্যুত করে হযরত ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান (রা) ও হযরত হিন্দ ইব্‌ন উমর জামালী (রা)-কে সেখানকার কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাযীরা বিজয়কে কোন কোন ঐতিহাসিক সিরিয়ার বিজয় অভিযানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মোটকথা, হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) (যিনি আয়ায ইব্‌ন গানামের সাহায্যে এসেছিলেন) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর বাহিনী তথা সিরীয় বাহিনী থেকেই এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জাযীরা বিজয়কে সিরিয়া ইরাক-উভয় দেশেরই বিজয় অভিযানসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদমর্যাদা হ্রাস

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে পদচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু তা মানুষের বুঝার ভুল। প্রকৃতপক্ষে হযরত ফারূকে আযম (রা) তখন হযরত খালিদ (রা)-এর পদমর্যাদা কিছুটা হ্রাস করেছিলেন মাত্র। প্রথমে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ছিলেন প্রধান

সেনাপতি। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে উপপ্রধান সেনাপতির মর্যাদায় নামিয়ে দেন। একটি স্তর নামিয়ে দেওয়ার কারণে তার দায়-দায়িত্বে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। এতে শুধুমাত্র এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীমতো মুসলিম বাহিনীকে কোন আশংকাজনক অবস্থায় ফেলতে পারতেন না। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর মতামত বা অনুমোদন তাকে নিতে হত। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির মূল ঘটনা হিজরী ১৭ সনের শেষ মাসগুলোতে ঘটে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেক সেনাপতি, মুসলিম অধিকৃত প্রত্যেকটি অঞ্চলের কর্মকর্তা, প্রত্যেকটি সেনাদল এবং প্রত্যেকটি শহরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। তার গোপন সংবাদদাতারা প্রত্যেকটি বাহিনী এবং প্রত্যেকটি শহরেই মোতায়েন ছিল। তারা সব সময় খলীফাকে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রাখত। অথচ প্রত্যেক কর্মকর্তা ও প্রত্যেক সেনাপতিও নিজ নিজ অবস্থা সম্পর্কে ফারূকে আযম (রা)-কে যথারীতি অবহিত রাখতেন। ফারূকে আযম (রা)-কে তার একজন গোপন সংবাদদাতা এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) জাযীরা বিজয়ের পর অতি সম্প্রতি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)-কে লিখেন : তুমি খালিদকে ভরা মজলিসে জিজ্ঞেস কর, তুমি আশআছকে যে পুরস্কার দিয়েছ তা কি নিজের পকেট থেকে দিয়েছ, না বায়তুল মাল থেকে দিয়েছ? যদি সে তার পকেট থেকে দিয়ে থাকে তাহলে তা নির্ঘাত অপব্যয়। আর যদি বায়তুল মাল থেকে দিয়ে থাকে তাহলে তা খিয়ানত ও অবিশ্বস্ততা বৈ কিছু নয়। উভয় অবস্থায়ই সে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। তুমি খালিদের পাগড়ী খুলে তা তার গলায় বেঁধে দাও। দূতকে হযরত ফারূকে আযম (রা) আরো বলে দিয়েছিলেন, যদি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যাহোক, হযরত খালিদ (রা)-কে জনসমাবেশে ডেকে পাঠানো হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দূত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এ পুরস্কার কোথা থেকে দিয়েছেন ? হযরত খালিদ (রা) একথা শুনে চুপ থাকলেন, নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে রাযী হলেন না। বাধ্য হয়ে দূত তাঁর পাগড়ী খুলে তাঁর গলায় বেঁধে দিলেন। তারপর পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। তখন হযরত খালিদ (রা) বললেন, আশআছকে আমি আমার পকেট থেকেই দিয়েছি, বায়তুল মাল থেকে দিই নি। দূত একথা শুনে হযরত খালিদ (রা)-এর গলা থেকে পাগড়ী খুলে দিলেন এবং পবিত্র মদীনায় গিয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তখন হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে জবাবদিহির জন্য পবিত্র মদীনায় তলব করেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) খলীফার দরবারে হাযির হয়ে বললেন, 'হে উমর! আল্লাহ্‌র কসম, আপনি আমার সম্পর্কে ন্যায় বিচার করেন নাই। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, আপনার কাছে এত ধন-সম্পদ এল কোত্থেকে? আর কোত্থেকেই বা আপনি একজন কবিকে এত বিরাট পরিমাণ পুরস্কার দিলেন ? হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) জবাবে বললেন, আমি আমার ভাগে যে মালে গনীমত পেয়েছিলাম তা থেকেই এ পুরস্কার দিয়েছি। তারপর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ষাট হাজারের অধিক যে অর্থ আমার কাছে আছে তা আমি বায়তুল মালে জমা দিলাম। হিসাব করে দেখা গেল, বিশ হাজারের কিছু অধিক মুদ্রা তাঁর হাতে

রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন। এখানেই উভয়ের মধ্যকার যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে প্রথম থেকেই এ অভিযোগ ছিল যে, তিনি সামরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি ঠিকমত রাখেন না এবং সম্পূর্ণ হিসাব বুঝিয়েও দেন না। আর তা এ কারণে যে, তিনি বেহিসাব খরচ করেন। অনেক অর্থ তিনি এমনভাবেও খরচ করেন, যা কোন নিয়ম বা বিধানের আওতায় পড়ে না। এ কারণে হযরত ফারূকে আযম (রা) পদমর্যাদা কিছুটা হ্রাস করে দিয়েছিলেন। এবারকার ঘটনা আরো বেশি আপত্তিকর ছিল বিধায় তিনি তাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে কিছুটা কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেন।

বসরা ও কূফা

হিজরী ১৪ সন থেকে হযরত ফারূকে আযমের কাছে প্রেরিত ইসলামী বাহিনীর সেনাপতিগণের রিপোর্ট এবং ইরাকের দিক থেকে আগত সৈন্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বিষয়টি মোটামুটিভাবে জানা হয়ে গিয়েছিল যে, ইরাকের আবহাওয়া আরবগণের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। এ প্রেক্ষিতে হযরত ফারূকে আযম (রা) নির্দেশ জারি করেন, যেন আরববাসিগণের জন্য এমন জায়গায় সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়, যেখানকার আবহাওয়া আরব এলাকার আবহাওয়ার অনুরূপ এবং আরবগণের স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাতে করে মুজাহিদগণ যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে যখন কিছুটা অবসর পান, তখনি ঐ সমস্ত সেনাছাউনিতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন। ঐ সময়ে দজলার সন্নিকটে বসরা শহর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানে একটি সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়। ঐ ছাউনিতে খড় বিচালির চালার নীচেই সৈন্যগণ বসবাস করতেন এবং যখন তাঁরা কোন অভিযানে বের হতেন, তখন আগুন লাগিয়ে ঐ চালাগুলো পুড়িয়ে ফেলতেন। অভিযান শেষে যখন আবার সেখানে ফিরে আসতেন, তখন প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ভাবে চালা তৈরী করে নিতেন। হিজরী ১৭ সনে হযরত ফারূকে আযম (রা) বসরায় গৃহাদি নির্মাণ করেন এবং কূফায়ও একটি সেনাছাউনি স্থানের আবহাওয়া আরবগণের স্বাস্থ্যের খুবই অনুকূল প্রমাণিত হওয়ায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কূফা ও বসরা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির দু'টি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আহওয়ায বিজয় এবং হরমূযানের ইসলাম গ্রহণ

ইরানের প্রখ্যাত নেতা হরমুযান কাদিসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে আহওয়ায প্রদেশের রাজধানী খুজিস্তানে গিয়ে পৌঁছেন এবং ঐ এলাকার শহরগুলোর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ধীরে ধীরে তিনি ঐ এলাকার উপর আপন রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করতে থাকেন। কূফা ও বসরার সেনাছাউনি থেকে মুসলিম বাহিনী তার উপর হামলা চালায় এবং হরমুযান শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত আহওয়ায প্রদেশের উপর নিজের দখল অব্যাহত রাখার জন্য হরমুযান জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুসলমানগণের সাথে সন্ধি করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং 'সূকে আহ্‌ওয়ায' নামক স্থানে মুসলমানগণের হাতে পরাজিত হয়ে 'রাম হরমুয' নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। এবারও হরমুযান অনন্যোপায় হয়ে সন্ধির আবেদন জানান। মুসলমানগণ শেষ পর্যন্ত বাকী এলাকা হরমুযানের দখলে ছেড়ে দিয়ে জিযিয়া শর্তে তার সাথে সন্ধি করে। আহওয়ায বিজেতা হযরত হরকূম ইব্‌ন মুহায়র সা'দী (রা) আহওয়ায পর্বতে তাঁবু স্থাপন করে

আহওয়ায এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরসমূহ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ঐ সময়ে এ মর্মে সংবাদ আসে যে, পারস্য সম্রাট ইয়াযদেজিরদ একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে মুসলমানগণের উপর আক্রমণ পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

এ সংবাদ পেয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে লিখেন : এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন পথে ইসলামী বাহিনী মোতায়েন কর। সে অনুযায়ী হযরত সা'আদ (রা) সাবধানবশত একটি বাহিনী হরমুযানের মুকাবিলায় রাম হরমুযানেও মোতায়েন করেন। কেননা, হরমুযানও ইয়াযদেজিরদের নির্দেশ পালন ও তার সংকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। হরমুযান তার বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করেন কিন্তু তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়। মুসলমানগণ রাম হরমুযান দখল করে নেয়। হরমুযান পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় তাশতর নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন এবং মুসলমানগণের বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তিনি তাশতর দুর্গ পুনর্নির্মাণ করেন, চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন এবং টাওয়ারগুলো মজবুত ও সুদৃঢ় করেন। ইরানী বাহিনীর সৈন্যরাও তার কাছে সমবেত হতে থাকে। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে বসরার সমগ্র বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠান।

হযরত আবূ মূসা (রা) তাশতরের দিকে অগ্রসর হন এবং 'হারকাত' নামক স্থানের নিকটবর্তী হয়ে ইরানীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। হরমুযান কয়েকবারই মুসলমানগণের মুখোমুখি হন, কিন্তু টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাশ্তর দুর্গে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকেই মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। অনেকগুলো সংঘর্ষের পর তাশতর মুসলমানগণের দখলে আসে। হরমুযান তাশতর দুর্গে আশ্রয় নেন। দুর্গটির উপরও মুসলমানগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এমন সময় হরমুযান হযরত আবূ মূসা (রা)-এর কাছে এ মর্মে আবেদন পেশ করেন যে, তিনি নিজেই মুসলমানগণের হাতে নিজেকে সমর্পণ করবেন, তবে এ শর্তে যে, তাকে হযরত ফারূকে আযমের (রা) কাছে পাঠাতে হবে এবং তার ব্যাপারটি খলীফার সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিতে হবে। হযরত আবূ মূসা (রা) তার এ শর্ত মেনে নেন। হরমুযানকে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হযরত আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির এক প্রতিনিধিদলের সাথে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে হরমুযান তার মণিমুক্তা খচিত মুকুট এবং জাঁকজমক পূর্ণ পোশাক পরিধান করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) এতবড় একজন সর্দারকে যখন এভাবে বন্দী অবস্থায় দেখতে পান, তখন তিনি মহান আল্লাহ্র শোকর আদায় করেন। তারপর তিনি হরমুযানকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি বহুবার তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ। এখন বলো, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে ? এ সম্পর্কে তোমার কোন ওযর-আপত্তি থাকলেও অনায়াসে বলতে পার। হরমুযান বললেন, আমি আশংকা করছি, না জানি আমার ওযর-আপত্তির কথা না শুনেই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, না, তুমি সে আশংকা করো না। তোমার ওযর-আপত্তি অবশ্যই শোনা হবে। তারপর হরমুযান পানি চাইলেন এবং পানির পাত্র হাতে নিয়ে বললেন, আমি আশংকা করছি, না জানি পানি পান করার অবস্থায়ই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, তুমি মোটেই ভয় করো না। যতক্ষণ

পর্যন্ত তুমি পানি পান না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। একথা শোনার সাথে সাথে হরমুযান হাত থেকে পাত্রটি রেখে দেন এবং বলেন, আমি পানি পান করবো না। আর এ শর্ত অনুযায়ী আপনি আমাকে হত্যাও করতে পারেন না। কেননা, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

হযরত উমর (রা)-এর চমৎকার ব্যবহার

হরমুযানের কথা শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দান করিনি। কিন্তু হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! হরমুযান সত্য কথাই বলেছে। আপনি তো এই মাত্র বলেছেন তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা না কর এবং পানি পান না কর ততক্ষণ তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। হযরত ফারূকে আযম (রা) একথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি হরমুযানকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমাকে ধোঁকা দেব না। এটাই সমীচীন যে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। হরমুযান তখন তখনই কালিমায়ে তাইয়িবা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এতে হযরত ফারূকে আযম (রা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি হরমুযানকে মদীনায়ে তাইয়িবাতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন এবং দু'হাজার দীনার তার বার্ষিক ভাতা মঞ্জুর করেন। তখন থেকে হযরত ফারূকে আযম (রা) পারস্য অভিযানের সময় প্রায়ই হরমুযানের পরামর্শ নিতেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হযরত আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা) প্রমুখ প্রতিনিধি দলের সদস্যগণকে সম্বোধন করে বললেন, সম্ভবত আপনারা যিম্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন না, তাই ওরা বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। একথা শুনে হযরত আহনাফ ইবন কায়স (রা) বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা সর্বদা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করি এবং যিম্মীদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করি। তাদের বার বার বিদ্রোহী হয়ে উঠার মূল কারণ, আপনি আমাদেরকে পারস্য ভূখণ্ডের দিকে আরো অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন। পারস্যের বাদশাহ্ ইয়াযদেজিরদ পারস্য শহরসমূহে বিদ্যমান। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পারস্য ভূখণ্ডে জীবিত ও নিরাপদ থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পারস্যবাসীরা আমাদের মুকাবিলা থেকে কখনো নিরস্ত হবে না। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আহনাফ (রা)-এর কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এরপর থেকে ইসলামী বাহিনীকে পারস্য ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেন।

মিসর বিজয়

হযরত ফারূকে আযম (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে যান, তখন হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) তার কাছ থেকে মিসর অভিযানের অনুমতি আদায় করে নেন। উপরন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-এর সাহায্যকারী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন। হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মিসরের দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মিসরের বাদশাহ্ মুকাওকাসের কাছে নিম্নোক্ত লিপি প্রেরণ করেন : "হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নয়ত জিযিয়া দাও, নয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এ সময় রোমান সেনাপতি আরতাবূন তাঁর সমগ্র বাহিনীসহ মিসরে অবস্থান করছিলেন। সর্বাগ্রে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলমানগণের মুখোমুখি হন এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মুসলমানগণ আরো অগ্রসর হয়ে 'আইনে

শাম্‌স্‌' নামক স্থানটি ঘিরে ফেলে এবং সেখান থেকে মিসরের 'হিসার ফরমা' নামক সেনাছাউনি ও ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) ঘেরাও করার জন্য দু'টি সেনাদল প্রেরণ করেন। তিনটি স্থানেই বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ ও অবরোধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত 'আহলে শাম্‌স্‌'বাসীরা জিযিয়া দানের শর্তে সন্ধি করে। সন্ধির পর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) বন্দীদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি মিসরের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে সেনাপতি করে একটি বাহিনী ফুসতাতের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলমানগণ তা অধিকার করে নেয়। তারপর আমর ইব্‌ন 'আস (রা) ইস্কান্দারিয়া আক্রমণ করেন। তিন মাস অবরোধ করে রাখার পর ইস্কান্দারিয়াও মুসলমানগণের দখলে আসে। মিসরের বাদশাহ মুকাওকাস, যিনি তখন ইস্কান্দারিয়ায়ই অবস্থান করছিলেন, মুসলমানগণের সাথে এ মর্মে সন্ধি করেন যে, যে ব্যক্তি ইস্কান্দারিয়া থেকে চলে যেতে চায়, তাকে থাকতে দেওয়া হবে। ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) তার সকল বাহিনীর সেনাপতিগণকে ইসকান্দারিয়ায় ডেকে পাঠিয়ে মিসরের বিভিন্ন শহর দখল এবং তথায় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করেন। সমগ্র মিসর দখল এবং তথায় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর তিনি 'তূবাহ্‌' জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ

মাদায়েন ও জাল্‌লা জয়ের পর ইয়ায্‌দেজিরদ 'রাই' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা আবান জাদভিয়া ইয়াযদেজিরদের এ অবস্থানকে তার রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতার প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে ইয়াযদেজিরদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে মনস্থ করে এবং যখন এর চিহ্নাদি প্রকাশ পায় তখন ইয়াযদেজিরদ 'রাই' থেকে ইসফাহান চলে যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি কিরমানের দিকে যাত্রা করেন। তারপর পুনরায় ইসফাহানে ফিরে আসেন। মুসলমানগণ যখন আহওয়ায প্রদেশ দখল করে নেন, তখন ইয়ায্‌দেজিরদ পূর্ব ইরান অর্থাৎ খুরাসানের মার্ভ শহরে চলে যান। সেখানে তিনি পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করতে থাকেন। তার ধারণা ছিল, আরবরা আর সম্মুখে অগ্রসর হবে না। কিন্তু মুসলিম বাহিনী কর্তৃক সমগ্র আহওয়ায দখল এবং হরমুযানকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার সংবাদ যখন তার কানে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে মুসলমানগণের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পুনরায় সেনা সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে চিঠি পাঠিয়ে মুসলমানগণের মুকাবিলায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন।

ইয়ায্‌দেজিরদের এ সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে হঠাৎ যেন তাবারিস্তান, জুরজান, খুরাসান, ইসফাহান, হামাদান, সিন্ধু প্রভৃতি রাজ্যে ও প্রদেশে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ভীষণ রকমের যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক এসে ইয়ায্‌দেজিরদের কাছে সমবেত হতে থাকে। ইয়ায্‌দেজিরদ ফিরূযকে (অপর বর্ণনা মতে মার্দান শাহকে) সেনাপতি নিয়োগ করে দেড় লক্ষ সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী নিহাওয়ান্দের দিকে প্রেরণ করেন। হযরত

ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে, তখন ইরানী বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য তিনি স্বয়ং নিহাওয়ান্দের দিকে রওয়ানা হতে মনস্থ করেন। কিন্তু হযরত আলী, হযরত উসমান গনী এবং হযরত তাল্‌হা (রা) এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করায় তিনি নিজে যুদ্ধাভিযানে অংশ গ্রহণ না করে নু'মান ইব্‌ন মুকরিম (রা)-কে কূফায় অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন : তুমি কূফার নিকটবর্তী কোন জলাশয়ের ধারে অবস্থান গ্রহণ কর। ঐ সময়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে মদীনা শরীফে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রা) তখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সাথেই ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কূফায় কাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছেন ? তিনি জবাবে বললেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবান (রা)-কে। তখন হযরত ফারূকে আযম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবান (রা)-কে লিখেন : আপনি কূফার সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে হযরত হুযায়ফা (রা) ও ইব্‌ন ইয়ামান (রা)-এর নেতৃত্বে হযরত নাঈম ইব্‌ন মুকরিন (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। উপরন্তু তিনি আহওয়াযে অবস্থানরত সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন : আপনারা ফারিস ও ইসফাহানের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করুন, যাতে নিহাওয়ান্দবাসীদের কাছে ইরানী সাহায্য পৌঁছতে না পারে। হযরত নু'মান ইব্‌ন মুকরিন (রা)-এর কাছে যখন সৈন্যরা একত্র হলো, তখন তিনি তার ভাই হযরত নাঈম ইব্‌ন মুকরিন (রা)-কে অগ্রবাহিনীর, হযরত হুযায়ফাকে দক্ষিণ বাহিনীর এবং মুজাশি' ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে পশ্চাৎ বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন। এ সমগ্র বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। মুসলিম বাহিনী কূফা থেকে রওয়ানা হয়ে নিহাওয়ান্দের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখান থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থান নেয়। ইরানী বাহিনীও তাদের দিকে এগিয়ে আসে। ইরানী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ।

বুধবার যুদ্ধ শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয় নি। শুক্রবার দিন ইরানী বাহিনী পুনরায় শহর ও শহর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে চলে যায়। তারা শহরের বহির্ভাগে লোহার কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল, যার কারণে ইসলামী বাহিনী শহরের প্রাচীরের ধারে কাছেও ঘেষতে পারছিল না। অথচ, ইরানীরা যখন ইচ্ছা দরজা দিয়ে বের হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত নু'মান (রা) মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন সেনাপতিকে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান। প্রত্যেকেই তাদের মতামত পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত তুলায়হা ইব্‌ন খালিদ (রা)-এর পরামর্শ সকলের কাছেই গ্রহণীয় হয়। সে অনুযায়ী ইসলামী বাহিনী সশস্ত্র ও সুশৃঙ্খল অবস্থায় শহর থেকে ছয়-সাত মাইল পিছিয়ে গিয়ে এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং হযরত কা'কা' (রা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে শহরবাসীদের উপর হামলা চালান। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দেখে ইরানীরা সাহসী হয়ে উঠে এবং তাদের মুকাবিলার জন্য শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। হযরত কা'কা' (রা) ইরানীদের মুকাবিলা করতে করতে আস্তে আস্তে পিছনে হটতে থাকেন। ইরানীরা এ জয়ের খুশীতে দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলমানগণকে হাঁকাতে হাঁকাতে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে। এভাবে অজান্তে তারা তাদের পরিখাসমূহ থেকে অনেক দূরে চলে যায় এবং মূল ইসলামী বাহিনীর নাগালের মধ্যে চলে আসে। এবার হযরত নু'মান ইব্‌ন মুকরিন (রা) এবং সমগ্র ইসলামী

বাহিনী এক সাথে তাকবীর ধ্বনি তুলে এমনভাবে ইরানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে এবং মুসলমানগণ নির্বিঘ্নে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। সংঘর্ষ চলাকালে হযরত নু'মান ইব্ন মুকরিন (রা) ভীষণভাবে আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে তার ভাই হযরত নাঈম ইব্ন মুকরিন (রা) সাথে সাথে তার (নু'মানের) পোশাক পরিধান করে ইসলামী পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর কেউই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানতে পারে নি যে, তাদের প্রধান সেনাপতি শাহাদতবরণ করেছেন। ইরানী বাহিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবার সময় তাদেরই বিছানো লোহার কাঁটায়ই বিদ্ধ হতে থাকে। শুধু এ সমস্ত কাঁটায় বিদ্ধ হয়েই কয়েক হাজার ইরানী প্রাণ ত্যাগ করে। ইরানী সেনাপতি নিহাওয়ান্দ থেকে পলায়ন করেন। এবার পলায়নকারীরা হামাদানে এসে সমবেত হয়। হযরত নাঈম (রা) ও হযরত কা'কা' ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে শেষ পর্যন্ত হামাদান অবরোধ করে ফেলেন এবং তা অতি সহজেই মুসলমানগণের দখলে চলে আসে। হযরত নু'মান (রা)-এর শাহাদতের পর হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মনোনীত হন। তিনি নিহাওয়ান্দে পৌঁছে মালে গনীমত একত্রিত করেন এবং সেখানকার অগ্নিকুণ্ডের আগুনও নিবিয়ে দেন।

জনৈক অগ্নিপূজারী পুরোহিত অতি মূল্যবান হীরা-জহরতে ভর্তি একটি ছোট সিন্দুক, যা তার কাছে শাহী আমানত স্বরূপ রাখা হয়েছিল, স্বয়ং হযরত হুযায়ফা (রা)-এর হাতে তুলে দেয়। হযরত হুযায়ফা (রা) গনীমত-সামগ্রী মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করেন এবং খুমুসের সাথে ঐ হীরা-জহরতের কাকনটিও হযরত সায়িব ইব্ন আকরা' (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ফারূকে আযমের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত সায়িব ইব্ন আকরা' (রা) হীরা-জহরত এবং সেই সাথে জয়ের সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছেন। বেশ কয়েকদিন যাবত হযরত ফারূকে আযম (রা) মুসলিম বাহিনীর কোন সংবাদ না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সায়িবের মাধ্যমে বিজয় সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং হীরা-জহরতের সিন্দুকটি বায়তুল মালে জমা করে নেন। তিনি হযরত সায়িব (রা)-কে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর একজন দূত তার পিছনে পিছনে কূফায় প্রবেশ করেন এবং তাকে পুনরায় মদীনা তাইয়িবাতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর হযরত সায়িব (রা)-কে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এ হীরা-জহরত রাখার কারণে ফেরেশতারা আমাকে ধমকাচ্ছে। কাজেই, এগুলো আমি বায়তুল মালে রাখব না। তুমি বরং এগুলো নিয়ে যাও এবং বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দাও। হযরত সায়িব (রা) কূফায় গিয়ে এ হীরা-জহরত হযরত আমর ইব্ন হুরায়স (রা) মাখযূমীর কাছে দু'লাখ দিরহামে বিক্রি করে দেন এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সে অর্থ বণ্টন করে দেন। পরে আমর ইব্ন হুরায়স এ হীরা-জহরত ফারিসে নিয়ে গিয়ে চার লাখ দিরহামে বিক্রি করেছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর হত্যাকারী আবূ লূলূ নিহাওয়ান্দের অধিবাসী ছিল এবং ঐ যুদ্ধেই সে মুসলমানগণের হাতে বন্দী হয়েছিল।

বিভিন্ন অনারব অঞ্চল অধিকার

নিহাওয়ান্দের পর হামাদান জয় করা হয়। কিন্তু কিছু দিন পরই হামাদানবাসীরা বিদ্রোহ করে। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) ইরানের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য

এক-একজন সেনাপতি নিয়োগ করে তাঁদেরকে নির্দেশ দেন : 'একের পর এক দেশ জয় কর, তাতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কর, এবং আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাও।' কাজেই, কূফা, বসরা উভয় ছাউনির সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমগ্র ইরান দখলের কাজে মনোনিবেশ করেন। উপরোক্ত ঘটনাবলীর পর হিজরী ২১ সনে এ অগ্রাভিযানের সূচনা হয়। ইরানীদের নিত্যদিনের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত ফারূকে আযম (রা) বাধ্য হয়ে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় তার একান্ত বাসনা ছিল মুসলমানরা তাদের দখলকৃত এলাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক এবং এমন অবস্থায় বসবাস করুক যে, ইরানীদের পক্ষ থেকে কোনরূপ হামলার আশংকা নেই। মোটকথা, এবার সমগ্র ইরান দখলের কাজ শুরু হয়। প্রথম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ইস্পাহান জয় করেন। হযরত নাঈম ইব্ন মুকরিন (রা) এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রাই ও আযারবায়জান দখল করেন। নাঈম ইব্ন মুকরিন (রা)-এর ভাই হযরত সুওয়ায়দ ইব্ন মুকরিন (রা) কূমাস জয় করেন। ইতিপূর্বে মুসলমানগণের হাতে নিহত সেনাপতি রুস্তমের ভাই ইসকান্দিয়ার হযরত উকবা (রা)-এর হাতে বন্দী হন। তারপর জিযিয়া প্রদানের শর্তে জুরজান জয় করেন। তারপর সম্পূর্ণ তাবারিস্তান প্রদেশ মুসলমানগণের দখলে চলে আসে। হযরত বুকায়র (রা) আর্মেনিয়া জয় করেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন রাবীআ (রা) 'বায়যা' নগরী এবং খাযার এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে নিয়ে আসেন।

আসিম ইব্ন উমর (রা) হিজরী ২৩ সনে সীস্তান এবং সুহায়ল ইব্ন আদী (রা) কিরমান জয় করেন। হযরত হাকাম ইব্ন আমর তাগলী (রা) মাকরান অর্থাৎ বেলুচিস্তান রাজ্য দখল করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইরানীদের ঐ করদরাজ্যের শাসক মুসলমানগণের হাতে পরাজিত হন। হযরত হাকাম ইব্ন আমর (রা) গনীমতরূপে প্রাপ্ত কয়েকটি হাতিসহ ঐ বিজয় সংবাদ হযরত সাহ্হার আবাদী (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ফারূকে আযমের কাছে পাঠান। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সাহ্হার আবাদী (রা)-এর কাছ থেকে বিজিত অঞ্চলের যাবতীয় সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হযরত হাকাম বিন আমর (রা)-কে লিখেন : আপনারা যে পর্যন্ত পৌঁছেছেন সেখানেই থাকুন, আর সামনে অগ্রসর হবেন না।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ায্দেজিরদ খুরাসানের রাজধানী অর্থাৎ মার্ভে অবস্থান করছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-কে খুরাসান জয়ের হুকুম দেন। তিনি প্রথমে হিরাত জয় করেন। তারপর মার্ভের দিকে অগ্রসর হন। ইয়ায্দেজিরদ এ সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে মার্ভেরূদ চলে যান। সেখান থেকে তিনি চীনের 'খাকান' (বাদশাহর উপাধি) ও অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠি মারফত সাহায্যের আবেদন জানান। হযরত আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) মার্ভ (মার্ভ শাহজাহান) দখল করে 'মার্ভেরূদ'-এর দিকে অগ্রসর হন। ইয়ায্দেজিরদ সেখান থেকেও পলায়ন করেন এবং বল্খে গিয়ে আশ্রয় নেন। ইয়ায্দেজিরদ যেহেতু খুরাসানে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে এক ভয়ানক সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল, তাই ফারূকে আযম (রা) আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-এর সাহায্যার্থে কয়েকজন বাহাদুর সেনাপতির নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এ সজীব সতেজ দলগুলো যখন হযরত আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি সমগ্র বাহিনীকে নতুন ভাবে সজ্জিত করে বল্খের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাতে ইয়ায্দেজিরদ পরাজিত হয়ে তুর্কিস্তানের দিকে পলায়ন করেন। হযরত আহনাফ ইবন কায়স (রা) সমগ্র খুরাসান দখল করে

মার্ভেরূদকে মুসলমানগণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন। যখন খুরাসান জয়ের সংবাদ হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি হযরত আহনাফের (রা) এ বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন, "হায়! যদি আমাদের ও খুরাসানের মধ্যে একটি আগুনের দরিয়া প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত।" তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য শুধু জয়ের বিস্তৃতি প্রশংসনীয় কিছু নয়, যদি না সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করা যায়। তিনি হযরত আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা)-কে লিখলেন, আপনি যেখানে পৌঁছেছেন সেখান থেকে আর অগ্রসর হবেন না।

ইয়াযদেজিরদ যখন ফারগানায় গিয়ে খাকানের দরবারে হাযির হন, তখন খাকান তার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে ইয়াযদেজিরদের সাথে খুরাসানের দিকে যাত্রা করেন। বলখ পর্যন্ত পৌঁছে খাকান মার্ভেরূদের উপর হামলা চালান।

অপর দিকে ইয়াযদেজিরদ হামলা চালান মার্ভে শাহজাহানের উপর। খাকান মার্ভেরূদে, হযরত আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা)-এর কাছে পরাজিত হন। তার কয়েক জন বিখ্যাত সেনাপতিও মুসলমানগণের হাতে নিহত হয়। এবার খাকান ফারগানার দিকে যাত্রা করেন। এ খবর পেয়ে ইয়াযদেজিরদ ও মার্ভে শাহজাহান থেকে অবরোধ উঠিয়ে তুর্কিস্তানের দিকে চলে যান। ইয়াযদেজিরদের আমীর-উমরা ও সেনাপতিরা এবার সুযোগ বুঝে ইয়াযদেজিরদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তিনি যেসব হীরা-জহরত ও মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে তুর্কিস্তানের দিকে যাচ্ছিলেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এবার খাকান একেবারে শূন্যহস্তে ফারগানায় গিয়ে পৌঁছেন। এ জয়ের সুসংবাদ হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে যখন মদীনা তাইয়িবাতে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি ঘোষণা দিয়ে সমগ্র শহরের জনসাধারণকে মসজিদে নববীতে একত্র করে একটি ভাষণ দেন, যার সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ :

অগ্নি উপাসকদের সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন, আর তারা তাদের দেশের এক বিঘত জমিরও মালিক হতে পারবে না এবং মুসলমানগণেরও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে অগ্নি উপাসকদের ভূসম্পত্তি, তাদের রাজ্য এবং যাবতীয় ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন, যাতে এখন আপনাদের কাজকর্ম ও স্বভাব-চরিত্র যাচাই করতে পারে না। কাজেই, হে মুসলমানগণ! আপনারা আপনাদের চরিত্র পরিবর্তন করবেন না। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের কাছ থেকেও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কোন জাতির হাতে তুলে দেবেন।

এর কিছুদিন পরই হযরত ফারূকে আযম (রা) মদীনা তাইয়িবাতে শাহাদত বরণ করেন।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী

হিজরী ১৭ সনের শেষ দিনগুলোতে ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে প্লেগ রোগ দেখা দেয় এবং হিজরী অষ্টাদশ সনের প্রথম দিকে তা মহামারী আকার ধারণ করে। সেই সাথে আরব ভূখণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের অভাবে দেশ জুড়ে হাহাকার উঠে। হযরত ফারূকে আযম (রা) দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ এবং মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আঞ্চলিক কর্মকর্তার কাছে দূত পাঠিয়ে মদীনাবাসীদের যথাসম্ভব খাদ্যশস্য পাঠাবার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) মিসর থেকে বিশটি জাহাজ ভর্তি খাদ্যশস্য মদীনার দিকে প্রেরণ করেন। এ সমস্ত জাহাজের আগমন সংবাদ পেয়ে খোদ হযরত ফারূকে আযম

(রা)-এর নির্দেশে মদীনা শরীফ থেকে খাদ্যশস্য খালাস করে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখা হয় এবং অভাবগ্রস্তদের তালিকা তৈরী করে তাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ মর্মে অঙ্গীকার করছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দুর্ভিক্ষ কবলিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিছুতেই ঘি এবং দুধ নিজের আহার্য হিসাবে গ্রহণ করবেন না। খরার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত ফারূকে আযম (রা) মদীনাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে ইস্তিসকার নামায আদায় করেন। নামাযান্তে দু'আর জন্য হাত উঠান এবং দু'আ শেষ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। সিরিয়ায় মহামারীরূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে জানতে পেরে হযরত ফারূকে আযম স্বয়ং সিরিয়ার ইসলামী বাহিনীর দিকে রওয়ানা হন। তিনি যখন 'সারাগ' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা) এবং অন্যান্য সেনানায়ক এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কোন কোন সাহাবী আবেদন করেন, আপনি আর অগ্রসর হয়ে প্লেগ আক্রান্ত এলাকায় যাবেন না। হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যেখানে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাবে না। আর যদি ঘটনাক্রমে তুমি যেখানে রয়েছ সেখানে মহামারী দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে পলায়ন করো না। এ হাদীস শোনার পর হযরত ফারূকে আযম (রা) সেখান থেকে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। আসার সময় তিনি ইসলামী বাহিনীর সেনানায়কদেরকে সতর্ক করে দেন, যেন তারা যতদূর সম্ভব এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। হযরত আবূ উবায়দা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং তাঁর বাঁচার কোন আশাই রইলো না, তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) আপন জায়গায় হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং এর কিছুক্ষণ পরই চিরদিনের জন্য দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-ও বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারেন নি। প্রথমে তার ছেলে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তারপর তিনি নিজেও আক্রান্ত হন। তিনি তাঁর ইনতিকালের পূর্বে হযরত আমর ইব্ন 'আসকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) ইসলামী বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যান এবং সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি দলকে পৃথক পৃথক পর্বত চূড়ায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর মহামারীর প্রকোপ হ্রাস পায়। এ মহামারী দেখা দেওয়ার পূর্বেই মিসর বিজিত হয়ে গিয়েছিল। তাই মহামারীর দিনগুলোতেই হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মিসর থেকে মদীনা শরীফে প্রচুর খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন। যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) সিরিয়া সীমান্তে আগমন করেছেন, তখন তিনি নিজেও সিরিয়ায় চলে আসেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিদমতে স্বয়ং হাযির হয়ে তার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করা এবং সেখানকার প্রশাসনিক ব্যাপারে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভ করা। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও হযরত মুআয (রা)-এর পরপর ওফাতের কারণে হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) সঙ্গে সঙ্গে মিসরে ফিরে যেতে পারেনি। এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দামিশ্কের কর্মকর্তা ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) ইনতিকাল করেন। তার ইনতিকালের সংবাদ শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা) তার ভাই

হযরত মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে দামিশ্‌কের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ ব্যবস্থার অধীন হযরত শুরাহবিল ইব্‌ন হাসনাহ (রা) উরদূন (জর্দান) এলাকায় নিযুক্ত হন। এ মহামারীতে অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবী ইনতিকাল করেন। ফলে ইসলামী বিজয় অভিযান স্তিমিত হয়ে পড়ে। কেননা, ইসলামী সেনাবাহিনী তখন নিজেরাই বিপন্ন অবস্থায় ছিল। এ বছরই (হি. ১৮ সনে) হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত শুরায়হ্ ইব্‌ন হারছ কিন্দি (রা)-কে কূফায় এবং হযরত কাআব ইব্‌ন সওয়ার আরযী (রা)-কে বসরার বিচারক নিয়োগ করেন, এ বছরই হযরত ফারূকে আযম (রা) মুসাফিরগণের সুবিধার জন্য মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে গৃহাদি নির্মাণ ও কূপ খননের ব্যবস্থা করেন এবং কা'বাঘর সংলগ্ন মানুষের ঘরবাড়ি খরিদ করে কা'বা ঘরের বারান্দার আয়তন বৃদ্ধি করেন।

ফারূকী আমলে বিজিত দেশসমূহ

হযরত ফারূকে আযমের (রা) খিলাফত আমলে যে সমস্ত দেশ, প্রদেশ ও অঞ্চল বিজিত হয়, সেগুলোর মধ্যে পারস্য, ইরাক, জাযীরাহ, খুরাসান, বেলুচিস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর, আর্মেনিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দশ বছরের খিলাফত আমলে যে বিজয় অর্জিত হয় তা ছিল অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। হযরত ফারূকে আযম (রা) হি. ২২ সনে ইসলামী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন। আর সেগুলো হলো মক্কা মুকাররমাহ, মদীনা মুনাওয়ারাহ, সিরিয়া, জাযীরা, বসরা, কূফা, মিসর, ফিলিস্তীন, খুরাসান, আযারবায়জান ও পারস্য। এগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রদেশের আয়তন ছিল দু'টি প্রদেশের সমান। কোন কোন প্রদেশের আবার দু'দুটি কেন্দ্র ছিল এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রে পৃথক পৃথক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের, একজন ওয়ালী বা কর্মকর্তা, একজন কাতিব (সচিব) বা মীর মুনশী, একজন সেনানায়ক, একজন সাহিবুল খারাজ বা কালেক্টর, একজন পুলিশ অফিসার, একজন ট্রেজারী অফিসার এবং একজন বিচারক অবশ্যই থাকতেন। ফারূকী খিলাফত নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পূর্বে আমরা তাঁর শাহাদত (মৃত্যুবরণ) সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করছি।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদত বরণ

ফিরূয নামীয় মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর জনৈক ক্রীতদাস (যার ডাক নাম ছিল আবূ লূ'লূ') মদীনা তাইয়িবাতে বসবাস করত। একদিন সে বাজারে হযরত ফারূকে আযমের কাছে অভিযোগ করল : আমার প্রভু মুগীরা ইবন শু'বা আমার কাছ থেকে অধিক মাশুল আদায় করে থাকেন। কাজেই, আপনি এর পরিমাণ হ্রাস করে দিন। হযরত ফারূকে আযম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজ কর ? সে উত্তরে বললো, আমি কামার, চিত্রকর ও ছুতারের কাজ করি। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, তোমার এসব শিল্পকর্মের অনুপাতে মাশুলের পরিমাণ তো অধিক নয়। একথা শুনে আবূ লূ'লূ' মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) তারপর তাকে বললেন, আমি শুনেছি তুমি এমন চাক্কি বানাতে পার, যা বাতাসের উপর ভর করে চলে। তুমি আমার জন্যও এ ধরনের একটি চাক্কি বানিয়ে দাও না? সে উত্তর দিল, বেশ আমি আপনাকে এমন একটি চাক্কি বানিয়ে দেব, যার শব্দ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র শোনা যাবে। পরদিন লোকেরা ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে সমবেত হন। আবূ লূ'লূ' একটি খঞ্জর নিয়ে মসজিদে ঢুকল। যখন নামাযের জন্য সারি বাঁধা হল এবং হযরত ফারূকে আযম

(রা) ইমাম হিসাবে আগে বেড়ে নামায পড়াতে শুরু করলেন, তখন মুক্তাদিগণের প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান আবূ লূ'লূ' খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খঞ্জর দ্বারা হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে একে একে ছয়টি আঘাত করল। একটি আঘাত ঠিক নাভীর নীচে পড়ে। হযরত ফারূকে আযমন (রা) হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা)-কে টেনে নিয়ে ইমামতি করার জন্য নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেন এবং আঘাতের যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা) এমন অবস্থায় নামায পড়ালেন যে, ভীষণভাবে আহত হযরত ফারূকে আযম (রা) তার সামনেই পড়েছিলেন। আবূ লূ'লূ' আঘাত হেনেই মসজিদ থেকে পালিয়ে যায়। লোকেরা তাকে ধরার চেষ্টা করে এবং এ অবস্থায় আরো কয়েকজন তার হাতে আহত হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে বন্দী করা হয়। কিন্তু বন্দী হওয়ার সাথে সাথে সে আত্মহত্যা করে। ফজরের নামায আদায় করার পর লোকেরা হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে মসজিদ থেকে উঠিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যায়। চেতনা ফিরে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমার হত্যাকারী কে ? লোকেরা আবূ লূ'লূ'র কথা বললে তিনি বললেন মহান আল্লাহ্র শোক্র, আমি এমন কোন লোকের হাতে মারা পড়িনি, যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেছে কিংবা যে মহান আল্লাহ্কে একটিবারের মত হলেও সিজদা করেছে। একজন চিকিৎসক এসে তাকে দুধ ও নাবীয (খেজুরের নির্যাস থেকে তৈরী পানীয়) পান করালেন। কিন্তু তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলেই তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন এবং তাঁর কাছে আবেদন করেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! যে ভাবে হযরত আবূ বকর (রা) আপনাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন, সেভাবে আপনিও কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত ফারূকে আযম (রা) তখন আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা), হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা), হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে তলব করেন। হযরত তালহা (রা) তখন মদীনা মুনাওয়ারাতে ছিলেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা) বাকী পাঁচজনকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা তিন দিন পর্যন্ত হযরত তালহা (রা)-এর জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি তিনি তিন দিনের মধ্যে চলে আসেন, তাহলে তাকেও আপনাদের দলভুক্ত করে নেবেন। তারপর তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে ডেকে বললেন, যদি খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে তুমি সেই দলে যোগ দেবে, যে দলে আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা) রয়েছে। তারপর তিনি হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) এবং হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠিয়ে নির্দেশ দেন : যখন তাঁরা খলীফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য কোন জায়গায় সমবেত হবেন, তখন তোমরা দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা সলা-পরামর্শের কাজ শেষ না করবেন, তোমরা কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। তারপর তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন : "আপনাদের মধ্যে যিনি খলীফা নির্বাচিত হবেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আমার ওসীয়ত তিনি যেন আনসারগণের অধিকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। কেননা, তাঁরা হচ্ছেন সেই লোক যাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য করেছিলেন এবং মুহাজিরগণকে নিজেদের ঘরে স্থান

দিয়েছিলেন। আনসারগণ আপনাদের অনেক উপকার করেছেন। কাজেই, আপনাদের উচিত, তাদের উপকার করা, তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিকে যথাসম্ভব উপেক্ষা করা এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া। আপনাদের মধ্যে যিনি খলীফা হবেন, তাঁর উচিত হবে, মুহাজিরগণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কেননা, তাঁরাই ইসলামের মূল উপাদান। অনুরূপভাবে যিম্মীদের প্রতিও পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা উচিত। সেই সাথে মহান আল্লাহ্ ও মহান আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূলের প্রতি একজন মুসলমানের যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সেগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যিম্মীদেরকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হবে, সেগুলো যেন অবশ্যই পূরণ করা হয়। তাদের থেকে তাদের শত্রুদেরকে যেন প্রতিহত করা হয় এবং তাদেরকে সামর্থ্যের অধিক কষ্ট যেন দেওয়া না হয়।"

তারপর তিনি পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন : তুমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে গিয়ে আবেদন জানাও, যেন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পাশে আমাকে দাফন করার অনুমতি দান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে গিয়ে হযরত ফারূকে আযম (আ)-এর অন্তিম আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানান। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি সাব্যস্ত করেছিলাম এ জায়গায় আমারই কবর হবে। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা)-এর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী আমি তাঁকেই আমার উপর প্রাধান্য দিলাম। এ জায়গায় যেন তাঁকেই দাফন করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) যখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে ঐ সংবাদ শোনান, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেন : আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ হল। হিজরী ২৩ সনের ২৭ যুলহাজ্জাহ বুধবার তিনি আহত হন এবং হিজরী ২৪ সনের ১লা মুহাররম শনিবার ইনতিকাল করেন।

তাঁর খিলাফতের মেয়াদ কাল সাড়ে দশ বছর। হযরত সুহায়ব (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। হযরত উছমান গনী (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে কবরে নামিয়ে শেষবারের মত শুইয়ে দেন।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন হযরত যয়নব (রা) বিন্ত মাযউন ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জামাহ্। জাহিলিয়া যুগে তাঁর এ বিবাহ হয়েছিল। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ও হযরত আবদুর রহমান 'আকবর' (রা) (বড়) ও হযরত হাফসা (রা)। হযরত যয়নাব (রা) মক্কা শরীফে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা)-এর বোন। হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। এক্ষেত্রে তার ক্রমিক নম্বর ছিল চৌদ্দ। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন মালীকা বিন্ত জারূল খুযাঈ। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উবায়দুল্লাহ্। যেহেতু এ স্ত্রী ঈমান আনেন নি তাই হিজরী ৬ সনে হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে তালাক দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন কারীবা বিন্ত আবী উমাইয়া মাখযূমী। এ বিবাহও জাহিলিয়া যুগে হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করার দরুন এ স্ত্রীকেও হযরত ফারূকে আযম (রা) হিজরী ৬ সনে হুদায়বিয়া সন্ধির পর তালাক দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন উম্মে

হাকীম বিন্‌ত আল-হারছ ইব্‌ন হিশাম মাখযুমী। এ বিবাহ হয় হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ফাতিমা। হযরত উমর (রা) মদীনা শরীফে হিজরত করার পর হিজরী ৭ সনে জামীলা বিন্‌ত আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবূ আফালাহ আওসী আনসারীকে বিবাহ করেন। এ ছিল তাঁর পঞ্চম বিবাহ। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আসিম। কিন্তু, কোন এক কারণে ফারূকে আযম (রা) এ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) ৪০ হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে ষষ্ঠ বিবাহ্ করেন হিজরী ৭ম সনে হযরত উম্মে কুলছুম বিন্‌ত আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিবকে। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রুকাইয়া ও যায়দ। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর চাচাত বোন আতিকা বিন্‌ত যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাযীলকেও বিবাহ করেন। ফাকীহা ইয়ামীনিয়াহও ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের অন্যতম। কারো কারো মতে, ফাকীহা ছিলেন তার ক্রীতদাসী। এরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুর রহমান। 'আওছাত' (মধ্যম)। ফারূকে আযম (রা)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফছা (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ছিলেন স্বনামখ্যাত। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) প্রায় সকল জিহাদেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন।

ফারূকে আযম (রা)-এর উদ্ভাবিত বিধানসমূহ

হযরত ফারূকে আযম (রা) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনেক বিধান উদ্ভাবন করেন। এগুলোকে আউয়ালিয়াতে ফারূকী (হযরত ফারূকে আযম কর্তৃক উদ্ভাবিত বিধান) বলা হয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা) নিয়মিতভাবে বায়তুল মাল বা ট্রেজারী স্থাপন করেন। তিনিই হিজরী সনের উদ্ভাবক। আমীরুল মু'মিনীন' খিতাবে তিনিই প্রথম ভূষিত হন। তিনিই সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীর জন্য নিয়মিত দফতর (অফিস) স্থাপন করেন। পৃথক আর্থিক দফতর স্থাপনও তারই কীর্তি। তিনিই সর্বপ্রথম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বেতন নির্ধারণ করেন।

তিনি ভূমি জরীপ আদমশুমারী ও খাল খননের ব্যবস্থা করেন; বিভিন্ন শহর (যেমন কূফা, বসরা, জাযীরা, ফুসতাত ইত্যাদি) স্থাপন করেন; মুসলিম অধিকৃত এলাকাসমূহকে সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন; বিদেশী বণিকদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন ও ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দেন, দুররাহ্ মারার প্রচলন করেন, জেলখানা নির্মাণ করেন এবং পুলিশ বিভাগও স্থাপন করেন। জনসাধারণের অবস্থাদি সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হওয়ার জন্য খোদ খলীফার রাতের বেলা পায়চারি করার নিয়ম তিনিই প্রবর্তন করেন। তিনিই গুপ্ত সংবাদ দাতা নিয়োগ করেন, মুসাফিরদের সুবিধার্থে কুয়া ও সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং অসহায় ও অভাবগ্রস্ত খ্রিস্টান ও ইয়াহূদীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি জামাআতের সাথে তারাবির নামায আদায়ের প্রচলন করেন এবং তেজারতী (বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ক্রীত) ঘোড়াসমূহের উপর যাকাত নির্ধারণ করেন। তিনিই জানাযার নামাযের মধ্যে চার তাকবীরের সর্বসম্মত বিধান প্রবর্তন করেন।

ফারূকে আযম (রা)-এর আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যাদি

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খাবার ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের। বহির্দেশ থেকে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসব দূত বা প্রতিনিধি দল মদীনা শরীফে

আসতেন, তারা অতিথি হিসাবে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সাথেই আহার করতেন। তাতে তাদের কিছুটা কষ্টের সম্মুখীন হতে হত এজন্য যে, তারা সাদাসিধে খাবারে সাধারণত অভ্যস্ত ছিলেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর পোশাকও ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের। তাঁর বেশীর ভাগ পোশাকই ছিল তালিযুক্ত। এমন কি কোন কোন সময় তার পরিহিত সুতিবস্ত্রের মধ্যে চামড়ার তালিও থাকত। কোন কোন সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। এরূপ করাটা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু, যখন তিনি বাইরে আসতেন তখন জানা যেত যে, তাঁর গায়ের কাপড়গুলো ময়লা হয়ে যাওয়ায়, ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে দেওয়া হয়েছিল এবং তা শুকানো পর্যন্ত ঘর থেকে বের হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেননা, এগুলো ব্যতীত তার আর দ্বিতীয় কাপড় ছিল না। হিজরতের পর তিনি প্রথম প্রথম মদীনা শরীফ থেকে দু'তিন মাইল দূরবর্তী একটি পল্লীতে থাকতেন। খলীফা হওয়ার পর তিনি মদীনা শরীফের শহর এলাকায় চলে আসেন। এখানে তাঁর ঘর মসজিদে নববীর নিকটে এবং বাবুস-সালাম ও বাবুর রহমতের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। শাহাদতের সময় তিনি ঋণী ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে যান, যেন তার ঘরটি বিক্রয় করে সে অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয়। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ঘরটি খরিদ করেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ঋণ পরিশোধ করা হয়। এক সময় তিনি খুতবায় বলেন, 'হে লোক সকল! আমার জীবনে এমন সময়ও গিয়েছে, যখন আমি ঘরে ঘরে পানি সরবরাহ করতাম, লোকেরা তার বিনিময়ে আমাকে কিছু খেজুর দিত এবং আমি তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতাম। লোকেরা বলল, আপনি এসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার মনে কিছুটা দম্ভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটাই তার ওষুধ। তিনি বহুবার মদীনা তাইয়িবা থেকে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত এবং মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা তাইয়িবা পর্যন্ত সফর করেছেন। কিন্তু তাঁর সাথে কখনো কোন তাঁবু বা ছোট খাটো শামিয়ানাও থাকত না। প্রয়োজন মত কোন বাবলা বৃক্ষের উপর কাপড় ছড়িয়ে দিতেন, তারই ছায়ায় তিনি বিশ্রাম নিতেন। শোয়ার প্রয়োজন হলে মাটির উপরস্থ কংকর ও পাথরসমূহ সমান করে, তারপর কয়েকটি পাথর স্তূপীকৃত করে সেগুলোকে বালিশ বানিয়ে এবং নীচে একটি কাপড় বিছিয়ে তিনি শুয়ে পড়তেন। তিনি বদর যুদ্ধ ও বায়আতুর রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিবৃন্দ, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীবৃন্দ এবং সমগ্র উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবীবৃন্দের জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর চাইতে হযরত উসামা (রা)-এর ভাতা বেশী পরিমাণ নির্ধারণ করলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাতে আপত্তি জানান। তখন তিনি তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসামা (রা)-কে তোমার চাইতে এবং হযরত উসামা (রা)-এর পিতাকে তোমার পিতার চাইতে অধিক ভালবাসতেন।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর উপদেষ্টা ও সভাসদের সকলেই ছিলেন আলিম ও বিজ্ঞ– চাই তারা অধিক বয়স্ক হোন অথবা অল্প বয়স্ক। তিনি আলিম সমাজকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। মানুষ চেনা ও মানুষের গুণাবলী আবিষ্কার করা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি মানুষের মধ্যে কি কি গুণ রয়েছে তা তিনি সহজেই বুঝে নিতেন এবং সে অনুযায়ী তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যিনি যে দায়িত্ব

পালনের জ্ঞান ও যোগ্যতা রাখতেন হযরত ফারূকে আযম (রা) তার উপর ঠিক সেই দায়িত্বই অর্পণ করতেন। যিনি যে পদের যোগ্য তিনি তাকে সে পদেই অধিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও তিনি নিজে সংসারবিমুখ ও আল্লাহ্ভীরু ছিলেন এবং অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কিংবা প্রাদেশিক প্রশাসনে তিনি সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন, তাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে শুধু যুহ্দ (সংসারবিমুখতা), তাকওয়া (পরহিযগারী)-কে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করতেন না, বরং যে কাজে যাকে নিয়োগ করতেন সে কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের পুরাপুরি যোগ্যতা তার মধ্যে আছে কিনা তা পূর্বাহ্নে পরখ করে নিতেন। তাঁর দশ বছরের খিলাফত আমলে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি দেশে শতশত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যদিও তিনি স্বয়ং ঐ সমস্ত যুদ্ধে শরীক হননি, তবু সেগুলোর আয়োজন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতেই ছিল। বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সেনাপতিগণের কাছে তিনি নির্দেশাদি পাঠাতেন এবং সেগুলো খুবই মোক্ষম ও সময়োপযোগী হত। তাই যুদ্ধ, সংঘর্ষ কিংবা প্রশাসনিক ব্যাপারে একথা বলা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) এক্ষেত্রে ভ্রান্তিকর বা খাপছাড়া নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি সকল প্রদেশের কর্মকর্তাদের কাছে এ মর্মে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, কোন মুজাহিদকে যেন একাধারে চারমাসের বেশী যুদ্ধক্ষেত্রে আটকিয়ে রাখা না হয়; বরং চার মাস পরপর যেন তাকে তার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। একদা কোন একটি অসুখের কারণে জনৈক ব্যক্তি তাকে মধু সেবন করতে বলেছিল। কিন্তু তাঁর কাছে মধু ছিল না এবং কোথাও তা পাওয়াও যাচ্ছিল না। অবশ্যই বায়তুল মালে সামান্য পরিমাণ মধু ছিল। লোকেরা বললো, আপনি এ মধুই ব্যবহার করুন। তিনি উত্তর দিলেন, এ তো সমগ্র মুসলমানের সম্পত্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ আমাকে অনুমতি না দেবে, ততক্ষণ আমি এ মধু ব্যবহার করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ মধু ব্যবহার করেন নি।

তিনি খলীফা হওয়ার পর প্রথমে অনেক দিন পর্যন্ত বায়তুল মাল থেকে একটি শস্যকণাও ভাতা হিসাবে গ্রহণ করনে নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, দারুণ অভাব তাঁকে ঘিরে ধরল, ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন পথই তাঁর সামনে খোলা রইল না। অগত্যা তিনি সাহাবায়ে কিরামকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে বললেন, আমাকে খিলাফতের কাজে এ পরিমাণ ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নিজের পারিবারিক খরচের কথা চিন্তাই করতে পারি না। অতএব, আপনারা সবাই মিলে আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে কিছু পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দিন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, আপনি আপনার সকাল-সন্ধ্যার খাবার বায়তুল মাল থেকেই পাবেন, হযরত ফারূকে আযম (রা) তাতেই সম্মত হন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন, এমনটা হয় নি যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) রাগান্বিত হয়েছেন, তখন কেউ তাঁর সামনে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করল কিংবা কুরআন শরীফের কোন আয়াত পাঠ করল কিংবা তাঁকে মহান আল্লাহ্র ভয় দেখালো এবং তাতে তাঁর রাগ প্রশমিত হল না। হযরত বিলাল (রা) একবার হযরত আসলাম (রা)-কে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি; কিন্তু যখন তিনি রাগান্বিত হন তখন অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। তখন হযরত বিলাল (রা) বলেন, ঐ সময়ে তুমি পাক কুরআনের কোন একটি আয়াত পাঠ কর

না কেন, যাতে তাঁর সমস্ত রাগ উবে যায় ? হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একবার হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সারিয়াহ (রা) নামক জনৈক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের নেতা করে পাঠান। কিছুদিন পর হঠাৎ এক জুমু'আর খুতবায় হযরত ফারূকে আযম (রা) তিন তিন বার উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও।"

এক সময় তিনি উটের ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আমার ভয় হয়, হয়ত কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। এক সময় তিনি হযরত সালমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো, আমি বাদশাহ্ না খলীফা ? তিনি জবাব দিলেন, যদি আপনি কোন মুসলমানের কাছ থেকে এক দিরহাম কিংবা তার চাইতেও অল্প বা অধিক আদায় করে তা আপনার ব্যক্তিগত কাজে খরচ করেন, তাহলে আপনি বাদশাহ্– অন্যথায় খলীফা।

প্রায় একমাস পর একজন দূত হযরত সারিয়াহ্ (রা)-এর কাছ থেকে মদীনা তাইয়িবাতে আসেন। তিনি সেখানকার অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিন তিন বার জনৈক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলছিলেন, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও।" আমরা তখন দ্রুত পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের শত্রুদেরকে পরাস্ত করলেন। যেদিন হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর খুতবার মধ্যে এ শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন সেদিন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে হযরত সারিয়া (রা)-কে ডাকছেন কেন ? তিনি তো নিহাওয়ান্দে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করছেন ? হযরত ফারূকে আযম (রা) জবাবে বললেন, তখনি আমি এরূপ একটি দৃশ্য দেখলাম যে, মুসলমানগণ যুদ্ধ করছে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যে, তখনই পাহাড়ের দিকে না গেলে শত্রুরা তাদের পর্যুদস্ত করে ফেলবে, তাই হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে ঐ শব্দগুলো বের হয়ে গেল। হযরত সারিয়া (রা)-এর পত্রেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে এ একই তারিখে ঠিক জুমু'আর দিন এবং জুমু'আর নামাযের সময়ে ঐ ঘটনা ঘটেছিল। একবার হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে বলেন, মানুষ আপনাকে এত ভয় করে যে, না তারা আপনার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে, আর না আপনার সামনে কথা বলতে পারে। হযরত ফারূকে আযম (রা) তখন বললেন, মহান আল্লাহ্র শপথ, তারা আমাকে যতটুকু ভয় করে আমি ওদেরকে তার চাইতেও বেশী ভয় করি।

হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রদেশসমূহের উলামা ও গভর্নরদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন তারা সবাই হজ্জের সময় হজ্জ করতে আসেন। তিনি নিজেও প্রতি বছর হজ্জ করতে যেতেন। গভর্নর বা কর্মকর্তাদেরকে হজ্জ উপলক্ষে মক্কা মুকাররমাতে একত্র করার মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যে, তখন প্রত্যেক প্রদেশের ও প্রত্যেক অঞ্চলের লোকেরাও খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেত এবং তাদের অঞ্চলে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন দোষত্রুটি থাকলে তা খলীফার কাছে অবাধে বলতে পারত। আবার ঐ কর্মকর্তা যেহেতু ঐ সময় সেখানে হাযির থাকতেন, তাই খলীফা তার থেকে ঐ অভিযোগের ব্যাখ্যা তলব করতে পারতেন। এ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কর্মকর্তাগণ নিজেদের দায়িত্ব পালনে সদাসতর্ক থাকতেন। তাদের ভয় ছিল, কর্তব্য পালনে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে হজ্জের সমাবেশে তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে। হযরত ফারূকে আযম (রা) সাম্য ও গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। আজকালকার ইউরোপীয় গণতন্ত্র, যা

ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের বিরোধী, তার প্রতি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কোন আকর্ষণ ছিল না। একবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানকালে জনৈক স্ত্রীলোক তাঁকে সম্বোধন করে বলে উঠেন, আপনার এ কথা ভুল। স্ত্রীলোকটি যেহেতু ঠিক কথাই বলেছিল, তাই হযরত ফারূকে আযম (রা) জনসমাবেশের মধ্যেই নির্দ্বিধায় নিজের সে ভুল স্বীকার করে নেন।

বিজয় অভিযানসমূহ : একটি পর্যালোচনা

বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) কর্তৃক বিজিত ভূখণ্ডের আয়তন ছিল সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল। ইরান ও রোম সম্রাটের মুকাবিলায় আরবের অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুদ্র একটি জাতি কর্তৃক এই বিজয় লাভ শুধু বিস্ময়কর নয় বরং অভাবিতও বটে। রোমান সাম্রাজ্য ছিল বলকান উপদ্বীপ থেকে শুরু করে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর ও সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত। রোমানরা ইরানীদেরকে পরাজিত করে সিরিয়া, ভূমধ্যসাগরের পূর্ববর্তী অঞ্চল, এমন কি মিসরও অধিকার করে নিয়েছিল। ইরানী সাম্রাজ্যের আয়তন রোমান সাম্রাজ্যের চাইতে কম ছিলো না। তখনকার দিনে এ দুই সাম্রাজ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন কোন তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব তখনকার বিশ্বে ছিল না। মুসলমানগণের এ বিস্ময়কর সাফল্য ও অভূতপূর্ব বিজয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে খ্রিস্টান ও অন্যান্য অমুসলিম ঐতিহাসিকরা বলেন, রোমান ও ইরানী উভয় রাষ্ট্রই তখন দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলমানগণ অতি সহজেই সেগুলো দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু তার বর্ণনা করতে গিয়ে তারা ভুলে যান যে, আরবদের তথা মুসলমানগণের শক্তি এ দুই দুর্বল সাম্রাজ্যের অনুপাতে কিছুই ছিলো না। তাছাড়া যখন মুসলমান এবং ঐ দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে একই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় তখন রোমান ও ইরানীদের মধ্যে পরস্পর কোন মতবিরোধ বা লড়াই-ঝগড়া ছিলো না। কাজে তারা উভয়েই তাদের সম্পূর্ণ শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রাখতে পেরেছিল। অপর দিকে মুসলমানদেরকে একই সময়ে রোমান ও ইরানী– এ দু'টি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিলো। তখনকার দিনে এ দুই ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যকে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নতমানের মনে করা হত। তাদের হাতে ছিল প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র, উন্নতমানের রণকৌশল, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কবৃন্দ। আরব তথা মুসলমানগণ এসব ক্ষেত্রে ছিল অনেক পিছনে– বলতে গেলে একেবারে নিঃস্বের পর্যায়ে। মুসলমানগণের অনুপাতে রোমান ও ইরানী শক্তির ব্যাপকতা এভাবেও অনুমান করা যেতে পারে যে, ইরানী এবং রোমানরা এক এক যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহবর্ম ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দু'লক্ষের চাইতেও অধিক সৈন্যকে সাহায্য করার জন্য আবার তাদেরই সমপরিমাণ, অপর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনাবাহিনী পিছনে অপেক্ষমাণ থাকত। ফলে যুদ্ধরত দু'লাখ প্রকার মানসিক প্রশান্তি নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে যেত। অপর দিকে মুসলমানগণের সর্ববৃহৎ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের বেশী ছিল না। অথচ, তারাই প্রায় সর্বক্ষেত্রে দু'লক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মেরে ভাগিয়ে অভূতপূর্ব বিজয়ের অধিকারী হয়েছিল–এমতাবস্থায় যে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের পিছনে কোন বিরাট সেনাবাহিনী বা সেনাছাউনি ছিল না। কাজেই একথা বলা বোকামি ছাড়া কিছু নয় যে, ইরানী ও রোমান সাম্রাজ্য তখন পূর্বের চাইতে দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলমানগণ তাদেরকে অতি সহজেই পদানত করতে পেরেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এর মূল কারণ হলো ইরানী ও রোমান উভয় জাতিই ছিল মুশরিক (অংশীবাদী)। অপর দিকে আরবগণ ছিল ঈমানের বলে বলীয়ান। তারা তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। আর একথা অনস্বীকার্য যে শির্ক বা অংশীবাদিতা মানুষকে কাপুরুষে পরিণত করে, আর ঈমানের বলে বলীয়ান মানুষ স্বভাবতই দুঃসাহসী হয়। কাজেই, ঈমান ও তাওহীদের বদৌলতেই আরবদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে সেই বীরত্বের উদ্ভব হয়েছিল যা ঈমানের জন্য এক অতি জরুরী শর্ত এবং যা কোন ক্ষমতার দাপটে কখনো স্তিমিত হয়ে যায় না। এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে ইসলাম আরবগণকে দিগ্বিজয় ও দেশ শাসনের এমন এক নীতি বা আদর্শ শিক্ষা দিয়েছিল যা ছিল উদার ও জনকল্যাণকর। অপরদিকে ইরানী ও রোমানদের দিগ্বিজয় ও দেশ শাসননীতি ছিল নিম্নমানের, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অমানবিক ও উৎপীড়নমূলক। এ কারণেই মুসলিমগণ যখন কোন শহর বা জনবসতি দখল করতেন তখন সেখানকার অমুসলিমগণই তাঁদের আগমন এবং তাঁদের হুকুমত বা রাষ্ট্রকে জান্নাত তুল্য মনে করত। বিজিত জাতিগুলো বিজয়ী আরবগণের চরিত্র, মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি তাদের করুণা প্রদর্শন, ন্যায়বিচার, দয়া, নেতৃত্বসুলভ আচরণ, উচ্চ মানসিকতা প্রভৃতি দেখেই সানন্দচিত্তে তাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে, তখন মানব জাতি তাঁদের মনুষ্যত্বকে এ বিজয়ী আরবগণেরই মাধ্যমে রক্ষা করতে পেরেছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ইরানী বা রোমানদের জয়লাভ কী করে সম্ভব হতে পারে ? এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলাম আরবগণকে শুধু বীরত্বই দেয় নি, বরং অতুলনীয় ঐক্য ও পরের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার শুভ প্রেরণাও যুগিয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সামগ্রিক এসব গুণ যেরূপ শিকড় গেড়ে বসে ছিল তার দৃষ্টান্ত কোন দেশে বা কোন জাতিতে কখনো পাওয়া যাবে না– পাওয়া যেতে পারে না।

খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধ

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালীন যুগকে ইসলামের দীনী ও মাযহাবী রাষ্ট্রের অর্থাৎ খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধ বলা যেতে পারে। এর শেষার্ধ হযরত উসমান গনী (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফতকালে। খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধের অবস্থা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ সময় কালের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানে কোথাও দীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। মহান আল্লাহ্‌র কালিমা তথা ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে অজান্তে ও ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি সামান্যমাত্র ঝুঁকে পড়ে নি বরং বিশুদ্ধ ইসলামী রং, নিখুঁত ইসলামী আচার-আচরণ, বিশুদ্ধ আরবী ও সংস্কৃতি সর্বত্রই মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্যমান ঝিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উঠাবসা করেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা তখন ছিল প্রচুর। তাঁরা সকলের কাছেই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের নমুনা বা আদর্শ ছিল সকলেরই অনুকরণীয়। তখন মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য বা মতবিরোধের নাম-নিশানাও ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে, মসজিদে, সেনাছাউনিতে, দেশ ভ্রমণের কাফেলাসমূহে মোটকথা সর্বত্রই মুসলমানগণ ছিল পারস্পরিক ঐক্য ও স্নেহ ভালবাসার প্রকৃষ্ট নমুনা। ঈর্ষা, শত্রুতা ও স্বার্থপরতা তখন ইসলামী সমাজের কোথাও দৃষ্টিগোচর হতো না। তখন মুসলমানগণ সব কাজই শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করত। তাঁদের জীবন এত সাদাসিধে ছিল যে, তারা রোমান

ও ইরানীদের আড়ম্বরপূর্ণ আসবাব-সামগ্রী ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনোপকরণসমূহকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। মুসলমানগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব তখনো হয়নি। প্রত্যেক লোকই তখন নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে হাযির জ্ঞান করত। মোটকথা তা ছিল এমন এক যমানা, যেখানে সর্বত্র শুধু পুণ্য, শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছা ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধও নিঃসন্দেহে সততা ও সৌভাগ্যের যুগ। কিন্তু তা প্রথমার্ধের সমকক্ষ বা সমতুল্য নয়। কেননা, প্রথমার্ধের মধ্যে রাসূল-জীবনের পরিপূর্ণ নমুনা ও স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি যেভাবে পাওয়া যায় দ্বিতীয়ার্ধে সেরূপ পাওয়া যায় না।

মুসলমানগণের সাহস ও বীরত্ব মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তথা ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকত। পার্থিব ধনসম্পদ ও দৈহিক সুখ-সম্ভোগের পিছনে তাদেরকে কখনো ছোটাছুটি করতে দেখা যায় নি। খলীফা তাঁর খিলাফত লাভের পূর্বেও তাঁকে ঐ একই কাপড় পরিধান করতে দেখা যেত। খিলাফতের উচ্চ মর্যাদা খলীফাগণের খাওয়া-পরা ও চলাফেরার মধ্যে কোনরূপ তারতম্যের সৃষ্টি করতে পারে নি। মুসলমানগণ ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের উর্বর ও সবুজ শ্যামল এলাকা এবং বিলাস সামগ্রীতে ভরপুর ইরানী শহরসমূহ জয় করেন কিন্তু হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা সিরিয়ার খ্রিস্টান বা ইরানের অগ্নি-উপাসকদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দ্বারা এতটুকুও প্রভাবিত হয় নি। যে মুসলমানগণ ইরাক ও পারস্য জয় করেন তাদের অবস্থান ছিল কূফা ও বসরার কয়েকটি ছাপড়া ও তাঁবুর মধ্যে। অনুরূপভাবে সিরিয়াস্থ ইসলামী বাহিনী ও সিরিয়ার শহরসমূহকে নিজেদের অবস্থানস্থল হিসাবে বেছে নেন নি বরং তারা মোসেল ও দামিশকের পাহাড়-প্রান্তরে ছাউনি তৈরী করে সেখানেই অবস্থান করতেন। শহর ও শহুরে জীবনের প্রতি তাঁহাদের কোন মোহ ছিল না। তাঁরা নিজেদের সৈনিক জীবন এবং সে জীবনের কষ্ট সহিষ্ণুতা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। যে ইসলামী বাহিনী মিসর জয় করে, তারা সেখানকার জাঁকজমকপূর্ণ শহরে জীবন পরিত্যাগ করে ফুসতাতের সেনা ছাউনিকেই (পরবর্তী কালে কায়রো শহরে রূপান্তরিত হয়েছে) নিজেদের অবস্থানস্থল হিসাবে বেছে নেয়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা) মানুষকে শুধু সহজ সরল জীবন যাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধই করেন নি, বরং ব্যক্তিগতভাবে নিজেরাও প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

বায়তুল মালের একটি পয়সাও তারা অযথা খরচ করতেন না এবং অপরকেও অপব্যয় করার অনুমতি দিতেন না। খলীফা সকল মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসতেন। এতে বর্ণ-গোত্রের মধ্যে কোন বৈষম্য করা হত না। দোষী ব্যক্তি– চাই সে যে কোন বংশের বা যে কোন গোত্রের হোক, খলীফা তাকে উচিত শাস্তিই দিতেন। কখনো কোন ব্যক্তি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা বলতে পারে নি যে তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে নিজেকে বিত্তশালী করে তোলার প্রতি সে যুগের সাধারণ মানুষের কোন ঝোঁক ছিল না।

পরবর্তীতে আমরা খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধ নিয়ে আলোচনা করবো। তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথমার্ধের বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে শুরু করেছে। আর খিলাফতে রাশিদার আমল শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেগুলোর অস্তিত্বও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

(খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধ)

হযরত উসমান গনী (রা)

নাম ও বংশ-পরিচয়

তাঁর নাম উসমান ইব্‌ন আফফান ইব্‌ন আবুল 'আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লূওয়াই ইব্‌ন গালিব। আর তাঁর নাম আবূ আমর আবূ আবদুল্লাহ। জাহিলিয়া যুগের পারিবারিক নাম আবূ আমর। মুসলমান হওয়ার পর হযরত রুকাইয়া (রা)-এর গর্ভে তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর জন্ম হয়। তখন থেকে তিনি হযরত আবূ আবদুল্লাহ (রা) নামে পরিচিত হন। হযরত উসমান (রা)-এর মাতামহী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সহোদরা ছিলেন এবং তারা ছিলেন যমজ ভাইবোন। এদিক দিয়ে হযরত উসমান (রা) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফাতো বোনের ছেলে।

গুণাবলী ও প্রকৃষ্টতা

লজ্জা ও শালীনতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। হযরত যায়দ (রা) ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হযরত উসমান আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন ফেরেশতা আমাকে বললেন, তাঁকে দেখলে আমি লজ্জায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ি। কেননা, তাঁকে তাঁর জাতির লোকেরাই হত্যা করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যেভাবে উসমান মহান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে লজ্জা (সমীহ) করেন ফেরেশতাগণও তাকে তেমনি লজ্জা (সমীহ) করেন। হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর কাছে উসমান গনী (রা)-এর লজ্জার (শালীনতার) কথা উঠলে তিনি বলেন, হযরত উসমান গনি (রা) কখনো গোসল করতে গেলে গোসলখানার দরজা বন্ধ করা সত্ত্বেও পরিধেয় বস্ত্র খুলতে গিয়ে এতবেশী লজ্জাবোধ করতেন যে, শিরদাড়া সোজা করতে পারতেন না। তিনি 'যূ-হিজরাতায়ন' বা 'জোড় মুহাজির' ছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রথম আবিসিনিয়া, তারপর মদীনা তাইয়িবাতে হিজরত করেন। আকার-আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতিতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর অনেক মিল ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি আপন কন্যা রুকাইয়াহ্ (রা)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। বদর যুদ্ধের দিন হযরত রুকাইয়া (রা) ইনতিকাল করেন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম (রা)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তিনি 'যুননূরাইন' (দুই আলোর অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত কুলছুম (রা)-ও হিজরী ৯ সনে ইনতিকাল করেন। পৃথিবীতে হযরত উসমান গনী (রা) ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই, যিনি কোন নবীর দু'কন্যা

পরপর বিবাহ করেছেন। হজ্জের ইবাদত ও অনুষ্ঠানসমূহ তিনি সবচাইতে ভাল জানতেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ছিলেন দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। হযরত উসমান গনী (রা) ছিলেন চতুর্থ মুসলিম অর্থাৎ তাঁর পূর্বে মাত্র তিন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর তাবলীগ বা প্রচারের ফলে মুসলমান হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি যেমন প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্বাধিক বদান্য ও মহান আল্লাহ্র পথে বড় দানশীল। তিনি হযরত রুকাইয়া (রা)-এর কঠিন অসুখের কারণে বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমোদন ও নির্দেশক্রমে তিনি মদীনা শরীফে রয়ে গিয়েছিলেন। তাই বদর যুদ্ধের মালে গনীমতের অংশ তিনি সেই পরিমাণই পেয়েছিলেন যা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদের ভাগে পড়েছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, উসমান 'আসহাব-ই-বদরের' (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদতে গভীর নিমগ্নতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বছরের পর বছর রোযা রাখতেন। মসজিদে নববীর পার্শ্বস্থিত কিছু জমি তিনি নিজস্ব অর্থ দ্বারা 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' [হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীবৃন্দ]-এর জন্য খরিদ করে দিয়েছিলেন।

এক সময় মদীনা তাইয়িবাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি অভাবগ্রস্ত সকল লোকের আহার্যের ব্যবস্থা করেন। মুসলমানগণ যখন মদীনা শরীফে আসেন তখন পানির খুব অভাব ছিল। জনৈক ইয়াহূদীর একটি কুয়া ছিল। সে ঐ কুয়ার পানি অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করত। হযরত উসমান (রা) পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ইয়াহূদীর কাছ থেকে ঐ কুয়াটি খরিদ করে জনসাধারণের জন্য 'ওয়াক্ফ' (উৎসর্গ) করেছেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি ক্রীতদাস খরিদ করে আযাদ (মুক্ত) করে দিতেন। তিনি তাঁর বিত্তবৈভব নিয়ে কখনো অহংকার করেন নি। জাহিলিয়ার যুগেও তিনি কখনও মদ পান করেন নি। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও সতর্কতার সাথে হযরত রাসূলে করীম (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন। তাবুক যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি সাড়ে ছয়শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া মহান আল্লাহ্র রাহে দান করেছিলেন। জাহিলিয়া যুগেও তিনি মক্কা মুকার্‌রমার উমরা তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

মুবারক আকার-আকৃতি

তিনি মধ্যমাকৃতির এবং ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট সুশ্রী চেহারার লোক ছিলেন। তবে চেহারায় বসন্তের দাগ ছিল। দাড়িতে মেহেদী রং লাগাতেন। তাঁর হাড় ছিল চওড়া, দেহের গৌর বর্ণের মধ্যে লালিমা ঝিলমিল করত। পায়ের নলি ছিল ভরা ভরা। হাত অপেক্ষাকৃত লম্বা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং দুই কাঁধের মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব ছিল। দাঁতগুলো ছিল খুবই সুন্দর; কানের পার্শ্ববর্তী কেশদাম ছিল নীচের দিকে প্রলম্বিত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযম (রা) বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর চাইতে অধিক সুন্দর কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখি নি।

নির্বাচন

হযরত ফারূকে আযম (রা) খলীফা নির্বাচনের জন্য তিনদিন সময় দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি হযরত মিকদাদ (রা)-কে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যাঁদের নাম খিলাফতের জন্য প্রস্তাব

করা হয়েছে, তাঁরা মজলিসে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা নির্বাচন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন অন্য কাউকে ভিতরে যেতে দেওয়া না হয়। অবশ্য নিজস্ব অভিমত প্রদানের জন্য শুধু হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যাতে অভিমত প্রদানকারীদের সংখ্যা বেজোড় (অর্থাৎ সাত) হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণয়ও সহজ হয়। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রথম থেকেই এ নির্দেশ জারি করে রেখেছিলেন যে তাঁকে কখনো খলীফা নির্বাচন করা যাবে না। তখন জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করার জন্য হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে সুপারিশ করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার ভোগান্তি কি কম হয়েছে যে, আমি আমার বংশের অন্য লোকের উপরও এ বোঝা উঠিয়ে দিয়ে যাব এবং তাদেরকে জীবনের আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত রাখব ? জনৈক ব্যক্তি যখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে আপনি নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করে যান–তখন তিনি বলেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর রীতি অনুযায়ী যদি আমি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত নাও করি তবু তা আমার জন্য অবৈধ হবে না। আমি আমার পর যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করি, তাহলে তিনি হবেন হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা)। কিন্তু, তিনি তো আমার আগেই ইনতিকাল করেছেন। হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর ক্রীতদাস হযরত সালিম (রা)-কেও আমি আমার পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে পারতাম। কিন্তু তিনিও তো আমার পূর্বেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তারপর তিনি খলীফা পদের জন্য ছয় ব্যক্তির নাম পেশ করেন যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত মিকদাদ ইব্ন আল-আসওয়াদ (রা) এবং হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ওসীয়াত মুতাবিক নতুন একজন খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত হযরত সুহায়ব (রা)-কে সাময়িকভাবে (তিন দিনের জন্য) মদীনার শাসনকর্তা (ইমাম) নিয়োগ করেন এবং হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত আ'দ (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর ঘরে হযরত মিসওয়ার ইবন মাখরামা এবং অন্য এক বর্ণনামতে, হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে একত্রিত করেন এবং অন্য কেউ যাতে সে ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নিজের লোকদের নিয়ে দরজায় বসে থাকেন। হযরত তালহা (রা) তখন মদীনা শরীফ ছিলেন না। কাজেই অন্য কারো সে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। হযরত আমর ইবন 'আস (রা) ও হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রা) একবার ঘরের দরজায় এসে বসেছিলেন। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তা জানতে পেরে তাঁদের সেখান থেকে উঠিয়ে দেন, যাতে তারা কখনো একথা বলতে না পারেন যে, আমরা মজলিসে শূরার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যখন সবাই সুস্থির হয়ে সেখানে এসে বসেন, তখন সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, খলীফা পদের জন্য যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি এ পদ থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিতে আগ্রহী ? যিনি তা করবেন তাঁকে এ অধিকার দেওয়া হবে যে, তিনি যেন তোমাদের মধ্যে যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক যোগ্য মনে করেন, তাঁকেই খলীফা

নির্বাচত করেন। একথা শুনে মজলিসের সবাই নিরুত্তর থাকেন। অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) পুনরায় ঘোষণা করেন, আমি আমার নাম প্রত্যাহার করে নিলাম এবং খলীফা নির্বাচনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। এ কথায় উপস্থিত সকলেই সায় দিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে এ অধিকার প্রদান করলেন যেন তিনি তাঁদের মধ্য থেকে যাকে চান তাঁকেই খলীফা নির্বাচন করেন। অবশ্য হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তখন সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। তিনি হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন নি। তখন হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি তো কিছু বললেন না। আপনিও আপনার মত প্রকাশ করুন। হযরত আলী (রা) তখন বলেন, আমিও আপনাদের সাথে একমত, তবে এ শর্তে যে, আপনি প্রথমে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা শুধুমাত্র ন্যায়, সত্য ও উম্মতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নেবেন এবং তাতে পক্ষপাতিত্ব বা ব্যক্তিস্বার্থ স্থান দেবেন না। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন, আমি আপনাকে সে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি যে সিদ্ধান্ত নেব তা পক্ষপাতিত্ব বা ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে নয় বরং উম্মতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন এবং ন্যায় ও সত্যের খাতিরেই নেব। কিন্তু আপনাদেরকেও এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে হবে যে, যাঁকেই আমি নির্বাচন করবো, আপনারাও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে মেনে নেবেন এবং যে আমার মতের ও আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে, আপনারা সকলে তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবেন। একথা শুনে হযরত আলী (রা)-সহ উপস্থিত সকলেই অঙ্গীকার করেন : আমরা নির্দ্বিধায় আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব এবং তা বাস্তবায়নে আপনাকে সাহায্য করবো।

এ অঙ্গীকার ও পাল্টা অঙ্গীকারের পর সেদিনের বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে যান। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বিখ্যাত সাহাবায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। নিজেও এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে একান্ত নিভৃতে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আপনার হাতে বায়'আত না করি, তাহলে আপনি প্রস্তাবিত ছয়জনের মধ্য থেকে কার হাতে বায়'আত করতে বলবেন ? তিনি জবাব দেন, হযরত আলী (রা)-এর হাতেই বায়'আত করা উচিত। তারপর আমি হযরত আলী (রা)-কেও একান্ত নির্জনে অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। তারপর আমি অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। তখন দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে রয়েছে। নির্ধারিত তিন দিনের শেষ রাত্রিতে উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ পুনরায় ঐ ঘরে সমবেত হন। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত সা'দ (রা)-কে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে বলেন, সাধারণভাবে সবাই হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। একথা শুনে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আপনি স্বয়ং আমাদের বায়'আত নিয়ে নিন এবং এসব ঝগড়া থেকে আমাদের মুক্ত করে দিন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বলেন, তা কি করে সম্ভব। আমি তো খলীফা পদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)

হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)-কে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেন। একলা পরামর্শ ও কথোপথনের মধ্যে সারা রাত কেটে যায়। পরবর্তী ভোরেই কিন্তু খলীফা নির্বাচনের ঘোষণা দিতে হবে। ফজরের নামাযের পর সমগ্র মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) খলীফা পদের জন্য কার নাম ঘোষণা করেন, তা শোনার জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) কিছু বলার পূর্বেই এমন কিছু লোক এ ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশ করতে শুরু করেন, যাঁরা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিল না। যেমন, হযরত আম্মার (রা) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে খলীফা পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। হযরত ইব্‌ন আবূ সারাহ্ ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ (রা) বলেন, আমরা হযরত উসমান (রা)-কেই এ পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। যখন এ ধরনের কথাবার্তা শুরু হল, তখন হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে বললেন, আপনি এখনো দেরি করছেন কেন ? মুসলমানগণের মধ্যে ফিত্‌না (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করে বিষয়টি মিটমাট করে ফেলুন। তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আমি প্রত্যেক স্তরের ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতামত জানার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমি মোটেই আলস্য করি নাই বা অসতর্কও হইনি। কাজেই আমার সিদ্ধান্ত কেউ অস্বীকার করবে সে সুযোগ বাকী নেই। কেননা, পরামর্শ কমিটি এবং খলীফা পদের জন্য যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাঁদের সকলেই আগ্রহ সহকারে ও সানন্দচিত্তে আমার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে আমি আমার সমগ্র শক্তি কাজে লাগিয়েছি। একথা বলার পর তিনি হযরত উসমান গনী (রা)-কে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, আপনি অস্বীকার করুন যে, মহান আল্লাহ্ ও মহান আল্লাহ্‌র পিয়ারা রাসূলের হুকুম এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলবেন। হযরত উসমান (রা) অঙ্গীকার করেন যে, তিনি সে অনুযায়ী চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য সবাই হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করতে থাকে। প্রথম এ দৃশ্য হযরত আলী (রা)-এর মনঃপূত হয়নি। তাই তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন, তারপর কি চিন্তা করে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ও ব্যস্তত্রস্ত হয়ে সারির পর সারি অতিক্রম করে সোজা এগিয়ে গিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। হযরত তালহা (রা) ঐ দিন অর্থাৎ ১লা মুহাররম মদীনা শরীফে ছিলেন না। তাই তিনি পরামর্শ সভায় যোগদান করতে পারেননি। হযরত তালহা (রা) পরদিন অর্থাৎ ২রা মুহাররম (হিজরী ২৪ সন) মদীনা তাইয়িবাতে আসেন। যখন তিনি শোনেন যে সকল লোক সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছেন তখন নিজেও বায়'আত করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখেই বলেন, আপনার অনুপস্থিতিতেই আমাকে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে। আপনার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করা সম্ভবও ছিল না। তবু আপনি যদি খলীফা পদের দাবীদার হন, তাহলে আমি আপনার পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি। হযরত তালহা (রা) বলেন,

যখন সবাই খলীফা হিসাবে আপনার হাতে বায়'আত করেছে তখন আমিও আপনাকে খলীফা হিসাবে মেনে নিতে সম্মত আছি। মুসলমানগণের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা মতানৈক্যের সৃষ্টি হোক আমি তা চাই না। এ বলে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন।

বায়'আত গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর হযরত উসমান গনী (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে পুণ্যকর্মের (আমলে সালিহার) প্রতি উৎসাহিত করেন, বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মানুষের মধ্যে যে শৈথিল্য ও কর্মবিমুখতা দেখা দেয় সে সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার উপদেশ দেন। তারপর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মকর্তাদের নামে এক নির্দেশ জারি করেন, যাতে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ইনতিকাল এবং তাঁর নিজের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার বিবরণ ছিল। তাতে সবাইকে তাগিদ দেওয়া হয় যেন তারা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে যেরূপ বিশ্বস্ততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর খিলাফত কালেও সেরূপ করে যান।

হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে প্রথম ভূমিকা

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদতের (মৃত্যুর) কয়েক দিন পূর্বে একবার আবূ লুলূ একটি খঞ্জর নিয়ে হরমুযানের কাছে যায়। ইনি সেই ইরানী নেতা হরমুযান যিনি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায়ই বসবাস করছিলেন। আবূ লুলূ হরমুযানের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে। সেখানে তখন হীরার অধিবাসী জাফীনাহ্ নামীয় একজন ক্রীতদাসও বসা ছিল। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) এ তিনজনকে একত্রে বসে আলাপ-সালাপ করতে দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে সেদিকে আসতে দেখে আবূ লুলূ সেখান থেকে উঠে চলে যায়। কিন্তু যে খঞ্জরটি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, উঠে দাঁড়াবার সময় তা তার হাত থেকে পড়ে যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সে তা উঠিয়ে নেয়।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) এ বিষয়টিও লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু এতে তার অন্তরে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন আবূ লুলূ হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে আহত করে এবং ধৃত হয়ে আত্মহত্যা করে, তখন তার কাছ থেকে যে খঞ্জরটি উদ্ধার করা হয় তা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) চিনে ফেলেন। এ সেই খঞ্জর, যা কিছু দিন পূর্বে তিনি আবূ লুলূর কাছে দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ হরমুযানের কাছে আবূ লুলূর গমন, তাদের পরস্পর আলাপ-সালাপ, জাফীনাহ্ নামক খ্রিস্টান ক্রীতদাসের সেখানে উপস্থিতি সবাইকে বলে দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদতের পর যখন তাঁর অপর ছেলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উপরোক্ত ঘটনার কথা শোনেন, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রথম সুযোগেই হরমুযানকে আক্রমণ করে বসেন। হরমুযানকে আহত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে পাকড়াও করতে ছুটে যান। কিন্তু তখন হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) জাফীনাহকে হত্যা করার জন্য তার তালাশে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটতে থাকেন। অবশ্য জাফীনাহকে হত্যা করার পূর্বেই হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস হযরত উবায়দুল্লাহ্‌কে ধরে ফেলেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত কেউ খলীফা পদে নির্বাচিত হন নি এবং হযরত সুহায়ব (রা) সাময়িকভাবে খিলাফতের প্রয়োজনীয় দায়িত্বসমূহ পালন করছিলেন, তাই

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত উবাদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে সুহায়ব (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। তিনি হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে বন্দী করে রাখেন।

যখন হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন, মসজিদে নববীতে সাধারণভাবে বায়'আত গ্রহণ করা হলো এবং হযরত উসমান (রা) খলীফা হিসাবে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণও পেশ করলেন, তখন সর্বপ্রথম তাঁর দরবারে উপরোক্ত মকদ্দমা পেশ করা হল। হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে খলীফার সামনে পেশ করার পর যখন হরমুযানের হত্যা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি তাঁর সত্যতা স্বীকার করেন। তারপর হযরত উসমান গনী (রা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে এ সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা) এ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, হরমুযানের হত্যার কিসাসে (বদলা স্বরূপ) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) হযরত আলী (রা)-এর ঐ মতের বিরোধিতা করে বললেন, তা কোনমতেই সমীচীন নয় যে, এ মাত্র (তিন দিন পূর্বে) যাঁর পিতা শহীদ (নিহত) হয়েছেন তাকে এখন আপনারা হত্যা করে ফেলবেন। উপস্থিত সবাই হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-এর রায়কে সমর্থন করেন। হযরত উসমান গনী (রা) প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করেন। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেন, এ ঘটনাটি না হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে ঘটেছে, আর না আমার খিলাফতকালে। আর যেহেতু তা আমার খিলাফতকালে ঘটেনি বরং আমি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই ঘটেছে, তাই এজন্য আমাকে দায়ী করা চলে না। তারপর তিনি এ উৎকৃষ্টতম পন্থাটি গ্রহণ করেন যে, তিনি স্বয়ং হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর অভিভাবক হয়ে নিজের কাছ থেকেই হরমুযান হত্যার 'দিয়াত' (রক্তমূল্য) পরিশোধ করে দেন। তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। এভাবে সকল লোক তার এ ফায়সালায় রাযী হয়ে গেল এবং হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) কিসাস থেকে রক্ষা পেলেন।

বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর বা কর্মকর্তা

হযরত উসমান গনী (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে হযরত ফারূকে আযম (রা) কর্তৃক নিয়োগকৃত যেসব প্রশাসক বা কর্মকর্তা কার্যরত ছিলেন।

প্রদেশ বা রাজ্যের নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক বা কর্মকর্তার নাম
১. মক্কা মুকাররমা	হযরত নাফি' ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হারাছ (রা)
২. তায়িফ	হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাকাবী (রা)
৩. ইয়ামন	হযরত ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা)
৪. আম্মান	হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন মুহসিন (রা)
৫. দামিশক	হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)
৬. মিসর	হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা)
৭. হিম্‌স	হযরত উমর ইব্‌ন সাআদ (রা)
৮. উর্দুন (জর্দান)	হযরত উমর ইব্‌ন উতবা (রা)
৯. বসরা	হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)

১০. কূফা — হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)
১১. বাহরায়ন — হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল 'আস (রা)

কর্মকর্তাগণের পদচ্যুতি ও নিযুক্তি সম্পর্কে হযরত উসমান গনী (রা) সর্বপ্রথম যে হুকুম জারি করেন, তা ছিল এই যে, তিনি হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে কূফার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে মদীনা তাইয়িবাতে ডেকে পাঠান এবং তার জায়গায় হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। জনগণ এ নিযুক্তি ও পদচ্যুতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হযরত মুগীরা (রা)-কে কোন ত্রুটির কারণে পদচ্যুত করা হয়নি, বরং হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ওসীয়ত অনুযায়ী এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তিনি ইনতিকালের পূর্বে তাঁর এ অন্তিম ইচ্ছার কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।

উসমানী খিলাফত আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) বিজয়

হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতের প্রথম বছর অর্থাৎ হিজরী ২৪ সনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসকান্দারিয়া বিজয়ের সাত মাস পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কনস্টানটিনোপলে পরলোকগমন করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর হিরাক্লিয়াস এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া থেকে পলায়ন করে কনস্টান্টিনোপলে চলে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানগণ ইতিমধ্যে তার সাম্রাজ্যের যেসব এলাকা অধিকার করে নিয়েছিল তা উদ্ধার এবং বাকি এলাকার উপর দখল টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) যখন মিসর আক্রমণ করে তখন মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস জিযিয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করে মিসর ও ইসকান্দারিয়া মুসলমানগণের হাতে সমর্পণ করেন। হিরাক্লিয়াস মিসরকে আপন সাম্রাজের একটি প্রদেশ মনে করতেন এবং মুকাওকিস ছিলেন তাঁরই অধীনস্থ ব্যক্তি। তাই যখন তিনি মুসলমানগণের মিসর অধিকারের খবর শোনেন তখন অত্যন্ত ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং সাত মাস পর এ দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এ হলো হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালীন ঘটনা। হিরাক্লিয়াসের পর তাঁর ছেলে কনস্টানটাইন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইসকান্দারিয়া থেকে মুসলমানগণকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। রোমান বাহিনী জাহাজযোগে কনস্টান্টিনোপল থেকে রওনা হয়ে ইসকান্দারিয়া উপকূলে অবতরণ করে। কিন্তু মুকাওকিস রোমানদেরকে ইসকান্দারিয়া প্রবেশ করতে দেন নি। তিনি মুসলমানদেরকে প্রদত্ত আপন প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকেন।

মুসলমানগণ যখন রোমানদের এ আক্রমণ সংবাদ পায় তখন তারা ফুসতাত (কায়রো) থেকে বেরিয়ে পড়েন। অপর দিকে রোমানরা ইসকান্দারিয়া থেকে ইসলামী সেনাছাউনির দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তা এক ঘোরতর যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। তাতে রোমান সেনাপতি ও হাজার হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায়, তারা দ্রুত পালিয়ে গিয়ে নিজেদের জাহাজে আরোহণ করে কনস্টানটিনোপলের দিকে যাত্রা করে। হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) রোমানদেরকে বিতাড়িত করে ইসকান্দারিয়া ও

তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি, যা রোমান বাহিনীর হামলার কারণে হয়েছিল, নির্ধারণ করে তা সঙ্গে সঙ্গে পূরণের ব্যবস্থা করেন। কেননা, তিনি মনে করতেন যে, যিম্মীদের নিরাপত্তা দান এবং তাদের ধন-সম্পদকে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের একজন শাসক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব। তারপর হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) ইসকান্দারিয়া শহরের রক্ষাপ্রাচীর ধ্বংস করে ফুসতাতের সেনাছাউনিতে ফিরে আসেন। রোমানদের পুনঃ আক্রমণ ও ইসকান্দারিয়া শহরের রক্ষাপ্রাচীর ধ্বংস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ হলো হিজরী ২৫ সনের ঘটনা।

আর্মেনিয়া বিজয়

হযরত ফারূকে আযম (রা) যে অবস্থায় ও যেভাবে শাহাদত বরণ করেন, সে সংবাদ পেয়েই রোমানদের মধ্যে ইসকান্দারিয়া আক্রমণের দুঃসাহস জন্মে। এ খবরে হামাদান, রাই প্রভৃতি ইরানী অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইরানীরা বলতে শুরু করে, আমরা আরবদের প্রজা হয়ে থাকব না, বরং নিজেদেরই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো। এ সমস্ত বিদ্রোহের খবর শুনে তা দমন করার জন্য হযরত উসমান গনী (রা) হযরত হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা), কুরত ইব্ন কা'ব (রা) প্রমুখ সেনাপতিকে নির্দেশ দেন এবং তাঁরা শীঘ্রই তা দমন করতে সক্ষম হন। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালেই পদচ্যুত হয়ে মদীনা শরীফে চলে এসেছিলেন। হযরত উসমান গনী খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে পুনরায় গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। ঐ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) কূফায় বায়তুল মালের কর্মকর্তা বা ট্রেজারী অফিসার ছিলেন।

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যিনি কূফার গভর্নর হয়ে এসেছিলেন, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ট্রেজারী অফিসার হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছ থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দেন, তখন হযরত সা'দ (রা) তা পরিশোধ করতে পারেন নি। এ বিষয়টি কেন্দ্র করে তাঁদের উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং এ খবর যখন মদীনা শরীফে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কানে গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে (হিঃ ২৫ সনে) পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুয়ীত (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। আযারবায়জান রক্ষার জন্য যে বাহিনী মোতায়েন ছিল তাও কূফার গভর্নরের অধীন মনে করা হত। আর কূফার ছাউনী থেকে পালাক্রমে এক একজন সেনাপতিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিয়ে আযারবায়জানে প্রেরণ করা হত। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর সময়ে উতবা ইব্ন ফারকাদ আযারবায়জানে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ (রা)-কে পদচ্যুত করার পর উতবা ইব্ন ফারকাদ (রা)-কেও পদচ্যুত করে আযারবায়জান থেকে ডেকে পাঠানো হয়। আর উতবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আযারবায়জানবাসীরা বিদ্রোহ করে বসে। ওয়ালীদ ইব্ন উতবা সঙ্গে সঙ্গে আযারবায়জান সৈন্য প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত আযারবায়জানবাসীরা পুরাতন শর্তাদির উপরই পুনরায় সন্ধি করে এবং নিয়মিত জিযিয়া পরিশোধ করতে থাকে। ওয়ালীদ ইব্ন উকবা যিনি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে জাযীরার কর্মকর্তা ছিলেন এবং এখন কূফার

গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি হযরত উসমান গনী (রা)-এর রিযায়ী ভাই (দুধভাই) ছিলেন। হযরত সা'দ (রা) যেহেতু অত্যন্ত মুত্তাকী ও আল্লাহ্ভীরু লোক ছিলেন এবং যেহেতু ওয়ালীদ ইব্ন উকবা পরহিযগারী ও ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে হযরত সা'দ (রা)-এর সমপর্যায়ে ছিলেন না, তাই কূফাবাসীরা ওয়ালীদ (রা)-এর আগমনে ও হযরত সা'দ (রা)-এর নির্গমনে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। ঐ সময়েই ওয়ালীদ ইব্ন উকবা আযারবায়জানে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

দামিশকের কর্মকর্তা হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) হযরত হাবীব ইবন মাসলামা (রা)-কে আর্মেনিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি সেখানকার বেশীর ভাগ শহর ও দুর্গ জয় করে রোমানদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করেছিলেন। এ সংবাদ শুনে রোমান সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের নির্দেশ অনুযায়ী একজন রোমান সেনাপতি মালীতাবাহ, সিওয়াম, কাউনিয়া প্রভৃতি শহর ও সেনাছাউনি থেকে আশি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে সোজা কনস্টান্টিনোপল উপসাগর দিয়ে হাবীব ইবন মাসলামা (রা)-কে আক্রমণ করে। হযরত হাবীব (রা) শত্রুপক্ষের এ বিরাট বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে কূফার গভর্নর ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা)-কে লিখেন : "তুমি হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা)-এর সাহায্যার্থে অবিলম্বে দশ হাজার সৈন্য আর্মেনিয়ার দিকে পাঠাও।" হযরত উসমান গনী (রা)-এর এ নির্দেশ হযরত ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা) মূসেলে প্রাপ্ত হন। তখন তিনি আযারবায়জান বিজয়ের পর কূফার দিকে আসছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হযরত সালমান ইব্ন রাবীআ (রা)-এর নেতৃত্বে আট হাজার সৈন্য আর্মেনিয়ার দিকে প্রেরণ করেন।

হযরত হাবীব ইবন মাসলামা (রা) ও হযরত সালমান ইবন রাবীআ (রা) সম্মিলিতভাবে সমগ্র আর্মেনিয়া দখল করে নেন এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী কোহে কাফে (ককেশাস পর্বতে) গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে হযরত সালমান ইবন রাবীআ (রা) শিরওয়ান এবং সমগ্র পার্বত্য এলাকা জয় করে কূফার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর হযরত হাবীব ইবন মাসলামা (রা) দামিশকে হযরত আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যান। তারপর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) খোদ একটি বাহিনী নিয়ে রোমান এলাকার উপর চড়াও হন। তখন রোমান বাহিনী আতংকিত হয়ে ইনতাকিয়াহ্ ও তারবাউসের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা ছেড়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) ঐ এলাকার কয়েকটি দুর্গে নিজের সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিছু কিছু দুর্গ ধ্বংস করে ফেলেন। এ সমস্ত ঘটনা ঘটে হিজরী ২৫ সনে।

মিসরের ঘটনা-বিচিত্রা ও পরিবর্তনসমূহ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (রা), যিনি ইব্ন আবূ সারাহ (রা) নামে পরিচিত ছিলেন, হযরত উসমান গনী (রা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে একবার মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আন্তরিকতার সাথে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে মিসরের কর্মকর্তা ও ট্রেজারী অফিসার করে পাঠান এবং হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে শুধু সেনাবাহিনীর দায়িত্বে রাখেন। এতে সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে সামগ্রিকভাবে পদচ্যুত করে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে মিসর

ও ইসকান্দারিয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। যদিও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর মতই আরবের বিখ্যাত বীরযোদ্ধা ও অশ্বারোহীদের মধ্যে গণ্য হতেন, কিন্তু তিনি হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর মত অভিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন না এবং হযরত 'আমর (রা)-এর পদচ্যুতিতে মিসরবাসীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়– এমন কি, তারা তাদের নতুন শাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কায়সার কনস্টানটাইন যখন মিসরের এ অবস্থা এবং হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর পদচ্যুতির কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর একজন অতি পরাক্রমশালী ও অভিজ্ঞ সেনাপতিকে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ নৌকাযোগে ইসকান্দারিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। শহরের মধ্যে যত রোমান তথা গ্রীক নাগরিক ছিল, তারা সকলেই এ রোমান বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে যায়। তারপর মামুলী সংঘর্ষ ও কিঞ্চিৎ রক্তারক্তির পর ইসকান্দারিয়া রোমান সৈন্যদের অধিকারে চলে যায়। এ সংবাদ শুনে হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে পুনরায় মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মিসরে উপনীত হয়ে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন প্রস্তুতি নেন এবং এমনভাবে তাদের মুকাবিলা করেন যে, রোমানরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং বাধ্য হয়ে ইসকান্দারিয়া থেকে পলায়ন করে। এবার নিয়ে হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মোটি তিনবার ইসকান্দারিয়া জয় করেন। এবার ইসকান্দারিয়া আক্রমণের পূর্বে তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে, সমগ্র শহরকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেবেন। কিন্তু জয় করার পরই তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে হত্যা, রক্তারক্তি ও লুটপাট থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। যেখানে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। মসজিদটি 'রহমত' (দয়া) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মিসরের মুসলমানদের পুরাপুরি অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠভাবে আইনের শাসন কায়েম করেন, তখন খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে মিসরের প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ করে তথায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে পুনরায় নিয়োগ করেন। এবার হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) এ পদচ্যুতির কারণে ব্যথিত হন। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ তাঁর এ পুনঃ নিয়োগে কিছুটা লজ্জিত হন। কেননা, তিনি মিসরের বিশৃঙ্খলা ও বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে সেখানে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল। আর হযরত আমর ইব্ন 'আস সমগ্র পরিস্থিতি শুধরিয়ে নেওয়ার পর পুনরায় তাঁকেই (আবদুল্লাহ্কে) মিসরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হল। অবশ্য আগামীতে কিভাবে নিজের অতীতের দুর্নাম মুছে ফেলা যায়, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) এখন সে চিন্তায় নিমগ্ন হন।

আফ্রিকা বিজয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ যুগে তো আফ্রিকা একটি মহাদেশের নাম, কিন্তু ঐ যুগে আফ্রিকা নামে একটি রাজ্যও ছিল, যা ত্রিপলী থেকে তান্জা (তাঞ্জানিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্য ঐ যুগে সম্মিলিতভাবে ঐ সমস্ত দেশকেও আফ্রিকা বলা হত, যা আজকাল আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত (যেমন ত্রিপলী, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো ইত্যাদি)।

হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মিসর থেকে বের হন এবং বারকাহ্ এলাকার সীমান্তবর্তী গোত্রপতিদের পরাজিত করেন। হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর শাসনামলেও ঐ সমস্ত গোত্রপতিদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তারা জিযিয়া প্রদানের শর্তে হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর সাথে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য পরে সুযোগ বুঝে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। এবারও তারা জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। তারপর যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) রাজ্যের মধ্যাংশ এবং ত্রিপলীর দিকে অগ্রসর হন, তখন হযরত উসমান গনী (রা) তাঁর সাহায্যের জন্য মদীনা শরীফ থেকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা), হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা), হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা), হযরত ইব্ন জা'ফর (রা) প্রমুখ ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ বাহিনী যখন মিসর অতিক্রম করে বারকায় গিয়ে পৌঁছে তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। এবার সম্মিলিত বাহিনী ত্রিপলীর দিকে অগ্রসর হয়। রোমানরা ত্রিপলী থেকে বের হয়ে মুসলমানদের মুখোমুখি হয়, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানগণ ত্রিপলী দখল করে সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তারপর মূল আফ্রিকা রাজ্যের দিকে রওয়ানা হয়। তখন আফ্রিকার রাজা ছিলেন জর্জীর (গ্রেগরী) এবং আফ্রিকা ছিল কায়সারের অধীনে একটি করদ রাজ্য। রাজা জর্জীর যখন ইসলামী বাহিনীর আগমন সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য একত্র করে একদিন ও এক রাত্রির দূরত্ব অতিক্রম করে আগে বেড়েই মুসলমানগণের মুকাবিলা করেন। উভয় বাহিনী যখন মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ সর্বপ্রথম খ্রিস্টান বাহিনীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। জর্জীর যখন পরিষ্কার ভাষায় এ দাওয়াত অস্বীকার করল, তখন তাকে জিযিয়া প্রদানের জন্য বলা হল। যখন সে পরিষ্কার ভাষায় তাও অস্বীকার করল তখন মুসলমানগণ সারিবদ্ধভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল। এমন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় যে, জয় পরাজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে একদল সৈন্য এসে পৌঁছে এবং তাদেরকে দেখে সমগ্র বাহিনী উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠে।

মূল ঘটনা হলো, অতিশয় দূরত্বের কারণে আফ্রিকার মুসলিম বাহিনীর সংবাদ যথাসময়ে মদীনা শরীফে পৌঁছতে পারেনি। হযরত উসমান গনী (রা) যখন দেখেন যে, আফ্রিকার ঐ বাহিনীর সংবাদ পেতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য আফ্রিকার দিকে প্রেরণ করেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর সেনাদল নিয়ে যখন মূল ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হন, তখন মুসলমানগণ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠে। জর্জীরের বাহিনী এ তাকবীর ধ্বনি শুনে যখন জিজ্ঞেস করল, মুসলমানগণের মধ্যে এ ধরনের ধ্বনি উঠল কেন–তখন তাদেরকে বলা হল, মুসলমানদের একটি নতুন দল মূল বাহিনীর সাহায্যার্থে এসে পৌঁছেছে। জর্জীর এটা শুনে খুবই চিন্তিত হন। কিন্তু ঐ দিন যুদ্ধের কোন ফায়সালা হলো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে উভয় বাহিনী নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল। পরদিন যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন

যুবায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন তাঁকে বলা হয় যে, জর্জীর আজ এ মর্মে এক ঘোষণা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-এর ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসতে পারবে সে পুরস্কার স্বরূপ এক লক্ষ দীনার পাবে এবং তার সাথে জর্জীর আপন মেয়েকেও বিয়ে দেবেন। কাজেই, হযরত আবদুল্লাহ, ইব্ন সা'দ (রা) প্রাণের ভয়ে আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন নি। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-এর তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে বললেন : তুমিও তোমার সেনাবাহিনীর মধ্যে এ ঘোষণা দাও যে, যে ব্যক্তি জর্জীরের ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসতে পারবে, তাকে মালে গনীমত থেকে এক লক্ষ দীনার দেওয়া হবে এবং জর্জীরের মেয়েকেও তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে। উপরন্তু, তাকে জর্জীরের রাজ্যের প্রশাসকও নিযুক্ত করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা) তাঁর সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ঐ ঘোষণা প্রদান করেন। ফলে জর্জীর ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। আজও উভয় বাহিনীর মধ্যে ফায়সালা হয়নি। রাতের বেলা পরামর্শ সভা বসল। তাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) এ অভিমত প্রদান করেন যে, আগামীকাল ইসলামী বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করবে এবং বাকী অর্ধেক নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করবে। যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে যথারীতি সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে এবং ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাবে, ঠিক তখনি তাঁবুতে অপেক্ষমাণ সৈন্যরা তরবারি নিয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে শীঘ্রই যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর এ অভিমত সকলেই পছন্দ করেন। পরদিন অর্থাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিন মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধ করতে থাকে এবং বাকি অর্ধেক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বাধীন নিজ নিজ তাঁবুতে অপেক্ষা করতে থাকেন। দুপুর পর্যন্ত উভয় বাহিনী লড়তে থাকেন এবং দুপুরের পর একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যান। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁবুতে অপেক্ষমাণ সৈন্যদের নিয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রোমানরা এ আকস্মিক অথচ জোরদার অভিযান সহ্য করতে না পেরে নিজ নিজ তাঁবুতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও তারা পরিত্রাণ পায়নি। মুসলমান সৈন্যগণ তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করতে থাকে।

জর্জীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর হাতে নিহত হন। পরদিন মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এগিয়ে চলে এবং আফ্রিকার রাজধানী সাবীতাল্লাহ্ মুসলমানগণের অধিকারে আসে এবং সেখান থেকে গনীমতস্বরূপ অপরিসীম ধন-সম্পদ মুসলমানগণের হস্তগত হয়। বন্টনের পর এক একজন অশ্বারোহীর ভাগে তিন হাজার দিরহাম পড়ে। সাবীতাল্লাহ নগরী দখলের পর মুসলমানগণ আরো অগ্রসর হয়ে 'জাম্ম' দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। তাও মুসলমানগণ যুদ্ধ ব্যতীতই জয় করেন। আফ্রিকানরা ইসলামী শক্তির সামনে নিজেদেরকে দুর্বল ও অসহায় দেখে দশ লক্ষ দীনার জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি স্থাপন করে। হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) আফ্রিকা বিজয়ের সুসংবাদ এবং প্রচুর 'খুমুস' (মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ যা রাষ্ট্রের প্রাপ্য) নিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। খলীফা

হযরত উসমান গনী (রা)-এর সামনে যখন এ খুমুস পেশ করা হয়, তখন তিনি তা মারওয়ান আল-হাকামের কাছে পাঁচ লক্ষ দীনারে বিক্রি করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) এক বছর তিন মাস পর হিজরী ২৭ সনে আফ্রিকা থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। আফ্রিকানবাসীরা জর্জীরের পরিবর্তে নিজেদের একজন বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং মুসলমানগণকে নির্ধারিত জিযিয়া প্রদান করতে থাকে। আফ্রিকার সেই রাজ্য বা দেশের নাম কার্থজানাহ কার্থেজ বলা হয়।

কাবরিস (সাইপ্রাস) ও রোডস বিজয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) কার্থজানাহ্ (কার্থেজ) এলাকা তথা আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ বছর (হিজরী ২৭ সনে) তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' (রা) মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন। তখন থেকে কনস্টানটাইন আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। হিজরী ২৮ সনে তিনি একটি নৌবাহিনী আফ্রিকার দিকে প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনী আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করে আফ্রিকানদের কাছে ঐ রাজস্ব দাবী করে যা তারা কায়সারকে প্রদান করত। আফ্রিকানরা রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, যখন মুসলমানগণ আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন তো কায়সার আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারেননি। কাজেই এখন তার অধীনতা স্বীকার করা এবং তাকে কর দেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আফ্রিকান ও রোমান বাহিনীর মধ্যে লড়াই বাঁধে এবং আফ্রিকানরা রোমানদের হাতে পরাজিত হয়।

তারপর রোমানরা ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। এখানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' (রা) রোমানদের প্রতিরোধ এবং তাদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। রোমান নেতা যখন আফ্রিকা থেকে ইসকান্দারিয়ার দিকে আসে, তখন 'কায়সারে রূম' স্বয়ং ছয়শ' যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ইসকান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মোটকথা, উভয় দিক থেকেই রোমান সৈন্যরা ইসকান্দারিয়া দখলের পাঁয়তারা চালায়। ইসলামী বাহিনী এক সাথে উভয় সেনাদলের মুকাবিলা করে। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত কনস্টানটাইন ও তাঁর বাহিনী ইসকান্দারিয়া থেকে পলায়ন করে সাইপ্রাসের দিকে চলে যায়। সাইপ্রাসকে তিনি তাঁর নৌবাহিনীর দফতর এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিলেন। আমরা এ ধারা বর্ণনাটি এখানে স্থগিত রেখে এ সুযোগে হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী মনে করছি, যাতে মুসলমানগণের বিজয় অভিযানসমূহের বর্ণনার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ওফাতকালে হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) দামিশক ও জর্দানের গভর্নর ছিলেন। আর হিম্স ও কিন্নাসরীনের শাসনকর্তা ছিলেন উমায়র ইব্ন সাঈদ আনসারী (রা)। ফারূকে আযম (রা)-এর ওফাতের পর হযরত উমায়র ইব্ন সাঈদ (রা) পদত্যাগ পত্র পেশ করলে হযরত উসমান গনী (রা) হিম্স ও কিন্নাসরীন এলাকাকেও হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর শাসনাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর যখন ফিলিস্তীনের শাসক হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আলকামা (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত উসমান গনী (রা) ফিলিস্তীন রাজ্যকেও হযরত আমীর মুআবিয়ার শাসনাধীনে দিয়ে দেন। এভাবে ধীরে ধীরে হিজরী ২৭ সনে আমীরে মুআবিয়া (রা) সিরিয়ার সমগ্র জেলাসমূহের একক শাসকে পরিণত হন। হযরত আমীরে মুআবিয়া ফারূকী খিলাফতের শেষ দিকে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর

কাছে সিরিয়া উপকূল থেকে আরম্ভ করে সাইপ্রাস দ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র এলাকাব্যাপী আক্রমণ পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা) সেই আক্রমণের অনুমোদন প্রদানের বিষয়টি গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুমোদন প্রদানের পূর্বেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। তারপর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) পরবর্তী খলীফা হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমোদন প্রার্থনা করলে তিনি কয়েকটি শর্তের অধীনে অনুমোদন প্রদান করেন। এর অন্যতম শর্ত এ ছিল যে, ঐ নৌযুদ্ধে যার ইচ্ছা সে অংশ গ্রহণ করবে, এজন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

হযরত মুআবিয়া (রা)-এর আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফলে সাইপ্রাস আক্রমণের জন্য একদল সেনা তৈরী হয়ে গেল। তাদের মধ্যে হযরত আবূ যর গিফারী (রা), আবূ দারদা (রা), হযরত শাদ্দাদ ইব্‌ন আওফ (রা), হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা) ছিলেন অন্যতম। এ মুজাহিদ দলের নেতৃত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা)-কে প্রদান করা হয়। মুজাহিদরা নৌকাযোগে সাইপ্রাসের দিকে রওয়ানা হন। রোম সম্রাট কনস্টানটাইন ইসকান্দারিয়া পরাজিত হয়ে সাইপ্রাসে চলে এসেছিলেন এবং তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে মিসরের ইসলামী বাহিনীও নৌকাযোগে সেখানে এসে পৌঁছেছিল। ঠিক সেই সময় সিরিয়া থেকে প্রেরিত ইসলামী বাহিনীও সাইপ্রাস উপকূলে অবতরণ করে। উম্মে হারাম (রা) যখন নৌকা থেকে তীরে নামেন, তখন তাঁর ঘোড়া হঠাৎ ভীত চকিত হয়ে পালাতে শুরু করে। ফলে তিনি ঘোড়া থেকে পতিত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ ত্যাগ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তার সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো। কনস্টানটাইন সাইপ্রাসেও মুসলমানগণের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারেন নি। তাই অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কনস্টানটিনোপলে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অপর বর্ণনা মতে, সাইপ্রাসবাসীরা যখন দেখল যে, কনস্টানটাইন মুসলমানদের কাছে বার বার পরাজিত হয়ে চলেছে, তখন একদিন সুযোগ বুঝে তারা তাকে স্নানরত অবস্থায় হাম্মামের (বাথরূমের) মধ্যে হত্যা করে। যা হোক, অতি সহজেই সাইপ্রাস মুসলমানগণের দখলে চলে আসে। তারপর হযরত মুআবিয়া (রা)-ও একটি বাহিনী নিয়ে সাইপ্রাসে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার শাসনব্যবস্থা সুসংহত করে তিনি রোড্‌স দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রোড্‌সবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুসলমানগণের মুখোমুখি হয়। কিন্তু বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ইসলামী বাহিনী রোড্‌স দ্বীপের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ঐ দ্বীপে তাম্র নির্মিত একটি মূর্তি ছিল। মূর্তিটির এক পা ছিল দ্বীপের উপকূলে এবং অপর পা ছিল উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপে। তার দু'পায়ের মধ্যবর্তী ফাঁক এতই চওড়া ছিল যে, তার নীচ দিয়ে অনায়াসে সামুদ্রিক জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারত। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) ঐ মূর্তিটি ভেঙ্গে তার তাম্র খণ্ডসমূহ মুসলিম বাহিনীর সাথে ইসকান্দারিয়ায় পাঠিয়ে দেন। জনৈক ইয়াহূদী ব্যবসায়ী ঐ খণ্ডগুলো মুসলমানদের কাছ থেকে ক্রয় করছিল। সাইপ্রাস ও রোড্‌স জয়ের ফলে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অনেক বৃদ্ধি পায়। কেননা, এ নৌ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সামনে কনস্টাটিনোপল ও অন্যান্য রাজ্য জয়ের যেন একটি সিংহদ্বার খুলে গিয়েছিল। হিজরী ২৮ সনের শেষভাগে অথবা হিজরী ২৯ প্রথম ভাগে এ ঘটনাগুলো ঘটে।

ইরানী শাসনব্যবস্থায় রদবদল

হিজরী ২৭ সনের প্রথম দিকে বসরাবাসীরা তাদের শাসনকর্তা (গভর্নর) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলে হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে পদচ্যুত করে আপন মামাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন কুরয ইব্ন রাবীআ ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদে শাম্সকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। ঐ সময় হযরত ইব্ন আমের (রা)-এর বয়স ছিল আনুমানিক ২৫ বছর। এতদসত্ত্বেও হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে শুধু হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর অধীনস্থ বাহিনীর নয়, বরং আম্মান ও বাহরায়নের গভর্নর হযরত উসমান 'আস-সাকাফী (রা)-এর অধীনস্থ বাহিনীরও নেতৃত্ব প্রদান করেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (রা) ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে সে পদ থেকে বদলী করে ফারিস প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। আর খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন হযরত উমায়র ইব্ন উসমান ইব্ন সা'দ (রা)-কে। হযরত উমায়র ইব্ন উসমান খুরাসান পৌঁছেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেখানকার শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজান এবং ফারগানাসহ সমগ্র এলাকা মুসলিম অধিকারে নিয়ে আসেন। হিজরী ২৭ সনের শেষ ভাগে ও ২৮ সনের প্রথম ভাগে হযরত উমায়র ইব্ন উসমান (রা)-কে খুরাসানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ঐ সময়ে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে কিরমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। কিছু দিন পর তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আসিম ইব্ন আমর (রা)-কে নিয়োগ করা হয়। ঐ সময় হযরত ইমরান ইব্ন নুফায়ল (রা)-কে সিজিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

ইরানীদের বিদ্রোহ ও ইসলামী বিজয় অভিযান

যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসক পদে রদবদল করা হয়েছিল, তাই তা ইরানীরা তাদের জন্য একটি গাইবী মদদ মনে করে আপোস-আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। আসতাখার এবং জওর নামক দু'টি স্থান ছিল ঐ সমস্ত ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির কেন্দ্রভূমি। ফারিসের গভর্নর হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (রা) এসব ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে হিজরী ২৭ সনে আসতাখারবাসীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। আসতাখারের সিংহদ্বারেই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (রা) তাতে শাহাদত বরণ করেন। সাথে সাথে তাঁর বাহিনীও সেখান থেকে ফিরে চলে যায়। বসরার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের (রা) এ সংবাদ পেয়ে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে ফারিসের দিকে অগ্রসর হন। তিনি উসমান ইব্ন 'আস (রা)-কে তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের (রা) নিজে আসতাখারের দিকে যান এবং হারাম ইব্ন হাইয়ান (রা)-কে 'জওর' অবরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন। ইরানীরা আসতাখারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটায় এবং অত্যন্ত বীরদর্পে মুসলমানগণের মুকাবিলা করে। এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত ইরানীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং আসতাখারের উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত হারাম ইব্‌ন হাইয়ান (রা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'জওর' অবরোধ করে রাখেন। তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন এবং শত্রুদের সাথে লড়তেন। সূর্য অস্ত গেলে ইফতার করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ঘটনাচক্রে একদিন এমন হলো যে, ইফতারের পর খাওয়ার মত এক টুকরা রুটিও তাঁর ভাগ্যে জুটলো না। পরের দিন তিনি এ অবস্থায়ই রোযা রাখলেন। সেদিনও ইফতারের পর তাঁর ভাগ্যে কোন রুটি জুটলো না। এভাবে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলো। তিনি একাধারে রোযা রেখে চললেন। যখন শরীর অত্যধিক দুর্বল হয়ে গেলো, তখন তিনি তাঁর ভৃত্যকে বললেন, বৎস, তোমার কি হলো যে, আমি এক সপ্তাহ যাবত শুধু পানি খেয়ে রোযা রাখছি, অথচ তুমি আমাকে খাওয়ার কিছুই দাও না। ভৃত্য বলল, হে আমার মনিব! আমি তো রোজই আপনার জন্য রুটি তৈরী করে রেখে যাই। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আপনি তা পান না। পরের দিন ভৃত্য যথারীতি রুটি পাকিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখল এবং সেই রুটি কোথায় যায়, তা দেখার জন্য এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইলো। হঠাৎ সে দেখতে পেলো, শহরের দিক থেকে একটি কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে এলো এবং তার মনিবের রুটিগুলো মুখে নিয়ে পুনরায় দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেলো। সে কৌতূহলবশত কুকুরের পশ্চাদ্ধাবন করল। কুকুরটি রুটি নিয়ে শহরের রক্ষাপ্রাচীরের দিকে ছুটে গেল। তারপর একটি ড্রেনের ভিতর দিকে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভৃত্য হযরত হারাম ইব্‌ন হাইয়ান (রা)-এর কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি খুলে বললে তিনি তাকে একটি গাইবী মদদ বলেই মনে করলেন। কেননা, শহরে ঢুকার এমন একটি গোপন পথ রয়েছে, তা তো তিনি জানতেন না। যা হোক ঐ রাতেই তিনি কয়েকজন দুঃসাহসী সৈন্যসহ ঐ ড্রেন পথে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং পাহারাদারদের হত্যা করে সঙ্গে সঙ্গে শহরের দরজা খুলে দিলেন। অপেক্ষমাণ ইসলামী বাহিনী তখন দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং তৎক্ষণাৎ শহরটি দখল করে ফেলে। এভাবে অতি সহজে মুসলমানগণ জওর দখল করে নেন। তারপর জওর ও আসতাখারের বিদ্রোহীদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় যাতে তারা ভবিষ্যতে আর বিদ্রোহ না করে। এ বিজয় সংবাদ মদীনা তাইয়িবাতে পাঠিয়ে খলীফার কাছ থেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রার্থনা করা হয়।

হিজরী ২৯ সনের হজ্জ

হযরত উসমান গনী (রা) মুহাজির ও আনসারগণের একটি দল নিয়ে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। মিনা নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি নির্দেশ দেন যে, তাঁবু ফেলে হাজী সাহেবদের যিয়ারতের ব্যবস্থা করা হোক। লোকেরা বিদ্‌আতজ্ঞানে এ কাজকে অপসন্দ করে। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর যুগে এরূপ করা হতো না। এ সফরেই জুহায়না গোত্রের একটি স্ত্রীলোককে তার সামনে পেশ করা হল। স্ত্রীলোকটি বিধবা ছিল। তারপর সে দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং বিবাহের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হতেই সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। ফলে হযরত উসমান (রা) (ব্যভিচারের অভিযোগে) তাকে 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে বধ) করার নির্দেশ দেন। যখন হযরত আলী (রা)-এর কাছে এ নির্দেশের সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَحَمْلُه وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

তাকে গর্ভ ধারণ করতে ও তার স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। (৪৬ : ১৫)

এ থেকে জানা গেল যে, গর্ভধারণ ও স্তন ছাড়ানোর সময় কাল ত্রিশ মাস। আর স্তন্যদানের সময়কাল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

যে স্তন্য দানকাল পূর্ণ করতে চায়, তাদের জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর পান করাবে। (২ : ২৩৩)

যেহেতু স্তন্যদানের সময়কাল দু'বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস থেকে ত্রিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের সর্ব নিম্ন সময়কাল ছয় মাস থাকে। কাজেই, ঐ স্ত্রীলোকের উপর ব্যভিচার প্রমাণিত হয় না।

হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আলী (রা)-এর একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন যেন স্ত্রীলোকটিকে 'রজম' করা না হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই 'রজম'-এর পাট চুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত উসমান গনী (রা) এতে খুবই ব্যথিত ও অনুতপ্ত হন। এ বছরই হযরত উসমান গনী (রা) মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেন। এবার মসজিদের দৈর্ঘ্য একশ ষাট গজ এবং প্রস্থ একশ পঞ্চাশ গজে গিয়ে দাঁড়ায়। সাথে সাথে মসজিদে পাথরের স্তম্ভ লাগানো হয় এবং দেওয়ালগুলোও পাকা করা হয়।

হিজরী ৩০ সন

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা কূফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবূ যুবায়দা নামক জনৈক খ্রিস্টান কবি, যে মুসলমান হওয়ার পরও মদ্যপান থেকে বিরত হয়নি, তাকে প্রায়ই হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রা)-এর সঙ্গে দেখা যেত। এ সূত্র ধরেই লোকেরা হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রা)-এর উপরও মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপন করে। ধীরে ধীরে এ অভিযোগ খলীফা উসমান গনী (রা)-এর দরবারে গিয়ে পৌঁছে। কাজেই, মদীনা তাইয়িবা থেকে তাকে তলব করা হয়। হযরত ওয়ালীদ (রা) যখন মদীনা তাইয়িবাতে গিয়ে পৌঁছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছে। হযরত ওয়ালীদ (রা) খলীফার দরবারে পৌঁছতেই হযরত উসমান গনী (রা) তাঁর সাথে 'মুছাফাহ' (করমর্দন) করেন। এতে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা তাঁর [হযরত উসমান গনী (রা)-এর] প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তারপর যখন মদপান সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত করা হয়, তখন এরূপ কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি, যে নিজ চোখে হযরত ওয়ালীদ (রা)-কে মদপান করতে দেখেছে। কাজেই এ সন্দেহজনক অবস্থায় হযরত উসমান গনী (রা) হযরত ওয়ালীদ (রা)-এর উপরে শাস্তির আদেশ স্থগিত রাখেন। এ বিষয়টিও জনসাধারণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত খলীফার দরবারে এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করা হয় যে, আমরা হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবাকে মদ্যপান করতে দেখিনি বটে; তবে মদ্য বমি করতে দেখেছি। তারপর হযরত উসমান গনী (রা) নির্দেশ দিলেন যেন হযরত ওয়ালীদ (রা)-কে বেত্রাঘাত করা হয়। হযরত আলী (রা)-ও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ওয়ালীদ (রা)-কে বেত্রাঘাত করতে শুরু করেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হলো, তখন হযরত

আলী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বেত্রাঘাত করা থেকে বিরত রেখে বলেন, যদিও হযরত ফারূকে আযম (রা) মদ্যপানের অপরাধে আশিটি বেত্রাঘাত করতেন এবং তা যথার্থও বটে, তবে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মদ্যপানের অপরাধে মাত্র চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। আর আমি এক্ষেত্রে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে অনুসরণ করাই অধিকতর সমীচীন বলে মনে করি। পরবর্তী সময়ে হযরত উসমান গনী (রা) হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রা)-কে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হযরত সাঈদ ইব্ন 'আস (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর ঘটনা

ঘটনাটি হিজরী ৩০ সনের। হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর অধীনে সিরিয়ার একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে হযরত মুআবিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর বিরোধ বাঁধে।

আয়াত কারীমা হলো–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ·

যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (৯ : ৩৪)

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর মতে আল্লাহ্র পথে খরচ না করে অযথা সম্পদ জমা করে রাখা মোটেই বৈধ নয়। আর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর মতে, মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করার অর্থ মালের যাকাত প্রদান করা। কাজেই, যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়, তা জমা করে রাখা অবৈধ নয়। যদি শর্তহীনভাবে মাল জমা করে রাখা গুনাহ্র কাজ হত, তাহলে পবিত্র কুরআনে পরিত্যক্ত মাল বন্টন এবং উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশের কোন উল্লেখ থাকত না। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর উপরোক্ত মতাদর্শের কথা জানাজানি হবার পর স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে যুবক কিশোররা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে। হযরত আবূ যর (রা)-ও দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনিও বেপরোয়া হয়ে তাঁর মতাদর্শ প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-কে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন হযরত উসমান গনী (রা) এ মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, হযরত আবূ যর (রা)-কে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মদীনা তাইয়িবাতে পাঠিয়ে দাও। মদীনা তাইয়িবাতে এসেও হযরত আবূ যর (রা) তাঁর মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। যেহেতু তিনি গোঁড়া মেজাযের লোক ছিলেন, তাই জনগণ সাধারণত তাঁকে উপেক্ষা করেই চলত। কিন্তু মদীনা তাইয়িবাতেও তো অল্প বয়স্ক ও ঠাট্টা-তামাশা করার মত লোক ছিল। তারা মাঝে মাঝে তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলত। ঘটনাচক্রে ঐ সময়ই হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর ওফাত হয়। তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম ছিলেন। কেউ না কেউ হযরত আবূ যর (রা)-কে বললো, আবদুর রহমান তো বিরাট পরিমাণ মাল-সম্পদ রেখে গেছেন। আপনি তাঁর সম্পর্কে কি বলেন? হযরত আবূ যর (রা) নির্দ্বিধায় হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর উপর আপন ফতওয়া জারি করেন (অর্থাৎ তিনিও অবৈধ কাজ করেছেন)। হযরত কা'ব আহবার (রা) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আবূ যর (রা)-এর ঐ ফতওয়ার বিরোধিতা করেন। তখন

হযরত আবূ যর (রা) রাগতস্বরে বলে উঠেন, 'হে ইয়াহূদী! তুই এ সমস্ত বিষয়ের কি জানিস ?'[১] সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দ্বারা তিনি হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে আক্রমণও করে বসেন। অগত্যা কা'ব আহবার (রা) সেখান থেকে সোজা হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরবারের দিকে ছুটতে থাকেন। হযরত আবূ যর (রা)-ও লাঠি হাতে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা)-এর ভৃত্যরা অনেক কষ্টেসৃষ্টে হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে হযরত আবূ যর (রা)-এর হাত থেকে রক্ষা করেন। হযরত আবূ যর (রা)-এর রাগ যখন প্রশমিত হল তখন তিনি নিজেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, আমার আকীদা তো সব ধন-সম্পদই মহান আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। সিরিয়ার লোকেরা আমার এ আকীদার বিরোধিতা করেছে এবং আমাকে কষ্ট দিতে চেয়েছে। এখন মদীনা শরীফের লোকেরাও অনুরূপভাবে আমার বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। আপনিই বলুন, এখন আমি কি করবো এবং কোথায় যাব ? হযরত উসমান গনী (রা) তখন তাঁকে পরামর্শ দেন : আপনি মদীনা তাইয়িবার বাইরে কোন পল্লীতে গিয়ে বসবাস করুন। তখন থেকে আবূ যর (রা) মদীনা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরবর্তী 'রাবযাহ' নামক একটি পল্লীতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত নবী করীম (সা)-এর আংটি

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মুবারক পত্রসমূহে এবং নির্দেশাদিতে যে আংটি দ্বারা ছাপ দিতেন, তা তাঁর ওফাতের পর হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে ছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আয়িশা তাঁর হাতেই তা সমর্পণ করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পর ঐ আংটি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফারূকে আযম (রা) যখন তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব একটি উপদেষ্টা কমিটির হাতে সোপর্দ করেন, তখন ঐ আংটি হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে আমানতস্বরূপ রেখে দেন। হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত হাফসা (রা) ঐ আংটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ হিজরী ৩০ সনে মদীনা তাইয়িবা থেকে দু' মাইল দূরবর্তী 'বি'-রে আরীম' নামক এক কুয়ায় ঐ আংটি হযরত উসমান গনী (রা)-এর হাত থেকে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কুয়ার সমস্ত পানি সিঞ্চন করা হয়, তন্নতন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়, কিন্তু আংটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। হযরত নবীয়ে পাকের আংটি এভাবে হারিয়ে যাওয়ায় হযরত উসমান গনী (রা) যারপরনাই ব্যথিত হন। ঘটনাচক্রে ঐ সময় থেকেই হযরত উসমান গনী (রা) নানা ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে থাকেন। অবশ্য ঐ আংটি হারিয়ে যাওয়ার পর তিনি তারই হুবহু আর এক আংটি তৈরী করিয়ে নেন। ঐ বছর মসজিদে নববীতে নামাযীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। জুমু'আর দিন তো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আযানের শব্দ সব নামাযীর কাছে পৌঁছান কষ্টকর হতে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে হযরত উসমান গনী (রা) নির্দেশ দেন যেন মুওয়াযযিন এক উঁচু জায়গায় আরোহণ করে খুতবার আযানের পূর্বে আর এক আযান দেন। এভাবে জুমু'আর দিন দু'টি আযানের প্রচলন হয়। ঐ বছরই হযরত উসমান গনী (রা)

---

১. হযরত কা'ব আহবার (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী একজন বিরাট আলিম ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাহাবায়ে কিরামকে পরামর্শ দেন যেন তাঁরা ইরাক ও সিরিয়ার সম্পত্তি বিক্রি করে মক্কা মুকাররমা, তায়িফ প্রভৃতি জায়গায় সম্পত্তি ক্রয় করেন। বেশীর ভাগ সাহাবীই তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন।

তাবারিস্তান বিজয়

হযরত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) কূফার গভর্নর পদে নিযুক্ত হওয়ার পর নতুনভাবে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা), হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) প্রমুখ ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ বাহিনী নিয়ে হযরত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) তাবারিস্তানে অভিযান করেন এবং এতে তাবারিস্তান ও জুরজানের সমগ্র এলাকা দখলে আসে। তারপর হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে কূমাসের দিকে প্রেরণ করা হয়।

পবিত্র কুরআন প্রচার

হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) যখন বসরা, কূফা, রাই, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন, তখন খলীফা উসমান গনী (রা)-এর কাছে বলেন, বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইরাকবাসীগণ কুরআন মজীদ একভাবে পাঠ করেন, তা সিরিয়াবাসীগণ পাঠ করেন অন্যভাবে। বাসরাবাসীগণের কিরাত (পঠন পদ্ধতি) কূফাবাসীদের চাইতে যেমন পৃথক, কূফাবাসীগণের কিরাত পারস্যবাসীদের চাইতে তেমনি পৃথক। কাজেই, সবাই যাতে একই কিরাত পড়ে সেরূপ ব্যবস্থালম্বন করা খুবই জরুরী।

হযরত উসমান গনী (রা) বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মজলিসে শুরার বৈঠক আহ্বান করেন। সকলেই হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা)-এর অভিমত পসন্দ করেন। তারপর হযরত উসমান গনী (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট থেকে পাক কুরআনের সেই কপি চেয়ে নেন, যা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর অন্য কয়েকজন সাহাবীর ব্যবস্থাধীনে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছিল। ঐ কপি প্রথম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কাছে ছিল। তারপর তা হযরত উমর (রা)-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়। হযরত উমর (রা) তা হযরত হাফসা (রা)-এর হিফাযতে রেখেছিলেন। যা হোক, হযরত উসমান গনী (রা) ঐ মুবারক কপির অনুসরণে বেশ কয়েকখানি কপি তৈরীর দায়িত্ব কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। যখন এর অনেকগুলো কপি তৈরী হয়ে গেল, তখন তিনি এক এক কপি এক এক শহরে পাঠিয়ে দেন এবং সেই সাথে নির্দেশ দেন ভবিষ্যতে যেন শুধু এ কপিরই অনুসরণ করা হয় এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে যতগুলো কপি তৈরী করা হয়েছে তা যেন অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কূফাতে যখন নতুন কপি পৌঁছল তখন হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) তাঁর নিজস্ব কিরাতের উপরই অনড় থাকেন।

হিজরী ৩১ সনের ঘটনাবলী

দরবারে খিলাফত থেকে যেসব নির্দেশ জারি করা হয়, সে অনুযায়ী হারাম ইব্‌ন হাইয়ান লশকরী, হারাম ইব্‌ন হাইয়ান আবাসী ও হারছ ইবন রাশেদ পারস্যের বিভিন্ন জেলায়, আহনাফ ইব্‌ন কায়স খুরাসানে, হাবীব ইব্‌ন কুরজহ মার্ভে, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলখে এবং

কায়স ইব্‌ন রীরাহ তূসে কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। খুরাসানের বেশ কয়েকটি শহরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমেরের নেতৃত্বে একটি ইসলামী বাহিনী সবগুলো বিদ্রোহই দমন করেন। তারপর নিশাপুরে অভিযান করে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকেও শায়েস্তা করা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের সারাখসের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজে একটি সেনাদলসহ হিরাত গিয়ে উপনীত হন। তিনি হিরাত জয় করে বলখ ও তাবারিস্তানের বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর কিরমান, সিজিস্তান এবং পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহও দমন করেন। এভাবে ইরান ও ইরাকের সমগ্র শহর ও জনপদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমেরের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইয়াযদিজার্দের পতন

ইরানী সাম্রাজ্য হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যে কয়েকটি প্রদেশ বা শহর তখনো ইসলামী খিলাফতের বাইরে রয়ে গিয়েছিল সেগুলো হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফত আমলে মুসলমানগণ অধিকার করে নেয়। তখন পারস্য-সম্রাট ইয়াযদিজার্দ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাকে কখনো দেখা যেত রাইয়ে, কখনো বলখে, আবার কখনো মার্ভে, কখনো ইসফাহানে, আবার কখনো চীনে, আবার কখনো ফিরে আসতেন পারস্যের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে। তার সাথে কয়েক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ছিল। তিনি তার বংশগত সম্মান এবং সামানী পরাক্রম ও আভিজাত্যের কারণে সাধারণ মানুষকে সহজেই নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। একদিন হয়ত তারও সুদিন আসবে– এ প্রত্যাশায়ও মানুষ ইয়াযদিজার্দের পিছনে বার বার সারিবদ্ধ হত। ইরানের বেশীর ভাগ প্রদেশ, জেলা ও শহরে বার বার বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। অবশ্য মুসলিম সেনাপতিগণ সবগুলো বিদ্রোহই দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিজরী ৩১ সনে ইয়াযদিজার্দ এক দল সৈন্য নিয়ে বলখে এসে উপনীত হন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলের বিভিন্ন শহর দখল করে রাখেন। মুসলিম বাহিনী যখন উদ্ধার অভিযান চালায় তখন তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং পাছে মুসলমানগণ তাকে বন্দী করে ফেলে এ ভয়ে তিনি জনৈক পানচাক্কী (WATER MILL) চালকের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এ অভিনব আগন্তুকের মূল্যবান লেবাস পোশাক, হাতিয়ার ও অলংকারের প্রতি পানচাক্কী চালকের লোভাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আগন্তুকটি ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে সে তাকে হত্যা করে তার দেহ থেকে যাবতীয় অলংকার, হাতিয়ার, পোশাক ইত্যাদি খুলে নেয় এবং তার লাশটি একটি জলাশয়ে নিক্ষেপ করে। মার্ভ এলাকার 'মারগার' নামক স্থানে ইংরেজী ৬৫১ সালের ২৩ আগস্ট এ ঘটনা ঘটে। ইয়াযদিজার্দ তার রাজত্বের প্রথম চার বছর তো তাকে শুধু পালিয়েই বেড়াতে হয়। ইয়াযদিজার্দের মৃত্যুর সাথে সাথে ইরানী বিদ্রোহেরও অবসান ঘটে।

এ বছরই মিসরে অবস্থানরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সেখানকার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন আবূ সারাহ-এর কোন কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং এটাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দারুন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা একেবারে প্রকাশ্যে হযরত উসমান গনী (রা)-এরও সমালোচনা করতে থাকেন। তারা তাঁকে এই বলে অপবাদ দেন যে, তিনি (উসমান গনী) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দের মত–লোকদেরকে, যাদের উপর খোদ হযরত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট ছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করে রেখেছেন। তারা মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করছে, অথচ তিনি তাদেরকে পদচ্যুত করছেন না।

হিজরী ৩২ সনের ঘটনাবলী

হিজরী ৩১ সনের যুলহাজ্জ মাসে আবদুল্লাহ ইব্ন আমির হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। এ সুযোগে কারিন নামীয় একজন ইরানী সরদার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৪০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করে ইরানী প্রদেশসমূহ দখল করতে শুরু করে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম নামীয় জনৈক মুসলিম গোত্রপতি মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে কারিনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি মুজাহিদগণকে নির্দেশ দেন, যেন তারা তাদের বর্শাসমূহ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে লেপ্টে নিয়ে তার উপর তেল ও চর্বি মাখিয়ে দেয়। যখন মুসলিম বাহিনী কারিনের নিকটবর্তী হল, তখন সবেমাত্র রাত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম এবার মুজাহিদগণকে তাদের বর্শায় জড়ানো কাপড়ে আগুন লাগাবার নির্দেশ দেন। মুজাহিদগণ তাই করলেন এবং বর্শা হাতে দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ আকস্মিক হামলা এবং সেই সাথে হাজার হাজার মশালের আলো দেখে ইরানীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। এ অবস্থায়ও মুজাহিদগণ অনেককে হত্যা করে, অনেককে বন্দী করে এবং অন্যরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির পবিত্র হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা শরীফে গিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিদমতে হাযির হন। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ঐ বছরই (হিঃ ৩২ সন) ৮৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রেখে যান।

হিজরী ৩৩ সনের ঘটনাসমূহ

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ওয়ালীদ ইব্ন উকবা পদচ্যুত হওয়ার পর তার স্থলে হযরত সাঈদ ইব্ন 'আস (রা) কূফার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি কূফাবাসীদের মন জয় করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান। মালিক ইব্ন আশতার নামে পরিচিত মালিক ইব্ন হারিছ নাখঈ, ছাবিত ইব্ন কায়স হামাদানী, আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, আলকামা ইব্ন কায়দ, জুনদুব ইব্ন যুহায়র, জুনদুয ইব্ন কাআব আযাদী, উরওয়াহ ইব্ন আল-জাআদ আমর ইব্ন আল-হাক্ক খুযাঈ, সা'সহি ইব্ন সূজান, যায়দ ইব্ন সূজান, কুমায়ল ইব্ন যিয়াদ প্রমুখ ব্যক্তি সাঈদ ইব্ন 'আস-এর দরবারে এসে বসতেন এবং অবাধে কথাবার্তা বলতেন। কখনো হাস্যরসের কথাবার্তাও চলত। একবার সাঈদ ইব্ন 'আস (রা)-এর মুখ থেকে একথা বেরিয়ে গেল যে, এ এলাকা কূফা কুরায়শদের উদ্যান। কিন্তু একথা শোনামাত্র মালিক আশতার অত্যন্ত রাগত ভাষায় বলে উঠল কী! যে এলাকাটি আমরা তরবারির জোরে দখল করেছি, সেটাকে তুমি তোমার গোত্রের উদ্যান মনে করে বসেছ ? তার একথার সূত্র ধরে অন্যরাও এরূপ কথাবার্তা বলতে শুরু করে। ফলে হৈ চৈ বেঁধে যায়। তখন আবদুর রহমান আসাদী এভাবে হৈ চৈ করতে সকলকে নিষেধ করেন। এবার সকলে একজোট হয়ে আবদুর রহমানকে আক্রমণ করে এবং তাকে এমনভাবে মারধর করে যে, তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। এ ঘটনার পর সাঈদ ইব্ন 'আস তার দরবারের নৈশ বৈঠক বন্ধ করে দেন এবং কেউ যাতে

ভিতরে না আসতে পারে, সেজন্য দরজায় প্রহরী মোতায়েন করেন। রাতের এ বৈঠক বন্ধ হওয়ায় লোকেরা খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং যেখানে সেখানে জড় হয়ে সাঈদ ইব্ন 'আস এবং সেই সাথে হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। এ অভিযোগ উত্থাপনকারীদের আশেপাশে স্বাভাবিকভাবে বাজে লোকেরা এসেও ভিড় জমাতো।

ধীরে ধীরে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সাঈদ ইব্ন 'আস (রা) হযরত 'উসমান গনী (রা)-কে সমগ্র ব্যাপারটি লিখে জানান। উত্তরে হযরত উসমান গনী (রা) সাঈদ ইব্ন 'আসকে লিখেন, 'ঐ লোকদেরকে কূফা থেকে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দাও।' সাঈদ ইব্ন 'আস তাই করলেন। হযরত মুআবিয়া (রা) ঐ লোকদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখান, তাদেরকে সাথে নিয়ে পানাহার করেন এবং তাদের দৈনিক ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। দুষ্ট প্রকৃতির এ লোকদেরকে সঠিক পথে আনয়নের উদ্দেশ্যেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশে তিনি তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। কিছু দিন পর তিনি ঐ লোকদেরকে বুঝিয়ে বললেন, যেন তারা কুরায়শের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং মুসলমানগণের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট না করে। কিন্তু ইব্ন সূজান হযরত মুআবিয়া (রা)-এর ঐ যুক্তিপূর্ণ সহানুভূতিশীল কথার যে উত্তর দেন তা ছিল অত্যন্ত অযৌক্তিক ও বিদ্বেষপূর্ণ। সে তার জিদের উপরই অনড় থাকে। বাধ্য হয়ে হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে লিখেন, এ লোকগুলো সরল পথে আসবে বলে তো মনে হয় না। হযরত উসমান গনী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-কে লিখলেন, তাহলে তাদেরকে হিমসের গভর্নর আবদুর রহমান ইব্ন খালিদের কাছে পাঠিয়ে দাও। হযরত মুআবিয়া (রা) তাই করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ তাদের আচার-আচরণ ভালভাবে লক্ষ্য করলেন এবং সে অনুযায়ী তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করলেন, এমন কি তাদেরকে তার মজলিসে বসার অনুমতিও দিলেন না। তাতে বেশ কাজ হল। কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা সরল পথে এসে গেল এবং নিজেদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তির উপর অনুশোচনাও প্রকাশ করল। আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ এ সম্পর্কে হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবহিত করলে তিনি উত্তরে লিখলেন, যদি কূফার দিকে যেতে চায় তাহলে যেতে দাও।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা ছিল ইব্ন সাওদা নামে পরিচিত। সে ছিল সানআ শহরের অধিবাসী একজন ইয়াহূদী। হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতকালে সে যখন লক্ষ্য করল যে, মুসলমানগণ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম জাতি তখন বিশ্বের বিরাট দিগ্বিজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে মদীনা শরীফে এসে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করল এবং মুসলমানগণের সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে, তার মনের কথা কেউই জানতে পারল না এবং জানার চেষ্টাও করল না। এ সুযোগে সে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ আবিষ্কার করল এবং ভালভাবে যাচাই করে নিল। তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে কি কি কৌশল অবলম্বন করা যায় বা কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কেও খুব চিন্তা গবেষণা করল। ঐ সময়ে বসরায় হাকীম ইব্ন জাবালা নামীয় ব্যক্তি বাস করত। সে তার পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেছিল যে, সে কোন একটি ইসলামী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুযোগমত

যিম্মীদের উপর লুটপাত চালাত। সে অন্যান্য লোককেও নিজের দলে টেনে নিয়ে এখানে সেখানে ডাকাতি ও রাহাজানি করত। তার এ দুষ্কর্মের সংবাদ শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা)-এর কানে গিয়েও পৌঁছে।

খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) বসরার গভর্নরকে লিখলেন, 'হাকীম ইব্‌ন জাবালাকে বসরার অভ্যন্তরে নযরবন্দী করে রাখ এবং কখনো শহরের বাইরে যেতে দিও না।' কাজেই, হাকীম ইব্‌ন জাবালাকে বসরাতে নযরবন্দী করে রাখা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা হাকীম ইব্‌ন জাবালার অবস্থাদি শুনে মদীনা শরীফ থেকে সোজা বসরাতে চলে যায়। সেখানে সে হাকীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র ঘরে অবস্থান করে হাকীম ইব্‌ন জাবালা এবং তার মাধ্যমে তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ও মুসলমানগণের ধ্বংস সাধনের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরি করে। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী সে নিজেকে মুসলমানগণের বন্ধু এবং রাসূল-পরিবারের একান্ত মঙ্গলকামী বলে যাহির করত এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম কথার মার-প্যাঁচে নিজের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস সাধারণ্যে প্রচার করত। সে কখনো বলত, মুসলমানগণই বলে বেড়ায়, দুনিয়ায় হযরত ঈসা (রা) পুনরায় আবির্ভূত হবেন, কিন্তু একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও দুনিয়ায় পুনরাবির্ভূত হবেন। সে জনসাধারণের সামনে–

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرَانَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ·

যিনি কুরআনকে তোমার জন্য করেছেন বিধান তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে। (২৮ : ৮৫)

—এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে এ আকীদা-বিশ্বাসে টেনে আনার চেষ্টা করে যে, অবশ্য অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও দুনিয়ায় পুনরাবির্ভূত হবেন। অনেক বোকাই তার এ প্রতারণার ইন্দ্রজালে পতিত হয় এবং সে ঐ বোকাদের নিয়ে এমন একটি আকীদা দাঁড় করাবার প্রয়াস পায় যে, প্রত্যেক নবীরই একজন 'খলীফা ও ওসী' (প্রতিনিধি) থাকেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওসী হযরত আলী (রা)। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেমন 'খাতামুল 'আম্বিয়া' (শেষ নবী) ঠিক হযরত আলী (রা)-ও তেমনি খাতামুল আওসিয়া' (শেষ ওসী)। তারপর সে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর মুসলমানগণ হযরত আলী (রা) ব্যতীত অন্যকে খলীফা বানিয়ে তার (আলীর) অধিকার খর্ব করেছে। কাজেই, এখন সকলেরই উচিত হযরত আলী (রা)-কে সাহায্য করা এবং বর্তমান খলীফাকে হত্যা অথবা পদচ্যুত করে হযরত আলী (রা)-কেই খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত করা। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এসব পরিকল্পনা তৈরি করেই মদীনা শরীফ থেকে বসরাতে এসেছিল। এখানে এসে সে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এবং যথাযথভাবে তার ঐ সব বদ-আকীদা ও কু-বিশ্বাসসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে।

ক্রমে ক্রমে এ ফিতনার খবর যখন বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের কানে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ এবং এখানে কেন এসেছ ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা উত্তর দিল, আমি ইয়াহূদী ধর্মের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে শাশ্বত সুন্দর ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি এখানে আপনার একজন মুসলিম প্রজা হিসাবে বসবাস করতে চাই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের বলেন, আমি তোমার হালচাল ও কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার তো মনে হয়, তুমি

একজন ইয়াহূদী হিসাবে মুসলমানগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে চাও। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমেরের মুখে একথা শুনে সুচতুর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা বুঝতে পারল, এখন আর বসরাতে অবস্থান করা তার জন্য নিরাপদ নয়। তাই সে তার একান্ত বিশ্বস্ত লোকদেরকে তার দলের আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে নিজে বসরা থেকে কূফার চলে গেল। কূফা ছিল ইসলামী বাহিনীর দ্বিতীয় কেন্দ্র। সেখানে পূর্ব থেকেই হযরত উসমান গনী (রা) এবং তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন একদল লোক ছিল। তাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা কূফায় এসে তাদের মাধ্যমে তার অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার ভাল সুযোগই পেল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার অন্তরে ছিল একদিকে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে হযরত উসমান গনী (রা)-এর প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা। তার কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, সে হযরত উসমান গনী (রা)-এর উপর কোন কিছুর বদলা বা প্রতিশোধ নিতে চায়। কূফায় এসেই ছদ্মবেশী আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা নিজেকে সকলের কাছে একজন অতি মুত্তাকী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করে। তাই সাধারণভাবে লোকেরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতে থাকে এবং কেউ কেউ তার ভক্ত-অনুরক্তেও পরিণত হয়। যখন কুফায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার আকীদা-বিশ্বাসের চর্চা শুরু হয় তখন সেখানকার গভর্নর হযরত সাঈদ ইব্ন 'আস (রা) তাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব করে শাসিয়ে দেন। কূফার বুদ্ধিমান ও ভদ্রজনেরাও তাকে একজন সন্দেহজনক লোক বলে মনে করে। এবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা কূফা থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়। বসরার নগর কূফায়ও সে তার একদল সাঙ্গ-পাঙ্গ রেখে গেল। মালিক আশতার ছিল তাদের অন্যতম। কূফা থেকে সিরিয়া তথা দামিশকে পৌঁছে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। তাই শীঘ্রই সেখান থেকে চম্পট দিল। হযরত উসমান গনী (রা) ও বনূ উমাইয়ার প্রতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার শত্রুতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এক শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য শহরে আশ্রয় গ্রহণ যেন তার সামনে সাফল্যের এক একটি নতুন ক্ষেত্র ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে লাগলো। সিরিয়া থেকে বের হয়ে সে সোজা মিসরের দিকে চলে গেল। সেখানকার গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ। মিসরে পৌঁছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা তার অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ আরম্ভ করল। এখানে সে তার গুপ্ত সংগঠনের একটি পরিপূর্ণ সংবিধান রচনা করল। তাতে আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা ও হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করাকে সাফল্যের সবিশেষ মাধ্যম রূপে গণ্য করা হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) তখন আফ্রিকা, বার্বার, কনস্টানটিনোপল প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার মত অবকাশ তার বড় একটা ছিল না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা মিসর থেকে কূফা ও বসরার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাথে পত্রালাপ শুরু করে। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিসর, কূফা ও বসরা থেকে সেখানকার গভর্নরদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত পত্রাদি মদীনাবাসীগণের কাছে প্রেরিত হতে থাকে। সেই সাথে বসরাবাসীগণের কাছে কূফা ও মিসর থেকে, মিসরবাসীদের কাছে বসরা ও কূফা থেকে এবং কূফাবাসীদের কাছে বসরা, মিসর ও দামিশকে থেকে এ মর্মে অনবরত পত্র আসতে থাকে যে, ঐ সমস্ত এলাকার গভর্নররা মানুষের উপর এতই জুলুম অত্যাচার করছে যে, তাদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। যেহেতু কোন অঞ্চলেরই গভর্নর বা কর্মকর্তারা

জুলুম করছিলেন না, তাই প্রত্যেক এলাকার লোকও ধারণা করে বসল যে, শুধু আমাদের এলাকা ছাড়া অন্য সব এলাকায়ই জুলুম অত্যাচারের স্টীমরোলার চলছে এবং তা সত্ত্বেও হযরত উসমান গনী (রা) উক্ত গভর্নর ও কর্মকর্তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের পদে বহাল রাখছেন এবং তাদেরকে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করছেন। প্রত্যেক প্রদেশ এবং প্রত্যেক এলাকা থেকে অনবরত রাজধানী মদীনা শরীফেও পত্র আসছিল। এ প্রেক্ষিতে হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে মিসরে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-কে কূফায় প্রেরণ করেন এবং সেখানকার অবস্থা তদন্ত করে দরবারে খিলাফতে তার রিপোর্ট পাঠাবার নির্দেশ দেন। হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) যখন মিসরে পৌঁছেনর তখন সে সেখানকার এ সমস্ত লোক যারা গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এবং যারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার দলভুক্ত ছিল– তারা কূটচালের মাধ্যমে হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে নিজেদের সম-মতাবলম্বী করে নেয় এবং তাকে এ বলে মদীনা শরীফে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে যে, যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) জেনে শুনেই মানুষের উপর জুলুম অত্যাচারের পথ উন্মুক্ত রেখেছেন, তাই তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে চলাই সমীচীন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) কূফা পৌঁছে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, এখানকার জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে গভর্নরকে দোষারোপ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ফলে, একটা বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে আশআছ ইব্‌ন কায়স, সাঈদ ইব্‌ন কায়স, সাঈব ইব্‌ন আকবা, মালিক ইব্‌ন হাবীব, হাকীম ইব্‌ন সালামত, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, সালমান ইব্‌ন রিবাঈ প্রমুখ অত্যন্ত প্রভাবশালী, দৃঢ়সংল্পের অধিকারী এবং খিলাফতে ইসলামিয়ার ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ব্যক্তিবর্গ কূফা থেকে বিভিন্ন এলাকা অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

সাঈদ ইব্‌ন 'আস চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা এবং মানুষের মুখে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখে কা' কা' ইব্‌ন আমরকে আপন স্থলাভিষিক্ত করে কূফা থেকে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। তার উদ্দেশ্য ছিল খোদ খলীফার সাথে কূফার লোকেরা মালিক আশতার এবং তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথী, যারা তখন হিমসে অবস্থান করছিলেন– তাদের লিখলো, আজকাল কূফা একদম খালি। তোমরা যেভাবে পার, এখানে চলে এসো।' কূফায় তখন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সবর্জনমান্য কোন সরকারী কর্মকর্তা বিদ্যমান না থাকায় সাধারণ মানুষের মুখ একেবারে লাগামহীন হয়ে উঠেছিল। মানুষ প্রকাশ্যে হযরত উসমান গনী (রা) এবং তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে গালি-গালাজ ও দোষারোপ করতে লাগলো। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়স কূফাবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল সঙ্গে নিয়ে এ উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয় যে, সেখানে পৌঁছে হযরত উসমান গনী (রা)-কে খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগে বাধ্য করবে। কিন্তু কা' কা' ইব্‌ন আমর একদল লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ইয়াযীদের পথে বাধার সৃষ্টি করেন এবং তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

ইয়াযীদ অত্যন্ত বিনীতভাবে কা' কা' ইব্‌ন আমরকে বলল, সা'দ ইব্‌ন 'আসের বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে। তাই আমি তাকে কূফার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় রওয়ানা হয়েছিলাম। তাছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। একথার উপর কা' কা' ইয়াযীদকে ছেড়ে দেন। কিন্তু এরপরই মালিক ইব্‌ন আশতার তার দলবল নিয়ে

হিমস থেকে কূফায় এসে পৌঁছালো। তাদের কূফা পৌঁছার সাথে সাথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে যেন নবজীবনের সঞ্চার হল। মালিক আশতার প্রকাশ্যে জনসাধারণকে ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কূফা থেকে রওয়ানা করল। কা' কা' এ জনদলের মুকাবিলা করতে পারলেন না। তারা কূফা থেকে কাদিসিয়ার নিকটবর্তী জার'আ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছল।

হিজরী ৩৪ সনের ঘটনাসমূহ

এ বছর কূফার যে অবস্থা ছিল তা তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উসমান গনী (রা) রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তার নামেও এ মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, এবারকার হজ্জের পর যেন তাঁরা সবাই মদীনা শরীফে এসে তাঁর সাথে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করেন। অতএব, সিরিয়া থেকে হযরত মুআবিয়া (রা), মিসর থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবী সারাহ (রা), কূফা থেকে সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা), বসরা থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের (রা) এবং কয়েকটি ছোট ছোট প্রদেশের কর্মকর্তারাও মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, কেন আমার বিরুদ্ধে এ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ নির্ধারণ করে আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন এবং বলুন, এখন আমার করণীয় কি ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের বলেন, আমার মতে এ লোকদেরকে জিহাদে নিয়োজিত রাখাই এর শ্রেষ্ঠতম প্রতিকার। নিষ্কর্মা বসে থাকার দরুনই তাদের মাথায় এ ধরনের ফাসাদ ও কুবুদ্ধির উদয় হয়। যখন তারা জিহাদে লিপ্ত হবে তখন আপনা আপনি এসব বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটবে। সাঈদ ইব্‌ন 'আস বলেন, এ দুষ্ট লোকদের নেতাদেরকে অর্থাৎ দুষ্কৃতির হোতাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কথার উপর যুক্তিভিত্তিক পাকড়াও করতে হবে। তারপর তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। ফলে তাদের অনুসারীরাও আপনাআপনি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, এ অভিমতটি নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাকে কার্যকরী করা সহজ নয়। আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে যিনি যে প্রদেশের গভর্নর আছেন, তিনিই সে প্রদেশ সামলাবেন। এভাবে প্রত্যেকটি প্রদেশ এ দুষ্কৃতিকারীদের থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, তাদের সব লোকই লোভী ও প্রতাপশালী। কাজেই তাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়ে আপন করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এই পরামর্শ সভায় বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার প্রকৃত অবস্থা ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার পর দেখা গেল, এসব বিক্ষোভের খবর একেবারে কাল্পনিক ও অনুমান ভিত্তিক; এতে সভ্যতার লেশ মাত্র নেই। এ প্রেক্ষিতে কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, যারা এ ধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহে অংশ নেয়, তাদের সবাইকে খুঁজে বের করে হত্যা করে ফেলা উচিত। যারা প্রকৃতই দোষী তাদের প্রতি কোন ভাবেই কৃপা প্রদর্শন সঙ্গত নয়। হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, আমি শুধু ঐ পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে যা পাক কুরআন ও হাদীস নির্ধারণ করে দিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন লোককে প্রকাশ্যে মুরতাদ হতে না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কী করে তাকে হত্যা করতে পারি ? যে অপরাধের যে শাস্তি নির্ধারিত আছে, সে অপরাধের জন্য আমি শুধু সে শাস্তিই দিতে পারি। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সূত্রপাত করা হয়েছে তা সহ্য করার মত যথেষ্ট ধৈর্য ও মনোবল আমার রয়েছে। এ ধরনের

আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার পর ঐ দিনের পরামর্শ বৈঠক সমাপ্ত হয়। তাতে কোন বিশেষ প্রস্তাব বা কর্মপন্থা গৃহীত হয় নি। অবশ্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয় যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে কোন কোন এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য কোন কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর গভর্নর ও কর্মকর্তাবৃন্দ মদীনা শরীফ থেকে নিজ নিজ এলাকার দিকে রওয়ানা হন। সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) তাঁর যাত্রাপথে যখন জার'আ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন তখন তিনি দেখতে পান যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সের নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান করছে। সাঈদ ইব্‌ন 'আস সেখানে পৌঁছতেই ইয়াযীদ অন্তত কঠোর ভাষায় বলে, তুমি এখান থেকে অবিলম্বে ফিরে যাও। আমরা তোমাকে কূফায় কখনো প্রবেশ করতে দেব না। একথা শুনে সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা)-এর ভৃত্য বলল, সাঈদের এখান থেকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। একথা শোনা মাত্র মালিক আশতার আগে বেড়ে সাঈদের ভৃত্যকে উটের পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলে এবং সাঈদ ইবন 'আস (রা)-কে কূফার পাঠিয়ে দেয়। সাঈদ বাধ্য হয়ে সেখান থেকে মদীনায় ফিরে যান এবং হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তখন উসমান গনী (রা) হযরত আবূ মূসা আশআরীকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) গভর্নর হিসাবে মদীনা শরীফ থেকে কূফায় গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সঙ্গে করে হযরত উসমান গনী (রা)-এর একটি পত্র নিয়ে যান, যা কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল : তোমরা যে ব্যক্তিকে নিজেদের প্রশাসক হিসাবে পসন্দ করেছো ও মনোনীত করেছো আমি তাঁকেই নিয়োগ করে তোমাদের কাছ পাঠালাম। তাতে এও বলা হয়েছিল : যে পর্যন্ত শরীআত আমাকে অনুমতি দেবে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে যাব। সেই সাথে তোমাদের যাবতীয় বাড়াবাড়ি সহ্য করে তোমাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

আবূ মূসা (রা) কূফায় পৌঁছে জুমু'আর দিন মিম্বরে আরোহণ করে সকলের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তাতে মুসলমানদের মধ্যকার দলাদলির বিলোপ সাধন এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী (রা)-এর আনুগত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবূ মূসা (রা)-এর এ ভাষণ প্রদানের ফলে কূফার অবস্থা কিছুটা শান্ত হয় এবং সাধারণ লোক, যারা সাবাঈ দলের সাথে কোন ভাবেই সম্পর্কিত ছিল না, তাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার দল এবং যারা হযরত উসমান গনী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত তারা সাধারণভাবে হযরত উসমান গনী (রা) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এমন কি তৎকর্তৃক কূফার আশেপাশে জেলাসমূহে নিযুক্ত ছোট খাটো কর্মচারীদের সম্পর্কেও পাইকারী হারে অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করে। তারা চিঠি পত্রের মাধ্যমে মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকেও হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টা চালায়। মদীনা শরীফের অধিবাসীদের কাছে যখন বাইরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্রাদি পৌঁছত, তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান অথবা পদচ্যুত করার জন্য হযরত উসমান গনী (রা)-এর উপর চাপ প্রয়োগ করতেন। তদন্তের পর যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্দোষ পেতেন, তাই তাকে শাস্তি প্রদান বা পদচ্যুত করতে ইতস্তত করতেন। ফলে মদীনা শরীফেও খোদ হযরত উসমান গনী (রা)-কে সাধারণ লোকেরা প্রকাশ্যে দোষারোপ

করতে শুরু করে এবং এখানেও খলীফার বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে আবূ উসায়দ সাঈদী, কা'ব ইবন মালিক, হাসসান ইবন ছাবিত (রা) প্রমুখ জনসাধারণকে পরস্পর গালাগালি ও দোষারোপ করা থেকে বিরত রাখতেন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে খলীফার আনুগত্য যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের কথায় সাধারণ মানুষ খুব একটা প্রভাবিত হচ্ছে বলে মনে হত না। কারণ তা ছিল ঐ যুগ যখন আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার এজেন্টরা ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বড় বড় শহর এবং জনবসতিতে পৌঁছে গিয়েছিল এবং সর্বত্রই নিজেদের কমবেশী অনুসারী তৈরী করে নিয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্রের তখন পাঁচটি বড় কেন্দ্র ছিল। মদীনা তাইয়িবা ছিল রাজধানী এবং সূচনাকাল থেকেই তা ছিল ইসলামী শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের উৎসস্থল ও কেন্দ্রভূমি। কূফা ও বসরা উভয় শহরেই ছিল বিরাট বিরাট সেনাছাউনি। সেখানে যোদ্ধা আরব গোত্রসমূহের বসতি গড়ে উঠেছিল। উভয় স্থানেই ইসলামী শক্তি এতই মজবুত ও সুদৃঢ় ছিল যে, তার প্রভাবে ইরান থেকে আরম্ভ করে তুর্কিস্তান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। ফুসতাত বা কায়রোয়ও সেনাছাউনি ছিল এবং মিসর ছাড়াও আলেপ্পো ও ফিলিস্তীন পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত ছিল। দামিশকও ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের একটি কেন্দ্রভূমি। এখানেও মুসলমানদের এ পরিমাণ সমর শক্তি বিদ্যমান ছিল যে, রোম সম্রাট তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। কেননা, যখনি দামিশকের মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে রোমান সেনাবাহিনীর মুকাবিলা হয়েছে, তখনি রোমান সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে। সুচতুর আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা প্রথম থেকেই এ পাঁচটি কেন্দ্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করছিল। সে এটাও ভালভাবে বুঝে নিয়েছিল যে, মুসলিম বিশ্বে এগুলোর মত সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কেন্দ্র নাই। কাজেই সে সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে আসে। সেখান থেকে বসরাতে গিয়ে পৌঁছে। দামিশকে হযরত মুআবিয়া (রা)-এর কারণে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি। বাকী সব জায়গায়ই সে সাফল্যের সাথে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করেছে, ছোট হোক অথবা বড় হোক সব কেন্দ্রেই নিজের দল গঠন করেছে অথবা এজেন্ট তৈরি করে রেখে এসেছে। দামিশকে আর কিছু না পারলেও হযরত আবূ যর (রা)-এর ঘটনা থেকে সে বেশ কিছু ফায়দা লুটেছে। সে মানুষের মধ্যে এ ধারণা প্রচার করেছে যে হযরত আবূ যর (রা) সত্যি কথা বলছেন এবং তিনি সঠিক পথেই আছেন। কেননা, বায়তুল মালকে হযরত মুআবিয়া মহান আল্লাহর মাল আখ্যা দিয়ে অন্যায়ভাবে নিজের দখলে বা এখতিয়ারে রাখতে চান। প্রকৃতপক্ষে তা মুসলিম জাতির সম্পদ এবং সমগ্র মুসলমান তাতে অংশীদার। কাজেই, মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান গনী (রা)-কে সে সব অভিযোগের উৎস বলে আখ্যা দেয় এবং জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা হযরত আবূ দারদা (রা)-এর কাছে যায় এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও চাতুর্যের সাথে তাঁর সামনে নিজের বাতিল আকীদাসমূহ তুলে ধরতে শুরু করে। তার কথাবার্তা শুনে হযরত আবূ দারদা (রা) বলে উঠেন, তোমাকে ইয়াহূদী বলে মনে হচ্ছে। তুমি ইসলামের মুখোশ পরে মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করছ। সেখানে তার চালাকি খাটে নি দেখে সে হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর কাছে যায়। তিনিও যখন তার কথাবার্তা থেকে তার বাতিল চিন্তাধারা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করে হযরত

মুআবিয়া (রা)-এর কাছে নিয়ে যান এবং বলেন, আমার মনে হয় এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আবূ যর (রা)-কে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে এবং আপনার সাথে তাঁর লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছে। হযরত মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাকে দামিশক থেকে বের করে দেন। তারপর সে মিসরে গিয়ে আপনার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে।

যখন দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে অনবরত অভিযোগ পত্র আসতে থাকে এবং সেখানেও কানাঘুষা শুরু হয় তখন মদীনা শরীফের কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে দেখা করে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কে তদন্ত চালান এবং জনসাধারণের অভিযোগসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। হযরত উসমান গনী (রা) কয়েকজন নির্ভরযোগ্য সাহাবীকে বাছাই করে তাঁদের এক-একজনকে এক-এক প্রদেশে পাঠান যেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা তদন্ত করে তাঁর কাছে এসে রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে কূফায়, উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে বসরায় এবং আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। এভাবে প্রত্যেকটি ছোট বড় প্রদেশে এক একজন তদন্তকারীকে পাঠানো হয়। কিছুদিন পর তাঁরা ফিরে এসে রিপোর্ট দেন যে, তাঁদের কেউ কোন এলাকায় কোন গভর্নর বা কর্মচারীকে আপত্তিকর কিছু করতে দেখেন নি বরং তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুষ্ঠভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কোন কর্মকর্তা কর্মচারীকে শরীআত বিরোধী কোন কাজ করতেও দেখা যায় নি এবং গণ্যমান্য ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোকও তাদের কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। এসব কথা শুনে মদীনাবাসীগণ অনেকটা স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন হজ্জের মওসুম ছিল আসন্ন। হযরত উসমান গনী (রা) প্রত্যেকটি শহর ও জনবসতিতে জনসাধারণের নামে একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, যার বিষয়বস্তু ছিলো নিম্নরূপ :

> আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ আসছে যে,আমার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে।এ প্রেক্ষিতে আমি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা এবারকার হজ্জে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করে। কাজেই, আমার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যার যে অভিযোগ আছে, সে যেন হজ্জের সময় তা আমার সামনে পেশ করে এবং আপন প্রাপ্য, যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে আমার কাছ থেকে অথবা আমার কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে যায়।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশ

হযরত উসমান গনী (রা) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে নির্দেশ পাঠান যেন তারা অবশ্য অবশ্যই হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন। সে মতে মিসরের শাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা), সিরিয়ার প্রশাসক মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা), বসরার প্রশাসক আবদুল্লাহ্ ইবন আমের (রা) সহ সকল গভর্নর, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হজ্জের মওসুমে মক্কা শরীফে এসে সমবেত হন। অপর দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার প্রস্তাবানুযায়ী তার অনুগত লোকেরা প্রত্যেকটি প্রদেশ ও প্রত্যেকটি কেন্দ্র থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কা শরীফের পরিবর্তে মদীনা শরীফে এসে জড় হয়। হজ্জের দিনগুলোতে হযরত উসমান গনী (রা) ঘোষণা দেন যে, এখানে (মক্কা শরীফে) সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত রয়েছেন। যদি তাঁদের কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় যেন তা পেশ করা হয়। কিন্তু সেখানে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ উত্থাপন করেনি। এবার খলীফার মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা কিভাবে দূর করা যায় সে সম্পর্কে পরস্পর শলা-পরামর্শ করতে থাকেন। কথার পিঠে কথা উঠে এবং প্রসঙ্গটি অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা) সকলকে সম্বোধন করে বলেন, এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা অবশ্য অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে এবং এর দ্বার শীঘ্রই উন্মুক্ত হবে। আমি চাই না যে, ফিতনার দরজা উন্মুক্ত করার দায়-দায়িত্ব আমার উপর পড়ুক। আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবগত আছেন যে, আমি মানুষের উপকার ছাড়া অপকার কখনো করিনি। আমি কখনো তাদের অমঙ্গল চিন্তা করিনি। তাঁর একথা শুনে সকলেই নীরব হয়ে যান এবং হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের দিকে পৌঁছেই যে সমস্ত লোক বাইরে থেকে মদীনা শরীফে এসেছিল তাদেরকে একটি বৈঠকে আহ্বান করেন। তিনি ঐ বৈঠকে হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা)-কেও আহ্বান করেন। হযরত মুআবিয়া (রা)-ও মক্কা শরীফ থেকে হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে মদীনা শরীফে এসেছিলেন এবং তিনিও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে হযরত মুআবিয়া (রা) সর্বপ্রথম উঠে দাঁড়ান এবং 'হামদ ও ছানার (আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর প্রশস্তির) পর সকলকে সম্বোধন করে বলেন :

> আপনারা সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী। আপনারা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং উম্মতের পৃষ্ঠপোষক। আপনারা আপনাদের বন্ধু উসমান গনী (রা)-কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই খলীফা নির্বাচিত করেছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে মানুষের মুখে মুখে নানা ধরনের কথাবার্তা শোনা যায়। যদি আপনারা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন, তাহলে তা প্রকাশ্যে বলুন। আমি তাঁর উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী আছি। হ্যাঁ, আমি একথাও অবশ্যই বলে দিতে চাই যে, যদি কারো মনে খলীফা বা আমীর হওয়ার সাধ জাগে তাহলে তার বা তাদের মনে রাখা উচিত যে, শেষ পর্যন্ত পিছন ফিরে পালানো ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না।

হযরত আলী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর বক্তৃতার শেষ বাক্যটির উপর তাকে একটি শাসানি দেন এবং অন্য কোন কথা না বলেই বসে পড়েন। এবার হযরত উসমান গনী (রা) দাঁড়িয়ে বলেন :

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর সতর্কতা হেতু এবং মহান আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে ভেবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সুখ-সুবিধার প্রতি মোটেই দৃকপাত করেন নি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতেন। আমার আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত গরীব। তাই আমি তাঁদের সাথে সদয় ব্যবহার করে থাকি। যদি আপনারা তা অবৈধ প্রমাণিত করতে পারেন, তাহলে আমি আমার এ আচরণ পরিত্যাগ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আপত্তি উত্থাপন

হযরত উসমান গনী (রা) এ পর্যন্ত বলার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনকে অবৈধভাবে ধন-সম্পদ দান করেন। যেমন আপনি আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ

(রা)-কে সমগ্র মালে গনীমত বিলিয়ে দিয়েছেন। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তর দেন, আমি মালে-গনীমতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে শুধু এক-পঞ্চমাংশ দান করেছি। আর এভাবে দান করার দৃষ্টান্ত হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালেও বিদ্যমান ছিল। তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনকে 'এমারত' (প্রশাসক পদ) দান করেছেন—যেমন মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে সমগ্র সিরিয়া রাজ্যের আমীর (প্রশাসক) বানিয়ে দিয়েছেন এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)--কে পদচ্যুত করে তার জায়গায় আবদুল্লাহ্ ইবন আমের (রা)-কে বসরার আমীর নিযুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আপনি কূফার প্রশাসকের পদ থেকে মুগীরা ইবন শু'বাকে অপসারণ করে সেখানে ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা)-কে, তারপর সাঈদ ইবন 'আসকে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। হযরত উসমান গনী (রা) তার উত্তরে বললেন, যাঁদেরকে আমি প্রশাসক পদ দান করেছি তারা আমার আত্মীয়-স্বজন নন, বরং নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করার যোগ্যতা রাখেন। যদি আপনাদের দৃষ্টিতে তাঁরা প্রশাসক পদের যোগ্য না হয় এবং এজন্য আমার উপর অযথা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তাহলে আমি তাদের জায়গায় অন্য লোক নিয়োগ করতে প্রস্তুত আছি। আমি তো ইতিমধ্যে সাঈদ ইবন 'আস (রা)-কে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেছি। তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আপনার অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনকে প্রশাসকের চাকরি দিয়েছেন—যেমন, আপনার আত্মীয় আবদুল্লাহ্ ইবন আমের (রা) একজন যুবক মাত্র; তাঁকে প্রশাসকের চাকরি দেওয়া উচিত হয়নি। হযরত উসমান (রা) উত্তরে বলেন, বিবেক-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যান্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবন আমের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কাজেই, তাঁর যুবক বয়সী হওয়াটা দোষের কোন ব্যাপার নয়। আপনারা বলুন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে মাত্র ১৭ বছর বয়সে কেন 'আমীর' (সেনাপতি) নিযুক্ত করেছিলেন ? তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আপনার গোষ্ঠীর লোককে বড় বেশী ভালবাসেন এবং তাদেরকে বড় বড় উপহার দিয়ে থাকেন। হযরত উছমান গনী (রা) উত্তরে বলেন, নিজের গোষ্ঠির লোককে ভালবাসা কোন অপরাধ নয়। যদি আমি তাদেরকে কোন উপহার দিয়ে থাকি, তাহলে তা বায়তুল মাল থেকে দেইনি, বরং আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিয়েছি। যেখানে বায়তুল মাল থেকে আমি আমার নিজের খরচের জন্যও একটি কানাকড়ি নেইনি, সেখানে আত্মীয়-স্বজনের জন্য কী করে বায়তুল মালের অর্থ খরচ করতে পারি ? আমার ব্যক্তিগত যে ধন-সম্পদ আছে তা তো আমি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারি।

তারপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি চারণভূমিকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তরে বলেন, আমি যখন খলীফা নির্বাচিত হলাম, তখন মদীনা তাইয়িবাতে আমার চাইতে অধিক উট বকরী কারোরই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমার কাছে মাত্র দুটি উট আছে, যা শুধু হজ্জের পরিবহন কাজে ব্যবহার করার জন্য রাখা হয়েছে। আমি এগুলোকেও চারণভূমিতে পাঠাই না। অবশ্য বায়তুল মালের উটসমূহের নির্দিষ্ট চারণভূমি রয়েছে। আর এ নীতি শুধু আমার সময়ে নয় বরং আমার পূর্ব থেকেই চলে আসছে। কাজেই, এজন্য আমাকে অভিযুক্ত করা চলে না। তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি

মীনায় (কসর নামায না পড়ে) পুরা নামায পড়লেন কেন ? সেখানে তো কসর (নামায সংক্ষেপ) করা উচিত ছিল। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তরে বলেন, আমার পরিবার-পরিজন যেহেতু মক্কা শরীফের 'মুকীম' (অবস্থানকারী) ছিল, তাই মিনায় আমার জন্য নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) না করা বৈধ ছিল। মোটকথা, প্রকাশ্য মজলিসে এভাবে একের পর এক আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং হযরত উসমান গনী (রা) প্রত্যেকটি আপত্তিরই সন্তোষজনক জবাব দেন। এভাবে মজলিসের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং লোকেরা যে যার পথে চলে যায়। তারপর হযরত আমর ইবন 'আস (রা) হযরত উছমান গনী (রা)-কে বলেন, আপনি মানুষের সাথে যতটুকু প্রয়োজন নয় তার চাইতেও বেশী নম্র ব্যবহার করেছেন। ফারূকে আযম (রা)-এর দস্তুর এটা ছিল না। তাঁর থেকে শতশত মাইল দূরে থেকেও একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, তাঁকে তার (উমরের) সম্মুখে উপবিষ্ট ভৃত্যের চাইতেও অধিক ভয় করত এবং সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। মানুষের সাথে সেই পরিমাণ নম্র ব্যবহার করা উচিত যার ফলে কোন ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ না থাকে। আপনি যে সমস্ত লোককে জানেন যে, তারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে তাদেরকে হত্যা করছেন না কেন ? হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আমর (রা)-এর এ পরামর্শ শুনে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যান।

হিজরী ৫২ সনের ঘটনাসমূহ

যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী হযরত উসমান (রা)-এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে এসেছিলেন তারা একের পর এক নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত মুআবিয়া (রা)-ও বিদায় গ্রহণের জন্য হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরবারে হাযির হন। তিনি নিবেদন করেন, আমার তো ভয় হয়, না জানি কে কখন আপনার উপর হামলা করে বসবে এবং আপনি তা প্রতিরোধ করতে পারবেন না। আমার কাছে তাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলে আসুন। সিরিয়ার সমগ্র অধিবাসীই আমার অনুগত এবং আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তর দেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর প্রতিবেশীগণকে অর্থাৎ মদীনা শরীফের অধিবাসীগণকে ছেড়ে যেতে পারব না। তখন আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেন, তাহলে আমাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিন যে, আমি একটি শক্তিশালী বাহিনী আপনার নিরাপত্তার জন্য সিরিয়া থেকে মদীনায় পাঠিয়ে দেব এবং তারা মদীনা শরীফেই অবস্থান করবে। হযরত উসমান গনী (রা) তখন উত্তর দেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিবেশীদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। এ কথা শুনে হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, আপনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হবেন। হযরত উসমান গনী (রা) তার উত্তরে :

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ·

(আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক) এ বলে নীরব হয়ে যান। হযরত মুআবিয়া (রা) সেখান থেকে উঠে গিয়ে হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত উসমান গনী (রা)-কে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিনীত আবেদন জানান। তারপর তিনি সিরিয়ায় চলে যান।

আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার ষড়যন্ত্র

আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা মিসরে বসে জনসাধারণের অগোচরেই তার ষড়যন্ত্রমূলক যাবতীয় কর্মপন্থা একেবারে পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল। হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ও হযরত ওয়ারাকা ইবন রাফি আনসারী (রা)-এর মত সাহাবীদেরকেও সে আপন ইন্দ্রজালে আবদ্ধ করে নিয়েছিল। কিন্তু তার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সে এবং তার মুসলিম বেশধারী বিশেষ কয়েকজন বন্ধু ব্যতীত আর কেউই অবহিত ছিল না। ইসলামী খিলাফতকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সে বাহ্যত হুব্বে আলী (আলী প্রেম) ও হুব্বে আহলে বায়ত (আহলে বায়তের প্রতি প্রেম)-কে মাধ্যমে পরিণত করেছিল। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী ও (মুসলিম মিল্লাতের জন্য) অনেক মারাত্মক। যাহোক, উল্লিখিত সামরিক কেন্দ্রসমূহের অনেক সরলপ্রাণ আরবই ইবন সাবার প্রতারণাজালে আটকা পড়ে এবং তারই ইঙ্গিতে প্রত্যেকটি স্থানেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলে। প্রত্যেকটি স্থানের এবং প্রত্যেকটি দলের লোকেরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, হযরত উসমান গনী (রা)-কে হয় পদচ্যুত, নয়ত হত্যা করতে হবে। তবে পরবর্তী খলীফা কাকে করা হবে সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল। কেউ হযরত আলী (রা)-কে, কেউ হযরত তালহা (রা)-কে, আবার কেউ হযরত যুবায়র (রা)-কে পরবর্তী খলীফা পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করত। ইসলামের প্রতি আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার আদৌ কোন আসক্তি বা আন্তরিক টান ছিল না বরং হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরোধিতা করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তাই সে আপাতত হুব্বে আলী (রা)-এর উপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্থগিত রাখে এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে জনসাধারণকে দ্বিধা-বিভক্ত দেখে তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থার উপরই ছেড়ে দেয়।

ফিত্না সৃষ্টিকারী কাফেলাসমূহের মদীনা তাইয়িবা যাত্রা

সর্বপ্রথম এক হাজার লোকের একটি কাফেলা তাদের হজ্জ যাত্রার কথা সর্বত্র প্রচার করে মিসর থেকে রওয়ানা হয়। আবদুর রহমান ইবন আদীস, কিনানা ইবন বাশার ইয়ামানী, সুদান ইবন ইমরান প্রমুখ ব্যক্তি এ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাফেলার নেতা নির্বাচিত হয় গাফিকী ইবন হার্‌ব মক্কী। স্থির করা হয় যে, সব লোক এক সাথে রওয়ানা হবে না, বরং চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে একের পর এক মিসর থেকে রওয়ানা হবে এবং কয়েকটি মনযিল অতিক্রম করার পর পুনরায় একে অপরের সাথে মিলিত হবে। মালিক আশতারের নেতৃত্বেও কূফা থেকে এক হাজার লোকের আর একটি কাফেলা অনুরূপভাবে (চারভাগে বিভক্ত হয়ে) রওয়ানা হয়। যায়দ ইবন সাফওয়ান আবদী, যিয়াদ ইবন রফর হারিছী, আবদুল্লাহ্ ইবন আসিম আমিরী প্রমুখ ছিল ঐ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হোরকাওস ইবন যুহায়দের নেতৃত্বে এক হাজার লোকের একটি দল বসরা থেকে রওয়ানা হয়। ঐ দলে হাকীম ইবন জাবাল্লাহ আবদী, বাশার ইবন শুরায়হ কায়সী প্রমুখ ছিলেন। কাফেলাগুলো হিজরী ৩৫ সনের শাওয়াল মাসে নিজ নিজ শহর থেকে রওয়ানা হয় এবং সকলেই এ কথা প্রচার করে যে, তারা হজ্জ করতে চলেছে। তারা গোপনে গোপনে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এবার তারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবশ্য অবশ্যই পদচ্যুত করাবে, নয়ত হত্যা করবে। তারা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ শহর থেকে বের হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায়

একত্রিত হয়। এভাবে বেশ কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর তিনটি শহরের তিনটি কাফেলাই পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং একই কাফেলায় রূপান্তরিত হয়ে মদীনা শীরফের দিকে অগ্রসর হয়। যখন মদীনা শরীফের দূরত্ব ছিল আর তিন মনযিল তখন ঐ কাফেলার মধ্যে যারা হযরত তালহা (রা)-কে খলীফা বানাতে চাচ্ছিলো তারা 'যূখাশার' নামক স্থানে থেমে যায়। আর যারা হযরত যুবায়র (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করতে চাচ্ছিল তারা আওয়াস নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। বসরার বেশীর ভাগ লোক হযরত যুবায়র (রা)-এর এবং মিসরের বেশীর ভাগ লোক হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে ছিল।

যিয়াদ ইবন মুনযির এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আসেম ঐ সব লোককে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তাড়াহুড়া না করে এখানেই অপেক্ষা কর। আমরা প্রথমে মদীনা শরীফে গিয়ে চেষ্টা করি। কেননা, আমরা জানতে পেরেছি যে, মদীনা শরীফের অধিবাসীরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি এ খবর সত্যি হয় তাহলে আমাদের তো কিছুই করার থাকবে না। এ কথা শুনে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। তারপর তারা দু'জন মদীনা শরীফে প্রবেশ করে। তারা হযরত আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদের মদীনা শরীফে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। অনুরূপভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীগণের সাথেও দেখা করে। কিন্তু, কেউই তাদেরকে প্রশ্রয় দেন নি, বরং তিরস্কার করেন এবং অবিলম্বে মদীনা থেকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মদীনা শরীফে অবস্থানরত আবদুল্লাহ ইবন সাবার লোকেরা হযরত আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে অনেক চিঠি কূফা, বসরা ও মিসরের ঐ সমস্ত লোকের কাছে পাঠিয়েছিল যারা এ মহান ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, অথচ তখন পর্যন্ত তারা আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার ফাঁদে নিশ্চিতভাবে আটকা পড়েন নি। ঐ সমস্ত বানোয়াট চিঠিতে বলা হয়েছিল, যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন, তাই তাকে পদচ্যুত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়, আর উম্মতে মুসলিমার স্বার্থে আগামী যিলহাজ্জ মাসেই এ অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করা উচিত। বিশেষত এ প্রেক্ষাপটেই এ তিনটি কাফেলা সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং হত্যা ও রক্তারক্তির উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে এসে জড় হয়েছিল। অন্যথায় এ তিনটি হাজার লোকের কী করে এ দুঃসাহস হতে পারে যে, যেখানে মদীনা শরীফে আহযাব যুদ্ধকালে বিরাট কাফিরও কোন সুবিধা করে উঠতে পারে নি, সেখানে তারা জোরপূর্বক নিজেদের একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মদীনা শরীফের দিকে ধেয়ে আসবে ? বরং এ ভরসায় তারা বুক উঁচিয়ে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল যে, মদীনা শরীফের গণ্যমান্য সব লোকই তো আমাদের পক্ষে রয়েছে এবং আমরা যা কিছু করব তাতে তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু যখন মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রই তাদের এ আগমনকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে সাব্যস্ত করলেন এবং তারা নিজেরাও মদীনা তাইয়িবাতে কোন প্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখতে পেল না, তখন তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ঐ বিরোধিতাকে একটি দূরদর্শিতামূলক সাময়িক সিদ্ধান্ত বলে মনে করল এবং বিক্ষোভকারীদের কাছে ফেরত গিয়ে তাদের সকল নেতা প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি পরামর্শ সভায় বসল। সভায় মদীনা শরীফের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সকলকে আশ্বস্ত করা

হল এবং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, যেহেতু মিসরবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হযরত আলী (রা)-কে সমর্থন করে, তাই মিসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হযরত আলী-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। অনুরূপভাবে বসরার অধিবাসীরা যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি পৃথক প্রতিনিধি দল মদীনা শরীফে এসে উল্লিখিত তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রত্যেক দলই তাদের সমর্থিত ব্যক্তিকে বলে, আমরা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকে মোটেই পসন্দ করি না। কাজেই, আপনি আমাদের কাছ থেকে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করুন। কিন্তু উল্লিখিত তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করেন। এবার দাঙ্গাবাজ মিসরবাসীরা হযরত আলী (রা)-কে বলল, আমাদের ওখানে (মিসরে) নিযুক্ত কর্মকর্তা যেহেতু অত্যন্ত জালিম ও স্বেচ্ছাচারী, তাই আমরা তার অপসারণের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কখনো মদীনা শরীফ থেকে ফিরে যাব না। তাদের এ দাপট ও আস্পর্ধা লক্ষ্য করে এবং সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে হযরত আলী (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী হযরত উসমান (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে পরামর্শ দেন : এ বিক্ষোভকারীরা যে কথার উপর জিদ ধরেছে তা আপনি পূরণ করে দিন এবং মদীনা শরীফে প্রবেশ করার পূর্বেই ওরা যাতে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়, সে ব্যবস্থা করুন। তারা আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা)-কে মিসরের গভর্নর পদ থেকে অপসারণের জন্য জিদ ধরেছে। তাই তাকে আপাতত অপসারণ করে অন্য কাউকে তার স্থলে নিয়োগ করুন।

হযরত আলী (রা) আপন পোষ্যের (সমর্থকের) জন্য সুপারিশ করেন

হযরত আলী (রা)-এর উপরোক্ত পরামর্শের উপর উসমান গনী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা)-এর পরিবর্তে কাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করা হবে ? হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা) প্রথম থেকেই হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক ছিলেন এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার প্রতারণা জালেও আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা) একটি লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-কে মিসরের আমীর তথা গভর্নর নিয়োগ করেন। এবার হযরত আলী (রা) বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদেরকে বললেন, 'যাও, এবার তোমাদের দাবী পূরণ হয়েছে।' হযরত তালহা (রা) এবং যুবায়র (রা)-ও তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে চলে যেতে বললেন। ফলে তারা ভালোয় ভালোয় মদীনা শরীফ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু পরবর্তী তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে সকল বিক্ষোভকারী তাকবীর ধ্বনি তুলে পুনরায় মদীনা শরীফে এসে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত উসমান গনী (রা)-এর বাসগৃহ ঘিরে ফেলল। হযরত আলী (রা) তখন তাদেরকে বললেন, তোমরা তো এখান থেকে চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরে আসলে কেন ? মিসরের বিক্ষোভকারীরা বলল, খলীফা উসমান গনী (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা)-কে লিখিত একটি পত্র তাঁর এক ভৃত্যের মাধ্যমে মিসরে পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আমরা যখনই মিসর পৌঁছব, তখনই যেন আমাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। আমরা রাস্তায়ই এ পত্র ধরে ফেলেছি এবং তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কূফা ও বসরার বিক্ষোভকারীরা বলল যেহেতু আমরা আমাদের মিসরীয় ভাইদের সুখ ও দুঃখের অংশীদার থাকতে চাই, তাই আমরাও তাদের সাথে ফিরে এসেছি। হযরত আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তা তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। তার

মধ্যে তোমাদের নেক নিয়্যতের (সদিচ্ছার) কোন চিহ্নই আমি দেখছি না। তারা তখন বলল, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এ খলীফাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আপনি আমাদেরকে এ কাজে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রা) তখন রাগত-স্বরে বলেন, এ রূপ কাজে আমি কি করে তোমাদের সাহায্য করতে পারি ? তারা বলে উঠল, তাহলে আপনি আমাদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন কেন ? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি তো তোমাদের কাছে কখনো কোন চিঠি লিখিনি। একথা শুনে বিক্ষোভকারীরা হতচকিত হয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হযরত আলী (রা) মদীনা শরীফ থেকে 'আহজারু'য-যায়ত' নামক স্থানে চলে যান। এদিকে বিক্ষোভকারীরা হযরত উসমান গনী (রা)-কে বিরক্ত করতে শুরু করে। তখন পর্যন্ত তারা হযরত উসমান গনী (রা)-এর পিছনে নামায পড়ছিল; এবার তা থেকেও বিরত রইল এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার প্রয়াস পেল।

হযরত উসমান গনী (রা) যখন এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন এবং এও লক্ষ্য করলেন যে, বিক্ষোভকারীদের দ্বারা মদীনা শরীফের অলিগলি ভরে উঠেছে তখন তিনি বিভিন্ন প্রদেশের কর্মকর্তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন। কিংবা এও হতে পারে যে, এ সমস্ত খবর লোকমুখে আপনাআপনি বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই মিসর, সিরিয়া, কূফা ও বসরা থেকে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য পুণ্যবান ব্যক্তি খলীফার সাহায্যের নিমিত্ত অবিলম্বে মদীনা শরীফে আসার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা) হাবীব ইবন মাসলামা ফিহরীকে এবং আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) মুআবিয়া ইব্‌ন খাদীজকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করেন। কা'কা' ইবন আমর একটি দল নিয়ে মদীনা শরীফের অভিমুখে রওনা হয়। বিভিন্ন এলাকায় এ সমস্ত খবর পৌঁছতে বিলম্ব ঘটেছিল অথবা খবর পৌঁছার পর সাহায্যকারী দল পাঠানো হবে কিনা সে ব্যাপারে ইতস্তত করা হচ্ছিল। তাই কোন সাহায্যকারী গোষ্ঠীই হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের পূর্বে মদীনা তাইয়িবাতে পৌঁছতে পারেনি। তারা সকলে পথিমধ্যেই কোন-না-কোন স্থানে এ মর্মান্তিক সংবাদ জানতে পারে এবং সেখান থেকেই আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

যা হোক ত্রিশ দিন পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা) ঘেরাও অবস্থায়ই মসজিদে এসে নামায আদায় করেন। তারপর বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেয় নি এবং তাঁর ঘরে পানি পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ করে দেয়। হযরত উসমান গনী (রা) তাদেরকে বার বার বলেন, তোমরা যে চিঠিকে কেন্দ্র করে আমাকে এভাবে হয়রান করছ সে চিঠি যে আমি লিখেছি তার কোন চাক্ষুস প্রমাণ থাকলে পেশ কর, অথবা আমা থেকে কসম নাও। আমি কসম করে বলতে পারি যে, ঐ চিঠি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তখন কোন যুক্তিপূর্ণ কথাই শুনতে রাযী নয়। ব্যাপক বাড়াবাড়ি শুরু হল। ঘরে পানি পৌঁছানোর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পতিত হন। অবশ্য জনৈক প্রতিবেশীর মাধ্যমে গোপনভাবে কিছু কিছু পানি তাঁর ঘরে পৌঁছতে থাকে।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর ইমামতি

হযরত উসমান গনী (রা) যখন মসজিদে আসতে সক্ষম হলেন না, তখন নামাযের ইমামতির জন্য তিনি হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-কে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পর বিক্ষোভকারীদের নেতা সাফিকী ইব্‌ন হারব মক্কী নিজেই ইমামতি করতে শুরু করে। মিসরে

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) যেমন হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছিলেন তেমনি প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছিলেন উসমান ইব্‌ন হুযায়ফাও। মিসর থেকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আদীসের নেতৃত্বে যে কাফেলাটি মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সে কাফেলার সাথে মদীনা শরীফে এসে পৌঁছেন, কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ফা মিসরেই রয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা)-এর অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ যখন মিসরে পৌঁছল, তখন খোদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (রা) একদল লোক নিয়ে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তিনি রামাল্লায় পৌঁছেন তখন খবর আসে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ফা মিসর দখল করে নিয়েছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) সেখান থেকেই মিসরের দিকে ফিরে যান। যখন তিনি ফিলিস্তীনে পৌঁছেন, তখন খবর পান যে, হযরত উসমান গনী (রা) শাহাদত বরণ করেছেন। এদিকে হযরত উসমান গনী (রা)-এর বাড়ি ৪০ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ঐ সময় হযরত আলী (রা) কয়েকবারই হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে দেখা করেন। বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফেরত পাঠাবার জন্যও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা)-এর মীর মুন্‌শী (মুখ্য সচিব) মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম, সে আত্মীয়তায় উসমান গনী (রা)-এর চাচাত ভাইও ছিল, হযরত আলী ও বনূ হাশিমের অন্যান্য নেতাকে আপন অশিষ্ট আচরণ দ্বারা বার বার অসন্তুষ্ট ও ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলতে থাকে। বেশ কয়েকবার হযরত উসমান গনী (রা) আপন সদিচ্ছা ও সদাচরণ দ্বারা বিগড়ে যাওয়া পরিস্থিতিকে শুধরে নেন এবং কুরায়শ ও অনসার নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি লাভ সক্ষম হন। কিন্তু পর মুহূর্তেই মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম আপন লাগামহীন কথাবার্তা দ্বারা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দিতে থাকে।

মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের ধৃষ্টতা

হযরত উসমান গনী (রা) ছিলেন অত্যন্ত শালীন এবং নম্র স্বভাবের লোক। এ সুযোগে মারওয়ানের দুঃসাহসও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মারওয়ান এবং তার পিতা হাকামকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রা) তাঁদের খিলাফত কালেও ঐ বাপ-বেটাকে মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে দেন নি। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা হওয়ার পর তাদেরকে মদীনা শরীফে ডেকে নিয়ে আসেন এবং আত্মীয়তার সুবাদে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জরুরী মনে করে মারওয়ানকে তার মীর মুন্‌শী (মুখ্য সচিব) নিয়োগ করেন। মীর মুন্‌শী বা কাতিব হয়ে মারওয়ান খলীফার উপর আধিপত্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ পায় এবং অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে মাঝে মাঝে 'দরবারে খিলাফত' থেকে সাহাবিগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক নির্দেশাদি জারি করার ব্যাপারেও সাফল্য লাভ করে। এ কারণেই মদীনা শরীফের অধিবাসীরা মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে দীর্ঘ চল্লিশ দিনের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং অবরোধকালীন দিনগুলোতে তারাও বিদ্রোহী ও বিক্ষোভকারীদের সাথে মিশে মারওয়ানকে তার পদ থেকে অপসারণের দাবী তুলে। যদি হযরত উসমান গনী (রা) মারওয়ানকে বিক্ষোভকারীদের হাতে সমর্পণ করতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে ঐ বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলারও পরিসমাপ্তি ঘটত। কেননা, অন্তত মদীনাবাসীদের কোন ক্ষোভ বা দুঃখ থাকলে তা মারওয়ানের প্রতিই ছিল। হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে মদীনা শরীফের কারো কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান গনী

(রা) মারওয়ানকে বিক্ষোভকারীদের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এজন্য যে, তাঁর বিশ্বাস ছিল তারা সুযোগ পাওয়া মাত্র মারওয়ানকে হত্যা করে ফেলবে। তাই তিনি তা চাননি যে, তাঁরই সুযোগ দানের কারণে মারওয়ানকে হত্যা করা হোক। যখন বিক্ষোভকারীরা অত্যধিক গণ্ডগোল আরম্ভ করে এবং অনুমিত হতে থাকে যে, এখনই তারা হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করবে তখন হযরত আলী (রা) আপন পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন (রা)-কে সেখানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যেন তাঁরা সশস্ত্র অবস্থায় হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং ভিতরে কাউকে প্রবেশ করতে না দেয়। অনুরূপভাবে হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) আপন আপন পুত্রদেরকে হযরত উসমান (রা)-এর দরজায় পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা সবাই সেখানে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদেরকে রুখে দাঁড়ায়। ফলে তারা ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পায়নি। কেননা এ সব ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বিক্ষোভকারীদের হাতে আহত বা নিহত হলে আশংকা ছিল যে সমগ্র বনী হাশিম তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। অপর দিকে বিক্ষোভকারীদের এ ভয়ও ছিল যে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অবরোধের সংবাদ পাওয়ার পর অবশ্যই মদীনা শরীফ অভিমুখে তাদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে এবং ঐসব সেনাবাহিনী মদীনা শরীফ পৌঁছে গেলে তাদের লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তারা অবিলম্বে হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। দরজায় কড়া পাহারা থাকার দরুন তারা হযরত উসমান (রা)-এর গৃহসংলগ্ন অন্য একটি গৃহে প্রবেশ করে এবং সে গৃহের দেওয়াল টপকিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদত বরণ

মিসরের বিক্ষোভকারীরা যখন পুনরায় মদীনা শরীফে ফিরে এসে জনসাধারণকে ঐ চিঠি দেখায় এবং হযরত উসমান গনী (রা) যখন শপথ করে বলেন যে, তিনি ঐ চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানেন না–তখন বিক্ষোভকারীদের নেতা আবদুর রহমান ইব্‌ন আদীস হযরত উসমান গনী (রা)-কে বলে, আপনি আপনার এ শপথ বাক্যে চাই মিথ্যাবাদী হন, আর চাই সত্যবাদী, আপনাকে কোন অবস্থায়ই খলীফা পদে বহাল রাখা বৈধ হবে না। কেননা, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে কোন মিথ্যাবাদী তো মুসলমানদের খলীফা হতে পারে না। আর আপনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে এমন দুর্বল খলীফা যার অনুমতি ও অবগতি ব্যতীতই তাঁর নামে যার ইচ্ছা সেই যে কোন নির্দেশ লিখে পাঠাতে পারে, তাঁকে তো কোন মতেই খলীফা পদে বহাল রাখা চলে না। আবদুর রহমান ইব্‌ন আদীস হযরত উসমান গনী (রা)-কে বলে, আপনি নিজেই খলীফা পদে ইস্তফা দিন। তিনি উত্তর দিলেন, যে জামাটি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন আমি স্বয়ং তা খুলে ফেলতে পারি না। অর্থাৎ আমি নিজ থেকে খলীফা পদ পরিত্যাগ করতে পারি না। তারপর বিক্ষোভকারীরা তাঁর গৃহ অবরোধ করে ফেলে এবং তাঁর উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে। যখন হযরত উসমান গনী (রা)-এর পানি বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পানির অভাবে তিনি আপন পরিবারসহ ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের উপর আরোহণ করে সকলকে তার ন্যায্য অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি এও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের অন্যতম। বিক্ষোভকারীদের উপর তাঁর এ বক্তৃতার কিছুটা প্রভাব পড়ে। ফলে, তাদের কেউ কেউ

বলতে থাকে, ভাই, ওকে ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা কর। ইতিমধ্যে মালিক ইব্‌ন আশতার এসে পড়ে এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে, খবরদার ! এসব কথায় ভুলে গেলে চলবে না। এগুলো প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। এতে ফেঁসে যাওয়ার অর্থ নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনা। তার কথা শুনে লোকেরা আবার হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। বিক্ষোভকারীরা যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসব সেনাবাহিনী আসবে তারা অনিবার্যভাবে হযরত উসমান গনী (রা)-এর সমর্থক ও আমাদের বিরোধী হবে। তাই তারা হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবিলম্বে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় হযরত আয়েশা (রা) হজ্জ পালনের সংকল্প নেন এবং আপন ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে তাঁর সাথে মক্কা মুকাররমাতে যেতে বলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে যেতে অস্বীকার করেন। কেননা, ইতিমধ্যে বিক্ষোভকারীদের সাথে তাঁর বেশ ভাব জমে উঠেছিল। কাতিবে ওয়াহী হযরত হানযাল (রা) মুহাম্মদকে বলেন, তুমি উম্মুল মু'মিনীনের সাথে যাচ্ছ না, বরং আরবের মূর্খজনদের অনুসরণ করছ, তা কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদার সাথে খাপ খাচ্ছে না। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা) তাঁর ঐ কথার কোন উত্তর দেন নি। তারপর হানযালা (রা) কূফার দিকে চলে যান। এ ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়র (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁরা তখন না ঘর থেকে বের হতেন, আর না কারো সাথে মেলামেশা করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরজায় দণ্ডায়মান থেকে দৃঢ়তার সাথে বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে রুখে দাঁড়ান। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে জবরদস্তিমূলকভাবে মুয়াযযমাতে পাঠিয়ে দেন। অথচ তিনি তখন বলেছিলেন, এ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমার কাছে হজ্জের চাইতেও অধিক পসন্দনীয়। হযরত হাসান ইব্‌ন আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা এবং সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা)-ও দৃঢ়তার সাথে বিক্ষোভকারীদের রুখে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তাদেরকে পিছনে হটিয়ে দেন।

কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) কসমের পর কসম কেটে তাদেরকে লড়াই থেকে বিরত রাখেন এবং ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান। এ সুযোগে বিক্ষোভকারী দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ভিতরে ঢুকে পড়ে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ বের হয়ে আবার বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেন। তখন হযরত উসমান গনী (রা) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি–

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ·

তাদেরকে লোকে বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিন্তু তা তাদের ঈমান মযবুত করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক। (৩ : ১৭৩)

–এ আয়াতে পৌঁছেন তখন উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমা থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আমি সে অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি।

কাজেই, তোমরা কখনো এ বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করো না এবং তাদেরকে হত্যাও করো না। তিনি হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন, তুমি এখনি তোমার পিতার কাছে চলে যাও। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ফিরে যাওয়া পসন্দ করলেন না এবং দরজায় দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় বিক্ষোভকারীদেরকে বাধা দিতে থাকলেন।

মুগীরা ইব্‌ন আখনাস (রা)-কোন মতেই এ ভয়াবহ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কয়েকজন সাথীসহ বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–

يَا قَوْمِ مَا لِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ .

(হে আমার সম্প্রদায় ! আমার কি হয়ে গেল যে, আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহবান করছি, অথচ তোমরা আমাকে আগুনের দিকে আহবান করছ)।

একথা বলতে বলতে বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত উসমান গনী (রা) যখন তা জানতে পারেন তখন তিনি জোর করে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে লড়াই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। ঐ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) সেখানে আসেন। তিনিও বিক্ষোভকারীদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ ফিতনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ শোনা দূরের কথা, উল্টো তাঁকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরে তখন যে সমস্ত লোক ছিলেন তাদের কেউ কেউ ছাদে উঠে বিক্ষোভকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, কেউ কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে যে সমস্ত বিক্ষোভকারী ভিতরে আসতে চাচ্ছিলো তাদেরকে বাধা প্রদান করছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা) এবং তাঁর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাফাদাহ্ তখন ঘরে অবস্থান করছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা প্রথমে প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে। তারপর সেখান থেকে দেওয়াল টপকিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরে ঢুকে তাঁর উপর হামলা চালায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর সর্বাগ্রে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে পৌঁছে এবং তাঁর দাড়ি টেনে ধরে রাগত স্বরে বলে, হে না'সাল ! (নির্বোধ বৃদ্ধ), আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। হযরত উসমান (রা) তখন বলেন, আমি না'সাল নই বরং আমি হচ্ছি আমীরুল মু'মিনীন উসমান। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর বলে, এ বার্ধক্যেও তোমার মধ্যে খিলাফতের সখ রয়েছে। হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, তোমার বাবা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তুমি আমার এ বার্ধক্যকে সম্মানের চোখে দেখতে এবং এ ভাবে আমার দাঁড়ি টেনে ধরতে না। একথা শুনে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ভীষণভাবে লজ্জিত হন এবং হযরত উসমান (রা)-এর দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীদের একটি দল দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঐ দলে বিক্ষোভকারীদের নেতা আবদুর রহমান ইবন আদীস, কিনানাহ ইবন বশীর, আমর ইবন উমুক, আমীর ইব্‌ন হানাবী, সাওদান ইব্‌ন হুমরান গাফিকী ছিল। কিনানাহ্ ইব্‌ন বশীর এসেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর উপর তরবারি চালায়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর স্ত্রী নায়িলাহ্ আগে বেড়ে হাত দিয়ে তরবারির আঘাত রুখে রাখার চেষ্টা করেন। ফলে তার অঙ্গুলীগুলো কেটে গিয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিনানাহ্ আবার আঘাত করে এবং সেই আঘাতেই হযরত উসমান গনী (রা) শাহাদত বরণ করেন। তখন তিনি

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। রক্তের ফোঁটা কুরআনের যে আয়াতের উপর পড়েছিল তা ছিল–

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

(তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২ : ১৩৭)

আমর ইব্‌ন উমুক তাঁকে বর্শা দিয়ে নয়টি আঘাত করে। আমীর ইব্‌ন হানাবী আগে বেড়ে এমনভাবে ঘুষি মারে যে তার পাঁজরের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সে অনবরত ঘুষি মারছিল এবং বলছিল, "তুমি কেন আমার বাবাকে এমনভাবে বন্দী করে রেখেছিলে যে, সে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।" ঘরের মধ্যে যে এ প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে, ছাদের উপরে বা দরজায় অবস্থানকারী লোকেরা তখন তা জানতে পারে নি। হযরত উসমান গনী (রা)-এর স্ত্রী নায়িলাহ্ যখন চীৎকার দিয়ে উঠে তখন লোকেরা ছাদ থেকে এবং দরজার দিক থেকে সেদিকে ছুটে আসে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা ইতিমধ্যে তাদের কাজ সেরে ফেলেছে। এবার তারা দ্রুত পলায়ন করে। অবশ্য তাদের কেউ কেউ হযরত উসমান গনী (রা)-এর ভৃত্যদের হাতে মারা যায়। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর, দরজায় যারা পাহারারত ছিলেন, তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা দলে দলে হযরত উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে তার যাবতীয় মাল-আসবাব, এমন কি দেহের কাপড়টি পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যায়। এ অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে হযরত উসমান গনী (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৩৫ সনের ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে। তিন দিন পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা)-এর লাশ এভাবে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাকীম ইব্‌ন হিযাম এবং যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম হযরত আলী (রা)-এর কাছে যান। হযরত আলী (রা) লাশ দাফনের অনুমতি দেন। রাতের বেলা 'ঈশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে জানাযা বের করা হয়। জানাযার সাথে যুবায়র, হাসান, আবূ জাহম ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) ও মারওয়ান প্রমুখ ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা জানাযার নামাযে এবং দাফনেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর কারণে তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) জানাযার নামায পড়ান। গোসল ছাড়াই পরিধানে যে কাপড় ছিল তা দিয়েই লাশ দাফন করা হয়।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের সময় আবদুল্লাহ্ ইবন হাযরামী মক্কা শরীফের, কাসিম ইব্‌ন 'রাবীআ ছাকাফী তায়িফের, ইয়া'লা ইব্‌ন মীনাহ সান'আর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ জুনদের, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমিল বসরার, মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান সিরিয়ার, আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ হিমসের, হাবীব ইব্‌ন মাসলামা কিন্নাসরীনের, আবুল আওয়ার সালামী জর্দানের এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়েস ফাযারী বাহরায়নের গভর্নর ছিলেন। আর আলকামা ইবন হাকীম কুনদি আমীর মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে ফিলিস্তীনের কর্মকর্তা ছিলেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) কূফার প্রশাসক এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর প্রধান সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। জারির মুখনী এবং সাম্মাক আনসারী উভয়েই সাওয়াদের রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন। জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ কারকীসীয়ার, আশআস ইব্‌ন কায়স আযারবায়জানের এবং সায়িব ইবন আকরা ইসফাহানের গভর্নর ছিলেন। মদীনা শরীফে বায়তুল মালের কর্মকর্তা ছিলেন উকবা ইব্‌ন আমর এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)।

হযরত উসমান গনী (রা) ১২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁকে 'জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তাঁর মোট ১১ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়ে ছিলো।

এক নযরে উসমানী খিলাফত

উসমানী খিলাফতের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে অনায়াসে বোঝা যায় যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর যুগ এবং সিদ্দীকী ও ফারূকী খিলাফতের যুগ অতিক্রম করে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। এ যুগের আবহাওয়া চালচলন ধরন-করণ সবকিছুই যেন আলাদা। ফারূকী খিলাফত পর্যন্ত মুসলমানগণের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদের কোন গুরুত্ব ছিল না। খোদ খলীফার অবস্থা এরূপ ছিল যে, পরিবার-পরিজনের দৈনন্দিন খরচ মেটাবার জন্য তাঁর হাতে অন্যান্য লোকের চাইতেও অনেক কম অর্থ আসত। আর এ অভাব ও দারিদ্র্যকে খলীফা তাঁর জন্য কোন বিপদ বলে মনে করতেন না। অনুরূপভাবে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদেরও কোন লোভ ছিল না। ইসলাম প্রচার এবং মহান আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন যেন ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। উসমানী যুগে এ অনুভূতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। হযরত উসমান গনী (রা) প্রথম থেকেই বিত্তশালী ছিলেন। খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এবং তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলীফার আর্থিক অবস্থার মধ্যে অনেক তফাত ছিল। তাছাড়া হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতের শেষ যুগ পর্যন্ত দেশ জয়ের প্রক্রিয়া জারি থাকে এবং অনেক সম্পদশালী ও উর্বর এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার বিত্ত-সম্পদও মুসলমানগণের হস্তগত হয়। কিন্তু তারা সেই বিত্ত-সম্পদ ব্যবহার এবং তা উপভোগ করার কৌশল পর্যন্ত জানত না। হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগেই মুসলমানগণ তাদের অর্জিত অর্থ-সম্পদ আয়েশ-আরামের কাজে নিয়োজিত করতে শুরু করে। মদীনা শরীফের সাধারণ ছাপড়াগুলোও দালান-কোঠায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের অন্তরে ধন-সম্পদ অর্জন ও অর্থ সংগ্রহের স্পৃহা জাগে। সেই সাথে মুসলমানগণের মধ্যে যে বীরত্ব ও পৌরুষ ছিল এবং আরবদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে। সামরিক প্রবৃত্তির স্থান দখল করে আমীরী স্বভাব তথা বড়লোকী ঠাটবাট। আর তাই ছিল মুসলমানদের উপর আপতিত সবচেয়ে বড় বিপদ, ছিল তাদের দুর্ভাগ্য।

সিদ্দীকে আকবর (রা) ও ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পর্যন্ত কুরায়শী ও হিজাযী অধিকাংশ মুসলমানই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র যুগ প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলে তারা ভেদাভেদহীন একই জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা সকলেই ইসলামকে মনে করত নিজেদের সম্পদ এবং নিজেদেরকে ইসলামের উত্তরাধিকারী জ্ঞান করত। ইসলামের ঔদার্য তাদের অন্তর থেকে গোত্রীয় সংকীর্ণতাকে একেবারে মুছে ফেলেছিল। তাদের কাছে ইসলামের বন্ধনের চাইতে বড় বন্ধন আর কিছুই ছিল না। ইসলামই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। দেশ জয়ের আওতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত প্রদেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে ইসলামী সেনাবাহিনী ও ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও রাতারাতি বৃদ্ধি পেল যারা অতি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত লোকের অন্তরে তখন পর্যন্ত গোত্র ও সম্প্রদায়গত ভেদ-বৈষম্যের স্থলে ইসলামের প্রেম-ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। ফারূকী খিলাফতের বিজয় অভিযানসমূহে যেসব মুজাহিদ অংশগ্রহণ করে তাদের

অধিকাংশই ছিল বনূ বকর, বনূ ওয়ায়েল, বনূ আবদুল কায়স, বনূ রাবীআ, বনূ আযদ, বনূ কিনদা, বনূ তামীম, বনূ কুযাআ' প্রভৃতি গোত্রের লোক। তারা ইরান ও সিরিয়ার প্রদেশসমূহ, মিসর, ফিলিস্তীন ইত্যাদি জয় করেছিল। এদের হাতেই ইরানী ও রোমান সম্রাটের রাজমুকুট ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্রগুলোর মধ্যে একটি গোত্রও এমন ছিল না যারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সংস্পর্শ পেয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে যাদের ভাগ্যে তা জুটেছিল তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কাজেই দেখা যায়, যে সমস্ত গোত্রের সৈনিক দ্বারা ইসলামের দুর্বার সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল তারা ঈমান ও ইসলামের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের দিক দিয়ে কুরায়শী হিজাযী সাহাবিগণের স্তরে পৌঁছতে পারিনি। তাছাড়া ফারূকে আযম (রা)-এর দৃষ্টি এতই প্রশস্ত ও গভীর ছিল যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকও তিনি জানতেন। তিনি এমন একটি 'নিযাম' (ব্যবস্থা) চালু করেছিলেন এবং মুহাজির ও আনসারের নেতৃত্বকে এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁর খিলাফত আমলে অন্যান্য লোক কখনো কল্পনাও করতে পারে নি যে, তারা মুহাজির কিংবা আনসারদের সমকক্ষ। হযরত ফারূকে আযম (রা) আনসার ও মুহাজিরগণকে এমন এক মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন যে, মনে হত যেন তাঁরা একটি রাজপরিবার এবং একটি মহাপরাক্রমশালী বিজেতা জাতির সদস্য। হযরত ফারূকে আযম (রা) আরবের দুর্দান্ত সেনাবাহিনীর বীরত্ব, দুঃসাহিসকতা ও অন্যান্য বেশিষ্ট্য সংরক্ষণের প্রতি এতই যত্নবান ও সচেষ্ট ছিলেন যে, তিনি তাঁর খিলাফত আমলে সিরিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ শহরসমূহ, আয়েশ-আরামে ভরা জনবসতিসমূহের, এমনকি সেগুলোর ধারে কাছেও ইসলামী সেনাবাহিনীর অবস্থানের কোন সুযোগ দেন নি। অপর দিকে তিনি এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে সাধারণ লোকেরা মর্যাদাবান সাহাবিগণ থেকে কিছুটা তফাতে থাকতে বাধ্য হত। তাতে সাহাবিগণের প্রভাব ও মর্যাদা যেমন সংরক্ষিত হত তেমনি আরবের নয় বরং সমগ্র বিশ্বের নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা তাদের সংসর্গ লাভের সুযোগ পেত।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য একের পর এক মুছে যেতে থাকে। উপরে উল্লিখিত গোত্রসমূহের লোকেরা নিজেদেরকে মুহাজির, আনসার এবং কুরায়শী ও হিজাযীদের শুধু সমকক্ষ নয় বরং তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলেও বিবেচনা করতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা শাহী বংশের মর্যাদা রাখতেন, দূর-দূরান্তের প্রদেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েন। মদীনা শরীফের ঐক্য ও ঐতিহ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রাজধানী মদীনা শরীফ রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হয়ে আর থাকতে পারে নি। যার ফলে সেই জাতি ও গোত্রগত ভেদ বৈষম্য পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। প্রত্যেক গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে সেই বর্বর যুগের প্রথাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি পুনরায় পরিলক্ষিত হতে থাকে। ফলে ইসলামী সম্বন্ধ ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে লোপ পায়। মুহাজির ও আনসারগণ নও মুসলিম জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। ফলে তাদের সেই প্রভাব ও মর্যাদা আর অক্ষুণ্ন থাকে নি।

হযরত উসমান গনী (রা) অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন ; কিন্তু রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে সুষ্ঠু নম্র মেযাজে কাজ হয় না, প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করা লাগে এবং কঠিন হতে হয়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগে একদিকে মুসলমানগণ অর্থ-বিত্ত ও আরাম-আয়েশের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছিল এবং অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল খলীফার প্রতি ভয়ভীতির পরিবর্তে কিছুটা উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। এ সুযোগে অর্থ ও

খ্যাতিলোভী স্বার্থশিকারীরা জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ পায়। কুরায়শী ও হিজাযীদের মধ্যে যারা ক্ষমতালোভী ছিল তারা অত্যন্ত সহজেই ঐ সমস্ত নও-মুসলিম গোত্র এবং তাদের বিজয়ী সেনাবাহিনীর সাহায্য ও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরায়শ বংশকে দু'ভাগে বিভক্ত বলে মনে করা হত। আর একটি ছিল বনূ উমাইয়া এবং অপরটি ছিল বনূ হাশিম। বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়া ছাড়াও কুরায়শ বংশের আরো অনেকগুলো গোত্র ছিল। কিন্তু যেহেতু বনূ উমাইয়া ছিল একে অপরের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই কুরায়শের বাকি গোত্রগুলো এদের কোন না কোন একটির পক্ষাবলম্বী ছিল। বনূ উমাইয়ার শক্তি ও প্রভাব ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে বনূ হাশিমের চাইতে কিছুটা বেশী ছিল। তবে এর অনেক পূর্বে তারা ছিল বনু হাশিমের চাইতে দুর্বল। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হাশিম গোত্রে আবির্ভূত হন তখন বনূ উমাইয়া তাঁর এবং ইসলামের বিরোধিতা করে সবচাইতে বেশি। উহুদ ও আহযাবের ভয়ানক যুদ্ধে ইসলাম বিরোধী বাহিনীসমূহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন আবূ সুফিয়ান এবং তিনি ছিলেন বনূ উমাইয়া গোত্রেরই লোক। শেষ পর্যন্ত খোদ আবূ সুফিয়ান এবং বনূ উমাইয়ার সব লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে উমাইয়া ও হাশিমীদের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদও লোপ পায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে ঐ একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। তখন মনে হত, সবগুলো গোত্রই এক ও অভিন্ন এবং তাদের মধ্যে আদৌ কোন শত্রুতা বা ভেদাভেদ নেই। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতকালে বনূ উমাইয়ার অন্তরে সেই জাহিলী যুগের বিদ্বেষমূলক প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আর যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) ছিলেন বনূ উমাইয়া গোত্রীয় এবং সেই সাথে আপন আত্মীয়-স্বজন তথা গোত্রীয় লোকদের উপকার সাধনের প্রতি অধিক মনোযোগী, তাই স্বাভাবিকভাবেই বনূ উমাইয়ারা তার থেকে অধিক পরিমাণে উপকৃত হতে থাকে। অপর দিকে মুসলমানদের সামরিক আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই বিত্ত-সম্পদের লিপ্সাও জেগে উঠে। জনসাধারণের উপর থেকে খলীফার দাপট বা ভয়ভীতিও হ্রাস পায়। নও-মুসলিম যোদ্ধাদের আধিক্যের কারণে মুহাজির, আনসার এবং কুরায়শদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেকটা লোপ পায়। মদীনা শরীফেও আর সেই আনসার-মুহাজিরের ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া বনূ উমাইয়া তাদের ব্যক্তিগত ও গোত্রীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রতি ছিল সর্বদা সজাগ, সচেতন। হযরত উসমান গনী (রা)-এর নম্র মেজাজের সুযোগ গ্রহণ করে উমাইয়া গোত্রের মুখ্য সচিব (মীর মুনশী) মারওয়ান ইবন হাকামকে তারা বনূ উমাইয়ার এমনি এক কট্টর সহায়ক ও অন্ধ পক্ষাবলম্বীতে পরিণত করে যে, সে সর্বত্র, সর্বক্ষণ ও সর্বতোভাবে বনূ উমাইয়ার লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ব্যাপারে যেন পাগলপারা হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের প্রতি সে মোটেই দৃকপাত করত না।

যখন রাজ্য ও প্রদেশসমূহের গভর্নর পদে প্রধানত বনূ উমাইয়ারা অধিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদও তাদের দখলে চলে যায়, তখন তাদের মধ্যে সেই পুরাতন মনোবৃত্তি আবার জেগে উঠে। অর্থাৎ তারা বনূ হাশিমের উপর নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজে পুনরায় আত্মনিয়োগ করে। আর এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বনূ হাশিম এবং অন্যান্য গোত্র ও বনূ উমাইয়ার এ মনোবৃত্তি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে। একথা

বলা যে, খোদ হযরত উসমান গনী (রা) বনূ উমাইয়াদের এ আন্দোলন বা প্রচেষ্টার হোতা ছিলেন একটা গুরুতর অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। কেননা, তার মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র, কুট-কৌশল কিংবা কপটতার নাম-নিশানাও ছিল না। তাঁর নম্র স্বভাব ও ক্ষমাপরায়ণতা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণই বনূ উমাইয়াকে সেই সুযোগ প্রদান করেছিল যে, তারা তাদের গোত্র ও বংশগত প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-তদবীরে লিপ্ত হয় এবং এভাবে তাদের মধ্যে জাহিলী যুগের সেই বিস্মৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষমূলক মনোবৃত্তি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আর এ সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে ইন্দন জোগায় বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য, আয়েশ-সামগ্রীর সহজলভ্যতা এবং সুখ-সম্ভোগের প্রতি জনসাধারণের আসক্তি। এ সমস্ত আচার-আচরণ ছিল সিদ্দিক ও ফারূকী খিলাফতকালে মানুষের কল্পনারও অতীত। অবশ্য একটি কথা না বলে উপায় নেই যে, যদিও স্বগোত্রের লোক এবং আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা একটি অতি প্রশংসনীয় কাজ, কিন্তু একজন খলীফা যখন এ কাজটি করবেন, তখন তাঁকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এক্ষেত্রে যথার্থ সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কিঞ্চিৎ শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আপন চাচাত ভাই মারওয়ান ইবন হাকামকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একাধারে নিজের কাতিব তথা মীর মুনশী, মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদে বহাল রাখা নিঃসন্দেহে একটি সতর্কতা বিরোধী কাজ ছিল। আর তা এ কারণে নয় যে, সে তার আত্মীয় ছিল, বরং এ কারণে যে তাক্ওয়া, পরহিযগারী ও রূহানিয়াতের দিক দিয়ে সে এতই নিম্নমানের ছিল যে, স্বভাবচরিত্র ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে ঐ বিরাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে ছিল না।

হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামীবাহিনী প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সমগ্র দেশব্যাপী পুনরায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে একটি উপকার এও হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি বিদ্রোহ কবলিত প্রদেশের সীমান্ত এলাকাসমূহের প্রতি নজর দেওয়া হয়। ফলে অনেক নতুন নতুন এলাকার উপরও মুসলমানগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, উত্তর ইরানের বিদ্রোহসমূহ দমন করতে গিয়ে সীস্তান ও কিরমানের প্রদেশসমূহও মুসলমানগণ দখল করে নেয়। উত্তর ও দক্ষিণ ইরানের বিদ্রোহ দমন এবং তুর্কী ও চীনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে মুসলমানগণ হিরাত, কাবুল, বলখ ও আমুদরিয়ার তীরস্থ এলাকাসমূহও দখল করে নেয়। রোমানরা মিসর ও ইস্কান্দারিয়াহ আক্রমণ করলে মুসলমানগণ তাদেরকে পরাস্ত করে এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপের উপরও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আফ্রিকার রোমান গভর্নর সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে মিসরের ইসলামী বাহিনীকে ভীতি প্রদর্শন করতে চাইলেন। যার ফলশ্রুতিতে বারকা, ত্রিপলী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মুসলমানগণ দখল করে নেন। অনুরূপভাবে এশিয়া মাইনরের রোমানবাহিনী কিছুটা হাত-পা ছুড়ে কসরত দেখাতে চাইলে মুসলমানগণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আর্মেনিয়া ও তিফলিস পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

মোটকথা, হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফত কালেও মুসলমানগণ যথেষ্ট পরিমাণে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অনেক বিস্তৃতি ঘটে। খলীফা

হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশে ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্য বা প্রদেশের গভর্নরগণ রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র বাহ্যিক উন্নতির সাথে সাথে শিল্পগত উন্নতিরও প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য এ সমস্ত উন্নয়নকর্ম উসমানী খিলাফতের প্রথম দিকে অর্থাৎ ছয় বছরের মধ্যে সম্পাদিত হয়। শেষ দিকে অর্থাৎ শেষ ছয় বছরে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার বিস্তার ঘটে। তার পূর্বে মুসলমানদের লক্ষ্য শুধু ইসলামের প্রচার এবং অংশীবাদিতার মূলোৎপাটন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু, এখন তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং দিনের পর দিন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন হতে থাকে। বনূ উমাইয়া মদীনা শরীফে তাদের জনসংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি করে। অন্যান্য রাজ্য বা প্রদেশেও দিন দিন তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আর তা ঠিক নয় যে, বনূ উমাইয়ার এ কার্যধারা লক্ষ্য করে অন্যান্য মুসলিম গোত্রের লোকেরা আপনা-আপনি তাদের পক্ষাবলম্বন করেছিল কিংবা কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তাদের বিরোধিতা করে গোত্রীয় লড়াইয়ের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল– বরং বনূ উমাইয়ার এ ভ্রান্ত কর্মধারা লক্ষ্য করার পর সাহাবায়ে কিরাম অর্থাৎ সর্বজনমান্য মুহাজির ও আনসারগণ যদি সহজভাবে ও দূরদর্শিতার সাথে জনসাধারণকে বোঝাতেন এবং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা দমন করার চেষ্টা করতেন, তাহলে তাঁদের প্রচেষ্টা কখনো বিফলে যেত না। কেননা, তখন পর্যন্ত মুহাম্মদিয়ার উপর তাঁদের এতটুকু প্রভাব ছিল যে, তাঁরা তাঁদের কথা না মেনে পারত না। বনূ উমাইয়া তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির যে চেষ্টা শুরু করে তা বেশ কিছুদিন পর সাহাবায়ে কিরাম উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু যখন এ জিনিসটি তাদের উপলব্ধিতে আসে, তখন থেকে চেষ্টা শুরু করে দিলেও তাঁরা এ বিশৃঙ্খলা দমনে সফলকাম হতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঠিক ঐ সময়ে উম্মতে মুসলিমার উপর আর একটা ভয়ানক বিপদ নেমে আসে আর তা হলো, ঠিক ঐ সময়ে আবদুল্লাহ ইবন সাবা নামীয় অতি চতুর, অতি সূক্ষ্মদর্শী ও তড়িৎকর্মা জনৈক ইয়াহূদী বাহ্যিকভাবে ইসলাম দরদী সেজে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংস সাধনে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেও মুনাফিকদের হাতে মুসলমানগণ বার বার প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উসমানী যুগে এসে আর একজন ইয়াহূদী মুনাফিকের হাতে মুসলমানগণ অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবায়্য ও মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার মধ্যে কে মুসলমানদের জন্য অধিক বিপজ্জনক ছিল তা নির্ণয় করা সত্যি কঠিন। তবে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়্য তার বাতিল পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করতে গিয়ে খুব কমই সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতিকে নিঃসন্দেহে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংস সাধনে সে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সে বনূ উমাইয়ার বিরোধিতায় এক সাথে ও এককভাবে সমগ্র আরব গোত্রগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলে। এজন্য সে হযরত আলী (রা)-এর মুহাব্বত ও ভালবাসাকে মাধ্যম বা বাহানা হিসাবে গ্রহণ করে। আর যেসব গোত্রে সে বনূ উমাইয়ার প্রতি বিদ্বেষ ও হযরত উসমান গনী (রা)-এর প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি

করতে চাচ্ছিল তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক যারা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে দাম্ভিক হয়ে উঠেছিল এবং নিজেদের এ কৃতিত্বের কারণে কুরায়শ এবং হিজাযবাসীদেরকে থোড়াই কেয়ার করত। তারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই পুরাতন মুসলিমগণের মত তারা ইসলামের মর্মকথা তখনও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা অতি সহজেই অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে হযরত উসাম গনী (রা) ও বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তারপর সে বসরা, কূফা, দামিশকে প্রভৃতি সামরিক কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে এবং দামিশক ছাড়া অন্য সব জায়গায় সে তার অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টিতে সফলকাম হয়। দামিশকেও যে সে একেবারে সাফল্য লাভ করেনি তা নয়। সেখানেও সে হযরত আবূ যর গিফারী (রা) কেন্দ্রিক ঘটনা থেকে যথেষ্ট ফায়দা উঠায়। তারপর সে মিসরে যায় এবং ইতিমধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রসমূহ যে আন্দোলনের সূচনা করে এসেছিল, সেখানে বসে বসে তা সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস পায়। সে মিসরকে তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে এজন্য যে, সেখানকার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা) স্বেচ্ছাচারিতার দিক দিয়ে অন্যান্য গভর্নরদের চাইতে যতটুকু এগিয়ে ছিলেন, দূরদর্শিতার দিক দিয়ে ছিলেন ততটুকু পেছনে। তাছাড়া তিনি রোমানদের হামলা প্রতিরোধ এবং আফ্রিকা, ত্রিপলী প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা দমনের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। তাছাড়া আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা মিসরে এমন দু'তিনজন সাহাবীকেও পেয়ে যায় যাঁরা অতি সহজেই তার প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়ে তার লক্ষ্য অর্জনে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা বসরায় হযরত তালহা (রা)-এর এবং কূফাতে হয়রত যুবায়র (রা)-এর অত্যধিক জনপ্রিয়তা দেখে এর বিরুদ্ধে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কেননা এ কথা সে ভালভাবেই জানত যে, ইসলামী বিশ্বে সামগ্রিকভাবে হযরত আলী (রা)-ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাই সে কূফা, বসরা ও দামিশক ছেড়ে মিসরে চলে আসে। এখানে স্থির হয়ে বসে সে কূফা ও বসরাবাসীদের অন্তরে সেই বিদ্বেষভাবে ফলে ফুলে সুশোভিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে যা সে বনূ উমাইয়া ও হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সৃষ্টি করে এসেছিল। তবে মিসরে ঐ বিদ্বেষভাবে সৃষ্টি ছাড়াও সে হযরত আলী (রা)-কে ভালবাসা, তাঁর অত্যাচারিত হওয়া, খিলাফত থেকে তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত রাখা, তাঁর 'ওয়াছী' (রাসূলের প্রতিনিধি) হওয়া প্রভৃতি ধ্যান-ধারণাও মানুষের মধ্যে প্রচার করে। এ প্রচারের কাজেও সে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁর সমর্থনকারীদের একটি বিরাট দল গঠন করতে সক্ষম হয়। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার এ কর্মতৎপরতা শীঘ্রই ইসলামী বিশ্বে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং সেই সাথে গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরামের হাত থেকে সেই সুযোগ চলে যেতে থাকে যা অবলম্বনে তাঁরা বনূ উমাইয়াকে সঠিক পথে রাখার প্রচেষ্টায় সফলকাম হতে পারতেন। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার দুষ্কর্মের জঘন্যতম দিকটি ছিল সে তার বিশ্বস্ত এজেন্টদের সাহায্যে মদীনা তাইয়িবা থেকে হযরত আলী (রা)-এর নামাংকিত, কল্পিত ও বানোয়াট চিঠিপত্র কূফা, বসরা ও মিসরবাসীদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। সে নিজেকে হযরত আলী (রা)-এর প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করে তুলতেও সক্ষম হয়, যার ফলে সে মানুষকে ব্যাপকভাবে

প্রতারণা করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। তারই প্রতারণার ফলে একদিকে হযরত উসমান গনী (রা)-কে নৃশংসভাবে শহীদ করা হয় এবং অন্যদিকে সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কিছু কিছু মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয়ে আছে যে, হযরত আলী (রা)-এর ইঙ্গিতে ও ষড়যন্ত্রেই (আল্লাহ্ পানাহ) হযরত উসাম গনী (রা)-কে শহীদ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে ভ্রান্ত, জঘন্য ও অমূলক কোন কথা আর হতে পারে না। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা না হযরত উসমান গনী (রা)-এর বন্ধু ছিল, আর না ছিল হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল। সে ছিল উভয়েরই শত্রু এবং ইসলামের ধ্বংস সাধনে সদা-তৎপর। এ কারণেই সে হযরত উসমান গনী (রা)-কে হত্যা করিয়েছে এবং অন্যদিকে হযরত আলী (রা)-কে ঐ হত্যার ষড়যন্ত্রকারী প্রমাণ করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর যদি হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হতেন, তাহলে তা হত সময়ের বিবেচনায় ও ক্রমধারা অনুসারে সর্বাধিক সঙ্গত ও সমীচীন। যদি হযরত আলী (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেন তাহলে তাঁর ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হত। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ন্যায় হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে ছিল সেই সারল্য, সেই তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতা, বিত্তসম্পদের প্রতি সেই অনাসক্তি, জাতীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের প্রতি সেই অনীহাভাব ইত্যাদি। তাই সম্ভবত দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে স্বজনপ্রিয়তা ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের উদ্ভব হত না। হযরত উসমান গনী (রা)-এর পর হযরত আলী (রা)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়াটা যে তাঁর খিলাফত আমলের যাবতীয় ব্যর্থতার মূল কারণ তা আমাদের আগামী আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর চরিত্র ও গুণাবলী

হযরত উসমান গনী (রা) প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন শান্তিকামী ও ধৈর্যশীল। জাহিলিয়া যুগেও তিনি মদ্যপানকে অবৈধ মনে করতেন। সে যুগেও তিনি কখনো ব্যভিচারের ধারে কাছে ঘেষেন নি বা চৌর্য বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন নি। তখনও তাঁর বদান্যতা দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হত। তিনি প্রত্যেক বছরই হজ্জ করতেন এবং মদীনায় তাঁবু স্থাপন করতেন। তিনি যতক্ষণ হাজীগণকে পানাহার না করাতেন ততক্ষণ নিজের তাঁবুতে ফিরে আসতেন না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই জনসাধারণকে এভাবে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। হযরত উসমান গনী (রা) 'জায়শুল উসরা' (কঠিন দিনগুলোতে গঠিত বাহিনী– যেমন, তাঁবুক যুদ্ধের জন্য গঠিত বাহিনী)-এর প্রায় যাবতীয় সামগ্রীর যোগান দিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা) এবং তাঁর পরিবারকে বারবার অনশনের সম্মুখীন হতে হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হযরত উসমান গনী (রা)-ই তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য বার বার এ বলে দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ قَدْ رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ قَدْ رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ ·

(হে আল্লাহ! আমি উসমানের উপর রাযী আছি; আপনিও তাঁর উপর রাযী হয়ে যান! হে আল্লাহ্! আমি উসমানের উপর সন্তুষ্ট আছি, আপনিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।)

একবার সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত শুধু এ দু'আই তিনি করেছিলেন। সিদ্দীকী খিলাফতকালে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আহার্য সামগ্রীর অভাবে মানুষ অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হয়। একবার

এ সংবাদ প্রচারিত হল যে, হযরত উসমান গনী (রা)-এর খাদ্য বোঝাই এক হাজার উট মদীনা শরীফে এসে পৌঁছেছে। তখন মদীনা শরীফের ব্যবসায়িগণ হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার এ খাদ্য সামগ্রী আমাদের কাছে দেড়গুণ দামে বিক্রি করে দিন। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) পাল্টা তাঁদেরকে বললেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকুন, আমি আমার আমদানীকৃত এসব সামগ্রী মদীনা শরীফের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি ঐ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) নূরানী পোশাক পরিহিত অবস্থায় একটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম এবং নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনাকে দেখার জন্য আমি খুবই উদগ্রীব ছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এখন আমার খুবই তাড়া আছে। উসমান আজ এক হাজার উটভর্তি খাদ্য সামগ্রী দান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার সে দান কবুল করে তাঁর সাথে জান্নাতের এক কনের বিবাহ দিয়েছেন এবং আমি এখন ঐ বিবাহ উৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছি। হযরত উসমান গনী (রা) যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতি জুমা'আর দিনে একজন দাসকে মুক্তি দান করেন। তিনি এক জুমুআতে কোন দাসকে মুক্তি দান করতে না পারলে পরবর্তী জুমুআ'তে দুজন দাসকে মুক্তি দান করতেন। অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় যখন বিক্ষোভকারীরা তাঁর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল, তখনও তিনি অনবরত দাসদের মুক্তিদান করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে খাবার খেতেন এবং সাদাসিধে পোশাকও পরিধান করতেন। কিন্তু মেহমানদের সামনে অত্যন্ত সুস্বাদু ও দামী খাবার পরিবেশন করতেন। খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি কখনো নিজেকে সাধারণ মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন না। তিনি সবার সাথে বসতেন, সবাইকে সম্মান করতেন, কিন্তু কারো কাছ থেকে প্রাপ্তির প্রত্যাশা করতেন না। একবার তিনি তাঁর এক গোলামকে বলেন, "আমি তোমার উপর বাড়াবাড়ি করেছি, তুমি আমার উপর থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তাঁরই নির্দেশে গোলাম তাঁর কান ধরে। তখন তিনি বলতে থাকেন, ভাই, আরো জোরে ধর। কেননা, দুনিয়ার প্রতিশোধ আখিরাতের প্রতিশোধের চাইতে অনেক সহজ।" কুরআন করীমের প্রচার এবং একই পাঠ পদ্ধতির উপর সবাইকে ঐকমত্যে পৌঁছানো তাঁরই বিরাট কীর্তি। তিনি মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন, যেমন ওপরে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি দৈনিক ভাতাসমূহ এবং ওয়াযীফা (উপহার-উপঢৌকন) বণ্টনের জন্য দিন ও সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। প্রত্যেকটি কাজ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা ছিল তাঁর চিরন্তন অভ্যাস। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে জুম'আর দিন ঠিক সেই সময়ে আযান দেওয়া হত যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করতেন। হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগে যখন লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, খুতবার আযানের পূর্বেও যেন একবার আযান দেওয়া হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত জুম'আর সময় দু'বার আযান দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে।

কয়েকটি জরুরী কথা

যখন বিক্ষোভকারীরা মদীনা শরীফে প্রবেশ করে অত্যন্ত গর্হিত ও অশিষ্ট আচরণ করতে থাকে তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা শরীফে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে সারফ নামক স্থানে

জনৈক উবায়দ ইবন আবূ সালামার কাছ থেকে তিনি এ সংবাদ পান যে, হযরত উসমান গনী (রা)-কে বিক্ষোভকারীরা শহীদ করে ফেলেছে। তখন তিনি মদীনা শরীফে না এসে পুনরায় মক্কা শরীফে ফিরে যান।

যখন বিক্ষোভকারীরা মদীনা শরীফে ভিড় জমায়, তখন হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-ও মদীনা শরীফে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, বিক্ষোভকারীদের অশিষ্ট আচরণ ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সমগ্র মদীনা শরীফ অবদমিত করে ফেলেছে এবং মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলায় আবদুল্লাহ্ এবং মুহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে ফিলিস্তীন চলে যান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই তার কাছে হযরত উসমান গনী (রা)-এর দুঃখজনক মৃত্যুসংবাদ গিয়ে পৌঁছে।

মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ যখন এ সংবাদ পান যে, মদীনা শরীফে বিক্ষোভকারীরা হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবরোধ করে রেখেছে, তখন তিনি মিসর থেকে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে যখন শুনতে পান যে, হযরত উসমান গনী (রা) শাহাদত বরণ করেছেন তখন মদীনায় না এসে মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে যখন জানতে পারেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাবীআ' মিসর দখল করে নিয়েছে তখন বাধ্য হয়ে ফিলিস্তীনে অবস্থান করেন। তারপর সেখান থেকে দামিশকের দিকে চলে যান।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের সময় হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) এ তিনজন অতি গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী সাহাবী মদীনায় ছিলেন। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), হযরত সা'দ ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ শ্রদ্ধাভাজন সাহাবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঐ উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভকারীদের হাতে সবাই যেন অসহায় যিম্মীতে পরিণত হয়েছিলেন। মদীনা শরীফের কর্তৃত্ব বিক্ষোভকারীদের হাতে চলে গিয়েছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তিত্রয় যদিও বিক্ষোভকারীদের চোখে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাদের ইয্‌যত ও সম্মানের ভয়ে নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউই তখন ঘর থেকে বের হতেন না। অবশ্য হযরত আলী (রা) বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে মদীনা শরীফের বাইরে যেতেন। কারো কারো মতে, বিক্ষোভকারীদের অশিষ্ট আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি মদীনা শরীফের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাই যখন হযরত উসমান গনী (রা)-কে শহীদ করা হয়, তখন হযরত আলী (রা) মদীনা শরীফ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন।

বিক্ষোভকারীদের হাতে মদীনা শরীফের শাসনক্ষমতা

মিসর, কূফা ও বসরার বিক্ষোভকারীরা যে দিন মদীনা শরীফে প্রবেশ করে হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘর ঘেরাও করে ফেলে এবং তাঁকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই মদীনা শরীফের শাসনক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। কিন্তু যেহেতু অবরুদ্ধ অবস্থায় হলেও খলীফা তখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাই বিক্ষোভকারীদের এ হুকুমত (শাসন ক্ষমতা)-কে 'হুকুমত' আখ্যা দেওয়া চলে না। অবশ্য হযরত উসমান গনী (রা)-কে শহীদ করার পর মদীনায় আনুমানিক এক সপ্তাহ বিক্ষোভকারীদের নেতা গাফিকী ইব্‌ন হারব মক্কীর শাসন বলবৎ থাকে। তখন সে নিজেই সব রকম হুকুমজারি করত এবং নামাযের ইমামতিও করত। কিন্তু এ বিক্ষোভকারীদের মধ্যেও বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী কিছু লোক ছিল। তারা চিন্তা করে

দেখল, এ হত্যাকাণ্ডের পর যদি আমরা এখান থেকে এভাবে নিজ নিজ ঘরে চলে যাই, তাহলে তা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কোন শুভ পরিণাম বয়ে আনবে না। বরং আমরা যেখানেই থাকব সেখানেই আমাদেরকে হত্যা করা হবে এবং এ বিক্ষোভকে একটি ফাসাদ ও বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং আমরা এর বৈধতার কোন যুক্তিই তখন পেশ করতে পারব না। তারপর তারা আপোসে সলা-পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এখনি কাউকে খলীফা নির্বাচন করতে হবে এবং কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ফিরে যাওয়া চলবে না। বিক্ষোভ চলা কালীন দিনগুলোতেও অনুরূপ প্রস্তাব নিয়ে কিছু লোক কূফা ও বসরা থেকে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবাও মিসর থেকে রওয়ানা হয় এবং প্রায় সবার অজ্ঞাতে ও অগোচরে মদীনা শরীফে প্রবেশ করে আপন এজেন্ট ও চরদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। যেহেতু বিক্ষোভকারীদের সবাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার বন্ধু ছিল না, বরং তাদের মধ্যে অনেক বেকুফ, হুজুগী ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকও ছিল তাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা মদীনা শরীফে এসে ইচ্ছে করেই নিজে কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করল না বরং আপন এজেন্টদের মাধ্যমে জনসমুদ্রকে আন্দোলিত করে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করল। একজন খলীফা নির্বাচনের প্রস্তাব মূলত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবারই ছিল। যাহোক, বিক্ষোভকারীরা একত্রিত হয়ে হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সাথে পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ করল এবং তাদের প্রত্যেকের কাছেই আবেদন জানাল : আপনি খলীফার পদ গ্রহণ করুন এবং আমাদের কাছ থেকে বায়'আত নিন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই খলীফার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত এ উদ্ভূত সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করল। সে অনুযায়ী বিক্ষোভকারীরা ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিল যে, যেহেতু মদীনা শরীফের অধিবাসীরাই যাবতীয় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, যেহেতু তারাই প্রথম থেকে খলীফা নির্বাচন করে আসছেন এবং তাদেরই নির্বাচিত খলীফাকে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা খলীফা বলে স্বীকার করে আসছে—তাই আমরা ঘোষণা করছি এবং মদীনা শরীফের অধিবাসীদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমাদেরকে শুধু দু'দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। তোমরা এ দু'দিনের মধ্যে একজন খলীফা নির্বাচন কর, অন্যথায় দুদিন পর আমরা আলী, তালহা ও যুবায়র-এ তিনজনকেই হত্যা করে ফেলবো। এ ঘোষণা শুনে মদীনা শরীফের অধিবাসিগণ আতংকিত হয়ে উঠে। তারা দ্রুত নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে হযরত আলী (রা)-এর কাছে ছুটে যায়। অনুরূপভাবে তারা হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথেও দেখা করে। হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেন, আমরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে মোটেই রাযী নই। হযরত আলী (রা)-ও প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন লোকেরা খুব কাকুতি মিনতি করতে লাগল তখন তিনি রাযী হয়ে যান। তিনি রাযী হওয়ার সাথে সাথে লোকজন দলে দলে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করে। মদীনা শরীফের অধিবাসী এবং সেই সাথে বিক্ষোভকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে খলীফা বলে মেনে নেয়।

হযরত আলী (রা)

নাম ও বংশ-পরিচয়

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মনাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই ইব্‌ন গালিব।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আবুল হাসান ও আবূ তুরাব নামে ডাকতেন। তাঁর মায়ের নাম ফাতিমা বিনত আসাদ ইব্‌ন হাশিম। হযরত আলী (রা) একাধারে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই ও জামাই ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর স্বামী। তিনি মধ্যমাকৃতির, অথচ কিঞ্চিত খাটো ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল হৃষ্টপুষ্ট; মাথার চুল কিছুটা উঠে গিয়েছিল; সমগ্র দেহ লোমে ঢাকা ছিল। দাঁড়ি ছিল লম্বা ও ঘন; গোধূম বর্ণের দেহ।

তাঁর বৈশিষ্ট্য

হযরত আলী (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ঐ সব ব্যক্তিদেরও অন্যতম, যাঁরা কুরআন মজীদ একত্রিত করে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জমা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বনী হাশিম গোত্রের সর্বপ্রথম খলীফা। জাহিলিয়াত যুগেও তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা তাইয়িবাতে হিজরত করেন তখন তাঁর কাছে রক্ষিত আমানতসমূহ স্ব স্ব মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই নির্দেশ পালন করার পর তিনিও মদীনা তাইয়িবাতে হিজরত করেন। শুধুমাত্র তাবূক যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধেই তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাবূক যুদ্ধে যাবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মদীনা শরীফের কর্মকর্তা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর দেহে মোট ১৬টি ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। খায়বার যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন এবং পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছিলেন যে, খায়বার দুর্গ তাঁর (আলী রা)-এর হাতেই বিজিত হবে। তিনি খায়বার দুর্গের গুরুভার লৌহকপাট একাই আপন পিঠে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ পরবর্তী সময়ে অনেক লোকের সম্মিলিত শক্তি ছাড়া সেটাকে তার জায়গা থেকে একটুখানি নড়ানোও সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর আবূ তুরাব নামটি খুবই পসন্দ করতেন। কেউ তাকে এ নামে ডাকলে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হতেন। তাঁর এ নামকরণের কারণ : একবার তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আসেন এবং তাঁকে ঘুম থেকে জাগান। তিনি তখন তাঁর (আলীর) দেহের মাটি মুছে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আবূ তুরাব উঠো !

তাঁর গুণসমূহ

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে মদীনা শরীফে অবস্থানের নির্দেশ দেন, তখন তিনি (আলী রা) বলেন, আপনি আমাকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর খলীফা বানিয়ে এখানে ছেড়ে যাচ্ছেন ? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমাকে সেই ভাবে ছেড়ে যাচ্ছি যেভাবে হযরত মূসা (আ) হারূন (আ)-কে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তবে শুধু একটি পার্থক্য, আমার পরে কোন নবী আসবে না। খায়বার যুদ্ধ চলাকালে একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেব যাঁর হাতে এ দুর্গ বিজিত হবে এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে।" ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে তা দেখার জন্য পরদিন ভোরে যখন সাহাবিগণ অপেক্ষা করছিলেন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং তাঁর হাতেই দুর্গ বিজিত হয়। যখন আয়াতে "মুবাহালা" নাযিল হয় তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা), ফাতিমা (রা), হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! তাঁরাই আমার পরিবারের লোক।" একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। তারপর বলেন, হে আমার প্রতিপালক যে ব্যক্তি আলীর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখে আপনিও তার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখুন এবং যে আলীর সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখে আপনিও তার সাথে শত্রুতার সম্পর্ক রাখুন। একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চার ব্যক্তি এমন আছে যাদেরকে ভালবাসার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত সবাই বললেন, অনুগ্রহপূর্বক তাদের নাম বলুন। তিনি বললেন, আলী, আবূ যর, মিকদাদ ও সালমান ফারসী। হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজিরগণকে আনসারগণের সাথে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন তখন হযরত আলী (রা) ক্রন্দনরত অবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করেন, 'আপনি প্রত্যেক মুহাজিরকেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন, শুধু আমিই বাকি রয়ে গেছি। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমার ভাই।" একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী তার দরজা।" হযরত উমর (রা) একবার বলেন, যে কোন বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা) আমাদের সবার আগে। হযরত আয়িশা (রা)-এর সামনে হযরত আলী (রা)-এর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, আলীর চাইতে সুন্নতকে বেশী বোঝে এমন লোক এখন আর বেঁচে নেই। হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, জঘন্যতম দু'ব্যক্তির একজন আহমার, যে হযরত সালিহ (আ)-এর উটনীর পা কেটেছিল, আর অন্যজন সেই ব্যক্তি যে তোমার মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করে তোমার দাঁড়ি রক্তরঞ্জিত করবে।

হযরত আলী (রা)-এর বিচার-মীমাংসা ও বাণীসমূহ

হযরত আলী (রা) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র শোকর যে, ধর্মীয় বিষয়ে আমার শত্রুও আমার কাছে ফাত্‌ওয়া চায়। মুআবিয়া (রা) আমার কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'খুনসাই মুশকিল' (জটিল আকারের নপুংসক) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কত অংশ পাবে ? আমি তাঁর কাছে

লিখে পাঠিয়েছি যে, খুনসার লিঙ্গের আকার আকৃতি অনুযায়ী তার উপর উত্তরাধিকারের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি তাঁর লিঙ্গ পুরুষদের মত হয় তাহলে সে পুরুষ আর যদি স্ত্রী লোকের মত হয় তাহলে স্ত্রীলোক বলে গণ্য হবে। হযরত আলী (রা) যখন বসরাতে চলে যান তখন ইবন কাওয়া ও কায়স ইবন উবাদাহ তাঁর কাছে নিবেদন করেন : কোন কোন লোক বলে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকেও এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমার পরে তোমাকেই খলীফা মনোনীত করা হবে। এ ব্যাপারে আপনার চাইতে বিশ্বস্ত লোক তো আর কেউ হতে পারে না। কাজেই আমরা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, কথাটা কি সত্য ? হযরত আলী (রা) উত্তরে বলেন : এটা একেবারেই অমূলক কথা যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিলাফতের ব্যাপারে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে আমি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়াতেই দিতাম না এবং আমার পক্ষে কেউ থাক অথবা না থাক নিজ হাতেই তাঁদেরকে হত্যা করতাম। আসল ব্যাপার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতার কাল যখন প্রলম্বিত হল তখন একবার মুয়াযযিন এসে তাঁকে নামায পড়াবার জন্য ডাকলে তিনি মুয়াযযিনকে বলেন, "আবূ বকরকে নিয়ে যাও। তিনি আমার স্থলে নামায পড়াবেন।" কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে চাইলে তিনি বলেন, "তুমি দেখছি হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগের স্ত্রীলোকদের মত।" হযরত আবূ বকর (রা)-কেই নিয়ে যাও।" যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেন, সেদিন যখন আমি আমার স্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করলাম তখন ঐ ব্যক্তিকেই আমার পার্থিব ব্যাপারেও নেতা মেনে নিলাম, যাকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে (নামাযের ইমামতির জন্য) নেতা নির্বাচন করেছিলেন। কেননা, নামায হচ্ছে আসল দীন (ধর্ম), আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীনের প্রতিষ্ঠাতা এবং দুনিয়ারও ব্যবস্থাপক। তাই আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-কেই যোগ্য মনে করে তাঁর হাতেই বায়'আত করি। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। কেউ কারো ক্ষতি করার কথা চিন্তা করেনি এবং কেউ হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। কাজেই আমিও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হক আদায় করেছি। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছি, তাঁর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর পক্ষে লড়েছি, তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তাই গ্রহণ করেছি, যেখানে আমাকে লড়ত হুকুম করেছেন সেখানেই এবং শরীআতের বিধান মতে যাকেই শাস্তি দিতে বলেছেন তাকেই শাস্তি দিয়েছি। তিনি ইনতিকালের সময় হযরত উমর (রা)-কে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করে যান। তাঁর পর আমি হযরত উমর (রা)-এর সাথেও সেরূপ ব্যবহার করেছি, যেরূপ ব্যবহার হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে করতাম। যখন হযরত উমর (রা)-এর শাহাদতের সময় ঘনিয়ে এল, তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, ইসলাম গ্রহণে আমার অগ্রবর্তিতা, রাসূলে পাকের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে হযরত উমর (রা) আমার জন্যই খিলাফতের নির্দেশ দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি এ ভয়ে যে, না জানি এমন কোন ব্যক্তিকে আবার মনোনীত করে যাবে যার পরিণাম ভাল নয় (আমাকে মনোনীত করেননি)। এই একই কারণে তিনি তাঁর সন্তানকেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে যান। হযরত উমর (রা) যদি দান ও অনুগ্রহের আদর্শ অনুসরণ করতেন তাহলে তিনি আপন সন্তানের চাইতে কাউকেই যোগ্য মনে

করতেন না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের দায়িত্ব কুরায়শের হাতে আসে এবং আমিও ছিলাম তাঁদের একজন। যখন লোকেরা খলীফা নির্বাচনের জন্য একত্রিত হয় তখন আমি ধারণা করি যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যাবে না। হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) আমার কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, যাকেই খলীফা নির্বাচিত করা হয় আমি যেন তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি। তারপর যখন তিনি হযরত উসমান (রা)-এর হাত ধরেন তখন আমি বুঝতে পারি যে, আমার কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে তা অন্য ব্যক্তির আনুগত্যের জন্যই নেওয়া হয়েছে। তাই আমি হযরত উসমান (রা)-এর হাতেই বায়'আত করলাম এবং তাঁর সাথে সেই ব্যবহারই করলাম যা হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর সাথে করতাম। যখন হযরত উসমান (রা)-এরও শাহাদত লাভ হল তখন আমি চিন্তা করলাম যে, ঐ সব ব্যক্তি তো গত হয়ে গেছেন যাঁদেরকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমাম বানিয়েছিলেন এবং ঐ ব্যক্তিও গত হয়ে গেছেন যাঁর আনুগত্যের জন্য আমার কাজ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। কাজেই এবার আমি (নিজের জন্য) বায়'আত গ্রহণের প্রস্তুতি নিলাম। 'আহলে হারামাইন' (মক্কা-মদীনার অধিবাসীবৃন্দ) এবং কূফা-বসরার অধিবাসীরাও আমার হাতে বায়'আত করে। এখন খিলাফতের ব্যাপারে এমন এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন যিনি (হযরত রাসূলের সাথে) আত্মীয়তা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ইসলামে অগ্রবর্তিতা কোন দিক দিয়েই আমার সমকক্ষ নন। এমতাবস্থায় আমিই খিলাফতের যোগ্য।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আপনার এক ভাষণে বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সেরূপ যোগ্যতা দান করুন যেরূপ যোগ্যতা আপনি খুলাফা-ই-রাশিদীনকে দান করেছিলেন"—তাহলে আপনার মতে খুলাফা-ই-রাশিদীন কারা ? একথা শুনে হযরত আলী (রা)-এর চক্ষু অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন, তাঁরা আমার বন্ধু হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)। তাঁরা উভয়েই 'ইমামুল হুদা' (পথ প্রদর্শনের নেতা) ও শায়খুল ইসলাম (ইসলামের গণ্যমান্য ব্যক্তি)। কুরায়শগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর দু'জনকে অনুসরণ করেছে এবং যারা এদেরকে অনুসরণ করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। হযরত আলী (রা) মিথ্যাচারিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। একবার তিনি কিছু বলছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কোন কথার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তখন তিনি তার জন্য বদদু'আ করলেন। তারপর দেখা গেল, মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই ঐ ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

একবার দু'ব্যক্তি খেতে বসল। তাদের একজনের কাছে ছিল পাঁচটি রুটি এবং অন্যজনের কাছে তিনটি। ইতিমধ্যে অপর এক ব্যক্তি এল এবং তারা দু'জন ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে তাদের সাথে খেতে বসাল। খাওয়া-দাওয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাদের দু'জনকে আট দিরহাম দিয়ে বলল, আমি যা খেয়েছি এটা তারই বিনিময় মনে কর। তৃতীয় ব্যক্তি চলে যাবার পর দিরহামগুলো ভাগ করতে গিয়ে তাদের দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। যার পাঁচটি রুটি ছিল সে অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি এ থেকে পাঁচ দিরহাম পাব এবং তুমি পাবে তিন দিরহাম। কেননা, আমার রুটি ছিল পাঁচটি এবং তোমার রুটি ছিল তিনটি। তিন রুটির অধিকারী বলল, আমি দিরহামগুলোর অর্ধেক (অর্থাৎ চার দিরহাম) ছাড়া কোন মতেই রাযী হব না। এ কলহ শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, তারা উভয়ে

বিচারপ্রার্থী হয়ে হযরত আলী (রা)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হল। তিনি তাদের উভয়ের বক্তব্য শুনে তিন রুটির অধিকারী ব্যক্তিকে বললেন, তোমার রুটির পরিমাণ ছিল কম। তিন দিরহাম দিলেও তোমার ভাগে বেশি পড়ে। কাজেই তুমি তিন দিরহামেই রাযী হয়ে যাও। সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার প্রাপ্য না পাব, ততক্ষণ কিছুতেই রাযী হব না। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার ভাগে পড়বে মাত্র এক দিরহাম। একথা শুনে এ ব্যক্তি বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলল, আপনিও দেখছি আশ্চর্য ধরনের রায় দিলেন। এবার আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, আমার ভাগে মাত্র একটি এবং তার ভাগে বাকি সাতটি পড়ে কিভাবে ? হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে শোনো। সর্বমোট আটটি রুটি ছিল এবং তোমরা লোক ছিলে তিনজন। যেহেতু এগুলো সমানভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়, তাই প্রত্যেকটি রুটি তিন টুকরা করলে মোট চব্বিশ টুকরা হয়। তা তো জানা সম্ভব নয় যে, কে কম খেয়েছে বা কে বেশি খেয়েছে। কাজেই, তা ধরে নিতে হবে যে, তিনজনই সমান সমান খেয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকে খেয়েছে আট টুকরা করে। তাহলে তোমার তিন রুটির নয় টুকরা থেকে তৃতীয় ব্যক্তি খেয়েছে মাত্র এক টুকরা এবং তুমি খেয়েছ আট টুকরা। আর তোমার সঙ্গীর পাঁচ রুটির পনর টুকরা থেকে সে খেয়েছে আট টুকরা এবং বাকি সাত টুকরা খেয়েছে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি। যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি খেয়েছে তোমার এক টুকরা এবং তোমার সঙ্গীর সাত টুকরা, তাই আট দিরহামের মধ্যে সে পাবে সাত দিরহাম এবং তুমি পাবে মাত্র এক দিরহাম। একথা শুনে লোকটি বলল, হাঁ, এখন আমি রাযী হলাম। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এ মর্মে অভিযোগ পেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি বলে, সে স্বপ্নের মধ্যে আমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছে। তিনি তখন রায় দিলেন, ঐ ব্যক্তিকে রোদে দাঁড় করিয়ে তার ছায়ার উপর বেত্রাঘাত কর।

তাঁর হিকমতপূর্ণ বাণীসমূহ

হযরত আলী (রা) বলেন, লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা ও কাজ এবং আত্মা ও দেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোল। কিয়ামতে মানুষকে সেই কাজের বদলা দেওয়া হবে যা সে এখানে করে যাবে এবং তাদেরই সাথে তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে যাদের সাথে তার ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে। তোমাদের আমল (কর্ম) যাতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় সেজন্য ঐকান্তিক চেষ্টা কর। কেননা, কোন আমলই তাক্ওয়া (আল্লাহর ভীতি) ও আন্তরিকতা ছাড়া গ্রহণীয় হয় না।

হে কুরআনের আলিম (জ্ঞানী) তুমি কুরআনের আলিম ও (কুরআন অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী) হও। প্রকৃত আলিম সেই ব্যক্তি, সে যা পড়ে তার উপর আমল করে এবং ইলম ও আমলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে। এমন এক যুগ আসবে যকন ইলম ও আমলের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না। আলিম নামধারী লোকেরা চক্রাকারে বসবে এবং একে অন্যের উপর ফখর (গর্ব) করতে থাকবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে কোন লোক এসে বসবে তখন তারা তাকে অন্যত্র গিয়ে বসতে হুকুম দেবে। স্মরণ রেখো, আমল (কর্ম) চক্রাকারের মজলিস বা বৈঠকের সাথে নয়, বরং তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে। সচ্চরিত্রতা মানুষের অলংকার, বুদ্ধি তার সাহায্যকারী এবং শিষ্টাচার তার উত্তরাধিকার। হিংস্রতা দাম্ভিকতার চাইতেও খারাপ বস্তু।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, 'তকদীর' (ভাগ্য) কি তা আমাকে বুঝিয়ে বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, তা একটা 'অন্ধকার পথ' এ সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করো না। লোকটি পুনরায় ঐ নিবেদন করল। তিনি উত্তর দিলেন, তা মহান আল্লাহর এমন একটা রহস্য যা তোমার থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কাজেই তুমি কেন তা তালাশ করছ ? তার পরে লোকটি পুনরায় ঐ একই নিবেদন করলে তিনি বললেন, আচ্ছা বল তো, আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করেছেন, না তোমার ইচ্ছানুযায়ী ? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্ তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী আমাকে তৈরি করেছেন। তিনি তখন বললেন, কাজেই মহান আল্লাহ্ যেভাবে চাইবেন সে ভাবেই তোমাকে ব্যবহার করবেন, তাতে তো তোমার করার কিছু নেই।

- প্রত্যেকটি বিপদের একটি সমাপ্তি আছে। আর যখন কারো উপর কোন বিপদ আসে তখন তা আপন সমাপ্তি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বুদ্ধিমানের উচিত, বিপদে পড়লে ব্যস্ত বা হতাশ না হওয়া এবং তা দূর করার জন্য অস্থির হয়ে না পড়া। কেননা, এতে কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।
- চাওয়ার পর কাউকে কিছু দেওয়ার নাম দান বা বখশিশ আর না চাইতে কিছু দেওয়ার নাম বদান্যতা (সাখাওয়াত)। ইবাদত বন্দেগীতে ঔদাসিন্য, জীবিকা নির্বাহে টানাটানি এবং স্বাদে ক্ষয়িষ্ণুতা গুনাহ বা অপরাধেরই শাস্তি।
- হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে শেষবারের মত তিনি যে নসীহত করেছেন তা হলো, বুদ্ধি সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর মূর্খতা সবচেয়ে বড় দরিদ্র।
- জঘন্যতম হিংস্রতা দাম্ভিকতা আর সচ্চরিত্র মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান। আহাম্মকের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাক। কেননা, সে নিকটতমকে দূরতম এবং দূরতমকে নিকটতম করে দেয়।
- কৃপণ থেকে দূরে থাক। কেননা সে তোমা থেকে সেই জিনিসটি দূরে ঠেলে দেয় যার প্রয়োজন তোমার খুব বেশী।
- পাপিষ্ঠের কাছে বসো না। কেননা, সে তোমাকে কড়ির বিনিময়ে বেচে দেবে।
- পাঁচটি কথা স্মরণ রেখো। গুনাহ ছাড়া আর কোন জিনিসকেই ভয় করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি কোন জিনিস জানে না তা জানার জন্য সে যেন কখনো লজ্জাবোধ না করে। কোন আলিমকে যদি এমন কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে না তাহলে তার উচিত বিনাদ্বিধায় এ কথা বলে দেওয়া যে, আল্লাহ্ সবচাইতে ভাল জানেন। ধৈর্য ও ঈমানের মধ্যে সেরূপ সম্পর্ক যেরূপ সম্পর্ক মাথা ও দেহের মধ্যে। যখন ধৈর্য চলে যেতে শুরু করে তখন ধরে নিও তোমার ঈমানও চলে যাচ্ছে। যখন মাথা চলে যায় তখন দেহ বাঁচে কি করে ?
- ফকীহ (বুদ্ধিমান) ঐ ব্যক্তিকে বলা উচিত, যে মানুষকে মহান আল্লাহ্ থেকে নিরাশ করে না, তার কাছে গুনাহ্ আসার সুযোগ দেয় না, মহান আল্লাহর আযাব থেকে তাকে শংকামুক্ত করে না এবং কুরআন শরীফ থেকে বিমুখ রেখে তাকে অন্য কোন কিছুর অভিমুখী করে না।

ডালিম ফল সেই হালকা ঝিল্লীসহ খাওয়া উচিত, যা দানার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কেননা তা পাকস্থলীতে গিয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। এমন এক যুগ আসবে যখন একজন মু'মিন সাধারণ একজন গোলামের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

খিলাফতের বায়'আত

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের এক সপ্তাহ পর হিজরী ৩৫ সনের ২৫ যুলহাজ্জ তারিখে মদীনা শরীফে হযরত আলী (রা)-এর হাতে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের পর মদীনা শরীফে ছিল তাঁর হত্যাকারীদের প্রাধান্য। তারা প্রথমে মদীনা শরীফের অধিবাসিগণকে ধমকিয়ে ও ভয় প্রদর্শন করে একজন খলীফা নির্বাচন করতে বাধ্য করে। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই ছিল হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মদীনা শরীফের অধিবাসিগণও হযরত আলী (রা)-কে সমর্থন করত। লোকেরা হযরত আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে বায়'আত গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে খলীফা নির্বাচন করেছ বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত 'আসহাবে বদর' (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ) আমাকে খলীফা বলে না মানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ নির্বাচনের কোন মূল্য নেই। একথা শুনে লোকেরা 'আসহাবে বদর'-এর কাছে গেল এবং যথাসম্ভব তাঁদেরকে একত্রিত করে হযরত আলী (রা)-এর সামনে হাযির করল। সর্বপ্রথম মালিক আশতার হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করে। তারপর অন্য লোকেরা বায়'আত করার জন্য অগ্রসর হয়।

হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা)-এর মতামতও জানা উচিত। তখন মালিক আশতার হযরত তালহা (রা)-এর কাছে এবং হাকীম ইবন আবদুল্লাহ্ যুবায়র (রা)-এর কাছে গেল এবং তাঁদেরকে জোর করে হযরত আলী (রা)-এর সামনে এনে হাযির করল। হযরত আলী (রা) তাঁদেরকে বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে যিনিই খলীফা হতে চান, আমি তাঁর হাতে বায়'আত করতে প্রস্তুত আছি। তাঁরা উভয়েই খলীফা হতে অস্বীকার করেন। তারপর ঐ দু'জনকে বলা হয়, যদি আপনারা নিজেরা খলীফা হতে না চান তাহলে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করুন। তাঁরা উভয় বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এমনি সময়ে মালিক আশতার খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করে হযরত তালহা (রা)-কে বলে, আমি এখনি তোমাকে শেষ করে ফেলব। হযরত তালহা (রা) পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, আমি আপনার হাতে এ শর্তে বায়'আত করছি যে, আপনি মহান আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ দিবেন এবং শাস্তির বিধানসমূহ জারি করবেন (অর্থাৎ হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের উপর কিসাস জারী করবেন)। হযরত আলী (রা) তাতে স্বীকৃত হন। হযরত তালহা (রা) বায়'আতের জন্য তাঁর কর্তিত দুর্বল হাতটি বাড়ালেন (উহুদ যুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহত হওয়ার কারণে তাঁর হাতটি অবশ হয়ে গিয়েছিল)। কোন কোন লোক ঐ মজলিসে সর্বপ্রথম হযরত তালহা (রা) বায়'আতের জন্য তাঁর কর্তিত হাতটি বাড়িয়ে দিচ্ছেন দেখে সেটাকে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের জন্য একটি অশুভ সংকেত বলে মনে করে। তারপর হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তিনিও হযরত তালহা (রা)-এর শর্তসমূহ পেশ করে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করলেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কেও বায়'আত করতে বলা হলো। কিন্তু তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেললেন এবং বললেন, যখন সকল লোক বায়'আত করে নেবে তখন আমিও বায়'আত করবো। তিনি

এ প্রতিশ্রুতিও দেন যে, আমার পক্ষ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। তখন হযরত আলী (রা) তাঁকে আপন অবস্থার উপরই ছেড়ে দিলেন। লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর বায়'আত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তখন মালিক আশতার তরবারি বের করে বলে, আমি তাঁকে হত্যা করব। হযরত আলী (রা) মালিক আশতারকে বাধা দিয়ে বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর জামিন হচ্ছি। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমরা পালনের জন্য মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন আলী (রা) তাঁর এ অবস্থা জানতে পারেন এবং লোকেরাও বলাবলি করতে থাকে যে, তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) (রা) আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা নিয়েই মদীনা শরীফ থেকে চলে যাচ্ছেন তখন হযরত আলী (রা) তাঁকে অবিলম্বে বন্দী করার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু সেই মুহূর্তে হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলছুম (যিনি ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর সহধর্মিণী) হযরত আলী (রা)-এর কাছে আসেন এবং তাঁকে এ কথার নিশ্চয়তা দেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আপনার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করবেন না ; তিনি শুধু উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। কাজেই হযরত আলী (রা) আশ্বস্ত হন। এ ছাড়াও মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ (রা), উসামা ইব্ন শু'বাহ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিও বায়'আত করেন নি। বহু লোক বিশেষ করে বনূ উমাইয়া বায়'আতে অংশগ্রহণ না করার জন্য মদীনা শরীফ থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করে। কোন কোন লোক ঐ উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখেও রওয়ানা হয়। যে কয়জন সাহাবায়ে কিরাম মদীনা শরীফে ছিলেন অথচ বায়'আত করেননি তাঁদেরকে হযরত আলী (রা) ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলেন, এখনও মুসলমানদের মধ্যে রক্তারক্তির কারণ বিদ্যমান রয়েছে এবং বিশৃঙ্খলাও পুরাপুরি বন্ধ হয়নি। তাই আমরা কারো হাতে বায়'আত না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে চাই।

তারপর হযরত আলী (রা) মারওয়ান ইব্ন হাকামকে তলব করেন। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি। হযরত উসমান গনী (রা)-এর সহধর্মিণীর (যিনি অকুস্থলে হাযির ছিলেন) কাছে হত্যাকারীদের নাম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কারো নাম বলতে পারেন নি ; তবে দু'ব্যক্তির আকার-আকৃতির বর্ণনা দেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (নায়িলাহ) বলেন, হযরত উসমান (রা) নিহত হওয়ার পূর্বেই তিনি (মুহাম্মদ) দরজা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। বনূ উমাইয়ার কিছু লোক উসমান (রা)-এর স্ত্রী নায়িলার কর্তিত অংগুলিসমূহ এবং হযরত উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামাটি নিয়ে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কাছে চলে যায়।

খিলাফতের দ্বিতীয় দিন

হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) পরদিন হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমরা তো আপনার হাতে এ শর্তে বায়'আত করেছি যে, আপনি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের 'কিসাস' জারি করলেন। যদি আপনি এ ব্যাপারে ইতস্তত করেন তাহলে আমাদের বায়'আতও অকার্যকর (বাতিল) বলে বিবেচিত হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি অবশ্যই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের উপর কিসাস জারি করব এবং তাঁর ঘটনার ব্যাপারে সুবিচার করব; কিন্তু এখনো বিক্ষোভকারীদের প্রাধান্য রয়েছে এবং খিলাফতের ব্যাপারেও স্থিরতা আসেনি। তাই, আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিন। কিছু স্বস্তি

লাভের পর আমি ঐ বিষয়টির প্রতি পুরাপুরি মনোনিবেশ করবো। বর্তমান অবস্থায় এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা)-এর একথা শুনে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) উভয়েই নিজ নিজ ঘরে চলে যান। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীসহ সকল বিক্ষোভকারীও এ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে যে, যদি কিসাস কার্যকর করা হয় তাহলে তো আমাদের রক্ষা নেই। আর ঐ সমস্ত লোক যারা হযরত উসমান গনী (রা)-কে মজলুম মনে করত এবং দাঙ্গাবাজদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করত, তারা একথা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, ঐ সমস্ত লোক যারা হযরত উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে আপন কৃতকর্মের পরিণাম আর ভোগ করতে হবে না এবং এভাবে তারা মজা করে ঘুরে বেড়াবে। মানুষের মনে অনুরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের জন্য ছিল ক্ষতিকারক। কিন্তু ঐ অবস্থায় যখন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং রাজধানী মদীনা তায়্যিবাতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল এর কোন প্রতিবিধান করাও হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দাঙ্গাবাজদের অবাধ্যতা

বায়'আতে খিলাফতের তৃতীয় দিন হযরত আলী (রা) নির্দেশ দিলেন কূফা, বসরা, মিসর এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত সকল আরবই যেন মদীনা থেকে চলে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা এবং তার দলের লোকেরা এ হুকুম অমান্য করে মদীনা তাইয়িবা থেকে চলে যেতে অস্বীকার করে এবং বেশীর ভাগ দাঙ্গাবাজও এ ব্যাপারে তাদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের জন্য সর্বপ্রথম অশুভ সংকেত। কেননা, তাঁর নির্দেশ এ লোকেরাই মানতে অস্বীকার করছে যারা নিজেদেরকে তারই জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে জাহির করত। তারপর হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, আপনি আমাদেরকে বসরা ও কূফাতে পাঠিয়ে দিন। যেহেতু সেখানকার লোকদের সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক রয়েছে, তাই আমরা সেখানে গিয়ে মানুষের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে একীভূত করার চেষ্টা করবো। তাঁদের একথার উপর হযরত আলী (রা)-এর কিছুটা সন্দেহ জাগে। তাই তিনি তাঁদের উভয়কে মদীনা তাইয়িবা থেকে বাইরে যেতে নিষেধ করে দেন।

হযরত মুগীরা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সুপরামর্শ

হযরত আলী (রা) এক লিখিত নির্দেশবলে তাঁর খিলাফতের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনেই হযরত উসমান (রা)-এর সময়কার সকল কর্মকর্তা ও প্রশাসককে পদচ্যুত করেন এবং তাদের স্থলে অন্য কর্মকর্তা ও প্রশাসক নিয়োগ করেন। তা শুনে, হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর নিকটাত্মীয়ও ছিলেন, হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে বলেন, আপনি হযরত তালহা, হযরত যুবায়র (রা) ও অন্যান্য কুরায়শের উপর মদীনা শরীফের বাইরে যাবার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তার প্রতিক্রিয়া হবে সমগ্র কুরায়শ বংশের লোক আপনার খিলাফতকে তাদের জন্য অস্বস্তিকর বলে ভাবতে শুরু করবে। ফলে আপনার প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি থাকবে না। অপর দিকে হযরত উসমান (রা)-এর সময়কার কর্মকর্তা ও প্রশাসকদের পদচ্যুত করার ব্যাপারে আপনি

তাড়াহুড়ার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই প্রেরিত কর্মকর্তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং সাবেক কর্মকর্তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় বহাল রাখুন এবং তাদের কাছ থেকে শুধু বায়'আত ও আনুগত্য দাবী করুন।

হযরত আলী (রা) পরিষ্কার ভাষায় হযরত মুগীরা (রা)-এর প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। পরদিন যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর কাছে আসেন এবং কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বেকার অভিমত পাল্টিয়ে বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর কর্মকর্তাদের পদচ্যুতির ব্যাপারটি আপনার ত্বরান্বিত করাই উচিত। যখন হযরত মুগীরা (রা) সেখান থেকে উঠে চলে যান তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, হযরত মুগীরা (রা) আপনাকে কাল সঠিক উপদেশই দিয়েছিলেন, আজ কিন্তু প্রতারণা করেছেন। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের সময় আপনার মক্কা থেকে চলে যাওয়াটাই সঙ্গত ছিল। যাক, এ মুহূর্তে তাই সমীচীন যে, আপনি হযরত উসমান গনী (রা) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে স্ব-স্ব পদে ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল রাখুন যতক্ষণ না খিলাফতের ভিত্তি মজবুত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠে। আপনি যদি তাদের পদচ্যুতির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন তাহলে বনূ উমাইয়া জনসাধারণকে এ বলে ধোঁকা দেবে যে, আমরা হযরত উসমান গনীর হত্যাকারীদের 'কিসাস' দাবী করছি যেমন মদীনার অধিবাসীরাও ঐ একই কথা বলছে। এভাবে জনসাধারণ তাদের দলে ভিড়ে যাবে। ফলে আপনার খিলাফতের ভিত্তি দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে উঠবে। একথা শুনে হযরত আলী (রা) বলেন, মুআবিয়াকে আমি তরবারির আঘাতেই শায়েস্তা করবো ; এ ব্যাপারে তাকে মোটেই খাতির করা হবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আপনি বীরোত্তম ব্যক্তি বটে, তবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ (যুদ্ধ একটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়)।

যদি আপনি আমার কথা শোনেন তাহলে আমি আপনাকে এমন কৌশল বাতলে দেব যে, বনূ উমাইয়া শুধু চিন্তাভাবনা করতে থাকবে, কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আলী (রা) বলেন, আমার মধ্যে না আপনার স্বভাব-চরিত্র রয়েছে, আর না মুআবিয়ার, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে তাই সঙ্গত যে, আপনি আপনার মাল-সামগ্রী নিয়ে ইয়ানবুর দিকে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকুন। আরবের লোক তখন উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু আমীর পদের জন্য আপনার মত যোগ্য লোক কোথাও পাবে না। আর যদি আপনি এ সমস্ত লোকদের (হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের) সাথে উঠাবসা করেন তাহলে লোকেরা আপনার উপর হযরত উসমান (রা)-কে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করবে। হযরত আলী (রা) তখন বলেন, আপনার একথা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না বরং আমার কথাই আপনার মানা উচিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তখন বলেন, নিঃসন্দেহে তাই আমার জন্য উচিত যে, আমি আপনারই নির্দেশ পালন করব। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, আমি আপনাকে সিরিয়ার গভর্নর করে পাঠাতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুআবিয়া হচ্ছে হযরত উসমান (রা)-এর নিকটতম আত্মীয় আর আমি হচ্ছি আপনার নিকটতম আত্মীয়। কাজেই, সে (মুআবিয়া) সিরিয়ায় দাখিল হওয়ার সাথে সাথে আমাকে হয় হত্যা করবে নয়ত বন্দী করে রাখবে। তাই মুআবিয়ার কাছে

চিঠিপত্র লিখে কোন না কোনভাবে তার বায়'আত গ্রহণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত। হযরত আলী (রা) এ কথা মানতে অস্বীকার করেন। অপর দিকে হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুবাহ যখন দেখলেন যে, হযরত আলী (রা) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন না, এমনকি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পরামর্শও তিনি রদ করে দিয়েছেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনা শরীফ থেকে চলে যান।

কর্মকর্তা ও প্রশাসক নিয়োগ

হযরত আলী (রা) উসমান ইব্‌ন হানীফকে মক্কা শরীফে, আম্মারা ইব্‌ন শিহাবকে কূফাতে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসকে ইয়ামনে, কায়স ইব্‌ন সা'দকে মিসরে এবং সাহল ইব্‌ন হানীফকে সিরিয়ায় কর্মকর্তা বা প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠান। উসমান ইব্‌ন হানীফ যখন বসরায় পৌঁছেন তখন কিছু লোক তাঁকে কর্মকর্তা বা হাকিম হিসাবে মেনে নেয়। আবার কিছু লোক বলে, আমরা আপতত চুপচাপ থাকব। আগামীতে মদীনা শরীফের অধিবাসিগণ যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে, আমরাও তাই মেনে চলব। কূফার দিকে আম্মারা ইব্‌ন শিহাবকে পাঠানো হয়েছিল। পথিমধ্যে তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তুলায়হা আম্মারাকে বলেন, তাই সঙ্গত যে, তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। কেননা, কূফাবাসীরা আবূ মূসার পরিবর্তে অন্য কোন কর্মকর্তাকে মেনে নিতে রাযী হবে না। এবার যদি তুমি আমার কথা না মান, তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। এ কথা শুনে আম্মারা চুপচাপ মদীনা শরীফের দিকে ফিরে আসেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইয়ামনে প্রবেশ করার পূর্বেই সেখানকার প্রাক্তন কর্মকর্তা ইউআন্না ইবন মুনাব্বিহ মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। তাই উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস নির্বিঘ্নে ইয়ামনের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেন। কায়স ইব্‌ন সা'দ যখন মিসরে পৌঁছেন, তখন সেখানকার কিছু লোক তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং কিছু লোক চুপচাপ থাকে। আবার কিছু লোক বলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভাইরা (বিক্ষোভকারীরা) মদীনা শরীফ থেকে মিসরে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছু করতে চাই না। সুহায়ল ইব্‌ন হানীফ সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। তাবূক পৌঁছার পর কয়েকজন অশ্বারোহীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অশ্বারোহীরা জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সুহায়ল উত্তর দেন, আমি আমীর নিযুক্ত হয়ে সিরিয়ায় যাচ্ছি। তারা বললো, তোমাকে উসমান ছাড়া অন্য কেউ যদি আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে তোমার জন্য মঙ্গলজনক যে, তুমি এখান থেকেই মদীনা শরীফের দিকে ফিরে যাও। একথা শুনে সুহায়ল মদীনা শরীফের দিকে ফিরে আসেন। তিনি যখন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তার সাথে সাথে আরো কয়েকজন কর্মকর্তাও মদীনা শরীফে এসে পৌঁছেন। জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের মুহূর্তে হামাদানের কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত আলী (রা) তাকে লিখেন, 'তুমি তোমার প্রদেশবাসীদের বায়'আত নিয়ে আমার কাছে চলে আস। তিনি সে নির্দেশ পালন করে মদীনা শরীফে চলে আসেন।

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) আত্মপক্ষ সমর্থন

হযরত আলী (রা) মা'বাদ আসলামীর মাধ্যমে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের উত্তরে আবূ মূসা (রা) লিখেন ঃ কুফাবাসীরা আমার হাতে বায়'আত করেছে, অধিকাংশ লোক তা করেছে সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহভরে, তবে কিছু লোক

অনিচ্ছার সাথে। যখন কূফায় আবূ মূসার নামে পত্র প্রেরণ করা হয় ঠিক একই সময় জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং সাবযা জাহ্‌মীর অপর একটি পত্র প্রেরণ করা হয় আমীর মুআবিয়ার নামে দামিশকে। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন মাস পর্যন্ত সেখান থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) কয়েক মাস পর্যন্ত পত্রবাহককে অপেক্ষমাণ রাখেন। অতঃপর সীলমোহরকৃত একটি পত্র আপন পত্রবাহক কাবীসা আবসীর হাতে দিয়ে জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহর সাথে মদীনায় প্রেরণ করেন। পত্রের খামে স্পষ্টাক্ষরে হযরত আলীর নাম-ঠিকানা লেখা ছিল (من معاوية إلى على)। পত্রটি নিয়ে বাহকদ্বয় হিজরী ৩৬ সনের রবীউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে মদীনায় পৌঁছেন। মুআবিয়া (রা)-এর পত্রবাহক হযরত আলী (রা)-এর দরবারে হাযির হয়ে পত্রটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। হযরত আলী (রা) খাম খুলে দেখতে পান এর ভিতরে কোন পত্র নেই। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে পত্রবাহকের দিকে তাকান। পত্রবাহক বলেন, আমি পত্রবাহক মাত্র ; আমি আমার প্রাণের নিরাপত্তা চাই। আলী (রা) বলেন, হাঁ, তুমি অবশ্যই নিরাপত্তা পাবে। এরপর পত্রবাহক বললো, সিরিয়ার কেউই আপনার হাতে বায়'আত করবে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ৬০ হাজার গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামা নিয়ে অঝোরে কাঁদছে। মানুষকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে ঐ জামা দামিশকের জামে মসজিদের মিম্বরের উপর রাখা হয়েছে। আলী (রা) তখন বললেন, 'ঐ সমস্ত লোক আমার থেকে উসমান হত্যার বদলা নিতে চাচ্ছে, অথচ আমি উসমান হত্যার সাথে কোন ভাবেই জড়িত নই। আল্লাহ উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করুন।' এই বলে তিনি পত্রবাহককে মুআবিয়ার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

সাবাঈদের গোমরাহী

বিদ্রোহীরা ও সাবাঈরা ঐ দূতকে গালিগালাজ করে এবং তাকে প্রহার করতে চায়। কিন্তু কয়েকজন মদীনাবাসী তাকে ঐ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং সে দামিশকে ফিরে যায়। বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে আমীর মুআবিয়ার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সে দীর্ঘদিন সিরিয়ায় অবস্থান করেছে এবং যথাসময়ে সেখান থেকে ফিরে আসে নি। জারীর এ অভিযোগ শ্রবণ করে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ফারকীসা শহরের দিকে চলে যান। আমীর মুআবিয়ার কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি ফারকীসায় আপন দূত পাঠিয়ে জারীরকে এক রকম জোর করেই সেখান থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি

মদীনাবাসীরা যখন আমীরে মুআবিয়া (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর দূতদের আসা-যাওয়া এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক উত্তপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তখন তারা এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের মধ্যে হয়ত আরো 'একটি' ভয়ানক রক্তক্ষয়ী ব্যাপার ঘটে যাবে। তারা এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য যিয়াদ ইবন হানযালাকে সরাসরি হযরত আলী (রা)-এর কাছে পাঠায়। যিয়াদ হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি প্রসঙ্গক্রমে তাকেও বলেন, হাঁ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও। যিয়াদ প্রশ্ন করেন, কি জন্য এই যুদ্ধ ? আলী (রা) বলেন, সিরিয়ায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য। যিয়াদ নিবেদন করেন, এরূপ পরিস্থিতিতে নম্র ও

দয়ার্দ্র ব্যবহারই তো উত্তম। আলী (রা) বলেন, না শাস্তিই বিদ্রোহীদের প্রাপ্য। মদীনাবাসীরা যখন জানতে পারল যে, হযরত আলী (রা) অচিরেই সিরিয়া আক্রমণ করবেন তখন হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) হযরত আলীর সাথে সাক্ষাত করে নিবেদন করলেন : আমরা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যেতে চাই। অতএব আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিন। হযরত আলী (রা) তাঁদের মদীনায় বেশি দিন রুখে রাখা তথা নযরবন্দী করে রাখা অসমীচীন মনে করে মক্কা গমনের অনুমতি দেন। তারপর তিনি মদীনায় এই মর্মে একটি সাধারণ ঘোষণা দেন যে, সিরিয়ায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য সবাই যেন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে তৈরি থাকে। তারপর তিনি বসরায় উসমান ইব্‌ন হানীফের কাছে, কূফায় আবূ মূসার কাছে এবং মিসরে কায়স ইব্‌ন সা'দের কাছে পত্র পাঠিয়ে নির্দেশ দেন : তোমরা যথাসম্ভব তোমাদের শক্তি ও প্রভাব খাটিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করো এবং তলব করার সাথে সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ

মদীনাবাসীর অধিকাংশ হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তিনি কুছাম ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং আপন পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রা)-এর হাতে সেনাবাহিনীর পতাকা তুলে দেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে ডান পাশের বাহিনীর (মায়মানা), আমর ইব্‌ন আবী সালমাকে বামপার্শ্বের বাহিনীর এবং আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহর ভাই আবূ লায়লা ইব্‌নুল জাররাহকে সম্মুখবর্তী বাহিনীর (মুকাদ্দিমাতুল জায়শ) অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে বিদ্রোহীদের কেউ (যাদের বেশীর ভাগ লোক তখনো মদীনায় অবস্থান করছিল।) সেনাবাহিনীর কোন অংশের অধিনায়কত্ব না পায়। এভাবে হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনীর বিভিন্ন অংশের অধিনায়কত্ব বন্টন করেন। কিন্তু বাহিনীটি তখনো মদীনা থেকে রওয়ানাই হয়নি। এমনি সময়ে মক্কার দিক থেকে সংবাদ এল যে, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত আলী (রা) সিরিয়া আক্রমণের সংকল্প তখনকার মত মুলতবি করেন।

মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতি

যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তিনি সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদত বরণের সংবাদ পান এবং সেখান থেকেই পুনরায় মক্কায় ফিরে যান। তাঁর কাছে এই সংবাদও পৌঁছে যে, মদীনার লোকেরা খলীফা হিসাবে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছেন। তাঁর মক্কায় ফিরে যাওয়ার কারণ জানার জন্য লোকেরা তাঁর সওয়ারীর চারপাশে সমবেত হলে তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বলেন : "আল্লাহর কসম! উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি এই হত্যার প্রতিশোধ নেব। আক্ষেপের বিষয়, আগত লোকেরা ক্রীতদাসদের সাথে একজোট হয়ে এই বিদ্রোহ করেছে। তারা এইজন্য হযরত উসমান (রা)-কে বিরোধিতা করেছে যে, তিনি যুবক বয়সের লোকদের আমিল গভর্নর নিয়োগ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁর পূর্ববর্তীরাও অনুরূপ করেছিলেন। ঐ বিদ্রোহীরা নিজেদের দাবীর অনুকূলে প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে রক্তপাত হারাম করেছেন

তারা তা প্রতিহত করেছে, যে শহরকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রাসূল (সা)-এর হিজরত স্থল বানিয়েছিলেন সে শহরেই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং যে মাসে রক্তপাত তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল সে মাসেই রক্তপাত করেছে, যে সম্পদ গ্রহণ করা তাদের জন্য অবৈধ ছিল তারা তা ছিনিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্র কসম ! উসমান (রা)-এর একটি অঙ্গুলীও এই দাঙ্গাবাজ গোষ্ঠী তথা সমগ্র বিশ্বের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। যে ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাতে ওরা হযরত উসমান (রা)-এর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল তিনি তা থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন ।

হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার আমিল (গভর্নর) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির হাদরামী। তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর এই বক্তৃতা শুনে বলে উঠেন, সর্বাগ্রে আমি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেব।

একথা শুনে বনূ উমাইয়ার লোকেরা, যারা হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভের পর সবেমাত্র মক্কায় গিয়ে পৌঁছে ছিল, এক বাক্যে বলে উঠল, আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। সাঈদ ইব্নুল 'আস, ওয়ালীদ ইব্ন উকবা প্রমুখও ছিলেন ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির বসরা থেকে পদচ্যুত হয়ে মক্কার দিকেই আসেন। ইয়ালা ইব্ন মুনাব্বিহ আসেন ইয়ামন থেকে এবং সাথে করে নিয়ে আসেন ছয় শ' উট ও ছয় লক্ষ দীনার। এরপর প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে যে, অবশ্যই উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

হযরত তালহা (রা) এবং যুবায়র (রা) মদীনা থেকে মক্কায় এসে পৌঁছলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁদের উভয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি কারণে ও কিভাবে মক্কা থেকে চলে এসেছ ? তাঁরা উভয়ে উত্তর দেন, মদীনার পুণ্যবান ও অভিজাত লোকদের উপর বেদুঈন এবং বিদ্রোহীরা প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। আমরা তাদের ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, তাহলে তো ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমাদেরও থাকা উচিত। তাঁরা উভয়েই নিজেদের আগ্রহ ও সম্মতির কথা তাঁকে জানান। মক্কাবাসীরা সকলেই হযরত আয়িশা (রা)-এর বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। বসরার প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ ইব্ন আমির, ইয়ামনের গভর্নর ইয়ালা এবং তালহা ও যুবায়র (রা) এ চারজনকে হযরত আয়িশা (রা)-এর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং সব ব্যাপারেই তাঁর উপদেষ্টা মনে করা হত। প্রথমে কেউ একজন পরামর্শ দিল : মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের সোজা সিরিয়ায় চলে যাওয়া উচিত। একথার উপর আবদুল্লাহ ইব্ন আমের বলেন, সিরিয়ায় আমীরে মুআবিয়া (রা) রয়েছেন এবং সেই দেশ সামাল দেওয়ার মত তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। অতএব আমাদের এখান থেকে বসরার দিকে যাওয়া সমীচীন মনে হয়। সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক লোক রয়েছে। আমিও সেখানে গভর্নর হিসাবে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। তাছাড়া বসবাসীরা হযরত তালহা (রা)-এর প্রতি সবচাইতে বেশি সহানুভূতিশীল। অতএব বসরায় আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। এভাবে একটি বিরাট প্রদেশ ও বিরাট জনগোষ্ঠী আমাদের হাতে আসবে। কেউ একজন বললো, আমরা মক্কায় থেকেই শত্রুদের মুকাবিলা করছি না কেন ? এর উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের বললেন, মক্কাবাসীদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের মতাবলম্বী করে নিয়েছি এবং তারা আমাদের পক্ষে রয়েছেন। কিন্তু আলী বাহিনী মদীনা থেকে এসে হামলা

করলে তা তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না। আমরা যদি এখান থেকে আমাদের সামরিক শক্তি নিয়ে বসরার দিকে চলে যাই তাহলে মক্কাবাসীরাও আমাদের পক্ষে এসে যাবে। তখন আমাদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে, আমরা যে কোন হামলা প্রতিরোধ করতে পারব এবং উসমান হত্যার বদলা নিতেও সক্ষম হব।

মোটকথা সকলেই এ মত সমর্থন করে। এবার বসরা যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। এরপর সকলে এই নিদ্ধান্ত নিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), যিনি তখন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, তাঁকেও পক্ষে নিতে হবে এবং নেতৃত্ব তাঁর হাতেই সোপর্দ করতে হবে। যা হোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে ডেকে পাঠানো হল এবং তাঁর কাছে নিবেদন করা হল, আপনি উসমান হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উত্তরে বলেন, আমি মদীনাবাসীদের সাথে রয়েছি। তারা যা করবে আমি তা-ই করব। তাঁর এই উত্তর শুনে কেউ এ নিয়ে তাঁর সাথে আর কথা কাটাকাটি করল না। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। যখন তাঁরা শুনলেন, হযরত আয়িশা (রা) বসরা যেতে মনস্থ করেছেন তখন তাঁরাও তাঁর সাথে সেখানে যেতে মনস্থ করেন। হযরত হাফসা বিন্ত উমরও তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁকে বসরা যেতে নিষেধ করেন। ফলে তিনি মক্কায় থেকে যান। মুগীরা ইব্ন শু'বাও মক্কায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তিনিও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

হযরত আয়িশা (রা)-এর মক্কা থেকে বসরা যাত্রা

আবদুল্লাহ ইব্ন আমির এবং ইয়ালা ইব্ন মুনাব্বিহ্ যথাক্রমে বসরা ও ইয়ামন থেকে প্রচুর অর্থ এবং রসদপত্র নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। অতএব তাঁরা হযরত আয়িশা (রা)-এর সফর সামগ্রীর প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সমগ্র মক্কা শহরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, হযরত আয়িশা, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছেন। অতএব যে ব্যক্তি ইসলাম-দরদী ও উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক সে যেন তাঁদের সফরসঙ্গী হয়। তাকেও বাহন, সফর সামগ্রী ইত্যাদি দেওয়া হবে। মোটকথা, এভাবে পবিত্র মক্কা থেকে দেড় হাজার লোকের একটি বাহিনী বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। ঠিক ঐ মুহূর্তে মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং সাঈদ ইব্নুল 'আসও মক্কায় আসেন এবং ঐ বাহিনীতে যোগ দেন।। মক্কা থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক এসে তাঁদের সাথে যোগদান করতে থাকে এবং শীঘ্রই বাহিনীর সদস্য-সংখ্যা তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

উম্মুল ফাদল বিনত হারিছ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও ঐ বাহিনীতে ছিলেন। তাঁরা জুহায়না গোত্রের যুফার নামক জনৈক লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হযরত আলী (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন এবং একটি পত্রের মাধ্যমে ঐ বাহিনীর বসরা যাত্রার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে যাঁরা হযরত আয়িশার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তাঁরা ইরাক পর্যন্ত আসার পর কাঁদতে কাঁদতে হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মদীনায় চলে যান।

যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মারওয়ান ইবনুল হাকামও ঐ বাহিনীর সাথে ছিলো। এই মারওয়ান হযরত উসমান (রা)-কে বিভিন্ন অভিযোগের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলো। হযরত

উসমান (রা) মুসলমানদের সর্বসম্মত দাবী অনুযায়ী তাঁর কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে চাইলে এই মারওয়ানই তাঁকে তা থেকে বিরত রাখেন। সাধারণ লোকেরা এই মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামকেই ঘৃণা করত। হযরত উসমান (রা)-কে যখন ঘেরাও করা হয়েছিল তখন যদি তিনি বিদ্রোহীদের দাবী অনুযায়ী মারওয়ানকে তাদের হাতে সমর্পণ করতেন তাহলে তাঁর সাথে এই দুঃখজনক আচরণ কখনো করা হত না এবং তাঁকে শাহাদত বরণ করতেও হত না, বরং অতি সহজেই যাবতীয় বিবাদের মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু তিনি মারওয়ানকে দাঙ্গাবাজদের হাতে সমর্পণ করেননি এই ভয়ে যে তারা তাকে নির্ঘাত হত্যা করবে।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম সেই ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মিথ্যা কথনের কারণে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন (এবং মহানবীর জীবদ্দশায় তাকে আর মদীনায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি)। মোটকথা, মারওয়ান ছিলো এক ধূর্ত ও ভয়ংকর ব্যক্তি। ঐ বাহিনীর সফর সঙ্গী হয়েও সে তার চিরাচরিত স্বভাববশত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর প্রথম সালাতের সময় হলে মারওয়ানই আযান দেয়, এরপর তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে এসে বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার উপর ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করা হবে ? তাঁরা উভয়ে কিছু বলার পূর্বেই আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, আমার পিতার উপর, ইবন তালহা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, আমার পিতার উপর। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে মারওয়ানকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি কি আমাদের কাজ লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাচ্ছ ? ইমামত আমার বোনপুত্র ইবনুয যুবায়র করবে।

আরো কয়েক মনযিল অগ্রসর হওয়ার পর একদা মারওয়ান হযরত তালহা এবং যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, যদি আপনারা জয়ী হন তাহলে কাকে খলীফা বানাবেন ? তাঁরা উত্তর দিলেন, জনসাধারণ আমাদের দু'জনের মধ্যে যাঁকে খলীফা নির্বাচন করবে সে-ই খলীফা হবে। একথা শুনে সাঈদ ইবনুল 'আস বলেন, তোমরা তো শুধু উসমান হত্যার বদলা নেবার জন্য বের হয়েছ। হযরত উসমান (রা)-এর পুত্রকেই খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। হযরত তালহা ও যুবায়র বললেন, তুমি যদি অন্য কারো নাম প্রস্তাব করতে তাহলে না হয় বিবেচনা করা যেত। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে, মুহাজিরদের প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অল্প বয়স্ক একটি ছেলেকে খলীফা মনোনীত করা হবে ? সাঈদ বলল, যদি ব্যাপার তাই হয় তাহলে আমি তোমাদের সাথে নেই। একথা বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন খালিদ ইবন উসায়দ এবং মুগীরা ইবন শু'বাও ফিরে গেলেন। তাদের সাথে সাকীফ গোত্রের অনেক লোকও ফিরে গেল। অগত্যা হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) বাকী লোকদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। ঘটনাচক্রে তাঁরা স্বপ্নকূপে (বিরে রুইয়া) উপনীত হলে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ঐ কুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলা হল, এটা স্বপ্নকূপ। এই নাম শোনার সাথে সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। লোকেরা বলল, কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে বসা অবস্থায় বলেছিলেন : "হায়! আমি যদি জানতে পারতাম, তোমাদের মধ্যে কাকে দেখে স্বপ্নকূপের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে ?" একথা বলে হযরত আয়িশা (রা) তাঁর উটের ঘাড়ে আঘাত করেন এবং সেখানেই তা বসিয়ে দেন। তিনি

একদিন এবং একরাত সেখানেই অবস্থান করেন এবং সমগ্র বাহিনীও তাঁর সাথে অবস্থান করে। হঠাৎ বাহিনীর মধ্যে এই চিৎকার উঠে, জলদি কর, আলী (রা) তোমাদের কাছে এসে পৌঁছে গেছেন। একথা শুনে সমগ্র বাহিনী বসরা অভিমুখে চলতে শুরু করে। হযরত আয়িশা (রা)-ও বাহিনীর সাথে রওয়ানা হন। কেননা ইতিপূর্বেই তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ভুলবশত কেউ না কেউ এই কুয়াকে 'স্বপ্নের কুয়া' বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয় এবং এ পথে তা পড়তেও পারে না। এভাবেই স্বপ্নকুয়ার পাশে অবস্থানের পরিসমাপ্তি ঘটল।

বসরার গভর্নরের বিরোধিতা

হযরত আয়িশা (রা)-এর বাহিনী বসরার নিকটবর্তী হলে তিনি প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইবন আমেরকে বসরাবাসীদের কাছে পাঠান। তিনি সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের কাছে পত্রাদিও লিখেন এবং তার জবাবের অপেক্ষা করেন। বসরার তখনকার গভর্নর উসমান ইবন হুনায়ফ তাঁর আগমন সংবাদ জানতে পেরে বসরার গণ্যমান্য লোকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে পাঠান। তারা উম্মুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাৎে করে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিদ্রোহীরা এবং বিভিন্ন গোত্রের দুষ্কৃতিকারীরা এই হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে এবং তারা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করে ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে চাচ্ছে। আমি মুসলমানদের এই দল নিয়ে এজন্য বের হয়েছি যে, আমি জনসাধারণকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করব এবং তাদেরকে সংশোধন করব। মুসলমানদের সংশোধন ছাড়া আমার এই সফরের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এরপর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হয়েছি। এরপর বসরাবাসীরা প্রশ্ন করেন, আপনারা উভয়ে কি হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নি ? তাঁরা বলেন, আমরা বায়'আত করেছি, তবে এই শর্তে যে হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। তাছাড়া যখন আমাদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করা হয় তখন তরবারি আমাদের মাথার উপর ঝুলছিলো। এরপর বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উসমান ইবন হুনায়ফের কাছে ফিরে যান এবং হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর সাথে তাদের যে কথাবার্তা হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। উসমান ইবন হুনায়ফ তা শুনে বিস্মিত হন এবং অলক্ষ্যে বলে উঠেন :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

এরপর তিনি বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করেন, এখন আপনাদের ইচ্ছা কি ? তারা বলেন, চুপচাপ থাকুন। উসমান বলেন, আমি তাঁদের প্রতিরোধ করব যতক্ষণ না হযরত আলী (রা) এখানে এসে পৌঁছেন। তারপর বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ থাকেন। এবার উসমান এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, সমগ্র বসরাবাসী যেন অবিলম্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মসজিদে এসে সমবেত হলে উসমান ইবন হুনায়ফ বসরার কায়স নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড় করান। সে বলতে লাগলো, লোকেরা! যদি তালহা, যুবায়র এবং তাঁদের সঙ্গীরা এখানে তাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এসে থাকেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা মক্কায় সামান্য একটি পাখিরও প্রাণের নিরাপত্তা রয়েছে।

সেখানে কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না। আর যদি তাঁরা উসমান হত্যার বদলা নেবার জন্য এসে থাকেন তাহলে আমরা তো হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী নই। অতএব এটাই সমীচীন যে, তাঁরা যেদিক থেকে এসেছে তোমরা তাদেরকে সেদিকেই ফিরিয়ে দাও। এ বক্তৃতা শুনে আসওয়াদ ইবন সুরায় আস-সাদী দাঁড়িয়ে বললেন, এরা আমাদের উসমান (রা)-এর হত্যাকারী ভেবে এখানে আসেনি, বরং তাঁর হত্যাকারীদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের সাহায্য চাইতে এসেছে। একথা শুনে লোকেরা উল্লিখিত কায়সের উপর কংকর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ফলে মসজিদের ঐ সভা পণ্ড হয়ে যায়। উসমান ইবন হুনায়ফ বুঝতে পারেন যে, বসরায়ও তালহা এবং যুবায়র (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁদের সাহায্যকারী লোক রয়েছে।

সম্মুখসমরের আয়োজন

হযরত আয়িশা (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে 'মারুর' নামক স্থানে উপনীত হলে উসমান ইবন হুনায়ফ তার বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে বের হন এবং সম্মুখযুদ্ধের জন্য তাদেরকে সারিবদ্ধ করেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন হযরত তালহা (রা) এবং বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন হযরত যুবায়র (রা)। যখন উভয় বাহিনী একে অন্যের মুখামুখি হয়ে দাঁড়াল তখন প্রথমে ডান পাশের বাহিনী থেকে হযরত তালহা বের হন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করার পর হযরত উসমান (রা)-এর গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। তারপর বাম পাশের বাহিনী থেকে হযরত যুবায়র বের হন এবং প্রকাশ্যে হযরত তালহা (রা)-এর বক্তৃতা সমর্থন করেন। এরপর হযরত উম্মুল মু'মিনীন সকলকে সম্বোধন করে বিভিন্ন উপদেশ দেন। উম্মুল মু'মিনীনের বক্তৃতা শুনে উসমান ইবন হুনায়ফের সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের একদল তো উসমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল এবং অপর দল তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসমীচীন মনে করে। হযরত উম্মুল মু'মিনীন এবং হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) যখন দেখলেন, স্বয়ং উসমান বাহিনীর মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু উসমান ইবন হুনায়ফ নিজ সৈন্যদের নিয়ে মুকাবিলার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন। উপরন্তু তিনি জারিয়া ইবন কুদামিয়াকে উম্মুল মু'মিনীনের কাছে পাঠান! জারিয়া এসে বললো, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার এই অভিশপ্ত উটে আরোহণ করে আগমনের চেয়ে উসমান গনী (রা)-এর হত্যাকাণ্ড বরং ভাল ছিল। আপনার জন্য আল্লাহ্ পর্দার যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আপনি তা ভঙ্গ করছেন। আপনি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসে থাকলে অবিলম্বে মদীনায় ফিরে যান। আর কেউ জোর করে আপনাকে এখানে নিয়ে এসে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং লোকদেরকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিন। তার এই বক্তৃতা শেষ হয়নি এমনি সময় হাকীম ইবন জাবালা উম্মুল মু'মিনীনের বাহিনীর উপর হামলা করে বসে। উম্মুল মু'মিনীনের বাহিনী সে হামলা প্রতিরোধ করে। কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসার কারণে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত থাকে। পরদিন ভোর বেলা উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় এবং হাকীম ইবন জাবালা নিহত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উসমান ইবন হুনায়ফ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং বসরার উপর তালহা ও যুবায়র

(রা)-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উসমান ইবন হুনায়ফকে গ্রেফতার করে তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তারা তা উম্মুল মু'মিনীনকে অবহিত করেন। উম্মুল মু'মিনীন উসমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উসমান সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সোজা মদীনা রওয়ানা হন। বসরা হযরত তালহা, যুবায়র ও উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর দখলে চলে আসলেও সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ শত্রু-মিত্র উভয় ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল।

হযরত আলী (রা)-এর বসরা যাত্রা

হযরত আলী (রা) যখন জানতে পারলেন মক্কাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তিনি তাঁর সিরিয়া যাত্রার পরিকল্পনা মুলতবি রাখেন। এরপর তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, হযরত আয়িশা, যুবায়র ও তালহা (রা) সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এতে তিনি মর্মাহত হন। তিনি সমগ্র মদীনাবাসীর সাহায্য কামনা করেন। জুমুআর ভাষণে তিনি জনসাধারণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। মদীনাবাসীদের কাছে এটা খুবই অসহনীয় ঠেকছিল যে, তাদেরকে এবার আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু হযরত আবুল হায়সাম বদরী, যিয়াদ ইব্‌ন হানযালা, খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা) প্রমুখ সাহাবী এ ব্যাপারে তাঁদের সম্মতি প্রকাশ করলে অন্যান্য লোকও তাতে সম্মত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৩৬ সনের রবীউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনায় অবস্থানরত কূফা ও মিসরের লোকেরাও তাঁর সফরসঙ্গী হয়।

ইয়াহূদী মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবাও নিজ সঙ্গী-সাথীসহ হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে যোগদান করেছিল। আলী (রা) যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হন ঠিক তখনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) আলী (রা)-এর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং তাঁকে বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি মদীনা ছেড়ে যাবেন না। আল্লাহর কসম ! যদি আপনি এখান থেকে চলে যান তবে মুসলমানদের আমীর আর কখনো এখানে ফিরে আসবে না। লোকেরা তখন গালি-গালাজ করতে করতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)-কে তাড়া করে। কিন্তু হযরত আলী (রা) তাদের বলেন, তাঁকে ছেড়ে দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক। এরপর হযরত আলী অগ্রসর হয়ে 'যীযায়' নামক স্থান উপনীত হন এবং সেখানেই সংবাদ পান যে, তালহা ও যুবায়র (রা) বসরায় প্রবেশ করেছেন।

হযরত আলী 'যীযায়' অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের জনসাধারণের কাছে নির্দেশাদি পাঠান। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (রা)-কে কূফায় প্রেরণ করেন যাতে তারা সেখানকার লোকদের একত্রিত করে যীযায় নিয়ে আসেন। আর যীযায় যেসব লোক অবস্থান করছিল তিনি তাদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। কয়েকদিন পর মদীনা থেকে তিনি তাঁর রসদপত্র ও বাহন ইত্যাদি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করেন। যেহেতু সাধারণ লোকের কাছে হযরত তালহা ও যুবায়র

(রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একটি অপসন্দনীয় ব্যাপার ছিল তাই হযরত আলী (রা) বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের উপর হামলা করব না যতক্ষণ না তাঁরা আমার উপর হামলা করে। আমি যথাসম্ভব বুঝিয়ে তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসারই চেষ্টা করব। হযরত আলী (রা) যীযাহ থেকে রওয়ানা হচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে 'তাঈ' গোত্রের একটি দল এসে তাঁর বাহিনীতে যোগদান করে। এজন্য তিনি তাদের প্রশংসা করেন। যীযাহ্ থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি আমর ইবনুল জাররাহকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত আলী (রা) যখন 'ফীদ' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন 'তাঈ' ও 'আসাদ' গোত্রের কিছু লোক এসে তাঁর সহযোগী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারে সুদৃঢ় থাক, এটাই যথেষ্ট। যুদ্ধের জন্য তো আমার কাছে যথেষ্ট সংখ্যক মুহাজির রয়েছেন। ঐ স্থানেই কূফা থেকে আগত জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে বলে, আবূ মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? যদি আপনি আপোস রফার উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকেন, অর্থাৎ তালহা, যুবায়র প্রমুখের সাথে আপোস করতে চান তাহলে আবূ মূসা এ ক্ষেত্রে আপনার সহায়ক হবেন না। আলী (রা) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাদের উপর হামলা না করবে ততক্ষণ আমাদের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নেই। হযরত আলী 'ফীদ' থেকে রওয়ানা হয়ে সালাবিয়াহ' নামক স্থানে পৌঁছে সংবাদ পান যে, হাকীম ইব্ন জাবালা নিহত হয়েছেন। সেখানেই উসমান ইব্ন হুনায়ফ তাঁর কাছে এসে হাযির হন। আলী (রা) তাঁকে দেখে বলেন, তোমার উপর দিয়ে যে ভীষণ বিপদ গেছে তার পুরস্কার তুমি অবশ্যই পাবে।

তারপর হযরত আলী (রা) বলেন, তালহা ও যুবায়র তো প্রথমে আমার হাতে বায়'আত করেছিলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁরা আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর আনুগত্য করেছেন, অথচ আমার বিরোধিতা করছেন। হায়, যদি তাঁরা একথা জানতেন যে আমি তাঁদের (অন্য তিন খলীফা) থেকে পৃথক নই। -একথা বলে তিনি তালহা ও যুবায়রকে বদ দু'আ করেন।

মুহাম্মদদ্বয়ের কূফা যাত্রা

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (রা)-কে আলী (রা) কূফায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা কূফায় পৌঁছে আলী (রা)-এর লেখা একটি পত্র আবূ মূসাকে দেন এবং আলী (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দিল না। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর অত্যন্ত জোরেসোরে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করলে তারা বলে, দুনিয়ার রাস্তা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া, আর আখিরাতের রাস্তা হচ্ছে (যুদ্ধে না গিয়ে) ঘরে বসে থাকা। একথা বলে তারা স্থির হয়ে বসে রইলো। এটা দেখে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (রা) রাগান্বিত হন এবং আবূ মূসার সাথে কঠোর আচরণ করেন। আবূ মূসা তাঁদের দু'জনকে বলেন, হযরত উসমান গনী (রা)-এর বায়'আতের দায়-দায়িত্ব আমার ও আলী (রা)-এর ঘাড়ে রয়েছে। যদি যুদ্ধ একান্ত অপরিহার্য হয়েই থাকে তাহলে উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে নিরাশ হয়ে কূফা থেকে চলে আসেন এবং যীকার নামক স্থানে হযরত আলী (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে কূফার যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

আশ্‌তার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কূফা যাত্রা

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর তাঁদের মিশনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর আলী (রা) আশতার-কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি ইব্‌ন আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে কূফায় যাও এবং আবূ মূসাকে যেভাবে পার বোঝাবার চেষ্টা কর। যা হোক তাঁরা উভয়ে কূফা যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তারা আবূ মূসাকে আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর কাছে সামরিক সাহায্য চান। কিন্তু আবূ মূসা আগাগোড়া একথাই বলতে থাকেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ আমি নীরব (নিরপেক্ষ) থাকবো। শেষ পর্যন্ত আশতার ও ইব্‌ন আব্বাস নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং হযরত আলী (রা)-কে বলেন, আমাদের কোন কথাই আবূ মূসাকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও হাসান ইব্‌ন আলীর কূফা যাত্রা

আশতার ও ইব্‌ন আব্বাস ফিরে আসার পর আলী (রা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং আপন পুত্র হাসান (রা)-কে কূফা প্রেরণ করেন। তাঁহার উভয়ের আগমন সংবাদ শুনে হযরত আবূ মূসা কূফা মসজিদে আসেন। তিনি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর সাথে গলাগলি করেন এবং আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি হযরত উসমান গনী (রা)-কে কোন সাহায্য কর নি, বরং দুষ্কৃতিকারীদের সাথে মিশে গিয়েছিলে। আম্মার উত্তরে বলেন, আমি তা করিনি। হযরত হাসান বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের সাথে কোন পরামর্শ করেনি। আর এখন লোকদের সংশোধন করা ছাড়া আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। আর আমীরুল মু'মিনীন (রা) উম্মতের সংশোধনমূলক কাজের ক্ষেত্রে কাউকেই ভয় করেন না। আবূ মূসা অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে উত্তর দেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বলেছেন, শীঘ্রই ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। আর ঐ অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে। তাছাড়া মুসলমান মাত্রই পরস্পর ভাই ভাই। তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হারাম। আবূ মূসার ঐ সমস্ত কথায় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) এতই বিরক্ত হন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকে গালি দিয়ে বসেন। আবূ মূসা গালি শুনে চুপ হয়ে যান। কিন্তু উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ এর প্রত্যুত্তর দেয়। এরপর কথায় কথা বাড়ে এবং লোকেরা আম্মারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আবূ মূসাই আম্মারকে রক্ষা করেন।

ঐ সময়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বসরা থেকে কূফাবাসীদের কাছে পত্রাদি পাঠান। সেগুলোতে তিনি লিখেছিলেন, এই মুহূর্তে তোমরা কাউকে সাহায্য করো না, বরং নিজ নিজ ঘরে চুপচাপ বসে থাক অথবা আমাদের সাহায্য কর। আমরা উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে বের হয়েছি। এ বৈঠকেই যায়দ ইব্‌ন সূহান মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর একটি পত্র সবাইকে পড়ে শোনায়। এজন্য সিবত ইব্‌ন রিবঈ তাকে গালি দিয়ে বসে। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। লোকেরা প্রকাশ্যে হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সমর্থন করতে থাকে। আবূ মূসা (রা) উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করছিলেন এবং বলছিলেন, ফিতনা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ঘরে বসে থাক, আমার আনুগত্য কর, আরবের টিলাসমূহের মতো এক একটি টিলায় পরিণত হও যাতে মজলুমরা

তোমাদের ছায়ায় এসে আশ্রয় নেয়। তোমাদের বর্শার অগ্রভাগ নত করে ফেল এবং নিজ নিজ তরবারি খাপে ভরে নাও।

এসব কথা শোনার সাথে সাথে যায়দ ইব্‌ন সূহান আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর সাহায্যের জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন এবং একের পর এক কয়েক ব্যক্তি তার বক্তব্য সমর্থন করেন। অতঃপর আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির বলেন, লোক সকল ! হযরত আলী (রা) তোমাদেরকে ন্যায় ও সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তোমরা উঠ এবং তাঁর বাহিনীতে যোগদান কর। তারপর হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বলেন, লোক সকল! আমাদের আহ্বানও গ্রহণ কর, আমাদের আনুগত্য কর এবং যে বিপদে তোমরা ও আমরা পতিত হয়েছি তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর। আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন, যদি আমরা মজলুম হই তাহলে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর, আর যদি আমরা জালিম হই তাহলে তোমরা আমাদের থেকে যাবতীয় অধিকার কেড়ে নাও। তিনি এও বলেছেন, সর্বপ্রথম তালহা ও যুবায়রই আমার হাতে বায়'আত করেছেন, অথচ সর্বপ্রথম তাঁরাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। হযরত হাসান ইব্‌ন আলীর বক্তৃতা জনসাধারণকে খুব প্রভাবিত করে এবং তারা হযরত আলীকে সমর্থনের কথা জানায়। আলী (রা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং হাসানকে প্রেরণের পর পর আশতারকেও কূফায় প্রেরণ করেন। আশতার ঠিক সেই মুহূর্তে কূফায় গিয়ে পৌঁছে যখন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বক্তৃতা করছিলেন। আশতারের উপস্থিতির কারণে বিষয়টি আরো গুরুত্ব পায়। ফলে আবূ মূসা আশআরীর কথা আর কেউ শুনেনি। এতদত্ত্বেও তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই অভিমতই ব্যক্ত করছিলেন যে, নির্জনবাস গ্রহণ কর এবং পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ কর। মালিক আশতার কূফায় পৌঁছে বিভিন্ন গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উপরন্তু তিনি আবূ মূসা আশআরীকে গভর্নর ভবন খালি করে দিতে বলেন।

যাহোক, হাসান (রা), আম্মার (রা) ও আশতার কূফা থেকে নয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কূফাবাসীদের এই বাহিনী 'যীকার' নামক স্থানের নিকটবর্তী হলে হযরত আলী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে কূফাবাসী ! আমরা তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি। তোমরাও আমাদের সাথে মিলে বসরাবাসীদের মুকাবিলা করবে। যদি তারা তাদের সংকল্প ত্যাগ করে তাহলে তো এর চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। আর যদি তারা তাদের সংকল্পে অটল থাকে তাহলেও আমরা তাদের সাথে নম্র আচরণ করব যাতে আমাদের পক্ষ থেকে জুলুম বাড়াবাড়ির সূচনা না হয়। যে কাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে আমরা তা সংশোধন না করে ছাড়বো না। এই সমস্ত কথা শোনার উপর কূফাবাসীরাও আলী (রা)-এর যীকার নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। পরদিন আলী (রা) কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা)-কে বসরা প্রেরণ করেন। এই যীকার নামক স্থানেই বিখ্যাত তাবিঈ হযরত উয়ায়স আল কারনী (রহ) আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত হন।

আপোস প্রচেষ্টা

আলী (রা) কা'কা' ইব্‌ন আমরকে বসরায় এজন্য প্রেরণ করেন যাতে তিনি সেখানে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করে

সেখানে তাদের আগমনের কারণ সম্পর্ক অবহিত হন এবং যথাসম্ভব বুঝিয়ে আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাঁদেরকে নতুনভাবে বায়'আতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কা'কা' ইব্ন আমর (রা) ছিলেন সুবক্তা, বিচক্ষণ ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য। তিনি বসরায় পৌঁছে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আয়িশা (রা)-এর কাছে নিবেদন করেন : কোন্ বস্তুটি আপনাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে ? আর আপনার লক্ষ্যই বা কি ? তিনি বলেন, আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের সংস্কার সাধন এবং কুরআনের উপর আমল করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রেরণা দান। হযরত তালহা এবং যুবায়র (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁদেরও অনুরূপ প্রশ্ন করলে তাঁরাও ঠিক একই উত্তর দেন। একথা শুনে হযরত কা'কা' ইব্ন আমর (রা) বলেন, আপনাদের লক্ষ্য যদি সংশোধন ও কুরআনের উপর আমল করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুপ্রেরণা দান হয়ে থাকে, তাহলে তো এভাবে তা অর্জন করা যাবে না, যেভাবে আপনারা চাচ্ছেন। তাঁরা বলেন, কুরআনে 'কিসাসের' হত্যার পরিবর্তে হত্যার নির্দেশ রয়েছে। আমরা উসমান হত্যার কিসাস নিতে চাই। কা'কা' (রা) বলেন, এভাবে তো কোথাও কিসাস নেওয়া হয় না। প্রথমে ইমামত ও খিলাফত কায়েম এবং তা সুদৃঢ় করা জরুরী যাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর উসমান হত্যাকারীদের থেকে তো সহজেই কিসাস নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেশে যখন আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত নেই তখন কিসের ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা হবে ? দেখুন, আপনারা এই বসরায়ই বহু লোককে উসমান-হত্যার কিসাসে ইতিমধ্যে হত্যা করেছেন, কিন্তু হারকুস ইব্ন যুহায়রকে ধরতে পারেন নি। যখন আপনারা তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন তখন ছয় হাজার লোক তার পক্ষ নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তৈরি হয়ে গেছে। ফলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে আপনারা তার পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) যখন বিশৃঙ্খলা দমন ও অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে 'কিসাস' নিতে সক্ষম হয় নি তখন আপনাদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এটা কি করে আপনাদের জন্য বৈধ হবে যে, আপনারা নিজেরাও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভংগ করবেন ? এভাবে তো শুধু বিশৃঙ্খলাই বাড়বে, মুসলমানদের মধ্যে আরো রক্তারক্তি হবে এবং এই সুযোগে উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরাও 'কিসাস' থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

এই সমস্ত কথা বলার পর কা'কা' ইব্ন আমর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেন, হে মান্যবর ব্যক্তিবৃন্দ ! এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সংস্কারকর্ম হচ্ছে বিষয়টির আপোস রফা করা যাতে মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। আপনারা হচ্ছেন, শান্তিদূত হিদায়াতের বাহক। আপনারা আল্লাহর দিকে চেয়ে আমাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। অন্যথায় আপনারাও বিপদে পতিত হবেন এবং এতে উম্মতে মুহাম্মাদীও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কা'কা'র এই কথায় উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা), তালহা ও যুবায়র (রা) অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। তাঁরা বলেন, আপনার বক্তব্য অনুযায়ী যদি আলীর চিন্তাধারা এই হয় এবং তিনি যদি প্রকৃতই উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণের ইচ্ছা রাখেন তাহলে তো যুদ্ধ ও বিরোধের কোন কারণই বাকী থাকে না। আমরা তো এতদিন যাবত মনে করে আসছিলাম, উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি রয়েছে। তাই উসমানের হত্যাকারীরা তাঁর বাহিনীতে রয়েছে এবং তাঁর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই হস্তক্ষেপ করছে। কা'কা' বলেন,

আমি যা কিছু বলেছি আলী (রা)-ও তাই চিন্তা করছেন। তাঁরা বলেন, তাহলে তো তাঁর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। এই কথোপকথনের পর কা'কা' (রা) বসরা থেকে বিদায় নিয়ে আলী (রা)-এর বাহিনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বসরার একদল প্রভাবশালী ব্যক্তিও তাঁর সফর সঙ্গী হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলী এবং কূফাবাসীরা কি চিন্তা করছেন এবং তারা প্রকৃতই আপোস মীমাংসায় রাযী কিনা সে সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞাত হওয়া। কেননা এই মর্মে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত আলীর সংকল্প হচ্ছে, বসরা জয় করে সেখানকার যুবকদের হত্যা করা এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদের দাসদাসীতে পরিণত করা। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার লোকেরা যারা হযরত আলীর বাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল তারাই বসরায় এই গুজব রটনা করেছেন। কা'কা' ইব্ন আমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর দরবারে হাযির হয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন এবং তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এরপর বসরার প্রতিনিধিদল, যারা কা'কা'র সাথে এসেছিলেন কূফাবাসীদের সাথে, যারা আলী (রা)-এর বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, অবাধে মিলিত হয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা সকলেই আপোস-নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দেন। এরপর হযরত আলী (রা)-ও ঐ প্রতিনিধিদলকে নিজের কাছে ডেকে তাদেরকে সর্বতোভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ফলে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে সেখান থেকে বসরায় ফিরে যায় এবং আপোস-নিষ্পত্তির প্রস্তাব যে সঠিক সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত করে।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র

আপোসরফার এই পটভূমি সৃষ্টি হওয়ার পর আলী (রা) সমগ্র বাহিনীকে একত্রিত করে বলিষ্ঠ ভাষায় একটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর তিনি নির্দেশ দেন, আগামীকাল আমরা বসরার দিকে যাত্রা করব। কিন্তু আমাদের এই যাত্রা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু আপোসরফা ও যুদ্ধের আগুন নির্বাপনের উদ্দেশ্যে। সাথে সাথে তিনি এ নির্দেশ দেন, যে সমস্ত লোক উসমানকে ঘেরাও করেছিল বা ঐ কাজে শরীক ছিল তারা যেন আমাদের সাথে যাত্রা না করে বরং তারা যেন আমার বাহিনীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আলী (রা)-এর এই বক্তৃতা এবং নির্দেশ শুনে মিসরবাসীরা এবং তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

আলী (রা)-এর বাহিনীতে ঐ ধরনের লোকের সংখ্যা মোটামুটি আড়াই হাজারের মত ছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ও সুচতুর লোকও ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি বিশেষ বৈঠকে আহবান করে। ঐ বৈঠকে ইব্ন মুলজিম, আশতার এবং আশতারের বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধব যেমন, উলিয়া ইব্ন হায়সাম, সালিম ইব্ন সা'লাবা, শুরায়হ্ ইব্ন আদানা প্রমুখ বিদ্রোহী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা বলাবলি করতে থাকে, তালহা ও যুবায়র এখনো কিসাস গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ। সম্প্রতি আমীরুল মু'মিনীনও তাঁদেরই অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। আজ আমাদেরকে তাঁর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তাঁদের মধ্যে একটা আপোসরফা হয়ে যায় তাহলে তাঁরা একজোট হয়ে কিসাস গ্রহণ করবে এবং আমাদের সকলকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আশতার বলে, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তালহাই হোক বা যুবায়রই হোক অথবা আলী আমাদের সম্পর্কে তাঁরা সকলেই একমত। এখন যদি তাঁরা একটা আপোস-মীমাংসায় পৌঁছে যায় তাহলে

নিশ্চিতভাবে আমাদের হত্যা করবে। অতএব আমাদের উচিত তালহা, যুবায়র, আলী-এই তিনজনকেই উসমান (রা)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া (হত্যা করা)। এরপর আপনা আপনি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ঐ বৈঠকের সভাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা বলল, তোমাদের সংখ্যা অনেক কম। আলীর বাহিনীতে এই মুহূর্তে বিশ হাজার সৈন্য রয়েছে। অনুরূপভাবে বসরায় তালহা ও যুবায়রের সাথে কমপক্ষে ত্রিশ হাজার সৈন্য রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা খুবই কঠিন। সালিম ইব্ন সা'লাবা বলল, একটা আপোস-মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত আমাদের উচিত দূরে কোথাও চলে যাওয়া। শুরায়হ বলে এই অভিমত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে থাকে। ফলে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবাকে বলে, আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন; হয়ত এর উপরই আমরা একমত হতে পারব। আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা বললো, ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলেরই মঙ্গল এর মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, আমরা হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে মিশে থাকব এবং কখনো তা থেকে বিচ্ছিন্ন হব না। যদি তিনি একান্তই আমাদের তাঁর বাহিনী থেকে বের করে দেন তাহলেও আমরা তাঁর আশেপাশে অবস্থান করব, দূরে কোথায় চলে যাব না। উপরন্তু তাঁকে বলব, আমরা আপনার আশেপাশে থাকতে চাই এজন্য যে, যদি আপনি কোন আপোস-মীমাংসায় পৌঁছতে না পারেন এবং যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে যথাসময়ে আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আপনাকে সাহায্য করতে পারব। হযরত আলীর বাহিনীর সাথে অথবা তাদের সন্নিকটে থেকে আমাদেরকে এই চেষ্টা করতে হবে যে, যখন উভয় বাহিনী একে অন্যের নিকটবর্তী হবে তখন কোন না-কোন ভাবে যেন যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং কোনরূপ আপোস-মীমাংসা হতে না পারে। আর এটা কঠিন কাজ নয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন আমাদের আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।

উষ্ট্রের যুদ্ধ

ভোর বেলা হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীদের যে বাহিনী মদীনা থেকে হযরত আলীর সফরসঙ্গী হয়েছিল তাদের একটি অংশ তাঁর বাহিনীর সাথেই মিশে থাকে। পথিমধ্যে বকর ইব্ন ওয়ায়েল, আবদুল কায়স প্রভৃতি গোত্রের লোকেরাও আলীর বাহিনীতে যোগ দেয়। বসরার সন্নিকটে পৌঁছার পর আলী (রা) 'আসরে উবায়দুল্লাহ্'র মাঠে তাঁর তাঁবু খাটান। অপর দিকে হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা) তাঁদের বাহিনীসহ একই মাঠে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিন দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী একদম চুপচাপ পরস্পর মুখামুখি হয়ে অবস্থান করে। ঐ সময়ে যুবায়র (রা)-এর কোন কোন সঙ্গী বলে, আমাদের যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া উচিত। যুবায়র বলেন, কা'কা' ইব্ন আমরের মাধ্যমে আপোস-মীমাংসার আলাপ-আলোচনা চলছে। আমাদের উচিত, এর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা। আপোস-মীমাংসার কথাবার্তা চলাকালে বিপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা কোনভাবেই বৈধ নয়। আলী (রা)-এর কাছে তাঁর বাহিনীর কোন কোন লোক যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার দাবী জানায়। কিন্তু তিনিও একই কথা বলেন। একদা জনৈক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বসরার দিকে এসেছেন কেন। তিনি বলেন, বিশৃঙ্খলা দমন ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য। সে বলে, বসরাবাসীরা যদি আপনার কথা না মানে এবং আপনার বিপক্ষ দলও

আপনার সাথে আপোস-মীমাংসায় না আসে তাহলে আপনি কি করবেন ? আলী (রা) বলেন, আমি তাদের প্রতিরোধ করব। ইতিমধ্যে একটি লোক বলে উঠে, তালহা, যুবায়র প্রমুখ বলে থাকেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বের হয়েছি। আপনার মতে কি তাঁদের কাছে উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কোন প্রমাণ আছে ? সে আরো বলে, আপনার কাছেও কি এমন প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনি উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিলম্ব করছেন ? আলী (রা) উত্তরে বলেন, যখন কোন বিষয় সন্দেহজনক হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন তাড়াহুড়া না করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। এরপর ঐ লোকটি জিজ্ঞেস করল, যদি আগামীকাল উভয় পক্ষ মুখামুখি হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ বেঁধে যায় তখন আমাদের এবং ওদের কি পরিণাম হবে। আলী (রা) বলেন, আমাদের এবং ওদের অর্থাৎ উভয় পক্ষের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে যাবে।

এরপর আলী (রা) হাকাম ইব্‌ন সালাম এবং মালিক ইব্‌ন হাবীবের মাধ্যমে হযরত তালহা ও যুবায়রের কাছে এই মর্মে একটি অনুরোধবার্তা পাঠান : আপনারা যদি আপনাদের সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, যে সম্পর্কে কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) আমাকে অবহিত করেছেন তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথা পাকাপাকি না হয়– আপনারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকুন। উত্তরে তালহা এবং যুবায়র (রা) বলেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছি। এরপর হযরত যুবায়র এবং হযরত তালহা (রা) তাঁদের বাহিনীর সম্মুখ সারি থেকে আগে বেড়ে দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে আসেন। তাঁদেরকে এই অবস্থায় দেখে হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনী থেকে বের হয়ে তাঁদের এতটুকু নিকটবর্তী হয়ে যান যে, তাঁদের একজনের ঘোড়ার মুখ অন্য জনের ঘোড়ার মুখ স্পর্শ করে। আলী (রা) প্রথমে তালহাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত এই বাহিনী সংগ্রহ করেছ এবং আমার সাথে মুকাবিলা করতে এসেছ। তুমি আল্লাহর কাছে কি এর কোন ওযর পেশ করতে পারবে এবং তোমার এই কাজকে বৈধ প্রমাণিত করতে পারবে ? আমি কি তোমার দীনী ভাই নই ? তোমার উপর কি আমার এবং আমার উপর কি তোমার রক্ত (অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করা) হারাম নয়? তালহা (রা) উত্তরে বলেন, তুমি কি উসমান হত্যার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র কর নি? আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবই দেখেন এবং সবই জানেন এবং তিনি উসমান হত্যাকারীদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন। হে তাল্‌হা! তুমি কি আমার হাতে বায়'আত করনি ? তালহা উত্তরে বলেন, হাঁ, আমি বায়'আত করেছি, তবে ঐ সময়ে আমার মাথার উপর তরবারি ঝুলছিল। অর্থাৎ আমি বাধ্য হয়ে বায়'আত করেছি এবং তাও এই শর্তে যে, উসমান হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেওয়া হবে।

এরপর আলী (রা) যুবায়রকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার কি ঐ দিনের কথা মনে পড়েছে, যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে বলেছিলেন, তুমি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বে এবং এটা হবে তার উপর তোমার অত্যাচার। একথা শুনে যুবায়র বলেন, হাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু মদীনা থেকে আমার রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আপনি তো একথা আমাকে বলেননি। অন্যথায় আমি মদীনা থেকে বেরই হতাম না। এখন আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করব না। এই কথোপকথনের পর তাঁরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যান। হযরত যুবায়র তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বলেন, আজ আলী (রা) আমাকে এমন

একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যার কারণে আমি কোন অবস্থায়ই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি না। এখন আমার ইচ্ছা সকলকে ত্যাগ করে আমি মদীনায় ফিরে যাব। উম্মুল মু'মিনীনও প্রথম থেকেই অনুরূপ সংকল্প পোষণ করছিলেন। কেননা স্বপ্নরূপে উপনীত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর মনে পড়েছিল। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন যুবায়রের কথা, কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর পিতা যুবায়র (রা)-কে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, আপনি দুই পক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে দাঁড় করিয়েছেন, একের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন এবং এখন আবার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের উদ্যোগ নিচ্ছেন। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আলী (রা)-এর বাহিনী দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং আপনার মধ্যে কাপুরুষতা দেখা দিয়েছে। একথা শুনে যুবায়র সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে একাকি হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর দিকে চলে যান এবং তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে এদিক ঘোরাফেরা করে পুনরায় ফিরে আসেন। আলী (রা) তাঁকে আসতে দেখে প্রথমেই নিজের লোকদের বলে রেখেছিলেন, সাবধান ! কেউ যেন তাঁকে কোনরূপ বাধা না দেয় এবং তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। ফলে কেউই তাঁর সাথে কোন অশিষ্ট আচরণ করেনি।

যুবায়র (রা) ফিরে গিয়ে তাঁর ছেলেকে বলেন, আমি যদি প্রকৃতই ভয় পেতাম তাহলে আলী (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়তাম না। আসল কথা হল, আমি আলী (রা)-এর সামনে কসম করে বলেছি যে, আমি তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়াব না এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র বলেন, আপনি আপনার কসমের কাফ্ফারাস্বরূপ একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দিন। যুবায়র (রা) তখন বলেন, আমি আলী (রা)-এর বাহিনীতে আম্মার (রা)-কে দেখেছি এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আম্মারকে একদল বিদ্রোহী হত্যা করবে। মোটকথা, যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ধারণা উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ তাদের অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে আসেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন তালহা (রা) তালহা ও যুবায়র (রা)-এর পক্ষ থেকে আলী (রা)-এর কাছে আসেন। পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় আপোস-মীমাংসার শর্তাবলী নির্ধারণ ও চূড়ান্ত করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরদিন ভোর বেলায় আপোস চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং উভয় পক্ষই তাতে স্বাক্ষর করবে। উভয় বাহিনী তিন দিন পর্যন্ত মুখোমুখি অবস্থায়ই ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার দল এবং অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী, যারা আলী (রা)-এর ধারে কাছেই অবস্থান করছিল, এই তিন দিনের মধ্যে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের কোন সুযোগই পায় নি। এবার যখন তারা জানতে পারল যে, ভোর বেলায়ই আপোস চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে তখন তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং রাতভর বিভিন্ন সলা-পরামর্শ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অতি প্রত্যূষে তারা তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা করে বসে। প্রতিপক্ষ বাহিনীর যে অংশের উপর হামলা করা হয়েছিল তারা তা প্রতিরোধের জন্য নিজ নিজ অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। আর যখন একাংশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন উভয় পক্ষের সকল সৈন্যই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যুদ্ধের এই হৈ চৈ শুনে তালহা ও যুবায়র (রা) নিজ নিজ তাঁবু থেকে বের হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, আলী (রা)-এর সৈন্যরা অকস্মাৎ তাদের বাহিনীর উপর

হামলা করে বসেছে। তখন তাঁরা আক্ষেপ করে বলেন, হায় ! আলী (রা) দেখছি রক্তপাত ছাড়া ক্ষান্ত হবেন না। অপর দিকে আলী (রা) তাঁর তাঁবু থেকে বের হয়ে হৈ চৈ-এর কারণ জিজ্ঞেস করলো, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে পূর্ব থেকে তাঁর তাঁবুর পাশে দণ্ডায়মান কয়েক ব্যক্তি প্রায় সমস্বরে বলে উঠে, তালহা ও যুবায়র (রা) অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আকস্মিকভাবে আমাদের উপর হামলা করে বসেছেন এবং বাধ্য হয়ে তাঁদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের লোকেরা তাঁদের উপর প্রতি-হামলা করেছে। আলী (রা) আক্ষেপ করে বলেন, হায় ! তালহা ও যুবায়র দেখছি রক্তপাত ছাড়া ক্ষান্ত হবে না। তারপর তিনি তাঁর বাহিনীকে শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। দুই পক্ষের সেনাপতিরা একে অপরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং আসল ব্যাপার উভয়ের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যায়। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর উভয় বাহিনীর অধিনায়করা নিজ নিজ বাহিনীর উদ্দেশ্যে একই ধরনের নির্দেশ জারি করেন। তা হলো, যদি কেউ এই যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে তবে যেন তার পশ্চাদ্ধাবন না করা হয়। কোন আহত ব্যক্তিকে যেন আক্রমণ না করা হয় এবং কারো ধন-সম্পদ যেন লুটপাট না করা হয়। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, তালহা, যুবায়র ও আলী (রা) কারো অন্তরেই পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা ছিল না বরং উভয় পক্ষের কাছেই এই যুদ্ধ ছিল নেহাৎ অবাঞ্ছিত ও অকল্পনীয় এবং তাঁরা একান্ত বাধ্য হয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার দল এবং মিসর ও অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্রোহীরা খুব স্ফূর্তির সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ নিজ বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকে। তারা সব সময়ই হযরত আলীর আশেপাশে থেকে বিশেষ করে তাঁকেই যেন তাদের বাহাদুরী দেখিয়ে চলে। কা'ব ইবন মিসওয়ার হযরত উম্মুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে নিবেদন করে : যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একটাই সমীচীন যে, আপনি উটে আরোহণ করুন এবং সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ান। সম্ভাবনা রয়েছে যে, আপনার জন্তুযান দেখে লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং পরস্পর আপোস-মীমাংসার একটা পন্থা বের হয়ে আসবে। কথাটি হযরত উম্মুল মু'মিনীনের পসন্দ হয় এবং তিনি উটে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হন। সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে লোকেরা তার শিবিকার উপর বর্ম ছড়িয়ে দেয় এবং উটটিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে দাঁড় করায় যেখান থেকে যুদ্ধের দৃশ্য পরিষ্কার নজরে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর সওয়ারী দেখে যুদ্ধের আগুন প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে যেন আরো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে।

তার পক্ষের যোদ্ধারা ভাবল, উম্মুল মু'মিনীন সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং আমাদেরকে আরও বেশী বীরত্বের সাথে লড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। অপর দিকে হযরত আলী (রা) প্রতিপক্ষের এই অবাঞ্ছিত নির্মমতা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা এবং আপন বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা জরুরী মনে করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই তালহা (রা)-এর পায়ে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় এবং তার সমস্ত মোজা রক্তে ভরে যায়। তীরের আঘাত ছিল মারাত্মক। তাই কোনমতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। কা' কা' ইবন আমর (রা), যিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে লড়ছিলেন, তালহার ঐ অবস্থা দেখে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, হে আবূ মুহাম্মদ! আপনার যখম (ক্ষত) খুবই মারাত্মক। অতএব আপনি অবিলম্বে বসরায় ফিরে যান। তালহা (রা) বসরার দিকে রওয়ানা

হলেন কিন্তু বসরায় প্রবেশ করার সাথে সাথে ক্ষতস্থানের ব্যথায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনতিকাল করেন। তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। মারওয়ান ইবনুল হাকাম ঐ যুদ্ধে হযরত তালহা এবং যুবায়রের বাহিনীতে যোগ দেন। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তালহা (রা) সংকল্প নেন, তিনি কখনো আলী (রা)-এর মুকাবিলা করবেন না। তাই তিনিও বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যান এবং কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আলী (রা)-এর মধ্যকার কথোপকথন এবং আম্মার (রা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটি পুনরায় ভেবে দেখেন এবং সেই প্রেক্ষিতে এই যুদ্ধ থেকে একদম আলাদা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক এই অবস্থায় যখন মারওয়ান তাঁকে দেখল এবং পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছেন তখন তিনি আপন ভৃত্যকে অর্থপূর্ণ একটি ইঙ্গিত করে এবং সে সাথে সাথে তার (মারওয়ানের) মুখের উপর এমনভাবে একটি চাঁদর লেপটে দেয় যে, তাকে তখন আর চেনাই যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় মারওয়ান তার ধনুকে একটি বিষমাখা তীর লাগিয়ে তালহা (রা)-কে লক্ষ্য করে তা ছুড়ে মারে। তীরটি তাঁর পা ভেদ করে তাঁর ঘোড়ার পেটে গিয়ে আঘাত হানে। ফলে ঘোড়াটি তালহা (রা)-কে নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। হযরত তালহা (রা) উঠে আলী (রা)-এর এক গোলামকে (যে-ঘটনাক্রমে তাঁর সামনে এসে পড়েছিল), ডেকে আলীর প্রতিনিধি হিসাবে তার হাতে অথবা হযরত কা' কা' (রা)-এর হাতে (যিনি ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পড়েছিলেন) নতুনভাবে বায়'আত হন। এরপর তিনি বসরা ফিরে যান এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। হযরত আলী (রা) তা জানতে পেরে তালহা (রা)-এর জন্য দু'আ করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন।

হযরত যুবায়র (রা)-এর আপোসকামিতা

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) যিনি প্রথম থেকেই মনস্থ করে ফেলেছিলেন যে, তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক হয়ে যান। ঘটনাক্রমে হযরত আম্মার (রা) তাঁকে দেখে ফেলেন এবং অগ্রসর হয়ে তাঁকে যুদ্ধের আহ্বান জানান। যুবায়র (রা) বলেন, আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। কিন্তু যেহেতু আম্মার (রা) যুবায়র (রা)-কে যুদ্ধের আহবায়ক মনে করে তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই তাঁকে আক্রমণ করে বসেন। যুবায়র (রা) আম্মারের প্রতিটি আঘাত প্রতিঘাত করে নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন, কিন্তু প্রতি আঘাত করেননি। শেষ পর্যন্ত আম্মার (রা) ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে যুবায়র (রা) সেখান থেকে সরে পড়েন। বসরাবাসীদের মধ্যে আহনাফ ইবন কায়স আপন গোত্রের একটি দল নিয়ে নিরপেক্ষভাবে উভয় বাহিনী থেকে কিছুটা দূরত্বে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন। তারা প্রথম থেকেই উভয় পক্ষের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা উভয় বাহিনীর কোন পক্ষে যোগ দেবেন না বা কারো বিরোধিতাও করবেন না। যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। তিনি আহনাফ ইবন কায়সের সেনাছাউনির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ বাহিনীর আমর ইবনুল জারমূয নামীয় জনৈক ব্যক্তি যুবায়র (রা)-কে অনুসরণ করতে থাকে। সে তাঁর কাছে একটি মাসআলা সম্পর্কে জানতে চায়। মূলত সে একটি অসৎ উদ্দেশ্যে যুবায়র (রা)-এর পিছু নিয়েছিল। 'ওয়াদী সাবায়' পৌঁছার পর নামাযের সময় হলে যুবায়র (রা) নামাযে দাঁড়িয়ে যান। তিনি সিজদায়

গেলে আমর তাঁর উপর আকস্মিক হামলা চালায়। এরপর সে সেখান থেকে সোজা আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে হাযির হয়। প্রথমে জনৈক ব্যক্তি আলী (রা)-কে বলে, যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর হত্যাকারী আপনার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায়। তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ তাকে অনুমতি প্রদান কর, তবে এই সাথে তাকে জাহান্নামের সুসংবাদও দাও। সে আলী (রা)-এর সামনে এলে তিনি তার হাতে যুবায়র (রা)-এর তরবারি দেখতে পান। এতে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে জালিম! এটা হচ্ছে তরবারি যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর হিফাযতে নিয়োজিত ছিল। আমর ইবনুল জারমূযের উপর এই কথা এমন প্রতিক্রিয়া হয় যে, সে আলী (রা)-এর সামনেই তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি অশিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে। অতঃপর নিজেই নিজের পেটের মধ্যে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে যাত্রা করে।

হযরত তালহা (রা)-ও সরে পড়লেন

যুদ্ধের প্রারম্ভেই তালহা ও যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন গোত্রের অধিনায়ক ও ছোট খাটো নেতারা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে হযরত আয়িশা (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ং হযরত আয়িশা (রা) চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, যাতে কোনও উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং আপোসরফারও একটা পথ বেরিয়ে আসে। অতএব এই পক্ষের তথা আহলে জামালের পক্ষের সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার জন্য সত্যিকার অর্থে কোন অধিনায়কই নিয়োজিত ছিল না। তাছাড়া সাধারণ যোদ্ধারাও জানত না, তারা যে যুদ্ধ করছে তা আসলে হযরত উম্মুল মু'মিনীনের মনঃপূত কিনা। হযরত উম্মুল মু'মিনীন এবং তাঁর সমগ্র বাহিনী হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এই ধারণা করে বসেন যে, তিনি আপোস-মীমাংসার কথাবার্তা বলে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে তাদের উপর আকস্মিক হামলা করে বসেছেন। এমতাবস্থায় তাঁরা তো তাদের বাহিনীকে আক্রমণ বা প্রতিরোধ থেকে রুখে রাখতে পারেন না। অপর দিকে বসরাবাসীরা একথা বিশ্বাস করতে লাগলো যে, হযরত আলী (রা) বসরাবাসীদেরকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করার যে গুজব রটেছিল তা আসলে গুজব নয়, সত্য। মোটকথা উভয় পক্ষের দশ হাজারেরও অধিক মুসলমান নিহত হল, অথচ শেষ পর্যন্ত কেউই জানতে পারল না যে, কি করে এই যুদ্ধ সংঘটিত হল। প্রত্যেক পক্ষ তার বিরুদ্ধ পক্ষকে জালিম ও দোষী সাব্যস্ত করতে থাকলো। যেহেতু স্বয়ং আলী (রা) নিজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাই তাঁর পক্ষ থেকে বিপক্ষ দলের উপর এমন ভয়ানক হামলা চালানো হয় যে, পিছু হটা ছাড়া তাদের সামনে কোন পথই খোলা ছিল না। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়িশা (রা)-এর উট হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর আওতার মধ্যে চলে আসে। উটের নাকদড়ি ছিল কা'বের হাতে। তিনিই আয়িশা (রা)-কে পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিলেন যাতে যুদ্ধের পরিবর্তে আপোসরফার একটা পথ বেরিয়ে আসে। যখন হযরত উম্মুল মু'মিনীন দেখলেন যে, হামলারত যোদ্ধারা কোন মতেই থামছে না এবং তাঁর উট রক্ষায় নিয়োজিত যেসব বসরাবাসী পিছপা হয়ে গিয়েছিল তারাও নব উদ্যমে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত জোরেসোরে তরবারি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন তিনি কা'বকে নির্দেশ দিলেন, তুমি উটের নাকদড়ি ছেড়ে দিয়ে এবং কুরআন মজীদ উচিয়ে ধরে সামনের দিকে

অগ্রসর হও এবং লোকদের কুরআন মজীদের ফায়সালার দিকে আহ্বান কর। তুমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর : আমরা কুরআনের ফায়সালা মানি, তোমরাও কুরআনের ফায়সালা মানো। কা'ব (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঐ ঘোষণা দেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার লোকেরা একসাথে তার উপর অসংখ্য তীর বর্ষণ করে এবং তিনি সাথে সাথে শহীদ হয়ে যান। এতে বসরাবাসীরা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত আয়িশা (রা)-এর উটের আশেপাশে লাশের স্তূপ জমে যায়। বসরাবাসীরা অনবরত নিহত হচ্ছিল, কিন্তু তারা বিপক্ষ দলের কোন যোদ্ধাকে আয়িশা (রা)-এর ধারে কাছে ঘেষতে দিচ্ছিলো না। আলী (রা) এই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই উট যুদ্ধক্ষেত্রে দৃশ্যমান থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হবে না। আয়িশা (রা)-এর উট আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। চতুর্দিক থেকে তাঁর শিবিকার উপর তীর বর্ষিত হচ্ছিল এবং তিনি উসমান হত্যাকারীদের জন্য বদদু'আ করছিলেন।

আলী (রা) তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেন : যেভাবে পার এই উটকে আঘাত কর। উট ভূমিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিদ্রোহীদের নেতা আশতার আলী (রা)-এর পক্ষ নিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। এভাবে অন্যান্য বিদ্রোহীও প্রশংসনীয়ভাবে লড়ে যাচ্ছিল। হযরত আলীর পক্ষ থেকে একের পর এক অত্যন্ত জোরদার হামলা চালানো হলেও আহলে জামালের পক্ষ থেকে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে সব কয়টি হামলাই প্রতিহত করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) ও মারওয়ান ইবন হাকাম হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হন। আবদুর রহমান ইবন আত্তাব, জানদুব ইবন যুহায়র, আবদুল্লাহ্ ইবন হাকীম প্রমুখ হযরত আয়িশার উট রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়িশা (রা)-এর পক্ষীয়রা এমন ভয়ানক হামলা করে যে, উটের সম্মুখভাগ বহুদূর পর্যন্ত একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। আলী (রা) তাঁর বাহিনীকে পিছপা হতে দেখে পুনরায় জোরদার আক্রমণ চালান এবং সামনে এগিয়ে যান। উটের সম্মুখবর্তী যোদ্ধারা বেশ কয়েকবার আগে বেড়ে পুনরায় পিছনে হটে যায়। শেষ পর্যন্ত জনৈক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে তরবারি দ্বারা উটের পায়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে উটটি চীৎকার দিয়ে বসে পড়ে।

ঐ সময় কা'কা' ইবন আমর (রা) উটের একেবারে নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। উটটি ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে আয়িশা (রা)-এর বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে আলী (রা)-এর বাহিনী উটটি ঘিরে ফেলে। আলী (রা) মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-কে, যিনি তাঁর সাথেই ছিলেন–নির্দেশ দেন, তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমার বোনের হিফাযত কর, কেউ যেন তাঁকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। কা'কা' ইবন আমর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) শিবিকার রশি কেটে তা একটি পৃথক জায়গায় নিয়ে রাখেন এবং পর্দার উদ্দেশ্যে তার উপর চাঁদর জড়িয়ে দেন। স্বয়ং আলী (রা)-ও সেখানে যান এবং শিবিকার নিকটবর্তী হয়ে আয়িশা (রা)-কে সালাম জানিয়ে বলেন, 'মা! আপনি কুশলে আছেন তো ? আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতিটি ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমারও প্রতিটি ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। এরপর আলী (রা)-এর বাহিনীর অধিনায়করা একের পর এক হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সালাম করার জন্য হাযির হন। তখন কা'কা'কে হযরত আয়িশা (রা) বলেন হায়! এই ঘটনার বিশ বছর পূর্বে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! কা'কা' (রা) একথা

হযরত আলী (রা)-এর কাছে বললে তিনিও বলে উঠেন, হায়, আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি আমারও মৃত্যু হয়ে যেত।

এই যুদ্ধ 'জামাল যুদ্ধ' নামে খ্যাত। কারণ হযরত আয়িশা (রা) যে জামালে (উটে) আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন সেটাই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এই যুদ্ধে হযরত আয়িশা (রা)-এর পক্ষে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যার মধ্যে নয় হাজারই নিহত হয়। আর আলী (রা)-এর পক্ষে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল বিশ হাজার, যার মধ্যে এক হাজার সত্তরজন নিহত হয়। আলী (রা) সকল নিহতের জানাযা পড়েন এবং সকলকে কবরস্থও করেন। সেনাছাউনি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব মাল পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা হয় : যে ব্যক্তি এসে কোন মাল নিজের বলে শনাক্ত করবে সে অবাধে তা নিয়ে যেতে পারবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর বসরায় নিয়ে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালাফ খুযাঈর ঘরে সাফিয়্যা বিনতুল হারিছ ইবন আবূ তালহার কাছে রাখেন। পরদিন হযরত আলী (রা) বসরায় প্রবেশ করেন। সমগ্র বসরাবাসী তাঁর হাতে বায়'আত করে। এরপর আলী (রা) হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খিদমতে গিয়ে হাযির হন। যেহেতু আবদুল্লাহ্ ইবন খালাফ এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তাই তার মা আলী (রা)-কে দেখে অনেক কটু কথা বলেন। কিন্তু আলী (রা) তার কোন প্রতিবাদ করেন নি। তার কোন কোন সঙ্গীর কাছে বিষয়টি অস্বস্তিকর মনে হলেও আলী (রা) তাদের বলেন, যেহেতু মহিলারা প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল হয়ে থাকে, তাই আমরা গোটা মহিলা সমাজকেই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি। আর এরা তো হচ্ছে মুসলিম মহিলা। অতএব এদের প্রত্যেকটি কথাই সহ্য করে নেওয়া উচিত। আলী (রা) হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কোন কষ্ট হয় নি তো ? তারপর সব বিষয়েরই একটা মিটমাট হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনা কালে হযরত আলী (রা) যেমন নিজের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করেন, তেমনি ওযর পেশ করেন হযরত আয়িশা (রা)-ও। আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বসরার হাকিম (গভর্নর) নিয়োগ করেন। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। সফরের যাবতীয় আসবাব-সামগ্রী সংগ্রহ করে হিজরী ৩৬ সনের ১লা রজব তারিখে হযরত আলী (রা) বসরার চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় মহিলা সমভিব্যাহারে হযরত আয়িশা (রা)-কে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে বসরা থেকে বিদায় দেন। তিনি কয়েক ক্রোশ-পর্যন্ত হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে তাঁর সঙ্গে পাঠান। উম্মুল মু'মিনীন প্রথমে মক্কায় যান। যিলহাজ্জ পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেন এবং হজ্জ আদায় করার পর হিজরী ২৭ সনের মুহাম্মদ মাসে মদীনায় ফিরে আসেন।

জামাল যুদ্ধে উমাইয়া বংশের অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা সবাই আয়িশা (রা)-এর পক্ষেই যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধের পর মারওয়ান, উতবা ইব্ন আবূ সূফিয়ান, মারওয়ানের ভাই আবদুর রহমান ও ইয়াহইয়া প্রমুখ বনূ উমাইয়ার সব লোক বসরা থেকে সিরিয়া চলে যায় এবং দামিশকে গিয়ে হযরত আমীরে মুআবিয়ার সাথে মিলিত হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনুল যুবায়র (রা) যিনি জামাল যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, বসরায় আযদ গোত্রের এক ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা (রা) আপন ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠান এবং নিজের সাথে মক্কায় নিয়ে আসেন।

সাবাঈ দলের আর একটি দুষ্কর্ম

হযরত আয়িশা (রা)-কে বসরা অভিমুখে রওয়ানা করার পর হযরত আলী (রা) বসরার বায়তুলমাল খুলেন এবং তাতে যে নগদ অর্থ ছিল তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন, যারা জামাল যুদ্ধে তাঁর পতাকাতলে লড়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে পাঁচশ দিরহাম করে পড়ে। এই অর্থ বন্টন করার পর তিনি বলেন, যদি তোমরা সিরিয়া আক্রমণ করে জয়যুক্ত হতে পার তাহলে নির্দিষ্ট ভাতা ছাড়াও এই পরিমাণ অর্থ তোমাদের দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার দল, যাদেরকে 'ফিরকা-ই সাবাইয়া' নামে অভিহিত করা হয় জামাল যুদ্ধ শেষ হতেই হযরত আলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অশিষ্ট কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তাদের এই অশিষ্ট কথাবার্তা, দোষারোপ ও তিরস্কার-ভর্ৎসনার আসল কারণ হল হযরত আলী বিপক্ষ দলের মাল-আসবাব লুণ্ঠন করতে তাদেরকে কড়া ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারা এখন পর্যন্ত কটুক্তি করে আসছিল, কিন্তু যখন তিনি প্রত্যেক যোদ্ধাকে পাঁচ দিরহাম করে দেন তখন এর উপরও তারা নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপন করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাদের এই বিরোধিতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি তাদেরকে যতই সদুপদেশ দিতেন, যতই বোঝাতেন ততই তাদের বক্রতা ও অসদাচরণ বৃদ্ধি পেত। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গড়ায় যে, একদিন তারা সবাই বসরা ছেড়ে চলে যায়। আলী (রা)-এর আশংকা হলো, এরা দেশের কোথাও না কোথাও গিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাই তিনি ওদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বসরা থেকে একটি সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন। কিন্তু তাদের নাগাল পাওয়া যায় নি। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা নিজেকে এমনভাবে যাহির করত যেন সে আলী (রা)-এর একজন অন্ধ ভক্ত এবং তাঁর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ। আলী (রা)-এর ভালোবাসার অন্তরালেই সে হযরত উসমান (রা)-কে হত্যার যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছিল। নিজেকে আলী প্রেমিক ঘোষণা করে সে জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করত। কিন্তু জামাল যুদ্ধ ও বসরা বিজিত হওয়ার পর ঐ সাবাঈ দল বুঝতে পারল যে, এবার হযরত আলীর বিরোধিতা করলেই ইসলামের অধিকতর ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হবে। তাই তারা অত্যন্ত জোরেসোরে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করতে লাগল। এ দলটি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের নামধারী ইয়াহূদী ও ইসলাম-দুশমনদের একটি দল ছিল যা পরবর্তীকালে 'খারিজী সম্প্রদায়' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর শাহাদত লাভের পর থেকে ইসলামে শত্রুদের নতুন ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন এবং গোপন সমিতি গঠনের যে ধারার সূচনা হয় তা আজো বিশ্বের সর্বত্র অব্যাহত রয়েছে। এমন একটি যুগও পাওয়া যাবে না যখন ইসলামের এই শত্রুরা কোন না কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না। কখনো তারা আবূ লূ' লূ' ও তার প্ররোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনো দেখা দিয়েছে আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা এবং সাবায়ী ফিরকারূপে, আবার কখনো চিহ্নিত হয়েছে খারিজী ফিরকা নামে। কখনো তারা বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে আব্বাসী ও আরবীদের হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে, কখনো আব্বাসীদের উপর আরবীদের তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, কখনো তারা উৎসর্গিতপ্রাণ ইসমাঈলীয়া নাম ধারণা করেছে, কখনো ফ্রিম্যাসনের রূপ ধারণ করেছে, আবার কখনো তাদের এই গোপন সোসাইটি নৈরাজ্যবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনো তারা কূটনীতির পোশাক পরেছে, আবার কখনো রাজা-বাদশাহদের পররাষ্ট্র দফতরের

অফিসসমূহে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষ দিনগুলো বাদে আর সব সময়েই এই গোপন ষড়যন্ত্রকারী দলের অস্তিত্ব ছিল। এরা কখনো বাবিলে (ব্যাবিলনে) হারূত-মারূত এবং হযরত হিযকীল ও দানিয়ালের তদবীরসমূহ সফল করার কাজে নিয়োজিত ছিল, আবার কখনো নিয়োজিত ছিল হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ মহাযান বংশের বিরাট সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ চানক্যের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তকে বিজয়ী করে তোলার কাজে। কখনো এই দল রুস্তমকে হত্যা করে কায়ানীদের বিখ্যাত রাজবংশের ধ্বংস ডেকে এনেছে। কখনো এরা শুধু বৌদ্ধ ধর্মকে নয় বরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাম্রাজ্য এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেও হিন্দুস্তান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, আবার কখনো জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি মিটিয়ে দিয়েছে, মোটকথা, বিশ্বে শুধু বিশ পঁচিশটি বছরের একটি যুগ এমনভাবে কেটেছে, যখন গোপন ষড়যন্ত্রকারী এই দলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর থাকলেও তা অজ্ঞাত ছিল। আর এই যুগটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর ফারূক (রা)-এর যুগ। এই যুগের পূর্বে এবং পরেও বিশ্বে সব সময়ই এই ষড়যন্ত্রকারীদের অস্তিত্ব ছিল। অতএব এই ইতিহাসের পাঠক এবং খিলাফতে রাশিদার ইতিহাসের শেষাংশের পাঠককে গোপন ষড়যন্ত্রকারী এই ইসলাম-শত্রুদের উৎসুক দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।

সাবাঈ ফিরকা, যারা প্রকাশ্য বিরোধিতা করে বসরা থেকে পলায়ন করে তারা দ্রুত ইরাকে ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং লম্পট লোকদেরকে নিজেদের সাথে শামিল করে একটি বিরাট দল গড়ে তোলে। তারা সর্বপ্রথম সিজিস্তান অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা একের পর এক ইরানের প্রদেশসমূহে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে যাতে মুসলমানদের খলীফা (হযরত আলী) গোটা দেশকে পুনরায় একটি স্থায়ী রাষ্ট্রে পরিণত করার অবকাশ না পান। ইরানের প্রদেশসমূহে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে *তারা আলী (রা)-কে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চাচ্ছিল যাতে তিনি সিরিয়া আক্রমণ করার* এবং জয়যুক্ত হওয়ার সুযোগই না পান। তাদের সিজিস্তানের দিকে যাত্রার কথা জানতে পেরে আলী (রা) তাদেরকে দমনের জন্য হযরত আবদুর রহমান তাঈকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের মুকাবিলা করতে গিয়ে আবদুর রহমান তাঈ শাহাদাত বরণ করেন। এই সংবাদ পাওয়ার পর আলী (রা) চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ রিবঈ ইবন কাসকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। ইতিমধ্যে সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমরূপী ইয়াহূদীরা অর্থাৎ সাবাঈ গোষ্ঠী নিজেদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য আলী (রা)-এর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকেই সমীচীন মনে করে এবং সুযোগ বুঝে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে একের পর এক তাতে যোগ দেয়।

কূফায় রাজধানী স্থানান্তর

জামাল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত আলী (রা)-এর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, সিরিয়া প্রদেশকে আয়ত্তাধীনে আনা এবং আমীর মুআবিয়ার কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে তিনি কূফায় অবস্থান করাই সমীচীন মনে করলেন। তাছাড়া আলী (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে কূফীরাই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। এই প্রেক্ষিতেও কূফার রাজধানী স্থানান্তর ছিল যুক্তিসঙ্গত। উপরন্তু কূফা ছিল মদীনার চাইতে সিরিয়ার অধিক নিকটবর্তী। ইরানী প্রদেশগুলো ছিল কূফা দ্বারা অধিক প্রভাবিত। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত উসমান

(রা)-এর খিলাফত আমলে মদীনার গণ্যমান্য তথা সাহাবিগণ বিভিন্ন প্রদেশে কর্মকর্তা বা গভর্নর পদে নিয়োগ লাভ করে মদীনার বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই নিজেদের সফর সঙ্গী করে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা গভর্নরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেত এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করাও সহজ হত। এভাবে হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলে মদীনার গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফারূকে আযম (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মদীনাকে সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন এবং নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এখন আর সে প্রয়োজন বাকী ছিল না। আলী (রা)-এর পূর্ববর্তী খলীফাদের স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার বা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতিরি প্রেক্ষিতে আলী (রা) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে হাযির থাকতে এবং একজন সেনাপতিরূপে যুদ্ধ পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যা হোক আলী (রা)-এর মদীনার পরিবর্তে কূফায় অবস্থান করাটাই ছিল অধিক সমীচীন। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে সৈন্যবাহিনীসহ কূফায় চলে যান।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী এবং বিদ্রোহীদের একটি অংশ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার প্রচেষ্টায় তার একান্ত ভক্তে পরিণত হয়েছিল। এদেরকে আবদুল্লাহ ইব্ন সাবার দল বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান স্রেফ প্রতারিত হয়ে ঐ সাবাঈ দলে যোগদান করেছিল তাই সত্যিকার অর্থে সাবাঈ দল বলতে ঐ সামান্য সংখ্যক লোকদের বোঝাত, যারা ছিল ঐ দলের মূল ভিত্তি। তারা যখন যেভাবে প্রয়োজন মনে করত, ঐ ধরনের লোক দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে করত, তখন সেভাবে সে ধরনের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মধ্য থেকেই একজন দলীয় নেতা নিয়োগ করত এবং ইতিপূর্বে অপর লক্ষ্য হাসিলের জন্য যেসব লোককে নিজেদের দলে ভিড়িয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে দিত। এটাই একমাত্র কারণ যে, উসমান হত্যার ক্ষেত্রে সাবা দল সকল বিদ্রোহীকেই কাজে লাগিয়েছিল এবং জামাল যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের একটি বিরাট অংশকে নিয়োজিত রেখেছিল। জামাল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন তারা আলী (রা)-এর বিরোধিতা এবং তার ছিদ্রান্বেষণে আত্মনিয়োগ করে তখন বিদ্রোহীদের একটি বিরাট অংশ সাবাঈ দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা হযরত আলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং আপন কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ উৎসর্গের বদৌলতে খলীফার দরবারে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনেও সক্ষম হয়। হযরত আলী কূফায় আবাস গ্রহণ করায় কূফীদের উপর তাঁর নির্ভরশীলতা আরো বেশী বৃদ্ধি পায়। এভাবে উসমানের হত্যাকারীরা হযরত আলীর বাহিনীতে শুধু আশ্রয়ই নেয়নি, বরং তাদের অনেকেই তার আস্থা অর্জনেও সক্ষম হয়। আর আমীরে মুআবিয়ার শক্তি বৃদ্ধির এটাও ছিল একটা কারণ। কেননা যে সমস্ত লোক হযরত উসমানের হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণ জরুরী মনে করত তারা যখন ঐ হত্যাকারীদেরই কিছু লোককে আলী (রা)-এর বাহিনীতে সসম্মানে ও সদর্পে বিচরণ করতে দেখত তারা আমীরে মুআবিয়ার তুলনায় আলী (রা)-এর অধিক উত্তম স্বীকার করা সত্ত্বেও আমীর মুআবিয়া (রা)-কে সমর্থন করছিল। আমীরে মুআবিয়া উসমান হত্যার প্রতিশোধের দাবীতেই হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

মিসরের গভর্নর পদে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর নিযুক্তি

যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমানের শাহাদত লাভের মুহূর্তে মুহাম্মদ ইবন আবূ হুযায়ফা আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দকে মিসরের শাসনক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজেই তা করায়ত্ত করে নেন। আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে কায়স ইবন সা'দ (রা)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে মদীনা থেকে প্রেরণ করেন। কায়স মাত্র সাতজন লোক সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং মিসরে পৌঁছেই মুহাম্মদ ইবন আবূ হুযায়ফাকে পদচ্যুত করে নিজেই সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। মিসরের ইয়াযীদ ইবন হারিছ, আসলামা ইবন মুখাল্লাদ প্রমুখ এমন কিছু লোকও ছিল যারা উসমান হত্যার কিসাস দাবী করছিল। তারা কায়সের হাতে বায়'আত হতে অস্বীকার করে এই অজুহাতে যে, তারা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবে এবং উসমান হত্যার ব্যাপারটি কিভাবে মিটমাট করা হয় তা লক্ষ্য করবে। যখন একটা মীমাংসা হয়ে যাবে তখন তারা অবশ্যই বায়'আত করবে। আর যতক্ষণ তারা বায়'আত না করবে ততক্ষণ নীরব থাকবে, কায়সের কোনরূপ বিরোধিতা করবে না। যা হোক কায়স নিজের সুন্দর চরিত্র ও যোগ্যতাবলে মিসরে পুরোপুরিভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

জামাল যুদ্ধশেষে আলী (রা) কূফায় যাত্রা করলে আমীরে মুআবিয়া এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, এখন তাঁরই উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। তিনি এটাও ভেবে রেখেছিলেন যে, মিসরে কায়স ইব্‌ন সা'দ একজন প্রতিপত্তিশালী জনপ্রিয় গভর্নর। তিনি হযরত আলীর প্রেরিত লোক এবং তাঁরই একান্ত ভক্ত। অতএব আলী (রা) যখন কূফার দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ করবেন তখন তিনি কায়স ইব্‌ন সা'দকে অবশ্যই নির্দেশ দেবেন, "তুমি ও তোমার বাহিনী নিয়ে মিসরের দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ কর।" আর উভয় দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ করা হলে তাঁকে (মুআবিয়াকে) নিঃসন্দেহে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। মুআবিয়া (রা) স্বাভাবিকভাবেই নিজের শক্তি অর্জন ও তা সমন্বিত করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তিনি সে সুযোগ পুরোপুরি কাজেও লাগিয়েছিলেন। উসমান (রা)-এর রক্তাক্ত জামা এবং তাঁর স্ত্রীর কর্তিত অঙ্গুলীসমূহ তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি প্রতিদিন এই জামা ও অঙ্গুলীসমূহ দামিশ্‌কের জামে মসজিদের মিম্বরের উপর রেখে দিতেন এবং জনসাধারণ তা দেখে আহাজারী করত। যেহেতু সিরিয়া প্রদেশ সব সময়ই রোমান সম্রাটের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই প্রথম থেকেই সেখানে একটি অতি শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন রাখা হত। এই মুহূর্তেও সেখানে একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং সে বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যই এই মর্মে শপথ করেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নেবে ততক্ষণ তারা বিছানায় ঘুমাবে না এবং ঠাণ্ডা পানিও পান করবে না। তাছাড়া আরবের গণ্যমান্য ও বাহাদুর লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে আমীরে মুআবিয়া ছিলেন সদাতৎপর। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং নানা উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে বশ করে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। যারা কাজের লোক তাদেরকে নিজের দলে টানা এবং তাদের মন জয় করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। নিজের দাবীর যথার্থতা প্রমাণ এবং নিজেকে উসমান (রা)-এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে একজন মজলুম হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভের পর তিনি পুরোপুরি এক বছরের অবকাশ পেয়েছিলেন এবং

এই সময়ে উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন কাজ ছিল না। কিন্তু হযরত আলী এই সময় দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। যদিও কূফায় চলে যাওয়ার পর একমাত্র সিরিয়া প্রদেশ ছাড়া সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্র বাহ্যত হযরত আলীর অধিকারে চলে এসেছিল, কিন্তু তিনি তখনো সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন নি, যা হযরত ফারূকে আযমের যুগে মুসলমানদের খলীফা তথা আমীরুল মু'মিনীনের ছিল। হিজায, ইয়ামন, ইরাক, মিসর, ইরান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্রই অনুগত লোকদের সাথে সাথে এমন কিছু লোকও পাওয়া যেত যারা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করত এবং তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রকাশ্য সমালোচনা করত। এ কারণেই হযরত আলী কোন প্রদেশ থেকেই আশানুরূপ সামরিক সাহায্য লাভ করতে পারেন নি।

আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও শুধুমাত্র সিরিয়া প্রদেশের উপর তাঁর আধিপত্য ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশ ছিল তাঁর সমমতাবলম্বী। এজন্য সমগ্র দেশেই তাঁর একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে তাঁকে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে, এ বিশ্বাস তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। এ প্রেক্ষিতে তিনি সর্বপ্রথম যে কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন তা হলো মিসরের দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা দূর করা। মুআবিয়া (রা) কায়স ইবন সা'দ (রা)-এর শক্তি ও যোগ্যতায় প্রভাবিত ছিলেন। এটাকে আমীরে মুআবিয়ার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, হঠাৎ এমন একটি কারণ সৃষ্টি হয়ে গেল, যার ফলে তাঁর সংকল্প ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল। আমীরে মুআবিয়া (রা) কায়সকে এই মর্মে পত্র লিখলেন : হযরত উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে। অতএব তাঁর কিসাসের দাবীতে আমাকে আপনার সহযোগিতা করা উচিত। কায়স উত্তরে লিখেন : আমি যতটুকু জানি, আলী (রা) উসমান হত্যা ষড়যন্ত্রে মোটেই শরীক ছিলেন না। তাঁর হাতে যখনি লোকেরা বায়'আত করে ফেলেছে এবং তিনি খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গেছেন তখন তাঁর মুকাবিলা বা বিরোধিতা করা আপনার উচিত হবে না। এই সোজা উত্তর পাওয়ার পর আমীরে মুআবিয়ার করণীয় হলো আলী (রা)-এর মুখামুখি হওয়ার পূর্বেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে মিসর আক্রমণ করে কায়সের দিক থেকে আগত সম্ভাব্য বিপদ দূরীভূত করা, এরপর আলী (রা)-এর হামলা প্রতিরোধ করা। কিন্তু এই কাজ ছিল নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা মিসরে যুদ্ধ যদি কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে যায় এবং আমীরে মুআবিয়া (রা) সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে না পারেন তাহলে সমগ্র সিরিয়া আলী (রা)-এর দখলে চলে যাবে এবং আমীরে মুআবিয়ার প্রাণ নিয়ে পালাবারও কোন পথ থাকবে না। অপরদিকে কায়স ইবন সা'দ ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন যতক্ষণ না হযরত আলী (রা)-এর আক্রমণের খবর এসে পৌঁছে। তার পরিকল্পনা ছিল, ঐ খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি মিসরের দিক থেকে আমীরে মুআবিয়ার উপর আক্রমণ করে তাঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন।

ইতিমধ্যে কায়সের একটি চিঠি আলী (রা)-এর কাছে কূফায় গিয়ে পৌঁছে। তিনি তাতে লিখেছিলেন, মিসরের অভ্যন্তরে বহু লোক এখনো নিরপেক্ষ আছে। আমি তাদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি এবং তাদের উপর কোনরূপ পীড়াপীড়ি করা সমীচীন মনে করিনি। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর আলী (রা)-কে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, ঐ নিরপেক্ষ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের বায়'আত করতে বাধ্য করার জন্য কায়সকে নির্দেশ

দেওয়া উচিত। কেননা এভাবে নীরবে বসে থাকতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব কায়সের কাছে এ নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি আলী (রা)-এর এই নির্দেশ পালন অপ্রয়োজনীয় এমন কি ক্ষতি বলে বিবেচনা করে তাঁকে পুনরায় লিখলেন, ঐ সমস্ত লোকেরা এখন নীরব রয়েছে, তাঁরা আপনার জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলে তারা সবাই আপনার শত্রুদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে এবং তখন তাঁরা আপনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। অতএব তাদেরকে এই অবস্থায়ই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই পত্র প্রাপ্তির পর হযরত আলীর দূতেরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলল যে, কায়স নিশ্চয়ই গোপনে আমীরে মুআবিয়ার সাথে ষড়যন্ত্র করছেন। আলী (রা) তাদের এ কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছিলেন। কেননা তিনি কায়সকে মিসরের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। আমীরে মুআবিয়া জানতে পারলেন যে, কায়সের ভূমিকা সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর দরবারে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন তিনি নিজ দরবারে প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন এবং সকলের কাছে বলতে শুরু করেন যে, কায়স হচ্ছে আমার পক্ষের লোক। আমি সব সময় তাঁর চিঠিপত্র পেয়ে থাকি। তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে আমাকে সব সময় অবহিত করেন। কখনো কখনো তিনি জনসমাবেশে এও বলেন যে, যারা মিসরে উসমান (রা) হত্যার কিসাস দাবী করছে কায়স তাদের যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা এবং অনেক বড় বড় উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেছেন। দামিশকে অবস্থানরত হযরত আলী (রা)-এর গুপ্তচররা আমীরে মুআবিয়ার ঐ সমস্ত কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে আলী (রা) কায়সকে পদচ্যুত করে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর মিসরে পৌঁছে কায়সকে তাঁর পদচ্যুতি ও নিজের নিয়োগপত্র দেখালে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হন এবং মিসর থেকে সোজা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।

আলী (রা)-এর মদীনা থেকে চলে আসার পর সেখানে কারোরই শাসন-কর্তৃত্ব ছিল না। সেখানে এমন লোকও ছিলেন, যারা তাঁর খিলাফতকে ন্যায়ানুগ বলে স্বীকার করতেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম অবশ্য পালনীয় মনে করতেন। আর এ ধরনের লোকের সংখ্যাও ছিল প্রচুর যারা উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ না করার কারণে খুবই অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে আলী (রা)-এর বিলম্ব ও উপেক্ষাকে অত্যন্ত আপত্তির চোখে দেখতেন। তারা তাঁকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারেও ছিলেন দ্বিধাহীন। কায়স ইবন সা'দ মদীনায় পৌঁছলে আমীরে মুআবিয়া প্রায় সাথে সাথেই মারওয়ানকে এই বলে মদীনায় প্রেরণ করেন যে, যেভাবেই হোক কায়সকে বুঝিয়ে সঙ্গে করে সিরিয়ায় নিয়ে আস। মারওয়ান প্রথম প্রথম কায়সকে বোঝান। এতে কোন ফলোদয় না হলে মারওয়ান তাকে এমনভাবে বিরক্ত শুরু করে যে, তিনি তা সহ্য করতে না পেরে মদীনা থেকে সোজা কূফায় হযরত আলীর কাছে চলে যান। তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এতে আলী (রা) নিশ্চিত হয়ে তাঁকে আপন সভাসদ হিসাবে গ্রহণ করেন। মুআবিয়া (রা) এ খবর পেয়ে মারওয়ানকে লিখেন, তুমি যদি এক লক্ষ বীরযোদ্ধার একটি বাহিনী দিয়ে আলী (রা)-কে সাহায্য করতে তবে সেটাও কায়সের তাঁর কাছে চলে যাওয়া থেকে ছিল অধিক শ্রেয়।

মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর মিসরে পৌঁছে নিরপেক্ষ লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন : হয় তোমরা আমার বশ্যতা স্বীকার কর এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত হও, অন্যথায় আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। তারা বলল, আমাদের সাথে যুদ্ধ বা আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। অন্তত কিছুদিন অবকাশ দিন, যাতে আমরা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারি। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন আবূ বক্কর বললেন, তোমাদের কোন মতেই অবকাশ দেওয়া যেতে পারে না। আর নবাগত গভর্নরের এই জবাব শুনে তড়িৎ গতিতে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং তাকে প্রতিরোধের জন্যও যথার্থ প্রস্তুতি নেয়। ফলে মুহাম্মদ নিজে তাঁর সৃষ্ট এই সমস্যায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, সিফ্ফীন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতে নিমজ্জিত থাকেন। অপর দিকে আমীরে মুআবিয়া মিসরের দিক থেকে একেবারে নিশ্চিত হয়ে সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হন।

মুআবিয়া (রা)-এর কাছে আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর উপস্থিতি

ফারূকী খিলাফত আমলে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) মিসর জয় করে তা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। যখন বিদ্রোহীরা মদীনায় প্রবেশ করে হযরত উসমান (রা)-কে অবরোধ করে তখন তিনি মদীনায় ছিলেন। বিদ্রোহীদের অবাঞ্ছিত আচরণ এবং তাদের এই বিশৃংখলার অশুভ পরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি মদীনা থেকে চলে যাওয়া সমীচীন মনে করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আপন দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং মুহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে সোজা বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যান। তিনি সেখান থেকে অত্যন্ত গভীরভাবে দেশের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখেন এবং দৈনন্দিন ঘটনাবলীরও খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। তিনি প্রথমে উসমান (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ পান। এরপর জানতে পারেন যে, আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি (আলী) উসমানের হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণে ইতস্তত করছেন। তিনি আরও শুনতে পান যে, তালহা এবং যুবায়র (রা) আয়িশা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বসরার দিকে যাত্রা করেছেন এবং আমীরে মুআবিয়া বায়'আত গ্রহণে অস্বীকার করে উসমান হত্যার কিসাস দাবী করেছেন। তিনি আরও শুনতে পান যে, আলী (রা)-ও বসরার দিকে যাত্রা করেছেন। এর পর পরই সংবাদ পান যে, তালহা, যুবায়র (রা) উভয়ই জামাল যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছেন এবং আলী (রা) বসরার উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করে নিজে কূফায় চলে গেছেন এবং সেখান থেকে সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি এও শুনতে পান যে, আমীরে মুআবিয়া (রা)-ও আলী (রা)-এর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এই সংবাদ শুনে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) তাঁর পুত্রদ্বয়ের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের বলেন, এখনি যথার্থ সময় যে, আমি আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যাব এবং খিলাফতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এর একটা প্রতিবিধান করবো। জামাল যুদ্ধের পূর্বে চার ব্যক্তি খিলাফতের দাবীদার ছিলেন। প্রথমত আলী (রা)। তিনি তো খলীফা নির্বাচিতই হয়েছিলেন এবং লোকেরা তাঁর হাতে বায়'আতও করেছিল। দ্বিতীয়ত হযরত তালহা (রা)। বসরাবাসীরা ছিল তাঁর সমর্থক ও সাহায্যকারী। তাঁরা তাঁকে খলীফার পদের যোগ্য মনে করত। তৃতীয়ত হযরত যুবায়র (রা)। তাঁর ভক্ত এবং তাঁকে খলীফা পদের যোগ্য বিবেচনাকারীর সংখ্যা কূফায়

ছিল সবচেয়ে বেশী। চতুর্থত আমীরে মুআবিয়া (রা)। তিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমল থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে সিরিয়ার শাসনভার তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর আত্মীয় স্বগোত্রীয় এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তিনি (মুআবিয়া) তাঁর হত্যা প্রতিশোধ 'কিসাস' গ্রহণের দাবী উত্থাপন করেছেন। এবার হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর শাহাদত বরণের পর শুধুমাত্র দু'ব্যক্তিই খিলাফতের দাবীদার রয়ে গেছেন। আমীরে মুআবিয়া বলেছেন, হযরত আলী (রা) হলেন বিদ্রোহীদের নির্বাচিত খলীফা যারা উসমান (রা)-কে শহীদ করেছে। এমন শীর্ষস্থানীয় অনেক সাহাবী তখন মদীনার বাইরে ছিলেন, খলীফা নির্বাচন বা ইতিপূর্বেকার খলীফাদের বায়'আতের ক্ষেত্রে যাঁদের অংশগ্রহণকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ এই নির্বাচনে তাঁদের কাছ থেকে কোন পরামর্শও গ্রহণ করা হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আলী (রা) হযরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে তাঁরই বাহিনীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। অপর দিকে তিনি বলছেন, মু'আবিয়া (রা) ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মতেই আমার সাথে মুকাবিলা করতে পারবে না। মোটকথা, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অগ্রগণ্যতার দাবী করছেন। এমতাবস্থায় আমি নিজেকে এসব ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সমীচীন মনে করি না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) পিতাকে পরামর্শ দেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর, হযরত উমর ও উসমান (রা) সকলেই তাঁদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব আমি এটাই সমীচীন মনে করি যে, আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে একেবারে চুপচাপ বসে থাকুন, যতক্ষণ না লোকেরা কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছে। কিন্তু অপর পুত্র মুহাম্মদ বললেন, আপনি হচ্ছেন আরবের গণ্যমান্য, প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অন্যতম। অতএব আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ না করবেন ততক্ষণ এ বিষয়টির কোন চূড়ান্ত ফায়সালা হবে না।

আমর ইবনুল 'আস (রা) তাঁর উভয় পুত্রের বক্তব্য শুনে বলেন, আমি আবদুল্লাহ্‌র পরামর্শের মধ্যে ধর্মের মঙ্গল এবং মুহাম্মদের পরামর্শের মধ্যে দুনিয়ার মঙ্গল লক্ষ্য করছি। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে আরো কিছুটা ভেবে-চিন্তে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হন এবং দামিশকে হযরত আমীরে মু'আবিয়ার কাছে চলে যান। আমীরে মু'আবিয়া তাঁর উপস্থিতিকে একটি বিরাট সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করেন। আমর ইবনুল 'আস আমীরে মুআবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রথম যে কথাটি বলেন তা হলো মজলুম খলীফার হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আপনি এ ব্যাপারে যে দাবী উত্থাপন করেছেন তা ঠিক ও যথার্থ। প্রথম প্রথম আমীরে মু'আবিয়া (রা) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেন। এরপর তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তাঁকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। হযরত আমর (রা) আমীরে মুআবিয়াকে পরামর্শ দেন : হযরত উসমান (রা)-এর রক্তাক্ত জামা এবং তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত অঙ্গুলীসমূহ এভাবে প্রতিদিন জনসমুদ্রে দর্শনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় এ ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ উচ্ছ্বাস ক্রমে ক্রমে অবদমিত হয়ে যাবে। অতএব শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এগুলো প্রদর্শন করা উচিত। আমীরে মু'আবিয়া তাঁর এই অভিমত পসন্দ করেন। ফলে জামা ও অঙ্গুলী সামনে রেখে প্রতিদিন যে আহাজারির রোল উঠত তা বন্ধ

হয়ে যায়। আমর (রা) আমীরে মু'আবিয়াকে এটাও বোঝান যে, জামাল যুদ্ধের কারণে প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রা)-এর সামরিক শক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেননা জামাল যুদ্ধে কম করে হলেও আট নয় হাজার লোক নিহত হয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও রয়েছেন। এখন যখন বসরাবাসীরা হযরত আলীর হাতে বায়'আত করেছেন তখন তারা কূফাবাসীদের সাথে মিশে যাবে এবং এই মিশ্রিত বাহিনী স্বাভাবিকভাবেই মনেপ্রাণে কখনো যুদ্ধ করবে না। তাদের মধ্যে সব সময়ই অনৈক্য বিরাজ করবে। আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর এই অনুমান অমূলক ছিল না। অবশ্যই এই রহস্য সম্পর্কে সাবাঈ দলও অবহিত ছিল।

সিফ্ফীন যুদ্ধের পটভূমি

হযরত আলী (রা) কূফায় গিয়ে সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে রওয়ানা হন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আলী (রা)-ও কূফায় আবূ মাসউদ আনসারী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে নাখীলায় চলে যান এবং সেনাবাহিনীর শৃংখলা বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও বসরী বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। সেখান থেকে আলী (রা) যিয়াদ ইব্ন নাসর হারিছীর নেতৃত্বে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আট হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এরপর শুরায়হ ইব্ন হানীর নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের আর একটি বাহিনী যিয়াদের পিছে পিছে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে নাখীলা থেকে রওয়ানা হয়ে মাদায়েনে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে মাসউদ সাকাফীকে গভর্নর নিয়োগ করে মাকাল ইব্ন কায়সের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি মাদায়েন থেকে রিক্কার দিকে রওয়ানা হন। তিনি রিক্কার নিকটস্থ ফুরাত নদী অতিক্রম করেন এবং সেখানে যিয়াদ, শুরায়হ, মাকাল প্রমুখ অধিনায়কের বাহিনীগুলোকে একত্রিত করেন। অপর দিকে হযরত মুআবিয়া যখন জানতে পারেন যে, আলী (রা) এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন তখন তিনি আবুল আওয়ার সালামীর নেতৃত্বে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন। আলী (রা) ফুরাত নদী অতিক্রম করার পর যিয়াদ এবং শুরায়হ্ উভয়ে পুনরায় অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে প্রেরণ করেন। যিয়াদ ও শুরায়হ্ সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পর জানতে পারেন যে আবুল আওয়ার সালামী সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী নিয়ে আসছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। আলী (রা) তখন আশতারকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন : তুমি যখন যিয়াদ ও শুরায়হের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে যিয়াদ ও শুরায়হকে যথাক্রমে ডান পাশের ও বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করবে। আর সিরীয় বাহিনী যতক্ষণ না তোমাদের উপর হামলা করে, তোমরা তাদের উপর হামলা করবে না। আশতার সেখানে গিয়ে সমগ্র বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং যিয়াদ ও শুরায়হকে যথাক্রমে ডান পাশের ও বামপাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। অপর দিকে আবুল আওয়ারও তাদের মুখামুখি তাঁবু স্থাপন করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পরের বিপরীত নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করে। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার পর আবুল আওয়ার হামলা করে বসেন। তবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর উভয় বাহিনী পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। পরদিন সকাল বেলা আবুল আওয়ার তার বাহিনীর সম্মুখসারি থেকে

যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। অপর দিক থেকে হাশিম ইব্‌ন উত্‌বা এগিয়ে গিয়ে তার মুকাবিলা করেন। আসরের সময় পর্যন্ত উভয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। এরপর তাঁরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ বাহিনীর দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আশতার তার বাহিনীকে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। আবুল আওয়ারও আপন লোকদের হামলার নির্দেশ দেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। তবে রাতের আধার ঘনিয়ে আসায় সেদিনকার মত তা মুলতবি হয়ে যায়।

পরদিন হযরত আলী (রা)-ও সেখানে এসে পৌঁছেন এবং জানা যায় যে, আমীরে মুআবিয়া (রা)-ও আপন বাহিনী নিয়ে শীঘ্রই সেখানে এসে পৌঁছেছেন। এ খবর পেয়ে আলী (রা) আশতারকে নির্দেশ দেন : তুমি তাড়াতাড়ি ফুরাত উপকূলে পৌঁছে পানির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু আশতার সেখানে পৌঁছে দেখতে পান, মুআবিয়া (রা) ইতিমধ্যে পানির উপর নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। আলী (রা) এ সংবাদ পেয়ে সা'সা' ইব্‌ন সাওহানকে একটি পয়গামসহ মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পাঠান। উক্ত পয়গামে আমীরে মুআবিয়াকে সম্বোধন করে বলা হয় : আমরা তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়ব না, যতক্ষণ না তোমাদের ওযর-আপত্তি শ্রবণ করি এবং সত্য প্রচারের মাধ্যমে তোমাদের উপর হুজ্জত (দলীল) প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তোমরা ফুরাত দখল করে আমাদের পানি বন্ধ করে দিয়েছ। ফলে পিপাসায় মানুষ কাতর হয়ে পড়েছে। তোমরা তোমাদের লোকদেরকে নির্দেশ দাও যাতে নদী থেকে পানি নিতে ওরা আমাদের বাধা না দেয়, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যকার বিবাদের একটা মীমাংসা হয়ে যায়। আর তোমরা যদি এই চাও যে, যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি সেটা ভুলে গিয়ে তোমরা পানিকে উপলক্ষ করেই যুদ্ধ করবে এবং এই যুদ্ধে যে জয়ী হবে একমাত্র সেই পানি পান করার অধিকার পাবে তাহলে তার জন্যও আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমীরে মুআবিয়া সঙ্গে সঙ্গে আপন উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠান এবং তাদের সামনে বিষয়টি পেশ করেন। তখন মিসরের প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা বলেন, পানির উপর থেকে আমাদের অধিকার প্রত্যাহার করা চলবে না, বরং ওদেরকে তৃষিত রেখেই মারতে হবে। কেননা ওরা হযরত উসমান (রা)-এর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তৃষিত অবস্থায়ই তাঁকে শহীদ করেছে। কিন্তু আমর ইবনুল 'আস (রা) তাদের বিরোধিতা করে বলেন, পানি বন্ধ করা কিংবা আলী (রা)-এর বাহিনীকে তৃষ্ণায় কষ্ট দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। এই বৈঠকেই সা'সা' এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবার মধ্যে কিছুটা শক্ত কথা কাটাকাটি হয়, এমন কি তা গালিগালাজের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সা'সা' সেখান থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে আলী (রা)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, ওরা আমাদের পানি আনার অনুমতি দেয় না। আলী (রা) আশআস্ ইব্‌ন কায়সকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। এবং বলেন, তোমরা জোর করে পানির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। অপর দিকে আবুল আওয়ার সালামীও মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়ার পূর্বেই আমর (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বুঝিয়ে বলেন, যদি আপনি পানির উপর থেকে আপনার দখল প্রত্যাহার না করেন, আর আলী (রা)-এর লোকেরা পানিতে কষ্ট পায় তাহলে অনিবার্যভাবে আপনার বাহিনীর অনেক লোকের অন্তরেই ওদের প্রতি দয়া ও করুণার উদ্রেক হবে এবং তারা আপনাকে পরিত্যাগ করে

আলীর বাহিনীতেই গিয়ে যোগ দেবে। অতঃপর তারা আপনাকে পাষাণ-হৃদয় ও জুলুমের অভিযোগে অভিযুক্ত করবে এবং আলীর পক্ষ নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে লড়বে। আমীরে মু'আবিয়া তখনই আপন বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা দেন : বিপক্ষ দলকে পানি থেকে বাধা দেওয়া বা পানিতে কষ্ট দেওয়া চলবে না। এভাবে একটি হাঙ্গামা চরম আকার ধারণ করার পূর্বেই প্রশমিত হয়ে যায়।

এরপর দু'দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ছাড়াই উভয় বাহিনী পরস্পরের বিপরীতে নীরবে অবস্থান করে। ইতিমধ্যে হিজায, ইয়ামন ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং হামাদান প্রভৃতি ইরানী অঞ্চল থেকে অনেক লোক আলী (রা)-এর বাহিনীতে এসে যোগ দেয় এবং বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা নব্বই হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আমীর মুআবিয়ার বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল আশি হাজার। দুই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন যথাক্রমে হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া (রা)। উভয় বাহিনীর বড় বড় অংশের জন্য পৃথক পৃথক অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। আলী (রা)-এর বাহিনীতে আশতারকে কূফার অশ্বারোহী বাহিনীর, সুহায়ল ইব্‌ন হানাফীকে বসরার অশ্বারোহী বাহিনীর, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে কূফার পদাতিক বাহিনীর এবং কায়স ইব্‌ন সা'দকে বসরার পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট গোত্রসমূহ এবং প্রদেশসমূহের বাহিনীসমূহের জন্য পৃথক পৃথক অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে পৃথক পৃথক পতাকাও প্রদান করা হয়। আর আমীরে মু'আবিয়ার বাহিনীতে যুলকালা' হামীরীকে ডান পাশের বাহিনীর, হাবীব ইব্‌ন মাসলামাকে বামপাশের বাহিনীর, আবুল আওয়ার সালামীকে সম্মুখবর্তী বাহিনীর, আমর ইবনুল 'আসকে দামিশকের অশ্বারোহী বাহিনীর এবং মুসলিম ইব্‌ন ওকবাকে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জন্য আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, বশীর ইব্‌ন মালিক কিনদী প্রমুখকে অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়।

উভয় বাহিনীর নীরবতার পর তৃতীয় দিন (হিজরী ৩৬ সনের ১লা যিলহাজ্জ) আলী (রা), মুআবিয়া (রা)-কে বুঝিয়ে আনুগত্য স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর কাছে বশীর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুহসিন আনসারী, সাঈদ ইব্‌ন কায়স এবং শীছ ইব্‌ন রিবঈ তামীমীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল আমীরে মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে সর্ব প্রথম বশীর ইব্‌ন আমর বলেন, 'হে মুআবিয়া! তুমি মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও রক্তারক্তির সৃষ্টি করো না। মু'আবিয়া উত্তরে বলেন, তুমি তোমার বন্ধু আলীকেও এই উপদেশ দিয়েছ কি ? বশীর (রা) উত্তরে বলেন, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি খিলাফত পদের অধিক হকদার। অতএব তোমার উচিত তাঁর হাতে বায়'আত করা। মু'আবিয়া (রা) উত্তরে বলেন, এটা কোন মতেই সম্ভব নয় যে, আমরা উসমান হত্যার দাবী ছেড়ে দেব। শীছ ইব্‌ন রিবঈ বলেন, হে মুআবিয়া, তুমি উসমান হত্যার কিসাসের যে দাবী করছ তার অন্তরালে তোমার কি মতলব লুকিয়ে রয়েছে তা আমরা ভাল করেই বুঝি। তুমি উসমানের সাহায্যে এগিয়ে যেতে এজন্য বিলম্ব করেছ যাতে তিনি শহীদ হয়ে যান এবং তুমি তাঁর খুনের দাবীকে উপলক্ষ করে খিলাফতের দাবী উত্থাপন করতে পার। হে মুআবিয়া ! তুমি তোমার ঐ খামখেয়ালী থেকে বিরত হও এবং আলীর সাথে ঝগড়া করতে যেয়ো না। মুআবিয়া তখন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় শীছের উত্তর দেন। শীছও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন।

তিনিও মুআবিয়ার উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধিদল আপোস-মীমাংসায় ব্যর্থ হয়ে আলী (রা)-এর কাছে ফিরে আসে।

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সূচনা

আপোস মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে উভয় পক্ষই যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু যেহেতু উভয় পক্ষই ছিল মুসলমান, সর্বোপরি তারা ছিল একে অন্যের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু, তাই কারো অন্তরেই যুদ্ধ করার সেরূপ আগ্রহ বা প্রেরণা ছিল না, যেরূপ কাফিরদের বেলায় হয়ে থাকে। সাধারণভাবে লোকেরা চাচ্ছিলো যেন যুদ্ধ না বাঁধে এবং যে কোনভাবে আপোস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে উভয় পক্ষ থেকে একজন করে লোক যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসত এবং পরস্পরের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হত আর বাকীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখত। কিছুদিন পর্যন্ত প্রতিদিনই এ ধরনের যুদ্ধ চলতে থাকে। এরপর যুদ্ধের ক্ষেত্র কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। উভয় পক্ষের এক একজন অধিনায়ক নিজ নিজ পক্ষ থেকে সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আসত এবং উভয় পক্ষের এই দুই ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকত। আর বাকী সৈন্যরা নিজ নিজ জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখত। একমাস পর্যন্ত এ ধরনের মুকাবিলা চলতে থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে একমাস পর্যন্ত উভয় বাহিনী তাদের ভাবী রক্তাক্ত যুদ্ধের জন্য পরস্পরের মধ্যে মহড়া দিতে থাকে। এক মাসের এই বিচ্ছিন্ন যুদ্ধকে সিফ্‌ফীন যুদ্ধের প্রথম ভাগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যিলহাজ্জ মাস শেষ হয়ে মুহাররম মাস আরম্ভ হলে (১লা মুহাররম ৩৭ হিজরী) উভয় পক্ষই এক মাসের জন্য সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ বন্ধ রাখে। এই একমাস উভয় পক্ষের সৈন্যরা একেবারে নীরব থাকে এবং এই অবকাশে পুনরায় আপোস-মীমাংসার কথাবার্তা চলতে থাকে। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, মুহাররমের এই এক মাস পরস্পরের উপর কোনরূপ আঘাত না করে উভয় বাহিনীকে নীরবে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করা একথারই স্পষ্ট প্রমাণ যে, উভয় বাহিনীই মনে করত, যুদ্ধের চেয়ে আপোস-মীমাংসাই ভাল এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যকার যুদ্ধ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যখন সকল যোদ্ধার মধ্যেই এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় তখন তাদের অধিনায়করাও কোন না কোনভাবে একটা আপোস চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হন। কিন্তু এই শান্তি ও নীরবতার দিনগুলোতে সাবাঈ দল, যারা ছদ্মবেশে হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে অবস্থান করছিল এবং যাদের পৃথক কোন পরিচয় ছিল না, অশান্তি সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর থাকে। উভয় পক্ষের মধ্যে যাতে সহানুভূতি ও ভালবাসার সৃষ্টি না হয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় সেজন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। আর উভয় বাহিনীর অধিনায়কদের অবস্থান ছিল এই যে, আলী (রা)-এর পক্ষে তো খিলাফত ত্যাগ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। আবার এই মুহূর্তেই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা মালিক আশতারের মতো প্রতাপশালী সেনাপতি, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর মত গভর্নর ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের মত সম্মানিত সাহাবীকে শাস্তি প্রদান এবং সমগ্র কূফা ও মিসরীয় বাহিনীকে শত্রুতে পরিণত করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। তা ছাড়া যে অবস্থায় ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটে তাতে হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি আলী (রা) আমীরে মুআবিয়ার মুকাবিলায় খিলাফতের পদের জন্য সব দিক দিয়েই যে অধিক যোগ্য ছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।

অপর দিকে আমীরে মুআবিয়া মক্কার রইস এবং উহুদ ও আহযাবের বিরাট যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আবূ সুফিয়ানের পুত্র হওয়ার কারণে আরবের আমীর বলে মনে করতেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ভাই এবং ওয়াহী লেখক। উসমানের উত্তরাধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে উসমান হত্যার কিসাস দাবী করা তিনি নিজের একটি পবিত্র অধিকার জ্ঞান করতেন। এত বড় একটি হত্যাকাণ্ডের হোতাদের খুঁজে বের করা কঠিন বলে কারো উপর থেকে কিসাস গ্রহণ না করা, তাঁর মতে, একটি সাক্ষাত জালিয়াতি ছাড়া কিছু নয়। হযরত আলী (রা)-এর কোন ব্যাখ্যাই তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না। অন্য কথায়, তিনি তা বুঝতে চাচ্ছিলেন না। আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে তালহা (রা) ও যুবায়র (রা)-এর বিদ্রোহ, মদীনার বেশ কয়েকজন সাহাবী তাঁর হাতে বায়'আত হওয়া থেকে এবং তাঁর (মুআবিয়া) প্রতি আমর ইবনুল 'আস প্রমুখের সহায়তা আমীরে মুআবিয়ার আস্থা ও বিশ্বাসকে আরো জোরদার করে দিয়েছিল। উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দাবী ও সংকল্প পুনর্বিবেচনা করতে এবং উচ্চাশা ত্যাগ করতে নিশ্চয়ই বাধ্য হতেন, যদি তাদের সঙ্গীসাথী এবং সৈন্যরা নিজেরা সঠিক পথে এসে এর পর নিজেদের নেতৃবৃন্দের উপরও সঠিক পথে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করত। এজন্য ঐ বিরতিকাল তথা মুহাররম মাস ছিল একটি যথার্থ মাস। কিন্তু সাবাঈ দল এমনভাবে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র চালায় যে, মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত একটা আপোস-মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়।

বিরতিকালীন পুনরায় আপোস-মীমাংসার চেষ্টা

যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর হিজরী ৩৭ সনের কোন এক সময়ে হযরত আলী (রা) আমীরে মুআবিয়ার সাথে একটা আপোস-মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য পুনরায় তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাতে আদী ইবন হাতিম, যায়দ ইবন কায়স, যিয়াদ ইবন হাসফাহ্ ও শীছ ইবন রিবঈ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শীছ ইবন রিবঈ প্রথম প্রতিনিধি দলেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সেবার তাঁর সাথে আমীরে মুআবিয়ার শক্ত কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। অতএব পুনরায় শীছকে প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত করা ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। প্রতিনিধি দলটি আমীরে মুআবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদের কর্তব্য পালন করে। প্রথমে আদী ইবন হাতিম (রা) আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের গুণগান করার পর বলেন, হে মুআবিয়া! তুমি আলী (রা)-এর আনুগত্য স্বীকার কর। তুমি বায়'আত করলে মুসলমানরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তুমি ও তোমার বন্ধুরা ছাড়া কেউই বায়'আত থেকে বিরত থাকে নি। যদি তুমি এই বিরোধিতা অব্যাহত রাখ তাহলে পুনরায় জামাল যুদ্ধের মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। মুআবিয়া (রা) তাঁর কথায় ছেদ টেনে বলেন, হে আদী! তুমি আপোস-মীমাংসার জন্য এসেছ, না যুদ্ধ লড়াবার জন্য ? তুমি জামাল যুদ্ধের কথা বলে আমাকে কি ভয় দেখাচ্ছ ? তুমি তো জানই, আমি হচ্ছি আরবের শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাদের বংশধর। আমি যুদ্ধকে ভয় করি না। আমি জানি, তুমিও উসমান হত্যাকারীদের অন্যতম। আল্লাহ্ তোমাকেও ধ্বংস করুন। অতঃপর ইয়াযীদ ইবন কায়স বলেন, আমরা প্রতিনিধি হয়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমাদের কাজ নয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত যাতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়। এই বলে তিনি আলী (রা)-এর গুণাবলী এবং তাঁর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করেন। এর উত্তরে মুআবিয়া (রা) বলেন, তুমি আমাকে

মুসলিম জামাআতের প্রতি কেন আহ্বান জানাচ্ছ ? মুসলিম জামাআত তো আমাদের সাথেও আছে। তাছাড়া আমি তোমাদের বন্ধুকে খলীফা পদের যোগ্য মনে করি না। কেননা তিনি আমাদের খলীফাকে হত্যা করেছেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন। আপোস-মীমাংসা তখনই হতে পারে যখন তিনি উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সমর্পণ করবেন। মুআবিয়া (রা) এই পর্যন্ত বলার পর শীছ তাঁর কথার মাঝখানে বলে উঠেন, হে মুআবিয়া! তুমি কি আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-কে হত্যা করবে ? মুআবিয়া উত্তর দেন, এমন কি জিনিস আছে, যা আম্মারের হত্যা থেকে আমাকে বাধা দিতে পারে ? আমি হযরত উসমানের গোলামের বিনিময়েও তাকে হত্যা করতে পারি। শীছ ইবন রিবঈ বলেন, তুমি কখনো তাকে হত্যা করতে পারবে না যতক্ষণ না ভূপৃষ্ঠ তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। মুআবিয়া উত্তরে বলেন, এর আগেই ভূপৃষ্ঠ তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এ ধরনের কথা কাটাকাটির পর এই প্রতিনিধিদলও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

আলী (রা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

এরপর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) হাবীব ইবন মাসলামা, শুরাহবীল ইবনুস সিমত এবং মাআন ইবন ইয়াযীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল আলী (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। হাবীব ইবন মাসলামা আলী (রা)-কে বলেন, উসমান (রা) সত্যপন্থী খলীফা ছিলেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী হুকুম জারি করতেন। তাঁর জীবন তোমার কাছে অসহ্য হওয়ায় তুমি তাঁকে হত্যা করেছ। যদি তুমি তাঁকে হত্যা না করে থাক তাহলে তাঁর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সমর্পণ কর এবং খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াও। এরপর মুসলমানরা যাকে ইচ্ছা নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবে। একথা শুনে আলী (রা) রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি চুপ কর। রাষ্ট্র পরিচালনা ও খিলাফত সম্পর্কে এ ধরনের বক্তৃতা ঝাড়ার কোন অধিকার তোমার নেই। হাবীব ইবন মাসলামা বলেন, তুমি আমাকে শীঘ্রই সেই অবস্থায় দেখবে, যা তোমার মনঃপূত নয়। একমাত্র তরবারিই এই বিরোধের মীমাংসা করবে। আলী (রা) বলেন যাও, তোমার মন যা চায় তাই কর। এই বলে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেন। তারপর হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর অনুপম গুণাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা এ দু'জনকে তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে দেখেছি। তাই আমি রক্ত সম্বন্ধ ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের খিলাফতের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিনি। এরপর জনসাধারণ উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করল। তাঁর কর্মধারায় লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে হত্যা করে। তারপর লোকেরা আমার হাতে বায়'আত করার আবেদন জানায়। আমি তাদের আবেদনে সাড়া দেই। কিন্তু বায়'আতের পর তালহা (রা) ও যুবায়র (রা) তাঁদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং মুআবিয়া (রা) আমার বিরোধিতা করতে থাকেন। অথচ তিনি আমার মত প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, তোমরা কিভাবে তার অনুগত হয়ে গেলে। এমতাবস্থায় যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব, সুন্নাহ ও আরকানে ইসলাম (ধর্মের একান্ত করণীয় বিষয়সমূহ)-এর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি হক ও সত্যকে সঞ্জীবিত এবং অন্যায় ও বাতিলকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। শুরাহবীল ইবনুস সিমত এই বক্তৃতা শোনার পর আলী

(রা)-কে বলেন, আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দেন না যে, হযরত উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি উত্তরে বলেন, আমি উসমান (রা)-কে মজলুমও বলি না, আবার জালিমও বলি না। একথা শুনে প্রতিনিধিদলের ব্যক্তিত্রয় এই বলে উঠে দাঁড়ান যে, যে ব্যক্তি উসমান (রা)-কে মজলুম বলে না আমরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাকে উপদেশ দেওয়া না দেওয়া সমান। কেননা এর কোন প্রভাবই তার উপর পড়বে না। এই ঘটনার পর আপোস-মীমাংসার আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের এক সপ্তাহ

হিজরী ৩৭ সনের মুহাররম মাসের শেষ দিনে আলী (রা) আপন বাহিনীকে সাধারণভাবে জানিয়ে দেন যে, আগামীকাল অর্থাৎ ১লা সফর থেকে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হবে। তিনি এ ঘোষণাও দেন যে, আমাদের প্রতিপক্ষ যখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে তখন না তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে, আর না তাদের হত্যা করা হবে। আহতদের সম্পদ লুট করা যাবে না। কোন লাশ বিকৃত করা চলবে না। স্ত্রী লোকেরা গালি-গালাজ করলেও তাদের উপর কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা চলবে না। মুআবিয়া (রা)-ও অনুরূপ নির্দেশ তাঁর বাহিনীর মধ্যে জারি করেন। ১লা সফর ভোরবেলা যুদ্ধ শুরু হয়। ঐ দিন কূফাবাসীরা আশতারের নেতৃত্বে এবং সিরিয়াবাসীরা হাবীব ইবন মাসলামার নেতৃত্বে পরস্পরের মুকাবিলা করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলে। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। দ্বিতীয় দিন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে হাশিম ইবন উতবা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে বের হন। সিরিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে আবুল আওয়ার সুলামী তার মুকাবিলা করেন। ঐ দিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ চলে। কিন্তু চূড়ান্ত ফায়সালা হয়নি। তৃতীয় দিন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) এবং মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনুল 'আস (রা) স্ব-স্ব বাহিনী নিয়ে বের হন। এ দিনকার যুদ্ধ ছিল প্রথম দু'দিনের যুদ্ধের চাইতেও ভয়ংকর। আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) সন্ধ্যার খানিক পূর্বে এমন জোরদার হামলা চালান যে, আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে কিছুটা পিছনে হটে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত ঐদিনও কোন ফায়সালা হল না। চতুর্থ দিন মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) এবং আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ঐ দিনও ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল তখন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে এককভাবে তাঁর সাথে মুকাবিলা করার আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া উচ্ছ্বাসবশে তাঁর দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু আলী (রা) তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর সিরীয় বাহিনীর দিকে ফিরে যান। পঞ্চম দিনে আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে ওয়ালীদ ইবন উতবা বের হন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ চলে। ষষ্ঠ দিনে এদিক থেকে মালিক আশতার এবং ওদিক থেকে হাবীব ইবন মাসলামা দ্বিতীয়বারের মত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ঐদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলে; কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। সপ্তম দিনে স্বয়ং হযরত আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) নিজ নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ঐ দিনের যুদ্ধ ছিল পূর্বের দিনগুলোর চাইতে আরো ভয়ংকর। তবে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই ছিল সমানে সমান।

এই সাতদিনের যুদ্ধকালে প্রতি দিনই উভয় পক্ষ থেকে নতুন নতুন অধিনায়ক নিযুক্ত হতেন এবং উভয়েই নিজ নিজ বীরত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতেন। যেহেতু উভয় বাহিনীরই সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সমান (নব্বই হাজার ও আশি হাজার) এবং উভয় বাহিনীতেই বীরত্ব ও রণকৌশলের অধিকারী লোকের সংখ্যাও ছিল সম-পরিমাণ তাই তাদের কেউ জয়ী হয়নি, আবার পরাজিতও হয়নি। উভয় পক্ষ থেকেই একথা প্রকাশ পেতে থাকে যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার বা বীরত্ব প্রদর্শনের যথেষ্ট আগ্রহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান। এ সপ্তাহটি ছিল মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। কেননা এতে উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনাবশে তারা অনরবত একে অন্যের রক্ত ঝরাচ্ছিল। আর অমুসলিমরা অত্যন্ত শান্তি ও স্বস্তির সাথে তামাশা দেখছিল। কিন্তু এর চাইতেও দুর্ভাগ্যজনক আরো দু'টি দিন ছিল সমাগত।

সিফফীন যুদ্ধের শেষ দু'দিন

পরিপূর্ণ এক সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হিজরী ৩৭ সনের ৮ই সফর বৃহস্পতিবার উভয় বাহিনী এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। বুধ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ রাত প্রস্তুতিতেই কেটে যায়। বৃহস্পতিবার দিন ফজরের নামাযের ঠিক পর পর আলী (রা) তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে সিরীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি বাহিনীর মাঝখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন কূফা ও বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ এবং মদীনাবাসী যাদের বেশীর ভাগ ছিল আনসার এবং স্বল্প সংখ্যকও বনূ খুযাআ ও বনূ কিনানার লোক। আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা খুযাঈকে তাঁর ডান পাশের বাহিনীর এবং আবদুল্লাহকে বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দেন। প্রত্যেকটি গোত্রেরই ছিল পৃথক পৃথক পতাকা ও পৃথক পৃথক অধিনায়ক। আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-কে কবিতা আবৃত্তিকারী ও কুরআন তিলাওয়াতকারীদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর কায়স ইবন সা'দকে ও আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদকে কবিতা-আবৃত্তিকারীদের নেতা নিয়োগ করা হয়।

আমীরে মুআবিয়া নিজের তাঁবুতে বসে লোকদের কাছ থেকে মৃত্যুর তথা আত্মবিসর্জনের বায়'আত নেন। তাঁর বাহিনীতে হাবীব ইবন মাসলামা ডান পাশের বাহিনীর এবং উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। আলী (রা)-এর ডান পাশের বাহিনী প্রথমে অগ্রসর হয় এবং আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল খুযাঈ তার অধীনস্থ বাহিনী অর্থাৎ ডান পাশের বাহিনী নিয়ে আমীরে মুআবিয়ার বাম পাশের বাহিনী অর্থাৎ হাবীব ইবন মাসলামার উপর হামলা চালান। যদিও এই হামলা ছিল অত্যন্ত জোরদার ও মারাত্মক, কিন্তু সিরীয় বাহিনীর জন্য তা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল হাবীব ইবন মাসলামার বাহিনীকে পিছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে সেই স্থানে নিয়ে যান যেখানে লোকেরা হযরত মুআবিয়ার হাতে মৃত্যুর বায়'আত নিয়েছিল। ডান পাশের বাহিনীর এই নাজুক অবস্থা লক্ষ্য করে মুআবিয়া (রা) তাঁর আশেপাশের সৈনিকদের হামলা করার নির্দেশ দেন। তারা এমন সাংঘাতিক হামলা চালায় যে, আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল মাত্র আড়াইশ' সৈন্যসহ সেখানে টিকে থাকেন। অবশিষ্ট সমগ্র ইরাকী সৈন্য সেখান থেকে পালিয়ে ঠিক সেই জায়গায় চলে আসে, যেখানে আলী (রা) দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজের ডান পাশের বাহিনীর এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি সুহায়ল ইবন হানীফকে মদীনাবাসীদের অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়লের

সাহায্যার্থে পাঠান। কিন্তু সিরীয়রা সুহায়লকে আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। এবং অল্প কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল আপন সঙ্গীসাথীসহ সিরীয় বাহিনীর হাতে নিহত হন। একদিকে ডানপাশের বাহিনীর এই পরাজয় আলী (রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, অপরদিকে বাম পাশের বাহিনীও সিরীয়দের হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো। বাম পাশের বাহিনীতে শুধু রাবীআ গোত্র আপন জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বাকী সৈন্যরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নিজের বাম পাশের বাহিনীকে পালিয়ে আসতে দেখে হযরত আলী (রা) আপন পুত্রত্রয় হাসান, হুসায়ন ও মুহাম্মদকে সেদিকে পাঠান এই উদ্দেশ্যে যে, রাবীআ গোত্রও যেন সেখান থেকে পালিয়ে আসে। আলী (রা) আশতারকে নির্দেশ দেন যেন তিনি ডান পাশের পলায়নকারীদের গিয়ে বলেন, তোমরা এই মৃত্যু থেকে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ, যে মৃত্যুকে তোমরা কখনো নিজেদের বশে আনতে পারবে না। আশতার ঘোড়া হাঁকিয়ে ডান পাশের পলায়ন রত যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে আলী (রা)-এর ঐ পয়গাম শোনান এবং অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে তাদের বিবেকে আঘাত করে এমন কিছু কথা বলে তাদেরকে দাঁড় করান। এরপর তাদেরকে সাথে নিয়ে সিরীয়দের মুকাবিলায় আত্মনিয়োগ করেন। অপর দিকে বাম পাশের বাহিনীর অবস্থা সামাল দিতে স্বয়ং আলী (রা) এগিয়ে যান। রাবীআ গোত্রের লোকেরা যখন দেখে যে স্বয়ং আলী (রা) তাদের সাথে শরীক হয়ে তরবারি চালাচ্ছেন তখন তাদের সাহসও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

স্বয়ং আলী (রা)-কে লড়তে দেখে আবূ সূফিয়ানের গোলাম আহমার সেদিকে ধেয়ে এলো। কিন্তু আলী (রা)-এর গোলাম কায়সান অগ্রসর হয়ে তার সাথে মুকাবিলা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আহমারের হাতে কায়সান নিহত হয়। আলী (রা) নিজ গোলামকে এভাবে নিহত হতে দেখে আহমারের উপর হামলা চালান এবং রাগের বশে তাকে শূন্যে উঠিয়ে এমন জোরে মাটির উপর ছুড়ে মারেন যে, তার উভয় হাতই সঙ্গে সঙ্গে বেকার হয়ে পড়ে। সিরীয় বাহিনী আলী (রা)-কে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে তাঁর উপর হামলা চালায়। কিন্তু রাবীআ গোত্রের লোকেরা শক্ত হাতে হামলা প্রতিহত করে। তাই তারা আলী (রা)-এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। অপর দিকে আশতারও ডানপাশের বাহিনীর অবস্থা সামলে নেন। ফলে আলী (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে যে আশংকাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তা কেটে যায়। এবার উভয় বাহিনী একেবারে অনড় থেকে তরবারি চালাতে লাগলো। আসরের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। ঠিক আসরের সময় মালিক আশতার আমীরে মুআবিয়ার বামপাশের বাহিনীকে পিছনের দিকে হটিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর আত্মোৎসর্গের জন্য বায়'আতকারী বাহিনী নিজেদের বামপাশের বাহিনীর সহায়তা করে এবং আলী (রা)-এর ডানপাশের বাহিনীকে বেশ খানিকটা পিছনে হটিয়ে দেয়। তাঁর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবন হুসায়ন, যিনি হযরত আম্মার ইবন ইয়াসিরের সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন, কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হন। বিপক্ষ বাহিনী থেকে ওকবা ইবন হুদায়বা নুমায়রী অগ্রসর হয়ে তার মুকাবিলা করে। ওকবা নিহত হলে সিরীয়দের পক্ষ থেকে একটি অতি জোরদার হামলা চালানো হয়। ফলে ইরাকীদেরকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এতদসত্ত্বেও তারা নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকে। আলী (রা) ডানপাশের বাহিনীর সাহস বৃদ্ধি এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং বামপাশের বাহিনীর দিক থেকে ডানপাশে চলে আসেন। সেখানে অত্যন্ত জোরেসারে তরবারি

যুদ্ধ চলছিলো। অপর দিকে যুলকালা হিময়ারী ও উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) আলী (রা)-এর ডানপাশের বাহিনীর উপর এমন জোরে হামলা চালান যে, রাবীআ গোত্রের লোকেরাও তাদের অবস্থানে টিকে থাকতে পারেনি। সেখানে লাশের স্তূপ জমে উঠে। বামপাশের বাহিনীর এই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আবদুল কায়স অগ্রসর হয়ে রাবীআ গোত্রকে টিকিয়ে রাখেন এবং সিরীয়দের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করেন। এই সময়োপযোগী সাহায্যের কারণে বামপাশের বাহিনীর অবস্থা পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং তাতে যুলকালা ও আবদুল্লাহ্ ইবন উমর উভয়ই নিহত হন।

মোটকথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষের ডানপাশের ও বামপাশের তীব্র তরবারি যুদ্ধ চলে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই মধ্যবর্তী বাহিনী তখনো নীরব দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আম্মার ইয়াসির (রা) উচ্চৈঃস্বরে সকলকে সম্বোধন করে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং নিজের ধন ও জনের দিকে ফিরে যাবার ইচ্ছা না রাখে সে যেন আমার সাথে আসে। তিনি এই বলে এগিয়ে যান। তাঁর সাথে আরো অনেক লোক মারা অথবা মরার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি আলী (রা)-এর পতাকাবাহী হাশিম ইবন উতবার কাছে গিয়ে পৌঁছেন। হাশিমও পতাকা নিয়ে তাঁর সাথে এগিয়ে যান। আম্মার (রা) নিজের বিশেষ দলটি সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার মধ্যবর্তী বাহিনীর উপর হামলা চালান। তখন দিন শেষ হয়ে রাত ঘনিয়ে আসছিল। তাঁর ঐ হামলা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। আমর ইবনুল 'আস (রা) অত্যন্ত কষ্টে তা প্রতিরোধ করেন। তারপর ভয়ানক তরবারি যুদ্ধ শুরু হয় এবং আম্মার (রা) শহীদ হন।

আম্মার (রা)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আলী (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তারপর সিরীয় বাহিনীর প্রত্যেকটি অংশই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তরবারির ঝন্‌ঝনানি, বর্শা নিক্ষেপকারীদের হট্টগোল, কবিতা আবৃত্তির আওয়ায এবং যোদ্ধাদের তাকবীর ধ্বনিতে রাতের নীরবতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। এটা ছিল জুমুআর রাত যা 'লায়লাতুল হারীর' নামে খ্যাত। এই রাতে হযরত উয়ায়স কারনীও শহীদ হন। আলী (রা)-কে কখনো ডান পাশের বাহিনীতে, কখনো বামপাশের বাহিনীতে, আবার কখনো সম্মুখ বাহিনীতে তরবারি চালাতে দেখা যায়। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বামপাশের বাহিনী এবং আশতার ডানপাশের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অনুরূপভাবে আমীরে মুআবিয়া, আমর ইবনুল 'আস ও অন্যান্য অধিনায়ক সিরীয় বাহিনীকে সব সময় যুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন। এভাবে সারা রাত কেটে গেলে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জুমুআর দিন যুদ্ধ শুরু হল। এদিনও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকলো।

লায়লাতুল হারীরের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ঘটেছিল। হযরত আলী (রা) বার হাজার অশ্বারোহীর একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এত তড়িৎ বেগে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালান যে, একেবারে চোখের পলকে তিনি আমীরে মুআবিয়ার তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যান। তিনি তখন আমীরে মুআবিয়াকে ডেকে বলেন, মুসলমানদের হত্যা করিয়ে কোন লাভ নেই। এসো আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের মুকাবিলা করি। আমাদের মধ্যে যে জয়ী হবে সে-ই খলীফা হবে। এই আওয়াজ শুনে আমর ইবনুল 'আস (রা) আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, কথা তো ঠিকই, মুকাবিলার জন্য আপনার বের হওয়াই উচিত। তখন তিনি বললেন, তুমি এই সিদ্ধান্ত

তোমার নিজের জন্য পসন্দ করছ না কেন ? তুমি কি জান না যে, আলীর মুকাবিলার জন্য যে বের হয় সে আর ফিরে আসে না। অতঃপর হেসে বললেন, সম্ভবত তুমি আমাকে এজন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাচ্ছ যাতে আমি মারা যাই এবং এই সুযোগে তুমি সিরিয়ার বাদশাহ বনে বস। মোটকথা, আমীরে মুআবিয়ার পক্ষ থেকে আলী (রা)-কে কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। অগত্যা তিনি তাঁর বাহিনীতে ফিরে আসেন। জুমু'আর দিনও দুপুর পর্যন্ত যথারীতি যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ত্রিশ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে অনবরত যুদ্ধ চলছিল। এই সময়ের মধ্যে দুই পক্ষের প্রায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়। মুসলমানদের জন্য এর চাইতে দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে যে, এই ত্রিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের যে পরিমাণ সমরশক্তি ধ্বংস হল তার মাধ্যমে তারা এই পৃথিবী কেন, এরূপ কয়েকটি পৃথিবী অনায়াসে জয় করতে পারত। যখন সূর্য কিছুটা ঢলে পড়ল তখন মালিক আশতার নিজের অধীনস্থ বাহিনীর দায়িত্ব আয়ান ইবন জুযার উপর অর্পণ করে স্বয়ং অশ্বারোহীদের একটি দল পৃথক করে নিয়ে তাদেরকে সিরিয়াবাসীদের উপর জোরদার হামলা চালাতে এবং প্রয়োজনবোধে এজন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অশ্বারোহীরাও কথা দিল, হয় আমরা বিজয় লাভ করব, নয়ত প্রাণ দেব। অশ্বারোহীদের একটি অংশ হযরত আলী (রা)-এর কমান্ডে থাকল এবং বড় অংশটি আশতারের সাথে চলে গেল। এবার আশতার একটি অনুকূল অবস্থান থেকে সিরীয়দের উপর হামলা চালান। যুদ্ধের একটি চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য এ মুহূর্তটি ছিল আলী (রা)-এর বাহিনীর জন্য খুবই অনুকূল। কেননা গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন সিরীয় বাহিনীকে খুবই সজীব ও দুঃসাহসী মনে হচ্ছিল। ঐ দিন আলী (রা)-এর বাহিনীর অবস্থা সন্ধ্যা পর্যন্ত এতই নাজুক ছিল যে, মনে হচ্ছিলো পরাজয় বুঝি এদের ভাগ্যে রয়েছে। কিন্তু রাতের যুদ্ধে সিরীয়দের অধিক লোক নিহত হয়। আজ জুমু'আর দিন সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত যদিও উভয় বাহিনীকে 'সমানে সমান' মনে হচ্ছিল, কিন্তু সিরীয়দের অর্ধেক লোকই ইতিমধ্যে মৃত্যু বরণ করেছে। ফলে তাদের সংখ্যা আশি হাজার থেকে নেমে এখন পঁয়ত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। আলী (রা)-এর বাহিনীতে এ যাবৎ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল এবং তাদের মোট সংখ্যা এখনো ছিল ষাট হাজার। অর্থাৎ এখন তাঁর সৈন্য সংখ্যা মুআবিয়া (রা)-এর সৈন্য সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

এভাবে শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে নিজের বাহিনী থেকে বাছাই করা একদল সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর পিছন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া এবং তাদের উপর জয়লাভ করা আলী (রা)-এর পক্ষে খুবই সহজ ছিল। এই প্রেক্ষিতেই মালিক আশতার তার প্রাণ-উৎসর্গকারী অশ্বারোহীদের নিয়ে শত্রুর উপর ভয়ানক আক্রমণ চালান। অশ্বারোহীদের মাধ্যমে এই আক্রমণ পরিচালনা বাঞ্ছনীয়ও ছিল। কেননা যে পদাতিক বাহিনী একাধারে ত্রিশ বত্রিশ ঘন্টা যাবত যুদ্ধরত ছিল তারা নিঃসন্দেহে এরূপ ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মাধ্যমে জোরদার আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করা মোটেই সহজ ছিল না। অপর দিকে অশ্বারোহীদেরকে তখন পর্যন্ত কাজে খুব একটা লাগানো হয়নি। তাই পদাতিক সৈন্যদের অনুপাতে তারা ছিল অধিকতর সজীব। আশতার তড়িৎ বেগে শত্রুদের উপর হামলা চালান এবং শত্রুদের মধ্যবর্তী বাহিনীর কাছে পৌঁছে যান। আলী (রা) যখন আশতারকে সাফল্যজনক হামলা পরিচালনা করতে দেখেন এবং এও লক্ষ্য করেন যে, তার বাহিনীর পতাকা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে তখন তিনিও তার বাহিনী থেকে একের

পর এক ছোট ছোট অশ্বারোহী দল আশতারের সাহায্যে পাঠাতে থাকেন যাতে তার আক্রমণ কোনভাবেই ব্যর্থ না হয় এবং সার্বিক জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠে।

আলী (রা)-এর এই কৌশল অব্যর্থ প্রমাণিত হয়। সিরীয় বাহিনীর পতাকাবাহী আশতারের হাতে নিহত হয় এবং আমর ইবনুল 'আস ও মুআবিয়ার অবস্থান স্থলের সামনেই রক্তাক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। ঘোরতর যুদ্ধে উভয় বাহিনীর অবস্থানস্থল এমনভাবে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল যে, ডানপাশের ও বামপাশের বাহিনী আপন মধ্যবর্তী বাহিনীর সাথে মিশে গেল এবং একে অপরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠল। যদি ডানপাশের বাহিনীর ও বামপাশের বাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত এবং যুদ্ধের একটি কেন্দ্রভূমিও থাকত তাহলে আশতারের ঐ হামলা কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারত না। কেননা অনুরূপ অবস্থায় বাহিনীর একটি অংশের শক্তি অন্য অংশের দিকে সহজেই স্থানান্তরিত করা যেত এবং প্রধান সেনাপতিও নিজের বাহিনীকে রক্ষা করার একটা না একটা কৌশল বের করতে পারতেন। কিন্তু ঐ আক্রমণ এমন সঠিক সময়ে করা হয়েছিল যে, সিরীয় বাহিনীর সামনে পরাজয় বরণ ছাড়া অন্য কোন পথই খোলা ছিল না। সিরীয় বাহিনীর অধিনায়ক বিপক্ষ বাহিনীকে এভাবে এগিয়ে আসতে এবং আপন পতাকাবাহীকে এভাবে নিহত হতে দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। প্রতিপক্ষের সমগ্র সৈন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল এবং সেই হামলা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতাই তার বাহিনীর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তখনো সিরীয়রা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি, তবে তাদের পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটি কয়েক ঘন্টা নয়, বরং কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে আমর ইবনুল 'আস এমন একটি কৌশল আঁটলেন যে, যুদ্ধের ফলাফল সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

আলী (রা) আশতারের সফল আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে যেমন আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন, মুআবিয়া (রা) বাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তেমনি নিরাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। আমর ইবনুল 'আস মুআবিয়াকে বলেন, 'কী দেখছ, সকলকে নির্দেশ দাও যেন তারা অবিলম্বে নিজ নিজ বর্শায় কুরআন মজীদ গেঁথে তা উঁচু করে ধরে এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (আমাদের এবং তোমাদের মধ্যকার ফায়সালা এ কুরআনই করবে)। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে এই নির্দেশ দেওয়া হল এবং সিরিয়ার প্রত্যেকটি সৈন্য নিজ নিজ বর্শায় কুরআন গেঁথে তা উঁচিয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, আমরা কুরআনের ফায়সালা মানি। কোন কোন দিক থেকে এ আওয়াজ উঠল, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ। আমাদের যুদ্ধ তো ধর্মের জন্য। অতএব এসো, আমরা কুরআনের ফায়সালাই মেনে নেই এবং এখানেই যুদ্ধের ইতি টানি। কোন কোন দিক থেকে এ আওয়াজও উঠল, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ। এ কুরআনকেই হাকিম হিসাবে মেনে নাও। যুদ্ধে যদি সিরীয়রা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে রোমানদের আক্রমণকে কে প্রতিরোধ করবে ? আর যদি ইরাকীরা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে প্রাচ্যের আক্রমণকারীদের মুকাবিলা কে করবে ? আলী (রা)-এর সৈন্যরা কুরআনকে বর্শায় গেঁথে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা দেখে যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নিল। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) সিরীয়দের এই কৌশল লক্ষ্য করে বললেন, এতক্ষণ যুদ্ধ হচ্ছিলো, এবার প্রবঞ্চনা শুরু হল। আলী (রা) তাঁর লোকদের বুঝিয়ে বললেন, তোমরা এই মুহূর্তে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। কেননা শীঘ্রই

তোমরা জয়লাভ করবে। লোকেরা অনবরত যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যকার এই যুদ্ধকে তারা ইসলাম বিরোধী মনে করছিলো। তাই তারা যুদ্ধের পরিবর্তে আপোস-মীমাংসার ঐ আবেদনকে যথার্থ বিবেচনা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ তরবারি খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল। তখন পর্যন্ত উভয় বাহিনীর শক্তি সমান সমান বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। আলী (রা)-এর বাহিনীর বিজয় যে অতি নিকটবর্তী তা তিনি ও অন্যান্য অভিজ্ঞ সমরনায়ক যেমন বুঝতে পারছিলেন, সাধারণ সৈন্যরা তেমন বুঝতে পারছিল না। প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে তা বুঝে উঠার শক্তিও তাদের ছিল না। এ কারণেই আলী (রা)-এর বেশির ভাগ লোক সিরীয়দের ঐ ইচ্ছাকে তাদেরই প্রতিফলন এবং একান্ত সময়োচিত কর্মপন্থা বলে বিবেচনা করল। এ অবস্থা দেখে সাবাঈদের চোখও খুলে গেল। তারাও তৎপর হয়ে উঠল এবং আলী (রা)-এর চারপাশে একত্রিত হয়ে তাঁর উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যেন তিনি অবিলম্বে আশতারকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করে পিছনে ডেকে নিয়ে আসেন।

আশতার তার সাফল্যকে নিশ্চিত জেনে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু যারা আশতারকে পিছনে ডেকে নিয়ে আসা ও যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার দাবী উত্থাপন করেছিল তাদের সাথে সাধারণ সৈন্যরাও এসে যোগ দিতে থাকে। ফলে একদিকে লোকেরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং অপর দিকে সিরীয়রা সম্মিলিতভাবে আশতারের হামলা প্রতিরোধ করার সুযোগ পায়। উপরন্তু হযরত আলীকে তাঁর লোকেরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে সম্বোধন করে অশিষ্টের মত বলতে থাকে, যদি আপনি আশতারকে ফিরে আসার হুকুম না দেন তাহলে আমরা আপনার সাথেও সেই আচরণ করব যে আচরণ আমরা উসমানের সাথে করেছি। এই ভয়ানক অবস্থা দেখে আলী (রা) সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে আশতারকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, এখানে বিশৃঙ্খলার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। আশতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে গিয়ে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এল শান্তি ও নীরবতা। আশতার ফিরে এলে আলী (রা) তার কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন। আশতার অত্যন্ত আক্ষেপ করে বললেন, "হে ইরাকবাসী! যখন সিরীয়দের উপর তোমাদের বিজয় লাভ ছিল সুনিশ্চিত ঠিক তখনই তোমরা তাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিলে।" সাধারণ লোকের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যে, তারা আশতারের উপর হামলা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু আলী (রা)-এর ধমকে তা থেকে বিরত থাকে। এরপর আশআস্ ইবন কায়স আগে বেড়ে হযরত আলীর কাছে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! লোকেরা তো কুরআনকে তাদের ফায়সালাকারী মেনে নিয়েছে এবং যুদ্ধও বন্ধ হয়ে গেছে–। এখন যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি মুআবিয়ার কাছে গিয়ে তার ইচ্ছার কথা জানতে পারি। আলী (রা) তাকে অনুমতি দিলে তিনি আমীরে মুআবিয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কুরআনকে বর্শায় গেঁথে কি উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলে ? তিনি উত্তরে বলেন, আমরা এবং তোমরা উভয়ই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের হুকুম মেনে নেব। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করব এবং তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করবে। আর ঐ দুই ব্যক্তির কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হবে যে, তারা কুরআন মজীদ অনুসরণে এই

বিবাদের একটা মীমাংসা করবে। এরপর তারা উভয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আমরা উভয় পক্ষই তা মেনে নেব।

এরপর আশআস্ ইবন কায়স আলী (রা)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং আমীরে মুআবিয়ার কথা তাঁকে শোনান। আলী (রা)-এর চারপাশের লোকেরা একথা শুনে সমস্বরে বলে উঠল, আমরা এতে সম্মত আছি এবং এ ধরনের ফায়সালাই আমরা সমর্থন করি। এরপর আমীরে মুআবিয়া ও সিরিয়াবাসীদের জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে কাকে হাকিম নিযুক্ত করতে চাও ? তারা আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নাম বলল। এবার আলী (রা)-এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপিত হল। তিনি বললেন, এ কাজের জন্য আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাসকেই পসন্দ করি। কিন্তু তাঁর দরবারের লোকেরা বলল, তিনি হচ্ছেন আপনার আত্মীয়। আমরা এমন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী মনোনীত করতে চাই যার সাথে আপনার ও আমীরে মুআবিয়ার সমান সম্পর্ক রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা কাকে পসন্দ কর ? লোকেরা বলল, আবূ মূসা আশআরী (রা) এ কাজের জন্য সর্বাধিক যোগ্য বলে আমরা মনে করি। তিনি বললেন, আমি আবূ মূসা (রা)-কে নির্ভরযোগ্য মনে করি না। তোমরা যদি ইবনুল আব্বাসকে আমার আত্মীয় হওয়ার কারণে মনোনীত না কর তাহলে মালিক আশতারকে মনোনীত করে ফেল। তিনি আমার আত্মীয় নন। লোকেরা বলল মক্কী জীবন থেকেই হযরত আবূ মূসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গে ছিলেন। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। কিন্তু মালিক আশতার এই গুণাবলী থেকে বঞ্চিত। অতএব আমরা আবূ মূসার উপর তাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আবূ মূসা আশআরীই হযরত আলীর পক্ষের হাকিম নিযুক্ত হন। তখনো হযরত আলীর দরবারে এ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল—এমন সময় আমীরে মুআবিয়ার পক্ষ থেকে আমর (রা) অঙ্গীকারনামা লেখার জন্য সেখানে এসে হাযির হন।

অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধকরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন

আমর ইবনুল 'আস (রা) হযরত আলীর দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে অনুরোধ জানান এবং তখনই উভয় পক্ষের সম্মতিতে নিম্নলিখিত অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করা হয়।

আলী ইবন আবূ তালিব ও মুআবিয়া ইবন আবূ সূফিয়ানের মধ্যে এই অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করা হলো। আলী ইবন আবূ তালিব (রা) কূফাবাসী এবং ঐ সমস্ত লোকের পক্ষ থেকে, যারা তাঁর সাথে রয়েছেন, একজন মুনসিফ তথা মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান সিরিয়াবাসী এবং ঐ সমস্ত লোকের পক্ষ থেকে যারা তার সাথে রয়েছেন, একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছেন। আমরা আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর নির্দেশকে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী মেনে নিয়ে এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছুকে (আমাদের বিষয়াদি ফায়সালার ক্ষেত্রে) গুরুত্ব দেব না। আমরা 'আলহামদু' (সূরা ফাতিহা) থেকে আরম্ভ করে 'ওয়ান্নাস' (সূরা নাস) পর্যন্ত সমগ্র কুরআন যেসব কাজ করার নির্দেশ দেয় আমরা তাই করব এবং যে কাজ করতে নিষেধ করে আমরা তা থেকে বিরত থাকব।

দুই পক্ষের যে দু'জন প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন তারা হচ্ছেন আবূ মূসা আবদুল্লাহ্ ইবন কায়স আশআরী (রা) এবং আমর ইবনুল 'আস (রা)। এরা উভয়ে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যে নির্দেশ পাবেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবেন। আর যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নির্দেশ না পান তাহলে সেই সুন্নাত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন, যার উপর মুসলিম উম্মতের মতৈক্য রয়েছে।

এরপর উভয় হাকিম তথা আবূ মূসা আশআরী ও আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হয় যে, তাঁরা আল্লাহ্কে হাযির-নাযির জেনে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধের সঠিক ফায়সালা করবেন এবং মুসলিম উম্মাহকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না। এরপর উভয় হাকিমকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত ছয় মাসের সময় দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তাঁরা এই সময়ের মধ্যে যখন ইচ্ছা উভয় পক্ষকে অবহিত করে আওয়াজ নামক স্থানে (যা দামিশক ও কূফার ঠিক মধ্যস্থলে ও দুমাতুল জানদালের সন্নিকটে অবস্থিত) তাঁদের ফায়সালা শুনিয়ে দেবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন এবং একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় যে, যখন হাকিমদ্বয় তাঁদের চূড়ান্ত ফায়সালা শোনাবার জন্য আওযাজের দিকে রওয়ানা হবেন তখন আলী (রা) মাত্র চারশ' লোক নিয়ে কূফা থেকে আবূ মূসা আশআরীর সাথে আসবেন। অনুরূপভাবে আমীরে মুআবিয়া (রা) দামিশক থেকে মাত্র চারশ' লোক নিয়ে আমর ইবনুল 'আসের সাথে আসবেন। এই আটশো লোক যাদেরকে হাকিমদ্বয় তাঁদের চূড়ান্ত ফায়সালা শোনাবেন সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হবেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) আপন আপন বাহিনীর কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনানোর পর উভয় হাকিম বা প্রতিনিধির জানমাল ও পরিবার-পরিজনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে। এরপর অঙ্গীকার পত্রের দু'টি কপি তৈরি করা হয়। তাতে সাক্ষী ও যামিন হিসাবে স্বাক্ষর করেন হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আশআস্ ইবন কায়স, সা'দ ইবন কায়স হামদানী, ওয়ারাকা ইবন ইয়াহইয়া বাজালী, আবদুল্লাহ্ ইবন ফাহল আজালী, হুজর ইবন আদী আল-কিনদী, আবদুল্লাহ্ ইবন তুফায়ল আমিরী, উকবা ইবন যিয়াদ হাদরামী, ইয়াযীদ ইবন খুযায়মা তামীমী, মালিক ইবন কা'ব হামাদানী এবং আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে আবুল আওয়ার হাবীব ইবন মাসলামা, যুউল ইবন আমর উযরী, হামযা ইবন মালিক হামাদানী, আবদুর রহমান ইবন খালিদ মাখযূমী, সুমাইয়া ইবন ইয়াযীদ আনসারী, উতবা ইবন আবূ সূফিয়ান ও ইয়াযীদ ইবনুল হুর আবসী। উভয় কপি তৈরি হলে তার একটি আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর এবং অপরটি আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে সোপর্দ করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে সাক্ষী ও যামিন হিসাবে আশতারকে স্বাক্ষর করতে বললে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন। আশআস ইবন কায়স এজন্য তাকে চাপ দিলে উভয়ের মধ্যে চরম কথা কাটাকাটি হয়, তবে তা ফিতনার পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। অঙ্গীকারনামা সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পন্ন করতে চার দিন লেগে যায়। সফর মাসের ১৩ তারিখে অঙ্গীকারনামা উভয় হাকিমের হাতে অর্পণ করা হয়। এরপর উভয় বাহিনী সিফ্ফীনের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে কূফা ও

দামিশকের দিকে ফিরে যায়। আমীর মুআবিয়া ভালোয় ভালোয় দামিশকে পৌঁছতে সক্ষম হলেও আলী (রা)-এর সামনে ফিতনার আর একটি নতুন দরজা খুলে যায়।

খারিজী ফিতনা

হিজরী ৩৭ সনের ১৩ই সফর যখন হযরত আলী (রা) সিফ্‌ফীনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কূফা প্রত্যাবর্তনের সংকল্প নেন তখন কিছু লোক তাঁর কাছে এসে বলেন, আপনি কূফা প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে সিরীয়দেরকে আক্রমণ করুন। আলী (রা) বলেন, অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করার পর আমি কী করে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি ? এখন আমাদেরকে রমযান মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং আপোস-মীমাংসার পর যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, যুদ্ধের কথা চিন্তা করাও উচিত হবে না। একথা শুনে ওরা নীরবে তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। কিন্তু পৃথক হওয়ার পর তারা তাদের সমতাবলম্বী লোকদের প্ররোচিত করতে থাকে যেন তারা হযরত আলী (রা) থেকে পৃথক হয়ে নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নেয়। ফলে আলী (রা) যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে রওয়ানা হন তখন সমগ্র পথ জুড়ে তাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-ঝাটি ও কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। কেউ বলছিলো, মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করায় ভালই হয়েছে, কেউ বলছিলো মন্দ হয়েছে, কেউ বলছিলো, এ ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগ করা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ, কেউ বলছিল আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই এভাবে মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগের হুকুম দিয়েছেন। আবার কেউ বলছিল, এটাকে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারের সাথে তুলনা করা ঠিক হয়নি, আমাদের নিজেদের বাহুবলেই এর মীমাংসা করা উচিত ছিল।

আবার কেউ এই বলে আপত্তি উত্থাপন করছিলো যে, উভয় হাকিমের ন্যায়পরায়ণ হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। যদি তাঁরা ন্যায়পরায়ণ না হয়ে থাকেন তাহলে কেন তাদেরকে হাকিম মেনে নেওয়া হল ? আবার কেউ কেউ বলছিলো, আলী (রা) কর্তৃক যুদ্ধ মুলতবি রাখা এবং আশতারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ঠিক ছিল না। অতএব তার হুকুম মেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য মোটেই উচিত হয়নি। এর উত্তরে আবার কেউ কেউ বলছিলো, আমরা যেহেতু আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছি, অতএব তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম মান্য করা আমাদের জন্য ফরয। এর উত্তরে আবার কেউ কেউ বলছিলো, আমরা কখনো তাঁর কোন অন্যায় হুকুম মানব না, যে কোন হুকুম মানা না মানার ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। আমাদেরও বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ দু'টিকে ডিংগিয়ে আমরা অন্য কারো হুকুম মেনে নিতে পারি না। একথা শুনে আবার কেউ কেউ বলছিলো, আমরা আলী (রা)-এর সাথে রয়েছি এবং সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম মান্য করা আমাদের জন্য ফরয এবং এটাকে আমরা হুবহু শরীআত বলেই মনে করি। আমরা এটাও মনে করি যে, তাঁকে অমান্য করা কুফরী সমতুল্য। এভাবে কথা বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক মনযিলেই পরস্পরের মধ্যে গালাগালি, এমন কি হাতাহাতি চলতে থাকে। আপন বাহিনীর এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা নিরসনের জন্য আলী (রা) লোকদের নানাভাবে বোঝান, কিন্তু যেহেতু তাঁর বাহিনীর মধ্যে জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মত লোকের অভাব ছিল না– তাই বলতে গেলে তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে বাহিনী কূফা থেকে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় সিফ্‌ফীনে

পৌঁছেছিল ইতিমধ্যে তাদের উপর দিয়ে অনৈক্যের এক প্রলয়ংকারী ঝড় বয়ে গেছে। ফলে মত ও পথের দিক দিয়ে এখন তারা ছিন্ন ভিন্ন শতধা বিভক্ত। গোটা বাহিনীর মধ্যে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকার কথা ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাও নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এখন বহু সংখ্যক দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক দল উপদলই সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা ও পৃথক আকীদা পোষণ করছে। তারা প্রকাশ্যে একে অন্যের বিরোধিতা করছে, এমন কি একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতেও ইতস্তত করছে না।

কিন্তু এদের মধ্যে দু'টি দল ছিল বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তারা সংখ্যার দিক দিয়ে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার ক্ষেত্রেও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একটি দল আলী (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করত এবং তার আনুগত্য মোটেই জরুরী মনে করত না। অপর দলটি ছিল এদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা হযরত আলীকে ভুলত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করত, এমন কি তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের উপর প্রাধান্য দিতেও কসুর করত না। প্রথম দল 'খাওয়ারিজ' এবং দ্বিতীয় দল 'শী'আনে আলী' নামে পরিচিতি লাভ করে। একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এ সমস্ত লোকই ইমাম বা নেতা ছিল যারা আলী (রা)-কে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। তারা হযরত আলীকে বলেছিল, আপনি আশতারকে শীঘ্রই ফিরিয়ে আনুন এবং যুদ্ধ বন্ধ করুন। অন্যথায় আমরা আপনার সাথে সেই আচরণ করব যে আচরণ আমরা উসমানের সাথে করেছি। আলী (রা) তাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তোমরাই তো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিয়েছ এবং আপোস-মীমাংসাকেই পসন্দ করেছ। এখন আবার তোমরাই আপোস-মীমাংসা অপসন্দ করছ এবং আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ। কিন্তু তাঁর এ কথায় কেউই কান দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এরূপ ধারণ করল যে, কূফার নিকটবর্তী হওয়ার পর বার হাজার লোক আলী (রা)-এর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে 'হারূরার দিকে চলে গেল।

এটা ছিল 'খাওয়ারিজ'-এর দল। তারা হারূরায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আবদুল্লাহ্ ইবনুল কাওয়াকে তাদের নামাযের ইমাম এবং শীছ ইবন রিবঈকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করে। ইনি হচ্ছেন সেই শীছ ইবন রিবঈ, যাকে আলী (রা) সিফফীনের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকালে দুবার তার প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত করে আমীরে মুআবিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর প্রত্যেক বারই তিনি আমীরে মুআবিয়ার সাথে এমন রূঢ়ভাবে কথা বলেন যে, এরপর প্রতিনিধিদলকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এই দলটি হারূরায় নিজেদের সংগঠিত করে ঘোষণা দিল :

> বায়'আত শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী পুণ্য কাজে আদেশ দেওয়া এবং পাপ কাজে নিষেধ করা আমাদের জন্য ফরয। কোন খলীফা বা আমীর নেই। বিজয় লাভের পর আমরা যাবতীয় কাজ মুসলমানদের পরামর্শে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে সম্পাদন করব। আমীরে মুআবিয়া (রা) ও আলী (রা) উভয়ই সমান এবং উভয়ই অপরাধী।

খারিজীদের এই গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হযরত আলী (রা) অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের পরিচয় দেন। কূফায় প্রবেশ করে তিনি সর্বপ্রথমে ঐ সমস্ত লোকের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানান যারা সিফ্ফীন যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তিনি এই বলে তাদের সান্ত্বনা দেন যে, সিফফীন যুদ্ধে যারা নিহত

হয়েছেন তারা আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করেছেন। এরপর খারিজীদের বুঝিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে তাদের কাছে পাঠান। তিনি তাদের সেনাছাউনিতে গিয়ে পৌঁছে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে উল্টাপাল্টা তর্কবিতর্ক করে।

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে খারিজীদের তর্কবির্তক চলছিল। এমন সময় স্বয়ং আলী (রা) সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। প্রথমে তিনি ইয়াযীদ ইবন কায়সের তাঁবুতে যান। কেননা ঐ দলের উপর ইয়াযীদ ইবন কায়সের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। আলী (রা) ইয়াযীদের তাঁবুতে ঢুকে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করেন। এরপর তাকে ইসফাহান ও রায়-এর গভর্নর নিয়োগ করে সেই বৈঠকে যান, যেখানে ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে খারিজীরা তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিল। তিনি খারিজীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান ও নেতৃস্থানীয় কে ? তারা বলল, আবদুল্লাহ্ ইবন কাওয়া। তিনি আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তো আমার হাতে বায়'আত করেছিলে; এখন আমার বিরুদ্ধে চলে গেলে কেন? তারা বলে, আপনার অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে।

আলী (রা) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে ছিলাম না। তোমরাই তো যুদ্ধ বন্ধ করাকে অপরিহার্য মনে করেছিলে, যার ফলে আমি মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হই। তবে আমি উভয় মধ্যস্থতাকারীর নিকট থেকেই এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তারা পবিত্র কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। যদি তারা কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করেন তাহলে তো এতে ক্ষতির কিছু নেই। আর যদি তারা কুরআনের বিরুদ্ধে ফায়সালা করেন তাহলে আমরা কখনো তা মেনে নেব না। একথা শুনে খারিজীরা বলল, মুআবিয়া মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির ব্যাপারে অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করেছে। অতএব তাঁর ক্ষেত্রে হাকিম বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা মোটেই ঠিক হয়নি। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে এই মর্মে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে যে, সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। আলী (রা) বলেন, আমরা তো কোন মানুষকে হাকিম নিয়োগ করিনি। পবিত্র কুরআনই হচ্ছে প্রকৃত হাকিম। যাদেরকে হাকিম বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছে তারা আমাদেরকে তাদের নিজেদের নয় বরং কুরআনেরই ফায়সালা শোনাবে। এরপর খারিজীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলে, তাহলে এজন্য সুদীর্ঘ ছয় মাস সময় দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল ? আলী (রা) বলেন, হয়ত এই সময়ের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যকার মতবিরোধ আপনাআপনি শেষ হয়ে যাবে। মোটকথা, দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকে। খারিজীদের একজন নেতাকে আলী (রা) ইতিমধ্যে ইসফাহান এবং 'রায়-এর গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর কথাবার্তায়ও সাধারণ লোকেরা কিছুটা প্রভাবিত হয়। ফলে খারিজীরা সাময়িকভাবে হলেও চুপ হয়ে যায়। তারপর হযরত আলী (রা) তাদেরকে নম্রভাবে বলেন, চল এবার তোমরা কূফায় গিয়ে অবস্থান কর। এই ছয় মাসের মধ্যে তোমাদের বাহনগুলোও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যাবে। এরপর আমরা শত্রুর মুকাবিলায় বের হব। তারা তাঁর এ কথায় রাযী হয়ে গেল এবং তাঁর সাথে কূফায় এসে মধ্যস্থতাকারী হাকিমদের ফায়সালা শোনার অপেক্ষায় রইলো। আলী (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বসরায় প্রেরণ করেন। যেহেতু তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন তাই এখন তাঁকেই সেখানকার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আযরাজ নামক স্থানে সালিশদ্বয়ের সিদ্ধান্ত

যখন ছয় মাসের অবকাশ প্রায় সমাপ্তির পথে তখন হযরত আলী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে বসরা থেকে ডেকে পাঠান এবং শুরায়হ ইবন হানী আল-হারিফীর নেতৃত্বে চারশো লোককে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সাথে আযরাজের দিকে প্রেরণ করেন। ইবন আব্বাস (রা)-কে ঐ দলের সালাতের ইমাম নিয়োগ করা হয়। আলী (রা) শুরায়হ ইবন হানীকে বুঝিয়ে বলেন, যখন আযরাজে আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তখন তাকে বলো : সততা ও সত্যবাদিতা পরিত্যাগ করবেন না এবং কিয়ামতের কথা স্মরণ রাখবেন। অনুরূপভাবে হযরত মুআবিয়া (রা)-ও আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে চারশো লোক প্রেরণ করেন। এই ফায়সালা শোনার এবং আযরাজের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য মক্কা এবং মদীনার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও দাওয়াত করা হয়। তাঁরা মুসলমানদের মধ্যকার এই মতানৈক্য দূর করার প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করেননি। অতএব হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, সা'দ ইবন ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ সাহাবী বৈঠকে যোগ দেন। আযরাজে একত্রিত হওয়ার পর ফায়সালা শোনার জন্য লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ফায়সালা ঘোষণার পূর্বে সালিশদ্বয়ের তো এ ব্যাপারে পরস্পর মত বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মক্কা-মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্যও অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল।

আলী (রা) যখন আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে কূফা থেকে আযরাজের দিকে পাঠাচ্ছিলেন তখন খারিজীদের পক্ষ থেকে হারকূস ইবন যুহায়র এসে তাঁর কাছে নিবেদন করল, আপনি সালিসী ফায়সালা স্বীকার করে নিয়ে মস্তবড় ভুল করেছেন। এখনো তা থেকে বিরত হোন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আলী (রা) উত্তরে বলেন, আমি কখনো আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না। এ হচ্ছে সেই হারকূস ইবন যুহায়র, যে ছিল হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিদ্রোহীদের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং যখন খারিজীদলের অন্যতম নেতা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আবূ মূসা আশআরী (রা) কূফা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আলী (রা) তাঁর কাছে প্রতিদিন চিঠি পাঠাতে থাকেন। অনুরূপভাবে প্রতিদিন আমর ইবনুল 'আসের কাছেও মুআবিয়া (রা)-এর চিঠি আসতে থাকে। ব্যাপারটির দিকে উভয় হাকিমেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল। আলী (রা)-এর পত্রাদি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের নামে এবং আমীরে মুআবিয়ার চিঠি আমর ইবনুল 'আসের নামে আসত। আমর ইবনুল 'আসের সঙ্গীদের মধ্যকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল খুবই সন্তোষজনক। তারা সকলেই ছিল তাঁর অনুগত। তাদের কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করত না যে, মুআবিয়া (রা) আপনার কাছে কি লিখেছেন ? কিন্তু আলী (রা)-এর পাঠানো চারশো ব্যক্তিরই অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। তারা প্রতিদিন তাঁর চিঠি আসার সাথে সাথে ইবন আব্বাসের চারপাশে ভিড় জমাত এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করত, আলী (রা) আজ কি লিখেছেন ? ফলে তাঁর সব কথাই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ্যে জানাজানি হয়ে যেত। ইবন আব্বাস (রা) ভয়ানক বিপদের মধ্যে ছিলেন। উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি কিছু কিছু তথ্য গোপন রাখতে চাইতেন। কিন্তু তাতে লোকেরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হত। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁর প্রায় সকল সঙ্গীই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রকাশ্যে তাঁর

বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে যে; তিনি আলীর চিঠি গোপন করেন এবং আমাদের শোনাতে চান না।

যাহোক আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবায়র, আবদুর রহমান ইবনুল হাব্স, আবদুর রহমান ইবন আবদে ইয়াগূস যুহরী, আবূ জাহম ইবন হুযায়ফা, মুগীরা ইবন শু'বা, সা'দ ইবন ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি আযরাজে উপনীত হলে তাঁদের নিজের মধ্যে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আবূ মূসা আশআরী ও আমর ইবনুল 'আসও যোগদান করেন এবং ঐ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনেই তাঁদের পরস্পর কথাবার্তা শুরু হয়। আমর (রা) প্রথমে আবূ মূসাকে একথা স্বীকার করিয়ে নেন যে উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তাঁকে একথাও স্বীকার করিয়ে নেন যে, জ্ঞাতিভাই হওয়ার সুবাদে উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবী করার অধিকার মুআবিয়ার রয়েছে। এ দু'টি কথার বিরুদ্ধে আবূ মূসা (রা) কখনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি, বরং নির্দ্বিধায়ই তিনি তিনি তা স্বীকার করেন।

তারপর আমর ইবনুল 'আস (রা) খিলাফতের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) কুরায়শের একটি অতি অভিজাত ও প্রখ্যাত গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ভাই। তিনি একাধারে সাহাবী ও কাতিবে ওয়াহী (ওয়াহী লিপিবদ্ধকারী)। এই কথাগুলো শুনে আবূ মূসা (রা) বলে উঠেন, মুআবিয়ার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আলী (রা) ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকতে মুআবিয়ার হাতে খিলাফতের দায়িত্ব কীভাবে অর্পণ করা যেতে পারে? মুআবিয়ার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য তো আলী (রা)-এর মধ্যে আরো বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। যেমন, তিনি আত্মীয়তার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর অতি নিকটতম ব্যক্তি। তিনিও কুরায়শের একটি অভিজাত গোত্রের সাথে সম্পর্কিত এবং কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান, বীরত্ব, তাকওয়া প্রভৃতি গুণের দিক দিয়ে তো তিনি অনন্য। আমর (রা) বলেন, আমীরে মুআবিয়ার মধ্যে অধিকতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা রয়েছে। আর মূসা (রা) বলেন, তাকওয়া ও ঈমানদারীর মুকাবিলায় এই সমস্ত জিনিসের উল্লেখ করা চলে না। মোটকথা, এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমার তো অভিমত এই যে, আলী, মুআবিয়া উভয়কে খিলাফতের পদ থেকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কেই খলীফা বানানো উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) চোখ বন্ধ করে আপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এমনি সময়ে যখন নিজের নাম উচ্চারিত হতে শোনেন তখন চোখ খুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, আমি এতে সম্মত নই। আমর (রা) তখন বলেন, তাহলে তুমি আমার ছেলে আবদুল্লাহকে মনোনীত করছ না কেন?

আবূ মূসা বলেন, হাঁ, তোমার ছেলে আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত পুণ্যবান বটে, কিন্তু তুমি তাকে এই যুদ্ধে শরীক করে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছ। এভাবে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পরও যখন এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না যাতে উভয়ে একমত হতে পারেন তখন আমর (রা) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু মুআবিয়া ও আলীর পরস্পর বিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সমগ্র মুসলমান আজ ভয়ানক বিপদের মধ্যে পতিত, অতএব এটাই শ্রেয় যে, আমরা তাঁদের উভয়কেই পদচ্যুত করব, এরপর সমগ্র মুসলমানকে অধিকার দেব, যেন তারা

সম্পূর্ণ একমত হয়ে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে নিজেদের একজন খলীফা নির্বাচন করে। আমর (রা) আবূ মূসা (রা)-এর ঐ মত সমর্থন করেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাইরে গিয়ে সাধারণ্যে এই ফায়সালার কথা জানিয়ে দেওয়া হবে। যদিও উভয় হাকিমই এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু এই অভিমতও শংকামুক্ত ছিল না। কেননা আলী (রা) তাঁর পদচ্যুতিকে কখনো মেনে নিতে পারতেন না। তাছাড়া মুআবিয়া (রা)-ও তাঁর পিছনে সমগ্র সিরিয়ার সমর্থন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবীর পৃষ্ঠপোষকতা থাকার কারণে ঐ ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারতেন না। যাহোক, যখন ঘোষণা করা হল যে, এখনই সাধারণ সভায় উভয় হাকিমের ফায়সালা ঘোষণা করা হবে তখন অপেক্ষমাণ লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে একটি জায়গায় সমবেত হয়ে গেল। সেখানে একটি মিম্বরও রাখা হল এবং উভয় হাকিম অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে সেখানে এসে হাযির হলেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা

আমর ইবনুল 'আস (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে বলেন, আমাদের মধ্যে যে ফায়সালা হয়েছে তা সবাইকে শুনিয়ে দিন। আবূ মূসা আশআরী (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন।

> লোকেরা! আমরা উভয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শুধু একটি সিদ্ধান্তের উপরই ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এখন আমি তোমাদেরকে সেই সিদ্ধান্তই শুনিয়ে দিচ্ছি। আশা করি এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে মুসলমানদের মধ্যকার অনৈক্য দূর হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি এবং আমর ইবনুল 'আস যে সিদ্ধান্তের উপর একমত হয়েছি তা এই যে, আমরা এই মুহূর্তে আলী এবং মুআবিয়া উভয়কেই পদচ্যুত করলাম এবং তোমাদেরকে অধিকার দিলাম, তোমরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা, তোমাদের খলীফা নির্বাচিত করো।

আবূ মূসা আশআরী তাঁর ঘোষণা শেষ করে মিম্বর থেকে অবতরণ করেন। এরপর আমর ইবনুল 'আস (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বলেন :

> আপনারা সবাই সাক্ষী যে, আবূ মূসা আপন বন্ধু হযরত আলী (রা)-কে পদচ্যুত করেছেন। আমিও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত। আমিও আলী (রা)-কে পদচ্যুত করছি। তবে মুআবিয়া (রা)-কে আমি পদচ্যুত করছি না, বরং স্বপদেই বহাল রাখছি। কেননা তিনি অন্যায়ভাবে নিহত খলীফার নিকটজন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য।

যদি আমর ইবনুল 'আস (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর অভিমত পুরাপুরি সমর্থন করতেন এবং আমীরে মুআবিয়ার পক্ষে কিছু না বলতেন তা হলে পরে সালিশদ্বয়ের ফায়সালার যে বেইজ্জতী হয়েছে তা কখনো হত না। আবূ মূসা যা কিছু বলেছেন তাতে কিছু না কিছু দুর্বলতা বা ভ্রান্তি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে পক্ষপাতিত্ব ও অবিশ্বস্ততার লেশমাত্র ছিল না। এ ব্যাপারে তথায় সমবেত আটশ' মুসলমানের মধ্যেও সম্ভবত কোন মতানৈক্য হত না। কেননা উভয় হাকিমের পক্ষ থেকে একজন খলীফা নির্বাচনের অধিকার তো তাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যা কিছু ঘটেছিল তার সবই পরেও ঘটার ছিল এবং তা হয়ত মুসলমানদের জন্য আরো বেশী মারাত্মক হত। কেননা আলী (রা) কখনো তাঁর পদচ্যুতিকে মেনে নিতেন

না। অনুরূপভাবে মুআবিয়া (রা)-ও সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা এবং নিজের দাবী কখনো ত্যাগ করতেন না। আর তৃতীয় যে খলীফা বা আমীরকে এই জনসভা নির্বাচন করত তিনি আমীরে মুআবিয়া (রা) বা হযরত আলী (রা) থেকে অধিক শক্তিশালী হতে পারতেন না। এভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থলে তৃতীয় আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটত এবং মুসলমানদের ধ্বংস হত আরো ব্যাপকতর এবং আরো বেশী ত্বরান্বিত।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমীরে মুআবিয়া আপোস-মীমাংসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যদি তিনি একান্তই আপোস-মীমাংসা চাইতেন তাহলে সিফফীন প্রান্তরে ব্যাপকতর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যখন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন তিনি আপোস-মীমাংসার এই প্রস্তাব অর্থাৎ দুই পক্ষ থেকে দুইজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের আবেদন পেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি শুধু তখনই আপোস-মীমাংসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যখন তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অতএব তাঁর পক্ষ থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের প্রস্তাব এবং هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (এই কিতাবই আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবে) এই উক্তি ঘাড়ের উপর থেকে বিপদ দূর করা ও পরাজয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি যুদ্ধ কৌশল, একটি সামরিক প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিল না। অনুরূপভাবে আলী (রা)-ও মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের এই প্রস্তাব আনন্দচিত্তে মেনে নেননি। তিনি তো এর বিরুদ্ধে ছিলেন; লোকেরাই তাঁকে এজন্য বাধ্য করেছিল। তারাই হুমকি দিয়ে আশতারকে ফিরিয়ে এনেছিল এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়েছিল। অতএব আমর ইবনুল 'আস (রা) যদি সাধারণ সমাবেশে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করতেন এবং তাদের উভয়কে বরখাস্ত করতেন তবে তাঁরা উভয়ে তা মেনে নিতেন কি না এটা বিশ্বাস করা মোটেই সহজ ছিল না। যাই হোক সালিশদ্বয় জনতার সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আমর ইবনুল 'আসের বক্তব্য শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং অন্যরা আবূ মূসা (রা)-কে এই বলে দোষারোপ করতে শুরু করেন যে, আপনি প্রতারিত হয়েছেন। আবূ মূসা (রা) আমর ইবনুল 'আসকে এই বলে তিরস্কার করেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী মত প্রকাশ করেছ এবং আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। মোটকথা আমর (রা)-এর বক্তৃতার পর পরই সেখানে দারুণ হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়।

শুরায়হ্ ইবন হানী আমর ইবনুল 'আসকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেন। তিনি তা প্রতিহত করে শুরায়হের উপর পাল্টা আঘাত হানেন। ইতিমধ্যে লোকেরা তাদের মধ্যখানে এসে যায় এবং উভয়কেই যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করে। এ মজলিসে বিশৃঙ্খলা ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হওয়ার কারণেও আমীরে মুআবিয়া লাভবান হন এবং হযরত আলী হন ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা এই অবস্থায় সিরীয় ও ইরাকী উভয় দলের এই জায়গায় অবস্থান উভয় পক্ষের নেতাদের চোখেই ছিল বিপজ্জনক। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের আটশো মুসলমানের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, আর না গণ্যমান্য সাহাবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল আপোস-মীমাংসার ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা। আবূ মূসা আশআরী এবং আমর ইবনুল 'আস (রা)-ও অতিদ্রুত সেখান থেকে দামিশকের দিকে যাত্রা করেন। শুরায়হ ও আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে কূফা রওয়ানা হন। মক্কা ও মদীনা থেকে যে কয়জন গণ্যমান্য ব্যক্তি

এসেছিলেন তাঁরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হন। মোটকথা, অতি অল্প সময়েই মধ্যেই আযরাজের জনসমাবেশ কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

সিরীয়রা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে আমর ইবনুল 'আসের সঙ্গে দামিশকের দিকে যাচ্ছিল। এখান থেকেই তারা মুআবিয়া (রা)-কে আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন বলতে শুরু করে। দামিশক পৌঁছে সিরীয়রা তাঁকে সাফল্যের সুসংবাদ দেয় এবং সকলে মিলে তাঁর হাতে বায়'আত করে। কিন্তু ইরাকের লোক, যারা আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) ও শুরায়হ ইবন হানীর সাথে কূফার দিকে যাচ্ছিল তাঁদের অবস্থা ছিল সিরীয়দের ঠিক বিপরীত। তারা পরস্পর অনবরত কথা কাটাকাটি করছিল। কেউ আবূ মূসাকে দোষী সাব্যস্ত করছিল, আবার কেউ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছিল। কেউ আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল এবং মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর সম্মতি প্রদানকে একটি ভুল পদক্ষেপ আখ্যা দিচ্ছিল। কেউ কেউ আবার আমর ইবনুল 'আসের প্রতারণামূলক বক্তব্য প্রদানের উপর তাঁকে গালিগালাজ করছিল। মোটকথা, এই চারশ' লোকের অবস্থা ছিল ঠিক ঐ বাহিনীর মত যারা কিছু দিন পূর্বে সিফফীন থেকে আলী (রা)-এর সাথে কূফার দিকে যাচ্ছিল। যাহোক, কূফা পৌঁছার পর ইবন আব্বাস (রা) আলী (রা)-কে যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি আবূ মূসা এবং আমর ইবনুল 'আস উভয়ের সিদ্ধান্তকে কুরআন বিরোধী আখ্যা দিয়ে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং মুআবিয়া, আমর, হাবীব ইব্ন মাসলামা, আবদুর রহমান ইবন মুখাল্লাদ, দাহহাক ইবন কায়স, ওয়ালীদ ও আবুল আওয়ারকে অভিসম্পাত করেন। এই অভিশাপ প্রদানের খবর আমীরে মুআবিয়ার নিকট পৌঁছলে তিনিও আলীকে অনুরূপ অভিসম্পাত করেন। আর তখন থেকেই এ দু'পক্ষের পরস্পর অভিশাপ প্রদানের প্রচলন শুরু হয়।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ·

আযরাজের ঘটনায় আমীরে মুআবিয়ার এতটুকু উপকার হয় যে, যারা তাকে সমর্থন করত, ইতিপূর্বে তারা তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন বা 'মুসলমানদের খলীফা' বলত না, কিন্তু এখন থেকে তারা তাঁকে প্রকাশ্যে আমীরুল মু'মিনীন বলতে শুরু করে। কিন্তু আযরাজের ঘটনার ফলে নতুন কোন দল এসে তাঁর হাতে বায়'আত করেনি। আর হযরত আলী (রা) প্রথম থেকেই দ্বিগুণ অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। এখন সে অসুবিধা তিন গুণ বৃদ্ধি পেল। মুআবিয়া (রা)-ও সিরীয়দের দমন করা এবং খারিজীদের কাবুতে রাখা ও দু'টি দায়িত্ব তো প্রথম থেকেই তাঁর ঘাড়ে ন্যস্ত ছিল, এখন আবার তাঁর উপর ন্যস্ত হল তৃতীয় আর একটি কঠিন দায়িত্ব। তা হলো, স্বয়ং আপন বন্ধু-বান্ধব এবং অনুসারীদের একথা হৃদয়ঙ্গম করানো যে, উভয় হাকিম যেহেতু পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন, তাই তাদের কারো ফায়সালাই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া উভয় হাকিমকে পবিত্র কুরআন এ অধিকার দেয়নি যে, তাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম ছেড়ে নিজ নিজ ইচ্ছামত ফায়সালা করবে এবং জলাঞ্জলি দেবে। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত আলী (রা) কূফাবাসীদের একথাই বোঝাতে থাকলেন যে, যেহেতু উভয় হাকিমের ফায়সালাই মেনে নেওয়া যেতে পারে না তাই আমাদের উচিত সিরীয়দের উপর হামলা করা। যখন লোকেরা তাঁর একথা বুঝতে পারল এবং তিনি সিরিয়ার

উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন তখন খারিজীদের দল, যারা তখন কূফায় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, পুনরায় নিজেদের মত পরিবর্তন করল।

খারিজীদের বিশৃঙ্খলা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা) হাকিমদের ফায়সালা শোনার জন্য চারশ' লোককে আযরাজে পাঠানোর সময় হারকূস ইবন যুহায়র তাঁকে বলেছিল, আপনি এখনো মধ্যস্থতাকারীদের ফায়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সিরিয়ার উপর হামলা করুন। কিন্তু আলী (রা) তার একথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না এবং নিজেদের লিখিত প্রতিশ্রুতি থেকেও ফিরে আসতে পারব না। এখন যখন হারকূস ও অন্যান্য খারিজীরা দেখল যে, স্বয়ং আলী (রা) মধ্যস্থতাকারী হাকিমদের ফায়সালাকে অমূলক এবং অগ্রহণীয় প্রমাণ করে লোকদেরকে সিরিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করছেন তখন যুরআ' ইবনুল বারহ্ ও হারকূস ইবন যুহায়র এ দু'জন খারিজী নেতা আলী (রা)-এর কাছে এসে বলে, আপনি প্রথমে আমাদের সঠিক পরামর্শ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথচ এখন আপনি নিজেই সেই কাজ করছেন যার কথা আমরা আপনাকে বলেছিলাম। মধ্যস্থতাকারীদের ফায়সালার প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে আপনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু সে ভুল আপনি স্বীকার করেন নি। অথচ এখন আপনি মধ্যস্থতাকারীদের ফায়সালা অমূলক আখ্যা দিয়ে সিরিয়া আক্রমণের সংকল্প নিয়েছেন। অতএব এখন থেকে আমরা তখনই আপনাকে সমর্থন করব যখন আপনি আপনার ভ্রান্তি ও অপরাধ স্বীকার করে তা থেকে তওবা করবেন।

আলী (রা) উত্তরে বললেন, মধ্যস্থতাকারীদের সমর্থন এবং তাদেরকে হাকিম হিসাবে মেনে নিতে তোমরাই তো আমাকে বাধ্য করেছিলে। অন্যথায় যুদ্ধের মাধ্যমে তখনই তো একটা ফায়সালা হয়ে যেত। এটা কেমন কথা যে, এখন তোমরা আমাকে অপরাধী আখ্যা দিয়ে তওবা করতে বলছ। তারা বলল, আচ্ছা আমরা স্বীকার করছি যে, আমরা অপরাধ করেছি এবং এজন্য আমরাও তওবা করছি। আপনিও আপনার অপরাধের কথা স্বীকার করে সেজন্য তওবা করুন, এরপর সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হোন। আলী (রা) বললেন, আমি তো অপরাধের কথা স্বীকারই করছি না; অতএব তওবা করব কিসের জন্য ? একথা শুনে ওরা উভয়ে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াল এবং لَا حُكْمَ اِلَّا لِلّٰه (আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম মানি না) এই শ্লোগান দিতে দিতে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে চলে গেল। এরপর আলী (রা) কূফার মসজিদে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে মসজিদের এক কোণা থেকে এক খারিজী উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, لَا حُكْمَ اِلَّا لِلّٰه (আল্লাহ্ ছাড়া কারো সালিশ মানি না)। আলী (রা) তখন বললেন, দেখ, এই লোকেরা সত্য কথার দ্বারা বাতিলকে প্রকাশ করছে। এরপর তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলে পুনরায় আওয়াজ উঠে 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ্। আলী তখন বলেন, তোমরা আমার সাথে অত্যন্ত অসঙ্গত আচরণ করছ। আমরা তোমাদের মসজিদে আসতে বাধা দেই না। যতক্ষণ, তোমরা আমাদের সাথে ছিলে আমরা তোমাদের গনীমতের সম্পদের সমান ভাগ দিয়েছি। আর আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না যতক্ষণ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করবে। আমরা এখন তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা করছি– দেখি তিনি কি ফায়সালা করেন।

একথা বলে তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে আপন ঘরের দিকে চলে যান। তারপর খারিজীরাও পরস্পর সলা-পরামর্শের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহবের ঘরে একত্রিত হয়। সেখানে আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব, হারকূস ইবন যুহায়র, হামযা ইবন সিনান, যায়দ ইবন হুসায়ন তাঈ, শুরায়হ ইবন আদান প্রমুখ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এখন খারিজীদের উচিত কূফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন একটি পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করা, তথা আলীর হুকুমতের বাইরে গিয়ে নিজেদের একটি পৃথক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। হামযা ইবন সিনান আসাদী বলল, এখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমাদের উচিত, কোন এক ব্যক্তিকে আমীর মনোনীত করা এবং তার হাতে নিজেদের পতাকা তুলে দেওয়া।

এ কাজের জন্য পরদিন শুরায়হের ঘরে পুনরায় বৈঠক বসল। ঐ বৈঠকে আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহবকে খারিজীরা তাদের আমীর মনোনীত করল এবং তার হাতে বায়'আত করল। আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব বলল, এখন আমাদেরকে এখান থেকে এমন কোন শহরে চলে যেতে হবে যেখানে আমরা আল্লাহ্র হুকুম জারি করতে পারি। কেননা আমরাই হচ্ছি আহলে হক বা ন্যায়পন্থী। শুরায়হ্ বলল, মাদায়েনের দিকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। কেননা সেখানে যে সামান্য সৈন্য রয়েছে তাদেরকে পরাস্ত করে অতি সহজেই আমরা এলাকার উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। এরপর আমরা সেখানে আমাদের বসরায় অবস্থানরত ভাইদেরকেও ডেকে নিয়ে যাব। যায়দ ইবন হুসায়ন বলল, যদি আমরা সকলে একযোগে বের হই তাহলে এটা আশ্চর্য নয় যে, আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অতএব এটাই সমীচীন যে, আমরা দু' দু' চার চার বা দশ দশ জন হয়ে এখান থেকে বের হব এবং সোজা মাদায়েনে না গিয়ে প্রথমে নাহরাওয়ান প্রান্তরে গিয়ে সমবেত হব। তারপর পত্র মারফত বসরার ভাইদেরকেও সেখানে ডেকে নিয়ে যাব। এই অভিমত সকলেই পসন্দ করে। এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কূফা থেকে বের হয়। সেই সাথে তারা বসরার খারিজীদের কাছে লিখে, তোমরাও বসরা থেকে বের হয়ে নাহরাওয়ানে এসে আমাদের সাথে মিলিত হও। আশআর ইবন আযাকী তাইমী পাঁচশ' খারিজীর একটি দল নিয়ে বসরা থেকে বের হয়। আলী (রা) যখন জানতে পারলেন যে, বহু সংখ্যক খারিজী কূফা থেকে বের হয়ে মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে তখন তিনি সেখানকার শাসক সা'দ ইব্ন মাসউদের কাছে একজন দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে তাঁকে নির্দেশ দেন, খারিজীদের প্রতিরোধ কর এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। সা'দ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে খারিজীদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 'কুরজ' নামক স্থানে খারিজীদের একটি দলের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। রাতের অন্ধকারে খারিজীরা দজলা নদী অতিক্রম করে চলে যায়। এরপর বসরার খারিজীরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে। তাদের সাথেও সা'দের সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত তারাও দাজলা অতিক্রম করে নাহরাওয়ান নামক স্থানে গিয়ে নিজ দলের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয়। নাহরাওয়ানে খারিজীরা নিজেদের সুসংগঠিত করে নেয়। তারপর আলী (রা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর কুফরী ফতওয়া জারি করে এবং যারা 'হযরত আলী ন্যায়ের উপর রয়েছেন' একথা স্বীকার করত তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমন কি তা পঁচিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ

খারিজীরা কূফা থেকে চলে যাওয়ার পর আলী (রা) কূফাবাসীদের সিরিয়া আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি প্রথমে আমীরে মুআবিয়াকে সিরিয়া থেকে উৎখাত করতে চাচ্ছিলেন। তিনি সিরিয়া অভিযানের উপর খারিজী ফিতনাকে অগ্রাধিকার দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বসরায় ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে লিখেন, সিরিয়া অভিযানের জন্য যে পরিমাণ সৈন্য সরবরাহ সম্ভব অবিলম্বে তা পাঠিয়ে দাও। বসরা থেকেও খারিজীরা চলে গিয়েছিল এবং এটা হযরত আলীর পক্ষে ভালই হয়েছিল। কেননা এরা শহরে না থাকায় সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। বসরায় তখন ষাট হাজার যোদ্ধা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যখন ইবন আব্বাস (রা) লোকদেরকে আলী (রা)-এর চিঠি পড়ে শোনান এবং তাদেরকে সিরিয়া আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেন তখন তাদের মধ্য থেকে মাত্র তিন হাজার লোক তৈরি হয়, অবশিষ্টরা হযরত আলীর নির্দেশ যেন শুনেও শুনেনি। কূফার লোকেরাও যেন নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিল। বসরার ঐ তিন হাজার যোদ্ধা হারিছা ইবন কুদামার নেতৃত্বে কূফা পৌঁছলে আলী (রা) কূফাবাসীদের একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি সকলকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। শেষ পর্যন্ত কূফাবাসীরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং চল্লিশ হাজারেরও অধিক সৈন্য আলী (রা)-এর পতাকাতলে সমবেত হয়। তিনি খারিজীদেরও আর এক দফা তাঁর সাথে যুদ্ধে শরীক হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা সঙ্গত মনে করেন। তিনি নাহ্‌রাওয়ানে ইবন ওয়াহবের কাছে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন, তোমরা সিরীয়দের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের কাছে চলে এসো। আমি আমার প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিরীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ। ইবন ওয়াহব আলী (রা)-এর চিঠি তার সঙ্গীদের পড়ে শোনায় এবং সকলের পরামর্শ অনুযায়ী তার নিম্নোক্ত উত্তর দেয়–

> তুমি আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে মধ্যস্থতাকারী হাকিমদ্বয় নিয়োগ করেছিলে এবং এখন সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ। এটাও তুমি তোমার রিপুর তাড়নায় করছ। যদি তুমি তোমার নিজের কাফির হওয়ার কথা স্বীকার কর এবং সেজন্য তওবা কর তাহলে আমরা তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করতে রাযী নই।

এই চিঠি পাওয়ার পর আলী (রা) খারিজীদের সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হয়ে যান। কিন্তু তিনি তাঁর সিরিয়া অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করলেন না। তিনি খারিজীদের সঠিক পথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা কোন মতেই একটা আপোস-মীমাংসায় আসল না। তিনি যখন ওদেরকে বলতেন, তোমরাই তো আমাকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিলে, অতএব এখন কি করে তোমরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ, তখন ওরা বলত, আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করছি, তুমিও তোমার ভুল স্বীকার করে নাও। আমরা জানি যে, আমরা ভুল করে কাফির হয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু তওবা করে তো পুনরায় মুসলমান হয়েছি। এভাবে তুমিও তওবা করে মুসলমান হয়ে যাও। তাহলে আমরা তোমার উপর কূফরীর যে ফতওয়া দিয়েছিলাম তা উঠিয়ে নেব। অন্যথায় আমরা তোমাকে কাফির বলেই বিশ্বাস করব এবং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব।

এই সব পাগলামী কথাবার্তা উপেক্ষা করে আলী (রা) সিরিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব (র)-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌঁছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব (রা) এক সফরে ছিলেন। তিনি নাহরাওয়ানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খারিজীদের একটি দল জানতে পারেন যে, তিনি একজন সাহাবী। অমনি তারা এসে তাকে প্রশ্ন করে, আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি উত্তর দেন, তাঁরা উভয়েই পুণ্যবান এবং আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ছিলেন। এরপর তারা প্রশ্ন করে, আপনি উসমানের খিলাফতের প্রথম ও শেষ যুগ সম্পর্কে কি বলেন ? আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব (রা) উত্তর দেন, তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যপন্থী ও ন্যায়বান ছিলেন। তারপর তারা প্রশ্ন করে, আলী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগ করার পূর্বে এবং পরে কিরূপ ছিলেন ? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুমকে বোঝা এবং তার উপর আমল করার ব্যাপারে আলী (রা) তোমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী। খারিজীরা একথা শুনতেই রাগে বেসামাল হয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব, তাঁর স্ত্রী ও সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করে। আলী (রা) এই সংবাদ পেয়ে বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য হারছ ইবন মুররাকে সেখানে পাঠান। কিন্তু খারিজীরা তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সংবাদের সাথে সাথে আলী (রা)-এর কাছে এই সংবাদও পৌঁছে যে, খারিজীরা এখন যাকেই পায়, যে তাদের সমমতাবলম্বী নয় তাকেই হত্যা করে। এতে আলী (রা)-এর বাহিনীর লোকেরা এই ভেবে শংকিত হন যে, যদি তারা সিরিয়ার দিকে চলে যায় তাহলে সেই সুযোগে খারিজীরা কূফা, বসরা তথা সমগ্র ইরাক দখল করে নেবে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে হত্যা করবে। আলী (রা)-এর এই ধারণা জন্মে যে, খারিজীরা কূফা ও বসরা দখল করে নিয়ে সিরিয়ার উপর হামলা করে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হবে বেশি। অতএব তিনি সিরিয়া যুদ্ধ মুলতবি রেখে খারিজীদের দমনে রওয়ানা হন এবং নাহরাওয়ানের নিকটবর্তী হয়ে তাদের কাছে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান।

> তোমাদের মধ্যে যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছ তাদের আমাদের হাতে সমর্পণ কর। আমরা তাদেরকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করব এবং তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হব। যতক্ষণ আমরা সিরিয়া-যুদ্ধে লিপ্ত থাকব আশা করি সেই সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সত্য পথে নিয়ে আসবেন।

এরপর আলী (রা) একের পর এক বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য সাহাবীকে খারিজীদের কাছে পাঠান যাতে তারা ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি স্বয়ং খারিজীদের একদল প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠিয়ে অনেক নসীহত করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য তোমরাই দায়ী। যাহোক অতীতে যা কিছু ঘটেছে তা ভুলে যাও এবং আমার সাথে সিরিয়া অভিযানে চল। খারিজীরা প্রতিবারই ঐ একই উত্তর দেয় : নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে কাফির হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তওবা করে পরে আবার মুসলমান হয়েছি। এখন তুমিও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অপরাধ স্বীকার করে তওবা না করবে ততক্ষণ কাফিরই থেকে যাবে এবং অনুরূপ অবস্থায় আমরা সর্বক্ষণ তোমার বিরোধিতা

করতে থাকব। আলী (রা) বলেন আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি, হিজরত করেছি এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছি। এমতাবস্থায় কি করে নিজেকে কাফির বলব ? শেষ পর্যন্ত তিনি খোদ খারিজী বাহিনীর একেবারে সন্নিকটে চলে যান এবং তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ খারিজীরা তাঁর উপদেশে প্রভাবিত হতে পারে এই আশংকায় তাদের নেতারা উচ্চৈঃস্বরে তাদের অনুসারীদের এই বলে উপদেশ দিতে থাকে–

তোমরা কখনো আলীর কথা শুনবে না এবং তাঁর সাথে কথাও বলবে না। বরং তোমাদেরকে, একদিন যে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে ভয় কর– অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু করে দাও।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে আলী (রা) সেখান থেকে পিছিয়ে আসেন এবং নিজ বাহিনীকে বিন্যস্ত করে প্রত্যেকটি খণ্ড বাহিনীর জন্য এক একজন অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-কে পতাকা দিয়ে বলেন, আপনি এই পতাকা নিয়ে একটি উচ্চ ভূমিতে দাঁড়ান এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিন : 'যে ব্যক্তি যুদ্ধ না করে আমাদের কাছে আসবে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি কূফা অথবা মাদায়েনের দিকে চলে যাবে সেও নিরাপদ। এই ঘোষণা শুনে কিছু লোক কূফার দিকে এবং কিছু লোক মাদায়েনের দিকে চলে যায়। কিছু লোক এসে আলী (রা)-এর বাহিনীতেও যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত খারিজীদের বাহিনীতে এক-তৃতীয়াংশ লোক অবশিষ্ট থাকে। এই যুদ্ধে খারিজীদের প্রভাবশালী নেতা আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব, যায়দ ইবন হুসায়ন, হারকূস ইবন যুহায়র, আবদুল্লাহ্ ইবন শাজার, শুরায়হ্ ইবন আদানা প্রমুখ নিহত হয় এবং শুধু নয়জন খারিজী কোন মতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। হযরত আলী (রা) খারিজীদের লাশসমূহ দাফন না করে সেই অবস্থায়ই ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে আসেন।

ঐ যুদ্ধে বাহ্যত খারিজীদের সম্পূর্ণ শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই এখন আর ওদের দিক থেকে কোন আশংকা বাকী ছিল না। হযরত আলী (রা) নাহরাওয়ান যুদ্ধ শেষ করে যখন সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেন তখন আশআস ইবন কায়স তাঁর কাছে নিবেদন করে : আপনি অনুগ্রহ করে আপাতত সিরিয়া অভিযান মুলতবি রেখে সৈন্যদেরকে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিন। কিন্তু তিনি একথা পসন্দ করেন নি। তিনি নাখীলায় এসে অবস্থান নেন এবং নির্দেশ দেন, সিরীয়দের উপর বিজয় লাভ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন কেউ কূফায় না যায়। কিন্তু লোকেরা তাঁর এই নির্দেশ মানেনি। তারা ছাউনি ত্যাগ করে নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। আলী (রা) যখন দেখেন যে, ছাউনি একেবারে শূন্য হয়ে গেছে তখন তিনি নিজেও কূফায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে সব নেতাকে একত্রিত করে তাদের কাছে এই দায়িত্বহীনতা ও আরামপ্রিয়তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর কথা শুনে এবং সিরিয়া আক্রমণের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে বাকী সবাই নীরব থাকে। এরপর তিনি সকলকে একত্রিত করে সিরিয়া অভিযানের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। সকলে তাঁর বক্তৃতা নীরবে শুনল বটে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না। তিনি এই অবস্থা দেখে নীরব থাকতে বাধ্য হন। এরপর তিনি আর সিরিয়া আক্রমণ করতে পারেন নি।

মিসরের অবস্থা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সিফফীন যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর মিসরের গভর্নর ছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে বা মুআবিয়া (রা)-এর বিপক্ষে কোন ভূমিকা

পালন করতে পারেন নি। কেননা তিনি তখন উসমান-ভক্তদের সাথে আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তথাকথিত উসমান-ভক্তরা মুআবিয়া ইবন খাদীজকে তাদের নেতা মনোনীত করে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের সাথে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। তারা কয়েকটি যুদ্ধে বিজয় লাভও করেছিল। সিফফীন যুদ্ধের পর আলী (রা) প্রথমে মালিক আশতারকে জাযীরার শাসক নিয়োগ করে পাঠান, কিন্তু কয়েক দিন পর পুনরায় তাকে মিসরের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ যখন এ সংবাদ পান যে, মালিক আশতার মিসরের শাসক হয়ে আসছেন তখন তিনি দুঃখিত হন। অনুরূপভাবে মুআবিয়াও এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেননা তিনি মালিক আশতারকে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবেই জানতেন। তিনি সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন যে, মালিক আশতার মিসরের ক্ষমতায় একবার বসে গেলে অবস্থা তার (মুআবিয়া) জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে মালিক আশতার মিসরে পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন। ফলে মুহাম্মদই যথারীতি মিসরের শাসক থেকে যান। মালিক আশতারের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আলী (রা) মুহাম্মদের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন, আমি মালিক আশতারকে মিসরের গভর্নর পদে এজন্য নিয়োগ করিনি যে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, বরং সে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এমন কিছু রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা করতে পারত যা মিসর সরকারের জন্য ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি যখন পথিমধ্যেই ইনতিকাল করেছেন তখন তুমিই মিসর প্রশাসনের জন্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তোমার উচিত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করা। ঐ পত্রের উত্তরে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর লিখেন, আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। মধ্যস্থতাকারী হাকিমদের ফায়সালা ঘোষণার পূর্বেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল। যখন আযরাজ নামক স্থানে শালিসদ্বয়ের ফায়সালা ঘোষিত হল তখন সিরিয়াবাসীরা আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করে। ফলে তাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু তিনি মুআবিয়া ইবন খাদীজের কাছে, যিনি মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, চিঠিপত্র লিখে তাকে তার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিতে থাকেন। তখন ইবন খাদীজ মুআবিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনিও মনে মনে তাই কামনা করছিলেন। তিনি অবিলম্বে আমর ইবন 'আসকে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে মিসরের দিকে প্রেরণ করেন। সেই সাথে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের নামে তিনি একটি চিঠিও লিখে দেন। আমর (রা) মিসরের সন্নিকটে পৌঁছে নিজের একটি চিঠির সাথে মুআবিয়া (রা)-এর চিঠিটিও মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ উভয় পত্রই আলী (রা)-এর কাছে কূফায় পাঠিয়ে দেন। আলী (রা) জনসাধারণকে একত্রিত করে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেন। মাত্র দু'হাজার লোক মিসর অভিযানের জন্য তৈরি হয়। অগত্যা তিনি তাদেরকেই মালিক ইবন কা'বের নেতৃত্বে মিসরের দিকে প্রেরণ করেন। ওদিকে মুহাম্মদ দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী কিনানা বিশরির নেতৃত্বে আমর ইবনুল 'আসের মুকাবিলায় প্রেরণ করেছিলেন। সিরীয়দের মুকাবিলা করতে গিয়ে কিনানা নিহত হন, তার কিছু সঙ্গী মারা যায় এবং কিছু এদিক-ওদিক পলায়ন করে।

এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সংকল্প নেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা সিরীয়দের সম্পর্কে এতই ভীত হয়ে পড়ে যে, যুদ্ধের পূর্বেই তারা তার সঙ্গ

ছেড়ে চলে যায়। মুহাম্মদ তখন নিজেকে একেবারে একাকী পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে জাবালা ইবন মাসরূকের ঘরে আশ্রয় নেন। তখন সিরীয় বাহিনী এবং মুআবিয়া ইবন খাদীজের সঙ্গীরা জাবালার 'ঘর' চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুহাম্মদ জীবনের আশা থেকে নিরাশ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করতে করতে বন্দী হন। মুআবিয়া ইবন খাদীজ তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর লাশ একটি মৃত ঘোড়ার চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। আলী (রা)-এর গোয়েন্দা আবদুর রহমান ইবন শাবাত ফাযারী সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁকে উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তখনই মালিক ইবন কা'বকে ফেরত আনার জন্য লোক প্রেরণ করেন। ওদিকে মালিক ইবন কা'ব কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে হাজ্জাজ ইবন আরাফা আনসারীর সাথে তার দেখা হয়। হাজ্জাজ মিসর থেকে আসছিলেন। তিনি মুহাম্মদের মৃত্যু এবং আমর ইবনুল 'আস কর্তৃক মিসর দখলের কথা মালিক কা'বকে বলেন। ইতিমধ্যে আলী (রা) কূফাবাসীদের একত্রিত করে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি তাদেরকে দোষারোপ করে বলেন, তোমাদেরই অকর্মণ্যতা ও নিস্পৃহতার কারণে মিসর দেশটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু এই বক্তৃতা শুনেও কূফাবাসীরা চুপ থাকে। আলী (রা) শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মিসর ও সিরিয়ার চিন্তা ছেড়ে দেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর হিজরী ৩৮ সনে মিসরে নিহত হন।

অন্যান্য প্রদেশও দখলের চেষ্টা

মিসর দখলের পর আমীরে মুআবিয়ার সাহস অনেক বেড়ে যায়। এবার তিনি বসরা দখলের চেষ্টা করেন। বসরার পরিস্থিতিও ছিল মিসরেরই অনুরূপ। জামাল যুদ্ধের কারণে অনেক বসরাবাসী আলী (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তারা উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াও জরুরী মনে করত। মুআবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন হাদরামীকে বসরার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বলেন, যেসব লোক আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াকে জরুরী মনে করে তুমি তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর, তাদের মন জয়ের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাক এবং কূট-কৌশলের মাধ্যমে বসরা দখল করে নাও। ইবনুল হাদরামী যখন বসরায় পৌঁছে তথাকার শাসক আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস সেখানে ছিলেন না। তিনি কোন কারণে হযরত আলীর কাছে গিয়েছিলেন। এটা ছিল ইবনুল হাদরামীর জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। বসরার একটি শক্তিশালী দল তার পক্ষে চলে আসে। কূফায় আলী (রা)-এর কাছে যখন এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি আয়ান ইবন দাবীয়াকে সেখানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন, যেভাবে পার, ইবনুল হাদরামীর চারপাশে যারা সমবেত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা কর। আয়ান চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন। ফলে ইবনুল হাদরামী হিজরী ৩৮ সনের শেষ দিকে বসরায় নিহত হয়।

হিজরী ৩৯ সনে ফারিসবাসীরা যখন দেখতে পেল যে, বসরাবাসীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে, সেখানকার কিছু লোক আলীর প্রতি সহানুভূতিশীল, আবার কিছু লোক মুআবিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল তখন তারা বিদ্রোহ করে তাদের গভর্নর সুহায়ল ইবন হানীফকে সেখান থেকে বের করে দেয়। আলী (রা) বসরার গভর্নর ইবন আব্বাসকে লিখলেন, যিয়াদকে

ফারিসের প্রশাসক নিয়োগ করে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দাও। যিয়াদ ফারিস পৌঁছে তরবারির জোরে সেখানকার লোকদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন।

মুআবিয়া (রা) যখন জানতে পারেন যে, লোকেরা আলী (রা)-এর কথায় খুব একটা কান দিচ্ছে না, তার সাথে যুদ্ধে যেতে রাযী হচ্ছে না, এমন কি এখানে সেখানে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে তখন তিনি এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেন। তিনি বদান্যতা, ক্ষমা, উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি সকলের জন্য তাঁর ঔদার্য ও বদান্যতার দরজা এমনভাবে খুলে দেন যে মদীনা, তায়িফ, ইয়ামন প্রভৃতি স্থান থেকে লোকেরা দলে দলে দামিশকে এসে তার দরবারে ভিড় জমাতে থাকে। মুআবিয়া (রা) নু'মান ইবন বশীরকে আইনুত তামরের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানকার গভর্নর মালিক ইবন কা'বের কাছে আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য না পৌঁছায় নু'মান সহজেই 'আইনুত তামর' দখল করে নেন। মুআবিয়া (রা) সুফিয়ান ইবন আওফকে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করেন। সুফিয়ান আনবার, মাদায়েন প্রভৃতি অঞ্চলের ধন-সম্পদ যতটুকু সম্ভব লুটে নিয়ে দামিশক অভিমুখে রওয়ানা হয়। আলী (রা) এই সংবাদ পেয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু তার নাগাল পাননি।

ইরাক ও ইরানেই আলী (রা)-এর খিলাফত সীমিত হয়ে পড়লো

অনুরূপভাবে আমীরে মুআবিয়া (রা) বুসর ইবন আরতাতকে হিজায ও ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করেন। মদীনাবাসীরা আমীরে মুআবিয়ার হাতে বায়'আত করে। তারপর মক্কাবাসী ও ইয়ামনবাসীরাও মদীনাবাসীদের অনুসরণ করে। ইয়ামনের রাজধানী সানআ' থেকে হযরত আলীর সমর্থক গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসকে বের করে দেওয়া হয়। মোটকথা, হিজরী ৪০ সনের প্রথম দিকেই ইয়ামন, হিজায, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর প্রভৃতি রাজ্যে আমীরে মুআবিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমস্ত অঞ্চলে না ছিল কোন বিদ্রোহ, না ছিল কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা, আর না ছিল কোনরূপ প্রশাসনিক দুর্বলতা। মক্কা-মদীনা উভয় শহরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ঐ দুই শহরে না হযরত আলীর হুকুমত ছিল, আর না মুআবিয়ার। এ ব্যাপারে তাঁরা উভয়েই সম্মত ছিলেন। ইরাক ও ইরান ছিল আলী (রা)-এর অধিকারভুক্ত। তবে ইরাকের আরব সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বেশ কিছু লোক এমনও ছিল যারা আলীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। অনুরূপভাবে ইরানেও ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ধারা অব্যাহত ছিল। ইরানের অগ্নি উপাসকরা এই সুযোগে তাদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিল। কূফা ও বসরার মত দু'টি কেন্দ্রীয় শহরেও কিছু লোক এমন ছিল যারা আলী (রা)-এর পরিবর্তে বরং মুআবিয়ার প্রতিই ছিল সহানুভূতিশীল। আলী (রা) আপন বীরত্ব ও নির্ভীকতা দ্বারা অনেক কিছুই করতে চাচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর খিলাফতকে ইসলামী বিশ্বের একক খিলাফতে পরিণত করতে। কিন্তু প্রধানত তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ছিল কাপুরুষ ও অবাধ্য। ফলে তিনি আশানুরূপ কিছুই করতে পারছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলী (রা)-এর বাহিনীতে ছিল অনারবদের আধিক্য, অপরদিকে মুআবিয়ার বাহিনীতে ছিল আরবদের আধিক্য। হিজায ও ইয়ামনের শাসনক্ষমতা হস্তগত করার পর আমীরে মুআবিয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও আলী (রা)-এর ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব ও মর্যাদা এতই উঁচু ছিল যে, তাঁর সামনে মুআবিয়া (রা) নিজেকে কিছুটা দুর্বল মনে করতেন। আর এ কারণেই তিনি সব সময় আলী (রা) সম্পর্কে আতংকিতও থাকতেন।

বসরা থেকে ইবন আব্বাস (রা)-এর বিদায়

ঐ সময়ে অর্থাৎ হিজরী ৪০ সনের প্রথম দিকে আর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বসরার শাসনক্ষমতা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আবুল আসওয়াদ ইবন আব্বাস (রা)-এর উপর এই মর্মে একটি মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তিনি (ইবন আব্বাস) তাঁর (আবুল আসওয়াদের) অনুমতি ছাড়া বায়তুল মাল থেকে অর্থ খরচ করেছেন। তিনি বসরা থেকে বিষয়টি লিখিতভাবে আলী (রা)-কে জানান। এজন্য আলী (রা) আবুল আসওয়াদকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেন, এ ধরনের তথ্যাদি পাঠানো এবং গভর্নরগণের পদঙ্খলন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা নিশ্চয়ই তোমার আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার লক্ষণ। অপর দিকে তিনি ইবন আব্বাসকে লিখেন, আমার কাছে তোমার সম্পর্কে এই এই অভিযোগ এসেছে, তোমার কাছে এর কি উত্তর রয়েছে ? ইবন আব্বাসের পত্রে আবুল আসওয়াদের কোন উল্লেখ ছিল না। তিনি উত্তরে লিখেন, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি যে মাল খরচ করেছি তা ছিল আমার ব্যক্তিগত। এর সাথে বায়তুল মালের কোন সম্পর্ক ছিল না। আলী (রা) এর উত্তরে লিখেন, ওটা তোমার ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে থাকলে আমাকে বলো, তুমি এটা কোথা থেকে এবং কিভাবে পেয়েছিলে এবং কোথায় রেখেছিলে ? উত্তরে ইবন আব্বাস (রা) লিখেন, আমি এ ধরনের গভর্নরের পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। আপনি যাকে সমীচীন মনে করেন তাকেই বসরার শাসনকর্তা করে পাঠিয়ে দিন। আমি যা খরচ করেছি তা ছিল আমার ব্যক্তিগত মাল এবং আপন ইচ্ছামত তা খরচ করার অধিকার আমার ছিল। এই পত্র লিখেই তিনি তাঁর সফরের আয়োজন করেন এবং বসরা থেকে রওয়ানা হয়ে সোজা মক্কা মুআয্‌যমায় চলে যান।

ঐ সময়ে যখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বসরার শাসনক্ষমতা ছেড়ে মক্কা মুআয্‌যমায় চলে গিয়েছিলেন তখন আলী (রা)-এর ভাই আকীলও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যান। মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য যথাযোগ্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। আকীলের এভাবে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আলী (রা)-কে গভীরভাবে মর্মাহত করে। তিনি মুআবিয়ার মুকাবিলা করা খুবই জরুরী মনে করেন। তিনি কূফাবাসীদেরকে সিরিয়া আক্রমণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এবার কূফাবাসীদের উপর তাঁর বক্তৃতার প্রভাব এমন গভীরভাবে পড়ে যে, প্রায় ষাট হাজার কূফাবাসী তাঁর হাতে এই মর্মে বায়'আত করে যে, তাদের দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তারা তাঁকে ত্যাগ করবে না এবং শত্রুদের তারা হয় মারবে, নয়ত নিজেরাই মরবে। এই ষাট হাজারের উপর আরো সৈন্য এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। খারিজীদের সামরিক শক্তি নাহরাওয়ানেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অতএব বাহ্যত এখন তাদের দিক থেকে আশংকার কোন কারণ ছিল না।

তিন নেতার হত্যায় খারিজীদের ভয়ংকর পরিকল্পনা

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, নাহরাওয়ান যুদ্ধে শুধু নয়জন খারিজী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তারা ছিল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তারা প্রথমে পারস্যের বিভিন্ন এলাকায় আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কিন্তু তাতে সাফল্য লাভ করতে না পেরে তারা ইরাক ও হিজাযে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবন মুলজিম মুরাদী, বারক ইবন আবদুল্লাহ্ তামীমী ও আমর ইবন বকর তামীমী এই তিন ব্যক্তি মক্কা মুআয্যমায় একত্রিত হয় এবং আপোসে নাহরাওয়ানের নিহতদের স্মরণ করে আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করে। এরপর তারা এ ব্যাপারে একমত হয় যে, যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্তমানে ইসলামী বিশ্বকে উত্তপ্ত করে রেখেছে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তিন জন এ কথায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তারপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আবদুর রহমান ইবন মুলজিম মুরাদী মিসরী আলী (রা)-কে, বারক ইবন আবদুল্লাহ্ তামীমী মুআবিয়া (রা)-কে এবং আমর ইবন বকর তামীমী সা'দ মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবন 'আস (রা)-কে হত্যা করবে। আর তিনটি হত্যাকাণ্ডই হবে একই দিনে ও একই সময়ে। অর্থাৎ ১৬ই রমযান শুক্রবার ঠিক ফজরের সময়। এরপর ওরা তিনজন যথাক্রমে কূফা, দামিশক ও মিসরে চলে যায়।

রমযান মাসের ঐ নির্দিষ্ট দিনে বারক ইবন আবদুল্লাহ তামীমী দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করে। মুআবিয়া (রা) যখন ফজরের নামাযের ইমামতি করছিলেন তখন তাঁকে আঘাত করে এবং আঘাত ঠিকমত লেগেছে মনে করে সেখান থেকে দৌড়ে পালায়। কিন্তু তাকে বন্দী করা হয়। ঐ আঘাতে মুআবিয়া আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তা তেমন মারাত্মক ছিল না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী বারককে ঐ মুহূর্তেই এবং অপর বর্ণনা অনুযায়ী কয়েক বছর বন্দীশালায় রেখে কোন এক সময় হত্যা করা হয়। মুআবিয়া (রা) এ ঘটনার পর থেকে মসজিদে একটি সংরক্ষিত স্থান নির্মাণ করান এবং যথারীতি পাহারারও ব্যবস্থা করেন। ঐ নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে আমর ইবন বকর মিসরের মসজিদে প্রবেশ করে খারিজা ইবন আবী হাবীবাকে আমর ইবনুল 'আস মনে করে তরবারির একটিমাত্র আঘাতে হত্যা করে ফেলে। ঘটনাচক্রে ঐদিন আমর (রা) অসুস্থ থাকায় তার পরিবর্তে খারিজা নামীয় জনৈক সামরিক অফিসার মিসরের মসজিদে ফজরের নামাযের ইমামতি করছিলেন। একই দিনে ও একই সময়ে আবদুর রহমান ইবন মুলজিম মসজিদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-এর উপর হামলা চালায়। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন, যার ফলে মাত্র দু'দিন পর অর্থাৎ হিজরী ৪০ সনের ১৭ই রমযান তিনি ইনতিকাল করেন। এই দুঃখজনক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইবন মুলজিম কূফায় এসে তার বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু কারো কাছে তার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেনি। শেষ পর্যন্ত সে শাবীব ইবন শাজারাহ আশজাঈ নামীয় জনৈক বন্ধুকে নিজের গোপন উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে তার সাহায্য কামনা করে। সে তার কাছে পরিষ্কার বলে আমরা নাহরাওয়ানের নিহতদের বদলা নিতে আলী (রা)-কে হত্যা করতে চাই। প্রথমে শাবীব তাকে তার এ সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তাকে সাহায্য প্রদানে সম্মত হয়। তামীম গোত্রের দশ ব্যক্তি, যারা খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন কূফায় থাকত তারা আলী (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।

ইবন মুলজিম ঐসব লোকদের সাথে মেলামেশা করতে প্রায়ই ওদের ঘরে যেত। সেখানেই সে কাতাম' নাম্নী এক অতি সুন্দরী নারীকে দেখতে পায়। কাতামের পিতা এবং কাতামের কাছে তার বিয়ের পয়গাম পাঠায়। তখন কাতাম বলে, তুমি যদি প্রথমে মাহর পরিশোধ করে দাও তাহলে আমি বিয়ের জন্য তৈরি আছি। তার কাছে মাহরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তরে বলল, তিন হাজার দিরহাম, একটি দাসী, একটি দাস এবং আলীর কর্তিত মাথা হচ্ছে আমার মাহর। ইবন মুলজিম তো এসেই ছিল আলী (রা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। অতএব সে বিনা-দ্বিধায় বলে উঠল, শুধু সর্বশেষ শর্তটিই আমি পূরণ করতে পারি। বাকি শর্তগুলো এখনই পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কাতাম বলল, যদি তুমি শেষ শর্তটি পূরণ করে দাও তাহলে আমি প্রথম শর্তগুলো ছেড়ে দেব। ইবন মুলজিম বলল, যদি আমি সত্যি সত্যি আলী (রা)-কে হত্যা করতে সক্ষম হই তাহলে তুমি একথা কোথাও প্রকাশ করতে পারবে না। কাতাম তা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিল এবং ইবন মুলজিমকে তার কাজে সাহায্য করার জন্য 'ওয়ারদান' নামীয় আপন এক আত্মীয়কেও নিয়োগ করল। শেষ পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ ১৬ই রমযান শুক্রবার ঘনিয়ে এল। ইবন মুলজিম, শাবীব ইবন শাজারা এবং ওয়ারদান-এর তিন জনই পূর্ববর্তী রাতে কূফা মসজিদে এল এবং দরজার কাছে ঘাপটি মেরে বসে থাকল। হযরত আলী (রা) আপন অভ্যাস অনুযায়ী মানুষকে নামাযের জন্য আহবান জানাতে মসজিদে এসে প্রবেশ করেন। সর্বপ্রথম ওয়ারদান আগে বেড়ে তাকে আঘাত করে। কিন্তু তার তরবারি দরজার চৌকাঠে কিংবা দেওয়ালে আটকে যায় এবং আলী (রা) সামনে এগিয়ে যান। ইবন মুলজিম তড়িৎ বেগে আগে বেড়ে তাঁর কপালের উপর তরবারির আঘাত করে। আঘাতটি ছিল খুবই মারাত্মক। তিনি আহত হওয়ার পর নির্দেশ দেন, এদেরকে পাকড়াও কর। লোকেরা নামাযের জন্য মসজিদে এসে পড়েছিল। এ আদেশ শুনতেই তারা খুনীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ওয়ারদান ও শাবীব মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইবন মুলজিম বের হতে পারেনি। সে মসজিদের এক কোণায় লুকিয়েছিল। সেখান থেকেই তাকে বন্দী করা হয়। শাবীবকে হাদরামী নামক জনৈক ব্যক্তি ধরেছিল, কিন্তু সে তার হাত থেকে ছুটে পালায়। ওয়ারদান ঊর্ধ্বশ্বাসে তাকে ধরে ফেলে এবং সেখানেই হত্যা করে। ইবন মুলজিমকে বন্দী অবস্থায় আলী (রা)-এর সামনে হাযির করা হলে নির্দেশ দেন, যদি আমি এই আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তোমরা ওকেও হত্যা করবে। আর যদি আমি সুস্থ হয়ে উঠি তাহলে আমি যা সঙ্গত মনে করি তাই করব। এরপর তিনি বনূ মুত্তালিবকে ওসীয়ত করেন। তিনি বলেন, 'আমার হত্যাকে তোমরা মুসলমানদের রক্তারক্তির ওসীলায় পরিণত করো না। স্রেফ এই একটি লোককে কিসাস স্বরূপ হত্যা করবে, যে আমার হত্যাকারী। এরপর তিনি নিজ পুত্র হাসান (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে হাসান! যদি আমি এই ক্ষতের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হই তাহলে তুমি তারই তরবারি দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করবে যাতে সে মারা যায়। কখনো 'মুসলা' (নিহতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন) করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা নিষেধ করেছেন।

ইবন মুলজিমের তরবারির আঘাত আলী (রা)-এর কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তরবারির ধারালো প্রান্ত নেমে গিয়েছিল একেবারে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। এই অবস্থায় তিনি

শুক্রবার দিন জীবিত থেকে ১৭ই রমযান শনিবার ইনতিকাল করেন। ওফাতের পূর্বে জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ্ তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন, আপনি যদি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যান অর্থাৎ যদি আপনার ইনতিকাল হয়ে যায় তাহলে কি আমরা হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করবো ? তিনি উত্তর দেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না, তোমরা যা সঙ্গত মনে করবে তাই করবে। এরপর তিনি হুসায়ন (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন এবং দুনিয়া নিয়ে মগ্ন না থাকার জন্য ওসীয়ত করছি। কোন জিনিস অর্জিত না হলে তুমি সেজন্য আক্ষেপ করো না। সব সময় হক কথা বলো, ইয়াতীমদের দয়া করো এবং অসহায়দের সাহায্য করো। জালিমদের শত্রু এবং মজলুমদের সাহায্যকারী হয়ে থাক। কুরআনের অনুসরণ কর। এজন্য কেউ যদি তোমাকে দোষারোপ বা গালি-গালাজ করে তাহলে ভয় পেয়ো না। এরপর তিনি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকেও ঐ সময় কথা মেনে চলতে এবং তোমার দু'ভাইয়ের মর্যাদার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে ওসীয়ত করছি। তাদের হক তোমার উপর বেশি। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা বলা উচিত নয়। এরপর তিনি হুসায়নকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাদেরও উচিত মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার সাথে সব সময় সদাচরণ করা এবং তাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা। এরপর তিনি তাঁর সাধারণ ওসীয়ত লিপিবদ্ধ করাতে থাকেন। তাঁর নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল এবং তখন তাঁর মুখ থেকে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া আর কোন শব্দ বের হচ্ছিল না।

আলী (রা)-এর কবর অজ্ঞাত

হযরত আলী (রা)-এর ইনতিকালের পর ইবন মুলজিমকে হাসান (রা)-এর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি তরবারির এক আঘাতেই তাকে হত্যা করেন। আলী (রা) পৌনে পাঁচ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাসান, হুসায়ন ও আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর (রা) তাঁর গোসল দেন এবং তিন কাপড়ের কাফন পরান। কাফনের মধ্যে কোন কামীজ ছিল না। হাসান (রা) তাঁর জানাযায় নামায পড়ান। কোন কোন বর্ণনামতে কূফার মসজিদে, কোন কোন বর্ণনামতে তাঁর নিজের ঘরে, আবার কোন কোন কোন বর্ণনামতে কূফা থেকে দশ মাইল দূরে তাঁকে দাফন করা হয়। কোন কোন বর্ণনামতে, না জানি খারিজীরা তাঁর দেহ অসম্মান করে– এই ভয়ে হযরত হাসান (রা) তাঁকে মূল কবর থেকে উঠিয়ে অতি গোপনে অপর একটি কবরে দাফন করেন। অপর এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করার উদ্দেশ্যে তাঁর জানাযা মদীনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে জানাযাবাহী উটটি দৌড়ে পালায়। এরপর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অপর একটি বর্ণনামতে, ঐ উটটিকে 'তাঈ নামক স্থানে পাওয়া যায়। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলে এবং তার পিঠের উপর থেকে জানাযা নামিয়ে সেখানেই দাফন করে। মোটকথা, এত বড় একজন মহান ব্যক্তির মাযার কোথায় তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। এর মূল কারণ এই যে, খারিজীদের ভয়ে তাঁকে এমন এক জায়গায় দাফন করা হয়, যার কথা সাধারণ মানুষ জানত না। সম্ভবত এর মধ্যে এক বড় হিকমত (রহস্য) এই যে, পরবর্তীকালে মানুষেরা আলী (রা)-কে 'খোদার মর্যাদায়' অধিষ্ঠিত করতেও দ্বিধা করেনি। যদি তাঁর মাযারের সঠিক সন্ধান জানা থাকত তাহলে লোকেরা সেটাকে শিরকের একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে ছাড়ত। আমরা অহরহ দেখতে

পাচ্ছি, কত মহান ব্যক্তির কবরকেই না লোকেরা 'কিবলা' ও প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে। এটা নিশ্চিত যে, আলী (রা)-এর কবর চিহ্নিত থাকলে আজ অনেক মুসলমানের অবস্থা মক্কার মুশরিকদের মতই হত।

স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা

হযরত আলী (রা) বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে ১৪টি ছেলে ও ১৭টি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে। ফাতিমার গর্ভে দুই ছেলে হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং দুই মেয়ে যয়নাব ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তিনি উম্মুল বানীন বিনত হারাম কিলাবিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন চার ছেলে—আব্বাস, জাফর, আবদুল্লাহ্ ও উসমান। তিনি তৃতীয় বিবাহ করেন লায়লা বিনত মাসউদ ইবন খালিদকে। তাঁর গর্ভে উবায়দুল্লাহ ও আবূ বকর এই দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চতুর্থ বিবাহ করেন আসমা বিনত উমায়সকে। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ আল-আফসার এবং ইয়াহ্ইয়া এই দুই ছেলে। শেষোক্ত আট ভাই-ই ইমাম হুসায়ন (রা)-এর সাথে কারবালার যুদ্ধে শহীদ হন। আলী (রা) পঞ্চম বিবাহ করেন উমামা বিনত আবুল 'আসকে। ইনি ছিলেন যয়নাব বিনত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর মেয়ে। তার গর্ভে মুহাম্মদ আল-আওসাত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ষষ্ঠ বিবাহ করেন হাকাবা গোত্রের খাওলা বিনত জা'ফরকে। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ আল-আকবর (র) যাকে মুহাম্মদ হানাফিয়াও বলা হত। তিনি সপ্তম বিবাহ করেন সাহ্বা বিনত রাবীঈ তাগলাবিয়াকে। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উম্মুল হাসান, রামলা, কুবরা ও উম্মে কুলসুম সুগরা। তিনি অষ্টম বিবাহ করেন উম্মে সাঈদ বিনত উরওয়া ইবন মাসউদ সাকাফিয়াকে। তাঁর গর্ভে তিনজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবম বিবাহ করেন বিনত ইমরাউল কায়স ইবন আদী কালবীকে। তাঁর গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং শিশুকালেই মারা যায়। এদের ছাড়া তাঁর আরও কয়েকজন কন্যা সন্তান ছিল যাঁদের নাম জানা যায়নি। আওন ইবন আলী (রা) নামীয় তাঁর আর একজন পুত্র ছিল যাঁর জন্ম হয়েছিল আসমা বিনত উমায়সের গর্ভে। স্রেফ হাসান, হুসায়ন, মুহাম্মদ হানাফিয়া, আব্বাস ও জা'ফর (র) এই পাঁচ পুত্র থেকে তাঁর বংশ জারি আছে। অন্যদের বংশের কোন ধারাক্রম অব্যাহত থাকেনি।

একনযরে আলী (রা)-এর খিলাফতকাল

হযরত আলী (রা) ছিলেন এমনি একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী যাঁর ইনতিকালের পর এমন কোন ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন না যাঁর সম্মান ও মর্যাদা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কাছে স্বীকৃত ছিল এবং যিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মানুষকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারতেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর শাহাদাত লাভের সংবাদ শুনে বলেন, এখন আরবের লোকেরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কেননা তাঁর পরে এমন আর কেউ বেঁচে নেই, যে তাদের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। অবশ্য একথা মনে করলে চলবে না যে, হযরত আলী (রা)-এর পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তা করতেন, তবে শুধু একজন উপদেশ দাতা

ও নসীহতকারী হিসাবে। আর হযরত আলী (রা) ছিলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তির অন্যতম যাঁরা নবী-রাসূলদের মতই মানুষকে কিছু করার আদেশ দিতেন। এমনকি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আমীরে মুআবিয়া (রা) মাযহাবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে আলী (রা) থেকে ফতওয়া গ্রহণ করতেন।

হযরত আলী (রা) কূটকৌশল ও প্রবঞ্চনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে হক ও সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া সবচাইতে বেশি জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি প্রথম থেকেই নিজেকে খিলাফত পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করতেন এবং একথা তিনি সাধারণ্যে প্রকাশও করেছিলেন। এ কারণেই বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেননি। কিন্তু ঐ সময়ে আবূ সুফিয়ান আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করলে তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাকে ধমক দেন। কেননা তিনি এ ধরনের কাজ অত্যন্ত খারাপ মনে করতেন। তারপর যখন তাঁর বুদ্ধিতে একথা আসে যে, খিলাফতের ব্যাপারে আত্মীয়তার কোন সম্বন্ধ নেই, বরং এ ব্যাপারে আরো অনেক জরুরী বিষয় বিবেচনা করতে হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন খিলাফত পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি তখন তিনি নিজে থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করেন। আর বায়'আত করার পর তিনিই ছিলেন আবূ বকর (রা)-এর সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ও সবচেয়ে বেশি অনুগত। উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফতকালে আলী (রা)-এর পরামর্শকেই সবচাইতে বেশি মূল্য দিতেন এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রধানত তাঁর অভিমতই গ্রহণ করতেন। আলী (রা) উসমান (রা)-কেও সব সময় সুপরামর্শ দিতেন। উসমান (রা) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলেন, না অন্যের পরামর্শ অনুযায়ী, সেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করতেন না। আবার উসমান (রা)-এর কোন কাজ তাঁর কাছে আপত্তিকর মনে হলে তিনি বিনাদ্বিধায় তাঁর প্রতিবাদ করতেন। লোকেরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তখন তাঁর (আলীর) দৃষ্টিতে এ অভিযোগ যতটুকু সত্য তিনি ঠিক ততটুকু পর্যন্তই তাঁর বিরোধিতা করেন এবং তা থেকে তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া বাকি সবটুকুতেই তিনি হযরত উসমান (রা)-কে সমর্থন করেন। মদীনা যখন বিদ্রোহীদের আয়ত্তাধীন এবং সেখানে যখন তারা বাড়াবাড়িমূলক কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছে তখন তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ ও দায়মুক্ত রূপে প্রকাশ করার জন্য কোন চালবাজির আশ্রয় নেননি বরং সেই অবস্থায়ও তিনি নিজের পবিত্র স্বভাব ও পবিত্র মানসিকতার উপর কায়েম থাকেন। উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভের পর যখন লোকেরা তাঁর হাতে বায়'আত করতে চায় তখন তিনি যেহেতু নিজেকে খিলাফত পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করতেন তাই শুধু লোক দেখানোর জন্য তিনি বায়'আত গ্রহণে ইতস্তত করেননি বা তার প্রতি অনীহাও প্রকাশ করেননি। হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন কালে তাঁর (আলীর) ধারণা ছিল যে, তাঁকেই খলীফা নির্বাচন করা হবে। আর প্রকৃত ব্যাপারও ছিল এই যে, উমর ফারূক (রা)-এর পর যদি তিনি খলীফা নির্বাচিত হতেন তাহলে মুসলিম বিশ্বের সেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের এই সতর্কতা অবলম্বনের কারণে যে ইসলামী খিলাফতকে আত্মীয়তার সাথে কোনভাবেই সম্পর্কযুক্ত করা উচিত হবে না উসমান (রা)-কে আলীর

মুকাবিলায় প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন হযরত আলী (রা)-ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য করে বিনা দ্বিধায় উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। মোটকথা, আলী (রা)-এর যাবতীয় কাজকর্ম থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে কথাকে ন্যায় ও সত্য মনে করতেন সে কথাকে প্রকাশ করতে মোটেই দ্বিধা করতেন না। তাঁর চেহারা ছিল তাঁর অন্তরের ছবি এবং তাঁর বাহ্যিক অবস্থা ছিল তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থার দর্পণ। তিনি ছিলেন এক উলঙ্গ তরবারি। সত্যকে সত্য বলাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। যদি তাঁর স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি হত তাহলে সে উসমান হত্যার সময়ে অনেক কিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে রাখত এবং খিলাফতের বায়'আত গ্রহণকালে অনেক ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করত। অনুরূপভাবে খিলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠানের পর সাধারণ গুজবসমূহের প্রভাব দূরীকরণ এবং বনূ উমাইয়াদের বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টাসমূহ বানচাল করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর, মালিক আশতার প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহীকে উসমান (রা)-এর হত্যার কিসাসস্বরূপ হত্যা করে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক করে নেওয়া খুব একটা কঠিন ছিল না। কেননা এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ আলী (রা)-কে সহায়তাদানে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ ধরনের নিশ্চিত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর হস্তগত হয়নি যার ভিত্তিতে তিনি (হযরত আলী) ঐসব লোকের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। অতএব তিনি বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন এবং ইত্যবসরে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তার মুকাবিলাও করেন, কিন্তু যে কাজটি তিনি করণীয় মনে করেননি তা কখনো করেননি।

যে সমস্ত লোক আলী (রা)-এর সংস্পর্শে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল সুযোগ সন্ধানী, সুচতুর ও চালবাজ। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকে ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পর্যন্ত যে ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করছিল তা পার্থিব লোভ-লালসা চরিতার্থকরণ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন, বংশগত রেষারেষির পুনরাবির্ভাব– বিশেষ করে একই সাথে ইরান, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলের বিরাট সংখ্যক নও-মুসলিমের ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কিছুটা ম্লান হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। যদি হযরত আলী (রা) ফারূকে আযম (রা)-এর পর খলীফা হতেন তাহলে তিনি তাঁর অপরিসীম যোগ্যতা দ্বারা ফারূকী আমলের অবস্থাকেই বহাল রাখতে পারতেন। কিন্তু উসমান (রা) তা পারেন নি। তাঁর যুগে সাহাবীদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। প্রভাবশালী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের প্রায় সকলেই তখন পরপারে। হাতে গোনা যে কয়জন বেঁচেছিলেন তাঁরাও ছিলেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ ছিলেন কূফায়, কেউ বসরায়, কেউ দামিশকে, কেউ মিসরে, কেউ ইয়ামনে, কেউ ফিলিস্তীনে, কেউ মক্কায়, আবার কেউ মদীনায়। ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক সাহাবী মদীনায়ই থাকতেন। অল্প যে কয়েকজন প্রয়োজনবশত বাইরে যেতেন, প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা পুনরায় মদীনায় ফিরে আসতেন। আলী (রা) তাঁর রাজধানী মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কূফাকে রাজধানী বানিয়ে যে সুযোগ-সুবিধা তিনি পাবেন ভেবেছিলেন তা পাননি। সাথে সাথে তিনি সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হন যা মদীনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইসলামী বিশ্বে হিজায প্রদেশের যে গুরুত্ব ছিল, কূফা রাজধানী হওয়ার কারণে তা হ্রাস পায়। ফলে তিনি হিজায প্রদেশ থেকে যে সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন তা থেকেও বঞ্চিত হন।

মুনাফিক ও গোপন ষড়যন্ত্রকারীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেও মুসলমানদের বেশ কয়েকবার অসুবিধায় ফেলেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সিদ্দীকী ও ফারূকী আমলে এই দুষ্কৃতিকারীরা উল্লেখযোগ্য কোন দুষ্কর্মের সুযোগ পায়নি। উসমানী যুগে তারা পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। আর আলী (রা)-এর যুগ তাদেরই সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে অতিবাহিত হয়। যদি তিনি আরো কিছুটা সুযোগ পেতেন এবং এত তাড়াতাড়ি তাঁর শাহাদতের দুর্ঘটনা না ঘটতো তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি আরো কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র ফিতনাবাজদের পর্যুদস্ত করে ইসলামী বিশ্বকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে মুক্ত করে তুলতে পারতেন। কেননা এতসব বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তাঁর সাহস ও দৃঢ়তায় কোন ভাটা পড়েনি। যে কোন সমস্যার সমাধানে তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর মধ্যে কখনো হতাশার সৃষ্টি হত না। তিনি মানুষের প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যেগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর ধারণার বিপরীত। কিন্তু এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শীঘ্রই শাহাদত বরণ করবেন এবং সেই সুযোগে উমাইয়া বংশ বলতে গেলে এক রকম নির্বিবাধেই তাদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করবে।

উমাইয়া গোত্র নিজেদেরকে আরবের নেতা এবং বনূ হাশিমকে তাদের প্রতিযোগী মনে করত। ইসলাম তাদের ঐ অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে মুছে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উমাইয়ারা তাদের হারানো নেতৃত্ব ফিরে পাবার জন্য পুনরায় চিন্তাভাবনা শুরু করে। তারা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার সুফল বাস্তবায়নে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর সংস্কার ও সংশোধন এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আলী (রা)-কে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং তাঁর বেশির ভাগ সময়, এমন কি সমগ্র খিলাফতকাল এতেই ব্যয় হয়। কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্তে আসার পূর্বেই আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। যদি এমন হত যে, হযরত উসমান (রা)-এর পর ফারূকে আযম (রা) পুনরায় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই প্রথম অবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতেন। মূলত যা ঘটার তাই ঘটেছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায়ই ঘটেছে।

হযরত আলী ও মুআবিয়া (রা)-এর পরস্পর সংঘর্ষ, যুবায়র, তালহা ও আলী (রা)-এর পরস্পর বিরোধ, লড়াই ইত্যাদিকে আমরা নিজেদের যুগের বিরোধ ও যুদ্ধ সংঘাতের সাথে তুলনা করে নানারূপ ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ি। আমরা এই মহান ব্যক্তিগণের চরিত্র আমাদের চরিত্রের পাল্লায় তুলে মাপতে চাই। এটা শুধু ভ্রান্তি নয় বরং ধৃষ্টতারই শামিল। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, জামাল যুদ্ধে হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আর তাও এমন সময়ে, যখন তাদের অধীনে ছিল উৎসর্গিতপ্রাণ একদল সেনাবাহিনী– তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এজন্য তাদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়, কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয় কিন্তু তাঁরা দীন ও ঈমানের উপর অন্য কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতে মোটেই রাযী হননি। যে তালহা ও যুবায়র (রা)

যুদ্ধক্ষেত্রকে একটি ক্রীড়াক্ষেত্র মনে করতেন, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও যাঁরা অনবরত তরবারি চালিয়ে অতি শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন, তাঁরাই একটি হাদীস শোনামাত্র সোজা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। অথচ আজকাল আমরা দেখি, তথাকথিত কিছু কিছু ধর্মীয় নেতা– যাদেরকে মুসলমানরা অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে, যখন– তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তাঁরা পরস্পর বিতর্ক বাহাস ও মুনাযারা করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন। তারা একে অন্যকে অপমান করেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, এমন কি সুযোগমত কোর্ট-কাছারীতে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, একে অন্যকে গালি-গালাজ করেন– সর্বোপরি একে অন্যকে হেয় জ্ঞান করাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন। সাধারণত তাদের কেউই নিজের ভুল স্বীকার করেন না এবং প্রতিপক্ষের দাবী ন্যায্য হলেও তা মেনে নিতে চান না। এরূপ ঘটনা আমরা সচরাচর ঘটতে দেখি। সিফফীন যুদ্ধ এবং সালিশদ্বয়ের ফায়সালা ঘোষণার পর একদা মুআবিয়া (রা) আলী (রা)-এর কাছে এই মর্মে একটি ফতওয়া চেয়ে পাঠান যে, হিজড়া (একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্নযুক্ত মানুষ)-এর মীরাছ সম্পর্কে শরীআতের হুকুম কি ? তিনি লিখে পাঠান, তার লিঙ্গের আকারের প্রাবল্য অনুযায়ী অর্থাৎ লিঙ্গের আকৃতিতে নারীত্বের প্রাবল্য থাকলে তাকে নারী মনে করতে হবে। আর পুরুষত্বের প্রাবল্য থাকলে পুরুষ বিবেচিত হবে, মীরাসের হুকুম জারি করা হবে। জামাল যুদ্ধের পর যখন তিনি বসরায় প্রবেশ করেন তখন কায়স ইবন উবাদা তাঁর কাছে নিবেদন করেন, লোকেরা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর পর আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করা হবে– একথা কি ঠিক ? তিনি উত্তরে বলেন, একথা ভুল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতে পারি না। যদি তিনি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে কি আমি হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-কে খলীফা বলে মানতাম এবং তাদের হাতে বায়'আত করতাম ? আজকাল কি কারো কাছ থেকে এ ধরনের নির্লোভ আচরণ আশা করা যেতে পারে ? এই কুরআন সম্পর্কেও—যার প্রারম্ভিক আয়াতে বলা হয়েছে, 'এই সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই'– আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهِ كَثِيْرًا ·

এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন (২ : ২৬)।

হযরত আদম (আ)-এর সময় থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ চলে আসছে এবং তা চিরদিন অব্যাহত থাকবে। রহমানী (সৎ) ও শয়তানী (অসৎ)। এ দু' দলের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদের অস্তিত্ব থেকে বিশ্ব কখনো খালি থাকতে পারে না। আর এই হক-বাতিলের সংঘর্ষের কারণেই পুণ্যবানরা তাঁদের পুণ্যকর্মের পুরস্কার পান এবং আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের ঈমানের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অতএব কুরআন যদি বহু লোকের হিদায়াত এবং কারো কারো পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে থাকে তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রশংসা করতে গিয়ে তাদেরকে গিয়ে তাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ·

এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়। (২ : ১৪৩)

ইসলাম মানুষকে মধ্যপন্থা শেখায় এবং যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করে। অনেক লোক আলী (রা) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে প্রথভ্রষ্ট হয়েছে। এই পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্যে একটি দল তাঁর বিরোধিতার উপর এত জোর দিয়েছে যে, তাদের এই বিরোধিতা শত্রুতার চাইতে হীনতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তারা আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাকে তিরস্কার করতেও দ্বিধা করেনি এবং এভাবে তারা তাদের বিভ্রান্তি ও ক্ষতির পথ প্রশস্ত করেছে। আর অপর দলটি তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে তাঁকে খোদায়ী মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। তারা এক বান্দাকে আল্লাহর গুণাবলীর প্রকাশস্থল ঘোষণা করে অন্যান্য পবিত্র ও পুণ্যবান বান্দাদের তিরস্কার ও হেয় প্রতিপন্ন করা পুণ্যের কাজ মনে করেছে। এভাবে তারা তাদের পথভ্রষ্টতাকে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত করে প্রথম দলেরই সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে আলী (রা)-এর অস্তিত্ব অনেকাংশে ঈসা (আ)-এর অস্তিত্বের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা ইয়াহূদীরা ঈসা (আ)-এর বিরোধিতা করে যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি ঈসায়ীরা তাঁকে খোদায়ী মর্যাদায় তুলে দিয়ে পথভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। সাচ্চা মুসলমানরা যেমন ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থেকে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও ঈসায়ীদের বাতিল আকীদা-বিশ্বাসকে পরিহার করে মধ্যপন্থার উপর কায়েম রয়েছে তেমনি তারা মধ্যপন্থার উপর কায়েম রয়েছে হযরত আলীর ব্যাপারে খারিজী ও শিয়াদের বাড়াবাড়িমূলক আকীদা-বিশ্বাস পরিহার করে। আমার এই কথাগুলো কোন ইতিহাস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা কারো নযরে হয়ত বেমানান ঠেকতে পারে, কিন্তু যে বিষয়টি পরবর্তীকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের উপর এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা নিশ্চয় ইসলামী ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং এতে দোষের কিছু নেই।

সাহাবায়ে কিরামকে আজকালকার মুসলমানদের সাথে তুলনা করা যেমন ভ্রান্তিকর, তেমনি তাঁদের মানবীয় দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করাও এক ধরনের ভ্রান্তি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মানুষই ছিলেন। অন্য যে কোন মানুষের মত তাঁদেরও খাওয়া-পরার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল জীবন ধারণের অন্যান্য সামগ্রীরও। সাহাবীরা তো দূরের কথা, খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও নিজেকে মানুষ বলে স্বীকার করতে গর্ববোধ করতেন। আমরা আমাদের প্রতিদিনকার সালাতে–

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ·

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল) একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে আল্লাহ্র বান্দা সে কথা নির্বিবাদে স্বীকার করি এবং তার সাক্ষ্যও প্রদান করি। আমরা একথাও মানি যে, তাঁর জীবন হচ্ছে এমন একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন, যা অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবনকে সার্থক করে তোলা যায়। সাহাবীরা হচ্ছেন ঐ সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি, যাঁরা কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং হিদায়াত ও

সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নবী ছিলেন না, নিষ্পাপ ছিলেন না, তাঁদের সবার যোগ্যতাও সমান ছিল না তাই তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন আমরা পাই সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম, অন্যদিকে তেমনি পাই মুআবিয়া ও মুগীরাকেও। তাদের মধ্যে একদিকে যেমন আয়িশা ও আলী (রা)-এর ফকীহর অস্তিত্ব রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অস্তিত্ব রয়েছে আবূ হুরায়রা ও ইবন মাসউদ (রা)-এর মত রাবী ও মুহাদ্দিসের। একদিকে তাঁদের মধ্যে যেমন আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর মত রাজনীতিক ও কূটনীতিক রয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন আবদুল্লাহ্ ইবন উমর ও আবূ যর (রা)-এর মত মুত্তাকী। অতএব যোগ্যতার তারতম্যের কারণে তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য রহমত ও উন্নতির সোপান বিশেষ। আমাদের উচিত; তাঁদের সেই মতপার্থক্যকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে রহমতের উপকরণে পরিণত করা। নির্বোধের মত তাড়াহুড়া করে তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা এবং এভাবে নিজেদের পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের জন্য মোটেই উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর হিজরী ৩০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ বছর ধরে মুসলমানরা একের পর এক দেশ জয় করতে থাকেন। শুধু প্রত্যেক বছরে নয়, বরং প্রত্যেক মাসেই কোন না কোন দেশ বা অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এই বিশ বছরে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সব কয়টি সভ্য দেশ মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য সমগ্র দুনিয়ার স্বীকৃতি লাভ করে। হিজরী ৩০ সাল থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এ সময়কালে কোন দেশ জয় করতে পারে নি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দশ বছরের এই সময়কাল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকর মনে হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে এর মধ্যেও অনেক মঙ্গলজনক দিক ধরা পড়বে। যে শক্তির মাধ্যমে ঐ বিশ বছরের মহাবিজয় অর্জিত হয়েছিল তা ছিল ঐ আধ্যাত্মিকতা ও রূহানী শিক্ষার ফলশ্রুতি, যা সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। আর ঐ দশ বছর সময়কালে মুসলমানদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল তা জড়বাদ এবং এই দুনিয়ার অধিবাসী হওয়ার কারণে যে কোন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঐ দশ বছরের প্রতিবন্ধকতা ও আভ্যন্তরীণ বিবাদ মুসলিম বিশ্বকে সেই শক্তি ও আদর্শগত নমুনা সরবরাহ করেছিল, যেভাবে শীতকালে গাছ তার পরিবৃদ্ধির উপাদান সঞ্চয় করে এবং বসন্ত ঋতু আসার সাথে সাথে উপাদানের মাধ্যমে ফলফুল এবং পাতার জন্ম দেয়। যদি ঐ যুগে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী প্রত্যক্ষ না করত এবং তাঁদের ইতিহাসের প্রথম দিকে পৃষ্ঠাসমূহের মধ্যে ঐ দশ বছরের দুঃখজনক পৃষ্ঠাগুলো না থাকত তাহলে পরবর্তী যুগে তাদের সোনালী যুগ অতীত হওয়ার অনেক পরে, যখন তারা কখনো এমনি সাংঘাতিক ধরনের কোন ধাক্কা খেত, তখন জ্ঞানবুদ্ধি শূন্য হয়ে এমনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত যে, এরপর পুনরায় উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের থাকত কিনা সন্দেহ। ধাক্কা খাওয়া, আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করা এবং দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়া—এগুলো হচ্ছে মানব সমাজের হাবীল ও কাবীল যুগের সুন্নাত বা সাধারণ নীতি। মানব জাতি যতদিন এ দুনিয়ায় বসবাস করবে ততদিন এই সমস্ত জিনিসের অস্তিত্বও এখানে

থাকবে। হক ও বাতিলের যুদ্ধ যেভাবে দুনিয়ায় জারি রয়েছে সেভাবে আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ও বৈষয়িকতার কারণে ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে পরস্পর মতবিরোধ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) যখন আপন ভাই হযরত হারূন (আ)-এর দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টানাটানি করতে পারেন, যখন ইউসুফ (আ)-কে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন এবং অধুনা প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীরা (অনুসারীরা) যখন খোদা ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে তখন সত্যের অনুসারীদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ এবং সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিয়ে অহরহ হৈ চৈ করার পিছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। পারস্পরিক মতবিরোধ এবং লড়াই-ঝগড়া থেকে মানব জাতি কখনো সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে পারেনি। তাছাড়া এই স্বাভাবিক ব্যাপারটি যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগেও না ঘটত তাহলে কিভাবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কাটিয়ে উন্নতির পথ অবলম্বন করা যায় এবং কিভাবে পর্বত-প্রমাণ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়, তা তাদের পরবর্তী বংশধররা জানতে পারত না এবং অনেক চিন্তা-গবেষণা করেও আজ ইসলামকে তার আসল রূপে আবিষ্কার করাও কারো পক্ষে সম্ভব হত না। অন্য কথায় বলতে গেলে, হযরত আলী, হযরত মুআবিয়া এবং হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর মধ্যকার মতবিরোধ ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বসন্ত বা প্লেগ রোগের প্রতিষেধক টিকাস্বরূপ। ঐ টিকা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। এটা স্মরণ করে আজো মুসলমানরা তাদের প্রত্যেকটি পতন ও ধ্বংসের পর পুনরায় সতর্ক ও সাবধান হয়ে উঠছে। বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসের পারস্পরিক বিরোধ, আব্বাসী খিলাফত আমলে নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তির বিদ্রোহ, গযনবী ও ঘুরীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফাতিমী ও মুওয়াহিদদের মধ্যকার সংঘর্ষ, উসমানী ও সাফাবীদের মধ্যকার সংঘাত, আফগান ও মুঘলদের মধ্যকার যুদ্ধ– মোটকথা এ ধরনের অসংখ্য অভ্যন্তরীণ ঘটনা আছে যার প্রতিটির মধ্যেই ছিল মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনের যথেষ্ট উপাদান। যখনই ঐসব ঘটনা সংঘটিত হত তখন অমুসলিমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিমত ব্যক্ত করত যে, এরপর আর মুসলমানরা নিজেদের সামলে নিতে পারবে না এবং পুনরায় উন্নতি করার যোগ্যতাও আর ফিরে পাবে না। কিন্তু বিশ্ববাসী সব সময়ই দেখেছে যে, তারা ঐ অবস্থায়ও নিজেদের সামলে নিয়েছে এবং পুনরায় উন্নতিও করেছে। তারা ঐ অবস্থায়ও নিরাশ হওয়াকে কুফরী মনে করেছে এবং নিজেদেরকে সব সময় আশাবাদী ও সুদৃঢ় রেখেছে। তারা ইসলামের মর্যাদাকে নিজেদের সম্মানের উপর এবং ইসলামের অস্তিত্বকে নিজেদের অস্তিত্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

হালাকু বাগদাদ ধ্বংস করল। কিন্তু মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে হালাকুর বংশধরদের অন্তরকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে নিল। ঈসায়ী বিশ্ব একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নিল, কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ূবী সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত শক্তিকে একেবারে পর্যুদস্ত করে ঐ পবিত্র শহর পুনরায় দখল করে নিলেন। মোটকথা, খিলাফতে রাশিদার শেষ দশ বছরে যা কিছু ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ভবিষ্যত জীবনকে অধিকতর দুঃসাহসী, সংযমী ও সুদৃঢ় করে তুলেছে। অতএব আলী (রা)-এর যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর আখ্যা দেওয়া চলে,

তবে তাঁর উপকারের দিকটি–যদিও তার ক্ষতির অনুপাতে অনুল্লেখযোগ্য, একেবারে বিস্মৃত হওয়া চলে না।

দিনের সাথে রাত, আলোর সাথে অন্ধকার, বসন্তের সাথে শীত, ফুলের সাথে কাঁটা, বাঘের সুন্দর ও আকর্ষণীয় আকার-অবয়বের মধ্যে হিংস্রতা, সাপের চিত্তাকর্ষক আকার ও চলনের মধ্যে প্রাণঘাতী বিষ এবং রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে ধ্বংস ও ডুবে মরার আশংকা বিদ্যমান। যদি কুফরীর অভিশাপ দুনিয়াতে বিদ্যমান না থাকত তাহলে ঈমানের নিআমাত আমরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারতাম না। যদি আমরা ঘাঢ় অন্ধকার রাতের সম্মুখীন না হতাম তাহলে চাঁদনী রাত আমাদেরকে এত আনন্দ দান করতে পারত না। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি সৌন্দর্যের সাথে একটি অসৌন্দর্য সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি মাধুর্যের সাথে রেখে দিয়েছেন একটি তিক্ততা। এই নিয়মের উপরই বিশ্ব কারখানা চলছে। ইসলামী খিলাফত দুনিয়ায় মানবজাতির জন্য একটি নি'আতামতস্বরূপ। যখন চন্দ্র ও সূর্যের চেহারাও কলংকমুক্ত নয় তখন এই নি'আমাতও যদি কখনো কখনো কালিমালিপ্ত বা পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে তবে তাতে বিস্মিত বা আশাহত হওয়ার কোন কারণ নেই। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইসলামের একদল শত্রুর আবির্ভাব ইতিহাস অধ্যয়নকারীদের চোখে খুবই অপসন্দনীয় ঠেকে এবং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এই দল সৃষ্টির জন্য ইসলামকে দায়ী করতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু তারা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করে তাহলে বুঝতে পারবে জীবনটা টিকে থাকার একটি নিত্যনৈমিত্তিক সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে যাবতীয় শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে রহমানী শক্তিসমূহের অহরহ সংগ্রামেরই অপর নাম। আর শয়তানী শক্তিসমূহের মধ্যে সবচাইতে বড় শক্তি হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের শক্তি। আজ পর্যন্ত ইসলামী খিলাফত যখনই এবং যেখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের কারণেই হয়েছে। এই মুনাফিকরা এখনো দুনিয়ায় বিদ্যমান এবং সত্য কথা বলতে গেলে, তাদেরকে পূর্বের চাইতে অধিক শক্তিশালীই দেখা যাচ্ছে। এই মুনাফিকরা হঠাৎ করে হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি, বরং তাদের অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফত আমলে। এরপর তারা অতি দ্রুত সংগঠিত হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত থেকে হযরত আলী (রা)-এর শাহাদত লাভ পর্যন্ত সময়কালে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। আজ পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত রয়েছে। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন উমর ফারূক (রা) শাহাদত লাভ করেন তখন থেকেই ইসলামের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যক্তি (উমর ফারূকের দিকে ইঙ্গিত করে) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের দরজাও বন্ধ থাকবে। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা উমরকে সমীহ করে এবং যমীনের প্রত্যেক শয়তান তাকে ভয় করে।" একদা হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বনী ইসরাঈলদের আসমানী কিতাবসমূহের কোথাও আমার উল্লেখও দেখেছ ? তিনি উত্তর দেন, হাঁ, আপনার সম্পর্কে লেখা হয়েছে আপনি একজন প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক হবেন এবং আল্লাহর পথে কোন সমালোচনাকারীরই পরোয়া করবেন না। আপনার পরে যিনি খলীফা হবেন তাকে জালিমরা

হত্যা করবে। এরপর বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে শয়তানরা বন্দী ছিল এবং তাঁর ইনতিকালের পর তারা শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে।

হযরত ইমাম হাসান (রা)

নাম, বংশ-পরিচয়, দৈহিক গঠন ইত্যাদি

হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে খুলাফা-ই-রাশিদীনের সর্বশেষ মনে করা হয়। তিনি হিজরী ৩ সনের মধ্যশাবানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চেহারার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার অনেক মিল ছিল। তাঁর নাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই রেখেছিলেন। জাহিলী যুগে কারো এই নাম ছিল না। ইমাম বুখারী (র) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা মিম্বরের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর পাশেই বসা ছিলেন হাসান (রা)। তিনি কখনো জনতার দিকে, আবার কখনো হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : আমার এই পুত্র (নাতি) হচ্ছে একজন নেতা। সে মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসানকে আপন কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলে সে হাসানকে সম্বোধন করে বলল, বৎস! তুমি তো একজন উত্তম সওয়ারী (বহনকারী) পেয়েছ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সওয়ারও (আরোহীও) যে অতি উত্তম। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) বলেন, আহলে বায়ত' (রাসূলের পরিবারবর্গ)-এর মধ্যে হাসানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার অনেক মিল ছিল এবং তিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্য

ইমাম হাসান (রা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল, গাম্ভীর্যসম্পন্ন, মহৎ ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি পদব্রজে পঁচিশবার হজ্জ করেন, অথচ উট ঘোড়া তাঁর সাথে থাকত। উমায়র ইবন ইসহাক বলেন, আমার কাছে শুধু হযরত হাসান (রা)-ই এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি কথা বলতেন আমি চাইতাম যেন তিনি অবিরত কথা বলে যান এবং তাঁর কথা যেন শেষ না হয়। আমি তাঁর মুখ থেকে কখনো কোন বিশ্রী কথা শুনিনি।

মারওয়ান যখন মদীনার গভর্নর ছিলেন এবং ইমাম হাসান (রা)-ও খিলাফত ত্যাগ করে মদীনায়ই বসবাস করতেন তখন একদা মারওয়ান তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে বলে পাঠায় তুমি হচ্ছ খচ্চরতুল্য (আল্লাহ্ পানাহ্)। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার বাপ কে, তখন সে বলে, আমার মা ছিল একটি ঘোটকী। এর উত্তরে তিনি মারওয়ানকে বলে পাঠান, আমি একথা কখনো ভুলব না যে, তুমি আমাকে অহেতুক গালি দিচ্ছ। একদিন তোমাকে ও আমাকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। যদি তুমি নিজের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এই সত্য বলার জন্য তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে ভালোভাবে স্মরণ রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক প্রতিশোধ

গ্রহণকারী। জারীর ইবন আসমা (রা) বলেন, হাসান (রা) ইনতিকাল করলে মারওয়ান তাঁর লাশের কাছে ক্রন্দন করতে থাকে। তখন ইমাম হুসায়ন (রা) বলেন, এখন তো তুমি কাঁদছ, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তুমি তাঁকে সব সময়ই কষ্ট দিতে। তখন মারওয়ান বলে, তুমি তো জানই, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে এরূপ আচরণ করতাম যিনি ছিলেন পাহাড়ের চাইতেও অধিক ধৈর্যশীল ও উদার। আলী ইবন যায়দ বলেন, ইমাম হাসান (রা) দু'বার নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করেন এবং তিনবার দান করেন অর্ধেক অর্ধেক। এমন কি শেষ পর্যন্ত একটি জুতা রেখে দেন, অপরটি দান করে ফেলেন।

একদা তাঁর সামনে উল্লিখিত হল যে, আবূ যর (সা) বলেন, ঐশ্বর্যের চাইতে দারিদ্র্য এবং সুস্থতার চাইতে অসুস্থতা আমার কাছে অধিক প্রিয়। তিনি (আলী), তখন বললেন, আল্লাহ্ আবূ যরের উপর কৃপা করুন, আমি তো নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেই এবং কোন কিছুই আশা করি না। তিনি (আল্লাহ্) যা চান তাই করুন, এতে হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই।"

তিনি যখন হিজরী ৪১ সনের রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব আমীরে মুআবিয়ার হাতে সমর্পণ করেন তখন থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধব তাঁকে 'আরুল মুসলিমীন' বা 'মুসলমানদের লজ্জা ও অপমান' এই নামে ডাকতো। তিনি বলতেন, 'আর (লজ্জা ও অপমান) নার' (জাহান্নাম)-এর চাইতে ভালো। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে মুসলমানদের অপমানকারী! তোমার উপর সালাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি মুসলমানদের অপমান করিনি বরং রাজত্ব লাভের জন্য তোমাদের হত্যা করাটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। যুবায়র ইবন নুফায়ল (রা) বলেন, আমি হাসান (রা)-কে বললাম, গুজব শোনা যাচ্ছে যে, আপনি পুনরায় খিলাফতের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি উত্তরে বলেন, যখন আমি আরববাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলাম, যাকে দিয়ে ইচ্ছা যে কারো বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম, তখন আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খিলাফত ত্যাগ করেছি। এখন শুধু হিজাযবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য কি করে তা গ্রহণ করতে পারি ? তিনি হিজরী ৫০ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলে, বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইমাম হুসায়ন (রা) প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইতেন, কে তাঁকে বিষ দিয়েছে ? কিন্তু তিনি কারো কথা বলেন নি বরং বলেছেন, যার উপর আমার সন্দেহ রয়েছে সে-ই যদি আমার হত্যাকারী হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর শক্ত প্রতিশোধ নেবেন। অন্যথায় আমার কারণে কেন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে।

ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

আলী (রা)-এর ওফাতের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার পরে কি আমরা হাসানের হাতে বায়'আত করব ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি আমার অবস্থা নিয়েই মগ্ন আছি। যাকে তোমাদের পসন্দ হয় তার হাতেই বায়'আত করবে। লোকেরা তাঁর এ কথাকেই ইমাম হাসানের পক্ষে অনুমতি ধরে নিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করে। সর্বপ্রথম কায়স ইবন সা'দ ইবন আব্বাস বায়'আতের জন্য স্বীয় হাত ইমাম হাসানের দিকে বাড়িয়ে দেন। এরপর অন্য লোকেরাও এসে বায়'আত করতে থাকে। বায়'আত গ্রহণের সময় ইমাম হাসান (রা)

সবার কাছে অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন, তোমরা আমার কথা অনুযায়ী চলবে। আমি যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তোমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আমি যার সাথে সন্ধি করব তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে।

এই বায়'আত গ্রহণের পরপরই কূফাবাসীরা পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে যে, মনে হচ্ছে তাঁর (হাসানের) যুদ্ধ করার ইচ্ছা নেই। মুআবিয়া (রা) যখন হযরত আলী (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি নিজের জন্য আমীরুল মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করেন। মধ্যস্থতাকারী দুই হাকিমের ফায়সালা ঘোষিত হওয়ার পর পরই সিরিয়াবাসীদের কাছ থেকে তিনি বায়'আত গ্রহণ করলেও এখন আবার নতুন ভাবে বায়'আত গ্রহণ করেন। কায়স ইবন সা'দ (রা) যখন ইমাম হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আপনার হাতে বায়'আত করছি। তখন ইমাম হাসান বলেছিলেন, জিহাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি তো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথকভাবে এগুলোর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। এই শেষোক্ত উক্তি থেকেই কূফাবাসীরা কানাঘুষা করার সুযোগ পায়। তারা সন্দেহ করে যে, যুদ্ধের প্রতি তাঁর কোনই আকর্ষণ নেই। আমীরে মুআবিয়া নতুন ভাবে বায়'আত গ্রহণের কাজ শেষ করে ষাট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে দামিশক থেকে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি ইমাম হাসান (রা)-এর কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান, সন্ধি যুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় এবং বর্তমান মুহূর্তে এটাই সমীচীন যে, আপনি আমাকে খলীফা স্বীকার করে নিন এবং আমার হাতে বায়'আত করুন। ইমাম হাসান (রা) যখন মুআবিয়া (রা)-এর আগমন সংবাদ পান তখন তিনিও চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কূফা থেকে রওয়ানা হন। বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে যখন তাঁর বাহিনী 'দীরে আবদুর রহমান' নামক স্থানে পৌঁছে তখন তিনি কায়স ইবন সা'দকে বার হাজার সৈন্য সম্বলিত অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে অগ্রে পাঠিয়ে দেন। হাসান (রা)-এর বাহিনী 'সাবাতে মাদয়েন' নামক স্থানে যখন পৌঁছে তখন সেখানে কেউ না কেউ এ মিথ্যা গুজব রটিয়ে দেয় যে, কায়স ইবন সা'দ (রা) নিহত হয়েছেন। হাসান (রা) সওয়ারীর পশুগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সেখানে একদিন অবস্থান করেন। এ স্থানেই তিনি সবাইকে সমবেত করে একটি ভাষণ দেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তির পর তিনি বলেন :

> লোক সকল! তোমরা আমার হাতে এই শর্তে বায়'আত করেছ যে, যুদ্ধ সন্ধি উভয় ক্ষেত্রেই তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি, কারো সাথে আমার শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষ নেই। প্রাচ্য থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি লোকও আমার নযরে পড়ে না যার সম্পর্কে আমার অন্তরে মনোমালিন্য বা ঘৃণার ভাব রয়েছে। একতা, ঐক্য, ভালোবাসা, নিরাপত্তা, সন্ধি ও সংস্কার-সংশোধনকে আমি সব সময়ই অনৈক্য ও শত্রুতার চাইতে শ্রেয় মনে করি।

ইমাম হাসান (রা)-এর উপর কুফরী ফতওয়া

এই বক্তৃতা শুনে খারিজী ও মুনাফিকরা সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাহিনীতে একথা প্রচার করে দিল যে, হাসান (রা) মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করতে চান। সেই সাথে তারা তাঁর উপর কুফরী

ফতওয়া জারি করে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের উপর কুফরী ফতওয়া জারি করার রীতি মুনাফিক ও সাবাঈদেরই আবিষ্কৃত। তারাই হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারি করেছিলো। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আজ আমাদের যুগের আলিম ও ফাযিল বলে কথিত এক শ্রেণীর জুব্বাধারী মুফতী মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইয়াহূদীদের ঐ অপবিত্র রীতিকে জীবিত রাখতে এবং উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কটিবন্ধনকে কুফরী ফতওয়ার খড়গের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে যেন সব সময় তৈরি হয়ে রয়েছে। যাহোক, ঐ কুফরী ফতওয়া ইমাম হাসানের বাহিনীতে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কেউ বলতে লাগল, ইমাম হাসান (রা) কাফির হয়ে গেছেন, আবার কেউ বলতে লাগল তিনি কাফির হননি। শেষ পর্যন্ত কুফরীর ফতওয়াদানকারীদের দলই ভারী হয়ে গেল এবং তারা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদেরই একটি বিরাট দল ইমাম হাসান (রা)-কে কাফির বলতে বলতে তাঁর তাঁবুতে ঢুকে পড়ল এবং চারদিক থেকে তাঁর পরনের পোশক ধরে টানাটানি শুরু করল। ফলে তাঁর সমস্ত পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাঁর কাঁধের উপর থেকেও চাদর টেনে নেওয়া হল এবং লুণ্ঠন করা হল তাঁর তাঁবুর যাবতীয় সামগ্রী। এ অবস্থা দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য রাবীআ ও হামদান গোত্রকে আহ্বান জানালেন। ঐ দুই গোত্রের লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল এবং ঐ দুষ্কৃতিকারীদেরকে তাঁর কাছ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হল। কিছুক্ষণ পর, বাহিনীর মধ্যে ইতিপূর্বে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছিল তাও বন্ধ হল। সেখান থেকে তিনি মাদায়েন নগরীর দিকে রওয়ানা হন। জাররাহ্ ইবন কাবীসাহ্ নামীয় জনৈক খারিজী পথিমধ্যে সুযোগ বুঝে তাঁর উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর এক রানে আঘাত লাগে। তাঁকে একটি খাটিয়ায় তুলে মাদায়েনের 'কাসরে আবয়াদে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই তিনি অবস্থান করেন। আবদুল্লাহ্ ইবন হানযালা ও আবদুল্লাহ্ ইবন যুবয়ান জাররাহকে হত্যা করেন। চিকিৎসকরা 'কাসরে আবয়াদেই তাঁর ক্ষতের চিকিৎসা করেন এবং তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। কায়স ইবন সা'দ যে বার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রযাত্রা করেছিলেন তারা 'আনবার' নামক স্থানে পৌঁছলে মুআবিয়া এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আমরকে আপোস-চুক্তির ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার জন্য একটি বাহিনীসহ মাদায়েনে প্রেরণ করেন। অপর দিকে মাদায়েন পৌঁছার পর নিজ বাহিনীর অসদাচরণের প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান নিজ থেকেই আপোস চুক্তি সম্পাদনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন এবং দূত হিসাবে আমীরে মুআবিয়ারই এক ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইবন নাওফালকে সন্ধিচুক্তির একটি আবেদনসহ ইতিপূর্বেই আমীরে মুআবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন আমের মাদায়েনের নিকট এসে পৌঁছেছেন শুনে তাঁর মুকাবিলার জন্য ইমাম হাসান (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। আবদুল্লাহ্ ইবন আমের এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ইরাকী বাহিনীর একেবারে নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমি হচ্ছি আমীরে মুআবিয়ার অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক। তিনি (মুআবিয়া) তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে আনবারে অবস্থান করছেন। তোমরা হাসান (রা)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও এবং বলো, আবদুল্লাহ্ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছে যে, যুদ্ধের হাত রুখে রাখ, যাতে মুসলমানরা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। যখন ইমাম

হাসান (রা) এই কথা শুনলেন তখন তিনি মাদায়েনে ফিরে এলেন এবং আবদুল্লাহ্ কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠালেন: আমি আমীরে মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করতে এবং খিলাফত ছেড়ে দিতে রাযী আছি, আর এই শর্তে যে, আমীরে মুআবিয়া কিতাব ও সুন্নাহর উপর কায়েম থাকবেন, পূর্ববর্তী সব মতবিরোধ ভুলে যাবেন এবং কারো জানমালের ক্ষতি করবেন না। তিনি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, তিনি আমার পক্ষের লোকদের প্রাণের নিরাপত্তাও প্রদান করবেন? সন্ধি নিশ্চিতভাবেই ভালো। আবদুল্লাহ্ ইবন আমের এই সংবাদ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমীরে মুআবিয়ার কাছে ফিরে যান এবং বলেন, ইমাম হাসান (রা) কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে খিলাফত ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শর্তগুলো কি ? আবদুল্লাহ্ বললেন, প্রথম শর্ত এই যে, যখন আপনি ইনতিকাল করবেন তখন হযরত হাসান (রা) খিলাফতের অধিকারী হবেন। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন ততদিন প্রতিবছর পাঁচ লক্ষ দিরহাম করে ইমাম হাসান (রা)-কে বায়তুল মাল থেকে প্রদান করবেন। তৃতীয় শর্ত এই যে, আহওয়ায ও ফারিস এলাকার খারাজ ব্যক্তিগতভাবে ইমাম হাসান (রা) পেতে থাকবেন।

আবদুল্লাহ্ স্বয়ং ইমাম হাসান (রা)-এর পক্ষ থেকে এই তিনটি শর্ত পেশ করার পর সেই শর্তগুলোও মুআবিয়া (রা)-কে শুনিয়ে দেন, যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে বলেছিলেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, এই সমস্ত শর্ত আমি মঞ্জুর করব। কেননা আমি বুঝতে পারছি যে, তাঁর নিয়্যত পবিত্র এবং তিনি মুসলমানদের মধ্যে আপোস-মীমাংসার পক্ষপাতী। এরপর মুআবিয়া (রা) একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিয়ে এবং তাঁর উপর নিজের মোহর লাগিয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমেরের কাছে তা হস্তান্তর করে বলেন, এই কাগজ হাসানের কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, "আপনি যে যে শর্ত চান এই কাগজের উপর লিপিবদ্ধ করুন, আমীর মুআবিয়া (রা) আপনার সব শর্তই পূরণ করতে প্রস্তুত আছেন।" ইমাম হুসায়ন ও আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর (রা) যখন জানতে পারলেন যে, হাসান (রা) সন্ধি স্থাপনের সংকল্প নিয়েছেন তখন তাঁরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ঐ সংকল্প থেকে তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসান (রা) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি আলী (রা)-এর যুগ থেকে কূফাবাসী ও ইরাকবাসীদের অস্থিরচিত্ততা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। তাছাড়া মুআবিয়া (রা)-এর রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা ও প্রখর প্রতিভার দিকটিও তাঁর সামনে ছিল। অতএব তিনি সন্ধি স্থাপনেই সুদৃঢ় থাকেন।

সন্ধিপত্র

আবদুল্লাহ্ ইবন আমের মুআবিয়া (রা)-এর সীলমোহর লাগানো ও স্বাক্ষরযুক্ত কাগজটি নিয়ে এলেন এবং এতে যে কোন শর্ত লিপিবদ্ধ করার কথা বললেন, তখন ইমাম হাসান (রা) বলেন, আমি কখনো এই শর্ত পসন্দ করি না যে, আমীরে মুআবিয়ার পর আমাকে খলীফা মনোনীত করা হোক। কেননা আমি যদি খিলাফতের একান্ত প্রত্যাশীই হতাম তাহলে এখন তা ছেড়ে দিতাম না। এরপর তিনি কাতিবকে ডেকে সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সন্ধিপত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

এই সন্ধিপত্রটি হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তাঁরা উভয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত হয়েছেন। খিলাফতের

দায়িত্ব মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করা গেল। তাঁর পরে মুসলমানরা সময়ের দাবি অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন করবে। মুআবিয়ার হাত ও জিহবা (কথা) থেকে সব মুসলমান নিরাপদ থাকবে। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। আলী (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত এবং তাঁর পক্ষাবলম্বনকারী অনুরূপভাবে হাসান, হুসায়ন এবং তাঁদের সম্পর্কিতদেরকে আমীরে মুআবিয়া কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেন না। ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং তাঁদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা যে শহরে বা যে বসতিতে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে। মুআবিয়া, তাঁর কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের এই অধিকার থাকবে না যে, তারা ওদেরকে নিজেদের অধীনস্থ মনে করে নিজেদের কোন ব্যক্তিগত নির্দেশ পালনে বাধ্য করবেন। মুআবিয়া (রা) সব সময় আসওয়ায প্রদেশ থেকে আদায়কৃত খারাজ হাসান (রা)-কে প্রদান করতে থাকবেন। কূফার বায়তুলমালে বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ মজুদ আছে, হাসান (রা)-কে তার মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। তিনি এই অর্থ যেভাবে ইচ্ছা খরচ করতে পারবেন। উপহার-উপঢৌকন প্রদানের ব্যাপারে আমীরে মুআবিয়া (রা) বনূ হাশিমকে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।

এই চুক্তিপত্রের উপর সাক্ষী ও যামিন হিসাবে আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইব্‌ন নাওফাল, উমর ইব্‌ন আবী সালামা প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়ে আনবারে মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি সেখান থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা)-কে মুক্ত করে দিয়ে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। কায়স (রা)-ঐ দিন সন্ধ্যায় আপন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কূফায় গিয়ে পৌঁছেন। মুআবিয়া (রা) কূফার জামে মসজিদে পৌঁছে ইমাম হাসান (রা) ও কূফাবাসীদের কাছ থেকে বায়'আত নেন। কায়স ইব্‌ন সা'দ বায়'আত করতে স্বীকৃত হননি এবং মসজিদেও আসেন নি। মুআবিয়া (রা) তাঁর কাছেও আপন স্বাক্ষর ও মোহর সংযুক্ত একটি সাদা কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, তোমার যে শর্ত ইচ্ছা, এর উপর লিখে দাও, আমি তা মেনে নেব। তখন কায়স ইব্‌ন সা'দ তাঁর কাছে নিজের ও নিজের সঙ্গীদের প্রাণের নিরাপত্তা চান। তিনি কোন ধনসম্পদ তাঁর কাছে চাননি। মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই শর্তগুলো মেনে নেন। এরপর কায়স ও তাঁর সঙ্গীরা মুআবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন।

ইমাম হুসায়ন (রা)-ও বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। এজন্য মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হলে হাসান (রা) তাকে বলেন, আপনি ওর উপর চাপ দিবেন না। কেননা আপনার হাতে বায়'আত করার চাইতে তাঁর কাছে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ অধিক প্রিয়। একথা শুনে মুআবিয়া (রা) নীরব হয়ে যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইমাম হুসায়ন (রা)-ও আমীর মুআবিয়ার হাতে বায়'আত করেন। ঐ সফরে আমীর মুআবিয়ার সাথে আমর ইবনুল 'আস (রা)-ও ছিলেন। তিনি আমীরে মুআবিয়াকে বলেন, "এখন আপনি হাসান (রা)-কে বলুন যেন তিনি জনতার সামনে একটি ভাষণ দেন। মুআবিয়া (রা) তাঁর এই পরামর্শ পসন্দ করেন। হাসান (রা) জনতার সামনে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন :

মুসলমানগণ ! আমি বিশৃঙ্খলা খুবই অপসন্দ করি। আমি আমার মাতামহের উম্মত থেকে ফিতনা-ফাসাদ দূরীকরণ এবং মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য আমীরে মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি এবং তাঁকে আমীর ও খলীফা বলে স্বীকার করে নিয়েছি। যদি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনা তাঁর অধিকার হয়ে থাকে তাহলে তা তাঁর হাতে পৌঁছে গেছে। আর যদি আমার অধিকার হয়ে থাকে তাহলে আমি তা তাঁকে দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

এরপর একের পর এক চুক্তির সবগুলো ধাপ অতিক্রান্ত হয় এবং ইমাম হাসান (রা) সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় যাতে তিনি বলেছিলেন : "আর এ পুত্র (নাতি) হচ্ছে একজন নেতা। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন। ইমাম হাসান (রা) তাঁর ভাষণ শেষে যখন মিম্বর থেকে নামেন তখন আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন :

"আবূ মুহাম্মদ ! আপনি আজ এমন বাহাদুরী ও বীরত্ব দেখিয়েছেন যা আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নি।

হযরত আলী (রা)-এর শাহাদতের ছয় মাস পর হিজরী ৪১ সনে এই সন্ধি সম্পাদিত হয়। তাই হিজরী ৪১ সনকে 'আমূল জামাআত' বা 'সম্মিলনী বছর' বলা হয়।

চুক্তি সম্পাদনের পর মুআবিয়া (রা) কূফা থেকে দামিশকের দিকে যাত্রা করেন। এরপর যতদিন পর্যন্ত হাসান (রা) জীবিত ছিলেন, মুআবিয়া তাঁর সাথে অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁর কাছে সর্বদা অর্থ প্রেরণ করতে থাকেন। মুআবিয়া (রা) কূফা থেকে চলে যাবার পর কূফাবাসীরা আপোসে বলাবলি করতে শুরু করল যে, আহওয়ায প্রদেশের খারাজ হচ্ছে আমাদেরই প্রাপ্য মালে গনীমত। আমরা এ থেকে হাসান (রা)-কে কিছুই নিতে দেব না। একথা শুনে তিনি কূফাবাসীদের একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

হে ইরাকবাসী ! আমি বার বার তোমাদের ক্ষমা করেছি। তোমরা আমার পিতাকে শহীদ করেছ, আমার সহায়-সম্পদ লুট করেছ এবং আমাকে বর্শা মেরে আহত করেছ। তোমরা দুই শ্রেণীর নিহত ব্যক্তির কথা স্মরণ রেখেছো, প্রথমত যারা সিফ্ফীন যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত যারা নাহরাওয়ানে নিহত হয়েছে। এখন তোমরা আমার কাছে ঐ নিহতদের বদলা দাবী করছ। আমীরে মুআবিয়া তোমাদের সাথে যে কাজটি (চুক্তি) করেছেন তাতে তোমাদের কোন সম্মান নিহিত নেই এবং ন্যায়বিচারও তাই। অতএব তোমরা যদি মৃত্যুর জন্য রাযী থাক আমি ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলব এবং তীক্ষ্ণধার তরবারির মাধ্যমেই এর একটা ফায়সালা তলব করব। আর যদি তোমরা তোমাদের জীবনকে ভালবাস তাহলে অতঃপর আমি এই চুক্তির উপর কায়েম থাকব।

এই ভাষণ শোনার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে আওয়াজ উঠল, আপনি চুক্তির উপর কায়েম থাকুন, চুক্তির উপর কায়েম থাকুন। আসল কথা হল, ইমাম হাসান (রা) কূফাবাসীদের ভীরুতা ও নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে হুমকি দিয়েই সরল পথে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং এটাকে সমীচীন মনে করেছিলেন। যাহোক, এখন থেকে আমীরে

মুআবিয়া সর্বসম্মতিক্রমেই খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হন। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) যিনি রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে শুধু উট বকরী চরাতেন এবং নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন–তিনিও মুআবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। মোটকথা, এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর অবশিষ্ট ছিলেন না, যিনি সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুদিন ভাবনা-চিন্তার পর আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা স্বীকার করে তাঁর হাতে বায়'আত করেন নি। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইমাম হাসান (রা) কিছুদিন কূফায় অবস্থান করেন। এরপর কূফা পরিত্যাগ করে নিজের সঙ্গী-সাথী ও ভক্ত-অনুরক্তসহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কূফাবাসীরা কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দেয়। মদীনা আসার পর তিনি আর কখনো অন্য কোথাও বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

বিষ প্রয়োগের কলাকাহিনী

হিজরী ৫০ অথবা ৫১ সনে ইমাম হাসান (রা) ইনতিকাল করেন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁকে তাঁর স্ত্রী জা'দা বিনতুল আশআছ বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু যেখানে স্বয়ং হাসান ও হুসায়ন (রা)-ও নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন নি, কে এবং কেন তাঁকে বিষ পান করিয়েছে সেখান শত শত বছর পর কাউকে এজন্য নিশ্চিতভাবে অভিযুক্ত করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

মৃত্যুশয্যায় ইমাম হাসান (রা) ইমাম হুসায়ন (রা)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হযরত আলী (রা) পর্যন্ত খিলাফত এসে পৌঁছেছে, খাপ থেকে তরবারি বের হয়ে পড়েছে এবং এভাবে ব্যাপারটি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। এখন আমি ভালো করেই জানি যে, নবুওয়াত ও খিলাফত আমাদের বংশে একত্রিত হতে পারবে না। আমার এ আশংকাও রয়েছে যে, কূফার নির্বোধরা তোমাকে এখান থেকে বের করার চেষ্টা করবে। তুমি তাদের ধোঁকায় পড়ো না। আমি হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা)-কে বলছিলাম যেন তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি দেন। তখন তো তিনি রাযী হয়েছিলেন। এখন লোকেরা বলছে, তুমি যখন তাঁকে এ সম্পর্কে বলবে তখন তিনি রাযী হবেন না। কিন্তু আমার পরে তুমি অবশ্যই তাঁকে এ সম্পর্কে বলবে। যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে তুমি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। ইমাম হাসান (রা)-এর ইনতিকালের পর ইমাম হুসায়ন (রা) আয়িশা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এতে সম্পূর্ণ রাযী আছি। কিন্তু তিনি রাযী হয়েছেন জানতে পেরে মারওয়ান এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। হুসায়ন (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মারওয়ানকে শায়েস্তা করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা) হুসায়ন (রা)-কে অনেক বুঝিয়ে রক্তপাতের সংকল্প থেকে বিরত রাখেন। শেষ পর্যন্ত ইমাম হাসান (রা)-কে তাঁর মহিয়সী মাতা হযরত ফাতিমা (রা)-এর পাশে দাফন করা হয়। হাসান (রা)-এর নয় পুত্র ও ছয় কন্যাসহ সর্বমোট পনর জন সন্তান ছিল।

এক নজরে ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত

কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর ছয় মাসের খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। কেননা এই খিলাফত ছিল স্বল্পকালীন এবং অসম্পূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে এটাকে স্বল্পকালীন বলা হলেও অসম্পূর্ণ বলা ঠিক হবে না। অন্যথায় অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকেও খিলাফতে রাশিদার আওতা-বহির্ভূত হবে। আর

এটা মোটেই বৈধ হবে না। তাছাড়া কোন খিলাফত স্বল্পকালীন হলে তাকে যে খিলাফত বলা যাবে না, এটাও কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কে ধৈর্য সহকারে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটা খিলাফতে রাশিদারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা সত্যি যে, তাঁর খিলাফত দেশ জয় তথা যুদ্ধ-বিগ্রহের হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ছিল। তবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত ছাড়াই ইসলাম ও ইসলামী বিশ্বের সেই উপকার করেছেন যা অনেক বছরের খিলাফত এবং শত শত যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেও কারো পক্ষে করা সম্ভব হত না। ইসলামী খিলাফত পরিচালনার দিক দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখেন। কেননা তিনি দশ বছরের যুদ্ধকে, যা বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নিমিষের মধ্যে বন্ধ করে দেন। তিনি মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইয়াহূদীদের নানা ধরনের ষড়যন্ত্রকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বানচাল করে দেন, যা দশ বছর যাবত অনবরত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। ফলে দুষ্কৃতিকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গত দশ বছর যাবত যে বিজয় অভিযান বন্ধ ছিল তিনি পুনরায় তা পরিচালনার সুযোগ করে দেন। তিনি সেই মুশরিকদের নিরাশ করে দেন, যারা দশ বছর যাবত মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে তাদের পতন সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। তিনি পুনরায় ইসলামের শত্রুদের মুসলিম যোদ্ধাদের সেই সব অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন, যা এতদিন পর্যন্ত শুধু মুসলমানদেরই রক্ত পান করেছিল। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পর তাঁর চাইতেও তিনি অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন যখন তিনি কূফায় আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করে বলেছিল "যদি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপর আমীরে মুআবিয়ার অধিকার থেকে থাকে তাহলে তিনি তা পেয়ে গেছেন। আর যদি আমার অধিকার থেকে থাকে তাহলে আমি তা তাঁর জন্য ছেড়ে দিলাম।"

আমীরে মুআবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামনে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের বাতিঘরের মতো কাজ করবে। ইমাম হাসান (রা)-এর কাছে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ছিল। এই বাহিনীর লোকেরা যতই বোকা, অস্থিরচিত্ত বা অশিষ্টই হোক, একথা তো সত্যি যে, তারা মুআবিয়া (রা) ও সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় স্বনামধন্য বীরশ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান ৩৭ বছরের একজন বীর যুবকের পক্ষে তাঁর প্রতিপক্ষ তথা আমীরে মুআবিয়াকে এক হাত না দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা কখনো সম্ভব হত না। হাসান (রা) একথাও জানতেন যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্ব জানে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে কত বেশী ভালোবাসতেন। আলী (রা)-এর চাইতেও তাঁর এ সুযোগ বেশী ছিল যে, তিনি সাহাবায়ে কিরাম এবং মুসলিম বিশ্বের সমগ্র মুসলমানের সহানুভূতি ও ভালোবাসা অতি অল্প সময়ে এবং অতি সহজে লাভ করতে পারতেন। তিনি সৈন্য পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতা রাখতেন। দুঃসাহস ও সংকল্পের দৃঢ়তাও তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এজন্য যে, তিনি ইসলামের সেবার সেই শ্রেষ্ঠতম নমুনা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য স্থাপন করে গেছেন, যা শুধু সর্বগুণের অধিকারী রাহমাতুল লিল আলামীনের একজন মহান নাতির পক্ষেই সম্ভব ছিল।

মোটকথা, ইমাম হাসান (রা) মুসলিম মিল্লাতের পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি দলকে একত্রিত করে সেই বিরাট কাজ আনজাম দিয়েছেন যা ছিল বিশ্বের পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি ভূখণ্ডকে একত্রে

জুড়ে দেওয়া কিংবা বিদীর্ণ আসমানের দু'টি খণ্ডকে একত্রে মিলিয়ে দেওয়ার চাইতেও কঠিন। তিনি তাঁর খিলাফত আমলে কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত করেন নি। তবে তিনি বিশ্বের সমস্ত বীর সেনানায়ক ও দিগ্বিজয়ীদের মাথার মুকুটে পরিণত হয়েছেন। তিনি মুআবিয়া (রা)-এর সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তাতে মুসলমানদের পক্ষে রোম সাগর এবং রোম সাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপসমূহ জয় করাও সম্ভব হয়েছিল। তারা পদানত করতে পেরেছিল ত্রিপলী, মরক্কো, স্পেন, সিন্ধু, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশ। ইমাম হাসান (রা) ইসলামী বিশ্বে এক নব জীবনের সূচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর অতুলনীয় আভিজাত্যের নমুনা পেশ করে ইসলামী বিশ্বে পুনরায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছিলেন। মুসলমানদের প্রতিটি সাফল্য, বিজয় ও উন্নতি তাঁর আত্মার উপর রহমতের বারি বর্ষণ করবে। হে ফাতিমাতুয যাহরা (রা)-এর আদরের দুলাল, আবূ তালিবের বংশের চন্দ্র, মুসলিম উম্মাহর আলোকবর্তিকা, আমার অন্তর তোমার প্রেমে প্লাবিত, আমার দিল তোমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপে, প্রতিটি রক্তকণায় তোমার প্রশংসার সুর ধ্বনিত। তোমার বীরত্ব হিমালয়ের চেয়ে উন্নত। তোমার পৌরুষ মহাসাগরের চেয়ে উদার। হে সুমহান বীর জান্নাতবাসীদের নেতা ! আমার পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ কর এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে আমাকে ভুলে যেও না। ওয়াস্‌সালাম।

খিলাফতে রাশিদা সম্পর্কে কিছু কথা

খিলাফতে রাশিদার ইতিহাস সমাপ্ত হল। এখন সূচনা হবে খিলাফতে বনূ উমাইয়ার বর্ণনা। খিলাফতে বনূ উমাইয়া এবং তাঁর পরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য খিলাফতের তুলনায় খিলাফতে রাশিদার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেক খলীফা মুসলমানদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। কোন খলীফাকে তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা মনোনীত করলেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের পরই তিনি তা করতেন। এর সাথে বংশগত উত্তরাধিকারিত্বের কোন দাবী কোন মতেই সম্পৃক্ত ছিল না। অন্যান্য খিলাফতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং সেখানে চালু করা হয় অযৌক্তিক উত্তরাধিকারিত্ব ভিত্তিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

খিলাফতে রাশিদার সময়ে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, আপত্তি, উত্থাপন, জবাব তলব এবং পরামর্শ দানের পুরাপুরি অধিকার যে কোন মুসলমানের ছিল। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে মুসলমানদেরকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

খিলাফতে রাশিদার যুগে খলীফাদের বাহ্যিক অবস্থা, তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, পরিবহন, খাদ্য, পানীয়, উঠাবসা ও চলাফেরা সব কিছুই সাধারণ মুসলমানদের মত ছিল। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে খলীফার চালচলন ছিল রাজসিক এবং সাধারণ মানুষের চালচলন ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।

খিলাফতে রাশিদার আমলে খলীফা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজের জন্য বা নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে পারতেন না। কেননা রাষ্ট্রীয় কোষাগার তখন ছিল সাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে খলীফারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হতে থাকে। ফলে খলীফা যাকে ইচ্ছা দান করতেন, উপহার-উপঢৌকন দিতেন। এতে কারো কোনরূপ আপত্তির অধিকার ছিল না।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সবাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। তাঁরা সব সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংস্পর্শে থাকতেন। পরবর্তীকালে মুআবিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সাহাবী খলীফা ছিলেন না।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সবাই ছিলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে এ ধরনের কোন সাহাবী পাওয়া যায় না। খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণ মুসলমানদের নিজেদেরই সন্তানতুল্য মনে করতেন, তাদেরকে নিজেদের দাস বা প্রজা জ্ঞান করতেন না এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে কোন নির্দেশ পালনে বাধ্য করতেন না। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তখনকার খলীফারা 'কায়সার' ও কিসরা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন পদ্ধতি পার্থিব দিক দিয়ে কায়সার ও কিসরার হুকুমতের মত জুলুম অত্যাচারমূলক ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারেও তাঁরা নিজেরা কিছু করতে পারতেন না। যখন কোন ধর্মীয় ব্যাপারে সন্দেহ বা মতবিরোধ দেখা দিত তখন তাঁরা অন্যান্য সাহাবীকে ডেকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং যে কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রমাণিত হত তদনুযায়ী হুকুম জারি করতেন। যখন কোন ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেত এবং পরবর্তী সময়ে তা ধরা পড়ত তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করে নিতেন। মোটকথা, ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক দিয়ে তাঁদের নেতৃত্ব ও হুকুমত ছিল বর্তমান যুগের খাঁটি গণতান্ত্রিক রাষ্ঠসমূহের প্রেসিডেন্ট ও দীনী উলামার নেতৃত্ব ও হুকুমতের এক সম্মিলিত রূপ। তবে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ছিল তাঁর দিক-নির্দেশক। নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁদের কাজ ছিল শরীআতের হুকুম-আহকাম জারি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের যুগে জনসাধারণ সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা যে কোন ছোট-খাটো ব্যাপারেও আপত্তি উত্থাপন করতে পারত এবং খলীফা তাঁর সন্তোষজনক জবাব দানে বাধ্য থাকতেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের হুকুম-আহকাম জারি করার জন্য কোন শক্তির বা বাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ হুকুম-আহকাম চাই তা তার বিরুদ্ধে যাক না কেন-বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের হুকুমত ছিল ভক্তি-ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, ভয়ভীতি বা জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে তা পরিচালিত হত না। কিন্তু পরবর্তী খলীফার শরীআতের বিধান জারি এবং তা প্রতিষ্ঠা করার কাজ নিজেরা ছেড়ে দিয়ে মওলভী মুফতী ও বিচারকদের হাতে সোপর্দ করেন। মসজিদসমূহে খতীব ও ইমাম পৃথক পৃথক লোককে নিয়োগ করা হয়। খলীফারা সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রেখে এই দুই শক্তিকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে শুরু করেন। যার ফলে তাদের হুকুমত ও রাষ্ট্র ভয়ভীতি ও জুলুম-অত্যাচারের উপর পরিচালিত হতে থাকে। মানুষের বৈধ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ধর্মীয় বিধান জারি ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ-সংশয় নিরসনের বৈধ স্বাধীনতা জনসাধারণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণেই আজ অনেকেই বুঝতে পারে না, একজন রঈস-বা নবাবের যে ধরনের ভয়ভীতি সাধারণ মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বা রঈস-নবাবরা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে যে পরিমাণ জরুরী মনে করেন– তা কেন খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না বা কেন তারা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে কোন জরুরী বিষয় বলে মনে করতেন না। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রতি ভয়-ভীতি

ছিল ঠিক সেরূপ যেরূপ ভয়ভীতি থাকে একজন দয়ালু শিক্ষক সম্পর্কে কিংবা স্নেহময় মাতাপিতার সম্পর্কে। তাঁরা মানুষের রক্ষক ছিলেন, ভক্ষক ছিলেন না। আজ একজন সূফী, মুফতী কিংবা জুব্বাধারী মওলবীর কথা ও কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে মানুষ যে পরিমাণ ভয় পায় খুলাফায়ে রাশিদীনের সমালোচনা করতে গিয়ে জনসাধারণ ততটা ভয়ও পেত না।

মুসলমানদের সংশোধনই ছিল খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার এবং শরীআতের হুকুম জারি করারই প্রত্যাশী। শুধু সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে দেশের পর দেশ জয় করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না।

খুলাফায়ে রাশিদীন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদায়কৃত কর এবং গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) জমা করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে পরিমাণ সম্পদ বায়তুলমালে আসত তাঁরা তা মুসলমান-দের মধ্যে বন্টন করে দিতেন অথবা জনসাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন কাজে খরচ করে ফেলতেন। এভাবে সমগ্র মাল খরচ করার পর তাঁরা বায়তুলমালকে একেবারে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন; কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতসমূহের অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত।

খুলাফায়ে রাশিদীন সর্বদা হজ্জ করতে যেতেন, সেখানে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের সাথে মিলিত হতেন, তাদের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অবহিত হতেন, তাদের অঞ্চলে নিয়োগকৃত সরকারী কর্মকর্তার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতেন এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। এভাবে হজ্জের বিরাট জনসমাবেশকে তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনের একটা বিরাট সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতেন। যদি কোন জরুরী কাজ কিংবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে তাঁরা হজ্জে যেতে অপারগ হতেন তাহলে কোন ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে উল্লিখিত প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। কিন্তু খিলাফতে রাশিদার পর অন্যান্য খলীফা হজ্জের জনসমাবেশ থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে উপকৃত হওয়ার দিকটি ত্যাগ করেন।

খুলাফায়ে রাশিদীন রাজধানীর মসজিদে নিজেরা সালাতের ইমামতি করতেন এবং জুমু'আর খুতবা দিতেন। তাঁদের পর শুধু বনূ উমাইয়ার খলীফাদের এই রীতি প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য খলীফা সালাতের ইমামতি ও জুমু'আর খুতবা প্রদানের দায়িত্ব থেকে নিজেদের অব্যাহতি দেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক পৃথক ধর্মীয় ফিরকা বা দল-উপদল ছিল না। তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিত, তবে দীন ও মিল্লাত এবং আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দলাদলির নাম-নিশানাও ছিল না, যা পরবর্তীকালে দেখা যায়। আজ তো শীআ', সুন্নী, ওয়াহাবী, হানাফী, শাফিঈ, কাদিরী, চিশতী ইত্যাদি শত শত ফিরকা বিদ্যমান। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এদের প্রতিটি ফিরকাই অপরাপর ফিরকা থেকে নিজেদের উৎকৃষ্টতর মনে করে এবং অন্যদের থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখার উপর গুরুত্বও আরোপ করে।

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে দীন ও শরীআতের সামনে আত্মীয়তা, জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির কোন গুরুত্ব ছিল না। যখন দীন ও মিল্লাতের প্রশ্ন সামনে আসত তখন ভাই-ভাইয়ের বা পিতা-পুত্রের পক্ষপাতিত্ব করা তো দূরের কথা, তার দিকে ফিরেও তাকাত না। তখন প্রতিটি লোকের বাক-স্বাধীনতা ছিল। একজন সাধারণ মুসলিমও খলীফার সামনাসামনি তাঁর সমালোচনা করতে পারতো। কিন্তু পরবর্তী খলীফাদের আমলে এই বাক-স্বাধীনতা এবং দীন ও মিল্লাতের প্রতি ঐকান্তিকতা আর বাকী থাকে নি।

খুলাফায়ে রাশিদীন নিজেদেরকে মুসলমানদের বাদশাহ্ নয় বরং একজন নগণ্য খাদিম মনে করতেন এবং তদনুযায়ী তাদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা মুসলমানদের রাখাল বা চৌকিদার ছাড়া কিছু নন। খুলাফায়ে রাশিদীনের কোন কথা বা কাজের উপর সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেও যে কোন লোক স্বাধীনভাবে তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে পারতো।

তারীখ-ই-ইসলামের এই প্রথম খণ্ডে খিলাফতে রাশিদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হল। এতে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের নাম বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আশা করি ঐসব নামের বরকতেই এই খণ্ডটির অধ্যয়ন শ্রদ্ধেয় পাঠকদের জন্য কল্যাণকর হবে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দশজন সাহাবী, যাদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়, সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। এরা হচ্ছেন সেই দশজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যাঁরা নিজেদের আমলে হাসানাহ্ তথা পুণ্য কার্যাদির বদৌলতে এই দুনিয়ায়ই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিজেদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শ্রবণ করেছেন। এরা হচ্ছেন : হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস, হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ ও হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)। শেষোক্ত জন অর্থাৎ হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) ছাড়া বাকি নয়জন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তাঁর সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)

তিনি ছিলেন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি। তাঁর বংশতালিকা নিম্নরূপ : সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন কুরত ইবন রিবাহ ইবন আদী। রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর অধিনায়কত্বে পরিচালিত সব কয়টি যুদ্ধেই তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। শুধু বদর যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বদরযুদ্ধের গনীমতের অংশ দেন এবং তাঁকে বদরীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অনেক কারামত তথা অলৌকিক ঘটনার অধিকারী এবং 'মুসতাজাবুদ দাওয়াত' (যার দু'আ কবূল হয়) ছিলেন। হিজরী ৫১ সনে ৭২ বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। একদা জনৈক স্ত্রীলোক তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত একটি মিথ্যা দাবী উত্থাপন করে। তিনি তার জন্য এই বলে বদ দু'আ করেন, "হে আল্লাহ্! যদি এই স্ত্রীলোক তার দাবীতে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে অন্ধ করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি অন্ধ হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর কোথাও যাওয়ার সময় একটি কুয়ায় পড়ে মারা গেল। একদা কূফার জামে মসজিদে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তিকে কিছু অপ্রীতিকর শব্দ উচ্চারণ করতে শুনে তিনি বললেন : আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র, আবূ উবায়দা, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)—এই নয় ব্যক্তি হচ্ছেন 'আশারায়ে মুবাশশারা-এর অন্তর্ভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি তখন বলল, দশম ব্যক্তির নামটিও অনুগ্রহ করে বলে দিন। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি হচ্ছি ঐ দশম ব্যক্তি।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ খাঁন নজিবাবাদী

ইসলামের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী

অনুবাদক

মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী

ও

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী
মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও
মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২২১/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২১০২১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1223-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউসসানী ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন
মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ শিল্পী : **জসিমউদ্দিন**

মূল্য ঃ ২৩০.০০ (দুইশত ত্রিশ) টাকা

ISLAMER ITIHAS (The History of Islam Vol-2) : written by Maulana Akbar Shah Khan Nagibabadi in Urdu and translated by Maulana Abdul Matin Jalalabadi & Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi into Bangla, published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. June 2008

Price : Tk 230.00; US Dollar : 8.00
Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

প্রকাশকের কথা

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ আকাইদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম এবং আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিরচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এরই ধারাক্রমে ২০০৩ সালে প্রকাশ করা হয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী প্রণীত 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড।

ইতিহাস জাতির দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে সাবধানী হয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। ইতিহাসকে জাতির বিবেক বলা চলে। এটা একটা জাতির দিকদর্শন যন্ত্রের মতও কাজ করে।

ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। এরপর আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিস্তার বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছে খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে। যার ফলে গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃ সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী এবং প্রুফ দেখেছেন মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক। আমরা তাঁদেরকেসহ গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য সকলকেও জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থখানি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কিংবা আন্তরিকতায় কোন ইচ্ছাকৃত গাফলতি করা হয়নি। তবু সুধীজনের নজরে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	প্রথম অধ্যায়	পৃষ্ঠা
	উমাইয়া বংশের শাসনামল	
ভূমিকা		১৭
হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)		২৩
প্রাথমিক অবস্থা		২৩
আমীরে মুআবিয়ার চরিত্র ও গুণাবলী		২৬
আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী		২৭
গভর্নর নিয়োগ		২৮
যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান		২৯
কনসটান্টিনোপল আক্রমণ		৩১
ইয়াযীদকে যুবরাজ ঘোষণা		৩২
কূফায় যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান		৩৫
যিয়াদের মৃত্যু		৩৯
হযরত আয়েশা (রা)-এর ইনতিকাল		৪০
মুআবিয়া (রা)–এর ইন্তিকাল		৪০
এক নজরে আমীরে মুআবিয়ার শাসনকাল		৪১
একটি সন্দেহের অপনোদন		৪৩
ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া		৪৮
মুসলিম ইব্‌ন আকীল ও হানী নিহত হন		৫৭
ইমাম হুসাইন (রা)-এর কূফা যাত্রা		৫৮
কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা		৬১
পানি বন্ধ		৬৫
ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতবরণ		৬৯
উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের আশাভঙ্গ		৭১
মক্কা-মদীনার ঘটনাবলী		৭১
ইয়াযীদের খিলাফতের বিরোধিতা		৭৩
মক্কা অবরোধ এবং ইয়াযীদের মৃত্যু		৭৬
ইয়াযীদের আমলে বিজয় অভিযান		৭৮
উকবার শাহাদাত লাভ		৭৯
এক নজরে ইয়াযীদের শাসনামল		৮০
মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ		৮৪
বসরায় ইব্‌ন যিয়াদের বায়আত গ্রহণ		৮৫
ইরাকে ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত		৮৫
মিসরে ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত		৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম	৮৭
খিলাফতের বায়আত এবং মার্‌জ রাহিতের যুদ্ধ	৮৮
তাওয়াবীনের যুদ্ধ	৯১
খারিজীদের সাথে যুদ্ধ	৯৩
কিরকীসা অবরোধ	৯৪
মারওয়ান পুত্রদের অলীআহ্‌দ নিয়োগ	৯৪
মারওয়ানের মৃত্যু	৯৪
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র (রা)	৯৫
বংশ পরিচয়, প্রাথমিক অবস্থা, চরিত্র ও গুণাবলী	৯৫
ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	৯৭
মুখতারের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি	৯৭
মুখতারের নবুয়ত দাবি এবং আলী (রা)-এর সিংহাসন	১০৫
উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা	১০৭
নাজদাহ্‌ ইব্‌ন আমের কর্তৃক ইয়ামামা দখল	১০৮
কূফা আক্রমণের প্রস্তুতি	১০৮
মুখতারকে হত্যা ও কূফা দখল	১১০
আমর ইব্‌ন সাইয়িদকে হত্যা	১১২
মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের অসতর্কতা	১১৩
আবদুল মালিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি	১১৪
মুসআব ইব্‌ন যুবায়রকে হত্যা	১১৫
যুফার ইব্‌ন হার্‌স ও আবদুল মালিক	১১৮
মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের হত্যা সংবাদ মক্কায় পৌঁছল	১১৯
আবদুল মালিক ও হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র (রা)	১২০
মক্কা অবরোধ	১২১
ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর শাহাদাত	১২৪
এক নজরে ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফত	১২৬
কূফা	১২৯
আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান	১৩১
আবদুল মালিকের খিলাফত আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	১৩৪
খারিজীদের ফিতনা	১৩৪
মুহাল্লাবের প্রতি হাজ্জাজের সম্মান প্রদর্শন	১৪০
কুশবাসী এবং হুরায়ছ ইব্‌ন কাতানার বিশ্বাসঘাতকতা	১৪১
মুহাল্লাবের মৃত্যু এবং নিজ পুত্রদের প্রতি তাঁর অন্তিম উপদেশ	১৪৩
হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ	১৪৩
ওয়াসিত নগরীর পতন	১৪৮
ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের পদচ্যুতি	১৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মূসা ইব্‌ন হাযিম	১৫০
ইসলামী মুদ্রা তৈরির সূচনা	১৫২
ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহ্‌দী (যৌবরাজ্য)	১৫৩
আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের মৃত্যু	১৫৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক	১৫৫
কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম আল-বাহিলী	১৫৭
মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম	১৬০
হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফী	১৬২
মূসা ইব্‌ন নুসায়র	১৬৪
ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যু	১৬৫
সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক	১৬৫
কুতায়বাকে হত্যা	১৬৫
মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মৃত্যু	১৬৬
মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পরিণাম	১৬৭
ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব	১৬৮
মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক	১৬৯
সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের চরিত্র ও ব্যবহার	১৭০
অলীআহ্‌দী (যৌবরাজ্য)	১৭০
সুলায়মানের মৃত্যু	১৭১
হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)	১৭২
খিলাফতের আসনে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)	১৭৪
বনূ উমাইয়ার অসন্তুষ্টির কারণ	১৭৭
চরিত্র ও গুণাবলী	১৭৯
খারিজী সম্প্রাদায়	১৮৬
উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর ইনতিকাল	১৮৭
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি	১৮৮
এক নজরে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকাল	১৮৯
ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক	১৯১
হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক	১৯৪
খুরাসানের ঘটনাবলী	১৯৪
হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ্‌	১৯৯
খাযার ও আর্মেনিয়া	২০১
কায়সারে রূম (বায়যান্টাইন সম্রাট)	২০৩
যায়দ ইব্‌ন আলী (র)	২০৪
আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্র	২০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক	২০৮
উমাইয়া শাসনামলে প্রদেশসমূহের বিভক্তি	২০৯
ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক	২১১
ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক	২১৫
মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম	২১৬
খারিজী সম্প্রদায়	২১৮
মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের খিলাফত আমল	২২২
এক নজরে বনূ উমাইয়ার খিলাফত	২২৩
বনূ উমাইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৎপরতা	২২৬
আবূ মুসলিম খুরাসানী	২৩১
আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা	২৪৪

তৃতীয় অধ্যায়
আব্বাসীয় খিলাফত

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ	২৪৯
আবূ জা'ফর মানসূর	২৫৬
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ	২৫৭
আবূ মুসলিমকে হত্যা	২৫৯
সিনবাদের বিদ্রোহ্ ঘোষণা	২৬১
রাওয়ান্দিয়া ফিরকা	২৬২
আবদুল জাব্বারের বিদ্রোহ ও মৃত্যু	২৬৩
উয়ায়না ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন কা'ব	২৬৪
আলাবীদের উপর জুলুম-নির্যাতন	২৬৫
বাগদাদ নগরীর নির্মাণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা	২৬৭
আলাবী নেতৃবৃন্দকে হত্যা	২৬৭
মুহাম্মদ মাহ্‌দী 'নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ ঘোষণা	২৬৯
ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ	২৮০
বিভিন্ন ঘটনা	২৮৩
আবদুল্লাহ্ আশতার ইব্‌ন মুহাম্মদ মাহ্‌দী	২৮৪
মাহদী ইব্‌ন মানসূরের অলীআহদী (যৌবরাজ্য)	২৮৫
উস্তাদাসীদের বিদ্রোহ ঘোষণা	২৮৬
রুসাফা নির্মাণ	২৮৬
মানসূরের মৃত্যু	২৮৮
মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূর	২৯২
হাকীম মুকান্নার আত্মপ্রকাশ	২৯৩
কর্মকর্তাদের পদচ্যুতি, রদবদল ও নিয়োগ	২৯৪
বারবদ অভিযান	২৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদী ইব্‌ন মাহ্‌দীকে অলীআহ্‌দ (যুবরাজ) নিয়োগ	২৯৫
মাহ্‌দীর হজ্জপালন	২৯৬
স্পেনে সংঘর্ষ	২৯৭
রোমান ভূখণ্ডে হারূনের প্রথম অভিযান	২৯৭
রোমান ভূখণ্ডে হারূনের দ্বিতীয় অভিযান	২৯৮
হাদীর জুরজান আক্রমণ	২৯৯
মাহ্‌দীর মৃত্যু	২৯৯
হাদী ইব্‌ন মাহ্‌দী	৩০১
হুসাইন ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ	৩০২
হাদীর মৃত্যু	৩০৩
আবূ জা'ফর হারূনুর রশীদ ইবন মাহ্‌দী	৩০৪
আমীনের অলীআহ্‌দী (যৌবরাজ্য)	৩০৬
ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ	৩০৭
সিরিয়ার বিশৃঙ্খলা দমন	৩০৮
আত্তাব ইব্‌ন সুফয়ানের বিদ্রোহ	৩০৮
মিসরে বিদ্রোহ	৩০৯
খারিজীদের বিশৃঙ্খলা	৩০৯
মামূনের অলীআহ্‌দী	৩১০
ওয়াহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাসাঈ ও হামযা খারিজীর বিদ্রোহ	৩১০
আর্মেনিয়া প্রদেশে বিশৃঙ্খলা	৩১২
ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ও আব্বাসীয়া নগরী	৩১২
মূতামিনের অলীআহদী	৩১৪
হারূনুর রশীদের স্মরণীয় একটি হজ্জপালন	৩১৫
বারমাকীদের পতন	৩১৫
বারমাকী বংশ	৩১৬
ভারতবর্ষে নাদির শাহ্	৩২২
বারমাকীদের মূলোৎপাটনের আসল তত্ত্ব	৩২৫
হারূনের আমলের আরো কিছু বিবরণ	৩৩২
খুরাসানে বিদ্রোহ	৩৩৪
হারূনের মৃত্যু	৩৩৫
আমীনুর রশীদ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ	৩৩৯
মামূন সকাশে রাফি ও হারছামা	৩৪২
আমীন-মামূনের সুস্পষ্ট বিরোধ	৩৪২
প্রদেশসমূহে অশান্তি	৩৪৩
রোমানদের অবস্থা	৩৪৪
আমীন ও মামূনের শক্তি পরীক্ষা	৩৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে সবিনয় নিবেদন	৩৪৬
খলীফা আমীনের রাজত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি	৩৪৭
খলীফা আমীনের পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল	৩৪৮
তাহিরের রাজত্ব	৩৪৯
আমীন নিহত হলেন	৩৫০
আমীনের শাসনকাল পর্যালোচনা	৩৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

মামূনুর রশীদ	৩৫৭
ইব্‌ন তাবাতাবা ও আবুস্ সারায়ার বিদ্রোহ	৩৫৮
আবুস্ সারায়ার রাজত্ব ও তার পরিণতি	৩৬০
হিজায ও ইয়ামানে বিশৃঙ্খলা	৩৬২
হারছামা ইব্‌ন আইউনের হত্যাকাণ্ড	৩৬৫
বাগদাদে গণ-অসন্তোষ	৩৬৮
ইমাম আলী রিযার মনোনয়ন লাভ	৩৬৯
ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফত	৩৭০
ফযল ইব্‌ন সাহলের হত্যাকাণ্ড	৩৭২
ইমাম আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের ওফাত	৩৭৪
তাহির ইব্‌ন হুসাইনের সমাদর	৩৭৫
সালতানাতের আমলা নিযুক্তি ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	৩৭৬
খুরাসানের গভর্নর তাহির	৩৭৭
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের গভর্নরী	৩৭৮
খুরাসানের গভর্নর তাহির ইব্‌ন হুসাইনের ইন্তিকাল	৩৭৯
আফ্রিকার বিদ্রোহ	৩৮১
নসর ইব্‌ন শীছের বিদ্রোহের অবসান	৩৮২
ইব্‌ন আইশার হত্যাকাণ্ড ও ইবরাহীমের গ্রেফতারী	৩৮২
মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ	৩৮৩
যুরায়ক ও বাবক খুররমী	৩৮৪
বিবিধ ঘটনা	৩৮৬
ওফাত	৩৮৭
বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন	৩৮৮
মুমূনুর রশীদের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি	৩৮৯
একটি অপবাদের জবাব, একটি ভ্রান্তির অপনোদন	৩৯১
খলীফা মামূনের চরিত্র	৩৯৩
মু'তাসিম বিল্লাহ্	৩৯৭
মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বিদ্রোহ	৩৯৮
জাঠদের ধ্বংসসাধন	৩৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সামেরা শহর	৩৯৯
ফযল ইব্‌ন মারওয়ানের পদচ্যুতি	৪০০
বাবক খুররমী ও আফশীন হায়দার	৪০১
আমুরিয়া বিজয় ও রোমের যুদ্ধ	৪০৩
আব্বাস ইব্‌ন মামূনের হত্যা	৪০৫
তাবারিস্তানের বিদ্রোহ	৪০৬
কুর্দিস্তানের বিদ্রোহ	৪০৮
আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের বিদ্রোহ	৪০৮
আফশীনের ভীষণ পরিণতি	৪০৮
মু'তাসিমের মৃত্যু	৪১০
মু'তাসিমের খিলাফতের বৈশিষ্ট্য	৪১১
ওয়াছিক বিল্লাহ্	৪১৩
আবূ হারব ও দামেশকবাসী	৪১৫
আশনাসের উত্থান ও পতন	৪১৫
আরবদের মর্যাদা খর্ব	৪১৬
আহমদ ইব্‌ন নসরের বিদ্রোহ ও পতন	৪১৭
রোমানদের সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়	৪১৮
ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র ওফাত	৪১৯
মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্	৪২০
মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিকের পদচ্যুতি ও মৃত্যু	৪২০
ঈতাখের বন্দীত্ব ও মৃত্যু	৪২১
খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও বায়আত	৪২১
আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ	৪২২
কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদের পদচ্যুতি ও মৃত্যু	৪২২
রোমানদের হামলা	৪২৩
রোম আক্রমণ	৪২৩
জাফরিয়া নদীর পত্তন	৪২৪
মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ড	৪২৫
মুতাওয়াক্কিলের চরিত্র ও আরো কিছু কথা	৪২৬
মুনতাসির বিল্লাহ্	৪২৮
মুসতাঈন বিল্লাহ্	৪২৮
মুতাজ্জ বিল্লাহ্	৪৩৩
মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের মৃত্যু	৪৩৪
আহমদ ইব্‌ন তূলূন	৪৩৪
ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ সিফার	৪৩৫
মুতাজ্জ বিল্লাহ্‌র পদচ্যুতি ও মৃত্যু	৪৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্‌	৪৩৭
মু'তামিদ আলাল্লাহ্‌	৪৪০
উলুভীদের বিদ্রোহ	৪৪০
ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ গভর্নর হলেন	৪৪২
মুসেলের বিদ্রোহ	৪৪২
ইব্‌ন মুফলেহ, ইব্‌ন ওয়াসিল ও ইব্‌ন লাইছ	৪৪৩
সামানিয়া রাজবংশের সূচনা	৪৪৪
যুবরাজের বায়আত	৪৪৫
সাফারের যুদ্ধ	৪৪৫
হাবশী ক্রীতদাসদের ওয়াসিত দখল	৪৪৬
আহমদ ইব্‌ন তূলূনের শাম দখল	৪৪৬
ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ সাফারের মৃত্যু	৪৪৬
মুওয়াফ্‌ফাক ও মু'তামিদের হাতে হাবশীদের উচ্ছেদ	৪৪৭
খুরাসানের অরাজকতা	৪৪৮
ইব্‌ন তূলূনের মৃত্যু	৪৪৮
তাবারিস্তানের বিবরণ ঃ উলুভী, রাফি ও সাফার	৪৪৯
আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার	৪৫০
মক্কা ও মদীনার অবস্থা	৪৫০
মুওয়াফ্‌ফাকের মৃত্যু	৪৫১
কারামিতা	৪৫১
যুবরাজরূপে মু'তাদিদের অভিষেক	৪৫৩
রোমের যুদ্ধ	৪৫৩
মু'তামিদের মৃত্যু	৪৫৪
পর্যালোচনা	৪৫৫

পঞ্চম অধ্যায়

মু'তাদিদ বিল্লাহ্‌	৪৫৯
কারামিতাদের খারাজ	৪৬০
মু'তাদিদ বিল্লাহ্‌র ওফাত	৪৬২
মুকতাফী বিল্লাহ্‌	৪৬২
সিরিয়ায় কারামিতাদের গোলযোগ	৪৬৩
মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের অবসান	৪৬৪
বনী হামদান	৪৬৪
তুর্কী ও রোমানদের হামলা	৪৬৫
মুকতাফী বিল্লাহ্‌র মৃত্যু	৪৬৫
মুকতাদির বিল্লাহ্‌	৪৬৬
উবায়দিয়া রাজবংশের সূত্রপাত	৪৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুবরাজের বায়আত	৪৭১
ইরাকে কারামিতাদের উৎপাত	৪৭২
রোমানদের আগ্রাসী তৎপরতা	৪৭৩
মুকতাদিরের পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল	৪৭৪
মক্কায় কারামিতাদের ঔদ্ধত্য	৪৭৪
মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত	৪৭৫
কাহির বিল্লাহ্	৪৭৬
বুওয়াইয়া দায়লামী রাজবংশের সূচনা	৪৭৭
কাহির বিল্লাহ্র অপসারণ	৪৮২
রাযী বিল্লাহ্	৪৮৩
মিরদাওয়ায়হ্ হত্যা	৪৮৩
প্রদেশসমূহের অবস্থা	৪৮৩
রাযী বিল্লাহ্র মৃত্যু	৪৮৪
মুত্তাকী লিল্লাহ্	৪৮৫
খলীফা মুত্তাকীর পদচ্যুতি	৪৮৬
মুসতাকফী বিল্লাহ্	৪৮৭
সতর্কবাণী	৪৮৭
বাগদাদে বুওয়াইয়া বংশের রাজত্ব	৪৮৯
মুতী' বিল্লাহ্	৪৯০
মুইজুদ্দৌলার আরেকটি অভিশপ্ত কর্ম	৪৯২
গাদীর উৎসব প্রবর্তন	৪৯২
তাযিয়াদারী প্রবর্তন	৪৯২
ওমান অধিকার ও মুইজুদ্দৌলার মৃত্যু	৪৯৩
ইজ্জুদ্দৌলার রাজত্ব	৪৯৩
তায়েলিল্লাহ্	৪৯৫
আদুদুদ্দৌলা	৪৯৬
সামসামুদ্দৌলা	৪৯৭
শারফুদ্দৌলা	৪৯৭
বাহাউদ্দৌলা	৪৯৭
কাদির বিল্লাহ্	৪৯৮
সুলতানুদ্দৌলা	৪৯৯
তুর্কীদের বিদ্রোহ	৫০০
মুশরিফুদ্দৌলা	৫০০
জালালুদৌলা	৫০০
কায়িম বি-আমরিল্লাহ্	৫০১
আবূ কালীজারের রাজত্ব	৫০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মালিকুর রাহীমের রাজত্ব	৫০৩
এক নজরে বুওয়াইয়া রাজত্ব	৫০৫
সালজুকী রাজত্বের সূচনা	৫০৫
মুক্তাদী বি-আমরিল্লাহ্	৫০৯
মজলিসে মৌলুদ	৫১১
মুসতাযহির বিল্লাহ্	৫১১
মুসতারশিদ বিল্লাহ্	৫১৩
রাশিদ বিল্লাহ্	৫১৮
মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্	৫১৯
দায়লামী ও সালজুকী	৫২৩
মুস্তানজিদ বিল্লাহ্	৫২৩
মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্	৫২৫
নাসির লি-দীনিল্লাহ্	৫২৬
যাহির বি-আমরিল্লাহ্	৫৩০
আবূ জা'ফর মুস্তানসির বিল্লাহ্	৫৩০
মুসতাসিম বিল্লাহ্	৫৩২
মিসরে আব্বাসীয় খিলাফত	৫৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ	৫৪১
রাষ্ট্রের উল্লেযোগ্য কর্মচারী ও পদাধিকারী	৫৪১
উযীরে আযম	৫৪২
আমীরুল উমারা	৫৪৩
সুলতান	৫৪৩
আমিল বা ওয়ালী (গভর্নর)	৫৪৪
সাহিবুশ শুরতা (পুলিশ প্রধান)	৫৪৪
হাজিব	৫৪৪
কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি)	৫৪৫
রাঈসুল 'আস্কর (সেনাবাহিনী প্রধান)	৫৪৫
মুহ্তাসিব	৫৪৬
নাযির	৫৪৬
সাহিবুল বারীদ বা রাঈসুল বারীদ (ডাক বিভাগ প্রধান)	৫৪৬
কাতিব	৫৪৭
আমীরুল মিনজানীক	৫৪৭
আমীরুততা'মীর বা রাঈসুল বিন্না	৫৪৭
আমীরুল বাহ্র	৫৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাবীব	৫৪৭
রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য দফতরসমূহ	৫৪৭
দীওয়ানুল আযীয	৫৪৮
দীওয়ানুল খারাজ	৫৪৮
দীওয়ানুল জিয্য়া বা দিওয়ানুয্ যিমান	৫৪৯
দীওয়ানুল আস্কার	৫৪৯
দীওয়ানুশ্ শুরতা	৫৪৯
দীওয়ানুদ্ দিয়া'	৫৪৯
দীওয়ানুল বারীদ	৫৪৯
দীওয়ানুল নাফ্কাত	৫৪৯
দীওয়ানুত-তাওকী'	৫৪৯
দীওয়ানুন্ নযর ফিল-মাযালিম	৫৫০
দীওয়ানুল আন্হার	৫৫০
দীওয়ানুর রাসায়েল	৫৫০
দারুল 'আদল	৫৫০
দারুল কাযা	৫৫১
রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থা	৫৫১
পর্যটন সুবিধা	৫৫২
ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা	৫৫২
সরকারী রাজস্ব	৫৫৩
সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ	৫৫৩
সামরিক ব্যবস্থাপনা	৫৫৪
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি	৫৫৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৫৫৬
হিস্পানিয়া (স্পেন)	৫৫৮
মরক্কোয় স্পেনীয় সালতানাত	৫৫৮
আফ্রিকায় আগলাবী রাজত্ব	৫৫৯
ইয়ামানে যিয়াদিয়া রাজত্ব	৫৫৯
খুরাসানে তাহিরিয়া হুকুমত	৫৬০
খুরাসান ও পারস্যে সাফারীয় হুকুমত	৫৬০
মাওরাউন নাহর ও খুরাসানে সামানীয় রাজত্ব	৬৬০
বাহরায়নে কারামিতা রাজত্ব	৬৬০
তারাবিস্তানে উলুভী রাজত্ব	৫৬১
সিন্ধু প্রদেশ	৫৬১
দায়লামী বুওয়াইয়া রাজত্ব	৫৬১
মিসরে তূলূনিয়া রাজত্ব	৫৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিসর ও সিরিয়ায় আখশাদিয়া রাজত্ব	৫৬২
মিসর, আফ্রিকা ও সিরিয়ায় উবায়দিয়া রাজত্ব	৫৬২
মুসেল, জাযিরা ও সিরিয়ায় বনূ হামদান রাজত্ব	৫৬৩
মক্কায় বনূ সুলায়মান রাজত্ব	৫৬৪
মক্কায় হাশিমী রাজত্ব	৫৬৫
দিয়ারে বকরে মারওয়ানীয়া রাজত্ব	৫৬৫
সালজুকী রাজত্ব	৫৬৫
ইরাক ও সিরিয়ায় আতাবেক রাজত্ব	৫৬৭
আরবেলে আতাবেকদের রাজত্ব	৫৬৭
দিয়ারে বকরে আতাবেক রাজত্ব	৫৬৮
আর্মেনিয়ায় আতাবেক রাজত্ব	৫৬৮
আযারবায়জানে আতাবেক রাজত্ব	৫৬৮
পারস্যে আতাবেক রাজত্ব	৫৬৮
তুর্কিস্তানে আতাবেক রাজত্ব	৫৬৮
খাওয়ারিযম শাহী আতাবেকদের রাজত্ব	৫৬৯
আইয়ূবী রাজত্ব	৫৬৯
মিসরে মামলুক রাজত্ব	৫৭০
তিউনিসে যায়রিয়া রাজত্ব	৫৭০
আলজিরিয়ায় সামাদিয়া রাজত্ব	৫৭০
মুরাবিতীনদের রাজত্ব	৫৭০
মুওয়াহ্হিদীনদের রাজত্ব	৫৭১
তিউনিসিয়ায় হাফসিয়া রাজত্ব	৫৭২
আলজিরিয়ায় যিয়ানিয়া রাজত্ব	৫৭২
মরক্কোয় মুরাইনিয়া রাজত্ব	৫৭২
হাশ্শাশীনদের ইসমাঈলী রাজত্ব	৫৭৩
সিরিয়ায় ঈসায়ী ক্রুসেড হামলা	৫৭৫
এশিয়ায় মোগল রাজত্ব	৫৭৫
তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য	৫৭৬
কাশগড়ে তুর্কী রাজত্ব	৫৭৮
ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব	৫৭৮
ইরাকে জালায়ের রাজত্ব	৫৭৯
মুযাফ্ফারিয়া রাজত্ব	৫৭৯
আযারবায়জানে কারাকোয়ুনলী তুর্কমেনদের রাজত্ব	৫৮০
আককোয়ুন্লী বংশের রাজত্ব	৫৮০
সফাভী রাজত্ব	৫৮০
সামগ্রিক দৃষ্টিপাত	৫৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

উমাইয়া বংশের শাসনামল

ভূমিকা

খিলাফতে রাশিদার পর এখন আমরা বনূ উমাইয়ার শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করব। খিলাফতে রাশিদার প্রথম দুইজন খলীফা না উমাইয়া বংশীয় ছিলেন, আর না হাশিম বংশীয়। তাঁদের উভয়ের খিলাফতকাল ছিল খিলাফতে রাশিদার শ্রেষ্ঠতম শাসনকাল। তৃতীয় খলীফা ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং চতুর্থ খলীফা হাশিম বংশীয়। খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধে বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিম উভয় গোত্রই ফিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমার্ধের অনুপাতে শেষার্ধকে 'একটি ব্যর্থতার যুগ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে– যদিও তা তৎপরবর্তী শাসনকালের তুলনায় ছিল নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠতর। কেননা ঐ সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং বেশির ভাগ সাহাবী তখনও জীবিত ছিলেন। শিরকের মূলোৎপাটন এবং তাওহীদ তথা একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে পরিপূর্ণ তাওহীদ এবং সত্যিকার সাফল্যের পথ প্রদর্শন করেছেন। মানুষের জন্য শিরকের চাইতে ক্ষতিকর এবং তাওহীদের চাইতে মঙ্গলজনক আর কিছুই হতে পারে না। শির্ক প্রকৃতপক্ষে একটি মারাত্মক জুলুম। তাই পবিত্র কুরআনে এটাকে 'জুল্‌মে 'আযীম' (চরম জুলুম) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর চাইতে বড় জুলুম আর কী হতে পারে যে, মানুষ তার প্রকৃত মাবূদ বা উপাস্যকে ছেড়ে ঐসব দুর্বল সত্তাকে নিজের মাবূদ বলে গ্রহণ করে, যারা সত্যিকার মাবূদের মাখলুক (সৃষ্ট) ও গোলাম ছাড়া কিছু নয়। অতএব শুধু ঐ ব্যক্তিই শির্ক করতে পারে, যে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুম ও অবিচারকে নিজের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। যে বস্তুটি তাকে এই জুলুমে লিপ্ত করেছে তা হচ্ছে তার মূর্খতা এবং দুনিয়ার প্রতি তার সীমাহীন আসক্তি। কুরআনের ভাষায় এটাকে 'ইদলাল' (পথভ্রষ্টতা) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, নিজের পরিবার ও নিজের গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা এবং তাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের মূর্তি ও তাদের কবরের প্রতি অযথা সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে শিরকের প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই সীমালংঘন ও পথভ্রষ্টতার মাধ্যমে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, তার মালিক এবং তার উপাস্যকে ভুলে গিয়ে নিজের সর্বনাশ সাধন করেছে। পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকের সম্ভাব্য পথসমূহ রুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষকে বিরত রেখেছেন গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের প্রেম-ভালবাসা থেকেও। অপর যে জিনিসটি মানুষকে 'জুল্‌মে 'আযীম' তথা শিরকের মধ্যে নিক্ষেপ করতে

পারে এবং চিরদিন করেও আসছে তা হলো দাম্ভিকতা ও অযথা গর্ববোধ। এটাই ইবলীসকে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত করেছে এবং এটাই অধিকাংশ মানুষকে সরল পথ থেকে হটিয়ে ধ্বংসের পথে চালিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ধ্বংসাত্মক শিরকী উপাদানসমূহ দূর করার জন্য মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মক্কার সমগ্র অধিবাসী এবং আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিশাল সমাবেশে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يا معشر قريش! ان الله قد اذهب منكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم خلق من تراب

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়া যুগের দাম্ভিকতা এবং পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সমগ্র মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ –

"হে মানুষ ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)।

উক্ত ভাষণে বংশগত ও গোত্রগত দাম্ভিকতা এবং শিরকের আশংকাসমূহ দূর করে তাওহীদের রং-এ রঞ্জিত হওয়ার প্রতিই আহবান জানানো হয়েছে। তাই বলে বংশ ও গোত্রের অস্তিত্ব এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে না। এখানে যা বলা হচ্ছে তা এই, বুযুর্গী ও কৌলীন্য বংশ ও গোত্রের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এটা সম্পর্কিত শুধু তাক্ওয়া ও পরহিযগারীর সাথে। প্রত্যেক ব্যক্তি মুত্তাকী ও আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে নিজেকে সম্মান ও আভিজাত্যের অধিকারী করতে পারে। আবার যে কোন গোত্রের যে কোন লোক আপন অসদাচরণের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সহজ ও সরল পথে মানুষকে পরিচালিত করেছেন, আর এ পথে চলেই মানুষ দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্যের অধিকারী হতে পারে। খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধে পূর্বের পরিত্যাজ্য পথভ্রষ্টতা ও গোত্রগত পক্ষপাতিত্বের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কাফ্রী বিলালকে কুরায়শের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 'সাইয়িদ' (আমার নেতা) বলে সম্বোধন করতেন এবং (তাঁর) পুণ্যকর্মের কারণে তাঁকে নিজেদের থেকে অধিক সম্মানিত ও অভিজাত মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক উসামা ইব্ন যায়দের নেতৃত্বাধীনে অভিজাত বংশের গণ্যমান্য মুহাজির ও আনসারদেরকে যুদ্ধে প্রেরণের মধ্যে যে হিকমত বা রহস্য লুকায়িত ছিল তা হলো এই যে, কারো অন্তরে যেন এই ধারণা আর বাকি না থাকে যে, শুধু জাতি, বংশ কিংবা গোত্রের কারণে মানুষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে। হুকুমত ও খিলাফত যদি কোন বিশেষ বংশ বা বিশেষ গোত্রের অধিকার

হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বে বনূ হাশিম ছাড়া অন্য কোন গোত্রের লোককে নিয়োগ করতেন না। সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বও বনূ হাশিমের লোক ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে জুটত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) বনূ হাশিমের খুব কম সংখ্যক লোককেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা কোন প্রদেশ ও অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। তিনি সব সময়ই ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষকে নেতৃত্বে বা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। কোন বংশ বা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত থাকাকে তিনি নেতৃত্বের জন্য একটি বৈধ অধিকার হিসেবে কখনো গণ্য করেন নি। এ কারণেই নবী করীম (সা)-এর দরবারে ক্রীতদাসরা পর্যন্ত আপন আপন ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে কুরায়শের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সম্বলিত বিরাট বাহিনীর উপর নেতৃত্ব লাভ করতে পারত। আর পরিপূর্ণ তাওহীদ শিক্ষাদানকারী শুধু একজন কামিল উস্তাদের কাছ থেকেই এ ধরনের সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার আশা করা যেতে পারে।

বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিম গোত্রের মধ্যে প্রথম থেকেই এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা রেষারেষি চলে আসছিল। তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। খুব সম্ভব এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের প্রথম দিকে (যেহেতু তিনি বনূ হাশিম গোত্রের লোক ছিলেন) বনূ উমাইয়ার লোকেরাই তাঁর কঠোর বিরোধিতা করেছে এবং বনূ হাশিমের লোকেরা তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করেছে অপেক্ষাকৃত বেশি। যখন আরব দেশ থেকে মুশরিকদের মূলোৎপাটন করা হলো, বনূ উমাইয়া ও হাশিম গোত্রের বিদ্বেষী মুশরিকরা নিহত হলো বাকি সবাই আশ্রয় গ্রহণ করল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তখন এই নবদীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে উমাইয়া গোত্রের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিভাধর ও সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আবূ সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ ঘোষণা করে তাঁকে সম্মানিত করেন। উমাইয়া গোত্রের উসমান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামাতা। তাঁর উপলক্ষেই 'বায়আতে রিদওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-ও ছিলেন উমাইয়া গোত্রের মেয়ে তথা আবূ সুফিয়ানের কন্যা ও মু'আবিয়ার বোন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানকে নাজরানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা) ছিলেন উসমান (রা)-এর চাচা। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাইফ ও তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ফারূকে আযম তাঁকে আম্মান ও বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আত্তাব ইব্ন উসাইদ আবূ সুফিয়ানের চাচা আবুল ঈসের নাতি ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন এবং সেখানকার শাসক নিযুক্ত হন। খালিদ ইব্ন সাঈদ আবূ সুফিয়ানের চাচা। মহানবী (সা) তাঁকে ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন। উসমান ইব্ন সাঈদকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের এবং তাঁর ভাই আবানকে বাহরাইনের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরে বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিমের পুরাতন শত্রুতার কারণে তাদের প্রতি কোন আক্রোশ থাকত এবং তিনি ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর বংশগত ও গোত্রগত সম্বন্ধকে প্রাধান্য দিতেন তাহলে তিনি বনূ উমাইয়ার উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন দেশের প্রশাসক নিয়োগ করতেন না। আসল কথা

হলো, তিনি কখনো ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর বংশগত বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন না। তবে হ্যাঁ, তিনি এই পর্যন্ত বংশগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিতেন যে, যে সব বংশ ও গোত্রের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা সর্বদা বিদ্যমান ছিল, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য লোক খুঁজতে গিয়ে তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐ সব বংশ বা গোত্রেরই শরণাপন্ন হতেন। যেহেতু উমাইয়া ও হাশিম গোত্রের মধ্যকার পুরাতন রেষারেষি, ইসলাম সবেমাত্র মুছে দিয়েছিল তাই তখন সতর্কতার দাবি অনুযায়ী উচিত ছিল খিলাফতের ব্যাপারে তাদের আরো কিছুদিন কোন সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া যাতে তারা তাদের সেই পুরাতন রেষারেষি চিরতরে ভুলে যাবার অবকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ্) পরে তিনিই যে খলীফা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি, সেদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামও তাঁর সেই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ও তাঁর পরে এমন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন যিনি ছিলেন যোগ্যতার দিক দিয়ে সবার উপরে, অথচ উল্লিখিত দু'টি গোত্রের কোনটির সাথেই তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। অনুরূপভাবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর যদি আবূ উবায়দা ইব্নুল জার্‌রাহ্ (রা) অথবা আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম-এর মধ্যে কোন একজন খলীফা হতেন, যেমন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহলে ঐ মৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি পুনরুজ্জীবিত হতো না। কিন্তু উমর ফারূক (রা)-এর পূর্বেই ঐ দু'ব্যক্তি ইনতিকাল করেন।

এরপর যে ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে মজলিসে শূরা তথা 'খলীফা নির্বাচক কমিটি' গঠিত হয়েছিল তাঁরা যদি নিজেদের মধ্য থেকে একজন খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কাজ করতেন অর্থাৎ উমাইয়া ও হাশিম গোত্রের কাউকে খলীফা না বানাতেন তাহলে সম্ভবত সেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না, যা পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল এবং অন্ততপক্ষে এই দুই গোত্রের লোকেরা তাদের ভুলে যাওয়া বিদ্বেষ পুনরায় স্মরণ করার সুযোগ পেত না। যদি আলী (রা) উমর ফারূক (রা)-এর পর খলীফা হতেন তাহলেও ঐ আগুন পুনরায় প্রজ্বলিত হবার সুযোগ লাভের আশংকা ছিল না। কেননা আলী (রা) সম্পর্কে এরূপ আশা ছিল যে, তিনি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বনূ হাশিমের লোকদেরকে সেরূপ অস্বাভাবিক ও দৃষ্টিকটু কোন সুযোগ-সুবিধা দিতেন না, যেরূপ হযরত উসমান (রা) বনূ উমাইয়ার লোকদেরকে দিয়েছিলেন। যাহোক আমাদের এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে, যা ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই ঘটেছিল এবং সেরূপ ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা আমাদের কাছে এমন কোন কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে, ঘটনাটি যেরূপ ঘটেছে সেরূপ না ঘটে অন্যরূপ ঘটলেই সব দিক দিয়ে মঙ্গলজনক হতো। একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার পরস্পর রেষারেষি ইসলামী যুগে পুনরুজ্জীবিত হয়ে দীর্ঘদিন অস্তিত্বশীল থাকার কারণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র যে ক্ষতি হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। আজও যারা এই বিদ্বেষ জীবন্ত রাখার পক্ষপাতী বা যারা কোন বংশ অথবা গোত্রের সম্বন্ধকে খিলাফতের জন্য অপরিহার্য মনে করেন তারা নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষার

ঘোর বিরোধী। আর তাদের দ্বারা যে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বনূ উমাইয়া তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে প্রথম থেকেই ইসলামী খিলাফত কাঠামোর একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। হযরত উসমান (রা) খলীফা হওয়ার পর তাঁর নম্র স্বভাব এবং তাঁর দ্বারা মারওয়ান ইবনুল হাকামকে প্রদত্ত ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বনূ উমাইয়া তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে, তা সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সাথে তারা সমগ্র আরবের উপর তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জোর তদবীরও চালাতে থাকে। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভ এবং সেই সাথে মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইহুদীদের ষড়যন্ত্র বনূ উমাইয়ার জন্য তাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়কই প্রমাণিত হয়। হযরত আলী (রা)-কে তাঁর খিলাফত আমলে এ কারণেও বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যে, তিনি বনূ হাশিমের লোক ছিলেন। তখন সমগ্র আরববাসীর চোখে বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার মধ্যকার বিদ্বেষের ছবি ভাসতে শুরু করেছিল। তাই মুআবিয়া (রা) ও বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে আলী (রা) যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করতেন, ঐ রেষারেষির দিকে লক্ষ্য করে তারা তাতে পুরোপুরিভাবে তাঁর পক্ষাবলম্বন করত না। কেননা তারা দুই গোত্রের পুরাতন শত্রুতার পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভূমিকাই পালন করতে চাইতেন না। যদি হযরত আলী (রা)-এর স্থলে অন্য কোন অ-হাশিমী ব্যক্তি খলীফা হতেন তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবেই আরব গোত্রসমূহের অধিকতর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতেন। স্বয়ং আলী (রা)-এর পরিবর্তে যদি অন্য কোন অ-হাশিমী ব্যক্তি খলীফা হতেন তাহলে তিনি আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে পরাস্ত করতে এবং বনূ উমাইয়াকে সঠিক পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতেন এবং ঐ অ-হাশিমী খলীফার শাসন সফল করার ক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি আরো বেশি কাজে লাগাতে পাতেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর সেই কথাগুলো মনে পড়ে, যা তিনি তাঁর অন্তিম মুহূর্তে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে ওসীয়তস্বরূপ বলেছিলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর খিলাফত যখন হযরত আলী (রা) পর্যন্ত এসে পৌঁছল তখন তরবারিসমূহ খাপ থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং বিবাদেরও কোন মীমাংসা হলো না। এখন আমি ভালোভাবে বুঝতে পারছি, নবুয়ত ও খিলাফত আমাদের বংশে একত্রিত হতে পারে না।"

হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর এই কথাগুলো সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর পর আজ পর্যন্ত সত্যই রয়ে গেছে। খিলাফতে রাশিদার পর বনূ উমাইয়া দামিশকে রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রায় নব্বই বছর সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে শাসন করেছে। স্পেনেও কয়েকশ বছর তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাগদাদকেন্দ্রিক বনূ আব্বাসের শাসনও পাঁচশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। বনূ আব্বাস নিঃসন্দেহে বনূ হাশিমের অন্তর্ভুক্ত, তবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচার বংশধর— তাঁর কন্যার বংশধর ছিল না, যাদেরকে 'সাদাত' বা' খান্দানে 'নবুওয়াত' বলা যেতে পারে। কেননা তাদের সাথেই হযরত ফাতিমা (রা)-এর মাধ্যমে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রক্ত সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু আব্বাসীদের সাথে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সরাসরি কোন রক্ত সম্বন্ধ নেই।

অতএব আব্বাসী বংশকে 'খান্দানে নবুওয়াত' বলা যেতে পারে না। মিসরের একটি রাজবংশ নিজেদেরকে ফাতিমী বলে দাবি করেছে, কিন্তু পর্যালোচকদের দৃষ্টিতে তাদের সে দাবি ভুয়া। হিন্দুস্তানেও এমন একটি রাজবংশ ছিল, যাদেরকে 'খান্দানে সাদাত' বা সাইয়িদ্ বংশ নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু একথা দিবালোকের মত সত্য যে, মুলতানের শাসক খিযির খান, যাকে ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, তিনি মোটেই সাইয়িদ ছিলেন না। 'সাইয়িদ' উপাধিতে তাঁর ভূষিত হওয়ার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, জনৈক বুযুর্গ সূফী তাকে 'সাইয়িদ' (সর্দার অর্থে) বলে সম্বোধন করেছিলেন। আজকালও লোকেরা মুঘল এবং পাঠান সর্দারদেরকে 'সাইয়িদী' (আমার নেতা) বলে সম্বোধন করে থাকে। মোটকথা, আজ পর্যন্ত সাইয়িদ বংশের কোন স্বাধীন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য বিশ্বের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ইতিহাসের এই বাস্তবতার সাথে ইমাম হাসান (রা)-এর অন্তিম বাক্যের যে অপূর্ব মিল রয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইমাম হাসান (রা) আপন ভাই ইমাম হুসাইন (রা)-কে যা বলেছিলেন তা শুধু তাঁরই ইজতিহাদ বা ইলহাম ছিল না, বরং সাহাবীদের ঐ সমগ্র দলটি যাঁরা দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন–একথা ভালোভাবে জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন হাশিমীকে না, কোন প্রদেশের স্বাধীন শাসক নিয়োগ করেছিলেন, আর না নিয়োগ করেছিলেন কোন বিরাট বাহিনীর স্বাধীন ও দায়িত্বশীল অধিনায়ক। মূতা যুদ্ধে তিনি জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে অধিনায়কের তালিকায় রেখেছিলেন সত্যি, তবে তাও নিজের মুক্তদাস যায়দ ইব্ন হারিসার পরের নম্বরে। নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে কিছুদিনের জন্য ইয়ামানের খারাজ (কর) আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সামরিক ও প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব দেন নি বরং তখন এই সব দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল হযরত মুআয ইব্ন জাবাল ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উপর। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক (রা)-ও বনূ হাশিমকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন নি। অথচ একথা কে না জানে যে, এ দুই খলীফাই বনূ হাশিমকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন এবং তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা যে কোন ব্যাপারে বনূ হাশিমের গণ্যমান্য লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং প্রধানত তাদের পরামর্শের উপরই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গৃহীত হতো।

ফারূকে আযম (রা) তো প্রসঙ্গক্রমে একবার পরিষ্কার বলেই ফেলেছিলেন, বনূ হাশিম যদি নবুয়তের মর্যাদার সাথে সাথে হুকুমতেরও অধিকারী হয়, তাহলে তারা জনসাধারণকে তাদের প্রতি সীমাতিরিক্ত বাধ্য ও অনুগত দেখে 'বংশগত দাম্ভিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে। ফলে তারা ইসলামের প্রকৃত রূহ্কে ধ্বংস করে নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। একদা তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি জাহিলিয়া যুগের সাম্প্রদায়িকতার প্রতি উস্কানি দেয় সে অবশ্যই হত্যাযোগ্য। আরেকবার তিনি এও বলেছিলেন, যদি কেউ আপন আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কারণে কোন ব্যক্তিকে আমীর বা হাকিম (শাসক) নিয়োগ করে এমতাবস্থায় যে, এই পদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তাঁর চাইতেও যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন তাহলে সে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও সমগ্র মুসলমানের কাছে প্রতারক হিসেবে গণ্য হবে।

মোটকথা, শুধু ইমাম হাসান (রা)-এরই ধারণা ছিল না যে, নবী বংশের জন্য নবুয়তের মর্যাদাই যথেষ্ট এবং এই মর্যাদার সাথে হুকুমতের (রাজ্য শাসন) একত্রিত হওয়া উচিত নয়–বরং বেশির ভাগ সাহাবীরই এই ধারণা ছিল। প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া থেকে শির্ক ও শিরকের আশংকাসমূহ দূর করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত 'সাদাতে ইযাম' তথা রাসূল-বংশের লোকদের, দুনিয়ার হুকুমত ও পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকা উচিতও নয়, যাতে তাঁরা নিজেদেরকে আলে রাসূল [মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধর] হওয়ার প্রমাণ হাতে-কলমে পেশ করতে পারেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ না দিতেন যে, 'সাদাতে ইযাম-এর জন্য সাদাকা (যাকাত গ্রহণ) হারাম তাহলে আমাদের এই ধারণা হতে পারত যে, 'সাদাত' (নবী বংশই) খিলাফত তথা রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী। কিন্তু রাসূল কর্তৃক আপন বংশের জন্য সাদাকা হারাম করাটা একথারই প্রমাণ যে, পার্থিব হুকুমত, সাম্রাজ্য ইত্যাদির সাথে সম্পর্কহীন থাকার বিষয়টি তিনিই প্রথম তাঁর বংশের জন্য বেছে নিয়েছেন অথবা ইলহামে ইলাহীর মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। আসলে পার্থিব সম্পদ ও সাম্রাজ্য এমনই বিষয় যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আর একারণেই কুরআন ও হাদীসে পার্থিব সম্পদকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ইতিহাস আমাদের সামনে এ তথ্য প্রকাশ করে যে, দওলত ও হুকুমতের কারণে সঠিক জ্ঞানও মানুষকে 'আমালে সালিহা' (পুণ্যকর্ম)-তে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দীন ইসলামের হিফাযত তাঁরাই করেছেন, যারা সম্পদ ও রাষ্ট্রের সাথে খুব একটা সম্পর্ক রাখতেন না। আর এ ধরনের লোকই কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হিফাযত করতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "ইসলাম গরীবদের মধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত গরীবদের মধ্যেই অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ হাদীসটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কুরআন এবং আমার 'আলে' (পরিবার) রেখে যাচ্ছি।" এ থেকেও পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইমাম হাসান (রা) হাদীসের মর্মানুসারেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "আমি ভালোভাবে জানি যে, নবুয়ত ও খিলাফত আমাদের বংশে একত্রিত হতে পারে না।"

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) হিজরতের সতের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি বয়সের দিক দিয়ে হযরত আলী (রা)-এর ছয় বছরের ছোট ছিলেন। আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর মা হিন্দা বিনতে উতবার প্রথম বিবাহ হয় কুরায়শ বংশীয় ফাকাহ্ ইব্ন মুগীরার সাথে। একদা হিন্দা-এর চরিত্র (সতীত্ব) সম্পর্কে ফাকাহ্র মনে সন্দেহ জাগে। তাই সে গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ্যে চর্চা হতে থাকে। তখন হিন্দার পিতা উতবা মেয়েকে বলল, তুমি আমাকে সত্যি করে বল, আসল ঘটনা কি ? তোমার বিরুদ্ধে ফাকাহ্র অপবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে দুর্ণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি ফাকাহ্কে হত্যার ব্যবস্থা করব। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় এবং অকারণে তোমার দুর্ণাম রটায় তাহলে আমরা এ ব্যাপারে কোন কাহিন (গণক ভবিষ্যৎ বক্তা)-এর শরণাপন্ন হব। তখন

হিন্দা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য পিতার সামনে কঠিন শপথ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত ঐ অভিযোগ সর্বতোভাবে অস্বীকার করে। উতবা তাঁর মেয়ের নির্দোষিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফাকাহ্ ইব্ন মুগীরাকে আপন গোত্রের (বনূ মাখযূমের) কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে ইয়ামানের জনৈক কাহিনের কাছে যেতে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে উতবা ইব্ন রাবীআ ও তাঁর সাথে আবদে মানাফের কিছু লোক হিন্দা ও তার এক বান্ধবীকে নিয়ে ঐ কাহিনের কাছে যায়। উভয় পক্ষই কাহিনকে বলে, আপনি এই দু'টি স্ত্রীলোক সম্পর্কে ধ্যান করে দেখুন।

কাহিন প্রথমে হিন্দা-এর বান্ধবীর কাছে গেল এবং তার উভয় কাঁধে মৃদু আঘাত করে বলল, উঠে পড়। এরপর হিন্দার কাছে গিয়ে তার কাঁধে আঘাত করে বলল, না তুমি কোন পাপ করেছ, আর না ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ। তুমি একটি বাদশাহ্র জন্ম দেবে, যার নাম হবে মুআবিয়া। ফাকাহ্ এই কথা শোনামাত্র হিন্দাকে ধরে ফেলল। কিন্তু হিন্দা ঝটকা মেরে ফাকাহের হাত দূরে ঠেলে দিয়ে বলল, যদি আমার ঘরে কোন বাদশাহ্র জন্ম হয় তাহলে সে বাদশাহ্র জন্ম তোমার বীর্যে হবে না। যাহোক এই নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ার পর হিন্দা ফাকাহের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেনি। এরপর আবূ সুফিয়ান হিন্দাকে বিবাহ করে এবং তাঁরই ঔরসে মুআবিয়ার জন্ম হয়।

মুআবিয়ার জন্মের সময় আবূ সুফিয়ানের বয়স চল্লিশ বছরের কিছু উর্ধ্বে ছিল। আবূ সুফিয়ানের বয়স ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে দশ বছর বেশি। শিশু বয়সেই আমীরে মুআবিয়ার মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ পাওয়া যেত যার কারণে লোকেরা তাঁকে 'কিসরা-ই আরব' (আরব সম্রাট) বলে সম্বোধন করত। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, ধীরতা, স্থিরতা ও দূরদর্শিতার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতির এবং লালিমা মিশ্রিত শুভ্র বর্ণের। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়, তবে এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ যে, যে কেউ তাঁর ধারে ঘেঁষতে সাহস পেত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুআবিয়াকে দেখে বলেছিলেন, এ হচ্ছে আরবের 'কিসরা' (সম্রাট)। যেদিন মুআবিয়া তোমাদের থেকে অন্তর্হিত হবে সেদিন তোমরা দেখবে, অনেক মস্তক দেহ থেকে পৃথক করা হচ্ছে। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি মিম্বরের উপর বসে খুতবা দিতেন। বসে বসে খুতবা দেওয়ার প্রচলন আমীরে মুআবিয়া (রা) থেকেই হয়েছে। তিনি অত্যন্ত লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ানের সাথে পঁচিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁর সংসর্গে থাকেন। তিনি হুনায়ন যুদ্ধ এবং তাইফ অবরোধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় উমরা পালনের পর যখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আমীরে মুআবিয়াও তাঁর সাথে ছিলেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত হন। ওহী লেখা ছাড়াও বহিরাগত প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) যখন আমীরে মুআবিয়ার ভাই ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে একটি বাহিনীসহ সিরিয়ায় প্রেরণ করেন তখন তাঁর সাথে যে সহায়ক বাহিনী পাঠান তার অধিনায়ক তাঁকেই নিযুক্ত করেন। সিরিয়ার বিজয় অভিযানে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক

হিসাবে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আর তখন থেকেই একজন বীর সৈনিক হিসাবে তিনি সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। ফারূকে আযম (রা) তাঁকে জর্দানের স্বতন্ত্র শাসক নিয়োগ করেন। 'ত্বা-উনে আম ওয়াসে' (আমওয়াস মহামারীতে) যখন হযরত আবূ উবায়দা, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান প্রমুখ ইনতিকাল করেন তখন ফারূকে আযম (রা) মুআবিয়াকে তাঁর ভাই ইয়াযীদের পদে অর্থাৎ সিরিয়ার গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। জর্দান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য জেলাও তাঁরই শাসনাধীনে থাকে। ফারূকে আযম (রা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে যান তখন মুআবিয়াও অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে হযরত উমর (রা)-এর অবস্থানকালীন সময়ে তিনিও তাঁর সাথে সাথে থাকেন। তখন ফারূকে আযম (রা) তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তুমি রাজা-বাদশাহদের চালচলন গ্রহণ করেছ এবং দ্বাররক্ষীও নিয়োগ করেছ। তিনি উত্তর দেন, সিরিয়া সীমান্তে সব সময়ই কায়সারের সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তাই যে কোন সময় আমাদের উপর তাদের আক্রমণের আশংকা রয়েছে। তাছাড়া কায়সারের গুপ্তচররা সিরিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় কায়সার এবং খ্রিস্টানদের ভীত-সন্ত্রস্ত রাখার জন্য বাহ্যিক শৌর্যবীর্যের এবং কায়সারের গুপ্তচর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দ্বাররক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। এই উত্তর শুনে ফারূকে আযম (রা) তাঁর উপর থেকে উপরোক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

আমীরে মুআবিয়া ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে নৌহামলার অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে কনসটান্টিনোপল ও রোম সাগরের দ্বীপসমূহের উপর নৌহামলা পরিচালনা করা যায়। কিন্তু ফারূকে আযম (রা) তাঁকে অনুমতি দেননি। ফারূকে আযমের পর হযরত উসমান (রা) খলীফা হলে তিনি তাঁকে সিরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের শাসক নিয়োগ করেন। তিনি (মুআবিয়া) (রা) সমগ্র সিরিয়া নিজ দখলে ও শাসনাধীন এনে সেখানকার শাসন ব্যবস্থা খুব মজবুত এবং সুদৃঢ় করে তোলেন। তিনি তাঁর সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক দক্ষতা দ্বারা রোমের কায়সারকে সর্বক্ষণ এমনভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখেন যে, তখন রোমান তথা খ্রিস্টান জাতি ইসলামী রাষ্ট্রের উপর হামলা করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর আমীরে মুআবিয়া হযরত আলী (রা)-এর মুকাবিলায় কি করেছিলেন সে সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী ৪১ সনের (জুলাই ৬৬১ খ্রি.) রবিউল আউয়ালের শেষ দশদিনে আমীরে মুআবিয়া ও ইমাম হাসান (রা)-এর মধ্যে আপোস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর তিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্ব আমীরে মুআবিয়ার হাতে বায়আত করে এবং তাঁকে মুসলিম বিশ্বের একক শাসক হিসাবে মেনে নেয়। ঐ সময়ের অর্থাৎ হিজরী ৪১ (৬৬০-৬১ খ্রি.) সালের বিশ বছর পূর্ব থেকে মুআবিয়া (রা) সিরিয়ার গভর্নর পদে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাজাধিরাজ অধিপতি হয়ে আরো বিশ বছর জীবিত থাকেন। তাঁর শাসনকালের মেয়াদ সর্বমোট চল্লিশ বছর। এই চল্লিশ বছরের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন একজন প্রাদেশিক গভর্নর এবং শেষার্ধে ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শাহানশাহ। এর প্রথমার্ধের অবস্থা সংক্ষেপে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শেষার্ধ তথা তাঁর রাজত্বকালীন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আমীরে মুআবিয়ার চরিত্র ও গুণাবলী

মুআবিয়া (রা) থেকে একশ তেষট্টিটি হাদীস বর্ণিত আছে–যেগুলো পরবর্তীকালে ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন যুবায়র, আবুদ্-দারদা (রা) প্রমুখ সাহাবী এবং ইবনুল মুসায়্যাব, হুমায়াদ ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ তাবিঈ বর্ণনা করেছেন। তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধেও অনেক হাদীস প্রসিদ্ধ। ইমাম তিরমিযী (র) হাসান হাদীসসমূহের অধীনে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমীরে মুআবিয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রভু মুআবিয়াকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করে দাও।' মুসনাদে আহমদ ইব্‌ন হাম্বলে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'যখন তুমি বাদশাহ হয়ে যাবে তখন মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। একবার মুআবিয়া (রা) তাঁর খিলাফত আমলে হজ্জ সম্পাদন করে মদীনায় আসেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব মুআবিয়া (রা)-এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় আবূ কাতাদা আনসারী (রা) সেখানে আসেন। মুআবিয়া (রা) তাঁকে দেখে বলেন, আমাকে দেখার জন্য সব লোকই এসেছে, কিন্তু আনসাররা আসেনি। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমার কাছে কোন বাহন নেই তাই আসতে পরিনি। মুআবিয়া (রা) বলেন, তোমার উটের কি হলো ? তিনি উত্তরে বলেন, তোমার এবং তোমার পিতার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে আমার সব উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার পরে এমন এক যুগ আসবে, যখন লোকেরা হকদারের চাইতে না-হকদারকে প্রাধান্য দেবে। তখন মুআবিয়া (রা) বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কিছু বলেছেন ? আবূ কাতাদা (রা) উত্তর দেন, হ্যাঁ। তিনি বলেছেন ঃ এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মুআবিয়া (রা) তখন বলেন, ব্যস! তাহলে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।

কুরায়শ বংশের একটি যুবক মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে গালমন্দ করলে তিনি বলেন, ভাতিজা! তুমি এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত হও। কেননা বাদশাহ্‌র রাগ হয় শিশুর মত, আর তার পাকড়াও হয় বাঘের মত। শাবী বলেন, আরবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের সংখ্যা হচ্ছে চার। আর তাঁরা হচ্ছেন মুআবিয়া, আমর ইব্‌নুল আস, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা ও যিয়াদ ইব্‌ন আবীহি। মুআবিয়া ছিলেন সহিষ্ণু ও প্রখরবুদ্ধি সম্পন্ন, আমর যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার যোগ্যতা রাখতেন, মুগীরা কখনো হতবুদ্ধি হতেন না, আর যিয়াদ প্রতিটি ছোটবড় ব্যাপারেই ছিলেন সমান মনোযোগী। কাযীর সংখ্যাও চার। আর তাঁরা হচ্ছেন উমর, আলী, ইব্‌ন মাসউদ ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)। জাবির (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর চাইতে কুরআন ও ফিকহের উপর অধিক জ্ঞানসম্পন্ন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র চাইতে অধিক বদান্য, মুআবিয়ার চাইতে অধিক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান এবং আমর ইব্‌নুল আসের চাইতে অধিক অকৃত্রিম বন্ধু আমি দেখিনি। হযরত আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব একদা আমীরে মুআবিয়ার কাছে গেলে তিনি তাঁকে দেখে রসিকতা করে বলেন, দেখ দেখ, ইনি হচ্ছেন আকীল, যার চাচা ছিলেন আবূ লাহাব। আকীল (রা) সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, আর দেখ, ইনি হচ্ছেন মুআবিয়া, যার ফুফু ছিলেন 'হাম্মালাতাল হাতাব' (ইন্ধন বহনকারী)। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস

(রা)-কে আমীরে মুআবিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তাঁর সহিষ্ণুতা তাঁর ক্রোধের উপর 'তিরইয়াক' বা বিষহরি ওষুধির ন্যায় কাজ করত, আর তাঁর বদান্যতা মানুষের জিহ্বার উপর তালা লাগিয়ে দিত। কিভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে হয় তা তিনি ভালভাবেই জানতেন এবং তাঁর রাজত্ব সুদৃঢ় হওয়ার এটাই ছিল প্রধান কারণ। একদা স্বয়ং মুআবিয়া (রা) বলেন, চারটি কারণে আমি আলীর বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছি।

১. আমি আমার সব কথা গোপন রাখতাম এবং আলী (রা) তাঁর সব কথা লোকের কাছে বলে দিতেন।
২. আমার বাহিনী ছিল বাধ্য ও অনুগত, আর তাঁর বাহিনী ছিল অবাধ্য ও অশিষ্ট।
৩. আমি জামাল যুদ্ধে কোনভাবেই অংশগ্রহণ করিনি।
৪. আমি কুরায়শের মধ্যে ছিলাম জনপ্রিয়। আর আলী (রা)-এর প্রতি লোকেরা ছিল অসন্তুষ্ট।

আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

আমীরে মুআবিয়া (রা) যখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন ইসলামী বিশ্বে আকাইদ ও আমলের (বিশ্বাস ও কার্যের) দিক দিয়ে তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে শীআনে আলী। এই দল আলী (রা)-কে খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি মনে করত। তারা আরও মনে করত যে, তাঁর পরে তাঁর বংশধররাই খিলাফতের উত্তরাধিকারী হবে। এ দলের লোক ইরাক ও ইরানে ছিল বেশি। মিসরেও তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু ইমাম হাসান (রা) খিলাফত ত্যাগ করেন। আমীরে মুআবিয়ার সাথে আপোস চুক্তি করায় এই দলের লোকসংখ্যা অনেক হ্রাস পায়। অপর শ্রেণীর লোক হচ্ছে শীআনে মুআবিয়া বা শীআনে বনূ উমাইয়া। সিরিয়ার সমগ্র লোক এবং হিজাযের বনূ কাল্‌ব এবং আরো কয়েকটি গোত্রের লোক এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করার কারণে এই দল আমীরে মুআবিয়া এবং বনূ উমাইয়াকেই খিলাফতের অধিকারী মনে করত এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সব সময় তৈরি থাকত। তৃতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে খাওয়ারিজ। এই দল শীআনে আলী ও শীআনে বনূ উমাইয়া উভয়কে পথভ্রষ্ট ও কাফির জ্ঞান করত এবং তাদের মুকাবিলার জন্য সব সময় তৈরি থাকত। মুনাফিক এবং ষড়যন্ত্রকারী লোক, যারা সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী বিশ্বের শত্রু ছিল তারা এই দলের সাথে অবাধে মেলামেশা করত। এই দলের বেশির ভাগ লোক ইরাক, বসরা, কূফা ও ইরানে বসবাস করত। এই তিন দল ছাড়া আরেকটি দল ছিল, যারা সর্বপ্রকার ঝগড়াঝাটি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করত এবং নিভৃত জীবন পছন্দ করত। বেশির ভাগ শীর্ষস্থানীয় সাহাবা এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলের বেশির ভাগ লোক মক্কা, মদীনা ও হিজাযের পল্লী অঞ্চল এবং উটের চারণভূমিসমূহে বসবাস করতেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমীরে মুআবিয়াকে সর্বপ্রথম খারিজীদের মুকাবিলা করতে হয়। হিজরী ৪১ সনের রবিউল আউয়ালের শেষাংশে যখন আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং কূফায় সাধারণভাবে আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখন

ফারওয়া ইব্‌ন নাওফাল আশজায়ী' নামীয় জনৈক খারিজী পাঁচশ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যে আমীরে মুআবিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং কূফা থেকে বের হয়ে নাখলিয়া নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করে।

মুআবিয়া (রা) ওদের সাথে জোরজবরদস্তি করা অসমীচীন মনে করেন এবং নিজ মতলব উদ্ধারের জন্য কূটনীতির আশ্রয় নেন। তিনি কূফাবাসীদের একত্রিত করে উপদেশের সুরে বলেন, এই সমস্ত লোক তোমাদেরই ভাই বন্ধু। তোমরাই এদের বুঝাও এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও বিরোধিতার কুফল সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও। আশ্‌জা গোত্রের লোকেরা তাঁর এই উপদেশে এতই প্রভাবিত হয় যে, তারা একযোগে ছুটে গিয়ে ফারওয়া ইব্‌ন নাওফাল আশজায়ীকে বন্দী করে নিয়ে আসে। এরপর খারিজীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল হাওসাকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে এবং কোনরূপ আপোস-মীমাংসায় আসতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত কূফাবাসীরা তাদের সাথে মুকাবিলা করে এবং তাতে অন্যান্যের সাথে আবদুল্লাহ্‌ও মারা যায়। তারপর খারিজীদের সংখ্যা দেড়শতে গিয়ে পৌঁছে। এবার তারা হাওসারা আসাদীকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। মুষ্টিমেয় এই লোকদের প্রতিও আপোস-মীমাংসার আহবান জানানো হয়। কিন্তু তারা আপোস-মীমাংসার চাইতে মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করে। শেষ পর্যন্ত আবূ হাওসারা ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করে এবং কিছু লোক ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন শহরে চলে যায়। আমীরে মুআবিয়া খলীফা হওয়ার সাথে সাথে কূফায় এই প্রথম রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। সাথে সাথে এই তথ্যও প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেক শহরে এবং সমগ্র ইরাকে খারিজীদের অস্তিত্ব রয়েছে।

গভর্নর নিয়োগ

আমীরে মুআবিয়া (রা) ইতিপূর্বেই মিসরের শাসন ক্ষমতা আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। সমগ্র ইসলামী বিশ্বের শাসক হওয়ার পর তিনি সাইয়িদ ইবনুল আসকে মক্কার এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সাইয়িদ ও মারওয়ান উভয়ই ছিলেন তাঁর আত্মীয়। এ কারণেই তিনি এ দু'জনের হাতে ইসলামী বিশ্বের দু'টি কেন্দ্রীয় শহরের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলেন, যাতে সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কোন দল গড়ে না ওঠে বা কোন ষড়যন্ত্রও সফল না হয়। তিনি প্রতিবছর স্বয়ং হজ্জে যেতেন না। তাই ঐ দু'জনের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে 'আমীরুল হজ্জের' দায়িত্ব প্রদান করতেন। মক্কা ও মদীনার কেন্দ্রিকতা ও সর্বজনমান্যতার সুযোগ নিয়ে যাতে এ দু'জনের কেউ আবার তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালী হয়ে না ওঠে সেজন্য তিনি প্রতিবছর এদের দু'জনকে একে অন্যের জায়গায় বদলী করতেন। কূফায় খিলাফতের বায়আত নেওয়ার পরই মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি যেভাবে সম্ভব সেখানে থেকে খারিজীদের বিশৃংখলা দূর করেন। অন্যান্য প্রদেশ এবং রাজ্যের কর্মকর্তাদের নামেও তিনি একটি নির্দেশনামা পাঠান। তাতে লেখা ছিল, জনসাধারণের কাছ থেকে আমার নামে বায়আত গ্রহণ কর এবং তুমি এজন্য নিজেকে আমার পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ও আদিষ্ট মনে কর। আলী (রা) যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে পারস্যের

শাসক নিয়োগ করেছিলেন। যিয়াদকে শীআনে আলী-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো। সমগ্র আরবে তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার খ্যাতি ছিল। যিযাদ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পারস্য প্রদেশ শাসন করছিলেন। আমীরে মুআবিয়া এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, যিয়াদ যদি তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং আলী (রা)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা বানিয়ে তার হাতে বায়আত করে এবং তাঁর (মুআবিয়ার) প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে তো এক বিরাট সমস্যা দেখা দেবে। অতএব কি কৌশল অবলম্বন করলে যিয়াদকে কাবু করা যাবে তিনি সর্ব প্রথম তাই চিন্তা করতে লাগলেন।

যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান

যিয়াদের মা সুমাইয়া ইব্‌ন কিলাব সাকাফীর ক্রীতদাসী ছিল। যিয়াদের পিতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা সংশয় ছিল। আসল ঘটনা এই যে, জাহিলিয়া যুগে আবূ সুফিয়ান সুমাইয়াকে বিবাহ করেছিল এবং তার ঔরসেই যিয়াদের জন্ম হয়। আবূ সুফিয়ানের সাথে যিয়াদের অনেক দৈহিক মিলও ছিল। কিন্তু আবূ সুফিয়ানের গোত্রের লোকেরা ও আমীরে মুআবিআ যিয়াদকে তার পুত্র স্বীকার করতেন না। সে যখন শুনতে পেল, আমীরে মুআবিয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা মেনে নেওয়া হয়েছে তখন সে বায়আত করবে কিনা বা আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা স্বীকার করবে কিনা সেই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। এই সুযোগে মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে (যিনি যিয়াদের একজন বন্ধু ছিলেন) একটি আমাননামাসহ (নিরাপত্তা পত্র) যিয়াদের কাছে পাঠান। সেই সাথে তিনি যিয়াদকে আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়ে তাকে উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মুগীরা (রা) আমাননামাসহ যিয়াদের কাছে পারস্যে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখানকার হিসাব-কিতাব ও কোষাগার দেখে সবকিছু ঠিক আছে বলে প্রত্যয়ন করেন এবং যিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে মুআবিয়ার কাছে চলে আসেন। মুআবিয়া (রা) যিয়াদকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেন এবং আপন ভাই বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন। সমস্ত চিঠিপত্রে তার নাম 'যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান' লেখা হতে থাকে। হযরত আলী (রা) বিশ্বাস করতেন যে, যিয়াদ আবূ সুফিয়ানেরই পুত্র। আবূ সুফিয়ান একবার হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর মজলিসে স্বীকার করেছিলেন যে, যিয়াদ তারই পুত্র। এজন্য তিনি যিয়াদকে পারস্যের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। এবার মুআবিয়া (রা) যিয়াদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং বসরাবাসীদের সঠিক পথে আনার জন্যে তাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। যিয়াদ বসরায় পৌঁছেই তাদের জামি' মসজিদে একত্র করে একটি কড়া ভাষণ দেন। ঐ সময়ে বসরাবাসীরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। সেখানে অহরহ চুরি, ডাকাতি ও বিদ্রোহের ঘটনা ঘটত। যিয়াদ সেখানে পৌঁছেই সামরিক আইন জারি করেন এবং এই মর্মে এক নির্দেশ দেন যে, যাকেই রাতের বেলা ঘরের বাইরে কিংবা রাস্তায় অথবা মাঠে দেখা যাবে তাকে কোনরূপ শুনানি ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে। এই নির্দেশ অত্যন্ত কঠোরভাবে কার্যকরী করা হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই বসরাবাসীদের সব বক্রতা ও ধৃষ্টতা যেন হাওয়ায় উবে যায়।

আমীরে মুআবিয়া বসরায় যিয়াদকে এবং কূফায় মুগীরাকে গভর্নর নিয়োগ করে ইরাক ও পারস্যের দিক থেকে অনেকটা স্বস্তি লাভ করেন। কেননা ইরানের সমগ্র প্রদেশ কূফা ও

বসরার অধীনে ছিল। এরপর তিনি সরাসরি পারস্য, জাযীরা ও সিজিস্তানের শাসন ক্ষমতাও যিয়াদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই সমগ্র অঞ্চল বসরার গভর্নরের শাসনাধীনে ন্যস্ত করে তিনি প্রাচ্য দেশীয় ফিতনাসমূহের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। খারিজীরা নিত্যদিন ইরাক ও পারস্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। যিয়াদ ও মুগীরা উভয়ে মিলে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার সাথে তা দমন করেন। মোটকথা, আমীরে মুআবিয়ার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে, ঐ অঞ্চলে তাঁরা এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টিই হতে দেননি। যিয়াদ প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত কঠোর হলেও তার শাসনাধীন এলাকাসমূহের যেখানে যেখানে সহৃদয় ও নম্র ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল সেখানে নম্র ব্যবহারই করতেন। একদা তিনি জানতে পারেন, আবুল খায়র নামীয় জনৈক দুঃসাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি খারিজীদের সমমতাবলম্বী হয়ে গেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবুল খায়রকে ডেকে পাঠান এবং তাকে 'জুনদী সাপূর' এলাকার শাসক নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশলের সাথে একটি আপাত বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

মিসরের গভর্নর আমর (রা) হিজরী ৪৩ (৬৬২-৬৩ খ্রি) সনে ইনতিকাল করেন। মুআবিয়া (রা) তাঁরই পুত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এই বছরই খারিজীরা যখন দেখল মুগীরা ইব্‌ন শুবা যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের মত তত কঠোর ও পাষাণ হৃদয় নন, বরং ক্ষমাশীল এবং দয়ালু তখন তারা পুনরায় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র শুরু করে। তখন মুগীরার স্থলে যদি যিয়াদ কূফার গভর্নর হতেন তাহলে খারিজীরা এই ষড়যন্ত্র করার সাহস পেত না। যিয়াদ খুব ভালভাবেই খারিজীদের' খবর রাখতেন। এজন্য তিনি বসরাবাসীদেরকেও শায়েস্তা করতে পেরেছিলেন। মুসতাওরিদ ইব্‌ন আলকামার নেতৃত্বে তিন শতাধিক খারিজী হিজরী ৪৩ (৬৬৩ খ্রি) ১লা শাওয়াল ঠিক ঈদুল ফিত্‌রের দিন কূফা থেকে বের হয়। মুগীরা তাদের বন্দী করার জন্য তিন হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী পাঠান। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং তিনশ খারিজী তিন হাজার সৈন্যকে পরাজিত করে। এরপর আরো সৈন্য পাঠানো হয় এবং তাদেরকেও খারিজীরা পরাজিত করে। শেষ পর্যন্ত মাকিল ইব্‌ন কায়সের নেতৃত্বে তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। প্রথমে উভয় বাহিনীর অধিনায়ক অর্থাৎ মাকিল ও মুসতাওরিদ পরস্পরের সাথে মুকাবিলা করেন এবং উভয়ই নিহত হন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি ছাড়া খারিজী বাহিনীর সকলেই মারা যায়। এই ঘটনার কারণে মুগীরা (রা) খারিজীদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠেন।

রোম সম্রাটের দিক থেকে সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে স্থল ও নৌ উভয় প্রকার হামলারই আশংকা ছিল। রোমানরা প্রায়ই মিসর ও আফ্রিকার উপর হামলা করত। মুআবিয়া (রা) প্রাচ্যের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর রোমানদের বিরুদ্ধেও তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি নৌবাহিনী গঠন করেন। স্থল বাহিনীর সৈন্যদের চাইতে নৌবাহিনীর সৈন্যদের জন্য অধিক ভাতা নির্ধারণ করা হয় যাতে লোকেরা নৌবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য অধিক আগ্রহী হয়।

আনুমানিক দু'হাজার সামরিক নৌযান তৈরি করা হয় এবং জুনাদা ইব্‌ন উমাইয়াকে নৌবাহিনীর অধিনায়ক তথা এডমিরাল নিয়োগ করা হয়। মুআবিয়া (রা) স্থলবাহিনীকেও

পূর্বের চাইতে অনেক সুন্দর করেন। তিনি স্থল বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগকে বলা হতো 'শাতিয়াহ' তথা শীতকালীন বাহিনী এবং অপর ভাগকে বলা হতো 'সায়িফাহ' তথা গ্রীষ্মকালীন বাহিনী। ফলে শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই আমীরে মুআবিয়ার স্থলবাহিনী সীমান্ত-সমূহে রোমান বাহিনীকে প্রতিরোধ করত এবং প্রয়োজনবোধে অনেক দূর পর্যন্ত তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। ফলে রোমানরা সব সময়ই মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত থাকত। অপর দিকে মুসলিম নৌবাহিনী সাইপ্রাস, রোডস প্রভৃতি দ্বীপে স্থায়ী সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করে সম্রাটের নৌযানসমূহকে রোম সাগর থেকে বেদখল করে দেয়। ফলে মিসর ও সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল রোমানদের সামরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। হিজরী ৪৩ (৬৬২-৬৬৩ খ্রি) সনে সিজিস্তানের সন্নিকটবর্তী এলাকা, রাজাহ ইত্যাদি জয় করা হয়। ঐ বছর বারকা ও সুদানের দিকে ইসলামী বাহিনী এগিয়ে যায় এবং সমস্ত অঞ্চল পদানত করে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

কনসটান্টিনোপল আক্রমণ

কায়সারের (রোমান সম্রাটের) ক্ষমতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করার পর আমীরে মুআবিয়া হিজরী ৪৮ (৬৬৮ খ্রি) সনে কায়সারের রাজধানী কনসটান্টিনোপল আক্রমণের পরিকল্পনা নেন, যাতে কায়সারের পরাক্রম খর্ব হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানরা এতটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, ভবিষ্যতে কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসার সাহস হারিয়ে ফেলে। তিনি কনসটান্টিনোপলে আক্রমণ পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মক্কা মদীনায়ও ঘোষণা করিয়ে দেন যে, শীঘ্রই মুসলমানরা কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করবে। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

"আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী কায়সারের শহর আক্রমণ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" তিনি আরও বলেছিলেন ঃ 'তোমরা অবশ্যই কনসটান্টিনোপল জয় করবে।' কত সৌভাগ্যবান সেই আমীর আর কত সৌভাগ্যবান সেই বাহিনী (সম্পাদক)। অতএব সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র,আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, হুসাইন ইব্ন আলী, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) প্রমুখ সাহাবী আল্লাহ্র মাগফিরাত ও সৌভাগ্য লাভের আশায় কনসটান্টিনোপল আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ফলে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে উঠে। মুআবিয়া (রা) সুফিয়ান ইব্ন আওফকে ঐবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াযীদকে (যিনি সাইফাহ্ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন) তাঁর অধীনে একটি খণ্ড বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপল অবরোধ করে। যেহেতু শহরের প্রাচীর ছিল খুবই সুদৃঢ়, উপরন্তু প্রকৃতিগতভাবে এর অবস্থান এমন দুর্ভেদ্য ছিল যে, মুসলমানদের অবরোধ বা আক্রমণ সফল হতে পারেনি, বরং তাতে কিছুসংখ্যক নাম করা ইসলামী ব্যক্তিত্ব শাহাদাত বরণ করেন। অবরোধ চলাকালেই বিখ্যাত সাহাবী আবূ আইয়ূব (রা) শাহাদাত বরণ করেন এবং শহর প্রাচীরের নিম্নদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা আরো কিছু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলমানরা কনসটান্টিনোপল জয় না করেই

ফিরে আসেন। বাহ্যত ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল। কেননা মুসলমানরা কনসটান্টিনোপল জয় করতে পারেনি। কিন্তু ভবিষ্যতের ফলশ্রুতির দিক দিয়ে এতে মুসলমানদের বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। কেননা, ঐ হামলার ফলে কায়সার ও তাঁর বাহিনী এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের ঐ প্রত্যাবর্তনকে তারা তাদের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয় বলে ধরে নিয়েছিল এবং ভবিষ্যতে তাদের দিক থেকে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ পরিচালনার যাবতীয় আশংকা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু যে সমস্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে এতদিন মুসলমান ও ঈসায়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল তা পুরোপুরিভাবে মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে এসেছিল।

হিজরী ৫০ (৬৭০ খ্রি) সনে মুআবিয়া (রা) উকবা ইব্‌ন নাফিকে মিসর, বারকা ও সুদানের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তাদের কাছে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন, আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের দেশসমূহ জয় করে ক্রমশ এগিয়ে যাও। আফ্রিকার বার্বারদের অবস্থা তখন পর্যন্ত এই ছিল যে, যখনই কোন ইসলামী বাহিনী তাদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছত, তারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিত। কিন্তু যখনই তারা মুসলমানদের কিছুটা অসতর্ক দেখত তখনই বিদ্রোহ করতো। উকবা ইব্‌ন নাফি মিসর ও বারকা জয় করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। এসব এলাকা জয় করার পর তিনি আলজিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ঐ বছরই মাকরান ও বেলুচিস্তানের প্রশাসক আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাওয়ার সিন্ধীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য সিন্ধু প্রদেশে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সিন্ধী বাহিনী, যারা পূর্ব থেকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি ছিল, কায়কান নামক স্থানে মুসলমানদের মুকাবিলা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাওয়ার ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। এরপর হালাব ইব্‌ন আবূ সুফরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিন্ধু আক্রমণ করেন এবং এর একটি বিরাট অংশ জয় করতে সক্ষম হন।

ইয়াযীদকে যুবরাজ ঘোষণা

ঐ বছর অর্থাৎ হিজরী ৫০ (৬৭০ খ্রি) সনে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা কূফা থেকে দামিশকে আসেন। তিনি একদা আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে বলেন, আমি মদীনায় হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা দেখেছি। তখনকার দুঃখজনক দৃশ্যাবলী এখনো আমার চোখে ভাসছে। খিলাফতকে কেন্দ্র করে তখন মুসলমানদের মধ্যে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছিল তা আমি এখনো ভুলতে পারিনি। অতএব আমার মতে এটাই সমীচীন যে, আপনি আপনার পুত্র ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করুন। এর মধ্যেই মুসলমানদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আমীরে মুআবিয়া নিজ পুত্রকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করবেন একথা তখনো চিন্তা করেননি। মুগীরা ইব্‌ন শু'বার একথা শোনার পর, প্রথমবারের মত তিনি এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তিনি মুগীরাকে বলেন, এটা কি সম্ভব যে, জনসাধারণ পরবর্তী খলীফা হিসাবে আমার পুত্রের হাতে বায়আত করবে? মুগীরা বলেন, হ্যাঁ, এটা অতি সহজেই সম্ভব। এজন্য আমি কূফাবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করব এবং যিয়াদ বসরাবাসীদেরকে বাধ্য করবে। মক্কা ও মদীনায় মারওয়ান ও সাঈদ ইবনুল 'আস অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারবেন। আর

সিরিয়ায় কোনরূপ বিরোধিতার আশংকা নেই। একথা শুনে আমীরে মুআবিয়া মুগীরাকে কূফায় পাঠান এবং বলেন, তুমি সেখানে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর। অপর এক বর্ণনায় এ ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো, মুআবিয়া (রা) কূফার গভর্নর মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে লিখেন, তুমি আমার এই পত্র পাঠমাত্র নিজেকে পদচ্যুত মনে করবে। কিন্তু এই পত্র যখন মুগীরার কাছে পৌঁছে তখন তিনি এতে প্রদত্ত নির্দেশ পালন করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটান। এরপর এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি তখন একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মুআবিয়া জিজ্ঞেস করেন, তা কি ? মুগীরা উত্তর দেন, পরবর্তী খলীফা হিসাবে আমি তোমার পুত্রের জন্য বায়আত নিচ্ছিলাম। তিনি একথা শুনে আনন্দিত হন এবং মুগীরাকে তার পদে পুনঃনিয়োগ করে কূফায় পাঠিয়ে দেন। মুগীরা দামিশ্‌ক থেকে কূফায় ফিরে এলে কূফাবাসী জিজ্ঞেস করে, বলুন ব্যাপার কি ? তিনি উত্তর দেন , আমি মুআবিয়াকে এমন একটি গোলকধাঁধায় ফেলেছি যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। যাহোক এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুগীরা ইব্‌ন শু'বাই আমীরে মুআবিয়াকে এমন একটি কাজে প্ররোচিত করেন, যার কারণে পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে পিতার পর পুত্রেরই রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার রীতি যেমন প্রচলিত হয় তেমনি গণরায়ের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের রীতি হয় পরিত্যাজ্য। ইয়াযীদ ছিল আমীর মুআবিয়ার পুত্র। আর পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসা থাকা এবং তাকে মানমর্যাদা ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী করার ইচ্ছা পোষণ একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য মুআবিয়াকে এক্ষেত্রে কিছুটা নিরুপায় বা ক্ষমাযোগ্য মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মুগীরার পক্ষ থেকে এর কোন কৈফিয়ত দেওয়া যেতে পারে না।

মুগীরা কূফায় ফিরে এসে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করেন, যেন তারা ইয়াযীদের (অলী আহদী তথা) যুবরাজের ব্যাপারে রাযী হয়ে যান। যখন কূফার প্রভাবশালী লোকেরা এতে রাযী হয়ে যান এবং তারা একথা স্বীকার করে নেন যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তপাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমীরুল মু'মিনীন কর্তৃক নিজ পুত্রকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করাই বাঞ্ছনীয়, তখন মুগীরা আপন পুত্র মূসার সাথে কূফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল আমীরে মুআবিয়ার কাছে প্রেরণ করেন।

তারা দামিশকে পৌঁছে মুআবিয়ার কাছে নিবেদন করেন, আমরা এই অভিমতই পোষণ করি যে, ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দী'র জন্য বায়আত গ্রহণ করা হোক। এই প্রতিনিধিদল আসার কারণে মুআবিয়ার সেই আকাঙ্ক্ষা, যা মুগীরা তাঁর অন্তরে জাগ্রত করেছিলেন, আরো বেশি জোরদার হয়। তিনি ঐ প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিদায় দেন এবং বলেন, অনুকূল সময় এলে তোমাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করা হবে। আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। তিনি প্রতিটি কাজই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতেন। তিনি প্রথমে দেখে নিতে চাচ্ছিলেন, ইসলামী বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় তাঁর আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে কিনা। তিনি একদিকে মদীনার গভর্নর মারওয়ান এবং অপরদিকে বসরার গভর্নর যিয়াদের কাছে লেখেন, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমার মৃত্যুর পরও খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে পারে। অতএব এটা

বন্ধ করার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে. আমি এমন কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করব, যে আমার পরে খলীফা হবে। প্রবীণ লোকদের মধ্যে তো আমি সে ধরনের কোন লোক দেখতে পাচ্ছি না। আর যুবকদের মধ্যে আমার পুত্র ইয়াযীদকেই আমি এজন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। অতএব তোমাদের উচিত এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে আমার পুত্র ইয়াযীদের খিলাফতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। বসরার গভর্নর যিয়াদের কাছে এই পত্র পৌঁছলে তিনি বসরায় একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উবায়দ ইব্‌ন কা'ব নুমায়রীকে তা দেখান এবং বলেন, আমার মতে, আমীরুল মু'মিনীন এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন এবং বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখেন নি। কেননা ইয়াযীদ হচ্ছে এমন এক যুবক, যে সব সময় খেলাধুলায় মগ্ন থাকে। সবাই জানে, শিকার করা ও ঘুরে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ। অতএব জনসাধারণ তার বায়আতের ব্যাপারে ইতস্তত করবে। উবায়দ ইব্‌ন কা'ব বলেন, আমীরুল মু'মিনীনের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে দামিশকে পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানে গিয়ে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাৎ করব এবং তাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি নিজেকে সংশোধন করে নাও, যাতে তোমার অনুকূলে বায়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইয়াযীদ আমার এই উপদেশ মেনে নেবে। এরপর তার আচার-আচরণে সন্তোষজনক পরিবর্তন ঘটলে জনসাধারণ তার অনুকূলে বায়আত করতে ইতস্তত করবে না। ফলে আমীরুল মু'মিনীনের লক্ষ্যও অর্জিত হবে। উবায়দের এই অভিমত যিয়াদের পছন্দ হলো এবং তাকে শীঘ্রই দামিশকে পাঠিয়ে দিল। উবায়দ ইয়াযীদকে আদ্যোপান্ত সবকিছু বুঝিয়ে বলেন এবং ইয়াযীদও স্বীয় অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে জনসাধারণের সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেয়।

মদীনায় মারওয়ানের কাছে এই পত্র পৌঁছলে তিনি মদীনার গণ্যমান্য লোকদের একত্র করে শুধু এতটুকু বলেন, আমীরুল মু'মিনীনের ইচ্ছা এই যে, মুসলমানদেরকে ফিতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর জীবনকালেই কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত করবেন। একথা শুনে সকলেই বলে উঠেন, তাঁর এই অভিমত খুবই পছন্দনীয়। আমরা সকলেই তা সমর্থন করি। কিছুদিন পর মারওয়ান পুনরায় লোকদেরকে একত্র করে বলেন, দামিশ্‌ক থেকে আমীরুল মু'মিনীনের আর একটি পত্র এসেছে। তাতে তিনি লিখেছেন, আমরা মুসলমানদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে ইয়াযীদকে আমার 'অলী আহদ' তথা ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি। একথা শুনে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ও হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা বলেন, মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য নয়, বরং ধ্বংসের জন্য মুআবিয়ার এই মনোনয়ন। কেননা এতে ইসলামী খিলাফত কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করবে। খিলাফতের জন্য পিতা কর্তৃক পুত্রের মনোনয়ন নিঃসন্দেহে ইসলামী আদর্শ-বিরোধী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যখন মারওয়ান মদীনায় আমীরে মুআবিয়ার এই ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন তার কয়েক মাস পূর্বেই ইমাম হাসান ইনতিকাল করেছিলেন। লোকেরা সাধারণভাবে একথা জানত যে, ইমাম হাসানের সাথে আপোসচুক্তি সম্পাদনের সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

আমরের প্রস্তাব অনুযায়ী আমীরে মুআবিয়া নিজের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকারও করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানকেই খলীফা মনোনীত করা হবে। কিন্তু যে কারণেই হোক, ইমাম হাসান (রা) একথা সন্ধিচুক্তিতে লিপিবদ্ধ করাননি। তবে জনসাধারণের ধারণা ছিল যে, সন্ধি চুক্তিতে ইমাম হাসানের পরবর্তী খলীফা হওয়ার কথা উল্লেখ না থাকলেও মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছবে। মদীনায় মারওয়ান প্রথমবারের মত আমীরে মুআবিয়ার পত্রের কথা সবাইকে শুনালে বেশির ভাগ লোকই মনে করেছিল যে, ইমাম হাসানের মৃত্যুর কারণেই তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে চাচ্ছেন। কেননা ইমাম হাসান (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি (মুআবিয়া) তাঁকেই ভাবী খলীফা বলে মনে করতেন। এই ধারণার মধ্যে একদিকে যেমন আমীরে মুআবিয়ার পবিত্রচিত্ততা ও ন্যায়ানুবর্তিতার দিকটি নিহিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যমান ছিল ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সুপ্ত আশার বিকাশ, যারা স্বয়ং নিজেদেরকে খলীফা পদের যোগ্য বিবেচনা করতেন। মারওয়ান দ্বিতীয়বার যখন ইয়াযীদের (অলী আহদীর) যুবরাজ ব্যাপারটি ঘোষণা করলেন তখন উল্লেখিত দু'টি কথা, যা প্রথম ঘোষণার ছদ্মাবরণে সৃষ্টি হয়েছিল, সকলের অন্তর থেকে একদম উবে গেল। উপরন্তু হযরত হাসানের ওফাতের পর পরই মুআবিয়া কর্তৃক এই কর্মপন্থা গ্রহণ করায় মানুষের মাঝে নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল। কেউ কেউ তো এই মন্তব্য করে বসল যে, আমীরে মুআবিয়ার ইঙ্গিতেই ইমাম হাসান (রা)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। ইয়াযীদের যুবরাজ সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে এমন কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে, ইমাম হাসানের ওফাত এবং মুআবিয়ার এই কর্মপন্থার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বা থাকতে পারে। তবে সন্দেহ নেই যে, মুআবিয়া (রা) ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার সাথে মোটেই জড়িত ছিলেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুগীরা (রা) ইমাম হাসান (রা)-এর ওফাতের পরে ইয়াযীদকে যুবরাজ করার ব্যাপার মুআবিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অন্যথায় তিনি তখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন চিন্তাই করেন নি।

মুগীরাই সর্বপ্রথম ইয়াযীদকে যুবরাজ করার ব্যাপারে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন এবং এটা বাস্তবায়নের ব্যাপারেও তিনি পালন করেছিলেন অগ্রণীর ভূমিকা। মুআবিয়া (রা) মারওয়ানের পত্র মারফত মদীনা ও হিজাযবাসীদের বিরোধিতার সংবাদ শুনে কিছুটা থমকে গিয়েছিলেন। কিভাবে মদীনাবাসীদের স্বমতে আনা যায় সে ব্যাপারে তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন এমন সময় এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, মুগীরা ইব্ন শু'বা কূফায় ইনতিকাল করেছেন। হিজরী ৫১ (৬৭১ খ্রি) সনের ঘটনা, মুগীরা (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমীরে মুআবিয়া যিয়াদের হাতে কূফার শাসনভার ন্যস্ত করেন। আর তখন থেকে যিয়াদকে 'হাকীমে ইরাকায়ন' বা 'বসরা ও কূফার শাসক' বলা হতে থাকে।

কূফায় যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান

যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের হাতে বসরা ও কূফা উভয় অঞ্চলের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করার আরেকটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, সে যেরূপ ছলেবলে কৌশলে সমগ্র ইরাকবাসীকে ইয়াযীদের বায়আতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতো সেরূপ আর কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। মুগীরা ইব্ন

শু'বার মেযাজ কিছুটা নম্র ও উদার ছিল। কিন্তু যিয়াদ ইরাকীদের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা না হবে ততক্ষণ এরা সরলপথে আসবে না এবং আসলেও টিকে থাকবে না। এ কারণেই ইরাকে তাঁর শাসনকাল ছিল খুবই সফল। আর তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যাকে একাধারে কূফা ও বসরা উভয় অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর হাতে সমগ্র ইরানের এবং তুর্কিস্তান পর্যন্ত খুরাসানেরও শাসনভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। যিয়াদ সামুরা ইবন্ জুনদুবকে বসরায় তাঁর সহকারী নিয়োগ করেন এবং নিজে দু'হাজার সৈন্য নিয়ে কূফার দিকে রওয়ানা হন। কূফার জামে মসজিদে গিয়ে প্রথমবারের মত বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কূফাবাসীরা, যারা যে কোন শাসকের বিরোধিতা করতে বা তাকে হেয় জ্ঞান করতে অভ্যস্ত ছিল, তার সাথে হাসি-তামাশা এমন কি চতুর্দিক থেকে তার উপর কংকর বর্ষণ করতে শুরু করে। যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা বন্ধ করে দেন এবং আপন সাথীদের নির্দেশ দেন, অবিলম্বে মসজিদ ঘেরাও করে ফেল এবং কাউকে বের হতে দিও না। এরপর তিনি একটি চেয়ার নিয়ে দরজায় বসে পড়েন এবং চার চার ব্যক্তিকে একসাথে ডেকে এনে তাদের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন তারা কংকর নিক্ষেপ করেছে কিনা। শেষ পর্যন্ত ত্রিশ ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের কথা স্বীকার করে। যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা করেন এবং বাকি সবাইকে ছেড়ে দেন। এভাবে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কূফাবাসীদেরকে আরো কিছু কঠোর শাস্তি দেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা একেবারে শায়েস্তা হয়ে যায়। যিয়াদ ছয় মাস কূফায় এবং ছয় মাস বসরায় অবস্থান করতেন।

মুআবিয়া (রা) তাঁর সকল কর্মকর্তার নামে এই মর্মে একটি নির্দেশ পাঠান, 'তোমরা জনসাধারণের কাছে ইয়াযীদের গুণাবলী বর্ণনা কর এবং নিজ নিজ এলাকা থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল আমার কাছে পাঠাও, যাতে আমি ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে তাদের সাথে সরাসরি আলাপ করতে পারি।' এই নির্দেশ জারি করার পর প্রতি প্রদেশ থেকেই এক একটি প্রতিনিধিদল দামিশকে আসে এবং আমীরে মুআবিয়া তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথাবর্তা বলেন। এরপর তিনি একটি সাধারণ সভায় সকলকে একত্র করে একটি ভাষণ দেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলের প্রশস্তি ও ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। এরপর খলীফাদের দায়িত্ব ও অধিকার, কর্মকর্তাদের আনুগত্য এবং জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে একটি বিশদ বর্ণনা দিয়ে ইয়াযীদের বীরত্ব, বদান্যতা, বিচার-বুদ্ধি এবং প্রশাসনিক যোগ্যতার উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, ইয়াযীদের যুবরাজের ব্যাপারে সকলেরই একমত হওয়া উচিত। মদীনার প্রতিনিধিদলের সাথে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম দামিশকে এসেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো ইয়াযীদকে খলীফা বানাতে চলেছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন এজন্য যে আপনাকে আল্লাহ্র সমীপে জবাবদিহি করতে হবে একথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? একথা শুনে আমীরে মুআবিয়া বলেন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার অভিমত সোজাসুজি ব্যক্ত করে আমাকে উপকৃত করেছেন। কিন্তু ব্যাপার এই যে, এখন তো শুধু আমাদের ছেলেরাই রয়ে

গেছে। আর তাদের মধ্যে আমার ছেলেই সর্বাধিক যোগ্য। এরপর দাহ্হাক ইব্ন কায়স দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি আমীরে মুআবিয়ার ইচ্ছাকে অত্যন্ত জোরেশোরে সমর্থন করেন। এরপর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা একের পর এক দাঁড়িয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। মিসর থেকে আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) এসেছিলেন। সকলের বক্তব্য শেষ হবে মুআবিয়া (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তিনি উত্তর দেন, যদি মিথ্যা বলি তাহলে আল্লাহ্র ভয় আর যদি সত্যি বলি তাহলে আপনার ভয়। আপনি এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শই বা নিচ্ছেন কেন। ইয়াযীদের অবস্থা সম্পর্কে তো আপনি আমাদের চাইতে অনেক বেশি ওয়াকিফহাল। আপনার যিম্মাদারীর উপর আমরা বায়আত করতে রাযী আছি। মুআবিয়া (রা) আহনাফের কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শ্রবণ করেন এবং পরে তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দেন। অনুরূপভাবে বহিরাগত সকল প্রতিনিধিকেই প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মুআবিয়া (রা) হিজায অর্থাৎ মক্কা-মদীনার অধিবাসীদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। কেননা সেখানে এমন লোক বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা সাহসের সাথে তাঁর ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারতেন। মুআবিয়া (রা) হিজরী ৫১ (৬৭১ খ্রি) সনের শেষ দিকে হজ্জে যাওয়ার সংকল্প নেন। হিজাযবাসীদের স্বমতে নিয়ে আসাটাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যাহোক তিনি প্রথমে মদীনায় পৌঁছেন। কিন্তু তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং হুসাইন (রা) মদীনা থেকে মক্কায় চলে যান। আমীরে মুআবিয়া মদীনায় পৌঁছে সেখানকার লোকদের নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। তাদেরকে স্বমতে নিয়ে আসেন। তিনি মারওয়ানকে নির্দেশ দেন, তুমি মদীনাবাসীদের ভাতা অবিলম্বে বাড়িয়ে দাও, তাদের ঋণের প্রয়োজন হলে বায়তুলমাল থেকে নির্দ্বিধায় ঋণ দাও, কিন্তু তা পরিশোধের জন্য তাগাদা করো না, উপরন্তু যার পক্ষ থেকেই বিরোধিতার আশংকা কর তাদের কোন না কোনভাবে তোমার কাছে ঋণী করে রাখ। এরপর তিনি উপরোক্ত চার ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান এবং ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে তাঁদের সাথে আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি আপনাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আপনার পরে যার খিলাফতের উপরই জনসাধারণ একমত হবে আমি তাকেই খলীফা বলে স্বীকার করে নেব। একটি কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি জনসাধারণ খলীফা নির্বাচন করে তাহলে আমি তারই আনুগত্য করব এবং সংখ্যাধিক্যের রায়কেই মেনে নেব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি আপনার সামনে কয়েকটি কথা বলব। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত অনুসরণ করুন এবং খিলাফতের ব্যাপারে কারো নাম উল্লেখ না করে বিষয়টি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিন। তারা যাকে ইচ্ছা তাদের খলীফা নির্বাচন করবে। যদি আপনি এটা পছন্দ না করেন তাহলে সুন্নতে সিদ্দিকী অনুসরণ করুন। অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তিকে আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন, যিনি না আপনার আত্মীয়, আর না আপনার স্বগোত্রীয়। যদি আপনি এটাও পছন্দ না করেন তাহলে সুন্নতে ফারূকী অনুসরণ করুন। অর্থাৎ খলীফা পদের জন্য এমন ছয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করুণ, যাদের মধ্যে আপনার স্বগোত্রীয় কেউ থাকবে না এবং আপনার পুত্রও থাকবে না। ঐ ছয় ব্যক্তি নিজেদের মধ্য থেকে

যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচিত করবে। এই তিন পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই যাতে আমরা সম্মত হতে পারি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের এই কথা বাকি তিনজনও সমর্থন করেন। মুআবিয়া (রা) হজ্জ সমাপনান্তে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ছাড়া সমগ্র মক্কাবাসীর কাছ থেকে ইয়াযীদের (অলী আহদীর) যুবরাজের ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজের বদান্যতা ও দান-দক্ষিণা দ্বারা সকলের মনও জয় করে নেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইয়াযীদের ব্যাপারে জনসাধারণকে নিজের সমমতাবলম্বী করতে গিয়ে আমীরে মুআবিয়া প্রচুর অর্থসম্পদ খরচ করেন। অবশ্য এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইয়াযীদকে ভাবী খলীফা নির্বাচনের মধ্যে ইসলামী বিশ্বের ও মুসলিম মিল্লাতের অধিকতর মঙ্গল নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন এবং এর যে ক্ষতিকর দিকটি ছিল তা তার নজরে পড়েনি। যাহোক হজ্জ সম্পাদনের পর তিনি দামিশক্ অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি সংবাদ পান যে, আবূ মূসা আশ'আরী ইনতিকাল করেছেন।

আমীরে মুআবিয়া ইতিপূর্বে যিয়াদকে বসরা ও কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। সিজিস্তান এলাকাও তাঁর অধীনে ছিল। এবার তিনি সিন্ধু, কাবুল, বাল্খ, জায়হূন, তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চল যিয়াদের শাসনাধীনে ন্যস্ত করেন। ফলে যিয়াদের মর্যাদা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি নিজেই পারস্য, খুরাসান প্রভৃতি প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করতেন এবং যাকে ইচ্ছা পদচ্যুতও করতেন। যিয়াদ অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে প্রাচ্যের ঐ সমস্ত দেশে শাসনব্যবস্থা বহাল রাখেন এবং খারিজীদেরকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই দেন নি। এটা আমীরে মুআবিয়ার জন্য একটি সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তিনি যিয়াদের মত একজন বিচক্ষণ ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপন সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছিলেন। যদি যিয়াদ প্রাচ্যের ঐ দেশসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারতেন তাহলে খারিজীদের বিদ্রোহ এবং মুনাফিকদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার কারণে মুআবিয়া (রা) এতই ব্যস্তত্রস্ত থাকতেন যে, ইয়াযীদের জন্য এভাবে ধীরে সুস্থে বায়আত গ্রহণের কোন অবকাশই তাঁর হতো না। উপরন্তু প্রাচ্য দেশসমূহের বিদ্রোহের ঢেউ পশ্চিমের অঞ্চলসমূহেও গিয়ে লাগত এবং রোমানদের আক্রমণের আশংকায়ও তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের পর মুআবিয়া (রা) মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদকে মিসর, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। উকবা ইব্ন নাফি আল-ফিহরীকে– যিনি পশ্চিম ত্রিপোলী, আলজিরিয়া ও মরক্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং যাঁকে স্বয়ং মুআবিয়া (রা) এই অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, এবার মাসলামার অধীনস্থ করে দেওয়া হয়। মারওয়ান মদীনার এবং সাইয়িদ ইব্নুল 'আস মক্কার গভর্নর ছিলেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সরাসরি মুআবিয়ার শাসনাধীনে ছিল। ওদিকে উকবা উত্তর আফ্রিকার শাসন পরিচালনার সুবিধার্থে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কায়রাওয়ান নামক জনবসতির ভিত্তি স্থাপন করেন। আফ্রিকার জন্য কায়রাওয়ানের সেনাছাউনি ততটুকু প্রয়োজনীয় ছিল যতটুকু প্রয়োজনীয় ছিল ইরাকের জন্য বসরা ও কূফার সেনাছাউনি। হিজরী ৫৫ সনে (৬৭৪-৭৫ খ্রি) কায়রাওয়ানের জনবসতি যখন জমজমাট হয়ে ওঠে, ঠিক তখনি মাসলামা উকবা ইব্ন নাফিকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আবুল

মুহাজির নামক আপন দাসকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। উকবা দামিশ্‌কে আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যান। মারওয়ান, সাইয়িদ, উকবা, যিয়াদ প্রমুখ সুযোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মুআবিয়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে তখনি হিজরী ৫৬ সনে (৬৭৫-৭৬ খ্রি) উলামাবৃন্দের মাধ্যমে ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দীর' জন্য সাধারণ বায়আত গ্রহণ করা হয়। শুধু তিন-চার ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) প্রমুখ ছাড়া সকলেই বায়আত করে। মুআবিয়া (রা) ঐ ব্যক্তিদেরকে তাঁদের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন এবং বায়আত করার জন্য তাঁদের উপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করেন নি।

যিয়াদের মৃত্যু

হিজরী ৫৩ সনে (৬৭২-৭৩ খ্রি) যিয়াদ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন। যিয়াদ তাঁর কাছে আবেদন করেছিলেন, যেন তাকে ইরাক ও পারস্য ছাড়াও হিজায ও আরবের শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তিনি তার ঐ আবেদন মঞ্জুরও করেছিলেন। কিন্তু হিজাযবাসী এই সংবাদ শুনে যারপর নাই আতংকিত হয়ে পড়ে। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের কাছে ছুটে গিয়ে যিয়াদের শাসন থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ চায়। তিনি তখন কেবলামুখী হয়ে দু'আ করেন এবং সবাই তাঁর সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলে। সম্ভবত এই দু'আর ফলে যিয়াদের অঙ্গুলিতে একটি দানা (প্লেগের ক্ষুদ্র ফোঁড়া) ফুটে উঠে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। যিয়াদ রমযান মাসে কূফায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে কূফার শাসন ক্ষমতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসায়দের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। যিয়াদের মৃত্যুর পর তার পঁচিশ বছর বয়স্ক পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে মুআবিয়া (রা) বলেন, 'বল, তোমার পিতা কার হাতে কোন্ অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করে গেছেন? আবদুল্লাহ্ বলে, তিনি বসরার শাসন ক্ষমতা সামুরা ইব্‌ন জুনদুবের হাতে এবং কূফার শাসন ক্ষমতা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদের হাতে ন্যস্ত করে গেছেন। মুআবিয়া বলেন, তোমাকে কোন্ অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে গেছেন? আবদুল্লাহ্ উত্তর দেয় ঃ আমার হাতে কোন অঞ্চলেরই শাসনভার দিয়ে যাননি। এরপর মুআবিয়া বলেন, তোমাকে তোমার পিতাই যখন কোন অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে যাননি তখন আমি তা দেই কি করে? উবায়দুল্লাহ্ তখন বলে, আমার কাছে এর চাইতে বড় অপমান ও লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে যে, আমার পিতাও আমাকে কোন অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে যাননি এবং আপনি চাচা হয়েও আমাকে কোন মর্যাদা দিচ্ছেন না? মুআবিয়া (রা) কিছুক্ষণ চিন্তা করেন এবং উবায়দুল্লাহ্ যে যথার্থ যোগ্যতার অধিকারী সে কথা বুঝতে পেরে তাকে বসরা, খুরাসান ও পারস্যের প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সাঈদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফফান ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দীর' বায়আত করেছিলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) প্রমুখ বায়আত করেননি তখন তিনিও বলে উঠেন, আমার পিতা তো ওদের পিতার চাইতে কম ছিলেন না। অতএব ইয়াযীদের জন্য বায়আত করে আমি অন্যায়ই করেছি। এরপর তিনি আমীরে মুআবিয়ার খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন

করেন, আমার পিতা আপনার কোন ক্ষতি করেননি। এবার বলুন, আপনি আমার কি উপকার করেছেন ? তখন আমীরে মুআবিয়া উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কাছ থেকে খুরাসান প্রদেশ ছাড়িয়ে নিয়ে সাঈদকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে নিয়োগ করেন একাধারে তার সহকারী ও সেনাধ্যক্ষ। যিয়াদের পর তিনি মারওয়ান ও সাঈদকে পুনরায় মদীনা ও মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

যিয়াদের মৃত্যুর সাথে সাথে খারিজীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে বসরায় সর্বপ্রথম খারিজীদেরই মুকাবিলা করতে হয়। খারিজীদের বিভিন্ন দল-উপদল অনবরত বিদ্রোহ করতে থাকে। তাই আমীরে মুআবিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ খারিজী দমনেই ব্যস্ত থাকে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর ইন্তিকাল

হিজরী ৫৮ সনে (৬৭৭-৭৮ খ্রি) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তিনি মারওয়ানের বিপক্ষেই ছিলেন। কেননা তার কর্মকাণ্ড সুবিধাজনক ছিল না। একদা মারওয়ান তাঁকে দাওয়াতদানের ছলে ধোঁকা দিয়ে ডেকে নিয়ে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। ঐ গর্তে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উলংগ তরবারি, খঞ্জর ইত্যাদি রেখে দেওয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) তখন এমনিতেই অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিলেন। তাই গর্তে পতিত হয়ে ভীষণভাবে আহত হওয়ার কারণে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইনতিকাল করেন।

হিজরী ৫৯ সনে (৬৭৮-৭৯ খ্রি) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন, আল্লাহ্! আমি ছেলে-ছোকরাদের শাসন থেকে এবং হিজরী ৬০ সন (৬৭৯-৮০ খ্রি) থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং হিজরী ৬০ সনের পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন।

মুআবিয়া (রা)-এর ইন্তিকাল

হিজরী ৬০ সনের রজব (৬৮০ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসের প্রথম দিকে হযরত মুআবিয়া (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান। কিন্তু ইয়াযীদ তখন শিকার বা এ জাতীয় কোন অভিযানে দামিশ্কের বাইরে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাকে দামিশ্কে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ইয়াযীদ এসে পৌঁছলে মুআবিয়া (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"বৎস! আমার ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ) মনোযোগ দিয়ে শোন এবং আমার প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও। আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান অর্থাৎ আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। এবার বল, আমার পরে মুসলমানদের সাথে তুমি কিরূপ ব্যবহার করবে ? ইয়াযীদ উত্তর দেয় ঃ আমি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণ করব।

আমীরে মুআবিয়া বলেন ঃ 'সুন্নতে সিদ্দিকীর উপরও আমল করা উচিত। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুরতাদদের সাথে লড়েছেন এবং এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন যে, সমগ্র উম্মত তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল।

পুত্র ঃ না, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণই যথেষ্ট।

পিতা ঃ বৎস! সীরাতে উমরের অনুসরণ কর। কেননা তিনি শহরসমূহ আবাদ করেছেন, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করেছেন।

পুত্র ঃ না, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণই যথেষ্ট।

পিতা ঃ বৎস! সীরাতে উসমানের অনুসরণ করবে। কেননা তিনি তাঁর জীবনে মানুষের অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধন করেছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন।

পুত্র ঃ না, শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নতই আমার জন্য যথেষ্ট।

মুআবিয়া (রা) একথা শুনে বলেন, বৎস! তোমার এই সমস্ত কথায় আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, তুমি আমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবে না, বরং তুমি আমার বিরোধিতাই করবে। হে ইয়াযীদ! তুমি দম্ভ কর না যে, আমি তোমাকে তোমার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি এবং সকল লোক তোমার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। এবার একটি জরুরী কথা শোন! আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের পক্ষ থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা সে দুনিয়াবিমুখ। হুসায়ন ইব্‌ন আলীকে ইরাকবাসীরা অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। যদি তুমি তাঁর উপর জয়ী হও তাহলে তাঁকে কখনো হত্যা করবে না, বরং তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র হচ্ছে ফেরেববাজ, কাবুতে পেলে তুমি তাকে হত্যা করবে। সব সময় মক্কা ও মদীনাবাসীদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে। ইরাকবাসীরা যদি তোমাকে প্রতিদিনই তাঁদের কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে বলে তাহলে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তুমি তাই করবে। সিরিয়াবাসীদেরকে সব সময় নিজের সাহায্যকারী মনে করবে এবং তাদের বন্ধুত্বের উপর ভরসা রাখবে।

এরপর ইয়াযীদ পুনরায় শিকারে চলে যান। মুআবিয়া (রা)-এর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬০ সনের ২২শে রজব (৬৮০ খ্রি এপ্রিল) বৃহস্পতিবার সত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু চুল ও নখ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করেছিরেন যেন এই চুল ও নখ তাঁর মুখে ও চোখে রেখে দেওয়া হয়। দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাঁকে দামিশ্‌কের 'বাবে জাবিয়া' ও 'বাবে সগীরের' মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়।

এক নজরে আমীরে মুআবিয়ার শাসনকাল

আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ২০ বছরব্যাপী শাসনকালকে অবশ্যই একটি সফল শাসনকাল বলা যেতে পারে। কেননা তাঁর সময়ে অন্য কেউ খিলাফতের দাবি উত্থাপন করতে পারেনি, বা তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও নামতে পারেনি। তাঁর আমলে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেই ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কোন প্রদেশ বা কোন অঞ্চলই ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বের হয়ে যায়নি। উল্লেখযোগ্য কোন বিদ্রোহও সংঘটিত হয়নি। ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও ডাকাতি বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা পরিলক্ষিত হয়নি (যেমন হযরত আলীর খিলাফত আমলে ইরাক ও ইরানে পরিলক্ষিত হতো)। ঐ যুগেই মুসলমানরা নৌ-অভিযান শুরু করে এবং রোমান

খ্রিস্টানরা মুসলিম নৌশক্তির কাছে হার মানে। ঐ সময়ে যিয়াদ এবং অন্য কিছু সংখ্যক শাসনকর্তা ইরাকী ও ইরানীদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করে সত্য, তবে এরূপ করা না হলে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব হতো না। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমীরে মুআবিয়াই ডাক প্রথার প্রচলন করেন এবং এজন্য সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনও রচনা করেন। প্রতিটি সরকারী আদেশের উপর মোহর লাগানোর এবং প্রতিটি নির্দেশের অফিস কপি সংরক্ষণের প্রথা তিনি উদ্ভাবন করেন। আমীরে মুআবিয়ার মোহরের উপর لكل عمل ثواب (প্রতিটি কাজেরই পুরস্কার রয়েছে) কথাটি খোদিত থাকত। তখন পর্যন্ত কা'বার গিলাফ চড়িয়ে দেওয়া হতো। তিনি সমস্ত পুরাতন গিলাফ নামিয়ে ফেলেন এবং নির্দেশ দেন যেন নতুন গিলাফ চড়াবার সময় পুরাতন গিলাফ নামিয়ে ফেলা হয়। ইসলামী সমাজে সর্বপ্রথম আমীরে মুআবিয়াই পাহারাদার ও দারোয়ান নিয়োগ করেন। ডাক বিভাগ এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগ তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। মুসিলম খলীফা ও শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নৌবাহিনীও গঠন করেন।

মুআবিয়া (রা) আপন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আপন গোত্রকে বনূ হাশিম গোত্রের উপর প্রাধান্য দানের ব্যাপারে আপোসহীন ছিলেন সত্যি, তবে তিনি এ ব্যাপারে এমন কাউকে নাক গলাতে দেননি, যে বনূ ইমাইয়া ও বনূ হাশিম কিংবা মুআবিয়া ও আলী উভয়েরই শত্রু এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে তৎপর। যখন মুআবিয়া ও আলী (রা)-এর মধ্যকার বিরোধ চরমে ওঠে তখন খ্রিস্টানদের একটি শক্তিশালী বাহিনী আলীর শাসনাধীন ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের উপর হামলা করার পরিকল্পনা নেয়। মুসলমানদের অনৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতা থেকে সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যেই তারা অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কেননা আলী (রা) তখন যে অবস্থায় ছিলেন তাতে খ্রিস্টানদের হামলা থেকে ঐ সমস্ত এলাকা রক্ষার কোন চেষ্টাই তিনি করতে পারতেন না। খ্রিস্টানরা যদি তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হামলা করে বসত তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি বিরাট ভূখণ্ড খ্রিস্টান শাসনাধীনে চলে যেত। তারা আলী (রা)-এর অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত ছিল, অপর দিকে আমীরে মুআবিয়ার পক্ষ থেকেও তারা ছিল নিশ্চিন্ত। কেননা তাঁর ও আলী (রা)-এর মধ্যকার নিত্যদিনের বিরোধ তো তারা অহরহ প্রত্যক্ষ করছিল। তারা ধারণা করেছিল, আলীর উপর হামলা করা হলে মুআবিয়া নিশ্চয়ই খুশি হবেন। কিন্তু তিনি এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে কায়সারের কাছে একটি জরুরী চিঠি পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের পরস্পরের বিবাদ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। যদি তুমি আলীর দিকে অগ্রসর হও তাহলে তাঁরই পতাকার নিচে সর্বাগ্রে যে সেনাপতি তোমাকে পর্যুদস্ত করতে এগিয়ে আসবে সে মুআবিয়া ছাড়া আর কেউ নয়।" মুআবিয়ার চিঠিতে সেই কাজ হলো, যা একটি বিরাট বাহিনী পাঠিয়েও সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। কেননা এই চিঠি পেয়ে খ্রিস্টানরা এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, এরপর তারা আর ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করার সাহসই পায়নি।

আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিরোধের সেই প্রকৃতি মোটেই ছিল না, যা অজ্ঞতাবশত আজকালকার মুসলমানরা ধারণা করে থাকে। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আলী (রা)-এর সহোদর ভাই আকীল আমীরে

মুআবিয়ারই সভাসদ ছিলেন। অপর দিকে আমীরে মুআবিয়ার ভাই যিয়াদ ছিলেন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে পারস্যের গভর্নর। যিয়াদ ছিলেন আলীর কাছে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, অপরদিকে আকীল আমীরে মুআবিয়ার যে কোন কাজের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আমীরে মুআবিয়ার একান্ত অনুগ্রহভাজন।

একটি সন্দেহের অপনোদন

মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি সন্দেহের অপনোদন করা দরকার। তা এই যে, আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিপালিত, তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর সাথে সর্বদা অবস্থানকারী এবং তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা। আর মুআবিয়া (রা) ছিলেন ওহী লেখক, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বন্ধু, তার শ্যালক (হযরত উম্মে হাবীবার ভাই) এবং সাহাবী। তাহলে আলী ও মুআবিয়ার মধ্যে কেন বিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং কেনইবা তাঁরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ? এরপর আমর ইব্‌নুল 'আস, তালহা, যুবায়র, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীই বা ঐ বিরোধ ও লড়াইয়ে কেন অংশগ্রহণ করেছিলেন ? তাহলে তো সাহাবায়ে কিরামের পরস্পর যুদ্ধ এবং আজ-কালকার দুনিয়াদারদের মধ্যকার যুদ্ধের মধ্যে বাহ্যত কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের উপর নবীর সাহচর্যের সেই প্রভাব পড়েনি, যা পড়া উচিত ছিল ? এই সন্দেহের উত্তর এই যে, প্রত্যেক সাহাবীই হচ্ছেন হিদায়াতের এক একটি নক্ষত্র। সাহাবীদের উপর নিঃসন্দেহে নবী সংসর্গের সেই প্রভাব পড়েছিল যা পড়া উচিত ছিল। আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধির স্বল্পতা ও অদূরদর্শিতার কারণেই উক্ত প্রশ্ন বা সংশয়ের সম্মুখীন হই। আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তাতে মানব জাতির শান্তি ও মঙ্গল লাভের যাবতীয় নীতি ও আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি সেই পরিপূর্ণ শরীয়ত প্রচারের গুরুদায়িত্ব পুরোপুরিভাবে আনজাম দিয়েছেন, যে শরীয়তের পর (কিয়ামত পর্যন্ত) আর কোন শরীয়ত আসবে না। এই শরীয়ত কিয়ামতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভ করতে হলে মানবজাতির জন্য এই শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অতএব এ ধরনের একটি বিরাট সুমহান ও পরিপূর্ণ শরীয়তকে অন্যান্য শরীয়তের মত পরিবর্তন ও ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হলে একটি বিরাট ব্যবস্থাপনারও প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মানব জাতিকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য খোদ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ–

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক" (১৫ ঃ ৯)।

অতএব জানা গেল যে, এই শরীয়তের হিদায়াত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই করতে থাকবেন এবং গত চৌদ্দশ বছরের দীর্ঘ সময় পূর্বেও আমরা দেখেছি, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই পরিপূর্ণ শরীয়ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মায়ের গর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে যখন আমরা নিজেরা নিজেদের হিফাযতের ব্যবস্থা করিনি, নিজেদের শস্যক্ষেত্রকে সবুজ-শ্যামল রাখার জন্য সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠিয়ে মেঘ তৈরি করে

প্রবল বায়ুর মাধ্যমে বারি বর্ষণ করার পরামর্শ যখন আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেইনি তখন আমাদের কী অধিকার আছে যে, আমরাই ইসলামী শরীয়তের হিফাযতের উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করবো এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে আল্লাহ্ তা'আলাকে বাধ্য করবো ? আমাদের মন তো চায় যে, আকাশ থেকে তৈরি রুটি বর্ষিত হোক এবং যমীন থেকে রান্না করা তরকারির হাঁড়ি আপনা আপনি বেরিয়ে পড়ুক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে তো আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না। তিনি সূর্য কিরণের সাহায্যে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত করেন, এরপর বায়ু স্তরের উষ্ণতা ও শীতলতা সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে বৃষ্টি বর্ষণ করে। এরপর কৃষকরা নিজেদের বলদ ও কৃষিকার্যের সামগ্রীর মাধ্যমে জমি চাষ করে, তারপর বীজ বপন করে। মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, চারা অংকুরিত হয়, এরপর চারার হিফাযত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাতে শস্য ধরে এবং তা পরিপক্ব হওয়ার পর কাটা হয়। তারপর শস্যদানাকে ভূষি থেকে পৃথক করা হয়, তারপর শস্যদানাকে চাকায় পিষে আটা তৈরি করা হয়। এরপর আটা মাখা হয়, তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে তা থেকে রুটি তৈরি করা হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শুধু রুটি সরবরাহ করতে গিয়ে একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু এটা আমাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ হবে, যদি আমরা উপরোক্ত প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য আল্লাহ্কে অভিযুক্ত করি এবং আমাদেরই মনগড়া সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেই। আল্লাহ্ তা'আলার কর্মধারাকে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই অন্ধত্ব ও অদূরদর্শিতা ছাড়া কিছু নয়। কেননা তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে যে অসীম হিকমত ও কৌশল নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা আমাদের সীমিত শক্তি দ্বারা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত পটভূমিতে পূর্বাপর বিষয়টি বিবেচনা করলে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, সাহাবীদের পরস্পর মতবিরোধ ও লড়াই-ঝগড়া আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শরীয়তের হিফাযতেরই একটি উপাদান ছিল। এর মধ্যে নিহিত ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই বাণীর হিকমত ও রহস্য যাতে তিনি বলেছিলেন اختلاف امتى رحمة (আমার উম্মতের মত-বিরোধের মধ্যে রহমত নিহিত রয়েছে)। কিন্তু আমরা অযোগ্যরা আল্লাহ্ তা'আলার এই রহমত বা আশীর্বাদকে অভিশাপে পরিণত করেছি এবং এ থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীকে বেছে নিয়েছি। বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আমীরে মুআবিয়া, আলী মুরতাযা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীর পরস্পর মতবিরোধ তাদের ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল। এক্ষেত্রে তাঁদের কারো ভুল হয়ে থাকলে সেটা ছিল ইজতিহাদী ভুল। তাঁরা যথেচ্ছভাবে বা রিপুর বশবর্তী হয়ে তা করেন নি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিলেন না, যিনি জেনেশুনে ইসলামী শরীয়ত, আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূলের সুন্নতের বিরোধিতা করতে পারেন।

আলী (রা) যা কিছু করেছেন তা তাঁর বিবেক মতে ন্যায় ও সত্য ছিল। অনুরূপভাবে মুআবিয়া (রা) যা করেছেন তা তিনি ন্যায় ও সত্য জেনেই করেছেন। অনুরূপ অবস্থা ছিল অন্যান্য সাহবীরও। যিনি যেটাকে ন্যায় ও সত্য মনে করেছেন তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে আল্লাহ্রই ইচ্ছানুযায়ী। এই অভ্যন্তরীণ ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলকে তাতে লিপ্ত করে দিয়েছিলেন। আর অপর একটি দল এই

ঝগড়া-বিবাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত রাষ্ট্র ও হুকুমতের যাবতীয় কার্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন জীবন বেছে নিয়েছিলেন। এই অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ যতদিন সৃষ্টি হয়নি, ততদিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কাফিরদের মুকাবিলায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)-এর সমগ্র খিলাফতকাল ছিল ঐ সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। তখন সাহাবীগণ একতাবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করেছিলেন এবং দেশের পর দেশ জয় করে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। উল্লিখিত দুই মহান খলীফার খিলাফতকালে যদিও কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করা হয়, যা করা তখন অপরিহার্যও ছিল– কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না যে, সাহাবায়ে কিরামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক কিংবা তাঁদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি জামাআত অন্যান্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও বিবেক শক্তিকে একাগ্রতার সাথে ফিক্‌হী মাসআলাসমূহের বিন্যাস ও রাসূলের হাদীসসমূহের হিফাযত ও প্রচারে নিয়োজিত রাখেন। মদীনা তখন এমন একটি সামরিক ক্যাম্পের রূপ ধারণ করেছিল, যার তাঁবুসমূহে প্রায় সব সময়ই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা খোলা থাকত এবং বড় বড় সমর কৌশলীরা সেগুলোর মাধ্যমে যুদ্ধপলিসি প্রণয়ন এবং বাহিনী অধিনাকদের অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা তৈরিতে নিমগ্ন থাকতেন। দেশ জয়ের পরিধি যতই প্রশস্ত হতো, এই সামরিক ব্যস্ততাও ততই বৃদ্ধি পেত। ফলে ঐ সব ব্যক্তি যাঁরা এক একজন শিক্ষকরূপে শরীয়তের পাঠ শিক্ষা দিতেন এবং রহস্যাদি উদঘাটন করতেন তাঁরা তরবারি ধার এবং তীরের ফলা পরখ করার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন এবং প্রয়োজনবোধে বল্লমের সামনে ঢালের পরিবর্তে নির্ভয়ে নিজেদের বুক পেতে দিতেন। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদেরকে নির্ভীক করে তোলার জন্য ঐ যুগে এ ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনও ছিল। উসমানী খিলাফত আমলে ঐ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলাম একটি বিজয়ী জীবন-ব্যবস্থা ও অতুলনীয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এবার যে জিনিসটির প্রয়োজন ছিল তা হলো, ইসলাম যেন একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, শরীয়তের সমগ্র দিক সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায় এবং সাহাবায়ে কিরাম এমন সুযোগ-সুবিধা বা অবকাশ পান যে, তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাবিঈদের এমন একটি জামাআত সংগঠিত করতে সক্ষম হন, যাঁরা তাঁদের পরবর্তীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারেন এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতএব মহান আল্লাহ্ তা'আলাই আপন পরিপূর্ণ কুদরতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা ও তার অনুসারী অর্থাৎ মুসলিমরূপী ইহুদীদের একটি জামাআত সৃষ্টি করে হযরত উসমানের শাহাদাত এবং জামালযুদ্ধ ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধের উপাদানসমূহ তৈরি করে দেন যার ফলশ্রুতিতে অনেক সাহাবী, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে রুস্তম ও ইসফিন্‌দিয়ারের বীরত্ব গাঁথাকে চিরতরে ম্লান করে দিয়েছিলেন, নিজ নিজ তীর-ধনুক এবং তরবারিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করে নিজ নিজ ঘরে ঢুকে পড়েন এবং সেনাপতিত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইরান-বিজেতা হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যাঁর অধিনায়কত্বে কাদেসিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র মুসলমানদের মুঠোয় এসে গিয়েছিল, ঐ অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলাকালে নিজের জন্য সম্পূর্ণ কোলাহলমুক্ত নির্জন জীবন বেছে নিয়ে উট-বকরীর দল

দেখা-শোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অনুরূপ অবস্থা আরো অনেক সাহাবীরই ছিল। দেশ জয়ের অগ্রযাত্রা বন্ধ এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক সাহাবীই তীর-তরবারির ব্যবহার হেয় দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। অভ্যন্তরীণ বিরোধ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে এমন আর কোন কারণ ছিল না, যা তাঁদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম সারি থেকে এভাবে পিছনে হটিয়ে নিয়ে আসতে পারত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য সমগ্র ইসলামী বিশ্ব একমত হতে পারত। কিন্তু ঐ অভ্যন্তরীণ বিবাদ তাঁকে একদম ঘরমুখী করে ফেলে। এই পুস্তকের মধ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তির উল্লেখ বার বার এসেছে, যাঁরা কোন না কোনভাবে অভ্যন্তরীণ বিরোধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী এমনও ছিলেন, যাঁরা এ সমস্ত বিবাদে অংশগ্রহণ করেন নি যার কারণে ঐ সমস্ত ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখও আসেনি।

এই বিরাট দলটি অন্তর্বিরোধ চলাকালে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের খিদমতে হাযির হওয়া লোকদের ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দিতেন এবং সীরাতে নবী সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতেন।

মদীনা ছিল মুহাজির ও আনসারদের কেন্দ্রভূমি আর কা'বা ঘরের অবস্থানের কারণে মক্কা ছিল ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের অবকাশ পান নি ততক্ষণ মদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম থেকে ইসলামী শিক্ষার কাজ নিতে চাইলেন তখন মদীনা থেকে রাজধানী হটিয়ে দিলেন। ফলে যে মদীনা কিছুদিন পূর্বেও সামরিক শক্তির কেন্দ্র ও সামরিক ছাউনি হিসেবে পরগণিত হতো, এবার দারুল উলূম তথা শিক্ষা কেন্দ্রে রূপান্তরিত। হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, হাদীস, ফিক্হ ও তাফসীরের যাবতীয় উপাদান শুধু ঐ যুগেই সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় যখন মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

যদি ঐ বিবাদ ছড়িয়ে না পড়ত, যদি আমীরে মুআবিয়া ও আলীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ না হতো তাহলে আমরা আজ ইসলামী শরীয়তের একটি বিরাট ও অপরিহার্য অংশ থেকে বঞ্চিত থাকতাম। কিন্তু এই বিরোধ দেখা দিয়েছিল কেন ? দেখা দিয়েছিল এই জন্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই দীনের সংরক্ষক। তিনি স্বয়ং এর হিফাযতের উপাদান সৃষ্টি করেন। অতএব তিনিই হযরত আলী ও আমীরে মুআবিয়ার মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। এবার একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রতিটি রাষ্ট্র, প্রতিটি সাম্রাজ্য এবং প্রতিটি সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য যে সব প্রতিবন্ধকতা বা বাধা-বিপত্তিই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বে যা হয়েও এসেছে তার নমুনা হযরত আলী ও মুআবিয়ার বিবাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর সাধারণভাবে রাষ্ট্রনায়করা এবং ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশাহরা আজ পর্যন্ত যে সমস্ত আচরণ বিধি অনুসরণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক প্রশংসনীয় ছিল সেই সব আচরণ-বিধি, যা সাহাবায়ে কিরাম অনুসরণ করেছিলেন। বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন এবং বিভিন্ন রাজবংশের সাফল্য ও ব্যর্থতার ঘটনাবলীতে বিশ্ব ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়ে আছে। অতি চালাকি, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং

প্রতারণা-প্রবঞ্চনার ঘটনাবলী থেকে কোন যুগ এবং কোন শাসনামলই মুক্ত নয়। এই সব ঘটনা সম্পর্কে যখন আমরা অনুসন্ধান চালাই তখন হযরত আলী ও মুআবিয়ার পরস্পর বিরোধের ধারা বিবরণী আমাদের সামনে একসাথে সকলেরই নমুনা পেশ করে এবং আমরা নিজেদের জন্য শ্রেষ্ঠতর একটি কর্মপন্থা নির্ধারণে সফলকাম হই। এটা আমাদেরই অন্ধত্ব ও অদূরদর্শিতা যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদী মতবিরোধ এবং আমীরে মুআবিয়া ও আলী (রা)-এর ঝগড়াকে আমাদের উপদেশ গ্রহণের উপাদান এবং শান্তি ও মঙ্গলের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করে নিজেদের ধ্বংস ও সর্বনাশের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি কোন জিনিসের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে মশগুল থাকে তারা সে জিনিসের সারবস্তু খুঁজে পায় না। মিল্লাত বা দীনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আমার উপরোক্ত মন্তব্যকে উপলক্ষ করে কেউ হয়ত বলবেন, আমি ইতিহাস রচনায় সীমালংঘন করছি। কিন্তু আমি প্রথমেই স্বীকার করেছি যে, আমি একজন বিধর্মী হিসাবে এই গ্রন্থ রচনা করছি না বরং আমি একজন মুসলমান হিসাবে মুসলমানদেরই অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করছি। অতএব কোন আপত্তিই আমার এ চিন্তাধারা প্রকাশের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না।

আমীরে মুআবিয়া (রা) অবস্থাদির বর্ণনা শেষ করার পূর্বে আমরা এখানে কোলকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী, যাঁকে শিয়া ও মুতাযিলী বলা হয়ে থাকে– ঐ সব উক্তির উদ্ধৃতি দিতে চাই, যা তিনি মাসউদীর বরাতে তাঁর 'তারীখে ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমীরে মুআবিয়া প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর স্থানীয় ফৌজদার বা পুলিশ প্রধানের রিপোর্ট শুনতেন। এরপর মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সভাসদবৃন্দ রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে তাঁর দরবারে হাযির হতেন। ঐ বৈঠকে পেশকাররা বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছ থেকে আগত চিঠি-পত্রাদি ও রিপোর্টসমূহ পড়ে শুনত। যুহরের সময় সালাত আদায়ের জন্য তিনি মহল থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং সালাতে ইমামতি শেষে মসজিদেই বসে যেতেন। তিনি সেখানে জনসাধারণের মৌখিক অভিযোগসমূহ শুনতেন এবং তাদের আবেদন গ্রহণ করতেন। এরপর মহলে ফিরে এসে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাত দান করতেন। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। আসরের সালাত সমাপনান্তে তিনি মন্ত্রী, সভাসদ ও উপদেষ্টাদেরকে সাক্ষাত দান করতেন। রাতের বেলা দরবারে বসেই সবার সাথে খাবার খেতেন এবং আরেকবার জনসাধারণকে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়ে সে দিনের মত অন্দর মহলে চলে যেতেন।

আমীরে মুআবিয়ার রাজত্বকালে রাষ্ট্রের ভিতরে বাইরে বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন, আমি মুআবিয়ার চাইতে ধীরস্থির ও ধৈর্যশীল লোক আর দেখি নি। একদা ঘটনাচক্রে আমি তাঁর মজলিসে হাযির ছিলাম। তিনি তাঁর আসনে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লিখিত রিপোর্ট এসে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, রোম-সম্রাট তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা পরিচালনার সংকল্প নিয়েছে। মুআবিয়া ঐ রিপোর্ট পড়ে কাগজটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারেন। আমি তা পড়লাম এবং তিনি কি বলেন, সেই অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু তিনি একইভাবে বসে রইলেন এবং কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ পর আর একটি চিঠি এসে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, নায়েল ইব্‌ন কায়স নামীয়

খারিজীদের জনৈক নেতা একটি বাহিনী সংগঠিত করে ফিলিস্তীন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি এই চিঠিও পড়লেন। এরপর কাগজটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। আমি এই চিঠিও পড়লাম এবং তিনি কি বলেন, সেই অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু তিনি একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর চেহারার মধ্যে কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করা গেল না। এর কিছুক্ষণ পর আর একটি চিঠি এসে পৌছল। তাতে লেখা ছিল, মাওসিলের জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীরা পালিয়ে গেছে এবং মাওসিলের সন্নিকটেই তাদের সমাবেশ হচ্ছে। তিনি এই চিঠি পড়েও আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং একইভাবে হেলান দিয়ে স্বীয় আসনে বসে রইলেন। এর কিছুক্ষণ পর আর একটি চিঠি এসে পৌছল। তাতে লেখা ছিল, আলী (রা) এক বাহিনী নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করতে আসছেন। তিনি এই চিঠি পড়েও আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং একইভাবে নিজ আসনে বসে রইলেন।

এরপর আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমি বললাম, চতুর্দিক থেকেই তো বিপদের খবর আসছে। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন ? তিনি বললেন, কায়সারের বাহিনী যদিও অনেক বিরাট, কিন্তু তিনি আমার সাথে সন্ধি করে ফিরে যাবেন। নায়েল ইব্‌ন কায়স স্বীয় আকীদার কারণে যুদ্ধ করছে এবং যে শহরটি দখল করে নিয়েছে তার উপর আপন কর্তৃত্ব বহাল রাখতে চায়। আমি ঐ শহরটি তার জন্য ছেড়ে দেব যাতে সে সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যে সমস্ত খারিজী জেলখানা ভেঙ্গে পালিয়েছে তারা আল্লাহ্‌র জেলখানা থেকে কোথায় পালিয়ে যাবে ? কিন্তু আলীর ব্যাপারে আমার চেষ্টা-তদবীর ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। কিভাবে তাঁর থেকে উসমান হত্যার বদলা নেওয়া যায় আমি তাই ভাবছি। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে তদনুযায়ী নির্দেশও জারি করলেন। এরপর পূর্বের মতই আসনে হেলান দিয়ে বসে রইলেন।

উমর ফারূক (রা) সিরিয়ায় আমীরে মুআবিয়ার শানশওকত ও জাঁকজমক লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যেভাবে ইরানে কিসরা ও রোমে কায়সার রয়েছে ঠিক সেভাবে আরবে রয়েছে মুআবিয়া।

সাহাবায়ে কিরামের শাসন ব্যবস্থার বিবরণী এখানেই শেষ হলো। আগামীতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর এই খিলাফতই হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের সর্বশেষ খিলাফত বা সালতানাত।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া

আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া হিজরী ৬৫ (৬৮৪ খ্রি) অথবা ৬৬ (৬৮৫ খ্রি) সনে মুআবিয়া (রা) সমগ্র সিরিয়া প্রদেশের শাসক থাকাকালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতার নাম ছিল মাইসূন বিনতি বাহ্‌দাল, যিনি ছিলেন বনূ কাল্‌ব গোত্রের মেয়ে। তিনি অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট লোক ছিলেন। তার গা ছিল ঘন চুলে ভরা। ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করেই তার ঘরে রাজসিক পরিবেশ দেখতে পান। মুআবিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি ইয়াযীদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। দু'-একবার তিনি তাকে 'আমীরে হজ্জ' করে পাঠান। একবার সেনাবাহিনীর অধিনায়কও নিয়োগ করেন। কনসটান্টিনোপল আক্রমণ ও

অবরোধেও ইয়াযীদ মুসলিম বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক ছিলেন। শিকারের প্রতি তার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। মুআবিয়া (রা) যখন মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন ইয়াযীদ দামিশ্‌কে ছিলেন না। লোক মারফত তাকে ডেকে পাঠানো হয় এবং মুআবিয়া (রা) তার উদ্দেশ্যে কিছু ওসীয়ত করেন। কিন্তু তিনি পিতার এই ব্যাধিকে মারাত্মক মনে না করে পুনরায় শিকারে চলে যান। তাই মুআবিয়া (রা) যখন ইনতিকাল করেন তখন ইয়াযীদ দামিশ্‌কে ছিলেন না। বেশ কয়েকদিন পর ফিরে আসেন এবং পিতার কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করেন। কাব্য রচনায়ও তার দক্ষতা ছিল। আমীরে মুআবিয়ার জীবনকালেই তার জন্য বায়আত নেওয়া হয়েছিল। এ কারণে জনসাধারণ তার প্রতি ছিল আরো অসন্তুষ্ট। মদীনার কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি তো তার জন্য বায়আত করতে অস্বীকারই করেছিলেন।

আপন জীবনকালে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করাটা মুআবিয়ার জন্য ছিল একটি মারাত্মক ভুল। খুব সম্ভবত পিতৃস্নেহের কারণে তিনি এই ভুলের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তাঁর চাইতেও বড় ভুল করেছিলেন। কেননা তাঁর পরামর্শেই মুআবিয়া (রা) অনুরূপ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র) বলেছিলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি রীতি চালু হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, ফলে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব লোপ পেয়েছে এবং পিতার পর পুত্র রাষ্ট্রনায়ক হতে শুরু করেছে।

আমীরে মুআবিয়ার পর সিরিয়াবাসী আগ্রহ সহকারে ও সন্তুষ্টচিত্তে ইয়াযীদের হাতে বায়আত করে। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও গভর্নরদের মাধ্যমে বায়আত করে। অন্তরে ঘৃণা বা অস্বীকৃতি থাকলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভয়ে বাহ্যত সকলেই ইয়াযীদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। ইয়াযীদ রাষ্ট্রনায়কের আসনে বসেই সমগ্র প্রদেশ ও রাজ্যের কর্মকর্তাদেরকে অবিলম্বে তার নামে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঐ সময়ে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান এবং কূফার শাসনকর্তা ছিলেন নু'মান ইব্‌ন বাশীর। এরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবান এবং আপোস মনোভাবাপন্ন। অন্যান্য শাসনকর্তার অনুপাতে তাদের স্বভাবে কঠোরতা ছিল না বললেই চলে।

যখন মদীনায় ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবার কাছে ইয়াযীদের নির্দেশ পৌঁছে তখন তিনি মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে একত্র করে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। ইমাম হুসাইন (রা) মুআবিয়া (রা)-এর ওফাতের সংবাদ শুনে আক্ষেপ করেন এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। এরপর তিনি ওয়ালীদকে বলেন, এখনি আমার বায়আতের জন্য আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি ভেবে-চিন্তে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। মারওয়ান যিনি ইতিপূর্বে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন এবং এখন ওয়ালীদের অধীনে উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত, ওয়ালীদকে প্ররোচিত করেন যেন তিনি তখনই ইমাম হুসাইনের বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাকে সেখান থেকে উঠে যেতে না দেন। কিন্তু ওয়ালীদ মারওয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, বরং পরবর্তী দিন পর্যন্ত তিনি ইমাম হুসাইনের বায়আত গ্রহণ মুলতবি রাখেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ওয়ালীদের কাছে আসেননি। তাই তাকে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি আসতে অস্বীকার করেন এবং এক রাতের অবকাশ চান। তাকেও ওয়ালীদ অবকাশ দেন।

কিন্তু রাতের এই সুযোগে ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনসহ মদীনা থেকে বেরিয়ে যান এবং পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তা ধরে চলতে থাকেন। পরদিন তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য মারওয়ান ও ওয়ালীদ ত্রিশ সদস্যের একটি বাহিনী নিয়ে বের হন, কিন্তু তারা কোথাও তাঁর সন্ধান পান নি। বিফল মনোরথ হয়ে তারা সন্ধ্যায় মদীনায় ফিরে আসেন। ঐ সম্পূর্ণ দিনটি যেহেতু ইব্‌ন যুবায়রের সন্ধানে কেটেছিল তাই তারা ইমাম হুসাইন (রা)-এর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পান নি। দ্বিতীয় রাতে তিনিও সুযোগ বুঝে আপন পরিবার-পরিজনসহ মদীনা থেকে বেরিয়ে যান। ভোরবেলা এই সংবাদ ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি ইমাম হুসাইনের পশ্চাদ্ধাবন করব না। এটা সম্ভব যে, তিনি আমার মুকাবিলা করবেন, যার কারণে তাঁর রক্তে আমার হাত রঞ্জিত হবে এবং এটা আমার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ঐ দুই ব্যক্তি চলে যাবার পর ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা মদীনাবাসীদের কাছ থেকে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর দিক থেকে কোন আশংকা ছিল না। কেননা খিলাফতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। এ দিকে ইয়াযীদও ওয়ালীদের কাছে লিখেছিল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বায়আত না করলেও যেন তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করা না হয়। অতএব বায়আতের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে কেউ কিছু বলেনি।

কিছু দিন পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। ইয়াযীদ হারিস ইব্‌ন হুরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে মক্কায় পাঠিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এবং হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-কে সাথে মক্কা গিয়ে উপনীত হন। তাদেরকে দেখামাত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, যিনি ছিলেন মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেন। এরপর মক্কার দু'হাজার অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁর হাতে বায়আত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হারিসকে বন্দী করে মক্কার শাসনক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। ইমাম হুসাইন (রা) তখন মক্কায় অবস্থান করলেও তাঁর হাতে বায়আত করেন নি। তিনিও ইমাম হুসাইন বা তাঁর পরিবারবর্গকে বায়আত করতে বলেন নি। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তার বেশির ভাগ সময় কা'বাঘরে ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। উল্লিখিত কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র মক্কাবাসী তাঁর হাতে বায়আত করে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ইমাম হুসাইনের সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনাও করতেন। অবস্থা এমন মনে হতো, যেন ইব্‌ন যুবায়র (রা) জনগণের কাছ থেকে প্রকৃত অর্থে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন নি, বরং তাঁর এ বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, ইয়াযীদকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একজন খলীফা নির্বাচিত না হবেন ততক্ষণ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) মক্কার শাসন পরিচালনা করবেন। কিন্তু এখানকার শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পিত হোক, এটা ইমাম হুসাইনের মনঃপূত ছিল না। আর এ কারণেই তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ইব্‌ন যুবায়রের পিছনে নামায পড়তেন না এবং মসজিদের জামাআতেও শরীক হতেন না।

এদিকে ইব্‌ন যুবায়র এবং হুসাইন (রা)-এর মদীনা থেকে প্রস্থান এবং মদীনাবাসীদের বায়আত সম্পর্কে মারওয়ান ইয়াযীদকে অবহিত করেন। ইয়াযীদ সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে আমর ইব্‌ন সাইয়িদ ইব্‌ন 'আসকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। আমর ইব্‌ন সাইয়িদ মদীনায় পৌঁছে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা মদীনা থেকেই ইয়াযীদের কাছে চলে যান। অপর দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কর্তৃক মক্কার শাসনক্ষমতা দখল এবং হারিসকে বন্দী করার সংবাদ হারিস ইব্‌ন খালিদ, যিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং ঘর থেকে বের হতেন না, ইয়াযীদের কাছে লিখে পাঠান। মক্কার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইয়াযীদ আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-কে লিখেন– আপনি অবিলম্বে মক্কায় গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে বন্দী করুন এবং তাঁর পায়ে বেড়ী লাগিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমর (রা) একটি বিরাট বাহিনী মক্কায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) জয়লাভ করেন। তিনি মদীনা থেকে আগত বাহিনীর সেনাপতিকে বন্দী করতেও সক্ষম হন।

কূফাবাসীরা আমীরে মুআবিয়ার শাসন আমলেই ইমাম হুসাইন (রা)-এর কাছে চিঠিপত্র লিখত এবং বার বার এই মর্মে অনুরোধ জানাত ঃ আপনি কূফায় চলে আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়আত করব। কূফাবাসীদের এই গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমীরে মুআবিয়াও অবহিত ছিলেন। ইমাম হাসান (রা) কূফাবাসীদের স্বভাব-প্রকৃতি ভালভাবেই আঁচ করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে হুসাইন (রা)-কে ওসীয়ত করেছিলেন, তুমি কখনো কূফাবাসীদের ধোঁকায় পড়বে না। অপরদিকে আমীরে মুআবিয়া (রা) ইয়াযীদকে বলে গিয়েছিলেন, কূফাবাসীরা ইমাম হুসাইনকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করবে। যদি তেমন অবস্থা দেখা দেয় এবং তুমি তাঁর বিরুদ্ধে জয়ী হও তাহলে তাঁর সাথে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করবে। যেহেতু মক্কার শাসনক্ষমতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে এসে গিয়েছিল তাই ইমাম হুসাইনের দৃষ্টি সব সময় কূফার দিকে নিবদ্ধ থাকত। কূফার শাসনকর্তা নু'মান ইব্‌ন বশীরের কাছে যখন ইয়াযীদের চিঠি এসে পৌঁছল এবং সাধারণভাবে জানাজানি হয়ে গেল যে, আমীরে মুআবিয়া (রা) ইনতিকাল করেছেন, তখন শীআনে বনূ উমাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নু'মান ইব্‌ন বশীরের হাতে ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত করে। কিন্তু শীআনে আলী ও শীআনে হুসাইন, যারা প্রথম থেকেই ইমাম হুসাইনকে কূফায় ডেকে আনার চেষ্টা করছিল, ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত করার ব্যাপারে ইতস্তত করে এবং সুলায়মান ইব্‌ন সারদের ঘরে একত্রিত হয়। সেখানে তারা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইয়াযীদকে খলীফা বলে স্বীকার করা হবে না এবং ইমাম হুসাইনকে কূফায় ডেকে আনা হবে। তখনও এই গোপন পরামর্শ চলছিল এমন সময় তাদের কাছে এ সংবাদ এল যে, ইমাম হুসাইন (রা) মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেছেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে নয়, বরং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকেই তাদের শাসনকর্তা মনোনীত করেছিল। অবশ্য ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন, তবে ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেননি। অতএব তারা ইমাম হুসাইনের কাছে নিম্নোক্ত মর্মে একটি চিঠি লিখেন ঃ

"আমরা আপনার ও আপনার মহামান্য পিতার অনুরক্ত এবং বনূ উমাইয়ার শত্রু। আমরা আপনার পিতার পক্ষ নিয়ে তালহা ও যুবায়রের বিরুদ্ধে লড়েছি, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধক্ষেত্রে

মুআবিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছি এবং সিরিয়াবাসীদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি। এখন আমরা আপনার পক্ষেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আপনি এই চিঠি পাওয়া মাত্র কূফায় চলে আসুন। আপনি এলেই আমরা নু'মান ইব্‌ন বশীরকে হত্যা করে কূফার শাসনক্ষমতা আপনার হাতে তুলে দেব। কূফা ও ইরাকে একলক্ষ যোদ্ধা রয়েছে এবং তারা সকলেই আপনার হাতে বায়আত করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আমরা আপনাকে খিলাফতের হকদার মনে করি। ইয়াযীদ তো আপনার মুকাবিলায় খিলাফত লাভের কোন অধিকারই রাখে না। এটাই সুযোগ, অতএব আপনি মোটেই দেরি করবেন না। আমরা ইয়াযীদকে হত্যা করে আপনাকে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের একক খলীফা বানাতে চাই। আমাদের দলের লোকেরা ইয়াযীদের কর্মকর্তা অর্থাৎ নু'মান ইব্‌ন বশীরের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কেননা আমরা একমাত্র আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদেরকেই ইমামতের যোগ্য মনে করি।"

মক্কায় যখন ইমাম হুসাইনের কাছে অনরবত এই মর্মের চিঠি পৌঁছতে থাকে তখন তিনি আপন চাচাত ভাই মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে (ইনি হচ্ছেন সেই আকীল ইব্‌ন আবূ তালিবের পুত্র, যাকে আমীরে মুআবিয়া তাঁর বিশিষ্ট সভাসদ ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন।) ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে কূফায় যাও। সেখানে গোপনে যাবে, গোপনে অবস্থান করবে এবং গোপনে আমার নামে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নেবে। যে সমস্ত লোক তোমার হাতে বায়আত হবে তাদের মোট সংখ্যা এবং তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম আমাকে লিখে জানাবে। তুমি নিজেকে গোপন করে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আর যারা বায়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে তাদেরকে বুঝিয়ে বলবে, আমি সেখানে গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা যেন কোনমতেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে না পড়ে।

মুসলিম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, যাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র টের না পায় মক্কা থেকে সেভাবে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি চিন্তাভাবনা করেন এবং ইমাম হুসাইনের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেন যে, আমাদের এই উদ্যোগের পরিণাম আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি আমাকে মাফ করুন এবং আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কূফায় পাঠান। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর কাছে লিখেন, 'তুমি তোমার ভীরুতা এভাবে প্রকাশ করো না। তুমি অবশ্যই কূফায় যাও।' অগত্যা মুসলিম ইব্‌ন আকীল কূফায় গিয়ে পৌঁছেন এবং মুখতার ইব্‌ন উবায়দার বাড়িতে আশ্রয় নেন। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর 'শীআনে আলী'-এর ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা দলে দলে এসে বায়আত হতে শুরু করে। প্রথম দিনই বার হাজার লোক বায়আত হয়। মুসলিম ইমাম হুসাইনের কাছে সাধারণের বায়আত গ্রহণের কথা লিখে জানান। তিনি লিখেন, প্রথম দিনই বার হাজার লোক বায়আত করেছে যাদের মধ্যে সুলতান ইব্‌ন সারদ, মুসাইয়াব ইব্‌ন নাজিয়াহ, রিকাতা ইব্‌ন শাদ্দাদ এবং হানী ইব্‌ন উরওয়াহ অন্যতম। আপনি যখন আসবেন এবং প্রকাশ্য বায়আত নিতে শুরু করবেন তখন আপনার হাতে বায়আত হবে। কায়স ও আবদুর রহমান নামীয় দুই ব্যক্তি এই চিঠি নিয়ে ইমাম হুসাইনের কাছে যায়। তিনি চিঠি পড়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং পত্রবাহকদ্বয়কে এই বলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেন যে, আমি শীঘ্রই কূফা আসছি। এবার তিনি আপন এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আহনাফ ইব্‌ন মালিককে বসরার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামে চিঠি লিখে

সেখানে প্রেরণ করেন। এখানে তাঁর পিতার অনেক ভক্ত ছিল। ঐ সব চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, আমার হাতে আপনাদের বায়আত হওয়া উচিত এবং আপনার অবিলম্বে কূফায় এসেও পৌঁছা উচিত।

কূফায় মুসলিম ইব্‌ন আকীলের আগমন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ইমাম হুসাইনের পক্ষে বায়আত গ্রহণের খবর জানাজানি হয়ে গেলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম হাদরামী নু'মান ইব্‌ন বশীরের কাছে এসে বললেন, হে আমীর! যুগের খলীফার কাজে আপনার এরূপ ঢিলেমি করা উচিত নয়। কিছুদিন যাবত মুসলিম ইব্‌ন আকীল কূফায় এসে হুসাইন ইব্‌ন আলীর খিলাফতের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আপনার উচিত মুসলিমকে হত্যা করা অথবা গ্রেফতার করে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। আর যারা এ যাবত হুসাইনের জন্য বায়আত করেছে তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। নু'মান ইব্‌ন বশীর বললেন, এ সমস্ত লোক আমার অজান্তে যে কাজ করেছে তা প্রকাশ করা আমি সমীচীন মনে করি না। যতক্ষণ এরা আমার মুকাবিলা না করবে ততক্ষণ আমি তাদের আক্রমণ করব না। আবদুল্লাহ্ এই উত্তর শুনে বেরিয়ে আসেন এবং সাথে সাথে ইয়াযীদকে লিখেন ঃ

"মুসলিম ইব্‌ন আকীল কূফায় এসে হুসাইন ইব্‌ন আলীর খিলাফতের জন্য বায়আত নিচ্ছেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বায়আত হয়েছে। এখানে হুসাইন ইব্‌ন আলীর আগমনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। নু'মান এ ব্যাপারে অত্যন্ত শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। যদি আপনি কূফা দখলে রাখতে চান তাহলে কোন শক্তিশালী গভর্নরকে অবিলম্বে কূফায় পাঠিয়ে দিন, যাতে তিনি এখানে এসে মুসলিমকে গ্রেফতার করেন। জনসাধারণের বায়আত থেকে বিরত রাখেন এবং হুসাইন ইব্‌ন আলীকে কূফা প্রবেশে বাধা দেন। এতে যদি বিলম্ব করেন তাহলে জানবেন, কূফা আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

উমারা ইব্‌ন উকবা ও আবূ মুঈতও ইয়াযীদের কাছে একই মর্মে চিঠি লিখেন। এই সব চিঠি পড়ে ইয়াযীদ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। সারজূন নামীয় হযরত আমীরে মুআবিয়ার একজন মুক্ত দাস ছিল। আমীরে মুআবিয়াও কোন কোন জটিল বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতেন এবং তাতে উপকৃতও হতেন। ইয়াযীদ তাকেই ডেকে পাঠান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাদরামীর চিঠি দেখিয়ে তার পরামর্শ চান। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াযীদ সব সময়ই যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। যিয়াদের পর তার পুত্র উবায়দুল্লাহ্‌র প্রতিও অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। উবায়দুল্লাহ্‌কে আমীরে মুআবিয়া বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ইয়াযীদ বসরার গভর্নর পদ থেকে উবায়দুল্লাহ্‌কে বরখাস্ত করে অন্য কাউকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করতে মনস্থ করছিলেন। কূফা থেকে ভয়ংকর সংবাদ আসার পর ইয়াযীদ আমীরে মুআবিয়ার মুক্তদাস সারজূনের কাছে পরামর্শ চাইলে সে নিবেদন করল, ইরাক আপনার দখল থেকে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে।

এখন আপনি যদি ইরাককে রক্ষা করতে চান তাহলে এ ব্যাপারে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। আমি জানি, এই পরামর্শ আপনার মনঃপূত হবে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইব্‌ন যিয়াদ ব্যতীত যাকেই আপনি

কূফার গভর্নর করে পাঠাবেন সেই কূফা রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ এই যে, যেরূপ আপনার পিতা উবায়দুল্লাহ্‌র পিতা যিয়াদকে বসরা ও কূফা উভয় প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন সেরূপ আপনিও উবায়দুল্লাহ্‌কে ঐ প্রদেশদ্বয়ের গভর্নর নিয়োগ করুন। বসরার জন্য অন্য কোন গভর্নর নিয়োগের প্রয়োজন নেই। ইয়াযীদ এই পরামর্শ শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর উবায়দুল্লাহ্‌র নামে নিম্নোক্ত নির্দেশ নামা পাঠান ঃ

"আমি বসরার সাথে কূফার শাসনক্ষমতাও তোমার হাতে অর্পণ করলাম। আমার এই নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে তুমি কাউকে বসরায় তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে অবিলম্বে কূফায় চলে যাও। সেখানে মুসলিম ইব্‌ন আকীল এসেছেন এবং ইমাম হুসাইনের পক্ষে বায়আত নিচ্ছেন। তুমি তাঁকে বন্দী কর অথবা হত্যা কর এবং যে সমস্ত লোক তাঁর হাতে বায়আত হয়েছে তারা যদি এ বায়আত প্রত্যাহার না করে তাহলে তাদেরকেও তরবারির আঘাতে খতম কর এবং এ জাতীয় যে কোন আশংকা প্রতিরোধ করার চেষ্টা কর।"

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের বিশ্বাস ছিল, ইয়াযীদ তাকে বসরার শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত না করে ছাড়বে না। তাই এই নির্দেশনামা পেয়ে সে একাধারে বিস্মিত, আনন্দিত ও চিন্তিত হলো। কেননা তার অন্তরে এই আশংকারও সৃষ্টি হলো যে, ইয়াযীদ এই বাহানায় তাকে বসরা থেকে বের করতে চাচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও নির্দেশ পালন করাই সমীচীন মনে করে এবং আপন ভাই উসমানকে বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে পরদিন কূফা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেয়। এরিমধ্যে মুনযির ইব্‌ন হারিছ তার কাছে দৌড়ে এসে বলে, হুসাইন ইব্‌ন আলীর একজন দূত এসেছে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে গোপনে তাঁর পক্ষে বায়আত নিচ্ছে। এ খবর পেয়ে উবায়দুল্লাহ্ ঐ রাতেই ধোঁকা দিয়ে ইমাম হুসাইনের দূতকে বন্দী করে এবং পরদিন জনসাধারণকে একত্র করে একটি ভাষণ দেয়। তাতে সে বলে ঃ

"হুসাইন ইব্‌ন আলীর একজন দূত বসরায় এসেছে। সে এখানকার অনেক লোকের নামে লেখা ইমাম হুসাইনের পত্রাদিও নিয়ে এসেছে। আমি তাকে বন্দী করেছি। বসরার যে সব লোকের নামে সে চিঠি নিয়ে এসেছে আমি তার কাছ থেকেই তাদের নাম জেনে নিয়েছি। ইতিমধ্যে যারা বায়আত করেছে আমি তাদের নামের তালিকাও তৈরি করেছি। আপনারা অবশ্যই জানেন, আমি হচ্ছি যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের পুত্র। মুসলিম ইব্‌ন আকীল কূফায় এসে অবস্থান করছে। আমি এখন কূফা যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি তাকে এবং যে সব লোক তার হাতে বায়আত হয়েছে তাদের সকলকেই হত্যা করব। যদি সমগ্র কূফাবাসী বায়আত করে থাকে তাহলে আমি সেখানকার একটি লোকও জীবিত রাখব না। এখন আমি তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করছি যে, হুসাইন ইব্‌ন আলীর দূত ছাড়া আমি তোমাদের কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু এখান থেকে আমার চলে যাবার পর কেউ যদি একটুও কান নাড়ে তাহলে তার পরিণাম হবে ভয়ংকর।"

এই বলে ইমাম হুসাইনের দূতকে ডেকে এনে উপস্থিত জনতার সামনে প্রকাশ্যে হত্যা করে। ভয়ে কেউ তখন টু শব্দটিও করেনি। এই কাজ সেরে সে এবার কূফা রওয়ানা হয়। ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায় বসে ধারণা করছিলেন যে, বসরায়ও তাঁর পক্ষে বায়আত নেয়া হয়ে থাকবে। কিন্তু হায়! এখানে যে তাঁর দূতকে হত্যা করা হচ্ছে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ

কাদিসিয়ায় পৌঁছে সেখানে আপন অশ্বারোহী বাহিনী রেখে দিয়ে নিজে আপন পিতার মুক্তদাসকে সঙ্গে নিয়ে একটি উটের সওয়ার হয়ে অতি দ্রুতবেগে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হয়। ঐ দিনই মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সে কূফায় গিয়ে পৌঁছে। সে হিজাযী ভঙ্গিতে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছিল। সেখানকার লোকেরা হযরত ইমাম হুসাইনের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। সেখানে শীআনে আলী ও হুসাইনের শক্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, নু'মান ইব্ন বশীর সন্ধ্যা হতেই আপন অফিসের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিশেষ বিশেষ লোকদের নিয়ে সেখানে বৈঠক করতেন। তিনি দরজায় একটি গোলামকে এই বলে বসিয়ে রাখতেন যে, কোন লোক যদি আসে তাহলে প্রথমে তার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। এরপর যদি তাকে ভিতরে আসার যোগ্য মনে কর তাহলে দরজা খুলে দেবে, অন্যথায় নয়। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ কূফায় প্রবেশ করলে লোকেরা মনে করল, তারা যে ইমাম হুসাইনের অপেক্ষা করছে তিনিই এসে পৌঁছেছেন। অতএব যে দিকেই উবায়দুল্লাহ্র উট যেত সেদিকেই লোকেরা অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বলতো, আপনার উপর সালাম, হে রাসূলের সন্তান! উবায়দুল্লাহ্ তার উট নিয়ে সরকারী অফিসে পৌঁছে দেখতে পায় যে, ভেতর থেকে অফিসের দরজা বন্ধ। সে দরজায় করাঘাত করে, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি, তখন নু'মান ইব্ন বশীর আপন বন্ধুদের নিয়ে ছাদের উপর বসেছিলেন। সেখান থেকে উঠে এসে ছাদের এক প্রান্ত দিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। যেহেতু সমগ্র শহরবাসী ইমাম হুসাইনের অপেক্ষা করছিল, তাই তিনি উবায়দুল্লাহ্কেই ইমাম হুসাইন মনে করে উপর থেকেই বলে উঠলেন, হে রাসূলের সন্তান! আপনি ফিরে যান, ফিতনার সৃষ্টি করবেন না। ইয়াযীদ কখনো কূফা আপনার হাতে ছেড়ে দেবেন না। নু'মানের যে সব বন্ধু ছাদে বসেছিলেন তারা নু'মানকে বললেন, ইমাম হুসাইনের সাথে এরূপ অশিষ্ট আচরণ করবেন না। অন্তত দরজা খুলে তাঁকে ভিতরে আসতে দিন। কেননা তিনি দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছেন এবং সোজাসুজি আপনারই আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। নু'মান বললেন, আমি পছন্দ করি না, লোকেরা একথা বলার সুযোগ পাক যে, নু'মানেরই শাসনামলে কূফার মাটিতে ইমাম হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছে।

উবায়দুল্লাহ্ তখন তার পাগড়ি খুলে বললো, হতভাগা আগে দরজা তো খোল। উবায়দল্লাহ্র কণ্ঠস্বর শুনে লোকেরা তাকে চিনে ফেলল এবং দরজা খুলে দিল। এরপর সবাই এদিকে ওদিকে ছুটে পালালো। উবায়দুল্লাহ্ ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পিছনে রেখে আসা তার অশ্বারোহী বাহিনীও কূফায় প্রবেশ করতে শুরু করল। মুসলিম ইব্ন আকীলের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, ইব্ন যিয়াদ তার বাহিনী নিয়ে কূফায় এসে পৌঁছেছে তখন তিনি (মুসলিম) যে ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং যে ঘরটি ছিল সকলের কাছেই পরিচিত, তিনি সেখান থেকে বের হয়ে হানী ইব্ন উরওয়ার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঐ পর্যন্ত মুসলিমের হাতে বায়আতকারীদের সংখ্যা আঠার হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। পরদিন ভোরে ইব্ন যিয়াদ জনসাধারণের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেয়। তাতে সে ইয়াযীদের ঐ নির্দেশনামা পড়ে শোনায়, যা বসরায় তার হস্তগত হয়েছিল। উবায়দুল্লাহ্ বলে ঃ

"তোমরা আমার পিতা যিয়াদকে ভাল ভাবেই চেন। তোমরা একথাও জান যে, তিনি কি ধরনের শাসন পরিচালনায় অভ্যস্ত ছিলেন। আমার মধ্যে আমার পিতার যাবতীয় স্বভাব-চরিত্র

বিদ্যমান। তোমরা আমার সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছ। আর আমিও এক এক করে তোমাদের সকলের নাম জানি। তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং মহল্লাও আমার জানা আছে। আমার থেকে তোমরা কিছুই লুকাতে পারবে না। আমি কূফায় রক্তের বন্যা বহাতে চাই না এবং তোমাদেরও হত্যা করতে চাই না। আমি জানি, তোমরা হুসাইন ইব্‌ন আলীর পক্ষে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের হাতে বায়আত করেছ। আমি তোমাদের সবাইকে এই শর্তে নিরাপত্তা দান করছি যে, তোমরা তোমাদের বায়আত প্রত্যাহার কর। আর তোমাদের মধ্যে যে বিদ্রোহ করবে তাকে যেন কেউ আপন ঘরে আশ্রয় না দেয়। অন্যথায় প্রত্যেক আশ্রয়দাতাকে তারই ঘরের দরজায় হত্যা করা হবে।"

এই ভাষণের পর ইব্‌ন যিয়াদ সবাইকে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের ঠিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেউ তা বলেনি। শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, তিনি হানী ইব্‌ন উরওয়ার ঘরে লুকিয়ে আছেন। উবায়দুল্লাহ্ মাকিল নামীয় এক ব্যক্তিকে— যে ছিল তামীম গোত্রের মুক্তদাসদের অন্যতম এবং যাকে কূফার কেউই চিনত না– নির্জনে ডেকে নিয়ে তার হাতে তিন হাজার দিরহামের একটি থলে দিয়ে বলে, তুমি অমুক মহল্লায় হানী ইব্‌ন উরওয়ার কাছে যাও। তার সাথে তোমার সাক্ষাত হলে তুমি তাকে বল, আমি আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলব। নির্জন স্থানে গিয়ে পৌঁছে হানীকে বল, আমাকে বসরার অমুক ব্যক্তি পাঠিয়েছে। তারা আমাকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে বলেছে, তুমি কূফায় মুসলিম ইব্‌ন আকীলের হাতে এই অর্থ পৌঁছে দাও এবং তাকে বল, আমাদের লিখছেন, তোমরা অমুক তারিখে কূফায় গিয়ে পৌঁছবে। ঐ তারিখে ইমাম হুসাইনও কূফায় গিয়ে পৌঁছবেন। আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা সবাই নির্দিষ্ট দিনে ইমাম হুসাইনের সাথে কূফায় প্রবেশ করব। আর এই তিন হাজার দিরহাম আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করুন এবং এটাকে আমাদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করুন। অতএব আপনি আমাকে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের কাছে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি যাবতীয় সংবাদ এবং এই অর্থ তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কূফায় চলে যেতে পারি। কেননা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ কূফায় এসে পড়েছে এবং সে আমাকে চিনে এমন যেন না ঘটে যে, আমি তার হাতে বন্দী হয়ে যাব।

যা হোক মাকিল তিন হাজার দিরহামের থলে নিয়ে হানীর কাছে পৌঁছে। তিনি তার দরজায় বসা ছিলেন। মাকিলের কথা শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমের কাছে তাকে নিয়ে যান। ইব্‌ন আকীল সন্তুষ্টচিত্তে ঐ থলে গ্রহণ করেন এবং যাবতীয় খবর শোনার পর মাকিলকে বিদায় দেন। সেখান থেকে বের হয়ে সে সোজা উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে এবং তাকে বলে, আমি মুসলিমকে থলেটি দিয়ে এসেছি এবং স্বয়ং তার সাথে কথাও বলেছি। তিনি হানীর ঘরেই অবস্থান করছেন। উবায়দুল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে হানীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, মুসলিম কোথায় ? হানী এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উবায়দুল্লাহ্ মাকিলকে ডেকে সবার সামনে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করতে বলে। এতে হানী অত্যন্ত লজ্জা পান। তবে অত্যন্ত প্রত্যয়ের সুরে বলেন, হ্যাঁ, মুসলিম আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে আমি এই অপমান সহ্য করতে পারব না যে, তাকে আপনার হাতে তুলে দেব। উবায়দুল্লাহ্ হানীকে তখনই গ্রেফতার করে। শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে,

উবায়দুল্লাহ্ হানীকে হত্যা করে ফেলেছে। তার ঘরের মেয়েরা এ সংবাদ শুনে ক্রন্দন করতে থাকে। মুসলিম ইব্ন আকীল এই অবস্থা দেখে আর সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তরবারি হাতে হানীর ঘর থেকে বের হয়ে ঐ সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান জানান, যারা তার হাতে বায়আত করেছিল। কিন্তু আঠারো হাজারের মধ্য থেকে মাত্র চার হাজার লোক তার আহ্বানে সাড়া দেয়। মুসলিম অবশিষ্টদের পুনরায় আহ্বান জানালে তারা উত্তর দেয়, বায়আত করার সময় তো আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (রা) কূফায় না আসবেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করব না। অতএব তাঁর এখানে এসে পৌঁছা পর্যন্ত আপনারও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। মুসলিম ইব্ন আকীল যেহেতু বেরিয়ে এসেছিলেন তাই পুনরায় তাঁর আত্মগোপনের কোন সুযোগ ছিল না। অগত্যা তিনি ঐ চার হাজার লোক নিয়েই উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে ঘেরাও করেন। ঐ সময় উবায়দুল্লাহ্ মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক নিয়ে সরকারী কার্যালয়ে অবস্থান করছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে সে ছাদের উপর চড়ে অবরোধকারীদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এরপর মুসলিমের সঙ্গীদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা এই বলে বোঝাতে লাগল যে, এভাবে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা তোমাদের পক্ষে মোটেই উচিত হবে না। একথা শুনে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক ছাড়া বাকি সকলেই মুসলিমকে ছেড়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়।

মুসলিম ইব্ন আকীল ও হানী নিহত হন

শেষ পর্যন্ত মুসলিম সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কূফার জনৈক ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নেন। উবায়দুল্লাহ্ তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য আমর ইব্ন জারীর মাখযূমীকে পাঠায়। পলায়নের কোন উপায় না দেখে তিনি কোষ থেকে তরবারি বের করেন। কিন্তু আমর বলে, আপনি অন্যায়ভাবে নিজেকে ধ্বংস করছেন কেন ? আপনি নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। আমি আমার নিজ দায়িত্বে আপনাকে আমীর ইব্ন যিয়াদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তার থেকে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। মুসলিম তরবারি রেখে নিজেকে আমরের হাতে সমর্পণ করলেন। সে তাকে নিয়ে উবায়দুল্লাহ্র কাছে গেল। উবায়দুল্লাহ্ মুসলিমকে সেই কামরায়ই বন্দী করে রাখল, যেখানে হানী ইব্ন উরওয়া পূর্ব থেকেই বন্দী ছিলেন। পরদিন বায়আতকারী দশ হাজার লোক একত্রিত হয়। তারা উবায়দুল্লাহ্র গৃহ অবরোধ করে মুসলিম এবং হানী উভয়েরই মুক্তি দাবি করে। তারা বলতে থাকে, হে উবায়দুল্লাহ্! যদি তুমি স্বেচ্ছায় এদের দু'জনকে ছেড়ে দাও তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় আমরা জোরপূর্বক এদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। উবায়দুল্লাহ্ তার লোকদেরকে নির্দেশ দেয়, তোমরা এ দু'জনকে ছাদের উপর নিয়ে যাও এবং সবার চোখের সামনে হত্যা কর। অতএব দু'জনকেই হত্যা করা হলো। এ দৃশ্য দেখে সকলেই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, যেন তাদের মৃত্যুদণ্ড দেখার উদ্দেশ্যেই তারা এখানে এসেছিল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ নির্দেশ দেন, মহলের দরজা খুলে এদের দু'জনের দেহ দরজায় ঝুলিয়ে রাখ এবং মাথা দু'টি ইয়াযীদের কাছে দামিশ্কে পাঠিয়ে দাও। এবার ইয়াযীদ উবায়দুল্লাহ্কে লিখল, ইমাম হুসাইন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং অতি শীঘ্রই কূফায় গিয়ে পৌঁছবেন। তুমি ভালভাবে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর এবং এমনভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন কর যাতে কূফায় পৌঁছার পূর্বেই তাঁকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর কূফা যাত্রা

ইমাম হুসাইন (রা) মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেন। তিনি কূফা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছেন, মক্কায় এখবর ছড়িয়ে পড়লে যারা তাঁকে ভালবাসতেন অথবা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তারা একের পর এক তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তারা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, এখন আপনার কূফা যাত্রা আশংকামুক্ত নয়। সর্বপ্রথম আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস এসে নিবেদন করেন, আপনি কূফায় যাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করুন। কেননা সেখানে ইরাকের গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ রয়েছে। তাছাড়া ইরাকের লোকেরা লোভী। এটা অসম্ভব নয় যে, যারা আপনাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তারাই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে লড়বে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, তুমি বায়আত গ্রহণ এবং শাসনক্ষমতা লাভের জন্য বাইরে যেয়ো না। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুনিয়া ও আখিরাত এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আখিরাতকেই বেছে নিয়েছিলেন। তুমিও নবী বংশের সন্তান। তাই তুমি দুনিয়ার পিছনে ছুটো না, বরং পার্থিক উপায়-উপকরণ থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখ।

এই উপদেশ দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) কেঁদে ফেলেন, ইমাম হুসাইনও তাঁর সাথে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর উপদেশ মেনে নিতে পারেননি। বাধ্য হয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, মক্কা ছেড়ে যেয়ো না এবং খানায় কা'বার সংস্পর্শ ত্যাগ করো না। তোমার সম্মানিত পিতা কূফাকে মক্কা ও মদীনার উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে কূফাবাসী কিরূপ ধৃষ্টতামূলক আচরণ করেছিল তা তো তুমি নিজেই দেখেছ। তারা তাঁকে শেষ পর্যন্ত শহীদ করে ছেড়েছে। তোমার ভাই হাসানকেও কূফাবাসী লুণ্ঠন করেছিল, তাঁকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিষপ্রয়োগে হত্যাও করেছে। ওদের উপর নির্ভর করা তোমার মোটেই উচিত নয়। ওদের বায়আতের কোন মূল্য নেই। ওদের চিঠিপত্রের উপরও ভরসা করা চলে না। ইব্‌ন আব্বাসের কাছ থেকে এসব কথা শুনে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, আপনি যা কিছু বলছেন সবই ঠিক। কিন্তু আমার কাছে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের চিঠি এসেছে। ইতিমধ্যে তাঁর হাতে বার হাজার লোক বায়আত হয়েছে। ইতিপূর্বে কূফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেড়শ' চিঠি আমি পেয়েছি। অতএব আশংকার কোন কারণ নেই। এমতাবস্থায় আমার সেখানে যাওয়াই উচিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কমপক্ষে যিলহজ্জ মাস শেষ হতে দাও। নতুন বছর শুরু হোক, তারপর সফরের কথা ভাব। হজ্জের মওসুম এসে গেছে, সমগ্র বিশ্বের লোক দলে দলে মক্কায় আসছে, আর তুমি মক্কা ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছ। আর এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, তুমি দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের উপর ক্ষমতা লাভ করবে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের অধিকারী হবে। বর্তমানে এটাই সমীচীন যে, তুমিও হজ্জে শরীক হও এবং জনসাধারণকেও হজ্জ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে দাও। হুসাইন (রা) বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আর দেরি করা চলে না। আমার শীঘ্রই রওয়ানা হওয়া উচিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যদি আমার কথা একান্তই না মান তাহলে অন্তত স্ত্রীলোক ও শিশুদের সঙ্গে

নিও না। কেননা কূফাবাসীদের উপর কোন বিশ্বাস নেই। বার হাজার লোক যদি তোমার খিলাফতের জন্য বায়আত করে থাকে তাহলে তো তাদের কর্তব্য ছিল, প্রথমেই ইয়াযীদের গভর্নরকে কূফা থেকে বের করে দেওয়া, রাজকোষের উপর কবজা করা, এরপর সেখানে যাওয়ার জন্য তোমাকে আহ্বান জানানো। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে কূফার গভর্নরের বিরুদ্ধে ওরা কিছুই করতে পারবে না। যখন তাদের কাছে অর্থ-ভাণ্ডারও নেই তখন এটা নিশ্চিত যে, গভর্নর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে অথবা লোভ দেখিয়ে আপন ইচ্ছানুযায়ী যখনই চাইবে তখনই তাদেরকে ব্যবহার করতে পারবে। এমতাবস্থায় যারা তোমাকে আহবান জানাচ্ছে তারাই ইয়াযীদের পক্ষ নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াটা অসম্ভব নয়। এই সব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমি তোমার নিরাপত্তা সম্পর্কে দারুণভাবে শংকিত। যদি স্ত্রীলোক ও শিশুরাও তোমার সাথে থাকে তাহলে যেভাবে হয়রত উসমান (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনের সামনে নিহত হয়েছিলেন ঠিক সেভাবে তোমার পরিবার-পরিজনকেও হয়ত তোমার হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে হবে। উপরন্তু এ আশংকাও রয়েছে যে, তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে। তিনি যখন ইব্‌ন আব্বাসের একথাও মানলেন না তখন তিনি বললেন, তোমার যদি রাষ্ট্রক্ষমতা ও খিলাফত লাভের এতই আগ্রহ, তাহলে প্রথমে ইয়ামানে চলে যাও। সেখানে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক লোক রয়েছে। তাছাড়া সেখানে এমন পর্বত শ্রেণীও রয়েছে, যেগুলোকে তুমি তোমার প্রতিরক্ষায় অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে। যদি তুমি হিজাযের শাসনক্ষমতা চাও তাহলে অতি সহজেই তাও লাভ করতে পার। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর কোন পরামর্শই মানলেন না। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এলেন। তিনিও তাঁকে বললেন, আপনি কখনো কূফা যাবেন না। আপনার কূফা যাত্রার সংবাদ যখন মক্কায় প্রচারিত হয় তখন আমি কোন কোন ব্যক্তিকে এই মন্তব্য করতে শুনেছি, হুসাইন ইব্‌ন আলীর কূফা রওয়ানা হওয়ার সংবাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (অর্থাৎ আমি) খুব খুশি হবে। কেননা এরূপ হলে মক্কায় তাঁর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তাই আমি ঐ সমস্ত অলীক ধারণা পোষণকারী লোকদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করার জন্য আপনাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বলছি, আপনি মক্কার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করুন। আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়আত করব এবং আপনার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করব। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) উত্তর দিলেন, আমি ইতিমধ্যে তাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি এবং রওয়ানা হওয়ার দৃঢ়সংকল্প নিয়েছি। এমতাবস্থায় নিজেকে বিরত রাখতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬০ সনের ৩রা যিলহজ্জ (৬৮০ খ্রি.-এর সেপ্টেম্বর) রোজ সোমবার ইমাম হুসাইন (রা) পরিবারসহ মক্কা থেকে রওয়ানা হন। আর ঐ তারিখেই মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে কূফায় হত্যা করা হয়। ইমাম হুসাইন (রা) যখন মক্কা থেকে রওয়ানা হন তখন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'আস এবং আরো কয়েকজন মক্কাবাসী তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ান। তাঁরা বলেন, আপনি বিরত না হলে আমরা শক্তি প্রয়োগে আপনাকে বাধা দেব এবং আপনার প্রতিরোধ করব। হুসাইন (রা) বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। আমি কোন মতেই আমার

সংকল্প ত্যাগ করব না। একথা শুনে সবাই তাঁর রাস্তা ছেড়ে দেন এবং তিনি কূফায় রওয়ানা হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, আমি এই মুহূর্তে তোমার উটের সামনে এমনভাবে শুয়ে পড়তাম যে, তুমি আমাকে দলিত-মথিত না করে অগ্রসর হতে পারতে না। কিন্তু আমি জানি, তাতেও তুমি বিরত হবে না এবং কূফা যাত্রার সংকল্পও ত্যাগ করবে না। যাহোক তিনি মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে 'তিগমা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলে একটি কাফেলার সাথে তাঁর দেখা হয়। ওরা ইয়ামানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে কিছু উপঢৌকন নিয়ে ইয়াযীদের কাছে যাচ্ছিল। তিনি ঐ কাফেলাকে বন্দী করে ফেলেন এবং তাদের কাছ থেকে কিছু মাল-সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। মক্কা ও কূফার মধ্যবর্তী 'সাফাহ' নামক স্থানে প্রসিদ্ধ আরবী কবি ফারাযদাকের সাথে তাঁর দেখা হয়। ফারাযদাক কূফা থেকে আসছিলেন। তিনি যখন কূফা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ কূফায় এসে পৌঁছেনি। ইমাম হুসাইন (রা) ফারাযদাকের কাছে কূফা ও কূফাবাসীদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কূফাবাসীরা তো আপনার সাথে আছে, কিন্তু তাদের তরবারিসমূহ আপনার সাথে আছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের একটি চিঠি পান। তিনি নিজ পুত্র আওন ও মুহাম্মদের মাধ্যমে ঐ চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমি শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে বলছি, আপনি কূফা যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করুন এবং মদীনায় চলে আসুন। আমার আশংকা যে, আপনাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। ঐ সাথে মদীনার গভর্নরের একটি চিঠিও দূতেরা ইমাম হুসাইনকে দিল। তাতে লেখা ছিল, যদি আপনি মদীনায় এসে থাকতে চান তাহলে আপনাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) ফিরে যেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তিনি মুহাম্মদ ও আওনকেও তাঁর সঙ্গী করে নেন এবং বসরাবাসী স্বীয় পথ প্রদর্শককে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চল, যাতে আমরা উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের পূর্বেই কূফায় প্রবেশ করতে পারি। সেখানে সম্ভবত লোকেরা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই ইব্ন যিয়াদের কাছে ইয়াযীদের একটি জরুরী বার্তা পৌঁছেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তুমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর। যেহেতু ইমাম হুসাইন ইতিমধ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে থাকবেন, তাই তুমি প্রতিটি রাস্তায় সৈন্য মোতায়েন কর, যাতে তিনি কূফায় এসে পৌঁছুতে না পারেন। ইমাম হুসাইন (রা) মনে মনে এই ধারণা নিয়ে পথ চলেছিলেন যে, যেহেতু মুসলিম ইব্ন আকীলের হাতে প্রতিদিনই লোকেরা বায়আত করছে, তাই এতদিনে বায়আতকারীদের দল অনেক ভারী হয়ে গেছে। কিন্তু ওদিকে কূফায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাঁকে বন্দী অথবা হত্যা করার জন্য সেনাবহিনী মোতায়েন করছিল। আরো কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর ইমাম হুসাইনের সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীর সাক্ষাত হয়। তিনি ইমাম হুসাইনের সংকল্পের কথা জেনে তা থেকে তাঁকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্র শপথ দিয়ে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানান। তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, আপনি ইরাকীদের ধোঁকায় পড়বেন না। যদি আপনি বনূ উমাইয়া থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, তাহলে তারা আপনাকে অবশ্যই হত্যা করবে।

অতএব আপনি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে ইসলাম, আরব এবং কুরায়শের মর্যাদাহানি করবেন না। কিন্তু এই সব কথায় ইমাম হুসাইন মোটেও প্রভাবিত হলেন না। তিনি যথারীতি কূফার দিকে এগিয়ে চললেন। আজির' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কায়স ইব্‌ন মুসহিরের হাতে কূফাবাসীদের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন তাতে তিনি লিখলেন, আমি তোমাদের নিকটেই এসে পৌঁছেছি। তোমরা আমার অপেক্ষায় থাক। কায়স কাদিসিয়ায় পৌঁছতেই ইব্‌ন যিয়াদের বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে ইমাম হুসাইনের চিঠি সমেত ইব্‌ন যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হয়। ইব্‌ন যিয়াদ কায়সকে সরকারী মহলের ছাদের উপর উঠিয়ে সেখান থেকে নিচে ছুঁড়ে মারে। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এদিকে ইমাম হুসাইন (রা) পরবর্তী মনযিল থেকে আপন দুধভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়কতারের মাধ্যমে আরেকটি চিঠি পাঠান। তাকেও কায়সের ন্যায় গ্রেফতার করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইমাম হুসাইনের কাফেলা সা'লাবা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারে যে, মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে কূফায় হত্যা করা হয়েছে এবং এখন কূফায় ইমাম হুসাইনের সমর্থক বা সাহায্যকারী বলতে কেউ নেই। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর কাফেলায় নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া নেমে আসে এবং তারা সেখান থেকেই ফিরে যাবার সংকল্প নেন। কেননা কূফায় গেলে মুসলিমের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছে তা এই কাফেলার সাথেও অনুরূপ আচরণ করার আশংকা রয়েছে। একথা শুনে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের ছেলেরা বলল, আমাদের কখনো ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এখন আমরা হয় মুসলিমের হত্যার প্রতিশোধ নেব, অথবা নিজেদের প্রাণ দেব। তাছাড়া হুসাইন ইব্‌ন আলী মুসলিম ইব্‌ন আকীলের মত নন। তাঁকে কূফাবাসীরা দেখে অবশ্যই তাঁর পক্ষ নেবে এবং তারা ইব্‌ন যিয়াদকেও বন্দী করবে। ঐ কাফেলায় কয়েকশ লোক ছিল। পথিমধ্যেও লোকেরা যোগদান করায় তার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু সা'লাবায় পৌঁছার পর যখন ঐ দুঃখজনক খবর এলো তখন অন্যান্য গোত্রের লোক ক্রমান্বয়ে কাফেলা ছেড়ে চলে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেবল ইমাম হুসাইনের পরিবার ও গোত্রের লোকেরাই অবশিষ্ট রইল। তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল সত্তর অথবা আশির মত। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াইশ।

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসকে 'রায়'-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এবার সে তাকে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে বলল, মরুভূমিতে গিয়ে সমগ্র রাস্তা ও জলপথে পাহারা বসাও এবং অনুসন্ধান করে দেখ, হুসাইন ইব্‌ন আলী কোন্ দিক থেকে আসছেন এবং বর্তমানে কোথায় আছেন। ইব্‌ন যিয়াদ হুর ইব্‌ন ইয়াযীদ তামীমীকেও এক হাজার সৈন্য দিয়ে টহল কাজে মোতায়েন করে। আমর ইব্‌ন সা'দ কাদিসিয়া হয়ে চতুর্দিক থেকে খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ইমাম হুসাইন (রা) অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে 'শারাফ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে আরো একটু অগ্রসর হতেই হুর ইব্‌ন ইয়াযীদ তামীমী এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ তাঁর সামনে এসে হাযির হয়। ইমাম হুসাইন (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে হুরকে বলেন, আমি তোমাদের আহ্বানেই

এখানে এসেছি। যদি তোমরা নিজেদের অঙ্গীকারে কায়েম থাক তাহলে আমি তোমাদের শহরে প্রবেশ করব, অন্যথায় যে দিক থেকে এসেছি সেদিকেই ফিরে যাব। হুর বলে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নির্দেশ এই যে, আমি আপনার সাথে থাকব এবং আপনাকে পাহারা দিয়ে তার সামনে নিয়ে হাযির করব। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, এই অপমান আমি কখনো সহ্য করতে পারব না। এর চেয়ে বরং ইয়াযীদের সামনে গিয়ে বন্দী অবস্থায় হাযির হব। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে যাবার সংকল্প নেন। কিন্তু হুর ইব্ন যিয়াদের ভয়ে তাঁকে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবং নিজ বাহিনীর সাহায্যে তাঁর রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ায়। ইমাম হুসাইন (রা) সেখান থেকে উত্তর দিকে রওয়ানা হন এবং কাদিসিয়ার নিকটে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আমর ইব্ন সা'দ সেখানে একটি বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছে। হুর তার পিছনে পিছনেই আসছিল। এবার ইমাম হুসাইন সেখান থেকে ফিরে দশ মাইল চলার পর কারবালা নামক স্থানে উপনীত হন। আমর ইব্ন সা'দ ইমাম হুসাইনের আগমন সংবাদ পেয়ে নিজ বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পরদিন কারবালায় এসে পৌঁছেন। ইমাম হুসাইনের একেবারে নিকটবর্তী হওয়ার পর আমর ইব্ন সা'দ নিজ বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে একাকী এগিয়ে আসেন এবং ইমাম হুসাইনকে তার দিকে এগিয়ে যাবার অনুরোধ জানান। ইমাম হুসাইন এগিয়ে গেলে তিনি তাঁকে সালাম জানিয়ে বলেন ঃ

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনি ইয়াযীদের চাইতে খিলাফতের অধিক যোগ্য। কিন্তু আপনাদের বংশে হুকুমত ও খিলাফত আসবে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা নয়। হযরত আলী ও হযরত হাসানের অবস্থা তো আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। যদি আপনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন তাহলে অতি সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। অন্যথায় আপনার প্রাণের আশংকা রয়েছে। মনে রাখবেন, আমরা আপনাকে বন্দী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"

ইমাম হুসাইন (রা) উত্তরে বলেন, "আমি এখন তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করব। তোমরা এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি আমার জন্য মনজুর কর।"

১. "আমি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকেই আমাকে ফিরে যেতে দাও। তাহলে আমি মক্কায় গিয়ে আল্লাহ্র বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করব।

২. আমাকে কোন একটি সীমান্তের দিকে বেরিয়ে যেতে দাও। তাহলে আমি সেখানে পৌঁছে কাফিরদের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাতবরণ করব।

৩. তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দাও এবং আমাকে সোজা ইয়াযীদের কাছে দামিশ্কে যেতে দাও। অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তোমরাও আমার পিছনে পিছনে আসতে পার। আমি ইয়াযীদের কাছে গিয়ে সোজাসুজি তার সাথেই আমার এ ব্যাপারটির একটা ফায়সালা করে নেব, যেমন আমার বড় ভাই হাসান (রা) আমীরে মুআবিয়ার সাথে করেছিলেন।"

আমর ইব্ন সা'দ একথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, আমি নিজে থেকে এ ব্যাপারে আপনাকে কোন চূড়ান্ত কথা দিতে পারব না। তবে এখনি উবায়দুল্লাহকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। আমার বিশ্বাস তিনি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলোর যে কোন একটি আপনার জন্য মনজুর করবেন। আমরও ঐ প্রান্তরে তাঁবু ফেলেন এবং ইব্ন যিয়াদকে এখানকার যাবতীয় অবস্থা লিখে জানান।

৬১ হিজরী ২রা মুহাররম (৬৮০ খ্রি ২রা অক্টোবর) আমর ইব্‌ন সা'দ ইমাম হুসাইন (রা)-এর কারবালায় পৌঁছার পূর্বের দিন সেখানে পৌঁছেছিলেন। আমর লিখেন যে, ইমাম হুসাইন (রা) যে কথা বলেছেন তাতে ফিতনা-ফাসাদের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তিনি ইয়াযীদের নিকট পৌঁছে তার হাতে বায়আত করবেন এবং এতে বিপদের আশংকা থাকবে না।

ইব্‌ন যিয়াদ যখন উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন তখন শিমার যিল-জাওশান নামক জনৈক ব্যক্তি তার কাছে বসা ছিল। সে যিয়াদকে বলল, হে আমীর! তোমার জন্য ইমাম হুসাইনকে নিঃসংকোচে হত্যা করার এটা এক সুবর্ণ সুযোগ। কেননা এতে তোমার উপর কোন অভিযোগ আসবে না। আর যদি ইমাম হুসাইন ইয়াযীদের কাছে একবার চলে যেতে পারেন তাহলে তার মুকাবিলায় ইয়াযীদের কাছে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না। কেননা ইয়াযীদের দরবারে ইমাম হুসাইন অতি সহজেই তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করবেন। একথা শুনে ইব্‌ন যিয়াদ আমর ইব্‌ন সা'দকে লিখেন ঃ

"তিনটি প্রস্তাবের কোনটিই মনজুর করা যায় না। তবে হ্যাঁ, একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। আর তা হলো, ইমাম হুসাইন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন এবং প্রথমে আমার হাতেই ইয়াযীদের জন্য বায়আত করবেন। এরপর আমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাঁকে ইয়াযীদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

এই উত্তর আসার পর আমর ইব্‌ন সা'দ ইমাম হুসাইনকে বললেন, আমি নিরুপায়। ইব্‌ন যিয়াদ প্রথমে তার হাতে ইয়াযীদের জন্য বায়আত নিতে চান। অন্য কোন কথাই তিনি শুনতে রাযী নন। ইমাম হুসাইন বলেন, ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়আত করার চাইতে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

ইব্‌ন সা'দ এই চেষ্টাই করছিলেন যাতে কোনরূপ রক্তপাত ঘটনা না ঘটে। তিনি চাচ্ছিলেন, হয় ইমাম হুসাইন (রা) ইব্‌ন যিযাদের শর্ত মেনে নিন, নয়ত ইব্‌ন যিয়াদ হুসাইনের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে চলে যাবার অনুমতি দিন।

এই চিঠি বিনিময় এবং প্রত্যাখ্যান ও চাপ সৃষ্টির মধ্যে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন ও ইব্‌ন সা'দ উভয়েই নিজ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে কারবালা প্রান্তরে অবস্থান করেন। ঠিক তখনি ইব্‌ন যিয়াদের কাছে কোন না কোন ভাবে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, ইমাম হুসাইন (রা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এতে সে অত্যন্ত চিন্তিত হয় এই ভেবে যে, সম্ভবত ইব্‌ন সা'দও তাঁর সাথে কোন ষড়যন্ত্র করে বসেছে। সে অবিলম্বে জুওয়ায়রা ইব্‌ন তামীমী নামক একজন লাঠিয়ালকে ডেকে তার মাধ্যমে ইব্‌ন সা'দের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। তাতে সে লিখে ঃ

"হুসাইন ইব্‌ন আলীকে বন্দী করার জন্য আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমার কর্তব্য ছিল তাঁকে বন্দী করে আমার সামনে হাযির করা। আর তা সম্ভব না হলে সোজা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আসা। আমি তো তোমাকে এই নির্দেশ দেইনি যে, তুমি তাঁর সংস্পর্শে থেকে তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট করবে। এখন এটাই তোমার কর্তব্য যে, এই পত্র পাঠ মাত্র হয় তুমি হুসাইন ইব্‌ন আলীকে আমার কাছে নিয়ে আসবে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করবে এবং তাঁর দেহ থেকে মাথা পৃথক করে তা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। যদি তুমি এতে সামান্যমাত্র ইতস্তত কর তাহলে আমি আমার সিপাহীকে, যে এই পত্র নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছে, এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, সে তোমাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে এবং তোমার সঙ্গের বাহিনী ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষমাণ থাকবে যতক্ষণ না আমি অন্য কাউকে তোমার জায়গায় নিয়োগ করে পাঠাই।"

জুওয়ায়রা এই পত্র নিয়ে হিজরী ৬১ সনের ৯ই মুহাররম (৬৮০খ্রি -এর ১০ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার ইব্‌ন সা'দের কাছে পৌঁছে। তিনি তখন আপন তাঁবুতে বসাছিলেন। এই পত্র পাঠমাত্র তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে নিজ বাহিনীকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি জুওয়ায়রা ইব্‌ন বদর তামীমীকে বলেন, তুমি সাক্ষী থাক, আমি আমীরের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তা কার্যকরী করেছি। এরপর তিনি সৈন্যদের সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে জুওয়ায়রাকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হন এবং ইমাম হুসাইনকে ডেকে বলেন, ইব্‌ন যিয়াদের একটি নির্দেশ এসেছে। আমি যদি তা কার্যকরী করতে সামান্য বিলম্ব করি তাহলে এই দূতকে, যিনি আমার সাথে রয়েছেন, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে ফেলতে। ইমাম হুসাইন বলেন, আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত আরো কিছুটা চিন্তা করতে দাও। ইব্‌ন সা'দ তখন জুওয়ায়রার দিকে তাকালেন। সে বলে, আগামীকাল দূরে নয়, এই সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত। ইব্‌ন সা'দ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন, হাতিয়ার রেখে দাও। আজ কোন যুদ্ধ হবে না।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ জুওয়ায়রার হাতে এই নির্দেশ পাঠানোর পর চিন্তা করল, যদি ইব্‌ন সা'দ আমার এই নির্দেশের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে এবং জুওয়ায়রা তাকে বন্দী করে ফেলে তাহলে সেনাবাহিনী নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এমন কি তারা ইমাম হুসাইনের দলেও ভিড়ে যেতে পারে। তখন আমাকে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং এই সুযোগে ইমাম হুসাইনও মক্কায় পালিয়ে যাবেন। আর এভাবে হাতের মুঠোয় পেয়েও যদি তাকে জব্দ করতে না পারি তাহলে তো এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় হবে। অতএব শিমার যিল জাওশানকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে বলে, আমি জুওয়ায়রাকে পাঠিয়েছি এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, যদি ইব্‌ন সা'দ যুদ্ধ করতে ইতস্তত করে তাহলে তাকে যেন বন্দী করে নিয়ে আসে। ইব্‌ন সা'দের দিক থেকে আমি কপটতার আশংকা করছি। যদি জুওয়ায়রা ইব্‌ন সা'দকে বন্দী করে থাকে তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সেনাবাহিনী পড়ে রয়েছে তারা ছিন্নভিন্ন এবং বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমি এ কাজের জন্য তোমার চাইতে যোগ্য কাউকে দেখছি না। তুমি অবিলম্বে কারবালা প্রান্তরের দিকে যাও। যদি ইব্‌ন সা'দ ইতিমধ্যে বন্দী হয়ে থাকে তাহলে তুমি সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ কর এবং ইমাম হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আস। আর যদি সে বন্দী না হয়ে থাকে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকে তাহলে তুমি সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ বাঁধিয়ে দাও এবং কাজটি অতি তাড়াতাড়ি শেষ কর। তখন শিমার যিল-জাওশান বলল, আমার একটি শর্ত আছে। আর তা এই যে, আপনি তো জানেনই, আমার বোন উম্মুল বানীন বিন্‌ত হারাম হযরত আলীর স্ত্রী ছিল এবং তার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্,

জাফর, উসমান, আব্বাস–এই চারটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। আমার এই চারটি ভাগ্নেও তাদের ভাই হুসাইনের সাথে কারবালায় রয়েছে। আপনি এই চারজনের প্রাণের নিরাপত্তা দিন। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ তখনি কাগজ চেয়ে নিয়ে ঐ চারজনের জন্য একটি আমলনামা (নিরাপত্তা পত্র) লিখে তার উপর নিজের মোহর লাগিয়ে তা শিমার যিল-জাওশানের হাতে অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে কারবালা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন।

জুওয়ায়রা রাতের বেলা রওয়ানা হয়ে বৃহস্পতিবার দিন ভোরে কারবালায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। শিমার সকাল বেলা রওয়ানা হয়ে আসরের সময় গিয়ে পৌঁছল। ইব্‌ন সা'দ শিমারকে সেখানকার যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন। কিন্তু সে বলে, আমি মুহূর্তের জন্যও ইমাম হুসাইনকে অবকাশ দেব না। তুমি হয় এখনি যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও, নতুবা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত কর। ইব্‌ন সা'দ তখনি ঘোড়ায় আরোহণ করে শিমারকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম হুসাইনের কাছে আসেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ এই দ্বিতীয় দূত পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে মোটেই অবকাশ দিতে চান না। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, সুবাহানাল্লাহ্। এখন আর অবকাশ দেওয়া না দেওয়ার কী প্রয়োজন ? এখন তো সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই রাতের বেলায়ও কি তোমরা যুদ্ধ মুলতবি রাখবে না ? একথা শুনে শিমার যিল-জাওশান পরদিন ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাযী হলো। ফলে উভয় বাহিনী রাতের মত নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।

পানি বন্ধ

রাতের বেলা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের একটি নির্দেশ এসে পৌঁছল যে, "যদি এখনো যুদ্ধ শুরু না হয়ে থাকে তাহলে এই নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে পানির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর এবং হুসাইন ইব্‌ন আলী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য পানি বন্ধ করে দাও। যদি সৈন্যরা শিমারের অধিনায়কত্বে এসে গিয়ে থাকে তাহলে শিমারকে এখনি এই নির্দেশ পালন করতে হবে।"

এই নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে আমর ইব্‌ন সা'দ আমর ইব্‌নুল হাজ্জাজের নেতৃত্বে পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্য ফুরাত উপকূলে মোতায়েন করেন। ঘটনাচক্রে ঐ দিন দিনের বেলা ইমাম হুসাইনের সঙ্গীরা নদী থেকে পানি তুলেন নি। তাই তাদের সব কয়টি পাত্রই খালি ছিল। রাতের বেলা তারা পানি ভরতে গেলে জানতে পারলেন যে, শত্রুরা পানির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইমাম হুসাইন (রা) আপন ভাই আব্বাস ইব্‌ন আলীকে পঞ্চাশজন লোকসহ ফুরাতের দিকে এই বলে পাঠান যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও পানি নিয়ে আস। কিন্তু ঐ জালিমরা পানি আনতে দিল না। এবার ক্রমে ক্রমে ইমাম হুসাইনের সঙ্গীরা পিপাসায় কাতর হয়ে উঠলেন। এই কষ্ট ছিল তীর ও তরবারির আঘাতের চাইতেও মারাত্মক। ইমাম হুসাইনের কনিষ্ঠপুত্র আলী অসুস্থ অবস্থায় তাঁবুতে শুয়েছিল! সে এবং তার বোন উম্মে কুলসুম এই ভেবে ক্রন্দন করতে লাগল যে, ভোর বেলা শত্রুরা হামলা চালাবে এবং আমাদের সমগ্র আত্মীয়-স্বজন, যারা এখানে রয়েছেন, তাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলবে। এই দু'জনের কান্নার শব্দ শুনে হুসাইন (রা) তাঁবুর ভিতরে আসেন। তিনি বললেন, শত্রুরা আমাদের কাছেই

অবস্থান করছে। তোমাদের কান্নার শব্দ শুনে একদিকে তারা খুশি হবে এবং অন্যদিকে তোমাদের সঙ্গীরা হতাশ হয়ে পড়বে। অতএব তোমাদের হাহুতাশ করা মোটেই উচিত নয়। এভাবে অনেক কষ্টে তিনি তাদের কান্না থামালেন। এরপর বাইরে এসে বলেন, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এসে আমি মস্ত বড় ভুল করেছি। ওদের সঙ্গে নিয়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি। এর পর তিনি তাঁর সকল সঙ্গীকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, তোমরা এখান থেকে যেদিকে ইচ্ছা চলে যাও। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কেননা একমাত্র আমিই শত্রুদের লক্ষ্য বস্তু। তোমরা চলে গেলে বরং ওরা খুশিই হবে। আমি তোমাদের সবাইকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা কর। সঙ্গীরা একথা শুনে বলল, আমরা কখনো আপনাকে ছেড়ে যাব না, বরং যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ আছে আপনার খাতিরে যে কোন কষ্ট সহ্য করে যাব। কিছুক্ষণ পর, ঐ রাতেই তারমাহ ইব্‌ন আদী নামীয় জনৈক ব্যক্তি, যে কোন না কোন কাজে এদিকে এসেছিল, হযরত ইমাম হুসাইন ও ইব্‌ন সা'দের বাহিনীর অবস্থা জানতে পেরে ইমাম হুসাইনের সাথে সাক্ষাত করল। সে আদ্যোপান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলল, আপনি একাকী আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে এমন এক গোপন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব যে, প্রতিপক্ষ তা ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। আমি আপনাকে আমার গোত্র 'বনী তাই'-এর কাছে নিয়ে যাব এবং আমারই গোত্র থেকে পাঁচ হাজার লোক আপনার খিদমতে পেশ করব। আপনি তাদেরকে দিয়ে যে কাজ ইচ্ছা, করিয়ে নিতে পারবেন। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, আমি এইমাত্র ওদের সবাইকে বলেছিলাম যে, আমাকে একাকী ছেড়ে তোমরা সবাই চলে যাও। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হয়নি। অতএব এখন এটা কি করে সম্ভব যে, আমি তাদের সবাইকে ছেড়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাব ? তখন তাঁর সঙ্গীরা বলল, আমাদেরকে তো ওরা কিছুই করবে না, যেমন আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন। ওরা শুধু আপনারই শত্রু। অতএব আপনি আপনার প্রাণের নিরাপত্তার জন্য বেরিয়ে যান। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এভাবে বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়া কখনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদ দিয়ে তিনি তারমাহকে বিদায় দেন। ভোর হলে শিমার যিল-জাওশান এবং আমর ইব্‌ন সা'দ তাদের বাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাযির হলো। ইমাম হুসাইনও তাঁর সঙ্গীদেরকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মোতায়েন করলেন। শিমার যিল-জাওশান হযরত আলী (রা)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ্, জা'ফর, উসমান ও আব্বাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে এনে বলল, তোমাদেরকে ইব্‌ন যিয়াদ নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। তারা উত্তর দিল, ইব্‌ন যিয়াদের নিরাপত্তার চাইতে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই শ্রেয়। একথা শুনে শিমার অত্যন্ত বিস্মিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, হিজরী ৬১ সনের ১০ই মুহাররম (৬৮০খ্রি-এর ১১ই অক্টোবর) ভোর বেলা যখন লড়াই শুরু হয় তখন ইমাম হুসাইনের সাথে বাহাত্তর জন লোক ছিল। কারো কারো মতে, তাদের সংখ্যা ছিল একশ চল্লিশ, আবার কারো কারো মতে দুশ চল্লিশ। মোটকথা যদি সর্বাধিক সংখ্যা দুশ চল্লিশ বলেও স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলেও শত্রুপক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধার মুকাবিলায় ইমাম হুসাইনের সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল নেহাতই কম। ইমাম হুসাইন তাঁর সঙ্গীদেরকে যথাযোগ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে

তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। এরপর উটে আরোহণ করে একাই কূফী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাদের উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, হে কূফাবাসী! আমি জানি যে, এই বক্তৃতা এখন আমার জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না এবং তোমরা যা কিছু করবার তা করবেই, তা থেকে কখনো বিরত হবে না। তবু আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার 'হুজ্জত' (যুক্তি) তোমাদের উপর পূর্ণ হয় এবং আমার ওযরও প্রকাশ পায়। তিনি এতটুকুই বলেছেন– এমন সময় তাঁর তাঁবুর দিক থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের কান্নার রোল ভেসে এল। এই আওয়াজ শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং বক্তৃতা বন্ধ করে বলে উঠেন–

لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ–

(সমুন্নত ও মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের মালিক)

এরপর তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে ঠিকই বলেছিলেন, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না। তাঁর পরামর্শ না শুনে আমি মস্তবড় ভুল করেছি। এরপর তিনি ফিরে গিয়ে আপন ভাই ও ছেলেদের বলেন, এই স্ত্রীলোকদের কাঁদতে নিষেধ কর এবং বল, এখন নীরব থাক, আগামীকাল মন ভরে কাঁদবে। তারা স্ত্রীলোকদের বুঝাল। ফলে কান্নার রোল থেমে গেল। হযরত হুসাইন (রা) এরপর কূফীদের দিকে মুখ করে পুনরায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন ঃ

"লোক সকল! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আমাকে জানে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে আমাকে জানে না, যেন ভালভাবে একথা জেনে রাখে যে, আমি হচ্ছি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাতি এবং হযরত আলী (রা)-এর পুত্র, হযরত ফাতিমা (রা) হচ্ছেন আমার মা এবং জা'ফর তাইয়ার (রা) হচ্ছেন আমার চাচা। এই বংশগত গর্ব ছাড়াও আমার আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এবং আমার ভাই হাসান (রা)-কে জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে এখনো অনেক সাহাবী জীবিত আছেন। তোমরা তাঁদের কাছে আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পার। আমি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, কখনো সালাত কাযা করিনি, কোন মু'মিনকে হত্যা করিনি এবং কষ্টও দেইনি। যদি ঈসা (আ)-এর গাধাও জীবিত থাকত তাহলে সমগ্র ঈসায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সেই গাধার প্রতিপালন ও আদর-আপ্যায়নে নিমগ্ন থাকত। তোমরা কি ধরনের মুসলমান এবং কি ধরনের উম্মত যে, নিজেদের রাসূলের নাতিকে হত্যা করতে চাচ্ছ। তোমাদের না আছে আল্লাহ্র প্রতি ভয়, আর না রাসূলের প্রতি লজ্জা-শরম। আমি যখন সারা জীবনেও কোন লোককে হত্যা করিনি তখন তো এটা পরিষ্কার যে, আমার উপর কারো কোন কিসাস নেই। তাহলে বল, তোমরা কিভাবে আমার রক্তপাত বৈধ বলে ধরে নিয়েছ ? আমি দুনিয়ার সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ থেকে পৃথক হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পদদ্বয়ের নিচে পড়েছিলাম। তোমরা সেখানেও আমাকে থাকতে দাওনি। এরপর পবিত্র মক্কায় আল্লাহ্র ঘরে ইবাদতে মগ্ন ছিলাম; তোমরা কূফীরা আমাকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দাওনি। তোমরা আমার কাছে অনবরত পত্রাদি পাঠিয়েছ এবং আমাকে বলেছ, তোমাকে আমরা ইমামতের (নেতৃত্ব) হকদার মনে করি এবং তোমার হাতেই খিলাফতের বায়আত

করতে চাই।' তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যখন আমি এখানে এলাম তখন তোমরা আমা থেকে ফিরে গেলে। এখনও যদি তোমরা আমাকে সাহায্য না কর তাহলে তোমাদের কাছে আমি স্রেফ এতটুকু চাই যে, আমাকে তোমরা হত্যা করো না বরং স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে আমি মক্কা অথবা মদীনায় গিয়ে নিজেকে ইবাদতে নিমগ্ন রাখতে পারি। বাদবাকি আল্লাহ্ তা'আলা ফায়সালা করবেন, কে এই দুনিয়ায় ন্যায় ও সত্যের উপর ছিল, আর কে জালিম ছিল।"

এই বক্তৃতা শুনে সবাই নীরব নিশ্চুপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। অল্প কিছুক্ষণ পর হযরত ইমাম হুসাইন পুনরায় বলেন, "আল্লাহ্র শোকর যে, আমি তোমাদের উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ করেছি (যুক্তি প্রদর্শন করেছি) এবং তোমরা এ ব্যাপারে কোন ওযর পেশ করতে পারনি এবং কখনো পারবে না।"

তারপর তিনি বেশ কয়েক ব্যক্তিকে একের পর এক নাম ধরে ডাকেন, হে শিব্ত ইব্ন রিবয়ী! হে হাজ্জাজ ইব্নুল হাসান! হে কায়স ইব্ন আশআছ! হে হুর ইব্ন ইয়াযীদ তামীমী! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি আমার কাছে পত্র লেখনি? তোমরা কি আমাকে এখানে জোর করে ডেকে নিয়ে আসনি ? আর যখন আমি এসেছি তখন তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ।

এ কথা শুনে সবাই বলল, আমরা আপনাকে কোন পত্র লিখিনি এবং কূফায় আসার আহ্বানও জানাই নি। তখন হযরত ইমাম হুসাইন চিঠিগুলো বের করে পৃথক পৃথকভাবে পড়ে শুনিয়ে বললেন, এগুলো কি তোমাদের চিঠি নয় ? তারা এবার বলল, আমরা আপনার কাছে পত্র পাঠাই আর নাই পাঠাই, এখন আমরা প্রকাশ্যে আপনার প্রতি আমাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করছি। একথা শুনে ইমাম হুসাইন (রা) উটের উপর থেকে নামলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। বিপক্ষ দল থেকে এক ব্যক্তি তাঁর মুকাবিলার জন্য বেরিয়ে এল, কিন্তু তার ঘোড়া এমনভাবে কুঁচকাতে শুরু করল যে, সে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাল। এই অবস্থা দেখে হুর ইব্ন ইয়াযীদ তামীমী সামনে ঢাল ধরে ঘোড়া দৌড়িয়ে একেবারে হামলার ভঙ্গিতে ইমাম হুসাইনের দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু তাঁর কাছে এসেই ঢাল ফেলে দিল। ইমাম হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য এসেছ ? সে বলল, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে সব দিক থেকে ঘেরাও করে এই প্রান্তরে আটকে রেখেছে এবং এখান থেকে ফিরে যেতে দেয়নি। আমি আমার এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে এখন আপনার পক্ষ নিয়ে কূফীদের মুকাবিলা করব। আপনি দু'আ করবেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাফ করে দেন। ইমাম হুসাইন (রা) তার জন্য দু'আ করেন এবং এতে সে খুবই আনন্দিত হয়।

শিমার যিল-জাওশান এবার আমর ইব্ন সা'দকে বলল, এখন আর দেরি করছেন কেন? আমর ইব্ন সা'দ সঙ্গে সঙ্গে তার ধনুকে তীর জুড়ে হাসানের বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করল এবং বলল, তোমরা সাক্ষী থাক, সর্বপ্রথম তীর আমিই নিক্ষেপ করেছি। এরপর কূফীদের বাহিনী থেকে দু'ব্যক্তি বেরিয়ে এল। ইমাম হুসাইনের পক্ষ থেকে একজন বীরযোদ্ধা ওদের মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন এবং উভয়কেই হত্যা করলেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লড়াই অব্যাহত থাকল এবং এতে কূফীদেরই অধিক সংখ্যক লোক মারা গেল। এরপর ইমাম হুসাইনের পক্ষ থেকে এক একজন করে এগিয়ে গিয়ে কূফীদের সারিসমূহের উপর হামলা চালাতে লাগল। এতে অনেক কূফী মারা গেল। ইমাম হুসাইনের সঙ্গীরা তখন পর্যন্ত আবূ তালিবের বংশের লোকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে দেয়নি, যতক্ষণ না তারা এক এক করে সকলেই শাহাদাতবরণ করেন। অবশেষে সর্বপ্রথম মুসলিম ইব্‌ন আকীলের পুত্ররা এগিয়ে যায়। তাঁরা অনেক শত্রুকে হত্যা করেন। এরপর নিজেরাও শহীদ হন। তাঁদের শহীদ হওয়ার পর ইমাম হুসাইনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তিনি কাঁদতে থাকেন। এরপর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ, জা'ফর ও উসমান শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং অনেক শত্রুকে হত্যা করে নিজেরাও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইনের এক কিশোর পুত্র মুহাম্মদ কাসিম শত্রুদের উপর হামলা চালান এবং শেষ পর্যন্ত তিনিও শহীদ হন। মোটকথা, ইমাম হুসাইনকে, নিজের শাহাদাত এবং অন্যান্য যাবতীয় বিপদ থেকেও মর্মান্তিক যে দৃশ্যটি কারবালা প্রান্তরে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল তা হলো এই যে, তিনি তাঁর চোখের সামনেই আপন ভাই ও ছেলেদেরকে একের পর এক শহীদ হতে দেখেছেন এবং দেখেছেন আপন বোন ও মেয়েদেরকে সেজন্য হাহুতাশ করতে। ইমাম হুসাইনের সঙ্গী এবং তাঁর বংশের লোকেরা এক দিকে যেমন বীরত্বের অপরূপ নমুনা পেশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি স্থাপন করেছেন বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাঁর দলের কোন লোকই যেমন ভীরুতা, কাপুরুষতা বা কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করেনি, তেমনি স্বার্থপরতা ও অবিশ্বস্ততার অভিযোগেও নিজেকে অভিযুক্ত করেনি। ইমাম হুসাইন (রা) শেষ পর্যন্ত একা থেকে যান। তাঁবুতে রুগ্ন শিশুপুত্র আলী ওরফে যয়নুল আবিদীন ছাড়া বাকি সবাই ছিল নারী। অত্যাচারী উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ইতিমধ্যে এই নির্দেশও পাঠিয়েছিল যে, হুসাইনের মস্তক কেটে যেন দেহ থেকে আলাদা করা হয় এবং দেহকে ঘোড়া দ্বারা এমনভাবে পিষ্ট করা হয় যে, তাঁর সব কয়টি অংগই যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতবরণ

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর যে অপূর্ব বীরত্ব ও পৌরুষের সাথে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষ করার মত তাঁর সঙ্গীদের কেউই জীবিত ছিলেন না। কিন্তু আমর ইব্‌ন সা'দ ও শিমার যিল-জাওশান তখন আপোসে বলাবলি করছিল, আমরা আজ পর্যন্ত এমন একজন বীর বাহাদুর দেখিনি। এই বিষাদময় ও মর্মান্তিক ঘটনার সার সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইমাম হুসাইনের দেহের উপর পঁয়তাল্লিশটি তীরের জখম ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে যান। অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী, তাঁর দেহে তেত্রিশটি বর্শার এবং তেতাল্লিশটি তরবারির জখম ছিল। আর তীরের জখম ছিল এগুলোর অতিরিক্ত। প্রথমে তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে হামলা চালাতে থাকেন। কিন্তু শত্রুর আঘাতে তাঁর ঘোড়া মারা গেলে তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। শত্রুদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই চাচ্ছিল না যে, ইমাম হুসাইন তার হাতে নিহত হোন বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর মুকাবিলা থেকে কিছুটা দূরে থাকার চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত শিমার যিল-জাওশান ছয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়। ওদের মধ্যে একজন এমনভাবে তরবারি দ্বারা

আঘাত করে যে, ইমাম হুসাইন (রা)-এর বাম হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম হুসাইন (রা) তাকে পাল্টা আঘাত করতে চান কিন্তু তাঁর ডান হাতও এমনভাবে আহত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি তরবারি উঠাতেই পারছিলেন না। পিছন থেকে সানান ইব্‌ন আনাস নাখ্‌ঈ তাঁকে লক্ষ্য করে এমন ভাবে বর্শা নিক্ষেপ করল যে, তা তাঁর পেট ভেদ করে চলে গেল। এবার তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সানান তখন বর্শা টেনে বের করল এবং সেই সাথে বের হয়ে গেল ইমাম হুসাইনের রূহও। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)।

এরপর শিমার কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ ইমাম হুসাইনের দেহ থেকে তাঁর মস্তকটি পৃথক করে ফেলে। এরপর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশ পালনার্থে বারজন অশ্বারোহীকে মোতায়েন করা হয়। তারা তাদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে ইমামের দেহকে মর্মান্তিকভাবে দলিত-মথিত করে। এরপর তাঁর পরিবার-পরিজনকে বন্দী করা হয়। তাঁদের মধ্যে শিশু যয়নুল আবিদীন ছাড়া আর কোন পুরুষ সদস্য ছিল না। শিমার যিল-জাওশান তাকেও হত্যা করার সংকল্প নেয়। কিন্তু আমর ইব্‌ন সা'দ তাকে বিরত রাখে। এরপর ইমাম হুসাইনের মস্তক এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ইব্‌ন যিয়াদের কাছে পাঠানো হয়। এই উপলক্ষে ইব্‌ন যিয়াদ একটি দরবার আহ্বান করে। ইমামের মস্তক একটি পেয়ালার মধ্যে রেখে-যিয়াদের সামনে পেশ করা হয়। ইব্‌ন যিয়াদ তা দেখে কিছু অশিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে। এরপর তৃতীয় দিন শিমার যিল-জাওশানের সাথে একদল সৈন্য দিয়ে ইমামের মস্তক এবং তাঁর বন্দী পরিবারবর্গকে দামিশকে ইয়াযীদের কাছে পাঠানো হয়। আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) অর্থাৎ ইমাম যয়নুল আবিদীন এবং হুসাইন পরিবারের মহিলাগণ ইয়াযীদের সামনে হাযির হলে সে তাদেরকে এবং সেই সাথে ইমাম হুসাইনের কর্তিত মস্তকটি দেখে কেঁদে ওঠে এবং ইব্‌ন যিয়াদকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে, এই সুমাইয়ার বাচ্চাকে আমি কখন নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, হুসাইন ইব্‌ন আলীকে হত্যা কর। এরপর তিনি শিমার যিল-জাওশান এবং ইরাকীদেরকে সম্বোধন করে বলে, আমি তোমাদের আনুগত্যে এমনিতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। তোমরা হুসাইনকে হত্যা করতে গেলে কেন? শিমার যিল-জাওশান এবং তার সঙ্গীরা আশা করেছিল যে, ইয়াযীদ তাদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবে। কিন্তু ইয়াযীদ কাউকেও কোন পুরস্কার বা উপঢৌকন দেয়নি, বরং উষ্মা প্রকাশ করে তাদের সবাইকে ফেরত যেতে বলে। এরপর তার সভাসদবৃন্দকে সম্বোধন করে বলে, "ইমাম হুসাইনের মা আমার মায়ের চাইতে উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাঁর নানা মুহাম্মদ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং মানবজাতির নেতা। কিন্তু তাঁর পিতা আলী ও আমার পিতা মুআবিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। এভাবে আমার ও হুসাইনের মধ্যেও ঝগড়া হয়েছে। আলী এবং হুসাইন উভয়েই বলতেন, যার বাপ-দাদা শ্রেষ্ঠ সেই খলীফা হবে। কিন্তু কুরআন শরীফের ঐ আয়াতের দিকে তাঁরা লক্ষ্য করেননি, যাতে বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর; আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ ঃ ২৬)

শেষ পর্যন্ত সবাই জানতে পেরেছে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরই পক্ষে ফায়সালা করেছেন।

এরপর সে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়ে সম্মানিত মেহমান হিসাবে নিজ প্রাসাদেই রাখে। মহিলারা অন্দর মহলের মহিলাদের কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, ইয়াযীদের প্রাসাদেও কান্নার রোল উঠেছে এবং স্ত্রীলোক মাত্রই কাঁদছে, যেমন ইমাম হুসাইনের বোন আপন ভাই এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য কাঁদছিলেন। কয়েকদিন রাজকীয় মেহমান হিসাবে কাটিয়ে এই ভাগ্যাহত কাফেলাটি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। ইয়াযীদ তাঁদের সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করে এবং আলী ইব্নুল হুসাইনকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের আশাভঙ্গ

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের আশা ছিল যে, ইমাম হুসাইনকে হত্যার পর তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু কারবালার ঘটনার পর ইয়াযীদ, মুসলিম ইব্ন যিয়াদকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। সেই সাথে ইরাকের কয়েকটি প্রদেশও, যা বসরার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তার অধীনে ন্যস্ত করে। ইয়াযীদ মুসলিমকে কূফা হয়ে যেতে বলে এবং তার হাতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নামে একটি পত্র দেয়। তাতে উবায়দুল্লাহকে লিখেছিলেন, তোমার কাছে ইরাকের যে সেনাবাহিনী আছে তা থেকে মুসলিমকে ছয় হাজার সৈন্য দিয়ে দেবে। সে যাদেরকে পছন্দ করবে তাদেরকেই তার হাতে ন্যস্ত করবে। একথায় উবায়দুল্লাহ্ খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং হুসাইন হত্যার উপর আপেক্ষ করে বলতে থাকে, যদি তিনি (হুসাইন) জীবিত থাকতেন তাহলে ইয়াযীদও আমার উপর নির্ভরশীল থাকত এবং আমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করতো। কিন্তু তিনি (হুসাইন) নিহত হওয়ায় ইয়াযীদ এমনভাবে চিন্তামুক্ত হয়ে গেছে যে, আমার কাছ থেকে শাসনক্ষমতা ও সেনাবাহিনী উভয়ই কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম কূফার সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে কারা আমার সাথে খুরাসান যেতে চাও, তখন প্রত্যেকেই তার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাতের বেলা উবায়দুল্লাহ্র বাহিনীর অধিনায়কদের কাছে তার নিজস্ব একজন লোক পাঠায় এবং তারই মাধ্যমে ওদেরক বলে, আক্ষেপের বিষয় যে, তোমরা মুসলিমকে আমার উপর প্রাধান্য দিচ্ছ। অধিনায়করা তখন উত্তর দেয়, আপনার সাথে থেকে তো আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্র পরিবারের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু মুসলিমের সাথে গেলে আমরা তুর্কী ও মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পাব। পরদিন মুসলিম কূফার সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করা ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। কারবালার ঘটনার পর উবায়দুল্লাহ্র ভাগ্যে লজ্জা ও অপমান ছাড়া কিছুই জোটেনি।

মক্কা-মদীনার ঘটনাবলী

ইয়াযীদ যখন আমর ইব্ন সা'দকে মদীনা থেকে কূফার দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কাছে যাবার নির্দেশ দেন তখন আমরের স্থলে ওয়ালীদ ইব্ন উতবাকে মদীনার শাসনকর্তা

নিয়োগ করেন। এই ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা তার কার্যভার গ্রহণ করার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের অনুরোধক্রমে এই মর্মে একটি দলীল লিখে দিয়েছিলেন যে, যদি ইমাম হুসাইন মদীনায় চলে আসেন, তাহলে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর নিজের একটি পত্রের সাথে এই দলীলটিও আপন পুত্র আওন ও মুহাম্মদের মাধ্যমে ইমাম হুসাইনের কাছে ঠিক তখনি পাঠিয়েছিলেন যখন তিনি কূফার দিকে যাচ্ছিলেন। মক্কা থেকে ইয়াযীদের শাসন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র। ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের খবর মক্কায় এসে পৌঁছলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র জনসাধারণকে একত্র করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"লোক সকল! ইরাকীদের চাইতে খারাপ মানুষ বিশ্বের কোথাও নেই। তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে কূফার লোকেরা। তারা পর পর চিঠি লিখে ইমাম হুসাইনকে কূফায় যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং তার খিলাফতের বায়আত করেছে। কিন্তু ইব্‌ন যিয়াদ কূফায় পৌঁছলে তারা তারই চারপাশে ভিড় জমায় এবং ইমাম হুসাইনকে হত্যা করায়— যিনি ছিলেন নামাযী, রোযাদার, কুরআনের অনুসারী এবং সব দিক দিয়ে খিলাফতের যোগ্য। আর হত্যা করতে গিয়ে আল্লাহকে বিন্দুমাত্রও ভয় করেনি।

এই বলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র কেঁদে ফেলেন। লোকেরা বলল, এখন আপনার চাইতে খলীফা পদের অধিকযোগ্য তো আর কেউ নেই। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনারই হাতে বায়আত করব এবং আপনাকে যুগের খলীফা হিসাবে মানব। যা হোক, সমগ্র মক্কাবাসী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করে। এই বায়আতের খবর ইয়াযীদের কাছে গিয়ে পৌঁছলে দু'জন বাহক মারফত একটি রৌপ্য-নির্মিত শিকল ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবার কাছে মদীনায় পাঠায় এবং তাকে লিখে ঃ 'তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে মক্কা থেকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর গলায় এই শিকল ঝুলিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' কিন্তু পরে সে নিজের এই কাজের জন্য নিজেই আক্ষেপ করে। কেননা সে জানত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এত সহজ লোক নন যে, এমনিতেই এই শিকল নিজের গলায় পরে নেবেন। অতএব সঙ্গত কারণেই ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইয়াযীদের নির্দেশ পালন করেনি। কিভাবে আবদুল্লাহকে কাবু করা যায় এবং রক্তপাত থেকে কা'বা ঘরের পবিত্রতাও রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে ইয়াযীদ গভীরভাবে চিন্তা করছিল। হিজরী ৪১ সনের যিলহজ্জ (৬৬২ খ্রি এপ্রিল) মাসে হজ্জব্রত পালনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে লোকেরা দলে দলে মক্কা অভিমুখে আসতে শুরু করে। ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ওয়ালীদ 'আমীরুল হজ্জ' নিযুক্ত হয়ে মক্কায় আসে। অপরদিকে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রও ছিলেন আমীরুল হজ্জ। যাহোক তারা উভয়ে পৃথকভাবে স্ব স্ব অনুসারীদের নিয়ে হজ্জ করেন এবং কেউ কারো বিরোধিতা করেননি। অবশ্য ওয়ালীদ এমন ফন্দিও আঁটতে থাকে যাতে আব্দুল্লাহকে বন্দী করে ইয়াযীদের কাছে পাঠানো যায়। কিন্তু তিনি ওয়ালীদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেন এবং হজ্জের মওসুম অতিক্রান্ত হবার পর ধীরেসুস্থে ইয়াযীদের কাছে নিম্নোক্ত চিঠি লিখেন ঃ

"ওয়ালীদ যদিও তোমার চাচাত ভাই, কিন্তু সে মস্তবড় আহাম্মক। আপন আহম্মকীর কারণে সে সব কাজই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। তোমার উচিত, অন্য কাউকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করা।"

এই পত্রে ইয়াযীদ খুবই প্রভাবিত হয়। ধারণা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রের অন্তর আমার প্রসঙ্গে বিরূপ নয় এবং তিনি মোটেই আমার বিরোধী নন। ইতিপূর্বে মারওয়ান ইব্‌ন হাকামও ওয়ালীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে ইয়াযীদের কাছে পত্র লিখেছিলেন। তাই ইব্‌ন যুবায়রের উক্ত চিঠি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই ইয়াযীদের অন্তরে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়নি। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে নিজের অপর চাচাত ভাই উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠায়।

উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ মদীনায় এসে মদ্যপান শুরু করে। ফলে জনসাধারণ তার উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। উসমান হিজরী ৬২ সনের মুহাররম (৬৮১ খ্রি-এর সেপ্টেম্বর) মাসে মদীনার শাসনভার গ্রহণ করেছিল। কিছুদিন পর সে মদীনার গণ্যমান্য দশজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল ইয়াযীদের কাছে দামিশকে পাঠায়। ঐ প্রতিনিধিদলে মুনযির ইব্‌ন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন মুগীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা দামিশকে উপনীত হলে ইয়াযীদ তাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রথমোক্ত দু'ব্যক্তিকে এক লাখ করে এবং বাকি আট ব্যক্তিকে দশ হাজার দিরহাম করে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। প্রতিনিধি দলটি ইয়াযীকে দামিশকে গানবাজনার মজলিসের আয়োজন এবং শরীয়তের খিলাফ কাজকর্ম করতে দেখে এসেছিলেন। মদীনায় ফিরে এসে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইয়াযীদের খিলাফতের বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত। প্রতিনিধিদলের নয় ব্যক্তি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু একজন অর্থাৎ মুনযির কূফার দিকে চলে গিয়েছিলেন। কেননা ইব্‌ন যিয়াদ ও মুনযিরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্যই কূফার দিকে চলে গিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালা তার সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছলে দামিশকের অবস্থাদি জানার জন্য লোকেরা তাদের কাছে এসে ভিড় জমায়।

ইয়াযীদের খিলাফতের বিরোধিতা

আবদুল্লাহ্ বলেন, ইয়াযীদ কোন মতেই খিলাফতের যোগ্য নয়। কেননা তাকে শরীয়ত-বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ করা উচিত। মদীনাবাসীরা বললো, আমরা শুনেছি ইয়াযীদ আপনাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করেছে। আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি এজন্য তা গ্রহণ করেছি যে, তার সাথে মুকাবিলা করার মত শক্তি আমার ছিল না। এসব কথা শুনে লোকেরা ইয়াযীদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। আবদুল্লাহ্ প্রস্তাব করলেন, ইয়াযীদকে খলীফা পদ থেকে বরখাস্ত করা হোক। অতএব কুরায়শরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে এবং আনসাররা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালাকে নিজ নিজ নেতা নির্বাচিত করে ইয়াযীদের খিলাফত ও হুকুমত অস্বীকার করে বসল। উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ মারওয়ানের ঘরে আশ্রয় নিল। মদীনাবাসীরা বনূ উমাইয়ার যাকেই পেল তাকেই বন্দী করল। তারা শুধু মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিককে– যে মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িবের খিদমতে সব সময় হাযির থাকত, মসজিদ থেকে কখনো বের হতো না এবং যাকে সবাই অত্যন্ত

পবিত্রচেতা ও মুত্তাকী মনে করত— কিছুই বলল না। এই অবস্থা সম্পর্কে বনূ উমাইয়ার লোকেরা ইয়াযীদকে অবহিত করল। সে সঙ্গে সঙ্গে ইব্‌ন যিয়াদের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখল, মুনযির ইব্‌ন যুবায়র তোমার কাছে কূফায় গিয়েছে। তুমি অবিলম্বে তাকে বন্দী কর এবং কখনো মদীনার দিকে যেতে দিও না। ইব্‌ন যিয়াদ যেহেতু ইয়াযীদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, কেননা হুসাইন হত্যার বিনিময়ে সে তাকে কোনভাবেই পুরস্কৃত বা সম্মানিত করেনি, তাই সে মুনযিরকে বন্দী করার পরিবর্তে তাকে মদীনার দিকে চলে যাবার সুযোগ দেয় এবং ইয়াযীদকে লেখে, আপনার চিঠি আসার পূর্বেই মুনযির মদীনায় চলে গেছে। মুনযির মদীনায় পৌঁছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে বলেন, তোমাদের উচিত, আলী ইব্‌ন হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবেদীন)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত করা। অতএব তাঁরা সবাই মিলে আলী ইব্‌ন হুসাইনের কাছে যান। কিন্তু বায়আত গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার পিতা এবং পিতামহ উভয়েই খিলাফত লাভ করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন। অতএব আমি পুনরায় ঐ একই ঝুঁকি নিতে পারি না। কেউ আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করুক, তা আমার মোটেই কাম্য নয়। তিনি একথা বলে মদীনার বাইরে কোন একটি পল্লীতে চলে যান। মারওয়ান তার গোত্রের আরো কিছু লোকসহ আপন ঘরে স্বেচ্ছা বন্দিত্ব গ্রহণ করেছিল। সে আবদুল মালিকের মাধ্যমে আলী ইব্‌ন হুসাইনের কাছে বলে পাঠাল, (খিলাফতের ব্যাপারে) আপনি যা করেছেন ভালই করেছেন। এখন আমরা একটি ব্যাপারে আপনার সাহায্য কামনা করি। আমরা আমাদের কিছু ধন-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন, যাদের এখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না, আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাদের হিফাযতের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। অতএব মারওয়ান রাতের অন্ধকারে গোপনে তার পরিবার-পরিজন এবং মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আলী ইব্‌ন হুসাইনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আলী ইব্‌ন হুসাইন নিজের অবস্থা সম্পর্কে ইয়াযীদের কাছেও পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, আমি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত। তাছাড়া আমি বনূ উমাইয়ার লোকদের রক্ষা করার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইয়াযীদ মদীনার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পর নু'মান ইব্‌ন বশীর আনসারীকে ডেকে বলেন, তুমি মদীনায় গিয়ে জনসাধারণকে বুঝিয়ে বল, যেন তারা এই সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকে এবং মদীনায় রক্তপাত ঘটার মত অবস্থার সৃষ্টি না করে। তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালাকেও বুঝিয়ে বল, তুমি তো দামিশকে গিয়ে ইয়াযীদের কাছ থেকে সম্মান ও উপহার-উপঢৌকন নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এসেছ, অথচ মদীনায় পৌঁছেই তার বিরোধিতা করছ, তার বায়আত অস্বীকার করছ, তাকে কাফির আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছ। এটা তো কোন বুদ্ধিমান ও সুপুরুষের কাজ নয়। আর আলী ইব্‌ন হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবিদীন)-এর সাথে সাক্ষাত করে আমার পক্ষ থেকে তাকে বল, 'তোমার বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মের মর্যাদা অবশ্যই দেওয়া হবে।' আর সেখানে বনূ উমাইয়ার যে সমস্ত লোক আছে তাদেরকে বল, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মাত্র দুটি লোককে হত্যা করে মদীনায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। আফসোস, এ কাজটিও তোমাদের দ্বারা হলো না। যাহোক, নু'মান ইব্‌ন বশীর উটে চড়ে দ্রুত মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি সবাইকে অনেক করে বুঝালেন, কিন্তু তাতে

কোন ফল হলো না। অতএব তিনি বাধ্য হয়ে মদীনা থেকে দামেশকে ফিরে গেলেন এবং মদীনার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইয়াযীদকে অবহিত করলেন। এবার সে মুসলিম ইব্‌ন উকবাকে ডেকে বলল, তুমি বাছাই করা একহাজার যোদ্ধা নিয়ে মদীনায় যাও এবং সেখানকার লোকদেরকে আমার আনুগত্য স্বীকার করতে বল। যদি তারা আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তরবারি চালিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করো।

মুসলিম বলল, আমি আপনার অনুগত, কিন্তু আজ অসুস্থ। ইয়াযীদ বললেন, তুমি অসুস্থ হলেও অন্য সুস্থদের চেয়ে ভাল। আর তুমি ছাড়া একাজ অন্য কেউ সুষ্ঠুভাবে করতেও পারবে না। বাধ্য হয়ে মুসলিম বাছাই করা একটি সেনাবাহিনী নিয়ে তৃতীয় দিন দামিশক থেকে রওয়ানা হলো। বিদায়কালে ইয়াযীদ তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, যতদূর সম্ভব ক্ষমা ও নম্র ব্যবহারের সাহায্যে মদীনাবাসীদেরকে সরল পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিন্তু যখন তোমার এ বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, নম্র ব্যবহার ও উপদেশ দ্বারা কোন কাজ হবে না তখন অবাধে রক্তপাত, হত্যা ও লুটপাট চালাবে; তবে লক্ষ্য রাখবে, যেন আলী ইব্‌ন হুসাইনের কোন কষ্ট না হয়। কেননা তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমার প্রতি বিশ্বস্ত। আমি তাঁর একটি পত্র পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন, এ সব বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সে মুসলিমকে আরও বলে, যদি তোমার রোগ বেড়ে যায় এবং তুমি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান করতে সক্ষম না হও তাহলে হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র সম্মত হলে তাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করবে। এই বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার পর ইয়াযীদ ঐ দিনই একজন দূত মারফত ইব্‌ন যিয়াদের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে লিখেন, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে মক্কা যাও এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিশৃঙ্খলা নির্মূল কর। উত্তরে ইব্‌ন যিয়াদ লিখল, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি ইমাম হুসাইনকে হত্যা করার মত একটি (জঘন্য) কাজ করেছি। এখন কা'বা ঘর ধ্বংস করার মত আর একটি (জঘন্য) কাজ আমার দ্বারা হবে না। আপনি এ কাজের দায়িত্ব অন্য কারো উপর ন্যস্ত করুন। মুসলিম ইব্‌ন উকবা তার বাহিনী নিয়ে মদীনার নিকটবর্তী হলে মদীনাবাসীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালাকে বলল, উমাইয়া গোত্রের যে সমস্ত লোক মদীনায় রয়েছে; দামিশকের বাহিনী মদীনায় পৌঁছার সাথে সাথে তারা তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে এবং এক অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব মুসলিম এখানে এসে পৌঁছার পূর্বেই উমাইয়াদের হত্যা করে ফেলা উচিত। আবদুল্লাহ্ বললেন, আমরা যদি উমাইয়াদের হত্যা করি তাহলে ইয়াযীদ সমগ্র সিরিয়াবাসী এবং ইব্‌ন যিয়াদ সমগ্র ইরাকবাসীকে নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হবে এবং আমাদের থেকে 'কিসাস' তলব করবে। অতএব এটাই বাঞ্ছনীয় যে, আমরা সমগ্র বনূ উমাইয়াকে ডেকে তাদের থেকে শপথসহ এই স্বীকারোক্তি নেব যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদেরকেও কোন সাহায্য করবে না। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেব। সকলেই এই অভিমত পছন্দ করল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালা মদীনায় অবস্থানরত উমাইয়া গোত্রের সকল লোকের কাছ থেকে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন। শুধু আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে মদীনায় থাকার অনুমতি দেওয়া হলো। ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে বনূ উমাইয়ার লোকদের সাথে মুসলিম ইব্‌ন উকবা ও তার

বাহিনীর সাক্ষাত হলো। মুসলিম তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, মদীনার উপর কোন্ দিক থেকে আমার হামলা করা উচিত? কিন্তু তারা তাদের প্রদত্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী মুসলিমকে কোন জবাব দিতে অস্বীকার করল। এবার মুসলিম জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যার কাছ থেকে উপরোক্ত মর্মে কোন অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি ? তারা বলল, হ্যাঁ, এমন একজন লোক মদীনায় আছে, আর সে হচ্ছে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান। মুসলিম বলল, সে তো একজন যুবক। আমার তো এমন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোকের দরকার, যিনি যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তারা উত্তরে বলল, ঐ যুবক বৃদ্ধদের চাইতেও যোগ্য। অতএব মুসলিম একজন দূতের মাধ্যমে আবদুল মালিককে মদীনা থেকে ডেকে পাঠাল এবং তার পরামর্শ শুনে বিস্মিত হলো। এরপর আবদুল মালিকেরই পরামর্শ অনুযায়ী সে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে মদীনাবাসীদের কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠাল, 'আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ তোমাদেরকে অভিজাত বলেই মনে করেন এবং তিনি তোমাদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতেও চান না। অতএব এটাই সমীচীন যে, তোমরা আমার বশ্যতা স্বীকার কর, অন্যথায় বাধ্য হয়ে আমাকে কোষ থেকে তরবারি বের করতে হবে। এই পয়গাম পাঠিয়ে মুসলিম তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কিন্তু মদীনাবাসী যুদ্ধের পক্ষেই রায় দিল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম হাররার দিক থেকে মদীনার উপর হামলা করল। মদীনাবাসী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করল। কিন্তু মুসলিমের বীরত্ব ও অভিজ্ঞতার সামনে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পরাজয়বরণ করতে হলো। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা, ফাসীল ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন কায়স, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্ম আনসারী, ওয়াহ্ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামআ, যুবায়র ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওফাল ইব্ন হারস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ মদীনার অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই যুদ্ধে নিহত হন। বিজয়ীপক্ষ মদীনায় প্রবেশ করল। মুসলিম ইব্ন উকবা তিনদিন পর্যন্ত অবাধে হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালাল। প্রায় এক হাজার লোক এই যুদ্ধ ও অবাধ হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হলো। তাদের মধ্যে তিনশ' জনেরও অধিক ছিলেন কুরায়শ ও আনসারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। চতুর্থ দিন মুসলিম অবাধ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে সকলকে বায়আতের নির্দেশ দিল। যারা এসে মুসলিমের হাতে বায়আত করল তারা রক্ষা পেল, আর যারা বায়আত করতে অস্বীকার করল তাদেরকে হত্যা করল। হিজরী ৬৩ সনের ২৭শে যিলহজ্জ (৬৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর) মুসলিম বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রবেশ করে এবং অবাধে হত্যাকাণ্ড চালাবার নির্দেশ দেয়। এই দিনই মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হচ্ছেন সেই মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যিনি ইতিহাসে মুহাম্মদ আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ নামে পরিচিত। ইনিই আব্বাসী বংশের প্রথম খলীফা। অনেক অনুসন্ধান করেও মুসলিম মুনযির ইব্ন যুবায়রকে পাকড়াও করতে পারেনি। কেননা তিনি ইতিমধ্যে কোন এক ফাঁকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মক্কা অবরোধ এবং ইয়াযীদের মৃত্যু

মদীনায় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করার পর মুসলিম ইব্ন উকবা নিজ বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। সে এমনিতেই অসুস্থ ছিল। পথিমধ্যে তার অসুস্থতা

আরো বৃদ্ধি পায়। 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় তখন সে হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রকে ডেকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে মারা যায়। অপর দিকে মদীনা থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারাও মক্কায় গিয়ে সমবেত হয়। খারিজীরাও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে সাহায্য করা সমীচীন মনে করে। তাই তারাও মক্কায় এসে জড়ো হয়। ঐ বছর হজ্জ মওসুমে হিজাযের বাসিন্দারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করে। হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র সিরীয় বাহিনী নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হলো এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠাল, 'তুমি ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার কর, অন্যথায় মক্কার উপর হামলা পরিচালনা করা হবে।' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। তিনি তাঁর ভাই মুনযিরকে নিজ বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। মুনযির সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে সিরীয় বাহিনীকে মুকাবিলার আহবান জানায়। প্রথম প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুনযিরের হাতে বেশ কয়েকজন সিরীয় সৈন্য মারা যায়। এরপর এক বাহিনী অপর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। এই যুদ্ধ হিজরী ৬৪ সনের ২৭শে মুহাররম (৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর) শুরু হয়েছিল। পরদিন হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর 'মিনজানীক' (প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করে কা'বা ঘরের উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করে এবং মক্কাও অবরোধ করে ফেলে। এই অবরোধ ও প্রস্তর বর্ষণ হিজরী ৬৪ সনের ৩রা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ দিন সিরীয়রা তূলা, গন্ধক ও আলকাতরার সংমিশ্রণে গোলা তৈরি করে তাতে আগুন লাগিয়ে কা'বার উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ফলে কা'বার সম্পূর্ণ গেলাফ পুড়ে যায় এবং প্রাচীরসমূহ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। দু'টি মিনজানীক থেকে রাত-দিন প্রস্তর ও গোলা বর্ষিত হতে থাকে। এই অবস্থায় মক্কাবাসীদের পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়াও ছিল দুষ্কর। পাথরের আঘাতে কা'বা ঘরের প্রাচীরসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ছাদও ধসে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে আগত সহায়ক বাহিনীসহ সিরীয় বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তারা অনবরত কা'বা ঘর ও মক্কা শহরের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে চলছিল। অপর দিকে ইয়াযীদ ১০ই রবিউল আউয়াল হাওরান নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করে। সে মোট ৩ বছর ৮ মাস দেশ শাসন করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র সর্বপ্রথম ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে সিরীয়দের সম্বোধন করে বলেন, 'হতভাগারা' তোমরা আর কার জন্য লড়ছ ? তোমাদের পথভ্রষ্ট নেতা তো মারা গেছে।'

হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র একথা বিশ্বাস করেনি। সে এটাকে আবদুল্লাহ্‌র একটি কূটচাল মনে করে। কিন্তু তৃতীয় দিন যখন কায়স ইব্‌ন সাবিত নাখঈ' কূফা থেকে এসে ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ দিল তখন সে সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীকে অবরোধ উঠিয়ে মক্কা থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিল। রওয়ানা হওয়ার আগে হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র ইব্‌ন যুবায়রের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠাল, আজ রাতে বাত্‌হা নামক স্থানে আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাই। উভয় পক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এবং হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র উভয়ে দশজন করে লোক সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্টস্থানে গিয়ে হাযির হন। হুসাইন বলে, আমি আপনাকে খলীফা বলে স্বীকার করতে এবং আপনার হাতে বায়আত করতে প্রস্তুত আছি। আমার সাথে

সিরীয় বাহিনীর যে পাঁচ হাজার যোদ্ধা রয়েছে এ ব্যাপারে তারাও আমাকে অনুসরণ করবে। আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন। আমিসহ সমগ্র সিরীয়বাসী আপনার হাতে বায়আত করেই ফেলেছি। এবার সিরিয়াবাসীরা বায়আত করে ফেললে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব কোনরূপ মতবিরোধ ছাড়াই আপনাকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ভাবলেন, হুসাইন তাকে প্রতারণা করছে। তাই তিনি সিরিয়ায় যেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সিরীয়দের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করব ততক্ষণ ওদেরকে কোনমতেই ক্ষমা করব না। হুসাইন আস্তে আস্তে কথা বলছিল এবং আবদুল্লাহ্ উচ্চৈঃস্বরে ও কঠোর ভাষায় তার জবাব দিচ্ছিলেন। হুসাইন বলল, আমি আপনাকে খিলাফত দিতে চাচ্ছি, আর আপনি আমাকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। যা হোক, ইব্ন নুমায়র বৈঠক থেকে উঠে নিজ বাহিনীতে ফিরে এলো এবং অবিলম্বে তাদেরকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিল। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তখন তিনি একজন দূত মারফত হুসাইনকে বলে পাঠান, আমাকে সিরিয়া যাবার জন্য বাধ্য কর না, বরং তোমরা এখানে এসেই আমার হাতে বায়আত কর। হুসাইন উত্তর দিল, সিরিয়ায় না যাওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ্ মক্কা ছাড়তে রাযী হলেন না। হুসাইন যখন মক্কা ছেড়ে মদীনার নিকটবর্তী হলো তখন জানতে পারল যে, ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ শুনে মদীনাবাসীরা পুনরায় বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা ইতিমধ্যে ইয়াযীদের সেই কর্মকর্তাকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছে যাকে মুসলিম ইব্ন উকবা সেখানে নিয়োগ করে এসেছিল। হুসাইন মদীনার বাইরে তাঁবু স্থাপনের সাথে সাথে মদীনার হৈ-হাঙ্গামা থেমে গেল এবং এই ফাঁকে বনূ উমাইয়ার যে সমস্ত লোক মদীনায় ছিল তারা সবাই তার বাহিনীতে মিলিত হয়ে বলল, তুমি আমাদেরকে তোমার সাথে সিরিয়ায় নিয়ে চল। সে বলল, তোমরা আজ রাতের মত এখানে থাক। ভোরবেলা আমি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হব। রাত ঘনিয়ে এলে ইব্ন নুমায়র একাকি আলী ইব্ন হুসাইনের সন্ধানে বের হলো এবং তার সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়াযীদ তো মারা গেছে। এখন মুসলিম বিশ্বের কোন ইমাম নেই। আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন। আমরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আপনার হাতে বায়আত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করব এবং আপনি সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হবেন। সিরীয়দেরকে আপনি ইরাকীদের মত মনে করবেন না। ওরা আপনাকে কখনো প্রতারিত করবে না এবং কোন কষ্টও দেবে না। আলী ইব্ন হুসাইন উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, আমি আমার সমগ্র জীবনে কারো কাছ থেকে বায়আত নেব না। তুমি আমাকে এই অবস্থায়ই থাকতে দাও এবং অন্য কাউকে খলীফাদের জন্য অনুসন্ধান কর। এই বলে তিনি হুসাইনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। শেষ পর্যন্ত হুসাইন নিজের বাহিনীর কাছে ফিরে এল এবং ভোর বেলা বনূ উমাইয়াদের সাথে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করল।

ইয়াযীদের আমলে বিজয় অভিযান

আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে ইয়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। কিন্তু সেই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি, যা কায়রাওয়ান নগরীর প্রতিষ্ঠাতা উকবা ইব্ন নাফিঈ'-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

উকবা আফ্রিকা থেকে দামিশকে আমীরে মুআবিয়ার কাছে গিয়ে তিনি আবুল মুহাজিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে মুআবিয়া (রা) তাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাকে পুনরায় আফ্রিকার প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে উকবাকে আফ্রিকার কর্তৃত্ব প্রদান করে সেখানে প্রেরণ করেন। উকবা কায়রাওয়ান পৌঁছে আবুল মুহাজিরকে বন্দী করেন। এর কারণ ছিল এই যে, আবুল মুহাজির তার শাসনামলে অন্যায়ভাবে উকবার নিন্দা করেছিলেন এবং তার দুর্নামও রটনা করেছিলেন। বন্দী অবস্থায়ই আবুল মুহাজির মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উকবাকে এই মর্মে ওসীয়ত করেন, 'কাসীলা নামীয় জনৈক বার্বার নওমুসলিম সম্পর্কে তুমি অবশ্যই সাবধান থাকবে। আবুল মুহাজির কাসীলাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং তিনি তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই তিনি জানতেন, উকবা যেহেতু তাকে বন্দী করেছেন, তাই কাসীলা সুযোগ পেলে অবশ্যই উকবার উপর প্রতিশোধ নেবে। উকবা ইব্‌ন নাফিঈ আবুল মুহাজিরের একথায় খুব একটা কান দেন নি। তাই কাসীলাকে যথারীতি নিজ বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। হিজরী ৬২ সনে (৬৮১-৮২ খ্রি) উকবা তার ছেলেদের ডেকে ওসীয়ত করে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই বের হব। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব, এটাই আমার আন্তরিক বাসনা। এরপর তিনি যুহায়র ইব্‌ন কায়স বালাবীকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে কায়রাওয়ানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করে নিজে মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে আল-মাগরিবের দিকে রওয়ানা হন। 'বাগানা' নগরীতে রোমান বাহিনীর সাথে তার মুকাবিলা হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর রোমানরা পলায়ন করে। এরপর আরবাহ্ নগরীতে রোমানরা পুনরায় মুসলমানদের মুকাবিলা করে। কিন্তু এই যুদ্ধেও তারা পরাজিত হয়। মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান বিজয় প্রত্যক্ষ করে রোমানরা বার্বারদেরকেও, যারা তখন পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্মেও দাখিল হয়নি, নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। এবার রোমান ও বার্বারদের সম্মিলিত বিরাট বাহিনী মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনীর মুকাবিলায় রণক্ষেত্রে অবতরণ করে। এক ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। এরপর তানজা শহরে রোমান প্যাট্রিয়কের সাথে মুসলমানদের সর্বশেষ মোকাবিলা হয়। এই যুদ্ধেও রোমানরা পরাজিত এবং রোমান প্যাট্রিয়ক (গভর্নর) উকবার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। উকবা প্যাট্রিয়ককে মুক্ত করে দেন এবং তানজা শহরের কোন ক্ষতি না করে সম্মুখে অগ্রসর হন। এভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে মরক্কো জয় করে একেবারে আটলান্টিক উপকূলে উপনীত হন এবং দ্রুতবেগে আপন ঘোড়া দৌড়িয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! সমুদ্র আমার পথে প্রতিবন্ধক না হলে আমি তোমার পথে এভাবে জিহাদ করতে করতে এগিয়ে যেতাম।'

উকবার শাহাদাত লাভ

এবার উকবা কায়রাওয়ানের দিকে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প নেন। তখন পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এসে গিয়েছিল। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি নিজ বাহিনীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে তাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং

একটি অংশকে নিজের সাথে রাখেন। এগিয়ে যাবার সময় তিনি এবং তাঁর সাথের মুজাহিদরা এমন একটি স্থানে উপনীত হন, যেখানে মোটেই পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। মুজাহিদরা তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করতে থাকে। উকবা তখন আল্লাহ্‌র দরবারে পানির জন্য দু'আ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘোড়ার পায়ের খুর দ্বারা মাটির উপর সজোরে আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির নিচ থেকে একটি পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসে। এবার তাঁর বাহিনীর লোকেরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করে এবং ঐ ফোয়ারাটি 'মাউল ফারাস' (অশ্বঝর্ণা) নামে খ্যাতি লাভ করে। আজও তা ঐ নামেই পরিচিত। সেখান থেকে উকবা যখন নিজের ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে 'হাতূয়া' নামক স্থানে উপনীত হন তখন রোমান ও বার্বাররা তাঁর সাথে সামান্য সংখ্যক সৈন্য দেখে তাঁর মুকাবিলা করতে উদ্যত হয়। অথচ তারা ইতিপূর্বে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কাসীলা, যে উকবার সাথেই ছিল, এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে রোমানদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং আপন সম্প্রদায়কেও যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে। এভাবে সে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে এবং উকবার বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অগত্যা মুসলিম মুজাহিদরা কোষ থেকে তরবারি বের করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে হত্যা করতে করতে একে একে নিজেরাও শাহাদাতবরণ করেন। উকবা ইব্‌ন নাফি'ঈও শাহাদাতবরণ করে নিজের মনের গোপন বাসনা পূরণ করেন।

উকবাকে হত্যা করার পর কাসীলা নিজের বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রাওয়ানের দিকে অগ্রসর হয়। কায়রাওয়ানে যখন উকবার শাহাদাতবরণ এবং কাসীলার বিরাট বাহিনী নিয়ে আগমনের সংবাদ পৌঁছে তখন যুহায়র ইব্‌ন কায়স তাঁর মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তার বাহিনীর মধ্যে অনৈক্য ও অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। তিনি এর কোন প্রতিবিধান করতে পারেন নি। ফলে মুসলমানদেরকে বাধ্য হয়ে কায়রাওয়ান ছেড়ে বারকার দিকে পিছিয়ে আসতে হয়। ফলে কাসীলা বিনা যুদ্ধেই কায়রাওয়ান দখল করেন।

এক নজরে ইয়াযীদের শাসনামল

ইয়াযীদ আনুমানিক পৌনে চার বছর ইসলামী রাষ্ট্রের অধিপতি ছিল। তার শাসনামলে মুসলমানরা কোন দেশ জয় করেনি। ইয়াযীদের জন্য সবচেয়ে বড় কলংক হলো, তারই শাসনামলে ইমাম হুসাইন (রা) অত্যন্ত অন্যায়ভাবে শাহাদাতবরণ করেন। এ নিষ্ঠুর কাজটি ইয়াযীদের যাবতীয় গুণাবলীকে ম্লান করে দেয়। কিন্তু আসল সত্য উদঘাটনের জন্য ধীরস্থির মস্তিষ্কে পূর্বাপর বিষয়টি আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। ভেবে দেখতে হবে, সেই আসল কারণ কি ছিল যার ফলে কারবালার মাঠে ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে অনুরূপ অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আচরণ করা হয়েছিল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুগীরা ইব্‌ন শুবার প্ররোচণায়ই আমীরে মুআবিয়া (রা) ইয়াযীদকে তাঁর 'অলী আহ্‌দ' নিয়োগ করিয়েছিলেন। এরপূর্বে তিনি কখনো চিন্তা করেননি যে, আপন পুত্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা মনোনীত করবেন। সর্বপ্রথম মুগীরাই কূফায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু যেহেতু নীতিগতভাবে এ প্রস্তাবটি ছিল খিলাফতে

রাশিদার সুন্নতের এবং ইসলামী জামহুরিয়াতের আদর্শবিরোধী, তাই ঐ সময়েই মদীনায় এর বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ছিলেন এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। মারওয়ান যখন মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে বিবেচনার জন্য এ বিষয়টি পেশ করে তখন সব মহল থেকেই এর বিরোধিতা শুরু হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তো পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন, খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুআবিয়া (রা) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি নয়, বরং কায়সার ও কিসরার পদ্ধতি। অতএব তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, এই নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নয়, বরং তাদের ধ্বংসের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এতে 'খিলাফতে ইসলামিয়া কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করবে। অর্থাৎ পিতার পর তার পুত্রই খিলাফতের অধিকারী হবে।

আমীরে মুআবিয়া উপরোক্ত ব্যক্তিদের রাযী করাতে গিয়ে এতটুকু পর্যন্ত বলেন, আপনারা শুধু একে খলীফা হিসাবে মেনে নিন। এরপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলী এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম আপনাদেরই পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করা হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা কেউই তাঁর কথা মেনে নিতে রাযী হননি।

এ থেকে ঐ যুগের সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি এবং ইয়াযীদের চরিত্র সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়। যা হোক, মুআবিয়া (রা) মদীনা থেকে দামিশ্‌কে গিয়ে আপন কর্মকর্তাদের নামে একটি নির্দেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়, 'তোমরা জনসাধারণের কাছে ইয়াযীদের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা কর এবং নিজ নিজ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এক একটি প্রতিনিধিদল আমার কাছে পাঠাও যাতে আমি ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলতে পারি। এরপর প্রত্যেক প্রদেশ থেকে যেসব প্রতিনিধিদল এসেছিল আমীরে মুআবিয়া তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলাপ করেন। এরপর তাদের একটি সম্মিলিত বৈঠকও আহবান করেন। উক্ত বৈঠকে তিনি খলীফাদের দায়িত্ব, সরকারী কর্মকর্তাদের আনুগত্য এবং জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। এরপর ইয়াযীদের বীরত্ব, বদান্যতা, বিচার-বুদ্ধি ও প্রশাসনিক যোগ্যতার উল্লেখ করে এ আশা ব্যক্ত করেন যে, এবার সকলেই ইয়াযীদের 'অলী আহ্‌দীর' প্রস্তাবটি মেনে নেবেন এবং এজন্য বায়আতও করবেন। কিন্তু এর উত্তরে মদীনার প্রতিনিধিদলের সদস্য মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম দাঁড়িয়ে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো ইয়াযীদকে খলীফা বানাচ্ছেন, কিন্তু এ বিষয়টি কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, কিয়ামতের দিন এ কাজের জন্য আপনাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌মের এই উক্তি থেকে অনুমিত হয় যে, সাধারণ লোকও ইয়াযীদের খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না এবং তারা এ জাতীয় কোন প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুতও ছিল না।

আমীরে মুআবিয়ার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযীদ তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল তা থেকেও খিলাফতের ক্ষেত্রে তার অযোগ্যতা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

হিজরী ৬০ সনের রজব (৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) মাসে মুআবিয়া (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এবার তাঁর জীবনের চরম দিনটি ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান। কিন্তু সে তখন শিকারের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন ব্যক্তিগত কাজে দামিশ্‌কের বাইরে ছিল। একজন দূত তার সাথে দেখা করে এবং তাকে সঙ্গে নিয়েই দামিশ্‌কে আসে। তখন মুআবিয়া (রা) ইয়াযীদকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে বৎস! আমার ওসীয়ত মনোযোগ দিয়ে শোন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। এখন আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান অর্থাৎ আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি বল, আমার পরে তুমি মুসলমানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে?' ইয়াযীদ উত্তর দিল, আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসরণ করব।

মুআবিয়া (রা) বলেন, সুন্নতে সিদ্দিকীর উপরও আমল করা উচিত। তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন যে, সমগ্র উম্মত তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ইয়াযীদ উত্তর দিল, না, শুধু আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতই যথেষ্ট।

এরপর আমীরে মুআবিয়া বলেন, 'হে বৎস! সীরাতে উমরের অনুসরণ কর। তিনি নতুন নতুন শহর আবাদ করেছেন, শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছেন এবং মালে গনীমত সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। কিন্তু ইয়াযীদ উত্তর দিল, 'শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের অনুসরণই যথেষ্ট।'

এরপর আমীরে মুআবিয়া বলেন, 'হে বৎস! সীরাতে উসমান গনীরও অনুসরণ কর। তিনি সারা জীবন মানুষের উপকার সাধন এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন।' ইয়াযীদ উত্তর দিল, 'না, শুধু আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতই আমার জন্য যথেষ্ট।'

একথা শুনে আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেন, তোমার এই সব কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তুমি আমার ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ) পালন তো করবেই না, বরং এর বিরোধিতা করবে।

যা হোক, মুগীরা ইব্‌ন শু'বার প্ররোচণা ও আমীরে মুআবিয়ার চেষ্টায় ইয়াযীদ শেষ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হয়। ইয়াযীদের জন্য বায়আত গ্রহণ ছিল মুআবিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। খুব সম্ভব পিতৃস্নেহের কারণেই তিনি এ ভুল করেছিলেন। কিন্তু মুগীরার ভুল ছিল এর চাইতেও মারাত্মক। কেননা তাঁর প্ররোচনায়ই আমীরে মুআবিয়ার অন্তরে অনুরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। তাছাড়া ইয়াযীদও নিজেকে খলীফা পদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে নি। তিনি ভালভাবে জানতেন যে, তার যুগে এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিও বিদ্যমান আছেন, যাঁরা একাধারে পবিত্রচেতা ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং ইবাদত-বন্দেগী ও ঈমানের দৃঢ়তায় অনন্য। এই সব ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনার পরিবর্তে ইয়াযীদ জনসাধারণের উপর জুলুম অত্যাচার চালায়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, ইমাম হাসান এবং অন্যান্য যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন তাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের জন্য

তাড়াহুড়া করে সেখানকার কর্মকর্তাদের নামে জরুরী নির্দেশ জারি করে। কিন্তু ইমাম হুসাইনের মত পবিত্রচেতা ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কী করে ইয়াযীদের হাতে বায়আত হতে পারেন ? প্রথমত ইয়াযীদের নির্বাচনই ছিল শরীয়ত বিরোধী। তাই তার হুকুমতও ছিল শরীয়ত বিরোধী। দ্বিতীয়ত, তার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সব সময় খেলাধুলা ও শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকত, নৃত্যগীতের মজলিসেও অংশগ্রহণ করত। এছাড়াও তার মধ্যে আরো অনেক দোষ ছিল। মুসলমানদের খলীফা বা নেতা নির্বাচিত হওয়ার কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে ছিল না। এমতাবস্থায় কী করে ইমাম হুসাইন তাকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিতে পারেন বা তার হাতে বায়আত করতে পারেন।

উপরোক্ত কারণেই তিনি ইয়াযীদ হুকুমতের বিরোধিতা করেন এবং জুলুম অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করবে। ইমাম হুসাইন কূফা সফরকালে এবং কারবালা প্রান্তরে যে সমস্ত ভাষণ দেন তা চিরদিন বিশ্ববাসীর কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। বায়দা নামক স্থানে হুরের সঙ্গী-সাথীদের সম্বোধন করে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ

"লোক সকল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন বাদশাহকে দেখল, যে অত্যাচারী, আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল করে, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভংগ করে, রাসূলের সুন্নতের বিরোধিতা করে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর পাপাচার ও জবরদস্তিমূলকভাবে হুকুমত চালায়– অথচ তার বিরোধিতা করল না বা অন্ততঃপক্ষে তার কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করল না– আল্লাহ্‌র এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি ঐ বাদশাহ্‌র পরিবর্তে ঐ সব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা ভালভাবে বুঝে নাও, এ সমস্ত লোক শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে। তারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তিসমূহ অকেজো করে দিয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে মালে গনীমতে ভাগ বসিয়েছে এবং আল্লাহ্ যে সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন সেগুলোকে হালাল এবং যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করেছে। অতএব তাদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে।

এগুলো ছিল সেই কারণ, যা ইমাম হুসাইনকে কারবালা প্রান্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার এবং বাতিল শাসনব্যবস্থার মুলোৎপাটন করতে গিয়েই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জালিমদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেও ইয়াযীদ আমীরে মুআবিয়ার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে তার সম্পর্ক ছিল খুবই গৌণ। সে রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। যদি সে আমীরে মুআবিয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতো তাহলে তার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা এই হতো যে, মানুষ যাতে আমীরে মুআবিয়া ও হযরত আলী (রা)-এর মতবিরোধের কথা ভুলে যায় সে ব্যাপারে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। কিন্তু এই বিষয়ের উপর হয় অতি অল্প গুরুত্ব আরোপ করেছে অথবা নিজের অযোগ্যতার কারণে এ ক্ষেত্রে কোন সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি। ইয়াযীদ তার বাস্তব

জীবনের যে নমুনা জনসাধারণের সামনে পেশ করেছে তাতে ছিল পাপাচার ও শরীয়ত বিরোধী কাজকর্মের সমাহার। তাই তার দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও আমলী যিন্দেগী দারুণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। দুর্বল ঈমানের লোকেরা পাপাচারের রাজসিক নমুনা প্রত্যক্ষ করে নৈতিকতা-বিরোধী কাজকর্মে বেপরোয়া হয়ে উঠে। ইয়াযীদেরই আদর্শহীনতা মুসলমানদেরকে গান-বাজনা ও মদ্যপানের প্রতি প্ররোচিত করে। কেননা ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বে এইসব কুকর্মের কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইয়াযীদের যুগ পর্যন্ত মুসলমানরা খিলাফতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের নীতিকে মেনে নেয়নি। তারা মনে করত, আমীরে মুআবিয়ার পর ইয়াযীদের খলীফা মনোয়ন একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ এবং এর নিরসন একান্ত অপরিহার্য। একারণেই হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে খলীফা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদের পর বনূ উমাইয়াদের প্রচেষ্টার ফলে উত্তরাধিকারিত্বের এই ধারণা ক্রমে ক্রমে জোরদার হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই ভ্রান্ত রীতি এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, আজ পর্যন্ত মুসলমানরা তা থেকে মুক্তি পায়নি।

ইয়াযীদ প্রথমে উম্মে হাশিম বিন্‌ত উতবা ইব্‌ন রাবীআকে বিবাহ করে। তার গর্ভে মুআবিয়া ও খালিদ এই দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইয়াযীদ খালিদকে অধিকতর ভালবাসত, কিন্তু মুআবিয়াকেই তার 'অলী আহদ' মনোনীত করে। ইয়াযীদের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল উম্মে কুলসুম বিন্‌ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির। তার গর্ভে আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। আবদুল্লাহ্ তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। এ ছাড়াও ইয়াযীদের দাসীদের গর্ভে আরো কয়েকটি সন্তানের জন্ম হয়।

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের উপনাম ছিল আবূ লায়লা ও আবূ আবদুর রহমান। মুআবিয়ার মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর কয়েক মাস। তিনি একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ যুবক ছিলেন। সিরিয়াবাসীরা ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তাঁর হাতে বায়আত করে। হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র সিরিয়া বাহিনী ও বনূ উমাইয়াদের নিয়ে যখন দামিশকে পৌঁছে তখন মুআবিয়ার হাতে বায়আত-পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। মুআবিয়া খিলাফত লাভ এবং বায়আত গ্রহণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি কিছুটা অসুস্থও ছিলেন এবং এই অবস্থায়ই তাঁর হাতে বায়আত করা হয়। জনসাধারণের চাপে তিনি বায়আত গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং শুধু চল্লিশ দিন, অপর বর্ণনা মতে দু'মাস এবং তৃতীয় বর্ণনা মতে, তিন মাস খিলাফত পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করেন। এই অল্প সময়ে তিনি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে পারেন নি। মুআবিয়া যখন মৃত্যু শয্যায় তখন লোকেরা তাকে বলল, আপনি কাউকে আপনার পরবর্তী খলীফা মনোনীত করুন। তিনি উত্তর দেন, আমি প্রথমেই আমার মধ্যে খিলাফত পরিচালনার কোন দক্ষতা প্রত্যক্ষ করিনি।

তোমরা আমাকে জবরদস্তি করে খলীফা বানিয়েছ। আমি চিন্তা করেছিলাম, যদি উমর ফারূকের মত কোন ব্যক্তিকে পাই তাহলে তার হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করব। কিন্তু তেমন কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি। এরপর আমি চাইলাম, উমর ফারূক (রা) যেমন তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন তেমনি আমিও কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করব। কিন্তু তেমন ব্যক্তিরাও আমার নজরে পড়েনি। অতএব এখন

আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না। তোমরা যাকে ইচ্ছা খলীফা মনোনীত কর। এই বলে তিনি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। শুধু তার মৃতদেহ বের করার জন্যই সেই দরজা খোলা হয়।

বসরায় ইব্‌ন যিয়াদের বায়আত গ্রহণ

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের খিলাফতকে শুধু সিরিয়াবাসী ও মিসরবাসীরাই স্বীকার করেছিল। হিজাযবাসীরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেছিল। ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ ইরাকে পৌঁছলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ বসরায় ছিল। সে বসরাবাসীদের একত্র করে বলে, আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ ইনতিকাল করেছেন। এখন এমন কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়ছে না, যিনি খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন। আমি এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখানেই প্রতিপালিত হয়েছি। আমার পিতাও এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন এবং আমিও এই অঞ্চল শাসন করছি। এখানকার আয়-আমদানির অবস্থা পূর্বের চাইতে অনেক ভালো। মানুষের বেতন-ভাতাও পূর্বের চাইতে বেশি। এখানে দুষ্কৃতিকারীদেরও কোন অস্তিত্ব নেই। এই বক্তৃতা শুনে সবাই বলল, আমরা আপনার হাতে বায়আত করাই সমীচীন মনে করি এবং এজন্য প্রস্তুতও রয়েছি। যাহোক, বসরাবাসীরা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়আত করে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা তাকে অপছন্দ করত। বসরাবাসীদের কাছ থেকে বায়আত নিয়ে সে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তার হাতে বায়আত করতে সরাসরি অস্বীকার করে। বসরাবাসীরা যখন জানতে পারল যে, কূফাবাসীরা ইব্‌ন যিয়াদকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন তারাও তাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। ইব্‌ন যিয়াদ শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ইরাক থেকে দামিশকে পালিয়ে যায়। সে ঠিক সেই সময় দামিশকে গিয়ে পৌঁছে যখন মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিরিয়ায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে।

ইরাকে ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত

কারবালার ঘটনার পর ইমাম হুসাইনের শাহাদাত কূফাবাসীদের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তারাই ইমাম হুসাইনকে পত্র মারফত সেখানে যাবার আহ্বান জানিয়েছিল এবং পুনরায় তাঁর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা তাদের এই আচরণের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিল। অপরদিকে ইব্‌ন যিয়াদও এই হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে কোন উপহার পায়নি, বরং উল্টা তার কাছ থেকে খুরাসানের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অতএব সেও হুসাইন হত্যার জন্য অনুতপ্ত ছিল। কূফার ঐ সমস্ত লোক, যাদের 'শীআনে আলী' বলা হতো, সুলায়মান ইব্‌ন সারদ খুযায়ীর ঘরে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয় এবং নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে তার প্রতিবিধানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অতএব তারা সবাই সুলায়মান ইব্‌ন সারদের হাতে বায়আত করে। সুলায়মান তাদেরকে বুঝিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের এই সংকল্পে অটল থাক, কিন্তু একথা কারো কাছে প্রকাশ করো না বরং ধীরে ধীরে জনসাধারণকে তোমাদের সমমতাবলম্বী করতে থাক। যখন সময় ও সুযোগ আসবে তখন আমরা বিদ্রোহ করব এবং হুসাইন-হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়ব।

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ কূফাবাসীদেরকে তার হাতে বায়আত হওয়ার আহ্বান জানালে তারা তাতে এজন্য সাড়া দেয়নি যে, তারা সুলায়মান ইব্‌ন সারদের প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুযায়ী ইব্‌ন যিয়াদ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় তো তারা ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়আত করতে পারে না। ইয়াযীদের মৃত্যু-সংবাদ শুনে শীআনে আলী সুলায়মানকে বলল, এই সুযোগে আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করুন। কিন্তু সে তাদেরকে এই সংকল্প থেকে বিরত রেখে বলল, এখনো কূফার এক বিরাট সংখ্যক লোক এমনও আছে যারা আমাদের সমমতাবলম্বী হয়ে উঠেনি। এটাই সমীচীন যে, তোমরা আরো কিছুদিন ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ এবং নিজেদের দল ও ক্ষমতা বৃদ্ধি কর।

ইব্‌ন যিয়াদকে সাফ জবাব দেওয়ার পর কূফাবাসীরা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কূফার হাকিম আমর ইব্‌ন হাফিসকে সেখান থেকে বের করে দেয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত মেনে নেয়। আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী কূফার গভর্নর এবং ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা রাজস্ব কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ইব্‌ন যুবায়রের গভর্নর কূফায় আসার এক সপ্তাহ পূর্বে মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দাও, যিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়ার কাছে গিয়েছিলেন, কূফায় এসে পৌঁছেন। এটা হচ্ছে হিজরী ৬৪ সনের রমযান (জুলাই ৬৮৪ খ্রি) মাসের ঘটনা। বসরাবাসীরাও ইব্‌ন যিয়াদের চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিসকে নিজেদের নেতা নির্বাচিত করে। এরপর কূফাবাসীদের ন্যায় নিজেদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত স্বীকার করে নেয়। এভাবে সমগ্র ইরাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিসরে ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত

মিসরের গভর্নর ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দাম। তিনি মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন দূত মারফত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে বায়আত করেন। হিম্‌সের গভর্নর ছিলেন নু'মান ইব্‌ন বশীর এবং কিন্‌নাসরীনের শাসনকর্তা ছিলেন জুফার ইব্‌ন হারিস। এরাও মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত মেনে নেওয়াকে সমীচীন মনে করেন। মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর সাথে সাথে যেহেতু খলীফা নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি তাই দামিশকবাসীরা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সের হাতে এই প্রতিশ্রুতির সাথে বায়আত করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের কোন আমীর নির্বাচিত না হবে ততক্ষণ আমরা আপনাকেই আমীর মানব এবং আপনারই নির্দেশ পালন করব। এই দাহ্‌হাকও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে খলীফা পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করতেন। ফিলিস্তীনের গভর্নর ছিলেন হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক। তিনি অবশ্য চাইতেন যে, বনূ উমাইয়া থেকে পরবর্তী খলীফাও যেন নির্বাচিত হয়।

মোটকথা, মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর সমগ্র ইসলামী বিশ্ব হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফতের উপর একমত হয়ে যায়। বনূ উমাইয়া ব্যতীত অন্য সব বংশ ও গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা খিলাফতের ইত্তরাধিকার প্রথা বাতিলের এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে খলীফা নির্বাচনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ইরাকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের যে অবস্থা হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখন তার ভাই ও খুরাসানের গভর্নর মুসলিম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

খুরাসানে ইয়াযীদের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে মুসলিম ইব্ন যিয়াদ খুরাসানবাসীদেরকে বলেন, ইয়াযীদের মৃত্যু হয়ে গেছে। যতক্ষণ অন্য কোন খলীফা মনোনীত না হয় ততক্ষণের জন্য তোমরা আমার হাতে বায়আত কর। খুরাসানবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে তার হাতে বায়আত করে। কিন্তু কিছুদিন পর তারা তাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। অতএব খুরাসানে মুসলিম প্রায় সেই পরিণতির সম্মুখীন হন, যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল ইরাকে তার ভাই উবায়দুল্লাহ্। মুসলিম ইব্ন যিয়াদ, মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে নিজের জায়গায় খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বয়ং দামিশক অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিমের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিমকে নিজের পক্ষ থেকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং মুহাল্লাব যথারীতি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে বহাল থাকেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম খুরাসানে পৌঁছেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারী ও বিদ্রোহীদেরকে একদম শায়েস্তা করেন। এরপর একদিকে দামিশকে খিলাফতের ব্যাপারটি ফায়সালা হচ্ছিল এবং অন্যদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম তুর্কী ও মুঘলদের পরাজিত করে জনসাধারণের মনে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

যদি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র হুসাইন ইব্ন নুমায়রের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সিরিয়ায় চলে যেতেন, তাহলে খলীফা পদে তাঁর মনোনীত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। তিনি এককভাবে ইসলামী বিশ্বের খলীফা নির্বাচিত হয়ে অবশ্যই ঐ সমস্ত অন্যায় অপকর্মের মূলোৎপাটন করতে পারতেন যেগুলো ইতিমধ্যে শিকড় গেড়েছিল। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপি যে অপরিবর্তনীয়। ইব্ন যুবায়রের ভাগ্যেও তাই ঘটল, যা পূর্ব থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল।

মারওয়ান ইব্ন হাকাম

মারওয়ান ইব্ন হাকাম ইব্ন আবিল আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদে শাম্স ইব্ন আবদে মানাফ-এর জন্ম হয় হিজরী ২ সনে (৬২২-২৩ খ্রি)। তাঁর মাতার নাম ছিল আমিনা বিন্ত আলকামা ইব্ন সাফওয়ান। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি মীর মুনশী ও উযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীরে মুআবিয়ার যুগে তিনি বেশ কয়েকবার মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ছয়মাস পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র এককভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন, বনূ উমাইয়ার কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত খিলাফতের দাবি করেনি। তাই সমগ্র কর্মচারী ও শাসনকর্তারা তাঁর খিলাফতকে স্বীকার করে নিয়েছিল। ছয়-সাত মাস পর মারওয়ান আপন প্রচেষ্টায় সফল হয়ে সিরিয়ায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এমতাবস্থায় তাকে একজন বিদ্রোহী হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে। আর যেহেতু খিলাফত বনূ উমাইয়াদের হাত থেকে একদম চলে গিয়েছিল, তাই মারওয়ানকে বনূ উমাইয়ার খিলাফতের একজন পুনরুজ্জীবনদানকারী বলা যেতে পারে।

খিলাফতের বায়আত এবং মার্‌জ রাহিতের যুদ্ধ

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃতুর পর, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, সিরিয়ার লোকেরাও দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদলে ছিল বনূ ইমাইয়ার লোক। তারা তাদের গোত্রেই 'খলীফা পদ' ধরে রাখতে চাচ্ছিল। অপর দলে ছিলেন দামিশকের শাসনকর্তা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স এবং তার সমমনা কর্মকর্তারা। তারা ভেতরে ভেতরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফতের সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না। সর্বপ্রথম নু'মান ইব্‌ন বশীর হিমসে আবদুল্লাহ্‌র নামে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন। কিন্‌নাসরীনের শাসনকর্তা যুফার ইব্‌ন হারিসও এক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করে। দামিশ্‌কে ছিল বনূ উমাইয়া ও বনূ কাল্‌বের সংখ্যাধিক্য। এই দুই গোত্র আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ছিল। তাই দামিশকের শাসনকর্তা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স, যিনি ভেতরে ভেতরে ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে ছিলেন, খিলাফত সম্পর্কে মুখ খুলে কিছু বলছিলেন না। দামিশ্‌কবাসীরা একথা জানত না যে, হিম্‌স এবং কিন্‌নাসরীনের সেনাবাহিনী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করে ফেলেছে। সর্বপ্রথম হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক কালবী যিনি ফিলিস্তীনের কর্মকর্তা এবং আত্মীয়তা সূত্রে বনী উমাইয়াদের পক্ষপাতী ছিলেন, এ খবর জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাওহ্ ইব্‌ন যানবা'কে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং বলেন, বাহিনীর অধিনায়করা ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করছে। আমাদের গোত্রের লোকেরা জর্দানে রয়েছে, আমি সেখানে গিয়ে ওদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি এখানে খুব সতর্ক অবস্থায় থাক এবং যে কেউ তোমার বিরোধিতা করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবে। এরপর হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক জর্দান অভিমুখে যাত্রা করেন। তার চলে যাওয়ার সাথে সাথে নাবিল ইব্‌ন কায়স আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ নিয়ে রাওহ্ ইব্‌ন যানবা'কে ফিলিস্তীন থেকে বের করে দেন। অতএব রাওহ্‌ও জর্দানে হাস্‌সানের কাছে চলে যান। ফলে ফিলিস্তীন এলাকাও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের অধীনে চলে যায়। হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক জর্দানবাসীদেরকে একত্র করে তাদেরকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে দাঁড় করান এবং তাদেরকে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেন যে, আমরা খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে খলীফা মনোনয়নের চেষ্টা করব। হাস্‌সান এটাও জেনে ফেলেছিলেন যে, দামিশকের শাসনকর্তা দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সও গোপনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে রয়েছেন, তবে সে ব্যাপারে মুখ খুলে কিছু বলছেন না। অতএব হাস্‌সান দাহ্‌হাকের কাছে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের নিন্দা করেন এবং মুআবিয়ার বংশধররাই যে খিলাফতের অধিকতর হকদার সে সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি বলেন, লোকেরা এখানে সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করছে। তুমি অতিসত্তর তা প্রতিহত কর। তিনি এই চিঠি যে দূতের মাধ্যমে দামিশকে পাঠান তাকে বুঝিয়ে বলেন, জুমুআর দিন জামে মসজিদে যখন শহরের সমগ্র গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বনূ উমাইয়ার লোকেরা সমবেত হবে ঠিক তখনি তুমি এই পত্রটি দাহ্‌হাককে পড়ে শুনাবে। দূত তাই করল।

এখানে প্রথম থেকেই দাহ্‌হাকের সমমতাবলম্বী যথেষ্ট লোক বিদ্যমান ছিল। এই চিঠির বিষয়বস্তু জানাজানি হওয়ার সাথে সাথে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দলে ছিল বনূ উমাইয়া ও তাদের পক্ষের লোকেরা। অন্য দলে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষের

লোকেরা। দুই দলের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি শুরু হয় এবং পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা একে অন্যের উপর হামলা পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুআবিয়া মধ্যখানে পড়ে উভয় দলকে বুঝিয়ে সম্মুখযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত রাখেন। দাহ্‌হাক চুপচাপ মসজিদ থেকে বের হয়ে আপন অফিসে চলে আসেন এবং তিন দিন পর্যন্ত সেখান থেকে বের হননি। ঠিক ঐ সময়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ইরাকের দিক থেকে নিরাশ হয়ে সিরিয়া তথা দামিশকে পালিয়ে আসে। সে তথায় পৌঁছাতেই বনূ উমাইয়া এবং তাদের পক্ষের লোকেরা অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দাহ্‌হাক এবং বনূ উমাইয়া সবাই মিলে জাবিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। তখন সাওর ইব্‌ন মাআন সুলমী দাহ্‌হাকের কাছে যান এবং তাকে বলেন, তুমি আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করার পরামর্শ দিয়েছিলে এবং আমরা তোমার সেই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক কাল্‌বীর কথা শুনে তার ভাগ্নে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদের পক্ষে বায়আত গ্রহণের চেষ্টা করছ। এতে দাহ্‌হাক কিছুটা লজ্জা পান এবং সাওরকে বলেন, আচ্ছা বল তো, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? তিনি উত্তর দেন, তুমি এ পর্যন্ত যে জিনিসটি গোপন রেখেছ তা প্রকাশ করে দাও এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়আত করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানাও। একথা শুনে দাহ্‌হাক তার সমমতাবলম্বী লোকদের নিয়ে পৃথক হয়ে যান এবং 'মারজে রাহিত' নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অপরদিকে বনূ উমাইয়া তার পক্ষাবলম্বী বনূ কাল্‌বকে নিয়ে জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক আপন বাহিনীসহ জর্দান থেকে সেখানে এসে পৌঁছেন। জাবিয়ায় সমবেত বনূ উমাইয়া ও বনূ কালবের লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারে গিয়ে পৌঁছে। মারজে রাহিত দাহ্‌হাকের কাছে মোট এক হাজার বনূ কায়সের লোক ছিল। তিনি দামিশকে নিজের যে প্রতিনিধি রেখে এসেছিলেন তাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন মালিক সেখান থেকে বেদখল করে বায়তুল মাল হস্তগত করে নেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল দাহ্‌হাকের জন্য একটি বড় আঘাত। যদি দামেশ্‌ক এবং বায়তুলমাল তার দখলে থাকত তাহলে তিনি এ ধরনের বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়তেন না। দাহ্‌হাক সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই অবস্থা সম্পর্কে হিম্‌স, কিন্‌নাসরীন ও ফিলিস্তীনে যথাক্রমে নু'মান ইব্‌ন বশীর, যুফার ইব্‌ন হারিস ও নায়ল ইব্‌ন কায়সকে অবহিত করেন। তারা দাহ্‌হাকের সাহায্যার্থে মারজে রাহিতে সৈন্য প্রেরণ করে। এদিকে হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক জাবিয়ায় ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। সেখানেও নতুন একজন আমীর বা খলীফা নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে। এজন্য সাধারণভাবে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদের নাম প্রস্তাব করা হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, তারই দিকে অধিকাংশ লোকের ঝোঁক রয়েছে।

মারওয়ান গোপনে গোপনে নিজের খিলাফতের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। মারওয়ানেরই ইঙ্গিতে একদা রাওহ্ ইব্‌ন যানবা এক সাধারণ সভায় খিলাফতের ব্যাপারে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এখনো বয়সে কচি। আমাদের একজন অভিজ্ঞ সদাসতর্ক খলীফার প্রয়োজন। আর এদিক দিয়ে মারওয়ান ইব্‌ন হাকামই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত খিলাফতের বিভিন্ন কাজে জড়িত থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অতএব এটাই বাঞ্ছনীয় যে, আমরা মারওয়ানকেই খলীফা

নির্বাচিত করব। কিন্তু এই শর্তে যে, মারওয়ানের পর খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ খলীফা হবেন। আর খালিদের পর খলীফা হবেন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস।

মোটকথা, জাবিয়া নামক স্থানে খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিবেচনাধীন থাকে। শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের চেষ্টায় রাওহ্ ইব্‌ন যানবা-এর উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তারই ভিত্তিতে বনূ উমাইয়া, বনূ কাল্‌ব, গাস্‌সান, তাঈ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা মারওয়ানের হাতে বায়আত করে। এরপর মারওয়ান আপন দলবলসহ মার্‌জ রাহিতের দিকে অগ্রসর হন এবং দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সের মুখোমুখি হয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। তখন মারওয়ানের কাছে মোট তের হাজার সৈন্য ছিল। অপর দিকে দাহ্‌হাকের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর চার গুণ। উভয়পক্ষ নিজেদের ডান পাশের ও বাম পাশের বাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। বিশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ মারওয়ানকে তার সৈন্যর স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে এই পরামর্শ দেন যে, শত্রুদের উপর রাত্রের বেলায়ই আকস্মিক হামলা করা উচিত। যেহেতু বিশ দিন পর্যন্ত উভয়বাহিনী সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং কেউ কারো উপর রাতের বেলা আক্রমণের চেষ্টা করেনি, তাই দাহ্‌হাক এবং তার বাহিনী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। উপরন্তু দিনের বেলা মারওয়ান তার কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়ে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সন্ধির শর্তাবলী মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো উপর হামলা করতে পারবে না। এই প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন দাহ্‌হাক এবং তার বাহিনী গভীর নিদ্রায় মগ্ন ঠিক তখনি মারওয়ানের বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে তাদের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। ফলে বনূ কায়সের ৮০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ বনূ সালীমের ছয়শ লোক মারা যায়। দাহ্‌হাকও নিহত হন। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বনূ কাল্‌ব ও বনূ কায়সের মধ্যকার যুদ্ধ। এই দু'টি গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়া যুগ থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। ইসলাম তাদের এই শত্রুতাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দু'টি গোত্রকেই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি তাদের পরস্পর শত্রুতাকে অত্যন্ত কৌশলের সাথে দাবিয়ে রাখেন। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে বনূ কাল্‌ব গোত্রে এজন্য বিবাহ করান, যাতে সবসময় একটি শক্তিশালী গোত্রের সহায়তা লাভ করতে পারেন। বনূ কায়সের লোকসংখ্যা ছিল বনূ কালবের চাইতে অধিক। তাই তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। এই দু'টি গোত্রকেই সিরিয়ায় দু'টি বৃহৎ শক্তি হিসাবে গণ্য করা হতো। কিন্তু যেভাবে হযরত উমর ফারূকের ইনতিকালের পর বনূ উমাইয়া ও বনূ হাশিমের পুরাতন শত্রুতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, ঠিক সেভাবে আমীরে মুআবিয়ার ইনতিকালের পর বনূ কায়স ও বনূ কালবের বিস্মৃত-প্রায় শত্রুতাও পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং 'মারজে রাহিত'-এর যুদ্ধ এই শত্রুতাকে চিরঞ্জীব করে দিয়ে ইসলামের একটি মহান আদর্শকে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর যখন দামিশ্‌ক খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মতানৈক্য চলছিল এবং বনূ কাল্‌ব ও বনূ কায়সের মধ্যে পুনরায় শত্রুতা দেখা দিতে শুরু করেছিল তখন

মারওয়ান এই দেখে যে, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার বিরাট সংখ্যক লোক আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফতকে স্বীকার করে নিয়েছে– যত শীঘ্র সম্ভব আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর হাতেই খিলাফতের বায়আত করার সংকল্প নেন। দামিশকের জামে মসজিদে যখন জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তখন মারওয়ান বনূ উমাইয়ার খিলাফত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মক্কা সফরের প্রস্তুতি নেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ দামিশকে এসে পৌঁছে এবং মারওয়ানের ইচ্ছার কথা জেনে তাকে অনেক বলে-কয়ে উক্ত সফর থেকে বিরত রাখে। ইব্ন যিয়াদেরই চেষ্টার ফলে মারওয়ানের হাতে বায়আত করা হয়। আর তারই কূটচালে পড়ে মারজে রাহিতের যুদ্ধে দাহ্হাক ইব্ন কায়স নিহত হন এবং বনূ কায়স পরাজিত হয়।

মারজে রাহিতে বিজয় লাভের পর মারওয়ান দামিশ্কে আসেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার প্রাসাদেই বসবাস করতে থাকেন। ইব্ন যিয়াদের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে এসেই তিনি সর্বাগ্রে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের মাকে বিবাহ করেন, যাতে একাধারে বনূ কাল্বের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ এবং আগামীতে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের অলী আহ্দীর আশংকা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। এরপর তিনি ফিলিস্তীন ও মিসরের দিকে যাত্রা করেন এবং হিজরী ৬৫ (৬৮৪ খ্রি মধ্য ভাগে) সনের প্রথম ভাগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষাবলম্বী সকল লোককে পরাজিত করে হয় হত্যা করেন অথবা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের মারাত্মক ভুল এই হয়েছিল যে, সিরিয়ায় তার অনুকূলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে তিনি লাভবান হওয়ার কোন চেষ্টা করেননি এবং যথাসময়ে নিজের সমর্থকদের কাছেও কোন সাহায্য পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি তাঁর ভাই মুসআবকে সিরিয়ার উপর আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশ তখনি দেওয়া হয় যখন সিরিয়ায় তার সমর্থকরা একেবারে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল।

তাওয়াবীনের যুদ্ধ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজরী ৬৪ সনের রমযান (৬৮৪ খ্রি-এর মে) মাসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষ থেকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে আসেন। ঐ সময়ে মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দাও কূফায় এসে জনসাধারণকে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানি দিতে থাকে। লোকেরা তখন বলে, আমরা তো প্রথমেই এজন্য সুলায়মান ইব্ন সারদের হাতে বায়আত করেছি। কিন্তু কাজ সম্পাদনের সুযোগ এখনো আসেনি। মুখতার বলে, সুলায়মান কাপুরুষ। সে কোন না কোন ভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চায়। আমাকে ইমাম হুসাইনের ভাই ইমাম মাহ্দী মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়া আপন প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। তোমরা সবাই আমার হাতে বায়আত করে হত্যাকারীদের থেকে ইমাম হুসাইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। একথা শুনে জনসাধারণ মুখতারের হাতে বায়আত করতে থাকে। এই সংবাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদের কাছে কূফায় গিয়ে পৌঁছলে তিনি ঘোষণা করেন, মুখতার এবং তার সমর্থকরা যদি ইমাম হুসাইনের হত্যাকারীদের থেকে তাঁর খুনের প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তাকে আমরাও একাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু

যদি সে আমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করতে চায় তাহলে আমরা তার মুকাবিলা করে তাঁকে উচিত শাস্তি দেব। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, সুলায়মান ইব্‌ন সারদ এবং তার সমর্থকরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। হিজরী ৬৫ সনের ১লা রবিউল আউয়াল (৬৮৫ খ্রি-এর অক্টোবর) সুলায়মান কূফা থেকে বের হয়ে নাখীলা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সতের হাজার যোদ্ধা তার আশেপাশে সমবেত হয়। কূফার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ তার কোন বিরোধিতা করেননি। যেহেতু মুখতার পৃথক দল গঠন করতে চাচ্ছিল এবং সুলায়মানের উদ্দেশ্যও তাই ছিল, যা মুখতার সর্বত্র বলে বেড়াত– তাই কূফার কিছু গন্যমান্য ব্যক্তির আন্দোলনের ফলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুখতারকে ধরে বন্দী করে ফেলেন। সুলায়মান রবিউস্ সানী সতের হাজার সৈন্য নিয়ে নাখীলা থেকে সিরিয়া সীমান্তের দিকে যাত্রা করেন। রওয়ানা হওয়ার সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন নুফায়ল সুলায়মানকে বলেন, হুসাইনের প্রায় সকল হত্যাকারীই কূফায় রয়েছে। আপনি ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর হত্যাকারীদের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছেন ? সুলায়মান বলেন, এরা তো সাধারণ সিপাহী ছিল। ইব্‌ন যিয়াদই হুসাইনকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল। এদিক দিয়ে প্রকৃত হত্যাকারী হচ্ছে সে-ই। অতএব সর্বপ্রথম তাকেই হত্যা করা উচিত। তাকে খতম করতে পারলে অবশিষ্ট লোকদের শায়েস্তা করা খুবই সহজ। যাহোক তারা নাখীলা থেকে রওয়ানা হয়ে কারবালায় গিয়ে পৌঁছে যেখানে হযরত হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং যেখানে তাঁর মস্তকবিহীন লাশ দাফন করা হয়েছিল। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'আইনুল ওয়ারদা' নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু গাড়ে। এদের সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ, যিনি মুসেলের গভর্নর হিসাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন, তাদের মুকাবিলা করার জন্য হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রের নেতৃত্বে বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সুলায়মান হিজরী ৬৫ সনের ২১শে জমাদিউল উলা (৬৮৫ খ্রি-এর ডিসেম্বর) আইনুল ওয়ারদায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। পাঁচদিন অপেক্ষা করার পর ২৬শে জমাদিউল আউয়াল হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রও সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। ঐ দিনই যুদ্ধ শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত সিরীয়রা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু রাত এসে পড়ায় তারা সেদিনকার মত রক্ষা পায়। পরদিন ভোরে ইব্‌ন যিয়াদ প্রেরিত আট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রের সাহায্যার্থে সেখানে এসে পৌঁছে। আজও ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; কিন্তু কোন চূড়ান্ত ফায়সালা হয়নি। উভয় বাহিনী অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে রাত কাটায়। ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইব্‌ন যিয়াদ প্রেরিত দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সিরীয়দের সাহায্যার্থে সেখানে এসে পৌঁছে। আজও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং তাতে সুলায়মানসহ কূফার প্রায় সকল নেতাই নিহত হন। কূফী বাহিনীতে খুব কম সৈন্যই অবশিষ্ট থাকে। তাই রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তারা সেখান থেকে পলায়ন করে। হুসাইন ইব্‌ন নুমায়র তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। সুলায়মান ও তার সঙ্গীদেরকে 'তাওয়াবীন' (তাওয়াবের বহুবচন–তাওয়াব অর্থ তওবাকারী) বলা হতো। অর্থাৎ তারা ইমাম হুসাইনকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করবার মত জঘন্য অপরাধ করেছিল এবং এখন তওবা করে সেই অপরাধের ক্ষতিপূরণ করতে চাচ্ছে। এ কারণে আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধকেও তাওয়াবীনের যুদ্ধ বলা হয়। তওবা কোন

সাম্রাজ্যের বা কোন শাসকের নিয়মিত সৈন্য ছিল না, বরং নিজে থেকে একত্রিত হয়ে ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা করতে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পালিয়ে আসা সামান্য সংখ্যক সৈন্য ব্যতীত ওদের সকলেই নিহত হয়।

খারিজীদের সাথে যুদ্ধ

একদিকে আইনুল ওয়ারদায় তাওয়াবীরা যুদ্ধ করছিল এবং অন্যদিকে বসরায় খারিজীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারস। বসরা এবং বসরার বাইরের খারিজীরা আহওয়ায অঞ্চলের দূলাব নামক স্থানে সমবেত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারস মুসলিম ইব্‌ন আবীস ইব্‌ন কুরায়স ইব্‌ন রাবীআকে খারিজী দমনে প্রেরণ করেন। মুসলিম ইব্‌ন আবীস আপন বাহিনী নিয়ে দূলাবে গিয়ে পৌঁছেন। খারিজীরা নাফিঈ ইব্‌ন আরযাককে তাদের নেতা ও প্রধান সেনাপতি মনোনীত করে। হিজরী ৬৫ সনের জমাদিউস্‌সানী (৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী) 'দুআব' নামক স্থানে নাফিঈ ইব্‌ন আরযাক ও মুসলিম ইব্‌ন আবীসের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এতে মুসিলম এবং নাফিঈ উভয়েই নিহত হন। বসরাবাসীরা মুসলিমের স্থলে হাজ্জাজ বাবকে এবং খারিজীরা নাফিঈ-এর স্থলে আবদুল্লাহ্ তামীমীকে নিজেদের সেনাপতি নিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত খারিজীরা বিজয় লাভ করে। বসরাবাসীরা খারিজীদের বিজয় এবং বসরাবাসীদের পরাজয়ের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হয়। একজন দ্রুতগামী দূত সঙ্গে সঙ্গে এ খবর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সুফরাকে খুরাসানের এবং হারস ইব্‌ন রাবীআকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। যখন হারস ইব্‌ন রাবীআ বসরার শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুহাল্লাব খুরাসান যাত্রার সংকল্প নেন তখন খারিজীদের সেনাবাহিনী এবং তাদের বিদ্রোহের প্রবল বন্যা বসরার নিকটে এসে পৌঁছে। হারস ইব্‌ন রাবীআ আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়সকে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য সেনাপতি নিয়োগ করতে চাইলে আহ্‌নাফ বলেন, এ কাজের জন্য মুহাল্লাবই হচ্ছেন যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু মুহাল্লাব বলেন, আমি খুরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে যাব এবং এ কাজ আনজাম দিতেও আমার আপত্তি নেই—তবে এই শর্তে যে, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যয় বাবদ আমাকে বায়তুলমাল থেকে যথেষ্ট অর্থ ও আসবাব-সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। এরপর যুদ্ধ করে আমি খারিজীদের কাছ থেকে যে সমস্ত অঞ্চল কেড়ে নেব সেগুলো আমাকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করতে হবে।

হারস ইব্‌ন রাবীআ উপরোক্ত শর্ত মেনে নিলে মুহাল্লাব বার হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে খারিজীদের মুকাবিলায় রওয়ানা হন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে খারিজীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। ফলে বেশ কয়েকবারই বসরাবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুহাল্লাবের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও অভিজ্ঞতা বসরাবাসীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। খারিজীরা বিপুল বিক্রমে বার বার হামলা করেও শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কিরমান ও ইস্পাহানের দিকে চলে যায়।

কিরকীসা অবরোধ

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের খিলাফতের পূর্বে কিন্‌নাসসিরীনের শাসনক্ষমতা যুফার ইব্‌ন হারিসের হাতে ছিল। মারওয়ান সাফল্যলাভ করার পর যুফার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে গিয়ে মারওয়ান কর্তৃক মিসর দখলের সংবাদ দেন। তিনি তখন যুফারকে কিরকীসার কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। কিরকীসা ছিল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সীমান্ত জেলা। আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধের পর, মারওয়ান উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে নির্দেশ দেন, 'যুফারকে কিরকীসা থেকে বহিষ্কার করে দাও। ইব্‌ন যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে কিরকীসা অবরোধ করেন। যুফার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইব্‌ন যিয়াদকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। এই অবরোধ এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, শেষ পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এবং নিজের সাফল্যের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে দামিশ্‌কে ফিরে আসে।

মারওয়ান পুত্রদের অলীআহ্‌দ নিয়োগ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে কিরকীসা অবরোধের নির্দেশ দিয়ে মারওয়ান নিজ পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগের প্রচেষ্টা চালান। তিনি সাধারণত প্রচার করে দেন যে, আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'আস বলে, মারওয়ানের মৃত্যুর পর আমি খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে কখনো তার স্থলাভিষিক্ত হতে দেব না, বরং আমি আমার নিজের খিলাফতের জন্য জনসাধারণের বায়আত গ্রহণ করব। একথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। মারওয়ান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক কালবীকে, যে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং প্রতারিত করে স্বমতে নিয়ে আসেন। এবার হাস্‌সানই এই মর্মে আন্দোলন শুরু করেন যে, মারওয়ানের পর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে এবং তারপর আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানকে খলীফা মনোনীত করতে হবে। হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক দামিশ্‌কের জামে মসজিদে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমীরুল মু'মিনীন মারওয়ানের পর লোকেরা খিলাফতের ব্যাপারে পুনরায় ঝগড়া-বিবাদ শুরু করবে। এই বিপদ থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার জন্য আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি এবং আশা করছি আমিরুল মু'মিনীন ও সমগ্র মুসলমান আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। প্রস্তাবটি এই যে, আমীরুল মু'মিনীন তার পরবর্তী খলীফা হিসাবে পর্যায়ক্রমে তার পুত্র আবদুল মালিককে ও আবদুল আযীযকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করবেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে এজন্য বায়আত গ্রহণ করবেন। তখন কেউই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি বা করার সাহস পায়নি। তাই সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং তখন আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের 'অলীআহ্‌দী'র বায়আত গ্রহণ করা হয়।

মারওয়ানের মৃত্যু

উপরোক্ত বায়আত যেহেতু খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে ছিল এবং তার ঘোর সমর্থকদেরকে মারওয়ান ইতিমধ্যে নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই এতে তিনি

অত্যন্ত মর্মাহত হন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কেউ কিছুই করতে পারেনি। এরপর মারওয়ান খালিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাকে কিভাবে জনসাধারণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, রাতদিন তিনি সেই ফন্দি-ফিকিরই আঁটতে থাকেন। এতেও যখন তার মন ভরল না তখন তিনি খালিদকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। খালিদ তার মা অর্থাৎ মারওয়ানের স্ত্রীর কাছে যখন অভিযোগ করল যে, সে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে তখন তার মা উম্মে খালিদ বলল, তুমি চুপচাপ থাক। আমিই মারওয়ান থেকে এর প্রতিশোধ নিচ্ছি। এরপর একদিন উম্মে খালিদ তার চার-পাঁচটি দাসীকে পূর্ব থেকে তৈরি করে রাখে। সেদিন রাতের বেলা মারওয়ান প্রাসাদে এসে শুয়ে পড়েন। তখন উম্মে খালিদের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দাসীরা মারওয়ানের মুখে কাপড় গুঁজে এমনভাবে চেপে ধরে যে, তার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হতে পারেনি এবং এই সুযোগে দাসীরা তাকে গলাটিপে হত্যা করে। এটা হিজরী ৬৫ সনের ৩রা রমযানের (৬৮৫ খ্রি-এর এপ্রিল) ঘটনা। ঐ দিনই দামিশ্‌কে আবদুল মালিকের হাতে লোকেরা বায়আত করে। আবদুল মালিক তাঁর পিতার কিসাসস্বরূপ উম্মে খালিদকে হত্যা করেন। মাওয়ান ইব্‌ন হাকাম ৬৩ বছর বয়সে মারা যান। তিনি সর্বমোট সাড়ে নয় মাস খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)

হযরত আবুদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ও তাঁর খিলাফতের বর্ণনা ইতিপূর্বে শুরু হয়েছে। যেহেতু মারওয়ানের মৃত্যু অবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফত আমলে হয়েছে এবং তার মৃত্যুর পরও তার খিলাফত অনেক দিন পর্যন্ত টিকে ছিল তাই মধ্যখানে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া এবং মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর মারওয়ানের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে এখন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু তাঁর খিলাফত ও শাসনকাল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের খিলাফতের পরেও অব্যাহত ছিল তাই তাঁর ও তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পর আলোচনা করা হবে। কারবালার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর যে যুগ শুরু হয় তা পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ ছিল, যেমন ছিল হিজরী ৩৬ থেকে ৪০ সন (৬৫৬ থেকে ৬৬০-৬১ খ্রি) পর্যন্ত সময়পর্ব। আমরা এখন একটি ভয়ংকর যুগের আলোচনায় এসেছি। এই যুগের পরিস্থিতি বর্ণনায় কালের ধারা বজায় রাখা খুবই কঠিন। এই সময়পর্বের ঘটনাবলী এতই জটিল যে, কালের ধারাবাহিকতা বজায় না রেখেও এগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সাজানো সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের তুলনায় আমার এই গ্রন্থে যতবেশি সম্ভব ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে পাঠকের মস্তিষ্ক ভারী হয়ে না ওঠে এবং তারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারেন।

বংশ পরিচয়, প্রাথমিক অবস্থা, চরিত্র ও গুণাবলী

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বংশতালিকা হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ইব্‌ন খুয়ায়লিদ ইব্‌ন আসা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই। তাঁর উপনাম ছিল আবূ

খুবায়ব। তিনি নিজে সাহাবী ছিলেন এবং সাহাবীর পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁর মা হযরত আসমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বোন। তাঁর দাদী সুফিয়্যা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার বিশ মাস পর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর জন্ম হয়। মদীনায় তিনি মুহাজিরদের সর্বপ্রথম সন্তান। তাই তাঁর জন্মের পর মুহাজিররা আনন্দ উৎসব করেন। কেননা ইহুদীরা যখন দেখল যে, মদীনায় হিজরত করার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মুহাজিরদের কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তারা একথা প্রচার করে দেয় যে, আমরা যাদু করেছি, এখন মুহাজিরদের আর কোন সন্তান হবে না। তাই তাঁর জন্মের পর যেমন মুসলমানরা আনন্দ প্রকাশ করে, তেমনি লজ্জা ও অপমানে ইহুদীদের মুখ কালো হয়ে যায়। জন্মের পর পরই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে খেজুর চিবিয়ে তরল করে তা আবদুল্লাহ্‌র মুখে দেন এবং নবজাতক তা চুষে খান।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) অনেক বেশি রোযা রাখতেন এবং প্রচুর নামাযও পড়তেন। কখনো কখনো তিনি সারারাত দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা রুকূর অবস্থায় অথবা সিজদার অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। আত্মীয়তার সম্বন্ধ বহাল রাখার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বীর সেনাপতি। তাঁর অশ্বারোহণের দক্ষতা কুরায়শের মধ্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী, অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং বাগ্মী পুরুষ। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন ছিল উঁচু, তেমনি স্পষ্ট। যখন তিনি ভাষণ দিতেন তখন তাঁর কণ্ঠধ্বনি নিকটস্থ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতো।

আমর ইব্‌ন কায়স বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের একশ ক্রীতদাস এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভাষা ছিল পৃথক। আর তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে তাদের স্ব-স্ব ভাষায় কথা বলতেন। তিনি আরো বলেন, আমি যখন তাঁকে কোন ধর্মীয় কাজে মগ্ন দেখতাম তখন আমার ধারণা হতো, ঐ অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও দুনিয়ার কোন কথাই তাঁর মনে পড়ছে না।

একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র আসাদী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে আসেন এবং বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এবং আপনি অমুক সূত্রে পরস্পর আত্মীয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তখন বলেন, ঠিকই বলেছ। তবে যদি চিন্তা কর তাহলে দেখবে সকল মানুষই পরস্পরের আত্মীয়। কেননা তারা সকলেই যে আদম ও হাওয়ার সন্তান। আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেন, আমার 'নাফাকাহ্' শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার হাতে এখন খরচ করার মত কোন অর্থ নেই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি তো তোমার 'নাফাকাহ্‌র দায়-দায়িত্ব নেইনি। আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেন, আমার উটটি ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, তুমি এটাকে কোন গরম জায়গায় নিয়ে রাখ এবং গরম বস্ত্র (কম্বল ইত্যাদি) দিয়ে ঢেকে দাও। আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেন, আমি আপনার কাছে পরামর্শ নিতে আসি নি বরং কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি। অভিশাপ ঐ উটের উপর, যে আমাকে আপনার কাছে এভাবে আসতে বাধ্য করেছে।

ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পরই মক্কার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। ইয়াযীদের শাসনামলে তিনি মক্কায় বনূ উমাইয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেন নি। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তিনি নিজের পক্ষে খিলাফতের বায়আত নেন এবং সিরিয়ার কিছু জায়গা ছাড়া সমগ্র ইসলামী বিশ্ব তাঁর খিলাফত স্বীকার করে নেয়। ঐ যুগে সিরিয়ায় তাঁর জন্য যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। আমীরে মুআবিয়ার পর সিরিয়ায় বনূ উমাইয়ার অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর উপলব্ধিতে আসেনি। যদি তিনি বনূ কায়স ও বনূ কালবের পরস্পর শত্রুতা এবং সিরিয়ায় তাঁর যে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছিল তা যথাসময়ে অনুধাবন করতে পারতেন তাহলে তিনি অবশ্যই একবার না একবার সিরিয়া সফর করতেন। আর তাঁর ঐ সফর তাঁর জন্য ঠিক সেরূপ কল্যাণকর হতো, যেমন কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সিরিয়া সফর। তিনি সিরিয়া সফর করলে মারওয়ানের খিলাফত লাভ এবং বনূ উমাইয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই থাকত না। যদি তিনি মক্কার পরিবর্তে মদীনাকে রাজধানী করতেন এবং ইয়াযীদের মৃত্যুর পর পরই মদীনায় চলে আসতেন তাহলে অপেক্ষাকৃত নিকটতর হওয়ার কারণে তিনি সিরিয়ার উপর অতি সহজেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এবং দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স, যুফার ইব্‌ন হারিস, নু'মান ইব্‌ন বশীর ও আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দামকে এভাবে পরাস্ত হতে দিতেন না। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যদি ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ থেকে সামান্য সাহায্য-সহযোগিতাও পেতেন তাহলে কখনো মাওয়ান, হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক এবং উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে পরাজিত হতেন না। মোটকথা, এই ভুলের বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন তাঁর থেকে বেদখল হয়ে যায় এবং সেই সুযোগে মারওয়ান তার বংশের জন্য খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন।

মুখতারের বিশৃংখলা সৃষ্টি

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলায়মান ইব্‌ন সারদ তাওয়াবদের নিয়ে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কূফা থেকে রওয়ানাকালে কূফার গভর্নর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মুখতার ইব্‌ন উবায়দা ইব্‌ন মাসউদ সাকাফীকে বন্দী করেন। এতে সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে তাওয়াবরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অবশ্য তাদের কিছু লোক কোনমতে প্রাণ নিয়ে কূফায় পালিয়ে আসে। তখন মুখতার বন্দীশালা থেকে একটি পত্র মারফত তাওয়াবদের কাছে একটি শোকবাণী পাঠায়। তাতে সে বলে, তোমরা মোটেই দুঃখ করো না, বরং নিশ্চিন্ত থাক। যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তোমাদের চোখের সামনেই হত্যাকারীদের থেকে ইমাম হুসাইনের এবং সেই সাথে তোমাদের সকল শহীদের হত্যার প্রতিশোধ নেব। আমি শত্রুদের কাউকে ছাড়ব না এবং এমনভাবে রক্তবন্যা বইয়ে দেব যে, মানুষের চোখের সামনে পুনরায় বখতে নসরের শাসনকাল এবং বনী ইসরাঈলের সাথে সে যে নির্মম ব্যবহার করেছিল সেই দৃশ্য ভেসে উঠবে। ঐ বাণীতে সে আরো বলে, দুনিয়ায় কি এমন কেউ অবশিষ্ট আছে যে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমার দিকে এগিয়ে আসবে এবং সেজন্য আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে ?

রিফাআ ইব্‌ন শাদ্দাদ, সায়নী ইব্‌ন মাখরাবা আবদী, সা'দ ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান, ইয়াযীদ ইব্‌ন আনাস, আহমার ইব্‌ন শামীত হিমসী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইয়ামানী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কামিল প্রমুখ তাওয়াবীন ঐ পত্র পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এই ভেবে যে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এখনো এমন এক ব্যক্তি বিদ্যমান আছে, যে আন্তরিকভাবে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় এবং এজন্য সে বদ্ধপরিকর। এরপর রিফাআ ইব্‌ন শাদ্দাদ চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে নিয়ে জেলখানায় যায় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মুখতারের সাথে দেখা করে। তারা বলে, জেলখানা ভেংগে হলেও আমরা আপনাকে মুক্ত করব। মুখতার উত্তরে বলে, এজন্য আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। আমি যখন ইচ্ছা, নিজেই বের হয়ে আসতে পারব। স্বয়ং কূফার গভর্নর আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ আমাকে মুক্ত করে দেবেন। সে সময় এখনো আসেনি। আপনারা আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরুন।

তাওয়াবরা (তাওয়াবীন) পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে কূফায় ফিরে আসার পূর্বে মুখতার জেলখানা থেকেই কোন একটি লোকের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। তাতে সে লিখেছিল, আমাকে কূফার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ বন্দী করে রেখেছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমার জন্য সুপারিশ করে তার কাছে একটি চিঠি লিখুন। আমি মজলুম ও অত্যাচারিত। আল্লাহ্ তা'আলা এই সুপারিশের জন্য আপনাকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। মুখতারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তার জন্য সুপারিশ করবেন। ফলে সে জেলখানা থেকে অনায়াসে মুক্তি পাবে। কিন্তু সে এ কথাটি গোপন রেখে নিজের মুক্তির ব্যাপারে রিফাআর সাথে এমন ভঙ্গিতে আলাপ করে যেন সে তার 'কারামতী' দ্বারাই আদুল্লাহ্‌কে বশীভূত করে মুক্তিলাভ করবে। সে এর দ্বারা তাওয়াবদের উপর তার কারামতী যাহির করতে চাচ্ছিল। যাহোক কিছুদিন পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদের কাছে একটি সুপারিশপত্র পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমরের সুপারিশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মুখতারকে জেলখানা থেকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তোমাকে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি, তবে এই শর্তে যে, তুমি কূফায় কোন গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না এবং সব সময় নিজের ঘরে থাকবে। মুখতার ঐ শর্তটি মেনে নেয় এবং জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের ঘরে এসে অবস্থান করতে থাকে। শীআনে হুসাইন এই আকস্মিক মুক্তি লাভকে মুখতারের একটি কারামত বলেই ধরে নেয় এবং তার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে আসা-যাওয়া করতে থাকে। তাদের এই আসা-যাওয়া হতো অত্যন্ত সঙ্গোপনে। কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হয়। এরপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদকে পদচ্যুত করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে তার স্থলে কূফার গভর্নর করে পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী' হিজরী ৬৬ সনের ২৫শে রমযান (৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) কূফা এসে পৌঁছেন। এই নিয়োগ ও বরখাস্তের মধ্যে মুখতার একটি আশার আলো দেখতে পায়। প্রাক্তন গভর্নর কূফা থেকে চলে যাওয়ার পর সে তার আরোপিত বিধিনিষেধ লংঘন করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা শুরু করে। তার কাছে লোকের আসা-যাওয়া অনেক বেড়ে যায় এবং সেই সাথে তার ভক্ত-অনুরক্তের সংখ্যাও বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী ইয়াস ইব্‌ন আবূ মাদারাবকে কূফার পুলিশ

প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। একদা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী'কে বলেন, মুখতারের দল অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আবার বিদ্রোহ করে বসে কিনা। অতএব তাকে ডেকে পাঠিয়ে পূর্বের ন্যায় গৃহবন্দী করে রাখাই সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী মুখতারের চাচা যায়দ ইব্ন মাসঊদ সাকাফী ও হুসাইন ইব্ন রাফিঈ আযাদীকে মুখতারের কাছে এই বলে পাঠান, 'তোমরা মুখতারকে আমার কাছে একটু ডেকে নিয়ে এস। তার সাথে আমার কিছু দরকারী কথা আছে। তারা উভয়ে মুখতারের কাছে গেল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীর উপরোক্ত পয়গাম পৌঁছিয়ে দিল। মুখতার দ্রুত পোশাক পরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীর কাছে আসার জন্য তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার চাচা যায়দ নিম্নোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করল।

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُاللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ-

"স্মরণ কর, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য; তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (৮ ঃ ৩০)।

মুখতার এই আয়াত শুনে বুঝে নিল, যায়দ তাকে কি বলতে চাচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, শীঘ্র লেপ নিয়ে এস, জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। এরপর সে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং হুসাইন ইব্ন রাফিঈকে বলল, দেখুন আমি তো যাওয়ার জন্য তৈরিই ছিলাম। কিন্তু কি করব, হঠাৎ জ্বর এসে গেল, আপনারা তো আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। গর্ভনরের কাছে গিয়ে বলুন, আগামীকাল যখন আমার অবস্থা কিছুটা ভাল হবে তখন অবশ্যই তার খিদমতে গিয়ে হাযির হব। এরপর ঐ দুই ব্যক্তি মুখতারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে হুসাইন যায়দকে বললেন, তুমি যে ঐ আয়াতটি পাঠ করে আকারে ইঙ্গিতে মুখতারকে গভর্নরের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলে তা আমি টের পেয়েছি। সে তোমার ইঙ্গিত পেয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েও যে জ্বরের ভান করেছে তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তবে হ্যাঁ,তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি একথা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীকে বলব না। কেননা হয়ত মুখতারের মাধ্যমেই আমি কোন দিন উপকৃত হব। যাহোক তারা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতীর কাছে এসে বলল, আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি, মুখতার অসুস্থ। এখন আপনার কাছে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ সে আসবে।

যায়দ এবং হুসাইন চলে যাবার পর মুখতার তার হাতে বায়আতকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাল এবং বলল, আর বেশিদিন অপেক্ষা করার সময় নেই। বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য আমাদের শীঘ্রই তৈরি হয়ে যেতে হবে। তারা বলল, আপনি যে নির্দেশই দেবেন আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমাদের এক সপ্তাহের সময় দিতে হবে, যাতে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে পুরোদমে তৈরি হয়ে যেতে পারি।

মুখতার বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী আমাকে কখনো এক সপ্তাহের সময় দেবেন না। তখন সা'দ ইব্ন আবূ সা'দ বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি আবদুল্লাহ্ আপনাকে একান্তই বন্দী করে ফেলে তাহলে আমরা জোর করে আপনাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসব। মুখতার একথা শুনে নীরব হয়ে যায়। এবার ভক্তরা তাকে তার ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে একটি অখ্যাত জায়গায় লুকিয়ে রাখে। এরপর সা'দ ইব্ন আবূ সা'দ তার সমমনাদের বলে, বিদ্রোহ করার পূর্বে আমাদের একথা যাচাই করে দেখতে হবে যে, মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া মুখতারকে একাজের জন্য তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন কি না। যদি মুখতার তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের জন্য সত্যিই আদিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে দ্বিধাহীন চিত্তে তার অধীনে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। আর যদি মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া কর্তৃক তিনি আদিষ্ট না হয়ে থাকেন এবং আমাদের প্রতারণা করতে চান তাহলে তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। এরপর সেই মুহূর্তেই সা'দ ইব্ন আবূ সা'দ তিন-চার ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে পৌঁছে তারা মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়াকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, আমি মুখতারকে আলী-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছি। একথা শুনে সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে কূফায় ফিরে আসে এবং পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে। এবার লোকেরা মুখতারের হাতে বায়আত করতে এগিয়ে আসে। মুখতার যখন জানতে পারে যে, তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, তার ব্যাপারে জনসাধারণের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। এবার সে সবাইকে বলে, আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হলে ইবরাহীম ইব্ন মালিক ইব্ন উশতারকেও, যিনি কূফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম, আমাদের দলে ভিড়াতে হবে। অতএব মুখতারের অন্যতম শিষ্য আমের ইব্ন শুরাহবিল ইবরাহীম ইব্ন মালিকের সাথে সাক্ষাত করে বলে, তোমার পিতা হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে ছিলেন এবং তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিয়েছেন। এখন লোকেরা এ ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প যে, যেভাবেই হোক হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব তোমারও এতে শরীক হওয়া উচিত।

ইবরাহীম উত্তর দেয়, আমি এই শর্তে তোমাদের সাথে শরীক হতে পারি যে, আমাকে দলের আমীর নিযুক্ত করতে হবে। আমের বলে, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া হচ্ছেন আমাদের ইমাম এবং তিনি মুখতারকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। তাই আমরা মুখতারের হাতে বায়আত করেছি। ইবরাহীম তখন বলে, ঠিক আছে, আমি নিজেই মুখতারের সাথে সাক্ষাত করব। আমের ফিরে এসে মুখতারকে সবকিছু খুলে বলে। পরদিন মুখতার তার পনেরজন অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ইবরাহীমের বাড়িতে যায়। তখন ইবরাহীম জায়নামায়ের উপর বসা ছিল। মুখতার ঘরে ঢুকেই বলে, তোমার পিতা 'শীআনে আলী'র মধ্যে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তোমাকেও আমাদের দলের লোক মনে করি। ইমাম মাহদী মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া আমাকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে কূফায় পাঠিয়েছেন। অতএব তোমাকে আমার হাতে বায়আত করতে হবে। আমি অঙ্গীকার করছি যে,

বিজয় লাভের পর যে পদই তুমি পছন্দ করবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে। মুখতারের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারাও তার এই অঙ্গীকারকে সমর্থন করে এবং এজন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। একথা শুনে ইবরাহীম সঙ্গে সঙ্গে তার জায়নামায থেকে উঠে মুখতারকে নিজের জায়গায় বসিয়ে তার হাতে বায়আত করে। মুখতার বায়আত নিয়ে সেদিনকার মত ফিরে আসে। পরদিন অর্থাৎ হিজরী ৬৬ সনের ১৪ই রবিউল আউয়াল (৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর) রাতের বেলা মুখতার ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠিয়ে বলে, আমরা এখনি বিদ্রোহ করার সংকল্প নিয়েছি। তুমিও তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের কাছে চলে এসো। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হতে না হতেই ইবরাহীমের কাছে তার দলের লোকেরা এসে সমবেত হয়।

ইয়াস ইব্‌ন মাযারিবকে গুপ্তচরেরা এই মর্মে একটি সংবাদ দিয়েছিল যে, আজ রাতেই শীআনে আলী বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ইয়াসকে এর প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, কূফায় মোট সাতটি মহল্লা রয়েছে। অতএব আপনি প্রত্যেক মহল্লায় পাঁচশ লোকের একটি বাহিনী মোতায়েন করুন। রাতের বেলা মহল্লার ভিতর থেকে কোন লোক বের হলে ওরা যেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী অথবা হত্যা করে। ইয়াসের এই পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক মহল্লায় এক একজন অধিনায়ককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রাস্তায় অথবা রাজপথে লোকের সমাবেশ ঘটতে না পারে। ঘটনাক্রমে ইবরাহীম যখন আপন সঙ্গীদের নিয়ে মুখতারের কাছে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে সে ইয়াসের মুখোমুখি হয়ে যায় এবং তারা একে অপরকে আক্রমণ করে বসে। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমের হাতে ইয়াস নিহত হন। অপরদিকে মুখতারের ঘরেও চার হাজার লোক এসে সমবেত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সরকারী বাহিনীর অপর একটি দল তাদেরকে আক্রমণ করে। এদিকে ইবরাহীম লড়তে লড়তে মুখতারের ঘরের কাছে এসে পৌঁছে। ওদিকে প্রত্যেকটি মহল্লায় মোতায়েনকৃত সরকারী ফৌজও একের পর এক সেখানে এসে সমবেত হয়। এবার দুই পক্ষের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ইবরাহীম সরকারী বাহিনীকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য করে। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী অপর একটি বাহিনী নিয়ে হাযির হন। ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কখনো ইবরাহীম ও মুখতার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে দারুল ইমারত (গভর্নর ভবন) পর্যন্ত হাঁকিয়ে নিয়ে যেত, আবার কখনো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী ওদেরকে পিছনে হটিয়ে কূফার বাইরে নিয়ে যেতেন। সারারাত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ যতই প্রলম্বিত হয় মুখতারের বাহিনীও ততই ভারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ তাতে নতুন লোক এসে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লহ্ ইব্‌ন মুতীকে দারুল ইমারতে অবরুদ্ধ হতে হয়। মুখতার তিনদিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখে। যেহেতু দারুল ইমারতে লোকসংখ্যা ছিল অনেক এবং খাদ্যপানীয়ের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী একটি গোপন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। লোকেরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে দারুল ইমারতের দরজা খুলে দেয়। মুখতার দারুল ইমারত ও বায়তুলমাল দখল করে সেখান থেকে প্রচুর অর্থ তার অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করে। কূফার জামে মসজিদে সকলে সমবেত হয়। মুখতার একটি ভাষণ দেয়

এবং তাতে মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার হাতে বায়আত করতে এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। কূফাবাসীরা বায়আতের মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ এবং আহলে বায়তের প্রতি তাদের সহানুভূতির অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মুখতারও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সাধারণ বায়আতের পর মুখতার জানতে পারে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী আবূ মূসা (রা)-এর ঘরে লুকিয়ে আছেন। সে তখনি লোক মারফত তার কাছে এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দেয় এবং সেই সাথে একথাও বলে পাঠায়, আমি জানতে পেরেছি যে, সফরসামগ্রী না থাকার কারণে তুমি আবূ মূসার ঘরে অবস্থান করছ। অতএব আমার এই এক লক্ষ দিরহাম গ্রহণ কর এবং তিন দিনের মধ্যে আপন সফরসামগ্রীর ব্যবস্থা করে কূফা থেকে চলে যাও। এই পরাজয়ের কারণে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী এতই লজ্জা ও অপমানবোধ করেন যে, এরপর কূফা থেকে মক্কায় না গিয়ে বসরায় চলে আসেন।

সুলায়মান ইব্‌ন সারদের যেসব সঙ্গী পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে কূফায় এসেছিল তাদের মধ্যে মুসান্না ইব্‌ন মাখরামা আবদী নামীয় বসরার একজন অধিবাসীও ছিল। মুখতারের চিঠি পড়ে ওরা যে জেলখানায় তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল একথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন মুসান্না মুখতারের হাতে বায়আতও করেছিল এবং মুখতার তাকে এই ওসীয়ত করে বসরায় পাঠিয়েছিল যে, তুমি সেখানে গিয়ে শীআনে আলীর কাছ থেকে আমার পক্ষে বায়আত গ্রহণ কর এবং সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাক। আর যখন আমি কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করব তখন তুমিও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। যাহোক, মুসান্না ইব্‌ন মাখরামা বসরায় গিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ শুরু করে এবং বেশ বড় একটি দল গড়ে তোলে। মুখতার যখন কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণার সংকল্প নেয় তখন মুসান্নাকে সে সম্পর্কে অবহিত করে। অতএব মুসান্নাও নির্দিষ্ট তারিখে বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন হারিস ইব্‌ন আবী রাবীআ। তিনি কৌশলের সাথে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে তাদেরকে একটি পল্লীতে ঘেরাও করে ফেলেন। এরপর তাদের সবাইকে বসরা থেকে বের করে দেন। ওরা তখন সেখান থেকে বের হয়ে কূফায় মুখতারের কাছে চলে আসে। এভাবে বসরা রক্ষা পায় বটে, তবে কূফা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের দখল থেকে ছুটে যায়। মুখতার কূফায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে তার সভাসদ নিয়োগ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর জয় করার জন্য সে কয়েকটি পতাকা তৈরি করে এবং একটি পতাকা দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারস ইব্‌ন আশতারকে আওবিনিয়ার দিকে, একটি পতাকা দিয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন আতারুদকে আযারবায়জানের দিকে, একটি পতাকা দিয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কায়সকে মাওসিলের দিকে, একটি পতাকা দিয়ে ইসহাক ইব্‌ন মাসউদকে মাদায়েনের দিকে এবং অপর একটি পতাকা দিয়ে সা'দ ইব্‌ন হুযায়ফাকে হুলওয়ানের দিকে প্রেরণ করে। সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কামিলকে কূফার কোতওয়াল (পুলিশ প্রধান) এবং শুরায়হ্‌কে কাযী (বিচারপতি) নিয়োগ করে। পরে অবশ্য শুরায়হকে পদচ্যুত করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক তায়ীকে কূফার কাযী নিয়োগ করা হয়। সবদিকেই মুখতার প্রেরিত

অধিনায়করা সাফল্য অর্জন করে। ফলে জনসাধারণ মুখতারের আধিপত্য মেনে নিয়ে তার হাতে বায়আত করে। শুধু মাওসিলে আবদুর রহমান ইব্‌ন সাঈদ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। কেননা সেখানে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ নিয়োজিত ছিলেন। আবদুর রহমান মাওসিলের পরিবর্তে তিকরীতে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং মুখতারকে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। তখন মুখতার ইয়াযীদ ইব্‌ন আনাসের উপর মাওসিল অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং তিন হাজার সৈন্যসহ তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে সে রাবীআ ইব্‌ন মুখতার গানাবীকে ইয়াযীদের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে। বাবিল নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হিজরী ৬৬ সনের ৯ই যিলহজ্জ (৬৮৬ খ্রি জুলাই) তারিখে সংঘটিত এই যুদ্ধে রাবীআ নিহত হন এবং সিরীয় বাহিনী পরাজিত হয়। পরাজিত সৈন্যরা যখন সিরিয়ায় ফিরে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিমলাহ্ খাশ'আমীর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। আবদুল্লাহ্‌কে তিন হাজার সৈন্যসহ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ রাবীআরই সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন। যাহোক আবদুল্লাহ্ পরাজিত সৈন্যদেরকেও সাথে নিয়ে যান এবং পরদিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ ঈদুল আযহার দিনে কূফী বাহিনীর উপর হামলা চালান। এই যুদ্ধেও কূফীরা জয়ী এবং সিরীয়রা পরাজিত হয়। কূফীরা কয়েক হাজার সিরীয়কে গ্রেফতার করে এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আনাসের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব থেকে রোগাক্রান্ত ইয়াযীদও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে ওরাকা ইব্‌ন আযিবকে তার বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে। পরদিনও রাকার গুপ্তচরেরা এসে সংবাদ দেয় যে, স্বয়ং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ মুকাবিলার জন্য আসছেন। ওরাকা তার নাম শুনতেই বাবিল থেকে পিছিয়ে এসে ইরাক সীমান্তের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয় এবং মুখতারের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখে, "আমার সৈন্য সংখ্যা অল্প থাকায় আমি পিছিয়ে এসেছি।" এই সংবাদ শুনে কূফার লোকেরা ওরাকার নিন্দা করতে থাকে। কেননা সে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পরাজিতদের মত পিছিয়ে এসেছে। মুখতার কূফা থেকে সাত হাজার সৈন্য দিয়ে ইবরাহীমকে ওরাকার কাছে প্রেরণ করে এবং তাকে নির্দেশ দেয়, "তুমি ইয়াযীদ ইব্‌ন আনাসের সমগ্র বাহিনীকেও (ওরাকার কাছ থেকে) নিজের নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসবে।"

ইবরাহীম চলে যাওয়ার পর কূফাবাসীরা শীস ইব্‌ন রিবয়ীর কাছে এসে এই মর্মে অভিযোগ করে যে, মুখতার আমাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে না, এমনকি আমাদের অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেয়। শীস বলে, আমি মুখতারের সাথে আলাপ করে দেখি, সে এ ব্যাপারে কি বলে। শীস মুখতারের সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, আমি প্রতিটি কাজই কূফাবাসীদে মর্জি মত করব এবং মালে গনীমত থেকেও তাদেরকে অংশ দেব। তবে এই শর্তে যে, তারা আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবে যে, তারা বনূ উমাইয়া ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের সমগ্র শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। শীস ইব্‌ন রিবয়ী বলে, ঠিক আছে, আমি কূফাবাসীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব। এই বলে সে মুখতারের

কাছ থেকে বিদায় নেয়। কূফার কিছু লোক এমন ছিল, যারা মুখতারের হাতে শাসনক্ষমতা আসার পূর্বেই বায়আত করেছিল। ওরা ছিল মুখতারের একান্ত অনুগত। তাই সে ওদের প্রতি বিরাট আনুকূল্য প্রদর্শন করত। কিছু লোক ছিল যারা শুধু তার শাসনক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তার হাতে আনুগত্যের বায়আত করেছিল। ওরা তার সমমনা ছিল এবং হুসাইন-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করত। মুখতারের বিরুদ্ধে ওরাই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। অতএব শীস ইব্‌ন রিবয়ী ফিরে এলে তারা মুখতারের বিরুদ্ধে জনসমাবেশের আয়োজন করে এবং দারুল ইমারতে গিয়ে মুখতারকে বলে, আমরা তোমাকে পদচ্যুত করলাম। তুমি শাসনক্ষমতা ছেড়ে দাও। কেননা তুমি মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার প্রতিনিধি, খলীফা নও। সে জনতাকে বুঝিয়ে বলে, আমি তোমাদের সাথে কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করতে চাই না। আমি তোমাদের সবাইকে হুসাইন-হত্যার অপরাধ থেকেও ক্ষমা করে দিচ্ছি। আগামীতেও আমি তোমাদের প্রতি সর্বপ্রকার আনুকূল্য প্রদর্শন করব। এখন বনূ উমাইয়াদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত, কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করা। যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে পরিণাম ভাল হবে না। যাও, এবার পূর্বাপর বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা করে দেখ। তোমরা ইতিমধ্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা তোমাদের জন্য কোনই সুফল বয়ে আনবে না।

ওদের নেতৃবৃন্দ তখন মুখতারের কথা প্রকাশ্যে মেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমরা বিষয়টি পুনরায় চিন্তা করে দেখব। কিন্তু তারা মনে মনে বলে, ইবরাহীম (যাকে মুখতার একটি বাহিনীসহ কূফার বাইরে পাঠিয়েছিল) কিছুটা দূরে চলে যাক। এরপর আমরা তোমাকে এক হাত দেখিয়ে তবে ছাড়ব। এদিকে মুখতারও ইবরাহীমের অনুপস্থিতিতে নিজের অসহায়ত্বের দিকটি অনুভব করতে পেরেছিল। অতএব সে সঙ্গে সঙ্গে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী দিয়ে আপন দূতকে ইবরাহীমের কাছে পাঠায় এবং তাকে অতিসত্বর কূফায় ফিরে আসতে বলে। এরপর সে অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে দারুল ইমারতে বসে থাকে। জনসাধারণ পরদিন দারুল ইমারত অবরোধ করে ফেলে। কিন্তু ইবরাহীম তৃতীয় দিন কূফায় ফিরে এসে মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল নির্বিচারে হত্যা করে। ফলে তখন কূফায় এমন কোন ঘর বাকি থাকেনি, যেখানে এক অথবা একাধিক ব্যক্তি ইবরাহীমের হাতে নিহত হয়নি। মুখতার জনসাধারণকে একত্র করে ঐ সমস্ত লোকের তালিকা তৈরি করে, যারা হুসাইন হত্যার সময় ইব্‌ন যিয়াদের বাহিনীতে ছিল কিংবা যারা কোন না কোনভাবে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন আমর ইব্‌ন সা'দ এবং শিমার যিল-জাওশানকেও বন্দী করে হত্যা করা হয়। আমর ইব্‌ন সা'দ মুখতারের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল, কিন্তু মুখতার তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করে। আমরের পুত্র হাফ্‌স ইব্‌ন আমর মুখতারেরই সভাসদ ছিল। আমরের কর্তিত মস্তক দরবারে এসে পৌঁছলে মুখতার হাফ্‌সকে বলে, তুমি কি চেন এটা কার মস্তক? হাফ্‌স উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমি চিনি। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনের সব সাধ-আহলাদ মাটি হয়ে গেছে। মুখতার সাথে সাথে জল্লাদকে হুকুম দেয়, 'হাফ্‌সের মস্তকও কেটে ফেল এবং ত্বরিত হুকুম পালিত হয়। মোটকথা এভাবে কয়েকদিন পর্যন্ত হত্যা ও গ্রেফতারের

কার্য অব্যাহত থাকে। লোকদেরকে ঘর থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হতো। আমর ইব্‌ন সা'দ এবং শিমার প্রমুখের কর্তিত মস্তক মুখতার মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানফিয়ার কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মুখতার ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ও ত্বরিৎকর্মা। কূফা দখল করার পর সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখে, 'আমি বর্তমানে কূফায় অবস্থান করছি। আমি অন্তর দিয়ে আনুগত্য ও আপনার খিলাফত স্বীকার করি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কূফার গভর্নর পদটি দান করুন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বুঝতে বাকি ছিল না যে, এই লোকটি তাকে ধোঁকা দিয়ে এবং নিজের দিক থেকে তাকে অন্যমনস্ক রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করতে চাচ্ছে। তিনি মুখতারের আনুগত্য যাচাই করার জন্য আমর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারস মাখযূমীকে কূফার গভর্নর পদে নিয়োগ করে পাঠান। মুখতার যখন এ সংবাদ জানতে পারে তখন যায়দ ইব্‌ন কুদামাকে সত্তর হাজার দিরহাম দিয়ে পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ এই বলে পাঠায় যে, তুমি পথিমধ্যেই আমর ইব্‌ন আবদুর রহমানকে রুখবে এবং তাকে এই অর্থ দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যদি সে ফেরত যেতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। আমর ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রথমে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন দেখেন যে, যায়দের সাথে পাঁচশ অশ্বারোহী যোদ্ধা রয়েছে তখন সত্তর হাজার দিরহাম গ্রহণ করাকেই সমীচীন মনে করেন এবং ঐ অর্থ নিয়ে বসরায় চলে যান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীও বসরায় চলে গিয়েছিলেন। এবার আমর ইব্‌ন আবদুর রহমানও সেই বসরার দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে হারস ইব্‌ন আবী রাবীআ কর্তৃত্ব করছিল।

মুখতারের নবুয়ত দাবি এবং আলী (রা)-এর সিংহাসন

হযরত আলী (রা) যখন কূফায় অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর একটি কুরসী (চেয়ার) ছিল। এর উপর উপবেশন করেই তিনি তাঁর বেশির ভাগ হুকুম-আহকাম জারি করতেন। তাঁর এক ভাগ্নে জা'দা ইব্‌ন উম্মে হানী বিন্‌তে আবূ তালিব কূফায় বাস করত। ঐ কুরসীটি তারই দখলে ছিল। মুখতার কূফায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর কুরসীটি হস্তগত করার চেষ্টা চালায়। জা'দা তখন বলে, আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিন। আমি তা খুঁজে বের করে আপনার ঘরে পৌঁছিয়ে দেব। মুখতার উত্তরে বলে, আমি কখনো তিন দিনের বেশি সময় দেব না। তুমি এর মধ্যে তা আমার হাতে পৌঁছিয়ে না দিলে আমি তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করব।

জা'দার মহল্লায় এক তেল বিক্রেতা বাস করত। তার কাছেও এ ধরনের একটি কুরসী ছিল। জা'দা ঐ কুরসীটি তার কাছ থেকে ক্রয় করে অতি সংগোপনে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। এরপর তা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে মুখতারের কাছে নিয়ে আসে। সে জা'দার কাছ থেকে কুরসীটি গ্রহণ করে তাকে নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করে। সে কুরসীটি প্রথমে চুম্বন করে। এরপর সেটা সামনে রেখে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করে। এবার সে তার মুরীদ ও ভক্তদের একত্র করে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বনী ইসরাঈলের (সাহায্য, বরকত ও কল্যাণ)-এর নিদর্শন হিসাবে

'তাবূতে সাকীনা' (প্রশান্তিকর সিন্দুক) দান করেছিলেন তেমনি 'শীআনে আলী'-এর জন্যও নিদর্শন হিসাবে এই কুরসীটি দান করেছেন। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার জয় অবশ্যম্ভাবী।' তখন তার মুরীদ ও ভক্তরা শ্রদ্ধাভরে কুরসী চুম্বন করে। এরপর মুখতার তার ভক্তদের একটি সিন্দুক তৈরির নির্দেশ দেয়। অতএব একটি সুন্দর সিন্দুক তৈরি করা হয় এবং তার ভিতর রাখা হয় ঐ কুরসী। সিন্দুকে রৌপ্য নির্মিত একটি তালা লাগানো হয় এবং তা পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েকজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। এরপর কূফার জামে মসজিদে সিন্দুকটি স্থাপন করা হয়। নামাযান্তে প্রত্যেক ব্যক্তি সেটা চুম্বন করতো। কূফায় হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুখতার তার প্রতারণার জাল বিস্তার করে এবং ছলচাতুরী দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে জনসাধারণকে নিজের ভক্তে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। কূফার হুকুমত লাভ করার পর তার চাতুর্য ও দূরদর্শিতা যেন ষোলকলায় গিয়ে পৌঁছে এবং ধীরে ধীরে সে নবুয়তের দাবি উত্থাপনের কথাও চিন্তা করতে থাকে।

সে সময়ে মুখতার কূফা দখল করে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে উল্লিখিত চিঠি লিখে তার সামান্য কিছুদিন পর আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আবদুল মালিক ইব্ন হারসকে একটি বাহিনীসহ ওয়াদিউল কুরা'-এর দিকে প্রেরণ করেন। এটা যেন ছিল আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের উপর প্রথম আক্রমণ। এই আক্রমণের সংবাদ শুনে মুখতার ইব্ন যুবায়রের কাছে আর একটি পত্র লিখে। তাতে সে বলে, যদি আপনি চান তাহলে আপনার সাহায্যের জন্য আমি কূফা থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠাব। ইব্ন যুবায়র উত্তরে লিখেন, যদি তুমি আমার অনুগত হিসাবে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাও তাহলে অবিলম্বে 'ওয়াদিল কুরা'-এর দিকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দাও। মুখতার শুরাহবিল ইব্ন দাওস হামদানীকে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে এবং তাকে নির্দেশ দেয়, তুমি সোজা মদীনায় চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর। তারপর সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। এরপর আমি তোমাকে যে নির্দেশ দেব তাই পালন কর। এর দ্বারা মুখতার যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছিল তা ছিল এই যে, এই বাহানায় মদীনায় সৈন্য পাঠিয়ে সে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার সন্তুষ্টি এমনভাবে অর্জন করবে যে, তাতে ইব্ন যুবায়রেরও কোন আপত্তি থাকবে না, অথচ 'শীআনে আলী'র এর উপর তার (মুখতারের) প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) মুখতারের এই সব চালাকি ভালভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি মুখতারের কাছে উপরোক্ত জবাব পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আব্বাস ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সাদের নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ওয়াদিল কুরার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি আব্বাসকে বলেন, যদি মুখতার কূফা থেকে কোন বাহিনী পাঠায় তাহলে প্রথমে জেনে নেবার চেষ্টা করবে, তারা আমার আজ্ঞাবহ হিসাবে এসেছে, না নিজেদের স্বার্থে। যদি তারা আমার আজ্ঞাবহ হিসাবে এসে থাকে তাহলে তাদেরকে কাজে নিয়োজিত করবে। আর যদি তারা নিজেদের স্বার্থে এসে থাকে তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। আর যদি তারা ফিরে যেতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের মুকাবিলা করবে। 'আকীম' নামক স্থানে আব্বাসের সাথে শুরাহ্বিলের সাক্ষাত হয়। আব্বাস তখন বলেন, শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য তোমরা আমার সাথে ওয়াদিউল কুরার

দিকে চল। শুরাহ্‌বিল উত্তর দেয়, আমাদের তো সোজা মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে পৌঁছার পর আমরা দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষা করব এবং তা পাওয়ার পর যেখানে যাবার সেখানে যাব। আব্বাস প্রথমে পানাহার সামগ্রী দিয়ে ঐ কূফীদের আতিথ্য প্রদর্শন করেন। এরপর যখন তারা তার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল তখন তিনি তার দু'হাজার সৈন্য নিয়ে শুরাহবিলের তিন হাজার সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সংঘর্ষে শুরাহবিলের সত্তর জন লোক নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা কূফার দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। মুখতার এই ঘটনা থেকেও নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করে। সে এক পত্র মারফত মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, আপনার হিফাযতের জন্য আমি যে বাহিনী পাঠিয়েছিলাম তা তিনি আপনার কাছে পৌঁছতে দেননি। এখন এটাই সমীচীন যে, আপনি আপনার একজন অতি বিশ্বস্ত দূতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তার সাথে একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়ে দিতে পারি এবং এখানকার লোকেরাও আপনার বিশ্বস্ত দূতকে দেখে স্বস্তি লাভ করতে পারে। মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া উত্তরে লেখেন, আমি তোমার সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত আছি। তুমি আমাকে পবিত্র পরিবেশে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের রক্তপাত ঘটানো থেকে বিরত থাক। খিলাফত ও হুকুমতের প্রত্যাশী হলে আমি তোমার চাইতেও অধিক লোককে আমার চারপাশে জড় করতে পারতাম। কিন্তু খিলাফত ও হুকুমতের প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। আমি আমার অনুসারীদেরও এ থেকে সম্পূর্ণ নিরস্ত রেখেছি। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর মর্জিমতে এ বিষয়টির ফায়সালা করবেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজরী ৬৬ সনের (৬৮৬ খ্রি) ঈদুল আযহার দিনে বাবিলের যুদ্ধক্ষেত্রে কূফীদের হাতে সিরীয়রা পরাজিত হয়। কিন্তু কূফী সেনাপতি ইব্‌ন যিয়াদের আগমন সংবাদ শুনে তারা (কূফীরা) সেখান থেকে পিছনে হটে আসে। এই খবর পেয়ে মুখতার তার প্রধান সেনাপতি ইবরাহীম-ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আশতারকে সাত হাজার সৈন্যসহ সিরীয়দের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু ইবরাহীমকে পথিমধ্য থেকেই কূফায় ফিরে আসতে হয়েছিল। এরপর কূফায় অনেক লোককে হত্যা করা হয়। শীআনে আলীর বিরোধী অথবা শীআনে আলী ব্যতীত যে সমস্ত লোক ছিল তাদেরকে একেবারে শেষ করে ফেলা হয়। ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের আশংকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অভিযান শেষ করে মুখতার হিজরী ৬৬ সনের ২২শে যিলহজ্জ (জুলাই ৬৮৫ খ্রি) ইবরাহীমকে পুনরায় ইব্‌ন যিয়াদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। এবার যেহেতু কূফায় বিদ্রোহের কোন আশংকা ছিল না এবং জনসাধারণ আক্রান্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল তাই ইবরাহীমের সাথে সকল বড় বড় সরদার এবং নামকরা বীরযোদ্ধা দেরকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সেই তাবূতও (সিন্দুক) প্রেরণ করা হয়, যার মধ্যে 'কুরসীয়ে আলী' সংরক্ষিত ছিল। তা পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সেনাবাহিনী প্রথম থেকেই তাদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়।

ইবরাহীম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইরাক সীমান্ত পেরিয়ে মাওসিল সীমান্তে প্রবেশ করেন, যেখানে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে গভর্নর হিসাবে

নিয়োজিত ছিল। ইব্‌ন যিয়াদ ইবরাহীমের আগমন সংবাদ শুনে মাওসিল থেকে রওয়ানা হয়। উভয় বাহিনী খারিয নদী সংলগ্ন একটি প্রান্তরে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে শিবির স্থাপন করে এবং পরদিন ফজরের নামায পড়ার সাথে সাথে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম দিকে কূফীদের পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে, কিন্তু ইবরাহীমের বীরত্ব ও দৃঢ়তা তাদের পুনরায় চাংগা করে তুলে। উভয় পক্ষের অধিনায়করা চমৎকার বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিরীয়রা পরাজিত হয় এবং তাদের প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ নিহত হয়। তার সাথে সিরীয়দের অপর বিখ্যাত অধিনায়ক হুসাইন ইব্‌ন নুমায়রও শারীক ইব্‌ন জাদীর তাগলাবীর হাতে নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে ইবরাহীম ইব্‌ন মালিক বলেন, নদীর কূলে প্রতিপক্ষের পতাকার নিচে আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি যার পোশাক থেকে মৃগনাভির সুগন্ধ আসছিল। আমার তরবারি তাকে একেবারে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। তোমরা গিয়ে দেখ সে কে? লোকেরা সেখানে গিয়ে লাশ দেখার পর জানতে পারল, ঐ ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ। অতএব তার দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করা হলো এবং বাকি দেহ পুড়িয়ে ফেলা হলো। মুখতারের কাছে বিজয় সংবাদ পাঠানো হলো এবং সেই সাথে পাঠানো হলো উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের ছিন্ন মস্তকও।

নাজ্‌দাহ ইব্‌ন আমের কর্তৃক ইয়ামামা দখল

নাজদাহ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুফরিহ ইয়ামামা অঞ্চলে হিজরী ৬৫ সন (৬৮৪ থেকে ৮৫ খ্রি) অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্বক আপন বাহিনীর নেতৃত্ব নিজে গ্রহণ না করে আবূ তালূত নামীয় এক ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করেছিল। ৬৫ হিজরীতে (৬৮৪-৮৫ খ্রি) ঐ দলটির খুব একটা পরিচিতি বা প্রভাব ছিল না। তারা তখন শুধু বিভিন্ন কাফেলার উপর আক্রমণ চালাত এবং ধনসম্পদ লুটে নিত। ৬৬ হিজরীতে (৬৮৫-৮৬ খ্রি) তারা এতটা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন শহরেও লুটপাট শুরু করে। এবার নাজদাহ আবূ তালূতকে পদচ্যুত করে নিজেই আপন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং হিজরী ৬৬ সনের শেষের দিকে ইয়ামামা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) ঐ সময়ে ইয়ামামার দিকে কোন সৈন্য পাঠাতে পারেন নি। কেননা সিরিয়া ও ইরাক সমস্যা নিয়ে তিনি তখন এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কোন অঞ্চলের দিকে নজর দেওয়ার মত অবকাশ তাঁর ছিল না। ফলে ৬৯ অথবা ৭০ হিজরী (৬৮৮-৮৯ অথবা ৬৮৯-৯০ খ্রি) পর্যন্ত ইয়ামামা নাজ্‌দার কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

কূফা আক্রমণের প্রস্তুতি

৬৪ হিজরীতে (৬৮৩-৮৪ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে মোটামুটিভাবে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব খলীফা বলে স্বীকার করত। কিন্তু ঐ বছরই মিসর, ফিলিস্তীন এবং সমগ্র সিরিয়া অঞ্চল তাঁর খিলাফতের আওতা থেকে বের হয়ে যায় এবং দামিশ্‌কে বনূ উমাইয়ার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫ হিজরীতে (৬৮৪-৮৫ খ্রি.) কোন কোন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে খলীফা হিসাবে তাঁর প্রতি সাধারণ স্বীকৃতি অব্যাহত থাকে এবং কোন প্রদেশই তাঁর কবজা থেকে বের হয়ে যায়নি। কিন্তু ৬৬ হিজরীতে কূফা ও ইয়ামামা উভয় অঞ্চলই তাঁর কবজা

থেকে বের হয়ে যায়। কূফায় মুখতার এবং ইয়ামামায় নাজদাহ্ নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তখন পর্যন্ত বসরাকে হারস্ ইব্ন রাবীআ এবং পারস্যকে মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরা সামলে রেখেছিলেন। খারিজীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মাত্র তারা কঠোর হস্তে তা দমন করতেন। মুখতারের পক্ষ থেকে বসরায় প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তখন সেখানে কূফার প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী এবং প্রস্তাবিত গভর্নর আমর ইব্ন আবদুর রহমানও অবস্থান করছিলেন। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে লজ্জিত ছিলেন। তাই বসরায় এ দু'জনের উপস্থিতি আশংকার কারণ ছিল এজন্য যে, কোন না কোন ষড়যন্ত্রে এদেরও ফেঁসে যাওয়ার আশংকা ছিল। যখন ইব্ন যুবায়র (রা) শুনতে পেলেন যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ইবরাহীম ইব্ন মালিকের হাতে নিহত হয়েছে তখন তিনি সিরিয়াবাসী ও আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে কিছুটা স্বস্তি লাভ করেন এই ভেবে যে, তাদের ক্ষমতায় একটি বিরাট আঘাত এসেছে বিধায় তারা বর্তমানে হিজাযের উপর হামলা করার সাহস পাবে না। কিন্তু বসরার ব্যাপারে তাঁর আশংকা বেড়ে যায়। কেননা সাম্প্রতিক বিজয় লাভের পর মুখতার এবার বসরার দিকে হাত বাড়াতে পারে। তাই তিনি বসরার শাসনকর্তা হারস্ ইব্ন রাবীআকে অবিলম্বে পদচ্যুত করে তার স্থলে আপন ভাই মুসআবকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন।

তখন মুখতারের ভয়ে অনেক লোক কূফা থেকে পলায়ন করে বসরায় এসে জড় হয়েছিল। এরা ছিল ঐ সমস্ত লোক, যাদের আশংকা ছিল যে, মুখতার হুসাইন-হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে হয়ত তাদেরকেও হত্যা করবে। মাফরূর ইব্ন শীস ইব্ন রিব্য়ী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ ছিলেন ঐ পলাতকদের অন্যতম। মুস্আব ইব্ন যুবায়র বসরার শাসনভার গ্রহণ করে পূর্বাপর পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। কূফা থেকে আগতদের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিও ছিলেন। তারা মুসআবকে অবিলম্বে কূফা আক্রমণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাকে আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ (রা) নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি মুহাল্লাবকে সঙ্গে না নিয়ে কূফা আক্রমণ না করি। অতএব সর্বাগ্রে পারস্য থেকে মুহাল্লাবকে ডেকে পাঠানোর প্রয়োজন। যাহোক মুসআব একটি পত্র লিখে মুহাম্মদ ইব্ন আশআছের মাধ্যমে তা মুহাল্লাবের কাছে পাঠিয়ে দেন। মুহাল্লাব তাকে দেখে মন্তব্য করেন, মুসআব তোমাকে ছাড়া কি আর কোন দূত পান নি। মুহাম্মদ বলেন, আমি নিজেই ইচ্ছা করে এসেছি, যাতে কূফার অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে সরাসরি অবহিত করতে পারি। (কূফার বর্তমান অবস্থা এই যে) গোলামের বাচ্চারা আমাদের যাবতীয় সহায়-সম্পদ ও ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে এবং আমরা বিপন্ন অবস্থায় বসরায় পালিয়ে এসেছি। আমি আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি, আল্লাহ্র দিকে চেয়ে আমাদের সাহায্য করুন এবং এই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

মুহাল্লাব পারস্য প্রদেশের শাসন-ক্ষমতা আপন পুত্র মুগীরার হাতে অর্পণ করেন এবং সেখানকার যাবতীয় সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সম্পদ ও একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং অতর্কিতে বসরায় এসে মুসআবের সাথে মিলিত হন। মুহাল্লাবের কাছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রেরও একটি চিঠি এসে পৌঁছেছিল। তাতে লেখা ছিল, 'তুমি বসরায় এসে মুসআবের সাথে মিলিত হও এবং কূফা আক্রমণ কর। মুহাল্লাব কিছুটা ইতস্তত

করছিলেন বিধায় মুসআবকেও বসরা থেকে তার কাছে একজন দূত পাঠাতে হয়েছিল। ইব্‌ন যুবায়র (রা) কূফা আক্রমণের ব্যাপারে হয়ত আরো কিছুটা চিন্তাভাবনা করতেন, কিন্তু মুখতারের বাড়াবাড়ির কারণে তিনি সেই অবকাশ আর পান নি। মুখতার কূফায় বিপুল সংখ্যক লোক হত্যা করে। সে এ কথাও প্রচার করে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার কাছে জিবরীল ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসেন এবং সে একজন নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছে। তার এ ঘোষণার পর জনসাধারণ শহর ছেড়ে পলায়ন করে। তাদের মধ্যে কিছু লোক বসরায় যায়, কিছু লোক সরাসরি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে গিয়ে পৌঁছে এবং মুখতারের নবুয়তের দাবি ও তার অকথ্য জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে। তিনি মুখতারের নবুয়ত দাবির কথা অবগত হয়ে তাকে দমনের ব্যাপারে আর ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে মুহাল্লাবকে চিঠি লিখেন এবং মুসআবকেও সতর্ক করে দেন, মুহাল্লাব বসরায় এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি যেন কূফা আক্রমণ না করেন।

মুখতারকে হত্যা ও কূফা দখল

মুহাল্লাব বসরায় এসে পৌঁছুলে মুসআব ইব্‌ন যুবায়র তাকে সমগ্র সেনাবাহিনী ঢেলে সাজাবার নির্দেশ দেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আহ্‌নাফকে কূফায় পাঠান এবং নির্দেশ দেন ঃ তুমি সেখানে গিয়ে অবস্থান কর এবং গোপনে জনসাধারণের কাছ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের জন্য বায়আত গ্রহণ কর। তিনি আব্বাদ ইব্‌ন হুসাইন হাতামী তামীমীকে মুকাদ্দিমাতুল জায়শ তথা অগ্রবর্তী বাহিনীর, আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মারকে ডান পাশের বাহিনীর এবং মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরাকে বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আর মধ্যবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব নিজের হাতেই রাখেন। এভাবে সমগ্র বাহিনীকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে তিনি বসরা থেকে কূফার দিকে রওয়ানা হন।

এই সংবাদ পেয়ে মুখতারও তার বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে বের হয়। ঐ সময়ে ইবরাহীম ইব্‌ন মালিক মাওসিলের শাসনকর্তা ছিলেন। তাই তিনি বসরা হয়ে কূফায় আসতে পারেন নি। বসরা বাহিনীর মধ্যে একটি খণ্ড বাহিনী কূফা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ঐ খণ্ড বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ। 'মাদআযা' নামক গ্রামের কাছে উভয় বাহিনীর মধ্যে মুকাবিলা হয়। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুখতার পরাজিত হয়ে কূফার দিকে পলায়ন করে এবং সরকারী প্রাসাদকে সুদৃঢ় করে সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে অবস্থান করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। মুসআব ইব্‌ন যুবায়র সরকারী প্রাসাদ অবরোধ করেন। এই অবরোধ বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রায় এক হাজার লোক মুখতারের সাথে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। শেষ পর্যন্ত রসদ সামগ্রী ফুরিয়ে যাওয়ায় মুখতার দুর্গের বাইরে এসে প্রতিপক্ষের সাথে সরাসরি মুকাবিলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিয়ে বলে ঃ মুসআবের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর এবং দরজা খুলে দাও। সম্ভবত তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। কিন্তু মুখতার তাদের এই পরামর্শ অগ্রাহ্য

করে। সে মাথায় তেল ও কাপড়ে সুগন্ধি মেখে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকজন লোক তার সাথে আসে এবং বাকিরা প্রাসাদের ভিতরেই থেকে যায়। মুখতার দুর্গ থেকে বের হয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালায় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাজাজাহ হানীফীর পুত্রদ্বয় তুরফা ও তাররাফের হাতে নিহত হয়।

মুখতার হিজরী ৬৭ সনের ১৪ই রমযান (৬৮৭ খ্রি এপ্রিল) মাসে নিহত হয়। তার সঙ্গীদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিবও মারা যান। যারা প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল মুসআব তাদের বন্দী করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বন্দী হয়েছিল তাদেরকেও কূফার অভ্যন্তরে নিয়ে আসা হয়। তারপর একটি প্রশস্ত জায়গায় তাদের সকলকে একত্র করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সলাপরামর্শ চলতে থাকে। মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ এবং সমগ্র কূফী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

এমতাবস্থায় মুসআব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কূফীরা বলছিল, এই সমস্ত লোক মুখতারের হাতে বায়আত করে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, কূফায় এমন কোন ঘর নেই যেখানে কেউ না কেউ তাদের হাতে মারা পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি এদের ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এখনি সমগ্র কূফায় বিদ্রোহ দেখা দিবে। ঐ লোকদের মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। তার মধ্যে মাত্র সাতশ লোক ছিল আরব এবং বাকি সবাই ইরানী। মুসআব শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন, এদের সবাইকে হত্যা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় এবং তাতে কূফাবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মুসআব মুখতারের উভয় হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কূফার জামে মসজিদের দরজায় ঝুলিয়ে রাখেন। হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত তা ঐভাবেই ঝুলন্ত ছিল।

মুসআব ইব্ন যুবায়র কূফার শাসনক্ষমতা হস্তগত করে ইবরাহীম ইব্ন মালিকের কাছে— যিনি মুখতারের পক্ষ থেকে মাওসিলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন— এই মর্মে একটি পত্র পাঠান ঃ তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর। তাহলে আমি তোমাকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করব। এই সাথে আমি এও অঙ্গীকার করছি যে, সিরিয়া থেকে পশ্চিম দিকে তুমি যতগুলো দেশ জয় করবে তার সবগুলোই তোমার জায়গীর হিসাবে গণ্য হবে। এদিকে মুখতারের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান দামিশ্ক থেকে ইবরাহীমের কাছে এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেন ঃ তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর। আমি তোমাকে ইরাকের শাসনকর্তৃত্ব দান করব এবং পূর্ব দিকে তুমি যতগুলো দেশ জয় করবে তার সবগুলোই তোমার শাসন কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উভয়পক্ষ থেকে একই ধরনের চিঠি ইবরাহীমের হাতে এসে পৌঁছে। তিনি কিছুটা ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত মুসআবকেই প্রাধান্য দেন এবং কূফায় এসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফত স্বীকার করে নিয়ে মুসআবের হাতে বায়আত করেন। মুসআব তখন মুহাল্লাবকে মাওসিল ও জাযিরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তার জায়গায় ইবরাহীমকে নিয়োগ করেন প্রধান সেনাপতি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যখন মুখতারের মৃত্যু এবং কূফায় আপন শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পান তখন মুসআবকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করে তার স্থলে নিজ

পুত্র হামযাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। হামযার আচার-ব্যবহারে বসরাবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে এই মর্মে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেনঃ আপনি হামযাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মুসআবকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করুন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬৮ সনে (৬৮৭-৮৮ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র বসরার শাসনভারও মুসআবের হাতে অর্পণ করেন।

আমর ইব্‌ন সাইয়িদকে হত্যা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্‌ন হারসের সাথে মুকাবিলা এবং তাকে অবরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ কিরকীসা থেকে ফিরে এসেছিল। যখন ইব্‌ন যিয়াদ নিহত হলো তখন আবদুল মালিক একটি বাহিনী গঠন করে ইরাক আক্রমণের সংকল্প নেন এবং সর্বপ্রথম কিরকীসার গভর্নর যুফার ইব্‌ন হারস কালবীকেই আক্রমণ করতে মনস্থ করেন। তিনি তার ভাগ্নে আবদুর রহমান ইব্‌ন উম্মে হাকামকে দামেশ্‌কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে খোদ আমর ইব্‌ন সাইয়িদ ইব্‌নুল আসকে সঙ্গে নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনীসহ ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামকে এই শর্তে খিলাফতের আসনে বসানো হয়েছিল যে, তার পরে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ এবং তাঁর পরে আমর ইব্‌ন সাইয়িদ খিলাফতের অধিকারী হবেন। কিন্তু মারওয়ান খালিদ ও আমর উভয়কে 'অলীআহ্‌দ' থেকে বরখাস্ত করে আপন পুত্রদ্বয় আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযকে নতুনভাবে অলী আহ্‌দ নিয়োগ করেন।

আমর ইব্‌ন সাইয়িদ বনূ উমাইয়ার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সম্মানিত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারী। মারওয়ানের পর যখন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি আমর ইব্‌ন সাইয়িদের সাথে এমন মধুর ব্যবহার করতে শুরু করেন যে, তাতে তার (আমরের) অন্তরের সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। এবার যখন আবদুল মালিক সেনাবাহিনী নিয়ে কিরকীসা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আমর ইব্‌ন সাইয়িদ পথিমধ্যে তাকে বলেন, আপনি আমাকেই আপনার পরবর্তী খলীফা তথা 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগ করুন। প্রকৃতপক্ষে তাকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রথমেই দেওয়া হয়েছিল। এখন তিনি এর 'যথারীতি ঘোষণা' চাচ্ছিলেন মাত্র। কিন্তু আবদুল মালিক তার এই ইচ্ছা পূরণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এতে তার মনে খুব কষ্ট লাগে এবং তিনি সুযোগ বুঝে রাস্তা থেকেই দামিশকে ফিরে আসেন এবং এখানে এসেই আবদুর রহমানকে গভর্নর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকেই খলীফা ঘোষণা করেন। তিনি জনসাধারণকে সমবেত করে একটি ভাষণ দেন, তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন এবং তাদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। এই সংবাদ শুনে আবদুল মালিকও অবিলম্বে দামিশকে ফিরে আসেন এবং রাজধানী শহর ঘেরাও করে ফেলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ফলে আবদুল মালিক অন্য কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত লোকেরা মধ্যস্থতা করে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করে। চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আমর ইব্‌ন সাইয়িদ শহর থেকে বেরিয়ে এসে আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাত করে তার হাতে দামেশ্‌কের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত করেন। তার পক্ষ থেকে সব সময়ই আবদুল মালিকের মনে এক

ধরনের আশংকা বিরাজ করত। এবার তিনি ঐ আশংকা চিরতরে দূর করার উদ্দেশ্যে একদা তাকে সাক্ষাতের বাহানায় ডেকে পাঠান। আমর ইব্‌ন সাইয়িদ সরলমনে দরবারে এসে যথারীতি তার সম্মুখবর্তী আসন গ্রহণ করেন। আবদুল মালিক প্রথম থেকেই সেখানে কয়েকজন লোক মোতায়েন করে রেখেছিলেন। আমর ইব্‌ন সাইয়িদ আসন গ্রহণ করার পরপরই ওরা তাকে পাকড়াও করে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে।

আমরের ভাই ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে আসেন এবং সরকারী প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলেন। আবদুল মালিক তখন আমর ইব্‌ন সাইয়িদের দেহ থেকে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ইয়াহ্‌ইয়ার দিকেই ছুঁড়ে মারেন এবং সেই সাথে ছুঁড়ে মারেন অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। তখন প্রতিপক্ষের লোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু ইয়াহ্‌ইয়া অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন। আমরের পুত্রদেরও গ্রেফতার করা হয়। মুসআব ইব্‌ন যুবায়র নিহত হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত লোক বন্দী জীবন যাপন করে। মুসআব নিহত হওয়ার পর ইরাকের উপর আবদুল মালিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমর ইব্‌ন সাইয়িদের হত্যার ঘটনা হিজরী ৩৫ (৬৫৫ খ্রি) সনে ঘটে।

মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের অসতর্কতা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কয়েক মাস এবং বড় জোর এক বছর হামযা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। এরপর সেখানকার শাসন ব্যবস্থা মুসআবের হাতে ন্যস্ত করা হয়। মুসআব স্বয়ং বসরায় গিয়ে উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মারকে বসরায় আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন ঃ যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য তুমি স্বয়ং পারস্যে যাবে এবং বসরায় নিজের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। মুসআব বসরার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করেন এবং কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর আপন মূল কর্মস্থল কূফায় চলে যান। কিন্তু হিজরী ৭০ সনে (৬৮৯-৯০ খ্রি) পারস্যে খারিজীদের ফিতনা এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, মুগীরা ইব্‌ন মুহাল্লাব এবং উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মারের পক্ষে তা দমন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মুসআব মুহাল্লাবকে মাওসিলের শাসনকর্তার পদ থেকে বদলী করে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং অবিলম্বে সেখানে গিয়ে খারিজীদের ফিতনা দমনের নির্দেশ দেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খারিজীদের শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে তখন মুহাল্লাবই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে তিনি মুসআবকে বলেন ঃ আমি তো পারস্যে যেতে রাযী আছি, কিন্তু বর্তমানে আমাকে মাওসিল থেকে সরানো আপনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। কেননা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইরাকে একটি গোপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে চলেছেন এবং আমি তার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে আসছি। এমনও হতে পারে যে, আমর এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি তার ষড়যন্ত্র সফল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

মুসআব পারস্যের প্রয়োজনকে এই কল্পিত প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেন। অতএব মুহাল্লাবকে বাধ্য হয়ে পারস্যের দিকে রওয়ানা হতে হয়। মুসআবের কাছে যে দুজন অভিজ্ঞ ও

প্রতাপশালী সমরনায়ক ছিলেন তারা হচ্ছেন ইবরাহীম ও মুহাল্লাব। তিনি এই দুজনের একজনকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলেন। সেই সাথে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আযিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং আব্বাদ ইব্ন হুসাইনকেও মুহাল্লাবের সাথে খুরাসানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ দুজনও ছিলেন অত্যন্ত নামকরা ও অভিজ্ঞ সমরনায়ক। এভাবে মুসআব ইব্ন যুবায়র সুযোগ্য ব্যক্তিদের নিজের কাছ থেকে পৃথক করে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। কূফায় তার সাথে ছিলেন শুধু ইবরাহীম ইব্ন মালিক এবং বসরায় ছিলেন আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার।

আমর ইব্ন সাইয়িদকে হত্যার পর আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান নানা ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক তদবীর শুরু করেন। তিনি পারস্যে নিজস্ব লোক পাঠিয়ে সেখানকার খারিজীদের আশা-ভরসা দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। এদিকে কূফা ও বসরায়ও তিনি নিজস্ব লোক পাঠিয়ে বনূ উমাইয়ার সমর্থকদের মাধ্যমে একটি ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেন। মুসআবের সমর অধিনায়কদের কাছেও তিনি গোপনে পত্র লিখে তাদের নিজের দিকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করেন। এমন কি মুহাল্লাব এবং ইবরাহীমকেও তিনি আপন দলে টানার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসআবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার মত লোক তারা ছিলেন না। এ কারণেই মুহাল্লাব পারস্য অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং তার সেই দুশ্চিন্তার কথা মুসআবের কাছে প্রকাশও করেছিলেন।

আবদুল মালিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি

আবদুল মালিক গোপনে খালিদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দকে বসরায় পাঠান, যেন তিনি সেখানে গিয়ে যে সমস্ত লোক আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বিপক্ষে এবং বনূ উমাইয়ার পক্ষে রয়েছে তাদেরকে স্বমতে আনার চেষ্টা করেন। খালিদ বসরায় এসে প্রথমে বনূ বক্র ইব্ন ওয়াইল এবং আয্দ গোত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেন এবং বিপুল সংখ্যক লোককে স্বমতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মা'মারের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি খালিদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। খালিদের সঙ্গীরা তাদের মুকাবিলা করলেও শেষ পর্যন্ত খালিদকে বসরা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

বসরার এই সমস্ত ঘটনার সংবাদ যখন কূফায় গিয়ে পৌঁছে এবং মুসআব ইব্ন যুবায়র এখানকার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হন তখন তার পক্ষে নীরবে বসে থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না। তিনি দ্রুত কূফা থেকে বসরায় চলে আসেন এবং খালিদের সংগীসাথী ও সমর্থকদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। তিনি কিছু লোককে জরিমানা করেন, আবার কারো কারো ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেন। অনুরূপভাবে কূফায়ও আবদুল মালিকের লোকেরা ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। এর ফলে শুধু সাধারণ লোকেরা নয়, বরং আত্তাব ইব্ন ওরাকা প্রমুখ অধিনায়কও গোপনে আবদুল মালিকের দলে ভিড়ে যেতে থাকেন।

একদিকে আবদুল মালিক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অন্যদিকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে কূফা ও বসরার সৈন্যদের আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। একদা

ইবরাহীম ইব্‌ন আশতারের কাছে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সীলমোহরকৃত একটি চিঠি আসে। ইবরাহীম জানতেন তাতে কি লেখা রয়েছে। তিনি খাম না খুলেই চিঠিটি মুসআবের সামনে পেশ করেন। মুসআব তা খুলে পড়েন। তাতে আবদুল মালিক ইবরাহীমকে লিখেছেন, 'তুমি আমার কাছে চলে আস। আমি তোমাকে সমগ্র ইরাকের গভর্নর করব।'

মুসআব ইবরাহীমকে বলেন, তোমার মত একজন লোক কি এসব কথায় প্রলুব্ধ হতে পারে? ইবরাহীম বলেন, আমি তো কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করব না। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আবদুল মালিক আপনার সকল অধিনায়কের কাছেই এ ধরনের চিঠি লিখেছেন। যদি আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে বলব, ঐ সব অধিনায়ককে হয় হত্যা করুন অথবা বন্দী করে রাখুন। মুসআব ইবরাহীমের ঐ মত পছন্দ করেন নি। তাই কোন অধিনায়ককে এজন্য পাকড়াও করা তো দূরের কথা, তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেন নি।

মুসআব ইব্‌ন যুবায়রকে হত্যা

আবদুল মালিক পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর আপন বাহিনী নিয়ে সিরিয়া থেকে ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি দামেশ্‌ক থেকে তখনি রওয়ানা হন যখন তার কাছে কূফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই মর্মে অনেক চিঠি লিখেন যে, অবিলম্বে আপনার ইরাক আক্রমণ করা উচিত। আবদুল মালিকের উপদেষ্টারা রওয়ানা হওয়ার সময় তাকে বাধা দেন এই ভেবে যে, ইরাকী ও কূফীরা এই সব চিঠি তো সেরূপ হুজুগের বশবর্তী হয়েই লিখতে পারে যেরূপ তারা ইতিপূর্বে ইমাম হুসাইনের কাছে লিখেছিল। আবদুল মালিক উত্তরে বলেন, ইমাম হুসাইন তো শুধু কূফীদের উপর ভরসা করেই কূফায় রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি আমার সঙ্গে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি। কূফীরা যদি আমার সাথে বেঈমানী করে বা অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় তাহলে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সাথে একটি শক্তিশালী বাহিনী দেখলে তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার সাহসই থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এদিকে তার আগমনের সংবাদ শুনে মুসআব ইব্‌ন যুবায়রও যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেন। যে মুহূর্তে আবদুল মালিকের আগমন সংবাদ কূফায় পৌঁছে তার পূর্বেই মুসআব উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মারকে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য বসরা থেকে পারস্যে প্রেরণ করেছিলেন। অতএব উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। যা হোক 'দ্বারে জাসলীক'-এর নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থায় শিবির স্থাপন করে। মুসআবের বাহিনী ছিল অত্যন্ত ছোট। কেননা ঠিক রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে অনেক লোক নানা ছল-ছুঁতায় তার সাথে আসতে অস্বীকার করেছিল। আর যারা যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত এসেছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই শত্রুপক্ষের সাথে যোগসাজশ ছিল এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা শত্রুদলের সাথে মিশে যাবার ফন্দি আঁটছিল। যাহোক যুদ্ধ শুরু হলো। আবদুল মালিক তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রথমে শত্রুবাহিনীর ইবরাহীমের নেতৃত্বাধীন অংশের উপর হামলা চালান। কেননা ইবরাহীমকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। আবদুল মালিকের ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানের নেতৃত্বে ইবরাহীমের উপর হামলা চালানো হয়। উভয় পক্ষই অত্যন্ত বীরত্বের

পরিচয় দেয়। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম মুহম্মদকে পিছনে হটিয়ে দেন। মুহাম্মদকে পর্যুদস্ত হতে দেখে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদকে তার সাহায্যের জন্য পাঠান। এবার দুইপক্ষ পুনরায় দৃঢ়তার সাথে একে অপরের মুকাবিলা করতে থাকে। এই সংঘর্ষে কুতায়বার পিতা মুসলিম ইব্‌ন আমর আল-বাহিলী নিহত হন।

ইবরাহীমের সামনে শত্রু সৈন্যের ভিড় লক্ষ্য করে তার সাহায্যের জন্য মুসআব ইব্‌ন যুবায়র আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আত্তাব যেহেতু এখানে আসার পূর্বেই গোপনে আবদুল মালিককে খলীফা বলে মেনে নেয়েছিলেন এবং সেজন্য বায়আতও করেছিলেন তাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। ইবরাহীম চতুর্দিক থেকে শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে আবদুল মালিক এবং তার বাহিনীর সাহস অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

মুসআব ইব্‌ন যুবায়র অন্যান্য অধিনায়ক এবং নিজের সঙ্গীদেরকে আগে বেড়ে আক্রমণ করতে বলেন, কিন্তু কেউই তার অবস্থান থেকে সামান্যমাত্র টলেনি। মুসআবের কথা যেন তাদের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুসআবের বাহিনীর মাত্র গোটা কয়েক লোক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছিল, আর বাকি সবাই দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল।

কূফীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের ঐ বিশ্বাসঘাতকতার চাইতেও নির্মম, যা তারা ইমাম হুসাইনের সাথে করেছিল। কেননা ইব্‌ন যিয়াদ এবং তার বাহিনীর ভয়ে হয়ত তারা ইমাম হুসাইনের পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু মুসআবের পক্ষ ত্যাগের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। এটা ছিল তাদের দুষ্টামি, বিশ্বাসঘাতকতা ও উপকারীর অপকার করার জন্মগত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। আবদুল মালিক মুসআবকে হত্যা করতে চাচ্ছিলেন না। তাই তিনি আপন ভাই মুহাম্মদকে মুসআবের কাছে এই বলে পাঠান ঃ

এখন আপনার বাহিনীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে। আপনি কোনমতেই জয়ী হতে পারবেন না। আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। আপনি এই নিরাপত্তা গ্রহণ করুন। কিন্তু মুসআব উত্তরে বলেন ঃ আমি আপনার নিরাপত্তা চাই না। আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট। এরপর মুহাম্মদ মুসআবের পুত্র ঈসাকে বলেন, তোমাকে এবং তোমার পিতাকে আবদুল মালিক নিরাপত্তা দান করেছেন। ঈসা পিতার কাছে এসে একথা বললে তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, সিরিয়াবাসী তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে। অতএব তুমি ইচ্ছা করলে তাদের নিরাপত্তায় চলে যেতে পার। তখন ঈসা বলেন, আমি কুরায়শ বংশের মেয়েদের কখনো একথা বলার সুযোগ দেব না, ঈসা নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পিতার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। মুসআব বলেন, তাহলে তুমি তোমার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের কাছে মক্কায় চলে যাও এবং তাঁর কাছে ইরাকবাসীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা বর্ণনা কর। আমাকে এখানেই রেখে যাও। আমি নিজেকে মৃতই ধরে নিয়েছি। ঈসা উত্তরে বলেন, আমি এসব কথা তাকে বলব না বরং আপনার জন্য এই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সোজা বসরায় চলে যাওয়াই সমীচীন। সেখানকার লোক আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনার

একান্ত অনুগত। আপনি বসরায় পৌঁছে এর একটা প্রতিবিধান করতে পারবেন। অন্যথায় মক্কায় চলে যাবেন।

মুসআব উত্তরে বলেন, বৎস! এটা কখনো সম্ভব নয়। কেননা এরূপ করলে সমগ্র কুরায়শ বংশে আলোচিত হতে থাকবে যে, আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি। অতএব তুমি তোমার অন্তর থেকে সব ধরনের চিন্তাভাবনা মুছে ফেল এবং অবিলম্বে শত্রুকে আক্রমণ কর। একথা শোনামাত্র ঈসা তার সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শত শত শত্রুকে হত্যা করে মুসআবের চোখের সামনে নিজেও নিহত হন। এরপর আবদুল মালিক এগিয়ে এসে অত্যন্ত মিনতির সুরে মুসআবকে বলেন, আপনি এখনো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান, নয়ত আমার নিরাপত্তা গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি আবদুল মালিকের কথায় মোটেই কান দেন নি। সম্ভবত ঐ মুহূর্তটা ছিল আবদুল মালিকের জন্য অত্যন্ত চমকপ্রদ। কেননা তার গোপন ষড়যন্ত্র যে অত্যন্ত সার্থকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে এটা ছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

কূফীদের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল, অথচ নিজেদের অধিনায়কের নির্দেশ অমান্য করে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখছিল। অপর দিকে মুসআব অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যে বাহিনী তার ইংগিত পাওয়া মাত্র মারা অথবা মরার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত তারাই আজ তার সাহায্যে মোটেই এগিয়ে আসছে না। কূফীরা মুসআব ও ইমাম হুসাইন উভয়ের হত্যাকাণ্ডে একই ধরনের অপরাধ করেছে। কিন্তু এ দু'টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আকারে। যেমন ওখানে ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর শত্রুদের কাছে চাচ্ছিলেন, যেন তারা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মক্কা কিংবা দামিশকে কিংবা সীমান্তের দিকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়, আর এখানে স্বয়ং মুসআবের শত্রু চাচ্ছে যেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যান। ওখানে ইমাম হুসাইনের শত্রুরা তাঁর কথায় কান দেয়নি, আর এখানে খোদ মুসআব তার শত্রুদের কথায় কান দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত উভয়কেই একই পরিণতি ভোগ করতে হয়।

ঈসা নিহত হওয়ার পর মুসআব আপন তাঁবুতে যান, মাথায় তেল এবং সারা দেহে সুগন্ধি মাখেন, এরপর তরবারি হাতে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাত্র সাতজন লোক তখন তার সঙ্গী হয়েছিল। একে একে তারা সকলেই নিহত হয়। তিনি শত্রুদের উপর এমন দুর্বার আক্রমণ চালান যে, তাদের সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরীয়রা তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কারবালার ঘটনার দশ বছর পর হিজরী ৭১ সনে (৬৯০-৯১ খ্রি) পুনরায় 'দ্বারে জাসলীকে' অনুরূপ মর্মান্তিক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হলো।

আবদুল মালিক যুদ্ধক্ষেত্রেই কূফী বাহিনীর কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে কূফার নিকটবর্তী নাখীলা নামক স্থানে ৪০ দিন অবস্থান করেন। কূফাবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি জামে মসজিদে খুতবা দেন, জনসাধারণের সাথে সদয় ব্যবহারের অঙ্গীকার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। এরপর তিনি পারস্য, খুরাসান, বসরা, আহওয়ায প্রভৃতি অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছে চিঠি লিখেন যেন তারা তার নামে জনসাধারণের

কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে। তিনি মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরাকেও তার পদে বহাল রাখেন। যাহোক, সকলেই আবদুল মালিকের খিলাফত স্বীকার করে নেয়। আর স্বীকার করা ছাড়া তাদের সামনে কোন বিকল্প পথও ছিল না। শুধু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম (যিনি তখন খুরাসানের একটি অংশের প্রশাসক ছিলেন) আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করতে অস্বীকার করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই বাহরায়ন ইব্‌ন ওয়ারাকা সারিমীর হাতে নিহত হন।

আবদুল মালিক খালিদ ইব্‌ন উসায়দকে বসরার এবং আপন ভাই বশীরকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের কর্তিত মস্তক আবদুল মালিক কূফা থেকে দামিশ্‌কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মস্তকটি দামিশ্‌কে পৌঁছলে জনসাধারণ সেটাকে কেন্দ্র করে বিজয় উৎসব করতে চায়। কিন্তু আবদুল মালিকের স্ত্রী আতিকা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া তা থেকে সকলকে নিরস্ত রাখেন এবং মস্তকটিকে গোসল দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করেন। মুহাল্লাবও আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন।

যুফার ইব্‌ন হার্‌স ও আবদুল মালিক

কিরকীসা অবরোধ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ এবং অন্যান্য অধিনায়ক যুফার ইব্‌ন হারসকে পরাজিত করতে পারেন নি। অর্থাৎ তার সাথে প্রতিটি যুদ্ধে সিরীয় বাহিনীকে পরাজয়বরণ করতে হয়। এবার আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান যখন একটি বাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে রওয়ানা হন তখন আবান ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবী মুঈতকে (যিনি হিম্‌সের গভর্নর ছিলেন) অপর একটি বাহিনী দিয়ে কিরকীসার দিকে প্রেরণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে যুফার ইব্‌ন হার্‌সকে অবিলম্বে দমন করার নির্দেশ দেন। আবান সেখানে পৌঁছেই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন। তখনো হারজিতের কোন ফয়সালা হয়নি এমনি সময় স্বয়ং আবদুল মালিকও একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কিরকীসা ঘেরাও করতে শুরু করেন। যুফার ইব্‌ন হার্‌স আপন পুত্র হুযায়লকে নির্দেশ দেন ঃ সিরীয় বাহিনীকে তাড়া কর এবং আবদুল মালিকের তাঁবু ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত ফিরে এস না। হুযায়ল পিতার হুকুম যথার্থভাবে পালন করেন এবং প্রতিপক্ষের উপর এমন জোরদার আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিকের তাঁবু ধূলিসাৎ করে তবে ফিরে আসেন। আবদুল মালিক যখন দেখলেন যে, কিরকীসা জয় এবং যুফার ইব্‌ন হার্‌সকে পরাস্ত করা মোটেই সহজ কাজ নয় তখন তিনি তার কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান ঃ তোমাকে এবং তোমার ছেলেদেরকে আমি নিরাপত্তা দান করছি। যে এলাকা বা যে পদ তুমি চাইবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে।

উত্তরে যুফার বলে পাঠান, আমি এই শর্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি যে, এক বছর পর্যন্ত আমার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের আশা করবেন না এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে আমার সাহায্যও চাইবেন না। সন্ধিপত্র লেখার উপক্রম হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুল মালিকের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, নগর প্রাচীরের চারটি টাওয়ার ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি করতে অস্বীকার করেন এবং নব উদ্যমে শহরের উপর এক

জোরদার হামলা চালান। কিন্তু তার ঐ হামলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুফার তাকে এবং তার বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে তাদের সেই পূর্বের অবস্থানে নিয়ে যান। এবার আবদুল মালিক দ্বিতীয়বারের মত যুফারের কাছে পয়গাম পাঠান ঃ আমি আপনার যাবতীয় শর্ত মেনে নিচ্ছি। তিনি উত্তর দেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র জীবিত থাকা অবস্থায় আমি অন্য কারো হাতে বায়আত করব না। সাথে সাথে আমাকে এ প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে যে, আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে কোন অজুহাতেই পাকড়াও করা হবে না কিংবা আমাদের থেকে কোনরূপ প্রতিশোধও নেওয়া হবে না। আবদুল মালিক সব শর্তই মনজুর করেন এবং এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র লিখে যুফারের কাছে পাঠিয়ে দেন। এতদ্সত্ত্বেও তিনি আবদুল মালিকের কাছে আসেন নি। কেননা আমর ইব্ন সাইয়িদের ঘটনা তো সবারই জানা ছিল। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লাঠি, যা তখন তাঁর কাছে ছিল, যুফারের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি এটাকে বিশ্বস্ততার একটি সন্তোষজনক জামানত মনে করে সঙ্গে সঙ্গে আবদুল মালিকের কাছে চলে আসেন। তিনি যুফারকে তাঁরই সমপর্যায়ের আসনে বসান এবং তার মেয়েকে মুসায়লামার স্ত্রী তথা আপন পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করেন।

মুসআব ইব্ন যুবায়রের হত্যা সংবাদ মক্কায় পৌঁছল

মক্কায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল যে, ইরাকীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার ভাই মুসআব নিহত হয়েছেন এবং সমগ্র ইরাক আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের অধিকারে চলে গেছে তখন তিনি সমগ্র মক্কাবাসীকে একত্র করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

الحمد لله الذى له الخلق والامر يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সমগ্র সৃষ্টি ও আদেশের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী করেন এবং যাকে ইচ্ছা হীন করেন।"

আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে হীন করেন না, যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, চাই সে যতই নিঃসংগ হোক। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন না, যার অভিভাবক হচ্ছে শয়তান, তার সাথে যত বেশি লোকই থাকুক। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের কাছে ইরাক থেকে এমন একটি সংবাদ এসেছে, যা একাধারে দুঃখজনক ও আনন্দদায়ক। অর্থাৎ আমাদের কাছে মুসআবের হত্যা সংবাদ এসেছে। আমরা আনন্দিত এজন্য যে, সে নিহত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। আর আমরা দুঃখিত এজন্য যে, বিপদের মুহূর্তে বন্ধুর বিদায় এমন একটি যন্ত্রণা, যা শুধু বন্ধুই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারে। তবে সে সুস্থবুদ্ধি এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। মুসআব কে ছিল? সে ছিল আল্লাহ্র অন্যতম প্রিয় বান্দা এবং আমার অন্যতম সাহায্যকারী। আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, ইরাকবাসী হচ্ছে অত্যন্ত

বিশ্বাসঘাতক ও কপট। তারা মুসআবের মাধ্যমে যে উপকার পেয়েছিল তা অতি অল্পমূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। মুসআব যদি নিহত হয়ে থাকে তাহলে তার বাপ-ভাইও তো নিহত হয়েছেন, যারা অত্যন্ত সৎ ও পুণ্যবান ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আমাদের শয্যায় সেভাবে মৃত্যুবরণ করব না, যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছে আবুল 'আসের সন্তানেরা। আল্লাহ্‌র কসম! এদের কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে না জাহিলিয়া যুগে মারা গেছে, আর না ইসলামী যুগে। আর আমরা বর্শার আঘাতে ও তরবারির ছায়াতলে মৃত্যুবরণ করি। ভাইয়েরা, জেনে রাখুন, এই দুনিয়া ঐ মহাপরাক্রমশালী শাহানশাহের কাছ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যাঁর হুকুমত চিরদিন থাকবে এবং যার বাদশাহী কখনো বিলীন হয়ে যাবে না। অতএব দুনিয়া যদি আমাদের হাতে আসে তাহলে আমরা সেটাকে পথভ্রষ্ট, লাঞ্ছিত, কাঙ্গাল ও কমজাতের মত গ্রহণ করব না। আর দুনিয়া যদি আমাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায় তাহলে আমরা তার জন্য দুর্বল ও অসহায় লোকদের মত ক্রন্দন করব না। তোমাদের কাছে এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আমি আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আবদুল মালিক ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)

ইরাক দখলের পর আবদুল মালিক উরওয়া ইব্‌ন উনায়ফকে ছয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ মদীনার দিকে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন, তুমি মদীনার বাইরে অবস্থান করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছবে ততক্ষণ মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন হার্‌স ইব্‌ন হাতিব। উরওয়ার নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ শুনে হার্‌স মদীনা থেকে চলে যান। উরওয়া একমাস পর্যন্ত মদীনার বাইরে অবস্থান করেন এবং কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে আবদুল মালিকের পরবর্তী নির্দেশ অনুযায়ী দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন। হার্‌স এরপর মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, সুলায়মান ইব্‌ন খালিদকে খায়বার ও ফাদাকের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল মালিক আবদুল মালিক ইব্‌ন হার্‌স ইব্‌ন হাকামকে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে দামিশ্‌ক থেকে এই বলে রওয়ানা করেন যে, তুমি হিজায আক্রমণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আবদুল মালিক ইব্‌ন হার্‌স ওয়াদিল কুরায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে একটি বিরাট বাহিনীসহ ইব্‌ন কামকামকে খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন, 'তুমি রাতের বেলা অতর্কিতে সুলায়মানের উপর হামলা চালাবে।' এতে সুলায়মান বন্দী হয়ে নিহত হন এবং ইব্‌ন কামকাম খায়বারে অবস্থান নেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হিজায আক্রমণের সংবাদ শুনে হার্‌স ইব্‌ন হাতিবকে পদচ্যুত করে তার স্থলে জাবির ইব্‌ন আসওয়াদ যুহরীকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। জাবির মদীনায় পৌঁছে ছশ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কায়সকে খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন। ইব্‌ন কামকাম ও আবূ বকরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্‌ন কামকাম পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ নিহত হয় এবং কেউ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি তারিক ইব্‌ন উমরকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে হিজায অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, তুমি ওয়াদিল কুরা ও আয়লার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়ে যতটুকু সম্ভব ইব্‌ন যুবায়রের কর্মকর্তাদেরকে প্রতিহত করবে এবং হিজাযীদের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তা সফল হওয়ার পূর্বেই পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করবে। আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী তারিক হিজাযে গিয়ে অবস্থান নেন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কায়স তার দুশ সঙ্গী-সাথীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তারিক খায়বারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। জাবির ইব্‌ন আসওয়াদ এই সংবাদ শুনে মদীনা থেকে দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তারিকের মুকাবিলা করার জন্য খায়বারের দিকে প্রেরণ করেন। খায়বারের সন্নিকটে দুই বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তারিক জয়লাভ করেন এবং প্রতিপক্ষের যুদ্ধবন্দী ও আহতদের হত্যা করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) জাবির ইব্‌ন আসওয়াদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে হিজরী ৭০ (৬৮৯ খ্রি) সনে তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ওরফে 'তালহাতুন নিদা'কে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর খায়বার অঞ্চল আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে এবং তালহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষ থেকে মদীনা শাসন করতে থাকেন। দু'বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয়নি। তাই আবদুল মালিকের দৃষ্টি তখন ইরাক ও ইরানের দিকে নিবদ্ধ থাকে।

মক্কা অবরোধ

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান সিরীয় নেতৃবৃন্দকে মক্কা আক্রমণে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা সকলেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের মুকাবিলা করতে এবং তার পরিণাম স্বরূপ কা'বাঘরকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে অস্বীকার করেন। আবদুল মালিক দামিশ্‌ক থেকে কূফায় যান। সেখানে তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ সাকাফীকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেন। হাজ্জাজ তিন হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে ৭২ হিজরীর জুমাদাল-উলা (৬৯১ খ্রি অক্টোবর) মাসে কূফা থেকে রওয়ানা হন। তিনি মদীনা অতিক্রম করে আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী তাইফে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি তার অশ্বারোহীদেরকে প্রতিদিন আরাফার দিকে প্রেরণ করতেন। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের অশ্বারোহীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো এবং পুনরায় তাইফে ফিরে আসত। কয়েকমাস এভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর হাজ্জাজ আবদুল মালিককে লিখেন, আমার সাহায্যের জন্য আরো কিছু সৈন্য প্রেরণ করুন এবং আমাকে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কা অবরোধের অনুমতি দিন।

আবদুল মালিক হাজ্জাজের আবেদন মনজুর করে তার সাহায্যের জন্য আরো পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তারিককে লিখেন, তুমি প্রথমে মদীনা আক্রমণ কর এবং একাজ সম্পন্ন করে মক্কার দিকে যাও এবং হাজ্জাজকে সাহায্য কর। হাজ্জাজ রমযান মাসে মক্কা অবরোধ করে এবং আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর 'মিনজানীক' স্থাপন করে প্রস্তর বর্ষণ করতে

শুরু করে। এমতাবস্থায় মক্কাবাসীদের জন্য ঐ বছরের রমযান মাস ছিল একটি বিপদের মাস। তারা অবরোধের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মক্কা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। রমযান ও শাওয়ালের পর যিলকদ মাস আসে। কিন্তু মক্কাবাসীদের বিপদ ও অবরোধের কঠোরতা মোটেই হ্রাস পায়নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) প্রতিদিন মুকাবিলায় যেতেন এবং অবরোধকারীদের পিছিয়ে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু দিন দিন তার সঙ্গীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। সেই সাথে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে তাঁর সাফল্যের আশাও।

মক্কাবাসীরা একদিকে মক্কা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল এবং অপর দিকে রসদসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠায় অবরুদ্ধদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। ৭২ হিজরীর যিলকদ (৬৯২ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসে তারিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের শাসনকর্তা তালহাতুন-নিদাকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং একজন সিরীয়কে তথাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বয়ং পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। এই বিরাট সাহায্য এসে পৌঁছায় হাজ্জাজের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায়ই যিলহজ্জ মাস শুরু হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে মুসলমানরা হজ্জ সম্পাদনের জন্য মক্কায় আসতে শুরু করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হাজ্জাজকে হজ্জ সম্পাদনের অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাওয়াফও করেন নি এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈও করেন নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) আরাফার মাঠে যেতে চাইলে হাজ্জাজ বাধা দেন। তাই তিনি মক্কায়ই কুরবানী করেন। আরাফার মাঠে কোন ইমাম ছিলেন না। মোটকথা, ঐ বছর লোকেরা 'আরকানে হজ্জ' আদায় করতে পারে নি। হজ্জের দিনগুলোতেও হাজ্জাজ প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ করেন নি। তাই কা'বাঘর তাওয়াফ করাও আংশকামুক্ত ছিল না। হাজীদের আগমনের কারণে মক্কায় দুর্ভিক্ষ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও ঐ বছর হজ্জ করতে এসেছিলেন। তিনি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হাজ্জাজের কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি অন্তত এটুকু লক্ষ্য কর যে, লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জ করতে এসেছে। তারা যাতে তাওয়াফ ও সাঈ করার সুযোগ পায় এবং হজ্জ সম্পাদন করতে পারে এ সময়টুকুর জন্যও তো প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ রাখতে পার। এই পয়গামে এতটুকু কাজ হয় যে, হাজ্জাজ প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ রাখেন। কিন্তু তিনি নিজে তাওয়াফ করেননি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকেও আরাফার মাঠে যেতে দেননি। হজ্জের দিনগুলো অতিক্রান্ত হতেই হাজ্জাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বাইরে থেকে আগত লোকেরা যেন অতিসত্বর নিজ নিজ শহর অভিমুখে যাত্রা করে। কেননা ইব্ন যুবায়রের উপর অবিলম্বে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হবে। এই ঘোষণা শুনতেই বহিরাগতদের কাফেলা নিজ নিজ শহর অভিমুখে যাত্রা করে। সেই সাথে মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদের অনেকেও আত্মরক্ষার জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

হাজ্জাজ পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ শুরু করেন। একটি বিরাট পাথর কা'বাঘরের ছাদের উপর পতিত হয় এবং তাতে ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। ঐ পাথর পতিত হওয়ার সাথে সাথে আসমান থেকে বজ্রাঘাতের একটি বিকট শব্দ আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকায় এবং সমগ্র আসমান-যমীন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। এতে হাজ্জাজের সৈন্যরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রস্তরবর্ষণ বন্ধ করে দেয়। হাজ্জাজ লোকদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন, এই বিদ্যুৎ এবং এই কড় কড় শব্দ

আমার সাহায্যের জন্য এসেছে। এটা আমার বিজয়ের চিহ্ন। তোমরা তোমাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি একেবারে মুছে ফেল। দু'দিন পর্যন্ত এই অন্ধকার বাকি থাকে এবং বজ্রাঘাতের শব্দের ভয়ে হাজ্জাজের বাহিনীতে ভয়ানক আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে পরদিন পুনরায় বজ্রাঘাত হয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বাহিনীর দু'জন লোকও সেই আতংকে মারা যায়। এতে হাজ্জাজ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তার বাহিনীর লোকদের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। এবার স্বয়ং হাজ্জাজ নিজ হাতে মিনজানীকের মধ্যে পাথর ঢুকিয়ে তা নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। এতে তার বাহিনীর লোকদের আতংক দূর হয়ে যায় এবং তারাও পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ করতে থাকে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বা ঘরে নামায পড়তেন এবং বিরাট বিরাট পাথর তার আশেপাশে এসে পতিত হতো। এই অবস্থায়ও আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নিবিষ্টতা এবং তাঁর নামাযের বিনয় ও আন্তরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না।

অবরোধ কঠোরভাবে অব্যাহত থাকে। মক্কার বাইরে থেকে কোন প্রকার সাহায্য এবং রসদ সামগ্রী আসতে পারত না। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, ইব্ন যুবায়র (রা) নিজের ঘোড়াটি যবেহ্ করে তার গোশত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাঁর কাছে রসদসামগ্রী ও খেজুরের একটি ভাণ্ডার ছিল। তিনি তা থেকে শুধু এই পরিমাণ খাদ্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করতেন, যাতে কোন মতে তাদের জীবন রক্ষা পায়। উদ্দেশ্য ছিল, যেন দীর্ঘদিন অবরোধকারীদের মুকাবিলা করা সম্ভব হয়। হাজ্জাজ যখন দেখেন যে, তার কোন কৌশলই কার্যকরী হচ্ছে না তখন তিনি ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সঙ্গীদের কাছে পৃথক পৃথক 'আমান নামা' (নিরাপত্তাপত্র) লিখে পাঠাতে শুরু করেন। তার এই কৌশল ফলপ্রসূ হয় এবং বহুলোক ইব্ন যুবায়রের সঙ্গ ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায়। ফলে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই তাঁর সঙ্গে থাকে। এমন কি, তাঁর আপন দুইপুত্র হামযা এবং হাবীবও পিতাকে ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যান। অবশ্য তাঁর তৃতীয় পুত্র পিতার সঙ্গেই থাকেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করেন। যখন হাজার হাজার লোক ইব্ন যুবায়রের সঙ্গ ছেড়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায় এবং মাত্র গুটি কয়েক লোক তাঁর কাছে অবশিষ্ট থাকে তখন হাজ্জাজ আপন সৈন্যদেরকে একত্র করে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"তোমরা নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ্র শক্তি নিরূপণ করতে পেরেছ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা এতই অল্প যে, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদের উপর এক এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ করে তাহলেও তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, তারা সকলেই ক্ষুধিত ও পিপাসার্ত। হে সিরীয় ও কূফী বাহাদুরেরা! সামনে এগিয়ে চল। ইব্ন যুবায়র এ দুনিয়ার আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মেহমান।"

এই ভাষণদানের পূর্বে হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "এখন আপনার কাছে আর কোন শক্তি বাকি থাকে নি। আপনি সব দিক দিয়েই এখন অসহায়। অতএব এটাই সঙ্গত যে, আপনি আমাদের নিরাপত্তায় চলে আসুন এবং আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করুন। আপনার সাথে

অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং আপনার সব ইচ্ছাই পূরণ করা হবে। আমাকে আমীরুল মু'মিনীন এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, আমি যেন আপনাকে যথাসম্ভব আপোস-মীমাংসার দিকে আকৃষ্ট করি এবং আপনার হত্যার ব্যাপারে মোটেই তাড়াহুড়া না করি।"

ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর শাহাদাত

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ঐ চিঠি পড়ে তাঁর মা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে যান এবং নিবেদন করেন ঃ

"আমার সাথে এখন আর কোন লোক নেই। নামে মাত্র চার-পাঁচ জন আছে, যারা বাহ্যত আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমার সাথে লোকেরা ঠিক সেরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করেছে যেরূপ আচরণ করেছিল কূফীরা হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর সাথে। কিন্তু তাঁর ছেলেরা যতক্ষণ জীবিত ছিল ততক্ষণ পিতার সামনে তরবারি নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেছে। কিন্তু আমার ছেলেরাও ঐ ফাসিকের নিরাপত্তায় চলে গেছে। এখন হাজ্জাজ বলছে, তুমিও আমার নিরাপত্তায় এস। এরপর তুমি যা কিছু চাও আমি তোমাকে তাই দিতে রাযী আছি। শেষ পর্যন্ত আমি আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আপনি এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে বলেন?"

হযরত আসমা (রা) উত্তরে বলেন ঃ "তুমি তোমার ব্যাপার আমার চেয়ে ভালো বোঝ। যদি তুমি সত্যের উপর থাক এবং সত্যের দিকে মানুষকে আহবান করে থাক তাহলে একাজেই নিজেকে আগাগোড়া নিয়োজিত রাখ। তোমার সঙ্গীরা আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাতবরণ করেছে। তুমিও এ পথে অটল থেকে শাহাদাতবরণ কর। আর যদি তুমি দুনিয়া লাভের সংকল্প করে থাক তাহলে তুমি খুবই অযোগ্য লোক। তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরও ধ্বংস করেছ। আমার অভিমত এই যে, তুমি নিজেকে বনূ উমাইয়ার হাতে সঁপে দিও না। মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই এসে হাযির হবে। তোমাকে সুপুরুষের মত বাঁচতে হবে এবং সুপুরুষের মত মরতেও হবে। তোমার একথা, 'আমি সত্যের উপর ছিলাম এবং লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে দুর্বল করে ফেলেছে'– এমনি একটি কথা যা পুণ্যবান লোকদের মুখে শোভা পায় না।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তখন বলেন ঃ "আমার এই আশংকা যে, ওরা আমাকে হত্যা করার পর 'মুসলা' (দেহ থেকে বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ কেটে বিচ্ছিন্ন করা) করবে এবং ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলাবে।"

হযরত আসমা (রা) উত্তর দেন ঃ "বৎস! বকরী যখন যবেহ হয়ে যায় তখন কি সে একথার পরওয়া করে যে, তার দেহ থেকে চামড়া উপড়ে ফেলা হবে ? তুমি যা কিছু করছ দূরদর্শিতার সাথে করে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

এবার আবদুল্লাহ্ (রা) মায়ের মাথায় চুমু খান এবং নিবেদন করেন ঃ আমারও ঐ একই মত ছিল যা আপনি ব্যক্ত করেছেন। আমার দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও দুনিয়ার হুকুমত লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি একাজটি বেছে নিয়েছিলাম শুধু এজন্য যে, লোকেরা আল্লাহ্

তা'আলার আদেশ যথাযথভাবে পালন করত না এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকত না। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমি লড়ে যাব। আমি আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী মনে করেছি এবং আপনার উপদেশ আমার দৃষ্টিকে অনেক বেশি প্রসারিত করে দিয়েছে। আম্মাজান! আমি আজ অবশ্যই নিহত হব। আপনি কোন দুঃখ করবেন না বরং আমাকে আল্লাহ্‌র হাতে অর্পণ করুন। আমি কখনো কোন অবৈধ কাজের সংকল্প করিনি, কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, কারো উপর জুলুম করিনি, কোন জালিমের সাহায্যকারী হইনি এবং জেনেশুনে আল্লাহ্‌র মর্জির বিরুদ্ধে কোন কাজও করিনি। প্রভু! আমি একথাগুলো দম্ভ প্রকাশের জন্য বলিনি, বলেছি শুধু আমার মায়ের সান্ত্বনার জন্য।

এবার হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ আমি আশা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। তুমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ কর।

বিদায়কালে দৃষ্টি শক্তিহীনা আসমা (রা) যখন ছেলের সাথে গলাগলি করেন তখন তাঁর হাত ছেলের বর্মের উপর পড়ে। অমনি তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে এই বর্ম পরিধান করেছ? পুত্র উত্তর দেন, শুধু সান্ত্বনা ও মানসিক দৃঢ়তার জন্য। আসমা (রা) তখন বলেন, 'এটা খুলে ফেল এবং সাধারণ পোশাক পরেই শত্রুর সাথে লড়াই কর।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ম খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন, জামার ঝুল উঠিয়ে কোমরের সাথে বাঁধেন, হাতা দু'টি উপরে উঠান এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি আপন সঙ্গীদের বলেন ঃ

"হে আলে-যুবায়র ! তরবারির ঝংকারে তোমরা শংকিত হবে না। কেননা ক্ষতসৃষ্টির সময় যে কষ্ট অনুভূত হয় তার চাইতে ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগানোর কষ্টই অপেক্ষাকৃত বেশি। তোমরা নিজ নিজ তরবারি তুলে নাও। যেভাবে তোমরা নিজেদের চেহারাকে যে কোন আঘাত থেকে রক্ষা কর ঠিক সে ভাবে এই তরবারিকেও অন্যায় হত্যা থেকে রুখে রাখবে। তোমরা নিচের দিকে তাকাও, যাতে তরবারির চমক তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে না পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্মুখবর্তী শত্রুর সাথে লড়বে। আমাকে তোমরা খুঁজে ফিরো না। যদি একান্তই খোঁজ তাহলে আমাকে সবার আগে শত্রুর সাথে লড়তে দেখবে।"

একথা বলেই তিনি সিরীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একের পর এক তাদের সারিগুলো বিদীর্ণ করে সম্মুখে যাকে পান তাকেই মেরে ভূপাতিত করে একেবারে পিছনের সারিতে গিয়ে পৌঁছেন এবং পুনরায় এভাবে শত্রু বাহিনীর জনসমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসেন।

হাজ্জাজ নানাভাবে তার লোকদের উৎসাহিত করছিল, তবু কেউই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের সম্মুখবর্তী হওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হাজ্জাজ পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাঁর পতাকাবাহীকে ঘিরে ফেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা হামলা চালিয়ে তার পতাকাবাহীকে শত্রুদের বেষ্টনী থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং হাজ্জাজকে পিছনে হটিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মাকামে ইবরাহীমে ফিরে এসে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। হাজ্জাজ পুনরায় হামলা চালান। এতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পতাকাবাহী 'বাব-ই-বনূ শায়বায়' নিহত হন। মসজিদে হারামের প্রতিটি গেটে সিরীয়রা অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারা সমগ্র মক্কা নগরীও অবরোধ করে রেখেছিল। হাজ্জাজ ও তারিক 'আবতাখ' (ابطح)-এর দিক থেকে মারওয়া পর্যন্ত ঘিরে ফেলেছিলেন। ইব্‌ন যুবায়র (রা) কখনো এদিকে, আবার কখনো ওদিকে হামলা করছিলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি পুনরায় লড়তে শুরু করেন। সাফার দিকের গেটে তিনি হামলা করেন এবং সিরীয়দের অনেকদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। সাফা পাহাড়ের উপর থেকে এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে। তাতে তাঁর কপালে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এই অবস্থায়ও তিনি লড়তে থাকেন। মোটকথা তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত শত্রুদের মুকাবিলায় এমনি বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করেন, যা এ পৃথিবী কখনো দেখেনি। শেষ পর্যন্ত এক এক করে তাঁর সকল সঙ্গীই নিহত হয়। এবার শত্রুপক্ষ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের উপর চতুর্দিক থেকে প্রস্তর ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। তাতে বিশ্বের এই প্রখ্যাত বীর ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি ৭৩ হিজরীর জুমাদাস-সানী (৬৯২ খ্রি নভেম্বর) মাসের শেষ মঙ্গলবার শাহাদাতবরণ করেন। সিরীয় বাহিনী এই মৃত বীরের দেহ থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং হাজ্জাজের সামনে তা পেশ করা হয়। হাজ্জাজ তখন সিজদাতুশ শোকর আদায় করেন এবং তার বাহিনীর লোকেরা তাকবীর جيحون ধ্বনি দিয়ে উঠে। লাশটি ঐ জায়গায় অর্থাৎ জীহূন নামক স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং মস্তকটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবদুল মালিকের কাছে। অপর এক বর্ণনা মতে, মস্তকটি আবদুল মালিকের কাছে পাঠানো হয়নি, বরং তা কা'বাঘরের প্রাচীরে কিংবা ছাদে পানি নিষ্কাষণী নালায় ঝুলিয়ে রাখা হয়।

হযরত আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) লাশ দাফনের অনুমতি চান; কিন্তু হাজ্জাজ অনুমতি দেননি। আবদুল মালিক এই বিষয়টি জানতে পেরে হাজ্জাজকে তিরস্কার করেন এবং লাশ দাফনের অনুমতি দান করেন। এর কিছুদিন পর হযরত আসমা (রা)-ও ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন যুবায়রের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন। বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত প্রচুর পাথর সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। পবিত্র মেঝের এখানে সেখানে রক্তের দাগ বিদ্যমান ছিল। তিনি পাথরগুলো সেখান থেকে উঠিয়ে ফেলেন এবং রক্তের দাগসমূহও ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি মক্কাবাসীদের থেকে আবদুল মালিকের খিলাফতের বায়আত নিয়ে মদীনায় ফিরে যান। তিনি মদীনায় দুই মাস অবস্থান করেন এবং সমগ্র মদীনাবাসীকে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী ধারণা করে তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করেন। ফলে সাহাবায়ে কিরামকে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। তিনি সেখান থেকে পুনরায় মক্কার দিকে আসেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নির্মিত কা'বাঘর ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় নতুনভাবে তা নির্মাণ করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজকে হিজাযের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি তারিকের স্থলে মদীনায় অবস্থান করতে শুরু করেন।

এক নজরে ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফত

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর পর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ এতটা যোগ্য ছিল না যে, তাকে মুসলমানদের খলীফা নির্বাচন করা যায়। কেননা তখন মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু লোক

বিদ্যমান ছিলেন যারা সব দিক দিয়েই হুকুমত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে ইয়াযীদের চাইতে ঢের বেশি যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইয়াযীদের অনেক আচার-আচরণই ছিল আপত্তিকর। তাই কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি তার হাতে বায়আত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

আমীরে মুআবিয়ার পর যদি ইমাম হাসান (রা) জীবিত থাকতেন তাহলে মুসলমানরা তাঁকে খলীফা হিসাবে মেনে নেওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা ছিল। ইয়াযীদের মুকাবিলায় যদি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) খিলাফতের দাবি করতেন তাহলে শুধু বিভিন্ন দল-উপদলের মুসলমান নয়, বরং বনূ উমাইয়ারও একটি বিরাট দল তাঁকে সমর্থন করত। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ দেখাননি। ইমাম হুসাইন (রা) স্বয়ং খিলাফত লাভের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কূফাবাসীরা তাঁকে ধোঁকা দেয়। হিজায তথা মক্কা-মদীনার লোকদের কোন পরামর্শই তিনি গ্রহণ করেননি। তাই হিজাযবাসীরাও তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। এমতাবস্থায় খিলাফতের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর খিলাফত যে সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্বের লোকেরা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর খিলাফত মেনে নিয়েছিল। যে সমস্ত জায়গায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল সেখানকার কোন লোকই তাঁর খিলাফত অস্বীকার করেনি। তবে হ্যাঁ, বনূ উমাইয়ার লোকেরা, যারা এ ব্যাপারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। তারা জবরদস্তিমূলক সিরিয়া, মিসর, ফিলিস্তীন প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের হুকুমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং এভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপরও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফতের মুকাবিলায় মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও আবদুল মালিকের হুকুমতকে বিদ্রোহীদেরই হুকুমত আখ্যা দেওয়া যায়। অতএব শুধু আবদুল মালিকের ঐ শাসনামল, যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের শাহাদাতের পর শুরু হয়েছিল সেটাকে যথারীতি হুকুমত এবং বৈধ খিলাফত মনে করা যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর শাসনামলে অনবরত লড়াই-ঝগড়া ও বিদ্রোহের কারণে একটুখানিও স্বস্তি পাননি। তাই তাঁর শাসনামলে, দেশজয় ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কোন চিহ্নই নজরে পড়ে না। আর এতে বিস্মিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। কেননা এ জাতীয় কাজ করার কোন অবকাশই তিনি পাননি। তিনি একজন বিরাট সেনাধ্যক্ষ ও সমর বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং সেই সাথে ছিলেন বিচক্ষণ শাসকও। কিন্তু এটাকে একটা দুর্ঘটনাই বলতে হবে যে, তাঁর প্রতিপক্ষের যাবতীয় চেষ্টা-তদবীর অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হয় এবং তারই জের হিসাবে তাঁকে শাহাদাতবরণ করতে হয় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। সংসার-বিমুখতা ও ইবাদত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় জীবনাদর্শের অধিকারী।

বনূ উমাইয়ার খলীফাদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রচুর টাকা-পয়সা বিলিয়ে দিয়ে নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং তা সুদৃঢ় করার কৌশলটি তারা খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। তারা যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনেও খুব দক্ষ ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিভাবে এবং কোথায় সেই অর্থ বিলিয়ে দিতে হবে সে ব্যাপারেও ছিলেন অপূর্ব

পারদর্শিতার অধিকারী। যদি মানুষের মধ্যে টাকা-পয়সার আসক্তি না থাকতো তাহলে বনূ উমাইয়ারা কখনো তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারত না এবং হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকেও তাদের মুকাবিলায় বিফল হতে হতো না।

ইব্ন যুবায়রও যদি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের মত বায়তুলমালকে আপন বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীদের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন এবং দুর্বল লোকদের স্বার্থের প্রতি দৃকপাত না করতেন তাহলে তাঁর আশেপাশেও অনেক বীর বাহাদুরেরা ভিড় জমাত। ফলে বনূ উমাইয়াকেই ব্যর্থতার মুখ দেখতে হতো। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায় ও অসত্যকে প্রশ্রয় দেন নি। তাই পার্থিব বিজয়লাভের জন্য অনুরূপ আচরণ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের সাথে সর্বতোভাবে মানানসই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের খিলাফত আমলে কূফায় মুখতারকে হত্যা, পারস্যে খারিজীদের বিশৃংখলা দমন এবং যথাসম্ভব তাদেরকে পুনর্গঠিত হতে না দেওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর এক একটি বিরাট কীর্তি। যদি বনূ উমাইয়াদের সাথে তাঁর অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও পরস্পর রশি টানাটানি সর্বক্ষণ লেগে না থাকত তাহলে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠতম খলীফা হিসাবে প্রমাণ করতে পারতেন এবং বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারতেন। তাঁর শাহাদাত লাভের পর সাহাবায়ে কিরামের শাসন পরিচালনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও আল্লাহ্প্রীতি ছিল হিদায়াতের মশালস্বরূপ। তিনি ছিলেন একমাত্র খলীফা যাঁর রাজধানী ছিল মক্কা। তাঁর পূর্বে অথবা পরে মক্কা কখনো কোন রাজ্যের রাজধানী ছিল না বা হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা), তাঁর ভাই মুসআব এবং তাঁর পিতা হযরত যুবায়র ইব্নুল আওয়ামের অতুলনীয় বীরত্বগাথা, তাঁর মাতা হযরত আসমা বিন্ত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সত্যের প্রতি অপূর্ব আসক্তি মানুষের অন্তরকে যারপরনাই আলোড়িত ও বিমোহিত করে এবং বিশ্বের বীর-বাহাদুরদের অন্তরে জাগ্রত হয় তাঁদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধুলায় ও রক্তে লুটোপুটি খাওয়া এবং তীর ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাত বুকে বয়ে নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এবং শত্রুবাহিনীকে তরবারি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা যেমন কঠিন ও দুরূহ কাজ, তেমনি আনন্দদায়ক ব্যাপারও বটে। তীক্ষ্ণধার বর্শার ঝলক এবং তরবারির চমকের মধ্যেই হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং বীরত্ব ও উচ্চ সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের যুগ এতই অপয়া যে, আমাদের এই যুগের মু'মিনদের রক্ত শিরায় বীরত্ব ও বীরশ্রেষ্ঠদের কাহিনীসমূহ মাত্র কিছুক্ষণের জন্য খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা এমন কোন ময়দান দেখতে পাই না, যেখানে যোদ্ধাদের মস্তকরাজি একের পর এক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, বর্শাসমূহ বক্ষ ভেদ করে এপার ওপার হয়েছে, গর্দানসমূহ থেকে রক্তের ফোয়ারা তীরবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, লাশসমূহ লহুর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, অশ্বরাজির খুরের নিচে ক্ষতবিক্ষত লাশসমূহ কীমায় পরিণত হচ্ছে, কর্তিত মস্তকসমূহ অশ্বের পায়ের আঘাতের পর আঘাত খেয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে, ধুলো মেঘের আড়ালে সূর্যকিরণ ঢাকা পড়ছে, অনবরত তাকবির ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, আল্লাহ্ প্রেমে আসক্ত বান্দারা তাঁদের প্রভুর নাম উচ্চে তুলে ধরার জন্য নিজেদের জান কুরবানীর ক্ষেত্রে

একে অন্যের সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আর আল্লাহ্‌র অপার রহমত ও করুণারাশি বেষ্টন করে আছে তাঁদের সেই পবিত্র ময়দান ও পবিত্র পরিবেশ। এই আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যরাজি অবলোকন করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তালহা, যুবায়র, খালিদ, দিরার, শুরাহবিল, আবদুর রহমান, হুসাইন ইব্‌ন আলী, আবদুর রহমান ইব্‌নুয যুবায়র, তারিক ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম, মুহাম্মদ খান (দ্বিতীয়), সুলায়মান আযম, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, নূরুদ্দীন যঙ্গী, মাহমূদ গাযনাবী, শিহাবুদ্দীন ঘুরী প্রমুখ বীর জনেরা। আমাদের মত দুর্বল ঈমান ও ভীরু হৃদয়ের লোকদের সেই সৌভাগ্য কোথায় ? আর বোধ হয় এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তরবারি, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদি বেকার করে দিয়ে সেগুলোর পরিবর্তে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন কামান, বন্দুক এবং উড়োজাহাজের মত যুদ্ধাস্ত্র। কেননা হৃদয়ের ক্ষমতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও সাহস-উদ্দীপনার প্রাবল্য অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের কিরণধারা যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তীক্ষ্ণধার তরবারির উপর প্রতিফলিত হয় সেরূপ বারুদের উদগীরণ বা অন্য কিছুতেই হয় না, হতে পারে না।

কূফা

এ যাবত যে সমস্ত দেশ ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায়, কূফা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের একটি বিস্ময়কর জনবসতি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা এবং প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রকারী দলই কূফায় নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। কূফাবাসীরাই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এরাই ছিল হযরত আলী (রা)-এর একান্ত ভক্ত অনুরক্ত। আবার তারাই তাঁকে ত্যক্ত-বিরক্ত করেছে সব চাইতে বেশি এবং তারাই ছিল তাঁর অনেক ব্যর্থতার কারণ। এই কূফাবাসীরাই হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তারাই আবার পরবর্তী সময়ে হযরত আলী হত্যার কিসাস দাবি করেছে এবং হযরত ইমাম হুসাইনের খিলাফত সমর্থন করেছে। এই কূফাবাসীরাই ছিল ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের কারণ। তারাই কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়েছে। এরপর তারাই সবার আগে ইমাম হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি তুলেছে। এই কূফাবাসীরাই আহ্‌লে বায়তের সবচেয়ে বড় সমর্থক মুখতার ইব্‌ন উবায়দার বিরোধিতা করেছে এবং মুসআব ইব্‌নুয যুবায়রকে ডেকে এনে তাঁর মাধ্যমে মুখতারকে হত্যা করিয়েছে। এই কূফাবাসীরাই ছিল মুসআব হত্যার মূল হোতা। কূফাবাসীরা একদিকে যেমন বীরত্বের অনেক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তেমনি চরম ভীরুতা ও কাপুরুষতার অনেক ঘটনা ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে হাসিয়েছে। তারা কখনো নিজেরাই নিজেদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করিয়েছে এবং প্রকাশ্যে কূফার শাসনকর্তাদের বিরোধিতা করেছে। আবার কখনো কখনো এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ প্রমুখ কূফার গভর্নরের প্রতিটি জবরদস্তিমূলক নির্দেশ একেবারে মুখ বুঁজে মেনে নিয়েছে।

স্বভাব-চরিত্রের এই বৈপরিত্যের কারণ জানতে হলে আমাদেরকে কূফার অধিবাসীদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ফারূকে আযমের খিলাফত আমলে কূফায় ঐ সমস্ত লোকের জন্য সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়, যারা অগ্নিউপাসক ইরানীদের মুকাবিলায় যুদ্ধরত ছিলেন। ঐ বাহিনীর একটি অংশ সেই সমস্ত লোকের সমন্বয়ে গঠিত

হয়েছিল, যারা ছিল হিজায, ইয়ামান, হাদরামাউত প্রভৃতি এলাকার অধিবাসী। এসব লোক ফারূকে আযমের সাধারণ আহবানের পর জিহাদের জন্য মদীনায় এসে সমবেত হয়েছিল এবং তাঁরই নির্দেশে ইরাকের দিকে প্রেরিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক আরবের ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তবে তারা ইরাক সীমান্তে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল। তাদের অধিবাস ছিল কূফা ও বসরার সন্নিকটে। ঐ সমস্ত লোক, সাহাবায়ে কিরামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মদীনার সাথে তাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি, এমন কি তারা মদীনা স্বচক্ষে দেখেও নি। কিছু লোকের ভাষা আরবী ছিল বটে, কিন্তু তারা ছিল অগ্নিউপাসক-সাম্রাজ্যের প্রজা। তারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছিল এবং মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা মনে করে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিল। তারা মুসলমানদের হাতে হাত মিলিয়ে ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মদীনার অধিবাসী মুহাজির ও আনসারও ছিলেন। যখন কূফায় ঐ বাহিনীর শিবির স্থাপিত হলো এবং তৎকালীন খলীফার প্রতিনিধি ও ইরাকী বাহিনীর অধিনায়ক কূফায় বসবাস করতে লাগলেন তখন তাদেরই প্রয়োজনে ইরানী শহরসমূহের বহু সংখ্যক অধিবাসী কূফার সরকারী দফতরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হলো। ফলে ইরানীদেরও একটি দল কূফায় বসবাস করতে শুরু করল। আরবের মরু অঞ্চলের সরল-সহজ জীবনের অনুপাতে কিসরা, নওশেরওয়াঁ, কায়কাউস ও খসরুর দেশসমূহ জয়কারী সেনাবাহিনীর বিজেতাও শাসক সুলভ জীবন, যা কূফায় অতিবাহিত হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে অধিক সুখকর ও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকবে। মালে গনীমতের প্রাচুর্য ও তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকবে। অতএব বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত ঐ বাহিনীর অধিকাংশ লোক কূফায় তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে। ফলে কূফা শুধু একটি সেনাছাউনি বা সৈন্যদের সামরিক আবাসস্থল থাকেনি, বরং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বিরাট নগরীর রূপ ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত 'দারুল খুলাফা' তথা রাজধানীতে পরিণত হয়। ঐ শহরের অধিবাসীদের বেশির ভাগ লোকই ছিল যোদ্ধা এবং জ্ঞানার্জন, চরিত্রগঠন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির উপাদান যেহেতু সেখানে অনেক কম ছিল তাই সাধারণভাবে সেখানকার অধিবাসীদের মনমেযাজ ও স্বভাব-চরিত্রও ছিল অনেকটা বিশৃঙ্খল ও বিকৃত ধরনের। এ ধরনের একটি জনবসতিতে বাহ্যত বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির অভাব থাকলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্ভট কল্পনার কোন অভাব থাকে না। এ কারণেই কূফাবাসীদেরকে সব সময়ই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্ভট কল্পনার কোন অভাব থাকে না। এ কারণেই কূফাবাসীদেরকে সব সময়ই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা গেছে। আর এ কারণেই তাদেরকে যে-ই চেয়েছে, সে-ই ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আবার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে যে-ই তাদেরকে অনুগত করতে চেয়েছে তারা তার অনুগতও হয়েছে। আবার যে-ই তাদেরকে ভয় দেখাতে পেরেছে, তারা তাকে ভয় করেছে। আবার যখন কেউ তাদেরকে কারো বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধাচরণে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন তাদেরকে বীরত্বের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তারা বীর বাহাদুরে পরিণত হয়েছে। পুনরায় যখন তাদেরকে বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্ততার শর্তাদি পূরণে আত্মনিয়োগ করেছে।

কূফীদের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিল না। তাদের ভাবাবেগ ছিল, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ছিল না। এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে সেই আচরণই আশা করা যেতে পারে, যা

তারা বার বার করে দেখিয়েছে। কিন্তু যখন তাদের কয়েক পুরুষ অতিক্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটে তখন তাদের মধ্যে এক নতুন মন-মেযাজের সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে প্রথম প্রথম যে অস্থিরচিত্ততা ও অপরিণামদর্শিতা ছিল তা ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম ইব্‌ন আবুল 'আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব ২৩ হিজরীর রমযান (৬৪৩ খ্রি-এর জুলাই) মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আবুল ওয়ালীদ। তিনি আবুদল মালিক নামেই বদুখ্যাত। কেননা তাঁর কয়েকজন পুত্র একের পর এক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ইয়াহ্‌ইয়া গাস্‌সানী বলেন, আবদুল মালিক প্রায়ই মহিলা সাহাবী উম্মু দারদা (রা)-এর কাছে বসতেন। একদা উম্মু দারদা (রা) তাঁকে বলেন, আমি শুনেছি, তুমি ইবাদত-গুযার হয়েও মদ্য পান করে থাক। আবদুল মালিক উত্তরে বলেন, আমি তো রক্তপায়ীও হয়ে গেছি। নাফিঈ বলেন, মদীনার কোন যুবকই আবদুল মালিকের মত চালাক, চতুর, কুরআন-হাদীসে অভিজ্ঞ এবং আবিদ ও যাহিদ ছিল না। আবুল যিনাদ বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ছিলেন মদীনার ফকীহ্। উবাদা ইব্‌ন মুসান্না ইব্‌ন উমর জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের পর আমরা কার কাছে মাসলা-মাসাইল জিজ্ঞেস করব ? তিনি উত্তর দিন, মারওয়ানের পুত্র (আবদুল মালিক) একজন ফকীহ্। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর।

একদা আবদুল মালিক হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর খিদমতে হাযির হলে তিনি তাকে উদ্দেশ করে বলেন, এই ব্যক্তি একদিন আরবের বাদশাহ্ হবে। আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার পর উম্মু দারদা (রা) একদা তাঁকে বলেন, আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি একদিন বাদশাহ্ হবে। আবদুল মালিক জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে বুঝতে পেরেছিলেন ? তিনি উত্তর দেন, আমি তোমার মত না কোন আলাপকারী দেখেছি, আর না আলাপ শ্রবণকারী। শা'বী বলেন, আমি যার সংস্পর্শেই গিয়েছি সেই আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু আমি আবদুল মালিককে (আমার চাইতেও অধিক) জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অধিকারী মনে করি। আমি যখনই তাঁর কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করেছি, তখনি তিনি তাতে কিছু না কিছু সংযোজন করেছেন। আবার যখনই তাঁর সামনে কোন কবিতা আবৃত্তি করেছি তখনই তিনি ঐ বিষয়ের উপর এক গাদা কবিতা শুনিয়ে দিয়েছেন। যাহাবী বলেন, আবদুল মালিক উসমান, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, উম্মু সালামা, বারীরা, ইব্‌ন উমর এবং মুআবিয়া (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর থেকে উরওয়া, খালিদ ইব্‌ন সাদান, রাজা ইব্‌ন হায়াত, যুহরী, ইউনুস ইব্‌ন মায়সারা, রবীআ ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্, জারীর ইব্‌ন উসমান প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া গাসসানী বলেন, মুসলিম ইব্‌ন উকবা মদীনায় এসে পৌঁছালে আমি মসজিদে নববীতে যাই এবং আবদুল মালিকের কাছে গিয়ে বসি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমিও কি এই বাহিনীতে আছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ!

আবদুল মালিক বললেন, তুমি এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছ, যিনি ইসলামের আবির্ভাবের পর (মুসলিম সমাজ) সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী, যাতুন নাতাকায়ন (হযরত আসমা)-এর সন্তান এবং যাকে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'তাহ্‌নীক' (খেজুর চিবিয়ে তরল করে নবজাত শিশুর মুখে ঢেলে দেওয়া) করেছেন। তাছাড়া আমি যখনই তাঁর সাথে দিনের বেলা সাক্ষাত করেছি তাকে রোযাদার পেয়েছি এবং যখনই রাতের বেলা তাঁর কাছে গিয়েছি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। স্মরণ রাখ, যেই তাঁর বিরুদ্ধে লড়বে তাকেই আল্লাহ্ তা'আলা উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি নিজেই হাজ্জাজকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তারই হাতে তিনি নিহত হন।

জুরায়জ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের শাহাদাতের পর আবদুল মালিক একটি ভাষণ দেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবীর প্রশস্তির পর তাতে তিনি বলেন, "আমি না দুর্বল খলীফা, (অর্থাৎ উসমান), না মন্থর খলীফা (অর্থাৎ মুআবিয়া) আর না দুর্বলমনা খলীফা (অর্থাৎ ইয়াযীদ) আমার কাছে তরবারিই হচ্ছে মানুষের বক্রতা দূর করার একমাত্র ওষুধ। তোমাদের কর্তব্য হবে আমারই সাহায্যে তোমাদের বর্শা উঁচিয়ে ধরা। মুহাজিরদের কর্মধারা অনুসরণের জন্য তোমরা আমার উপর চাপ সৃষ্টি কর, কিন্তু নিজেরা তাদেরকে অনুসরণ কর না। স্মরণ রেখ, আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়ে একেবারে শেষ করে ফেলব। তরবারিই তোমাদের ও আমাদের ফায়সালা করবে। আমার তরবারি কি অবস্থার সৃষ্টি করে তা তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। আমি তোমাদের সব কথাই সহ্য করব কিন্তু হাকিমের (খলীফার) বিরুদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ কখনো সহ্য করব না। আমি সব কাজের দায়-দায়িত্ব তোমাদের ঘাড়ের উপর চাপাব। এরপর যার ইচ্ছা সে আমাকে যেন আল্লাহ্‌র ভয় দেখায়।

সর্বপ্রথম আবদুল মালিকই কা'বা ঘর রেশমী পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন। তাঁকে জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! অনেক তাড়াতাড়ি আপনার বার্ধক্য এসে গেছে। তিনি উত্তর দেন, আসবে না কেন! আমি প্রত্যেক জুমুআয় আমার শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিটুকু মানুষের জন্য খরচ করি। জনৈক ব্যক্তি আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করল, শ্রেষ্ঠতম মানুষ কে ? তিনি উত্তর দিলেন, যে উচ্চমর্যাদা লাভ করার পরও মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করে, ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সংসার বিমুখতাকে প্রাধান্য দেয় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আবদুল মালিকের কাছে বাইরে থেকে কোন লোক আসলে তিনি তাকে বলতেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

এক ঃ মিথ্যা বলবে না। কেননা মিথ্যাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। দুই ঃ আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করব তারই উত্তর দেবে। তিন ঃ আমার প্রশংসা করবে না, কেননা আমি নিজেকে খুব ভালোভাবেই জানি। চার ঃ আমাকে আমার প্রজাদের বিরুদ্ধে কখনো উস্কানি দেবে না। কেননা তারা আমার অনুগ্রহেরই অধিক মুখাপেক্ষী।

মাদায়িনী বলেন, যখন আবদুল মালিকের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তিনি আর বাঁচবেন না তখন তিনি বলেন, জন্মগ্রহণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই আক্ষেপই করে আসছি,

'হায়! আমি যদি কুলি হতাম।' এরপর তিনি আপন পুত্র ওয়ালীদকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং অন্তঃবিরোধ থেকে দূরে থাকবে। তিনি তাকে আরো বলেন ঃ

"যুদ্ধের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেবে এবং পুণ্যকর্মে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করবে। কেননা যুদ্ধ কখনো নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুকে ডেকে আনে না। আর পুণ্যকর্মের পুরস্কার অবশ্যই পাওয়া যায় এবং বিপদে আল্লাহ্ মানুষের সাহায্যকারী হন। কঠোরতার মধ্যে নম্রতা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। নিজেদের মধ্যে মনঃবিবাদ বাড়াবে না। কেননা একটি তীর যে কেউ ভাঙ্গতে পারে। কিন্তু যখন অনেকগুলো তীর একত্রে জড় করা হয় তখন সেগুলো কেউ ভাঙ্গতে পারে না। হে ওয়ালীদ! আমি যে ব্যাপারে তোমাকে খলীফা করেছি সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। হাজ্জাজের দিকে লক্ষ্য রাখবে। সেই তোমাকে খিলাফত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তাকে তুমি নিজের ডান হাত এবং নিজের তরবারি মনে করবে। সে তোমাকে তোমার শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। তার সম্পর্কে কারো কোন কথা শুনবে না। স্মরণ রাখবে, হাজ্জাজের প্রয়োজন তোমার অনেক বেশি, কিন্তু তোমার প্রয়োজন হাজ্জাজের বড় একটা নেই। আমি মরে যাওয়ার পর জনসাধারণের কাছ থেকে খিলাফতের বায়আত নেবে। যে ব্যক্তি বায়আত করতে অস্বীকার করবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে।"

মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে ওয়ালীদ তাঁর কাছে এসে কাঁদতে থাকেন। তখন আবদুল মালিক বলেন, "মেয়েদের মত কেঁদে কি লাভ ? আমার মৃত্যুর পর কাঁধের উপর তরবারি ঝুলিয়ে নির্ভীকচিত্তে সদা প্রস্তুত থাকবে। যে কেউ তোমার সামান্য মাত্র বিরোধিতা করবে তুমি তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। যে চুপ থাকবে তাকে ছেড়ে দেবে। সে তার মৃত্যু রোগে আপনা-আপনি মারা পড়বে।"

আবদুল মালিক ৮৬ হিজরীর শাওয়াল (৭০৫ খ্রি-এর অক্টোবর) মাসে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। সালাবী বলেন, আবদুল মালিক বলতেন, আমি রমযানে জন্মগ্রহণ করেছি, রমযানেই আমার দুধ (মাতৃস্তন) ছাড়ানো হয়েছে, রমযানেই আমি প্রথম কুরআন খতম করেছি, রমযানেই আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি, রমযানেই 'অলীআহ্‌দ' নিযুক্ত হয়েছি, রমযানেই আমি মারা যাব। কিন্তু যখন রমযান অতিক্রান্ত হয় এবং আবদুল মালিক নিজের জীবন সম্পর্কে কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠেন ঠিক তখনি অর্থাৎ শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

একদা আবদুল মালিকের কাছে এক স্ত্রীলোক এসে বলে, আমার ভাই ছয়শ দীনার রেখে মারা গেছেন। কিন্তু মীরাস বণ্টনকালে আমাকে একটি মাত্র দীনার দেওয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, এটুকুই তোমার প্রাপ্য।

আবদুল মালিক তখনি শা'বীকে ডেকে পাঠান এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। শা'বী বলেন, এই বণ্টন যথাযথ হয়েছে। মৃত ব্যক্তি দু'টি মেয়ে রেখে মারা গেছে। মেয়েরা দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশ দীনার পাবে, মা পাবে এক-যষ্ঠাংশ অর্থাৎ একশ দীনার, স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ পঁচাত্তর দীনার এবং বার ভাই পাবে চব্বিশ দীনার। অতএব এই হিসাব তার (বোনের) অংশে এক দীনারই আসবে।

আবদুল মালিকের খিলাফত আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর মৃত্যুর পর আবদুল মালিক হাজ্জাজকে হিজাযের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। হাজ্জাজ কা'বাঘর ভেঙে ফেলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) নির্মিত কা'বা ঘরের একটি অংশ বাদ দিয়ে নতুনভাবে তা নির্মাণ করেন। হাজ্জাজ মক্কা ও মদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরামের সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেন। হযরত আনাস (রা) প্রমুখ প্রবীণ সাহাবীদের দ্বারাও তিনি পানির মশক টানিয়েছেন, এমনকি তাঁদেরকে বেত্রাঘাতও করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহাবীর সাথেও হাজ্জাজ শত্রুতা পোষণ করতেন। আর তা শুধু এজন্য যে, ইব্ন উমর (রা) সব সময় স্পষ্টবাদী ও ন্যায়ানুসারী ছিলেন। হাজ্জাজের শাসন তাঁকে ভীতগ্রস্ত করতে পারত না। সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ থেকে কোন কিছুই তাঁকে রুখতে পারত না। ইব্ন উমরকে আহত, এমনকি শেষ করে ফেলার জন্য হাজ্জাজ জনৈক ব্যক্তিকে মোতায়েন করেন। হজ্জের সময় যখন তিনি ক'বাঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন ঠিক তখনই ঐ লোকটি ভিড়ের মধ্যে তাঁর পায়ের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তা তাঁর পায়ের পাতা ভেদ করে মাটিতে গিয়ে ঠেকে। ঐ ক্ষতের যন্ত্রণায় কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইনতিকাল করেন। হাজ্জাজের ঐ সমস্ত জুলুম-অত্যাচার যা তিনি সাহাবীদের উপর চালিয়েছিলেন তাতে শুধু তিনিই দোষী বা অপরাধী প্রমাণিত হন না, সেই সাথে আবদুল মালিকের উপরও সেই অপরাধের দায়-দায়িত্ব গিয়ে বর্তায়। কেননা তিনিই তো এ ধরনের জালিম ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির হাতে মক্কা মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন। আবদুল মালিক ও হাজ্জাজের মধ্যে কিছু কিছু সৎগুণাবলী অবশ্যই ছিল, তবে সেই সাথে ছিল উল্লিখিত জঘন্য ধরনের দোষত্রুটিও।

খারিজীদের ফিতনা

যে যুগে ইব্ন যুবায়রের খিলাফতের পতনের আলামতসমূহ ফুটে উঠে এবং আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের লোকেরা ইরাক ও পারস্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে তখন খারিজীদের বিভিন্ন গ্রুপ, যারা এতদিন ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে নীরব জীবন-যাবন করছিল, পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে জেগে উঠতে শুরু করে। মুসআব ইব্ন যুবায়রকে হত্যার মাধ্যমে ইরাকে আবদুল মালিকের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে সেখানকার বিদ্রোহী ভাবাপন্ন লোকেরা পুনরায় কানাঘুষা শুরু করে দেয়। ইরাক দখল করার পর আবদুল মালিক খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র হাতে বসরার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। ইরাক থেকে দামিশ্কে ফিরে যাবার পর তিনি খারিজীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পুরোপুরি নিবদ্ধ রাখতে পারেন নি। কেননা তখন তাঁর অন্তরে হিজায ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের চিন্তাও ছিল। তাঁকে হত্যা করার পর আবদুল মালিক বসরা ও কূফার গভর্নরদের পদচ্যুত করে আপন ভাই বশীরকে একাধারে কূফা ও বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন ঃ তুমি মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে খারিজীদের মুকাবিলায় পারস্যে প্রেরণ কর। সে খারিজীদের যেখানে পায় সেখানেই যেন নির্মূল করে। মুহাল্লাব বসরা থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আর তুমি কূফা থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে মুহাল্লাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ কর, যাতে সে সম্পূর্ণরূপে এই

বিশৃংখলা নির্মূল করতে সক্ষম হয়। এই নির্দেশ মুহাল্লাবের নামেও সরাসরি পাঠানো হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন কর্তৃক সরাসরি মুহাল্লাবকে এভাবে দায়িত্ব প্রদান করাটা বশীরের মনঃপূত হয়নি। তার মতে খারিজীদের দমনে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হওয়া উচিত ছিল যাতে তিনি যাকে ইচ্ছা এ কাজে নিয়োগ করতে পারেন। মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরা আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী বসরা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এদিকে বশীর ইব্‌ন মারওয়ানও আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুহাল্লাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফকে বলেন, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমি তোমাকে মুহাল্লাবের চাইতে অধিকযোগ্য মনে করি। অতএব তুমি নিজেকে পুরাপরি মুহাল্লাবের অধীনে ন্যস্ত করবে না, বরং নিজের মতামতও কাজে লাগাবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ 'দ্বারে হরমুয়' নামক স্থানে গিয়ে মুহাল্লাবের সাথে মিলিত হন। তবে নিজের বাহিনী পৃথক রেখেই শিবির স্থাপন করেন এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যের হাবভাব প্রকাশ করতে থাকেন। কিছুদিন পরই ঐ জায়গায় সংবাদ পৌঁছে যে, বশীর ইব্‌ন মারওয়ান মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্বে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গেছেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বসরা ও কূফার সৈন্যরা নিজ নিজ শহরে ফিরে যেতে শুরু করে। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাদেরকে অনেক করে বোঝান, এমন কি ভীতি প্রদর্শনও করেন, তবু তারা মুহাল্লাবের কাছে ফিরে যেতে রাযী হয়নি। অপরদিকে খুরাসানের অবস্থা এই ছিল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিমকে হত্যার পর (যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) তুর্কিস্তান ও মুঘালিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেল খুরাসান সীমান্তে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম আপন পিতামাতার সঙ্গী ও অনুসারীদেরকে নিয়ে মার্ভ থেকে পালিয়ে 'তিরমিয' নামক দুর্গে অবস্থান নেন এবং নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ একদিকে তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করে যেমন সাফল্য অর্জন করতেন, অন্যদিকে আবদুল মালিক কর্তৃক নিযুক্ত খুরাসানের শাসনকর্তার সাথেও সব সময় যুদ্ধরত থাকতেন। খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন বুকায়র ইব্‌ন বিশাহ্। আবদুল মালিক তাকে পদচ্যুত করে উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ উসায়দকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। উসায়দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তার পদচ্যুতির পর খুরাসানেই অবস্থান করতে থাকেন এবং উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পরবর্তীকালে তাকে মার্ভের কোতওয়াল (পুলিশ প্রধান) নিয়োগ করেন। উমাইয়া খুরাসানে পৌঁছে তুর্কিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেলকে আক্রমণ করেন। এর ফলে তিনি এই শর্তের উপর সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন যে, আগামীতে তিনি কখনো মুসলমানদের উপর হামলা করবেন না। উমাইয়া তুর্কিস্তানের বাদশাহের সাথে উপরোক্ত চুক্তি সম্পাদন করে বল্‌খ থেকে মার্ভের দিকে ফিরে আসছিলেন এমন সময় মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তার উপর হামলা করেন। কিন্তু উমাইয়া বেশ কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করে হলেও ঐ হামলা থেকে নিজেকে কোনমতে রক্ষা করে মার্ভের ধারেকাছে গিয়ে পৌঁছেন। অগত্যা মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পৌঁছে জানতে পারেন যে, বুকায়র ইব্‌ন বিশাহ্ মার্ভের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। এখানেও যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বুকায়র শহরকে সুদৃঢ় করে বসে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন পর সন্ধি স্থাপিত হয় এবং উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুকায়রকে

খুরাসানের কোন একটি প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্ভকে তার দখল থেকে ছাড়িয়ে নেন।

ওদিকে মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরা এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে খারিজীদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। বাহিনীর লোকেরা ফিরে যাওয়ায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীকে হিজাযের গভর্নর পদ থেকে বদলী করে ৭৫ হিজরীতে (৬৯৪ খ্রি) তার হাতে একাধারে কূফা ও বসরার শাসনভার অর্পণ করেন। হাজ্জাজ ৭৫ হিজরীর রমযান (৬৯৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসে কূফায় প্রবেশ করেন। তিনি সোজা জামে মসজিদের মিম্বরে গিয়ে বসেন এবং জনসাধারণকে সেখানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন।

কূফার লোকেরা সাধারণত অশিষ্ট ছিল। তারা শাসনকর্তাদের হেয় প্রতিপন্ন করতে ছিল অভ্যস্ত। তারা হাজ্জাজের আহ্বানে সাড়া দেয় বটে, তবে ভাষণ দানকালে তার উপর ছুঁড়ে মারার জন্য মুঠি ভরে কংকর নিয়ে আসে। কিন্তু হাজ্জাজ যখন বক্তৃতা করতে শুরু করেন তখন তার এমনি প্রতিক্রিয়া হয় যে, শ্রোতা মাত্রেই আতংকিত হয়ে ওঠে এবং ভয়ের চোটে কংকরগুলোও আপনা-আপনি তাদের হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। হাজ্জাজ তার বক্তৃতায় বলেন ঃ

"এখানে অনেক পাগড়ি ও দাড়ি আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যা অচিরেই রক্তাপ্লুত হবে। এই সমাবেশে এমন অনেক মাথা আমি দেখতে পাচ্ছি যেগুলোকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমীরুল মু'মিনীর আবদুল মালিক তাঁর তূনীরের সবগুলো তীর পরীক্ষা করে যেটাকে সবচাইতে শক্ত ও অব্যর্থ পেয়েছেন সেটাই তোমাদের উপর নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমার মত পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিকে তোমাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। আমি তোমাদের সমস্ত দুষ্টামি ও বক্রতা দূর করে তোমাদের শায়েস্তা করে ছাড়ব। তোমরা দীর্ঘদিন থেকে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছ। এবার তোমাদের উচিত শিক্ষা দেবার এবং তোমাদের চোখ খুলে দেবার সময় এসে গেছে। তোমাদের মধ্যে ভাতা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য আমীরুল মু'মিনীন নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা খারিজীদের মুকাবিলার জন্য অতি সত্বর মুহাল্লাবের কাছে চলে যাও। ভাতা বণ্টনের পর শুধু তিন দিন তোমাদের অবকাশ দেওয়া হবে। চতুর্থ দিন যদি কোন লোককে কূফায় দেখা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ভালোভাবে স্মররণ রেখ, এটা স্রেফ হুমকি নয়, বরং তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে, আমি যা বলি তা করেও ছাড়ি।"

হাজ্জাজ জামে মসজিদ থেকে উঠে 'দারুল ইমরাত' তথা সরকারী প্রাসাদে যান এবং জনসাধারণের মধ্যে ভাতা বিতরণ করতে শুরু করেন। জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে যার দেহে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল, হাজ্জাজের কাছে এসে বলল, আমি একজন বৃদ্ধ লোক। আমার ছেলে আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী। অতএব আমার স্থলে তাকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? সে উত্তর দিল, উমায়র ইব্‌ন দাবী বারজানী। হাজ্জাজ বললেন, তুমি কি সেই উমায়র ইব্‌ন দাবী, যে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের গৃহে হামলা করেছিল।' সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন, কোন্ জিনিসটি তোমাকে এ কাজে

উদ্বুদ্ধ করেছিল ? সে উত্তর দিল, উসমান আমার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেছিলেন। হাজ্জাজ বললেন, তুমি জীবিত থাক এটা আমি পছন্দ করি না। এই বলে তিনি তাকে হত্যার এবং তার সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তৃতীয় দিন হাজ্জাজের ঘোষক ঘোষণা দিল, আজ রাতে যে ব্যক্তি তার ঘরে থাকবে এবং মুহাল্লাবের কাছে রওয়ানা না হবে তাকে হত্যা করা হবে। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে লোকেরা ত্বরিত বেগে মুহাল্লাবের বাহিনীর দিকে রওয়ানা হয়। ফলে খারিজীদের মুকাবিলার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুহাল্লাব একটি বিরাট বাহিনীর অধিকারী হয়ে যান।

এরপর হাজ্জাজ হাকাম ইব্‌ন আইয়ূব সাকাফীকে বসরার এবং সাঈদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন যুরআকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুআবিয়া ইব্‌ন হারস কিলাবী এবং তার ভাই মুহাম্মদও জিহাদে বেরিয়ে পড়েন। তারাই বেশির ভাগ শহর দখল করে নেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা অথবা বন্দী করেন। এই কাজ শেষ করে তারা খোদ সাঈদকেও খতম করেন। এই সংবাদ শুনে হাজ্জাজ তার স্থলে মুজাআ ইব্‌ন সাঈদ তামীমীকে নিয়োগ করেন। সাঈদ্ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন যুরআ নিজ ক্ষমতাবলে ঐ সীমান্তে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার শাসনামলের এক বছর পর মাকরান দারাবীলের বেশির ভাগ শহর জয় করেন।

হাজ্জাজ কূফার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে এখানে উরওয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন শোবাকে আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে স্বয়ং বসরায় চলে আসেন। বসরায় এসে তিনি সে ধরনেরই ভাষণ দেন, যা কূফায় দিয়েছিলেন। যারা মুহাল্লাবের পক্ষাবলম্বন করেছিল তিনি তাদেরকে খুব করে ধমকিয়ে দেন।

শারীক ইব্‌ন আমর ইয়াশকুরী হাজ্জাজের কাছে এসে বলল, আমি হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত। আমার এই ওযর বশীর ইব্‌ন মারওয়ানও গ্রহণ করেছিলেন। অতএব আপনিও গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুহাল্লাবের বাহিনীতে যোগদান থেকে রেহাই দিন। হাজ্জাজ সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সমগ্র বসরাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং মুহাল্লাবের বাহিনীতে যোগদান করার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটতে থাকে। কূফা ও বসরা থেকে লোকদেরকে বের করে হাজ্জাজ নিজেও মুহাল্লাবের বাহিনীর দিকে রওয়ানা হন। মুহাল্লাবের অবস্থান স্থল 'দ্বারে হরমুয' থেকে ১৮ ফার্লং দূরত্বে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং বলেন, হে কূফাবাসী ও বসরাবাসী! তোমরা এখানে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান কর যতক্ষণ না খারিজীরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। এই জায়গায় হাজ্জাজ স্বয়ং নিজের জন্য একটি নতুন ফিতনার সৃষ্টি করেন।

মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের যুগে সৈন্যদের ভাতা শত শত দিরহাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তখন পর্যন্ত সেই নিয়মই অব্যাহত ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক সৈন্যকে সেই পরিমাণ ভাতা দেওয়া হবে, যা মুসআবের পূর্বে নির্ধারিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক সৈন্যের ভাতা থেকে শত শত দিরহাম কমিয়ে দেওয়া হলো। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনুল জারূদ বললেন, আমাদের এই বেতন আবদুল মালিক এবং তার ভাই বশীরও অনুমোদন করেছেন। অতএব আপনি তা হ্রাস করবেন না।

হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্‌র কথায় কর্ণপাত করেননি। তাই তিনি পুনরায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হাজ্জাজের ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। মুসকালা ইব্‌ন কারাব আবদী তাকে বলেন, আমীর যে হুকুম দিয়েছেন তা মান্য করা কর্তব্য, বিরোধিতা করা আমাদের জন্য মোটেই উচিত নয়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জারূদ মুসকালাকে তিরস্কার করতে করতে হাজ্জাজের দরবার থেকে চলে আসেন এবং হাকীম ইবন মুজাশিয়ীর কাছে গিয়ে যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করেন। হাকীম তাকে সমর্থন করেন। এভাবে একের পর এক অধিকাংশ সৈন্যই আবদুল্লাহ্ ইবনুল জারূদের সমর্থন করে এবং তারা সকলে মিলে তার হাতে এই মর্মে বায়আত করে যে, তারা যে করেই হোক হাজ্জাজকে কূফার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করবে। এরপর তারা এক জোট হয়ে তার নেতৃত্বে হাজ্জাজের তাঁবু ঘেরাও করে।

হাজ্জাজের সাথে অতি অল্পসংখ্যক লোক ছিল। দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, হাজ্জাজকে অচিরেই হত্যা অথবা বন্দী করা হবে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় সেদিনকার মত যুদ্ধ মুলতবি রাখা হয় এবং আবদুল্লাহ্‌র লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যায়। প্রকৃত পক্ষে হাজ্জাজকে হত্যা নয়, বরং তাকে ইরাক থেকে বের করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। রাতের বেলা হাজ্জাজের বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দেয়, তুমি এখান থেকে পালিয়ে আবদুল মালিকের কাছে চলে যাও। হাজ্জাজ এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে উবাদা ইব্‌ন হুসাইন সাবতী ইবনুল জারূদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে আসে। এরপর তার দেখাদেখি যথাক্রমে কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম, সাব্‌য়া ইব্‌ন আলী কিলাবী, সাঈদ ইব্‌ন আসলাম কিলাবী, জা'ফর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ আযদী প্রমুখ নিজ নিজ অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে আসেন। মোটকথা, ভোর হতে না হতেই হাজ্জাজের কাছে ছয় হাজার সৈন্য এসে জড় হয়। তাই ভোর বেলা তিনি প্রতিপক্ষের উপর জোর হামলা চালান।

হাজ্জাজ এবং তার সঙ্গীদের যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উপক্রম হয় ঠিক তখনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল জারূদের গলদেশে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান। এই ঘটনার পর যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বিলকুল পাল্টে যায়। হাজ্জাজের বাহিনীর মধ্যে নব উদ্যম এবং ইব্‌নুল জারূদের বাহিনীর মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ইব্‌নুল জারূদের অনেক সঙ্গী নিহত হয় এবং অনেক নিরাপত্তা প্রার্থনা করে হাজ্জাজের বাহিনীতে এসে যোগ দেয়। হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্ ও তার আঠার জন নেতৃস্থানীয় সঙ্গীর মস্তক ছিন্ন করে তা মুহাল্লাবের কাছে প্রেরণ করেন। মুহাল্লাব সেগুলোকে বর্শায় গেঁথে রাখেন যাতে খারিজীরা তা দেখে ভীত হয়। যখন ইবনুল জারূদের সাথে হাজ্জাজের সংঘর্ষ চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বসরা থেকে এই সংবাদ আসে যে, সুদানের 'রান্‌জ' নামীয় একটি গোত্র, যারা বসরা ও তার আশেপাশে বসবাস করছিল, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

ইব্‌নুল জারূদকে হত্যা করার পর হাজ্জাজ আপন পুত্র হাফ্‌সকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে রান্‌জ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি কূফাস্থ তার প্রতিনিধিকেও লিখেন, 'তুমি এই

নতুন বিদ্রোহ দমনের জন্য কূফা থেকে সৈন্য পাঠাও। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর রান্‌জদের বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন সম্ভব হয়।

মুহাল্লাবের মুকাবিলা করার জন্য ইরান, খুরাসান ও ইরাকের বিভিন্ন শহর থেকে খারিজীরা 'দ্বারে হরমুয'-এ এসে সমবেত হয়। মুহাল্লাবকে পিছনে হটিয়ে বসরা দখল করে নেওয়ার জন্য তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়ে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে কূফা ও বসরা থেকে ক্রমান্বয়ে সাহায্যকারী বাহিনী আসতে থাকে। ফলে মুহাল্লাব ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ, যারা শক্ত প্রাচীরের ন্যায় খারিজীদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন, আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। সৈন্য সংখ্যা অল্প থাকার দরুন তারা এতক্ষণ শত্রু হামলা শুধু প্রতিরোধ করছিলেন, এবার সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছায় খারিজীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করেন। খারিজীরা পিছু হটতে হটতে 'গাযরূন' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে শক্ত অবস্থান নিয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করতে থাকে।

মুহাল্লাব এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আপন বাহিনীর চারপাশে পরিখা খনন করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ প্রথম থেকেই আপন বাহিনীকে মুহাল্লাবের বাহিনী থেকে পৃথক রাখতেন এবং পৃথক জায়গায় তাঁবুও গাড়তেন। এখানেও তিনি কিছুটা দূরত্বে আপন ছাউনি স্থাপন করেছিলেন। মুহাল্লাব আবদুর রহমানের কাছে বলে পাঠান, এখানে রাতের বেলা শত্রুদের আকস্মিক হামলার আশংকা রয়েছে। অতএব তুমিও তোমার বাহিনীর আশেপাশে পরিখা খনন কর। প্রত্যুত্তরে আবদুর রহমান বলে পাঠান, আপনি আশ্বস্ত থাকুন। আমাদের তরবারিই পরিখার কাজ দেবে। এই বলে তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুতেই অবস্থান করতে থাকেন।

একদা খারিজীরা রাতের বেলা মুহাল্লাবের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু পরিখা থাকার কারণে তারা সম্মুকে অগ্রসর হতে পারে নি। এবার তারা আবদুর রহমানের দিকে অগ্রসর হয়। একেবারে খালি প্রান্তর। পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই তারা বিদ্যুৎ বেগে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে অবাধে হত্যা করতে থাকে। আবদুর রহমানের ঘুমন্ত বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোন অবকাশই পায়নি, তাই যে দিকে পারে সেদিকেই পালিয়ে যায়। আবদুর রহমান তার সামান্য কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে খারিজীদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন বটে, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সকল সঙ্গীকে খারিজীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। মুহাল্লাব ও আবদুর রহমান দু'জনই ছিলেন অধিনায়ক। মুহাল্লাবের বাহিনীর সমগ্র লোক ছিল বসরার এবং আবদুর রহমানের বাহিনীর লোক ছিল কূফার অধিবাসী। এ সংঘর্ষে কূফা বাহিনী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাজ্জাজের কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি আবদুর রহমানের স্থলে আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকাকে কূফা বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দেন ঃ তুমি মুহাল্লাবের অধীনে থাকবে এবং তার প্রতিটি নির্দেশ পালন করবে। একথা আত্তাবের কাছে খুবই অপছন্দনীয় ঠেকে। ফলে মুহাল্লাব ও আত্তাবের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

আত্তাব হাজ্জাজের কাছে আবেদন করেন, আপনি আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। হাজ্জাজ তার সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এরপর কূফী বাহিনীকে সরাসরি মুহাল্লাবের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। মুহাল্লাব আপন পুত্র হাবীবকে আপন বাহিনীর এই কূফী অংশের অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং প্রায় এক বছর নিশাপুরে অবস্থান করে খারিজীদের মুকাবিলা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত খারিজীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। মুহাল্লাব এই অবস্থায় তাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকেন। যখন তাদের একদল অপর দলকে পরাজিত করে তাবারিস্তানের দিকে তাড়িয়ে দিল তখন মুহাল্লাব বিজয়ী পক্ষের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এভাবে হিজরী ৭৭ সনে (৬৯৬ খ্রি) মুহাল্লাব খারিজীদের ফেতনা থেকে অব্যাহতি পান। খারিজীরা এমনি অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে লড়ত যে, কোন কোন সময় তারা তাদের চাইতে দশগুণ, এমন কি বিশগুণ প্রতিপক্ষ বাহিনীকেও মেরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হতো। খারিজীদের বিরুদ্ধে যারা লড়েছেন তাদের মধ্যে একমাত্র মুহাল্লাবই ছিলেন এমন একজন অধিনায়ক, যিনি সব দিক দিয়েই সাফল্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। খারিজীদের পর্যুদস্ত করে তিনি কূফায় ফিরে এলে হাজ্জাজ একটি জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের আয়োজন করেন। মুহাল্লাবকে তার পার্শ্ববর্তী আসনেই বসান। মুহাল্লাবের সাত পুত্র ছিল এবং তারা সকলেই খারিজীদের মুকাবিলায় অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অতএব তাদের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ দু'হাজার দিরহাম করে বৃদ্ধি করা হয়। খারিজীদের যে পরাজিত দলটি তাবারিস্তানের দিকে পলায়ন করেছিল হাজ্জাজ তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তারা তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেয়। ৭৬ হিজরীতে (৬৯৫ খ্রি) সালিহ ইব্‌ন মুসাররিহ-এর নেতৃত্বে খারিজীদের একটি দল মাওসিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাদের দমনের জন্য মাওসিলের আমীর একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। অনেক সংঘর্ষের পর সালিহ নিহত হন। এবার তার স্থলে শাবীব খারিজীদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে মাদায়েনে চলে যান। হাজ্জাজ তার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। শাবীবের সাথে মোট এক হাজ্জার লোক ছিল। একদা তিনি তার সাথীদের নিয়ে কূফায় আসেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান করে চলে যান। হাজ্জাজ ঐ এক হাজার লোকের মুকাবিলার জন্য পঞ্চাশ হাজার কূফীর একটি বাহিনী পাঠান। খারিজীরা ঐ বাহিনীকেও পরাজিত করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত একদিন শাবীব তার এক হাজার সঙ্গীসহ ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যান।

মুহাল্লাবের প্রতি হাজ্জাজের সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের জন্য খারিজীদের ফিতনাই ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। আবদুল মালিক যদি আরো কিছুদিন খারিজীদের সম্পর্কে উদাসীন থাকতেন এবং তাদের মূলোৎপাটনের উপায় অবলম্বন না করতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে খুরাসান, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি প্রদেশ তার হাতছাড়া হয়ে যেত। আর এই ফিতনা দমনের জন্য হাজ্জাজকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করাই ছিল যুক্তিসংগত। কেননা অনুরূপ পরিস্থিতিতে ঐ পদের জন্য তিনিই ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। যা হোক হাজ্জাজ ইরাকে এসে তার দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। খারিজীদের মূলোৎপাটনের জন্য

মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরার নির্বাচনও ছিল খুবই যথার্থ। বেশ কয়েক বছরের চেষ্টার পর খারিজীদের দিক থেকে স্বস্তি পাওয়া গেল, তখন আবদুল মালিক ৭৮ হিজরীতে (৬৯৭ খ্রি) কূফা, বসরা অর্থাৎ ইরাকসহ খুরাসান ও সিজিস্তান এলাকাও সোজাসুজি হাজ্জাজের কর্তৃত্বাধীনে অর্পণ করেন। এভাবে প্রাচ্যের সমগ্র ইসলামী দেশসমূহের শাসনকর্তৃত্ব হাজ্জাজের হাতে চয়ে যায়। হাজ্জাজ ঐ বছরই নিজের পক্ষ থেকে মুহাল্লাবকে খুরাসানের এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরকে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এতদিন পর্যন্ত মুহাল্লাব একজন সেনাপতি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। এবার তিনি প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

মুহাল্লাব ৮০ হিজরী (৬৯৯ খ্রি) পর্যন্ত স্বয়ং বসরায় অবস্থান করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে আপন পুত্র হাবীবকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে খুরাসানে প্রেরণ করেন। হাবীব পিতার নির্দেশ অনুযায়ী খুরাসানে গিয়ে উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং তার অফিসারদের সাথে কোনরূপ বিরূপ ব্যবহার করেননি, বরং তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। হাজ্জাজ মুহাল্লাবের মেয়ে হিন্‌দকে বিবাহ করেন। আর এভাবে হাজ্জাজের সাথে মুহাল্লাবের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রি) মুহাল্লাব স্বয়ং খুরাসানে এসে শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং পাঁচ হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী নিয়ে মাওরাউন নাহরের দিকে অগ্রসর হন এবং কুশ নামক দুর্গটি অবরোধ করেন। বাদশাহ্ খুতানের চাচাত ভাই এখানে এসে মুহাল্লাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি আপন পুত্র ইয়াযীদকে তার সাথে প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ বাদশাহ্ খুতানকে হত্যা করে তার রাজ্য তারই ভাতিজার হাতে অর্পণ করেন এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী তার কাছ থেকে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। ঐ সময়েই মুহাল্লাব আপন পুত্র হাবীবকে চার হাজার সৈন্যসহ বুখারা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। বুখারার শাসক চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হাবীবের মুকাবিলা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হাবীবের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়। হাবীব প্রচুর মালে গনীমত নিয়ে মুহাল্লাবের কাছে ফিরে আসেন। কুশ অবরোধ দু'বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত কুশবাসীরা জিয্‌য়া প্রদানে রাযী হয়। মুহাল্লাব তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কুশ দুর্গের অবরোধ তুলে নেন।

কুশবাসী এবং হুরায়ছ ইব্‌ন কাতানার বিশ্বাসঘাতকতা

মুহাল্লাব যখন খুরাসানের রাজধানী মার্ভে আসেন তখন নিজের পক্ষ থেকে মুগীরাকে মার্ভের প্রশাসক নিয়োগ করেন, এরপর সেখানে থেকে 'মাওয়ারাউন নাহ্‌র' অর্থাৎ কুশ শহরের দিকে রওয়ানা হন। কুশ অবরোধ তখনো অব্যাহত ছিল এমনি সময়ে মুহাল্লাবের কাছে মুগীরার মৃত্যু সংবাদ এসে পৌছে। তখন মুহাল্লাব আপন পুত্র ইয়াযীদকে, যিনি তারই সঙ্গে ছিলেন মার্ভের প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং ত্রিশজন সঙ্গীসহ তাকে তথায় পাঠিয়ে দেন। ইয়াযীদ যখন বুসত-এর একটি উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন তখন সেখানকার পাঁচশ 'তুর্কী তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। তুর্কীরা তাদের সাথে যত ধন-সম্পদ ছিল তার সবটাই দাবি করে কিন্তু ইয়াযীদ তা দিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদের সঙ্গীরা সামান্য পরিমাণ ধন-সম্পদ দিয়ে তুর্কীদেরকে সন্তুষ্ট করে নেয়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তুর্কীরা

পুনরায় ফিরে আসে এবং বলে, যাবতীয় ধন-সম্পদ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে ছাড়ব না।

ইয়াযীদ ত্রিশজন সঙ্গী নিয়েই তুর্কীদের মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের নেতা নিহত হয় এবং বাকিরা পলায়ন করে। মার্ভে পৌঁছে ইয়াযীদ আপন ভাইয়ের জায়গায় শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই মুহাল্লাব কুশবাসীদের সাথে সন্ধি করে ফিরে আসেন। সন্ধি চুক্তিতে একথাও ছিল যে, কুশবাসীরা তাদের বাদশাহের ছেলেদেরকে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করবে। আর ঐ ছেলেরা ততক্ষণ পর্যন্ত জামানত হিসাবে মুসলমানদের হিফাযতে থাকবে, যতক্ষণ না কুশবাসীরা নির্ধারিত পরিমাণ জিয্য়া মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করে। জিয্য়া বা ফিদ্য়ার অর্থ আদায়, এরপর বাদশাহর ছেলেদেরকে ফেরত দানের জন্য মুহাল্লাব নিজের পক্ষ থেকে হুরায়স ইব্ন কাতানাকে সেখানে রেখে এসেছিলেন। মুহাল্লাব যখন কুশ থেকে রওয়ানা হয়ে বলখে এসে পৌঁছেন তখন একজন দূত মারফত হুরায়স ইব্ন কাতানাকে নির্দেশ দেন, ফিদ্য়ার অর্থ আদায় করার পর তুমি বাদশাহর ছেলেদেরকে তখন পর্যন্ত ছাড়বে না, যতক্ষণ না তুমি বল্খে এসে পৌঁছ।

মুহাল্লাব উক্ত নির্দেশ এজন্য দিয়েছিলেন যাতে হুরায়সকেও সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইয়াযীদকে। হুরায়স কুশবাসীদের এই নির্দেশনামা দেখিয়ে বলেন, যদি তোমরা অবিলম্বে জিয্য়ার অর্থ পরিশোধ কর তাহলে আমি এখানেই তোমাদের ছেলেদের তোমাদের হাতে তুলে দেব এবং মুহাল্লাবকে বলব, 'আপনার নির্দেশনামা হস্তগত হওয়ার পূর্বেই আমি জিয্রা অর্থ বুঝে পেয়ে ছেলেদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি।' তখন কুশবাসীরা অবিলম্বে জিয্য়া পরিশোধ করে তাদের ছেলেদের ফেরত নিয়ে নেয়।

পথিমধ্যে তুর্কীরা হুরায়সের সাথেও সেই আচরণই করে, যা তারা ইয়াযীদের সাথে করেছিল। যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে হুরায়সের অনেক লোক নিহত হয়। অনেককে তুর্কীরা বন্দী করে, এরপর মুক্তিপণের বিনিময়ে ফেরত দেয়। যখন হুরায়স ইব্ন কাতানা মুহাল্লাবের কাছে এসে পৌঁছেন তখন মুহাল্লাব তার নির্দেশ পালন না করার শাস্তিস্বরূপ হুরায়সকে বিশ ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান করেন। এই শাস্তি ভোগ করার পর হুরায়স জনসাধারণের সামনে এই মর্মে শপথ করেন যে, তিনি যে ভাবেই হোক, মুহাল্লাবকে হত্যা করবেন। মুহাল্লাব যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি হুরায়সের ভাই সাবিত ইব্ন কাতানাকে ডেকে পাঠান। এরপর তার সামনেই মুহাল্লাবকে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত নম্র ভাষায় তাকে তার শপথ পরিহার করতে বলেন। কিন্তু হুরায়স মুহাল্লাবের সামনেই অশিষ্টের মত তার শপথের পুনরাবৃত্তি করে। মুহাল্লাব বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং হুরায়সের অশিষ্টতার কোন উত্তর না দিয়েই তাকে বিদায় দেন। হুরায়স ও সাবিত এবার মনে মনে ভয় পেয়ে যায় এবং নিজেদের তিনশ' সঙ্গীকে সাথে করে মুহাল্লাবের কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিমের কাছে তিরমিযে গিয়ে পৌঁছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং খুরাসানের শাসকদের সাথে তার সংঘর্ষ সব সময়ই লেগে থাকত। এটা হচ্ছে ৮২ হিজরীর (৭০১ খ্রি) ঘটনা।

মুহাল্লাবের মৃত্যু এবং নিজ পুত্রদের প্রতি তার অন্তিম উপদেশ

মুহাল্লাব আপন পুত্র মুগীরার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। মার্ভে ফিরে আসার পর তিনি বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ৮২ হিজরীর (৭০১ খ্রি) শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। আমীর মুহাল্লাবের বীরত্ব, পবিত্রচিত্ততা ও বিশ্বস্ততার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার আচার-আচরণ ও চালচলন ছিল অবিশ্বস্ততা ও বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সব সময়ই খলীফার আনুগত্য এবং তার প্রতিটি নির্দেশ পালন জরুরী মনে করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পুত্র ইয়াযীদকে নিজের স্থলে খুরাসানের আমীর এবং অপর পুত্র হাবীবকে সালাতের ইমাম নিয়োগ করেন। এরপর সকল পুত্রকে একত্র করে নিম্নোক্ত অন্তিম উপদেশ (ওসীয়ত) প্রদান করেন ঃ

"তোমাদের প্রতি আমার অন্তিম উপদেশ এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে। কেননা এর দ্বারা জীবন দীর্ঘ হয়, ধন-সম্পদে প্রাচুর্য আসে এবং জনশক্তিও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র ভয় পরিত্যাগ এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কেননা এতে জাহান্নামে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয় এবং জনশক্তিও হ্রাস পায়। আমীর-উমারা তথা প্রশাসকদের আনুগত্য এবং মুসলিম জামাআতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা তোমাদের জন্য ফরয। তোমাদের কার্যকলাপ তোমাদের কথাবার্তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাড়াহুড়া করো না। নিজের জিহ্বাকে স্খলন ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা কর। কেননা মানুষ পায়ের স্খলনে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু জিহ্বার স্খলনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমাদের উপর যে সমস্ত লোকের হক রয়েছে তা তোমরা আদায় কর।

সকাল-সন্ধ্যা বসে বসে অনর্থক গাল-গল্প বলার চাইতে মানুষের প্রাপ্য আদায় করা অনেক ভাল। তোষামোদকারীদের জালে আটকা পড়ো না। বদান্যতাকে কার্পণ্যের উপর প্রাধান্য দাও। পুণ্যকে জীবিত রাখ এবং সব সময় পুণ্যকাজ করার চেষ্টা কর। যুদ্ধের সময় সদা-সতর্ক থাক। কেননা এটা বীরত্বের চাইতে অধিক ফলদায়ক। যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন আসমান থেকে মৃত্যু অবতীর্ণ হয়। তখন যদি মানুষ সাহসে বুক বেঁধে সদা-সতর্ক থাকতে পারে তাহলে জয় সুনিশ্চিত। আর যদি কেউ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে এসব কিছুই আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন। কুরআন ও সুন্নতের শিক্ষা অনুসরণ এবং পুণ্যবানদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন তোমরা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। তোমরা নিজেদের মজলিসে অধিক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাক।"

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ ৭৮ হিজরীতে (৬৯৭ খ্রি) মুহাল্লাবকে খুরাসানের এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরকে সিজিস্তান ও সিন্ধুর আমীর নিয়োগ করেছিলেন। সিন্ধু ও সিজিস্তানের পূর্ব দিক থেকে হিন্দুরা এবং উত্তর দিক তেকে তুর্কী ও মুঘলরা মুসলিম রাষ্ট্রের উপর প্রায়ই হামলা করত। তাই হাজ্জাজ হিমইয়ান ইব্‌ন আদী আসাদীকে সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর অধিনায়ক করে কিরমানে পাঠান এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন।

তিনি তাকে এও নির্দেশ দেন, যখন সিজিস্তান ও সিন্ধুর প্রশাসকদের কোন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তুমি তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর কর্মস্থলে পৌঁছে নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু হিমইয়ান ইব্‌ন আদী কিরমানে নিজের অধীনে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী রয়েছে দেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং খোদ উবায়দুল্লাহ্‌কে সাহায্য করার পরিবর্তে তার এলাকা আক্রমণ করেন।

হাজ্জাজ এই সংবাদ পেয়ে হিমইয়ান ইব্‌ন আদীকে দমনের জন্য আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছকে পাঠান। আবদুর রহমান হিমইয়ানকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। এরপর কিছু দিন কিরমানে অবস্থান করে ফিরে আসেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তুর্কিস্তানের বাদশাহ রুতবেল কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ আসার পর তিনি তার কাছে কিছুদিন কর প্রদান করেন। এরপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। উবায়দুল্লাহ্ রুতবেলের রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন বাদাখ্‌শান, কাফিরিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে শুরু করে তিব্বত পর্যন্ত রুতবেলের অধীনে ছিল। উবায়দুল্লাহ্ যখন আক্রমণ চালাল রুতবেল পিছনে হটতে হটতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরকে এমন এক স্থানে নিয়ে যান যেখান থেকে ফিরে আসাটা তার পক্ষে ছিল সুকঠিন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা গিরি-গুহায় পতিত হতে লাগল এবং তাতে অনেকেই নিহত হলো। শুরায়হ ইব্‌ন হানীও ঐ জায়গায় নিহত হন। যারা কোন মতে ফিরে আসে তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। সিজিস্তান-বাহিনীর এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীর কানে পৌঁছলে তিনি আবদুল মালিককে সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তার কাছ থেকে রুতবেলের এলাকা আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবদুল মালিক সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি প্রদান করেন। হাজ্জাজ কূফা থেকে বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং বসরা থেকে বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছকে ঐ চল্লিশ হাজার অভিজ্ঞ সৈন্যের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ঐ সময়ে সংবাদ এসে পৌঁছে যে, উবায়দুল্লাহ্ সিজিস্তানে ইনতিকাল করেছেন।

হাজ্জাজ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আশআছকে সিজিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাকে রুতবেলের রাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দেন। আবদুর রহমান যখন ইসলামী বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানে গিয়ে পৌঁছেন এবং রুতেবল জানতে পারেন যে, এখনি তার দেশের উপর হামলা চালানো হবে তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তখন তার আর করার কিছুই ছিল না। আবদুর রহমান রুতবেলের দেশ জয় করে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকেন। তবে পথিমধ্যে যেখানেই কোন উপত্যকা বা ঘাঁটি পড়ত তিনি সেখানেই সেনাচৌকি স্থাপন করে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রুতবেলের রাজ্যের অর্ধেকের চাইতেও বেশি জয় করে পরবর্তী বছরের জন্য অগ্রাভিযান মুলতবি রাখেন। তিনি হাজ্জাজের কাছে তার বিজয়বার্তা প্রেরণ করে বলেন ঃ

"আমরা আগামী বছরের জন্য অগ্রাভিযান মুলতবি রেখেছি, যাতে বিজিত এলাকার শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করে তোলা যায় এব সৈন্যরাও কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পায়। হাজ্জাজ

এই বার্তা পাঠ করে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন, তুমি তোমার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখ। রুতবেলের বাহিনীর যে সমস্ত লোক তোমার কাছে বন্দী আছে তাদেরকে অবিলম্বে হত্যা কর এবং দুর্গসমূহ ধ্বংস করে ফেল। আবদুর রহমানের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছার পূর্বেই তিনি একই মর্মে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নির্দেশও তার কাছে প্রেরণ করেন। তৃতীয় নির্দেশে এও লেখা হয়, তুমি যদি আমার এই নির্দেশ পালন কর তাহলে তো ভাল অন্যথায় নিজেকে পদচ্যুত মনে করবে এবং তোমার স্থলে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হবে তোমার ভাই ইসহাক। তিনটি নির্দেশই একের পর এক আবদুর রহমানের কাছে পৌঁছে। তিনি হাজ্জাজের নির্দেশসমূহ পাঠ করে সমগ্র বাহিনীকে একত্র করেন এবং নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"আমি তোমাদের সকলের সাথে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমরা এখন তুর্কীদের বিজিত এলাকার শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত করব, নিজেদেরকে আরো সুদৃঢ় করব এবং পরিপূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে আগামী বছর রুতবেলের রাজ্যের বাকি অংশ জয় করব। কিন্তু হাজ্জাজ তুর্কীদের সাথে অবিরাম লড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ এবং এখন তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণের যে খুবই প্রয়োজন সেদিকে তার কোন লক্ষ্য নেই। এটা হচ্ছে সেই দেশ, যেখানে কিছুদিন পূর্বেও তোমাদের ভাইরা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। আমি তোমাদের ভাই এবং তোমাদের মতই একজন মানুষ। যদি তোমরা সকলে লড়তে এবং অগ্রাভিযান চালাতে প্রস্তুত থাক তাহলে আমিও তোমাদের সাথে রয়েছি।"

এই ভাষণ শুনে সমগ্র কূফী ও বসরী সৈন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। তারা আবদুর রহমানকে সম্বোধন করে সমস্বরে বলে ওঠে, আমরা কখনো হাজ্জাজের আনুগত্য করব না। তার কোন কথাই শুনব না। আমির ইব্‌ন দাইলা কিনানী বলেন, হাজ্জাজ হচ্ছে আল্লাহর দুশমন। তাকে আমীরের (গভর্নরের) পদ থেকে বিচ্যুত করে তার স্থলে আবদুর রহমানকে বসাও এবং আমীর হিসাবে তার হাতে বায়আত কর। তখন চতুর্দিক দিকে আওয়াজ ওঠে, হ্যাঁ, আমরাও তাই চাই। আবদুর রহমান ইব্‌ন শীস রিবয়ী সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলে, 'চল, আমরা আল্লাহর শত্রু হাজ্জাজকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেই। একথা শোনামাত্র সৈন্যরা আবদুর রহমানের হাতে বায়আত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অঙ্গীকার করে, আমরা হাজ্জাজকে ইরাক থেকে বের করে তবে ছাড়ব। ঠিক ঐ মুহূর্তে আবদুর রহমান রুতবেলের কাছে একটি পয়গাম পাঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে এই মর্মে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, যদি আবদুর রহমান এবং তার বাহিনী হাজ্জাজকে তাদের শহর থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয় তাহলে রুতবেলের রাজ্যের সমগ্র কর মাফ করে দেওয়া হবে। আর যদি হাজ্জাজ জয়লাভ করে তাহলে রুতবেল তাকে এবং তার বাহিনীকে নিজের এলাকায় প্রবেশ করতে দেবে না এবং তার মুকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী সমগ্র বিজিত এলাকা ত্যাগ করে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে। হাজ্জাজ এই বাহিনীর প্রত্যাবর্তন সংবাদ জানতে পেরে আবদুল মালিককে যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, আপনি আমার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠান। মুহাল্লাব এই ঘটনার কথা জানতে পেরে হাজ্জাজকে সহানুভূতির সাথে

লিখেন, তুমি ইরাকবাসীদেরকে তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসতে দাও এবং তাদের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করো না।

হাজ্জাজ ঐ পরামর্শের কোন পরওয়া করেন নি। কেননা ইরাকীদের উপর তার আর কোন আস্থা ছিল না। এবার মুহাল্লাব সম্পর্কেও তার অন্তরে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। এমনকি তিনি এ চিন্তাও করে বসেন যে, খুরাসানের গভর্নর মুহাল্লাবও নিশ্চয়ই তাদের সমর্থক ও উপদেষ্টা হয়ে থাকবে। আবদুল মালিক প্রেরিত সৈন্যরা এসে পৌঁছলে হাজ্জাজ তাদেরকে নিয়ে বসরা থেকে রওয়ানা হন এবং 'তাশ্‌তার' নামক স্থানে পৌঁছে অশ্বারোহী বাহিনীকে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে সামনে বাড়িয়ে দেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদও সেখানে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার অশ্বারোহীরা হাজ্জাজের অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণ করে ভাগিয়ে দেয় এবং তাদের একটি বিরাট অংশকে হত্যা করে।

এবার হাজ্জাজ বাধ্য হয়ে 'তাশতার' থেকে বসরার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যাবিয়ার দিকে মোড় নেন, আর আবদুর রহমান সোজাসুজি বসরায় এসে প্রবেশ করেন। বসরাবাসীরা আবদুর রহমানের হাতে বায়আত করে। তখন মুহাল্লাবের উপদেশটি হাজ্জাজের মনে পড়ে। তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন, মুহাল্লাব যা কিছু লিখেছিলেন, যথার্থই লিখেছিলেন। হাজ্জাজের কঠোর ব্যবহারের কারণে বসরাবাসীরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এবার তারা একজোট হয়ে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফত অস্বীকার করে বসে এবং হাজ্জাজের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। এটা হচ্ছে ৮১ হিজরীর (৭০০ খ্রি) ঘটনা। ৮২ হিজরীর মুহাররম (৭০১ খ্রি ফেব্রুয়ারী) মাসের প্রথম থেকে হাজ্জাজ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কখনো হাজ্জাজ জয়ী হতেন, আবার কখনো আবদুর রহমান। কিন্তু ২৯শে মুহাররমে যে যুদ্ধ হয় তাতে আবদুর রহমান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তিনি তার পরাজিত সৈন্যদের নিয়ে কূফা রওয়ানা হন এবং সেখানকার সরকারী প্রাসাদ দখল করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ পরাজিত হলে বসরাবাসীরা আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন রাবীআর হাতে বায়আত করে এবং হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অনবরত লড়ে যেতে থাকে। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হাজ্জাজের মুকাবিলা করেন। এই অবসরে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ অতি সহজে কূফার উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাসও অনেক বসরী সৈন্য নিয়ে বসরা থেকে কূফায় এসে তার সাথে মিলিত হন। এবার হাজ্জাজ বসরায় প্রবেশ করে হাকীম ইব্‌ন আইয়ুব সাকাফীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বয়ং কূফা রওয়ানা হন। 'দায়রে কুবরা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি তাঁবু ফেলেন। এদিকে কূফা থেকে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ রওয়ানা হন এবং 'দায়রে জাম্ম' নামক স্থানে অবস্থান নেন। উভয় পক্ষই পরিখা, বেষ্টনী ইত্যাদি নির্মাণ করে এবং ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রতিদিনই উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতো এবং একে অপরকে পিছনে হটিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু চূড়ান্ত কোন ফায়সালা হতো না। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং আপন ভাই মুহাম্মদের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী কূফায় প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে ইরাকবাসীদের প্রতি নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান।

'আমি হাজ্জাজকে পদচ্যুত করব। আর ইরাকীদের ভাতাসমূহ সিবীয়দের মতই নির্ধারণ করে দেব। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ যে প্রদেশেরই গভর্নর হতে চাইবে আমি তাকে তথাকার গভর্নর করব।

হাজ্জাজ এই পয়গামের বিবরণী শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল মালিককে লিখেন, 'আপনার এই কর্মপন্থা ইরাকীদেরকে কখনো অনুগত করতে পারবে না, বরং এতে তাদের অবাধ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আবদুল মালিক হাজ্জাজের একথা অপছন্দ করেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ ইরাকীদের কাছে আবদুল মালিকের ঐ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন।

ইরাকবাসীদের জন্য এটি ছিল একটি বিরাট সাফল্য। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আবদুল মালিকের এই প্রস্তাব মেনে নিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সৈন্যরা বেঁকে বসল। তারা সমস্বরে বলে উঠল, আমরা আবদুল মালিকের খিলাফতের বায়আত ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। অতএব তার কোন কথাই মানা চলে না। আবদুল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ এই অবস্থা দেখে নিজেদের বাহিনী হাজ্জাজের কাছে রেখে আবদুল মালিকের কাছে চলে যান। এরপর নতুন উদ্যম ও নতুন প্রস্তুতির সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয় এবং এক বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। উভয় পক্ষ প্রতিদিন ভোরে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে এবং সারাদিন যুদ্ধ করে সন্ধ্যার সময় ফিরে যেত। এই সমস্ত যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের পাল্লা ভারী দেখাচ্ছিল এবং হাজ্জাজ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজের কাছে সিরিয়া থেকে অনবরত সাহায্য এসে পৌঁছছিল। শেষ পর্যন্ত ৮৩ হিজরীর ১৫ই জামাদিউস সানী (৭০২ খ্রি জুলাই) একটি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আকস্মিক কিছু ঘটনার কারণে হাজ্জাজ তাতে জয়লাভ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কূফায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। হাজ্জাজ পুনরায় কূফাবাসীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং এক্ষেত্রে কেউ ইতস্তত করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেন।

বসরায় আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে বহু সংখ্যক সৈন্য এসে জড় হয়। তিনি তখন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার সংকল্প নেন। হাজ্জাজ এই সংবাদ শোনামাত্র কূফা থেকে একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। ৮৩ হিজরীর ১লা শাবান (৭০২ খ্রি সেপ্টেম্বর) যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৫ই শাবান পর্যন্ত তা অত্যন্ত জোরেশোরে চলতে থাকে। হাজ্জাজ বেশ কয়েকবারই পরাজিত হন, কিন্তু পুনরায় নিজেকে কোনমতে সামলে নেন। হাজ্জাজের বাহিনীতে আবদুল মালিক ইব্‌ন সুলবও ছিলেন। ১৫ শাবান যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ হাজ্জাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন তখন আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাল্লাব আপন অশ্বারোহী সঙ্গীদের নিয়ে আবদুর রহমানের উপর আকস্মিক হামলা চালান। ঠিক তখনি এই হামলা চালানো হয় যখন আবদুর রহমান হাজ্জাজের ক্যাম্পে লুটপাট চালিয়ে এবং তাকে তার অবস্থান থেকে তাড়িয়ে বিজয়ীবেশে আপন অবস্থানে ফিরে আসছিলেন। যাহোক আবদুল মালিকের হামলা আবদুর রহমানের সঙ্গী-সাথীদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তারা ঊর্ধ্বমুখে পলায়ন করে। তাদের অনেকেই পরিখায় পতিত হয়ে ধ্বংস হয়।

অনেকে আবদুল মালিকের হাতে মারা যায়, আবার অনেকে কোনমতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

এবার পরাজিত হাজ্জাজ ফিরে এসে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের ছাউনি দখল করে নেন। এই পরাজয়ের পর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ বসরা থেকে সূস, সাবূর, কিরমান, যারানজ ও বুস্‌ত হয়ে তুর্কিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেলের কাছে চলে যান। আবদুর রহমানের সঙ্গীরা সিজিস্তানের নিকটে একত্রিত হয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাসকে নিজেদের নামাযের ইমাম মনোনীত করে এবং আপন সঙ্গী-সাথীদেরকে সবদিক থেকে ডেকে এনে সেখানে জড় করে। এরপর তারা আবদুর রহমানের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠায়, আপনি ফিরে আসুন এবং খুরাসান দখল করে নিন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব খুরাসান শাসন করছেন। তার থেকে এটা ছিনিয়ে আনা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু তার সাথীরা তার উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করে যে, বাধ্য হয়ে তাকে রুতবেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসতে হয়। এবার তার বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল ২০ হাজার। তিনি তাদেরকে নিয়ে হিরাতের দিকে অগ্রসর হন এবং সহজেই হিরাত দখল করে নেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব তার বাহিনী নিয়ে আবদুর রহমানের মুকাবিলা করতে আসেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই আবদুর রহমানের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে তিনি সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইয়াযীদের মুকাবিলা করেন। তাতে তার অনেক সৈন্য নিহত অথবা বন্দী হয়। তিনি সেখান থেকে সিন্ধুতে পালিয়ে যান। ইয়াযীদ তার বাহিনীকে প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন থেকে রুখে রাখেন। আবদুর রহমান শেষ পর্যন্ত সিন্ধুতে গিয়ে হিরাত যুদ্ধে ইয়াযীদ যে সমস্ত লোককে বন্দী করেছিলেন তাদের মার্ভে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ছিলেন ঐ সমস্ত বন্দীর অন্যতম। হাজ্জাজের নির্দেশে তাকেও হত্যা করা হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ সিন্ধু থেকে রুতবেলের কাছে চলে যান এবং সেখানে পৌঁছে সিলরোগে (ফুসফুসের ক্ষত) আক্রান্ত হন। হাজ্জাজ রুতবেলকে লিখেন, যদি তুমি আবদুর রহমানের ছিন্ন মস্তক আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি তোমার দশ বছরের কর মাফ করে দেব। রুতবেল অসুস্থ আবদুর রহমানের মাথা কেটে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। এটা হচ্ছে ৮৪ হিজরীর (৭০৩ খ্রি) ঘটনা।

ওয়াসিত নগরীর পতন

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে হাজ্জাজকে আবদুল মালিকের কাছ থেকে বার বার সামরিক সাহায্য চাইতে হয়েছিল। যখন আবদুর রহমান ইরাক থেকে বেদখল হয়ে সিজিস্তানের দিকে ফিরে এলো তখন হাজ্জাজের কাছে বিরাট সংখ্যক সিরীয় সৈন্য ছিল। বসরা ও কূফাবাসীদের দিক থেকে হাজ্জাজের স্বস্তি ছিল না। কেননা কূফা ও বসরার লোকেরা তো আবদুর রহমানের সাথে শরীক হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অতএব হাজ্জাজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিরীয় বাহিনীকে নিজের কাছে রাখার প্রয়োজনবোধ করেন। প্রথমে তিনি নির্দেশ দেন, সিরীয়রা যেন কূফীদের ঘরে অবস্থান করে। কিন্তু কিছুদিন পরই সিরীয়রা কূফী স্ত্রীলোকদের সাথে শ্লীলতা হানিকর কার্যকলাপ শুরু করে।

হাজ্জাজ এটা জানতে পেরে সিরীয় বাহিনীর জন্য তিনি একটি পৃথক ছাউনি নির্মাণের প্রয়োজনবোধ করেন। তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে ছাউনির জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনের নির্দেশ দেন। তারা দেখতে পান যে, এক রাহিব (খ্রিস্টান পুরোহিত) একটি নোংরা জায়গা পরিষ্কার করছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পড়েছি, এই জায়গায় আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করা হবে। তাই আমি এটা পরিষ্কার করছি। তারা হাজ্জাজের কাছে এই ঘটনার কথা বললে তিনি ঐ বিশেষ জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে তার আশেপাশে সেনাছাউনি গড়ে তোলেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণের জন্য সিরীয়দের নির্দেশ দেন। এটাই ওয়াসিত শহরের পত্তন। এটা ৮৩ হিজরীর (৭০২ খ্রি) ঘটনা।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের পদচ্যুতি

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদকে দমন করার পর হাজ্জাজ ইরাকবাসীদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। তিনি বেছে বেছে তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেন। ইরাক অর্থাৎ কূফা ও বসরার এমন কোন বিখ্যাত পরিবার ছিল না, যার কোন না কোন ব্যক্তি হাজ্জাজের নির্দেশে নিহত অথবা লাঞ্ছিত হয়নি। শুধু মুহাল্লাবের পরিবার তাদের বিশ্বস্ততার দরুন তখন পর্যন্ত হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব খুরাসানের গভর্নর এবং হাজ্জাজ ও আবদুল মালিকের অনুগত ছিলেন। হাজ্জাজ বেশ কয়েকবার ইয়াযীদকে এমন অবস্থায় কূফায় তলব করেন যখন তিনি খুরাসানে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। ফলে তিনি হাজ্জাজের কাছে তার অসুবিধার কথা জানান এবং তখনকার মত কূফায় আসতে পারেননি। হাজ্জাজের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতাও ছিল। তাই ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব সম্পর্কেও তার অন্তরে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি তাকে খুরাসানের শাসনকর্তা থেকে কিভাবে অপসারণ করা যায় সে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি প্রথমে আবদুল মালিকের কাছে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। আবদুল মালিক কিন্তু প্রতিবারই হাজ্জাজকে লিখতেন, মুহাল্লাব এবং তার পুত্র সব সময়ই আমাদের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে আসছে। অতএব তারা ক্ষমারযোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও হাজ্জাজ বার বার ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক বাধ্য হয়ে হাজ্জাজকে লিখেন, যেহেতু তুমি তোমার অভিমতের উপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করছ তাই আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যাকে ইচ্ছা খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করতে পার। ব্যাপারটি যাতে জটিল হয়ে না দাঁড়ায় এবং অন্য গভর্নর সেখানে গিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সে চিন্তা করে হাজ্জাজ প্রথমে ইয়াযীদকে নির্দেশ দেন, তুমি তোমার ভাই মুফাদ্দালের কাছে খুরাসানের শাসনক্ষমতা অর্পণ করে আমার কাছে আস। ইয়াযীদ সফর সামগ্রীর আয়োজন করছিলেন এমন সময় খুরাসানে হাজ্জাজের দ্বিতীয় নির্দেশ গিয়ে পৌঁছল। সেই সাথে ছিল মুফাদ্দালের নামে খুরাসানের গভর্নর পদের নিয়োগপত্র। ইয়াযীদ তার ভাইকে বললেন, তুমি এই নিয়োগপত্র দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। আমি হয়ত খুরাসানের শাসনক্ষমতা ত্যাগ করতে অস্বীকার করব এই আশংকায় হাজ্জাজ তোমাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেছেন। কিছুদিন পর তিনি তোমাকেও পদচ্যুত করবেন। এই বলে ইয়াযীদ ৮৫ হিজরীর রবিউস সানী

(৭০৪ খ্রি এপ্রিল) মাসে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন। ইয়াযীদের ধারণা শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়। নয় মাস পর হাজ্জাজ মুফাদ্দালকে অপসারণ করে তার স্থলে কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

মূসা ইব্‌ন হাযিম

ইতিপূর্বে মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি তিরমিযে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিপূর্বে এও আলোচিত হয়েছে যে, কাতানা খুযায়ীর পুত্রদ্বয় হুরায়স ও সাবিত মুহাল্লাবের কাছ থেকে পালিয়ে মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র কাছে তিরমিযে চলে গিয়েছিলেন। মুহাল্লাব খুরাসানে গভর্নর থাকাকালীন মূসার সাথে কোনরূপ সংঘর্ষে যাননি। তিনি তার পুত্রদেরকেও উপদেশ দেন, যেন তারা মূসার সাথে সর্বদা ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করেন। কেননা তার অস্তিত্ব না থাকলে খুরাসানের গভর্নর পদে বনূ কায়সেরই কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হিরাতের নিকটে যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের কাছে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ পরাজিত হন তখন তার এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাসের যে সব সঙ্গী-সাথী পলায়ন করেছিল তারাও সোজা মূসার কাছে তিরমিযে চলে যায়। যখন রুতবেল আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদের ছিন্ন মস্তক হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন তখন আবদুর রহমানের সঙ্গীরা তার নিকট থেকে পালিয়ে মূসার কাছে চলে আসে এবং তিরমিযেই আশ্রয় নেয়। এভাবে তিরমিযে মূসার কাছে আট হাজার আরব যোদ্ধা এসে সমবেত হয়। হুরায়স ও সাবিত দুই ভাই মন্ত্রীত্ব ও সেনাপতিত্বের দায়িত্ব আনজাম দিতেন এবং মূসা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতেন। হুরায়স ও সাবিত মূসাকে বলেন, বুখারাবাসী এবং সমগ্র তুর্কী নেতৃবৃন্দ ইয়াযীদের প্রতি অসন্তুষ্ট। চলুন, আমরা ওদের সবাইকে সাথে নিয়ে তাকে বিতাড়িত করে খুরাসান দখল করে নেই। মূসা বলেন, যদি ইয়াযীদকে খুরাসান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আবদুল মালিকের অপর কোন গভর্নর এসে তা দখল করে নেবে এবং আমরা তা রক্ষা করতে পারব না। বরং এর চেয়ে ভালো হবে, যদি আমরা মাওয়ারাউন নাহর অর্থাৎ তুর্কিস্তান এলাকা থেকে আবদুল মালিকের কর্মকর্তাদেরকে বের করে দিই। এই এলাকার উপর আমরা অনায়াসে আমাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে পারব। কেননা ওখানে চতুর্দিক থেকে আবদুল মালিকের সৈন্যরা আসতে পারবে না। তাছাড়া সমগ্র সীমান্ত এলাকায় তুর্কী ও মোঙ্গলরা রয়েছে, যারা সব সময়ই আমাদের সাহায্য করবে। শেষ পর্যন্ত মাওয়ারাউন নাহর এলাকা থেকে আবদুল মালিকের কর্মকর্তাদের বের করে দেওয়া হয় এবং তিরমিযে মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহর শাসন কর্তৃত্ব দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছুদিন পর তুর্কী, মোঙ্গল ও তিব্বতীরা একজোট হয়ে মূসার রাজ্য আক্রমণ করে। তুর্কীদের অধিনায়ক দশ হাজার সৈন্য নিয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। হুরায়স ইব্‌ন কাতানা তাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ এতই জোরদার ছিল যে, তুর্কীদের শেষ পর্যন্ত টিলার পিছনে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে একটি তীর সোজা হুরায়স ইব্‌ন কাতানার কপালে বিদ্ধ হয় এবং তাতে এমন গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় যে, তিনি এর মাত্র দু'দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় যুদ্ধ মুলতবি হয়ে যায়। পরদিন মূসা অত্যন্ত জোরদার আক্রমণ চালান। তাতে তুর্কী ও শত্রুপক্ষের অন্যান্য লোকের শোচনীয় পরাজিত

হয়। মূসা প্রচুর গনীমতসামগ্রী নিয়ে তিরমিয দুর্গে ফিরে আসেন। হুরায়সের মৃত্যুর পর তার ভাই সাবিত ইব্‌ন কাতানা মূসার দিক থেকে ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে তিরমিয থেকে পালিয়ে যান এবং হাওশারা নামক স্থানে এসে অবস্থান নেন এবং আরব-অনারব উভয় প্রকার সৈন্য সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করেন।

মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তিরমিয থেকে যখন তার বাহিনী নিয়ে সাবিতের মুকাবিলা করতে আসেন তখন বুখারা, কুশ, নাসাফ প্রভৃতি এলাকার অধিবাসীরা সাবিতের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে মূসাকে বাধ্য হয়ে তিরমিযে ফিরে আসতে হয়। কিছুদিন পর সমগ্র তুর্কী একত্রিত হয়ে সাবিতকে তাদের পক্ষে টেনে নেয় এবং ৮০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে তিরমিয অবরোধ করে। মূসা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুর্কীদের মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত সাবিত নিহত হন। তুর্কীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং অবরোধ উঠিয়ে সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মাত্র কিছুদিন পর ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব তার পদ থেকে অপসারিত হন এবং তার স্থলে তার ভাই মুফাদ্দাল খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি খুরাসানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে মূসার উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য মার্ভ থেকে উসমান ইব্‌ন মাসউদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং বলখে অবস্থানরত আপন ভাই মুদরিককে লিখেন, "তুমিও তোমার বাহিনী নিয়ে তিরমিয আক্রমণের জন্য রওয়ানা হও।" এ ছাড়া তিনি রুতবেল, তারখুন প্রমুখ তুর্কী বাদশাহর কাছে লিখেন, "তোমরাও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে উসমান ইব্‌ন মাসউদের সাহায্যে এগিয়ে যাও।" এই তুর্কী নেতারা ইতিপূর্বে মূসার কাছে বার বার পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তিরমিয অভিমুখে রওয়ানা হন। এভাবে মূসার এলাকায় চতুর্দিক থেকে শত্রুবাহিনী প্রবেশ করতে থাকে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তিরমিয দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় শত্রুদের মুকাবিলা করতে থাকেন। বিরাট শত্রুবাহিনী একাধারে দু'মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখে। কিন্তু জয়ের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মূসা তার সঙ্গীদের বলেন, আর কত ধৈর্য ধারণ করব? চল, আমরা আকস্মিকভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। সকলেই তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মূসা আপন ভাতিজা নাসর ইব্‌ন সুলায়মানকে তিরমিয শহর ও দুর্গের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাকে উপদেশ দেন ঃ যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই তাহলে তুমি শহর ও দুর্গ উসমান ইব্‌ন মাসউদের পরিবর্তে মুদরিক ইব্‌ন মুহাল্লাবের হাতে অর্পণ করবে। মূসা তার এক-তৃতীয়াংশ সঙ্গীকে উসমানের বিরুদ্ধে মোতায়েন করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা প্রথমে আক্রমণ করবে না। উসমান যখন তোমাদের আক্রমণ করবে কেবল তখনই তোমরা তাকে প্রতি-আক্রমণ করবে। এরপর তিনি তার অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং রুতবেল ও তারখুনের উপর হামলা চালান। ওরা মূসার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পলায়ন করে এবং তিনি অনেক দূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। যখন মূসা ফিরে আসছিলেন তখন দাওরবাসী ও অন্যান্য তুর্কী তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। মূসাকে তুর্কীরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। উসমান ইব্‌ন মাসউদও এদিকে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে মূসার ঘোড়া নিহত হয়। এরপর তিনিও অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে প্রাণত্যাগ করেন। এভাবে ১৫ বছর পর্যন্ত একজন স্বাধীন অধিপতি হিসাবে তিরমিয

শাসন করে ৮৫ হিজরীতে (৭০৪ খ্রি) মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাযিম ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি কায়স গোত্রের লোক ছিলেন। মুফাদ্দাল হাজ্জাজকে মূসা-হত্যার সুসংবাদ দেন। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট হননি। নাসর ইব্‌ন সুলায়মান মুদরিকের হাতে তিরমিয অর্পণ করেন এবং মুদরিক তা অর্পণ করেন উসমানের হাতে।

ইসলামী মুদ্রা তৈরির সূচনা

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের একটি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ এই যে, তাঁরই যুগে প্রথমবারের মত মুসলমানরা নিজস্ব মুদ্রা তৈরি করে। তখন পর্যন্ত সিরিয়া, আরব, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে রোমানদের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। আরবে যেহেতু কোন বিরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই আরবী মুদ্রারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র আরবে রোমান মুদ্রার প্রচলন ছিল। যখন ইসলামী রাষ্ট্র বল্‌খ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে তখনও কোন খলীফা বা সুলতানের মনে এ চিন্তার উদয় হয়নি যে, তাদেরও নিজস্ব কোন মুদ্রা থাকা উচিত। ঘটনাচক্রে রোমান সম্রাটের কাছে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে কয়েকটি চিঠি লিখতে হয়। তিনি ইসলামী রীতি অনুযায়ী চিঠিগুলোর শিরোভাগে কালেমা তাওহীদ ও দরূদ শরীফ লিখেন। এরপর নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেন।

রোমান বাদশাহ তখন আবদুল মালিককে লিখেন, তুমি তোমার চিঠির শিরোভাগে তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব) ও দরূদ লিখো না। কেননা এটা আমাদের কাছে অপছন্দনীয়। যদি তুমি তোমার এই রীতি ত্যাগ না কর তাহলে আমরা আমাদের টাকশালে এমন সব দিরহাম ও দীনার ঢালাই করব, যেগুলোতে তোমাদের নবী সম্পর্কে এমন সব অপমানকর কথা লিপিবদ্ধ থাকবে, যা তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকবে।

এই চিঠি পড়ে আবদুল মালিকের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি এ ব্যাপারে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, তুমি তোমার দেশে রোমান মুদ্রার প্রচলন একদম বন্ধ করে দাও এবং নিজস্ব মুদ্রা ঢালাই করে নাও। এই পরামর্শ আবদুল মালিকের খুবই মনঃপূত হয়। তিনি নিজস্ব টাকশাল স্থাপন করে তাতে চৌদ্দ কিরাত তথা পাঁচ মাশা ওজনের দিরহাম ঢালাই করে নেন। এরপর হাজ্জাজ দিরহাম ও দীনারের একপিঠে 'কূলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' (বলো, তিনিই আল্লাহ্ অদ্বিতীয়) অংকিত করেন। মোট কথা, আবদুল মালিক নির্দেশ জারি করেন যে, এখন থেকে খারাজ বাবদ আরবী মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করা হবে না। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশে আরবী মুদ্রা প্রচলিত হয়ে পড়ে।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান খলীফা হওয়ার পর ৭৫ হিজরীতে (৬৯৪ খ্রি) প্রথমবার হজ্জ করেন। তিনি ৭৭ হিজরী (৬৯৬ খ্রি) হারকালা জয় করেন। ঐ বছরই মিসরের গভর্নর এবং আবদুল মালিকের ভাই আবদুল আযীয মিসরের জামে মসজিদ ভেঙে চারপাশের আয়তন বৃদ্ধি করে তা পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি ৮১ হিজরীতে (৭০০ খ্রি) রোমানদের কাছ থেকে কালীকালা ছিনিয়ে নেন। ৮২ হিজরীতে (৭০১ খ্রি) সিনান দুর্গ দখল করা হয়। খুরাসানের গভর্নর মুফাদ্দাল ইব্‌ন মুহাল্লাব মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহকে হত্যা করার পর বাদগীস জয় করেন। ৮৪ হিজরীতে (৭০৩ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক রোমানদের কাছ থেকে মাসীসাহ্ দখল করে নেন। হিজরী ৮৫ সনের জমাদিউল আউয়াল (৭০৪ খ্রি মে) মাসে আবদুল

মালিকের ভাই আবদুল আযীয মিসরে ইনতিকাল করেন এবং আবদুল মালিক আপন পুত্র আবদুল্লাহকে তার স্থলে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন।

ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদী (যৌবরাজ্য)

কিভাবে আপন ভাই আবদুল আযীযকে অলীআহদী থেকে খারিজ করে তার স্থলে আপন পুত্রদেরকে অলী আহদ নিয়োগ করবেন আবদুল মালিক গভীরভাবে সেই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সহজ ছিল না। কেননা এতে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। যখন আবদুল আযীযের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তখন আবদুল মালিক স্বাভাবিকভাবেই নিজের গোপন বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি ৮৬ হিজরীতে (৭০৫ খ্রি) সমগ্র প্রদেশের গভর্নর ও কর্মকর্তাদের নামে একটি ফরমান জারি করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন ১লা শাওয়াল (অক্টোবর) তথা ঈদুল ফিতরের দিনে জনসাধারণের কাছ থেকে ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদীর বায়আত গ্রহণ করেন। সেই ফরমান অনুযায়ী সর্বত্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তখন মদীনার প্রশাসক ছিলেন হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযুমী। তিনি মদীনাবাসীদেরকে ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদীর পক্ষে বায়আত করতে বললে সকলেই তা মেনে নেয়, কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) বেঁকে বসেন। হিশাম তাঁকে গ্রেফতার করেন। এরপর তাঁকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করে কয়েদখানায় আটকে রাখেন। আবদুল মালিক এই সংবাদ জানতে পেরে তাকে লিখেন, তুমি সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাবের সাথে কঠোর ব্যবহার করে ভুল করেছ। কেননা তাঁর মধ্যে না শত্রুতা রয়েছে, আর না রয়েছে বিরোধিতা বা কপটতা। এমন ব্যক্তিকে কখনো কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের মৃত্যু

ওয়ালীদ ও সুলায়মানের অলীআহদীর বায়আত গ্রহণের পর আবদুল মালিক এক মাসের বেশি জীবিত ছিলেন না। কিছুদিন রোগ ভোগের পর ৮৫ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল (৭০৫ খ্রি-এর ১৯শে অক্টোবর) আবদুল মালিক মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র-এর শাহাদাতের পর আবদুল মালিক মোট তের বছর তিন মাস তেইশ দিন জীবিত ছিলেন। আর এটাই ছিল তার খিলাফত-আমল। মৃত্যুকালে আবদুল মালিক তার পুত্রদেরকে ডেকে এনে নিম্নোক্ত ওসীয়ত করেন ঃ

"আমি ওসীয়ত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কেননা তাক্‌ওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম পোশাক এবং শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়। তোমাদের বড়দের উচিত ছোটদের স্নেহ করা এবং ছোটদের উচিত বড়দের সম্মান করা। তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অভিমত ও পরামর্শের মূল্য দেবে এবং তাদের বিরোধিতা থেকে দূরে থাকবে। কেননা এরাই হচ্ছে সেই মাড়ি যার দ্বারা তোমরা চিবাও এবং এরাই হচ্ছে সেই দাঁত যার সাহায্যে তোমরা খাদ্য-সামগ্রী চূর্ণ কর। তোমরা বুদ্ধিমানদের সাথে ভালো আচরণ কর। কেননা ওরাই হচ্ছে এর যথার্থ হকদার।"

এরপর তিনি ঐ সমস্ত কথা বলেন, যা আবদুল মালিকের প্রাথমিক অবস্থা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মৃত্যুর পর লোকেরা ওয়ালীদের হাতে বায়আত করে। আবদুল মালিকের

পনের-ষোল জন পুত্র এবং বেশ কয়েকজন কন্যা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একজন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার কন্যা, একজন হযরত আলীর এবং একজন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের কন্যা ছিলেন। ওয়ালীদ ও সুলায়মান উভয়ই বিলাদাহ বিন্‌ত আব্বাসের গর্ভজাত ছিলেন।

আবদুল মালিকইব্‌ন মারওয়ান ছিলেন একজন বিখ্যাত ও সৌভাগ্যশালী খলীফা। তিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে একই কেন্দ্রের অধীনে নিয়ে আসতে এবং উসমান (রা) হত্যার পর মুসলিম বিশ্বে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা দূর করে একটি বিরাট ইসলামী সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করতে হয়। অবশ্য এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি স্বয়ং বলতেন, যদি হযরত সিদ্দীকে আকবর ও উমর ফারূককেও এ ধরনের মূর্খ ও অবাধ্য লোকদের সম্মুখীন হতে হতো তাহলে তাঁরাও তাদের সাথে আমারই অনুরূপ ব্যবহার করতেন। আবদুল মালিকের পূর্বে বনূ উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। তিনি তা শক্ত ও সুদৃঢ় করেন। তার মেযাজ ছিল অত্যন্ত কঠোর, তবে তিনি প্রচুর বুদ্ধিমত্তারও অধিকারী ছিলেন এবং গুণীজনদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং উচ্চ সাহসিকতারও প্রশংসা না করে পারা যায় না। আবদুল মালিকের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি ছিল এই যে, তিনি হাজ্জাজকে তার পাওনার চাইতেও অধিক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন। আর হাজ্জাজও সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন একজন নিষ্ঠুর পাষাণের মত। অবশ্য এমন প্রত্যেক শাসকের মধ্যেই এ ধরনের কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া যায়, যিনি নিজের সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়-সংকল্প। আবদুল মালিকের বহুমুখী সাফল্যের ক্ষেত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ, হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফী এবং মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরার বিশেষ অবদান ছিল। তার শাসনামলে মুসলমানদের হাতে যেমন অনেক দেশ বিজিত হয়েছে, তেমনি এক এক করে মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধ-বিশৃঙ্খলাও দূরীভূত হয়ে গেছে। আবদুল মালিক তার তের বছরের খিলাফত আমলে যেসব কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দিয়েছেন তাতে তিনি একজন বিখ্যাত ও সফল খলীফা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। তিনি নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী খলীফাও ছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত সেনাপতিদের অন্যতম। আবদুল মালিকের মৃত্যুকালে ইসলামী বিশ্ব সব রকম অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ৫০ হিজরীতে (৬৭০ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ছত্রিশ বছর বয়সে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। অত্যন্ত আদর-সোহাগে লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে তিনি জ্ঞানার্জন থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন। আবদুল মালিকের কাফন-দাফন সম্পন্ন করে তিনি দামিশকের জামে মসজিদে এসে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সামনে বাড়িয়ে দেন তাকে কেউ পিছনে হটাতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পিছনে হটিয়ে দেন তাকে কেউ সামনে বাড়াতে পারে না। মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত জ্ঞানের অন্তর্গত এবং নবী-রাসূল, জ্ঞানীগুণী সকলের জন্য নির্ধারিত। এবার আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে এই উম্মতের অভিভাবক নিয়োগ করেছেন, যে অপরাধীদের সাথে কঠোর ব্যবহার, জ্ঞানীগুণী ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে নম্র ব্যবহার এবং শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তিসমূহের প্রয়োগ করার দৃঢ়-সংকল্প রাখে। সে কা'বা ঘরের হজ্জ পালনে এবং সীমান্ত অঞ্চলে জিহাদ তথা ইসলামের শত্রুদের উপর আক্রমণ পরিচালনায়ও দৃঢ়-সংকল্প। এ কাজে সে যেমন উদাসীন থাকতে চায় না তেমনি সীমালংঘন করাকেও শ্রেয় জ্ঞান করে না। লোক সকল! তোমরা যুগের খলীফাকে মান্য কর এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখ। স্মরণ রেখ, যে অবাধ্য হবে তার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর যে চুপ থাকবে সে স্বাভাবিক রোগে আপনা-আপনি মৃত্যুবরণ করবে।"

এরপর লোকেরা তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত করে। ওয়ালীদ খলীফা হওয়ার পর হাজ্জাজের ক্ষমতা যথারীতি বহাল রাখেন। হাজ্জাজ রায়-এর শাসনকর্তা কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম বাহিলীকে মুফাদ্দাল ইব্‌ন মুহাল্লাবের স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কুতায়বা চীন ও তুর্কিস্তান জয় করেন। আর পশ্চিম দিকে আফ্রিকার গভর্নর মূসা ইব্‌ন নুসায়র মরক্কো থেকে স্পেন পর্যন্ত দেশসমূহে ইসলামী বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ওয়ালীদের ভাই মাসলামা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে অনেকগুলো শহর ও দুর্গ দখল করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ সাকাফী, যিনি একাধারে হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন, হিন্দুস্থানের সিন্ধু রাজ্য জয় করেন। ওয়ালীদ আপন চাচাত ভাই হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। ৮৭ হিজরী (৭০৫ খ্রি) ওয়ালীদ দামিশকের জামে মসজিদ সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ করেন। ঐ বছরই হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ব্যবস্থাপনায় মদীনায় মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর সহধর্মিণীদের কক্ষগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে মসজিদ সম্প্রসারিত করা হয়। মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য রোমান সম্রাটও উপঢৌকনস্বরূপ অনেক মূল্যবান পাথর এবং বেশ কয়েকজন সুদক্ষ কারিগর ওয়ালীদের কাছে প্রেরণ করেন। ওয়ালীদ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন। তিনি অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, শহরে ও পল্লীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, সরাইখানা নির্মাণ করেন, পানির কূপ খনন করেন, হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং শহর ও পল্লী সর্বত্রই শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। মদীনায় পানির অভাব ছিল। তিনি একটি খাল কেটে সেখানে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি লঙ্গরখানাও স্থাপন করেন। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর শাসনামলে চতুর্দিকে মুসলমানদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে এবং উল্লেখযোগ্য কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। তাঁর যুগে মুসলমানদের অনবরত বিজয়লাভ জনসাধারণকে ফারূকে আযমের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওয়ালীদ অভাবগ্রস্ত, ফকীহ্ ও আলিমদের এই পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দেন যে, তাঁরা অত্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক আইন-কানুন ও রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন।

তিনি হিশাম ইব্ন ইসমাঈল মাখযূমীকে পদচ্যুত করে যখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে মদীনার শাসক নিয়োগ করেন তখন তিনি (উমর) সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, তিনি মদীনার ফকীহদের মধ্য থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দশজন আলিমকে নির্বাচন করেন। মদীনার 'ফুকাহা-ই সাব'আ' তথা সপ্তফকীহ্ও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যাহোক তিনি ঐ দশ ব্যক্তির একটি মজলিস (কমিটি) গঠন করেন এবং ঐ মজলিসের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিটি কাজ আনজাম দিতে থাকেন। ঐ মজলিসের সদস্যদেরকে নিজের শাসন-ব্যবস্থার সাথে শরীক করে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের জন্য এমন একটি অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, তাঁকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করার জন্য মদীনাবাসীরা অসংখ্য চিঠি মারফত ওয়ালীদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন।

ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই হাজ্জাজ ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব ও তার ভাইদের বন্দী করেন এবং তাদের উপর দায়িত্বপালনে অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

৮৭ হিজরীতে (৭০৫-৭০৬ খ্রি) মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক মাসীসার পথে রোমান শহরগুলোর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং লূলাক, আখরাম, বোলুস, কামীকাম প্রভৃতি দুর্গ জয় করেন। ৮৮ হিজরীতে (৭০৬-৭০৭ খ্রি) জারসূমা এবং তাওয়ানাও বিজিত হয়।

৮৯ হিজরীতে (৭০৭-৭০৮ খ্রি) মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক ও আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ রোমান-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। রোমানদের একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী তাদের মুকাবিলা করে। কিন্তু মুসলমানরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোমানদের পরাজিত করে। সূরাইয়া, আর্দূলিয়া, আমূরিয়া, হারকালা, কামূলিয়া প্রভৃতি দুর্গ মুসলমানরা দখল করে নেয়। ঐ বছরই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক আযারবায়জানের দিক থেকে তুর্কীদের উপর হামলা চালিয়ে অনেকগুলো শহর ও দুর্গ দখল করেন। ঐ বছরই মানূরাকা এবং মাবূরাকা দ্বীপও বিজিত হয়।

৯০ হিজরীতে (৭০৮-৭০৯ খ্রি.) আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ সুরিয়া অঞ্চলে পাঁচটি বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেন।

৯১ হিজরীতে (৭০৯-৭১০ খ্রি.) ওয়ালীদ আপন চাচা মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানকে দারিনিয়া দ্বীপের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে আপন ভাই মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিককে নিয়োগ করেন। মাসলামা আযারবায়জানের দিক থেকে তুর্কীদের উপর হামলা চালান এবং শহরের পর শহর দখল করে 'বাব' পর্যন্ত এগিয়ে যান। ঐ বছর নাসাফ, কুশ, শূমান প্রভৃতি দুর্গও মুসলমানরা জয় করে।

৯২ হিজরীতে (৭১০-১১ খ্রি.) মাসলামা তিনটি দুর্গ জয় করেন এবং সারসানার অধিবাসীদেরকে রোমান সাম্রাজ্যে নির্বাসিত করেন। ঐ বছর সিন্ধু রাজ্যের দেবল (বর্তমানে করাচী) বিজিত হয়। কারখ, বারহাম, বাজাহ, বায়যা, খাওয়ারিজম এবং সমরকন্দের উপরও মুসলমানরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি.) মাসলামা ইব্‌ন আদুল মালিক, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ও মারওয়ান ইব্‌ন ওয়ালীদ গাযালা পুনর্দখল করেন এবং সাবীতালা, হানজারা, মাশাহ, হিসনুল হাদীদ, মালাতিয়া প্রভৃতি জয় করেন।

৯৪ হিজরীতে (৭১২-৭১৩ খ্রি.) আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইনতাকিয়া (এন্টিওক) এবং আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদ গাযালা পুনর্দখল করেন। ঐ বছরই ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশাম 'মারাজুল হাম্মাম' এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ কাবশাহ সূরিয়া পর্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ঐ বছর কাবুল, ফারগানা, শাশ, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চল বিজিত হয়।

৯৫ হিজরীতে (৭১৩-১৪ খ্রি) হারকালাবাসীরা ইসলামী বাহিনীকে অন্যত্র ব্যস্ত দেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ তাদেরকে পুনরায় দমন করেন। ঐ বছরই মূকান, 'মদীনাতুল বাব' প্রভৃতিও মুসলমানরা জয় করে।

৯৬ হিজরীতে (৭১৪-১৫ খ্রি.) তূস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিজিত হয়।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের যুগে এত অধিক সংখ্যক যুদ্ধ হয়েছে যে, এই স্বল্প পরিসরে তার বিবরণ দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর যুগের শুধু কয়েকজন স্বনাম খ্যাত অধিনায়কের কীর্তিসমূহ অতি সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিকও ওয়ালীদের যুগের দিগ্বিজয়ী অধিনায়কদের অন্যতম। উপরে তাঁর সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আরো কয়েকজন অধিনায়ক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম আল-বাহিলী

হাজ্জাজ কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম আল-বাহিলীকে ৮৬ হিজরীতে (৭০৫-৭০৬ খ্রি) খুরাসানের আমীর নিয়োগ করেছিলেন। কুতায়বা মার্ভে পৌঁছে আয়াস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরকে সামরিক বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিয়োগ করেন এবং উসমান ইব্‌ন সা'দীর হাতে বায়তুল মালের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর স্বয়ং একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তালিকানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তুর্কী সম্রাট তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর

বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে আখিরদান ও শূমান তথা তাগারিস্তানের শাসনকর্তাদের উপর হামলা করার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। কুতায়বা আখিরদান ও শূমানের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার শাসকরাও বশ্যতা স্বীকার ও রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে তাঁর সাথে সন্ধি করেন। কুতায়বা তখন আপন ভাই সালিহকে ফারগানায় পাঠিয়ে দিয়ে মার্ভে ফিরে আসেন। সালিহ্ ফারগানার কাশান, দারাশত আখ্শকীত প্রভৃতি শহর জয় করেন।

৮৭ হিজরীতে (৭০৬ খ্রি.) কুতায়বা বুখারা অঞ্চলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। আশেপাশের তুর্কীরা একজোট হয়ে মুকাবিলা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং গনীমতস্বরূপ তাদের অনেক ধন-সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

৮৮ হিজরীতে (৭০৭ খ্রি.) সাগাদ ও ফারগানার অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা চীন-সম্রাটের ভাগ্নেকে নিজেদের অধিনায়ক নিয়োগ করে দুইলাখ সৈন্যসহ মুসলমানদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। কুতায়বা তাদের পরাজিত করে মার্ভে ফিরে আসেন।

৮৯ হিজরীতে (৭০৮ খ্রি.) বুখারা, কুশ, নাসাফ ও সাগাদের নেতারা একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুতায়বা তাদের উপর হামলা চালান। তারা পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি পুনরায় মার্ভে ফিরে আসেন।

৯০ হিজরীতে (৭০৮-৯ খ্রি.) বুখারার বাদশাহ্ ওয়ার্দান ও সাগাদের বাদশাহ্ এবং আশে-পাশের সর্দাররা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু বাদগীসের শাসনকর্তা নিযকতুরখান মুসলমানদের অনুগত থাকেন। কুতায়বা নিযকতুরখানকে সঙ্গে নিয়ে বুখারার দিকে অগ্রসর হন। তুর্কীরা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে তাঁর মুকাবিলা করে। প্রথমে স্থানীয় অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর মুসলমানরা যখন নিজেদের সামলে নিয়ে তুর্কীদের উপর হামলা চালায় তখন তুর্কীদের বাদশাহ্ খাকান ও তার পুত্র আহত হয়ে পলায়ন করেন। ফলে মুসলমানরা জয়লাভ করে। সাগাদের শাসনকর্তা তারখুন বার্ষিক জিয্য়া নিয়মিত পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কুতায়বা পুনরায় মার্ভে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে নিয্ক তাখারিস্তানে পৌঁছে পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। বলখের বাদশাহ আসবাহান্দ, মার্ভের বাদশাহ্ বাযান, তালিকানের বাদশাহ্ দূদ, জুরজানের শাসক ফায়ারাব এবং কাবুলের বাদশাহ্ একজোট হয়ে কুতায়বার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের স্ব-স্ব এলাকা থেকে বের করে দেন। কুতায়বা আপন ভাই আবদুর রহমানকে বার হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাকে বারূকান নামক স্থানে অবস্থান করতে বলেন। শীত মওসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুতায়বা নিশাপুরের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্রোহীদের উপর হামলা চালান। তিনি তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি দেন এবং তারা সকলেই বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিত জিয্য়া প্রদানের অঙ্গীকার করে। ঐ সময় সামানগানের দুর্গ দখল করে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিযক বন্দী হন এবং তাকে হত্যা করা হয়।

জুরজানের বাদশাহ্র অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে তাঁর দেশে বহাল রাখা হয়। মোটকথা তুর্কী সর্দাররা বার বার বিদ্রোহ করে এবং প্রতিবারই কুতায়বা তাদের পরাজিত

করেন। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্ক থেকে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মনোবৃত্তি লোপ পেতে থাকে।

৯২ হিজরীতে (৭১০-১১ খ্রি.) সিজিস্তানের বাদশাহ্ রুতবেল বিদ্রোহের সংকল্প নেন। কুতায়বা তাঁর বাহিনী নিয়ে রুতবেলকে আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করে জিয্‌য়ার যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করেন।

৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি.) কুতায়বা খাওয়ারিযম জয় করে সেখানকার বাদশাহ্‌র কাছ থেকে খারাজ পরিশোধের অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে আসেন। যখন তিনি খাওয়ারিযম জয় করছিলেন তখন সাগাদবাসীরা এই ভেবে যে, কুতায়বা আমাদের থেকে অনেক দূরে রয়েছেন, তাঁর কর্মকর্তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুতায়বা গনীমতের মাল খাওয়ারিযম থেকে প্রেরণ করেন এবং একটি সেনাবাহিনী নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সাগাদের দিকে রওয়ানা হন।

কুতায়বার আগমনের সংবাদ শুনে সাগাদবাসীরা চীনের খাকানের সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি নিজের প্রখ্যাত অধিনায়কবৃন্দ এবং রাজকুমারদেরকে কুতায়বার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তুর্কীরা সমরকন্দ দুর্গে মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। কুতায়বা সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খাকানের পুত্র নিহত হন। মুসলমানরা দুর্গ দখল করে নেয় এবং হাজার হাজার তুর্কী নিহত হয়। এরপর তুর্কীদের উপর বিপুল পরিমাণ কর ধার্য করা হয় এবং তাদের যে সমস্ত বিখ্যাত অধিনায়ক মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল তাদেরকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ বন্দীদের মধ্যে ইয়াযদিগার্দের বংশের একটি মহিলাও ছিল। হাজ্জাজ তাকে ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে বিবাহ করেন। এই মহিলার গর্ভেই তাঁর পুত্র ইয়াযীদের জন্ম হয়। কুতায়বা মার্ভে ফিরে এসে মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে নিশাপুরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

৯৪ হিজরীতে (৭১২-১৩ খ্রি.) শাশবাসীরা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে। কুতায়বা বুখারা, কুশ, নাসাফ ও খাওয়ারিযমের অধিবাসীদের কাছ থেকে সাহায্যকারী বাহিনী তলব করেন। তাতে সকলেই সাড়া দেয় এবং বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। তিনি স্বয়ং খোজান্দ নামক এলাকায় অবস্থান নেন এবং একটি সেনাবাহিনী শাশের দিকে প্রেরণ করেন। শাশ বিজিত হয় এবং কুতায়বা মার্ভে ফিরে আসেন। এখানে ফিরে এসেই তিনি শুনতে পান যে, হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তিনি কাশগড় পর্যন্ত সমগ্র এলাকা পদানত করে সম্পূর্ণ তুর্কিস্তানের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি হুরায়রাহ্ ইব্‌ন মাশ্‌মারজ কিলাবীর নেতৃত্বে চীনের বাদশাহ্‌র কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তাদের মাধ্যমে তিনি বাদশাহকে বলে পাঠান ঃ তুমি মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাও, অন্যথায় মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে চীন পদদলিত হবে। এই প্রতিনিধিদল পৌঁছার পর চীনের বাদশাহ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে কুতায়বার কাছে সন্ধি প্রার্থনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম

যে যুগে মুসলমানগণ বিজয় পতাকা নিয়ে আরব থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন তখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক রাজা সিন্ধু দেশ শাসন করতেন। ইরান সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হলে কিছুসংখ্যক ইরানী অধিনায়ক তাদের দেশ থেকে সিন্ধু, তুর্কিস্তান ও চীনে পালিয়ে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। অবশ্য কিছুসংখ্যক অধিনায়ক ইসলাম গ্রহণ করে সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিজেদের দেশে বসবাস করতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যখন বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার মধ্যে গোত্রগত শত্রুতা চরমে ওঠে তখন ইরানীদের মধ্যেও জাতিগত শত্রুতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা ও অন্যান্য মুনাফিকের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যোগ দেয়। এই সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদের আন্তঃবিরোধের কারণে কাবুল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে নির্বাসিত জীবন যাপনকারী ইরানীদের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার হয়। একমাত্র এই কারণেই ইরানীদের দ্বারা কূফা, বসরা, ইরান ও খুরাসান অঞ্চলে মুসলমানদেরকে বার বার অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

সিন্ধু দেশ যেহেতু বসরা-কূফা তথা ইরাকের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ছিল এবং ইরানী সাম্রাজ্যের সীমা যেহেতু এর সাথে সংযুক্ত ছিল, তাই বেশির ভাগ দুষ্ট প্রকৃতির ইরানী সিন্ধু দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের বিজয় এবং ইরানীদের শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করে সিন্ধুর রাজা নিজে থেকেই ইরানীদের জন্য আক্ষেপ করতেন। তিনি মনে মনে কামনা করতেন, যেন ইরানীরা পুনরায় তাদের আধিপত্য ফিরে পায়। তাই দেখা যায়, ইরানের সর্বশেষ সম্রাট নিহাওয়ান্দ যুদ্ধের পর বেশ কয়েকবার সৈন্য সংগ্রহ করে যখন মুসলমানদের মুকাবিলা করেন তখন তার সাহায্যার্থে সিন্ধুর রাজাও সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ইরান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে গেল তখন সিন্ধুর রাজা তার সীমান্তবর্তী ইরানী প্রদেশসমূহ নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরাজিত ইরানীরাও কিরমান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশ সন্তুষ্টচিত্তে সিন্ধুর রাজার হাতে অর্পণ করে যাতে সেগুলো মুসলমানদের দখলে চলে না যায় এবং তার বদলে তারা সিন্ধুর রাজার সমর্থন ও সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়।

এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সিন্ধুর রাজাকে শায়েস্তা করা মুসলমানদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর যুগে ইরান ও খুরাসানের উপর মুসলমানদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বেই অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয়। ফলে সিন্ধু অভিযানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। আমীরে মুআবিয়া (রা) অভ্যন্তরীণ সংঘাত কাটিয়ে ওঠার পর বাইরের দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাঁর যুগে সিন্ধু রাজার নিকট থেকে ইরানী সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো ফেরত আনার চেষ্টা করা হয়। এই সুবাদে সিন্ধী বাহিনীর সাথে ছোট-খাটো সংঘর্ষও হয়। কিন্তু ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয়। ফলে তারা বহির্দেশের দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারেননি।

আবদুল মালিকের যুগে মুসলমানরা বহির্দেশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ পায়নি। প্রাচ্য দেশসমূহের শাসক হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানের চাইতে আফগানিস্তান ও বাদাখশানের শাসক রুতবেলকে দমন করার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেননা তিনি আশংকা করতেন, রুতবেল একদিন ইসলামী প্রদেশের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হতে পারেন। হাজ্জাজের দৃষ্টি প্রধানত রুতবেল এবং তারই কারণে বুখারা প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে নিবদ্ধ থাকত। তাঁর গভর্নর কুতায়বা চীন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের অবাধ্যদের শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপর সিন্ধুর রাজার দখল থেকে মুসলমানদের প্রাপ্য অঞ্চলসমূহ ফিরিয়ে আনা এবং তিনি যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর অবাধ্যতা না দেখান সেজন্য তাকে মুসলমানদের কিছু বীরত্ব ও পরাক্রমের নমুনা প্রদর্শনের সময় এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে সেই জরুরী কাজটি শুরু করার পূর্বেই ঘটনাচক্রে খোদ সিন্ধুরাজ মুসলমানদেরকে তার দেশ আক্রমণের আহ্বান জানান।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কিছু সংখ্যক মুসলিম বণিক সফররত অবস্থায় সিংহল দ্বীপে ইনতিকাল করেছিলেন। তাদের যে সব ইয়াতীম সন্তান ও বিধবা স্ত্রীরা সেখানে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সিংহলের রাজা ইরাক শাসক হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ছাকাফী এবং খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কৃপাদৃষ্টি নিজের দিক আকর্ষণের একটি মাধ্যমে পরিণত করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একের পর এক মুসলমানদের বিজয় সংবাদ শুনে তিনি একেবারে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অনেকদিন যাবত মুসলিম খলীফার কাছে নিজের ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন। যাহোক এবার সেই মাধ্যম তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি ঐ সব ইয়াতীম শিশু ও বিধবাদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য কর্মচারীসহ বিশেষ জাহাজযোগে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের সাথে হাজ্জাজ ও খলীফা ওয়ালীদের জন্য অনেক মূল্যবান উপহারসামগ্রীও পাঠান। তাঁর আশা ছিল, এই সব বিধবা ও ইয়াতীম শিশু নিশ্চয়ই হাজ্জাজের কাছে আমার প্রশস্তি বর্ণনা করবে। ঐ জাহাজগুলো শ্রীলংকা থেকে রওয়ানা হয়ে সমুদ্র উপকূল ধরে পারস্য উপসাগরের দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে প্রতিকূল অবহাওয়া ঐ জাহাজগুলোকে সিন্ধুর দেবল (করাচী) বন্দরে নিয়ে ভিড়ায়। সেখানে সিন্ধুর রাজা দাহিরের সৈন্যরা ঐ জাহাজগুলোতে লুটপাট চালায় এবং আরোহীদের বন্দী করে। এই সংবাদ হাজ্জাজের কানে পৌঁছলে তিনি সিন্ধুর রাজাকে লিখেন, ঐ জাহাজগুলো আমার কাছে আসছিল। তুমি লুটেরাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাও এবং জাহাজগুলো সমস্ত আরোহী ও ধনসম্পদসহ অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু রাজা দাহির তাঁকে এর যে উত্তর দেয় তা ছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিবেকবর্জিত।

ফলে হাজ্জাজ প্রথমবারের মত আবদুল্লাহ্ আসলামীর নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি সিন্ধুতে পৌঁছে রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করতে গিয়ে নিহত হন। অতএব এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়বার হাজ্জাজ বুদায়ল নামক একজন অধিনায়কের অধীনে পুনরায় সিন্ধুর দিকে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি দেবলে গিয়ে পৌঁছেন এবং প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পরে মারা যান।

এই সংবাদ শুনে হাজ্জাজ আরো বেশি ব্যথিত হন। এবার তিনি তৃতীয়বারের মত আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ১৭ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের নেতৃত্বে ছয় হাজার সিরীয় সৈন্যের একটি বাহিনী সিন্ধুতে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে এবার সিরীয় সৈন্য পাঠাবার কারণ হলো, ইতিপূর্বে হাজ্জাজ সিন্ধুতে দুই দুইবার যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তারা ছিল যথাক্রমে ইরাকী ও ইরানী। এতে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইরাকী ও ইরানী সৈন্যরা হয়ত সিন্ধীদের সাথে কোন না কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম প্রথমে মাকরান প্রদেশ জয় করেন যা সিন্ধীরা এতদিন পর্যন্ত দখল করে রেখেছিল। তিনি সিন্ধীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেবলের দিকে অগ্রসর হন এবং দেবলও জয় করেন। এরপর তিনি নিরূন ও ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হন। রাজা দাহিরের কাছে শুরু ইরানীরাই আশ্রয় গ্রহণ করেনি, বরং সেখানে এমন বহু আরবও ছিল, যারা তৎকালীন খলীফা কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে রাজা দাহিরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সমস্ত কারণেও সিন্ধু আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। যাহোক রাজা দাহির মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মুকাবিলা করে নিহত হয়। এরপর তিনি একের পর এক সিন্ধুর শহরসমূহ জয় করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সিন্ধু ও মুলতানের সমগ্র অঞ্চল তাঁর হস্তগত হয়।

সিন্ধু বিজয়কালে হাজ্জাজের দৃষ্টি সব সময় মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের প্রতি নিবদ্ধ থাকত। তিনি প্রতিদিন সিন্ধু অভিযানের সংবাদ জানতে চাইতেন এবং তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম নিজেকে সিন্ধীদের কাছে একজন অতি দয়ালু, কোমল হৃদয় এবং প্রজাবৎসল শাসক হিসাবে প্রমাণ করেন। অভিযান চলাকালে এই দিগ্বিজয়ী যুবক যে ধৈর্য, সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ হিন্দুস্তানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হবে। তিনি মুলতান জয় করেছেন এমন সময় হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি ৯৬ হিজরী (৭১৪-১৫ খ্রি) পর্যন্ত সুরাট বন্দর থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম-ভারত জয় করেন।

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফী

হাজ্জাজ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে হাজ্জাজ ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে খুরাসানের গভর্নরের পদ থেকে এবং হাবীব ইব্‌ন মুহাল্লাবকে কিরমানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন। এরপর মুহাল্লাব এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের সকল পুত্রকেই বন্দী করেন। ইয়াযীদ আপন ভাইদের নিয়ে জেলখানা থেকে পালিয়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের ভাই সুলায়মানের কাছে ফিলিস্তীনে চলে যান। সুলায়মান তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন। হাজ্জাজ ওয়ালীদের কাছে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু সুলায়মান ইয়াযীদ বা তার ভাইদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। হাজ্জাজের কঠোর ব্যবহার ইরাকবাসীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। একারণে অনেক লোকই ইরাক থেকে পলায়ন

করে মক্কা-মদীনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকে। তখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন হিজাযের গভর্নর। তিনি ইরাক থেকে আগত ঐ সমস্ত লোকদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করতেন।

৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি) হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) একটি পত্র মারফত আবদুল মালিকের কাছে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি ইরাকবাসীদের উপর সীমাতিরিক্ত কঠোর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছেন। হাজ্জাজ ব্যাপারটি জানতে পেরে তিনিও একটি পত্র মারফত ওয়ালীদের কাছে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, বেশির ভাগ ফিতনাবাজ ও মুনাফিক ইরাক থেকে পালিয়ে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে চলে যায় এবং তিনি তাদের গ্রেফতারীর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। তার এই আচরণ রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। এমতাবস্থায় তাকে হিজাযের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

ওয়ালীদ ৯৩ হিজরীর শাবান (৭১২ খ্রি.-এর জুন) মাসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে মক্কার এবং উসমান ইব্‌ন হিব্বানকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। খালিদ মক্কায় পৌঁছে ইরাকীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেন এবং ঐ সমস্ত লোককেও সাবধান করে দেন, যারা ইরাকীদের জন্য তাদের ঘর ভাড়া দিয়ে রেখেছিল। হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মক্কায় চলে এসেছিলেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-ও ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আশআছের সমমনা ছিলেন। আর এটা হাজ্জাজের চোখে কোন সাধারণ অপরাধ ছিল না। খালিদ সাঈদকে গ্রেফতার করে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। হাজ্জাজ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেন। তিনি শুধু সাঈদকে নয়, বরং এ ধরনের আরো অনেক নির্দোষ লোককেই হত্যা করেছিলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আদুল মালিকের পর সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার কথা। কেননা আবদুল মালিক সুলায়মানকে ওয়ালীদের পরবর্তী যুবরাজ নিয়োগ করেছিলেন এবং তদনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ওয়ালীদ সুলায়মানকে যুবরাজ থেকে বঞ্চিত করে আপন পুত্র আবদুল আযীযকে অলীআহ্‌দ করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা পৃথক পৃথকভাবে আপন সভাসদদের কাছে ব্যক্তও করেছিলেন এবং হাজ্জাজ ও কুতায়বা তাতে সায়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সভাসদ তাতে সায় দেননি, বরং তাঁরা ওয়ালীদকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এরূপ করা হলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ৯৫ হিজরীর শাওয়াল (৭১৪ খ্রি. জুলাই) মাসে বিশ বছর ইরাক শাসনের পর হাজ্জাজ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি আপনপুত্র আবদুল্লাহ্‌কে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। ওয়ালীদ হাজ্জাজ কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তাকে স্ব-স্ব পদে বহাল রাখেন।

মূসা ইব্‌ন নুসায়র

হাজ্জাজ যেমন প্রাচ্য দেশসমূহের সবচেয়ে প্রভাবশালী গভর্নর ছিলেন তেমনি ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের শাসনামলে মূসা ইব্‌ন নুসায়র ছিলেন পাশ্চাত্য দেশসমূহের (উত্তর আফ্রিকা, তথা আল-মাগরিবের) সবচেয়ে প্রভাবশালী গভর্নর। কায়রাওয়ান ছিল মূসা ইব্‌ন নুসায়রের কর্মস্থল। উত্তর আফ্রিকার এই সর্ববৃহৎ শাসনকর্তার কাছে স্পেনের কিছু লোক এসে রাজা লাযারিকের (রডারিকের) বিরুদ্ধে জুলুম-অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপন করে আবেদন জানায়, যেন তিনি স্পেনের উপর হামলা চালিয়ে মরক্কোর মত তাও মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

মুসা স্পেনবাসীদের এই আবেদন সম্পর্কে কয়েকদিন চিন্তাভাবনা করেন। এরপর নিজের একজন ক্রীতদাসের অধিনায়কত্বে চারটি জাহাজে মোট চারশ সৈন্য স্পেনে প্রেরণ করেন, যাতে তারা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হতে পারে। অপরদিকে তিনি খলীফা ওয়ালীদের কাছে স্পেন আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা অনুমতি প্রদান করেন। অপরদিকে ঐ চারশ সৈন্যও তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে সুস্থ শরীরে ফিরে আসে।

৯১ অথবা ৯২ হিজরীতে (৭১০ অথবা ৭১১ খ্রি) মূসা তাঁর অপর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস তারিক ইব্‌ন যিয়াদকে স্পেন আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁর অধিনায়কত্বে মোট সাত হাজার সৈন্য ছিল। তারিক তখন মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পক্ষ থেকে মরক্কোয় অবস্থিত তাঞ্জার শাসনকর্তা ছিলেন। যাহোক তারিক নিজ বাহিনী নিয়ে জাহাজে আরোহণ করেন এবং বারো মাইল প্রশস্ত জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করেন। তিনি প্রথম উত্তর দিকে রওয়ানা হন। সাযূনা অঞ্চলে স্পেনের রাজা রডারিকের একলক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের সাথে তারিকের মুকাবিলা হয়। আটদিন পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে। শেষ পর্যন্ত অষ্টম দিনে, ৯২ হিজরীর ২৮শে রমযান (৭১১ খ্রি. জুলাই) রডারিক নিহত হন এবং খ্রিস্টান বাহিনী পলায়ন করে। এরপর তারিক অতি সহজেই শহরের পর শহর জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র এই বিরাট বিজয় সংবাদ পেয়ে তারিককে আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে সে যেখানে আছে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর দুর্দান্ত সৈন্যরা তো তখন অপেক্ষা করার মত অবস্থায় ছিল না। যাহোক ৯৩ হিজরীর রমযান (৭১২ খ্রি.-এর জুলাই) মাসের শেষ দিকে মূসা ইব্‌ন নুসায়রও আঠারো হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে গিয়ে পৌঁছেন এবং পীরেনিজ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র স্পেন উপদ্বীপ দখল করেন। পূর্ব স্পেনের বারসেলোনা এলাকা জয় করার পর মূসা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে লিখেন ঃ আমি সমগ্র স্পেন দখল করেছি। এবার আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি ইউরোপের মধ্য দিয়ে বিজয় নিশান উড়িয়ে কনসটান্টিনোপলে পৌঁছতে পারি এবং তা জয় করে আপনার খিদমতে হাযির হতে পারি।

কিন্তু ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মূসাকে লিখেন, তুমি কাউকে স্পেনের শাসক নিয়োগ করে আফ্রিকার পথে তারিকসহ আমার কাছে ফিরে আস। যদি ঐ সময় মূসা অনুমতি পেয়ে যেতেন তাহলে সমগ্র ইউরোপ জয় করা তাঁর জন্য কঠিন ছিল না। মোটকথা, খলীফার নির্দেশ

অনুযায়ী মূসা আপন পুত্র আবদুল আযীযকে স্পেনের গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল মালিককে মরক্কোয় এবং তৃতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে কায়রোওয়ানে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে বেশ কিছু উপহার উপঢৌকনসহ দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু যেদিন তিনি দামিশ্‌কে গিয়ে পৌঁছেন সেদিন খলীফা ওয়ালীদ চিরতরে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যু

ওয়ালীদ আপন ভাই সুলায়মানকে 'যৌবরাজ্য' থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর স্থলে আপন পুত্রকে যুবরাজ নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তাতে সফল হতে পারেননি। তিনি যদি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তাহলে হয়ত তাঁর ঐ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো। এবার ওয়ালীদের মৃত্যুর পর অবস্থা এই দাঁড়ায়, যে সমস্ত সভাসদ ওয়ালীদের উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন সুলায়মান তাদের কট্টর শত্রুতে পরিণত হন। এছাড়াও যে ব্যক্তিই ওয়ালীদকে ভালোবাসত ও সম্মান করত, সুলায়মান তাদেরও শত্রু হয়ে দাঁড়ান। আর এই অবস্থা ছিল মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক। ওয়ালীদ ৯৬ হিজরীর ১৫ জমাদিউস-সানী (৭১৫ খ্রি-এর ২৫ ফেব্রুয়ারী) প্রায় ৪৫ বছর বয়সে ৯ বছর ৮ মাস খিলাফত পরিচালনা করে সিরিয়ার 'দায়রে মারান' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১৯ জন পুত্র রেখে যান। ওয়ালীদের শাসনামলে সিন্ধু, তুর্কিস্তান, সমরকন্দ, বুখারা, স্পেন ও এশিয়া মাইনরের বেশির ভাগ শহর ও দুর্গ এবং কিছু সংখ্যক দ্বীপ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর যুগ একদিকে যেমন ছিল সমৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ, অন্যদিকে তেমনি ছিল বিরাট বিরাট বিজয়ের যুগ। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর এ ধরনের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয় তখন পর্যন্ত মুসলমানদের ভাগ্যে জুটেনি। ওয়ালীদের ইনতিকালের সময় তাঁর ভাই সুলায়মান রামলা নামক স্থানে ছিলেন।

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক

সুলায়মান আপন ভাই ওয়ালীদের চাইতে চার বছরের ছোট ছিলেন। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর ৯৬ হিজরীর জমাদিউস্ সানী (৭১৫ খ্রি-এর ফেব্রুয়ারী/মার্চ) মাসে তার হাতে খিলাফতের বায়আত করা হয়। সুলায়মানকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে হাজ্জাজ যেহেতু ওয়ালীদের সাথে একমত ছিলেন এবং কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমও ছিলেন এ ব্যাপারে তাদের সমর্থক, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি হাজ্জাজ ও কুতায়বার কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। খলীফা হওয়ার পূর্বেই হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তবে কুতায়বা তখনও জীবিত ছিলেন এবং খুরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন তা কুতায়বা ভালোভাবেই জানতেন।

কুতায়বাকে হত্যা

খুরাসানের গভর্নর কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম বাহিলী যখন শুনলেন যে, ওয়ালীদ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর স্থলে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক, তখন তিনি খুরাসানে অবস্থানকারী সমগ্র সৈন্য এবং সেনানায়কদের একত্র করে

অভিমত ব্যক্ত করেন, সুলায়মানের খিলাফত অস্বীকার করা উচিত। কুতায়বার কাছে যেসব সৈন্য ছিল তার একটি বিরাট অংশ ছিল তামীম গোত্রের। বনূ তামীমের নেতা ছিলেন ওয়াকী। তিনি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে জনসাধারণের কাছ থেকে সুলায়মানের পক্ষে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন। ধীরে ধীরে এ সংবাদ সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব গোত্রের লোকেরাই ওয়াকীর চারপাশে এসে ভিড় জমায়। কুতায়বা অনেক চেষ্টা করেন, যাতে লোকেরা তাঁর কথা শোনে এবং তাঁর সাথে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া করে। কিন্তু কেউই তাঁর কথা শোনেনি, বরং তাঁর সাথে প্রকাশ্যে অশিষ্ট আচরণ করে। কুতায়বার সাথে তাঁর ভাই, পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিল। শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা তাঁর ক্যাম্পে লুটপাট শুরু করে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিটি জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে। কুতায়বার তাঁবুর হিফাযত করতে গিয়ে তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত তিনিও মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলে। ঐ সময় কুতায়বার ভাই ও পুত্রদের মধ্যে এগারজনই মারা যান। তাঁর ভাইদের মধ্যে শুধু উমর ইব্‌ন মুসলিম রক্ষা পান একারণে যে, তার মা ছিলেন তামীম গোত্রের মেয়ে। ওয়াকী কুতায়বার মাথা এবং আংটি খুরাসান থেকে সুলায়মানের কাছে পাঠিয়ে দেন। কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম উমাইয়া গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত দিগ্বিজয়ী অধিনায়ক ছিলেন। এ রকম একজন বিরাট ব্যক্তির এ ধরনের শোচনীয় মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি আক্ষেপজনক ঘটনা। কিন্তু যেহেতু তিনি যুগের খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের উপর হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করা চলে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের মৃত্যু

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে তা মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম সম্পর্কিত। হাজ্জাজের সাথে সুলায়মানের শত্রুতা থাকতে পারে, তবে সেই শত্রুতা তার আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমকেও কট্টর শত্রু মনে করেন, যে ধরনের কট্টর শত্রু মনে করতেন হাজ্জাজকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম ছিলেন একজন অতি বুদ্ধিমান, বীরহৃদয় ও পুণ্যবান যুবক। তিনি সিন্ধু ও হিন্দুস্থান বিজয়ে একদিকে নিজেকে রুস্তম ও ইসকান্দারের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং অন্যদিকে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন নও-শেরওয়ানের চাইতেও অধিক ন্যায়বিচারক ও প্রজাবৎসলে। এই দিগ্বিজয়ী তরুণ অধিনায়ক সুলায়মানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা তো দূরের কথা, তাঁর বিরুদ্ধে কখনো টু শব্দটিও করেননি।

হাজ্জাজের মৃত্যুর পরও মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম দেশ জয়ে মগ্ন থাকেন, যেমন ছিলেন হাজ্জাজের জীবনকালে। তাঁর কাছে যে সব সৈন্য ছিল তারা তাঁর জন্য ছিল উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তারা তাঁর যে কোন হুকুম পালন করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করত। আর এটাও এ কথার বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম একজন অতি যোগ্য ও বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। যে যুবকের জীবনের সূচনা ছিল এরূপ পবিত্র ও মহৎ তাঁকে যদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা

হতো এবং তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত সেবাও গ্রহণ করা হতো তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে চীন, জাপান পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মহাদেশ সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু সুলায়মান বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ কাবশাকে সিন্ধুর গভর্নর করে পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সুলায়মানের এই নির্দেশ ছিল প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি উদ্যমশীল ও দিগ্বিজয়ী অধিনায়কের গালে একটি চপেটাঘাত তুল্য। যে কোন খলীফা বা সম্রাটের জন্য এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, তিনি আপন অধিনায়কদের কৃতিত্বপুর্ণ ও প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাঁদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত না করে বরং গ্রেফতারের নির্দেশ দেন ?

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ কাবশা সিন্ধুতে এসে গায়ের জোরে মুহাম্মদ ইবন্ কাসিমকে কখনো পরাজিত করতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গীরা খলীফার ঐ মান হানিকর নির্দেশের কথা জানতে পেরে তাঁকে বলেন, আপনি কখনো এই নির্দেশ পালন করবেন না, আমরা আপনাকেই আমীর বলে জানি এবং আপনার হাতে আনুগত্যের বায়আতও করেছি। খলীফা সুলায়মানের হাত কখনো আপনার নাগাল পাবে না। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমকে পরাজিত করার জন্য খলীফা সুলায়মানকে আপন খিলাফতের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হতো। কেননা এখানে তিনি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে শুধু মানুষ নয়, বরং সিন্ধু মরুভূমির প্রতিটি বালুকণাও বোধ হয় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসত। কিন্তু এই সুশীল যুবক কোনরূপ ইতস্তত না করে নিজেকে আবূ কাবশার হাতে অর্পণ করতে গিয়ে বলেন, যুগের ললীফার নির্দেশ অমান্য করার মত অপরাধ আমি কখনো করতে পারব না। যাহোক আবূ কাবশা তাঁকে গ্রেফতার করে দামিশকে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সুলায়মানের নির্দেশে তাঁকে ওয়াসিতের জেলখানায় আটক করে রাখা হয় এবং তাঁর প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমানকে। সালিহ্ নানাভাবে তাঁকে নির্যাতন করে এবং এর ফলেই তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পরিণাম

ইতিপূর্বে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং স্পেন বিজয়ের পরিপূর্ণতাও দান করেছিলেন। মূসার পিতা নুসায়র আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁকে মারওয়ান গোত্রের লোক বলেই মনে করা হতো। এই বীর অধিনায়কের বীরত্ব ও উদ্যমশীলতার পরিমাপ এভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি শুধু পনের-বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ জয় করতে চেয়েছিলেন। মূসা যখন রাজধানীতে পৌঁছেন তখন তাঁর গুণগ্রাহী খলীফা ওয়ালীদ আর ইহজগতে নেই। আর সুলায়মান তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করা তো দূরের কথা, তাকে উল্টা কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তাঁকে এত বিরাট পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদান করেন, যা পরিশোধ করা ছিল তাঁর সাধ্যের অতীত। শেষ পর্যন্ত মূসাকে জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য আরবের নেতৃবৃন্দের কাছে হাত পাততে হয় এবং এভাবে ভূলুণ্ঠিত হয় তাঁর যাবতীয় সম্মান।

ওয়ালীদের যুগের প্রখ্যাত অধিনায়কদের মধ্যে শুধু মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক সুলায়মানের নির্যাতন থেকে রক্ষা পান। সুলায়মান তাঁকে যথারীতি তাঁর পদেই বহাল রাখেন। মাসলামা ছিলেন সুলায়মানের ভাই। তাছাড়া যৌবরাজ্যের ব্যাপারেও তিনি কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাই সুলায়মান আপন শত্রু তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ মুহাল্লাবের পুত্রদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবসহ তার সকল ভাইকে বন্দী করে রেখেছিলেন। ইয়াযীদ জেলখানা থেকে পালিয়ে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে ফিলিস্তিনে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন। ইতিপূর্বে এও বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ মৃত্যুকালে নিজ পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে নিজের স্থলে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন এবং ওয়ালীদ তাঁর এ নিয়োগ অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু ওয়ালীদের মৃত্যুর পর সুলায়মান ফিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বপ্রথম হাজ্জাজের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে পদচ্যুত করে তার স্থলে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইয়াযীদ জানতেন, জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়কালে কড়াকড়ি করা হলে তিনিও হাজ্জাজের ন্যায় দুর্ণামের অধিকারী হবেন, আর যদি এক্ষেত্রে নম্র ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেন তাহলে সুলায়মানের চোখে খাট হয়ে যাবেন। এই উভয় সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি অতি কৌশলে সুলায়মানকে সম্মত করান যে, তিনি (সুলায়মান) খারাজ আদায় তথা অর্থ বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমানের উপর ন্যস্ত করবেন। আর অন্যান্য বিভাগের (যেমন সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার) দায়িত্ব ইরাকের গভর্নরের (ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের) উপর ন্যস্ত থাকবে। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সুলায়মান কোন আপত্তি করেননি এজন্য যে, তিনি জানতেন, হাজ্জাজ ইয়াযীদের উপর সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে বন্দী করেছিলেন। যাহোক প্রথমে সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমানকে অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিয়োগ করে ইরাকে পাঠানো হয়। এরপর ইয়াযীদ গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে কূফায় যান। সেখানে ইয়াযীদ ও সালিহের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার কাছে সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমানের কূফা উপস্থিতিও অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

ঐ সময়ে সংবাদ আসে যে, কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম খুরাসানে নিহত হয়েছেন। ইয়াযীদ খুরাসানের গভর্নরের পদই প্রাধান্য দিতেন। কেননা তিনি ও তাঁর পিতা ইতিপূর্বে খুরাসানের গভর্নরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে তার ইচ্ছানুযায়ী খুরাসান প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। তবে ইরাকও তাঁর অধীনে রাখেন। ইয়াযীদ ইরাকের কূফা, বসরা, ওয়াসিত প্রভৃতি এলাকায় নিজের পৃথক পৃথক নায়েব (সহকারী) নিয়োগ করে খোদ খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রথমে কাহতান, এরপর জুরজান আক্রমণ করেন এবং সেখানকার বিদ্রোহী সর্দারদের সাথে জরিমানা ও কর পরিশোধের শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। জুরজানবাসীরা কিছুদিন পর পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইয়াযীদ সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালিয়ে চল্লিশ হাজার তুর্কীকে হত্যা করেন এবং

জুরজানের মৌলিক প্রশাসন নিজের হাতে রেখে জাহ্‌ম ইব্‌ন যাখার জুফীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে জুরজান বলে কোন শহর ছিল না, বরং তা ছিল এমন একটি পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে ছোট বড় অনেক পল্লী ছিল। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব সেখানে একটি শহরের পত্তন করেন যা জুরজান নামে খ্যাতি লাভ করে। এরপর ইয়াযীদ তাবারিস্তান জয় করে সেখানে আপন কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক

৯৭ হিজরীতে (৭১৫-১৬ খ্রি.) মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক রিদাখিয়া অঞ্চল জয় করেন। ৯৮ হিজরীতে (৭১৬-১৭ খ্রি.) আলকূন নামীয় জনৈক রোমান সর্দার খলীফার দরবারে হাযির হয়ে কনসটান্টিনোপল জয় করার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। খলীফা সুলায়মান আপন পুত্র দাউদ এবং আপন ভ্রাতা মাসলামাকে সেনাবাহিনী দিয়ে কনসটান্টিনোপলে প্রেরণ করেন। মাসলামা ছিলেন ঐ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তিনি সেখানে পৌঁছেই কনসটান্টিনোপল অবরোধ করেন। ইসলামী বাহিনী কনসটান্টিনোপলের নিকটে গিয়ে পৌঁছলে মাসলামা নির্দেশ দেন, যেন প্রত্যেক সৈন্য এক 'মুদ' পরিমাণ খাদ্য নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং তা সেনাছাউনিতে নিয়ে জমা করেন। কনসটান্টিনোপল অবরোধ করার পর যখন এই খাদ্য স্তূপীকৃত করা হয় তখন তা পাহাড়ের আকার ধারণ করে। মাসলামা কনসটান্টিনোপল অবরোধ করে সৈন্যদের জন্য মাটি ও পাথরের ঘর তৈরি করে দেন এবং তাদেরকে মাঠে শস্য ফলাবার নির্দেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফসল পাকে এবং তা কেটে গুদামে তোলা হয়। প্রতিদিন যে খাদ্যের প্রয়োজন হতো তা অভিযানের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হতো। মূল খাদ্যের স্তূপ তখনো সংরক্ষিতই ছিল। তার সাথে আবার নতুন ফসল তোলা হলো। কনসটান্টিনোপলের বাসিন্দারা অবরোধের ক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর এই দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করে ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এভাবে প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা গোপন প্রস্তাব পাঠিয়ে পূর্বোল্লিখিত রোমান সর্দার আলকূনকে লোভ দেখায় যে, যদি সে সুলায়মানদের অবরোধ উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে কনসটান্টিনোপল থেকে কোনমতে বিদায় করে দিতে পারে তাহলে তাকে অর্ধেক সাম্রাজ্য দিয়ে দেওয়া হবে। আলকূন এ প্রস্তাবে রাযী হয়ে যায়। এরপর সে মাসলামাকে পরামর্শ দেয়, যদি তুমি খাদ্য ভাণ্ডারে এবং শস্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দাও তাহলে রোমানরা মনে করবে, এবার মুসলমানরা একটি চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। এরপর আশা করা যায়, তারা শহরটি আপনার হাতে সমর্পণ করবে। ফলে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই শহরের উপর আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মাসলামা রোমান সর্দারের ঐ প্রতারণার শিকার হন। অথচ ইতিপূর্বে কনসটান্টিনোপলবাসীরা মাসলামার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিল ঃ আমরা মাথা পিছু এক আশরাফী করে জিয্‌য়া দেব, আপনি অবরোধ উঠিয়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু তিনি তাদের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি আরো কিছুদিন অবরোধ অব্যাহত থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে কনসটান্টিনোপল মুসলমানদের হাতে চলে আসত। কিন্তু তখন মুসলমানরা কনসটান্টিনোপলের অধিকারী হোক, বোধ করি আল্লাহ্‌র সেই ইচ্ছা ছিল না। শেষ পর্যন্ত মাসলামা খাদ্যস্তূপ এবং শস্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দেন। ঐ নির্বুদ্ধিতামূলক পদক্ষেপের ফলে রোমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে

দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এদিকে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যকষ্ট দেখা দেয়। আর ওদিকে আলকূন আপন সঙ্গী-সাথীসহ ইসলামী বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে রোমানদের সাথে গিয়ে যোগ দেন। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক মাসলামাকে প্রেরণ করে খোদ ওয়াবিক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং সেখান থেকেই মাসলামার কাছে সব ধরনের সাহায্য এসে পৌঁছেছিল। এবার একদিকে খাদ্যভাণ্ডার ও শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এবং অন্যদিকে শীত মওসুম এসে পড়ায় সুলায়মান-প্রেরিত রসদসামগ্রী মাসলামার কাছে এসে পৌঁছতে পারল না। ফলে মুসলিম বাহিনীতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং ক্ষুৎপিপাসায় সৈন্যরা মরতে শুরু করল। কেননা তখন আশেপাশের এলাকা থেকেও লুটপাটের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না।

মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে বারজান নামীয় কায়সারের জনৈক অধিনায়ক, যিনি সাকালিয়া শহরের গভর্নর ছিলেন, একটি বিরাট সেনাবাহিনীসহ মুসলমানদের উপর হামলা চালান। কিন্তু মাসলামা তাকে পরাজিত করে সাকালিয়া শহর দখল করেন। এ সময়ে মাসলামার কাছে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের ইনতিকালের সংবাদ এসে পৌঁছে।

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের চরিত্র ও ব্যবহার

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক অত্যন্ত স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে নিজের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর (উমরের) সংস্পর্শে স্বাভাবিকভাবে তাঁর স্বভাব-চরিত্রও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। উমাইয়া যুগে একটি কু-রীতির প্রচলন হয়। তারা সাধারণত দেরি করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ত। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক গান-বাজনাকেও অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি গান-বাজনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠিত দেহের অধিকারী। তিনি সুস্থ-সবল এবং ভোজন-বিলাসীও ছিলেন। একদা তিনি একই বৈঠকে সত্তরটি ডালিম, অনেকগুলো কিসমিস, ছয়মাস বয়স্ক একটি বকরী এবং ছটি মুরগী খান এবং তা হযম করতেও সক্ষম হন।

অলীআহ্দী (যৌবরাজ্য)

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক নিজ পুত্র আইয়ূবকে 'অলীআহ্দ' মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তিনি পিতার জীবিতাবস্থায়ই মারা যান। এবার সুলায়মান ওয়াকিব নামক স্থানে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাজা ইব্ন হায়াতের কাছে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ চান। তিনি এজন্য প্রথমে আপন পুত্র দাউদের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু রাজা ইব্ন হায়াত বলেন, তিনি তো কনসটান্টিনোপল অবরোধে নিয়োজিত রয়েছেন এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করছেন। দীর্ঘদিন যাবত সেখানকার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ্ই জানেন, তিনি জীবিত আছেন, না শাহাদাতবরণ করেছেন। তাছাড়া তিনি আপনার থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে অলীআহ্দ মনোনীত করার পরামর্শ দিতে পারি না। এরপর সুলায়মান বলেন, তাহলে আমি আমার কনিষ্ঠপুত্রকে অলীআহ্দ মনোনীত করি? রাজা ইব্ন হায়াত উত্তরে বলেন, তার বয়স এতই অল্প যে, সে খিলাফতের দায়িত্ব বহন করতে পারবে না। তখন সুলায়মান বলেন, তুমিই বল, আমি কাকে আমার স্থলাভিষিক্ত

নিয়োগ করব? রাজা ইব্‌ন হায়াত বলেন, মুসলমানদের মঙ্গল সাধন এবং আপনার পবিত্রচিত্ততা ও ধর্মপরায়ণতার দাবি তো এই হওয়া উচিত যে, আপনি আপনার চাচাত ভাই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে নিজের অলীআহ্‌দ মনোনীত করবেন। কেননা তাঁর চাইতে ভাল লোক কোথাও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া তিনি আপনার প্রধানমন্ত্রী থাকার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন। সুলায়মান বলেন, আমিও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আমার ভাইরা অর্থাৎ আবদুল মালিকের সন্তানরা তাতে রাযী হবে না এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। রাজা ইব্‌ন হায়াত বলেন, আপনি তাঁকে খলীফা মনোনীত করে সেই সাথে এই ওসীয়তও করে যান যে, তাঁর (উমরের) পরে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হবে। সুলায়মান এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের জন্য অলীআহ্‌দীর ফরমান লিখে তার উপর মোহর লাগিয়ে দেন। তিনি ঐ দলীল একটি লেফাফায় ভরে সীলমোহর করে তার মুখও বন্ধ করে দেন। এরপর রাজা ইব্‌ন হায়াতের হাতে তা তুলে দিয়ে বলেন, তুমি বাইরে গিয়ে জনসাধারণকে এই লেফাফা দেখিয়ে বল, আমীরুল মু'মিনীন তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে একটি কাগজের মধ্যে তাঁর নাম লিখে তা এই লেফাফার মধ্যে বন্ধ করে রেখেছেন। অতএব এ ফরমানে যার নামই থাকবে তাঁর জন্য তোমরা বায়আত কর। রাজা বাইরে গিয়ে জনসাধারণকে একত্র করে এই নির্দেশ শুনালে তারা বলেন, আমরা তখনি বায়আত করব যখন আমাদের কাছে ঐ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হবে। রাজা ইব্‌ন হায়াত সুলায়মানের কাছে এ অবস্থার কথা বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন, কোতওয়াল ও পুলিশ বাহিনী ডেকে নির্দেশ দাও, তারা যেন আমার হুকুম অনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃত হলে, সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সুলায়মানের এই হুকুম শোনার সাথে সাথে একে একে সকলেই বায়আত করে।

রাজা ইব্‌ন হায়াত যখন বায়আত নিয়ে ফিরে আসছিলেন তখন রাস্তার মধ্যেই হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হিশাম বলেন, আমার ভয় হচ্ছে, আবদুল মালিক আমাকে অলীআহ্‌দী থেকে বঞ্চিত করেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমাকে বলে দিন, যাতে আমি এর একটা সুরাহা করতে পারি। রাজা উত্তরে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে সীল-মোহরকৃত লেফাফা দিয়েছেন এবং সকলের কাছেই একথা গোপন রেখেছেন। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কি উত্তর দিতে পারি ? কিছুদূর যাওয়ার পর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে রাজার সাক্ষাৎ হয়। উমর তখন বলেন, আমি শংকিত এই ভেবে যে, সম্ভবত সুলায়মান তাঁর অলীআহদ হিসাবে আমার নামই লিখে দিয়েছেন। যদি তা তোমার জানা থাকে তাহলে আমাকে বলে দাও। আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। রাজা উমরকে সেই উত্তরই দেন যা তিনি হিশাম উব্‌ন আবদুল মালিককে দিয়েছিলেন।

সুলায়মানের মৃত্যু

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক ৯৮ হিজরীতে (৭১৬-১৭ খ্রি.) দামিশ্‌ক থেকে জিহাদের সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন, কনসটান্টিনোপলের দিকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে স্বয়ং ওয়াবিক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং সেখান থেকেই ঐ অভিযান সার্থক করে তোলার সবরকম

প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, তিনি জিহাদরত অবস্থায়ই ইনতিকাল করেছেন। ৯৯ হিজরীর ১০ই সফর (৭১৭ খ্রি-এর সেপ্টেম্বর) রোজ শুক্রবার তিনি ওয়াবিকের সন্নিকটস্থ কিননাসরীন নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রায় তিন বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। এই খলীফার যুগেও মুসলমানরা অনেক দেশ জয় করে। শরীয়ত বিরোধী অনেক রীতি-নীতির উচ্ছেদ সাধন করা হয়। তিনি হাজ্জাজ কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদচ্যুত করেন। কেননা তাদের মধ্যে হাজ্জাজের ন্যায় জুলুম-প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের প্রতি তিনি যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল তাঁর জীবনের একটি মারাত্মক ভুল। সুলায়মানের জীবনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে, তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মত পুণ্যের মূর্ত প্রতীককে নিজের পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেছিলেন। এই একটি পুণ্যের মুকাবিলায় তাঁর সমস্ত ভ্রান্তি ও অপরাধই অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যেতে পারে এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)

আবূ হাফ্‌স উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশিদীনের পঞ্চম খলীফা। তিনি খলীফায়ে সালিহ্ (ন্যায়পরায়ণ শাসক) নামেও বিখ্যাত। অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, খুলাফায়ে রাশিদীন হচ্ছেন পাঁচজন। যথা ঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা) ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)। উমরের পিতা আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। উমর ৬২ হিজরীতে (৬৮১-৮২ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হযরত ফারূকে আযমের পৌত্রী তথা আসিম ইব্‌ন উমর ফারূকের কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা আবদুল আযীয আবদুল মালিকের পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু আবদুল মালিকের জীবিতাবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করায় খলীফা হতে পারেন নি। ছোটবেলায় তাঁকে ঘোড়ায় লাথি মেরেছিল এবং সেই আঘাতের দাগ তাঁর দেহে বিদ্যমান ছিল। ফারূকে আযম (রা) প্রায়ই বলতেন, আমার বংশধরদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে, যার চেহারায় একটি দাগ থাকবে এবং সে বিশ্বকে ন্যায় বিচারে ভরে দেবে। এ কারণেই ঘোড়া যখন তাঁকে লাথি মারে তখন তাঁর পিতা তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, যদি তুমি ঐ দাগযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাক তাহলে তো খুব সৌভাগ্যের কথা।

ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রায়ই বলতেন, হায়! আমি যদি আমার সেই দাগযুক্ত পুত্রের (বংশধরের) যুগ পেতাম, যে বিশ্বকে ঠিক ঐ সময়ে ন্যায় বিচারে ভরে দেবে যখন তা থাকবে জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ। বিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের চেহারায়ও একটি দাগ ছিল। তাই ধারণা করা হতো যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইনি সেই ব্যক্তি। কিন্তু হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হওয়ার পর সবাই বুঝতে পারলেন যে, ইনিই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি। ইতিপূর্বে লোকেরা সাধারণত বলাবলি করত যে, দুনিয়া শেষ হবে না যতক্ষণ উমরের মত কোন রাষ্ট্রনায়কের জন্ম না হয়।

বাল্যকালে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পিতা তাঁকে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তথায়ই তিনি প্রতিপালিত হন। ফুকাহায়ে মদীনার সংস্পর্শে তাঁর জীবনের প্রথমভাগ কাটে। উলামায়ে মদীনার কাছে তিনি দীনী ইল্‌ম শিক্ষা করেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তিনি যদি খলীফা না হতেন তাহলে অবশ্যই শরীয়তের ইমামদের মধ্যে গণ্য হতেন এবং তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম হিসাবে মান্য করা হতো। মদীনায় তাঁর পিতা তাঁকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি উবায়দুল্লাহ্‌র কাছেই প্রশিক্ষিত ও প্রতিপালিত হন। যায়দ ইব্‌ন আসলাম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির পিছনে এ ধরনের নামায পড়িনি, যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্‌র নামাযের অনেক মিল ছিল। যায়দ বলেন, তিনি রুকূ ও সিজদা পুরোপুরি আদায় করতেন, কিন্তু কিয়াম ও কূউ'দে (দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়) দেরি করতেন না। জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, তিনি হচ্ছেন বনূ উমাইয়ার 'নাজীর' (অভিজাত ব্যক্তি) এবং কিয়ামতের দিন তিনি একক উম্মত হিসাবে উত্থিত হবেন।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর তিনি পানাহারে ও পরিধানে একেবারে দরবেশী রূপ ধারণ করেন। মায়মূন ইব্‌ন মিহরান বলেন, অনেক বিখ্যাত উলামা শাগরিদের ন্যায় তাঁর সংসর্গে থাকতেন। মুজাহিদ বলেন, আমি উমর উব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে এই ধারণা নিয়ে এসেছিলাম যে, তিনি আমার কাছ থেকে কিছু শিখবেন। কিন্তু তাঁর কাছে এসে স্বয়ং আমাকেই অনেক কিছু শিখতে হলো।

তাঁর পিতা আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের মৃত্যুর সময় তিনি মদীনায়ই ছিলেন। আবদুল আযীযের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান উমরকে দামিশকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সাথে আপন কন্যা ফাতিমার বিবাহ দেন। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালীদ খলীফা হয়ে উমরকে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ৮৬ হিজরী থেকে ৯৩ হিজরী সন (৭০৩ থেকে ৭১২ খ্রি) পর্যন্ত মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি 'আমীরে হজ্জ' হিসাবে বেশ কয়েকবার হজ্জ আদায় করেন। মদীনায় গভর্নর থাকাকালে সমগ্র ফুকাহা ও উলামা সব সময় তাঁর দরবারেই অবস্থান করতেন।

তিনি মদীনার ফকীহ্‌দের একটি কাউন্সিল গঠন করেছিলেন এবং সেই কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতেন। হাজ্জাজের অভিযোগের ভিত্তিতে ৯৩ হিজরীতে (৭১১-১২ খ্রি) ওয়ালীদ তাঁকে পদচ্যুত করে মদীনা থেকে সিরিয়ায় ডেকে পাঠান। যখন ওয়ালীদ এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, তিনি আপন ভাই সুলায়মানকে 'অলীআহ্‌দী' থেকে বঞ্চিত করে আপন পুত্রকে অলীআহ্‌দী নিযুক্ত করবেন তখন হাজ্জাজ, কুতায়বা প্রমুখ ওয়ালীদকে সমর্থন করেন; কিন্তু অন্যান্য সভাসদ সমর্থন করেন নি। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে এবং সজোরে ওয়ালীদের ঐ মতের বিরোধিতা করেন তিনি হচ্ছেন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। তাই ওয়ালীদ তাঁকে বন্দী করেন এবং তিন বছর তাঁকে বন্দী অবস্থায়ই

কাটাতে হয়। এরপর কারো সুপারিশে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ কারণেই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী ছিলেন। সুলায়মান খলীফা হওয়ার পর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁকেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন।

খিলাফতের আসনে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)

যখন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইনতিকাল করেন তখন (তাঁর প্রধানমন্ত্রী) রাজা ইব্‌ন হায়াত সমগ্র বনূ উমাইয়া এবং সকল অধিনায়ককে ওয়াবিকের মসজিদে একত্র করেন। সীলমোহরকৃত সুলায়মানের ঐ ফরমান তাঁর কাছে ছিল। তিনি সকলকে খলীফার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে পুনরায় সীলমোহরকৃত ঐ ফরমানের অনুকূলে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সীলমোহর খুলে ফরমানটি সবাইকে পাঠ করে শুনান। তাতে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক লিখেছিলেন ঃ

"এটি আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের নামে লিখিত।

আমি তোমাকে এবং তোমার পরই ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে অলীআহ্‌দ নিযুক্ত করলাম। অতএব জনসাধারণের উচিত, আমার এই ফরমান শোনা, তা মান্য করা, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং মতবিরোধ না করা, যাতে অন্যরা তোমাদের পরাজিত করার ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে না ওঠে।"

এই ফরমান শুনে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক বলেন, আমরা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের হাতে বায়আত করব না। কিন্তু রাজা ইব্‌ন হায়াত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জবাব দেন, 'আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।' একথা শুনে হিশাম চুপ হয়ে যান। আবদুল মালিকের সন্তানরা এই ওসীয়তকে তাদের অধিকার হরণের একটি কারণ বলে মনে করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খলীফা হওয়াকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তিনি ছাড়া অন্য কেউ খলীফা হোক তা তারা চাইত না। অপরদিকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পর যেহেতু ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে 'অলীআহদ' নিয়োগ করা হয়েছিল তাই আবদুল মালিকের বংশধররা কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিল এই ভেবে যে, খিলাফত তো পুনরায় আমাদের হাতেই ফিরে আসবে। যখন রাজা ইব্‌ন হায়াত সুলায়মানের ওসীয়তনামা পড়ে শুনান তখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খিলাফতের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং অসাড় হয়ে আপন জায়গায় বসে থাকেন। রাজা ইব্‌ন হায়াত তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে মিম্বরের উপর বসিয়ে দেন। সকলেই প্রথমে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিককে ডেকে বায়আত করতে বলেন। হিশাম আসেন এবং বায়আত করেন। তাঁর বায়আতের পর সব লোকই সন্তুষ্টচিত্তে বায়আত করে। বায়আতের পর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের জানাযার সালাত পড়ান। লাশ দাফন করে যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁর সামনে শাহী আস্তাবলের একটি ঘোড়া এনে দাঁড় করায় এবং বলে, আপনি এর উপর আরোহণ

করে তাঁবুতে ফিরে যান। তখন তিনি বলেন, আমাকে বহন করার জন্য আমার নিজস্ব খচ্চরই যথেষ্ট। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব খচ্চরে আরোহণ করেই আপন তাঁবুতে ফিরে যান। লোকেরা তাঁকে খিলাফতের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেন, সেখানে আইয়ূব ইব্‌ন সুলায়মানের পরিবার-পরিজন রয়েছে। যতক্ষণ তারা ওখানে থাকবে ততক্ষণ আমি আমার তাঁবুতেই অবস্থান করব।

খিলাফতের বায়আত নেওয়ার পর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"(আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তি বর্ণনার পর) লোকেরা! পবিত্র কুরআনের পর আর কোন গ্রন্থ নেই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আর কোন নবী নেই। আমি কোন জিনিসের সূচনাকারী নই, বরং সমাপ্তকারী। আমি মুবতাদি' (বিদআতী) নই, বরং মুত্তাবি' (অনুসরণকারী)। আমি কোন অবস্থায়ই তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্ট নই। অবশ্য আমার কাঁধের বোঝা তোমাদের চাইতে অনেক ভারী। যে ব্যক্তি জালিম বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে সে জালিম হতে পারে না। স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে কোন সৃষ্টির (মানুষের) আনুগত্য বৈধ নয়।"

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাফন-দাফন সেরে ফিরে এলে তাঁর ক্রীতদাস বলল, আপনাকে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তিনি উত্তর দেন, আজ যদি এই বিশ্বে কোন ব্যক্তি বিষাদগ্রস্ত থাকে তো সে আমিই। আমার উপর এ বোঝা কি কম যে, আমি চাচ্ছি, আমার আমলনামা লিপিবদ্ধ হওয়া এবং আমার কাছ থেকে তার জবাব তলব করার পূর্বেই যেন আমি হকদারের হক তার কাছে পৌঁছিয়ে দেই। খিলাফতের বায়আত গ্রহণ এবং সুলায়মানের কাফন-দাফন শেষ করে তিনি ঘরে প্রবেশকালে তাঁর দাড়ি ছিল অশ্রুসিক্ত। এই অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি ভালো তো ? তিনি উত্তর দেন, ভালো কোথায়? আমার ঘাড়ে উম্মতে মুহাম্মদীর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে বস্ত্রহীন, অন্নহীন রোগী, মজলুম, মুসাফির, কয়েদী, শিশু, বৃদ্ধ, অসচ্ছল, আত্মীয়-স্বজন—সকলেরই বোঝা আমাকে বহন করতে হবে। আমি এই ভয়েই কাঁদছি। এমন যেন না হয় যে, আমাকে কিয়ামতের দিন এই বোঝা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, অথচ আমি তার জবাব দিতে অপারগ হয়ে পড়ব।

খলীফা হওয়ার পর তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিককে বলেন, তুমি তোমার যাবতীয় অলংকার বায়তুলমালে দান কর, অন্যথায় আমি তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাব। কেননা এটা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয় যে, তুমি ও তোমার অলংকারাদি এবং আমি একই ঘরে অবস্থান করি। একথা শুনে তাঁর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তার যাবতীয় অলংকার মুসলমানদের কল্যাণার্থে বায়তুল মালে দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ সমস্ত অলংকারের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান মোতিও ছিল, যা আবদুল মালিক তাঁর মেয়েকে দান করেছিলেন।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হন তখন তিনি ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিককে বলেন, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার অলংকারাদি বায়তুলমাল থেকে ফেরত নিতে পারেন। ফাতিমা উত্তরে বলেন, যে জিনিস আমি

সন্তুষ্টচিত্তে বায়তুলমালে দান করেছি তা এখন উমর আবদুল আযীযের পর আর ফেরত নিতে পারি না।

আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদ সুলায়মানের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বায়আতের কথাও জানতেন না। সুলায়মানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি খিলাফতের দাবি উত্থাপন করেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তিনি দামিশকের নিকটবর্তী হন এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বায়আতের কথা শুনেন তখন নির্দ্বিধায় তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর হাতে বায়আত করেন এবং বলেন, আপনার হাতে বায়আত করা হয়েছে, একথা আমি জানতাম না। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) উত্তরে বলেন, যদি তুমি খিলাফতের জন্য উদ্যোগী হতে তাহলে আমি কখনো তোমার মুকাবিলা করতাম না, বরং লড়াই-ঝগড়া পরিহার করে নিজের ঘরে বসে থাকতাম। আবদুল আযীয ইব্‌ন ওয়ালীদ তখন বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে খিলাফতের যোগ্য মনে করি না।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে একটি নির্দেশ জারি করেন যে, এখন থেকে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে কেউ যেন কোনরূপ অপ্রীতিকর ও শিষ্টাচার বিরোধী শব্দ ব্যবহার না করে। তখন পর্যন্ত বনূ উমাইয়াদের মধ্যে সাধারণভাবে এই রেওয়াজ চলে আসছিল যে, তারা হযরত আলী (রা)-কে মন্দ বলতে এবং জুমুআর খুতবায়ও তাঁকে গালিগালাজ করতে দ্বিধা করত না।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীকে অত্যাচারী শাসক বলেই মনে করতেন। তাই সুলায়মানের যুগে যে সব আলিম ও সভাসদ হাজ্জাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, তিনি তাদের পদচ্যুত করেন। খুরাসানের গভর্নর ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে তিনি মন্দ লোক বলেই জানতেন। একথা তাঁর জানা ছিল যে, ইয়াযীদ জুরজান এলাকার জিয্‌য়া আদায় করে তা বায়তুলমালে জমা দেননি। তাই তিনি তাকে তলব করেন। ইয়াযীদ দরবারে হাযির হয়ে উল্লিখিত অর্থ দাখিল না করার পিছনে অনেক ওযর ও যুক্তি পেশ করেন। তিনি এ ব্যাপারে চাতুর্যের আশ্রয় নেন। কিন্তু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেন, এটা হচ্ছে সমগ্র মুসলমানের সম্পত্তি। আমি কি করে এটা মাফ করতে পারি ? এরপর তিনি ইয়াযীদকে পদচ্যুত করে হালাব (আলেপ্পো) দুর্গে বন্দী করে রাখেন এবং তার স্থলে জাররাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাকামীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক এবং তাঁর সেনাবাহিনীর লোকদেরকে যারা দীর্ঘদিন থেকে রোমানদের মুকাবিলায় এবং কনসটান্টিনোপল অবরোধে নিয়োজিত থাকার কারণে একেবারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর খুরাসানের গভর্নর জার্‌রাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাকামীর বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ আসে যে, তিনি মাওয়ালীদেরকে কোনরূপ ভাতা এবং রসদসামগ্রী না দিয়েই জিহাদে পাঠান। আর যিম্মীদের মধ্য থেকে যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকেও খারাজ আদায় করেন। এই অভিযোগ শ্রবণ করে তিনি জার্‌রাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র কাছে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রেরণ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি নামায পড়ে তার জিয্‌য়া মাফ করে দাও।'

এটা শোনার সাথে সাথে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। জার্‌রাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এই সমস্ত নওমুসলিমের ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলেন না। তিনি খতনার মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেন। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি জার্‌রাহ্‌কে লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা দাঈ (আহবানকারী) রূপে প্রেরণ করেছিলেন। খাতিন (খতনাকরী) রূপে নয়। এরপর তিনি তাকে নিজের কাছে তলব করেন। জার্‌রাহ্ আবদুর রহমান ইব্‌ন নাঈমকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে স্বয়ং খলীফার দরবারে এসে হাযির হন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কখন খুরাসান থেকে রওয়ানা হয়েছিলে ? তিনি নিবেদন করেন, পবিত্র রমযান মাসে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে জালিম বলে সে সত্য কথাই বলে। তুমি কেন পবিত্র রমযান অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমার কর্মস্থলে অবস্থান করলে না ?

এরপর তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন নাঈমকে জিহাদ ও নামাযের ইমাম এবং আবদুর রহমান কুশায়রীকে রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

শত্রুরা আযারবায়জান আক্রমণ করে মুসলমানদের উপর লুটপাট চালিয়েছিল। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ইব্‌ন হাতিম বাহিলীকে অধিনায়ক নিয়োগ করে সেদিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে শত্রুদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেন এবং ইসলামের ভাবমর্যাদা পুনরুজ্জীবিত করেন। হযর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয়ের শাসনামলেই সিন্ধুর জনসাধারণ ও সেখানকার রাজারা সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। স্পেনের দিক থেকে প্রয়োজন অনুভূত হলে তিনি সেদিকেও সাজসরঞ্জামসহ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁর আমলে রোমানদের বিরুদ্ধেও উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জিত হয়।

বনূ উমাইয়ার অসন্তুষ্টির কারণ

বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাদের খিলাফত আমলে ভালো ভালো জায়গীরসমূহ জবরদস্তি-মূলকভাবে দখল করে নিয়েছিল। এতে অন্যান্য মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট হয়। কিন্তু যেহেতু বনূ উমাইয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাই ভয়ে কেউ তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করত না। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম নিজের স্ত্রীর অলংকারাদি, যেগুলোর মধ্যে অন্যায়ভাবে অর্জিত মালের সংমিশ্রণ রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন, নিজের ঘর থেকে বের করে বায়তুলমালে জমা করিয়ে নেন। এরপর তিনি বনূ উমাইয়াকে একত্র করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধিকারে ফাদাক উদ্যান ছিল, যার আয় থেকে তিনি বনূ হাশিমের শিশুদের দেখাশুনা করতেন এবং তাদের বিধবাদের বিবাহ দিতেন। হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঐ উদ্যানটি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর যুগে ঐ বাগানটি সেই অবস্থায়ই ছিল। শেষ পর্যন্ত মারওয়ান তা দখল করে নেন। মারওয়ান থেকে হস্তান্তরিত হতে হতে এটা আমার উত্তরাধিকারিত্বে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু একথা আমার বুদ্ধিতে আসে না যে, যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন কন্যাকে দিতেও অস্বীকার করেছিলেন, তা আমার জন্য কিভাবে বৈধ হয়ে গেল ? অতএব আমি তোমাদের

সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ফাদাক উদ্যান সেই অবস্থায়ই ছেড়ে দেব, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে ছিল। এরপর তিনি তাঁর সমগ্র আত্মীয়-স্বজন ও বনূ উমাইয়ার লোকদের যাবতীয় আসবাব সামগ্রী যা অবৈধভাবে তারা দখল করে রেখেছিল, বায়তুলমালে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আওযাঈ (র) বলেন, একদা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ঘরে বনূ উমাইয়ার অধিকাংশ গণ্যমান্য লোক উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি এই যে, আমি তোমাদেরকে কোন বাহিনীর অধিনায়ক এবং কোন এলাকার মালিক ও হাকিম বানিয়ে দেব ? স্মরণ রেখ, আমি এটাও মানতে রাযী নই যে, আমার ঘরের মেঝে তোমাদের পদধূলিতে অপবিত্র হোক। তোমাদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি তোমাদেরকে আপন ধর্ম এবং মুসলমানদের সহায়-সম্পদের মালিক কোনভাবেই করতে পারি না। তারা নিবেদন করলেন, আত্মীয়তা সূত্রেও কি আমরা আপনার কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারি না ?

উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) উত্তরে বলেন, আমার মতে এক্ষেত্রে তোমাদের এবং একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে তিল পরিমাণ পার্থক্য নেই। খুলাফায়ে রাশিদার পর খুলাফায়ে বনূ ইমাইয়ার অন্তর থেকে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সেই স্বেচ্ছাচারিতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যা এক সময়ে কায়সার ও কিস্‌রার সাম্রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ইসলামী সাম্য নীতি ও গণতন্ত্র পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সিদ্দীকে আকবর (রা) ও ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পুনরায় মানুষের চোখে ভাসতে থাকে। যেহেতু তাঁর খিলাফতকালে বনূ উমাইয়ার লোকেরা (তাদের ধারণা অনুযায়ী) বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, অনেক সম্পত্তি, যা জোরপূর্বক তারা দখল করে নিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ স্থান যা গোত্রগত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে তারা লাভ করেছিল, ইসলামী সাম্য নীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার কারণে ক্রমশ তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল, তাই তারা তাঁর খিলাফতকে নিজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতে থাকে। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বিশুদ্ধ মন-মানসিকতার কথা অন্যান্যের মত বনূ উমাইয়ারাও স্বীকার করত, তবে তারা তাঁর অস্তিত্বকে তাদের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ উদ্ধারের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখতে পেত।

একদা বনূ উমাইয়ার লোকেরা নিজেদের (অবৈধভাবে অর্জিত) সম্পত্তি রক্ষার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে যে, তারা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ফুফু ফাতিমা বিন্ত মারওয়ানের কাছে গিয়ে এই মর্মে আবেদন জানায়, আপনি অনুগ্রহপূর্বক উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে আমাদের সম্পত্তির ব্যাপারে সুপারিশ করুন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁর ঐ ফুফুকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। যা হোক, ফাতিমা আবদুল আযীযের কাছে সুপারিশ করলে তিনি তার সামনে ন্যায় ও সত্য অনুসরণের বিষয়টি এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাতিমা একথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তোমার ভাইদের (সম্প্রদায়ের লোকদের) অত্যধিক চাপ সৃষ্টির কারণে তোমাকে বুঝাতে এসেছি। কিন্তু তোমার ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্র চিন্ততার প্রেক্ষিতে আমি সে ব্যাপারে আর কিছুই বলতে চাই না। এই

বলে তিনি তাঁর কাছ থেকে উঠে যান এবং বনূ ইমাইয়াকে গিয়ে বলেন, তোমরা ফারূকে আযমের পৌত্রীর সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলে বলে তাঁর সন্তানের মধ্যে আজ ফারূকী রং বিকশিত হচ্ছে।

চরিত্র ও গুণাবলী

আবূ নাঈম (নুআয়ম) বিশুদ্ধ সনদের বর্ণনা করেছেন, একদা রিবাহ ইব্‌ন উবায়দা দেখেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছেন এবং এক বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরে তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছে। তিনি সালাত শেষে আপন ঘরে ফিরে এলে রিবাহ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ব্যক্তি কে যে আপনার হাত ধরে যাচ্ছিল? তিনি একথা শুনে অবাক কণ্ঠে বলেন, আরে তুমিও দেখে ফেলেছ ? তাহলে তুমিও তো একজন উৎকৃষ্ট লোক। অতএব তোমাকে বলতে বাধা নেই যে, ঐ বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন খিযির (খিজর) (আ)। তিনি আমার কাছে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অবস্থা জিজ্ঞেস করতে এবং আদ্‌ল ও ন্যায়বিচার শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

একদা জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, আমি রাতে স্বপ্ন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে আছেন। আর তাঁর ডানদিকে সিদ্দীকে আকবর, বাম দিকে ফারূকে আযম এবং সম্মুখে আপনি বসে আছেন। ইতোমধ্যে দু'জন লোক একটি বিবাদ নিয়ে হাযির হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তুমি তোমার খিলাফত আমলে এ দু'জনের (আবূ বকর ও উমর) পদাংক অনুসরণ করে চলবে। একথা শুনে হযরত উমর ফারূক (রা) নিবেদন করলেন, আমি দেখি যে, সে এরূপই করে। এই স্বপ্ন বর্ণনা করে বর্ণনাকারী এর সত্যতার সম্পর্কে শপথ করলে তিনি কাঁদতে থাকেন।

হাকাম ইব্‌ন উমর বলেন, আমি একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সরকারী আস্তাবলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে তাঁর কাছে আস্তাবলের খরচ চাইলেন। তিনি বললেন, তুমি আস্তাবলের সবগুলো ঘোড়া সিরিয়ার শহরসমূহে নিয়ে গিয়ে যে দাম পাও তাতেই বিক্রি করে দাও এবং ঐ অর্থ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দাও। আমার জন্য আমার খরচটাই যথেষ্ট।

ইমাম যুহ্‌রী (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয পত্র মারফত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, যাকাতের ব্যাপারে ফারূকে আযম কি নীতি অবলম্বন করতেন? এর উত্তরের শেষাংশে তিনি লিখেন, আপনি যদি মানুষের সাথে সেরূপ আচরণ করেন যেরূপ আচরণ হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর খিলাফত আমলে করতেন তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর চাইতেও অধিক মর্যাদার অধিকারী হবেন। যখন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খলীফা নির্বাচিত হন এবং লোকেরা তাঁর হাতে বায়আত করে তখন তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলতে থাকেন, আমি আমার সম্পর্কে অত্যন্ত শংকিত। হযরত হাম্মাদ (র) জিজ্ঞেস করেন, আপনার কাছে দিরহাম-দীনার কি পরিমাণ প্রিয় ? হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয উত্তর দেন মোটেই (প্রিয়) নয়। হাম্মাদ বলেন, তাহলে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? আল্লাহ্ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।

খলীফা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস (র) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে বলেন, আপনার পূর্বে যত খলীফা হয়েছেন তাঁরা সকলেই আমাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করেছেন। কিন্তু আপনি খলীফা হওয়ার পর তার ব্যতিক্রম করেছেন। আমার কাছে কিছু জায়গীরও আছে। যদি আপনি হুকুম দেন তাহলে তা থেকে সেই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারি, যা আমার পরিবার-পরিজনের জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তরে বলেন, যা কিছু তুমি পরিশ্রম করে অর্জন কর তাই তোমার সম্পত্তি। এরপর বলেন, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। কেননা তুমি কষ্টের মধ্যে থাকলে আরাম পাবে, আর আরামের মধ্যে থাকলে তাতে কোনরূপ কমতি দেখা দেবে না।

কোন কোন অঞ্চলের কর্মকর্তা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে লিখেন, আমাদের শহর, দুর্গ ও রাস্তাসমূহ মেরামত করা প্রয়োজন। যদি আমীরুল মু'মিনীন কিছু অর্থ মঞ্জুর করেন তাহলে আমরা মেরামতের ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি উত্তরে লিখেন, এই পত্র পাঠ মাত্র তোমরা নিজ নিজ শহরে ন্যায়বিচারের দুর্গ নির্মাণ কর এবং রাস্তাসমূহ থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর কর। এটাই হচ্ছে আসল মেরামত।

ইবরাহীম সুকূনী বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলতেন, যখন থেকে আমি জানতে পেরেছি, মিথ্যা বলা দূষণীয় তখন থেকে আমি কখনো মিথ্যা বলি নি। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ বলেছেন, এই উম্মতে কেউ মাহ্‌দী হয়ে থাকলে তিনি হচ্ছেন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ফাদালা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এক রাহিবের (ইহুদী আলিম) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ রাহিব একটি দ্বীপে বাস করতেন। তিনি আবদুল্লাহ্‌কে দেখামাত্র তার কাছে চলে এলেন। অথচ তিনি কখনো কারো কাছে আসতেন না। যা হোক তিনি আবদুল্লাহ্‌র কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান কি কারণে আমি তোমার কাছে এসেছি ? আবদুল্লাহ্ বলেন, না, আমি জানি না। রাহিব বলেন, শুধু এইজন্য যে, তুমি হচ্ছ একজন ইমামে আদিল (ন্যায়পরায়ণ শাসক)-এর সন্তান।

মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খলীফা হলে রাখালেরা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকে, কে এই ব্যক্তি, যিনি খলীফা হওয়ার পর বাঘেরা আমাদের বকরীর কোন ক্ষতি করছে না ? মূসা ইব্‌ন আইউন বলেন, আমরা তখন কিরমানে বকরী চরাতাম। বাঘেরা আমাদের বকরী পালের সাথে চলাফেরা করত, অথচ বকরীর কোন ক্ষতি করত না। একদা একটি বাঘ একটি বকরী ধরে নিয়ে গেল। আমি ঐ দিন বলে দিলাম, আজ নিশ্চয়ই কোন পুণ্যবান খলীফা ইনতিকাল করেছেন। এরপর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ঐ দিনই হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ইনতিকাল করেছেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন, খুরাসানের জনৈক অধিবাসী স্বপ্নে দেখল, কেউ একজন তাকে বলছে, যখন মুখে দাগযুক্ত বনূ উমাইয়ার কোন ব্যক্তি খলীফা হবে তখন তুমি অনতিবিলম্বে তাঁর হাতে গিয়ে বায়আত করবে। তখন থেকে ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক খলীফার চেহারার গঠন সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞেস করতে থাকে। যখন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খলীফা হন তখন ঐ ব্যক্তি একাধারে তিন রাত স্বপ্ন দেখল, ঐ লোকটি তাকে

বলছে, যাও এখন গিয়ে বায়আত কর। অতএব সে খুরাসান থেকে দামিশকে এসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের হাতে বায়আত হয়।

হাবীর ইব্‌ন হিন্দ আসলামী বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, খলীফা হচ্ছে তিন জন ঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)। আমি বলি, প্রথম দু'জনকে তো চিনি। কিন্তু এই তৃতীয় জন কে ? তিনি উত্তরে বলেন, যদি তুমি জীবিত থাক তাহলে জানতে পারবে। আর যদি মারা যাও তাহলে তিনি তোমাদের পরবর্তী সময়ে আসবেন। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফত প্রাপ্তির পূর্বেই ইব্‌নুল মুসাইয়িব ইনতিকাল করেন।

মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন, যদি কোন ব্যক্তি যাহিদ (সাধক) হতে পারেন তাহলে তিনি হচ্ছেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। দুনিয়া তাঁর কাছে আসল, কিন্তু তিনি তা ত্যাগ করলেন। ইউনুস ইব্‌ন আলী শাবীব বলেন, আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তাঁর খিলাফত লাভের পূর্বে দেখেছি। তখন তিনি এত হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন যে, পাজামার ফিতা তার পেটের মধ্যে ঢুকে যেত। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর তিনি এতই শীর্ণ হয়ে পড়েন যে, একটি একটি করে তাঁর দেহের সবগুলো হাড় গণনা করা যেত। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পুত্র বলেন, আমাকে আবূ জা'ফর মানসুর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর কি পরিমাণ সম্পদ ছিল ? তিনি উত্তর দেন, সর্বমোট চারশ দীনার। যদি তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তাহলে আয়ের পরিমাণ আরো হ্রাস পেত।

মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক বলেন, আমি রোগাক্রান্ত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে দেখতে যাই। দেখি যে, তিনি একটি ময়লা জামা পরে আছেন। আমি আমার বোন অর্থাৎ উমরের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তাঁর জামাটি ধুয়ে দাও না কেন? তিনি বলেন, তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোন জামা নেই যে, গায়েরটি খুলে সেটি পরবেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ক্রীতদাস আবূ উমাইয়া বলেন, আমি একদিন আমার মনিবের খেদমতে নিবেদন করলাম, হুযূর! মসুর ডাল খেতে খেতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, এটা তো তোমার মনিবেরও নিত্য দিনের খাবার।

একদা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, আমার আংগুর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। যদি তোমার কাছে কিছু অর্থ থাকে তো দাও। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমার কাছে তো একটি কানাকড়িও নেই। আর আপনি নিজে আমীরুল মু'মিনীন হওয়া সত্ত্বেও আপনার কাছেও আংগুর কিনে খাবার মত অর্থ নেই। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমাকে শিকলে বেঁধে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার তুলনায় আংগুরের কামনা অন্তরে নিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

তাঁর স্ত্রী বলেন, খিলাফতের দিনগুলোতে তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, বাইরে থেকে এসে তিনি সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকতেন এবং এই অবস্থায়ই ঘুমিয়ে যেতেন। যখন চোখ খুলতেন তখন পুনরায় কাঁদতে থাকতেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন আবূ সাইব বলেন, আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের চাইতে অধিক আল্লাহ্-ভীতি আর কারো মধ্যে দেখিনি।

সাঈদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) মসজিদে নামায পড়তে এলেন। তখন দেখা গেল, তাঁর জামার সামনে ও পিছনে তালি লাগানো রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে সব কিছু দান করেছেন। অতএব আপনি নতুন জামা-কাপড় তৈরি করছেন না কেন? তিনি অল্পক্ষণ মাথা নিচু করে কিছু একটা যেন ভাবলেন। এরপর বললেন, প্রাচুর্যের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে মার্জনা করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।

একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি যদি পঞ্চাশ বছরও তোমাদের মধ্যে থাকি তবু আদল ও ন্যায় বিচারের মর্যাদাকে পূর্ণতায় পৌছাতে পারব না। আমি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং তোমাদের অন্তর থেকে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা বের করে দিতে চাই। কিন্তু দেখতে পাই যে, তোমাদের অন্তর তা বরদাশ্‌ত করতে সক্ষম নয়। ইবরাহীম ইব্‌ন মায়সারা তাউসকে বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হচ্ছেন মাহ্‌দী। তাউস বলেন, শুধু মাহ্‌দী নন, বরং পূর্ণ ন্যায়বিচারকও। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মৃত্যুকালে লোকেরা অনেক মালসম্পদ নিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হয়। তিনি তখন বলেন, এসব তোমরা নিয়ে যাও এবং নিজেদের কাজে লাগাও। এরপর তিনি নিজের মালসম্পদও ঐসব মাল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। জুওয়ায়রিয়া বলেন, আমরা একদা ফাতিমা বিন্‌ত আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের কাছে গেলাম। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের প্রশংসা করলেন এবং বললেন, যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে আমাদের কোন জিনিসেরই অভাব থাকত না।

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, তিনি কোন লোককে শাস্তি দিতে চাইলে সতর্কতামূলকভাবে তাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদ করে রাখতেন, যাতে রাগবশত কিংবা তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে তাকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া না হয়। তিনি বলতেন, যখনই আমি আমার নফ্‌স্‌কে (রিপুকে) তার চাহিদা অনুযায়ী কিছু দিয়েছি তখনই সে এর চাইতে উৎকৃষ্ট জিনিসটি আমার কাছে দাবি করেছে। উমর ইব্‌ন মুহাজির বলেন, তাঁর দৈনিক ভাতা দু'দিরহাম নির্দিষ্ট ছিল। তিনটি কাঠ খাড়া করে তার উপর মাটি বসিয়ে তাঁর চেরাগদান তৈরি করা হয়েছিল। একদা তিনি তাঁর ভৃত্যকে পানি গরম করে আনতে বললে সে শাহী রন্ধনশালা থেকে তা গরম করে নিয়ে আসে। তা জানতে পেরে তার বিনিময়ে এক দিরহাম মূল্যের কাঠ শাহী রন্ধনশালায় পাঠিয়ে দেন। যতক্ষণ লোকেরা তাঁর কাছে বসে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করত ততক্ষণ তিনি বায়তুল মালের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেন। আর যখন লোকেরা চলে যেত তখন সেই প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতেন। ইতিপূর্বে খলীফার নিরাপত্তার জন্য একশ জন চৌকিদার ও পুলিশ নিযুক্ত থাকত। তিনি খলীফা হয়ে তাদের বলেন, আমার নিরাপত্তার জন্য আমার ভাগ্যলিপিই যথেষ্ট। তোমাদের আমার কোন প্রয়োজন নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তোমাদের কেউ আমার সাথে থাকতে চায় তাহলে সে দশ দীনার করে বেতন পাবে। আর যদি কেউ থাকতে না চায় তাহলে সে যেন আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

উমর ইব্‌ন মুহাজির বলেন, একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ডালিম খাওয়ার খুব শখ হলো। তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁর কাছে একটি ডালিম পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বন্ধুর খুব প্রশংসা করলেন এবং আপন ভৃত্যকে বললেন, যে ব্যক্তি এটা আমার কাছে পাঠিয়েছে তার কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেবে এবং এই ডালিমটি তাকে ফেরত দিয়ে বলবে, তোমার হাদিয়া (উপঢৌকন) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। ভৃত্য বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা তো আপনার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাঠিয়েছেন। অতএব তা রাখতে তো আপত্তির কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তো হাদিয়া গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হাদিয়া ছিল, কিন্তু আমার জন্য ঘুষ। মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে অশিষ্ট কথা বলার অপরাধে তিনি এক ব্যক্তিকে চাবুক মারেন, এছাড়া আর কাউকে বেত্রাঘাত করেন নি।

তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের খরচের পরিমাণ কমিয়ে দিলে তারা এ সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ পেশ করে। তিনি উত্তরে বলেন, বর্তমানে আমার ধনসম্পদ এত প্রচুর নয় যে, পূর্বের ন্যায় তোমাদের খরচের কোটা বহাল রাখব। বাকি রইল বায়তুল মালের কথা। তাতে তোমাদেরও যে ধরনের অধিকার রয়েছে, সে ধরনের অধিকার রয়েছে একজন সাধারণ মুসলমানেরও। ইয়াহইয়া গাস্‌সানী বলেন, হযরত ইমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আমাকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করলে আমি লক্ষ্য করি যে, সেখানে অনেক বেশি চুরির ঘটনা ঘটে। আমি তাঁকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করি এবং তাঁর কাছে জানাতে চাই, এ ধরনের মোকদ্দমার ফায়সালা আমি সাক্ষ্যের উপর করব, না ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে ? তিনি নির্দেশ দেন, প্রত্যেক মোকদ্দমায়ই সাক্ষ্য গ্রহণ অপরিহার্য। যদি 'হক' (ন্যায় ও সত্য) তাদেরকে সংশোধন না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে কখনো সংশোধন করবেন না। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করি; যার ফলে মাওসিল সর্বাধিক নিরাপদ ভূখণ্ডে পরিণত হয়।

রাজা ইব্‌ন হায়াত বলেন, একদা আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে বসছিলাম, এমন সময় প্রদীপ নিভে গেল। সেখানেই তাঁর ভৃত্য শুয়েছিল। আমি চাইলাম তাকে জাগিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। এরপর আমি নিজেই উঠে গিয়ে প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি নিজেই উঠে গিয়ে তেলের পাত্র নিয়ে এলেন এবং তা থেকে প্রদীপে তেল ভরে তা জ্বালিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলেন। এরপর বললেন, আমি এখনো সেই পূর্বেকারই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালিয়ে আনার কারণে আমার মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি।

আতা বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) রাতের বেলা আলিমদের একত্র করতেন এবং মৃত্যু ও কিয়ামতের আলোচনা করে এত কাঁদতেন যে, মনে হতো তাঁর সামনে যেন কোন জানাযা রেখে দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গাবরাআ বলেন, একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর খুতবায় বলেন, লোক সকল! তোমরা তোমাদের গোপন বিষয়গুলো সংশোধন করে নাও, তোমাদের বাহ্যিক বিষয়গুলো আপনা-আপনি সংশোধিত হয়ে যাবে। পরকালের জন্য কাজ কর। দুনিয়ার প্রতি সেই পরিমাণ মনোযোগ দাও, যে পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। স্মরণ রেখ, তোমাদের বাপ-দাদাকে মৃত্যুই গ্রাস করেছে।

তিনি বলতেন, অতীতের মহান ব্যক্তিদের (সালাফে সালেহীন) অনুসরণ কর। কেননা তাঁরা তোমাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল মালিকের মৃত্যু হলে তিনি তার প্রশংসা করতে থাকেন। মাসলামা বলেন, আপনি তার প্রশংসা করছেন কেন ? তিনি উত্তর দেন, আমি দেখতে চাচ্ছি, আমার মরহুম পুত্র শুধু আমারই দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য না, অন্যরাও তার প্রশংসা করে। কেননা পিতার দৃষ্টিতে পুত্র সব সময়ই প্রশংসাযোগ্য থাকে। তাই পিতার প্রশংসা দ্বারা পুত্রের প্রশংসার পরিমাণ নির্ধারণ করা চলে না। উসামা ইব্‌ন যায়দ (র)-এর কন্যা তাঁর দরবারে এলে তিনি তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান এবং একজন অতি শিষ্টজনের মত তাঁর সামনে বসে পড়েন। এরপর তিনি যা চান তাঁকে তাই দান করেন।

একদা তাঁর নিকটাত্মীয়রা বলেন, চলো আমরা হাস্যরসের কথা বলে আমীরুল মু'মিনীনকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি। অতএব তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে গেল। তাদের একজন হাস্যরসের কিছু কথা বললে অপরজন তাতে সায় দিল। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তখন বললেন, তোমরা একটি অত্যন্ত ঘৃণিত কথার উপর সমবেত হয়েছ, যার পরিণাম হচ্ছে শত্রুতা। তোমরা কুরআন পাঠ কর, হাদীস পাঠ কর এবং হাদীসের মানে-মতলব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর, এটাই শ্রেয়।

ইয়াহ্‌ইয়া গাস্‌সানী বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে একজন খারিজী হত্যা থেকে নিবৃত্ত রাখেন এবং এই মর্মে রায় দেন যে, তাকে তখন পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে। তখন সুলায়মান ঐ খারিজীকে ডেকে বলেন, তুমি এবার কি বলতে চাও ? সে উত্তর দিল, হে ফাসিকের পুত্র ফাকিস! যা জিজ্ঞেস করতে চাস্ কর। সুলায়মান বলেন, আমি আবদুল আযীযের রায়ের কারণে নিরুপায়। এরপর তিনি উমরকে ডেকে বলেন, দেখ এই খারিজী কি বলে। খারিজী পুনরায় সেই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। সুলায়মান বলেন, এবার বল তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিতে হবে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে যেভাবে আপনাকে গালি দিয়েছে আপনিও সেভাবে তাকে গালি দিন। খলীফা সুলায়মান বলেন, এটা সমীচীন নয়। এরপর তিনি খারিজীকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়। উমর যখন খলীফার দরবার থেকে ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে পুলিশপ্রধানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। পুলিশপ্রধান বলেন, আপনি একটি অদ্ভুত রায় দিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনও খারিজীকে সেরূপ গালি দিন যেরূপ গালি সে তাঁকে দিয়েছে। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, না জানি আমীরুল মু'মিনীন আপনাকেই মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি পুলিশপ্রধানকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমীরুল মু'মিনীন আমার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতেন তাহলে তুমি কি আমার গর্দান উড়িয়ে দিতে ? খালিদ (পুলিশপ্রধান) উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমি তাই করতাম। তিনি খলীফা হওয়ার পর খালিদ যথারীতি নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাকে নির্দেশ দেন, তোমার এই তরবারি রেখে দাও এবং এখন থেকে নিজেকে পদচ্যুত মনে কর। এরপর তিনি ইব্‌ন মুহাজির আনসারীকে

ডেকে তাকে পুলিশপ্রধান নিয়োগ করেন এবং বলেন, আমি তাকে (ইব্‌ন মুহাজিরকে) প্রায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি এবং এমন গোপন জায়গায় নামায পড়তে দেখেছি, যেখানে কেউ তাকে দেখতে পেত না। উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) বলতেন, যে ব্যক্তি রাগ, ঝগড়াঝাটি এবং কামনা-বাসনা থেকে দূরে রইল সে মুক্তি পেয়ে গেল।

একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলে, যদি আপনি নিজের জন্য উটনী নির্দিষ্ট করে নিতেন এবং পানাহারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন তাহলে খুব ভাল হতো। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমি যদি কিয়ামত ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে ভয় করি তাহলে আমাকে তা থেকে নিরাপদ রেখ না। একদা তিনি বলেন, লোক সকল! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরো না। তোমার ভাগ্যে যে জীবিকা নির্ধারিত আছে তা যদি পাহাড় কিংবা মাটির নিচেও থাকে তবুও তা তোমার কাছে এসে পৌঁছবে। আযহার বলেন, আমি তাঁকে খুতবা দিতে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তাঁর জামা ছিল তালিযুক্ত।

একদা তিনি আমর ইব্‌ন কায়স সুকুনীকে সায়ফার দিকে প্রেরিতব্য সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে বিদায় দানকালে বলেন, সেখানকার পুণ্যবান লোকদের কথা শুনবে এবং খারাপ লোকদেরকে ক্ষমা করে দেবে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, যাতে মানুষ তোমার মর্যাদা ভুলে না বসে, বরং তোমার কথা শুনতে আগ্রহী হয়।

খুরাসানের গভর্নর জাররাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁকে লিখেন, খুরাসানবাসীরা বক্র প্রকৃতির লোক। তরবারি ছাড়া এদেরকে শায়েস্তা করা যাবে না। তিনি উত্তরে লিখেন, তুমি ভুল বলেছ যে, খুরাসানবাসীদের তরবারি ছাড়া সংশোধন করা যাবে না। অবশ্যই মনে রাখবে, ন্যায়বিচার এবং অধিকার প্রদান এমন বস্তু, যার দ্বারা মানুষ আপনা-আপনি সংশোধিত হয়ে যায়। অতএব তুমি তাদের মধ্যে এ দু'টি বস্তুর প্রসার ঘটাও।

সালিহ্ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, কখনো কখনো এমন ঘটত যে, আমি আমীরুল মু'মিনীনকে একটি কথা বলতাম এবং তিনি সেজন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট হতেন। একদা তাঁর সামনে উল্লেখ করা হলো যে, কোন একটি গ্রন্থে লিখিত আছে, বাদশাহ্‌র অসন্তুষ্টিকে ভয় কর। যখন তাঁর রাগ পড়ে যায় তখন তার সামনে যাও। তিনি একথা শুনে বললেন, হে সালিহ্! আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আমার ক্ষেত্রে এ আইন মেনে চলবে না।

আল্লামা যাহাবী (র) বলেন, মায়লান নামক জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফত আমলে তাকদীর অস্বীকার করে। তিনি তাকে ডেকে তাওবা করার নির্দেশ দেন। সে উত্তরে বলে, আমি যদি পথভ্রষ্ট হতাম তাহলে আপনার এই হিদায়াত যথার্থই ছিল। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্! যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তার হাত ও পা কেটে তাকে শূলে চড়িয়ে দাও। এই বলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। সে তার বিশ্বাসের উপরই কায়েম ছিল এবং তা নিয়মিত প্রচারও করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক তাকে তার এই আকীদার কারণে গ্রেফতার করেন এবং তার হাত-পা কেটে তাকে শূলে চড়িয়ে দেন।

একদা মারওয়ানের সন্তানরা উমর উব্‌ন আবদুল আযীযের দরজায় সমবেত হয় এবং তাঁর পুত্রকে বলে, তুমি তোমার পিতাকে গিয়ে বল, আপনার পূর্বে বনূ উমাইয়ার যত খলীফা হয়েছেন তারা সকলেই আমাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার এবং জায়গীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি খলীফা হয়ে আমাদেরকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন। তার পুত্র এ পয়গাম নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেন, তুমি ওদেরকে গিয়ে বল, আমার পিতা বলেন,

اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ –

"আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির"- (৬ ঃ ১৫)।

খারিজী সম্প্রদায়

এই পর্যন্তকার সার্বিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, খারিজীদের বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যকর তৎপরতা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। কোন যুগেই এর মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। হ্যাঁ, যখন কোন পরাক্রমশালী খলীফা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেন তখন খারিজীরা কিছু দিন ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষা করত এবং যখনই সুযোগ আসত তখনই রণক্ষেত্রে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। খারিজী এবং অন্যদের গোপন ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি জায়গায় বিকশিত ও সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। মোটকথা খারিজীরা কখনো প্রকাশ্যে, আবার কখনো গোপনে হলেও, বরাবরই আন্দোলনরত থাকে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) যখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর সৎকর্মপরায়ণতা ও পবিত্রচিত্ততার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন খারিজীরাও নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মত একজন পুণ্যবান খলীফার বিরুদ্ধে কোনরূপ বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ মোটেই সমীচীন হবে না। অতএব এই মহান ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন আমরা আমাদের বিপ্লবী কর্মসূচি মুলতবি রাখব। এ কারণেই তাঁর খিলাফত আমলে কোন খারিজী বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হয়নি।

তারা একবার শুধু খুরাসানে মাথা তুলেছিল। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সেখানকার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা কাউকে হত্যা না করে ততক্ষণ ওদের সাথে সংঘর্ষে যাবে না। তবে ওদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। এরপর তিনি খারিজীদের নেতার কাছে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের খাতিরে বিদ্রোহ করেছ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। তোমরা আমাদের কাছে চলে এসো এবং এ ব্যাপারে একটা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হোক। আমরা যদি সত্যের উপর থাকি তাহলে তোমরা আমাদের সহযোগিতা করবে। আর যদি তোমরা সত্যের উপর থাক তাহলে আমরা তোমাদের কথা মেনে নেব। এই চিঠি পড়ে খারিজীদের নেতা নিজের পক্ষ থেকে দু'জন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিতর্কের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। ঐ দুই ব্যক্তি এসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। খারিজীরা তাঁকে বলছিল, তোমাদের মহান ব্যক্তিরা অর্থাৎ খুলাফায়ে বনূ উমাইয়া কাফির ছিল। তাদের উপর

অভিশাপ বর্ষণ করা অত্যাবশ্যক। আর তিনি বলেছিলেন, তোমরা তো কখনো ফিরআউনের উপরও অভিশাপ বর্ষণ করনি, অথচ সে নিশ্চিতভাবেই কাফির ছিল। অতএব তোমরা যখন ফিরআউনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করাকে জরুরী মনে করছ না, তখন কী করে তোমরা ঐ সমস্ত লোককে কাফির আখ্যা দিতে পার, যারা তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান রাখতেন এবং ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকামও পালন করতেন ? বিতর্কের ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, ঐ দুই খারিজীর একজন নিজের দল ছেড়ে সাধারণ মুসলমানদের দলে ভিড়ে যায়। অন্য খারিজীরাও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একদম নীরব থাকে।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর ইনতিকাল

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উমাইয়া গোষ্ঠী উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কর্মনীতির প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কেননা তিনি তাদের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জায়গীর, সহায়-সম্পদ ও মাল-সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়েছিলেন যেগুলোর উপর তারা অন্যায়ভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের সুবিধা আদায়ের অন্যান্য পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এই ক্ষতি বরদাশ্‌ত করে নিতে পারেনি, তাই তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আর তাকে হত্যা করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য যেমন কোন পাহারাদার নিয়োগ করতেন না, তেমনি পানাহারের ক্ষেত্রেও কোন সাবধানতা অবলম্বন করতেন না। বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাঁকে হত্যার জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম তথা তাঁর খাদ্যে বিষপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাঁর ক্রীতদাসকে লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে ভিড়ায় এবং তার মাধ্যমে উমর উব্‌ন আবদুল আযীযের খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করে। যখন তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয় তখন তিনি তা জেনে ফেলেন। বিষক্রিয়া ক্রমশ বাড়তে থাকলে লোকেরা তাঁকে বলে, আপনি চিকিৎসা করছেন না কেন ? তিনি উত্তর দেন, যখন আমাকে বিষপ্রয়োগ করা হয় তখন যদি কেউ বলত, এখন তুমি তোমার কানের লতি স্পর্শ করলে অনায়াসে আরোগ্য লাভ করতে পারবে– তাহলেও আমি আমার কানের লতি স্পর্শ করতাম না।

মুজাহিদ বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জনসাধারণ আমার সম্পর্কে কি বলে ? আমি বললাম, তাদের ধারণা এই যে, আপনাকে 'জাদু' করা হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, না, আমি জাদুগ্রস্ত নই, বরং যখনই আমাকে বিষপ্রয়োগ করা হয় তখনই আমি তা জানতে পারি। এরপর তিনি ঐ ক্রীতদাসকে ডেকে পাঠান, যে তার খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করেছিল। তিনি তাকে বলেন, আক্ষেপের বিষয় তুমি আমাকে বিষপ্রয়োগ করেছ। শেষ পর্যন্ত কোন্ প্রলোভনে তুমি এই কাজ করতে উদ্যত হলে? সে উত্তর দেয়, আমাকে এক হাজার দীনার এবং মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ঐ দীনারগুলো আমার কাছে নিয়ে এস। সে তা নিয়ে এল। তিনি তখনই ঐ এক হাজার দীনার বায়তুলমালে জমা দেন এবং ক্রীতদাসকে বলেন, তুমি এখনই এখান থেকে বের হয়ে যেদিকে ইচ্ছা পালিয়ে যাও। কেউ যেন তোমার চেহারা আর দেখতে না পায়।

উবায়দ ইব্‌ন হাস্‌সান বলেন, তাঁর অন্তিম সময় উপনীত হলে এবং মৃত্যুকষ্ট শুরু হলে তিনি লোকদেরকে বলেন, আমাকে একা থাকতে দাও। অতএব সকলেই বাইরে চলে গেল।

কিন্তু মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক এবং তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিক দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা সেখান থেকে শুনতে পেলেন, তিনি বলছেন, বিসমিল্লাহ্, এবার আসুন। এই আকৃতি না মানুষের, আর না জিনের। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ –

"এটা আখিরাতর সেই আবাস, যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য" (২৮ ঃ ৮৩)।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হিজরী ১০১ সনের ২৫শে রজব (৭২০ খ্রি-এর ফেব্রুয়ারীতে) ইন্তিকাল করেন। তিনি মোট দু'বছর পাঁচ মাস চার দিন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিম্‌স এলাকার 'দাহরে মাআন' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। হাসান বসরী (র) তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বলে উঠেন, আজ সবচেয়ে ভাল মানুষটি চলে গেলেন। কাতাদা বলেন, তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন ঃ

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। ঐ পত্রটি আল্লাহ্‌র বান্দা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পক্ষ থেকে। আস্‌সালামু আলায়কুম।

"হে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক! জেনে রেখ, আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আমার অন্তিম অবস্থায় তোমার কাছে এ চিঠি লিখছি। আমি জানি যে, আমাকে আমার শাসনামল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর সেই জিজ্ঞাসাবাদকারী হচ্ছেন দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। এটা কোন মতেই সম্ভব নয় যে, আমি তাঁর নিকটে আমার কোন কাজ গোপন রাখতে পারব। যদি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে আমি মুক্তি পেয়ে যাব, অন্যথায় আমার ধ্বংস অনিবার্য। আমি দু'আ করি, যেন তিনি তাঁর অপার করুণাগুণে আমাকে মার্জনা করেন, জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই দেন এবং আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। তোমার উচিত, আল্লাহ্ সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকা এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা। আমার পর তুমিও বেশি দিন দুনিয়ায় থাকবে না।"

ইউসুফ ইব্‌ন মালিক বলেন, আমরা তাঁকে কবরে শুইয়ে মাটি দিয়ে ঢাকছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটি কাগজ এসে পড়ল। তাতে লেখা ছিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের তিনজন স্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এগারজন পুত্র সন্তান রেখে যান। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিক ছিলেন ঠিক তাঁর মতই পবিত্রচেতা ও আল্লাহ্‌ভীরু। ফাতিমা ছিলেন একাধারে খলীফার নাতনী, খলীফার কন্যা,

খলীফাদের বোন ও খলীফার স্ত্রী। এতদসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, আবদুল্লাহ্, বকর ও ইবরাহীম স্ত্রীদের গর্ভে এবং অবশিষ্টরা দাসীদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অবশিষ্টদের নাম আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, আসিম, ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ্, আবদুল আযীয ও রাইয়ান। তাঁর পুত্র আবদুল মালিক অবিকল পিতার মত ছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) প্রায়ই বলতেন, আমি আমার পুত্র আবদুল মালিকের কারণে পুণ্যকাজে ও ইবাদত-বন্দেগীতে প্রেরণা পাই। কিন্তু আবদুল মালিক তাঁর জীবিতাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মৃত্যুকালে যে অর্থ-সম্পদ রেখে যান তার পরিমাণ ছিল ২১ দীনার। তা থেকে কয়েক দীনার কাফন-দাফনে খরচ হয় এবং অবশিষ্ট অর্থ পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ১১ জন পুত্র রেখে যান, অনুরূপভাবে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকও ১১জন পুত্র রেখে যান। লক্ষণীয় যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পুত্ররা তাদের পিতার সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জন প্রতি প্রায় এক দীনার পান। অথচ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের পুত্ররা মাথা প্রতি প্রায় দশ লক্ষ দিরহাম পান। আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের এক পুত্রকে দেখেছি যে, তিনি একদিন জিহাদের জন্য একশ ঘোড়া দান করেছেন, অথচ হিশামের এক পুত্রকে দেখেছি যে, তিনি অভাবের তাড়নায় মানুষের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করছেন।

এক নজরে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকাল

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকাল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালের ন্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সিদ্দিকী খিলাফতকাল যেমন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তেমনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফতকালও ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। বনূ উমাইয়ার শাসনকাল ধীরে ধীরে মানুষের মনে সংসার পূজা, ধন-সম্পদের আসক্তি ও আখিরাত সম্পর্কে ঔদাসীন্য সৃষ্টি করে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সংক্ষিপ্ত খিলাফতকাল কিছু দিনের জন্য হলেও ঐসব অসৎ মনোবৃত্তি দূর করে মুসলমানদেরকে পুনরায় রূহানিয়াত ও পুণ্যের দিকে চালিত করে। সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে, তিনি রাজতান্ত্রিক খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বে পুনরায় সিদ্দিকী ও ফারূকী যুগের আবির্ভাব ঘটান।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বনূ উমাইয়ার খলীফাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং বাড়াবাড়িকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন বিশ্বে শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মানবিক অধিকার থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করতে। তিনি একজন নাস্তিকের উপরও কোনরূপ জবরদস্তি করতে চাইতেন না। তিনি খারিজীদেরকেও তাদের মতবাদ প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীনের মর্যাদা এই পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করতে চাচ্ছিলেন যে, যদি কোন অপরাধী খলীফাকে গালি দেয় তাহলে খলীফাও প্রতিশোধস্বরূপ ঐ ব্যক্তিকে সেরূপ গালিই দিতে পারবেন, এর বেশি কিছু করতে পারবেন না।

তিনি তাঁর অধীনস্থদের কাছ থেকে চাইতেন না যে, তারা তাঁর প্রত্যেকটি ন্যায়-অন্যায় কাজে সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করুক। তিনি খলীফাকে মুসলমানদের বাদশাহ ও শাসক মনে করতেন না, বরং তাদের একজন হৃদয়বান পিতা বলেই মনে করতেন। মোটকথা সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযমের মধ্যে যে সব গুণ আমরা দেখেছি তার যাবতীয় নমুনা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তাই একথা অত্যন্ত যুক্তিসংগত যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর সাথে সাথে খিলাফতে রাশিদারও পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর যুগে এক বিরাট সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্য কোন খলীফার যুগে ইসলাম গ্রহণের এরূপ জোয়ার পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ তাঁর যুগে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে খুবই কম। তাঁর রাষ্ট্রের সীমা সিন্ধু, পাঞ্জাব, বুখারা, তুর্কিস্তান ও চীন থেকে শুরু করে মরক্কো, স্পেন ও ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এত বড় রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল।

তাঁর শাসনামলে বহু রাস্তা নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রদেশেই মাদ্‌রাসা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর সময়কার আদল ও ন্যায় বিচারের নমুনা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। এ কারণেই তাঁর মৃত্যুতে শুধু মুসলমানদের ঘরেই ক্রন্দন রোল ওঠেনি, বরং খ্রিস্টান ও ইহুদীদেরকেও মাতম করতে দেখা গেছে। রাহিবরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাদের গির্জা ও উপাসনালয়ে এই বলে রোদন করতে থাকে যে, আজ দুনিয়া থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং তা রক্ষাকারী বিদায় গ্রহণ করেছেন।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) শিয়া, সুন্নী, খারিজী প্রভৃতি ফিরকার সমগ্র বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন। আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন একটি লোকও দৃষ্টিগোচর হয় না, যে তার অন্তরে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের প্রতি সামান্য বিদ্বেষও পোষণ করে। এখানে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য একথা চিন্তা করে দেখার সুযোগ রয়েছে যে, যে ব্যক্তিই ইসলামের অধিকতর অনুসারী সে বিশ্ববাসীর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এটা নিঃসন্দেহে ইসলামের সৌন্দর্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সিদ্দীকে আকবর, ফারূকে আযম, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহ্‌উদ্দীন আইয়ুবীকে ইউরোপবাসীরা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। সাথে সাথে তাদের এটাও দেখা উচিত যে, এই সব ব্যক্তি ইসলামের প্রতি কতই না অনুগত ছিলেন। তাঁদের যাবতীয় সৌন্দর্য এই একটি কথার মধ্যেই নিহিত ছিল যে, তাঁরা ছিলেন সত্যিকার মুসলমান এবং তাঁরা তাঁদের জীবনকে ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সদাসচেষ্ট ছিলেন। একদিকে যেমন আমরা দেখি যে, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন সবচেয়ে বড় শাহানশাহ্ এবং অন্যদিকে যখন আবার দেখি যে, তিনি তালিযুক্ত জামা গায়ে দিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এর চাইতে উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বানুভূতি আর কি হতে পারে যে, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের জীবন অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর আড়াই বছর সময়কালে তিনি এতটা শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর দেহের হাড়গুলো একটি একটি করে গণনা করা যেত।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান আপন ভাই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের ওসীয়ত অনুযায়ী হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। খলীফা হওয়ার পর তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার যতটুকু মুখাপেক্ষী, ততটুকু হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযও ছিলেন না। তিনি হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পদাংক অনুসরণ করতে থাকেন। উমাইয়া বংশের লোকেরা যখন দেখল, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পরও তাদের স্বার্থোদ্ধারের কোন সুরাহা হচ্ছে না তখন তারা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চালাবার চেষ্টা শুরু করে। তাদের এ ধরনের সব চেষ্টাই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সামনে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক তো উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ছিলেন না। তাই তিনি এদের ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, চল্লিশজন শুভ্রকেশী লোক ইয়াযীদের সামনে হাযির হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, যুগের খলীফা যা কিছু করবেন তার হিসাব তার থেকে নেওয়া হবে না এবং এজন্য তাকে কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। এরূপ কৌশল অবলম্বনে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মূর্খতা তাকে ধীরে ধীরে প্রথম ইয়াযীদের মত পাপাচারের দিকে ঠেলে দিল, এমন কি তিনি মদ্যপানও করতে শুরু করলেন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম খলীফা, যিনি প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন এবং গান-বাজনার মধ্যে নিজের মূল্যবান সময় কাটিয়ে দিতেন। এবার উমাইয়া বংশের লোকেরা সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। তারা দরবারে খিলাফতের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের যুগের যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজকর্ম বন্ধ করে দিল। তারা পূর্বের ন্যায় অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ ও জায়গীরসমূহের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করল এবং এই অন্যায় আচরণ পূর্বের চাইতেও অধিক এগিয়ে গেল। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পর থেকে উমাইয়া খিলাফতের পতনের যুগ শুরু হয়েছে মনে করতে হবে। এই সময়েই বনূ আব্বাস এবং হাশিমীরা বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে এবং তাতে কিছুটা সাফল্যও লাভ করে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসূফ সাকাফীর ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ তার শাসন আমলে ইয়ামানবাসীদের উপর এক ধরনের নতুন কর ধার্য করেছিল। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খলীফা হওয়ার পর ঐ কর রহিত করে তার পরিবর্তে 'উশর' (উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশ) ধার্য করেন এবং বলেন, এই নতুন কর ধার্য করার চাইতে, ইয়ামান থেকে সামান্য পরিমাণ কর না আসাটা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হয়ে ইয়ামানবাসীদের কাছ থেকে পুনরায় ঐ কর আদায়ের নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে তিনি সেখানকার জনসাধারণের মতামতের কোন তোয়াক্কাই করেন নি। তার চাচা মুহাম্মদ

ইব্‌ন মারওয়ান, যিনি জাযীরা ও আযারবায়জানের গভর্নর ছিলেন, ঐ সময়েই মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াযীদ তার জায়গায় অপর চাচা মাসলামাকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন।

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয জুরজানের কর আদায় না করার কারণে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে বন্দী করেছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত বন্দী অবস্থায়ই ছিলেন। যখন তিনি শুনতে পান যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে বনূ উমাইয়ার লোকেরা বিষপ্রয়োগ করেছে এবং তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না, তখন তিনি (ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব) কয়েদখানা থেকে পালিয়ে বসরায় চলে যান। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মধ্যে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের যুগ থেকে মনোমালিন্য চলে আসছিল। যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব জানতে পারেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের জীবন সংকটাপন্ন এবং তারপরে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন তখন তিনি প্রহরীদেরকে বিরাট অংকের ঘুষ দিয়ে কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যান, যাতে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক তার উপর বাড়াবাড়ি করার কোন সুযোগ না পান। অবশ্য যাবার সময় তিনি একটি চিঠি লিখে তা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন, যদি আমার এই বিশ্বাস থাকত যে, আপনি পুনরায় সেরে উঠবেন তাহলে আমি কখনো কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যেতাম না। কিন্তু এই আশংকা করে আমি পালিয়ে যাচ্ছি যে, আপনার পর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আমাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবেন। এই চিঠি যখন তাঁর কাছে পৌঁছে তখন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তিনি চিঠি পড়ে বললেন, হে প্রভু! যদি ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি তাকে শাস্তি প্রদান কর। কেননা সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হয়ে বসরার প্রশাসক আদী ইব্‌ন আরতাতকে ইয়াযীদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে লিখেন, তুমি তার পরিবার-পরিজনকে গ্রেফতার কর। তদনুযায়ী আদী মুহাল্লাবের দুই পুত্র মুফাযযল ও মারওয়ানকে বন্দী করেন। ইতিমধ্যে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব বসরায় গিয়ে পৌঁছেন। বসরাবাসীরা তার পক্ষ নেয়। ফলে আদী ইব্‌ন আরতাত বসরা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব বসরা থেকে আহওয়ায পর্যন্ত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন করে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গঠন করেন। তিনি ইরাকবাসীদেরকে এই বলে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেন যে, তুর্কী ও রোমানদের চাইতে সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শ্রেষ্ঠতর। হাসান বসরী (র) তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু জনসাধারণ এই ভয়ে হাসানকে চুপ থাকতে বাধ্য করে যে, একথা শুনতে পেলে হয়ত ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব তাঁকে হত্যা করবেন। ইয়াযীদ নিজ বাহিনী নিয়ে কূফার দিকে রওয়ানা হন। সেখানে এক ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শন করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ইয়াযীদ ও তার ভাই হাবীব মারা যান। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক জয়লাভ করেন। মুহাল্লাবের পরিবারের বাকি লোকেরা ইয়াযীদ ও হাবীবের বাহিনীর পরাজয় ও তাদের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেয়ে নৌকাযোগে বসরা থেকে পালিয়ে পূর্বদিকে চলে যায়। তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। কান্দাবাল

নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তাতে শুধু আবূ উতবা ইব্‌ন মুহাল্লাব ও উছমান ইব্‌ন মুফাযযাল ইব্‌ন মুহাল্লাব ও দু'টি শিশু ছাড়া মুহাল্লাব পরিবারের সকলেই নিহত হন।

এই বিজয় লাভের পর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মাসলামাকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর আমর ইব্‌ন হুরায়রাকে মাসলামার জায়গায় ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। সাগাদ ও সমরকন্দবাসীরা বিদ্রোহ করলে আমর ইব্‌ন হুরায়রা সাঈদ হারশীকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তাকে নিজ বাহিনীসহ তথায় প্রেরণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে সাগাদ ও সমরকন্দবাসীদেরকে যথোপযুক্ত শায়েস্তা করেন।

খাযার ও আর্মেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা কিবচাকের সাহায্য নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সেখানকার ইসলামী বাহিনীর প্রায় অধিকাংশ সৈন্য হত্যা করে। যারা কোনমতে প্রাণে রক্ষা পায় তারা দামিশকে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে পালিয়ে আসে। ইয়াযীদ জার্‌রাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাকীমকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। জার্‌রাহ্ সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খাযারবাসীরা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এরপর জার্‌রাহ্ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত সেখানকার বাদশাহ ও শাসকরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং সমগ্র এলাকা মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন দাহ্‌হাক হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের যুগ থেকে হিজাযের গভর্নর নিয়োজিত ছিলেন। তিন বছর পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালনের পর তার মনে হযরত হুসাইনের নাতনীকে বিবাহ করার সাধ জাগে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইন অর্থাৎ কন্যার মায়ের কাছে পয়গাম পাঠান। কিন্তু কন্যার মা তাঁর অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন দাহ্‌হাক তাঁকে এই বলে ধমক দেন যে, যদি তুমি সম্মত না হও তাহলে আমি তোমার ছেলের উপর মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে বেত্রদণ্ড প্রদান করব। তখন ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। ইয়াযীদ এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে স্বহস্তে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, আমি তোমাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করলাম। এই পত্র পাঠমাত্র তুমি দাহ্‌হাকের কাছে যাও, তাকে পদচ্যুত কর এবং তার থেকে চল্লিশ হাজার দীনার জরিমানা আদায় কর। এরপর তাকে এমনভাবে নির্যাতন কর যে, তার আর্ত চীৎকার যেন আমি আমার এই শয্যা থেকে শুনতে পাই। দূত পত্রটি নিয়ে আবদুল ওয়াহিদকে দিল। তিনি মদীনার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করে ইব্‌ন দাহ্‌হাককে নানাভাবে নির্যাতন করেন। জনসাধারণও তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তিনি পদচ্যুত হওয়ার পর তার সম্পর্কে অনেক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করা হয়। আবদুল ওয়াহিদ মদীনার আনসারদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করতেন। তাই সব লোকই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের দুই পুত্র কাসিম ও সালিম সব কাজেই তার উপদেষ্টা ছিলেন। হিজরী ১০৪ সনের শাওয়াল (৭২৩ খ্রি এপ্রিল) মাসে ইব্‌ন দাহ্‌হাক পদচ্যুত হন এবং তার স্থলে আবদুল ওয়াহিদ নিযুক্তি লাভ করেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাঈদ হুরায়শী ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। কিছুদিন পর ইব্‌ন হুবায়রা হুরায়শীকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ কিলাবীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইব্‌ন হুবায়রা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইরাকের গভর্নর ছিলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক নিজের পরবর্তী খলীফা হিসাবে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিককে এবং হিশামের পরবর্তী খলীফা হিসাবে নিজ পুত্র ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে মনোনীত করেছিলেন। চার বছর এক মাস রাজত্ব করার পর হিজরী ১০৫ সনের ২৫শে শাবান (৭২৪ খ্রি-এর জানুয়ারী) ৩৮ বছর বয়সে বালকা নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। এরপর তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক হিজরী ৭২ সনে (৬৯১-৯২ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল আইশা বিন্‌ত হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযূমী। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যুর সময় হিশাম হিম্‌সে অবস্থান করছিলেন। একজন দূত ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ, তাঁর লাঠি এবং অঙ্গুরী নিয়ে সেখানেই তাঁর কাছে হাযির হয়। হিশাম হিম্‌স থেকে দামিশ্‌কে চলে আসেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে নিজ খিলাফতের বায়আত নেন।

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইব্‌ন হুবায়রাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে ইরাকের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ খুরাসানের হাকিম নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুসলিম একটি বাহিনী নিয়ে তুর্কীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং হিজরী ১০৫ সনের (৭২৪ খ্রি) শেষভাগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে বেশির ভাগ তুর্কী সরদারকে পরাজিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে খারাজ ও জিয্‌য়া আদায় করেন।

খুরাসানের ঘটনাবলী

হিজরী ১০৬ সনে (৭২৪-২৫ খ্রি) মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করেন। তিনি বুখারা ও ফারগানার দিকে যান এবং সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন। চীনের খাকান (বাদশাহ) ফারগানাবাসীদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাই তার সাথে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত খাকান পরাজিত হন এবং তুর্কীদের অনেক বড় বড় সরদার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এই বছরই খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে লিখেন ঃ তুমি মুসলিম ইব্‌ন সাঈদকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তোমার ভাই আসাদকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ কর। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আপন ভাই আসাদকে নিয়োগ করে খুরাসানে পাঠান। মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ সন্তুষ্টচিত্তে খুরাসানের শাসনভার তার হাতে অর্পণ করেন। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যখন আসাদকে খুরাসানে পাঠান তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন নাঈমকে তার সহকারী নিয়োগ করেন।

আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুরাসানের শাসনভার গ্রহণ করেই হিরাত পর্বতমালা অর্থাৎ ঘূর প্রভৃতি অঞ্চলের উপর হামলা পরিচালনা করেন। সেখান থেকে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণ মালে গনীমত লাভ করে। ঐ সমস্ত যুদ্ধে নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার এবং মুসলিম ইব্‌ন আহ্‌ওয়ায অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কয়েক দিনের মধ্যেই জনসাধারণের সাথে এমন আচরণ শুরু করেন যে, তারা তার সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তিনি নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারকে একশ বেত্রাঘাত করেন, আবদুর রহীম ইব্‌ন নাঈমের মাথা ন্যাড়া করে দেন এবং তাদের উভয়কে আপন ভাই খালিদের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দেন যে, এরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে শরীক ছিল।

তিনি খুরাসানবাসীদেরকেও অকথ্য গালিগালাজ করতেন এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক তা জানতে পেরে দামিশ্‌ক থেকে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে লিখেন ঃ আসাদকে খুরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ কর। এরপর তিনি সরাসরি নিজে থেকে আশরাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সালামীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান এবং খালিদকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। আশরাস খুরাসানে পৌঁছে নিজের মার্জিত ব্যবহার এবং পুণ্য আচরণ দ্বারা সকলকে আপন করে নেন। আশরাস হিজরী ১১০ সনে (৭২৮-২৯ খ্রি) আবূ সায়দা, সালিহ্ ইব্‌ন যারীফ এবং রাবী ইব্‌ন ইমরান তামীমীকে সমরকন্দ ও মাওরাউন নাহ্‌রের দিকে প্রেরণ করেন, যাতে তারা সেখানে গিয়ে জনসাধারণের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও শিরকের কদর্যতা তুলে ধরে তাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম তথা সরল পথে নিয়ে আসেন। ঐ সমস্ত এলাকায় প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিত। তাই বলতে গেলে, তরবারির জোরেই সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রেক্ষিতে আশরাস সেখানকার জনসাধারণের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য যথাযথভাবে পেশ করে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা নেন। আর এরূপ করা হলে তাদের মধ্যে যে দোষত্রুটি রয়েছে তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আশংকার আর কোন কারণ থাকবে না। যাহোক অনুরূপভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তখন সমরকন্দ এলাকার বায়তুলমাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন হাসান ইব্‌ন উমর তাহা আল-কিনদী।

লোকেরা ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই জিয্‌য়ার আমদানী (যা যিম্মীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হতো) হ্রাস পায়। যিম্মীরা মুসলমান হওয়ার কারণেই যে এই আমদানী হ্রাস পাচ্ছে সে কথা হাসান ইব্‌ন উমর খুরাসানের গভর্নর আশরাসকে কিছুটা অভিযোগের সুরে লিখে জানান। তিনি উত্তর দেন, হয়ত অনেক লোক শুধু জিয্‌য়ার কারণে মুসলমান হয়েছে এবং আর ইসলাম গ্রহণ করেনি। অতএব তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, যে ব্যক্তি নিজের খাতনা করিয়েছে এবং নামাযও পড়ে তার জিয্‌য়া মাফ করে দাও। এছাড়া অন্য কেউ মুসলমান দাবি করলেও তার কাছ থেকে নিয়মিত জিয্‌য়া আদায় কর। আশরাস যদিও এটা পছন্দ করতেন না, কিন্তু খালিদ ও হিশামের ইচ্ছা ছিল নওমুসলিমদের কাছ থেকে কড়াকড়ি হিসাব নেওয়া এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা। আশরাসের জবাব পেয়ে হাসান ইব্‌ন

উমর ঐ হুকুম কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ইতস্তত করতে থাকেন। কেননা এটা ইসলামী শরীয়তসম্মত ছিল না। তাই তিনি হাসান ইব্‌ন উমরকে বায়তুলমাল বিভাগ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে হানী ইব্‌ন হানীকে নিয়োগ করেন। অবশ্য হাসানকে তিনি সমরকন্দের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগে বহাল রাখেন। হানী তার পদে যোগদান করেই নওমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় শুরু করেন। আবূ সায়দা নওমুসলিমদেরকে জিয্‌য়া দিতে এবং হানীকে জিয্‌য়া আদায় করতে নিষেধ করে দেন। এবার হানী আশরাসের কাছে লিখেন, এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে অনেক মসজিদও নির্মাণ করে ফেলেছে। অতএব তাদের কাছ থেকে কি করে জিয্‌য়া আদায় করা যেতে পারে? এর উত্তরে হানীর কাছে নির্দেশ আসে, তুমি যাদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় করতে তাদের কাছ থেকে তা আদায় অব্যাহত রাখ, চাই তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক।

এই অবস্থা দেখে আবূ সায়দা নয় হাজার নওমুসলিমের একটি বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ থেকে কয়েক ফারসাং দূরে অবস্থান নেন এবং মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। যেহেতু আবূ সায়দার বিরোধিতার যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাই অনেক নেতৃস্থানীয় মুসলমান সমরকন্দের শাসনকর্তার বাহিনী থেকে বের হয়ে নওমুসলিমদের পক্ষে যোগ দেন। আশরাস এই অবস্থা লক্ষ্য করে হাসান ইব্‌ন উমরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মাহ্‌শার ইব্‌ন মুযাহিম সুলামীকে নিয়োগ করেন। মাহ্‌শার সমরকন্দে পৌঁছে সন্ধি স্থাপনের বাহানায় আবূ সায়দা ও তার নেতৃস্থানীয় সঙ্গীদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে বন্দী করে আশরাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। তখন নওমুসলিমরা আবূ ফাতিমাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এই সমস্ত নওমুসলিমকে জিয্‌য়া থেকে অব্যাহতি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এরপর তাদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট হতে থাকলে ধীরে ধীরে তাদের উপর পুনরায় বাড়াবাড়ি শুরু হয় এবং তারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে থাকে। ফলে যারা ইতোমধ্যে মুসলমান হয়েছিল তারা মুরতাদ হয়ে পুনরায় মুসলমানদের মুকাবিলায় উদ্যত হয়। এজন্য তারা খাকানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। খাকান একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং মুসলমানদের সাথে পুনরায় এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সূচনা হয়। আশরাস স্বয়ং মুকাবিলা করতে যান। যুদ্ধে উভয় পক্ষই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং অনেক মুসলমান ও তুর্কী নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যারা বলে থাকেন, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে, তাদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে চিন্তাভাবনার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তরবারির জোরে ইসলামের প্রসার লাভ ঘটেনি। বরং এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন কোন মুসলিম প্রশাসক তরবারির জোরে ইসলাম প্রসারের পথ রুদ্ধ করারও চেষ্টা করেছেন।

হিজরী ১১১ সনে (৭২৯-৩০ খ্রি) হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক আশরাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে তুর্কী ও সমরকন্দীদের সাথে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায় পদচ্যুত করে তার স্থলে জুনায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান মুরয়ীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। জুনায়দ খুরাসানের রাজধানী মার্ভে পৌঁছে সেখানে আশরাসের পরিবর্তে তার সহকারী খাত্তাব ইব্‌ন মুহরিয

সালামীকে পান। তিনি সেখানে একদিন অবস্থান করে মাওরাউন নাহরের দিকে রওয়ানা হন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে মাহ্‌শার ইব্‌ন মুযাহিম সালামীকে মারো রেখে যান এবং খাত্তাবকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি আশরাসের সাথে সাথে খাকান ও বুখারাবাসীদের উপরও জয়লাভ করে হিজরী ১১১ সনের (৭২৯-৩০ খ্রি) দিকে মার্ভে ফিরে আসেন এবং কাতান ইব্‌ন কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমকে বুখারার ওয়ালীদ ইব্‌ন কা'কা' আবসীকে হিরাতের এবং মুসলিম ইব্‌ন আবদুর রহমান বাহিলীকে বল্‌খের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরই মুসলিম ইব্‌ন আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে তার স্থলে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাবীআকে বল্‌খের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

জুনায়দ হিজরী ১১২ সনে (৭৩০-৩১ খ্রি) তুখারিস্তানের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য আঠার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ এক দিকে উমারা ইব্‌ন মারয়ামকে এবং দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ অপর দিকে ইবরাহীম ইব্‌ন বাস্‌সামকে প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও সেদিকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নেন। তুর্কীরা এই সংবাদ পেয়ে খাকানকে নিজেদের সেনাপতি মনোনীত করে একটি বিরাট বাহিনীসহ সমরকন্দের উপর চড়াও হয়। ঐ সময়ে সূরাহ্‌ ইব্‌নুল জাবার ছিলেন সমরকন্দের শাসনকর্তা। তিনি জুনায়দের কাছে লিখেন, খাকান একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ আক্রমণ করেছে। আপনি আমার সাহায্যার্থে অবিলম্বে সৈন্য পাঠান। মাহ্‌শার ইব্‌ন মুযাহিম এবং অন্যরা জুনায়দকে পরামর্শ দেন, কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আপনার সমরকন্দের দিকে যাওয়া উচিত। কেননা তুর্কীদের মুকাবিলা করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আজকাল সমগ্র বাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আপনার কাছে খুব কম সৈন্যই রয়েছে। এমতাবস্থায় সমরকন্দের দিকে রওয়ানা হওয়া আপনার জন্য যুক্তিসংগত নয়। জুনায়দ বলেন, এটা কি করে সম্ভব যে, আমার ভাই সূরাহ্‌ ইব্‌নুল জাবার সেখানে বিপন্ন অবস্থায় থাকবে, আর আমি এখানে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংগৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকব? এই বলে তিনি সমরকন্দের দিকে রওয়ানা হন। খাকান এবং তুর্কীদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে যে, স্বয়ং জুনায়দ সমরকন্দের দিকে আসছেন তখন তারা অল্প সংখ্যক সৈন্য সমরকন্দ অবরোধে রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে জুনায়দকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সংখ্যায় অল্প হলেও সেই যুদ্ধে জুনায়দ ও তার সঙ্গীরা যে অপরিসীম বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন তাতে তুর্কীদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকেও অনেক নামকরা বীরসেনা নিহত হন। আর তুর্কীদের ওখানে তো লাশের স্তূপ জমে যায়। তুর্কী ও খাকান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক। জুনায়দ একটি পাহাড়কে পিছনে রেখে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি খাকান ও তার বাহিনীকে বেশ কয়েকবারই পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন এবং তুর্কী বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার অধিনায়কদের পরামর্শ অনুযায়ী সূরাহ্‌ ইব্‌ন জাবারের কাছে সমরকন্দে এই মর্মে বার্তা পাঠান ঃ আমরা তোমাদের থেকে শুধু দু'মনযিল দূরত্বে যুদ্ধরত অবস্থায় আছি। তোমরা সাহস করে সমরকন্দ থেকে বেরিয়ে পড়, নদীর তীর ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে এস এবং উল্টা দিক দিয়ে তুর্কীদের উপর হামলা কর। সূরাহ্‌

সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হন। কিন্তু যে রাস্তা ধরে তাকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি তাঁর পরিবর্তে অন্য রাস্তা ধরে আসেন। ফলে নিকটে পৌঁছেও তিনি তুর্কী বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। ফলে তার বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি জুনায়দকে কোন সাহায্যই করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত মুসলিম মুজাহিদরা প্রাণবাজি রেখে এমন ভয়ানক আক্রমণ চালায় যে, খাকান ও তুর্কীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং মুসলমানরা সমরকন্দে প্রবেশ করে।

জুনায়দ সেখান থেকে এক দ্রুতগামী দূত মারফত খলীফা হিশামকে যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। হিশাম কূফা ও বসরা থেকে দশ দশ হাজার সৈন্য পাঠাবার জন্য সংশ্লিষ্ট গভর্নরদের নির্দেশ দেন এবং জুনায়দকে লিখেন, তুমি যুদ্ধ করে যাও, আমি তোমার সাহায্যার্থে কূফা ও বসরা থেকে শীঘ্রই বিশ হাজার সৈন্য, ত্রিশ হাজার বর্শা এবং ত্রিশ হাজার তরবারি পাঠাচ্ছি। খলীফার এই পয়গাম জুনায়দের কাছে সমরকন্দে গিয়ে পৌঁছে। তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিন পর সংবাদ পান যে, খাকান এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় তার সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে এবং বুখারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন কাতান ইব্‌ন কুতায়বা। জুনায়দ আশংকা করেন যে, হয়ত কাতানও বুখারায় সেই অবস্থার সম্মুখীন হবেন, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন সূরাহ্ সমরকন্দে। তিনি উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে চারশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ সমরকন্দে মোতায়েন করেন এবং তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রসদের ব্যবস্থা করে দিয়ে স্বয়ং মহিলা, শিশু এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও রসদ সামগ্রীসহ সমরকন্দ থেকে বুখারা অভিমুখে রওয়ানা হন। হিজরী ১১২ সনে (৭৩০ খ্রি) তাওয়াবীসের নিকটবর্তী মীনীয়া নামক স্থানে খাকানের সাথে তাঁর মুকাবিলা হয় এবং তাতে খাকান পরাজিত হন। এবার জুনায়দ সম্মুখের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার পেয়ে বুখারার দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তুর্কীরা আর একবার তার সাথে মুকাবিলা করে। তাতেও মুসলমানরা জয়ী হয়। এরপর জুনায়দ বুখারায় প্রবেশ করেন। সেখানে কূফা ও বুখারার সেনাবাহিনীও তাঁর সাথে এসে মিলিত হয়।

জুনায়দ তুর্কীদেরকে বার বার পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে খুরাসানে সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা কায়েম করেন। তিনি খুরাসানের দিক থেকে স্বস্তি লাভ করে হিজরী ১১৬ সনে (৭৩৪ খ্রি.) ফাদিলা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে বিয়ে করেন। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মুহাল্লাব-পরিবারের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তিনি উপরোক্ত বিবাহের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং জুনায়দকে পদচ্যুত করে তার স্থলে আসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ হিলালীকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু আসিম যেদিন তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য খুরাসানের রাজধানী মার্ভে পৌঁছেন ঠিক সেদিনই জুনায়দ ইনতিকাল করেন। তাই আসিম জীবিত জুনায়দের সাক্ষাত পান নি। তিনি খুরাসানে পৌঁছে জুনায়দের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদচ্যুত করে তাদের স্থলে নিজের পছন্দমত লোক নিয়োগ করেন।

হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ্‌

হিজরী ১০০ সনে (৭১৮-১৯ খ্রি.) যখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত, ঠিক তখন থেকেই বনু আব্বাস নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে গোপনে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং এ উদ্দেশ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে এই কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখা হয়। এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কিছু সংখ্যক হাদীস বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বনূ আব্বাসের লোকেরা কিছু সংখ্যক জাল হাদীস নিজে থেকেও গড়ে নেয়। কোন কোন হাদীসের মধ্যে তারা কিছু বাড়তি কথাও জুড়ে দেয়। এসব কিছুর উদ্দেশ্য হলো, জনসাধারণকে এই মর্মে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, খিলাফতে ইসলামিয়া একদিন অবশ্যই বনূ আব্বাসের হাতে আসবে এবং শ্রীঘই আসবে। ইতিমধ্যে বনূ হাশিমের খিলাফতের অধিকারী হওয়া এবং বনূ উমাইয়ার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটি বিভিন্ন বিপ্লবী দল কর্তৃক একটি মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বনূ আব্বাসও সেটাকে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছিল এবং তা দ্বারা বহুলভাবে উপকৃতও হচ্ছিল। বিশেষভাবে দক্ষ ও লোভ-লালসাহীন কিছু লোক সব সময়ই একাজে নিয়োজিত থাকত। কিন্তু বনূ উমাইয়ারা তাদের শাসনামলে এ ব্যাপারটিকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। তাই তারা এটা প্রতিরোধের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি। সত্যিকথা বলতে গেলে, তারা এ ধরনের গোপন ষড়যন্ত্রের গ্রন্থি উন্মোচনের পিছনে লেগে থাকাটা আদৌ পছন্দই করত না।

আব্বাসীদের সাথে সাথে ফাতিমী এবং আলাবীরাও এ ধরনের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই যথারীতি অব্যাহত রেখেছিল এবং খুরাসানই ছিল তাদের এই যাবতীয় তৎপরতার ক্ষেত্র। কেননা সেখানকার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ছিল এ জাতীয় তৎপরতার জন্য অধিকতর অনুকূল। খুরাসানে বিখ্যাত আয্‌দ গোত্রের নেতা হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ ছিলেন আলাবী ও ফাতিমীদের বিশেষ ভক্ত। তিনি হিজরী ১১৬ সনে (৭৩৪ খ্রি.) কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করেন এবং জনসাধারণকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ এবং ইমাম রিদার হাতে বায়আত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ফিরইয়াবে পৌছে এ কাজ শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার হাজার উৎসর্গকারী মুজাহিদ তার কাছে এসে ভিড় জমায়। তিনি তাদেরকে নিয়ে বল্‌খ অভিমুখে রওয়ানা হন। তখন নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার ছিলেন বলখের শাসনকর্তা। তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হারসের মুকাবিলা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ্‌ বলখের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাযিমকে সেখানকার শাসক নিয়োগ করেন এবং স্বয়ং জুরজানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি অতি সহজেই জুরজানের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকে মার্ভের দিকে রওয়ানা হন। মার্ভের শাসনকর্তা আসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ জনসাধারণকে হার্‌স ইব্‌ন মুরায়হের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাননি। এর কারণ, হারস পূর্ব থেকেই সেখানকার জনসাধারণের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছিলেন।

হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হের সৈন্য সংখ্যা ষাট হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আয্‌দ ও তামীম গোত্রের অনেক নামকরা সরদার এবং ফিরইয়াব ও তালিকানের জমিদাররাও তার বাহিনীতে যোগদান করেছিল। অপর দিকে আসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ও হারসের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ্‌ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মার্ভের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু ঠিক মুকাবিলার মুহূর্তে আয্‌দ ও তামীম গোত্রের চার হাজার যোদ্ধা তার বাহিনী ত্যাগ করে এবং আসিমের সাথে যোগ দেয়। ফলে হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হের সঙ্গীদের সাহস ও উদ্দীপনা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত হার্‌স পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। তবে আসিম তার পশ্চাদ্ধাবন করেন নি। এবার আসিম 'মানাযিলে রুহ্‌বান'-এর নিকটে পৌঁছে সেখানেই তাঁবু স্থাপন করেন। তার কাছে তিন হাজার অশ্বারোহী এসে সমবেত হয়। এরপর হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হও নিজের অবস্থা পুনর্গঠিত করে তুলেন। তিনি তার দখলীকৃত খুরাসানের দ্রুত উন্নতি বিধান করতে থাকেন।

খুরাসানের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক আসিমের কাছে তার কৈফিয়ত তলব করেন। আসিম উত্তরে লিখেন, খুরাসান যেহেতু সরাসরি দামিশক তথা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, তাই সেখান থেকে কেন্দ্রে খবর পাঠাতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য পেতে কিছুটা বিলম্ব হয়। এমতাবস্থায় খুরাসান প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় ইরাক প্রদেশের হাতেই ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। এতে বসরা ও কূফা থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খুরাসানে সাহায্য এসে পৌঁছবে। হিশাম তাঁর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে তাকে খুরাসানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন। এরপর তিনি ইরাকের গভর্নর খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ কাসরীকে লিখেন, তুমি তোমার ভাই আসাদকে পুনরায় খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দাও।

আসিম তার এই পদচ্যুতির সংবাদ পেয়ে হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেন ঃ চলো, আমরা উভয়ে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে একটি তাবলিগী পত্র লিখি এবং তাঁকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র উপর আমল করার আহ্বান জানাই। যদি তিনি অস্বীকার করেন তাহলে আমরা সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করব। কিন্তু তাদের এই সন্ধি বেশি দিন টিকেনি। কোন একটি ব্যাপারে দ্বিমত দেখা দেওয়ায় তাদের মধ্যে মনোমালিন্য, এমনকি সংঘর্ষ দেখা দেয়।

ঐ সংঘর্ষে হার্‌স পরাজিত হন এবং আসিম তার অধিকাংশ সঙ্গীকে বন্দী করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। আসিম তার এই বিজয়কে খলীফা হিশামের মন-জয়ের একটি মাধ্যমে পরিণত করতে চান। কিন্তু ততক্ষণে আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ গভর্নরের সনদ নিয়ে খুরাসানের নিকটে এসে পৌঁছেছেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই আসিমকে বন্দী করেন। এটা হচ্ছে হিজরী ১১৭ সনের (৭৩৫ খ্রি.) ঘটনা। আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে হার্‌স ইব্‌ন শুরায়হ এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করতে থাকেন। তখন হারসের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তার গুটি কয়েক বন্ধুবান্ধব নিয়ে এখানে সেখানে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। হিজরী ১১৯ সনে (৭৩৭ খ্রি.)

খাকান ও বদর তুরখান ইসলামী বাহিনীর হাতে নিহত হন। ঐ সময়ে আবদুল্লাহ্‌র বিজয় অভিযান তুর্কিস্তান ছাড়িয়ে পশ্চিম চীন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

হিজরী ১২০ সনের রবিউল আউয়াল (৭৩৮ খ্রি-এর মার্চ) মাসে আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসরী বলখে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি জা'ফর ইব্‌ন হানযালা নাহরাওয়ানীকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। জা'ফর মোট চার মাস শাসন কর্তৃত্বে ছিলেন। এরপর রজব মাসে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ঐ বছর অর্থাৎ হিজরী ১২০ সনে (৭৩৮ খ্রি.) ইরাকের গভর্নর খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধবাদীরা খলীফা হিশামের দরবারে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। খলীফা তখন খালিদকে পদচ্যুত করে ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফীকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইউসূফ একদিকে যেমন ছিলেন দুনিয়া বিমুখ দীনদার, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন রক্তপিপাসু আহাম্মক।

নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর নওমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায়ের প্রথাটি কিভাবে বিলোপ করা যায় সে ব্যাপারে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন এবং তিনি তাতে সফলও হন। তিনি অবিলম্বে নওমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় বন্ধ করে দেন। ফলে তুর্কীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

খাযার ও আর্মেনিয়া

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক জার্‌রাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাকামীকে আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। জার্‌রাহ্ হাকামী হিজরী ১১১ সনে (৭২৯-৩০ খ্রি.) তিফলীসের দিকে অগ্রসর হয়ে তুর্কিস্তানে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত শহর বায়দা জয় করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। হিজরী ১১২ সনে (৭৩০ খ্রি.) তুর্কীরা তাদের সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত শহরগুলোতে আক্রমণ চালায়। জার্‌রাহ্ তাদের মুকাবিলার জন্য বের হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে মারজে আরদাবীল নামক স্থানে সংঘর্ষ হয়। মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল খুবই কম। জার্‌রাহ্ যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের কারণে তুর্কমেনীয় এবং তুর্কীদের সাহস অনেকটা বেড়ে যায় এবং তারা অগ্রসর হতে হতে মাওসিলের নিকটে এসে পৌঁছে।

এই সংবাদ রাজধানী দামিশকে পৌঁছলে খলীফা হিশাম সাঈদ হুরায়শীকে ডেকে বলেন, দেখ জার্‌রাহ তুর্কীদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সাঈদ বলেন, জার্‌রাহ্ আল্লাহ্‌কে এত বেশি ভয় করেন যে, তিনি কখনো আল্লাহ্‌র শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে পারেন না। তিনি তুর্কীদের কাছে পরাজিত হওয়ার অপমানও সহ্য করতে পারেন না। আমার ধারণা, তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। হিশাম বলেন, তাহলে এখন কি করা যায়? সাঈদ হুরায়শী বলেন, এখন আমাকে শুধু চল্লিশজন সৈন্য দিয়ে সেদিকে পাঠিয়ে দিন। এরপর প্রতিদিন চল্লিশজন করে পাঠাতে থাকেন। তাছাড়া ওদিককার সকল শাসনকর্তা ও কর্মকর্তাদের কাছেও এই মর্মে একটি সাধারণ নির্দেশ পাঠান যে, তারা যেন প্রয়োজনের সময় আমাকে সাহায্য করে।

এই প্রস্তাবটি হিশামের মনঃপূত হয়। অতএব সাঈদ চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে জার্‌রাহের সঙ্গীদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ওরা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ফিরে আসছিল। সাঈদ তাদেরকেও নিজের সঙ্গী করে নেন। যাওয়ার পথে যেখানেই মুসলিম বসতি পড়তো সেখানেই তিনি লোকদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। এভাবে সব জায়গা থেকেই কিছু কিছু লোক সংগৃহীত হতে থাকে। খালাত নামক স্থানে পৌঁছার পর তুর্কীদের সাথে সাঈদের মুকাবিলা হয়। এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তুর্কীরা পরাজিত হয় ও প্রচুর মালে গনীমত মুসলমানদের হাতে আসে। বিজয়ের পর সাঈদ বারযাগা নামক স্থানে অবস্থান নেন। তুর্কীরা ওরসান নামক স্থানটি অবরোধ করে রেখেছিল। সাঈদ বারযাগা থেকে ওরসানবাসীদের কাছে ইসলামী বাহিনীর আগমন সংবাদ পাঠান এবং তুর্কীদের কাছেও এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান ঃ তোমরা ওরসানের অবরোধ তুলে নাও, অন্যথায় আমরা তোমাদের আক্রমণ করব।

তুর্কীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিজে থেকেই অবরোধ উঠিয়ে নেয়। সাঈদ ওরসানে প্রবেশ করেন। এরপর আরদাবীল পর্যন্ত এগিয়ে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, মাত্র চার ফারসাং দূরে দশ হাজার তুর্কী সৈন্য অবস্থান করছে এবং তাদের হাতে পাঁচ হাজার মুসলমান বন্দী হয়ে আছে। সাঈদ রাতের বেলা আক্রমণ করেন এবং ঐ দশ হাজার তুর্কীকে হত্যা করে মুসলমান বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। পরদিন তিনি বাজারদানের দিকে রওয়ানা হন। জনৈক গুপ্তচর এসে সংবাদ দেয় যে, তুর্কীদের অপর একটি বাহিনী নিকটেই অবস্থান করছে। সাঈদ সেই রাতে তাদের উপর আক্রমণ চালান এবং সকলকে হত্যা করে মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন। ঐ বন্দীদের মধ্যে জাররাহ্‌র পুত্র এবং তার পরিবার-পরিজনও ছিল। এরপর পুনরায় তুর্কীরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে। সারান্দ নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয় এবং এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তুর্কীরা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তুর্কীরা পুনরায় আরেকদফা মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। বহু তুর্কী মরণপণ করে বায়কান নদীর তীরে সমবেত হয়। সাঈদ হুরায়শী সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক ঘোরতর যুদ্ধের পর অনেক তুর্কী নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায় তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে গিয়ে নদীতে ডুবে মরে। এই বিজয়ের পর হুরায়শী বাজারদানে ফিরে আসেন এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর তিনি খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে এই বিষয় সংবাদ পাঠান। সেই সাথে মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশও খলীফার দরবারে পাঠানো হয়। খলীফা এরপর সাঈদ হুরায়শীকে দামিশ্‌কে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপন ভাই মাসলামাকে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

সাঈদ হুরায়শী ফিরে আসার পর মাসলামা সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে তুর্কীরা পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তুলে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ মুসলমানদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ও নামকরা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের ভীরুতার কারণে নয়, বরং ইসলামী বাহিনীর সংখ্যাল্পতা ও শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের দিকটি বিবেচনা করে বিশেষ করে ঐ ভয়ংকর এলাকায় তুর্কীদের

হাতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত এবং শিশু ও মহিলাদের বন্দী হওয়ার নিশ্চিত আশংকা থাকায় সেখান থেকে দারবান্দ নামক স্থানে পিছিয়ে আসেন। তিনি আর্মেনিয়ায় তার দেড়-দুই বছরের শাসনামলে তুর্কীদের সাথে অত্যন্ত নম্র সহৃদয় ব্যবহার করার কারণেও তুর্কীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দুঃসাহস করে। মাসলামা যখন দারবান্দে ফিরে আসেন তখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান, যিনি মাসলামারই সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, চুপি চুপি দামেশ্‌কের দিকে পালিয়ে যান এবং খলীফার কাছে মাসলামার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তিনি আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের লোকদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করেন। এর ফলে তুর্কীরা বিদ্রোহ করার দুঃসাহস পায়। এরপর যখন তাদের মুকাবিলা করার সময় আসে তখন তিনি পশ্চাদপসরণ করেন এবং ঐ এলাকা ছেড়ে দারবান্দে ফিরে আসেন। তিনি হিশামকে বলেন, আপনি আমাকে এক লক্ষ বিশ হাজার লড়াকু সৈন্য দিয়ে আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করলে আমি তুর্কীদের আচ্ছামত শায়েস্তা করে ছাড়ব।

খলীফা হিশাম মারওয়ানকে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে বালানজার তথা আর্মেনিয়া অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মাসলামা রোগাক্রান্ত হয়ে দারবান্দে মারা যান। মারওয়ানের সাথে এই বিরাট বাহিনী দেখে তুর্কীরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং শর্তহীনভাবে মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে। মারওয়ান যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনি তুর্কীদের আচ্ছামত শায়েস্তা করে ছাড়েন। ফলে আর্মেনিয়া ও সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মারওয়ানকে হিজরী ১১৪ সনে (৭৩২ খ্রি.) আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন।

কায়সারে রূম (বায়যান্টাইন সম্রাট)

হিশাম আবদুল মালিকের খিলাফত আমলে মুসলমানরা বার বার কায়সারে রূমের বাহিনীকেও পরাজিত করে। আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর যুগ থেকেই শীত ও গ্রীষ্ম মওসুমে উত্তরাঞ্চলীয় দেশসমূহে হামলাকারী বাহিনী মোতায়েন ছিল। ঐ শীত-গ্রীষ্মকালীন বাহিনী কনসটান্টিনোপল ও রোমান এলাকাসমূহে হামলা চালাত। ফলে রোমানদের উপর মুসলমানদের অসাধারণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। হিশামের খিলাফত আমলে মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম, সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম, মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক, মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ, আব্বাস, ওয়ালীদ প্রমুখ রাজকুমার ঐসব বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা পরিচালনা করতেন। রাজকুমারদের সাথে আবদুল্লাহ্ বাত্তাল, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন বাখ্‌ত প্রমুখ বিখ্যাত অশ্বারোহীকেও অধিনায়ক নিয়োগ করা হতো। তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা রূম দেশে (খ্রিস্টান বায়যান্টাইন রাজ্যে) প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। হিশামের যুগে মুসলমানদের হাতে রোমানদের অপরিসীম ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটিবারও বিজয় অর্জন করতে পারে নি।

স্পেনেও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উকবার দুর্বার বিজয় অভিযান ইউরোপের খ্রিস্টান জনসাধারণ ও রাজা-বাদশাহদেরকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলা এবং মুসলমানদের নাম শোনামাত্র তাদের দেহে কম্পনের সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তখন হিজায, ইয়ামান প্রভৃতি অঞ্চলেও শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যায়দ ইব্‌ন আলী (র)

হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) ইব্‌ন আবী তালিবের সাথে কারবালা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের সাথে মক্কায় বনূ ইমাইয়া সরকারের পক্ষ থেকে যে আচরণ করা হয়েছিল, এরপর হাজ্জাজ প্রমুখ হিজায ও ইরাকে যে নিষ্ঠুর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা প্রথম দিকে হিজায ও ইরাকের আরব সম্প্রদায়গুলোকে ভীতসন্ত্রস্ত করে একেবারে নিশ্চুপ করে দিয়েছিল। এরপর সোনাদানা ও ধন-দওলতের যথেষ্ট ব্যবহার মানুষের মনে বনূ উমাইয়ার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। তাদের উপর থেকে জনসাধারণের আন্তরিক আকর্ষণ ও সহানুভূতিও হ্রাস পেতে থাকে। হিশামের শাসনামলে মুসলিম রাষ্ট্রে বাহ্যত শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ইরাক ও হিজাযে হাজ্জাজ, ইব্‌ন যিয়াদ প্রমুখের মত পাষাণহৃদয় ও অত্যাচারী কোন শাসকের অস্তিত্ব ছিল না। তখন বনূ হাশিমের অন্তরে নিজেদের পতন ও বনূ উমাইয়ার উত্থানের দৃশ্যটি ভেসে উঠত। যারা সরাসরি তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে অস্বাভাবিক ধরনের কোন ফায়দা লুটছিল না, তাদেরকে তার নিজেদের (বনূ হাশিমের) প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই মনে করত। তখন ভীতি ও সন্ত্রাসের জগদ্দল পাথরও তাদের বুকের উপর থেকে নেমে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বনূ হাশিম বনূ উমাইয়াদের উচ্ছেদ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর যুগ থেকে তারা এ অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছিল যে, কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধনে শক্তির চাইতে কৌশলই অধিক ফলদায়ক। অতএব অত্যন্ত জোরেশোরে ও নেহাত দক্ষতার সাথে গোপন ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারের কাজ শুরু হয়। বনূ হাশিমের দু'টি গোত্র তথা আলী ইব্‌ন আবী তালিব এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা পৃথক পৃথকভাবে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে একাজ শুরু করে। আব্বাসীয়দের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা আলাবী তথা ফাতিমীদের একটি প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে চাই। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফীকে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে অর্থাৎ হিজরী ১২২ সনে (৭৪০ খ্রি) যায়দ ইব্‌ন আলী জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ শুরু করেন। উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষাপটে যেহেতু উমাইয়াদের গ্রহণযোগ্যতা এতই হ্রাস পেয়েছিল যে, যায়দ ইব্‌ন আলী (র) তাঁর বায়আত গ্রহণ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন। একমাত্র কূফা শহরে তাঁর হাতে প্রায় পনের হাজার লোক বায়আত করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)ও যায়দের সমর্থক ছিলেন। যে সমস্ত লোক অতীতের অবস্থার উপর নজর রাখতেন তারা যায়দকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার এবং আরো কিছু দিন অপেক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের ঐ পরামর্শ গ্রহণ না করে কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফী তা দমনের চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি সংঘর্ষের রূপ নেয়। কূফীরা যেভাবে হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) এবং মুসআব ইব্‌ন যুবায়রকে ধোঁকা দিয়েছিল সেভাবে যায়দ ইব্‌ন আলীকেও ধোঁকা দেয়। যখন অসির চালনা ও বীরত্ব প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হয় তখন তারা জ্ঞানার্জনে উদাসীন ছাত্রদের ন্যায় তার সামনে নানা ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। তারা তাকে বলে, আপনি প্রথমে বলুন, সিদ্দীকে

আকবর ও উমর ফারূককে আপনি কি ধরনের লোক মনে করেন ? তিনি উত্তর দেন, আমি আমার বংশের কোন লোককে এই দুই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করতে শুনিনি। কূফীরা বলে, যখন খিলাফতের প্রকৃত হকদার আপনারই বংশের লোক ছিল এবং যখন এই দুই ব্যক্তি খিলাফতের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার পরও আপনার বংশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়নি তাহলে এখন আপনার পরিবর্তে বনূ উমাইয়ার লোকেরা খিলাফতের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করায় আপনি তাদের খারাপ বলছেন কেন বা তাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন কেন ? একথা বলে তারা তাদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। এখন যায়দ ইব্‌ন আলী তাদেরকে 'রাফিযী' (নেতা পরিত্যাগকারী) উপাধি প্রদান করেন।

শেষ পর্যন্ত মাত্র দুশ বিশজন লোক তাঁর সাথে থাকে। এই সামান্য সংখ্যক লোক নিয়ে তিনি ইউসুফ সাকাফীর কয়েক হাজার লোকের সাথে মুকাবিলা করেন। তিনি কূফার অলিগলিতে প্রত্যেকটি লোকের ঘরে যান এবং বায়আতের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সাহায্য কামনা করেন; কিন্তু কেউই তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার ইরাকের গভর্নরের বাহিনীকে পরাজিত করার পর যায়দ ইব্‌ন আলী (র) নিহত হন। তাঁর কপালে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইউসুফ ইব্‌ন উমর সাকাফী দেহ থেকে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে তা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে দামিশ্‌কে পাঠিয়ে দেন। যায়দ ইব্‌ন আলীর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দ পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে নীনিওয়ার দিকে চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর সুযোগ বুঝে খুরাসানের দিকে চলে যান। যায়দের প্রচেষ্টা তাড়াহুড়া ও অদূরদর্শিতার কারণে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আব্বাসীরা এ থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়। তারা এই শিক্ষা লাভ করে যে, এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া এই ঘটনার পূর্বে বনূ উমাইয়ার বর্তমান প্রভাব ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। যায়দ ইব্‌ন আলীর মৃত্যুতে আরো বেশি লোক বনূ হাশিমের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। কেননা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক একদিকে যেমন যায়দের কর্তিত মস্তক দামিশকের সদর দরজায় রেখেছিলেন, অন্যদিকে ইউসুফ সাকাফী কূফার শূলীতে ঝুলিয়ে রেখেছিল তাঁর সঙ্গীদের লাশ। ঐ লাশগুলো বছরের পর বছর ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে জনসাধারণকে বনূ উমাইয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী এবং বনূ হাশিমের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল।

আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্র

আবু হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ হানাফিয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক প্রমুখ বনূ উমাইয়ার খলীফাগণ খুবই সম্মান এবং সমীহ করতেন। কিন্তু হাশিমী হওয়ার কারণে বনূ উমাইয়ার প্রতি তিনিও শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি তাদের উচ্ছেদ ও বনূ হাশিমের প্রতিষ্ঠা লাভ অন্তর দিয়ে কামনা করতেন। তাঁর এই চেষ্টা শুধু তাঁর বন্ধু অনুরক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে যাকে তিনি বিশ্বস্ত মনে করতেন শুধু তার কাছেই এই গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। আর এ ধরনের লোকের সংখ্যা কম ছিল না, বরং অনেক বেশিই ছিল। তারা ইরাকেও বাস করত, আবার খুরাসান এবং হিজাযেও।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুত্তালিব ও বনূ উমাইয়াকে উচ্ছেদ করে বনূ আব্বাসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলেন। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে একদা আবূ হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ তার কাছে দামিশ্‌কে যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বালকার হামীমাহ নামক স্থানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের সাথে অবস্থান করতে থাকেন। ঘটনাক্রমে তিনি মুহাম্মদকে ওসীয়ত করেন ঃ তুমি খিলাফত লাভের চেষ্টা চালাবে। এই ওসীয়ত মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে বহুলভাবে উপকৃত করে। অর্থাৎ যেসব লোক আবূ হাশিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদের ভক্ত ছিল তারা সকলেই গোপনে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর হাতে বায়আত হয়। এরপর হিজরী ১০০ সনে (৭১৮-১৯ খ্রি) যখন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসী ইরাক, খুরাসান, হিজায, ইয়ামান, মিসর প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলোতে অত্যন্ত সংগোপনে নিজস্ব দূত প্রেরণ করেন। বনূ উমাইয়ার প্রতি মানুষের যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) যদিও তা অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবুও মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী বালকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে সেখান থেকে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আপন আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। কিছু দিন পর তিনি তাঁর বারজন নকীব (প্রতিনিধি) নিয়োগ করে তাদেরকে ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেন। ঐ সব নকীব প্রত্যেক জায়গায়ই সাফল্য লাভ করে।

হিজরী ১০২ সনে (৭২০-২১ খ্রি) অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ১০৪ সনে (৭২২-২৩ খ্রি) আবূ মুহাম্মদ সাদিক খুরাসানী সেখানকার দাওয়াত গ্রহণকারী কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন মুহাম্মদ তাঁর ১৫ দিনের নবজাত পুত্র সন্তানকে কোলে করে নিয়ে আসেন এবং ঐ লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন, এ-ই হবে তোমাদের নেতা (ঐ শিশুই ছিল পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্)। এরপর জুনায়দের সাথে সিন্ধুতে অবস্থানকারী বুকায়র ইব্‌ন মাহান সেখান থেকে কূফায় আসেন এবং আবূ মুহাম্মদ সাদিকের সাথে দেখা করেন। তিনি বুকায়রকে দাওয়াত দেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা কবূল করেন।

এটা হচ্ছে হিজরী ১০৫ সনের (৭২৩-২৪ খ্রি) ঘটনা। হিজরী ১০৭ সনে (৭২৫-২৬ খ্রি) বুকায়র ইব্‌ন মাহান, যিনি কূফায় মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর পক্ষ থেকে ইরাক ও খুরাসান অঞ্চলের দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, আবূ ইকরামা, আবূ মুহাম্মদ সাদিক, মুহাম্মদ খুনায়ন, আম্মার ইবাদী প্রমুখ ব্যক্তিকে খুরাসান অঞ্চলে খিলাফতে আব্বাসীয়ার দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন। তখন খুরাসানের গভর্নর ছিলেন আসাদ কাসরী। ঘটনাক্রমে তিনি জানতে পারেন যে, কিছু লোক খিলাফতে আব্বাসীয়ার জন্য জনসাধারণকে দাওয়াত দিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবাইকে বন্দী করে হত্যা করেন। শুধু আম্মার নামীয় জনৈক ব্যক্তি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এবার সে বুকায়র ইব্‌ন মাহানকে ঐ দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। বুকায়র এ সংবাদই মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে লিখিতভাবে জানান। তিনি উত্তরে লিখেন, আল্লাহ্‌র শোকর যে, তোমাদের প্রচেষ্টা

ফলপ্রসূ হয়েছে। এখন তুমি নিজেকেও মৃত্যুর জন্য তৈরি রাখ। হিজরী ১১৮ সনে (৭৩৭ খ্রি) তিনি আম্মার ইব্‌ন যায়দকে বনূ আব্বাসের সমর্থকদের নেতা নিয়োগ করে খুরাসানে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজেকে খার্‌রাশ (মট্‌কা বিক্রেতা) নামে পরিচয় দেন। খাররাশ বনূ আব্বাস প্রীতিকে নামায-রোযার উপরও প্রাধান্য দিতেন। তিনি লোকদের বলতেন, তোমরা বনূ আব্বাসের খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা কর এবং বিষয়টি যাতে ফাঁস হয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। মনে রেখ, এ কাজটি নামায-রোযার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এই সংবাদ শুনে খার্‌রাশের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। খুরাসানের গভর্নর আসাদ কাসরী খার্‌রাশের আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে খুরাসানবাসীদের উপর অসন্তুষ্ট হন। তাই খুরাসানের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে নিজেদের অপরাধের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী স্বয়ং নকীব নিয়োগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। তিনি নকীবদের জন্য নিজেদের কাছ থেকে কয়েকটি (লাঠি) প্রদান করেন, যেগুলোকে নকীবী বা প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন বলে মনে করা হতো। হিজরী ১২৪ সনে (৭৪২ খ্রি) মুহাম্মদ বন্দী অবস্থায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে আপন পুত্র ইবরাহীমকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) নিয়োগ করে যান। তিনি তাঁর নকীব ও অনুসারীদের ওসীয়ত করেন, আমার পরে তোমরা সবাই ইবরাহীমকে তোমাদের ইমাম মানবে এবং সর্বদা তাঁর অনুগত থাকবে। বুকায়র ইব্‌ন মাহান ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত নিয়ে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজের সমমনা লোকদের মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর ইনতিকাল এবং তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ দেন এবং যাবতীয় নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিফহাল করেন। এবার বনূ আব্বাসের ভক্ত-অনুরক্তরা যা কিছু অর্থকড়ি তাদের হাতে ছিল তা একত্র করে। এরপর বুকায়র সেই অর্থ নিয়ে ইমাম ইবরাহীমের খিদমতে হাযির হলো। হিজরী ১২৪ সনে (৭৪২ খ্রি) ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে খুরাসানে প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম, ইমাম ইবরাহীম ও এই আন্দোলন সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের ওসীয়ত অনুযায়ী হিশামের পর অলীআহ্‌দ ছিলেন ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ। কিন্তু হিশামের ইচ্ছা ছিল, তিনি ওয়ালীদকে বঞ্চিত করে তার স্থলে আপন পুত্রকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করবেন। কিন্তু রাজদরবারের আমীর ও সভাসদগণ তাতে রাযী হননি। ফলে তাঁর ঐ ইচ্ছা পূরণ হতে পারেনি। কিন্তু এই তৎপরতার ফলে হিশাম ও ওয়ালীদের মধ্যে মন-কষাকষির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১২৫ সনের ৬ই রবিউস সানী (৭৪৩ খ্রি ফেব্রুয়ারী) সাড়ে উনিশ বছর খিলাফত পরিচালনার পর হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম হিজরী ৯০ সনে (৭০৯ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীর ভাতিজী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের কন্যা। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল অল্প। শুরু থেকেই তাঁর আচার-আচরণ সুবিধাজনক ছিল না। নানা পাপাচারে লিপ্ত থাকার দরুন তার দেহ ছিল দুর্বল ও শীর্ণ। এই প্রেক্ষিতে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক কর্তৃক তাকে অলীআহ্‌দী থেকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ খুব একটা আপত্তিকর ছিল না। কিন্তু অদূরদর্শী আমীর ও সভাসদদের বিরোধিতার কারণে হিশামের সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের পর ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ওয়ালীদের খিলাফত আমল প্রকৃতপক্ষে খিলাফতে বনূ উমাইয়ার পতনের দ্বার উন্মুক্ত করে।

ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই যে সমস্ত লোককে তিনি তার বিরোধী মনে করতেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ শুরু করেন। তিনি কারো ভাতা বন্ধ করে দেন, কাউকে বন্দী করেন, আবার কাউকে হত্যা করেন। তিনি আপন চাচাত ভাই সুলায়মান ইব্‌ন হিশামকেও ধরে এনে বেত্রাঘাত করেন। এরপর তার দাড়ি মুণ্ডন করে বিভিন্ন অলিগলি প্রদক্ষিণ করিয়ে তাকে অপমান করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন হিশাম এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের কয়েকজন পুত্রকেও বন্দী করে রাখেন। মোটকথা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সর্বপ্রথম নিজের পরিবারের অধিকাংশ লোককে, মদীনার গভর্নর হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল মাখযূমীর পুত্রদেরকে এবং ইরাকের প্রাক্তন গভর্নর খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কাসরীকে গ্রেফতার করে ইরাকের শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্‌ন উমরের হাতে সোপর্দ করেন। ইউসুফ ঐ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান। ফলে তাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আপন খিলাফতের প্রথম বছরেই অর্থাৎ হিজরী ১২৫ সনে (৭৪৩ খ্রি) ওয়ালীদ আপন পুত্রদের (উসমান ও হাকাম) যদিও জনসাধারণের কাছ থেকে অলীআহ্‌দীর বায়আত নেন, যদিও পূর্ব থেকে অলীআহদের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণও এ ধরনের বায়আতে অভ্যস্ত ছিল, তবু কেউই খোলা মনে এই ছেলেদের জন্য বায়আত করেনি।

ওয়ালীদ শুধু উপরোক্ত ভুলত্রুটিই করেন নি, বরং সেই সাথে আপন বাতিল আকাইদ ও চিন্তাধারার কথাও প্রকাশ্যে প্রচার করে জনসাধারণকে দারুণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলেন। মদ্যপান এবং ব্যভিচারেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এই সমস্ত কথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের গভর্নর ও কর্মকর্তাগণ তার সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্রমে খিলাফতে বনূ উমাইয়ার প্রতি সাধারণ মানুষও তাদের যাবতীয় আকর্ষণ ও সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে।

হিজরী ১২৫ সনে (৭৪৩ খ্রি) অর্থাৎ আপন খিলাফতের প্রথম বছরেই ওয়ালীদ খুরাসান প্রদেশকে ইরানের অন্তর্ভুক্ত করে খুরাসানের গভর্নর নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারকে পদচ্যুত করেন।

নাস্‌রের কাছে একদিকে ওয়ালীদের এবং অপর দিকে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ ইব্‌ন উমরের কাছে এই মর্মে একটি নির্দেশ গিয়ে পৌঁছে ঃ তোমাকে পদচ্যুত করা হলো। তুমি অবিলম্বে রাজধানী দামিশকে এসে তোমার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দাও।

উমাইয়া শাসনামলে প্রদেশসমূহের বিভক্তি

বনূ উমাইয়ার যুগে ইসলামী রাষ্ট্র বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন আমীর (ভাইসরয় বা গভর্নর) নিযুক্ত হতেন। প্রত্যেক গভর্নর আপন অধীনস্থ প্রদেশে সম্পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হতেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকেই তার অধীনস্থ রাজ্যসমূহের হাকিম নিয়োগ করতেন। হিজায, ইরাক, জাযীরা, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন, খুরাসান প্রভৃতি ছিল বৃহৎ প্রদেশগুলোর অন্যতম। মক্কা, মদীনা, তাইফ ও ইয়ামান অঞ্চলকে হিজায প্রদেশ থেকে আলাদা করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়। সেখানকার হাকিম দারুল খুলাফা তথা কেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন। জর্দান, হিম্‌স, দামিশ্‌ক ও কিন্‌নাসরীন রাজ্য বা অঞ্চল সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফ্রিকাকে কখনো মিসরের অন্তর্ভুক্ত করা হতো, আবার কখনো পৃথক একটি প্রদেশ ঘোষণা করে সরাসরি কেন্দ্র থেকে কায়রাওয়ানের গভর্নর নিয়োগ করা হতো। অনুরূপভাবে স্পেনকে কখনো পৃথক প্রদেশ ঘোষণা করা হতো এবং সেখানকার হাকিম, কেন্দ্র তথা সরাসরি খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। আবার কখনো সেটাকে কায়রাওয়ানের আমীরের অধীনস্থ করে আফ্রিকা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এমতাবস্থায় কায়রাওয়ানের আমীর আপন ইচ্ছানুযায়ী কাউকে স্পেনের হাকিম নিযুক্ত করতেন। ইরাক এবং খুরাসানেরও একই অবস্থা ছিল। কখনো খুরাসান একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গণ্য হতো এবং সেখানকার গভর্নর বা আমীর সরাসরি কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত হতেন। আবার কখনো খুরাসানকে হাকিম ইরাকের গভর্নরের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হতেন। প্রদেশের আমীর এবং রাজ্য বা অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা আপন অধীনস্থ ভূখণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতেন। আবার কখনো কখনো এমনও হতো যে, রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্ব অর্থাৎ খারাজ ও জিয্‌য়া আদায় করার দায়িত্ব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোন পৃথক ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হতো। কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত রাজস্ব অফিসারকে প্রদেশ কিংবা রাজ্যের হাকিমের অধীনস্থ মনে করা হতো না। তবে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সব সময়ই সংশ্লিষ্ট প্রদেশের শাসনকর্তার হাতে থাকত। রাজস্ব অফিসারের ন্যায় কখনো কখনো প্রদেশের 'আমীরে শরীআত' কিংবা প্রধান বিচারপতিও সরাসরি কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত হতেন। তবে সংশ্লিষ্ট আমীর নামাযসমূহের ইমামতি করতেন। অর্থাৎ নামাযসমূহের ইমামতি ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব– এ দু'টি দায়িত্ব আমীরের উপর ন্যস্ত থাকত। পরবর্তীকালে নামাযের ইমামতি এবং প্রদেশের প্রশাসনও পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও জুমুআর খুতবা প্রদানের দায়িত্ব প্রদেশের গভর্নর এবং প্রধান সেনাপতির উপরই ন্যস্ত থাকে।

নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারের কাছে তার পদচ্যুতির নির্দেশ পৌঁছলে প্রথম প্রথম তিনি তা মেনে নিলেও পরে নানা দিক চিন্তা করে খুরাসানের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ না করারই সংকল্প নেন এবং

নিজেকে স্বাধীন শাসক ঘোষণা করেন। পূর্বাপর ঘটনাবলীর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা এই যে, যখন নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারের কাছে তার পদচ্যুতির নির্দেশ পৌঁছেনি এবং যখন তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে খলীফা মানতেন ঠিক তখনি তার কাছে অপর একটি নির্দেশ পৌঁছেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, তুমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দ আলাবীকে যিনি নিজ পিতার নিহত হওয়ার পর খুরাসানের অন্তর্গত বল্‌খ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন—অবিলম্বে গ্রেফতার করে দামিশকে পাঠিয়ে দাও। নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দকে ডেকে এনে গ্রেফতার করেন এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে লিখেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়াকে বন্দী করে ফেলেছি। নাস্‌র তখন ইয়াহ্‌ইয়াকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, তুমি দামিশকে খলীফার কাছে যাও। ইয়াহ্‌ইয়া সেখান থেকে দামিশক অভিমুখে রওয়ানা হলেও রাস্তা থেকে পুনরায় খুরাসানে ফিরে যান। সেখানে তার সাথে ভক্ত-অনুরক্তদের একটি দল জুটে যায়। তখন নাস্‌র তার মুকাবিলার জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ইয়াহ্‌ইয়ার সব সঙ্গী মারা যায়। তার কপালেও একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং তাতে তিনিও মারা যান। এই ঘটনা ১২৫ হিজরীতে (৭৪৩ খ্রি) জুরজান নামক স্থানে সংঘটিত হয়। ইয়াহ্‌ইয়ার ছিন্ন মস্তক ওয়ালীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর তার লাশটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটি শূলীতে, যা দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত সেখানে ঝুলতে থাকে। অবশেষে আবূ মুসলিম খুরাসানী তা শূলী থেকে নামিয়ে তার দাফনের ব্যবস্থা করেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে জনসাধারণ তার প্রতি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তিনি যখন তার চাচাত ভাইদের উপরও নির্যাতন চালান তখন তারা শুধু তার প্রতি অতিষ্ঠই হয়ে উঠেনি, বরং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। তার চাচাত ভাই ইয়াযীদ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শাহী পরিবারে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে অধিকতর পুণ্যবান ও আল্লাহ্‌ওয়ালা মনে করা হতো। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তার শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং সাধারণ্যেও তা প্রকাশ করে দেন। এতে অনেক লোক তাঁর সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ইয়াযীদের পিছনে শুধু সামরিক অধিনায়ক বা আমীর-উমারার সমর্থন ছিল না, বরং শাহী পরিবারের সদস্যদেরও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শেষ পর্যন্ত সবাই গোপনে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাতে বায়আত করে এবং সিরীয় বাহিনীর একটি বিরাট অংশও তাঁকে সমর্থন দিতে থাকে। এরপর তিনি দামিশ্‌ক থেকে চলে যান এবং কিছুটা দূরবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান করতে থাকেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর প্রতিনিধিদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন, যাতে তারা জনসাধারণের কাছে ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ তুলে ধরে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জনমত তার বিরুদ্ধে ও ইয়াযীদের অনুকূলে চলে আসে। বনূ উমাইয়া বিশেষ করে রাজপরিবারের মধ্যে এই প্রথমবারের মত এমন ভয়ানক মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা, এমনকি প্রচারণামূলক তৎপরতাও শুরু করে দেয়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র পরিস্থিতি ওয়ালীদের বিরুদ্ধে এবং ইয়াযীদের পক্ষে চলে যায়। ইয়াযীদের ভাই আব্বাস যদিও ওয়ালীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার দ্বারা কিছুটা নির্যাতিতও হয়েছিলেন তবু তিনি আপন ভাই ইয়াযীদকে এই বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা থেকে নিরস্ত রাখার চেষ্টা করেন। এই

বিরোধিতার কারণেই ইয়াযীদ বিরক্ত হয়ে দামিশ্‌ক ছেড়ে একটি পৃথক জায়গায় গিয়ে [illegible] করতে থাকেন। ইয়াযীদ সব দিক দিয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পর ১২৬ হিজরীর ২৭ শে জমাদিউস্ সানী (৭৪৪ খ্রি-এর এপ্রিল) শুক্রবার বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করেন। ইশার নামাযান্তে দামিশকে প্রবেশ করে প্রথমে তিনি পুলিশ প্রধানকে গ্রেফতার করেন, এরপর সরকারী অস্ত্রাগারের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইতিপূর্বে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন নি। তাই এই অবস্থা দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং রাজপ্রাসাদের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। এবার দামিশ্‌ক ও তার আশেপাশের লোকেরা দল বেঁধে এসে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাতে বায়আত করতে থাকে। ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ দামিশক থেকে হিম্‌সের দিকে যেতে চান। শেষ পর্যন্ত কাসরে নু'মানী নামক স্থানে ইয়াযীদ ওয়ালীদকে ঘেরাও করে ফেলেন। ওয়ালীদের সঙ্গীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে। আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ অর্থাৎ ইয়াযীদের সহোদর আপন সঙ্গীদের নিয়ে ওয়ালীদকে সাহায্য করেন এবং ইয়াযীদের মুকাবিলার জন্য দামিশ্‌ক থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পথিমধ্যে মানসূর ইব্‌ন জামহুর তাকে গ্রেফতার করে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সামনে নিয়ে হাযির করে। ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ যখন বুঝতে পারেন যে, এখন আর রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তখন এই বলে পবিত্র কুরআন পড়তে বসে যান যে, হযরত উসমান (রা)-এর উপর যেইদিন এসেছিল আজ সেইদিন আমার উপরও এসেছে। ইয়াযীদের লোকেরা রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নেয়। মানসূর ইব্‌ন জামহুর সেই মস্তক ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সামনে পেশ করেন। ইয়াযীদ নির্দেশ দেন, এটাকে ভালভাবে প্রদর্শনের পর ওয়ালীদের ভাই সুলায়মানকে দিয়ে দাও। নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়। এক বছর তিন মাস খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১২৬ হিজরীর ২৮শে জমাদিউস্ সানী (৭৪৪ খ্রি-এর এপ্রিল) ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ নিহত হন। ঐ দিনই ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। বনূ উমাইয়ার মধ্যে অন্তর্বিরোধ এমনি অবস্থার সৃষ্টি করে যে, তারা দিনের পর দিন অধঃপতনের দিকে যেতে থাকে এবং পুনরায় শক্তি অর্জন করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক

আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামকে 'ইয়াযীদে ছালিছ' (তৃতীয় ইয়াযীদ) এবং ইয়াযীদুন্ নাকিস (অধম ইয়াযীদ)-ও বলা হয়। ইয়াযীদুন্ নাকিস এজন্য বলা হয় যে, তিনি সৈন্যদের ভাতা কমিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ওয়ালীদ খলীফা হওয়ার পর সৈন্যদের ভাতা মাথাপিছু যে দশ দিরহাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি তা কমিয়ে পুনরায় পূর্বের ভাতাই নির্ধারণ করেন। তিনি তাদের বলেন, "ইয়াযীদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ ভাল ছিল না। তাই সে নিহত হয়েছে। আমি এখন তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করব। তোমরা তোমাদের বেতনাদি নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই পেয়ে যাবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রেখা মজবুত ও সুদৃঢ় এবং প্রতিটি শহরকে আদল ও ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ করে না তুলব ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা প্রয়োজনে তোমাদের কাউকে কোন

জায়গীর দেওয়া হবে না। আমার দরজায় কোন প্রহরী রাখব না। যাতে প্রতিটি লোক আমার সাথে সহজেই সাক্ষাত করতে পারে। যদি আমি ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাকে পদচ্যুত করার ইখতিয়ার তোমাদের রয়েছে।" এরপর ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ জনসাধারণের কাছ থেকে যথাক্রমে ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং আবদুল আযীয ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আবদুল মালিকের অলীআহ্‌দীর বায়আত গ্রহণ করেন।

হিম্‌সবাসীরা ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের হত্যার খবর জানতে পেরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ওয়ালীদ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়াকে নিজেদের নেতা নিয়োগ করে দামিশকের দিকে অগ্রসর হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিককে একটি বাহিনী দিয়ে তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। প্রথমে হিম্‌সবাসীদের সামনে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব তারা গ্রহণ না করলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ নিহত হন, হিম্‌সবাসীদের অনেকেই মারা যায় এবং বাকিরা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে।

এই সংবাদ শুনে ফিলিস্তীনবাসীরাও বিদ্রোহ করে এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে নিজেদের নেতা মনোনীত করে। জর্দানবাসীরা যখন এই সংবাদ পায় তখন তারা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে নিজেদের বাদশাহ্‌ মনোনীত করে এবং ফিলিস্তীন-বাসীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়। এরপর উভয় বাহিনী একত্রিত হয়ে দামিশকের দিকে রওয়ানা হয়। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকদেরকে ইতিপূর্বে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ নিজের সমর্থক করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন খলীফা-হত্যার ঘটনা ঘটেনি। যখন খলীফাকে হত্যা করা হয় তখন আপনা-আপনি ঐ সমস্ত লোকের অন্তরে নিহত খলীফার প্রতি সহানুভূতি ও বর্তমান খলীফার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আর এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারও ছিল না। আমরা সচরাচর দেখি যে, যখন একজন হত্যাকারী ডাকাতকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় তখন ন্যায়ত প্রতিটি লোকই তাকে ফাঁসির যোগ্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন তারা ঐ ডাকাতকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখে তখন তার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং তার সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাদের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল তা হঠাৎ যেন দূর হয়ে যায়। যা হোক, ঐ বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে ইয়াযীদ তাদের প্রতিরোধের জন্য সুলায়মান ইব্‌ন হিশামের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তিনি তাদের পরাজিত করে খলীফার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

সিরিয়ার উল্লিখিত গণ্ডগোল প্রশমনের পর ইয়াযীদ ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মানসূর ইব্‌ন জামহুরকে ইরাক ও খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইউসূফ মানসূরকে যথারীতি গভর্নরের দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়ে গোপনে ইরাক থেকে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু দামিশকের নিকটবর্তী হতেই ইয়াযীদ তাকে বন্দী করেন এবং ঐ অবস্থায়ই তিনি নিহত হন। মানসূর ইব্‌ন জামহুর কুফায় পৌঁছে ইউসুফের সময়কার বন্দীদেরকে মুক্ত করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে আপন ভাইকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু নাসর ইব্‌ন সাইয়ার তাকে খুরাসানে প্রবেশ করতে দেননি। তখনও এই ঝগড়ার কোন মীমাংসা

হয়নি এবং মানসূর মাত্র দু'মাস হয় কূফায় এসেছেন, এমনি সময়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ মানসূরকে পদচ্যুত করে তার স্থলে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন। মানসূর ইরাকের গভর্নরের দায়িত্ব আবদুল্লাহকে বুঝিয়ে দিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। আবদুল্লাহ্ নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারকে যথারীতি খুরাসানের হাকিম নিয়োগ করেন। ঐ সময়ে ইয়ামামাও ইরাক প্রদেশের শাসনাধীন ছিল। ইয়ামামাকে কখনো হিজাযের অন্তর্ভুক্ত করা হতো, আবার কখনো ইরাকের। ইউসুফ ইব্‌ন উমরের যুগেই ইয়ামামাবাসীরা সেখানকার হাকিম আলী ইব্‌ন মুহাজিরকে বের করে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং তখন পর্যন্ত সেখানে ঐ অবস্থাই চলছিল।

আবদুল্লাহ্ ইরাকের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করে যখন নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে নিজের পক্ষ থেকে খুরাসানের হাকিম নিয়োগ করেন তখন সেখানে জুদায় ইব্‌ন কিরমানী আযদী নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। জুদায় আসলে আযদী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কিরমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই কিরমানী নামেই পরিচিত হন। তিনি যখন দেখেন যে, নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার, যিনি ইতিপূর্বে খুরাসানের স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন, এখন কূফার গভর্নর পদ লাভ করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন, তখন খুবই দুঃখিত হন। তিনি তার বন্ধুদের বলেন, এই লোকটি ফিতনায় পড়ে গেছে। তোমরা তোমাদের কার্য সম্পাদনের অন্য কাউকে আমিল নির্বাচন কর। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার এবং কিরমানীর মধ্যে প্রথম থেকেই মনোমালিন্য ছিল এবং কিরমানী এই নতুন ফিতনা সৃষ্টি করায় নাসর তাকে বন্দী করেন। এটা হচ্ছে ১২৬ হিজরীর ২৭শে রমযানের (৭৪৪ খ্রি. জুলাই) ঘটনা। কিরমানী কিছুদিন বন্দী অবস্থায় থাকেন। এরপর বন্দীশালার দেওয়াল ডিংগিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীও গড়ে তোলেন। অপরদিকে নাস্‌রও তাকে দমন করার জন্য একজন অধিনায়ক নিয়োগ করেন। কিন্তু লোকেরা মধ্যস্থতা করে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করে। এর ফলে কিরমানী নাস্‌রের কাছে চলে আসেন। তখন নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার তাকে নির্জন জীবনযাপনের পরামর্শ দেন। কিন্তু কিছুদিন পরই কিরমানী পুনরায় বিদ্রোহের সংকল্প নেন। মোটকথা, এভাবে বেশ কয়েকবারই যুদ্ধ প্রস্তুতি চলে এবং পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কিরমানী খুরাসান ছেড়ে জুরজানে চলে যাবেন। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরও হয়।

যে দিনগুলোতে নাসর ও কিরমানীর মধ্যে বার বার মতবিরোধের সৃষ্টি হচ্ছিল এবং সমগ্র পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করছিল তখন নাসরের এই আশংকা হয় যে, কিরমানী হয়ত তুর্কিস্তান থেকে হারস ইব্‌ন শুরায়হ্‌কে ডেকে এনে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। হারস ইব্‌ন শুরায়হ্ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি বার-তের বছর যাবত তুর্কিস্তানে অবস্থান করছিলেন। যাহোক, পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে নাসর মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানী নাবাতীকে হারসের কাছে পাঠান এবং তাকে (নাসরের) কাছে ডেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অপর দিকে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীরের কাছে কূফায় এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের কাছে দামিশকে পত্র প্রেরণ করেন। তাতে হারস ইব্‌ন শুরায়হ সম্পর্কে যে আশংকা রয়েছে তার উল্লেখ করে সুপারিশ করা হয়, যেন তাকে নিরাপত্তা প্রদান

করে ডেকে নিয়ে আসার অনুমতি প্রদান করা হয়। উভয় স্থান থেকেই আমাননামা (নিরাপত্তা পত্র) চলে আসে। এদিকে হারস ইব্‌ন শুরায়হ্‌ও তুর্কিস্তান থেকে খুরাসানে চলে আসেন। নাসর তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তার দৈনিক ভাতা পঞ্চাশ দিরহাম নির্ধারণ করে দেন। তিনি তাকে এও বলেন, আপনি যে শহরেরই শাসনক্ষমতা চান সেখানেই আপনাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হবে। হারস বলেন, আমি শাসনক্ষমতা বা ধন-দৌলতের প্রত্যাশী নই, বরং কুরআন-সুন্নাহ্‌ নিয়েই পড়ে থাকতে চাই। জুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি বরদাশ্‌ত করতে না পেরে আমি এই সমস্ত শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। বার-তের বছর পর তুমি পুনরায় আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছ। একথা শুনে নাসর নীরব হয়ে যান। এরপর হারস কিরমানীর কাছে বলে পাঠান, যদি নাসর ইব্‌ন সাইয়ার কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করেন তাহলে আমি তার পক্ষ অবলম্বন করব এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ব। আর যদি তিনি কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল না করেন তাহলে আমি পুনরায় তোমার সাথে যোগ দেব। কেননা তুমি কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করার অঙ্গীকার করেছ। এরপর হারস বনূ তামীম ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের প্রতি তার শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেবার আহ্বান জানান। কিছু দিনের মধ্যেই তিন হাজার লোক তার হাতে বায়আত করে।

খুরাসানের পরিস্থিতি তো এই ছিল, যা উপরে বর্ণনা করা হলো। তখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান আর্মেনিয়ার এবং আবদুহ্‌ ইব্‌ন রাইয়াহ্‌ গাস্‌সানী ছিলেন জাযীরার গভর্নর। যখন ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ নিহত হন তখন আবদুহ্‌ গাস্‌সানী জাযীরা থেকে সিরিয়ায় চলে যান। মারওয়ান ইবন মুহাম্মদের পুত্র আবদুল মালিক যখন দেখলেন যে, জাযীরা প্রদেশ একেবারে শূন্য তখন তিনি সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপন পিতা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানকে লিখেন, এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। আপনি ওয়ালীদ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এদিকে ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ হিম্‌স, জর্দান ও ফিলিস্তীনের বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করে উঠতে পারেন নি এমন সময় সংবাদ পান যে, মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ইয়াযীদের জন্য এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি নাজুক মুহূর্ত। তিনি বায়আতের আহ্বান জানিয়ে মারওয়ানকে লিখেন, যদি তুমি আমার হাতে বায়আত কর তাহলে তোমাকে সমগ্র জাযীরা, আযারবায়জান, আর্মেনিয়া ও মাওসিল প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে। তখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইয়াযীদের হাতে বায়আত করেন এবং ইয়াযীদ নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে উপরোক্ত প্রদেশসমূহের গভর্নর নিয়োগ করেন। এভাবে রাস্তা থেকেই মারওয়ান ফিরে যান এবং উল্লিখিত প্রদেশসমূহ শাসন করতে থাকেন। পূর্বে তিনি শুধু আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। এবার মাওসিল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

'ইয়াযীদুন্‌ নাকিস' খ্যাত ইয়াযীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আপন স্বভাব-চরিত্র ও যোগ্যতার দিক দিয়ে খারাপ ছিলেন না। তবে তাঁর আয়ু ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ১২৬ হিজরীর ২০ যিলহজ্জ (৭৪৪ খ্রি.-এর অক্টোবর) মাত্র ছয় মাসের মত খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক

'ইয়াযীদুন্ নাকিস'-এর মৃত্যুর পর তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী তাঁর ভাই আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা হন। ইবরাহীমের হাতে সাধারণভাবে বায়আত করা হয়নি। আর যারা বায়আত করেছিল তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজ নিজ বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। আর্মেনিয়ার গভর্নর মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইয়াযীদের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। প্রথমে তিনি কিন্‌নাসরীনে পৌঁছেন এবং তা জয় করে হিম্‌সের দিকে রওয়ানা হন। হিম্‌সবাসীরা ইবরাহীমের হাতে বায়আত করেনি। তাই আবদুল আযীয ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে দামেশ্‌ক থেকে প্রেরিত ইবরাহীমের সেনাবাহিনী হিম্‌স অবরোধ করে রেখেছিল। যখন খবর পাওয়া গেল যে, মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ধারেকাছে এসে পৌঁছেছেন তখন আবদুল আযীয দামেশকের দিকে চলে যান। এরপর মারওয়ান হিম্‌সে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা বিনাদ্বিধায় তার হাতে বায়আত করে। ইবরাহীম এই সমস্ত বিষয়ে অধিনায়কত্বে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মারওয়ানের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। মারওয়ানের কাছে মোট আশি হাজার সৈন্য ছিল। তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে এই মর্মে পয়গাম পাঠান ঃ আমি ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের রক্তের দাবি ত্যাগ করছি। তুমি তার দুই পুত্র হাকাম ও উসমানকে মুক্তি দাও, যাদেরকে ওয়ালীদ 'অলীআহদ' নিয়োগ করেছিলেন। সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাতে সুলায়মান পরাজিত হন। এই যুদ্ধে তার সতর হাজার সৈন্য নিহত হয়। এরপর মারওয়ান ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদের দুই পুত্র হাকাম ও উসমানের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করে দামিশকের দিকে অগ্রসর হন। দামিশকে ইবরাহীম এবং তার উপদেষ্টারা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, হাকাম এবং উসমান উভয়কেই হত্যা করে ফেলা উচিত। শেষ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায়ই দু'জনকে হত্যা করা হয়। মারওয়ান বিজয়ী বেশে দামেশকে প্রবেশ করেন। অপর দিকে ইবরাহীম, সুলায়মান প্রমুখ দামেশক থেকে তাদাম্মুরের দিকে পালিয়ে যান। মারওয়ান হাকাম ও উসমানের লাশ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং জানাযার নামায পড়ে দাফনের ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেন, এবার তোমরা কাকে নিজেদের খলীফা বানাতে চাও ? সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে খলীফা মনোনীত করে এবং তাঁর হাতে বায়আত করে। এটা হচ্ছে হিজরী ১২৭ সনের ২৪শে সফর (৭৪৪ খ্রি.-এর ডিসেম্বর) রোজ সোমবারের ঘটনা। মারওয়ান ইবরাহীমকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং ইবরাহীমও সন্তুষ্টচিত্তে মারওয়ানের পক্ষে নিজের খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। ইবরাহীম ইব্‌ন ওয়ালীদের খিলাফত সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ তাঁকে খলীফা মনে করেন, আবার কেউ মনে করেন না। কেননা তাঁর খিলাফত সমগ্র ইসলামী বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করার পূর্বেই তিনি তা থেকে ইস্তফা দেন। আর তাঁকে খলীফা বলে সবাই স্বীকার করলেও তাঁর খিলাফতকাল মাত্র দু'মাস কয়েক দিনের বেশি ছিল না।

মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম

মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ হচ্ছেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা। তাঁকে লোকেরা 'মারওয়ানুল হিমার' (গর্দভ মারওয়ান) নামে অভিহিত করত। ধৈর্যশীল প্রাণী হিসাবে আরবরা গাধার খুব প্রশংসা করত। এই প্রেক্ষিতে কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিকে তারা কখনো কখনো 'গাধা' উপাধি দিত। মারওয়ানকে গাধা উপাধি দেওয়ার কারণ ছিল, তিনি তাঁর সমগ্র খিলাফতকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করেন এবং বরাবরই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর রাজধানী দামিশক থেকে হাররানে স্থানান্তরিত করেন। তাদাম্মুর থেকে তিনি ইবরাহীমকে (বরখাস্তকৃত খলীফাকে) নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। ১লা শাওয়াল মারওয়ানের কাছে এই মর্মে একটি সংবাদ পৌঁছে যে, হিম্‌সবাসীরা ইতিমধ্যে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং শীঘ্রই বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাছাড়া চতুর্দিক থেকে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাদের কাছে এসে সমবেত হয়েছে। তিনি এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং ৩০শে শাওয়াল হিম্‌সের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, হিম্‌সবাসীরা শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মারওয়ানের ঘোষক তাদের ডেকে বলে, তোমরা আমীরুল মু'মিনীনের বায়আত প্রত্যাহার করেছ কেন ? শহরবাসীরা উত্তর দেয়, আমরা বায়আত প্রত্যাহার করিনি, বরং আমীরুল মু'মিনীনের অনুগত রয়েছি এবং নিজেদের বায়আতের উপরও অটল আছি। এরপর তারা শহরের দরজা খুলে দেয়। কিন্তু মারওয়ানের সঙ্গীরা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে শহরবাসী এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই অবস্থা দেখে মারওয়ান শহরের দরজা ডিংগিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। এরপর আনুমানিক তিনশ' গজ পর্যন্ত শহর প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তিনি শহরবাসীদের কাছ থেকে নিজের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন।

মারওয়ান তখন হিম্‌সেই ছিলেন, এমন সময় সংবাদ পৌঁছে যে, গূতাবাসী ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ কাসরীর নেতৃত্বে দামিশকের উপর হামলা করে সেখানকার শাসনকর্তাকে অবরোধ করে রেখেছে। তিনি দামিশকের শাসনকর্তার সাহায্যার্থে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এরা দামিশকে পৌঁছে বাইরে থেকে এবং দামিশকবাসীরা ভিতর থেকে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত গূতাবাসীরা পরাজিত হয় এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ নিহত হন। তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ফিতনা প্রশমিত হতে না হতেই সাবিত ইব্‌ন কায়স ফিলিস্তীনবাসীদেরকে একত্র করে তাবারিয়া অবরোধ করেন। তখন তাবারিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম। মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাপতি আবুল ওয়ারদকে প্রেরণ করেন। আবুল ওয়ারদ সেখানে পৌঁছতেই তাবারিয়াবাসীরা শহর থেকে বের হয়ে অবরোধকারীদের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তীনবাসীরা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। আবুল ওয়ারদ সাবিত ইব্‌ন নাঈমের তিন পুত্রকে বন্দী করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন। মারওয়ান হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয কেনানীকে ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা

নিয়োগ করেন। তিনি হাসান ইব্‌ন সাবিতকে খুঁজে বের করেন এবং গ্রেফতার করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন। মারওয়ান সাবিত এবং তার তিন পুত্রের হাত-পা কেটে তাদেরকে শূলে চড়িয়ে দেন। এই সমস্ত কাজ শেষ করে তিনি 'দায়রে আইয়ুব' নামক স্থানে আপন দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহর অলীআহ্‌দীর বায়আত নেন এবং তাদের সাথে হিশামের দুই মেয়ের বিবাহ দেন। এরপর তিনি তাদাম্মুরের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কেননা তখন পর্যন্ত তাদাম্মুরবাসীরা তাদের স্বাধীনতার দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মারওয়ানের হাতে বায়আত করতে বাধ্য করা হয়।

এরপর তিনি খারিজী নেতা দাহ্‌হাক শায়বানীকে দমনের জন্য ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাকে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। কেননা শায়বানী কূফায় নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দামেশকের জন্য এক মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছিলেন। মারওয়ান ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাকে নির্দেশ দেন ঃ তুমি শায়বানীকে অবিলম্বে কূফা থেকে বের করে দাও। এরপর তিনি হুবায়রার জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবার উদ্দেশ্যে খোদ কিরকিসায় তাকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হারস তার সংকল্পে ছিলেন অটল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মার্ভ শহরের অলিতে-গলিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে কিরমানীও কিরমানে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছিলেন। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার কিরমানীকে তার কাছে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু তার অন্তর পরিষ্কার না থাকায় তিনিও প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ বেছে নেন। মোটকথা, মার্ভে কিরমানী, হারস ও নাসর– এই তিন ব্যক্তি একত্রিত হন। তিনজনই সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং পৃথক পৃথক লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারা একে অপরের সহযোগী বা সমব্যথী ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হারস ও কিরমানী একজোট হয়ে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারকে লাঞ্ছিত করে মার্ভ থেকে বের করে দেন। এরপর একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে হারস ইব্‌ন শুরায়হ নিহত হন। এরপর নাসর তার বাহিনীকে সংগঠিত করে ক্রমান্বয়ে কিরমানীর মুকাবিলায় পাঠাতে থাকেন। অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে নাসরের অধিনায়করা কিরমানীর কাছে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত নাসর ইব্‌ন সাইয়ার একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে স্বয়ং মার্ভে গিয়ে পৌঁছেন। উভয় বাহিনী সুবিধামত জায়গায় অবস্থান নেয় এবং একটির পর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। কোন পক্ষই জয়ী বা পরাজিত হয়নি– এমনি পরিস্থিতিতে সুযোগ সন্ধানী আবূ মুসলিম খুরাসানী (পরে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) একদিকে নাসরের সাথে পত্রালাপ শুরু করেন এবং অন্যদিকে কিরমানীকেও লিখেন ঃ ইমাম ইবরাহীম তোমার সম্পর্কে আমার কাছে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আমি মনে করি, এর দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে। বিশ্বাস কর, আমি তোমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। ইমাম ইবরাহীম আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, যেন আমি প্রয়োজনের সময় তোমার সাহায্যে এগিয়ে যাই। এই সব চিঠি যে সব দূতের মাধ্যমে তিনি প্রেরণ করতেন তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, রাস্তায় যে সব গোত্র পড়ে তাদের মধ্যে যারা নাসরের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদেরকে নাসরের নামে লিখিত পত্রটি আর যারা কিরমানীর প্রতি সহানুভূতিশীল তাদেরকে কিরমানীর নামে লিখিত পত্রটি দেখাতে দেখাতে যাবে। লক্ষ্য ছিল, যেন এভাবে সব গোত্রেরই সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব হয়। এভাবে

আবূ মুসলিম নানা কৌশল অবলম্বন করে খারিজীদের সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে কিরমানী ও নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের অবস্থান স্থলের ঠিক মধ্যখানে অবস্থান নেন। উভয় পক্ষের কেউই অনুমান করতে পারছিল না আবূ মুসলিম তাদের কার পক্ষ নেবে এবং কার বিরোধিতা করবে। এবার আবূ মুসলিম কিরমানীকে বলে পাঠান, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে নাসরের মুকাবিলা করব। একথা শুনে কিরমানী খুবই আনন্দিত হন। নাসর এই সংবাদ পেয়ে কিরমানীকে লিখেন, আবূ মুসলিম প্রতারণা করে তোমার ক্ষতি করতে চাচ্ছে। অতএব তুমি তার প্রতারণায় পড়ো না বরং এই মুহূর্তে আমাদের উভয়ের উচিত, পারস্পরিক মতবিরোধ ভুলে যাওয়া। কিরমানী নাসরের এই অভিমত পছন্দ করেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরদিন তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবেন। কিরমানী দুশ লোক সঙ্গে নিয়ে নাসরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বের হন। এবার নাসরের লোকেরা সুযোগ পেয়ে কিরমানী এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেলে। কিরমানীর পুত্র আলী পলায়ন করে আবূ মুসলিমের কাছে আসেন। এবার কিরমানীর বাহিনী ও আবূ মুসলিমের বাহিনী একত্রে মিলে আবূ মুসলিম ও আলী ইব্‌ন কিরমানীর নেতৃত্বে নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে এবং তাতে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার পরাজিত হন এবং পালিয়ে গিয়ে একটি সাধারণ লোকের ঘরে আশ্রয় নেন। আবূ মুসলিম ও আলী মার্ভ দখল করে নেন। এবার আলী ইবন কিরমানী আবূ মুসলিমের হাতে বায়আত করতে চাইলে তিনি বলেন, তুমি এখন যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই থাক। ইমামের কাছ থেকে নির্দেশ আসার পর যা সঙ্গত মনে হবে তাই করা যাবে। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার মার্ভ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এদিকে আবূ মুসলিম খারিজীদের নেতা শায়বান খারিজীকেও আপন করে নেন। কেননা নাসর ইবন সাইয়ার খারিজীদের নেতাকে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠিয়ে আবূ মুসলিম থেকে পৃথক করে নিতে চাচ্ছিলেন যে, সে (আবূ মুসলিম) হচ্ছে শীআনে আলী। মোটকথা, আবূ মুসলিম থেকে কখনো শায়বান খারিজী পৃথক হয়ে গেছেন, আবার কখনো পৃথক হয়ে গেছেন ইব্‌ন কিরমানী। এই চার ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ মুসলিম, শায়বান খারিজী, ইব্‌ন কিরমানী, নাসর ইব্‌ন সাইয়ার সমগ্র খুরাসান অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একে অপরের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিতেন, আবার মুহূর্তের মধ্যেই একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। এই চার ব্যক্তির মধ্যে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার এবং আবূ মুসলিম খুরাসানী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। যার ফলে আবূ মুসলিম খুরাসানী সুযোগ বুঝে একের পর এক শায়বান খারিজী এবং ইব্‌ন কিরমানীকে হিজরী ১৩০ সনে (৭৪৮ খ্রি.) হত্যা করেন এবং হিজরী ১৩১ সনে (৭৪৮-৪৯ খ্রি.) নাসর ইব্‌ন সাইয়ার রোগাক্রান্ত হয়ে 'রায়'-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত সমগ্র খুরাসানে আবূ মুসলিমের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই আর অবশিষ্ট ছিল না।

খারিজী সম্প্রদায়

খুরাসানের অবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খারিজীরা ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করে

বিদ্রোহ ঘোষণার প্রয়াস পায়। খুরাসানের খারিজীরা একজোট হয়ে দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স শায়বানীকে তাদের নেতা মনোনীত করে। দাহ্‌হাক কূফার উপর হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেন। ফলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে কূফা ছেড়ে ওয়াসিতে চলে আসতে হয়। সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে পরাজিত হয়ে দাহ্‌হাকের সাথে এসে মিলিত হন। এভাবে তার ক্ষমতা আরো বেড়ে যায় এবং তিনি মাওসিলের উপর চড়াও হন। মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের পুত্র আবদুল্লাহ্ তার মুকাবিলা করেন। কিন্তু তার সাথে ছিল মাত্র সাত হাজার সৈন্য এবং দাহ্‌হাকের সাথে ছিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্য। দাহ্‌হাক আবদুল্লাহকে অবরোধ করে ফেলেন।

মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ এই খবর শুনে বিষয়টির উপর খুব গুরুত্ব দেন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং তাতে দাহ্‌হাক নিহত হন। এবার খারিজীরা সাঈদ ইব্‌ন বাহদালকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে। তিনিও নিহত হন। এরপর শায়বান ইব্‌ন আবদুল আযীয খারিজীদের নেতা মনোনীত হন। মারওয়ান ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাকে কূফায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখান থেকে খারিজীদের বের করে দেন। এদিকে শায়বান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সমগ্র খারিজীদের নিয়ে পারস্যে চলে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি আবূ মুসলিমের সাথে যোগ দেন, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৩০ হিজরীতে (৭৪৭-৪৮ খ্রি.) আবূ মুসলিম নিহত হন।

হিজায, ইয়ামান এবং হাদরামাওতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আবূ হামযা মুখতার ইব্‌ন আওফ আযদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হাদরামাওতের রঈস (গোত্র প্রধান) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াও তার সাথে যোগ দেন। আবূ হামযা প্রথমে মদীনা দখল করেন। এরপর সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইব্‌ন আতিয়া সা'দীকে তার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। ওয়াদিল কুরায় যুদ্ধ হয়। তাতে আবূ হামযা নিহত হন। এরপর ইব্‌ন আতিয়া ইয়ামানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তার মুকাবিলার জন্য তৈরি ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া নিহত হন। ইব্‌ন আতিয়া তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

যখন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ মাওসিলের সন্নিকটে দাহ্‌হাকের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তখন ইমাম ইবরাহীমের লেখা একটি চিঠি, যা আবূ মুসলিম খুরাসানীর নামে লেখা হয়েছিল, ধরা পড়ে এবং তার সামনে পেশ করা হয়। ঐ চিঠিতে ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে কতিপয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে এও লেখা ছিল, খুরাসানে কোন আরব বংশোদ্ভূত বা আরব লোককে জীবিত রাখবে না। খুরাসানের মূল মুসলিম বাসিন্দারা আমাদের অনেক কাজে আসবে। অতএব তাদের উপরই অধিকতর আস্থা রাখা উচিত। ঐ চিঠি থেকে এ রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। আর ইমাম ইবরাহীম হচ্ছেন এই ষড়যন্ত্রের হোতা এবং তিনি বালকা এলাকার হামীমা নামক স্থানে বসবাস করছেন।

মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ এই চিঠি পড়ে বালকায় নিযুক্ত আপন কর্মকর্তাকে লিখেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদকে হামীমা থেকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অতএব ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং তার পরিবারের আরো কিছু লোককে বন্দীদের করে মারওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মারওয়ান তাদেরকে হাররান নামক স্থানে বন্দী করে রাখেন। ইমাম ইবরাহীমের সাথে সাঈদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক, তার দুই পুত্র উসমান ও মারওয়ান, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং মুহাম্মদ সাইয়ানীকেও বন্দী করা হয়েছিল। কিছুদিন পর হাররানে মহামারী দেখা দেয় এবং তাতে বন্দী অবস্থায়ই ইমাম ইবরাহীম, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয মৃত্যুবরণ করেন।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম অন্যান্য কয়েদীকে সাথে নিয়ে জেলখানার দারোগাকে হত্যা করেন এবং জেলখানা ভেঙে পালিয়ে যান। হাররানবাসীরা এই পলায়নপর বন্দীদের পাকড়াও করে হত্যা করে। শুধু আবূ মুহাম্মদ সুফ্‌য়ানী কয়েদখানা থেকে বের হননি। তাকে মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ পরাজিত অবস্থায় ফিরে এসে মুক্ত করেন। ইমাম ইবরাহীম আপন বন্দীত্বের মুহূর্তে ওসীয়ত করেছিলেন ঃ আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহ। সেই সাথে তিনি এই ওসীয়তও করেছিলেন ঃ এখন আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহের বালকা এলাকায় নয়, বরং কূফায় এসে যেন বসবাস করতে থাকেন। ইমাম ইবরাহীম বন্দী হওয়ার পূর্বে আবুল আব্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি আবূ মুসলিম খুরাসানীকে আপন অধিনায়ক মেনে নিয়ে তার হুকুম পালন করবে। এরপর তিনি কাহ্‌তাবা ইব্‌ন শাবীবকে একটি কৃষ্ণ পতাকা দিয়ে আবূ মুসলিমের কাছে এই বলে পাঠিয়েছিলেন, 'তুমি এই পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে খুরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা কর, তারপর এলাকার পর এলাকা জয় করে এগিয়ে যাও।'

আবূ মুসলিম হিজরী ১৩০ থেকে ১৩১ হিজরী (৭৪৭ থেকে ৭৪৮ খ্রি) পর্যন্ত সমগ্র খুরাসান প্রদেশ দখল করে নেন। এরপর কাহতাবাকে কূফা দখলের জন্য প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শুনে মারওয়ান এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হার্‌রান থেকে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে যাব নদীর তীরে সাফ্‌ফাহের বাহিনীর সাথে– যার অধিনায়ক ছিলেন সাফ্‌ফাহ্‌র চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী, তার মুকাবিলা হয়। মারওয়ানের বাহিনী ঠিক মত যুদ্ধ করলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর বাহিনীকে অতি সহজেই পরাস্ত করতে পারত। কিন্তু মারওয়ান যেই মুহূর্তে আবদুল্লাহ্‌র বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন এবং তার বিজয় লাভের পথে কোন প্রতিবন্ধকতাই বাকি ছিল না তখন তার বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্য যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে যেন মারওয়ানকে পরাজিত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী নিজেকে পরাজিত দেখে নিজের বিশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর মরণপণ হামলা চালান। কিন্তু তা প্রতিরোধের জন্য মারওয়ানের পক্ষ থেকে কোন সেনানায়ক এগিয়ে আসেননি। মারওয়ান তাদেরকে সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভ দেখান, কিন্তু

তাতেও কোন কাজ হয়নি। তারপর যে অর্থভাণ্ডার তার সাথে ছিল তা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, আক্রমণ চালাও এবং দুর্বল শত্রুকে পরাজিত করে অর্থ ভাণ্ডার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও। এতে সৈন্যরা ভাণ্ডার লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। যারা তখন পর্যন্ত লড়ছিল তারাও লড়াই ছেড়ে দিয়ে অর্থ ভাণ্ডারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করে মারওয়ান নিজ পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন, তুমি এগিয়ে গিয়ে লোকদেরকে এই বিশৃঙ্খলা নিরস্ত কর। আবদুল্লাহ্ সেখানে পৌঁছতেই সব লোক যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মারওয়ান তার বাহিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নিজেও বাধ্য হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মাওসিলে চলে যান, কিন্তু সেখানে অবস্থান করা সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় হার্‌রানের দিকে চলে আসেন। হার্‌রানের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবান ইব্‌ন ইয়াযীদ। মারওয়ান যাব নদীর তীরে ১৩১ হিজরীর ১১ই জমাদিউস্ সানী (৭৪৮ খ্রি.-এর ফেব্রুয়ারী) শনিবার দিন পরাজয়বরণ করেছিলেন।

তিনি হার্‌রানে এসে মাত্র বিশ দিন অবস্থান করার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর আগমন-সংবাদ পান। আবদুল্লাহ্ হার্‌রানের সন্নিকটে পৌঁছলে তথাকার শাসনকর্তা আবান কালো কাপড় পরে এবং কালো ঝাণ্ডা নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য বের হন এবং তার হাতে সাফ্‌ফাহ্‌র জন্য খিলাফতের বায়আত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। মারওয়ান হিম্‌সে গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা প্রথম প্রথম তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও তাঁর সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা খুবই কম দেখে তারা শুধু তাঁর অবাধ্যই হয়নি, বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অতএব মারওয়ান তিনদিন পরই সেখান থেকে চলে যান। কিন্তু হিম্‌সবাসীরা তাঁর ধন-সম্পদ লুট করার সংকল্প নেয়। তিনি প্রথমে তাদেরকে বুঝান। তাতে কাজ না হলে তিনি আক্রমণ করে তাদেরকে উড়িয়ে দেন।

মারওয়ান হিম্‌স থেকে দামিশকে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার কর্মকর্তা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই ওয়ালীদ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন মারওয়ান। সেখানেও অবস্থান করা সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় তিনি ওয়ালীদকে উমাইয়া বংশের বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করার অনুপ্রেরণা দিয়ে ফিলিস্তীনের দিকে চলে যান এবং সেখানে নির্জন ও গণসম্পর্কহীন জীবন যাপনের ইচ্ছা নিয়ে কোন এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন।

এদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী হার্‌রানের সেই কয়েদখানা ধ্বংস করে ফেলেন, যেখানে ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এরপর তিনি দামিশকের দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আপন ভাই আবদুস সামাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। সাফ্‌ফাহ্ তাকে আট হাজার সৈন্যসহ আবদুল্লাহ্‌রই সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবন আলী কিন্‌নাসরীন ও বালাবাক হয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নিতে নিতে দামিশকে এসে পৌঁছেন। তিনি দামিশক অবরোধ করেন। এরপর ১৩২ হিজরীর ৫ই রমযান (৭৫০ খ্রি-এর এপ্রিল) বুধবার তরবারির জোরে দামিশকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং রক্তবন্যায় দামিশকের অলিগলি ভাসিয়ে দেন। ঐ সংঘর্ষে দামিশকের শাসনকর্তা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুআবিয়া

নিহত হন। এই বিজয় ও পাইকারী হত্যার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী পনের দিন দামিশকে অবস্থান করেন। এরপর ফিলিস্তীন অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে সবেমাত্র ফিলিস্তীন সীমান্তে পৌঁছেছেন এমন সময় তার কাছে আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্র এই মর্মে একটি ফরমান পৌঁছে ঃ তুমি তোমার ভাই সালিহ্কে মারওয়ানের পশ্চাদ্ধাবনে নিয়োজিত কর। এই ফরমান ১৩২ হিজরীর যিলকদ (৭৫০ খ্রির জুন) মাসে এসে পৌঁছে। সালিহ্ ইব্ন আলী সংবাদ পেয়ে ফিলিস্তীন থেকে আরীশে চলে যান। সেখান থেকে পুনরায় নীল নদ হয়ে সাঈদের দিকে যাত্রা করেন। সালিহ্ ইব্ন আলী সামনে অগ্রসর হয়ে ফুসতাতে গিয়ে অবস্থান নেন এবং মারওয়ানের পশ্চাদ্ধাবন ও তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন দিকে খণ্ডবাহিনী প্রেরণ করেন। ঘটনাচক্রে মারওয়ানের অশ্বারোহীরা সালিহের বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

মারওয়ানের অশ্বারোহীরা প্রথম থেকেই নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ন ছিল। তারা সালিহের বাহিনীর সাথে মুকাবিলা না করে পালিয়ে যায়। তাদের কয়েকজনকে বন্দী করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, মারওয়ান বূসীরে অবস্থান করছেন। সালিহ্র বাহিনীর অধিনায়ক আবূ আওন রাতের বেলা মারওয়ানের উপর হামলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তিনি জানতেন তাঁর সাথে প্রকাশ্যে মুকাবিলা করা সহজ নয়। যাহোক, মারওয়ানের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। তিনি ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। প্রথম থেকেই এই সুযোগের অপেক্ষারত জনৈক ব্যক্তি তাঁর উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন তাঁর জনৈক সঙ্গী চিৎকার দিয়ে বলে উঠে, হায় হায়! আমাদের আমীরুল মু'মিনীন নিহত হয়েছেন। তখন আবূ আওন ও তার সঙ্গীরা সেদিকে দ্রুত ছুটে যান এবং মারওয়ানের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা আবূ আবদুল্লাহ্ সাফফাহ্র কাছে পাঠিয়ে দেন।

এই ঘটনা ২৮শে যিলহজ্জ, ১৩২ হিজরী (৫ই আগস্ট, ৭৫০ খ্রি) সংঘটিত হয়। এখান থেকেই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার পরিসমাপ্তি এবং খিলাফতে বনূ আব্বাসের সূচনা। মারওয়ানের নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্ আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান। আবিসিনীয়রা তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেনি। উবায়দুল্লাহ্ আবিসিনীয়দের হাতেই নিহত হন এবং আবদুল্লাহ্ ফিলিস্তীন গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসবাস করতে থাকেন। এরপর মাহ্দীর খিলাফত আমলে ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা তাকে গ্রেফতার করে মাহ্দীর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি তাকে বন্দী করে রাখেন।

মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদের খিলাফত আমল

যেহেতু মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ হচ্ছেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা, তাই সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, তিনিই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার ধ্বংস ও পতনের জন্য মূলত দায়ী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বনূ উমাইয়ার ধ্বংসের যাবতীয় উপাদান, তার খিলাফতের পূর্বেই, অন্যান্য খলীফার আলস্য ও অসতর্কতার কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মারওয়ান মোটামুটি ছয় বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি দিনও তিনি বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পাননি।

তিনি তার সমগ্র খিলাফত আমল ঘোড়ার পিঠেই কাটান। তাঁর উদ্দীপনা, বীরত্ব ও দৃঢ় মনোবলের পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি এজন্য যে, তাঁর হাতে এমন একটি সাম্রাজ্য অর্পিত হয়েছিল যা ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তিনি আরো কিছুদিন পূর্বে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারলে নিশ্চিতভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনকে আরো বেশ কিছুদিন হয়ত ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি সমকালীন গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা এবং আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রসমূহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মারওয়ান এমন কোন অসাধারণ বিচক্ষণ বা বুদ্ধিমান ছিলেন না যে, মৃতপ্রায় একটি সাম্রাজ্যকে সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া তাঁর গোটা শাসনকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই কাটে। তখন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই চলছিল বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ; কোথাও শান্তি বা স্বস্তি ছিল না। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তো কোন সুযোগই ছিল না। এই যুগে মুসলমানদের হাতে খোদ মুসলমানদের যে রক্ত ঝরেছে, মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।

মারওয়ান ৭০ অথবা ৭২ হিজরীতে (৬৮৯ অথবা ৬৯১ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান ছিলেন জাযীরার গভর্নর। তাঁর মা ছিলেন কুর্দিস্তানের একজন ক্রীতদাসী। তাঁর প্রথম মালিক ছিলেন ইবরাহীম আশতার। ইবরাহীম আশতার নিহত হওয়ার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান তার মালিক হন। আর তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা মারওয়ান।

একনজরে বনূ উমাইয়ার খিলাফত

১. হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষার্ধ থেকে যে গোপন অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও সংঘাতের সূচনা হয় তার প্রথম অংকের যবনিকাপাত হয় আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর খলীফা এবং উমাইয়া বংশের খিলাফতের ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে। খিলাফতে বনূ উমাইয়া প্রথম স্তরেই এর পতনের এবং মুসলিম জাহানের দুর্ভাগ্যের ধ্বংসাত্মক বীজ-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুআবিয়া (রা) বপন করেন নিজ পুত্র ইয়াযীদ-এর অলীআহ্‌দ নিয়োগের মাধ্যমে। সেই অলীআহ্‌দীর মহামারীর যে সূচনা হলো তা আজ পর্যন্তও মুসলমানদের পিছু ছাড়েনি। আমীরে মুআবিয়ার কারণেই, ইসলাম মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য গণতন্ত্রের যে রীতি প্রবর্তন করেছিল তা বিলুপ্ত হয়ে তার স্থলে বংশগত রাজতন্ত্রের সেই অভিশপ্ত রীতি পুনঃপ্রবর্তিত হয়, ইসলামের হাতে যার সার্থক বিলুপ্তি ঘটেছিল। উমাইয়া বংশের মধ্যে আমীরে মুআবিয়া, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক– এই তিনজন খলীফা দেশ জয় ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের পর হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী খলীফা। তাঁর খিলাফত-আমল ছিল খিলাফতে রাশিদার প্রথমাংশের অবিকল প্রতিচ্ছবি। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মধ্যে ছিল ধর্মপ্রবণতা, ছিল পার্থিব অনাসক্তি। তাই বনূ উমাইয়ার দুনিয়াদার খলীফাদের সাথে তাঁর কোন তুলনাই চলে না। যদিও তাঁর খিলাফতকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাতে ঘটেছিল ন্যায়বিচার ও ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন। তাঁর শাসনামল শুধু নিজেকে নয়, বরং বলতে

গেলে গোটা উমাইয়া আমলকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। তাঁর পরে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকও এমন একজন খলীফা ছিলেন যাকে প্রথমোক্ত তিনজন খলীফার তালিকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। হিশামের পর দশ বছরও অতিবাহিত না হতেই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার বিরাট প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়ে একেবারে মাটির সাথে মিশে যায়। এরপর তার ভিত্তিসমূহও উপড়ে ফেলা হয়। উপরে যে পাঁচজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন আরামপ্রিয়, কাপুরুষ এবং অদূরদর্শী। ইসলাম যে মদ্যপান ও গানবাদ্যের মূলোৎপাটন করেছিল; বনূ উমাইয়ার খলীফারা সেই অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তুর পুনঃপ্রচলন করেন যা আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

২. বনূ উমাইয়ার অপরাধ-তালিকায় এ অপরাধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম জাতি, বংশ ও গোত্রের মধ্যকার ভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের সমগ্র সম্প্রদায়কে একই সম্প্রদায়ে পরিণত করে। আর বনূ উমাইয়ারা সেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিলোপ সাধন করে পুনরায় জাহিলী যুগের সেই নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। ফলে মুসলমানরা গোত্রগত সম্পর্ককে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে। বনূ উমাইয়ারা গোত্রগত পক্ষপাতিত্বের যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তার ফল শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই ভোগ করতে হয়। আর এটাই হয় তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। কেননা আলাভী ও আব্বাসীরা এই বংশগত বা গোত্রগত পক্ষপাতিত্বকে ভিত্তি করেই বনূ উমাইয়ার ধ্বংস সাধনে আত্মনিয়োগ করে।

৩. বনূ উমাইয়ারা নিজেদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষকে জুলুম-নির্যাতন বা হত্যা করতে মোটেও দ্বিধা করত না। বনূ উমাইয়ার শাসকগণের সব চাইতে প্রশংসাভাজন গভর্নর তারাই হতেন যারা মানুষকে অনায়াসে হত্যা করতে বা তাদের উপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারতেন। অবশ্য নিজেদের হুকুমত টিকিয়ে রাখার জন্য বনূ উমাইয়াকে বাধ্য হয়ে এধরনের জুলুম-নির্যাতন চালাতে হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কর্মধারাই তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। কেননা অনবরত ভয়ভীতির মধ্যে বসবাস করার দরুন শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি ও ভালবাসা আর অবশিষ্ট ছিল না।

৪. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বনূ উমাইয়া ছিল কুরায়শ ও আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় গোত্র। এই গোত্রে বেশির ভাগ সময় এমন সব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে থাকেন, যাঁরা বুদ্ধি-বিবেচনা ও দূরদর্শিতার দিক দিয়ে সমকালীন লোকদের চাইতে অগ্রণী এবং হুকুমত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। এই গোত্রটি জাহিলী যুগেও এই সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে, উমাইয়া গোত্রে কোন অযোগ্য লোক জন্মগ্রহণ করতেই পারে না। যদি উমাইয়া গোত্রে অলীআহ্‌দীর রীতি প্রচলিত না হতো এবং খলীফা নির্বাচন শুধু উমাইয়া গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, অর্থাৎ মুসলমানরা নিজেদের সম্মতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা উমাইয়া গোত্রের কোন যোগ্যতম ব্যক্তিকে খলীফা পদের জন্য নির্বাচন করত (যদিও এই নীতি অন্যায় ও

অবিচারমূলক) তাহলেও খিলাফতে বনূ উমাইয়ার এই করুণ পরিণতি হতো না এবং মুসলিম বিশ্বকেও এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো না। অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে সম্ভবত খিলাফতে বনূ উমাইয়ার আয়ূ আরো দীর্ঘ হতো এবং তাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তা আদৌ উত্থাপিত হতো না।

৫. গোপন চেষ্টা-তদবীর, ষড়যন্ত্র এবং চালাকি-চাতুর্যের ক্ষেত্রে বনূ উমাইয়া ছিল আরবের অন্যান্য গোত্রের চাইতে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। এই সব জিনিসের সাহায্যেই তারা নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, হাশিমীরাও ঐ সমস্ত জিনিসের মাধ্যমেই তাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে। অথচ এই সব ব্যাপারে হাশিমীরা ছিল তাদের শিষ্যতুল্য। এর একমাত্র কারণ এই ছিল যে, ধন-দৌলত ও হুকুমতের নেশা তাদেরকে মূর্খ ও উদাসীন করে তুলেছিল এবং অলীআহ্‌দীর কুরীতি সেই মূর্খতা ও উদাসীনতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৬. উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও বনূ উমাইয়া খিলাফতের মধ্যে এমন অনেক সৌন্দর্য ছিল যা তাদের পরবর্তী যুগে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, খিলাফতে বনূ উমাইয়া খিলাফতে রাশিদার বিজয় অভিযানকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দূর-দূরান্তে বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। পূর্বে চীন এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তাদের সময়েই বিজিত হয়। তাদেরই যুগে দূর সমুদ্রের দ্বীপসমূহে, আফ্রিকা মহাদেশের মরু এলাকায় এবং হিন্দুস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। খিলাফতে বনূ উমাইয়ার যুগে ইসলামী হুকুমতের একটি মাত্র কেন্দ্র ছিল। বনূ উমাইয়ার পরে মুসলমানরা নতুনভাবে দেশ জয়ের সুযোগ খুব কমই পেয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, বনূ উমাইয়াদের হাতেই যেন দিগ্বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর বাকি থাকে শুধু দেশ শাসনের পালা। বনূ উমাইয়াদের পর ইসলামী হুকুমতেরও একক কোন কেন্দ্র থাকেনি বরং দিনের পর দিন এক থেকে একাধিক পৃথক হুকুমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অবশ্য সেগুলোর মধ্যে খিলাফতে আব্বাসীয়াই ছিল সর্ববৃহৎ হুকুমত।

৭. বনূ উমাইয়ার খিলাফত আমলে আরবরা একটি দিগ্বিজয়ী জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। সর্বত্রই ছিল আরবী আচার-ব্যবহার, আরবী ভাষা, আরবী সভ্যতা ও আরবী রীতি-নীতির অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু বনূ উমাইয়ার পর অনারব এবং অন্যান্য বিজিত জাতিও আরবদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

৮. বনূ উমাইয়ার যুগে যদিও খারিজী, শিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তবে সকল মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ছিল শুধু কুরআন ও হাদীস। কুরআন-সুন্নাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে এমন সব ফিরকারও উদ্ভব হয়, যারা কুরআন-সুন্নাহকে পিছনে ফেলে রেখে তথাকথিত পীর-মুরশিদ, ইমাম ও স্বমতাবলম্বী আলিমদের আদেশ-নির্দেশকেই তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য

যথেষ্ট মনে করে। একারণেই খিলাফতে বনূ উমাইয়ার যুগে মুসলমানদের সার্বিক দৃষ্টি কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। এরপর কুরআনের প্রতি মুসলমানরা যেন উদাসীন হয়ে ওঠে। এই ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এ যুগের একজন ওয়ায়েয (ধর্মীয় বক্তা) বা শেষ স্তর পর্যন্ত দীনী কিতাব পড়ুয়া মওলভীর জন্য এ জিনিসটি জরুরী মনে করা হয় না যে, তিনি চিন্তা ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়বেন এবং তার অর্থও যথারীতি হৃদয়ঙ্গম করবেন।

৯. খিলাফতে রাশিদার যুগে সবচেয়ে বড় সাফল্য এটাকেই মনে করা হতো যে, লোক শির্‌ক ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়া এবং ইসলাম মানুষের দৈনন্দিন জীবনব্যবস্থায় পরিণত হোক। তখন ধন-দৌলত ও বৈষয়িক শান-শওকতের কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা ছিল না। কিন্তু বনূ উমাইয়ার খিলাফত আমলে ধন-দৌলত এবং জাগতিক সম্মান-মর্যাদাকে মানবজীবনের সাফল্যের মাপকাঠি মনে করা হতে থাকে এবং বায়তুল মালের অর্থ ঐ সমস্ত লোকের জন্য ব্যয়িত হতে থাকে, যারা খিলাফত ও সালতানাত তথা উমাইয়া গোত্রের স্বার্থোদ্ধারের কাজে লাগতে পারে। যাদের কাছ থেকে উমাইয়া গোত্রের জন্য কোন সাহায্য-সহায়তা পাবার সম্ভাবনা ছিল না কিংবা বনূ উমাইয়ার লোকেরা যাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার কোন প্রয়োজনবোধ করত না তাদের প্রতি বরাবরই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হতো এবং তারা সব সময় নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকত। এই কুরীতি পরবর্তী খিলাফত আমলসমূহে আরো বিস্তার লাভ করে। এ কারণেই সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থান্ধতা ও পরস্পর শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১০. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এবং খিলাফতে রাশিদার আমলে মুসলমানদের জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ও আড়ম্বরহীন। তাই তাদের জীবনের চাহিদাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। বনূ উমাইয়ার যুগে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার আসবাবসামগ্রী ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ফলে সিপাহীসুলভ মনোবৃত্তি, যা প্রথমে মুসলমানদের কাছে একটি গর্বের বস্তু ছিল, ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে পেতে একেবার অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ, জাঁকজমকপূর্ণ ঘরবাড়ি ও আসবাব-সামগ্রীর অনুপ্রবেশ ঘটে। এ কারণেই তখন মুসলমানদের মধ্যে সিদ্দীক, ফারূক, খালীফা প্রমুখের নমুনা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হতো।

বনূ উমাইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৎপরতা

উসমান-হত্যার পর হাশিমী ও উমাবীদের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি হয় বাহ্যত তার ফলশ্রুতিতে হযরত আলী (রা)-এর পর হযরত ইমাম হাসানের খিলাফত ত্যাগের মধ্য দিয়ে বনূ উমাইয়া বনূ হাশিমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং বাজিতে জিতে যায়। জামাল, সিফ্‌ফীন এবং খারিজীদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর বনূ উমাইয়ার হাতে খিলাফত চলে যাওয়াটা বনূ হাশিমের জন্য ছিল এমন এক ব্যর্থতা যে, তারা তখন থেকে পুনরায় খিলাফত লাভের ব্যাপারটি সুকঠিন মনে করতে থাকে। এ ব্যাপারে দ্রুত কোন উদ্যোগ গ্রহণও তাদের

পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমীরে মুআবিয়ার পর ইয়াযীদের খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে অলীআহদীর মত কুরীতির প্রবর্তন বনূ উমাইয়ার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের দুর্বলতারও কারণ। এই প্রেক্ষিতে ইমাম হুসাইন (রা) একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেন। কিন্তু যারা ছিল তাঁর সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করায় কারবালার দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

আমীরে মুআবিয়ার দুর্বল উত্তরাধিকারী ইয়াযীদ এবং ইয়াযীদের অপরিণামদর্শী কর্মকর্তা ইব্‌ন যিয়াদ নিজেদের অন্যায় ব্যবহার ও নির্দয় আচরণ দ্বারা বনূ হাশিমকে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত করলেও তাতে বনূ উমাইয়ার জনপ্রিয়তার উপর আসে এক বিরাট আঘাত। মানুষ তাদের বিরোধিতায় ক্রমে ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এর ফলেই ইব্‌ন যুবায়রের ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই ঘটনা যখন ঘটে তখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন অতি পরাক্রমশালী ব্যক্তি। তিনি উমাইয়া বংশের তখনকার দুর্বলতাকে দূর করে হুকুমতকে শুধু শক্তিশালীই করেননি, বরং জনসাধারণকে উমাইয়া শাসকদের সম্পর্কে আরো আতংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেন। ফলে হাশিমীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের বা ক্ষমতা প্রকাশের কোন সুযোগ তখন আর বাকি থাকেনি। অতএব তারা তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে তারা ঐ সমস্ত কর্মতৎপরতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, যা ইব্‌ন সাবা ও তার অনুসারীরা অবলম্বন করেছিল এবং যেগুলোর কারণে হাশিমীরা সিফ্‌ফীন ও আযরাজে বিফলকাম হয়েছিল। হাশিমী গোত্রের শুধু দু'টি পরিবারের মধ্যেই নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল। একটি হচ্ছে হযরত আলী (রা)-এর পরিবার এবং অন্যটি হচ্ছে হযরত আব্বাস (রা) ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের পরিবার। হযরত আলী (রা) ছিলেন একাধারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা আর হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন তাঁর চাচা। এ দুই পরিবারই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহলে বায়তের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাই তাঁদের মর্যাদা ও নেতৃত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত। হযরত আলী (রা) যেহেতু সরাসরি বনূ উমাইয়ার মুকাবিলা করেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই আব্বাসীদের অনুপাতে আলাবীরা ছিল অধিকতর সাহসী ও উদ্যমশীল। আবার হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদতের কারণে আলাবীদের চাইতে ফাতিমীরা ছিল অধিকতর সুঃসাহসী ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা ছিল অধিকতর দৃঢ়প্রত্যয়ী। আলাবীদের মধ্যে আবার ছিল দু'টি দল। এক দল ইমাম হুসাইনের বংশধরকে খিলাফতের যোগ্য মনে করত। অপর দলটি মনে করত যে, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া হচ্ছেন খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য। তৃতীয় দলটি ছিল আব্বাসীদের। উপরোক্ত দলগুলোর মধ্যে ফাতিমী বা হুসাইনীরা ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী। কেননা কারবালার ঘটনার কারণে জনসাধারণ তাঁদের প্রতি ছিল অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তাঁরা ছিল অধিকতর সম্মানিত ও জনপ্রিয়।

মর্যাদার দিক দিয়ে মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার দলটি ছিল দ্বিতীয় আর আব্বাসীরা ছিল তৃতীয়। পরবর্তীকালে ফাতিমীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল ছিল যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন-এর সমর্থক। তাদেরকে যায়দী বলা হতো। দ্বিতীয় দল ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর সাদিকের হাতে বায়আত করেছিল। তাদেরকে বলা হতো ইসমাঈলী। যায়দ ইব্‌ন আলী এবং তাঁর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়ার নিহত হওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার প্রচেষ্টা এবং কূফায় মুখতারের তৎপরতা সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা কর হয়েছে। আলাবীরা যখনই সামান্য সুযোগ পেয়েছে তখনই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে বিফলকাম হতে হয়েছে। আলাবীদের এইসব তৎপরতা এবং তার পরিণাম থেকে আব্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই তারা অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এই তিনটি দলের প্রত্যেকটিই নিজেদের জন্য একই ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। আর তা হলো, উমাইয়াদের মুকাবিলা করার মত শক্তি অর্জনের জন্য গোপনে জনসাধারণকে নিজেদের সমমনা করে তোলা এবং তাদের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষে বায়আত আদায় করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ঐ প্রতিনিধিরা জনসাধারণের কাছে সুকৌশলে ও বিচক্ষণতার সাথে আহলে বায়তের প্রতি প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার ওয়ায করত, বনূ উমাইয়ার হুকুমতের দোষ-ত্রুটি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা করত এবং 'আহলে বায়তকেই খিলাফত ও হুকুমতের একমাত্র হকদার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। এই গোপন প্রচারকার্য অত্যন্ত সতর্কতা, বিচক্ষণতা এবং আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করা হয়। কাজটি প্রথম শুরু করা হয় আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফত আমলে। হাশিমী গোত্রের তিনটি দলই একে অন্যের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তিন দলেরই শত্রু ছিল এক, তাই তাদের মধ্যে আপোসে কোন শত্রুতা ছিল না বরং একে অপরের রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তা গোপন রাখারই চেষ্টা করত। প্রত্যেকটি দলের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি পৃথক পৃথক থাকলেও প্রচারকার্য চালাবার সময় তাদেরকে এমন সব শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হতো, যেগুলো দ্বারা অপর দলের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়। যেমন আব্বাস কিংবা মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া কিংবা ইমাম যায়নুল আবিদীনের একচেটিয়া ফযীলত বর্ণনার পরিবর্তে শুধু আহলে বায়তের ফযীলত বর্ণনা করা হতো এবং তারাই যে খিলাফতের একমাত্র হকদার তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হতো। তারা পরস্পরের বিরোধিতা তো করতই না, বরং বনূ উমাইয়ার বিরোধিতার খাতিরে খারিজীদের সাথেও সৌজন্যমূলক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করত। কেননা খারিজীরাও প্রথম থেকেই বনূ উমাইয়াকে কাফির ফতওয়া দিত এবং সব সময়ই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত। এই গোপন প্রচার অভিযানে আলাবীরা প্রায়ই তাড়াহুড়া শুরু করে দিত। ফলে খুলাফায়ে বনূ উমাইয়া আলাবীদের তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে যেত এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগও লাভ করত। কিন্তু আব্বাসীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খুলাফায়ে বনূ

উমাইয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একেবারে বে-খবর থাকে। আর এ কারণেই আব্বাসীরা আলাবীদেরকে পশ্চাতে ফেলে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও আব্বাসীরা আর একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা নিজেদের কর্মতৎপরতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, দামিশ্‌ক প্রভৃতি বড় বড় শহরের পরিবর্তে হামীমাহ্ নামক একটি অখ্যাত স্থানকেই নিজেদের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়। হামীমাহ্ ছিল বনূ উমাইয়া প্রদত্ত একটি জায়গীর। তার অবস্থান ছিল দামিশ্‌ক ও মদীনার মধ্যস্থলে। দামিশকের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকা সত্ত্বেও কোন দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে তার উপর বনূ উমাইয়ার কোন খলীফা বা গভর্নরের দৃষ্টি পড়ত না। তাই আব্বাসীরা সেটাকেই নিজেদের যাবতীয় তৎপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে। আলাবীদের তৎপরতা যেহেতু বার বার ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল তাই বার বার তাদের উপর হত্যাকাণ্ডও চালানো হয়েছিল। কিন্তু বনূ আব্বাসকে কখনো এ ধরনের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। তাদের কর্মতৎপরতা মধ্যমগতির হলেও তা সব সময়ই অব্যাহত থাকে। শেষদিকে বনূ আব্বাসের উন্নতির গতি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। এজন্য যে, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার দলও সামগ্রিকভাবে বনূ আব্বাসের দলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আবূ হাশিম ইব্‌ন মুহাম্মদ হামীমায় মৃত্যুবরণকালে তার যাবতীয় অধিকার মুহাম্মদ ইবন আলী আব্বাসীর হাতে অর্পণ করেন এবং যারা আবূ হাশিমের খিলাফতের জন্য চেষ্টা করছিল তাদেরকে আদেশ দেন, যেন তারা আগামীতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর নির্দেশ মতে তৎপরতা চালিয়ে যায় এবং তাকেই নিজেদের ইমাম (নেতা) মান্য করে। আলাবীদের একটি বিরাট দল আব্বাসীদের সাথে যোগ দিলে শেষোক্তরা পূর্বের চাইতে অধিকতর সাহস ও প্রেরণা নিয়ে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রায় সমগ্র শক্তি আব্বাসীদের হাতে এসে গেল। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ছিলেন ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বিরাট দলের নেতা। ১২৪ হিজরীতে (৭৪১ খ্রি) তিনি ইনতিকাল করলে তাঁর পুত্র ইবরাহীম তার স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম ইবরাহীম এই আন্দোলনকে পূর্বের চাইতেও অধিক সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথক পৃথক 'দাঈ' (আহ্বানকারী) নিয়োগ করেন। তারা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ। তারা ইরাক, খুরাসান, পারস্য, সিরিয়া, হিজায প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের আন্দোলনের জাল বিস্তার করেন। ঐ সময়ে ইমাম ইবরাহীম সৌভাগ্যক্রমে এমন এক ব্যক্তিকে পেয়ে যান, যিনি পরবর্তী সময়ে ঐ আন্দোলনকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌছানোর ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি হচ্ছেন আবূ মুসলিম খুরাসানী।

ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিম খুরাসানীকে ইরাক ও খুরাসানের দাঈদের নেতা নিযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে তার অধীনে কাজ করার এবং তার প্রতিটি হুকুম মেনে চলার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবরাহীম চিঠিপত্রের মাধ্যমে আবূ মুসলিমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন এবং নিজের প্রতিটি ইচ্ছা ও সংকল্প সম্পর্কেও তাকে অবহিত রাখতেন। এতে একটি উপকার ছিল

এই যে, স্বয়ং ইমাম ইবরাহীমকে প্রত্যেক 'দাঈর' কাছে চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হতো না। ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফ্ফাহ্ ইমাম নিযুক্ত হন। তিনি ইমাম ইবরাহীমের মতই বিচক্ষণ ছিলেন। আবূ মুসলিমের যোগ্যতা ও দক্ষতা তখন সার্বিক আন্দোলনকে সাফল্যের একেবারে শেষ সীমান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে খুরাসানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। বনূ উমাইয়া যখন এই আব্বাসী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয় তখন আবূ মুসলিম মোটামুটিভাবে সমগ্র খুরাসানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছেন এবং তার আন্দোলন ফাঁস করে দেওয়ার উপযুক্ত সময়ও এসে গেছে। এ কারণেই আব্বাসীরা তাদের আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যর্থতা বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি।

ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুর পর আবূ মুসলিম যখন খুরাসানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন এবং বনূ উমাইয়ার খিলাফত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যাবতীয় আলামত প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বনূ আব্বাস ও আলাবীদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ঐ ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা ১৩০ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৪৭ খ্রি আগস্ট) মাসে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত তাদের বিশেষ বিশেষ 'দাঈ' ও প্রতিনিধিদেরকে একটি ঘরে একত্র করে। সেখানে এ বিষয়টি উত্থাপিত হয় যে, যেহেতু বনূ উমাইয়ারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের হাত থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রসমূহও শীঘ্রই ফলপ্রসূ হবে, তাই এ বিষয়টিরও একটি চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়া উচিত যে, এরপর কাকে খলীফা নিয়োগ করা হবে। ঐ বৈঠকে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর ভাই আবূ জা'ফর মানসূর এবং হযরত আলীর বংশধরদের মধ্যেও কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তখন আবূ জা'ফর মানসূর নির্দ্বিধায় বলে উঠেন, এমতাবস্থায় হযরত আলীর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করা উচিত। উপস্থিত সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ওরফে 'নাফসে যাকিয়্যাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। ঐ মুহূর্তটি ছিল খুবই নাজুক। কেননা বনূ উমাইয়ার হুকুমত ধ্বংস করা এবং খুরাসানের উপর আবূ মুসলিমের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল তা হলো, শীআনে আলী ও শীআনে বনূ আব্বাস একযোগে ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। যদি ঐ বৈঠকে বনূ আব্বাস ও আলাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত তাহলে মক্কা থেকে শুরু করে খুরাসানের শেষ পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মতানৈক্যের এমন একটি স্রোত বয়ে যেত, যা পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ করা, আব্বাসী বা আলাবী কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না এবং খিলাফতে বনূ উমাইয়া, যা অনবরত মৃত্যুর প্রহর গুণছিল, পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। কিন্তু আবূ জা'ফর মানসূরের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ফলে অতি সহজে ঐ বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় এবং শীআনে আলী পূর্বের চাইতেও অধিক উদ্যম ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে। আর তাদের ঐ অপূর্ব কর্মতৎপরতা আব্বাসীদের জন্য তখনকার মত খুবই মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়।

আবূ মুসলিম খুরাসানী

ইরানী বংশোদ্ভূত আবূ মুসলিম খুরাসানীর প্রকৃত নাম ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন বাশ্‌শার। তিনি ইরানের শাহানশাহ্ নওশেরওয়ার মন্ত্রী 'বুযুরচে মিহিরের বংশধর ছিলেন বলে প্রকাশ। তাঁর জন্ম ইসফাহানে। তার পিতামাতা কূফা সংলগ্ন একটি পল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতা উছমানের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। পিতা মৃত্যুকালে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন, যেন ঈসা ইব্‌ন মূসা সাররাজ তাঁর প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ঈসা তাঁকে নিয়ে কূফায় আসেন। আবূ মুসলিম ঈসার কাছে জিন তৈরির কাজ শিখেন এবং তার সাথেই থাকতেন। ঈসা তার তৈরি জিন বিক্রির উদ্দেশ্যে খুরাসান, জাযীরা এবং মাওসিলের বিভিন্ন এলাকায় যেতেন। এই উপলক্ষে প্রায়ই সফরে থাকতেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে মেলামেশা করতেন। সাধারণভাবে ধারণা করা হতো যে, তিনিও বনূ হাশিম ও আলাবীদের একজন নকীব বা প্রতিনিধি। এভাবে তার পরিবারের অন্যান্য লোক সম্পর্কেও সন্দেহ করা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কূফার গভর্নর ইউসূফ ইব্‌ন উমর ঈসা ইব্‌ন মূসা ও তার চাচাত ভাই ইদরীস ইব্‌ন মাকিল এবং তাদের উভয়ের চাচা আসিম ইব্‌ন ইউনূস আজালীকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় আটকে রাখেন। এই কয়েদখানায় খালিদ কাসরীর গ্রেফতারকৃত কর্মচারীরাও আটক ছিল।

আবূ মুসলিম ঈসা ইব্‌ন মূসার কারণে প্রায়ই কয়েদখানায় যেতেন। সেখানকার সমগ্র কয়েদীই বনূ উমাইয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কয়েদী প্রকৃতপক্ষে বনূ আব্বাস বা বনূ ফাতিমার নকীব (প্রতিনিধি) ছিল। অতএব ওদের কথা শুনে আবূ মুসলিম খুবই প্রভাবিত হন। তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং শীঘ্রই তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। ঘটনাচক্রে কাহ্‌তাবা ইব্‌ন শাবীব– যিনি ইমাম ইবরাহীমের পক্ষ থেকে খুরাসানে কাজ করতেন এবং জনসাধারণকে খিলাফতে আব্বাসিয়ার প্রতি আহ্বান জানাতেন, খুরাসান থেকে হামীমার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কূফার ঐ কয়েদীদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে জানতে পারেন যে, ঈসা ও আসিমের খাদিম আবূ মুসলিম একজন অতি বিচক্ষণ ও গুণগ্রাহী যুবক। একথা শুনে তিনি তাঁকে ঈসার কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হামীমা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ইমাম ইবরাহীমের খিদমতে আবূ মুসলিমকে পেশ করা হয়। তিনি আবূ মুসলিমের নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তর দেন, আমার নাম ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন বাশ্‌শার। ইবরাহীম বলেন, না, তোমার নাম আবদুর রহমান। তাই ঐদিন থেকেই তাঁর নাম আবদুর রহমান হয়ে যায়। ইমাম ইবরাহীমই তাঁর ডাকনাম আবূ মুসলিম রাখেন এবং কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবের কাছ থেকে চেয়ে নেন।

কিছুদিন পর্যন্ত আবূ মুসলিম ইমাম ইবরাহীমের সাথে অবস্থান করেন। আর তখনই তিনি আবূ মুসলিমের অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় পান এবং নিজের একজন বিখ্যাত নকীব আবূ নাজ্‌ম ইমরান ইব্‌ন ইসমাঈলের কন্যার সাথে তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। আবূ নাজ্‌ম ছিলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তির অন্যতম, যারা আলীর বংশধরকে খিলাফতের আসনে

অধিষ্ঠিত করতে চাইতেন। অতএব ঐ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, আবূ মুসলিম যেন শীআনে আলীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং কখনো যেন নিজেকে দুর্বল মনে না করেন। এই ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ-আয়োজনের পর ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে খুরাসানে প্রেরণ করেন এবং সমগ্র 'দাঈ' ও নকীবকে জানিয়ে দেন ঃ আমি আবূ মুসলিমকে সমগ্র খুরাসান এলাকার মুহতামিম (তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগ করে পাঠালাম। তোমরা দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে অবশ্যই তাঁর কথা মেনে চলবে। খুরাসানের বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ নকীব, যারা মুহাম্মদ ইব্ন আলী আব্বাসী অর্থাৎ ইবরাহীমের পিতার যুগ থেকে কাজ করে আসছিলেন, তারা হলেন যথাক্রমে সুলায়মান ইব্ন কাসীর, মালিক ইব্ন হায়সাম, যিয়াদ ইব্ন সালিহ্ তালহা ইব্ন যুরায়ক ও উমর ইব্ন জাবীন। এই পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন খুযাআ গোত্রের লোক। বিখ্যাত নকীব কাহতাবা ইব্ন শাবীব ছিলেন তাঈ গোত্রের। আবূ উয়ায়না, মূসা ইব্ন কা'ব, কাসিম ইব্ন মুজাশি, আসলাম ইব্ন সালাম—এই চার ব্যক্তি ছিলেন তামীম গোত্রের। আরো যারা এক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তারা হলেন আবূ দাউদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীম শায়বানী, আবূ আলী হারাবী ওরফে শিবল ইব্ন তাহমান, আবূ নাজ্‌ম ইমরান ইব্ন ইসমাঈল প্রমুখ। আবূ মুসলিম খুরাসানে গিয়ে পৌঁছলে অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সুলায়মান ইব্ন কাসীর তাঁকে হামীমায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। এরা সবাই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা আবূ মুসলিমের মত একজন অল্প বয়স্ক যুবককে তাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে মেনে নিতে রাযী ছিলেন না।

যখন আবূ মুসলিম খুরাসানে গিয়ে পৌঁছেন তখন আবূ দাউদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীম শায়বানী কোন একটি দরকারী কাজে মাওরাউন নাহ্‌রে ছিলেন। যখন তিনি মার্ভে ফিরে আসেন এবং ইমাম ইবরাহীমের পত্র পাঠ করেন তখন আপন বন্ধু-বান্ধবকে আবূ মুসলিমের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলেন, অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সুলায়মান ইব্ন কাসীর তাঁকে হামীমায় ফেরত পাঠিয়েছেন। কেননা তাঁর দ্বারা কোন কাজ হবে না বরং সে আমাদের সকলকে এবং ঐ সমস্ত লোককেও যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, বিপদের মধ্যে ফেলবে। আবূ দাউদ তখন সকল নকীবকে একত্র করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। আহলে বায়তের লোকেরা হচ্ছেন তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তাঁরা হচ্ছেন যাবতীয় জ্ঞানের আধার, সর্বোপরি রাসূলের উত্তরাধিকারী। তোমাদের কি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে ? উপস্থিত সকলেই উত্তর দেন 'না'। আবূ দাউদ বলেন, তাহলে তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হচ্ছ কেন ? ইমাম ইবরাহীম নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিকে (আবূ মুসলিমকে) তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে থাকবেন। এই বক্তৃতা শুনে আবূ মুসলিমকে ফেরত পাঠানোর জন্য সকলকেই আক্ষেপ করতে দেখা যায় এবং অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর আবূ মুসলিমের হাতেই তারা তাদের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে চলতে থাকে। যেহেতু প্রথমে সুলায়মান ইব্ন কাসীর তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আবূ

মুসলিম সুলায়মানের প্রতি সব সময়ই কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন থাকতেন বলে মনে হতো। যাহোক তিনি নকীবদেরকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন ও সমগ্র খুরাসানে দাওয়াতী আন্দোলন সার্থক সফল করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১২৯ হিজরীতে (৭৪৬-৪৭ খ্রি.) ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে লিখেন ঃ এ বছর হজ্জ মওসুমে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে, যাতে দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তোমাকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারি। তিনি এও লিখেন, কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবকে এবং যে পরিমাণ ধন-সম্পদ তার কাছে সংগৃহীত হয়েছে তাও সঙ্গে করে নিয়ে এস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্রের জন্য হজ্জের মওসুমই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়। তখন হজ্জের জন্য বিশ্বের সর্বপ্রান্ত থেকে লোকেরা মক্কায় এসে জড় হতো। তাই বিশেষ কোন ব্যক্তির আগমনের উপর অন্য কারো সন্দেহ করার সুযোগ ছিল না। অতএব ষড়যন্ত্রকারীরা যে কোন জায়গায় বসে আপোসে যে কোন ধরনের আলাপ-আলোচনা করতে পারত। তাই পারতপক্ষে কেউই হজ্জের এই সুযোগ নষ্ট হতে দিত না। যাহোক, আবূ মুসলিম কাহতাবা ও অন্যান্য নকীবকে সঙ্গে নিয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কূমিস নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি ইমাম ইবরাহীমের একটি পত্র পান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, তুমি অবিলম্বে খুরাসানের দিকে ফিরে যাও। আর যদি খুরাসান থেকে রওয়ানা না হয়ে থাক তাহলে সেখানেই অবস্থান কর এবং এখন থেকে দাওয়াতী কাজ গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যে শুরু করে দাও। এই পত্র পাঠ মাত্র আবূ মুসলিম মার্ভের দিকে ফিরে যান এবং কাহতাবা যাবতীয় ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে ইমাম ইবরাহীমের উদ্দেশে রওয়ানা হন। কাহতাবা জুরজানের রাস্তা ধরে রওয়ানা হয়েছিলেন। জুরজান এলাকায় পৌঁছে তিনি খালিদ ইব্‌ন বারমাক এবং আবূ আওনকে তলব করেন। ওরা ধন-সম্পদ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার খিদমতে হাযির হয় এবং তিনি ঐ সমস্ত ধন-সম্পদও সঙ্গে নিয়ে ইমামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

আবূ মুসলিমকে যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত ও শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয় ঠিক তখন খুরাসানে কিরমানী ও নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের মধ্যে অবিরাম লড়াই চলছিল। আবূ মুসলিম তাঁর দলের লোকদের নিয়ে সেদিকে যান এবং কিরমানী ও নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের ঠিক মাঝখানে নিজেদের তাঁবু স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত কিরমানী নিহত হন এবং তার পুত্র আলী আবূ মুসলিমের কাছে চলে আসেন। আবূ মুসলিম নাসরকে মার্ভ থেকে বের করে দিয়ে সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মার্ভে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি মাহ্‌ওয়ানের দিকে চলে যান। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার দামিশকে খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ঐ সময়ে মারওয়ান দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স খারিজীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলে নাস্‌রের কাছে কোন সাহায্য পাঠাতে পারেননি। যে সময়ে নাসরের আবেদন পত্র মারওয়ানের কাছে পৌঁছে ঠিক তখনি আবূ মুসলিমের নামে লেখা ইমাম ইবরাহীমের একটি পত্র ধরা পড়ে। ইমাম ইবরাহীম তাতে লিখেছিলেন ঃ খুরাসানে যেসব আরবী ভাষী রয়েছে তাদের কাউকেই জীবিত রাখবে না এবং নাস্‌র ও কিরমানীকেও খতম করে ফেলবে। যাহোক পত্রটি মারওয়ানুল হিমারের খিদমতে পেশ করা হয় এবং এর মাধ্যমেই বনূ উমাইয়ারা প্রথম

বারের মত আব্বাসীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়। মারওয়ান বালকা এলাকার শাসককে লিখেন ঃ তুমি হামীমায় গিয়ে ইবরাহীমকে গ্রেফতার কর। অতএব ইমাম ইবরাহীমকে গ্রেফতার করা হয় এবং মারওয়ান তাঁকে কয়েদখানায় আটকে রাখেন, যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আবূ মুসলিম যখন খুরাসানে প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন সেখানকার লোক দলে দলে তাঁর কাছে আসতে থাকে।

১৩০ হিজরীর (৭৪৭ খ্রি. সেপ্টেম্বর) শুরু হতেই আবূ মুসলিম কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ এবং আহলে বায়তে নববীর আনুগত্যের উপর জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করেন। কিরমানী, শায়বানী খারিজী ও নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার— তিনজনই আবূ মুসলিমের এই বায়আত গ্রহণ এবং লোকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তারা এমনভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁর এই কাজে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কিরমানী নিহত হওয়ার পর আলী ইব্‌ন কিরমানী আপন পিতার দলের নেতা নির্বাচিত হন। এদিকে আবূ মুসলিম যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেন। নাস্‌র ইব্‌ন সাইয়ার এবং শায়বান খারিজীও অনুরূপ শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, তখন খুরাসানে একই সময়ে একই পর্যায়ের চারটি শক্তি বিরাজ করছিল।

আবূ মুসলিম শায়বান খারিজীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেন এবং এ উদ্দেশ্যে ইব্‌ন কিরমানীকে তাঁর কাছে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। আলী ইব্‌ন কিরমানী শায়বান খারিজীর কাছে চলে যান। নাসর ইব্‌ন সাইয়ারও শায়বান খারিজীর সাথে সন্ধি স্থাপনের উদ্যোগ নেন যাতে তার দিক থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবূ মুসলিমকে এক হাত দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আবূ মুসলিম আলী ইব্‌ন কিরমানীর মাধ্যমে এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে তাদের মধ্যে কোন সন্ধি স্থাপিত হতে পারে নি। এই সুযোগে আবূ মুসলিম নাসর ইব্‌ন নাঈমকে একটি বাহিনীসহ হিরাতের দিকে প্রেরণ করেন। নাস্‌র হিরাতে পৌঁছে বলতে গেলে, সকলের অগোচরেই সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের কর্মকর্তা ঈসা ইব্‌ন আকীলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন নাঈম ইব্‌ন হুরায়রা শায়বানী এই সংবাদ শুনে ইব্‌ন কিরমানীর কাছে আসেন এবং বলেন ঃ তুমি নাসরের সাথে সন্ধি করে ফেল। তাহলে আবূ মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে নাসরের মুকাবিলায় এগিয়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই তোমার সাথে তাঁর আর কোন সংঘর্ষ বাঁধবে না। আর যদি তুমি নাসরের সাথে সন্ধি কর তাহলে আবূ মুসলিম নাসরের সাথে সন্ধি করে অবশ্যই তোমার মুকাবিলায় এগিয়ে আসবে। শায়বানী সঙ্গে সঙ্গে নাসরকে লিখেন ঃ আমি তোমার সাথে সন্ধি করতে চাই। নাসর সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে যান। কেননা তিনিও মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন।

আবূ মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে শায়বান খারিজীর সহযোগী আলী ইব্‌ন কিরমানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ মনে রেখ, নাসর ইব্‌ন সাইয়ার হচ্ছে তোমার পিতার হত্যাকারী। আলী একথা

শোনামাত্র শায়বান খারিজী থেকে পৃথক হয়ে যান এবং তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আবূ মুসলিম ইব্‌ন কিরমানীর সাহায্যে এগিয়ে যান। অপর দিকে নাসর ইব্‌ন সাইয়ার শায়বান খারিজীর পক্ষাবলম্বন করেন। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তখন একই সময়ে একই জায়গায় চারটি দল ছিল এবং তারা প্রত্যেকেই পৃথক মত পোষণ করত। কিন্তু সময় ও সুযোগের প্রেক্ষিতে তারা একে অপরকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে তৃতীয় পক্ষকে শেষ করে ফেলার ফন্দী আঁটত। খুরাসানে প্রথম থেকেই প্রচুর সংখ্যক 'শীআনে আলী' ছিল এবং তারা সকলেই ছিল আবূ মুসলিমের সহযোগী।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবও কূফায় জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয প্রতাপশালী হয়ে ওঠায় তিনি মাদায়েনে চলে যান। তার সাথে কূফার কিছু লোকও এসেছিল। তিনি পার্বত্য এলাকার দিকে রওয়ানা হন এবং তা দখল করে হুলওয়ান, কূমিস, ইসফাহান ও রায়-এর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইসফাহানে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ১২৮ হিজরীতে (৭৪৫-৪৬ খ্রি.) শীরায দখল করে নেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এসে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান। ইসতাখরের সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া পরাজিত হন। তার অনেক সঙ্গী নিহত হয় এবং মানসূর ইব্‌ন জামহূর সিন্ধুর দিকে পালিয়ে যান। তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়, কিন্তু তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়ার সঙ্গীদের মধ্যে যারা বন্দী হয় তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী আব্বাসী ছিলেন অন্যতম। কূফার গভর্নর ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর তাকে মুক্ত করে দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া আবূ মুসলিমের কাছে পালিয়ে যান। কেননা তিনি আহলে বায়তের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলে আবূ মুসলিমের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল। কিন্তু তিনি শীরায থেকে কিরমান যান এবং সেখান থেকে হিরাতে গিয়ে পৌঁছেন। আবূ মুসলিম কর্তৃক নিযুক্ত হিরাতের কর্মকর্তা নাসর ইব্‌ন নাঈম তাকে সেখানে থামিয়ে আবূ মুসলিমকে তার আগমন সংবাদ জানান। আবূ মুসলিম লিখে পাঠান ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন্ মুআবিয়াকে হত্যা কর এবং তার দুই ভাই হাসান ও ইয়াযীদকে মুক্ত করে দাও। নাসর ইব্‌ন সাইয়ার যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।

হিজরী ১৩০ সন (৭৪৭-৪৮ খ্রি.) শুরু হতেই উল্লিখিত চারটি শক্তি খুরাসানে একে অন্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত আলী ইব্‌ন কিরমানী ও আবূ মুসলিম নাসর ইব্‌ন সাইয়ার ও শায়বান খারিজীকে পরাজিত করে মার্ভের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আবূ মুসলিম মার্ভের সরকারী প্রাসাদে গিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং একটি ভাষণও দেন। নাসর মার্ভ থেকে পরাজিত হয়ে সারাখস্ এবং তূস হয়ে নিশাপুরে এসে অবস্থান নেন। আর ইব্‌ন কিরমানী আবূ মুসলিমের সাথে থেকে তাঁর সব কথায়ই হ্যাঁ মিলাতে থাকেন। আবূ মুসলিম শায়বান খারিজীর কাছে (যিনি পরাজিত হয়ে মার্ভের সন্নিকটে

অবস্থান করছিলেন) বায়আত করার আহ্বান জানিয়ে একটি পয়গাম পাঠান। শায়বান উত্তরে বলেন, তুমিই বরং আমার কাছে বায়আত কর। এরপর শায়বান খারিজী সারাখ্সের দিকে চলে যান এবং বকর ইব্ন ওয়ায়েলের কিছু লোককে নিজের কাছে জড় করে নেন। এই সংবাদে আবূ মুসলিম সারাখ্সের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শায়বান খারিজী নিহত হন। এরপর আবূ মুসলিম তাঁর নকীব মূসা ইব্ন কা'বকে আবীওয়ারদের দিকে এবং আবূ দাঊদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীমকে বলখের দিকে প্রেরণ করেন। তারা উভয়েই জয়লাভ করেন। আবীওয়ারদ ও বলখের উপর যখন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আবূ মুসলিম আবূ দাঊদকে সেখান থেকে ডেকে পাঠান এবং ইয়াহইয়া ইব্ন নাঈমকে বলখের হাকিম (শাসক) নিয়োগ করেন। যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান কাসরী, যিনি হুকুমতে বনূ উমাইয়ার পক্ষ থেকে বলখের শাসক ছিলেন এবং আবূ দাঊদের কাছে পরাজিত হয়ে তিরমিয চলে গিয়েছিলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন নাঈমের সাথে পত্রালাপ করে তাকে নিজের সমমনা করে নেন। এরপর মুসলিম ইব্ন আবদুর রহমান বাহিলী, ঈসা ইব্ন যুরআ সালামী, তাখারিস্তান, মাওরাউন নাহর ও বলখের রাজন্যবর্গ, তিরমিযবাসী এবং ইয়াহইয়া ইব্ন নাঈমকে তার বাহিনীসহ সঙ্গে নিয়ে আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হন। তারা সবাই এক জোট হয়ে কালো পতাকাধারী (বনূ আব্বাসের দাঈ)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান নাবাতীকে সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়।

আবূ মুসলিম এই সংবাদ শুনে আবূ দাঊদকে পুনরায় বল্খের দিকে প্রেরণ করেন। বল্খ থেকে সামান্য দূরে, একটি নদীর ধারে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হয়। আবূ সাঈদ কুরাশী ছিলেন মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান নাবাতীর সাকা'হ্ (কমাণ্ডো) বাহিনীর অধিনায়ক। গোটা বাহিনীর পশ্চাৎভাগে যে সেনাদল থাকে তাদেরকে সাকা'হ বাহিনী বলা হয়। এই বাহিনীকে খুব ভালভাবে অস্ত্র সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রতিপক্ষ ধোঁকা দিয়ে পিছন দিক থেকে হামলা চালিয়ে কোন ক্ষতি করতে না পারে। যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয় তখন আবূ সাঈদও তার পশ্চাৎবর্তী বাহিনী নিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করার প্রয়োজন বোধ করেন। ঘটনাচক্রে আবূ সাঈদের পতাকার রংও ছিল কালো। যখন তিনি তার বাহিনী নিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হন তখন দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মুখবর্তী বাহিনীর যোদ্ধারা ভুলে গেল যে, তাদের পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর পতাকার রংও কালো। অতএব তারা আবূ সাঈদের পতাকা দেখেই ধরে নিল, শত্রু বাহিনী পিছন দিক থেকেও তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল তাদেরই বাহিনী, যারা বিজয়ী বেশে বুক ফুলিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিল। যা হোক এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে মুকাতিলের সম্মুখ-বাহিনীর মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয় এবং তারা পালাতে শুরু করে। তাদের অনেকেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই তাদের সলীল সমাধি হয়। শেষ পর্যন্ত যিয়াদ ও ইয়াহইয়া তিরমিযের দিকে চলে যান এবং আবূ দাউদ বল্খের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিজয় লাভের পর আবূ মুসলিম দউদকে বল্‌খ থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং নাসর ইব্‌ন সাবীহ্‌ মুযানীকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আলী ইব্‌ন কিরমানী এবং তার ভাই উছমান আবূ মুসলিমের সাথেই থাকতেন। আবূ দাঊদ আবূ মুসলিমকে পরামর্শ দিলেন, এই দুই ভাইকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। আবূ মুসলিম এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং উছমান ইব্‌ন কিরমানীকে বল্‌খের হাকিম (শাসক) নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। উছমান বল্‌খে পৌঁছে ফারাফিদা ইব্‌ন যুহায়রকে নিজের সহকারী নিয়োগ করেন এবং নাসর ইব্‌ন সাবীহকে নিয়ে নিজে মার্ভ আররূফে চলে যান। এই সংবাদ শুনে মুসলিম ইব্‌ন আবদুর রহমান বাহিলী তিরমিয থেকে মিসরীদেরকে সঙ্গে নিয়ে বল্‌খ আক্রমণ করেন এবং অস্ত্র বলে তা দখল করে নেন। উছমান ও নাসর এই সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খ অভিমুখে রওয়ানা হন। তাদের আগমন সংবাদ শুনে আবদুর রহমানের সঙ্গীরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। নাসর একদিক থেকে এবং উসমান অন্যদিক থেকে বলখের উপর হামলা চালান। নাসরের সঙ্গীরা পলায়নকারীদের সাথে কোনরূপ সংঘর্ষে যায়নি। কিন্তু উছমান ইব্‌ন কিরমানী পলায়নকারীদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন এবং নিজেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। তার অনেক সঙ্গী নিহত হয় এবং তখনকার মত বল্‌খের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এই সংবাদ শোনার পর আবূ মুসলিম এবং আবূ দাঊদ বিষয়টি নিয়ে পরস্পর পরামর্শ করেন। এরপর আবূ মুসলিম নিশাপুরে রওয়ানা হন এবং আবূ দাঊদ পুনরায় বল্‌খে আসেন। আবূ মুসলিমের সঙ্গে ছিলেন আলী ইব্‌ন কিরমানী। আবূ মুসলিম নিশাপুরের পথে আলী ইব্‌ন কিরমানীকে হত্যা করেন এবং আবূ দাঊদের পরামর্শ অনুযায়ী বল্‌খ দখল করে আবদুর রহমানকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি উছমান ইব্‌ন কিরমানীকেও হত্যা করেন। এভাবেই তিনি কিরমানী ভ্রাতৃদ্বয়ের ঝামেলা চিরতরে মিটিয়ে ফেলেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে প্রথমে ডেকেছিলেন। এরপর তাঁকে আসতে নিষেধ করে খুরাসানে প্রকাশ্যে দাওয়াতকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। আবূ মুসলিম কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবকে ধন-সম্পদসহ ইমাম ইবরাহীমের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। কাহ্‌তাবা ইমাম ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করে যাবতীয় ধনসম্পদ তাঁর সমক্ষে পেশ করেন। ইমাম ইবরাহীম কাহ্‌তাবার হাতে একটি পতাকা তুলে দেন এবং তাকে মক্কা থেকে খুরাসানের দিকে পাঠিয়ে স্বয়ং হামীমায় চলে আসেন। হামীমায় পৌঁছতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কাহ্‌তাবা ঐ পতাকা নিয়ে আবূ মুসলিমের কাছে আসেন। আবূ মুসলিম তা অগ্রবর্তী বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং কাহতাবাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ১৩০ হিজরী (৭৪৭-৪৮ খ্রি.) শেষ হতে না হতেই আবূ মুসলিম খুরাসানের একটি বিরাট অংশের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার প্রত্যেকটি শত্রুকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আলী ইব্‌ন কিরমানীকে হত্যা করার পর আবূ মুসলিম ফিরে আসেন এবং আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াযীদ, খালিদ ইব্‌ন বারমাক, উছমান ইব্‌ন নাহীক, খাযিম ইব্‌ন খুযায়মা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কাহতাবাকে তূসের দিকে পাঠিয়ে দেন। তূসবাসীরা তাদের মুকাবিলা করে পরাজিত হয়। কাহতাবা নির্দয় পাষাণের মত তাদেরকে

পাইকারীহারে হত্যা করেন। এরপর কাহ্তাবা সুযকানে অবস্থানকারী তামীম ইব্ন নাসরের উপর হামলা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। তাতে তামীম তার তিন হাজার সঙ্গীসহ নিহত হন। কাহতাবা শহরে প্রবেশ করে পাইকারী হত্যা চালান এবং খালিদ ইব্ন বারমাককে মালে গনীমত সংগ্রহ করার কাজে নিয়োগ করেন।

এরপর কাহ্তাবা নিশাপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেখানে নাসর ইব্ন সাইয়ার অবস্থান করছিলেন। তিনি নিশাপুর থেকে কূমিসে পালিয়ে আসেন। কাহতাবা ১৩০ হিজরীর রমযান (৭৪৭ খ্রি এপ্রিল) মাসের শুরুতে নিশাপুর দখল করেন এবং শাওয়াল মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। (কূফার গভর্নর ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রা নাসর ইব্ন সাইয়ারের সাহায্যার্থে নাবাতা ইব্ন হানযালার নেতৃত্বে কূফা থেকে একটি সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। নাসর ইব্ন সাইয়ার কূমিসেও বেশিদিন অবস্থান করেন নি। সেখান থেকে জুরজানে চলে আসেন। সেখানেই নাবাতা তার বাহিনীসহ নাসরের সাথে মিলিত হন। কাহতাবা যিলকদ মাসের প্রথম দিকে নিশাপুর থেকে জুরজানের দিকে রওয়ানা হন।

কাহতাবার সঙ্গীরা নাবাতার একটি বিরাট সিরীয় বাহিনীসহ সিরিয়া থেকে জুরজানে এসে পৌঁছার সংবাদে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাহতাবা তখন তাদের উদ্দেশে একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন ঃ ইমাম ইবরাহীম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তুমি একটি বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করে জয়লাভ করবে। এতে সৈন্যদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কাহতাবা জয়লাভ করেন। তিনি নাবাতার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা আবূ মুসলিমের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই যুদ্ধ ১৪৭ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৬৫ খ্রি মার্চ) মাসের প্রথম দিকে সংঘটিত হয়। কাহতাবা জুরজান দখল করে ত্রিশ হাজার জুরজানবাসীকে হত্যা করেন। জুরজানে পরাজিত হওয়ার পর নাসর ইব্ন সাইয়ার 'খাওয়ারূর রায়'-এর দিকে চলে আসেন। সেখানকার আমীর ছিলেন আবূ বকর উকায়লী। ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবায়রা যখন এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন তখন ইব্ন গালীফের অধিনায়কত্বে একটি বিরাট বাহিনী নাসরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

কাহতাবা জুরজান থেকে আপন পুত্র হাসানকে 'খাওয়ারূর-রায়'-এ প্রেরণ করেন। পিছন থেকে একটি বাহিনী আবুল কামিল ও আবুল আব্বাস মারূযীর অধিনায়কত্বে হাসানের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। কিন্তু যখন তারা হাসানের বাহিনীর নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন আবুল কামিল নিজ সঙ্গীদের নিয়ে সোজা নাসরের সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনি নাসরকে হাসানের সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কেও অবহিত করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং হাসান ইবন কাহতাবার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বনূ নাসর মালে গনীমত এবং বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে ইব্ন গালীফ সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে আসছিলেন। রায় নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাত হয়। ইব্ন গালীফ চিঠি এবং মালে গনীমত গ্রহণ করেন এবং রায়-এ অবস্থান নেন।

নাসর এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। যখন নাসর খুদরের উদ্দেশে রওয়ানা হন তখন গালীফ তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে হামাদান, এরপর সেখান থেকে ইসফাহানে চলে যান।

নাসর দু'দিন পর্যন্ত রায়-এ অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন অসুস্থ হয়ে পড়ার সাথে সাথে রায় ছেড়ে চলে যান। তিনি হিজরী ১৩১ সনের (৭৪৮খ্রি. নভেম্বর) ১২ই রবিউল আউয়াল সাদাহ্ নামক স্থানে পৌঁছে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার সঙ্গীরা হামাদানে চলে যায়। রায়-এর শাসক ছিলেন হাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ। নাসরের মৃত্যুর পর যখন কাহতাবা জুরজান থেকে নিজ বাহিনী নিয়ে রায়-এর দিকে আসেন তখন হাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ এবং তার সাথে যে সব সিরীয় ছিল, কোনরূপ মুকাবিলা ছাড়াই রায় ত্যাগ করে চলে যায়। কাহতাবা রায় দখল করে এখানকার অধিবাসীদের যাবতীয় মাল-আসবাব আটক করে ফেলেন। এখানকার বেশির ভাগ পলায়নকারী হামাদানে চলে যায়। কাহতাবা রায় থেকে আপন পুত্র হাসানকে হামাদানের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক হামাদান ছেড়ে নিহাওয়ান্দে চলে যায়। হাসান নিহাওয়ান্দে পৌঁছে শহর অবরোধ করে ফেলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর হুবায়রা হিজরী ১২৯ সনে (৭৪৬-৪৭ খ্রি.) আপন পুত্র দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন এবং দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ তার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে কিরমান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। দাউদের সাথে আমির ইব্‌ন সাবারাহও ছিলেন। ওরা দু'জন পশ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কিরমানে অবস্থান করছিলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা নাবাতা ইব্‌ন হানযালার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে দাউদ ইব্‌ন সাবারাহকে লিখেন ঃ তুমি কাহতাবার মুকাবিলার জন্য এগিয়ে যাও। তারা দু'জন পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কিরমান থেকে রওয়ানা হয় এবং ইসফাহানে গিয়ে পৌঁছে। কাহতাবা তাঁদের মুকাবিলার জন্য মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে নির্দেশ দেন। হাসান ইব্‌ন কাহতাবা নিহাওয়ান্দ অবরোধ করে রেখেছেন জানতে পেরে ইব্‌ন সাবারাহ নিহাওয়ান্দ রক্ষার সংকল্প নেন এবং সেদিকে রওয়ানা হন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে কাহতাবার সঙ্গীরা এমন প্রাণপণে হামলা করে যে, খোদ ইব্‌ন সাবারাহ্ নিহত হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়।

এটা হচ্ছে ১৩১ হিজরীর রজব (৭৪৯ খ্রি. এর মার্চ) মাসের ঘটনা। কাহতাবা এই বিজয় সংবাদ আপন পুত্র হাসানের কাছে পাঠান এবং স্বয়ং ইসফাহানে বিশদিন অবস্থান করেন। এরপর হাসানের কাছে এসে অবরোধ-কর্মসূচিতে যোগ দেন। তিন মাস পর্যন্ত নিহাওয়ান্দবাসীরা অবরুদ্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত তা বিজিত হয় এবং সেখানকার অনেক লোক নিহত হয়। এরপর কাহতাবা হাসনকে হুলওয়ান প্রেরণ করেন এবং তা অতি সহজেই বিজিত হয়। এরপর কাহতাবা আবূ আওন ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াযীদ খুরাসানীকে শাহরিযুর আক্রমণের জন্য পাঠান। সেখানকার হাকিম ছিলেন উছমান ইব্‌ন সুফইয়ান। তার অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ। আবূ আওন ও উছমানের মধ্যে শেষ যিলহজ্জ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত উছমান নিহত হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। আবূ আওন মাওসিল শহর দখল করে নেন।

আমির ইব্‌ন সাবারাহ্ নিহত হলে দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ নিজ পিতার কাছে পালিয়ে আসেন। দাউদ যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রার এই পরাজয়ের সংবাদ পান তখন

একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ ও হাওসারাহ্ ইব্‌ন সুহায়ল বাহিলীকে একটি বাহিনী দিয়ে তার সাহায্যে প্রেরণ করন। ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হাওসারাহ্ ইব্‌ন সুহায়ল হুলওয়ানে পৌঁছেন। কাহতাবাও এই সংবাদ পেয়ে হুলওয়ানের দিকে রওয়ানা হন এবং আনবারের দিক থেকে দজলা অতিক্রম করেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন উমরও কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং হাওসারাকে পনর হাজার সৈন্য দিয়ে কূফার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। কাহতাবা আনবার থেকে ১৩২ হিজরীর ৮ই মুহাররম (৭৪৯ খ্রি.-এর ২৮শে আগস্ট) ফুরাত নদী অতিক্রম করেন। ঐ সময়ে হুবায়রা সেখান থেকে ২৩ ফারাসাং দূরে ফুরাত উপকূলে অবস্থান করছিলেন। সঙ্গীরা তাকে পরামর্শ দিল, 'আপনি কূফা পরিত্যাগ করে খুরাসানে চলে যান। তাহলে কাহতাবা বাধ্য হয়ে কূফার সংকল্প ত্যাগ করে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে আসবে। ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর তাদের ঐ পরামর্শ উপেক্ষা করে মাদায়েনের দিক থেকে দজলা অতিক্রম করেন এবং উভয় বাহিনী কূফার উদ্দেশে ফুরাতের উভয় তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। হেঁটে পার হওয়া যায় এমন এক স্থান দিয়ে কাহতাবা নদী অতিক্রম করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রার বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু কাহতাবা নিহত হন। কাহতাবা মৃত্যুকালে অন্তিম উপদেশ দেন, কূফায়ই শীআনে আলীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আবূ সালিমাকেই আমীর মনোনীত করতে হবে। হাওসারাহ, ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা এবং ইব্‌ন নাবাতা ইব্‌ন হানযালা ওয়াসিতের দিকে পলায়ন করেন। কাহতাবার বাহিনী হাসান ইব্‌ন কাহতাবাকে তাদের নেতা মনোনীত করে। এ ঘটনার সংবাদ যখন কূফায় পৌঁছে তখন মুহাম্মদ্ বিন খালিদ কাসরী 'শীআনে আলী'কে (আলী ভক্তদেরকে) একত্র করে ১৩২ হিজরী (৭৪৯ খ্রি.-এর আগস্ট মাসে) আশুরার রাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরকারী প্রাসাদ দখল করে নেন।

এই ঘটনার সংবাদ শুনে হাওসারা ওয়াসিত থেকে কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ সরকারী প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু হাওসারার সঙ্গীরা আব্বাসী দাওয়াত গ্রহণ করে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে তিনিও ওয়াসিতে ফিরে যান। মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ এই ঘটনা এবং সরকারী প্রাসাদে নিজের অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ ইব্‌ন কাহতাবাকে দেন। হাসান ইব্‌ন কাহতাবা কূফায় প্রবেশ করেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদকে সঙ্গে নিয়ে আবূ সালিমার কাছে যান। তিনি আবূ সালিমাকে আমীর মনোনীত করেন এবং তার হাতে বায়আতও করেন। আবূ সালিমা হাসান ইব্‌ন কাহতাবাকে ইব্‌ন হুবায়রার মুকাবিলার জন্য ওয়াসিতে প্রেরণ করেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর আবূ সালিমা হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবাকে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করেন। আহওয়াযের আমীর ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন হুবায়রা। তার ও বাসসামের সাথে হুমায়দের যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত হয়ে বসরার দিকে পলায়ন করেন। বসরার শাসনকর্তা ছিলেন মুসলিম ইব্‌ন কায়কাবাহ্ বাহিলী। বাসসাম আবদুর রহমানকে পরাজিত করে সুফইয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের হাতে বসরার শাসনভার ন্যস্ত করেন। ১৩২ হিজরীর

সফর (৭৪৯ খ্রি. সেপ্টেম্বর) মাসে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলিম তাতে জয়লাভ করেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বসরাকে নিজের দখলে রাখেন, যতক্ষণ না তার কাছে ইয়াযীদ ইব্‌ন উমরের নিহত হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে। এই সংবাদ শুনে তিনি বসরা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসরা দখল করে নেন। কয়েকদিন পর আবূ মালিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসায়দ খুযায়ী আবূ মুসলিমের পক্ষ থেকে বসরায় এসে উপস্থিত হন। আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহ্ তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করার পর সুফইয়ান ইব্‌ন মুআবিয়াকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুকালে হামীমায় তার পরিবারের নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঃ আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্, আবূ জা'ফর মানসূর, আবদুল ওহ্‌হাব (এই তিনজন ছিলেন ইমাম ইবরাহীমের ভাই), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, ঈসা ইব্‌ন মূসা, দাউদ, ঈসা, সালিহ্, ইসমাঈল, আবদুল্লাহ্ ও আবদুস সামাদ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন ইমাম ইবরাহীমের চাচা। ইমাম ইবরাহীম গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আপন ভাই আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে ওসীয়ত করেছিলেন যেন তিনি কূফায় গিয়ে বসবাস করেন। ঐ ওসীয়ত অনুযায়ী আবুল আব্বাস সাফফাহ্ তাঁর পরিবারের উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে সঙ্গে নিয়ে হামীমা থেকে কূফায় চলে আসেন। আবুল আব্বাস যখন কূফায় পৌঁছেন তখন সেখানে আবূ সালিমা কূফায় ইমাম ইবরাহীমের প্রতিনিধি এবং কূফা কেন্দ্রে দাওয়াতী আন্দোলন পরিচালনার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কিন্তু তখন তার সমগ্র প্রচেষ্টা হযরত আলীর বংশধরকে খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে নিয়োজিত ছিল। কাহতাবা ইব্‌ন শাবীবও তাই চাইতেন। কিন্তু যেহেতু আবূ হাশিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসকে যেন তার দলের সকল লোক নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে, অতএব তিনি এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

যখন সংবাদ পাওয়া যায় যে, আবুল আব্বাস কূফার নিকটে এসে পৌঁছেছেন তখন আবূ সালিমাহ্ শীআনে আলীসহ তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য 'হাম্মামে আইউন' পর্যন্ত আসেন এবং আবুল আব্বাসকে ওয়ালীদ ইব্‌ন সা'দের ঘরে নিয়ে তোলেন। তিনি সমগ্র শীআনে আলী এবং বাহিনী অধিনায়কদের কাছে চল্লিশদিন পর্যন্ত এই রহস্য গোপন রাখেন। আবূ সালিমাহ্ চান, আবূ তালিবের পরিবারের কোন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করে তাঁর হাতেই বায়আত করা হোক। কিন্তু আবূ জাহম, যিনি শীআনে আলীরই অন্যতম নেতা ছিলেন। উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন, এরূপ করলে আবূ তালিবের পরিবারের লোকেরা হয়ত খিলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং জনসাধারণ আবুল আব্বাসকেই খলীফা বলে স্বীকার করে নেবে। যদি আবুল আব্বাস ইমাম ইবরাহীমের ওসীয়ত অনুযায়ী কূফায় না আসতেন তাহলে এটা সম্ভব ছিল যে, আবূ সালিমাহ্ আবূ তালিবের পরিবারেরই কোন না কোন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করতে সক্ষম হতেন। আবূ সালিমাহ্ চাচ্ছিলেন না যে, লোকেরা আবুল আব্বাসের আগমন সম্পর্কে অবহিত হোক এবং তার দিকে ঝুঁকে পড়ুক। আবূ সালিমাহ্ ঐ সময়কালের মধ্যে

ইমাম জা'ফর সাদিককে লিখেন, আপনি কূফায় আসুন এবং খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হোন। কিন্তু ইমাম জা'ফর সাদিক তাতে সম্মত হননি। এদিকে ক্রমে ক্রমে লোকেরা কূফায় আবুল আব্বাস সাফ্ফাহের আগমন সংবাদ জেনে ফেলে।

তখন কূফায় দুই শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণীর লোক আব্বাস পরিবারকে এবং অপর শ্রেণীর লোক আবূ তালিব পরিবারকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইত। আব্বাসী পক্ষের লোকেরা আবুল আব্বাসের আগমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে। জনসাধারণ যখন একথা জানতে পারে যে, কূফার গভর্নর আবূ সালিমাহ্ (যিনি 'ওয়াযীরে আহলে বায়ত' উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন) আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উপেক্ষার ভাব দেখিয়েছেন তখন 'শীআনে আলী'র অনেক লোকও সাফ্ফাহের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এভাবে কূফায় আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এভাবে কূফায় আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের উপস্থিতি সাধারণভাবে তার প্রতি মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন কুড়াতে সক্ষম হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৩২ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল (৭৪৯ খ্রি. ৩০শে অক্টোবর) রোজ শুক্রবার জনসাধারণ একত্রিত হয়ে আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহকে তাঁর বাসস্থান থেকে সরকারী প্রাসাদে নিয়ে তোলে। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ সরকারী প্রাসাদ থেকে জামে মসজিদে আসেন। এরপর খুতবা দেন এবং জুমুআর নামায পড়ান। নামাযের পর পুনরায় তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং একটি ভাষণ দেন। তাঁর ঐ ভাষণ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। তাতে তিনি নিজেকে খিলাফতের যোগ্য বলে প্রমাণ করেন, জনসাধাণের ভাতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন এবং কূফাবাসীদের প্রশংসা করেন। এরপর তার চাচা দাউদ মিম্বরে আরোহণ করে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বনূ আব্বাসের খিলাফতের সাথে মানানসই শব্দাবলী ব্যবহার করেন এবং বনূ উমাইয়ার নিন্দা করেন। তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন ঃ আজ আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ জ্বর ও ব্যথায় কিছুটা আক্রান্ত; তাই আপনাদের সামনে বেশি কিছু বলতে পারেননি। আপনারা সবাই তাঁর জন্য দু'আ করুন। এরপর আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ সরকারী প্রাসাদে চলে যান এবং তাঁর ভাই আবূ জা'ফর মানসূর মসজিদে বসে রাত পর্যন্ত জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করতে থাকেন। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফফাহ্ খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করার জন্য প্রথমে সরকারী প্রাসাদে যান। এরপর সেখান থেকে আবূ সালামার তাঁবুতে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন। আবূ সালিমা বায়আত করেছিলেন বটে, তবে অন্তর দিয়ে এই বায়আত এবং আব্বাসীদের খিলাফত সমর্থন করেননি। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ কূফার আশেপাশের এলাকার প্রতিনিধিত্ব আপন চাচা দাউদকে প্রদান করেন এবং আপন অপর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে আবূ আওন ইব্ন ইয়াযীদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তিনি আপন ভাতিজা ঈসা ইব্ন মূসাকে কাহতাবার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন, যিনি ওয়াসিত অবরোধ করে রেখেছিলেন। ইয়ামীমী ইবন জা'ফর ইব্ন তামাম ইব্ন আব্বাসকে হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবার সাহায্যার্থে মাদায়েনে প্রেরণ করা হয়। অনুরূপভাবে

সব দিকেই অধিনায়কদের নিয়োগ ও মুতায়েন করা হয়। আবূ মুসলিম খুরাসানেই ছিলেন এবং খুরাসানকে দ্রুত শত্রুমুক্ত করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই আবূ মুসলিমের পরামর্শ চাইতেন এবং তিনি যে পরামর্শ দিতেন তা-ই নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন।

সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ঐ যুগ ছিল অত্যন্ত নাজুক ও ভয়ংকর যুগ। প্রতিটি প্রদেশের এখানে সেখানে লড়াই ও বিশৃঙ্খলা চলছিল। ওয়াসিতে ইব্‌ন হুবায়রাকে পরাজিত করা সহজ ছিল না। এদিকে উমাবী খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ সিরিয়ায় বিদ্যমান ছিলেন। হিজাযেও নৈরাজ্য চলছিল। মিসরের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। স্পেনে তখন পর্যন্ত আব্বাসী আন্দোলনের কোন প্রভাবই পড়েনি। জাযীরা ও আর্মেনিয়ায় উমাবী শাসকগণ বিদ্যমান ছিলেন এবং তারা আব্বাসীদের মুকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলেন। খুরাসানেও পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বসরায়ও আব্বাসী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না। হাদরামাওত, ইয়ামামা ও ইয়ামনের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ খলীফা হওয়ার পর আলে 'আবূ তালিব' বা আলাবীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা ঐ সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা তাঁরা নিজেদেরই খিলাফত কামনা করছিল। আব্বাসীদের এই সাফল্যের মূলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার পুত্র আবূ হিশাম আবদুল্লাহর সেই ওসীয়ত যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের উদ্দেশে প্রদান করেছিলেন। ঐ ওসীয়তের কারণে শিয়াদের 'কায়সায়া' ফিরকার এই আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত আলী (রা)-এর পর যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া, আবূ হিশাম আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আব্বাসী, ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ সাফফাহ্ মুসলমানদের ইমাম হয়েছেন। এভাবে শিয়াদের একটি বিরাট দল মূল শিয়াদের থেকে পৃথক হয়ে আব্বাসীদের পক্ষে চলে যায়। ফলে আলাবী কিংবা ফাতিমীরা আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন সুযোগ পায়নি, ভিতরে ভিতরে শুধু হাহুতাশই করতে থাকে।

শেষ উমাবী খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ নিহত হলে বালাকার শাসনকর্তা হাবীব ইব্‌ন মুররা আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অথচ ইতিপূর্বে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী আব্বাসীর হাতে বায়আত করেছিলেন। হিম্‌সবাসীরাও তার সাথে যোগ দেয়। অপর দিকে আর্মেনিয়ার গভর্নর ইসহাক ইব্‌ন মুসলিম উকায়লীও আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সমস্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রেরণ করেন এবং তাতে ক্রমশ সাফল্য অর্জিত হয়। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা তখন পর্যন্ত ওয়াসিত এলাকা নিজ দখলে রেখেছিলেন এবং কোন অধিনায়কই তাকে পরাজিত করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবূ জা'ফর মানসূর ও আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ তার সাথে সন্ধি করেন এবং তিনি বায়আত করতে রাযী হন। কিন্তু আবূ মুসলিম খুরাসান থেকে আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহকে লিখেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন উমরের অস্তিত্ব

অত্যন্ত ভয়ংকর। তাকে অবিলম্বে হত্যা করুন। অতএব প্রতারণার মাধ্যমে মানসূর আব্বাসী ইয়াযীদকে হত্যা করে উপরোক্ত আশংকা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

এবার কূফায় আবূ সালামা অবশিষ্ট ছিলেন। বাহ্যত তাকে হত্যা করার পিছনে কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছিল না। কেননা আব্বাসীরা তাদের খিলাফতের এই সূচনাকালে প্রকাশ্যে শীআনে আলীর বিরোধিতা করতে চাচ্ছিল না। আবূ সালামার যাবতীয় অবস্থা লিপিবদ্ধ করে তা আবূ মুসলিমের কাছে খুরাসানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে তার পরামর্শ তলব করা হয়। আবূ মুসলিম লিখেন, আবূ সালামাকে অবিলম্বে হত্যা করা উচিত। এর উত্তরে আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ আপন চাচা দাঊদ ইব্ন আলীর পরামর্শ নিয়ে আবূ মুসলিমকে লিখেন ঃ যদি আমরা তাকে হত্যা করি তাহলে তার সমর্থকবৃন্দ এবং শীআনে আলীর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও বিদ্রোহের আশংকা রয়েছে। অতএব আবূ সালামাকে হত্যা করার জন্য তুমি ওখান থেকে কোন লোক পাঠিয়ে দাও। আবূ মুসলিম এ কাজের জন্য মুরাদ ইব্ন আনাসকে পাঠিয়ে দেন। মুরাদ কূফায় আসে এবং একদা আবূ সালামা কোন এক গলিপথে হেঁটে যাওয়ার সময় সে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে । মুরাদ ইব্ন আনাস অকুস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায় এবং সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, জনৈক খারিজী আবূ সালামাকে হত্যা করেছে। এরপর আবূ মুসলিম সুলায়মান ইব্ন কাসীরকেও অনুরূপভাবে হত্যা করেন। ইনি হচ্ছেন সেই সুলায়মান যিনি আবূ মুসলিমকে প্রথমে খুরাসান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং আবূ দাঊদ তাকে রাস্তা থেকে পুনরায় ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। মোটকথা, যাদের পক্ষ থেকেই আবূ মুসলিমের বিরোধিতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তিনি তাদের সকলকেই বেছে বেছে হত্যা করান।

আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা

'খিলাফতে ইসলামিয়াকে' যে সম্প্রদায় বা পরিবার নিজেদের অধিকার মনে করে তারা অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। বনূ উমাইয়ার ইসলামী হুকুমতকে তাদের গোত্র ও পরিবারের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা ছিল তাদের একটি ভুল। বনূ আব্বাস এবং বনূ হাশিমও যদি খিলাফতে ইসলামিয়াকে নিজেদের গোত্রগত অধিকার বলে মনে করে থাকেন তাহলে এটাও ছিল তাদের একটি ভ্রান্তি এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক মনোবৃত্তি। কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু সাধারণভাবে মানুষ এই ভ্রান্তির শিকার যে, হুকুমত বা সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকারিত্ব চলে এবং তাতে অন্যায়ের কিছু নেই– তাই যখন কোন ব্যক্তি নিজের হারানো সাম্রাজ্য কোন লুণ্ঠনকারীর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে চায় তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে হত্যাকাণ্ড চালাতে হয়। বনূ আব্বাস বনূ উমাইয়াকে যেরূপ পাইকারীভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং তাদের সাথে যেরূপ নির্মম আচরণ করেছে তার দৃষ্টান্ত মানব-ইতিহাসে বিরল। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে এর কিছু কিছু নযীর পাওয়া যায়। যেমন, বখ্তে নসর বনী ইসরাঈলকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সে চেয়েছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেক বনী ইসরাঈলের অস্তিত্ব

চিরতরে মুছে ফেলতে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বনী ইসরাঈল এখনো দুনিয়ায় টিকে আছে। হিন্দুস্থানে আর্যরা অনার্যদের উপর এর চাইতেও অধিক জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু হিমালয় পর্বত, বিন্ধ্যাচলের অরণ্য ভূমি এবং রাজপুতানার মরু অঞ্চলে অনার্যরা টিকে আছে। আজ তারা শূদ্র ও হরিজন আকারে ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। হিন্দুস্থানের আর্যরাও মূলত ইরান ও খুরাসানের লোক ছিল। আব্বাসীদের খুরাসানী বংশোদ্ভূত সেনাপতিও বনূ উমাইয়াদের হত্যা ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে আব্বাসীদের এমন সব জুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়িতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যার তুলনায় হিন্দুস্থানের মজলুম অনার্যদের জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী একটি মামুলী ব্যাপার বলেই মনে হয়। বিশ্বের অনেক গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কত বিপুল সংখ্যক মানুষকেই না হত্যা করেছে এবং নারী-পুরুষ ও আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে মানব জাতির উপর কত অকথ্য জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। মুসলিম ইতিহাসেও এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। উমাইয়া পরিবারের হাত থেকে ইসলামী খিলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে অপরাধের কিছু ছিল না। তবে উমাইয়াদের মত আর একটি পরিবারের কাছে তা (ইসলামী খিলাফত) হস্তান্তরিত হওয়ার মধ্যে সৌন্দর্যের বা প্রশংসারও কিছু ছিল না। কেননা, এই হস্তান্তরের পিছনে ইসলামী ও ইসলামী বিশ্বের কল্যাণ সাধনের কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না।

আবূ মুসলিম, কাহতাবা ইব্‌ন হাবীব এবং আহলে বায়তের অন্যান্য নকীব খুরাসানের বিভিন্ন শহরে অত্যন্ত নৃশংসভাবে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। খোদ ইমাম ইবরাহীম আবূ মুসলিমকে তার শেষ পত্রে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ খুরাসানে কোন আরবী ভাষীকে জীবিত রাখবে না। এর দ্বারা তিনি বনূ উমাইয়ার সমস্ত লোকদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যারা ছিল আরব বংশোদ্ভূত এবং যারা বিজয়ী বেশে খুরাসানে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল। কেননা এদেরকে উৎখাত করতে পারলে খুরাসানে যে সব নওমুসলিম রয়েছে তারা অনায়াসেই আব্বাসীদের দাওয়াত কবুল করে নেবে। যাহোক আবূ মুসলিম সে নির্দেশ অনুযায়ী আরবী ভাষীদের নির্দ্বিধায় হত্যা করেন। আর এর ফলে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির যে চর্চা সেখানকার অনারবদের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং ইরানী ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ মরতে মরতেই যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ঐ আরবী ভাষীদেরকে হত্যা করা না হলে আজ ইরান ও খুরাসান ফারসী ভাষী দেশ না হয়ে আরবী ভাষী দেশ হতো। আবূ মুসলিম স্বয়ং ছিলেন খুরাসানী ও ইরানী বংশোদ্ভূত। অতএব তার কাছে আরবদের হত্যা করার চাইতে আকর্ষণীয় কাজ আর কিছুই হতে পারত না। গোত্র ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও শত্রুতা, ইসলাম যার মূলোৎপাটন করেছিল, বনূ উমাইয়ার যুগে পুনরায় তা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই বনূ উমাইয়া বনূ হাশিমের উপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারত যে, সে উমাইয়া গোত্রের, তখন

আপনা-আপনি তাদের অন্তরে এক নিদারুণ আতংকের সৃষ্টি হতো। অতএব যখনই তারা সুযোগ পেত তখনই ঐ ভয় ও আতংক থেকে রেহাই পাওয়ার জন তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করত। আর ঐ আতংক দূর করার মোক্ষম পন্থা হলো, বনূ উমাইয়াদের অস্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা।

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্র চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ১৩২ হিজরী ৫ই রমযান (৭৫০ খ্রি. মার্চ) মাসে দামেশকে প্রবেশ করে সেখানে পাইকারীভাবে হত্যাকাণ্ড চালাবার নির্দেশ দেন। যখন সর্বশেষ উমাবী খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ বূসীরে নিহত হন তখন আব্বাসীদের কাছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় কাজ ছিল উমাইয়াদের মূলোৎপাটন। অবশ্য বনূ উমাইয়ার সুউচ্চ প্রাসাদ ধ্বংস করার কাজে কিছু সংখ্যক বনূ উমাইয়াও আব্বাসীদের সাথে সহযোগিতা করে এবং এই অবাঞ্ছিত খিদমতের জন্যই তারা আব্বাসীদের পক্ষপুটে সসম্মানে বসবাস করার সুযোগ পায়। অতএব বনূ উমাইয়ার লোকদের একেবারে নির্মূল করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আবূ মুসলিম ছিলেন সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আব্বাসীকে বার বার লিখেন ঃ বনূ উমাইয়ার কোন লোককে, চাই সে বনূ আব্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল হোক অথবা না হোক, কোনমতেই জীবিত রাখা চলবে না। তার এই পরামর্শ যথাযথভাবে কার্যকরও হয়। কিন্তু বনূ উমাইয়ার মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এমনও ছিলেন, যারা বিরাট বিরাট বাহিনীসহ অত্যন্ত নাজুক ও সংকটময় মুহূর্তে উমাবী খলীফাদের বিরোধিতা করে আব্বাসীদের সাহায্য করেছিলেন। ওদের হত্যা করা ছিল সৌজন্য ও মানবতাবিরোধী। যে সব কবি ও সভাসদ আব্বাসী খলীফা ও আব্বাসী সেনাপতিদের দরবারে ওঠাবসা করতেন, আবূ মুসলিম তাদেরকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে ঐসব দরবারে এমন সব কবিতা আবৃত্তি ও এমন সব কথা বলতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন যে সব কবিতা বা কথা শুনলে উমাইয়াদের সম্পর্কে আব্বাসীদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং তা প্রশমন করতে গিয়ে তারা বনূ উমাইয়াকে হত্যা করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আবূ মুসলিমের ঐ চেষ্টার ফলে আব্বাসীরা উমাইয়াদেরকে বেছে বেছে হত্যা করে। উল্লিখিত ধরনের একটি উত্তেজনাকর কবিতা শুনে সাফ্ফাহ্ সুলায়মান ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিককে প্রকাশ্য দরবারে একেবারে নির্দ্বিধায় হত্যা করেন। অথচ তিনি আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর সাথে থাকতেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ফিলিস্তীনে অবস্থানকালে একদা নদীর তীরে দস্তরখান বিছিয়ে পানাহার করছিলেন। বনূ উমাইয়ার আশি-নব্বই জন লোকও তার সাথে ঐ পানাহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন শিবল ইব্ন আবদুল্লাহ্ সেখানে আসে এবং এমন সব কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে যেগুলোর মধ্যে বনূ উমাইয়ার নিন্দাবাদ এবং ইমাম ইবরাহীমের বন্দী হওয়ার ঘটনাবলীর উল্লেখ ছিল এবং তা দ্বারা বনূ উমাইয়াকে হত্যা করার জন্য জনসাধারণকে দারুণভাবে উত্তেজিত করা হয়েছিল। ঐ কবিতা শোনার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তথা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহের চাচা নির্দেশ দেন ঃ এখানে যে সব উমাইয়া আছে তাদেরকে অবিলম্বে হত্যা কর। সঙ্গে সঙ্গে তার ভৃত্যরা ঐ নিরীহ-নিরস্ত্র উমাইয়াদের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে তাদের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয় এবং কেউ কেউ ভীষণভাবে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে; তবে তাদের দেহে তখনো প্রাণ ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ঐ আহত ও নিহতদের সারিবদ্ধভাবে শুইয়ে তাদের উপর দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী দস্তরখান বিছানো হয়। এরপর তার উপর সাজিয়ে রাখা হয় হরেক রকমের খাবার। এবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ঐ দস্তরখানের উপর বসে আহার গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। তারা আহার্য গ্রহণ করছিলেন। আর তাদের দস্তরখানের নিচে ঐ সমস্ত মৃতপ্রায় লোক করুণ সুরে গোঙাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে যখন পানাহার পর্ব শেষ হলো তখন ঐ সব বেচারার ধড়ে আর প্রাণ ছিল না। ঐ সব নিহতের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, মুইয্য ইব্‌ন ইয়াযীদ, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন সুলায়মান, আবূ উবায়দা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক প্রমুখ। কারো কারো মতে, পদচ্যুত খলীফা ইবরাহীমও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস বনূ উমাইয়ার খলীফাদের কবরসমূহ খোঁড়ার নির্দেশ দেন। আবদুল মালিকের কবর থেকে তাঁর মাথার খুলি বেরিয়ে আসে। আমীরে মুআবিয়ার কবরে কিছুই পাওয়া যায়নি। কোন কোন কবরে কিছু ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায়। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের কবরে তাঁর সম্পূর্ণ লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। শুধু তাঁর নাকের উপরাংশে কিছুটা পচন ধরেছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ঐ লাশে বেত্রাঘাত করে কিছুদিন তা শূলিতে ঝুলিয়ে রাখেন। এরপর পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলীর ভাই সুলায়মান আব্বাসী বসরায় বনূ উমাইয়ার একটি দলকে হত্যা করে লাশগুলো শুধু রাস্তার উপর ফেলেই রাখেন নি, সেগুলোর কাফন দাফনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুকুরের দল ঐ লাশগুলো টানা-হেঁচড়া করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর অপর ভাই অর্থাৎ সাফ্‌ফাহের চাচা দাঊদ ইব্‌ন আলী মক্কা, মদীনা, হিজায ও ইয়ামানে এক এক করে উমাবীদেরকে খুঁজে বের করেন এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ সমস্ত এলাকা থেকে বনূ উমাইয়ারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, রাষ্ট্রের সর্বত্র এই সাধারণ নির্দেশ জারি করা হয় যে, যেখানেই বনূ উমাইয়ার কোন লোক দৃষ্টিগোচর হবে, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে যেন হত্যা করা হয়। রাজ্যসমূহের শাসনকর্তা এবং শহরসমূহের হাকিমরা সাধারণভাবে আব্বাসী বংশেরই লোক ছিলেন। উমাইয়াদের খুঁজে বের করে হত্যা করাই ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব। এমন কি কোন হিংস্র জন্তু শিকার করার জন্য যেমন লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘর থেকে বের হয় তেমনি বনূ উমাইয়াকে শিকার করার জন্যও লোকেরা প্রতিদিন ঘর থেকে বের হতো। কোন ঘর, কোন পল্লী, কোন গ্রাম বা কোন শহরে বনূ উমাইয়াদের নিরাপত্তা ছিল না। বছরের পর বছর ধরে আব্বাসীরা তাদেরকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে থাকে। খুরাসানে আবূ মুসলিম এই কাজ আরো ব্যাপকভাবে এবং আরো গুরুত্বের সাথে আনজাম দিয়েছিলেন। তিনি শুধু বনূ উমাইয়াকে নয়, বরং যে সমস্ত লোক কোন না কোন সময়ে এবং কোন না কোন ভাবে বনূ উমাইয়ার পক্ষ সমর্থন করেছিল কিংবা তাদের কোন খিদমত আনজাম দিয়েছিল তাদেরকেও

নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই পাইকারী হত্যা থেকে যারা রক্ষা পেয়েছিল তারা নিজেদের বেশভূষা পরিবর্তন করে এবং নিজের ও নিজের গোত্রের নাম বদল করে সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। খুরাসানের প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে যেহেতু এই পাইকারী হত্যা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও নৃশংস, তাই এখানে বনূ উমাইয়া গোত্রের যে লোক ছিল তারা সিন্ধু, সুলায়মান পর্বত এবং কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে যায়। যে সব লোক তাদের গোত্রের নাম বদলে ফেলেছিল তারাও ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতার বাইরে চলে আসে। কেননা আব্বাসী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের শান্তি ও স্বস্তি লাভের কোন উপায় ছিল না। ঐ সব গর্বিত আরব গোত্র যারা সিন্ধু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল তাদের বংশধর আজ পর্যন্ত পাক-ভারতে বিদ্যমান আছে বলে মনে করা হয়। তবে নিজেদের পরিবর্তিত নাম ও পেশার কারণে তারা যে আরব-বংশোদ্ভূত সে কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে। উমাইয়া গোত্রের আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম আব্বাসীদের জালে আটকা পড়তে পড়তে বেঁচে যান এবং পালাতে পালাতে মিসর ও কায়রাওয়ান হয়ে স্পেনে গিয়ে পৌঁছেন। স্পেন যেহেতু আব্বাসী দাওয়াতের প্রভাব থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত ছিল এবং সেখানে বনূ উমাইয়ার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীও বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি সেখানে পৌঁছেই ঐ দেশটি দখল করে নেন এবং সেখানে এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার দিকে আব্বাসী খলীফারা সব সময় ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন কিন্তু তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারতেন না, করার সুযোগ পেতেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

আব্বাসীয় খিলাফত

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ১০৪ হিজরীতে (৭২২-২৩ খ্রি.) বালকা এলাকার হামীমাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই প্রতিপালিত হন এবং পরবর্তীকালে আপন ভাই ইমাম ইবরাহীমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর অপর ভাই মানসূরের চাইতে বয়সে ছোট ছিলেন। ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন চাচা আব্বাসকে বলেছিলেন, তোমার বংশধররা একদিন খিলাফতের অধিকারী হবে, সেদিন থেকেই আব্বাসের বংশধররা খিলাফত লাভের আশা পোষণ করে আসছিল।

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ একাধারে নরহত্যা, বদান্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অনন্য। তাঁর কর্মকর্তারাও ছিল হত্যাকাণ্ডে যারপরনাই অভ্যস্ত। সাফ্ফাহ্ আপন চাচা দাউদকে প্রথমে কূফার, এরপর হিজায, ইয়ামান ও ইয়ামামার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আর কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন আপন ভাতিজা ঈসা ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদকে।

১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) যখন দাউদের মৃত্যু হয় তখন সাফ্ফাহ্ আপন মামা ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মিদ্দান হারিসীকে হিজায ও ইয়ামামার এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মিদ্দানকে ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খ্রি.) তিনি সুফ্য়ান ইব্ন উয়াইনা বালাবীকে বসরার শাসক নিয়োগ করেন। এরপর ১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) তাকে পদচ্যুত করে আপন চাচা সুলায়মান ইব্ন আলীকে একাধারে বসরা, বাহরাইন ও আম্মানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খি.) সাফ্ফাহ্র এক চাচা ইসমাঈল ইব্ন আলী আহ্ওয়াযের, অপর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সিরিয়ার এবং আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্ন ইয়াযীদ মিসরের এবং আবূ মুসলিম খুরাসানী খুরাসান ও জাবালের গভর্নর ছিলেন। আর খালিদ ইব্ন বারমাক ছিলেন 'দীওয়ানুল খারাজ' তথা অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) আবূ মুসলিম, মুহাম্মদ ইব্ন আশআছকে নিজের পক্ষ থেকে গভর্নর নিয়োগ করে পারস্যে প্রেরণ করেন। ঠিক ঐ সময়ে সাফ্ফাহ্ও আপন চাচা ঈসা ইব্ন আলীকে পারস্যের গভর্নর নিয়োগ করে সেখানে পাঠান। মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ প্রথমে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। ঈসা ইব্ন আলী সেখানে পৌঁছলে মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ প্রথম প্রথম তার হাতে পারস্যের শাসনভার তুলে দিতে অস্বীকার করেন। এরপর এই স্বীকারোক্তি নিয়ে তাকে দায়িত্বভার

বুঝিয়ে দেন যে, তিনি কখনো মিম্বরের উপর খুতবা দেবেন না এবং জিহাদ ব্যতীত কখনো তরবারি হাতে নিবেন না। মোটকথা তিনি ঈসা ইব্‌ন আলীর হাতে পারস্যের শাসনভার অর্পণ করেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনিই শাসনকর্তা থেকে যান। যখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ ইনতিকাল করেন তখন সাফ্‌ফাহ্ আপন চাচা ইসমাঈল ইব্‌ন আলীকে পারস্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন সূলকে মাওসিলের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। কিন্তু মাওসিলবাসীরা মুহাম্মদকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

ঐ সমস্ত লোক বনূ আব্বাসের বিরুদ্ধে ছিল। সাফ্‌ফাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আপন ভাই ইয়াহ্‌ইয়াকে বার হাজার সৈন্যসহ মাওসিলে পাঠান। তিনি মাওসিলে পৌঁছে সরকারী প্রাসাদে অবস্থান নেন এবং বারজন নেতৃস্থানীয় মাওসিলবাসীকে প্রতারণার মাধ্যমে ডেকে এনে হত্যা করেন। এতে মাওসিলবাসীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইয়াহ্‌ইয়া এই অবস্থা দেখে ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে চলে আসবে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। এই ঘোষণা শুনে লোকেরা দ্রুত জামে মসজিদের দিকে ছুটতে থাকে।

ইয়াহ্‌ইয়া জামে মসজিদের দরজায় লোক মোতায়েন করে রেখেছিলেন। যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করত তাকেই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হতো। এভাবে এগার হাজার লোককে হত্যা করা হয়। এরপর শহরে অবাধে হত্যাকাণ্ড চলে। রাতের বেলা ইয়াহ্‌ইয়ার কানে ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের কান্নার রোল ভেসে আসে যাদের স্বামী, পিতা, ভাই এবং পুত্রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ভোর হতেই ইয়াহ্‌ইয়া ঐ সমস্ত স্ত্রীলোক এবং শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনদিন পর্যন্ত শহরবাসীকে অবাধে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে সমগ্র শহরে রাতদিন নির্মম হত্যাকাণ্ড চলে এবং তিনদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

ইয়াহ্‌ইয়ার বাহিনীতে চার হাজার যঙ্গী ছিল। যঙ্গীরা মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করেনি। তারা হাজার হাজার স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে যায়। চতুর্থ দিন ইয়াহ্‌ইয়া ঘোড়ায় চড়ে শহর পরিক্রমায় বের হন। জনৈক স্ত্রীলোক সাহস করে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বলে ঃ তুমি কি বনূ হাশিম নও ? তুমি কি রাসূলুল্লাহর চাচার সন্তান নও ? তুমি কি এই খবর রাখ না, যঙ্গীরা মু'মিন ও মুসলিম মহিলাদের জবরদস্তিমূলক ভাবে বিবাহ করছে?

ইয়াহইয়া তার কোন উত্তর না দিয়ে চলে যান। পর দিন তিনি ভাতা বণ্টনের বাহানায় যঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠান। যঙ্গীরা যখন তার দরবারে এসে হাযির হয় তখন তিনি তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

সাফ্‌ফাহ্ যখন এই সমস্ত সংবাদ পান তখন ইয়াহ্‌ইয়াকে বদলী করে ইসমাঈল ইব্‌ন আলীকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করেন।

১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১ খ্রি.) রোমান সম্রাট মুসলমানদের কাছ থেকে লামতিয়া ও কালীকালা অস্ত্র বলে ছিনিয়ে নেয়। ঐ সনেই ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মিদ্দান,

ইবরাহীম ইব্‌ন হিব্বান সালামীকে একটি বাহিনী দিয়ে ইয়ামামায় প্রেরণ করেন। সেখানে মুসান্না ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা তার পিতার যুগ থেকে হাকিম ছিলেন। তিনি ইবরাহীমের মুকাবিলা করেন এবং তাতে নিহত হন। ঐ সনেই শারীক ইব্‌ন শায়খ মাহরী বুখারায় আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এজন্য ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করেন। আবূ মুসলিম যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ খুযায়ীকে শারীকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শারীক তার মুকাবিলা করেন এবং তাতে নিজেই নিহত হন। আবূ মুসলিম ১৩৩ হিজরীতে (৭৫০-৫১খ্রি.) আবূ দাঊদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীমকে খাতাল এলাকা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে খাতালের বাদশাহ্ হাবাশ ইব্‌ন শিবল্ পরাজিত হন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে ফারগানা হয়ে চীন দেশে চলে যান। ঐ সময়ে ইখশীদ, ফারগানা ও শাশের বাদশাহদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চীনের বাদশাহ্ তাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং শাশ ও ফারগানার বাদশাহদের বিরুদ্ধে একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম যিয়াদ ইব্‌ন সালিহকে সেদিকে প্রেরণ করেন। তারায নদীর তীরে যিয়াদ চীনা বাহিনীর মুকাবিলা করেন। তাতে মুসলমানদের হাতে পঞ্চাশ হাজার চীনা সৈন্য নিহত এবং বিশ হাজার বন্দী হয়।

১৩৪ হিজরীতে (৭৫১-৫২ খ্রি.) খুরাসানের প্রখ্যাত সেনাপতি বাসসাম ইব্‌ন ইবরাহীম বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাদায়েন দখল করে নেন। সাফ্‌ফাহ্ খাযিম ইব্‌ন খুযায়মাকে বাস্‌সামের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। খাযিম বাস্‌সামকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এরপর সাফ্‌ফাহ্ খারিজীদের মুকাবিলা করার জন্য খাযিমকে ওমানে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে খারিজীদের পর্যুদস্ত এবং তাদের নেতাকে হত্যা করেন। ঐ বছরই আবূ দাঊদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম কুশবাসীদের উপর হামলা চালান এবং তথাকার বাদশাহকে (যিনি যিম্মী ছিলেন) হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক আবূ মুসলিমের কাছে সমরকন্দে পাঠিয়ে দেন। এরপর নিহত বাদশাহর ভাই তাযানকে সিংহাসনে বসিয়ে বল্‌খে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে আবূ মুসলিম সাগাদ ও বসরাবাসীদের উপর পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালান। এরপর হাকিম ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন সালিহকে বুখারা ও সমরকন্দের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তাকে সমরকন্দের নগর-প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে মার্ভে ফিরে আসেন। এই সমস্ত ঘটনার পর সাফ্‌ফাহর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মানসূর ইব্‌ন জামহূর তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সিন্ধুতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ইনি হচ্ছেন সেই মানসূর যিনি ইয়াযীদুন নাকিসের আমলে দু'মাস ইরাক ও খুরাসানের গভর্নর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের অন্যতম সহচর ছিলেন। ইসতাখরের নিকটে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া যখন দাঊদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুবায়রা এবং মাআন ইব্‌ন যায়েদার হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন তখন মানসূর ইব্‌ন জামহূর সিন্ধুর দিকে পালিয়ে আসেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া হিরাত পৌঁছেন। তখন আবূ মুসলিমের নির্দেশ অনুযায়ী হিরাতের শাসনকর্তা মালিক ইব্‌ন হায়সাম খুযায়ী তাকে হত্যা করে সাফ্‌ফাহ্ আপন পুলিশ অফিসার মূসা ইব্‌ন কা'বকে সিন্ধুর দিকে প্রেরণ করেন এবং তার স্থলে মুসায়্যাব ইব্‌ন যুহায়রকে পুলিশ অফিসার নিয়োগ করেন। হিন্দ্-সীমান্তে মূসার সাথে মানসূরের সংঘর্ষ হয়। মানসূরের সাথে বার হাজার সৈন্য ছিল।

এতদসত্ত্বেও তিনি মূসার কাছে পরাজিত হয়ে পালাতে পালাতে এক দুর্গম মরুভূমিতে পৌঁছেন এবং পানীয়ের অভাবে সেখানে মারা যান। মানসূরের গভর্নর, যিনি সিন্ধুতে ছিলেন, এই সংবাদ পেয়ে পরিবার-পরিজন এবং সহায়-সম্পদসহ খাযার এলাকার দিকে চলে যান। এই বছরই অর্থাৎ ১৩৪ হিজরীতে (৭৫১-৫২ খ্রি.) সাফ্‌ফাহ্ আনবারে আসেন এবং তাকে 'দারুল খুলাফা' বা রাজধানী ঘোষণা করেন।

১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৫৩ খ্রি.) যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্, যিনি আবূ মুসলিমের পক্ষে সমরকন্দ ও বুখারার শাসক ছিলেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবূ মুসলিম এই সংবাদ পেয়ে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন। আর আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম যিয়াদের বিদ্রোহের সংবাদ শুনে তাকে শায়েস্তা করার জন্য নাসর ইব্‌ন রাশিদকে তিরমিযের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু নাসর ইব্‌ন রাশিদ তিরমিযে পৌঁছতেই কিছু লোক তালিকান থেকে বের হয়ে তাকে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে আবূ দাউদ ঈসা ইব্‌ন হাসানকে নাসরের হত্যাকারীদের পিছু ধাওয়া করতে পাঠান এবং তারা তাকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে আবূ মুসলিম আমিদ নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। তার সাথে সাবা ইব্‌ন নু'মান আযদীও ছিলেন। সাফ্‌ফাহ্ যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ এবং সাবা ইব্‌ন নু'মান আযদীকে এই বলে আবূ মুসলিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন ঃ 'যদি সুযোগ পাও তাহলে তাকে (আবূ মুসলিমকে) হত্যা করে ফেলবে।'

আমিদে পৌঁছতেই আবূ মুসলিম কোন একটি সূত্রে ঐ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাবাকে আমিদে বন্দী করেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য সেখানকার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। আবূ মুসলিম আমিদ থেকে বুখারার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি যিয়াদ ইব্‌ন সালিহর কয়েকজন অধিনায়কের সাক্ষাত পান, যারা যিয়াদকে পরিত্যাগ করে তার (আবূ মুসলিমের) কাছে আসছিল। আবূ মুসলিম বুখারা পৌঁছতেই যিয়াদ একজন কৃষকের ঘরে আশ্রয় নেন। কিন্তু ঐ কৃষক যিয়াদকে হত্যা করে তার লাশটি আবূ মুসলিমের সামনে এনে পেশ করে। আবূ মুসলিম আবূ দাউদের কাছে যিয়াদ হত্যার সংবাদ পাঠান। আবূ দাউদ তালিকান অভিযান সম্পন্ন করে কুশে ফিরে আসেন এবং ঈসা ইব্‌ন হাসানকে বাস্‌সামের দিকে প্রেরণ করেন, কিন্তু সেখানে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ঐ সময়ে ঈসা ইব্‌ন হাসান আবূ মুসলিমের ঐ সমস্ত চিঠি সংগ্রহ করে আবূ দাউদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঈসা আবূ দাউদকে খুব মারধর করে বন্দী করে রাখেন। কিছুদিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হলে সেনাবাহিনীর লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে। এই অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর আবূ মুসলিম প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩৬ হিজরীতে (৭৫৩-৫৪ খ্রি.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী সাফ্‌ফাহর দরবারে হাযির হন। সাফ্‌ফাহ্ তাকে সিরীয় বাহিনী ও ইরানী বাহিনীর সাথে রোমানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। সাফ্‌ফাহর ভাই আবূ জা'ফর মানসূর জাযীরার শাসক ছিলেন। তিনি ঐ বছর সাফ্‌ফাহর ইঙ্গিতেই হজ্জ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেজন্য তাঁর অনুমতিও প্রার্থনা করেন। সাফ্‌ফাহ্ তাকে লিখেন ঃ তুমি আমার কাছে চলে এস। আমি তোমাকে 'আমীরে হজ্জ' করে পাঠাব। অতএব মানসূর আনবারে চলে আসেন। হাররানের শাসনভার মুকাতিল ইব্‌ন হাকিমের উপর ন্যস্ত করা হয়। আসল ব্যাপার এই যে, আবূ মুসলিমও ঐ বছর সাফ্‌ফাহর

কাছে হজ্জের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তাই সাফ্‌ফাহ্ নিজে থেকেই গোপনে আপন ভাই মানসূরকে বলে পাঠান ঃ তুমি অবিলম্বে হজ্জের জন্য তৈরি হয়ে যাও এবং সেজন্য আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে আবূ মুসলিম সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সাফ্‌ফাহ্ যখন খলীফা হন এবং আব্বাসী হুকুমত স্থিতিশীল হয়ে ওঠে তখন আবূ মুসলিমকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয় এবং সাফ্‌ফাহ্ তার নামে যথারীতি নিয়োগপত্রও প্রেরণ করেন। কিন্তু আবূ মুসলিম স্বয়ং দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে বায়আত করেন নি। তিনি সেই শুরু থেকে, যখন ইমাম ইবরাহীম তাকে খুরাসানে পাঠিয়েছিলেন, আগাগোড়া সেখানেই অবস্থান করেন। তিনিই খুরাসান দখল করেন। এরপর সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার সর্বময় কর্তা হন। যখন এক এক করে সকল শত্রুকে খতম করে দেওয়া হলো তখন আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ চিন্তা করে দেখলেন, আবূ মুসলিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন তাকে কোন প্রদেশের গভর্নর পদে বদলী করা হচ্ছে না, তেমনি তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র খাটো করা সম্ভব হচ্ছে না।

আবূ মুসলিম নিজেকে খিলাফতে আব্বাসীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং সাফ্‌ফাহর পৃষ্ঠপোষক মনে করতেন। তিনি সাফ্‌ফাহকে যে পরামর্শ দিতেন তিনি তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। কিন্তু খুরাসানের ব্যাপারে আবূ মুসলিম তাঁর অনুমতি বা পরামর্শ গ্রহণ জরুরী মনে করতেন না। উসমান ইব্‌ন কাসীর ছিলেন আব্বাসীদের প্রখ্যাত ও সর্বপ্রাচীন নকীবদের অন্যতম। আবূ মুসলিম ব্যক্তিগত শত্রুতাবশত তাকে হত্যা করেন, অথচ সাফ্‌ফাহ্ সে সম্পর্কে তার কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেন নি। শুধু তিনিই নন, বরং তাঁর চাচা এবং ভাইও আবূ মুসলিমের এই স্বেচ্ছাচারিতা বরদাশত করতে পারছিলেন না।

সাফ্‌ফাহ্ যখন আপন ভাই আবূ জা'ফর মানসূরকে বায়আত গ্রহণের জন্য খুরাসানে পাঠান এবং তারই হাতে আবূ মুসলিমের নামে গভর্নর পদের নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন তখন তিনি আবূ জা'ফর মানসূরের সাথেও সৌজন্যমূলক আচরণ করেন নি বরং আবূ জা'ফরের চোখে তার প্রতিটি আচরণে ও প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গিতে দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। তখনই আবূ মুসলিম ও আবূ জা'ফরের মধ্যে মনকষাকষির সৃষ্টি হয়। তিনি এই সমস্ত কথা সাফ্‌ফাহর কাছে ব্যক্ত করলে তাঁর চিন্তা আরো বেড়ে যায়। আবূ মুসলিমের এই অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন এবং এর দায়িত্ব, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ এবং সাবা ইব্‌ন নু'মান আযদীর উপর ন্যস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত সাফ্‌ফাহ্ ও আবূ মুসলিম পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন।

আবূ মুসলিম যেহেতু একজন ক্ষমতা লিপ্সু ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি শুধু খুরাসানেই আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল রাখাকে যথেষ্ট মনে করেননি, বরং হিজায এবং ইরাকেও আপন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে আব্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে। এমন এক ব্যক্তি যে আব্বাসীদের 'দাওয়াত কর্মসূচিকে' সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন তিনি যদি গোপনে হিজায, ইরাক এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে

নিজের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা চালান তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে একথা তার মনে রাখা উচিত ছিল যে, তার বিরুদ্ধে এমন একটি পরিবার রয়েছে, যেখানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এবং ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদের মত ব্যক্তির জন্ম হয়েছে এবং তারা বনূ উমাইয়াকে ধ্বংস করে সবেমাত্র তাদের হাত থেকে খিলাফত ছিনিয়ে এনেছেন। আবূ মুসলিম এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তবে একথা তার ভুলে গেলে চলবে কি করে যে, এ কাজে তিনি আব্বাসীদের শিষ্য এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি ছাড়া কিছুই ছিলেন না ?

যাহোক আবূ মুসলিম সাফ্‌ফাহর কাছে হজ্জের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সাফ্‌ফাহ্ তাকে অনুমতি দেন, তবে পূর্বাহ্নেই লিখে জানান ঃ আসার সময় তোমার সাথে ৫০০-এর বেশি লোক আনবে না। আবূ মুসলিম উত্তরে লিখেন ঃ মানুষের সাথে আমার শত্রুতা রয়েছে। অতএব অল্প লোক নিয়ে সফর করা যুক্তিসংগত হবে না। সাফ্‌ফাহ্ উত্তরে লিখেন, সর্বাধিক এক হাজার লোকই যথেষ্ট। তার চাইতে বেশি আনলে অসুবিধা হবে। কেননা মক্কা সফরকালে রসদসামগ্রী সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। আবূ মুসলিম এক হাজার সৈন্য নিয়ে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন এবং যখন খুরাসান-সীমান্তে পৌঁছেন তখন সীমান্ত অঞ্চলেরই বিভিন্ন জায়গায় সাত হাজার সৈন্য রেখে যান এবং মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানী আনবারের দিকে অগ্রসর হন। সাফ্‌ফাহ্ আবূ মুসলিমকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর নামকরা অধিনায়কদের প্রেরণ করেন। যখন আবূ মুসলিম খলীফার দরবারে এসে পৌঁছেন তখন স্বয়ং খলীফাও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বলেন ঃ যদি এ বছর আমার ভাই আবূ জা'ফর মানসূর হজ্জের সংকল্প না করতেন তাহলে আমি তোমাকেই 'আমীরে হজ্জ' নিয়োগ করতাম। অতএব আবূ মুসলিমের আমীরে হজ্জ হওয়ার বাসনা আর পূর্ণ হলো না। যাহোক আবূ জা'ফর মানসূর এবং আবূ মুসলিম উভয়েই একসাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আবূ মুসলিম খুরাসান থেকে একটি বিরাট অর্থ ভাণ্ডার সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি মানসূরের সাহচর্য পছন্দ করছিলেন না। কেননা মানসূর সঙ্গে থাকলে স্বাধীনভাবে ও মুক্ত মনে কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও তিনি মক্কার রাস্তার প্রতিটি মনযিলে কূপ খনন, সরাইখানা নির্মাণ এবং মুসাফিরদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কাজ শুরু করে দেন। জনসাধারণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন এবং লঙ্গরখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উপহার-সামগ্রী বণ্টন করেন এবং বিভিন্নভাবে আপন বদান্যতার এমনি নমুনা পেশ করেন যে, জনসাধারণ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

মক্কায়ও আবূ মুসলিম অত্যন্ত ব্যাপকভিত্তিতে ঐ সমস্ত কাজ আনজাম দেন। সব দেশের এবং সব অঞ্চলের লোকই সেখানে এসে জড় হয়েছিল। হজ্জের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আবূ জা'ফর মানসূর তখনো রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেন নি, ইতিমধ্যে আবূ মুসলিম মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। মক্কা থেকে দুই মনযিল অগ্রসর হয়েছেন এমন সময় রাজধানী আনবারের একজন দূতের সাথে তার সাক্ষাত হয়। ঐ দূত একাধারে সাফ্‌ফাহর মৃত্যু ও আবূ জা'ফর মানসূরের খলীফা হওয়ার সংবাদ নিয়ে মানসূরের কাছে আসছিল। আবূ মুসলিম দুইদিন পর্যন্ত এ দূতকে নিজের কাছে আটকে রাখেন। এরপর মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

আবূ মুসলিম প্রথমে চলে যাওয়ায় মানসূর তার প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এবার আরো অসন্তুষ্ট হন এই ভেবে যে, আবূ মুসলিম সব খবর জানা সত্ত্বেও নব নির্বাচিত খলীফা হিসাবে তার কাছে কোন অভিনন্দনবার্তা পাঠালেন না, এমন কি বায়আত করার জন্যও অপেক্ষা করলেন না, অথচ সর্বাগ্রে তারই বায়আত করা উচিত ছিল। ন্যূন পক্ষে তার (মানসূর) সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত তার (আবূ মুসলিমের) অপেক্ষা করা উচিত ছিল, যাতে তারা এক সাথে সফর করতে পারেন। যাহোক আবূ জা'ফর মানসূর ঐ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত মক্কা থেকে রওয়ানা হন। কিন্তু আবূ মুসলিম তাঁর পূর্বেই আনবারে গিয়ে পৌঁছেন।

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ চার বছর আট মাস খিলাফত পরিচালনা করে ১৩৬ হিজরীর ১৩ যিলহজ্জ (৭৫৫ খ্রি.-এর জুন) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর চাচা ঈসা জানাযার নামায পড়ান এবং আনবারেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে যথাক্রমে আবূ জা'ফর মানসূর ও ঈসা ইব্ন মূসার পক্ষে অলীআহদীর অঙ্গীকারপত্র লিখে তা একটি কাপড়ে জড়িয়ে তার উপর আপন আহলে বায়তের মোহর লাগিয়ে ঈসার হাতে অর্পণ করেন। যেহেতু মানসূর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, তাই ঈসা মানসূরের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে মানসূরকে ওয়াকিফহাল করার জন্য মক্কায় একজন দূত প্রেরণ করেন।

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ আপন খিলাফতের ভিত্তি মজবুত করতে গিয়ে ঠিক সেরূপ অকাতরে অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দেন, যেরূপ দিয়েছিলেন খিলাফতে বনূ উমাইয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমীরে মুআবিয়া (রা)। আমীরে মুআবিয়া (রা) আপন বদান্যতা দ্বারা আপন বিরোধীপক্ষ তথা আলাবীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নিজের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিশীল করে তুলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে খিলাফতে আব্বাসীয়ার প্রতিষ্ঠাতা সাফ্ফাহর মুকাবিলায়ও আলাবীরা খিলাফতের দাবিদার ছিল। আব্বাসীরা তাদের সাথে একত্রিত হয়ে বনূ উমাইয়াকে ধ্বংস করেছিল সত্য, তবে এখন আব্বাসীয়া পরিবারে খিলাফত চলে যাওয়ার কারণে তারা ঠিক সেরূপ অসন্তুষ্ট হয় যেরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছিল বনূ উমাইয়া পরিবারের খিলাফত চলে যাওয়ার কারণে। আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ও আমীরে মুআবিয়ার মত আলাবীদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করে একেবারে নিশ্চুপ করে রাখেন। যখন সাফ্ফাহকে কূফায় খলীফা মনোনীত করা হয় তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান, মুসান্না ইব্ন আলী এবং অন্যান্য আলাবী সেখানে আসেন এবং বলেন ঃ এটা কেমন কথা যে, যে খিলাফত আমাদের প্রাপ্য ছিল তা তোমরা দখল করে নিয়েছ ? এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নার পুত্র মুহাম্মদকে ১৩১ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৪৯ খ্রি-এর আগস্ট) মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত এক সভায় আব্বাসী, আলাবী সকলেই খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। আবূ জা'ফর মানসূরসহ উপস্থিত সকলেই তাঁর হাতে বায়আত করেছিলেন। এমতাবস্থায় সাফ্ফাহ্ কি করে খলীফা হতে পারেন ? একথা শোনার সাথে সাথে সাফ্ফাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নার হাতে দশ লক্ষ দিরহাম তুলে দেন। এই পরিমাণ অর্থ তখন সাফ্ফাহর হাতে ছিল না। তাই ইব্ন মুকারিনের কাছ থেকে তাঁকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এভাবে প্রত্যেক আলাবীকেই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সেদিন বিদায় করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান তখনো সাফ্ফাহর কাছ থেকে বিদায় নেননি, এমনি সময় মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদের হত্যার সংবাদ এবং সেই সাথে

মালে গনীমত হিসাবে অনেক মূল্যবান হীরা-জহরত নিয়ে জনৈক দূত আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর কাছে এসে পৌঁছে। তিনি ঐ সমস্ত হীরা-জহরত এবং অলংকারাদিও নির্দ্বিধায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নাকে দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ব্যবসায়ী আশি হাজার দীনার দিয়ে ঐসব অলংকার আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের কাছ থেকে কিনে নেয়। মোটকথা আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ যদি অনুরূপ কৌশল অবলম্বন না করতেন তাহলে আলাবীরা প্রকাশ্যে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। আর তখন এটাও পুরোপুরি সম্ভব ছিল যে, অনেক প্রভাবশালী নকীবও আলাবীদের পক্ষাবলম্বন করতেন। ফলে আব্বাসীদের জন্য নিজেদের খিলাফত টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। অতএব এটাই আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি সকল আলাবীকে বেহিসাব ধন-দৌলত দিয়ে এমনভাবে নিশ্চুপ করে দিয়েছিলেন যে, তাদের কেউই তখন নিজেদের খিলাফতের দাবি উত্থাপন করেনি। অবশ্য আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহর মৃত্যুর পর পরই আলাবীরা বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তখন যে খিলাফতে আব্বাসীয়া একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আবূ জা'ফর মানসূর

আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ মানসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের মাতা সালামা একজন বার্বার ক্রীতদাসী ছিলেন। আবূ জা'ফর মানসূর ৯৫ হিজরীতে (৭১৩-১৪ খ্রি.) আপন দাদার জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১০১ হিজরীতে (৭১৯-২০ খ্রি.)। তিনি বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও প্রভাব-পতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। খেলাধুলার ধারেকাছেও তিনি ঘেঁষতেন না। আদব (সাহিত্য) ও ফিকাহর উপর তাঁর পরিপূর্ণ দখল ছিল। প্রধান বিচারপতি পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বন্দী করেন এবং ঐ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন। কারো কারো মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র) মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাই তাঁর খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। মানসূর ছিলেন অত্যন্ত অলংকারসমৃদ্ধ সুললিত ভাষার অধিকারী। তিনি একজন ভালো বক্তাও ছিলেন। অবশ্য তিনি লোভী এবং কৃপণ ছিলেন বলেও কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত। আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী ১৩১ হিজরীতে (৭৪৮-৪৯ খ্রি.) অর্থাৎ মানসূরের খিলাফত আমলে স্পেনে নিজের একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবদুর রহমানও একজন বার্বার মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই লোকেরা তখন বলাবলি করত, ইসলামী হুকুমত এখন বার্বারদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে গেছে। ইব্ন আসাকির লিখেছেন, মানসূর যখন জ্ঞানার্জনের জন্য এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছিলেন তখন একদা একটি সরাইখানায় অবতরণ করলে সেখানকার চৌকিদার তাঁর কাছ থেকে দুই দিরহাম ভাড়া চায় এবং বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভাড়া না দেবে ততক্ষণ এই ঘরে অবস্থান করতে পারবে না। মানসূর বলেন, আমি বনূ হাশিমের লোক, আমাকে মাফ করে দাও। কিন্তু চৌকিদার সেকথা মানে নি। এবার মানসূর বলেন, আমি কুরআনের জ্ঞান রাখি। অতএব আমাকে মাফ করে দাও। চৌকিদার সে কথাও গ্রাহ্য করে নি। মানসূর এবার বলেন, আমি আলিম, ফকীহ্ এবং ফারায়েয বিশেষজ্ঞ। তাতেও চৌকিদার মানে নি। শেষ পর্যন্ত নিরূপায়

হয়ে মানসূরকে দুই দিরহাম ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। সেই দিন থেকেই মানসূর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করার সংকল্প নেন। তিনি একদা আপন পুত্র মাহদীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ বাদশাহ প্রজাদের আনুগত্য ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না এবং প্রজারা ন্যায়বিচার ছাড়া আনুগত্য করতে পারে না। সেই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেয়। আর সবচেয়ে নির্বোধ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অন্যের উপর জুলুম করে। চিন্তা-ভাবনা না করে কোন ব্যাপারেই হুকুম দেওয়া উচিত নয়। কেননা চিন্তাভাবনা হচ্ছে এমন একটি দর্পণ, যার মধ্যে মানুষ তার দোষগুণ দেখতে পায়। দেখ, সর্বদা নিআমতের শোকর আদায় করবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে মাফ করে দেবে। আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করবে এবং জয়লাভের পর নম্র ও দয়ার্দ্র আচরণ করবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর বিদ্রোহ

মানসূরের চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ তার মৃত্যুর পূর্বে খুরাসানী ও সিরীয় বাহিনীর সাথে সায়েফার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। ১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৫৩ খ্রি.) মানসূর আনবারে পৌঁছে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঈসা ইব্ন মূসা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকেও সাফ্ফাহর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং এও লিখেছিলেন ঃ সাফ্ফাহ্ তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মানসূরকে মনোনীত করেছেন এবং এই মর্মে ওসীয়তও করে গেছেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী লোকদেরকে সমবেত করে বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ যখন হাররান অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন তখন সেদিকে যাওয়ার সাহস কারো হয়নি। সাফ্ফাহ্ তখন বলেছিলেন, যে ব্যক্তি এই অভিযানে নেতৃত্ব দেবে সে আমার পর খলীফা হবে। আমিই ঐ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং আমিই মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ও অন্যান্য উমাবী অধিনায়কদের পরাজিত করে, ঐ অভিযানকে সার্থক করেছিলাম। উপস্থিত সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর এই কথাকে সত্যায়িত করে এবং তার হাতে বায়আত করে। এবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী 'দালূক' থেকে প্রত্যাবর্তন করে হাররানে গিয়ে মুকাতিল ইব্ন হাকীমকে অবরোধ করেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। অবরোধ চলাকালীন সন্দেহবশত তিনি খুরাসানের অনেক অধিবাসীকে হত্যা করেন। এরপর তিনি হুমায়দ ইব্ন কাহতাবাকে হলবের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তথাকার বর্তমান গভর্নর যুফার ইব্ন আসিমের নামে লিখিত একটি পত্রসহ সেখানে প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, হুমায়দ সেখানে পৌঁছতেই তাকে হত্যা করবে। তিনি পথিমধ্যে সেই চিঠি খুলে পড়েন এবং হলবের পরিবর্তে ইরাকের দিকে যাত্রা করেন। এদিকে মানসূর আনবারে গিয়ে দেখেন, আবূ মুসলিম তাঁর পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি মানসূরের হাতে বায়আত করেন। মানসূর তার প্রতি সম্মান দেখান এবং তার সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেন। এরই মধ্যে সংবাদ পৌঁছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। মানসূর আবূ মুসলিমকে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর দিক থেকে আমি খুবই শংকিত। আবূ মুসলিম তো মনে মনে এ ধরনেরই একটি ঘটনার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে শায়েস্তা করার জন্য তৈরি হয়ে যান। কেননা এভাবে তিনি মানসূরকেও নিজের কাছে ঋণী

করে রাখতে পারবেন। যা হোক আবূ মুসলিমকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর মুকাবিলায় প্রেরণ করা হয়। ইব্ন কাহতাবা, যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ইরাকের দিকে আসছিলেন, তিনি আবূ মুসলিমের সাথে যোগ দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী মুকাতিল ইব্ন হাকীমকে নিরাপত্তা দান করেন। ফলে মুকাতিল হাররানের শাসন কর্তৃত্ব আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর হাতে সোপর্দ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী একটি চিঠিসহ মুকাতিলকে রাককার হাকিম উছমান ইব্ন আবদুল আলীর নিকট প্রেরণ করেন। মুকাতিল সেখানে পৌঁছতেই উছমান তাকে হত্যা করেন এবং তার দুই পুত্রকে বন্দী করে রাখেন। মানসূর আবূ মুসলিমকে প্রেরণ করার পর মুহাম্মদ ইব্ন সাওলকে আযারবায়জান থেকে তলব করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার কাছে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সাওল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর কাছে গিয়ে বলেন ঃ আমি সাফ্ফাহকে বলতে শুনেছি, আমার চাচা আবদুল্লাহ্ আমার পর আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী, আমি তোমার প্রতারণা ধরে ফেলেছি। এই বলে তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী হাররান থেকে নিসীবীনে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পরিখা খনন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মানসূর আবূ মুসলিমকে প্রেরণ করার পূর্বে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা হাসান ইব্ন কাহতাবাকে লিখেছিলেন, যেন তিনি আবূ মুসলিমের সাথে এসে যোগদান করেন। অতএব হাসান ইব্ন কাহতাবাও আবূ মুসলিমের সাথে মাওসিলে এসে মিলিত হন। আবূ মুসলিম তার বাহিনী নিয়ে যখন নিসীবীনের নিকটবর্তী হন তখন নিসীবীনের রাস্তা ছেড়ে সিরিয়ার রাস্তার উপর ছাউনি স্থাপন করেন এবং একথা প্রচার করে দেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি তো সিরিয়ার গভর্নর পদে যোগদান করার জন্য সেখানে যাচ্ছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর সাথে সিরিয়ার যে সমস্ত লোক ছিল তারা একথা শুনে বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা আবদুল্লাহকে বলে ঃ তাহলে আমাদের পরিবার-পরিজন নির্ঘাত আবূ মুসলিমের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হবে।

অতএব এই মুহূর্তে আমাদের উচিত, তাকে সিরিয়ার দিকে যেতে না দেওয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী তাদেরকে অনেক বুঝালেন যে, সে আমাদেরই মুকাবিলা করতে এসেছে। অতএব সিরিয়ায় কখনো যাবে না। কিন্তু তার এ কথায় কেউই কান দেয়নি। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ঐ স্থান ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। অমনি আবূ মুসলিম তার ঐ চমৎকার অবস্থানটি দখল করে নেন। ফলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে রাস্তা থেকে ফিরে এসে ঐ স্থানেই অবস্থান নিতে হয়, যেখানে ইতিপূর্বে আবূ মুসলিম ছিলেন। এভাবে আবূ মুসলিম অতি সহজেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থানটি করায়ত্ত করে নেন। এবার উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৩৭ হিজরী ৭ জমাদিউস্ সানী (৭৫৪ খ্রি. ডিসেম্বর) রোজ বুধবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী পরাজিত হন। আবূ মুসলিম এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে বসরায় আপন ভাই সুলায়মান ইব্ন আলীর কাছে আশ্রয় নেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন।

আবূ মুসলিমকে হত্যা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী পরাজিত হলে তার ছাউনি লুট করে আবূ মুসলিম প্রচুর মালে গনীমত হস্তগত করেন। মানসূর যখন এই বিজয় সংবাদ পান তখন তিনি তার ভৃত্য আবূ খাসীবকে মালে গনীমতের একটি তালিকা তৈরির জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম এতে খুব অসন্তুষ্ট হন এই ভেবে যে, আমার উপর মানসূরের কোন আস্থা নেই বলেই তালিকা তৈরির জন্য নিজের একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানসূর যখন আবূ মুসলিমের এই অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারেন তখন তিনি চিন্তান্বিত হন এই ভেবে যে, আবূ মুসলিম অসন্তুষ্ট হয়ে হয়ত খুরাসানে চলে যাবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মিসর ও সিরিয়ার গভর্নর পদের নিযুক্তিপত্র লিখে আবূ মুসলিমের কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে আবূ মুসলিম আরো বেশি মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, মানসূর তাকে খুরাসান থেকে সরিয়ে নিয়ে দুর্বল করে ফেলার ফন্দি আঁটছেন। যাহোক তিনি জাযীরা থেকে বের হয়ে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে মানসূর আনবার থেকে মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং আবূ মুসলিমকে তার কাছে হাযির হতে বলেন। কিন্তু আবূ মুসলিম তার কাছে আসতে অস্বীকার করেন এবং লিখে পাঠান আমি দূর থেকেই আপনার আনুগত্য করব। আপনার সব শত্রুকেই আমি পরাস্ত করেছি। এখন আপনার পথের সব কাঁটাই দূর হয়ে গেছে। অতএব আমার আর কোন প্রয়োজন আপনার নেই। যদি আপনি আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেন তাহলে আমি কখনো আপনার অবাধ্য হব না এবং নিজের বায়আতের উপরই অটল থাকব। কিন্তু যদি আপনি আমার পিছনে লাগেন তাহলে আমি আপনার খিলাফত অস্বীকার করে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। এই চিঠি পেয়ে মানসূর অত্যন্ত নম্র ও স্নেহার্দ্র ভাষায় আবূ মুসলিমকে লিখেন ঃ তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও আনুগত্যের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তুমি অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি। শয়তান তোমার অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিয়েছে। তুমি এই কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা কর এবং আমার কাছে চলে এস। এই পত্র মানসূর আপন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস আবূ হুমায়দের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতি-মিনতি যে করেই হোক, তুমি তাকে আমার কাছে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। এতেও যদি সে সম্মত না হয় তাহলে তাকে আমার ক্রোধের ভয় দেখাবে। এই চিঠি আবূ মুসলিমের কাছে পৌঁছলে তিনি মালিক ইব্ন হায়সামের সাথে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। মালিক পরামর্শ দেন, তুমি কখনো মানসূরের কাছে যাবে না। সে তোমাকে পেলেই হত্যা করবে। কিন্তু মানসূর পত্র মারফত আবূ দাউদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীমকে খুরাসানের গভর্নর পদের লোভ দেখিয়ে একথায় রাযী করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি আবূ মুসলিমকে যেভাবে পারেন তার (মানসূরের) কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আবূ দাউদের প্ররোচনায় আবূ মুসলিম সত্যি সত্যি মানসূরের কাছে আসতে রাযী হয়ে যান; তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে প্রথমে আপন উযীর আবূ ইসহাক খালিদ ইব্ন উছমানকে মানসূরের কাছে পাঠিয়ে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করেন। ইসহাকের উপর আবূ মুসলিমের খুব আস্থা ছিল। তাই প্রথমে আবূ ইসহাককেই প্রেরণ করেন। আবূ ইসহাক যখন দরবারে খিলাফতের নিকটবর্তী হন তখন বনূ হাশিমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

এবং দরবারে খিলাফতের সভাসদবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। মানসূরও তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে একজন সহৃদয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ইসহাককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং বলেন ঃ খুরাসানে না গিয়ে আমার এখানে আসার জন্য যদি তুমি আবূ মুসলিমকে রাযী করাতে পার তাহলে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব দান করব। আবূ ইসহাক এ প্রস্তাবে রাযী হয়ে যান। তিনি আবূ মুসলিমের কাছে এসে তাকে মানসূরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত করান। আবূ মুসলিম তার সেনাবাহিনীকে মালিক ইব্‌ন হায়সামের অধিনায়কত্বে হুলওয়ানে রেখে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হন। আবূ মুসলিম মাদায়েনের নিকটবর্তী হলে মানসূরের ইঙ্গিতে জনৈক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে এবং বলে ঃ আপনি অনুগ্রহপূর্বক মানসূরের কাছে আমার সম্পর্কে এই সুপারিশ করবেন যে, তিনি যেন আমাকে কসকরের শাসক নিয়োগ করেন। তাছাড়া 'ওয়াযিরুস্ সালতানাত' (মন্ত্রী) আবূ আইউবের প্রতি মানসূর আজকাল খুবই অসন্তুষ্ট আছেন। অতএব আপনি আবূ আইউবের জন্যও একটু সুপারিশ করবেন। আবূ মুসলিম একথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তার মনের মধ্যে যে কিছুটা ভয়ভীতি ছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। তিনি খলীফার দরবারে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে সসম্মানে বিদায় নিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তার জন্য নির্ধারিত অতিথি ভবনে চলে যান। পরদিন মানসূর উছমান ইব্‌ন নাহীক, শাবীব ইব্‌ন রাওয়াহ্, আবূ হানীফা হারব ইব্‌ন কায়স প্রমুখকে দরবারের একটি গোপন কক্ষে বসিয়ে রাখেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, যখন আমি দু'হাতে তালি বাজাবো তখন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে আবূ মুসলিমকে হত্যা করবে। যাহোক পরদিন আবূ মুসলিম যখন দরবারে আসেন তখন মানসূর কথা প্রসঙ্গে তাকে ঐ দু'টি তরবারির কথা জিজ্ঞেস করেন, যা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী থেকে পেয়েছিলেন। আবূ মুসলিম তখন কোমরে বাঁধা একটি তরবারির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এটি হচ্ছে ঐ দু'টির একটি। মানসূর বলেন, আমাকে একটু দেখান। আবূ মুসলিম সঙ্গে সঙ্গে তরবারিটি কোমর থেকে খুলে খলীফা মানসূরের হাতে দেন। মানসূর কিছুক্ষণ সেটি দেখতে থাকেন। এরপর নিজের উরুর নিচে চেপে রেখে আক্রমণাত্মক সুরে আবূ মুসলিমের উপর বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। তিনি সুলায়মান ইব্‌ন কাসীরকে হত্যার উল্লেখ করে বলেন, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ ? তিনি তো তখন থেকেই আমাদের সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যখন তুমি এ কাজে যোগই দাওনি। আবূ মুসলিম প্রথম প্রথম তোষামোদের ভঙ্গিতে এবং নম্র স্বরে নিজের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করতে থাকেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মানসূরের ক্রোধাগ্নি বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি বুঝতে পারেন, আর তার আর রক্ষা নেই। এবার তিনি বেপরোয়া হয়ে উত্তর দেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না। মানসূর তখন আবূ মুসলিমকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং সাথে সাথে দুই হাতে তালি বাজান। অমনি উছমান ইব্‌ন নাহীক এবং তার সঙ্গীরা গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আবূ মুসলিমের উপর হামলা চালায় এবং তাকে চিরতরে খতম করে দেয়। এটি হিজরী ১৩৭ সনের ২৫শে শাবানের (৭৫৫ খ্রি. ফেব্রুয়ারী) ঘটনা। আবূ মুসলিম নিহত হওয়ার পর 'ওয়াযিরুস্ সালতানাত' (মন্ত্রী) বাইরে এসে আবূ

মুসলিমের সঙ্গীদেরকে এই বলে সেখান থেকে বিদায় করে দেন যে, আমীর (আবূ মুসলিম) এ বেলা আমীরুল মু'মিনীনের সাথে থাকবেন। অতএব তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাও। এরপর ঈসা ইব্‌ন মূসা দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে আবূ মুসলিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং যখন জানতে পারেন যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে তখন অলক্ষ্যেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। এ বিষয়টি মানসূরের কাছে খুবই বিরক্তিকর ঠেকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, আবূ মুসলিমের চাইতে বড় শত্রু তোমার আর কেউ ছিল না। এরপর মানসূর জা'ফর ইব্‌ন হানযালাকে ডেকে পাঠান এবং আবূ মুসলিমকে হত্যা সম্পর্কে তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। জা'ফর তাকে হত্যা করার পক্ষে মত দেন। তখন মানসূর বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর তিনি আবূ মুসলিমের লাশের প্রতি ইঙ্গিত করেন। জা'ফর আবূ মুসলিমের লাশ দেখে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! প্রকৃতপক্ষে আজ থেকেই আপনার খিলাফতকাল গণনা করা হবে। একথা শুনে মানসূর মুচকি হেসে নীরব হয়ে যান।

আবূ নাসর মালিক ইব্‌ন হায়সাম, যার হাতে আবূ মুসলিম আপন বাহিনী ও ধন-সম্পদ রেখে এসেছিলেন, হুলওয়ান থেকে খুরাসানের উদ্দেশে হামাদানের দিকে রওয়ানা হন। এরপর মানসূরের কাছে ফিরে আসেন। মানসূর তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এই বলে যে, তুমি আবূ মুসলিমকে কেন আমার কাছে না আসার কুপরামর্শ দিয়েছিলে? আবূ নাসর উত্তর দেন, আমি যতক্ষণ আবূ মুসলিমের কাছে ছিলাম তাকে সুপরামর্শ দিয়েছি। এখন যখন আপনার কাছে এসে গেছি তখন আপনারই মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত থাকব। মানসূর তাকে মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন।

সিনবাদের বিদ্রোহ ঘোষণা

আবূ মুসলিমকে হত্যা করে মানসূর বাহ্যত স্বস্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তাকে বার বার নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আবূ মুসলিমের সঙ্গীদের মধ্যে ফিরূয নামীয় জনৈক অগ্নিউপাসক সিন্‌বাদ নামে পরিচিত ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করে আবূ মুসলিমের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। তার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুহিস্তানের লোকেরা তাকে সমর্থন দেয়। সিন্‌বাদ নিশাপুর ও রায় দখল করে ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে, যা আবূ মুসলিম হজ্জে রওয়ানা হওয়ার সময় রায় এবং নিশাপুরে রেখে গিয়েছিলেন। উপরন্তু সিনবাদ সাধারণ লোকদের বাড়িঘরেও লুটপাট চালায় এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে দাসদাসীতে পরিণত করে। এরপর সে মুরতাদ হয়ে ঘোষণা করে যে, সে কাবাঘর ধ্বংস করতে যাচ্ছে। নওমুসলিম ইরানীদের জন্য এ ধরনের আন্দোলন ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাদের মধ্যে যে সব লোক ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান অর্জন করেনি তারা যখন দেখল যে, তাদেরই দেশ এবং তাদেরই জাতির এক ব্যক্তি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তখন তারাও তার সাথে যোগ দেয়। মানসূর যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি সিন্‌বাদকে পরাস্ত করার জন্য জামহূর ইব্‌ন মুরার আজালীকে প্রেরণ করেন। হামাদান ও রায়-এর মধ্যবর্তী একটি স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে সিনবাদ পরাজিত হন। তার প্রায় সাত

হাজার সঙ্গী রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। সিনবাদ পলায়ন করে তাবারিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তাবারিস্তানের কর্মকর্তার জনৈক ভৃত্য তাকে হত্যা করে। মানসূর এই সংবাদ শুনে তাবারিস্তানের আমিলকে (কর্মকর্তাকে) নির্দেশ দেন, সিনবাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু আমিল সে নির্দেশ অমান্য করেন। এবার মানসূর তাবারিস্তানের ঐ কর্মকর্তাকে শায়েস্তা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ সংবাদ পেয়ে তাবারিস্তানের কর্মকর্তা পলায়ন করেন। এদিকে জামহূর সিনবাদকে পরাস্ত করায় প্রায় সমগ্র ভাণ্ডারই তার হস্তগত হয়। জামহূর এই ধন-ভাণ্ডার এবং আরো অনেক মাল-সম্পদ মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন এবং রায়-এ গিয়ে ভালোভাবে সেখানকার দুর্গ মেরামত করে মানসূরের খিলাফতের বায়আত প্রত্যাহার এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মানসূর মুহাম্মদ ইব্‌ন আশ্‌আছের নেতৃত্বে জামহূরের মুকাবিলায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি এই খবর পেয়ে রায় থেকে ইসফাহানের দিকে চলে যান। জামহূর ইসফাহানের উপর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ রায়-এর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মুহাম্মদ ইসফাহান আক্রমণ করেন। একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের পর জামহূর পরাজিত হয়ে আযারবায়জানের দিকে পলায়ন করেন। সেখানে জামহূরেরই জনৈক সঙ্গী তাকে হত্যা করে এবং তার ছিন্ন মস্তক মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এটি হচ্ছে ১৩৮ হিজরীর (৭৫৫-৫৬ খ্রি.) ঘটনা।

১৩৯ হিজরীতে (৭৫৬-৫৭ খ্রি.) মানসূর আপন চাচা সুলায়মানকে বসরার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে এও লিখেন ঃ তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে প্রাণের নিরাপত্তাদান কর এবং আমার কাছে আসার সময় তাকেও সঙ্গে নিয়ে আস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী আবূ মুসলিমের কাছে পরাজিত হয়ে বসরায় আপন ভাই সুলায়মানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুলায়মান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে নিয়ে মানসূরের দরবারে হাযির হলে তিনি তাকে বন্দী করেন (পরবর্তীতে তাকেও হত্যা করা হয়)।

রাওয়ান্দিয়া ফিরকা

রাওয়ান্দিয়া ফিরকাকে শিয়াদেরই একটি ফিরকা মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ইরান ও খুরাসানের মূর্খ লোকদের একটি দল বা ফিরকা। ওরা রাওয়ান্দ এলাকার অধিবাসী ছিল বলে এই ফিরকাকে রাওয়ান্দিয়া ফিরকা বলা হয়। আবূ মুসলিম খুরাসানী এই ফিরকাকে নিজের সহযোগী করে নিয়েছিলেন। কেননা তিনি যে দল গঠন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তিনি বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের লোককে একই প্লাটফর্মে জড় করেছিলেন। রাওয়ান্দিয়া ফিরকার লোকেরা 'তানাসুখ' (জন্মান্তরবাদ) ও 'হুলুল' (অবতারবাদ)-এ বিশ্বাসী ছিল। তাদের আকীদা ছিল আল্লাহ্ তা'আলা মানসূরের রূপ ধারণ করেছেন। তাই তারা মানসূরকে খোদা মনে করে তাকে দর্শন করতে আসত এবং এটাকেই ইবাদত মনে করত। তারা এও বিশ্বাস করত যে, আদম-আত্মা উছমান ইব্‌ন নাহীকের এবং জিবরীল হায়সাম ইব্‌ন মুআবিয়ার রূপ ধারণ করেছেন। এইসব লোক রাজধানীতে এসে তাদের এই বাতিল আকীদার কথা প্রচার করতে থাকলে মানসূর তাদের মধ্য থেকে দুশ ব্যক্তিকে বন্দী করেন। তাদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ। যারা বাইরে ছিল তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এমন কি কয়েদখানার উপর আক্রমণ

চালিয়ে তাদের সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে নেয়। এরপর তারা মানসূরের প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যারা মানসূরকে 'খোদা' বলে বিশ্বাস করত তারাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাআন ইব্‌ন যায়দাহ্ ছিল ইব্‌ন হুবায়রার অন্যতম সঙ্গী। যখন ইব্‌ন হুবায়রা আব্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করেন তখন মাআন ছিলেন তার অন্যতম সমর্থক। ইব্‌ন হুবায়রার পর মাআন ইব্‌ন যায়দাহ্ দারুল খুলাফা হাশিমিয়ায় এসে আত্মগোপন করে থাকেন। অবশ্য মানসূর তাকে হত্যা অথবা বন্দী করার জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যান। যাহোক রাওয়ান্দিয়ারা যখন মানসূরের প্রাসাদ ঘেরাও করে তখন তিনি একেবারে খালি পায়ে প্রাসাদ থেকে বের হন এবং বিক্ষোভকারীদেরকে মেরে ভাগাতে থাকেন। মানসূরের সাথে তখন লোক ছিল অতি অল্পই। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তখন রাজধানীতে এই বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করার মত কোন সেনাবাহিনীও ছিল না। মানসূরের জন্য ঐ মুহূর্তটি ছিল খুবই নাজুক। কেননা তখন রাওয়ান্দীরা তাকে হত্যা করে তার রাজধানী দখল করে নিতে পারত। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মাআন ইব্‌ন যায়দাহ্ সঙ্গে সঙ্গে মানসূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং বিক্ষোভকারীদেরকে আক্রমণ করে তাড়াতে থাকেন। তার আক্রমণ এতই জোরদার ছিল যে, মানসূর বিস্ময়াভিভূত ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে এই অচেনা লোকটির অনন্য বীরত্ব প্রত্যক্ষ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাআনকে এই যুদ্ধে অধিনায়কেরই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এবং তার কাছে বিক্ষোভকারীরা শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। ইতিমধ্যে শহরবাসীরা বেরিয়ে আসে এবং একে একে প্রত্যেকটি বিক্ষোভকারীকেই হত্যা করে। এভাবে যখন সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন মানসূর জিজ্ঞেস করেন, কে এই ব্যক্তিটি যার বীরত্ব ও পরাক্রম এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ? যখন তিনি জানতে পারেন যে, সে মাআন ইব্‌ন যায়দাহ ছাড়া আর কেউ নয় তখন তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তার পূর্ববর্তী সব অপরাধ মাফ করে দেন। উপরন্তু তিনি তার সম্মান ও মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন।

আবূ দাউদ খালিদ ইব্‌ন ইবরাহীম যাহ্‌লী তখন খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৪০ হিজরী (৭৫৭-৫৮ খ্রি.) তার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তারা তার বাসভবন ঘেরাও করে ফেলে। আবূ দাউদ বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তার বাসভবনের ছাদে উঠেন এবং দুর্ভাগ্যবশত পা পিছলে সেখান থেকে পড়ে মারা যান। এরপর তার সেনাপতি হুসাম ঐ বিদ্রোহ দমন করেন এবং খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে সে সম্পর্কে মানসূরকে অবহিত করেন। মানসূর আবদুল জাব্বার ইব্‌ন আবদুর রহমানকে পরবর্তী গভর্নর নিয়োগ করে খুরাসানে পাঠিয়ে দেন।

আবদুল জাব্বারের বিদ্রোহ ও মৃত্যু

আবদুল জাব্বার খুরাসানের শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আবূ দাউদের কর্মকর্তাদেরকে হয় পদচ্যুত, না হয় লাঞ্ছিত, না হয় হত্যা করেন। সামান্যমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করে তিনি সমগ্র দেশে এক মহাসন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন। যখন মানসূরের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাকে কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে খুরাসান থেকে অপসারণ করতে পারেন সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। তিনি

আশংকা করছিলেন, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে আবদুল জাব্বার হয়ত প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে বসবেন। শেষ পর্যন্ত মানসূর তাকে লিখেন, তুমি খুরাসান বাহিনীর একটি বড় অংশকে রোমান যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও। তার পরিকল্পনা খুরাসান বাহিনীর বড় অংশ সেখান থেকে চলে এলে আবদুল জাব্বারকে পদচ্যুত করে তার স্থলে নতুন কোন গভর্নর পাঠানো সহজ হবে। আবদুল জাব্বার উত্তরে লিখেন, তুর্কীরা সৈন্য প্রেরণ করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় যদি আপনি খুরাসানের বাহিনীকে অন্য কোন দিকে স্থানান্তরিত করেন তাহলে হয়ত খুরাসানই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই জবাব পেয়ে মানসূর আবদুল জাব্বারকে লিখেন, খুরাসান আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড এবং এটাকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। যদি তুর্কীরা এরিমধ্যে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে তাহলে আমি খুরাসান রক্ষার জন্য একটি বিরাট বাহিনী পাঠাচ্ছি। তুমি এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। এই চিঠি পড়ে আবদুল জাব্বার সঙ্গে সঙ্গে মানসূরকে লিখেন, খুরাসানের যা আয় তাতে এই বিরাট বাহিনীর খরচের বোঝা বহন করা সম্ভব হবে না। অতএব আপনি কোন বিরাট বাহিনী পাঠাবেন না। এই উত্তর পেয়ে মানসূরের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস হয় যে, আবদুল জাব্বার বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়ে গেছেন। অতএব তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপন পুত্র মাহ্দীর অধিনায়কত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মাহদী রায়-এ পৌঁছে সেখানেই অবস্থান নেন এবং খাযিম ইব্ন খুযায়মাকে আবদুল জাব্বারের মুকাবিলায় অগ্রে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত আবদুল জাব্বার পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু মাহশার ইব্ন মুযাহিম তাকে বন্দী করতে সক্ষম হন এবং খাযিম ইব্ন খুযায়মার খিদমতে নিয়ে হাযির করেন। খাযিম ইব্ন খুযায়মা তাকে চুলের একটি জুব্বা পরিয়ে এবং পশ্চাৎমুখী করে উটের পিঠে বসিয়ে খুব হৈ-হল্লা করেন। এরপর তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীসহ মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন। মানসূর তাদের সবাইকে বন্দী করেন। এরপর ১৪২ হিজরীতে (৭৫৯ খ্রি) আবদুল জাব্বারের দেহ থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। আবদুল জাব্বারের উপর জয়লাভ করার পর মাহদী খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। ১৪৯ হিজরী (৭৬৬ খ্রি) পর্যন্ত তিনি খুরাসানের গভর্নর ছিলেন।

উয়ায়না ইব্ন মূসা ইব্ন কা'ব

মূসা ইব্ন কা'ব সিন্ধুর কর্মকর্তা ছিলেন। তার পরে তার পুত্র উয়ায়না সিন্ধুর কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সিন্ধুতে মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মানসূর এই সংবাদ পেয়ে রাজধানী থেকে বসরায় আসেন এবং সেখান থেকেই আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন আবূ সাফওয়া আতাকীকে সিন্ধু ও হিন্দের গভর্নর নিয়োগ করে তাকে উয়ায়নার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। আমর ইব্ন হাফ্স সিন্ধুতে পৌঁছে উয়ায়নার সাথে যুদ্ধ শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত সিন্ধু দখল করে নেন। এটা হচ্ছে ১৪১ হিজরীর (৭৫৮-৫৯ খ্রি.) ঘটনা। ঐ সময়ে তাবারিস্তানের শাসনকর্তাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন খাযিম ইব্ন খুযায়মা এবং রাওহ্ ইব্ন হাতিমকে তাবারিস্তানে প্রেরণ করা হয়। তারা তাবারিস্তান দখল করে নেন এবং সেখানকার গভর্নর, যিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

আলাবীদের উপর জুলুম-নির্যাতন

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, বনূ উমাইয়ার শাসন আমলের একেবারে শেষ পর্যন্ত মক্কায় উমাইয়া বিরোধীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে খলীফা নির্বাচনের বিষয়টিও ওঠে। মানসূরও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফা পদের জন্য মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলীর নাম প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে তার সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ঐ বৈঠকেই আবদুল্লাহর হাতে বায়আত করা হয়। মানসূরও ঐ বায়আতে অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনিও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহকে খলীফা স্বীকার করে নেন। সাফ্‌ফাহ্ তাঁর খিলাফত আমলে প্রচুর অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে এবং অনেক সম্মান প্রদর্শন করে আলাবীদেরকে নিশ্চুপ করে রেখেছিলেন। ফলে তাঁর আমলে আলাবীরা কোন বিদ্রোহ করেনি। মানসূর খলীফা হয়ে সাফ্‌ফাহর যুগের সেই বদান্যতাকে বহাল রাখেন নি। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান সাফ্‌ফাহর কাছে এসেছিলেন এবং সাফ্‌ফাহ্ তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দিয়েছিলেন। মানসূর খলীফা হলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আপন পুত্র মুহাম্মদ এবং ইবরাহীমকে এই ভেবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, হয়ত মানসূর তাদেরকে হত্যা করে ফেলবেন। এই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যাঁর হাতে মানসূর বায়আত করেছিলেন, মুহাম্মদ মাহ্‌দী নামে পরিচিত ছিলেন না। অতএব আমরা আগামীতে মুহাম্মদ মাহদী নামেই তাঁর উল্লেখ করব। ১৩৬ হিজরীতে (৭৫৩ খ্রি) যখন মানসূর হজ্জ করতে মক্কায় যান এবং সেখানে শুনতে পান যে, সাফ্‌ফাহ্ ইনতিকাল করেছেন তখন তিনি সর্বপ্রথম মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সন্ধান নেন। তখন মাহ্‌দী সেখানে ছিলেন না। কিন্তু তাতে মানসূরের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সে কারণেই মুহাম্মদ মাহ্‌দী আত্মগোপন করে থাকেন।

মনসুর খলীফা হওয়ার পর সব সময়ই যার-তার কাছে তাঁর ঠিকানা জানতে চাইতেন। তিনি এ ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহ দেখান যে, প্রত্যেক লোকই জেনে যায়, মানসূর মুহাম্মদ মাহ্‌দীকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্নার উপর যখন মানসূরের দিক থেকে তাঁর ছেলেকে হাযির করার জন্য অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন তিনি মানসূরের চাচা সুলায়মান ইব্‌ন আলীর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। সুলায়মান বলেন, মানসূর যদি ক্ষমা করার লোক হতো তাহলে আপন চাচাকে ক্ষমা করত। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীর উপর বাড়াবাড়ি করত না। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আপন পুত্রদেরকে গোপন করে রাখার ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মানসূর হিজাযের প্রান্তে প্রান্তে আপন গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে দেন এবং বানাওয়াট পত্রাদি লিখিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের কাছে পাঠাতে থাকেন, যাতে কোন না কোনভাবে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সন্ধান বেরিয়ে আসে। মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম অত্যন্ত সন্তর্পণে আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর শুধু তাঁদের সন্ধান বের করার জন্য স্বয়ং মানসূর হজ্জের বাহানায় মক্কায় গিয়ে পৌঁছেন। এবার দুইভাই হিজায থেকে বসরায় এসে বনূ রাহিব ও বনূ মুররা গোত্রে অবস্থান করতে থাকেন। মানসূর এই সন্ধান পেয়ে সোজা বসরায় চলে আসেন। কিন্তু তাঁর আসার পূর্বেই মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং ইবরাহীম বসরা ছেড়ে আদনে চলে গিয়েছিলেন।

এবার মানসূর বসরা থেকে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন দুই ভাই আদনেও স্বস্তি পেলেন না তখন সোজা সিন্ধুতে চলে যান এবং কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে পুনরায় কূফায় এসে আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর তথা থেকে মদীনায় চলে যান। ইবরাহীম মানসূরকে খতম করার সংকল্প নেন। কিন্তু তা থেকে মুহাম্মদ মাহ্দী তাঁকে বিরত রাখেন। মানসূর এবারও তাঁদের কোন সন্ধান পান নি। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্নাকে ডেকে পাঠিয়ে উভয় পুত্রকে হাযির করার জন্য পুনরায় চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতার কথা জানালে মানসূর তাঁকে বন্দী করতে চান। কিন্তু মদীনার কর্মকর্তা যিয়াদ জামিন হওয়ায় আবদুল্লাহ্ তখনকার মত মুক্তি পান। যেহেতু মদীনার কর্মকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের জন্য জামিন হয়েছিলেন তাই মানসূরের মনে তার সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি রাজধানীতে ফিরে এসে মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসীরকে মদীনার কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠান এবং যিয়াদ ও তার বন্ধু-বান্ধবকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে বন্দী করে রাখেন। মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ মদীনার কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে মুহাম্মদ মাহ্দীকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। শুধু এ কাজের জন্যই তিনি মদীনাস্থ বায়তুল মালের সব অর্থ খরচ করে ফেলেন। মানসূর তার এই অপব্যয় ও বিফলতার জন্য তাকে পদচ্যুত করেন এবং রাবাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন হাইয়ানকে মদীনার কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। রাবাহ মদীনায় পৌঁছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেন। এজন্য সমগ্র মদীনায় এক মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি নিম্নলিখিত আলাবীদের গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখেন।

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান মুসান্না ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর পিতা)।
২. ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন মুসান্না ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।
৩. জা'ফর ইব্ন হাসান মুসান্না ইব্ন হাসান আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।
৪. সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ইব্ন হাসান মুসান্না ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাঊদ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৭. ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইবন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচাত ভাই)।
৯. আব্বাস ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।
১০. মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর আপন চাচা)
১১. আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (মুহাম্মদ মাহ্দীর চাচা)।

এই সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সংবাদ মানসূরের কাছে পাঠানো হলে তিনি লিখেন, এদের সাথে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানকেও বন্দী কর। কেননা সে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান আলীর একই মা অর্থাৎ ফাতিমা বিন্‌ত হুসাইনের সন্তান। রাবাহ্ মানসূরের এ নির্দেশও পালন করেন। ঐ সময়েই মিসরের গভর্নর আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী, মুহাম্মদ মাহ্‌দীর পুত্রকে গ্রেফতার করে মানসূরের কাছে পাঠান এবং তিনি তাঁকে বন্দী করে রাখেন। আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মিসরে গিয়েছিলেন।

বাগদাদ নগরীর নির্মাণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা

সাফ্‌ফাহ্ আন্‌বারে আপন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পর আনবার সংলগ্ন একটি জায়গায় নিজের প্রাসাদ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বাসস্থানও নির্মাণ করেছিলেন। ফলে সেখানে একটি ক্ষুদ্র বসতি গড়ে ওঠে এবং তার নাম রাখা হয় হাশিমিয়া। মানসূর হাশিমিয়ায়ই ছিলেন এমন সময় খুরাসানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ১৪০ হিজরী (৭৫৭-৫৮ খ্রি.) কিংবা ১৪১ হিজরী (৭৫৮-৫৯ খ্রি.)-তে মানসূর নিজের একটি পৃথক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে বাগদাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাগদাদ নগরী নির্মাণের কাজ নয়-দশ বছর পর্যন্ত চলে এবং ১৪৯ হিজরীতে (৭৬৬ খ্রি) তা সমাপ্ত হয়। সেদিন থেকে বনূ আব্বাসের রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে উলামায়ে ইসলাম দীনী জ্ঞানের চর্চা এবং তা প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ শুরু করেন।

মক্কায় ইব্‌ন জুরায়জ, মদীনায় মালিক, সিরিয়ায় আওযাঈ, বসরায় হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা প্রমুখ, ইয়ামানে মা'মার এবং কূফায় সুফিয়ান সাওরী হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। ইব্‌ন ইস্‌হাক 'মাগাযী' (যুদ্ধ-সংক্রান্ত ইতিহাস) এবং আবূ হানীফা 'ফিকাহ্' (ইসলামী আইন শাস্ত্র)-এর উপর গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইতিপূর্বে শুধু মুখে মুখে এসব বিষয়ের চর্চা হতো। গ্রন্থনা ও রচনার এই ধারা ক্রমশ উন্নতি লাভ করতে থাকে। এরপর বাগদাদ ও রাজদরবারে গ্রন্থকারদের খুবই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়। হাদীস গ্রন্থাদি প্রণয়ন এবং স্মৃতিশক্তির বোঝা কাগজ ও লেখনীর উপর উঠিয়ে দেওয়ার এটাই ছিল উপযুক্ত সময় এবং সব চাইতে জরুরী মুহূর্ত। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার জায়গা এটা নয়।

আলাবী নেতৃবৃন্দকে হত্যা

রাবাহ যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলেন তাঁরা ১৪৪ হিজরীর (৬৬১-৬২ খ্রি) শেষ দিন পর্যন্ত মদীনায় বন্দী অবস্থায়ই কাটান। মানসূর সব সময়ই মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এই সময়ে ঐ দুই ভাই হিজাযের বিভিন্ন গোত্রের জনবসতিতে এবং অখ্যাত স্থানসমূহে আত্মগোপন করে থাকেন। তাঁরা ঘন ঘন তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করতেন। মোটকথা, এই সময়ে হযরত হাসান ইব্‌ন আলীর সন্তানদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যাঁকে বন্দী করা হয়নি বা যিনি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য দেশের কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে থাকেন নি। ১৪৪ হিজরীর যিলহজ্জ (৭৬২ খ্রি. মার্চ)

মাসে মানসূর হজ্জ করতে যান। তিনি তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন তালহা এবং মালিক ইব্‌ন আনাসকে হাসানের সন্তানদের কয়েদখানায় পাঠান। তারা তাদেরকে গিয়ে বলেন, তোমরা মুহাম্মদ ও ইবরাহীমকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর। তাঁদের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান বলেন, আমি তো ওদের দু'জনের কোন খবরই জানি না। তোমরা বরং আমাকে স্বয়ং মানসূরের সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি দাও। কিন্তু মানসূর বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর দুই পুত্রকে হাযির না করবেন ততক্ষণ আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করব না। মানসূর হজ্জ করে যখন ইরাকের দিকে আসছিলেন তখন রাবাহ্‌কে নির্দেশ দেন, এই কয়েদীদেরকে আমার কাছে ইরাকে পাঠিয়ে দাও। রাবাহ তাঁদের সকলকে কয়েদখানা থেকে বের করে হাতে, গলায় ও পায়ে শিকল পরিয়ে, শিবিকা ছাড়াই উটের উপর চড়িয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে ইরাকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে মুহাম্মদ ও ইবরাহীম উভয় ভাই বেদুঈন বেশে তাঁদের পিতা আবদুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছে বিদ্রোহ ঘোষণার অনুমতি চান। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তাঁদেরকে তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন। ঐ কয়েদীরা মানসূরের কাছে পৌঁছলে তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমানকে তাঁর সামনে ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং তাঁর পিঠে দেড়শ বেত্রাঘাত করেন। মানসূর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমানের শত্রু ছিলেন এ জন্য যে, সিরিয়াবাসীরা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল এবং সেখানে তাঁর বেশ প্রভাবও ছিল।

এই কয়েদীদেরকে ইরাকে স্থানান্তরিত করার পর মুহাম্মদ মাহ্‌দী আপন ভাই ইবরাহীমকে ইরাক ও খুরাসানের দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তুমি সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে দাওয়াত দাও এবং তাদেরকে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোল। মুহাম্মদ মাহ্‌দী হিজাযেই থাকেন। মানসূরের যখন এই বিশ্বাস হলো যে, মুহাম্মদ মাহ্‌দী হিজাযেই রয়েছেন তখন তিনি তাঁকে প্রতারিত করা, সর্বোপরি তাঁর ঠিকানা বের করার উদ্দেশ্যে যে সব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি বিভিন্ন শহরের লোকের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নামে লিখিত পত্রাদি মক্কা-মদীনার ঐ সমস্ত লোকের কাছে অনবরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, যাদের সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যে, তারা মুহাম্মদ মাহ্‌দীর অনুরাগী এবং তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কেও খোঁজ-খবর রাখেন। ঐ সমস্ত পত্রে জনসাধারণের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হতো, মানসূরের নিন্দা করা হতো এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হতো। মানসূরের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে কোন গুপ্তচর হয়ত মাহ্‌দী পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানসূরের এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবে একটি কাজ অবশ্যই হয়েছিল যে, মুহাম্মদ মাহ্‌দী তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে উপরোক্ত পত্রাদির কথা জানতে পারেন এবং ঐ সমস্ত পত্রাদি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তরাই লিখেছে বলে কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন। অর্থাৎ তিনি তাঁর দলের ক্ষমতা বাস্তবের চাইতে বেশি বলেই অনুমান করেন। অপর দিকে তাঁর ভাই ইবরাহীম বসরা, কিরমান, ইসফাহান, খুরাসান, মাওসিল, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে এখানে সেখানে অনেক 'দাঈ' ও সহযোগী নিয়োগ করেন এবং মানসূরের রাজধানীতে এসে একবার খোদ মানসূরের দস্তরখানে বসে পানাহারও করে যান, অথচ মানসূর ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারেন নি। দ্বিতীয়বার যখন মানসূর

বাগদাদের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করতে আসেন তখনও তিনি মানসূরের লোকদের সাথে মিলেমিশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। গুপ্তচররা মানসূরকে অবহিত করে যে, ইবরাহীম বাগদাদেই রয়েছেন। কিন্তু এবারও মানসূর তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেননি। অনুরূপভাবে রাবাহ্ হিজাযে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও মুহাম্মদ মাহ্দীকে বের করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১৪৫ সনে (৭৬২ খ্রি) খুরাসানের কর্মকর্তা আবূ আওন মানসূরের কাছে লিখিতভাবে জানান যে, খুরাসানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে এবং সমগ্র খুরাসানবাসী মুহাম্মদ মাহ্দীর বিদ্রোহ ঘোষণার অপেক্ষা করছে। মানসূর এই পত্র পাঠমাত্র মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমানকে কয়েদখানা থেকে ডেকে এনে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করেন এবং তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা খুরাসানে পাঠিয়ে দেন। ঐ মস্তকের সাথে এমন কিছু লোককেও পাঠানো হয়, যারা খুরাসানে গিয়ে কসম খেয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই মস্তক মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র এবং তার দাদীর নাম ছিল ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ্। এভাবে খুরাসানবাসীকে ধোঁকা দেওয়া হলো যে, মুহাম্মদ মাহ্দী নিহত হয়েছেন। এরপর মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন আলী, আব্বাস ইব্ন হাসান ইব্ন আলী প্রমুখের উপর বিভিন্নভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালান। যার ফলে তাঁরা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মানসূরের এই বর্বরতা ও পাষাণ হৃদয়তা যে কোন মানুষকে বিস্মিত ও শোকাহত না করে পারে না। বনূ উমাইয়ারা আলাবীদের শত্রু ছিল এবং আব্বাসীরা তখন পর্যন্ত আলাবীদের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করছিল এবং সব ব্যাপারেই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আলাবীদের সাথে বনূ উমাইয়ার আত্মীয়তার কোন নিকট-সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আব্বাসীরা ছিল আলাবীদের অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়। আলাবীরা বনূ উমাইয়াদের প্রবল বিরোধিতা করে এবং বার বার তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু বনূ আব্বাসের বিরুদ্ধে তাঁরা তখন পর্যন্ত কোন লড়াই-ঝগড়া করেনি। এসব কথা মনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বনূ ইমাইয়া কোন আলাবীকে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গ্রেফতার করে হত্যা করেনি। তাদের হাতে যে সমস্ত আলাবী নিহত হয়েছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে লড়তেই নিহত হয়েছে। কিন্তু মানসূর একেবারে নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হাসান সন্তানদেরকে কত নির্দয়ভাবেই না হত্যা করেছেন। মানসূর কর্তৃক আলাবী নেতৃবৃন্দের এই হত্যাকাণ্ড, অপরাধের দিক দিয়ে ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া কর্তৃক ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের চাইতেও জঘন্য মনে হয়। সম্ভবত এরই নাম দুনিয়া, যাকে লাভ করতে গিয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় এবং এ ধরনের পাশবিক ও জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।

মুহাম্মদ মাহ্দী 'নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ ঘোষণা

মানসূর যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান এবং হাসান পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যা করেন তখন ইমাম মাহ্দী আর বেশি দিন অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করেন নি। কিভাবে যেন তাঁর অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, জনসাধারণ তাঁদেরকে সমর্থন দান এবং মানসূরের 'বায়আতে খিলাফত' প্রত্যাহার করার জন্য সর্বত্রই উদগ্রীব হয়ে আছে। তিনি তাঁর মদীনার

বন্ধুদের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। ঘটনাচক্রে মদীনার শাসনকর্তা রাবাহ্ গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, মুহাম্মদ মাহদী আজই বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তিনি তখন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন, হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন এবং আরো কয়েক কুরায়শী নেতাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, যদি মুহাম্মদ মাহ্দী বিদ্রোহ করেন তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করব। তখনও এসব কথা হচ্ছিল, এমন সময় তাকবীরের আওয়াজ শোনা গেল এবং জানা গেল যে, মুহাম্মদ মাহদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। প্রথমে তাঁর সাথে মাত্র দেড়শ লোক ছিল। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সর্বপ্রথম কয়েদখানার দিকে যান এবং সেখান থেকে মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ কাসরী, তাঁর ভাতিজা এবং অন্যান্য বন্দীকে মুক্ত করে দেন। এরপর সরকারী প্রাসাদ ঘেরাও করে রাবাহ্, তার ভাতিজা আব্বাস এবং ইব্ন মুসলিম ইব্ন উকবাকে বন্দী করেন। এরপর মসজিদে এসে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি মানসূরের বদস্বভাব, বদ-আচরণ এবং অত্যাচারমূলক কার্যকলাপের বর্ণনা দেন এবং নিজে জনসাধারণের সাথে সুবিচারমূলক আচরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর তিনি সকলের সাহায্য ও সমর্থন কামনা করেন। তিনি উছমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন যুহায়রকে মদীনার প্রধান বিচারপতি, আবদুল আযীয ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ মাখযূমীকে অস্ত্রাগারের ব্যবস্থাপক এবং উছমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাবকে পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আযীযের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি ধমকের সুরে বলেন; তুমি কেন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছ ? তখন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয তাঁকে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন মাহ্দীর হাতে বায়আত করেননি। অনুরূপভাবে আরো কয়েকজন বায়আতের ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। মুহাম্মদ মাহ্দীর বিদ্রোহ ঘোষণা এবং রাবাহর বন্দী হওয়ার সংবাদ প্রায় নয়দিন পর মানসূরের কানে পৌঁছে। এতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে কূফায় এসে মুহাম্মদ মাহ্দীর নামে আমাননামা (নিরাপত্তা পত্র) হিসাবে একটি পত্র লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـــ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে (৫ ঃ ৩৩)।"

"আমি আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যিম্মা রেখে অঙ্গীকার করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তোমার, তোমার সমগ্র পরিবারের এবং তোমার অনুসারীদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করব। তুমি এ যাবত যত লোককে হত্যা করেছ কিংবা অন্যের যত মাল ছিনিয়ে নিয়েছ তাও মাফ করে দেব। এই সাথে আমি তোমাকে আরো এক লক্ষ দিরহাম দান করব। এছাড়া তোমার অন্য কোন প্রয়োজন বা চাহিদা থাকলে তাও পূরণ করব। তুমি যেখানেই চাইবে সেখানেই তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তোমার যারা সহযোগী রয়েছে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের পর আর কখনো পাকড়াও করা হবে না। যদি তুমি এই সমস্ত ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হতে চাও তাহলে তোমার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিয়ে যাও, যাতে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ না থাকে।"

মুহাম্মদ মাহ্দী উত্তরে লিখেন ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ــ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ــ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ــ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ــ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ــ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ــ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

"ত্বা-সীন-মীম। এই আয়াতগুলো স্পষ্ট কিতাবের। আমি তোমার কাছে মূসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, ওদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে; এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে, আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা ওদের নিকট তারা আশংকা করত" (২৮ ঃ ১-৬)।

"আমি তোমার জন্য সেরূপ নিরাপত্তা দান করছি, যেরূপ তুমি আমার জন্য করেছ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হুকুমত আমাদেরই হক (অধিকার)। তুমি আমাদের কারণে এর দাবিদার হয়েছ এবং আমাদেরই গোষ্ঠীর লোক হয়ে হুকুমত লাভের প্রয়াস পেয়েছ এবং সে জন্য সাফল্যও লাভ করেছ। আমার পিতা আলী 'ওয়াসী' (ওসীয়তপ্রাপ্ত) ও ইমাম ছিলেন। তুমি কি

করে তাঁর বেলায়েতের উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে এমতাবস্থায় যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি বিদ্যমান রয়েছে। তুমি এ কথাও জান যে, আমাদের মত খাঁটি বংশের ভদ্র লোকেরা হুকুমত লাভের আকাঙ্খা করেনি। আমরা মালউন ও মারদূদের (অভিশপ্তদের) সন্তান নই। বনূ হাশিমের কোন ব্যক্তি আত্মীয়তা, অগ্রগণ্যতা ও প্রকৃষ্টতার ক্ষেত্রে আমাদের সমতুল্য নয়। জাহিলিয়া যুগে আমরা ফাতিমা বিন্‌ত আমরের বংশধর ছিলাম এবং ইসলামী যুগে হচ্ছি ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলের বংশধর। আল্লাহ্ তা'আল আমাদেরকে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পিতা মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। পরবর্তীতে আমার পিতা হচ্ছেন আলী, যিনি সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর রাসূলের সহধর্মিণীদের মধ্যে খাদীজাতুল কুবরা সবার আগে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছেন। তার মেয়েদের মধ্যে ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন সমগ্র জাহানের মেয়েদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। হাসান ও হুসাইন হচ্ছেন তাঁর দুই সন্তান, যাঁরা হবেন জান্নাতবাসীদের নেতা। হাশিমের সাথে আলীর আত্মীয়তার ভিন্ন আরেকটি লাইন রয়েছে। এদিক দিয়ে দ্বিগুণ লাইনে হাসান আবদুল মুত্তালিবের নিকটাত্মীয়। বংশ তালিকার দিক দিয়ে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠতম বনূ হাশিম। আমার পিতা বনূ হাশিমের বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। আমার মধ্যে না কোন অনারবের মিশ্রণ রয়েছে, আর না রয়েছে কোন দাসী-বাঁদীর প্রভাব। আমি আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে আমি তোমাকে তোমার জান ও মালের নিরাপত্তাদান করব এবং তুমি যে কোন ধরনেরই ভুল করে থাক না কেন, তা মাফ করে দেব। তবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কোন শাস্তি যদি তোমার প্রাপ্য থাকে কিংবা তোমার উপর কোন মুসলমানের হক বা অঙ্গীকার থাকে তাহলে আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করব না। কেননা এ ব্যাপারে যেমন তোমার অজানা থাকার কথা নয় আমি অসহায়। আমি নিশ্চিতভাবে তোমার চাইতে খিলাফতের অধিকযোগ্য এবং তোমার চাইতে অধিকতর প্রতিশ্রুতি পূরণকারী। তুমি আমার পূর্বেও কিছু লোককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলে। এবার আমাকে কি ধরনের নিরাপত্তা দান করছ ? এটা কি ইব্‌ন হুবায়রাকে অথবা তোমার আপন চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলীকে অথবা আবূ মুসলিমকে প্রদত্ত নিরাপত্তার অনুরূপ ?"

মানসূরের কাছে যখন এই চিঠি পৌঁছল তখন তিনি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেন এবং নিম্নোক্ত চিঠি লিখে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করেন ঃ

"আমি তোমার চিঠি পড়েছি। মহিলাদের সাথে আত্মীয়তা-বন্ধনের উপর তোমার গৌরব-গরিমা নির্ভরশীল। এর দ্বারা একমাত্র মূর্খ ও বাজে লোকেরাই প্রতারিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদেরকে চাচা, বাবা তথা পুরুষ অভিভাবকদের মত করে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা চাচাকে বাবার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে তাকে নিকটতম আত্মীয়, মায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের আত্মীয়তা-বন্ধনকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন তাহলে আমিনা (রাসূলুল্লাহর মা) জান্নাতে প্রবেশকারী মহিলাদের নেত্রী হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপন মর্জি মুতাবিক যাকে চেয়েছেন সম্মানিত করেছেন। তুমি গর্বভরে আবূ তালিবের মা ফাতিমার উল্লেখ করেছ। কিন্তু তার অবস্থা তো এই যে, তার কোন পুত্র বা কন্যার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন পুরুষকে

আত্মীয়তা-বন্ধনের কারণে সম্মানিত করতেন তাহলে নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেই করতেন। তিনি নিঃসন্দেহে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধর্মের জন্য যাঁকে ইচ্ছা তাকেই মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ–

"তুমি যাকে ভালোবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে" (২৮ ঃ ৫৬)।

আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করেন তখন তাঁর চাচা বিদ্যমান। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

"তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও" (২৬ ঃ ২১৪)।

"অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং 'দীনে হক'-এর দিকে আহ্বান জানান। তখন ওদের চারজনের দু'জন দীনে হক তথা খাঁটি ও সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন। আর তাঁদের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন অন্যতম। আর দু'জন দীনে হক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আর তাদের মধ্যে তোমার পিতা (আবূ তালিব) ছিলেন অন্যতম। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এই দুইজনের অভিভাবকত্বের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ থেকে ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং তারাও এই দু'জনের মধ্যে মিত্রতার বা উত্তরাধিকারিত্বের কোন সম্পর্ক স্থাপন করেননি। তুমি লিখেছ, আবদুল মুত্তালিবের সাথে হাসানের দু'ধারী সম্পর্ক রয়েছে। এরপর তোমার সাথে রাসূলুল্লাহ্র দু'ধারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের সাথে তাঁর একটা পৈতৃক সম্পর্ক ছিল মাত্র। তোমার ধারণা যে, তুমি বনূ হাশিমের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, তোমার পিতামাতা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন এবং অনারব ও দাসী-বাঁদীদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি নিজেকে সমগ্র বনূ হাশিম থেকে অধিকতর গর্বিত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছ। আক্ষেপ তোমার জন্য। একটু চিন্তা করে দেখ, কাল আল্লাহ্র দরবারে তুমি এর কি জবাব দেবে ? তুমি এ ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছ। তুমি ঐ ব্যক্তি থেকে তোমাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছ, যিনি সত্তাগত ও পুণ্যগতভাবে তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইবরাহীম ইব্ন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। বিশেষ করে বাঁদীর সন্তান ছাড়া তোমার পিতার বংশধরদের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তোমাদের মধ্যে আলী ইব্ন হুসাইন অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবেদীনের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি। আর তিনি ছিলেন বাঁদীর সন্তান এবং নিঃসন্দেহে তোমার হাসান ইব্ন হাসানের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এরপর তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন আলীর তুল্য কোন ব্যক্তির জন্ম হয়নি। অথচ তাঁর দাদী বাঁদী

ছিলেন এবং তোমার পিতার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পুত্র জা'ফর তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর দাদী একজন বাঁদীই ছিলেন। 'আমি মুহাম্মদ (সা)-এর পুত্র' তোমার এ কথা বলা ভুল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ-

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন।"

"তবে হ্যাঁ, তুমি হচ্ছো তাঁর মেয়ের ছেলে। আর এ সম্পর্ক নিকটাত্মীয়তার হলেও এর দ্বারা কেউ মীরাছ (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বা বেলায়েত (অভিভাবকত্ব)-এর অধিকারী হতে পারে না এবং ইমামতও তার জন্য বৈধ নয়। অতএব এই আত্মীয়তার মাধ্যমে তুমি কি করে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পার? তোমার পিতা (আলী) ইমামতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি দিনের বেলা ফাতিমাকে ঘর থেকে বের করেছেন, তাঁর রোগ গোপন রেখেছেন এবং রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ 'শায়খায়ন' (আবূ বকর ও উমর) ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করেনি। সমগ্র মুসলমান এ সম্পর্কে একমত যে, নানা, মামা ও খালা উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তুমি গর্ব প্রকাশ করেছ এই বলে যে, আলী সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ওফাতের অব্যবহিত পূর্বে অন্যকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর জনসাধারণ একের পর এক ইমাম নির্বাচন করতে থাকে। কিন্তু আলীকে নির্বাচন করেনি। তিনিও হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে ঐ পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করেনি বা তাঁকে এর হকদারও মনে করেনি। আবদুর রহমান তাঁর উপর উসমানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এ জন্য তাঁর দুর্নামও করা হয়। তালহা ও যুবায়র (রা) তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সা'দ (রা) তাঁর বায়আত অস্বীকার করেন, এরপর মুআবিয়ার হাতেই বায়আত করেন। এরপরও তোমার পিতা খিলাফতের আশা ছাড়েননি এবং যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের পূর্বে তাঁর ভক্তরা তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এরপর তিনি সন্তুষ্টচিত্তে দু'ব্যক্তিকে হাকিম (মধ্যস্থতাকারী) নিয়োগ করেন, কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তিই তাঁর পদচ্যুতির ব্যাপারে একমত হন। এরপর হাসান খলীফা হন। তিনি শেষ পর্যন্ত কিছু কাপড়চোপড় ও দিরহামের বিনিময়ে মুআবিয়ার হাতে তাঁর খিলাফত বিক্রি করে ফেলেন এবং তাঁর সমর্থকদের মুআবিয়ার হাতে সমর্পণ করেন। অতএব যদি খিলাফতের মধ্যে তোমাদের কোন হক বা অধিকার থেকে থাকে তাহলে তোমরা সেটাকে বিক্রি করে ফেলেছ এবং তার মূল্য আদায় করে নিয়েছ। এরপর তোমার চাচা হুসাইন (রা) ইব্ন মারজানাহ্ (ইব্ন যিয়াদ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু জনসাধারণ তোমার চাচার বিরুদ্ধে ইব্ন মারজানারই পক্ষাবলম্বন করে এবং শেষ পর্যন্ত তোমার চাচাকে হত্যা করে এবং তাঁর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ইব্ন মারজানার হাতেই তা তুলে দেয়। এরপর তোমরা বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে। যার কারণে তারা তোমাদেরকে পাইকারীহারে হত্যা করে, ফাঁস লাগিয়ে খেজুরের ডালে ঝুলিয়ে রাখে, আগুন দিয়ে পোড়ায় এবং দেশ ছাড়া করে। তারা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দকে খুরাসানে হত্যা করে। সেই সাথে তোমাদের আরো অনেক পুরুষকে হত্যা করে এবং তোমাদের শিশু-

সন্তান ও মহিলাদেরকে বন্দী করে পর্দা ছাড়াই উটের পিঠে তুলে ক্রীতদাসীদের মত সিরিয়ায় প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত আমরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম এবং তাদের থেকে তোমাদের বদলা নিতে চাইলাম। শেষ পর্যন্ত তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি। এবং তোমাদেরকে তাদের জমি ও ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছি। আমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি এবং তাদেরকে সম্মানিত করেছি। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে অপরাধী ঠাওরাতে চাও ? সম্ভবত তুমি প্রতারিত হয়েছ এই ভেবে যে, হামযা, আব্বাস ও জা'ফরের উপর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আমরা সর্বাগ্রে তোমার পিতার উল্লেখ করতাম। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ আসল ব্যাপার তা নয়। ওরা তো দুনিয়া থেকে এমন পরিষ্কার ও নিষ্কলুষ অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে, সব লোকই তাঁদের অনুগত ছিল এবং তারা এক বাক্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত। কিন্তু তোমার পিতা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন। বনূ উমাইয়া তাঁর উপর ঠিক সেভাবে অভিশাপ বর্ষণ করত, যেভাবে ফরয নামাযসমূহে কাফিরদের উপর করা হয়। অতএব আমরা এ ক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি করি, তাঁর ফযীলত ও গুণাবলী বর্ণনা করি, বনূ উমাইয়ার উপর চড়াও হই এবং তাদের শাস্তি প্রদান করি। তুমি এ কথা নিশ্চয়ই জান যে, হাজীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করার কারণে জাহিলিয়া যুগে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলাম। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব সব ভাইয়ের মধ্যে শুধু আব্বাসই অর্জন করেছিলেন। তোমাদের পিতা এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমাদের সাথে ঝগড়া বাধালে উমর ফারূক (রা) আমাদের পক্ষেই রায় দেন। অতএব জাহিলিয়া ও ইসলামী উভয় যুগেই আমরা পানি সরবরাহের অধিকারী ছিলাম এবং আছি। তখন খলীফা উমর ফারূক (রা) তাঁর প্রভুর কাছে পানি প্রার্থনা করার সময় আমাদেরই পিতার 'ওয়াসীলা' ধরেছিলেন এবং তাঁর প্রভু (আল্লাহ্ তা'আলা) তখন বৃষ্টিও বর্ষণ করেছিলেন। অথচ তোমার পিতাও তখন বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাঁকে 'ওয়াসীলা' ধরা হয়নি। তুমি অবশ্যই জান যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয় তখন আবদুল মুত্তালিব বংশে আব্বাস ছাড়া রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকারী হওয়ার মত অন্য কোন পুরুষ জীবিত ছিলেন না। অতএব স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ্র উত্তরাধিকারিত্ব তাঁর চাচার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে এবং তাঁর বংশধরেরা খিলাফতের অধিকারী হয়ে গেছে। অতএব দুনিয়া ও আখিরাত এবং জাহিলিয়াত ও ইসলামের এমন কোন বিরাট মর্যাদা বাকি থাকেনি, যার উত্তরাধিকারিত্ব আব্বাস লাভ করেননি। যখন ইসলাম প্রচারিত হয় তখন আব্বাস, আবূ তালিব ও তার সন্তানদের অভিভাবক ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষাবস্থায় তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। যদি বদর যুদ্ধে আব্বাসকে জবরদস্তিমূলক বের করা না হতো তাহলে (খাদ্যের অভাবে) আবূ তালিব-এর সন্তান আকীল মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতেন এবং উতবা ও শায়বার থালা তাঁদেরকে চাটতে হতো। কিন্তু আব্বাস তাঁদের খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন। তিনিই তোমাদের সম্মান রক্ষা করেন এবং দাসত্ব ও গোলামি থেকে তোমাদেরকে বাঁচান। এরপর বদরযুদ্ধে 'ফিদয়া' (মুক্তিমূল্য) পরিশোধ করে আকীলকে তিনিই ছাড়িয়ে আনেন। অতএব তুমি আমাদের সামনে কিসের বড়াই কর। আমরা কুফরী যুগেও তোমাদের পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিয়েছি, তোমাদের 'ফিদয়া' পরিশোধ করেছি। তোমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মুখ রক্ষা করেছি এবং সবশেষে আমরাই আইনত শেষ নবীর উত্তরাধিকারী হয়েছি। তোমাদের উপর বনূ উমাইয়া যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল আমরা তার প্রতিশোধ নিয়েছি এবং যা

করতে তোমরা অপারগ ছিলে এবং যা অর্জন করা তোমাদের সাধ্যের অতীত ছিল আমরা তা করে দেখিয়েছি। আমার সালাম নিও।"

বংশ নিয়ে বড়াই করার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ মাহ্দীর দিক থেকে শুরু হয়েছিল। মানসূর তার জবাব দিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি তার জবাবে বার বার সীমালংঘন করেছেন। মুহাম্মদ মাহ্দী হযরত আব্বাস (রা) সম্পর্কে কিছুই লিখেননি। মানসূর বিনা কারণে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে দুর্মুখের মত অনেক কথা বলেছেন। মানসূর হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এই মর্মেও একটি গুরুতর অপবাদ রটিয়েছেন যে, তিনি (আলী) খিলাফত লাভ করার জন্য হযরত ফাতিমাকে দিনের বেলা ঘর থেকে বের করেছিলেন। ইমাম হাসান সম্পর্কেও মানসূর অত্যন্ত মানহানিকর কথা বলেছেন। ইমাম হাসান (রা) কারো কাছে খিলাফত বিক্রি করেননি, বরং মুসলমানদের যে দু'টি দল আপোসে লড়ছিল তিনি তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীকেই বাস্তবে রূপ দান করেছেন। হযরত আব্বাস (রা) অবশ্যই আবূ তালিবকে সাহায্য করেছেন এবং আকীলকেও নিজের কাছে রেখে প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু এসব কথা মুখে আনা এবং এগুলোর মাধ্যমে অন্যের মানহানি করা নিঃসন্দেহে কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানসূর এইসব কথা মুখে এনে নিঃসন্দেহে তাঁর হীনম্মন্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। মুহাম্মদ মাহ্দী মদীনার ব্যবস্থাপনা শেষ করে মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি কাসিম ইব্ন ইসহাককে ইয়ামানের এবং মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্কে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করে তাদেরকে স্ব স্ব কর্মস্থলে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইব্ন হাসান এবং কাসিম ইব্ন ইসহাক উভয়েই মদীনা থেকে এক সাথে রওয়ানা হন। মক্কার গভর্নর তাদের সাথে মুকাবিলা করে পরাজিত হন এবং মুহাম্মদ ইব্ন হাসান মক্কায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মানসূর উপরোক্ত চিঠি প্রেরণ করার পর মুহাম্মদ মাহ্দীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য একটি বিরাট বাহিনীসহ ঈসা ইব্ন মূসাকে প্রেরণ করেন। ঈসার সাথে মুহাম্মদ ইব্ন সাফফাহ্, কাসীর ইব্ন হুসাইন আবদী এবং হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবাকেও প্রেরণ করা হয়। রওয়ানা হওয়ার সময় ঈসা ইব্ন মূসা এবং অন্যান্য নেতাকে বলে দেওয়া হয় ঃ যদি তোমরা মুহাম্মদ মাহ্দীর উপর জয়ী হও তাহলে তাকে নিরাপত্তা দান করবে এবং হত্যা করবে না। আর যদি তিনি আত্মগোপন করেন তাহলে মদীনাবাসীদেরকে গ্রেফতার করবে। কেননা ওরা তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত আছে। আবূ তালিব বংশের যেসব লোক তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসবে তোমরা তাদের নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। আর যে সমস্ত লোকের সন্ধান তোমরা না পাও তাদের মাল-আসবাব বাজেয়াপ্ত করবে। ঈসা ইব্ন মূসা যখন 'ফায়দ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন তখন সেখান থেকে চিঠি পাঠিয়ে মদীনার কয়েক ব্যক্তিকে নিজের কাছে তলব করেন। তার চিঠি পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব, তাঁর ভাই উমর এবং আবূ আকীল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আকীল মদীনা থেকে ঈসার দিকে রওয়ানা হন। মুহাম্মদ মাহ্দীর কাছে যখন ঈসার আগমন সংবাদ পৌছে তখন তিনি তার উপদেষ্টাদের কাছে পরামর্শ চান, মদীনা থেকে বের হয়ে আমরা শত্রুর মুকাবিলা করব, না মদীনায় অবস্থান করেই তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ

করব? বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে মুহাম্মদ মাহ্দী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রণকৌশল অনুসরণ করার সদিচ্ছা নিয়ে পরিখা খননের নির্দেশ দেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) আহ্যাব যুদ্ধে করেছিলেন। ইতিমধ্যে ঈসা ইব্ন মূসা 'আহ্ওয়ায' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। মুহাম্মদ মাহ্দী মদীনাবাসীদেরকে বাইরে বের হয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাই কেউ মদীনা থেকে বের হতে পারছিল না। কিন্তু ঈসা ইব্ন মূসা যখন নিকটে এসে পৌঁছেন তখন তিনি মদীনা থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। মুহাম্মদ মাহ্দী এভাবে তার নিষেধাজ্ঞা রহিত করে মস্ত বড় ভুল করে বসেন। কেননা এই সুযোগে মদীনার বিরাট সংখ্যক লোক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। ফলে মদীনার অভ্যন্তরে মুহাম্মদ মাহ্দীর সাথে অতি অল্প সংখ্যক লোক অবস্থান করে। আর তখনি তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং ঐ সমস্ত লোককে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। ঈসা 'আহ্ওয়ায' থেকে অগ্রসর হয়ে মদীনা থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থান নেন এবং একটি খণ্ড বাহিনীকে মক্কার রাস্তায় মোতায়েন করে রাখেন, যাতে পরাজিত হলে মুহাম্মদ মাহ্দী মক্কার দিকে পালিয়ে যেতে না পারেন। এরপর তিনি মুহাম্মদ মাহ্দীর কাছে পয়গাম পাঠান ঃ খলীফা মানসূর তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, কিতাব ও সুন্নাহ্র ফায়সালার দিকে আহ্বান করেছেন এবং বিদ্রোহের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন। মুহাম্মদ মাহ্দী উত্তরে বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে নিহত হওয়ার ভয়ে কখনো পলায়ন করিনি। হিজরী ১৪৫ সনের ১২ই রমযান (৭৬২ খ্রি ডিসেম্বর) ঈসা ইব্ন মূসা আগে বেড়ে 'জায়াফ' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। ১৪ই রমযান তিনি একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে মদীনাবাসী! আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করছি এই শর্তে যে, তোমরা আমার এবং মুহাম্মদ মাহ্দীর মাঝখান থেকে সরে যাও এবং নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। মদীনাবাসীরা এই আওয়ায শুনে ঈসাকে গালিগালাজ করতে থাকে। ঈসা তার তাঁবুতে ফিরে যান। তিনি পরদিন পুনরায় যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে ঐ জায়গায় আসেন এবং আপন অধিনায়কদেরকে মদীনার চতুর্দিকে মোতায়েন করেন। মুহাম্মদ মাহ্দীও মুকাবিলার জন্য ময়দানে বের হন। তাঁর পতাকা উছমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন যুবায়রের হাতে ছিল এবং তাঁর 'শিআর (যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপন লোককে আহ্বান করার সাংকেতিক শব্দ) ছিল 'আহাদ' 'আহাদ'। মুহাম্মদ মাহ্দীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আবূ গালমাশ যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান এবং তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানান। ঈসার পক্ষ থেকে একের পর এক বেশ্ কয়েকজন বীর যোদ্ধা মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু তারা সকলেই আবূ গালমাশের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষই বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করে। দুই বাহিনীর অধিনায়করাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর ঈসার নির্দেশে হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা পদাতিক বাহিনী নিয়ে পরিখার নিকটবর্তী প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যান। মুহাম্মদ মাহ্দীর সঙ্গীরা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে বাধা দিতে চায়। কিন্তু হুমায়দ এই অবস্থায়ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং অনেক কষ্টসৃষ্টে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে তা ধসিয়ে দেন এবং পরিখাও অতিক্রম করেন। এরপর তিনি

মুহাম্মদ মাহ্‌দীর বাহিনীর সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে দেন। এবার ঈসা সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে পরিখার কয়েক জায়গা ভরাট করে রাস্তা বানিয়ে ফেলেন এবং তার অশ্বারোহীরা পরিখা অতিক্রম করে মুহাম্মদ মাহদীর বাহিনীর উপর হামলা চালায়। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাম্মদ মাহদীর বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। অপর দিকে হামলাকারী বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং তারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ভোর থেকে আসর পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। মুহাম্মদ মাহদী তাঁর সঙ্গীদেরকে এই মর্মে সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে পারবে। মুহাম্মদ মাহদীর সঙ্গীরা বার বার তাঁকে অনুরোধ করে এই মুহূর্তে আপনি আপনার প্রাণ বাঁচিয়ে মক্কা অথবা বসরার দিকে চলে যান। এরপর অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে পুনরায় শত্রুবাহিনীর মুকাবিলা করুন। কিন্তু মুহাম্মদ মাহ্‌দী উত্তরে বলেন, যদি তোমরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে চলে যেতে পার। আমি দুশমনদের ভয়ে পিছপা হতে পারব না। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সাথে সর্বমোট তিনশ লোক থাকে। তখন তাঁর অন্যতম সঙ্গী ঈসা ইব্‌ন খাদীর সেই রেজিস্টার পুড়িয়ে ফেলেন, যাতে বায়আতকারীদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। এরপর তিনি কয়েদখানায় গিয়ে রাবাহ ইব্‌ন উছমান এবং তার ভাইদেরকে হত্যা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসরী নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে ফেলায় সে যাত্রা রক্ষা পান। এই সব কাজ শেষ করে ঈসা ইব্‌ন খাদীর মুহাম্মদ মাহ্‌দীর পাশে দাঁড়িয়ে পুনরায় যুদ্ধ করতে থাকেন। এবার মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সঙ্গীরা তাদের ঘোড়ার পা কেটে ফেলে, তরবারির খাপ ভেঙে ফেলে এবং মরা অথবা মরার কসম খেয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হামলা এতই জোরদার ও ভয়ংকর ছিল যে, ঈসার বাহিনী পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। কিন্তু তাদের কিছু লোক কোন মতে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মদীনার অভ্যন্তরে চলে আসে এবং জনৈক আব্বাসী মহিলার কাছ থেকে একটি ওড়না নিয়ে তা পতাকার ন্যায় মসজিদের মিনারে উড়িয়ে দেয়। এই অবস্থা দেখে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে যায় এই ভেবে যে, ঈসার বাহিনী মদীনা দখল করে নিয়েছে। অতএব তারা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। এতে ঈসার পলায়নপর সৈন্যরা সাহস ফিরে পায়। তারা নিজেদের সামলে নিয়ে পুনরায় মাহ্‌দী বাহিনীর মুকাবিলা করতে শুরু করে। ঈসার একটি খণ্ড বাহিনী বনূ গিফারের মহল্লার দিক থেকে মদীনায় প্রবেশ করে সেদিক থেকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর উপর হামলা করে। এই সব ব্যাপার ছিল একেবারে আকস্মিক। মুহাম্মদ মাহ্‌দী এটা কখনো চিন্তা করেন নি যে, বনূ গিফার শত্রুদেরকে এভাবে রাস্তা ছেড়ে দেবে। এই অবস্থা দেখে মুহাম্মদ মাহ্‌দী সামনে অগ্রসর হয়ে হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবাকে মুকাবিলার জন্য আহবান করেন। কিন্তু হুমায়দ তাঁর মুকাবিলায় আসেন নি। মুহাম্মদ মাহ্‌দীর সঙ্গীরা পুনরায় শত্রুদের উপর হামলা চালায়। ঈসা ইব্‌ন খাদীর অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। ঈসা ইব্‌ন মূসা সামনে এগিয়ে এসে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দান করছি, তুমি যুদ্ধ বন্ধ কর। কিন্তু ঈসা ইব্‌ন খাদীর তার কথায় মোটেই কর্ণপাত করেন নি। তিনি বরাবর লড়ে যেতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অপর দিকে মুহাম্মদ মাহ্‌দীকে ঈসা ইব্‌ন মূসার বাহিনী চতুর্দিক

থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হামলাকারীদের মুকাবিলা করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলেন। মুহাম্মদ মাহ্দী তখন আপন বীরত্বের সেই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যার ফলে ঈসা ইব্ন মূসার বাহিনীর কোন লোকই তাঁর সামনে টিকতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত জনৈক ব্যক্তি পিছন থেকে হঠাৎ এগিয়ে এসে তার কোমরে বর্শা নিক্ষেপ করে। সেই আঘাত সামলাতে গিয়ে যেই তিনি কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকেন অমনি হুমায়দ ইব্ন কাহতাবা ক্ষিপ্রতার সাথে আগে বেড়ে তাঁর বুকের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। সামনে ও পিছন থেকে দু'টি বর্শা এসে যখন তাঁর দেহ ভেদ করে এপার ওপার হয়ে যায় তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কাহ্তাবা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা ঈসা ইব্ন মূসার কাছে নিয়ে আসেন। এই বীরকে হত্যা করার সাথে সাথে মদীনা ঈসা ইব্ন মূসার দখলে চলে যায়। ঈসা ইব্ন মূসা মুহাম্মদ মাহ্দীর মস্তক এবং বিজয়ের সুসংবাদ মুহাম্মদ ইব্ন আবিল্ কিরাম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর এবং কাসিম ইব্ন হাসান ইব্ন যায়দ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবের মাধ্যমে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন। এই ঘটনা ১৪৫ হিজরীর ১৫ই রমযান (৭৬২-খ্রি ডিসেম্বর) সোমবার আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে। ঈসা ইব্ন মূসা মুহাম্মদ মাহ্দীর লাশ মদীনা ও 'সানিয়াতুল বিদা'-এর মধ্যবর্তী স্থানে শূলীতে ঝুলিয়ে রাখেন। এরপর তাঁর বোন যায়নাব ঈসার অনুমতি নিয়ে তা জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেন। এই যুদ্ধে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এতে হাশিমী ও আলাবীরা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। এমনও দেখা গেছে যে, পিতা একপক্ষে লড়ছেন তো পুত্র লড়ছে অন্য পক্ষে। সম্ভবত বনূ উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা ও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে অনেক আলাবী দমে গিয়েছিল। যেমন আলী ইব্ন হুসাইন (যায়নুল আবিদীন) কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায় এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, জীবনে তিনি কখনো বনূ উমাইয়ার কোনরূপ বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেন নি বরং সব সময়ই তাদের অনুকূলে কথা বলতেন। অনুরূপভাবে আলাবীদের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বনূ আব্বাসের বিরোধিতাকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বিবেচনা করতেন। মুহাম্মদ মাহ্দীর পরাজয় ও বিফলতার জন্য তাঁর খান্দানের লোকেরাই দায়ী। কেননা তাদের অনেকেই তাঁর পক্ষাবলম্বন করেন নি এবং তাদের দেখাদেখি অন্যান্য গোত্রের অনেক লোকও তাঁর থেকে দূরে সরে থাকে। যখন মুহাম্মদ মাহ্দী মদীনায় জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত নেন এবং রাবাহ্ ইব্ন উছমানকে বন্দী করে নিজেদের খিলাফতের ঘোষণা দেন তখন তিনি ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরকেও, যিনি একজন প্রবীণ লোক ছিলেন, বায়আত করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি উত্তরে বলে পাঠান, তোমাকে তো হত্যা করা হবে; অতএব আমি কি করে তোমার হাতে বায়আত করতে পারি? ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহর এই উত্তর শুনে কোন কোন বায়আতকারীও নিজেদের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয়। তখন হামাদাহ্ বিনত মুআবিয়া ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহর কাছে এসে বলেন, আপনার ঐ কথায় অনেক লোক মুহাম্মদ মাহ্দী থেকে পৃথক হয়ে গেছে; কিন্তু আমার ভাই এখনো তাঁর সাথে রয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সেও আবার মারা পড়ে কিনা। মোটকথা, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের লোকেরা পৃথক হয়ে যাওয়ার দরুন ইমাম মাহ্দী তেমন শক্তি অর্জন করতে

পারেননি। অন্যথায় ইসলামী খিলাফত পুনরায় হাসান (রা)-এর বংশে চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। যদি মুহাম্মদ মাহ্‌দী ঐ সময়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতেন কিংবা বিদ্রোহ ঘোষণার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করতেন এবং আপন ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহ ঘোষণার অপেক্ষায় থেকে দুই ভাই একই সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন তাহলে তাঁর সাফল্য ছিল অনিবার্য। এটা মানসূর এবং আব্বাসী বংশের সৌভাগ্য যে, আব্বাসী বাহিনীকে মুহাম্মদ এবং ইবরাহীমের মুকাবিলা একের পর এক করতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের সামরিক শক্তিকে একই সময়ে দু'ভাগে বিভক্ত করতে হয়নি।

ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ

মানসূর যখন বাগদাদের নির্মাণ কাজ দেখতে আসেন তখন মুহাম্মদ মাহ্‌দীর ভাই ছদ্মবেশে তার সাথেই ছিলেন। পরে তিনি একইভাবে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে সেখান থেকে কূফায় চলে আসেন। এরপর মানসূর তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য প্রত্যেকটি শহরেই শত শত গুপ্তচর ছড়িয়ে দেন। মানসূর যখন জানতে পারেন যে, ইবরাহীম বসরায় অবস্থান করছেন তখন তিনি বসরার প্রত্যেকটি ঘরের জন্য এক একজন গুপ্তচর নিয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তখন কূফায় সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হিব্বানের ঘরে অবস্থান করছিলেন। একথাও সবার জানা ছিল যে, সুফ্‌য়ান হচ্ছেন ইবরাহীমের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গুপ্তচরদের ঘোরাঘুরি লক্ষ্য করে সুফ্‌য়ান ইবরাহীমের পরিণাম সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি চমৎকার একটি ফন্দি আঁটেন। তিনি সোজা মানসূরের দরবারে গিয়ে হাযির হন এবং বলেন ঃ আপনি আমার ও আমার ভৃত্যদের জন্য তহশীলদারের চাকরি প্রদান করুন এবং আমার সাথে একদল সৈন্য দিন। ইবরাহীম যেখানে থাকুন না কেন, আমি তাঁকে গ্রেফতার করে আপনার দরবারে এনে হাযির করব। মানসূর সঙ্গে সঙ্গে তহশীলদারের নিয়োগপত্র লিখে দেন এবং একটি ক্ষুদ্র বাহিনীও সুফ্‌য়ানের সাথে প্রেরণ করেন। সুফ্‌য়ান নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ঘরের ভিতরে গিয়ে ইবরাহীমকে নিজের ভৃত্যদের পোশাক পরান। এরপর নিজের কয়েকজন ভৃত্যসহ তাঁকে সাথে নিয়ে কূফা থেকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। মজার ব্যাপার এই যে, তখন তার সাথে ইবরাহীম প্রদত্ত ঐ বাহিনীও ছিল। যা হোক বসরায় পৌঁছে তিনি প্রত্যেক বাড়িতে দু-চারজন করে সৈন্য মোতায়েন করেন। এভাবে বাহিনীর সব লোক যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং শুধু সুফ্‌য়ান ও ইবরাহীম একসাথে রয়ে গেলেন তখন সুফ্‌য়ান তাঁকে আহ্‌ওয়াযের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজেও আত্মগোপন করে থাকেন। ঐ সময়ে বসরার আমীর ছিলেন সুফয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া। তিনি যখন এই পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন তখন সৈন্যদেরকে, যারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল, একত্র করেন এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হিব্বানকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কারোরই পাত্তা পাননি। আহ্‌ওয়াযের আমীর ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন। ইবরাহীম আহ্‌ওয়াযে পৌঁছে হুসাইন ইব্‌ন হাবীবের ঘরে আশ্রয় নেন। আহওয়াযের গভর্নর গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ইবরাহীম বর্তমানে আহ্‌ওয়াযে আছেন। অতএব তিনিও ইবরাহীমকে অনুসন্ধান করতে

থাকেন। ইবরাহীম দীর্ঘদিন পর্যন্ত হুসাইনের ঘরে লুকিয়ে থাকেন এবং এই সময়ে অনেক লোককে আপন দাওয়াতের সাথেও শরীক করে নেন। ১৪৫ হিজরীতে (৭৬২-৬৩ খ্রি.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যিয়াদ ইব্ন হাইয়ান নাবাতী ইবরাহীমকে বসরায় ডেকে নিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জনসাধারণকে মুহাম্মদ মাহ্দীর বায়আতের দিকে আহ্বান জানাতে শুরু করেন। তখন জ্ঞানীগুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও একটি বিরাট দল ইবরাহীমের হাতে বায়আত করে। বায়আতকারীদের রেজিস্টারে চার হাজার বসরাবাসীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ সময় মুহাম্মদ মাহ্দী মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইবরাহীমকে লিখেন, তুমি বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা কর। মানসূর সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে কয়েকজন অধিনায়ককে বসরায় পাঠিয়ে দেন, যাতে সেখানে বিদ্রোহের কোন আশংকা দেখা দিলে তারা সুফইয়ান ইব্ন মুআবিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। যদি মুহাম্মদ মাহ্দীর পরামর্শ অনুযায়ী ইবরাহীম সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই মানসূরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত এবং ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেতেন। কিন্তু ইবরাহীম তখন বসরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যাপারে তিনি ইতস্তত করতে থাকেন। মানসূর ইমাম মাহ্দীর মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ করার পর অর্থাৎ ১৩৫ হিজরীর ১লা রমযান (৭৫৩ খ্রি. মার্চ) ইবরাহীম বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সুফইয়ান ইব্ন মুআবিয়া এবং তার সাহায্যে আগত অধিনায়কদেরকে বন্দী করেন। সুলায়মান ইব্ন আলীর পুত্র তথা মানসূরের চাচাত ভাই জা'ফর ও মুহাম্মদ ছয়শ সৈন্য নিয়ে বসরার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ওদেরকেও মানসূরই পাঠিয়েছিলেন। এই দুই ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহের সংবাদ শুনতেই তাঁর উপর হামলা করে বসেন। ইবরাহীম এই ছয়শ লোকের মুকাবিলায় মাত্র পঞ্চাশ জন লোক পাঠান এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই পঞ্চাশজনই উল্লেখিত ছয়শ জনকে পরাজিত করে একেবারে উর্ধ্বমুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ইবরাহীম সমগ্র বসরা দখল করে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং সকলের নিরাপত্তার কথাও ঘোষণা করেন। এরপর বায়তুলমাল থেকে বিশ লক্ষ দিরহাম বের করে এনে আপন সঙ্গীদের মধ্যে মাথাপিছু পঞ্চাশ দিরহাম করে বন্টন করে দেন। এরপর মুগীরাকে একশ পদাতিক সৈন্যসহ আহ্ওয়াযের দিকে প্রেরণ করেন। আহ্ওয়াযের শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন চার হাজার সৈন্যসহ মুকাবিলায় বের হন। কিন্তু ঐ একশ পদাতিক সৈন্য এই চার হাজার সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। মুগীরা আহ্ওয়ায দখল করে নেন। ইবরাহীম, আমর ইব্ন শাদ্দাদকে পারস্যের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানকার গভর্নর ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এবং তার ভাই আবদুস সামাদ আমর ইব্ন শাদ্দাদের মুকাবিলা করেন এবং তাতে পরাজিত হন। অতএব আমর ইব্ন শাদ্দাদ পারস্য দখল করে নেন। ইবরাহীম হারূন ইব্ন শামস আজলীকে ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। হারূন মানসূরের গভর্নর হারূন ইব্ন হুমায়দকে পরাজিত করে ওয়াসিত দখল করে নেন। মোটকথা যেদিন মদীনায় মুহাম্মদ মাহ্দী এবং ঈসা ইব্ন মূসার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুহাম্মদ মাহ্দী শহীদ হন সেদিন পর্যন্ত বসরা, পারস্য, ওয়াসিত এবং ইরাকের এক বিরাট অংশ মানসূরের কবজা থেকে বের হয়ে গেছে। সিরিয়াও তাঁর কবজা থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কূফাবাসীরাও ইবরাহীমের অপেক্ষায় ছিল।

এমতাবস্থায় মানসূরের হুকুমত টিকে থাকার মত অবস্থায় ছিল না। ইবরাহীম ১লা রমযান বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শেষ রমযান পর্যন্ত তাঁর জয়জয়কার অবস্থা অব্যাহত থাকে। রমযান শেষ হতেই ইবরাহীমের কাছে খবর আসে যে, মুহাম্মদ মাহ্দী নিহত হয়েছেন। ইবরাহীম ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করে ঈদের মাঠে এই সংবাদ ঘোষণা করেন। সংবাদটি ঐ সমস্ত ব্যক্তির কাছে গিয়েও পৌঁছে, যারা বিভিন্ন অঞ্চলে মানসূরের শাসনকর্তাদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে মানসূরের অধিনায়ক ও শাসনকর্তাদের মধ্যে এক নতুন ভীতির সঞ্চার হয়। বসরাবাসী এই সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদ মাহ্দীর স্থলে ইবরাহীমকে, যিনি তাঁদেরই সাথে ছিলেন, খলীফা বলে স্বীকার করে নেয় এবং পূর্বের চাইতে অধিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর পক্ষে কাজ করতে থাকে। বসরায় ইবরাহীমের সাথে অনেক কূফাবাসী ছিল। বসরাবাসীদের এই অভিমত ছিল যে, বসরাকেই রাজধানী ঘোষণা করে এখান থেকে বিভিন্ন দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কূফীরা এতে দ্বিমত পোষণ করে। তাদের অভিমত ছিল, সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে খোদ ইবরাহীমের কূফা আক্রমণ করা উচিত। কেননা কূফাবাসীরা তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে। ইবরাহীম কূফীদের সাথে একমত হন এবং আপন পুত্র হাসানকে বসরায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে কূফার দিকে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেন। কূফায় মানসূরের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈসা ইব্ন মূসাকে একজন দ্রুতগামী দূত মারফত বলে পাঠান ঃ তুমি যত শীঘ্র সম্ভব কূফায় চলে আস। সেই সাথে তিনি খুরাসানে মাহ্দীর কাছে লিখে পাঠান ঃ তুমি অবিলম্বে পারস্য আক্রমণ কর। অনুরূপভাবে যে সমস্ত কর্মকর্তা কোন দিক দিয়েই কোনরূপ আশংকার মধ্যে ছিলেন না তাদেরকেও সেনাবাহিনীসহ কূফায় আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত কর্মকর্তার ধারে কাছে ইবরাহীমের কোন অধিনায়ক ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তারা সাহসিকতার সাথে তাঁর মুকাবিলা করেন। যা হোক সব দিক থেকেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সৈন্যরা মানসূরের নিকট আসতে থাকে এবং দেখতে দেখতে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য কূফায় এসে সমবেত হয়। ইবরাহীমের হামলার খবর শুনে মানসূর পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত নিজের পরিধেয় বস্ত্র বদল করেন নি। তখন বেশির ভাগ সময়ই তিনি জায়নামাযে বসে থাকতেন। এদিকে ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন এবং কূফা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে একটি জায়গায় এসে তাঁবু খাটান। অপর দিকে ঈসা ইব্ন মূসা আপন সঙ্গীদের নিয়ে কূফায় এসে উপনীত হন। মানসূর তাকে ইবরাহীমের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন এবং হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবাকে 'মুকাদ্দিমাতুল জায়শ' (অগ্রবর্তী বাহিনী)-এর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ইবরাহীমকে পরামর্শ দেওয়া হয়, যেন তিনি তাঁর ছাউনির আশেপাশে পরিখা খনন করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা বলে, আমরা বিজিত নই, বরং বিজয়ী। অতএব পরিখা খননের কোন প্রয়োজন নেই। তারা ইবরাহীমকে পরামর্শ দেয়, শত্রুর মুকাবিলায় খণ্ড খণ্ড বাহিনী পাঠানো উচিত, যাতে একটি বাহিনী পরাজিত হলে অপর একটি সজীব বাহিনীকে তাদের সাহায্যার্থে পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু ইবরাহীম তাদের এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন এবং ইসলামী রীতি অনুযায়ী সকলকে সারিবদ্ধ হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। যুদ্ধ শুরু হয়। হামীদ ইব্ন কাহতাবা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঈসা শপথ করে তাকে ফিরিয়ে

রাখতে চান, কিন্তু তিনি বিরত হন নি। ঈসাও তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। তবে তার বেশিরভাগ লোক টিকতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। ঈসা তখন পর্যন্ত শত্রুর মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন, যদিও তার পরাজয়ের আলামত ফুটে উঠেছিল— ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান ইব্‌ন আলীর দুই পুত্র জা'ফর ও মুহাম্মদ একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছে এবং ইবরাহীমের বাহিনীর ঠিক পিছন দিক দিয়ে হামলা চালায়। ইবরাহীমের বাহিনী এই আকস্মিক হামলায় ঘাবড়ে গিয়ে ঐ পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। এবার ঈসা তার বাহিনীকে সামলে নিয়ে শত্রুর উপর জোর হামলা চালান। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার বাহিনীর যে সমস্ত লোক ইতিমধ্যে পালিয়ে যাচ্ছিল তারাও ফিরে আসে। হুমায়দ ইব্‌ন কাহ্‌তাবাও তার সঙ্গীদের নিয়ে নব উদ্যমে হামলা চালান। ফলে ইবরাহীমের বাহিনী চতুর্দিক থেকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাঁর অনেক সৈন্য ভালোভাবে শত্রুর মুকাবিলা করার সুযোগও পায়নি। শেষ পর্যন্ত তারা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় শত্রু বেষ্টনী থেকে বের হয়ে পালাতে শুরু করে। ফলে ইবরাহীমের সাথে শুধু চারশ সৈন্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাদেরকে ঈসা, হুমায়দ, মুহাম্মদ, জা'ফর এই চারজন অধিনায়ক চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমের গলায় একটি তীর বিদ্ধ হয়, যার আঘাত ছিল খুবই গুরুতর। সঙ্গীরা তাঁকে ঘোড়া থেকে নামায় এবং সারিবদ্ধভাবে তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ায়। এই অবস্থায়ই তারা শত্রুরও মুকাবিলা করতে থাকে। হুমায়দ ইব্‌ন কাহ্‌তাবা তার বাহিনীকে জোর হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। ইবরাহীমের সঙ্গীরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। এরপর হুমায়দ ইবরাহীমের দেহ থেকে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে ঈসাকে উপহার দেন। ঈসা সঙ্গে সঙ্গে তা মানসূরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এটা ১৪৫ হিজরীর ২৫শে যিলকাদার (৭৬৩ খ্রি. এর ফেব্রুয়ারী) ঘটনা। এরপর ঈসা হাসান ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহকে বসরা থেকে বন্দী করেন। সেই সাথে ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদকেও বন্দী করা হয়।

বিভিন্ন ঘটনা

মুহাম্মদ মাহ্‌দী এবং তাঁর ভাইকে হত্যা করার পর মানসূর সালিম ইব্‌ন কুতায়বা বাহিলীকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। আর মাওসিলের গভর্নর নিয়োগ করেন আপন পুত্র জা'ফরকে। তবে হারস ইব্‌ন আবদুল্লাহর হাতে মাওসিলের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

মদীনায় ইমাম মালিক (র) মুহাম্মদ মাহদীর হাতে বায়আত করার জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাই তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। ইরাকে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহর পক্ষে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাই মানসূর তাঁকে গ্রেফতার করে নির্মীয়মাণ বাগদাদ শহরে নিয়ে যান এবং সেখানে বন্দী করে রাখেন। বন্দী অবস্থায় শাস্তি স্বরূপ তাঁকে দিয়ে নির্মীয়মাণ দালানসমূহের ইট গণনার কাজ করানো হতো। একটি বর্ণনায় আছে, মানসূর ইমাম আবূ হানীফাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হলে তাঁর উপর ইট গণনার কাজ ন্যস্ত করা হয়। ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি) এই বন্দী অবস্থায়ই ইমাম আবূ হীফা (র) ইন্তিকাল করেন। এদের

ছাড়াও ইব্‌ন আজলান, আবদুল হামীদ ইব্‌ন জা'ফর প্রমুখ উলামা মুহাম্মদ মাহ্‌দী ও তাঁর ভাই ইবরাহীমের বায়আতের পক্ষে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাই তাঁদেরকেও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়।

১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩-৬৪ খ্রি.) খাযার এলাকায় তুর্কীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা 'বাবুল আবওয়াব' থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় মুসলমানদের উপর হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালায়। ঐ বছর মুসলমানরা সাইপ্রাস দ্বীপের উপর নৌ-হামলা চালায়। সীসতান এলাকায় খারিজীরা গণ্ডগোল আরম্ভ করলে মানসূর মাআন ইব্‌ন যায়েদাকে ইয়ামানের গভর্নর পদ থেকে বদলী করে সীসতানের গভর্নর নিয়োগ করেন। মাআন সেখানে পৌঁছে সব রকম বিদ্রোহ ও গণ্ডগোল দমন করেন। তিনি হিজরী ১৫১ সন (৭৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত খারিজীরা ধোঁকা দিয়ে তাকে হত্যা করে।

আবদুল্লাহ্ আশতার ইব্‌ন মুহাম্মদ মাহ্‌দী

মুহাম্মদ মাহ্‌দীর বিদ্রোহকালে মানসূরের পক্ষ থেকে সিন্ধুর গভর্নর ছিলেন উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন কাবীসাহ্ ইব্‌ন আবূ সুফরাহ্ ওরফে 'হাযার মর্দ'। মুহাম্মদ মাহ্‌দী বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ ওরফে আশতারকে তাঁর চাচা ইবরাহীমের কাছে বসরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে আবদুল্লাহ্ আশতার একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী নিয়ে সিন্ধুর উদ্দেশে রওয়ানা হন। কেননা সিন্ধুর হাকিম উমর ইব্‌ন হাফসের কাছ থেকে তার সাহায্য-সহানুভূতি পাবার আশা ছিল। আবদুল্লাহ্ আশতার সিন্ধুতে পৌঁছে উমর ইব্‌ন হাফ্‌সকে দাওয়াত দিলে তিনি মুহাম্মদ মাহ্‌দীর খিলাফত স্বীকার করে নেন। আব্বাসীদের পোশাক ও ইউনিফর্ম ছিঁড়ে ফেলেন এবং খুতবায় আব্বাসী খলীফার জায়গায় মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নাম উল্লেখ করতে থাকেন। ঐ সময় উমর ইব্‌ন হাফ্‌সের কাছে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে। তিনি আবদুল্লাহ্ আশতারকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেন এবং তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আবদুল্লাহ্ আশতার তখন বলেন, 'আমার তো প্রাণের আশংকা দেখা দিয়েছে। এখন আমি কোথায় যাব বা কি করব ? তখন সিন্ধুর অবস্থা এরূপ ছিল যে, খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর যুগে সেখানকার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তখন থেকে তারা নিজেরাই নিজেদের রাজ্য শাসন করে আসছিল। তবে তারা বর্তমান খলীফার আধিপত্য স্বীকার করত এবং যাবতীয় ইসলামী নিয়ম-কানুনও মেনে চলত। উমর ইব্‌ন হাফ্‌স আবদুল্লাহ্ আশতারকে পরামর্শ দেন ঃ তুমি সিন্ধুর অমুক রাজার রাজ্যে চলে যাও। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রেও তাঁর খুব সুনাম আছে। আমার বিশ্বাস, তিনি তোমার সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করবেন। আবদুল্লাহ্ আশতার তাতে সম্মত হন। এরপর উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ঐ রাজার সাথে পত্রালাপ করে তার কাছ থেকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আশতার সম্পর্কিত একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে আনেন। এরপর আবদুল্লাহকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। সিন্ধুর ঐ রাজা আবদুল্লাহ্ আশতারের কাছে আপন মেয়ের বিবাহ দেন এবং হিজরী ১৫১ সন (৭৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত

আবদুল্লাহ্ আশতার সেখানেই অবস্থান করেন। ঐ সময়ে প্রায় চারশ আরব, দেশের বিভিন্ন এলাকা ও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবদুল্লাহ্ আশতারকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। ঘটনাচক্রে মানসূর জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ্ আশতার সিন্ধুর জনৈক রাজার কাছে অবস্থান করছেন এবং কিছু আরব তাঁর সাথে রয়েছে। ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) তিনি উমর ইব্ন হাফ্সকে সিন্ধুর গভর্নর পদ থেকে মিসরের গভর্নর পদে বদলী করেন এবং হিশাম ইব্ন আমর তাগলিবীকে সিন্ধুর গভর্নর পদে নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। হিশাম সিন্ধু অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় মানসূর তাকে কড়া নির্দেশ দেন, তুমি সেখানে পৌঁছে যেভাবে পারো আবদুল্লাহ্ আশতারকে গ্রেফতার করবে। যদি সিন্ধুর রাজা তাঁকে তোমার হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাকে আক্রমণ করবে। হিশাম অনেক বুঝানো সত্ত্বেও সিন্ধুর রাজা আবদুল্লাহ্ আশতারকে তার হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চলতে থাকে। আবদুল্লাহ্ আশতার রাজ্যের যে অংশে অবস্থান করছিলেন হিশাম ইব্ন আমরের ভাই সাফীহ্ সে দিকেই সৈন্য সমাবেশ ঘটান। একদিন আবদুল্লাহ্ আশতার শুধু দশজন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে সিন্ধু নদের তীর ধরে ভ্রমণ করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে সাফীহর বাহিনীর সাথে সেখানে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তখন সাফীহ্ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করতে চাইলে আবদুল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা সাফীহের বাহিনীর মুকাবিলা করে এবং এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর আবদুল্লাহ্ আশতার ও তাঁর সকল সঙ্গী নিহত হন। হিশাম মানসূরের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। মানসূর উত্তরে লিখলেন, ঐ রাজার রাজ্যকে একেবারে শেষ করে দাও। অতএব যুদ্ধ শুরু হয় এবং হিশাম সমগ্র রাজ্যটি দখল করে নেন। আবদুল্লাহ্ আশতারের স্ত্রী আপন পুত্রসহ বন্দী হয়ে মানসূরের কাছে প্রেরিত হন। তিনি আবদুল্লাহ্ আশতারের স্ত্রী ও পুত্রকে মদীনায় তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকের কাছে পাঠিয়ে দেন।

মাহ্দী ইব্ন মানসূরের অলীআহদী (যৌবরাজ্য)

আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ মৃত্যুকালে মানসূরকে তাঁর প্রথম অলীআহদ নিয়োগ করেছিলেন। আর মানসূরের পরবর্তী অলীআহদ নিয়োগ করেছিলেন ঈসা ইব্ন মূসাকে। ঐ ওসীয়ত অনুযায়ী মানসূরের পর ঈসার খলীফা হওয়ার কথা। মানসূর যখন মুহাম্মদ মাহ্দী ও ইবরাহীমের হুমকি থেকে স্বস্তি লাভ করেন এবং ঈসার সাহায্যের তাঁর খুব একটা প্রয়োজনও বাকি থাকেনি তখন তিনি তাঁর পরিবর্তে আপন পুত্র মাহ্দীকে অলীআহদ নিয়োগ করার সংকল্প নেন। প্রথমে তিনি ঈসার সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু ঈসা তাতে সম্মত হননি। এবার মানসূর, খালিদ বারমাক এবং অন্যান্য অনারব সর্দার ও সভাসদদেরকে নিজের দলে ভিড়িয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৪৭ হিজরীতে (৭৬৪ খ্রি.) ঈসা ইব্ন মূসাকে (যিনি সাফ্ফাহ্র যুগ থেকে কূফার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন) পদচ্যুত করে তার স্থলে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানকে তথাকার গভর্নর নিয়োগ করেন। কূফার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর ঈসার সমগ্র ক্ষমতা শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং মানসূরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অশুভ পরিণতি তার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মোটকথা, ঈসাকে অসহায় ও

নিরুপায় করে মানসূর ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে মাহ্দীর জন্য অলীআহ্দীর বায়আত গ্রহণ করেন এবং ঈসাকে স্রেফ বাহ্যিক সান্ত্বনা দানের জন্য মাহ্দীর পরবর্তী অলীআহ্দ হিসাবে তার নাম ঘোষণা করেন। খালিদ ইব্ন বারমাক একথা প্রচার করে দেন যে, ঈসা আমার সামনে তার অলীআহ্দী পরিত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই আমীরুল মু'মিনীন আপন পুত্র মাহ্দীকে অলীআহ্দ নিয়োগ করেছেন। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানসূর প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন বিতরণ করা হয়। মানসূরের হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে ঈসা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনিই মুহাম্মদ, মাহ্দী এবং ইবরাহীমকে পরাজিত করেন এবং তাঁদেরকে হত্যা করে মানসূরকে এক মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই অমূল্য অবদানের যে পুরস্কার (!) তিনি পান, তা উপরে উল্লিখিত হলো। গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর ঈসা কূফার অন্তর্গত রাহবা নামক পল্লীতে নীরব ও নিভৃত জীবন যাপন করতে থাকেন।

ধীরে ধীরে মানসূরের পথ থেকে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। শুধু স্পেন ছাড়া সমগ্র ইসলামী দেশের উপর হিজরী ১৪৮ সনের (৭৬৫ খ্রি.) মধ্যেই তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৯ হিজরীতে (৭৬৬ খ্রি) বাগদাদ নগরীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লিখিত ঘটনাসমূহের কারণে মুসলমানরা এতদিন রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ পায়নি। ১৪৯ হিজরীতে আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ, হাসান ইব্ন কাহতাবা ও মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ রোমানদের উপর হামলা পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যান।

উস্তাদাসীদের বিদ্রোহ ঘোষণা

১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি.) উস্তাদাসীস নামীয় জনৈক ব্যক্তি খুরাসানে নবুয়তের দাবি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হাজার হাজার লোক তাকে নবী বলে স্বীকার করে। হিরাত, বাদগীস, সীস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকও তার পতাকাতলে সমবেত হয় এবং খুরাসানের বেশির ভাগ অংশ সে দখল করে নেয়। এই সংবাদ শুনে মানসূর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রথমে মার্বরূদের হাকিম জাসাম তার সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে উস্তাদাসীসের উপর হামলা চালান, কিন্তু নিজেই পরাজিত ও নিহত হন। এরপর খাযিম ইব্ন খুযায়মা সামরিক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে উস্তাদাসীসের বাহিনীর উপর একই সাথে দু'দিক থেকে হামলা চালান। এতে উস্তাদাসীসের সত্তর হাজার সঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়। বাকি চৌদ্দ হাজার সঙ্গী উস্তাদাসীসসহ একটি পাহাড়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এই অবরোধ চলার পর উস্তাদাসীস তার সকল সঙ্গীকে নিয়ে খাযিমের কাছে আত্মসমর্পণ করে। খাযিম এ সম্পর্কে মানসূরকে অবহিত করেন।

রুসাফা নির্মাণ

উস্তাদাসীসের বিদ্রোহকালে মাহ্দী ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। তিনি মার্ভে থাকতেন। খাযিম ইব্ন খুযায়মা তাঁর কাছেই ছিলেন এবং মানসূরের নির্দেশ অনুযায়ী তিনিই উস্তাদাসীসের

উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর মাহ্দী মানসূরের খিদমতে হাযির হন। তখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ লোক আরব-গোত্রেরই ছিল এবং তাদেরই বীরত্ব ও সমর নৈপুণ্যের কারণে সবক'টি বিজয়ই অর্জিত হয়েছিল। অনারব এবং খুরাসানীরা নিজেদেরকে আরবদের সমতুল্য মনে করত না। তাই আরবগোত্রগুলো সম্পর্কে আব্বাসীদের সব সময়ই এই আশংকা থাকত যে, যদি তারা বিরোধিতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের (আব্বাসীদের) হুকুমতকে ওলট-পালট করে দেবে। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই ইমাম ইবরাহীম অনারবদেরকে শক্তিশালী করা এবং তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আদায় করার পলিসি বেশ আগেভাগেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরিরাও এই কর্মধারা বহাল রাখে। তাই দেখা যায়, আবদুল্লাহ্ সাফ্ফাহ্ আবূ সালামাকে হত্যা করে বল্খের 'নওবাহার' অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি পূজারীর সন্তান এবং আবূ মুসলিমের সামরিক অধিনায়ক নওমুসলিম খালিদ বারমাককে নিজের মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর খালিদ বারমাককে কোন একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তার স্থলে আবূ আইয়ূব মন্ত্রী হন। মানসূর পুনরায় খালিদ বারমাককে মন্ত্রীত্ব দান করেন। তখন সামরিক অধিনায়ক এবং প্রাদেশিক গভর্নর পদেও অগ্নিপূজারী বংশোদ্ভূত অনেক লোককে নিয়োগ করা হয়। ফলে ধীরে ধীরে ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আরব বংশোদ্ভূত লোকদেরই প্রাধান্য ছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বাদশাহ আকবর কর্তৃক গৃহীত হিন্দুস্থানের একটি রাষ্ট্রীয় নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনিও হিন্দুস্থানের শক্তিশালী পাঠানজাতির পাঞ্জা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এবং তাদের দিক থেকে হস্তক্ষেপের যে আশংকা ছিল তা স্থায়িভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে জরুরী ভিত্তিতে মৃতপ্রায় হিন্দু জাতিকে পুনরায় জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলার পরিকল্পনা নেন। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানসিংহকে হিন্দুস্থানের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং পাঠানদেরকে সর্বক্ষেত্রে দুর্বল ও নির্জীব করে রাখার প্রচেষ্টা চালান। আব্বাসীরাও আরবদের শক্তি খর্ব করে তাদের জায়গায় মাজূসী ও ইরানী বংশোদ্ভূত লোকদের শক্তিশালী করে তোলার পরিকল্পনা নেন, যাতে আরব বংশোদ্ভূত কোন গোত্র বা গোত্রসমূহের সাহায্য নিয়ে কোন আলাবী বিদ্রোহ সংঘটিত করতে না পারে। মাহ্দী খুরাসান থেকে ফিরে এসে যখন মানসূরের খিদমতে হাযির হন, ঠিক সেই মুহূর্তে সৈন্যরা মানসূরের কাছে উপহার চাইতে গিয়ে যে বাড়াবাড়িমূলক আচরণ করে তাতে তাদের স্বাধীনতা ও বেপরোয়া মনোবৃত্তি যেভাবে প্রকাশ পায়, তা কোন রাষ্ট্রপ্রধান কখনো সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। ঐ সৈন্যদের সকলেই ছিল আরব-বংশোদ্ভূত। তারা অগ্নি উপাসকদের মত বাদশাহ বা খলীফাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের এই মানসিকতা বা চরিত্র বৈশিষ্ট্য আব্বাসীদের সব সময় শংকিত করে রাখত।

যাহোক আরব সৈন্যদের এই অবস্থা লক্ষ্য করে কাসাম ইব্ন আব্বাস ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আরবের প্রধান দুই গোত্র রাবীআ ও মুদারের মধ্যে পরস্পর শত্রুতার সৃষ্টি করেন এবং মানসূরকে পরামর্শ দেন; যেহেতু মুদার ও রাবীআর মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে তাই এখন সমগ্র সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা মুদার গোত্রের সৈন্যদেরকে মাহ্দীর অধীনে রাখাই সমীচীন। কেননা খুরাসানবাসীরা মুদার গোত্রের প্রতি

সহানুভূতিশীল। আর রাবীআ গোত্রের সৈন্যদেরকে আপনার অধীনে রাখুন। কেননা সমগ্র ইয়ামানীরা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এভাবে দেশের দু'টি প্রান্তে সামরিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর তখন যেহেতু তারা একে অন্যকে ভয় করবে, তাই দেশে কোন প্রকার বিদ্রোহ সফল হতে পারবে না। মানসূর এই অভিমতকে যথার্থ বিবেচনা করে আপনপুত্র মাহ্দীর অবস্থানের জন্য ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) বাগদাদের পূর্ব দিকে রাসাফা শহর নির্মাণের নির্দেশ দেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) মুহাম্মদ আশআছ রোম (এশিয়া মাইনর) থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন।

১৫৩ হিজরীতে (৭৭০ খ্রি.) মানসূর একটি অভিনব নির্দেশ জারি করেন। তা হলো, এখন থেকে আমার সব প্রজা বাঁশ ও পাতার তৈরি লম্বা টুপি পরিধান করবে। এই টুপি তখনকার যুগে একমাত্র হাবশীরাই পরিধান করত। ১৫৪ হিজরীতে (৭৭১ খ্রি.) যুফার ইব্ন আসিম বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। মুসলমানদের নিত্যদিনের আক্রমণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৫৫ হিজরী সনে (৭৭২ খ্রি.) 'কায়সারে রুম' মানসূরের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেন এবং তাঁকে জিয্য়া প্রদানে সম্মত হন।

মানসূরের মৃত্যু

১৫৮ হিজরীতে (৭৭৫ খ্রি.) মানসূর মক্কার শাসনকর্তাকে লিখেন ঃ তুমি সুফ্য়ান ছাওরী আব্বাদ ইব্ন কাসীরকে বন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। জনসাধারণ আশংকা করেছিল, মানসূর হয়ত এ দু'জনকে হত্যা করবেন। হজ্জের দিন ঘনিয়ে আসছিল। এ বছর খোদ মানসূরও হজ্জ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে মক্কাবাসীরা আরো বিচলিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, মানসূর এখানে এসে না জানি আর কত লোককে বন্দী অথবা হত্যা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের অন্তরের এই আহাজারী আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবূল হয়ে যায়। তাই মানসূর মক্কা পর্যন্ত পৌছার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মানসূর ১৫৮ হিজরীর যিলকদ মাসে (৭৭৪ খ্রি. সেপ্টেম্বর) হজ্জের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। বাগদাদ থেকে বিদায় গ্রহণকালে তিনি আপনপুত্র মাহ্দীকে সেখানে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাঁকে ওসীয়ত করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যে ছোট সিন্দুকের মধ্যে আমার নোটবুকগুলো রয়েছে সেই সিন্দুকের খুব যত্ন নেবে এবং প্রয়োজনকালে নিজের সমস্যাদি সমাধানের উপায় ঐ নোটগুলোতেই তালাশ করবে। বাগদাদ নগরীর খুব হিফাযত করবে এবং আমার পরে কখনো রাজধানী অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তরিত করবে না। আমি ইতিমধ্যে যে অর্থ ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছি, দশ বছর পর্যন্ত যদি খারাজ হিসাবে একটি পয়সাও কোষাগারে না আসে তবু সৈন্যদের বেতন-ভাতা এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি তোমার গোত্রের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে এবং তাদেরকে বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত করবে। তুমি অবশ্যই খুরাসানীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। কেননা এক কথায় এরা হচ্ছে তোমার বাহুশক্তি। এরা তোমার বংশের হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জানমাল সবকিছু লুটিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, খুরাসানীদের অন্তর থেকে তোমাদের ভালোবাসা কখনো মুছে

যাবে না। তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করবে এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবে। সাবধান! বনূ সালামার কোন লোকের কাছে কখনো কোন সাহায্য চাইবে না। রাষ্ট্রীয় কাজে মহিলাদেরকে কখনো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেবে না। উম্মতে রাসূলের হিফাযত করবে। অযথা রক্তপাত করবে না। আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলবে, বিধর্মীদের উপর আক্রমণ চালাবে, বিদআতসমূহ নির্মূল করবে, মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করবে না এবং গনীমতের মাল সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। কেননা আমি তোমার জন্য কোষাগারে যথেষ্ট ধন-সম্পদ রেখে যাচ্ছি। সীমান্তের পরিপূর্ণ হিফাযত করবে, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে, জনসাধারণের ধন-সম্পদের হিফাযত করবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতকে উপেক্ষা করবে না, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী যে পরিমাণ সম্ভব তৈরি রাখবে, আজকের কাজ আগামীকালের জন্য তুলে রাখবে না, যখন বিভিন্নমুখী বিপদ আসে তখন স্থির ও অবিচল থাকবে। আলস্য পরিহার করবে। মানুষ যাতে সহজে তোমার সাথে দেখা করতে পারে সে রকম পরিবেশ বজায় রাখবে এবং প্রহরীদের প্রতি সতর্ক থাকবে, যেন তারা জনসাধারণের সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার না করে।"

মানসূর বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে কূফায় আসেন, হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর জন্তুসমূহ পূর্বাহ্নেই মক্কায় পাঠিয়ে দেন। কূফা থেকে দুই মানযিল অতিক্রম না করতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থাবস্থায় তিনি তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস রাবী' (যে তার দ্বাররক্ষী ও দেহরক্ষী ছিল)-কে বেশির ভাগ সময় নিজের কাছে রাখতেন। ১৫৮ হিজরীর ৬ই যিলহজ্জ (৭৭৫ খ্রি. অক্টোবর) যখন তিনি মক্কা থেকে তিন-চার মাইল দূরবর্তী 'বাতন' নামক স্থানে পৌঁছেন ঠিক তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর মুহূর্তে বিশেষ খাদিমবৃন্দ এবং রাবী' ছাড়া অন্য কেউ তাঁর পাশে ছিল না। 'রাবী' ঐ দিন মানসূরের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন। পরদিন ঈসা ইব্ন আলী, ঈসা ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ (দ্বিতীয় অলীআহদ), আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান, ইবরাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কাসিম ইব্ন মানসূর, হাসান ইব্ন যায়দ আলাবী, মূসা ইব্ন মাহ্দী ইব্ন মানসূর, আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন হাসান প্রমুখকে, যারা ঐ সফরে মানসূরের সাথে ছিলেন, দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। রাবী' তখন খলীফার মৃত্যু সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং মানসূরের লেখা একটি লিপিও তাদেরকে পড়ে শুনান। তাতে মানসূর লিখেছিলেন ঃ

"দয়ালু, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে। এই লিপিটি আবদুল্লাহ্ মানসূরের পক্ষ থেকে বনূ হাশিমের উত্তরসূরি খুরাসানবাসী এবং সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশে লিখিত। পর সমাচার এই যে, আমি এই লিপিটি আমার জীবনের তথা দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে লিখছি। আমি তোমাদের জন্য আমার সালাম পেশ করছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করছি, তিনি যেন তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে না ফেলেন, আমার পরে তোমাদেরকে যেন বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত না করেন এবং তোমাদেরকে যেন গৃহযুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন না করান। তোমরা আমার পুত্র মাহ্দীর আনুগত্যের যে স্বীকৃতি দিয়েছ তার উপর অটল থাকবে এবং কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

রাবী' এই কাগজ পড়ে শুনিয়ে মূসা ইব্‌ন মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূরের প্রতি ইংগিত করেন, যেন তিনি আপন পিতা মাহ্‌দীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক বায়আত গ্রহণ করেন। রাবী' সর্বপ্রথম হাসান ইব্‌ন যায়দের হাত ধরে বলেন, উঠুন, বায়আত করুন। হাসান ইব্‌ন যায়দ বায়আত করেন। এরপর একের পর এক সকলেই বায়আত করেন। কিন্তু ঈসা ইব্‌ন মূসা বায়আত করতে অস্বীকার করেন। একথা শুনে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন হাসান বলেন, যদি তুমি বায়আত না কর তাহলে এই তরবারির আঘাতে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঈসা ইব্‌ন মূসাও বায়আত করেন। এরপর বাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ এবং সাধারণ লোকেরাও বায়আত করে। এরপর আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান মক্কায় যান এবং রুকন ও মাকামের মধ্যবর্তীস্থানে জনসাধারণের কাছ থেকে মাহ্‌দীর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর ঈসা ইব্‌ন মূসা জানাযার নামায পড়ান। এরপর হাজূন ও বি'-রে মায়মূনের মধ্যবর্তী মাকবারা-ই মুআল্লাত'-এ মানসূরের লাশ দাফন করা হয়। এরপর রাবী মানসূরের মৃত্যু সংবাদ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাদর, লাঠি ও খতমে খিলাফত (খিলাফতের মোহর) মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করেন। ১৫৮ হিজরীর ১৫ই যিলহজ্জ (৭৭৫ খ্রি. অক্টোবর) এই সংবাদ মাহ্‌দীর কাছে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছে। বাগদাদবাসীরাও দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করে। মানসূর এক সপ্তাহ কম ২২ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। মৃত্যুকালে তিনি সাতপুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর পুত্রদের নাম হলো– মুহাম্মদ মাহ্‌দী, জা'ফর আকবর, জা'ফর আসগর, সুলায়মান, ঈসা, ইয়াকূব ও সালিম। তাঁর কন্যার নাম ছিল আলিয়া। ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

খলীফা মানসূরকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আপনার কি এমন কোন আকাঙ্ক্ষা আছে যা এখনো পূর্ণ হয়নি ? মানসূর উত্তর দেন, হ্যাঁ, শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তা হলো, আমি কিছুটা উঁচু একটি জায়গায় বসব, আর হাদীসবেত্তারা বসবে আমার চারপাশে। পরদিন যখন মন্ত্রীবর্গ বিভিন্ন কাগজপত্র, ফাইল নথি ও দোয়াত-কলম নিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হয় তখন গতকালকের ঐ প্রশ্নকারী সভাসদও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলে উঠল, তাহলে এবার আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। মানসূর উত্তরে বলেন, আমি যাঁদের আকাঙ্ক্ষা করি, এরা সেই লোক নন। আমার কাঙ্ক্ষিত লোকদের পোশাক হয় জীর্ণ পুরাতন, পা হয় খালি, চুল হয় উস্কখুস্ক এবং তাঁরা সর্বদা হাদীস চর্চায় ব্যাপৃত থাকেন।

মানসূর ইমাম মালিককে মুওয়াত্তা সংকলনে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "হে আবূ আবদুল্লাহ! তুমি জান যে, এখন তোমার ও আমার চাইতে শরীয়তের অধিক জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি আর বেঁচে নেই। আমি তো খিলাফত ও সালতানাতের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু তোমার অবসর আছে। অতএব তুমি মানুষের জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা কর যার দ্বারা তারা উপকৃত হয়। তাতে ইব্‌ন আব্বাসের (উদার) বৈধতা এবং ইব্‌ন উমরের কাঠিন্য ও (সীমাহীন) সতর্কতাকে স্থান দিও না। এভাবে তুমি মানুষের জন্য গ্রন্থনা ও সংকলনের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন কর।" ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর কসম! এগুলো শুধু কথার কথা ছিল না, বরং এর দ্বারা মানসূর আমার সামনে গ্রন্থনার একটি সুন্দর রেখাচিত্র তুলে ধরেছিলেন।

আবদুস সামাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ একদা মানসূরকে বলেন, আপনি শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে এমন কঠোর যে, আপনি মাফ করতে জানেন একথা কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না। মানসূর উত্তরে বলেন, আলে-মারওয়ান যে রক্তবন্যা বইয়েছে তা এখনো শুকায় নি। উপরন্তু আবূ তালিবের পরিবারের তরবারিসমূহ এখনো খাপমুক্ত রয়েছে। এই যুগ এমনি যে, এখন পর্যন্ত খলীফাদের ভাবমূর্তি জনসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবেও না, যতক্ষণ তারা ক্ষমার অর্থ ভুলে না যায় এবং শাস্তি ভোগের জন্য সব সময় তৈরি থাকে। যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হারিসী মানসূরের কাছে আবেদন করেন, আমার জায়গীর ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করুন। তিনি তার এ আবেদনপত্রে সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষার যত মারপ্যাঁচ থাকতে পারে তার সবটাই প্রয়োগ করেন। মানসূর উত্তরে লিখেন, যখন কোন ব্যক্তি সুখে থাকে এবং ভাষার মারপ্যাঁচও আত্মস্থ করে ফেলে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তোমার সম্পর্কে আমার মনে এই আশংকাই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তোমার উচিত ভাষার মারপ্যাঁচ ত্যাগ করা। আবদুর রহমান যিয়াদ আফ্রিকী ছাত্রাবস্থায় মানসূরের বন্ধু ছিলেন। মানসূরের খিলাফত আমলে তিনি একবার তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। মানসূর তাকে জিজ্ঞেস করেন, বনূ উমাইয়াদের মুকাবিলায় আমার খিলাফত তোমার কাছে কেমন লাগছে ? আবদুর রহমান উত্তর দেন, তোমার যুগে যেরূপ জুলুম-অত্যাচার চলছে সেরূপ জুলুম-অত্যাচার বনূ উমাইয়া যুগে ছিল না। মানসূর বলেন, কি করব, আমি তো সাহায্যকারী পাই না। আবদুর রহমান বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেছেন, যদি বাদশাহ পুণ্যবান হয় তাহলে পুণ্যবানরা তাঁর চারপাশে এসে ভিড় জমায়, আর বাদশাহ যদি পাপী হন তাহলে তার কাছে পাপীরাই আসে। একদা এক ঝাঁক মাছি মানসূরকে বিরক্ত করে। তিনি তখন মুকাতিল ইব্‌ন সুলায়মানকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, এই মাছিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কেন সৃষ্টি করেছেন ? মুকাতিল উত্তর দেন, জালিমদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য।

মানসূরের যুগে বিভিন্ন অনারব ভাষার গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। উলকাদিজা' ও কালীলা দিমনা'-এর অনুবাদ তাঁর যুগেই সম্পন্ন হয়। মানসূরই সর্ব প্রথম জ্যোতিষীদেরকে তাঁর দরবারে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। তাঁর যুগেই আব্বাসী ও আলাবীদের পরস্পরের মধ্যে রক্তপাত শুরু হয়। অন্যথায় তাঁর পূর্বে আলাবী ও আব্বাসীরা পরস্পর ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ এবং বিভিন্ন কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানসূর আব্বাসীর সাথে আবদুল মালিক উমুবীর অনেক মিল দেখা যায়। আবদুল মালিক এবং মানসূর যথাক্রমে উমাইয়া ও আব্বাসী খান্দানের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন। আবদুল মালিক যেমন উমাইয়া খিলাফতকে হাবুডুবু অবস্থা থেকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের হাতে আব্বাসী খিলাফত ডুবতে ডুবতে শেষ পর্যন্ত মানসূরের মাধ্যমে রক্ষা পায়। আবদুল মালিক এবং মানসূর উভয়ই আলিম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মিতব্যয়িতা ও কার্পণ্যের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। উভয়ের খিলাফত-আমলও ছিল প্রায় সমান। তাদের উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য শুধু এই ছিল যে, মানসূর মানুষকে নিরাপত্তা দান করার পরও হত্যা করেন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কিন্তু আবদুল মালিকের এ ধরনের কোন দুর্নাম ছিল না।

মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূর

মুহাম্মদ আল-মাহ্‌দী মানসূরের পৈতৃক নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্‌। তিনি হিজরী ১২৬ সনে (৭৪৩ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল উম্মে মূসা আরদা বিন্‌ত মানসূর হিময়ারী। মাহ্‌দী অত্যন্ত দানশীল, জনপ্রিয়, প্রজাবৎসল, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। মাহ্‌দীর বয়স যখন পনর বছর তখন মানসূর তাকে আবদুল জব্বার ইব্‌ন আবদুর রহমানের বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৪১ হিজরীতে (৭৫৮ খ্রি) খুরাসানে প্রেরণ করেন। ১৪৪ হিজরীতে (৭৬১ খ্রি) তিনি খুরাসান থেকে ফিরে এলে মানসূর তাকে সাফ্‌ফাহর কন্যা তথা আপন ভাতিজীর সাথে বিবাহ দেন এবং আপন অলীআহদ (প্রথম) নিয়োগ করেন। ঐ বছরই তাঁকে খুরাসানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে রায়-এ পাঠানো হয়। ১৫২ হিজরীতে (৭৬৯ খ্রি) মানসূর তাঁকে আমীরে হজ্জ মনোনীত করেন। ১৫৮ হিজরীতে (৭৭৪ খ্রি) পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। বাগদাদের জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়আত করার পর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন ঃ

"তোমরা যাকে আমীরুল মু'মিনীন বল তিনি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। কেউ তাঁকে আহ্বান করলে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দেন। আর কেউ তাঁকে কোন হুকুম করলে তিনি সেই হুকুম পালন করেন। একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই আমীরুল মু'মিনীনের রক্ষাকর্তা। মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আমি আল্লাহ্‌ তা'আলারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমরা মুখে যেমন আমার আনুগত্য প্রকাশ করেছ, তেমনি অন্তরেও আমাকে মান্য করবে। তাহলেই দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে। যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে 'আদল' ও ন্যায় বিচারের কথা বলে তোমরা তার বিরোধিতা করো না। আমি তোমাদের উপর থেকে সবরকম জোর-জবরদস্তি প্রত্যাহার করে নেব এবং আমার সমগ্র জীবন তোমাদের কল্যাণ সাধনে এবং তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের শাস্তি বিধানে নিয়োজিত রাখব।"

মাহ্‌দী খলীফা হওয়ার সাথে সাথে মানসূরের কয়েদখানায় যে সমস্ত কয়েদী ছিল তাদের সকলকেই ছেড়ে দেন। ঐ সমস্ত কয়েদীকে আটকে রাখা হয়, যারা বিদ্রোহী, ডাকাত অথবা খুনী ছিল। ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদ ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের অন্যতম। আর যেসব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি, হাসান ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ছিলেন তাদের অন্যতম। হাসান এবং ইয়াকুব উভয়কে ইবরাহীম হত্যার পর বসরা থেকে বন্দী করে আনা হয়েছিল, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াকূবের পিতা দাউদ ছিলেন বনূ সুলায়ম গোত্রের মুক্তদাস। তিনি খুরাসানের নাসর ইব্‌ন সাইয়ারের মীর মুন্সী ছিলেন। ইয়াকূব ও আলী হচ্ছেন দাউদের দুই পুত্র। এরা উভয়েই অত্যন্ত বিদ্বান, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন। বনূ আব্বাসের হুকুমত যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বনূ সুলায়মের মর্যাদা হ্রাস পায়। ফলে বনূ সুলায়মের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ইয়াকূব ও আলীর প্রতি কেউ আর সম্মান দেখাত না অথচ যোগ্যতার দিক দিয়ে তারা সত্যিকার অর্থে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। যখন মুহাম্মদ মাহ্‌দী ও ইবরাহীম বনূ আব্বাসের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন ইয়াকূব সেই দাওয়াতে শরীক হন এবং জনসাধারণের দৃষ্টি মুহাম্মদ মাহ্‌দী ও

ইবরাহীমের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত হুসায়ন ইব্‌ন ইবরাহীমের সাথে তাকে বন্দী করা হয়। কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে ইয়াকূব জানতে পারেন যে, হাসান ইব্‌ন ইবরাহীম কয়েদখানা থেকে পালাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে মাহ্‌দীকে অবহিত করেন। মাহ্‌দী সঙ্গে সঙ্গে হাসানকে অন্য কয়েদখানায় স্থানান্তর করেন। কিন্তু হাসান সেখান থেকে পালিয়ে যান। মাহদী ইয়াকূবকে ডেকে পাঠিয়ে হাসান সম্পর্কে পরামর্শ করেন। ইয়াকূব বলেন, আপনি যদি হাসানকে নিরাপত্তা দান করেন তাহলে আমি তাকে আপনার খিদমতে হাযির করতে পারি। মাহ্‌দী হাসানকে নিরাপত্তা দান করলে তিনি তাকে মাহ্‌দীর দরবারে এনে হাযির করেন এবং তাঁর কাছ থেকে এই অনুমতিও আদায় করেন যে, হাসান মাঝেমধ্যে খলীফার দরবারে আসা-যাওয়া করতে পারবে। অতএব হাসান তাঁর দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন আসে, যখন মাহ্‌দী হাসানকে আপন দীনী ভাই বলে ঘোষণা করেন এবং সেই সাথে তাঁকে এক লক্ষ দিরহামও দান করেন। কিছুদিন পর মাহ্‌দী আবূ আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করে (যিনি তার অলীআহদীর যুগ থেকে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) তার স্থলে ইয়াকূব ইব্‌ন দাউদকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। ইয়াকূব ও হাসানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মাহ্‌দী আপন ন্যায়ানুবর্তিতা ও গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দেন। এতে তিনি তাঁর শত্রুদের অন্তর জয় করতেও সক্ষম হন। মুহাম্মদ মাহ্‌দী ও ইবরাহীমের অনুসারীবৃন্দ, যারা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দের দলের সাথে মিশে বনূ আব্বাসকে উৎখাত করতে চাচ্ছিল, তারাই ছিল খিলাফতে আব্বাসীয়ার আশংকার সবচেয়ে বড় কারণ। মাহ্‌দী ইয়াকুবকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় এই সব আশংকা দূর হয়ে যায়। কেননা ঐ দুই দলের লোকের সাথে ইয়াকূবের যোগাযোগ ছিল। ইয়াকূব তাদের অনেককে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ করে মাহ্‌দীর বিরোধিতা থেকে বিরত রাখেন। আর এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে তাদের বিরোধিতার উচ্ছ্বাস-উন্মাদনাও হ্রাস পায়।

হাকীম মুকান্নার আত্মপ্রকাশ

মাহ্‌দীর খিলাফতের প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৫৯ হিজরীতে (৭৭৫-৭৬ খ্রি.) হাকীম মুকান্না নামীয় মার্ভের জনৈক অধিবাসী (যে সোনার একটি মুখোশ সব সময় নিজের মুখে লাগিয়ে রাখত) নিজেকে খোদা বলে দাবি করে। তার আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে খোদ আদমের রূপ ধারণ করেন। এরপর রূপ ধারণ করেন আবূ মুসলিম ও হাশিমের। 'তানাসুখ' বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মুকান্না বলত, আমার ভিতরেও খোদার আত্মা রয়েছে। অর্থাৎ আমাতেও আল্লাহ্ রূপান্তরিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তার এই আকীদা ছিল রাওয়ান্দ এলাকার সেই অধিবাসীদের আকীদারই অনুরূপ যারা মানসূরের যুগে হাশিমিয়ার অভ্যন্তরে গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। এরা সবাই ছিল আবূ মুসলিমের দলের লোক। আবূ মুসলিমের দাওয়াতের একটি বিস্ময়কর দিক ছিল এই যে, তিনি যে পরিবেশের লোকের সাথে মিশতেন তাদের পরিবেশ বা আকীদা-বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে আহলে বায়তের দাওয়াতও পেশ করতেন। এভাবে বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ফিরকা কর্তৃক আহলে বায়তের

দাওয়াত বিভিন্ন ছাঁচে ঢালাই হওয়ার কারণে সেই দাওয়াতের ফলও বিভিন্নমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাকীম মুকান্নার একটি আকীদা এও ছিল যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দ নিহত হন নি, বরং আত্মগোপন করে আছেন। কোন এক সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং শত্রুদের থেকে তার প্রতি কৃত অপরাধের বদলা নেবেন। মুকান্নার আবির্ভাবের সাথে সাথে বহু লোক তার অনুসারীতে পরিণত হয়। মুকান্না মাওরাউন নাহ্র এলাকার বাস্সাম দুর্গে অবস্থান নেয়। বুখারাবাসী, সাগাদবাসী ও তুর্কীরা আব্বাসীদের বিরুদ্ধে মুকান্নাকে সমর্থন করে। তারা তার নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে অবাধে হত্যা করতে শুরু করে। ঐ অঞ্চলের কর্মকর্তারা (আবূ নু'মান, জুনায়দ ও লায়ছ ইব্ন নাস্র ইব্ন সাইয়ার) তার মুকাবিলা করেন। লায়ছের ভাই মুহাম্মদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হাস্সান ইব্ন তামীম ঐ সংঘর্ষে নিহত হন। মাহ্দীর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি জিবরাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে ওদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি জিবরাঈলের ভাই ইয়াযীদকে বুখারা ও সাগাদের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার নির্দেশ দেন। প্রথমে বুখারা ও সাগাদবাসীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। চারমাস যুদ্ধ চলার পর মুসলমানরা বুখারা ও অন্যান্য অঞ্চলের দুর্গসমূহ দখল করে। সাতশ বিদ্রোহী মারা যায়। অন্যরা মুকান্নার কাছে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর মাহ্দী আবূ আওনকে মুকান্নার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু আবূ আওন মুকান্নাকে পরাজিত করতে না পারায় মুআয ইবন মুসলিমকে প্রেরণ করা হয়। মুআযের অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সাঈদ হুরায়শী। এরপর উকবা ইব্ন মুসলিমকেও ঐ বাহিনীর সাথে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা মুকান্নার উপর এক জোরদার হামলা চালিয়ে তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং বাস্সাম দুর্গ অবরোধ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন মুআয ও সাঈদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাই সাঈদ মাহ্দীর কাছে পত্র লিখে মুকান্নাকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব তার একার হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি লাভ করেন। মুকান্না বত্রিশ হাজার লোকসহ অবরুদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ লোকেরা সাঈদ হুরায়শীর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সাঈদ তাদের প্রার্থনা মনজুর করেন। তখন ত্রিশ হাজার লোক দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। স্রেফ দু'হাজার লোক মুকান্নার সাথে থেকে যায়। মুকান্নার চোখে যখন তার নিশ্চিত পরাজয়ের আলামত ফুটে ওঠে তখন সে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তার মধ্যে প্রথমে নিজের সমস্ত পরিবার-পরিজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এরপর নিজেও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে মুকান্নার লাশ আগুন থেকে টেনে বের করে। এরপর তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা মাহ্দীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

কর্মকর্তাদের পদচ্যুতি, রদবদল ও নিয়োগ

১৫৫ হিজরীতে (৭৭১ খ্রি.) মাহ্দী আপন চাচা ইসমাঈলকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে ইসহাক ইব্ন সাবাহ কিনদী আশাআসীকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি বসরার শাসনকর্তার পদ থেকে সাঈদ ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন হাসানকে অপসারণ করে তাঁদের স্থলে আবদুল মালিক ইব্ন যুবয়ান নুখায়রীকে, কাছাম ইব্ন আব্বাসকে ইয়ামামার শাসনকর্তার পদ

থেকে অপসারণ করে তার স্থলে ফাদল ইব্‌ন সালিহ্‌কে, মাতার (মানসূরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস)-কে মিসরের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে আবূ হামযাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে এবং আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে যুফার ইব্‌ন আসিম বিলালীকে নিয়োগ করেন। এই বছরই তিনি মা'বাদ ইব্‌ন খলীলকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করে সেখানে পাঠান। হুমায়দ ইব্‌ন কাহতাবা ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। হিজরী ১৫৯ সনে (৭৭৫ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হলে আবূ আওন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াযীদকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। এই বছরের শেষের দিকে সাঈদ ইব্‌ন খলীলের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে রাওহ্ ইব্‌ন হাতিমকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

১৬০ হিজরীতে (৭৭৬-৭৭ খ্রি.) আবূ আওন, আবদুল মালিক মাহ্‌দীর রোষানলে পতিত হন এবং তার স্থলে মুআয ইব্‌ন মুসলিমকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঐ বছরই হামযা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও জিবরাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াকে গভর্নর নিয়োগ করে যথাক্রমে সীস্তান ও সমরকন্দে প্রেরণ করা হয়। জিবরাঈল তাঁর শাসনামলে সমরকন্দের দুর্গ ও নগর প্রাচীর মেরামত করান। ঐ বছর সিন্ধুর শাসনকর্তার পদে বিসতাম ইবন আমরকে প্রেরণ করা হয়। হিজরী ১৬১ সনে (৭৭৭-৭৮ খ্রি.) মাহ্‌দী নাসর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছকে সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করেন। ঐ বছর আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীকে জাযীরার, ঈসা ইব্‌ন লুকমানকে মিসরের এবং বিসতাম ইব্‌ন আমর তাগলবীকে সিন্ধুর গভর্নরের পদ থেকে বদলী করে আযারবায়জানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঐ বছর মাহ্‌দী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ বারমাককে আপন পুত্র হারূনের আতালীক (গৃহশিক্ষক) এবং সুলায়মান ইব্‌ন রাজাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানের স্থলে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন।

বারবদ অভিযান

খলীফা মাহ্‌দী তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই হিন্দুস্থানের একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন শিহাব সাময়ী' সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করে একটি বাহিনী নিয়ে সিন্ধু উপকূলের দিকে রওয়ানা হন। তারা বারবদ নামক বন্দরে অবতরণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এতে বহু সংখ্যক বারবদবাসী নিহত হয়। মুসলমানদের নিহত হয় মাত্র বিশজন। কিন্তু যুদ্ধের পরপরই মুসলমানদের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে প্রায় এক হাজার মুসলমান মারা যায়। আবদুল মালিক ইব্‌ন শিহাব সেখান থেকে জাহাজে আরোহণ করে পারস্য অভিমুখে রওয়ানা হন, কিন্তু উপকূলের নিকটবর্তী হতে না হতেই সামদ্রিক ঝড় ওঠে এবং তাতে বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবে যায়। ফলে সেখানেও বেশ কিছু মুসলমানের সলীল সমাধি ঘটে।

হাদী ইব্‌ন মাহ্‌দীকে অলীআহ্‌দ (যুবরাজ) নিয়োগ

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈসা ইব্‌ন মূসা কূফা সংলগ্ন রাহবা নামক পল্লীতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু জুমুআ অথবা ঈদের দিন কূফায় এসে নামায পড়তেন এবং বাকি দিন উপরোক্ত পল্লীতে নীরবে ও নির্জনে কাটিয়ে দিতেন। আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, সাফ্‌ফাহ্ ঈসাকে মানসূরের পরবর্তী অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মানসূর সেই নিয়োগ ব্যবস্থা

পরিবর্তন করে আপন পুত্র মাহ্দীকে তাঁর পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। আর ঈসার অলীআহ্দী বহাল রাখা হয় এই শর্তে যে, তিনি মাহ্দীর পর খলীফা হবেন। অর্থাৎ এখন থেকে মাহ্দীর পরবর্তী অলীআহ্দ হলেন ঈসা ইব্ন মূসা। কিন্তু এক বছর গত হওয়ার পূর্বেই মাহ্দীর উপদেষ্টারা তাঁকে ঈসা ইব্ন মূসার স্থলে নিজপুত্র হাদীকে দ্বিতীয় অলীআহ্দ নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। মাহ্দী ঈসাকে বাগদাদে তলব করেন। কিন্তু তিনি সেখানে আসতে অস্বীকার করেন। মাহ্দী কূফার গভর্নরকে কড়া নির্দেশ দেন, সে যেন ঈসাকে উত্ত্যক্ত করে। কিন্তু তিনি যেহেতু প্রথম থেকেই নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন, তাই কূফার গভর্নর তাকে বিরক্ত করার কোন সুযোগই পাননি। এরপর মাহ্দী ঈসার কাছে একটি কড়া চিঠি লিখেন। কিন্তু ঈসা তারও কোন উত্তর দেননি। এরপর মাহ্দী ঈসাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য আপন চাচা আব্বাসকে পাঠান। কিন্তু ঈসা তাঁর সাথে যেতেও অস্বীকার করেন। এরপর মাহ্দী ঈসাকে নিয়ে আসার জন্য দু'জন সেনাপতি প্রেরণ করেন। এবার বাধ্য হয়ে ঈসা বাগদাদে আসেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের বাড়িতে ওঠেন। তিনি সেখান থেকে মাহ্দীর দরবারে যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু সব সময়ই নীরব থাকতেন। এবার ঈসার উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। অলীআহ্দী থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত খোদ মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানও তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। ঈসা তখন নিজের সেই প্রতিশ্রুতি ও শপথের ওযর পেশ করেন, যা অলীআহ্দ নিয়োগকালে তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এবার মাহ্দী ফকীহদের ডেকে পাঠান। তাঁরা এই মর্মে ফতওয়া দেন যে, ঈসা শপথের কাফ্ফারা দিয়ে অলীআহ্দী থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। শেষ পর্যন্ত মাহ্দী ঈসাকে দশ হাজার দিরহাম এবং যাব ও কিসকর এলাকার কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন এবং তার বিনিময়ে তিনি ১৬০ হিজরীর ২৬শে মুহাররম (৭৭৬ খ্রি ১৩ নভেম্বর) তাঁর অলীআহ্দীর দাবি প্রত্যাহার করেন। এরপর হাদীর অলীআহ্দীর বায়আত নেওয়া হয়। পরদিন মাহ্দী সাধারণ দরবার আহ্বান করেন। সেখানে সুলতানদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বায়আত নেওয়া হয়। এরপর মাহ্দী জামে মসজিদে এসে একটি ভাষণ দেন। তাতে ঈসার পদচ্যুতি এবং হাদীকে অলীআহ্দ নিয়োগের ব্যাপারে সকলকে অবহিত করা হয়। ঈসাও সেখানে আপন অলীআহ্দীর দাবি প্রত্যাহারের কথা সকলের সামনে স্বীকার করেন। এবার জনসাধারণ সর্বসম্মতিক্রমে হাদীর অলীআহ্দীর পক্ষে রায়আত করে।

মাহ্দীর হজ্জপালন

১৬০ হিজরীর যিলকদ (৭৭৭ খ্রি. সেপ্টেম্বর) মাসে মাহ্দী হজ্জ পালনের প্রস্তুতি নেন এবং আপনপুত্র হাদীকে বাগদাদে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। তিনি হাদীর মামা ইয়াযীদ ইব্ন মানসূরকে হাদীর সাথে রেখে যান। তিনি তাঁর অপর পুত্র হারূনসহ আপন পরিবারের আরও কয়েক ব্যক্তিকে হাদীর সভাসদ নিয়োগ করেন। এরপর আপন মন্ত্রী ইয়াকূব ইব্ন দাউদ ইব্ন তাহমানসহ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় পৌঁছে তিনি কা'বাঘরের এলোমেলো গিলাফটি খুলে ফেলে তদ্স্থলে একটি নতুন ও অতি মূল্যবান গিলাফ পরিয়ে দেন। মাহ্দী সেখানে দেড়লক্ষ দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন, মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং ফিরে আসার সময় পাঁচশ আনসার পরিবারকে সাথে করে ইরাকে নিয়ে আসেন।

ঐ সমস্ত পরিবারকে ইরাকে জায়গীর প্রদান করা হয়, তাঁদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয় এবং খলীফার প্রহরার কাজে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। ঐ সময়ে খলীফা মাহ্দী মক্কার রাস্তাসমূহের পাশের ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং প্রত্যেক বাড়িতে কুয়া খনন করান। তিনি এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব ইয়াকতীন ইব্ন মূসার উপর অর্পণ করেন। মাহ্দী বসরার মসজিদ প্রশস্ত করার এবং তার মিম্বর ছোট করার নির্দেশ দেন।

স্পেনে সংঘর্ষ

মাহ্দীর পক্ষ থেকে আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব ফিহ্রী। তিনি বার্বারদের একটি দল নিয়ে স্পেন উপকূলের মার্সিয়া বন্দরে অবতরণ করেন এবং একটি পত্র মারফত স্পেনের সারাকুস্তা (সারাগোসা) প্রদেশের গভর্নর সুলায়মান ইব্ন ইয়াকতীনকে খিলাফতে আব্বাসীয়ার দাওয়াত দেন। সুলায়মান ঐ পত্রের কোন উত্তর দেননি। তাই আবদুর রহমান ফিহরী সারাকুস্তা আক্রমণ করেন, কিন্তু সুলায়মানের কাছে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। ইতোমধ্যে স্পেনের শাসক আমীর আবদুর রহমান সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। তিনি সর্বপ্রথম সমুদ্র উপকূলে অবস্থানরত আবদুর রহমান ফিহরীর নৌযানগুলো পুড়িয়ে ফেলেন; এরপর ফিহরীর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি নিরুপায় হয়ে বালানসিয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন। তখন আমীর আবদুর রহমান ঘোষণা দেন ঃ যে কেউ আবদুর রহমান ইব্ন ফিহরীর ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসতে পারবে তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেওয়া হবে। ফিহরীর সঙ্গী জনৈক বার্বার এই ঘোষণার কথা জানতে পেরে কোন এক সুযোগে তার ছিন্ন মস্তক আমীর আবদুর রহমানের খিদমতে হাযির করে এবং তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার নিয়ে চলে যায়। আমীর আবদুর রহমান আব্বাসীদের এই বাড়াবাড়ির কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং প্রত্যুত্তরে সিরিয়া উপকূলে হামলা চালিয়ে আব্বাসী খলীফার কাছ থেকে তার ঐ ভুলের মাশুল আদায় করার সংকল্প নেন। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন উছমান আনসারী সারাকুস্তায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অতএব আমীর আবদুর রহমান সেই বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন এবং সিরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা মুলতবি রাখেন।

খলীফা মানসূর আব্বাসীর যুগে স্পেনে উমাইয়া বংশের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা ইসলামী হুকুমতের অপর একটি পৃথক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

রোমান ভূখণ্ডে হারূনের প্রথম অভিযান

মাহ্দী খুরাসান ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রোমানদের উপর হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৬৩ হিজরীর ১লা রজব (৭৮০ খ্রি. মার্চ) মাসে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। এর একদিন পূর্বে অর্থাৎ ৩০শে জমাদিউস্সানী মাহ্দীর চাচা ঈসা ইব্ন আলী ইনতিকাল করেন। মাহ্দী নিজের সহোদর হাদীকে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র হারূনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। ঐ সফরে মাওসিল ও জাযীরা অতিক্রমকালে তিনি ঐ

প্রদেশের গভর্নর আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলীকে পদচ্যুত ও বন্দী করেন এবং আপন পুত্র হারূনকে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়াসহ সমগ্র পশ্চিম ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহের হাতে জাযিরার শাসনভার ন্যস্ত করেন। ১৬২ হিজরীতে (৭৭৮-৭৯ খ্রি.) রোমানরা ইসলামী ভূখণ্ড আক্রমণ করে কয়েকটি শহর ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই কারণে খলীফা মাহ্‌দী তাদের উপর এই আক্রমণ চালান। এই সফরে মাহ্‌দী মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিকের প্রাসাদের সম্মুখে পৌঁছলে তাঁর (মাহ্‌দীর) চাচা আব্বাস ইব্‌ন আলী তাঁকে বলেন, একদা এই পথ অতিক্রমকালে মাসলামা আপনার দাদা মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে দাওয়াত করেছিলেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ তাকে এক হাজার দীনার দিয়েছিলেন। মাহ্‌দী একথা শুনতেই মাসলামার সন্তান-সন্ততি, চাকর, ভৃত্য ও অন্যান্য সম্পর্কিতকে ডেকে এনে তাদেরকে বিশ হাজার দীনার দান করেন এবং তাদের জন্য ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। মানসূর হলবে পৌঁছে থেমে যান এবং হারূনকে সেনাবাহিনীসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। হারূনের সাথে ঈসা ইব্‌ন মূসা, আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্, হাসান ইব্‌ন কাহতাবা, রাবী ইব্‌ন ইউনুস এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ প্রমুখ অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব এবং রসদ সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা হারূনের হাতেই ছিল । হারূন সামনে অগ্রসর হয়ে রোমানদের দুর্গসমূহ অবরোধ করেন এবং একের পর এক বেশ কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। ঐ সময়ে মাহ্‌দী হলবের আশেপাশের ধর্মদ্রোহীদের হত্যা করেন। ইতিমধ্যে হারূন বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। মাহ্‌দী হারূনকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পরিদর্শনে যান, মসজিদে আকসায় নামায পড়েন, এরপর বাগদাদে ফিরে আসেন। তিনি হারূনকে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগকালে হাসান ইব্‌ন সাবিতকে তাঁর অর্থমন্ত্রী এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইবন খালিদ বারমাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন, ঐ বছর অর্থাৎ ১৬৩ হিজরীতে (৭৭৯-৮০ খ্রি.) খালিদ ইব্‌ন বারমাক ইনতিকাল করেন।

রোমান ভূখণ্ডে হারূনের দ্বিতীয় অভিযান

হিজরী ১৬৪ (৭৮০-৮১ খ্রি.) সনে আবদুল কবীর ইব্‌ন আবদুর রহমান রোমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু প্যাট্রিয়ক মীকাঈল ও প্যাট্রিয়ক তারাহ্ আর্মেনী নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর মুকাবিলা করতে এলে আবদুল কবীর পিছু হটে চলে আসেন। এই ঘটনার কারণে এবং হিজরী ১৬৩ সনের (৭৭৯-৮০ খ্রি) হামলার ফলে রোমানদের উপর মুসলমানদের যে প্রভাব পড়েছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। মাহ্‌দী এই সংবাদ শুনে আবদুল কবীরকে বন্দী করেন এবং হিজরী ১৬৫ সনে (৭৮১-৮২ খ্রি) আপন পুত্র হারূনকে রোমানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। অবশ্য আপন বিশ্বস্ত সংগীত ও বিশিষ্ট সভাসদ রবীকেও হারূনের সংগী করেন। হারূন আনুমানিক এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রোমানদের উপর হামলা চালান এবং তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পরাজিত করে এবং একের পর এক রোমান শহর দখল করে কনসটান্টিনোপল পর্যন্ত এগিয়ে যান। ঐ সময়ে 'গাস্তাহ' নাম্নী জনৈক মহিলা কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কায়সার আলইউকের পত্নী।

তিনি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের পক্ষে রাজ্যশাসন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বার্ষিক সত্তর হাজার দীনার জিয্য়া প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে রোমানরা তিন বছরের জন্য মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। তারা এই শর্তও মেনে নেয় যে, মুসলমানরা কনসটান্টিনোপলের বাজারে অবাধে যাওয়া-আসা ও ব্যবসা করতে পারবে। এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে মুসলমানরা পাঁচ হাজার ছয়শ রোমানকে গ্রেফতার এবং ছাপ্পান্ন হাজারকে হত্যা করেছিল। ঐ বছরই মাহ্দী হারূনকে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শাসনকর্তা ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন।

১৬৬ হিজরীতে (৭৮২-৮৩ খ্রি) মাহ্দী আপন পুত্র হারূনকে হাদীর পরবর্তী অলীআহ্দ নিয়োগ করেন, জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর অলীআহ্দীর পক্ষে বায়আত দেন এবং তাঁকে 'রশীদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ বছর মাহ্দী বাগদাদ থেকে মক্কা, মদীনা ও ইয়ামান পর্যন্ত খচ্চর ও উটের মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন, যাতে ঐ সমস্ত এলাকার দৈনন্দিন খবরাখবর পাওয়া যায় এবং সেখানেও রাষ্ট্রীয় নির্দেশাদি পৌঁছতে থাকে। ঐ বছরই মাহ্দী ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-কে বসরার বিচারক নিয়োগ করেন।

১৬৭ হিজরীতে (৭৮৩-৮৪ খ্রি) ঈসা ইব্ন মূসা কূফায় ইনতিকাল করেন। ঐ বছর ধর্মদ্রোহীরা এখানে সেখানে বিদ্রোহ করে। মাহ্দী প্রথমে তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে তাদেরকে নিরুত্তর করার প্রয়াস চালান, এরপর হত্যার উদ্যোগ নেন। তিনি যেখানেই ধর্মদ্রোহীদের খোঁজ পেতেন সেখানেই তাদের হত্যা করতেন। ইয়ামামা ও বাহরায়নের মধ্যবর্তী বসরা এলাকায় তারা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেখানকার অনেক মুসলমানও নামায ত্যাগ করে, শরীয়ত নির্ধারিত হারাম-হালালের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং রাস্তাঘাটে লুটপাট শুরু করে দেয়। মাহ্দী যত্রতত্র তাদেরকে পাইকারীহারে হত্যা করেন। ফলে তারা একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটি নিঃসন্দেহে মাহ্দীর কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্যতম। ঐ বছর তিনি আশেপাশের ঘরবাড়ি কিনে নিয়ে মসজিদে হারামের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

হাদীর জুরজান আক্রমণ

১৬৭ হিজরীতে (৭৮৩-৮৪ খ্রি) সংবাদ পৌঁছে যে, তাবারিস্তানবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। খলীফা তাদেরকে দমনের জন্য আপন অলীআহ্দ হাদীকে প্রেরণ করেন। হাদীর সেনাবাহিনীর পতাকা মুহাম্মদ ইব্ন জামীলের হাতে ছিল। হাদী তাবারিস্তানে, এরপর জুরজানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্রোহীদেরকেও যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন।

১৬৮ হিজরীতে (৭৮৪-৮৫ খ্রি) রোমানরা মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি করেছিল, মেয়াদ শেষ হওয়ার চার মাস পূর্বেই তা ভঙ্গ করে। এই খবর পেয়ে জাযীরা ও কিন্নাসরীনের গভর্নর আলী ইব্ন সুলায়মান ইয়াযীদ ইব্ন বদর ইব্ন বাত্তালের অধিনায়কত্বে একটি বিরাট বাহিনী কনসটান্টিনোপলে প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ সেখান থেকে প্রচুর গনীমতসহ ফিরে আসেন।

মাহ্দীর মৃত্যু

নিজস্ব অভিজ্ঞতায় মাহ্দী বুঝতে পারেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হাদীর অনুপাতে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হারূন অধিকতর যোগ্য। তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হওয়ার পর ১৬৮ হিজরীতে তিনি অলীআহ্দীর ক্ষেত্রে হারূনকে হাদীর উপর অগ্রাধিকার প্রদানের সংকল্প নেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি হাদীর অলীআহ্দী রহিত করে হারূনকে তার স্থলে প্রথম অলীআহ্দ নিয়োগ করেন এবং এই মর্মে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আতও নেন। ঐ সময়ে হাদী জুরজানে অবস্থান করছিলেন। মাহ্দী দূত মারফত তাঁকে তলব করেন। কিন্তু হাদী দূতের সাথে অশিষ্ট আচরণ করেন। তিনি তাকে মারধর করে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর পিতার নির্দেশ পালনার্থে জুরজান থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে স্বয়ং মাহ্দীও হাদীর উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে জুরজান অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে বাসাবষান নামক স্থানে ১৬৯ হিজরীর ২২শে মুহাররম (৭৮৫ খ্রি-এর ৫ই আগস্ট) তিনি ইনতিকাল করেন। হারূন ঐ সফরে পিতার সাথেই ছিলেন। তিনি জানাযার নামায পড়ান এবং ভাইয়ের কাছে জুরজানে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাঠান। হাদী সেখানে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আপন খিলাফতের বায়আত নেন। এদিকে হারূনুর রশীদ তাঁর বাহিনী নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে এসে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে আপন ভাই হাদীর খিলাফতের বায়আত নেন এবং খলীফা মাহ্দীর মৃত্যু ও হাদীর খলীফা হওয়ার সংবাদ বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। বিশ দিন পর হাদী জুরজান থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদে এসে পৌঁছেন এবং খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে 'হাজিব' (প্রাসাদাধ্যক্ষ) রাবীকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই রাবী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খলীফা মাহ্দী আব্বাসীদের মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব, মুত্তাকী, খোশ-মেজাযী, বীর ও পুণ্যবান খলীফা ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার যুগে ঐ সমস্ত রক্তারক্তি প্রত্যক্ষ করেন যা আলাবীদের উপর চালানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি এগুলোকে যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন না। জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করাকে তিনি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা এবং মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার চালানোকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এ কারণে তিনি তাঁর উপদেষ্টা ও সভাসদদের সাথে একই মজলিসে বসতে শুরু করেন। অন্যথায় তাঁর পূর্বে মানসূরের যুগে উপদেষ্টা ও সভাসদরা এমনভাবে পর্দার আড়ালে বসতেন যে, খলীফা শুধু তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পেতেন এবং তারাও খলীফার আওয়াজ শুনতে পেতেন, কিন্তু একে অপরকে স্বচক্ষে দেখতে পারতেন না। মাহ্দী তাঁর খিলাফত আমলে নিজের নির্দেশে কোন হাশিমীকে হত্যা করাননি। তিনি এই মর্মে শপথ করেছিলেন যে, তিনি কখনো কোন হাশিমীকে হত্যা করবেন না। প্রাণদণ্ড পাওয়ার যোগ্য এমন হাশিমীকে তিনি শুধু বন্দী করে রাখতেন। তিনি ধর্মদ্রোহীদের প্রাণের শত্রু ছিলেন। তাই কোন ধর্মদ্রোহীকে পেলে হত্যা না করে ছাড়তেন না। ইয়াকূব ইব্ন ফাদল হাশিমী ধর্মদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং সে কথা সে প্রকাশ্যে ব্যক্তও করত। কিন্তু মাহ্দী তাকে বন্দী করে রাখেন এবং আপন অলীআহ্দ হাদীকে বলেন, তুমি যখন খলীফা হবে তখন তাকে হত্যা করবে। আমি আমার শপথে অটল থাকার কারণে তাকে হত্যা করতে পারি না। অতএব হাদী খলীফা হওয়ার পর তাকে হত্যা করেন। রাসূলের সুন্নত অনুসরণের প্রতি মাহ্দীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ইতিপূর্বে খলীফাদের জন্য মসজিদসমূহে যে সব বিশেষ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল, সুন্নতের পরিপন্থী মনে করে তিনি সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। যে সমস্ত মসজিদের মিম্বর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বরের চাইতে উঁচু ছিল তিনি সেগুলোকেও নিচু করার নির্দেশ দেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার, ধৈর্যশীল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর দরবারে যে কেউ

অবাধে যাতায়াত করতে পারত। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর গোলাম-ভৃত্য অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাদেরকেও দেখতে যেতেন। কোন কোন সময় জনসাধারণ কাযীর আদালতে তাঁর বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা দায়ের করে। তখন তিনি কাযীর নোটিশ পেয়ে একজন সাধারণ আসামীর ন্যায় কাযীর আদালতে হাযির হন এবং কাযী তাঁর সম্পর্কে যে রায় দেন তা নত মস্তকে মেনে নেন। একদা সেই যুগের বিখ্যাত আলিম শারীক তাঁর দরবারে আসেন। মাহ্দী তাঁকে বলেন, তিনটি কথার যে কোন একটি আপনাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। হয় আপনি কাযীর পদ গ্রহণ করুন, অথবা আমার পুত্রকে পড়ান, অথবা আমার সাথে খাবার খান। শারীক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, এগুলোর মধ্যে খাবার খাওয়াটাই সবচেয়ে সহজ। অতএব দস্তরখানের উপর রং বেরংয়ের খাবার পরিবেশন করা হয়। শারীক খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে রাজকীয় বাবুর্চি বলে, ব্যস, এবার আপনি ফেঁসে গেলেন। বাস্তবেও ঘটলো তাই। শারীক কাযী পদ গ্রহণ করেন এবং হাদীর পুত্রদেরকেও পড়ান। মাহ্দী কখনো বসরায় এলে জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই ইমামতি করতেন। একদিন লোকেরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এরপর এক বেদুঈন আসে কিন্তু জামাআত পায়নি। তাই সে মাহ্দীকে বলে, আমি যুহরের নামায আপনার পিছনে পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মাহ্দী তখন নির্দেশ দেন, প্রত্যেক নামাযেই এই লোকটির জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। পরবর্তী আসরের নামাযের সময় দেখা গেল, মাহ্দী মিহরাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শেষমেষ ঐ লোকটি মসজিদে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সেই ওয়াক্তের নামায শুরু করার তাকবীর-এর অনুমতি দেননি। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে তাঁর এই উদারচিত্ততা লক্ষ্য করে। মাহদী সর্বপ্রথম বসরায় আপন এক খুতবায় পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـــ

"আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও" (৩৩ ঃ ৫৬)।

এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের খতীবগণ তাঁদের খুতবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে আসছেন।

হাদী ইব্ন মাহ্দী

হাদী ইব্ন মাহ্দী ইব্ন মানসূর ১৪৭ হিজরীতে (৭৬৪-৬৫ খ্রি) 'রায়' নামক স্থানে খায়যুরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খায়যুরান বার্বারের অধিবাসিনী একজন দাসী ছিল। মাহ্দী তাকে ক্রয় করেন এবং তারই গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হাদী ও হারূনের জন্ম। এরপর মাহ্দী তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং ১৫৯ হিজরীতে (৭৭৫-৭৬ খ্রি) তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহও করেন। খলীফা হাদী খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আপন পিতার ওসীয়ত অনুযায়ী ধর্মদ্রোহীদের মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর খিলাফত আমলে নিম্নোক্ত

ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব মদীনার, ইবরাহীম ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতবা ইয়ামানের, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছাম মক্কা ও তাইফের, সুওয়ায়দ কায়েদ খুরাসানী ইয়ামামা ও বাহরাইনের, হাসান ইব্‌ন সুলায়ম হাওয়ারী আম্মানের, মূসা ইব্‌ন ঈসা কূফার, ইব্‌ন সুলায়মান বসরার খলীফা হাদীর মুক্ত গোলাম হাজ্জাজ জুরজানের, যিয়াদ ইব্‌ন হাসান কূমিসের, সালিহ্ ইব্‌ন শায়খ ইব্‌ন উমায়রা আসাদী তাবারিস্তানের এবং হাশিম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন খালিদ মাওসিলের শাসনকর্তা ছিলেন। হাদী হাশিমকে তার অসদাচরণের কারণে পদচ্যুত করে তার স্থলে আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আলী হাশিমীকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

হুসাইন ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ

হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান মুছাল্লাছ ইব্‌ন হাসান মুছান্না ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান তাদের চাচা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান এবং আবূ তালিবের পরিবারের অন্যান্য লোক একত্রে মিলে হুকুমতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন যে, ১৫৯ হিজরীর (৭৭৬ খ্রি-এর অক্টোবর) হজ্জ মওসুমে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু হজ্জ মওসুমের পূর্বেই মদীনার শাসনকর্তা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সাথে তাদের কিছু মন কষাকষি হয়ে যায়। ফলে তখনি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মদীনার শাসনকর্তার ভবন অবরোধ করে হুসাইন ইব্‌ন আলী মুছাল্লাছের হাতে বায়আত করতে শুরু করেন। মদীনাবাসীরাও এই বায়আতে অংশগ্রহণ করেন। এরই মধ্যে খালিদ ইয়াযীদী দুশ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। অপর দিকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযও অবরোধমুক্ত হয়ে একদল সৈন্য নিয়ে মসজিদের ঠিক সেই জায়গায় এসে পৌঁছেন, যেখানে হুসাইন ইব্‌ন আলীর জন্য বায়আত নেওয়া হচ্ছিল। যে সমস্ত লোক তখন মসজিদে ছিলেন তারা খালিদের মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের পুত্রদ্বয় ইয়াহ্ইয়া ও ইদরীসের হাতে খালিদ ইয়াযীদী নিহত হন এবং নিহত হওয়ার সাথে সাথে অন্যরাও পরাজয়বরণ করে। এরপর হুসাইন ইব্‌ন আলীর দল বায়তুল মালের দরজা ভেঙ্গে গোটা সরকারী ভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যায়। পরদিন বনূ আব্বাসের সমর্থকরা একত্রিত হয়ে পুনরায় মুকাবিলা করে। কয়েক দিন পর্যন্ত মদীনার এই সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত হুসাইন ইব্‌ন আলী সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে মদীনার উপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একুশ দিন মদীনায় অবস্থান করার পর মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় পৌঁছে তিনি ঘোষণা দেন যে, যে ক্রীতদাসই আমার কাছে আসবে আমি তাকে মুক্ত করে দেব। এই ঘোষণা শুনে বেশ কয়েকজন ক্রীতদাস হুসাইন ইব্‌ন আলীর কাছে এসে জড়ো হয়। ঐ বছর সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলী, আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, ঈসা ইব্‌ন মূসার পুত্রদ্বয় মূসা ও ইসমাঈল প্রমুখ আব্বাসী পরিবারের বেশ কয়েক ব্যক্তি হজ্জ করতে এসেছিলেন। তাঁদের রওয়ানা হওয়ার পর হাদীর কাছে হুসাইন ইব্‌ন আলীর বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পৌঁছে। হাদী সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে লিখেন, তুমি

তোমার সকল সঙ্গীকে নিয়ে হুসাইন ইব্‌ন আলীর মুকাবিলা কর। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান হজ্জে আসার সময় কিছু সৈন্যও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যীতুওয়া নামক স্থানে আরো কিছু লোক সংগ্রহ করে দস্তুর মত একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এরপর তিনি মক্কায় গিয়ে উমরা আদায় করেন। সেখানে বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্য থেকে যে সমস্ত আব্বাসী হজ্জ করতে এসেছিলেন তারাও মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানের সাথে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত তারবিয়ার দিন 'ফাখ' নামক স্থানে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তাতে অনেক লোক মারা যায়। শেষ পর্যন্ত হুসাইন ইব্‌ন আলী পরাজিত হন এবং তার সঙ্গীরা পলায়ন করে। কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি হুসাইন ইব্‌ন আলীর ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসে। তার সঙ্গীদেরও প্রায় একশটি মস্তক জড়ো করা হয়। সেগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর ভাই সুলায়মানের মস্তকও ছিল। পরাজিতরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে হাজীদের সাথে মিশে যায়। এ দিকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণার পর হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বন্দী হন। তবু মূসা ইব্‌ন ঈসা তাকে হত্যা করেন। এতে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান মূসার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। হাদীও যখন এই ব্যাপারটি জানতে পারেন তখন তিনি মূসার যাবতীয় মালপত্র আটক করেন। এই যুদ্ধে কোন না কোনভাবে মুহাম্মদ মাহ্‌দীর ভাই ইদরীসের প্রাণ রক্ষা পায় এবং তিনি পালিয়ে সোজা মিসরে গিয়ে পৌঁছেন। সালিহ ইব্‌ন মানসূরের মুক্ত দাস ওয়াযিহ্ সেখানকার ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। আবূ তালিব পরিবারের প্রতি তার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি ইদরীসকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়ে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেন। ইদরীস তাঞ্জা এলাকায় দালীলাহ নামক শহরে গিয়ে পৌঁছেন এবং বার্বারদের কাছে আহলে বায়তের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। কিছুদিন পর খলীফা হাদী যখন জানতে পারেন যে, ওয়াযিহ্ ইদরীসকে পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন তিনি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন। অপর দিকে ইদরীস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র অপর ভাই ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ 'ফাখ' থেকে পালিয়ে দায়লামে চলে গিয়েছিলেন।

হাদীর মৃত্যু

হাদী খিলাফতের আসনে বসেই আপন ভাই হারূনকে অলীআহ্‌দী থেকে বঞ্চিত করে তাঁর পরিবর্তে আপন পুত্র জা'ফরকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করার সংকল্প নেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বারমাক হারূন রশীদের শিক্ষাগুরু ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি অনেক বুঝিয়ে খলীফাকে উক্ত সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাদীর অন্যান্য সভাসদ বার বার তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন, যাতে তিনি হারূনকে বাদ দিয়ে পরিবর্তে আপন পুত্র জা'ফরকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন। কিন্তু ইয়াহ্‌ইয়া হাদীকে বলেন ঃ আপনার পুত্র জা'ফর এখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক। যদি আপনি আজ ইনতিকাল করেন তাহলে সরকারী কর্মকর্তারা এই ছোট শিশুটির খিলাফত কখনো মেনে নেবে না। ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। আপনার পিতা হারূনকে আপনার পরবর্তী অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেছিলেন। আপনিও যদি জা'ফরকে হারূনের পরবর্তী অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন তাহলে কোন দিক দিয়েই আর দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। আপনার জীবিতাবস্থায় জা'ফর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে এবং

আপন যোগ্যতা প্রদর্শন করবে তখন আমি হারূনকে অলীআহ্‌দীর অধিকার জা'ফরের পক্ষে হস্তান্তর করার ব্যাপারে রাযী করিয়ে নেব। এসব কথায় হাদীর মনে সান্ত্বনা আসে। কিন্তু যেসব সভাসদ হারূনের বিরুদ্ধে ছিল তারা হাদীকে বার বার ঐ একই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ফলে হাদী এ ব্যাপারে হারূনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। ইয়াহ্‌ইয়া বিষয়টি জানতে পেরে হারূনকে পরামর্শ দেন ঃ তুমি মৃগয়ার বাহানায় কোথাও চলে যাও এবং হাদী থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান কর। অতএব হারূন শিকারের অনুমতি নিয়ে 'কাসরে মুকাতিল'-এ চলে যান। হাদী তাঁকে ফিরে আসতে বললে তিনি অসুখের বাহানায় ফিরে আসেননি। ঐ সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। হাদী আপন মাতা খায়যুরানকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখতে শুরু করেন। মাহ্‌দীর যুগ থেকে খায়যুরান এ ক্ষেত্রে যে সব অধিকার ভোগ করে আসছিলেন তিনি তা সম্পূর্ণ কেড়ে নেন। মাতা-পুত্রের এই মন কষাকষি এমনি এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে যে, তাঁরা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াহ্‌ইয়ার মাধ্যমে খায়যুরান যখন জানতে পারেন যে, হাদী আপন পুত্র জা'ফরের অলীআহ্‌দীর জন্য হারূনের 'প্রাণের শত্রু' হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁর (খায়যুরানের) হৃদয়ে হারূনের স্নেহ-ভালবাসার মাত্রা কিছুটা বেশি পরিমাণেই বৃদ্ধি পায় এবং তিনি হাদীর কট্টর শত্রুতে পরিণত হন। এবার শুধু ইয়াহ্‌ইয়া নন, বরং খায়যুরানও হারূনের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ান। হারূন যখন হাদীর আহ্বানে বাগদাদে আসতে অস্বীকার করেন তখন হাদী নিজেই মাওসিলে রওয়ানা হন। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় হারূনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে হাদী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিন দিন অসুস্থ থাকার পর ১৭০ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (৭৮৬ খ্রি-এর ৯ই আগস্ট) রবিবার রাতে ইসাবাদ নামক স্থানে আনুমানিক সোয়া এক বছর খিলাফত পরিচালনা করে মারা যান। হাদী এভাবে হঠাৎ ইনতিকাল করায় জনসাধারণ বলাবলি করতে থাকে যে, খায়যুরান তাঁর এক দাসীর মাধ্যমে হাদীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। কিন্তু যেহেতু হাদী অসুস্থ ছিলেন, তাই বিষ প্রয়োগের এই ঘটনা একটি বানোয়াট কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। এই কাহিনী মতে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদও ঐ কাজে খায়যুরানের উপদেষ্টা ও অংশীদার ছিলেন।

হাদী বাগদাদ থেকে জুরজান পর্যন্ত ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। তিনি বদান্য, সদালাপী এবং কিছুটা জুলুমপ্রিয় ছিলেন, তবে রাষ্ট্রীয় কাজে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বল্পায়ু। তাঁর খিলাফতকালও ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ ভালভাবে প্রকাশ লাভের সুযোগই পায়নি বলা চলে।

আবূ জা'ফর হারূনুর রশীদ ইব্‌ন মাহ্‌দী

আবূ জা'ফর হারূনুর রশীদ ইব্‌ন মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ১৪৮ হিজরীতে (৭৬৫-৬৬ খ্রি) রায় নামক স্থানে খায়যুরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এর এক সপ্তাহ পূর্বে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের পুত্র ফাদল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ম হয়েছিল। হারূনের মা খায়যুরান ফযলকে এবং ফযলের মা হারূনকে স্তন্য দান করেছিলেন। হারূনুর রশীদ ১৭০ হিজরীর (৭৮৬ খ্রি অক্টোবর) ১৪ই রবিউল আউয়াল রবিবার

রাতে আপন ভ্রাতার মৃত্যুর সাথে সাথে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঐ রাতেই তাঁর পুত্র মামূনের জন্ম হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা যে, একই রাতে এক খলীফার মৃত্যু হলো, দ্বিতীয় খলীফা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন এবং তৃতীয় খলীফা জন্মগ্রহণ করলেন। হারূনের পৈতৃক নাম ছিল আবূ মূসা। কিন্তু পরবর্তীতে তা আবূ জা'ফর হয়ে যায়। হারূনুর রশীদ ছিলেন দীর্ঘাকৃতির ও সুন্দর চেহারার অধিকারী একজন সুপুরুষ।

হারূনুর রশীদ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ বারমাককে নিজের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁর হাতে মন্ত্রীত্বের সাথে সাথে 'খাতামে খিলাফত' (খলীফার মোহর) অর্পণ করে তাঁকে রাষ্ট্রের যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। খায়যুরান, যিনি হাদীর যুগে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিলেন, এবার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ইয়াহ্ইয়া এবং খায়যুরানকে প্রশাসনিক অধিকার প্রদানের অর্থ এই নয় যে, হারূনুর রশীদ স্বয়ং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতেন। বরং এই অধিকার প্রদান দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহ্ইয়া ও খায়যুরানের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা তিনি ওদেরকে তাঁর সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ওদের প্রতিটি পরামর্শ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। ইয়াহ্ইয়ার সাথে পরামর্শ না করে তিনি কোন কাজই করতেন না। বাইশ-তেইশ বছরের একজন তরুণ খলীফার এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় যে, তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদে এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন, যিনি ঐ যুগের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপযুক্ত এবং যথার্থ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিযুক্তি-পদচ্যুতি ও রদবদলের নিয়ম-কানুন পূর্বের চাইতে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয উমরীকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে তার স্থলে ইসহাক ইব্ন সুলায়মানকে নিয়োগ করেন। আফ্রিকার গভর্নর পদে রাওহ্ ইব্ন হাতিমকে পাঠানো হয়। হারূন জাযীরা ও কিন্নাসরীন থেকে সীমান্ত এলাকাসমূহ আলাদা করে নিয়ে 'আওয়াসিম' নামে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন। খিলাফতের প্রথম বছরে হজ্জ মওসুমে তিনি হজ্জ করতে যান। ঐ সময়ে তিনি মক্কা মদীনার সর্বত্রই অপূর্ব বদান্যতা প্রদর্শন করেন।

১৭১ হিজরীতে (৭৮৭-৮৮ খ্রি) হারূন বনূ তাগলিবের যাকাত আদায় করার জন্য রাওহ্ ইব্ন সালিহ্ হামাদানীকে নিয়োগ করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার এবং বনূ তাগলিবের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তিনি বনূ তাগলিবকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বনূ তাগলিব রাতের বেলা আকস্মিক হামলা চালিয়ে রাওহ্কে হত্যা করে।

ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হাদীর খিলাফত আমলে 'ফাখ'-এর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বার্বারদের মধ্যে আপন 'ইমামত'-এর দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং ১৭২ হিজরীতে

(৭৮৮-৮৯ খ্রি) দালীলাহ্ শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রকাশ্যে বায়আত গ্রহণ করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি মরক্কোয় একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এটা হচ্ছে আলাবীদের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র, যা মরক্কোয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মরক্কো ইসলামী বিশ্ব তথা খিলাফতে ইসলামিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায়। হারূন এই সংবাদ পেয়ে ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহকে হত্যা করার সংকল্প নেন এবং এ উদ্দেশ্যে আপন গোলাম সুলায়মান ইব্ন জাবীর ওরফে শাম্মাখকে মরক্কোতে প্রেরণ করেন। শাম্মাখ সেখানে পৌঁছে ইদরীস ইব্ন আবদুল্লাহ্র হাতে বায়আত করে। সে ইদরীসের সামনে রাতদিন হারূনের বিরূপ সমালোচনা করত। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ইদরীসের আপন জনে পরিণত হয়। এরপর সুযোগ পেয়ে ১৭৭ হিজরীতে (৭৯৩-৯৪ খ্রি) বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইদরীসকে হত্যা করে সে বিজয়ী বেশে বাগদাদে ফিরে আসে। কিন্তু ইদরীস যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মৃত্যুর পর তার কোন এক দাসীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বার্বাররা ঐ নবজাতকের নামও ইদরীস রাখে। এরপর তাকেই নিজেদের ইমাম মনোনীত করে। ইদরীসী সাম্রাজ্য সম্পর্কে আগামীতে আলোচনা করা হবে। কিছুদিন পর তিউনিসিয়া এলাকায়ও একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উপর খিলাফতে আব্বাসীয়ার নামমাত্র কর্তৃত্ব বাকি থাকে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পশ্চিমা দেশগুলো ধীরে ধীরে আব্বাসী আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

১৭৩ হিজরীতে (৭৮৯-৯০ খ্রি) বসরার গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের মৃত্যু হয়। হারূন তার যাবতীয় ধনসম্পদ আটক করে বায়তুলমালে দাখিল করে নেন। তিনি ইসহাক ইব্ন সুলায়মানকে সিন্ধু ও মাকরানের শাসনকর্তা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর পুত্র ইউসুফকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করেন।

আমীনের অলীআহ্দী (যৌবরাজ্য)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হারূনুর রশীদের খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তে হিজরী ১৭০ সনে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) তাঁর পুত্র মামুনূর রশীদ জন্মগ্রহণ করেন। মামুনূর রশীদের জন্ম হয় মারজিল নাম্নী অগ্নিউপাসক বংশোদ্ভূত এক দাসীর গর্ভে। ঐ বছরই অর্থাৎ হিজরী ১৭০ সনে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) হারূনের দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ আমীন বেগম যুবায়দা বিন্ত জা'ফর ইব্ন মানসূরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আমীনের শিক্ষাগুরু ছিলেন ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন বারমাক, আর মামুনের শিক্ষাগুরু ছিলেন ফযলের ভাই জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া। ফযলের আকাঙ্ক্ষা ছিল, হারূনুর রশীদ যেন আপন পুত্র আমীনকে অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। অপর দিকে জা'ফর চেষ্টা করেছিলেন যেন মামুনই অলীআহ্দ নিযুক্ত হন। যেহেতু আমীন হাশিমী বংশের মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যেহেতু ফযল এবং বেগম যুবায়দাও তাকে অলীআহ্দ করার ব্যাপারে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এবং যেহেতু বেগম যুবায়দা ছিলেন হারূনের প্রিয়তমা মহিষী, তাই হিজরী ১৭৫ সনে (৭৯১-৯২ খ্রি) যখন আমীনের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, হারূনুর রশীদ জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর (আমীনের) অলীআহ্দীর বায়আত গ্রহণ করেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানের পুত্রদ্বয় এবং মুহাম্মদ মাহ্দী ওরফে নাফসে যাকিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ইদরীস ও ইয়াহ্ইয়া 'ফাখ' যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ইদরীস পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে এক সময় মরক্কো দখল করে নেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ দায়লামে খিলাফতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জনসাধারণ চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর হাতে বায়আত করতে থাকে। ফলে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। হারূন এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী ইয়াহ্ইয়ার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। সেই সাথে তিনি ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে জুরজান, তাবারিস্তান, রায় প্রভৃতি অঞ্চলের গভর্নরও নিয়োগ করেন। ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে তালিবানে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে বর্তমান খলীফার মাহাত্ম্য ও শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য তিনি ইয়াহ্ইয়াকে আহ্বান জানান এবং সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে পুরস্কার ও জায়গীর প্রদানের আশ্বাস দেন। উত্তরে ইয়াহ্ইয়া লিখেন, আমি এই শর্তে সন্ধি করতে রাযী আছি যে, হারূনুর রশীদ নিজ হাতে সন্ধিপত্র লিখবেন। এরপর তার উপর ফকীহ্ ও কাযীবৃন্দ এবং বনূ হাশিমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দান করবেন। ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আগাগোড়া পরিস্থিতি সম্পর্কে হারূনুর রশীদকে অবহিত করেন। এতে হারূন খুবই সন্তুষ্ট হন এবং নিজ হাতে সন্ধিপত্র লিখে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী তাতে বিভিন্ন জনের দস্তখত নিয়ে বেশ কিছু উপহার-উপঢৌকনসহ ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার মাধ্যমে তা ইয়াহ্ইয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর ইয়াহ্ইয়া এবং ফযল উভয়ই বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সন্ধি উপলক্ষে দায়লামের শাসনকর্তাকেও যিনি আপন দুর্গে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও প্রদান করেছিলেন— দশ লক্ষ দিরহাম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে সন্ধি করতে অনুপ্রাণিত করবেন। অতএব এই অর্থও (সংশ্লিষ্ট) শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইয়াহ্ইয়া এবং ফযল বাগদাদে পৌঁছলে হারূন ইয়াহ্ইয়ার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন, সহৃদয়তার সাথে তাকে গ্রহণ করেন এবং অনেক উপহারসামগ্রীসহ তাকে মূল্যবান জায়গীরও প্রদান করেন। নির্বিঘ্নে এই কাজ আনজাম দেওয়ায় খলীফার কাছে ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। এরপর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর দেখাশুনার দায়িত্ব ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার হাতে অর্পণ করা হয়। অতএব তিনি ফযল ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার দেখাশুনায় বাগদাদেই অত্যন্ত আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন।

১৭৬ হিজরীতে (৭৯২-৯৩ খ্রি) হারূনুর রশীদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের গভর্নর মূসা ইব্ন ঈসা 'আলাবী দাওয়াতে' প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন এবং আব্বাসী খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। হারূন মিসরের গভর্নর পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার

হাতে অর্পণ করেন। জা'ফর মিসরের গভর্নর পদের জন্য উমর ইব্‌ন মিহরান (পৈতৃক নাম আবূ হাফসী)কে মনোনীত করেন। কিন্তু উমর এই শর্তে সে পদ গ্রহণ করেন যে, যখন তিনি মিসরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করে ফেলবেন এবং সেখানকার যাবতীয় কর আদায় করে তা সরকারী কোষাগারে দাখিল করে নেবেন তখন সেখান থেকে ফিরে আসার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার থাকবে। অন্য কথায়, তিনি যখন ইচ্ছা মিসর থেকে চলে আসতে পারবেন, এজন্য পূর্বাহ্নে খলীফার অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন হবে না। হারূনুর রশীদ এই শর্ত গ্রহণ করে উমর ইব্‌ন মিহরানকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। উমর মিসরে পৌঁছে মূসা ইব্‌ন ঈসার কাছ থেকে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই জনসাধারণের কাছ থেকে সমগ্র বকেয়া কর আদায় করে বাগদাদ ফিরে আসেন। এবার হারূন ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মানকে গভর্নর নিয়োগ করে মিসরে প্রেরণ করেন।

সিরিয়ার বিশৃঙ্খলা দমন

সিরিয়ায় সাফ্‌ফারিয়া ও ইয়ামানিয়া এই দুই গোত্রের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ চলছিল তা হিজরী ১৭৬ সনে (৭৯২-৯৩ খ্রি) ভয়ানক আকার ধারণ করে। দামিশকের গভর্নর আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী এই গৃহযুদ্ধ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় হারূনুর রশীদ তাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে ইবরাহীম ইব্‌ন সালিহকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি গোপনে ইয়ামানিয়া গোত্রকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এর ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐ বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হয়নি এবং এই সুযোগে 'মুদার' গোত্রের লোকেরা দামিশক কবজা করে নিয়ে বেশ কয়েক বারই দামিশকের গভর্নরকে বেদখল করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হারূনুর রশীদ জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং হিজরী ১৮০ সনে (৭৯৬-৯৭ খ্রি) তিনি ঐ বিশৃঙ্খলা দমন করে রাজধানী বাগদাদে ফিরে আসেন।

ঐ বছরই অর্থাৎ হিজরী ১৭৬ সনে (৭৯২-৯৩ খ্রি) 'সায়িফা' (গ্রীষ্মকালীন) বাহিনীর অধিনায়ক আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ রোমান শহর 'দীসা' দখল করেন এবং রোমান বাহিনীকে কয়েক দফা পরাজিত করেন।

আত্তাব ইব্‌ন সুফ্‌য়ানের বিদ্রোহ

১৭৭ হিজরীতে (৭৯৩-৯৪ খ্রি) আত্তাব ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আযদী বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাওসিল ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ দখল করে নেন এবং তথাকার গভর্নরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে কর আদায় করতে থাকেন। এই অবস্থার কথা জানতে পেরে খোদ হারূন বাগদাদ থেকে সৈন্য নিয়ে মাওসিল অভিমুকে রওয়ানা হন। আত্তাব তখন আর্মেনিয়ায় পালিয়ে যান। হারূন মাওসিলের নগরপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর যখন শুনতে পান যে, মিসর এবং খুরাসানেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদে ফিরে আসেন। আত্তাব আর্মেনিয়া থেকে রিক্কা শহরে ফিরে আসেন এবং সেখানে অধিবাস গ্রহণ করে নিভৃতে জীবন যাপন করতে থাকেন। ঐ বছরই আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন হুমায়দ সালাবী রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে ঠিকমত শায়েস্তা করে নিজের কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

মিসরে বিদ্রোহ

১৭৭ হিজরীর (৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে) শেষ দিকে বাগদাদে সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরে কোন একটি গোত্র বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তথাকার গভর্নর ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান সেই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪-৯৫ খ্রি) এক মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা ইসহাককে পরাজিত করে। ঐ সময়ে হারছামা ইব্‌ন আমীন ফিলিস্তীনের কর্মকর্তা ছিলেন। হারূনুর রশীদ হারছামাকে লিখেন ঃ তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে মিসরে যাও এবং সেখানকার বিদ্রোহ দমন কর। হারছামা মিসর গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহীদের পরাজিত ও আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। হারূনুর রশীদ তাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু মাত্র এক মাস পর তাকে বরখাস্ত করে তার স্থলে আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্‌কে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন।

খারিজীদের বিশৃঙ্খলা

যে যুগে মিসর, সিরিয়া, মাওসিল প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ চলছিল তখন কায়স ইব্‌ন সালাবার মুক্তদাস হুসাইন খারিজীও বিদ্রোহ ঘোষণা করে খুরাসানের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তথাকার গভর্নর খালিদ ইব্‌ন আতা কিনদী দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে সীস্তানের কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি উছমান ইব্‌ন আম্মারাকে হুসাইন খারিজীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু হুসাইন মাত্র ছয়শ সৈন্য নিয়ে বার হাজার সৈন্যের ঐ বাহিনীকে পরাজিত করে এবং সেখানে উপর্যুপরি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। বার বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতি যুদ্ধেই হুসাইন খুরাসানস্থ সরকারী বাহিনীকে পরাজিত করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮ হিজরীতে হুসাইন খারিজী নিহত হলে খুরাসানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪-৯৫ খ্রি) যুফার ইব্‌ন আসিম রোমানদের উপর হামলা চালান।

১৭৯ হিজরীর রমযান (৭৯৬ খ্রি ডিসেম্বর) মাসে খলীফা হারূনুর রশীদ উমরা পালন করেন এবং একই ইহরামে হজ্জও আদায় করেন। তিনি মক্কা থেকে আরাফা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। ঐ বছরের ৭ই রবিউস সানী হযরত ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং একই বছরে অর্থাৎ ১৭৯ হিজরী সনের যিলকদ (৭৯৬ খ্রি ফেব্রুয়ারি) মাসে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পুত্র হাম্মাদও ইনতিকাল করেন।

১৮০ হিজরীতে (৭৯৬-৯৭ খ্রি) তুর্কী ও মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মাওরাউন নাহরে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং খুরাসানের গভর্নর পদে নিয়োগ করা হয় আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন হাসানকে। এই নিযুক্তি হারূনুর রশীদের প্রধানমন্ত্রী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ বারমাকের মনঃপূত হয়নি। তিনি আলী ইব্‌ন ঈসার কঠোর স্বভাবের প্রতি হারূনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে ইয়াহ্‌ইয়ার কোন পরামর্শ গ্রহণ না করে তাকে খুরাসানে প্রেরণ করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ স্বভাবতই এ কথা পছন্দ করছিলেন না যে, একদা তার পূর্বপুরুষদের বাসভূমি খুরাসানের অধিবাসীদের উপর কোন জুলুম-নির্যাতন চালানো হোক। অপর দিকে খুরাসানের নিত্যদিনের বিদ্রোহ হারূনকে বাধ্য করেছিল যেন তিনি কোন কঠোর স্বভাবের লোককে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬-৯৭ খ্রি) ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার মীনার ভেঙ্গে পড়ে। ঐ বছরই

স্পেনের সুলতান হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র সুলতান আল-হাকাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বছরই আরবী ব্যাকরণ (নাহু) শাস্ত্রের ইমাম আবূ বাশার আমর ইব্‌ন উছমান মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর উপাধি ছিল সীবাওয়ায়হ। তিনি পারস্য অঞ্চলের 'বায়যা' নগরীর অধিবাসী ছিলেন।

১৮১ হিজরীতে (৭৯৭-৯৮ খ্রি) স্বয়ং খলীফা হারূনুর রশীদ রোমানদের উপর হামলা চালান এবং অস্ত্রবলে 'সাফসাফ' দুর্গ দখল করেন। ঐ বছর আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ আংকারা পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। ঐ বছরই রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে একটি সন্ধি হয়। এটাই ছিল রোমানদের সাথে আব্বাসী শাসকদের সর্বপ্রথম সন্ধি। তারসূস থেকে ১২ ফারাসাং দূরত্বে অবস্থিত লামস নামক স্থানে উলামা, সালতানাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং সেই সাথে সীমান্তের অধিবাসীবৃন্দ একত্রিত হয়। তারসূসের শাসনকর্তাও আসেন। এরপর হারূনুর রশীদের পুত্র কাসিম ওরফে মু'তামিনের ব্যবস্থাপনায় একটি জাঁকজমকপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রোমানরা মুসলমান কয়েদীদেরকে, যাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার সাতশ, মজলিসে এনে হাযির করে। মু'তামিন তাদের বিনিময়ে ঈসায়ী বন্দীদেরকে ফেরত দেন। ঐ বছরই হারছামা ইব্‌ন আইউন আফ্রিকিয়ার গভর্নরের পদে ইস্তফা দিয়ে বাগদাদে চলে আসেন। হারূনুর রশীদ তাকে তার রাজকীয় বাহিনীর অধিনায়ক এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে আফ্রিকিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন।

মামূনের অলীআহ্‌দী

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হারূনুর রশীদ ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি) আপন পুত্র আমীন ইব্‌ন বেগম যুবায়দাকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন। ঐ সময় আমীন ও মামূন উভয়েরই বয়স ছিল পাঁচ বছর। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান শাসক এত অল্প বয়স্ক কাউকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেননি। এবার ১৮২ হিজরীতে (৭৯৮-৯৯ খ্রি) হারূন নিজের অপর পুত্র মামূন ইব্‌ন মারাজিলকে (যখন তাঁর বয়স বার বছর) দ্বিতীয় অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন। অর্থাৎ জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেন যে, আমীনের পর মামূন খিলাফতের অধিকারী হবে। মামূনের প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ্ এবং আমীনের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। হারূন মুহাম্মদকে ১৭৫ হিজরীতে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করাকালে তাঁর উপাধি দেন আমীন। এবার যখন আবদুল্লাহকে দ্বিতীয় অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন তখন তাঁর উপাধি দেন মামূন এবং তাঁকে খুরাসান ও এতদসংশ্লিষ্ট এলাকা তথা হামাদান পর্যন্ত সমগ্র এলাকার গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর হারূন খুরাসানের গভর্নর ঈসা ইব্‌ন আলীকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে মামূনের পক্ষ থেকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮২ হিজরীর ২৭শে রজব (৭৯৯ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে ইমাম আবূ হানীফার স্বনামধন্য শাগরিদ বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ইয়াকূব ওরফে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইনতিকাল করেন।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাসাঈ ও হামযা খারিজীর বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈসা ইব্‌ন আলী মামুনূর রশীদের অলীআহ্‌দীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে যখন বাগদাদে আসেন তখন আবূ খাসীব ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ নাসাঈ বিদ্রোহ

ঘোষণা করে খুরাসানে লুটপাট শুরু করে দেন। ঈসা ইব্‌ন আলী খুরাসানে ফিরে গিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলে ওয়াহ্‌ব ভীত হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং তিনি নিভৃত জীবন যাপন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এ ঘটনার পরই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, হামযা ইব্‌ন আতরাক খারিজী বাদগীস অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শহরের পর শহর দখল করে নিচ্ছে। আমরাবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ তখন হেরাতের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে হামযার উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ঐ সংঘর্ষে আমরাবিয়া পরাজিত হয়। হামযা তার অনেক অশ্বারোহীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঐ সংঘর্ষে আমরাবিয়াও ঘোড়ার খুরের আঘাতে মারা যায়। এই খবর শুনে আলী ইব্‌ন ঈসা আপন পুত্র হাসানকে দশ হাজার সৈন্যসহ হামযার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি হামযার মুকাবিলা করেন নি। এরপর আলী আপন দ্বিতীয় পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তাতে হামযা ঈসা ইব্‌ন আলীকে পরাজিত করে। আলী ইব্‌ন ঈসা পুনরায় ঈসা ইব্‌ন আলীকে আর একটি সজীব বাহিনী দিয়ে হামযার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। নিশাপুর নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে হামযা পরাজিত হয়ে কাহকিস্থানের দিকে চলে যায়। তখন ঈসা ইব্‌ন আলী আদাক, জবায়ন এবং ঐ সমস্ত পল্লী এলাকায় আপন সৈন্যদেরকে প্রেরণ করেন, যেখানকার লোকেরা হামযাকে সাহায্য করেছিল। সৈন্যরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খারিজীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করে এবং এতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক নিহত হয়। এরপর ঈসা মালে গনীমত একত্র করার জন্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস নাসাফীকে যারানজ নামক স্থানে রেখে স্বয়ং কাবুল ও যাবিলিস্তানের দিকে এগিয়ে যান। আবূ খাসীব ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ, যিনি নিরাপত্তা প্রার্থনা করে নাসা শহরে নিভৃত জীবন যাপন করেছিলেন, এবার শূন্য মাঠ পেয়ে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহীকে সমবেত করে নাসা, তূস, আজীওয়ার্দ ও নিশাপুর দখল করে নেন। অপরদিকে হামযা আপন ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রাম-পল্লী ও রাস্তাঘাটে লুটপাট চালাতে থাকে। মোটকথা, হামযা এবং ওয়াহ্‌ব চার বছর পর্যন্ত আলী ইব্‌ন ঈসা এবং তার সঙ্গীদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ঐ সময়কালে আবূ খাসীব কখনো কখনো মার্ভও অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৬ হিজরীতে (৮০২ খ্রি) ওয়াহ্‌বকে হত্যা করার পর খুরাসানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে, তবে আলী ইব্‌ন ঈসা খুরাসানবাসীদের উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে দেন।

ঐ বছরই হিজরী ১৮৬ হিজরী সনে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ 'সায়েফা' বাহিনীর সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঐ সময়ে সম্রাট কনস্টানটাইনের মৃত্যু হলে রোমানরা তার মাতা রানী রুইবীকে 'আতশা' উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসায়। কনসটান্টিনোপলের রাজদরবারে হারূনুর রশীদের যে প্রভাব ইতিপূর্বে পড়েছিল তারই ফলে ঐ রোমান রানী মুসলিম অধিনায়কদের কাছে পয়গামের পর পয়গাম পাঠিয়ে তাদেরকে তার সাথে সন্ধি স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন ফ্রান্সের সম্রাট শার্লামেন ইতালী জয় করে এবং পশ্চিম রূমের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে কনসটান্টিনোপল সাম্রাজ্যের উপর তার আগ্রাসী থাবা বিস্তার করতে চাচ্ছিলেন। তাই ঐ রোমান রানী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে জিয়্‌য়া প্রদানে সম্মত হয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেন এবং নিজেকে পশ্চিমা হামলা মুকাবিলা করার মত যোগ্য করে তোলেন।

আর্মেনিয়া প্রদেশে বিশৃঙ্খলা

১৮৩ হিজরীতে (৭৯২-৯৩ খ্রি) খাযার-এর বাদশা খাকানের মেয়েকে ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বারাআ নামক স্থানে পৌছার পর ঘটনাচক্রে মেয়েটি মারা যায়। অথচ তার সঙ্গীরা সেখান থেকে খাযায় ফিরে গিয়ে তার পিতাকে বলে, মুসলমানরা চক্রান্ত করে তাকে মেরে ফেলেছে। খাকান এ কথা শুনে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বাবুল আবওয়ারে' বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আর্মেনিয়া প্রদেশের কর্মকর্তা সাঈদ ইব্‌ন মুসলিম তার সাথে মুকাবিলা করতে পারেননি। খাকান আর্মেনিয়া প্রদেশে প্রায় একলক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুসহ হাজার হাজার মুসলমানকে ধরে নিয়ে তাদের উপর এমন অমানুষিক নির্যাতন চালান, যার বিবরণ শুনলেও শরীর শিউরে ওঠে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। খলীফা হারূনুর রশীদ ইয়াযীদ ইব্‌ন সাঈদকে আর্মেনিয়া প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে তিনি আযারবায়জান প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। এবার আর্মেনিয়া প্রদেশের শাসনভারও তার উপর ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে খুযায়মা ইব্‌ন খাযিমকে আর্মেনিয়াবাসীদের সাহায্যের জন্য নাসিবাইনে মোতায়েন করা হয়। ইয়াযীদ ও খুযায়মার বাহিনী আর্মেনিয়া সীমান্তে প্রবেশ করতেই খাযারবাসীরা আর্মেনিয়া ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনী সেখানে পুনরায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

হারূনুর রশীদ ইমাম মূসা কাযিম ইব্‌ন ইমাম জা'ফর সাদিককে সতর্কতামূলকভাবে বাগদাদে বসবাস করতে বাধ্য করেছিলেন। আলাবীদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি তাঁকে বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি দিতেন না। ঐ বছর অর্থাৎ ১৮৩ হিজরী ২৫শে রজব (৮০০ খ্রি আগস্ট) শুক্রবার ইমাম মূসা কাযিম ইনতিকাল করেন এবং বাগদাদেই সমাধিস্থ হন। শিয়ারা তাকে তাদের সপ্তম ইমাম বলে মান্য করে। বাগদাদে তাঁর এবং ইমাম মুহাম্মদ তাকীর কবর 'কাযিমায়ন' নামে খ্যাত একটি গম্বুজের নিচে রয়েছে।

ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ও আব্বাসীয়া নগরী

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হারছামা ইব্‌ন আইউন ইফ্রিকিয়া প্রদেশের গভর্নর পদ থেকে ইস্তফাদানের পর হারূনুর রশীদ তার স্থলে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল ইব্‌ন হাকীমকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন হারূনুর রশীদের দুধ ভাই। তিনি আপন কর্মস্থলে গিয়ে ইফ্রিকিয়াবাসীদের বিদ্রোহ দমন করেন। ইফ্রিকিয়া থেকে হারছামা ইব্‌ন আইউনের চলে আসার সাথে সাথে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার সাথে ইফ্রিকিয়াবাসীদের আনুগত্য অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত লোক তার শক্তি ও প্রভাব লক্ষ্য করে বাহ্যিকভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। ভিতরে ভিতরে তারা তাঁর অবাধ্য ছিল এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদের এই অবাধ্যতার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তারা 'যার' রাজ্যের গভর্নর ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কাছ থেকে সব সময় কুপরামর্শ গ্রহণ করত। বিদ্রোহীদের নেতার সাথে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের গোপন যোগাযোগ ছিল এবং তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্যও করতেন। সব সময় বিদ্রোহ লেগে

থাকার কারণে ইফ্রিকিয়া প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, শুধু সেখানকার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য মিসরের অর্থ ভাণ্ডার থেকে বার্ষিক একলক্ষ দিরহাম ঋণ গ্রহণ করতে হতো। অন্যথায় সেখানে ইসলামী হুকুমত টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। অন্যকথায় বলতে গেলে, ইফ্রিকিয়া প্রদেশ থেকে বার্ষিক খারাজ পাওয়া তো দূরের কথা, অন্য এলাকার খারাজ থেকেই সেখানে বার্ষিক একলক্ষ দিরহাম ব্যয় করতে হতো। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল যদিও সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু মিসরের কোষাগার থেকে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো তা পরবর্তীতেও যথারীতি অব্যাহত থাকে। এবার ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আবেদন জানান, আমাকে ইফ্রিকিয়া প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করুন। তাহলে আমি বার্ষিক একলক্ষ দিরহাম মিসরের খারাজ থেকে গ্রহণ করব না, বরং খারাজ স্বরূপ সেখান থেকে বার্ষিক চার লক্ষ দিরহাম খলীফার কোষাগারে পাঠাতেও সক্ষম হব। হারূনুর রশীদ এ ব্যাপারে তার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হারছামা ইব্‌ন আইউন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইবরাহীমকে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিয়োগের মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই। অতএব ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) হারূনুর রশীদ তার কাছে গভর্নরের নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেন। ইবরাহীম ইফ্রিকিয়া পৌঁছতেই সেখানকার ঐ সমস্ত বিদ্রোহী নেতাকে বেছে বেছে গ্রেফতার করেন, যাদের সাথে তার খুব জানাশোনা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এরপর তাদেরকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। ফলে সেখানকার গণ্ডগোল একেবারে থেমে যায়। এরপর তিনি কায়রাওয়ানের কাছে আব্বাসীয়া নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন এবং সেটাকেই রাজধানী শহর ঘোষণা দেন। এরপর সেখানেই তাঁর বংশধররা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) হারূনুর রশীদ হাম্মাদ বার্বারীকে ইয়ামান ও মক্কা, দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে সিন্ধুর, ইয়াহ্‌ইয়া হুরায়শকে কুহিস্তানের এবং মিহরাবিয়া রাযীকে তাবারিস্তানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৮৫ হিজরীতে (৮০১ খ্রি) তাবারিস্তানবাসীরা আক্রমণ চালিয়ে মিহরাবিয়াকে হত্যা করলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ হুরায়সীকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ঐ বছরই আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর ইনতিকাল করলে তার স্থলে তারই পুত্র আসাদকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

১৮৬ হিজরীতে (৮০২ খ্রি) যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, আলী ইব্‌ন ঈসা খুরাসানের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ঐ সময়ে ওয়াহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাসাঈ মারা যান। আলী ইব্‌ন ঈসা বেশিদিন স্বস্তিতে কাটাতে পারেননি। কেননা খুরাসানবাসীরা তার বিরুদ্ধে দরবারে খিলাফতে প্রচুর অভিযোগপত্র পাঠাতে থাকে। তিনি খুরাসানের গভর্নর পদে থাকুন, এটা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ পছন্দ করতেন না। এ কারণেই ইয়াহ্‌ইয়ার দুই পুত্র মূসা ও মুহাম্মদ (খুরাসানবাসীদের উপর যাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল) ওয়াহ্‌ব ইবন আবদুল্লাহ্ এবং হামযা খারিজীকে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করেন এবং তাদেরই গোপন চেষ্টার ফলে খুরাসানে কয়েক বছর পর্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। ঐ সময় ইয়াহ্‌ইয়া ও জা'ফর খলীফা হারূনুর রশীদকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি আলী

ইব্‌ন ঈসাকে খুরাসান থেকে অপসারণ করেন। কিন্তু হারূনুর রশীদ তাঁদের কথায় কান দেননি। এবার যখন খুরাসানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয় তখন শুরু হয় কাগজী যুদ্ধ। অর্থাৎ বারমাকীদের আন্দোলনের ফলে খুরাসানীরা আলীর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগপত্র খলীফার দরবারে পাঠাতে শুরু করে। যখন এই সব অভিযোগপত্রের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ অভিযোগও আসতে থাকে যে, আলী শুধু জনসাধারণের উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করছেন না, বরং খিলাফতের আসন উলটপালট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত রয়েছেন– তখন হারূনুর রশীদ বাধ্য হয়ে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে 'রায়' নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। আলী ইব্‌ন ঈসা খলীফার আগমন-সংবাদ পেয়ে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে মার্ভ থেকে রায়-এ আসেন এবং খলীফার খিদমতে হাযির হয়ে তার কাছে যথারীতি স্বীয় আনুগত্য প্রকাশ করেন। হারূন সন্তুষ্ট হয়ে তাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং সেই সাথে রায়, তাবারিস্থানে, নিহাওয়ান, তূমাস ওহামাদানের শাসনকর্তৃত্বও তার হাতে অর্পণ করেন।

মূতামিনের অলীআহ্‌দী

১৮৬ হিজরী (৮০২ খ্রি) হারূনুর রশীদ আপন তৃতীয় পুত্র কাসিমকে তৃতীয় অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন। অর্থাৎ জনসাধারণের কাছ থেকে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেন যে, মামূনের পর কাসিম খিলাফতের অধিকারী হবে। এই উপলক্ষে কাসিমকে মূ'তামিন উপাধি প্রদান করা হয়। তবে মুতামিনকে অলীআহ্‌দ নিয়োগ করার পর বায়আত গ্রহণকালে এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, যদি অন্যথায় যোগ্য হয় তবেই মামূনের স্থলাভিষিক্ত হবে– অন্যথায় মামূনের এই অধিকার থাকবে যে, সে মূতামিনকে অলীআহদী থেকে বঞ্চিত করে আপন পছন্দ মত যে কোন লোককে তার অলীআহ্‌দ নিয়োগ করবে। হারূনুর রশীদ প্রথম অলীআহ্‌দ অর্থাৎ আমীনকে ইরাক, সিরিয়া ও আরব দেশগুলোর শাসনকর্তা, দ্বিতীয় অলীআহ্‌দ মামূনকে প্রাচ্যদেশসমূহের শাসনকর্তা এবং তৃতীয় অলীআহ্‌দ মূতামিনকে সাগূর দ্বীপ ও আওয়াসিম প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর তিনি আমীনের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নেন। তাতে লেখা ছিল– 'আমি মামূনের সাথে আমার অঙ্গীকার পালন করব।' অনুরূপভাবে তিনি মামূনের কাছ থেকেও একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নেন। তাতে লেখা ছিল– 'আমি আমীনের সাথে আমার অঙ্গীকার পালন করব।' এরপর এই অঙ্গীকার পত্রগুলোর উপর প্রখ্যাত উলামা-মাশায়েখ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, দরবারে খিলাফতের আমীর-ওমরাবৃন্দ এবং মক্কা ও মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দের স্বাক্ষর নিয়ে তা কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তিনি এই মর্মেও তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন, যে পুত্রকে তিনি যে এলাকা দিয়েছেন তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকবে এবং কখনো অন্য ভাইয়ের এলাকা দখল করার চেষ্টা করবে না। উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী প্রথমে আমীন খলীফা হবেন এবং মামূন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবেন। তবে আমীন মামূনকে ঐ সমস্ত প্রদেশ বা অঞ্চলের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে পারবেন না, যেগুলো হারূন তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমীনের পর মামূন খলীফা হবেন এবং মামূনের পর মূতামিন। এইসব বিষয় উল্লিখিত অঙ্গীকার পত্রে পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার উপর আমীন, মামূন, মুতামিন সকলেই স্বাক্ষর করেন এবং

তা কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এভাবে পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করে হারূনুর রশীদ ভবিষ্যতের খিলাফতকেন্দ্রিক ঝগড়াবিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তবে এটা তাঁর কোন বিজ্ঞতাসুলভ পদক্ষেপ ছিল না। খুব সম্ভবত সন্তানবাৎসল্যের কারণে তিনি এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বা এমন একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, যার সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দেহমুক্ত ছিলেন না।

হারূনুর রশীদের স্মরণীয় একটি হজ্জ পালন

হারূনুর রশীদ হজ্জ পালনে খুব আগ্রহী ছিলেন। সাংঘাতিক কোন অসুবিধা দেখা না দিলে তিনি অবশ্যই হজ্জ পালন করতেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি একটি নিয়ম কড়াকড়িভাবে পালন করতেন। তা হলো, এক বছর কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং অন্য বছর হজ্জ পালন করা। তাঁর মত কোন খলীফাই এত বেশি সংখ্যক হজ্জ পালন করেননি। তবে তাঁর ১৮৬ হিজরীর (৮০২ খ্রি) হজ্জটি হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এই হজ্জের সময় কা'বা ঘরের দেওয়ালে উল্লিখিত অঙ্গীকার পত্রটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই হজ্জ পালন শেষ করেই তিনি বারমাকী পরিবারের ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে দেন। হারূনুর রশীদ হজ্জের নিয়তে আন্‌বার থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে তার তিন পুত্র আমীন, মামূন ও মূতামিন ছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াও তাঁর সাথে ছিলেন। হজ্জ পালন সমাপ্ত করে তিনি মদীনায় যান। তিনি মক্কা ও মদীনাবাসীদেরকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনি এবং তার পুত্রগণ মোট এক কোটি পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন। মদীনা থেকে ফিরে এসে তিনি আম্বর নামক স্থানে অবস্থান নেন এবং সেখানেই ১৮৭ হিজরীর মুহাররম (৮০৩ খ্রি জানুয়ারি) মাসের শেষ দিনে জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীকে হত্যা করেন।

বারমাকীদের পতন

হারূনুর রশীদের খিলাফতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা হিজরী ১৮৭ সনে (৮০৩ খ্রি) পৌঁছে গেছি। এই বছরেরই প্রথম মাসে তিনি আপন মন্ত্রী জা'ফর বারমাকীকে হত্যা করেন এবং সেই সাথে তাঁর ভাই ফযল এবং পিতা ইয়াহ্‌ইয়াকে বন্দী করেন। বাদশাহ্ বা খলীফার হাতে কোন মন্ত্রীর নিহত হওয়া কোন অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। অনেক শাসকের ইতিহাসেই এ ধরনের ঘটনা পাওয়া যায়। বাদশাহদের কার্যকলাপ সাধারণত রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু বারমাকীদের পতন ও জা'ফর হত্যার মত মামুলী ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন কোন পণ্ডিতমূর্খ ঐতিহাসিক, জনসাধারণকে যেরূপ ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছেন তাতে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের খাতিরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহান সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর ও মাহমুদ গাযনাবী সম্পর্কেও এ ধরনের নানা বানোয়াট কাহিনী গড়ে নিয়ে কোন কোন পণ্ডিতমূর্খ ঐতিহাসিক মুসলমান শাসকদের যে দুর্নাম রটনার প্রয়াস পেয়েছেন তাও নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। যা হোক জা'ফর হত্যা ও বারমাকীদের পতন সম্পর্কে নিম্নে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

বারমাকী বংশ

ইরানীদের সর্বপ্রাচীন ধর্ম হচ্ছে 'মাহ্আবাদী'। এতে তারকা পূজা ছিল বেশি এবং অগ্নিপূজা ছিল কম। মাহ্আবাদের পর তাদের ধর্মকে সংস্কার করার জন্য একের পর এক অনেক সংস্কারক আসেন। এদের সকলের পর আবির্ভূত হন যরথুস্ত্র (Zarathustra)। যরথুস্ত্র যে শরীয়তের প্রচলন করেন, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন তার মূল স্বরূপ কি। আজকাল অনুসন্ধান চালিয়ে এ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো, যরথুস্ত্রের শরীয়তে অগ্নিপূজা ছিল বেশি এবং তারকাপূজা ছিল কম। যরথুস্ত্রের জীবনকালেই তার ধর্ম রাজকীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং তা ইরানের অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বীরশ্রেষ্ঠ ইসফান্দইয়ারের জয়জয়কার সে যুগেই আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব পর্যন্ত এই ধর্মের বিস্তৃতি ঘটায়। হিন্দুস্থানের তৎকালীন মহাপণ্ডিত 'সংগ্রাচাহ্' ও 'বিয়াসজী' বল্খে গিয়ে যরথুস্ত্রের হাতে বায়আত করেন এবং হিন্দুস্থানে ফিরে এসে অগ্নিপূজার পক্ষে প্রচারকার্য চালান, যার চিহ্ন এখনো হিন্দুদের 'হাভান' (বৈশ্বানর)-এর মধ্যে বিদ্যমান। বল্খই ছিল যরথুস্ত্র এবং তার একনিষ্ঠ শিষ্য সংসার ত্যাগী বাদশাহ্ লাহরাস্পের শেষ অবস্থানস্থল। বল্খের সাথে অগ্নি উপাসকদের ধর্মের ঠিক সেরূপ সম্পর্ক রয়েছে,যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেমের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের কিংবা গয়াজীর (গয়া) সাথে বৌদ্ধ ধর্মের। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ইসতাখর, সমরকন্দ, কাংড়া, করাচী ও বাবিলের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড একেবারে চুরমার করে দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল কায়ানী বংশের অগ্নিপূজারী শাসকদের বিজিত ও অধীনস্থ ভূখণ্ড। এখানে অগ্নিপূজার বহুল প্রচলন ছিল। গ্রীকদের বিজয় অভিযান শুধু কায়ানীদের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেনি, অগ্নিপূজাকেই স্তব্ধ করে দেয়। শত শত বছর পর ইরানীরা গ্রীক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং বাদশাহ প্রথম সাসান ইরানের খণ্ডিত রাজ্যসমূহকে একত্র করে পুনরায় বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের পত্তন করেন এবং সেখানে অগ্নিপূজার পুনরাবির্ভাব ঘটে। যরথুস্ত্রের জীবনকালেই চীনারা বল্খ রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই তা পূর্বের জাঁকজমক পুনরায় ফিরে পায় এবং অগ্নি-উপাসকদের কিবলা তথা কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। আলেকজান্ডারের জয়যাত্রা বল্খের জাঁকজমক নষ্ট করে দিলেও তা ছিল দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী যরথুস্ত্রীদের আশা-ভরসার স্থল। সাসানীদের শাসনামলে বল্খের জাঁকজমক পুনরায় বৃদ্ধি পায়। কাদিসিয়া ও নিহাওয়ান্দের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে যখন সাসানী সাম্রাজ্যের দম বন্ধ হয়ে আসে তখন বল্খের অগ্নিকুণ্ডের তেজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কেননা ইরানের পরাজিত সম্রাট এবং রাজদরবারের পলাতক সভাসদবৃন্দ দলে দলে বল্খ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং বল্খের 'নওবাহার' নামক অগ্নিকুণ্ডে ভগবান 'যায়দা'-এর পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ যুগে 'মাগ্-ই-আযম' বা অগ্নিপূজারীদের প্রধান পুরোহিত সমাজে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাই ইরান সম্রাটের পতন ও অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন তার অন্তরে নিশ্চয়ই এই চিন্তা জেগেছিল যে, তিনি যে ধর্মের নেতা সে ধর্মই যখন ধ্বংসের সম্মুখীন তখন তার বংশ-মর্যাদা রক্ষা পাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। অগ্নিকুণ্ডের নেতা বা মুতাওয়াল্লীকে 'মাগ' বলা হতো। আর যিনি এই

মাগদের নেতা এবং প্রদেশের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাপক ছিলেন তাকে বলা হতো 'বারমাগ'। ইরানের চারটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডের একটি ছিল 'নওবাহার'। এই অগ্নিকুণ্ড ছিল সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত। কেননা বল্‌খ ছিল লাহরাসপের বধ্যভূমি, যরথুস্ত্রের বাসভূমি এবং যরথুস্ত্রী ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এ কারণে নওবাহারের বারমাগ সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই সমগ্র ইরানীদের উর্ধ্বে ছিলেন।

৩১ হিজরীতে (৬৫১-৫২ খ্রি) মুসলমানদের জয়যাত্রা ইরানের প্রান্তরসমূহ পাড়ি দিয়ে এবং পাহাড়সমূহ ডিঙ্গিয়ে বল্‌খ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুনও চিরতরে নির্বাপিত হয়, যার মধ্যে হাজার বছর ধরে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে আসছিল। সেই সাথে স্বাভাবিকভাবে অগ্নিপূজারীদের অস্তিত্বও লোপ পায়, লোপ পায় অগ্নিকুণ্ডের প্রয়োজন, বারমাগের সম্মান ও মর্যাদা এবং তার আয়-আমদানী ও আরাম-আয়েশের উপায়-অবলম্বন। এতদসত্ত্বেও 'বারমাগ'কে তার স্বীয় উপাধিতেই সম্বোধন করা হতো। বিজয়ী আরববাসীরা 'বারমাগ'কে 'বারমাক' বলত। এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে, আরবরা নওবাহার অগ্নিকুণ্ডকে ধ্বংস করে দিয়ে অগ্নিপূজারীদের উপাসনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণে তাদেরকে বাধ্য করেছিল। কেননা মুসলমানরা যদি জবরদস্তিমূলকভাবে অগ্নিপূজারীদেরকে মুসলমান বানাত তাহলে সর্বপ্রথম মুসলমান বানাত বারমাককেই। কিন্তু তারা বারমাকের উপর আদৌ কোন জোরজবরদস্তি চালায়নি বরং অগ্নিপূজারীরাই স্বধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। আর তাদের এই ধর্ম বদলের ফলে মুসলমানরা বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে দেশের পর দেশ জয় করে এগিয়ে যায়। মুসলমানদের বল্‌খ পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ছিল ইসলামও বল্‌খ পর্যন্ত পৌঁছা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে বল্‌খের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে যায় এবং বারমাকের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বারমাক যেহেতু ধর্মীয় নেতা ছিলেন, তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। কেননা এ দেশে ইসলামের আগমনের কারণেই তিনি সব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। মুসলমানদের আগমনের পর, চীন সীমান্তের মুঘল ও তুর্কী গোত্রসমূহ যারা ইরানী জাতি বা ইরানী ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখত এবং ইরান সম্রাটের বল-বিক্রম প্রত্যক্ষ করে বল্‌খের উপর হামলা করার সাহস পেত না– বল্‌খের উপর আকস্মিক হামলা চালাতে থাকে এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের কাছে জিয্‌য়া প্রদানের অঙ্গীকার করে বল্‌খের উপর নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এরাই পরবর্তীকালে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের সামনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই মোঙ্গলরাই বল্‌খের অগ্নিপূজার যাবতীয় উপাদান নষ্ট করে দেয় এবং বারমাক পরিবারকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করে একেবারে সাধারণ লোকদের সারিতে নিয়ে দাঁড় করায়। আরবরা প্রথমবার এখানে বেশিদিন থাকতে পারেনি। এমনকি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে তারা তাদের রাষ্ট্রের সীমান্তসমূহের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেনি। ফলে বল্‌খ মুঘলদের শাসনাধীনে চলে যায়। তখন সেই বারমাক, যিনি নওবাহারের মাগ্‌ ছিলেন এবং একদা মা'জুসী সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তার পুত্র বারমাকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই উপাধিতেই সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেছেন। এই দ্বিতীয় বারমাক নওবাহারের জাঁকজমকের যুগ দেখেন নি।

৮৬ হিজরীতে (৭০৫ খ্রি.) যখন খুরাসানের গভর্নর কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম বল্‌খ আক্রমণ করেন তখন সেখানকার কিছু সংখ্যক দাসীও তার কাছে বন্দী হয়ে আসে। দ্বিতীয় বারমাকের স্ত্রীও ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমের ভাই আবদুল্লাহর ভাগে পড়েন। কিছুদিন পর বল্‌খবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হলে ঐ সমস্ত দাসী ও কয়েদীদেরকে বল্‌খে ফেরত পাঠানো হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিমও ঐ স্ত্রীলোকটিকে ফেরত দেন। বিদায়কালে স্ত্রী লোকটি আবদুল্লাহ্‌কে বলে, আমি তোমার সাথে সহবাসের ফলে ইতিমধ্যে গর্ভধারণ করেছি। যাহোক বারমাকের ওখানে পৌঁছার পর স্ত্রীলোকটি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। আর ঐ পুত্র সন্তানটিই হচ্ছেন জা'ফর বারমাকীর দাদা খালিদ। এই কাহিনীটি মনগড়া হতে পারে। যাহোক, দ্বিতীয় বারমাকের ঘরে হিজরী ৮৬ অথবা ৮৭ সনে (৭০৫ অথবা ৭০৬ খ্রি.) খালিদের জন্ম হয়। ইমাম ইবরাহীম আব্বাসী যখন আবূ মুসলিম খুরাসানীকে খুরাসানের দাঈ' (খিলাফতে আব্বাসীয়ার দিকে আহ্বানকারী)-দের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা ব্যবস্থাপক করে পাঠান তখন তিনি ৪০ বছর বয়স্ক খালিদ ইব্‌ন বারমাককেও আপনদলে টেনে নেন। আবূ মুসলিম খালিদ ইব্‌ন বারমাককে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি খালিদের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। আবূ মুসলিম যখন খুরাসানের জনৈক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আবূ সালিমা খালাল ওরফে ওযীর-ই আলে মুহাম্মদকে হত্যা করান তখন সাফ্‌ফাহকে লিখেন, আপনি খালিদ ইব্‌ন বারমাককে আপনার মন্ত্রী করে নিন। অতএব আব্বাসী বংশের প্রথম খলীফা আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ্ খালিদ ইব্‌ন বারমাককে নিজের মন্ত্রী করে নেন। সাফ্‌ফাহর মৃত্যু পর্যন্ত খালিদ তাঁর মন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। এরপর মানসূর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলে তিনিও খালিদকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। মানসূর তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই আবূ মুসলিমকে (যিনি খালিদের পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমমতাবলম্বী ছিলেন) হত্যা করেন।

কিন্তু এতে খালিদের চেহারায় বা চালচলনে কোনরূপ মালিন্য বা অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যায়নি। খালিদ তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মানসূর সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে আবূ মুসলিমকে হত্যার চার-পাঁচ মাস পর কোন একটি বিদ্রোহ দমনের বাহানায় খালিদকে বাইরে পাঠিয়ে তার জায়গায় আবূ আইউবকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন খালিদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গের আলামত লক্ষ্য করা গেল না তখন খলীফা মানসূর তার মত একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জ্ঞানীব্যক্তির উপর বিভিন্ন কাজের দায়দায়িত্ব অর্পণ করতে আর দ্বিধা করেননি। খালিদের পরবর্তী কার্যকলাপও ছিল সন্তোষজনক। যেহেতু খালিদ আবূ মুসলিমের মত একজন দুঃসাহসী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তির সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন এবং তার কাছ থেকে রাজনৈতিক ব্যাপারে হাতে-কলমে অনেক কিছু শিখেছিলেন, অধিকন্তু ইরানী জাতীয়তাবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন এবং আবূ মুসলিমের দুঃখজনক পরিণতিও স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি আবূ মুসলিমের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন, তবে মানসূরের মত চালবাজ ও ধূর্ত খলীফার কাছে নিজের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখতেও তিনি পুরোপুরি সক্ষম হন। এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে মুসলিম রাজ্যের শাসনকর্তার এবং মানসূরের পুত্র মাহ্‌দীর শিক্ষাগুরুর পদ লাভ করেন বেং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখেন। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য আশীর্বাদতুল্য। এমনও হতে পারে যে, মাহ্‌দীর শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হওয়ার জন্য তিনি নিজ থেকে চেষ্টাও করেছিলেন। মাহ্‌দীর খিলাফত লাভ এবং মানসূরের মৃত্যুর পরও খালিদ জীবিত

ছিলেন। তখন তার মান-মর্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাহ্দীর খিলাফতকালে অর্থাৎ ১৬৩ হিজরী (৭৭৯-৮০ খ্রি.) সনে আনুমানিক ৭৭ বছর বয়সে খালিদ ইনতিকাল করেন। তার জীবনের শেষার্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়ার দৃশ্য অবলোকন করেই কেটেছে।

তিনিও বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে ও নতুন সাম্রাজ্য গঠনে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তার মৃত্যুকালে তার পুত্র ইয়াহ্ইয়ার বয়স ছিল ৪৫ অথবা ৫০ বছর। ইয়াহ্ইয়াও ছোটবেলা থেকে এই সব বিচিত্র কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে আসছিলেন। তিনি আপন পিতা থেকে তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ও সতর্কতা-সাবধানতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, তাদের সম্মান-মর্যাদা এবং সেই সাথে ইরানী সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনীও ইতিমধ্যে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আপন পিতার কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলেন। তিনি মনে মনে নিজেকে ইরানী জাতির প্রতিনিধি এবং নেতা বলেই ভাবতেন। অবশ্য এটাও তিনি ভালভাবে জানতেন যে, যদি তার চলার পথে সামান্য মাত্র পদস্খলন ঘটে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে তিনি যে সম্মান-মর্যাদা ভোগ করছেন তা নিমিষের মধ্যে হারিয়ে যাবে এবং তিনি এক সর্বহারায় পরিণত হবেন। অপর দিকে তাঁর ও তাঁর পিতার আব্বাসী পরিবারের অভ্যন্তরীণ, এমন কি পারিবারিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ছিল। উপরন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত আব্বাসী পরিবারের সাথে বসবাস করার ফলে সাম্রাজ্যের যে কোন বোঝা কাঁধে তুলে নেওয়ার ব্যাপারেও তাদের মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ভয়ভীতি ছিল না। খালিদ ইব্ন বারমাক সর্ববৃহৎ এবং সব চাইতে গভীর যে কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন তা হলো, তিনি হিজরী ১৬১ সনে (৭৭৭-৭৮ খ্রি.) মাহ্দীকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি ইয়াহ্ইয়াকে হারূনুর রশীদের আতালীক তথা শিক্ষাগুরু নিয়োগ করেন। যেহেতু খালিদ মাহ্দীর আতালীক ছিলেন, তাই তিনি সানন্দে খালিদের পুত্র ইয়াহ্ইয়াকে আপন পুত্র হারূনুর রশীদের আতালীক নিয়োগ করেন। এরও অনেক পূর্বে 'রৌহ' নামক স্থানে, হারূনুর রশীদ যখন খায়যুরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তখন খালিদ মাহ্দীর সাথেই বসবাস করেছিলেন। খালিদই হারূনুর রশীদকে ইয়াহ্ইয়ার স্ত্রীর এবং আপন নাতি অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়ার পুত্র ফযলকে খায়যুরানের স্তনের দুধ পান করিয়ে ফযল এবং হারূন —এ দু'জনের মধ্যে পরস্পর দুধ ভাইয়ের সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছিলেন। খালিদের এই সমস্ত কূটকৌশলের দিকে যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকানো যায় তাহলে অনায়াসে বোঝা যাবে যে, খালিদ অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে আপন পরিবারের ভবিষ্যৎ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এটা করছিলেন একটা বিরাট উদ্দেশ্য সামনে রেখে। আর তা হলো, আবূ মুসলিমের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করে ইরানীদের হৃত গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনা।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের উপর হারূনের শিক্ষাগুরু ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বও ছিল। আর এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি হারূনের উপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেন যে, তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাকে 'মহান পিতা' বলে সম্বোধন করতেন এবং তার সামনে খোলামেলা কথাবার্তা বলতেও লজ্জাবোধ করতেন। খলীফা হাদীর খিলাফতকাল কোন দিক দিয়েই বারমাকী পরিবারের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের অনুকূল ছিল না এবং হাদীর উপর ইয়াহ্ইয়ার কোন প্রভাবও খাটত না। তাই ইয়াহ্ইয়া এমন কূটকৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে হাদীর মা খায়যুরান তার কট্টর শত্রুতে পরিণত হন। এরপর ইয়াহ্ইয়া ও খায়যুরান উভয়ে মিলে কিছুদিনের মধ্যেই হাদীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। ফলে হাদী খলীফা হিসাবে এক বছরের বেশি জীবিত থাকতে পারেননি। ইয়াহ্ইয়া নিজের স্বার্থেই যতশীঘ্র

সম্ভব হারূনকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেন। তাই তো দেখা যায়, হারূন খলীফা হওয়ার সাথে সাথে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে আপন প্রধানমন্ত্রী এবং যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। হারূনের মা খায়যুরানকে কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট রাখবেন, ইয়াহ্ইয়া তেমন নির্বোধ ছিলেন না। তিনি প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সর্ব প্রথম খায়যুরানের পরামর্শ চাইতেন। কিছুদিন পর খায়যুরানের মৃত্যু হয়। তাই ইয়াহ্ইয়া স্বাভাবিকভাবেই খায়যুরানের ঝামেলা থেকে নিস্কৃতি পান। ইয়াহ্ইয়া প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত চিন্তাভাবনার পর গ্রহণ করতেন বলে হারূনের চোখে তার সম্মান প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইয়াহ্ইয়াও সর্বদা সতর্ক থাকতেন, যাতে হারূন আকারে-ইঙ্গিতেও বুঝতে না পারেন যে, তিনি (ইয়াহ্ইয়া) তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন বা তাঁর মনের বাসনা পূরণে বাদ সাধছেন। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতো, হারূনের ইচ্ছা ও মনের বাসনা পূরণ করাই যেন 'তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' কিন্তু এসব কিছুরই আড়ালে ইয়াহ্ইয়া প্রকৃতপক্ষে নিজের মনের বাসনাই পূরণ করতে চাচ্ছিলেন। তিনি আপন পরিবারের লোকদেরকে আপন ভাই-ভাতিজা ও সমমনা লোকদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বা প্রদেশের শাসনকর্তা, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার পদে নিয়োগ করতে শুরু করেন। ফযল, জা'ফর প্রমুখ আপন পুত্রদেরকে তিনি হারূনুর রশীদের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। হারূনও ইয়াহ্ইয়ার পুত্রদেরকে ভাই বলেই সম্বোধন করতেন এবং তাদের সাথে একান্ত আপনজনের মত ব্যবহার করতেন। হারূন ফযল ও জা'ফরকে আপন পুত্রদের আতালীক বা শিক্ষাগুরু নিয়োগ করেছিলেন। হিজরী ১৭৪ সালে (৭৯০ খ্রি) ইয়াহ্ইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়লে হারূন তার স্থলে তার পুত্র ফযলকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন।

১৭৬ হিজরী (৭৯২-৯৩ খ্রি.) যখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ দায়লামে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন ফযলই ঐ সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান করেছিলেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর জন্য খলীফার পক্ষ থেকে জায়গীর বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছুদি পর হারূন, 'ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার হাতে সোপর্দ করে বলেন, তুমি একে তোমার কাছে নজরবন্দী করে রাখ। হারূন ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪-৯৫ খ্রি.) ফযলকে খুরাসান, তাবারিস্তান, রায় ও হামদানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন এবং আপন পুত্র হারূনের 'আতালীক' বা গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র এক বছর পরই গৃহশিক্ষক ১৭৯ হিজরীতে (৭৯৫-৯৬ খ্রি.) হারূন ফযলকে খুরাসান থেকে ডেকে পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। ইয়াহ্ইয়ার অপর পুত্র জা'ফর হারূনের বন্ধু এবং বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। হারূন সব সময় তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন। জা'ফর অত্যন্ত খোশমেজাজী, সদালাপী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৬ হিজরীতে (৭৯২-৯৩ খ্রি.) জা'ফরকে অন্যান্য দায়িত্বের সাথে মিসরের শাসনকর্তার দায়িত্বও দেওয়া হয়। জা'ফর নিজের পক্ষ থেকে ইমরান ইব্ন মিহরানকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান এবং নিজে হারূনের সান্নিধ্যে থাকেন। হিজরী ১৮০ সনে (৭৯৬-৯৭ খ্রি.) দামিশ্ক ও সিরিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে জা'ফর স্বয়ং সেখানে যান এবং ঐ বিশৃঙ্খলা দমন করেন। এরপর হারূন জা'ফরকে খুরাসানের গভর্নর পদ দান করেন। কিন্তু মাসেক দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তাকে বাগদাদের প্রশাসক ও পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। জা'ফর এই কাজ হারছামা ইব্ন আইউনের হাতে সোপর্দ করেন এবং নিজে হারূনের সভাসদই থাকেন। হারূনুর রশীদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদকে ডেকে এনে বলেন, আপনি ফযলকে বলে দিন, যেন তিনি মন্ত্রীত্বের দায়-দায়িত্ব জা'ফরকে বুঝিয়ে দেন। কেননা

আমি ফযলকে একথা বলতে লজ্জবোধ করছি। ইয়াহ্ইয়া ফযলের কাছে হারূনের এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। ফলে জা'ফর প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, হারূনের উপর বারমাকী পরিবারের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মন্ত্রী থাকাকালে রাষ্ট্রের সমগ্র পদ ও সমগ্র বিভাগের উপর এমনভাবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাষ্ট্রের হর্তাকর্তায় পরিণত হন। বাগদাদের সমগ্র পুলিশ ও বড় বড় প্রাসাদসমূহের দায়দায়িত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। রাজ্যসমূহের কর্মকর্তা, প্রদেশসমূহের গভর্নর, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সকলেই ছিলেন তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি ছিলেন রাজকোষের মালিক ও ব্যবস্থাপক। এমন কি প্রয়োজনকালে অর্থের জন্য হারূনুর রশীদকেও জা'ফরের কাছে ধর্ণা দিতে হতো। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের আরো কয়েকজন পুত্র ছিলেন এবং তারা ছিলেন সকলেই এক একটি বিরাট সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। নিজেদের ঐ সব ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সাহায্যে ইয়াহ্ইয়া ও তার পুত্ররা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ফায়দা লোটে। অর্থাৎ তাঁরা বড় বড় জায়গীর ও ভাতা বন্টন ছাড়াও সাম্রাজ্যের রাজকোষের অর্থও বেদেরেগ খরচ করে ও দান-দক্ষিণায় ব্যয় করে। ফলে তাদের বদান্যতা হাতেমতাঈর বদান্যতার মত বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তখন এমন একটি লোকও পাওয়া যেত না, যে বারমাক পরিবারের বদান্যতা ও আভিজাত্যের প্রশংসা করে না। শুধু খুরাসান বা ইরাকে নয়, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামান ও দূরদূরান্তের দেশসমূহেও বারমাক পরিবারের বদান্যতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রশংসায় কবিরা বহু কবিতা রচনা করে। এক কথায় বলতে গেলে, সম্মান, মর্যাদা, জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে বারমাকী পরিবার উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। শুধু খিলাফতের আসনটি ছাড়া আর সবকিছুই তারা নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। এতদসত্ত্বেও তারা হারূনুর রশীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করত না। তাই হারূনের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীরও সুযোগ ছিল না যে, তিনি বারমাকীদের ঐ অধিকার ও ক্ষমতাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। কিন্তু ঐ শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিচে যদি কোন বদ-নিয়ত কিংবা বিদ্রোহ চাপা থাকে তাহলে তো হারূনুর রশীদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছুই হতে পারে না। ১৮৭ হিজরী সনে (৮০৩ খ্রি.) হঠাৎ দেখা গেল, হারূনুর রশীদ বারমাকী পরিবারের সাথে সেই ব্যবহার করছেন, যা শুধু কোন কট্টর শত্রুর সাথেই করা হয়ে থাকে।

অতএব এখন আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভেবে দেখতে হবে, বারমাকীরা প্রকৃতই হারূনুর রশীদের সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরোধী কোন ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল কিনা এবং তিনি তাদের ঐ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিনা। প্রকৃতপক্ষে বারমাকীরা যদি আব্বাসী খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে থাকে তাহলে হারূন তাদের সাথে সর্বশেষ যে আচরণ করেছেন তা ছিল সম্পূর্ণ বৈধ এবং সব দিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত। আর যদি বারমাকীদের ভিতর ও বাহির এক হয়ে থাকে এবং তারা বিশুদ্ধচিত্তে হারূনের অনুগত হয়ে থাকে তাহলে হারূনের চাইতে অকৃতজ্ঞ ও জালিম আর কেউ হতে পারে না। যারা কোন কোন বিষয়কে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে বিচার করেন তাদের কাছে বারমাকীদের পতন ও ধ্বংস এমন একটি অমীমাংসিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যার সমাধান করতে গিয়ে তারা অনেক ভিত্তিহীন গালগল্পের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেগুলোকেই বাস্তব ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষে নাদির শাহ্

নাদির শাহ্ ইরানী ভারতবর্ষে আসলে ভারতবর্ষের বাদশাহ তাঁকে সম্মানিত মেহমানরূপে অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সাথে দিল্লীতে গ্রহণ করলেন সেই সময় কোন এক পানশালায় একব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বলে উঠলো ঃ

"واہ محمد شاہ کیا کام کیاہے قزلباش کو
قلعہ میں لاکر قلماقینوں کے ہاتھ سے قتل کرا دیا"

"বাহ্! মুহাম্মদ শাহ্ কী কাণ্ডই না করলেন! শী'আ সম্রাটকে কেল্লায় নিয়ে এসে গায়িকা-নর্তকীদের দিয়ে হত্যা করালেন।" এ গুজব ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোটা দিল্লীতে ইরানীদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। অগত্যা নাদির শাহ্ ইরানীকে একটি গণহত্যার ফরমান জারি করতে হলা। এমন গণহত্যা যা ইতিপূর্বে দিল্লীতে কোনদিন সংঘটিত হয়নি। এটা ঠিক জা'ফর বারমাকীর হত্যার কারণের মত যা কোন এক ব্যক্তি রটনা করে প্রচার করেছিল।

বাদশাহ্ হারূনুর রশীদের সহোদরা এবং মাহ্দীর কন্যা ছিলেন আবাসা। হারূন তাঁর সে বোনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনুরূপভাবে তাঁর প্রধানমন্ত্রী জা'ফর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সহচর। অহরহ তিনি বাদশাহ্র সাথে অবস্থান করতেন। হারূন জা'ফর ও আবাসার সাথে একত্রে উপবেশন করে মদ্যপান করতেন। তিনি তাঁর মদের জলসায় যেভাবে সহোদরা আবাসার সঙ্গসুখ ভোগ করতেন, তেমনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী জা'ফরকেও সে মজলিসে অবশ্যই শরীক রাখতে চাইতেন। তাই তিনি তাদের দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি তাদের দু'জনকে কঠোরভাবে স্বামী-স্ত্রীর মত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু তারা তাঁর সে নিষেধাজ্ঞার গণ্ডির মধ্যে থাকতে সমর্থ হলেন না। হারূন যখন তা জানতে পারেন তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে জা'ফরকে সবংশে নিপাত করেন।

মদ্যশালায় এ গল্প যখন আমাদের এ যুগের উপন্যাস রচয়িতা এবং লেখাপড়া জানা মূর্খদের হাতে এসে পড়লো তখন তারা সে মিথ্যার বহ্নিতে ঘৃত সংযোগ করে এমনি লেলিহান বহ্নির রূপ দিলেন যে, আজকাল উর্দুভাষী মাত্রকেই এ মিথ্যা কাহিনীর প্রতি কুরআন-হাদীসের চাইতে অধিকতর বিশ্বাসী বলে প্রতীতি হয়। তারা এর বিরুদ্ধে কোন কথাও শুনতে নারাজ।

জা'ফরকে হত্যার একশ বছর পর এ গুজব সৃষ্টি হয় এবং তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ করেন। আর যায় কোথায় ? ঘটনাটি যেহেতু অদ্ভুত ও রূপকথার আমেজপূর্ণ ছিল, তাই বৈচিত্র্য প্রিয় পাঠকরা সেদিকে বেশিমাত্রায় ঝুঁকে পড়তে থাকে। ফলে হারূনুর রশীদের জীবন কথা আলোচনাকারী প্রায় প্রত্যেকেই এ গুজব উদ্ধৃত করেছেন। আর আজ আমাকেও সে অনুল্লেখ্য কাহিনী উদ্ধৃত করতে হলো। তাবারী প্রমুখ ঐতিহাসিক জা'ফর হত্যার অন্যান্য অনেক কারণও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেগুলো সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ ও কার্যকারণ নির্ণয়ের প্রয়াস খুব কম লোকই পেয়েছে।

১. হারূনুর রশীদ হচ্ছেন আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলীফা। আব্বাসীয়দের বংশগরিমার অহমিকা ছিল। আরবদের মধ্যে তাঁরা যে অত্যন্ত অভিজাত বংশের অধিকারী এ অহংকার তাঁদের ছিল। গোটা আরব সমাজ তাঁদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করতো। তাঁদের সে বংশকৌলীন্যের বলেই তাঁরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উৎসাহিত হন এবং শেষ পর্যন্ত সে প্রচেষ্টায় সফলও হন। প্রায় গোটা মুসলিম জাহানের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁদের সে আভিজাত্যবোধ আরো শানিত হয়ে ওঠে। আরবদের স্বভাবজাত গোষ্ঠীপ্রীতি এবং কৌলীন্যবোধও পূর্ণমাত্রায় তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। এমতাবস্থায় এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, হারূনুর রশীদের মতো একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ এমন একটি লোককে তাঁর সহোদরার পাণি গ্রহণ করতে দেবেন যাকে তিনি বংশগত দিক থেকে দাসবংশ জাত, অগ্নিউপাসক বংশের লোক এবং অজ্ঞাত কুলশীল বলে জানতেন ? এটা মেনে নিলাম যে, তিনি জা'ফরকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর পিতাকে আপন গৃহশিক্ষকরূপে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু তাই বলে আপন সহোদরার বিবাহকালে তিনি তাঁর বংশমর্যাদা ও কৌলীন্যের কথা বিস্মৃত হয়ে যাবেন এমনটি আশা করা যায় না। আর যদি একান্তই হারূনুর রশীদ এ যুগের লোকদের মতো অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বা মুক্তবুদ্ধির অধিকারীও হয়ে যেতেন তবুও তাঁর বংশের লোকদের জন্যে তা চোখ বুঁজে মেনে নেয়াটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাঁরা এরূপ অসম বিবাহকে তাঁদের বংশের জন্য মর্যাদাহানিকর বলে কোনমতেই তা মেনে নিতে পারতেন না।

২. হারূনুর রশীদের মতো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব– যিনি এক বছর হজ্জ আর অন্য বছর জিহাদ করতেন আর যিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের নেতা ও খলীফা, তাঁর পক্ষে পানশালায় মজলিসের শোভাবর্ধন কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বনূ উমাইয়ার কোন খলীফা যদি কোনদিন শরাব বা তাড়ি পান করে থাকেন তবে তা মশহুর হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা সে কুকর্মের কথা বর্ণনা করতে থাকেন, অথচ হারূনুর রশীদের মতো ধার্মিক এবং আলিম-উলামা ও পীর-দরবেশদের খিদমতে সবিনয়ে দীনবেশে উপবেশনকারী এবং তাঁদের ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ শ্রবণ করে শিশুর মতো রোদনকারী ব্যক্তি কি করে শরাব তথা পেশাবের মত নাপাক বস্তু পান করতে পারেন ? ফুযায়ল ইব্ন আয়ায, ইব্ন সাম্মাক এবং সুফিয়ান সওরীর মতো যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ মনীষীগণ যার বন্ধু এবং সহচর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আদায় করেন বিশেষত ফজরের সালাত যিনি একান্তই আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ে অভ্যস্ত, উপরন্তু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছাড়াও একশ রাকাআত নফল সালাত যাঁর নিত্যদিনের কর্মসূচি, এমন ফেরেশতা চরিত্রের লোককে মদ্যপ বলে অভিহিত করা যে তাঁর প্রতি কতবড় অবিচার ও লজ্জাহীনতা তা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি রাত কাটায় পানশালার আসরে, ফজরের জামাআতে সে কী করে হাযির হবে ? এছাড়া মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা কি কোন দিন সালাতে মনোনিবেশ করতে পারে ?

৩. ইরাকের আলিম সমাজ নবীয (ফলের তরল রূপ) পান বৈধ বলে ফতওয়া দিয়ে ছিলেন। তাই আমীর-উমারা শ্রেণীর কেউ কেউ তা সেবন করতেন। মদ্যপানের নেশায়

বিভোর হওয়ার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। হারূনুর রশীদের নবীয পান সম্পর্কেও তো নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না– যার বর্ণনা উপরিউক্ত বিবরণে পাওয়া যায়। তাঁর যুগ পর্যন্ত আরবদের সেই সরল অনাড়ম্বর ও সৈনিকসুলভ জীবন তাদের মধ্যে অক্ষুণ্ন ছিল। সেখানে মদ্যপানের প্রবেশাধিকার ছিল না। হারূনুর রশীদ যে আরব কৌলীন্যের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন তাতে সর্বদাই মদ্যপান ছিল অত্যন্ত নিন্দিত ও গর্হিত কাজ। এমন কি জাহিলিয়াতের যুগেও আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মদ্যপান করতেন না। তাঁরা এটাকে ভদ্রজনোচিত কাজ বলে বিবেচনা করতেন না। এ জন্যেই আমাদের নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মতো অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জাহিলিয়াতের যুগেও এহেন নোংরামির ধারেকাছেও ঘেঁষেন নি। এহেন নোংরা কাজ যদি ইসলামী বিধি-বিধানের পরিপন্থী নাও হতো তবুও হারূনুর রশীদ তা পছন্দ করতেন না।

৪. এ বেদীনী ও আত্মমর্যাদাবোধের অভাবের যুগেও যখন হিন্দুস্থানে ইসলামী হুকুমত কায়েম নেই, বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কোন সরকারী বাধা-নিষেধ নেই, কোন আত্মমর্যাদাবোধহীন ব্যক্তি সে নিজে যতই প্রকাশ্যে মদ্যপানে অভ্যস্ত হোক, কখনো পছন্দ করবে না যে, তার সহোদরাও মদ্যশালায় তার পানসঙ্গিনী হোক। আমাদের দেশে চর্মকার ও মেথর শ্রেণীর লোকই সর্বাধিক মদ্যপ হয়ে থাকে। সম্ভবত তাদের দ্বারাও এহেন জঘন্য কাজ হবে না যে, সে তার পানশালার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একত্রে তার বোনকেও মদ্যপানের সঙ্গিনী করবে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে হারূনুর রশীদের মতো ধর্মপ্রাণ শাসকের– যাঁর দরবারে তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈরা উপস্থিত থাকতেন– তাঁর পক্ষে এহেন নির্লজ্জ কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব হতো ?

৫. যে সব লোক ব্যভিচার, চৌর্যবৃত্তি ও মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকে, তারা সাধারণত তাদের পরিবার-পরিজনকে এসব দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। হারূনুর রশীদ নিজে যদি এরূপ নোংরামিতে অভ্যস্ত হয়েও থাকতেন তবুও তো আপন সহোদরাকে এহেন জঘন্য অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে দিতেন না। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী যুবায়দাই বরং তাঁর পানসঙ্গিনী হতেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই এরূপ কোন আভাস দেননি। তাঁর পূত-পবিত্র জীবনে এরূপ কলংকের ছিঁটে-ফোঁটা পর্যন্ত লাগেনি। কী তাজ্জবের কথা! যুবায়দার প্রাসাদে তো অহরহ কুরআন তিলাওয়াত চলছে আর তাঁর প্রেমিক স্বামী জা'ফর ও আবাসাকে নিয়ে পানশালায় পানমত্ত!

৬. ঐতিহাসিকগণ নির্ভরযোগ্য এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক ইহুদী চিকিৎসক জিবরাঈল সর্বদা হারূনুর রশীদের দরবারে থাকতেন। তিনি সর্বদা খলীফার আহারসঙ্গীরূপে থাকতেন এবং খলীফাকে কোন অনিষ্টকর বস্তু খেতে দেখলে বারণ করতেন। একদা খলীফার দস্তরখানে মাছ আসলে তিনি খলীফাকে তা খেতে বারণ করলেন এবং খানসামাকে তা উঠিয়ে নিতে বললেন। তারপর ঘটনাচক্রে খলীফার জনৈক খাদেম দেখতে পেল যে, হেকীম প্রবর ঐ মাছটি তাঁর নিজ ঘরে নিয়ে গিয়ে নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করছেন। তখন আর বুঝতে কারো

বাকি রইল না যে, চিকিৎসক প্রবর নিজে খাওয়ার জন্যে চালাকি করে সুস্বাদু মাছটি খেতে খলীফাকে বারণ করেছিলেন। উক্ত ভৃত্য খলীফাকে তা জানিয়ে দেয়। খলীফা মৃদুহাস্য ছাড়া চিকিৎসককে এ ব্যাপারে আর কিছুই বললেন না। কিন্তু হেকীম প্রবর যখন জানতে পারলেন যে, খলীফা এ ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন তখন তিনি মাছের তিনটি টুকরো তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পেয়ালায় রাখলেন। একটি পেয়ালায় তিনি গোশত এবং ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য রাখলেন যা হারূনুর রশীদ ঐ সময় খেয়েছিলেন। দ্বিতীয় পেয়ালায় মাছের টুকরোর উপর বরফের পানি ঢেলে দিলেন আর তৃতীয় পেয়ালায় ঢাললেন মদ। এবার পেয়ালা তিনটি খলীফার খিদমতে হাযির করে বললেন, প্রথম দু'টি পেয়ালায় আপনার খাওয়ার দ্রব্যগুলো রক্ষিত আছে আর তৃতীয় পেয়ালায় রক্ষিত আছে আমার খাদ্য। কয়েকঘণ্টা পর দেখা গেল যে, প্রথমোক্ত দু'টি পেয়ালায় রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যগুলো পচে গিয়ে দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় পেয়ালায় রক্ষিত মাছ মদের মধ্যে গলে গিয়ে শোরবায় পরিণত হয়েছে। এভাবে চিকিৎসক খলীফাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি নিজে যেহেতু মদ্যপানে অভ্যস্ত তাই ঐ খাদ্যদ্রব্য তার জন্যে ক্ষতিকর ছিল না, পক্ষান্তরে খলীফা যেহেতু মদ্যপানে অভ্যস্ত নন, তাই এটা তাঁর জন্যে নিশ্চিতভাবেই ছিল ক্ষতিকর। আর এ জন্যেই তাঁকে মাছ খাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এভাবে চিকিৎসক তাঁর লজ্জা ঢাকতে প্রয়াস পান। এ ঘটনা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা হারূনুর রশীদ মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন না।

৭. প্রকৃত কথা হলো, সহোদরা আবাসাকে খলীফা হারূনুর রশীদ বিয়ে দেন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানের সাথে। এই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁকে বিয়ে দেন ইবরাহীম ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আলীর সাথে। দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন খলীফার আত্মীয় এবং আব্বাস বংশীয়। এমন একটি পুণ্যবতী মহিলা সম্পর্কে এহেন মিথ্যাচার চরম নীচতার পরিচায়ক। একান্ত নীচতার চরিত্রের লোক ছাড়া অন্য কেউ এরূপ মিথ্যা রচনা করতে পারে না। সর্বোপরি এঘটনা রটনার আশ্চর্য ব্যাপার হলো, জা'ফর ও আবাসার পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতকে শরীয়ত-সম্মত ও জাইয করার জন্যে তো খলীফা হারূনুর রশীদকে খুবই ব্যস্ত-সমস্ত ও অধীর দেখানো হয়েছে, অথচ শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মদ্যপানের ব্যাপারে তিনি শরীয়তের সে পাবন্দীর কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন। এটাও কি সম্ভব ?

বারমাকীদের মূলোৎপাটনের আসল তত্ত্ব

হুকুমত ও সালতানাত এমনি এক মোহনীয় বস্তু যার জন্যে ভাই ভাইয়ের এবং পিতা পুত্রের শত্রুতে পরিণত হয়। সালতানাতসমূহের ইতিহাসই তার সাক্ষী। আব্বাসীয়রাও যাকে বা যাদেরকেই তাদের রাজত্বের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেছেন নির্দ্বিধায় তাদেরকে হত্যা করেছেন। খলীফা মানসূর যখন লক্ষ্য করলেন যে, আবূ মুসলিম গোটা রাজত্বকে তার হাতের মুঠোয় নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে তখন তিনি তাকে উৎখাত করেন। রাজা-বাদশাহদের এই বিশেষ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে তাদের মোসাহেব-অমাত্যরাও অনেক সময় ফায়দা লুটে থাকেন। তারা বাদশাহর দ্বারা যারই ক্ষতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তাকেই বিদ্রোহী বলে

প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানসূরের[১] দেহরক্ষী রাবী ইব্‌ন ইউনুস ছিলেন হযরত উসমান গনী (রা)-এর গোলাম ফায়সালের বংশধর। তিনি ছিলেন মানসূরের সবচাইতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পারিষদ। মানসূর তাঁকে তাঁর উযির বানিয়ে রেখেছিলেন। মানসূরের শাসনামলে তাঁর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিল। খলীফাকে তিনিই আবূ মুসলিমকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। খালিদ বারমাকীর স্থলে খলীফা আবূ আইউবকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৫৩ হিজরী (৭৭০ খ্রি.) সালে তিনি উক্ত রাবী ইব্‌ন ইউনুসকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তখনো তিনি দেহরক্ষীর পরিচয়েই পরিচিত ছিলেন। মানসূর তাঁর মৃত্যুকালে মাহ্‌দীর হাতে খিলাফতের বায়আতের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। মাহদীর আমলেও রাবী' উযির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু যেহেতু তিনি দেহরক্ষী রূপে মশহুর ছিলেন তাই মাহ্‌দী তাঁর পাশাপাশি আবূ আবদুল্লাহ্ মুআবিয়া ইব্‌ন ইয়াসারকেও উযীর নিযুক্ত করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ তাঁরই হাতে অর্পণ করেন। কিছুদিন পরেই রাবী আবূ আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করে ও খলীফার কোপানলে ফেলে গ্রেফতার করিয়ে ফেলেন। তারপর মাহ্‌দী আবূ আবদুল্লাহর স্থলে ইয়াকূব ইব্‌ন দাঊদকে মন্ত্রী পদে বরণ করেন। ইয়াকূব ইব্‌ন দাঊদও কিছু দিন যেতে না যেতেই খলীফার কোপানলে পড়েন এবং পদচ্যুত হন। এবার মাহ্‌দী নিশাপুরের একটি খ্রিস্টান পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত কায়য ইব্‌ন আবূ সালিহকে মন্ত্রী পদে বরণ করেন। মোটকথা মাহ্‌দীর আমলে রাবী ইব্‌ন ইউনুস কাউকেই শান্তিপূর্ণভাবে ও সাফল্যের সাথে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে দেননি। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁরই হাতে। মাহ্‌দীর পর হাদী খলীফারূপে বরিত হলে রাবীর ক্ষমতার দাপট আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, হাদী সমস্ত ক্ষমতা তারই হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। খযযুরানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনেও রাবীই সক্রিয় ছিলেন। হাদী এবং রাবী স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাবীর পুত্র ফযল ইব্‌ন রাবীর প্রত্যাশা ছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করবেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই হারূন সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের হাতে তুলে দিলেন। উপরেই বলা হয়েছে যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ছিলেন আবূ মুসলিমের সম্প্রদায়ের লোক। রাবী ইব্‌ন ইউনুসের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। কেননা একদিকে এই রাবী যেমন ছিলেন আবূ মুসলিমকে হত্যার উসকানিদাতা, তেমনি তিনি ছিলেন ইয়াহ্‌ইয়ার পিতা খালিদ ইব্‌ন বারমাকীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট আর তিনিই খালিদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করিয়ে তাঁর বন্ধু আবূ আইউবকে ঐ পদে আসীন করিয়েছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ ফযল ইব্‌ন রাবীকে কোন পদে আসীন হতে দিলেন না। তিনি তাঁকে হাযিবের পদে বহাল রেখে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে দন্তনখর বিহীন অথর্বে পরিণত করলেন। এবার আশা করি পাঠকের আর বুঝতে বাকি নেই যে, বারমাক পরিবার এবং ফযল ইব্‌ন রাবীর এই রেষারেষি ছিল অত্যন্ত পুরনো এবং দীর্ঘস্থায়ী। বারমাকীদের উন্নতি ও উত্থানের সাথে সাথে ফযল ইব্‌ন রাবীর বৈরিতাও দিন দিন বেড়েই চলে। কিন্তু হারূনুর রশীদ এ

---

১. হাযিব শব্দের প্রতিশব্দরূপে উর্দু লেখক আকবর শাহ্ নজীবাবাদী বডিগার্ড অফিসার লিখলেও আমাদের বর্তমান যুগের পরিভাষায় একে মিলিটারী সেক্রেটারী বা সামরিক সচিব বলা যেতে পারে। —অনুবাদক।

পরিবারের প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও আস্থাবান থাকায় তিনি তাদের কোন অনিষ্টসাধনে সমর্থ হচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় ফযল ইব্‌ন রাবীর হাতে বারমাকী খানদানের অবিশ্বস্ততা ও রাজদ্রোহী হওয়ার প্রমাণ খুঁজে বেড়ানো ছাড়া করার মত আর কোন কাজই ছিল না। এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেলে খলীফাকে তা অবহিত করে তাদের প্রতি সন্দিহান ও রুষ্ট করার মাধ্যমেই কেবল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। বারমাকীরা যেহেতু অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সতর্ক ও প্রখর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তাই তাঁরা এদের কোন অবকাশ রাখছিলেন না যাতে ফযল ইব্‌ন রাবীর জন্য সে সুযোগ এসে যায়। এতদসত্ত্বেও ফযল সদা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন এবং বারমাকীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলতেন। বারমাকীরা তাদের বদান্যতা দ্বারা এত অধিক সংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ফযল ইব্‌ন রাবী কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হারূনুর রশীদ পুরনো পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দানের কথা চিন্তা করতেন, কিন্তু তাঁর মাতা খায়যুরান যেহেতু ফযল এবং তার পিতা রাবীর প্রতি বিমুখ ছিলেন আর এ ব্যাপারে ইয়াহ্‌ইয়াও তাঁর সাথী ছিলেন তাই খায়যুরান তাঁর পুত্র হারূনুর রশীদকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ১৭৪ হিজরীতে (৭৯০ খ্রি) খায়যুরানের মৃত্যু হলে হারূনুর রশীদ ফযলকে হিসাব বিভাগের অধ্যক্ষ পদে আসীন করেন। এবার ফযল রাবী পূর্বের তুলনায় অনেকটা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যখন দায়লম থেকে ফযল ইব্‌ন জা'ফরের সাথে আসেন তখন হারূনুর রশীদ তাঁকে অঙ্গীকারনামা লিখে দেয়া সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রথম কোন কোন ফকীহ্-এর নিকট থেকে ফাতাওয়া হাসিল করেন এবং এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বারমাকীরা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহর স্বপক্ষে তৎপর হন এবং তাঁরা খলীফার কাছে সুপারিশ করেন। যেহেতু তিনি (ইয়াহ্‌ইয়া) আবূ মুসলিম খুরাসানীর আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে আহলে বায়তের সমর্থক ছিলেন তাই হারূনুর রশীদ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহকে জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার দায়িত্বে ছেড়ে দেন এবং তাকে বলে দেন যে, তুমিই তাকে নিজ দায়িত্বে রেখ। জা'ফর অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহকে নিজের কাছে রাখেন।

১৮০ হিজরীতে (৭৯৬-৯৭ খ্রি.) যখন হারূনুর রশীদ আলী ইব্‌ন ঈসাকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান তখন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদ তার এ নিয়োগের বিরোধিতা করেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটাই ছিল হারূনুর রশীদের প্রথম সিদ্ধান্ত। ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর পুত্ররা এবং আত্মীয়-স্বজন যেহেতু গোটা দেশের উপর ছেয়েছিল তাই বারমাকীরা আলী ইব্‌ন ঈসাকে খুরাসানে শান্তিতে বসতে দেননি। ইয়াহ্‌ইয়ার পুত্র মূসা তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করে উপর্যুপরি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করতে লাগল। ঘটনাচক্রে আলী ইব্‌ন ঈসা খুরাসানের এসব বিদ্রোহের উসকানিদাতা সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি হারূনুর রশীদের দরবারে ইয়াহ্‌ইয়া পুত্র মূসার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেন। এ অভিযোগ এবং উপরে উল্লিখিত আলী ইব্‌ন ঈসাকে নিয়োগের ব্যাপারে

ইয়াহ্ইয়ার বিরোধিতা মিলে হারূনুর রশীদের মনে একটি সন্দেহের জন্ম দেয়। ফলে বারমাকীদের পক্ষ থেকে যখন সুপরিকল্পিতভাবে রাজধানীতে এ গুজব রটানো হচ্ছিল যে, খুরাসানে আলী ইব্ন ঈসা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্যত হচ্ছেন, তিনি খলীফার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, তখন হারূনুর রশীদ কোন আমীর বা সিপাহ-সালারকে সে সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ না করে নিজেই সসৈন্যে খুরাসানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি রে-তে পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন। এটা ১৮৬ হিজরীর (৮০২ খ্রি.) ঘটনা। এ পর্যন্ত হারূনুর রশীদের মনে কেবল নানারূপ সন্দেহই ছিল। তিনি বারমাকীদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতেন না। তাঁর কেবল এতটুকুই জানা ছিল যে, আলী ইব্ন ঈসার খুরাসানে অবস্থান বারমাকীরা সুনজরে দেখে না। আলী ইব্ন ঈসা যখন মূসা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এবং ইয়াহ্ইয়ার অন্যান্য পুত্রের ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে এমর্মে লিখিত অভিযোগ খলীফার কাছে প্রেরণ করেন যে, এরাই খুরাসানে অশান্তির ইন্ধন যোগাচ্ছে, তখন খলীফা বিশেষভাবে খুরাসানের পরিস্থিতির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু তিনি বারমাকীদের কাছে তা অত্যন্ত গোপন রাখলেন। তারা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে, খলীফা তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ নযর রাখছেন। তাই তারা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়ে খলীফার কাছে পাঠাতে থাকে। যদি তাদের জানা থাকত যে খলীফা তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন, তাহলে তারা কস্মিনকালেও আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রাদি খলীফার দরবারে প্রেরণ করতো না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগও উত্থাপন করতো না। এখন যখন স্বয়ং খলীফা রে-তে উপস্থিত হলেন এবং আলী ইব্ন ঈসা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে খুরাসানে সংঘটিত ঘটনাসমূহ একান্তে খলীফার কাছে নিবেদন করলেন এবং তাঁকে অবহিত করলেন যে, খুরাসান এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ প্রকৃতপক্ষে বারমাকীদের হাতের মুঠোয় এবং তারা অত্যন্ত আঁটঘাট বেঁধে আবূ মুসলিম খুরাসানীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে, তখন যে হারূনুর রশীদের মনে কি তুমুল ঝড় বয়ে যায় তা পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারেন। তিনি দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। বারমাকীদের দুর্দান্ত প্রতাপ ও দাপট তাঁর চোখের সম্মুখেই ছিল। এদিকে নিজের কানে তাদের প্রস্তুতির কথা শুনলেন। আলী ইব্ন ঈসাকে সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি তাকে মার্ভের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজ মনোভাব একান্তই গোপন রেখে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলী ইব্ন ঈসার রওয়ানা হওয়ার পর এবার ফযল ইব্ন রাবী মওকা বুঝে খলীফাকে জা'ফর বারমাকী কর্তৃক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহকে মুক্ত করে দেয়ার ভয়ংকর সংবাদটি অবহিত করলেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে একথাও অবহিত করলেন যে, ইয়াহ্ইয়া এখন বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হারূন কথা প্রসঙ্গে জা'ফরের সম্মুখে ইয়াহ্ইয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ এখন কোথায় অবস্থান করছে ? জবাবে জা'ফর জানালেন যে, সে পূর্বের মতই আমার হাতে নজরবন্দী আছে। হারূন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার কাছে হলফ করে একথা বলতে

পারবে? এতে জা'ফর প্রমাদ গুনলেন এবং তার বুঝতে বাকি রইল না যে, এ সম্পর্কিত গোপন সংবাদ ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি কোনক্রমে আত্মসংবরণ করে বললেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ সুদীর্ঘকালতো আমার দায়িত্বে নজরবন্দীরূপে কাটালেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি আমার আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকায় তাকে মুক্তিদানের তেমন কোন অসুবিধা আছে বলে আমার মনে হয়নি। হারূনের জন্য এটাই ছিল অত্যন্ত নাজুক সময়। তিনি যদি এ সময় আত্মসংবরণে ব্যর্থ হতেন, তা হলে আর কোন মতেই তিনি বারমাকীদেরকে কাবু করতে সমর্থ হতেন না। তারা তখন তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হতো যা এতকাল ধরে তারা সঞ্চয় করে রেখেছিল। হারূনের পক্ষে বারমাকীদের মুকাবিলা করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। হয়তো তখন হারূনকে তারা নিঃশ্বাস ফেলার বা উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করারও সুযোগ দিতো না। কেননা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের পুত্র ও পৌত্রদের পঁচিশ জন শক্তিমান ব্যক্তি যারা অসি ও মসির বলে বলীয়ান ছিলেন– স্বয়ং হারূনের রাজপ্রাসাদে নানা কাজের বাহানায় অহরহ অবস্থান করছিলেন। গোটা দেশের শাসনতন্ত্রের চাবিকাঠি বারমাকীদের করায়ত্ত ছিল। সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োজিত অফিসারদের প্রায় সকলেই ছিলেন তাদেরই নিয়োজিত এবং সমর্থক। গোটা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠিও ছিল বারমাকীদের হাতে। আলিম-উলামা, ফকীহ্, সামরিক বাহিনীর তারাও সবাই ছিল তাদের গুণগ্রাহী ও অনুগত। শাস্ত্রবিদগণের সকলেই ছিলেন তাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত ও অনুগত। কেননা তাঁরা সর্বদা এসব জ্ঞানীগুণীর খিদমত করতেন। কবি-সাহিত্যিকদের সকলেই ছিলেন তাদের প্রশংসায় মুখর। প্রজাসাধারণের মধ্যেও তাঁদের বদান্যতার সুনাম ছিল আর এজন্যে রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সকল মহলেই তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এ ছিল তাদের এমনি এক প্রস্তুতি যে, তারা ময়দানে অবতীর্ণ হলে এক হারূন কেন কয়েকজন হারূনের পক্ষেও তাদের সাথে এঁটে ওঠা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হারূন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেকে সামলিয়ে নেন এবং জা'ফরের কাছে ইয়াহ্ইয়ার মুক্তির কথা শুনে সুর পাল্টে অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন, আমি এমনিতেই তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছি। তাকে মুক্তি দিয়ে আসলে তুমি ভালই করেছ। আমি নিজেই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, বেচারাকে এবার ছেড়ে দাও!

এটা যে কেউ অনুধাবন করতে পারে যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহর মুক্ত হওয়া হারূনুর রশীদের জন্য বজ্রাঘাতের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। উলুভী (আলীপন্থী)-দের বিদ্রোহের কারণে আব্বাসীগণ এখনো দুশ্চিন্তামুক্ত ছিলেন না। আর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না যে, তাঁর মুক্তিকে হারূন একটা মামুলী ঘটনা বলে হালকাভাবে নেবেন। কিন্তু আপন মনোভাব গোপন রাখতে সমর্থ হয়ে হারূন এ যাত্রা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন।

ঠিক এ সময়কালেই ঘটনাচক্রে একদা জা'ফরের এখানে কোন একটা উৎসব উপলক্ষে রাষ্ট্রের প্রায় সকল ঊর্ধ্বতন অফিসারবর্গ এবং ইরানী বংশোদ্ভূত সর্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কেউ একজন বলে উঠলো ঃ আবূ মুসলিম কী দক্ষতার সাথেই না এক বংশ থেকে আরেক বংশের হাতে রাজত্ব হস্তান্তর করেছেন! একথা শুনে জা'ফর মন্তব্য করলেন, এটা আর

তেমন দক্ষতার ব্যাপার কী হলো ? এ কাজটি করতে আবূ মুসলিমকে ছয় লাখ লোক হত্যা করতে হয়েছে! দক্ষতা হতো তখন যদি এক বংশ থেকে রাজত্ব এমনিভাবে হস্তান্তরিত হতো যে, কেউ ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটি টের পেত না। এ মজলিসে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল যে, ব্যাপারটি আনুমানিক হারূনুর রশীদের কর্ণগোচর করলো। হারূন এবার নিশ্চিত হলেন যে, আসলে জা'ফর ঠিক তা-ই করতে যাচ্ছেন। তারপর তিনি বারমাকীদেরকে গাফেল রাখার উদ্দেশ্যে আপন পুত্রকে অলীআহ্দ (পরবর্তী বাদশাহ্ বলে মনোনীত) করার এবং তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করার দলীল-দস্তাবেজ প্রণয়নে এমনভাবে ব্যস্ততা শুরু করলেন যে, কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আসন্ন বিদ্রোহের মুখোমুখি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে এমনটি করতে পারে না। বারমাকীদেরকে তিনি সবচাইতে বেশি প্রতারণা জালে ফেললেন এই চালটি চেলে। এ কাজে তাঁর বেশি কালক্ষেপণ করার অবকাশ যেমন ছিল না, তেমনি তিনি বেশিদিন পর্যন্ত বারমাকীদেরকে গাফেল রাখতে পারতেন না। তাই ১৮৬ হিজরীর (৮০২ খ্রি.) শেষ দিকে তিনি 'রে' থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। মৃতামিনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তার স্বপক্ষে বায়আত নিলেন এবং বণ্টনপত্র লিখলেন। আমীন ও মামূনের দ্বারা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে তাদের সই করালেন। তারপর হজ্জে গেলেন। কা'বাগৃহে এ প্রতিজ্ঞাপত্র লটকিয়ে রাখলেন। লোকজনের মধ্যে দান-খয়রাত করলেন। মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে হাদিয়া-তুহ্ফা ও খয়রাত বণ্টন করলেন। তারপর প্রত্যাবর্তনকালে আম্বার নামক স্থানে উপনীত হয়ে ১৮৭ হিজরীর মুহাররম (৮০৩ খ্রি. জানুয়ারী) মাসের শেষ তারিখে গভীর রাতে আকস্মিকভাবে জা'ফরকে হত্যা করালেন এবং তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে বন্দী করলেন। কারো কিছু একটা করার সুযোগমাত্র তিনি দিলেন না।

আম্বার নামক স্থানে উপনীত হয়ে হারূনুর রশীদ একদিন রাতের বেলা তাঁর দেহরক্ষী মাসরূরকে ডেকে এমর্মে নির্দেশ দিলেন যে, সশস্ত্র সৈন্যের একটি বিশ্বস্ত দল নিয়ে এক্ষুণি জা'ফরের তাঁবুতে যাও এবং তার শিরশ্ছেদ করে তার খণ্ডিত শিরটি নিয়ে এসো। মাসরূর প্রথমে এ আদেশ শুনে ঘাবড়ে যায় তারপর যখন হারূনুর রশীদ বললেন আমার এ নির্দেশ কালবিলম্ব না করে এক্ষুণি কার্যকরী কর তখন মাসরূর আর কালক্ষেপণ না করে খলীফার আদেশ কার্যকরী করে এবং তার খণ্ডিত শির এনে খলীফার সামনে উপস্থিত করে। ঐ রাতে খলীফা জা'ফরের ভাই ফযল এবং তার পিতা ইয়াহ্ইয়াকেও গ্রেফতার করেন এবং এক ফরমান বলে তাৎক্ষণিকভাবে জা'ফর ও ইয়াহ্ইয়ার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[১] তারপর বারমাকী খান্দানের প্রত্যেকটি লোককে বন্দী করা হলো। তাদের নিয়োজিত গভর্নরবর্গ এবং উচ্চপদে আসীন অফিসারদেরকে পদচ্যুত করা হলো।[২] এভাবে হারূনুর রশীদ একই রাতের মধ্যে বারমাকীদের সংকট কাটিয়ে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। এ কাজটি তিনি এতই দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করলেন যে, কেউ কান নাড়বার পর্যন্ত সময় পেল না। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদের ভাই মুহাম্মদ ইব্ন খালিদের বারমাকীর আনুগত্যের প্রতি হারূনুর রশীদের আস্থা

---

১. এ বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩০,৬৭৬,০০০ দীনার। –অনুবাদক।

২. ইব্ন খালদূনের মতে, হারূনের খিলাফতে কমপক্ষে ২৫০ জন পদস্থ বারমাকী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। –অনুবাদক।

ছিল। সম্ভবত তিনিই হারূনুর রশীদকে অনেক গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। তাই হারূনুর রশীদ তাকে গ্রেফতার বা বন্দী করেন নি। এদিকে স্বয়ং হারূনুর রশীদের পরিবারের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস– যিনি সম্পর্কে তাঁর দাদা ছিলেন– বারমাকীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বারমাকীরা তাঁকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বারমাকীদেরকে গ্রেফতার করার পর হারূনুর রশীদ তাকেও গ্রেফতার করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহ্-এর পুত্র আবদুর রহমান আপন পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। আবদুল মালিক মামুনুর রশীদের যুগ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় জীবন যাপন করেন। অবশেষে মামূন তাঁকে মুক্তিদান করেন।[১] ইবরাহীম ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন নাহীকও বারমাকীদের সাথে ষড়যন্ত্রে শামিল ছিলেন। এজন্যে তাকেও হত্যা করা হয়। ইয়াহ্ইয়া বারমাকী ১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) এবং ফযল বারমাকী ১৯৩ হিজরীতে (৮০৮-৯ খ্রি.) বন্দী অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২]

বারমাকীরা যেহেতু অকাতরে দান-দক্ষিণা করতেন এবং কবি-সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন, তাই তাদের পতনের পর প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অনবহিত জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়। তারা একে হারূনুর রশীদের একটা নিষ্ঠুর কার্যরূপে বিবেচনা করে। কবিরা এ নিয়ে মর্সিয়াগাথা রচনা করেন। কাহিনীকাররা অতিরঞ্জিত করে তাদের দান-দক্ষিণার কাহিনী রচনা করেন। হারূনুর রশীদ বারমাকীদের প্রকৃত তথ্য ফাঁস হতে দেননি। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বারমাকীদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা আইনত নিষিদ্ধ করে দেন। যদ্দরুন স্বয়ং হারূনুর রশীদের যুগের সাধারণ লোকেরাও বারমাকীদের মূলোৎপাটনের সঠিক কারণ সম্পর্কে অবগত ছিল না। যদি বারমাকীদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণ জানতে পারতো তা হলে এতে হারূনুর রশীদ তথা আব্বাসীয়া সালতানাতের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার এবং নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হওয়ার দৃঢ় আশংকা ছিল। এটা হারূনুর রশীদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক যে, বারমাকীদের ব্যাপারে তিনি কোন বিবরণ প্রকাশ করেননি। এভাবে হারূনুর রশীদের প্রতাপ এবং তাঁর ব্যাপারে লোকের বিস্ময় বিমূঢ়ভাব পূর্ববৎ বজায় থাকে। আব্বাসী সালতানাতের জন্যে এটা দরকার ছিল। বারমাকীদের উৎখাতের ব্যাপারে যদি সাধারণভাবে জনসাধারণকে মুখ খোলার ও মতামত প্রকাশের অধিকার দেয়া হতো তা হলে বলাই বাহুল্য, সর্বত্র বারমাকীদের গুণগ্রাহী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরাগীদের প্রাচুর্য ছিল। তাদের মুখ খুললে আব্বাসীয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে অবশ্যই আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। এ সময় হারূনুর রশীদের গৃহীত কর্মপন্থার কোন উপাদেয় বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

বারমাকীরা যেহেতু আহলে বায়ত এবং আবূ তালিবের বংশধরদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে নিজেদেরকে দাবি করতো, তাই তাদের সর্বনাশকে আবূ তালিব বংশের লোকজন নিজেদের এক চরম ক্ষতি বলেই বিবেচনা করলো। আজ পর্যন্ত আলী ও হোসেন সমর্থক শিয়াদেরকে বারমাকীদের পতনের জন্য শোক প্রকাশ করতে দেখা যায়। তাদের বিদ্যোৎসাহিতা ও

---

১. History of the saracens-এ সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন যে, আমীন তাঁকে মুক্তি দিয়ে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। –অনুবাদক।

২. এ বছর দু'টি খ্রিস্টাব্দ ৮০৬ ও ৮০৯ সন। –অনুবাদক।

জ্ঞানীগুণীদের সমাদরের কথা অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা হয়ে থাকে। অথচ এই মজুসী বংশোদ্ভূত খান্দানটি দীন ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র কোন অসাধারণ খিদমত আঞ্জাম দেয়নি। তাদের নিধন ও ধ্বংসের কারণ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। এতে সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আপন রাজত্ব রক্ষার স্বার্থেই হারূনুর রশীদ বারমাকীদেরকে উচ্ছেদে বাধ্য হন। আপন রাজত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্রাটই এরূপ করে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যেখানে বারমাকীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, তেমনটি কারাগারে তিনি নিক্ষেপ করেছেন তাঁর স্ববংশীয় দাদাকেও। কেননা তাঁরও ঐ একই অপরাধ ছিল। এমন স্পষ্ট কথার সাথে অবাস্তব ও অসংলগ্ন কথাবার্তা জুড়ে দেওয়ার কোনই প্রয়োজন করে না।

হারূনের আমলের আরো কিছু বিবরণ

হারূনুর রশীদের যুগের বিবরণ দিতে গিয়ে এবং ঐ আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিবৃত করতে গিয়ে আমরা ১৮৭ হিজরী (৮০৩ খ্রি.) পর্যন্ত উপনীত হয়েছি। ঐ বছর খলীফা তাঁর পুত্র মুতামিনকে 'আসিম' প্রদেশের দিকে রওয়ানা করেন। মুতামিন রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালাতে শুরু করেন এবং আব্বাস ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আশআছকে সেনান দুর্গ অবরোধের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রোমানরা আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে ৩২০ জন মুসলিম বন্দীকে ফেরত দিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। ঐ সময়ে রোমানরা তাদের সম্রাজ্ঞী আইরীনকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে নিসীফোরাস বা নিকফূর নামক জনৈক সর্দারকে তাদের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোমানরা ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমেনের ইতালী বিজয়ে প্রভাবান্বিত হয়ে হারূনুর রশীদের কাছে অনেকটা নতি স্বীকার করে সন্ধি করেছিল। এবার নিকফূর সিংহাসনে বসেই সর্বপ্রথম শার্লিমেনের সাথে আপোস-রফা করেন এবং সেদিকের সীমান্ত নির্ধারণ করে তথা সীমান্ত বিরোধ চুকিয়ে নিয়ে হারূনুর রশীদকে একটি পত্র লিখেন ঃ

> "সম্রাজ্ঞী তার নারীসুলভ দুর্বলতার দরুন তোমার সাথে নতি স্বীকার করে সন্ধি করেছিলেন এবং তোমাকে খারাজ (কর) প্রদান করে আসছিলেন। কিন্তু এটা ছিল তার অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। এবার তুমি এ যাবত আমাদের সাম্রাজ্য থেকে গৃহীত সমুদয় কর ফেরত দাও এবং জরিমানাস্বরূপ আমাদেরকে কর প্রদান করো। অন্যথায় তরবারি দ্বারা তোমাদের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।"

পত্রটি হারূনুর রশীদের হস্তগত হতেই তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ দেখে আমীর-উমারা ও মন্ত্রীবর্গ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দরবার থেকে চুপি চুপি কেটে পড়লেন। হারূন তৎক্ষণাৎ দোয়াত-কলম নিয়ে ঐ পত্রেরই অপর পিঠে লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদের পক্ষ থেকে রোমের কুকুরের প্রতি। হে কাফিরের বাচ্চা! আমি তোর পত্র পাঠ করেছি। তার জবাব তুই নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবি, শোনবার দরকার হবে না।–ইতি

এ জবাব লিখে তিনি পত্রটি পাঠিয়ে দিলেন এবং ঐ দিনই সসৈন্যে বাগদাদ থেকে রোম অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়েই তিনি রাজধানী হারকেলা অবরোধ করে

বসলেন। দিশাহারা হয়ে নিকফূর হারূনুর রশীদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেন এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দানের অঙ্গীকার করেন। হারূন নিকফূরকে পরাস্ত করে পূর্বের তুলনায় অধিক জিযিয়া দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে সেখান থেকে চলে আসেন। প্রত্যাবর্তন পথে রিক্কা পৌঁছেই তিনি সংবাদ পেলেন যে, নিকফূর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবার বিদ্রোহ করতে উদ্যত। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, শীতের তীব্রতার মধ্যে মুসলিম সৈন্যরা সহসা আর আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু হারূনুর রশীদ এ সংবাদ পাওয়া মাত্র রিক্কা থেকে আবার হারকেলা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এবার তিনি রোমানদের অনেক দুর্গ জয় ও ধ্বংস করে নিকফূরের অবস্থানস্থল পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবারও নিকফূর বিনয়ের সাথে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। হারূন তার নিকট থেকে জিযিয়ার অর্থ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ঐ রাজ্যের অধিকাংশে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৭ হিজরীতে হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম ইন্তিকাল করেন।

১৮৮ হিজরীতে (৮০৪ খ্রি.) পুনরায় রোম সম্রাট নিকফূরের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গেল। তাই ইবরাহীম ইব্‌ন জিবরাঈল সাফসাফ সীমান্ত দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালালেন। রোম সম্রাট নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও সুবিধা করতে পারলেন না। চল্লিশ হাজার রোমান সৈন্যকে হত্যা করিয়ে ভীষণ পরাজয়বরণ করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। মুসলিম বাহিনী রোমানদেরকে পরাস্ত করে প্রত্যাবর্তন করে।

১৮৯ হিজরীতে (৮০৫ খ্রি.) খলীফা হারূনুর রশীদ রে-তে আগমন করেন এবং খুরাসানের দিকের প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদের পদে রদবদল করে শাসন পুনর্বিন্যাস করেন। ঐ সময় তিনি দায় লামের শাসকদের অভয়পত্র দিয়ে তার মন জয়ের চেষ্টা করেন। সীমান্ত এলাকার রঈস ও শাসকগণ তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার এবং আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। হারূন এ সময় তারাবিস্তান, রে-, কোমস, হামদান প্রভৃতি এলাকার শাসনক্ষমতা আবদুল মালিক ইব্‌ন মালিককে অর্পণ করেন। এ বছর রোমান এবং মুসলমানদের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়। এ বছরই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদ ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান শায়বানী রে-র নিকটবর্তী যাম্বইয়া পল্লীতে ইন্তিকাল করেন। ঐ একই দিন আরবী ব্যাকরণবিদ কাসাঈও ইন্তিকাল করেন। এরা দু'জনেই হারূনুর রশীদের সফরসঙ্গী ছিলেন। হারূনুর রশীদ উভয়েরই জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। কবরস্তান থেকে ফিরে এসে হারূন মন্তব্য করেন যে, আজ ফিকাহ্ ও ব্যাকরণ দুটোকেই আমরা সমাধিস্থ করে আসলাম।

১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) হারূনুর রশীদ তাঁর পুত্র মামূনকে তাঁর সহকারীরূপে রিক্কায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করে রোম সম্রাট নিকফূরের বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি হারকেলা শহর অবরোধ করেন এবং ত্রিশ দিনের অবরোধের পর তা জয় করে রোমানদেরকে হত্যা ও বন্দী করেন। তারপর দাউদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মূসাকে সত্তর হাজার সৈন্যসহ রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য দুর্গ জয়ের জন্যে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে নাড়া দেয়। ঐ সময় শারজীন ইব্‌ন মাআন ইব্‌ন যাইদা সাকালিয়া, বিস্‌সা ও অপরাপর দুর্গ জয় করেন। ইয়াজীদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ কাওনিয়া জয় করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

মালিক জয় করেন বিখ্যাত যিলকিলা দুর্গ। আমীরুল বাহর হুমায়দ ইব্‌ন সায়ূফ মিসর ও সিরিয়া উপকূলের জাহাজসমূহের মেরামত করে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন এবং সাইপ্রাসবাদীদেরকে পরাস্ত করে গোটা দ্বীপ জয় করে সতের হাজার লোককে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তারপর হারূন তাওয়ানা অবরোধ করেন। মোদ্দাকথা গোটা রোমান সাম্রাজ্যকে তোলপাড় করে মুসলমানরা এবার নিত্যকার ঝগড়া চিরতরে অবসান করতে সংকল্প করেন। এবারও নিকফূর অত্যন্ত বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করে পঞ্চাশ হাজার দীনার জিযিয়া কর প্রেরণ করে। এর মধ্যে তার নিজের জিযিয়া হিসাবে চার দীনার এবং তার পুত্র প্যাট্রিয়কের জিযিয়া হিসাবে দুই দীনার সে প্রদান করে। সাথে সাথে খলীফা হারূনুর রশীদের কাছে আর্জি পেশ করেন যে, হারকেলার বন্দীদের মধ্যকার অমুক রমণীকে জাঁহাপনা যেন দয়া করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে মর্জি করেন। কেননা তার সাথে আমার পুত্রের বিবাহ স্থির হয়েছে। খলীফা তার সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং সত্যি সত্যি ঐ বন্দিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। নিকফূরের কাকুতি-মিনতির প্রেক্ষিতে বার্ষিক তিন লক্ষ দীনার জিযিয়া কর নির্ধারণ করে হারূনুর রশীদ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আবার রোমানরা বিদ্রোহ করে বসে। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) মুসেলের গভর্নর পদে খলীফা খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে নিয়োগ করেন। ঐ বছরই তিনি হারছামা ইব্‌ন আয়ূনকে তারতূস দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। খুরাসানের তিন হাজার এবং মাসীসা ও এন্টিয়কের এক হাজার সৈন্য তারতূস কেল্লা নির্মাণের কাজে নিয়োজিত থাকে। ১৯২ হিজরীতে (৮০৮ খ্রি.) কেল্লা নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ঐ বছরই আযারবায়জানের খারমিয়া বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। তাকে দমনের জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক দশ হাজার সৈন্যসহ প্রেরিত হন। আবদুল্লাহ্ বিদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করে তাদেরকে বধ করেন। এভাবে এ ফিতনা নির্মূল হয়। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯০ হিজরীতে (৮০৫ খ্রি. ২৯শে নভেম্বর) ৩রা মুহাররম তারিখে বৃদ্ধ ইয়াহ্ইয়া বারমাকী ৭০ বছর বয়সে বন্দী অবস্থায় রিক্কায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

১৯১ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) খলীফা মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল ইব্‌ন সুলায়মানকে মুসেলের গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং ফযল ইব্‌ন আব্বাসকে মক্কার আমীর মনোনীত করেন।

খুরাসানে বিদ্রোহ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী ইব্‌ন ঈসা খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করায় বারমাকীরা ওহাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং হামযা ইব্‌ন আতরুককে দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে দেয়। ওহাব নিহত হয় কিন্তু হামযাকে কোন মতেই কাবু করা যায়নি। তখনো সে যত্রতত্র লুটপাট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খুরাসানের আমীর আলী ইব্‌ন ঈসা সমরকন্দও মাওরাউন্ নাহর অঞ্চলে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আশআছকে শাসক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। মাওরাউন্ নাহরের সৈন্যবাহিনীতে রাফি ইব্‌ন লায়ছ ইব্‌ন নসর ইব্‌ন সাইয়ার ছিলেন একজন মশহুর সর্দার। এই রাফি ছিলেন বারমাকীদের সমর্থক এবং আলী ইব্‌ন ঈসা ও খলীফা হারূনুর রশীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের লোক। ঘটনাক্রমে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আশআছ এক মহিলাকে বিবাহ করলে উক্ত রাফি ইব্‌ন

লায়ছ উক্ত মহিলাকে তার সাথে বিবাহ বসার জন্যে প্ররোচিত করে। মহিলা তখন ইয়াহ্ইয়ার নিকট থেকে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে কিন্তু ইয়াহ্ইয়া তাকে তালাক প্রদানে সম্মত হয় না। রাফি তখন তাকে কৌশল শিকিয়ে দিল যে, মহিলাটি যদি নিজের ধর্মত্যাগের কথা ঘোষণা করে এবং ধর্মচ্যুতির দু'জন সাক্ষীও রেখে দেয় তা হলে ইয়াহ্ইয়ার সাথে তার বিবাহ আইনত ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারপর আবার তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নেবে এবং তখন আমি তোমাকে বিবাহ করে নেবো। মহিলা উক্ত কৌশল অবলম্বন করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাফির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। সম্ভবত বিবাহ বিচ্ছেদের এ কৌশল সর্ব প্রথম রাফিই আবিষ্কার করেছিল। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছ এ বিবরণ আনুপূর্বিক লিখে খলীফা হারূনুর রশীদকে তা অবহিত করলেন। হারূনুর রশীদ খুরাসানের গভর্নর আলী ইব্ন ঈসাকে লিখলেন যে, রাফি ও উক্ত মহিলাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাফির উপর শরীয়তের বিধান অনুসারে দণ্ডাদেশ কার্যকরী কর এবং তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সমরকন্দ শহর ঘুরিয়ে এর ঢোল-শহরত কর। সত্যি-সত্যি এ আদেশ কার্যকরী করতে গিয়ে রাফিকে উক্ত মহিলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমরকন্দের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সুযোগ বুঝে কোন এক ফাঁকে রাফি সমরকন্দের কারগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বল্খে গিয়ে খুরাসানের গভর্নর আলী ইব্ন ঈসার দরবারে উপস্থিত হয়। আলী ইব্ন ঈসা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন কিন্তু তার পুত্র ঈসা ইব্ন আলী তার সপক্ষে সুপারিশ করে বসেন। অগত্যা আলী ইব্ন ঈসা তাকে সমরকন্দ গিয়ে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছের সাথে দেখা করতে বলেন। রাফি সমরকন্দে পৌঁছে সেখানকার শাসক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আশআছকে হত্যা করে সমরকন্দের দখল নিজ হাতে তুলে নেয়। এ সংবাদ পেয়ে আলী ইব্ন ঈসা তার পুত্র ঈসা ইব্ন আলীকে সৈন্যবাহিনীসহ সমরকন্দে প্রেরণ করেন। রাফির সাথে যুদ্ধে আলী পুত্র ঈসা নিহত হলেন। এ সংবাদ পেয়ে রাফি মার্ভ দখল করে ফেলতে পারে এ আশংকায় আলী ইব্ন ঈসা সৈন্যবাহিনী নিয়ে বল্খ থেকে মার্ভের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। এটা ছিল ১৯১ হিজরীর (৮০৬ খ্রি) ঘটনা। খলীফা হারূনুর রশীদ রাফির এ দৌরাত্ম্যের সংবাদ অবগত হয়ে খুরাসানের শাসন-শৃংখলা রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি তথায় এ সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। আসল ব্যাপার হলো, খুরাসানের সৈন্যবাহিনীর সকল বড় বড় সর্দার এবং বারমাকী সমর্থকগণ সকলেই রাফির দলে ভিড়ে গিয়েছিল। হারছামা ইব্ন আইউন সমরকন্দে পৌঁছে রাফি ইব্ন লায়ছকে অবরোধ করেন। রাফি সমরকন্দে অবরুদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে।

হারূনের মৃত্যু

রোমানদেরকে দমন এবং নিকফূরকে পরাস্ত করে তাঁর কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার পর হারূনুর রশীদ রিক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে এসে তিনি রাফির দৌরাত্ম্যের এবং খুরাসানের কোন কোন আমীরের বিদ্রোহী মনোভাবের সংবাদ অবহিত হন। তিনি স্বয়ং খুরাসানে যেতে মনস্থ করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করে ১৯২ হিজরীর (৮০৭ খ্রি) শাবান মাসে রিক্কা থেকে বাগদাদে এবং এরপর খুরাসানের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। যাত্রার সময় তিনি রিক্কায় মুতামিনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে খুযায়মা ইব্ন খায়েমকে তাঁর কাছে রেখে যান।

বাগদাদে তিনি তাঁর পুত্র আমীনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং মামূনকেও বাগদাদে আমীনের কাছে অবস্থানের নির্দেশ দেন। মামূনের সেক্রেটারী তাঁকে বাগদাদে আমীনের কাছে অবস্থানের পরিবর্তে খলীফার সহগামী হওয়ার পরামর্শ দেন। সে অনুসারে মামূন খলীফার সহগামী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং হারুনও তাঁর আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর করে নিয়ে তাঁকে সাথে নিয়ে নেন। বাগদাদ থেকে তাঁর যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে রিক্কায় ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকী ১৯৩ হিজরীর মুহাররম (৮০৮ খ্রি অক্টোবর) মাসে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। বাগদাদ থেকে যাত্রা করে উক্ত বছরের সফর মাসে খলীফা জুরজানে উপনীত হন। জুরজানে পৌঁছে খলীফার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। রোমান সাম্রাজ্যের দুর্গ ধ্বংসের সময় সর্বপ্রথম তাঁর এ পীড়ার সূত্রপাত হয়। এই পীড়া নিয়েই তিনি রিক্কায় আসেন এবং সেখান থেকে পীড়িত অবস্থায়ই বাগদাদে আসেন। এই পীড়া নিয়েই তিনি সসৈন্যে খুরাসান অভিযানে যান। খলীফা জুরজানে সমস্ত সর্দারের উপস্থিতিতে সেনাপতিদের সম্মুখে ঘোষণা করেন, এ অভিযানে শামিল সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে তা সবই থাকবে খুরাসানে এবং মামূনের আয়ত্তে। এ বাহিনী ও সর্দার সেনাপতি সকলেই মামূনের প্রতি অনুগত থাকবে। এভাবে মামূনকে রাজ্যলাভের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে তিনি তাঁকে মার্ভের দিকে রওয়ানা করে দিলেন এবং তাঁর সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুআদ, আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা, আব্বাস ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছ এবং নঈম ইব্‌ন হাযিম প্রমুখ সেনাপতিকেও প্রেরণ করলেন। মামূনকে মার্ভের দিকে রওয়ানা করে দিয়ে তিনি নিজে জুরজান থেকে রওয়ানা হয়ে তূসে গিয়ে উপনীত হন। এ সময় তাঁর সাথে ফযল ইব্‌ন রাবী, ইসমাঈল ইব্‌ন সাবীহ, মাসরূর, হাজিব, হুসাইন, জিবরাঈল ইব্‌ন বখতীশু প্রমুখ সেনাপতি ও অমাত্যরা ছিলেন। তূসে পৌঁছে পীড়া এতই বৃদ্ধি পায় যে, খলীফা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। হারছামা ইব্‌ন আইউন এবং রাফি' ইব্‌ন লায়ছের মুকাবিলার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। হারছামা তখনো রাফিকে কাবু করতে পারেননি। তবে বুখারী বিজিত হয় এবং রাফির সহোদর বশীর ইব্‌ন লায়ছ তখন বন্দী হয়ে গেছেন। হারছামা বশীরকে খলীফার সদনে প্রেরণ করেন। তূসে হারূনুর রশীদের রোগ শয্যার সম্মুখে বশীর নীত হন এবং খলীফার নির্দেশে নির্দয়ভাবে নিহত হন। বশীরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েই খলীফা সংজ্ঞা হারান। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর তিনি তখন যে গৃহে অবস্থান করছিলেন সে গৃহের এক কোণে কবর খননের নির্দেশ দিলেন। কবর খনন সমাপ্ত হলে কয়েকজন হাফিয কবরে অবতরণ করে কুরআন খতম করেন। হারূন তাঁর খাট কবরের পাশে বিছিয়ে খাট থেকেই শুয়ে শুয়ে কবর অবলোকন করতে থাকেন। এই অবস্থায়ই ৩রা জুমাদাস সানী ১৯৩ হিঃ মুতাবিক ৮০৮ খ্রস্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে রাতের বেলা খলীফা হারূনুর রশীদ ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র সালিহ্ জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। এভাবে তাঁর ২৩ বছর আড়াই মাস কালব্যাপী শাসন আমলের অবসান ঘটে। তূসে তাঁর কবর রয়েছে।

হারূনুর রশীদের বিবাহ হয়েছিল মানসূর তনয় জা'ফরের কন্যা যুবায়দার সাথে। যুবায়দার কুনিয়ত বা উপনাম ছিল উম্মে জা'ফর। মুহাম্মদ আমীন তাঁরই গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। আলী, আবদুল্লাহ্, মামুন, কাসিম, মু'তামিন, মুহাম্মাদ মু'তাসিম, সালিহ্, মুহাম্মদ আবূ মূসা, মুহাম্মদ

আবূ ইয়াকূব, আবুল আব্বাস, আবূ সুলায়মান, আবূ আলী, আবূ আহ্‌মদ তাঁর এসব সন্তানেরই জন্ম দাসী মাতাদের গর্ভে। হারূনুর রশীদের উক্ত সন্তানদের মধ্যে আমীন, মামূন, মুতামিন ও মু'তাসিম এই চারজন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মু'তাসিমের তেমন লেখাপড়া ছিল না। এজন্যে হারূন তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার যোগ্য বিবেচনা করেননি, কিন্তু কালক্রমে তিনি খলীফা হন এবং তাঁরই বংশধরদের মধ্যে অনেক আব্বাসীয় খলীফার জন্ম হয় এবং তাঁরই মাধ্যমে হারূনুর রশীদের বংশধারা অব্যাহত থাকে। পুত্রদের মত মৃত্যুকালে হারূনুর রশীদ অনেক কন্যা সন্তানও রেখে যান– যাদের সকলেরই জন্ম হয় দাসী মাতাদের গর্ভে।

হারূনুর রশীদ আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে বংশের সূর্য বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাঁরই আমলে আব্বাসী বংশের খিলাফত সংহত হয় এবং উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। হারূনুর রশীদের খিলাফত আমলে আবূ তালিব বংশীয় ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী মহলের সাহসে ভাটা পড়ে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি তাঁর বিশেষ খেয়াল ছিল। যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীদের উৎখাতের কার্যটি তিনি পূর্ণোদ্যমে সম্পন্ন করেন। বিশাল রোমান গ্রীক ঈসায়ী সাম্রাজ্য ছিল তাঁর পদানত ও করদরাজ্য। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোষে নব্বই কোটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। স্পেন ও মরক্কো ছাড়া গোটা মুসলিম জাহানের তিনি ছিলেন খলীফা। মানসূরের যুগেই পুস্তকাদি সংকলনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হারূনুর রশীদের যুগে বাগদাদ-দরবারে ইহুদী ও ঈসায়ী পণ্ডিতদেরও অত্যন্ত সমাদর ছিল। ঈসায়ীদেরকে হারূন সামরিক নেতৃত্বভারও অর্পণ করতেন এবং তাদেরকে অমাত্যরূপ দরবারেও স্থান দিতেন। তাঁর শাসনামলে সিন্ধুর গভর্নরের মাধ্যমে এবং সরাসরি নিজের অনেক ভারতীয় পণ্ডিত বাগদাদে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁদের খুব সমাদর হয়। হিব্রু ভাষায় অনেক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ হয়। নানা শাস্ত্রের গ্রন্থাদি প্রণয়নের ধারার সূচনা ঘটে। বাগদাদের অধিবাসীদের সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য ছিল। এজন্যে বাগদাদে কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চাও বিদ্যমান ছিল। কাহিনীকাররা তাঁর জীবনী সম্পর্কে অনেক কাহিনী ও রূপকথার জন্ম দেয় এবং সে সব রূপকথা বিশ্বময় প্রচারিত হয়। এজন্যে এই খলীফা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্তধারণারও উদ্ভব হয়। হারূনুর রশীদ অত্যন্ত সাহসী ও সামরিকমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অম্লান বদনে তিনি ঘোড়ার জিনে বসে মাসের পর মাস এমনকি বছরও কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু যখন তিনি সূফী-সাধকের মজলিসে বসতেন তখন তাঁকে এক সংসারত্যাগী দরবেশ বলে মনে হতো। ফকীহ্‌দের দরবারে যখন তিনি উপবেশন করতেন তখন তাঁকে একজন উঁচুদরের ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসের মজলিসে উপবেশন করলে একজন উঁচুদরের মুহাদ্দিস বলে বিশ্বাস জন্মাতো। কেবল একটি শ্রেণীর তিনি জাতশত্রু ছিলেন; তারা হলো যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীর দল। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করতেন। হজ্জ, জিহাদ ও দান-খয়রাত তিন কাজেই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কেউ যখন তাঁকে উপদেশ দিতেন এবং দোযখের ভয় প্রদর্শন করতেন, তখন তিনি অঝোরে ক্রন্দন করতেন।

একদা ইব্‌ন সাম্মাক হারূনের দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় হারূনের খুব তৃষ্ণা পেল। হারূন পানি পান করতে যাচ্ছেন এমনি সময় ইব্‌ন সাম্মাক বলে উঠলেন, আমীরুল মু'মিনীন, একটু থামুন! হারূনুর রশীদ তক্ষুণি থেমে গিয়ে বললেন ঃ জী বলুন!

দরবেশ বললেন, আচ্ছা বলুন দেখি, তীব্র পিপাসার সময় যদি পানি একান্তই দুর্লভ হয় তখন এক পেয়ালা পানির জন্যে আপনি কতটা মূল্য দিতে সম্মত হবেন ?

জবাবে হারূনুর রশীদ বললেন ঃ এজন্যে প্রয়োজন হলে অর্ধেক সাম্রাজ্য দান করব। তখন ইব্‌ন সাম্মাক বললেন ঃ আচ্ছা আপনি পানি পান করে নিন!

খলীফার পানি পান করা শেষ হলে দরবেশ আবার তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা আমীরুল মু'মিনীন, বলুন দেখি, সে পানি যদি আপনার পেটেই রয়ে যায়, বের না হয় তা হলে কী পরিমাণ অর্থ আপনি এটা বের করার জন্য ব্যয় করতে সম্মত আছেন ?

জবাবে হারূনুর রশীদ বললেন, এ জন্যে প্রয়োজন হলে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেব। এবার দরবেশ বলে উঠলেন, এবার বুঝে নিন, আপনার এ গোটা রাজত্বের মূল্য হচ্ছে এক পেয়ালা পানি এবং একটু পেশাব। এজন্যে আপনার গর্বিত হওয়া সাজে না। দরবেশের এ উপদেশ বাক্য শুনে হারূনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর এ কান্নাকাটি অব্যাহত ছিল।

একদা হারূনুর রশীদ জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমাকে উপদেশ দিন! তিনি বললেন, আপনার কোন মোসাহেব যদি আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করে আর তার ফল ভাল হয় তবে ঐ মোসাহেবটি ঐ মোসাহেবের তুলনায় উত্তম যে আপনাকে ভয়মুক্ত করে দেয় অথচ তার পরিণাম মন্দ।

হারূনুর রশীদ বললেন ঃ ব্যাপারটি একটু খুলেই বলুন যাতে তা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করতে পারি। দরবেশ বললেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে বলে যে, কিয়ামতের দিন আপনাকে প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন! তবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম যে আপনাকে বলে যে, আপনি নবী পরিবারের নিকটাত্মীয়, নবী করীম (সা)-এর সাথে বংশগত নৈকট্যের দরুন আপনার সকল গোনাহ্‌ই মাফ হয়ে গেছে। একথা শুনে হারূন এমনিভাবে অশ্রুপাত করলেন যে, দর্শকমাত্রেরই তাঁর প্রতি করুণার উদ্রেক হলো।

কাযী ফাযিলী বলেন, দুইজন বাদশাহ্ ছাড়া তৃতীয় এমন কেউ নেই যিনি জ্ঞানান্বেষণ নিমিত্ত সফর করেছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন হারূনুর রশীদ। তিনি তাঁর পুত্রদ্বয় আমীন ও মামূনকে নিয়ে ইমাম মালিকের খিদমতে তাঁর মুয়াত্তার জ্ঞানার্জনের জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি মুয়াত্তার যে কপিটি থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা মিসরের বাদশাহদের কাছে সংরক্ষিত থাকতো। অপর ভাগ্যবান বাদশাহ হচ্ছেন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী—যিনি মুয়াত্তারই শিক্ষা লাভের মানসে আলেকজান্দ্রিয়া সফর করেছিলেন।

হারূনুর রশীদের পোলো খেলার এবং তীর-ধনুকের মাধ্যমে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে হেকীম জিবরাঈলের ভুলের দরুন তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। হারূনুর রশীদের সফর সঙ্গীদের মধ্যে এই হেকীম ছিলেন তাঁর পুত্র আমীনের সমর্থক। অপর দিকে হাজিব মাসরূর ছিল মামূনের সমর্থক। হারূনুর রশীদ যখন সফরে ছিলেন এবং তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল তখন

খলীফা তনয় আমীন বকর ইব্‌ন মুতামির-এর মাধ্যমে হারূনের সফরসঙ্গীদেরকে এমন কিছু চিঠিপত্র পাঠিয়েছিলেন– যাতে খলীফাকে মৃত্যু ধরে নিয়ে তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান ছিল। একটি পত্রে আমীন তাঁর ভাই সালিহ্‌কে লিখেন যে, লোক-লশকর, যুদ্ধাস্ত্র ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে ফযল ইব্‌ন রাবীর সাথে পরামর্শক্রমে কালবিলম্ব না করে রাজধানীতে চলে এসো। এ মর্মে পত্র খলীফার অন্য অনেক সফর সঙ্গীকেও লিখিত হয়। একটি পত্র ফযল ইব্‌ন রাবীর নামেও ছিল। এরূপ পত্রে আমীন সকলকে তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখার অঙ্গীকারও করেছিলেন। ঘটনাক্রমে হারূনুর রশীদ বকর ইবনুল মুতামিরের বাগদাদ থেকে আগমনের সংবাদ অবগত হন। তিনি বকরকে কাছে ডেকে তার আগমনের হেতু কি জিজ্ঞেস করেন। সে কোন সঙ্গত জবাব দিতে না পারায় খলীফা তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন এবং তার অব্যবহিত পরেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। ফযল ইব্‌ন রাবী বকরকে কারামুক্ত করেন। তখন বকর আমীনের লিখিত পত্রগুলো হস্তান্তরিত করে। সর্দাররা এ নিয়ে সলা-পরামর্শ করেন। যেহেতু সকলেই বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন এজন্যে লোক-লশকর ও ধন-সম্পদ নিয়ে ফযল ইব্‌ন রাবী বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। হারূনের অন্তিম উপদেশ এবং মামূনের ব্যাপারে তা ওসীয়তের কথা কেউ আর স্মরণ রাখল না।

আমীনুর রশীদ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ

মুহাম্মাদ আমীন ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মাহদী ইব্‌ন মানসূর আব্বাসীর জন্ম হয় যুবায়দা খাতুনের গর্ভে। আমীন ও মামূন দু'জনই ছিলেন সমবয়স্ক। হারূনুর রশীদের আমীনকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন, কিন্তু সাথে সাথে মামূনকে খুরাসান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র শাসক মনোনীত করে আমীনকে ওসীয়ত করেন যে, মামূনকে যেন খুরাসানের শাসক পদ থেকে অপসারিত করা না হয়। সাথে সাথে মামূনকেও তিনি আমীনের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে বারণ করে যান। তূসে যখন হারূনুর রশীদের ইন্তিকাল হয় মামূন তখন মার্ভে এবং আমীন বাগদাদে। সালিহ্ পিতার সাথে তূসেই ছিলেন। হারূনের মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জুমাদাস সানী ১৯৩ হিজরীতে (৮০৯ খ্রি ফেব্রুয়ারী) হারূনের সেনাপতি সর্দার ও অমাত্যরা আমীনের সপক্ষে সালিহ্-এর হাতে খিলাফতের বায়আত করেন। ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ হামুভীয়া সাথে সাথে বাগদাদে অবস্থিত তাঁর নায়েবকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। নায়েব কালবিলম্ব না করে যথাসময়ে আমীনকে হারূনের মৃত্যু এবং তাঁকে খলীফা বলে অমাত্যদের স্বীকার করে নেয়ার সংবাদ অবহিত করেন। হারূন পুত্র সালিহ্‌ও এ সংবাদটি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আমীনকে পত্র মারফত অবহিত করে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে তিনি খলীফার সীলমোহর, রাজদণ্ড ও আঙ্গুরীয় অগ্রজ আমীনের খিদমতে পাঠিয়ে দেন। এসময় হারূন মহিষী ও আমীনের গর্ভধারিণী বেগম যুবায়দা খাতুন রিক্কায় অবস্থান করছিলেন। রাজকোষ তখন তাঁরই হাতে ছিল। আমীন এ সংবাদ ও পত্রাদি লাভের প্রেক্ষিতে জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে খুতবা প্রদান করলেন। তিনি খলীফা হারূনুর রশীদের ইন্তিকালের কথা জনগণকে অবহিত করলেন এবং জনগণের বায়আত গ্রহণ করলেন।

এ সংবাদ পেয়ে যুবায়দা খাতুন রাজকোষসহ রিক্কা থেকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। সংবাদ পেয়ে আমীন আম্বার পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে বাগদাদে নিয়ে আসলেন। মামূন পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মার্ভে সেনাপতিবর্গ ও সেখানে উপস্থিত অমাত্যদেরকে সমবেত করলেন এবং তাঁদের কাছে নিজের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। এই সর্দার ও সিপাহ্সালারদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআয, শাবীব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবা, আল্লামা হাজি, আব্বাস ইব্ন যুহায়র, আইউব ইব্ন আবূ সুমায়র, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালিহ, ফযল ইব্ন সাহল প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে জুরজান পর্যন্ত মামূনসহ এদের সবাই হারূনের সাথেই ছিলেন। এ সফরে ফযল ইব্ন সাহ্ল সিপাহসালার ও সর্দারদেরকে মামূনের পক্ষে টানার চেষ্টা চালান। ফলে অনেকে মামূনের সমর্থনে সবকিছু করার অঙ্গীকারও করেছিলেন। কিন্তু ফযল ইব্ন রাবী ছিলেন আমীনের সমর্থক। এবার হারূনুর রশীদের ওফাতের পর ফযল ইব্ন রাবীর চেষ্টার ফলে তূসে উপস্থিত সকলেই আমীনের পক্ষে বায়আত করে বাগদাদে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তাঁরা একটি বারের জন্যেও চিন্তা করলেন না যে, খলীফার ওসীয়ত অনুসারে আমাদেরকে এখন মামূনের দরবারে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। কেননা, সেই ওসীয়ত অনুসারে এসব এখন মামূনের। খলীফার ওসীয়ত অনুসারে যারা খুরাসানে ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে মামূনের আধিপত্যের সমর্থক ছিলেন সেই সব সেনাপতির কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন যে, ফযল ইব্ন রাবী এখনো পথে রয়েছেন, এখান থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাকে মার্ভে নিয়ে আসা হোক। কিন্তু ফযল ইব্ন সাহ্ল এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করে বললেন যে, যদি এভাবে তাদেরকে মার্ভে আসতে বাধ্য করা হয় তা হলে এরা প্রতারণাপূর্বক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে ভীষণ অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য যারা ইতিপূর্বে মামূনের সমর্থনের অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁদেরকে খলীফার ওসীয়ত এবং তাঁদের পূর্ব অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে পয়গাম পাঠানো যেতে পারে। সে মতে দুইজন কাসেদ প্রেরণও করা হলো। কিন্তু তারা যখন ফযল প্রমুখের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সকলকেই বৈরী ভাবাপন্ন দেখতে পেলেন। কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে মামূনকে গালমন্দও করলেন। কাসেদদ্বয় অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসলেন এবং সেখানকার অবস্থা সবিস্তারে মামূনের কাছে বিবৃত করলেন। মামূন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে তিষ্টাতে দেয়া হবে না। এজন্যে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এদিকে ফযল ইব্ন সাহল পণ করে বসলেন যে, যেভাবেই হোক, মামূনকে খলীফা বানিয়েই ছাড়বো। মামূনের সঙ্গীদের মধ্যে এমনও অনেক ছিলেন যারা তাকে খলীফা বানানোর পক্ষপাতী ছিলেন না সত্য তবে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে তাঁর আধিপত্যকে তাঁরা সমর্থন করতেন। ফযল ইব্ন সাহ্ল এবং তাঁর সমর্থকরা আমীনকে খলীফারূপে মেনে নিতেই নারাজ ছিলেন। তাঁরা যে কোন মুল্যে মামূনকে খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ফযল ইব্ন সাহ্লের পিতা সাহ্ল ছিলেন একজন নওমুসলিম অগ্নিপূজক যিনি হারূনুর রশীদের আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হারূনুর রশীদই সাহলের পুত্র ফযলকে মামূনের সচিবরূপে নিয়োগ করেন। অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন তিনি মামূনকেই খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমীনের জন্মদাত্রী ছিলেন হাশিমিয়া বংশের রমণী। সেজন্য আরবদের সমর্থন ছিল তাঁর পক্ষে। পক্ষান্তরে মামূনের জন্মদাত্রী ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। এজন্য ইরানী ও খুরাসানীরা ছিল মামূনের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমীন বাগদাদে আরবদের মধ্যে ছিলেন। এদিকে মামূনও মার্ভে তাঁর সমর্থকগোষ্ঠী অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে ছিলেন। যুবায়দা খাতুন মামূনকে পছন্দ করতেন না। আবার আব্বাসীদের শুভাকাঙ্ক্ষী আরব সর্দাররা উলুভীদেরকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু খুরাসানে উলুভীদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। জা'ফর বারমাকী উলুভীদের সমর্থক এবং মামূনের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এজন্যে খুরাসান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে মামূনের জনপ্রিয়তা ছিল বেশি। ফযল ইব্‌ন রাবী প্রমুখ বারমাকীদেরকেও ঘৃণা করতেন, আবার মামূনের প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। মোটকথা মামূন ও আমীনের মধ্যে বনিবনা ছিল না। তাঁদের পাশেও এমন সব লোক জমায়েত হয়েছিল যারা দু'টি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল। তাই হারূনের মৃত্যুর সাথে সাথে আমীন ও মামূনের নেতৃত্বে উভয় শিবিরের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হলো। তাদের একদল অপরদলের ওপর মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। মামূন খুরাসানবাসীদের অন্তর জয় করার জন্যে তাদের এক-চতুর্থাংশ খারাজ মওকুফ করে দিলেন এবং খুরাসানী সর্দারদেরকে বড় বড় পদে নিয়োগের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। ইরানবাসীরা উল্লসিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, মামূনুর রশীদ হচ্ছেন আমাদের বোন-পো। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে পদোন্নতি দান করবেন। এদিকে মামূন মার্ভের উলামা ও কূফীদেরকে ডেকে জনগণকে তাঁর সপক্ষে টানার উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করার জন্যে বলে দিলেন যাতে পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে থাকে। এতদসত্ত্বেও আমীনের খিদমতে উপঢৌকনাদিসহ বিনয়-সম্ভাষণপূর্ণ পত্র প্রেরণ করে আপন আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে মামূন অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন।

খলীফা আমীনুর রশীদ যদি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, তবে মামূনুর রশীদের পক্ষ থেকেই অবৈধ আক্রমণের সূচনা হতো এবং বিশ্বের দরবারে তিনিই নিন্দিত হতেন। এতে হয়ত তাঁর পক্ষে সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। কিন্তু ফযল ইব্‌ন রাবী প্রমুখ মন্ত্রণাদাতার কুপরামর্শে তিনি এমনি অদূরদর্শী তৎপরতায় লিপ্ত হলেন যে, জনসমক্ষে খুব শিগগিরই হারূনুর রশীদের সিংহাসনের অনুপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন হলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই সর্বপ্রথম তিনি তাঁর ভাই কাসিম অর্থাৎ মু'তামিনকে জাযিরার হুকুমত থেকে পদচ্যুত করার ভুলটি করে কেবল কানসারা ও আওয়াসিম প্রদেশের শাসনভার তাঁর হাতে রাখলেন। জাযিরা রাজ্যে তিনি খুযায়মা ইব্‌ন খাযিমকে গভর্নর নিয়োগ করলেন। ঐ বছরই অর্থাৎ সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি মামূনের পরিবর্তে তাঁর আপন পুত্র মূসা ইব্‌ন আমীনকে ফযল ইব্‌ন বারীর পরামর্শক্রমে যুবরাজ মনোনীত করতে গিয়ে মামূনকে বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। (পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর প্রাক্কালে) যখন হারূনুর রশীদ খুরাসান যাত্রা করছিলেন তখনই তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, এ লশকর এবং সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম মামূনুর রশীদের হস্তে খুরাসানেই থাকবে এবং মামূনই এর স্বত্বাধিকারী হবেন। কিন্তু, ফযল ইব্‌ন রাবী, সমস্ত লোক-লশকর ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি যা তখন তূসে খলীফার সাথে ছিল—সব কিছু নিয়ে বাগদাদ রওয়ানা হয়ে পড়েন। এভাবে তিনি মামূনকে অত্যন্ত দুর্বল

করে ফেলেছিলেন। এজন্যে তাঁর মনে আশংকা ছিল যে, আমীনের পরে যদি মামূন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শীঘ্রই খলীফা হয়ে যান, তাহলে মামূন নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এজন্যে যে কোন মূল্যে মামূনকে যুবরাজের পদ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঐ একই আশংকা ছিল খুরাসানের ভূতপূর্ব গভর্নর আলী ইব্‌ন ঈসারও। এজন্যে তিনিও ফযল ইব্‌ন রাবীর পরামর্শের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেন এবং মামূনকে যুবরাজ পদ থেকে অপসারণের জন্যে আমীনকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু খুযায়মা ইব্‌ন খাযিমের কাছে যখন ব্যাপারটি উত্থাপন করা হলো তখন তিনি এ পরামর্শের ঘোর বিরোধিতা করলেন এবং খলীফাকে এ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিবৃত রাখলেন। এসব খবর অরহর মামূনের কাছে পৌঁছেছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন এবং পানি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকলেন।

মামূন সকাশে রাফি ও হারছামা

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, হারছামা ইব্‌ন আইউন সমরকন্দে রাফিকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। রাফির পরাস্ত হওয়ার পূর্বেই তূসে হারূনুর রশীদের মৃত্যু হয়। রাফির সহোদর বশীর বন্দী হয়ে খলীফার দরবারে নীত হয় এবং তাঁরই নির্দেশে নিহত হয়। হারূনের মৃত্যুর পর হারছামা বাহুবলে সমরকন্দ পুনর্দখল করলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। তাহের ইব্‌ন হুসাইনও ছিলেন ঐ সময় হারছামার সাথী। রাফি ইব্‌ন লাইছ সমরকন্দ থেকে পালিয়ে তুর্কীদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং একটি তুর্কী বাহিনী সাথে নিয়েই পুনরায় সমরকন্দে হারছামার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে রাফি পরাজিত হয়। তারপর তুর্কীদের সাথেও রাফির মনোমালিন্য শুরু হয়। ফলে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সে যথারীতি মামূনের দরবারে দূত পাঠিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। মামূন তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং সে মার্ভে মামূনের দরবারে উপস্থিত হয়। সেখানে তাকে মর্যাদাপূর্ণ আতিথ্য প্রদান করা হয় এবং অল্প কয়েকদিন পরেই হারছামাও মামূনের দরবারে উপস্থিত হন। মামূন তাঁকে তাঁর রেকাবী ফৌজের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেন। এ সময়ে মামূন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিককে রে-র গভর্নর পদ থেকে পদচ্যুত করেন।

আমীন-মামূনের সুস্পষ্ট বিরোধ

বাগদাদে আমীনের কাছে খবর পৌঁছল যে, মামূন হারছামাকে তাঁর রেকাবী বাহিনীর প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, রাফিকে সসম্মানে পারিষদভুক্ত করেছেন এবং রে-রাজ্যের গভর্নর পদ থেকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে পদচ্যুত করেছেন। এ সংবাদ পেয়েই অহেতুক তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং খুতবা থেকে মামূনের নাম কেটে দিয়ে আপন পুত্রের নাম যুবরাজরূপে খুতবাভুক্ত করলেন। সাথে সাথে তিনি আব্বাস ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন জা'ফর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীককে দূতরূপে এ পয়গাম দিয়ে মামূনের কাছে পাঠালেন যে, আমার পুত্র মূসা তোমার পূর্বেই যুবরাজ হবে, এ ব্যাপারে তুমি সম্মত হয়ে যাও এবং এ মাসে সাধারণ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও যে, মূসা ইব্‌ন আমীন প্রথম যুবরাজ। মামূন এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল এ মওকায় আব্বাস ইব্‌ন মূসাকে সপক্ষে টেনে এ ব্যাপারে সম্মত করে

ফেললেন যে, তিনি বাগদাদে অবস্থান করে গুপ্তচরের কাজ করবেন এবং জরুরী সংবাদগুলো যথাসময়ে সরবরাহ করবেন। আমীন খুরাসানের কোন কোন অঞ্চলও ছেড়ে দেয়ার জন্যে মামূনকে নির্দেশ দিলেন। মামূন তাঁর এ আবদারও প্রত্যাখ্যান করলেন। মামূন যখন সংবাদ পেলেন যে, বাগদাদে আমীন খুতবা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন তখন তিনিও পাল্টা ব্যবস্থারূপে খুরাসানে খুতবা থেকে আমীনের নাম বাদ দিয়ে দিলেন। এ সময়ে আমীন কা'বাগৃহে হারূনুর রশীদ রক্ষিত সেই দলীলও খুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। এটা ১৯৪ হিজরীর (৮০৯ খ্রি) শুরুর দিকের কথা। এবার আমীনের বিরোধিতা করার পূর্ণ অধিকার মামূনের অর্জিত হলো। মামূন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খুরাসান সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন যাতে আমীনের কোন দূত বা পত্র খুরাসানে পৌঁছে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বালিয়ে দিতে না পারে।

প্রদেশসমূহে অশান্তি

যখন দুই ভাইয়ের বিরোধ, কা'বাগৃহ থেকে দস্তাবেজ তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা এবং খুতবা থেকে পরস্পরের নাম প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল, তখন চারদিকের সুযোগ সন্ধানীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তিব্বতের খাকান, তুর্কী রাজন্যবর্গ এবং কাবুলের বাদশাহর মতো মুসলিম সাম্রাজ্যের করদরাজ্যসমূহের রাজারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। তারা মুসলিম রাজ্যসমূহে লুটপাট, চোরাগোপ্তা হামলা ও প্রকাশ্য আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। এ সব সংবাদ শ্রবণে মামূন চিন্তিত হলেন। কিন্তু ফযল ইব্ন সাহলের পরামর্শ মুতাবিক এসব রাজা-বাদশাহকে নম্রতাপূর্ণ এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন পত্রাদি লিখলেন। তিনি কারো রাজস্বকর মওকুফ করে, কাউকে অন্যভাবে সুবিধাদি দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করলেন। ফলে মামূনের এ দুশ্চিন্তা শিগগির কেটে গেল। দেশের অভ্যন্তরে আর কোনরূপ বিশৃংখলার সুযোগ রইল না। কেননা খুরাসানবাসীরা মনেপ্রাণে মামূনের সমর্থক ছিল। তাঁরা আরবপন্থী আমীনকে পরাস্ত দেখতে আগ্রহী ছিল। এদিকে পশ্চিমাঞ্চল তথা আমীনের শাসনাধীন রাজ্যসমূহে যে অশান্তি দেখা দিল তা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হলো। সিরিয়ায় বনূ উমাইয়া বংশের কেবল একব্যক্তি বেঁচে ছিলেন যার নাম আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া। তাঁর মা ছিলেন নফীসা বিন্ত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। ইনি সুফিয়ানী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আমি সিফ্ফীন যুদ্ধের সর্দারদের অর্থাৎ মুআবিয়া (রা) ও আলী (রা)-এর বংশধর। তিনি অত্যন্ত বিদ্যাধর এবং সচেতন পুরুষ ছিলেন। আমীন ও মামূনকে পরস্পর যুদ্ধোদ্যত দেখে সুযোগ বুঝে তিনি সিরিয়ায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। সিরিয়ায় অবস্থান রত বনূ উমাইয়া সমর্থক গোত্রসমূহ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। আমীন সিরিয়ায় অভিযান চালিয়েও পরাস্ত হলেন। কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে হাঙ্গামা রইল। অবশেষে ১৯৮ হিজরীতে (৮১৩ খ্রি) সুফিয়ানী কোন কোন শামী গোত্রের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে সিরিয়া থেকে ফেরার হয়ে যায়। এবার সিরীয়রা দামেশ্ক দখল করে নেয়। আমীন যখন খানাকা'বা থেকে দস্তাবেজ উঠিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং দাঊদ ইব্ন ঈসা এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে মক্কা-মদীনা তথা হিজায প্রদেশের অধিবাসীদেরকে এ মর্মে বুঝালেন যে, আসলে এভাবে আমীনও মামূনের প্রতি

অবিচারই করেছেন। আমাদের উচিত হবে খলীফা হারূনুর রশীদের সাথে অথবা মামূনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার যে অঙ্গীকার করেছি তার উপর অবিচল থাকা এবং আমীনের দুধের শিশু মূসার প্রতি আনুগত্যের শপথ না নেয়া। দাউদ ইব্‌ন ঈসার এ প্রচেষ্টার ফল দাঁড়ালো এই যে, হিজাযবাসীরা একবাক্যে মামূনের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমীনের নাম তারা খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দিল। তারা মামূনকেই খলীফা বলে স্বীকার করে নিল। দাউদ ইব্‌ন ঈসা মক্কা থেকে বসরা ও পারস্য কিরমান হয়ে মার্ভে গিয়ে মামূনুর রশীদকে হিজাযের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। খুশি হয়ে মামূন তাঁকেই মক্কার গভর্নর নিয়োগ করে পাঠালেন। এটা হচ্ছে ১৯৬ হিজরীর (৮১১ খ্রি) ঘটনা। মোটকথা, বিদ্রোহজনিত ক্ষতি আমীনকেই সমধিক সইতে হয়েছে। মামূনকে এ জন্যে কোন ক্ষতিই সইতে হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমীনের রাজ্যশাসনের যোগ্যতার ঘাটতি ছিল।

রোমানদের অবস্থা

হারূনুর রশীদের ইন্তিকালের কয়েকদিন পরে রোম সম্রাট নিকফূরও জর্জানের যুদ্ধে নিহত হন।[১] তাঁর পুত্র[২] তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়, কিন্তু দু'বছর পর সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর তার ভাগিনী জামাই মীকাঈল ইব্‌ন জুরজীস সিংহাসনে আরোহণ করে। কিন্তু পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪ হিজরীতে (৮০৯ খ্রি) রোমানরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ফলে সে রাজধানী পরিত্যাগ করে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তখন রোমানরা তাদের সেনাপতি এলিউনকে সিংহাসনে বসায়। মোটকথা, যখন হারূনুর রশীদের রাজত্বে গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতা চলছিল তখন রোমান সাম্রাজ্যও চরম বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল।

আমীন ও মামূনের শক্তি পরীক্ষা

১৯৪ হিজরীর শেষ দিকে (৮১০ খ্রি) আমীন মামূনকে যুবরাজের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং মামূনও আমীনের নাম খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দেন। তারপর আমীন যে কেবল মামূনের স্থলে তাঁর নিজ পুত্রকে যুবরাজ করলেন তাই নয়, বরং তিনি তাঁর অপর ভাই মু'তামিনকেও পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে তাঁর অপরপুত্র আবদুল্লাহকে যুবরাজ মনোনীত করলেন এবং যথারীতি খুতবাতে তাঁর উক্ত পুত্রদ্বয় মূসা ও আবদুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হতে লাগলো। এবার আমীন ও মামূনের শক্তি পরীক্ষার পথে আর কোন কিছুর অপেক্ষার প্রয়োজন রইল না। ফযল ইব্‌ন সাহ্‌লকে মামূন যুর-রিয়াসাতায়ন অর্থাৎ অসি ও মসির অধিকর্তা খেতাব প্রদান করে সালতানাতের নির্বাহী প্রধান (মাদারুল মাহাম) পদ দান করেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুসাব ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আসাদ খুযায়ীকে তিনি প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করেন। ফযল ইব্‌ন সাহল সীমান্তবর্তী রাজ্য রে-তে গিয়ে সেখানকার দক্ষ সৈন্যদেরকে সেনাদলে ভর্তি করে প্রধান সিপাহসালারের হাতে অর্পণ করেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন আবুল আব্বাস খুযায়ীকে রে-র প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। আবুল আব্বাস রে-তে তাঁর

---

১. এ যুদ্ধ ছিল কুলচারীয়গণের সাথে।
২. তার নাম ছিল ইস্তিব্রাক। –অনুবাদক

বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেন। এদিকে আমীনুর রশীদ ইসমাত ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমকে এক হাজার পদাতিক সৈন্যসহ হামাদানের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা হামাদানে অবস্থান করে অগ্রবর্তী বাহিনীকে সাদার দিকে রওয়ানা করবে। তারপর আমীন একটি বিশাল বাহিনী বিন্যস্ত করে ফযল ইব্‌ন রাবীর পরামর্শ অনুসারে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহানের নেতৃত্বে মামূনের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা করেন। আমীন ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ফযল ইব্‌ন রাবীর এটা ছিল একটা মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। কেননা, ইতিপূর্বেই খুরাসানবাসীরা আলীকে গভর্নররূপে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তার প্রতি বিরূপ খুরাসানবাসীরা যখন তার আগমনের সংবাদ পেল তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আরো বেশি মারমুখী হয়ে উঠল। আমীন আলী ইব্‌ন ঈসাকে নাহাওন্দ, হামাদান, কুম, ইস্ফাহান এবং পার্বত্য অঞ্চল জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। তিনি রাজকোষ থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সাথে দিয়ে বিদায় করেন এবং আমিলদের নামে এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, তারা যেন আলী ইব্‌ন ঈসার সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন। আলী ইব্‌ন ঈসা যখন আমীনের মাতা যুবায়দা খাতুনের নিকট থেকে বিদায় নিতে গেলেন তখন তিনি তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে, মামূনকে গ্রেফতার করে তার সাথে যেন কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা না হয়। স্বয়ং খলীফা আমীন এবং তাঁর প্রভাবশালী শাসক সহকর্মিগণ ১৯৫ হিজরীর শাবান মাসে (৮১০ খ্রি) আলী ইব্‌ন ঈসা ও তার বাহিনীকে রাজধানীর বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে বিদায় দেন। এটা ছিল এমনি একটি বাহিনী যে, বাগদাদবাসীরা ইতিপূর্বে এমন শানশওকত পূর্ণ বাহিনী কোনদিন দেখেনি।

আলী ইব্‌ন ঈসা খলীফা আমীনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যখন রে-এর নিকটবর্তী হলেন তখন তার সঙ্গীরা অগ্রবর্তী বাহিনী বিন্যাস এবং ব্যূহ-রচনার জন্য তাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আলী তা উপেক্ষা করলেন এবং বললেন যে, তাহিরের মত ব্যক্তির মুকাবিলার জন্য ব্যূহ রচনার আদৌ প্রয়োজন নেই। বরং এদেরকে ঘেরাও করেই গ্রেফতার করে নেয়া উচিত। আলী ইব্‌ন ঈসার বিশাল বাহিনীকে আসতে দেখে তাহির ইব্‌ন হুসাইনের বাহিনীর কিছু লোক ঠিক কাতারবন্দি হওয়ার সময় আলীর দলে এসে যোগ দিল। বিজয়ী দলে যোগদান করে ফায়দা হাসিল করা এবং পরাজয়ের ক্ষতি এড়ানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আলী ইব্‌ন ঈসা তাদেরকে পিটিয়ে বের করে দেন এবং তাদের কিছু সংখ্যককে গ্রেফতার করেন। এতে তাহির ইব্‌ন হুসাইনের খুব উপকার হলো। তার বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্য তখন যুদ্ধের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো এবং মরিয়া হয়ে উঠলো। অবশেষে লড়াই শুরু হলো। আলীর দক্ষিণ বাহিনী ও বাম বাহিনী তাহিরের দক্ষিণ বাহিনী ও বাম বাহিনীকে পরাস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসারণে বাধ্য করলো। কিন্তু তাহির তার মধ্যবাহিনীসহ আলীর মধ্যবাহিনীর উপর এমনি প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন যে, আলীর মধ্যবাহিনী পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। অবস্থা দৃষ্টে তাহিরের দক্ষিণ বাহিনী এবং বাম বাহিনী পুনরায় এগিয়ে এলো এবং সাহসে ভর করে তাহিরের সাথে এসে মিলিত হলো। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে একটা

তীর এসে আলীর গলায় বিঁধলো। তাকে ভূতলশায়ী হতে দেখে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাহিরের সৈন্যরা আলীর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তাহিরের বিজয়ী বাহিনী দুই ফার্সং[১] পর্যন্ত আলীর পলাতক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলো। বাগদাদের বাহিনীর অনেকেই এভাবে নিহত ও বন্দী হলো। রাতের অন্ধকার নেমে এসে অবশিষ্ট বাহিনীকে নিহত ও বন্দী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলো। তাহির ইব্‌ন হুসায়ন রে-তে প্রত্যাবর্তন করে মামূনের নামে এভাবে বিজয়বার্তা প্রেরণ করলেন ঃ

আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে সবিনয় নিবেদন

এমন অবস্থায় আমি আপনাকে এ পত্র লিখছি ফযল আলী ইব্‌ন ঈসার খণ্ডিত শির আমার সম্মুখে। তার অঙ্গুরীয় এখন আমার আঙ্গুলে শোভা পাচ্ছে। তার বাহিনী এখন আমার নির্দেশাধীন।

তিনদিনে পত্রখানি মার্ভে ফযল ইব্‌ন সাহলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।[২] ফযল তা নিয়ে মামূনের খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং জয়ের জন্য মুবারকবাদ দিলেন। রাজদরবারের অমাত্যবর্গ মামূনকে আমীরুল মু'মিনীনরূপে অভিবাদন জানালেন। দু'দিন পর আলীর খণ্ডিত শিরও মার্ভে এসে পৌঁছল। গোটা খুরাসানে এর প্রদর্শনী হলো।

বাগদাদে আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন হামানের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছতেই আমীন আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা আনবারীকে বিশ হাজার সৈন্য সহকারে তাহিরের মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। তাঁকে হামাদান এবং খুরাসান রাজ্যের গভর্নর পদও প্রদান করা হলো এবং বলা হলো যে, এ রাজ্যগুলো পুনরুদ্ধার করে তুমিই রাজ্যগুলোর শাসন পরিচালনা করবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা হামাদানে পৌঁছে দুর্গে আশ্রয় নেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন তার আগমনের সংবাদ পেয়ে হামাদানের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা হামাদান থেকে অগ্রসর হয়ে তার মুকাবিলা করেন, কিন্তু তাহির প্রথম আক্রমণেই তাঁকে পরাস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে বাধ্য করেন। আবদুর রহমান হামাদানে প্রত্যাবর্তন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনর্বার তাঁর মুকাবিলা করেন। কিন্তু এবারও তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। অগত্যা তিনি পুনর্বার হামাদানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন হামাদান অবরোধ করে বসলেন। এ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলো। এই ফাঁকে তাহির ইব্‌ন হুসাইন কাযভীন জয় করে নেয়। কাযভীনের শাসক পলায়ন করেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় শহরবাসীরা এতই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, তাদের পক্ষ থেকেই আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবালা চোরাগোপ্তা হামলার আশংকা করলেন। অগত্যা তিনি তাহির ইব্‌ন হুসাইনের নিকট অভয় প্রার্থনা করলেন। তাহির তাকে অভয় দিয়ে নিজে হামাদান দখল করে ফেললেন। তাহিরের নিকট অভয় পেয়ে আবদুর রহমান নির্বিবাদে হামাদানে অবস্থান করতে থাকেন। একদা এক অসাধারণ মুহূর্তে আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে সমন্বিত করে তাহির ইব্‌ন হুসাইনের উপর অতর্কিতে হামলা করে

---

১. ছয় মাইল
২. তিন দিনের এ পথের দূরত্ব ছিল ২৫০ ফার্সং বা ৭৫০ মাইল। —অনুবাদক

বসেন। এবার তাহির আবদুর রহমানকে পরাস্ত করে হত্যা করেন। আবদুর রহমানের যে সঙ্গীরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল তারা বাগদাদ থেকে আবদুর রহমানের সাহায্যার্থে আগমনকারী হুরায়সীর পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ আহমদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। উক্ত দুইজন আবদুর রহমানের নিহত হওয়ার সংবাদে এতই ভীতসন্ত্রস্ত হলো যে, কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে তার পথ থেকেই বাগদাদে ফিরে যায়। তাহির একের পর এক শহরগুলো জয় করে অগ্রসর হতে থাকেন। হালওয়ান পৌঁছে তিনি ব্যূহ রচনা করেন এবং পরিখাদি খনন করে নিজের অবস্থানকে সংহত করেন। এ বিজয়গুলো সম্পন্ন হওয়ার পর মামূন সর্বত্র তাঁর সপক্ষে বায়আত গ্রহণের এবং তাঁর নামে খুতবা পাঠের নির্দেশ জারি করেন। ফযল ইব্ন সাহ্লকে 'যুর-রিয়াসাতায়ন' বা অসি ও মসির অধিপতি খেতাবে ভূষিত করে আপন প্রধানমন্ত্রী ও মাদারুল মাহাম পদে বরণ করেন এবং তাঁর অধীনে আলী ইব্ন হিশামকে যুদ্ধমন্ত্রী এবং নুয়াইম ইব্ন খাযিমকে অর্থমন্ত্রী ও সংস্থাপন বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ফযল ইব্ন সাহলের ভাই হাসান ইব্ন সাহলকে তিনি রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করেন।

খলীফা আমীনের রাজত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি

বাগদাদে যখন এ দুঃসংবাদ পৌঁছল যে, আবদুর রহমান ইব্ন জাবালা ও আবদুর রহমানের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তখন গোটা শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। খলীফা আমীন আসাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মযীদকে ডেকে তাহিরের মুকাবিলায় যাত্রার নির্দেশ দিলেন। আসাদ ইব্ন ইয়াযীদ তার বাহিনীর সৈন্যদের এক বছরের অগ্রিম বেতন দাবি করলেন। তিনি আরো দাবি করলেন যে, প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জামাদি দিতে হবে, যত শহরই আমি জয় করবো, তার কোন হিসাব-নিকাশ আমার কাছে চাওয়া যাবে না, অতীতের দক্ষ সৈন্যদেরকে আমার সাথে দিতে হবে এবং অকর্মণ্য ও অদক্ষদেরকে আমার বাহিনী থেকে বের করে দিতে হবে। এ সব শর্তের কথা শুনে আমীর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি আসাদ ইব্ন ইয়াযীদকে গ্রেফতার করলেন। এবার তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন হুসাইন ইব্ন কাহতাবাকে তাহিরের মুকাবিলায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই ব্যক্তিও নানারূপ শর্ত আরোপ করে আমীনের বিরাগভাজন হলেন। তারপর আসাদ ইব্ন ইয়াযীদের চাচা আদ ইব্ন মযীদকে তলব করে তার ভাতিজাকে গ্রেফতার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। সে মতে আহমদ ইব্ন মযীদ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাগদাদ থেকে যাত্রা করলেন। তা লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাহ্তাবা আরো বিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রার জন্যে উদ্যত হলেন। তাঁরা উভয়ে একই সময়ে হুলওয়ানের দিকে যাত্রা করলেন। হুলওয়ানের নিকটবর্তী কানিকীল নামক স্থানে উভয় সর্দার একই সঙ্গে শিবির স্থাপন করলেন। এ সংবাদ শ্রবণে তাহির ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের মুকাবিলায় সেখানে এসে পৌঁছল। তিনি তাঁর গুপ্তচরদেরকে পোশাক পরিবর্তন করে ছদ্মবেশে বাগদাদের সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তারা বাগদাদ বাহিনীর মধ্যে গুজব রটিয়ে দিল যে, বাগদাদের রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে সৈন্যদের বেতন-ভাতাও বন্ধ হয়ে গেছে। সৈন্যবাহিনীর লোকজন দিশেহারা হয়ে যেখানে যা পাচ্ছে তাই লুট করে নিচ্ছে। এ গুজব রটতেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে

বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কেউ তা বিশ্বাস ও অনুমোদন করলো, আবার কেউ কেউ অবিশ্বাস এবং প্রতিবাদ করলো। দেখতে দেখতে দুইপক্ষের আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তাহিরের সাথে যুদ্ধ না করেই বাগদাদের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। তাহির অগ্রসর হয়ে হুলওয়ান দখল করে ফেললেন। এ সময় হারছামা একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মার্ভ থেকে মামূনের এ মর্মে ফরমান নিয়ে হুলওয়ানে এসে পৌছলেন যে, এ পর্যন্ত যত অঞ্চল জয় করেছে তা হারছামার হাতে ন্যস্ত করে তুমি আহওয়াযের দিকে অগ্রসর হও। তাহির সে ফরমান তামিল করে আহওয়ায অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন।

খলীফা আমীনের পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, খলীফা হারুনূর রশীদ আবদুল মালিক ইব্‌ন সালিহকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। আমীন সিংহাসনে বসেই তাঁকে মুক্তি দেন। যখন তাহিরের মুকাবিলায় বাগদাদ বাহিনী উপর্যুপরি পরাজয়বরণ করে চলেছিল, তখন তিনি খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দেন যে, খুরাসানীদের মুকাবিলায় ইরাকবাসীদের পরিবর্তে সিরীয়দেরকে প্রেরণ করাই বাঞ্ছনীয়। কেবল তারাই পারবে খুরাসানীদের মুকাবিলা করতে। আর আমি নিজে তাদের আনুগত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। এই পরামর্শ অনুসারে আমীন আবদুল মালিককে শাম ও জাযিরার গভর্নরী দান করে প্রেরণ করলেন। আবদুল মালিক রিক্কায় পৌছে শামদেশের রঈসদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই শামদেশীয় একটি বিরাট বাহিনী গঠনে সমর্থ হন। হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ঈসাও আবদুল মালিকের সাথে ছিলেন এবং তিনি সৈন্যবাহিনীর ঐ অংশের নেতৃত্বে ছিলেন যা খুরাসানীদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। এ সময় অসুস্থ হয়ে আবদুল মালিক মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে শামী ও খুরাসানীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। শামদেশীয়রা আপন আপন গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়ে। হুসাইন ইব্‌ন আলী খুরাসানীদেরকে নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। বাগদাদবাসী রঈসগণ ও জনসাধারণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। রাতের বেলা খলীফা আমীন হুসাইন ইব্‌ন আলীকে দরবারে তলব করেন। কিন্তু তিনি খলীফার সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। প্রত্যুষেই তিনি খলীফার অমাত্যবর্গকে তাঁকে পদচ্যুত করার জন্য প্ররোচিত করেন। হুসাইন নিজে বাগদাদের পুলের উপর চলে আসেন। এখানে আমীনের বাহিনী তার মুকাবিলা করে পরাস্ত হয়। হুসাইন ইব্‌ন আলী রাজপ্রাসাদের উপর হামলা চালিয়ে আমীন ও তাঁর মাতা যুবায়দা খাতুনকে গ্রেফতার করে মানসূর-প্রাসাদে নিয়ে বন্দী করে রাখেন এবং মামূনের খিলাফতের সপক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন। পরদিন লোকজন হুসাইন ইব্‌ন আলীর কাছে তাদের ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়ে সাড়া না পেয়ে কানাঘুষাতে লিপ্ত হয়। তারা আমীনের পদচ্যুতি এবং গ্রেফতারীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে হুসাইন ইব্‌ন আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হুসাইন ইব্‌ন আলী পরাস্ত ও গ্রেফতার হন। নগরবাসীরা মানসূর-প্রাসাদে গিয়ে আমীন ও রাজমাতা যুবায়দা খাতুনকে মুক্ত করে। তারা আমীনকে পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হাতে পুনরায় বায়আত হয়। হুসাইন ইব্‌ন আলী বন্দী অবস্থায় আমীনের সম্মুখে নীত হলেন। আমীন

তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, তাহির ইব্‌ন হুসাইনের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাস্ত করে আপন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর। তিনি হুসাইনকে বহুমূল্য বস্ত্রাদিও প্রদান করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিদায় দেন। বাগদাদবাসীরা তাঁকে মুবারকবাদ দিয়ে নগরীর পুল পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দিলেন। লোকজনের ভিড় কমে যেতেই হুসাইন ইব্‌ন আলী পুল অতিক্রম করেই সেখান থেকে বলীয়ান করতে উদ্যত হয় এবং পুনরায় খলীফার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমীন তার পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলেন। বাগদাদের তিন মাইল দূরেই ঐ বাহিনী হুসাইনের নাগাল পায়। সামান্য যুদ্ধেই সে নিহত হয় এবং তার খণ্ডিত মস্তক আমীনের সম্মুখে নীত হয়। এটা ১৯৬ হিজরীর ১৫ই রজবের (৮১২ খ্রি এপ্রিল) ঘটনা। আলীর হত্যার দিনই আমীনের প্রধানমন্ত্রী ফযল ইব্‌ন রাবী এমনিভাবে আত্মগোপন করলো যে, কেউ তার সন্ধান পর্যন্ত পেল না। ফযল ইব্‌ন রাবী এরূপ আত্মগোপন ও প্রতারণা করায় আমীনের দুর্গতি ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেল। তিনি একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

তাহিরের রাজত্ব

বাগদাদে যখন এ অবস্থা চলছে তখন তাহির ইব্‌ন হুসাইন হুলওয়ানে হারছামা ইব্‌ন আইউনকে বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনভার অর্পণ করে মামূনের নির্দেশ মুতাবিক আহওয়াযের দিকে অগ্রসর হলেন। নিজে যাত্রার পূর্বে তিনি হুসাইন ইব্‌ন উমর রুস্তমীকে অগ্রে রওয়ানা করেন। এদিকে আমীনের প্রেরিত আবদুল্লাহ্ ও আহমদ ফিরে আসায় তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতিমকে আহওয়ায রক্ষার জন্য প্রেরণ করলেন। বাগদাদ থেকে সসৈন্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাহির হুসাইন ইব্‌ন উমর রুস্তমীর সাহায্যার্থে কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে নর্দেশ দিলেন যে, যথাসত্বর আক্রমণ পরিচালনা করে তোমরা হুসাইন ইব্‌ন উমর রুস্তমীর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকারিম নামক স্থানে পৌঁছতেই তাহিরের প্রেরিত বাহিনী নিকটে আসার সংবাদ তিনি অবহিত হলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ এখানে তাদের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে প্রথমে আহ্ওয়াযের দখল নিয়ে নেয়াই সমীচীন মনে করলেন। তিনি আহওয়াযে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে তাহিরের বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তুমুল যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ইয়াযীদ নিহত হলেন। তাহির আহওয়ায দখল করে নিজের পক্ষ থেকে ইয়ামামা, বাহরায়ন ও ওমানের জন্য শাসক মনোনীত করে সেসব স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে নিজে ওয়াসিতা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওয়াসিতার শাসকও পলায়ন করলো। তাহির অনায়াসে ওয়াসিতা অধিকার করলেন এবং কূফা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কূফায় আমীনের নিয়োজিত শাসক আব্বাস ইব্‌ন হাদী আনুগত্য বদল করে মামূনের পক্ষ অবলম্বন করে আমীনের পদচ্যুতি ঘোষণা করলেন এবং মামূনের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করে তাহিরের কাছে তার সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। বসরার গভর্নরও তাই করলেন। এই কূফা আর বসরাই ছিল ইরাকের কেন্দ্রীয় শহর। এ দুই প্রদেশের গভর্নর ছিলেন খলীফার নিজ পরিবারের লোক। তারা দু'জনই আমীনের পদচ্যুতি ঘোষণা করে এবং মামূনের খিলাফতের পক্ষে আনুগত্যের বায়আত করে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় নমুনা হয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে খলীফা বংশের

হিজাযের শাসকও মামূনের পক্ষে জনগণের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের কথা পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তাহির এদের সবাইকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। তাহির নিজে জরজরায়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে হারছ ইব্‌ন হিশাম এবং দাউদ ইব্‌ন মূসাকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রার দিকে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন। এটা ১৯৬ হিজরীর রজব (৮১২ খ্রি মার্চ-এপ্রিল) মাসের কথা। তারপরেই খলীফা আমীনের পদচ্যুতি ও পুনর্বহালের ঘটনা ঘটেছিল।

খলীফা আমীন খলীফা পদে পুনর্বহাল হয়েই মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাদ বারবারীকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রার দিকে এবং ফযল ইব্‌ন মূসাকে কূফার দিকে রওয়ানা করলেন। হারস এবং দাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর তাদেরকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করলেন। ফযল ইব্‌ন মূসা কূফার দিকে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাহির মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে ফযলের মুকাবিলার জন্য নির্দেশ দান করলেন। পথিমধ্যে উভয়ে সাক্ষাৎ হলে ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি অযথাই আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ। আমি তো খলীফা মামূনের অনুগতরূপেই এসেছি। এদিকে রাতের বেলা ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা করলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী যেহেতু পূর্বেই তা আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন তাই তিনি এদের অতর্কিত নৈশ আক্রমণের ব্যাপারে পূর্বেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করে ফযলকে পরাস্ত করে বাগদাদের দিকে পলায়নে বাধ্য করলেন। তারপর তাহির মাদায়েন অভিমুকে অগ্রসর হলেন। মাদায়েনে খলীফা আমীনের প্রচুর সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন ছিল। এদিকে বাগদাদ থেকে রীতিমত সাহায্যকারী বাহিনী ও রসদ মাদায়েনে এসে পৌঁছে ছিল। কিন্তু তাহির উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে সকলেই বাগদাদের দিকে পালিয়ে গেল। তাহির মাদায়েন অধিকার করে সারসার নদীর তীরে শিবির স্থাপন করলেন এবং সেখানে একটি সেতু নির্মাণ করলেন। খলীফা আমীন কসরে ইব্‌ন হুবায়রা এবং কূফার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাহির আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীককে হারছামা ইব্‌ন আইউনের দিকে রওয়ানা করেছিলেন। নাহরাওয়ানের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। হারছামা আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ বাহিনীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন এবং আলী ইব্‌ন মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে মামূনের দরবারে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে হুলওয়ানের পরিবর্তে নাহরাওয়ানে এসে অবস্থান করতে শুরু করেন।

আমীন নিহত হলেন

আমীনের প্রতিটি বাহিনী মামূনের বাহিনীসমূহের হাতে উপর্যুপরি পরাজয়বরণ করেই চললো। মামূনের দুর্ধর্ষ সেনাপতি তাহির ইব্‌ন হুসাইন এবং হারছামা ইব্‌ন আইউন দু'দিক থেকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে মুসেল, ওয়াসেতা, কূফা, বসরা, হিজায, ইয়ামান, হীরা প্রভৃতি প্রদেশসমূহও ইতিমধ্যেই আমীনের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। আমীনের রাজত্ব কেবল বাগদাদ এবং তার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। উপর্যুপরি পরাজয়বরণ করতে করতে ১৯৬ হিজরীর রমযান (৮১২ খ্রি জুন) মাসে আমীনের জীবনের অত্যন্ত সঙ্গিন ও নাজুক পর্যায়ের সূচনা হলো। তিনি গোপনে তাহিরের বাহিনীর কাছে পয়গাম

পাঠিয়ে অর্থ-সম্পদের প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে দলে ভিড়াতে সচেষ্ট হন। ফলে সারসার নদীর তীরের শিবির থেকে পাঁচ হাজার সৈন্য বাগদাদে আমীনের কাছে চলে আসে। এরপর ফৌজী সর্দারদেরও কেউ কেউ আমীনের সাথে গিয়ে মিলিত হন। আমীন পদমর্যাদা অনুসারে তাদের সকলকেই পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে তাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর আমীনের এ বাহিনীও পরাজয়বরণ করে এবং পালিয়ে বাগদাদে আমীনের নিকট ফিরে আসে। এবার আমীন সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি বাহিনী যাতে পরাজিত সৈন্যদের একজনও ছিল না— তাহিরের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বাহিনীও পরাজয়বরণ করলো। এবার তাহির তাঁর বাহিনী নিয়ে সারসার দিক থেকে এবং হারছামা তাঁর বাহিনীসহ নাহরাওয়ানের দিক থেকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। তাহির আনবায় তোরণে শিবির স্থাপন করলেন। হারছামা নহরে ইয়ামানে ব্যূহ রচনা করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াদ্দাহ শামাসিয়ার দিকে এবং মুসাইয়িব ইব্ন যুহায়ির কসরে কুলওয়াযির দিকে তাঁবু স্থাপন করলেন। এভাবে চতুর্দিক থেকে বাগদাদে অবরোধ করে মামূনের বাহিনী সেনাপতি নগরবাসীর জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুললো। এদিকে আমীন ও তাঁর যাবতীয় স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারাদি ও তৈজসপত্রাদিসহ মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে সৈন্যদের ভাতা প্রদান করলেন এবং প্রতিরোধের জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করলেন। এ অবরোধ প্রায় সোয়া একবছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এ দীর্ঘ সময় ধরে বাগদাদবাসী এবং আমীনের সেনাপতিরা যে বিপুল ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সবই ছিল অর্থহীন ও নির্বুদ্ধিতামূলক। সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন কাদিম অভয় লাভ করে তাহিরের কাছে চলে আসেন। তাহির তাকে পরিখা খনন ও ব্যূহকে অগ্রগামী করার কাজে নিয়োগ করেন। অবরোধকারীদের মধ্যে তাহির ও হারছামা ছিলেন বড় সেনাপতি। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে অগ্রগামী তাহিরই গোটা বাহিনীর নেতারূপে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমীনের পক্ষ থেকে বাগদাদের উপকণ্ঠস্থিত দাজলা তীরবর্তী সালিহ প্রাসাদ এবং সুলায়মান ইব্ন মানসূর প্রাসাদে কতিপয় সর্দার অবরোধকারীদের উপর তোপ-কামানের (মিনজানিকের) সাহায্যে গোলা-বারুদ ও প্রস্তর নিক্ষেপ করে অবরোধ ভঙ্গের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাহিরের পক্ষ থেকেও পাল্টা প্রস্তর ও অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। প্রজ্বলিত গোলাপিণ্ড ও প্রস্তর উভয় পক্ষ থেকেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। অবরোধকারীদের বাহিনী যতই অগ্রসর হচ্ছিল, পরিখা খনন করে তারা তাদের ব্যূহকে ততই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে বাইরের দিক থেকে বৃত্ত সংকীর্ণ হতে হতে তা একেবারে নগরপ্রাচীরে এসে ঠেকলো। অবরোধকারী বাহিনী নগরীর তোরণ এবং প্রাচীর ভেঙ্গে নগরীতে ঢুকে পড়লো। তারপর প্রতিটি মহল্লায় এবং শহরের প্রতিটি অংশে প্রতিটি কদমে কদমে মুকাবিলা করতে হয়। এমন কি শেষ পর্যন্ত 'মদীনাতুল মানসূর' বা মানসূর প্রাসাদে আমীনকেও অবরোধ করা হলো। শস্যসম্ভার এবং প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ নগরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারাগার থেকে কারাবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। শহরের গুণ্ডাপাণ্ডা এবং বখাটে যুবকদেরকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হয়েছিল। লুটপাট চুরি-ডাকাতির উপদ্রব খুব বেশি ছিল। প্রভাবশালী ও বীর সৈন্যরা তাহিরের ষড়যন্ত্রে ও প্রলোভনে পড়ে ক্রমেই আমীনের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে তাহিরের নিকট এসে সমবেত হতে লাগলো। মওকা পেয়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শহর থেকে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। অনেক মহল্লা উজাড় ও জনশূন্য হয়ে গেল। বনূ কাহতায়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাহান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আব্বাস তাঈ পরপর গিয়ে তাহিরের সাথে মিলিত হলো। যে সমস্ত স্থানে এ ব্যক্তিগণ তাহিরের মুকাবিলার জন্যে আদিষ্ট ছিল, সেসব স্থান তারা তাহিরের কাছে সমর্পণ করতে থাকে। আমীন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করেন। অবশেষে তিনি চূড়ান্ত যুদ্ধের দায়িত্বভার মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীকের উপর অর্পণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াদ্দাহ-এর বাহিনী যে দিকে নিয়োজিত ছিল, সেদিক থেকে বাগদাদবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াদ্দাহকে পরাস্ত করে শুমাসিয়া দখল করে নেয়। এ সংবাদ পেয়ে হারছামা তার সাহায্যার্থে বাহিনী নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন, ঘটনাচক্রে তিনিও পরাজিত এবং বন্দী হন। কিন্তু তার সাথীরা প্রতারণাপূর্ণ চালের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এ সংবাদ জানতে পেরে স্বয়ং তাহির সসৈন্যে সেদিকে অগ্রসর হয়ে এক প্রচণ্ড হামলায় আমীন বাহিনীকে পশ্চাৎপসারণে বাধ্য করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াদ্‌দাহকে পুনরায় তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহির ক্রমান্বয়ে তাঁর সৈন্যদেরকে গোটা শহরে ছড়িয়ে দেন এবং মদীনাতুল মানসূরে আমীনকে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হন। আমীন অত্যন্ত ধৈর্যস্থৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে থাকেন। হোমরা-চোমরাদের মধ্যে কেবল হাতিম ইব্‌ন সাকরাহ্ হাসান হুরায়শী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আফ্রিকী তাঁর সাথে অবশিষ্ট ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আমীনকে বলেন, এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তেও সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আমীরুল মু'মিনীনের যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত। এমতাবস্থায় রাজ্যের পদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের হাতে রাজ্য শাসন ও রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করে নিজে কোন এক অলস মুহূর্তের ফাঁকে জাযিরা ও শামদেশের দিকে বেরিয়ে পড়ে নতুন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমীরুল মু'মিনীনের জন্য সমীচীন কাজ হবে। এমনও হতে পারে যে কিছুদিন যেতে না যেতেই জনমত আপনার সপক্ষে চলে আসবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের কোন একটা পথ বেরিয়েই আসবে। আমীন যদি এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন তবে নিশ্চয়ই তার পরিণতি তার চাইতে উত্তম হতো যা পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। যখন আমীরুল মু'মিনীনের হাবভাব টের পেয়ে তাহির সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাহীকের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তোমরা যদি আমীনকে তাঁর এ ইচ্ছা থেকে বিরত না রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। তারা তাহিরের ভয়ে ভীত হয়ে আমীনের কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমীরুল মু'মিনীনের জন্যে এটা মোটেই সমীচীন হবে না যে, নিজেকে তিনি ইব্‌ন আগলাব এবং ইব্‌ন আসকার মতো ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেবেন। কেননা, এরা মোটেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নয়। বরং হারছামা ইব্‌ন আইউনের কাছে অভয় প্রার্থনা করে তার দায়-দায়িত্বে চলে যাওয়াটা সমীচীন হবে। ইব্‌ন আসকার যখন জানতে পেলেন যে, খলীফা আমীন হারছামা ইব্‌ন আইউনের কাছে অভয় প্রার্থনা করে তারই কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে উদ্যত তখন সে বললো, আমীরুল মু'মিনীন!

আপনাকে যদি অভয় প্রার্থনাই করতে হয়, তবে তা তাহিরের কাছে করাটাই সমীচীন, হারছামার অভয়ে আপনি আশ্রয় নেবেন না। কিন্তু আমীন বললেন, আমি তাহিরের কাছে অভয় প্রার্থনা করবো না। সত্যি সত্যি তিনি হারছামার কাছে আশ্রয় চেয়ে পাঠালেন। হারছামা তা সানন্দে মঞ্জুর করলেন। কিন্তু এ সংবাদ তাহিরের কানে পৌঁছতেই এটা তার কাছে খুবই অসহনীয়বোধ হলো যে চূড়ান্ত বিজয়ের গৌরব ও কৃতিত্ব হারছামা লাভ করবেন। তিনি আমীন যাতে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হতে না পারেন সে উদ্দেশ্যে কঠোর প্রহরা বসিয়ে দিলেন। হারছামা স্থির করেছিলেন যে, রাতের আঁধারে আমীন মহল থেকে বের হয়ে মহলের ঘাটে রক্ষিত নৌকায় হারছামার আশ্রয়ে চলে আসবেন। তাহিরের হাবভাব লক্ষ্য করে তিনি আমীনের কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তিনি যেন আজ রাত ধৈর্য ধরে থাকেন, কেননা, আজ সকালে নদীর তীরে এমন কিছু নিদর্শন দেখা গেছে, যা রীতিমত সংকটজনক। জবাবে আমীন বলে পাঠালেন, এখানে আমার আর কোন শুভাকাঙ্ক্ষীই নেই। সকলে সরে পড়েছেন। তাই এখানে আর একঘণ্টাও তিষ্টানো দায়। আমার ভয় হচ্ছে, তাহির আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে আমাকে না ধরে নিয়ে হত্যা করে ফেলে। অবশেষে ১৯৮ হিজরীর ২৫শে মুহাররম (৮১৩ খ্রি ২৫ সেপ্টেম্বর) রাতের বেলায় আমীন তাঁর পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করলেন, তাদেরকে আদর-সোহাগ করলেন। তারপর অশ্রুসজল চোখে নদীর ঘাটে এসে হারছামার যুদ্ধ জাহাজে আরোহণ করলেন। জাহাজে অপেক্ষারত হারছামা স-সম্মানে তাঁকে জাহাজে তুললেন এবং তাঁর হাতে চুমু খেলেন। তিনি জাহাজ চালকদেরকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হতেই তাহিরের নৌবাহিনী এসে সে জাহাজটিকে ঘিরে ফেললো। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল।

ডুবুরী সৈন্যরা জাহাজ ছিদ্র করে ফেললো। আক্রমণকারী সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষণ করতে লাগলো। অবশেষে পানি ভর্তি হয়ে জাহাজটি ডুবে গেল। জাহাজের কাপ্তান হারছামার চুল মুঠোয় ধরে তাকে উদ্ধার করে। আমীন পানিতে সাঁতার কাটতে লাগলেন। তাহিরের লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে। আহমদ ইব্‌ন সালিম সাঁতার কেটে উঠতেই তাহিরের লোকজন তাকেও গ্রেফতার করে ফেলে। আহমদ ইব্‌ন সালিম নিজে বর্ণনা করেন, আমাকে গ্রেফতার করে তাহিরের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। তাহির আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। রাতের সামান্য অংশ অতিবাহিত হতেই তাহিরের সিপাহীরা কারাগারের দরজা খুললো। তারা আমীনকে কারাগারের ভিতর ঠেলে দিয়ে দরজা পুনরায় বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। এ সময় আমীনের পরনে একটা পাজামা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অবশ্য মাথায় আমামা আর বাহুর উপর একটা ছেঁড়া কাপড় ছিল। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আমীন আমাকে চিনতে পেরে বললেন, তুমি আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁর ভয় কিছুটা কাটলো, তখন তিনি আমাকে মামূনের অবস্থা কি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, তিনি জীবিত এবং সুস্থই আছেন। তিনি বললেন, তাঁর প্রতিনিধি তো আমাকে বললো যে সে মারা গেছে। হয়তো বা এ কথা বলে সে যুদ্ধের ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহই আপনার উজীরদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারা

আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। তারপর আমীন একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন : কেন ভাই, তার কি তাদের অঙ্গীকার পালন করবে না ? আমি বললাম, আল্লাহ চাহেতো নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। আমাদের এই বাক্যালাপ চলাকালেই মুহাম্মদ ইব্‌ন হামীদ সেখানে এল এবং দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। আমীনকে চিনতে পেরে সে চলে গেল। তারপর মধ্য রাতে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে কয়েকটি আ'জমী (অনারব) কারাগারে এসে ঢুকলো। আমীন তাদেরকে আসতে দেখে ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলেন। এমন সময় একজন লাফ দিয়ে আমীনকে গিয়ে ধরল এবং তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চোখের পলকে যবেহ্ করে শির নিয়ে উধাও হয়ে গেল। প্রত্যূষে এসে তারা লাশটিও নিয়ে গেল।

তাহির আমীনের লাশ প্রকাশ্যে লটকিয়ে রাখল। যখন জনতা তার লাশ ভাল মতে দেখে নিল তখন সে তার চাচাতো ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন জুরায়েক ইব্‌ন মুসআবের হাতে খলীফার সীলমোহরে, লাঠি ও অঙ্গুরীয় দিয়ে মামূনের কাছে পাঠালো এবং আমীন নিহত হওয়ার সংবাদ শহরে ঢোল-শোহরত করে দিল। জুমুআর দিন মামূনের সাথে মসজিদে খুতবা পড়লো এবং আমীনের নিন্দাবাদ করলো। সে আমীনের পুত্রদ্বয় মূসা ও আবদুল্লাহকে মামূনের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর তাহিরের বাহিনী তাদের বেতন-ভাতার দাবি করলো। সে তা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সৈন্যদল বিদ্রোহ করতে উদ্যত হলো। তাহির প্রাণ নিয়ে বাগদাদ থেকে পালিয়ে গেল। তারপর বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ সেনাপতিদেরকে একত্র করে এবং একটি বাহিনী যোগাড় করে তাদের সাহায্যে পুনরায় বাগদাদে প্রবেশ করলো এবং শহরবাসী ও সৈন্যদলকে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করলো।

আমীনের শাসনকাল পর্যালোচনা

খলীফা আমীন সাতাশ বা আটাশ বছরের আয়ু পেয়েছিল। তাঁর মোট খিলাফতকাল হচ্ছে চার বছর সাড়ে সাত মাস। এ গোটা সময়টা তিনি ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তপাতের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অকারণে হাজার হাজার মুসলমানের রক্তপাত করেন। আমীনের শাসনকাল ছিল মুসলিম জাহানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অশুভকাল। আমীন যদিও আরবী ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ও কবি এবং জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, জ্ঞানী-গুণীদের কদর করতেন, কিন্তু খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদেই তিনি বেশি মত্ত থাকতেন। তাঁর মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্যতার অভাব ছিল। সিংহাসনে বসেই তিনি মানসূর প্রাসাদের পার্শ্বে হকি খেলার মাঠ নির্মাণের নির্দেশ জারি করলেন। সাজ-সজ্জার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক ও মনোযোগ। গানবাদ্য ও রূপ-পূজার অভিশাপও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সর্বোপরি তাঁর স্বার্থপর মন্ত্রী পরিষদে এমন একটি লোকও ছিল না যে তাঁকে তাঁর গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করতে পারতো।

মোটকথা, আমীন তাঁর যৌবনের প্রবণতাসমূহের হাতে পরাস্ত এবং রাজ্য শাসনের গুণাবলী থেকে শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁর উযীর ফযল ইব্‌ন রাবী আব্বাসীয় বংশের জন্যে উত্তম বলে প্রতিপন্ন হননি। এই ফযল ইব্‌ন রাবীই তুস থেকে সেই বাহিনী ও রসদপত্র বাগদাদে নিয়ে এসে মামূনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমীন ও মামূন দু'ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে দিলেন— যাদের হারূনুর রশীদের অন্তিম ওসীয়ত অনুসারে মামূনের কাছেই থাকার

কথা ছিল। এতটুকু ব্যাপার হয়তো মামূন মেনেই নিতেন আর বিলাসব্যসনে ব্যস্ত থাকায় আমীনও আর মামূনের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতেন না। কিন্তু ফযল ইব্‌ন রাবী অপর একটি অসঙ্গত ও অশোভন কাজ আমীনকে দিয়ে করালেন আর তাহলো মামূনের যুবরাজ পদ বাতিল করে দিয়ে আমীনের শিশুপুত্রকে মামূনের স্থলে যুবরাজ বলে ঘোষণা করিয়ে দিলেন। এ ছাড়া হারূনের ওসীয়ত-অনুসারে মামূনের প্রাপ্য রাজ্যের একটি অংশও তিনি কাটছাঁট করতে উদ্যত হন। এই ফযল ইব্‌ন রাবীর পরামর্শেই আমীন পবিত্র কা'বা ঘরে রক্ষিত হারূনের ওসীয়তনামা আনিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেন। ফলে আব্বাসী বংশের সকল প্রভাবশালী অমাত্যবর্গের মন আমীনের প্রতি বিষিয়ে ওঠে।

গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মুসলিম বিশ্বের এ বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির হেতু ছিলেন হারূনুর রশীদ নিজে। তাঁর সবচাইতে নিন্দনীয় ও ভুল পদক্ষেপ ছিল এই যে, তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নে ভুল পন্থা অনুসরণ করেছিলেন এবং মামূনকে আমীনের চাইতে যোগ্যতর পাত্র জেনেও তিনি আমীনকেই মামূনের উপর প্রাধান্য দান করেছিলেন। হারূনের পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে যে, আমীন পিতামাতা উভয় দিক থেকেই ছিলেন সম্ভ্রান্তকুলশীল, পক্ষান্তরে মামূনের মা ছিলেন অগ্নি-উপাসক। তাই মামূন ক্ষমতাসীন হলে আরবদেরকে দুর্বল করে ইরানীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলবেন এমন একটা আশংকা ছিল।

আমীনকে তিনি এ উদ্দেশ্যে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন যে, তিনি নির্ভেজাল হাশিমী বংশোদ্ভূত হওয়ায় হারূনের শেষ জীবনে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ইরানীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার কাজটি সমাধা করবেন। কিন্তু এ নীতিকে সফল করে তোলার জন্যে যে মন-মস্তিষ্ক ও মেধার প্রয়োজন ছিল আমীনের মধ্যে যে তার অভাব ছিল তাও হারূন সম্যক অবহিত ছিলেন। কেননা, তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই মামূনের যোগ্যতা এবং আমীনের অযোগ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন। আরো গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ ব্যাপারে হারূনুর রশীদেরও কোন অপরাধ ছিল না। একেবারে সূচনাকাল থেকেই আব্বাসীয়রা যে নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন এটা ছিল তাঁরই স্বাভাবিক পরিণতি। আব্বাসীয়রা প্রথমে খুরাসানীদেরকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের বাহনরূপ বেছে নিয়ে আরবদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং আরবদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খর্ব করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে নওমুসলিম খুরাসানীদেরকে শক্তিশালী করে তোলেন। আবূ মুসলিমকে আব্বাসী কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আরবী ভাষীকে হত্যার যে নির্মম নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, সে কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আবূ মুসলিম সে নির্দেশ অনুসারে খুরাসান ও ইরানে ছয় লক্ষ আরবকে যমদ্বারে প্রেরণ করেন। শুরু থেকেই বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে উলুভী ও আব্বাসীদের যৌথ প্রচেষ্টা আরবদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে খুরাসানী, পারসিক ও ইরাকীদেরকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে নিয়োজিত ছিল। বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে সফলভাবে পরিচালিত প্রতিটি ষড়যন্ত্রেই ইরাকী ও খুরাসানীদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এতদ্‌দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বনূ উমাইয়াদের যখন পতন ঘটছিল, উলুভীরা তখন নীরব দর্শক হয়েই রইল আর আব্বাসীয়রা ততক্ষণে খিলাফতের মালিক হয়ে গেল। এবার উলুভীরা আব্বাসীদের বিরোধিতা শুরু করলো। একের পর এক ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো। এবারও ইরাকী এবং খুরাসানীরাই আব্বাসীয়দের মুকাবিলায় উলুভীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

যাদেরকে পূর্বে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আরবদেরকে হত্যার জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল এখন তারাই আব্বাসীয়দের জন্যে সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মানসূরের শাসনামল পর্যন্ত খুরাসানীদের উত্থান অব্যাহত ছিল। কেবল মাহ্‌দীর কয়েক বছরের রাজত্বকালে পারসিক বংশোদ্ভূতদের উত্থান কিছুদিনের জন্য বাধাগ্রস্ত ছিল। ঐ সময়টায় আরবদের কিছুটা মূল্যায়ন করা হলো। হাদী ও হারূনের খিলাফত আমলে পারসিক বংশোদ্ভূতদের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি সমানে চলতে থাকে। হারূনুর রশীদ তাঁর শেষ জীবন অনুভব করতে সক্ষম হন যে, আরবদেরকে দুর্বল করে আমরা আমাদের নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছি। তখন তিনি এর প্রতিকারের প্রতি যত্নবান হন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে আর সে প্রতিকারের জন্যে তেমন সময় দেয়নি।

আমীনের খিলাফতে আরবদের শক্তির কেন্দ্র ছিলেন আমীন আর খুরাসানীদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন মামূন। অর্থাৎ আমীন ও মামূনের মাধ্যমে আরব বংশোদ্ভূতদের মুকাবিলা হয়। আমীন যেহেতু ব্যক্তি হিসাবে অথর্ব ছিলেন পক্ষান্তরে মামূন তাঁর তুলনায় অনেক প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাই আরবদের সে মুকাবিলায় পরাজয় হয়। পারসিক বংশোদ্ভূতরাই ইসলামী হুকুমতের মালিক-মুখতার হয়ে ওঠে।

ঐ খুরাসানী ও পারসিক বংশোদ্ভূত লোকেরাই মামূনকে নিজেদের করে নিয়ে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের করায়ত্ত করে মামূনের পরে রাষ্ট্রকে উলুভীদের হাতে তুলে দিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় এমন কিছু কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ফলে রাজত্ব আব্বাসীদের হাতেই রয়ে যায়। অবশেষে ঐ খুরাসানীরা এবং নওমুসলিম তুর্কীরা অধিকতর সাহসী হয়ে ইসলামী-রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব গড়ে তোলে। এর বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আসছে। মোটকথা, ইসলামী খিলাফতে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের অভিশাপ সমস্ত অনর্থ, সমস্ত বিপদাপদ ও সমস্ত দোষত্রুটির ভিত্তিস্বরূপ। এই বিদআতই মুসলমানদের সর্বাধিক অনিষ্ট সাধন করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উজ্জ্বল ও মনোরম চেহারাকে সর্বদা ধূলি-ধূসরিত করে রেখেছে। আমীনের খিলাফত আমলের ধৃষ্টতাসমূহ ও ঐ খিলাফতের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের অভিশাপেরই ফল ছিল।

হযরত আলী (রা), হযরত ইমাম হাসান (রা) ও আমীনুর রশীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল এই যে, তাঁরা তিনজনই এমন তিনজন খলীফা ছিলেন যাঁরা তাঁদের পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে ছিলেন হাশিমী বংশোদ্ভূত। তিনজনের মায়েরা ছিলেন হাশিমী অথচ বাহ্যিকভাবে খিলাফত তাঁদেরকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেনি। হযরত আলী (রা)-এর গোটা খিলাফতকালই কাটে মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এক পামরের হাতেই তাঁকে শাহাদাতবরণ করতে হয়। হযরত হাসান (রা) নিজেই খিলাফত ত্যাগ করেন। এতদসত্ত্বেও বিষপ্রয়োগে শাহাদাত লাভ করেন। আমীনের গোটা খিলাফতকালও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং তিনিও আততায়ীর হাতে নিহত হন।

চতুর্থ অধ্যায়

মামূনুর রশীদ

মামূনুর রশীদ ইব্‌ন হারূনুর রশীদের আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ। পিতা তাঁকে খিতাব দেন মামূন বলে। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। ১৭০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি শুক্রবার (৭৮৬ খ্রি সেপ্টেম্বর) তিনি ভূমিষ্ঠ হন। যে রাতে মামূনুর রশীদের জন্ম হয় ঐ রাতেই হাদীর ইন্তিকাল হয়। তাঁর মায়ের নাম ছিল মারাজিল। যিনি গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চল্লিশতম দিনে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন পারসিক বংশোদ্ভূত ক্রীতদাসী। হিরাত এলাকার অন্তর্গত বাদেগীসে ঐ মহিলার জন্ম। খুরাসানের গভর্নর আলী ইব্‌ন ঈসা তাকে খলীফা হারূনুর রশীদের খিদমতে পেশ করেছিলেন। মামূনুর রশীদের মায়ের কোলে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। হারূনুর রশীদ তাঁর প্রতিপালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মামূনকে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ কিসাঈ ও ইয়াযীদীর শিক্ষাধীনে ন্যস্ত করেন। তাঁরা তাঁকে কুরআন মজীদ ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা দেন।

বার বছর বয়সে যখন মামূন তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত মেধার বলে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তখন তাঁকে জা'ফর বারমাকীর গৃহশিক্ষকতাধীনে দেয়া হয়। জা'ফর বারমাকী তাঁর গৃহশিক্ষকরূপে তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা দিতে থাকেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮২ হিজরীতে (৭৯৮ খ্রি) হারূনুর রশীদ তাঁকে আমীনের পরবর্তী রাজকুমার বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন দান করেন। ঐ দু'জন আলিম ছাড়াও হারূনের দরবারে আলিম-ফাযিল ও জ্ঞানী-গুণীদের কমতি ছিল না। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে মামূনের শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

মামূন কুরআনুল করীমের হাফিয এবং ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলিম ছিলেন। ভাষার অলঙ্কার এবং অনবদ্য বাক্য-বিন্যাসে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর ভাই আমীনের চাইতে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। ফিকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্র তিনি বড় বড় ইমামের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। হারূনুর রশীদ অত্যন্ত যত্নসহকারে আমীন ও মামূনকে শিক্ষাদীক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ যত্ন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যতটুকু মামূনের চরিত্রের উপর পড়েছিল, আমীনের চরিত্রে ততটুকু পড়েনি।

যদিও ১৯৩ হিজরীর জুমাদাস সানী (৮০৯ খ্রি এপ্রিল) মাসে খলীফা হারূনুর রশীদের ইন্তিকালের সাথে সাথেই মামূনুর রশীদ খুরাসান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের স্বাধীন শাসক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর খিলাফতকাল শুরু হয় ১৯৮ হিজরীর মুহাররম (৮১৩ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে আমীন নিহত হওয়ার পর। আমীন ঐ বছর ২৫শে মুহাররম (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতের বেলা নিহত হয়েছিলেন। আর মামূনের বায়আত ও অভিষেক হয় তার অব্যবহিত পরবর্তী দিন শনিবার ১৯৮ হিজরীর ২৬শে মুহাররম (৮১৩ খ্রি ২৬ সেপ্টেম্বর) বাগদাদে।

মামূন যখন আমীনের নিহত হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন আর বাগদাদে তাঁর সৈন্যবাহিনীর দখল প্রতিষ্ঠিত এবং বাগদাদবাসী কর্তৃক তাঁর খিলাফত স্বীকৃত হলো, তখন তিনি তাঁর উযীর ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল -এর ভাই হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লকে জিবাল, পারস্য, আহওয়ায, বসরা, কূফা, হিজায, ইয়ামান প্রভৃতি বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনভার অর্পণ করে বাগদাদ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। হারছামা ইব্‌ন আইউন এবং তাহির ইব্‌ন হুসাইন এসব এলাকা জয় করেছিলেন। এ দুজন সিপাহ্‌সালারের অক্লান্ত চেষ্টায় ও বীরত্বের ফলেই মামূন বাগদাদের খিলাফত লাভ করেন এবং আমীন নিহত হন। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী তাহির ভেবেছিলেন যে, তাঁকেই এসব বিজিত এলাকায় শাসনভার অর্পণ করা হবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হাসান ইব্‌ন সাহলকেই সে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো আর হাসান ইব্‌ন সাহল তাহিরকে জাযিরা, মুসেল ও শামের গভর্নর নিযুক্ত করে নসর ইব্‌ন শীছ ইব্‌ন আকীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আমেরের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ নসর ইব্‌ন শীছ আমীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মামূনের খিলাফতের বিরুদ্ধে মুসেল ও সিরিয়ায় প্রচুর লোক সংগ্রহ করে ইরাকের শহরগুলো একে একে অধিকার করে চলেছিল। হাসান ইব্‌ন সাহল শাসক ও নায়েবে সালতানাত হয়ে আসায় লোকের বদ্ধমূল ধারণা হলো যে, মামূনের উপর ফযল ইব্‌ন সাহলের অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে আর এখন সর্বদিকে ইরানীদেরই জয়-জয়কার হবে। আরব সর্দাররা এ কথা কল্পনা করে অত্যন্ত সংকটবোধ করলেন এবং সাধারণভাবে তাদের মনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত হলেন যে, মামূন এখন ফযল ইব্‌ন সাহলের ইচ্ছানুসারে মার্ভকেই রাজধানী রূপে বহাল রাখবেন—তিনি আর বাগদাদে আসছেন না।

তাহিরকে হাসান ইব্‌ন সাহল নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলায় প্রেরণ করলে সেখানে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হননি। তাহির রিক্কা শহরে অবস্থান করে নসর ইব্‌ন শীছের সাথে মামুলী সংঘর্ষ চালিয়ে যান। রিক্কাতেই তাহিরের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, খুরাসানে তাঁর পিতা হুসায়ন ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন মুসআব ইন্তিকাল করেছেন আর স্বয়ং খলীফা মামূন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন। হারছামা ইব্‌ন আইউনকে হাসান ইব্‌ন সাহল খুরাসানের দিকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। নসর ইব্‌ন শীছের বিদ্রোহ যেহেতু এ জন্য ছিল যে, আরবদের উপর অনারবদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, সে জন্যে তাহির তাঁর মুকাবিলার ব্যাপারে ততটা উৎসাহী বা মনোযোগী ছিলেন না। কেননা স্বয়ং তাহিরের মনেও এ ক্ষোভ কিছুটা কম ছিল না। আব্বাসী খান্দানের পুরনো সংশ্লিষ্টজন হিসেবে হারছামা ইব্‌ন আইউনও অনারবদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সন্দেহের চোখেই দেখতেন।

ইব্‌ন তাবাতাবা ও আবুস সারায়ার বিদ্রোহ

আবুস সারা বা সারা ইব্‌ন মানসূর বনূ শায়বান গোত্রের লোক ছিল। আমীনের খিলাফত আমলে সে জাযীরার গভর্নর সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সেখানে সে বনূ তামীমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে গভর্নর কিসাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। প্রাণভয়ে সে ফেরারী হয়ে যায় এবং লুটপাট ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত আরও ত্রিশ

ব্যক্তি তার সাথে রাহাজানিতে যোগ দেয়। কয়েকদিন পর সে তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে আর্মেনিয়াতে ইয়াযীদ ইব্‌ন মযীদের কাছে চলে যায়। ইয়াযীদ ইব্‌ন মযীদ তাকে সিপাহসালার পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন মযীদের মৃত্যু হলে সে তার পুত্র আসাদ ইব্‌ন ইয়াযীদের কাছে থেকে যায়। আসাদ আর্মেনিয়ার শাসনক্ষমতা হারালে তখন সে আবুস সারা আহমদ ইব্‌ন মযীদের কাছে চলে যায়। আমীন যখন আহমদ ইব্‌ন মযীদকে হারছামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন আহ্‌মদ ইব্‌ন মযীদ আবুস সারাকে তাঁর বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সেনাপতির পদ দান করেন। হারছামা তার সাথে চক্রান্ত করে তাকে তাঁর দলে ভিড়িয়ে নেন। সে তখন হারছামার বাহিনীর একজন।

হারছামার কাছে গিয়ে সে ব্যক্তি জাযীরা থেকে তার স্বগোত্র বনূ শায়বানের লোকজনকে নিয়ে আসে এভাবে ঐ গোত্রের দুই হাজার লোক জাযীরা থেকে এসে হারছামার বাহিনীতে ভর্তি হয়। আবুস সারায়া হারছামাকে দিয়ে তাদের বড় বড় বেতনভাতা ধার্য করিয়ে দেয়। আমীন নিহত হলে হারছামা তাদেরকে বড় অংকের সেই বেতন ভাতাদানে অস্বীকৃতি জানায়। ক্ষুব্ধ আবুস সারায়া হারছামার কাছে হজ্জের অনুমতি প্রার্থনা করে। হারছামা তাকে হজ্জের অনুমতি দেন এবং সকল খরচ স্বরূপ তাকে বিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। আবুস সারায়া সে অর্থ তার সাথীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বলে দেয় যে, তোমরাও একজন দু'জন করে ক্রমে ক্রমে আমার কাছে চলে আসবে। আবুস সারায়া বাহ্যত হজ্জের জন্যে হারছামার নিকট থেকে বিদায় নেয় এবং পথিমধ্যে একস্থানে অবস্থান করে। সেখানে আরো দুশ ব্যক্তি গিয়ে তার কাছে সমবেত হয়। এদেরকে সংঘবদ্ধ করে আবুস সারায়া আইনুত তামার আক্রমণ করে এবং সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের গ্রেফতার করে সেখানে ব্যাপক লুটপাট চালায়। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সে সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। তারপরও সে তার লুটপাট অব্যাহত রাখে এবং কয়েকটি স্থানে সরকারী কোষাগারও লুট করে।

হারছামা তাকে দমন ও গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। আবুস সারায়া তাদেরকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। তার অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথীরাও তার সাথে এসে যোগ দেয়। ফলে তার দলবল বেশ ভারী হয়ে ওঠে। তারপর আবুস সারায়া ও কূফার আমীনকে পরাজিত করে সেখানকার কোষাগার লুট করে এবং আম্বার অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানকার আমীন ইবরাহীম মার্ভীকে হত্যা করে আম্বারেও যদৃচ্ছ লুটপাট চালায় এবং যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে সেখান থেকে প্রস্থান করে। আম্বার থেকে যাত্রা করে তওক ইব্‌ন মালিক তাগলাবীর কাছে গিয়ে উপনীত হয়। তারপর যেখান থেকে রিক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় সেখানে ঘটনাচক্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান মুছান্না ইব্‌ন আলীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম খিলাফতের দাবিদার রূপে আত্মপ্রকাশ করে সদলবলে রিক্কা থেকে বের করে দিলেন। তাঁর পিতা ইবরাহীম তাবাতাবা নামে অভিহিত হতেন। এ কারণে ইবরাহীম ইব্‌ন তাবাতাবা নামে খ্যাতিলাভ করেন।

এটি ছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণ যখন হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইরাক, হিজায, ইয়ামান প্রভৃতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে বাগদাদে এসেছিলেন এবং তিনি স্বভাবত আরবদের ক্ষমতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তারা তখন মামূনের খিলাফতকেই নিজেদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করছিল। উলুভীরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্যে বিভিন্নস্থানে প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর ছিলেন। ওদিকে নসর ইব্‌ন শীছ ঘোষণা করে দেন যে, আমি আসলে আব্বাসী খিলাফতের বিরোধী নই, কিন্তু বর্তমান সরকারের বিরোধিতা করছি এ জন্যে যে, তারা আরবদের উপর অনারবদের প্রাধান্য দিলেন। তার এ ঘোষণার ফলে মামূনের আরব সেনাপতিরা নসর ইব্‌ন শীছের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহবোধ করেন।

ঐ সময় হাসান ইব্‌ন সাহল অসন্তুষ্ট হয়ে হারছামাকে খুরাসানের দিকে পাঠিয়ে দেন। আবুস সারায়া মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (যৌবনে তাবাতাবা)-এর অস্তিত্বকে তার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক বিবেচনা করেন এবং কালবিলম্ব না করে সে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। ইব্‌ন তাবাতাবা আবুস সারায়াকে নদীপথে কূফার দিকে প্রেরণ করে নিজে স্থলপথে কূফা অভিমুখে অগ্রসর হন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১৫ জুমাদাস্‌সানী ১৯৯ হিজরীতে (৮১৫ খ্রি ফেব্রুয়ারী) একদিকে আবুস সারায়া এবং অপর দিকে ইব্‌ন তাবাতাবা কূফায় প্রবেশ করেন। তারা কূফার গভর্নর মূসা ইব্‌ন ঈসার আবাস স্থল ও শাহী কোষাগার 'কসরে-আব্বাসে' লুটপাট চালিয়ে সমস্ত কূফা শহরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কূফাবাসীরা ইব্‌ন তাবাতাবার হাতে বায়আত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নেয়।

হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল কূফায় আবুস সারায়া এবং ইব্‌ন তাবাতাবার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ পেয়ে যুহায়র ইব্‌ন মুসাইয়িবকে দশহাজার সৈন্য দিয়ে কূফা অভিমুখে প্রেরণ করেন। আবুস সারায়া এবং ইব্‌ন তাবাতাবা কূফা থেকে বের হয়ে যুহায়র ইব্‌ন মুসাইয়িবের মুকাবিলা করেন। যুদ্ধে যুহায়রের বাহিনী পরাস্ত হয়। আবুস সারায়া যুহায়রের বাহিনীর শিবিরে লুটপাট ও নির্দয় হত্যাকাণ্ড চালায়। ইব্‌ন তাবাতাবা তাকে নির্দয় আচরণ করতে বারণ করেন। শুরু থেকেই লুটপাট, হত্যা, রাহাজানি ও নির্দয় হত্যাকাণ্ড ও স্বাধীন চলাফেরায় অভ্যস্ত আবুস সারায়ার কাছে ইব্‌ন তাবাতাবার এ নিষেধাজ্ঞা ছিল একেবারেই অসহনীয়। সে ইব্‌ন তাবাতাবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। পরদিনই ইব্‌ন তাবাতাবার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এভাবে তাঁর রাজত্বের অধ্যায়টি দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে যায়। আবুস সারায়া কালবিলম্ব না করে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব নামক এক কিশোরের হাতে বায়আত করে তাঁকেই ইব্‌ন তাবাতাবার স্থলাভিষিক্ত করে। কার্যত সে নিজেই গত ঐ প্রশাসনের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।

আবুস্ সারায়ার রাজত্ব ও তার পরিণতি

যুহায়র ইব্‌ন মুসাইয়িব পরাজিত হয়ে কসরে ইব্‌ন হুবায়রায় এসে বসবাস করতে থাকেন। হাসান ইব্‌ন সাহল আবদে দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ মার্দরোজীকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে যুহায়রের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। যুহায়র ও আবদে দীন কূফায় আক্রমণ চালালেন। কিন্তু ১৯৯ হিজরীর ১৫ই রজব তারিখের (৮১৫ খ্রি মার্চ) যুদ্ধে তাঁরা আবুস

সারায়ার হস্তে পরাস্ত নিহত হন। এ বিজয়ের পর আবুস সারায়া কূফায় তার স্বনামে মুদ্রা চালু করে এবং উলুভীদের বেশ কয়েকজনকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করে। সে আহওয়াযে আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদকে, মক্কায় হুসাইন ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ওরফে আফতাসকে, ইয়ামানে ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে, বসরায় যাইদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে প্রেরণ করে। আব্বাসও বসরায় পৌঁছে সেখানকার আমিলকে পরাস্ত করে বসরা দখল করে নেন। অনুরূপভাবে আবুস সারায়ার অন্যান্য আমিলও নিজ নিজ কর্মস্থলে সাফল্য অর্জন করেন। আবুস সারায়া আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদকে লিখলো যে, তিনি যেন আহওয়ায থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পূর্ব দিক থেকে বাগদাদে আক্রমণ চালান। সৈন্যসহ সে নিজে এসে কসরে হুবায়রা ওঠে। হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদ থেকে আলী ইবন সাঈদকে মাদায়েন ও ওয়াসিতের হিফাযতের জন্যে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করলেন। সে খবর পেয়ে আবুস সারায়া কসরে-হুবায়রা থেকে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল। তারা আলী ইব্‌ন সাঈদের মাদায়েনে পৌঁছার পূর্বেই ১৯৯ হিজরীর রমযান (৮১৫ খ্রি মে) মাসে মাদায়েন দখল করে নিল। স্বয়ং আবুস সারায়া কসরে ইব্‌ন হুবায়রা থেকে রওয়ানা হয়ে নহর সারসার এসে অবস্থান গ্রহণ করে। আলী ইব্‌ন সাঈদ মাদায়েনে পৌঁছে ১৯৯ হিজরীর শাওয়াল (৮১৫ খ্রি জুন) মাসে আবুস সারায়ার বাহিনীকে অবরোধ করলেন। আবুস সারায়া তার বাহিনীর অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে নহ্‌র সারসার থেকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লো।

১৯৯ হিজরীর রজব (৮১৫ খ্রি মার্চ) মাসে হাসান ইব্‌ন সাহলের প্রেরিত বাহিনী আবুস সারায়ার হাতে পরাজয়বরণ করলো এবং তাঁর সেনাপতি তার হাতে গ্রেফতার ও নিহত হলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। সেনাপতি তাহির তখন রিক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং নসর ইব্‌ন শীছের দরুন ওখান থেকে তিনি সরে আসতে পারছিলেন না। হারছামা বাগদাদ থেকে বিদায় নিয়ে খুরাসানের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েছিলেন। এ দু'জন সর্দার ছাড়া আবুস সারায়ার মুকাবিলায় প্রেরণের মত আর কোন সেনাপতিও হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে ছিলেন না। ওদিকে আবুস সারায়া বাগদাদ জয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। বসরা, কূফা, ওয়াসেত, মাদায়েন প্রভৃতি এলাকা ইতিমধ্যেই তার দখলে এসে গিয়েছিল। হাসান ইব্‌ন সাহল ও হারছামা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ জন্য হাসান হারছামার কোনরূপ সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এবার একান্তই দায়ে পড়ে তিনি দ্রুতগামী কাসেদ মারফত পত্রে হারছামাকে অনুরোধ করলেন যেন পথ থেকেই তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি ফিরে আসেন এবং আবুস সারায়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে যান। হারছামা যদিও চাইতেন না যে, হাসান ইব্‌ন সাহলের কোন কাজ সহজভাবে সম্পন্ন হোক, কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, তাই এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাকেও তিনি সমীচীন মনে করলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলেন। হারছামা ঠিক তখনি বাগদাদে প্রবেশ করছিলেন যখন আবুস সারায়া নহ্‌রে সারসার থেকে মাদায়েনের অবরোধ সংবাদ শুনে কসরে-ইব্‌ন হুবায়রার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। হারছামা কালবিলম্ব না করে বাগদাদ থেকে আবুস সারায়ার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। পথিমধ্যে প্রথমে তিনি আবুস সারায়ার বাহিনীর একটি দলকে

পান এবং তাদেরকে ঘেরাও করে হত্যা করেন। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে আবুস সারায়ার নিকটবর্তী হন। সে তখন পিছনে ফিরে মুকাবিলায় প্রবৃত্ত হয়। এ সংঘর্ষে তার অনেক সঙ্গী-সাথী নিহত হয়। আবুস সারায়া নিজে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে কূফায় পৌঁছে বনূ আব্বাস এবং তাদের সমর্থকদের বাড়িঘর বেছে বেছে লুট করে এবং সেগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেয়। তাদের সমস্ত মাল-আসবাব এবং অন্যদের কাছে গচ্ছিত তাদের আমানতসমূহ দখল করে নেয়। হারছামা অগ্রসর হয়ে কূফা অবরোধ করেন। আবুস সারায়া সেখানে দীর্ঘ দু'মাস ধরে দৃঢ়তার সাথে তাঁকে প্রতিরোধ করে চলে। কিন্তু অবরোধের কঠোরতায় শেষ পর্যন্ত হতাশ ও অপারগ হয়ে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে আটশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ কূফা থেকে পালিয়ে যায়। ২০০ হিজরীর ১৫ই মুহাররম (৮১৫ খ্রি ২৬শে আগস্ট) হারছামা কূফায় প্রবেশ করে সেখানে একজন আমিল নিযুক্ত করেন এবং একদিন সেখানে অবস্থান করে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।

আবুস সারায়া কূফা থেকে কাদিসিয়া এবং সেখান থেকে তূস অভিমুখে রওয়ানা হয়। খুযিস্তানে একটি কাফেলার সাথে তার সাক্ষাত হয় যারা প্রচুর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিল। আবুস সারায়া সে কাফেলা লুট করে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়।

ঐ সময়ই হাসান ইব্ন আলী মামুনী আহ্ওয়ায থেকে আবুস সারায়ার আমিলকে তাড়িয়ে দিয়ে তা দখল করে নেন। হাসান ইব্ন আলী আবুস সারায়ার এই নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে আহ্ওয়ায থেকে সসৈন্য আবুস সারায়ার পশ্চাদ্ধাবন করতে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং আবুস সারায়া সে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। সে তখন জালূলা এলাকায় অবস্থিত 'রাস আইন' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। হাসান ইব্ন আলী তা অবগত হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং আবুস সারায়াকে মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ইব্ন মুহাম্মদসহ গ্রেফতার করে হাসান ইব্ন সাহলের খিদমতে পাঠিয়ে দেন। হাসান ইব্ন সাহল আবুস সারায়াকে হত্যা করিয়ে তার শবদেহ বাগদাদের পুলের উপর লটকিয়ে দেন এবং তার খণ্ডিত শির মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদকে সাথে দিয়ে মামূনের খিদমতে পাঠিয়ে দেন। আলী ইব্ন সাঈদ মাদায়েন জয় করে এবং আবুস সারায়ার সৈন্যদেরকে হত্যা করে হাসান ইব্ন সাহলের নির্দেশানুসারে প্রথমে ওয়াসিত অভিমুখে যান এবং দখল করে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি যাইদ ইব্ন মূসা ইব্ন জা'ফর সাদিককে পরাজিত করে বসরা দখল করেন।

যাইদ ইব্ন মূসা বসরায় সমস্ত বনূ আব্বাস বংশীয়দের এবং তাদের সমর্থকদের বাড়িঘর অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্যেও তিনি 'যাইদুন্নার' বা আগুনে যাইদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আলী ইব্ন সাঈদ যাইদুন্নারকে গ্রেফতার করে নজরবন্দী করেন। এভাবে ২০০ হিজরীর মুহাররম (৮১৫ খ্রি আগস্ট) মাসে আবুস সারায়া ও ইরাকের বিদ্রোহের অবসান ঘটে। কিন্তু হিজায ও ইয়ামানে তখনো হাঙ্গামা ও অশান্তি বিরাজ করছিল।

হিজায ও ইয়ামানে বিশৃঙ্খলা

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আবুস সারায়া আবূ তালিব বংশীয়দেরকেই বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের গভর্নররূপে নিযুক্তি দিয়েছিল। সর্বত্র আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে উলুভীরাই সক্রিয় ও

তৎপর ছিল। আবুস সারায়া উলুভীদেরকেই বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে নিযুক্তি দিয়ে বাহ্যিকভাবে তার রাজত্বকে যে উলুভী রাজত্বের রূপ দিয়েছিল সেটা ছিল তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিরই পরিচায়ক। আবুস সারায়ার জীবন ও রাজত্বের অবসান ঘটলেও তার নিযুক্ত অধিকাংশ উলুভী গভর্নর ও শাসক কিন্তু সাহস হারায়নি, তারা নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাধনা চালিয়ে যেতে থাকে। আমীনের হত্যাকাণ্ডের পর উলুভীদের হাতে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। কেননা, স্বয়ং মামূনের উপর যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সেই ফযল, হাসান ও সাহলের পুত্ররা ইরানী বংশোদ্ভূত হওয়ায় আবূ তালিব বংশীয়দেরকে আব্বাস বংশীয়দের তুলনায় উত্তম বিবেচনা করতেন এবং উলুভীদের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি।

স্বয়ং মামূন জা'ফর বারমাকীর কাছে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন। এ জন্য তাঁর অন্তরেও সৈয়দদের সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর জন্যে আমীনের হত্যার পর সালতানাতের গতিধারা উলুভীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হারছামা ইব্‌ন আইউনের সামরিক কুশলতা ইরাকের বুক থেকে আবুস সারায়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাঁকে বিপদমুক্ত করে। উলুভীদের রাজ্যশাসন প্রণালী তাদেরকে হিজায ও ইয়ামানে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে। এর বিশদ বিবরণ এরূপ ঃ

আবুস সারায়া যখন হুসাইন ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ওরফে হুসাইন আকতাসকে মক্কায় গভর্নর নিয়োগ করে পাঠায় তখন ঘটনাচক্রে হারূনুর রশীদের প্রসিদ্ধ ভৃত্য মাসরূর তার সঙ্গী-সাথীসহ সেখানে ছিলেন। ঐ সময় মামূনের পক্ষ থেকে মক্কায় আমিল ছিলেন দাউদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মূসা আব্বাসী। দাউদ ও মাসরূর মক্কায় হুসাইন আকতাসের আগমনের সংবাদ পেয়ে আব্বাস বংশীয় এবং তাদের সমর্থকদের একটি পরামর্শসভা আহ্বান করেন। মাসরূর এবং অন্যান্য অনেকেই যুদ্ধের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু দাউদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মূসা কোনক্রমেই হেরেম শরীফে রক্তারক্তি পছন্দ করলেন না। তিনি স্পষ্টতই এ ব্যাপারে তাঁর অনীহার কথা জানিয়ে বললেন, হুসাইন আকতাস একদিকে মক্কায় প্রবেশ করলে আমি অন্যপথে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাব।

এ কথা শুনে মাসরূর চুপ হয়ে গেলেন। সত্যি সত্যি দাউদ হুসাইন আকতাস মক্কার নিকটবর্তী হয়েছেন শুনেই ইরাকের উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে চললেন। তা লক্ষ্য করে মাসরূরও মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুসাইন আকতাস মক্কার বাইরে এসে থামলেন এবং মক্কায় প্রবেশ করতে ইতস্তত করছিলেন। যখন তিনি জানতে পেলেন যে, আব্বাস বংশীয়রা মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছে, তখন তিনি প্রথমে মাত্র দশজন সাথী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি তাওয়াফ করলেন এবং একরাত মক্কায় কাটিয়েই তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেও ডেকে এনে মক্কার দখল গ্রহণ করলেন। তিনি যথারীতি সেখানে রাজত্বও করতে লাগলেন। ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর সাদিক ইয়ামানে পৌঁছে মামূনের নিযুক্ত আমিল ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে তার দখল গ্রহণ করে সেখানে রাজত্ব করতে শুরু করে দেন। হুসাইন আকতাস কা'বা শরীফের গিলাফ খুলে ফেলে আবুস সারায়ার কূফা থেকে প্রেরিত গিলাফ কা'বা গাত্রে চড়িয়ে দেন। আব্বাসীয়দের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি লুট করেন। অন্যদের কাছে

গচ্ছিত তাদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেন। কা'বা শরীফের স্তম্ভসমূহে লাগানো স্বর্ণ সম্ভার খুলে নেন এবং খানায়ে কা'বার কোষাগারে রক্ষিত সকল ধনসম্পদ ও মাল-আসবাবপত্র বের করে নিজের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

হুসাইন আকতাসের সঙ্গী-সাথীরা হারাম শরীফের জালিসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন। ওদিকে ইবরাহীম ইয়ামানে পৌঁছে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেন। নিরপরাধ লোককে হত্যা করে তিনি 'কসাই' খেতাব অর্জন করেন। এখনো লোকে তাকে ইবরাহীম কাস্সাব বা কসাই ইবরাহীম নামে স্মরণ করে থাকে। ইবরাহীম ইব্ন মূসা এবং হুসাইন আকতাস যে সব সর্দারকে বিভিন্ন এলাকার দিকে প্রেরণ করেছিলেন, তারাও লুটপাট ও হত্যা রাহাজানির ব্যাপারে কেউ কম করেননি। যায়দ ইব্ন মূসার কথা উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে বসরায় নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে যায়দুন্নার বা আগুনে যায়দ খেতাব লাভ করেছিলেন। মোটকথা, উলুভীরা আবুস সারায়ার পক্ষ থেকে হুকুমতের ভয়ে লাভ করে চতুর্দিকে এক ব্যাপক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দেয়। তাদের এই নিপীড়ন নির্যাতনের নীতি সম্ভবত তাদের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবুস সারায়ার নিহত হওয়ার সংবাদ মক্কায় এসে পৌঁছলে মক্কাবাসীরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু করে দেয়। হুসাইন আকতাস নিজে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সাদিকের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, এটা সুবর্ণ সুযোগ, লোকজন আপনার প্রতি আকৃষ্ট রয়েছে। আবুস সারায়া নিহত হয়েছেন। আপনি এবার নিজের খিলাফতের বায়আত লোকজনের নিকট থেকে গ্রহণ করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত হচ্ছি। তারপর আর কেউ আপনার বিরোধিতা করবে না। মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ওরফে দীবাচা আলম তাতে সম্মত হলেন না। কিন্তু হুসাইন আকতাস এবং মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরের ছাত্র আলী উভয়ে মিলে পুনঃপুনঃ কথা দেয়ায় শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর বায়আত নিতে উদ্যত হলেন। লোকজন বায়আত গ্রহণ করলো। তিনি আমীরুল মু'মিনীন খেতাবে অভিহিত হলেন। কিন্তু তারপরেই হুসাইন আকতাস এবং মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরের পুত্র আলী স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। তারা ব্যভিচারে এমনিভাবে মগ্ন হলেন যে, মক্কায় কুল নারীদের পক্ষে সতীত্ব রক্ষা মুশকিল হয়ে উঠলো। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা নারীদের সম্ভ্রম লুটতে এবং পুরুষদের অবমাননা করতে লাগলো। দুষ্ট লোকদের একটি চক্র তাদের চারপাশে সমবেত হলো আর তারা দিবারাত্রি এই অপকর্মের মধ্যেই ডুবে রইল।

মক্কার কাযী মুহাম্মদের এক কিশোর পুত্র ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ একদিন বাজারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। 'আমীরুল মু'মিনীন' মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরের পুত্র আলী তাঁকে পাকড়াও করে তার গৃহের মধ্যে বন্দী করলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত এ অপরাধের দৃশ্য লোকজন প্রত্যক্ষ করলো। তারা একটি সভায় মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সাদিককে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ঠিক করে যে, যে কোন মূল্যে কাযীর পুত্রকে আলী ইব্ন মুহাম্মদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। তারা মহা হৈচৈ বাঁধিয়ে দেয় এবং শোরগোল সহকারে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর সাদিকের বাড়ি ঘেরাও করে। আমীরুল মু'মিনীন মুহাম্মদ তখন লোকজনের কাছে অভয় প্রার্থনা করেন এবং নিজে আপন পুত্র আলীর ঘরে গিয়ে কাযী পুত্রকে সেখানে দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জনতার হাতে ফিরিয়ে দেন। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম ইব্ন মূসা কাযিম ওরফে ইবরাহীম কাসসাব ইয়ামানের আমিল ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন ঈসাকে তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইয়ামানেই আত্মগোপন করে সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। এবার উলুভীদের নির্যাতন-নিপীড়নের রাজত্ব এবং গণমনে বিরাজমান অসন্তোষ লক্ষ্য করে তিনি অনায়াসেই একটি বাহিনী গড়ে তুললেন। ইবরাহীমও ইয়ামান থেকে মক্কায় এসেছিলেন। ইসহাক ইয়ামান থেকে যাত্রা করে মক্কায় এসে হামলা চালালেন। উলুভীরা আশেপাশের বেদুঈনদেরকে সমবেত করে পরিখা খনন করে ইসহাকের মুকাবিলার জন্যে উদ্যত হয়। ইসহাক প্রথমে সারি বিন্যাস করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু তারপর কি যেন মনে করে সোজা সেখান থেকে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ওদিকে হাসান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইরাকের ব্যাপারটি গুছিয়ে নিয়ে হারছামা ইব্‌ন আইউনকে হিজায ও ইয়ামানের গোলমাল দমনের দায়িত্ব প্রদান করলেন। হারছামা রাজ ইব্‌ন জামীল এবং জালুভীকে একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করলেন। হারছামা প্রেরিত এ বাহিনী এদিক থেকে যাচ্ছিল আর ওদিক থেকে ইসহাক আসছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। ইসহাকও তাঁদের সাথে মক্কার দিকে ফিরে যান। সেখানে পৌঁছে তারা উলুভীদেরকে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত দেখতে পেলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর উলুভীরা পরাজিত হলো। আব্বাসী সৈন্যবাহিনী বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলো।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। তিনি মক্কা থেকে কূফা এবং কূফা থেকে জাহনিয়া অঞ্চলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। এক বিরাট বাহিনী সংগৃহীত হলো। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা চালালেন। মদীনার আমিল হারূন ইব্‌ন মুসাইয়ির মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। বেশ ক'টি লড়াই হলো। অবশেষে দীবাচা আলম মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর সাদিক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জাহিনিয়া অঞ্চলের দিকে ফিরে যান। এ লড়াইয়ে তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট হয় এবং তাঁর প্রচুর সঙ্গীসাথী মারা পড়ে। পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে মক্কার শাসনকার্যে এখনো পর্যন্ত বহাল রাজা ইব্‌ন জামীল এবং জালুভীর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে মক্কায় আসেন। এ সময় তিনি লোকজনকে সমবেত করে খুতবা দিয়ে বলেন, আমি শুনেছিলাম, মামূনুর রশীদের মৃত্যু হয়েছে। এজন্যে আমি লোকজনের নিকট থেকে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলাম। এখন আমি জানতে পেরেছি যে, আসলে মামূনুর রশীদের মৃত্যু হয়নি। তাই আমি তোমাদেরকে আমার বায়আতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি।

হজ্জ আদায়ের পর ২০১ হিজরীতে (৮১৬-১৭ খ্রি.) হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লের নিকট তিনি বাগদাদে চলে যান। তিনি তাকে মামূনের দরবারে পাঠিয়ে দেন। মামূন তাঁকে সসম্মানে রাখেন। যখন মামূন মার্ভ থেকে ইরাকের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে জুরজান নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।

হারছামা ইব্‌ন আইউনের হত্যাকাণ্ড

ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল হারূনুর রশীদের ওফাতের পর মামূনুর রশীদের মনে সাহস যুগিয়ে যান এবং তিনিই আমীনের মুকাবিলার সমস্ত আয়োজন করেন। মামূন তাঁকে উযীরে আযম এবং তরবারি ও কলমের অধিপতি করেন। ইরানীরা এজন্যে মামূনের প্রতি দুর্বল ছিল যে, মামূনের মা ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। মামূন শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিলেন জা'ফরের কাছে এবং তিনি

ইরানীদের এক-চতুর্থাংশ খারাজ মাফ করে দিয়েছিলেন । এজন্যে ফযলের ওজারতি লাভ এবং খলীফার উপর প্রভাব বিস্তারের সকল প্রকার সুবিধাই ছিল। তিনি মামূনকে খুরাসানের কেন্দ্রস্থল মার্ভেই রাজধানী রক্ষার ব্যাপারে সম্মত করে ফেলেছিলেন। এখানে আরবদের তেমন শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের সুবিধা ছিল না। মামূনুর রশীদ বাগদাদে স্থানান্তরিত হলে সেখানে ফযলের তেমন প্রভাব চলতো না। সেখানে আরবরা মামূনকে ফযলের হাতে ক্রীতদাসের মতো ছেড়ে রাখতো না। ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল তাঁর ভাই মুহ্‌সিন ইব্‌ন সাহলকে ইরাক, হিজায প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে আরবদের প্রভাব খর্ব করার ব্যবস্থা করেছিলেন। হারছামা এবং তাহির ছিলেন এমন দু'জন জবরদস্ত সিপাহসালার যাঁরা মামূনকে খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অনেক বড় বড় সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাহিরের খ্যাতি যদিও বা হারছামাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, কিন্তু হারছামার জ্যেষ্ঠতা সে ঘাটতিটুকু পূরণ করে দিয়েছিল। সুতরাং খলীফার দরবারে তাঁদের কারো দাবিই কম ছিল না।

তাহির সম্যক টের পান যে, আমীনকে হত্যার কারণে ভ্রাতৃবৎসল মামূনের মনে তিনি আঘাত দিয়েছেন। এজন্যেই বিজিত এলাকাসমূহের শাসনভার তাঁকে না দিয়ে হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লকে মামূনের ইচ্ছানুসারে অনায়াসেই ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল প্রদান করেছেন আর তাঁকেই পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ভাইসরয় নিযুক্ত করতে পেরেছেন। এজন্যে তাহিরের পক্ষে অনারবদের শক্তি খর্ব করার বা মামূনকে মার্ভ থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা সম্ভবপর ছিল না। কেবল হারছামা ইব্‌ন আইউনের পক্ষেই মামূনকে আরবদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করার সাহস দেখানো সম্ভব ছিল। হারছামা একথাও সম্যক জানতেন যে, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌লের মাধ্যম ব্যতিরেকে কোন পত্র, দরখাস্ত ও সহায়ক লিপি সরাসরি মামূনুর রশীদের হাতে পৌঁছানোরও কোন উপায় নেই। তিনি একথাও জানতেন যে, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌লের মাধ্যম ব্যতীত খলীফার সাথে সাক্ষাতেরও কোন উপায় নেই। অর্থাৎ ফযলের অনুমতি না নিয়ে কেউই খলীফার সাথে দেখা পর্যন্ত করতে পারতো না। এমতাবস্থায়, মামূনুর রশীদের অবস্থা ছিল অনেকটা মুহাম্মদ খানের হাতে ভারতবর্ষে জাহাঙ্গীরের অবস্থা।

ইসলামের ইতিহাসে উযীরের হাতে এরূপ অসহায় বন্দীর অবস্থা কোন খলীফার জন্যে এটাই ছিল প্রথম। অথচ খলীফা নিজে জানতেন না যে, তিনি তাঁর উযীরের হাতে কতটা অসহায়। আবুস সারায়ার হত্যা এবং মক্কার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পরই হারছামা জানতে পারলেন যে, মামূনুর রশীদ এখন পর্যন্ত ইরাক ও হিজাযের বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুই অবগত নন। তিনি রাজ্যের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তাই হারছামা নিজে খলীফাকে রাজ্যের যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করার মানসে খুরাসানের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল যে খলীফাকে কিভাবে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছেন সে তথ্যও তিনি তাঁকে অবহিত করবেন। হারছামা হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লের নিকট থেকে বিদায় না নিয়েই খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন। ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল যখন জানতে পারলেন যে, হারছামা খলীফার দরবারে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি মামূনুর রশীদের দ্বারা এ আদেশ লিখিয়ে পাঠিয়ে দিলেন যে, তুমি কালবিলম্ব না করে শাম ও হিজাযের দিকে চলে যাও, সেখানে এ মুহূর্তে তোমার খুবই প্রয়োজন। এ মুহূর্তেই আমার কাছে খুরাসানে আসার প্রয়োজন নেই।

হারছামা যেহেতু প্রকৃত ব্যাপার পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন, তাই তিনি মামূনের নির্দেশের কোনই পরওয়া করলেন না, বরং পূর্ববর্তী বড় বড় খিদমত এবং জ্যেষ্ঠতার অধিকারের ওপর ভরসা করে মার্ভ অভিমুখে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। তিনি যখন মার্ভের উপকণ্ঠে উপনীত হলেন, তখন ভাবলেন, ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল আমাকে খলীফার দরবারে পৌঁছতে নাও দিতে পারে। এমনকি খলীফা মামূনুর রশীদ হয়তো ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না যে, আমি এসেছি। তাই তিনি শহরে প্রবেশকালে তাঁর বাহিনীকে কাড়া নাকাড়া বাজাবার নির্দেশ দিলেন—যাতে খলীফা আঁচ করতে পারেন যে, নিশ্চয়ই কোন বড় সেনাপতির আগমন শহরে ঘটেছে। তাই এই বাদ্যের তান শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে ফযল যখন জানতে পারলেন যে, হারছামা নির্দেশ পালন করেননি এবং মার্ভ অভিমুখে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন আর তিনি তার বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে অনুযোগ করার অভিপ্রায় পোষণ করেন তখন মামূনুর রশীদকে বলেন যে, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, আবুস সারায়াকে বিদ্রোহের জন্যে হারছামাই উস্কানি দিয়েছিল। আর যখন হারছামাকে সে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তখন সে আবুস সারায়াকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হাসান ইব্‌ন আলী তাকে হত্যা করেছিল। এখন তার অভিপ্রায় কি তা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারেন। কিন্তু তার ঔদ্ধত্য যে চরমে উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য। আপনি তাকে শাম অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ সে তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দর্পভরে মার্ভ অভিমুখে এগিয়ে আসছে।

যখন হারছামা মার্ভ শহরে প্রবেশ করলেন তার চতুর্দিকে একটা হৈ চৈ শোরগোল পড়ে গেল, মামূনের কানে বাদ্যের আওয়াজ পৌঁছল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কিসের বাদ্যধ্বনি ও শোরগোল? জবাবে ফযল বললেন ঃ হারছামা এসে পৌঁছেছে। সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে এসে প্রবেশ করছে। একথায় মামূন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত হারছামা দরবারে এসে উপনীত হলেন। হারছামা তাঁর মনের কথা প্রকাশ করার পূর্বেই খলীফা গর্জন করে উঠলেন ঃ আগে বল, নির্দেশ কেন অমান্য করেছ ?

হারছামা সে জন্যে ওযরখাহী করতে লাগলেন। কিন্তু মামূনের ক্রোধ তখন এতই চরমে উঠেছিল যে, তিনি তাঁর কোন কথায়ই কর্ণপাত না করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দিলেন। তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর কৃতিত্বসমূহের কথা খলীফার কর্ণগোচর হলে সেগুলোই হয়তো তাঁর মুক্তির সুপারিশ স্বরূপ কাজ করতো এবং ক্রোধ প্রশমিত হলে একটু আগে বা পরে তিনি তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল এ সুযোগকে একটুও হাতছাড়া হতে দিলেন না। সে হারছামাকে কারাভ্যন্তরে হত্যা করিয়ে খলীফাকে সংবাদ দিল যে,কারাগারে হারছামার মৃত্যু হয়েছে। হারছামার এ মৃত্যু সংবাদে মামূনের একটু দুঃখ হলো না। তাঁর যে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে হারছামা এসে অঘোরে প্রাণ দিলেন তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও সাধিত হলো না। মামূন যে তিমিরে ছিলেন, সে তিমিরেই পূর্ববৎ পরে রইলেন। এখন বাহ্যত তাঁর তিমির মুক্তির আর কোন ব্যবস্থাই রইল না। কিন্তু স্বয়ং কুদরতের ইন্তেজাম এমনি ছিল যে, ফযলকে শেষ পর্যন্ত শোচনীয় মৃত্যুরই সম্মুখীন হতে হলো।

বাগদাদে গণ-অসন্তোষ

হারছামা মার্ভের কারাগারে যখন নিহত হন হাসান ইব্‌ন সাহল তখন বাগদাদের নাহ্‌রাওয়ানে অবস্থান করছিলেন। বাগদাদে হারছামার হত্যা সংবাদ পৌঁছতেই এখানে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। জনগণ বলাবলি করতে লাগলো যে, ফযল ইব্‌ন সাহল খলীফা ও খিলাফতকে তার কুক্ষিগত করে রেখেছে। আর যেহেতু সে পারসিক বংশোদ্ভূত এবং একজন পারসিকের সন্তান, তাই আরবদেরকে তার হাতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এই প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ বাগদাদবাসীদেরকে এমর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন যে, আমি হাসান ইব্‌ন সাহলকে ইরাক থেকে বের করে তবে ছাড়বো। বাগদাদবাসীরা এ ব্যাপারে তাঁর আনুগত্যের শপথ নিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ যথারীতি একটি বাহিনী তৈরি করলেন এবং হাসান ইব্‌ন সাহলের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বাগদাদের আমিল আলী ইব্‌ন হিশামকে বাগদাদ থেকে বের করে দিলেন। হাসান ইব্‌ন সাহল নাহ্‌রাওয়ান থেকে বাগদাদ অভিমুখে একাধিক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। মুহাম্মদ তাদেরকে একে একে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। হাসান ইব্‌ন সাহল ওয়াসিতে পৌঁছেন। সেখানে তাঁর পৌঁছার কিছু দিনের মধ্যেই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ বাগদাদ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন।

হাসান ইব্‌ন সাহল এ সংবাদ অবগত হয়ে ওয়াসিত থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ ওয়াসিতে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নেন এবং কালবিলম্ব না করে হাসান ইব্‌ন সাহলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। হাসান ইব্‌ন সাহল পেছনে ফিরে তাঁর মুকাবিলা করেন। ঘটনাচক্রে সংঘর্ষে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ পরাজয়বরণ করেন। তিনি জরজারায়ায় এসে অবস্থান করেন এবং নিজের অবস্থা শুধরে নিয়ে তারপর পুনরায় হাসান ইব্‌ন সাহলের মুকাবিলা করেন। তাদের মধ্যে বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়। একটি যুদ্ধে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ মারাত্মক আহত হন। তাঁর পুত্র তাঁকে সাথে নিয়ে বাগদাদে পৌঁছেন। বাগদাদে পৌঁছতেই আহত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ মৃত্যুবরণ করেন। তারপর বাগদাদবাসীরা মাহ্‌দী ইব্‌ন মানসূরের পুত্র মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দী আব্বাসীকে খলীফা বানাতে উদ্যত হয়। কিন্তু মানসূর তাতে কোন মতেই স্বীকৃত হন না। শেষ পর্যন্ত লোকে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে এমর্মে রাযী করাতে সক্ষম হয় যে, খলীফা মামূনই থাকবেন এবং খুতবা তাঁরই নামে হবে, কিন্তু নায়েবে সালতানাতরূপে হাসান ইব্‌ন সাহলের পরিবর্তে মানসূরই বাগদাদের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। সেমতে ২০১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (৮১৬ খ্রি) মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দী বাগদাদের শাসনভার নিজ হস্তে তুলে নেন। তাঁর সেনাপতি হন ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ।

হাসান ইব্‌ন সাহল এবার তাঁর অবস্থা শুধরে নিয়ে মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দীর মুকাবিলায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষে বেশ ক'টি লড়াই হয়। ওদিকে মার্ভে মামূন এসবের কিছুই না জেনে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। কেননা, ফযল ইব্‌ন সাহল তাঁর কাছে সরাসরি সংবাদ পৌঁছবার সকল পথই রুদ্ধ করে রেখেছিল। মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দী এবং হাসান ইব্‌ন সাহলের সংঘর্ষের সময় বাগদাদের সমাজবিরোধী অপকর্মে নিয়োজিত গুণ্ডা-বদমাশদের স্বাধীনভাবে গুণ্ডামি করার সুযোগ জুটে যায়। লুটপাট, ডাকাতি, রাহাজানি, চুরি, ব্যভিচার,

ধর্ষণ প্রভৃতির হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ অবাধে এবং প্রকাশ্যে সংঘটিত হতে থাকে। এসব অনাচার দুর্নীতি যখন সকল সীমা অতিক্রম করলো এবং বাগদাদে ভদ্র লোকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো, তখন বাগদাদে খালিদ মাদরিউশ এবং সাহল ইব্‌ন সালামা নামক দু' ব্যক্তি তাদের ওয়ায-নসীহতের দ্বারা লোকজনকে সৎপথে ফিরে আসার এবং অসৎ জীবন ত্যাগের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় অপরাধ প্রবণতার হার অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু সাহল ইব্‌ন সালামার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আশংকা করেন মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দী এবং ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ। শেষ পর্যন্ত মানসূর ও ঈসা উভয়েই হাসান ইব্‌ন সাহলের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেন যে, হাসান ইব্‌ন সাহল মামূনের স্বহস্ত স্বাক্ষরিত অভয় পত্র তাদেরকে শুনিয়ে দেবেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাঁদের দু'জনকেই বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করবেন।

সে মতে হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদে প্রবেশ করে তাঁর পক্ষ থেকে দু'জনকেই বাগদাদের শাসক নিযুক্ত করে নাহ্‌রাওয়ানে ফিরে যান। এটা ২০১ হিজরীর রমযান (৮১৭ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসের ঘটনা। ২০১ হিজরীতে (৮১৬-১৭ খ্রি) মামূনুর রশীদ আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিম ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা মনোনীত করছিলেন আর বাগদাদে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি একেবারেই অনবহিত ছিলেন।

ইমাম আলী রিযার মনোনয়ন লাভ

মামূনুর রশীদ যদিও প্রকৃতপক্ষে ফযল ইব্‌ন সাহলের হাতে বন্দী এবং রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না, ফযল তার ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যশাসন করে চলেছিল, কিন্তু তাঁর ঐ বন্দী দশার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছিলেন না। মামূন শুরু থেকেই সৈয়দ বংশ ও আহলে বায়আতদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—যা উপরেও বর্ণিত হয়েছে।

মামূন ২০০ হিজরী (৮১৫-১৬ খ্রি) আব্বাসীয় বংশের অধিকাংশ সদস্যকে মার্ভে তাঁর সকাশে তলব করেন এবং মাসের পর মাস ধরে তাঁদেরকে রাজকীয় আতিথ্য প্রদান করেন। কিন্তু একজনও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁর চোখে পড়লো না। অবশেষে ফযল ইব্‌ন সাহল ও অন্যান্য আহলে বায়আত প্রেমিকদের মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টি ইমাম আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের দিকে আকৃষ্ট হলো। প্রকৃত পক্ষে আলী রিযা বনী হাশিম বংশের যোগ্যতম পাত্র ছিলেন। তাই মামূনুর রশীদ নিঃসঙ্কোচে আলী রিযাকে তাঁক কন্যা সম্প্রদান করলেন এবং ২০১ হিজরীর রমযান (৮১৭ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসে আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করে হারূনুর রশীদের ওসীয়ত অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত উত্তরাধিকারী তাঁর ভাই মুতামানকে উত্তরাধিকারী পদ থেকে পদচ্যুত করলেন। অবশ্য মুতামানকে পদচ্যুত করার অধিকার স্বয়ং হারূনুর রশীদই মামূনকে দিয়ে রেখেছিলেন। তাই মুতামানকে পদচ্যুত করার জন্যে মামূনকে দায়ী করা চলে না। এরপর মামূন আব্বাসীদের প্রতীক কৃষ্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে উলুভীদের প্রতীক সবুজ বস্ত্র ধারণ করতে শুরু করেন। গোটা দরবারের লোকজন এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করে।

এরপর মামূন এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, আমলা-অমাত্য এবং সামরিক অফিসারগণ এখন থেকে সবুজ বস্ত্র পরিধান করবেন। আমলাদের নামে এ মর্মেও ফরমান জারি করলেন

যে, তাঁরা যেন আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের নামে উত্তরাধিকারিত্বে বায়আত গ্রহণ করেন। এ ফরমান যখন ফযল ইব্‌ন সাহলের মাধ্যমে রাজ্যের আমলা-অমাত্যদের কাছে পৌঁছলো তখন কেউ কেউ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবার কেউ কেউ অনিচ্ছায় সে নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু ঐ ফরমান যখন হাসান ইব্‌ন সাহল বাগদাদের ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ এবং মানসূর ইব্‌ন মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করলেন, তখন বাগদাদে নতুনভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। লোকজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, ফযল ইব্‌ন সাহল খিলাফত আব্বাসীদের হাত থেকে উলুভীদের হাতে হস্তান্তরিত করতে পূর্ণমাত্রায় কৃতকার্য হয়েছেন। আব্বাসীয় এবং তাদের সমর্থকদের পক্ষে এ ছিল একেবারে অসহনীয় ব্যাপার। তাঁদের জানা ছিল যে, এ চেষ্টা সর্বপ্রথম আবূ মুসলিম খুরাসানী করেছিলেন। তারপর বারমাকীরাও এ চেষ্টা করেছিল— যারা ছিল পারসিক বংশোদ্ভূত। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কৃতকার্য হতে পারেনি। এখন আরেকজন পারসিক এ ব্যাপারে সফলকাম হয়ে গেল। কিন্তু আরব আজমের পার্থক্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আরবরা সাধারণভাবে ফযল ইব্‌ন সাহলকে তাদের প্রতিপক্ষ এবং অনারবদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুরব্বীরূপেই জানতো। তাই আরব মাত্রই আলী রিযার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন লাভকে আজমীদের সাফল্য এবং নিজেদের পরাজয় বলে গ্রহণ করলো।

বাগদাদে আরবদের সংখ্যা বেশি ছিল। আব্বাসীয়দের এটা ছিল খাস ঘাঁটি। এখানে এ সংবাদ লোকজনের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে তা সলা-পরামর্শ চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। একদিকে তারা সবেমাত্র বিদ্রোহের পরিণামে কী ভীষণ দুর্গতি নেমে আসে, আর একদিকে তারা সবেমাত্র সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, অপরদিকে মুসলিম জাহানে অর্থাৎ অন্যান্য প্রদেশ ও রাজ্যে আলী রিযার মনোনয়নের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে তা অবগত হওয়াকেও তারা জরুরী বিবেচনা করছিল। বাগদাদে এ সংবাদ পৌঁছে ২০১ হিজরীর রমযান (৮১৭ খ্রি.-এর এপ্রিল) মাসে। পূর্ণ তিনটি মাস ধরে বাগদাদবাসীরা কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এ সময় আব্বাসীদের হাত থেকে খিলাফত উলুভীদের হাতে যেতে পারে না এ ধারণাটি বেশ শক্তি সঞ্চয় করে।

ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফত

২০১ হিজরীর ২৫শে যিলহজ্জ (৮১৭ খ্রি জুলাই) বনী আব্বাস বংশীয় এবং তাদের সমর্থক শুভানুধ্যায়ীরা ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে খিলাফতের জন্যে নির্বাচিত করে গোপনীয়ভাবে তাঁর হাতে বায়আত হন। এরপর ২০২ হিজরীর ১লা মুহাররম (৮১৭ খ্রি. ২০ জুলাই) নববর্ষের দিন বাগদাদবাসীরা প্রকাশ্যে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করে তাঁকে খলীফারূপে গ্রহণ করে এবং মামূনকে খলীফা পদ থেকে পদচ্যুত করে। ইবরাহীম খলীফা হয়েই সৈন্যদেরকে ছয় ছয় মাসের বেতন বখশিশ স্বরূপে প্রদানের অঙ্গীকার করেন এবং কূফা ও সাওয়াদ দখল করে মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগদাদের পশ্চিম দিকে আব্বাস ইব্‌ন মূসাকে এবং পূর্ব দিকে ইসহাক ইব্‌ন মূসাকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদ হাসান ইব্‌ন সাহলের পক্ষ থেকে কসরে ইব্‌ন হুবায়রায় অবস্থায় করছিলেন। তিনি সেখান থেকে হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে যান। ইবরাহীম কস্‌রে

ইব্‌ন হুবায়রা দখলের জন্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে প্রেরণ করেন। ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ সে মতে কস্‌রে ইব্‌ন হুবায়রা দখল করে হুমায়দের সেনাছাউনিতে লুটপাট চালান। হাসান ইব্‌ন সাহল আব্বাস ইব্‌ন মূসা কাযিম অর্থাৎ আলী রিযার ভাইকে গভর্নরীয় সনদসহ কূফার দিকে পাঠিয়ে দেন। আব্বাস ইব্‌ন মূসা কাযিম কূফায় পৌঁছে ঘোষণা করেন যে, আমার ভাই আলী রিযা মামূনের পর খিলাফতের আসনের অধিকারী হবেন। এজন্যে তোমরা যারা আহলে বায়তের মহব্বতের দাবিদার তোমাদের ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফতকে স্বীকৃতি দেয়া এবং মামূনুর রশীদের বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ সমীচীন হবে না।

কূফাবাসীরা আব্বাস ইব্‌ন মূসা কাযিমকে গভর্নররূপে স্বীকার করে নেয়। কেবল শিয়ারা এই বলে তাঁর সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে যে, আমরা তোমার ভাই ইমাম আলী রিযার সমর্থক, মামূনের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী আব্বাস ইব্‌ন মূসা কাযিমের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তাঁর দু'জন সিপাহ্‌সালার সাঈদ এবং আবুল বাতকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। আব্বাস তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরকে তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ পরাজিত হলেন। সাঈদ হীরায় অবস্থান করে সৈন্যবাহিনীকে কূফার দিকে প্রেরণ করেন। কূফাবাসীরাও আব্বাস মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। বেশ ক'টি লড়াইর পর আব্বাস ও কূফাবাসীরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। আব্বাস ইব্‌ন মূসা কাযিম তাঁর বাসগৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং বিজয়ী সৈন্যরা কূফা শহরে প্রবেশ করতে লাগলো। এমনি সময় আব্বাসের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সাঈদের সৈন্য বাহিনী আবারো আব্বাসের সাথীদেরকে পরাস্ত করলো এবং কূফা দখল করে আব্বাসকে গ্রেফতার করলো।

সংবাদ পেয়ে সাঈদ হীরা থেকে কূফায় আগমন করেন। তদন্তে যখন প্রমাণিত হলো যে, নিরাপত্তা প্রার্থনার পর আব্বাস নিজে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি, তখন তিনি আব্বাসকে মুক্ত করে দেন এবং কূফার কিছু লোককে হত্যা করেন। তিনি কূফায় নিজস্ব আমিল নিযুক্ত করে বাগদাদে ফিরে আসেন। হাসান ইব্‌ন সাহল হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদকে কূফা অভিমুখে রওয়ানা করেন। কূফার আমিল তার সাথে মুকাবিলায় প্রবৃত্ত না হয়েই কূফা ছেড়ে পলায়ন করলেন। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী হাসান ইব্‌ন সাহলের উপর হামলা করার জন্যে ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে ওয়াসিত অভিমুখে প্রেরণ করলেন, কেননা হাসান ইব্‌ন সাহল তখন ওয়াসিতে অবস্থান করছিলেন। হাসান ইব্‌ন সাহল ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বাগদাদের দিকে তাড়িয়ে দেন। মোটকথা এরূপ হৈ-হল্লা ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে ২০২ হিজরীর (৮১৭-১৮ খ্রি) অবসান ঘটে এবং ২০৩ হিজরী (৮১৮-১৯ খ্রি) শুরু হয়।

ইবরাহীম তাঁর খিলাফতকে মজবুত ও স্থায়ী করার সম্ভাব্য চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি করেননি। কিন্তু ২০৩ হিজরীর (৮১৮ খ্রি. জুলাই-আগস্ট) প্রারম্ভের দিকে বাগদাদে এমন এক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়ে যে, তাতে তাঁর রাজত্ব ও খিলাফতসমূহ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়।

একথার বিশদ বিবরণ হচ্ছে, হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদ কূফা অধিকার করার পর ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর সাথে লড়বার উদ্দেশ্যে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর সিপাহ্‌সালার ছিলেন ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী খালিদ।

হুমায়দ গোপন বার্তা মারফত ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে হাত করে তার সাথে গোপনে আঁতাত করেন। ফলশ্রুতিতে ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। এ গোপন আঁতাতের কথা অবগত হয়ে ঈসার ভাই হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ তা ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে অবগত করেন। খলীফা ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদকে দরবারে তলব করে এজন্যে তাকে ভীষণ অপদস্থ করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ঈসার বন্দী হওয়ার সংবাদে সৈন্যবাহিনীতে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। ঈসার নায়েব আব্বাস সৈন্যবাহিনীর লোকজনকে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তাঁর নিজের সমর্থনে নিয়ে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব দেন। বাগদাদবাসীদের অনেকেই এ প্রস্তাবের সপক্ষে সাড়া দেয়। তারা ইবরাহীমের অনেক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে। এরপর আব্বাস হুমায়দকে শীঘ্রই বাগদাদে চলে আসতে লিখে পাঠান এবং তিনি তার হাতে বাগদাদ সমর্পণ করবেন বলে জানান। তদনুযায়ী হুমায়দ সসৈন্য বাগদাদে এসে পৌঁছে শহরের একাংশ দখল করে বসেন। অপর অংশ ইবরাহীমের দখলে ছিল। শহরে বেশ ক'টি সংঘর্ষ হয়। অবশেষে হতাশ হয়ে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী আত্মগোপন করেন। গোটা শহর হুমায়দ ইব্‌ন আবদুল হামীদ ও আলী উব্‌ন হিশাম প্রমুখ হাসান ইব্‌ন সাহলের সেনাপতিদের দখলে চলে যায়। এভাবে ২০৩ হিজরীর ১৭ই যিলহজ্জ (৮১৯ খ্রি.-এর জুন) ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফতের অবসান ঘটে।

ফযল ইব্‌ন সাহলের হত্যাকাণ্ড

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, ফযল ইব্‌ন সাহল তার ইচ্ছেমত যে কোন সংবাদ মামূনকে অবগত করতেন আর যে ঘটনা তাঁর কাছে গোপন রাখতে চাইতেন তা অবলীলাক্রমে গোপন করে ফেলতেন। মামূন তা ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন না। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী যে বাগদাদে খলীফা হয়ে বসেছিলেন এ সংবাদটিও ফযল ইব্‌ন সাহল মামূনের কাছে গোপন রাখেন। ইরাকের সঠিক সংবাদ মামূনুর রশীদের কর্ণগোচর করার সাধ্য কারো হয়নি। তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে ফযল রিক্কায় ওয়ালীরূপে নিযুক্তি দিয়ে রেখেছিলেন। তাহির ছিলেন একজন নামজাদা সেনাপতি। তিনি নিঃসন্দেহে এতটা যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন যে, ইরাকের উপদ্রব দূর করতে তাঁর সাহায্য নেয়া যেতে পারতো। কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহল তাঁকে আরেক হারছামা মনে করতেন। তাই তাঁকে একটি মামুলী ও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এলাকার শাসনভার অর্পণ করে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী সম্পর্কে ফযল মামূনকে শুধু এতটুকু জানিয়ে রেখেছিলেন যে, বাগদাদবাসীরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারসমূহের তত্ত্বাবধানের স্বার্থে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে তাদের আমিলরূপে পেলে খুশি হবে বলে জানিয়েছে। এজন্যে ইবরাহীমকে বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে।

এদিকে ইরাকে গণ-অসন্তোষ ও অরাজকতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোকজন ক্রমেই হাসান ইব্‌ন সাহলের প্রতি অধিক মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এ সময় কয়েক ব্যক্তি সাহসে ভর করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মার্ভ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে খিলাফতের

মনোনীত উত্তরাধিকারী আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে যে, একমাত্র আপনি ছাড়া মামূনকে আর কেউই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারবে না। আপনি এ গুরুদায়িত্ব পালন করুন।

আলী রিযা যদিও ফযল ইব্‌ন সাহলকে তাঁর বিরোধিতা করতে কোন দিনই দেখেন নি বরং সর্বদা তাঁকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সমর্থকরূপেই পেয়েছেন, কিন্তু এ পবিত্রাত্মা পুরুষ পূর্ণ সাহসিতার সাথে তৎক্ষণাৎ সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলেন। তিনি মামূনুর রশীদের ফযল ইব্‌ন সাহল ও হাসান ইব্‌ন সাহলের অন্যায় কার্যকলাপ, হারছামার অন্যায় হত্যাকাণ্ড, তাহিরকে নিষ্ক্রিয় রাখা, ইরাকের বিদ্রোহ ও ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফত সম্পর্কে তথ্যাদি বিশদভাবে অবহিত করলেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে বললেন যে, এ সব কারণে গণ-অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি আপনার খিলাফতও এখন সঙ্কটাপন্ন হতে চলেছে। ইমাম আলী রিযা অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে এ তথ্যও তাঁকে অবগত করতে বিরত রইলেন না যে, তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় বনূ আব্বাস এবং তাদের সমর্থকরা খলীফার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য অবগত হয়ে মামূনের রীতিমত টনক নড়লো। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি ছাড়া আর কেউ কি এসব তথ্য অবগত আছে? জবাবে তিনি বললেন ঃ আপনার অমুক অমুক সেনাপতি এবং অমাত্য এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত, কিন্তু ফযল ইব্‌ন সাহলের ভয়ে তাঁরা তা অতিকষ্টে চেপে আছেন। তাঁরা তা আপনাকে অবহিত করতে রীতিমত ভয় পান। মামূন তখন ঐ সব আমলা-অমাত্যকে একান্তে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রথমে তাঁরা অস্বীকার করেন, কিন্তু যখন মামূন তাঁদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করে বললেন যে, ফযল তোমাদের কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। তোমরা নির্ভয়ে সত্য কথা বল, তখন তাঁরা আলী রিযার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুমোদন করলেন। সব শুনে মামূন মার্ভ থেকে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। সব জেনে ফযল যে সব সর্দার আলী রিযার বর্ণনা অনুমোদন করে মামূনের কাছে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং তাঁকে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, তাঁদেরকে নানারূপ ক্লেশ দেয়। কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করে আবার কাউকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করে কশাঘাত করে। কিন্তু এখন আর করার কিছু ছিল না, যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। মামূন এটুকু বিজ্ঞের পরিচয় দিলেন যে, নিজের পক্ষ থেকে ফযল ইব্‌ন সাহলকে কোনরূপ ভয়ভীতি প্রদর্শন করলেন না, বা হতাশ হতে দিলেন না বরং তিনি ফযল ইব্‌ন সাহলের চাচাত ভাই গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করে নিজে খুরাসান থেকে ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তারা যখন সারাখ্‌স নামক স্থানে উপনীত হলেন, তখন চারব্যক্তি হাম্মামখানায় প্রবেশ করে ফযল ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

মামূন এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, যে ব্যক্তি ফযলের হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে, তাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। হত্যাকারীরা গ্রেফতার হয়ে তাঁর দরবারে নীত হলো। মামূন তাদেরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং তাদের খণ্ডিত শির হাসান ইব্‌ন সাহলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মামূন হাসান ইব্‌ন সাহলকে শোকবাণী সম্বলিত পত্র লিখলেন এবং ফযল ইব্‌ন সাহলের স্থলে তাঁকেই তাঁর উযীররূপে মনোনীত করলেন। তিনি নিজে ফযল ইব্‌ন সাহলের মায়ের কাছে গিয়ে শোক প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, যেরূপ ফযল আপনার সন্তান ছিলেন সেরূপ আমিও আপনারই সন্তান। কয়েকদিন পর হাসান ইব্‌ন সাহলের কন্যা বুরানকে বিবাহ করে তিনি হাসানের মর্যাদা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি করলেন। মোটকথা ফযল ইব্‌ন সাহলের হত্যাকাণ্ড ঠিক তেমনিভাবে সংঘটিত হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে জা'ফর বারমাকীর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মামূনই ফযল ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করিয়েছিলেন আর যারা হাম্মামখানায় ঢুকে ফযলকে হত্যা করেছিল তারা মামূনেরই নিয়োজিত লোক ছিল। ফযল নিজেই নিজেকে হত্যাযোগ্য অপরাধী করে তুলেছিলেন। মামূন এ ব্যাপারে তাঁর পিতা হারূনুর রশীদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। তবে ফারাক এতটুকু যে, হারূনুর রশীদ জা'ফরকে হত্যা করেন এবং গোটা বারমাকী খানদানকে কোপানলে নিক্ষেপ করে জা'ফর হত্যার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে মামূন ফযল ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করে তার বংশের লোকজনের প্রতি তাঁর বদান্যতা আরো বৃদ্ধি করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে, কারো পক্ষে মামূনকে দায়ী করার বা দোষারোপ করার কোন উপায়ই ছিল না। এমন কি স্বয়ং ফযলের ভাই এবং তার পিতামাতাও কোনদিন মামূনের এ দুর্নাম করতে পারেন নি।

ফযল ইব্‌ন সাহল সারাখ্‌স নামক স্থানে ২০৩ হিজরীর শা'বান (৮১৯ খ্রি-এর ফেব্রুয়ারী) মাসে নিহত হন।

ইমাম আলী রিযা ইব্‌ন মূসা কাযিমের ওফাত

খলীফা মামূনুর রশীদ তাঁর কন্যা উম্মে হাবীবাকে ইতিপূর্বেই আলী রিযার কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। এবারকার সফরকালে তিনি তাঁর অপর কন্যা উম্মে ফযলকে আলী রিযার পুত্র মুহাম্মদের সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু স্বামীগৃহে কন্যাদানের অনুষ্ঠান কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত মুলতবি রাখেন। এ অনুষ্ঠান পরে ২১৫ হিজরীতে (৮৩০-৩১ খ্রি) সম্পন্ন হয়েছিল।

মামূনুর রশীদ ২০২ হিজরীর রজব (৮১৮ খ্রি ফেব্রুয়ারী) মাসে মার্ভ থেকে রওয়ানা হন এবং ২০৪ হিজরীর ১৫ই সফর (৮১৯ খ্রি জুলাই) বাগদাদ গিয়ে উপনীত হন। এ সফরে মামূনের প্রায় দেড় বছর সময় লেগে যায়। পথে প্রত্যেকটি স্থানে তিনি সপ্তাহ দিন এমন কি মাসাধিক-কাল পর্যন্ত অতিবাহিত করে বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সফরে তিনি রাজ্যের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে পরিস্থিতি তাঁর সম্পূর্ণ অনুকূলে এসে যায়। এ সফরেই মামূনুর রশীদ আলী রিযার ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা কাযিমকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে পাঠান এবং সাথে সাথে তাঁকে ইয়ামান প্রদেশের গভর্নর হিসেবেও সনদ দান করেন। তূসে পৌঁছে মামূন সেখানে অবস্থান করেন এবং আপন পিতা হারূনুর রশীদের কবরে ফাতিহা পাঠ করেন।

তূসে তিনি মাসাধিক-কাল ধরে অবস্থান করেন। এখানেই খিলাফতের মনোনীত উত্তরাধিকারী ইমাম আলী রিযা আঙুর খাওয়ার ফলে ইন্তিকাল করেন।

মামূন তাঁর ইন্তিকালে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং খালি মাথায় তাঁর শবযাত্রায় শামিল হন। কেঁদে কেঁদে তিনি বলতে থাকেন, "হে আবুল হাসান! তোমার পর এখন আমি কোথায় যাব? কি করবো?" তিন দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সমাধিতে অবস্থান করেন এবং তখন তাঁর আহার্য ছিল কেবল একটি রুটি এবং সামান্য লবণ। তিনি তাঁর পিতা হারূনুর রশীদের কবর খনন করিয়ে ঐ একই কবরে পিতার সাথে তাঁর লাশও দাফন করেন যাতে আলী রিযার বরকতে তাঁর পিতা হারূনুর রশীদেরও সদগতি হয়। আলী রিযাকে সত্যিই তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা করতেন।

লোকে বলে যে, স্বয়ং মামূনুর রশীদই আলী রিযাকে আঙুরের সাথে বিষ দিয়ে হত্যা করেছেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল বলেই মনে হয়। কেননা আলী রিযাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্যে মামূনুর রশীদকে কেউই চাপ দেয়নি। তিনি নিজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি তাঁর দু' কন্যার বিবাহ আলী রিযা ও তাঁর পুত্রের সাথে করিয়েছিলেন। অন্য কারো প্রস্তাব বা চাপ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আলী রিযার ভাইকে ইয়ামানের গভর্নর এবং আমীরুল হজ্জের সম্মানিত পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। যাঁকে তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যাই করতে চাইবেন তাঁর প্রতি তিনি এত বদান্যতা প্রদর্শন করতে পারেন না। সর্বোপরি, হারূনুর রশীদের কবরে তাঁকে দাফন করাটাই তাঁর প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতে কোনরূপ কপটতা বা ভণ্ডামির ব্যাপার নেই। তাঁর মৃত্যুতে মামূনের গভীর শোকাভিভূত হওয়াটাও তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। একথাও ভুললে চলবে না যে, পরবর্তীকালেও মামূন সর্বদাই উলুভীদের সাথে সদয় আচরণ করেছেন এবং তাঁদেরকে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে অভিষিক্ত করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, উলুভীদের প্রতি তাঁর মনে কোনরূপ বিরূপ ভাব বা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সর্বদাই তাঁদের উপকার করার এবং তাঁদের অবস্থা উন্নয়নের প্রতি সচেষ্ট ও তৎপর ছিলেন। সত্যি সত্যি যদি তিনি আলী রিযাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতেন, তা হলে পরবর্তীকালে উলুভীদের প্রতি এরূপ সদাচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তবে এটা খুবই সম্ভব যে, বনূ আব্বাসের কেউ বা তাদের কোন শুভাকাঙ্ক্ষী ইমাম আলী রিযাকে আঙুরের সাথে বিষ দিয়ে দিয়েছিল; কেননা, তারা ইমাম আলী রিযাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করার দরুন মামূনুর রশীদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

ইমাম আলী রিযা ৫৫ বছর বয়সে ২০৩ হিজরীর সফর (৮১৮ খ্রি-এর আগস্ট) মাসে ইন্তিকাল করেন। ১৪৮ হিজরীতে (৭৬৫-৬৬ খ্রি) মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

তাহির ইব্‌ন হুসাইনের সমাদর

তাহির ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুসআব ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন মাহানের অবস্থা আগেই বর্ণিত হয়েছে। যুরায়ক ছিলেন হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র ক্রীতদাস, সেই বিখ্যাত তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ খুযাঈ যিনি তাল্‌হাতুত তাল্‌হাত নামে বিখ্যাত ছিলেন। যুরায়কের পুত্র মুসআব বনূ আব্বাসের নকীব সুলায়মান ইব্‌ন কাছীরের কাতিব এবং পরবর্তীকালে হিরাতের আমীর হয়েছিলেন।

মুসআবের পৌত্র তাহির ইব্‌ন হুসাইন ১৫৯ হিজরীতে (৭৭৫-৭৬ খ্রি) মার্ভ এলাকায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাহিরকে ফযল ইব্‌ন সাহল রিক্কার শাসনভার অর্পণ করে নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। নসর ইব্‌ন শীছ আলেপ্পো ও তার উত্তরদিকের এলাকা জুড়ে একটি স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাহির যেহেতু বাগদাদ বিজয় এবং আমীনকে হত্যার মত কৃতিত্বের কোনই আশানুরূপ বিনিময় বা পুরস্কার পাননি এবং ফযল ইব্‌ন সাহল তাঁর কোনরূপ উৎসাহ বর্ধন করতে দেননি এজন্যে তিনি রিক্কায় অবস্থান করে অত্যন্ত মনমরা ও দায়সারা ভাবে নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলা চালিয়ে যান। কিন্তু তাতে তাঁর কোনরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল না। নসর ইব্‌ন শীছ নিজে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি কেবল এজন্যে মামূনের আনুগত্য করতে চাই না যে, তিনি আরবদের উপর আজমী তথা অনারবদেরকে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন। একারণে তাহিরও নসর ইব্‌ন শীছকে অন্তর থেকে ততটা অপছন্দ করতেন না। এবার মামূন সমস্ত ব্যাপার অবগত হওয়ার পর বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে লিখলেন তাঁর বাগদাদে পৌঁছার পূর্বেই তিনি যেন নাহ্‌রাওয়ানে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

মামূন তূস থেকে রওয়ানা হয়ে জুরজান পৌঁছেন। এখানেও তিনি মাসাধিককাল কাটান। এভাবে এক স্থান থেকে অপর স্থানের দিকে যাত্রা করে তিনি নাহ্‌রাওয়ানে পৌঁছলেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন তাহিরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে নাহ্‌রাওয়ানে এসে মামূনের খিদমতে উপস্থিত হন। মামূন যতই বাগদাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর খিলাফতের পতন ততই ঘনীভূত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মামূনের বাগদাদে উপস্থিতির পূর্বেই ইবরাহীমের খিলাফতের অবসান ঘটে। তিনি আত্মগোপন করে বাগদাদের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

নাহ্‌রাওয়ান থেকে রওয়ানা হয়ে মামূন ২০৪ হিজরীর ১৫ই সফর (৮১৯ খ্রি. আগস্ট) বাগদাদে এসে পৌঁছেন। এখানে তিনি যথারীতি দরবার অনুষ্ঠান করেন এবং তাহিরের পূর্ববর্তী বিজয়সমূহ এবং অবদানসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমার যে কোন বাসনা আমার কাছে প্রকাশ কর, তা পূর্ণ করা হবে। তাহির বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সবুজ বস্ত্র পরিত্যাগ করে সেই পুরনো আমলের কালবস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিন এবং আব্বাসীয়দের সেই পুরনো প্রতীক আপনি নিজেও গ্রহণ করুন! মামূন সত্যি সত্যি তাঁর কথা রাখলেন এবং সবুজবাসের পরিবর্তে আব্বাসী প্রতীক কৃষ্ণবাস ধারণ করলেন। এতে গোটা বাগদাদ নগরীতে আনন্দের বান ছুটলো এবং আব্বাস বংশীয়দের সকল অনন্তোষের অবসান ঘটলো। এটা হচ্ছে ২০৪ হিজরীর ২৩ শে সফরের (৮১৯ খ্রি. আগস্ট) ঘটনা।

সালতানাতের আমলা নিযুক্তি ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

২০৪ হিজরীর সফর (৮১৯ খ্রি. আগস্ট) মাসে বাগদাদে পদার্পণ করেই মামূনুর রশীদ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দিকে মনোনিবেশ করলেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে তিনি পুলিশ প্রধান এবং বাগদাদের কোতওয়ালপদে অধিষ্ঠিত করলেন। সে যুগে এটা ছিল অনেক বড় একটা পদ। সাথে সাথে তাঁকে জাযিরা ও সাওয়াদের গভর্নরের দায়িত্বও প্রদান করলেন। কূফার

গভর্নরের পদ তিনি তাঁর ভাই আবূ ঈসাকে এবং বসরার শাসনভার অপর ভাই সালিহ্‌র হাতে অর্পণ করলেন। হিজাযের গভর্নর পদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে এবং মুসেলের শাসনভার সাইয়িদ ইব্‌ন আনাস আযদীকে অর্পণ করেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইনের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে রিক্কার গভর্নরের পদ দান করা হলো। জাযিরার শাসনভার ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুআযকে এবং আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার শাসনভাব ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ খালিদকে অর্পণ করা হয়।

ঐ বছরই মিসরের গভর্নর সিররী ইব্‌ন মুহাম্মদের ইন্তিকাল হলে তদস্থলে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সিররীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বছরই সিন্ধুর গভর্নর দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদেরও ইন্তিকাল হয়। তদস্থলে বাশশার ইব্‌ন দাউদ সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হন। এ সময় তাঁর প্রতি বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম রাজস্ব প্রদানের শর্ত আরোপ করা হয়। ঐ বছরই হাসান ইব্‌ন সাহলের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাঁর পাগলামি এমনি চরমে পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিকল পরাতে হয়। মামূনুর রশীদ তাঁর স্থলে আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ খালিদ আহ্‌ওলকে উযীরে আযম নিযুক্ত করেন। পারস্য উপসাগরের উপকূলে জাঠ নামক একটি সম্প্রদায়ের বাস ছিল। সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় পনের-বিশ হাজার। ডাকাতি রাহাজানি করে তারা বসরার যাত্রাপথকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। মামূনুর রশীদ তার জাযিরার আমিল ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুআযকে তাদের দমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি ব্যর্থ হন।

খুরাসানের গভর্নর তাহির

২০৫ হিজরীতে (৮২০-২১ খ্রি) মামূনুর রশীদ ঈসা ইব্‌ন ইয়াযীদ জালুদীকে জাঠদের দমনের জন্যে নির্দেশ দিলেন। ঐ বছরই একদিন মামূনের এক আনন্দঘন বৈঠকে তাহির ইব্‌ন হুসাইন উপস্থিত হলেন। তাহিরের চেহারার দিকে নজর পড়তেই মামূনের স্মৃতিপটে তাঁর ভাই আমীনের চেহারা ভেসে উঠলো। সাথে সাথে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমীনকে গ্রেফতার ও হত্যা করার সময় তাহির যে সব নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছিলেন সবই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। তাহির খলীফার চোখে পানি দেখে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে খলীফা বলেন, এ এমন একটি ব্যাপার যা প্রকাশ করলে অবমাননা হয় আর গোপন রাখলে মানসিক যাতনায় ভুগতে হয়। কিন্তু এ জগতের মানসিক যাতনা থেকে কে-ই বা মুক্ত আছে? আমিও এ যাতনাকেই কবুল করে নিচ্ছি।

তাহির তখন তো কিছু বললেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মামূনের পার্শ্বচর হুসাইনকে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানান যে, যে করেই হোক তিনি যেন তা খলীফার নিকট থেকে জেনে নিয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি হুসাইনের কাছে তাঁর কাতিব মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন মারফত এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে জানালেন যে, এটা হচ্ছে তাঁর ঐ খিদমতের বিনিময় স্বরূপ। হুসাইন এক দুর্বল মুহূর্তে মামূনকে তাঁর সে দিনের অশ্রুপাতের কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। মামূন এ গোপন কথা ফাঁস না করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বললেন ঃ সেদিন তাহিরের মুখ দেখে আমার চোখে অশ্রু আসার কারণ, আমার মনে হলো. এই তো সেই তাহির যে আমার ভাই আমীনকে নানাভাবে নির্যাতন ও অপদস্থ করে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। অথচ আজ সে আমার প্রতি কতই না সম্মান সম্ভ্রম প্রদর্শন করছে।

হুসাইন যখন তাহিরকে এ সংবাদটি অবগত করলেন, তখন তাহির অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি তখন নিশ্চিত হন যে, কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই মামূন তাঁর অনিষ্ট করবেন। তিনি একথা মনে রেখে উযীরে আযম আহমদ ইব্ন আবূ খালিদকে বলেন ঃ বাগদাদে আমি এখন হাঁফিয়ে উঠেছি, এখন আমি বাগদাদ থেকে দূরে থাকতে চাই। আপনি দয়া করে আমাকে অন্য কোন প্রদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমি আপনার এ উপকারটুকুর কথা কোনদিনই ভুলবো না।

মামূন যখন খুরাসান থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা করেন তখন আল-গাস্সান ইব্ন উব্বাদকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করে এসেছিলেন। আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ মামূনের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন যে, গাস্সান ইব্ন উব্বাদ এবং খুরাসানের চিন্তা আমার রাতের আরামকে হারাম করে দিয়েছে। কেননা সীমান্তের তুর্কীদের সম্পর্কে খবর পেয়েছি যে, তারা নাকি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করতে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে খুরাসান রক্ষা করা গাস্সান ইব্ন উব্বাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। সেখানে কোন যোগ্যতর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। মামূন বললেন ঃ ব্যাপারটি চিন্তার বৈকি! আচ্ছা তুমিই বলো দেখি কাকে সেখানে পাঠান যায়? আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ অমনি বলে উঠলেন ঃ তাহির ইব্ন হুসাইনের চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কাউকে আমি দেখছি না। মামূন বললেন ঃ তাহির ইব্ন হুসাইন নিজেও তো বিদ্রোহ করে বসতে পারে! আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ বললেন ঃ সে দায়িত্ব আমি নিতে পারি। আমি আপনাকে সে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সে কখনো বিদ্রোহী হবে না।

মামূন তৎক্ষণাৎ তাহিরকে দরবারে ডেকে বাগদাদের পূর্ববর্তী সমস্ত প্রদেশগুলোর ভাইসরয় নিযুক্ত করলেন। সিন্ধু, বল্খ ও বুখারা পর্যন্ত গোটা খুরাসান রাজ্যের শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে মার্ভ অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বাগদাদের কোতোয়াল ও পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব তাহিরেরই পুত্র আবদুল্লাহ্র উপর অর্পণ করলেন। বিদায় দেবার সময় মামূন তাহিরকে দশ লক্ষ দিরহাম দান করলেন এবং একটি ক্রীতদাস উপঢৌকনস্বরূপ সাথে দিয়ে বললেন ঃ এ হচ্ছে তোমার পূর্ব অবদানের বিনিময় স্বরপ। সেই ক্রীতদাসটিকে মামূন বুঝিয়ে দেন যে, তাহিরকে কখনো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখতে পেলে তাৎক্ষণিকভাবে ছলেবলে বিষ-প্রয়োগে তাকে হত্যা করতে হবে । তাহির ২০৫ হিজরীর যিলকদ (৮২১ খ্রি মে মাসের মাঝামাঝি) মাসের শেষ তারিখে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের গভর্নরী

২০৬ হিজরীতে (৮২১-২২ খ্রি) সংবাদ এলো যে, জাযিরার আমিল ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআয এবং মিসরের গভর্নর সিররী ইব্ন মুহাম্মদ হাকাম উভয়েই ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যু সময় ইয়াহ্ইয়া তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে জাযিরায় এবং সিররী তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে মিসরের গভর্নর পদে বসিয়ে গেছেন। নসর ইব্ন শীছ জাযিরা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন আর উবায়দুল্লাহ্ মিসরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছেন। মামূন বাগদাদের পুলিশ প্রধান ও কোতোয়ালের দায়িত্ব আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পরিবর্তে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুসআবকে প্রদান করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে জাযিরার শাসক নিযুক্ত করে জাযিরা

অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, রিক্কা ও মিসরের মধ্যবর্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে প্রথমে নসর ইব্‌ন শীছের মুকাবিলা করবে। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর মিসর অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির সসৈন্যে রওয়ানা হলেন। খলীফার নির্দেশ অনুসারে রিক্কা ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে নসর ইব্‌ন শীছকে কাবু করার উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে সামরিক ডিউটিসমূহকে ছড়িয়ে দিলেন। তাহির ইব্‌ন হুসাইন খুরাসান থেকে যখন সংবাদ পেলেন যে, খলীফা আবদুল্লাহ্‌কে জাযিরার গভর্নর করে আশেপাশের প্রদেশসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্‌র নামে একটি বিস্তারিত পত্র লিখে পাঠালেন। সে পত্রটিতে রাজ্য শাসন, চরিত্র মাধুর্য ও রাজনীতির যে চমৎকার নিয়মাবলী তিনি লিখে পাঠান তা নীতিশাস্ত্র ও রাজ্য শাসনের নিয়মাবলীর এক উৎকৃষ্ট বয়ান বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

মামূনুর রশীদ সে পত্রের উঁচুমানের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার অনেক কপি নকল করিয়ে সমস্ত রাজ্যের আমলা-অমাত্যদের কাছে প্রেরণ করেন। ইমাম ইব্‌ন খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দামায়ে তারীখ' গ্রন্থে এবং ইব্‌ন আছীর তাঁর 'তারীখে কামিলে' এর মূল্যবান পত্রখানি উদ্ধৃত করেছেন। লোকে এ পত্রখানাকে নীতিশাস্ত্রেরে পাঠ্যভুক্ত করা জরুরী বিবেচনা করেছে। ঐ বছরই মামূনের ভয়ে আত্মগোপনকারী এবং পরে ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীর মুসাহিব যিনি ইবরাহীমের আত্মগোপনের পর নিজেও আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিলেন, মামূনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন। মামূন তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে প্রাণের নিরাপত্তা দান করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ও নসর ইব্‌ন শীছের মধ্যকার লড়াই বেশ ক'বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে মিসরের দিকে অভিযান প্রেরণ সম্ভবপর হয়নি। ঐ বছরই ইয়ামানে আবদুর রহমান ইব্‌ন আহমদ বিদ্রোহের পতাকা ইত্তোলন করেন। কিন্তু সে বিদ্রোহ ঐ বছর দমন করা হয়। মামূন দীনার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণ করলে আবদুর রহমান ইব্‌ন আহমদ দীনারের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ইয়ামান থেকে বাগদাদ উপস্থিত হওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ফলে ইয়ামানের রাজত্ব দীনার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র করতলগত হয়।

খুরাসানের গভর্নর তাহির ইব্‌ন হুসাইনের ইন্তিকাল

তাহির ইব্‌ন হুসাইন খুরাসান পৌঁছে অনায়াসেই শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার সকল অশান্তি ও উপদ্রব দূরীভূত হয়। প্রকৃত পক্ষে খুরাসানের গভর্নরীর জন্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য পাত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাহির মামূনুর রশীদের দিক থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না। সম্ভবত নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে এক বিশাল এলাকার রাজত্বভার হাতে নিয়ে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন যাতে মামূন তাঁকে কাবু করতে না পারেন। তিনি ফযল ইব্‌ন সাহলের পরিণাম দেখেছিলেন। বারমাকীদের পরিণামের কথা তাঁর অজানা ছিল না। আবূ মুসলিম খুরাসানীর অবস্থাও তাঁর জানা ছিল। তাঁর সম্পর্কে মামূনের অনুভূতির কথাও তিনি মামূনের পার্শ্বচর হুসাইনের মাধ্যমে জেনে নিয়েছিলেন।

মোদ্দাকথা, ২০৭ হিজরীর জুমাদাস সানী মাসে (৮২২ খ্রি সেপ্টেম্বর) জুমআর দিন মার্ভের জামে মসজিদে তাহির খুতবা প্রদান করলেন। সে খুতবায় তাহির খলীফা মামূনুর রশীদের নাম নিলেন না। এমন কি তিনি তাঁর জন্যে দু'আও করলেন না। কেবল মুসলিম জাতির অবস্থার সংশোধনের দু'আ করেই মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন।

খুরাসানের পারচানবীস বা খলীফার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধকারী কুলছুম ইব্ন ছাবিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদন লিখে বাগদাদ পাঠিয়ে দিলেন। মামূন সে প্রতিবেদন পাঠ করে তাৎক্ষণিকভাবে উযীরে আযম আহ্মদ ইব্ন আবূ খালিদকে দরবারে তলব করে এ সংবাদ দিলেন এবং কালবিলম্ব না করে সসৈন্যে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা করে দিলেন। তিনি বললেন, যেহেতু তুমিই তাহিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে, তাই তুমি নিজে গিয়েই খুরাসানকে এ আপদ থেকে রক্ষা কর। তাহিরকে গ্রেফতার করে সাথে নিয়ে আসবে। আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ খুরাসান সফরের প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন। পরদিনই বাগদাদে মামূনুর রশীদের কাছে বার্তাবাহক একটি প্রতিবেদন নিয়ে উপস্থিত হলো যাতে শনিবার দিন তাহিরের মৃত্যু হয়েছে বলে খলীফাকে জানানো হয়েছে।

তাহিরের এ মৃত্যু ছিল একান্তই আকস্মিক। শুক্রবারেই তাঁর জ্বর হয়। শনিবার দিন যখন অনেক বেলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি শয়ন কক্ষ থেকে বের হলেন না, তখন লোকে প্রবেশ করে শয়ন কক্ষে তাঁকে চাদর মুড়ি দেয়া অবস্থায় মৃত দেখতে পায়। সম্ভবত মামূনুর রশীদের বিদায় কালে দেয়া সেই ক্রীতদাসটিই তাহিরের পরিবর্তিত মতিগতি লক্ষ্য করে তাঁকে বিষ দিয়ে দিয়েছিলে।

মামূনুর রশীদ তাহিরের মৃত্যু সংবাদ শুনে বললেন ঃ

الحمد لله الذى قدما واخرنا

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি তাহিরকে আমার আগেই মৃত্যুদান করলেন। এরপর তিনি তাহিরের পুত্র তালহাকে খুরাসানের গভর্নররূপে সনদদান করলেন এবং আহমদ ইব্ন আবূ খালিদকে এজন্যে খুরাসানে রওয়ানা করলেন যে তিনি যেন তালহা ইব্ন তাহিরকে উত্তমরূপে খুরাসানের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আসেন এবং বিদ্রোহের কোনরূপ সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে।

মামূনের এ অভ্যাসটি উল্লেখের দাবি রাখে যে, কোন বিদ্রোহী ব্যক্তির অপকর্মসমূহ লক্ষ্য করে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন, হত্যা করাতেও কুণ্ঠিত হতেন না, কিন্তু ঐ অপরাধীর পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি কোনরূপ ক্ষতি করতেন না বরং পূর্বের তুলনায় তাদের প্রতি আরো বদান্যতা প্রদর্শন করে তাদেরকে আরো আপন করে নিতেন।

আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ খুরাসান গিয়ে মাওরাউন নাহ্র এলাকায় পৌঁছে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেন। তিনি যখন খবর পেলেন যে, তাহিরের ভাই হুসাইন ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুসআব কিরমানে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছেন তখন তিনি কিরমানে পৌঁছে তাকে গ্রেফতার করেন এবং মামূনের খিদমতে এনে উপস্থিত করেন। মামূন হুসাইন ইব্ন হুসাইনের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আহমদ ইব্ন আবূ খালিদ যখন খুরাসান

থেকে রাজধানী বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তালহা ইব্‌ন তাহির ত্রিশ লাখ দিরহাম নগদ এবং এক লাখ দিরহাম মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদের হাতে তুলে দেন। তিনি তাঁর কাতিবকে পাঁচ লাখ দিরহাম দান করেন।

ঐ বছরই মামূনুর রশীদ ঈসা ইব্‌ন ইয়াযীদ জালুদীকে পদচ্যুত করে দাউদ ইব্‌ন মনজুরকে জাঠ দমন অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বসরা, দজলা, ইয়ামামা ও বাহরায়ন এলাকার শাসনভার তাঁকে অর্পণ করেন। ঐ বছরই মুহাম্মদ ইব্‌ন হিফযকে তাবারিস্তান প্রভৃতি এলাকার শাসনভার অর্পণ করা হয়। ঐ বছরই বনূ শায়বান গোত্র বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। মামূনুর রশীদ সাইয়িদ ইব্‌ন আনাসকে তাকে দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। ওয়াকারা নামক স্থানে বনূ শায়বানের সাথে লড়াই হয়। তাদেরকে ভাল মত শায়েস্তা করে লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হয়।

ঐ বছরই মামূনুর রশীদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর আমেরীকে নসর ইব্‌ন শীছের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করে তাকে আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির একে উপর্যুপরি লড়াইয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। দূত মারফত প্রস্তাব পেয়ে নসর ইব্‌ন শীছ বললেন, আমি মামূনুর রশীদের সাথে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত আছি। তবে একটি শর্তে, আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হবো না। মামূনের কাছে ফিরে এসে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর নসরের এ শর্তের কথা তাঁকে জানালে তিনি কসম খেয়ে বসলেন যে, যে পর্যন্ত নসরকে আমার দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য করতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না। নসর তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে মামূনুর রশীদের জাঠ সম্প্রদায়ের ব্যাঙদেরকে এ পর্যন্ত দমাতে পারলেন না তিনিই কিনা শায়েস্তা করবেন আমাদের মত আরবদেরকে। বলাবাহুল্য, নসর ইব্‌ন শীছের সঙ্গী-সাথীদের সকলেই ছিল আরব। তারা পূর্বের তুলনায় অধিকতর প্রস্তুতিসহ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

আফ্রিকার বিদ্রোহ

আফ্রিকা অর্থাৎ সেট প্রদেশ যাতে তিউনিস ও কায়রোয়ানের মত বড় বড় কেন্দ্রীয় স্থান ছিল এবং যা মিসর ও মরক্কোর মধ্যে অবস্থিত ছিল— হারূনুর রশীদের আমলে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) চল্লিশ হাজার দীনার বার্ষিক খারাজ ধার্য করে ঠিকাদারী স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। ইবরাহীম অত্যন্ত সুচারুভাবে আফ্রিকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এখন মামূনুর রশীদের আমলে আফ্রিকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন ইবরাহীমেরই পুত্র যিয়াদতুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব। ২০৮ হিজরীতে (৮২৩-২৪ খ্রি) তিউনিসে বিদ্রোহ দেখা দিল। মানসূর ইব্‌ন নুসায়র ছিলেন এ বিদ্রোহের নায়ক। মানসূর ইব্‌ন নুসায়র আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা দখল করে রাজধানী কায়রোয়ানে যিয়াদতুল্লাহকে অবরোধ করে বসলেন। যিয়াদতুল্লাহ্ মানসূরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু মানসূর ইব্‌ন নুসায়র সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। দু'জনের শক্তিপরীক্ষার এ মহড়া ২০৮ হিজরী (৮২৩-২৪ খ্রি) থেকে ২১১ হিজরী (৮২৬-২৭ খ্রি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ২১১ হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) মানসূর ইব্‌ন নুসায়র তাঁর এক সহচরের হাতে নিহত হন। যিয়াদতুল্লাহ তখন শান্তিপূর্ণভাবে আফ্রিকা শাসনে মনোনিবেশ করেন।

নসর ইব্‌ন শীছের বিদ্রোহের অবসান

নসর ইব্‌ন শীছ সম্পর্কে উপরেই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন হারূনুর রশীদের পুত্র আমীনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমীন হত্যার সংবাদ পেয়ে এবং আরবদেরকে মামূনের নতুন প্রশাসনের অধীনে দুর্বল এবং আজমীদেরকে প্রবল দেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। উলুভীদের প্রতি তাঁর কোনরূপ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছিল না। কিন্তু আজমীদের প্রতি তাঁর ঘৃণাবোধ তাঁকে মামূনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের পূর্বে তাঁর পিতা তাহির ইব্‌ন হুসাইন দায়সারাভাবে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। দীর্ঘকাল এ মুকাবিলা চলতে থাকে। নসর ইব্‌ন শীছ উকায়লী দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহিরের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকার ফলে তা একজন কৃতী সেনাপতিরূপে তাঁর সুনাম বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাযিরা প্রদেশের প্রায় সকল জেলাই তাঁর দখলে এসে গিয়েছিল। তিনি আলেপ্পোর উত্তরে কায়সুম নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে ২০৯ হিজরীতে (৮২৪-২৫ খ্রি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে কায়সুমে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। অবরোধের কঠোরতায় বাধ্য হয়ে অবশেষে নসর ইব্‌ন শীছ বিনা শর্তে অস্ত্র সংবরণ করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির তাঁকে মামূনের কাছে বাগদাদে প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মামূনের দরবারে নীত হলে মামূন তাঁকে ২১০ হিজরীর সফর (৮২৫ খ্রি-এর জুন) মাসে মদীনাতুল মানসূরে নজরবন্দী করে রাখেন।

ইব্‌ন আইশার হত্যাকাণ্ড ও ইবরাহীমের গ্রেফতারী

ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন ইবরাহীম ইমাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ওরফে ইব্‌ন আইশা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্দীর হাতে। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্দী আত্মগোপন করলে ইবরাহীম ইব্‌ন আইশা আত্মগোপন করেন। তাঁর সাথে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব এবং মালিক ইব্‌ন শাহীনও ছিলেন। সে সময় নসর ইব্‌ন শীছকে গ্রেফতার করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির বাগদাদে প্রেরণ করেন তখন গোয়েন্দারা মামূনকে এ সংবাদ দেয় যে, যেদিন নসর ইব্‌ন শীছ বাগদাদে প্রবেশ করবেন ঠিক ঐদিনই ইব্‌ন আইশা ইবরাহীম এবং মালিক ইব্‌ন শাহীন বাগদাদে বিদ্রোহের সূচনা করবেন। সেদিন বাগদাদে তুলকালামকাণ্ড ঘটবে। ইতিপূর্বে মামূনের কর্ণগোচর হয়েছিল যে, ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্দী ইবরাহীম ইব্‌ন আইশা ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব এবং মালিক ইব্‌ন শাহীন বাগদাদে আত্মগোপন করে বাগদাদে তাদের বিদ্রোহী প্রচারণা চালিয়ে তাদের দল ভারী করে চলেছেন।

এ খবর শোনার পরই বাগদাদ পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, যে কোন মূল্যে এসব বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে। সত্যি সত্যি পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে এবং একমাত্র ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্দী ছাড়া অপর তিনজন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারাগারের ফটক বন্ধ করা মাত্র তারা কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেরারী হওয়ার প্রয়াস পান। সংবাদ পেয়ে মামূন নিজে কারাগারে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ইব্‌ন আইশাকে শূলীবিদ্ধ করে অন্য দু'জনকে হত্যা করেন। শূলে ঝুলানো অবস্থায়ই ইব্‌ন আইশার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। আব্বাসী খিলাফতের তিনি ছিলেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রথম আব্বাসী ব্যক্তি। এ হত্যাকাণ্ড

সংঘটিত হয় ২১০ হিজরীর সফর (৮২৫ খ্রি-এর জুন) মাসে। এর কয়েক দিন পরেই ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী নারীবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় পথ অতিক্রমকালে গ্রেফতার হন এবং এরূপ নারীবস্ত্র পরিহিত অবস্থায়ই মামূনের দরবারে নীত হন।

মামূন দরবারে অমাত্যবর্গের কাছে তাঁর ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্যেও অনুরোধ করলে সকলেই এক বাক্যে তাঁর হত্যার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। একমাত্র উযীর আযম আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ তার বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। মামূন ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দীকে ক্ষমা করে দেন এবং এই ক্ষমার তাওফীকদানের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া সিজদা আদায় করেন। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী তাঁর এ ক্ষমায় অভিভূত হয়ে মামূনের প্রশংসায় কবিতা শুনালেন। মামূন তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। ইবরাহীম গ্রেফতার হয়েছিলেন ২১০ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৮২৫ খ্রি-এর জুলাই) মাসে।

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের গভর্নর সিররী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকাম মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ শাসনভার হাতে নিয়েই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। নসর ইব্‌ন শীছের সাথে যুদ্ধরত থাকার দরুন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির মিসরের দিকে মনোনিবেশ করতে পারেননি। আর মামূনও তাঁর রাজত্বের অন্যান্য অংশের ব্যস্ততা শেষ করে উঠতে না পারায় নতুন করে কোন বাহিনীকে মিসর অভিমুখে পাঠাতে পারেননি। ঐ সময় মিসর প্রদেশের বিরাট একটা অংশ উবায়দুল্লাহ্‌রও হাতছাড়া হয়ে যায়।

ব্যাপারটি ছিল এই যে, স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় বসবাসকারী ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাসের একজন অনুসারী উমাইয়া খলীফা হাকাম ইব্‌ন হিশামের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে খলীফা কর্ডোভার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত তাদের বাসস্থান ধ্বংস করে তাদেরকে দেশছাড়া করেন।

এই দেশান্তরিতদের একদল মরক্কোতে বসবাস শুরু করে। আর অপর দল সমুদ্র পথে মিসরের দিকে রওয়ানা হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উঠে। আলেকজান্দ্রিয়ায় উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সিররীর পক্ষ থেকে একজন আমিল নিযুক্ত ছিলেন। এ নবাগত মালিকীরা সুযোগ পেয়ে এখানেও বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার আমিলের উপর হামলা চালিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও তার আশেপাশের এলাকা দখল করে আবূ হাফ্‌স উমর বালুতীকে তাদের আমীররূপে গ্রহণ করে। ঐ সময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির নসর ইব্‌ন শীছের সাথে যুদ্ধে রত ছিলেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সিররী ঐ এলাকা আর ঐ নবাগত মালিকীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হননি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির নসরের ব্যাপারটি সামনে নিয়েই মিসরের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সিররী মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তাকে পরাজিত করে অবরুদ্ধ করেন। অবরোধের কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে উবায়দুল্লাহ অভয় প্রার্থনা করেন এবং নিজেকে আবদুল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করেন। এ কাজ সম্পন্ন করে

আবদুল্লাহ্ আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর মুকাবিলা করার শক্তি নেই দেখে আবূ হাফ্স উমর বালুতী তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির এ শর্তে তাঁর আবেদনে সম্মতি দেন যে, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের কোন দ্বীপে তাকে চলে যেতে হবে।

তদনুযায়ী উমর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জাহাজে করে ক্রীটস দ্বীপ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। সে দ্বীপে গিয়ে তারা তা দখল করে নেন এবং বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়িভাবে বসবাস এবং রাজত্ব করতে থাকেন। এটা ২১০ হিজরীর (৮২৫-২৬ খ্রি) ঘটনা। ২১০ হিজরী (৮২৫-২৬ খ্রি) থেকে প্রায় ১৬০ বছর যাবত আবূ হাফ্স উমর বালুতীর বংশধররা ক্রীটস দ্বীপে রাজত্ব করেন। অবশেষে এ বংশের শেষ শাসক আবদুল আযীযের নিকট থেকে সম্রাট কনস্টানটাইনের পুত্র আরমিটাস এ দ্বীপটি দখল করে গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

যুরায়ক ও বাবক খুররমী

যুরায়কের আসল নাম ছিল আলী ইব্ন সাদাকা। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। খলীফা মামূনুর রশীদ তাঁকে ২০৯ হিজরীতে (৮২৪-২৫ খ্রি) আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের গভর্নররূপে নিযুক্ত করেন। ২১১ হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) চল্লিশ হাজারের মত সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করে বসেন এবং মামূনুর রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মামূনুর রশীদ ইবরাহীম ইব্ন লায়ছ ইব্ন ফযলকে আযারবায়জানের শাসনভার দিয়ে প্রেরণ করেন। পারস্য প্রদেশের উত্তর এবং আযারবায়জানের সীমান্তের নিকট হারূনুর রশীদের আমল থেকেই একটি নতুন ধর্মের ভিত্তি পাকাপোক্ত হচ্ছিল। অর্থাৎ জাভিদান নামক জনৈক অগ্নিউপাসক একটি নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করে। সে ধর্মে হত্যা, রক্তপাত ও ব্যভিচার পাপ বলে গণ্য হতো না। এ ধর্ম অনেকটা মুযদাকী ধর্মের মতোই ছিল। জাভিদানের মৃত্যু হলে তারই এক শিষ্য বাবক খুররমী তার স্ত্রীকে হস্তগত করে আপন গুরুর সকল শিষ্যের সর্দারী লাভ করে। বাবক খুররমীর আমলে এরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। তাদের ডাকাতি, রাহাজানি ও লুটপাটে ঐ অঞ্চলের প্রদেশসমূহের শান্তি-শৃঙ্খলা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

২০১ হিজরীতে (৮১৬-১৭ খ্রি) এরা শাহী ফৌজের মুকাবিলা করতে শুরু করে। আযারবায়জান প্রদেশের গভর্নরকে কয়েকবারই এদের হাতে পরাজয়বরণ করতে হয় এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দারুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯ হিজরীতে (৮২৪-২৫ খ্রি) বাবক আযারবায়জানের আমিলকে জীবিত গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। এর পরই যুরায়ককে গভর্নর করে পাঠানো হয়।

২১১ হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) যখন যুরায়কও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন ঐ এলাকায় একজন শত্রুর স্থলে দুইজন শক্তিশালী শত্রুর উদ্ভব ঘটে। মামূনুর রশীদ মুসেলের শাসনকর্তা সাইয়িদ ইব্ন আনাসকে যুরায়ককে দমনের নির্দেশ দেন। সাইয়িদ ইব্ন আনাস একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে যুরায়কের উপর আক্রমণ চালান, কিন্তু তিনি নিজে এ যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসে। এ সংবাদে মামূন অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ২১১

হিজরীতে (৮২৬-২৭ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ তূসীকে মুসেলের গভর্নর পদে নিযুক্ত করে যুরায়ক ও বাবক উভয়ের উৎখাতের নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ তূসী বাগদাদ থেকে সসৈন্যে রওয়ানা হলেন, কিন্তু ততক্ষণে মুসেল যুরায়কের দখলে চলে গেছে। মুসেলের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুরায়ক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ মুসেলে প্রবেশ করেন।

তিনি মুসেলের আরব অধিবাসীদেরকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে যুরায়কের পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর হন। জাব নদীর তীরে পুনরায় উভয় পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হলো।

এ যুদ্ধেও যুরায়ক পরাস্ত হয় এবং বন্দীত্বের অপমান তাকে সইতে হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ অগ্রসর হয়ে যুরায়কের সমস্ত আমিল ও আমলাদেরকে বেদখল করে গোটা আযারবায়জান প্রদেশ দখলে আনেন। এরপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ বাবক খুররমীর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশকটি যুদ্ধ হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ খুররমীদেরকে পরাস্ত করে পিছু হটাতে হটাতে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। খুররমীরা পাহাড়ের উপর উঠে যায়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে পাহাড়ের উপর উঠে যান। খুররমীরা সেখানে তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দের বাহিনী পরাজিত হয়। গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে খুররমীরা নিধনযজ্ঞ চালায়। এ যুদ্ধে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ নিহত হন। বাবক খুররমীর সাহস ও মনোবল পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। এটা ২১২ হিজরীর (৮২৭-২৮ খ্রি) ঘটনা।

এ বছরই তাবারিস্তানের শাসনকর্তা মূসা ইব্‌ন হাফ্‌সের মৃত্যু হলে মামূন তদস্থলে তার পুত্রকে তাবারিস্তানের শাসনভার অর্পণ করেন। ঐ বছরই মামূন হাজিব ইব্‌ন সালিহকে সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। সিন্ধুর পূর্ববর্তী শাসক বাশশার ইব্‌ন দাউদ চার্জ বুঝিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। অবশেষে বাশ্‌শার ইব্‌ন দাউদ পরাজিত হয়ে কিরমানে পালিয়ে যান।

ঐ বছরই অর্থাৎ ২১২ হিজরীতে (৮২৭-২৮ খ্রি) মামূনুর রশীদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে মিসর থেকে ফিরিয়ে এনে বাবক খুররমীকে উৎখাত করার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির দাইনুর নামক স্থানে সৈন্য বিন্যাস করে বাবক খুররমীর দিকে অগ্রসর হলেন, এমনি সময় খবর এলো যে, নিশাপুরে খারিজীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কুরাসানের গভর্নর তাল্‌হা ইব্‌ন তাহির ইনতিকাল করায় তারা এ সুযোগ পেয়েছে। মামূনুর রশীদ তাল্‌হার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে খুরাসানের গভর্নর পদে নিয়োগ করে নিয়োগপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি খুরাসানে গিয়ে খারিজী বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির দাইনুর থেকেই সরাসরি নিশাপুরের দিকে যাত্রা করেন। এভাবে বাবক খুররমী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়। তারপর আর বাবক খুররমীকে দখলের জন্যে খলীফার পক্ষ থেকে কোন সেনাপতি প্রেরিত হননি। মামূনুর রশীদের মৃত্যুর পর এ ফিতনার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির খুরাসানে পৌঁছে সেখানকার বিদ্রোহ দমনে সফল হন।

বিবিধ ঘটনা

এ বছরই মামূনুর রশীদের উযীরে আযম আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্থলে মামূনুর রশীদ আহমদ ইব্‌ন ইউসুফকে উযারতের খিলাত প্রদান করেন। আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ বনী আমের গোত্রভুক্ত একজন শামী ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের সাহিত্যিক ও লেখক ছিলেন।

আহমদ ইব্‌ন আবূ খালিদ একটি মামুলী দফতরের কেরানী ছিলেন। মামূন যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর যোগ্যতা ও জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই সরাসরি তাঁকে উযীরে আযমের পদে নিযুক্তি প্রদান করেন। ২১২ হিজরীতে (৮২৭-২৮ খ্রি) আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ উমরী ওরফে আহমারুল আইন ইয়ামানে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলীফা মামূনুর রশীদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ ওরফে আবুর রাযীকে ইয়ামানের দায়িত্ব প্রদান করেন।

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) মামূনুর রশীদ তাঁর পুত্র আব্বাসকে জাযীরাহ ছুগূর ও আওয়াসিমের এবং ভাই আবূ ইসহাক মু'তাসিমকে সিরিয়া ও মিসরের শাসনভার অর্পণ করেন। আবূ ইসহাক মু'তাসিম নিজের পক্ষ থেকে ইব্‌ন উমায়রা বায ঈসাকে মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। কায়সিয়া এবং ইয়ামানিয়ার একটি দল হাঙ্গামা বাধিয়ে ২১৪ হিজরীতে (৮২৯-৩০ খ্রি) ইব্‌ন উমায়রাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তারা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন, মুতাসিম মিসরে যান এবং তরবারির জোরে বিদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করে নিজে মিসরে অবস্থান করতে থাকেন। নিজের পক্ষ থেকে তিনি আমিলদেরকে নিযুক্তি প্রদান করে মিসরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) মামূনুর রশীদ গাসসান ইব্‌ন আব্বাসকে সিন্ধুর গভর্নর করে পাঠান। ঐ বছরই ইয়ামানের ওয়ালী আবুর রাযী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। অগত্যা মামূনুর রশীদ যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের বংশধর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম রিয়াদীকে ইয়ামানের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে যুবায়দ শহরের পত্তন করেন, ঐ শহরকেই তাঁর রাজধানীরূপে গ্রহণ করে সেখানে থেকেই তাঁর রাজ্য শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। খলীফাকে তিনি নিয়মিত উপঢৌকনাদি পাঠাতেন এবং খুতবায় তাঁর নাম ব্যবহার করতেন। ২৪৫ হিজরী (৮৫৯-৬০ খ্রি) পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে ইয়ামানে রাজত্ব চালিয়ে যান। তাঁর পরেও ৫৩২ হিজরী (১১৩৭ খ্রি) পর্যন্ত তাঁর বংশধর ও ক্রীতদাসদের হাতে ইয়ামানের রাজত্ব অব্যাহত থাকে।

২১৪ হিজরীতে (৮২৯-৩০ খ্রি) খলীফা মামূন আলী ইব্‌ন হিশামকে জবল, কুম, ইস্পাহান ও আযারবায়জানের শাসনভার অর্পণ করেন। ২১৪ হিজরীতে (৮২৯-৩০ খ্রি) আবূ বিলাল সাবী শারী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মামূনুর রশীদ তাঁর পুত্র আব্বাসকে কয়েকজন সেনাপতিসহ তাকে দমনের জন্যে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে আবূ বিলাল নিহত হন এবং এ বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

... রোমক সম্রাট মিখাইলের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নাওফিল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রোমকদের পক্ষ থেকে বৈরিতার লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকলে মামূনুর রশীদ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে সাওয়াদ, হুলওয়ান ও দাজলার গভর্নর করে বাগদাদে তাঁর

নায়েবরূপে রেখে নিজে সসৈন্যে রোমকদের উপর আক্রমণ চালান। মুসেল, এন্টিয়ক, মাসীসা ও তারতূস হয়ে তিনি রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করেন। কারা দুর্গ দখল করে দুর্গপ্রাচীর ধূলিসাৎ করে দেন। তারপর আশনাসকে সুন্দাস দুর্গ এবং আজীফ ও জা'ফরকে সেনান দুর্গের দিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। এ দু'টি দুর্গও বিজিত হয়। আব্বাস ইব্‌ন মামূনুর রশীদ মালিতা শহর জয় করেন।

মিসরে অবস্থানরত মুতাসিম মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করে মামূনের খিদমতে উপস্থিত হন। রোমকরা নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মামূন এবার প্রত্যাবর্তন করে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি পথিমধ্যে থাকতেই রোমকরা নিজেদের শক্তি সংগঠিত করে তারতূস ও মাসীসায় আকস্মিক আক্রমণ চালায়। শহরের অধিবাসীরা রোমকরা সন্ধি করেছে ভেবে একান্তই অসতর্ক ছিল। তারা অত্যন্ত নির্মম হত্যার শিকার হন। এ সংবাদ পেয়েই মামূন তাঁর গতি পরিবর্তন করে সেদিকে ফিরে আসলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদে রোমক রাজ্যসমূহে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। মুসলিম বাহিনী দুর্গের পর দুর্গ ও শহরের পর শহর দখল করে এগিয়ে চললো।

একদিকে মামূন তাঁরা বিজয়যাত্রা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলেছিলেন অপর দিকে মুতাসিম আক্রমণ চালিয়ে ত্রিশটি দুর্গ দখল করে নেন। তৃতীয় দিকে ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছাম শহরের পর শহর জয় করে এবং রোমকদেরকে গ্রেফতার করতে করতে এগিয়ে চলেছিলেন। অবশেষে রোমান সম্রাট ক্ষমা প্রার্থনা করলে খলীফা মামূন সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে দামেশকে ফিরে যান। এবার তিনি মিসরের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করে সেখানকার অবস্থা স্বাভাবিক করেন। মিসর থেকে আবার সিরিয়া অভিমুখে ফিরে আসেন। এ আক্রমণ ও যাতায়াতে পুরো একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

২১৭ হিজরীতে (৮৩২ খ্রি) রোমানরা আবারও বাড়াবাড়ি শুরু করে। মামূনুর রশীদ আবারও তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এবারও রোমানদের সাথে বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়। রোমান সম্রাট নাওফিল আবারও অত্যন্ত বিনম্রভাবে সন্ধির দরখাস্ত করেন। এবারও মামূন তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে রোমান এলাকা থেকে ফিরে আসেন। ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি) আবারও তাঁকে রোমানদের শায়েস্তা করার জন্যে অভিযান চালাতে হয়। সেখান থেকে ফেরার পথে আপন পুত্র আব্বাসকে বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ তাওয়ানা শহর নির্মাণের আদেশ দেন। তিনি এক বর্গমাইল বিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ করেন এবং চার ক্রোশ স্থান ঘিরে বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে বিভিন্ন শহরের লোকজনকে সেখানে আবাদ করেন।

ওফাত

রোম সফর থেকে ফেরার পথে বযন্দূন নদীর তীরে একদিন খলীফা মামূনুর রশীদ সদলবলে শিবির স্থাপন করেন। ২১৮ হিজরীর ১৩ই জুমাদাসসানী (৮৩৩ খ্রি-এর জুলাই) সেখানে তিনি জ্বরাক্রান্ত হন এবং ঐ স্থানেই ২১৮ হিজরীর ১৮ই (৮৩৩ খ্রি-এর জুলাই) জুমাদাসসানী ইন্তিকাল করেন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। মৃত্যুর পূর্বে আমীর-উমারা, আমলা-অমাত্য এবং উলামা ফুকাহাকে সম্মুখে ডেকে ওসীয়ত করেন এবং নিজের দাফন-কাফনের ব্যাপারে নির্দেশাদি প্রদান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন। তারপর তাঁর পূর্ব মনোনীত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর ভাই আবূ

ইসহাক মু'তাসিমকে সম্মুখে ডেকে উপদেশ প্রদান করেন এবং রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালীর দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তারপর কুরআনুল করীমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এক সময় বলে উঠলেন ঃ

"হে সেই মহান সত্তা যাঁর রাজত্ব কোন দিনই বিলুপ্ত হবার নয়! তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হও, যার রাজত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে।"

তারপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর ভাই আবূ ইসহাক মু'তাসিম এবং তাঁর পুত্র আব্বাস রিক্কার অন্তর্বর্তী বযন্দূন নদীর তীর থেকে তাঁর শবদেহ তারতূসে নিয়ে আসেন এবং সেখানেই তা দাফন করেন। মামূন মোট ৪৮ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকাল ছিল সাড়ে বিশ বছর।

মামূনের গোটা রাজত্বকাল যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। জাঠ বিদ্রোহীদের দমন এবং বাবক খুররমীকে দমনের অভিযান তাঁর আমলে অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। এ দু'টি ফিতনার অবসান তাঁর জীবদ্দশায় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্বকাল সত্যিকারভাবে শুরু হতে না হতেই মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তাঁকে গ্রাস করে। তাঁর অন্তিম জীবনে তিনি তাঁর শৌর্যবীর্য এবং সমরনায়করূপে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। রোমকদের বিরুদ্ধে তিনি লাগাতার কয়েক বছর জিহাদে লিপ্ত থাকেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, জিহাদরত অবস্থায় রণক্ষেত্রেই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন।

বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

যতদিন উমাইয়া খলীফাদের রাজত্ব ছিল, ততদিন দামেশ্‌ক ছিল বিশ্ব মুসলিমের একক কেন্দ্র ও রাজধানী। যখন বনূ আব্বাস তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো তখন প্রথম আব্বাসী খলীফা আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফাহ ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খ্রি) বনী উমাইয়ার খলীফাদের স্থলাভিষিক্তরূপে গোটা মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা হন। কিন্তু মাত্র ছ'বছর পরই ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫-৫৬ খ্রি) স্পেন দেশ বনী আব্বাসের খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বতন্ত্র উমাইয়া খিলাফতের সূচনা হয়। ১৭২ হিজরী (৭৮৮-৮৯ খ্রি) সনে মরক্কোতে আরেকটি স্বতন্ত্র রাজত্ব ইদ্রিসিয়া সালতানাত নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে মরক্কোও চিরতরে আব্বাসীদের রাজত্ব সীমানা থেকে বেরিয়ে যায়। এর কিছুকাল পর ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) তিউনিস ও আলজিরিয়া এলাকা যাকে আফ্রিকা প্রদেশ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে– নামেমাত্র আব্বাসীদের অধীনে রয়ে যায়। কেননা সেখানে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের স্বায়ত্তশাসিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐ বংশের দ্বারা শাসিত হয়। ২০৫ হিজরীতে (৮২০-২১ খ্রি) মামূনুর রশীদ তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে খুরাসানের গভর্নর করে পাঠান। সেই অবধি খুরাসানের রাজ্যশাসন তাহিরীয় বংশের লোকেরাই করতে থাকে। আফ্রিকা যেমন নামেমাত্র আব্বাসীদের অধীনে ছিল, তেমনি খুরাসানের তাহিরিয়া রাজ্যও নামেমাত্রই আব্বাসীয় শাসনাধীনে ছিল। অর্থাৎ সেখান থেকে খারাজ বা রাজস্ব আসা এবং খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নাম ব্যবহার ছাড়া আর সকল ব্যাপারেই তাহিরীয়রা পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম যিয়াদীকে ইয়ামানের শাসনভার অর্পণ করা হয়। এরপর এ বংশের হাতেই ইয়ামানের শাসনভার ন্যস্ত থাকে। ইয়ামানও

খুরাসান ও আফ্রিকার মত স্বাধীন হয়ে যায়। মোটকথা ১২৮ হিজরী (৭৪৫-৪৬ খ্রি) থেকে ২১৩ হিজরী (৮২৮ খ্রি) পর্যন্ত ৭৫ বছরের মধ্যেই স্পেনের উমাইয়া রাজত্ব, মরক্কোর ইদরীসিয়া রাজত্ব, আফ্রিকার আগলাবিয়া রাজত্ব, খুরাসানের তাহিরিয়া রাজত্ব, ইয়ামানের যিয়াদিয়া রাজত্ব— এই পাঁচটি স্বাধীন রাষ্ট্র মামূনুর রশীদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ এটা ছিল ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায়, যখন আব্বাসীয় খিলাফতকে উন্নয়নশীল বলে ধারণা করা হতো।

মামূনুর রশীদের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি

মামূনুর রশীদের শাসনামলের কোন একটি বছরও যুদ্ধবিগ্রহ ও হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ছিল না। অহরহ তাঁকে রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ দমনের চিন্তায় অস্থির থাকতে হতো। এমতাবস্থায় এমন ব্যস্ত-সমস্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট খলীফার আমলে তাঁর রাজত্বের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবেন এমনটি আশা করা যায় না। কিন্তু এ কথা ভেবে বিস্ময়াভিভূত হতে হয় যে,মামূনুর রশীদের শাসনাধীন আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার নজীর দুর্লভ। এ জন্যে তাঁর অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও মাহাত্ম্য আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। হারূনুর রশীদ বায়তুল হিকমত নামে বাগদাদের একটি অনুবাদ ও পুস্তকাদি রচনা ও সংকলনের কেন্দ্র খুলেছিলেন। তাতে নানা দেশের নানাভাষী ও নানা ধর্মের অনুসারী পণ্ডিতগণ কর্মরত থাকতেন।

এরিস্টটলের পুস্তকাদির অনুবাদ করার ইচ্ছে হলে মামূনের রোমান সম্রাটকে এরিস্টটলের লিখিত যাবতীয় পুস্তকাদি সম্ভাব্য উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁর দরবারে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালনে রোমান সম্রাটের কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি এ ব্যাপারে ঈসায়ী পণ্ডিতদের মতামত জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, দর্শনের পুস্তকাদি আমাদের দেশে তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিষিদ্ধ রয়েছে। কেননা, এতে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়। আপনি নিশ্চিন্তে এগুলো মুসলিম খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দিতে পারেন, যাতে এগুলোর প্রসারে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা ভাটা পড়ে। তাই রোমান সম্রাট পাঁচটি উট বোঝাই করে দর্শনের পুস্তকাদি মামূনুর রশীদের দরবারে প্রেরণ করলেন। মামূনুর রশীদ ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক কিন্দীকে সব গ্রন্থ অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করলেন। তারপর তিনি তাঁর রাজ্যে কর্মরত ঈসায়ী পণ্ডিতদেরকে রোম ও গ্রীসের এলাকাসমূহে পাঠিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি সেদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে বাগদাদে আনালেন। কাস্তা ইব্‌ন লুক নামক জনৈক খ্রিস্টীয় দার্শনিক পণ্ডিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোম দেশে গিয়ে দর্শনের পুস্তকাদি অনুসন্ধান করে আনলেন। মামূনুর রশীদ এতে প্রীত হয়ে তাকে দারুত-তরজমা বা অনুবাদ কেন্দ্রে চাকরি দান করেন।

অনুরূপভাবে তিনি মজুসী পণ্ডিতদেরকে উচ্চবেতনে চাকরি দিয়ে মজুসীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদির অনুবাদ করান। ভারতবর্ষের রাজারা মামূনের এ বিদ্যোৎসাহী মনের খবর পেয়ে তাদের দরবারে বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিতদেরকে উপঢৌকন স্বরূপ মামূনের দরবারে পাঠিয়ে তাঁর মনোরঞ্জনের প্রয়াস পান। বায়তুল হিকমতের পণ্ডিতদের এক একজনের বেতন

আড়াই হাজার মুদ্রা পর্যন্ত ধার্য ছিল এবং তাঁদের সংখ্যা শয়ের কোঠা পেরিয়ে গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে ইয়াকুব কিন্দী, হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক, কাস্তা ইব্‌ন লূক বা'লাবাক্কী, আবূ জা'ফর ইয়াহহিয়া ইব্‌ন আদী, জিবরাঈল ইব্‌ন বখতীশূ' প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন। নির্ধারিত বেতনভাতা ছাড়াও পণ্ডিতদেরকে তাঁদের অনূদিত গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণ-রৌপ্য উপহার দেয়া হতো। ফিলিস্তীন, মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া, সিসিলী, রোম, ইরান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি আনিয়ে আরবী ভাষায় অনুবাদ করানো হতো। অনেক অনুবাদক পণ্ডিত এগুলোর সম্পাদনা ও সংশোধনের কার্যে নিয়োজিত থাকেন।

মামূনুর রশীদের শাসনামলে জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা খাওয়ারিযমী মামূনের ফরমায়েশ মত জবর ও মুকাবিলা (বীজগণিত) শাস্ত্রের একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি এ বিষয়ের এমনি সূত্র মূলনীতি সম্বলিত পুস্তকও রচনা করেন যা আজ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সম্ভবপর হয়নি। গ্রীক গ্রন্থাদিতে পৃথিবী গোলাকার বলে উল্লেখ দেখতে পেয়ে মামূনুর রশীদ ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার পণ্ডিতদেরকে গোটা পৃথিবীর পরিধি কত জানবার জন্যে একটি বিস্তীর্ণ মাঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার নির্দেশ দেন। এ উদ্দেশ্যে সানজারের সমতল ভূমিকে পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপে বেছে নেয়া হলো। একটি স্থানে উত্তর মেরুর উচ্চতার সাথে কোণ ধরে জরিপ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করতে করতে সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ৬৯ $\frac{২}{৩}$ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর উত্তর মেরুর উচ্চতার কোণে এক ডিগ্রী বৃদ্ধি পায়। এতে বোঝা গেল যে ভূপৃষ্ঠে এক ডিগ্রীর দূরত্ব যখন ৬৯$\frac{২}{৩}$ মাইল, তখন ৩৬০ ডিগ্রী বিশিষ্ট এ পৃথিবীর পরিধি হবে ৬৯ $\frac{২}{৩}$ X ৩৬০ = ২৪,০০০ মাইল। কেননা চতুর্দিকে থেকে কোণগুলোর যোগফল ৩৬০। দ্বিতীয়বার কূফা প্রান্তরে ঐ একটি পরীক্ষা চালিয়ে ঐ একই ফল বেরিয়ে আসে।

খালিদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মারূরুজী এবং ইয়াহহিয়া ইব্‌ন আবূ মানসূর প্রমুখের সাহায্যে শুমাসিয়ার মানমন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করা হয় এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিতদেরকে নক্ষত্রমণ্ডলীর ব্যাখ্যার গবেষণার নির্দেশ মামূন দান করেন। রীতিমত ফরমান জারি করে প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি এলাকা থেকে পণ্ডিতমণ্ডলীকে এনে গবেষণা সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং বিতর্কসভার আয়োজন করা হতো। সে সব সভা ও সেমিনারে খলীফা মামূন নিজে অংশগ্রহণ করতেন। কবি, সাহিত্যিক, কালাম শাস্ত্রবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সর্বোচ্চ স্তরের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের ও বিশেষজ্ঞদের এমন সমাবেশ বাগদাদে ঘটিয়ে ছিলেন যে, গোটা বিশ্বে তার কোন নজীর পাওয়া যেত না। আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের যশস্বী পণ্ডিত ও ইমাম আসমাঈ বার্ধক্যের দরুন কূফা ছেড়ে বাগদাদে আসতে পারেননি। তিনি সেখানে বসেই বাগদাদ দরবারের ভাতা লাভ করতেন। ভাষাতাত্ত্বিক জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে সেখানেই তাঁর কাছে পাঠানো হতো। ব্যাকরণবিদ ফাররা বাগদাদে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করে বাগদাদে বসে পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর জন্যে রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ খালি করে দেয়া হয়েছিল। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতরা শিষ্যরূপে তাঁর নিকট এসে বসতেন এবং রীতিমত পাঠ গ্রহণ করতেন। রচনা সৌকর্য ও লিপিবিদ্যা সম্পর্কে মামূনের যুগেই গ্রন্থাদি প্রণীত হয় এবং এ শাস্ত্রের নীতিমালাও প্রণীত হয়। মোটকথা, মামূনুর রশীদের

মনোযোগ ও বিদ্যোৎসাহিতার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের সম্মুখে গ্রীক, ইরানী, মিসরীয় এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলিত রূপ অবারিত হয়ে ওঠে।

যদিও কুরআন-হাদীসের বর্তমানে মুসলমানদের আর কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না, তা সত্ত্বেও ঐ সব প্রাচীন দর্শন এবং রকমারি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে সবকিছুকে এমনিভাবে সুবিন্যস্ত ও মার্জিত করে তুলেছিল যেন তারা ঐ সব শাস্ত্র নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়। ফলে বাহ্যত এ বিজাতীয় ধারার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন কুরআনের মুকাবিলায় এসে দাঁড়ায়। ইসলামের সেবকদের সম্মুখে সর্বপ্রথম ঐ সব কুরআন-বিরোধী তত্ত্ব ও তথ্যের ভুলত্রুটি নির্দেশের সুযোগ আসে। এভাবে নানা ধর্ম ও নানা শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের যে বিরাট বিজয় সূচিত হয়, তা মুসলমানদের দিগ্বিজয়ের তুলনায় অনেকগুণ বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল যা উমাইয়া আমলে মুসলমানরা অর্জন করেছিল। আর এই জ্ঞানগত বিজয়সমূহ আব্বাসী খিলাফতকে উমাইয়া খিলাফতের সমকক্ষ করে দেয়। নতুবা দিক বিজয়ের ক্ষেত্রে আব্বাসী খিলাফত উমাইয়া খিলাফতের ধারেও ঘেঁষতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে যে, দিক বিজয়ের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খিলাফত চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কেননা, তারা উমাইয়াদের বিজিত রাজ্যসমূহকে ধরেও রাখতে পারেনি।

একটি অপবাদের জবাব, একটি ভ্রান্তির অপনোদন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি অপূর্ণাঙ্গ সার-সংক্ষেপ, যাকে ইতিহাস নামে অভিহিত করাও ভুল, আমাদের সরকারী বিদ্যালয়সমূহে পড়ানো হয়ে থাকে। সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এ সমস্ত তথাকথিত ইতিহাস পুস্তকের লেখকরা এমন সব ভিত্তিহীন কথা তাঁদের পুস্তকসমূহে লিখেন যা পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়। এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণারূপী তীরের এক শিকার হচ্ছেন খলীফা মামূনুর রশীদও। প্রায় ৩০/৪০ বছর পূর্বে রাজা শিব প্রসাদ সিতারায়ে হিন্দ লিখিত একটি পুস্তক সরকারী বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য ছিল। তাতে লেখা ছিল যে, রাজপুতানার জনৈক রাজা বাপা রাভিলের বিরুদ্ধে মামূনুর রশীদ ২২ বার আক্রমণ করেন এবং প্রতিবারই বাপা তাকে পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। শুনেছি এই নির্জলা মিথ্যা কথাটুকু অন্যান্য পুস্তকেও নাকি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেগুলোও পাঠ্য ছিল, নাকি এখনো আছে। যারা বাল্যকালে পড়েছে যে, বাপা ২২ বার মামূনকে পরাজিত করেছেন, মামুনুর রশীদ আব্বাসীয় সম্পর্কে তাদের মনে কি হীন ধারণা জন্ম নেবে যে, এ কেমন খলীফা যিনি সামান্য এক জমিদারকে পরাজিত করার জন্যে সারা জীবন ও সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও তা করতে পারলেন না। উপরে মামূনুর রশীদের আমলের অবস্থা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। খলীফা হওয়ার পূর্বে তাঁর কী ব্যস্ততা ছিল, তাও মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। খুরাসান শাসনের দায়িত্ব লাভ করে তিনি সেখানে অবস্থানরত থাকা অবস্থায়ই খলীফা হারূনুর রশীদের ইন্তিকাল হয়। তারপর প্রায় ছয় বছর কাল তিনি মার্ভে অতিবাহিত করেন। মার্ভের বাইরে কোথাও তিনি এক দিনের জন্যেও যাননি। অবশ্য তাঁর সৈন্যবাহিনী কাবুল ও কান্দাহারের বিদ্রোহীদেরকে দমন করেছে আর ঐ দেশে ২০০ হিজরী (৮১৫-১৬ খ্রি) নাগাদ সাধারণভাবে ইসলামের প্রসার ঘটে গেছে।

ঐ সময় তিব্বতের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত দেবমূর্তি খলীফা মামূনের কাছে মার্ভে পাঠিয়ে দেন। সিন্ধুদেশ তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলীফার দরবারে থেকে আমিল নিযুক্ত হয়ে রীতিমত সেখানে প্রেরিত হতেন এবং রাজত্ব করতেন। কিন্তু মামূন নিজে কোনদিন এদিকে পদার্পণ করেননি। তিনি মার্ভ থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদ পর্যন্ত সফর করেন। সে সফরের বিশদ বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাতে সিন্ধু বা ভারতবর্ষের দিকে তাঁর কোন সফরের কথা উল্লেখ নেই। বাগদাদে উপনীত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে সেখানেই অবস্থান করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি বাগদাদ থেকে বের হয়ে রোমের দিকে যাত্রা করেন এবং সে দেশে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সিরিয়া ও মিসরেও তিনি গমন করেন।

এ পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহের সফর শেষে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ কথাটি কোনমতেই বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না যে, তা হলে সেই সময়টি কখন ছিল, যখন মামূন ভারত আক্রমণ করেছেন বলে লিপিবদ্ধ করা হবে ? হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, সিন্ধুর কোন গভর্নর হয়তো কোন সময় রাজপুতানার জমিদার গোছের সামন্ত রাজাকে দমনের উদ্দেশ্যে কোন সামরিক ইউনিটকে প্রেরণ করে থাকবেন। কিন্তু সে অভিযান এতই মামুলী গোছের ও তাৎপর্যবিহীন যে, কোন ঐতিহাসিকই তার উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করেননি। যদি বলা হয় যে, সিন্ধুর আমিলের প্রেরিত বাহিনী যেহেতু রাজা বাপার হাতে পরাস্ত হয়েছিল এ জন্যেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তা চেপে গিয়েছেন। কিন্তু এরূপ বক্তব্যদাতা তার নীচতা ও হীনম্মন্যতাই প্রকাশ করে। কেননা, তাতে বোঝা যায় যে, তার মতে, ইতিহাস রচনায় এরূপ মিথ্যাচারকে সে বৈধ জ্ঞান করে। নতুবা মুসলমান ঐতিহাসিকরা মামূনের বাহিনীর বিভিন্ন পরাজয়ের এবং তাঁর সেনাপতিদের ব্যর্থতার কথা কোথাও গোপন করেননি।

জাঠদের লুটপাটের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা নসর ইব্‌ন শীছের মুখে উচ্চারিত সেই তিরস্কার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যাতে নসর বলেছিলেন— কয়েকটি জাঠ ব্যাঙের বিরুদ্ধেও তিনি জয়যুক্ত হতে পারলেন না। ঐতিহাসিকগণ যদি মামূনের পক্ষপাতিত্বের জন্যে এতই ব্যস্ত হতেন এবং এভাবে তাঁরা সত্যগোপনের অপরাধ করতে আগ্রহী হতেন তা হলে অনায়াসেই তাঁরা এ প্রসঙ্গটিও এড়িয়ে যেতে পারতেন। কেননা, এর অল্পকাল পরেই রোমানদের হাতে এ সম্প্রদায়টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা বাপার বীরত্বের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা এই নির্জলা মিথ্যা কাহিনী ফেঁদেছেন, যার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। এটা হচ্ছে রাজা বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিকের নির্লজ্জ মিথ্যা কাহিনী ফাঁদার মত ব্যাপার– যাতে তাঁরা লিখে যে, উক্ত রাজা ভারত থেকে সুদূর ইটালীর রোমে গিয়ে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। তাঁদের ধারণা মতে, এভাবে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের আড্ডায় বসে এক জাতীয় চমকদার গল্প বলে কিছুক্ষণের জন্যে হয় তো আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, কিন্তু একে ইতিহাস চর্চা আদৌ বলা যায় না।

খলীফা মামূনের চরিত্র

খলীফা মামূনুর রশীদ গোটা বনূ আব্বাস বংশের মধ্যে ধৈর্য-স্থৈর্য, বুদ্ধি-শুদ্ধি ও শৌর্যবীর্যে সকলের শীর্ষে ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন ঃ আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর আমর ইব্‌নুল আসের এবং আবদুল মালিকের হাজ্জাজের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর মন-মগজে শিয়া ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছিল অত্যধিক। অর্থাৎ তিনি উলুভীদেরকে অত্যধিক শ্রদ্ধারপাত্র এবং খিলাফতের হকদার বলে মনে করতেন। এ কারণেই তিনি আপন ভাই মুতামানকে পদচ্যুত করে আলী রিযাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাঁরই সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তাঁর ধারণা ছিল, নিজে খলীফার পদ থেকে সরে গিয়ে তাঁর জীবদ্দশায়ই আলী রিযাকে খলীফারূপে বরণ করবেন। কিন্তু খিলাফতের প্রথম দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর উলুভীদের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি এ ধারণা পরিত্যাগ করেন। তিনি এরূপ ফরমান জারি করতেও উদ্যত হয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যেন হযরত আমীর মুআবিয়ার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ না করে। অন্যথায় তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু পরে জনমত সৃষ্টি করবেন চিন্তা করে সে ফরমান জারি করেননি।

তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কোন কোন রমযানে দৈনিক এক খতম কুরআন পড়তেন। আলী রিযাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে কোন কোন আব্বাসীয় তাঁকে এই বলে বারণ করেন যে, আপনি খিলাফতকে উলুভীদের হাতে হস্তান্তর করবেন না। জবাবে তিনি বলেন ঃ স্বয়ং হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর খিলাফত আমলে আব্বাসীয়দেরকে অধিকাংশ প্রদেশের গভর্নররূপে নিয়োগ করেছিলেন। আমি তারই প্রতিদানে তাঁর বংশধরদের হাতে খিলাফত ও রাজত্ব সমর্পণ করতে চাই।

মামূন দারুল মুনাযিরায় যখন সকল ধর্মমতের লোকদেরকে স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার প্রদান করলেন এবং একাডেমিক আলোচনা-সমালোচনা স্বাধীনভাবে হতে থাকলে কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ এবং মুতাযিলাদের প্রতি তিনি অনেকটা ঝুঁকে পড়েন। এই স্বাধীনতা ও তর্ক-বিতর্কের ফলে খালকে-কুরআনের মত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বিতর্ক হয় এবং মামূন নিজে খালকে-কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করে যারা এ মতের সমর্থক ছিলেন না তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেন। এর ফলে বিরোধী বিশ্বাসের আলিম-উলামারা আরো কঠোরভাবে ঐ আকীদার বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হন। এ বিরোধিতার ও রেষারেষির ফলে মামূনের পরবর্তী আমলে আলিম সমাজকে এ তুচ্ছ ও অর্থহীন মাসআলার জন্যে অনেক কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

আবূ মুহাম্মদ ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি মামূনকে তাঁর শৈশবে পড়াতাম। একদা ভৃত্যরা নালিশ করলো যে, আপনি চলে যাওয়ার পর সে চাকর-বাকরদের সাথে দুষ্টুমি করে এবং তাদেরকে অহেতুক মারপিট করে আনন্দ পায়। এতে আমি তাকে সাতটি বেত্রাঘাত করি। এতে সে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি মুছতে ছিল, এমন সময় উযীরে আযম জা'ফর বারমাকী আগমন করলেন। আমি তখন উঠে বেরিয়ে গেলাম। জা'ফর মামূনের সাথে কথাবার্তা বলে তাঁকে হাসিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর আমি মামূনের কাছে

আসলাম এবং বললাম, আমি তো এতক্ষণ এই ভয়ে অস্থির ছিলাম যে, তুমি জা'ফরের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ না করে বস। জবাবে মামূন বললেন, জা'ফর কেন আমি আমার পিতার কাছেও তো এ জন্যে নালিশ করতে পারি না। কারণ আমার কল্যাণের জন্যই আমাকে প্রহার করেছেন।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছাম বলেন ঃ একদা আমি মামূনুর রশীদের কামরায় শুয়েছিলাম। মামূনও অদূরে নিদ্রারত ছিলেন। হঠাৎ মামূন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বললেন, দেখুন তো আমার পায়ের কাছে কী যেন একটা আছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, কিছুই দেখছি না। মামূন তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি শয্যারচনাকারীদের ডাকলেন। তারা আলো জ্বালিয়ে তাঁর বিছানার নিচে একটি সাপ দেখতে পেল। আমি তখন মামূনকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ আপনার অন্যান্য গুণের সাথে আপনার গায়েবের ইল্‌মও যেন আছে বলতে হবে। মামূন বললেন 'মাআয আল্লাহ্' (আল্লাহ্ পানাহ), এ আপনি কী বলছেন? ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম, কে একজন যেন আমাকে বলছেন, আপনি নিজেকে নিষ্পেষিত তরবারি থেকে রক্ষা করুন! তৎক্ষণাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি ভাবলাম এখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমার সবচাইতে নিকটে ছিল আমার বিছানা। তাই সর্বপ্রথমে আমি এটাই পরখ করে দেখলাম এবং সাপ খুঁজে পেলাম।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর বলেন, মামূন প্রায়ই বলতেন, শরীফ মানুষের একটা লক্ষণ এই যে, নিজের চাইতে বড়দের অত্যাচার তারা সয়ে যায় কিন্তু নিজের চাইতে ছোটদের প্রতি তারা অত্যাচার করে না।

সাঈদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন, একদা মামূন বললেন, অপরাধীরা যদি জানতো যে আমি ক্ষমা কিরূপ পছন্দ করি তা হলে তাঁরা নির্ভয় হয়ে যেত এবং আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো।

একবার এক অপরাধীকে লক্ষ্য করে মামূন বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোকে হত্যা করবো। সে বললো, আপনি একটু ধৈর্য অবলম্বন করুন। কেননা নম্র আচরণ ক্ষমার অর্ধেক। মামূন বললেন, আমি তো কসম খেয়ে বসেছি। সে বললো,একজন খুনীর বেশে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে একজন কসম ভঙ্গকারীরূপে উপস্থিত হওয়া লাখ গুণ উত্তম। একথা শুনে মামূন তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

আবদুস সালাম ইব্‌ন সালাহ্ বলেন, একদা আমি মামূনের কক্ষে শয়ন করলাম। প্রদীপ নিভু নিভু করছিল। তাকিয়ে দেখি মশালচী দিব্যি নিদ্রা যাচ্ছে। মামূন নিজে উঠে স্বহস্তে চেরাগের সলিতা ঠিক করে আবার শুয়ে পড়লেন আর বললেন, অনেক সময় আমি যখন গোসলখানায় থাকি তখন এ ভৃত্যরা আমাকে গালি দেয় এবং আমার বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করে। তারা মনে করে আমি বুঝি এগুলো শুনি না। কিন্তু আসলে আমি এ সব শুনেও ক্ষমা করে দেই। কোন দিন তাদেরকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেই না যে, আমি তাদের সব কথাই শুনেছি।

একদা মামূন দজলা নদীতে প্রমোদ বিহারে মত্ত ছিলেন। মাত্র ক'টি পর্দা ছিল। পর্দার অপর পার্শ্বে মাঝি-মাল্লারা ছিল। মামূন যে সেখানে রয়েছেন তা তারা টেরই পায়নি। তাদের

মধ্যে একজন বলে উঠলো, মামূন মনে করেন, আমি বুঝি তাঁকে খুবই সম্মান করে থাকি। কিন্তু তিনি একটুও বুঝেন না যে, যে ব্যক্তি আপন ভাইকে হত্যা করতে পারে তাঁকে আমি কিভাবে সম্মান করতে পারি ? মামূন মুচকি হেসে বলে ফেললেন, বন্ধুরা, তোমরাই একটা উপায় বল দেখি, যাতে ঐ মহাত্মার অন্তরে আমরা শ্রদ্ধার আসনটা করে নিতে পারি ?

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছাম বলেন, একদা আমি মামূনের কামরায় শায়িত ছিলাম। তখনো আমার ঘুম আসেনি। হঠাৎ মামূনের কাশি পেল। তিনি তাঁর জামার আঁচলে মুখ চাপা দিলেন, যেন কারো ঘুম ভেঙ্গে না যায়। মামূন নিজে বলতেন, আমার কাছে যুক্তির প্রাবল্য শক্তির প্রাবল্যের চাইতে উত্তম। কেননা শক্তির প্রাবল্য শক্তির পতনের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যুক্তির প্রাবল্য কোন দিনই শেষ হবার নয়।

মামূন বলতেন, বাদশাহ্‌র পক্ষে তোষামোদ প্রিয় হওয়া অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু বিচারকের সংকীর্ণতা তার চাইতেও মন্দ– যা ব্যাপার উপলব্ধি করার পূর্বেই তার মধ্যে দৃষ্ট হয়। তার চাইতেও মন্দতর হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের নির্বুদ্ধিতা। তার চাইতেও মন্দতর হচ্ছে ধনীদের কৃপণতা, বৃদ্ধদের উপহাস, যুবকদের আলস্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা প্রদর্শন করা।

আলী ইব্‌ন আবদুর রহীম মারুজী বলেন, মামূন বলতেন, সেই ব্যক্তি তার নিজের প্রাণের শত্রু, যে সেই সব লোকদের নৈকট্য কামনা করে যারা তার নিকট থেকে দূরত্বকে পছন্দ করে, যে এমন ব্যক্তির সাথে বিনয়পূর্ণ আচরণ করে, যে তাকে সম্মান করে না, আর এমন ব্যক্তির প্রশংসায় আনন্দিত হয়, যে তাকে চেনেই না।

হাদবা ইব্‌ন খালিদ বলেন, একদা আমি মামূনের সাথে একত্রে আহার্য গ্রহণ করলাম। আহার শেষে যখন দস্তরখান উঠিয়ে নেয়া হলো, তখন মাদুরে পতিত খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশগুলো উঠিয়ে আমি মুখে দিচ্ছিলাম তা দেখে মামূন বললেন, তোমার ক্ষুধা মিটে নাই বুঝি। আমি বললাম, ক্ষুধা তো মিটেছে, কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি খাবারের অবশিষ্টাংশ উঠিয়ে খায় সে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত থাকবে। এ কথা শুনে মামূন আমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন।

একবার হারূনুর রশীদ হজ্জ শেষে কূফায় এসে সকল মুহাদ্দিসকে ডেকে পাঠালেন। সকলেই আসলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস এবং ঈসা ইব্‌ন ইউনুস দু'জন আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। হারূনুর রশীদ তাঁর দুই পুত্র আমীন ও মামূনকে তাঁদের খিদমতে পাঠালেন। তাঁরা দু'জন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীসের ওখানে পৌঁছলে তিনি আমীনকে লক্ষ্য করে একশটি হাদীস পড়ে শুনালেন। মামূনও পাশে বসে তা শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি হাদীস শুনিয়ে নিবৃত্ত হলেও মামূন বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি ঐ হাদীসসমূহ আপনাকে মুখস্থ শুনিয়ে দিতে পারি। তিনি অনুমতি দান করলেন। মামূন হুবহু সে সব হাদীস তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। ইব্‌ন ইদরীস মামূনের স্মরণশক্তি প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে গেলেন। মামূনুর রশীদ একবার বলেন, আমি কোনদিন কারো কথায় এত লা-জবাব ও অপ্রস্তুত হইনি, যতটুকু হয়েছিলাম একবার কূফাবাসীদের প্রশ্নের মুখে। ব্যাপারটি ছিল এই যে, কূফাবাসীরা এসে

আমার নিকট কূফার আমিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। আমি বললাম, তোমরা মিথ্যা বলছো, তিনি তো অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তারা বললো, আমরা মিথ্যাবাদী আর আমীরুল মু'মিনীন সত্যবাদী এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ এই আমিলের ন্যায় বিতরণের জন্যে আমাদের এ শহরটাকেই বেছে নেয়া হলো কেন ? একে অন্য কোন শহরে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা থেকে আমাদের এ শহরের মত অন্য শহরবাসীদেরকেও উপকৃত হতে দেয়া উচিত নয় কি ? অগত্যা আমাকে বলতে হলো, আচ্ছা যাও, আমি তাকে পদচ্যুত করলাম।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছাম বলেন, একদা আমি মামূনুর রশীদের কক্ষে শয়ন করলাম। মধ্যরাতে আমার খুব পিপাসা পেল। আমি ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে লাগলাম। মামূনুর রশীদ ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। মামূন উঠে পানি নিয়ে এসে আমাকে পান করালেন। আমি বললাম, আপনি কোন ভৃত্যকে ডাকলেন না কেন ? মামূন জবাব দিলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি তাঁর দাদার নিকট থেকে আর তিনি হযরত উকবা ইব্‌ন আমের (রা) থেকে শুনেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, সেবকরাই জাতির নেতা হয়ে থাকেন।

খলীফা মামূনুর রশীদের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ও প্রশংসনীয় ব্যাপার হচ্ছে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদার অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পিতৃস্নেহের ফাঁদে আটকা পড়েননি, যেমনটা তাঁর পূর্বসূরিরা উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে করেছিলেন এবং ইসলামী হুকুমতকে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের অভিশাপে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন। মামূনুর রশীদ ইমাম আলী রিযাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে আব্বাসীয়দেরকে বঞ্চিত করে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে একজন সুযোগ্য লোককে মনোনয়ন প্রদান করেন যেমনটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর (রা)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে করেছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয়রা তাতে কতটুকু অসন্তুষ্ট হয়েছে, মামূন তা অচিরেই আঁচ করতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এবং তারা নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুসলিম বিশ্বকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে উদ্যত হবে। আলী রিযার অকাল মৃত্যু মামূনের সে সদিচ্ছা পূর্ণ হতে দেয়নি। এরপর তিনি তাঁর বংশের মধ্য থেকেই তাঁর ভাই আবূ ইসহাক মু'তাসিমকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন আর আপন পুত্র আব্বাসকে সর্বপ্রকার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও খিলাফতের দাবি থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখেন। মু'তাসিম যেহেতু যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন তাই তিনি মু'তাসিমকেই মনোনয়ন দান করেন এবং পুত্রকে উপেক্ষা করে যান। মামূনের পূর্বসূরিরা একজন নয় দু-দু'জন করে উত্তরাধিকারী নিয়োগের বিদআতে লিপ্ত ছিলেন। মামূন যদি তাঁদের অনুকরণ করতেন তাহলে তিনি অনায়াসেই আপন পুত্র আব্বাসকে মনোনয়ন দান করতে পারতেন। আর এই ভেবে অন্তত তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন যে, মু'তাসিমের পরে অন্তত আমার ছেলেই খলীফা হবে। কিন্তু এ অসঙ্গত কাজটিও তিনি করতে চাননি। এ জন্যে মামূনের যতই প্রশংসা করা হোক, তা কমই হবে।

মু'তাসিম বিল্লাহ্

আবূ ইসহাক মু'তাসিম ইব্‌ন হারূনুর রশীদ ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬ খ্রি) যখন রোমদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন সীমান্ত এলাকার জাবতারা নামক স্থানে বারেদা নাম্নী এক ক্রীতদাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। হারূনুর রশীদ তাঁর এ পুত্রটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কোন কিছু ভাগ-বন্টন করলে সব চাইতে বড় অংশটা দিতেন মু'তাসিমকে।

মু'তাসিম লেখাপড়ায় আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি তাঁর সবটা সময় খেলাধুলাতেই কাটিয়ে দিতেন। হারূনুর রশীদ তাঁর একটি ক্রীতদাসকে এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে,সে যেন সব সময় মু'তাসিমের সাথে সাথে থাকে এবং একটু সুযোগ পেলেই তাকে যেন কিছুটা পড়ালেখা শিক্ষা দেয়। সে ক্রীতদাসটির মৃত্যু হলে হারূনুর রশীদ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার দাসটিও তো চলে গেল। এবার বল দেখি তোমার ইচ্ছা কি? জবাবে মু'তাসিম বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! দাসটি যখন মরে গেছে, তখন আমার পড়ালেখার ঝামেলাটাও চুকে গেছে। এ ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি ?

মু'তাসিম সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি একেবারে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। সত্য কথা হলো, তিনি খুব অল্প পড়ালেখা জানতেন। নিজের নাম-ধাম লেখা প্রভৃতির মত মামুলী পড়ালেখা তাঁর ছিল। কিন্তু যেহেতু শাহী খানদান এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সাহচর্যে মানুষ হয়েছেন এবং হারূন ও মামূনের আমলের জ্ঞানচর্চার মজলিসসমূহের উচ্চাঙ্গের একাডেমিক আলোচনাদি সর্বদাই শুনেছেন ও দেখেছেন তাই তাঁর জানাশোনার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মু'তাসিম অত্যন্ত বলিষ্ঠ গড়নের পাহলোয়ান এবং বীর পুরুষ ছিলেন। সাথে সাথে তিনি উঁচুদরের মানবিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

ইব্‌ন আবূ দাঊদ বলেন, মু'তাসিম প্রায় সময়ই তাঁর বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, এতে কামড় বসাও দেখি। আমি সজোরে দাঁত দিয়ে কামড় দিতাম। কিন্তু মু'তাসিম বলতেন, আমিতো একটুও টের পাচ্ছি না। আমি আবার কামড় দিতাম, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হতো না। আমার দাঁতের কি ক্রিয়া হবে, ওখানে তো বল্লমের আঘাতও ফিরে আসতো। মু'তাসিম প্রায়ই দুই অঙ্গুলীর চাপ দিয়ে হাতের কব্জির হাড় ভেঙ্গে দিতেন।

মু'তাসিম কখনো কখনো নিজে স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবিদেরকে তিনি অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন। খালকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে তিনিও তাঁর ভাই মামূনের মত পাগলামিতে লিপ্ত ছিলেন। মামূনের মত তিনিও এ প্রশ্নে অনেক আলিম ও জ্ঞানীগুণীকে নানারূপ কষ্ট দিয়েছেন। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলকে এ প্রশ্নেই মু'তাসিম অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চালান।

মামূনুর রশীদের শাসনামলে মু'তাসিম বিল্লাহ সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর ছিলেন। মামূনুর রশীদের রোমান এলাকা আক্রমণের সময় মু'তাসিম বিল্লাহ্ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এ জন্যেই খুশি হয়ে মামূনুর রশীদ তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং আপন পুত্র আব্বাসকে বঞ্চিত করেন। মু'তাসিম বিল্লাহর খিলাফতের বায়আত মামূনের ইন্তিকালের পরদিনই অনুষ্ঠিত হয়। তারিখটি ছিল ১৯শে রজব, ২১০ হিজরী মুতাবিক ১০ আগস্ট ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

ফযল ইব্‌ন মারওয়ান নামক জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তি তাঁর কার্যব্যবস্থাপক ও নায়েব ছিল। বাগদাদে মামূনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছার অব্যবহিত পরেই ফযল ইব্‌ন মারওয়ান বাগদাদ-বাসীদের নিকট থেকে মু'তাসিমের খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। মু'তাসিম বাগদাদে উপনীত হয়ে এই ফযল ইব্‌ন মারওয়ানকেই তাঁর উযীরে আযম নিযুক্ত করেন। তারতূসে যখন মু'তাসিমের হাতে বায়আত অনুষ্ঠান হচ্ছিল তখন সামরিক বাহিনীর অনেকেই আব্বাস ইব্‌ন মামূনকে খিলাফতের যোগ্যতার পাত্র বলে মত প্রকাশ করেন। মু'তাসিম কালবিলম্ব না করে আব্বাসকে ডেকে পাঠান। আব্বাস তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। আব্বাসের বায়আত গ্রহণ করায় এ বিরোধিতার আপনা আপনি অবসান ঘটে।

খলীফা হয়েই মু'তাসিম তাওয়ানা শহর ধূলিসাৎ করে দিয়ে সেখানে এসে বসতি স্থাপনকারীদেরকে তাদের নিজ নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। এর নানা কারণ হতে পারে।

১. এটা যেহেতু আব্বাসেরই হাতে পত্তন করা শহর, তাই তাঁর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে মু'তাসিম তা ধ্বংস করে ফেলেন।

২. রোমান সীমান্তে মুসলিম অধ্যুষিত এ দুর্জয় মজবুত ঘাঁটিটি রোমানদেরকে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে পারে। তাই এ আপদ থেকে মুক্ত থাকাই ছিল এটা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য। অথবা এর অন্য কোন কারণও থাকতে পারে যা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন।

এ শহরটি ধ্বংস করিয়ে দিয়ে যে সমস্ত অস্থাবর সম্পদ নিয়ে আসা সম্ভবপর ছিল তা বাগদাদে নিয়ে আসেন এবং অবশিষ্ট সবকিছু অগ্নি সংযোগে জ্বালিয়ে দেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিমের বিদ্রোহ

মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম আলী ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন তালিব মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে অবস্থান করতেন এবং ধর্ম-কর্ম ও ইবাদত-বান্দেগীতে জীবন অতিবাহিত করতেন। জনৈক খুরাসানী ব্যক্তি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে খিলাফতের প্ররোচনা দিয়ে বলতে থাকে, আপনিই হচ্ছেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। সুতরাং গোপনভাবে লোকদের বায়আত গ্রহণ করা উচিত। সে মতে খুরাসান থেকে যে সমস্ত লোক হজ্জ করতে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় রয়ে যেত তাদেরকে সে তাঁর খিদমতে নিয়ে এসে বায়আত করাতে লাগলো।

এভাবে এক বিপুল সংখ্যক লোক খুরাসানে সংঘবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম উক্ত খুরাসানীকে সাথে নিয়ে জুরজানে চলে যান এবং কাজের সুবিধার্থে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। সেখানেও অত্যন্ত সন্তর্পণে বায়আতের কাজ চলতে থাকে। অনেক রঈস ও আমীর ব্যক্তি গোপনভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে থাকেন। অবশেষে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম উলুভী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তালিকান অঞ্চলে বেশ ক'টি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম উলুভী পরাস্ত হন।

অবশেষে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম কেবল নিজের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। নাসা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি গ্রেফতার হন এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহিরের কাছে নীত হন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির তাঁকে বাগদাদে মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র খিদমতে পাঠিয়ে দেন। মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাঁকে মাসরূর আল-কবীরের তত্ত্বাবধানে বন্দী করে রাখেন। ২১৯ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৮৩৪ খ্রি-এর মার্চ) মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম বাগদাদে নীত হন। ২১৯ হিজরীর শাওয়াল (৮৩৪ খ্রি অক্টোবর) মাসের ১লা তারিখে অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাতে সুযোগ বুঝে তিনি কারাগার থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

জাঠদের ধ্বংসসাধন

২১৯ হিজরীর জুমাদাল উখরা (৮৩৪ খ্রি) মাসে খলীফা মু'তাসিম তদীয় এক সিপাহ্‌সালার আজীদ ইব্‌ন আম্বাকে জাঠদের দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আজীদ দীর্ঘ সাত মাস পর্যন্ত এ দস্যু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। অবশেষে তারা ২১৯ হিজরীর যিলহজ্জ (৮৩৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে বাধ্য হয় এবং আজীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আজীদ তাদের সর্বসাকল্যে সতের হাজার লোককে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সতের হাজারের মধ্যে বার হাজার ছিল যুদ্ধক্ষম পুরুষ। ২২০ হিজরীর ১০ই মুহাররম (৮৩৫ খ্রি ১৫ই জানুয়ারি) আজীদ তাদেরকে নিয়ে বাগদাদে পদার্পণ করেন। মু'তাসিম নিজে কিস্তিতে আরোহণ করে শুমাসার দিকে আগমন করেন এবং জাঠবন্দীদের পরিদর্শন করে নির্দেশ দেন যে, এদেরকে রোমান সীমান্তের চশমাজারবা নামক স্থানের সন্নিকটে বসবাস করতে দাও। সে মতে তাদেরকে সেখানেই বসত করতে দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে সীমান্তবর্তী এলাকায় এদেরকে পেয়ে রোমানরা নৈশ আক্রমণ চালিয়ে প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করে চলে যায়। এভাবে এ দস্যু সম্প্রদায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সামেরা শহর

খলীফা মু'তাসিম ছিলেন একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। তাঁর পূর্বসূরি আব্বাসী খলীফাগণ সাধারণভাবে খুরাসানীদের বেশি কদর করতেন। আরব সৈন্যদের উপর তাঁদের আস্থা খুব কমই ছিল। যদিও খুরাসানীদের পক্ষ থেকেও তাঁদের জন্যে বারবার সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এতদসত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আরবদের মুকাবিলায় খুরাসানী ও ইরানীদের উপরই তাঁদের আস্থা ছিল বেশি। এ জন্যে সামরিক বাহিনীতে আরবদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে খুবই অল্পে এসে ঠেকে। মু'তাসিম বিল্লাহ শুরুতেই সৈন্যবাহিনীর বিন্যাসের দিকে মনোযোগী হন। তিনি ফারগানা ও আশরুস্‌না এলাকা থেকে তুর্কীদেরকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।

এসব তুর্কী সেনার যুদ্ধপ্রিয়তা এবং তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। এ যাবত সামরিক বাহিনীতে আরবী ও ইরানী এই দুই শ্রেণীর সৈন্যই থাকতো। তুর্কীদের সাথে অহরহ সীমান্ত লড়াই লেগে থাকতো। কখনও তুর্কী সর্দাররা বশ্যতা স্বীকার করে করদ-মিত্রে পরিণত হতো, আবার কখনো বিদ্রোহী হয়ে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে রীতিমত যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নতি স্বীকার করতো। তাদের এরূপ আচরণের দরুন এ যাবত তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার মত আস্থা স্থাপন করা যায়নি। মু'তাসিম এত প্রচুর

সংখ্যক তুর্কীকে ফৌজে ভর্তি করলেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করলেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত ইরানীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হ্রাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে। খলীফা সমস্ত আরব সৈন্যকে মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র আরব রেজিমেন্ট গঠন করেন। ঐ রেজিমেন্টের নাম দেন মাগরিবা বা পশ্চিমা বাহিনী।

সমরকন্দ, ফারগানা ও আশরুস্নার তুর্কী সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত সব চাইতে দুর্ধর্ষ ও বড় বাহিনীর নাম দেন ফারগানা। খুরাসানীরা ফারগানাদেরকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে থাকে। খলীফা মু'তাসিম যেহেতু নিজে শখ করে এ বাহিনীটি গঠন করেছিলেন তাই তাদের অশ্বও ছিল উন্নতজাতের। তাদের বেতন-ভাতাও ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি। এ জন্যে খুরাসানীরা বাগদাদে তাদের সাথে ঝগড়া-কলহে প্রবৃত্ত হয়। মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাদের এ অবাঞ্ছিত ঈর্ষা লক্ষ্য করে বাগদাদ থেকে নব্বই মাইল দূরবর্তী দজলা নদীর তীরে এবং কাতুন নদীর নির্গমন স্থলের নিকটে ফারগানা বাহিনীর সেনাছাউনি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজের বসবাসের জন্যেও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সৈন্যদের জন্যে ব্যারাকসমূহ নির্মাণ করান। বাজার, জামে মসজিদ প্রভৃতি জরুরী ঘরবাড়ি নির্মাণ করিয়ে এবং তুর্কীদের বসতি স্থাপন করে তিনি নিজেও এ নবনির্মিত শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যান।

তিনি শহরটির নাম রাখেন সুররামানরাআ (এর অর্থ হচ্ছে যে দেখে তার মন জুড়ায়—অনুবাদক)। বহুল ব্যবহারে তা সামেরা রূপ পরিগ্রহ করে। এ শহরটি ২৩০ হিজরীতে (৮৪৪ খ্রি) স্থাপিত হয় এবং ঐ বছর থেকেই বাগদাদের পরিবর্তে সামেরা রাজধানীতে পরিণত হয়। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তার জনসংখ্যা ও জৌলুস বাগদাদের সমপর্যায়ে চলে আসে। আরব ও খুরাসানীদের পরিবর্তে তুর্কীরাই এখন রাজধানী ও খলীফার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। ঐ বছরই মুহাম্মদ ইব্ন আলী রিযা ইব্ন মূসা কাযিম ইব্ন সাদিকের মৃত্যু হয় এবং বাগদাদে তিনি সমাহিত হন।

ফযল ইব্ন মারওয়ানের পদচ্যুতি

ঐ বছরই অর্থাৎ ২৩০ হিজরীতে (৮৪৪-৪৫ খ্রি) উযীরে আযম ফযল ইব্ন মারওয়ানের বিরুদ্ধে খলীফার কানে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। খলীফা হিসাব-পত্র যাচাই করার উদ্দেশ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সত্যি সত্যি দশ লক্ষ দীনারের তহবিল তসরুফ ধরা পড়ে। খলীফা এ পরিমাণ অর্থ ফযলের সম্পত্তি থেকে উসুল করে নেন এবং তাঁকে মুসেলের নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামে নজরবন্দী করেন। তাঁর স্থলে খলীফা মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইব্ন আবান ইব্ন হামযাকে উযীরে আযম নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যাইয়াত নামে বিখ্যাত। তাঁর পিতামহ আবান একটি গ্রামে বাস করতেন এবং সেখান থেকে তৈল এনে বাগদাদে বিক্রি করতেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক বাগদাদে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ওজরাতির মেয়াদ মু'তাসিম, ওয়াছেক এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খলীফা মামূনুর রশীদের আমলে যেমন কাযী ইয়াহইয়া ইবন আকছাম উযীরে আযম না হয়েও উযীরে আযমের চাইতে

বেশি ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ছিলেন এবং সর্বদা মামূনের সাথে সাথে তাকতেন ঠিক তেমনি মু'তাসিমের আমলে ঐ কাযী আকছামেরই জনৈক শাগরিদ আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ থাকতেন। তিনিও উযীরে আযম না হলেও উযীরে আযমের সম-পর্যায়ের সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা দু'জন উস্তাদ ও শাগরিদ কালাম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মু'তাযিলী ছিলেন। খালকে কুরআনের প্রশ্নে উলামাদের উপর মামূন ও মু'তাসিমের নির্যাতন-নিপীড়নের মূলে উক্ত দু'জনের প্রভাবই সমধিক কার্যকরী ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল ইব্‌ন আবূ দাউদই মু'তাসিমের দরবারে তখন এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন– যিনি আরবদের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর জন্যেই রাজধানী শহরে আরবদের যা একটু মর্যাদা ছিল, নতুবা সর্বদিক দিয়ে তুর্কীরা এবং তারপর ইরানীদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

বাবক খুররমী ও আফশীন হায়দার

বাবক খুররমী সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মামূনুর রশীদের প্রেরিত প্রত্যেক সিপাহসালারই তার হাতে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন। কারো নিকট সে পরাজিত হয়নি। উক্ত শহরকে সে তার বাসস্থানরূপে গ্রহণ করে এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকার ওপর তার প্রতিপত্তি ও দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়। আশেপাশের আমিল ও রঈসগণ তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তার লোকজনকে খাতির করতেন। খলীফা মু'তাসিম আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফকে বাবক খুররমীকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। আবূ সাঈদ প্রথমে আর্দবেল এবং আযারবায়জানের মধ্যকার যে সব দুর্গ বাবক ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল সেগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করেন। তার পর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহ করে বাবকের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাবক খুররমীর একটি সেনাছাউনি ঐ এলাকার কোন একটি স্থানে নৈশ আক্রমণ করে। আবূ সাঈদ সে সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তার পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হন। তাঁরা বাবকের বাহিনীর নিকটবর্তী হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। এ যুদ্ধে প্রথমবারের মত বাবক পরাজিত হয়। আবূ সাঈদ তার অনেক লোকজনকে হত্যা ও অনেককে গ্রেফতার করেন এবং নৈশ আক্রমণকালে তাদের ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যসম্ভার তাদের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করেন। তার এ প্রথম পরাজয়ের পরই যে সব সর্দার তার ভয়ে তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে যেতেন, কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা তাকে সমর্থন করতেন না এমন সব সর্দাররা ইসলামী বাহিনীর সমর্থনে এগিয়ে আসতে লাগলেন। বাবক খুররমীর ইসমত নামক জনৈক সিপাহসালার আযারবায়জান এলাকার জনৈক দুর্গাধিপতি মুহাম্মদ ইব্‌ন বাঈছের এখানে বসে উঠে। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাঈছ চিরাচরিত নিয়মানুসারে তাঁকে মেহমানদারী করেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে বিশেষ মর্যাদায় ও ব্যবস্থাপনায় রাখেন। রাতের বেলা তিনি ইসমতকে গ্রেফতার করে খলীফা মু'তাসিমের খিদমতে পাঠিয়ে দেন এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করেন। খলীফা মু'তাসিম ইসমতের নিকট বাবকের গোপন রহস্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ইসমত মুক্তিলাভের আশায় সবই খলীফাকে খুলে বলে। মু'তাসিম ইসমতকে বন্দী করে রাখলেন এবং বাবকের মুকাবিলায় কোন বড় ও দুর্ধর্ষ সিপাহসালারকে প্রেরণ করা জরুরী বিবেচনা করলেন যাতে সহসাই এ ফিতনার উচ্ছেদ ঘটে।

মু'তাসিমের সিপাহসালারদের মধ্যে হায়দার ইব্‌ন কাউস ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তিনি ছিলেন আশরুসনার বাদশাহজাদা। তাঁর খানদানী খেতাব ছিল আফশীন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর ইসলামী নামকরণ করা হয় হায়দার। এ জন্যে তিনি আফশীন হায়দার নামেই খ্যাতিলাভ করেন। তিনি সমস্ত ফারগানা রেজিমেন্ট অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি খলীফা মামূনুর রশীদের খিলাফত আমলেই মু'তাসিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তারই খিদমতে থাকতেন। মু'তাসিম সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর থাকাকালে আফশীন হায়দারের সামরিক খিদমত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সামরিক যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেন। তাই খিলাফতের দায়িত্বভার পেয়েই তিনি ফারগানা বাহিনী সংগঠিত করেন এবং ঈতাখ, আশনাস, আজিব, ওসীফ, বাগা কবীর প্রমুখকে সেনাপতি এবং আফশীন হায়দারকে প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। বলাবাহুল্য, এদের সকলেই ছিলেন তুর্কী।

এ সেনাপতিদের জন্যে সামেরায় মহল নির্মিত হয়। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ বাবকের শক্তি এবং দুর্গম পার্বত্য ঘাঁটির কথা লক্ষ্য রেখে আফশীন হায়দারকেই সেদিকে প্রেরণ করেন। তাঁর অধীন তুর্কী সৈন্যদের ছাড়াও খুরাসানী এবং আরব বাহিনীর সৈন্য ইউনিটসমূহও প্রেরিত হয়। জিহাদের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সংখ্যক আম মুজাহিদও তাঁর সাথে যান। আফশীন সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত চাতুর্য ও যোগ্যতার সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। মু'তাসিম আফশীনকে এত সাজ-সরঞ্জাম ও বিরাট বাহিনীসহ প্রেরণ করা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাদের সাহায্যার্থে ঈতাখের নেতৃত্বে নতুন বাহিনী প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পরে বাগা কাবীরকেও সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি দিয়ে প্রেরণ করেন। ফৌজের সমস্ত খরচাদি এবং যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতির খরচ ছাড়াও আফশীনের দৈনিক ভাতা ছিল দশ হাজার দিরহাম। অর্থাৎ যতদিন অবরোধ ও যুদ্ধ চলবে ততদিন তিনি দৈনিক দশ হাজার দিরহাম লাভ করবেন। এটা ছিল তাঁর নির্ধারিত বেতন-ভাতার অতিরিক্ত। যেদিন যুদ্ধ হতো না আফশীন তাঁর শিবিরে বা তাঁবুতে অবস্থান করতেন। খলীফার তহবিল থেকে ঐ দিনের অতিরিক্ত ভাতা তিনি পাঁচ হাজার দিরহাম করে পেতেন। বাবক বিরোধী যুদ্ধের জন্যে এটা ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। এ যুদ্ধ প্রায় দেড় বছর কাল চলেছিল।

আফশীন আর্দবেল পৌঁছে যুদ্ধছাউনি তৈরি করেন এবং এরূপ অনেক সেনাছাউনি অল্প অল্প ব্যবধানে গড়ে তুলেন যাতে যুদ্ধের রসদ এবং চিঠিপত্র বার্তা প্রভৃতি নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারে। তারপর বাবকের দখল ও প্রহরাধীন পাহাড়সমূহে প্রবেশ করে সৈন্যদেরকে সুবিধামত স্থানসমূহে ছড়িয়ে দিয়ে কোথাও ঝাণ্ডা মারফত, আবার কোথাও কাসেদ মারফত একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করে বাবকের সৈন্যদেরকে পিছু হটিয়ে এবং কেল্লার দিকে ঠেলে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। আকস্মিক নৈশ আক্রমণ এবং গোপন অবস্থানসমূহ থেকে হামলার খুবই আশঙ্কা ছিল। সেদিকেও আফশীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আবহাওয়া এবং শীতের প্রাবল্য আরব ও ইরাকী সৈন্যদেরকে তুর্কী ও খুরাসানী সৈন্যদের তুলনায় বেশি কাবু করে।

জা'ফর ইব্‌ন দীনার খাইয়াত স্বেচ্ছাসেবক ও মুজাহিদ তথা মিলিশিয়া বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি, ঈতাখ ও বাগা শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বাবক এবং তার সিপাহসালার আযীন ও তুররাখান প্রমুখও বেশ বীরত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করে। আফশীনের ঐ এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই বাবকের সাথে যুদ্ধরত আবূ সাঈদও আফশীনের অধীনে নিজের

বাহিনী ও নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে অবশেষে বাবক খুররমী পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে বন্দী অবস্থায় সামেরার খলীফা মু'তাসিমের দরবারে নীত হয়। বাবক ও তার ভাই মুআবিয়া ২২৩ হিজরীর শাওয়াল (৮৩৮ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে গ্রেফতার হয় এবং আফশীন ঐ বছরের সফর মাসে সামেরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

খলীফা মু'তাসিম যুদ্ধ জয় এবং বাবকের গ্রেফতারীর সংবাদ পেয়ে এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, আযারবায়জানের বরযন্দ মঞ্জিল থেকে সামেরা পর্যন্ত প্রতি মঞ্জিলে যেন খলীফার পক্ষ থেকে আফশীনকে একটি খিলাত ও সুসজ্জিত ঘোড়া পেশ করা হয় এবং তাঁর অভ্যর্থনায় রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়। আফশীন রাজধানী সামেরার সন্নিকটবর্তী হলে খলীফা স্বয়ং শাহযাদা ওয়াছিককে আফশীনের অভ্যর্থনার জন্যে শহরের উপকণ্ঠে প্রেরণ করেন।

আফশীন যখন খলীফার সম্মুখে দরবারে উপস্থিত হলেন তখন স্বর্ণমণ্ডিত আসনে তাঁকে বসিয়ে মাথায় মুকুট পরানো হলো। বহুমূল্য খিলাত এবং নগদ বিশ লক্ষ দিরহাম উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হলো। এ ছাড়াও উক্ত বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে আরো দশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করা হলো। বাবককে খলীফা মু'তাসিমের নির্দেশে সামেরায় হত্যা করা হয় এবং তার ভাইকে বাগদাদে পাঠিয়ে সেখানে তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। এরপর উভয়ের শবদেহ শূলিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বাবকের দাপট প্রায় কুড়ি বছর কাল ধরে চলেছিল। এই সময়-সীমার মধ্যে সে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষকে হত্যা করে। সাত হাজার ছয়শ মুসলমান নর-নারীকে তার বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করা হয়। বাবকের পরিবার থেকে সতেরজন পুরুষ ও ত্রিশজন মহিলাকে আফশীন গ্রেফতার করেন।

আমুরিয়া বিজয় ও রোমের যুদ্ধ

বাবক খুররমী মুসলিম বাহিনীর অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে রোমান অধিপতি নাওফিল ইব্‌ন মীকাঈলের কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখল যে, মুতাসিম তাঁর গোটা বাহিনীকে আমার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। বাগদাদ ও সামেরাসহ গোটা রাজ্যের প্রদেশসমূহ এখন সৈন্যশূন্য এবং সেনাধ্যক্ষের প্রায় সকলেই আমার বিরুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছেন। এটা আপনার জন্য বাগদাদ আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে, এ সুযোগ আপনি কোনক্রমেই হাতছাড়া করবেন না। মক্কা দখল করে আপনি সোজা বাগদাদ পর্যন্ত অগ্রসর হোন। বাবকের মতলব ছিল, রোম সম্রাট যদি আক্রমণ পরিচালনা করেন তাহলে মুসলিম বাহিনী নিশ্চিত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তার উপর চাপ অনেকটা কমে যাবে।

পত্রপাঠ মাত্র রোম সম্রাট একলক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে বাবকের সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। মুসলিম সৈন্যরা তখন রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি নিয়োগে সমর্থ। নাওফিল সর্বপ্রথম জিবাত্রা নামক স্থানে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার প্রতিরোধকারী পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে যান। এরপর তিনি মালাতিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানেও অনুরূপ ধ্বংসলীলা চালান।

২২৩ হিজরী ২৯শে রবিউস সানি (৮৩৮ খ্রি-এর মার্চ) মু'তাসিমের কাছে জিবাত্রা ও মালাতিয়ার ধ্বংস-যজ্ঞের সংবাদ পৌঁছে। সংবাদবাহক দূত তাঁকে এ কথাও জানায় যে,

জনৈকা হাশিমী বংশীয়া রমণীকে যখন রোমান সৈন্যরা টানাহেঁচড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে মু'তাসিম মু'তাসিম বলে চিৎকার করছিল। লাব্বায়িক! লাব্বায়িক!! বলে মু'তাসিম তৎক্ষণাৎ সিংহাসন থেকে উঠে অশ্বের উপর আরোহণ করলেন। রণ-দামামা বাজিয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু হলো। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ সেনাপতি মু'তাসিমের সহযাত্রী হলেন। মু'তাসিম তখন আজীফ ইব্‌ন আম্বাসা ও উমর ফারগানীকে দ্রুতগামী সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে অগ্রে প্রেরণ করলেন যাতে তাঁরা যথাসম্ভব শীঘ্র জিবাত্রায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের আশ্বস্ত করেন এবং রোমানদেরকে তাড়িয়ে দেন। উক্ত সেনাপতিদ্বয়ের জিবাত্রা পৌঁছার পূর্বেই রোমানরা পালিয়ে যায়।

এরপর খলীফা মু'তাসিমও স-সৈন্য সেখানে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে পৌঁছে খলীফা জানতে চান যে, রোমানদের সবচাইতে মশহুর মজবুত এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর কোন্‌টি? জবাবে লোকজন জানায় যে, আজকাল আমুরিয়ার চাইতে বেশি মজবুত দুর্গ নগরী দ্বিতীয়টি নেই। এছাড়া রোম সম্রাট নাওফিলের জন্মস্থান হিসাবেও এর অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। মু'তাসিম বললেন, আমার জন্মস্থান জিবাত্রায় যখন রোম সম্রাট ধ্বংস চালিয়েছে তখন জবাবে আমিও তার জন্মস্থান আমুরিয়া ধ্বংস করে ছাড়ব। সত্যি সত্যি তিনি এ অভিযানে এমনি সমরোপকরণ নিয়োগ করলেন যা ছিল অভূতপূর্ব। অগ্রবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন আশনাসকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুসআবকে তিনি তাঁর সাহায্যকারী সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতি ঈতাখকে এবং বাম বাহিনীর কর্তৃত্ব জা'ফর ইব্‌ন দীনার খাইয়্যাতকে প্রদান করলেন। মধ্যবাহিনীর সেনাপতিত্বে আজীফ ইব্‌ন আম্বাসাকে নিয়োগ করলেন। এবম্বিধ ব্যবস্থা গ্রহণের পর তিনি রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়লেন। গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন আজীফ ইব্‌ন আম্বাসাকে। সুলুকিয়ায় পৌঁছে নদী তীরে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। স্থানটি ছিল তারতুস থেকে একদিনের পথের দূরত্বে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইতিমধ্যেই আফশীনকে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের গভর্নর নিযুক্ত করে আর্মেনিয়ার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আফশীন আর্মেনিয়া থেকে আপন লোক-লশকর নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েন। মুসলিম বাহিনীর একটি দল অগ্রসর হয়ে আঙ্কুরা দখল করে ফেলে। সেখানে প্রচুর খাদ্য-শস্য মুসলমানদের দখলে আসে– যা তখন তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। রোম সম্রাট মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে আঙ্কুরায় তাদের মুখোমুখি হতে মনস্থ করলেন, কেননা এখানেই সর্ববিধ রসদপত্র ও খাদ্য-শস্যের সংকুলান ছিল। কিন্তু এখানে নিযুক্ত তাঁর সৈন্যবাহিনী ও সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তার অসন্তুষ্ট বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। এ সময় স্বয়ং রোম সম্রাট আফশীনকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আর্মেনিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পরাস্ত হয়ে তিনি আঙ্কুরার দিকে পশ্চাদপসরণ করে দেখতে পান যে, ইতিমধ্যেই আঙ্কুরা মুসলমানদের দখলে চলে গিয়েছে। অগত্যা তিনি আর্মেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। চতুর্দিক থেকে যুদ্ধসামগ্রী এনে যুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। এ দিকে খলীফা মু'তাসিম

আঙ্গুরায় অবস্থান করে সেনাপতি আফশীনের অপেক্ষায় থাকেন। আফশীন সেখানে উপস্থিত হয়ে খলীফার সাথে সহাবস্থানের গৌরব অর্জন করেন।

২২৩ হিজরীর শাবান (৮৩৮ খ্রি-এর জুলাই) মাসের শেষ দিকে খলীফা মু'তাসিম তাঁর লোক-লশকর নিয়ে আঙ্গুরা থেকে পুনরায় যাত্রা করেন। এ যাত্রায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে তিনি আফশীনকে দক্ষিণ বাহিনীর এবং আশনাছকে বাম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। নিজে ব্যূহের মধ্যবর্তী অবস্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে আমুরিয়া নগরী অবরোধ করে বসে। তারা মোর্চা কায়েম করে সাবাত এবং দাব্বাবার সাহায্যে নগর-প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ অবরোধ ২২৩ হিজরীর ৬ই রমযান (৮৩৮ খ্রি-এর জুলাই-সেপ্টেম্বর) থেকে শাওয়াল মাসের শেষ অবধি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবশেষে মুসলমানরা আমুরিয়া বিজয় করে সেখানকার লোকদের বন্দী ও হত্যা করে। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার মু'তাসিম ৫ দিন পর্যন্ত লোক-লশকর দিয়ে বিক্রি করান এবং অবশিষ্ট সবকিছু পুড়িয়ে দেন। তারপর আমুরিয়া নগরীকে ধূলিসাৎ করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। রোম সম্রাট নাওফিল পলায়ন করে কনসটান্টিনোপলে চলে যান। খলীফা মু'তাসিম বন্দীদেরকে আপন সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে তারতূসের দিকে যাত্রা করেন।

আব্বাস ইব্‌ন মামূনের হত্যা

সেনাপতি আজীফ ও আফশীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। খলীফা মু'তাসিম প্রায়ই আজীফের কাজকর্মের সমালোচনা করতেন এবং আফশীনের মুকাবিলায় এতে তাঁর অবমাননা হতো। ফলে আজীফের বিশ্বস্ততা বিঘ্নিত হলো। তিনি খলীফা মু'তাসিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফলে রোম সাম্রাজ্যে অভিযান চলাকালে তিনি খলীফা মামূনের পুত্র তাঁর সহযাত্রী আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, মু'তাসিমের হাতে বায়আত করে আপনি বড্ড ভুল করে ফেলেছেন। আপনি নিজে খলীফা পদপ্রার্থী হলে সেনাধ্যক্ষরা আপনাকেই খলীফারূপে বরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। আব্বাস তাঁর এই কথায় অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। আজীফের এরূপ পৌনপুনিক প্ররোচনায় আব্বাসের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্থির হয়, গোপনে গোপনে প্রথমে সেনাপতিদেরকে বশে আনতে হবে। তার যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে মু'তাসিম, আফশীন ও আশনাসকে হত্যা করে আব্বাসের খলীফা পদে আসীন হওয়ার কথা ঘোষণা করতে হবে। সলাপরামর্শ অনুসারে কাজ শুরু করে সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে খলীফারূপে আব্বাসকে বরণের জন্য প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু আমুরিয়া জয়ের পরে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে মু'তাসিম এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হন।

সর্বপ্রথম মু'তাসিম আব্বাসকে ডেকে গ্রেফতার করেন এবং তাঁকে আফশীনের হাতে তুলে দেন। তারপর মাশ্‌শার ইব্‌ন সাহল উমর ফারগানী ও আজীফকে পর পর গ্রেফতার করেন। সর্বাগ্রে মাশ্‌শার ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করা হলো। তারপর বানজ নামক স্থানে পৌঁছে আব্বাস ইব্‌ন মামূনকে একটি বস্তায় পুরে বস্তার মুখ সেলাই করে দেয়া হলো। এ অবস্থায়ই দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা গেলেন। তারপর নাসীবাঈন নামক স্থানে পৌঁছে একটি গর্ত খুঁড়ে উমর

ফাল্গানীকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলো। মুওসেল পৌঁছে আজীফকেও একটি বস্তায় পুরে বস্তার মুখ সেলাই করে দেওয়া হলো। ফলে, দম বন্ধ হয়ে তারও মৃত্যু হলো। সামেরায় পৌঁছে খলীফা মামূনুর রশীদের অবশিষ্ট সন্তানদেরকে গ্রেফতার করে একই ঘরে সকলকে আবদ্ধ করে রাখা হলো। একে একে সকলেই সেখানে মৃত্যুবরণ করলেন। মোটকথা, এই যাত্রায় খলীফা মু'তাসিম বিদ্রোহের সাথে জড়িত বলে সন্দেহকৃত সকলকেই বেছে বেছে হত্যা করলেন।

তাবারিস্তানের বিদ্রোহ

তাবারিস্তানের রঈস মাযইয়ার ইব্‌ন কারিন ছিলেন খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের অধীন। তিনি তাঁকে খারাজ দিতেন। কোন কারণে মাযইয়ার ও আবদুল্লাহর মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হলো। মাযইয়ার বললেন, আমি রাজধানীতে সরাসরি খলীফার কাছে খারাজ প্রেরণ করবো– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের কাছে নয়। আবদুল্লাহ্ এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি একে তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করলেন। কিছুদিন পর্যন্ত এ বিরোধ অব্যাহত থাকে। মাযইয়ার সরাসরি কেন্দ্রে খারাজ পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের প্রতিনিধির কাছে তা হস্তান্তরিত হতো।

বাবকের সাথে যুদ্ধ চলাকালে সেনাপতি আফশীন স্বাধীনভাবে খরচের অধিকার লাভ করেন। মু'তাসিম অহরহ তাঁর কাছে টাকা-পয়সা রসদপত্র প্রেরণ করতেন আর আফশীন অত্যন্ত কৃপণতার সাথে অর্থ ব্যয় করে উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁর স্বদেশ আশরুসনায় (তুর্কিস্তান এলাকায়) পাঠিয়ে দিতেন।

আযারবায়জান থেকে প্রেরিত এ সব দ্রব্যসম্ভার যেত খুরাসান হয়ে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির যখন জানতে পারলেন যে, আফশীন অহরহ রসদপত্র, অর্থ-সম্পদ ও সমর-সম্ভারাদি তার মাতৃভূমিতে প্রেরণ করেছেন তখন তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তিনি এ সব দ্রব্যসম্ভারের বাহকদেরকে বন্দী এবং সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ছিনিয়ে নিয়ে আটক করলেন। সাথে সাথে আফশীনকে পত্র লিখলেন যে, আপনার বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তি অমুক অমুক দ্রব্যসম্ভার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে বন্দী করেছি এবং দ্রব্যসম্ভার আমার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাগবন্টন করে দিয়েছি। কেননা আমি তুর্কিস্তানের উপর আক্রমণ করতে মনস্থ করছি এবং সে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। অবশ্য সেই সব লোকজন নিজেদেরকে আপনার লোক এবং আপনার প্রেরিত বলে পরিচয় দিয়েছে এবং নিজেরা চোর নয় বলে আমার কাছে প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি তাদের কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। কেননা তারা যদি চোরই না হতো তা হলে অবশ্যই আপনি এ ব্যাপারে অবহিত থাকতেন। তাই তাদের বক্তব্যকে আমি কোনক্রমেই সঠিক বলে মেনে নিতে পারিনি। পত্র পেয়ে আফশীন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং উত্তরে জানালেন, আসলে এরা চোর নয়, বরং আমার প্রেরিত লোক। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির এ পত্রের জবাব পেয়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু দ্রব্যসম্ভার আর ফেরত দিলেন না।

এর একটি গোপন রিপোর্ট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির খলীফা মু'তাসিম বরাবরে পাঠিয়ে দিলেন। বাহ্যত মু'তাসিম এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। প্রকৃত ব্যাপার ছিল

এই যে, আফশীন তার মাতৃভূমি আশরুসনাতে তার রাজত্ব কায়েমের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তার ধারণা ছিল যে, বাবকের যুদ্ধ শেষে সামেরায় প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথে মামূন তাকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করবেন। তখন তার নিজ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ হাতে আসবে। কিন্তু মু'তাসিম তাঁকে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়ার গভর্নর নিয়োগ করলেন। এভাবে তাঁর খুরাসানের গভর্নর হওয়ার সাধ পণ্ড হয়ে গেল।

তারপরেই রোমের যুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধে আফশীনকে অংশগ্রহণ করতে হলো। কিন্তু এবার স্বয়ং মু'তাসিম সাথে ছিলেন। শুরুর দিকে তিনি যদি কাউকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে থাকেন তো তিনি হচ্ছেন আজীফ—যাকে আফশীন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করতেন। আজীফের পরিণতির কথা ইতিপূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এবার আফশীন এক নতুন চাল চাললেন। তিনি তাবারিস্তানের শাসক মার্জিয়ারকে গোপনে একটি পত্র লিখে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলেন। সে পত্রের মর্ম ছিল এরূপ ঃ

"যরথুস্ত্র ধর্মের এখন আপনি ও আমি ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী নেই। বাবক এ ধর্মেরই সাহায্যার্থে সক্রিয় ছিল। কিন্তু আপন নির্বুদ্ধিতার জন্যেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। সে আমার উপদেশের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। এখনও একটা সুবর্ণ সুযোগ আছে। তা হচ্ছে, আপনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করুন। এরা আমি ছাড়া আর কাউকেই আপনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে না এটা নিশ্চিত। বর্তমানে আমার কাছে সবচাইতে বড় ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রয়েছে। আমি আপনার দলে ভিড়ে যাবো। তারপর আমাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে মাগরিবী, আরব ও খুরাসানী সৈন্যদের বাহিনী ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসবে না। মাগরিবী সৈন্যদের সংখ্যা একান্তই অল্প। আমাদের একটা ছোট্ট বাহিনীই তাদের মুকাবিলায় যথেষ্ট। আরবদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, একটি গ্রাস তাদের সম্মুখে দিয়ে পাথর দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। খুরাসানীদের জোরের অবস্থা হচ্ছে ফুটন্ত দুধের মত– ফুঁসে উঠে পরক্ষণেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একটু শক্তভাবে আঘাত করলেই তাদের অবসান ঘটতে পারে। আপনি যদি একটু সাহস করেন তা হলে আযারবায়জানের সেই পুরোনো ধর্ম আবারো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

মাযইয়ার পত্রখানি পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। প্রজাসাধারণের নিকট থেকে এক বছরের অগ্রিম রাজস্ব আদায় করে সমর-সম্ভার ক্রয় ও দুর্গ প্রাকারাদির সংস্কার সম্পন্ন করে বড় বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির মাযইয়ারের বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্র আপন চাচা হাসান ইব্ন হুসাইনকে একটি বাহিনী সাথে দিয়ে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এদিকে মু'তাসিমের নিকট যখন এ বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনিও রাজধানী থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের সাহায্যার্থে বাহিনী প্রেরণের ফরমান জারি করলেন। কিন্তু আফশীনকে সেদিকে গমনের নির্দেশ দিলেন না। ফলে মাযইয়ার বন্দী হয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের নিকট নীত হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির তাকে মু'তাসিমের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। হাসান ইব্ন হুসাইন যখন মাযইয়ারকে গ্রেফতার করেন তখন ঘটনাক্রমে আফশীনের উপরোল্লিখিত পত্রগুলো এবং এমর্মে আরো কিছু চিঠিপত্রও উদ্ধার করেন– যা মাযইয়ার আফশীনের কাছে

প্রেরণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির এ পত্রগুলোও খলীফা মু'তাসিমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু খলীফা তা সযত্নে তাঁর নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং বাহ্যত এগুলোর প্রতি কোন গুরুত্বই আরোপ করলেন না। এটা ২২৪ হিজরীর (৮৩৮ খ্রি) ঘটনা।

কুর্দিস্তানের বিদ্রোহ

তাবারিস্তানের বিদ্রোহ দমিত হতে না হতেই মুসেল এলাকায় জা'ফর ইব্ন ফিহের নামক জনৈক কুর্দী কুর্দদের এক বিরাট সংখ্যক লোককে সমবেত করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। এ প্রদেশটি যদিও আযাবরায়জান এবং আর্মেনিয়া প্রদেশ সন্নিহিত ছিল, এতদসত্ত্বেও মু'তাসিম তাকে দমনের জন্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আনাসকে জা'ফরকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তিনি এ যাত্রায়ও আফশীনকে পাঠালেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ তথায় উপনীত হয়ে ব্যূহ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। ২২৪ হিজরীর (৮৩৮ খ্রি) শেষ নাগাদও এ যুদ্ধের অবসান ঘটলো না দেখে মু'তাসিম তাঁর এক সেনাপতি ঈতাখকে একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করলেন। জা'ফর ইব্ন ফিহের যুদ্ধে নিহত হলো। তার সঙ্গী-সাথীরা নিহত ও বন্দী হলো। এ বিদ্রোহও সম্ভবত আফশীনের ইঙ্গিতে দেখা দিয়েছিল। ২২৫ হিজরীতে (৮৩৯ খ্রি) এ বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের বিদ্রোহ

আফশীন তাঁর জনৈক আত্মীয় মুনকাজারকে আযারবায়জানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে নিজে রাজধানীতে অবস্থান করতেন। মুনকাজার আযারবায়জানের এক পল্লীতে জনৈক খুরাসানীর প্রচুর গুপ্তধন লাভ করলেন। কিন্তু খলীফাকে তা অবগত না করে নিজে আত্মসাৎ করেন। মু'তাসিমের ঘটনা-পঞ্জিকাকার এ ঘটনার কথা মু'তাসিমকে অবহিত করেন। মুনকাজার তা অবগত হয়ে পঞ্জিকাকারকে হত্যা করতে উদ্যত হন। পঞ্জিকাকার আর্দবিলবাসীদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আর্দবিলবাসীরা মুনকাজারকে বাধা দিলে সে তাদেরকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। মু'তাসিম তা অবগত হয়ে মুনকাজারকে বরখাস্ত করে বরখাস্তপত্র আফশীনের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বগাকবীরকে মুনকাজারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ফৌজসহ আযারবায়জানের দিকে পাঠিয়ে দেন। সংবাদ পেয়ে মুনকাজার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং আর্দবিল থেকে বের হয়ে বগাকবীরের বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যুদ্ধে মুনকাজার পরাস্ত হলো এবং আর্দবিল বগাকবীরের দখলে আসলো। মুনকাজার পালিয়ে আযারবায়জানের একটি দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল। প্রায় এক মাসকাল দুর্গবন্দী থাকার পর তার সাথীরাই কোন এক অলস মুহূর্তে তাকে বন্দী করে বগাকবীরের হাতে অর্পণ করে। বগাকবীর তাকে সামাররায় নিয়ে এসে খলীফা মু'তাসিমের হাতে অর্পণ করলেন। খলীফা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।

আফশীনের ভীষণ পরিণতি

উপরোক্ত ঘটনায় আফশীনের ব্যাপারে খলীফার সন্দেহ ঘনীভূত হলো। আফশীনও টের পেলেন যে, খলীফা তার প্রতি ঘোর সন্দিহান। তাই তিনি রাজধানী থেকে পালিয়ে যাবার

ফন্দি-ফিকির করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি আপন প্রদেশ আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া হয়ে খযর অঞ্চল দিয়ে মাতৃভূমি আশরুসনা (মাওরাউন নাহর) চলে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু খলীফা মু'তাসিম যেহেতু মুনকাজার-এর স্থলে তাঁর নিজ লোককে স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাই সেখানে তার নিরাপত্তা ছিল না, তাই তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হলো না।

এরপর তিনি খলীফা, মন্ত্রী-মুসাহেব ও সর্দারগণকে আমন্ত্রণ করে সারাদিন ভোজে আপ্যায়ন করে ব্যস্ত রেখে সন্ধ্যা সমাগমে তারা যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন তখন অবসর বুঝে পালিয়ে যেতে মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে পুরোপুরি মনস্থির করার পূর্বেই ঘটনাচক্রে একদিন তিনি কোন কারণে রুষ্ট হয়ে ঘনিষ্ঠতম ভৃত্যকে একটু গালমন্দ করেন। ভৃত্যটি তখন সেনাপতি ঈতাখের কাছে এসে আফশীনের গোপন ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে দেয়। ঈতাখ তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে সঙ্গে করে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সমস্ত ব্যাপার খলীফাকে অবহিত করেন। খলীফা কালবিলম্ব না করে আফশীনকে দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং তার গায়ের উর্দি খুলে নিয়ে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। তারপর খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে এ মর্মে ফরমান লিখে পাঠালেন যে, অবিলম্বে মাওরাউন নাহরের শাসকরূপে নিযুক্ত আফশীন তনয় হাসানকে আশরুসনার তার বাসভবন থেকে বন্দী করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও। হাসান ইব্ন আফশীন প্রায়ই বুখারার শাসনকর্তা নূহ্ ইব্ন আসাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করতেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির হাসান ইব্ন আফশীনকে এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আমি তোমাকে বুখারারও শাসক নিযুক্ত করলাম। তুমি বুখারায় গিয়ে আমার এ পত্র নূহ্ ইব্ন আসাদকে দেখিয়ে বুখারার শাসনভারও আপন হস্তে তুলে নাও। এদিকে বুখারার শাসক নূহ্ ইব্ন আসাদকে ইতিপূর্বে তিনি এ মর্মে লিখে পাঠান যে, হাসান ইব্ন আফশীনকে আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। বুখারায় প্রবেশমাত্র তুমি তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। সত্যি সত্যি এভাবে হাসান ইব্ন আফশীন গ্রেফতার হয়ে মার্ভে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের দরবারে নীত হলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির বন্দী আফশীন তনয়কে মু'তাসিমের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। খলীফার দরবারে তার আগমন মাত্র খলীফা উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক কাযী আহমদ ইব্ন আবূ দাউদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আরো কতিপয় পারিষদকে নিয়ে গঠিত একটি কমিশনের হাতে আফশীনের তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। খলীফা মু'তাসিম তাৎক্ষণিকভাবে আফশীনকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু অন্য সর্দাররাও গোপনে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকতে পারেন এই সন্দেহে তিনি ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। এটা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কেননা তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাতে কোনরূপ সেনা অসন্তোষের অবকাশ ছিল না।

মু'তাসিম আফশীনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছিলেন। বাবকের সাথে যুদ্ধ চলাকালেই তিনি অবহিত হয়েছিলেন যে, আফশীন ইতিপূর্বেই তার যে পুত্রকে আশরুসনার

আমিল নিযুক্ত করিয়ে নিয়েছিলেন; তার কাছে রাজকীয় বাহিনীর রসদপত্র গোপনে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন আফশীন এমন এক দুর্ধর্ষ বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন যে, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অপরাজিত রয়ে খলীফাকে বিব্রত করে রেখেছিল। তাই মু'তাসিম এ ব্যাপারে টু শব্দটিও করেন নি। বাবকের যুদ্ধের সে কৃতিত্ব কোন মামুলী কৃতিত্ব ছিল না। তাই বাবকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আফশীনকে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি ও পুরস্কার না দেয়া বা তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে শাস্তি প্রদান করা স্বয়ং মু'তাসিমের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক হতো এবং এতে তাঁর দুর্নাম হতো। কৃতিত্বের পুরস্কার না দিলে তা তার অর্জনের নিদর্শন বলেই গণ্য হতো। এ ছাড়া তিনি তখনো আফশীনের মনোভাবের পরিবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু আফশীনের চিঠিপত্র ও কার্যকলাপের দ্বারা যখন তার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠলো তখন তাঁর এছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

উযীরে আযম ও অন্যান্য সর্দারের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আফশীনের মামলার শুনানী গ্রহণ ও তদন্তকার্য শুরু করলেন। প্রতিদিন কারাগার থেকে আফশীনকে আদালতে হাযির করা হতো এবং তার উপস্থিতিতেই সাক্ষীদের শুনানী গ্রহণ ও কাগজপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতো। মাযইয়ারকেও কারাগার থেকে সাক্ষীরূপে আদালতে হাযির করা হলো। আফশীনকে তার স্ব-লিখিত পত্রগুলো দেখানো হলো এবং পড়ে শুনানো হলো। আফশীন সবকিছু স্বীকার করলেন। মাযইয়ারও অকপটে সকল ব্যাপার খুলে বললেন। তারপর যে সব তথ্য প্রকাশিত হলো তাতে আফশীনের মুনাফিক হওয়ার কথা সুপ্রমাণিত হলো। তদন্তে প্রমাণিত হলো যে, সে কুরআন শরীফ, মসজিদ এবং মসজিদের ইমামগণের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করতো। যরথুস্ত্রের ধর্মগ্রন্থ প্রতিদিন সে পাঠ করতো এবং সর্বক্ষণ তা সাথে রাখতো। নবী করীম (সা)-এর শানে বেআদবী করতো, অথচ বাহ্যত মসজিদে হাযির হয়ে মুসলমানদের সাথে জামাআতে সালাতও আদায় করতো এবং ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলতো। মোদ্দাকথা, অকাট্যভাবে তার অমুসলিম মজুসী হওয়ার এবং মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহাসন দখল করে মজুসী রাষ্ট্র কায়েমের ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হলো। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মোকদ্দমার শুনানী ও তদন্তকর্ম সম্পন্ন হলো। মাযইয়ারকে চারশ বেত্রাঘাত এবং আফশীনকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হলো। মাযইয়ার বেত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলো এবং আফশীনকে শূলিতে চড়ানো হলো। দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয় শাস্তি হিসাবে এ শূলিতে ঝুলানোর কাজটি প্রকাশ্যে সম্পন্ন করা হলো। এটি ২২৬ হিজরীর শাবান (৮৪১ খ্রি জুন) মাসের ঘটনা। আফশীনের স্থলে ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুআয প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন।

মু'তাসিমের মৃত্যু

আফশীন সংকটের সুরাহা করে খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাঁর অধীনস্থ গোটা সাম্রাজ্যের সীমান্তসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর এ ব্যাপারেও যখন পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে কোন বিদ্রোহ বা অসন্তোষের আশংকা নেই; তিনি বললেন, যখন বনূ

উমাইয়ারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখন আমরা শাসন ক্ষমতার কোন অংশই ভোগ করিনি। কিন্তু এখন আমাদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বনূ উমাইয়ারা স্পেনে দিব্যি রাজত্ব করে যাচ্ছে। তাই এখন পশ্চিমাঞ্চলে (মাগারিতে) হামলা চালিয়ে সে রাজত্বও ছিনিয়ে নেয়া আমার কর্তব্য। সত্যি সত্যি আপন রাজকোষে, যুদ্ধসামগ্রী ও সামরিক প্রস্তুতির একটি নিরিখ নিয়ে তিনি আন্দালুস (স্পেনে) আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। এমনি সময় সংবাদ আসলো যে, ফিলিস্তীনে বসবাসকারী আবূ হারব ইয়ামানী যে নিজেকে বনূ উমাইয়া বংশীয় লোক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে– সে তার চতুর্দিকে প্রায় এক লক্ষ লোক জুটিয়ে নিয়ে বিদ্রোহের পাঁয়তারা করছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদিন ফিফিস্তীনে অবস্থানকারী উক্ত আবূ হারব কোন এক কার্য উপলক্ষে বাইরে গিয়েছিল। সে সময় জনৈক সৈন্য তার গৃহে পদার্পণ করে এবং রাত্রি যাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। বাড়ির রমণীরা সৈন্যটিকে স্থান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু সৈন্যটি রমণীদেরকে প্রহার করে বলপূর্বক বাড়ির পুরুষদের থাকার অংশে রাত্রি যাপন করে। আবূ হারব বাইরে থেকে এসে সৈন্যটির বলপূর্বক বাড়িতে অবস্থান এবং নারীদের প্রতি তার দুর্ব্যবহারের সংবাদ অবহিত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এদিকে শাসকের পক্ষ থেকে শাস্তির ভয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী জর্দানী এলাকার একটি পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। তিনি তাঁর চেহারার ওপর একটি নেকাব ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে ওয়ায-নসীহত করে বেড়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চারপাশে লক্ষাধিক ভক্ত জুটে গেল। খলীফার সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা তাঁর পতাকা তলে সমবেত হলো। মু'তাসিম রাজা ইব্‌ন আইউবকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তাকে দমনের জন্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু রাজা ইব্‌ন আইউব আবূ হারবের বিপুল সংখ্যক ভক্ত দেখে ভড়কে যান। তিনি যুদ্ধ শুরু করতে পিছপা হলেন। তিনি ভাবলেন আবূ হারবের কৃষিজীবী ভক্তদের কৃষিকার্যে মনোযোগী হওয়ার মওসুম আসার পূর্বে যুদ্ধ শুরু করা সমীচীন হবে না। এই অবস্থায়ই ২২৭ হিজরীর ২০শে রবিউল আউয়াল (৮৪২ খ্রি-এর ৯ই জানুয়ারী) খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র ইন্তিকাল হয়। বনূ উমাইয়ার সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়নি।

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াছিক বিল্লাহ্ অব্বাসী সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রজাসাধারণ নতুনভাবে তাঁর হাতে বায়আত হয়। মু'তাসিমের জানাযার নামাযের ইমামতি করেন ওয়াছিক বিল্লাহ্। সামার্‌রায় তাঁকে দাফন করা হয়।

মু'তাসিমের খিলাফতের বৈশিষ্ট্য

খলীফা মু'তাসিম যেহেতু তেমন শিক্ষিত ছিলেন না তাই তাঁর আমলে হারূনুর রশীদ ও মামূনের যুগের সেই জ্ঞানচর্চার জোর আর ছিল না। মু'তাসিম দেশ জয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শাসন আমলে রোম, খযররাজ্য, মাওরাউন নাহর, কাবুল, সিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় অর্জিত হয়। রোম সম্রাটের উপর তিনি যে মরণ আঘাত হানেন ইতিপূর্বে কোন মুসলিম শাসকের পক্ষে তেমন আঘাত হানা হয়নি। রোমের যুদ্ধ ও আমুরিয়া বিজয়ের সময়

ত্রিশহাজার রোমান সৈন্যকে হত্যা এবং অপর ত্রিশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করার মাধ্যমে রোমানদের মনে তিনি ত্রাসের সঞ্চার করেন। তাঁর দরবারে যত রাজরাজড়ার আগমন ঘটে তেমনটি আর কোন মুসলিম খলীফার দরবারে হয়নি। মু'তাসিম স্থাপত্য শিল্পেরও একজন শৌখিন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বাবুর্চিখানার প্রাত্যহিক ব্যয় ছিল এক হাজার দীনার।

তুর্কী গোলাম ক্রয় এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেও মু'তাসিমের খুব ঝোঁক ছিল। তিনি তাঁর খাস তুর্কী গোলামদেরকে বড় বড় সেনাপতির পদও দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে তুর্কীদের প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই তুর্কীরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইতিপূর্বে আরবদের মর্যাদা খর্বকারী খুরাসানীদের শক্তি ও মর্যাদা খর্ব করা। কালক্রমে এই তুর্কীরাই আব্বাসী খিলাফতের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মু'তাসিম এক-তৃতীয় শক্তিকে উদ্ভব ঘটিয়ে বিরাট ভুল করেন। অথচ তাঁর করণীয় ছিল আরবদের মধ্যে পুনঃশক্তি সঞ্চার করে তাদেরকে খুরাসানীদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেয়া। কিন্তু তাঁর বাপ-দাদারা যেহেতু পূর্ব থেকেই আরবদের পরিবর্তে খুরাসানীদের অধিকতর বিশ্বস্ত ও আপন বিবেচনা করে আসছিলেন তাই পিতৃপুরুষের সেই রীতিনীতিকে রাতারাতি পরিবর্তন করে নতুন পন্থা অবলম্বনে তিনি সাহসী হননি।

মুতাসিম খুরাসানীদের পূর্বের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কথাও সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন কেমন করে তাঁর বাপ-দাদারা বারবার খুরাসানী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন এবং এ সব ষড়যন্ত্রকে ভণ্ডুল করতে তাঁদের কত বেগ পেতে হয়েছে। তিনি এটাও জানতেন যে, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী উলুভীদের কী বিপুল প্রভাব আরব ও খুরাসানীদের উপর বিদ্যমান রয়েছে। উলুভীরা অহরহ এ দুই শক্তির সাহায্যও লাভ করে থাকেন। এমতাবস্থায় মু'তাসিম যদি উলুভীদের প্রভাবমুক্ত তৃতীয় একটি শক্তি গড়ে তোলেন তবে এজন্যে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুর্কীরা তখনও ইসলামের সাথে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেনি। তুর্কীদেরকে অনেক পূর্বেই পরাভূত করে বশ্যতা শৃংখলে আবদ্ধ করলেও তাদের মধ্যে কিন্তু ইসলামের সুষ্ঠু প্রচার হয়নি। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে তুর্কী এলাকাসমূহ যা মাওরাউন নাহর বলে খ্যাত—সাধারণত করদ তুর্কী প্রধানদের দ্বারাই শাসিত হতো। তারা কেবল ইসলামী খিলাফতকে রাজস্ব প্রদান করেই ক্ষান্ত হতো। তাদেরকে নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাতো না।

এহেন নওমুসলিম তুর্কীরা যখন লক্ষ্য করলো যে, প্রভূত উন্নতি করে তারাই এখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বৃহত্তম সামরিক শক্তি, তখন তারা ইসলামী খিলাফতের সিংহাসন দখলের স্বপ্নে বিভোর হলো। আফশীনের ঘটনাবলীতে সেই সত্যই বিধৃত হয়েছে। খলীফা মু'তাসিম অজ্ঞ হলেও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। তুর্কীদেরকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করে শক্তিশালী বানানোর যে নীতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন তার অনিষ্টকারিতা দূর করার মত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতাও তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাই তাঁর জীবদ্দশায় তুর্কীদের হাতে ইসলামী হুকুমতের কোন অনিষ্টও সাধিত হয়নি। তাঁর উত্তরাধিকারীরাও যদি তাঁর মত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হতেন বা তিনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তবে পরবর্তীকালে তুর্কীদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাবলীর উদ্ভবই হতো না।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এ সবই কল্পনামাত্র। আসলে সবচাইতে অনিষ্টকর ব্যাপার ও ত্রুটি ছিল এই যে, মুসলিম জাতির জন্য বংশানুক্রমিক রাজত্ব বা রাজতন্ত্রের অভিশাপকে স্বীকার করে নেয়া। পিতার পর পুত্রের সিংহাসনে আসীন হওয়ার এই ক্ষতিকর বিদআতই ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য চরম বিপর্যয়কর প্রতিপন্ন হয়। সিদ্দীকী ও ফারূকী যুগের খিলাফতের কল্যাণকর ব্যবস্থা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের দুর্দিন দেখা দেয়। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। মোদ্দাকথা মু'তাসিমের খিলাফতের যুগেই তুর্কীদের নবজীবনের যাত্রা শুরু হয়।

মু'তাসিমকে খলীফায়ে মুছাম্মান বা আট সংখ্যার খলীফাও বলা যেতে পারে। কেননা তাঁর সাথে 'আট' সংখ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। মু'তাসিম ছিলেন খলীফা হারূনুর রশীদের অষ্টম সন্তান। ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬ খ্রি) মতান্তরে ১৭৮ হিজরীতে (৭৯৪ খ্রি) তার জন্ম। এ দু'টি সংখ্যায় ৮ রয়েছে। ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখানেও ৮ সংখ্যাটি রয়েছে। আব্বাসীয় বংশের তিনি অষ্টম খলীফা। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৪৮ বছর। আটজন পুত্র ও আটজন কন্যা সন্তান রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর জন্ম বৃশ্চিক রাশিতে যা রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। তাঁর রাজত্বকাল হচ্ছে আট বছর আট মাস আট দিন। আটটি প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করেন। আটটি বড় বড় যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। তাঁর দরবারে আটজন সম্রাটের আগমন ঘটে। আফশীন, আজীফ, আব্বাস, বাবক প্রমুখ আটজন প্রধান শত্রুকে তিনি হত্যা করেন। আট লাখ দীনার আট লাখ দিরহাম, আট হাজার অশ্ব, আট হাজার গোলাম ও আট হাজার বাঁদী তিনি তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে যান। রবিউল আউয়াল মাসের আটদিন অবশিষ্ট থাকতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

খলীফা মামূনুর রশীদের মতো খালকে কুরআনের পাগলামি তাঁর মগজকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমন একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তাঁর অধিক মনোনিবেশের ফলে অনেক আলিম-উলামায়ে কিরামকে তাঁর হাতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এ ত্রুটিটি তাঁর জীবনে না থাকলে নিঃসন্দেহে তাঁকে আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলীফা বলে অভিহিত করা যেত। আব্বাসীয় বংশের প্রতাপ তাঁর আমলেই সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর পর ধীরে ধীরে এ বংশের পতনের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

ওয়াছিক বিল্লাহ্

ওয়াছিক বিল্লাহ ইব্‌ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ ইব্‌ন মাহদী ইব্‌ন মানসূর আব্বাসীর কুনিয়াত আবূ জা'ফর বা আবুল কাসিম। তাঁর আসল নাম ছিল হারূন। মক্কার রাস্তায় কারাতীস নাম্নী দাসীর গর্ভে ২০শে শাবান ১৯৬ হিজরীতে (৮১২ খ্রি মে) মাসে তার জন্ম হয়। তাঁর পিতা মু'তাসিম বিল্লাহ্ তাঁকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী রাজকুমার রূপে মনোনীত করেন। মু'তাসিমের মৃত্যুর পর তিনি খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণ লোক ছিলেন। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন এবং সুন্দর। তাঁর শুভ্র গাত্র বর্ণের সাথে জরদ বর্ণের ঝলক পরিলক্ষিত হতো। চোখের শুভ্র অংশে কাল তিল দেখা যেত। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের কবি ও সাহিত্যিক। আরবী সাহিত্যে তিনি মামূনের সমতুল্য বা তাঁর

চাইতেও উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে কিন্তু তিনি মামূনের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের ছিলেন। তিনি মামূনুর রশীদের জ্ঞানচর্চার মজলিসও দেখেছেন। জ্ঞানচর্চায় তিনি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। এ জন্যে তাঁকে ক্ষুদে মামূন বা দ্বিতীয় মামূন নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র এত বেশি আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল যে, আব্বাসীয় বংশের অন্য কোন খলীফার এত বেশি কবিতা মুখস্থ ছিল না। আপন পিতা ও পিতামহের মতো তিনিও অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদেরকে তিনি বড় বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করতেন। জ্ঞানীগুণীদের সমাদর করতেন। তাঁদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করাকে জরুরী বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু খালকে কুরআনের পৈতৃক উন্মাদ এত বেশি তাঁকে পেয়ে বসেছিল যে, অনেক বড় বড় আলিমকে এ প্রশ্নে নিজ হাতে হত্যা করে তিনি পুণ্যলাভের তৃপ্তিবোধ করতেন।

অন্তিম বয়সে এমনি এক ঘটনা ঘটলো যাতে তাঁর 'খালকে কুরআন' সংক্রান্ত তৎপরতায় ভাটা পড়ে এবং তা একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে আসে। ঘটনাটি ছিল এই— ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসাঈর উস্তাদ আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইজদী খালকে কুরআন বিরোধী মতবাদ পোষণের অপরাধে বন্দী হয়ে তাঁর দরবারে নীত হন। তাঁকে যথারীতি খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সেখানে কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদও উপস্থিত ছিলেন। এই কাযী সাহেব মু'তাসিমের আমল থেকেই দরবারে প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদা ভোগ করে আসছিলেন এবং তিনিও ঘটনাচক্রে খালকে কুরআনের ব্যাপারে খলীফার মতালবম্বী ছিলেন। অর্থাৎ তিনিও কুরআন শরীফকে সৃষ্ট ও অনিত্য বলে বিশ্বাস পোষণ করতেন। উক্ত কাযীকে আবূ আবদুর রহমান প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, প্রথমে বলুন দেখি নবী কারীম (সা) নিজে এ খালকে কুরআনের ব্যাপারটি অবগত ছিলেন কিনা ?

জবাবে কাযী আহমদ বললেন ঃ অবশ্যই নবী করীম (সা) এটা জানতেন। তখন আবূ আবদুর রহমান আবার প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, হুযূর (সা) কি লোকদেরকে কুরআন মাখলূক হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন ? কাযী আহমদ জবাবে বললেন ঃ না, হুযূর (সা) এরূপ কোন তা'লীম বা নির্দেশ দেন নি।

আবূ আবদুর রহমান তখন চিৎকার করে বললেন ঃ তা'হলে যে ব্যাপারে স্বয়ং হুযূর (সা) তা'লীম দেননি এবং এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি যেখানে লোকজনকে তা মানতে বাধ্য করেননি আপনারা এমন একটি ব্যাপারে লোকজনের মৌনতাকে কেন যথেষ্ট বিবেচনা করেন না বা তা মানতে কেনই বা আপনারা লোকজনকে বাধ্য করেন। এ কথাটি শোনামাত্র ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সম্বিত ফিরে এলো। তিনি তৎক্ষণাৎ দরবার থেকে উঠে আপন প্রাসাদে চলে গেলেন। তারপর একটি পালঙ্কে শয়ন করে বার বার বলতে লাগলেন ঃ যে ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (সা) কোনদিন কড়াকড়ি করলেন না, মৌনতা অবলম্বন করলেন ঠিক সেই ব্যাপারটি নিয়েই আমরা কঠোরতা আরোপ করছি। তারপর তিনি এ মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, আবূ আবদুর রহমানকে মুক্ত করে সসম্মানে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কর। সাথে সাথে তিনি তাঁকে ইনাম স্বরূপ তিনশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানেরও নির্দেশ দিলেন।

আবূ হারব ও দামেশ্কবাসী

খলীফা মু'তাসিমের আলোচনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রিযা ইব্ন আইউবকে মু'তাসিম আবূ হারব ইয়ামানীকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তিনি আবূ হারবের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এমনি সময় মু'তাসিম বিল্লাহর ইন্তিকাল এবং ওয়াছিক বিল্লাহর সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা ঘটে। মু'তাসিমের মৃত্যু সংবাদ দামেশকে পৌঁছতেই দামেশকবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের আমীরকে প্রাদেশিক রাজধানীতে গৃহে বন্দী করে। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ লোক-লশকর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রচুর লোকবল যোগাড় করে।

এ সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছামাত্র ওয়াছিক বিল্লাহ্ রিযা ইব্ন আইউবকে দামেশকবাসীদের প্রতি মনোনিবেশ করার এবং তাদেরকে সমুচিত শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়ে পাঠান। এ সময় রিযা ইব্ন আইউব রামাল্লায় আবূ হারবের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে রত ছিলেন। খলীফার উক্ত নির্দেশ পাওয়া মাত্র স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে আবূ হারবের সাথে যুদ্ধের জন্য রেখে অবশিষ্ট গোটা বাহিনী নিয়ে দামেশকের দিকে অগ্রসর হলেন। দামেশকবাসীরাও সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তার জবাব দিল। প্রচণ্ড যুদ্ধে দামেশকবাসীদের দেড় হাজার এবং রিযা ইব্ন আইউবের দলের তিনশ লোক নিহত হলো। পরাস্ত হয়ে দামেশকবাসীরা সন্ধির আবেদন জানালো এবং এভাবেই এ বিদ্রোহের অবসান ঘটলো। দামেশকের বিদ্রোহ দমন করে রিযা ইব্ন আইউব পুনরায় রামাল্লায় যান এবং যুদ্ধে আবূ হারবকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। আবূ হারবের বিশ হাজার সঙ্গী এ যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

আশনাসের উত্থান ও পতন

খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই তুর্কী গোলাম আশনাসকে তাঁর সহকারী খলীফা নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা তারই হাতে তুলে দেন। মু'তাসিম বিল্লাহ্র আমলের উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যাইয়াত ওয়াছিকের খিলাফত আমলেও স্বপদে বহাল থাকেন। আশনাসকে প্রদত্ত নায়েবে সালতানাত পদটি ছিল ওয়াছিক বিল্লাহর একান্তই নব উদ্ভাবিত।

নায়েবে সালতানাত খলীফার পূর্ণ ক্ষমতা নিজে ব্যবহার করতেন। তিনি পদমর্যাদায় রাজ্যের তাবৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মত উযীরে আযমেরও ঊর্ধ্বতন কর্তা বলে বিবেচিত হতেন। এ অবধি অন্য কোন খলীফা এরূপ সর্বময় ক্ষমতা অন্য কারো হাতে অর্পণ করেননি।

আফশীনের নিহত হওয়ায় যদিও তুর্কীদের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব এবং তাদের মন ব্যথিত হয়ে গিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাদের সৈন্য, পল্টন ও ব্যাটেলিয়নসমূহ পূর্ববৎ বহাল ছিল। তাদের মান-মর্যাদাও ছিল পূর্ববৎ অটুট। এবার ওয়াছিক বিল্লাহ্র ক্ষমতার মসনদে আরোহণের সাথে সাথে রাজ্যের পূর্ণ ক্ষমতা একজন তুর্কীর হাতে তুলে দেয়ায় মুসলিম জাহানে যেন তুর্কীদেরই রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। এ ক্ষমতার সুখ দীর্ঘকাল আশনাসের কপালে সয় নাই। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার ক্ষমতার আওতা সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা এমনি একটি নজীর প্রতিষ্ঠিত হলো যে, কালক্রমে তারাই আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওয়াছিক বিল্লাহ যেহেতু জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, তাই তিনি জ্ঞানীগুণী ও পারিষদদেরকে নিয়ে জ্ঞানচর্চার মজলিসে বসতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণে কাটিয়ে দিতেন। জ্ঞানীগুণীদের অধিকাংশই যেহেতু আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন তাই তাঁরা এ সুযোগে হারূনুর রশীদের আমলের ঘটনাবলীও শোনাতেন এবং সাথে সাথে বারমাকীদের জ্ঞানানুরাগ ও বদান্যতার কথাও বলতেন। ফাঁকে ফাঁকে তাঁর রাজসরকারে তাদের উচ্চক্ষমতা লাভ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসও তাঁর কর্ণগোচর করতে ত্রুটি করতেন না। ফলে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সম্বিত ফিরে আসে। তখন তিনি তুর্কী ও খুরাসানী আমীর-উমারার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। ফলে তুর্কী আশনাসের ক্ষমতার পরিধিও সংকুচিত হয়ে আসলো। এ অবস্থায় ২৩০ হিজরীতে (৮৪৪-৪৫ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়।

আরবদের মর্যাদা খর্ব

এ যাবত আব্বাসীয় খলীফাগণ আরবদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা খর্বই করে আসছিলেন। তাঁরা দিন দিন আজমী মানে অনারবদের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেই চলেছিলেন। তা সত্ত্বেও আরব ইসলামের পীঠস্থান এবং আরবরা ইসলামের আদি সেবক হওয়ায় সাধারণ্যে আরবদের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। স্বয়ং খলীফার পরিবার ছিল একটি আরব পরিবার। সেহেতু আজমীরা কোনদিন আরবদের সম্ভ্রম নষ্ট করার কথা ভাবতে বা সে সুযোগ নিতে সাহসী হয়নি। খলীফাগণও কোন দিন হিজায বা ইয়ামানের কোন আরব কবীলাকে দমনের উদ্দেশ্যে কোন খুরাসানী বা তুর্কীবাহিনীকে প্রেরণ করেননি বরং এ সব আরব প্রদেশের বিশৃঙ্খলা দমনের প্রয়োজন দেখা দিলে তারা আরব, ইরাকী বা সিরিয়ান সৈন্যদের কোন বাহিনী পাঠিয়ে তা করতেন।

এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের ফলে আরবদেরকে সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়া হলেও তাঁদের প্রতি একটি শ্রদ্ধাবোধ জনমনে বিরাজমান ছিল। তাঁদের এ বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে কারো মনে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। এবার খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র আমলে একটি ঘটনায় আরবদের সে মর্যাদাটুকুও ছিনিয়ে নেয়া হলো সে ঘটনাটি ছিল এরূপ ঃ

মদীনার উপকণ্ঠে বনূ সুলায়ম গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক বসবাস করতো। তারা একবার বনূ কিনানার উপর আক্রমণ করলো এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করলো। আরবদের মধ্যে এ জাতীয় লুটপাটের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ছিল এই যে, এখন আর তাঁরা রাজসরকারের চাকরিতে বা সৈন্যবাহিনীতে স্থান পাচ্ছিল না। আব্বাসীয় খলীফাগণ ক্রমান্বয়ে তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে ছাঁটাই করে দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আরবদের সামরিক প্রতিভা এখন লুটপাট, ডাকাতি, রাহাজানিতে রূপান্তরিত হতে লাগলো। মদীনার আমিল মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ্ বনূ সুলায়মের এ সীমালংঘনের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাদেরকে দমনের জন্যে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু বনূ সুলায়ম গোত্রীয়রা এ বাহিনীকে পরাস্ত করলো। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী গোটা এলাকা দেখতে দেখতে অশান্ত হয়ে উঠল। কাফেলাসমূহের যাতায়াতে অচলাবস্থা দেখা দিল। এ সংবাদ অবগত হয়ে ওয়াছিক বিল্লাহ্ তাঁর তুর্কী সিপাহ্‌সালার বগাকবীরকে তাঁর দুর্ধর্ষ তুর্কী বাহিনীসহ সে বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরণ

করলো। বগাকবীর ২৩০ হিজরীর শাবান (৮৪৫ খ্রি মে) মাসে সসৈন্যে মদীনায় গিয়ে উপনীত হলো। বনূ সুলায়মের সাথে তাঁর কয়েকটি যুদ্ধ হলো। অবশেষে বনূ সুলায়ম গোত্রীয়রা পরাভূত হলো। তাদের এক হাজার লোক বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হলো। এবং বেশ কয়েক শত লোক নিহত হলো।

বগাকবীর প্রায় চার মাস ধরে তাঁর তুর্কী বাহিনীসহ মদীনায় অবস্থান করে আরব গোত্রসমূহকে নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিড়ম্বিত ও সন্ত্রস্ত করে তুললেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে বগাকবীর বনূ বিলাল গোত্রের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাদেরকেও বনূ সুলায়মের মত নানাভাবে শায়েস্তা করতে লাগলেন। তিনি তাদের তিনশ লোককে গ্রেফতার করে কারাবন্দী করলেন। তারপর বনূ মুররা গোত্রের দিকে তিনি মনোনিবেশ করলেন। ফাদাকে গিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করে বনূ কাজারা ও বনূ মুররার প্রচুর লোককে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে এসে তাদেরকেও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তারপর একে একে বনূ গোত্রীর বনূ ছা'লাবা ও আশজা গোত্রের রঈসদেরকে তলব করে তাদের নিকট থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করলেন। তারপর তিনি বনূ কিলাবের তিন হাজার লোককে ধরে এনে দু' হাজারকে ছেড়ে দিয়ে এক হাজারকে কারাগারে প্রেরণ করলেন। তারপর ইয়ামামায় গিয়ে বনূ নুমায়রের পঞ্চাশ ব্যক্তিকে হত্যা করে চল্লিশ জনকে বন্দী করলেন।

ইয়ামামাবাসীরা রুখে দাঁড়ালো। বগাকবীর কয়েকটি যুদ্ধে তাদের দেড় হাজার লোককে হত্যা করলেন। যুদ্ধের সে দাবানল না নিভতেই ওয়াছিক বিল্লাহ আরও একজন তুর্কী সেনাপতিকে নতুন তুর্কী বাহিনী দিয়ে বগাকবীরের সাহায্যার্থে ইয়ামামায় প্রেরণ করলেন। বগাকবীর এবার নবোদ্যমে গোটা ইয়ামামায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলেন। ইয়ামামাবাসীরা সেখান থেকে পালালে তারা ইয়ামান পর্যন্ত গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং হাজার হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করলেন। মোদ্দাকথা, আরব গোত্রসমূহকে মনের মত করে পদদলিত ও বিড়ম্বিত করে তারা দুশ আরব রঈসকে বন্দী করে বাগদাদে নিয়ে আসলেন।

যারা ইতিমধ্যেই মদীনার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এরা ছিলেন তাদের অধিক। মদীনায় পৌঁছে তারা মুহাম্মদ্ ইব্ন সালিহকে লিখে পাঠালেন যে, মদীনার বন্দীদেরকে নিয়ে বাগদাদে এসে উপনীত হও। মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ্ সে হুকুম তামিল করে বন্দীদের বাগদাদে এনে পৌঁছালেন। এবার সকলকেই একত্রে বাগদাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। বগা-কবীর এভাবে দীর্ঘ দু'বছর ধরে এভাবে তুর্কীদের হাতে আরবদেরকে হত্যা করিয়ে করিয়ে তাদের অবমাননার হদ্দ করলেন।

২৩০ হিজরীতে (৮৪৪-৪৫ খ্রি) খুরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির ইন্তিকাল করলে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পুত্র তাহির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন তাহিরকে খুরাসান, কিরমান, তাবারিস্তান ও রে-এর গভর্নর পদে সমাসীন করলেন।

আহমদ ইব্ন নসরের বিদ্রোহ ও পতন

আহমদ ইব্ন নসর ইব্ন মালিক ইব্ন হায়ছাম খুযাঈর পিতামহ মালিক ইব্ন হায়ছাম খুযাঈ ছিলেন আব্বাসীয় বংশের খিলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম নকীব। আহমদ ইব্ন নসর প্রায়ই

মুহাদ্দিসদের সাহচর্যে থাকতেন, তাই তিনিও একজন সেরা মুহাদ্দিস বলে গণ্য হতেন। তিনি খালকে কুরআন সংক্রান্ত আব্বাসী খলীফাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। এ জন্যে বনী আব্বাস বংশের খিলাফতের বিরোধী প্রচুর সংখ্যক লোক তাঁর হাতে এসে বায়আত গ্রহণ করে। ফলে ২৩১ হিজরীর ৩রা শাবান (৮৪৬ খ্রি মার্চ) আহমদ ইব্‌ন নসর বাগদাদে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। বাগদাদের পুলিশ কর্মকর্তা অত্যন্ত সন্তর্পণে আহমদ ইব্‌ন নসরকে গ্রেফতার করলেন।

আহমদ ইব্‌ন নসর ও তাঁর সঙ্গে যারা গ্রেফতার হলেন তাঁরা সামর্‌রায় ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নীত হলেন। ওয়াছিক স্বহস্তে আহমদ ইব্‌ন নসরকে হত্যা করে তার খণ্ডিত দেহ ও শির বাগদাদে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর খণ্ডিত দেহ বাগদাদের তোরণে এবং শির বাগদাদের পুলের উপর ঝুলিয়ে রাখা হলো। শিরের সাথে একজন প্রহরী এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হলো যেন সে বর্শার দ্বারা সব সময় শিরকে কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর তাঁর কানে একটি ছিদ্র করে এ মর্মে একটি চিরকুট লিখে রাখা হলো যে, "এ শির আহমদ ইব্‌ন নসরের। খলীফা তাকে খালকে কুরআনের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সে তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা কালবিলম্ব না করে তাকে দোযখের আগুনের দিকে টেনে নিয়েছেন। অবশ্য আহমদ ইব্‌ন নসরের হত্যার এ ঘটনাটি পূর্ব বর্ণিত আবূ আবদুর রহমানের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইজদীর ঘটনাটির পূর্বের।

রোমানদের সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়

রোমানদের সাথে যুদ্ধের ঘটনা অহরহ ঘটেই আসছিল। মুসলমানরা সর্বদাই যুদ্ধে রোমানদেরকে পরাস্ত করে এসেছে এবং কখনো কখনো তাঁরা যুদ্ধ জয় করতে করতে কনসটান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু কোনদিনই রোমান সাম্রাজ্যের শিকড় গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে পারেননি। এর কারণ হচ্ছে খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে পারস্য সাম্রাজ্যের শাহানশাহী খতম হয়ে গেলেও রোমান সম্রাটগণ তখনো বর্তমান ছিলেন। যদিও শাম, ফিলিস্তীন, মিসর প্রভৃতি দেশ মুসলমানরা রোমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কনসটান্টিনোপল বিজয় করে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়বার পূর্ণ প্রস্তুতি সত্ত্বেও তার পূর্বেই তাঁদের মধ্যে আত্মকলহ এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যে, কনসটান্টিনোপল ও ইউরোপ মুসলিম বাহিনীর অশ্বখুরের দ্বারা দলিত হতে হতে বেঁচে গেল। মুসলমানদের এ আত্মকলহ এমনিভাবে স্থায়িভাবে বাসা বেঁধে বসলো যে, কোনদিনই কোন মুসলিম খলীফা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং বিদ্রোহের আশঙ্কামুক্ত হয়ে ইউরোপ বিজয়ের দিকে পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে ওঠেননি।

মোট কথা, মুসলমানদের আত্মকলহ কনসটান্টিনোপলের কাইজার এবং ইউরোপের দেশসমূহের রক্ষাকবচ বনে গেল। রোমানদের সাথে সীমান্ত যুদ্ধের ধারা সর্বদাই চালু ছিল। মাঝে মাঝেই মুসলিম খলীফাগণ রোমমুল্লুকের ঈসায়ী সম্রাটদের বাহিনীকে আক্রমণ করে। তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে পুনরায় সত্বর নিজেদের রাজধানীতে ফিরে আসতেন। এমনটি কখনো হয়নি যে, উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে তাঁরা রাজধানী থেকে বাইরে কোন বিজিত রোমান রাজ্যে অবস্থান করেছেন। ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র খিলাফত আমলেও রোমানদের সাথে

সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। খলীফা হারূনুর রশীদের আমলে দু'-দু'বার মুসলিম ও খ্রিস্টান বন্দীদের বিনিময় হয়েছে। মুসলমানগণ তাদের হাতে বন্দী খ্রিস্টান সৈন্যদেরকে এবং বিনিময়ে খ্রিস্টানগণ মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্তিদান করেছে। এ বন্দী বিনিময়পর্ব পূর্বেও লামেস নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এবারও ২৩১ হিজরীর ১০ই মুহররম (৮৪৫ খ্রি ১৭ সেপ্টেম্বর) তৃতীয়বারের মত এ একই লামেস নদীর উভয় তীরে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র যুগে অনুষ্ঠিত হলো। এ উদ্দেশ্যে উক্ত নদীতে পাশাপাশি দু'টি পুল নির্মিত হলো। একটি পুলে করে ঈসায়ী কয়েদীরা ওদিকে যাচ্ছিল। আর অপর পুলে করে মুসলমান বন্দীরা এদিকে আসছিল। ওয়াছিক বিল্লাহ্ এ উদ্দেশ্যে খাকানকে ঈসায়ী বন্দীদেরকে সাথে দিয়ে লামেস নদীর তীরে পাঠিয়ে দেন। সমসংখ্যক কয়েদীর বিনিময় পর্ব সম্পন্ন হলে দেখা গেল যে, খ্রিস্টান রাজ্য থেকে ফেরত আসা মুসলিম বন্দীর সংখ্যা চার হাজার ছশ জন, তখনও কিন্তু অনেক খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দী মুসলমানদের হাতে রয়ে গিয়েছে। খাকান এ অবশিষ্ট খ্রিস্টান সৈন্যদেরকেও কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই এই বলে রোমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন যে, এ বিনিময়ের ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চাই রোমান খ্রিস্টানদের প্রতি আমাদের বদান্যতার নিদর্শন স্বরূপ।

ওয়াছিক বিল্লাহর ওফাত

ওয়াছিক বিল্লাহ্ জলাতঙ্গ রোকে আক্রান্ত হন। তাঁর সারা দেহে ফোস্কা দেখা দিল। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁকে উত্তপ্ত তন্দুরের উপর বসিয়ে দেয়া হলো। এতে রোগের প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পেল। পরদিন ততোধিক উত্তপ্ত তন্দুরের উপর ততোধিক সময় তাঁকে বসিয়ে রাখা হলো। ফলে তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তন্দুরের উপর থেকে তুলে তারপর তাঁকে বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে পাল্কীতে করে বাইরে মুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু ভূমিতে তাঁকে রাখা হলে দেখা গেল তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। অনতিবিলম্বে কাযী আহমদ ইব্‌ন দাউদ, উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, সেনাপতি ঈতাখ ওসীফ, উমর ইব্‌ন ফারাহ প্রমুখ খলীফার প্রাসাদে পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র নয় বছর বয়স্ক কচি শিশু পুত্রকে খলীফা পদে বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এ সময় ওসীফ সমবেত পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"আপনাদের কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই যে, একটি কচি শিশুকে খলীফার গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিচ্ছেন।" তাঁর এ বক্তব্য শুনে সকলের চৈতন্যোদয় হলো। তাঁরা একজন যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা পদে বরণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। অবশেষে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র ভাই জা'ফর ইব্‌ন মু'তাসিমকে ডেকে এনে খিলাত পরিয়ে খলীফার আসনে বসালেন। তাঁরা তখন তাঁকে মু'তাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত করলেন। মু'তাওয়াক্কিল খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেই সর্বপ্রথম ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র জানাযার নামায পড়ালেন এবং তাঁকে দাফনের আদেশ জারি করলেন।

মক্কার পথে হারূনী নামক স্থানে ওয়াছিক বিল্লাহকে দাফন করা হলো। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর নয় মাস মাত্র। ছত্রিশ বছর চার মাস বয়সে ২৩২ হিজরীর ২৪শে যিলহজ্জ (৮৪৭ খ্রি-এর আগস্ট) রোজ বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ও

সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু খালকে কুরআনের প্রশ্নে তিনি অনেক বাড়াবাড়ি করেন। শেষ বয়সে তাঁর এ পাগলামি স্বভাব বিদূরিত হয়।

শিক্ষণীয় ঃ মৃত্যুর পর খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহর শবদেহটি কিছুক্ষণ একাকী রেখে দিয়ে সকলে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহর বায়আত গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় একটি শুশুক এসে ওয়াছিক বিল্লাহর চোখ দু'টি খুলে খেয়ে ফেলে।

মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ ইব্ন মু'তাসিম বিল্লাহ ইব্ন হারূনুর রশীদের আসল নাম জা'ফর ও কুনিয়াত আবুল ফযল। ২০৭ হিজরী (৮২২-২৩ খ্রি) সুজা নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ওয়াছিক বিল্লাহ্র মৃত্যুর পর ২৩২ হিজরীর ২৪শে যিলহজ্জ (৮৪৭ খ্রি-এর আগস্ট) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সৈন্যদের আটমাসের বেতন-ভাতা প্রদান করেন। আপন পুত্র মুনতাসিরকে তিনি হারামাইন, ইয়ামান ও তাইফের শাসনভার অর্পণ করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মালিকের পদচ্যুতি ও মৃত্যু

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন যাইয়াত মু'তাসিমের খিলাফতের আমল থেকেই উযীরে আযমের গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ওয়াছিক বিল্লাহ্র খিলাফত আমলেও তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ-এর আমলে মাত্র একমাস কাল প্রধানমন্ত্রীরূপে থাকার পর তিনি খলীফার বিরাগভাজন ও পদচ্যুত হন। ঘটনা হচ্ছে, ওয়াছিক বিল্লাহ্ একবার তাঁর রাজত্বকালে তাঁর ভাই মুতাওয়াক্কিলের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

মুতাওয়াক্কিল তখন উযীরে আযম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিকের শরণাপন্ন হলেন এবং খলীফার কাছে তার জন্য সুপারিশ করে আমীরুল মু'মিনীনকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিতে বলেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক দীর্ঘকাল ধরে প্রধানমন্ত্রী থাকায় অনেকটা দাম্ভিক ও রুক্ষ মেযাজের অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নেহাত উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনেকটা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, তুমি নিজের চরিত্র সংশোধন কর, তা হলে খলীফা এমনিতেই তোমার প্রতি প্রীত হবেন, কারো সুপারিশের কোন প্রয়োজন হবে না। তারপর আবার ওয়াছিক বিল্লাহ্র কাছে মুতাওয়াক্কিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, সে আমার কাছে সুপারিশের জন্যে এসেছিল, কিন্তু তার মাথায় মেয়েলী ধরনের লম্বা চুল দেখে আর পাত্তাই দেইনি। ওয়াছিক বিল্লাহ্ তখন মুতাওয়াক্কিলকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং প্রকাশ্য দরবারে নাপিত ডাকিয়ে তার মাথা মুণ্ডন করিয়ে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দেন। সব অপমানের মূলে যেহেতু মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক তাই খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার এক মাস যেতে না যেতেই মুতাওয়াক্কিল ঈতাখকে নির্দেশ দিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিককে তার স্বগৃহে গ্রেফতার করে গোটা রাজ্যে পত্র পাঠিয়ে দাও যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিকের যে কোন সম্পদ যেখানেই থাক না কেন তা যেন বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়। নির্দেশ মোতাবেক ঈতাখ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিককে গ্রেফতার করলেন এবং তাঁর সমস্ত অর্থ-সম্পদ বাগদাদে আনিয়ে বায়তুলমালে জমা করে দেয়া হলো। কারাগারের কঠোরতা

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের সহ্য হলো না এবং ২৩৩ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৮৪৭ খ্রি-এর অক্টোবর) কারাবন্দী অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হলো। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পর উমর ইব্‌ন ফারাহকেও একই বছর রমযান মাসে অনুরূপভাবে গ্রেফতার করে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর এগার লাখ দিরহাম অর্থদণ্ড আদায় করে মুক্তি দেয়া হয়।

ঈতাখের বন্দীত্ব ও মৃত্যু

ঈতাখ ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাস। প্রথমে তিনি সালাম ইব্‌ন আবরাসের কাছে ছিলেন এবং পাচকের কাজ করতেন। এ জন্যে শেষ অবধি তিনি ঈতাখ তাব্বাখ বা পাচক ঈতাখ নামেই মশহুর হন। খলীফা মু'তাসিম বিচক্ষণতা, মার্জিত রুচি ও সুন্দর সুঠাম দেহবল্লরীর জন্য অভিভূত হয়ে ১৯৯ হিজরীতে (৮১৪-১৫ খ্রি) সালাম আবরাসের নিকট থেকে তাকে কিনে নেন। লোকটি যেহেতু অত্যন্ত পারঙ্গম এবং বিচক্ষণ ছিলেন তাই শীঘ্রই উন্নতি করে মু'তাসিমের আমলেই অনেক মাল-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন। রাজকীয় বিরাগভাজনরা সাধারণত তারই ঘরে বন্দী থাকতেন, তাঁরই দায়িত্বে তাদেরকে রাখা হতো। আজীফ, মামূনুর রশীদের সন্তানবর্গ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, উমর ইব্‌ন ফারাহ্ প্রমুখ তাঁরই তত্ত্বাবধানে বন্দী থাকেন ও নিহত হন। সমর বিভাগ তথা স্বরাষ্ট্র দফতর তাঁরই অধীনে ছিল। হাজিব (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান) ও দৌত্যকর্মের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঈতাখ বাগদাদের উপকণ্ঠে পৌঁছলে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশ অনুসারে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম তাঁকে দাওয়াত করে বাগদাদে গ্রেফতার করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় মানসূর ও মুযাফ্‌ফরও বন্দী হলেন। এই কারাবন্দী অবস্থায়ই ঈতাখের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পুত্রদ্বয় মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলের শেষ অবধি বন্দীজীবন অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে মুনতাসির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের উভয়কে মুক্তি দেন।

খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও বায়আত

২৩৫ হিজরীতে (৮৪৯-৫০ খ্রি) আযারবায়জানে মুহাম্মদ ইব্‌ন বাঈস ইব্‌ন জালীস বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে বাগাসগীর সৈন্যবাহিনী দিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর এ বছরই খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর তিন পুত্র যথাক্রমে মুহাম্মদ, তালহা ও ইবরাহীমকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে প্রজাসাধারণের বায়আত গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি স্থির করেন যে, আমার পর প্রথমে মুহাম্মদ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন, তারপর তালহা খলীফা হবেন। মুহাম্মদকে মুনতাসির এবং তালহাকে মুতাজ্জ খিতাব প্রদান করলেন। মুহাম্মদ ও মুতাজ্জকে যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জায়গীর প্রদান করলেন। তারপর এ দু'জনকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন এবং শামদেশ তাদের জায়গীর বলে ঘোষণা করেন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ২৩৫ হিজরীতে (৮৪৯-৫০ খ্রি) খলীফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্ ফৌজের উর্দি পরিবর্তন করেন এবং কম্বলের জোব্বা পরিধান করিয়ে কোমর বন্ধনীর পরিবর্তে রশি দিয়ে কোমর বাঁধার প্রথা চালু করেন। যিম্মীদের জন্য নতুন উপাসনালয় নির্মাণও তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাজ্যজোড়া ঘোষণা করে দেন যে, কোন ব্যক্তি কার্যোদ্ধার উদ্দেশ্যে কোন

শাসকের দোহাই দিতে পারবে না। খ্রিস্টানদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হলো যে, তারা যেন ক্রুশ নিয়ে মিছিল-শোভাযাত্রা না করে। এ বছরই হাসান ইব্‌ন সাহল এবং তাহির ইব্‌ন হুসাইনের ভ্রাতুষ্পুত্রও মামূনুর রশীদের আমল থেকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুসআব মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাককে পুলিশ বিভাগের প্রধান নিয়োগ করেন। সাথে সাথে তাকে পারস্য প্রদেশের গভর্নর পদেও অধিষ্ঠিত করেন। জ্ঞাতব্য যে, পারস্য প্রদেশ খুরাসান থেকে পৃথক ছিল। খুরাসানের হুকুমতও তাবারিস্তান প্রভৃতিসহ তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাহির ইব্‌ন হুসাইনের করায়ত্তে ছিল। এ বছরই খলীফা মুতাওয়াক্কিল এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, খ্রিস্টানদের অবশ্যই গলাবন্ধ ব্যবহার করতে হবে। রঙীন নেকটাই সম্ভবত তারই স্মৃতিবাহী। ২৩৬ হিজরীতে (৮৫০-৫১ খ্রি) মুতাওয়াক্কিল ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন নিষিদ্ধ করেন এবং মাযারের চর্তুষ্পার্শে নির্মিত বাড়িসমূহ ধূলিসাৎ করে দেন। এ বছরই উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন খাকানকে উযীর পদে নিযুক্তি দেয়া হয়।

আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ

আর্মেনিয়া প্রদেশে গভর্নররূপে নিযুক্ত ছিলেন ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ। বুকরাত ইব্‌ন আসওয়াত নামক বিশপ রাজধানীতে এসে ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। ইউসুফ তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে গ্রেফতার করে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে আর্মেনিয়ার পাদ্রীদের মধ্যে ইউসুফের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দিল। বুকরাত ইব্‌ন আসওয়াতের জামাতা মূসা ইব্‌ন জারারা পাদ্রীদের একটি সমাবেশ আহ্বান করে এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ কি জানতে চান। সকলে ইউসুফকে হত্যা করার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। সে মতে মূসা ইব্‌ন জারারার নেতৃত্বে খ্রিস্টানরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ২৩৭ হিজরীর রমযান (৮৫২ খ্রি-এর মার্চ) মাসে ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীসাথীসহ তাদের হাতে নিহত হলেন। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র মুতাওয়াক্কিল বগাকবীরকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেন। বগাকবীর মুসেল ও জাযীরা হয়ে আর্জনর নিকট গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর্জন জয় করার পর মূসা ইব্‌ন জারারার প্রায় ত্রিশ হাজার সঙ্গী-সাথী নিহত হয় এবং প্রচুর সংখ্যক বন্দী হয়। তারপর ২৩৮ হিজরীতে (৮৫২-৫৩ খ্রি) বগাকবীর আর্মেনিয়ার বিদ্রোহী পাদ্রীদেরকে বেছে বেছে শাস্তি প্রদান করেন এবং গ্রেফতার করে সকলকে বাগদাদে পাঠান।

কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদের পদচ্যুতি ও মৃত্যু

কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র আমলে উযীরে আযমের চাইতেও বেশি মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের আমলের প্রথম দিকেও তাঁর মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু ২৩৭ হিজরীতে (৮৫১-৫২ খ্রি) তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের বিরাগভাজন হন। খলীফা তাঁর সমুদয় ধন-সম্পদ ও জায়গীর বাজেয়াফত করার নির্দেশ জারি করেন। কাযী আহমদের পুত্র আবুল ওয়ালীদ তার সর্বস্ব বিক্রয় করে ষাট হাজার দিরহাম খলীফার খিদমতে পেশ করেন। মুতাওয়াক্কিল কাযী আহমদকে গ্রেফতার করে

কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তাঁর স্থলে ইয়াহইয়া ইব্‌ন আকছামকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। এ সময় কাযী আহমদ পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন। মুতাওয়াক্কিল ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি) কাযী আকছামকেও বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে জা'ফর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদকে ঐ পদে নিযুক্তি প্রদান করেন। কাযী আহমদ ইব্‌ন আবূ দাউদ ঐ বছরই অর্থাৎ ২৩৭ হিজরীতে (৮৫১-৫২ খ্রি) তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালীদের মৃত্যুর মাত্র কুড়ি দিন পর ইন্তিকাল করেন। ঐ একই বছর হিমসে ঈসায়ীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং হিমসের আমিলকে দেশান্তরিত করে সেখানকার শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। খলীফা মুতাওয়াক্কিল তখন দামেশক ও দজলার বাহিনীদ্বয়কে হিমসে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তার সে নির্দেশানুসারে হিমসে গিয়ে তারা সেখানকার বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টানকে দেশান্তরিত করেন।

ঐ একই বছর মুতাওয়াক্কিল মিসরের কাযী আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল লায়ছকে পদচ্যুত করে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁর স্থলে ইমাম মালিকের শাগরিদ হারিছ ইব্‌ন মিসকীনকে মিসরের কাযীউল কুযাতুল পদে নিযুক্তি দান করেন। ঐ বছরই খলীফা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মাসআবকে বাগদাদের পুলিশ প্রধান নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, তাঁর ভাই তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তখন খুরাসানের গভর্নর ছিলেন।

রোমানদের হামলা

২৩৮ হিজরীতে (৮৫২-৫৩ খ্রি) মিসরের গভর্নর আব্বাস ইব্‌ন ইসহাক দিমিয়াত উপকূলে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীকে কোন এক প্রয়োজনে মিসরে ডেকে পাঠান। ময়দান খালি দেখে রোমানদের একশটি জাহাজের একটি বহর দিমিয়াত লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়। তারা অবাধে লুটপাট চালায়। সেখানকার জামে মসজিদ ভস্মীভূত করে এবং মাল-আসবাব ও বন্দীদেরকে জাহাজে তুলে তিউনিস অভিমুখে চলে যান। সেখানেও তারা ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে। জবাবে আলী ইব্‌ন ইয়াহইয়া আর্মেনী সসৈন্যে রোমান এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টানকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। ২৪১ হিজরীতে (৮৫৫-৫৬ খ্রি) রোমের মহিলা কাইজার রাণী নাদুরা মুসলমান কয়েদীদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াস চালান। যারাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অনেকে প্রাণভয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। তারপর কি যেন ভেবে বন্দী বিনিময়ের আবেদন জানান। মুতাওয়াক্কিল তাঁর সে আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর ভৃত্য সাইফকে বাগদাদের কাযী জা'ফর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদের সাথে ঈসায়ী কয়েদীদেরকে সাথে দিয়ে পূর্বোক্ত লামেস নদীর তীরে প্রেরণ করলেন। সেখানে মুসলমান কয়েদীদের সাথে যথারীতি তাদের বিনিময় সমাপ্ত হয়।

রোম আক্রমণ

উপরোক্ত কয়েদী বিনিময় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর রোমানরা পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করে অতর্কিতে মুসলিম এলাকায় হামলা করে প্রচুর সংখ্যক মুসলমানকে ধরে নিয়ে যায়। মুসলমান সর্দাররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেও তাতে কোন কাজ হয়নি। এবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলী ইব্‌ন ইয়াহইয়াকে সসৈন্য রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে

রওয়ানা করে দেন এবং ২৪৪ হিজরীতে (৮৫৮-৫৯ খ্রি) নিজে রাজধানী ছেড়ে দামেশকে আসেন। দামেশকে অবস্থান করে তিনি রোম সাম্রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ এবং সে হামলাকে সফল করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেন। খলীফার দামেশক অবস্থান উপলক্ষে গোটা মন্ত্রীসভা ও সচিবালয় দামেশকে স্থানান্তরিত হয়। কেননা মনে হচ্ছিল খলীফা এবার স্থায়িভাবেই দামেশকে বসবাস করবেন। কিন্তু দুই মাস না যেতেই দামেশকে ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। অগত্যা খলীফাকে দামেশক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হতে হয়। দামেশক ত্যাগকালে তিনি বগাকবীরকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে প্রেরণ করেন। সত্যি সত্যি বগাকবীর রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে হত্যা চালাতে থাকেন। অনেক দুর্গ তাঁর হাতে বিজিত হয়। খৃস্টানদের জানমালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও তাঁর হাতে সাধিত হয়।

বগাকবীরের আক্রমণে যখন রোমানদের ত্রাহিত্রাহি অবস্থা হলো এবং খ্রিস্টানরা ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো তখন খলীফার নির্দেশ পেয়ে বগাকবীর প্রত্যাবর্তন করেন। ২৪৫ হিজরীতে (৮৫৯-৬০ খ্রি) খ্রিস্টানরা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সুযোগ পেয়ে তারা মুসলিম এলাকায় লুটপাট করে পালিয়ে যেত। জবাবে আলী ইব্‌ন ইয়াহইয়া পুনরায় খ্রিস্টান এলাকায় ঢুকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ফিরে আসেন। ২৪৬ হিজরীতে (৮৬০-৬১ খ্রি) খ্রিস্টানরা পুনরায় মুসলিম এলাকায় উপদ্রব করে। তারা সীমান্তবর্তী মুসলিম এলাকায় লুটপাট করে সে এলাকাকে বিরান করে দেয়।

এবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল যুগপৎভাবে জল ও স্থলবাহিনী পাঠিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বহুমুখী হামলা পরিচালনা করলেন। নৌ ও স্থল বাহিনীর যুগপৎ হামলায় খ্রিস্টান এলাকায় এক প্রলয়ঙ্করী অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার তারা ক্ষমা ভিক্ষা করে সন্ধি প্রার্থনা করে। মুসলমানরা খুশি মনে আবারো তাদের সে প্রস্তাবে সাড়া দিল। লামেস নদীর তীরে আবার খ্রিস্টান ও মুসলমান কয়েদীদের বিনিময় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। এবার ফেরত পাওয়া মুসলমান বন্দীর সংখ্যা ছিল দুই হাজার তিনশ। ২৪৬ হিজরীতে (৮৬০-৬১খ্রি) এ সৈন্যদেরকে মুক্ত করা হয়।

জাফরিয়া নদীর পত্তন

২৪৫ হিজরীতে (৮৫৯-৬০ খ্রি) মুতাওয়াক্কিল জাফরিয়া নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করেন। এ শহর নির্মাণে দুই লক্ষ দীনার ব্যয়িত হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে লুলুয়া নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। এ প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল গোটা নগরীর বর্মখানার মধ্যে সর্বাধিক। এ শহরটিকে কেউ কেউ জাফরিয়া, আবার কেউ কেউ মুতাওয়াক্কিলিয়া বলে অভিহিত করতো। ঐ বছরই জাফর ইব্‌ন দীনার খাইয়াতের মৃত্যু হয়। ঐ বছর নাজাহ ইব্‌ন সালামাকে মুতাওয়াক্কিল এত বেশি প্রহার করেন যে, প্রহারেই তার মৃত্যু ঘটে। নাজাহ ইব্‌ন সালামা অত্যন্ত প্রতাপ-প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন মুতাওয়াক্কিলের ফরমান জারি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এ জন্যে তাকে এ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়।

মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ড

খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর পুত্র মুনতাসিরকে তাঁর প্রথম উত্তরাধিকারী বলে মনোনয়ন দান করেন— যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। মুনতাসির শিয়া মতবাদের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছিলেন। ওয়াছিকও মুতাসিমের মত মুতাযিলাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে মুতাওয়াক্কিল সুন্নতের অত্যন্ত পাবন্দ এবং আহলে সুন্নত আলিমদের অত্যন্ত কদরদার ছিলেন। তিনি খালকে কুরআন বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী এবং শির্ক বিদআত উচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। পিতাপুত্রের তথা মুতাওয়াক্কিল ও মুনতাসিরের বিশ্বাসগত এই মতান্তর তাঁদের মধ্যে মনান্তরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুতাওয়াক্কিল এবার মুনতাসিরের পরিবর্তে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান মু'তাজ্জকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে মনস্থ করেন। মুনতাসির ও মুতাজ্জ যেহেতু দু'জন পৃথক পৃথক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তাই তাঁদের মধ্যে রেষারেষি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। এবার যখন মুতাওয়াক্কিল মুতাজ্জকে মুনতাসিরের উপর প্রাধান্য আরোপ করতে লাগলেন তখন পিতা-পুত্রের এ বিরোধ চরমে উঠলো এবং মুনতাসির পিতার প্রাণের বৈরী হয়ে দাঁড়ালেন।

এর মাত্র কিছুদিন পূর্বে খলীফা মুতাওয়াক্কিল বগাকবীর, ওয়াসীফ কবীর, ওয়াসীফ সাগীর, দাওয়াজিন আশরুসনী প্রমুখ তুর্কী সিপাহসালারের কোন কোন তৎপরতার প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদের কারো কারো জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। এ জন্যে তুর্কীরা মুতাওয়াক্কিলের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল। তাই মুনতাসির ও তুর্কীরা সম্মিলিতভাবে মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার যোগসাজশে লিপ্ত হয়। বগাকবীর রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরিত হলেও তার পুত্র মূসা ইব্‌ন বগা শাহীপ্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল।

বগাসগীর মুনতাসিরকে তাদের সমর্থনে পেয়ে তার চার পুত্র এবং তুর্কীদের একটি ছোট দলকে মুতাওয়াক্কিলের সংহারের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে। একদা রাতে মুনতাসির এবং তাঁর পারিষদবর্গ যখন একে একে সকলে দরবার থেকে উঠে গেলেন এবং ঐ স্থানে কেবল খলীফা, ফাতেহ ইব্‌ন খাকান ও অপর কেবল চারজন মুসাহেব সেখানে অবশিষ্ট ছিলেন তখন দজলা পারের দিক থেকে ঘাতকরা শাহী দরবারে ঢুকে পড়ে এবং খলীফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ফাতেহ ইব্‌ন খাকানও খলীফার সাথে নিহত হন। লাশ দুটো ওখানে ফেলে রেখে ঘাতকরা রাতের বেলাই রক্তসিক্ত তলোয়ার নিয়ে মুনতাসিরের সাথে গিয়ে দেখা করে এবং তাকে নতুন খলীফারূপে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করে। মুনতাসির তৎক্ষণাৎ সওয়ারীতে আরোহণ করে শাহী মহলে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং লোকদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করলেন। ওসীফ ও অন্য তুর্কী সর্দাররা উপস্থিত হয়ে যথারীতি তাঁর হাতে বায়আত হলেন। এ খবর ইয়াহইয়া খাকানের পুত্র উবায়দুল্লাহ্ উযীরের কাছে পৌঁছামাত্র রাতের আঁধারেই তিনি মুতাজ্জ-এর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই অল্পক্ষণ পূর্বে মুতাজ্জকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর বায়আত আদায় করে নিয়েছেন। মুতাজ্জ তখন তাঁর ঘরে ছিলেন না। উবায়দুল্লাহ্ উযীর যখন মুতাজ্জ-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে দশ হাজার লোক সমবেত হয়ে গেল। এদের মধ্যে আর্মেনীয়, আযারবায়জানীয়, আজমীরা ছিল। এরা সকলে সমবেত কণ্ঠে দাবি করে যে, আপনি আজ্ঞা করলে আমরা এক্ষুণি মুনতাসির ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দফারফা করে দেব। উবায়দুল্লাহ্ তাতে সায় না দিয়ে মৌনতা অবলম্বন করেন। পরদিন প্রত্যূষে

মুতাওয়াক্কিল ও ফাতেহ্-এর দাফন কাফনের নির্দেশ দেন। এটা ৪ঠা শাওয়াল ২৪৭ হিজরীর (৮৬২ খ্রি-এর নভেম্বর মাসের) ঘটনা।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল চল্লিশ বছর বয়সে চৌদ্দবছর দশ মাস তিন দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে ইন্তিকাল করেন।

মুতাওয়াক্কিলের চরিত্র ও আরো কিছু কথা

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খলীফা পদে আসীন হয়েই সুন্নত পুনর্জীবিত করার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। ২৩৪ হিজরীতে (৮৪৮ খ্রি) তিনি রাজ্যের মুহাদ্দিসগণকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর পূর্বের শাসকদ্বয় ওয়াছিক ও মুতাসিমের আমলে মুহাদ্দিসগণ প্রকাশ্যে হাদীসের দরস দিতে পারতেন না। মুতাওয়াক্কিল এ মর্মে ফরমান জারি করলেন যে, মুহাদ্দিসগণ এখন থেকে মসজিদসমূহে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে হাদীস বর্ণনা করবেন এবং আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করবেন। মুতাওয়াক্কিলের এ নীতি-আদর্শ দর্শনে মুসলিম জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। মসজিদে মসজিদে পূর্ণোদ্যমে হাদীসের দরস শুরু হলো। মুতাওয়াক্কিল কবর পূজার অবসান ঘটান। এ জন্যে শিয়ারা তাঁর প্রতি বৈরী হয়ে যায়। কেননা, তিনি হযরত ইমামের মাযারে শির্কপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি মওকুফ করিয়ে দিয়েছিলেন।

২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি) খাল্লাতবাসীরা আকাশ থেকে এমনি এক বিকট গর্জন শুনতে পান যে, অনেকে এ গর্জন শুনে প্রাণত্যাগ করেন। ইরাকে মুরগীর ডিমের মত বিরাটাকৃতির শিলা বর্ষিত হয়। মাগরিব এলাকায় তেরটি গ্রামে ধস নামে। ২৪৩ হিজরীতে (৮৫৭-৫৮ খ্রি) উত্তর আফ্রিকা, খুরাসান, তাবারিস্তান ও ইস্পাহানে প্রবল ভূমিকম্প হয়। অধিকাংশ পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ভূমিতে প্রোথিত হয়ে যায়। মিসরে পাঁচ সের ওজনের শিলাবৃষ্টি হয়। আলেপ্পোতে ২৪৩ হিজরীতে রমযান (৮৫৮ খ্রি জানুয়ারি) মাসে লোকজন একটি পাখিকে এ কথা বলে উড়ে যেতে দেখে যে, হে লোকজন! আল্লাহ্কে ভয় কর। তারপর উড়ে যাওয়ার পূর্বে চল্লিশবার আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করে। পরদিনও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। আলেপ্পোবাসীরা রাজধানীতে এ সংবাদ প্রেরণ করে এবং পাঁচশ প্রত্যক্ষদর্শী এ ঘটনার সত্যতার সাক্ষী প্রদান করে। ২৪৫ হিজরীতে (৮৫৯-৬০ খ্রি) পৃথিবীব্যাপী প্রবল ভূমিকম্পে অনেক শহর ও দুর্গ বিধ্বস্ত হয়। এন্টিয়কের একটি পাহাড় সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হয়। মক্কাবাসীদের ঝর্ণাধারাসমূহে অকস্মাৎ পানির অভাব দেখা দেয়। মুতাওয়াক্কিল আরাফাত থেকে পানি আনয়নের জন্য এক লক্ষ দিরহাম ব্যয় করেন। আকাশ থেকে বিকট আওয়াজ শোনা যায়।

মুতাওয়াক্কিল অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদেরকে তিনি এতবেশি পারিতোষিকাদি দান করেন যে, ইতিপূর্বে অন্য কোন খলীফা তেমনটি করেননি। তাঁরই শাসনামলে হযরত যুন্নুন মিসরী এতবেশি অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন যে, ইমাম মালিকের শাগরিদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকিম এতে ক্ষিপ্ত হয়। এ জন্যে যুন্নুন মিসরীকে যিন্দীক বলে অভিহিত করেন যে, তিনি এমন এক বিদ্যার আবিষ্কারক যা ইতিপূর্বে কোন বুযুর্গ অলিআল্লাহ প্রদর্শন করেন নি। মিসরের গভর্নর যুন্নুন মিসরীকে ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলে

তিনি তার যে জবাব দেন তাতে গভর্নর আশ্বস্ত হন এবং মুতাওয়াক্কিলের দরবারে তাঁর সপক্ষে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ফলশ্রুতিতে মুতাওয়াক্কিল যুন্নুন মিসরীকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন। তাঁর বক্তব্য শ্রবণে খলীফা অভিভূত হন এবং তাঁকে পরম সম্মান প্রদর্শন করেন। মুতাওয়াক্কিলের নিহত হওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ্ আপনার সাথে কী আচরণ করলেন ? জবাবে তিনি জানালেন, সুন্নতের পুনর্জীবন ঘটানোর প্রয়াসের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাগফিরাত দান করেছেন।

ইব্ন আসাকির লিখেন যে, একদা মুতাওয়াক্কিল স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশ থেকে একটি চতুষ্কোণ মুরব্বা পতিত হলে তাতে লেখা আছে ঃ

'জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্'

তারপর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় যখন তাঁর খেতাব কি হবে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল তখন কেউ প্রস্তাব করলেন মুনতাসির বিল্লাহ, আবার কেউ কেউ অন্যান্য প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন মুতাওয়াক্কিল উপস্থিত উলামা ও বিজ্ঞজনদের সম্মুখে তাঁর উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন তখন সকলে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খেতাবই পছন্দ করলেন।

একবার মুতাওয়াক্কিল তাঁর দরবারে উলামাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আলিম-উলামায়ে কিরাম এসে সমবেত হলে মুতাওয়াক্কিল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমন দর্শনে সমস্ত উলামায়ে কিরাম উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। উক্ত সমাবেশে আহমদ ইব্ন মা'দলও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও দরবারে আমন্ত্রিত আলিম অতিথি ছিলেন। কিন্তু সকলে দণ্ডায়মান হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেও তিনি মোটেই দাঁড়াবার নাম নিলেন না। বিস্মিত হয়ে মুতাওয়াক্কিল তাঁর উযীর উবায়দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, এ লোকটি আমার হাতে বায়আত হয়নি? জবাবে মন্ত্রী প্রথমে জানালেন, তিনি বায়আত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তিনি চোখে একটু কম দেখেন। আহমদ ইব্ন মা'দল তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমার দৃষ্টি শক্তি ঠিকই আছে। কিন্তু আমি আপনাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই দণ্ডায়মান হইনি। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে, লোকে তাকে দেখে তার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হোক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়। এ জবাব শুনে মুতাওয়াক্কিল তাঁর পার্শ্বে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

ইয়াযীদ মুহাল্লাবী বলেন, একদা মুতাওয়াক্কিল আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! খলীফাগণ কেবল এ জন্যে প্রজাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতেন যেন লোকে তাদেরকে সমীহ করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে নম্র আচরণ করি এ জন্যে যেন তারা প্রসন্নমনে আমার আনুগত্য করে। উমর শায়বানী বলেন, নিহত হওয়ার দুইমাস পরে আমি মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কী আচরণ করলেন?

জবাবে তিনি বললেন, নবীর সুন্নতকে জিন্দা করার প্রয়াসের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি তখন আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হত্যাকারীদের কি হবে। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার পুত্র মুহাম্মদ (মুনতাসির)-এর অপেক্ষা করছি, সে এসে পৌঁছামাত্র আমি আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করবো।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আর তিনিই প্রথম খলীফা– যিনি শাফিঈ মাযহাব আবলম্বন করেন।

মুনতাসির বিল্লাহ্

মুনতাসির বিল্লাহ্ (ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ)-এর আসল নাম ছিল মুহাম্মদ আর তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ জা'ফর ও আবূ আবদুল্লাহ। ২২৩ হিজরী (৮৩৮ খ্রি) সনে সামরায় রুমিয়া জশিয়া নাম্নী বাঁদীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মুতাওয়াক্কিলকে ঘাতক হস্তে হত্যা করিয়ে ২৪৭ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল (৮৬২ খ্রি নভেম্বর) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলীফা পদে আসীন হয়েই তিনি তার পিতা কর্তৃক সিংহাসনে মনোনীত অপর দুই উত্তরাধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় মুতাজ্জ ও মুওয়াইয়াদের উত্তরাধিকারী পদ বাতিল করেন।

তুর্কীরা তখন খিলাফতের উপর জেঁকে বসেছিল। দিন দিন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল। মুনতাসিরকে তো এই তুর্করাই খলীফার পদে বসিয়েছিল। এ জন্যে তারা তখন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দৃষ্টে মুনতাসির প্রমাদ গুনলেন। তিনি ভাবলেন যে, তাদের এ ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এক সময় তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে মনস্থ করলেন।

তিনি তার ছয় মাসের খিলাফত আমলে শিয়াদের প্রতি অনেক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযার যিয়ারত করার পুন অনুমতি তিনি প্রদান করেন। তিনি আলীপন্থীদেরকে তাদের সমুদয় অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে করার অনুমতি প্রদান করেন। খলীফা পদে আসীন হয়ে তিনি আহমদ ইব্‌ন খুসায়বকে মন্ত্রীত্ব এবং বগাকবীরকে প্রধান সেনাপতি পদ অর্পণ করেন। বগাকবীর প্রমুখ তুর্কী সর্দারদের প্ররোচনায়ই তিনি তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে খিলাফতের উত্তরাধিকার বাতিল করেন। তিনি যখন তুর্কীদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টায় রত হলেন তখন তুর্কীরা তাঁর বুদ্ধিমত্তার ও সাহসিকতার জন্যে এ উদ্দেশ্যে তিনি যে সফলকাম হবেন সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ছিলেন। তাই তারা তাঁর চিকিৎসক ইব্‌ন তাইফুরকে ত্রিশ হাজার দীনার উৎকোচ দিয়ে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করায়। উক্ত চিকিৎসক রক্তমোক্ষণের ছলে তাঁর উপর বিষ প্রয়োগ করে।

২৪৮ হিজরীর ৫ই রবিউল আউয়াল (৮৬২ খ্রি মে মাসে) মাত্র ছয় মাসেরও কম সময় খলীফা পদে আসীন হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আম্মা! আমার দীন ও দুনিয়া উভয়কুলই নষ্ট হলো। আমি আমার পিতার মৃত্যুর হেতু হই এবং এখন স্বল্পসময়ের ব্যবধানে তাঁরই পশ্চাদনুসরণ করছি। পারস্য সম্রাট কিসরার বংশের জনৈক রাজকুমার শেরোইয়া তার পিতাকে হত্যা করেছিল। সেও কয়েকমাসের বেশি আয়ু লাভে সমর্থ হয়নি।

মুসতাঈন বিল্লাহ্

মুসতাঈন বিল্লাহ্ (ইব্‌ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন হারূনুর রশীদ)-এর আসল নাম ও উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের এক সুপুরুষ। মুখে গুটি বসন্তের দাগ ছিল এবং তিনি তোতলা ছিলেন। মাখারিক নাম্নী দাসীর গর্ভে ২২১ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি) তিনি ভূমিষ্ঠ হন। মুনতাসিরের মৃত্যুর পর কে খলীফা হবেন সে ব্যাপারে খলীফার পারিষদবর্গের বৈঠক বসলো। মুতাওয়াক্কিলের সন্তানদ্বয় মুতাজ্জ ও মুওয়াইয়াদ তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু

তুর্কী অমাত্যরা তাদের ব্যাপারে নিঃশঙ্ক ছিলনা। আর তারাই মূলত তাঁদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মন্ত্র যুগিয়েছিল, তাই এবার তারা মুতাসিম বিল্লাহ্‌র পুত্র আহমদকে সিংহাসনে বসালো। এখন থেকে তাঁর খেতাব হলো মুসতাঈন বিল্লাহ্। মুসতাঈন বিল্লাহ অত্যন্ত পুণ্যবান, জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও সুভাষী ছিলেন। ৬ রবিউস সানি, ২৪৮ হিজরীতে (জুন ৮৬২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসতাঈনের অভিষেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যখন তাঁকে নিয়ে খলীফার প্রাসাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ও প্রজাসাধারণ গোলযোগ ও হৈহল্লা করে তাঁর প্রতি অনাস্থা ও মুতাজ্জ-এর খিলাফতের সপক্ষে ধ্বনি দেয়। তুর্কীরা এদেরকে দমন করে।

উভয়পক্ষের যুদ্ধে গোলযোগকারীদের অনেকেই নিহত হয়। পরাস্ত হয়ে অনেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। এদিকে জোর লড়াই চলছিল অপরদিকে তুর্কীরা মুসতাঈন বিল্লাহ্‌র হাতে বায়আত করছিল। গোলযোগ দমন হয় এবং পারিতোষিকাদির বন্টন হতে থাকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের কাছে বায়আতের জন্য পয়গাম প্রেরণ করা হলো। তিনিও এসে যথারীতি বায়আত করলেন। বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর সংবাদ এলো যে, খুরাসানের গভর্নর তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাহির মারা গেছেন। মুসতাঈন বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহিরকে তার স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

এরই মধ্যে খুরাসানের পূর্বাঞ্চলে নিযুক্ত শাসক হুসাইন ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন হুসাইনেরও মৃত্যু হয়ে যায়। তার স্থলে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে নিযুক্তি দেয়া হয়। তার চাচা তালহাকে নিশাপুরের এবং তার পুত্র মানসূরকে সারাখ্‌স ও খাওয়ারিযমের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। হুসাইন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে হিরাতের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর চাচা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে তাবারিস্তানের এবং তাঁর চাচাত ভাই আব্বাসকে জুজান ও তালিকানের শাসক করে পাঠান।

২৪৮ হিজরীতে (৮৬২ খ্রি.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খাকান হজ্জে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা তাঁকে অনুমতি দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রওয়ানা হওয়ামাত্র জনৈক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াকে গ্রেফতার ও দেশান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত সর্দার তাঁকে গ্রেফতার করে রিক্কায় দেশান্তরিত করে। ঐ দিনগুলোতেই তুর্কীরা মুতাজ্জ এবং মুওয়াইয়াদকে হত্যা করতে মনস্থ করে। আহমদ ইব্‌ন খুসায়ব তাদেরকে এ অন্যায় কাজ থেকে বারণ করেন। খলীফা মুসতাঈন সিংহাসনে বসেই জনৈক তুর্কী সর্দার তামেশকে উযীর এবং আহমদ ইব্‌ন খুসায়বকে নায়েবে উযীর পদে নিয়োগ করেন। মুতাজ্জ এবং মুওয়াইয়াদকে খলীফা জুসাক নামক একটি স্থানে নজরবন্দী করে রাখেন। তামেশকে উযারত ছাড়াও মিসর ও মাগরিবের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। বগা কবীরকে হুলওয়ান ও মাসবুযান শাসনের সনদ দান করা হয়। আশনাসকে সিপাহ্‌সালার ও সংস্থাপন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। মোটকথা, রাষ্ট্রের সকল বড় বড় পদে তুর্কীদেরকে বসানো হলো।

২৪৯ হিজরীতে (৮৬৩ খ্রি.) রোমানদের পক্ষ থেকে হামলা হলো। তাদের হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও আলী ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া নামক দু'জন বিখ্যাত সর্দারসহ

অনেক মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। উক্ত সর্দারদ্বয়ের মৃত্যু সংবাদে বাগদাদে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো যে, শক্তি হাতে পেয়ে তারা খলীফাগণকে হত্যা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করতে খুবই পারঙ্গমতার পরিচয় দেয়। কিন্তু কাফির বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে কোনই যোগ্যতা ও তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেনি যার ফলে ইসলামের দু'জন মহান সর্দারকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হলো এবং রোমানদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পেল।

এ জাতীয় আলোচনা সমালোচনার ফলে বাগদাদে চরম অসন্তোষ দেখা দিল। লোকজন জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এসে সমবেত হতে লাগলো। মুসলমান আমীর-উমরাগণ এজন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলানের ব্যবস্থা করেন। বাগদাদ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। মুসতাঈন ও তাঁর আমলাবর্গ সামার্‌রায় নির্লিপ্তভাবে বসে তা অবলোকন করতে থাকলেন। তারা এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করলেন না। অবশেষে মুসলমানরা সামার্‌রায় পৌঁছেও চরম অসন্তোষ প্রদর্শন করেন। তারা কারাগার ভেঙ্গে বন্দীদেরকে মুক্ত করেন। তারপর তুর্কী সর্দার বগা, ওসীফ ও আতামেশ তুর্কী বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনতার অনেকেই প্রাণ হারালো। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে গেল। আতামেশের শক্তি ও সুবিধা যেহেতু অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল এবং রাজকোষের অর্থ যথেষ্ট ব্যবহারের অধিকারও তিনি সংরক্ষণ করতেন তাই বগা ও ওসীফ তাঁর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন। তাঁরা আতামেশের পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীকে উযীর পদ দান করেন। অল্পকাল যেতে না যেতেই বগা সগীর এবং উযীর আবূ সালিহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর মধ্যে রেষারেষি ও সংঘাত দেখা দিল।

আবূ সালিহ্ আবদুল্লাহ্ বগা সগীরের ভয়ে সামাররা ছেড়ে বাগদাদে গিয়ে উঠলেন। খলীফা মুসতাঈন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল জুরজানীকে উযীর পদে নিযুক্তি প্রদান করলেন। মোটকথা, খলীফা মুসতাঈন তুর্কীদের একেবারে হাতের ক্রীড়নক হয়ে গেলেন। সামাররায় তখন তুর্কীদেরই বাস। এজন্যে তুর্কীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টাও খলীফা করতে পারতেন না। এমনি যখন অবস্থা তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আমের ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন যাইদ শহীদ– যাঁর উপনাম ছিল আবুল হুসাইন, কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কূফায় তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাহিরের পক্ষ থেকে আইউব ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আলী ওয়ালী নিযুক্ত ছিলেন। আবুল হুসাইন আইউবকে কূফা থেকে বের করে দিলেন এবং শাহী বায়তুলমাল লুট করে কূফায় তাঁর পূর্ণদখল প্রতিষ্ঠা করলেন।

এরপর আবুল হুসাইন কূফা থেকে ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির তখন হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুস্‌আব তার মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। আবুল হাসান তাকে পরাস্ত করে বিজয়ীর বেশে কূফায় ফিরে এলেন। বাগদাদবাসীরাও তখন তার সাহয্যার্থে এগিয়ে আসলেন। হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে আবুল হুসাইন ইয়াহ্ইয়ার

উপর আক্রমণ চালালেন। ইয়াহ্ইয়া কূফা থেকে বের হয়ে তার মুকাবিলা করলেন। তুমুল যুদ্ধের পর এবার আবুল হুসাইন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর নিহত হলেন। তাঁর শির কেটে সামাররায় খলীফা মুসতাঈনের দরবারে প্রেরণ করা হলো। মুসতাঈন তা একটি সিন্দুকে পুরে অস্ত্রাগারে রেখে দিলেন। আবুল হাসান ইয়াহ্ইয়া হত্যার এ ঘটনাটি ঘটে ২৫০ হিজরী ১৫ই রজব (আগস্ট ৮৬৪ খ্রি.)।

আবুল হুসাইনকে পরাস্ত করার পুরস্কারস্বরূপ খলীফা মুসতাঈন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে তাবারিস্তানে বেশ কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন। খলীফার প্রদত্ত এ জায়গীরগুলোর একটি ছিল দায়লাম সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে। ঐ জায়গীরটির দখল নেয়ার জন্যে যখন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমিল তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন রুস্তম নামক এক ব্যক্তি তাকে বাধা দিল। দায়লামবাসীরা রুস্তম ও তার পুত্রদ্বয় মুহাম্মদ ও জা'ফরের পক্ষ অবলম্বন করলো। তাবারিস্তানে তখন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম উলুভী অবস্থান করছিলেন। মুহাম্মদ ও জা'ফর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললো যে, আপনি আমীর হওয়ার দাবি করুন, আমরা আপনার পাশে দাঁড়াবো। তিনি বললেন, তোমরা রে-নগরীতে গিয়ে হাসান ইব্ন যাইদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাসান ইব্ন যাইদ ইব্ন হাসান সিবতের খিদমতে গিয়ে এ আবেদন জানাও। তিনিই হচ্ছেন আমাদের অনুসরণীয় নেতা।

মুহাম্মদ ও জা'ফর তাদের পিতা রুস্তমের কাছে এসে তা বিবৃত করলেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে রে-তে প্রেরণ করলেন। হাসান ইব্ন যাইদ সেখান থেকে তাবারিস্তানে চলে আসেন। দায়লাম ও বায়ান প্রভৃতি এলাকা থেকে লোক সেখানে এসে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করে। দেখতে দেখতে এক বিরাট সংখ্যক জনতা তাঁর চারপাশে এসে জমায়েত হয়। হাসান ইব্ন যাইদ তাবারিস্তান দখল করে বসলেন। তারপর রে-ও তাঁর দখলে চলে আসে। এ সংবাদ পেয়ে মুসতাঈন হামাদান রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু এ বাহিনী পরাজিত হলো। তারপর বগাকবীরের পুত্র মূসাকে রাজধানী থেকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো। তিনি তাবারিস্তান তো হাসান ইব্ন যাইদের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু দায়লামের উপর তাঁর দখল রয়েই গেল। মূসা সেখান থেকে রে-তে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে খলীফা মুসতাঈন দলীল ইব্ন ইয়াকূব নাসরানীকে তাঁর উযীর মনোনীত করলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই বাগর নামক জনৈক তুর্কী সর্দারের সাথে ঐ নাসরানী উযীরের বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে বগা সগীর ও ওসীফ দু'জনেই বাগরকে দোষী সাব্যস্ত করেন। খলীফা তাকে বন্দী করেন। তুর্কীরা তখন গোলযোগ সৃষ্টি করে। তুর্কীদের এ গোলযোগলক্ষ্যে বগা সগীর বাগরকে হত্যা করিয়ে ফেলেন। এতে গোলযোগ হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পায়। গোটা সামাররা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। চতুর্দিকে বিদ্রোহীদের পতাকা উড়তে দেখা গেল। অগত্যা খলীফা মুসতাঈন বাগা, ওয়াসীফ, শাবেক ও আহমদ ইব্ন সালিহ শিরজা সামাররা ত্যাগ করে বাগদাদে এসে উঠলেন। তাঁরা এসে বাগদাদস্থ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের ঘরে উঠলেন। এটা ছিল ২৫১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী ৮৬৫ খ্রি.) মাসের ঘটনা। খলীফার বাগদাদ আগমনে সমস্ত অফিস-আদালতও বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়ে গেল।

খলীফার বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় তুর্কীরা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। ছয়জন তুর্কী সর্দার বাগদাদে খলীফার দরবারে এসে কাকুতি-মিনতি করে এই মর্মে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি সামাররায় ফিরে চলুন। আমাদের দ্বারা আর কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হবে না। খলীফা তাদের অতীতের বিশ্বাসঘাতকতা ও ঔদ্ধত্যসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সামাররায় যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তুর্কীরা তখন সামাররায় গিয়ে মুতাজ্জ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁকেই খলীফারূপে বরণ করে নেয়। হারূনুর রশীদ তনয় আবূ আহমদও তখন সামাররায় ছিলেন। তাঁকে বায়আতের কথা বলা হলে তিনি বললেন, আমি ইতিপূর্বে মুসতাঈনের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি। আর মুতাজ্জ তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন বাতিলের ব্যাপারটি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। তাই আমি আর নতুন করে বায়আত করতে চাই না। মুতাজ্জ আর এ ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য না করে তাঁকে তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দেন।

বগাকবীরের পুত্রদ্বয় মূসা ও আবদুল্লাহ্ মুতাজ্জের হাতে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করলেন। এভাবে আরো যারা মুতাজ্জকে পছন্দ করতেন তারা সকলেই একে একে সামাররায় গিয়ে উঠলেন। পক্ষান্তরে যারা মুসতাঈনকে পছন্দ করতেন তারা সামাররা থেকে বাগদাদে চলে আসলেন। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও আলিমগণও এভাবে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। বাগদাদ ও সামাররায় সমান্তরালভাবে দু'জন খলীফার খিলাফত চলতে লাগলো। মুসতাঈনের পক্ষে প্রধানত তাহিরের বংশের লোকজন এবং খুরাসানীরা ছিল। পক্ষান্তরে প্রায় সমস্ত তুর্কী ও অন্যান্য সর্দার মুতাজ্জর পক্ষ অবলম্বন করে। এগার মাস পর্যন্ত উভয় খলীফার মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে। উভয়ই বাইরের গভর্নরদের আনুগত্য ও সহযোগিতা কামনা করে চিঠিপত্র লিখতেন। এ সংঘর্ষ কেবল বাগদাদ ও সামাররার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বাইরেও এর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার লাভ করতে লাগলো। অবশ্য এর বেশি জোর ছিল বাগদাদের উপকণ্ঠে। কেননা বাইরের অমাত্যগণ রাজধানীর শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায় তা দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উদগ্রীব ছিলেন।

অবশেষে ২৫১ হিজরীর যিলকদ (ডিসেম্বর ৮৬৫ খ্রি.) মাসের শেষদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের পুত্র মুহাম্মদ বাগদাদের মুসতাঈন বিল্লাহ্‌র বাহিনীর সিপাহ্‌সালার রূপে বাগদাদ অবরোধকারী তুর্কীদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে তাদেরকে পরাস্ত করলেন। তারা তখন পলায়নের পথ ধরলো। বাগদাদে মুসতাঈনের সাথে অবস্থানকারী বগা ও ওসীফ তাদের ছোট ছোট বাহিনী নিয়ে মুহাম্মদের সাথে যোগ দেন। অবশ্য তখন মুসতাঈনের বাহিনীতে খুব কম তুর্কীই ছিলেন। বগা ও ওসীফ যখন তাদের স্বজাতি তুর্কী ভাইদেরকে খুরাসানী ও ইরাকী বাহিনীর মুকাবিলায় অসহায়ের মত পলায়নপর লক্ষ্য করলেন তখন তাদের জাত্যাভিমান জেগে উঠলো। তারা তৎক্ষণাৎ আনুগত্য পরিবর্তন করে পরাজিত তুর্কী সেনাদের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তাঁদেরকে দল ও আনুগত্য পরিবর্তন করতে দেখে তুর্কীদের মনোবল ফিরে পেল। তারা তাদের ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে পুনরায় বাগদাদ অবরোধ করে বসলো।

এদিকে শহরে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের বিরুদ্ধে গুজব রটানো হলো যে, তিনি জেনেশুনে খলীফাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এসব গুজব শুনে তাঁর মনও দমে

গেল। অবশেষে ২৫২ হিজরীর ৬ই মুহাররম (৮৬৬ খ্রি ২৭ জানুয়ারী) মুসতাঈন বিল্লাহ্ একটি লিখিত ইকরার-নামা প্রেরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুতাজ্জ বিল্লাহ্র খিলাফতকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজে খিলাফতের দাবি থেকে সরে দাঁড়ালেন। খলীফা মুতাজ্জ বাগদাদে প্রবেশ করে পদচ্যুত খলীফা মুসতাঈনকে নজরবন্দী করে ওয়াসিতে প্রেরণ করলেন। মুসতাঈন সেখানে নয় মাস পর্যন্ত জনৈক আমীরের তত্ত্বাবধানে রইলেন। তারপর সামাররায় চলে আসেন। এবং ২৫২ হিজরীর ৩রা শাওয়াল (অক্টোবর ৮৬৬ খ্রি.) খলীফা মুতাজ্জর ইঙ্গিতে নিহত হন।

মুতাজ্জ বিল্লাহ্

মুতাজ্জ বিল্লাহ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ইব্ন মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূনুর রশীদ ২৩২ হিজরীতে (৮৪৬-৪৭ খ্রি.) সামাররায় ফাতহিয়া নাম্নী জনৈকা রোমানীয় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২৫১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী ৮৬৫ খ্রি.) মাসে সামাররায় তিনি খলীফা পদে বরিত হন। এক বছরকাল পর্যন্ত মুসতাঈন বিল্লাহ্র সাথে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থেকে মুসতাঈনকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুপুরুষ। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছরই তুর্কী অমাত্য আশনাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আশনাস অর্ধলক্ষ দীনার রেখে যান। মুতাজ্জ তা বাজেয়াপ্ত করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করেন। মুতাজ্জ যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর বয়স ছিল উনিশ বছর মাত্র। তিনি আহমদ ইব্ন ইসরাঈলকে তাঁর উযীর মনোনীত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে তিনি পুলিশ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পুত্র মুহাম্মদ ছিলেন খুরাসানের গভর্নর, কিন্তু তিনি খুরাসানে তাঁর নায়েব রেখে বাগদাদে অবস্থান করতেন। মুতাজ্জকে তুর্কীরাই ক্ষমতায় বসায় এবং তিনি তুর্কীদের হাতের একেবারে ক্রীড়নক ছিলেন। বাগদাদে যে সৈন্য বাহিনী থাকতো তাতে খুরাসানী ও ইরাকী লোকেরা ছিল। এ বাহিনীকে বেতন-ভাতা বণ্টন করতেন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্। মুতাজ্জ এ বাহিনীর বেতন-ভাতা যোগান বন্ধ করে দেন।

২৫২ হিজরীর রজব (জুলাই ৮৬৬ খ্রি.) মাসে খলীফা মুতাজ্জ তাঁর ভাই মুওয়াইয়াদীকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী পদ থেকে পদচ্যুত করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করানো হয়।

২৫২ হিজরীর রমযান (সেপ্টেম্বর ৮৬৬ খ্রি.) মাসে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় বাগদাদের সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ অতিকষ্টে সে বিদ্রোহ দমন করেন। এ বছরই সৈন্যবাহিনীর তুর্কী ও আরবদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। উভয়পক্ষে চরম কোন্দল চলে। বাগদাদবাসীরা আরবদের পক্ষ অবলম্বন করে, কিন্তু তুর্কীরা কূটনীতির জোরে ধোঁকা দিয়ে আরব সৈন্য ও সর্দারদেরকে হত্যা ও দেশান্তরিত করে। ঐ বছরই খলীফা মুতাজ্জ হুসাইন ইব্ন আবূ শাওয়ারিবকে কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্তি প্রদান করেন।

খলীফার দাপট ও প্রতিপত্তি যেহেতু প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাই বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ নিজেদেরকেই তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মালিক-মুখতার ভাবতে লাগলেন। খারিজী

এবং উলুভী (আলীপন্থী)-রা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড়াতে লাগলো। মাসাভির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসাভির বাজালী খারিজী মুসেল দখল করে স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়ে দিল। খলীফার পক্ষ থেকে যে সর্দারকে তার সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো সে তাকে পরাস্ত করে রীতিমত তাড়িয়ে দেয়।

২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) তুর্কীরা তাদের সেনাপতি ওসীফ, বগা ও সীমা তবীলের কাছে চার মাসের অগ্রিম বেতন-ভাতা দাবি করে বসলো। তাঁরা জানালেন যে, রাজকোষ অর্থশূন্য, তাই এ দাবি মিটানো সম্ভব নয়। তাতে তুর্কীরা অশান্ত হয়ে উঠলো। সর্দাররা তখন খলীফা মুতাজ্জকে তা অবগত করলেন। কিন্তু বেচারা মুতাজ্জই বা কি করতে পারতেন। বিক্ষুব্ধ তুর্কীরা তখন ওসীফকে ধরে নিয়ে হত্যা করলো। কিছুদিনের মধ্যেই বাবকিয়াল ও বগা সগীরের মধ্যে রেষারেষির সূত্রপাত হলো। খলীফা বাবকিয়ালের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে লাগলেন। বগা তখন খলীফাকে হত্যার ফন্দিফিকির করতে লাগলেন। যথাসময়ে মুতাজ্জ তা আঁচ করতে পারলেন। বাবকিয়ালের লোকজনরা তখন বগাসগীরকে হত্যা করে এ ষড়যন্ত্রের যবনিকাপাত ঘটায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের মৃত্যু

খুরাসানের গভর্নর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহকে তার স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগের ওসীয়ত করে যান। কিন্তু তার অপর পুত্র ও উবায়দুল্লাহ্‌র ভাই তাহির ইব্‌ন মুহাম্মদ তার বিরোধিতা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র জানাযার জামাআতেই উভয় ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। অবশেষে পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে উবায়দুল্লাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খলিফা মুতাজ্জ সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকেই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি বাগদাদে অবস্থান করে গুরুদায়িত্ব পালন করে যান।

আহমদ ইব্‌ন তূলূন

তুর্কী সর্দারদের মধ্যে বাবকিয়াল ও বগা ওসীফ ও সীমা তবীলের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও খ্যাতনামা সর্দার ছিলেন। ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) খলীফা মুতাজ্জ বিল্লাহ্ বাবকিয়ালকে মিসরের গভর্নরী মসনদদান করেন। বাবকিয়াল তাঁর পক্ষ থেকে আহমদ ইব্‌ন তূলূনকে মিসরের নায়েব নিযুক্ত করে পাঠান। তূলূন একজন তুর্কী ছিলেন। বাল্যকালে ফারগানায় যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন। খলীফার খানদানেই তিনি প্রতিপালিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন শাহী পরিবারের গোলামদের অন্তর্ভুক্ত। তার পুত্র আহমদ ইব্‌ন তূলূনও রাজধানীতে প্রতিপালিত হয়ে রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করেন। বাবকিয়াল মিসরের গভর্নরীর সনদ হাতে পেয়েই কাকে মিসরে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করবেন চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর মন্ত্রণাদাতারা আহমদ ইব্‌ন তূলূনের নাম প্রস্তাব করলেন। সে মতে তিনি তাঁকে মিসরে পাঠিয়ে দেন। আহমদ মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

মুতাজ্জর পর মুহ্তাদী খলীফা হয়ে যখন বাবকিয়ালকে হত্যা করে অপর তুর্কী সর্দার ইয়ারকূজকে মিসরের গভর্নর মনোনীত করলেন তখন ইয়ারকূজও ইব্ন তূলূনকেই তাঁর নায়েবরূপে মিসরের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখলেন। এভাবে আহমদ ইব্ন তূলূন মিসরে অত্যন্ত দৃঢ়তা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে মিসরে রাজত্ব করেন এবং নিজেদের নামে মুদ্রা পর্যন্ত চালু করেন। মোটকথা ২৫৩ হিজরী (৮৬৭ খ্রি.) থেকে মিসরকে খিলাফতে আব্বাসীয় গর্ভনর বহির্ভূতই ধরতে হবে। কমপক্ষে এতটুকু বলতে হয় যে, ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি) মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ সিফার

ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ এবং তাঁর ভাই আমর ইব্ন লায়ছ উভয়ে সিজিস্তানে তামা ও পিতলের পাত্রের ব্যবসা করতেন। এ সময়ে যেহেতু খিলাফতে দুর্বলতার সুযোগ চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল তাই এ সুযোগে খারিজীরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের মুকবিলায় উলুভী তথা আহলে বায়তের সমর্থনেও অনেকে মাথা তুললো। এদের মধ্যে সালিহ্ ইব্ন নযর কিনআনীও আহলে বায়তের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে আত্মপ্রকাশ করলেন। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতেই আমীর-উমারা, রঈস ও প্রজাসাধারণের বিরাট একটি দল তাঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়ালো। ইয়াকূব ইব্ন লায়ছও এদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। সালিহ্ যুদ্ধের মাধ্যমে সিজিস্তান অধিকার করেন এবং তাহিরিয়া খান্দানের লোকজনকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। এ সাফল্য অর্জনের পরই সালিহ্র মৃত্যু হয়। দিরহাম ইব্ন হাসান নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু খুরাসানের গভর্নর অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে তাকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। সালিহ্র সমর্থকরা এবার ইয়াকূব ইব্ন লায়ছকে তাদের দলপতিরূপে গ্রহণ করে। ইয়াকূব অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সিজিস্তানে তাঁর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পক্ষ থেকে হিরাতে নিযুক্ত আমিল মুহাম্মদ ইব্ন আওস আম্বারীকে হিরাত থেকে বহিষ্কার করে খুরাসানের এলাকাসমূহ দখল করতে শুরু করেন।

এদিকে পারস্য প্রদেশের গভর্নর আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন শিবল কিরমান দখল করতে উদ্যত হন। ওদিকে ইয়াকূব ইব্ন লায়ছও কিরমানে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আলী ইব্ন হুসাইনের সিপাহ্সালারদেরকে পরাজিত করে ইয়াকূব তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। অবশেষে ২৫৫ হিজরীতে (৮৬৯ খ্রি) পারস্যের রাজধানী শিরাজ নগরীতে আক্রমণ পরিচালনা করে তা অধিকার করেন। তারপর তিনি কালবিলম্ব না করে সিজিস্তানে ফিরে আসেন এবং খলীফার দরবারে এ মর্মে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন যে, এ অঞ্চলে দারুণ গোলযোগ চলছিল। লোকজন আমাকে ধরে তাদের আমীর মনোনীত করেছে। আমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অনুগত। তারপর ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ পর্যায়ক্রমে খুরাসান থেকে তাহির বংশীয়দেরকে বহিষ্কার করে তার নিজের রাজত্ব গড়ে তুলেন। এতকাল তাহির ইব্ন হুসাইনের বংশধররাই একাধারে খুরাসানে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল। এজন্যে খুরাসানের স্বাধীন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা কালে সর্বপ্রথম তাহিরিয়া বংশের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু

সত্য কথা হলো, তাহিরীয় বংশীয়রা সর্বদাই খলীফার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এ বংশের কেউ না কেউ বাগদাদের পুলিশ কর্মকর্তা থাকতেনই।

আব্বাসীয় খলীফাদের কোন দিন তাহিরীয় বংশীয়দেরকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করার সাহস হয়নি। কিন্তু তাহিরীয়রা সর্বদাই আব্বাসীয় খলীফাদের অধীন বলেই গণ্য করেছে। তারা খলীফার দরবার থেকে সর্বদাই গভর্নরীর সনদ হাসিল করেন এবং সর্বদাই নির্ধারিত খারাজ সরকারে প্রেরণ করতেন। পক্ষান্তরে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ যে রাজত্বের সূচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইতিহাসে তা সাফারীয় রাজবংশ নামে পরিচিত। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

মুতাজ্জ বিল্লাহ্‌র পদচ্যুতি ও মৃত্যু

খলীফা মুতাজ্জ সম্পূর্ণভাবে তুর্কী সর্দারদের ক্রীড়নক ছিলেন। তারা যাই চাইতো খলীফাকে দিয়ে তাই করাতো। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। বড় বড় সর্দার ইচ্ছামতো রাজকোষ লুটে নেয়। সৈন্যবাহিনীর লোকজন খলীফার কাছে বেতন-ভাতা দাবি করতো। কিন্তু খলীফা ছিলেন একান্ত অসহায় ও নিরুপায়। অবশেষে একদিন তুর্কীরা আমীরুল মু'মিনীনের দরজায় গিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করে এবং বলে যে, আমাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করুন. নতুবা আপনার দক্ষিণহস্ত তথা পরিচালক সত্তা সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসীফকে আমরা আজ-কালকের মধ্যে হত্যা করবো।

সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসীফ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী তুর্কী সর্দার। খলীফা তাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। এ হট্টগোল প্রত্যক্ষ করে মুতাজ্জ তার মা ফাতহিয়ার কাছে গিয়ে বলেন, আপনার কাছে কিছু ধন-সম্পদ থাকলে তা দিয়ে এদেরকে নিবৃত্ত করুন। ফাতহিয়ার হাতে তখন প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি তার অনটনের কথা জানিয়ে অর্থদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তুর্কীরা মুহাম্মদ ইব্‌ন বগা সগীর ও বাবকিয়ালকে তাদের দলে ভিড়িয়ে এদের নেতৃত্বে সশস্ত্র হয়ে খলীফার প্রাসাদের কাছে সমবেত হয়ে খলীফাকে বের হওয়ার আহ্বান জানালো। খলীফা অন্দর থেকে জানালেন যে, তিনি অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ সেবন করেছেন বিধায় এখন বেরোতে পারবেন না। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছেন। খলীফার এ জবাবে তুর্কীরা নিবৃত্ত হলো না। তারা বলপূর্বক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর পা ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে এনে বেদম প্রহার করে, গালাগাল দেয় এবং প্রাসাদের সম্মুখে দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রে খালি মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকে এক একটি করে চপেটাঘাত করে তাঁকে চরম অপদস্থ করে পদত্যাগপত্র লিখতে বলে। মুতাজ্জ তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তারা কাযীউল কুযাত হুসাইন ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিবকে ডেকে পাঠালো এবং মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের অধিবেশন আহ্বান করলো। তারপর মুতাজ্জর পদচ্যুতির সপক্ষে কাযী সাহেব ও অমাত্যবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাকে ভূগর্ভস্থ এক বদ্ধ কামরায় আটক করে। সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এ ঘটনা ঘটে ২৫৫ হিজরীর রজব (৮৬৯ খ্রি জুলাই) মাসে আর মুতাজ্জর মৃত্যু হয় একই সনের ৮ই রমযানে।

তারপর লোকজন বাগদাদ থেকে মুতাজ্জর চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিককে খলীফা পদে বরণ এবং মুহতাদী বিল্লাহ্ খেতাব প্রদান করে। খলীফা মুতাজ্জর মা পুত্রের গ্রেফতারী ও

সত্য কথা হলো, তাহিরীয় বংশীয়রা সর্বদাই খলীফার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এ বংশের কেউ না কেউ বাগদাদের পুলিশ কর্মকর্তা থাকতেনই।

আব্বাসীয় খলীফাদের কোন দিন তাহিরীয় বংশীয়দেরকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করার সাহস হয়নি। কিন্তু তাহিরীয়রা সর্বদাই আব্বাসীয় খলীফাদের অধীন বলেই গণ্য করেছে। তারা খলীফার দরবার থেকে সর্বদাই গভর্নরীর সনদ হাসিল করেন এবং সর্বদাই নির্ধারিত খারাজ সরকারে প্রেরণ করতেন। পক্ষান্তরে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ যে রাজত্বের সূচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইতিহাসে তা সাফারীয় রাজবংশ নামে পরিচিত। যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

মুতাজ্জ বিল্লাহ্‌র পদচ্যুতি ও মৃত্যু

খলীফা মুতাজ্জ সম্পূর্ণভাবে তুর্কী সর্দারদের ক্রীড়নক ছিলেন। তারা যাই চাইতো খলীফাকে দিয়ে তাই করাতো। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। বড় বড় সর্দার ইচ্ছামতো রাজকোষ লুটে নেয়। সৈন্যবাহিনীর লোকজন খলীফার কাছে বেতন-ভাতা দাবি করতো। কিন্তু খলীফা ছিলেন একান্ত অসহায় ও নিরুপায়। অবশেষে একদিন তুর্কীরা আমীরুল মু'মিনীনের দরজায় গিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করে এবং বলে যে, আমাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা করুন. নতুবা আপনার দক্ষিণহস্ত তথা পরিচালক সত্তা সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসীফকে আমরা আজ-কালকের মধ্যে হত্যা করবো।

সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসীফ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী তুর্কী সর্দার। খলীফা তাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। এ হট্টগোল প্রত্যক্ষ করে মুতাজ্জ তার মা ফাতহিয়ার কাছে গিয়ে বলেন, আপনার কাছে কিছু ধন-সম্পদ থাকলে তা দিয়ে এদেরকে নিবৃত্ত করুন। ফাতহিয়ার হাতে তখন প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি তার অনটনের কথা জানিয়ে অর্থদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তুর্কীরা মুহাম্মদ ইব্‌ন বগা সগীর ও বাবকিয়ালকে তাদের দলে ভিড়িয়ে এদের নেতৃত্বে সশস্ত্র হয়ে খলীফার প্রাসাদের কাছে সমবেত হয়ে খলীফাকে বের হওয়ার আহ্বান জানালো। খলীফা অন্দর থেকে জানালেন যে, তিনি অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ সেবন করেছেন বিধায় এখন বেরোতে পারবেন না। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছেন। খলীফার এ জবাবে তুর্কীরা নিবৃত্ত হলো না। তারা বলপূর্বক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর পা ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে এনে বেদম প্রহার করে, গালাগাল দেয় এবং প্রাসাদের সম্মুখে দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রে খালি মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকে এক একটি করে চপেটাঘাত করে তাঁকে চরম অপদস্থ করে পদত্যাগপত্র লিখতে বলে। মুতাজ্জ তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তারা কাযীউল কুযাত হুসাইন ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিবকে ডেকে পাঠালো এবং মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের অধিবেশন আহ্বান করলো। তারপর মুতাজ্জর পদচ্যুতির সপক্ষে কাযী সাহেব ও অমাত্যবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাকে ভূগর্ভস্থ এক বদ্ধ কামরায় আটক করে। সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। এ ঘটনা ঘটে ২৫৫ হিজরীর রজব (৮৬৯ খ্রি জুলাই) মাসে আর মুতাজ্জর মৃত্যু হয় একই সনের ৮ই রমযানে।

তারপর লোকজন বাগদাদ থেকে মুতাজ্জর চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিককে খলীফা পদে বরণ এবং মুহতাদী বিল্লাহ্ খেতাব প্রদান করে। খলীফা মুতাজ্জর মা পুত্রের গ্রেফতারী ও

অবমাননা দেখে একটি সুড়ংগ পথে পালিয়ে গিয়ে সামাররায় আত্মগোপন করেন। তারপর মুহ্তাদী খলীফা হলে ২৫৫ হিজরীর রমযান মাসে (আগস্ট ৮৬৯ খ্রি.) সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ খলীফার নায়েব মনোনীত হলেন। তখন তাঁর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর অনুসন্ধান করে তার কাছে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দীনার পাওয়া যায়। অথচ মুতাজ্জ মাত্র ৫০,০০০ দীনার তার কাছে চেয়েছিলেন যা দিয়ে অনায়াসে তিনি বিদ্রোহীদেরকে নিবৃত্ত করতে পারতেন। সালিহ ফাতহিয়ার সমস্ত অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং সম্ভাব্য যে, এ পাষাণী হতভাগিনী মাত্র পঞ্চাশ হাজার দীনারের জন্য আপন পুত্রকে হত্যার মুখে ঠেলে দিল অথচ তার হাতে তখন এক কোটি দীনার ছিল। তারপর সালিহ্ ফাতহিয়াকে মক্কাশরীফে পাঠিয়ে দেন। মুতামিদ ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেন। অবশেষে সামাররায় এসে ২৬৪ হিজরীতে (৮৭৭ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহ্তাদী বিল্লাহ্

মুহতাদী বিল্লাহ্ (ইব্ন ওয়াছিক বিল্লাহ্ ইব্ন মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন হারূনুর রশীদ)-এর আসল নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিল আবূ ইসহাক। পিতামহ মুতাসিমের শাসনামলে ২১৮ হিজরীতে (৮১৮ খ্রি.) জন্মগ্রহণকারী মুহতাদী ৩৭ বছর বয়সি ২৫৫ হিজরীতে (৮৬৯ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উজ্জ্বল বর্ণের হালকা-পাতলা গড়নের সুদর্শন, আবিদ, যাহিদ সাধু প্রকৃতির ন্যায়পরায়ণ ও বীর পুরুষ ছিলেন এই খলীফা মুহ্তাদী বিল্লাহ্। ধর্মীয় বিধি-বিধান চালু করার ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। খলীফা পদে বরিত হওয়ার দিন থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই রোযা অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোন সহায়ক সমর্থক ছিল না। এমন এক কুক্ষণে তিনি খলীফা পদে বরিত হন যে, ইসলামী খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা তখন ছিল অত্যন্ত দুঃসহ কাজ। হাশিম ইব্ন কাসিম বলেন ঃ একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মুহ্তাদীর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। আমি যখন তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে উঠতে চাইলাম তখন তিনি বললেন, বস! আমি তখন বসলাম। দু'জনে একত্রে ইফতার করে তারপর নামায আদায় করলাম। খলীফা খাবার আনালেন। একটি বেতের ডালিতে পাতলা কয়েকখানা রুটি, একটি পেয়ালাতে লবণ, অপরটিতে শিরকা এবং আরেকটিতে কিছু যয়তুন তেল। এই ছিল আমীরুল মু'মিনীনের খাদ্যসম্ভার। তিনি আমাকে বললেন, খাও। আমি ভাবলাম আসল আহার্য বুঝি তারপরই আসবে। তাই আমি খুবই আস্তে আস্তে খাবার খেতে লাগলাম। খলীফা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে! তুমি খাচ্ছ না যে। দিনে রোযা ছিলে না ? আমি বললাম, রোযাতো ছিলাম। বললেন, আগামীকাল রোযা থাকবে না? বললাম, রমযান মাস কেন রোযা রাখবো না? বললেন, তাহলে ভালমত খাওয়া দাওয়া কর। এ আশায় বসে থেক না যে, আরো আহার্য-সম্ভার আসবে। কেননা এগুলো ছাড়া আমার এখানে আর কোন খাবারের আয়োজন নেই।

আমি বিস্ময় নেত্রে বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন! ব্যাপার কি? আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সর্বাধিক নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনার খাওয়া-দাওয়ার এ অবস্থা? মুহতাদী বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। কিন্তু আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম বনী উমাইয়া বংশের খলীফাদের

মধ্যে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এমনি একজন খলীফা ছিলেন যিনি অল্প আহার্য গ্রহণ করে এবং প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যখন নিজের খান্দানের খলীফাদের অবস্থা তলিয়ে দেখলাম তখন গোটা বনী আব্বাসের মধ্যে তেমনি একজনও খুঁজে পেলাম না। আমার মন লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল য, আমরা হাশিমীয় বংশের হয়েও তাঁদের সমকক্ষ হতে পারলাম না। এ কথা ভেবেই আমি এ জীবন গ্রহণ করেছি।

মুহ্‌তাদী অহেতুক বিনোদন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। গানবাদ্যকে হারাম ঘোষণা করেন, আমিল সচিবদেরকে প্রজাসাধারণের প্রতি অবিচার অত্যাচার করতে কঠোরভাবে বারণ করে দেন। দফতরের নিয়মকানুন তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। নিজে প্রতিদিন দরবারে বসতেন এবং দরবারে আমে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতেন। হিসাবরক্ষকদেরকে পাশে বসিয়ে হিসাব-নিকাশ মিলাতেন।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্‌কেও তুর্কীরাই সিংহাসনে বসিয়েছিল। তুর্কী আমলাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসীফ মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্‌র অভিষেক অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই আহমদ ইব্‌ন ইসরাঈল যাইদ ইব্‌ন মুতাজ্জ বিল্লাহ্ ও আবূ নূহ্‌কে গ্রেফতার করে হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। তারপর হাসান ইব্‌ন মুয়াল্লাদকেও গ্রেফতার করে তাঁর ধনসম্পদও বাজেয়াপ্ত করে। খলীফা মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্ তা অবগত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেন, এদেরকে গ্রেফতার করাই কি যথেষ্ট ছিল না! এদেরকে অযথাই হত্যা করার কি প্রয়োজন ছিল? তারপর মুহ্‌তাদী বিল্লাহ্ সামারিয়া থেকে সমস্ত বায়েজী নর্তকীদেরকে বহিষ্কার করলেন। শাহী মহলে রাখা হিংস্র জন্তুগুলোকে হত্যার এবং শখের কুকুরসমূহকে বের করে দেয়ার নির্দেশ জারি করলেন। তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ওহাবকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কূটনৈতিক চালে সালিহ্ বা ওয়াসীফ তাঁকে পরাস্ত করে নিজেই রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। মুতাজ্জর পদচ্যুতি এবং মুহ্‌তাদীর খলীফারূপে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় মূসা ইব্‌ন বগা রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন কার্য ব্যাপদেশে রে-তে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, সালিহ্ মুতাজ্জকে পদচ্যুত করে মুহ্‌তাদীকে খলীফা পদে বসিয়েছে তখন মুতাজ্জর খুনের বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

রাজধানীতে উপনীত হয়ে তিনি খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসিক আত্মগোপন করলো। মূসাকে খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। দরবারে উপস্থিত হয়েই মূসা খলীফাকে বন্দী করে একটি খচ্চরে আরোহণ করিয়ে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। মুহতাদী বললেন, মূসা, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। শেষ পর্যন্ত তুমি কি করতে যাচ্ছ? জবাবে মূসা বললেন, আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি নেই। তবে আপনি অঙ্গীকার করুন যে, আপনি সালিহ্-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না। খলীফা এতে সম্মত হলে মূসা তৎক্ষণাৎ খলীফার হাতে আনুগত্যের শপথ নিলেন। তারপর সালিহ্‌র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। খলীফা চাইতেন যে, কোনক্রমে মূসা ও সালিহ্‌র মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাক। ফলে মূসা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ফলীফা নিশ্চয়ই সালিহ্‌র অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনিই

বুঝি তাকে গোপন করে রেখেছেন। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, মূসা ইব্‌ন বগার ঘরে তুর্কী অমাত্যদের গোপন বৈঠক বসলো। বৈঠকে স্থির হয় যে, মুহ্‌তাদীকে হত্যা অথবা পদচ্যুত করতে হবে। খলীফা তা জেনে ফেলেন। পরদিন তিনি আম-দরবার তলব করলেন। তারপর সশস্ত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় ক্রুদ্ধ মূর্তিতে দরবারে উপস্থিত হয়ে তুর্কীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের দুরভিসন্ধির কথা আমি অবগত আছি। তোমরা আমাকে অন্য খলীফাদের মতো ভেব না। যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে আমি তোমাদের কয়েকশ লোকের প্রাণ নিয়ে তবে ছাড়বো। আমি আমার শেষ কথা বলে যাওয়ার জন্য এসেছি। প্রাণ নিতে ও দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তোমরা মনে রাখবে, আমার সাথে বৈরিতা তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি শপথ করে বলতে পারি সালিহ্ কোথায় আত্মগোপন করে আছে তার বিন্দুবিসর্গও আমি অবগত নই।

খলীফার তেজদীপ্ত ভাষণে মজলিসে স্তব্ধতা নামলো। কেউ আর টু শব্দটি পর্যন্ত করলো না। তারপর মূসা ঘোষণা করিয়ে দিলেন, যে ব্যক্তি সালিহ্‌কে বন্দী করে আনবে তাকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেয়া হবে। ঘটনাচক্রে এক জায়গায় সালিহ্‌র সন্ধান পাওয়া গেল। মূসা তাকে হত্যা করিয়ে তার দেহচ্যুত শির বল্লমের মাথার উপর রেখে শহর প্রদক্ষিণ করালেন। মুহ্‌তাদী এতে ভীষণ ব্যথিত হন, কিন্তু তুর্কীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মুখে খলীফার করার কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত খলীফা তুর্কী সর্দার বাবকিয়ালের নিকট মূসাকে হত্যা করার লিখিত নির্দেশ পাঠালেন। বাবকিয়াল তা মূসাকে দেখিয়ে দিল। কালবিলম্ব না করে মূসা সসৈন্য খলীফার প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। এদিকে মাগরিব ও ফারগানার সৈন্যরা খলীফার পক্ষে রুখে দাঁড়ালো। ইতস্তত কয়েকটি যুদ্ধ সংঘর্ষ হলো।

ইতিমধ্যেই বাবকিয়াল বন্দী হয়ে খলীফা মুহ্‌তাদীর সম্মুখে নীত হন। মুহ্‌তাদী তাকে হত্যা করিয়ে তার দেহচ্যুত শির তুর্কীদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এতে তুর্কীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বাবকিয়ালের হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ ফারগানা প্রভৃতি স্থানে যে তুর্কীরা এতদিন খলীফার পক্ষে ছিলেন তারাও গিয়ে মূসার বাহিনীতে যোগ দিল। খলীফা মুহ্‌তাদী যখন তুর্কীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন বাগদাদ, সামারা ও অন্যান্য স্থানের প্রজাসাধারণ খলীফার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করছিল। কেননা প্রজাসাধারণ এই খলীফার ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠার জন্যে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিল। তারা তাঁকে পুণ্যবান খলীফা বলে অভিহিত করতো।

কিন্তু তুর্কীদের সাথে এ ন্যায়পরায়ণ খলীফার সংঘর্ষের ফল তাঁর বিপক্ষেই যায়। খলীফা পরাস্ত হন। তুর্কীরা তাঁর অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপ দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে ২৫৬ হিজরীর ১৪ই রজব (জুন ৮৯০ খ্রি.) তারিখে। খলীফা মুহ্‌তাদী সাড়ে এগার মাসকাল খিলাফত পরিচালনা করেন। নিহত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর।

মুহ্‌তাদীকে হত্যার পর তুর্কীরা জুসাক নামক স্থানে কারাবন্দী আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসায়। তারা তাঁর হাতে বায়আত করে তাঁর খিতাব দেয় মু'তামিদ আলাল্লাহ্।

মু'তামিদ আলাল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্ ২২৯ হিজরীতে (৮৪৩-৪৪ খ্রি.) ফতিয়ান নাম্নী জনৈকা রোমদেশীয় বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা মু'তামিদ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খাকানকে প্রধান উযীর মনোনীত করেন। ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) এ ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে মুহাম্মদ ইব্ন মুখাল্লাদ তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী পদে বরিত হন।

উলুভীদের বিদ্রোহ

২৫৬ হিজরীতে (৮৭০ খ্রি.) ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়া ইব্ন আবূ তালিব, যিনি সাধারণ্যে ইব্ন সূফী নামে মশহুর ছিলেন, মিসরে এবং আলী ইব্ন যায়দ উলুভী কূফায় আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। ইব্ন সূফী মিসরে উপর্যুপরি কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে মক্কায় পালিয়ে আসেন। মক্কার আমিল তাঁকে গ্রেফতার করে মিসরে ইব্ন তুলূনের নিকট পাঠিয়ে দেন। ইব্ন তুলূন তাকে কিছুকাল কারাবন্দী রেখে তারপর মুক্ত করে দেন। ইব্ন সূফী মুক্ত হয়ে মিসর থেকে মদীনায় চলে আসেন এবং সেখানেই মারা যান।

আলী ইব্ন যাইদ কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেখানকার আমিলকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে নিজে কূফার সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন। খলীফা মু'তামিদ শাহ্ ইব্ন মীকাল নামক জনৈক সর্দারকে তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু ইনি আলী ইব্ন যাইদের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন। এবার খলীফা কায়জুর নামক সর্দারকে কূফার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

তিনি গিয়ে আলী ইব্ন যাইদকে পরাস্ত করেন। ২৫৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে (সেপ্টেম্বর ৮৭০ খ্রি.) ইনি আলী ইব্ন যাইদের উপর পুনরায় আক্রমণ চালান, এবারও যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে আলী ইব্ন যাইদ পরাস্ত হয়ে গ্রেফতার হলেন। কায়জুর তাঁকে বন্দী অবস্থায় রাজধানীতেই নিয়ে এলেন। এদিকে হুসাইন ইব্ন যাইদ আলভী রে দখল করে বসেন। মূসা ইব্ন বগাকে তার মুকাবিলায় প্রেরণ করা হলো।

এর কিছুদিন পূর্বে আলী নামক একব্যক্তি নিজেকে উলুভী বলে পরিচয় দিয়ে প্রথমে বাহরায়নবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর সে আহ্সায় চলে আসে এবং সেখানেও নিজেকে উলুভী বলে পরিচয় দেয়। তবে প্রথমে যে নসবনামা বর্ণনা করেছিল এবার তাতে কিছু পরিবর্তন করে ফেলে। চতুর্দিকে উলুভীদের বিদ্রোহ ঘোষণার ধুম পড়ে গেছে দেখে তার মনেও বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং নিজেকে উলুভী পরিচয় দিয়ে লোকজনকে দলে ভিড়াতে থাকে। কিন্তু স্থানে স্থানে তার ভুয়া উলুভী পরিচয়ের কথা ফাঁস হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে বাগদাদে সে কতিপয় ক্রীতদাসকে দলে ভিড়িয়ে তাদেরকে সাথে নিয়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখানে গিয়ে ঘোষণা করে যে, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের যে-ই তার দলে ভিড়বে সেই মুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ ঘোষণা শোনামাত্র প্রচুর ক্রীতদাস তার পাশে এসে জমায়েত হয়।

এসব ক্রীতদাস মনিবরা যখন তাদের নিজ নিজ ক্রীতদাসদের ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করার উদ্দেশ্যে তার কাছে দেখা করতে আসলেন তখন তার ইঙ্গিতে ক্রীতদাসরা তাদের মনিবদেরকে গ্রেফতার করে ফেলে। অবশেষে আলী তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। প্রতিদিনই আলীর দলে প্রচুর ক্রীতদাস এসে যোগ দিতে থাকে। আলীর দল দিন দিন ভারী হতে থাকে। সে তাদেরকে রাজনীতি ও তরবারি পরিচালনা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে। তারপর সে কাদিসিয়া এবং তার আশেপাশে লুটপাট করে বসরায় চলে আসে। বসরাবাসীরা তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে পরাস্ত হয়। তারপরেও বসরাবাসীরা বারবার তার সাথে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু প্রতিবারই তারা পরাজিত হয়।

কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস বাহিনী বসরা দখল করে ফেলে। খলীফার দরবার থেকে চার হাজার সৈন্যসহ আবূ হিলাল তুর্কীকে বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরণ করা হলো। রায়যান নদীর তীরে উভয় দলে যুদ্ধ হলো। ক্রীতদাস বাহিনী তাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। মোটকথা ক্রীতদাস বাহিনী কেবল বসরা দখল করে ক্ষান্ত হলো না, তারা আয়লা, আহওয়ায ও অন্যান্য অনেক স্থানও দখল করে নিল। পুনঃপুন তুর্কী সেনাপতিরা খলীফার পক্ষ থেকে তাদের মুকাবিলা করতে এসে প্রতিবারই পরাস্ত হয়ে ফিরে যান। অবশেষে সাঈদ ইব্‌ন সালিহ্ তাদেরকে পরাজিত করে বসরা থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু ২৫৭ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল (সেপ্টেম্বর ৮৭১ খ্রি.) ক্রীতদাস বাহিনী বাহুবলে বসরা পুনর্দখল করে গোটা বসরা শহরকে ভস্মীভূত করে দেয়। বড় বড় দামী প্রাসাদ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে মাটির সাথে একাকার হয়ে যায়। লুটপাটের অন্ত ছিল না। যে-ই সম্মুখে পড়লো সে-ই তাদের তরবারির শিকার হলো।

এ সংবাদ অবগত হয়ে খলীফা মু'তামিদ মুহাম্মদ মা'রূফকে মাওলেদকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে রওয়ানা করলেন। ক্রীতদাসবাহিনী বসরা থেকে বের হয়ে নাহরে মা'কিলে তার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। মাওলেদ বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তারা তাদের সমস্ত রসদপত্র লুটে নেয় এবং পলায়নরতদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারপর তারা নাহ্‌রে মা'কিলের দিকে ফিরে আসে।

এরপর খলীফা মু'তামিদ সেনাপতি মানসূর ইব্‌ন জা'ফর খায়রাতকে ক্রীতদাস বাহিনীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। ক্রীতদাসরা তাদের নেতা আলী ইব্‌ন আবানের নেতৃত্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলে। অবশেষে মানসূর ইব্‌ন জা'ফর পরাস্ত ও নিহত হয়। এ খবর পেয়ে খলীফা মু'তামিদ মক্কার নিযুক্ত গভর্নর তাঁর ভাই মুওয়াফ্‌ফাককে মক্কা থেকে ডেকে পাঠিয়ে মিসর, কিন্‌নাসরীন ও আওয়াসিমের গভর্নরীর সনদ দিয়ে ক্রীতদাস বাহিনীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে মুফ্‌লিহ্ নামক অপর একজন সেনাপতিকে আরেকটি বাহিনী সাথে দিয়ে একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। উভয়ে ক্রীতদাস বাহিনীর মুকাবিলায় রওয়ানা হয়ে পড়লেন।

ক্রীতদাসদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে মুফলিহ্ নিহত হলেন এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা পলায়ন করলো। এতে মুওয়াফ্‌ফাকের সাথীদের মধ্যেও এর বিরাট প্রতিক্রিয়া হলো। তাদের মধ্যেও এতে বিশৃংখলার ভাব দেখা দেয়। অবশেষে মুওয়াফ্‌ফাক পশ্চাদপসরণ করে আপন বাহিনীকে

বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে আবূ খুসায়ব নদীর তীরে এসে পুনরায় ক্রীতদাসবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এ যুদ্ধে তিনি ক্রীতদাসদেরকে পরাস্ত করেন। তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কয়েকশ ক্রীতদাসকে বন্দী করে এবং তাদের হাতে বন্দী অনেককে মুক্ত করে তিনি সামাররায় ফিরে আসেন। কিন্তু এ পরাজয়ের পরও ক্রীতদাসবাহিনীর উৎপাত বন্ধ হয়নি। তারা তাদের বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে আবার লুটপাটে মত্ত হয় এবং ২৭০ হিজরী (৮৮৩-৮৪ খ্রি.) পর্যন্ত বসরাসহ ইরাকের অধিকাংশ এলাকা দখল করে রাখে।

ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ গভর্নর হলেন

মু'তামিদের খলীফা হওয়ার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ২৫৬ হিজরী সালেই (৮৭০ খ্রি) মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিল ইব্‌ন ইবরাহীম তামিমী কিছু সংখ্যক কুর্দীকে হাত করে পারস্য প্রদেশের গভর্নর হুরছ ইব্‌ন সায়মাকে হত্যা করে ঐ প্রদেশে তার দখল প্রতিষ্ঠা করে। এ লোকটি আসলে আরব ইরাকের বাসিন্দা ছিল। বহুদিন পর্যন্ত সে পারস্যে বসবাস করছিল। এদিকে ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ যখন তা অবগত হলেন তখন তিনি পারস্য আক্রমণ করলেন। মুওয়াফ্‌ফাক যে কোন মূল্যে পারস্যকে ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছের কবল থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মু'তামিদের নিকট থেকে তাখারিস্তান ও বল্‌খের গভর্নরীর সনদ লিখিয়ে তাঁর কাছে প্রেরণ করান। তাঁকে এ মর্মে বলে পাঠান যে, আপনি পারস্যের চিন্তা বাদ দিয়ে বল্‌খ ও তাখারিস্তানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ একে সুবর্ণ সুযোগরূপে গ্রহণ করে বল্‌খ ও তাখারিস্তানে শাসন সংহত করে কাবুল গিয়ে উপনীত হন এবং তাবীলকে গ্রেফতার করেন। তিনি প্রচুর উপঢৌকনাদি খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন।

তারপর তিনি সিজিস্তানে আসেন। সিজিস্তান থেকে হিরাত এবং হিরাত থেকে খুরাসান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে খুরাসানের বিভিন্ন নগরীতে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫৯ হিজরীতে (৮৭৩ খ্রি) ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ খুরাসান দখল করে সেখান থেকে তাহিরীয়দেরকে বহিষ্কার করেন। খলীফা মু'তামিদ তখন তাঁকে এ মর্মে একটি হুঁশিয়ারিপত্র প্রেরণ করেন যে, তোমাকে যে সব জনপদের গভর্নরীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে কেবল সেগুলো নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। খুরাসানের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ইয়াকূব তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। ২৬০ হিজরীতে (৮৭৩-৭৪ খ্রি) হাসান ইব্‌ন যায়দ উলুভী দায়লাম থেকে ফৌজ নিয়ে ইয়াকূবের উপর হামলা চালান। তুমুল লড়াইয়ের পর হাসান ইব্‌ন যায়দ পরাস্ত হয়ে দায়লামে ফিরে যান। ইয়াকূব সারিয়া ও আমিল দখল করে অবশেষে সিজিস্তানে ফিরে যান।

মুসেলের বিদ্রোহ

মু'তামিদ আসাতেগীনে নামক জনৈক সর্দারকে মুসেলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তুর্কীরা মুসেলবাসীদের প্রতি অত্যাচার করতে শুরু করে। ফলে মুসেলবাসীরা ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মানকে তাদের নেতা মনোনীত করে তুর্কীদেরকে তাড়িয়ে দেয়। খলীফা এ বিদ্রোহের

কথা অবগত হয়ে তুর্কীদের একটি বাহিনী তাদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর খলীফার পক্ষ মানে তুর্কীবাহিনী পরাস্ত হয় এবং মুসেলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ২৬০-৬১ হিজরীর (৮৭৩-৭৫ খ্রি) ঘটনা।

ইব্ন মুফলেহ, ইব্ন ওয়াসিল ও ইব্ন লাইছ

২৫৬ হিজরীতে (৮৭০ খ্রি) ইয়াকূব ইব্ন লাইছ যখন মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের নিকট থেকে পারস্য প্রদেশ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা করেন তখন খলীফা তাঁকে বল্খ ও তাখারিস্তানের গভর্নরী দিয়ে পারস্য থেকে ফেরত নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইয়াকূবকে যে কোন মূল্যে পারস্য থেকে সরিয়ে রাখা। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের নিকট থেকে পারস্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান ও মুহাম্মদের মধ্যে পারস্যের দখল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। খলীফা আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহের সাহায্যার্থে তাশতামির নামক তুর্কী সর্দারকে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। তাশতামির নামক তুর্কী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং ২৬২ হিজরীতে (৮৭৫ খ্রি) মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহ্কে বন্দী করতে সমর্থ হন। এবার খলীফা মু'তামিদ আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল খলীফার পত্রসমূহের জবাব পর্যন্ত না দিয়ে আবদুর রহমান ইব্ন মুফলেহকে হত্যা করে ওয়াসেত শহরে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মূসা ইব্ন বগা উক্ত ওয়াসেত শহরে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল যখন ওয়াসেত অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ইবরাহীম ইব্ন সায়মা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।

এদিকে ইতিমধ্যে খলীফা মু'তামিদের নিযুক্ত পারস্যের গভর্নর আবুস সাজ তদীয় জামাতা আবদুর রহমানকে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের বিরুদ্ধে রওয়ানা করলেন—যাতে তিনি ওকে উৎখাত করে পারস্যের দখল গ্রহণ করেন। আবদুস সাজ নিজে তখন বসরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে সীমাহীন উপদ্রবরত ক্রীতদাস বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রত ছিলেন। আবদুর রহমান যখন সৈন্যবাহিনীসহ পারস্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে ক্রীতদাসবাহিনীর সর্দার আলী ইব্ন আবানের সাথে ঘটনাচক্রে তার সংঘর্ষ বাঁধে। আলী ইব্ন আবান আবদুর রহমানকে যুদ্ধে পরাস্ত করে হত্যা করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল আহ্ওয়াযেই ইবরাহীম সায়মার মুখোমুখি হন। এমনি সময় খবর এলো যে, ইয়াকূব ইব্ন লাইছ সাফার সিজিস্তান থেকে লোক-লশকর নিয়ে এসে আক্রমণ চালিয়েছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল তামিমী ইবরাহীম ইব্ন সায়মার সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে পারস্যে ফিরে যায়। অবশেষে সাফার ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ইব্ন ওয়াসিল পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। ইয়াকূব সাফার পূর্ণ পারস্য প্রদেশ দখলে আনেন। খুরাসান ইতিমধ্যেই তার দখলে এসেছিল। এবার ২৬১ হিজরীতে (৮৭৫ খ্রি) পারস্যও তাঁর অধিকারে আসলো।

সামানিয়া রাজবংশের সূচনা

সামানী বংশের পূর্ণ বৃত্তান্ত বিশদভাবে যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে কেবল ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এর সূচনাকাল সম্পর্কে আলোকপাত করাকে জরুরী মনে করছি।

আসাদ ইব্‌ন সামান খুরাসানের এক সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর চারপুত্র ছিলেন যথাক্রমে নূহ্, আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ও ইলিয়াস। যে সময় মামূনুর রশীদ খুরাসানের রাজধানী মার্ভে অবস্থান করছিলেন সে সময় উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয় মামূনুর রশীদের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। মামূনুর রশীদ তাঁর উযীরে আযম ফযল ইব্‌ন সাহলের সুপারিশক্রমে তাঁদের চারজনকেই ভাল ভাল পদে নিয়োগ দান করেন। তারপর মামূনুর রশীদ যখন খুরাসানে গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদকে তাঁর নায়েবে সালতানাত বানিয়ে ও খুরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলেন তখন গাস্‌সান ইব্‌ন উব্বাদ নূহকে সমরকন্দের, আহ্‌মদকে ফারগানার, ইয়াহ্ইয়াকে শাশ ও আশরুসনার এবং ইলিয়াসকে হিরাতের শাসনভার অর্পণ করেন।

মানূনুর রশীদ যখন তাঁর মশহুর সিপাহ্‌সালার তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে খুরাসানের গভর্নর করে পাঠালেন তখন তিনিই উক্ত চার ভাইকে তাদের স্বপদে বহাল রাখেন। তারপর নূহ্ ইব্‌ন আসাদের মৃত্যু হলে তাহির ইব্‌ন হুসাইন সমরকন্দ এলাকাকে ইয়াহ্ইয়া ও আহমদের এলাকা দু'টির সাথে শামিল করেছেন। এর দিন কয়েক পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির গভর্নর থাকাকালে ইলিয়াসও ইনতিকাল করলে তার পুত্র আবূ ইসহাক মুহাম্মদকে তার স্থলে হিরাতের শাসক নিযুক্ত করা হয়। আহমদ ইব্‌ন আসাদের সাতটি পুত্র সন্তান ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর বড় পুত্র নসরকে সমরকন্দের শাসক নিযুক্ত করা হয়।

তাহিরীয় বংশের খুরাসান থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ সাফারের অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত নসর সেখানকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ২৬১ হিজরীতে (৮৭৫ খ্রি) খলিফা মু'তামিদ নসরের কাছে সমরকন্দের গভর্নরীর সনদ প্রেরণ করেন। এতকাল এ প্রদেশের শাসক খুরাসানের শাসকের নিকট থেকেই শাসনভার লাভ করতেন। কিন্তু খুরাসান হস্তচ্যুত হওয়ার এবং ইয়াকূব ইব্‌ন সাফারের অধিকারে চলে যাওয়ায় খলীফা কমপক্ষে মাওরাউন নাহর এলাকায় নিজ অধিকার বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সরাসরি নসরের কাছে শাসক নিযুক্তির সনদ প্রেরণ করেন এবং বলে পাঠান যে, ইয়াকূব ইব্‌ন সাফারের প্রতিষ্ঠা থেকে এ এলাকাকে সংরক্ষণ কর। নসর তার ভাই ইসমাঈলকে নাজারার শাসনভার অর্পণ করেন এবং নিজে সমরকন্দে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি) এ দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত বাঁধে। যুদ্ধে ইসমাঈল জয়ী হন। নসর বন্দী হয়ে ইসমাঈলের সম্মুখে নীত হন। ইসমাঈল তখন তাঁর ভাইয়ের পদতলে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁকে সসম্মানে সিংহাসনের উপর উঠিয়ে বসান এবং নিজে তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। তারপর যথারীতি দু'ভাইই স্ব-স্ব এলাকার শাসন পরিচালনা করতে থাকে। এই ইসমাঈল সামানীয় রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর বিশদ আলোচনা পরে আসছে।

যুবরাজের বায়আত

২৬১ হিজরীর শাওয়াল (৮৭৫ খ্রি. জুলাই) মাসে খলীফা মু'তামিদ একটি আম-দরবার ডেকে ঘোষণা করেন যে, আমার পরে আমার পুত্র জা'ফরই পরবর্তী খলীফা হবে। তারপর আমার ভাই আহমদ মুওয়াফ্ফাক হবে খিলাফতের দ্বিতীয় দাবিদার। তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমার পুত্র জা'ফর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তবে আমার ভাই-ই খলীফা পদে আসীন হবে এবং এমতাবস্থায় জা'ফর হবে তার পরবর্তী খলীফা।

এমর্মে সকলের বায়আত নেয়া হলো। জা'ফরকে মুফাওয়ায ইলাল্লাহ্ খেতাব দেয়া হলো এবং আফ্রিকা, মিসর, শাম, জাযিরা, মুসেল ও আর্মেনিয়ার শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে মূসা ইব্ন বগাকে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করা হলো। আবূ আজ্দকে আন-নাসির লি দীনিল্লাহ্ আল-মুওয়াফ্ফাক খেতাব দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের বাগদাদ, কূফা, তরীকে মক্কা, ইয়ামান, কসকর, আহ্ওয়ায ফারেস, ইস্পাহান, রে, যুঞ্জান এবং সিন্ধুর শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত দু'জন যুবরাজের জন্যে দু'টি শ্বেতবর্ণের পতাকা প্রস্তুত করা হলো। যুবরাজ হিসাবে এ বায়আত হওয়ার পর খলীফা মু'তামিদ তাঁর ভাই মুওয়াফ্ফাককে হাবশীদের উৎখাতের জন্যে প্রেরণ করলেন।

সাফারের যুদ্ধ

মুওয়াফ্ফাক হাবশীদের দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা না হতেই খলীফার কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, ইয়াকূব সাফার খুরাসান দখল সম্পন্ন করে রাজধানী দখলের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন। এ সংবাদে সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। মুওয়াফ্ফাক নিজেও হাবশীদের বিরুদ্ধে অভিযান মুলতবি করলেন। খলীফা নিজে রাজধানী থেকে অগ্রসর হয়ে যাফরামিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং আপন ভাই মুওয়াফ্ফাককে সাফারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। মুওয়াফ্ফাকের দক্ষিণ বাহিনীর নেতৃত্ব মূসা ইব্ন বগাকে এবং বামের বাহিনীর নেতৃত্ব মাসরূর বলখীকে অর্পণ করেন। মধ্যবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন স্বয়ং মুওয়াফ্ফাক। ভোর থেকে আসর পর্যন্ত তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। কখনো সাফার বাহিনী আবার কখনো মুওয়াফ্ফাকের বাহিনীর বিজয় হয়। জয়-পরাজয় অনির্ধারিত হয়ে পড়ে। এমনি সময় খলীফা মুওয়াফ্ফাকের সাহায্যার্থে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ নতুন বাহিনীর আগমনে মুওয়াফ্ফাক বাহিনীর নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং সাফার বাহিনীর পরাজয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইয়াকূব ইব্ন সাফার এবং তার সঙ্গীরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। মুওয়াফ্ফাকের বাহিনী তার সেনাছাউনি লুটে নিল। সাফাররা রণাঙ্গণে পরাজিত হয়ে খুযিস্তানের দিকে রওয়ানা হলো এবং জুন্দ সাবূর নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলো। মুওয়াফ্ফাক আর সাফারদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারলেন না। তিনি ওয়াসিতে এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাগদাদে চলে আসেন।

এদিকে মুওয়াফ্ফাকও সাফার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ওদিকে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল যিনি ইতিপূর্বে সাফার বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে পারস্য প্রদেশ হারিয়ে পলায়ন করছিলেন– তিনি এবার উভয়পক্ষের লড়াইয়ের এ সুবর্ণ সুযোগে ময়দান খালি পেয়ে পারস্য দখল করে বসেন। সাফার যখন পরাজিত হয়ে জুন্দী সাবূরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন তখন হাবশীরা

সাফারের কাছে এ মর্মে পত্র লিখলো যে, আপনি এখন খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। সাফার তাদের এ পত্রের জবাবে পূর্ণ 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' সূরা লিখে তাদের কাছে পাঠালেন এবং উমর ইব্‌ন সরীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। উমর ইব্‌ন সরী মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিলকে পারস্য থেকে বের করে দিয়ে পারস্য অধিকার করেন।

মু'তামিদ ইয়াকূব সাফারের যুদ্ধের পর মূসা ইব্‌ন বগাকে হাবশীদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ওদিকে সাফারও একজন সর্দারকে আহ্‌ওয়াযে প্রেরণ করেন। আহ্‌ওয়াযে বাগদাদের খলীফা সাফার ও হাবশী বিদ্রোহীরা ত্রিমুখী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কোন দল অপর কোন দলের সাহায্যকারী বা সমর্থক ছিল না। ইয়াকূব সাফার জুনদী সাবূর থেকে সিজিস্তানের দিকে অগ্রসর হন এবং নিশাপুরে আযীয ইব্‌ন সরীকে এবং হিরাতে আপন ভাই উমর ইব্‌ন লাইছকে শাসক নিযুক্ত করেন। এ সব হচ্ছে ২৬১ হিজরীর (৮৭৫ খ্রি.) ঘটনা।

হাবশী ক্রীতদাসদের ওয়াসিত দখল

ইয়াকূব সাফার জুনদী সাবূর দখল করে সেখানে তার পক্ষ থেকে একজন আমিল নিযুক্ত করে সিজিস্তান অভিমুখে চলে যায়। জনৈক সর্দারকে আহ্‌ওয়াযের দিকে পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে হাবশীরা আহ্‌ওয়াযে সাফারের অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং সাফারের বাহিনীর সাথে সন্ধি করে তারা ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে খলীফার পক্ষ থেকে জনৈক তুর্কী সর্দার নিযুক্ত ছিলেন। আব্বাসীরা তাকে পরাস্ত করে ওয়াসিত দখল করে নয়। খলীফার বাহিনী হাবশীদের মুকাবিলায় টিকতে পারেনি। এটা ২৬৩ হিজরীর (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) ঘটনা।

আহমদ ইব্‌ন তুলূনের শাম দখল

২৬৪ হিজরীতে (৮৭৭-৭৮ খ্রি.) মাজুর নামক জনৈক তুর্কী সর্দার শামদেশের গভর্নর পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁরই পুত্র পিতার স্থলে শাসনভার নিজহাতে তুলে নেন। আহমদ ইব্‌ন তুলূন এ সংবাদ অবগত হয়ে মিসরে আপন পুত্র আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং দামেশকের দিকে অগ্রসর হন। তুর্কী সর্দার তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। ফলে ২৬৪ হিজরীতে (৮৭৭-৭৮ খ্রি) দামেশকে ও তার আশেপাশের এলাকাসমূহ ইব্‌ন তুলূনের পদানত হলো। দুই বছরকাল শামদেশে অবস্থান করে তিনি তাঁর শাসন সংহত করেন। ২৬৬ হিজরীতে (৮৭৭-৭৮ খ্রি.) তিনি শাম থেকে মিসর চলে আসেন। এভাবে মিসর ও শাম উভয় দেশই আহমদ ইব্‌ন তুলূনের দখলে চলে আসে।

ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ সাফারের মৃত্যু

ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ সাফারের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। যদিও খুরাসান তাবারিস্তান ও পারস্যে আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুজিস্তানী, সাঈদ ইব্‌ন তাহির, আলী ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া খারিজী, হাসান ইব্‌ন যায়দ উলুভী, রাফি ইব্‌ন হারছামা প্রমুখ কয়েকজন ক্ষমতা প্রত্যাশী শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই তার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাত করে ক্ষমতা দখলের জন্যে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলে যে, কে জিতবে আর কে

হারবে তা নির্ধারণ করা ছিল অত্যন্ত মুশকিল। তবে বাহ্যত ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছ তাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন, সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর রাজ্যের পরিধিও ছিল খুবই বিস্তৃত। মু'তামিদ যখন লক্ষ্য করলেন, শাম তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে, ইরাকেরও একটা বিশাল এলাকায় হাবশীরা জেঁকে বসেছে, আর কোন মতেই তাদেরকে কাবুও করা যাচ্ছে না, এদিকে খুরাসান ও পারস্য প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তাঁর দখল থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন লাইছকে খুরাসান প্রভৃতি এলাকার শাসনের সনদ যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করাই সমীচীনবোধ করলেন–যাতে তিনি তাঁর আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন এবং বিদ্রোহী হয়ে না ওঠেন। তিনি ভাবলেন এভাবে এসব এলাকায় তাঁর শাসনক্ষমতা সুসংহত হবে। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষে যথারীতি পত্রালাপও শুরু হয়। এমনি সময় ৯ই শাওয়াল, ২৬৫ হিজরীতে (৮৭৮ খ্রি) ইয়াকূব ইব্‌ন সাফার শূলবেদনায় আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। ইয়াকূব ইব্‌ন সাফারের নামে জারিকৃত পারস্যের গভর্নরীর ফরমান খলীফার পক্ষ থেকে ঠিক ঐ সময় গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলো যখন তাঁর মৃত্যুযাতনা শুরু হয়েছে।

ইয়াকূবের পর তাঁর ভাই আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খলীফার দরবারে যথারীতি আনুগত্যের একরারনামা প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁর এ একরারনামা পাঠ করে অত্যন্ত প্রীত হন এবং আমর ইব্‌ন লাইছের নামে খুরাসান, ইস্পাহান, সিন্ধু ও সিজিস্তানের গভর্নরীর সনদ প্রেরণ করে বাগদাদ ও সামাররার পুলিশ বিভাগের দায়িত্বও অর্পণ করলেন। সাথে সাথে তাঁর জন্যে সম্মানজনক খেলাতও পাঠালেন। খলীফার এই ফরমান ও খেলাত প্রেরণের ফলে জনসাধারণ খুশি মনে আমর ইব্‌ন লাইছের আধিপত্য মেনে নেয়। ফলে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মুওয়াফ্‌ফাক ও মু'তামিদের হাতে হাবশীদের উচ্ছেদ

হাবশীদের আগ্রাসী তৎপরতা এবং খলীফার বাহিনীর বার বার তাদের হাতে পর্যুদস্ত হওয়ার ব্যাপারটি মামুলী ছিল না। প্রায় এক দশক ধরে হাবশীরা শাহী বাহিনীর জাঁদরেল জাঁদরেল সেনাপতিদেরকে অধঃমুখী করে রেখেছিল। তাদের আগ্রাসী তৎপরতায় বিভিন্ন জনপদ বিরাণ হয়ে গিয়েছিল। এক একজন হাবশী দল জনপদের উলুভী ও হাশেমী রমণীকে ভোগ করে চলেছিল। বাহবূদ এবং খবীছ নামক তাদের সর্দার মিম্বরে আরোহণ করে খুলাফায়ে রাশিদীন, আহলে বায়ত ও নবী সহধর্মিণীগণকে প্রকাশ্যে গালাগাল দিত। বাহবূদ নিজে আলিমুল-গায়ব তথা অদৃশ্যজ্ঞাতা ও অন্তর্যামী হওয়ারও দাবি করেছিল। সে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। প্রায় এক কোটি মুসলমানকে সে নিধন করে। উপর্যুপরি তাদের বিজয়ে তাদের বিরাট প্রভাব ও ভীতি জনমনে অংকিত হয়। তুর্কীদের বীরত্বের দর্পও তারা চূর্ণ করে দেয়।

তুর্কীরা তাদের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতো। অবশেষে খলীফা মু'তামিদের ভাই মুওয়াফ্‌ফাক তাঁর পুত্র আবদুল আব্বাস মু'তামিদকে যিনি পরবর্তীকালে মু'তামিদ বিল্লাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন– ২৬৬ হিজরীর রবিউস সানী (৮৭৯ খ্রি. নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে হাবশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। আবদুল আব্বাস মু'তামিদ ওয়াসিতের নিকট তুমুল যুদ্ধে হাবশীদেরকে পরাস্ত করেন। খলীফার সৈন্যদের হাতে এটাই ছিল হাবশীদের প্রথম উল্লেখযোগ্য পরাজয়।

তারপর মুওয়াফ্ফাক তাঁর পুত্রের সাথে গিয়ে মিলিত হন। এবার পিতা-পুত্র মিলে হাবশীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করতে থাকেন। চার বছর পর্যন্ত এরূপ যুদ্ধব্যস্ত থাকার পর ২৭০ হিজরীর সফর (৮৮৩ খ্রি. আগস্টের ১১) মাসের পয়লা তারিখে হাবশীদের সর্দার বছীর নিহত হওয়ায় এ উৎপাতের চির অবসান ঘটে। এ উপলক্ষে শহরে আলোকসজ্জা করা হয় এবং আনন্দোৎসব করা হয়। এদিকে মুওয়াফ্ফাক ও মু'তামিদ যখন হাবশীদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন ওদিকে মুসেলে তখন খারিজীরা তুল্কালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। মুসাভির খারিজী ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) নিহত হয় যা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারপর তার ভক্ত অনুরক্তরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ২৭৬ হিজরী (৮৮৯-৯০ খ্রি.) পর্যন্ত উভয় দলে পরস্পরে যুদ্ধরত থাকে। এতদসত্ত্বেও খলীফার পক্ষ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনই উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই একটি ঘটনা দ্বারাই গোটা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

খুরাসানের অরাজকতা

ইয়াকূব ইব্ন সাফারের মৃত্যু হলে খলীফা মু'তামিদ ইয়াকূবের ভাই আমর ইব্ন লাইছকে গভর্নরীর সনদ প্রদান করেন। কিন্তু খুরাসানে তখনো তাহিরীয় বংশের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল না। তাদের একজন ছিল আবূ তালহা এবং অপর এক ব্যক্তি রাফি ইব্ন হারছামা। তারা হুসাইন ইব্ন তাহিরের নামে লোকজনকে সংগঠিত করে শহর জনপদ দখল করতে এবং নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। তারা কখনো আমর ইব্ন লাইছের আমিলদেরকে বের করে দিয়ে শহরসমূহ দখল করতো আবার কখনো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত। এ সব লড়াইয়ে তারা বুখারার শাসক ইসমাঈল ইব্ন আহমেদ ইব্ন আসাদ ইব্ন সামানের সাহায্য-সহযোগিতা চাইত।

ইসমাঈল সামানী কখনো এর, আবার কখনো ওর সাহায্য করতেন। আবার কখনো আমর ইব্ন লাইছ সাফারের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। মোটকথা, এসব রাজ্যে তখন চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় ২৭১ হিজরীতে (৮৮৪-৮৫ খ্রি.) মুওয়াফফাক নিজের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন তাহিরকে খুরাসানের শাসক নিয়োগ করেন। আমর ইব্ন লাইছ সাফারকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগকারী খলীফা মু'তামিদ তাঁকে উক্ত গভর্নরী পদ থেকে পদচ্যুত করলেন। মুহাম্মদ ইব্ন তাহির নিজে বাগদাদে অবস্থান করতেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে খুরাসানে পূর্ব থেকে যুদ্ধরত রাফি ইব্ন হারছামাকে তাঁর নায়েব রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তাতে খুরাসান-এর আশেপাশের এলাকাসমূহে অরাজক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি।

ইব্ন তূলূনের মৃত্যু

আহমদ ইব্ন তূলূনের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মিসর ও শাম দেশ তাঁর দখলে ছিল। খলীফা মু'তামিদ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। তাঁর ভাই মুওয়াফ্ফাক স্বীয় বীরত্ব ও বুদ্ধি বলে গোটা খিলাফত দরবারে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। রাজ্যের আসল কলকাঠি ছিল তাঁরই হাতে। ইব্ন তূলূনের সাথে পত্র যোগাযোগ করে এক সময় তিনি যোগসাজশ করে মিসরে চলে যেতে মনস্থ করেন। এটা ২৬৭ হিজরীর (৮৮০ খ্রি) ঘটনা। এ সময় মুওয়াফ্ফাক

হাবশী ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তিনি অন্যান্য সর্দারের মাধ্যমে মু'তামিদকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁর এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু এজন্যে ইব্‌ন তূলূনের প্রতি তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

২৭০ হিজরীতে (৮৮৩-৮৪ খ্রি.) যখন মুওয়াফ্‌ফাক হাবশীদের সাথে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হলেন, ইব্‌ন তূলূন তখন এন্টিয়কে অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র খামারুভিয়া মিসর ও শামে পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। মুওয়াফ্‌ফাক ইসহাক ইব্‌ন কিন্দাহ্ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুস সাজকে শাম দেশ দখলের জন্যে প্রেরণ করলেন। তার নির্দেশানুযায়ী উক্ত দু'জন সর্দার শামদেশের শহর জনপদসমূহ দখল করতে শুরু করলেন। খামারুভিয়াও তাঁদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তাঁর বাহিনী প্রেরণ করলেন। উক্ত সর্দারদ্বয় তাদের সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে কিছুটা দ্বিধা করলেন এবং কেবল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে নিয়োজিত রইলেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে মুওয়াফ্‌ফাক তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মু'তাদিদকে শামদেশে প্রেরণ করলেন। মু'তাদিদ মিসরীয় সৈন্যদেরকে পিছনে হটিয়ে দামেশ্‌ক জয় করে আরো অগ্রসর হতে লাগলেন। স্বয়ং খামারুভিয়া তাঁর সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। আবুল আব্বাস মু'তাদিদ যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। তিনি যখন দামেশকে ফিরে গেলেন তখন দামেশকবাসীরা শহরের তোরণ খুলতে অস্বীকৃতি জানালো। অগত্যা তিনি তারনুসের দিকে অগ্রসর হলেন। খামারুভিয়া দামেশকে প্রবেশ করলেন এবং শামদেশের শহর ও জনপদসমূহে তাঁর খুতবা ও মুদ্রা চালু হলো। তারমুসবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে আবুল আব্বাস মু'তাদিদকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দিল এবং খামারুভিয়ার খুতবা তথায় চালু করলো। আবুল আব্বাস ভগ্ন হৃদয়ে বাগদাদে ফিরে আসলেন।

তাবারিস্তানের বিবরণ ঃ উলুভী, রাফি ও সাফার

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, দায়লামবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতায় তাবারিস্তানে হাসান ইব্‌ন যাইদ উলুভীর রাজত্ব ইতিমধ্যেই কায়েম হয়ে গিয়েছিল। ২৭০ হিজরীর রজব (৮৮৪ খ্রি. জানুয়ারী) মাসে ইব্‌ন যাইদের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ২৭২ হিজরীতে (৮৮৫-৮৬ খ্রি.) কাযভীনের জনৈক তুর্কী আমিল চার হাজার সৈন্য নিয়ে তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ আট হাজার সৈন্য নিয়ে তার মুকাবিলা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং জুরজানে গিয়ে আশ্রয় নেন। বিজয়ী সৈন্যরা তাবারিস্তান ত্যাগ করার সাথে সাথে তিনি তাবারিস্তান পুনর্দখল করেন। ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি.) রাফি ইব্‌ন হারছামা তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ দীর্ঘকাল তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে ২৭৭ হিজরী (৮৯০-৯১ খ্রি.) পর্যন্ত তাবারিস্তান থেকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হন। অবশেষে ২৮৩ হিজরীতে (৮৯৬ খ্রি.) রাফি ইব্‌ন হারছামা যখন আমর ইব্‌ন লাইছের সাথে যুদ্ধে নিহত হলেন তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ পুনরায় তাবারিস্তান অধিকার করেন। কিন্তু আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার তাঁকে পুনরায় তাবারিস্তান থেকে উৎখাত করেন। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) যখন ইসমাঈল সামানী আমর ইব্‌ন লাইছ সাফারকে গ্রেফতার করে বাগদাদে পাঠিয়ে ছিলেন তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ পুনরায় দায়লাম থেকে

বেরিয়ে এসে তাবারিস্তান পুনর্দখল করেন। এরপর ইসমাঈল সামানী মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূনকে তাবারিস্তানে প্রেরণ করেন। এবার মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন। তার পুত্র যাইদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাইদ বন্দী হয়ে বুখারার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার

আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার খলীফার দরবার থেকে খুরাসান সিজিস্তান প্রভৃতি এলাকার গভর্নরীর সনদ লাভ করেছিলেন। যা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পারস্যও তাঁর আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। ২৭১ হিজরীতে (৮৮৪-৮৫ খ্রি.) খলীফার দরবার থেকে আমর ইব্‌ন লাইছের নামে পদচ্যুতির ফরমান জারি করা হয়। ইস্পাহানের শাসক আহমদ ইব্‌ন আবদুল আযীযের প্রতি খলীফা নির্দেশ জারি করলেন যে, আমর ইব্‌ন লাইছকে পরাস্ত করে পারস্য প্রদেশ যেন তিনি পুনরুদ্ধার করেন। ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাঁধে এবং আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার যুদ্ধে পরাস্ত হন কিন্তু এতদসত্ত্বেও পারস্য তাঁর দখলেই থাকে।

অবশেষে ২৭৪ হিজরীতে (৮৮৭-৮৮ খ্রি.) স্বয়ং মুওয়াফ্‌ফাক পারস্য প্রদেশ আক্রমণ করেন। তিনি প্রদেশটিকে আমর ইব্‌ন লাইছের দখলমুক্ত করে বাগদাদে ফিরে আসেন। আমর ইব্‌ন লাইছ কিরমান ও সিজিস্তানের দিকে চলে যান এবং সিজিস্তান ও খুরাসানে সাফল্যের সাথে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি খলীফার দরবারে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং ২৭৮ হিজরীতে (৮৯১ খ্রি) খলীফার দরবার থেকে মাওরাউন নাহর এলাকা তথা বুখারা, সমরকন্দ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের গভর্নরীর সনদ লাভে সমর্থ হন।

মাওরাউন নাহরে ইসমাঈল ইব্‌ন আহমদ সামানী কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন। আমর ইব্‌ন লাইছ উক্ত এলাকার সনদ লাভ করে সৈন্য-সামন্ত ও সমরাস্ত্র সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। ইসমাঈল ইব্‌ন আহমদ সামানী তা অবহিত হয়ে আমর ইব্‌ন লাইছকে লিখে পাঠালেন যে, আমি সীমান্ত এলাকার এক কোণে পড়ে আছি, আপনার হাতে বিশাল রাজ্য রয়েছে। আপনি আমাকে এ কোণে পড়ে থাকতে দিন। আমাকে রাজ্যহারা করার কোন ফন্দি করবেন না। কিন্তু আমর ইব্‌ন লাইছ তাতে কর্ণপাত করলেন না। তিনি সসৈন্যে মাওরাউন নাহরে আক্রমণ চালালেন। ইসমাঈল সামানী তাঁর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে আমর ইব্‌ন লাইছ বন্দী হয়ে সমরকন্দের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) ইসমাঈল সামানী তাকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। খলীফা মুতামিদের ওফাত পর্যন্ত তিনি বাগদাদের কারাগারেই থাকেন। তারপর মুকতাদী বিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করে তাকে হত্যা করিয়ে ফেলেন।

মক্কা ও মদীনার অবস্থা

মদীনায় মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মূসা কাসিম এবং তাঁর ভাই আলী ইব্‌ন হাসান একে অপরের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হয়ে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। সরকারের ভয় জনমন থেকে তখন সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত। সর্বত্র অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব মদীনা শরীফের অভ্যন্তরে দুই ভাই এমনি ঘোর কলহে লিপ্ত হলেন যে, উভয়পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হলো। ২৭৭ হিজরীর (৮৯০-৯১ খ্রি.) পূর্ণ একটি মাস মদীনা শহরে জুমুআর জামাআত

অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। মক্কা শরীফের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সেখানে ইউসুফ ইব্‌ন আবুস সাজ ছিলেন প্রধান আমিল। তাঁর স্থলে খলীফার দরবার থেকে আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঈ শাসকরূপে সনদ লাভ করলেন। আহমদ তাঈ তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর গোলাম বদরকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করলেন। ইউসুফ তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। মসজিদে বায়তুল হারামের সম্মুখেই উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। ইউসুফ বদরকে বন্দী করলেন। বদরের সৈন্যরা এবং হাজীরা মিলে ইউসুফের উপর হামলা করলেন। তারা ইউসুফকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দিলেন এবং বদরকে মুক্ত করে দিলেন। মোটকথা, তখনকার পরিস্থিতি ছিল লাঠি যার মুল্লুক তার।

মুওয়াফ্‌ফাকের মৃত্যু

খলীফা মু'তামিদ বিল্লাহ্ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। তার ভাই মুওয়াফ্‌ফাকই স্বীয় শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞানবত্তার জোরে রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যাপারে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সত্য কথা হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি খলীফা না হয়েও প্রকৃত পক্ষে তিনিই ছিলেন খিলাফতের চালিকাশক্তি। মুওয়াফ্‌ফাক যুবরাজও ছিলেন— যা উপরেই বিবৃত হয়েছে। তাঁর পূর্বে তুর্কী সর্দাররাই ছিলেন খিলাফতের প্রধান চালিকাশক্তি। মুওয়াফ্‌ফাক ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সে শক্তি খর্ব করে দেন এবং সে শক্তি নিজ হাতে তুলে নেন। মুওয়াফ্‌ফাক যেহেতু হাবশীদের দর্প চূর্ণ করে তাদেরকে উৎখাত করেছিলেন তাই মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর পুত্র মু'তাদিদের জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুর্কী সেনাপতিরা কোনদিনই হাবশীদের সাথে এঁটে উঠতে পারেননি। এ জন্যে তাদেরও আর মুওয়াফ্‌ফাকের বিরোধিতা করার মুখ বা সাহস ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা যেহেতু ইতিমধ্যেই অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল তাই অরাজকতা বেড়েই চলেছিল। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দিনে দিনে যে সব শক্তি গড়ে উঠেছিল, এবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং তাদেরকে দমন করা যাচ্ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজধানীতে মুওয়াফ্‌ফাকের বর্তমানে কারো খলীফা (অগ্রাহ্য) করার বা খুতবায় তাঁর নাম এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। মুওয়াফ্‌ফাক যখন পারস্য ও ইস্পাহান থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁর গেঁটে বাত দেখা দেয়। নানারূপ চিকিৎসা করেও কোন ফলোদয় হয়নি। ২৭৮ হিজরীর ২২ সফর (৮৯১ খ্রি. ৬ জুন) তাঁর মৃত্যু হয় এবং তিনি রুসাফা নামক স্থানে সমাহিত হন। খলীফা মু'তামিদ তখন বেঁচে থাকলেও তাঁর মর্যাদা একজন কয়েদীর বেশি ছিল না। আসল খলীফা মুওয়াফ্‌ফাকই ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে অমাত্যবর্গ তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মুতাদিদকে সর্ব সম্মতিক্রমে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। আপন শৌর্যবীর্য ও প্রজ্ঞাবলে তিনি রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারের মধ্যমণিতে পরিণত হন। খলীফা মু'তামিদ পূর্ববৎ অক্ষম ও অথর্বরূপেই বহাল থাকেন।

কারামিতা

হিজরী ২৭৮ সালে (৮৯১-৯২ খ্রি.) কূফায় হামাদান ওরফে কারামিতা নামক জনৈক ব্যক্তি এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করে। সে ছিল একজন কট্টর শিয়া। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ছিল, ইমাম কেবল সাতজন ঃ

প্রথম ইমাম হুসাইন (রা)
দ্বিতীয় ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন
তৃতীয় ইমাম বাকের ইব্‌ন আলী
চতুর্থ ইমাম হযরত জা'ফর সাদেক
পঞ্চম ইমাম ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর
ষষ্ঠ ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল
সপ্তম ইমাম উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ।

নিজেকে সে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে প্রচার করতো। অথচ প্রকৃত পক্ষে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের উবায়দুল্লাহ্ নামে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সে হযরত আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়াকে রাসূল বলে প্রচার করতো। তার প্রচারিত আযানে সে আশহাদু আন্না মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া রাসূলুল্লাহ্ শব্দ যোগ করেছিল। সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বলে প্রচার করতো। দিবা-রাত্রির মধ্যে কেবল তার দুই ওয়াক্ত নামায ছিল, দুই রাকাআত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং দুই রাকাআত সূর্যাস্তের পরে। সে প্রচার করতো যে, কোন কোন সূরা মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়ার উপরও অবতীর্ণ হয়েছিল। জুমুআর পরিবর্তে সোমবারকে সে সপ্তাহের পবিত্র দিনরূপে গণ্য করে। সে দিন কোন কাজকর্ম করতো না। পূর্ণ বছরে দুই দিন রোযা ফরয জ্ঞান করতো। সে নবীয তথা দ্রাক্ষারসকে হারাম এবং মদ্যকে হালাল জ্ঞান করতো। সঙ্গমের ফরয গোসলকে সে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করতো। তার ইচ্ছামত কোন কোন চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল, আবার কোন কোন চতুষ্পদ জন্তুকে হারাম বলে অভিহিত করতো। কারামিতার বিরুদ্ধাচরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে অবশ্য বধ্য বিবেচনা করতো। সে তার নিজের উপাধি রেখেছিল 'কায়েম ইব্‌ন হক্ক' (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) বলে।

হাবশীদের সর্দার খবীছ এবং বাহবূদের সাথেও সে তার এ নতুন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে তার সমর্থক বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তাদের উৎখাত হওয়ার আট বছর পর কূফায় সে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করলে অনেকেই তার হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে তার ভক্তদলে শামিল হয়। বেগতিক দেখে কূফার আমিল তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

ঘটনাচক্রে কারারক্ষীদের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে কারমাত কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তার ভক্তরা রটিয়ে দিল যে, সে এত বেশি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী যে, কারাগার তাকে আটকে রাখতে পারে না। ধীরে ধীরে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তার ভক্তদল দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজকাল আমরা আমাদের যুগের কবরপূজারী পীরপূজারীদেরকে দেখে তাজ্জব হই যে, কেমন করে তারা অজ্ঞ, মূর্খ, গাঁজাখোর আফিম খোরদেরকে কামেল ও আল্লাহ্‌র ওলী জ্ঞানে তাদের পিছু পিছু ছোটে এবং তাদের প্রত্যেকটি আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাকে জরুরী জ্ঞান করে। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক যুগেই এরূপ অজ্ঞদের একটি দল বর্তমান থাকে। আমাদের নজীবাবাদ শহরে এমনি এক ব্যক্তির কাছে শহরের পেশাদার নর্তকী ও পতিতা রমণীরা প্রতি বৃহস্পতিবার

এসে জমায়েত হয়। তারা তার মজলিসে নাচগান পরিবেশন করে। গুণ্ডা-বদমাশ যুবকরা এই সুযোগে তাদের যৌন লালসা চরিতার্থ করে। প্রকাশ্য মজলিসে আল্লাহ্ ও রাসূলের শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যাদি উচ্চারিত হয়। নামায-রোযার তো কোন বালাই নেই। এক বিরাট সংখ্যক লোক তাকে একেবারে খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। আর তার কাছে তাদের অভাব-অনটনের কথা জ্ঞাপন করে এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদি পেশ করে তাকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পায়। সুস্বাদু আহার্য দ্রব্যাদি এবং দুর্লভ উপহার সামগ্রী তারা তার হাতে তুলে দেয়।

এ ভক্তদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ও উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাও রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও কেন যে লোক তাকে এত ভক্তি করে তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই অগত্যা মেনেই নিতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছেন যারা চোখ থাকতে অন্ধ, মাথা থাকতেও বিবেকহীন, পাগল। এ জাতীয় লোক আজও সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর এ জাতীয় লোকেরাই সে যুগে কারমাতের নব্য আবিস্কৃত ধর্মে দীক্ষিত হয়। এ জাতীয় লোকের উপস্থিতি সর্বদা অন্ধকারমনা লোকদেরকে তাদের রমরমা ব্যবসা চালাতে সাহসী করে তোলে এবং দীন ইসলামের মুকাবিলায় চিরকালই সমস্যা সৃষ্টি করে সত্যিকারের মুসলমানদেরকে তরবারি ও রসনার জিহাদের সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই এদের অস্তিত্বও আল্লাহ্র হিকমত থেকে শূন্য বলে ভাবা যাবে না। এরা যদি নাই থাকতো তবে সত্যিকারের মুসলমানদের তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও তৎপর হয়ে উচ্চতর মর্যাদা লাভ ঘটতো কী করে? নফসে আম্মারা বা পাপাচারের উদ্বুদ্ধকারী প্রবৃত্তি এবং বিতাড়িত শয়তানই যদি না থাকতো তা হলে আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্যে পুরস্কার লাভ ঘটতো কী করে?

যুবরাজরূপে মু'তাদিদের অভিষেক

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুওয়াফ্ফাকের মৃত্যুর পর মু'তাদিদকে যুবরাজ মনোনীত করা হয়। কিন্তু তার এই যুবরাজ পদ প্রাপ্য ছিল জা'ফর ইব্ন মুতামিদের পর। জা'ফর ছিলেন প্রথম যুবরাজ এবং মুতাদিদ ছিলেন দ্বিতীয় যুবরাজ যেমনটি ছিলেন তাঁর পিতা মুওয়াফ্ফাক দ্বিতীয় যুবরাজ। কিন্তু ২৭৯ হিজরীতে (৮৯২-৯৩ খ্রি.) মু'তামিদ মু'তাদিদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে নিজ পুত্র জা'ফরের পরিবর্তে ভ্রাতুষ্পুত্র মুতাদিদের যুবরাজত্বকে অগ্রগণ্য করে তাঁকেই প্রথম যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করলেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ প্রদেশসমূহে আমিলদের নামে এ মর্মে ফরমান জারি করে দিলেন যে, তাঁর পরে মুতাদিদকে সিংহাসনে আরোহণ করবেন।

রোমের যুদ্ধ

খলীফা মু'তামিদের আমলের অস্থির অশান্ত পরিস্থিতির আলোচনায় এখনো রোমানদের প্রসঙ্গ আসেনি। ২৫৭ হিজরীতে (৮৭১ খ্রি.) কনসটান্টিনোপলের কায়সার মীখাইল ইব্ন রুফিলকে তাঁর সাকলাবী নামক জনৈক আত্মীয় হত্যা করে তার সিংহাসনে আরোহণ করে। ২৫৯ হিজরীতে (৮৭৩ খ্রি.) রোমানরা মালীতা আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ২৬৩ হিজরীতে (৮৭৬ খ্রি) তারা তারতূসের নিকটবর্তী কারকারা দুর্গ মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ২৬৪ হিজরীতে (৮৭৬-৭৭ খ্রি.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন

রশীদ কাউস চল্লিশ হাজার শামদেশীয় সীমান্ত সৈন্যসহ রোমানদের উপর হামলা করে জয়ী হন, কিন্তু পরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রশীদ বন্দী হয়ে কনসটান্টিনোপলে নীত হন।

২৬৫ হিজরীতে (৮৭৮-৭৯ খ্রি.) রোমানরা আম-আফ্রিকা আক্রমণ করে চারশ মুসলমানকে হত্যা এবং চারশজনকে বন্দী করে। ঐ বছরই রোম সম্রাট আবদুল্লাহ্ ইব্ন রশীদকে কয়েক জিল্দ কুরআন শরীফসহ আহমদ ইব্ন তূলূনের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। ২৬৬ হিজরীতে (৮৭৯-৮০ খ্রি.) সাকলিয়া দ্বীপ সন্নিহিত রোমান মুসলমানদের নৌবহরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, মুসলমানরা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজ রোমানরা দখল করে নিয়ে যায়। অবশিষ্ট জাহাজগুলো সিসিলী দ্বীপে গিয়ে নোঙর করে।

আহমদ ইব্ন তূলূনের শামের নায়েব এই রোমানদের উপর একটি সফল হামলা চালিয়ে অনেক গনীমত হাসিল করেন। ২৭০ হিজরীতে (৮৮৩-৮৪ খ্রি.) এক লাখ সৈন্যসহ তারতূস থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত কলমিয়া আক্রমণ করে। তারতূসের শাসনকর্তা মাজিয়ার তাদের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়ে সত্তর হাজার সৈন্যকে বধ করেন। তাদের প্রধান পোপ বন্দী হন এবং প্রধান ক্রুশ মুসলমানদের দখলে আসে। ২৭৩ হিজরীতে (৮৮৬-৮৭ খ্রি.) তারতূসের শাসনকর্তা মাজিয়ার এবং আহমদ জু'ফী যৌথভাবে রোমানদের উপর হামলা করেন। যুদ্ধের সময় প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্রের একটি গোলার প্রচণ্ড আঘাতে আহত হয়ে মাজিয়ার যুদ্ধ স্থল পরিত্যাগ করেন এবং পথেই ইনতিকাল করেন। মুসলমানরা তার শবদেহ তারতূসে নিয়ে এসে দাফন করেন। মুসলিম জাহানে চরম অস্থিরতা ও স্থানে স্থানে গৃহযুদ্ধ চলা সত্ত্বেও রোমানরা এ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভে সমর্থ হয়নি।

মু'তামিদের মৃত্যু

খলীফা মু'তামিদ আলাল্লাহ্ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ২০ শে রজব ২৭৯ হিজরীতে (অক্টোবর ৮৯২ খ্রি.) ইনতিকাল করেন। সামাররায় তিনি সমাহিত হন। হারূনুর রশীদের তনয় মুতাসিম বিল্লাহ্র আমল থেকেই সামাররা ছিল আব্বাসীয় খলীফাদের রাজধানী। মু'তামিদ আলাল্লাহ্ সামাররা ছেড়ে বাগদাদে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে রাজধানী পুনরায় বাগদাদে চলে আসে। সামাররা থেকে রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় খলীফার দরবারে জেঁকে বসা তুর্কী সর্দারদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। রাজধানী পরিবর্তনের এ ব্যাপারটির কৃতিত্বও ছিল মু'তামিদের ভাই মুওয়াফ্ফাকেরই। তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই একাজে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মু'তামিদের আমলে রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্ব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে যা একান্তই স্বাভাবিক রাষ্ট্রের আমলাবর্গের সেই অনৈক্য ও রেষারেষি তখন চরমে উঠেছিল। গোটা রাজ্যের সর্বত্র চরম হাঙ্গামা বিরাজ করছিল। লোকের মন থেকে খলীফার প্রভাব বা শ্রদ্ধাবোধ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। যে যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাদেশিক গভর্নররা রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। দেশে আইন-কানুন বলতে কিছু ছিল না। যে যে ভূখণ্ড দখল করলো সেখানেই তার নিজস্ব আইন চালু করে দেয়।

প্রজাদের উপর ব্যাপক জুলুম হতে থাকে। আমলারা যেমন ইচ্ছে তাদের প্রতি নির্যাতন নিপীড়ন চালাতে থাকে। বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। সামান বংশীয়রা মাওরাউন নাহরে, সাফার বংশীয়রা সিজিস্তানে, কিরমান, খুরাসানে ও পারস্য দেশে, হাসান ইব্‌ন যাইদ তাবারিস্তান ও জুর্জানে, হাবশীরা বসরা, আল্লা ও ওয়াসিতে, খারিজীরা মুসেল ও জাযীরায়, ইব্‌ন তূলূন মিসর ও শামে এবং ইব্‌ন আগলাব আফ্রিকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তুলে।

এদের ছাড়াও অনেক ছোট ছোট সর্দারও বিভিন্ন এলাকায় আপন আপন দখল ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষরত ছিল। খলীফার রাজত্বের নিদর্শন কেবল এতটুকুই ছিল যে, জুমুআর খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারিত হতো। খলীফার আর কোন নির্দেশ মান্য করা হতো না। মুওয়াফ্‌ফাক তাঁর সকল শক্তি এবং গোটা জীবন এ সব বিদ্রোহ দমনেই ব্যয় করেন। কিন্তু একমাত্র হাবশী বা যঙ্গীদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হননি। ঐ আমলেই কারামিতা প্রমুখের (পরবর্তীকালে প্রকাশিত) ফিতনার ভিত্তি রচিত হয়। ঐ আমলেই পরবর্তীকালের মিসরীয় সুলতানদের এবং ইয়ামানের শিয়াদের ঊর্ধ্বতম পুরুষ উবায়দুল্লাহ্ উবায়দ নিজে মাহ্‌দী হওয়ার দাবি করেন। এই ব্যক্তি কবীলা বনূ কিনানার অধিকাংশ লোককে সঙ্গে নিয়ে মাগরিবের (মরক্কোর) দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে ক্রমে ক্রমে দল ভারী করে মিসর ও আফ্রিকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঐ আমলেই হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমামবর্গ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) প্রমুখ ইন্তিকাল করেন। মোটকথা, মু'তামিদের রাজত্বের তেইশটি বছর এভাবে অরাজকতা, অস্থিরতা, দুর্ভোগ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

পর্যালোচনা

আব্বাসীয় বংশের খিলাফতের দেড়শ বছর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে তাদের রাজত্ব চলে অত্যন্ত শানশওকত ও দাপটের সাথে। মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র মৃত্যু অর্থাৎ ২২৭ হিজরী (৮৪১-৪২ খ্রি.) থেকে পতনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। পরবর্তী কুড়ি বছর খিলাফতে আব্বাসীয়রা বিগত শতাব্দীকালের গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে এরূপ একটা প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ২৪৭ হিজরীতে (৮৬১-৬২ খ্রি.) মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর হত্যার দ্বারা এর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বার্ধক্য এমনিভাবে তার উপর ছেয়ে যায় যে, অতীত গৌরব ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। দুর্বলতা ও বার্ধক্যের ঐ বত্রিশটি বছরও আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম। এখনও এ বার্ধক্যগ্রস্ত ও দুর্বল খিলাফতকে কয়েক শতাব্দীকাল বেঁচে থাকতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কায়েম হয়ে গেছে। আরো অনেকগুলো কায়েম হওয়ার পথে। শীঘ্রই এমন একটি যুগ আসবে যখন বাগদাদের খিলাফত বা আব্বাসীয় খিলাফতের নামের একটি মহিমা বাকি থাকবে, কিন্তু তা কোন শক্তিরূপে গণ্য হবে না।

এমতাবস্থায় আব্বাসী খিলাফতের খলীফাদের পরবর্তী অবস্থা যদি এই হারে এই অনুপাতে লিখিত হয় তা হলে ইতিহাস তার হৃদয়গ্রহিতা হারিয়ে বসবে এবং পাঠকদের মন-মস্তিষ্কে এক অনাহুত বোঝা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। এজন্যে এ পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস খুবই সংক্ষেপে লিখিত হলেও পরবর্তী বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত হবে। খলীফা মু'তামিদ বিল্লাহ্‌র খিলাফত আমলের যে বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে তার অবিন্যস্তরূপ একথারই প্রমাণবহ যে, এ খলীফাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে বর্ণনা উপযোগী উল্লেখযোগ্য ঘটনা আদতেই খুব কম ছিল। অবশ্য তাঁদের শাসনামলে অন্যদের ভুরি ভুরি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। কেননা, নতুন নতুন সিলসিলা এবং নতুন নতুন রাজবংশের তখন উদ্ভব হচ্ছিল। এ সব সিলসিলা ও রাজবংশকে নিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়ে যাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে তার সূচনাকাল বর্ণনা যে, আব্বাসীয়দের সংস্পর্শে এসে কীভাবে তারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করা জরুরী ছিল যাতে তাদের অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনাকালে তাদের সূচনা ক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। ভবিষ্যতেও আব্বাসীয়দের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সব নতুন নতুন রাজবংশের উদ্ভব হবে সেগুলোর উল্লেখও যথাস্থানে করা হবে।

বনী উমাইয়া বংশের সবচাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে এই যে, তারা যুবরাজ বা পরবর্তী শাসক নির্বাচনকে বংশভিত্তিক করে ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংসের বীজ বপন করেছিল এবং মুসলমানদেরকে এক বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলে। বনী আব্বাস বংশের ত্রুটি কোন অংশে তার চাইতে কম ছিল না যে, তারা বনী উমাইয়ার প্রতিটি ব্যাপার মিটিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রতিটি স্মৃতিকে নিশ্চিহ্ন করেছে, কিন্তু তাদের এই কুপ্রথাকে তারা সযত্নে সংরক্ষণ করেছে এবং মুসলিম জাতির ধ্বংসের এ উপাদানকে তারা মজবুত থেকে মজবুততর করে তুলেছে। তাদের দ্বিতীয় ত্রুটি ছিল এই যে, শুরু থেকেই তারা আরবদের মুকাবিলায় নওমুসলিম ইরানীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সাফ্‌ফাহ্ থেকে শুরু করে হারূনুর রশীদ পর্যন্ত এক মাহ্‌দী ব্যতীত সকলেই আরবদের শক্তি খর্ব করেন এবং মজুসী-বংশোদ্ভূত লোকদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান। ফলে বনী আব্বাস বনী উমাইয়াদের বিজয়ের চাইতে একটুও অগ্রসর হতে পারেনি বরং দিন দিন তাদের রাজত্বের পরিধি হ্রাস পেতে থাকে। ইসলামের সঠিক রূপরেখা এবং ইসলামী নীতিবোধের উপর অগ্নিপূজারীদের একটা হালকা কুজঝটিকার আবরণ পড়ে। মজুসী-বংশোদ্ভূত এ লোকগুলোই আব্বাসীয় খলীফাদের জন্যে সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকে। তবে সাহসী আব্বাসী খলীফাগণ এ সব সমস্যাকে জয় করতে সমর্থ হন। মু'তাসিম বিল্লাহ্ প্রবল শক্তিশালী মজুসীদের মুকাবিলায় মাওরাউন নাহরের তুর্কীদের এক নতুন শক্তি গড়ে তোলেন যাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম মজুসীদের অগ্নি-উপাসনার ধর্ম হলেও বংশগত দিক থেকে তাদের চাইতে এবং খুরাসানীদের চাইতে স্বতন্ত্র ছিল। মুতাসিম বিল্লাহ্‌র এ উদ্যোগ অবশ্যই কার্যকর ও উপাদেয় প্রতিপন্ন হতো—যদি না তিনি তাদেরকে খুরাসানীদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী করে তুলতেন আর যদি তিনি আরবদেরকেও উন্নত করে উক্ত দু'দলের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতেন। কিন্তু খলীফা বংশের সাথে দিন দিন আরবদের দূরত্ব বৃদ্ধিই পেতে থাকে। মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র তুর্কী জনপদ সামাররায় অবস্থান করায় তুর্কীদের সীমাহীন উন্নতির পথ খুলে যায়। মু'তাসিম বিল্লাহ্ সম্ভবত এজন্যেই তুর্কীদেরকে পছন্দ করেন যে, তারা

উলুভীদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আরবদের প্রতি তাদের বিরূপ থাকার কারণ ছিল উলুভীরাও আরব ছিল। কিন্তু উলুভীদের প্রতি ইরানীদের অনুরাগ আরবদের চাইতেও বেশি ছিল। এজন্যে খলীফাদের সমস্যার অন্ত ছিল না। মু'তাসিম তাই উক্ত দু'দল ছেড়ে তৃতীয় এমন একটি দলকে বেছে নিলেন যারা এ ব্যাপারে একেবারেই নিরাসক্ত ছিল। কিন্তু ঐ তৃতীয় দল অর্থাৎ তুর্কীরা ইরানীদের মত সুসভ্য এবং অভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদ ছিল না। এদেরকে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন ছিল জবরদস্ত চৌকস হাতের। মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি হারূন ও মামূনের মত উচ্চ মেধার আরও কয়েকজন খলীফা হতেন তা হলে আব্বাসী খিলাফতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো এবং মু'তাসিমের রাজধানী সামাররায় স্থানান্তর সঠিক ও কার্যকর বলে গণ্য হতো। কিন্তু মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা এবং আরবদের দুর্বলতর হওয়ায় সামাররায় রাজধানী স্থানান্তর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার প্রতিবিধান কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

তুর্কীরা ছিল একটা দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি। তাদের মেধা বলতে কিছু ছিল না। তাই তারা না পারলো নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আর না তারা উলুভীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযাগী হলো। উলুভীরা ক্লান্ত শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে। বাহ্যত আব্বাসীয়দের সম্মুখে তেমন কোন বড় সংকট ছিল না। কিন্তু মু'তাসিমের পর স্বয়ং রাজধানী বাগদাদে যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতা শুরু হলো তখন কেন্দ্রের এ অরাজকতার প্রভাব গোটা রাজ্যে পড়লো এবং বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ালী ও আমিলরা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়লো। আন্দালুস (স্পেন), মরক্কো ও আফ্রিকার উদাহরণ তাদের চোখের সম্মুখেই ছিল। হৃৎপিণ্ড আঘাতগ্রস্ত হতেই গোটা দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেল। ঐ সব প্রাদেশিক ওয়ালী ও আমিলদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও অরাজকতা লক্ষ্য করে খারিজী, হাবশী, কারামতী প্রভৃতি দল ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো। এখন এমন এক অবস্থার উদ্ভব হলো যে, মানসূর, হারূন ও মামূনও যদি এ অবস্থায় বেঁচে থাকতেন তবে তাঁদের পক্ষেও হয়তো পরিস্থিতি সামাল দেয়া মুশকিল হতো। মুতাওয়াক্কিলের হত্যা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের পক্ষেও অত্যন্ত অশুভ একটি ঘটনা। তাঁর অব্যবহিত পরেই যদি মুওয়াফ্ফাক সিংহাসনে আরোহণ করতেন তাহলে হয়তো তিনি সামাল দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তখন খলীফারূপে কাজ করার মওকা পাননি। আর তাঁর পুত্র মু'তাদিদ—যিনি পিতার মতই শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ছিলেন এমন সময় খলীফা হন যখন ব্যাধি সকল চিকিৎসার অতীত হয়ে গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুতাদিদ বিল্লাহ্

মু'তাদিদ বিল্লাহ্‌র বংশ তালিকা নিম্নরূপ

হারূনুর রশীদ

মু'তাসিম বিল্লাহ্

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্

মুওয়াফ্‌ফাক বিল্লাহ্

মুতাদিদ বিল্লাহ্

তাঁর আসল নাম ও উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। ২৪৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৮৫৭ খ্রি. জুলাই) সাওআব নাম্নী দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর চাচা মু'তামিদ বিল্লাহ্‌র পর ২৭৯ হিজরীর রজব (অক্টোবর ৮৯২ খ্রি) মাসে তিনি খলীফা পদে আসীন হন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, সাহসী ও বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন। প্রয়োজনে কঠোরতা এমনকি রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হতেন না। চেহারায় ছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। যে কোন বিষয় উপলব্ধি করার মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষী ও গল্পকথকদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। মামূনের যুগ থেকেই দর্শনের চর্চা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় কলহ এবং বাক্-বিতণ্ডার অবসানকল্পে তিনি দর্শন ও বাহাসের পুস্তকাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রজাদের ভূমি-রাজস্ব তিনি কমিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং প্রজাদের উপর থেকে সকল প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন দূরীকরণে সচেষ্ট থাকতেন।

মক্কায় এতকাল পর্যন্ত দারুন্ নাদওয়া নামক কুরায়শদের সেই ইতিহাস বিখ্যাত মন্ত্রণাগৃহটি বর্তমান ছিল। মুতাদিদ তা ভেঙ্গে দিয়ে বায়তুল হারাম মসজিদের পাশে তদস্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ায় নওরোজের দিন তারা বাগদাদে উৎসব পালন ও অগ্নি প্রজ্বলনের প্রথা চালু করেছিল। মুতাদিদ ফরমানবলে তা বন্ধ করে দেন। তিনি মিসরের শাসক খামারুভিয়া ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূনের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি মীরাছ সংক্রান্ত অধিদপ্তর কায়েম করেন এবং যাবিল আরহামদের জন্যেও উত্তরাধিকার দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রজাসাধারণ এতে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং তাঁর জন্যে দু'আ করে। প্রজাসাধারণের মধ্যে এজন্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

একবার মু'তাদিদ কাযী আবূ হাযিমকে বলে পাঠালেন যে, আপনি অমুকের নিকট থেকে লোকের প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিয়েছেন। তার কাছে আমার নিজেরও কিছু প্রাপ্য আছে। আপনি তা আমাকে আদায় করে দিন। কাযী জবাবে বলে পাঠালেন, আপনি সাক্ষী পেশ

করুন, তা হলে আপনার সপক্ষে রায় দেয়া হবে। মু'তাদিদের পক্ষে সাক্ষীরা কাযী আবূ হাযিমের আদালতে হাযির হতে অস্বীকৃতি জানালো এই ভয়ে যে, পাছে কাযী সাহেব তাদেরকে সাক্ষী হিসাবে অনুপযুক্ত না সাব্যস্ত করেন। ফলে মু'তাদিদ তাঁর প্রাপ্য আদায়ে ব্যর্থ হন। মু'তাদিদ আব্বাসীয় খিলাফতের অত্যন্ত দুরবস্থা যুগে খলীফা হন এবং তিনি এ দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় উন্নতির কিছু লক্ষণ দেখা দিলেও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রাখার মত যোগ্যতা ছিল না।

মু'তাদিদের ক্ষমতাসীন হওয়ার কয়েকদিন মাত্র পরেই নসর ইব্‌ন আহ্‌মদ সামানীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্থলে তাঁর ভাই ইসমাঈল ইব্‌ন সামানী মাওরাউন নাহরের শাসক নিযুক্ত হন। মুসেল এলাকায় খারিজীদের দু'টি দল পরস্পরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তন্মধ্যে একদলের নেতা আবূ জূযা ২৮০ হিজরীতে (৮৯৩-৯৪ খ্রি.) বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হলে মু'তাদিদ অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে তাকে হত্যা করান। অপর দলের সর্দার হারূন শাবী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকে। ২৮০ হিজরীতে (৮৯৩-৯৪ খ্রি) মু'তাদিদ নিজে জাযিরায় অভিযান চালিয়ে বনী শায়বানের গোত্রসমূহের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করেন এবং প্রচুর গনীমতের মাল নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। মু'তাদিদ তাঁর বদর নামক গোলামকে পুলিশ বিভাগের প্রধান এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহবকে উযীর নিযুক্ত করেন। ২৮১ হিজরীতে (৮৯৪-৯৫ খ্রি.) তিনি মারভীন দুর্গ দখলকারী হামদান ইব্‌ন হামদূনকে বন্দী করে বাগদাদে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, উক্ত হামদান খারিজী নেতা হারূন শা'বীর সাথে সখ্যতা স্থাপন করেছিল। মু'তাদিদ এ সময় মারভীন দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেন।

২৮১ হিজরীতে (৮৯৪-৯৫ খ্রি) মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আলী ওরফে মুক্‌তাফীকে রে, কাযবীন, জুনজান, কুম, জাদআন প্রভৃতি এলাকার শাসক নিযুক্ত করেন। ২৮৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ৮৯৬ খ্রি.) মাসে খলীফা মু'তাদিদ মুসেল এলাকায় নিজে সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে হারূন শা'বী খারিজীকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। হারূনকে গ্রেফতার করে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং নিজে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর বাগদাদে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাকে হত্যা করেন। ২৮৫ হিজরীতে (৮৯৮ খ্রি.) মু'তাদিদ আযারবায়জান আক্রমণ করে আমুদকেল্লা অধিকার করেন এবং আহমদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন শায়খকে গ্রেফতার করেন। ২৮৬ হিজরীর রবিউসসানী (৮৯৯ খ্রি-এর এপ্রিল) মাসে তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

কারামিতাদের খারাজ

২৮১ হিজরীতে (৮৯৪ খ্রি.) কারামিতাভক্তদের মধ্যকার জনৈক ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাহ্‌দী বাহরায়নের নিকটবর্তী কাতীফ নামক স্থানে এসে আলী ইব্‌ন মুআল্লা ইব্‌ন হামাদানের গৃহে অবস্থান করে এবং দাবি করে যে, যামানার মাহ্‌দী তাকে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি নিজে শিগগিরই বিদ্রোহ করবেন। উক্ত আলী ছিল শিয়া মতাবলম্বী। সে শিয়াদেরকে একত্র করে ইয়াহ্‌ইয়া পেশকৃত কথিত যামানার ইমামের পত্রটি দেখায় এবং তাদেরকে তা পাঠ করে শুনায়। শিয়ারা অত্যন্ত ভক্তি গদ গদ চিত্তে পত্রটি শ্রবণ করে এবং মাহ্‌দী আত্মপ্রকাশ করলে তাঁর সাথে বিদ্রোহে শামিল হবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিছুদিন পর ইয়াহ্‌ইয়া আত্মগোপন করে এবং তারপর পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে কথিত ইমামের দ্বিতীয় একখানা পত্র দেখায় যাতে

লেখা ছিল– তোমরা মাথা পিছু ছত্রিশ দীনার করে ইয়াহ্ইয়াকে প্রদান কর। শিয়ারা তাৎক্ষণিকভাবে তা পালন করে। কয়েকদিন পর তৃতীয়বারের মত আত্মপ্রকাশ করে ইয়াহ্ইয়া কথিত ইমামের এ মর্মের একটি পত্র হাযির করে যাতে লেখা ছিল ঃ তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যামানার ইমামের জন্যে ইয়াহ্ইয়ার হাতে অর্পণ কর।

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খ্রি.) আবূ সাঈদ জানানী বাহরায়নে এসে কারামিতা ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিল। এতকাল যারা গোপনে গোপনে এ ধর্ম পালন করে আসছিল এখন তারা প্রকাশ্যে তার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হতে লাগল। আবূ সাঈদ তাদের সকলকে নিয়ে কাতীফে অবস্থান করে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করে বসরা আক্রমণ করতে মনস্থ করলো। বাহরায়নে এ বৃত্তান্ত অবহিত হয়ে খলীফা মু'তাদিদ বসরার আমিল আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ওয়াছিকীকে বসরায় প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। চৌদ্দ হাজার দীনার ব্যয়ে সে মতে বসরার প্রাচীর নির্মিত হলো।

আবূ সাঈদ বসরার উপকণ্ঠে পৌঁছতেই রাজধানী বাগদাদ থেকে আব্বাসী ইব্ন উমর গানাভী দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বসরার হিফাযতের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপনীত হন। বসরার বাইরেই আব্বাস ও আবূ সাঈদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আবূ সাঈদ আব্বাসকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। আব্বাসের সাথে অপর যারা যুদ্ধে বন্দী হলেন তাদের সকলকেই আবূ সাঈদ একে একে আগুনে নিক্ষেপ করে জীবন্ত দগ্ধ করে। এটা ২৮৭ হিজরীর শাবান (আগস্ট ৯০০ খ্রি.) মাসের ঘটনা। আবূ সাঈদ কারামতী যুদ্ধ বিজয়ের পর বসরা ছেড়ে হিজর জয় করতে মনস্থ করে। হিজরবাসীদেরকে অভয় দিয়ে সে অনায়াসেই হিজর অধিকার করে। তারপর বসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়।

বসরাবাসীদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু বসরার আমিল আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ওয়াছিকী তাদেরকে অভয় ও সান্ত্বনা দেন। আবূ সাঈদ এবারও বসরা ছেড়ে এবং আব্বাসকে মুক্ত করে দিয়ে বাহরায়নের নিকটবর্তী এলাকায় চলে যায়। ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) আবুল কাসিম ইয়াহ্ইয়া ওরফে যাকারাভিয়া ইব্ন মাহ্রাভিয়া কূফায় গিয়ে কুলায়স ইব্ন যামযাম ইব্ন আদী গোত্রকে কারামিতা মাযহাবে দীক্ষিত করে। দিন দিন তাদের দল ভারী হয়ে উঠলে শবল নামক জনৈক সর্দার তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের আবুল ফাওয়ারিস নামক জনৈক সর্দারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। অবশিষ্টরা পালিয়ে দামেশকের দিকে চলে যায়। শবল বন্দী আবুল ফাওয়ারিসকে বাগদাদে খলীফা মু'তাদিদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খলীফা তাকে হত্যা করিয়ে দেন। কারামিতারা দামেশকে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে নিজেদের দলে ভিড়াতে প্রয়াস পায়। দামেশকের শাসক বতখ কারামিতাদের সাথে উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত হন। এটা ২৮৯ হিজরীর (৯০২ খ্রি.) কথা। এ সময় মু'তাদিদ বিল্লাহ্র শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কারামিতাদের অবশিষ্ট বর্ণনা পরবর্তীতে যথাস্থানে দেয়া হবে।

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খ্রি.) মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আলীকে জাযীরা এবং আওয়াসিমের গভর্নর হিসেবে সনদ প্রদান করেন এবং হাসান ইব্ন আমর নাসরানীকে রিক্কা থেকে ডাকিয়ে এনে তাঁর মীর-মুন্সী বা উযীর পদ দান করেন। এই আলীই পরবর্তীকালে মুকতাফী লকবে খ্যাতি অর্জন করেন।

২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) তাহির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লাইছ সাফার একটি বাহিনী যোগাড় করে পারস্য অধিকার করতে উদ্যোগী হন। ইসমাঈল সামানী তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তুমি যদি এ প্রদেশে হস্তক্ষেপ করার খায়েশ অন্তরে পোষণ কর, তা হলে আমি আসছি। এতে তাহির নিবৃত্ত হলো। কিন্তু খলীফা মু'তাদিদের গোলাম বদর গিয়ে পারস্য অধিকার করে ফেললো। উযীর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহবের ইন্তিকাল হলে খলীফা মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আবুল কাসিমকে উযীরে আযম পদে মনোনীত করলেন। খলীফা মু'তাদিদের শাসনামলে ২৮৫ হিজরী (৮৯৮ খ্রি.) ২৮৭ হিজরী (৯০০ খ্রি.) এবং ২৮৮ হিজরীতে (৯০১ খ্রি.) মুসলমানরা রোমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। যুদ্ধে কখনো রোমানদের, আবার কখনো মুসলমানদের বেশি ক্ষতি হয়।

মু'তাদিদ বিল্লাহ্‌র ওফাত

২৮৯ হিজরীতে (৯০২ খ্রি.) খলীফা মু'তাদিদ বিল্লাহ্ অধিক সঙ্গমজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর উপর নানা রোগব্যাধির প্রাবল্য দেখা দেয়। মৃত্যু যাতনার সময় জনৈক চিকিৎসক তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করছিলেন। আচমকা তিনি চিকিৎসককে সজোরে একটি লাথি মারেন। ফলে সাথে সাথে চিকিৎসক মারা গেলেন। ওদিকে মু'তাদিদেরও প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। মু'তাদিদ চার পুত্র এবং এগারজন কন্যা সন্তান রেখে যান। ২৮৯ হিজরীর রবিউস সানী (৯০২ খ্রি. মার্চ) মাসের শেষ তারিখে মু'তাদিদের মৃত্যু হয়।

মুকতাফী বিল্লাহ্

মুকতাফী বিল্লাহ্‌র বংশতালিকা নিম্নরূপ

হারূনুর রশীদ
মু'তাসিম বিল্লাহ্
মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্
মুওয়াফ্‌ফাক বিল্লাহ্
মুকতাফী বিল্লাহ্

তাঁর আসল নাম ছিল 'আলী এবং উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। জীজাক নাম্নী জনৈকা তুর্কী দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ইতিহাসে আলী নামের খলীফা কেবল দু'জনই হয়েছেন। একজন হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং অপরজন এই মুকতাফী বিল্লাহ্। মু'তাদিদ বিল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনীত করেন। মু'তাদিদের ইন্তিকালের সময় তিনি রিক্কায় ছিলেন। পারস্যে ক্রীতদাস বদর এবং রাজধানীতে উযীরে আযম কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ মুকতাফীর নামে লোকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং রিক্কায় তাঁর কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। মুকতাফী জুমাদাল আউয়াল তারিখে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং উযীর কাসিমকে সাতটি খেলাত প্রদান করেন। মুকতাফী অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী এবং সুঠাম দেহী সুপুরুষ ছিলেন। উযীর কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ মু'তাদিদের সন্তানই কেবল খলীফা হোন এটাই চাইতেন না। তাঁর ইচ্ছে এ বংশের অন্য কেউ খলীফা হোন।

বদরের চাপের মুখে উযীরকে তার মত পরিবর্তন করতে হয়। এখন তার ভয় ছিল পাছে বদর দরবারে উপস্থিত হয়ে খলীফাকে তাঁর পূর্ব ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেন। তাহলে খলীফা তাঁর শত্রু হয়ে যাবেন। তাই বদর পারস্য থেকে বাগদাদে এসে পৌঁছার পূর্বেই খলীফাকে তার প্রতি যে কোন প্রকারে সন্দিহান করে তুলবার ফন্দি তিনি আঁটতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্যে বদরের সাথে পারস্যে অবস্থানকারী বড় বড় সর্দারকে রাজধানীতে ডেকে পাঠানো হলো। বদর যখন পারস্য থেকে ওয়াসিতে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াসিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হলো। বদর খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তার নির্দেশ হওয়ার কথা প্রকাশ করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। উযীর খলীফাকে তার বিরুদ্ধে আরো বেশি ক্ষেপিয়ে তুললেন। ফলে বাগদাদে পৌঁছবার পূর্বেই তাকে হত্যা করা হলো।

বদর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, সাহসী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর হত্যা মামূনুর রশীদের খিলাফত আমলের প্রথম দিকে হারছামা ইব্‌ন আইউনের হত্যার সাথেই কেবল তুল্য। ২৮৯ হিজরীর রজব (৯০২ খ্রি জুলাই) মাসে ইসমাঈল সামানীর জনৈক বিদ্রোহী সর্দার মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন রে অধিকার করে নেয়। মুকতাফী তাকে দমনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ হারূন তাদেরকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। খলীফা মুকতাফী তখন রে এলাকাও ইসমাঈল সামানীকে দিয়ে দেন। তিনি রে-তে পৌঁছে তা অধিকার করেন। মুহাম্মদ হারূন পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দী হয়ে আসে। ইসমাঈল সামানী তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ২৯০ হিজরীর শাবান (জুলাই ৯০৩ খ্রি) মাসে কারাগারেই তার মৃত্যু হয়।

সিরিয়ায় কারামিতাদের গোলযোগ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারামিতারা বাহরায়ন প্রদেশ দখল করে কূফায় এসে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেখানে তারা পরাস্ত হয়। তারপর তারা দামেশকে গিয়ে সেখানকার আমিল তাফাজকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে অবরোধ করে ফেলে। দামেশকে কারামিতাদের এ উৎপাত লক্ষ্য করে মুকতাফী বিল্লাহ্ বাগদাদ থেকে সসৈন্যে রওয়ানা হন। ২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খ্রি.) তিনি রিক্কায় পৌঁছে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে দামেশকে কারামিতাদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কারামিতাদের মুকাবিলা করেন। কারামিতাদের সর্দার আবুল কাসিম ইয়াহ্ইয়া ওরফে যাকরাভিয়া ২৯১ হিজরীর ৬ই মুহাররম (৯০৩ খ্রি. ৩০ নভেম্বর) গ্রেফতার হয়। তাদের অনেকে হতাহত ও অনেকে বন্দী হয়, আবার অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যাকরাভিয়া বন্দী অবস্থায় রিক্কায় মুকতাফীর সম্মুখে নীত হয়। তিনি তাকে হত্যা করেন। যাকরাভিয়ার পর তার ভাই হুসাইন কারামিতাদেরকে পুনরায় সংগঠিত করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাকেও হত্যা করা হয়। এই হুসাইন নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন মাহ্দী খেতাবে ভূষিত করে। তার এক চাচাত ভাই ঈসা নিজেকে মুদ্দাছছির নামে অভিহিত করে দাবি করে যে, সূরা মুদ্দাছছিরে তারই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে তার গোলামের নামকরণ করে 'মুতাওয়াক বিননূর' বা 'আলোকমালা সজ্জিত' বলে। মোটকথা, ২৯১ হিজরী (৯০৪ খ্রি.) অবধি কারামিতা নেতাদের সকলেই একে একে নিহত হয় এবং সিরিয়ার এ উৎপাত বন্ধ হয়। তবে এরা ইয়ামানে গিয়ে সেখানে নতুনভাবে উৎপাত সৃষ্টি করে।

মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের অবসান

কারামিতাদের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে মুকতাফী রিক্কা হতে বাগদাদে ফিরে আসেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানও দামেশক থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা ইব্‌ন তূলূনের পৌত্র হারূন ইব্‌ন খামারুভিয়ার শাসনাধীন ছিল। খলীফা কিংবা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল কারোরই তার সাথে লড়াইর কোন ইচ্ছে ছিল না বরং কারামিতাদের উচ্ছেদ সাধনে খলীফার তৎপর হওয়ায় যেমন খলীফার জন্যে তাঁর রাজত্ব রক্ষার ব্যবস্থা ছিল তেমনি তা মিসর রাজ হারূনের পক্ষেও বেশ সহায়ক ছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান প্রথমে মিসর রাজদরবারে তূলূন বংশের একজন বেতনভোগী সর্দার ছিলেন। তারপর কোন কারণে ঐ বংশের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে খলীফার দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। কারামিতাদেরকে দমন শেষে মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান যখন বাগদাদ অভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন তিনি হারূন ইব্‌ন খামারুভিয়ার দাস বদর হাম্মামীর এ মর্মের একটি পত্র পান যে, আজকাল তূলূন বংশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁদের শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। আপনি যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সসৈন্য এদিকে হানা দেন এবং মিসর আক্রমণ করেন তাহলে আমি রাজবংশের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান এ পত্রখানা নিয়ে বাগদাদে আসেন এবং খলীফা মুকতাফীর দরবারে তা পেশ করেন। খলীফা কালবিলম্ব না করে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে তাকে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান মিসরে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করলেন। পূর্বের কথা অনুযায়ী বদর হামী দলত্যাগ করে তাঁর সাথে এসে মিলিত হলো। যুদ্ধে হারূন ইব্‌ন খামারুভিয়া নিহত হলেন। মিসর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের পদানত হলো। তূলূন বংশের প্রত্যেকে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হলো। এটা ২৯২ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ৯০৪ খ্রি.) মাসের ঘটনা। খলীফার দরবার থেকে ঈসা নওশরীকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে তথায় প্রেরণ করা হলো। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান তাঁর হাতে মিসরের শাসন বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। ওদিকে মিসরে তূলূন বংশের সমর্থক সর্দারদের একজন সিপাহ্‌সালার ইবরাহীম খিলজী ঈসা নওশরীকে পরাস্ত করে মিসর পুনর্দখল করে নেয়। বাগদাদ থেকে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হলো। প্রথমে সে বাহিনী পরাস্ত হলেও পরে ইবরাহীম খিলজী পরাজিত ও বন্দী হয়ে বাগদাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ বছরই খলীফা ইয়ামানে কারামিতাদের উৎপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুজাফফার ইব্‌ন হাজকে গভর্নরীর সনদ দিয়ে ইয়ামানে প্রেরণ করেন।

বনী হামদান

২৯২ হিজরীতে (৯০৫ খ্রি.) খলীফা মুকতাফী আবুল হায়জা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন হামদূন আদভী তাগলবীকে মুসেল প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। ২৯৩ হিজরীর পয়লা মুহাররম (২রা নভেম্বর ৯০৫ খ্রি.) তিনি প্রথম মিসরে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর মুসেলে উপস্থিতির সাথে সাথে সেখানকার কুর্দীরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। আবুল হায়জা মিসর থেকে সৈন্য আনিয়ে কুর্দীদের মুকাবিলায় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি কুর্দীদের হাতে প্রথমে পরাস্ত হন। অগত্যা মুসেলে ফিরে এসে তিনি খলীফার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেমতে বাগদাদ থেকে সাহায্য পাঠানো হয়। ২৯৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল

(জানুয়ারী ৯০৭ খ্রি.) মাসে আবুল হায়জা পুনরায় কুর্দীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। এবার কুর্দীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সীক পর্বতে আত্মগোপন করে। আবুল হায়জা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ লড়াই ও অবরোধ চলার পর অবশেষে কুর্দী নেতা মুহাম্মদ ইব্ন বিলাল অভয় প্রার্থনা করেন। তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুরও করা হয়। এ ঘটনায় গোটা প্রদেশে আবুল হায়জার দাপট কায়েম হয়। কুর্দীরা তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়ে পড়ে। ৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) স্বয়ং আবুল হায়জা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। খলীফা মুকতাদির তাঁর মুনিস নামক ভৃত্যকে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবুল হায়জা বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হন। তাঁর অপরাধ ক্ষমা করা হয় এবং তিনি বাগদাদে বসবাস করতে থাকেন। তারপর আবুল হায়জা এবং তাঁর ভাই হুসাইনকে তাঁদের অন্যান্য নিকটাত্মীয়সহ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৩০৫ হিজরীতে (৯১৭-১৮ খ্রি.) তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

তুর্কী ও রোমানদের হামলা

২৯১ হিজরীতে (৯০৪ খ্রি.) রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু তাতে তারা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। সীমান্তের মুসলিম সর্দাররা তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেন। ২৯৩ হিজরীতে (৯০৬ খ্রি.) এক নতুন উপদ্রবের সূচনা হয়। মাওরাউন নাহরের অপর পারে উত্তরের পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী তুর্কীরা মাওরাউন নাহরে আক্রমণ চালায়। এটা ছিল তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রথম হামলা। এই বন্য ও গেয়ো হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর। পাহাড়ী ঢলের মত তারা সমভূমিতে নেমে এসে চতুর্দিক ছেয়ে যায়। মাওরাউন নাহরের শাসনকর্তা ইসমাঈল সামানী অত্যন্ত সাহসিকতা ও পরম ধৈর্য-সহ্যের সাথে আপন সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করে এ আক্রমণকারীদের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন। তাদের হাজার হাজার সৈন্য বন্দী এবং হাজার হাজার হতাহত হয়। অবশিষ্টরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। এ বছর রোমানরা সন্ধির আবেদন জানায় এবং পূর্বের নিয়মানুযায়ী বন্দী বিনিময় হয়। কিন্তু এ সন্ধির অব্যবহিত পরেই রোমানরা ফোরাস শহরে অতর্কিত নৈশ আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার ঘুমন্ত মুসলমানকে শহীদ ও গ্রেফতার করে। তারা শহরের জামে মসজিদ ভস্মীভূত করে চলে যায়। ঐ বছরই ইসমাঈল সামানী দুয়াইলেম ও তুর্কীদের কোন কোন এলাকা বাহুবলে জয় করেন। ২৯৪ হিজরীতে (৯০৬ খ্রি) মুসলমানরা তারতূসের দিক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের উপর হামলা করে একজন পাদ্রীসহ অনেককে গ্রেফতার করেন। এই পাদ্রী পরে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুকতাফী বিল্লাহ্র মৃত্যু

সাড়ে ছয় বছরকাল রাজ্য শাসন করে ২৯৫ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল (মার্চ ৯০৮ খ্রি.) মাসে মুকতাফী বিল্লাহ্ বাগদাদে ইন্তিকার করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন তাহিরের বাড়িতে সমাহিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভাই জা'ফরকে তাঁর উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করেন। মুকতাফী বিল্লাহ্ মৃত্যুকালে বায়তুলমালে দেড় কোটি দীনার রেখে যান। জা'ফর ইব্ন মুতাদিদের বয়স তখন ছিল মাত্র তের বছর। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে মুকতাদির বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন।

মুকতাদির বিল্লাহ্

মুকতাদির বিল্লাহ্‌র আসল নাম ছিল জা'ফর এবং তার উপনাম ছিল আবুল ফযল। ২৮২ হিজরীর রমযান (ডিসেম্বর ৮৯৫ খ্রি.) মাসে গারীর নাম্নী রোমান দাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়। মুকতাফী বিল্লাহ্ তার মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে রাজকুমার মনোনয়নের ব্যাপারে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন তখন লোকজন তাঁকে মুকতাদির বিল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানালে তিনি তাঁকেই রাজকুমার মনোনীত করেন। ইতিপূর্বে এত কম বয়সে আর কেউই খলীফা হননি। তাই মুকতাদির ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে জল্পনাকল্পনা চলে। উযীরে আযমের ক্ষমতার পরিধি যেহেতু অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তাঁর ছিল এজন্যও অমাত্যবর্গের মুকতাদিরের খিলাফত পছন্দ ছিল না। এদিকে উযীরে আযমেরও এই ছেলে মানুষের খিলাফত পছন্দ ছিল না। তাই তারা মুতাজ্জর পুত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসার জন্যে প্ররোচণা দিতে লাগলো। মুকতাদিরকে পদচ্যুত করার এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাজ্জকে সিংহাসনে বসাবার সলাপরামর্শ যখন চলছিল সেই সময় আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাজ্জর মৃত্যু হয়ে যায়। তারপর মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ্‌র পুত্র আবুল হুসাইনকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঘটনাচক্রে আবুল হুসাইনও এ সময় মৃত্যুবরণ করেন। দু'জন প্রস্তাবিত ব্যক্তির মৃত্যুতে খলীফা মুকতাদিরের খিলাফতের ভিত্তি একরূপ শক্তই হয়ে যায়। কয়েকদিন পর পুনরায় কানাঘুষা শুরু হয় এবং অমাত্যবর্গ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাজ্জকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাজ্জ এ উপলক্ষে রক্তপাত হবে না এ শর্তে তাতে সম্মতি দেন। অমাত্যবর্গের সকলেই এ পরামর্শে শামিল ছিলেন। কিন্তু উযীরে আযম আব্বাস ইব্‌ন হুসাইন এতে শামিল ছিলেন না। ২০শে রবিউল আউয়াল ২৯৬ হিজরীতে (ডিসেম্বর ৯০৮) তিনি যখন বাগানে পায়চারী করতে যাচ্ছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। পরদিন ২১শে রবিউল আউয়াল মুকতাদিরের পদচ্যুতির ঘোষণা দিয়ে সকলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাজ্জর হাতে বায়আত করেন। খলীফা মুকতাদির তখন মাঠে পোলো খেলছিলেন। পদচ্যুতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে বহির্দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাজ্জ সিংহাসনে বসে আল-মুরতাযা বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি মুকতাদিরকে লিখে পাঠালেন যে, খলীফার প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসো এবং চিরতরে খিলাফতের মায়া ছেড়ে দেয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। মুকতাদির জবাবে লিখে পাঠালেন যে, আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। রাত পর্যন্ত আমাকের সময় দিন। রাতের বেলা ভৃত্য মুনিসের সাথে অন্যান্য ভৃত্যরা হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা করল। হুসাইন ইব্‌ন হামদান খলীফার প্রাসাদের দরজায় পা দিতেই তারা তীর বর্ষণ করতে লাগলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুকতাদিরের গোলামরা এরূপ তীর বর্ষণ অব্যাহত রাখে। রাত নাগাদ আরো অনেকে এসে মুকতাদিরের সপক্ষে দাঁড়াল। ফলশ্রুতিতে নব্য খলীফা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাজ্জ তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীসহ আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। মুকতাদির ভৃত্য মুনিসকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রোহী তৎপরতা দমনের আদেশ দিলেন। আবুল হাসান ইব্‌ন ফুরাতকে তিনি উযীরে আযম মনোনীত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাজ্জ গ্রেফতার হয়ে নিহত হন। ঐ বছরই অর্থাৎ ২৯৬ হিজরীর রবিউস সানী (৯০৯ খ্রি জানুয়ারী) মাসে আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর হাতে বায়আত হওয়ায় উবায়দিয়া শিয়া ইমামিয়া রাজবংশের সূচনা হয় এবং আগলাবী রাজবংশের অবসান ঘটে। তাই উবায়দিয়া রাজবংশের সূচনা এবং আগলাবী রাজবংশের অবসানের বিবরণ প্রদান সমীচীন মনে করছি।

উবায়দিয়া রাজবংশের সূত্রপাত

এ বংশের প্রথম বাদশাহ্ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী নিজেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর সাদিকের পুত্র বলে দাবি করতেন। কিন্তু তাঁর বংশপঞ্জী সম্পর্কে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ছিলেন অগ্নিউপাসক। আবার কেউ কেউ তাঁকে খ্রিস্টানও বলেছেন- শায়খুল মুনাযিরীন কাযী আবূ বকর বাকিল্লানীও উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর সাইয়িদ বংশোদ্ভূত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্‌র শাসনামলে তার বংশতালিকা সম্পর্কে যখন আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছিল তখন বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর উলুভী বা আলী বংশোদ্ভূত হওয়ার দাবিকে মিথ্যাচার বলে অভিহিত করেছেন। সে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে আবুল আব্বাস আবিওযারা, আবূ হামিদ ইসফারায়েনী, আবূ জা'ফর নাসফী, কুদূরী প্রমুখও রয়েছেন। মুরতাযা ইব্‌ন বাতহাবী ও ইব্‌ন আয্‌যাকও উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীকে তাকে তার নসবনামা বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছেন।

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী ছিলেন চরমপন্থী শিয়া। কিন্তু শিয়া পণ্ডিতবর্গও তার উলুভী হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মান তার উলুভী হওয়ার দাবিতে তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ঐতিহাসিকদের শিরোমণি শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী অত্যন্ত জোর দিয়ে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীকে তার নসবের দাবিতে মিথ্যাবাদী এবং অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত বলে তার সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তবে ইতিহাস শাস্ত্রের অপর এক ইমাম ইব্‌ন খালদুন ইবায়দুল্লাহ্‌কে উলুভী বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর মুকাদ্দমা ইব্‌ন খালদুনে এবং ইতিহাস পুস্তকে উবায়দুল্লাহ্‌র বংশ সংক্রান্ত দাবিকে যথার্থ বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর সপক্ষে তিনি যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা একান্তই দুর্বল এবং তাঁর নিজের মর্যাদার দিক থেকে চিন্তা করলে তা একান্তই হাস্যকর ঠেকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তিনি লিখেছেন উবায়দুল্লাহ্ খানদানে এক বিরাট সালতানাত গড়ে ওঠে। তিনি যদি উলুভীই না হতেন, তবে লোকে তাদের বাদশাহী মেনে নিত না বা তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে শির দিতে কোনমতেই রাযী হতো না। কারো নসবনামা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এরূপ যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয় নেয়া একান্তই হাস্যকর ব্যাপার। সত্যকথা হলো, এ ব্যাপারে ইব্‌ন খালদুনের কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি নিজে যেহেতু মাগরিবের লোক তাই একটি মাগরিবী রাজবংশ অজ্ঞাত কুলশীল হবে এটা পছন্দ করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে মরক্কোর উয়ায়সিয়া রাজবংশকেও উলুভী প্রতিপন্ন করার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সুলতান দ্বিতীয় ইদরীসকে প্রথম ইদরীসের পুত্র প্রমাণ করতে এবং অযথা একজন বর্বর রমণীর সতীত্ব নিয়ে অযথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করেছেন। কেননা, ওটাও একটা মাগবিরী সালতানাতই ছিল। এটা উক্ত ইমাম সাহেবের প্রতি আমাদের

একটা কুধারণাও হতে পারে। আল্লাহ্ মাফ করুন। এসব রাজবংশের ধারাবাহিক আলোচনা যেখানে আসবে সেখানেই তাদের বংশপঞ্জী সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

পরবর্তীকালে ইব্ন হাওশাব নামক ইয়ামানে বসবাসকারী জনৈক কূফাবাসী কারামতী শিয়া হালওয়ানী ও সুফিয়ানী নামক দু'জন প্রচারককে আফ্রিকায় পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে সেখানে আহলে বায়তের প্রতি অনুরাগের দাওয়াত দিতে থাকে। তারা আফ্রিকার কাতামা নামক স্থানে যথারীতি প্রচারকেন্দ্র খোলে ও স্থায়িভাবে আখড়া গেড়ে বসে লোকজনকে কারামিতা আদর্শের দিকে আহ্বান জানাতে থাকে। তারা তাদের সপক্ষে প্রচুর লোককে ভিড়াতে সমর্থ হয়। তারা সেখানকার প্রচুর সংখ্যক লোকের মধ্যে এ ধারণা ছড়াতে সক্ষম হয় যে, হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) বলপূর্বক ও অন্যায়ভাবে খিলাফত দখল করেছিলেন। এজন্যে তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ধর্মত ওয়াজিব। খিলাফত ও ইমামত একমাত্র হযরত আলী (রা)-এর বংশধরদেরই অধিকার। এতে অন্য কারো অধিকার নেই। কাতামা এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সেখান থেকে যখন সংবাদ আসলো যে, হালওয়ানী ও সুফিয়ানীর মৃত্যু হয়েছে, তখন উক্ত উবায়দুল্লাহ্ জনৈক আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়াকে এই নিশ্চিত ধারণা দিয়ে আফ্রিকায় তার প্রতিনিধি প্রচারকরূপে প্রেরণ করে যে, সে (উবায়দুল্লাহ্) ইমাম জা'ফর সাদিকের বংশধর। উক্ত প্রচারকারী ছিল সানআবাসী একজন শিয়া। উবায়দুল্লাহ্ তাকে এ ধারণা দেন যে, জা'ফর সাদিকের পুত্র মুহাম্মদকে মুহাম্মদ মাকতূস তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন। এজন্যে প্রচারক আবূ আবদুল্লাহ্কে কাতামায় গিয়ে অবস্থান করতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল, কাতামা আর মাকতূস শব্দ দু'টিরই মূল ধাতু হচ্ছে আরবী 'কিৎমান যার অর্থ হচ্ছে গোপন করা।

আবূ আবদুল্লাহ্ প্রথমে ইয়ামানে ইব্ন হাওশাবের কাছে যায়। সেখান থেকে হাজীদের এক কাফেলার সাথে মক্কা মুয়ায্যামায় আসে। এখানে সে কাতামার হাজীদেরকে খুঁজে নিয়ে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। তারা তার ধর্মপরায়ণতা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয় এবং তার খুব খিদমত করে। হজ্জের পর তারা যখন আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন সেও তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে যায়। তারা এটাকে তাদের সৌভাগ্য মনে করে। দেশে পৌঁছে তারা আঙ্কজান পর্বত শীর্ষে তার জন্যে একটা ঘর নির্মাণ করে দেয়। তারা এ ঘরের নাম রাখে 'ফাজ্জুল আখইয়ার'। আবূ আবদুল্লাহ্ সেখানে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়। লোকজন অত্যন্ত ভক্তি গদ-গদচিত্তে তার সাথে মুলাকাত করতে আসতো। সে তাদের কাছে প্রকাশ করতো যে, মাহ্দী অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনিই আমাকে এখানে অবস্থানের আদেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমার সাহায্যকারী ভক্তদের নাম কিতমান ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। তাই তারা কাতামাবাসীই হবে। ধীরে ধীরে কাতামায় আবূ আবদুল্লাহ্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

রাজধানী কায়রোয়ানে আফ্রিকায় নিযুক্ত ওয়ালী ইবরাহীম ইব্ন আগলাবের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁর অধীনস্থ মায়লার আমিলকে আবূ আবদুল্লাহ্র বিবরণ লিখে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। জবাবে আমিল এ মর্মে রিপোর্ট দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি একজন সংসার বিরাগী। সে লোকজনকে

সালাত, সিয়াম শিক্ষা দেয়। এ জবাব পেয়ে ইবরাহীম চুপ হয়ে গেলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই আবূ আবদুল্লাহ্ তার লোক সংগ্রহ করে মায়লা শহরে আক্রমণ চালায়। শহরটি অবরোধ করে শহরের ওয়ালীকে তাড়িয়ে দিয়ে সে মায়লায় তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সংবাদ পেয়ে ইবরাহীম ইব্ন আহমদ আগলাবী তাঁর পুত্র আহওয়ালকে একটি বাহিনী দিয়ে মায়লায় প্রেরণ করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মায়লা থেকে কাতামা অভিমুখে পালিয়ে যায় এবং একেবারে আঙ্কজান পর্বতে গিয়ে ওঠে। আহ্ওয়াল সেখান থেকে কায়রোয়ানে ফিরে যান। এ সময় আফ্রিকার বাদশাহ ইবরাহীম ইব্ন আহমদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আঙ্কজানে একটি নতুন শহর পত্তন করে তার নামকরণ করে 'দারুল হিজরত'। আহওয়াল তাকে দমনের উদ্দেশ্যে আঙ্কজান গিয়ে উপস্থিত হন। এদিকে আবুল আব্বাসের মৃত্যু হয়ে যায় এবং তার পুত্র যিয়াদতুল্লাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েই আহওয়ালকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে কোন কারণে হত্যা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে কাতামার একটি প্রতিনিধিদলকে হিমসে অবস্থানরত তার গুরু উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে পাঠায় এবং তার নিজের সাফল্য ও বিজয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করে তাকে সেখানে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানায়। এ প্রতিনিধি দলের আগমন এবং এরূপ বার্তা নিয়ে আসার সংবাদ গুপ্তচর মাধ্যমে খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্ অবহিত হন। তিনি অবিলম্বে উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করেন এবং মিসরের গভর্নর ঈসা নওশরীকেও (ইবন তূলূনের বংশধরদের পতনের পর মিসরের গভর্নর নিয়োজিত ছিলেন) লিখেন যে, উবায়দুল্লাহ্ যখন মিসর দিয়ে অতিক্রম করবে, তাকে তুমি গ্রেফতার করবে। খলীফা মুকতাফীর এ আদেশকেও ইব্ন খালদূন উবাদুল্লাহ্র সাইয়িদ বংশোদ্ভূত হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, উবায়দুল্লাহ্ যদি প্রকৃতই আহলে বায়তভুক্ত না হতেন তা হলে মুকতাফী তাকে গ্রেফতারীর হুকুম জারি করতেন না। অথচ এটা একেবারেই দুর্বল যুক্তি। কেননা, প্রতিটি গোলযোগ সৃষ্টিকারী বা গোপনে গোপনে এরূপ তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাকে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে। এমনকি এরূপ নাশকতামূলক তৎপরতার স্থান সে রাষ্ট্রর সীমার বাইরে হয়ে থাকলেও রাষ্ট্র তা করে থাকে। বলাবাহুল্য, আফ্রিকার আগলাব বংশীয় সুলতানরা আব্বাসীয় খলীফাদের কর্তৃক স্বীকার করতেন এবং তারা জুমুআর খুতবায় আব্বাসীয় সুলতানদের নাম উচ্চারণ করতেন। এছাড়া তদানীন্তন আফ্রিকার সীমা মিসরের সাথে লাগোয়া ছিল। সুতরাং মুকতাফী আফ্রিকায় কোন গোলযোগ সৃষ্টিকে কেমন করে মেনে নিতে পারতেন?

উবায়দুল্লাহ্ তার পুত্র ও ভক্তদেরকে নিয়ে সওদাগরের বেশে সওদাগরী কাফেলার সাথে হিম্স থেকে সত্যি সত্যি রওয়ানা হয়ে পড়লো। মিসরে গিয়ে সে ধরাও পড়লো, কিন্তু নওশরীকে প্রতারণা করে সে মুক্ত হয়ে গেল। মিসর অতিক্রম করে সে আফ্রিকা রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করলো। এখানেও যিয়াদতুল্লাহ্র গুপ্তচর বাহিনী তার জন্যে ওঁৎপেতে ছিল। কিন্তু সকলের চোখে ধূলা দিয়ে সে সালহামাসা রাজ্যে গিয়ে উপনীত হলো। সেখানকার শাসক

ছেলেদেরসহ উবায়দুল্লাহ্‌কে গ্রেফতার করতে সমর্থ হলেন। যিয়াদতুল্লাহ্ বিলাস-ব্যসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রাজ্য শাসনের দিকে তাঁর তেমন মনোযোগ ছিল না। এজন্যেই উবায়দুল্লাহ্ নির্বিঘ্নে তার শিয়া তৎপরতা চালিয়ে দল ভারী করতে সমর্থ হয়। যিয়াদতুল্লাহ্ যখন লক্ষ্য করলেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ আফ্রিকা রাজ্যের সুবিশাল এলাকায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ক্রমেই তাঁর রাজ্য সীমাকে সঙ্কুচিত করে চলেছে তখন তিনি একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে আবূ আবদুল্লাহ্‌কে উৎখাতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ রণক্ষেত্রে টিকতে না পেরে একটি সুউচ্চ পর্বতে আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘ ছয়মাসকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করে। সপ্তম মাসে আকস্মিক এক নৈশ অভিযান চালিয়ে আফ্রিকান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে একের পর এক বিজয় অর্জন করে এবং শহর ও জনপদ দখল করতে থাকে। যিয়াদতুল্লাহ্ অপর এক সেনাপতিকে তার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু আবূ আবদুল্লাহ্‌র হাতে তারও পরাজয় ঘটে। অবস্থা বেগতিক দেখে ২৯৫ হিজরীতে (৯০৭-৮ খ্রি) যিয়াদতুল্লাহ্ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁর বাহিনীসমূহ ও সিপাহসালারদেরকে আবূ আবদুল্লাহ্‌কে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে আবূ আবদুল্লাহ্‌র দাপট ও প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে গেছে। পূর্ণ বছরব্যাপী যুদ্ধ অব্যাহত রইল। কখনো আবূ আবদুল্লাহ্‌র পরাজয় হচ্ছিল, আবার কখনো আফ্রিকা বাহিনী পরাস্ত হচ্ছিল। আবূ আবদুল্লাহ্‌র লোক-লশকর দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। লোকজন ক্রমেই তার দলে ভিড়তে লাগলো। পক্ষান্তরে যিয়াদতুল্লাহ্‌র বাহিনীর লোকসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকলো। একে একে অনেক শহর জনপদই আবূ আবদুল্লাহ্‌র পদানত হতে লাগলো। এমনকি যিয়াদতুল্লাহ্‌র বাহিনীর সর্দাররাও এসে আবূ আবদুল্লাহ্‌র শিবিরে ভিড়তে লাগলো।

আরূবা ইব্‌ন ইউসুফ ও হাসান ইব্‌ন আবূ খুযায়ব এসে তার এখানে চাকরি গ্রহণ করলো। ২৯৬ হিজরীর রজব (এপ্রিল ৯০৯ খ্রি) মাসে আবূ আবদুল্লাহ্ রাজধানী কায়রোয়ান দখল করে যিয়াদতুল্লাহ্‌কে তাড়িয়ে দিয়ে শাহী মহলসমূহে কাতামাবাসীদের বসবাসের সুযোগ করে দেয়। তার সালজামাদের আক্রমণ করে সেখানকার শাসক আলইয়াছ ইব্‌ন মিদরারকে পরাস্ত করে তাকে গ্রেফতার ও হত্যা করে। তারপর উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীকে কারামুক্ত করে ঘোড়ার উপর চড়িয়ে তার পিছনে পিছনে হাযা মাওলাকুম হাযা মাওলাকুম (ইনি তোমাদের মনিব,ইনি তোমাদের মনিব) বলতে বলতে সৈন্য শিবিরে এসে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে মার্চ করে তারা 'রাফাদা' শহরে যায়। আবূ আবদুল্লাহ্ এবং অপর সকলে উবাদুল্লাহ্‌র হাতে বায়আত হয় এবং তাকে আল-মাহ্‌দী আমীরুল মু'মিনীন খেতাবে ভূষিত করে। এই বায়আত ২৯৬ হিজরীর রবিউস সানি (জানুয়ারী ৯০৯ খ্রি) মাসের শেষ দশকে অনুষ্ঠিত হয় আর সেদিন থেকেই উবায়দিয়া রাজত্বের সূচনা হয়।

মাহ্‌দী উবায়দুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর মুবাল্লিগ ওয়ায়েজদেরকে গোটা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। কেউ তার ধর্মমত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সে তাকে হত্যার হুকুম দেয়। কাতামাবাসীদেরকে সে বড় বড় জায়গীর ও রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ দান করে। সাকালিয়া দ্বীপের গভর্নর রূপে সে হাসান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ হুযায়রকে প্রেরণ করে। সে ব্যক্তি

২৯৭ হিজরীর যুলহাজ্জ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৯১০ খ্রি.) মাসে সেখানে উপস্থিত হয়ে অত্যাচার নিপীড়নে দ্বীপবাসীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অনুরূপভাবে আফ্রিকা রাজ্যের সর্বত্র নিজস্ব ওয়ালী নিয়োগ করে সে যথারীতি তার রাজ্য শাসন চালিয়ে যায়।

২৯৯ হিজরীতে (৯১১-১২ খ্রি.) সাকালিয়া দ্বীপবাসীরা হাসান ইব্ন আহমদের বিরুদ্ধে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে তার স্থলে আলী ইব্ন উমরকে সাকালিয়ার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। সাকালিয়াবাসীরা তার প্রতিও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তারা তাকেও পদচ্যুত করে নিজেরাই আহমদ ইব্ন মাওহাবকে তাদের শাসকরূপে গ্রহণ করে নেয়। আহমদ ইব্ন মাওহাব মুকতাদির বিল্লাহ্ আব্বাসীর আনুগত্যের প্রতি লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে মাহ্দীর পরিবর্তে জুমুআর খুতবায় মুকতাদির বিল্লাহ্র নাম প্রবর্তন করেন। তিনি একটি নৌবাহিনী বিন্যস্ত করে আফ্রিকার উপকূলের দিকে প্রেরণ করেন।

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন খুযায়রের অধীনে একটি নৌবহর প্রেরণ করলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইব্ন খুযায়র যুদ্ধে মারা যায় এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর নৌবহর সাকালিয়াবাসীরা পুড়িয়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করে দেয়। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ আহমদ ইব্ন মাওহাবের জন্য বহুমূল্য কৃষ্ণখিলাত প্রেরণ করেন এবং পতাকা পাঠিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। এভাবে প্রায় এক বছরকাল ধরে সাকালিয়া দ্বীপে আব্বাসীয় খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তারপর উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী একটি শক্তিশালী নৌবহর সাকালিয়া অভিমুখে প্রেরণ করলে আহমদ ইব্ন মাওহাব পরাস্ত হন। সাকালিয়া দ্বীপবাসীরা তাঁকে এবং তাঁর সৈন্য-সামন্তকে বন্দী করে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে প্রেরণ করে নিজেরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী আহমদ ইব্ন মাওহাব ও তার সঙ্গীদেরকে ইব্ন খুযায়রের সমাধি ক্ষেত্রে নিয়ে হত্যার নির্দেশ জারি করে। এটা ৩০০ হিজরীর (৯১২-১৩ খ্রি.) ঘটনা।

যুবরাজের বায়আত

৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) মুকতাদির তাঁর চার বছরের শিশু সন্তান আবুল আব্বাসকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং মিসর মাগরিবের গভর্নরী তার নামে প্রদান করে মুনিস খাদিমকে তার নায়েব করে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই আবুল আব্বাসই পরবর্তীকালে কাহির বিল্লাহ্র পর রাযী বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে খলীফা পদে আসীন হয়েছিলেন।

ঐ বছরই হাসান ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন উমর ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আবূ তালিব (তিনিই পরবর্তীকালে তদ্রূপ নামে খ্যাতিলাভ করেন) তাবারিস্তান প্রদেশ অধিকার করেন। আতরূশ তাবারিস্তান ও দায়লামে ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁর আকর্ষণীয় ওয়ায-নসীহতের দ্বারা সে এলাকার লোকজনকে ইসলামে দীক্ষিত করে শক্তি অর্জন করেন এবং এভাবেই তাবারিস্তান দখল করেন। তিনি ধর্মমতের দিক দিয়ে শিয়া ছিলেন। এজন্যে তাঁর হাতে দীক্ষিতরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরই মতাবলম্বী হয়। আতরূশের সেনাপতিদের সকলেই ছিলেন দায়লামী। ৩০৪ হিজরীতে (৯১৬-১৭ খ্রি.) খুরাসানের ওয়ালী তাবারিস্তান আক্রমণ করে আতরূশকে হত্যা করেন।

৩০২ হিজরীতে (৯১৪-১৫ খ্রি) উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তাঁর সেনাপতি খাফাশা কাতামীকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মিসরে অবস্থানরত মুনিস খাদিম তার মুকাবিলা করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাহ্দী পক্ষের সাত হাজার সৈন্য নিহত হওয়ার পর তারা আফ্রিকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

৩০৭ হিজরীতে (৯১৯-২০ খ্রি.) উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তার পুত্র আবুল কাসিমকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে মিসর আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুনিস খাদিমের হাতে শোচনীয় পরাজয়বরণ করে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে তাদের অনেক সেনাপতি বন্দী হয়। ঐ বছরই রোম সম্রাট মুকতাদির বিল্লাহ্র সাথে সন্ধি করেন এবং খলীফার সাথে সখ্যতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাগদাদে তাঁর দূত প্রেরণ করেন। অত্যন্ত শানশওকতের সঙ্গে এ দূতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। ৩০৮ হিজরীতে (৯২০-২১ খ্রি.) উবায়দী বাহিনী মিসরের একাংশ অধিকার করে নেয়।

ইরাকে কারামিতাদের উৎপাত

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারামিতাদের একটি দল বাহরায়ন প্রদেশ দখল করে রেখেছিল। ৩১১ হিজরীর (৯২৩-২৪ খ্রি.) এক রাতে কারামিতা সর্দার আবূ তাহির সুলায়মান ইব্ন আবূ সাঈদ জানানী সতেরশ সৈন্য নিয়ে বসরা আক্রমণ করে বসে। তারা শহর প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে শহরের তোরণ খুলে দেয় এবং শহরে ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকে। বসরার আমিল সাইয়িদ মুফলিহী তাদের এ আক্রমণের কথা অবহিত হয়ে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন এবং তাদের হাতে নিহত হন। আবূ তাহির বসরা অধিকার করার পর সতের দিন পর্যন্ত বসরায় অবস্থান করে লুটপাট চালিয়ে প্রচুর মালপত্র ও বন্দী শিশু ও নারীসহ আঠারতম দিবসে হাজরের দিকে যাত্রা করে। খলীফা মুকতাদির এ দুঃসংবাদ অবগত হয়েই মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ফারূকীকে গভর্নরী সনদ দিয়ে সসৈন্য বসরা অভিমুখে রওয়ানা করে দেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যখন বসরায় গিয়ে উপনীত হলেন ততক্ষণে আবূ তাহির বসরা থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

৩১২ হিজরীতে (৯২৪-২৫ খ্রি.) আবূ তাহির কারামতী তার লোক-লশকর নিয়ে মক্কা থেকে প্রত্যাগমনকারী হজ্জযাত্রীদের কাফেলা লুটপাট করে। এ সময় তারা আবূ লুহায়জান হামদানী এবং মুকতাদির বিল্লাহের মামা আহমদ ইব্ন বদরকে উক্ত হজ্জযাত্রী কাফেলা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পরে তারা তাঁদেরকে মুক্তি দিয়ে মুকতাদিরের কাছে আহওয়াজ দাবি করে বসে। খলীফা তার প্রস্তাবে সম্মত না হলে সে আবার কাফেলাসমূহে লুটপাট চালাতে থাকে। খলীফা তাকে দমনের জন্যে সৈনবাহিনী প্রেরণ করলে আবূ তাহির সে শাহী বাহিনীকে পরাস্ত করে কূফা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে দলবলসহ অবস্থান করে। তারপর সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে হাজরে ফিরে যায়।

৩১৩ হিজরীতে (৯২৫-২৬ খ্রি.) কারামিতাদের ভয়ে কেউ হজ্জ করতে যায়নি। ৩১৪ হিজরীতে (৯২৬-২৭ খ্রি.) মুকতাদির বিল্লাহ্ ইউসুফ ইব্ন আবূস সাজকে আযারবায়জান থেকে ডেকে পাঠিয়ে পূর্বাঞ্চলের এলাকাসমূহের শাসক নিযুক্ত করে আবূ তাহির কারামিতার মুকাবিলা করার নির্দেশ দান করেন। কিন্তু কার্যত সে বছর কোন মুকাবিলা হয়নি। ৩১৫

হিজরীর রমযান (নভেম্বর ৯২৭ খ্রি) মাসে আবূ তাহির সসৈন্য কূফা অভিমুখে যাত্রা করে। এদিকে কূফা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউসুফ ওয়াসিত থেকে রওনা হলেন। কিন্তু আবূ তাহির একদিন পূর্বেই কূফা পৌঁছে। ইউসুফের বাহিনী আবূ তাহিরের হাতে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আবূ ইউসুফ আহত অবস্থায় ধৃত হন। আবূ তাহির ইউসুফের চিকিৎসার্থে একজন চিকিৎসক নিয়োগ করে। এ খবর বাগদাদে পৌঁছলে খলীফা সেখান থেকে মুনিসকে প্রেরণ করলেন। মুনিস সেখানে পৌঁছুবার পূবেই আবূ তাহির কূফা ত্যাগ করে আইনুত তামরের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল।

আবূ তাহির কূফা থেকে রওয়ানা হয়ে আম্বারে গিয়ে উপনীত হয় এবং আম্বার দখল করে সেখানকার সৈন্যদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে নসর হাজিব বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে মুনিসের সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং উভয়ে চল্লিশ হাজার সৈন্যর বিশাল বাহিনী নিয়ে কারামিতাদের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হন। আবূ তাহির তার হাতে বন্দী ইউসুফকে হত্যা করে ফেলে। এ পরাজয়ের সংবাদে বাগদাদে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বাগদাদবাসীরা ভয়ে শহর ছেড়ে পালাতে থাকে। ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮-২৯ খ্রি.) আবূ তাহির আম্বার থেকে যাত্রা করে রাহবা নামক স্থানে উপনীত হয়ে সেখানে লুটপাট চালায়। একদিন এক রাতের জন্য সে তার লোকজনকে যথেচ্ছ হত্যাযজ্ঞ চালাবার অনুমতি প্রদান করে।

কারকীসাবাসীরা এ হত্যাযজ্ঞের ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। আবূ তাহির তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করে সেখানে হত্যাযজ্ঞ চালানো থেকে নিবৃত্ত থাকে। তারপর তার সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দল আশেপাশে বিভিন্ন এলাকায় নৈশ আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। তিনদিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে রিক্কা তাদের পদানত হলো এবং তারা জাযিরা প্রদেশ দখল করে নিলো। বাগদাদ থেকে তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যদল প্রেরিত হলো। কিন্তু সকলই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হলো। ৩১৬ হিজরীর শাওয়াল (ডিসেম্বর ৯২৮ খ্রি) মাসে কারামিতারা হাজরের দিকে চলে যায়। তার কিছু দিন পরেই আবার তারা সওয়াদ, আইনুত, তামর প্রভৃতি স্থানে দলবদ্ধভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। খলীফা মুকতাদির হারূন ইব্‌ন গরীব, সাফী, বসরী ও ইব্‌ন কায়স প্রমুখ সর্দারকে কারামিতাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কারামিতারা পরাস্ত হয়ে এবং তাদের পতাকা ফেলে পলায়ন করে। ফলে এ সব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই আবূ তাহির দারুল হিজরত নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে।

রোমানদের আগ্রাসী তৎপরতা

৩১৪ হিজরীতে (৯২৬-২৭ খ্রি.) রোমানরা লামীতা অধিকার করে। ৩১৫ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি.) তারা দিময়াত দখল করে নেয়। তারা সে শহরটি তছনছ করে জামে মসজিদে শঙ্খ বাজায়। ঐ বছরই দায়লামবাসীরা রে ও জিবাল এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হতাহত করে। একই বছর তারা খাল্লাত দখল করে এবং সেখানকার জামে মসজিদ থেকে মিম্বর বের করে ফেলে এবং তার স্থলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠা করে মসজিদটিকে গির্জায় রূপান্তরিত করে।

মুকতাদিরের পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল

৩১৭ হিজরীতে (৯৩০ খ্রি.) মুনিস ওরফে মুযাফ্ফার মুকতাদিরকে সিংহাসনচ্যুত করে। ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, মুকতাদির মুনিসের স্থলে হারূন ইব্ন গরীবকে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। মুনিস তা অবগত হতে পেরে লোক-লশকর ও অমাত্যবর্গের অধিকাংশকে নিয়ে খলীফার প্রাসাদ ঘেরাও করে মুকতাদিরকে গ্রেফতার করেন এবং মুতাদিদের পুত্র মুহাম্মদকে আল-কাহির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসান। সকলে তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত করেন এবং আমিলদের কাছে অবগতি পত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরদিন সৈন্যবাহিনীর লোকজন এসে উপঢৌকনাদি দাবি করলো। এ দাবি পূরণে তালবাহানা দেখে লোকজন হট্টগোল শুরু করে দেয়। তারা মুকতাদিরের খোঁজে মুনিসের ঘরে ছুটে যায় এবং তাঁকে কাঁধে তুলে খলীফার প্রাসাদে নিয়ে এসে কাহির বিল্লাহ্কে ধরে এনে তার সম্মুখে হাযির করে। মুকতাদির তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, তুমি বিচলিত হয়ো না, কারণ এতে যে তোমার কোন হাত ছিল না তা আমি জানি। লোকজন শান্ত হলো। পুনরায় আমিলদের কাছে অবগতিপত্র পাঠানো হলো যে, মুকতাদির যথারীতি খলীফা পদে বহাল আছেন। মুকতাদির লোকজনকে উপঢৌকনাদি দিয়ে বিদায় করলেন।

মক্কায় কারামিতাদের ঔদ্ধত্য

বাহরায়নে কারামিতাদের রাজত্ব সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কারামিতাদের সর্দার ছিল আবূ তাহির, কিন্তু খুতবায় তারা আফ্রিকার ওয়ালী উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর নাম নিতো। তারা তাকেই খলীফা বলে মান্য করতো। ৩১৮ হিজরীতে (৯৩১ খ্রি.) আবূ তাহির কারামতী সসৈন্য মক্কা মুয়াযযামায় যাত্রা করে। তখন ছিল হজ্জের মওসুম। বাগদাদ থেকে মানসূর দায়লামী আমীরুল হুজ্জাজ হয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন ৮ই যিলহজ্জ মানসূর দায়লামী এবং ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আবূ তাহির মক্কায় উপনীত হন। মক্কায় পৌঁছেই আবূ তাহির হাজীদের হত্যা করতে শুরু করে। সে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয়। খানাকা'বার অভ্যন্তরে হাজীদেরকে হত্যা করে যমযম কূপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করতো। হাজরে আসওয়াদ বা পবিত্র কৃষ্ণপাথরটি লৌহ মুদ্গর দিয়ে টুকরো টুকরো করে এবং এগার দিন পর্যন্ত তা কা'বা প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখে। কা'বা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। প্রত্যক্ষদর্শী মুহাম্মদ ইব্ন রাবী ইব্ন সুলায়মান বলেন, এ গোলযোগের সময় আমি মক্কায়ই ছিলাম। আমার চোখের সম্মুখে এক ব্যক্তি খানাকা'বার মেহরাব উপড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে কা'বার ছাদে আরোহণ করলো। আমি তখন আর্তনাদ করে উঠলাম– হে আল্লাহ্! এ দৃশ্য আমি সইতে পারছি না। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পা পিছলে উপুড় হয়ে পড়লো এবং সাথে সাথে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবূ তাহির এগারদিন পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। তারপর হাজরে আসওয়াদ উটের পিঠে তুলে বাহরায়নের রাজধানী হাজরের দিকে যাত্রা করে। মক্কা থেকে হাজর পর্যন্ত পৌঁছতে হাজরে আসওয়াদ বহনকারী চল্লিশটি উট একে একে মারা যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছরকাল উক্ত পবিত্র পাথরটি কারামিতাদের দখলে থাকে। কারামিতাদেরকে এর বিনিময়ে পঞ্চাশ সহস্র দীনার প্রদানের প্রস্তাব দিলেও তারা তা প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হয়নি। অবশেষে খলীফা মুতীঈ লিল্লাহ্-এর যামানার শেষ দিকে হাজরে আসওয়াদ তাদের নিকট

থেকে ফেরত নিয়ে খানাকা'বায় পুনঃস্থাপন করা হয়। কিন্তু এবার একটি উটই হাজর থেকে দীর্ঘ পথ বহন করে খানাকা'বায় এ পবিত্র পাথরটি নিয়ে আসে। আবূ তাহিরের এ অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির সংবাদ অবহিত হয়ে উবায়দুল্লাহ্ আবূ তাহিরকে কঠোর ভর্ৎসনা করে পত্র লিখে এবং মক্কাবাসীদের লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণ করার শক্ত তাগিদ দেয়। তদনুযায়ী আবূ তাহির মক্কাবাসীদের ধন-সম্পদের একাংশ ফেরত দেয়। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ প্রত্যর্পণ করেনি। ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫০-৫১ খ্রি.) হাজরে আসওয়াদ মক্কায় ফেরত আসে এবং কা'বা গাত্রে পুনঃস্থাপিত হয়।

মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত

৩২০ হিজরীর সফর (ফেব্রুয়ারী/মার্চ ৯৩২ খ্রি) মাসে মুনিস খাদিম মুসেল দখল করে নেয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদানের পুত্রদ্বয় সাঈদ ও দাঊদ এবং তাদের ভাতিজা নাসিরুদ্দৌলা হুসাইন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদানকে পরাস্ত করে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তিরা খলীফার পক্ষ থেকে মুসেলের শাসনকার্যে লিপ্ত ছিলেন। মুনিসের মুসেল বিজয়ের পর বাগদাদ, শাম ও মিসরের সৈন্যরাও মুনিসের কাছে চলে আসে। এর কারণ হলো, মুনিসের দান করার অভ্যাস ছিল বলে সৈন্যবাহিনীর লোকজন তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। এমনকি নাসিরুদ্দৌলাও মুনিসের দলে এসে ভিড়ে যায় এবং মুনিসের সাথে মুসেলেই বসবাস করতে থাকে। পরবর্তী নওরোজ দিবসের পর মুনিস বাগদাদ আক্রমণ করতে মনস্থ করে। মুনিস এবং মন্ত্রীবর্গের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টির ফলেই এ সব ঘটনার সূত্রপাত হয়।

সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ পরাস্ত হয়ে বাগদাদে চলে আসে। মুনিসের হামলার খবর শুনে বাগদাদ থেকে উক্ত সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদান, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব এবং অন্যান্য সর্দারের অধীনে সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু মুনিসের বাহিনী নিকটবর্তী হতেই সৈন্যরা বাগদাদ অভিমুখে পালিয়ে আসে। অগত্যা সর্দারদেরকেও বাগদাদে চলে আসতে হয়। মুনিস বাগদাদে পৌঁছে শুমাসিয়া তোরণে অবস্থান করে। সেখানে উভয় পক্ষের ব্যূহ রচিত হলো। উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলে মুকতাদির খলীফার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। সম্মুখেই তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল। শেষ পর্যন্ত বাগদাদ বাহিনী পরাস্ত হলো। খলীফার সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন। খলীফা সেখান থেকে ফিরে যাবার সময় মুনিসের বাহিনীভুক্ত বার্বার সৈন্যদের একটি দল তাঁকে এসে ঘেরাও করলো। এক বার্বার সৈন্য খলীফার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। বার্বারী চোখের পলকে মুকতাদিরের শির দেহচ্যুত করলো এবং ঘোটা দেহকে বিবস্ত্র করে তাঁর শির বল্লমশীর্ষে নিয়ে মুনিসের নিকট হাযির করলো।

৩৩০ হিজরীর ২৭ শে শাওয়াল (জুলাই ৯৪২ খ্রি) বুধবার এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মুনিস আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন মুতাদিদকে সিংহাসনে বসিয়ে কাহির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করে। আলী ইব্ন মুকাল্লা প্রধানমন্ত্রী এবং আলী ইব্ন বালীক হাজিব পদে নিযুক্ত হন। মুকতাদিরের মাকে গ্রেফতার করে তার কাছে অর্থ দাবি করা হয় এবং এত বেশি প্রহার করা হয় যে, তিনি তাতেই মারা যান। এভাবে লোকজনকে ধরে ধরে বলপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়।

কাহির বিল্লাহ্

কাহির বিল্লাহ্‌র বংশপঞ্জি নিম্নরূপ

মুতওয়াক্কিল বিল্লাহ

মারফূ' বিল্লাহ্

মু'তাদিদ বিল্লাহ্

কাহির বিল্লাহ্

মুৎনা নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিল আবূ মানসূর।

খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র আবদুল ওয়াহিদ হারূন ইব্‌ন গরীব মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকুত এবং ইবরাহীম ইব্‌ন রায়েকসহ মাদয়ানে চলে যান। সেখান থেকে ওয়াসেত ও সূস হয়ে তিনি আহওয়াযে পৌঁছেন। কাহির বিল্লাহ্ তদীয় হাজিব আলী ইব্‌ন বালীককে সৈন্যদলসহ আবদুল ওয়াহিদ ও তাঁর সাথীদেরকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ফলে আবদুল ওয়াহিদ ও তাঁর সাথীগণ চিঠিপত্রের মাধ্যমে মুনিস এবং খলীফার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয় এবং তাঁরা বাগদাদে ফিরে আসলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূতকে মুসাহেবদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়। কিন্তু উযীর আলী ইব্‌ন মাকাল্লার তা মোটেই মনঃপূত ছিল না। তিনি মুনিসকে তার বিরুদ্ধে এই বলে প্ররোচিত করেন যে, তিনি তার ঘোর বিরোধী এবং তাঁর পতনের জন্য সচেষ্ট। মুনিস বালীক এবং হাজিব আলী ইব্‌ন বালীককে খলীফার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্যে নির্দেশ দিলেন। ফলে খলীফার গৃহে যাতায়াতকারী নারীদের পর্যন্ত কঠোরভাবে তল্লাশি নেয়া হতো। কারোই অন্দরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। খলীফা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে এবং নিষ্ক্রিয় করার পাঁয়তারা চলছে তখন তিনিও মুনিস প্রমুখের বিরুদ্ধে কোন কোন সামরিক সর্দারদের সাথে গোপনে যোগসাজশ করতে লাগলেন। এদিকে মুনিস ও তার সাথীরা খলীফাকে পদচ্যুত করে আবূ আহমদ ইব্‌ন মুকতাফীকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হলেন। কাহির বিল্লাহ্ তাঁর প্রচেষ্টায় সফল হলেন। হাজিব আলী ইব্‌ন বালীক, বালীক ও মুনিসকে চাতুর্যের সাথে গ্রেফতার করে কাহির বিল্লাহ্‌র নির্দেশে হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূত হাজিব এবং আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌কে উযীর নিযুক্ত করা হয়। এটা ৩২১ হিজরীর শাবান (আগস্ট ৯৩৩ খ্রি) মাসের কথা। ঐ সময়ই আত্মগোপনকারী আহমদ ইব্‌ন মুকতাফীকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়। কাহির বিল্লাহ্ তাকে প্রাচীর গেঁথে আটকে দেন। নিহতদের আবাসস্থলগুলোকে ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়। তাদের ধন-সম্পদ খলীফা বাজেয়াপ্ত করেন। সাড়ে তিন বছর মন্ত্রীত্ব করার পর আবূ জা'ফর উযীর ও খলীফার কোপানলে পড়ে গ্রেফতার হন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। আঠারো দিন কারাগারে থাকার পর বন্দী অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

বুওয়াইয়া দায়লামী রাজবংশের সূচনা

আব্বাসীয় খলীফাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে এখন যেহেতু বারবার বুওয়াইয়া বংশের লোকদের প্রসঙ্গ আসবে তাই এখানে ঐ খান্দানের প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। আতরুশ অর্থাৎ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী যায়নুল আবিদীন সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ উলুভী নিহত হওয়ার পর ইনি দায়লামে গিয়ে লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং দীর্ঘ তের বছরকাল অবিশ্রান্তভাবে দায়লাম ও তাবারিস্তানে ইসলামের প্রচারকার্য চালিয়ে সে এলাকার লোকদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

ঐ সময় হাস্সান নামক এক ব্যক্তি দায়লামের শাসক ছিলেন। আতরুশের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্যে হাস্সান প্রমাদ গুণতে থাকেন এবং তা রোধের চেষ্টাও করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আতরুশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে। তিনি স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করান এবং লোকজনকে ইসলামী অনুশাসনে অভ্যস্ত করে 'উশর'ও আদায় করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত আতরুশ ঐ সব নওমুসলিমকে সংগঠিত করে একটি সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলে কাস্পিয়ান, সালূস প্রভৃতি সীমান্তবর্তী শহর জনপদে হামলা করেন এবং ঐ সব এলাকার লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকেও ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। তাবারিস্তান প্রদেশ সামানী বংশের শাসনাধীন ছিল। তাবারিস্তানের সামানী আমিল নির্যাতন-নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন। আতরুশ দায়লামবাসীদের তাবারিস্তান আক্রমণের উৎসাহ যোগাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) আতরুশ দায়লামবাসীদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করে তাবারিস্তান আক্রমণ করে বসলেন এবং দায়লামের শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সালূককে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিতাড়িত করে নিজে তাবারিস্তানের শাসন গ্রহণ করেন। আতরুশের পর তাঁর জামাতা হাসান ইব্ন কাসিম এবং তাঁর বংশধররা তাবারিস্তান জুরজান, সারিয়া, আমদ ও আস্তরাবাদে রাজত্ব করেন। তবে তাঁদের ফৌজী সর্দার সব সময়ই দায়লামীরাই ছিল। এ দায়লামীদেরই একজন লায়লা ইব্ন নু'মানকে হাসান ইব্ন কাসিম জুরজানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি.) এ ব্যক্তি সামানীদের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হন। তারপর সামানীরা একাধিকবার আতরুশের উপর আক্রমণ চালায়। বনী আতরুশের পক্ষ থেকে এ সব হামলার মুকাবিলা করতেন সুরখাব নামক একজন দায়লামী সিপাহ্সালার। তিনি সামানীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। সুরখাবের চাচা মাকান ইব্ন কানী দায়লামী আতরুশ বংশীয়দের পক্ষ থেকে আস্তারাবাদের শাসকরূপে নিয়োজিত ছিলেন।

মাকান তার স্বদেশী দায়লামীদেরকে সংগঠিত ও জোটবদ্ধ করে একটি বাহিনী গঠন করে জুরজান দখল করে নেন। মাকানের সাহায্যকারী এ দায়লামীদের মধ্যে আসফার ইব্ন শিরোইয়া দায়লামী ছিলেন একজন বিখ্যাত সমরনায়ক। মাকান তাঁর স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গড়ে তুলে তাবারিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোন কারণে আসফার ইব্ন শিরোইয়ার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে বের করে দেন। আসফার সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে

সামানীদের পক্ষ থেকে নিশাপুরে নিয়োজিত আমিল বকর ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছে চলে যান। বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ একটি বাহিনী সাথে দিয়ে আসফারকে জুরজান জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ সময়ে মাকান তাবারিস্তানে ছিলেন এবং তাঁর ভাই আবুল হাসান ইব্‌ন কানী আপন ভাইয়ের পক্ষে জুরজান শাসন করতেন।

এখানে আতরুশের পুত্র আবূ আলী বসবাস করতেন। তাঁর আর তখন কোন রাজ্য বাকি নেই। আবূ আলী একদিন মওকা পেয়ে আবুল হাসান কানীকে হত্যা করে ফেললেন। জুরজানে বসবাসরত দায়লামী বাহিনীর লোকজন আবূ আলীর হাতে বায়আত হয়ে গেল আর আবূ আলী তাঁর পক্ষ থেকে আলী ইব্‌ন খুরশীদ দায়লামীকে জুরজানের শাসক নিযুক্ত করেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন আসফার সামানীদের পক্ষ থেকে সৈন্যদলসহ জুরজানের নিকট এসে হানা দিয়েছিল। আলী ইব্‌ন খুরশীদ আসফার এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, তুমি আমার উপর হামলা করার পরিবর্তে আমার সাথে মিলে তাবারিস্তানে অবস্থানরত মাকানের উপর হামলা চালাও না কেন? আসফার বকর ইব্‌ন মুহাম্মদের নিকট থেকে অনুমতি দিয়ে এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। এ খবর শুনে মাকান ইব্‌ন কানী তাবারিস্তান থেকে সসৈন্যে জুরজান অভিমুখে যাত্রা করলো। আলী ইব্‌ন খুরশীদ ও আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া সম্মিলিতভাবে তাকে বাধা দেয়।

তারা মাকানকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয় এবং তাবারিস্তানে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই আলী ইব্‌ন খুরশীদ এবং আবূ আলী ইব্‌ন আতরুশ দু'জনেই মৃত্যুবরণ করেন। তাবারিস্তানে আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া নির্বিবাদে রাজত্ব চালিয়ে যান। এটাকে মাকান সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আসফারের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাবারিস্তান দখল করে নেন। রাজ্যহারা আসফার বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল ইয়াসার কাছে জুরজানে চলে যান।

৩১৫ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি) বকর ইব্‌ন মুহাম্মদের মৃত্যু হলে সামানী বাদশাহ তাঁর স্থলে আসফার ইব্‌ন শিরোইয়াকে তাঁর পক্ষ থেকে জুরজানের শাসক নিযুক্ত করেন। আসফার ইব্‌ন শিরোইয়ার সেনাপতিদের মধ্যে মিরদাওয়ায় নামক একজনকে আসফার সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে জুরজান থেকে তাবারিস্তান আক্রমণের জন্যে প্রেরণ করলেন। মাকান যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে আতরুশের জামাতা হাসান ইব্‌ন কাসিমের কাছে রে-তে চলে যান এবং মিরদাওয়ায় তাবারিস্তান দখল করে নেন। তারপর হাসান ইব্‌ন কাসিমের মৃত্যু হয়।

আসফার তাবারিস্তান ও জুরজান দখল করে খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের ওয়ালী নসর ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন সামানের নামে খুতবা প্রবর্তন করেন। তারপর রে অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রেও মাকানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। রাজ্যহারা হয়ে মাকান এবার তাবারিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে যান। আসফার ইব্‌ন শিরোইয়া তখন রে, কাস্পিয়ান, জানিজান, আবহুর, কুম ও কারখসহ বিশাল রাজ্যের শাসক। এবার আসফারের মনে স্বাধীনতার চিন্তা উঁকিঝুকি দিতে লাগলো। তিনি সামানী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলেন। এ সংবাদ পেয়ে খলীফা মুকতাদির হারূন ইব্‌ন গারীবকে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে আসফারের নিকট থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধে হারূন আসফারের হাতে পরাজিত হলেন। তারা স্বয়ং নসর ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন সামান আসফারকে

উৎখাতের উদ্দেশ্যে বুখারা থেকে লোক-লশকরসহ রওয়ানা হলেন। আসফার এবার ক্ষমাভিক্ষা করে করদানের অঙ্গীকার করলেন। নসর তার দরখাস্ত মঞ্জুর করে রে প্রদেশের শাসনভার তার হাতে রেখে নিজে বুখারায় ফিরে এলেন। আসফারের অন্যতম সেনাপতি মিরদাওয়ায় অন্যান্য সেনাপতিকে হাত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং নিজে হামদান, ইস্পাহান প্রভৃতি এলাকা জয় করে বিশাল এলাকায় রাজত্ব করতে থাকেন এবং মাকান ইব্‌ন কানীকে ডেকে তাবারিস্তান ও জুরজানের শাসনভার অর্পণ করেন। তারপর মাকানকে পদচ্যুত করা হয়। মাকান দায়লামে চলে যান এবং সেখানে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। কিন্তু মিরদাওয়ায় আমিলের হাতে পরাজিত হয়ে নিশাপুরে পালিয়ে যান।

৩১৯ হিজরীতে (৯৩১ খ্রি) মিরদাওয়ায় অধিকৃত সমস্ত এলাকার শাসনের সনদ আব্বাসী খলীফার নিকট থেকে আদায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি আব্বাসী খলীফার দরবারে ঐসব এলাকার শাসনের সনদ প্রার্থনা করে বিনিময়ে বার্ষিক দু'লাখ দীনার খারাজ খলীফার দরবারে প্রেরণের অঙ্গীকার করেন। খলীফা সে আবেদনে সাড়া দিয়ে সনদ পাঠিয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে জায়গীরও প্রদান করেন। ৩২০ হিজরীতে (৯৩২খ্রি) মিরদাওয়ায়হ্ গীলান থেকে তার ভাই ওয়াশমগীরকেও ডেকে পাঠান। মিরদাওয়ায়হর রাজত্বে আবূ শুজা বুওয়াইয়া নামক এক ব্যক্তির তিন পুত্র চাকরি সূত্রে সর্দারী হাসিল করেন। এদের জন্যেই গোটা এই কাহিনী শুনাতে হলো।

আবূ শুজা বুওয়াইয়া দায়লামী ছিল একজন একান্তই দরিদ্র মৎস্যজীবী। মাছ ধরে অত্যন্ত কষ্টে সে তার পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করতো। একদিন সে স্বপ্নে দেখলেন যে, সে প্রস্রাব করতে বসেছে এবং তার প্রস্রাবনালী দিয়ে এমনি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হলো যা দশ দিগন্তকে আলোক উদ্ভাসিত করে তুললো। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সে এভাবে করলো যে, তার ঔরসে এমন সন্তানের জন্ম হবে যারা বাদশাহ হবে এবং যতদূর পর্যন্ত সে আলোকরশ্মি ছড়িয়েছিল, তাদের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর উক্ত বুওয়াইয়া মৎস্যজীবীর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে আলী, হাসান ও আহমদ। পরবর্তীকালে তাদের তিনজনই প্রভূত উন্নতি করে যথাক্রমে ইমাদুদ্দৌলা, রুকনুদ্দৌলা ও মুইজুদ্দৌলা নামে খ্যাতি অর্জন করে এবং প্রভূত মান-সম্মানসহ রাষ্ট্রের উচ্চপদে আসীন হন বলে কেউ তাদের নসবনামা ইরান সম্রাট ইয়াজদগুর্দের সাথে, আবার কেউ বাহরামগূরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। শাসকদেরকে উচ্চকুলশীল প্রতিপন্ন করার এ প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। আর চাটুকার শ্রেণীর লোকেরা এ কাজে সর্বাধিক সহায়ক প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

আমাদের নজীবাবাদ শহরটি পাঠানদের দ্বারা আবাদ হয়। পাঠানরা এখানে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত খান্দান বলে গণ্য হয়ে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর যখন পাঠানদের উপর ধ্বংস নেমে এলো তখন তাদের অনেকেই রামপুর,বেরিলী, শাহজাহানপুরের দিকে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। শত শত লোকের বংশপঞ্জী মিটে গিয়ে তারা অজ্ঞাত কুলশীল হয়ে পড়ল। খুব কম সংখ্যক লোকই টিকে আছেন। কিন্তু দারিদ্র্য তাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে যে, এখন তারা আর কোন গণ্যমান্যর মধ্যেই আসছেন না। তাদের চাকর-নকর ও

গোলামদের অনেকেই কালের বিবর্তনে আজ ধনদৌলত ও বিত্তবৈভবের অধিকারী হয়ে নিজেদেরকে পাঠান বংশোদ্ভূত বলে দাবি করছেন। অনেক যোগী সন্তান নিজেদের কুলপঞ্জী নওয়াব নজীবুদ্দৌলার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অনেক তেলী, মালী,ধোপা, নাপিত, জেলে ও জোলা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে পাঠান ও খান বলে জাহির করছে। ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের বংশপরিচয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না।

এ জন্যে আজ কোন সম্ভ্রান্ত পাঠানের পক্ষেই নিজের প্রকৃত বংশপঞ্জী বর্ণনা করে নতুন প্রজন্মকে নিজেদের বংশমর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমরা নিজের চোখে লোকের বংশপঞ্জী পরিবর্তন করে জাতে ওঠার দৃশ্য দেখছি। এমতাবস্থায় উক্ত মৎস্যজীবীর সন্তানদের রাষ্ট্রের উচ্চতর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজের কুলজীনামা ইরানের শাহানশাহদের কুলজীনামার সাথে মিলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি আমাদেরকে বিস্মিত করে না।

মাকান ইব্‌ন কানী যখন দায়লামবাসীদেরকে আপন সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করছিলেন তখন উক্ত বুওয়াইয়ার পুত্রত্রয়ও তার সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেল। মাকানের পরাজয় ও ব্যর্থতার পর অনেকেই তাকে ত্যাগ করে চলে যান মিরদাওয়ায়হর কাছে। মিরদাওয়ায়হ তাদের প্রত্যেককে তাদের যোগ্যতার চাইতে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করে। বুওয়াইয়ার উক্ত পুত্রত্রয় ছিল তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের সেবাপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মিরদাওয়ায়হর নিকট অনেক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। মিরদাওয়ায়হ্ আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়াকে কারখের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। আলী তার সহোদরদ্বয় হাসান এবং আহমদকেও তার সাথে নিয়ে যায়। সে সময় মিরদাওয়ায়হর পক্ষ থেকে তার ভাই ওয়াশমগীর রে-র শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন।

ওয়াশমগীর হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে আমীদকে তাঁর উযীর বানিয়ে রেখেছিলেন। আলী রে-তে পৌঁছে আমীদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে একটি খচ্চর উপহার দেয়। তারপর কারখে গিয়ে সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। মিরদাওয়ায়হ্ যখন আমীদের সাথে আলীর এভাবে সাক্ষাতের এবং তার উপঢৌকন পেশ করার কথা অবহিত হলেন তখন তার মনে এ ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হলো যে, মাকানের নিকট থেকে আগত ও ভাল ভাল পদে অধিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন এলাকার শাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পাছে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে কোন সমস্যার না সৃষ্টি করে ফেলে। তাই মিরদাওয়ায়হ তার ভাই ওয়াশমগীরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, মাকানের ওখান থেকে আগত যে সব ব্যক্তিকে বিভিন্ন শহর ও জনপদের শাসনকার্যের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার কর। এ আদেশ অনুসারে কেউ কেউ গ্রেফতার হলেও কারখে নিয়োজিত আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়াকে গ্রেফতারের কোন উদ্যোগই নেয়া হলো না। কেননা তাতে বিদ্রোহ দেখা দেয়ার আশঙ্কা ছিল।

আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া কারখের আশেপাশের কয়েকটি দুর্গ জয় করেন এবং যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সৈন্যদের মধ্যে ভাগবণ্টন করে দেন। সিপাহীদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যধিক বৃদ্ধি

পায় এবং সাথে সাথে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩২১ হিজরীতে (৯৩৩ খ্রি) মিরদাওয়ায়হ্ রে-তে বন্দী উক্ত সর্দারদেরকে মুক্ত করে দেন। তাদের সকলেই কারখে আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার কাছে চলে যায়। তিনি তাদের অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করেন। এই দিনগুলোতেই শেরযাদ নামক একজন দায়লামী সর্দার একটি বাহিনীসহ আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার কাছে এসে তাকে ইস্পাহানের উপর হামলা করতে প্ররোচিত করলো। মিরদাওয়ায়হ্ যখন অবগত হলেন যে, দায়লামী সর্দারদের সকলেই আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার কাছে এসে সমবেত হয়েছে তখন তিনি এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, নজরবন্দী থেকে মুক্ত হয়ে যে সর্দাররা তোমার কাছে গিয়ে উঠেছে তাদের সকলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া এ আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান এবং শেরযাদের সাথে মিলে ইস্পাহান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইস্পাহানে তখন মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূত ও আবূ আলী ইব্‌ন রুস্তমের রাজত্ব চলছিল। এরা খলীফার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলেন। আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া ইস্পাহান আক্রমণ করে মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূতকে তাড়িয়ে দেন। আবূ আলী ইব্‌ন রুস্তম মারা যায় এবং ইস্পাহান আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার দখলে চলে আসে। এ সংবাদ অবগত হয়ে মিরদাওয়ায়হ্ বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা, আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া এখন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর ভাই ওয়াশমগীরকে সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়াকে দমনের উদ্দেশ্যে ইস্পাহান অভিমুখে রওয়ানা করলেন। সংবাদ পেয়ে আলী ইস্পাহান ছেড়ে দিয়ে জুরজান দখল করে নিলেন। এটা ৩২১ হিজরীর যিলহজ্জ (ডিসেম্বর ৯৩৩ খ্রি) মাসের ঘটনা। ওয়াশমগীর ইস্পাহান অধিকার করে মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূতকে তথাকার শাসনভার অর্পণ করেন। আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া তাঁর ভাই হাসানকে খারাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে গারজুনের দিকে পাঠান। পথে মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূতের সৈন্যবাহিনীর সাথে তার সংঘর্ষ হয়। হাসান যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করেন এবং অর্থ আদায় করে ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসেন।

আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া আস্তাখরের দিকে যাত্রা করেন। ইব্‌ন ইয়াকূত একটি বিরাট বাহিনীসহ তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার ভাই আহমদ অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূত পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন এবং ওয়াসিতে গিয়ে উঠেন। আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া শিরাজ এসে তা অধিকার করেন। এভাবে গোটা পারস্য প্রদেশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে। এখানে সেনাবাহিনীর লোকজন তাদের বেতন-ভাতা দাবি করে। সৈন্য-সামন্তের সংখ্যা তখন অনেক অথচ আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার কাছে এত অর্থ-সম্পদ ছিল না যে, তাদের দাবি মেটাতে পারেন। এই চিন্তায় চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি একটি ঘরের ছাদে আরোহণ করেন। তাঁর চোখের সম্মুখে ছাদ থেকে একটি সাপ নিচে পড়লো। ইব্‌ন বুওয়াইয়া সে ছাদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ছাদ ভাঙ্গতে গিয়ে সেখান থেকে স্বর্ণভর্তি সিন্দুক বেরিয়ে আসলো। এ স্বর্ণসম্ভার তিনি সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এভাবে তিনি এ চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন। তারপর আলী কাপড় সেলাইয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্যদ্বারা জনৈক দর্জিকে ডেকে পাঠালেন। দর্জি ভাবলো, তাকে বুঝি গ্রেফতার করা হবে। ভয়ে ছুটতে ছুটতে সে বললো, আমার কাছে সিন্দুক ছাড়া আর

কিছুই নেই আর আমি এখন পর্যন্ত খুলেও দেখিনি যে সিন্দুকের মধ্যে কী রয়েছে। তার এই স্বীকারোক্তি অনুসারে তার নিকট থেকে সিন্দুক উদ্ধার করা হলো। তাতে প্রচুর আশরফী পাওয়া গেল। আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া তাও অধিকার করলেন।

এ সমস্ত অর্থ-সম্পদ ছিল মুযাফফর ইব্‌ন ইয়াকূতের, তিনি এগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। ঘটনাচক্রে এ সময় সাফারীয় রাজবংশের একটি ধনভাণ্ডারও তাঁর হাতে এসে যায়। এর অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ লাখ দীনার। একদিন আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া যখন ঘোড়ায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন তখন অকস্মাৎ তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে ধসে গেল। সে স্থানটি খনন করতেই সে ধনভাণ্ডার বেরিয়ে এলো। এভাবে বিশাল সম্পদ ভাণ্ডার আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়ার করতলগত হলো। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পারস্য প্রদেশ শাসন করে দিন দিন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়ে মিরদাওয়ায়হর একজন শক্ত প্রতিপক্ষরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন।

কাহির বিল্লাহর অপসারণ

কাহির বিল্লাহ্ ছিলেন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, অস্থিরমতি ও পাঁড় মদ্যপ। অবশ্য প্রজাদের মধ্যে মদ্যপান এবং মদ্য ব্যবসায় তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রায় দেড় বছর রাজত্ব করার পর সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহীদের হাতে তিনি গ্রেফতার হন। বিদ্রোহীসেনারা আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকতাদিরকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাযী বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করে। রাযী বিল্লাহ সিংহাসনে বসেই কাহির বিল্লাহকে অন্ধ করে দেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ খুরাসানী বর্ণনা করেন ঃ "একদা কাহির বিল্লাহ্ বল্লম হাতে আমার কাছে এসে বলেন, আব্বাসী খলীফাদের প্রত্যেকের চরিত্রগুণ আমার কাছে বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ

"সাফ্‌ফাহ্ রক্তপাত করতেন নির্দ্বিধায়। তাঁর আমিলরাও পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করতো। মানসূর ছিলেন বীর পুরুষ ও সঞ্চয়ী চরিত্রের লোক। মানসূরই সর্বপ্রথম আব্বাস বংশীয় ও আবূ তালিব বংশীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করেন। সর্বপ্রথম তিনিই জ্যোতিষীদেরকে নৈকট্য প্রদান করেন। সুরিয়ানী ও আজমী কিতাবসমূহ যেমন জ্যামিতি, কালীলা ও দিমনা এবং গ্রীক পুস্তকাদি তাঁরই জন্যে অনুবাদ করা হয়।

মাহ্‌দী অত্যন্ত দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা যা লোকের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ছিলেন, তিনি তা প্রত্যর্পণ করেছিলেন। ধর্মদ্রোহীদেরকে তিনি হত্যা করেন। মসজিদুল হারাম, মদীনা শরীফের মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার নির্মাণ কাজ তিনি করিয়ে ছিলেন। হাদী ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও দাম্ভিক চরিত্রের এবং তাঁর আমিলরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতো।

হারূনুর রশীদ হজ্জ ও জিহাদ করেন। মদীনার পথে রাস্তাঘাট ও জলাধার নির্মাণ করান। তিনি তারসূস, মাসীসা, মারআশ প্রভৃতি শহরের পত্তন করেন। জনহিতকর কার্যাদি দ্বারা তিনি প্রজাসাধারণকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। খলীফাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পোলো খেলেন, শিকার, বিহার করেন এবং দাবা খেলেন।

আমীন দাতা ছিলেন, কিন্তু আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মামূন জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণুমনা ও উদার ছিলেন। মু'তাসিমও অনুরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন তবে অশ্বারোহণ এবং অনারব রাজ-রাজড়াদের অনুকরণের শখ তাঁকেও পেয়ে বসেছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিজয় তিনি প্রচুর করেছেন। ওয়াছিক তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মুতাওয়াক্কিল সর্ব ব্যাপারে মামূন, মু'তাসিম ও ওয়াছিকের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাসেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। হাদীসের ক্লাস চালু করারও তিনি নির্দেশ দেন। প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিল।

মোট কথা, এভাবে তিনি অন্যান্য খলীফার কথাও জিজ্ঞেস করতে থাকেন আর আমিও তাঁর জবাব দিতে থাকি। সব কিছু শুনে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান।

রাযী বিল্লাহ্

রাযী বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ্র নাম মুহাম্মাদ এবং উপনাম আবুল আব্বাস। ২৯৭ হিজরীতে (৯০৯-১০ খ্রি) যালুম নাম্নী জনৈকা রোমান দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। কাহির বিল্লাহ্র পদচ্যুত হওয়ার পর ৩২২ হিজরীর জুমাদাসসানী (জুন ৯৩৪ খ্রি) মাসে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁকে কারাগার থেকে এনে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। তিনি আলী ইব্ন মাকাল্লাকে তাঁর উযীরে আযম মনোনীত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূতকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ইয়াকূত সে সময় ওয়াসিতে ছিলেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি আলী ইব্ন বুওয়াইয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে পরাস্ত হন। ঐ বছরই উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী মজূসী পঁচিশ বছর আফ্রিকায় রাজত্ব করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার পুত্র আবুল কাসিম বি আমরিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

মিরদাওয়ায়হ্ হত্যা

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, মিরদাওয়ায়হ্ গোটা রে প্রদেশ, ইস্পাহান ও আহওয়ায প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে খলীফার দরবার থেকে যথারীতি সনদও হাসিল করে। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই সে স্বাধীন সম্রাটরূপে নিজেকে ঘোষণা করে স্বর্ণের এক সিংহাসনও নির্মাণ করে। সেনাপতিবর্গ ও সর্দারদের জন্যে সে রৌপ্যের আসন নির্মাণ করায়। পারস্য সম্রাটের মতো কারুকাজমণ্ডিত মুকুট শিরে ধারণ করে নিজেকে শাহানশাহ বলে ঘোষণা করে। তারপর সে ইরাক ও বাগদাদে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ঘোষণা করে যে, আমি পারস্য সম্রাটের প্রাসাদরাজী পুনর্নির্মাণ করবো এবং ইরাকীদের রাজত্বকে চুরমার করে দিয়ে নতুনভাবে অগ্নি উপাসকদের রাজত্ব কায়েম করবো। তার এরূপ বাগাড়ম্বর তার কোন কোন সর্দারের নিকট অসহনীয়বোধ হয়। ৩২৩ হিজরীতে (৯৩৫ খ্রি) ইস্পাহানের বাইরে তাকে হত্যা করা হয়।

প্রদেশসমূহের অবস্থা

খলীফা রাযী বিল্লাহ্র রাজত্ব বাগদাদ এবং তার চতুষ্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন প্রদেশ থেকেই কোন রাজস্ব আসতো না। সর্বত্র লোকজন স্বাধীন রাজ্যসমূহ গড়ে তুলেছিলেন। যারা নির্দিষ্ট হারে কর প্রেরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করে খলীফার দরবার থেকে রাজ্য শাসনের সনদ হাসিল করেছিল তারাও সে অঙ্গীকার পূর্ণ করার কোন গরজবোধ করছিল না। বসরায় মুহাম্মদ

ইব্‌ন রাইক, খুযিস্তান ও আহওয়াযে আবূ আবদুল্লাহ্ বুরায়দী, পারস্যে আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুওয়াইয়া যার উপাধি ছিল ইমাদুদ্দৌলা, কিরমানে আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইলিয়াস, রে, ইস্পাহান এবং পার্বত্য প্রদেশসমূহে রুকনুদ্দৌলা উপাধিধারী হাসান ইব্‌ন বুওয়াইয়া এবং মিরদাওয়ায়হ্‌র ভাই ওয়াশমগীর একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজত্ব করে চলেছিল। মুসেল, দিয়ারবকর, দিয়ার মুদার, দিয়ার রাবীআ ইব্‌ন হামদানের দখলে ছিল।

মিসর ও সিরিয়া মুহাম্মদ ইব্‌ন তাফাজের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মাওরাউন নাহর ও খুরাসানের কোন কোন অংশে ইব্‌ন সামান রাজত্ব করে চলেছিল। বাহ্‌রায়ন ও ইয়ামামা প্রদেশসমূহে আবূ তাহির কারামতীর রাজত্ব কায়েম ছিল। তাবারিস্তান প্রদেশে ছিল দায়লামীদের রাজত্ব। আন্দালুস, মরক্কো ও আফ্রিকায় তো দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহ কায়েম হয়েছিল।

রাযী বিল্লাহর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই ইমাদুদ্দৌলা আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া এক কোটি আশি লক্ষ দিরহাম বার্ষিক কর খলীফার দরবারে প্রেরণের অঙ্গীকার করে পারস্য প্রদেশের শাসনের সনদ হাসিল করেন। খলীফা তাকে সনদ, খিলাফত ও পতাকা পাঠিয়ে ইমাদুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করেন, তাঁর ভাই হাসানকে রুকনুদ্দৌলা এবং অপর ভাই আহমদকে মুইজুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করেন। মিরদাওয়ায়হ্ নিহত হওয়ার পর তার সৈন্যবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একাংশ পারস্যে ইমামুদ্দৌলার কাছে এবং অপর অংশ তার এক সর্দার ইয়াহকামের কাছে অবস্থান করে।

ইয়াহকাম খলীফার দরবারে পৌঁছে প্রভাব বিস্তার করে এবং দরবারের সকল সর্দারের উপর টেক্কা দিতে 'আমীরুল উমারা' খেতাব হাসিল করে খলীফার মাথার উপর চেপে বসে ও বেশ দাপট নিয়েই বাগদাদে অবস্থান করতে থাকে। মিরদাওয়ায়হের ভাই ওয়াশমগীর রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়ার মুকাবিলায় ইস্পাহান ত্যাগ করে জবোল ও আয়ারবায়জান দখল করে নেয়। রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়া ইস্পাহান দখল করে বসেন। মুইজুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়া আহ্‌ওয়ায দখল করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন রাইক মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাফাজের নিকট থেকে শামদেশ ছিনিয়ে নেন। তার হাতে তখন কেবল মিসর অবশিষ্ট থাকে। রাযীর আমলে খলীফা নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। ইয়াহ্‌কাম খলীফা ও দরবারের মাথার উপর চেপে বেশ দাপটের সাথে বিরাজমান ছিল। কারো তার বিরুদ্ধে টুশব্দটি করার উপায় ছিল না। ইয়াহ্‌কাম নিজে ওয়াসিতে বসবাস করতো এবং মীর-মুন্‌শী বা প্রধান সচিব প্রধানমন্ত্রীরূপে খলীফার সাথে বাগদাদে অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনা করতো।

রাযী বিল্লাহর মৃত্যু

কয়েক মাস কম সাত বছর সিংহাসনে থাকার পর ৩২৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি) মাসে খলীফা রাযী বিল্লাহ্ উদরী রোগে ইন্তিকাল করেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে ইয়াহকাম তার সচিবকে নির্দেশ লিখে পাঠায়। সে মতে ইবরাহীম ইব্‌ন মুতাদিদ বিল্লাহকে মুত্তাকী বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করে ৩২৯ হিজরীর ২৯শে রবিউল আউয়াল (জানুয়ারী ৯৪১ খ্রি) সিংহাসনে বসানো হয়।

খলীফা রাযী বিল্লাহ্‌র খিলাফত আমলে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী সামআনী ওরফে ইব্‌ন আবুল গারাকির আবির্ভূত হয়ে খোদায়ী দাবি করে বসে। অনেক অজ্ঞ লোক তারও ভক্ত হয়ে যায়। খলীফা রাযীর খিলাফতের প্রথম বছরেই তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যেও যারা তওবা করেনি তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। এ বছর কারামিতারা বাগদাদ ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এমন লুটপাট ও অরাজকতা চালায় যে, বাগদাদ থেকে সে বছর কেউই হজ্জে যেতে পারেননি। ৩২৭ হিজরী (নভেম্বর ৯৩৮—অক্টোবর ৯৩৯ খ্রি) পর্যন্ত বাগদাদের কেউই হজ্জে যাওয়ার সাহস করতে পারেনি। ৩২৭ হিজরীতে (৯৩৮-৩৯ খ্রি) আবূ তাহির কারামতী উট প্রতি পাঁচ দীনার কর প্রদান সাপেক্ষে হজ্জের অনুমতি দেয়। হজ্জের জন্য কর প্রদান এই ছিল প্রথম। বাগদাদবাসীরা মনোকষ্টের সাথে এ কর দিয়ে হজ্জ আদায় করেন। রাযীই শেষ খলীফা যিনি যথারীতি মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিতেন। তারপর থেকে এ দায়িত্ব খলীফারা অন্যদের উপর ন্যস্ত করে দেন।

মুত্তাকী লিল্লাহ

মুত্তাকী লিল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাদিদ বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল যুহ্‌রা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। ৩৪ বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি খলীফা হন। ৩২৯ হিজরীর ২৬শে রজব (এপ্রিল ৯৪১ খ্রি) ইয়াহ্‌কামের নির্দেশে ওয়াসিতের উপকণ্ঠে কুর্দীদের হাতে তিনি নিহত হন। দুই বছর আটমাসকাল তিনি আমীরুল উমারারূপে কার্যরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এগার লাখ দীনার মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে রাজকোষে আসে। ৩২৯ হিজরীর শাবান (মে ৯৪১ খ্রি) মাসে আবূ আবদুল্লাহ বুরায়দী বসরা থেকে সসৈন্য বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে। মুত্তাকী তাকে ফিরে যাওয়ার জন্যে লিখে পাঠান। সে তাতে সম্মত হলে খলীফা তার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। সৈন্যবাহিনী তার মুকাবিলা না করে পালিয়ে যায়। বুরায়দী বাগদাদে প্রবেশ করে খলীফার নিকট পাঁচ লাখ দীনার তলব করে, অন্যথায় তাঁকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। খলীফা কালবিলম্ব না করে এ অর্থ পাঠিয়ে দেন। চব্বিশ দিন পর ৩২৯ হিজরীর রমযান (জুন ৯৪৩ খ্রি) মাসে বুরায়দীর বাহিনী বেতন-ভাতা না পাওয়ায় বিদ্রোহ করে। বুরায়দী পালিয়ে ওয়াসিতে চলে যায়। যুরায়দীর প্রস্থানের পর কুর্তগীননামক একজন সর্দার খলীফা ও তার দরবারের উপর চেপে বসে। সে আমীরুল উমারার খেতাব লাভ করে। এ সময় তুর্কীদের ছাড়াও দায়লামীদের একটি বড় দলও মওজুদ ছিল। ইয়াহকামের আমল থেকে দায়লামীদের প্রভাব বাগদাদে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দায়লামীরা কুর্তগীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তুর্কী ও দায়লামীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, কিন্তু তাতেও কুর্তগীনের প্রভাব অব্যাহত থাকে। এ সংবাদ অবগত হয়ে শামদেশে ক্ষমতাসীন মুহাম্মদ ইব্‌ন রাইক নিজে আমীরুল উমারা পদ দখলের উদ্দেশ্যে শাম থেকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। কুর্তগীন বাগদাদ থেকে বের হয়ে তার মুকাবিলা করে। ইব্‌ন রাইক বলপূর্বক বাগদাদে প্রবেশ করেন। কুর্তগীন ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। খলীফা ইব্‌ন রাইককে আমীরুল উমারা পদে অধিষ্ঠিত করে মুহাম্মদ ইব্‌ন রাইক আবূ আবদুল্লাহ্ বুরায়দীর নিকট থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করেন।

৩৩০ হিজরীর রবিউস সানী (জানুয়ারী ৯৪২ খ্রি) মাসে ইব্‌ন বুরায়দী বাগদাদ আক্রমণ করে। ইব্‌ন রাইক যুদ্ধে পরাস্ত হন। বুরায়দীর বাহিনীতে তুর্কী ও দায়লামীরা শামিল ছিল। শহরে প্রবেশ করেই তারা লুটপাট শুরু করে দেয়। খলীফা ইব্‌ন রাইক ও স্বীয় পুত্র আবূ মানসূরসহ মুসেলে পালিয়ে যান। খলীফার প্রাসাদসহ বাগদাদবাসীদের বাড়িঘরে লুটপাট চললো। এ লুটপাটে কিছু কারামতী এসেও অংশগ্রহণ করে। শহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ সীমাহীন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। মুসেলের শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামদান। খলীফা সেখানে পৌঁছতেই তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। খলীফা এবং ইব্‌ন রাইক তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন। নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন রাইককে হত্যা করে ফেলেন। খলীফা নাসিরুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারা খেতাব প্রদান করলেন। তিনি নাসিরুদ্দৌলার ভাই আবুল হুসাইনকে সাইফুদ্দৌলা খেতাবে অভিহিত করেন। মুসেল থেকে ফৌজ নিয়ে নাসিরুদ্দৌলা ও খলীফা বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। বাগদাদে অবস্থানরত দখলদার ইব্‌ন বুরায়দী তাঁদের মুকাবিলা করে পরাস্ত হয়। ৩৩০ হিজরীর শাওয়াল (জুন ৯৪২ খ্রি) মাসে ইব্‌ন বুরায়দীর এ পরাজয়ের পর নাসিরুদ্দৌলা খলীফাসহ বাগদাদে প্রবেশ করলেন। নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা দীর্ঘ এগার মাস ধরে বাগদাদে খলীফার সাথে অবস্থান করেন। তারপর তাঁদের মুসেলের ভাবনা জাগে এবং তাঁরা মুসেলের পথে রওয়ানা হয়ে পড়েন। ৩৩১ হিজরীর রমযান (মে ৯৪৩ খ্রি) মাসে তূযূন নামক সর্দার বাগদাদে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দখল কায়েম করে। খলীফা তাকে আমীরুল উমারা খেতাব প্রদানে বাধ্য হন। এর মাত্র কিছুদিন পর ৩৩২ হিজরীর মুহাররম (সেপ্টেম্বর ৯৪৩ খ্রি) মাসে আবূ জা'ফর ইব্‌ন শেরযাদ বাগদাদে প্রবেশ করে। এ সময় তূযূন ওয়াসিতে গিয়েছিলেন। খলীপা মুত্তাকী ভীত হয়ে বাগদাদ থেকে মুসেলের দিকে পালিয়ে যান। তূযূন ও আবূ জা'ফর মিলে মুসেল আক্রমণ করে বসেন। সেখানে নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খলীফাকে নিয়ে নাসীবায়নের দিকে চলে যান। নাসীবায়ন থেকে খলীফা মুত্তাকী রিক্কায় আগমন করেন এবং সেখান থেকে তূযূনকে পত্র লিখেন। তূযূন বনূ হামদানের সাথে সন্ধি করে বাগদাদে ফিরে আসে। খলীফা বনূ হামদানসহ রিক্কায় থেকে যান।

ঐ সময়েই আহওয়ায নিয়ন্ত্রণকারী শাসক মুইজুদ্দৌলা আহমদ ইব্‌ন বুওয়াইয়া ওয়াসিতের উপর হামলা করেন। তূযূন মুসেল থেকে ফিরে এসে তাঁর মুকাবিলা করে। তূযূন ও মুইজুদ্দৌলার মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৩৩২ হিজরীর ১৭ই যুলকাদা (জুলাই ৯৪৪ খ্রি) তারিখে। এ যুদ্ধে মুইজুদ্দৌলার পরাজয় হয় কিন্তু দ্বিতীয়বার হামলা করে তিনি ওয়াসিত অধিকার করে নেন। ৩৩২ হিজরীতে (৯৪৩-৪৪ খ্রি) রুশীয়রা আযারবায়জান সীমান্তের বারুণা শহরে হামলা চালায়। দায়লাম অধিপতি এ সংবাদ পেয়ে সেদিকে সৈন্য পাঠালেন। রুশীয়রা মুসলমানদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মুসলমানরা সংঘটিত হয়ে তাদের মুকাবিলা করে। এ লড়াই দীর্ঘকাল যাবত চলে। অবশেষে তুমুল যুদ্ধের পর তারা রুশীয়দেরকে প্রচণ্ড মার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

খলীফা মুত্তাকীর পদচ্যুতি

খলীফা মুত্তাকী ৩৩২ হিজরীর (৯৪৪ খ্রি-এর আগস্টের দিকে) শেষ নাগাদ বনূ হামদানের ওখানেই অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে খলীফা ও বনূ হামদানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি

হয়। খলীফা একদিকে বাগদাদে অপরদিকে মিসরে আখশীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাকাজের কাছে চিঠিপত্র লিখতে থাকেন। ৩৩৩ হিজরীর ১৫ই মুহাররম (৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪৪ খ্রি) আখশাদ রিক্কায় স্বয়ং খলীফার খিদমতে হাযির হন এবং তাঁকে মিসরে এসে সেখানে অবস্থানের আবেদন জানালেন। উযীরও তাঁর এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান এবং মিসরে রাজধানী স্থানান্তরের উপকারিতা বর্ণনা করেন। কিন্তু খলীফার এ প্রস্তাব মনঃপূত হলো না। ইতিমধ্যে বাগদাদ থেকে তূযূনের পত্র এসে পৌছাল। পত্রে খলীফা এবং তাঁর উযীর ইব্‌ন শেরযাদকে নিরাপত্তা দেয়া হয়। খলীফা এ পত্র পাঠ করে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আখশীদকে রেখেই ৩৩৩ হিজরীর মুহাররম (২৩ সেপ্টেম্বর ৯৪৪ খ্রি) মাসের শেষ তারিখে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। তূযূন সুন্দিয়া নামক স্থানে অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং আপন তাঁবুতে নিয়ে যান। পরদিন খলীফার চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত কাঠি বুলিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্‌ন খলীফা মুকতাদি বিল্লাহকে ডেকে তাঁর হাতে অমাত্যবর্গ ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ বায়আত করে তাঁকে মুসতাকফী বিল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত করেন। সর্বশেষ পদচ্যুত খলীফা মুত্তাকীকে দরবারে পেশ করা হয়। তিনিও খলীফা মুসতাকফীর হাতে বায়আত হন। মুত্তাকীকে জাযিরায় অন্তরীন করে রাখা হয়। পঁচিশ বছর এ দুর্গতি ভোগ করে ৩৫৭ হিজরীতে (৯৬৮ খ্রি) তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। কাহির বিল্লাহ মুত্তাকীর অন্ধত্বের সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মন্তব্য করলেন ঃ এবার আমরা দু'জন অন্ধ হলাম, তৃতীয় অন্ধের স্থানটি অপূর্ণ রয়ে গেল। ঘটনাচক্রে এর মাত্র কয়েকদিন পরেই মুসতাকফীকেও ঐ একই ভাগ্যবরণ করতে হয়।

মুসতাকফী বিল্লাহ্

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ মুসতাক্‌ফী বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুকতাফী বিল্লাহ্ আমলাহুন নাস নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৩৩ হিজরীর সফর (অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি) মাসে একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় আবুল কাসিম ফযল ইব্‌ন মুকতাদির বিল্লাহও খিলাফতের দাবিদার ছিলেন। তিনি আত্মগোপন করেন। মুসতাকফী অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়েও তাঁর কোন সন্ধান পাননি। মুসতাকফীর গোটা শাসনামলই তিনি আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়ে দেন। মুসতাকফী যখন কোনমতেই আর তাঁর সন্ধান পেলেন না, তখন তাঁর বাসগৃহ তিনি ধূলিসাৎ করে দিলেন।

খলীফা মুসতাক্‌ফী সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরই তূযূনের মৃত্যু হয়। মুসতাকফী আবূ জা'ফর ইব্‌ন শেরযাদকে আমীরুল উমারা খেতাবে ভূষিত করেন। ইব্‌ন শেরযাদ ক্ষমতা হাতে পেয়েই নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয় করতে শুরু করেন। রাজকোষ অচিরেই কপর্দকশূন্য হয়ে উঠলো। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ এতই বৃদ্ধি পেল যে, লোকজন শহর ছেড়ে দেশান্তরী হতে শুরু করলো।

সতর্কবাণী

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন ও পরিধি উমাইয়া আমল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের তখন একটিই কেন্দ্র ছিল। দামেশকের খলীফার দরবার থেকে যে ফরমান

জারি হতো তা আন্দালুস ও মরক্কোর পশ্চিম উপকূল থেকে শুরু করে চীন ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমভাবেই তামিল করা হতো। ইসলামী খিলাফত বনূ আব্বাসের করতলগত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আন্দালুস তথা স্পেনে বনী উমাইয়া বংশের একটি স্বাধীন সালতানাত কায়েম হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের একটি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের স্থলে দু'টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্প কিছুদিন পর মরক্কোতে মুসলমানদের তৃতীয় আরেকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর আফ্রিকা ও মিসরে আরেকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে মাওরাউন নাহর, খুরাসান, পারস্য প্রভৃতি প্রদেশে বাগদাদের খলীফার নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাজ্য কায়েম হয়ে যায়। এখন ইতিহাসের যে পর্যায়ে আমরা আলোচনা করছি তখন স্বয়ং বাগদাদ শহরেও খলীফার খিলাফত কায়েম নেই। অল্প কয়েকদিন পূর্বেও দজলা ও ফোরাত বিধৌত দো-আবা অঞ্চল খলীফার রাজত্বের অধীন ছিল। কিন্তু যখন থেকে আমীরুল উমারা পদের সৃষ্টি হলো সে সময় থেকে দো-আবা এলাকার প্রকৃত কর্তৃত্ব থাকতো আমীরুল উমারার হাতেই, আর এই আমীরুল উমারা নামেমাত্রই খলীফার অধীন ও নায়েব থাকতেন।

খাস বাগদাদ শহরে খলীফার ফরমানের মর্যাদা ছিল। আর বাগদাদ শহরে তাঁর কর্তৃত্বই সর্বোচ্চ বলে গণ্য হতো। এমন প্রতিটি ব্যক্তি যে অন্য সকলকে পরাস্ত করে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারতো সেই বাহুবলে আমীরুল উমারা বনে যেত। খলীফাকে বাধ্য হয়ে তাকে আমীরুল উমারা খেতাব দিতে হতো। খলীফার হাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতা না থাকলেও তাঁর অল্পবিস্তর স্বাধীনতা অবশ্যই ছিল এবং তাঁর একরকম সম্ভ্রম বা দাপটও ছিল। কিন্তু এবার মুইজ্জুদ্দৌলা আহমদ ইব্‌ন বুওয়াইয়া আহওয়ায থেকে এসে বাগদাদ ও খলীফার উপর এমনিভাবে জেঁকে বসলো যে, সে দিব্যি মালিক (রাজা) উপাধি পেয়ে যাচ্ছে। তারপর একে একে অনেকেই মালিক হচ্ছেন। মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফাকে অন্তরীণাবদ্ধ করে তাঁকে একজন সম্মানিত কয়েদীর মর্যাদা দিল। এ যাবত বাগদাদ শহরে খলীফার যেটুকু মানমর্যাদা ছিল তাও সে কেড়ে নিল। খলীফার কাজ শুধু এতটুকু ছিল যে, যখন বাইরের কোন দূত আসতেন তখন তাঁকে খলীফার দরবারে হাযির করা হতো এবং এ কৃত্রিম দরবারে খলীফার বাহ্যিক জাঁকজমক প্রদর্শন করে অভীষ্ট কাজটি সমাধা করা হতো। কাউকে খেতাব বা সনদ দেয়া প্রভৃতি কাজ খলীফার হাত দিয়েই হতো সত্য, কিন্তু তাতে খলীফার নিজের কোন ইখতিয়ার থাকতো না। প্রতিটি কাজের ইখতিয়ার থাকতো মালিক-এর হাতে।

খলীফার মর্যাদা কোন অংশেই দাবার ছকের রাজার চাইতে বেশি ছিল না। মালিক খলীফার একটা বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দিতো। এ বেতন-ভাতা পেতে যখন বিলম্ব হতো বা কোন সময় যখন তিনি আদৌ তা পেতেন না তখন অগত্যা তাঁকে কোন তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রি করে তাঁর নিজ ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে নেমে এসেছে তখন বলাই বাহুল্য, সালতানাত বা রাষ্ট্রের ইতিহাস লেখকের আর তাঁদের কথা উল্লেখেরই প্রয়োজন নেই। কেননা এখন খলীফা শব্দটি ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যেহেতু ইসলামী হুকুমতের ইতিহাস পূর্ণ করতে হবে আর তার শাসকদের কথা বর্ণনা করতে হবে তাই তাতে ঐ মালিকের উল্লেখ করতেই হয় যারা বাগদাদে মালিক নামে অভিহিত হয়ে কেবল বাগদাদেই নয়, বরং দজলা ফোরাত দোআবা অঞ্চল ও অন্যান্য প্রদেশে

শাসনকার্য চালিয়েছে। তাই সে সব মালিকের আলোচনা প্রসঙ্গে আরো কিছু দূর পর্যন্ত আমাদেরকে ঐ আব্বাসী খলীফাদের সাহায্য নিয়ে এগুতে হবে– যারা দাবার ছকের রাজার চাইতে বেশি কিছু না হলেও এখনো তাঁদেরকে খলীফাই বলা হচ্ছে।

মোদ্দাকথা, আমরা এখন আব্বাসীয় খলীফাদের আলোচনা করছি না বরং আমাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে বাগদাদের হুকুমত বা খিলাফতের অবস্থা। সাথে সাথে একথাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদিও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ও রাজত্ব গড়ে উঠেছে, তবুও সকলেই কিন্তু খলীফার নামটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। খুতবায় সকলেই তাঁর নাম উচ্চারণ করছেন। আন্দালুসে এক স্বতন্ত্র খিলাফত গড়ে উঠেছিল। উবায়দীপন্থীরা ছিল শিয়া কারামিতা; তারাও খিলাফত ও ইমারতের দাবিদার ছিল। এজন্যে আন্দালুস ও আফ্রিকায় বাগদাদের খলীফার নাম খুতবায় উচ্চারিত হতো না। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত ইসলামী জগতের দেশ বা প্রদেশসমূহে বাগদাদের আব্বাসী খলীফাকে সকলেই খলীফা বলে মান্য করছিলেন এবং তাঁকেই নিজেদের ধর্মীয় নেতারূপে সম্মান করেছিলেন। অবশ্য, কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, কোন মালিক খোদ বাগদাদ নগরীতেই খুতবায় খলীফার নাম খারিজ করে দিয়েছে। কেবল নিজের নামেই খুতবা চালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে অবশ্যই খলীফার নাম খুতবায় উচ্চারিত হয়েছে।

বাগদাদে বুওয়াইয়া বংশের রাজত্ব

বুওয়াইয়া বংশ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বুওয়াইয়ার পুত্রত্রয় আলী, হাসান ও আহমদ ইতিমধ্যেই সর্দারী ও রাজত্বের অধিকারী হয়ে বসেছেন। আলী (ইমাদুদ্দৌলা) পারস্য প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। হাসান (রুকনুদ্দৌলা) উস্পাহান ও তাবারিস্তান অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। আহমদ (মুইজ্জুদ্দৌলা) আহ্ওয়ায শাসন করছিলেন। ইব্ন শেরযাদের আমীরুল উমারা থাকা অবস্থায় বাগদাদে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বাগদাদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানরত মুইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদ আক্রমণ করেন। শেরযাদ পালিয়ে বনূ হামদানের কাছে মুসেলে চলে যায়। মুইজ্জুদ্দৌলা নির্বিবাদে বাগদাদ দখল করে খলীফার খিদমতে উপস্থিত হন। খলীফা তাঁকে মুইজ্জুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করেন।

মুইজ্জুদ্দৌলা নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন এবং অত্যন্ত দাপটের সাথে বাগদাদে রাজত্ব চালান। কয়েকদিন পরে মুইজ্জুদ্দৌলা জানতে পারেন যে, খলীফা মুসতাকফী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এ সময় খুরাসানের ওয়ালীর দূত খলীফার দরবারে আসেন এবং এ উপলক্ষে দরবারে-আম বসে। মুইজ্জুদ্দৌলা প্রকাশ্য দরবারে দায়লামীদেরকে ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা খলীফার দিকে অগ্রসর হলে খলীফা ভাবলেন তারা তাঁর হস্তচুম্বনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে, তিনি সরল মনে হাত বাড়িয়ে দিতেই তারা সে হাত ধরে খলীফাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামায় এবং প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে গ্রেফতার করে। কারো টু শব্দটি করার উপায় ছিল না। মুইজ্জুদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ বাহনে চড়ে তার নিজ ঘরে আসেন আর দায়লামীরা খলীফাকে টেনেহেঁচড়ে অপদস্ত করে মুইজুদ্দৌলার সম্মুখে উপস্থিত করে। এ সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এটা ৩৩৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা (জানুয়ারী

৯৪৬ খ্রি) মাসের ঘটনা। খলীফা মুসতাক্ফী এক বছর চার মাস নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি) অন্তরীণ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন।

মুতী' বিল্লাহ্

মুইজ্জুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়াইয়া দায়লামী ছিলেন বুওয়াইয়ার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এরা যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আতরুশের হাতে, তাই দায়লামী মাত্রই শিয়া ছিল। বুওয়াইয়া বংশীয়রা শিয়া মতবাদ ও গোত্রপ্রীতির ব্যাপারে চরমপন্থী ছিল। মুসতাকফীকে অপমান, অপদস্ত, পদচ্যুত, অন্তরীণ ও অন্ধ করার পর মুইজ্জুদ্দৌলা কোন উলুভীকে খলীফা পদে বসাতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁর কোন কোন পরামর্শদাতা তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। তারা তাঁকে এ মর্মে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, আপনি যদি কোন উলুভীকে খলীফা বানান তা হলে গোটা জাতি তাকেই খিলাফতের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে আপনার পরিবর্তে সেই উলুভী খলীফারই আনুগত্য করবে। ফলে দায়লামীদের উপর আপনার যে প্রভাব বিদ্যমান তা খর্ব হবে। ফলে আপনার এ প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ঘটবে। তার চাইতে এই আব্বাসী খান্দানের কাউকে ধরে খলীফার আসনে বসানোই শ্রেয়। তাতে শিয়ারা তাকে আনুগত্যের অনুপযুক্ত বিবেচনা করে আপনারই আনুগত্যে লেগে থাকবে। কেবল এভাবেই বাগদাদে শিয়া প্রভাব বিদ্যমান থাকতে পারে। সেমতে মুইজ্জুদ্দৌলা আবুল কাসিম ফযল ইব্ন মুকতাদিরকে তলব করে মুতী' লিল্লাহ্ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে প্রথাগত বায়আত অনুষ্ঠান করেন এবং দৈনিক তিনি একশ দীনার তাঁর ভাতা নির্ধারণ করে দেন। মুতী' লিল্লাহ্ ৩১৬ হিজরীতে (৯২৯ খ্রি) মাশ্গালা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জমাদিউস সানী ৩৩৪ হিজরীতে (জানুয়ারী ৯৪৬ খ্রি) তাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়।

মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফার উযীর রূপে আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ মাহবালীকে নিযুক্তি প্রদান করেন। উযীর প্রকৃত পক্ষে মালিক-এরই উযীর হতেন। কেননা খলীফা তো নামেই কেবল খলীফা ছিলেন। মুসেলে নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান এবং শামে সাইফুদ্দৌলা ইব্ন হামদান রাজত্ব করছিলেন। মিসরে আখশীদ মুহাম্মদ ইব্ন তাফাজ ফারগানীর শাসন চলছিল। নাসিরুদ্দৌলা যখন এভাবে মুইজ্জুদ্দৌলার বাগদাদের ক্ষমতা দখলের সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি মুসেল থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ৩৩৪ হিজরীর শা'বান (৯৪৬ খ্রি এপ্রিল) মাসে সামা রায় উপনীত হলেন। এ সংবাদ পেয়ে মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মূতি' বিল্লাহসহ বাগদাদ থেকে সেদিকে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধে মুইজ্জুদ্দৌলা পরাস্ত হয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন।

মুইজ্জুদ্দৌলা মুতী' বিল্লাহ্সহ পশ্চিম বাগদাদে এসে ওঠেন, পূর্ব বাগদাদে নাসিরুদ্দৌলা এসে অবস্থান নিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলতে লাগলো। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি হলো। মুইজ্জুদ্দৌলা নাসিরুদ্দৌলার পুত্র আবূ তাগলিবের সাথে তাঁর পৌত্রীর বিয়ে দিয়ে দেন। নাসিরুদ্দৌলা মুসেলে ফিরে যান। ৩৩৫ হিজরীতে (৯৪৬-৪৭ খ্রি) আবুল কাসিম বুরায়দী বসরায় মুইজ্জুদ্দৌলার বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ৩৩৬ হিজরীতে (৯৪৭ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতীকে সাথে নিয়ে বসরা আক্রমণ করেন। আবুল কাসিমের বাহিনী পরাস্ত হয়। আবুল কাসিম পলায়ন করে বাহরায়নে কারামিতাদের কাছে চলে

যান। মুইজ্জুদ্দৌলা বসরা দখল করে আবূ জা'ফর সুহায়রীকে সেখানে রেখে খলীফাকে নিয়ে বাগদাদে চলে আসেন। ৩৩৭ হিজরীতে (৯৪৮-৪৯ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা মুসেলের ওয়ালী নাসিরুদ্দৌলার উপর আক্রমণ চালান। মুকাবিলা করতে না পেরে নাসিরুদ্দৌলা নাসিরায়ন চলে যান। এ সময় মুইজ্জুদ্দৌলার ভাই রুকনুদ্দৌলা সংবাদ পাঠান যে, খুরাসানের সৈন্যবাহিনী জুরজান ও রে আক্রমণ করে বসেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাও। মুইজ্জুদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ নাসিরুদ্দৌলার সাথে সন্ধি করে মুসেল থেকে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। নাসিরুদ্দৌলা মুসেলে ফিরে আসেন।

নাসিরুদ্দৌলার সাথে সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, তিনি যথারীতি খারাজ বা রাজস্ব প্রেরণ করবেন এবং খুতবায় মুইজ্জুদ্দৌলা, রুকনুদ্দৌলা ও ইমাদুদ্দৌলা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম উচ্চারণ করবেন। ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতীকে দিয়ে এ মর্মে ফরমান লিখিয়ে নেন যে, আলী ইব্‌ন বুওয়াইয়া ওরফে ইমাদুদ্দৌলা আপন সহোদর মুইজ্জুদ্দৌলার সাথে তাঁর সহকারী রূপে কাজ করবেন। কিন্তু ইমাদুদ্দৌলা এ বছরই মারা গেলে তার স্থলে তাঁর অপর সহোদর রুকনুদ্দৌলাকে মুইজ্জুদ্দৌলার সহকারীরূপে মনোনীত করা হয়। ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫০-৫১ খ্রি) হাজরে আসওয়াদ খানাকা'বার নির্ধারিত স্থানে পুনঃসংস্থাপিত হয়। তার চতুষ্পার্শ্বে তিন হাজার সাতশ সাতাত্তর দিরহাম ওজনের স্বর্ণের একটি বৃত্ত লাগানো হয়।

৩৪১ হিজরীতে (৯৫২-৫৩ খ্রি) এমন একটি দলের উদ্ভব হয় যারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিল। এক ব্যক্তি দাবি করে বসলো যে, হযরত আলী কারামুল্লাহ্ ওয়াজহাহুর আত্মা তার মধ্যে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। তার স্ত্রীর দাবি ছিল যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর আত্মা তার দেহে ভর করে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। অপর এক ব্যক্তি দাবি করলো যে, আমার মধ্যে জিবরাঈলের রূহ্ বিদ্যমান। এদের এ সব দাবির কথা শুনে লোকজন তাদেরকে প্রহার করে কিন্তু মুইজ্জুদ্দৌলা নিজে শিয়া হওয়ার দরুন লোকদেরকে তাদেরকে ক্লেশ দিতে বিরত রেখে তাদের প্রতি উল্টো সম্মান করার নির্দেশ জারি করেন। কেননা তাদের সকলেই নিজেদেরকে আহলে বায়তভুক্ত বলে প্রচার করতো। ৩৪৬ হিজরীতে (৯৫৭-৫৮ খ্রি) রে এবং তার আশেপাশের এলাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। গোটা তালেকান ধসে যায়। সেখানকার মাত্র ত্রিশ ব্যক্তি বেঁচে ছিল। অবশিষ্ট সকলেই নিহত হয়। রে-এর পার্শ্ববর্তী ত্রিশটি গ্রাম ভূমিধসে তলিয়ে যায়।

হুলওয়ান শহরের অধিকাংশ ভূমিধসে বিলীন হয়ে যায়। ৩৪৭ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৫৭-মার্চ ৫৮ খ্রি) পুনরায় অনুরূপ ভূমিকম্প হয়। এ বছরই মুইজ্জুদ্দৌলা নাসিরুদ্দৌলার মুসেল থেকে খারাজ প্রেরণে বিলম্ব হওয়ার দরুন মুসেল আক্রমণ করেন। ৩৪৭ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল মাসে (আগস্ট ৯৫৮ খ্রি) তিনি মুসেল অধিকার করেন। নাসিরুদ্দৌলা নাসিরায়ন চলে যান। মুইজ্জুদ্দৌলা তার প্রধান হাজিব সবুক্তগীনকে মুসেলে রেখে নিজে নাসিরায়ন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। নাসিরুদ্দৌলা সেখান থেকে তাঁর ভাই সাইফুদ্দৌলার কাছে আলেপ্পোতে চলে যান। সাইফুদ্দৌলা চিঠিপত্র লিখে মুইজ্জুদ্দৌলার সাথে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস পান। ৩৪৮ হিজরীর মুহাররম (মার্চ-এপ্রিল ৯৫৯ খ্রি) মাসে এ চুক্তিপত্র লিখিত হয় এবং মুইজ্জুদ্দৌলা ইরাকের দিকে ফিরে আসেন। ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদে একটি বিশাল প্রাসাদ নিজের জন্যে নির্মাণ করান যার ভিত্তি ছত্রিশ গজ গভীর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। এ বছরই রোমানরা আফ্রীতাস ও ক্রীটদ্বীপ মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। এ দ্বীপটি ২৩০ হিজরী (সেপ্টেম্বর ৮৪৪-আগস্ট ৮৪৫ খ্রি) থেকে মুসলিম অধিকারেই ছিল।

মুইজ্জুদ্দৌলার আরেকটি অভিশপ্ত কর্ম

৩৫১ হিজরীতে (৯৬২ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদের জামে মসজিদের তোরণে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য উৎকীর্ণ করেন তা উদ্ধৃত করতেও গা শিউরে উঠে। কুফরের উদ্ধৃতি দিলে কেউ কাফির হয় না। এ প্রবচন অনুসারে নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

لعن الله معاوية بن سفيان ومن غصب فاطمة فدكا
ومن منع عن دفن الحسن عند جده
ومن نفى ابا ذر ومن اخرج العباس عن الشورى

অর্থাৎ ঃ আল্লাহর অভিশাপ মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের ওপর, আর যে ফাতিমাকে ফাদাক থেকে বঞ্চিত করেছে, আর যে ব্যক্তি হাসানকে তাঁর মাতামহের নিকট সমাহিত হতে দেয়নি, আর যে আবূ যরকে বহিষ্কার করেছে আর যে ব্যক্তি আব্বাসকে মজলিসে শূরা থেকে বহিষ্কার করেছে।

গাদীর উৎসব প্রবর্তন

মুইজ্জুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ (৯৬৩ খ্রি জানুয়ারী) বাগদাদে উৎসব পালনের নির্দেশ জারি করলেন আর এ উৎসবের তিনি নামকরণ করেন 'খুমে-গাদীরের ঈদ' বলে। এ উপলক্ষে ঢাকঢোল পিটানো হয় এবং আনন্দোৎসব করা হয়। এ তারিখে অর্থাৎ ১৮ই যিলহজ্জ (জানুয়ারী ৯৬৩ খ্রি) তারিখে যেহেতু হযরত উসমান (রা) শহীদ হয়েছিলেন এ জন্যেই শিয়ারা এদিনকে খুমে-গাদীরের ঈদ বা উৎসব পালনের জন্যে বেছে নেয়। আহমদ ইব্‌ন বুওয়াইয়া দায়লামী তথা মুইজ্জুদ্দৌলা কর্তৃক ৩৫১ হিজরীতে (৯৬২ খ্রি) প্রবর্তিত এ উৎসব শিয়াদের মধ্যে এমনি গুরুত্ব লাভ করে যে, আজকাল শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ঈদে গাদীরের মর্যাদা ঈদুল আযহার চাইতেও বেশি।

তাযিয়াদারী প্রবর্তন

৩৫২ হিজরীর (৯৬৩ খ্রি) প্রারম্ভে বুওয়াইয়ার উক্ত পুত্রটি এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, দশই মুহাররম তারিখে হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের শোক পালনার্থে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হবে। সেদিন কোন বেচাকেনা হবে না। শহর ও গ্রামগঞ্জের সর্বত্র লোকজন মাতমের পোশাক পরিধান করবে এবং বিলাপ করবে। নারীরা নিজেদের চুল খুলে দিয়ে চেহারাকে কাল করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে সড়ক ও বাজারসমূহে মর্সিয়া গেয়ে গেয়ে মুখ নখর দ্বারা আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে ছাতি পিটাতে পিটাতে বের হবে। শিয়ারা অত্যন্ত প্রসন্ন মনে এ নির্দেশ পালন করে, কিন্তু আহলে সুন্নতপন্থীরা চাপা ক্রোধ নিয়ে গুমরে মরতে থাকে। কেননা তখন শিয়াদের রাজত্ব ছিল। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৩৫৩ হিজরীতে (৯৬৪ খ্রি) সে আদেশের পুনরাবৃত্তি হলে সুন্নী মহলে অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রচুর রক্তপাতও হয়। তারপর থেকে শিয়ারা প্রতি বছর এ কুসংস্কারের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে যা আজ পর্যন্ত আমরা উপমহাদেশেও প্রত্যক্ষ করছি। আশ্চর্যের বিষয়, উপমহাদেশে সুন্নীরাও তাযিয়ার এ কুসংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ওমান অধিকার ও মুইজ্জুদ্দৌলার মৃত্যু

ওমানে কারামিতাদের দখল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমতাবস্থায় ৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রি) মুইজ্জুদ্দৌলা সমুদ্রপথে ওমান আক্রমণ করেন। উক্ত সালের ৯ই যিলহজ্জ তারিখে তিনি ওমান অধিকার করেন এবং কারামিতাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। হাজার হাজার কারামিতা এ সময় নিহত হয়। তাদের উননব্বুই খানা রণতরী ভস্মীভূত করে দেয়া হয়।

ওমান বিজয় সম্পন্ন করে মুইজ্জুদ্দৌলা ওয়াসিতে আসেন। এখান থেকে অসুস্থ হয়ে বাগদাদে ফিরেন। বাগদাদে তাঁর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু তাতে কোনই ফলোদয় হয়নি। ২২ বছর রাজত্ব করে ৩৫৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল (ফেব্রুয়ারী ৯৬৭ খ্রি) মাসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইজ্জুদ্দৌলার রাজত্ব

মুইজুদ্দৌলা তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র বখতিয়ারকে যুবরাজ মনোনীত করেন। মুইজ্জুদ্দৌলার পর তিনি ইজ্জুদ্দৌলার খেতাব খলীফার নিকট থেকে হাসিল করে রাজকার্য পরিচালনায় ব্রতী হন। দায়লামীরা এ পর্যায়ে এত বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তাঁদেরকেই প্রকৃত শাসক মনে করা হতে থাকে। খলীফার নিজস্ব শক্তি বলতে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ পর্যায়ে তাঁরাই তাঁদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। একদিকে খলীফা তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী করতেন, অপরদিকে এই শাসক সুলতানগণ তাঁদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। খলীফার হাতে রাজ্য পরিচালনার কোন ক্ষমতাই আর অবশিষ্ট ছিল না বরং তাঁরা নিজেরাই ছিলেন সুলতানদের দ্বারা শাসিত। প্রকৃত ক্ষমতা ঐ সুলতানদের হাতেই ছিল। এ জন্যে বাগদাদে এ সুলতানদের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারটি অধিক গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত হতো। কেননা, রাজকার্য পরিচালনার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে বাগদাদে দায়লামীদের প্রথম বাদশাহ ছিলেন মুইজ্জুদ্দৌলা। এবার দ্বিতীয় বাদশাহ্ ইজ্জুদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

ইজ্জুদ্দৌলা আবুল ফযল আব্বাস ইব্‌ন হুসাইন শিরাজীকে তাঁর উযীর মনোনীত করেন। এ বছরই জাতী ইব্‌ন মুইজ্জুদ্দৌলা বসরায় তাঁর ভাই ইজ্জুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। আবুল ফযল আব্বাস এ বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে ইজ্জুদ্দৌলার সম্মুখে এনে হাযির করেন। তিনি তাকে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। ৩৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭২—সেপ্টেম্বর ৭৩ খ্রি) ইজ্জুদ্দৌলা আবুল ফযল আব্বাসকে অপসারিত করে মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকীয়াকে উযীর পদে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকীয়া ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। তিনি ছিলেন ইজ্জুদ্দৌলার রান্না ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। ঐ বছরই আবূ তাগলিব ইব্‌ন নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামদান মুসেলে তার পিতা নাসিরুদ্দৌলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করে নিজে দেশ শাসনে ব্রতী হন। পূর্বেই বলা হয়েছে আবূ তাগলিব ইজ্জুদ্দৌলার কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। আবূ তাগলিবের দুই ভাই ইবরাহীম ও হামদান মুসেল থেকে পালিয়ে বাগদাদে ইজ্জুদ্দৌলার কাছে চলে আসেন এবং আবূ তাগলিবের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে তার বিরুদ্ধে ইজ্জুদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইজ্জুদ্দৌলা তাঁর উযীর মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকীয়া এবং সিপাহসালার সবুক্তগীনকে সাথে নিয়ে মুসেল আক্রমণ করেন। আবূ তাগলিব তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সঞ্জরে চলে যান।

ইজ্জুদ্দৌলা মুসেলে প্রবেশ করতেই আবূ তাগলিব সঞ্জর থেকে বাগদাদের উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন। এ খবর পেয়ে ইজ্জুদ্দৌলা ইব্‌ন বাকীয়া এবং সবুক্তগীনকে বাগদাদ রক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মুসেলে থেকে গেলেন। ইব্‌ন বাকীয়া আবূ তাগলিবের বাগদাদে পৌঁছবার পূর্বেই নিজে বাগদাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সবুক্তগীন বাগদাদের বাইরেই আবূ তাগলিবের মুকাবিলা করে তাকে প্রতিহত করতে মনস্থ করেন। এদিকে আবূ তাগলিব ও সবুক্তগীনের, ওদিকে বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বেঁধে গেল। এ সংবাদ পেয়েই আবূ তাগলিব ও সবুক্তগীন সন্ধি করে ফেললেন এবং উভয়েই ঐকমত্যে উপনীত হলেন যে, উজ্জুদ্দৌলা ও তাবৎ শিয়াকে বেদখল করে নতুন খলীফাকে সিংহাসনে বসাতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে ভাবনা-চিন্তা করে তাঁরা সে ইচ্ছা থেকে বিরত থাকেন। ইব্‌ন বাকীয়াকে বাগদাদ থেকে ডেকে এনে সবুক্তগীন আবূ তাগলিবের সাথে সন্ধির শর্ত ঠিক করে নেন। এ শর্তানুসারে ইব্‌ন বাকীয়া ইজ্জুদ্দৌলাকে লিখে পাঠান যে, আপনি মুসেল থেকে বাগদাদে চলে আসুন এবং আবূ তাগলিবকে মুসেল ছেড়ে দিন।

আবূ তাগলিব মুসেল পৌঁছে আপন শ্বশুরকে আলিঙ্গন করলেন। ইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদে ফিরে আসলেন। বাগদাদে ফিরে ইজ্জুদ্দৌলা অর্থ আদায়ের মানসে আহওয়াযে গেলেন। সেখানে তাঁর সহচর তুর্কী ও দায়লামীদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়। ইজ্জুদ্দৌলা তুর্কীদেরকে এ জন্যে কঠোর শাস্তি দেন। এ সংবাদ পেয়ে বাগদাদে অবস্থানরত সবুক্তগীন বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি ইজ্জুদ্দৌলার প্রাসাদ লুণ্ঠন করে তাঁর পরিবারস্থ লোকজনকে গ্রেফতার করে ওয়াসিতে পাঠিয়ে দেন। এটা ৩৬৩ হিজরীর যিলকদ (সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) মাসের ঘটনা।

এবার বাগদাদে সুবক্তগীনের সুন্নী রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। তিনি শিয়াদেরকে বাগদাদ থেকে বের করে দিলেন। তারপর খলীফা মুতীকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগে বাধ্য করলেন। কেননা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শাসনকার্য পরিচালনার অযোগ্য হয়ে পড়েছিলেন। সে মতে ৩৬৩ হিজরীর যিলকদ (সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) মাসে খলীফা মুতী পদত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র আবদুল করীমকে তায়েলিল্লাহ খেতাব দিয়ে খলীফা পদে আসীন করা হয়। খলীফা মুতী সাড়ে ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত নামেমাত্র খলীফা ছিলেন। যখন থেকে নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামদান মুসেল প্রদেশ অধিকার করেন তখন থেকেই রোমানদের আগ্রাসন প্রতিরোধ বা তাদের উপর হামলা চালানোর দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তাতে থাকে। আবার যখন ৩৬৩ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭৩-সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) নাসিরুদ্দৌলার ভাই সাইফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামদান আলেপ্পো ও হিম্‌স অধিকার করে নেন তখন রোমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ দায়-দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তাতে থাকে। সাইফুদ্দৌলা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রোমানদের হামলা প্রতিরোধ করেন এবং তাদের সমুচিত জবাব দেন।

৩৬৩ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭৩-সেপ্টেম্বর '৭৪ খ্রি) ইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতী লিল্লাহ্‌র নাম খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দেন। খলীফা তাতে ইজ্জুদ্দৌলার প্রতি গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইজ্জুদ্দৌলা তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে খলীফার বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেন। অগত্যা খলীফাকে আপন গৃহসামগ্রী বিক্রি করে নিজ ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। পদচ্যুত হওয়ার পর মুতী লিল্লাহর

খেতাব হয় শায়খুল ফাযিল। মুতী ৩৬২ হিজরীর মুহাররম (৯৭২ খ্রি-এর অক্টোবর) মাসে ওয়াসিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবূ বকর শিবলী (র) আবূ নসর ফরাবী ও কবি মুতানব্বী এ খলীফার আমলেই ইন্তিকাল করেন।

তায়ে' লিল্লাহ

আবূ বকর আবদুল করীম তায়ে' লিল্লাহ্ ইব্ন মুতী' লিল্লাহ্ হাযারা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খলীফা মুতী সরে দাঁড়ানোর পর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ৩৬৩ হিজরীর যুলকাদা (সেপ্টেম্বর ৯৭৪ খ্রি) মাসের তেইশ তারিখে বুধবারে তিনি খলীফা পদে আসীন হন। সবুক্তগীনকে নসরুদ্দৌলা খেতাব ও পতাকা দিয়ে ইজ্জুদ্দৌলার স্থলে নায়েবে সালতানাত ও সুলতান পদে আসীন করেন। এ বছরই মক্কা ও মদীনায় মাগরিবের শাসক মুইজ্জু উবায়দীর নাম খুতবায় উচ্চারিত হতে থাকে। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে,খলীফা মুতী' যখন খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান তখন বাগদাদে সবুক্তগীনের রাজত্ব চলছিল। ইজ্জুদ্দৌলা ইব্ন মুইজ্জুদ্দৌলা তখন আহওয়াযে ছিলেন। এ খবর পেয়ে ইজ্জুদ্দৌলার মায়ের সাথে সাক্ষাত মানসে ওয়াসিতে আসেন এবং আপন চাচা হাসান ইব্ন বুওয়াইয়াকে যিনি রুকনুদ্দৌলা খেতাব নিয়ে পারস্য শাসন করছিলেন– সবুক্তগীন তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাঠানোর জন্যে পত্র লিখলেন।

রুকনুদ্দৌলা তাঁর উযীর আবুল ফাতাহ্ ইব্ন হুমায়দকে একটি বাহিনী দিয়ে আপন পুত্র আদুদুদ্দৌলার কাছে আহওয়াযে পাঠালেন। তিনি আদুদুদ্দৌলাকেও এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, তুমিও সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবুল ফাতাহ্র সাথে মিলিত হয়ে আপন চাচাত ভাই ইজ্জুদ্দৌলার সাহায্যার্থে এগিয়ে যাও।

এদিকে সবুক্তগীন খলীফা তায়ে' লিল্লাহ্ এবং তাঁর পিতা মুতী' উভয়কে সাথে নিয়ে তুর্কী বাহিনীসহ ওয়াসিতের দিকে যাত্রা করলেন। মুসেলের শাসক আবূ তাগলিব এ সংবাদ পেয়ে মুসেল থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদ দখল করে ফেললেন। ওয়াসিতের নিকট পৌঁছেই সবুক্তগীন ও মুতী' উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তুর্কীরা উফতিগীনকে নিজেদের সর্দাররূপে বরণ করে নিয়ে ওয়াসিত অবরোধ করে ফেলে। উফতিগীন ছিলেন মুইজ্জুদ্দৌলার আযাদকৃত তুর্কী গোলাম। উফতিগীন দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখেন।

আদুদুদ্দৌলা তাঁর পিতাসহ উযীর আবুল ফাতাহ্ ইব্ন হুমায়দকে সাথে নিয়ে ওয়াসিত পৌঁছলেন। আদুদুদ্দৌলা নিকটে এসে গেছেন এ সংবাদ পেয়ে উফতিগীন ওয়াসিত থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উফতিগীন নিকটে এসে পৌঁছে গেছেন খবর পেয়ে আবূ তাগলিব বাগদাদ ত্যাগ করে মুসেলের দিকে অগ্রসর হলেন। ইজ্জুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা উভয়ে মিলে কয়েকদিন ওয়াসিতে অবস্থান করলেন। তারপর উভয় ভাই মিলে বাগদাদ অবরোধ করে চতুর্দিক থেকে রসদ আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। শহরবাসীদের ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। তুর্কীরা উফতিগীনের ঘর লুট করে আত্মকলহে লিপ্ত হলো। অবশেষে উফতিগীন খলীফা তায়ে' লিল্লাহকে সাথে করে অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন এবং তিক্রীতে গিয়ে উঠলেন।

৩৬৪ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল (জানুয়ারী ৯৭৫ খ্রি) মাসে আদুদুদ্দৌলা ও ইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদে প্রবেশ করলেন। আদুদুদ্দৌলা তুর্কীদের সাথে পত্র যোগাযোগ করে ৩৬৪ হিজরীর

রজব (মার্চ ৯৭৫ খ্রি) মাসে খলীফা তায়ে' লিল্লাহকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনলেন এবং খলীফার প্রাসাদে তাঁকে রেখে তাঁর হাতে বায়আত হলেন। ইজ্জুদ্দৌলাকে অন্তরীণাবদ্ধ করে তিনি নিজে রাজত্ব করতে লাগলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকীয়াকে তিনি ওয়াসিতের শাসনভার অর্পণ করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ইজ্জুদ্দৌলার পুত্র যাবান বসরায় রাজত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ইজ্জুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপের বিবরণ লিখে রুকনুদ্দৌলার কাছে আদুদুদ্দৌলার বিরুদ্ধে অনুযোগ করলেন। রুকনুদ্দৌলা তা জানতে পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন এবং আদুদুদ্দৌলাকে কঠোর ভর্ৎসনা করে পত্র লিখলেন। জবাবে আদুদুদ্দৌলা রুকনুদ্দৌলাকে লিখলেন ঃ

"ইজ্জুদ্দৌলার রাজ্য পরিচালনার মত যোগ্যতা ও শক্তি ছিল না। আমি হস্তক্ষেপ না করলে বাগদাদের রাজত্ব বুওয়াইয়া বংশের হাতছাড়া হয়ে যেত। আমি ইরাক প্রদেশের খারাজ স্বরূপ বার্ষিক ত্রিশ লাখ দিরহাম প্রদানের অঙ্গীকার করছি। আপনি যদি ইরাকের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে চান তা হলে চলে আসুন। আমি ফারিস প্রদেশে চলে যাব।"

এ পত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইরাক ও বাগদাদ দায়লামী রাজত্বের অধীন ছিল। আর ঐ আমলে দায়লামীদের সবচাইতে বড় শাসক ছিলেন রুকনুদ্দৌলা। বাগদাদের খলীফা ইরাকের গভর্নরের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে বাগদাদে কয়েদীদের মত থাকতেন। অবশেষে রুকনুদ্দৌলার আদেশানুসারে আদুদুদ্দৌলা ইজ্জুদ্দৌলাকে কারামুক্ত করে ইরাকের শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, ইরাকে খুতবায় আদুদুদ্দৌলার নাম উচ্চারণ করা হবে এবং ইজ্জুদ্দৌলা নিজেকে আদুদুদ্দৌলার নায়েব রূপেই গণ্য করবেন। আবুল ফাতাহকে ইজ্জুদ্দৌলার কাছে রেখে তিনি নিজে পারস্যের দিকে চলে গেলেন।

উফতিগীন এ সব ঘটনার পর দামেশকে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে মুইজ্জু উবায়দীর আমলেকে বহিষ্কার করে নিজে দামেশকের সর্বময় কর্তা বনে বসেন। দামেশকবাসীরা উফতিগীনকে নিজেদের শাসকরূপে পেয়ে আনন্দিত হলো। কেননা, শিয়া রাফিযীরা সেখানে বলপূর্বক নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। উফতিগীনের উপস্থিতিতে তারা সে আপদ থেকে রক্ষা পায়। উফতিগীন উবায়দী সুলতানের নামের স্থলে খলীফা তায়ের নাম খুতবায় প্রবর্তন করলেন। এটা ৩৬৪ হিজরীর শাবান (৯৭৫ খ্রি মে) মাসের কথা।

আদুদুদ্দৌলা

৩৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৯৭২-সেপ্টেম্বর '৭৩ খ্রি) রুকনুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। আদুদুদ্দৌলা পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। ইজ্জুদ্দৌলা আদুদুদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে প্রয়াসী হন। আদুদুদ্দৌলা তার মতি-গতি টের পেয়ে বাগদাদ আক্রমণ করলেন। বাগদাদ অধিকার করে তিনি বসরাও দখল করলেন। এটা ৩৬৬ হিজরীর (৯৭৭ খ্রি-এর জুলাই) শেষ দিকের ঘটনা।

আদুদুদ্দৌলা তাঁর পিতার উযীর আবুল ফাতাহকে গ্রেফতার করেন ও অন্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কেননা তিনি ইজ্জুদ্দৌলার সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন। এ দিকে ইজ্জুদ্দৌলা আপন উযীর উসায়দ আদুদুদ্দৌলার সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন বলে অন্ধকারে মুসেল ও শাম

অভিমুখে চলে যান। সেখানে মুসেলের ওয়ালী আবূ তাগলিবের সমর্থন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে বাগদাদ আক্রমণ করেন। আদুদুদ্দৌলা ইজ্জুদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলেন। তারপর আবূ তাগলিবকে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মুসেল ও জাযিরা অধিকার করেন। আবূ তাগলিব রাজ্যহারা হয়ে রোম সম্রাটের কাছে চলে যান। রোম সম্রাট তাঁর কন্যাকে আবূ তাগলিবের সাথে বিয়ে দেন। মোটকথা, মুসেল কিছুদিনের জন্যে বনূ হামদানের হাতছাড়া হয়ে যায়। সাড়ে পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর ৩৭২ হিজরীতে (৯৮২-৮৩ খ্রি) আদুদুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। অমাত্যবর্গ তাঁর পুত্র কায়জারকে সামসামুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করে আদুদুদ্দৌলার স্থলাভিষিক্ত করে। খলীফা তায়ে লিল্লাহ্ও এ উপলক্ষে শোকজ্ঞাপন ও মুবারকবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে সামসামুদ্দৌলার কাছে আসেন।

সামসামুদ্দৌলা

সামসামুদ্দৌলারা কয়েক ভাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শারফুদ্দৌলা। তিনি সামসামুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পারস্য অধিকার করে নেন। ৩৭৫ হিজরীতে (৯৮৫-৮৬ খ্রি) শারফুদ্দৌলা বাগদাদ আক্রমণ করেন। ৩৭৬ হিজরীর রমযান (জানুয়ারী ৯৮৭ খ্রি) মাসে শারফুদ্দৌলা সামসামুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে বাগদাদ অধিকার করেন। খলীফা তায়ে লিল্লাহ্ সাম্রাজ্যের জন্যে শারফুদ্দৌলাকে অভিনন্দিত করেন। সামসামুদ্দৌলাকে পারস্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে পৌছবার পর তাঁকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

শারফুদ্দৌলা

শারফুদ্দৌলার বাগদাদ তথা ইরাক দখলের সময় মুসেলে দারুণ গোলযোগ চলছিল। বনূ হামদান সায়ফুদ্দৌলার পর তাঁর পুত্র সাদুদুদ্দৌলা আলেপ্পো প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শারফুদ্দৌলা ইব্ন আদুদুদ্দৌলা দুই বছর আট মাসকাল রাজত্ব করার পর ৩৭৯ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৮৯-মার্চ ৯৯০ খ্রি) শোথদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। শারফুদ্দৌলার ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র বাহাউদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

বাহাউদ্দৌলা

বাহাউদ্দৌলাকে খলীফা তায়ে লিল্লাহ্ যথারীতি খেলাত প্রদান করেন এবং মুবারকবাদ প্রদানের জন্য স্বয়ং আগমন করেন। বাহাউদ্দৌলা নাসিরুদ্দৌলার পুত্রদ্বয় ইবরাহীম ও হুসাইনকে মুসেলের শাসনভার অর্পণ করে আমিলরূপে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই তিনি এ জন্যে অনুতপ্ত হয়ে মুসেলের সাবেক আমীরকে লিখে পাঠালেন যে, কোন মতেই এদের কাছে যেন ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়। কিন্তু ইবরাহীম ও হুসাইন বলপূর্বক মুসেল অধিকার করে নিলেন। ৩৮০ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৯০-মার্চ ৯১ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা তার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ আলী ইব্ন শারফুদ্দৌলাকে পারস্য থেকে ধোঁকা দিয়ে ডেকে এনে হত্যা করলেন। আবূ আলী তখন পারস্যে রাজত্ব করছিলেন। তাঁকে হত্যার পর পারস্যের সম্পদ-সম্ভার দখলের উদ্দেশ্যে বাহাউদ্দৌলা পারস্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌছে তিনি পারস্য অধিকার করেন। পারস্যে অবস্থানরত সামসামুদ্দৌলা তখন তাঁর সমর্থকদেরকে

সংগঠিত করে দেশ দখল করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, বাহাউদ্দৌলাকে স্বেচ্ছায় পারস্য সামসামুদ্দৌলার হাতে ছেড়ে দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হলো। এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে বাহাউদ্দৌলা বাগদাদে ফিরে আসলেন। যখন তিনি এখানে এসে পদার্পণ করেন তখন বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা চলছিল।

বাহাউদ্দৌলা উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস-রফা করিয়ে দেন। ফলে উভয়পক্ষই শান্ত হয়ে যায়। ৩৮১ হিজরীর রমযান (নভেম্বর ৯৯১ খ্রি) মাসে খলীফা তায়ে' লিল্লাহ্ আম-দরবার অনুষ্ঠান করেন। বাহাউদ্দৌলা সিংহাসনের পাশে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। অমাত্যবর্গ এসে একে একে খলীফার হস্তচুম্বন করে নিজ নিজ আসনে গিয়ে আসন গ্রহণ করছিলেন। এ সময় একজন দায়লামী সর্দার এসে দরবারে প্রবেশ করলো। সে হস্ত চুম্বনের ছলে খলীফার হাত ধরে টেনে তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিচে ফেলে বেঁধে ফেললেন। তারপর খলীফার দরবার ও প্রাসাদে লুটপাট চললো। বাহাউদ্দৌলা নিজ ঘরে চলে গেলেন। দায়লামীরা খলীফাকে অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করে টেনেহেঁচড়ে বাহাউদ্দৌলার সম্মুখে হাযির করলো। বাহাউদ্দৌলা অসহায় খলীফাকে পদত্যাগে বাধ্য করলেন এবং আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুকতাদিরকে ডেকে এনে কাদির বিল্লাহ উপাধি দিয়ে খলীফার আসনে বসালেন। তায়ে লিল্লাহকে খলীফা প্রাসাদের একাংশে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হলো এবং তাঁর জীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হলো। ৩৯২ হিজরী (১০০২ খ্রি) পর্যন্ত এ অবস্থায় জীবন ধারণ করে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাদির বিল্লাহ্

আবুল আব্বাস আহমদ কাদির বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাদির ৩৩৬ হিরজীতে (৯৪৭-৪৮ খ্রি) তামান্না নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৮১ হিজরীর ১২ই রমযান (ডিসেম্বর ৯৯১ খ্রি) তিনি খলীফা পদে আসীন হন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ রাজনীতিক ছিলেন। তাহাজ্জুদের নামায কখনো কাযা করেননি। অত্যন্ত উঁচুদরের ফকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের অল্প কয়েকদিন পরেই ৩৮১ হিজরীর শাওয়াল (জানুয়ারী ৯৯২ খ্রি) মাসে তিনি একটি দরবার অনুষ্ঠান করেন তাতে বাহাউদ্দৌলা ও খলীফা কাদির বিল্লাহ পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করেন। কাদির বিল্লাহ খলীফা তায়ে লিল্লাহ্র আমলে খিলাফতের যে অবমাননা করা হয়েছে তার মাত্রা কমিয়ে আনতে এবং খলীফার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু দায়লামীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল এবং খলীফার মর্যাদা এতই কমে গিয়েছিল যে, কাদির বিল্লাহ্ তাতে তেমন পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হননি। তা সত্ত্বেও তায়ে লিল্লাহ্র তুলনায় তিনি নিজের মর্যাদা অনেকাংশে বাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ৩৮০ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৯০-মার্চ ৯১ খ্রি) সামসামুদ্দৌলা এবং বাহাউদ্দৌলার মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হয় যে, পারস্যে সামসামুদ্দৌলার এবং ইরাকে বাহাউদ্দৌলার রাজত্ব থাকবে। কিন্তু ৩৮৩ হিজরীতে (৯৯৩ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা পারস্য থেকে সামসামুদ্দৌলাকে উৎখাত করে নিজের দখল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। সামসামুদ্দৌলা সে বাহিনীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। ৩৮৪ হিজরীতে (৯৯৪ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা তুর্কী সেনাপতিদের অধীনে একটি বিশাল বাহিনী পারস্য অভিমুখে পাঠান। সামসামুদ্দৌলার সাথে

উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের ধারা ৩৮৮ হিজরী (৯৯৮ খ্রি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। জয় পরাজয় পালাক্রমে উভয় পক্ষেরই হতে থাকে। অবশেষে ৩৮৮ হিজরীর যিলহজ্জ (৯৯৮ খ্রি) মাসে নয় বছর পারস্যে রাজত্ব করার পর সামসামুদ্দৌলা বন্দী ও নিহত হন। পারস্য বাহাউদ্দৌলার দখলে আসে। ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) বাহাউদ্দৌলা স্বয়ং পারস্যে যান। এ সময় আবূ জা'ফর হাজ্জাজ ইব্ন হরমুজকে তিনি ইরাক শাসনের জন্য বাগদাদে রেখে যান। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ আবূ জা'ফরকে আমীদুদ্দৌলা খেতাব দান করেন। এ বছরই অর্থাৎ ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) গোটা মাওরাউন নাহর সামানী শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং এ বংশের শাসনের অবসান ঘটে। ইতিপূর্বে ৩৮৪ হিজরীতে (৯৯৪ খ্রি) খুরাসান তাদের দখল থেকে মুক্ত হয়েছিল। সামানীয়দের অর্ধেক রাজ্য সবুক্তগীন বংশের এবং অবশিষ্ট অর্ধেক তুর্কীদের দখলে চলে যায়। এর বিশদ বিবরণ পরে দেয়া হবে। কয়েকদিন পূর্বেই বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বাধে। বাহাউদ্দৌলা পারস্য থেকে এ সংবাদ অবহিত হয়ে আমীদুদ্দৌলাকে বাগদাদ তথা ইরাকের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত করে ৩৯০ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) আবূ আলী হাসান ইব্ন হরমুজকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করে 'আমীদুল জুয়ূশ' খেতাবে ভূষিত করেন। আমীদুল জুয়ূশ শিয়া-সুন্নী দাঙ্গার অবসান ঘটিয়ে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৩৯১ হিজরীতে (১০০০ খ্রি) আমীদুল জুয়ূশকে ক্ষমতাচ্যুত করে আবূ নসর ইব্ন সাবূযকে ইরাক ও বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করা হয়। শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব পুনরায় দেখা দেয়। তবে কয়েকদিন পরে তা বন্ধও হয়।

৩৯৭ হিজরীতে (১০০৬ খ্রি) বাহাউদ্দৌলার ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র সুলতানুদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ তাঁকে সুলতানুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করেন।

সুলতানুদ্দৌলা

সুলতানুদ্দৌলা আপন পিতা বাহাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েই আপন ভাই আবুল ফাওয়ারিসকে কিরমানের শাসনভার অর্পণ করেন। কিরমানে অনেক দায়লামী আবুল ফাওয়ারিসের চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হয়ে তাঁকে তাঁর ভাই সুলতানুদ্দৌলার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। আবুল ফাওয়ারিস সত্যি সত্যি কিরমান থেকে সসৈন্যে এসে শিরাজ আক্রমণ করেন। এদিক থেকে সুলতানুদ্দৌলা মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তুমুল যুদ্ধের পর আবুল ফাওয়ারিস পরাস্ত হন। সুলতানুদ্দৌলা তার পশ্চাদ্ধাবন করে কিরমান পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে আবুল ফাওয়ারিস কিরমানেও টিকতে পারলেন না। তিনি গযনীতে সুলতান মাহমূদের দরবারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সুলতান মাহমূদ তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং আপন একজন সেনাপতি আবূ সাঈদ তাযীকে সৈন্যদল সাথে দিয়ে আবুল ফাওয়ারিসের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। আবুল ফাওয়ারিস এদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় পারস্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও সুলতানুদ্দৌলা তাঁকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। এবার পরাস্ত হয়ে আবুল ফাওয়ারিস আর সুলতান মাহমূদের ওখানে গিয়ে উঠলেন না। কারণ সেনাপতি আবূ সাঈদ তাযীর সাথে তিনি ভাল আচরণ করেননি। এ জন্যে পরাজিত হওয়ার পর তিনি বুতায়হার শাসনকর্তা মুহায্যাবুদ্দৌলার কাছে চলে গেলেন। তারপর পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সুলতানুদ্দৌলার ক্ষমা লাভ করে পুনরায় কিরমান শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

তুর্কীদের বিদ্রোহ

চীন ও মাওরাউন নাহরের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা থেকে খাতা রাজ্যে বসবাসকারী তুর্কী গোত্রসমূহ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তুর্কিস্তানের ওয়ালী তাগাখানের এলাকায় লুটপাট ও খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়। তাগাখান বিভিন্ন ইসলামী রাজ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা ও পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করেন। নিজের এলাকা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে সংকীর্ণ ও দুর্গম গিরিপথ দিয়ে তিনমাস পথ অতিক্রম করে তাদের নাগাল পেতে সক্ষম হন। যুদ্ধে তাদের দুইলক্ষ লোককে হত্যা করে তিনি ফিরে আসেন। এভাবে তুর্কী তথা মোগলদের সমুচিত শিক্ষালাভ হয়। এ ঘটনাটি ৪০৮ হিজরীতে (১০১৭ খ্রি) সংঘটিত হয়।

সুলতানুদ্দৌলা আপন ভাই মুশরিফুদ্দৌলাকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। মুশরিফুদ্দৌলা ইরাকে সুলতানুদ্দৌলার স্থলে নিজের নামে খুতবা চালু করেন। তিনি সুলতানুদ্দৌলাকে পদচ্যুত করেন। এটা ৪১১ হিজরীর (১০২০ খ্রি) ঘটনা।

মুশরিফুদ্দৌলা

ইরাকে অবস্থিত দায়লামী সর্দারদের সকলেই যখন মুশরিফুদ্দৌলাকে শাসক রূপে বরণ করে নেন, তখন সুলতানুদ্দৌলা তাঁর পুত্র আবূ কালীজারকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। আবূ কালীজার আহওয়ায অধিকার করেন। কয়েকটি লড়াইয়ের পর ৪১২ হিজরী (১০২১ খ্রি)তে কূফায় শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে তীব্র দাঙ্গা দেখা দেয়। শাসনক্ষমতা যাদের করতলগত ছিল সেই দায়লামী সর্দারদের সকলেই ছিলেন শিয়া আর ক্ষমতাহীন খলীফা ছিলেন সুন্নী। বাগদাদ ও সামাররায় প্রচুর তুর্কীর বাস ছিল। তাদের সকলেই সুন্নী ছিলেন বিধায় খলীফার আনুগত্যকে তাঁরা জরুরী মনে করতেন। খলীফা কাদির এ সব বিবেচনা করে সুন্নীদের সহযোগিতা নিয়ে কয়েকটি সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং শিয়াদেরকে তাদের কয়েকটি অপচেষ্টা থেকে বিরত রাখেন। তুর্কীরা এবং বাগদাদের সুন্নীদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক খলীফা কাদির বিল্লাহর সমর্থক ছিল। এ জন্যেই তাঁর পক্ষে কিছু মর্যাদা লাভ করা সম্ভবপর হয়। ৪১৬ হিজরীর (মে. ১০২৫ খ্রি) রবিউল আউয়াল মাসে মুশরিফুদ্দৌলা তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বছরে ইনতিকাল করেন। তাঁর ভাই বসরার গভর্নর আবূ তাহির জালালুদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

জালালুদ্দৌলা

মুশরিফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর বাগদাদে জালালুদ্দৌলার নামে খুতবা পঠিত হয়। জালালুদ্দৌলা বসরা থেকে রওয়ানা হয়ে বাগদাদ না এসে ওয়াসিতে চলে যান। বাগদাদবাসীরা তখন খুতবা থেকে তাঁর নাম খারিজ করে দিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ কালীজার ইব্‌ন সুলতানুদ্দৌলার নাম খুতবায় দাখিল করে নেন। আবূ কালীজার তখন কিরমানে তাঁর চাচা আবুল ফাওয়ারিসের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। বাগদাদবাসীরা আবূ কালীজারকে বাগদাদে আসার জন্যে আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি বাগদাদ আগমনে সমর্থ হননি। এ সংবাদ পেয়ে জালালুদ্দৌলা ওয়াসিত থেকে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হন। বাগদাদের সৈন্যবাহিনী তাঁকে

বাগদাদে প্রবেশ করতে না দিয়ে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। জালালুদ্দৌলা পুনরায় বসরায় চলে যান। আবূ কালীজারের আগমনের ব্যাপারে বাগদাদবাসীরা নিরাশ হয়ে পড়লে খুরাসানী, তুর্কী ও দায়লামীরা মিলে সলাপরামর্শ করে যে, জালালুদ্দৌলাকে ফিরিয়ে দেয়ার পর এবার কোন কুর্দী বা আরব সর্দারের বাগদাদ দখলের সম্ভাবনা রয়েছে। কোন আরব বাগদাদের উপর জেঁকে বসলে, কোন তুর্কী বা দায়লামীর পক্ষে বাগদাদ পুনর্দখল করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তখন আরব শাসক বসরা, শাম, হিজায, ইয়ামামা, বাহরায়ন, মুসেল প্রভৃতি প্রদেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে মজবুত হয়ে দাঁড়াবে।

এসব ভাবনাচিন্তা করে জালালুদ্দৌলার কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করা হলো যে, আপনি কালবিলম্ব না করে বাগদাদে আগমন করুন। সেমতে জালালুদ্দৌলা বাগদাদে এসে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তাঁর নাম খুতবায় উল্লেখ করা হতে থাকে।

৪১৮ হিজরী (১০২৭ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায উপলক্ষে নাকাড়া বাজাবার নির্দেশ জারি করলেন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ ব্যাপারটি একটি বিদআত বিধায় তা অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং এ নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে জালালুদ্দৌলাকে তাগিদ দেন। জালালুদ্দৌলা নির্দেশ প্রত্যাহার করলেন সত্য, কিন্তু খলীফার প্রতি তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কয়েকদিন পর খলীফা অনুমতি প্রদান করলে জালালুদ্দৌলা পুনরায় তাঁর নাকাড়া বাজাবার আদেশ জারি করলেন।

৪১৯ হিজরী (১০২৮ খ্রি)তে তুর্কীরা জালালুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু খলীফা কাদির বিল্লাহ্র মধ্যস্থতায় সে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। তারপর আবূ কালীজার ইরাক আক্রমণ করেন। জালালুদ্দৌলা তার মুকাবিলায় সৈন্য পাঠালে উভয় পক্ষে সংঘাতের সূচনা হয়। উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলছিল এমতাবস্থায় ৪২২ হিজরী (১০৩০ খ্রি)তে খলীফা কাদির বিল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্' লকব গ্রহণ করে খলীফার আসনে বসেন। শায়খ তকীউদ্দীন সালাহ্ কাদির বিল্লাহকে শাফিঈ মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

কায়িম বি-আমরিল্লাহ

আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ্ 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্' ইব্ন কাদির বিল্লাহ্ ১৫ই যিলকদ ৩৯১ হিজরী (অক্টোবর ১০০১ খ্রি)তে বদরুদ্দোজা নাম্নী জনৈকা আর্মেনীয় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর-সুঠাম, আবেদ-যাহেদ তথা দরবেশ প্রকৃতির সহিষ্ণু সাহিত্যিক, সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী, দানশীল ও পরোপকারী চরিত্রের মহান ব্যক্তি ছিলেন। জালালুদ্দৌলার শাসন ক্ষমতায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ লেগেই থাকতো। ৪২৫ হিজরী (১০৩৩ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা বাগদাদের কারখ মহল্লায় বসবাস করতে থাকেন এবং বাসাসেরী নামে পরিচিত তুর্কী আরসলানকে বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন। বাসাসেরী ক্ষমতায় আসীন হয়ে বাগদাদবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা সে খলীফাকেও অতিষ্ঠ করে তোলে। খলীফার অবস্থা তখন একজন কয়েদীর মতো হয়ে দাঁড়ায়।

শিয়া-সুন্নী দাঙ্গাও তখন বেশ কয়েকবার বাঁধে। বাসাসেরী নিজে শিয়াদের সমর্থক ছিল বিধায় সুন্নীদেরকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ৪২৭ হিজরী (১০৩৫ খ্রি)তে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী সৈন্যরা জালালুদ্দৌলার বাড়ি অবরোধ করে তা লুণ্ঠন করে। জালালুদ্দৌলা ক্রীটে চলে যান। খলীফা 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্' মধ্যস্থতা করে তুর্কী সৈন্যদের ও জালালুদ্দৌলার মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে দেন। ৪২৮ হিজরী (১০৩৬ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ কালীজারের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। তাঁরা এ সময় একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।

৪২৬ হিজরী (১০৩৪ খ্রি)তে জালালুদ্দৌলা খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্‌র কাছে তাকে মালিকুল মুলূক উপাধিদানের আবেদন জানালেন। খলীফা শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে এরূপ পদবীর বৈধতা সম্পর্কে ফাতাওয়া চাইলে তাঁদের কেউ কেউ এর বৈধতার পক্ষে আবার কেউ কেউ বৈধতার বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত খলীফা বাধ্য হয়ে বৈধতার পক্ষের মতই মেনে নিলেন এবং সে মতেই কাজ করলেন। তিনি জালালুদ্দৌলাকে মালিকুল মুলূক (রাজাধিরাজ) খেতাবে ভূষিত করলেন। ৪৩১ হিজরী (১০৩৯ খ্রি)তে আবূ কালীজার বসরায় সামরিক অভিযান চালিয়ে সেখানকার আমিলকে তাড়িয়ে দিয়ে বসরা অধিকার করেন এবং আপন পুত্র ইয়াযুল মুলূককে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে আহওয়াযের দিকে অগ্রসর হন। ঐ বছরই তুগরিল বেগ সালজুকী খুরাসানে সুলতান মাসউদ ইব্‌ন মাহমুদ সবুক্তগীনের সেনাপতিকে পরাস্ত করে নিশাপুর অধিকার করেন। খুরাসান অধিকার করে তিনি সুলতানে আযম খেতাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঐ বছরই তুগরিল বেগ এবং জালালুদ্দৌলার মধ্যে সন্ধিনামা লিখিত হয় এবং খলীফা তাঁর বিশেষ দূত কাযী আবুল হাসানকে তুগরিল বেগের নিকট প্রেরণ করেন। ৪৩৫ হিজরীর (১০৪৩ খ্রি) শাবান মাসে জালালুদ্দৌলা ইন্তিকাল করেন। লোকজন তাঁর পুত্র আবূ মানসূর মালিকুল আযীযকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে। কিন্তু মালিকুল আযীয সৈন্য-সামন্তকে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বখশিশ ভাতা দিতে সক্ষম হননি। ফলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। আবূ কালীজার উদ্ভূত এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা ওঠান এবং প্রচুর অর্থবৈভব বাগদাদে সেনাপতিদের কাছে প্রেরণ করেন। ফলে তারই নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ৪৩৬ হিজরীর সফর মাসে (আগস্ট ১০৪৪ খ্রি) আবূ কালীজার বাগদাদে প্রবেশ করলে খলীফা তাকে 'মহীউদ্দীন' (দীনের জীবন সঞ্চারকারী) খেতাবে ভূষিত করেন। ৪৩৯ হিজরী (১০৪৭ খ্রি) সালে মহীউদ্দীন ইব্‌ন সুলতানুদ্দৌলা ইব্‌ন বাহাউদ্দৌলা ইব্‌ন আদুদুদ্দৌলা ইব্‌ন রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়াইয়া দায়লামী নামে খ্যাত আবূ কালীজার সুলতান তুগরিল বেগের সাথে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হন।

আবূ কালীজারের রাজত্ব

আবূ কালীজার নায়েবে সালতানাত হয়ে আপন বিদ্যাবুদ্ধি ও সামরিক শক্তি বলে ইস্পাহান ও কিরমান এলাকা দখল করে সোয়া চার বছরকাল রাজত্ব করে ৪৪০ হিজরী (১০৪৮ খ্রি)তে ইনতিকাল করেন। বাগদাদে তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র আবূ নসর ফিদেয় শাহ্ স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন 'মালিকুর রাহীম' উপাধি ধারণ করেন।

মালিকুর রাহীমের রাজত্ব

মালিকুর রাহীম বাগদাদ ও ইরাকে রাজত্ব শুরু করলেন এবং তাঁর অপর ভাই শীরায অধিকার করেন। ঐ বছরই বাগদাদে ভীষণ দাঙ্গা হয় আর এর মূলে ছিল শিয়া-সুন্নী বিভেদ। তারপর মালিকুর রাহীম তাঁর শীরায দখলকারী ভাই আবূ মানসূর খসরুকে আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তারপর মালিকুর রাহীমের অন্যান্য ভাই ও আত্মীয়-স্বজনরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ৪৪২ হিজরীতে (১০৫০ খ্রি) বাগদাদের শিয়া-সুন্নী দাঙ্গায় উভয় পক্ষের শত শত লোক নিহত হয়।

ঐ বছরই সুলতান তুগরিল বেগ ইস্পাহান অধিকার করেন এবং তিনি তাঁর ভাই আরসালান ইব্‌ন দাউদকে পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। আরসালান ইব্‌ন দাউদ ৪৪৪ হিজরী (১০৫২ খ্রি)তে পারস্য প্রদেশ দখল করে নেন। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ সুলতান তুরগিল বেগের কাছে এ সব প্রদেশের শাসনের সনদ পাঠিয়ে দেন যেগুলো তিনি অধিকার করে নিয়েছিলেন। ৪৪৩ হিজরী (১০৫১ খ্রি)তে ঈদের সময় সুলতান তুগরিল বেগ বাগদাদে আগমন করেন এবং খলীফার হস্তচুম্বন ও খেলাত লাভে ধন্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ৪৪৫ হিজরী (১০৫৩ খ্রি)তে পুনরায় বাগদাদে প্রচণ্ড শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং তাতে বাগদাদের কয়েকটি মহল্লা ভস্মীভূত হয়ে যায়। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহকে এ দাঙ্গা থামাতে প্রচুর বেগ পেতে হয়। মালিকুর রাহীম শীরায, বসরা প্রভৃতি স্থানে আপন ভাই-ভাতিজাদের সাথে যুদ্ধরত থাকেন। ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি) পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

এ সময়টিতে সুলতান তুগরিল বেগ আযারবায়জান ও জাযিরা দখল করে নেন। রোমকদের বিরুদ্ধেও তিনি জিহাদ পরিচালনা করেন। সেখান থেকে কল্পনাতীত পরিমাণ ধন-সম্পদ লাভ করে খুরাসান ও পারস্য দখল সম্পূর্ণ করে মুসেল ও সিরিয়াও অধিকার করেন। হজ্জ আদায়ের জন্যে তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে গমন করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে রে ও খুরাসানে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তখন গুণ্ডা-বদমাশদের ভীষণ উপদ্রব ছিল। ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি)-তে তুগরিল বেগ খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্‌র কাছে দরবারে আনুগত্যের পত্র প্রেরণ করেন। ঐ সময় মালিক আবদুর রাহীম বসরা থেকে বাগদাদে আগমন করেন এবং খলীফাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তুগরিল বেগের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। খলীফা ৪৪৭ হিজরীর রমযান মাসে (ডিসেম্বর, ১০৫৫ খ্রি) এ মর্মে ফরমান জারি করলেন যে, খুতবায় যেন সুলতান তুগরিল বেগের নামও উচ্চারিত হয়। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান তুগরিল বেগ অত্যন্ত প্রীত হন এবং খলীফার দরবারে উপস্থিতির অনুমতি চেয়ে পাঠান। খলীফা তাঁকে সে অনুমতি দান করেন। এদিকে বাগদাদের সেনাধ্যক্ষরা সুলতান তুগরিল বেগের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ করে পত্রাদি প্রেরণ করেন। ৪৪৭ হিজরীর রমযান (১০৫৫ খ্রি ডিসেম্বর) মাসে বাগদাদে সুলতান তুগরিল বেগকে অভ্যর্থনা জানানোর বিপুল আয়োজন করা হয়।

বাসাসিরী যেহেতু শিয়া ছিলেন এবং মিসরের শাসনকর্তা উবায়দীর সাথে তার যোগসাজশ ছিল তাই তিনি বাগদাদে দাঙ্গা সংঘটিত করেন। তুগরিল বেগ বাগদাদে উপনীত হয়ে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে দায়লামীদের শক্তি চূর্ণ করেন। ৪৪৮ হিজরীর শুরুর দিকে

(১০৫৬ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী খাদীজা ওরফে আরসালান খাতুন বিনত দাউদের বিবাহ খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর সাথে দিয়ে খলীফার বংশের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ৪৮৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ তারিখে (ডিসেম্বর ১০৯২ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগের চাচাত ভাই কাতালমাশ সানজার নামক স্থানে বুসাসিরীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কাতালমাশ যুদ্ধে পরাস্ত হন।

বাসাসিরী মুসেল প্রদেশ অধিকার করে মিসরের শাসনকর্তা মুসতানসির উবায়দীর নামে খুতবা প্রচলন করলেন। এদিকে জাযিরা প্রদেশের ওয়ালীও বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। সুলতান তুগরিল বেগ মুসেলে অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে ৪৪৯ হিজরীর শুরুতে (১০৫৭ খ্রি) বাগদাদের দিকে ফিরে আসেন। খলীফা তাঁকে সম্মানিত করেন। এ উপলক্ষে তিনি একটি দরবার বসান। খলীফা তুগরিল বেগকে 'মালিকুল মুল্‌ক আল-মাশরিক ওয়াল মাগরিব' (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিপতি) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গোটা সাম্রাজ্যের হুকুমত ও ইন্তিজামের সনদ প্রদান করেন।

এ সময় বাসাসিরী ও মিসরের ওয়ালী উবায়দী সুলতান তুগরিল বেগের ভাই ইবরাহীমকে প্ররোচনা দিয়ে হামদানে বিদ্রোহ করান। সুলতান তুগরিল বেগ হামদানের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেই সুযোগ বুঝে বাসাসিরী বাগদাদ আক্রমণ করে দখল করে বসেন এবং বাগদাদের জামে মসজিদে মুসতানসির উবায়দীর নামে খুতবা পাঠ করান। এটা ৮ই যিলকদ ৪৫০ হিজরীর (জানুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) ঘটনা। বাগদাদের শিয়ারা সর্বতোভাবে বাসাসিরীকে সহযোগিতা করে। বাসাসিরী বাগদাদের মসজিদসমূহে আযানে 'হাইয়া আলা খায়ারিল আমল' বাক্যের সংযোজন করেন। বাসাসিরীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাগদাদের সুন্নীরা বিদ্রোহ করেন। কিন্তু তারা বাসাসিরীর সৈন্যদের হাতে পরাস্ত হয়ে নিহত হন। বাসাসিরী রঈসুর রুয়াসা নামে প্রসিদ্ধ খলীফার উযীর আযমকে ধরে শূলিতে চড়ান। ঘটনা ৪৫০ হিজরীর যিলহজ মাসের শেষ দিকে (ফেব্রুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) সংঘটিত হয়। বাসসিরী মিসরে মুসতানসির উবায়দীর কাছে সুসংবাদ জানিয়ে তাঁর সাহায্য চেয়ে পাঠান, কিন্তু মিসর থেকে কোন সাহায্যই তিনি পাননি। এ দিকে বাসাসিরীর কাছে খবর পৌঁছে যে, সুলতান তুগরিল বেগ তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে তিনি কায়িম বি-আমরিল্লাহ এবং তাঁর বেগম আরসালান খাতুনকে গ্রেফতার করে বাগদাদের বাইরে কোন এক স্থানে নজরবন্দী করেন। খলীফার প্রাসাদ লুটপাট করা হয়। এ সব সংবাদ অবগত হয়ে তুগরিল বেগ বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন।

এ সংবাদ পেয়ে বাসাসিরী পূর্ণ এক বছর কাল বাগদাদ দখল করে থাকার পর ৪৫১ হিজরীর ৬ই যিলকদ (জানুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) বাগদাদ ত্যাগ করেন। তুগরিল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করে খলীফাকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির দরুন খলীফাকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তজ্জন্যে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সময় খুরাসানে তুগরিল বেগের ভাই দাউদের ইন্তিকাল হয়। ৪৫১ হিজরীর যিলকদে (জানুয়ারী ১০৫৯ খ্রি) খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ বাগদাদে প্রবেশ করেন।

এক নজরে বুওয়াইয়া রাজত্ব

বুওয়াইয়া মাহীগীর দায়লামীর বংশধরদের বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে। এরা খলীফাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে খিলাফতের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। একশ বছরেরও অধিককাল ধরে তাঁরা বাগদাদের খলীফা এবং ইরাক ও পারস্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাখে। এরা ছিল শিয়া। এ জন্যে সুন্নীদেরকে এই শতাব্দীকালব্যাপী যে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয় তা কল্পনা করাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এদের রাজত্বকালে উলুভী তথা আলীপন্থীদেরও তেমন কোন উপকার হয়নি। এরা মুখে মুখে আহলে বায়তের প্রেমিক বলে দাবি করলেও কোন আলীপন্থীকে শক্তিশালী করা বা শাসনক্ষমতায় নিয়ে আসার কোনই প্রয়াস পায়নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যোৎসাহী বলেও খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এদের আমলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালু হয়েছে। কিন্তু এ সবের উপর মজুসিয়ত তথা পারসিক ধর্মের প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তারা আব্বাসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়।

এদের আমলে আরব আধিপত্যের সকল নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়। এদের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তাদের আধিপত্যের এই গোটা একশ বছর ধরে তারা শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বাধিয়ে রাখে। ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তাঁরা এমন সব মুশরিকানা প্রথা-পদ্ধতির পত্তন করে যা আজ পর্যন্ত মুসলমানদের গলায় লানতের শিকলরূপে ঝুলে আছে। এদের রাজত্বের পরিধি পারস্য ও ইরাকের বাইরে প্রসারিত হয়নি। খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের শাসনক্ষমতা লাভ তাদের ভাগ্যে জোটেনি। সিরিয়া ও হিজায তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে। তাদের রাজত্বের শ-সোয়াশ বছর বিশৃঙ্খলা, লুটপাট, রাহাজানি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ ছিল। তাই বুওয়াইয়া বংশ মুসলিম জাতির জন্যে কোন হিতকর বা আশীর্বাদরূপী বংশ ছিল না। এরা মুসলিম জাতির শান-শওকত ও দাপটকে ধূলিসাৎ করার ব্যাপারে সর্বাধিক কাজ করেছে। তারা এমন কোন কীর্তি রেখে যেতে সমর্থ হয়নি যা নিয়ে মুসলিম জাতি গর্ব করতে পারে।

যাহোক, ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি)তে এ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তাদের স্থলে সালজুকী বংশের রাজত্ব কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ খিলাফতের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সালজুকী রাজত্বের সূচনা

সালজুকী রাজত্বের অবস্থা আব্বাসী খলীফাদের বিবরণ স্থলে ঠিক তেমনভাবে বর্ণনা করা হবে না যেমনটি বুওয়াইয়া রাজত্বের অবস্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে। সালজুকী রাজত্বের ইতিহাস স্বতন্ত্র কোন অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল সালজুকী রাজত্বের সূচনা কিভাবে হলো তাই বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি। তারপর আব্বাসীদের বর্ণনার সাথে অপর কোন বংশের রাজত্বের বর্ণনা দেয়ার হয়তো আর প্রয়োজন হবে না। সামানী বংশ এবং সবুক্তগীন গজনভীর বংশের প্রসঙ্গ এখনো উত্থাপিত হয়নি।

তুর্কী সম্প্রদায় চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে খাওয়ারিযম শাশ, ফারগানা, বুখারা, সমরকন্দ ও তিরমিয পর্যন্ত ভূখণ্ডে বসবাস করতো। মুসলমানরা তাদেরকে পরাস্ত করে তাদের সর্দারদেরকে করদ সামন্তে পরিণত করেছিল। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের কোন কোন

গোত্র চীন সীমান্তের নিকটবর্তী দুর্গম এলাকাসমূহে এমনভাবে বাস করে আসছিল যারা তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার না করে চীন ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতো। এরা ৪০০ হিজরী (১০০৯ খ্রি)র দিকে তাদের উপত্যকাসমূহ থেকে বেরিয়ে এসে মাওরাউন নাহরের সেই সব এলাকায় চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে শুরু করে সামানী বংশের পতনের পর যেগুলো সেখানকার তুর্কী সর্দারদের অধিকারে ছিল।

এ সব এলাকায় ইতিপূর্বেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। এদিকের সবচাইতে বড় সর্দার আইলাক খান ছিলেন এ এলাকার শাসনকর্তা। ইসলাম সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনবহিত এ তুর্কীরা লুটপাটের স্বাদ পেয়ে যায় এবং তারা উপর্যুপরি তুর্কিস্তান ও মাওরাউন নাহর এলাকায় হামলা চালাতে থাকে। ৪১৮ হিজরী (১০২৭ খ্রি) পর্যন্ত এ সব তুর্কী তাদের পার্বত্য এলাকা থেকে বের হয়ে আসতে আসতে আযারবায়জান পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি এবং খলীফা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বলতা তাদেরকে সুদূরের এলাকাসমূহে পর্যন্ত এসে লুটপাট করার সুযোগ করে দেয়।

৪১৮ হিজরী (১০২৭ খ্রি)তে লুটেরা তুর্কীদের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র—যারা এ পর্যন্ত লুটপাটের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেনি– তুর্কিস্তান অভিমুখে যাত্রা করে এবং বুখারা থেকে ২০ ফারসং দূরবর্তী একটি শ্যামল প্রান্তরে রাজপথের নিকট তাঁবু স্থাপন করে। এ গোত্রের গোত্রপতির নাম ছিল সালজুক। এরা তাদের পূর্বে আসা তুর্কীদের তুলনায় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ছিল। তাদের সাথে ছিল তাদের পশুপাল। এরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর এবং এদের দেহের গড়নও ছিল বেশ মজবুত। এরা ছিল অত্যন্ত বীর গোত্র। সুলতান মাহমূদ গযনভীর আমিল তূস সুলতান মাহমূদকে এ গোত্রের আগমনের সংবাদ দিতে গিয়ে লিখেন যে, বুখারার অদূরে এদের শিবির স্থাপনকে নিরাপদ মনে করা চলে না। সুলতান মাহমূদ সেদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেখানে সদলবলে উপনীত হয়ে সেই তুর্কীদের কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তোমাদের একজন প্রতিনিধিকে আমার দরবারে প্রেরণ কর। সেমতে সালজুক তনয় আরসালান অথবা ইসরাঈল সুলতান মাহমূদের দরবারে হাযির হন।

মাহমূদ গজনভী শান্তি-শৃঙ্খলার জামানত স্বরূপ তাকে বন্দী করে ভারতের দুর্গে পাঠিয়ে ছিলেন। দুই-তিন বছর পর মাহমূদ গজনভী মৃত্যুবরণ করেন। তুর্কীদের এ গোত্রটি তখন খুরাসানকে তাদের নিকট সহজলভ্য দেখে খুরাসান এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্বে খুরাসানে লুটপাটকারী গোত্রগুলোর সাথে এসে মিলিত হতে শুরু করে। মাহমূদ গজনভীর পুত্র মাসউদ গজনভী তাদেরকে বাধা দেন এবং তাদের সাথে বেশ কটি যুদ্ধও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গজনভীদেরকে খুরাসান থেকে বেদখল করতে সমর্থ হয় এবং নিজেরা তা অধিকার করে নেয়। মাহমূদ গজনভীর বংশধররা দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা সালজুকী গোত্রের সাথে সন্ধি করে খুরাসান আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বুওয়াইয়া বংশীয়রা তখন আত্মকলহে লিপ্ত। এ ছাড়া সালজুকীদেরকে প্রতিহত করার যোগ্যতা বা সাহস কোনটিই তাদের ছিল না। তাই সালজুকীরা বিস্ময়কর গতিতে এগিয়ে যায়। বাগদাদে যেহেতু আব্বাসী খলীফা বর্তমান ছিলেন, তাই সালজুকীদের অন্তরে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রমবোধ বিদ্যমান ছিল।

সালজুকী গোত্র তাদের রাজত্ব শুরুর পূর্বেই বুখারা সন্নিহিত অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণ করে ছিল। তারা শিয়া প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি। কেননা বুখারা তথা গোটা মাওরাউন নাহর এলাকার মুসলমানরা ছিল সুন্নী। সালজুকীরাও তাই স্বভাবতই সুন্নী ছিল। যারা ইতিপূর্বে বুওয়াইয়াদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সালজুকীরা তাদের কাছে ছিল রহমতের ফেরেশতাস্বরূপ। সালজুকীদের সর্দার তুগরিল বেগ প্রথমে খুরাসান, আযারবায়জান, জাযিরা প্রভৃতি অধিকার করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এরপর তিনি বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হন যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে দায়লামীদের বেদখল করে স্বয়ং বাগদাদে তিনি নায়েবে সালতানাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর বংশধররাই বাগদাদে রাজত্ব করতে তাকে। তাঁর অধঃস্তন পুরুষ আল-আরসালান সালজুকী দানিয়ূব নদী থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এবং সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এবার খলীফা 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ্র' অবশিষ্ট বর্ণনার দিকে মনোনিবেশ করতে চাই।

৪৫১ হিজরী (১০৫৯ খ্রি)তে সুলতান তুগরিল বেগের ভাই খুরাসানের ওয়ালী চাগরী বেগ দাউদ গজনভী সুলতানের সাথে সন্ধি করেন। ঐ বছরই সুলতান মাসউদ গজনভীর মীর-মুনশী বা প্রধান সচিব আবুল ফযল বায়হাকী 'তারীখে' বায়হাকী নামক ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেন। চাগরী বেগ দাউদের ইন্তিকালের পর সুলতান তুগরিল বেগ তাঁর ভ্রাতৃবধু অর্থাৎ সুলায়মানের মাতাকে বিবাহ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ৪৫১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১০৬০ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ কূফায় পৌঁছে লুটপাটরত বাসাসিরীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন এবং পরে তাকে হত্যা করে তার কর্তিত শির বাগদাদে প্রেরণ করেন। সেখানে তা খলীফার প্রাসাদের তোরণে লটকিয়ে রাখা হয়। ৪৫২ হিজরীতে মুহাররম মাসে (ফেব্রয়ারী-মার্চ, ১০৬০ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ বাগদাদে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করে আওসাতের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করে ৪৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (এপ্রিল, ১০৬০ খ্রি) পার্বত্য এলাকা ও আযারবায়জানের দিকে যাত্রা করেন। ৪৫৩ হিজরীর ১৫ রবিউস সানী (মে, ১০৬১ খ্রি) আবুল ফাতাহ্ ইব্ন আহমদ আহওয়ায থেকে বাগদাদে আসেন। খলীফা তাঁকে উযীর পদে বরণ করেন। এর কয়েকদিন পরেই আবূ নসর ইব্ন জুহায়র ইব্ন মারওয়ানকে ফখরুদ্দৌলা উপাধি দিয়ে উযীরের পদ দেয়া হয় এবং আবুল ফাতাহ পদচ্যুত হয়ে আহওয়াযে ফিরে যান।

৪৫৩ হিজরী (১০৬১ খ্রি)-তে সুলতান তুগরিল বেগের স্ত্রী অর্থাৎ সুলায়মানের মায়ের মৃত্যু হলে রে-এর কাযী আবূ সা'দ মারফত তিনি খলীফার দরবারে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা সাইয়িদাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। খলীফা তাতে অসম্মত হন। তারপর তুগরিল বেগ তার নিজের উযীর আমীদুল মুল্ক কুন্দরীকে এ উদ্দেশ্যে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন। আমীদুল মুল্ক ৪৫৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা (জুলাই, ১০৬২ খ্রি) পর্যন্ত বাগদাদে যথারীতি অবস্থান করে খলীফাকে সম্মত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয় না। অগত্যা তিনি তুগরিল বেগের কাছে ফিরে যান। তুগরিল বেগ বাগদাদের কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ও শায়খ আবূ মানসূর ইব্ন ইউসুফের নামে ক্রোধ মিশ্রিত

পত্র পাঠালেন। তাঁরা খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অনেক করে বোঝালেন। অবস্থা বেগতিক দেখে খলীফা তুগরিল বেগের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করলেন। এ ছাড়া স্বয়ং খলীফার মহিষী আরসালান বেগ– যিনি তুগরিল বেগের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন– তিনিও এ ব্যাপারে খলীফাকে সম্মত করতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত খলীফা 'কায়িম বি-আমরিল্লাহ' তুগরিল বেগের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তুগরিল বেগেরই উযীর আমীদুল মুল্ককে শাহযাদী সাইয়িদার বিয়ের উকীল মনোনীত করেন এবং এ মর্মে তাঁকে সংবাদ দেন। শেষ পর্যন্ত ৪৫৪ হিজরীর শাবান মাসে (সেপ্টেম্বর, ১০৬২ খ্রি) তাবরীযের শিবিরে খলীফা দুহিতা ও তুগরিল বেগের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এ বিয়ের পর তুগরিল বেগ খলীফা ও তাঁর কন্যার জন্যে প্রচুর ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ও মণিমানিক্য উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর লোকান্তরিত মহিষীর নামে প্রদত্ত সমস্ত জায়গীর খলীফা দুহিতা সাইয়িদার নামে হস্তান্তরিত করেন। তারপর ৪৫৫ হিজরীর মুহাররম মাসে (জানুয়ারী, ১০৬৩ খ্রি) সুলতান তুগরিল বেগ আর্মেনিয়া থেকে বাগদাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং এ সময় শাহযাদী সাইয়িদার রুখসতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তুগরিল বেগ রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন। তারপর তিনি তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী সাইয়িদা খাতুন সমভিব্যাহারে পার্বত্য প্রদেশের দিকে রওয়ানা হন। রে-তে পৌঁছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪৫৫ হিজরীর ৮ই রমযান (সেপ্টেম্বর ১০৬৩ খ্রি) ইন্তিকাল করেন।

তুগরিল বেগ ছিলেন নিঃসন্তান। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ চাগরী বেগ ছিলেন তুগরিল বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। সে হিসাবে উযীর আমীদুল মুল্ক সুলায়মানকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। কিন্তু লোকজন তার বিরোধিতা করে এবং খুতবায় সুলায়মানের অপর ভাই আরসালান ইব্‌ন দাউদ চাগরী বেগের নাম পাঠ করে। আল্‌প আরসালান তখন খুরাসানের ওয়ালী ছিলেন এবং তিনি তখন মার্ভে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেয়ে আল্‌প আরসালান মার্ভে থেকে রে আক্রমণ করেন। আমীদুল মুল্ক তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু আল্‌প আরসালান আমীদুল মুল্কের প্রতি আস্থাবান হতে পারেননি। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকে সন্দেহ করতে থাকেন। অবশেষে ৪৫৬ হিজরী (১০৬৩ খ্রি)তে তিনি আমীদুল মুল্ককে বন্দী করে নিজ মন্ত্রী নিযামুল মুল্ক তূসীকে উযীরে আযম নিয়োগ করেন। রে-তে প্রবেশ করে আল্‌প আরসালান খলীফা দুহিতা সাইয়িদাকে পূর্ণ মর্যাদা সহকারে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা করে দেন। বাগদাদে সুলতান আল্‌প আরসালানের নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

নিযামুল মুল্ক তূসী সুলতান আল্‌প আরসালানের পক্ষ থেকে ৪৫৬ হিজরীর ৭ই জুমাদাল উলা (মে, ১০৬৪ খ্রি) তারিখে বাগদাদে খলীফার কাছে বায়আতের উদ্দেশ্যে হাযির হন। খলীফা আম-দরবার অনুষ্ঠান করেন। নিযামুল মুল্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন এবং তাঁকে যিয়াউদ্দৌলা এবং সুলতান আল্‌প আরসালানকে আল-ওয়ালিদুল মুওয়াইয়াদ খেতাবে ভূষিত করেন। ৪৬০ হিজরীতে (১০৬৭ খ্রি) খলীফা ফখরুদ্দৌলা ইব্‌ন জুবায়রকে পদচ্যুত করে ৪৬১ হিজরীর সফর মাসে (নভেম্বর, ১০৬৮ খ্রি) পুনরায় উযীর পদে পুনর্বহাল করেন। ৪৬২ হিজরী (১০৬৯ খ্রি)তে মক্কার ওয়ালী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাশিম খুতবা

থেকে মিসরের উবায়দীর নাম খারিজ করে দিয়ে খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ এবং সুলতান আল্প আরসালানের নাম খুতবায় দাখিল করেন। তিনি আযান থেকে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমল' বাক্যটি খারিজ করে দেন এবং নিজ পুত্রকে প্রতিনিধিরূপে আল্প আরসালানের খিদমতে প্রেরণ করেন। সুলতান তাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে খিলাত ও ত্রিশ হাজার দীনার ইনামস্বরূপ প্রদান করেন এবং বার্ষিক দশ হাজার দীনার বেতনভাতা নির্ধারণ করেন।

৪৬৩ হিজরী (১০৭০ খ্রি)-তে আলেপ্পোতেও খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ ও সুলতান আল্প আরসালানের নাম খুতবাভুক্ত হয়। ৪৬২ হিজরী (১০৬৯ খ্রি)-তে রোমান সম্রাট আরমানুস দু'লাখ সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে খিলাত প্রদেশ আক্রমণ করেন। সুলতান আল্প আরসালান মাত্র পনের হাজার সৈন্য নিয়ে সেই দু'লাখ সৈন্যের বাহিনীকে পরাস্ত করেন। রোমান সম্রাট আরমানুসের সাথে তখন ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্রাটদ্বয়ও ছিলেন। রুশ সম্রাট যুদ্ধে বন্দী হন। তাঁর নাক-কান কেটে দেয়া হয়। রোমান সম্রাটকে বন্দী করে তাঁর নিকট থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

রোমানদেরকে এরূপ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করার পর সুলতান আল্প আরসালান ৪৬৫ হিজরীতে (১০৭২ খ্রি) মাওরাউন নাহরের দিকে যাত্রা করেন। আমুদরিয়া নদীতে সেতু নির্মাণ করা হয়। সুলতানের বাহিনী দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরে নদী পার হন। ইউসুফ খাওয়ারিযমী নামক জনৈক দুর্গাধিপতিকে অপরাধীরূপে সুলতানের দরবারে উপস্থিত করা হলো। সুলতান বললেন, একে ছেড়ে দাও। আমি তাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করবো। ঘটনাচক্রে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইউসুফ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে সুলতানকে খঞ্জরবিদ্ধ করেন। সুলতান আহত হন। উপস্থিত লোকজন ইউসুফকে হত্যা করে। এদিকে সুলতান আল্প আরসালানও আঘাত সহ্য করতে না পেরে ৪৬৫ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল (নভেম্বর, ১০৭২ খ্রি) প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ মার্ভে নিয়ে দাফন করা হয়। তাঁর পুত্র মালিক শাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ মালিক শাহের নামে সনদ ও খলীফার পতাকা পাঠিয়ে দিলেন।

৪৬৭ হিজরীর ১৫ই শাবান (এপ্রিল, ১০৭৫ খ্রি) খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ রক্ত মোক্ষণ করিয়ে শয়ন করেন। ঘটনাচক্রে মোক্ষণকৃত রগ থেকে রক্তক্ষরণ পুনরায় শুরু হয় এবং এতই রক্তক্ষরণ হয় যে, তাঁর জীবনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। অমাত্যবর্গ জরুরীভাবে তলব করা হলে তারা খলীফার পৌত্র আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্ন যখীরাতুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন কায়িম বি-আমরিল্লাহ খলীফার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। পরদিনই খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তাঁর একমাত্র সন্তান যখীরাতুদ্দীন মুহাম্মদ পিতার জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ছ' মাস পর আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ নামক তাঁর এ পুত্র সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হন। আবুল কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করে মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ ৪৫ বছর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম বি-আমরিল্লাহ্ আরগাওয়ান নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উনিশ বছর তিন

মাস বয়ঃক্রমকালে খলীফা পদে আসীন হন। সিংহাসনে আরোহণ করেই গানবাদ্য ও আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। তাঁর দ্বারা খলীফার দাপট ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সাহসী খলীফা ছিলেন। ৪৬৭ হিজরী (১০৭৪ খ্রি)তে দামেশক বিজয় করে খলীফা মুকতাদী ও সুলতান মালিক শাহর নামে খুতবা পাঠ করান। আযান থেকে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমাল' বাক্য বাদ দিয়ে দেন। ক্রমে ক্রমে গোটা শাম দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৬৯ হিজরী (১০৭৬ খ্রি)তে বাগদাদে আশ'আরী ও হাম্বলীদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। উভয়পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়। এরপর এ দাঙ্গা প্রশমিত হয়। ৪৭০ হিজরী (১০৭৭ খ্রি) তে মালিক শাহ্ তাঁর ভাই তাজুদ্দৌলা তুতুশকে শামদেশ জায়গীর স্বরূপ দান করেন এবং এ মর্মে অনুমতি দান করেন যে, মিসরের যে সব এলাকা তিনি জয় করতে সমর্থ হবেন তাও তাঁর জায়গীর বলে গণ্য হবে।

৪৭১ হিজরী (১০৭৮ খ্রি)তে তাজুদ্দৌলা আলেপ্পো অবরোধ করেন। মিসরীয় সৈন্যরা এসে দামেশক অবরোধ করে বসে। দামেশকে অবরুদ্ধ আতসাজ তুতুশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি আলেপ্পোর অবরোধ উঠিয়ে দামেশকে আগমন করেন। মিসরীয়রা এ সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাজুদ্দৌলা তুতুশ আতসাজকে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্যে অভিযুক্ত করে হত্যা করিয়ে ফেলেন। ৪৭৬ হিজরী (১০৮৩ খ্রি)তে খলীফা মুকতাদী তাঁর উযীর আমীদুদ্দৌলা ইব্ন ফখরুদ্দৌলাকে ওজারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আবূ শুজা' মুহাম্মদ ইব্ন হাসানকে উযীর নিয়োগ করেন। মালিক শাহ আমীদুদ্দৌলাকে দরবারে তলব করে তাকে দিয়ার বকরের শাসনভার অর্পণ করেন।

৪৭৭ হিজরীর শা'বান মাসে (ডিসেম্বর ১০৮৪ খ্রি) কাওনিয়ার গভর্নর সুলায়মান ইব্ন কুতুলমাশ সালজুকী রোমকদের নিকট থেকে এন্টিয়ক ছিনিয়ে নেন। ৩৫৮ হিরজী (৯৬৮খ্রি) থেকে এন্টিয়ক রোমকদের অধীন ছিল। ৪৭৯ হিজরীতে (১০৮৬ খ্রি) মরক্কোর গভর্নর ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন খলীফা মুকতাদীর দরবারে এ মর্মে আবেদন জানাল যে, যে পরিমাণ ভূখণ্ড তাঁর অধীনে রয়েছে তার সনদ দিয়ে তাঁকে যেন সুলতান উপাধি দান করা হয়। খলীফা মুকতাদী সে আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর নিকট খিলাত ও পতাকা প্রেরণ করেন এবং তাঁকে 'আমীরুল মুসলিমীন' খেতাব দান করেন। এই ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনই মরক্কো শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ৪৭৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (মার্চ ১০৮৭ খ্রি) সুলতান মালিক শাহ সর্বপ্রথম বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি খিলাত লাভ করেন। পরদিন তিনি খলীফার সাথে পোলো খেলেন।

উযীর নিযামুল মুল্ক তাঁর মাদ্রাসা নিযামিয়া পরিদর্শন করেন। সুলতান মালিকশাহ্ একমাস বাগদাদে অবস্থান করে ইস্পাহান অভিমুখে রওয়ানা হন। ৪৮১ হিজরীতে (১০৮৮ খ্রি) ইবরাহীম ইব্ন মাসউদ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন সবুক্তগীন ইন্তিকাল করেন এবং জালালুদ্দীন মাসউদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খ্রি) ফিরিঙ্গীরা গোটা সাকলিয়া দ্বীপ দখল করে নেয়। এ দ্বীপটি মুসলমানরা সর্বপ্রথম ২০০ হিজরীতে (৮১৫ খ্রি) জয় করেছিলেন। এ দ্বীপে প্রথমে বনী আগলবের রাজত্ব ছিল। তারপর তা উবায়দীদের অধিকারে আসে। উবায়দীদের হাত থেকে তা ফিরিঙ্গীরা ছিনিয়ে নেয়। ঐ বছর অর্থাৎ ৪৮৪ হিজরীর রমযান মাসে (নভেম্বর ১০৯১ খ্রি) সুলতান মালিকশাহ্ পুনরায় বাগদাদে আগমন করেন।

মজলিসে মৌলুদ

৪৮৫ হিজরী (১০৯২ খ্রি) তে মালিক শাহ সালজুকী বাগদাদে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে মজলিসে মৌলুদ অনুষ্ঠান করেন। ঐ বছরই ৪৮৫ হিজরীর রমযান মাসে (নভেম্বর, ১০৯২ খ্রি) নাহাওন্দে উযীর নিযামুল মুল্ক তূসী সাতাত্তর বছর বয়সে হাসান সাব্বাহর অনুসারী জনৈক ঘাতকের হাতে নিহত হন।

ঐ বছরই ৪৮৫ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল (ডিসেম্বর ১০৯২ খ্রি) মালিক শাহ সালজুকী ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতকালের অব্যবহিত পরেই মালিক শাহের মহিষী তুরকান খাতুন ও তাঁর পুত্র বরকিয়ারুকের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ৪৮৬ হিজরীতে (১০৯৩ খ্রি) বরকিয়ারুক বাগদাদে আগমন করেন। খলীফা মুকতাদী তাঁকে রুকনুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করেন এবং নায়েবের খিলাত ও সুলতানী উপঢৌকনাদি দান করেন। কথিত আছে যে, মালিক শাহর মৃত্যু খলীফা মুকতাদীর অভিশাপেরই ফলশ্রুতিতে হয়েছিল। মালিক শাহ খলীফাকে বলেছিলেন, আপনি বাগদাদ ত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও চলে যান, যাতে আমি নিরংকুশভাবে বাগদাদকে আমার রাজধানী বানাতে পারি। খলীফা অতিকষ্টে আট দিনের সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি রাত-দিন আট প্রহর মালিক শাহর বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করতে থাকেন। আট দিন পূর্ণ না হতেই মালিক শাহর মৃত্যু হয় এবং খলীফা এ বিপদ থেকে রেহাই পান।

৪৮৭ হিজরীর মুহাররম (১০৯৪ খ্রি) মাসে খলীফা মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কথিত আছে যে, শামসুন্নাহার নাম্নী জনৈকা পূজারিণী তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে। খলীফা মুকতাদীরের ওফাতের পর তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুসতাযহির বিল্লাহ খেতাব গ্রহণ করেন।

মুসতাযহির বিল্লাহ্

আবুল আব্বাস আহমদ মুসতাযহির বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুকতাদী বিল্লাহ্ ৪৭০ হিজরীর শাওয়াল মাসে (মে, ১০৭৮ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হন এবং তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ষোল বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুকতাদীর মৃত্যুর সময় বরকিয়ারুক বাগদাদেই ছিলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসতাযহির বিল্লাহর হাতে বায়আত হন।

খলীফা মুকতাদীর মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সুলতান বরকিয়ারুক তাঁর উযীর ইয্‌যুল মুল্ক ইব্‌ন নিযামুল মুল্ক এবং তাঁর ভাই বাহাউল মুল্ক সমভিব্যাহারে খলীফার দরবারে উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য পারিষদও যথারীতি শোক প্রকাশার্থে হাযির ছিলেন। ৪৮৭ হিজরীতে (১০৯৪ খ্রি) মিসরের গভর্নর মুসতানসির উবায়দীর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র মুস্তালী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৪৮৮ হিজরীতে (১০৯৫ খ্রি) সমরকন্দের গভর্নর আহমদ খান নিজের ধর্মদ্রোহিতার জন্যে বন্দী হয়ে নিহত হয় এবং তার চাচাত ভাই তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

এ বছরই রে-এর নিকটবর্তী এলাকায় তুতুশ ও বরকিয়ারুকের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বরকিয়ারুকের হাতে তুতুশের মৃত্যু হয়। বরকিয়ারুকের শাসন তাতে সুসংহত হয়। বরকিয়ারুকের ভাই মুহাম্মদ শক্তি অর্জন করে খুরাসান অধিকার করেন। বরকিয়ারুক তাকে দমনের জন্যে অগ্রসর হলে রে-তে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বরকিয়ারুক পরাস্ত হয়ে

খুরাসানে চলে যান। মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ বাগদাদে প্রবেশ করে ৪৯২ হিজরীর ১৫ই যিলহজ্জ (নভেম্বর, ১০৯৯ খ্রি) খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহ্‌র নিকট থেকে "গিয়াছুদ দুনিয়া ওয়াদদীন" খেতাব হাসিল করেন। তারপর তিনি খুরাসানের দিকে চলে যান। বরকিয়ারুক খুজিস্তান থেকে ওয়াসিতে পৌঁছে সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন এবং ৪৯৩ হিজরীর ১৫ই সফর (ডিসেম্বর ১০৯৯ খ্রি) বাগদাদে গিয়ে উপনীত হন। খলীফা তাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এবং খিলাত দান করেন। বরকিয়ারুকের নামে খুতবা পাঠ করা হয় তারপর বরকিয়ারুক মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক শাহকে আক্রমণ করেন। হামদানের নিকটবর্তী নহরে আবইয়াযের তীরে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বরকিয়ারুক পরাজিত হন। এরপর ৪৯৩ হিজরীর ১৫ই রজব (জুন ১১০০ খ্রি) পুনরায় বাগদাদে সুলতান মুহাম্মদের নামে খুতবা পাঠ করা হয়। বরকিয়ারুক পরাস্ত হয়ে রে-তে অবস্থান করেন। সেখান থেকেই ইস্পাহানে এবং তারপর সেখান থেকে তিনি খুজিস্তানে গমন করেন। সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ৪৯৪ হিজরীর ১লা জুমাদাসসানী (মে, ১১০১ খ্রি) পুনরায় তিনি মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধে মুখোমুখি হন। তাকে পরাস্ত করে তিনি রে-তে চলে আসেন। মুহাম্মদ তাঁর আপন সহোদর সহুরের কাছে জুরজানে চলে যান। অবশেষে ৪৯৪ হিজরীর ১৫ই যিলকদ (অক্টোবর ১১০১ খ্রি) বরকিয়ারুক বাগদাদে উপনীত হন এবং তাঁর নামে বাগদাদে খুতবা পাঠ করা হয়।

মোদ্দাকথা সুলতান বরকিয়ারুক এবং তাঁর সহোদর সুলতান মুহাম্মদের মধ্যে একের পর এক লড়াই চলতে থাকে। বাগদাদে কখনো একজনের, আবার কখনো অন্যজনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কখনো বা সন্ধি হতো, আবার কখনো বা পরমুহূর্তেই তা লংঘিত হয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। এ উপর্যুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ইরাক, পারস্য, জাযিরা প্রদেশ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা তিরোহিত হয়ে গেল। লোকের ধন-প্রাণ ও সম্ভ্রম বাঁচানো দুষ্কর হয়ে পড়লো। ৪৯৭ হিজরীর জুমাদাল আউয়াল (ফেব্রুয়ারী ১১০৪ খ্রি) মাসে সেনাধ্যক্ষদের চেষ্টায় উভয় ভাইয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং সন্ধি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগি হয়। সাথে সাথে এটাও স্থির হয় যে, উভয়ের রাজ্যে দু'জনের নাম যুগপৎভাবে খুতবায় উচ্চারিত হবে। এ সন্ধি অনুসারে বাগদাদ বরকিয়ারুকের ভাগে পড়ে। এ সন্ধির পর কিছুদিন বরকিয়ারুক ইস্পাহানেই অবস্থান করেন। সেখান থেকে বাগদাদে আগমনের পথে ইয়াযদজার্দ নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে তিনি ৪৯৮ হিজরীর রবিউস সানী (১১০৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ ইব্‌ন বরকিয়ারুককে আপন উত্তরাধিকারী এবং আমীর আয়াযকে তাঁর অভিভাবকরূপে মনোনীত করেন।

মালিক শাহের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর ছিল। বরকিয়ারুকের মরদেহ ইস্পাহানে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। আমীর আয়ায মালিক শাহকে নিয়ে ৪৯৮ হিজরীর ১৫ই রবিউসসানী (১১০৫ খ্রি ফেব্রুয়ারী) বাগদাদে প্রবেশ করেন। মালিক শাহকে খলীফা সেই সব খেতাব প্রদান করলেন যা ইতিপূর্বে তাঁর পিতামহ মালিক শাহ ইব্‌ন আল্‌প আরসালানকে প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর নামে যথারীতি বাগদাদে খুতবা পঠিত হলো। তারপর সুলতান মুহাম্মদ মুসেল অধিকার করে বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ৫০১ হিজরীতে (১১০৭ খ্রি.) তিনি বাগদাদে প্রবেশ করে আমীর আয়াযকে হত্যা করলেন এবং নিজ নাম খুতবায় পড়ালেন। ৫০২ হিজরীতে (১১০৮ খ্রি) সুলতান মুহাম্মদ বাগদাদে নিজের জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ

করলেন। গোটা পৈতৃক রাজ্যে এবার মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক শাহ্‌র শাসন পুরাদস্তুর প্রতিষ্ঠিত হলো। সমস্ত গোলযোগের অবসান ঘটলো। ৫১১ হিজরীর শা'বান মাসে (ডিসেম্বর ১১১৭ খ্রি) সুলতান মুহাম্মদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুখ দীর্ঘায়িত হয়। অবশেষে ৫১১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে (এপ্রিল ১১১৮ খ্রি) সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র সুলতান মাহমূদ তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খলীফা তাঁর এ সিংহাসন আরোহণকে অনুমোদন করে তাঁর জন্যে খেলাত প্রেরণ করেন। ৫১২ হিজরীর মুহাররম মাসে (এপ্রিল-মে, ১১১৮ খ্রি) মসজিদসমূহে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তারপর ৫১২ হিজরীর ১৫ই রবিউল আখের (আগস্ট, ১১১৮ খ্রি) তারিখে খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহ্ দীর্ঘ চব্বিশ বছর তিন মাস কাল রাজত্ব করে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র আবূ মানসূর ফযল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তখন মুসতারশিদ বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন।

মুসতারশিদ বিল্লাহ্

মুসতারশিদ বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুসতাযহির বিল্লাহ্ ৪৮৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল (এপ্রিল, ১০৯২ খ্রি) মাসে ভূমিষ্ঠ হন এবং ২৭ বছর বয়সে পিতার পর ৫১২ হিজরীর ১৫ই রবিউল আখের (আগস্ট, ১১১৮ খ্রি) তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলীফা মুসতারশিদের সহোদর আমীর আবুল হাসান ইব্‌ন মুসতাযহির বায়আত না করে বাগদাদ থেকে ওয়াসিতে চলে যান। এক বছর পর গ্রেফতার হয়ে বাগদাদে নীত হন। খলীফা তার অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে খলীফার প্রাসাদেই থাকতে দেন। খলীফা মুসতারশিদের অভিষেক অনুষ্ঠানের মাত্র দু'মাস পর সুলতান মাহমূদের ভাই মাসউদ ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদ সালজুকী যিনি মুসেলে অবস্থান করছিলেন– বিদ্রোহ করে বসেন। তিনি তাঁর সাথে এ বিদ্রোহ বুখারার গভর্নর কসীমুদ্দৌলা জঙ্গী ইব্‌ন আকসানযির এবং হরবলের গভর্নর আবুল হায়জাকে তাঁর সাথে মিলিয়ে নেন এবং বাগদাদে এসে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে সুলতান মাহমূদের অপর ভাই সুলতান তুগরিল ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদ তাঁর পিতার শাসনামল থেকেই জুনজানের শাসনকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। সুলতান মাহমূদ মালিক তুগরিলের উপর আক্রমণ চালান। মালিক তুগরিল জুনজান থেকে পালিয়ে যান। সুলতান মাহমূদ জুনজানে লুটপাট চালায়।

যখন সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যু হলো এবং সুলতান মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন সুলতান মুহাম্মদের ভাই অর্থাৎ সুলতান মাহমূদের চাচা সঞ্জর মাওরাউন নাহরের শাসক ছিলেন। সুলতান সঞ্জরের লকব প্রথমে নাসিরুদ্দীন তথা ধর্মের সাহায্যকারী ছিল। সুলতান মুহাম্মদের ইন্তিকালের পর সুলতান সঞ্জর মাওরাউন নাহর থেকে সুলতান মাহমূদের প্রতি আক্রমণ চালান। সাভা নামক স্থানে ৫১৩ হিজরীর জুমাদাল উলা (সেপ্টেম্বর ১১১৯ খ্রি) মাসে চাচা-ভাতিজার যুদ্ধ হয়। সুলতান সঞ্জরের সাথে এ যুদ্ধে সিজিস্তানের গভর্নর আবুল ফযল, খাওয়ারিযম শাহ্ মুহাম্মদ আমীর নযদা এবং আলাউদ্দৌলা প্রমুখ সর্দারও ছিলেন। এ যুদ্ধে সুলতান মাহমূদ পরাস্ত হন এবং সুলতান সঞ্জর জয়যুক্ত হন। তিনি অগ্রসর হয়ে হামদান অধিকার করেন। বাগদাদে এ খবর পৌঁছতেই সেখানে সুলতান সঞ্জরের নামে খুতবা পঠিত হয়।

সুলতান মাহমূদ পরাজিত হয়ে ইস্পাহানে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অবশেষে সুলতান সঞ্জরের মায়ের চেষ্টায় উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত স্থির হয় যে, সুলতান সঞ্জর সুলতান মাহমূদকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মেনে নেবেন এবং খুতবায় সঞ্জরের পরে মাহমূদের নাম উচ্চারিত হবে। এ শর্তানুসারে সুলতান সঞ্জর মাওরাউন নাহর, গজনা, খুরাসান প্রভৃতি রাজ্যে সুলতান মাহমূদের উত্তরাধিকারিত্বের ফরমান পাঠিয়ে দেন। কেবল রে-অঞ্চল সুলতান সঞ্জর সুলতান মাহমূদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ দখলে নিয়ে অবশিষ্ট সকল রাজ্যে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। এদিকে সুলতান মাহমূদ তাঁর ভাই সুলতান মাসউদের সাথে সন্ধি করে তাঁকে মুসেল ও আযারবায়জান প্রদেশদ্বয় দিয়ে দেন আর তিনি মুসেলকে নিজের রাজধানীরূপে গ্রহণ করেন।

৫১৩ হিজরীতে (১১১৯ খ্রি) সুলতান মাসউদ নিজের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ৫১৪ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (জুন ১১২০ খ্রি) উভয় ভাইয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান মাসউদ পরাস্ত হয়ে মুসেলের নিকটবর্তী পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেন। অমাত্যবর্গ মধ্যস্থতা করে উভয় ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। সুলতান মাহমূদ ৫১৪ হিজরীর রজব (অক্টোবর, ১১২০ খ্রি) মাসে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতান মাসউদ পুনরায় মুসেলে রাজত্ব করতে থাকেন। ৫১৫ হিজরী (১১২১ খ্রি)তে সুলতান মাহমূদ মুসেলের শাসনভার আকসুনকুর বারসেকীকে অর্পণ করেন এবং আযারবায়জান পূর্ববৎ মাসউদের হাতেই থাকে।

সুলতান তুগরিলের বর্ণনা ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। তিনি সুলতান মাহমূদের কাছে পরাস্ত হয়ে গাঞ্জায় চলে যান। ৫১৬ হিজরী (১১২২ খ্রি)তে সুলতান মাহমূদ ও সুলতান তুগরিলের মধ্যে চুক্তিপত্র লেখা হয়। এরপর সুলতান মাহমূদ আকসুনকুর বারসেকীকে মুসেল ছাড়া ওয়াসিত অঞ্চলও জায়গীর স্বরূপ দিয়ে দেন। আকসুনকুর বারসেকী নিজ পক্ষ থেকে কসীমুদ্দৌলা ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুরকে ওয়াসিতের শাসনভার অর্পণ করেন। ৫১৭ হিজরীতে (১১২৩ খ্রি) সুলতান মাহমূদ তাঁর উযীর শামসুল মুল্‌ককে বধ করেন। এদিকে শামসুল মুল্‌কের ভাই নিযামুদ্দৌলাকে খলীফা মুসতারশিদ তাঁর উযীরের পদ থেকে পদচ্যুত করেন। ৫১৭ হিজরীর যিলহজ্জ (ফেব্রুয়ারী, ১১২৪ খ্রি) মাসে খলীফা মুসতারশিদ স্বয়ং সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে দাবিস ইব্‌ন সাদকাকে দমনের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে যাত্রা করেন। মুসেল ও ওয়াসিতের সৈন্যরাও খলীফার খিদমতে উপস্থিত হয়। মুবারাকা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ওয়াসিতের গভর্নর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুর অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খলীফা যুদ্ধে জয়ী হন। ৫১৮ হিজরীর ১০ই মুহাররম (মার্চ, ১১২৪ খ্রি) খলীফা বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। সুদীর্ঘকাল পর সম্ভবত এটাই ছিল আব্বাসী কোন খলীফার প্রথম সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সেনাপতির দায়িত্ব পালনের ঘটনা। এরপর জানা গেল যে, দাবীস ইব্‌ন সাদকা বসরা লুণ্ঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুর বসরার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব লাভ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে দাবীস ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মালিক তুগরিল ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। ঐ বছরই অর্থাৎ ৫১৮ হিজরী (১১২৪ খ্রি) ইরাকের প্রতিরক্ষা কার্যের ভারপ্রাপ্ত আকসুনকুর

বারসেকী যিনি তখন মুসেলের উপর রোমকদের হামলা প্রতিরোধের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্‌ন আকসুনকুরকে বসরার শাসনকার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী বসরা থেকে রওয়ানা হলেন সত্য, কিন্তু মুসেলে না গিয়ে তিনি ইস্পাহানে সোজা গিয়ে সুলতান মাহমূদের কাছে উঠলেন। সুলতান মাহমূদ তাঁকে বসরা শাসনের সনদ প্রদান করে বসরায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। দাবীস ইব্‌ন সাদকা সুলতান তুগরিলের কাছে উপনীত হলে তিনি তাঁকে নিজ অমাত্যবর্গের মধ্যে শামিল করে নিলেন। দাবীস তুগরিলকে প্ররোচনা দিয়ে তাঁকে দিয়ে ইরাক আক্রমণ করালেন।

৫১৯ হিজরীতে (১১২৫ খ্রি) তুগরিল দাবীসকে সাথে নিয়ে ওকুতা নামক স্থানে উপনীত হয়ে সেখানে অবস্থান করেন। এ সংবাদ পেয়ে খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ্ ৫১৯ হিজরীর ৫ই সফর (মার্চ ১১২৫ খ্রি) মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। নাহ্‌রওয়ানের উভয় পক্ষে মুকাবিলা হলো কিন্তু দাবীস ও তুগরিল উভয়েই খুরাসানে সুলতান সঞ্জরের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। ৫৩০ হিজরীর রজব (এপ্রিল, ১১৩৬ খ্রি) মাসে বাগদাদের কোতোয়াল ইয়ারতাকিশ যাকভী ইস্পাহানে সুলতান মাহমূদের কাছে পৌঁছে অনুরোধ করলেন যে, খলীফা মুসতারশিদ সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। প্রচুর যুদ্ধাস্ত্রও তিনি সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর আর্থিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে। খলীফা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ কথা শোনামাত্র সুলতান মাহমূদ সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে স্বয়ং বাগদাদের পথে বেরিয়ে পড়লেন। খলীফা মুসতারশিদ যখন সংবাদ পেলেন যে, সুলতান মাহমূদ সসৈন্যে বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন তখন তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, এদিকে আসার দরকার নেই, তুমি দাবীস ও অন্যদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ফিরে যাও। এ পত্র পাওয়ার সুলতান মাহমূদের অনুমান সত্য বলেই প্রতীয়মান হলো। তিনি ধারণা করলেন,খলীফা বুঝি সত্যসত্যই তাঁর প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তিনি তখন আরো দ্রুতবেগে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে ৫২০ হিজরীর ১৭ই যিলহজ্জ (জানুয়ারী ১১২৭ খ্রি) সুলতান মাহমূদ বাগদাদে পদার্পণ করলেন। খলীফা তখন পশ্চিম বাগদাদে সরে গেলেন। ৫২১ হিজরীর ১লা মুহাররম (জানুয়ারী ১১২৭ খ্রি) সুলতান মাহমূদের লোকজন খলীফার প্রাসাদ লুণ্ঠন করলো। ত্রিশ সহস্র বাগদাদবাসী খলীফা মুসতারশিদের পাশে এসে জমায়েত হলো। দজলা নদীর তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত খলীফা ও সুলতান মাহমূদের মধ্যে সন্ধি হয়। ৫২১ হিজরীর রবিউস সানী (এপ্রিল ১১২৭ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদ বাগদাদ থেকে হামদানের পথে রওয়ানা হন। যাবার প্রাক্কালে তিনি ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে বসরা থেকে ফিরিয়ে এনে বাগদাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, দাবীস ও তুগরিল উভয়েই খুরাসানে সঞ্জরের কাছে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা সঞ্জরকে খলীফা মুসতারশিদ ও সুলতান মাহমূদের উপর বিষিয়ে তুলতে তৎপর হলেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান সঞ্জর খুরাসান থেকে লোক-লশকর নিয়ে রে-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তিনি রে-তে উপস্থিত হয়ে সুলতান মাহমূদকে তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠালেন। তাঁর এ ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সুলতান মাহমূদ সত্যি সত্যি যদি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন না

হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসবেন, অন্যথায় তাতে অস্বীকৃতি জানাবেন। সুলতান মাহমূদ কিন্তু নির্দ্বিধায় তাঁর চাচা সঞ্জরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। সঞ্জর তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন এবং দাবীসের ব্যাপারে সুপারিশ করে তাকে সুলতান মাহমূদের সাথেই পাঠিয়ে দিলেন। মাহমূদ দাবীস সমভিব্যাহারে হামদানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ৫২৩ হিজরীর ৯ই মুহাররম (জানুয়ারী ১১২৯ খ্রি) সুলতান মাহমূদ দাবীসকে নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং খলীফার দরবারে তাঁকে হাযির করে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে খলীফার দরবারে সুপারিশ করলেন। খলীফা দাবীসের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করে দেন। সুলতান মাহমূদ বাহরুজকে বাগদাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে মুসেলের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ৫২৩ হিজরীর জুমাদাস সানী (জুন ১১২৯ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদ বাগদাদ থেকে হামদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। এতে সুযোগ বুঝে দাবীস বাগদাদ থেকে রওয়ানা হয়ে হুল্লা অধিকার করে বসে এবং খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। খলীফা তাকে দমনের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলাকালেই এ সংবাদ অবগত হয়ে ৫২৩ হিজরীর যিলকদ (নভেম্বর, ১১২৯ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদও বাগদাদে এসে উপনীত হলেন। দাবীস এবার হুল্লা ছেড়ে বসরার দিকে পালিয়ে গেলেন এবং বসরায় প্রচুর লুটপাট করে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। সুলতান মাহমূদ হামদানে ফিরে যান।

৫২৫ হিজরীর শাওয়াল (জানুয়ারী ১১৩১ খি) মাসে সুলতান মাহমূদ ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিলাদে জবল (পার্বত্য এলাকা) ও আযারবায়জানে তাঁর নামে খুত্বা পঠিত হয়। ৫২৫ হিজরীর যিলকদ (অক্টোবর, ১১৩১ খ্রি) মাসে দাউদ হামদান থেকে জুনজানের দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর পান যে, সুলতান মাসউদ জুরজান থেকে এসে তাবরিজ অধিকার করে বসেছেন। কালবিলম্ব না করে দাউদ তাবরিজ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। ৫২৬ হিজরীর মুহাররম মাসে (১১৩১ খ্রি) তিনি তাবরিজ অবরোধ করলেন। চাচা-ভাতিজার মধ্যে বেশ ক'টি যুদ্ধ হওয়ার পর অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। দাউদ তাবরিজ থেকে হামদানে ফিরে যান। মাসউদ তাবরিজ থেকে বের হয়েই সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী হন এবং যখন একটি বিরাট বাহিনী তিনি গঠন করতে সমর্থ হলেন তখন খলীফা মুসতারশিদের কাছে বাগদাদে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, বাগদাদে যেন তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। উত্তরে খলীফা জানিয়ে দিলেন যে, এখন খুতবায় যেহেতু সুলতান সঞ্জরের নাম পঠিত হয়, তাই আপাতত তোমার বা দাউদের নাম পাঠের অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে সালজুক শাহ ইব্ন সুলতান মুহাম্মদ এক বিরাট বাহিনী সংগঠিত করে বাগদাদে এসে উপস্থিত হলেন। খলীফা তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করলেন। এদিকে সুলতান ও ইমাদুদ্দীন জঙ্গী একত্রিত হয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তাঁরা আব্বাসীয়া নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সালজুক শাহ তাঁদের সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি কুরাজা সাকীকে তাঁদের বিরুদ্ধে রওয়ানা করলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জঙ্গী পরাস্ত হলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী পরাস্ত হয়ে তিকরীতের দিকে চলে গেলেন। তিকরীতে তখন

সুলতান সালাহুদ্দীনের পিতা নাজমুদ্দীন আইয়ুব শাসক ছিলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর অবতরণের জন্যে তিনি নৌকাও সরবরাহ করেন এবং সেতুও বাঁধিয়ে দেন। জঙ্গী সাগর পার হয়ে মুসেলের পথ ধরেন। সুলতান মাসউদ চিঠিপত্র লিখে সালজুক শাহ ও খলীফাকে এ কথায় সম্মত করতে সমর্থ হন যে, ইরাকের শাসনক্ষমতা সুলতান মাসউদের হাতেই থাকবে। ইরাকের শাসনক্ষমতা ছাড়াও মাসউদ শাহ্ আরেকটি আনুকূল্য লাভ করবেন। সেটি হলো খুতবায় সুলতান মাসউদের পরে সালজুক শাহের নাম উচ্চারিত হবে। সে অনুসারে মাসউদ শাহ্ ৫৩৬ হিজরীর জুমাদালউলা (ডিসেম্বর ১১৪১ খ্রি) মাসে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং চুক্তিপত্র লিখিত হয়।

উপরেই বলা হয়েছে, সুলতান তুগরিল তাঁর চাচা সুলতান সঞ্জরের সাথে রয়েছেন। পাহাড়ে আত্মগোপনকারী দাবীসও সুলতান সঞ্জরের কাছে পৌঁছে যান। এসব অবগত হয়ে সুলতান সঞ্জর তুগরিল ও দাবীস সমভিব্যাহারে রে-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সেখান থেকে যান হামদানে। সেদিক থেকে মাসউদ শাহ্ ও সালজুকশাহ্ তাঁদের সাথে কুরাজা সাবীকে নিয়ে সঞ্জরকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। সঞ্জর আস্তর আবাদ থেকে অগ্রসর হয়ে মাসউদ ও সালজুক শাহর মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। সুলতান সঞ্জর মাসউদ ও সালজুকের অপরাধ ক্ষমা করে তাদেরকে কাছে ডেকে স্বস্থানে রাখেন এবং আপন ভ্রাতুষ্পুত্র তুগরিলকে ইরাকের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেন। তিনি খুতবায়ও তাঁর নাম জারি করে দেন। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ৫২৭ হিজরীর যিলহজ্জ (অক্টোবর ১১৩৩ খ্রি) মাসে সংবাদ আসলো যে, মাওরাউন নাহরের গভর্নর বিদ্রোহ ঘোষণা করে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। মালিক সঞ্জরকে কালবিলম্ব না করে খুরাসানের দিকে যাত্রা করতে হলো। সে সময় সুলতান দাউদ ইব্ন আহমদ আযারবায়জানের দিকে ছিলেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে হামদানের দিকে অগ্রসর হলেন। ওদিক থেকে মুকাবিলার জন্যে তুগরিল অগ্রসর হলেন। দাউদ যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। পরাজিত হয়ে তিনি বাগদাদে যান। সুলতান মাসউদ ও সুলতান সঞ্জরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাগদাদে আসেন। দাউদ ও মাসউদ উভয়ে মিলিত হয়ে খলীফার কাছে আযারবায়জান অধিকার করে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খলীফা তাঁদেরকে অনুমতি দিলে তাঁরা মালিক তুগরিলের কর্মচারীদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে আযারবায়জান অধিকার করে নিলেন। তুগরিল মুকাবিলা করতে এসে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যান। সুলতান মাসউদ হামদান দখল করে নিলেন এবং সুলতান দাউদ আযারবায়জানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান মাসউদের নিকট হামদানে যখন খবর পৌঁছল যে, সুলতান দাউদ আযারবায়জানে স্বায়ত্তশাসনের কথা ঘোষণা করে বিদ্রোহ করে বসেছেন, তখন তিনি আযারবায়জান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। মওকা বুঝে মালিক তুগরিল সৈন্য সংগ্রহ করে বিলাদে-জবল তথা পার্বত্য এলাকা জয়ে মনোনিবেশ করলেন। সুলতান মাসউদ তাঁর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। তুগরিল সুলতান মাসউদকে ৫২৮ হিজরীর রমযান (জুলাই, ১১৩৪ খ্রি) মাসে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। সুলতান পরাস্ত হয়ে বাগদাদে চলে আসেন। তুগরিল হামদানে চলে আসেন।

মোদ্দাকথা সালজুকীদের গৃহবিবাদের ঘটনা অনেক দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর। সুলতান তুগরিলের মৃত্যু হলে সুলতান মাসউদ ইরাকে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। খলীফা

মুসতারশিদ ও সুলতান মাসউদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। খলীফা তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। খলীফার সৈন্যরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। ফলে খলীফা পরাস্ত হয়ে হামদানের এক দুর্গে বন্দী হলেন। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে শহরবাসীর মাতম শুরু হয়ে যায়। এ সময় উপর্যুপরি কয়েকদিন ইরাক ও খুরাসানে ভূমিকম্প হয়। সুলতান সঞ্জর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান মাসউদকে লিখে পাঠালেন যে, কালবিলম্ব না করে তুমি খলীফার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। ভূমিকম্প আসা এবং লোকদের মসজিদে নামাযের জন্যে না আসাটা কোন মামুলী ব্যাপার নয়। আমীরুল মু'মিনীনকে সসম্মানে রাজধানী বাগদাদে পাঠিয়ে দাও! সুলতান মাসউদ সুলতান সঞ্জরের আদেশ যথারীতি পালন করে স্বয়ং খলীফার দরবারে গিয়ে হাযির হলেন। যে সৈন্যরা সে সময় সুলতান মাসউদের সাথে গিয়েছিল তাদের মধ্যে যে ১৭ জন কারামিতা বা বাতেনী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল তা সুলতান মাহমূদের নিজেরও জানা ছিল না। তারা খলীফার তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। খলীফার এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর লোকজনের মধ্যে প্রচারিত হতেই বাতেনীদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। সুলতান মাসউদ নিজেও খুবই মর্মাহত হন। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে সেখানে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘরে ঘরে মাতম শুরু হয়ে যায়। খলীফা মুসতারশিদের পুত্র আবূ জা'ফর মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং তিনি রাশিদ বিল্লাহ্ খেতাব গ্রহণ করলেন।

রাশিদ বিল্লাহ্

রাশিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুসতারশিদ বিল্লাহ্ ৫০০ হিজরী (১১০৬ খ্রি) সালে জনৈকা দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের সময় তাঁর মলদ্বার ছিল না। চিকিৎসকরা একটি রৌপ্যনির্মিত অস্ত্রের দ্বারা ছিদ্র করে দিলে সে সমস্যার সমাধান হয়।

রাশিদ বিল্লাহ্ যখন বাগদাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুলতান মাসউদ তখন বাগদাদে ছিলেন না। রাশিদ বিল্লাহ্র নামে শহরে শহরে খুতবা পাঠ করা হলো। রাশিদ বিল্লাহ্ সিংহাসনে বসেই অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করলেন। তিনি অন্যায়ভাবে অনেকের সম্পদ কুক্ষিগত করলেন। লোকজন খলীফার বিরুদ্ধে শাহ্ মাসউদের কাছে অভিযোগ লিখে পাঠালেন। সুলতান মাসউদ তখন বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সুলতান মাসউদের বাগদাদের দিকে আসার খবর পেয়ে রাশিদ বিল্লাহ্ মুসেলের দিকে চলে যান। সুলতান মাসউদ বাগদাদে উপনীত হয়ে যথারীতি একটি অভিযোগপত্র তৈয়ার করালেন। তাতে যথারীতি এ মর্মে অনেক শহরবাসীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হলো যে, খলীফা অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে অবৈধভাবে অর্থ কুক্ষিগত করেছেন, রক্তপাত ঘটিয়েছেন এবং মদ্যপান করেছেন। এ অভিযোগ পত্রখানা ফকীহ্ এবং কাযীদের নিকট প্রেরণ করে তিনি ফতওয়া তলব করলেন যে, খলীফা যদি এরূপ অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হন তবে নায়েবে সালতানাত খলীফাকে পদচ্যুত করতে পারেন কি না! জবাবে শহরের প্রধান কাযী ফতওয়া দিলেন যে, এরূপ অবস্থায় নায়েবে সালতানাত খলীফাকে পদচ্যুত করতে পারেন। সুলতান মাসউদ সেমতে কাজ করলেন। তিনি রাশিদ বিল্লাহর চাচা মুহাম্মদ ইব্ন মুসতাযহিরকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হাতে বায়আত

করলেন এবং সাথে সাথে রাশিদ বিল্লাহকে পদচ্যুত করার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এটা হচ্ছে ৬ই যিলকদের ঘটনা।

রাশিদের খিলাফত এক বছর পর্যন্ত চলেছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসতাযহির খলীফা হয়েই মুকতাফী বি-আমরিল্লাহ্ লকব গ্রহণ করলেন। রাশিদ স্বীয় পদচ্যুতির সংবাদ শুনে আযারবায়জানের দিকে চলে যান। তিনি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ধন-সম্পদ বণ্টন করেন। আযারবায়জানের শহরগুলোতে তিনি লুটপাট চালিয়ে ধ্বংস করেন। তারপর যান হামদানে এবং সেখানেও বিপর্যয় সৃষ্টি করেন। লোকজনকে ধরে শূলিতে চড়ান, হত্যা করেন এবং আলিম-উলামাকে দাড়ি-মুণ্ডন করে অপদস্ত করেন। তারপর ইস্পাহানে গিয়ে সে শহর অবরোধ করে বসেন। এমনি সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৫৩২ হিজরীর ১৬ই রমযান (জুন, ১১৩৮ খ্রি) কয়েকজন অনারব তাঁর শিবিরে প্রবেশ করে তাকে ছুরিকাহত করে হত্যা করে। বাগদাদে রাশিদের হত্যার খবর পৌছলে তাঁর শোকে সেখানে একদিন অফিস-আদালত বন্ধ হয়। খলীফার আলোয়ান ও লাঠি মৃত্যুর সময় রাশিদের কাছে এসেছিল– যা তাঁর হত্যার পরে মুকতাফীর হাতে বাগদাদে পৌছানো হয়।

মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ ইব্‌ন মুসতাযহির বিল্লাহ্ ৪৭৯ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (জুলাই ১০৮৬ খ্রি) জনৈকা আবিসিনীয় দাসীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। ৫৩০ হিজরীর ১২ই যিলহজ্জ (সেপ্টেম্বর ১১৩৬ খ্রি) তিনি খলীফার আসনে আসীন হন। এর অব্যবহিত পরেই সুলতান মাসউদ সুলতান দাউদকে দখলের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দাউদ সারাগা নামক স্থানে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খুজিস্থানে পৌছে সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী হন এবং তশতর অবরোধ করেন। ওয়াসিতের শাসনকর্তা সালজুক শাহ্ সুলতান মাসউদের নির্দেশক্রমে তশতর রক্ষার নিমিত্তে অগ্রসর হলে যুদ্ধে দাউদের নিকট পরাস্ত হয়ে ফিরে যান। সুলতান মাসউদ রাশিদের দ্বারা বাগদাদ আক্রান্ত হতে পারে এ আশঙ্কায় বাগদাদ থেকে বের হওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তিনি মুসেলের গভর্নর ইমাদুদ্দীন যঙ্গীকে খুতবায় মুকতাদীর নাম পাঠের লিখিত নির্দেশ পাঠালেন। ইমাদুদ্দীন যখন খুতবায় মুকতাদীর নাম পাঠ করলেন এবং রাশিদের নাম খুতবা থেকে খারিজ করে দিলেন তখন অসন্তুষ্ট হয়ে রাশিদ ৫২১ হিজরীর রজব (জুলাই ১১২৭ খ্রি) মাসে মুসেল ত্যাগ করলেন– যা উপরেই বলা হয়েছে। পারস্যের কতিপয় সর্দার রাশিদকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে রাশিদের কাছে যেতে উদ্যোগী হন। এ সংবাদ অবগত হয়ে সুলতান মাসউদ বাগদাদ থেকে সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং ৫৩২ হিজরীর শাবান (এপ্রিল ১১৩৮ খ্রি) মাসে তাদেরকে পরাস্ত করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তিনি সেখান থেকে আযারবায়জানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ওদিকে দাউদ, খাওয়ারিযম শাহ্ ও রাশিদ একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান মাসউদ বাগদাদ থেকে যাত্রা করেন। খাওয়ারিযম শাহ্ ও দাউদ উভয়েই রাশিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। রাশিদ ইস্পাহান অবরোধ করেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি খুরাসানী গোলাম রাশিদকে হত্যা করে ফেলে। তাঁকে ইস্পাহানের শাদরিস্তানে দাফন করা হয়। এদিকে সালজুক শাহ্ ওয়াসিত থেকে এসে বাগদাদ আক্রমণ ও দখল করেন। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বাগদাদবাসীরা সালজুক শাহকে পরাস্ত করে বাগদাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। দেশের সর্বত্র এমনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো যে, ৫৩২ হিজরীতে (১১৩৭ খ্রি) বাগদাদ থেকে গেলাফে-কাবা পাঠানো সম্ভবপর হয়নি। পথেঘাটে শান্তি-শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। ৫৩৩ হিজরীতে (১১৩৮ খ্রি) সুলতান মাসঊদ বাগদাদে এসে বাগদাদবাসীদের উপর থেকে অনেক প্রকার কর মওকুফ করে দেন। এমনি অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। সালজুকী বংশের অনেকের সাথে সাথে বাইরের অনেক সামন্ত-সর্দারও স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পাঁয়তারা করতে লাগলেন। সুলতান মাসঊদ তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ সর্দার ও সেনাপতিকে যাঁদের প্রতি তাঁর সন্দেহ ছিল অথচ তাঁরা তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল তাদেরকে তিনি হত্যা করতে শুরু করলেন, কয়েকজন সর্দারকে তিনি ছলচাতুরীর মাধ্যমে বধ করেন। ফলে তিনি নিজে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ও ইরাককে পূর্ণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিজে গিয়ে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে লাগলেন। খলীফা মুকতাফী এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণে একটুও ত্রুটি করলেন না। তিনি তাঁর প্রভাববলয় ও শক্তি শনৈ-শনৈ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। দিন দিন খলীফা শক্তিশালী এবং সুলতান মাসঊদ ও সুলতান সঞ্জর দুর্বল হতে থাকেন। সুলতান সঞ্জর সুলতান মাসঊদকে ভর্ৎসনা করে চিঠি-পত্রাদি লিখলেন এবং নিজের বিশ্বস্ত সেনাপতিদেরকে হত্যার এবং বাগদাদ ত্যাগের কুফল বর্ণনা করলেন। অবশেষে ৫৪৪ হিজরীর শেষ দিকে (১১৪৯ খ্রি) সুলতান সঞ্জর রে-তে আগমন করেন। সুলতান মাসঊদও তাঁর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। ৫৪৪ হিজরীর রবজ (নভেম্বর ১১৪৯ খ্রি) মাসে মালিক শাহ্ ইব্ন সুলতান মাহমূদ কতিপয় সর্দারকে সাথে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করেন। খলীফা মুকতাফী শহরের দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং সুলতান মাসঊদকে তলব করে পাঠান। কিন্তু রে-তে চাচা সুলতান সঞ্জরের কাছে অবস্থানরত সুলতান মাসঊদ সেখান থেকে এসে উঠতে পারেননি। মালিক শাহ বাগদাদে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে নাহরওয়ানে লুটপাট করে সে শহরটিকে বিরান করে দেন। এরপর ৫৪৪ হিজরীর ১৫ শাওয়াল (ফেব্রুয়ারী ১১৫০ খ্রি) মাসঊদ বাগদাদে পদার্পণ করেন। এরপর ৫৪৫ হিজরী (১১৫০ খ্রি)তে হামদানে চলে যান। ৫৪৭ হিজরীর ১লা রজব (অক্টোবর ১১৫২ খ্রি) সুলতান মাসঊদ ইন্তিকাল করেন। সুলতান মাসঊদের উযীর খাস বেগ তাঁর স্থলে মালিক শাহ্ ইব্ন সুলতান মাহমূদকে স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু সুলতান মাসঊদের মৃত্যুর পর বাগদাদে সালজুকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন খর্ব হতে থাকে। এ বংশের আর এমন কেউ রইল না যে আমীর ও সুলতানের মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারে। এ জন্যে সুলতান মাহমূদকে সালজুকীদের শেষ পুরুষ বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

মালিখ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেই জনৈক সর্দারকে হাল্লা অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি হাল্লা দখল করলেন। বাগদাদের কোতওয়াল জনৈক জালাল হাল্লায় গিয়ে মালিক শাহর প্রেরিত সেই সর্দারকে হত্যা করে নিজে হাল্লায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে দেয়। খলীফা মুকতাফী স্বয়ং সসৈন্যে হাল্লা আক্রমণ করে নগরবাসীদের আনুগত্যের শপথ আদায় করেন। এরপর খলীফা ওয়াসিত আক্রমণ করে তাও জয় করে ৫৪৭ হিজরীর ১০ই যিলকদ (ফেব্রুয়ারী ১১৫৩ খ্রি) বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ৫৪৮ হিজরী (১১৫৩ খ্রি)তে খলীফা তাঁর উযীর পুত্র ও আমীর তুরশুক উভয়কে তিকরীত জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

করলেন। তাদের দুজনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। উযীরপুত্রকে তিকরীতবাসীদের হাতে গ্রেফতার করিয়ে দিয়ে আমীর তুরতক নিজে খুরাসানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি পথিমধ্যে লুটতরাজ করেন। ৫৪৯ হিজরী (১১৫৪ খ্রি)-তে খলীফা মুকতাফী নিজে তিকরীত আক্রমণ করে নগরটি পদানত করেন কিন্তু তিকরীতের দুর্গ অজেয়ই রয়ে যায়। খলীফা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর উযীরকে দুর্গ বিধ্বংসী মিনজানিক সাথে দিয়ে তিকরীত দুর্গ জয়ের জন্যে প্রেরণ করলেন। উযীর সেখানে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করলেন। এদিকে আরসালান ইব্‌ন তুগরিল ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদ একটি বাহিনী নিয়ে উযীরের উপর আক্রমণ চালান। এ সংবাদ অবগত হয়ে স্বয়ং খলীফা মুকতাফী একটি বাহিনী নিয়ে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হন। আকর বাবেল নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ আঠার দিন যুদ্ধের পর খলীফার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ফেরার হয়ে যায়, কিন্তু খলীফা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত খলীফার জয় হয়। আরসালান ইব্‌ন তুগরিল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। ৫৪৯ হিজরীর ১লা শাবান (অক্টোবর ১১৫৪ খ্রি) খলীফা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ৫৫০ হিজরী (১১৫৫ খ্রি)তে খলীফা ওকূকা আক্রমণ করেন কিন্তু কয়েকদিন অবরোধ করে থাকার পর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ৪৯০ হিজরী (১০৯৬ খ্রি)তে সুলতান বারকিয়ারুক সুলতান সঞ্জরকে খুজিস্তানের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যখন সুলতান মুহাম্মদ ও সুলতান বারকিয়ারুকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ও লড়াই হয় তখন সুলতান মুহাম্মদ তাঁর সহোদর সঞ্জরকে খুরাসানের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেন। তখন থেকে খুরাসান বরাবরই সুলতান সঞ্জরের অধিকারে ছিল এবং সুলতান মুহাম্মদের পুত্ররা তাঁকে ইরাকের সুলতান বলেই অভিহিত করতেন। ৫৩৬ হিজরী (১১৪১ খ্রি)তে তুরকান খাতা নামে অভিহিত একটি গোষ্ঠী মাওরাউন নাহর এলাকাটি তুর্কিস্তানের খানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। সুলতান সঞ্জর এই খাতা গোষ্ঠীর লোকজনকে মাওরাউন নাহর এলাকা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি বরং তাদের সাথে যুদ্ধে তাঁর অনেক অভিজ্ঞ সেনাপতি নিহত হন। সুলতান সঞ্জর হীনবল হয়ে পড়ায় তাঁর অধীনস্থ শাসকদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে খাওয়ারিযম শাহর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মাওরাউন নাহরে বসবাসকারী তুর্কী গুজ সম্প্রদায়ের লোকজনও খুরাসানে এসে লুটপাট ও অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে।

৫৪৮ হিজরী (১১৫৩ খ্রি)-তে ঐ তুর্কীদের এবং সুলতান সঞ্জরের মধ্যে লড়াই হয়। যুদ্ধে সুলতান সঞ্জরকে পরাস্ত করে তাঁরা তাঁকে তাদের সাথে বন্দী করে রাখে এবং খুরাসানের শহরসমূহে লুটপাট চালাতে থাকে। মাওরাউন নাহর এরা খাতা তুর্কীদেরকেও পরাস্ত করতে থাকে। গুজ তুর্কীরা সুলতান সঞ্জরকে গ্রেফতার করে একজন সহিসের সমান বেতন-ভাতা তাঁর জন্যে নির্ধারণ করে। সারকথা হলো, গোটা খুরাসান এলাকায় খুতবা কিন্তু তারা সুলতান সঞ্জরের নামেই দিত। ৫১১ হিজরী (১১১৭ খ্রি)-তে সুলতান সঞ্জর তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ৫৫২ হিজরী (১১৫৭ খ্রি)-তে ব্যর্থকাম অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর খাওয়ারিযম শাহ্ ও তাঁর বংশধররা গোটা খুরাসান এলাকা অধিকার করে বসেন। ইস্পাহান ও রে প্রদেশসমূহ সবুক্তগীনের বংশধরদের অধীনে চলে যায়। তারা চেঙ্গীয খানের অভ্যুদয় পর্যন্ত এসব এলাকায় ক্ষমতাসীন থাকে। মোটকথা খলীফা মুকতাফী ইব্‌ন আমরিল্লাহর আমলেই

খাওয়ারিযম শাহী রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ৫৪৯ হিজরী (১১৫৪ খ্রি)-তে খলীফা মুকতাফী আলেপ্পোর গভর্নর নূরউদ্দীন মাহমূদ ইব্‌ন ইমাদুদ্দীন যঙ্গীকে মিসরের দিকে যেতে নির্দেশ দেন যাতে তিনি সেখানকার উবায়দী শাসকের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। ঐ বছরই খলীফা নূরুদ্দীন মাহমূদকে 'মালিকুল আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুলায়মান শাহ্ ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মদ আপন চাচা সুলতান সঞ্জরের কাছেই থাকতেন। সুলতান সঞ্জর তাঁকেই তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সুলতান সঞ্জর যখন তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েন তখন তিনিই তুর্কীদের অবশিষ্ট বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। খুরাসানে তাঁর কোন নিরাপদ আশ্রয় স্থল নেই দেখে তিনি বাগদাদে চলে আসেন। ৫৫১ হিজরীর মুহাররম (ফেব্রুয়ারী ১১৫৬ খ্রি) মাসে তিনি খলীফার দরবারে হাযির হন এবং খলীফার হাতে বায়আত হয়ে নায়েবে সালতানাত মনোনীত হন। বাগদাদে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ৫৫১ হিজরী (১১৫৬ খ্রি)-তে সুলায়মান শাহ্ বাগদাদ থেকে পার্বত্য এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। ৫৫১ হিজরীর যিলহজ্জ (ফেব্রুয়ারী ১১৫৭ খ্রি) মাসে সুলতান মাহমূদ মুসেলের গভর্নর ও অন্যান্য সর্দারকে সাথে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং শহর অবরোধ করে বসেন। মুসেলের সেনাপতি কুতবুদ্দীনকে তাঁর অগ্রজ নূরুদ্দীন যঙ্গী এ মর্মে তিরস্কার করে পত্র লিখেন যে, বাগদাদ অবরোধে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত হয়নি। তাই কুতবুদ্দীন যঙ্গী খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হচ্ছিলেন। ফলে ৫৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ১১৫৭ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদ অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে হামদানের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। কুতবুদ্দীন মুসেলের দিকে যাত্রা করলেন। সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ বাগদাদ অবরোধের পর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হামদানে অবস্থান করেন এবং ৫৫৪ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে (১১৬০ খ্রি জানুয়ারী) সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর সালজুকী শাহযাদাদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে মুসেলে কুতবুদ্দীন যঙ্গীর কঠোর প্রহরাধীন সুলতান মুহাম্মদের চাচা সুলায়মান শাহকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসানো হয়। অবশেষে তাঁরই রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়। কিন্তু সুলায়মান শাহের শরফুদ্দীন নামক জনৈক সর্দার তাঁকে আর তাঁর উযীরকে হত্যা করে ফেলে। তারপর শরফুদ্দীন আরসালান শাহ্ ইব্‌ন তুগরিলকে সিংহাসনে বসাতে মনস্থ করেন এবং তাঁর আতাবেক এলিদুযকে আরসালান শাহকে সাথে নিয়ে হামদানে চলে আসতে লিখে পাঠান। সে মতে এলিদুয সসৈন্যে হামদানে এসে পৌঁছেন এবং তথায় আরসালান শাহের নামে খুতবা পাঠ করান। এলিদুয ছিলেন সুলতান মাসউদের জনৈক দাস। সুলতান তুগরিলের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আরসালান শাহর মায়ের পাণি গ্রহণ করেন। আরসালান শাহর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে এবার তিনিই হলেন তার আতাবেক আযম বা প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বাগদাদে খলীফার দরবারে আরসালান শাহর নামে খুতবা পাঠ করাবার আবেদন লিখে পাঠান। খলীফা তার দূতকে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দেন। খলীফার উযীর ছিলেন মাহমূদ ইব্‌ন মালিক শাহর অভিষেকের পক্ষপাতী যিনি ছিলেন একজন অল্প বয়স্ক বালক এবং যাকে তাঁর পিতার মুসাহেবরা পারস্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পারস্যে গভর্নর যঙ্গী ইব্‌ন ওকালা সালগরী তাদের নিকট থেকে মাহমূদকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্তখর কেল্লায় বন্দী করে

রেখেছিলেন। খলীফার উযীর আঈনুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুবায়রা তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, তুমি অবিলম্বে মাহমূদকে মুক্ত করে তার হাতে বায়আত হয়ে তোমার শাসনাধীন এলাকায় তাঁর নামে খুতবার প্রবর্তন কর। যঙ্গী সেমতে কাজ করেন।

এদিকে এলিদকুসকে এ মর্মে লিখে পাঠান যে, তুমি আরসালান শাহের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। যঙ্গী তা প্রত্যাখ্যান করে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। উভয় পক্ষে বেশ ক'টি যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাতে তেমন কোন ফলাফল আসেনি।

খলীফা মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ চব্বিশ বছর চার মাসকাল খিলাফত পরিচালনার পর ৫৫৫ হিজরীর ২রা রবিউল আউয়াল (১১৬০ খ্রি) ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র আবুল মুযাফফর ইউসুফ মুসতানজিদ বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ্ সালজুকী সুলতানদের আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইরাক ও বাগদাদে স্বাধীনভাবে নিজে রাজত্ব করেন। এ জন্যে তিনি আব্বাসীয় শেষ দুর্বল খলীফাদের মধ্যে একজন শক্তিমান খলীফা বলে গণ্য হয়ে থাকেন।

দায়লামী ও সালজুকী

দায়লামী অর্থাৎ বুওয়াইয়ারা ক্ষমতা লাভ করে আব্বাসীয় খলীফাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে। তারা তাদের রাজত্বকালে ইসলামী খিলাফতের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। তাদের শাসনামলে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গাও প্রায়ই লেগে থাকতো। ফলে, অহরহ মুসলমানদের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে। তাদের পরে যখন সালজুকীরা তাদের স্থলাভিষিক্ত ও ক্ষমতার অধিকারী হলেন, তখন খিলাফত ও খলীফাগণের সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। সালজুকীরা আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁরা খলীফাদের একান্তই ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন।

সালজুকীদের ক্ষমতা বুওয়াইয়াদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সালজুকী সুলতানরা সামগ্রিকভাবে খলীফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। সালজুকী আমলে মুসলমানদের হৃত গৌরব ও শক্তি পুনরুদ্ধার হয়। সালজুকীদের রাজ্যশাসন দক্ষতাও বুওয়াইয়াদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল। শেষ দিকে আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে সালজুকীরাও শাসনক্ষমতা হারিয়ে বসে এবং তাদের যুগের অবসান ঘটে। অবশ্য, ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যে আরো অনেক দিন পর্যন্ত তাদের শাসন চলতে দেখা যায়। কিন্তু নায়েবে সালতানাত এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের অভিভাবকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন আর তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

মুস্তানজিদ বিল্লাহ

মুস্তানজিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ ৫১০ হিজরীর রবিউস সানী (আগস্ট ১১১৬ খ্রি) মাসে জনৈকা গুরজিস্তানী দাসীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মার নাম ছিল তাউস। ৫৪৭ হিজরী (১১৫২ খ্রি)তে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর ৫৫৫ হিজরী (১১৬০ খ্রি)তে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫৫৬ হিজরী (১১৬১ খ্রি)তে তুর্কমেন গোষ্ঠী, কুর্দীরা এবং সর্বশেষ আরবরা একের পর এক বিদ্রোহ করেন। খলীফা মুস্তানজিদ এসব বিদ্রোহ দমন করেন। হাল্লা নামক স্থানে বনী আসাদ গোত্রের লোকদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিলে ৫৫৮ হিজরী (১১৬২ খ্রি)তে

খলীফা সমগ্র বনী আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করেন। ৫৫৯ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রি)তে ওয়াসিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দমন করা হয়। ৫৬০ হিজরী (১১৬৪ খ্রি)তে খলীফার উযীর আঈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়। ৫৬৩ হিরজীতে (১১৬৭ খ্রি) মিসরের শেষ উবায়দী শাসক আযিদ লি-দীনিল্লাহ্-এর উযীর শাওর ইব্ন সাওয়ার নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়ে তাঁকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেন। শাওর মিসর থেকে মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গীর কাছে আসেন। নূরুদ্দীন ছিলেন সালজুকী সুলতানদের একজন সেনাপতি বা সর্দার।

তাঁর পিতা ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর কথা উপরেই বিবৃত হয়েছে। নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী আলেপ্পো, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করে রেখেছিলেন। তিনি বাগদাদের খলীফার অনুগত ছিলেন। নূরুদ্দীন মাহমূদের সর্দারদের মধ্যে নজমুদ্দীন আইয়ূব (যার বর্ণনা ইতিপূর্বেই এসেছে) এবং তাঁর পুত্র সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন নজমুদ্দীন ইউসুফ এবং নজমুদ্দীন আইয়ূবের ভাই আসাদুদ্দীন শেরকোহ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন মাহমূদ সেনাপতি আমীর আসাদুদ্দীন শেরকোহকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে মিসরের দিকে রওয়ানা করেন। শেরকোহ ইব্ন শাওয়ারকে খতম করেন। কিন্তু শাওয়ার নূরুদ্দীনের দরবারে গিয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন তা পূর্ণ করলেন না। এটা ছিল একটা দুর্যোগকাল। এই সময় ক্রুসেডাররা সিরিয়া ও মিসরের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হেনে উপকূলীয় এলাকাসমূহ দখল করে নিয়েছিল। শেরকোহকে এ খ্রিস্টানদেরকেও দেশ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। শেরকোহ এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন দীর্ঘ কয়েক মাসের যুদ্ধে ফিরিঙ্গীদেরকে মিসর থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং নিজে সিরিয়ার দিকে চলে আসেন। ৫৬৪ হিজরী (১১৬৮ খ্রি)-তে ক্রুসেডাররা পুনরায় মিসরের উপর হামলা চালায়। আযিদ লি-দীনিল্লাহ পুনরায় সাহায্যের জন্য মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গীর শরণাপন্ন হলেন। নূরুদ্দীন সালাহুদ্দীনকে সাথে দিয়ে পুনরায় শেরকোহকে মিসরের দিকে প্রেরণ করলেন। ক্রুসেডাররা শেরকোহর আগমনের সংবাদ পেয়ে পলায়ন করলো। আযিদ লি-দীনিল্লাহ শেরকোহকে নিজের উযীর পদ দান করে তাঁকে তাঁর নিজের নিকট রেখে দিলেন। শাওর বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলেন। শেরকোহ কালবিলম্ব না করে তাকে খতম করে দেন এবং অত্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে উযীররূপে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এক বছর পর ৫৬৫ হিজরী (১১৬৯ খ্রি)তে মিসরে শেরকোহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মিসরের শাসক আযিদ লি-দীনিল্লাহ্ শেরকোহের ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন ইউসুফকে উযীর মনোনীত করেন। শেরকোহ এবং সালাহুদ্দীন উভয়েই তাঁদের পুরাতন মনিব সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের প্রতিও অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাঁর অনুগত ছিলেন। এভাবে সিরিয়া ও মিসরের উভয় দেশের ইসলামী শক্তি সম্মিলিতভাবে ঈসায়ী হামলার মুকাবিলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এদিকে খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহও ইরাকের সমস্ত বিদ্রোহ দমনে সফলকাম হন। ফলে খলীফার আধিপত্য পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়। মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহর পূর্ণ অনুগত এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ মান্য করার জন্যে সদাপ্রস্তুত ছিলেন। সে জন্যে ঐ যুগটা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের জন্যে সমৃদ্ধির যুগ। ৫৬৬ হিজরীর ৯ই রবিউস সানী (ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রি) অসুস্থ হয়ে খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহ

ইন্তিকাল করেন। এই খলীফার আমলেই হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র) ইন্তিকাল করেন। মুসতানজিদের পর লোকজন তাঁর পুত্র আবূ মুহাম্মদ হাসানকে সিংহাসনে বসিয়ে মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ খেতাবে ভূষিত করেন।

মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্

মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্ ইব্ন মুসতানজিদ বিল্লাহ্ ৫৩৬ হিজরী (১১৪১ খ্রি)তে জনৈকা আর্মেনীয় দাসীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। সিংহাসনে বসেই তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাদের যাবতীয় কর মওকুফ করে দেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরই মিসরের উবায়দী শাসনের অবসান ঘটে। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, সালাহুদ্দীন ইউসুফ শেষ উবায়দী শাসক আযিদ লি-দীনিল্লাহর উযীরে আযম হয়ে গিয়েছিলেন। সালাহুদ্দীন মিসরের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়ে উত্তমভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। সিরিয়ার গভর্নর নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী ৫৬৬ হিজরী (১১৭০ খ্রি)-র শেষ দিকে সুলতান সালাহুদ্দীনকে এ মর্মে ফরমান লিখে পাঠান যে, মিসরে খলীফা মুস্তাযী বিল্লাহ্ আব্বাসীর নামে খুতবা জারি কর। সালাহুদ্দীন ইউসুফ নিজেকে সুলতান নূরুদ্দীনের নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে গণ্য করতেন। তিনি ভয়ে ভয়ে এ হুকুম তামিল করলেন। ৫৬৭ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে (সেপ্টেম্বর ১১৭১ খ্রি) আশুরার পূর্বের জুমুআয় খলীফা মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহর নাম খুতবায় শুনে জনগণ তা খুবই পছন্দ করল। এর কয়েকদিনের মধ্যেই ১০ই মুহাররম আযিদুদ্দীনের মৃত্যু হয়। পরবর্তী জুমুআয় সমগ্র মিসরে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হলো। সুলতান সালাহুদ্দীন যথারীতি এ সংবাদ সুলতান নূরুদ্দীনকে অবহিত করলেন। সুলতান নূরুদ্দীনও যথারীতি এ সুসংবাদ বাগদাদে প্রেরণ করলেন। এ সংবাদ বাগদাদে পৌঁছতেই খলীফা আনন্দে নহবত বাজালেন এবং গোটা বাগদাদে আলোকসজ্জা করলেন। খলীফা তাঁর খাস খাদেম এবং খলীফার প্রাসাদের রক্ষী সন্দলকে নূরুদ্দীনের কাছে পাঠালেন এবং তারই মাধ্যমে নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের জন্যে বহুমূল্য খিলাত ও কৃষ্ণবর্ণ বিশেষ পতাকা প্রেরণ করলেন। সন্দলের উপস্থিতিতে নূরুদ্দীনও পরম উল্লাস প্রকাশ করেন এবং সালাহুদ্দীনের কাছে খলীফার খিলাত প্রেরণ করেন। মিসর থেকে উবায়দী রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটলো এবং তথায় আইয়ূবী শাসনের পত্তন হলো। নূরুদ্দীনের কাছে সিরিয়া ও মুসেলের সমগ্র এলাকা ছিল। এবার খলীফা তাঁর নামে মিসর, সিরিয়া, জাযিরা, মুসেল, দিয়ারে বকর, খাল্লাত, বিলাদে রোম ও সাওয়াদে ইরাকের শাসনের সনদ লিখে দিয়ে ঐ সব এলাকায় তাঁকেই তাঁর নায়েবে সালতানাত বা ভাইসরয় মনোনীত করে সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করলেন। নূরুদ্দীনের পক্ষ থেকে সালাহুদ্দীন মিসরের সার্বিক দায়িত্বে রইলেন। সালাহুদ্দীন যেরূপ মিসরে নূরুদ্দীনের প্রতিনিধিত্ব করতেন, তেমনি নূরুদ্দীনও বাগদাদের খলীফার আনুগত্য করতেন। এবার খলীফা মুস্তাযীকে সকল রাজা-বাদশাহই ভয় ও সমীহ করতে লাগলেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর নামে খুতবা পঠিত হতে লাগলো। কেউ তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সাহস পেত না। খলীফা কুতবুদ্দীন কায়েমাযকে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। ৫৭০ হিজরীতে (১১৭৪ খ্রি) কায়েমায

বাগদাদে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলীফা প্রাসাদে অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কুতবুদ্দীন কায়েমাযের ধন-সম্পদ তোমাদের জন্যে বৈধ করা হলো। এ ঘোষণা শোনামাত্র লোকজন তার বাড়ির দিকে ধাবিত হলো এবং চোখের পলকে তার সর্বস্ব লুটে নিল। কায়েমায বাগদাদ থেকে ফেরার হয়ে হিল্লায় গিয়ে পৌছলো। সেখান থেকে মুসেলের দিকে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

৫৭৩ হিজরী (১১৭৭ খ্রি)তে খলীফা মুস্তাযীর উযীর আদুদুদ্দীন আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হজ্জের উদ্দেশ্যে এক বিরাট কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমেধ্য জনৈক কারামতী তাঁকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করে। তারপর খলীফা আবূ মানসূর যহীরুদ্দীন ইব্ন নসর ওরফে ইব্ন আতাকে উযীর পদে মনোনীত করেন। সাড়ে নয় বছর খলীফা পদে থাকার পর ৫৭৫ হিজরীর যিলকদ (এপ্রিল ১১৮০ খ্রি) মাসে খলীফা মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন। উযীর যহীরুদ্দীন ইব্ন আতা এখন খলীফা তনয় আবুল আব্বাস আহমদকে সিংহাসনে বসালেন। তিনি নাসির লি-দীনিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করলেন।

নাসির লি-দীনিল্লাহ্

নাসির লি-দীনিল্লাহ্ ইব্ন মুস্তাযী বি-আমরিল্লাহ্ ৫৫৩ হিজরীর ১০ই রজব (আগস্ট ১১৫৮ খ্রি) জমরুদ নাম্নী জনৈকা তুর্কী দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। ৫৭৫ হিজরীতে যিলকদ (এপ্রিল ১১৮০ খ্রি) মাসে তিনি পিতার স্থলে খলীফার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত চৌকস ও দূরদর্শী খলীফা ছিলেন। মসনদে বসেই তিনি অধীনস্থ রাজ্যসমূহে কাসেদ মারফত এ মর্মে ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, খলীফার পক্ষ থেকে খলীফার আমীরগণ বায়আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন। সে সময় হামদান, ইস্পাহান ও রে-তে বহলোয়ান ইব্ন ইলিদকুয রাজত্ব করছিলেন। তাঁর বায়আত নেওয়ার উদ্দেশ্যে শায়খুশ শুয়ূখ সদরুদ্দীনকে রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রেরণ করা হলো। বহলোয়ান প্রথমে বায়আত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু যখন স্বয়ং তাঁর সর্দাররাই খলীফার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করলে তাঁর প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিলেন তখন অগত্যা বহলোয়ানকেও বায়আত হতে হলো। ইলিদকুয আতাবেক ইতিপূর্বে ৫৬৮ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি) হামদানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইলিদকুয আরসালান শাহ্ ইবন সুলতান তুগরিলের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। তিনি যেহেতু আরসালান শাহর মাকে বিবাহ করে নিয়েছিলেন এ জন্যে আরসালান শাহ্ ছিলেন তার সৎপুত্র। ইলিদকুযের মৃত্যুর পর আরসালান শাহর গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব বর্তালো ইলিদকুযের পুত্র বহলোয়ানের উপর।

৫৭৩ হিজরী (১১৭৭ খ্রি)-তে আরসালান শাহেরও মৃত্যু হলে বহলোয়ান আরসালানের পুত্র তুগরিল ইব্ন আরসালান ইব্ন তুগরিলকে তাঁর মসনদে বসিয়ে নিজে উপরোক্ত রাজ্যসমূহে রাজত্ব করতে থাকেন। ৫৮২ হিজরী (১১৮৬ খ্রি)র বহলোয়ান ইব্ন ইলিদকুযের মৃত্যুকালে হামদান, রে, ইস্পাহান, আযারবায়জান ও আরানিয়া এলাকাসমূহ তাঁর অধীনে ছিল এবং তুগরিল ইব্ন আরসালান তাঁর অভিভাবকত্বের অধীন ছিলেন। বহলোয়ানের মৃত্যুর পর

তাঁর ভাই উছমান ওরফে কিযিল আরসালান ইব্‌ন ইলিদকুয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তুগরিল ইব্‌ন আরসালান প্রথম প্রথম কিছুদিন তো কিযিল আরসালানের অভিভাবকত্বে চললেন, কিন্তু তারপরই আমীর-উমারাদেরকে হাত করে তাঁর অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কয়েকটি শহর অধিকার করে নিলেন। তারপর কিযিল আরসালান ও তুগরিলের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধও হয়। দিন দিন তুগরিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কিযিল আরসালানের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। কিযিল আরসালান খলীফার জন্যে উদ্বেগের কারণ রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ বাগদাদে নির্মিত সালজুকী সুলতানদের প্রাসাদসমূহ ধূলিসাৎ করিয়ে দিলেন এবং কিযিল আরসালানের সাহায্যার্থে বাগদাদ থেকে আবুল মুযাফ্‌ফর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুসকে সসৈন্যে প্রেরণ করলেন। উবায়দুল্লাহ্ কিযিল আরসালানের নিকটে পৌছবার পূর্বে ৫৮৪ হিজরীর ১৮ই রবিউল আউয়াল (মে, ১১৮৮-৮৯ খ্রি) হামদানে তুগরিলের সাথে তার মুকাবিলা হয়ে যায়। তুমুল যুদ্ধের পর তুগরিল জয়যুক্ত হন এবং উবায়দুল্লাহ্ গ্রেফতার হন। অবশিষ্ট সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে বাগদাদে পৌছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু তারপর কিযিল আরসালান হামদান, রে, ইস্পাহান প্রভৃতি সকল প্রদেশে নির্বিবাদে রাজত্ব চালিয়ে যান। তিনি তাঁর স্বনামে মুদ্রা ও খুতবার প্রচলন করেন। ৫৮৭ হিজরীতে (১১৯১ খ্রি) বন্দী অবস্থায় তুগরিল নিহত হন এবং এভাবে সালজুকী রাজত্বের অবসান ঘটে। সুলতান তুগরিল বেগের দ্বারা এ বংশের যে রাজত্বের সূচনা করেছিলেন এবং তারই নামের অপর একজন তুগরিল বেগের দ্বারা তার অবসান ঘটলো।

৫৮৫ হিজরী (১১৮৯ খ্রি)-তে তিকরীতের গভর্নর আমীর ঈসার মৃত্যু হলে তাঁর ভাইয়েরা তিকরীত অধিকার করে বসেন। খলীফা নাসির এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তিকরীতে নিজ অধিকার কায়েম করেন এবং আমীর ঈসার ভাইদের নামে জায়গীর প্রদান করেন। এরপর ৫৯১ হিজরী (১১৯৪ খ্রি)-তে খলীফা নাসির খুযিস্তানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে সে রাজ্যও দখল করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাশতাকীন মুজীরুদ্দীনকে খুযিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সে সময় রে-তে কুতলুগ ইব্‌ন বহলোয়ান ইব্‌ন ইলিদকুয রাজত্ব করছিলেন। খাওয়ারিযম শাহ্ কুতলুগকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন এবং তার রাজ্য দখল করে নেন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী যিনি খলীফার নির্দেশ মুতাবিক খুযিস্তান জয় করে তুশতাগীনের হাতে তা অর্পণ করেছিলেন। তিনি সসৈন্যে রওয়ানা হচ্ছিলেন এমন সময় কুতলুগ ইব্‌ন বহলোয়ান তাঁর কাছে পৌছে তাঁকে রে অভিমুখে সসৈন্য অভিযান চালাতে উৎসাহিত করেন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন কুতলুগ সমভিব্যাহারে হামদানের দিকে অগ্রসর হন। খাওয়ারিযম শাহের পুত্র সেখানে পূর্ব থেকেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে মওজুদ ছিলেন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীনের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি রে-এর দিকে সরে যান। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন বিনা বাধায় হামদান দখল করে নেন। তারপর তিনি হামদান থেকে রে অভিমুখে রওয়ানা হন। ইব্‌ন খাওয়ারিযম সেখান থেকেও সরে পড়েন। মুওয়াইয়াদ উদ্দীন রে-ও দখল করে নেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে মুওয়াইয়াদ উদ্দীন কুতলুগের অধীনস্থ সমস্ত এলাকা অধিকার করে নেন। খাওয়ারিযম শাহ্ প্রথমে একজন দূত পাঠিয়ে এ সব এলাকা থেকে দখল প্রত্যাহার করার জন্যে মুওয়াইয়াদ উদ্দীনকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু জবাবে মুওয়াইয়াদ উদ্দীন জানান,

এ সব এলাকা খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্‌র বাহিনী জয় করেছে। এরা কস্মিনকালেও তা ফেরত দেবে না। খাওয়ারিযম শাহ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হামদান আক্রমণ করেন। এমনি সময় ৫৯২ হিজরীর শাবান (জুলাই, ১১৯৬ খ্রি) মাসে অকস্মাৎ মুওয়াইয়াদ উদ্দীনের মৃত্যু হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁর বাহিনী শক্তভাবে খাওয়ারিযম শাহর বাহিনীর মুকাবিলা করে। শেষ পর্যন্ত বাগদাদের বাহিনী সেনাপতির অভাবে পরাস্ত হয়ে যায় এবং হামদান খাওয়ারিযম শাহের হস্তগত হয়। এরপর খাওয়ারিযম শাহ্ ইস্পাহানে যান। ইস্পাহানও তাঁর করতলগত হয় এবং সেখানে তিনি তার পুত্রকে একটি বিরাট বাহিনীসহ রেখে যান— যাতে তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে শহর রক্ষা করতে পারে। খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ সাইফুদ্দীন তুগরিল নামক জনৈক সর্দারকে সসৈন্যে ইস্পাহানে প্রেরণ করলে তিনি খাওয়ারিযম শাহকে তাড়িয়ে দিয়ে ইস্পাহান পুনরুদ্ধার করেন। এরপর একে একে হামদান, জুনজান এবং কাযভীনও অধিকার করে খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৬০২ হিজরী (১২০৫ খ্রি)-তে খুযিস্তানের আমীর তুশতাগীনের মৃত্যু হলে খলীফা নাসির তাঁর স্থলে তাঁর জামাতা সঞ্জরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ৬০৬ হিজরী (১২০৯ খ্রি)তে খলীফা তাঁর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সময় পারস্যের শাসক ছিলেন আতাবেক সা'দ যঙ্গী ইব্‌ন ওকলা। খলীফা সঞ্জরকে দমনের জন্যে তাঁর নায়েবে উযীরকে সসৈন্য খুযিস্তানে প্রেরণ করেন। নায়েবে উযীর খুযিস্তানের নিকটে পৌঁছতেই সহুর খুযিস্তান ছেড়ে সা'দ যঙ্গীর কাছে পারস্যে চলে যান। সাদ সঞ্জরকে যথেষ্ট সমাদর ও আপ্যায়ন করেন। ৬০৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল (সেপ্টেম্বর ১২০৯ খ্রি) মাসে খলীফার বাহিনী খুযিস্তান অধিকার করে সঞ্জরকে তলব করেন। সঞ্জর উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বাগদাদ-বাহিনী পারস্যের রাজধানী শীরাজ নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। আতাবেক সা'দ যঙ্গী সঞ্জরের জন্যে সুপারিশ করে নায়েবে উযীরকে পত্রাদি লিখেন। শেষ পর্যন্ত সঞ্জর নায়েবে উযীর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি সঞ্জরকে সাথে নিয়ে ৬০৮ হিজরীর মুহাররম (জুন ১২১১ খ্রি) মাসে বাগদাদে আসনে। সঞ্জরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় খলীফার দরবারে উপস্থিত করা হয়। খলীফা তাঁর ভৃত্য ইয়াকূতকে সিজিস্তানের শাসক নিযুক্ত করে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দেন এবং সঞ্জরকে মুক্ত করে খিলাত দান করেন। ৬১৩ হিজরীর মুহাররম (১২১৬ খ্রি) মাসে খলীফা তাঁর আপন পৌত্র মুওয়াইয়াদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন নাসির লি-দীনিল্লাহকে খুযিস্তানের পার্শ্ববর্তী এলাকা তশতরের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা আলী ইতিপূর্বেই ৬১২ হিজরীর যিলকদ (মার্চ ১২১৬ খ্রি) মাসে ইন্তিকাল করেছিলেন।

আগলামাশ ছিলেন বহলোয়ান ইব্‌ন ইলিদকুযের একজন সর্দার। তিনি তার বীরত্ব ও বিচক্ষণতার জোরে জাবাল প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে স্বাধীনভাবে সেখানে রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন। ৬১৪ হিজরীতে (১২১৭ খ্রি) বাতেনী ফের্কা তথা কারামতিরা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। আগলামাশ নিহত হওয়ার পর একদিকে তাঁর রাজ্যের উপর পারস্যের শাসনকর্তা আতাবেক সা'দ ইব্‌ন ওকলা এবং অপরদিকে খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের শাসক খাওয়ারিযম শাহ্ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। আতাবেক ইব্‌ন যঙ্গী সসৈন্য অগ্রসর হবার সময় রে-তে উভয় বাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আতাবেক সা'দ পরাজিত ও

গ্রেফতার হন। খাওয়ারিযম শাহ্ আগলামাশের গোটা রাজ্যে নিজ দখল প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী বাগদাদে খলীফার নিকট নায়েবে সালতানাতরূপে খুতবায় তাঁর নাম পাঠের আবেদন করে পাঠান। কিন্তু খলীফা তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। খাওয়ারিযম শাহ্ বাগদাদের দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু রাস্তায় এত ভারী বরফপাত হলো যে, তাঁর প্রেরিত বাহিনীর অধিকাংশই তাতে মারা গেল। অবশিষ্টদেরকে তুর্কী ও কুর্দীরা লুটপাট করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় স্বল্প সংখ্যক সৈন্য খাওয়ারিযম শাহের কাছে ফিরে আসে। খাওয়ারিযম শাহ্ একে অশুভ লক্ষণ মনে করে খুরাসানে ফিরে যান। বিজিত রাজ্যে তিনি তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীনকে প্রতিনিধিরূপে রেখে ইমাদুল মূল্ক সাদীকে তাঁর 'মাদারুল মাহাম' নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর বিজিত রাজ্যসমূহে খলীফা নাসিরের নাম খুতবা থেকে মওকুফ করে দেন। এটা ৬১৫ হিজরীর (১২১৮ খ্রি) ঘটনা।

৬১৬ হিজরী (১২১৯ খ্রি)তে চীন সংলগ্ন তমগাচ পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী তাতার উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করে। এদের মাতৃভূমি ছিল তুর্কিস্তান থেকে ছয় মাসের দূরত্বে অবস্থিত। এ উভয় গোত্রের সর্দারের নাম ছিল চেঙ্গিস খান। তুর্কীদের তামরানী নামক গোত্রের লোক ছিলেন এই চেঙ্গিস খান। চেঙ্গিস খান তুর্কিস্তান ও মাওরাউন নাহরে হামলা চালিয়ে এবং খাতা তুর্কীদের হাত থেকে তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহ ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন। তারপর তিনি খাওয়ারিযম শাহের উপর হামলা চালিয়ে খুরাসান ও জাবাল প্রদেশ তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। তারপর তিনি আরানিয়া এবং শেরোয়ান অধিকার করেন। এই তাতারীদেরই একটি দল গজনী, সিজিস্তান, কিরমান প্রভৃতি এলাকার দিকে চলে যান। খাওয়ারিযম শাহ্ এই তাতারীদের হাতে পরাস্ত হয়ে তাবারিস্তানের কোন এক স্থানে চলে গিয়ে একুশ বছর রাজত্ব করার পর ৬১৭ হিজরী (১২২০ খ্রি)তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খাওয়ারিযম শাহকে পরাস্ত করার পর তাতারীরা তাঁর ছেলে জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযম শাহকে গজনীতে পরাস্ত করে। চেঙ্গিস খান সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। জালালুদ্দীন সিন্ধু নদ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। কিছুদিন ভারতে কাটিয়ে তারপর তিনি ৬২২ হিজরী (১২২৫ খ্রি)-তে খুযিস্তান ও ইরাকের দিকে চলে যান এবং আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া অধিকার করে নেন। মুযাফফরের হাতে নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। চেঙ্গিস খান ও তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে। ৬২২ হিজরীর রমযান (সেপ্টেম্বরে ১২২৫ খ্রি) মাসের শেষ দিকে ৪৭ বছর খলীফা থাকার পর খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, খাওয়ারিযম শাহ যেহেতু খলীফার সাথে বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর অধিকৃত এলাকাসমূহে খলীফার নাম খুতবা থেকে মওকুফ করে দিয়েছিলেন। এজন্যে খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ই চেঙ্গিস খানকে খুরাসান আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কেননা, খাওয়ারিযম শাহকে স্বহস্তে শাস্তি দেওয়া বা তার প্রতিশোধ তখন তাঁর নিজের জন্যে দুঃসাধ্য ছিল। নাসির লি-দীনিল্লাহ্ তাঁর গুপ্তচর বাহিনীকে দেশজোড়া প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা লোকজনের সাধারণ ব্যাপারসমূহ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল থাকতে সচেষ্ট থাকতেন এবং অধিকাংশ লোকের এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, জিনরা তাঁর বশীভূত এবং তারাই তাঁকে সব গোপন সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

তিনি রাজনৈতিক চাল চালতে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাজ্যসমূহে তাঁর বিস্তর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তবে প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁর কঠোর শাসন ও কঠোর শাস্তি সকলেরই মনঃকষ্টের কারণ ছিল। এ খলীফারই যুগে ৫৮৩ হিজরী (১১৮৭ খ্রি)-তে সুলতান সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের নিকট থেকে অনেক শহর ছিনিয়ে নেন। বায়তুল মুকাদ্দাসও ৯১ বছর পর মুসলমানদের অধিকারে আসে।

৫৮৯ হিজরী (১১৯৩ খ্রি)তে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ী সুলতান সালাহুদ্দীন ইউসুফের ইন্তিকাল হয়। এই খলীফারই রাজত্বকালে আবুল ফারাহ ইব্‌ন জাওযী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, নাজমুদ্দীন কুবরা, আল-ফাতাওয়া প্রণেতা কাযী খান, হিদায়া প্রণেতা প্রমুখ বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ইন্তিকাল করেন। খলীফা নাসিরুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র আবূ নসর মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যাহির বি-আমরিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন।

যাহির বি-আমরিল্লাহ্

যাহির বি-আমরিল্লাহ্ ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন ৫৭১ হিজরী (১১৭৫ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর ৫২ বছর বয়সে ৬২২ হিজরীর ১লা শাওয়াল (অক্টোবর ১২২৫ খ্রি) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মসনদে আরোহণ করেই তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন। প্রজাসাধারণের সুখ-শান্তি বিধান করেন। কর মওকুফ করেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণ লোকজনের যে সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তিনি তা প্রত্যর্পণ করেন। ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ তিনি পরিশোধ করে দিতেন। এ খলীফা বলতেন, আমি সন্ধ্যাবেলা দোকান খুলেছি, আমাকে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে দাও। একদা খলীফা কোষাগারের দিকে পদার্পণ করলে জনৈক গোলাম বলে উঠলো, আমীরুল মু'মিনীন, এ কোষাগার তো আপনার পিতার আমলে পূর্ণ থাকতো। জবাবে খলীফা বললেন, আমি তা কোন করণীয় কাজ খুঁজে পেলাম না যা দ্বারা এ কোষাগার পূর্ণ হতে পারে। আমি তো পারি কেবল কোষাগার শূন্য করতে। কোষাগার পূর্ণ করা হচ্ছে বেনিয়া সওদাগরদের কাজ। আলিম-উলামা ও বিদ্বজ্জনকে এ খলীফা প্রচুর উপঢৌকনাদি দান করতেন। এ খলীফার শাসনকাল অনেকটা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের শাসনামলের মত ছিল। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। প্রজাসাধারণ তাঁর ন্যায়বিচারে অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল অতি অল্প। কেবল সাড়ে নয় মাসকাল খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে ৬২৩ হিজরীর ১৫ই রজব (জুলাই ১২২৬ খ্রি) তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তার পুত্র আবূ জা'ফর মানসূর 'মুস্তানসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবূ জাফর মুস্তানসির বিল্লাহ্

মুস্তানসির বিল্লাহ্ ইব্‌ন যাহির বি-আমরিল্লাহ ৫৮৮ হিজরী (১১৯২ খ্রি) জনৈকা তুর্কী দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর ৬২৩ হিজরী (১২২৬ খ্রি) তিনি ক্ষমতাসীন হন। তিনি সদগুণাবলীতে তাঁর পিতার সাথে তুল্য ছিলেন। পিতার মতই তিনি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাগদাদে তিনি মাদ্রাসা মুস্তানসিরিয়া প্রতিষ্ঠা করে সুযোগ্য উলামাকে মুদারিস পদে নিযুক্ত

করেন। এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ৬২৫ হিজরী (১২২৭ খ্রি) পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরকাল ব্যয় হয়। এ মাদ্রাসায় তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন যার জন্যে একশ ষাটটি উটে করে অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাদি আনয়ন করা হয়। হাদীস, আরবী ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ফারায়েয প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উস্তাদদেরকে তিনি মাদ্রাসায় আহার্য, ফলমূল, মিষ্টান্ন এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে নিযুক্ত করেন। অনেক গ্রাম ও ভূসম্পদ মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্ফ ছিল। ৬২৮ হিজরী (১২৩০ খ্রি)-তে মালিক আশরাফ দারুল হাদীস আশরাফিয়া প্রতিষ্ঠার্থে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৬৩০ হিজরী (১২৩২ খ্রি)-তে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ৬২৯ হিজরী (১২৩১ খ্রি)-তে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন হুদ আন্দালুসে (স্পেনে) আব্বাসীয় দাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করেন। ৬৩৪ হিজরীতে (১২৩৬ খ্রি) এশিয়া মাইনরের অধিকাংশের শাসনকর্তা খাওয়ারিযম শাহের অধঃস্তন পুরুষ আলাউদ্দীন কায়কোবাদের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু মসনদে আরোহণ করেন। ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রি)তে তাতারীদের আক্রমণের মুখে পরাস্ত হয়ে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু তাদের করদ রাজারূপে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলে এশিয়া মাইনরে দীর্ঘ দুইশ বছরব্যাপী সালজুকী শাসনের অবসান ঘটে। গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮খ্রি) পর্যন্ত তাতারীদের করদ রাজারূপে রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময়ই উছমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর গগনস্পর্শী অট্টালিকা সদৃশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে।

খলীফা মুস্তানসির রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা বিধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তুর্কী ও তাতারীরা যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশ ও জনপদে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে সেগুলো অধিকার করে চলেছিল, সেজন্যে খলীফার রাজস্ব আয় হ্রাস পায়। মিসর ও সিরিয়ায় শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী সালাহুদ্দীন ইউসুফের বংশধরদের মধ্যে অনৈক্যের দরুন সে রাজ্যগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায়। তাতারীদের হামলায় মাওরাউন নাহর থেকে ভূমধ্য সাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এলাকাসমূহ ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও ইরাকের উপর খলীফার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাতারীদের (মোগলদের) অন্তরে বাগদাদের খলীফার প্রভাব এমনিভাবে ছিল যে, তারা খলীফার অধিকৃত এলাকাসমূহের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতো না। যেভাবে খুরাসান, আযারবায়জান, মুসেল, শাম প্রভৃতি রাজ্যের সুলতানগণ খলীফার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত থাকতেন। তেমনিভাবে মোগলরাও বাগদাদের খলীফার প্রাধান্য স্বীকার করতো এবং কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কথা চিন্তাও করতে পারতো না। এই তাতারীরা যেহেতু সূর্য পূজারী ছিল এবং সালজুকীদের মতো মুসলমান হয়ে আসেনি তাই মসজিদে কার নামে খুতবা হলো তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। এ জন্যে তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহে পূর্ববৎ খুতবা খলীফার নামেই পঠিত হতো। আর এ জন্যে খলীফাও নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাতারীদের এই বন্যা লক্ষ্য করে খলীফার চাইতেও অধিকতর বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী খলীফা মুস্তানসিরের ভাই খাফাজী বলতেন, আমি তাতারীদেরকে জৈহূন নদীর তীর পর্যন্ত গোটা ভূখণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বো।

৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রি)-তে খলীফা মুস্তানসিরের ইন্তিকাল হলে তাঁর এই সুযোগ্য ভাই খাফাজীকে মসনদে না বসিয়ে অমাত্যরা মুস্তানসিরের পুত্র আবূ আহমদ আবদুল্লাহকে শুধু এ জন্যে মসনদে বসায় যে, তিনি অত্যন্ত নম্র মেযাজ ও গোবেচারা ধরনের লোক ছিলেন।

আমলা-অমাত্যরা নিজেদের দাপট বৃদ্ধির স্বার্থে এরূপ নিরীহ গোবেচারা ধরনের খলীফাকেই পছন্দ করতো। আবূ আহমদ আবদুল্লাহ্ মুসতাসিম বিল্লাহ্ উপাধি ধারণ করে খলীফার আসনে উপবিষ্ট হলেন।

মুসতাসিম বিল্লাহ্

মুসতাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন মুস্তানসির বিল্লাহ্ ৬৯০ হিজরী (১২৯১ খ্রি)তে হাজার নাম্নী জনৈকা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর খলীফার আসনে উপবিষ্ট হন। এই খলীফার মধ্যে সাহস ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তাঁর মধ্যে ধর্মপরায়ণতা ও সুন্নতের পাবন্দির কমতি ছিল না। তবে তিনি মুওয়াইয়াদ উদ্দীন আলকামী নামক এমন এক ব্যক্তিকে তাঁর উযীর মনোনীত করেন, যে ছিল একজন কট্টরপন্থী শিয়া। আলকামী উযীর হয়েই সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিয়ে খলীফাকে একেবারে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলেন। আলকামী প্রতিটি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দিয়ে শিয়াদেরকে অগ্রসর করার চেষ্টায় মেতে ওঠেন। তিনি দায়লামীদের যুগের শিয়া বিদআতসমূহ পুনর্জীবিত করে তোলেন। ফলে দায়লামীদের যুগের সেই কুখ্যাত শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাথে সাথে আলকামী নানা ছলেবলে-কৌশলে আব্বাসীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে দিয়ে উলুভীদেরকে বাগদাদের খলীফার আসনে বসানোর পাঁয়তারায় লিপ্ত হলো। বাগদাদে তখন আলকামীর এ সব ষড়যন্ত্র ও পাঁয়তারা আঁচ করার মতো লোকেরও অভাব ছিল না। তাঁরা খলীফাকে আলকামীর এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করলেন। খলীফা এতই কাপুরুষ ও নির্বোধ ছিলেন যে, দূরদর্শী লোকদের এ অনুযোগ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং আলকামীর সাথেই আলোচনা করলেন। ধূর্ত আলকামী সাথে সাথে খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে পাল্টা ঐ লোকদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করলেন। সরলপ্রাণ খলীফা তা বিশ্বাস করলেন। ফলে আলকামীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেল। মঙ্গলকামীদের সৎপরামর্শদান একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ধুরন্ধর আলকামী খলীফাকে আমোদ-প্রমোদ ও পানাসক্তির দিকে ঠেলে দিলেন। এভাবে তিনি তার নিজের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন এবং খলীফার সন্দেহ থেকে বেঁচে রইলেন। কিছু দিন পর স্বয়ং খলীফা তনয় আবূ বকর শিয়াদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাগদাদের শিয়া জনপদ কারখ মহল্লায় হামলা চালালেন। তিনি আলকামী সম্পর্কেও কটুকাটব্য করলেন। এতে আলকামী অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন এবং খলীফার দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। কিন্তু খলীফা আলকামীর মনোবাঞ্ছা অনুসারে আবূ বকরকে শাস্তি না দিয়ে পুত্রের মনই রক্ষা করলেন। ফলে আলকামীর অন্তর্জ্বালা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের সাথে পত্রযোগে যোগসাজশ শুরু করে দেন। হালাকু খান তখন তাতারীদের সর্দার এবং খুরাসান প্রভৃতি রাজ্যের বাদশাহ। আলকামীর দূতকে হালাকু খান প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। আলকামী লিখেছিলেন ঃ

"আমি অতি সহজেই বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বাগদাদ ও ইরাকে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারি। আপনি অবশ্যই সসৈন্যে এদিকে আক্রমণ করুন।"

জবাবে হালাকু খান আলকামীর দূতকে শুধু এতটুকু বললেন ঃ "আলকামী যে অঙ্গীকার করছে, তার জন্যে যথেষ্ট বিশ্বাসবহ তেমন কিছু নেই। আমি কি করে তার কথায় আস্থা স্থাপন করি?"

আসল কথা হচ্ছে, খলীফার সৈন্য সংখ্যার প্রাচুর্য, আরবদের শৌর্যবীর্য ও বাগদাদবাসীদের দুরন্ত সাহসকে মোগলরা খুব ভয় করতো। ইতিপূর্বে সিরিয়ায় তারা আরব গোত্রদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার পরাস্তও হয়েছিল। আলকামী খলীফার খিদমতে হাযির হয়ে রাজস্ব আয়ের স্বল্পতা এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের বেতন-ভাতা বেশি হওয়ার অনুযোগ করে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব পেশ করলেন। খলীফা তা মেনেও নিলেন। ফলে বাগদাদের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ অন্যান্য শহরে ও প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হলো। যে স্বল্পসংখ্যক লোক সামরিক বাহিনীতে অবশিষ্ট ছিল তাদেরও বেতন পরিশোধের জন্যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো যে, শহরের বিপনন কেন্দ্রসমূহ থেকে তারা কর উঠিয়ে তা বেতন-ভাতাস্বরূপ নিয়ে নেবে। এর ফলে নগরবাসীদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেল। চারদিকে লুটপাট শুরু হলো। সামরিক বাহিনীর অনেক ইউনিটকে আলকামী ছাঁটাই করে ফেলল। খলীফার কাছে বলা হলো যে, তাতারীদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়োজিত করা হয়েছে। হাল্লা নামক স্থানে শিয়া অধিবাসীদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাদেরকে প্ররোচিত করে আলকামী হালাকু খানকে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে গেছেন যে, অমুক সনে অমুক তাতারী সর্দার বাগদাদ তথা ইরাকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আপনিই হচ্ছেন সেই বিজয়ী তাতারী সর্দার। আমাদের স্থির বিশ্বাস, আপনার শাসন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবেই। অতএব আমরা আগাম আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি এবং আপনার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

হালাকু খান অত্যন্ত প্রসন্ন মনে দূতকে অভয়পত্র লিখে দিলেন। হালাকু খানের দরবারে নাসীরুদ্দীন তূসীর অত্যধিক প্রভাব ছিল। তিনি তাঁর উযীররূপে দায়িত্ব পালন করতেন। নাসীরুদ্দীন তূসীও ছিলেন আলকামীর মত কট্টরপন্থী শিয়া। আলকামী আব্বাসী খিলাফতের ধ্বংসসাধন করে শিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মিশনের সাথে তিনিও ছিলেন পূর্ণ একাত্ম ও সমান অংশীদার। আলকামী নাসীরুদ্দীনকে লিখে পাঠালেন যে, যেভাবেই পারেন হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণে প্ররোচিত করুন। এখনই বাগদাদ আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ। সাথে সাথে ঐ ধুরন্ধর হালাকু খানের নামেও এ মর্মে আবেদনপত্র প্রেরণ করলো যে, আমি বাগদাদ সৈন্যশূন্য করছি। যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বাইরে সরিয়ে দিয়েছি। এর চাইতে বড় গ্যারান্টি আপনি আর কী চান? এ আবেদনপত্র প্রেরণের সাথে সাথে সে আরবদের শাসকের নামেও বাগদাদ আক্রমণের আহ্বান সম্বলিত আবেদনপত্র প্রেরণ করলো। হালাকু খানের কাছে আলকামীর আবেদনপত্র খানা ঠিক এমন মুহূর্তে পৌঁছলো যখন সে কারামিতা অর্থাৎ ইসমাঈলীদের নিকট থেকে বিখ্যাত আলমূত কেল্লা অধিকার করে নিয়েছে এবং ইসমাঈলীদের সর্বশেষ বাদশাহ্ তার দরবারে বন্দীরূপে নীত। হালাকু খান নাসীরুদ্দীন তূসীর কাছে বাগদাদ আক্রমণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইল। নাসীরুদ্দীন বললেন ঃ জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে দেখা যাচ্ছে, বাগদাদে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই বাগদাদ আক্রমণে আপনার কোন ক্ষতি নেই।

সত্যি সত্যি হালাকু খান বিরাট বাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসাবে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলো। এ বাহিনী নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পেয়ে মুসতাসিম বিল্লাহ্ সেনাপতি ফাতহুদ্দীন দাউদকে দশ হাজার আইবেক অশ্বারোহী মুজাহিদসহ প্রেরণ করলেন। ফাতহুদ্দীন ছিলেন

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বীর সেনাপতি। মোগলরা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। ফাতহুদ্দীন ঐ স্থানে অবস্থানকেই সঙ্গত বিবেচনা করেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ মুজাহিদ বাহিনী মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করতে জেদ ধরে। অগত্যা ফাতহুদ্দীন মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এবার মোগলরা রুখে দাঁড়ায়। পিছনে যে সব মোগল লুক্কায়িত রয়ে গিয়েছিল তারা পেছন দিক থেকে এবং সম্মুখের মোগলরা সম্মুখ দিক থেকে বাগদাদ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বাগদাদ বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফাতহুদ্দীন রণক্ষেত্রেই নিহত হলেন। অবশিষ্টরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাগদাদে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মুজাহিদদের অদূরদর্শিতার জন্যে বাগদাদ বাহিনীর বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু খলীফা মুসতাসিম তাঁর স্বভাবসুলভ নির্বুদ্ধিতার দরুন পলাতক সেনাপতির মুখ দর্শনে তিন তিন বার বলে উঠলেন ঃ

الحمد لله على سلامه مجاهد الدين–

"দীনের মুজাহিদরা নিরাপদে ফিরে এসেছে এজন্যে আল্লাহ্‌র শোকর"

বাগদাদ বাহিনী পরাজিত হলেও হালাকু খানের ঐ অগ্রবর্তী বাহিনীও পেরেশান এবং ক্ষত-বিক্ষত ছিল। এটাই ছিল খলীফা মুসতাসিমের সান্ত্বনা যে,

رشيده بود بلائم ولم نجير كزشت–

"এসেছিল বিপদ বটে
ভালোয় ভালোয় গেল কেটে"

কিন্তু যে আলকামী খলীফাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে চাতুর্যের সাথে সম্পূর্ণ অনবহিত রেখেছিল সে মনে মনে বিজ্ঞের হাসি হাসছিল। এমনি সময় খবর রটে গেল যে, হালাকু খান এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাগদাদ অবরোধ করে বসেছে। নগরবাসীরা আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে এবং একজন তাতারীকেও শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি। শহরে শিয়ারা হালাকু খানের সৈন্যবাহিনীর কাছে গিয়ে গোপনে গোপনে অভয় আদায় করে এবং শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে। উযীর আলকামী শহরের মধ্যেই অবস্থান করে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় হালাকু খানকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখে। স্বয়ং উযীর যেহেতু শহরবাসীর স্বার্থের অনুকূলে ছিল না এবং তাদের জন্যে তার অন্তরে বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না তাই শহরবাসীরা প্রতিনিয়ত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত উযীর আলকামী শহর থেকে বের হয়ে হালাকু খানের সাথে দেখা করে এবং কেবল নিজের জন্যে অভয় নিয়ে ফিরে আসে। এদিকে খলীফার সাথে দেখা করে সে জানায় যে, তাঁর জন্যেও সে হালাকু খানের নিকট থেকে অভয় নিয়ে এসেছে। সে বলে, আপনিও আমার সাথে হালাকু খানের কাছে চলুন। তিনি আপনাকে ঠিক সেরূপ ইরাকের রাজত্ব পূর্বের ন্যায় বহাল রাখবেন যেমনটি তাতারীরা ইতিপূর্বে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরুকে তাঁর রাজ্যের শাসনকার্যে বহাল রেখেছিল। সে মতে খলীফা তাঁর পুত্রসহ শহর থেকে বেরিয়ে হালাকু খানের সৈন্যদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আটকে রেখে হালাকু খান তাকে তাঁর অমাত্যবর্গ ও বিদ্বানমণ্ডলীকে তলব করতে বললো। খলীফার নির্দেশ পেয়ে অমাত্যবর্গ ও বিদ্বানমণ্ডলী শহর থেকে বের হয়ে তাতারবাহিনীর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের

মুতাজ্জর পর মুহ্তাদী খলীফা হয়ে যখন বাবকিয়ালকে হত্যা করে অপর তুর্কী সর্দার ইয়ারকূজকে মিসরের গভর্নর মনোনীত করলেন তখন ইয়ারকূজও ইব্ন তূলূনকেই তাঁর নায়েবরূপে মিসরের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখলেন। এভাবে আহমদ ইব্ন তূলূন মিসরে অত্যন্ত দৃঢ়তা অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে মিসরে রাজত্ব করেন এবং নিজেদের নামে মুদ্রা পর্যন্ত চালু করেন। মোটকথা ২৫৩ হিজরী (৮৬৭ খ্রি.) থেকে মিসরকে খিলাফতে আব্বাসীয় গর্ভনর বহির্ভূতই ধরতে হবে। কমপক্ষে এতটুকু বলতে হয় যে, ২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি) মিসরে তূলূন বংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ সিফার

ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ এবং তাঁর ভাই আমর ইব্ন লায়ছ উভয়ে সিজিস্তানে তামা ও পিতলের পাত্রের ব্যবসা করতেন। এ সময়ে যেহেতু খিলাফতে দুর্বলতার সুযোগ চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল তাই এ সুযোগে খারিজীরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের মুকবিলায় উলুভী তথা আহলে বায়তের সমর্থনেও অনেকে মাথা তুললো। এদের মধ্যে সালিহ্ ইব্ন নযর কিনআনীও আহলে বায়তের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে আত্মপ্রকাশ করলেন। ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতেই আমীর-উমারা, রঈস ও প্রজাসাধারণের বিরাট একটি দল তাঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়ালো। ইয়াকূব ইব্ন লায়ছও এদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। সালিহ্ যুদ্ধের মাধ্যমে সিজিস্তান অধিকার করেন এবং তাহিরিয়া খান্দানের লোকজনকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। এ সাফল্য অর্জনের পরই সালিহ্র মৃত্যু হয়। দিরহাম ইব্ন হাসান নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু খুরাসানের গভর্নর অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে তাকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। সালিহ্র সমর্থকরা এবার ইয়াকূব ইব্ন লায়ছকে তাদের দলপতিরূপে গ্রহণ করে। ইয়াকূব অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সিজিস্তানে তাঁর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের পক্ষ থেকে হিরাতে নিযুক্ত আমিল মুহাম্মদ ইব্ন আওস আম্বারীকে হিরাত থেকে বহিষ্কার করে খুরাসানের এলাকাসমূহ দখল করতে শুরু করেন।

এদিকে পারস্য প্রদেশের গভর্নর আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন শিবল কিরমান দখল করতে উদ্যত হন। ওদিকে ইয়াকূব ইব্ন লায়ছও কিরমানে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আলী ইব্ন হুসাইনের সিপাহ্সালারদেরকে পরাজিত করে ইয়াকূব তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। অবশেষে ২৫৫ হিজরীতে (৮৬৯ খ্রি) পারস্যের রাজধানী শিরাজ নগরীতে আক্রমণ পরিচালনা করে তা অধিকার করেন। তারপর তিনি কালবিলম্ব না করে সিজিস্তানে ফিরে আসেন এবং খলীফার দরবারে এ মর্মে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন যে, এ অঞ্চলে দারুণ গোলযোগ চলছিল। লোকজন আমাকে ধরে তাদের আমীর মনোনীত করেছে। আমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অনুগত। তারপর ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ পর্যায়ক্রমে খুরাসান থেকে তাহির বংশীয়দেরকে বহিষ্কার করে তার নিজের রাজত্ব গড়ে তুলেন। এতকাল তাহির ইব্ন হুসাইনের বংশধররাই একাধারে খুরাসানে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল। এজন্যে খুরাসানের স্বাধীন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা কালে সর্বপ্রথম তাহিরিয়া বংশের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু

বরং পশমী কম্বলে তাকে লেপটে লাথিতে লাথিতে
তার প্রাণ সংহার করাই সমীচীন হবে।"

হালাকু খান তাতে সায় দিল এবং এ দায়িত্বটি আলকামীর উপরই অর্পিত হলো। সে তার মনিব মুসতাসিম বিল্লাহকে পশমী কম্বলে জড়িয়ে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে উপর্যুপরি লাথির পর লাথি মারতে লাগলো। এভাবে যখন খলীফার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল তখন সে তাতারী সৈন্যদের হাতে তাঁর শবদেহ অর্পণ করে। তারা তার নির্দেশানুসারে তাদের পদাঘাতে খলীফার শবদেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলির সাথে মিশিয়ে দিল। সে এই ভেবে আনন্দবোধ করছিল যে, উলুভী অর্থাৎ শিয়াপন্থীদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হলো। মোদ্দাকথা, খলীফার দাফন-কাফন বা শেষকৃত্য বলেও কিছুই হলো না। আব্বাসীয় বংশের যাকেই তাতারীরা সম্মুখে পেল নির্বিচারে নির্দয়ভাবে হত্যা করলো। কেউ তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না।

তারপর হালাকু খান শাহী গ্রন্থাগারের দিকে মনোনিবেশ করলো। সে ছিল অসংখ্য গ্রন্থের বিপুল এক সমাহার। সমস্ত গ্রন্থ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হলো। দজলা নদীতে যেন একটি বাঁধের সৃষ্টি হলো। তারপর ধীরগতিতে পানি তা বয়ে নিয়ে গেল। দজলার যে পানি ইতিপূর্বে মনুষ্য রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল এবার গ্রন্থাদির কালির রঙে তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পানির এ কৃষ্ণবর্ণ অব্যাহত ছিল। তারপর শাহী প্রাসাদগুলো লুণ্ঠন করে ধূলিসাৎ করে দেয়া হলো। মোদ্দাকথা, বাগদাদে যে রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান হলো, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। ইসলাম তথা মুসলিম জাহানের উপর এ ছিল এমন এক বিপর্যয় যে, লোকে তাকে ছোট মহাপ্রলয় নামে অভিহিত করে।

এবার এ মহাবিপর্যয় ও নরহত্যাযজ্ঞের হেতু—আলকামীর চেষ্টা হলো হালাকু খান যেন কোন উলুভী অর্থাৎ শিয়াপন্থীকে বাগদাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তাকে খলীফা খেতাবে ভূষিত করে। প্রথমে যখন হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে তখন আলকামীকে সে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। আলকামীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হালাকু খান কোন হাশেমী উলুভীকে খলীফা পদে বসিয়ে তাকেই নায়েবে সালতানাত পদটি দান করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। হালাকু খান ইরাকে তার নিজের লোককে শাসক নিযুক্ত করলো। তা দেখে আলকামীর আশাভঙ্গ হলো। সে নানা কূটচাল চেলেও হালাকু খানকে ইরাকে তার নিজের পদলাভে সম্মত করতে সমর্থ হলো না। এমন কী এ জন্যে সে অনেক কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি পর্যন্ত করেছে। কিন্তু সকলি গরল ভেল। তার সকল পদলেহন, খোশামোদ ও তোষামোদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। শেষ পর্যন্ত আশা ভঙ্গের ব্যথাদীর্ণ বুকে শীঘ্রই সে অক্কা পেল।

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহই ছিলেন বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের শেষ পুরুষ। ৬৫৬ হিজরীর (১২৫৮ খ্রি) পর বাগদাদ আর রাজধানী রইল না। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর পর সাড়ে তিন বছরকাল পৃথিবীতে খলীফা বলে কেউ ছিলেন না। তারপর ৬৫৯ হিজরী (১২৬২ খ্রি)-তে মুসতাসিম বিল্লাহর চাচা আবুল কাসিম আহমদের হাতে খিলাফতের বায়আত করা হয়।

মিসরে আব্বাসীয় খিলাফত

সুলতান সালাহুদ্দীন ইব্‌ন আইয়ূব উবায়দী রাজত্বের অবসানের পর মিসরে আইয়ূবী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। পূর্বেই এ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করাও হয়েছে।

৬৪৮ হিজরী (১২৫০ খ্রি) পর্যন্ত মিসর, সিরিয়া ও হিজাযে সুলতান সালাহুদ্দীনের বংশধরদের রাজত্ব টিকে ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন যেহেতু বংশে ছিল কুর্দী, তাই তাঁর বংশধরদের রাজত্বকে যেমন আইয়ূবী রাজত্ব বলা হয়ে থাকে, তেমনি কুর্দী রাজবংশের রাজত্বও বলা হয়ে থাকে। আইয়ূবী রাজবংশের সপ্তম বাদশাহ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের সহোদরের পৌত্র মালিকুস সালিহ্। তিনি তার স্ববংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে কোফকাফ এলাকা তথা সারকশিয়া প্রদেশ থেকে বার হাজার ক্রীতদাস (মামলুক) ক্রয় করে একটি পদাতিক রক্ষীবাহিনী বিশষভাবে গড়ে তুলেছিল। তাঁরই রাজত্বকালে ফ্রান্সের খ্রিস্টান বাদশাহ্ মিসরের ওপর নৌ-হামলা চালান। ক্রীতদাস বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লড়াই করে রণক্ষেত্র থেকে ফ্রান্সের বাদশাহকে গ্রেফতার করে। এ কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর ক্রীতদাস বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

মালিকুস সালিহের ওফাতের পর তাঁর পুত্র মালিক মুয়াযযম তুরাণ শাহ্ মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান মালিকুস সালিহর শাজারাতুদদুর নাম্নী এক আদরিণী দাসী সিংহাসন অধিকার করে বসে। এর রাজত্বকাল বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। শাজারাতুদদুর মাত্র তিন মাসকাল রাজত্ব করার পর আত্মগোপন করেন এবং নামেমাত্র আইয়ূবী খান্দানের এক ব্যক্তি মালিকুল আশরাফ মূসা ইব্ন ইউসুফকে সিংহাসনে বসানো হয়। এর রাজত্বকালে ক্রীতদাস বাহিনীর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ৬৫৩ হিজরী (১২৫৫ খ্রি)-তে মামলুকরা (ক্রীতদাসরা) তাদেরই একজন আযীব আইবেক সালেহীকে মালিকুল মুইজ্জ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসায়। এভাবে মিসরে আইয়ূবী শাসনের অবসান হয়ে মামলুক শাসনের সূচনা হয় এবং তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকে।

৬৫৫ হিজরী (১২৫৭ খ্রি)-তে মালিকুল মুইজ্জের পর তার শিশুপুত্র আলী মসনদে উপবিষ্ট হন। তাঁর লকব রাখা হয় মালিকুল মানসুর। আমীর সাইফুদ্দীন মামলুককে তার আতাবেক বা অভিভাবক মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ৬৫৭ হিজরী (১২৫৮ খ্রি)-তে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ফতওয়া নিয়ে মালিকুল মানসূরকে এ জন্যে পদচ্যুত করা হয় যে, তিনি তখনো শিশু মাত্র। তাঁর স্থলে আমীর সাইফুদ্দীনকে মসনদে বসানো হয়। তাঁর খেতাব হয় মালিকুল মুযাফফর।

সাধারণত মামলুকরা নিজেদের মধ্য থেকে বিশ-পঁচিশ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁদের উপরই শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এই কুড়ি-পঁচিশ ব্যক্তিই শাসক পরিষদের সদস্য বা নির্বাহীবৃন্দ বলে গণ্য হতেন। এদের মধ্য থেকে কাউকে তারা সদর বা আমীর নিযুক্ত করতেন। এই নির্বাচিত সদর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বাদশাহদের মত মসনদে আরোহণ করতেন এবং সুলতান বা মালিক নামে অভিহিত হতেন। মসনদে আরোহণ করে সুলতান নির্বাহী পষিদের অপর সদস্যদেরকে বড় বড় সামরিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দান করতেন। এই কুড়ি-পঁচিশ ব্যক্তির মধ্য থেকে কেউ উযীরে আযম বা প্রধানমন্ত্রী, কেউ রঈসুল আসফার বা সেনাধ্যক্ষ, আবার কেউ পুলিশ বাহিনী প্রধান, কেউ অর্থ বিভাগ প্রধান নিযুক্ত হতেন। এদের ছাড়া অন্যদের মর্যাদা হতো অপেক্ষাকৃত কম। এ নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মর্যাদা হতো আবার সবার উপরে। মামলুক বাহিনীর কিছু লোক যখন মারা যেত তখন সরকারী কোষাগার থেকে অর্থব্যয় করে সেই সংখ্যক সরকারী ক্রীতদাস ক্রয় করে এনে সে

সংখ্যা পূরণ করা হতো। মামলুকদের দ্বিতীয় স্তরের হাতে এ নীতিমালা সর্বাধিক নিষ্ঠার সাথে পালিত হতো।

ভারতেও মামলুক বংশ বলে একটি বংশ রাজত্ব করেছে। কিন্তু এখানে দুই-তিন জন ব্যকিক্রম ছাড়া অবশিষ্ট সকল সুলতানই ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের বংশধরদের মধ্য থেকে। অর্থাৎ সেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অভিশাপ এখানেও বর্তমান ছিল। পক্ষান্তরে মিসরের মামলুক সুলতানগণের অধিকাংশই ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ক্রীতদাস। তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বলেই তারা রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতেন। ঐতিহাসিকগণ এদিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাই মিসরী মামলুক রাজত্বের এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের কথাটি কেউই স্পষ্ট করে লিখেন নি। কিন্তু এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, মিসরের মামলুক রাজত্বের কোন কোন ব্যাপার সংশোধনের অতীত না থাকলেও এ ব্যাপারটি তাদের মধ্যে অবশ্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল যে, বাদশাহ্ নির্বাচন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে করতেন। এ সালতানাতের বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ্ স্বতন্ত্রভাবে একটি অধ্যায়ে করা হবে। এখানে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি যে, মালিক মুযাফফর যখন শুনতে পেলেন যে, মোগল অর্থাৎ তাতারী সৈন্যরা বাগদাদ, ইরাক, খুরাসান, পারস্য, আযারবায়জান, জাযিরা, মুসেল প্রভৃতি এলাকা ধ্বংস করে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে সিরিয়া অঞ্চলেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তখন তিনি তাঁর মামলুক বাহিনী ও মিসরীয় সৈন্যদের নিয়ে মিসর থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন।

৬৫৫ হিজরীর ১৫ই রমযান (অক্টোবর ১২৫৭ খ্রি) শুক্রবার নহরে জালুত নামক স্থানে মামলুক বাহিনী সিপাহ্সালার রুকনুদ্দীন বায়বার্স নেতৃত্বে মোগলদেরকে এমনি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলেন যে, এমন শোচনীয় ও অপমানজনক পরাজয় ইতিপূর্বে আর কোথাও তারা বরণ করেনি। হাজার হাজার মোগল সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হলো। যারা বেঁচে রইল তারা মামলুকদের সম্মুখ থেকে এমনভাবে পালিয়ে গেল যেমন ছাগল-ভেড়ার পাল সিংহ দেখলে পালায়। মোগলদের অনেক দ্রব্য-সম্ভার মামলুকদের হস্তগত হলো। তাদের অন্তরে মামলুকদের ভয় ও দাপ্ট এমনভাবে অংকিত হলো যে, তারা কত রাজ-রাজড়াদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছে, কত রাজ্য চুরমার করে দিয়েছে, কিন্তু মামলুকদের ভয়ে মিসরের মামলুকদের দিকে কোনদিন আড়চোখে তাকাতে সাহসী হয়নি। মামলুকরা আলেপ্পো পর্যন্ত মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তারপর তারা মিসরে ফিরে যায়। ৬৫৮ হিজরীর ১৬ই যিলকদ (নভেম্বর ১২৬০ খ্রি) মালিকুল মুযাফফর নিহত হলে রুকনুদ্দীন বায়বার্স মসনদে আরোহণ করেন। তিনি মালিকুয যাহির খেতাব ধারণ করেন।

মালিকুয যাহিরের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জানা গেল যে, ৩৭তম ও শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ্র চাচা আবুল কাসিম আহমদ যিনি বাগদাদে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন এবং বাগদাদ ধ্বংস ও মুসতাসিমের নিহত হওয়ায় কোনমতে কয়েদখানা থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়ে সিরিয়ার কোন এক স্থানে আত্মগোপন করে বাস করছেন। মালিকুয যাহির দশজন সম্ভ্রান্ত আরব সম্বলিত একটি প্রতিনিধিদলকে মিসর থেকে উক্ত আবুল কাসিম আহমদ ইব্ন যাহির বি-আমরিল্লাহ্ আব্বাসীর খোঁজে সিরিয়ায় পাঠালেন। তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মিসরে প্রত্যাবর্তন করলেন। মালিকুয যাহির আবুল কাসিমের আগমন সংবাদে মিসরের সমস্ত

বিদ্বজ্জন ও অমাত্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে রাজধানী কায়রো থেকে বেরিয়ে আসলেন। তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা করে শহরে এনে ৬৫৯ হিজরীর ১৩ই রজব (জুন ১২৬১ খ্রি) তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এখন থেকে তাঁর খেতাব হলো আল-মুসতানসির বিল্লাহ্। তাঁর নামে খুতবা পঠিত এবং মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত হলো। জুমুআর দিন খলীফা শোভাযাত্রা সহকারে মসজিদে আগমন করেন। খুতবায় বনী আব্বাস বংশের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। খলীফার জন্যে দু'আ করা হয়। জুমুআর নামাযান্তে খলীফা সুলতান যাহিরকে খিলাত দানে সম্মানিত করেন। ৪ঠা শাবান ৬৫৯ হিজরী (জুলাই ১২৬১ খ্রি) সোমবার খলীফা কায়রোর বাইরে শহরতলিতে শিবির স্থাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে দরবার বসান। তিনি নিজের পক্ষ থেকে মালিকুয যাহিরকে নায়েবে সালতানাত নিযুক্ত করে মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা তারই হাতে তুলে দেন। অর্থাৎ এ মর্মের একটি লিখিত ফরমান পাঠ করে দরবারে তিনি সকলকে শুনিয়ে দেন। মালিকুয যাহির খলীফার জন্যে খেদমতগার, খাজাঞ্চি, সাকী বা আবদার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে দেন এবং মিসরের রাজকীয় কোষাগারের একাংশ খলীফার ইচ্ছামত ব্যয় করার জন্যে নির্ধারণ করে তাঁর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। এভাবে সাড়ে তিন বছর আল-মুসতানসির বিল্লাহ্ আবুল কাসিম আহমদ খলীফা পদে আসীন থাকার পর ৬৬০ হিজরীর ২রা মুহাররম (২৭ নভেম্বর ১২৬১ খ্রি) যখন মালিকুয যাহিরের নিকট থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাতারদের দমনের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন একটি যুদ্ধ চলাকালে নিহত অথবা নিখোঁজ হয়ে যান। খলীফার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ একবছর কাল আর কাউকে খলীফা করা হয়নি। অবশেষে আরেকজন শাহযাদার সংবাদ পেয়ে মালিকুয যাহির তাঁকে মিসরে এনে খলীফা পদে আসীন করেন। এ শাহযাদার নাম ছিল আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ বকর ইব্ন খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ্ ইব্ন মুস্তাহি বিল্লাহ্। তাঁর প্র-পিতামহ পর্যন্ত কয়েক পুরুষের কেউ খলীফা হননি। এভাবে খলীফা মুস্তারশিদের বংশধরদের মধ্যে পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হলো। এ খলীফার উপাধি হয় হাকিম বি-আমরিল্লাহ্।

৬৬১ হিজরীর ৮ই মুহাররম (নভেম্বর ১২৬২ খ্রি) হাকিম বি-আমরিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৭৪ হিজরীতে (১২৭৫ খ্রি) মালিক যাহির সুদান দেশ জয় করেন। এটা ছিল এক বিরাট বিজয়। ৬৭৬ হিজরীর মুহাররম (জুন, ১২৭৬ খ্রি) মাসে মালিক যাহিরের মৃত্যু হলে মালিক সাঈদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯ খ্রি) মালিক মানসূর মিসরের সুলতান পদে আসীন হন। ৬৮০ হিজরীতে (১২৮১ খ্রি) মালিক মানসূর সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে তাতারীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। ৬৮৯ হিজরীতে (১২৯০ খ্রি) মালিক মানসূরের ইন্তিকাল হয় এবং মালিক আশরাফ ক্ষমতাসীন হন। ৭০১ হিজরীর ১৮ জুমাদাল আউয়াল (জানুয়ারী ১৩০২ খ্রি) খলীফা হাকিম বি-আমরিল্লাহ্ চল্লিশ বছর পাঁচ মাস দশ দিন রাজত্ব করে ইনতিকাল করে কায়রোতে সমাধিস্থ হন। তাঁর স্থলে খলীফা হন তাঁরই পুত্র আবুর রবী' মুস্তাকাফী বিল্লাহ্। মোদ্দাকথা, মিসরে ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি) পর্যন্ত স্বাধীন মামলুক রাজত্ব কায়েম থাকে। ৭৮৪ হিজরী (১৩৮২ খ্রি) পর্যন্ত বাহরিয়া মামলুক নামে অভিহিত সরকেশী মামলুকরা রাজত্ব করেন। তারপর তাদেরই অপর সম্প্রদায় চরকেসী মামলুকরা ক্ষমতাসীন হতে থাকেন। বাহরিয়া মামলুকদের শেষ সুলতান মালিক সালিহ্ ৭৮৪ হিজরীর রমযান (নভেম্বর ১৩৮২ খ্রি) মাসে পদচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলে

বরকূফ চরকস মালিকুয যাহির খেতাব নিয়ে মসনদে আরোহণ করেন। তারপর ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি) পর্যন্ত একের পর এক চরকসী গিরজী মামলুকরা মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। গিরজী বা চরকসী সুলতানদের শেষ সুলতান তুমান-বে সুলতান সালীম উসমানীর হাতে পরাস্ত হওয়ায় মিসর উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মামলুকদের রাজত্ব শুরুর প্রথম দিকেই মিসরে আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয় পূর্বেই যা বর্ণিত হয়েছে। এই ধারা ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি)-তে মামলুক রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মিসরের আব্বাসীয় খিলাফত অনেকটা আজকালকার পীরের গদীর মতই ছিল। নামে এরা খলীফাই ছিলেন এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীও মনোনীত হতেন। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মুসলমান বাদশাহ তাদের নিকট থেকে রাজ্য শাসনের সনদ এবং খেতাবও হাসিল করতেন। মিসরের মামলুক সুলতানগণও নিজেদেরকে সেই খলীফাদের নায়েবে সালতানাত (ভাইসরয়) বলে অভিহিত করতেন। বাহ্যত তাঁরা তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন। খুতবায়ও তাঁদের নাম পঠিত হতো। কিন্তু আসলে তাঁদের কোন শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। তাঁদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল। মিসরের সুলতানরা না দিতেন তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে, না দিতেন তাঁদের সাথে কাউকে মেলামেশা করতে। এই খলীফা তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গসহ তাঁদের প্রাসাদসমূহের মধ্যেই অনেকটা নজরবন্দী হয়ে থাকতেন। তাঁদের অবস্থা ছিল অনেকটা রাজনৈতিক শাহী কয়েদীদেরই মত। নামে তাঁরা ছিলেন খলীফা। কিন্তু আসল ইসলামের খলীফা যে অর্থ বহন করে তার সাথে তাঁদের ফারাক ছিল আসমান যমীনের। সুলতান সলীম উছমানী মিসর অধিকার করার পর মিসরের আব্বাসী খলীফা মুহাম্মদের উপরই তিনি আধিপত্য লাভ করেন। মুহাম্মদ ছিলেন মিসরের খলীফাদের মধ্যে অষ্টাদশতম এবং খলীফা হিসাবে শেষ খলীফা। এই খলীফার কাছে যে বিশেষ পতাকা এবং জুব্বা খিলাফতের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান ছিল সুলতান সলীম তাঁকে সম্মত করে তা নিজে হস্তগত করে নেন। মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সুলতান সলীম ঐ আব্বাসী খলীফাকেও সাথে করে নিয়ে যান। আব্বাসী খলীফা সুলতান সলীমকে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফারূপে মনোনয়নও দান করেন। এভাবে ৯২২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রি)-তে আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ থেকে শুরু করে চলে আসছিল আব্বাসীদের খিলাফত দীর্ঘ আটশ বছর পর নামমাত্র খিলাফতের রূপ পরিগ্রহ করে তার অবসান ঘটে এবং সে যুগে খিলাফতের সবচাইতে যোগ্য হকদার উছমানীদের খিলাফতের সূচনা হয়। আব্বাসীয় বংশের ৩৭ জন খলীফা বাগদাদ তথা ইরাকে এবং ১৮ জন মিসরে রাজত্ব করেন। এদের মোট সংখ্যা ছিল ৫৫ জন।

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছি। এবার আমাদেরকে পুনরায় এই ধারার শুরুতে চলে যেতে হবে এবং ডানে বায়ে যে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহ রেখে এসেছি তার প্রতি আলোকপাত না করে আমরা এক পদও অগ্রসর হতে পারি না। হয়তো এখানে পাঠকগণ আব্বাসীয় খিলাফতের সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা আশা করতে পারেন। কিন্তু যা কিছু বলার ছিল তার সব কিছুই আমি যথাস্থানে বলে এসেছি। তাই এই আযীমুশশান খলীফা বংশের পরিণতি দর্শনে স্বাভাবিকভাবে অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছে তাকে আর নষ্ট করতে চাই না। হ্যাঁ পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি জরুরী কথা আরয করে এই খণ্ডের এখানেই ইতি টানছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

খিলাফতে বনী উমাইয়া ও খিলাফতে আব্বাসীয়ার বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের বর্ণনা পাঠে খলীফাদের শাসন ও ক্ষমতা, বিজয় ও যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মানসপটে অংকিত হয়। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ রাজরাজড়াদের এরূপ বিবরণ তাঁদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। উপরে তাই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধুনা ইতিহাসশাস্ত্র যে উন্নতি করেছে তাতে নতুনভাবে লিখিত কোন ইতিহাসগ্রন্থে এটাও খুঁজে দেখা হয় যে, যে যুগ বা যে রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তার শাসননীতি কি ছিল? সমাজের লোকজনের জীবনযাত্রা প্রণালী বা মানচিত্র কি ছিল? তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষই বা কতটুকু ছিল ইত্যাদি। পাঠকদের সে চাহিদা পূরণ করতে হলে পুস্তকের কলেবর অন্তত দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হয়। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তক দ্বারা পাঠকদের সে চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে না। এ অপূর্ণতার কথা স্বীকার করে নিয়েই নিম্নে কয়েকটি ইঙ্গিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করছি।

রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কর্মচারী ও পদাধিকারী

খিলাফতে বনী উমাইয়া ছিল একটি বিজয়ী ও সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রমশীল সালতানাত। সে যুগে আরবদেরকে বিজয়ী জাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে বিজিত জাতি বলে বিবেচনা করা হতো। আরবদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান ছিল। কুরআনুল করীম ও সুন্নাতে রাসূল ছাড়া অন্য কোন আইন তাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় ও রাষ্ট্রীয় ফরমানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারতো না। মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহও ছিল, কিন্তু এ আত্মকলহ থাকা সত্ত্বেও আরব, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যের গণজীবন এবং তাদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যে কোন জটিল রাষ্ট্রনীতির তেমন প্রয়োজন ছিল না। খলীফা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর জন্যে কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। আবার বিনা তলবেও লোকে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতো। অনেক সময় সেই পরামর্শ তাঁকে মঞ্জুরও করতে হতো। রাষ্ট্রে সাধারণত আরবসুলভ সরলতার প্রতিফলন ছিল। মামুলী একজন মরুচারী বেদুঈনও নির্বিবাদে খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারতো। খলীফার প্রবল পরাক্রম এ মরুচারী বেদুঈনের বাকস্বাধীনতাকে একটুও বাধাগ্রস্ত করতে পারতো না। খলীফা তাঁর অধীনস্থ প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে নিজ নায়েব মনোনীত করে প্রেরণ করতেন। সেসব রাজ্য বা প্রদেশে নায়েবের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকতো। খলীফা যেমন গোটা মুসলিম জাহানের শাসক ছিলেন, তেমনি তিনি গোটা মুসলিম জাহানের প্রধান সিপাহ্‌সালার বলেও গণ্য হতেন। প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের আমিলগণ তাঁদের সংশ্লিষ্ট এলাকার বাদশাহ ও সিপাহ্‌সালার হতেন। একাধারে তারাই হতেন

ধর্মীয় নেতা, সালাতের ইমাম এবং কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। খলীফারও যখন কোন ধর্মীয় প্রশ্নে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হতো তখন তিনি ধর্মবেত্তা আলিম ও ফকীহগণের কাছে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে একটুও সংকোচবোধ করতেন না। অনুরূপ আমিল বা ওয়ালীদেরও সময় সময় উলামা ও ফকীহদের মতামত চাইতে হতো। কোন কোন সময় আবার এক একটি প্রদেশে একজন আমিল বা গভর্নরের সাথে আরেকজনকে কাযী বা প্রধান বিচারপতি করে পাঠানো হতো। আমিল হতেন শাসন বিভাগের প্রধান। তাঁর কাজ হতো সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করা, শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রজাসাধারণের দেখাশোনা করা ও রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা সঞ্চিত করা। কাযীর কাজ ছিল শরীয়তের দণ্ডবিধি জারি করা, বিচার-মীমাংসাদি করা এবং শরীয়তের বিধি-বিধান ও অনুশাসন জনসাধারণকে মেনে চলার জন্য বাধ্য করা। এমতাবস্থায় আমিল কেবল সেনাবাহিনী প্রধানই হতেন। মোদ্দাকথা, বনী উমাইয়ার খিলাফতে সরলতার আধিক্য ছিল। শরীয়তের বিধি-নিষেধ দিয়ে সমস্ত জটিলতার নিরসন করা হতো। প্রজাসাধারণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকায় অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। প্রজা-সাধারণের উপর কোনরূপ অন্যায় কর আরোপ করা হতো না। শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে রাষ্ট্রকেও খুব একটা অর্থ ব্যয় করতে হতো না। খলীফা একাধারে গোটা মুসলিম জাহানের আধ্যাত্মিক নেতা এবং দুনিয়াবী শাহানশাহ বলে বিবেচিত হতেন। এ জন্যে রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা বহাল রাখাটা ছিল খুবই সহজসাধ্য। বিধিবদ্ধভাবে কেউ উযীর হতেন না। আবার প্রয়োজনে যে-কেউ উযীরের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন।

খিলাফতে আব্বাসীয়ায় আরবদের সাথে ইরানী-তুর্কীরাও বিজয়ী জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। ক্রমে ক্রমে বিজিত জাতিদের ক্ষমতা বিজয়ী আরবদের চাইতেও অধিক হয়ে যায়। ফলে শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে জটিলতার উদ্ভব হয়। যদি আরব, ইরানী ও তুর্কীদেরকে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সমমর্যাদায় রাখা হতো এবং সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তা হলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় বনী উমাইয়াদের চাইতেও বেশি সরলতা ও দক্ষতার অভিব্যক্তি ঘটতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসব জাতির মধ্যে বিরোধ, মনোমালিন্য ও রেষারেষি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর আসল কারণ ছিল, ইরানীদেরকে আরবদের উপর প্রাধান্য দেয়া। খলীফার দরবারে ইরানী ও সাসানী ঠাটবাটের প্রাদুর্ভাব ঘটলো এবং শান্তিময় আরব সরলতাকে তাচ্ছিল্যভরে দরবার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলো। ফলে ইসলামী খিলাফতকে এমনি জটিলতার আবর্তে পড়তে হলো যাতে তার প্রভাবও দিন দিন হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়ালো। আব্বাসী খিলাফতের উল্লেখযোগ্য পদ ও পদবীসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

উযীরে আযম

প্রথম প্রথম খলীফার একজন মাত্র উযীর থাকতেন আর তিনি হতেন সব ব্যাপারে খলীফার নায়েব বা প্রতিনিধি স্বরূপ এবং সকল বিভাগের উচ্চতর অধিকর্তা। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল একজন মাত্র উযীরের পক্ষে সকল বিভাগের দেখা-শোনা ও পরিচালনার দায়িত্বপালন সম্ভব নয় তখন উযীরে আযম বা প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র উযীর নিযুক্ত করা হতে থাকে। উযীরে আযম প্রথম দিকে শুধু এমন সব ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন, যেগুলো খলীফা স্বেচ্ছায় তাঁর উপর অর্পণ করতেন। এমন অনেক ব্যাপারও রাষ্ট্রে থাকতো

যেগুলোর ইখতিয়ার খলীফা ভিন্ন আর কারোরই ছিল না। অবশ্য, উযীরে আযম সে সব ব্যাপারেও খলীফাকে পরামর্শ দিতে পারতেন। এ জাতীয় পরামর্শ দানের জন্যে কেবল উযীরে আযমই নন রাষ্ট্রের অন্যান্য অমাত্যকেও খলীফা মতামত প্রদানের জন্যে আহ্বান জানাতেন। কোন কোন খলীফা যেমন খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁর উযীরে আযমকে সালতানাতের প্রতিটি ব্যাপারে নিরংকুশ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন। উযীরে আযমই যে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ জারি করে দিয়ে খলীফাকে কেবল তা অবগত করতেন। এরূপ পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী উযীরদের মর্যাদা ছিল অত্যুচ্চ এবং প্রকৃতপক্ষে এরূপ উযীরে আযম খলীফার চাইতেও বেশি ক্ষমতাধর বলে বিবেচিত হতেন।

পরবর্তীকালে যখন খলীফাগণ খুব দুর্বল হয়ে পড়েন এবং দায়লামী আমীরুল উমারা বা সালজুকী সুলতানরা খিলাফতের উপর চেপে বসেন, তখন খলীফার উযীরে আযম এবং উক্ত সুলতানদের উযীরে আযম হতেন পৃথক পৃথক। এ পর্যায়ে খলীফার উযীরে আযম তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ বলে বিবেচিত হতো না। এই দ্বৈতশাসনের যুগে কোন কোন সময় খলীফার উযীরকে রঈসুর রুআসা এবং সুলতানের উযীরকে উযীর বলা হতো। কোন কোন সময় খলীফার উযীরের মর্যাদা ছিল খলীফার চাইতেও বেশি। আর যে সব ক্ষেত্রে খলীফার উযীর সুলতানের মনোনীত ব্যক্তি হতেন সে সব ক্ষেত্রে খলীফা তাঁর উযীরের হাতে বন্দী হয়ে পড়তেন।

উযীর নির্বাচন সাধারণত খলীফা তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনার ভিত্তিতেই করতেন। আবার কখনো কখনো তিনি নেহায়েত মামুলী সামাজিক মর্যাদার লোককে খিলাত দিয়ে রাষ্ট্রের সবচাইতে উঁচু পদে বসিয়ে দিতেন। কখনো বা একজন উযীরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রই হতেন পরবর্তী উযীর। খলীফা হারূনুর রশীদের উযীর জাফর বারমাকী ও ফযল, আল্প আরসালান ও মালিক শাহের উযীর নিযামুলমুল্ক প্রমুখ অত্যন্ত নামকরা উযীর ছিলেন।

আমীরুল উমারা

এ পদটি আব্বাসী খলীফাদের পতনের যুগে সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাবান লোকেরা খলীফার উপর চেপে বসে নিজে নিজে এ পদবীটি গ্রহণ করে। এই আমীরুল উমারারা আসলে ইরাক, পারস্য ও খুরাসানের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন। রাষ্ট্রের অপর সকল পদস্থ কর্মকর্তা তাঁদেরই অধীন এবং তাঁদেরই দ্বারা নিয়োজিত হতেন। খলীফা হতেন নামেমাত্র খলীফা অথবা কেবল বায়আতের জন্যে। দায়লামীদের শাসনকাল প্রায় একশ বছর বিস্তৃত ছিল। তাঁদেরকেই আমীরুল উমারা বলা হতো।

সুলতান

দায়লামীরা যেমন নিজেদের জন্যে 'আমীরুল উমারা' খেতাব বেছে নেয়, তেমনি সালজুকীরা নিজেদের জন্যে 'সুলতান' খেতাবটি বেছে নেয়। এই সালজুকী সুলতানরা দায়লামীদের চাইতে তুলনামূলকভাবে খলীফাদের বেশি অনুগত ছিলেন। দায়লামীরা দরবারে খিলাফতের সকল ক্ষমতা রহিত করেছিল। সালজুকীরা খলীফার মর্যাদা স্বীকার করে নেয় এবং তাঁদেরকে শাসন পরিচালনার সুযোগও দান করে। তাঁদের যুগে খলীফাগণ তাঁদের হৃত শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি উদ্ধারে যত্নবান হন এবং এ ব্যাপারে অনেকটা সফলও হন। আব্বাসী খলীফাগণের প্রথম যুগে আমীরুল উমারা ও সুলতানের কোন পদ ছিল না।

আমিল বা ওয়ালী (গভর্নর)

প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের শাসকদের সাধারণত ক্ষমতা থাকতো। প্রত্যেক আমিল বা ওয়ালী তাঁর প্রদেশের রাজস্ব আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ খলীফার দরবারে নিয়মিত প্রেরণ করতেন। কোন কোন সময় কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ বা রাজস্ব নির্ধারণ করেই আমিলকে কেন্দ্র থেকে পাঠানো হতো। প্রদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে এবং শাসন-শৃঙ্খলা বিধানের ব্যাপারে ওয়ালী পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীন হতেন। বিনিময়ে তিনি নির্ধারিত রাজস্ব প্রতিবছর খলীফার দরবারে পাঠাতেন। এটা অনেকটা ইজারাদারীর মতো ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমিলকে তাঁর প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রে দিতে হতো। এমতাবস্থায় তাঁকে নির্ধারিত হারের কর দিতে হতো না বরং যে বছর যে পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকতো সে বছর তা-ই কেবল কেন্দ্রে পাঠাতে হতো। আফ্রিকিয়া, ইয়ামান, মাওরাউন নাহরের মতো সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহে সাধারণত পূর্বোক্ত ইজারাদারী ব্যবস্থা অর্থাৎ নির্ধারিত অংকের কর কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা থাকতো। এরূপ প্রদেশসমূহের আমিলদের থেকে নামে মাত্র খারাজ আদায় করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে তো এসব প্রদেশের জুমুআর মসজিদসমূহে খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারণকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হতো। এসব সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহের আমিল বা ওয়ালিগণ কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, বিরোধিতা বা বিদ্রোহ না করলে তাঁদেরকে সাধারণত বদলী বা পদচ্যুত করা হতো না। তবে অন্যান্য প্রদেশে খলীফা ঘন ঘন আমিল পরিবর্তন করতে থাকতেন।

সাহিবুশ শুরতা (পুলিশ প্রধান)

শহর ও জনপদসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন ও চোর-ডাকাতদেরকে গ্রেফতার করে তাদের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকতো, তাঁকে 'সাহিবুশ শুরতা' বলা হতো। আমরা একে পুলিশ বিভাগের প্রধান বলে থাকি। এই সাহিবুশ শুরতা নিজে বাগদাদে অবস্থান করতেন, ইরাকের অন্যান্য শহরে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। কোন কোন সময়ে ইরাকের সামরিক বাহিনী প্রধান এবং প্রদেশের আমিল বা গভর্নর নিজেই এ দায়িত্ব পালন করতেন। বিখ্যাত তাহির ইব্‌ন হুসাইন সাহিবুশ শুরতা থেকেই খুরাসানের গভর্নর হয়েছিলেন। মোটকথা, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল এবং কোন সাধারণ ব্যক্তি এ দায়িত্ব লাভ করতেন না।

হাজিব

হাজিব ছিলেন খলীফার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান হতেন। খলীফার দরবারে তাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকতো সর্বাধিক। হাজিব সফরে বা ঘরে সর্বাবস্থায় ছায়ার মত খলীফার সাথে সাথে থাকতেন এবং খলীফার একাকিত্বের সময় তাঁর মন ভুলানো সঙ্গী হতেন। খলীফার প্রাসাদের ভৃত্য ও রক্ষিগণ এবং সান্ত্রীরা তাঁর অধীন থাকতেন। হাজিবকে খলীফার দরবারে প্রবেশকারী প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং খলীফার হুকুম তামিলের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতে হতো। হাজিবের কাছে কোন কোন সময় উযীরে আযমকেও নতি স্বীকার করতে হতো। হাজিব খলীফার গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং

খলীফার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতেন। হারূনুর রশীদ তাঁর হাজিব মাসরূরকে দিয়েই তাঁর উযীর জা'ফর বারমাকীকে হত্যা করিয়েছিলেন।

কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি)

কাযীউল কুযাতের স্বতন্ত্র পদ সর্বপ্রথম খলীফা হারূনুর রশীদই সৃষ্টি করেছিলেন– যা সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফার যুগ পর্যন্ত কায়েম ছিল। এই পদকে আজকাল 'শায়খুল ইসলাম' বলা হয়ে থাকে।[১] কাযীউল কুযাত সমস্ত প্রদেশ ও রাজ্যে নিজ ক্ষমতা বলে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। আবার প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশের কাযী তাঁর নিজ ক্ষমতাবলে তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেক শহরে স্থানীয় কাযী নিয়োগ করতেন। তাঁর কাজ হতো ধর্মীয় বিধি-বিধানের হিফাযত ও পাবন্দী করানো এবং বিচারপ্রার্থী ও বিবদমান লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দেয়া। এটা অত্যন্ত বড় পদ ছিল। দরবারে কাযীউল কুযাতের মর্যাদা সেনাবাহিনী প্রধান বা উযীরে আযমের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। নতুন মসনদে আরোহণকারী তখনই খলীফা বলে গণ্য হতেন যখন কাযীউল কুযাত তাঁকে খলীফা বলে স্বীকৃতি দিতেন। কোন খলীফাকে পদচ্যুত করতে কাযীউল কুযাতের নিকট থেকেই ফতওয়া হাসিল করা হতো। কাযীকে খলীফা পদচ্যুত করতে পারতেন।

তবে নতুন খলীফার অভিষেক অনুষ্ঠানে কাযীর মঞ্জুরি ছিল অপরিহার্য। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে যেমন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর অভিযান চালানো বা কোন প্রদেশের আমিল নিয়োগকালে কাযীর পরামর্শও গ্রহণ করা হতো। যদি খলীফা নিজে সিপাহ্সালার হয়ে কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করতেন, তবে কাযীউল কুযাতও তাঁর সহযাত্রী হতেন, নতুবা প্রতিটি বাহিনীর সাথে কাযী তাঁর একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতেন। চুক্তিপত্র, সন্ধিপত্র, কোন রাজ্যের শাসনের সনদ, খলীফার গুরুত্বপূর্ণ ফরমান ও ওসীয়তনামা প্রভৃতির উপর অবশ্যই কাযীর মোহর অঙ্কিত থাকতো।

রাঈসুল 'আস্কর (সেনাবাহিনী প্রধান)

যদিও প্রত্যেক খলীফা, প্রত্যেক আমিল, প্রত্যেক উযীর এবং প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তি সিপাহ্সালার হতে পারতেন, এতদসত্ত্বেও খলীফার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর একজন প্রথাসিদ্ধ রাঈসুল 'আস্কার বা প্রধান সেনাপতিও থাকতেন। এটাকে কোন স্থায়ী বা স্বতন্ত্র পদ মনে করা হতো না বরং প্রতিটি সেনা ইউনিটেরই একজন করে সেনাপতি থাকতেন। যে ব্যক্তিকে বড় বড় অভিযানে সেনাপতি করে পাঠানো হতো, তাঁকেই সাধারণত রাঈসুল 'আস্কার বা রাঈসুল আসাকির (সেনাবাহিনীর বা সেনাবাহিনীসমূহের প্রধান) নামে অভিহিত করা হতো।

মুহ্তাসিব

মুহ্তাসিবের কাজ হতো শহর পরিক্রমা করে লোকজনকে আইন ও শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা বা বে-আইনী ও বে-শরা কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি

---

১. বলাবাহুল্য, মূল পুস্তক রচনাকালে এ বক্তব্য প্রযোজ্য ছিল। বর্তমানে 'শায়খুল ইসলাম' পদও কোথাও আছে বলে জানা যায় না। – অনুবাদক

বিধান করা। মুহ্তাসিব কখনো কাযীউল কুযাতের, আবার কখনো সাহিবুশ শুরতার অধীন হতেন। আজকালকার পরিভাষায় একে মিউনিসিপ্যাল ইন্সপেক্টরও বলা যেতে পারে। ব্যবসায়ী, সওদাগর বা দোকানদারদের ওজন ও মাপ ঠিক কিনা তা দেখার বা এ ব্যাপারে তাদের ত্রুটির জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাও তার হাতে থাকতো। প্রত্যেক শহর ও কসবায় পূর্ণ স্টাফসহ একজন মুহ্তাসিব নিযুক্ত থাকতেন।

নাযির

খলীফা সালতানাতের সকল বিভাগের দেখাশোনা বা তদারকির জন্যে একজন প্রধান নাযির নিযুক্ত করতেন যাঁর মর্যাদা ছিল একজন মন্ত্রীর সমপর্যায়ের। তাঁর অধীনে প্রত্যেকটি বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাযির বা ইন্সপেক্টর নিযুক্ত থাকতেন। মুশরিফে আ'লা বা প্রধান নাযির প্রত্যেকটি বিভাগের প্রতিবেদন সংগ্রহ করার পর এর একটি জরুরী সারসংক্ষেপ খলীফার খিদমতে পেশ করতেন।

সাহিবুল বারীদ বা রাঈসুল বারীদ (ডাক বিভাগ প্রধান)

প্রত্যেক প্রদেশে ডাক বিভাগের দেখাশোনা ও পরিচালনার জন্যে খলীফার পক্ষ থেকে একজন সাহিবুল বারীদ অর্থাৎ পোস্টমাস্টার জেনারেল নিযুক্ত হতেন। তাঁর কাজ ছিল শাহী ডাক রওয়ানা করা ও কাসেদ বা পত্রবাহকদের জন্যে রাস্তার চৌকিসমূহে বাহনের ব্যবস্থাপনা করা। তারই অধীনে প্রত্যেক মঞ্জিলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘোড়া, খচ্চর বা উটের একটি বহর সদাপ্রস্তুত থাকতো। সাহিবুল বারীদের এটাও একটা কর্তব্য ছিল যে, তিনি তাঁর প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় খবরাদি কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। খলীফার দরবারে এসব খবর যথারীতি পৌঁছানো হতো। সাহিবুল বারীদের অধীনে গুপ্তচরদের একটি বাহিনীও থাকতো, যাদের মাধ্যমে প্রদেশের প্রজাসাধারণ ও শাসকদের এবং বিভিন্ন বিভাগের অবস্থাদি সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করা হতো।

সাহিবুল বারীদ প্রত্যেকটি শহরে তাঁর একজন নায়েব নিযুক্ত করতেন। এই বিভাগটি প্রজা-সাধারণের চিঠিপত্রাদি একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছাবার দায়িত্বও পালন করতো। এই সাহিবুল বারীদের অধীনে বার্তাবাহী কবুতরের একটি ঝাঁকও থাকতো। সাহিবুল বারীদের কাছে এমন একটি রেজিস্টারও থাকতো যাতে প্রতিটি ডাকঘর ও চৌকির দূরত্ব, দিক ও সেখানকার কর্মচারীবৃন্দের তালিকা লিপিবদ্ধ থাকতো।

কাতিব

খলীফা এক ব্যক্তিকে তাঁর কাতিব বা মীর-মুন্শী (প্রধান সচিব) নিযুক্ত করতেন। তিনিও উযীরদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর কাজ ছিল খলীফাকে বাহির থেকে আগত পত্রাদি পড়ে শুনানো, ফরমানাদি লেখা, খলীফার নির্দেশ মুতাবিক হুকুম জারি করা ও রুত্বপূর্ণ দলীল-দস্তাবেজসমূহ সংরক্ষণ করা। তাঁরই অধীনে বিভিন্ন দফতর হতো। যেমন শাহী ফরমানের নকল সংরক্ষিত রাখার দফতর, রেজিস্ট্রি দফতর, দীওয়ানুল জুয়ূশ বা সামরিক বাহিনীর রেকর্ডের দফতর, দীওয়ানুন্ নাফাকাত বা বেতন-ভাতাদির রেকর্ডের দফতর ইত্যাদি।

আমীরুল মিনজানীক

এর কাজ ছিল সামরিক প্রকৌশলীর কাজ। সৈন্যবাহিনীর যে পল্টন সুড়ঙ্গ নির্মাণ ও খনন কাজে নিয়োজিত থাকে সে পল্টনও তাঁর অধীন হতো। রাস্তা নির্মাণ, যুদ্ধ ও শিবিরের স্থান নির্বাচন, শত্রুদের দুর্গ ধ্বংস করা, দুর্গ, কৃত্রিম দুর্গ ও পরিখা নির্মাণ তাঁর কাজ ছিল। দুর্গ অবরোধ করার সময় তাঁর পরামর্শ ও প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্ব পেত।

আমীরুত তা'মীর বা রাঈসুল বিন্না

তিনি হতেন প্রধান প্রকৌশলী। শাহী প্রাসাদাদি নির্মাণ ও মেরামত করা, শহর নির্মাণ,লেক নির্মাণ, পুল নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি ছিল তাঁর কাজ।

আমীরুল বাহ্‌র

নৌবাহিনীর জাহাজ এবং নৌবাহিনীর প্রধানকে আমীরুল বাহ্‌র বলা হতো। তাঁর অধীনে অনেক 'কায়েদ' থাকতেন। প্রত্যেক কায়েদের অধীনে একটি যুদ্ধ জাহাজ থাকতো। কায়েদকে কাপ্তান বলা যেতে পারে।

তাবীব

একাধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ রাজধানীতে মওজুদ থাকতেন এবং তাঁরা রীতিমত খলীফার দরবারে উপস্থিত থাকতেন। ইল্‌মী মজলিস বা একাডেমিক আলোচনাসমূহে তাঁরা অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হতো। প্রত্যেক রাজ্য ও ধর্মের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ তাতে শামিল থাকতেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন দারুত-তাসানীফ্, দারুত তরজমা ও বায়তুল হিকমার গৌরব বর্ধনকারী যুগবিখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও গবেষক।

রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য দফতরসমূহ

খলীফাকে যদিও নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করা হতো, এতদসত্ত্বেও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিহীন ক্ষমতার অধিকারী ও পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। খলীফার মসনদে আরোহণের সময় যখন তাঁর হাতে বায়আত করা হতো, তখন কুরআন-সুন্নাহর শর্ত তাঁর জন্যে অবশ্যই যুক্ত থাকতো। বিদ্বানমণ্ডলী ও শাস্ত্রজ্ঞগণ খলীফার শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপের সমালোচনার এবং এ ব্যাপারে তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন। তাঁদের এ অধিকার প্রয়োগে খলীফার পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হলে জনসাধারণ সে বাধার মুকাবিলায় ধর্মীয় নেতাদের সমর্থনে দাঁড়াতো, এমনকি এ জন্যে খলীফাকে পদচ্যুত করতে পর্যন্ত তাঁরা উদ্যত হতো এবং কালবিলম্ব না করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কখনো কখনো ধর্মীয় নেতাদের এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যও দেখা যেত। নানা অনাচারের উদ্ভব হতো এবং খিলাফত ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তো। খলীফার যে ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব ছিল, তার উপর নির্ভর করে খলীফা কখনো কখনো পরামর্শ ব্যতিরেকেও নির্দেশাদি জারি করতেন এবং তা বাস্তবায়নও করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণত গণস্বার্থ বিষয়ক ব্যাপারাদি নির্ধারিত আইনের ছকেই নিষ্পন্ন হতো এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র অত্যন্ত

নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই চলতো। এ কারণেই রাজরাজড়াদের গৃহযুদ্ধাদি এবং আমীর-উমারাদের মতানৈক্য ও রেষারেষি সত্ত্বেও আব্বাসীয় খিলাফত আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নাগরিকদের সভ্যতা-ভব্যতার শিক্ষা কখনো ব্যাহত হয়নি। আব্বাসী খিলাফতের সূচনার যুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আব্বাসীয় আমলের দিনগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতিতে বা আবিষ্কারের গতিতে একটুও ছেদ পড়েনি। কারণ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ জন্যে রাষ্ট্র দুর্বল এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও অনৈক্য প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়নি বরং বিশৃঙ্খলার যুগেও তার প্রাণশক্তি বর্তমান ছিল এবং ইল্‌মী, সামাজিক ও নৈতিক অগ্রগতির পথে তেমন কোন বিপত্তির সৃষ্টি হয়নি। সামানী, সাফারী ও সালজুকীদের রাজত্ব তেমন একটা দীর্ঘস্থায়ী বা টিকসই ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের যুগে এবং তাঁদের আয়ত্তাধীন রাজ্যসমূহে বড় বড় জাঁদরেল আলিম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার যুগখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিদ্বজ্জনের জন্ম হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের অমর কীর্তিসমূহ রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

দীওয়ানুল আযীয

দরবারে খিলাফত বা খলীফার সচিবালয়ের নাম ছিল দীওয়ানুল আযীয। যে সব উযীর রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন এবং যারা রাষ্ট্রীয় শক্তির চাবিকাঠি বলে বিবেচিত হতেন, তাঁদের দফতর বা সচিবালয়সমূহকে দীওয়ানুল আযীয বলে অভিহিত করা হতো। রাষ্ট্রের সমস্ত দফতর ও বিভাগ এ দফতরের অধীন হতো। উযীরে আযমকে সংশ্লিষ্ট দফতরের আমলাদের সাথে সলা-পরামর্শ করে বিধি-নিষেধ জারি করতে হতো।

দীওয়ানুল খারাজ

একে অর্থ দফতর মনে করা যেতে পারে। কখনো এ দফতরটি উযীরে আযম বা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাকতো, আবার কখনো এ জন্যে ভিন্ন স্বতন্ত্র একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হতেন— যিনি প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকতেন। কখনো কখনো খলীফা অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উযীরের হাতে না রেখে কাতিবের মাধ্যমে নিজেই এ বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। অর্থমন্ত্রী বা দীওয়ানুল খারাজের দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রী কখনো কখনো প্রদেশসমূহে তার নায়েব নিযুক্ত করতেন এবং তাঁর এ নায়েবরা প্রাদেশিক গভর্নরের কর্তৃত্বের বাইরে থাকতেন। সাধারণত অর্থমন্ত্রী প্রদেশের গভর্নরদের তত্ত্বাবধানে প্রাদেশিক অর্থ দফতরের দায়িত্ব রেখে দিয়ে তাঁকেই এই ব্যাপারের দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিকারী কর্তৃপক্ষরূপে গণ্য করতেন।

দীওয়ানুল জিয্‌য়া বা দীওয়ানুয্ যিমান

এ দফতরে জিয্‌য়া এবং যিম্মী তথা অমুসলিম প্রজাদের সংক্রান্ত দলীল-দস্তাবেজ থাকতো। জিয্‌য়া উসুল, জিয্‌য়ার পরিমাণ নির্ধারণ, জিয্‌য়া মওকুফ প্রভৃতি ব্যাপার এ দফতরের অধীন হতো। এ দফতরের প্রধান অর্থমন্ত্রীর অধীনস্থ বলে গণ্য হতেন। তবে কাযীউল কুযাতের নির্দেশাদিও তাঁকে মেনে চলতে হতো। কাযীউল কুযাতের নির্দেশাদি

সাধারণত জিয্য়ার পরিমাণ হ্রাস বা তা মওকুফ করার ব্যাপারেই হতো। যেমন তাঁর নির্দেশ হতো, অমুক প্রদেশের অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে জিয্য়া উসুল করা হবে না, ইত্যাদি।

দীওয়ানুল আস্কার

এ দফতরে ফৌজী রেজিস্টার থাকতো। এ দফতর উযীরে আযম বা খলীফার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকতো। সৈন্যবাহিনীর লোকদের বেতন-ভাতাও এ দফতরের মাধ্যমে প্রদত্ত হতো। প্রধান সেনাপতিও এ বিভাগের প্রধান বলে গণ্য হতেন। কিন্তু তাঁর এ বিভাগে শুধু এতটুকুই কাজ ছিল যে, তাঁর উপস্থিতিতে সৈন্যদের বেতন-ভাতাদি দেয়া হতো। ভারবাহী পশু ইত্যাদি ক্রয়, অস্ত্র সঞ্চয়, ফৌজী পোশাকাদি তৈরি প্রভৃতি বিভাগও এ দফতরের অধীনে ছিল।

দীওয়ানুশ শুরতা

পুলিশ বিভাগের দফতরসমূহ এবং তার ব্যবস্থাপনা একজন স্বতন্ত্র কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত থাকতো। মুহতাসিব প্রভৃতি পদও এ বিভাগেরই অধীন ছিল। পুলিশ বিভাগের সিপাইদের বেতন-ভাতা সাধারণত সামরিক বাহিনীর সিপাইদের চাইতে বেশি হতো এবং এদের নিয়োগের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইও হতো বেশি।

দীওয়ানুদ্ দিয়া'

ইরাক প্রদেশে অবস্থিত খলীফার জায়গীর বলে গণ্য এলাকাসমূহের এবং খলীফার নিজস্ব জমিজমার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এগুলোকে শস্যশ্যামল রাখার উদ্দেশ্যে এ দফতরটি নিয়োজিত ছিল।

দীওয়ানুল বারীদ

এ দফতরের সদর দফতর ছিল বাগদাদে। এ দফতরে রাজ্যসমূহের মানচিত্র, ডাকঘরসমূহের তালিকা এবং প্রতিটি মঞ্জিল ও রাস্তা সম্পর্কে দিকনির্দেশ, কর্মচারীদের জন্যে নির্দেশনা, চাকরিজীবী ও কর্মকর্তাদের খিদমত সম্পর্কে প্রতিবেদন এবং রাস্তার নিরাপত্তা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভৃতি সংরক্ষিত থাকতো।

দীওয়ানুল নাফ্কাত

শাহী মহলের খরচপত্র, পারিতোষিক, ভাতা ও দান-দক্ষিণার রেজিস্টার এ দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

দীওয়ানুত-তাওকী'

দফতরে খলীফার স্বাক্ষর বা সীলমোহরে যে সব নির্দেশাদি জারি হতো তা সংরক্ষিত থাকতো। এ বিভাগও কাতিবের তত্ত্বাবধানে থাকতো। একে রেজিস্ট্রার বিভাগও বলা যেতে পারে।

দীওয়ানুন্ নযর ফিল-মাযালিম

এ দফতরটি মুশরিফে-আলার অধীনে থাকতো। শাহী মহলের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের নিরিখ নেয়া, রেজিস্টারসমূহের গরমিল ধরা এবং বিভিন্ন দফতর পরিদর্শন ছিল এ দফতরের কাজ। এ দফতর কর্মকর্তাদেরকে দুর্নীতি থেকে বিরত রাখতো।

দীওয়ানুল আনহার

খাল মেরামত ও সংরক্ষণ করা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ এ দফতরের কাজ। নতুন খাল খননের ব্যাপারে কৃষি-খামারের মালিকরা ছাড়াও আমীর-উমারা এবং সমাজসেবীদের স্বাধীনতা ছিল। কৃষক বা কোন এলাকার অধিবাসীরা যদি নতুন খাল খনন করতে চাইত তাহলে তার অর্ধেক খরচ সরকার বহন করতো। পানি বণ্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রামের লোকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে এ দফতরের লোকজন গিয়ে সে বিরোধের নিষ্পত্তি করে দিতেন। নতুবা সাধারণভাবে এ সব ব্যাপারে কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ করা হতো না। কৃষকরা নিজেরাই আপোসে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে নিত। নতুন খাল খননে সরকারের শুধু এতটুকু সুবিধা হতো যে, সরকারী রাজস্ব আদায় অনেকটা সহজ হয়ে যেত। কেননা, তাতে কৃষকদের উৎপাদন ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেত। ফলে রাজস্ব প্রদানে কেউ দ্বিধা বা গড়িমসি করতো না।

দীওয়ানুর রাসায়েল

এ দফতরের কর্মচারী কর্তকর্তাদের কাজ ছিল সন্ধিপত্রাদির মুসাবিদা করা, শাহী ফরমানসমূহের বক্তব্য লিখে মোহরাঙ্কিত করা এবং লেফাফায় তা বন্ধ করে পুনরায় সীলমোহর এঁটে দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালাসমূহের নকল রাখা এবং জনগণের জ্ঞাতব্য বিষয়াদির নকল তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশে ও শহরে প্রেরণ, জনসাধারণের নিকট থেকে আবেদনপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে তা প্রেরণ করা এবং যে দফতরের জন্যে যে ফরম সমীচীন হবে তা তৈরি করা, এসব ছিল এই দফতরের কাজ।

দারুল 'আদল

এ দফতরে সর্বস্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যেত। দারুল 'আদলে বাগদাদের কাযী অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি, উযীরবর্গ ও ফকীহ্, আলিমগণ একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমাসমূহের শুনানি গ্রহণ করতেন। দারুল 'আদলে খলীফা সভাপতিরূপে শরীক হতেন আর যদি বিচার্য ব্যাপারের সাথে খলীফার নিজের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকতো তা'হলে ঐ বিশেষ সেশনের সভাপতির দায়িত্ব উযীরে আযম বা কাযীউল কুযাতের উপর বর্তাতো। কোন প্রাদেশিক গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হলে বা কোন সিপাহ্সালারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনীত হলে অভিযুক্ত গভর্নর বা সিপাহ্সালারকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজ সাফাই পেশ করার সুযোগ দেয়া হতো। এই আদালতে কেবল এমন ব্যক্তিরাই সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত হওয়ার অধিকার পেতেন যাদের সচ্চরিত্র হওয়ার লিখিত সনদ থাকতো এবং সে সনদে কাযী বা মুহতাসিবের স্বাক্ষর থাকতো। বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিও এ আদালতে সাক্ষী দানকালে কম্পমান থাকতেন। কেননা, যে কোন সময় তাঁদের সচ্চরিত্রতার সনদ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার এবং ফলশ্রুতিতে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকতো।

দারুল কাযা

কাযী হতেন পদমর্যাদা নির্বিশেষে শহরের সকল শ্রেণীর লোকের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ। যদি ঐ শহরের আমিল বা গভর্নরের বিরুদ্ধেও কেউ মামলা দায়ের করতো, তাহলে

সেই গভর্নরকেও একজন সাধারণ আসামীর বেশে কাযীর কাঠগড়ায় গিয়ে হাযির হতে এবং তার সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করতে হতো। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে তাদের স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের মুন্সেফের কোর্টের ব্যবস্থা থাকতো– যেখানে তাদের মোকদ্দমাসমূহের শুনানি ও রায় হতো। ঐ অমুসলিম মুন্সেফদের আদালতেই অমুসলিমদের সমুদয় দীওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি হতো। কিন্তু যদি মামলার একপক্ষ অমুসলিম হতো, তাহলে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে কোর্টে ইচ্ছে মামলা দায়ের করতে পারতো। তবে এরূপ মামলার আপীল কাযীর আদালতে হতে পারতো। সাধারণত অমুসলিমরাও তাদের মামলা কাযীর আদালতেই দায়ের করতো এবং সেখান থেকেই মামলার রায় নিতে আগ্রহী থাকতো। তাতে তাদের কোনরূপ আপত্তি বা দ্বিধা থাকতো না।

রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থা

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রা এবং তাদের পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে কখনো হস্তক্ষেপ করা হতো না। শহর-বন্দর বা পল্লীগ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ সাধারণত তাদের নিজেদের আয়ত্তাধীনে থাকতো। তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আপোস-নিষ্পত্তি এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতো। যদি তারা কোন আমিলের (গভর্নর বা শাসকের) প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তা হলে খলীফার দরবারে তাঁকে বদলী করার দরখাস্ত করতো এবং সাধারণত খলীফা এ জাতীয় আবেদনে সাড়াও দিতেন। সাধারণত কোন এলাকাবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর কোন আমিল বা গভর্নরকে চাপিয়ে দেয়া হতো না। প্রত্যেক শহরবাসীর নিজেরাই একটি সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতার অধিকারী থাকতো। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে, কোন শহরের গভর্নরকে কোন বাহিনী অবরোধ করে বসেছে। তিনি হয়তো সরকারী বাহিনীর দ্বারা তাদেরকে প্রতিহত করতে চাইলেন। কিন্তু শহরবাসীদের মধ্যে এবং প্রতিহতকারী সরকারী বাহিনীর মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। এমতাবস্থায় গভর্নরকে বাধ্য হয়ে উক্ত শহর ত্যাগ করতে হতো।

নাগরিকদের অধিকার নষ্ট করার সাধারণত শাসনকর্তাদের সাহস হতো না। যে কোন সাধারণ নাগরিক যে কোন বড় শক্তিধর শাসক এমন কি খলীফার দরবারে পর্যন্ত অবাধে পৌঁছে যেতে পারতো এবং তার ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারতো। খলীফারা সাধারণত নিজেদেরকে জনপ্রিয় এবং প্রজাহিতৈষীরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে সাধারণভাবে আব্বাসীয় খলীফারা অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।

পর্যটন সুবিধা

আব্বাসীয় খলীফাগণ ইরাক, হিজায, পারস্য, খুরাসান, মুসেল, সিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে পথঘাটের নিরাপত্তা ও পথিকদের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সামরিক প্রহরা সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। সামান্য সামান্য ব্যবধানে চৌকির ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক মঞ্জিলেই শাহী ঘোড়া, উট ও অন্যান্য বাহন মওজুদ থাকতো। প্রত্যেক মঞ্জিলেই যাত্রীদের থাকা-খাওয়া ও বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। ডাক বিভাগের অধীনে রক্ষিত বাহনগুলো ভাড়া দিয়ে অন্য যাত্রীরাও ব্যবহার করতে পারতো। কখনও কোথাও কোন

বিদ্রোহী বাহিনী বা ডাকাতদলের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্যবসায়ী কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে সাথী ফৌজও সাথে দেয়া হতো। হাজীদের কাফেলায় যাকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করা হতো, তার অধীনে হাজীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে একদল সৈন্যও দিয়ে রাখা হতো।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা

প্রত্যেকটি শহরে একটি ব্যবসায়ী সমিতি (চেম্বার অব কমার্স) থাকতো— যাতে কোন সরকারী প্রতিনিধি থাকার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্যবসায়ীরা নিজেরাই ব্যবসায়পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতো। ব্যবসায় পণ্যের উপর কর থাকতো নামে মাত্র, ফলে এ ব্যাপারে কোন সময় ব্যবসায়ীদের কোনরূপ অনুযোগ থাকতো না। ব্যবসায়ীরা শাহী আমলাদের চাইতে অধিকতর সম্মানিত বিবেচিত হতেন। ব্যবসায়ীরা শাহী দরবারে উপনীত হওয়ার সুবিধাদি পেতেন। যে সব বণিক বাহির থেকে ব্যবসায়পণ্যাদি নিয়ে এসে বিক্রি করতেন, সাধারণত শহরের শাসকরা তাদেরকে এমনভাবে আদর-আপ্যায়ন করতেন যেন বাহির থেকে পণ্যাদি সরবরাহ করে বণিক তাঁর একটা বড় উপকার করে দিয়েছেন। বণিকের ব্যবসায়পণ্যাদি ঘটনাচক্রে বিক্রি না হলে শাসক, সুলতান বা খলীফা বিনা প্রয়োজনেও তা কিনে নিতেন। তবুও বহিরাগত বণিককে অপ্রসন্নভাবে ফেরত যেতে দিতে চাইতেন না। যে আমিল বা শাসকের শাসনাধীন এলাকায় কোন বণিকের কাফেলা লুণ্ঠিত হতো তিনি একান্তই অযোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসক বলে বিবেচিত হতেন। শহরের আমীরগণ ব্যবসায়ীদেরকে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ করে অত্যন্ত সম্মানিত মেহমানরূপে তাদের আদর আপ্যায়ন করতেন। কোন ব্যবসায়ী বহির্দেশ থেকে ঘুরে আসলে স্বয়ং খলীফা তাঁকে খলীফার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে তাঁর সফর কাহিনী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন এবং নানাভাবে তাকে সম্মানিত করতেন। খলীফাদের এরূপ আচরণের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ জন্যেই আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে সর্বপ্রকার শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং প্রতিটি শহরই কোন না কোন শিল্পের জন্যে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এভাবে এক স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যত্র যেতে থাকে। আরববাসীরা তো প্রাচীনকাল থেকেই ছিল বণিকের জাত। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফত আমলে ইরানীরা ব্যবসায়র ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের সে উৎসাহ এতই বৃদ্ধি পায় যে, মুসলিম বণিকরা উত্তরে উত্তর সাগরের উপকূল পর্যন্ত এবং দক্ষিণে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রমাণস্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিকরা সুইডেন ও মাদাগাস্কারে বাগদাদের শিল্পসামগ্রী খুঁজে পান। ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র মতো কোন কোন খলীফা বহিরাগত সওদাগরদের উপর তাদের আনীত পণ্যদ্রব্যাদির শুল্ক মওকুফ করে দেন।

সরকারী রাজস্ব

কৃষিপণ্যাদির শুল্ক অর্থমূল্যে আদায় করার পরিবর্তে শুল্কের ভাগ নির্ধারিত ছিল যে, কোন উৎপন্ন দ্রব্যের কতভাগ কর স্বরূপ দিতে হবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির দুই-পঞ্চমাংশ সরকারী রাজস্বরূপে আদায় করা হতো এবং তিন-পঞ্চমাংশ কৃষকের থাকতো। যেখানে কৃষককে নিজ ব্যবস্থাপনায় সেচকাজ করতে হতো সেখানে কৃষককে তিন-চতুর্থাংশই ছেড়ে দেয়া হতো এবং সরকারী রাজস্বরূপে কেবল এক-চতুর্থাংশ আদায় করা হতো। কোন কোন জমির কেবল এক-

পঞ্চমাংশ রাজস্বরূপে নিয়ে চার-পঞ্চমাংশই কৃষকের জন্যে ছেড়ে দেয়া হতো। আঙ্গুর ও খেজুর বাগানসমূহের রাজস্ব এ হারে আদায় করা হতো। বাহরায়ন, ইরাক, জাযিরা প্রভৃতি স্থানে এমনও অনেক কৃষক ছিল– যাদের জমির নির্ধারিত রাজস্ব-হার চুক্তি অনুসারে খিলাফতে রাশিদার যুগ থেকেই চলে আসছিল। সেগুলো ছিল অনেকটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষকদের উপর তার অতিরিক্ত রাজস্ব-হার ধরা যেত না। রাজস্ব নির্ধারণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই রাজস্ব আদৌ ধরা হতো না। আবার সামান্য সামান্য অজুহাতেও অনেক জমির রাজস্ব মওকুফ করে দেয়া হতো। রাষ্ট্র সবসময় কৃষকদেরকে সুখী-সমৃদ্ধ রাখার দিকে যত্নবান থাকতো। যাতে এলাকার ফসল উৎপাদনের আগ্রহ লোক হারিয়ে না বসে এবং তার শ্যামল প্রান্তরসমূহ অনাবাদী হয়ে না পড়ে। রাজ্যের বিশাল এলাকার ভূমি রাজস্ব ছিল কেবল এক-দশমাংশ। যিম্মীদের নিকট থেকে—যাদেরকে সামরিক বাহিনীতে কোন দায়িত্ব পালন করতে হতো না তাদের জানমালের হিফাযত বাবদ নামে মাত্র ট্যাক্স নেয়া হতো আর যারা স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হতে এগিয়ে আসতো, তাদের উপর থেকে জিয্য়া কর নেয়া হতো না। কিন্তু মুসলমান নাগরিকদের জন্যে সামরিক দায়িত্ব পালন ছিল বাধ্যতামূলক। যিম্মীদের অর্থাৎ অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যেও বৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং নিঃস্বদের নিকট থেকে কোনরূপ কর নেয়া হতো না। তাদের কর মওকুফ করে দেয়া হতো। মুসলমানদের নিকট থেকে 'সাদাকাত' খাতে একটি ট্যাক্স নেয়া হতো। বিত্তবান মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত নামেও কর আদায় করা হতো। একে ইনকামট্যাক্স বা আয়কর বলে ধরা যেতে পারে।

সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

রোমক সীমান্তে যে সব সৈন্য স্থায়িভাবে সীমান্তচৌকিসমূহে নিযুক্ত থাকতো, অন্য সৈন্যদের তুলনায় তাদের বেতন-ভাতা বেশি ছিল। এরূপ একজন সৈন্য সাধারণত পনের থেকে ত্রিশ টাকা বেতন পেত। একদল সৈন্য সর্বদা রাজধানীতে নিযুক্ত থাকতো। সামরিক বাহিনীর একটি অংশ রাস্তাঘাটের প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো। তাদের দায়িত্ব হাজার হাজার চৌকি বা ফাঁড়িতে বিভক্ত করা থাকতো। বড় বড় শহর এবং কেন্দ্রীয় স্থানসমূহেও এক বিপুলসংখ্যক সৈন্য সর্বদা মোতায়েন থাকতো। শহরসমূহের হিফাযতের উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টরের অধীনে এবং সাহিবুশ শুরতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পুলিশরাও সরকারী তহবিল থেকে বেতন-ভাতা পেত। রাজস্বের একটি বিরাট অংশ সামরিক বাহিনীর খাতে ব্যয়িত হতো। ডাক বিভাগের জন্যে নিয়োজিত সৈন্য, সওয়ারীর পশু এবং ওগুলোর দায়িত্বে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীরা এবং ডাক খরচও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোমকদের সাথে লড়াইর উদ্দেশ্যে যে সব স্বেচ্ছাসেবী ভর্তি হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতো, তাদের আহার্য, বাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সরকারীভাবে সরবরাহ করা হতো। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারবর্গকে নগদ অর্থ বা খাদ্যদ্রব্যাদি সরকারীভাবে সরবরাহ করা হতো। যুদ্ধাবস্থায় সৈন্যবাহিনীর যাবতীয় আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারকেই দিতে হতো। রোমানদের সাথে প্রায় সর্বদাই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এ জন্যে খলীফাদেরকে সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক শহর ও দুর্গ নির্মাণ করতে হয়। প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের সৈন্যদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতো। কিন্তু রোম সীমান্ত বাগদাদ ও ইরাক, ডাক বিভাগ, পথঘাটে প্রহরারত বাহিনী এবং খলীফার ব্যক্তিগত

প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যাবতীয় ব্যয় খলীফার কেন্দ্রীয় তহবিল থেকেই নির্বাহ করা হতো। প্রত্যেক নতুন সিংহাসনারোহী খলীফা সৈন্যবাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইনাম দিতেন।

বড় বড় কীর্তিমান পুরুষদেরকে জায়গীরও প্রদান করা হতো। তাঁদের জন্যে বেতন-ভাতাদিও নির্ধারিত থাকতো। শহর-নগর ও কেল্লা নির্মাণ ছাড়াও মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল, খাল, কুয়ো, মসজিদ প্রভৃতিও অহরহ নির্মিত হতে থাকতো। শিল্পী, আবিষ্কারক ও কারিগরদেরকে বড় অংকের ইনাম ও বেতন-ভাতা দেয়া হতো। ফলে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেত। হাকীম, চিকিৎসক, কবি, সাহিত্যিক এবং শাস্ত্রবিদদেরকে অকুণ্ঠে ইনাম ও সম্মান দেয়া হতো। কোন কোন খ্রিস্টান ও ইহুদী চিকিৎসক বাগদাদে এতই বিত্তবৈভব ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে পড়েছিল যে, একমাত্র খলীফা ছাড়া আর কারোরই এত বিত্তবৈভব ছিল না। বাগদাদে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এগুলোর রাজসিক ব্যয় নির্বাহ করা হতো। অনুরূপভাবে অন্যান্য শহরেও উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অস্ত্র নির্মাণ, বর্ম নির্মাণ, মিস্ত্রী তৈরীকরণ, ঔষধ তৈরী ও আতর তৈরির কারখানাসমূহ বড় বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এগুলোকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। রেশমী ও পশমী কাপড় নির্মাণের কারখানাদি এবং স্ফটিক ও কাচ জাতীয় তৈজস শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি স্বয়ং খলীফাদের মনোযোগের দরুন সম্ভবপর হয়।

খলীফার তোষাখানায় হাজার হাজার খিলাত, শাল-আলোয়ান, মনোহর কারুকার্য খচিত চাদর, বহুমূল্য তলোয়ার, বর্শা, ঢাল, ধনুক, প্রভৃতি কেবল এ জন্যে মওজুদ রাখতে হতো যাতে এগুলো ইনাম ও সম্মানের প্রতীকরূপে বড় বড় বীরপুরুষ, জ্ঞানীগুণী, শিল্পী ও আবিষ্কারকদেরকে প্রদান করা যায়। বিদেশ থেকে বহিরাগত সওদাগররা যে সব মূল্যবান পণ্যাদি নিয়ে আসতো, খলীফা তা উচ্চমূল্যে ক্রয় করে তোষাখানায় সংরক্ষণ করতেন। এগুলো পরে ইনামরূপে প্রদত্ত হতো।

সামরিক ব্যবস্থাপনা

সামরিক বাহিনীর সামগ্রিক সংখ্যা সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধি করা হতো। অনেক ব্যাটালিয়ন থাকতো। প্রতি ব্যাটালিয়নে প্রায় দশ হাজার করে সৈন্য থাকতো। ব্যাটালিয়ন প্রধানকে আমীরুল জায়শ বলা হতো। আমীরুল জায়শের অধীনে দশজন করে সর্দার থাকতো। প্রত্যেক সর্দারের অধীনে এক হাজার করে সৈন্য থাকতো। এই সর্দারদেরকে বলা হতো কায়েদ। আবার প্রত্যেক কায়েদের অধীনে দশজন করে নকীব থাকতেন। এক একজন নকীব একশ করে সৈন্যের সেনাপতিরূপে থাকতেন। প্রত্যেক নকীবের অধীনে দশজন করে আরিফ থাকতেন। একজন হতেন দশজন সৈন্যের অফিসার বা হাবিলদার স্বরূপ। ফৌজের ইউনিফর্মে খলীফারা অনেক সময় নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী পরিবর্তনও ঘটাতেন। উদাহরণস্বরূপ মু'তাসিম তুর্কী সৈন্যদের ইউনিফর্মে লেইস লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের সাথে একটি ইউনিট থাকতো পরিমাপকরূপে। একটি ইউনিট থাকতো খননকারীরূপে। এদের কাছে শাবল, গাঁইতি ও কুঠারাদি থাকতো। অনেক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ইউনিফর্ম হতো মূল্যবান কিংখাব বস্ত্রে নির্মিত। বাহনরূপে প্রচুর পরিমাণে উট ও

খচ্চর থাকতো। পদাতিক সৈন্যদের সাথে বল্লম, তলোয়ার ও ঢাল থাকতো। এদেরকে হারাবিয়া বাহিনী বলা হতো। যে পদাতিক বাহিনীর সাথে তরবারি ও বর্ম ছাড়াও তীর-ধনুকও থাকতো তাদেরকে বলা হতো রামিয়া বা নিক্ষেপক বাহিনী। প্রত্যেকটি সৈন্যের মস্তকে শিরস্ত্রাণ, দেহে মখমলমণ্ডিত চারটি লোহার পাত সম্বলিত বর্ম, হাতে লৌহনির্মিত বাজুবন্ধ ও দস্তানা এবং পায়ে মোজা থাকতো। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের সাথে প্রকৌশলীদের একটি সঙ্গত সংখ্যক বাহিনীও মওজুদ থাকতো। কয়েকজন চিকিৎসক এবং সার্জনও অবশ্যই সাথে থাকতেন। একটি ঔষধ ভাণ্ডার এবং ঔষধ নির্মাণের যাবতীয় সরঞ্জামও অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল এবং আহতদেরকে বহনের জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন, পাল্কী প্রভৃতি সাথে থাকতো। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের সাথে একটি অশ্বারোহী বাহিনীও থাকতো এবং এসব অশ্বারোহী হতো উঁচুমানের বল্লম নিক্ষেপকারী ও তীরন্দাজ।

খিলাফতের মধ্যে যখন দুর্বলতা দেখা দিল অর্থাৎ খলীফাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং বুওয়াইয়ারা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে পড়ে তখন ফৌজী সর্দারদেরকে জায়গীরদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগের সরকারী রাজস্ব তাদের বেতন-ভাতা বাবদ নিজেরাই নিয়ে নিতো। এ ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। তুর্কী অর্থাৎ সালজুকরা যখন খিলাফতের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাঁরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সমস্ত মুসলিম রাজ্যে এ নিয়ম চালু করে যে, প্রত্যেক আমিল বা ওয়ালী (গভর্নর)কে এক একজন সেনাপতিরূপে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগের রাজস্ব আদায় অনুপাতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী তাকে সার্বক্ষণিকভাবে তৈরি রাখতে হতো। অর্থাৎ ফৌজী সর্দারদেরকে জায়গীর দিয়ে সে এলাকার শাসন প্রশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পণ করে রাখা হতো। কেন্দ্রের তলব অনুসারে যে কোন সময় তারা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হতো। এভাবে সমগ্র রাজ্যের ক্ষমতা ফৌজী সর্দারদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং প্রাক্তন কর্মকর্তা ও জায়গীরদারগণ ক্ষমতাহারা হয়ে পড়েন। শাহী কেন্দ্রীয় কোষাগারের সাথে সামরিক বাহিনীর আর কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট রইল না বরং ফৌজ সর্দারগণ নিজেরাই নিজেদের বেতন-ভাতা নিজেদের জায়গীর থেকে উঠিয়ে নিতেন। তাদের বেতন-ভাতা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও তাদের হাতেই এসে পড়ে। খলীফাকে বাধ্য হয়েই নিজের ফৌজী বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করতে হয়– যাতে খলীফার ক্ষমতাও স্বাভাবিকভাবেই খর্ব হয়ে পড়ে। সালজুকীদের দুর্বল হয়ে পড়ার পর বাগদাদের খলীফা ইরাকে আবার তাঁর ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তা সংহত করে আবার সেই প্রশাসন থেকে সামরিক বাহিনীর পৃথক রাখার পুরনো নীতি চালু করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি

বাগদাদে হারূনুর রশীদের আমল থেকেই বায়তুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন চালু ছিল। মামূনের আমলে গ্রীক, সুরিয়ানী, হিব্রু, সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদের একটা বিভাগ বা অনুষদ চালু করা হয়। স্বয়ং খলীফা একাডেমিক আলোচনার ব্যবস্থাপনায় থাকতেন এবং আলোচনায় তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। আমীর, উযীর ও বড় লোকদের গৃহাঙ্গনে জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ হতো এবং জোরেশোরে জ্ঞানমূলক আলোচনা সমালোচনা হতো

শ্রোতারা তাতে আলোকদীপ্ত হতেন এবং তা উপভোগ করতেন। পুস্তকাদির গ্রন্থনা, সংকলন ও অনুবাদের জন্যে যেমন জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতদের এক বিরাট দল অহরহ লেগে থাকতেন তেমনি এগুলোর অনুলিখনের জন্যে সে হারে প্রচুর লোকজন নিয়োজিত থাকতেন। পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকদেরও অত্যন্ত কদর ছিল। তাই তাঁরা গ্রন্থাদির অনুলিখনের জন্য এক বিরাট সংখ্যক লিপিকারদের সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। জ্ঞানানুসন্ধান ও গবেষণার উদ্দেশ্যে লোকজন দূরবর্তী এলাকাসমূহে সফর করতো। ফিরে এসে তাঁরা তাদের দেশবাসী ও শাহী দরবারসমূহের জন্যে ভূষণস্বরূপ প্রতিপন্ন হতেন। আব্বাসীয় খিলাফত আমলে আরবী ব্যাকরণ নাহুশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং এ শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থাদি রচিত হয়। অনেক লেখক নিজ নিজ সফরনামা রচনা করেন। হাদীসশাস্ত্র সংকলিত হয়। উসূলে হাদীসের কিতাবাদি রচিত হয়। কালামশাস্ত্র, ফিকাহ্শাস্ত্র, উরুযশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়। কেবল রাজধানী বাগদাদেই নয়, দেশের সর্বত্র নগর-বন্দরে গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীর বিজ্ঞানের বিশালায়তন মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত ও প্রকাশিত হয়। দাওয়াখানা বা ফার্মাসিক্যাল কারখানাসমূহও এ যুগেরই আবিষ্কার। ইতিহাসশাস্ত্র সংকলন এবং তার বিন্যাস, সংস্কার ও অলংকরণও এ যুগেরই গর্বের ধন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আব্বাসীয়রা অনেক মূল্যবান ও উপাদেয় আবিষ্কারের হোতা। মামূনুর রশীদ দু' দু'বার ভূতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে পৃথিবীর ব্যাস ২৪ হাজার মাইল বলে প্রমাণ করেন। তিনি অনেক মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্থাপত্য বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও তিনি লিখান। দূরবীক্ষণ এবং ঘড়িও আব্বাসীয় যুগের আবিষ্কার। তাসাউফ, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় গ্রন্থাদি এ যুগে রচিত হয়। অংকশাস্ত্র, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শুধু গ্রন্থাদিই রচিত হয়নি বরং মুসলমান পণ্ডিতগণই এসব শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। এটা এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ দানের ক্ষেত্র নয়। এ জন্যে স্বতন্ত্র বিশালায়তন পুস্তক রচনা করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ উন্নতির ক্ষেত্রে স্পেনের উমাইয়া খলীফাগণের অবদানও আব্বাসী খলীফাদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু অধ্যয়ন করলাম তার সারমর্ম দাঁড়াচ্ছে এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনী অধ্যয়নের পর আমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর এমন কোন নিকটাত্মীয় যিনি তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারতেন– তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের শাসক বা খলীফা হননি। এটা ছিল ইসলামের শিক্ষার ফলশ্রুতি। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেক খলীফারই সন্তানগণ ছিলেন, তাঁদের সে সন্তানদের খলীফা হওয়ার মত যথেষ্ট যোগ্যতাও ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন খলীফা তাঁর নিজ সন্তানকে খলীফা মনোনীত করে যাননি এবং কেউ খিলাফতের উত্তরাধিকারীও হননি। কেবল হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর পর তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা)-কে কূফাবাসীরা খলীফা পদে বসায়,কিন্তু তিনিও মাত্র ছ'মাস পরেই এ খিলাফত হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। হযরত আমীর মুআবিয়া দ্বারা এ ভুলটি হয় যে, তিনি তাঁর পুত্রকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে সেই

ইসলামী খিলাফতকে– যা মুসলমানদের সংখ্যাগুরু জনতার সমর্থনেই স্থিরীকৃত হতে পারতো, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের মতো, ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের মতো আপন সন্তানের হাতে তুলে দেন। তবুও তিনি এ কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করেননি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনাধিকার কোন খান্দান বা গোষ্ঠীর একক সম্পদ নয়। এ জন্যে তিনি ইয়াযীদের খিলাফতের ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের সমর্থন আদায়ের প্রয়াস চালান। আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ভুলটিও তেমন মারাত্মক ছিল না। কেননা, সে যুগের মুসলমানগণ তা সংশোধনের চেষ্টাও শুরু করে দেন। এ চেষ্টার ফলে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছিল তার একটি সফলরূপ। সে ক্ষেত্রে হযরত আমীরে মুআবিয়ার বংশ ইসলামী খিলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ভুলটির সাথে যুক্ত হয়েছিল ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার ষড়যন্ত্র যা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত প্রয়াস। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যে একই সাথে দু'টি উপসর্গ কাজ করেছে। এর একটি আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর ত্রুটি এবং এটিকে অভ্যন্তরীণ উপসর্গ ও দল বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং অপরটি সাবায়ী ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে– এ দু'টি উপসর্গ ইসলামের এক বিরাট ফিতনার রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র কিছুটা কক্ষচ্যুত এবং অনেক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। বংশানুক্রমিক খলীফা মনোনয়নের কুপ্রয়াসকে মারোয়ান বংশীয়রা অনেকটা স্থায়ী রীতিতে পরিণত করে। ফলে অযোগ্য ও নিষ্কর্মা লোকদের খলীফা পদে বরিত হওয়ার সুযোগ জুটে যায়। ইসলামী খিলাফতের দাপট ও গাম্ভীর্যের তাতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সাবায়ী আন্দোলন থেকে ফায়দা লুটে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রেরই সাথে তাল দিয়ে সমান্তরাল একটা অবৈধ প্রশাসন চালুর অপচেষ্টা চলে। অবশেষে উমাইয়া খলীফাদের রাজত্বের অবসানে আব্বাসীয় খলীফাগণ খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হন। ফলে খিলাফত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে বনূ উমাইয়ারা গোটা মুসলিম জাহানের শাসনকার্য পরিচালনা করতো। ফলে মুসলমানদের কেন্দ্র ছিল একত্র ও অভিন্ন। কিন্তু আব্বাসীয় আমলের সূচনাতেই স্পেন কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সেখানে এক স্বতন্ত্র রাজত্ব গড়ে ওঠে। আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

তারপর একে একে মরক্কো, আফ্রিকা এবং তারপরে একে একে আরো অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। উমাইয়া খিলাফতের পর আব্বাসীয় খিলাফতের বর্ণনাও আমরা সমাপ্ত করেছি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে স্বতন্ত্রভাবে গড়েওঠা অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের কথা আমরা ছেড়ে এসেছি। তাই আব্বাসীয় খিলাফতের বর্ণনার পর এবার তৃতীয় খণ্ডে আমরা সেই সব বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের আলোচনা করবো। বিষয় ও ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার স্বার্থে এখানে শাসক বংশসমূহের একটি মোটামুটি চিত্র তুলে ধরা সমীচীন বোধ করছি।

হিস্পানিয়া (স্পেন)

মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে ৯৩ হিজরী (৭১১ খ্রি)তেই সেখানে নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলেন। এভাবে এ দেশটি বনূ উমাইয়া খলীফাদের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। ১৩৮ হিজরী (৭৫৫ খ্রি) পর্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানেও উমাইয়া খলীফাদের পক্ষ থেকে

আমীর ও আমিল তথা গভর্নর নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা উমাইয়া খলীফাদের হয়ে সেখানে রাজত্ব করতেন। আব্বাসীয়রা যখন উমাইয়া খিলাফতের বিলোপসাধন করলেন এবং নিজেরা সেখানে দখলদারী কায়েম করলেন তখন দশম উমাইয়া খলীফা হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান কোন প্রকারে স্পেনে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানে নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এটা ১৩৮ হিজরী (৭৫৫ খ্রি)-এর ঘটনা। আব্বাসীয় বাহিনী তাঁর ওপর আক্রমণ চালালে তিনি তাদেরকেও পরাস্ত করেন এবং কর্ডোভাকে রাজধানী করে সেখানে তাঁর শান-শওকতপূর্ণ রাজত্বের সূচনা করেন। ৪২২ হিজরী (১০৩০ খ্রি) পর্যন্ত তাঁরই বংশের লোকজন সে দেশ শাসন করে। স্পেনের এ খলীফাদের শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি গোটা ইউরোপ মহাদেশকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলে। তাঁদের জ্ঞানানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা গোটা বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের কীর্তিগাঁথা আব্বাসীয়দের কীর্তিগাঁথার চাইতেও অধিকতর চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। ৪২২ হিজরীতে (১০৩০ খ্রি) স্পেনে অরাজকতার সূত্রপাত হয় এবং উমাইয়াদের শান-শওকতপূর্ণ রাজত্বের অবসান ঘটে। স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের অবসানে সেখানে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি মুসলিম রাজ্য গড়ে ওঠে। ঐ সব ছোট ছোট রাজ্য কর্ডোভা, আশবেলা (সেভিল), গ্রানাডা, বালানশিয়া, তলীতলা (টলেডো), মাল্কা (মালাগা) প্রভৃতি শহরে তাদের রাজধানী গড়ে তোলে। কিছুদিনের মধ্যেই উভয় আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যগুলো স্পেনের অধিকাংশে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে খ্রিস্টান রাজারা মুসলমানদের আত্মকলহের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের এ আত্মকলহে আরো ইন্ধন যুগিয়ে তাদেরকে আরো দুর্বল করে তোলে। তারপর তারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চালায় তা ছিল অভূতপূর্ব। মানব জাতির ইতিহাসে নির্যাতনের এরূপ কলংকজনক নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর— যেমনটি স্পেনের বিজয়ী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রতি করেছে। স্পেনের সে মর্মবিদারী ইতিহাস আজো মুসলমানদের রক্তাশ্রু বহিয়ে চলেছে। স্পেনের মুসলমানদের ধ্বংসের সে মর্মন্তুদ কাহিনী মুসলিম হৃদয়কে ব্যথাতুর না করে পারে না।

মরক্কোয় স্পেনীয় সালতানাত

১৭২ হিজরী (৭৮৮ খ্রি)-তে মরক্কোও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে এবং সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজত্ব গড়ে ওঠে। এ রাজ্যটি হিস্পানিয়া রাজ্যের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও যেমনভাবে তা আব্বাসীয় খিলাফতের বিরোধী ছিল যেমন বিরোধী ছিল স্পেন বা আন্দালুসিয়া সালতানাতেরও। প্রায় দু' শতাব্দী ধরে এ রাজ্যটি টিকেছিল। সোয়াশ বছর পর্যন্ত সেখানে ইদরীসীদের স্বাধীন হুকুমত কায়েম ছিল। তারপর আফ্রিকায় উবায়দী রাজত্বের সূচনা হলে তারা একে তাদের করদ রাজ্যে পরিণত করে। এরপর এ রাজ্যটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং কিছুদিন মামুলী রঈসদের সামন্তরাজ্য রূপে অস্তিত্ব রক্ষা করে অবশেষে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আফ্রিকীয় আগলাবী রাজত্ব

১৮৪ হিজরী (৮০০ খ্রি)তে আফ্রিকা প্রদেশ (তিউনিসিয়া)ও আব্বাসীয় খিলাফতের কবল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের বংশধররা শতাধিক বছর ধরে সেখানে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রাজত্ব করে। ২১৯ হিজরী (৮৩৪ খ্রি)তে আগলাবী

সালতানাত সাকালিয়া (সিসিলী) দ্বীপ খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তাদের রাজত্বভুক্ত করে ফেলে। তাদের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত তারা এ দ্বীপ তাদের দখলে রাখে। এ বংশে বেশ ক'জন সুযোগ্য এবং প্রজ্ঞাবান শাসকের উদ্ভব হয়। যখন উবায়দীরা সেখানে অভ্যুত্থান ঘটায় তখন তাঁরা আগলাবী সালতানাতের ভিত্তির উপরই তাদের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল। তারা ইদরীসীয়দের শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দিয়ে আগলাবীদের রাজধানী কায়রোয়ানকেই নিজেদের রাজধানীরূপে গ্রহণ করে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা মিসর পর্যন্ত জয় করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত মিসরে তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। আগলাবীয়দের রাজত্বের ইতিহাস ইদরীসীয়দের ইতিহাস থেকেও অধিকতর চমকপ্রদ। ২৯৬ হিজরী (৯০৮ খ্রি)তে এ রাজত্বের অবসান ঘটে। এ বংশ কেবল (সিসিলী) দ্বীপই দখল করে ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা মাল্টা এবং সার্ডিনিয়াও দখল করে নিয়েছিল। তাদের নৌ-শক্তি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সমস্ত ভূমধ্যসাগরে আগলাবী সুলতানদের দখল কায়েম ছিল। কোন কোন সময় তাদের নৌ-শক্তি গ্রীস ও ফ্রান্সের উপকূলেও আক্রমণ চালিয়ে আসতো।

ইয়ামানে যিয়াদিয়া রাজত্ব

২০৩ হিজরীতে (৮১৮ খ্রি) যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের অধঃস্তন বংশধর মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত হন। ৪০২ হিজরী (১০১১ খ্রি) পর্যন্ত এ বংশ ইয়ামানে রাজত্ব করে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ যুবায়দ নামক শহর প্রতিষ্ঠা করে ঐ শহরকেই তার রাজধানী করেন। তিনি ইয়ামানের পার্শ্ববর্তী তিহামা প্রদেশও বাহুবলে জয় করেন। হাদরামাউত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাও তিনি জয় করেন। এ বংশে অনেকে ভাগ্যবান এবং প্রতাপশালী বাদশাহ রূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ২৮৮ হিজরী (৯০০ খ্রি)তে তাদের রাজত্বের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে আলভীরা যায়দিয়া হুকুমত কায়েম করে। এরপর ধীরে ধীরে এ রাজ্যটি সংকুচিত হতে থাকে। যায়দিয়া হুকুমত আসলে স্বায়ত্তশাসিত থাকলেও আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খুতবা পাঠ করা হতো। যিয়াদ ছাড়া যাইদ যখন ইয়ামানের একটি অংশে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করলেন তখন তিনিও তাঁর রাজত্বের সীমায় এ খুতবা উঠিয়ে দিলেন। যিয়াদিয়া হুকুমত যখন দুর্বল হয়ে পড়লো তখন তাদের দাস ও তস্যদাসরা রাজত্ব করতে শুরু করে। এরপর ইয়ামানে একের পর এক অনেক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যিয়াদিয়া বংশের রাজত্বকাল চমৎকারিত্বশূন্য নয়। যিয়াদিয়াদের পর ইয়াকুবিয়া, নাজাহিয়া, সুলায়হিয়া, হামদানিয়া, মাহদিয়া, যুরিয়া, আইয়ুবিয়া, রাসূলিয়া, তাহিরিয়া প্রভৃতি খান্দান একের পর এক ১০০০ হিজরী (১৫৯১ খ্রি) পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ইয়ামানে রাজত্ব করে। এই শাসক বংশের অনেকে শিয়া, আবার অনেকে সুন্নী ছিলেন। তাদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই।

খুরাসানে তাহিরিয়া হুকুমত

৪০৫ হিজরী (১০১৪ খ্রি)তে মামূনুর রশীদ আব্বাসী তাহির ইব্‌ন হুসাইনকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে খুরাসান তাদের বংশের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। তাহিরিয়া বংশীয় শাসকরা আসলে খুরাসানে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে

থাকে। এ জন্যে খুরাসানকে ঐ সময় থেকেই বাগদাদ বিচ্ছিন্ন ছিল বলে মনে করতে হবে। তাহিরীয়া শাসকরা নিজেদেরকে বাগদাদের খলীফার অধীন বলে বিবেচনা করলেও এবং খলীফার নামে তারা খুতবা পাঠ করলেও বাগদাদের খলীফা কোনদিন খুরাসানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না।

খুরাসান ও পারস্যে সাফারীয় হুকুমত

২৫৪ হিজরী (৮৬৮ খ্রি)তে ইয়াকূব ইব্‌ন লাইস সাফার পারস্য দখল করে এ প্রদেশকে আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ২৫৯ হিজরীতে (৮৭২ খ্রি) খুরাসানও দখল করে তিনি তাহিরীয় হুকুমতের বিলোপ সাধন করেন। সাফারীয় খান্দান প্রায় ৪০ বছরকাল ধরে রাজত্ব করে। এরপর সামানী বংশীয়রা তাদের বিলোপ সাধন করে। তাহিরীয় ও সাফারীয়দের সম্পর্কে বিগত পৃষ্ঠাসমূহে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে বিধায় তাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র বর্ণনার প্রয়োজন নেই। সুতরাং পাঠকবর্গ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এদের ইতিহাস আর খুঁজবেন না।

মাওরাউন নাহর ও খুরাসানে সামানীয় রাজত্ব

সামানীয়দের অবস্থাও উপরে কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। ২৯০ হিজরী (৯০২ খ্রি)-তে যখন মাওরাউন নাহরের সামানীয় রাজ্য সাফারীয়দের নিকট থেকে খুরাসান এবং উলুভীদের নিকট থেকে তাবারিস্তান ছিনিয়ে নেয়, তখন মাওরাউন নাহর অর্থাৎ সমরকন্দ ও বুখারা থেকে নিয়ে পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সে রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সে সময় থেকে মাওরাউন নাহর প্রদেশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে পড়ে। সামানীয় বংশীয়রা সোয়াশ বছরকাল ধরে রাজত্ব করে। এ রাজবংশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বুখারা ও সমরকন্দ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানে পরিণত হয় এবং এ এলাকায় এমন সব জ্ঞানী-গুণী জন্মগ্রহণ করেন যে,অদ্যাবধি তাদের সুনাম পৃথিবীতে রয়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পরে খুরাসান পারস্য ও তাবারিস্তান সামানীয় রাজত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তা বনী বুওয়াইয়াদের দখলে চলে যায়। তারপর এ খান্দানে তুর্কী গোলামদের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে তাদের পতন ঘনিয়ে আসে। ৩৮৪ হিজরী (৯৯৪ খ্রি)তে এই খান্দানের জনৈক তুর্কী গোলাম আলপ্তগীন আম্মান নদীর উত্তর তীরের অবশিষ্ট এলাকাও অধিকার করে নিয়ে এ বংশকে উচ্ছেদ করে দেন। সামানীয়দের ইতিহাস এ জন্যেও উল্লেখের দাবি রাখে যে, ঐ রাজত্ব থেকেই আলপ্তগীনের রাজত্বের উদ্ভব হয়। সবুক্তগীন হচ্ছেন আলপ্তগীনেরই উত্তরাধিকারী যাঁর পুত্র সুলতান মাহমূদকে ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশুও ঔৎসুক্যের নজরে দেখে থাকে।

বাহরায়নে কারামিতা রাজত্ব

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খ্রি) বাহরায়ন প্রদেশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারামিতারা সেখানে তাদের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলে। তাদের নারকীয় নির্যাতন নিবর্তনে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কারামিতাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বর্ণনা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। ৩৬৪ হিজরী (৯৭৪ খ্রি) পর্যন্ত এদের রাজত্ব টিকেছিল। এরপর অন্যান্য খান্দানের লোকেরা বাহরায়ন শাসন করে। বাহরায়ন ও আশেপাশের এলাকায় অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়।

তাবারিস্তানে উলুভী রাজত্ব

২৫০ হিজরী (৮৬৪ খ্রি) থেকে ৩১৬ হিজরী (৯২৮ খ্রি) পর্যন্ত তাবারিস্তান রাজ্যে রাজত্ব করে যায়দিয়া উলুভী বংশীয়রা। সামানীয়দের হাতে এদের পতন ঘটে। তারপরও কয়েকটি রাজবংশ এ এলাকায় সংঘর্ষরত থাকে এবং তাদের মধ্য থেকেই বনী বুওয়াইয়াদের উদ্ভব হয়। এদের অবস্থা ওপরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

সিন্ধু প্রদেশ

২৬৫ হিজরী (৮৭৮ খ্রি)তে সিন্ধু প্রদেশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ এলাকায় মুলতান ও মানসূরাকে রাজধানী করে দু'দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাজত্ব গড়ে ওঠে। মানসূরা রাজ্যের একটি অংশ ছিল সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চল। আর এর উত্তরাঞ্চল ছিল মুলতান রাজ্যভুক্ত। এছাড়াও তূরান, কাসদার, কায়কান, মাকরান, মুশকী প্রভৃতি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যও আরব সর্দাররা কায়েম করে নিয়েছিলেন। এ ছোট রাজ্যগুলো উপরোক্ত বড় বড় রাজ্যের অধীন করদ রাজ্যরূপে ছিল। এভাবে সিন্ধু প্রদেশ স্বাধীন ও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ সব রাজ্যে খুতবা ঠিকই বাগদাদের খলীফার নামে পাঠ করা হতো। এ সব রাজ্য ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে হতে একশ-সোয়াশ বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মুলতান রাজ্য সুলতান মাহমূদ গজনভীর ভারত আক্রমণ বরং হিন্দুদের দ্বারা তার ভারত আগমন অপরিহার্য করে তোলা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

দায়লামী বুওয়াইয়া রাজত্ব

দায়লামী ৩২২ হিজরী (৯৩৩ খ্রি) থেকে ৪৪৭ হিজরী (১০৫৫ খ্রি) পর্যন্ত প্রায় দুশ বছরকাল ধরে পারস্য ও ইরাকে রাজত্ব করে। এ দায়লামীরা রাজধানী থেকে দূরবর্তী কোন প্রদেশকে খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে স্বয়ং খলীফাও ইরাক প্রদেশকে কুক্ষিগত করে একেবারে শাব্দিক ও প্রকৃত অর্থেই আব্বাসী খিলাফতের বিলোপ সাধন করে। অবশ্য, খলীফার নাম এবং নামে মাত্র খিলাফত তারা বাঁচিয়েই রাখে। কিন্তু তাদের জন্যে আব্বাসীয় খিলাফতের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়– যার বিবরণ ইতিপূর্বেই মোটামুটি আলোচিত হয়েছে। যেহেতু তারা খলীফা ও খিলাফতকেই কুক্ষিগত করে রেখেছিল এবং খলীফা তাদের হাতে কাষ্ঠ পুত্তলিকাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আব্বাসীয় খলীফাদের আলোচনা স্থলে বনূ বুওয়াইয়াদের অবস্থা এবং তাদের রাজত্বের কথা ধারাবাহিকভাবেই একে একে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আর তাদের আলোচনার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি।

মিসরে তূলূনিয়া রাজত্ব

ইব্‌ন তূলূন সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তূলূন বংশীয়রা ২৫৪ হিজরী (৮৬৮ খ্রি) থেকে ২৯২ হিজরী (৯০৪ খ্রি) পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব করেছে। এটা যদিও স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন ছিল এবং ২৫৪ হিজরী (৮৬৮ খ্রি.)-তেই মিসর প্রদেশ কার্যত আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল এতদসত্ত্বেও মিসরে খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নাম পাঠ করা হতো। তূলূন বংশীয়রা সিরিয়াকেও তাদের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। এভাবে সিরিয়া ও মিসরে এমন একটি রাজ্য গড়ে ওঠে যারা মুখে বাগদাদের খলীফার অধীন বলে নিজেদের

পরিচয় ব্যক্ত করলেও বাগদাদের খলীফার দরবার থেকে মিসর ও সিরিয়াকে কার্যত বিচ্ছিন্নই করে দিয়েছিল।

মিসর ও সিরিয়ায় আখশাদিয়া রাজত্ব

মিসর ও সিরিয়ায় তূলূন বংশীয়দের রাজত্বের অবসান ঘটলে কিছুদিনের জন্যে বাগদাদ থেকে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন। এভাবে বাহ্যত এ দু'টি প্রদেশ পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের অধীন চলে আসে। ৩১৬ হিজরী (৯২৮ খ্রি.) বাগদাদের খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন তুফাজকে রামাল্লায় শাসক নিযুক্ত করেন। ৩১৮ হিজরী (৯৩০ খ্রি.)-তে তাকে দামেশকের শাসনবার অর্পণ করা হয় এবং ৩২৩ হিজরী (৯৩৪ খ্রি.)-তে মিসরের শাসনভারও অর্পণ করা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন তুফাজ মাওরাউন নাহর এলাকার ফারগানার প্রাচীন শাসক বংশের লোক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ফারগানার অধীন। সে যুগে ফারগানার শাসকদের উপাধি ছিল আখশিদ। মুহাম্মদ ইব্ন তুফাজ মিসরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে ৩২৭ হিজরী (৯৩৮ খ্রি)-তে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজেকে আখশিদ বলে ঘোষণা করেন। ৩৩০ হিজরী (৯৪১ খ্রি.)-তে তিনি সিরিয়াও দখল করে বসেন। ৩৩১ হিজরী (৯৪২ খ্রি.) হিজাযকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এতে তার খুব বেশি একটা কালক্ষেপণও করতে হয়নি। কেননা দায়লামীয় খিলাফতকে নিস্তেজ ও প্রভাববিহীন করে ফেলেছিল। ফলে খলীফার ভয় সকলের অন্তর থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। আখশিদীয়রা ৩৫৬ হিজরী (৯৬৬ খ্রি.) পর্যন্ত এ সব রাজ্যে তাদের শাসন চালিয়ে যায়। তারপর উবায়দীয়রা প্রথমে মিসর এবং তার কিছুদিন পরেই সিরিয়াও জয় করে নেয়।

মিসর, আফ্রিকা ও সিরিয়ায় উবায়দিয়া রাজত্ব

২৯৬ হিজরী (৯০৮ খ্রি.)-তে আফ্রিকা (তিউনিসে) আগলাবিয়া হুকুমতের অবসানে সেখানে উবায়দিয়া রাজত্বের সূচনা হয়। উবায়দীয়রা ৩৫৬ হিজরী (৯৬৬ খ্রি.)-তে মিসরে জনৈক অল্পবয়স্ক আখশিদীয় শিশু শাসকের নিকট থেকে মিসর ছিনিয়ে নেয় এবং কায়রোকে তাদের রাজধানী করে শহরের চারদিকে প্রাচীর গড়ে তোলে। ৩৮১ হিজরী (৯৯১ খ্রি.) উবায়দীয়রা আলেপ্পো অধিকার করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে মরক্কো সীমান্ত থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। উবায়দীয়রা যেহেতু কায়রোয়ানের পরিবর্তে কায়রোকে তাদের রাজধানী বানিয়ে নিয়েছিল তাই ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ এবং পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলো তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব এলাকায় তাদের অধিকার স্বীকৃত হয়। এভাবে পূর্বাঞ্চলের শাসনক্ষমতা সংহত হওয়ায় পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পশ্চিমের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এলাকাগুলোর অধিকাংশই খ্রিস্টানদের করতলগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলো উবায়দীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ফলে উবায়দীয়দের মিসর জয়ে ঈসায়ীদের উপকার হয়, কিন্তু মুসলমানদের তাতে ক্ষতিই হয়। উবায়দীয়রা খিলাফতেরও দাবি করে এবং তাদের অধীনস্থ লোকদের নিকট থেকে খিলাফতের বায়আতও গ্রহণ করে। নিজেদেরকে তারা খলীফা বলেই পরিচয় দেয়। এভাবে একই সময়ে পৃথিবীতে তিন তিনটি খিলাফত আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রথম এবং প্রধান ধারার সূচনা হয়েছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ

খলীফা আবদুল মজীদ পর্যন্ত যা অব্যাহত গতিতে চলে এসেছিল। এ সিলসিলার প্রথমাংশের নাম খিলাফতে রাশেদা, দ্বিতীয়াংশ খিলাফতে বনী উমাইয়া, তৃতীয় অংশের নাম বাগদাদের খিলাফতে আব্বাসীয়, চতুর্থ অংশের নাম মিসরের খিলাফতে আব্বাসীয় এবং পঞ্চম অংশের নাম খিলাফতে উসমানীয় বা উসমানী খিলাফত। এ দীর্ঘ ধারা পরবর্তী খণ্ডসমূহে আলোচিত হবে।

খিলাফতের দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমানের মাধ্যমে যার সূচনা এবং তারই বংশ দ্বারা যার পরিসমাপ্তি ঘটে। খিলাফতের এ ধারাটি কোন কোন উলামায়ে কিরাম খিলাফতের সিলসিলা বলে স্বীকার করেছেন। তারা স্পেনের খলীফাগণকে ইসলামেরই খলীফার মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের শাসনাধীন মুসলমানদের জন্যে তাঁদের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণকে না-জায়েয ও গোনাহ্‌র কাজ বলে উলামাগণ মনে করেন।

খিলাফতের তৃতীয় যে ধারাটির সূচনা উবায়দীয়রা চালু করে ইসলামী পণ্ডিতগণ এটাকে আদৌ খিলাফত বলে স্বীকার করেন নাই। উবায়দীয়দেরকে তারা আদৌ খলীফা মনে করেন না এবং ইসলামী আইন ও অনুশাসনের আলোকে এদের সে মর্যাদা ছিল বলে তাঁরা ধারণা করেন না যে, এদের আনুগত্য অবশ্য পালনীয় হবে। এরা (উবায়দীয়রা) শির্‌ক ও বিদআতের প্রবর্তন করেছে, ইসলামী প্রতীকসমূহের অমর্যাদা করেছে এবং নানা ধরনের পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। মিসরে ৫৬৭ হিজরী (১১৭১ খ্রি.) পর্যন্ত এদের রাজত্ব কায়েম ছিল। এরপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী উবায়দী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আইয়ূবী রাজত্বের সূচনা করেন। মিসরে পুনরায় খিলাফতে আব্বাসীয়ার খুতবা চালু হয়।

মুসেল, জাযিরা ও সিরিয়ায় বনূ হামদান রাজত্ব

আবুল হায়জা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন হামদূন ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন লূকমান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন হাযম ২৮৯ হিজরী (৯০১ খ্রি.) মুসেল প্রদেশে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের পত্তন করেন এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে বনূ হামদানরা মুসেল, জাযিরা ও সিরিয়ায় রাজত্ব করে। তারা তাদের রাজত্বে খুতবায় ঠিকই আব্বাসীয় খলীফার নাম পাঠ করতো। এ বংশের বাদশাহদের মধ্যে সাইফুদ্দৌলা ও নাসিরুদ্দৌলা অত্যন্ত খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। বনূ আখশাদিয়াদের হাত থেকে সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলই এরা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জাযিরাও তাদের দখলে এসে যায়। বনূ বুওয়াইয়া অর্থাৎ দায়লামীদের সাথেও তাদের অনেক সংঘর্ষ হয়। এ সব সংঘর্ষে তারা কোন অংশেই বনূ বুওয়াইয়া থেকে কম যেতেন না। কখনও কখনও বাগদাদের খলীফার উপরও তারা প্রভাব বিস্তার করে বসতেন। তাদের আমলে রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ বা রোমকদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারটা আর বাগদাদের খলীফার সাথে কোনক্রমেই জড়িত ছিল না। বনূ হামদানরাই রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন আর তারাই আবার রোমানদের হামলা প্রতিহতও করতেন। এদের মধ্যে সাইফুদ্দৌলা রোমানদের বিরুদ্ধে বেশ কটি সফল বড় রকমের জিহাদ পরিচালনা করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বেশ খ্যাতিও অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত সিরিয়া প্রদেশ তাদের হাতেই ছিল। অবশেষে বনূ হামদানের রাজত্ব তাদের গোলামদের দখলে চলে যায়। ঐ গোলাম বাদশাহরা সিরিয়া

প্রদেশে উবায়দীদের নামে খুতবা জারি করে। অবশেষে ২৮০ হিজরী (৮৯৩ খ্রি.)-তে ঐ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মুসেলে বনূ আকীল ইব্‌ন কাআব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আমের এর রাজত্ব গড়ে ওঠে। তারা জাযিরা প্রদেশ অধিকার করে নেয়। তারপর সিরিয়া প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বেশ ক'জন আরব সর্দার তাদের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। নামেমাত্র এরা কোন বড় রাষ্ট্রের অধীন হতেন। আবার কখনো স্বাধীনতাও ঘোষণা করে বসতেন। সালজুকীদের বাগদাদ দখল পর্যন্ত এ অবস্থায় চলতে থাকে। অবশেষে তাদের বাগদাদ অধিকার করার পর তারা সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের পক্ষ থেকে আমিল নিযুক্ত করতে থাকেন। এভাবে সে সব এলাকাও সালজুক রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মক্কায় বনূ সুলায়মান রাজত্ব

মক্কা মুয়ায্‌যমায় বাগদাদের খলীফার দরবার থেকে আমিল বা গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন। কিন্তু ৩০১ হিজরী (৯১৩ খ্রি.)-তে জনৈক মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন সুলায়মান দাউদ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের বংশধরদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মানকে সুলায়মান ইব্‌ন দাউদের পুত্র মনে করা ঠিক হবে না। এ দুই সুলায়মানের মধ্যে এ কুলপঞ্জীতে আরো ২/৩ পুরুষ রয়েছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ স্বাধীন রাজ্যটি ৪৩০ হিজরী (১০৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ সোয়াশ বছরাধিককাল সময়ে মক্কা শরীফে বেশ কটি বড় বড় দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ বংশের চার-পাঁচজন শাসক মক্কায় রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এদের রাজত্ব ছিল অদ্ভুত ধরনের। হজ্জের মওসুমে মিসর ও বাগদাদের হাজীদের কাফেলা আসতো। হজ্জের নেতৃত্ব ও খুতবা কে দিবেন তা নিয়ে প্রায়ই কলহ বাঁধতো। উভয় পক্ষে যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁধে যেত এবং সেখানে মক্কার শাসকের কোন ভূমিকাই থাকতো না। বাগদাদের পক্ষ হজ্জের আমীররূপে সংঘর্ষে জয়যুক্ত হলে বনূ বুওয়াইয়া ও বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। পক্ষান্তরে মিসর পক্ষ জয়ী ও আমীর হলে বনূ আখশিদিয়াদের নাম খুতবায় পাঠ করা হতো। তারপর যখন মিসরে উবায়দী রাজত্ব কায়েম হলো তখন উবায়দী ও আব্বাসীয়দের মধ্যে খুতবা কার নামে পাঠ করা হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব হতো। এদিকে কারামিতারা এসে পড়লে তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। তারা হাজীদেরকে হত্যা ও লুটপাট করতো। কখনো মিসরীয়রা হাজরে আসওয়াদের অবমাননা করতো, তাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করতো এবং হাজরে আসওয়াদের নাম ধরে গালাগাল দিত। তখন ইরাকীরা উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে দিত। ঐ আমলে কারামিতারা হাজরে আসওয়াদ তুলে বাহরায়নে নিয়ে যায় এবং বিশ বছর বা ততোধিক সময় পরে তা মক্কায় ফিরিয়ে দেয়। মোদ্দাকথা, হজ্জের মওসুমে মক্কায় বনূ সুলায়মানের আধিপত্যের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হতো না। এরা ছিলেন যায়দিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই উবায়দীদের প্রতি এদের ঝোঁক ছিল। কিন্তু কার্যত তারা যে পক্ষকে শক্তিশালী দেখতে পেতেন তাদের পক্ষই তারা সমর্থন করতেন।

মক্কায় হাশিমী রাজত্ব

সুলায়মানীদের পর মক্কায় আবূ হাশিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবিল কিরাম ইব্‌ন মূসা জূনের বংশধররা তাদের রাজত্ব কায়েম করে। এরাও বনূ সুলায়মানের মতো মক্কার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সালজুকী শাসনের প্রথম দিকে এরা বাগদাদের খলীফার নামেই খুতবা পাঠ করতেন আবার সালজুকীরা দুর্বল হয়ে গেলে আবার তারা উবায়দীদের নামে খুতবা পাঠ শুরু করে দেন। ৫৬৭ হিজরী (১১৭১ খ্রি.)-তে যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে উবায়দী রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে মক্কার হাশিমী রাজত্বেরও অবসান ঘটে অর্থাৎ হিজায এবং ইয়ামানও সুলতান সালাহুদ্দীনের করতলগত হয় মক্কায় তখন সুলতানের পক্ষ থেকে আমিল নিযুক্ত হয়ে আসতেন। কিছুদিন পর মক্কায় বনূ কাতাদার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বনূ নুমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর অন্যরাও মক্কায় নিজেদের অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। উসমানী বংশীয় সুলতান সালীমের হিজায অধিকার পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। তারপর উসমানী আমলে মক্কায় তাঁদের পক্ষ থেকে যিনি শাসক হয়ে আসতেন তাকে বলা হতো শরীফে মক্কা বা মক্কার শরীফ। শেষ পর্যন্ত আমাদের যুগে (মূল পুস্তক রচনার যুগে) মক্কার শরীফ হুসাইন উসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন। এজন্য মুসলিম বিশ্বের তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। বাহ্যত তিনি খ্রিস্টানদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সায়্যিদ বংশীয় ও হাশিমী বংশীয়দের নামকে কলংকিত করেন।

দিয়ারে বকরে মারওয়ানীয়া রাজত্ব

কুর্দী গোত্রোদ্ভূত জনৈক আবূ আলা ইব্‌ন মারওয়ান দিয়ারে বকর এলাকায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৮০ হিজরী (৯৯০ খ্রি.) থেকে ৪৮৯ হিজরী (১০৯৫ খ্রি.) পর্যন্ত শতাব্দীরও অধিককাল ধরে এ বংশের রাজত্ব টিকেছিল। আমুদ, আরজান, মায়া ফারিকীন, কায়ফা প্রভৃতি শহর এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বংশের শাসকগণ মিসরের উবায়দী শাসকদের আধিপত্য স্বীকার করতেন বলে উবায়দীরা এদেরকে আলেপ্পোও প্রদান করে। এভাবে তারা অনেকটা হামদানীদের স্থলবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এরা বুওয়াইয়াদের অধীনতাও স্বীকার করতেন। সালজুকীদের হামলার মুখে এদের রাজত্বের অবসান ঘটে।

সালজুকী রাজত্ব

সালজুকীদের রাজত্ব ৪৩০ হিজরী (১০৩৮ খ্রি.) থেকে শুরু করে ৭০০ হিজরী (১৩০০ খ্রি.) পর্যন্ত আড়াইশ বছরাধিককাল ধরে টিকেছিল। তাদের রাজত্বের শুরুর দিকটা ছিল অত্যন্ত শান-শওকতপূর্ণ। শেষ দিকে তাদের রাজত্ব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। সূচনালগ্ন থেকেই তাদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যাদের সবচাইতে বড় ধারাটিতে আল্প আরসালান ও মালিক শাহের মত বিশ্ববিখ্যাত সুলতানদের উদ্ভব হয়েছিল। এদেরকে ইরানী সালজুকী সুলতান বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাদের আলোচনা অনেকটা আমরা ইতিপূর্বেই করে এসেছি। ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। এদের ছাড়াও ইরাকী সালজুকী, সিরীয় সালজুকী, রোমান সালজুকী প্রভৃতি সালজুকী রাজাগণও বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। এ সব খান্দানের ইতিহাস কম চমকপ্রদ ও কম আকর্ষণীয়

নয়। আর এ সব সালজুকী গোলামদের এবং আতাবেকদের সালতানাতসমূহ কায়েম হয়। সেগুলোও অত্যন্ত মশহুর এবং ইসলামী ইতিহাসের ভূষণস্বরূপ। সালজুকীদের অবির্ভাব হয় ঠিক সেই মুহূর্তে যখন দায়লামীদের অত্যাচার অনাচারের মুখে বাগদাদের খিলাফত অত্যন্ত অপদস্থ ও অসহায় হয়ে পড়ে। ইসলামী রাষ্ট্রকে লোকজন শতধা বিচ্ছিন্ন করে পৃথক অনেক স্বাধীন ছোট ছোট রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। কিছু সংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র যে বেশ বিপুল আয়তন নিয়েও গড়ে উঠেছিল তা এ অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে। সালজুকীরা আব্বাসীয় খিলাফতের হৃত মর্যাদা, ঔজ্জ্বল্য ও দাপট ফিরিয়ে আনেন এবং অনেক ছোট ছোট রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করে খলীফাকে প্রভাব-প্রতিপত্তির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সালজুকীদের রাজত্বের উপাদানসমূহের সবটাই যেহেতু ছিল সামরিক উপাদান এবং ফৌজী সর্দারদেরকেই প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হতো তাই কিছুদিনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সালজুকী সেনাপতিরা বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে। ফলে পূর্বের অরাজকতা আবার গোটা রাষ্ট্রে ফিরে আসে। সালজুকীরা ছিলেন নওমুসলিম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁরা উলুভী ষড়যন্ত্র এবং সাবায়ী কূটচক্র থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা দীন ইসলামের খিদমতের পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত হন এবং এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পুণ্যবান ও জ্ঞানীগুণীদের বিপুল খিদমত আঞ্জাম দেন। তাঁরা আব্বাসীয় খলীফাগণকে কেবল এ কারণে সম্মান করতেন যে, ইসলামী পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা মুসলমান মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয়, উমাইয়া ও উলুভীদের পারস্পরিক রেষারেষির দ্বারা তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত হননি। না এদের কোন পক্ষের সাথে তাদের বৈরিতা ছিল, না কোন পক্ষের সাথে অপ্রয়োজনীয় মাখামাখি ছিল। এক কথায় তাঁরা ছিলেন সাদাসিধে মুসলমান এবং ইসলামের পাকা পাবন্দ। তাঁরা খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন তাতে খ্রিস্টান জগতে মুসলমানদের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঈসাইদের অগ্রসরমান সয়লাব এমনভাবে প্রতিহত হয় যে, তারা অনেক দূর পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সালজুকীদের জন্যেই ইরাকে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফত টিকেছিল।

যে সব চিরাচরিত কারণ বিভিন্ন সময়ে নানা রাজবংশের পতনের কারণ হয়েছে অর্থাৎ পারস্পরিক অনৈক্য ও আত্মকলহ সালজুকীদেরও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, সালজুকীরা মূলত একটি সামরিক শক্তি ছিল। যে সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করে তারা চলতেন তার অফিসাররা ছিলেন তুর্কী গোলাম। তীচাক উপত্যকা থেকে তাদেরকে ক্রয় করে আনা হতো। সে সব ক্রীতদাসের ওপরই তারা সর্বাধিক আস্থাশীল ছিলেন। তাদের বিশ্বস্ততায় তাঁরা একটুও সন্দেহ করতেন না। এজন্যে সামরিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব থেকে শুরু করে প্রদেশসমূহের গভর্নরী পর্যন্ত তাদেরকে তাঁরা নির্দ্বিধায় প্রদান করতেন। এই ক্রীতদাসরা যখন মার্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সর্দারী লাভ করতেন তখন তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বীররূপে প্রতিপন্ন হতো। সালজুকী সুলতানরা তাদের কিশোর পুত্রসন্তানদের গৃহশিক্ষকরূপেও এদেরকেই নিযুক্ত করতেন। ভাবী সুলতানরা শিষ্টাচার শিখতেন এদের নিকট থেকেই। এজন্যে এ ক্রীতদাসরা সাধারণত আতাবেক বা গৃহশিক্ষক বলেই অভিহিত হতেন। তুর্কী ভাষায় আতাবেক মানে পিতৃস্থানীয় অভিভাবক আমীর। আতা শব্দের অর্থ হচ্ছে পিতা আর 'বেক' বেগ শব্দেরই অপভ্রংশ যার অর্থ সর্দার। সালজুকী সুলতানরা যখন গৃহযুদ্ধের দরুন

দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তখন সুযোগ বুঝে এই ক্রীতদাস বা আতাবেকরা স্থানে স্থানে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুললেন। তাগতাগীন যিনি তুতুশ সালজুকীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি তুতুশের কিশোর সন্তান বেফাক সালজুকীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এই সুবাদে তুতুশের পর তিনিই হয়ে গেলেন রাজ্যের অধিপতি। এভাবে উক্ত ক্রীতদাসটি দামেশকের সুলতান বনে যান। ইমাদুদ্দীন যঙ্গী সুলতান মালিক শাহ সালজুকীর ক্রীতদাসের পুত্র ছিলেন। তিনি মুসেল ও আলেপ্পোতে আতাবেকী সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। ইরাকের সালজুকী সুলতান মাসউদের জনৈক কায়চাকী গোলাম আযারবায়জানে একটি আতাবেকী সালতানাত গড়ে তোলেন। মালিক শাহ সালজুকীর আরেকজন ক্রীতদাস ছিলেন শাকী আবূ সবুক্তগীন। খাওয়ারিযম শাহী সুলতানরা ছিলেন তাঁরই অধঃস্তন বংশধর। অনুরূপভাবে পারস্যে আতাবেকী সালাতানাতের গোড়াপত্তনকারীও ছিলেন সালগার নামক জনৈক আতাবেক সর্দার। মোটকথা হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে সমস্ত সালজুকী রাজত্ব জুড়ে অসংখ্য সামরিক সর্দার বিভিন্ন এলাকায় তাদের নিজ নিজ স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলেন।

ইরাক ও সিরিয়ায় আতাবেক রাজত্ব

মালিক শাহ্ সালজুকীর তুর্কী গোলাম আক সুনকুর ছিলেন তাঁর হাজিব বা প্রাসাদরক্ষীও। তাঁকে আলেপ্পো, সিরিয়া ও ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ৫২১ হিজরীতে (১১২৭ খ্রি) আক সুনকুরের পর তাঁর পুত্র ইমাদুদ্দীন ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি মুসেল, সঞ্জর, জাযীরা ও ইরানকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করে নেন। ৫২২ হিজরী (১১২৮ খ্রি)-তে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা এবং আলেপ্পো প্রভৃতি এলাকাও তাঁর অধিকারে চলে আসে। ইমাদুদ্দীন খ্রিস্টান ও রোমকদের বিরুদ্ধে শক্তহাতে জিহাদ করে মুসলিম বিশ্বে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইমাদুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র নূরুদ্দীন মাহমূদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুসেল ও ইরাকের শাসন ক্ষমতা পান তাঁর অপর পুত্র সাইফুদ্দীন। নূরুদ্দীন মাহমূদ খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় তাঁর পিতার চাইতেও বেশি মাত্রায় জিহাদ করে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন। নূরুদ্দীন মাহমূদের পর তাঁর খান্দান আরও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আইয়ূবী বংশের রাজত্ব এই খান্দানেরই একটি শাখায় স্থলাভিষিক্ত হয়। প্রায় সোয়াশ বছরকাল ধরে ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর বংশধরদের রাজত্ব টিকেছিল।

আরবেলে আতাবেকদের রাজত্ব

ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর তুর্কী অফিসারদের একজনের নাম ছিল আলী কুচাক ইব্ন বুকতাগীন। তিনি তাকে মুসেলে তার নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। ৫৩৯ হিজরী (১১৪৪ খ্রি)-তে যাইনুদ্দীন আলী কুচাক সঞ্জর, হাররান, তিকরীত ও আরবেলকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন এবং আরবেলকে রাজধানী করে নিজের স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত রাজত্ব গড়ে তোলেন। যাইনুদ্দীন আলী কুচাকের খান্দানে ৬৩০ হিজরী (১২৩২ খ্রি.) পর্যন্ত এ রাজত্ব টিকেছিল। তারপর তা বাগদাদের খলীফার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায়।

দিয়ারে বকরে আতাবেক রাজত্ব

সালজুকী ফৌজের জনৈক অফিসার ছিলেন আরতূক ইব্ন আকসাব। তাঁর পুত্র আবীল গাযী ৪৯৫ হিজরী (১১০১ খ্রি.)-তে একটি স্বাধীন রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। এ বংশের

হাতে তৈমুরের আমল পর্যন্ত নামেমাত্র রাজত্ব ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীনের আমলে তারা সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে নেন।

আর্মেনিয়ায় আতাবেক রাজত্ব

কুতুবুদ্দীন সালজুকীর গোলাম সুলায়মান কিবতী ৪৯৩ হিজরী (১০৯৯ খ্রি)-তে মারওয়ানী সাম্রাজ্যের হাত থেকে খালাত শহর ছিনিয়ে নিয়ে নিজের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলেন। ৬০৪ হিজরী (১২০৭ খ্রি.) পর্যন্ত আইয়ূবীদের হাতে তাদের পরাস্ত হওয়া সময় পর্যন্ত এ রাজত্ব টিকেছিল।

আযারবায়জানে আতাবেক রাজত্ব

সুলতান মাসউদ সালজুকীর কাবচাকী ক্রীতদাস আলযাকুয আযারবায়জানে নিজের স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করেন যা ৫৩১ হিজরী (১১৩৬ খ্রি.) থেকে ৬৩৩ হিজরী (১২৩৫ খ্রি.) পর্যন্ত একশ এক বছর টিকেছিল।

পারস্যে আতাবেক রাজত্ব

তুর্কীদের একটি দলের সর্দার ছিলেন সালগারী নামক জনৈক তুর্কী। তিনি তুগরিল বেগ সালজুকীর দলে ভিড়ে পড়েন। তাঁরই বংশধর সুনকুর ইব্‌ন মওদূদ ৫৪৩ হিজরী (১১৪৮ খ্রি.) পারস্য অধিকার করেন। ৬৮৬ হিজরী (১২৮৬ খ্রি.) পর্যন্ত পারস্যের শাসন ক্ষমতা তারই বংশধরদের হাতে থাকে। এ খান্দানেরই একজন বাদশাহ্ আতাবেক সা'দ খাওয়ারিযম শাহের করদ রাজায় পরিণত হন। তাঁরই নামানুসারে শেখ মুসলেহুদ্দীন শিরাজী, তাঁর ছদ্মনাম সা'দী রেখেছিলেন। আতাবেক সা'দের পর আতাবেক আবূ বকর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আকতাই খান মোগলের আনুগত্য গ্রহণ করেন। শায়খ সাদী তাঁর গুলিস্তাঁ গ্রন্থে এই আতাবেক আবূ বকরের নাম উল্লেখ করেছেন।

তুর্কিস্তানে আতাবেক রাজত্ব

এ খান্দানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পারস্যের আতাবেকদের জনৈক ফৌজী সর্দার আতাবেক তাহির। সুনকুর ইব্‌ন মওদূদ যে বছর পারস্য অধিকার করেন ঐ বছরই তিনি আবূ তাহিরকে তুর্কিস্তান দখলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবূ তাহির ৫৪৩ হিজরী (১১৪৮ খ্রি.)-তে তুর্কিস্তান অধিকার করে সেখানে তাঁর নিজ রাজত্বের পত্তন করেন। এই রাজত্ব ৭৪০ হিজরী (১৩৩৯ খ্রি.) পর্যন্ত কায়েম ছিল। এই খান্দানেরই একটি শাখা দশম হিজরী শতক পর্যন্ত তুর্কিস্তান মাইনরে রাজত্ব করে।

খাওয়ারিযম শাহী আতাবেকদের রাজত্ব

বলগাতেগীন গযনভীর জনৈক তুর্কী গোলাম আনুসতেগীন যিনি পরবর্তীকালে সুলতান মালিক শাহ সালজুকীর ভিত্তিওয়ালা হয়েছিলেন— তাঁকে মালিক শাহ খাওয়ারিযম অর্থাৎ খিভার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সুলতান মালিক শাহ সালজুকীর ভিত্তিওয়ালা হয়েছিলেন। তারপরে তার পুত্র খাওয়ারিযম শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর রাজ্যকে আমুদরিয়ার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি খুরাসান এবং ইস্পাহানও জয় করেন।

এরপর তিনি দ্রুততার সাথে ৬১১ হিজরী (১২১৪ খ্রি.)-তে আফগানিস্তানেরও এক বিরাট এলাকা গজনী পর্যন্ত জয় করে ফেলেন। তারপর তিনি শিয়া মতে দীক্ষা গ্রহণ করে আব্বাসী খিলাফতকে সমূলে উচ্ছেদের সংকল্প করেন। তাঁর এ সাধ পূর্ণ হবার পূর্বেই চেঙ্গিস খান তাঁর মনোযোগ কেড়ে নেন। অবশেষে মোগলরা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। তারা তাঁকে উপর্যুপরি ধাওয়া করতে থাকে। অবশেষে পালাতে পালাতে তিনি কাস্পিয়ান সাগরের এক দ্বীপে গিয়ে ৭১৭ হিজরী (১৩১৭ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তার তিন পুত্রও অহরহ মোগলদের কর্তৃক তাড়িত হতে থাকেন। তাঁর এক পুত্র জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমী পালিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং দু'বছর ভারতবর্ষে বসবাস করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অবশেষে ৬২৮ হিজরী (১২৩০ খ্রি.)-তে মোগলরা তাদের রাজত্বের অবসান ঘটায়। খাওয়ারিযম শাহীদের রাজত্ব ৪৭০ হিজরী (১০৭৭ খ্রি.) থেকে ৬২৮ হিজরী (১২৩০ খ্রি.) পর্যন্ত টিকেছিল। কিন্তু তাদের রাজত্বকালের ১২টি বছর এমন উন্নতি অগ্রগতির যুগ ছিল যে, তাঁদের রাজত্ব সালজুকীদের রাজত্বের সমতুল্য বলে পরিগণিত হতো।

আইয়ূবী রাজত্ব

সিরিয়া ও ইরাকের আতাবেকদের কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁরাই কুর্দিস্তানের অধিবাসী একজন ইমাদুদ্দীন যঙ্গী জনৈক কুর্দী সর্দার আইয়ূব ইব্‌ন শাদীকে তাঁর পক্ষ থেকে বাআলবাক শহরের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কালক্রমে তিনি একজন বড় নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। আইয়ূবের এক অনুজ ছিলেন শেরকোহ। ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নূরুদ্দীন মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করে শেরকোহকে হিম্‌স ও রাহবার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। শেরকোহর মিসরে প্রেরণ করার সময় নূরুদ্দীন তাকে নিজের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শেরকোহকে মিসরে প্রেরণ করার সময় নূরুদ্দীন তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন ইব্‌ন আইয়ূবকেও মিসরে পাঠিয়ে দেন। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সালাহুদ্দীন ৫৬৪ হিজরী (১১৬৮ খ্রি.)-তে তার নিজ রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তারপর স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর রাজত্ব মিসর, সিরিয়া ও হিজায পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সালাহুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত এ রাজত্ব আইয়ূবী রাজত্ব নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ৬৪৮ হিজরী (১২৫০ খ্রি.) পর্যন্ত এ বংশের রাজত্ব স্থায়ী হয়। সালাহুদ্দীনের পর এ খান্দানটিও কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। হামাত এ খান্দানের একটি শাখা ৭৪২ হিজরী (১৩৪১ খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্ব করে। এ খান্দানের শাখাটি মিসরে রাজত্ব করেছিল। তাদেরকে আইয়ূবী ও আদেলিয়া বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মিসরে তাদের স্থলাভিষিক্তদেরকে সরিয়ে যাঁরা রাজত্ব করে তাঁরা মামলুক বলে পরিচিত ছিলেন।

মিসরে মামলুক রাজত্ব

মিসরের আইয়ূবী রাজত্বের অব্যবহিত পরেই ৫৬০ হিজরী (১১৬৪ খ্রি.) থেকে মিসরের মামলুক সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়। তাদের কথাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ মামলুক রাজত্বেরও দুটো ধারা। একটি বাহরিয়া, অপরটি গির্জীয়া ধারা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি.)-তে তাঁদের রাজত্বেরও অবসান ঘটে এবং তাঁদের স্থলে মিসরে উসমানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সালজুকী সুলতানদের স্থলাভিষিক্তদের প্রসঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। কালের ধারাবহিকতা অনুসারে আরও কয়েকটি মশহুর ও উল্লেখযোগ্য রাজবংশের কথা এখানে আলোচনা করতে পারি নি। যারা এদেরও অনেক আগে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং এবার খুরাসান, ইরাক ও সিরিয়া প্রভৃতি পূর্বদেশীয় রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজত্বসমূহের আলোচনায় আসা যাক।

তিউনিসে যায়রিয়া রাজত্ব

উবায়দী রাজরা কায়রোয়ান থেকে তাঁদের রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তরিত করার সময় মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত গোটা উত্তর আফ্রিকা তাদের রাজত্বভুক্ত ছিল। সেই সময় ভূমধ্যসাগরে উবায়দীদের নৌ-শক্তি সর্বাধিক শক্তিধরণী নৌ-শক্তি বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু কায়রোতে (মিসর) রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর পশ্চিম অঞ্চলের উপর তার সে দাপট আর অক্ষুণ্ন রইল না। তাই তিউনিসে যায়রিয়া বংশের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে ওঠে। এ রাজবংশের রাজত্ব ৩৬২ হিজরী (৯৭২ খ্রি.) থেকে ৫৪৩ হিজরী (১১৪৮ খ্রি.) পর্যন্ত টিকেছিল।

আলজিরিয়ায় সামাদিয়া রাজত্ব

আলজিরিয়ার স্বাধীন সামাদিয়া রাজত্ব গড়ে ওঠে এবং তা ৩৯৮ হিজরী (১০০৭ খ্রি.) থেকে ৫৪৭ হিজরী (১১৫২ খ্রি.) পর্যন্ত টিকে থাকে। অনুরূপভাবে উবায়দীদের রাজধানী পরিবর্তনের ফলে মরক্কোতে বর্বর উপজাতিগুলোও স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। পরবর্তীকালে মুরাবিতীন রাজবংশ অবশ্য তাঁদেরকে অধীনতার পাশে আবদ্ধ করে ফেলে।

মুরাবিতীনদের রাজত্ব

বনূ উমাইয়ার রাজত্বকালে ইয়ামানের কোন কোন গোত্র বর্বর অঞ্চল অর্থাৎ তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোতে এসে বসতি স্থাপন করে। এঁরা ক্রমেক্রমে তাঁদের ওয়ায-নসীহত এবং উন্নত ইসলামী জীবন-যাপন পদ্ধতির প্রভাবে বার্বারদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। বার্বারজাতিকে ইসলামে দীক্ষিত করার সকল কৃতিত্ব তাঁদেরই। মরক্কোর একটি গোত্র লুমতূনা গোত্রের ফকীহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াসীনের ওয়ায-নসীহতে মুগ্ধ হয়ে এবারও যে সব বার্বার ইসলাম গ্রহণ করেন তারাও এসে দলে দলে ৪৪৮ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে। এ বিপুল সংখ্যক নওমুসলিম তাঁদের দীক্ষাদাতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াসীনকে তাদের সর্দার বলে ঘোষণা করতে উদ্যত হলে তিনি তাতে সম্মত না হয়ে আবূ বকর ইব্‌ন উমর নামক আরেক ব্যক্তিকে সর্দাররূপে গ্রহণের পরামর্শ দেন। নওমুসলিম বার্বার গোত্রীয়রা সে মতে আবূ বকর ইব্‌ন উমরকেই তাদের সর্দাররূপে গ্রহণ করে আমীরুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁদের এ অভূতপূর্ব একতা লক্ষ্য করে আশেপাশের গোত্রগুলো এসে তাঁদের চর্তুষ্পার্শ্বে সমবেত হতে থাকে। মরক্কোতে সে যুগে কোন সুসংহত রাজত্ব কায়েম ছিল না বরং বিভিন্ন গোত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের কেউ কারো রাজত্বকে মেনে নিতো না। এই অরাজকতার যুগে আবূ বকর ইব্‌ন উমরের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবূ বকর ইব্‌ন উমর তাঁর অনুচরদেরকে মুরাবিতীন নামে অভিহিত করেন। এর অর্থ হচ্ছে এরা ইসলামের সীমান্তরক্ষী সেনাবাহিনী। এদেরকে মুলছেমীনও বলা হয়ে থাকে। আবূ বকর বার্বার

গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের সেবার চেতনা সৃষ্টি করে তাদের শৌর্যবীর্য জাগিয়ে তোলেন। তিনি মরক্কো থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বাজালমাসা জয় করেন এবং আপন পিতৃব্যপুত্র ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন আল মুতাওয়াকাফাকে বাজালমাসার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বীর এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। ৪৫৩ হিজরী (১০৬১ খ্রি.) আবূ বকর ইব্‌ন উমরের ইন্তিকাল হলে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন রাজ্যের বাদশাহ্ হন। ৪৬০ হিজরী (১০৬৭ খ্রি.)-তে তিনি মারাকিশ শহরের পতন করে একেই তাঁর রাজধানীরূপে গ্রহণ করেন। ৪৭২ হিজরীতে খ্রিস্টানরা যখন স্পেনের মুসলমান রঈসদেরকে আক্রমণ করে অতিষ্ঠ করে তোলে তখন তাঁরা ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের সাহায্য প্রর্থনা করেন। তিনি তাঁদের আমন্ত্রণক্রমে সশরীরে স্পেনে উপস্থিত হয়ে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের দর্প খর্ব করে দেন। তারপর তিনি তিন হাজার মুরাবিতীন সৈন্য স্পেনের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সেখানে রেখে নিজে আফ্রিকা অর্থাৎ মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন। চার বছর পর পুনরায় খ্রিস্টানদের উৎপাতে বাধ্য হয়ে স্পেনের মুসলমানরা ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের শরণাপন্ন হন। এবার খ্রিস্টানদেরকে পরাস্ত করে তিনি স্পেনের ইসলামী অঞ্চলকে তাঁর একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মোটকথা, স্বল্পসময়ের মধ্যেই মুরাবিতীনদের রাজ্য স্পেন, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও ত্রিপোলীসহ বিশাল এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নৌ-শক্তি বিস্তারের দিকে তারা তত মনোযোগী ছিলেন না। ৫৫১ হিজরী (১১৫৬ খ্রি) পর্যন্ত মুরাবিতীনদের রাজত্ব টিকে রইল। আপন শৌর্যবীর্য ও তৎপরতা দ্বারা দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ধরে তাঁরা খ্রিস্টান শক্তিসমূহকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখেন।

মুওয়াহ্‌হিদীনদের রাজত্ব

বার্বারদের মাসমূদা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন তুমার্ত। তিনি ছিলেন জাবালে সূসের অধিবাসী। হাদীস, উসূলে ফিকাহ্ এবং আরবী সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন দক্ষপণ্ডিত। 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের' কাজে তিনি ছিলেন সদাতৎপর। উপদেশদান ও স্পষ্টবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আমীর, গরীব নির্বিশেষে সবাই ছিল সমান। তাঁর তাকওয়া পরহিযগারী তাঁকে সাদাসিধা খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদে পরিতৃপ্ত রাখতো। একদল লোক ছিল তাঁর অনুসারী যারা তাঁকে মাহ্‌দী নামে সম্বোধন করতো। অনুসারীদের মধ্যে তিনি রাজা-বাদশাহর মত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর দলের নামকরণ করেছিলেন মুওয়াহ্‌হিদীন বা একত্ববাদী।

৫২২ হিজরী (১১২৮ খ্রি.)-তে ইন্তিকালের সময় তিনি তাঁর বন্ধু আবদুল মু'মিনকে তাঁর দলের নেতৃত্ব সোপর্দ করে যান। আবদুল মু'মিন মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিভিন্ন এলাকা দখল করতে থাকেন। মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে তিনি মুরাবিতীনের রাজ্যের বিরাট এলাকা দখল করে নেন। ৫২৪ হিজরী (১১২৯ খ্রি.) তিনি মুরাবিতীনদের রাজধানী দখল করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাদের মূলোচ্ছেদ করে স্পেনে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। স্পেন ও মরক্কো দখলের পর তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধি ধারণ করেন। এরপর ৫৪৭ হিজরী (১১৫২ খ্রি)-তে আলজিরিয়া দখল করেন এবং সামাদিয়া রাজবংশের বিলোপ করে ত্রিপোলী দখল করেন। এ সময় মিসর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ জুড়ে তাঁর রাজত্ব কায়েম হয়। স্পেনও তাঁর অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৩২ হিজরী

(১২৩৪ খ্রি.)-তে তাঁর মুওয়াহ্হিদীন সেনাবাহিনী খ্রিস্টানদের হাতে এমনি শোচনীয় পরাজয়বরণ করে যে, স্পেনে তাঁর রাজত্ব আর টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়নি। তবে গ্রানাডার সুলতানগণ সর্বদা সফলতার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করে যেতে থাকেন। স্পেন হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর মুওয়াহ্হিদীন বংশের মধ্যে দুর্বলতা ও পতনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হতে থাকে। এরপর সুলতান সালাহুদ্দীন তাদের হাত থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নেন। তারপর তিউনিসিয়ায় মুওয়াহ্হিদীনদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হাফসিয়া খান্দানের নায়েব স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। এরপর মরক্কোতেও বেশ ক'জন শাসক নিজ নিজ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। অবশেষে ৬২৭ (১২২৯ খ্রি.) হিজরী এ খান্দানের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মরক্কোতে মুরাইনিয়া বংশ তাঁদের স্থলাভিষিক্তরূপে রাজত্বের অধিকারী হয়।

তিউনিসিয়ায় হাফ্সিয়া রাজত্ব

মুওয়াহ্হিদীনরা তাদের পক্ষ থেকে তিউনিসিয়ায় হাফ্স নামক এক ব্যক্তিকে তাদের প্রতিনিধিরূপে শাসক নিযুক্ত করে। তার বংশধররা বংশানুক্রমিকভাবে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ৬২৫ হিজরী (১২২৭ খ্রি.)-তে এ বংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তিন শতাব্দী ধরে তিউনিসিয়ায় সুনামের সাথে রাজত্ব করে। অবশেষে ৯৪১ হিজরী (১৫৩৪ খ্রি.)-তে উসমানী আমীরুল বাহ্র খায়রুদ্দীন তিউনিস দখল করে এলাকাটিকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে চিরতরে এ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটায়।

আলজিরিয়ায় যিয়ানিয়া রাজত্ব

মুওয়াহ্হিদীনদের পক্ষ থেকে আলজিরিয়া প্রদেশে যিয়ানিয়া খান্দানের যে ব্যক্তিটি শাসক নিযুক্ত হয়ে যায়, হাফ্সিয়া খান্দানের দেখাদেখি সেই ব্যক্তিও স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। তাদের রাজধানী ছিল তিলিমিসান। ৭৯৬ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি.) পর্যন্ত তাদের রাজত্ব টিকেছিল। তারপর মরক্কোর মুরাইনিয়া খান্দান তাদের দেশ জয় করে তাদের মূলোচ্ছেদ করে।

মরক্কোয় মুরাইনিয়া রাজত্ব

মুরাইনিয়া খান্দান ৫৯১ হিজরী (১১৯৪ খ্রি.) থেকে মরক্কোয় পার্বত্য অঞ্চলে তাদের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলে। ৬২৭ হিজরী (১২২৯ খ্রি.)-তে তারা মুওয়াহ্হিদীনদের রাজধানী দখল করে গোটা মরক্কোতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ৭৯৬ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি.) এ খান্দানকে তাদেরই একটি শাখা উচ্ছেদ করে এবং নিজেরাই তাদের স্থান দখল করে নেয়। তারপর ঐ দেশে মুসলমানদের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তাদের কাজ ছিল সর্বদা পরস্পরে হানাহানিতে লিপ্ত থাকা।

এ পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের কেবল সেই সব রাজত্বের তালিকা দেয়া হলো যেগুলো আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক অর্থাৎ ৯০০ হিজরীর (১৪৯৪ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান এবং উসমানী খিলাফতের সূচনার পরবর্তী ইসলামী রাজ্যগুলোর অবস্থান বা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় নতুন সৃষ্ট অসংখ্য মুসলিম রাষ্ট্রের বর্ণনা এ অধ্যায়ে দেয়া হবে না। কেননা, তারা আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক ছিল না। এরপর উসমানী খিলাফত এবং তাদের সমসাময়িক সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বর্ণনা দেয়া হবে।

আর খিলাফতে উসমানীয়া যেহেতু এ বছর অর্থাৎ ১৩৪২ হিজরী (১৯২৩ খ্রি.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এজন্যে উসমানী খিলাফত এবং তাদের সমসাময়িক মুসলিম রাজত্বসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসেরও সমাপ্ত হয়ে যাবে।

এই পরিচ্ছেদে যে সব রাজবংশের তালিকা দেয়া হচ্ছে, সেগুলোর কতকগুলো এমন যে এক তালিকায় প্রদত্ত বর্ণনাই সেগুলোর জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু অধিকাংশই এমন যার বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। যদিও সেই বর্ণনাও খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক হবে। এমন রাষ্ট্রগুলোর বর্ণনাই হবে ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড। এ পরিচ্ছেদে পূর্বাঞ্চলীয় কোন কোন রাষ্ট্রের বর্ণনা এখনো দেয়া হয়নি। যেমন ঃ

হাশ্‌শাশীনদের ইসমাঈলী রাজত্ব

হযরত ইমাম জা'ফর সাদিকের পুত্র মূসা কাযিমকে ইসলাম আশারী শিয়ারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমামরূপে মান্য করে। কিন্তু ইমাম মূসা কাযিমের এক ভাই ছিলেন ইমাম ইসমাঈল। যারা মূসা কাযিমের পরিবর্তে তাঁর ভাই ইসমাঈলকে ইমামরূপে গণ্য করেন, তাদেরকে বলা হয় ইসমাঈলী শিয়া। উবায়দীদের রাজত্ব ছিল ইসমাঈল শিয়াদের সব চাইতে বড় রাজত্ব। ইসমাঈলীয়া তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সর্বদা গোপন তৎপরতা এবং রহস্যঘেরা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। উবায়দী সালতানাত গোড়া থেকেই নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রচারার্থে একটি গোপনীয় বিভাগ চালু করে রেখেছিল। এই বিভাগের মাধ্যমেই তারা শিয়া প্রচারকদেরকে শুধু যে নিজেদের অধিকৃত এলাকাসমূহেই প্রেরণ করতো তাই নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রেও প্রেরণ করতো। সে সব প্রচারক, ওয়ায়েয, দরবেশ ও ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তারা লোকজনকে ইসমাঈলী আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের কুফরী আকীদাসমূহ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। কুরআন শরীফকে তারা আমল করার যোগ্য গণ্য করতো না। তারা ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর সাদিককে নবী বলে মান্য করতো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ধারণা করতো। তারা ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মদ মকতুমকেও নবী বলে বিশ্বাস করতো। তাদের মতে ইমামদের সংখ্যা ছিল সাত। উবায়দী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতাকে তারা সপ্তম ইমাম বলে মান্য করতো এবং উবায়দী সুলতানদের আনুগত্যকে মুক্তির পথ বলে প্রচার করতো। তাদের এ প্রচার ও প্রচেষ্টা উবায়দী রাজত্বের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক প্রতিপন্ন হয় এবং তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ নামক এক ব্যক্তি ছিল রে-এর অধিবাসী। তার বংশ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, সে ছিল আরব বংশোদ্ভূত। তার পূর্বপুরুষরা ইয়ামান থেকে আগমন করেছিলেন। আবার কেউ বলেন ঃ সে বংশগতভাবে ছিল অগ্নিপূজক। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহর পিতা এবং বংশের লোকজন শিয়া আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ নিশাপুরে শিক্ষা লাভ করে। সে উমর খাইয়াম, আল্‌প আরসালান ও মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুল্‌ক তূসীর সহপাঠি ছিল। সে ছিল অত্যন্ত প্রতিভাধর এবং আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি।

মুসতানসির উবায়দীর আমলে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মিসরে গিয়ে উপনীত হয়। সেখানে সে প্রভূত সম্মান লাভ করে। এক বছরেরও অধিককাল ধরে সে মিসরের শাহী মেহমান এবং

মুসতানসিরের পারিষদরূপে সেখানে অবস্থান করে। সেখানে সে ইসমাঈলী মতাদর্শে পরিপক্ব জ্ঞান লাভ করে এবং মুসতানসিরের হাতে বায়আত হয়। সে উবায়দী রাজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একজন প্রচারক বলে গণ্য হয়।

হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ যখন ইসমাঈলী প্রচারকরূপে মিসর থেকে রওয়ানা হয় তখন সে মসতানসিরকে জিজ্ঞেস করে, আপনার পর আমরা কার আনুগত্য করবো আর কে আমাদের ইমাম হবেন? জবাবে মুসতানসির বলেন যে, তাঁর পরে তাঁর পুত্র নাজ্জার ইমাম হবেন। এজন্যে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত দলকে নাজ্জারিয়া জামাআত বলা হয়ে থাকে। মিসর থেকে ইরাক ও ইরানে ফিরে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ বিভিন্ন শহর ও জনপদে অল্পদিন করে অবস্থান করে লোকজনকে তার মতাদর্শে দীক্ষিত করতে থাকে। এখানে প্রথম থেকেই ইসমাঈলী দাঈদের চেষ্টায় অনেক শিয়া এবং অ-শিয়া ইসমাঈলী মতের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। এজন্যে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহকে তার অনুসারী ও সাহায্যকারী জুটিয়ে নিতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি বা এজন্যে তার তেমন কোন সময়ও লাগেনি। মালিক শাহের পক্ষ থেকে ইস্পাহান ও কোহিস্তান প্রদেশের শাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মাহ্‌দী উলুভী। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মাহ্‌দী উলুভীর নিকট থেকে ইবাদতখানা নির্মাণের জন্যে আলমূত দুর্গ ক্রয় করে নেয়। এ দুর্গে বসে সে তার অবস্থানকে মযবুত করে নেয়। সে তার অনুসারীদেরকে এখানে সমবেত করে এবং আশেপাশের মূর্খ ও দুর্বল লড়াকু গোত্রসমূহে নিজের প্রভাব বিস্তার করে নিজের রাজত্বের গোড়াপত্তন করে। নিজেকে সে শায়খুল জাবাল নামে সুবিদিত করে তোলে। সে অনেক অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস ও আমলের উদ্ভাবন করে লোকজনকে এগুলোতে দীক্ষা দিতে থাকে। সে একটি জানবাজ দল গঠন করে। এ জানবাজরা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করে। দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহ্, উযীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে সে এসব আত্মঘাতী জানবাজ অনুসারীদের মাধ্যমে খতম করে দিত। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ তার মশহুর 'দাঈ' কাইয়া বুযুর্গ উমেদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। এরপর কাইয়া বুযুর্গ উমেদের বংশধরদের রাজত্ব কয়েক পুরুষ ধরে চলতে থাকে। অবশেষে ৬২৫ হিজরী (১২২৭ খ্রি.)-তে হালাকু খাঁর হাতে তার রাজত্বের অবসান ঘটে। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত এ রাজত্ব কোহিস্তানে ৪৮৩ হিজরী (১০৯০ খ্রি.) থেকে ৬৫৫ হিজরী (১২৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত পৌনে দুশ বছর টিকেছিল। এই ইসমাঈলী রাজত্বের দাপট গোটা বিশ্বে কায়েম ছিল এবং বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ তাদের ফিদায়ী বা জানবাজদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকতেন। কেননা তারা সব সময় ধোঁকা দিয়ে এবং শত্রুকে একাকী অবস্থায় আক্রমণ করতো।

সিরিয়ায় ঈসায়ী ক্রুসেড হামলা

ইউরোপের ঈসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৪৯০ হিজরী (১০৯৬ খ্রি.) থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। ঈসায়ী পাদ্রীরা গোটা ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর প্রচারণা চালিয়ে খ্রিস্টান সমাজে ধর্মান্ধতার জোয়ার বইয়ে দেয়। তারা সিরিয়া মুসলমানদের দখলমুক্ত করাকে উচ্চস্তরের ধর্মীয় খিদমত ও মুক্তির উপায় বলে আখ্যায়িত করে। ঈসায়ীদের এ আক্রমণের ধারা দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ্ তাদের সমবেত শক্তি সার্বিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে

এবং নিজেরা সশরীরে ঈসায়ী হামলাকারীদের সাথে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এসব হামলা ও যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের এক আকর্ষণীয় অধ্যায় এবং এ কাহিনীটি একটি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে। এসব ক্রুসেডের যে অংশের সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক খ্রিস্টানদের মুকাবিলার কথা বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক।

এশিয়ায় মোগল রাজত্ব

চীনের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকা থেকে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোগল বা তাতারীগোষ্ঠী পশ্চিম দিকে রওয়ানা হয়ে তুর্কিস্তান, মাওরাউন নাহর, খুরাসান, আযারবায়জান, ইস্পাহান, আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, রুশ ও অস্ট্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডকে হিজরী সপ্তম শতকের শুরুতেই তাদের আক্রমণ ও লুটপাটের শিকারে পরিণত করে। তারা শত শত রাজত্বের অবসান ঘটায় এবং শত শত রাজবংশকে সমূলে উৎখাত করে। সপ্তম হিজরী শতকের মধ্যভাবে ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮ খ্রি.)-তে হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে এবং বাগদাদের শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ্‌কে হত্যা করে। এ বিবরণ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। ৬২৪ হিজরী (১২২৬ খ্রি.)-তে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চেঙ্গিস খানের বংশধরদের একটি অংশ চীনের শাসনক্ষমতা লাভ করে। একটি অংশ তুর্কিস্তান ও মাওরাউন নাহরে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং আরেকটি অংশ খুরাসান ও ইরানে তাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অপর এক অংশ কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব কায়েম করে। সেগুলোর মধ্যে হালাকু খান কর্তৃক ইরান ও খুরাসানে প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজত্বটি সবিশেষ গুরুত্ববহ। স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিকাংশ মোগল রাজত্ব মুসলিম রাজত্বে রূপান্তরিত হয়। অন্য কথায়, মোগলরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। দুশ বা পৌনে দুশ বছর পর এশিয়া মহাদেশে মোগলদের রাজত্বসমূহ ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে আর সেগুলোর স্থলে গড়ে উঠে ইরান, ইরাক, খুরাসান ও মাওরাউন নাহরের স্থানে স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য।

৮০০ হিজরীর (১৩৯৭ খ্রি.) দিকে মোগলদের পতন ও ধ্বংসের যুগে তৈমুর নামক এক ব্যক্তি তাদের নেতা হন। তিনি উপর্যুপরি রাজ্য দখল দ্বারা গোটা এশিয়া মহাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেন এবং বিশ্ববাসীর মানসপটে চেঙ্গিস খাঁর বিজয় অভিযানের দৃশ্য আবার জাগিয়ে তোলেন। তৈমুর যেহেতু মুসলমান ছিলেন, তাই তার হাতে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হলেও চেঙ্গিস খাঁর হামলা ও হত্যাযজ্ঞের তুলনায় তা অনেকটা নিয়ম মাফিক ও মার্জিত ছিল। তৈমুরের বংশধররা চেঙ্গিয খাঁর বংশধরদের অধিকৃত রাজ্যসমূহের সব ক'টাই নিজেদের করতলগত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিস খাঁর বংশধরদের যেভাবে পতন ঘটেছিল তৈমুরের বংশধরদেরও সেইভাবে পতন ঘটে। চেঙ্গিয খাঁর বংশধররা যতকাল ধরে এশিয়ার রাজ্যসমূহে রাজত্ব করেছিল প্রায় ততটা সময়ই তৈমুরের বংশধররাও রাজত্ব করে। অবশেষে ইরাক ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি রাজ্যে তৈমুরী মোগল রাজত্বের অবসান ঘটলে তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে বাবর নামক একব্যক্তির জন্ম হয়। তিনি ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন যা সুদীর্ঘকাল ধরে এ বংশ শাসন করে।

তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য

গাজের তুর্কীদের উল্লেখ উপরে কোথাও করা হয়েছে। এ গাজ তুর্কীদের অধিকাংশ গোত্রকেই সালজুকীরা আর্মেনিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলের দিকে ঠেলে দেয়। এদেরই একটি গোত্র উসমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জন করে। যখন সালজুকীদের উত্থানের যুগ শেষ হয় এবং তাতারীরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উৎপাত শুরু করে দেয় তখন এশিয়া মাইনরের মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকায় দশ-বারটি ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সব রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালজুকী শাহ্যাদারা বা তাদের ক্রীতদাসরা রাজত্ব করে আসছিল। এসব রাজত্বেরই একটি ছিল আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত এবং সেটিই ছিল উল্লিখিত তুর্কীগোত্রের সর্দার সুলায়মান খানের রাজ্য। ৬২১ হিজরী (১২২৪ খ্রি,)-তে যখন মোগলরা আলাউদ্দীন কায়কোবাদ সালজুকীর রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায়, তখন সুলায়মান খান এবং তাঁর পুত্র এবং তুগরিল তাঁর সমগোত্রীয় তুর্কীদেরকে সাথে নিয়ে মোগলদের মুকাবিলায় আলাউদ্দিন কায়কোবাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। এই সাহায্য ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। আর এর ফলশ্রুতিতে মোগলদেরকে পরাস্ত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে হয়। এজন্য আলাউদ্দীন কায়কোবাদ সালজুকী সুলায়মানকে খিলাত দিয়ে আপন সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদ দান করেন এবং তাঁর পুত্র আর তুগরিলকে আঙ্গোরা শহরের সন্নিকটে একটি বিশাল জায়গীর প্রদান করেন। সে সময় আলাউদ্দীন সালজুকীর রাজধানী ছিল কাউনিয়ায়। আর তুগরিলের জায়গীরটি ছিল একেবারে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষে। আর তুগরিল তাঁর পিতার মৃত্যুর পর নিজ রাজ্যের পরিধি আরও বিস্তৃত করেন। কিছু এলাকা তিনি কাউনিয়ার সুলতানের পক্ষ থেকে ইনাম ও উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হন আর কিছু এলাকা ঈসায়ীদের নিকট থেকে ছিনিয়েও নেন। এভাবে তুগরিলের একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগলরা এশিয়া মাইনরের এই ছোট ছোট রাজ্যগুলোর ব্যাপারে কোনরূপ নাক না গলিয়ে তাদেরকে তাদের মত থাকতে দেয়। ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রি.)-তে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের পুত্র গিয়াসুদ্দীন কায়খসরুকে মোগলদের করদরাজ্যে পরিণত হতে হয়। ৬৫৭ হিজরী (১২৫৮ খ্রি.)-তে আর তুগরিলের পুত্র উসমান খান জন্মলাভ করেন। ৬৮৭ হিজরী (১২৮৭ খ্রি.)-তে আর তুগরিলের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র উসমান খান ত্রিশ বছর বয়সে পিতার দেশটির শাসক হন। কাউনিয়ার বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু সালজুকী তাঁর কন্যার সাথে উসমান খানের বিয়ে দেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদেও অধিষ্ঠিত করেন। ৬৯৯ হিজরী (১২৯৯ খ্রি.)-তে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু সালজুকী নিহত হলে সালজুকী তুর্কীরা সবাই মিলে উসমান খানকে কাউনিয়ার সিংহাসনে বসায়। এভাবে প্রাচীন রাজত্ব ছাড়া কাউনিয়াও উসমান খানের কর্তৃত্বাধীন হয়। উসমান খান তখন সুলতান উপাধি ধারণ করলেন। তিনিই হচ্ছেন উসমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান খান—যাঁর নামে উসমানী সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়। উসমানী সুলতানরা স্বল্পকালের মধ্যেই সমগ্র এশিয়া মাইনরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রোম সম্রাটকে এশিয়া ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেন। ৬২৩ হিজরী (১২২৬ খ্রি.)-তে উসমানী সুলতান আদ্রিয়ানোপল অধিকার করে এ শহরকেই তাঁর রাজধানী করেন এবং ত্রিপোলী প্রদেশ দখল করে ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন। রোম সম্রাট নতি স্বীকার করে সন্ধি করে তাঁর সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশকে উসমানী শক্তির কবল থেকে নিরাপদ করেন। তারপর উসমানী সুলতানগণ

ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে ইউরোপ ভূখণ্ডে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত করতে শুরু করেন। অবশেষে ৭৯২ হিজরী (১৩৮৯ খ্রি.)-তে অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, বসনিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ঈসায়ী রাষ্ট্রগুলোর বাদশাহরা সমবেত হয়ে এক বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে একযোগে উসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। সুলতান মুরাদ খান উসমানী তাঁর স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কসোভা নামক স্থানে ঈসায়ীদের এ বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে প্রকম্পিত করে তোলেন। ৭৯৯ হিজরী (১৩৯৬ খ্রি.)-তে ফ্রান্স ও জার্মানীসহ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ সমবেতভাবে হামলা চালিয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। নিকোপোলিস নামক স্থানে সুলতান বায়েযিদ ইব্‌ন মুরাদ খান তাঁদের মুকাবিলা করেন। বায়েযিদ ইয়ালদারিম নামে খ্যাত এই সুলতানের হাতে এবারও ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। এ লড়াইয়ে কুড়ি জনেরও বেশি সংখ্যক ঈসায়ী সর্দার বন্দীরূপে সুলতান বায়েযিদের সম্মুখে নীত হন। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন বাদশাহ্ অথবা শাহযাদা। এ শোচনীয় পরাজয় বরণের ফলে সমগ্র খ্রিস্টান জগতে আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের কালো ছায়া নেমে আসে। পরাজিত ঈসায়ী সম্রাটগণ নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ক্রুসেড যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। সমগ্র খ্রিস্টান জগত ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে সুলতান বায়েযিদের মুকাবিলা করার জন্য পূর্বের চাইতে বেশি প্রস্তুতি নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। বায়েযিদ ইয়ালদারিম এবারও তাঁদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে সমগ্র ইউরোপ থেকে বশ্যতার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। বাহ্যত রোমসম্রাট তখন ভীত-সন্ত্রস্ত ও জড়সড় হয়ে কনসটান্টিনোপলে চুপচাপ বসে থাকেন। কিন্তু গোপনে তিনি উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ঈসায়ী ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্য প্রেরণে একটুও ত্রুটি করেন নি। তাই বায়েযিদ ইয়ালদারিম এবার সর্ব প্রথম রোম সম্রাটকে সমুচিত শাস্তি দানের এবং গোটা বলকান উপদ্বীপ থেকে ঈসায়ী শাসনের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে সংকল্প করেন। তাঁর সংকল্প ছিল, এরপর তিনি গোটা ইউরোপ মহাদেশ জয় করে গোটা বিশ্ব থেকে চিরতরে ঈসায়ীদের মূলোচ্ছেদ করবেন। কিন্তু রোম সম্রাটের উপর তাঁর হামলা করতে না করতেই এশিয়া মহাদেশ থেকে খবর এসে পৌঁছে যে, এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তৈমুর বায়েযিদ ইয়ালদারিমের এশিয়ান রাজ্যসমূহের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। তাই অগত্যা বায়েযিদকে কাল বিলম্ব না করে এশিয়া মাইনরে প্রত্যাবর্তন করে তৈমুরের মুকাবিলা করতে হয়।

৮০৪ হিজরী (১৪০১ খ্রি.) আঙ্গোরায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে তৈমুর বিজয়ী হন এবং বায়েযিদ বন্দী হন। এভাবে ইউরোপ মহাদেশ ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পায়। তারপর মনে হতো যেন, উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে। কিন্তু কয়েক বছর পর আবার উসমানীয় সাম্রাজ্য ঠিক তেমনিভাবে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়, যেমনটি ছিল বায়েযিদ ইয়ালদারিমের আমলে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনসটান্টিনোপল জয় করে বলকান উপদ্বীপ থেকে ঈসায়ীদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। তারপর সুলতান সালীম খান ইরানীদেরকে পরাস্ত করেন। মিসর জয় করেন এবং ইরাক ও আরব নিজ অধিকারভুক্ত করেন। এভাবে এক বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের পত্তন করে ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি.)-তে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটিয়ে তাঁদেরই স্থলে উসমানীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, এ খান্দানের ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

কাশগড়ে তুর্কী রাজত্ব

ফারগানার পূর্বাঞ্চলে যে সব তুর্কী গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা সামানীয় রাজত্ব পতনমুখী হওয়ার পর নিজেদের স্বাধীন রাজত্বের পত্তন করে রাজত্ব ৩২০ হিজরী (৯৩২ খ্রি.) থেকে ৫৬০ হিজরী (১১৬৪ খ্রি.) পর্যন্ত টিকেছিল। তাঁদের মধ্যে আইলক খান তুর্কিস্তানের বিখ্যাত শাসক হন। তাঁর রাজধানী ছিল কাশগড়ে। তিনি ছিলেন গাজ তুর্কীদের অন্তর্ভুক্ত। উসমানী তুর্কীরা ছিলেন তাঁদেরই স্বদেশের লোক। সালজুকী তুর্কীদের অভ্যুত্থানের পর গাজ তুর্কীদের অধিকাংশই আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানে চলে যান। সালজুকী তুর্কীরাও তাদেরই স্বদেশীয় এবং সমগ্রোত্রীয় ছিলেন। যে সমস্ত গোত্র পালিয়ে পশ্চিমে চলে যায় তারা কাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশে নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে। আর যাদেরকে পূর্বদিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল, তারা পূর্ব তুর্কিস্তান অর্থাৎ কাশগড়ে রাজত্বের পত্তন করে।

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব

ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ অর্থাৎ সিন্ধুদেশ হিজরী প্রথম শতকেই ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে সিন্ধুর জন্যে খলীফার দরবার থেকে আমিল বা গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন। তারপর আব্বাসীয় খিলাফতে দুর্বলতা দেখা দিলে তখন সিন্ধুদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্বের পত্তন হয়। ক্রমেই ইসলামী রাজ্যসমূহের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে আসে। মাহমূদ গজনীর হামলার সময় পর্যন্ত সিন্ধুতে একটি ইসলামী রাজ্য বিদ্যমান ছিল। মাহ্মূদ গজনভী পাঞ্জাব ও মুলতান অধিকার করে ইসলামী রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর যখন ঘোরীরা গজনভীদের স্থলাভিষিক্ত হলে তাঁরা সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র ইসলামী রাজত্বের পত্তন করেন। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মুসলমান বাদশাহ ছিলেন কুতবুদ্দীন আইবেক। তিনি ছিলেন শিহাবুদ্দীন ঘোরীরা ক্রীতদাস। ক্রীতদাস রাজবংশের পর খিলজী রাজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। খিলজীদের পর তুঘলকরা রাজশক্তির অধিকারী হন। তুঘলক বংশের পর খিযির খাঁর বংশধররা রাজত্বের অধিকারী হন। এরপর লোদী বংশ রাজত্ব করে। লোদীদের পর মোগলরা হিন্দুস্থানে আসেন। কিন্তু শেরশাহ তাঁদেরকে বহিষ্কার করে আপন রাজত্ব কায়েম করেন। মোগলরা শেরশাহর বংশধরদের হাত থেকে হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়ে পুনরায় নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ইংরেজরা হিন্দুস্থানে আসে। উপরে উল্লিখিত মুসলমান রাজবংশগুলো দিল্লী ও আগ্রাতে বসবাস করতো। তাঁদের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আরও অনেক মুসলিম রাজবংশ রাজত্ব করে। যেমন বাহমনী রাজবংশ, গুজরাটী রাজবংশ, জৌনপুরী রাজবংশ, বাংলার রাজবংশ, মালোয়ার রাজবংশ। এসব রাজবংশের বিবরণ সম্বলিত ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত হবে। সেখানেই গজনভী ও ঘোরী বংশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হবে।

ইরাকে জালায়ের রাজত্ব

মোগল অর্থাৎ তাতারদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ার সাথে সাথে মোগলদের ফৌজী সর্দাররা স্থানে স্থানে নিজেদের স্বাধীন রাজত্ব গড়ে তোলে। এদের মধ্যে ইরাকের জালায়েরদের রাজত্ব হচ্ছে অন্যতম। ৭৩৬ হিজরী (১৩৩৫ খ্রি.) থেকে ৮১৪ হিজরী (১৪১১ খ্রি.) পর্যন্ত তাঁরা ইরাকে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজধানী ছিল বাগদাদ। শেখ হাসান

বুযুর্গ জালায়ের ছিলেন এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র ৭৫৭ হিজরী (১৩৫৬ খ্রি.) স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৭৫৯ হিজরী (১৩৫৭ খ্রি.)-তে তুর্কমেনদের হাত থেকে আযারবায়জান ও তাব্রীয ছিনিয়ে নেন। ৭৫৬ হিজরী (১৩৫৫ খ্রি.)-তে তিনি মুসেল ও দিয়ারে বকরকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। ৭৪৮ হিজরী (১৩৪৭ খ্রি.)-তে মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বায়েযীদ কুর্দিস্তানে এবং অপর পুত্র আহ্‌মদ জালায়ের ইরাক, আযারবায়জান প্রভৃতি প্রদেশে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রূপে রাজত্বের অধিকারী হন। ৭৯৬ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি.)-তে তৈমুর সুলতান আহ্‌মদ জালায়েরের গোটা রাজ্য দখল করে নেন। আহ্‌মদ জালায়ের পালিয়ে মিসরে গিয়ে সেখানকার মামলূক সুলতানদের আশ্রয়ে কয়েক বছর কাটান। এরপর তৈমুর সমরকন্দের দিকে ফিরে গেলে তিনি আবার নিজ রাজ্যে প্রত্যার্বতন করে পুনরায় তা অধিকার করেন। ৮১৩ হিজরী (১৪১০ খ্রি.)-তে আহ্‌মদ জালায়ের কারা ইউসুফ তুর্কমেনের যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মাহ্ ওয়ালাদ বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অবশেষে ৮১৪ হিজরী (১৪১১ খ্রি.)-তে কারা কায়ুনলী তুর্কমেনদের হাতে এ খান্দানের রাজত্বের অবসান ঘটে।

মুযাফ্‌ফারিয়া রাজত্ব

মোগল সুলতানদের দরবারে আমীর মুযাফ্‌ফর খুরাসানী ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সর্দার। তাঁর পুত্র মুবায়িয উদ্দীনকে মোগল বাদশাহ আবূ সাঈদ ৭১৩ হিজরী (১৩১৩ খ্রি.)-তে পারস্যের গভর্নর করে প্রেরণ করেন। ৭১৫ হিজরী (১৩১৫ খ্রি.)-তে পারস্যের সাথে কিরমানও সংযোজিত হয়। পারস্য ও কিরমানের শাসনভার হাতে নিয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। ৭৫৯ হিজরী (১৩৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত এ বংশের রাজত্ব টিকেছিল। প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি হাফিজ শিরাজী এ বংশেরই সুজা বাদশাহ্‌র দরবারে উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

আযারবায়জানে কারাকোয়ুনলী তুর্কমেনদের রাজত্ব

এঁরাও জালায়ের খান্দানের মতো মোগল সৈন্যবাহিনীর সর্দার ছিলেন। এ খান্দান আযারবায়জানে নাহ্‌রাওয়ানের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে রাজত্ব করে। ৭৮০ হিজরী (১৩৭৮ খ্রি) থেকে ৮৭৪ হিজরী (১৪৭৯ খ্রি.) পর্যন্ত এঁদের রাজত্ব টিকেছিল। এ বংশের শাসকদের মধ্যে কারা ইউসুফ তুর্কমেন অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। আককোয়ুনলী তুর্কমেনরা তারপর তাদের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়। কারাকোয়ুনলী শব্দের অর্থ হচ্ছে কালো মেষ। এঁরা নিজেদের পতাকায় কালো মেষের ছবি অংকন করতেন। এজন্যে তাঁদেরকে কারাকোয়ুনলী বলে অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে আককোয়ুন্‌লী মানে শ্বেত বর্ণের ভেড়া যাঁরা শ্বেত ভেড়ার ছবি তাঁদের পতাকায় অংকন করতেন তাঁরা আককোয়ুনলী বলে অভিহিত হয়ে থাকেন।

আককোয়ুনলী বংশের রাজত্ব

আককোয়ুন্‌লী তুর্কমেনরাও দিয়ারে বকরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৭৮০ হিজরী (১৩৭৮ খ্রি.)-তে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করেন। ৭৮৪ হিজরী (১৩৮২ খ্রি.)-তে তাঁরা কারাকোয়ুন্‌লী তুর্কমেনদেরকে আযারবায়জান থেকে সম্পূর্ণ বে-দখল করে সমগ্র আযারবায়জান ও দিয়ারে বকরে তাদের রাজত্ব গড়ে তোলেন। কিন্তু ৯০৭ হিজরী (১৫০১ খ্রি.)-তে শাহ্ ইসমাঈল সাফাভী তাঁদের রাজত্বের বিলোপ সাধন করে সমগ্র রাজ্য দখল করে নেন।

সাফাভী রাজত্ব

৮০৪ হিজরী (১৪০১ খ্রি.)-তে আঙ্গোরা নামক স্থানে তৈমুর জয়যুক্ত হলে অনেক তুর্কীকে গ্রেফতার করে তৈমুর শায়খ আর্দাবেলীর খিদমতে হাযির হলেন। শায়খ সফীউদ্দীন নিজেকে ইমাম মূসা কাযিমের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন, তিনি সুন্নী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তৈমুর তখন তুর্কী কয়েদীদেরকে মুক্তিদান করেন। কয়েদীরা মুক্তি পেয়েই শায়খের হাতে বায়আত হয়ে যান এবং তখন থেকেই শায়খের খিদমতে অবস্থান করতে শুরু করেন। তৈমুর আর্দাবেল থেকে বিদায় হয়ে গেলেন, কিন্তু তুর্কীরা তাঁর খিদমতে রয়েই গেলেন। দেখতে দেখতে প্রচুর সংখ্যক তুর্কী শায়খের জন্যে আত্মত্যাগকারী খাদেমরূপে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হয়ে যায়। তাঁরা বংশানুক্রমে শায়খের বংশধরদের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করে যায়। এমন কি এক পর্যায়ে তারা শায়খের অধঃস্তন বংশধর ইসমাঈল সাফাভীকে নিজেদের বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ইসমাঈল সাফাভী কিন্তু শিয়া মতে বিশ্বাসী ছিলেন। ৯০৩ হিজরী (১৪৯৭ খ্রি.)-তে তিনি ইরানের কয়েকটি শহরে নিজ দখল প্রতিষ্ঠা করেন। ৯২০ হিজরী (১৫১৪ খ্রি.) সুলতান সালীম উসমানী তাঁকে তাব্রীয থেকে কুড়ি ফার্সং দূরে অবস্থিত খালেদরান নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন এবং সাফাভী রাজত্বের কয়েকটি পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন। তারপর তিনি মিসর ও সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। ইসমাঈল সাফাভী এ পরাজয় বরণের পর আরও দশ বছরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা ইরানে রাজত্ব করতে থাকেন। ১১৪৮ হিজরী (১৭৩৫ খ্রি.)-তে নাদির শাহ ইরানীর হাতে এ রাজত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত তাদের রাজত্ব অব্যাহত ছিল। তারপর ইরান ও আফগানিস্তানে পাঠানদের রাজত্ব কায়েম হয়। তারপর ইরানে কাচার রাজত্বের সূচনা হয়। আফগানিস্তান এখনও পাঠানদের দখলভুক্ত আছে।

সামগ্রিক দৃষ্টিপাত

বিভিন্ন রাজবংশ ও ইসলামী রাজত্বের উপরোক্ত তালিকা অধ্যয়নের পর এ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। তৃতীয় খণ্ডের পাঠকদের মস্তিষ্কে এর দ্বারা ইসলামী রাজ্যসমূহের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অঙ্কিত হবে। পাঠক এর দ্বারা কোন্ কোন্ যুগে কোন্ কোন্ খান্দান কোন্ কোন্ দেশে রাজত্ব করেছেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। এই সামগ্রিক জ্ঞান লাভের পর আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান পর্যন্ত তার পূর্ণ বিবরণ ও পতনের গতি সম্পর্কে পাঠক সম্যক ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হবেন। ভবিষ্যতে তৃতীয় খণ্ডে ঐ সব খান্দানের যে ইতিবৃত্তের বর্ণনা আসছে, সেগুলো অনুধাবন করতে এ অধ্যায়টির পাঠ যথেষ্ট সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত (পুনর্মুদ্রণ)

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৭-২০০৮/অঃ সঃ/৪৫৫৩—৩২৫০

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

ইসলামের ইতিহাস

তৃতীয় (শেষ) খণ্ড

মূল

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

অনুবাদক

মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী

ও

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় (শেষ) খণ্ড
মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী
মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও
মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত
দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৫২
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৩৮/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২১৫৮
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭০৯
ISBN : 984-06-1230-1.
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউস সানি ১৪২৯
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪
প্রুফ সংশোধন
মোঃ আবদুল বারেক মল্লিক
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১
প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিমউদ্দিন
মূল্য : ২২২.০০ (দুইশত বাইশ) টাকা

ISLAMER ITIHAS (The History of Islam Vol-3) : written by Maulana Akbar Shah Khan Najibabadi in Urdu and translated by Maulana Abdul Matin Jalalabadi & Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi into Bangla, Published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394 June 2008
Price : Tk 222.00; US Dollar : 7.50
Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundation.@yahoo.com

প্রকাশকের কথা

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, আকায়িদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম এবং আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিরচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

এরই ধারাক্রমে ২০০৪ সালে প্রকাশ করা হয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী প্রণীত 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড।

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে সাবধানী হয়, ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। ইতিহাসকে জাতির বিবেক বলা চলে। এটা একটা জাতির দিকদর্শন যন্ত্রের মতও কাজ করে।

ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। এরপর আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে।

এ কিতাবের প্রথম খণ্ডে রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়কাল, দ্বিতীয় খণ্ডে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতকাল এবং তৃতীয় খণ্ডে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলে গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

বিজ্ঞ গ্রন্থকার ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদক জনাব মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদীকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এক্ষণে পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। তাঁকে এবং প্রুফ রীডার জনাব মোঃ আবদুল বারেক মল্লিকসহ গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য সকলকেও জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থখানি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কিংবা আন্তরিকতায় কোন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করা হয়নি। তবু সুধীজনের নজরে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে ইন্‌শা আল্লাহ্।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বিষয় **পৃষ্ঠা**

তৃতীয় অধ্যায়

আমীরানে আন্দালুস	৪২
আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা	৪২
ধর্মীয় স্বাধীনতা	৪২
আমীর আবদুল আযীয নিহত	৪৩
আইয়ুব ইব্‌ন হাবীব	৪৪
কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তর	৪৪
হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান ছাকাফী	৪৫
সামাহ্ ইব্‌ন মালিক	৪৬
স্পেনে আদমশুমারী	৪৬
দক্ষিণ ফ্রান্সে অগ্রাভিযান	৪৬
আমীর সামাহ্‌র শাহাদাত	৪৭
আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ গাফিকী	৪৮
আবদুর রহমানের পদচ্যুতি	৪৮
আম্বাসা ইব্‌ন সুহায়ম কাল্‌বী	৪৯
দক্ষিণ ফ্রান্স বিজয়	৪৯
আমীর আম্বাসার শাহাদাত	৪৯
উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ফাহ্‌রী	৫০
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সালমা	৫০
উসমান	৫০
হুযায়ফা ইবনুল আহ্ওয়াস	৫০
হাশীম ইব্‌ন উবায়দ	৫১
হাশীমের পদচ্যুতি	৫১
মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আশজাঈ	৫১
দ্বিতীয় বারের মত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ গাফিকী	৫২
উসমান লাখমীর বিদ্রোহ	৫২
উসমান লাখমী নিহত হলেন	৫২
তুরস শহরে যুদ্ধ	৫৩
আমীর আবদুর রহমানের শাহাদাত	৫৪
আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রী	৫৫
আবদুল মালিকের পদচ্যুতি	৫৫
উতবা ইব্‌ন হাজ্জাজ সলুলী	৫৫
উতবার কীর্তিসমূহ	৫৬
আমীর উতবার ওফাত	৫৭
আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ঃ দ্বিতীয় পর্যায়	৫৭
আফ্রিকার গভর্নর পদে কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের নিযুক্তি	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায সিউটা দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন	৫৮
আফ্রিকার গভর্নররূপে হানযালার নিযুক্তি	৫৯
আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের হত্যা	৫৯
আত্মকলহ	৬০
ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা	৬০
ইব্‌ন সালামার পদচ্যুতি	৬১
আবুল খাত্তাব হুশাম ইব্‌ন যেরার কালবী	৬১
আবুল খাত্তাবের একটি রাজনৈতিক ভুল	৬১
ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা- দ্বিতীয়বার	৬৩
ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহ্‌রী	৬৩
স্পেনকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্তিকরণ	৬৩
স্পেনে কেন্দ্রের পরিবর্তনের প্রভাব	৬৪
আবদুর রহমান আদ-দাখিল ঃ স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা	৬৫
একনজরে স্পেনে ইসলামী শাসনের প্রথম পর্যায়	৬৬
স্পেনের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসিত ঈসায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা	৬৮
পলিও	৬৮
আলফোন্‌সূ	৬৯
স্বাধীন ঈসায়ী রাজ্যের রাজধানী শহর	৭০

চতুর্থ অধ্যায়

স্পেনের খিলাফত শাসন	৭১
আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া উমুবী	৭১
স্বভাব-চরিত্র	৭১
দেশত্যাগ	৭১
আবদুর রহমান আফ্রিকায়	৭২
আবদুর রহমানের আফ্রিকায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং পলায়ন	৭২
আবদুর রহমান স্পেনে	৭৩
আবদুর রহমানের কর্ডোভা অধিকার	৭৪
আবদুর রহমানের আমলাবর্গ	৭৫
বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ	৭৫
স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের হত্যাকাণ্ড	৭৬
অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা	৭৭
আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় খলীফাদের পদক্ষেপ	৭৭
আবদুর রহমানের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ	৭৮
অদ্ভুত উপহাস	৭৯
বিদ্রোহীদের উৎখাত	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদ্রোহের কারণসমূহ	৮৪
আবদুর রহমানের ওফাত	৮৯
আবদুর রহমানের জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা	৯০
দৈহিক অবয়ব এবং সন্তান-সন্ততি	৯২
শাসন-শৃঙ্খলা	৯৩
হিশাম ইব্‌ন আবদুর রহমান	৯৫
জন্ম	৯৫
অভিষেক	৯৬
ভাইদের বিদ্রোহ ঘোষণা	৯৬
ভাইদের সাথে যুদ্ধ	৯৬
ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন	৯৭
ফ্রান্স আক্রমণ	৯৮
পার্বত্য ঈসায়ীদের উৎখাত	৯৮
দক্ষিণ ফ্রান্সের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খুমুস দিয়ে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ	৯৮
আরবুনিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমন	৯৮
কর্ডোভা মসজিদের কাজের পূর্ণতা বিধান এবং ওয়াদিউল কবীরে পুল পুনর্নির্মাণ	৯৯
ওফাত	১০০
হিশামের জীবনী পর্যালোচনা	১০০
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন	১০৩
হাকাম ইব্‌ন হিশাম	১০৩
হাকামের চাচা সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ ঘোষণা	১০৪
হাকামের প্রতিরোধ	১০৫
সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্‌র পরিণতি	১০৬
খ্রিস্টানদের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত	১০৬
মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য একটি নতুন খ্রিস্টান রাজ্য গঠন	১০৭
বিশ্বাসঘাতক মুসলিম আমিলদেরকে ঈসায়ীদের উৎসাহ প্রদান	১০৮
হাকামের বিরোধিতার কারণসমূহ	১১০
টলেডোর বিদ্রোহীদের উৎখাত	১১২
ঈসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ	১১৩
নতুন সৈন্য ভর্তি	১১৪
মালিকীদের বিরোধিতা	১১৪
শাহী প্রাসাদে পর্যন্ত বিরোধিতার অগ্নিশিখা	১১৫
সুলতান হাকামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব	১১৫
মালিকীদের দেশান্তরিতকরণ	১১৬
ফ্রান্স আক্রমণ	১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদ্রোহের কারণসমূহ	৮৪
আবদুর রহমানের ওফাত	৮৯
আবদুর রহমানের জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা	৯০
দৈহিক অবয়ব এবং সন্তান-সন্ততি	৯২
শাসন-শৃঙ্খলা	৯৩
হিশাম ইব্‌ন আবদুর রহমান	৯৫
জন্ম	৯৫
অভিষেক	৯৬
ভাইদের বিদ্রোহ ঘোষণা	৯৬
ভাইদের সাথে যুদ্ধ	৯৬
ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন	৯৭
ফ্রান্স আক্রমণ	৯৮
পার্বত্য ঈসায়ীদের উৎখাত	৯৮
দক্ষিণ ফ্রান্সের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খুমুস দিয়ে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ	৯৮
আরবুনিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমন	৯৮
কর্ডোভা মসজিদের কাজের পূর্ণতা বিধান এবং ওয়াদিউল কবীরে পুল পুনর্নির্মাণ	৯৯
ওফাত	১০০
হিশামের জীবনী পর্যালোচনা	১০০
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন	১০৩
হাকাম ইব্‌ন হিশাম	১০৩
হাকামের চাচা সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ ঘোষণা	১০৪
হাকামের প্রতিরোধ	১০৫
সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্‌র পরিণতি	১০৬
খ্রিস্টানদের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত	১০৬
মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য একটি নতুন খ্রিস্টান রাজ্য গঠন	১০৭
বিশ্বাসঘাতক মুসলিম আমিলদেরকে ঈসায়ীদের উৎসাহ প্রদান	১০৮
হাকামের বিরোধিতার কারণসমূহ	১১০
টলেডোর বিদ্রোহীদের উৎখাত	১১২
ঈসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ	১১৩
নতুন সৈন্য ভর্তি	১১৪
মালিকীদের বিরোধিতা	১১৪
শাহী প্রাসাদে পর্যন্ত বিরোধিতার অগ্নিশিখা	১১৫
সুলতান হাকামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব	১১৫
মালিকীদের দেশান্তরিতকরণ	১১৬
ফ্রান্স আক্রমণ	১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি	১১৮
সুলতান হাকামের ওফাত ও সন্তান-সন্ততি	১১৯
হাকামের চরিত্র পর্যালোচনা	১১৯
আবদুর রহমান ছানী	১১৯
খান্দানের লোকদের বিরোধিতা	১২০
সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ আলী ইব্‌ন নাফির সমাদর	১২০
আলী ইব্‌ন নাফির সামাজিক সংস্কারসমূহ	১২১
স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রসার	১২১
বিদ্রোহ দমন	১২২
কনসটান্টিনোপলের দূতের আগমন	১২৩
আমীর আবদুর রহমানের ইসলামী চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ	১২৪
পর্তুগীজদের বিদ্রোহ	১২৪
টলেডোতে বিদ্রোহ	১২৬
কনসটান্টিনোপল সম্রাটের দ্বিতীয় কূটনৈতিক মিশন	১২৭
সেনাপতি মূসা ইব্‌ন মূসার বিদ্রোহ	১২৮
স্পেনের উত্তর সীমান্তের ঈসায়ীদের বিদ্রোহ	১২৮
উত্তর ও দক্ষিণ স্পেনের ঈসায়ীদের নতুন ফিতনা	১৩০
আবদুর রহমানের ওফাত	১৩১
আবদুর রহমানের রাজত্বকালের পর্যালোচনা	১৩১
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন	১৩২
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান	১৩৩
অভিষেক	১৩৩
সর্বপ্রথম কাজ	১৩৩
বিদ্রোহ দমন	১৩৪
একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব	১৩৭
সুলতান মুহাম্মাদের ওফাত	১৪০
সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বকালের পর্যালোচনা	১৪০
সুলতান মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ	১৪৩
অভিষেক	১৪৩
মুনযিরের কৃতিত্বসমূহ	১৪৩
সুলতান মুনযিরের ওফাত	১৪৪
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদের প্রথম দুর্বলতা	১৪৪
আবদুল্লাহ্‌র আমলে বনূ উমাইয়ার রাজত্বের অবস্থা	১৪৫
আবদুল্লাহ্‌র বাস্তব উদ্যোগ	১৪৬
সন্তান-সন্ততি	১৪৭
ওফাত	১৪৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় আবদুর রহমান	১৪৯
অভিষেক	১৪৯
প্রথম ফরমান	১৪৯
দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি	১৫০
প্রথম অভিযান	১৫০
বিদ্রোহসমূহের মূলোৎপাটন	১৫১
সুলতানের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত	১৫২
ঈসায়ী অধিকৃত অঞ্চলসমূহের বিবরণ	১৫২
আল-ফোনসুর বিভক্ত হলো	১৫৪
মরক্কো অধিকার	১৫৫
সারাকসতার গভর্নরের বিদ্রোহ	১৫৬
পরিখার যুদ্ধ	১৫৬
আব্বাসীয় খিলাফতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন	১৫৮
স্থল ও নৌবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি	১৫৯
খলীফা আবদুর রহমানের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি	১৫৯
ফরিয়াদীরূপে খলীফার দরবারে তিনজন খ্রিস্টান রাজার উপস্থিতি	১৬২
জ্ঞানীগুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	১৬২
স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়ন	১৬৩
পবিত্র-চিত্ততা	১৬৪
রাজস্ব আয়	১৬৫
খলীফার মৃত্যু	১৬৬
তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা	১৬৬
মৃত্যু	১৬৯
খলীফা হাকাম ইব্‌ন বাবদুর রহমানের খিলাফত লাভ	১৬৯
প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা	১৭০
সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজাদের বিদ্রোহ	১৭০
খ্রিস্টান রাজন্যবর্গের ভীতিগ্রস্ততা	১৭২
মরক্কোর শাসনকর্তার বিদ্রোহ	১৭৩
'অলি আহদী' (ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব)	১৭৪
মৃত্যু	১৭৪
খলীফা দ্বিতীয় হাকামের শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা	১৭৪
দ্বিতীয় হাকামের বিদ্যানুরাগ	১৭৫
হাকামের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী	১৭৬
গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা	১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাকামের রচনা	১৭৬
উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	১৭৭
জ্ঞানী ও গুণীজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্ত	১৭৭
হাকামের খিলাফত আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৭৮
দ্বিতীয় হিশাম ইব্‌ন হাকাম দ্বিতীয় এবং মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির	১৭৯
সালতানাতের অধিকারী সদস্যবর্গের পরামর্শ	১৭৯
সিংহাসনে আরোহণ	১৮০
একজন উপদেষ্টা হিসাবে মুহাম্মাদ ইবন আমির	১৮১
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের জীবন-বৃত্তান্ত	১৮১
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের কৃতিত্ব	১৮২
খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	১৮৩
মৃত্যু	১৮৩
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির মানসূরের শাসনকাল সম্বন্ধে পর্যালোচনা	১৮৪
মানসূরে আযম জ্ঞানী-গুণীদের মর্যাদা দিতেন	১৮৫
হিশামের পদচ্যুতি	১৮৬
মাহদী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল জাব্বার	১৮৭
সেনাবাহিনীর ক্ষমতা	১৮৭
মাহদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	১৮৮
সুলায়মান ইব্‌ন হাকামের মৃত্যু	১৮৮
গৃহ যুদ্ধ	১৮৮
খ্রিস্টান সম্রাট ইব্‌ন আওফুনুশ-এর কাছে সুলায়মান ও মাহ্‌দীর সাহায্য প্রার্থনা	১৮৮
মাহ্‌দীর অপসারণ	১৯০
হিশামের পুনরায় সিংহাসন লাভ	১৯০
দুশটি দুর্গের বিনিময়ে খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে আপোস	১৯০
হিশামের পরিণাম	১৯১
মুসতাঈন বিল্লাহ্	১৯১
মুসতাঈন নিহত	১৯১
উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তি	১৯১
উমাইয়া শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা	১৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনূ হামূদের শাসনামল	১৯৪
আলী ইব্‌ন হামূদ	১৯৪
আলী ইব্‌ন হামূদকে হত্যা	১৯৫
কাসিম ইব্‌ন হামূদ	১৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ	১৯৫
কাসিম ইব্ন হামূদের দ্বিতীয়বার শাসন ক্ষমতা দখল	১৯৬
উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা	১৯৬
আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম	১৯৭
মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ মুসতাক্ফী	১৯৭
ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হামূদী	১৯৮
হামূদ বংশের শেষ সম্রাট মুহাম্মাদ আসগর	১৯৯

সপ্তম অধ্যায়

বনূ ইবাদ, বনূ যুন্নুন, বনূ হূদ প্রভৃতি	২০০
স্বাধীন রাজবাংশ	২০০
সেভিল ও পশ্চিম স্পেন (বনূ ইবাদ)	২০০
আবুল কাসিম মুহাম্মাদ	২০০
আবূ উমর ইবাদ	২০০
মুতামিদ ইব্ন মুতাদিদ ইব্ন ইসমাঈল	২০১
চতুর্থ আলফোনসূ কর্তৃক মুসলমান অধ্যুষিত শহরসমূহ লুণ্ঠন	২০২
আলফোনসূ কর্তৃক মুতামিদের কাছ থেকে কর তলব	২০২
মুতামিদ কর্তৃক ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের কাছে সাহায্যের আবেদন	২০২
যালাকা রণক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ	২০৩
বাতলিউস (পশ্চিম স্পেন) প্রদেশে বনূ আফতাসের শাসন প্রতিষ্ঠা	২০৩
ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন কর্তৃক বাতলিউস দখল	২০৪
কর্ডোভায় ইব্ন জাহূর-এর শাসন প্রতিষ্ঠা	২০৪
আবুল ওয়ালীদ ইব্ন জাহূর আবদুল মালিক	২০৪
ইব্ন আত্তাশা	২০৪
গ্রানাডায় ইব্ন হাবুসের শাসন	২০৫
তালীতলায় বনূ যুন্নুনের শাসন	২০৫
সারাকাস্তায় বনূ হূদের শাসন	২০৬
আবূ আইয়ূব সুলায়মান, আহমদ মুকতাদির বিল্লাহ, ইউসুফ মুতামিন ও আহমদ মুসতাঈন	২০৬
পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপ মেজর্কা, মেয়র্কা, সার্দানিয়া ইত্যাদি	২০৭

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টানদের দুঃসাহসিকতা ও বাড়াবাড়ি এবং মুরাবিতীনদের শাসন	২০৮
ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন কর্তৃক স্পেন দখল	২১২
ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের মৃত্যু	২১৩
আবুল হাসান আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন	২১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবূ মুহাম্মাদ তাশুফীন	২১৪
তাশুফীন ইব্‌ন আলী	২১৪
ইবরাহীম ইব্‌ন তাশুফীন	২১৫
স্পেনের উপর মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের পতনের প্রতিক্রিয়া	২১৫
নবম অধ্যায়	
স্পেনে মুওয়াহ্‌হিদীন শাসন	২১৬
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তুমার্‌ত	২১৬
ইমাম গায্‌যালী (র)-এর ভবিষ্যদ্বাণী	২১৬
ইব্‌ন তুমার্‌তের বিশিষ্ট শিষ্য আবদুল মু'মিন	২১৭
ইব্‌ন তুমার্‌তের মাহ্‌দী হওয়ার দাবি	২১৭
আবদুল মু'মিন	২১৭
আবদুল মু'মিন কর্তৃক স্পেন দখলের বিশদ বিবরণ	২১৮
আবূ ইয়াকূব	২১৯
আবূ ইয়াকূবের শাসনকাল সম্পর্কে পর্যালোচনা	২১৯
আবূ ইউসুফ মানসূর	২২০
আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ	২২২
ইউসুফ মুনতাসির	২২৪
আবদুল ওয়াহিদ	২২৫
আবদুল ওয়াহিদ আদিল	২২৫
মুওয়াহ্‌হিদীন শাসনের অবসান	২২৫
দশম অধ্যায়	
মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনে পুনরায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা	২২৬
বনূ হূদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসূফের শাসনকাল	২২৭
একাদশ অধ্যায়	
গ্রানাডা সাম্রাজ্য	২৩০
ইব্‌নুল আহমার	২৩০
আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ	২৩০
মুহাম্মাদ মাখলূ	২৩১
সুলতান নাসর ইব্‌ন মুহাম্মাদ	২৩২
আবুল ওয়ালীদ	২৩২
আল-বাসীরা যুদ্ধ	২৩৩
সুলতান মুহাম্মাদ	২৩৫
সুলতান ইউসুফ	২৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুলতান মুহাম্মাদ গনী বিল্লাহ্	২৩৬
সুলতান ইসমাঈল	২৩৬
সুলতান ইউসুফ (দ্বিতীয়)	২৩৭
সুলতান মুহাম্মাদ (সপ্তম)	২৩৭
সুলতান ইউসুফ (তৃতীয়)	২৩৮
সুলতান মুহাম্মাদ (নবম)	২৩৯
ইউসুফ ইব্‌ন আল-আহমার	২৪০
সুলতান ইব্‌ন ইসমাঈল	২৪২
সুলতান আবুল হাসান	২৪২
সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ যাগাল	২৪৪
স্পেনে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসমাপ্তি	২৫০
খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র	২৫১
স্পেনের মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের জুলুম-অত্যাচার	২৫৩
স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা	২৫৪

দ্বাদশ অধ্যায়

মারাকিশ (মরক্কো) ও আফ্রিকা	২৫৮
ইদরীসী সালতানাত	২৬০
ইদরীসের মৃত্যু	২৬০
দ্বিতীয় ইদরীস	২৬০
রাজ্য বিস্তার	২৬১
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস	২৬২
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের মৃত্যু	২৬৩
আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ	২৬৩
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ	২৬৩
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন উমর	২৬৩
ইদরীসী হুকুমতের পরিসমাপ্তি	২৬৪
আফ্রিকার আগলাবী সাম্রাজ্য	২৬৪
ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব	২৬৫
যুদ্ধ-বিগ্রহ	২৬৬
মৃত্যু	২৬৭
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম	২৬৭
যিয়াদাতুল্লাহ্	২৬৭
বিদ্রোহ	২৬৮
সিসিলী দ্বীপ জয়	২৬৮
যিয়াদাতুল্লাহ্‌র মৃত্যু	২৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
আগলাব ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ ইকাল	২৭২
আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ	২৭২
আবূ ইবরাহীম আহমদ	২৭২
যিয়াদাতুল্লাহ্	২৭২
আবুল গারানীক	২৭২
ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ	২৭৩
আবুল আব্বাস	২৭৪
আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্	২৭৪
আগলাবী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি	২৭৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মিসর ও আফ্রিকায় উবায়দী সাম্রাজ্য	২৭৬
আবূ আবদুল্লাহ্	২৭৬
উবায়দুল্লাহ্ মাহদী	২৮০
আবূ আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা	২৮১
বিদ্রোহ	২৮২
মাহ্‌দীয়া নগরী নির্মাণ	২৮৩
মৃত্যু	২৮৫
আবুল কাসিম নায্‌যার	২৮৫
আবূ ইয়াযীদের সাথে সংঘর্ষ	২৮৬
মৃত্যু	২৮৭
ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম	২৮৭
আবূ ইয়াযীদের বন্দী ও মৃত্যু	২৮৮
ইসমাঈলের মৃত্যু	২৮৯
মুইয্য ইব্‌ন ইসমাঈল	২৮৯
মিসর দখল	২৯০
কায়রোয় রাজধানী স্থানান্তর	২৯১
মিসরে কারামতীয়দের হামলা	২৯২
দামেশ্‌ক অধিকার	২৯৩
মুইয্যের মৃত্যু	২৯৩
আযীয ইব্‌ন উবায়দী	২৯৪
উফতোগীনের সৈন্য সমাবেশ	৩৯৪
উফতোগীনকে বন্দী করে মন্ত্রীত্ব প্রদান	২৯৪
আযীযের মৃত্যু	২৯৬
আবূ মানসূর হাকিম ইব্‌ন আযীয উবায়দী	২৯৬
ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের বিদ্রোহ এবং তাকে হত্যা	২৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাকিমের মৃত্যু	২৯৭
যাহির ইব্‌ন হাকিম উবায়দী	২৯৮
মৃত্যু	২৯৮
মুসতানসির ইব্‌ন যাহির উবায়দী	২৯৯
গৃহযুদ্ধ	২৯৯
মুসতানসিরের হাতে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্-এর বায়আত গ্রহণ	৩০১
আবুল কাসিম মুসতালা উবায়দী	৩০২
মুসতালার মৃত্যু	৩০৪
আবূ আলী আমির উবায়দী	৩০৪
আমির উবায়দীকে হত্যা	৩০৫
হাফিজ উবায়দী	৩০৬
মৃত্যু	৩০৬
যাফির ইব্‌ন হাফিজ উবায়দী	৩০৬
যাফিরকে হত্যা	৩০৭
ফায়িয ইব্‌ন যাফির উবায়দী	৩০৭
ফায়িয উবায়দীর মৃত্যু	৩০৮
আদিদ ইব্‌ন ইউসুফ উবায়দী	৩০৮
সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গীর মিসরের প্রতি মনোনিবেশ	৩০৯
খ্রিস্টানদের কাছে মিসরীয়দের সাহায্য প্রার্থনা	৩১০
অদূরদর্শিতার পরিণাম	৩১১
আদিদ কর্তৃক সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা	৩১১
মিসরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সালাহুদ্দীন আইয়ূবী	৩১২
আদিদের মৃত্যু	৩১৪
একনজরে উবায়দী শাসনামল	৩১৪

চতুর্দশ অধ্যায়

বাহরাইনের কারামতীয় সম্প্রদায়	৩১৬
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ফারজ কারমাত	৩১৬
হুসাইন মাহ্দী	৩১৭
দ্বিতীয় ইয়াহ্ইয়া	৩১৭
আবূ সাঈদ জানাবী	৩১৮
আবূ তাহির	৩১৮
আবূ তাহিরের দস্যুবৃত্তি	৩১৯
পবিত্র মক্কা আক্রমণ	৩১৯
আবুল মানসূর	৩১৯
সাবূরকে হত্যা	৩২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাসান আযম কারামতী	৩২০
জা'ফর ও ইসহাক	৩২২

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফারিসের কারামতীয় ও বাতিনী সাম্রাজ্য	৩২৩
আহমদ ইব্‌ন আত্তাশ	৩২৪
হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ	৩২৪
হাসান ইব্‌নে সাবাহর মৃত্যু	৩২৬
কারা বুযুর্গ উমীদ	৩২৭
রুকনুদ্দীন খুরশাহ	৩২৭
ফিদায়ীদের হাতে নিহত ব্যক্তিবৃন্দ	৩২৮

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

চেঙ্গিযী মুঘল	৩২৯
তুর্ক, মুঘল ও তাতার	৩২৯
একটি সন্দেহ নিরসন	৩২৯
'তুর্ক' শব্দের প্রয়োগ	৩৩০
গায্ তুর্ক	৩৩০
সালজুকী	৩৩১
মুঘল ও তাতার	৩৩১
মুঘল শব্দের ব্যাখ্যা	৩৩৪
ফারাতাতার	৩৩৪
একটি ভুল ধারণা ও তার অপনোদন	৩৩৫
চেঙ্গিয খান	৩৩৬
মুঘলদের আকার-আকৃতি	৩৩৬
মুঘলদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা	৩৩৬
কাচূলীর স্বপ্ন	৩৩৬
তুমনাহ্ খানের ব্যাখ্যা	৩৩৭
চেঙ্গিয খানের জন্ম	৩৩৭
চেঙ্গিয খানের স্বপ্ন	৩৩৭
নামের পরিবর্তন	৩৩৮
মুঘলদের ধর্ম	৩৩৯
সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ	৩৪০
খাওয়ারিযমের জন্য তিনজন মহাপুরুষের বদদু'আ	৩৪০
চেঙ্গিয খান কর্তৃক সুলতান খাওয়ারিযম শাহের সাথে আপোসচুক্তির উদ্যোগ	৩৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাওয়ারিযম শাহের ভ্রান্তি	৩৪২
ইসলামী দেশসমূহের উদ্দেশে চেঙ্গিয খানের অভিযান	৩৪৩
খাওয়ারিযম শাহের কাপুরুষতা	৩৪৩
খাওয়ারিযম শাহের মৃত্যু	৩৪৪
জালালুদ্দীন ইব্‌ন খাওয়ারিযম	৩৪৫
সুলতান জালালুদ্দীনের পরিণাম	৩৪৮
ইসলাম সম্পর্কে চেঙ্গিষ খানের চিন্তা-গবেষণা	৩৪৮
উত্তরাধিকারী মনোনয়ন	৩৪৯
চেঙ্গিয খানের মৃত্যু	৩৫০
চেঙ্গিয খানের শাসনামল সম্পর্কে একটি সমীক্ষা	৩৫০
উকতাই খান	৩৫৩
কুয়ূক খান	৩৫৪
কুয়ূক খানের মৃত্যু	৩৫৫
মানকূ খান	৩৫৬
মানকূ খানের মৃত্যু	৩৫৬
কুবলাঈ খান	৩৫৬
কুবলাঈ খানের মৃত্যু	৩৫৮
হালাকূ খান	৩৫৮
হালাকূ খানের মৃত্যু	৩৬০
আবাকা খান	৩৬১
আবাকা খানের মৃত্যু	৩৬২
তেকূদার আগলান ওরফে আহমদ খান	৩৬২
তেকূদার আগলানের শাহাদাত	৩৬২
আরগূন খান	৩৬৩
আরগূন খানের পুত্র কীখাতূ খান	৩৬৩
কীখাতূ খানের মৃত্যু	৩৬৩
বায়দূ খান ইব্‌ন কারাকায়ী ইব্‌ন হালাকূ খান	৩৬৩
বায়দূ খানকে হত্যা	৩৬৪
সুলতান মাহমূদ গাযান খান	৩৬৪
সুলতান মাহমূদ গাযানের মৃত্যু	৩৬৫
সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ উলজায়তূ	৩৬৫
সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর মৃত্যু	৩৬৬
সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান	৩৬৬
আবূ সাঈদের মৃত্যু	৩৬৬
আরতাক বূকা ইব্‌ন তুলি খানের উত্তর পুরুষ আরপা খান	৩৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরপা খানের হত্যা	৩৬৭
মূসা খান ইব্‌ন বায়দূ খান	৩৬৭
চেঙ্গিয খানের পুত্র জূজী খানের বংশধর	৩৬৮
বাতূ খান ইব্‌ন জূজী খান	৩৬৮
বারাকাহ্ খান ইব্‌ন জূজী খান	৩৬৮
চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের বংশধর	৩৭১
জূজী খান ইব্‌ন চেঙ্গিয খান অর্থাৎ উযবেক জাতির বংশ লতিকা	৩৭৩
চুঘতাই খান ইব্‌ন চেঙ্গিয খানের বংশ লতিকা	৩৭৪
তুলি খান ইব্‌ন চেঙ্গিয খানের বংশ লতিকা	৩৭৫
চেঙ্গিযী মোঙ্গলদের সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা	৩৭৬

সপ্তদশ অধ্যায়

ইরানের ইসলামী ইতিহাসের পরিশিষ্ট	৩৮২
সাফ্‌ফারিয়া সাম্রাজ্য	৩৮২
সামানী সাম্রাজ্য	৩৮৪
দায়লামী শাসনামল	৩৮৭
গাযনাবী সাম্রাজ্য	৩৮৭
সালজুক সাম্রাজ্য	৩৯৩
খাওয়ারিয্‌ম শাহী সালতানাত	৩৯৭
ঘূরী সাম্রাজ্য	৩৯৯
শীরাযের আতাবেকবৃন্দ	৪০১
সীস্তানের রাজন্যবর্গ	৪০২
কুরত বংশের রাজন্যবর্গ	৪০২
আযারবায়জানের আতাবেকবৃন্দ	৪০৩
আলামূতের ধর্মদ্রোহী সাম্রাজ্য	৪০৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

মিসর ও সিরিয়ার ইসলামী ইতিহাসের পরিশিষ্ট	৪০৬
সিরীয় আতাবেক	৪০৬
মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ূবী সাম্রাজ্য	৪০৭
মিসরের মামলূক সাম্রাজ্য ঃ প্রথম স্তর	৪০৯
মামলূক সাম্রাজ্য ঃ দ্বিতীয় স্তর বা কালাউনী সাম্রাজ্য	৪১০
মিসরের মামলূক সাম্রাজ্য ঃ দ্বিতীয় স্তর বা চারকাসী সাম্রাজ্য	৪১১
মিসরের আব্বাসী খলীফাবৃন্দ	৪১৩

বিষয় পৃষ্ঠা

উনবিংশ অধ্যায়

উসমানীয় সাম্রাজ্য ৪১৫
উসমান খান ৪১৮

বিংশ অধ্যায়

রোমান সাম্রাজ্য ৪২২
আরখান ৪২৫
নেগচারী বাহিনী ৪২৬
মুরাদ খান (প্রথম) ৪৩১
সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম ৪৩৮
আংকারা যুদ্ধ ৪৫১
সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের পুত্রদের আত্মকলহ ৪৫৮
সুলতান মুহাম্মাদ খান (প্রথম) ৪৬১
সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল ঃ একটি পর্যালোচনা ৪৬৫
সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ৪৬৫
কনসটান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) ৪৭৬
কনসটান্টিনোপল বিজয় ৪৮১
কনসটান্টিনোপল শহরের ইতিহাস ৪৮৯
বিজয়ী সুলতানের অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী ৪৯০
সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল ঃ একটি পর্যালোচনা ৪৯৮

একবিংশ অধ্যায়

সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ এবং জামশীদের বিস্ময়কর কাহিনী ৫০১
সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) ৫১১
সুলতান সালীম উসমানী ৫১৭
ইসমাঈল সাফাভী ৫২১
খালদারান যুদ্ধ ৫২৫
মিসর ও সিরিয়া বিজয় ৫৩৪
মিসরে মামলূকী ও উসমানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ ৫৩৮
সুলতান সালীমের শাসনামল ঃ একটি পর্যালোচনা ৫৫০

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেন

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান

ইউরোপের মানচিত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি উপদ্বীপ রয়েছে যার মাধ্যমে ইউরোপ মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশের সাথে সম্মিলিত হতো। অর্থাৎ এ উপদ্বীপের দক্ষিণকোণ মরক্কোর উত্তরকোণের সাথে সম্মিলিত হয়ে যেন একটি যোজক নির্মাণ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে করমর্দনের জন্য এগিয়ে আসে। ফলে ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে প্রায় দশ মাইলের ব্যবধান থেকে যায়। অপরদিকে ভূমধ্যসাগর ও বিস্ক উপসাগর একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে এ উপদ্বীপটিকে একটি দ্বীপে পরিণত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু জাবালুল বারতাত বা পিরেনীজ পর্বতমালা একটি প্রাচীর তুলে উপদ্বীপটিকে ফ্রান্স থেকে তো আলাদা করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে একটি দ্বীপে পরিণত হতে দেয় নি। ইউরোপের এই দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপটিকে আইবেরিয়া, স্পেন, হিস্পানিয়া, আন্দালুস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্পেনের আয়তন দুই লাখ বর্গমাইলেরও অধিক।

উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও আবহাওয়া

এ দেশটির আবহাওয়া ইউরোপের অন্য সমস্ত দেশের তুলনায় উত্তম অর্থাৎ মধ্যম। ভূমি কৃষির জন্যে সমধিক উপযুক্ত এবং উর্বর। শস্য-শ্যামল ও অধিক ফসল উৎপন্নের দিক থেকে দেশটি সিরিয়া ও মিসরের সাথে তুলনীয়। রৌপ্য খনির জন্য বিশেষভাবে এর খ্যাতি আছে। অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও এ দেশে পাওয়া যায়।

ওয়াদিউল কবীর ও টেগস এ দেশের দুটি বিখ্যাত নদী। এ দুটি নদী, এগুলোর শাখা নদী ও উপনদীসমূহ দেশটিকে একটি বাগানে পরিণত করেছে। এ উপদ্বীপটির উত্তর সীমানায় রয়েছে বিস্ক উপসাগর ও পিরেনীজ পর্বতমালা, পূর্বে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, জিব্রাল্টার প্রণালী ও আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর।

প্রদেশসমূহের বিবরণ

এ উপদ্বীপের বিখ্যাত প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ উত্তর-পশ্চিম কোণে পর্তুগাল, দক্ষিণ-পশ্চিমে জালীকিয়া প্রদেশ। উত্তরে আস্তুরিয়া, কাস্তালা, আরবুনিয়া ও আরগাওয়ান প্রদেশসমূহ। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কাৎলুনিয়া, পূর্বাঞ্চলে আন্দালুসিয়া প্রদেশ।

টলেডো আন্দালুস বা হিস্পানিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। কর্ডোভা ও গ্রানাডা শহর দুটি আন্দালুসিয়া অর্থাৎ উপদ্বীপটির দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এ উপদ্বীপটির সর্বাধিক উর্বর ও মূল্যবান দক্ষিণাঞ্চল বা আন্দালুসিয়া প্রদেশ আর দক্ষিণাঞ্চলই অধিককাল ধরে মুসলিম অধিকারে ছিল যার বর্ণনা পরে আসছে।

ফিনিশিয়া, কার্তাজেনা, রোমক ও গথদের রাজত্ব

ফিনিশিয়া রাজত্ব

ফিনিশিয়া বা ফুনীশিয়া বা কিনআন হচ্ছে সেই দেশটির নাম যা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল বলে সুপরিচিত। এটা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল। হযরত মূসা আলায়হিস সালামের কয়েকশ বছর পূর্বে দেশটির ঐ অঞ্চলে একটি দুর্ধর্ষ ও বণিক সম্প্রদায় বসবাস করতো। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে তাদেরকে ফুনীশিয়াবাসী বলে অভিহিত করে থাকে। ফুনীশিয়াবাসীদের নৌবহর সর্বদা ব্যবসাপণ্য নিয়ে সমগ্র ভূমধ্যসাগর জুড়ে বিচরণ করতো। সম্পদের বৈভব ও প্রাচুর্য তাদেরকে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী করে তোলে। ফিলিস্তীন অধিকার করে এরা লোহিত সাগরের পথ বেয়ে হিন্দুস্থান ও চীন পর্যন্ত এবং অপরদিকে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে বৃটেন ও উত্তর সাগর পর্যন্ত নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলের বন্দরসমূহ তাদেরই দখলে ছিল। তাদের নৌশক্তি ছিল পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী নৌশক্তি। তারা বিভিন্ন দেশে তাদের উপনিবেশসমূহ গড়ে তুলেছিল। এসব উপনিবেশের একটি হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার (তিউনিসিয়া) কার্তাজেনা শহর– যা পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও রাজবংশের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

সে সব উপনিবেশের মধ্যে ছিল আন্দালুসের সাগর উপকূলে তাদেরই আবাদ করা অনেক নগর-বন্দর-জনপদ। ধীরে ধীরে আন্দালুস বা স্পেন দেশ তাদের রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং ফুনিশীয়রা ঐ দেশে রাজত্ব করতে থাকে। ফিনিশীয়দের শক্তি স্তিমিত হয়ে আসলে তাদেরই একাংশ কার্তাজেনা অর্থাৎ তিউনিসিয়ায় একটি শক্তিশালী রাজত্বের গোড়াপত্তন করে। তখন আন্দালুসও কার্তাজেনার একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কার্তাজেনাবাসীরা বহু শতাব্দী ধরে এ রাজ্যে তাদের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলে। এরা ছিল অগ্নিউপাসক ও নক্ষত্রপূজারী। তাদের সংস্কৃতি তাদের সমকালের অন্য সংস্কৃতি বলে গণ্য হতো। স্পেনে ফুনিশীয়দের তুলনায় কার্তাজেনীয়দের প্রভাব বেশি পড়েছিল। কেননা, সিরীয় উপকূলের তুলনায় কার্তাজেনা আন্দালুসের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এলাকা ছিল।

স্পেনে রোমান রাজত্ব

ইতালীর রোম শহরকে কেন্দ্র করে বায়যানটাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্তাজেনীয় ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের এক অবিচ্ছিন্ন ধারার সূত্রপাত হয়। অবশেষে রোমানরা কার্তাজেনীয়দেরকে উচ্ছেদ করে সেখানে তাদের নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে। রোমানরা দীর্ঘ পাঁচশ বছর ধরে সেখানে রাজত্ব করে। রোম শহর থেকে ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে স্পেনে

আসতেন। তিনি বার্ষিক রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রে অর্থাৎ রোমে প্রেরণ করতেন। যেভাবে ভূমধ্যসাগর ও তার উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহের রাজত্ব ফিনিশীয়দের হাত থেকে কার্তাজেনীয়দের করতলগত হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে তা কার্তাজেনীয়দের হাত থেকে রোমানদের হস্তগত হয়।

গথ রাজত্ব

রোমানদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর ৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁদের ওপর দু'দুটি বিপদ আপতিত হয়। প্রথম বিপদ হচ্ছে, মোগলদের সাথে তুল্য গথ সম্প্রদায় মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে উত্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। বিলাসপ্রিয় রোমানরা পরিশ্রমী গথ সম্প্রদায়ের মুকাবিলার সামর্থ্য রাখতো না। তাই এই লুটেরা সম্প্রদায়টি রোমানদেরকে তাড়িয়ে ফিরতে থাকে। এমনি অবস্থায় রোমক সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একই অংশের রাজধানী রোমেই থাকে। অপর অংশ অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পূর্বভাগের রাজধানী হয় কনসটান্টিনোপল। লুটেরা গথ সম্প্রদায় ঠিক তেমনিভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে বসে যেমনটি হয়েছিল তুর্কী সালজুকদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে। সালজুকীরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণের পর স্বল্পকালের মধ্যেই নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল। ঠিক তেমনি গথরাও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সের দিক থেকে অগ্রসর হয়ে স্পেন উপদ্বীপটি দখল করে বসে। গথদের একাংশ পূর্বাঞ্চলে তাদের নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলে। অপর অংশ পশ্চিমাঞ্চলে আন্দালুসে নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলে।

রোমান সাম্রাজ্য যেভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্বরোম এবং পশ্চিমরোমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি গথদেরও দুটি রাজ্য পূর্বাঞ্চলীয় গথ রাজ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গথ রাজ্যরূপে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম গথ রাজ্যে যেহেতু ধর্ম ও রাজনীতি যুগপৎভাবে পাশাপাশি চলেছিল, তাই তাঁরা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণের পরও নিজেদেরকে রোমের ঈসায়ী ধর্মগুরু পোপের অধীন করে রাখেনি বরং আন্দালুসের ঈসায়ী পোপ রোমের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখে।

গথ রাজারা ধর্মের তেমন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন না। তাঁরা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণই করেছিল রাজনৈতিক গরজে। কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত আন্দালুসেও ধর্মনেতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত এমনও এক সময় আসে যখন পাদ্রীরা সম্রাট নির্বাচন ও অভিষেক অনুষ্ঠানেও অত্যন্ত গুরুত্ববহ ভূমিকার অধিকারী হয়ে ওঠে। তাঁদের সে প্রভাবকে খর্ব করা রাজা-বাদশাহদের জন্য রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। গথ রাজত্ব আন্দালুসে ৫০০ খৃস্টাব্দের দিকে পূর্ণ দাপটে কায়েম হয় এবং দু'শ' বছর ধরে তা আন্দালুসে প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুশ' বছরের এই ব্যবধানে গথদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও দুর্ধর্ষতার স্থলে তাদের মধ্যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফুনিশীয় ও কার্তাজেনীয়রা উভয় সম্প্রদায়ই ছিল অগ্নিউপাসক ও নক্ষত্রপূজারী। উভয় সম্প্রদায়ই বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রীতিতে মত্ত ছিল। তাই স্পেনবাসীরা তাদের শাসকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং তাদের মধ্যেও এগুলোর সঞ্চার হয়। তারপর রোমান রাজত্বের সময় বিলাস প্রবণতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। গথ রাজারা তাদের সাথে যদিও সৈনিক

জীবনের দুর্ধর্ষতাসহ স্পেনের ঘাঁটিতে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দেশবাসীর বিলাসপ্রবণতা স্বল্পকালের মধ্যেই শাসকদেরকেও গ্রাস করে এবং তাদেরকেও বিলাসপ্রিয় করে তোলে। গথদের নিজেদের কোন উন্নত কৃষ্টি-সংস্কৃতি বা উন্নত জীবন-যাপন প্রণালী ছিল না বিধায় তারা স্পেনবাসীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিলাস-বসন থেকেও আর দূরে রইল না। মোটকথা, স্পেন ছিল অনেক সভ্যতার মিলনকেন্দ্র। সাথে সাথে সর্বপ্রকার উন্নতি অগ্রগতি এবং সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও তা বঞ্চিত ছিল না। খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার ও তার বিরাট প্রভাব দেশের উপর বিস্তার করে।

৭০০ খ্রিস্টাব্দের পর গথ রাজত্বেরও ঐ দেশে অবসান ঘটে। অপর এক প্রাচ্য সম্প্রদায় ইরানী, রোমান, সিরীয়, মিসরীয় এবং গ্রীক রাজত্বসমূহেরই কেবল নয় বরং ঐসব দেশের বিখ্যাত কৃষ্টি-সভ্যতা ও ধর্মসমূহকে পর্যন্ত চুরমার করে দিয়ে যেখানে প্রবেশ করে মূর্তিপূজা ও খ্রিস্টধর্মের স্থলে একত্ববাদের পতাকাকে সমুন্নত করে এবং ইসলামী রাজত্বের গোড়াপত্তন করে যার বিশদ বিবরণ দেয়া হবে।

গথ রাজত্বের অবসান

যুগ পরিক্রমার সাথে সাথে গথ রাজত্বে ধর্মীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেখানে পৃথক ধর্মীয় কেন্দ্র অর্থাৎ চার্চ কায়েম ছিল। রাষ্ট্রীয় আইনে খ্রিস্টধর্মীয় সংকীর্ণতার অনুপ্রবেশ বহুল পরিমাণ ঘটে। ফলশ্রুতিতে স্পেনের ইহুদীরা অহরহ নিপীড়িত হতে থাকে। ঈসায়ীরা ইহুদীদেরকে তাদের সেবাদাস মনে করতো। তাদের সহায়-সম্পদ তারা নির্বিচারে লুটেপুটে খেত। তাদের সর্বপ্রকার সেবা বলপূর্বক আদায় করে নেয়া হতো। তাদের অধিকার অনেকটা চতুষ্পদ পশুর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ গথ রাজত্বের সূচনালগ্নে ইহুদীদের অবস্থা এতটা শোচনীয় ছিল না। মূর্তিপূজার সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাস স্পেনের খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহুদীরা ছিল খ্রিস্টানদের তুলনায় প্রাগ্রসর। খ্রিস্টানরা সাধারণভাবে আরামপ্রিয় এবং কর্মবিমুখ ছিল। পক্ষান্তরে ইহুদীরা ছিল পরিশ্রমী। কিন্তু ইহুদীরা যেহেতু সংখ্যায় কম ছিল আর রাজশক্তি ছিল খ্রিস্টানদের হাতে, তাই তারা নিষ্কৃতির কোন উদ্যোগ গ্রহণেও সক্ষম ছিল না। পাদ্রীরা বাক্য শাসনের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ এতই বাড়িয়ে তোলে যে, বাদশাহরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেতেন না। বড় বড় জায়গীর ও উর্বর এলাকা ছিল পাদ্রীদের দখলভুক্ত। স্বয়ং পাদ্রীদের বাসভবনসমূহ ছিল পরীস্থান তুল্য। সর্বপ্রকার বিলাস-বসন এবং মাতালপনার দৃশ্য পাদ্রীদের মজলিসসমূহে পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে কারো টু শব্দটি করার উপায় ছিল না। পাদ্রীদের ফতওয়া ও ডিক্রির সম্মুখে বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিরাও মাথা নত করতে বাধ্য হতেন। এক একজন পাদ্রীর ঘরে শ' দু'শ' করে বর্বর সম্প্রদায়ের দাস থাকা ছিল একটা মামুলী ব্যাপার। তাদের বিধানের বিরুদ্ধে কারো আপীল করার উপায় ছিল না। গথদের রাজধানী ছিল টলেডোতে। স্পেনীয় চার্চের প্রধান ধর্মগুরু এই টলেডোতেই বাস করতেন। প্রধান পুরোহিতের মর্যাদা ও অধিকার এত দূর উন্নীত হয়েছিল যে, তিনি বাদশাহকে পদচ্যুতির ফরমানও জারি করতে পারতেন। অন্য কথায় বলা চলে, স্পেনে নির্ভেজাল খ্রিস্ট ধর্মীয় রাজত্ব কায়েম ছিল।

লারযীকের সিংহাসনারোহণ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ দশকে শান-শওকত ও রাজ্যের পরিধির দিক থেকে গথ রাজত্ব ছিল তার উন্নতির চরমে। সমস্ত ভূমধ্যসাগর জোড়া তাদের আধিপত্য ছিল সর্বজন-স্বীকৃত। স্পেন উপদ্বীপ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরের অধিকাংশ দ্বীপেও তাদের আধিপত্য ও রাজত্ব কায়েম ছিল। আফ্রিকার উত্তর উপকূলের কোন কোন স্থানেও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে বায়যানটাইন অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্য অত্যন্ত শান-শওকত ও দাপটের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে যুগে মুসলমানরা রোমানদেরকে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর থেকে বের করে দেয়, সে যুগে গথ সম্প্রদায়ের বাদশাহ্ ওটিজা টলেডোতে রাজত্ব করছিলেন। ওটিজা যখন লক্ষ্য করলেন যে, পাদ্রীরা গোটা রাজ্য কুক্ষিগত করে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাদের নির্যাতন মানবতার সীমালংঘন করে যাচ্ছে, তখন তিনি খ্রিস্টানদের অর্থাৎ খ্রিস্টান পাদ্রীদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস পান। পাদ্রীরা তা আঁচ করতে পেরে ওটিজাকে পদচ্যুত করতে সংকল্পবদ্ধ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদী প্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করে। ইহুদী প্রীতি-দয়ার্দ্র আচরণ এমনি এক অমার্জনীয় অপরাধ ছিল যে, এ অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তাদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। তারা ওটিজাকে পদচ্যুত করে জনৈক ফৌজী সর্দার রডারিককে সিংহাসনে বসায়। এভাবে গথ রাজত্বের অবসান ঘটে এবং খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শুরুর দিকে রডারিকের রাজত্ব কায়েম হয়। রডারিক ছিলেন সত্তর-আশি বছরের একজন অভিজ্ঞ ফৌজী সর্দার বা সিপাহ্সালার। যেহেতু পাদ্রীরা তাঁর পেছনে সক্রিয় ছিল, তাই প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করে রডারিকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় কোন প্রকার বেগই পেতে হয়নি। রডারিক সিংহাসনে আরোহণ করে নির্বিঘ্নে এবং কঠোর হস্তে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকেন। পাদ্রীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও এভাবে অক্ষুণ্ন থাকে।

স্পেনে মুসলিম হামলার পটভূমি

আফ্রিকা তথা মরক্কোর উত্তর উপকূলে সিউটা বা সাওতা দুর্গ তখনো ছিল ঈসায়ীদের অধিকারে। কাউন্ট জুলিয়ান নামক এক ব্যক্তি ছিল এ দুর্গের অধিপতি। আরব ঐতিহাসিকগণ একে বালিয়ান নামে অভিহিত করে থাকেন। জুলিয়ান ছিলেন একজন গ্রীক সর্দার। তিনি কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উক্ত সম্রাটের সমগ্র আফ্রিকান রাজ্য মুসলিম অধিকারে চলে এসেছিল। একমাত্র ঐ দুর্গটি একটি চুক্তির বলে জুলিয়ানের অধিকারে অবশিষ্ট ছিল। জুলিয়ান সম্রাটের ইঙ্গিত অনুসারে স্পেনের খ্রিস্টান রাজার সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। কেননা, কনসটান্টিনোপলের তুলনায় স্পেন সিউটার নিকটবর্তী এলাকা ছিল আর স্পেনের সমর্থনপুষ্ট থাকলে এ খ্রিস্টান ঘাঁটিটির অস্তিত্ব নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারতো। এভাবে কাউন্ট জুলিয়ান স্পেনের গভর্নররূপে গণ্য হতেন আর

সিউটা দুর্গটি স্পেনের একটি দেশীয় রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের সাথে এর নামেমাত্র সম্পর্ক ছিল। স্পেনের শেষ গথ রাজা ওটিজা উক্ত জুলিয়ানের সাথে তাঁর নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তাই ওটিজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হলে স্বাভাবিকভাবেই জুলিয়ান ওটিজার সিংহাসনচ্যুতি ও রডারিকের সিংহাসন আরোহণে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন। কিন্তু যেহেতু তা পাদ্রীদেরই ইচ্ছা অনুসারে হয়েছিল তাই অগত্যা জুলিয়ানকেও তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। জুলিয়ানের এক কন্যা ছিলেন ফ্লোরিডা। তিনি ছিলেন প্রাক্তন রাজা ওটিজার দৌহিত্রী। গথ রাজত্বের সময় রীতি প্রচলিত ছিল, আমীর, গভর্নর, সিপাহসালার এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের কনিষ্ঠ সন্তান রাজার খিদমতে উপস্থিত থেকে দরবারের আদব-কায়দা ও প্রথা-পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। রাজাও নিজ পুত্রের মত এদের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তারা যখন যৌবনে পদার্পণ করতো, তখন তিনি তাদেরকে তাদের পিতা-মাতার নিকট ফিরে যেতে অনুমতি দিতেন। অনুরূপভাবে আমীর-উমারাদের কন্যাদেরকেও রাজমহিষীদের খিদমতে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তারাও রাণীদের সাথে একই মহলে অবস্থান করে লালিত-পালিত হতো। রাজা এবং রাণী তাদেরকে আপন কন্যার মত মনে করতেন এবং সেই দৃষ্টিতে দেখতেন। এই প্রাচীন রীতি অনুসারে কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডাও রাজপ্রাসাদে ছিলেন। এ বালিকাটি ততদিনে যৌবনপ্রাপ্তা হয়ে পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাবার বয়সে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু স্পেনের নতুন রাজা রডারিক বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও বলপূর্বক উক্ত বালিকার সতীত্ব হরণ করেন। বালিকা অতি কষ্টে তার এ অপমান ও সতীত্ব হরণের সংবাদ তার পিতার কর্ণগোচরে পৌঁছান। এ সংবাদ পেয়ে জুলিয়ানের অন্তরে প্রতিশোধ বহ্নি জ্বলে ওঠে। গথ সম্প্রদায়ের যার কানেই এ সংবাদটি পৌঁছালো প্রাক্তন রাজবংশের এ নিয়ম ও আপন জাতির এ অপমানের সংবাদ তাকেই ব্যথিত করে তুললো। কিন্তু কাউন্ট জুলিয়ান তাঁর সে রাগের কথা গোপন রাখলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে টলেডোয় গিয়ে পৌঁছলেন। রাজদরবারে পৌঁছে তিনি তাঁর স্ত্রীর অর্থাৎ ফ্লোরিডার মায়ের অন্তিম শয্যায় থাকার এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কন্যাদর্শনের অন্তিম অভিপ্রায়ের কথা রাজাকে জানিয়ে ফ্লোরিডাকে ফেরত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা জানালেন। এ ছিল এমনি এক কৌশল যা রডারিক কোন মতেই অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। এভাবে জুলিয়ান তাঁর কন্যাসহ সিউটা প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হলেন। প্রাক্তন রাজ-পরিবারের সমর্থকদের মধ্যে আশবেলিয়ার (সেভিলের) প্রধান ধর্মযাজকও জুলিয়ানের কাছে আসলেন এবং রডারিকের রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে উভয়েই সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন।

মূসা ইবন নুসায়র

সে যুগে খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে কায়রোয়ান শহরে মূসা ইব্‌ন নুসায়র ছিলেন খলীফার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ভাইসরয়। মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পক্ষ থেকে তাঁর জনৈক বার্বার বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস তারিক ইব্‌ন যিয়াদ ছিলেন তাঞ্জা শহরের

শাসক এবং মরক্কোর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তারিক যদিও দূরত্বের দিক থেকে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের তুলনায় জুলিয়ানের নিকটবর্তী স্থানে ছিলেন, তবুও তাঁর পরিবর্তে জুলিয়ান তাঁর মনের কথা মূসা ইব্‌ন নুসায়রের কাছে ব্যক্ত করাই অধিকতর সমীচীন বিবেচনা করলেন। তিনি আশবেলিয়ার (সেভিলের) প্রধান ধর্মযাজক এবং কয়েকজন খ্রিস্টান সর্দারকে সাথে নিয়ে কায়রোয়ান পৌঁছে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের কাছে তাঁর আগমন-বার্তা পৌঁছালেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র এই খ্রিস্টান ব্যক্তিটিকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। জুলিয়ান ও তাঁর সহচরগণ তখন আরয করলেন যে, আপনি স্পেন আক্রমণ করুন। বিজয় অবশ্যই আপনার পদচুম্বন করবে। এ কথা শুনে মূসা চিন্তামগ্ন হলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না। তখন জুলিয়ান এবং সেভিলের প্রধান-পাদ্রী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকাল স্পেনে একজন জোরদখলকারীর রাজত্ব চলছে। বর্তমান সরকার স্পেনবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র গযবস্বরূপ। মানব জাতির প্রতি একজন মানুষ হিসেবে আপনার যে মানবিক দায়িত্ব রয়েছে, সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে আপনি এগিয়ে আসুন এবং স্পেনবাসীদেরকে এই নারকীয় অত্যাচার থেকে মুক্ত করুন। আপনি ছাড়া এ বিশ্বে এমন কেউ নেই যার কাছে আমরা এ ফরিয়াদ নিয়ে যেতে পারি এবং যার মাধ্যমে আমরা এ আপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। মূসা ইব্‌ন নুসায়র জুলিয়ানের এ পৌনঃপুনিক আবেদন শ্রবণে স্পেনের অবস্থা এবং তার সামরিক শক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি এ ব্যাপারে দামেশকের খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের অনুমতি লাভ জরুরী বিবেচনা করে খলীফার দরবারে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করলেন।

তারীফের নেতৃত্বে স্পেনীয় উপকূলে প্রথম মুসলিম অভিযান

এদিকে জুলিয়ানের সাথে জনৈক সর্দার তারীফ বা তারীফের নেতৃত্বে পাঁচশ জনের একটি দলকে জুলিয়ানেরই জাহাজে করে স্পেনে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন স্পেনীয় উপকূলে অবতরণ করে সেখানকার অবস্থা সরেজমীনে পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে আসে। সত্যি সত্যি তারীফ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ৯২ হিজরীতে (৭১১ খ্রি.) স্পেনীয় উপকূলে অর্থাৎ তার দক্ষিণ অন্তরীপে অবস্থিত জাযীরা বন্দরে অবতরণ করেন এবং যৎসামান্য লুপপাট করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই খলীফার দরবার থেকে অনুমতি আসে। খলীফা অত্যন্ত ধৈর্য-স্থৈর্য ও সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণের তাকীদ দেন।

তারিক ইব্‌ন যিয়াদের প্রতি স্পেন আক্রমণের নির্দেশ

মূসা ইব্‌ন নুসায়র যখন তারীফের বর্ণনার মাধ্যমে জুলিয়ান ও তাঁর সাথীদের বক্তব্য সঠিক বলে নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি তাঞ্জার গভর্নর তারিক ইব্‌ন যিয়াদকে সসৈন্যে স্পেনে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। তারিক সাত হাজার সৈন্য নিয়ে চারটি জাহাজযোগে

জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের দক্ষিণ অন্তরীপে অবতরণ করলেন। সে যুগের জাহাজগুলো যে কত বিশাল আকৃতির হতো এ থেকেই তা আঁচ করা যায়। অরিকের বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল বার্বার বংশোদ্ভূত ও নওমুসলিম এবং তাতে স্বল্প সংখ্যক আরব সৈন্যও ছিল। মুগীস রূমী নামক জনৈক বিখ্যাত সেনাপতিও এ বাহিনীতে ছিলেন। তিনি তারিকের সহসেনাপতি বা নায়েব বলে গণ্য হতেন। তারিক মধ্যপ্রণালীতে থাকা অবস্থায়ই অর্থাৎ স্পেন উপকূলে পৌঁছবার আগেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বলছেন, তোমার হাতেই স্পেন বিজিত হবে। সাথে সাথে তাঁর তন্দ্রা টুটে যায় এবং তিনি নিশ্চিত হন যে, এ অভিযানে অবশ্যই তাঁর বিজয় হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্পেনে ইসলামী শাসন

স্পেন উপকূলে তারিকের এক বিস্ময়কর নির্দেশ

তারিক তাঁর সহযাত্রীদেরকে নিয়ে স্পেনের উপকূলে অবতরণ করলেন আর সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করলেন তা হলো যে সব জাহাজে করে তারা স্পেনে এসেছিলেন, সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে সাগরে ডুবিয়ে দিলেন। তারিকের এ কাজ অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে তা যে তাঁর পরম বীরত্ব এবং একজন সুদক্ষ সেনাপতির পরিচায়ক তা বোঝা যায়। তারিক এ কথা সম্যকভাবে অবগত ছিলেন যে, একটি বিশাল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীর তুলনায় তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য একেবারেই নগণ্য। তাঁর বাহিনীর বার্বার বংশোদ্ভূত নওমুসলিম সৈন্যদের বাড়িঘরের কথা তাদের স্মৃতিপটে জাগরূক হয়ে তাদেরকে দুর্বল করে তুলতে পারে। তাঁর অধীনস্থ ফৌজী অফিসাররা হয়তো বা দেশ থেকে নতুন বিশাল বাহিনী না আসা পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হবেন না, বরং তাঁরা তাঞ্জারে ফিরে যেতেই মনস্থ করবেন। এমতাবস্থায়, এই প্রথম অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তারিকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। তারিক তাঁর স্বপ্নের প্রতি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ যাত্রায়ই এবং এ বাহিনীর সাহায্যেই তিনি স্পেন জয় করবেন। জাহাজগুলো নিমজ্জিত করে তিনি সহযাত্রীদের জানিয়ে দিলেন যে, এখন আর ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তিনি বললেন, এখন আমাদের পশ্চাতে উত্তাল সমুদ্র আর সম্মুখে শত্রুরাজ্য। শত্রুরাজ্য জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং শত্রুসৈন্যদের পিছু হটিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের সম্মুখে বাঁচার আর কোন পথ নেই। এ কাজ আমরা যত দ্রুত, যত সাহসিকতার সাথে এবং যত দক্ষতা ও পরিশ্রমের সাথে সম্পন্ন করবো, ততই উত্তম। অলসতা, ভীরুতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নিজেদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না।

ইসলামী বাহিনীর প্রথম অবতরণস্থল

তারিক যে স্থানে অবতরণ করেছিলেন তার নাম ছিল লাইনজরাক। তারপর থেকে তা জাবালুত তারিক নামে খ্যাতি লাভ করে। আজ পর্যন্ত তা জাবালুত তারিক বা জিব্রাল্টার নামেই খ্যাত।

ঈসায়ী জেনারেল তাদমীরের প্রথম হামলা ও পরাজয়

ঘটনাচক্রে সম্রাট লারযীকের (রডারিক) সিপাহ্‌সালার তাদমীর একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ঐ সময় ঐ এলাকায় মওজুদ ছিলেন। তারিকের সঙ্গী-সাথীরা নতুন দেশের পরিস্থিতি

বুঝে উঠতে না উঠতেই তাদমীর এ নবাগতদের খবর পাওয়া মাত্র তাদের উপর আক্রমণ করে বসলেন। তাদমীর ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান সিপাহ্‌সালার। তিনি ইতিপূর্বে অনেক যুদ্ধেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদমীর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হামলা চালালেন কিন্তু তারিক তাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে পলায়ন করতে বাধ্য করলেন। তাদমীর তারিকের হাতে পরাজয়বরণ করে এক নিরাপদ স্থানে পৌঁছে সম্রাট লারযীক (রডারিক)-কে লক্ষ্য করে লিখলেন ঃ

"বাদশাহ্ জাঁহাপনা! বিদেশী বিজাতীয়রা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। আমি পূর্ণ বীরত্বের সাথে তাদের সাথে যুঝেছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা তাদেরকে ঠেকানোর প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছি। আমার বাহিনী তাদের সম্মুখে টিকতে পারেনি। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার নিজের তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার দরকার। এই আক্রমণকারী যে কারা এবং কোথাকার লোক তা আমার জানা নেই। তারা কি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলো, নাকি এ মাটি ভেদ করে উদ্গত হলো তা আমি বলতে পারবো না।"

স্পেনরাজ রডারিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি

এ ভয়ঙ্কর সংবাদ শ্রবণে লারযীক (রডারিক) তার সমস্ত শক্তি সৈন্য সংগ্রহে নিয়োগ করেন। তিনি টলেডো থেকে রওয়ানা হয়ে কর্ডোভায় আসেন। সমস্ত রাজ্যের সৈন্যরা এখানে এসে তাঁর সাথে যোগদান করতে থাকে। রডারিক তার অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করে অকৃপণ হস্তে অর্থ বিলাতে থাকেন। ফলে এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তিনি তারিকের অবস্থান অভিমুখে রওয়ানা হতে সমর্থ হলেন। তাদমীরও তাঁর বাহিনীসহ তাদের সাথে সাথে চললেন। এ সময় তারিকও কিন্তু বসে ছিলেন না। তিনি শহর-বন্দর ও গ্রামসমূহ দখল করে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি আল-জাযায়ের ও শাদূনা এলাকাসমূহ অধিকার করে লুকতা উপত্যকা পর্যন্ত উপনীত হলেন। রডারিকের বাহিনীতে এক লাখ সৈন্য ছাড়াও গোটা স্পেনের বাছাই করা অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ সিপাহ্-সালারমণ্ডলী এবং প্রতিটি প্রদেশের বিখ্যাত সর্দাররাও ছিলেন।

প্রথম যুদ্ধ

শাদূনা শহরের অদূরে লাজ্জিন্ডা হ্রদের নিকট একটি ছোট নদীর তীরে ৯২ হিজরীর ২৮শে রমযান মুতাবিক ৭১১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয়। মূসা ইব্‌ন নুসায়র তারিকের রওয়ানা হওয়ার পর আরও পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তাঁরাও তারিকের সৈন্যবাহিনীর সাথে এসে যোগ দিলেন। তাই এবার তারিকের সৈন্যসংখ্যা বার হাজারে উপনীত হলো। একদিকে নতুন দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অপরিচিত বার হাজার মুসলিম সৈন্য, অপরদিকে স্বদেশের সুপরিচিত ভূমিতে নিজেদের রাজত্ব রক্ষার সংকল্পে অগ্রসর এক লক্ষ ঈসায়ী সৈন্যের বিশাল বাহিনী। একদিকে ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি হচ্ছেন আফ্রিকার গভর্নর মূসা ইব্‌ন নুসায়রের আযাদকৃত ক্রীতদাস তারিক ইব্‌ন যিয়াদ– কাউকে তেমন উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে

পুরস্কৃত করারও ক্ষমতা যার ছিল না। অপর দিকে স্বয়ং স্পেন সম্রাট ঈসায়ী বাহিনীর সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ। গোটা রাজ্যের ধনভাণ্ডার এবং সর্বপ্রকার সম্মানে সম্মানিত করার ক্ষমতায় তিনি ক্ষমতাবান। একদিকে অধিকাংশ সৈন্যই হচ্ছে নওমুসলিম বার্বার। অপর দিকে ভক্ত ঈসায়ী সৈন্যের দল যাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্দীপ্ত করার নিমিত্তে বড় বড় ও বিখ্যাত পাদ্রী-পুরোহিতের সকলেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত। এ যুদ্ধে তারিকের মুষ্টিমেয় সৈন্যের সংখ্যা তাদের প্রতিপক্ষের এক-অষ্টমাংশের চাইতেও কম ছিল। তারা যদি পরাজয়বরণ করতো, তাহলে তা কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় হতো না। কিন্তু যেহেতু মাত্র বার হাজার সৈন্যের এ বাহিনী সর্বপ্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত এক লাখ দুর্ধর্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে, তাই এ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এরূপ কৃতিত্বময় যুদ্ধের নজীর বিশ্ব ইতিহাসে খুবই বিরল এবং হাতেগোনা কয়েকটিই মাত্র। এক সপ্তাহকাল ধরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থায় নিজ নিজ শিবিরে দিন কাটায়। তারিক যখন স্পেন সম্রাট রডারিকের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলায় আপন মুষ্টিমেয় সৈন্যের বাহিনীকে বিন্যস্ত করেছিলেন, তখন তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ তাঁর বাহিনীর লোকদের সম্মুখে প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণটি ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র রাহে অটল থাকার প্রেরণায় ভরপুর। তারিকের এ জ্বালাময়ী ভাষণ মুসলিম বীরদের রক্তের গতি-প্রবাহ বৃদ্ধি করেছিল। তারা শাহাদাতের নেশায় উদ্দীপ্ত ও পাগলপারা হয়ে উঠলো। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও স্ত্রী-পুত্রের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। ঈসায়ীপক্ষে হা-হুতাশ ও আর্তচীৎকার এবং মুসলিম বাহিনীর মুহুর্মুহু তাকবির ধ্বনি রণভূমিতে অনুরণিত হচ্ছিল। তাঁদের এ তাকবীর ধ্বনি শত্রুদের অন্তরকে প্রকম্পিত এবং মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করে চলেছিল। ফার্সী কবির ভাষায়—

ব-পায়কারে কারীকা তকবীর কার্দ
নে শমশীর কার্দ ও নে তীর কার্দ

'অর্থাৎ 'তীর ও তরবারি যে কাজ করতে পারেনি শুধু তাকবির ধ্বনিই সে কাজ সম্পন্ন করেছে।'

ঈসায়ী বাহিনীর সিংহভাগই ছিল বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর সকলেই ছিল পদাতিক। ঈসায়ী অশ্বারোহী সৈন্যদের সারিগুলো যখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালার মত আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতো তখন হস্তীতুল্য সে সব অশ্ব এবং দৈত্য বংশোদ্ভূত সে সব অশ্বারোহী মুসলমান সৈন্যদেরকে পদদলিত করে তাদের লাশগুলোকে অশ্বখুরের চাপে একেবারে ধ্বংস করে তাদের উপর দিয়ে চলে যেতে পারতো। তাদের বল্লম ও তরবারি ব্যবহারের বুঝি আর প্রয়োজনই হবে না। কিন্তু যখন সেই লৌহবর্ম পরিহিত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সৈন্য সমুদ্র ইসলামী বাহিনীরূপ পর্বতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, তখন মনে হচ্ছিল প্রচুর সংখ্যক মেষ যেন স্বল্পসংখ্যক সিংহের উপর বিজয়ের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইসলামী তরবারিসমূহের বিদ্যুৎ প্রভায় চমকে উঠতেই ঈসায়ী বাহিনীর মেঘমালার

একাংশ রক্তাপ্লুত শবদেহরূপে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো আর তাদের অধিকাংশই মেঘ-খণ্ডের মতো টুকরো টুকরো হয়ে দিক-বিদিক উড়ে যেতে লাগলো। মুহুর্মুহু তাকবিরের ভীতিপ্রদ হুঙ্কার রণক্ষেত্রের সকল কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠছিল। তরবারিধারীদের ক্ষিপ্রতা এবং বল্লমধারীদের চাতুর্য এ যুদ্ধকে বিশ্বের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এমনি মহিমান্বিত করে তুলেছে যে, গোটা বিশ্বের তাবৎ অঞ্চল ও সর্বদেশে সর্বজাতির লোকজন মুসলমানদের ইসলামী জোশের এ বিস্ময়কর দৃশ্য সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রডারিকের পলায়ন

শাহানশাহ্ রডারিক অর্থাৎ ঈসায়ী বাহিনীর প্রধান সিপাহ্সালার তারিক বাহিনীর উপর তার দৈত্যাকৃতির অশ্বরাজির প্রাধান্য বহাল রাখতে না পেরে সমস্ত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শৌর্যবীর্য ও সুনামকে ঈসায়ী সৈন্যদের লাশের সাথে ভূলুণ্ঠিত করে নিজের প্রাণকে মানমর্যাদার চাইতে অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করে রণক্ষেত্রের পশ্চাৎপদ হয়ে হতবুদ্ধি অবস্থায় পলায়ন করলেন। তার পলায়নের দৃশ্য ছিল এরূপ যে, অপর সব পলাতককে পিছনে ফেলে তিনি সর্বাগ্রে পলায়নে সচেষ্ট ছিলেন। পলায়নের তাড়াহুড়োর মধ্যে কারো এতটুকু হুঁশ ছিল না যে, নিজেদের শাহানশাহর পলায়নের পথ একটু সুগম করে দেবে।

খ্রিস্টান বাহিনীর পরাজয়ের কারণসমূহ

মোটকথা, খ্রিস্টান বাহিনী পরাস্ত হয় এবং স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের বাহিনী সুস্পষ্ট বিজয়ের অধিকারী হয়। এ শোচনীয় পরাজয়কে খ্রিস্টান সৈন্যদের কাপুরুষতার ফল বলে ভাববার কোন কারণ নেই। আসলে মুসলমান সৈন্যদের অসাধারণ ও বিস্ময়কর বীরত্ব এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই তাঁরা জয়ী হয়েছিল। খ্রিস্টান সৈন্যদের কাপুরুষতা এর জন্য দায়ী হলে নিহতদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক সেনাপতি, শাহযাদা ও পাদ্রীর লাশ পরিদৃষ্ট হতো না। যুদ্ধের তাড়াহুড়া শেষ হতেই দেখা গেল, সমস্ত রণাঙ্গন শবদেহে একাকার হয়ে রয়েছে। এ যুদ্ধে কত খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা তো বলা যাবে না, তবে এ কথা সত্য যে, যে সব মুসলিম সৈন্য পদাতিক সৈন্যরূপে যুদ্ধে এসেছিল যুদ্ধ শেষে তাদের সকলেই ছিল অশ্বের মালিক। তাদের গোটা পদাতিক বাহিনী রীতিমত একটি অশ্বারোহী বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ সব অশ্ব যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত খ্রিস্টান সৈন্যদের ছিল তা বলাই বাহুল্য। সে সব খ্রিস্টান অশ্বারোহী যদি পালাতে চাইত, তবে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ার পূর্বেই অনায়াসেই তারা তা পারতো। এক সপ্তাহব্যাপী শিবিরে অবস্থানকালে মুসলমান সৈন্যদের স্বল্পতার কথা খ্রিস্টান বাহিনীর কাছে গোপন ছিল না। এ সময় ঈসায়ী সৈন্যদের কাছে আরো রণসম্ভার এসে পৌঁছেছিল। তাদের সৈন্য সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। পক্ষান্তরে এ নতুন দেশে নবাগত মুসলমানদের অবস্থা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা নিশ্চয়ই খ্রিস্টান বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে তুলেছিল। এ লড়াই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল। এ সময় উভয়পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল পরিষ্কার বলে দিল, যেভাবে

মুসলমানরা তাদের আটগুণ বেশি শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিধর প্রমাণিত হয়েছে তেমনি তারা তাদের চাইতে দশগুণ বেশি শত্রুকেও শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করতে সমর্থ।

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ .

'যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুশ শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে আর যদি তোমাদের একশ জন থাকে, তবে কাফিরদের এক হাজারের বিরুদ্ধে তারা জয়যুক্ত হবে— কেননা, তাঁরা নির্বোধ সম্প্রদায়।' (৮ঃ ৬৫)।

স্পেনের গথ রাজরা একদিকে ফ্রান্সকে এবং অপরদিকে রোমান সাম্রাজ্যকে যুদ্ধবিগ্রহে হেয় প্রতিপন্ন করতো। গোটা ইউরোপ মহাদেশ তাদের দাপটে অস্থির ছিল। স্পেনের সেনাপতিরা সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও বিজয়ের ঘোড়া দৌড়িয়েছে। কিন্তু মুসলিম গাযীদের হাতে তারা ঠিক সেইরূপ পরাজয়ই বরণ করলো যেমনটি পরাস্ত ও বিপর্যস্ত তাদের স্বজাতীয়রা হয়েছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের হাতে।

মুসলমানদের এ বিরাট বিজয়টি হয়েছিল ৯২ হিজরীর ৫ই শাওয়াল মুতাবিক ৭১১ খ্রিস্টাব্দে। সেদিন থেকেই স্পেনে ইসলামী শাসনের সূচনা হয়। তারিক সেদিনই বিজয়ের সুসংবাদসহ আমীর মূসা ইব্‌ন নুসায়রের উদ্দেশে দূত রওয়ানা করলেন এবং নিজে মুসলিম বাহিনীসমূহকে আশেপাশের এলাকার দিকে পাঠিয়ে গোটা স্পেন বিজয়ের আয়োজনে লিপ্ত হলেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র এ বিরাট বিজয়ের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি দামেশকে খলীফার দরবারে এ সুসংবাদসহ দূত পাঠিয়ে নিজে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হতে মনস্থ করলেন। তারিক ইব্‌ন যিয়াদের নামে লিখিত পত্রে তিনি লিখে পাঠালেন যে, এ পর্যন্ত যতটুকু এলাকা বিজিত হয়েছে তা'ই দখল করে থাক, তুমি আপাতত আর অগ্রসর হয়ো না। তারপর মূসা ইব্‌ন নুসায়র আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে কায়রোয়ান থেকে যাত্রা করলেন। কায়রোয়ানে তিনি তাঁর পুত্রকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। তারিকের হাতে যখন এ পত্রখানা গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি উপদ্বীপটির দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ আন্দালুসিয়া প্রদেশের বিজয় সুসম্পন্ন করে ফেলেছেন। তবে উপদ্বীপের বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর এবং রাজধানী টলেডো তখনো বিজিত হয়নি। ওগুলো তখন খ্রিস্টান সৈন্যদের ছাউনির রূপ পরিগ্রহ করেছে। আশংকা করা হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ঈসায়ী সর্দাররা সম্মিলিতভাবে তারিকের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতে পারে। তারিকের জন্যে তখন সর্বাধিক জরুরী কাজ ছিল নির্দ্বিধায় উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে একের পর এক শহর জয় করে তাঁর সে প্রভাব ও দাপটকে অক্ষুণ্ন রাখা যা লুকতা প্রান্তরের যুদ্ধের পর খ্রিস্টানদের মনে অঙ্কিত হয়েছিল। তারিক তাঁর সেনাপতিদেরকে ডেকে আমীর মূসার নির্দেশের কথা তাদেরকে অবহিত করলেন। তাঁরা একবাক্যে বললেন, আমীর মূসার নির্দেশ পালন করতে গেলে চতুর্দিক থেকে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তারা স্পেন বিজয়ের কাজকে সুকঠিন করে তুলতে পারে। কাউন্ট জুলিয়ান তখন তারিকের কাছেই ছিলেন। তিনিও বললেন, এ মুহূর্তে বিজয়

অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে একটু সময়ক্ষেপণ করলে পরে স্পেন বিজয়ের কাজ সুকঠিন হয়ে উঠবে।

তারিকের কর্ডোভা অভিযানে যাত্রা

সে মতে, তারিক কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কর্ডোভার শাসক ছিলেন স্পেনের শাহী খান্দানেরই জনৈক ব্যক্তি। লুকতা প্রান্তরের যুদ্ধে পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্তরাও সেখানে এসে তাঁর কাছে সমবেত হয়েছিল। এ শহরের দুর্গ ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অজেয়। তারিক এসেই প্রথমে শহরবাসীদের কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তোমরা সন্ধির মাধ্যমে শহরে আমাদের অধিকার স্বীকার করে নাও। যখন তারা তাতে অসম্মতি জানাল, তখন তিনি শহর অবরোধ করলেন। এ অবরোধে অধিক কালক্ষেপণ সমীচীন হবে না ভেবে তিনি মুগীস রূমীকে কর্ডোভা অবরোধের দায়িত্বে রেখে নিজে টলেডোর দিকে অগ্রসর হলেন।

টলেডো বিজয়

তারিক অনায়াসেই ৯৩ হিজরীর রবিউস সানী মাসে (জানুয়ারী ৭১২ খ্রিস্টাব্দে) টলেডো দখল করেন। টলেডোর রাজকোষে গথ রাজাদের পঁচিশটি মুকুট তিনি প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকটি রাজমুকুটে রাজার নাম এবং রাজত্বকালের কথা উৎকীর্ণ ছিল। অর্থাৎ একে একে পঁচিশ জন গথ বংশীয় রাজা স্পেনে এ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রত্যেক রাজার জন্যে নতুন করে মুকুট নির্মিত হতো এবং বিগত রাজার মুকুট রাজকোষে সংরক্ষণ করা হতো। তারিক টলেডো নগরীতেও অবস্থান করলেন না বরং তিনি স্পেনের সর্বউত্তরের প্রদেশ পর্যন্ত জয় করতে করতে অগ্রসর হলেন। এদিকে মুগীস রূমীও স্বল্পকালের অবরোধের পর কর্ডোভা এবং তার আশেপাশের এলাকাসমূহ দখল করে নেন। এভাবে তারিক উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত স্পেনের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ দখল করে নেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রদেশগুলো তখনো বিজিত হওয়া বাকি ছিল।

মূসা ইব্‌ন নুসায়রের স্পেনে পদার্পণ

এমনি সময় আমীর ইব্‌ন নুসায়র সসৈন্যে স্পেনে প্রবেশ করেন। কাউন্ট জুলিয়ানকে আন্দালুসিয়া প্রদেশের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তারিক অর্পণ করে রেখেছিলেন। সর্বপ্রথম কাউন্ট জুলিয়ানই আমীর মূসাকে স্পেনের মাটিতে স্বাগতম জানান। তারিক তাঁর নির্দেশ অমান্য করে কেন জয়যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এজন্যে তারিকের প্রতি তাঁকে ক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করে কাউন্ট জুলিয়ান অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন যে, এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ জয় করা বাকি আছে। আপনি টলেডো যাত্রার জন্য পশ্চিমের পথ ধরে পথের উভয়পার্শ্বের নগরী ও জনপদসমূহ জয় করতে করতে অগ্রসর হোন। তাহলে সকল সঙ্কট দূরীভূত হবে। মূসা ইব্‌ন নুসায়র সেমতে কাজ করলেন। তিনি টলেডো পর্যন্ত সমস্ত এলাকা জয় করে রাজধানী নগরীতে গিয়ে উপনীত হলেন। আমীর মূসার স্পেন আগমনের সংবাদ পেয়ে তারিকও টলেডো নগরীতে ফিরে এসে মূসার সাথে মিলিত হলেন। মূসা তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে অগ্রসর হওয়ার জন্যে তারিককে ভর্ৎসনা

করলেন এবং কয়েকদিনের জন্যে তাঁকে বন্দী করেও রাখলেন। অধীনস্থ অফিসারদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করে চলা যে কত বেশি জরুরী ও বাধ্যতামূলক অন্যান্য সেনাপতির কাছেও তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তারপর তারিককে মুক্ত করে তিনি একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীসহ বিজয় অভিযান প্রেরণ করলেন এবং নিজেও তাঁর পিছে পিছে রওয়ানা হলেন। আমীর মূসা তারিকের সম্পাদিত সন্ধি ও চুক্তিসমূহ অনুমোদন দিয়ে যেতে থাকেন। তারিক ও মূসা স্পেনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকার শহরসমূহ বিজয়ে এবং মূসার পুত্র আবদুল আযীয দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার জনপদসমূহ জয়ে আত্মনিয়োগ করল। সম্রাট রডারিকের সেনাপতি তাদমীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে সৈন্যদেরকে সমবেত করে আবদুল আযীযের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। বেশ ক'টি লড়াইও তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু তাদমীর উন্মুক্ত রণাঙ্গনে আবদুল আযীযের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। তিনি পার্বত্য এলাকাসমূহে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন এবং সময় ও সুযোগ বুঝে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল আযীয ও তাদমীরের মধ্যে সন্ধি হয়। আবদুল আযীয একটি ক্ষুদ্র এলাকা তাদমীরের হাতে ছেড়ে দেন। তাদমীর সে এলাকায় তাঁর শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু সন্ধির শর্ত ছিল এই যে, তাদমীর তাঁর শাসিত এলাকায় মুসলমানদের কোন শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারবেন না এবং প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। এদিকে তারিক এবং মূসাও অত্যন্ত সহজ শর্তে বিজিতদের সাথে সন্ধি করল। এসব শর্তের মোদ্দাকথা ছিল, ঈসায়ীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাদের গির্জাসমূহের কোনরূপ অনিষ্ট করা হবে না। ঈসায়ী ও ইহুদীদের যাবতীয় ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে আদালতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হবে। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে ঈসায়ীরা তাতে বাদ সাধতে পারবে না। ঈসায়ীদের জানমাল ও সহায়-সম্পদের হিফাজত করা হবে। তারিক ও মূসা তাঁদের সৈন্যদের প্রতি এ মর্মে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হবে না তাদেরকে যেন কোনভাবে বিব্রত করা না হয়। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদেরকে কোনমতেই হত্যা করা চলবে না। কেবল যারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করবে, তাদেরকেই হত্যা করা চলবে।

তারিক ও মূসা উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহ অধিকার করতে করতে পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চল জয় করে মুসলিম বাহিনী শীতের মওসুমের প্রচণ্ড শীত এবং রসদের স্বল্পতার জন্যে পিরেনীজ পর্বতে ফিরে আসল। মূসা ইব্‌ন নুসায়র পরবর্তী বছর গোটা ফ্রান্স অধিকার করে অস্ট্রিয়া, ইতালী ও বলকানসহ কনসটান্টিনোপল জয় করতে মনস্থ করেন। ফিরে এসে তারা এ পর্যন্ত পরাস্ত খ্রিস্টান সৈন্যদের আশ্রয়স্থলরূপে বিবেচিত উত্তর ও পশ্চিমের প্রদেশ জালীকিয়া বা গ্লোশিয়াও জয় করে নেন।

স্পেনে মুসলিম বিজয়ের পূর্ণতা

মূসা ইব্‌ন নুসায়র স্পেনে অবতরণ করেই টলেডো থেকে উত্তর দিকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মুগীস রূমীকে উপঢৌকনসামগ্রীসহ স্পেন দখলের সুসংবাদ দিয়ে রাজধানী

দামেশকের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। মুগীস রূমী যখন রাজধানী থেকে ফিরে আসলেন তখন মূসা ইব্‌ন নুসায়রের জালীকিয়া প্রদেশ বিজয়ও সম্পন্ন হয়ে গেছে। স্পেন বিজয় সম্পন্ন করে ইউরোপের অবশিষ্ট রাজ্যসমূহ জয়ের পরিকল্পনায় মগ্ন ছিলেন। মুগীস রূমী খলীফার দরবার থেকে যে নির্দেশ বয়ে আনলেন তা মূসা ইব্‌ন নুসায়রের উচ্চাভিলাষ ও বিজয়ের দুঃসাহসিক স্বপ্নকে মুহূর্তের মধ্যে গভীর হতাশায় রূপান্তরিত করলো।

খলীফা ওয়ালীদের নির্দেশ ঃ মূসা ইব্‌ন নুসায়রকে খলীফা তলব করলেন

খলীফা মূসা ইব্‌ন নুসায়রকে ইউরোপ জয় থেকে বিরত করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। সে নির্দেশ তামিল করতে আমীর মূসা ইব্‌ন নুসায়র স্পেনের শাসনভার তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের হাতে ন্যস্ত করে তারিক ও মুগীস রূমী সমভিব্যাহারে প্রচুর ধন-সম্পদসহ স্পেন থেকে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে তখন স্পেনের রাজকোষের অর্থভাণ্ডার, স্বর্ণের বাসনকোসন ও অলংকারাদি অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ এবং প্রচুর সংখ্যক ক্রীতদাস ও দাসী। স্পেন থেকে মূসা মরক্কো হয়ে কায়রোয়ান গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সেখান থেকে মিসর হয়ে রাজধানী দামেশকের নগরপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হন। খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক তখন মৃত্যু শয্যায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। মূসা ইব্‌ন নুসায়র দুই বছরকাল আন্দালুসে ছিলেন। তিনি ৯৬ হিজরীর জুমাদাল আখির (৭১৫ খ্রি জানুয়ারী) মাসের প্রথম দিকে সিরিয়া সীমানায় প্রবেশ করেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পর তাঁর ভাই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা নির্ধারিত ছিল। সুলায়মান যখন জানতে পারলেন যে, ওয়ালীদের প্রাণে বাঁচার আশা সুদূর পরাহত এবং মূসা ইব্‌ন নুসায়র রাজধানীতে প্রবেশের পথে তখন তিনি মূসার কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তিনি যেন আপাতত রাজধানীতে প্রবেশ না করেন। সম্ভবত ভাবী খলীফার উদ্দেশ্য ছিল, ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তাঁর নিজের খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার প্রারম্ভ যেন গৌরবময় ও জাঁকজমকপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ভাবী খলীফার এ সাধ পূর্ণ করা মূসার জন্যে তেমন কোন ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল না। কেননা, মূসার এ প্রতীক্ষায় যদি খলীফার অসুখ সেরে তিনি নিরাময় হয়ে উঠতেন, তা হলে খলীফার সুস্থাবস্থায় তাঁর খিদমতে হাযির হওয়াটা বেশি উপাদেয় হতো, আর যদি খলীফা ওয়ালীদের মৃত্যু হয়ে যেত তা হলে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁর সাধ পূর্ণ করার জন্যে মূসার প্রতি প্রসন্ন হতেন। এমতাবস্থায় নতুন খলীফার কাছে তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মূসা ইব্‌ন নুসায়র ভাবী খলীফার পয়গামের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে যত শীঘ্র সম্ভব দামেশকে প্রবেশ করে খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিদমতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অন্তিম শয্যায় খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক উপঢৌকনাদি ও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার লাভে তেমনটা উল্লসিত হলেন না— যেমনটা মূসা প্রত্যাশা করেছিলেন। বর্তমান খলীফার অবস্থা আশঙ্কাজনক লক্ষ্য করে আমীর-উমারা ও মন্ত্রী-মুসাহিবগণ ভাবী খলীফার কাছে অধিকতর প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাই মূসা ইব্‌ন নুসায়রের এ

ব্যাপারটিকে মূসার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে থাকবে। তাঁরা হয়তো তিলকে তাল করে নতুন খলীফার মনকে মূসার প্রতি বিষিয়ে তুলেছিলেন। ফলে সুলায়মানের হয়তো মূসার প্রতি ক্রোধের পরিমাণ আরো বেড়ে গিয়ে থাকবে।

সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের অভিষেক ঃ রাজরোষে মূসা ইব্‌ন নুসায়র

অবশেষে ঐ সপ্তাহেই খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের ইন্তিকাল হয়। ৯৬ হিজরীর ১৬ই জুমাদাস সানী (ফেব্রুয়ারী ৭১৫ খ্রি) খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফার মসনদে আরোহণ করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি মূসা ইব্‌ন নুসায়রের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে শুরু করলেন। খিলাফতের পশ্চিমাঞ্চলের বকেয়া খারাজ আদায়ে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ব্যর্থতার জন্য তিনি খলীফার রোষানলের শিকার হলেন। খলীফা তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাঁর কাছে পাওনা দু'লক্ষ আশরাফী পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। স্পেন বিজয়ে মূসার প্রধান সহযোগী ও সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি তারিক এবং মুগীস রূমীকেও দুঃসহ পরিণতি বরণ করতে হলো। স্পেনে অভিযান পরিচালনার কোন নির্দেশ খলীফার দরবার থেকে দেয়া হয়নি বরং মূসার আবেদনের প্রেক্ষিতে খলীফা স্পেন অভিযানের অনুমতি দিয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং স্পেন বিজয়ের কৃতিত্ব ছিল মূসারই এবং এ জন্যই এ বিজয় মূসা এবং তারিকেরই খ্যাতির কারণ হয়েছিল।

তারিকের পরিণাম

খলীফা সুলায়মান যখন মূসার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করলেন তখন মূসারই ক্রীতদাস এবং তাঁরই হাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাপতি তারিকের উপর স্বভাবত তার প্রভাব পড়লো। তারিকের কৃতিত্বের জন্যে তেমন কোন স্বীকৃতি বা সম্মান তাঁর ভাগ্যেও জুটলো না। তাঁকে স্পেন বা মরক্কোর শাসন ক্ষমতায়ও ফিরিয়ে দেয়া হলো না। কেননা, গোটা পশ্চিমাঞ্চল ছিল মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পুত্রদের শাসনাধীনে। স্পেনে আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা, কায়রোতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা এবং মরক্কোয় মারওয়ান ইব্‌ন মূসা গভর্নররূপে দায়িত্ব পালন করছিলেন। খলীফা সুলায়মান মূসার পরিবারের লোকজন সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তারিক যেহেতু মূসার পরিবারেরই একজন বলে বিবেচিত হতেন তাই তাঁকে কোনরূপ গুরু-দায়িত্বে আসীন করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করতেন না। তিনি তাঁকে একটি সঙ্গত পরিমাণ অবসর ভাতা দিয়ে সিরিয়ায় কোন শহরে বসবাস করার ফরমান জারি করলেন। মূসাকে গ্রেফতার করা হলো। অবশেষে আমীর ইবনুল মুহাল্লাবের সুপারিশক্রমে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক মূসাকে কারামুক্ত করে সম্ভাব্য পরিমাণ অর্থ তাঁর নিকট থেকে আদায় করে তাঁকে ওয়াদিউল কুরায় বসবাস করার নির্দেশ প্রদান করলেন।

মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ইন্তিকাল

মূসা ইব্‌ন নুসায়র এ ব্যর্থতা ও গ্লানিকর অবস্থায় পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৯৭ হিজরীতে (৭১৫ খ্রি) আটাত্তর বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি আফ্রিকার গভর্নর হয়েছিলেন ৭৯ হিজরী (৬৯৮ খ্রি) সনে।

ঐতিহাসিকগণ এ প্রসঙ্গে মূসা ও তারিকের এ গ্লানিকর পরিণতির জন্য খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সমালোচনায় মুখর। তাঁরা বলেন যে, সুলায়মান এমন দিগ্বিজয়ী ও কৃতী সেনাপতিদ্বয়ের কৃতিত্বের যথাযোগ্য কদর করেন নি। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, এ ব্যাপারে তিনি ততটা দোষী নন যতটা সাধারণত তাঁকে মনে করা হয়ে থাকে। দিগ্বিজয় যেমন একটা কৃতিত্ব ও সম্মানের ব্যাপার, শাসন-শৃঙ্খলাও তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বরং তা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক যা করেছেন তা ছিল শাসন-শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে সাধারণত দিগ্বিজয়ী ও বীর সেনাপতিরা অনৈতিক ব্যাপারে দুর্বল এবং অনেকটা বেপরোয়া মনোভাবের হয়ে থাকেন। এ বেপরোয়া মনোভাবের জন্যেই হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ পদক্ষেপ মোটেই সমালোচনাযোগ্য ছিল না। বরং তাঁর এ পদক্ষেপ ছিল পুরোপুরি সঠিক ও সঙ্গত। মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ব্যাপারটিও ছিল ঠিক তাই। মূসা ষোল-সতের বছর ধরে আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন। তাঁর কাছে আফ্রিকার খারাজের যে বকেয়া পড়েছিল এবং তিনি বায়তুল মালের কাছে যে পরিমাণ ঋণী ছিলেন, তা যদি কেবল তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃতিত্বের জন্যে মওকুফ করে দেয়া হতো, তা হলে অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্নরের জন্য তা হতো একটা মন্দ দৃষ্টান্ত এবং মূসা ইব্‌ন নুসায়রের স্পর্ধা, গাফলতি ও অবিশ্বস্ততা তাতে আরো বৃদ্ধি পেত।

তারপর এ বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয় যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়র এবং তারিকের ব্যাপারে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টাবর্গ এবং মুসাহিববর্গের কেউই তাঁর ওফাতের পর তাঁর সমালোচনায় একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। মুসলিম ঐতিহাসিকদের কেউই এ জন্যে কোনরূপ বিস্ময় বা আক্ষেপ প্রকাশ করেন নি। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়রের সাথে কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা হয়নি। যা করা হয়েছে তা ছিল একান্তই ন্যায্য এবং সমীচীন। বনূ উমাইয়াদের আপদের কথা বর্ণনাকারী এবং তাদের প্রতিটি কাজকে অসঙ্গত প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন বনূ আব্বাস। কিন্তু এই আব্বাসীয়রাও ঐ বিশেষ ব্যাপারটিতে সুলায়মানের দুর্ণাম করেন নি বা কোনদিন তাঁকে এ জন্য একজন কৃতী পুরুষের কদর না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি।

আমাদের এ যুগে যখন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচনাবলী মুসলমান পাঠকদের নাগালে এসেছে, তখন বিভ্রান্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ স্পেন বিজয়ের ইতিহাস আলোচনায় তাকে তো একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রডারিকের সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর কোন প্রমাণ ছাড়াই তাঁরা এ কথা বলে থাকেন যে, রডারিকের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে মুসলমানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুসলমানদের রাজ্য শাসনের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে স্পেনের প্রজাসাধারণ অবশ্যই মুসলিম বিজেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল এবং তারা রীতিমত তাঁদের অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র কাউন্ট জুলিয়ানের ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ

হয়ে মুসলমানদেরকে স্পেন আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে এবং এ ব্যাপারে জনৈক পাদ্রী তাঁকে সমর্থন জানানো ছাড়া সাধারণভাবে স্পেনের প্রজাসাধারণ মুসলমানদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা দেয়নি। অধিকন্তু মুসলমানরা তাঁদের ঈমানী শক্তি এবং হৃদয়ের বলে এতই বলীয়ান ছিলেন যে, এমন ষড়যন্ত্রকারী এবং বিদ্রোহীদের সাহায্যের কোন দরকারই তাঁদের ছিল না। ঈসায়ী ঐতিহাসিকগণ মুসলমানদের এ অসাধারণ বীরত্বের মহিমাকে ক্ষুণ্ন করার মতলবে অদ্ভুত কল্প-কাহিনীর অবতারণা করে থাকেন। অবশেষে তাঁরা তারিক, মূসা ও সুলায়মানের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে তাদের অন্তরের উত্তাপকে কিছুটা প্রশমিত করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

একটি মনগড়া কাহিনী ও তার সমালোচনা

তারা এ মর্মে একটি কল্পিত কাহিনী রচনা করে তাতে রঙ চড়ান যে, তারিক যখন টলেডো থেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হলেন তখন টলেডোর পলায়নকারীদের একটি দলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ওদের কাছে হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের ব্যবহৃত একটি টেবিল বা খাট দেখতে পান। উক্ত টেবিল বা খাটখানা বহুমূল্য স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের কারুকার্যে খচিত ছিল। তার মূল্য ছিল কোটি কোটি টাকা। তারিক তা তাদের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন। মূসা যখন স্পেনে উপনীত হলেন তখন তিনি উক্ত খাটখানা তারিকের নিকট থেকে তলব করেন। তারিক খাটখানির একটি পায়া খুলে নিজের কাছে গোপনে রেখে দেন এবং তিনটি পায়া সমেত খাট মূসার হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে, এ অবস্থায়ই খাটখানি তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মূসা আরেকটি পায়া স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিয়ে খাটখানিতে তা সংযোজন করেন, কিন্তু তা আর আসল তিনটি পায়ার মতো হয়নি। যখন মূসা খলীফা ওয়ালীদ বা সুলায়মানের খিদমতে তা পেশ করলেন তখন তিনি বলেন যে, এ খাটখানি আমি যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সাথে পেয়েছিলাম। খলীফা ত্রুটিপূর্ণ পায়াখানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, ঐ পায়াখানি অবশিষ্ট তিনটি পায়ার মত নয় কেন ? মূসা জবাব দেন যে, তিনি ঈসায়ীদের নিকট থেকে এ অবস্থায়ই খাটখানা পেয়েছিলেন। এ সময় তারিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বগলের তলা থেকে চতুর্থ পায়াখানা বের করে খলীফার সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন যে, এই যে তার আসল পায়াখানা আমার কাছে রয়েছে। খলীফা যখন হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে, মূসা ইব্‌ন নুসায়র তারিকের কৃতিত্বকে তাঁর নিজের কৃতিত্ব বলে খলীফার কাছে জাহির করেছেন তখন তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে মূসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং এত অধিক পরিমাণে অর্থদণ্ড তাঁর প্রতি নির্ধারণ করেন যে, মূসার পক্ষে সে অর্থদণ্ড প্রদান করা কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। এ ধরনের আরো অনেক অলীক কাহিনী ঈসায়ী ঐতিহাসিকগণ নিজেরা রচনা করেন। আক্ষেপ হয় আমাদের যুগের ঐতিহাসিকদের জন্য যারা স্পেনের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, অথচ এহেন আজেবাজে কল্প-কাহিনীর স্বরূপ উদঘাটন করেন নি। তারিকের এত ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা ও মনিবের এরূপ চাতুর্য ও প্রতারণাপূর্ণ আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া আর কয়েক বছর পূর্বেই

মূসাকে সমুচিত শিক্ষাদানের এরূপ পরিকল্পনা এঁটে রাখার কথা কোন মতেই বোধগম্য হয় না। তারপর তাজ্জবের ব্যাপার হলো যে, মূসাকে চতুর্থ পায়াখানা নতুন করে বানাতে হলো অথচ কেউ একটি পায়ার জন্য তাঁকে বললো না যে, এ টেবিলখানা যখন আমরা ঈসায়ী পলাতকদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম তখন তার চারখানি পায়াই ঠিক ছিল। আপনি তার চতুর্থ পায়াখানা খুঁজে বের করুন। অথচ তখন সে খাটখানা অধিকারের পর তিন তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর মূসা তা ঘূণাক্ষরেও টের পেলেন না যে, আসলে তা ঠিকঠাকই ছিল। তিনি তখনও বুঝে ছিলেন যে, খাটখানা এ অবস্থায়ই খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। যে মূসা গোটা ইউরোপ জয় করে কনসটান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছবার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁর মত বীরপুরুষ কেমন করে এ নীচতা প্রদর্শন করতে পারেন যে, অপরের কৃতিত্বকে তিনি খলীফার দরবারে নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করবেন? তাও আবার স্বয়ং খলীফার নিকট ডাহা মিথ্যা কথা বলে! তারপর মজার কথা হলো, যুদ্ধে পরাস্ত ও মারখাওয়া খ্রিস্টানদের কাছ থেকে উক্ত খাটখানা ছিনিয়ে নেয়া কোন বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল না। যে কেউই তা ছিনিয়ে নিত, শেষ পর্যন্ত তাকে তা খলীফার দরবারে পেশ করতেই হতো, তারপর দামেশকে খলীফার দরবারে তারিকের খাটের পায়া বগলদাবা করে হাযির হওয়া আরও বিস্ময়ের ব্যাপার। তারিক ও মূসার এ হাস্য উদ্রেককারী ঘটনার পর খলীফা সুলায়মান কর্তৃক তাঁদের এরূপ শাস্তি বিধানের ব্যাপারটিও কোনক্রমেই বোধগম্য হয় না। স্পেন ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে আমাদের সর্বাধিক আস্থা স্থাপন করতে হয় ইব্‌ন খালদূনের উপর। কিন্তু তিনি তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখমাত্র করেন নি। ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনায় আছে, মূসা ইব্‌ন নুসায়র যখন গোটা ইউরোপ জয় করে তার কনসটান্টিনোপল বিজয়ের সংকল্পের কথা খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের দরবারে ব্যক্ত করলেন, তখন খলীফা এ কথা ভেবে তাতে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন যে, এভাবে মূসা মুসলিম জাতিকে সঙ্কট ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে নেবার দুঃসাহস পোষণ করল। উপরন্তু,খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এ সংবাদ পেয়েই তারিককে স্পেন থেকে দরবারে তলব করেছিলেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই গোটা ইউরোপ আক্রমণের সঙ্কল্প খলীফার অনুমতি না নিয়েই করে বসেছেন। আর এ জন্যই খলীফা সুলায়মানও মূসা ইব্‌ন নুসায়রের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন যে, তুমি নিজের ইচ্ছামত মুসলিম সৈন্যদেরকে এরূপ সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়ার দুঃসাহস কেন করেছিলে? ইব্‌ন খালদূনের এ বর্ণনা সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসঙ্গত। এখানে সে খাটের ঘটনার কোন উল্লেখ নেই।

মূসা ইব্‌ন নুসায়র স্পেনের শাসনভার তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে এবং আফ্রিকা ও মরক্কোর শাসনভার তাঁর অপর দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও মারওয়ানের হাতে অর্পণ করে এসেছিলেন। অন্য কথায় পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সবকটাই ছিল মূসার পুত্রদের শাসনাধীনে। এ জন্যে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন খলীফার জন্য আপদমুক্ত বা ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। আর এজন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের কোনরূপ অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়নি।

এ ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয় যে, একদিকে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের প্রতি তো খলীফা কঠোরতা প্রদর্শন করলেন, অপর দিকে তাঁর সন্তানদের হাতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে রাখলেন। তিনি তাদেরকে পদচ্যুত করার কোনরূপ চিন্তা-ভাবনাই করলেন না। অবশ্য, কিছুকাল পরে খলীফা সুলায়মান মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদকে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের ভাইসরয় নিযুক্ত করে কায়রোয়ানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্পেনের শাসনভার তখনো তিনি পূর্বের মতোই মূসার পুত্র আবদুল আযীযের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন।

স্পেনের প্রথম মুসলিম শাসক

তারিক এবং মূসা উভয়েই ছিলেন স্পেন বিজেতা। এ দু'জন সমরনেতা যতদিন স্পেনে ছিলেন ততদিন বিভিন্ন দেশ শহর জনপদ ও দুর্গসমূহ দখল এবং ঈসায়ী নেতাদের চুক্তিপত্র লেখানো ও ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্যের স্বীকৃতি আদায়েই তাঁরা সময় অতিবাহিত করেন।

তাঁদের দু'জনকেই স্পেন বিজয়ী বলে অভিহিত করা চলে। স্পেনের সর্বপ্রথম নিয়মিত শাসক ছিলেন আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা। তারপর একে একে অনেকেই স্পেনের শাসক হয়ে আসেন। এঁদের নিয়োগ কখনো খলীফার দরবার থেকে, কখনো পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকার্যে কায়রোয়ানে নিযুক্ত খলীফার ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে, আবার কখনো স্পেনীয় মুসলমানদের পছন্দের ভিত্তিতে হতো। স্পেনের সে শাসকদেরকে আমীরানে আন্দালুস বা স্পেনের আমীরবর্গ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমীরানে আন্দালুস

আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা

মূসা ইব্‌ন নুসায়রের স্পেন থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর আনুগত্য প্রকাশকারী অধিকাংশ শহরই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ সব বিদ্রোহ দমন করে ঈসায়ীদেরকে পুনরায় অনুগত ও বাধ্য করার ব্যাপারে আমীর আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা অত্যন্ত যোগ্যতা ও সতর্কতার পরিচয় দেন। মুসলমান উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী ছিল না। এজন্যই ঐ খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ ঘোষণার সাহস হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করা যে সহজ কাজ নয় তা তারা অচিরেই টের পেয়েছিল। সাথে সাথে একথাও তাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে, মুসলিম প্রশাসন পূর্ববর্তী গথ-রাজাদের প্রশাসনের চাইতে বহুগুণে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

মুসলমানগণ সর্বপ্রথমেই ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করে ঈসায়ী প্রজাদের সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও বৈষয়িক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল, তারা ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। আমীর আবদুল আযীয এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যে ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করবে সে তার অমুসলিম মনিবের অধীনতা বন্ধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। ঈসায়ীদের কাছে প্রচুর ক্রীতদাস বিদ্যমান ছিল। তারা ঐ ক্রীতদাসদের সেবা গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে রেখেছিল। আমীর আবদুল আযীযের উক্ত ঘোষণার ফলে হাজার হাজার ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে স্বাধীন মানবীয় জীবনের স্বাদ লাভ করে। এভাবে মানবজাতির এক মহাকল্যাণ সাধিত হয় এবং মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতার সমস্যারও সমাধান হয়।

আমীর আবদুল আযীয রডারিকের বিধবা স্ত্রী এজিওলোনাকে বিয়ে করেন এবং তাকে তাঁর স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেন। আমীরের অনুকরণে অন্যান্য মুসলমানও ঈসায়ী রমণীদেরকে বিয়ে করতে শুরু করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলাতক ঈসায়ীদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে মুসলমানরা ঈসায়ীদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করেন। আমীর আবদুল আযীয কেবল ঈসায়ীদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদেরকে শহর ও পল্লীসমূহের নাযিমও নিয়োগ করেন। রডারিকের সাবেক সিপাহসালার তাদমীরকে মারসিয়া প্রদেশের শাসনক্ষমতা তিনি পূর্বেই দিয়ে রেখেছিলেন। আবদুল আযীযের ঈসায়ী

স্ত্রী এজিওলোনা– যিনি উম্মে আসিম নামেও পরিচিত ছিলেন, স্বল্পকালের মধ্যেই আমীর আবদুল আযীযের মনমর্জি বুঝে নিয়ে শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। এটা আরব সর্দারদের তেমন মনঃপূত না হলেও আমীরের আনুগত্য তাদের করতেই হতো। ফলে পরাজিত ও অধীনস্থ খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখে তারা মর্মপীড়ায় ভুগতেন কিন্তু তাদের করণীয় কিছুই ছিল না।

এমনি পরিস্থিতিতে খবর পৌঁছলো যে, খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক মূসা ইব্‌ন নুসায়রকে বকেয়া খারাজ প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং নতুন দিগ্বিজয়ের জন্যে তাঁর কোন মূল্যায়নই করেন নি। আবদুল আযীযের অন্তরে এ সংবাদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা বলাইবাহুল্য। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে তাঁর টু শব্দটি করার উপায় ছিল না। এজিওলোনা এবং অন্যান্য ঈসায়ী কর্মকর্তা এ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আবদুল আযীযের সাথে তখন তাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর প্রতি তাদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেল। আবদুল আযীয যেহেতু তাঁর পিতার সংবাদে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তিনি এজিওলোনার মাধ্যমে ঈসায়ীদেরকে শক্তিশালী করে তুলে দামেশকের খলীফার কবল থেকে স্পেনকে মুক্ত করার তদবিরে লিপ্ত হলেন। আমীর আবদুল আযীয খলীফা সুলায়মানকে তাঁর পক্ষ থেকে আশ্বস্ত রাখার উদ্দেশ্যে স্পেনের খারাজ বা ভূমি রাজস্বের এক বিরাট অংক ও উপঢৌকনাদি দামেশকের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। খলীফা তাঁর নিজস্ব প্রতিবেদকদের মাধ্যমে আবদুল আযীযের মনোভাব সম্পর্কে যথাসময়েই অবহিত হয়েছিলেন। এবার যারা খারাজ ও উপঢৌকনাদি নিয়ে দামেশকে গেল, তারাও খলীফাকে আমীর আবদুল আযীযের মারাত্মক দুরভিসন্ধি ও অসংগত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করলো।

আমীর আবদুল আযীয নিহত

বিদ্রোহের এ অপরাধে খলীফার দরবার থেকে যে ফরমান জারি হওয়ার ছিল তাই হলো। খলীফা সুলায়মান তাঁর নিকট রাজস্ব ও উপঢৌকনাদি প্রেরণের জন্যে ব্যবহৃত লোকদের মাধ্যমেই স্পেনের পাঁচজন মুসলমান সর্দারের নামে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, আবদুল আযীযের দুর্মতির কথা যথার্থ হলে কালবিলম্ব না করে তাকে হত্যা কর। আমীর আবদুল আযীয তাঁর রাজধানী আশবেলিয়ায় (সেভিলে) স্থানান্তরিত করেছিলেন। খলীফার উক্ত নির্দেশ সর্বপ্রথম হাবীব ইব্‌ন উবায়দার কাছে পৌঁছলে তিনি অন্য চারজনকেও এ ব্যাপারে সলাপরামর্শের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠালেন। অবশেষে পাঁচজন সর্দারই আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হলেন। তারা সত্যি সত্যি খলীফার নির্দেশ অনুসারে আবদুল আযীযকে গ্রেফতার করে হত্যা করলেন এবং শবদেহ আশবেলিয়ায় (সেভিলে) দাফন করে তাঁর শির দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ভাগিনেয় অর্থাৎ আমীর আবদুল আযীযের ফুফাতো ভাই আইয়ুব ইব্‌ন হাবীব লাযমীকে স্পেনের নতুন আমীরের আসনে বসালেন। খলীফা সুলায়মান যেহেতু আমীর আবদুল আযীযের দোষী বা নির্দোষ হওয়ার তদন্তের ভার স্পেনের উক্ত পাঁচ সর্দারের উপরই ছেড়ে

দিয়েছিলেন তাই আমীর আবদুল আযীয সত্যিই দোষী প্রতিপন্ন হয়ে নিহত হলেন কিনা সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। এ জন্যেই তিনি দামেশকে আবদুল আযীযের পরবর্তী আমীর কে হবেন তা নির্ধারণ করে দেন নি। বরং উক্ত পাঁচ সর্দারকেই তিনি এ মর্মে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা যাকে সঙ্গত মনে করেন, তাঁকেই যেন নিজেদের আমীর রূপে বেছে নেন। করাও হয়েছিল তাই। স্পেনের ঐ পাঁচজন সর্দার যদি আবদুল আযীযের দোষ না পেতেন, তবে তাঁরা কস্মিনকালেও তাকে হত্যা করতেন না। খলীফা সুলায়মান আবদুল আযীযকে হত্যার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তার চাইতে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের কোন অবকাশ ছিল না। এ জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্দারদের সংখ্যাও এমন ছিল যে, এত লোকের একত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আশংকা ছিল না। এছাড়া এর চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য তদন্তের আর কোন মাধ্যমও ছিল না। এ সর্দাররা যে এ ব্যাপারে কতটুকু নিঃস্বার্থ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তার প্রমাণ হলো, তাঁরা আবদুল আযীযকে হত্যার পর তাঁরই বংশের একজনকে, যিনি শুধু তাঁর ফুফাত ভাইই নন, চাচাত ভাইও ছিলেন, তাঁকেই তাঁরা স্পেনের পরবর্তী আমীর রূপে নির্বাচন করলেন। এই নবনির্বাচিত আমীর আইয়ুব ইব্‌ন হাবীবের পিতা মূসা ইব্‌ন নুসায়রের চাচাত ভাই ছিলেন। উক্ত সর্দারগণ যদি কোনরূপ ব্যক্তিগত শত্রুতাবশে আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করতেন তা হলে তাঁরই খান্দানের মধ্যে স্পেনের আমীর পদ তাঁরা থাকতে দিতেন না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা ব্যাপারটিকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যে, তাঁদের বিবরণ পড়লে খলীফা সুলায়মানের একটি অত্যাচারী চেহারা চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। তাঁরা আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যা পাঠে মুসলমান পাঠক উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তারপর যখন এহেন নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তিটির নির্মমভাবে নিহত হওয়ার বিবরণ তাঁরা পাঠ করেন তখন খলীফা সুলায়মানের প্রতি ঘৃণায় তাঁদের মন বিষিয়ে ওঠে। আর ঈসায়ী ঐতিহাসিকগণের উদ্দেশ্যও তাই।

আইয়ুব ইব্‌ন হাবীব

খলীফার নির্দেশ পালনকারী পাঁচজন সর্দার আবদুল আযীযকে হত্যা করার পর সমস্ত ফৌজী ও প্রশাসনিক সর্দারদের একত্র করে তাঁদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন পরিষদ গঠন করে আইয়ুব ইব্‌ন হাবীবের নাম পরবর্তী আমীররূপে পেশ করেন। সকলেই এ শর্তে তা মঞ্জুর করেন যে, কায়রোয়ানে নিযুক্ত খলীফার ভাইসরয় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ এবং খলীফাতুল মুসলিমীন মঞ্জুর করলে তিনিই স্পেনের পরবর্তী আমীর হবেন। অন্যথায় তাঁরা যাকে আমীর মনোনীত করলেন তিনিই আমীর হবেন।

কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তর

আইয়ুব ইব্‌ন হাবীব যখন লক্ষ্য করলেন যে, আশবেলিয়ায় (সেভিলে) ঈসায়ী ও ইহুদী অধিবাসীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং আমীর আবদুল আযীযের অনুসৃত বিশেষ কর্মনীতির ফলে সেখানে তাদের প্রভাবটি সমধিক কার্যকরী তখন তিনি আশবেলিয়ার পরিবর্তে

কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। কর্ডোভাতে রাজধানী স্থানান্তর আমীর আইয়ুবের অন্যতম প্রধান ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলে গণ্য হওয়ার কারণ, এরপর সুদীর্ঘকাল মুসলমানদের প্রাদেশিক রাজধানী এবং পরে দারুল খিলাফত বা কেন্দ্রীয় রাজধানীরূপে গণ্য হয়ে পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তারপর আমীর আইয়ুব আফ্রিকা ও মরক্কো থেকে বার্বার ও আরব গোত্রসমূহকে স্পেনে এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অনেক মুসলমান স্পেনে আগমন করেন এবং আমীর আইয়ুব তাদেরকে স্পেনের বিভিন্ন শহর ও জনপদে পুনর্বাসিত করেন। এভাবে ঈসায়ীদের বিদ্রোহের আশংকা অনেকটা প্রশমিত হয়। সীমান্ত এলাকাসমূহে দুর্গ নির্মিত হয় এবং সে সব দুর্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে মওজুদ রাখা হয়। আমীর আইয়ুবের শাসনকাল ছয় মাস পূর্ণ হতেই তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হার্‌ব ইবন আবদুর রহমান ছাকাফীকে স্পেনের শাসক করে পাঠানো হয়। ঘটনা হলো, আমীর আইয়ুবের অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার কথা জ্ঞাত হয়ে কায়রোয়ানে নিযুক্ত খলীফার ভাইসরয় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদের সন্দেহ হয় যে, আইয়ুব আমীর আবদুল আযীয ও মূসা খান্দানেরই লোক। যে কোন সময় তিনি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাই তিনি নিজের অধিকার প্রয়োগ করেই হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমানকে গভর্নরীর সনদ দিয়ে স্পেনে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, আইয়ুবকে পদচ্যুত করে স্পেনের গভর্নর পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর খলীফার দরবার থেকে তার অনুমোদনও গ্রহণ করেন।

হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান ছাকাফী

হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমান স্পেনে পৌঁছে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন এবং মূসা আবদুল আযীয ও আইয়ুবের আমলের সমস্ত আমলাকে সন্দেহ করে তাঁদের প্রতি কঠোর আচরণ করতে শুরু করেন। তাছাড়া ঈসায়ী এবং ইহুদীদের সাথেও একই আচরণ করতে থাকেন। ঈসায়ী ও ইহুদীরা ইতিপূর্বে মুসলমান শাসকদেরকে অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীলরূপে দেখেছে। তারা তাদের একটি প্রতিনিধিদলকে কায়রোয়ানে প্রেরণ করে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদের প্রতি তাঁর স্পেনে প্রেরিত নতুন গভর্নরকে বদলী করার আবেদন জানান। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ সে আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। কারণ, হার্‌ব ইব্‌ন আবদুর রহমানকে তিনিই মনোনীত করে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল তখন সাহস করে দামেশকে খলীফার দরবারে উপনীত হলেন। সৌভাগ্যক্রমে, দামেশকে তখন খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের রাজত্বের অবসান ঘটেছে এবং খলীফা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফতের যুগ শুরু হয়েছে। প্রতিনিধিদলটি খলীফাতুল মুসলিমীনের দরবারে উপনীত হয়ে হার্‌ব ইবন আবদুর রহমানের স্থলে স্পেনে কোন দয়ালু ও প্রজাবৎসল আমীর নিয়োগ করার আবেদন জ্ঞাপন করেন। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হারব ইব্‌ন আবদুর রহমানকে স্পেনের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে আফ্রিকিয়া প্রদেশের প্রধান সেনাপতি সামাহ্ ইব্‌ন মালিক খাওলানীকে স্পেনের গভর্নর রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন।

সামাহ্ ইব্ন মালিক স্পেনে উপনীত হয়ে হার্‌ব ইব্ন আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। হার্‌ব ইব্ন আবদুর রহমান ছাকাফী স্পেনে দুবছর আট মাসকাল রাজত্ব করেছিলেন।

সামাহ্ ইব্ন মালিক

আমীর সামাহ্ ইব্ন মালিক খাওলানী যদিও একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং তারিক ইব্ন যিয়াদের স্পেন অভিযানের সহযাত্রী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্পেনের শাসনভার হাতে নিয়েই সর্বপ্রথম সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে মনোনিবেশ করলেন। আমীর সামাহ্‌র শাসন ছিল হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের শাসনেরই প্রতিচ্ছবি।

স্পেনে আদমশুমারী

হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নির্দেশক্রমে আমীর সামাহ্ স্পেনে আদমশুমারী করান। ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক গোত্র এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী লোকদের সংখ্যা নির্ণীত হয়। বার্বারী লোক আমীর সামাহ্ বার্বারদেরকে জনহীন এলাকাসমূহে পুনর্বাসিত করে তাদেরকে কৃষি ও শিল্পকর্মে উৎসাহ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তিনি সাফল্য লাভ করেন। স্পেনের একটি ভৌগোলিক বর্ণনা প্রস্তুত করান, যাতে প্রতিটি শহর ও জনপদের জনসংখ্যা, অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সন্নিবেশিত ছিল। এক শহর থেকে আরেক শহরের দূরত্ব, নদনদী, পাহাড়-পর্বত সব কিছুর বিবরণও তাতে লিপিবদ্ধ ছিল। দেশের ব্যবসাপণ্যসমূহের তালিকা, বন্দরসমূহের বিবরণ, খনিজ দ্রব্যাদির অবস্থাসহ স্পেন দেশের একটি বিশদ ভূগোল প্রণয়ন করে তিনি তা খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। সাথে সাথে স্পেন দেশের একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়ে তাও তিনি খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য সহজ করে তোলেন। জিযিয়া, উশর, খুমুস ও ভূমি রাজস্বের পাকা আইন-কানুনও তিনি চালু করেন। তিনি সারাকস্তা শহরে একটি মসজিদ এবং কর্ডোভায় ওয়াদিউল কবীর নদীর উপর বিখ্যাত পুল নির্মাণ করান। এছাড়াও স্থানে স্থানে তিনি আরও অনেক মসজিদ ও পুল নির্মাণ করান। মোটকথা, মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্পেনকে একটি শান্তি ও ন্যায়ের রাজ্যে পরিণত করেন। আমীর সামাহ্‌কে স্পেনের আমীরদের মধ্যে ঠিক সেই মর্যাদার আসনই দেয়া হয়ে থাকে, যা বনূ উমাইয়া বংশীয় খলীফাদের তুলনায় হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ছিল।

দক্ষিণ ফ্রান্সে অগ্রাভিযান

আমীর সামাহ্‌র শাসনকালের প্রথম দিক দেখে কোনদিন মনেও হয়নি যে, তিনি একজন কুশলী সমরবিদ ও সুদক্ষ সিপাহসালারও হতে পারেন। স্পেনের অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলাকে সংহত করে খলীফার অনুমতিক্রমে আমীর সামাহ্ সসৈন্যে জাবলে আলবুর্তাত অভিমুখে অগ্রসর হন। এই পাহাড়ের উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করে তিনি যে এলাকায়

উপনীত হন তা বর্তমানে দক্ষিণ ফ্রান্স বলে পরিচিত। তিনি ফ্রান্সের এ এলাকায় দুটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। এর একটি ছিল স্পেন থেকে পালিয়ে আসা গথদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এ রাজ্যটির রাজধানী ছিল নার্বুন শহর। যেহেতু স্পেনের যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও রত্নভাণ্ডার বয়ে আনা সম্ভবপর ছিল তা তারা নিয়ে এসেছিল এবং মুসলমানদের যারা শত্রু ছিল তারাই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই এ রাজ্যটি ছিল খুবই শক্তিশালী। একে দুর্জেয় মনে করা হতো আর তার ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপর শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল গল সম্প্রদায়ের, যার রাজধানী ছিল তুলুয। আমীর সামাহ্ জাবলে আলবুর্তাত বা পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে নার্বুনের ওপর হামলা করে শহরটি অধিকার করে নেন। গোটা রাজ্যটিই তখন মুসলমানদের দখলে চলে আসে। মুসলিম বাহিনী এ শহরে প্রচুর গনীমত লাভ করেন। নার্বুন জয় শেষে তুলুযেও আক্রমণ চালানো হয়। এখানে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অবশেষে মুসলমানরা শহরটি অবরোধ করে ফেলে। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। পক্ষান্তরে ঈসায়ী সৈন্যদের সংখ্যা পরবর্তী প্রতিটি যুদ্ধেই অনেক বেশি বর্ধিত কলেবরে সম্মুখে আসতে থাকে। তুলুষ শহর বিজিত হওয়ার মুখে ডিউক অব একিউটিন নামক জনৈক খ্রিস্টান শাসক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সমরক্ষেত্রে উপনীত হন। আমীর সামাহ্র সাথে যে সব সৈন্য অভিযানে বেরিয়েছিলেন তাদের একাংশকে বিজিত নার্বুন প্রভৃতি বিজিত অঞ্চলে রেখে আসতে হয়েছিল। এজন্য তাঁর সাথে শেষ পর্যন্ত অতিনগণ্য সংখ্যক মুসলমানই ছিলেন। মুসলিম সৈন্যদের সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে একথা নিশ্চিত যে, যখন বিপুল সংখ্যক ফরাসী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ব্যূহ রচনা করলো তখন হতবুদ্ধি না হয়ে আমীর সামাহ্ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করে মুসলিম সৈন্যদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য তাদের এক উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করলেন। অপরদিকে খ্রিস্টান পাদ্রী পুরোহিতরা ও ফরাসী বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে ভাষণ দিল। তারপর যুদ্ধ শুরু হলে, তারিক ও রডারিকের যুদ্ধের চিত্রই দক্ষিণ ফ্রান্সে পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তীর ও তরবারি ও বল্লমের বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হলো। বিশাল ফরাসী বাহিনী মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যের হাতে লাশের স্তূপ ফেলে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং গোটা ফ্রান্স মুসলিম বাহিনীর পদতলে দলিত হওয়ার উপক্রম হয়।

আমীর সামাহ্র শাহাদাত

ঠিক যে সময় মুসলমানরা ঈসায়ী সৈন্যদেরকে ধাওয়া করে অগ্রসর হচ্ছিল, এমনি সময় অকস্মাৎ একটি তীর এসে আমীর সামাহ্র গলদেশের ঠিক মধ্যভাগে লাগে এবং তার অর্ধেক অংশ তাঁর গলা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আপন আমীরকে এমন শোচনীয় শাহাদাতবরণ করতে দেখে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে তারা হতবুদ্ধি হলেন না, যেমনটি সাধারণত এ অবস্থায় হওয়ার কথা। মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি থেমে যায়। চোখের পলকে খ্রিস্টানরা প্রবল হয়ে উঠলো। মুসলমানরা কালবিলম্ব না করে আমীর সামাহ্র স্থলে আবদুর রহমান গাফিকীকে নিজেদের সিপাহসালার ও আমীর নির্বাচিত করলেন। আবদুর রহমান গাফিকী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং ধৈর্যের সাথে

মুসলিম বাহিনী নিয়ে পিছু হটে আসলেন। কিন্তু ইসলামী বাহিনীকে ধাওয়া করার সাহস ঈসায়ীদের হলো না। রণক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান শহীদ হলেন। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশকে নিয়ে আবদুর রহমান গাফিকী পশ্চাদপসরণ করলেন।

আবদুর রহমান ইবন্ আবদুল্লাহ্ গাফিকী

আবদুর রহমান গাফিকী যে বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে আপন বাহিনীকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নার্বুনে ফিরিয়ে আনলেন, তাতে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা তাঁর প্রশংসাই করে থাকেন। তুলুযের যে যুদ্ধে আমীর সামাহ্ শাহাদাতবরণ করেন তা ১০২ হিজরীতে (৭২০ খ্রি) সংঘটিত হয়। তুলুয রণভূমি থেকে নার্বুন আসার পথে ঈসায়ী প্রজারা স্থানে স্থানে এ বাহিনীকে লুটপাট করতে প্রয়াস পায়। তারা ভেবেছিল, যেভাবে পরাস্ত বিপর্যস্ত বাহিনী বা কাফেলাকে গ্রাম্য লোকজন লুটেপুটে নিতে পারে, সেরূপ আমরাও বুঝি এদেরকে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হবো। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, ফরাসী দশগুণ ভারী দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীও তাদের উপর হামলা পরিচালনার বা পশ্চাদ্ধাবনের সাহস পায়নি। পথে কয়েক স্থানে ঈসায়ীদের সাথে তাঁদের লড়াই হয় এবং প্রত্যেক স্থানেই ঈসায়ীরা পরাস্ত হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। নার্বুন শহরে পৌঁছে আমীর আবদুর রহমান গাফিকী নিজের বাহিনীর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করেন এবং এ প্রদেশ থেকে খারাজ ও গনীমতের মাল আদায় করেন। তারপর জাবলে আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতের সে সব গোত্রের বিদ্রোহ দমন করেন, যারা আমীর সামাহ্র শাহাদাত এবং তুলুষ থেকে মুসলমানদের ফিরে আসার কথা শুনে বিদ্রোহ এবং মুসলমানদের অনিষ্ট-সাধনের প্রয়াস পেয়েছিল। এ পার্বত্য গোত্র কয়টিকে শায়েস্তা করে আমীর আবদুর রহমান স্পেনে ফিরে আসেন।

আমীর সামাহ্ ফ্রান্স অভিযানে যাওয়ার প্রাক্কালে আম্বাসা ইব্ন সুহায়ম কালবীকে স্পেনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আম্বাসা যখন খবর পেলেন যে, আবদুর রহমানকে পার্বত্য উপজাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে তখন তিনি স্পেন থেকে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু ঐ সাহায্যকারী বাহিনী ঐ এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই আবদুর রহমানের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাঁদের স্পেনে প্রত্যাবর্তনের পর ফৌজী নির্বাচন অনুসারে আবদুর রহমান গাফিকীকেই স্পেনের পরবর্তী আমীররূপে নির্বাচিত করা হয়।

আবদুর রহমানের পদচ্যুতি

কিন্তু কয়েক দিন পরেই যখন আফ্রিকার গভর্নর বাশার ইব্ন হানযালা আবদুর রহমান গাফিকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেন যে, তিনি সামরিক বাহিনীর লোকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন তখন তিনি আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আম্বাসা ইব্ন সুহায়ম কালবীকে স্পেনের আমীর রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন। আবদুর রহমান তাঁর এ নিযুক্তিকে অম্লান বদনে মেনে নেন। আমীর আম্বাসা ইব্ন সুহায়ম কালবীর হাতে তিনি যথারীতি বায়আত হলেন। নবনিযুক্ত আমীর আবদুর রহমানকে তাঁকে তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল পূর্ব স্পেনের আমীর পদে পুনর্বহাল করলেন।

আম্বাসা ইবন্ সুহায়ম কালবী

আম্বাসা আমীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েই অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দেশ শাসন শুরু করেন এবং প্রজাসাধারণের নানারূপ হিতসাধন করতে থাকেন। আমীর-আম্বাসার শাসনামলের শুরুর দিকে বালাই নামক জনৈক খ্রিস্টান একটি পার্বত্য এলাকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অনেক খ্রিস্টান তার সাথে মিলিত হয়। ইংরেজীতে তাকে পলিও নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তার বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে ইসলামী বাহিনী বিদ্রোহদমনে মনোনিবেশ করে। তারা এই বিদ্রোহী খ্রিস্টানদেরকে হত্যা ও বন্দী করে এ বিদ্রোহের অবসান ঘটান। পলিও ফেরার হয়ে ত্রিশজন সঙ্গীসহ পার্বত্য এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করে। মুসলমানরা মাত্র ত্রিশজনের এ ক্ষুদ্রদলকে তুচ্ছ বিবেচনা করে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। মুসলমানরা সক্রিয় হলে যেখানেই তারা যাক না কেন পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে পারতো। কিন্তু এ ফিৎনা নির্মূল করাকে তারা ততটা জরুরী বিবেচনা করেনি। এ ত্রিশ ব্যক্তি সর্বদা লুপপাট করে পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করে থাকে। তাদের লুটপাটের ফলে কোন কোন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। মুসলমানরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করায় বা এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এরা ক্রমেই শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ঈসায়ীরা ক্রমান্বয়ে এসে তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের দল ভারী করতে থাকে। এভাবে স্পেনে একটি ঈসায়ী রাষ্ট্রের গোড়পত্তন হয়। ইনশাআল্লাহ্ পরে এর বিবরণ দেয়া হবে।

দক্ষিণ ফ্রান্স বিজয়

আমীর আম্বাসা শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করে ফ্রান্স আক্রমণ করেন। নার্বুন এলাকা পূর্ব থেকেই মুসলিম অধিকারে ছিল। এজন্যে পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। আমীর আম্বাসা গোটা দক্ষিণ ফ্রান্স অধিকার করে ফেলেন এবং মধ্যফ্রান্সে উপনীত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সৈন্যবাহিনীকে ছড়িয়ে দেন। এ পর্যায়ে গনীমতের মালের প্রাচুর্যে মুসলিম বাহিনীর বোঝা বেড়ে ওঠে। ফরাসীরা তাদের সমস্ত সামরিক শক্তিকে সংঘবদ্ধ করেও তাদের দেশের অর্ধেকেরও বেশি অংশের মুসলিম বাহিনীর পদতলে পিষ্ট হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। অবশেষে এক দুর্বল মুহূর্তে তারা সুযোগমত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাতে তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু এবারও মুসলমানরা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং ফরাসীদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেন।

আমীর আম্বাসার শাহাদাত

আমীর আম্বাসা অসতর্কতার জন্যে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর সারি অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ঈসায়ীদের ওপর হামলা চালালেন। তিনি ঈসায়ী বাহিনীর সারিসমূহ ভেদ করে একেবারে তাদের মধ্যস্থলে ঢুকে শাহাদাতবরণ করেন।

ফলশ্রুতিতে তুলুযের যুদ্ধের মত এবারও মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়। আমীর আম্বাসা তাঁর শাহাদাতবরণের প্রাক্কালে উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফাহরীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তাই আমীর সামাহর শাহাদাতবরণের পর যেভাবে আবদুর রহমান গাফিকী মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই উরওয়া ইবন আবদুল্লাহ ফাহরী মুসলিম বাহিনীকে স্পেনে ফিরিয়ে আনেন। এটি ১০৭ হিজরীর (৭২৫-২৬ খ্রি) ঘটনা।

উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফাহরী

উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ স্পেনের মশহুর সর্দারদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় ও খান্দানের প্রচুর লোক স্পেনে বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সাহসী এবং ধীরস্থির মেযাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু স্পেনের কিছু লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আফ্রিকার গভর্নর বাশার ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন সারওয়ানের নিকট অভিযোগ করে। তিনি উরওয়ার স্থলে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালমাকে স্পেনের আমীর নিযুক্ত করেন। উরওয়া কয়েক মাস মাত্র স্পেনের আমীর ছিলেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালমা

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালমা কালবী ১০৭ হিজরীর (৭২৫-২৬ খ্রি.) শেষ দিকে স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর মেযাজে রুক্ষতা ও জিদ ছিল অত্যন্ত বেশি। এজন্যে স্পেনের প্রজাসাধারণ তাঁর প্রতিও অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। আফ্রিকার গভর্নরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ফলে দু'বছর কয়েক মাস পর তিনিও পদচ্যুত হন এবং তাঁর স্থলে আমীর উসমান ইব্‌ন আবূ উবায়দা লাখমী স্পেনের শাসক নিযুক্ত হন।

উসমান

আমীর উসমানকে ১১০ হিজরীতে (এপ্রিল ৭২৮-মার্চ ২৯ খ্রি) আফ্রিকার গভর্নর আবদুর রহমান স্পেনের আমীররূপে নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। বাশার ইব্‌ন হানযালার পর উবায়দা ইব্‌ন আবদুর রহমান আফ্রিকার গভর্নর হয়েছিলেন। আমীর উসমান মাত্র পাঁচ মাসকাল স্পেন শাসন করার পরই হুযায়ফা ইবনুল আহ্‌ওয়াস কায়সীকে আমীর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়।

হুযায়ফা ইবনুল আহ্‌ওয়াস

আমীর হুযায়ফা ইবনুল আহ্‌ওয়াস ১১০ হিজরীর (এপ্রিল ৭২৮-মার্চ ২৯ খ্রি) শেষ নাগাদ স্পেন শাসন করেন। তারপর ১১১ হিজরীর মুহাররম (৭২৯ খ্রি-এর মার্চ) মাসে আফ্রিকার গভর্নর হুযায়ফার স্থলে হাশীম ইব্‌ন উবায়দ কিলাবীকে স্পেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। কোন কোন বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, দামেশকের খলীফা নিজেই হাশীমকে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।

হাশীম ইব্‌ন উবায়দ

হাশীম ইব্‌ন উবায়দ কিলাবী ছিলেন শামী বংশোদ্ভূত। তাঁর মধ্যে কঠোরতার আধিক্য ছিল বিধায় স্পেনবাসীদের কাছে তাঁর কার্যকলাপ ভাল ঠেকেনি। স্পেনের মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলেই হাশীমের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর ফলে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে একটি প্রতিনিধিদল অভিযোগ নিয়ে আফ্রিকায় গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু আফ্রিকার গভর্নর এ প্রতিনিধিদলের কথায় কর্ণপাত করলেন না বা স্পেনের আমীরকে পদচ্যুতও করলেন না। হাশীম যেহেতু স্বয়ং দামেশকের খলীফার মনোনীত ও প্রেরিত আমীর ছিলেন, তাই আফ্রিকার গভর্নর তাকে পদচ্যুত করার সাহস করেননি। মোদ্দা কথা, আফ্রিকা অর্থাৎ কায়রোয়ানে স্পেনের আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী প্রতিনিধিদল তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে দামেশকে খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের দরবারে গিয়ে উপনীত হন। তাঁরা তাদের শাসকের বিরুদ্ধে কঠোর আচরণের অভিযোগ করলে খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আশজাঈকে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আশজাঈকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্পেন গিয়ে হাশীমের কার্যকলাপ তদন্ত করে দেখেন এবং প্রথমে ছদ্মবেশে থেকে পূর্ণ মনোযোগের সাথে তন্ন তন্ন করে এ তদন্ত কার্য চালান। তদন্তে যদি সত্যিই হাশীমের অপরাধ প্রমাণিত হয়, তবে কাল-বিলম্ব না করে তাকে পদচ্যুত করে নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করবেন। আর যদি দেখা যায় যে, তাঁর কোন কার্যকলাপ খিলাফত ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ-বিরোধী নয়, তবে তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ স্পেনের আমীররূপে থাকতে দিয়ে ফিরে আসবে।

হাশীমের পদচ্যুতি

হাশীম ইব্‌ন উবায়দ মাকরেশায় জিহাদ করেন এবং সে এলাকা জয় করে সেখানে দশ মাসকাল অবস্থান করেন। দু'বছরকাল স্পেন শাসন করার পর হাশীম পদচ্যুত হন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আশজাঈ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আশজাঈ স্পেনে উপনীত হয়েই তদন্তকার্যে মনোনিবেশ করেন এবং খুব দ্রুত তদন্তকার্য সম্পন্ন করেন। তদন্তে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশীমের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তিনি তাঁর পরিচয় দেন এবং খলীফার নির্দেশের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি হাশীমকে গ্রেফতার করে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় দামেশকে খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন এবং নিজে কয়েক মাস স্পেনে অবস্থান করে সেখানকার শাসন-শৃঙখলার অব্যবস্থা দূর করেন। তারপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ গাফিকীকে পুনরায় স্পেনের আমীর পদে বসিয়ে নিজে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। এটা ১১৩ হিজরীর (৭৩২ খ্রি.) ঘটনা।

দ্বিতীয়বারের মত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ গাফিকী

আবদুল রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ গাফিকী স্পেনের শাসনভার হাতে নিয়ে সর্বপ্রথম রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাসমূহ দূর করেন। স্পেনের অধিকাংশ শহর ও জনপদে তিনি মাদ্রাসা, মসজিদ ও পুল নির্মাণ করে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফ্রান্স আক্রমণ করার এবং এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ব্যর্থতাসমূহের প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করেন।

উসমান লাখমীর বিদ্রোহ

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার পাঁচ মাসকাল উসমান লাখমী আমীর রূপে স্পেন শাসন করেন। তারপর তাঁকে পদচ্যুত করে স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তার পদদান করা হয়। এই প্রদেশেই ছিল জাবাল আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বত এবং তার উত্তরস্থ সেই ভূখণ্ডটি যা মুসলমানরা ইতিপূর্বে জয় করে নিয়েছিলেন। উসমান যেহেতু গোটা স্পেন রাজ্যের শাসকরূপে ইতিপূর্বে গোটা দেশ শাসন করেছিলেন আর এখন তাঁরই একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসক, তাই তাঁর মনে গভীর অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এজন্যে তিনি অহরহ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিভোর থাকতেন। উসমান যেহেতু বার্বার বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাই তার আরব বা সিরীয়দের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না এবং তিনি তাদের প্রতি অনেকটা বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবই অন্তরে পোষণ করতেন। ডিউক অব একিউটিন যেহেতু ফ্রান্সের এক বিরাট অংশ জুড়ে রাজত্ব করছিলেন আর তিনি ছিলেন গথ বংশের রাজা, তুলুয যুদ্ধের পর ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের রাজা চার্লস মার্টিলের মুকাবিলায় নিজেকে শক্তিশালী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবেশী মুসলমান আমীরকে নিজের পক্ষে টেনে ও তার সহানুভূতি অর্জন করে মার্টিলকে তার নিজের তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় ও তৎপর হলেন। সেমতে ডিউক অব একিউটিন উসমানের সাথে পত্রযোগাযোগ স্থাপন ও উপঢৌকনাদি বিনিময়ের মাধ্যমে সখ্যতা স্থাপন করলেন এবং তাদের এ সখ্যতা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, ডিউক অব একিউটিন তাঁর নিজের সুন্দরী তন্বী কন্যাকে এ শর্তে উসমানের বিবাহবন্ধনে দান করলেন যে, সে তার পিতৃধর্মে টিকে থাকতে পারবে, উসমান তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। কন্যা সম্প্রদানের বিনিময়ে ডিউক অব একিউটিন উসমানের নিকট থেকে এ মর্মে লিখিত সন্ধিনামা হাসিল করলেন যে, উসমান কখনো তাঁর বাহিনীকে ডিউকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না।

উসমান লাখমী নিহত হলেন

এবার যখন স্পেনের আমীর আবদুর রহমান গাফিকী ফ্রান্সের ওপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে জাবালে আল-বুরতাত অতিক্রম করতে মনস্থ করলেন তখন তিনি উসমানকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে আমীরের বাহিনীর অধীনে সমর্পণ করেন এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত

থাকেন। উসমান সে নির্দেশ পালনে তাঁর অসুবিধা আছে বলে জানালো এবং নানা টালবাহানা করে সময় কাটাতে থাকেন। কিন্তু আবদুর রহমান সসৈন্যে এসে পৌছলে স্বয়ং উসমানই মুসলিম বাহিনীকে জাবালে আল-বুরতাতের গিরিপথে বাধা দেয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন আবদুর রহমান এক সর্দারকে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যসহ উসমানকে দমনের জন্য প্রেরণ করলেন। উসমান পরাস্ত হয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। সেই সর্দার তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করেন এবং তার ঈসায়ী স্ত্রীকে গ্রেফতার করে আবদুর রহমানের কাছে নিয়ে আসেন।

এভাবে জাবালে আল-বুরতাতের এ বাধা অপসারণ করে ইসলামী বাহিনী পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সের সমভূমিতে গিয়ে পদার্পণ করে। তখন নার্বুন শহর ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা। এ শহর থেকে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনী ফ্রান্সের শহরসমূহ অধিকার করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দর ও উল্লেখযোগ্য শহর বোর্ডিওও মুসলিম অধিকারে চলে আসলো। এ পর্যায়ে ডিউক অব একিউটিন বাধ্য হয়ে চার্লস মার্টিলের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। তিনি তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে চার্লস মার্টিলের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামী বাহিনীর সয়লাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাঁকে উৎসাহিত করেন। চার্লস মার্টিল অত্যন্ত যোগ্যতা ও সতর্কতার সাথে সম্ভাব্য বেশি পরিমাণ সৈন্য ও যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ঈসায়ী সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী বিখ্যাত সেনাপতিদের নেতৃত্বে তাঁর পতাকাতলে এসে সমবেত হয় এবং এ যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধরূপে চিত্রিত করে ঈসায়ী পাদ্রীরা উত্তেজনাকর বক্তৃতার মাধ্যমে ঈসায়ীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মুসলমানরা গরূন নদী অতিক্রম করে ওয়ার্দুন নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে ঈসায়ী সৈন্যরা মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু মুসলমানদের হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। মুসলমানরা পাইটেরাস শহর অধিকার করে নেন।

তুরস শহরে যুদ্ধ

পাইটেরাস শহর অধিকার করে মুসলিম বাহিনী তুরস শহর অভিমুখে যাত্রা করে। শহরটি ফ্রান্সের সমতল এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তুরস শহরের নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে সম্মিলিত ঈসায়ী বাহিনী ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলা করে। এ প্রান্তরে উপনীত হয়ে উভয় বাহিনী এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত মুখোমুখি শিবির স্থাপন করে অবস্থান করে। কোন বাহিনী অপর বাহিনীকে হামলা করতে সাহসী হয়নি। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন ও অপরিচিত স্থান। পক্ষান্তরে, ঈসায়ীরা তাদের স্বদেশ ভূমির হিফাজতের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল। চার্লস মার্টিল এবং ডিউক অব একিউটিনের মত খ্যাতনামা ও অভিজ্ঞ সিপাহসালারদের ছাড়াও এরূপ উচ্চ পর্যায়ের আরো কয়েকজন ঈসায়ী সেনাপতি ঈসায়ী বাহিনীর বিভিন্ন অংশের সেনাপতিত্ব করছিলেন। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য ঈসায়ী সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। পাদ্রীদের ধর্মীয় উত্তেজনাকর ভাষণে ঈসায়ী সৈন্যদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। এই দফা

মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় সম্ভবত বেশিই ছিল। কিন্তু যেহেতু ঈসায়ী সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এবং ফ্রান্স ভূমির হিফাজতের জন্য তারা বদ্ধপরিকর ও মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাই তাদের সংখ্যা মুসলিম বাহিনীর তুলনায় পূর্বের মতই অনেক বেশি ছিল। অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ঈসায়ীদের এক-দশমাংশেরও কম। এ দফায় মুসলমানরা গনীমতের মালের প্রাচুর্যের জন্যে অনেক ভারাক্রান্ত ছিলেন। আপন মাতৃভূভি থেকে তাঁরা অনেক দূর-দেশে চলে এসেছিলেন। চারদিকেই তাঁরা দুশমন বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অবশেষে অষ্টম দিনে মুসলমানদের আমীর আবদুর রহমান গাফিকী আর অপেক্ষা করা সমীচীনবোধ করলেন না। তিনি তাঁর বাহিনীকে হামলা পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বেঁধে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ লড়াই চললো। রাতের অন্ধকার অন্তরাল হয়ে যুদ্ধের ফায়সালাকে মুলতবি করে দিল। রাতের বেলা মুসলমান সৈন্যরা ঈসায়ী বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কথা ভেবে এবং ঈসায়ীরা মুসলমানদের যে বীরত্ব প্রত্যক্ষ করেছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে খুবই চিন্তামগ্ন হলো। পরদিন ভোরে আবার আক্রমণ প্রতি আক্রমণের পালা শুরু হলো। এদিন ডিউক একুইটিন যার ইতিপূর্বেও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল—এক চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর বাহিনীসহ একটি রাত গোপন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ঠিক যে মুহূর্তে ঈসায়ী বাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলায় ময়দানে টিকতে না পেরে পলায়ন করতে উদ্যত হলো, ঠিক সে মুহূর্তে ডিউক অব একুইটিন পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ অপ্রত্যাশিত হামলার ফলে সম্মুখবর্তী সারিসমূহ পেছন দিক থেকে আক্রমণকারী শত্রু সৈন্যদের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হলো– এ সুযোগে সম্মুখের পলায়নপর বিশাল ঈসায়ী বাহিনী নিজেদেরকে সামলে নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালালো। মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী তাতে আর সংঘবদ্ধ থাকতে পারলো না।

আমীর আবদুর রহমানের শাহাদাত

এ প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময় আমীর আবদুর রহমান গাফিকী তাঁর পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বন করেন। তরবারি হস্তে শত্রুদের ব্যূহ অতিক্রম করে শত শত শত্রু নিধন করে অজস্র আঘাত দেহে নিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এদিন সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। রাতের অন্ধকার যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটায়। বাহ্যত আজও ঈসায়ীরা বিজয়ী ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিলেও সন্ধ্যাকালীন তরবারি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সামলে নিয়ে একদিকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। মুসলমানদেরকে স্থানচ্যুত করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ঈসায়ীদের জন্যে পরম আনন্দঘন ছিল। মুসলিম বাহিনী তাদের সিপাহসালারের ও আমীরের শাহাদাতবরণ করার পর যুদ্ধক্ষেত্রে আর অধিকক্ষণ অবস্থান সমীচীনবোধ করলেন না। তারা রাতের বেলাই সেখান থেকে যাত্রা করলেন। সকাল বেলা মুসলমানরা মাঠে নেই দেখে খ্রিস্টান বাহিনীও আর মাঠে অবস্থানকে সমীচীন বোধ করলেন

না। মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করা ছিল সুকঠিন। চার্লস মার্টিল তার রাজধানীতে এ জন্য দ্রুত ফিরে যাচ্ছিলেন যে, তিনি আশঙ্কা করছিলেন মুসলমানরা আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করে খ্রিস্টান বাহিনীকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এ যুদ্ধে ঈসায়ীদের অসংখ্য লোক নিহত হয় আর মুসলমানদের সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় তাঁরা তাঁদের আমীরকে এ যুদ্ধে হারান। মোটকথা, এ যুদ্ধের পর এ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে এবং মুসলমানরা আর অধিক ভূমি জয় করতে পারেন নাই। পাঠক ইচ্ছে করলে একে মুসলমানদের ব্যর্থতা বা পরাজয়ও বলতে পারেন। ইচ্ছে হলে সমানে সমান যুদ্ধও বলতে পারেন। আবার একে একদিক থেকে ঈসায়ীদের পরাজয়ও বলতে পারেন। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১১৪ হিজরীতে (৭৩২ খ্রি.)।

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রী

এ যুদ্ধের পরিণতি এবং আবদুর রহমানের শাহাদাতের কথা অবগত হয়ে আফ্রিকার গভর্নর উবায়দ ইবন আবদুর রহমান আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রীকে স্পেনের আমীর নিয়োগ করেন এবং তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, ফরাসীদের নিকট থেকে যে কোন মূল্যে আমীর আবদুর রহমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রী স্পেনে প্রবেশ করে ১১৫ হিজরীতে (৭৩৩ খ্রি.) শাসন ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা বিধান করেই ফ্রান্স আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণে মনোযোগী হন।

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ছিলেন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি তাঁর সাথে আফ্রিকা থেকেও কিছু সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি একটু ভুল করে ফেললেন এই যে, তিনি বর্ষা মওসুমে ফ্রান্স অভিযানে যাত্রা করেন। ফলে জাবাল আল-বুরতাত অতিক্রমকালে ভরা নদীনালা অতিক্রম করা তাঁর সৈন্যদের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। তাদের এ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে ফরাসী লুটেরারা তাঁর বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে থাকে। আপন বাহিনীকে নদী-নালায় অবরুদ্ধ দেখে আবদুল মালিক ফিরে যেতে মনস্থ করেন এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে অনেক কষ্টে সসৈন্যে দেশে ফিরে আসেন। আসা-যাওয়ায় অনেক সময়ের অপচয় হয়। লোকক্ষয়ও নেহাৎ কম হয় না। অথচ কাজের কাজ কিছুই হলো না।

আবদুল মালিকের পদচ্যুতি

আবদুল মালিকের এ ব্যর্থতার জন্যে অসন্তুষ্ট হয়ে আফ্রিকার গভর্নর স্পেনের আমীরের পদ থেকে তাঁকে পদচ্যুত করলেন এবং তাঁর স্থলে উতবা ইব্‌ন হাজ্জাজ সলুলীকে স্পেনের আমীর মনোনীত করে পাঠালেন।

উতবা ইব্‌ন হাজ্জাজ সলুলী

উতবা ইব্‌ন হাজ্জাজ ১১৭ হিজরীতে (৭৩৫ খ্রি.) স্পেনে উপনীত হয়ে সে দেশের শাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন এবং আবদুল মালিক কাতান ফাহ্‌রীকে একটি ছোট

এলাকার শাসনভার অর্পণ করেন। এটা ছিল উতবার একটি ভুল। এমন এক ব্যক্তিকে তিনি তাঁর অধীনে আমিল হিসেবে নিয়োগ করলেন যিনি ইতিপূর্বে গোটা স্পেনের শাসকরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জাতীয় ভুল ইতিপূর্বে উসমান নাখমীর ব্যাপারেও করা হয়েছিল। পরবর্তী আমীরের উচিত ছিল উসমান লাখমীকে হয় সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন করে রাখতে নতুবা তাঁকে স্পেনে না রেখে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়া। অনুরূপভাবে উতবারও উচিত ছিল আবদুল মালিককে আফ্রিকায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া অথবা কমপক্ষে কোন ভূখণ্ডের শাসনভার আদৌ তাঁর হাতে অর্পণ না করা। সে যাই হোক উতবা একটি রাজনৈতিক ভুলের শিকার হলেন।

উতবার কীর্তিসমূহ

উতবা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। উতবার কীর্তিসমূহের অন্যতম হলো, স্পেনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি অনেক প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগে তিনি অশ্বারোহী ভর্তি করেন এবং তাদের দ্বারা ভ্রাম্যমাণ প্রহরার ব্যবস্থা করে রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তার ইন্তিজাম করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ভ্রাম্যমাণ পুলিশের ব্যবস্থা প্রবর্তন। উতবা প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি জনপদে এক একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন— যাতে কেন্দ্রীয় আদালতে কাজের চাপ বেশি না থাকে এবং প্রজাসাধারণের বিচার লাভে কোনরূপ বেগ পেতে না হয়। তিনি প্রতিটি গ্রামে ও বস্তিতে কমপক্ষে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ সব বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্যে রাজস্বের একটি অংক নির্দিষ্ট করে দেন। যেখানে যেখানে প্রয়োজনবোধ করেন সেখানে তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিটি মসজিদের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে একটি করে বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা করেন। স্পেনে বার্বারদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তাদের চালচলনে বর্বরতা ও গেঁয়ো স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ অহরহ পরিদৃষ্ট হতে থাকে। উতবা তাদেরকে এমন কর্মব্যস্ত রাখেন যে তাদের মধ্যে কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মার্জিত রুচির বিকাশ ঘটে। ভূমি রাজস্ব প্রভৃতির হার ও আদায়ের পন্থা নির্ধারণেও প্রজাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হতো। এজন্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে শান্তি-সমৃদ্ধি ও সন্তোষ দৃশ্যমান হচ্ছিল। আমিল ও ওয়ালী তথা জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের শাসকদেরকেও তিনি ন্যায়বিচার ও নিষ্ঠায় অভ্যস্ত করে স্পেনকে একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত করেন।

তারপর তিনি ফ্রান্সের মুসলমানদের বিজিত এলাকার দিকে মনোনিবেশ করেন যেখানে নামেমাত্র মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাবুনিয়া শহরকে তিনি সুরক্ষিত ও মজবুত করে তোলেন। রূপ নদীর তীরে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করান, যাতে মুসলিম অধিকৃত এলাকা সংরক্ষণ করা ও ভবিষ্যতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং বিজয় অভিযান পরিচালনা সহজতর হয়। তাঁর আমলে ফরাসীদের সাথে কয়েকবারই যুদ্ধ হয় এবং প্রতিবারই ফরাসীরা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

১১২ হিজরীতে (৭৩০ খ্রি.) আফ্রিকার বার্বাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ দমনে আমীর উতবার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। তাই আফ্রিকার গভর্নর সে বিদ্রোহ দমনের জন্যে আমীর উতবাকেই সেখানে তলব করেন। উতবা আফ্রিকায় পৌঁছে

বার্বারদেরকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেন। আমীর উতবার অনুপস্থিতির সুযোগে এদিকে স্পেনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। বিভিন্ন এলাকায় ষড়যন্ত্র এবং গোত্রীয় রেষারেষি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

এ দিকে জাবালে আল-বুরতাতের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন তখন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান। সে প্রদেশের রাজধানী ছিল নার্বুন শহরে। তখন মার্সেলিস ছিল ফ্রান্সের একটি মশহুর শহর এবং শহরটি ছিল পূর্ব ফ্রান্সের রাজধানী। রাজ্যটি ছিল খুবই শক্তিশালী এবং তার শাসক- যাকে ডিউক অব মার্সেলিস নামে অভিহিত করা হতো—ছিলেন মরূন শী আস। তিনি নার্বুনের ওয়ালী ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। চার্লস মার্টিলের ভয়ে তিনি ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মুসলমানদের করদ রাজায় পরিণত হন। এ খবর পেয়ে চার্লস মার্টিল তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালে মুসলমান সৈন্যরা মরূন শী আসের সাহায্যর্থে এগিয়ে আসে। উভয় পক্ষে বেশ কটি যুদ্ধ হয়। স্পেনের আমীরের অনুপস্থিতিতে নার্বুনের ওয়ালীকে কোনরূপ রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। চার্লস মার্টিল মার্সিলিসে লুটপাট করে শহরটিকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেন। কিন্তু নার্বুন শহরে যখন তিনি হামলা চালান তখন তাঁকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

আমীর উতবার ওফাত

আমীর উতবা আফ্রিকার ঝামেলা চুকিয়ে ১২২ হিজরীতে (৭৪০ খ্রি.) স্পেনে ফিরে আসেন। তখন স্পেনে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সংকল্পের দৃঢ়তা তুঙ্গে পৌঁছেছে। আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতাম সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উতবা তাঁকে একটি এলাকার আমিল বানিয়েছিলেন। উতবার স্পেনে অনুপস্থিত থাকাকালে আবদুল মালিক স্পেনবাসীদের এক বিরাট অংশকে তাঁর বিদ্রোহের সমর্থক বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি তখন নিজেকে স্পেনের শাসক বলে দাবি করলেন। আমীর উতবা দেশে ফিরেই এ বিদ্রোহ দমনের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে অবকাশ দেয়নি। ১২৩ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ৭৪০ খ্রি) মাসে আমীর উতবা রাজধানী কর্ডোভায় ইন্তিকাল করেন এবং আবদুল মালিক ইবন কাতান অনায়াসেই গোটা স্পেনের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন।

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রী ছিলেন শতবর্ষের এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর দেহ ছিল যুবকদের মত সুঠাম এবং বুদ্ধিশুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনায় কোনরূপ ভাটা বা শৈথিল্যের লেশমাত্র ছিল না। তিনি যুবক সুলভ দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। আবদুল মালিক ছিলেন মদীনার অধিবাসী এবং হারার ঘটনার সময় তিনি তাতে শরীক ছিলেন। তিনি মদীনা, সিরিয়া, মিসর, ইরাক, আফ্রিকিয়া এবং স্পেনের অনেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দেহে ছিল শত শত জখমের চিহ্ন। সিরীয় এবং হিজাযীদের মধ্যে যে

পারস্পরিক ঘৃণাভাব ছিল, হাররার যুদ্ধের কারণে আবদুল মালিকের সে ঘৃণাভাব ছিল আরো প্রকট। এ দিকে আফ্রিকা ও মরক্কোতে বার্বারদেরকে আরব বিজেতারা তাদের বর্বরতার জন্যে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। উমাইয়া বংশীয়দের রাজত্ব ছিল নির্ভেজাল আরব বংশীয় রাজত্ব। বিজেতা আরবদের এ ঘৃণার কথা বার্বাররা সম্যক টের পেত। এ জন্যে বার্বাররা আরবদেরকে তাদের বিজেতা শাসকরূপে মেনে নিলেও ইসলামের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পরে তারা যখন আরবদের এ বংশগত গর্ব ও উন্নাসিকতা লক্ষ্য করতো তখন তাদের মনে তা বেশ রেখাপাত করতো। এ কারণে যখনই বনূ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন শুরু হতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রভাবান্বিত হতো এবং তারও বিদ্রোহ করতে উদ্যত হতো। এ কারণেই উবায়দী রাজত্বের ভিত্তি এই বার্বার সম্প্রদায়ের উপর অনায়াসেই স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছিল। আর এ কারণেই আবরদের শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী প্রত্যেকেই বার্বার সম্প্রদায়কে তাদের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক শক্তিরূপে ভেবেছে। বার্বারদের শৌর্যবীর্যের গর্ব ছিল। তারা সর্বদাই আরবদেরকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছে। সে আমলে বার্বার বিদ্রোহ পুনরায় নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আফ্রিকার গভর্নর বার্বারদের এ বিদ্রোহের দরুন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন। তাই তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াতে কোনরূপ আপত্তি করেননি।

আফ্রিকার গভর্নর পদে কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের নিযুক্তি

খলীফার দরবার থেকে আমীর আবদুর রহমানের স্থলে কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসলেন। তিনি ছিলেন একজন সিরীয় সর্দার। এ দিকে মাগরিবে মায়সারা নামক জনৈক বার্বার সর্দার লুটপাট করে ভীষণ অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায বার্বারদেরকে একটি অনুন্নত ও নীচ গোত্র ভেবে বেপরোয়াভাবে তাদের মুকাবিলা করলেন। কিন্তু যে বার্বার সম্প্রদায় শুরুতেও বিনা চ্যালেঞ্জে আরব প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি তারা বিগত শতাব্দীকাল ধরে ইসলামের অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছিল। তাদের শৌর্যবীর্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তারা অনেক যুদ্ধে আবরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে নিজেদেরকে সমকক্ষ প্রতিপন্ন করেছিল। এবার বার্বাররা সিরীয়দেরকে পরাস্ত করলো।

কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায সিউটা দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন

কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায তাঁর অনেক সৈন্য ক্ষয় করে অবশেষে দশ হাজার সিরীয় সৈন্যসহ সিউটা দুর্গের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ দুর্গটি জিব্রাল্টার প্রণালীর দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত ছিল। স্পেনবাসীরা চাইলে কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযকে সাহায্য-সামগ্রী ও রসদ পৌঁছাতে পারতো। এ দুর্গটি জয় করা বার্বারদের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু যেহেতু দুর্গের মধ্যে কোনরূপ রসদ ছিল না, তাই অবরুদ্ধদের উপবাসে থাকতে হয়। তাদের সবচাইতে বড় সাহায্য তখন ছিল খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা। কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায স্পেনের শাসনকর্তা

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের কাছে তাঁর দুর্দশার কথা জানিয়ে খাদ্যসামগ্রীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু আবদুল মালিক সিরীয়দের প্রতি তাঁর পূর্বের ঘৃণার কারণে কুলছুম ইব্‌ন ইয়ায এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জন্যে কোনরূপ সাহায্যসামগ্রী পাঠালেন না। স্পেনের জনৈক আমীর সওদাগর যায়দ ইব্‌ন আমর যখন সিউটার অবরুদ্ধ সৈন্যদের দুর্দশার কথা অবগত হলেন, তখন তিনি কয়েকটি জাহাজভর্তি রসদ-সামগ্রী সিউটা দুর্গের দিকে প্রেরণ করলেন। আবদুল মালিক এ সংবাদ অবগত হয়ে যায়দ ইব্‌ন আমরকে গ্রেফতার করে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে তাঁকে হত্যা করেন।

আফ্রিকার গভর্নররূপে হানযালার নিযুক্তি

দামেশকের খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক যখন সিরীয় সৈন্যদের এ দুর্দশার কথা অবহিত হলেন তখন তিনি কালবিলম্ব না করে একটি শক্তিশালী বাহিনী সাথে দিয়ে আমীর হানযালাকে মাগরিবের দিকে রওয়ানা করে দিলেন। হানযালা সেখানে উপনীত হয়ে সিউটা কিল্লার অবরোধ ভেঙে দিয়ে অবরুদ্ধ সৈন্যদেরকে উদ্ধার করলেন। বার্বাররা তাঁর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এমনি সময় কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের ইন্তিকাল হয় এবং হানযালা নিজে আফ্রিকার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের হত্যা

এদিকে স্পেনে যখন আফ্রিকার বার্বারদের শোচনীয়ভাবে নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তখন স্পেনের বার্বাররা সংঘবদ্ধ হয়ে আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের ওপর হামলা চালালো। জালীকিয়া প্রদেশ ও আরাগুনে প্রচুর সংখ্যক বার্বারের বাস ছিল। জালীকিয়া প্রদেশটি ছিল স্পেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। আর আরাগুন ছিল উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। উভয় দিক থেকে বার্বাররা কর্ডোভার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালালো। তারা আবদুল মালিককে কয়েকবার পরাস্ত করলো। বার্বারদের এ ফিতনা দমন করা যখন আমীর আবদুল মালিকের সাধ্যাতীত বলে তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হলো, তখন তিনি অগত্যা কুলছুম ইব্‌ন ইয়াযের দশ হাজার সিরীয় সৈন্যের নতুন অধিকর্তা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বালাজ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন ইয়াযের নিকট বার্বারদের দমনে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি বার্বারদের দমনের জন্য তাঁকে যথাযথ পুরস্কৃত করা হবে এ কথাও জানালেন। বালাজ ইব্‌ন বাশার আফ্রিকার নতুন গভর্নর হানযালার থাকার চাইতে এ প্রস্তাব রক্ষা করে স্পেন গমনকেই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। সেখানে পৌঁছে মাত্র কয়েক দিনেই বার্বারদের দমন করেন এবং তাদের বাহিনীসমূহকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। এবার যখন সেই সিরীয় বাহিনী স্পেনের আরবদের নিকট সিউটা দুর্গে তাদের উপবাসী থাকার এবং সে সময় আবদুল মালিকের নিষ্ঠুর আচরণের কথা ব্যক্ত করলেন তখন সাধারণভাবে সকলেই আবদুল মালিকের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। বালাজ ইব্‌ন বাশার যখন লক্ষ্য করলেন যে, স্পেনবাসীরা তাঁর সমর্থনে রয়েছে, তখন তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানকে গ্রেফতার করলেন। বালাজ আবদুল মালিককে অন্তরীণ অবস্থায় রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথীরা এবং আবদুল

মালিকের শত্রুরা বালাজকে হুমকি দিয়ে অনন্যোপায় করে তুললো। অগত্যা এই শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধকে হত্যা করা হলো। এটি ১২৩ হিজরীর (৭৪১ খ্রি.) শেষ দিককার ঘটনা।

আত্মকলহ

বালাজ ইব্‌ন বিশতরী বা বালাজ ইব্‌ন বাশারের স্পেনের শাসনভার অধিকারের পর আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতান ফাহ্‌রীর দুই পুত্র উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল মালিক ও কাতান ইব্‌ন আবদুল মালিক গোপনে গোপনে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বালাজ ইব্‌ন বাশারের বিরুদ্ধ সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। নার্বুনের আমিল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান যাঁর কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে— আবদুল মালিকের পুত্রদ্বয়ের সাথে যোগদান করলেন। ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের যোগদান এবং সিরীয়দের রাজত্বের আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের কল্পনার ফলে যে সব বার্বার এই মাত্র ক'দিন আগেও আবদুল মালিকের বিরোধী ছিল, তারাও আবদুল মালিকের পুত্রদ্বয় এবং ফাহরীদের সাথে এসে যোগ দেয় এবং কর্ডোভা অভিমুখে অগ্রসর হয়। এদিকে বালাজ ইব্‌ন বাশারও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন।

বালাজের বাহিনীতে বার হাজার সিরীয় এবং স্পেনে অবস্থানরত অধিকাংশ আরবই শামিল ছিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এখানে মুসলমানদের দু'টি শক্তিশালী বাহিনী মধ্য স্পেনে একে অপরের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে ঈসায়ীরা ফ্রান্সে বসে তাদের স্বদেশভূমিকে মুসলিম অধিকার মুক্ত করার পরিকল্পনা আঁটছিল। যুদ্ধে আমীর বালাজ মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সিরীয়দের এ সর্দারবিহীন বাহিনীটি শেষ পর্যন্ত শত্রুদের পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেয়। পরের দিনই আমীর বালাজ জখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এটা ১২৪ হিজরীর (৭৪১-৪২ খ্রি) ঘটনা। আমীর বালাজ এগার মাসকাল স্পেন শাসন করেন। তারপর আরব ও সিরীয়রা মিলে ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাকে স্পেনের আমীর রূপে নির্বাচিত করেন।

ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা

ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা যেহেতু ইয়ামানী ছিলেন, তাই স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি ইয়ামানীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের পুত্রদ্বয় যারা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেছিল— তারা ইব্‌ন সালামার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলো না। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটপাট চালাতে লাগলো। এদিকে ইয়ামানীদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্বে এবং অন্যান্য আরবের প্রতি অহেতুক কঠোরতা অবলম্বনের দরুন আরব গোত্রসমূহ ইব্‌ন সালামার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাধ্য হয়ে আফ্রিকার গভর্নর হানযালা ইব্‌ন সাফওয়ানের কাছে ইব্‌ন সালামার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাঁর স্থলে কোন নতুন আমীরের নিয়োগের আবেদন জানালো।

ইব্‌ন সালামার পদচ্যুতি

হানযালা ইব্‌ন সাফওয়ান আবুল খাত্তাব হুসাম ইব্‌ন যিরার কালবীকে 'ইমারতের' সনদ দিয়ে স্পেনে প্রেরণ করলেন। স্পেনবাসীরা হুসামকে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করলো। হুসাম ইব্‌ন সালামকে পদচ্যুত করে স্বহস্তে শাসনভার তুলে নেন। এটা ১২৫ হিজরীর (৭৪৩ খ্রি.) ঘটনা।

আবুল খাত্তাব হুসাম ইব্‌ন যেরার কালবী

আবুল খাত্তাব সর্বদিক দিয়ে রাজ্য শাসনের সুযোগ্য পাত্র ছিলেন। এদিকে মুসলিম-ঈসায়ী নির্বিশেষে স্পেনবাসীরা নিত্যদিনকার গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সকলে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে কর্ডোভার উপকণ্ঠে নতুন শাসককে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো। আবদুল মালিকের বিদ্রোহী পুত্রদ্বয়ও তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে আনুগত্যের বায়আত করলো। এ আমীর আত্মকলহের কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং তার কারণ নিরূপণও করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও প্রতিটি গোত্রের জন্যে স্পেনে ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্ধারণ করে দিলেন এবং এভাবে তিনি কর্ডোভায় অবস্থানরত সিরীয়কে, যারা প্রচুর সংখ্যায় সমবেত হয়ে নানারূপ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো, তাদেরকেও নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। রাজধানীতে এভাবে আমীরের শাসন-শৃঙ্খলা বিধান সহজতর হয়ে পড়লো।

আবুল খাত্তাবের একটি রাজনৈতিক ভুল

কিন্তু এ আমীরও একটি ভুল করে বসলেন। তিনি তার স্ব-দেশীয়, স্ব-গোত্রীয় ইয়ামানীদেরকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য প্রদান করলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। ইয়ামানীদের প্রতি আবুল খাত্তাবের আনুকূল্য প্রদর্শন তাঁকে তাদের প্রতিপক্ষ মুদারীয় গোত্রসমূহের শত্রুতে পরিণত করলো। কায়স গোত্রীয় লোকেরাও তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। একদা আমীর আবুল খাত্তাবের চাচাত ভাই এবং জনৈক কিনানী আরবের মধ্যে বচসা হয়। আমীরের আদালতে বিচার প্রার্থনা করা হলো। আমীর তাঁর চাচাত ভাই দোষী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিই আনুকূল্য প্রদর্শন করে বিচারের রায় তার পক্ষেই প্রদান করেন। কিনানী তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে কায়স গোত্রের সর্দার বাখার দামীল ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন শিমার যিল-জাওশানের কাছে আমীরের বিরুদ্ধে অনুযোগ করলো। দামীল ইব্‌ন হাতিম ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সর্দার এবং আবরদের মধ্যে তাঁর প্রভূত সম্মান ও জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি আমীর আবুল খাত্তাবের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলেন। আমীরের উত্তর শুনে দামীল ইব্‌ন হাতিম কোন শক্ত প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকবেন। আমীর তাঁকে দরবার থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করার নির্দেশ প্রদান করলেন। দারোয়ান তাঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেয়ার সময় তাঁকে কয়েকটি চপেটাঘাতও করে। ফলে তার শিরস্ত্রাণ একদিকে কাত হয়ে ঝুলে পড়ে। এ অবস্থায় যখন

তিনি বেরিয়ে আসছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর শিরস্ত্রাণ সোজা করতে বলে। জবাবে তিনি বললেন, আমার গোত্র চাইলে এ শিরস্ত্রাণ তারাই সোজা করে দিতে পারে। দামীল ইব্‌ন হাতিম তাঁর ঘরে পৌছেই আপন গোত্রের সর্দার এবং অন্যান্য আরবকে ডেকে পাঠালেন এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। সকলেই দামীল ইব্‌ন হাতিমের সাহায্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

তারপর দামীল ইব্‌ন হাতিম কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সে সব এলাকার আমীরদের সাথে দেখা করে তাদের কাছে নিজের অবস্থার কথা শুনালেন। ততক্ষণে যেহেতু গোটা আরব গোত্রসমূহ আবুল খাত্তাবের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তাই সকলেই দামীলের সাহায্যের অঙ্গীকার করলেন। দামীলের কাছে যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আবুল খাত্তাবের প্রতি সাধারণভাবে স্পেনের আমীর-উমারা বিক্ষুব্ধ, তখন তিনি সদুনা শহরে অবস্থান করে আপন গোত্র ও বন্ধুদেরকে সেখানে আহ্বান করলেন। সকলেই যখন সেখানে এসে সমবেত হলেন, তখন তিনি তাদের সকলকে সাথে নিয়ে কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হলেন। স্পেনের সাবেক ইয়ামানী আমীর ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাও সদলবলে এসে দামীলের বাহিনীর সাথে যোগ দেন। আলেকতা নদীর তীরে স্পেনের আমীর সে বাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে আবুল খাত্তাবের বাহিনী পরাস্ত হলো এবং তিনি নিজে বন্দী হলেন। দামীল আবুল খাত্তাবকে কর্ডোভায় নিয়ে গিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বন্দী করেন। ছা'লাবা এবং দামীল উভয়েই গোটা স্পেন দখল করে নিলেন। এটা ১২৭ হিজরীর রজব (এপ্রিল ৭৪৫ খ্রি.) মাসের ঘটনা।

আবুল খাত্তাব দু'বছর রাজত্ব করার পর বন্দী হন। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই আবদুর রহমান ইব্‌ন হাসান কালবীর চেষ্টায় আবুল খাত্তাব হুসাম ইব্‌ন যিয়ার কালবী অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হন। তিনি কারামুক্ত হয়ে কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার স্বদেশীয় ইয়ামানী গোত্রসমূহকে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত করতে থাকেন। ফলে ইয়ামানী গোত্রসমূহের প্রচুর লোক স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর চুতর্দিকে এসে সমবেত হয়ে গেল। এদিকে দামীল এবং ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এটা ছিল ঐ যুগ, যখন দামেশকের খিলাফত আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা মারওয়ানুল হিমার আব্বাসী বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে তখন পলাতক ছিলেন। কারো তখন স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করার মত অবস্থা ছিল না। আফ্রিকা, মিসর প্রভৃতিও তখন খলীফা বংশের ধ্বংসলীলা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্পেনে ১২৭ থেকে ১২৯ হিজরী (১৩ই অক্টোবর ৭৪৪ খ্রি - ১০ সেপ্টেম্বর ৭৪৭ খ্রি.) সনের মধ্যে দ্বিতীয় বার প্রতিপক্ষের হাতে গ্রেফতার হয়ে আবুল খাত্তাব নিহত হন। ১২৮ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৪৫ খ্রি - ২১ সেপ্টেম্বর ৭৪৬ খ্রি) ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা স্পেন থেকে আফ্রিকায় গভর্নর আবদুর রহমান হাবীবের খিদমতে চলে যান। আবদুর রহমান যখন আবুল খাত্তাবের নিহত হওয়ার সংবাদ পেলেন তখন তিনি ছা'লাবা ইব্‌ন সালামাকে দ্বিতীয়বারের মত স্পেনের

আমীর মনোনীত করে পাঠালেন। ১২৯ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৭৪৬ - আগস্ট ৭৪৭ খ্রি.) ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা স্পেনে উপনীত হন এবং সে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা–দ্বিতীয় বার

১২৯ হিজরীর রজব (মার্চ ৭৪৭ খ্রি) মাসে ছা'লাবা ইব্‌ন সালামা স্পেনের শাসন ক্ষমতা নিজ হস্তে তুলে নেন এবং দামীল ইব্‌ন হাতিম যেহেতু তাঁরই বন্ধু এবং হাতের লোক ছিলেন তাই শাসনকার্যে তাঁর সবচাইতে বেশি দখল ছিল এবং তিনি তাঁর সবচাইতে বড় উপদেষ্টা রূপে থাকেন। ছা'লাবাও যেহেতু ইয়ামানী ছিলেন এজন্যে দামীল ইব্‌ন হাতিম অনেক চেষ্টা করে ইয়ামানী ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এর কিছুদিন পরেই ছা'লাবা ইবন সালামার মৃত্যু হয়। স্পেনবাসীরা যেহেতু পূর্ব থেকেই নিজেদের আমীর নির্বাচনে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমনটা উপরের বর্ণিত কয়েকজন আমীরের ব্যাপারেই হয়েছে, আর তখন কেন্দ্র দামেশকে অরাজকতা চলছিল, তাই নিজেদের আমীররূপে একজনকে বেছে নিতে তাদের কোন দ্বিধা ছিল না। তারা ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহ্‌রীকে, যার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, নিজেদের আমীররূপে নির্বাচন করে। ইউসুফের পুরনো পরিচিতি ও অবদান এ জন্যে সহায়ক হয়েছিল এবং এ সব কারণেই তাকে আমীররূপে নির্বাচন করতে কারো মনে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না।

ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহ্‌রী

যেহেতু স্পেনের এখন আর কেন্দ্রের সাথে তেমন যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না আর এখানে সকল সম্প্রদায় ও মুসলমান গোত্রের আবাদ ছিল, এজন্যে অল্পদিনের মধ্যেই স্পেনে সংঘাত ও অসন্তোষ দেখা দিল। ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান সেই দামীল ইব্‌ন হাতিমকেই টলেডো প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করলেন, যিনি ছিলেন সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং ইউসুফের আমীর নির্বাচিত হওয়ায় অনেকটা মনঃক্ষুণ্ন। এদিকে ঈসায়ীরা আরবুনিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইব্‌ন আলকমাকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিল। কিন্তু আবদুর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বেই নিহত হলেন। তারপর অপর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইবনুল ওয়ালীদকে ঈসায়ীরা বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দেয় এবং অনেক ঈসায়ী সৈন্য তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। ইবনুল ওয়ালীর আশবেলিয়া (সেভিল) শহর জয় করে কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করেন। আমীর ইউসুফ যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করেন এবং গ্রেফতার করে হত্যা করেন। তারপর উমর ইব্‌ন আমর নামক জনৈক সর্দার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ মনোরথ হন।

স্পেনকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্তিকরণ

এ সব বিদ্রোহ দমন করার পর ইউসুফ দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। খাস স্পেন মুলুককে তিনি চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং পঞ্চম

প্রদেশরূপে ঐ অংশকে ঘোষণা করেন, যা ফ্রান্স ভূমিতে মুসলিম অধিকারে ছিল। প্রদেশসমূহের নাম হলো ঃ

ক্রমিক নম্বর	প্রদেশের নাম	প্রসিদ্ধ শহরসমূহ
১.	আন্দালুসিয়া	কর্ডোভা, কারমুনা, আশবেলিয়া, শাদুনা, মালকুন, আলবীরা, জিয়ান
২.	টলেডো	উবায়দা, বীসা, মারসিয়া, ভিনিয়া, বালনেসিয়া
৩.	মারীদা (জালীকিয়া)	মারীদা, বিশুনা, বীজেস্তা, সালামনিকা
৪.	সারাকাস্তা	সারাকাস্তা, তারকুনা, বারসেলোনা, লারীদা
৫.	আরবুনিয়া (দক্ষিণ ফ্রান্স)	নার্বুন, তালুন, ইব্‌ন বালুনা, লিউগো, টুটী

স্পেনে কেন্দ্রের পরিবর্তনের প্রভাব

আমীর ইউসুফ আবদুর রহমান ফিহ্‌রী যদিও নিজে কোন পক্ষে শামিল ছিলেন না, তবুও স্পেনে যখন উমাইয়া খিলাফতের পতন এবং আব্বাসীয়দের খিলাফত প্রতিষ্ঠার সংবাদ গিয়ে পৌঁছাল, তখন স্থানে স্থানে সিরীয়দের এবং তাদের আমীরদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কেননা, সিরীয় আমীররা উমাইয়া পক্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দামীল ইব্‌ন হাতিমকে উমাইয়াদের শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে চারদিক থেকে ঘেরাও করা হলো। শেষ পর্যন্ত কায়েস গোত্রের লোকজন তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো। দামীল ইব্‌ন হাতিম যখন আমীর ইউসুফ আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন তখন তিনি তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইব্‌ন হাতিম কোনমতে নিজেকে শত্রুদের কবলমুক্ত করলেন। এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেশের সর্বত্র হতে থাকে। স্পেনে উমাইয়াদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন আবূ উসমান উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ। এঁরা পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন অর্থাৎ আবূ উসমান ছিলেন শ্বশুর এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ তাঁর জামাতা। এঁরা দু'জন আন্দালুসিয়া প্রদেশের আলবীর শহরের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ শহরে সিরীয়দের সংখ্যা বেশি ছিল। এছাড়াও ইউসুফ ইব্‌ন বখত এবং হুসাইন ইব্‌ন মালিক কালবীও মশহুর সর্দার ছিলেন। দামীল ইব্‌ন হাতিমকে যখন আমীর ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান সাহায্য করলেন না, তখন আবূ উসমান ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলেন। এ দু'জনের পৌঁছার পূর্বেই আবদুর রহমান আদ-দাখিলের (যাঁর বর্ণনা পরে আসছে) ক্রীতদাস বদর তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি দামীল হাতিমকে আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে স্পেনে ডেকে পাঠানোর পক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হন। দামীল ইব্‌ন হাতিম বাহ্যত ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের সাথে কোনরূপ বিরোধ সৃষ্টিকে অসমীচীন হবে ভেবে ইউসুফের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁর প্রতি বন্ধুত্বভাব প্রদর্শনে কোনরূপ ত্রুটি করলেন না। দামীলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আবূ উসমান ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ উভয়ে আলবীরায় ফিরে আসেন

এবং ধীরে ধীরে নিজেদের বন্ধুমহলে গোপনে গোপনে সে ইচ্ছার কথা প্রচার করে তাঁদেরকে দলে ভিড়াতে থাকেন। পরবর্তীতে তাঁরা জানতে পারেন যে, দামীল ইব্‌ন হাতিম তাঁর অঙ্গীকার ও সংকল্পে অটল নন, বরং ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের শাসন বহাল রাখারই তিনি পক্ষপাতী। এর ফলে কায়েস ও ফিহর গোত্রের নিকট থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা লাভের আশা তিরোহিত হয়ে গেল। কিন্তু আবূ উসমান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে উক্ত দু'টি গোত্রের বিরুদ্ধে ইয়ামানী গোত্রগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। ফলে ইয়ামানী সর্দাররা স্থানে স্থানে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। আমীর ইউসুফ আবদুর রহমান এবং দামীল ইব্‌ন হাতিম তাঁদের দমনে আত্মনিয়োগ করলেন।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল ঃ স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা

আবূ উসমান যখন লক্ষ্য করলেন যে, ইয়ামানী গোত্রসমূহ স্থানে স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েছে তখন তিনি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের ক্রীতদাস বদরকে এগারজন সঙ্গীসহ জাহাজে তুলে দিয়ে অবিলম্বে আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে নিয়ে আসার জন্যে আফ্রিকা অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন স্থায়িভাবে আফ্রিকায় অবস্থান করছিলেন। সেমতে আবদুর রহমান আদ-দাখিল ১৩৮ হিজরীতে রবিউস সানী (সেপ্টেম্বর ৭৫৫ খ্রি.) মাসে স্পেনে গিয়ে উপনীত হন। তিনি আলবীরা এলাকায় দাকাত বন্দরে জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। আবূ উসমান ও উমাইয়া বংশের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবূ উসমান আবদুর রহমান আদ-দাখিলকে নিজের আলবীরাস্থ বাসভবনে নিয়ে উঠান এবং লোকজনকে ডেকে এনে মোটামুটি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান তখন সারাকাস্তা প্রদেশে বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত ও ব্যস্ত ছিলেন। আবদুর রহমান আদ-দাখিলের স্পেনে উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তিনি বিদ্রোহ দমন সমাপ্ত করে দ্রুত টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। এখানে এসে তিনি দামীল ইব্‌ন হাতিমের সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি একটি ভুল করেন, তাহলো ইতিপূর্বে যে সমস্ত বন্দীকে প্রাণে রক্ষার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করলেন। ফলে তাঁর নিজের বাহিনীর অনেক সেনাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং তারা ইউসুফের দলত্যাগ করে আলবীরায় আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এ খবরটি প্রচারিত হওয়া মাত্র স্থানে স্থানে আরব সর্দারগণ বিশেষত ইয়ামানী গোত্রসমূহ, যাঁরা ইউসুফের বিরুদ্ধে ছিল, আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে লাগলো। তখন ইউসুফ ও ইব্‌ন হাতিম কেবল ফিহ্‌রী এবং কায়স গোত্রের লোকজনের সমর্থন নির্ভর হয়ে ছিলেন। সিরীয়দের সমর্থন আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পক্ষে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ইয়ামানীরা যারা সাধারণত সিরীয়দের বিপক্ষেই থাকতো, তারাও ইউসুফের বিরোধিতার জন্যে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের পক্ষে যোগদান করে। কেননা, তারা জানতো যে, আবদুর রহমান আদ-দাখিল ইউসুফের নিকট থেকে স্পেনের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে এসেছেন। এভাবে কেবল ফাহরী এবং কায়স গোত্র ছাড়া অপর সকল আরব গোত্রই আবদুর

রহমান আদ-দাখিলের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। ঐ দু'টি গোত্রও কেবল ইউসুফ ও ইব্‌ন হাতিমের ব্যক্তিত্বের দরুন তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। নতুবা তারাও মনে মনে উমাইয়া বংশীয় শাহযাদাকে পছন্দ করতেন। আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জনপ্রিয়তার একটি কারণ এও ছিল যে, তাঁর স্পেনে আগমনের পূর্বেই তাঁর উন্নত চরিত্রের খ্যাতি সে দেশে পৌঁছেছিল। আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতানের শাসনামলে কয়েক ব্যক্তি দামেশক থেকে এসে সেখানকার যে অবস্থা বিবৃত করেন তাতে তাঁরা বলেন যে, আবদুর রহমান হচ্ছেন বনূ উমাইয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ চরিত্রবান যুবক। তাঁরা আরো বলেন যে, তিনি হিজাযী ও ইমামানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর সে খ্যাতি তখন খুবই কাজে লাগে। বনূ উমাইয়া ছাড়া তাদের বিরোধী অন্যরাও এজন্যে আবদুর রহমানকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন।

অবশেষে ইব্‌ন হাতিম ও ইউসুফ দু'জনেই টলেডো থেকে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওদিক থেকে আবদুর রহমান আদ-দাখিল তাঁর দলবলসহ কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওয়াদিউল কবীর নদীর তীরে কর্ডোভার উপকণ্ঠের প্রান্তরে ঈদুল আযহার দিন অর্থাৎ ১৩৮ হিজরীর দশই যিলহজ্জ মুতাবিক ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে আবদুর রহমান আদ-দাখিল জয়ী হন এবং আমীর ইউসুফ ইবন আবদুর রহমানের পুত্র আবদুর রহমান ও অন্যান্য সর্দার গ্রেফতার হন, কিন্তু ইব্‌ন হাতিম ও ইউসুফ উভয়েই প্রাণ বাঁচিয়ে চলে যতে সক্ষম হন। ইব্‌ন হাতিম সাবীদায় এবং ইউসুফ জিয়ানে গিয়ে আশ্রয় নেন। আবদুর রহমান আদ-দাখিল সেই প্রান্তর থেকে সোজা গিয়ে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি আনুগত্যের অঙ্গীকার করবে, তাকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া হবে না। লোকজন খুশি মনে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে। ইবন হাতিম ও ইউসুফ আবার সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, কিন্তু অবশেষে আনুগত্য অবলম্বনে সম্মত হন। আবদুর রহমান আদ-দাখিল এ শর্তে তাঁদেরকে অভয় দেন যে, তাঁরা কর্ডোভায়ই অবস্থান করবেন এবং প্রতিদিন একবার সশরীরে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দেখা দেবেন। তারপরই স্পেনে আবদুর রহমান আদ-দাখিল এবং তাঁর বংশধরদের রাজত্বের সূচনা হয় এবং আমীরদের শাসন যুগের অবসান ঘটে।

এক নজরে স্পেনে ইসলামী শাসনের প্রথম পর্যায়

স্পেন দেশ খিলাফতের কেন্দ্র অর্থাৎ দামেশক থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। স্পেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার জন্যে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন বর্বর প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে পদানত করতে হয়। দরবারে খিলাফতের কোন ফরমান স্পেনে পৌঁছাতে মাসের পর মাস লেগে যেতো। সুদূর আরব দেশ থেকে খলীফার দরবার পর্যন্ত কোন আর্জি পৌঁছাতেও মাসের পর মাস কাটাতে হতো। যে যুগে মুসলমানরা স্পেন জয় করেন তখন বিখ্যাত

মুসলিম সেনাপতি ও রাজনীতি-বিশারদদের অনেক মনোযোগ ও শক্তিই আত্মকলহে ব্যয়িত হচ্ছিল। ইরাক, সিরিয়া ও ইরান প্রদেশ খিলাফতের কেন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এজন্যে স্পেনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের সুযোগ কখনো হয়ে ওঠেনি। স্পেন সাধারণত আফ্রিকার গভর্নরের অধীনেই থাকতো। কিন্তু যেহেতু স্পেনের উর্বরতা, শস্য-শ্যামল ভূমি এবং সমৃদ্ধির খ্যাতি মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই স্পেন বিজয়ের পর হিজায, সিরিয়া ও ইরাকে যাঁদেরকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হতো না তাঁরাই স্পেনে গিয়ে হাযির হতেন। এ নবাগত আরবদেরকে স্পেনে একটি বিজেতা জাতির সদস্য হিসেবে বেশ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং এজন্যে সেখানে তাঁরা অনায়াসেই উচ্চ পদে আসীন হতে পারতেন। এজন্যেই যাঁরা একবার সেখানে যেতেন, তাঁরা চিরদিনের জন্যে সেখানকার একজন হয়েই থাকতেন। আফ্রিকার বার্বার গোত্রের লোকজন শুরু থেকেই প্রচুর সংখ্যায় সেদেশে গিয়ে হাযির হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাদের সেখানে যাওয়া অব্যাহত গতিতে চলছিল। ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই স্পেন একটি মুসলিম উপনিবেশে পরিণত হয়। ঈসায়ীরাই ছিল এদেশের আসল অধিবাসী, যারা মুসলমানদের আনুগত্য গ্রহণ করেছিল। বিপুল সংখ্যক ইহুদীও সে দেশে বাস করতো। এভাবে স্পেনের বাসিন্দাদের মধ্যে নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কুড়িজনের মত শাসক ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। শাসকদের তত দ্রুত পরিবর্তনের ফলে স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা ও জিদের ভাব কায়েম থাকে এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনারও উন্মেষ ঘটে। ঈসায়ী অধিবাসীদেরকে কখনও কোনরূপ নির্যাতন করা হয়নি। আনুগত্যের স্বীকৃতিই তাদের জন্যে সর্বপ্রকার আপদ থেকে রক্ষার জন্য ছিল যথেষ্ট। অর্থনৈতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্যে অবারিত ছিল।

প্রথম প্রথম মুসলমানদের মধ্যে বিজয়ীসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্যন্ত জোরদার ছিল। তারা ফ্রান্সের মধ্যভাগ পর্যন্ত জয় করতে করতে এগিয়ে যায়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই আত্মকলহ দেখা দেয়। এই আত্মকলহ মুসলমানদের বিজয়ের গতিকে রোধ করে দেয়। ফ্রান্সের সেই ঈসায়ীদেরকে তা আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দেয় যারা সর্বদা মুসলমানদের হামলার ভয়ে তটস্থ থাকতো। এই পঞ্চাশ বছরকালের মধ্যে নানা গোত্রের, নানা যোগ্যতার এবং নানা মন-মানসিকতার লোক স্পেনের আমীর হয়ে আসেন। এতদসত্ত্বেও স্পেনের জনসংখ্যা, উৎপাদন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সর্বোপরি মুসলমানদের অস্তিত্ব এবং তাদের উন্নত নাগরিক জীবনের নমুনাই স্পেনবাসীদের জন্যে ছিল এক বিরাট পাওয়া। তদুপরি স্পেনের প্রজাসাধারণের আরও সুবিধা হয় এই যে, বিজেতারা বিজিত-সম্প্রদায়ের রমণীদেরকে বিবাহ করে নিজেদের অন্তঃপুরে উদারভাবে ঠাঁই দেয়ার ফলে বিজিতদের প্রতি বিজয়ীদের স্বভাবসুলভ উপেক্ষার মনোভাব স্বভাবতঃই তিরোহিত হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের অন্তরে ঈসায়ী প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উদ্রেক হয়। তাঁরা তাঁদের ঈসায়ী প্রজাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা ও উন্নত

চরিত্রের উৎসাহ দিতে থাকেন। এমন কি অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, ফ্রান্সের শাসকও যখন নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হতেন তখন তাদের কেউ কেউ প্রতিবেশী মুসলমান শাসকদের কাছে সামরিক সাহায্য চাইতেন এবং তাঁরা তা পেতেনও।

যখন প্রথম প্রথম মুসলমানরা স্পেনে প্রবেশ করলেন এবং ঈসায়ীদের গথ রাজত্বের অবসান ঘটলো, তখন অনেক পাদ্রী এবং পাদ্রীদের মত উগ্র খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সাথে মুকাবিলাকারী ফৌজী সিপাহসালার পালিয়ে উত্তর দিকে চলে যায়। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলই ছিল উষ্ণ, উর্বর এবং সমৃদ্ধিশালী। মুসলমান বিজেতারা দক্ষিণ দিক থেকেই সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন। তাই তাঁরা বিপুল সংখ্যায় এই দক্ষিণাঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেন। দেশের উত্তরাঞ্চল ছিল পর্বতঘেরা এবং অধিকতর শীতল। আরবদের এ উত্তরাঞ্চলের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। এজন্যে খুব কম সংখ্যক মুসলমানই উত্তরাঞ্চলে বসবাস গড়ে তুলেন। এমনিতেই পার্বত্য এলাকা তেমন মূল্যবান বা উর্বর ছিল না। মুসলমানরা সে অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাজত্ব তো গড়ে তোলেন, কিন্তু তারা সে এলাকাকে তেমন ভালবাসেন নি বা তেমন মূল্যবান বলে ভাবতে পারেননি। পরাস্ত ও পলাতক খ্রিস্টান সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁরা পিরেনীজ পর্বতের উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। যখন গথ সর্দাররা এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত উক্ত খ্রিস্টানরা তাদেরকে পিরেনীজ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত সমভূমিতে অর্থাৎ দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমিতে যুদ্ধের আমন্ত্রণ জানালো, তখন এক নতুন দেশে নতুন যুদ্ধ সিরিজের সূচনা হলো। ফলশ্রুতিতে আরবুনিয়া প্রদেশে, নার্বুন শহরে এবং তার উত্তরে সমভূমিতেও মুসলমানদের রাজত্ব গড়ে উঠলো। কিন্তু তারপর মুসলমানদের আত্মকলহ বিজয়ের এ গতিকে আর অগ্রসর হতে দিল না।

স্পেনের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্ত শাসিত ঈয়াসী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

পলিও

সব কিছুই হলো, কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণ পরিচালনা ও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় একটি সামান্য ভুলের জন্যে পরিণামে মুসলমানদের বিরাট সর্বনাশও সাধিত হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আমীর আম্বাসা পলিও নামক জনৈক ঈসায়ী লুটেরাকে তুচ্ছ ভেবে জাবাল আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতে থাকতে দিয়েছিলেন। পলিও যখন পিরেনীজ পর্বতে তার ঘাঁটি গড়ে তুললো, তখন যে সব ঈসায়ী মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং যে সব পাদ্রী স্পেনের গির্জাসমূহ থেকে মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাঁরা এসে পলিওর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হতে লাগলো। এভাবে পলিওর দলবল দিনে দিনে ভারী হয়ে ওঠে। সে তখন এক দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। আশ্চর্যের বিষয়, পলিও যে কয়েক বর্গমাইল আয়তনের রাজ্য গড়ে তোলে তার চতুষ্পার্শ্বেই ইসলামী রাজ্য বিরাজ করছিল আর সে ছিল চতুর্দিক থেকেই মুসলিম রাজ্য পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে ও পূর্বে মুসলিম রাজ্য বর্তমান ছিল। পশ্চিম দিকেও ইসলামী রাজ্য ছিল। চারপাশ

থেকে ইসলামী রাজ্য পরিবেষ্টিত বিদ্রোহীদের এ রাজ্যটির উচ্ছেদ সাধন তেমন কোন কঠিন বা দুঃসাধ্য কাজও ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম শাসক এবং সিপাহসালারই পর্বতশীর্ষে সৈন্যদলসহ গিয়ে আক্রমণ চালনাকে নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করেছেন। তাঁরা তাকে এজন্যে ছেড়ে রাখেন যে, সে মুসলিম রাজ্যের কোন ক্ষতি কস্মিনকালেও করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষেও পলিও কোনদিন পর্বতশীর্ষ থেকে নামবার বা মুসলিম শাসিত সমতলে নামবার সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। কোন ঈসায়ীই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ দুঃসাহস দেখাতে ভরসা পেত না। কিন্তু ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিয়ে যে সব পাদ্রী পলিওর নিকট এসে সমবেত হয়েছিল তারা তাকে একজন ধর্মীয় বীর এবং ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্নসমূহের রক্ষকরূপে চিত্রিত করলো। বার-তের বছর পর্যন্ত সে ঐ পর্বত শীর্ষে সেই ছোট্ট এলাকায়ই অবস্থান করে এবং চতুর্দিকের ঈসায়ীরা তাকে রসদ পৌঁছাতে থাকে। যতই সময় যেতে থাকে ততই খ্রিস্টান মহলে পলিওর প্রতি অনুরাগ এবং তার খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক ঈসায়ী দূর-দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করে পলিওর নিকট এসে পৌঁছতো এবং ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্ন দর্শনকে অতীব পুণ্যকাজ ও জরুরী বিবেচনা করতো। মুসলমানরা সব সময় মনে করতো, স্বল্পসংখ্যক ঈসায়ী প্রাণভয়ে অস্থির হয়ে পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছে, তারা আমাদের চেহারা দর্শনেও ভয় পায়। প্রাণভয়ে তারা আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে সাহসী হয় না। তাদেরকে পড়ে থাকতে দাও। মুসলমানদের এ অমনোযোগিতা খ্রিস্টানদেরকে ক্রমে ক্রমে সাহসী করে তোলে এবং তারা তাদের এ পার্বত্য আশ্রয়স্থলকেই নিজেদের রাজ্য বলে ভাবতে শুরু করে দেয়। তারা পলিওকে তাদের রাজা এবং ধর্মের রক্ষক বিবেচনা করে।

আলফোন্‌সূ

পলিওর মৃত্যুর পর ঈসায়ীরা তার পুত্রকে নিজেদের রাজারূপে গ্রহণ করে। দুই-তিন বছর পর সেও মৃত্যুমুখে পতিত হলে তারা তার জামাতা আল-ফোন্‌সুকে নিজেদের হর্তাকর্তা ও রাজারূপে গ্রহণ করে। এদিকে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ ও পারস্পরিক রক্তারক্তি তাদেরকে উত্তরের প্রদেশসমূহ এবং পিরেনীজ পর্বতের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের দিকে মনোনিবেশ করার সময় দেয়নি। এই অবকাশে আল-ফোন্‌সু জালীকিয়া, আরাগুয়াল ও আরবুনিয়া এলাকাসমূহ থেকে ঈসায়ীদেরকে পার্বত্য রাজ্যে আগমনের এবং সেখানে বসতি স্থাপনের জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। ঈসায়ীরা যখন তার আমন্ত্রণে সমভূমিতে অবস্থিত তাদের শস্য-শ্যামল প্রান্তরসমূহ পরিত্যাগ করে পর্বতশীর্ষের বৈরাগ্য জীবন গ্রহণে সম্মত হলো না, তখন সে আশেপাশের এলাকাসমূহে লুটপাট শুরু করে দেয়। সে তার আক্রমণকালে কেবল লুটপাট করেই ক্ষান্ত হতো না, বরং ঈসায়ী বসতিসমূহতে আক্রমণ চালিয়ে ঈসায়ী প্রজাদেরকে ধরে নিয়ে যেত এবং আপন পার্বত্য রাজ্যে বসবাসে তাদেরকে বাধ্য করতো। অন্তরীণাবদ্ধ লোকের মত সে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও রাখতো এবং তারা কোনক্রমেই উক্ত পার্বত্য এলাকা ছেড়ে বেরিয়েও আসতে পারতো না।

স্বাধীন ঈসায়ী রাজ্যের রাজধানী শহর

এভাবে জোরজবরদস্তিমূলক ভাবে পর্বতশীর্ষে একটি জনপদ বসানো হলো। যা ঈস্টার ইয়াস নামে খ্যাতিলাভ করে। এটাই হলো আল-ফোন্‌সুর রাজধানী। এখানে পাদ্রীদের দিবারাত্রির ওয়ায-নসীহত গ্রেফতারকৃত ঈসায়ীদের পাহাড়ে অবস্থান করতে সম্মত করে তুলে। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা এতই বেড়ে যায় যে, পাহাড়ের এ ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থলটি তাদের জন্যে আর যথেষ্ট ছিল না। এবার আল-ফোন্‌সু জাবাল আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতের উত্তর দিকের মুসলমান অধিকৃত এলাকায় লুটপাট শুরু করে দেয়। কিন্তু সমভূমিতে তারা মুসলমানদের সাথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারতো না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা ক্রমে ক্রমে জাবাল আল-বুরতাতের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য এলাকা দখল করে নেয়। এভাবে তারা একটি ক্ষুদ্র ঈসায়ী রাজ্য গড়ে তুলে ঈসায়ীদের আশা-ভরসার স্থলে পরিণত হয়। মুসলমানরা যদিও আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন তবুও তাদের কোন সর্দার ইচ্ছে করলে পিরেনীজ পর্বতের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনায়াসেই কাঁটা তোলার মত তাদেরকে তুলে এলাকাটাকে নিষ্কণ্টক করে ফেলতে পারতেন। এরকম অবস্থায়ও মুসলমানরা ইচ্ছে করলে আলবুনিয়া প্রদেশের সীমা ছাড়িয়ে ফ্রান্স দেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতে পারতেন। মধ্যখানের এ ধর্মোন্মাদ ঈসায়ীদের দলকে তারা একটুও ভ্রূক্ষেপযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন না। এদেরকে ঈসায়ী পাদ্রীরা মুসলিম বিদ্বেষের নেশায় বুঁদ করে রাখবার জন্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এভাবে স্পেনে আমীরদের শাসনের আমলে সে দেশের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় একটি স্বাধীন ঈসায়ী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যার রাজধানী ছিল ঈস্টার ইয়াস। এ ঈসায়ী রাষ্ট্রটির না ফ্রান্সের ঈসায়ী রাষ্ট্রের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল, না ইতালীর পোপের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল। কিন্তু তার ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল সর্বাধিক এবং এর শাসনতন্ত্র ও আইন-কানুন পাদ্রীদের দ্বারাই রচিত ছিল। ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫-৫৬ খ্রি.) আবদুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনে প্রবেশ করে সে দেশের আমীর যুগের অবসান ঘটান। ঐ বছরই ঈস্টার ইয়াসের শাসনকর্তা প্রথম আল-ফোন্‌সুর মৃত্যু হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্পেনের খিলাফত শাসন

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া উমুবী

স্বভাব-চরিত্র

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ১১৩ হিজরীতে (৭৩১ খ্রি.) ভূমিষ্ঠ হন। আবদুর রহমানের পিতা মুআবিয়া পূর্ণ যৌবনে মাত্র ২১ বছর বয়সে ১১৮ হিজরীতে (৭৩৬ খ্রি.) ইন্তিকার করেন। যখন আবদুর রহমানের বয়স মাত্র পাঁচ বছর, এ সময় আবদুর রহমানের পিতামহ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খলীফা হিশাম আপন পৌত্রের সুশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। হিশামের ইচ্ছা ছিল পৌত্র আবদুর রহমানকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। এজন্যে আবদুর রহমান যাতে সবদিক দিয়ে উপযুক্ত হয়ে ওঠে এটা ছিল তাঁর একান্তই আকাঙ্ক্ষিত। আবদুর রহমানের বয়স যখন মাত্র বার বছর তখন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুর রহমানের মধ্যে শৈশব থেকেই নেতা-সুলভ লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। তিনি কু-অভ্যাস ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাছাড়া প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষা এবং শাসন-নীতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। জ্ঞানী-গুণী এবং কুশলী আমীর উমারার সাহচর্য থেকেও তিনি উপকৃত হন। যৌবনকালে তিনি যুদ্ধবিদ্যা এবং রণকুশলতা থেকেও অজ্ঞ থাকেননি। অসৎ লোকদের সাহচর্যকে তিনি সর্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন এবং সু-স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। অমাত্যবর্গ এবং দামেশকের জ্ঞানী-গুণীগণ তাঁর মর্যাদার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন এবং তাঁকে খলীফার পরিবারের একজন উত্তম ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করতেন।

দেশত্যাগ

১৩২ হিজরীতে (৭৪৯-৫০ খ্রি.) যখন উমাইয়া খিলাফতের অবসান এবং আব্বাসী খিলাফতের সূচনা হয় তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়ার বয়স ছিল পাঁচ কুড়ি বছর। ফুরাত নদীর কোল ঘেঁষে আবদুর রহমানের একটি জায়গীর ছিল। আব্বাসী সৈন্যরা দামেশ্‌কে প্রবেশ করে যখন তা অধিকার করে এবং উমাইয়াদের হত্যা শুরু হয়, তখন আবদুর রহমান দামেশকে ছিলেন না বরং তিনি তখন জায়গীরের গ্রামসমূহে অবস্থান করছিলেন। আবদুর রহমান যখন জানতে পারেন যে, বনূ উমাইয়া এবং তাদের সমর্থকদের

বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে, তখন তিনি অতি সঙ্গোপনে গ্রামের বাইরের কুঞ্জবনে তাঁবুতে বসবাস করতে লাগলেন, যাতে গ্রামে শত্রুরা হানা দিলে সংকট সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে তিনি প্রাণরক্ষার চিন্তা করতে পারেন।

একদিন তিনি যখন তাঁর তাঁবুতে উপবিষ্ট এমন সময় তাঁর তিন-চার বছরের একটি শিশু সন্তান তাঁবুর বাইরে খেলছিল। হঠাৎ শিশুটি ভয়ে জড়সড় হয়ে তাঁবুতে এসে প্রবেশ করলো। ব্যাপার কি দেখার জন্যে বের হলে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আব্বাসীদের কৃষ্ণবর্ণ পতাকা বাতাসে পত পত করে উড়ছে আর ক্রমেই তা তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমগ্র গ্রামে লোকের কলরব। আব্বাসী সৈন্যরা উমাইয়াদেরকে হত্যা করার জন্যে এসে পৌঁছে গেছে দেখে তিনি তাঁর শিশু সন্তানটিকে কোলে করে নদী তীরের দিকে দৌড় দিলেন। নদী তীরে তাঁর পৌঁছার পূর্বেই শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। তাঁরা চিৎকার করে বলল, পালিয়ো না, পালিয়ো না, আমরা তোমাদের কোনই অনিষ্ট-সাধন করবো না বরং সর্বপ্রকারে তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আবদুর রহমানের পিছে পিছে তাঁর ভাইও ছিলেন। আবদুর রহমান শত্রু সৈন্যদের এরূপ চিৎকারের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। তিনি নদী তীর পর্যন্ত পৌঁছেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। আবদুর রহমানের ভাই শত্রুর কথায় ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কি যেন ভেবে তিনি পেছনের দিকে তাকালেন। শত্রুরা দ্রুত তাঁর নিকটে পৌঁছে তরবারি দ্বারা তাঁর শিরশ্ছেদ করে। আবদুর রহমান সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে আপন শিশুপুত্রকে বক্ষে ধরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে নদীর অপর তীরে গিয়ে ওঠেন। শত্রু সৈন্যরা নদী অবতরণের সাহস করলো না। তারা নদীর এপারে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল।

আবদুর রহমান আফ্রিকায়

আবদুর রহমান প্রাণ বাঁচিয়ে আত্মগোপন করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কখনও গ্রামে মুসাফিরের ছদ্মবেশে থাকতেন, আবার কখনো বনে-জঙ্গলে রাত্রিযাপন করতেন। মোটকথা, ছদ্মবেশে তিনি পুত্রকে নিয়ে বড় বড় মঞ্জিল অতিক্রম করে ফিলিস্তীন এলাকায় গিয়ে উপনীত হন। ঘটনাচক্রে সেখানে তাঁর পিতার বদর নামক একজন ক্রীতদাসের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সেও তখন অনুরূপভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে মিসরের দিকে ছুটে চলেছিল। বদরের কাছে আবদুর রহমানের বোনের কিছু অলঙ্কার এবং নগদ অর্থ গচ্ছিত ছিল। সে তা আবদুর রহমানের হাতে প্রত্যর্পণ করলো। এভাবে আবদুর রহমানের প্রবল অর্থসংকট দূরীভূত হলো। এবার তিনি বেশ পরিবর্তন করে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর বেশে বদরের সহযাত্রী রূপে সফর শুরু করলেন। মিসরে উপনীত হয়ে তিনি বনূ উমাইয়ার সমর্থকদের সাথে সাক্ষাত করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে তিনি আফ্রিকিয়া (তিউনিসিয়া) অভিমুখে যাত্রা করেন।

আবদুর রহমানের আফ্রিকায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং পলায়ন

আফ্রিকিয়ার গভর্নর আবদুর রহমানের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই তিনি আঁচ করতে পারেন যে, আবদুর রহমান সেখানে তাঁর রাজত্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। এদিকে তিনি আব্বাসীয়দের

খিলাফত সুসংহত হওয়ার সংবাদও পান। তিনি আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করে অব্বাসী খলীফা সাফ্ফাহ্‌র কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান সময়মত টের পেয়ে যান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আত্মগোপন করে ক্রীতদাস বদর ও শিশু সন্তানটিকে নিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। আফ্রিকার গভর্নর আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করার জন্য একটি বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। স্থানে স্থানে আবদুর রহমানকে খোঁজা শুরু হলো। এবার প্রাণ রক্ষার্থে আবদুর রহমানকে অনেক কষ্টবরণ করতে হয়। তিনি উপর্যুপরি কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাস থাকতেন। মরুভূমির ধু-ধু বালু প্রান্তরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হতো।

একদা আবদুর রহমান জনৈকা বার্বার রমণীর কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রেফতারকারী অনুসন্ধানী দল সেখানে গিয়ে পৌঁছলে উক্ত বৃদ্ধা আবদুর রহমানকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রেখে তাঁর শরীরের উপর অনেক কাপড়-চোপড় চাপিয়ে দেয়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরাতন কাপড়-চোপড়ের একটি স্তূপ পড়ে রয়েছে। অনুসন্ধানকারীরা তা দেখে ঘরময় তাঁকে খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। এমন কি অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, খাবার এবং পরিধেয় সংগ্রহও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে। এরূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আবদুর রহমান ৪-৫ বছর অতিবাহিত করে অবশেষে তিনি বার্বার সম্প্রদায়ের যানানা গোত্রের একটি শাখা গোত্র বনূ নাফূসায় গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা যখন জানতে পারলো যে, আবদুর রহমানের মা তাদেরই বংশের মহিলা ছিলেন, তখন তারা তাদের আপনজনের মত আতিথ্য প্রদান করলো এবং সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিল। আবদুর রহমান বনূ নাফূস গোত্রের লোকজনের আধিক্য সম্বলিত সাব্‌ত নামক স্থানে অবস্থান করেন। এ চার-পাঁচ বছরে আফ্রিকায় অবস্থানের অভিজ্ঞতায় আবদুর রহমান সম্যক আঁচ করতে পারেন যে, আফ্রিকার গভর্নরের হাত থেকে এ দেশটি জয় করে নেয়া বা এখানে কোন নতুন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা সুকঠিন। সাবতায় আসার পর তিনি স্পেন সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হওয়ার সুযোগ পান। কেননা, এ স্থানটি ছিল স্পেনের খুবই নিকটবর্তী। এ ছাড়া স্পেনের সাথে এলাকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। আবদুর রহমান যখন জানতে পারলেন যে, স্পেনে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ চলছে এবং সেখানকার শাসনকর্তা ইউসুফ বিদ্রোহীদেরকে দমনে ব্যস্ত এবং অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে রয়েছেন, তখন তাঁর সংকল্প ও সাহস বেড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্রীতদাস বদরকে স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন। তিনি তার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনামলে যারা সর্দারী ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বনূ উমাইয়ার প্রতি যাঁরা সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তাঁদের নামে পত্র পাঠালেন।

আবদুর রহমান স্পেনে

বদর স্পেনে উপনীত হয়ে আবূ উসমান ও আবদুল্লাহ্ উব্‌ন খালিদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে তাঁদেরকে স্ব-মতে আনয়ন করেন। আবূ উসমান সিরীয় ও আরব সর্দারদের একত্র করে তাঁদের সম্মুখে এ নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁরা একবাক্যে শাহযাদা আবদুর রহমানকে স্পেনে আমন্ত্রণ জানানোর এবং তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতাদানের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁরা নিজেদের এগারজন

লোককে জাহাজযোগে সাবতায় আবদুর রহমানের নিকট প্রেরণ করেন এবং বাহকদের বলে দেন যে, তোমরা গিয়ে শাহ্যাদা আবদুর রহমানকে আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব এখানে নিয়ে এসো। এটা ছিল একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনা যে, যারা বনূ উমাইয়ার সমর্থক ও সহযোগী হবেন সেই সব সর্দারের প্রায় সকলেই স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে বসবাস করতেন। এজন্যে আবদুর রহমানের স্পেনে অবতরণ সহজ ও সুগম হয়। স্পেন থেকে আগত জাহাজটি যখন বদরসহ এগারজন স্পেনবাসীকে নিয়ে সাবতার উপকূলে এসে ভিড়ল, ঘটনাচক্রে আবদুর রহমান তখন নামায আদায় করছিলেন। ঐ ব্যক্তিরা জাহাজ থেকে অবতরণ করে বদরের পিছু পিছু আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সর্বপ্রথম স্পেনের এগার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতা আবূ তামাম আবদুর রহমানের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি আরয করলেন, স্পেনবাসীরা আপনার অপেক্ষায় আছে। আবদুর রহমান তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। ঐ ব্যক্তি তার নাম বললে আবদুর রহমান উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবো। তারপর আবদুর রহমানের আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে জাহাজে আরোহণ করলেন। তিনি সঙ্গে নিলেন তাঁর কয়েকজন জানবাজ সঙ্গী-সাথীকে যারা সাবতায় তাঁর সঙ্গে মওজুদ ছিলেন এবং তাঁর সাথে প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাখতেন। তারপর এক শুভক্ষণে গিয়ে তারা স্পেনের উপকূলে অবতরণ করলেন। সেখানে পূর্ব থেকেই হাজার হাজার লোক তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে উপস্থিত ছিলেন।

আবদুর রহমানের কর্ডোভা অধিকার

আবদুর রহমানের স্পেনে উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে বনূ উমাইয়া ও সিরিয়াবাসী যে যেখানে ছিলেন, দ্রুত এসে আবদুর রহমানের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। তারপর শুরু হলো পার্শ্ববর্তী শহর-বন্দর ও গ্রাম-জনপদ অধিকারের পালা। বর্ষা মওসুম এসে পড়ায় ইউসুফ সহসা কর্ডোভায় এসে পৌঁছতে পারলেন না। এজন্যে আবদুর রহমান ইউসুফের চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যে সাত মাস সময় হাতে পান। অবশেষে ঈদুল আযহার দিন যুদ্ধ হলো এবং রাজধানী কর্ডোভা আবদুর রহমানের অধিকারে আসলো। এ যুদ্ধে জয়লাভের পর আবুস সাবাহ্ নামক জনৈক ইয়ামানী সর্দার আপন গোত্রের লোকজনকে লক্ষ্য করে বললো ঃ ইউসুফের নিকট থেকে আমরা আমাদের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি, এবার এ যুবক অর্থাৎ আবদুর রহমানকে হত্যা করে উমাইয়া রাজত্বের স্থলে এখানে নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোল। কিন্তু আবদুর রহমানের বাহিনীতে সিরীয় ও বার্বারদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর, এজন্যে ইয়ামানীরা প্রকাশ্যে বিরোধিতা বা বিদ্রোহও করতে পারলো না। তাঁরা ঘাপটি মেরে থেকে গোপনে আবদুর রহমানের ওপর হামলার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। ঘটনাচক্রে আবদুর রহমানও তাদের ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করতে পারলেন। তিনি নিজের একটি প্রহরী দল গঠন করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। বাহ্যত তিনি এ ব্যাপারে কিছুই না জানার ভান করলেন এবং এজন্যে কাউকে কোনরূপ দোষারোপও করলেন না। কয়েক মাস পরে তিনি আবুস সাবাহ্কে তার ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করালেন।

আবদুর রহমানের আমলাবর্গ

আবদুর রহমান ইব্‌ন উমাইয়া যেহেতু বয়সে নবীন এবং স্পেন দেশে একজন নবাগত ছিলেন, তাই এখানকার আমীর-উমারা, আমলা, প্রজাবর্গ, গোত্রসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। আবদুর রহমানের রাজত্ব শুরু হতেই রাজকার্য এবং বড় বড় পদে যারা অধিষ্ঠিত হলেন তাদের কেউ কেউ এমনও ছিলেন যাদের প্রতি স্পেনবাসীরা নানা কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেখানে এমনও অনেকে ছিলেন, যাদের প্রত্যাশা ছিল তাঁরা বড় বড় পদ লাভ করবেন, কিন্তু কার্যত তাঁরা সেরূপ উচ্চপদ লাভ করতে পারেন নি। এভাবে দেশে এমন এক বিরাট সংখ্যক লোকের সৃষ্টি হলো, যারা আবদুর রহমানের প্রতি অসন্তুষ্ট ও অপ্রসন্ন ছিলেন। এছাড়া স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ফিহ্‌রী এবং দামীল ইব্‌ন হাতিমের বন্ধু-বান্ধবরা তো তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেনই।

বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া যদিও কোন গোষ্ঠী বা দল-উপদলের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন না এবং তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু যারা আগে থেকেই স্পেনে বিশেষ সুবিধাদি ভোগ করে আসছিলেন তাদের প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, আবদুর রহমান তাঁর শাসনামলের শুরুর দিকেই অনেক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। একথার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায় ঃ স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ফিহ্‌রী চুক্তির শর্ত মুতাবিক কর্ডোভায় অবস্থানরত বা অন্য কথায় নজরবন্দী ছিলেন। আবদুর রহমানের কর্ডোভা অধিকারের পর দীর্ঘ দু'বছরকাল তাঁর বিভিন্ন প্রদেশে নিজ শাসন-শৃঙ্খলা কায়েমে এবং বিদ্রোহ দমনে বা তাদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে ব্যয়িত হয়। এ সময় তিনি তাঁর স্ববংশের যারা আব্বাসীয়দের তলোয়ারের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, তাদেরকে খুঁজে খুঁজে নিজের কাছে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এছাড়া তাঁর সমর্থক ও সহানুভূতিশীল বার্বারদের একটি বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন যাতে প্রয়োজনের সময় তাদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বনূ উমাইয়ার এক ব্যক্তি আবদুল মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম এবং তাঁর পুত্র আমর ইব্‌ন আবদুল মালিক আব্বাসীয়দের তরবারি থেকে আত্মরক্ষা করে তখনো মিসরে অবস্থান করছিলেন। স্পেন অধিকৃত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তারা মিসর থেকে স্পেনের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী আরও দশ ব্যক্তি তাদের সহযাত্রী হয়। এভাবে বার ব্যক্তির কাফেলাটি একদিন স্পেনে গিয়ে আবদুর রহমানের দরবারে উপনীত হয়। আবদুর রহমান তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন আমরকে আশবেলিয়ার (সেভিলের) এবং আমর ইব্‌ন আবদুল মালিককে শুরার-এর শাসনভার অর্পণ করেন।

এ অপরিচিত দেশে আবদুর রহমান ছিলেন একেবারেই একাকী। স্পেনের মুসলমানদের বিভিন্ন ফের্কা এবং উপদলের প্রতি তিনি এতটা আস্থাশীল ছিলেন না যে, তাদের সকলে

মিলে আব্বাসীয়দের মুকাবিলায় তাঁর সাথে থাকবে। এজন্যে তিনি শুরুর দিকে নিজেকে স্পেনের একজন সাবেক আমীরের অবস্থানে রাখেন এবং খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নামই পাঠ করতেন। অথচ অন্তরে অন্তরে তিনি আব্বাসীয়দের শত্রু ছিলেন এবং নিজেও তাদেরকে শত্রু ভাবতেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকটাত্মীয়দের আগমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগরূপে গণ্য করেন এবং তাদেরকে নির্দ্বিধায় বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করেন। স্পেনে আবদুর রহমানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এমন অনেক লোকের উদ্ভব হয় যারা অন্তরে অন্তরে আবদুর রহমানের শাসনকে পছন্দ করতো না। এখন ১৪১ হিজরীতে (৭৫৮-৫৯ খ্রি) আবদুল মালিক এবং তাঁর পুত্র আমরকে আশবেলিয়া (সেভিল) প্রভৃতি স্থানের শাসনভার অর্পণের পর তাদের বিরুদ্ধবাদী গুঞ্জরণের সুযোগ আরও বৃষ্টি পেল। চতুর্দিকে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং তা এক মারাত্মক সংকটের আকার ধারণ করলো।

স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের হত্যাকাণ্ড

স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানকে লোকজন প্ররোচিত করতে লাগলো। তিনি কর্ডোভা থেকে গোপনে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর দুই পুত্র আবূ যায়দ আবদুর রহমান এবং আবুল আসওয়াদ কর্ডোভা থেকে বের হতে সক্ষম হলেন না। তাঁরা কর্ডোভায়ই রয়ে গেলেন। ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের উযীর দামীল ইব্‌ন হাতিমও কার্ডোভা থেকে বের হতে সক্ষম হলেন না। তাঁরা তিনজনেই গ্রেফতার এবং নজরবন্দী হন। ইউসুফ ফাহ্‌রী কর্ডোভা থেকে পলায়ন করে টলেডো গিয়ে পৌছলেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে তাঁর কাছে সমবেত হলো। দেখতে দেখতে টলেডোতে বিশ হাজার লোক এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হলো। ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান এ বাহিনীকে নিয়ে আশবেলিয়া (সেভিল) আক্রমণ করলেন এবং আবদুল মালিক ইব্‌ন আমরকে অবরোধ করলেন। আবদুল মালিক প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলেন। ইউসুফ আশবেলিয়া (সেভিল) জয়ে অধিক কালক্ষেপণ সঙ্গত হবে না ভেবে আশবেলিয়ার অবরোধ প্রত্যাহার করে কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে আবদুল মালিকের পুত্র আমর তাঁর পিতার অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আশবেলিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েন। পিতাপুত্র উভয়ে মিলে ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমানের বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। এদিকে আমীর আবদুর রহমান যখন জানতে পারলেন যে, ইউসুফ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কর্ডোভার দিকে এগিয়ে আসছে তখন তিনি কর্ডোভা থেকে বের হয়ে ইউসুফের উদ্দেশে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। সম্মুখ দিক থেকে আবদুর রহমান হামলা করলেন। পিছন দিক থেকে আবদুল মালিক ও আমর এসে পৌছলেন। এ সাঁড়াশি আক্রমণে ইউসুফের পক্ষের অনেক লোক হতাহত হয়। পরাস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে ইউসুফ টলেডোর দিকে পলায়ন করেন। তিনি টলেডোর নিকটবর্তী হলে তাঁর বাহিনীর ইয়ামানী সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো যে, আমরা যদি নিজেরাই ইউসুফকে হত্যা করে তার শির আমীর আবদুর রহমানের দরবারে পৌছিয়ে দেই, তা হলে তিনি খুশি হয়ে আমাদের বিদ্রোহজনিত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। সত্যি সত্যি ইয়ামানীরা সে মতে কাজ করলো এবং তাঁর টলেডোয়

প্রবেশের পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর শির নিয়ে আবদুর রহমানের সমীপে উপস্থিত হয়।

ইউসুফ ফাহ্‌রী অত্যন্ত বীর পুরুষ এবং খ্যাতনামা সিপাহ্‌সালার ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে স্পেনের আমীর ছিলেন। তাঁর চরিত্রে বদান্যতা ও শিষ্টতার কোন কমতি ছিল না। কিন্তু তিনি সহজেই মানুষের প্রতারণা জালে ধরা দিতেন। এবারও তিনি প্রতারিত হলেন এবং লোকের কথায় ভুলে অঘোরে প্রাণ দিলেন। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমীর আবদুর রহমানকে দামীল ইব্‌ন হাতিম এবং ইউসুফের পুত্রদেরকে হত্যার বৈধতা এনে দেয়। তাই ইব্‌ন হাতিম এবং আবূ যাদ ইব্‌ন ইউসুফকে হত্যা করা হয়, কিন্তু স্বল্প বয়সের বিবেচনায় ইউসুফের অপর পুত্র আবুল আসওয়াদকে হত্যা না করে কর্ডোভার নিকটবর্তী একটি পার্বত্য দুর্গে নজরবন্দী করে রাখা হয়। ইউসুফের বিদ্রোহ দমনের পর অন্যান্য বিদ্রোহীর সাহস উবে যায় এবং ব্যাহ্যত আমীর আবদুর রহমানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমীর আবদুর রহমান ফাহ্‌রী বংশের বিদ্রোহীদের শবদেহগুলোকে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে কর্ডোভার উপকণ্ঠে প্রকাশ্যে শূলিতে ঝুলিয়ে রাখেন। বাহ্যত মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হলেও ভেতরে ভেতরে ফাহ্‌রীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

ইউসুফ ফাহ্‌রীর বিদ্রোহ দমন করার পর আমীর আবদুর রহমান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন শৃঙ্খলার দিকে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রকার শাহী নিদর্শন হস্তগত করার পর ১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩ খ্রি.) নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিয়ে আব্বাসী খলীফার নাম তিনি খুতবা থেকে বাদ দিয়ে দেন। আব্বাসীদের খিলাফত রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখনো পূর্বাঞ্চলের বাকি ঝামেলা থেকে তাঁরা মুক্ত হন নি। তজ্জন্য আবদুর রহমানের স্পেন অধিকারের সংবাদে তাঁরা ব্যথিত হলেও এত দূরবর্তী অঞ্চলে কোন অভিযান প্রেরণে তাঁরা সমর্থ হন নি। তবে এ কথা ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত ছিলেন যে, আবদুর রহমানকে দমন করা যেহেতু সহজসাধ্য নয় তাই আমাদের নাম যে খুতবায় সেখানে পড়া হয় সেটাও কম কথা নয়।

আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় খলীফাদের পদক্ষেপ

এবার যখন জানা গেল যে, আমীর আবদুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করে খুতবা থেকে খলীফার নাম খারিজ করে দিয়েছেন তখন আব্বাসীয় খলীফা মানসূর অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি আফ্রিকার সিপাহ্‌সালার আলা ইব্‌ন মুগীছ ইয়াহসূবীকে পত্র লিলখেন এবং তাঁর কাছে একটি কৃষ্ণ পতাকা প্রেরণ করে তাঁকে সসৈন্য স্পেন আক্রমণের নির্দেশ করলেন। আলা ইব্‌ন মুগীছ খলীফার পত্র পেয়ে আফ্রিকা থেকে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এদিকে স্পেনে ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাহ্‌রীর জনৈক আত্মীয় হাশিম ইব্‌ন আবদে রাব্বাই ফাহ্‌রী টলেডোর রঈস বলে গণ্য হতেন। ফাহ্‌রীদের শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংসের জন্য তিনি মর্মজ্বালায় ভুগছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী প্রচুর সংখ্যক বার্বারীকে

প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সমর্থক বানিয়ে ফেলেন। এছাড়া ফাহ্‌রীদের শোচনীয় পরিণতির জন্যে মর্মাহত আরও অনেকে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাশিমের পার্শ্বে সমবেত হতে থাকে।

হাশিম ফাহ্‌রী আফ্রিকায় আলা ইব্‌ন মুগীছের কাছে এমর্মে পয়গাম প্রেরণ করেন যে, আপনি কালবিলম্ব না করে স্পেন আক্রমণ করেন। এদিক থেকে আমরা পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে হামলা করবো। এ বার্তা আলা ইব্‌ন মুগীছের সাহস আরো বৃদ্ধি করে তোলে। আবদুর রহমান আফ্রিকার দিক থেকে আসন্ন হামলার কথা মোটেই অবগত ছিলেন না। ১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩ খ্রি) হাশিম বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন এবং উত্তর স্পেন অধিকার করে নিলেন। তিনি টলেডোকে মজবুত করে গড়ে তুলেন। আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা থেকে সসৈন্যে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং জাগীর টলেডো অবরোধ করেন। টলেডোর বিদ্রোহীরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ অবরোধ দীর্ঘ কয়েকমাস পর্যন্ত চলে। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। এদিকে আলা ইব্‌ন মুগীছ তাঁর বাহিনী নিয়ে নৌপথে বাজায় অবতরণ করেন। তাঁর কাছে খলীফা মানসূর আব্বাসীর প্রেরিত কৃষ্ণ পতাকা এবং ফরমান ছিল।

স্পেনের প্রজাসাধারণ আলা ইব্‌ন মুগীছকে খলীফাতুল মুসলিমীনের প্রতিনিধি জেনে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। তাঁরা আবদুর রহমানকে বিদ্রোহী বলে গণ্য করতে শুরু করে। আমীর আবদুর রহমান এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করেন। এটা ছিল অত্যন্ত নাজুক অবস্থা। কেননা, উত্তর স্পেনের বিদ্রোহীরা তখনো কাবু হয়ে সারেনি। এমনি সময়ে দক্ষিণ স্পেনে এমন একটি শক্তিশালী শত্রুর আবির্ভাব হলো এবং প্রজাসাধারণ তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আমীর আবদুর রহমান টলেডো থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে নবাগত শত্রুর মুখোমুখি হলেন। তিনি আশবেলিয়ার সন্নিকটস্থ কারমূনা নামক স্থানে উপনীতি হতেই আলা ইব্‌ন মুগীছ তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্যে উপস্থিত হলো। আলার নিকটবর্তী হতেই স্বয়ং আবদুর রহমানের বাহিনীর বেশ কিছু লোক আলা ইব্‌ন মুগীছের বাহিনীতে যোগ দেয়। এদিকে টলেডোর অবরুদ্ধ বিদ্রোহীরা অবরোধ মুক্ত হতেই আলা ইব্‌ন মুগীছের বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাদের একাংশ সৈন্য পাঠিয়ে দিল এবং তাঁকে তাদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিল। অগত্যা আবদুর রহমানকে কারমূনা দুর্গে অবরুদ্ধ হতে হলো।

আবদুর রহমানের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ

আলা ইব্‌ন মুগীছ নিজে কারমূনা অবরোধ করলেন এবং তার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে লুটপাট চালানোর জন্যে বিভিন্ন দিকে রওয়ানা করে দিলেন। স্পেনের বার্বারী ও অন্যরা এ অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেরাও লুটপাটে মত্ত হলো। গোটা স্পেনদেশের সর্বত্র লুটপাট ও অরাজকতা শুরু হলো। আমীর আবদুর রহমান দু'মাস ধরে কারমূনা দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন। রসদপত্র শেষ হয়ে গেলে ক্ষুৎপিপাসায় লোকজন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে লাগলো। উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনই পথ আর বাকি রইল না। এ পরম হতাশার মুহূর্তে আমীর আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

"আমাদের এখন ক্ষুধার প্রাবল্যে মৃত্যুবরণ করা বা জীবিত অবস্থায় শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার চাইতে যুদ্ধ করে বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা এবং কাপুরুষের জীবনের চাইতে বীরের মৃত্যুকে প্রাধান্য দেয়ার সময় এসেছে।"

তাঁর কথা মত তক্ষুণি একটি বিরাট চুল্লী ধরিয়ে সাতশ লোক তাদের সাতশ তলোয়ারের খাপ তাতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দিলেন, যার তাৎপর্য হলো, হয় যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেব, নতুবা জয়যুক্ত হব। তারপর দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে আকস্মিকভাবে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবরোধকারী বাহিনী দীর্ঘ দু'মাস ধরে দুর্গ অবরোধ করে রয়েছিল। তারা জানতো যে, দুর্গে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যই রয়েছে। এজন্যে এদের ব্যাপারে এরা অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিল। আকস্মিকভাবে এ সাতশ ক্ষুধার্ত সিংহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে এমনিভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করলো যে, অবরোধকারী শত্রুবাহিনী তাদের সাত হাজার শবদেহ দুর্গের সম্মুখে ফেলে পলায়ন করলো। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গোটা স্পেনদেশে আবার আমীর আবদুর রহমানের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁর হৃত রাজ্য তিনি ফিরে পেলেন।

অদ্ভুত উপহাস

এ সময় আবদুর রহমান মানসূর আব্বাসীর সাথে এক অদ্ভুত উপহাস করেন। তিনি আলা ইব্‌ন মুগীছ এবং আব্বাসীয় বাহিনীর বড় বড় সর্দারের শিরশ্ছেদ করে এবং তাদের কান ছিদ্র করে প্রত্যেকের শিরের সাথে তার নাম-ধাম ও পদবী সম্বলিত এক একটি চিরকুট বেঁধে দিয়ে শিরগুলোকে পরম যত্নসহকারে বাক্সবন্দী করে হাজীদের কাফেলার সাথে করে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে জনৈক হিজাযী তা খলীফা মানসূরের খিদমতে পেশ করেন। খলীফা মানসূর যখন সিন্দুক খুলে আলা ইব্‌ন মুগীছের শির দেখতে পেলেন, সাথে সাথে তাঁর কৃষ্ণপতাকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র শোকর! আমার এবং আবদুর রহমানের মধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে। তারপর আরেক দিন তিনি বললেন, আবদুর রহমানের সাহসকিতা, বিচক্ষণতা এবং কর্মকুশলতার জন্যে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। কী নিঃস্বভাবেই না সে এত দূর-দূরান্তের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আপন রাজত্ব গড়ে তুলেছে। কারমূনার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৪৬ হিজরীর (৭৬৪ খ্রি.-এর প্রথমার্ধে) শেষার্ধে।

বিদ্রোহীদের উৎখাত

কারমূনার বিজয়ের পর আমীর আবদুর রহমান তাঁর ভৃত্য বদর এবং তামাম ইব্‌ন আলকামাকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে টলেডো অভিমুখে প্রেরণ করলেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বদর ও তামাম টলেডোর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করেন। হিশাম ইব্‌ন আবদে রাব্বিহী ফাহ্‌রী, হায়াত ইব্‌ন ওয়ালীদ ইয়াহসূবী, উসমান ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাত্তাব প্রমুখ বড় বড় বিদ্রোহী সর্দার বন্দী হলেন। এ সর্দারদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যখন তাঁরা কর্ডোভার সন্নিকটে উপনীত হলেন, তখন নগরীর উপকণ্ঠেই তাদের শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত করে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় গাধায়

চড়িয়ে নগরীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমীর আবদুর রহমানের নির্দেশে সেখানে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

আলা ইব্‌ন মুগীছের সাথে অনেক ইয়ামানী গোত্র শামিল হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই কারমূনার যুদ্ধে আবদুর রহমান ও তাঁর সহচরদের হাতে নিহত হয়। ইয়ামানীরা তাদের সে সব সঙ্গী-সাথীর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিল। সে মতে ঐ বছরই অর্থাৎ ১৪৭ হিজরীতে (৭৬৪ খ্রি.) সাঈদ ওরফে মাতারী বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং লাবলা শহরে ফৌজ সংগ্রহ করে আশবেলিয়া দখল করে বসেন। এ সংবাদ পেয়ে আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মাতারীকে দমনের উদ্দেশ্যে আশবেলিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। মাতারী আশবেলিয়ার একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করলেন। আবদুর রহমান আশবেলিয়া অবরোধ করে বসলেন। আত্তাব আলকামী শাদূনা শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি মাতারীর সাথে এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। তাই মাতারীর অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আত্তাব ইব্‌ন আলকামী শাদূনা থেকে সসৈন্যে আশবেলিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

এ সংবাদ অবগত হয়ে আমীর আবদুর রহমান তাঁর ভৃত্য বদরকে একদল সৈন্য দিয়ে আত্তাবকে মাতারী পর্যন্ত পৌছার পথে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। এদিকে সাঈদ ওরফে মাতারী নিহত হলেন। দুর্গবাসীরা খলীফা ইব্‌ন মারওয়ান নামক এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভয় প্রার্থনা করে আবেদন জানাতে বাধ্য হলো। আবদুর রহমান তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করে সে দুর্গটি ধ্বংস করে দিলেন এবং নিজে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তার অব্যবহিত পরেই জিয়ান এলাকায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খারাশা আসাদী বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং আমীর আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। আমীর আবদুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে একটি সৈন্যবাহিনী সে দিকে পাঠিয়ে দেন। আবদুল্লাহ্‌র বাহিনীর লোকজন যখন জানতে পারলো যে, আবদুর রহমানের বাহিনী এসে পড়েছে তখন তারা আবদুল্লাহ্‌র দলত্যাগ করে। আবদুল্লাহ্ আসাদী আমীর আবদুর রহমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি.) গিয়াস ইব্‌ন মীর আসাদী বিদ্রোহ করেন। বাজা অঞ্চলের শাসক সৈন্য সংগ্রহ করে তার মুকাবিলা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াস নিহত হন। তাঁর পরাজিত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বাজার আমিল গিয়াসের শিরশ্ছেদ করে যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদসহ তাঁর শিরও আমীর আবদুর রহমানের দরবারে প্রেরণ করলেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা নগরীর প্রাচীরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) বার্বারীদের মাকনাসা গোত্রের জনৈক শাকনা ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদের আবির্ভাব ঘটে। ঐ ব্যক্তি শিক্ষকতা করতো। সে নিজেকে হযরত হুসাইন ইব্‌ন আলীর বংশধর বলে দাবি করে এবং তার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বলে ব্যক্ত করে। সে ব্যক্তি আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে এবং তাতে তাদের সাফল্যের ব্যাপারে অবগত ছিল। এছাড়া উলুভী বা আলীপন্থী প্রচারকরা যে প্রায়ই মাকনাসা এবং বার্বারদের এলাকায় আসতেন তাও তার জানা ছিল। তাই স্পেনের শাসন-শৃঙ্খলাকে লণ্ডভণ্ড

করে দেয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণে সে সাহসী হয়। তার এ দুঃসাহস কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। দেখতে দেখতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বার্বাররা তার চতুষ্পার্শ্বে এসে জমায়েত হতে থাকে। বার্বারদের ছাড়া আরো অনেক লোকও তার ভক্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ে। ইবনুল ওয়াহিদ তার অলৌকিক ক্ষমতার কথাও তাদের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে তার নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। তার ভক্ত সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং স্পেনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ বালানসিয়ার অন্তর্ভুক্ত শায়তারান নামক স্থান অধিকার করে নিল। আমীর আবদুর রহমান এ সংবাদ অবগত হয়ে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সসৈন্য কর্ডোভা থেকে রওয়ানা হলেন।

ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আমীর আবদুর রহমানের আগমন সংবাদ পেয়ে দলবলসহ পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। সে তাঁর সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো না। আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভায় ফিরে আসেন। টলেডোর শাসনভার হাবীব ইব্‌ন আবদুল মালিকের হাতে অর্পণ করে তাঁকেই তিনি ইব্‌নুল ওয়াহিদকে দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। হাবীব ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁর পক্ষ থেকে সুলায়মান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবাস ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফফানকে ইবনুল ওয়াহিদকে গ্রেফতার করার এবং তার সমুচিত শাস্তি বিধানের জন্য প্রেরণ করলেন। সুলায়মান সসৈন্য ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ যুদ্ধে সুলায়মানকে পরাস্ত ও গ্রেফতার করে তাকে হত্যা করে এবং কাউরিয়া অঞ্চল অধিকার করে নেয়।

এ সংবাদ অবগত হয়ে ১৫২ হিজরীতে (৭৬৯ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা থেকে যাত্রা করেন। ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আমীরের আগমন সংবাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। অগত্যা বিব্রত অবস্থায় আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫৩ হিজরীতে (৭৭০ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান তাঁর ভৃত্য বদরকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করলেন। বদর শায়তারানের দুর্গের নিকটবর্তী হতেই ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ শায়তারান ছেড়ে পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৫৪ হিজরীতে (৭৭১ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান পুনরায় নিজে যান কিন্তু পূর্বের মতোই শাকনা ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ তাঁর নাগালের বাইরেই রয়ে যায়।

১৫৫ হিজরীতে (৭৭২ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান আবূ উসমান উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমানকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু এবারও আশাব্যঞ্জক কোন ফলোদয় হলো না। বরং ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ আবূ উসমানকে তাঁর বাহিনীর এক বিরাট অংশকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করতে সমর্থ হয়। সে কয়েকটি শহরেও লুটপাট চালায়। অগত্যা ১৫৬ হিজরীতে (৭৭৩ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান পুনরায় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কর্ডোভা থেকে যাত্রা করলেন, কর্ডোভায় তখন তিনি তার পুত্র সুলায়মানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। যখন তিনি শায়তারান দুর্গের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সংবাদ পেলেন যে, ইয়ামানী গোত্রসমূহ এবং আশবেলিয়াবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অগত্যা আমীর আবদুর রহমান শায়তারান ও ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদকে পূর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করে আশবেলিয়া

অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং আবদুল মালিক ইব্‌ন উমরকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আশবেলিয়া আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

আবদুল মালিক আশবেলিয়ার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে আপন পুত্র উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল মালিককে আশবেলিয়াবাসীদের ওপর নৈশ আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী দলরূপে প্রেরণ করলেন। উমাইয়া যখন লক্ষ্য করলেন যে, আশবেলিয়াবাসীরা সদাসতর্ক তখন তিনি হামলা করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে আসলেন। আবদুল মালিক তাঁর প্রত্যাবর্তনের কারণ কি জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে, আশবেলিয়াবাসীরা অপ্রস্তুত ছিল না বিধায় তিনি হামলা করতে পারেন নি। আবদুল মালিক গর্জে উঠলেন, 'কী? মৃত্যুভয়ে তুই আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকেছিস ? আমি কোন কাপুরুষকে পছন্দ করি না'—এ কথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আপন পুত্র উমাইয়ার গর্দান উড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সহযাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমরা কি নৃশংসভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, তা কি তোমরা অবগত আছ ? আমরা রাজ্যহারা হয়ে অতিকষ্টে মাতৃভূমি থেকে দূরের এ ভূমিখণ্ডটি হস্তগত করেছি, যা বড় জোর আমাদের জীবন-যাপনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কাপুরুষতার দ্বারা এ ভূখণ্ডটিও আর হাতছাড়া করা আমাদের জন্যে কোনক্রমেই উচিত হবে না। এখন আর জীবনকে মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দেয়ার কোনই অর্থ হয় না। বীরদর্পে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাই আমাদের জন্যে শ্রেয়।" সকলে এক বাক্যে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালেন এবং তাঁরা মরতে ও মারতে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। আশবেলিয়ার ইয়ামানী গোত্রসমূহের প্রচুর সৈন্য ছিল। আর এরাই ছিল এদের শক্তি ও বলবীর্যের সর্বশেষ প্রকাশ। তাই আশবেলিয়া জয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আবদুল মালিক ইব্‌ন উমর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তাঁর গোটা বাহিনী তাঁর সাথে এ আক্রমণে যোগ দিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে আশবেলিয়াবাসীরা পরাস্ত হলো। আবদুল মালিকের দেহে কয়েকটি আঘাত লাগলো এবং যখম হলো, কিন্তু শত্রু হত্যায় তিনি বিস্ময়কর বীরত্ব এবং ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন আবদুল মালিক তরবারি হাত থেকে রাখতে চাইলেন তখন তাঁর মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলিসমূহ খুলছিল না। তা তরবারি আঁকড়েই রইল। এমনি সময় আমীর আবদুর রহমান এসে সেখানে উপনীত হলেন। আবদুল মালিকের রক্তাপ্লুত মুষ্টিতে আবদ্ধ তরবারি দেখে এবং যুদ্ধের বিবরণ শুনে তিনি বলে উঠলেন, ভাই আবদুল মালিক! আমি আমার পুত্র হিশামের বিবাহ আপনার কন্যার সাথে করাতে আগ্রহী। তারপর আমীর আবদুর রহমান আবদুল মালিককে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করে নেন।

ইয়ামানী গোত্রসমূহের অর্থাৎ আশবেলিয়াবাসীদের দু'জন সর্দার বানীলা শহরের শাসক আবদুল গাফ্‌ফার ইব্‌ন হামিদ, আশবেলিয়ার শাসক হায়াত ইব্‌ন কালাকশ এবং বীজার শাসক আমর এ যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হন। তাঁরা আবার তাঁদের চতুষ্পার্শ্বে আরব গোত্রগুলোকে সমবেত করলেন। ১৫৭ হিজরীতে (৭৭৪ খ্রি.) আমীর আবদুর রহমান তাঁদের উপর হামলা করলেন এবং তাদেরকে এবং তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে পরাস্ত করে হত্যা করেন। এ সব ঘটনার ফলশ্রুতিতে আবদুর রহমান আরব গোত্রসমূহের প্রতি বীতরাগ হন এবং তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাই তিনি অনারব এবং ক্রীতদাসদেরকে ভর্তি করতে শুরু করেন যাতে আরবদের বিদ্রোহের কারণে বিব্রতকর

পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। একই কারণে সম্ভবত আব্বাসীয় খলীফাগণও নিজেরা আরব হয়েও আরবদের ওপর অনারব শক্তিদের প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং আরবদের বিশ্বাসঘাতকতাকে সারা জীবন ভীতির চোখে দেখেছেন।

১৬০ হিজরীতে (৭৭৭ খ্রি.) আবদুর রহমান একটি বাহিনী ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী শায়তারানে গিয়ে সেখানকার কেল্লা অবরোধ করে। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত কেল্লা অবরোধ করে থাকার পর অবশেষে তারাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। অবশেষে ১৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৭৮-সেপ্টেম্বর ৭৯ খ্রি.) ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ শায়তারান দুর্গ থেকে বের হয়ে শাতাৎবারিয়া এলাকার একটি গ্রামে আসেন। তাঁর দুজন সঙ্গী আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরায়ম তাঁকে হত্যা করে এবং তার শিরশ্ছেদ করে সে কর্তিত শির নিয়ে আমীর আবদুর রহমানের খিদমতে উপস্থিত হয়। এভাবে সুদীর্ঘকাল জ্বালাতন করার পর এ আপদের অবসান ঘটে।

ইবনুল ওয়াহিদ নিহত হতে না হতেই ১৬১ হিজরীতে (৭৭৭-৭৮ খ্রি.) আবদুর রহমান ফিহ্‌রী ওরফে সাকলবী আফ্রিকায় সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী তৈরি করে স্পেন দখলের অভিলাষে হামলা চালান। তিনি তাদমীরের প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করেন। এখানে স্পেনের বার্বারদের অনেকে এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব বারসেলোনার ওয়ালী সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াক্কাযার নিকট এ মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তুমি আব্বাসী খলীফার আনুগত্য গ্রহণ কর। নতুবা আমাকে তোমার মাথার উপর খড়গহস্তে দেখতে পাবে। কিন্তু সুলায়মান তাতে অসম্মত হন। ফলে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব সুলায়মানের উপর হামলা করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে সুলায়মান আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব ফিহ্‌রীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব তাদমীর প্রান্তরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমীর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া এ সংবাদ অবগত হয়ে কর্ডোভা থেকে সসৈন্য তাদমীর অভিমুখে যাত্রা করেন। আমীর আবদুর রহমানের আগমন সংবাদে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব বালানসিয়ার পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। আমীর এবার আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের কর্তিত শিরের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কারের লোভে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের জনৈক বার্বারী সহচর তাঁর শিরশ্ছেদ করে কর্তিত শির আমীর আবদুর রহমানের দরবারে এনে উপস্থিত করে। ওয়াদা অনুসারে আমীর উক্ত বার্বারীকে পুরস্কৃত করে বিদায় করেন। এ বছরই অর্থাৎ ১৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৭৮-সেপ্টেম্বর '৭৯ খ্রি) আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের হত্যার মাধ্যমে এ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা অভিমুখে ফিরে আসেন।

এর কয়েকদিন পরে ১৬২ হিজরীতে (অক্টোবর ৭৭৮-সেপ্টেম্বর ৭৯) দাহিয়া গাস্‌সানী আলবীরা অঞ্চলের একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। আমীর আবদুর রহমান শহীদ ইবন ঈসাকে তাকে দমনের জন্যে দায়িত্ব প্রদান করেন। শহীদ ইব্‌ন ঈসা এ বিদ্রোহীকে পরাস্ত করে বধ করেন। তার কিছুদিন পর বার্বারীরা ইবরাহীম ইব্‌ন সাজরার নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। আমীর আবদুর রহমান তাদের দমনের উদ্দেশ্যে বদরকে প্রেরণ করেন। বদর ইবরাহীমকে বধ করে বার্বারদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। ঐ সময়েই সালমা নামক জনৈক সেনাপতি কর্ডোভা থেকে ফেরারী হয়ে টলেডো

অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ ব্যক্তি টলেডো অধিকার করে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। আমীর আবদুর রহমান হাবীব ইব্‌ন আবদুল মালিককে তাকে দমনের নির্দেশ দেন। হাবীব গিয়ে টলেডো অবরোধ করেন। এ অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অবশেষে অবরুদ্ধ অবস্থায়ই বিদ্রোহী সেনাপতি সালমার মৃত্যু হয়। তার সঙ্গী-সাথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বিদ্রোহের কারণসমূহ

স্পেনের এ উপর্যুপরি বিদ্রোহের কোন বিশেষ কারণ ছিল কিনা তা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। কেননা, এ বিদ্রোহীরা কোন দিনই আমীর আবদুর রহমানকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেয়নি। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্পেনে এমন কিছু লোকের সমাবেশ ঘটেছিল এবং মুসলিম স্পেনের লোকদের মেযাজ-প্রকৃতি এমনি ছিল যে, তারা পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সাথে সাথে কারো অধীনে বসবাস করা ছিল তাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বর্তমান শাসক আমীর আবদুর রহমান যেহেতু ছিলেন একজন পরদেশী, যার বংশে রাজত্ব ও প্রতাপ পূর্বাঞ্চলে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমীর আবদুর রহমানের রাজত্বকেও দীর্ঘদিন টিকতে দেয়ার তারা পক্ষপাতী ছিল না। এ কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এবং যা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটি বিশেষ কারণও ছিল। আর আমীর আবদুর রহমানের সমস্ত পেরেশানীর মূলে ছিল সে কারণটিই। যে আব্বাসীয় খলীফারা বাগদাদকে তাদের রাজধানী করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন আমীর আবদুর রহমান থেকে অনেক দূরে। তাঁদের রাজ্য আর আমীর আবদুর রহমানের রাজ্যের মধ্যে সমুদ্র অন্তরায় ছিল।

তাঁরা আবদুর রহমানের রাজত্ব আর প্রতাপের কথা তো লোকমুখে শুনতেন, কিন্তু এত দূরের রাজ্যে তাঁর কোনরূপ অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতা তাদের ছিল না। আব্বাসীয়রা দু'দু'বার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছেন ঠিক, কিন্তু উভয়বারই তাদের সেনাপতির মৃত্যু এবং তাঁদের বাহিনীর অপমানজনক পরাজয়ই তাদের ললাট লিপি হয়ে ধরা দিয়েছে। আলবীদের ষড়যন্ত্রসমূহ এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের জটিলতার কারণে তাদের সামরিক অভিযান পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি এবং এ ব্যাপারে তাদের মনোবলও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁরা আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়ার বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রমূলক পন্থা অবলম্বনে ত্রুটি করেননি, যা বনূ উমাইয়ার পতন ও দামেশকের খিলাফত ধ্বংস করার ব্যাপারে তাঁরা ইতিপূর্বে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা গোপন আঁতাতের মাধ্যমে স্পেনের আরব গোত্রসমূহ এবং ষড়যন্ত্রে অভ্যস্ত বার্বারদের মধ্যে আব্বাসীয়দের সমর্থন ও আব্বাসীয় খিলাফতের সাহায্য-সহযোগিতার স্বপক্ষে প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখে। আব্বাসী প্রচারকরা এমনভাবে স্পেনে আসা-যাওয়া ও প্রচারকার্য চালাতো যে কেউ তা ঘুণাক্ষরেও টের পেত না বা তা অনুভব করতে পারতো না। এভাবে অধিকাংশ আরব সর্দার এবং বার্বার নওমুসলিম আমীর আবদুর রহমানের শাসনের অবসান ঘটানো এবং আব্বাসীয় খলীফার দৃষ্টিতে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। এরা বারবার বিদ্রোহ করে এবং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, বাগদাদ দরবার থেকে বিদ্রোহীদের জন্যে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না।

স্পেনের সে সব অপরিণামদর্শী বিদ্রোহী এবং অবাধ্য সর্দাররা একদিকে আমীর আবদুর রহমানকে বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখে, অপরদিকে ঈস্টার ইয়াসের যে ঈসায়ীরা যাদের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে, যারা জাবলে আল-বুরতাত বা পিরেনীজ পর্বতে একটি ক্ষুদ্র ঈসায়ী রাজ্য গড়ে তুলেছিল, এ অবসরে তারা তাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং পর্বতের পাদদেশে তাদের রাজ্যের সীমানা প্রশস্ত করার বিস্তর সুযোগ পেয়ে যায়। উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, যে বছর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া স্পেনে পদার্পণ করেন, ঐ বছরই ঈসায়ী রাজ্যের শাসক আলফোনসূর মৃত্যু হয়। আলফোনসূর স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ফার্ডিনান্ড, বা ফার্দ বা আলী রায়। ফার্ডিনান্ড ঈসায়ীদেরকে তার দলে ভিড়াবার বা তার প্রতি তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি বৃদ্ধির বা ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এ দিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের যে প্রদেশটি মুসলিম অধিকারে ছিল, সেদিকে মনোনিবেশ করার বা সেখানকার মুসলমানদেরকে সাহায্য করার কোন সুযোগই হলো না কর্ডোভা দরবারের। কেননা, সেদিকে সৈন্য প্রেরণ করলে ফরাসীদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলে স্পেনের রাজত্ব রক্ষা করা আমীর আবদুর রহমানের পক্ষে সম্ভবপর হতো না।

এবার যখন আব্বাসীদের সমর্থক ও সহানুভূতিশীলরা অহরহ বিদ্রোহ করতে রইলেন তখন সুযোগ বুঝে ফরাসীরা নার্বুন শহরে হামলা চালিয়ে শহরটি অবরোধ করে বসে। দীর্ঘ দু'বছরকাল ধরে বাইরের কোনরূপ সাহায্য ব্যতিরেকেই নার্বুনের মুসলমানরা ফরাসী সৈন্যদের মুকাবিলা চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষফল দাঁড়ায় এই যে, যে দক্ষিণ ফ্রান্স দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মুসলিম শাসনাধীনে ছিল, তা আবার ফরাসী দখলে চলে যায়।

বাগদাদের খলীফার সেনাপতি আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীবের নিহত হওয়ার পর ফ্রান্সে যারা আব্বাসী ষড়যন্ত্রের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে হুসাইন ইব্‌ন আসী এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াকযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দুজন সারাকসতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার শাসক ছিলেন। সারাকসতা শহরটি পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত দু'জন আব্বাসী খলীফা মাহদীর সাথে পত্র যোগাযোগ স্থাপন করেন। খলীফা মাহদী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলীফা ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানবীয় দুর্বলতা বশত অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি উমাইয়াদের প্রতি বিদ্বিষ্ট এবং স্পেনে আবদুর রহমানের শাসনাধীনে থাকায় দুঃখিত ও বিমর্ষ ছিলেন। বাগদাদ দরবার থেকে উক্ত সর্দারদ্বয়কে উৎসাহিত করা হয়। উক্ত দু'জন ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনের সাথে পত্র যোগাযোগ করে তাঁকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। তারা তাঁকে জানায় যে, বিশ্বমুসলিমের পার্থিব ও পারলৌকিক নেতা খলীফাতুল মুসলিমীন মাহ্‌দী আব্বাসীরও মনোবাঞ্ছা হচ্ছে এই যে, আবদুর রহমান এবং তার রাজত্বের চির অবসান হোক। সুতরাং আমরা এবং স্পেনের অধিকাংশ মুসলমান সমর্থক ও সাহায্যকারী রূপে আপনার সঙ্গে থাকবো। শার্লিমেনের জন্যে স্পেন বিজয়ের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কিছুই হতে পারতো না আর স্পেন বিজয়ের চাইতে অধিকতর সুনাম সুখ্যাতির ব্যাপারও তাঁর জন্যে আর কিছুই হতে পারতো না। কিন্তু নার্বুন শহরের মুষ্টিমেয় অসহায় মুসলমানের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে তিনি অবগত

ছিলেন। তাই তিনি স্পেন আক্রমণে তাড়াহুড়া করলেন না বরং উত্তমরূপে সে জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে স্পেনের উক্ত বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে সর্বপ্রকার সংবাদাদি সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকতে লাগলেন। এ ব্যাপারে স্পেনের সাবেক শাসক আমীর ইউসুফ ফাহরীর কর্ডোভা সন্নিহিত একটি দুর্গে বন্দী পুত্র আবুল আসওয়াদকে মুক্ত করে আমীর আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে স্পেনের মুসলমানদের অধিকতর সহানুভূতি অর্জন করা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলো। আবুল আসওয়াদের মুক্তির বিবরণ উপরে এসেছে যে, নিজেকে অন্ধ বলে জাহির করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। উক্ত আবুল আসওয়াদও ১৬৪ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৭৮০-আগস্ট '৮১ খ্রি) মুক্ত ও ফেরারী হয়ে সারাকসতার বিদ্রোহীদের সাথে এসে যোগ দেন। এদিকে ফ্রান্স সম্রাট শার্লিমন লাখ লাখ সৈন্য সংগ্রহ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠেন। তিনি তার অভিযানের উদ্দেশ্যে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করা এবং ঈসায়ী হুকুমত কায়েম করা বলে ঘোষণা করেন। ফলে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য লাভ করেন এবং গোটা ঈসায়ী মহলে আমীর আবদুর রহমান বিরোধী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। শার্লিমেন নিজে আক্রমণ করার পূর্বে সারাকসতার বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। আমীর আবদুর রহমানের জন্যে এটা ছিল সবচাইতে নাজুক ও বিপজ্জনক সময় যে, বাগদাদের খলীফার প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্পেনের মুসলমানদের সবচাইতে বড় ষড়যন্ত্র এবং বিশাল ঈসায়ী সৈন্যবাহিনীর শক্তি সমবেতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। আবদুর রহমান সে সঙ্কট সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। তিনি তাঁর জনৈক সেনাপতি ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দকে সারাকসতার বিদ্রোহীদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হওয়ার পর ছা'লাবাকে সুলায়মান গ্রেফতার করে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ ও নিজেদের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ তাকে শার্লিমেনের দরবারে বন্দী অবস্থায় প্রেরণ করলেন। ছা'লাবার গ্রেফতারীর পর তাঁর অবশিষ্ট বাহিনী পলায়ন করে কর্ডোভার আবদুর রহমানের নিকট গিয়ে ওঠে। তারা তাঁকে বিদ্রোহীদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত করে।

ছা'লাবার গ্রেফতারীর অব্যবহিত পরে অসংখ্য সৈন্যসহ পিরেনীজ পর্বতের ঐ পাশে দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণের জন্যে অপেক্ষারত শার্লিমেন যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, পিরেনীজ পর্বতের একটি গিরিপথ দিয়ে সকলের অতিক্রম করা ছিল অসম্ভব, তাই দুই ভিন্ন ভিন্ন গিরিপথে পিরেনীজ অতিক্রম করে দু'দিক থেকে তারা সারাকসতা শহরের প্রাচীরের পাদদেশে সমবেত হয়। এ ঈসায়ী সৈন্যদের আধিক্য এবং স্পেন থেকে মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করার তাদের অঙ্গীকারের কথা অবগত হয়ে সারাকসতার মুসলমানরা সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াকযানকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। বিশেষত হুসাইন ইব্‌ন আসীও এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে বলে আঁচ করলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সারাকসতা শহরের ফটক বন্ধ করে দিলেন। শার্লিমেন যখন টের পেলেন যে, সারাকসতা শহরের মুসলমানরা তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে কুণ্ঠিত এবং আমীর আবদুর রহমান এসে পড়লে তার পক্ষই অবলম্বন করার সম্ভাবনাই প্রবল তখন তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সারাকসতা থেকে প্রস্থান করে ফ্রান্স অভিমুখে রওয়ানা হন।

শার্লিমেনের আগমনকালে ঈস্টার ইয়াসের ঈসায়ী রাজ্যও তাঁর সহযোগী হয়ে উঠেছিল। পার্বত্য অঞ্চলের ঈসায়ী বাসিন্দারা শার্লিমেনকে ঈসায়ী জাতির মুক্তিদাতা মনে করে তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রমে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল। কিন্তু যখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন ঐ পার্বত্য ঈসায়ীরা তাঁর সৈন্যবাহিনীর ওপর পিছন থেকে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। উত্তরের সমভূমিতে পৌছার পূর্বেই শার্লিমেন বাহিনীর এক বিরাট অংশ এবং কয়েকজন সেনাপতি তাদের হাতে নিহত হন। পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাসকারী এবং ক্রমেই নিজেদের শক্তি বর্ধনকারী ঐ ঈসায়ীরা যেন শার্লিমেনকে এজন্যে শাস্তি দিল যে, কেন তিনি মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে আসলেন।

শার্লিমেনের প্রত্যাবর্তনের পর হুসাইন ইব্‌ন আসী সুলায়মান ইয়াকযানকে হত্যা করে নিজ হাতে সারাকসতার শাসনভার এবং বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব তুলে নিলেন। তারপর আমীর আবদুর রহমানও কর্ডোভা থেকে সসৈন্য এসে সারাকসতায় উপনীত হলেন। তিনি কালবিলম্ব না করেই সারাকসতা অবরোধ করলেন। হুসাইন ইব্‌ন আসী আনুগত্য প্রকাশ করে সন্ধির আবেদন জানালেন। আমীর আবদুর রহমান তাঁর সে আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তা মঞ্জুর করলেন।

সারাকসতার ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে আমীর আবদুর রহমান ফ্রান্সের রাজার স্পেন অভিমুখে আগমনের জবাব স্বরূপ ফ্রান্স অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলেন। তিনি অনায়াসেই পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে ফ্রান্সের সমভূমিতে পদার্পণ করলেন। এ সময় ঈস্টার ইয়াসের ঈসায়ীরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পর্বত গুহায় বসে বসে তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা এটাকেই তাদের সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করছিল যে, আমীর আবদুর রহমান আমাদের দিকে দৃকপাত করছেন না, যেমনটি ইতিপূর্বেও কোন আমীর তাদের দিকে ফিরেও তাকাননি। যেহেতু ইতিমধ্যেই সেই ঈসায়ীরা, যাদেরকে পার্বত্য লুটেরা দস্যু বলে বিবেচনা করা হতো, শার্লিমেনের অনেক রসদপত্র লুটেপুটে নিয়েছিল এবং তাঁর বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, সেজন্যে আমীর আবদুর রহমান তাদের প্রতি দৃকপাত করার বা তাদের অনিষ্ট সাধনের কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করেন নি বরং তাদের অস্তিত্বকে তিনি অনেকটা তাঁর সহায়কই মনে করলেন, যারা ইতিপূর্বে কোনদিন স্পেনের শাহী ফৌজের কোন অনিষ্ট সাধন করেনি।

ফ্রান্সের সমভূমিতে পদার্পণ করে আমীর আবদুর রহমান দক্ষিণ ফ্রান্সের অর্ধেক অংশকে কঠোরভাবে পদদলিত করেন। অনেক দুর্গ এবং অনেক শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ধ্বংস করে দেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দ্রুতই তিনি সেদেশ থেকে সরে আসেন। শার্লিমেন দেশের উত্তর প্রান্তের দিকে সরে যান। তিনি দক্ষিণাংশের এ ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে একটুও রক্ষা করতে সমর্থ হলেন না। আমীর আবদুর রহমানেরও ফ্রান্সে দীর্ঘকাল অবস্থানের সুযোগ ছিল না, কেননা, তাঁর স্বদেশের এ অবস্থা উত্তমরূপেই জানা ছিল যে, সেখানে বিদ্রোহ ও অরাজকতার কত উপাদান বিদ্যমান। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর কর্ডোভা উপস্থিতির কয়েক মাস যেতে না যেতেই ১৬৫

হিজরীতে (৭৮১ খ্রি) সারাকসতা থেকে হুসাইন ইব্‌ন আসীর বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ এলো। আবদুর রহমান সে বিদ্রোহ দমনের জন্য গালিব ইব্‌ন তামামা ইব্‌ন আলকামাকে প্রেরণ করলেন। গালিব ও হুসাইনের মধ্যকার এ লড়াই প্রায় এক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু সে বিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। অগত্যা ১৬৬ হিজরীতে (আগস্ট ৭৮২-জুলাই ৮৩ খ্রি) আবদুর রহমান নিজে সারাকসতা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি হুসাইন ইব্‌ন আসীকে গ্রেফতার করে তাকে হত্যা করেন। এ সময় তিনি সারাকসতার শত শত বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড বিধান করেন এবং বাহ্যত এ বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। দীর্ঘ কয়েক বছর স্থায়ী এ হাঙ্গামাকালে আবুল আসওয়াদ তার অনভিজ্ঞতার জন্যে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। সে কোন মতে আত্মরক্ষা করে গোপনে অবস্থান করে এবং শাহী রোষানল থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সমর্থ হয়। বিদ্রোহ ঘোষণার মত কোন সর্দার যদিও বাহ্যত অবশিষ্ট ছিল না, আর আব্বাসী ষড়যন্ত্র পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, তবুও যাদের আত্মীয়-স্বজন বিদ্রোহের অপরাধে আবদুর রহমানের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাদের বুকে স্বজন হারানোর ব্যথা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। কিছু করিৎকর্মা লোক কাৎলুনায় আত্মগোপনকারী আবুল আসওয়াদকে বিদ্রোহের জন্যে উস্কানি দিতে লাগলো। ১৬৮ হিজরীতে (৭৮৪-৮৫ খ্রি) তার চুতর্দিকে এমন অনেক যুদ্ধপ্রিয় লোকের সমাবেশ ঘটলো। আবদুর রহমান তাদেরকে ওয়াদিয়া আহমর বা লোহিত উপত্যকার যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। তাঁরা তখন পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। ১৬৯ হিজরীতে (৭৮৫-৮৬ খ্রি) আবুল আসওয়াদ পুনরায় ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং আবদুর রহমানের মুকাবিলায় বার হাজার অনুচরকে মৃত্যুবরণে বাধ্য করে শেষ পর্যন্ত পলায়ন করে। পরবর্তী বছর ১৭০ হিজরীতে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) আবুল আসওয়াদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার সঙ্গী-সাথীরা যারা দস্যু-লুটেরার জীবন যাপন করছিল তার ভাই কাসিম ইব্‌ন ইউসুফকে তাদের নেতারূপে মনোনীত করে এবং স্বল্পকালের মধ্যে এক বিশাল বাহিনী তার পতাকাতলে সমবেত হয়। আমীর আবদুর রহমান তার ওপর আক্রমণ চালান। তুমুল যুদ্ধের পর তিনি কাসিম ইব্‌ন ইউসুফকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে সমর্থ হন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৭০ হিজরীতে (৭৮৬-৮৭ খ্রি) খলীফা হারূনুর রশীদ বাগদাদের খলীফার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শার্লিমেন আমীর আবদুর রহমানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে সন্ধির আবেদন করেন এবং তাঁর কাছে আপন কন্যাকে বিবাহ দানের প্রস্তাব দেন। আবদুর রহমান তাঁর সন্ধি প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাঁর কন্যাকে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করাতে শুকরিয়ার সাথে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। শার্লিমেনের কন্যা তাঁর রূপলাবণ্যের জন্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। আমীর আবদুর রহমান সম্ভবত এজন্যে তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে স্থান দিতে অসম্মত হন যে, ইতিপূর্বে রডারিকের স্ত্রী রাণী এজিওলোনা যেভাবে আমীর আবদুল আযীযের হেরেমে ঢুকে ইসলামী হুকুমতের অনিষ্টের কারণ হয়েছিলেন, শার্লিমেন তনয়াও তেমনিভাবে তাঁর হেরেমে ঢুকে সঙ্কটের হেতু হয়ে উঠতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। আমীর আবদুর রহমানের বয়সও তখন প্রায় ৫৭ বছর ছিল। এ বয়সে আমীর আবদুর রহমানের মত দিগ্বিজয়ী ও রাজ্য শাসনে ব্যস্ত শাসকের

নতুন নতুন বিবাহের শখ থাকার কথাও নয়। সম্ভবত কোন কোন ঐতিহাসিকের এ অভিমতও যথার্থ ছিল যে, সারাকসতার যুদ্ধের সময় আবদুর রহমানের উরুদেশে এমন একটি আঘাত লেগেছিল যে, তিনি স্ত্রী সঙ্গমের যোগ্যতা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছিলেন। যাই হোক, আবদুর রহমান শার্লিমেনের অপরাধ ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হন। শার্লিমেন এ কথাও সম্যক জানতেন যে, বাগদাদের খলীফা আবদুর রহমানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। এজন্যে বাগদাদের খলীফার নিকট থেকে তাঁর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা না থাকলেও একথাও তাঁর সম্যক জানা ছিল যে, বাগদাদের খলীফা যে কোন সময় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে পারেন। সুতরাং বাগদাদের নতুন খলীফার দরবারে দূত পাঠিয়ে তিনি তাঁর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁর সাথে তাঁর সখ্যতা প্রতিষ্ঠা এজন্যেও সহজ হবে বলে তিনি মনে করতেন যে, ইতিপূর্বে নতুন খলীফার পিতা মাহদীর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী তিনি স্পেনে সসৈন্য অভিযান চালিয়েছিলেন, তিনি জানতেন হারূনুর রশীদ অবশ্যই আমার প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবেন। শার্লিমেনের এ অনুমান যথার্থ প্রতিপন্ন হয়। খলীফা হারূনুর রশীদ শার্লিমেনের দূতদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদেরকে আপ্যায়িত করেন এবং শার্লিমেনের জন্যে তিনি উপঢৌকনস্বরূপ একটি ঘড়ি প্রেরণ করেন। শার্লিমেন কিন্তু তেমন বন্ধুবৎসল ছিলেন না। তাই তাঁর নিকট-প্রতিবেশী ইউরোপের ঈসায়ী রাজাদের সাথে তাঁর তেমন সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিল না। তিনি যদি প্রকৃতই বন্ধুবৎসল ও সম্প্রীতি সৃষ্টিকারী রাজা হতেন তা হলে ইউরোপের প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজাদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক থাকতো। কিন্তু বাগদাদের মত এত দূর-দূরান্তের দেশে দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে কী করে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অনুরূপভাবে হারূনুর রশীদও কেবল স্পেনের সালতানাতের বিরোধিতার স্বার্থেই শার্লিমেনের সাথে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারোই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। আবদুর রহমান বা তাঁর বংশধরদের কোন অনিষ্টই হারূনুর রশীদ বা শার্লিমেন করে উঠতে পারেন নি।

আবদুর রহমানের ওফাত

শার্লিমেনের সাথে সখ্যতা স্থাপিত হওয়ার পর আবদুর রহমানের আর কিছুই করণীয় ছিল না। কেননা, দেশব্যাপী তাঁর শাসন ও দাপট সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহীদেরকে পূর্ণভাবে দমন করা হয়েছিল। কারো আর মাথা তোলার উপায় ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন আবদুর রহমানের ভাগ্যে ছিল না। ১৭১ হিজরীতে (৭৮৭-৮৮ খ্রি) তাঁর ভৃত্য বদর এবং তার কতিপয় আত্মীয়-স্বজন এবং তার স্বগোত্রের লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাঁর হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিতে উঠে পড়ে লাগে। এমনও হতে পারে যে, আব্বাসীয়দের কোন গোপন তৎপরতার প্রভাবে এমনটি হয়েছিল। আবার স্পেনের প্রাচীন ঐতিহ্যও এসব অকপট বন্ধুকে কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। সে যাই হোক, আমীল আবদুর রহমান তাদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করে আফ্রিকায় দেশান্তরিত করাই সমীচীনবোধ করেন। এরপর আর আবদুর

রহমানের করণীয় বলতে কিছু ছিল না। তেত্রিশ বছর চার মাস কাল রাজত্ব করার পর ১৭২ হিজরীর রবিউসসানী (সেপ্টেম্বর ৭৮৮ খ্রি) মাসে ৫৮ বা ৫৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর পুত্র হিশাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

আবদুর রহমানের জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা

আবদুর রহমান ইব্‌ন উমাইয়ার জীবন-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর এ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্যে এ আলোচনা যথেষ্ট নয়। জীবনের কুড়ি বছর বয়ঃকাল পর্যন্ত তাঁর প্রধান ব্রত ছিল গ্রন্থপাঠ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাডেমিক আলোচনা-পর্যালোচনা। সৈনিক জীবনের কলাকৌশল রপ্ত করা সেকালে জরুরী বলে বিবেচিত হতো। কুড়ি বছরের শান্তিপূর্ণ জীবনের পর তাঁর জীবনে এমন এক সময়ও এলো যখন তিনি চোর-ডাকাতের মত আত্মগোপন করে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় যাকেই তিনি দেখতেন তাকেই তাঁর কাছে রক্তপিপাসু জল্লাদ বলে ধারণা হতো। তাঁর কাছে তখন আহার্য বা পরিধেয় পর্যন্ত ছিল না। উপর্যুপরি কয়েকটি বছর এরূপ অসহায় জীবন-যাপন এবং বনে-বাদাড়ে, মরুপ্রান্তরে ও দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে তিনি একটি রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। কিন্তু সে রাজত্বও তাঁর কাছে কোন সহজলভ্য গ্রাস বা শরবতের ঢোক ছিল না, বরং তা ছিল একটি আপদের পুঁটলী স্বরূপ– যা তাঁর মস্তকে তুলে দেয়া হয়েছিল। আবদুর রহমানের স্থলে অন্য কেউ হলে শুরুতেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আবদুর রহমান ছিলেন এক অদ্ভুত প্রাণ-শক্তির অধিকারী এবং দুর্বিনীত সাহসের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি স্পেনে একজন নির্বান্ধব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সাথে কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্পর্ক বা সখ্যতা ছিল না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যে বিপুল প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তা কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব ছিল।

সাথে সাথে তিনি একজন উঁচুদরের সিপাহসালার ও তরবারি চালকও ছিলেন। অথচ স্পেনে পদার্পণের পূর্বে কোনদিন তাঁর সেনাপতিত্বের বা তরবারি চালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও হয়নি। তিনি কোন যুদ্ধে বা রণক্ষেত্রে এমন কোন ত্রুটিও কোনদিন করেন নি, যার ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞ সেনাপতি কোন আপত্তি বা সমালোচনা করতে পারেন। যে সমস্ত যুদ্ধে তাঁর অভিজ্ঞ সেনাপতিরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতেন, সে সব যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করতেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি হতোদ্যম বা হতবুদ্ধি হন নি। অথচ বার বার তাঁর ওপর বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অহরহ এমন সব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ হয়েছে যে, তাঁর স্থলে অন্য কেউ হলে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেত এবং ধর্মীয় অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। অথবা নির্বোধের মত সে ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতো অথবা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতো। কিন্তু আবদুর রহমান সে মওকাই কোনদিন কাউকে দেন নি যে, তাঁর সাহসের শেষ সীমা বা তাঁর ধৈর্যের বাঁধ সম্পর্কে কেউ কোন ধারণায় উপনীত হতে পারে। তিনি সর্বক্ষেত্রে পরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তাঁর পরম ধৈর্যশীল আচরণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ কার্যধারা দেখে দর্শকের মনে

এ প্রতীতিই জন্মাতো যে, ইচ্ছে করলে তিনি এর চাইতেও অনেক বেশি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ।

তিনি জীবনে এমন কোন কাজ করেন নি, যদ্দ্বারা তাঁর মূর্খতা বা অজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটেছে বরং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে এমনই প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, যার চাইতে বেশি প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা কল্পনা করা যেতে পারে না।

তাঁর গোটা জীবন আমরা যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ দেখতে পাই। তাঁর এ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন দেখে কেউ একথা কল্পনাও করতে পারে না যে, আবদুর রহমান স্পেন দেশে এমন কোন কাজ করতে পারেন বা এমন কোন কীর্তি স্থাপন করতে পারেন যা কোন শান্তিপূর্ণ রাজ্যের সুলতানের দ্বারা সাধিত হওয়ার কথা কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু যখন জানতে পারা যায় যে, আমীর আবদুর রহমান স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে বিরাট কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন এবং তাঁর বংশধরদের রাজত্বকে স্থায়ী করার জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং দেশব্যাপী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকেই সবচাইতে জরুরী জ্ঞান করেছেন, তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মানুষ তখন এ গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী দূরদর্শী শাসকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমীর আবদুর রহমান কর্ডোভা ও অন্যান্য শহরের বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করান। স্পেনের অনেক শহরে-বন্দরে এবং গ্রামে-গঞ্জে তিনি অনেক মসজিদ নির্মাণ করে দেন। কর্ডোভা শহরে তিনি এমনি একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যে, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তার কাজ তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি, তা অপূর্ণ রেখেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যখন তার কাজ সমাপ্ত হলো, তখন তা তার পরিকল্পনাকারীর মাহাত্ম্য ও গগনস্পর্শী দৃষ্টিভঙ্গিরই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কর্ডোভার মসজিদের সৌন্দর্য ও অভূতপূর্ব স্থাপত্যকৌশল অনেক দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মুসলমানের দৃষ্টিতে তাকে খানা কা'বার মত পবিত্র ও মাহাত্ম্যপূর্ণ প্রতিপন্ন করেছিল। যদিও প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার তাবৎ মসজিদই সমমর্যাদাসম্পন্ন। স্থাপত্যবিলাসে আবদুর রহমানের স্থান যেমন ভারতবর্ষের সম্রাট শাহজাহানেরও ঊর্ধ্বে, তেমনি কর্মকুশলতা ও পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ব্যাপারে তিনি এরিস্টটলের সমকক্ষ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। স্পেনের মত দেশে নিজ রাজত্ব গড়ে তোলা তৈমুর ও নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের চাইতে অধিক কৃতিত্বের ব্যাপার।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তিনি হারূনুর রশীদ ও মামূনুর রশীদের চাইতে কোন অংশেই কম ছিলেন না বরং হারূন ও মামূনের পর আব্বাসীয়দের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কোন বিদ্যোৎসাহী খলীফার আবির্ভাব হয়নি। পক্ষান্তরে আবদুর রহমানের বংশধরদের মধ্যে এমন অনেকেরই জন্ম হয়েছে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে হারূন-মামূনের চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন আর এজন্যেই কর্ডোভার খ্যাতি বাগদাদকেও ছাড়িয়ে যায়।

ইব্‌ন হাইয়ান লিখেন ঃ "আবদুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয় এবং মার্জিত রুচির অধিকারী। তাঁর বক্তৃতা ছিল অলংকারসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল। তাঁর অনুভূতি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও শাণিত। কোন ব্যাপারে তিনি তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। কিন্তু একবার কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা সম্পন্ন করতেন। কোন কিছুই তাঁর সে সিদ্ধান্তকে টলাতে পারতো না। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দেখা দিলে তিনি সে ব্যাপারে তাঁর

উপদেষ্টা ও আমলাদের সাথে পরামর্শ করতেন। আবদুর রহমান অত্যন্ত জানবাজ, সাহসী এবং বীরপুরুষ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তিনিই শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাতেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের ওপরই তাঁর চেহারার গাম্ভীর্যের প্রভাব পড়তো। জুমুআর দিন তিনি নিজে জামে মসজিদে খুতবা দিতেন। রোগীদের কুশলবার্তা জানবার জন্যে নিজে তাদের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং বিবাহ-শাদী ও আনন্দ অনুষ্ঠানসমূহে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যোগদান করতেন।"

আমীর আবদুর রহমানের আমলে একে একে যাঁরা কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. তামাম ইব্‌ন আলকামা
২. ইউসুফ ইব্‌ন বখ্‌ত
৩. আবদুল করীম ইব্‌ন মাহরান
৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুগীছ
৫. মানসূর খাজাসরা

আবদুর রহমান কোন কোন ব্যক্তিকে উযীর পদে মনোনীত করেছেন, কিন্তু কোন উযীরই কোনদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছেন নি যে, তিনি কেবল তাঁর কথামতই কাজ করে গেছেন বা তাঁর পরামর্শের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তিনি একটি মজলিসে ওমারা বা পরামর্শ-পরিষদ গঠন করে রেখেছিলেন, যাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর সে পরামর্শ পরিষদের সদস্যরা ছিলেন ঃ

১. আবূ উসমান
২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ
৩. আবূ উবায়দা
৪. শাহীদ ইব্‌ন ঈসা
৫. ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ
৬. আসিম ইব্‌ন মুসলিম।

দৈহিক অবয়ব এবং সন্তান-সন্ততি

আবদুর রহমান অত্যন্ত সুদর্শন, দীর্ঘদেহী ও একহারা গঠনের লোক ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফর্সা এবং কেশ ছিল ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কাল। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর ঘ্রাণশক্তি কম ছিল বলে লিখেছেন। মৃত্যুকালে তিনি নয়টি পুত্র এবং এগারটি কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন সুলায়মান– যাকে তিনি ফুরাত নদীর তীর থেকে বগলদাবা করে পালিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হিশামকে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, যে শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে আবদুর রহমান দেশত্যাগ করে পালিয়েছিলেন, সে সন্তানটি তাঁর স্পেনে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সে যাই হোক, তাঁর মৃত্যুকালে উপস্থিত সন্তানদের মধ্যে সুলায়মান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। কিন্তু হিশাম

তাঁর ভাই সুলায়মানের চাইতে সিংহাসন ও রাজ্য পরিচালনায় যোগ্যতর পাত্র ছিলেন। এজন্যে আবদুর রহমান তাঁকেই তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে মনোনীত করেন।

শাসন-শৃঙ্খলা

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, আমীর আবদুর রহমানের চরিত্র মাহাত্ম্য ও বদান্যতার প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহীরা তাঁকে কঠোর হতে বাধ্য করে। তাঁর স্বভাবগত ঝোঁক ছিল জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার দিকে, কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে তাঁকে হতে হয় একজন কুশলী ও অভিজ্ঞ সিপাহসালার। আবদুর রহমানের প্রথম জীবন কাটে দামেশকের রাজপ্রাসাদে অত্যন্ত জাঁকজমক ও আরাম-আয়েশের মধ্যে। কিন্তু যখন বিপদাপদ এবং দারিদ্র ও নিঃস্বতার পালা এলো, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে ও সাহসিকতার সাথে তা বরণ করে নিলেন। তাঁর রাজ্য কায়েম হতে না হতেই তিনি পূর্বাঞ্চলের দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে নিজ ব্যয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বনূ উমাইয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে স্পেনে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের প্রত্যেককেই তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চপদে আসীন করেন। আবদুর রহমানের প্রতিভা, পরিণামদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা তাঁর শত্রুরাও করতো। তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে নীরবে বরণ করে নিতেন।

আবদুর রহমান তাঁর বিজিত রাজ্যকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একজন সেনাপ্রধান থাকতেন। সেনাপ্রধানের অধীনে দুজন করে আমিল এবং ছয়জন করে উযীর থাকতেন। কাযী এবং অন্যান্য আমলারা তাদেরকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। রাজ্যের সদর দফতর কর্ডোভায় তাঁরা প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করতেন। আবদুর রহমান সর্বদা তাঁর প্রজাসাধারণের হিতসাধনে ব্রতী থাকতেন। তিনি এমনি শাসন-নীতি প্রবর্তন করেন যে, প্রজাসাধারণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল এবং বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই তারা তাদের ধন-সম্পদ অবাধে ভোগ করতে পারতো।

আবদুর রহমান শিক্ষা-দীক্ষা এবং কলা ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন। গোটা স্পেনদেশে তিনি সড়কজাল বিস্তার ও ডাকের প্রচলন করেন। প্রত্যেকটি মঞ্জিলে তিনি ঘোড়া রাখতেন যাতে স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের দূরবর্তী স্থানের সংবাদও রাজধানী কর্ডোভায় পৌঁছাতে পারে।

আবদুর রহমান পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে দস্যুবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করেন। যে বার্বাররা কোনদিন তাদের স্বভাবজাত দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হতো না, তারাও সর্বপ্রথম আবদুর রহমানের আমলেই দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসতে বাধ্য হয়। আবদুর রহমান সর্বদা তাঁর বিজিত রাজ্যসমূহে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে তাঁর আমিলরা প্রজাসাধারণের সাথে কী আচরণ করে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যেখানেই আমীর যেতেন, সেখানেই তিনি অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতেন এবং লোকজনের চরিত্র সংশোধন এবং তাদের কল্যাণমূলক কার্যাদি করতেন।

আমীর আবদুর রহমানের বদান্যতার দ্বার সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিল। সকলেই তাঁর বদান্যতা থেকে উপকৃত হতো। যদিও তিনি রাজ্যের সর্বত্র মসজিদ ও সমাজকল্যাণমূলক

প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন, কিন্তু রাজধানী কর্ডোভার শানশওকত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সুদৃশ্য প্রাসাদাদি নির্মাণের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। শাহী প্রাসাদের সম্মুখে তিনি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করেন। স্পেন দেশের এটাই ছিল সর্বপ্রথম খেজুর বৃক্ষ। কর্ডোভার উপকণ্ঠে তিনি তাঁর পিতামহের রুসাফা নামক বাগিচার নামে রুসাফা নামক একটি কুঞ্জবন নির্মাণ করেন। তিনি কর্ডোভায় একটি টাকশাল নির্মাণ করেন, যেখানে সিরিয়ায় প্রচলিত ও দামেশকে ঢালাই করা দীনার ও দিরহামের অনুরূপ দীনার দিরহাম ঢালাই করা হতো। তিনি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীদের কর্ডোভায় আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের জ্ঞান-গরিমার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করেন। গবেষণা ও দার্শনিক আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক মজলিস-সেমিনার অনুষ্ঠান করেন। আপন পুত্রদেরকে তিনি সর্বোচ্চ পন্থায় শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে শাহী দফতরসমূহে এবং কাযীদের বিচারসভায় উপস্থিত হয়ে রাজকার্যাদি প্রত্যক্ষ করার নির্দেশ দেন। গুরুত্বপূর্ণ বিচারসমূহের রায় এবং রাজকীয় দলীল-দস্তাবেজ শাহযাদাদেরকে দেখবার জন্যে দেয়া হতো।

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কবি-সভা ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা হতো। উচ্চাঙ্গের কবিতা এবং বিতর্কের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করা হতো। স্পেনের বিলাসিতাপূর্ণ আবহাওয়া এবং প্রাচুর্যের আধিক্য আমীর আবদুর রহমানের সৈনিকসুলভ চরিত্রের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়নি। তাঁর তাকওয়া-পরহিযগারী ও ধর্মপরায়ণতায় কোনদিন সামান্যতম ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়নি। কর্ডোভায় বিশ্ববিখ্যাত মসজিদটির জন্য যে স্থানটি সবচাইতে শোভনীয় ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়, ঐ স্থানটি ছিল খ্রিস্টানদের মালিকানাধীন। আমীর আবদুর রহমান তা জবরদখল বা হুকুমদখল করাটাকে সঙ্গতবোধ করেননি। যখন ঈসায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তা বিক্রি করতে উদ্যত হয়, কেবল তখনই আমীর তা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন এবং শহরের একাধিক স্থানে তাদের গির্জা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

আমীর আবদুর রহমানের চরিত্রে সে সব গুণ-গরিমাই বিদ্যমান ছিল, যা একজন বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ-রাজনীতিক এবং প্রগতিশীল চিন্তাসম্পন্ন শাসকের মধ্যে থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যে তারিখে আমীর আবদুর রহমান স্পেনে পদার্পণ করেন, ঠিক সে তারিখটি থেকেই স্পেন দেশ পূর্বাঞ্চলীয় ইসলামী খিলাফতের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমীর আবদুর রহমান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে নিজেকে 'আমীর' বলেই অভিহিত করেন, খিলাফতের বা নিজে খলীফা হওয়ার ঘোষণা দেন নি। দীর্ঘ দশ বছর পর তিনি খুতবায় নিজ নাম পাঠ করেন। আবদুর রহমান এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, স্পেনে এমনও অনেক লোক রয়েছে যারা উমাইয়া বংশের লোকজনকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। তাঁরা আব্বাসীয়দেরকে মনে মনে ভালবাসে। তাঁরা সাধারণভাবে মুসলিম রাজ্যসমূহের কেন্দ্র একটিই বলে মনে করে আর তা হচ্ছে, পূর্বের ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র বাগদাদ। আমীর আবদুর রহমান যদি নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করতেন, তাহলে সমস্ত মুসলমান নিশ্চয়ই অসি হস্তে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। আর তখন আবদুর রহমানকে তাঁরা এক উদ্ধত

যুবক বলে ধারণা করতো। স্পেনে মুসলমানদের সে মনোভাবকে ক্রমান্বয়ে তিনি শুধরে নেন। অবশেষে তৃতীয় আবদুর রহমান যথাযথ সময়ে নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন বলে আখ্যায়িত করেন।

অন্য এক ঐতিহাসিক লিখেন ঃ আবদুর রহমানের ভাষণ ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং চিত্তাকর্ষক। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন, সমঝদার এবং সমন্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত গোছানো, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত। কোন কাজে তিনি তড়িঘড়ি করতেন না। কিন্তু যে কাজ করতে একবার মনস্থির করে ফেলতেন, তা তিনি সমাপ্ত না করে ছাড়তেন না। ক্রীড়াকৌতুক এবং অপ্রয়োজনীয় আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতাকে তিনি কাছেও ঘেঁষতে দিতেন না। অধিকাংশ সময়ই শুভ্র পোশাক পরতেন। অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকদের সহজে ও অবাধে তাঁর দরবারে আসার সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বাররক্ষী তুলে দিয়েছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁর আহার্য গ্রহণকালে কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে এলে তিনি তাকেও দস্তরখানে বসিয়ে একত্রে আহার্য গ্রহণ করতেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া পৃথিবীর সেই সব মহান ব্যক্তির অন্যতম যাঁরা জাতিসমূহকে উজ্জীবিত করার, সাম্রাজ্য গড়ে তোলার এবং পৃথিবীর বুকে বিরাট পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এ বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্যে সুখ্যাতির গগনে তিনি একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান ও চির অমর হয়ে আছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়ার উপরোক্ত জীবন-কাহিনী সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন, কি অসাধারণ মেধা ও মন-মস্তিষ্কেরই না তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসনীয় গুণ ছিল তাঁর সৈনিকসুলভ জীবন। কর্ডোভার মসজিদ নির্মাণকালে তিনি স্পেনের আমীর হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ দীন মজুরের মত তাদের সাথে কাজ করাকে এবং পাথর বহন করাকে মোটেই দোষের মনে করেননি।

হিশাম ইব্‌ন আবদুর রহমান

আমীর আবদুর রহমান ইবন মুআবিয়া ওরফে আবদুর রহমান আদ-দাখিল যদিও নিজেকে আমীর বলেই অভিহিত করতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন স্পেনের প্রথম খলীফা। একজন খলীফার চরিত্রে যে সব গুণ ও শর্তাবলী থাকা দরকার তার সবটাই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তাঁর বংশধরদের একজন অর্থাৎ তৃতীয় আবদুর রহমানই সর্বপ্রথম খলীফা উপাধি ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের উচিত হিশাম এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে সুলতান বা খলীফা হিসেবে আখ্যায়িত করা।

জন্ম

সুলতান হিশাম ইবন আবদুর রহমান তাঁর পিতার স্পেনে পদার্পণের পর ১৩৯ হিজরীর শাওয়াল (৭৫৭ খ্রি এপ্রিল) মাসে ভূমিষ্ঠ হন। হিশামের মা উম্মে হিলাল স্পেনের সাবেক আমীর ইউসুফ ফাহরীর সাথে আবদুর রহমানের সন্ধিকালে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত

হয়েছিলেন। আবদুর রহমান তাঁকে স্বাধীনতা প্রদান করে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। তিনি উক্ত মহিলাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

অভিষেক

৩২ অথবা ৩৩ বছর বয়ঃক্রমকালে হিশাম তাঁর পিতার ওসীয়ত অনুসারে ১৭২ হিজরীতে (৭৮৮-৮৯ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুর রহমানের ইন্তিকালের সময় তিনি মারীদা শহরে তথাকার গভর্নররূপে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোটা স্পেন দেশে তাঁর নামে খুতবা পঠিত হয়। কর্ডোভায় তাঁর সহোদর আবদুল্লাহ্ও ছিলেন। তিনি হিশামের বিরোধীরূপে রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভা শহরে নিজ দখল কায়েম করেন। ওদিকে টলেডোতে তাঁর অপর সহোদর সুলায়মান গভর্নর ছিলেন। হিশাম মারীদা শহর থেকে কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ছোটখাট যুদ্ধের পর তিনি আবদুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে কর্ডোভা অধিকার করেন এবং পুনরায় যথারীতি অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। এ উপলক্ষে তিনি তাঁর সহোদর আবদুল্লাহ্কে ক্ষমা করে তাঁকেও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তাঁকে একটি বড় জায়গীরও প্রদান করেন।

ভাইদের বিদ্রোহ ঘোষণা

স্পেনে পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী লোকের বাস ছিল। বিশেষ করে আমীর আবদুর রহমানের ইন্তিকালের সময় দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিতে পারতো। কিন্তু আমীর আবদুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় বিদ্রোহীদেরকে এমনভাবে পরাস্ত করেছিলেন যে, তাদের আর মাথা চাড়া দেয়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু বাইরের সে শত্রুদের পরিবর্তে স্বয়ং হিশামের ভাইয়েরাই ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁর শাসনের প্রারম্ভেই তাঁর জন্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি করলেন। অচিরেই লোকজন উপলব্ধি করতে পারলো যে, আমীর আবদুর রহমান উত্তরাধিকারী মনোনয়নে একটুও ভুল করেননি। টলেডোর গভর্নর সুলায়মান বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এদিকে আবদুল্লাহ্ও কর্ডোভা থেকে পলায়ন করে অগ্রজ সুলায়মানের কাছে গিয়ে উঠলেন। সুলতান হিশাম ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্রোহের কথা অবগত হয়েও তাঁদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করলেন। তিনি ভাবলেন, দু'দিন পরে তাঁরা নিজেরাই তাদের ভুল বুঝতে পেরে শুধরে যাবেন।

ভাইদের সাথে যুদ্ধ

টলেডোতে সুলায়মানের উযীর গালিব ছাকাফী ছিলেন আমীর আবদুর রহমানের একজন অতি অনুগত সর্দার। তিনি উক্ত দু'ভাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ উল্টা বুঝলেন। তাঁরা গালিব ছাকাফীকে উযীর পদ থেকে বরখাস্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর বন্দীত্বের সংবাদ পেয়ে হিশাম কর্ডোভা থেকে দূত মারফত টলেডোতে ভাইদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, পিতার এরূপ একজন বিশ্বস্ত ও চির-অনুগত

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা কোনমতেই সমীচীন হয়নি। সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ এতে উত্তেজিত হয়ে দূতের সম্মুখেই কারাগার থেকে আনিয়ে গালিব ছাকাফীকে হত্যা করলেন এবং দূতকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, এটাই হচ্ছে পত্রের জবাব। সুলতান হিশাম দূতমুখে পত্রের এহেন জবাবের কথা অবগত হয়ে কর্ডোভা থেকে বিশ হাজার সৈন্যসহ টলেডো অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। এদিকে সুলায়মান এবং আবদুল্লাহ্ও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। টলেডোর অদূরেই উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ পরাস্ত হয়ে টলেডোতে ফিরে গিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। টলেডোর দুর্গটি একটি সুরক্ষিত দুর্গরূপে বিখ্যাত ছিল। এটা জয় করা ছিল সুকঠিন। হিশাম টলেডো অবরোধ করলেন। সুলায়মান তাঁর পুত্র এবং ভাই আবদুল্লাহ্কে টলেডোতে রেখে নিজে একদল সৈন্য নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। কর্ডোভায় তখন গভর্নর ছিলেন আবদুল মালিক। সুলায়মানের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি কর্ডোভার অদূরেই তীর ও শমশের দিয়ে সুলায়মানকে অভ্যর্থনা জানালেন। পরাজিত হয়ে সুলায়মান মারসিয়ার দিকে পালিয়ে যান। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটপাট করে ফিরতে থাকেন। এ অবস্থা লক্ষ্যে সুলতান হিশাম টলেডো অবরোধে একজন সর্দারকে রেখে নিজে রাজধানী কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, যাতে সেখানে বসে সুলায়মানের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সহজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে আবদুল্লাহ বিনা শর্তে এবং প্রাণ ভিক্ষা বা নিরাপত্তা প্রার্থনা না করেই হিশামের কাছে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। তিনি অবরোধকারী জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কর্ডোভায় এসে সুলতানের দরবারে হাযির হন। সুলতান হিশাম ভাইয়ের অপরাধ মার্জনা করেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন। আবদুল্লাহ্র প্রতি তাঁর মনে যে আর কোন কালিমা নেই, তাঁর প্রমাণ্ স্বরূপ তিনি তাঁকে টলেডোতেই জায়গীর দিয়ে বিদায় করেন।

সুলায়মান মারসিয়াতে অনেক লোকের একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। সুলতান তাঁর কিশোরপুত্র হাকামকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করে তার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলেন। উভয়পক্ষের মুকাবিলা হলে সুলায়মান হাকামের হাতে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন। তাঁর গোটা বাহিনী নিহত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর দু'বছর কাল ধরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ পর্যন্ত অগত্যা ১৭৪ হিজরীতে (৭৯০-৯১ খ্রি.) সুলায়মান সুলতান হিশামের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন জানান। সুলতান হিশাম তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর আবেদনে সাড়া দেন এবং ভাইকে নিজ দরবারে সসম্মানে বরণ করেন। সুলায়মান জানান যে, স্পেনে থাকাটা আর তাঁর মনঃপূত নয়, তাই তিনি আফ্রিকায় চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হিশাম প্রসন্ন মনে তাঁকে সে অনুমতি দান করেন এবং স্পেনে তাঁর নামে যে জায়গীর ছিল তা সত্তর হাজার মিছকাল মূল্যে তার নিকট থেকে ক্রয় করে নেন। সুলায়মান আফ্রিকায় গিয়ে স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানে আব্বাসীয়দের এজেন্টরূপে কাজ করেন। তিনি সর্বদা পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে স্পেনবাসীদেরকে বিদ্রোহের উস্কানি দিতেন।

ফ্রান্স আক্রমণ

ভাইদের দিক থেকে ঝামেলামুক্ত হয়ে সুলতান হিশাম চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরি করে ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং আমীর আবদুর রহমানের আমলে মুসলমানদের গৃহবিবাদের সুযোগে ফরাসীদের কেড়ে নেয়া দক্ষিণ ফ্রান্স এবং আরবুনিয়া প্রদেশের রাজধানী নার্বুন শহর পুনর্দখল করেন। এখানে অকল্পনীয় ধনভাণ্ডার মুসলমানদের দখলে আসে। দেশে প্রত্যাবর্তনকালে পিরেনীজ পর্বতের অধিবাসী খ্রিস্টানদের ঔদ্ধত্যের নমুনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ঐ ঈসায়ী রাজ্যটি মুসলমানদের অনবধান ও গাফলতি এবং খ্রিস্টানদের চাতুর্যের বদৌলতে পর্বতের পাদদেশে গড়ে উঠেছিল। আজ পর্যন্ত এ ঈসায়ী রাজ্যটি কোনদিন মুসলিম বাহিনীর সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়নি। এজন্যে মুসলমানরা এ রাজ্যটির অস্তিত্বকে ক্ষতিকর বলে ভাবেননি। তাই তাঁরা একে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে দেন। ইসলামী বাহিনী যখন ফ্রান্স জয় করে এবং শার্লিমেনকে তাড়িয়ে দিয়ে বিজয়লব্ধ গনীমত সম্ভার নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন ঈস্টার ইয়াসের খ্রিস্টানগণ মুসলিম সৈন্যদের পশ্চাৎভাগে হামলা চালিয়ে ঠিক সেরূপ লুটপাট করতে উদ্যত হয় যেমনটি ইতিপূর্বে তারা শার্লিমেনের বাহিনীর সাথে পিরেনীজ পর্বতে করেছিল এবং তার একট বিরাট অংশের ধ্বংস সাধন করেছিল। কিন্তু শার্লিমেন ও হিশামের বাহিনীর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল।

পার্বত্য ঈসায়ীদের উৎখাত

সুলতান হিশাম কর্ডোভা পৌঁছেই ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি.) তার উযীর ইউসুফ ইব্‌ন বখতকে এ পার্বত্য ঈসায়ীদের দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ইউসুফ ইব্‌ন বখত ঈস্টার ইয়াস রাজ্য আক্রমণ করে তা ধূলিসাৎ করে দেন। ঈস্টার ইয়াসের খ্রিস্টানদের এটাই ছিল মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার প্রথম অভিজ্ঞতা। তারা শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হয় এবং তাদের নেতা বরমিউডর গ্রেফতার হয়। জয়ের পর মুসলমানরা যখন লক্ষ্য করলেন যে, এ অনুর্বর পার্বত্য রাজ্যটি তাদের বসবাসের উপযোগী নয়, তখন তারা তা পুনরায় ঐ খ্রিস্টান শাসকের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে তার নিকট থেকে আনুগত্য ও কর প্রদানের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ ফ্রান্সের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খুমুস দিয়ে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ

দক্ষিন ফ্রান্স এবং ঈসায়ী প্রদেশসমূহ থেকে মুসলমানরা যে বিপুল গনীমত সম্ভার লাভ করেন তার এক-পঞ্চমাংশ বা খুমুসরূপে ৪৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা সুলতান হিশামের হস্তে অর্পণ করা হলো। সুলতান হিশাম তার সম্পূর্ণটাই কর্ডোভার মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে ব্যয় করেন।

আরবুনিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমন

আবদুল মালিক এ অভিযানকালে এক অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তিনি জালীকিয়া, ঈস্টার ইয়াস, আরবুনিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে যুদ্ধকালে গ্রেফতার কৃত খ্রিস্টানদেরকে নার্বুন শহরে

এ ফরমান শুনিয়ে দেন যে, তোমাদের মুক্তিপণ হচ্ছে, তোমরা নার্বুন শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে তার পাথর কর্ডোভায় পৌঁছিয়ে দেবে। সত্যি সত্যি ঐ খ্রিস্টান বন্দীরা নার্বুন শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে তার পাথর কর্ডোভায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কর্ডোভা এবং নার্বুন শহরের দূরত্ব ছিল কয়েকশ ক্রোশের। পথে অনেক নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত এবং দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করতে হয়। এক একজন বন্দী এক একটি ছোট পাথর খণ্ড নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়। যে সব প্রস্তর খণ্ড আকারে বড় ছিল সেগুলোকে গাড়িতে রেখে কয়েদীরা তা টেনে নেয়। মধ্যম আকারের পাথরগুলো দু'জন কয়েদী ডুলির মত করে বেঁধে বাঁশ বা কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে লটকিয়ে বহন করে নিলো। এভাবে নার্বুন শহরের বেষ্টনী প্রাচীরের যে পরিমাণ পাথর উক্ত কয়েদীদের পক্ষে বহন করা সম্ভবপর ছিল, তা তারা বহন করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন মঞ্জিলে থেমে থেমে শাহী ফৌজের একটি বাহিনীর তত্ত্বাবধানে তারা তা কর্ডোভা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ পাথর দিয়ে কর্ডোভা মসজিদের পূর্ব প্রাচীরের একটি অংশ নির্মিত হয়। আবদুল মালিক তাদের নিকট থেকে এ শ্রম আদায় করে নিয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যি সত্যি তাদেরকে মুক্ত করে দেন। শাস্তি প্রদানের পর ঈসায়ী রাজ্যগুলোর আনুগত্যের শপথ নিয়ে আবার ঈসায়ীদের হাতেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। কেননা উত্তরের এ পার্বত্য এলাকা শীতল আবহাওয়ার জন্যে আরব সর্দারদের কাছে মনঃপূত বা আকর্ষণীয় ছিল না। তারা এগুলোকে মূল্যবান ভূখণ্ড বলেও বিবেচনা করতো না। এ কারণেই উত্তরের এ সব অঞ্চলে মুসলিম বাসিন্দাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ স্পেনে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আর এ অঞ্চলের ঈসায়ী অধিবাসীদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমের সংখ্যাও বেশি ছিল।

কর্ডোভা মসজিদের কাজের পূর্ণতা বিধান এবং ওয়াদিউল কবীরে পুল পুনর্নির্মাণ

সুলতান হিশাম তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়ার কর্ডোভা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হন। ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি.) তিনি তার পুত্র হাকামকে টলেডোর গভর্নররূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৬ হিজরীতে (৭৯২ খ্রি) তিনি কর্ডোভার ওয়াদিউল কবীর নদীর সেতু পুনর্নির্মাণ করেন। এ সেতুটি আমীর সামাহ্ হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের আমলে সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। এবার সুলতান হিশাম সেতুটিকে আরো প্রশস্ত, মজবুত ও সুন্দরভাবে পুনর্নির্মাণ করালেন। এ পুল নির্মাণ সমাপ্ত হলে তাঁর কানে এ আওয়াজটি এলো যে, সুলতান তাঁর নিজের সাত্তায় যাওয়া-আসার সুবিধার জন্যে এ পুলটি নির্মাণ করিয়েছেন। এ কথা শুনে সুলতান জীবনেও কোনদিন এ পুলের ওপর পা রাখেন নি। যেহেতু আব্বাসী এজেন্টরা গোপনে গোপনে স্পেনে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেত, এদিকে স্বয়ং সুলতান হিশামের ভাই সুলায়মান আফ্রিকা অর্থাৎ মরক্কোতে বসে বসে মুসলমান ও ঈসায়ীদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, উত্তর দিকে হারূনুর রশীদের সাথে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ শার্লিমেন এ জাতীয় প্রচেষ্টায় অহরহ লিপ্ত ছিলেন। ফলশ্রুতিতে জালীকিয়া প্রদেশের নবজাত ঈসায়ী, ফরাসী এবং স্পেনীয়

উস্কানিদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। সুলতান হিশাম একটুও কালবিলম্ব না করে আবদুল করীম ইব্‌ন আবদুল ওয়াহি ইব্‌ন মুগীছকে ডেকে পাঠিয়ে জালীকিয়ার দিকে প্রেরণ করলেন। ইসলামী বাহিনী জালীকিয়ায় উপনীত হয়ে বিদ্রোহীদেরকে অবনত করে এবং তাদের নিকট থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে ফিরে আসে। এ বিদ্রোহ দমন হতে না হতেই বার্বাররা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান হিশাম তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে হযরত আমীর মুআবিয়ার খাদিম আবদুল্লাহ্‌র পৌত্র আবদুল কাদির ইব্‌ন আবানকে প্রেরণ করেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আবদুল কাদির বার্বারদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং হাজার হাজার বিদ্রোহীকে হতাহত করেন। এটা ১৭৮ হিজরীর (এপ্রিল ৭৯৪-মার্চ '৯৫ খ্রি) ঘটনা। ১৭৯ হিজরীতে (এপ্রিল ৭৯৫-মার্চ '৯৬ খ্রি.) ফরাসীদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে জালীকিয়াবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন মুগীছকে সসৈন্য সেদিকে রওয়ানা করেন এবং তাঁকে আদেশ দেন যে, জালীকিয়া এলাকার মধ্য দিয়ে তাঁরা যেন ফ্রান্সে ঢুকে পড়েন এবং অপর পার্শ্ব দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশকারী বাহিনীর সাথে যেন তারা গিয়ে মিলিত হন। সে মতে আরেকটি বাহিনীকে অন্য পথে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ অবগত হয়ে জালীকিয়ার ঈসায়ী নেতা উফুনুশ সমস্ত পথঘাট ও শহর ছেড়ে ইসলামী বাহিনীর অগ্রে অগ্রে পাহাড়ে পর্বতে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। আবদুল মালিক যেহেতু বেশি দিন জালীকিয়ায় অবস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই বিদ্রোহী নেতাকে পালাতে দেখে তিনি ফ্রান্সের সীমানায় ঢুকে পড়েন এবং ফ্রান্সের অধিকাংশ শহর এবং দুর্গ জয় করে সেগুলোকে ধূলিসাৎ করেন এবং জয়যুক্ত হয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

ওফাত

১৮০ হিজরীর সফর (এপ্রিল ৭৯৬ খ্রি) মাসে সুলতান হিশাম ইব্‌ন আবদুর রহমান সাত বছর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর চল্লিশ বছর চার মাস বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হিশামের জীবনী পর্যালোচনা

কর্ডোভার মসজিদ নির্মাণে আমীর আবদুর রহমান আশি হাজার দীনার ব্যয় করেন। সুলতান হিশাম এ কাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় করেন এক লক্ষ ষাট হাজার দীনার। সুলতান হিশাম তাঁর পিতারই মত সাদা রঙের কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিধা এবং স্বল্পমূল্যের পোশাক পরতেন। তাঁর শিকারের বেজায় শখ ছিল। কিন্তু তাঁর এ শখ ততটা ছিল না, যতটা রাজকার্য এবং ধর্ম কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। শেষ বয়সে তাও তিনি ছেড়ে দেন। অভাবগ্রস্তদের জন্য সর্বদা তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। অত্যাচারিত ব্যক্তিরা তাদের ফরিয়াদ জানাবার পথে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হতো না। অনটনগ্রস্তদের খোঁজখবর নেবার জন্যে তিনি রাতের আরামকে হারাম করতেন। পথিক মুসাফিরদেরকে নিজে ডেকে নিয়ে আহার্য প্রদান করতেন। আঁধার রাতে শহরের অলিগলিতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং অভাবগ্রস্ত বিধবা ও

নিঃস্বদের সাহায্য করে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করতেন। চোর, ডাকাত ও অপরাধীদের নিকট থেকে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ রাজকোষে জমা করার পরিবর্তে প্রজাসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হতো। যুদ্ধবিগ্রহে ঘটনাচক্রে যারা ঈসায়ীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়তেন, তাদেরকে সরকারী তহবিল থেকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনা হতো।

সুলতান হিশাম কোন একটি মুসলমান বন্দীকেও ঈসায়ীদের হাতে বন্দী থাকতে দেননি। তন্ন তন্ন করে খুঁজে তিনি সকলকেই আযাদ করে দেন। একবার স্পেনের জনৈক মুসলমান ব্যক্তি মৃত্যুকালে ওসীয়ত করেন যে, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যেন একজন মুসলমান কয়েদীকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। কিন্তু সমস্ত ঈসায়ী রাজ্য খুঁজে কোথাও একজন মুসলমান কয়েদী পাওয়া গেল না। কেননা, সুলতান হিশাম নিজেই ইতিপূর্বে সকল মুসলমান কয়েদীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। একদা সুলতান হিশাম একটি বাড়ি ক্রয় করবার উদ্দেশ্যে বাড়ির মালিকের সাথে দামদর করছিলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ বাড়িটির নিকটেই বসবাসকারী অন্য এক ব্যক্তি ঐ বাড়িটি কেনার জন্য আগ্রহী। কিন্তু যেহেতু নিজে ঐ বাড়িটি কেনার জন্যে দামদস্তুর করছেন, তাই ঐ ব্যক্তি সুলতানের ভয়ে তা কেনার ইচ্ছা ছেড়ে দিয়েছে। এ কথা শুনতে পেয়ে সুলতান গোটা রাজ্যে অভিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ এমন কিছু লোক নিয়োগ করলেন, যারা প্রদেশসমূহের গভর্নরদের শাসন পদ্ধতি, তাদের বিচার-ইনসাফ এবং দফতরসমূহের কার্যকলাপ যাচাই করতেন এবং প্রতিটি প্রদেশে সরেজমিনে গিয়ে সে সব প্রদেশের জনগণের নিকট থেকে শাসকদের ব্যাপারে অভিযোগাদি শ্রবণ করতেন।

সুলতান হিশামের রাজত্বকালে কর্ডোভা নগরীতে সেখানকার আমীর-উমারা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বড় বড় মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আর জ্ঞান-চর্চার মজলিসসমূহ অনুষ্ঠান তো আমীর আবদুর রহমানের যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুলতান হিশামের যুগে তার আরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়। সর্বোপরি তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই স্পেনের ঈসায়ীরা আরবী ভাষা রপ্ত করে কুরআন শরীফ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এদের অনেকেই পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের প্রতি তাদের পর পর ভাব এবং ঘৃণা অনেকটা দূরীভূত হয়ে যায়। মুসলমান ও ঈসায়ীদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরবী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় তা ইসলামের প্রচার-প্রসারে বেশ সহায়ক হয়। ঈসায়ীদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হয়। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের ত্রুটিসমূহ নিজেরাই অনুভব করতে সমর্থ হয়। মুসলমান ও ঈসায়ী উভয় জাতির লোকেরা একে অপরকে রেয়াত করতে শুরু করে এবং অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, সাধারণভাবে মুসলমানরা ঈসায়ী রমণীদেরকে বিবাহ করতে শুরু করে। ঈসায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে শুরু করে দেয়। সুলতান হিশামের চরিত্র ও জীবন পদ্ধতিতে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে অনেকটা সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। স্পেনের প্রজাসাধারণ তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ সুলতান' বলে অভিহিত করে এবং এ নামেই সর্বত্র তিনি আলোচিত হতেন।

সুলতান হিশাম তাঁর পিতা আবদুর রহমানের চাইতেও অধিকতর আবেদ-যাহেদ ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আমীর আবদুর রহমানের প্রতিপত্তি এবং তাঁর রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি ইসলামী পণ্ডিত এবং ইসলামী পণ্ডিত ধরনের লোকদের শাহী দরবারে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন ও প্রতিপত্তি অর্জনের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান হিশামের রাজত্বকালে শাস্ত্রজ্ঞ ফকীহ্‌দের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সবার ওপরে।

ঐ আমলে ফকীহ্‌গণের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের ভিত্তি রাখা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। হযরত ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর মদীনায় খুব খ্যাতি ছিল। হিজাযবাসীরা সাধারণভাবে মালিকী ফিকাহ্ অনুসরণ করছিল। স্পেনের কিছু মুসলমান মদীনায় এসে হযরত মালিক (র)-এর খিদমতে অবস্থান করে আবার স্পেন দেশে ফিরে যান। হযরত ইমাম মালিক (র) সুলতান হিশামের কথা অবগত হয়ে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীতি, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে কেউ যদি খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে তবে তিনি হচ্ছেন হিশাম ইব্‌ন আবদুর রহমান।' ইমাম মালিক (র)-এর এ ধারণা যথার্থই ছিল। কেননা, হিশাম আবেদ-যাহেদ হওয়া ছাড়াও অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, কুশলী ও বীর পুরুষ ছিলেন। বীরত্ব ও সেনাপতিত্বের যোগ্যতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার সমকক্ষ এবং যুহদ ও ইবাদতে তাঁর পিতার চাইতেও অগ্রবর্তী ছিলেন।

ইমাম মালিকের উক্ত প্রশংসা বাক্যসমূহ আব্বাসীয়দের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় ঠেকে এবং এজন্যে আব্বাসীয়দের হাতে তাঁকে অনেক নিপীড়ন সইতে হয়। হিশামের রাজত্বের প্রারম্ভের দিকে স্পেন দেশের বিখ্যাত ফকীহ্ ও আলিম ফিরআওন ইব্‌ন আব্বাস, ঈসা ইব্‌ন দীনার এবং সাঈদ ইব্‌ন আবী হিন্দ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়ায্‌যমার পানে রওয়ানা হন। তাঁদের সাথে আরো অনেক বড় বড় আলিম-উলামা ছিলেন। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হলে তাঁরা তাঁর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত হন। কিছুদিন তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করে তাঁরা স্পেন দেশে ফিরে যান এবং সেখানে ইমাম মালিকের মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের তাবলীগে প্রভাবান্বিত হয়ে স্পেনের কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতিও মালিকী মাযহাব গ্রহণ করেন। সুলতান হিশামের দৃষ্টিতে এদের মর্যাদাই ছিল সর্বাধিক এবং তিনি এদেরকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাখতেন। ফলে সুলতান হিশামও মালিকী মাযহাবের অনুসারী হয়ে ওঠেন। তিনি এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, যারা ইমাম মালিকের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ফিকাহ্ ও হাদীসের জ্ঞানার্জন করতে চান তাদের ব্যয়ভার সরকার বহন করবে। নওমুসলিম ঈসায়ীরা এবং নওমুসলিমদের সন্তানরা এ সুযোগ গ্রহণে সর্বাধিক এগিয়ে আসে। প্রকৃত পক্ষে এসব নওমুসলিমের মধ্যেই ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার এবং ইবাদত-বন্দেগীর নিষ্ঠা অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। সুলতান হিশাম এবং শায়খুল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ্ মালিকী মাযহাব গ্রহণ করায় মালিকী মাযহাব রাষ্ট্রীয় মাযহাবে পরিণত হয় এবং রাজ্যজোড়া মালিকী মাযহাব অনুসারে কাযীদের রায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হিশামের শাসনামলে সাদাকা যাকাত সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের বিধি মুতাবিক উসুল করা হতো।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

সুলতান হিশাম তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর পুত্র হাকামকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং অমাত্য ও আমলাবর্গের নিকট থেকে তাঁর পক্ষে বায়আত নেন। এ উপলক্ষে হাকামকে লক্ষ্য করে তিনি ওসীয়তস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেন ঃ

"ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম রাখার ব্যাপারে আমীর-গরীব তথা ধনী-নির্ধনের কোন পার্থক্য করবে না। অধীনস্থদের প্রতি বদান্যতা ও দয়ার্দ্র আচরণ প্রদর্শন করবে। বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরের শাসনভার বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ লোকদের হাতে অর্পণ করবে। যে সমস্ত আমিল অহেতুক প্রজাদেরকে উৎপীড়ন করে, তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করবে। সামরিক বাহিনীর ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপত্তি কঠোরভাবে এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে রক্ষা করবে আর এ কথা খেয়াল রাখবে যে, ফৌজের কাজ হচ্ছে দেশের হিফাজত করা, ধ্বংস করা নয়। ফৌজের বেতনভাতা সর্বদা সময়মত প্রদান করবে এবং যে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার করবে, তা অবশ্যই পূরণ করবে। সর্বদা এদিকে লক্ষ্য রাখবে যেন প্রজাসাধারণ তোমাকে ভালবাসার চোখে দেখে। প্রজাদেরকে উটস্থ করে রাখা রাজত্বের স্থায়িত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। অনুরূপ প্রজাসাধারণের বাদশাহকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

"কৃষককুলের ব্যাপারে কখনো অজ্ঞ বা অনবহিত থাকবে না, সর্বদা তাদের খোঁজখবর নেবে। ফসল হানি বা চারণক্ষেত্র যেন বিনষ্ট হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তোমার সামগ্রিক কার্যপদ্ধতি যেন এমন হয় যে, তোমার প্রজাকুল তোমার ছায়াতলে সুখ-সমৃদ্ধির জীবন যাপন করতে পারে। এ কথাগুলো মেনে চলতে পারলে কীর্তিমান বাদশাহদের তালিকায় তোমার নামটিও স্থান পাবে।"

সুলতান হিশামের গোটা জীবন যুদ্ধবিগ্রহ এবং আক্রমণ পরিচালনায় অতিবাহিত হয়। কিন্তু যখন তাঁর ধর্মীয় খিদমতসমূহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিনৈতিকতা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদানের কথা চিন্তা করা হয় তখন তিনি যে সামরিক ক্ষেত্রেও গৌরবময় কীর্তি রেখে গিয়ে অনেক বিদ্রোহী দমনকারী ও দিগ্বিজয়ী কীর্তিমান বিদ্যোৎসাহী বাদশাহদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন, তা কল্পনা করতেও অবাক লাগে।

মোটকথা, স্পেন দেশে বনী উমাইয়ার খিলাফত কায়েম হয়ে তিনশ বছর পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল উক্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর আবদুর রহমানের পর হিশামের মত সর্বগুণে গুণান্বিত সুলতান স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা। সুলতান হিশামের স্থলে অন্য কেউ সুলতান হলে বনূ উমাইয়া বংশের হাতে রাজত্ব থাকা অত্যন্ত দুষ্কর হতো। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, সুলতান হিশামের রাজত্বকাল ছিল খুবই স্বল্পকাল স্থায়ী। মাত্র সাত বছর আটমাসকাল তিনি রাজত্ব করেন। তবে এ ক্ষতি পূরণ হয়ে গিয়েছিল এভাবে যে, হিশামের পর হাকামও একজন সুযোগ্য শাসকরূপে প্রতিপন্ন হন।

হাকাম ইব্‌ন হিশাম

হাকাম ইব্‌ন হিশাম তদীয় পিতার ইন্তিকালের পর ১৮০ হিজরীতে (৭৯৬ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে অনেক বড় বিদ্রোহ দেখা দেয়।

হাকামের চাচা সুলায়মান ও আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ঘোষণা

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, সুলতান হিশামের ভাই সুলায়মান আফ্রিকা অর্থাৎ মরক্কোতে অবস্থান করছিলেন, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সুলায়মান চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্পেনের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহের মনোভাব প্রজাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্যে তৎপর ছিলেন। হিশামের অপর ভাই আবদুল্লাহ্ টলেডো সংলগ্ন তাঁর জায়গীরে অবস্থান করছিলেন। সুলতান হিশামের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র টলেডো থেকে পালিয়ে তাঁর ভাই সুলায়মানের কাছে গিয়ে উপনীত হন, যিনি মরক্কোর তানযীর শহরে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে তখন বার্বার দস্যুদের এক বিরাট দল ছিল। সে এলাকাকে তারা ডাকাতি-রাহাজানির শিকার বানিয়ে রেখেছিল। তানযীরে বসে উভয় ভাই রাজ্য দখলের ফন্দী আঁটলেন। ফরাসী সম্রাট শার্লিমেন এবং অন্যান্য সীমানায় অবস্থিত রঈসদের সাথে সুলায়মান ইতিপূর্বেই সলাপরামর্শ করে রেখেছিলেন। এবার স্থির হলো যে, আবদুল্লাহ্ স্বয়ং ফ্রান্সে শার্লিমনের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ফ্রান্সের বাদশাহকে স্পেন আক্রমণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এভাবে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট বিদ্রোহকে তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবেন। সে মতে আবদুল্লাহ্ শার্লিমেনের দরবারে গিয়ে উপনীত হলেন। শার্লিমেন তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন এবং আপন পুত্রের অধীনে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীকে স্পেন সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ সেখান থেকে ফিরে এসে টলেডোর আমিলকে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে নিজে টলেডো দখল করে বসলেন।

টলেডো ছিল স্পেনের প্রাচীন রাজধানী শহর ও যীগাতম সম্রাটদের এটি রাজধানী ছিল। এখানে খ্রিস্টান অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং মুসলমানরাও ছিল এমন যে, তারা তাদের খ্রিস্টান পূর্বপুরুষ এবং প্রাচীন খ্রিস্টান রাজ-রাজড়াদের বীরত্বগাথা গর্বের সাথে বর্ণনা ও তার স্মৃতিচারণে অভ্যস্ত ছিল। এজন্যে টলেডোর খ্রিস্টানদেরকে এবং তাদেরই সমগোত্রীয় নওমুসলিমদেরকে বিদ্রোহী করে তোলাটা ছিল অত্যন্ত সহজ। এখানে আমীর আবদুর রহমানকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হতো। তাই আবদুর রহমানের পুত্র আবদুল্লাহ্ এদের কাছে ছিলেন আবদুর রহমানের পৌত্র হাকামের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। মোটকথা এরূপ অনেক কারণে আবদুল্লাহ্ সহজেই টলেডো অধিকারে সমর্থ হন। এদিকে সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান মরক্কো থেকে স্পেনের বালানসায় উপনীত হয়ে খলীফার খান্দানের যোগ্যতম ও জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার দাবিতে নিজেকেই খিলাফত ও ইমারতের সবচাইতে বেশি হকদার বলে অভিহিত করে ঐ প্রদেশে তিনি তাঁর আপন শাসন কায়েম করেন।

সুলায়মান ও আবদুল্লাহর বিদ্রোহ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পরিকল্পনা মুতাবিক শার্লিমেন তনয় পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে স্পেনের ভূমিতে পদার্পণ করেন। কয়েকটি শহর দখল করার পর তিনি বার্সেলোনা অবরোধ করলেন। বার্সেলোনার আমিল যায়েদ শার্লিমেনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন, তবে ফরাসীদের তিনি তাঁর দুর্গ মধ্যে প্রবেশও করতে দিলেন না। এদিকে একুইটিন রাজ্যের রাজা লুই পিরেনীজ পর্বতের পশ্চিম অংশ

ডিঙিয়ে স্পেনের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ চালিয়ে লারদা ও দাশকা দখল করে নেন। দেশের অভ্যন্তরে সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মর্যাদার শহর ও প্রদেশসমূহ দখল করে নেন। উত্তর দিক থেকে ঈসায়ীরা প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে উত্তর স্পেনকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এসব সংকট মোটেই মামুলী ছিল না। এভাবে স্পেন হাতছাড়া হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা দেখা দেয়।

হাকামের প্রতিরোধ

সুলতান হাকাম ইব্‌ন হিশাম সর্বপ্রথম টলেডোতে বিদ্রোহের কথা শুনতে পেয়ে অবিলম্বে সসৈন্য টলেডো পৌঁছলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। সেখানে আবদুল্লাহ্ ত্বরিত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। সে অবরোধ ফলবতী না হতেই উত্তর স্পেন হাতছাড়া হওয়ার এবং ঈসায়ীদের আক্রমণের সংবাদ এসে পৌঁছল। সুলতান হাকাম ঈসায়ীদের হামলাকে তাঁর চাচাদের বিদ্রোহের চাইতে বেশি সঙ্কটজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করে টলেডোর অবরোধ উঠিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। হাকামের আগমন সংবাদ পেয়ে শার্লিমেন বাহিনী ত্বরিত গতিতে বার্সেলোনা এবং তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে এমনভাবে পলায়ন করলো যে, তারা পথে কোথাও যাত্রাবিরতি করাও নিরাপদ ভাবলো না। সরাসরি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেই তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তারপর সুলতান হাকাম ওশকা এবং লারদার দিকে মনোনিবেশ করলেন। সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীও ব্যাপক লুটপাট চালায়। সুলতান হাকামের সেখানে এসে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে তারা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পলায়ন করলো এবং একেবারে একুইটিন রাজ্যে পৌঁছে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সুলতান হাকাম স্পেনকে ঈসায়ী দখলমুক্ত করে পিরেনীজ পর্বতের উত্তরাঞ্চলে পৌঁছে দক্ষিণ ফ্রান্সে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং নার্বুন শহর ঈসায়ীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। এদিকে হাকাম ঈসায়ীদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফ্রান্সে উপনীত হন। ওদিকে স্পেন থেকে হাকামের অনুপস্থিতির সুযোগে আবদুল্লাহ্ ও সুলায়মান স্পেনের শহরসমূহ দখল করে সুলতান হাকামের আমিলদেরকে বে-দখল করতে লাগলেন। দু'ভাই অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে টেগ্‌স নদীর তীরে এসে একে অপরের সাথে মিলিত হন। কিন্তু তারপর আর তাঁরা অগ্রসর হননি বরং ফ্রান্সে হাকামের পরিণতি কি হয়, তা দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তাঁদের দু'জনের একান্ত কাম্য ছিল যেন হাকাম ফরাসীদের হাতে পরাজয়বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে যাতে তাঁরা গোটা স্পেনে তাঁদের রাজত্বের সূচনা করতে পারেন। এদিকে হাকামের আমিলরাও এই ভেবে অধীর অপেক্ষায় দিন গুণ-ছিলেন যে, হাকামের এ ত্বরিত আক্রমণের ফলাফল কি দাঁড়ায়। আল্লাহ্ না করুন যদি ফ্রান্সে হাকামের জীবনাবসান ঘটতো, তাহলে তারা সবাই খুশি মনে সুলায়মান ও আবদুল্লাহর আনুগত্য করতো। কেননা, তারা দু'জনই ছিলেন আবদুর রহমানের পুত্র। কিন্তু হাকাম ফ্রান্সের ভূমিতে পদার্পণ করা মাত্র ফরাসী বাহিনী এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, সর্বত্র তারা হাকামের আগে আগে পালাতে লাগলো। হাকাম তখন ফ্রান্স দখল করে সে দেশে কিছুদিন বসবাস করতে পারতেন এবং সে দেশে রীতিমত তাঁর আমিলদেরকে বসিয়ে দেয়ার

জন্যে যত্নবান হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্যক জানতেন যে, দেশে তিনি কত শক্তিশালী শত্রু রেখে গেছেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁরা ভীষণ ক্ষতি করতে পারে। তাই ঈসায়ীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেই তিনি অচিরেই স্পেনে ফিরে আসেন।

সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্‌র পরিণতি

সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ নিজেদের পক্ষ থেকে উবায়দা ইব্‌ন উমারকে টলেডোর গভর্নর নিযুক্ত করে নিজেরা সৈন্য-সামন্তসহ হাকামকে বাধা দেয়ার জন্যে অগ্রসর হলেন। হাকামের বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। যুদ্ধে তাঁরা উভয়ে পরাজিত হলেন এবং পালিয়ে স্পেনের পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সুলতান হাকাম তাঁর জনৈক সর্দার আমর ইব্‌ন ইউসুফকে টলেডো অবরোধের নির্দেশ দিয়ে নিজে সুলায়মান ও আবদুল্লাহর পশ্চাদ্ধাবন করেন। কয়েক মাস পর্যন্ত সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ হাকামকে পার্বত্য এলাকায় পেরেশান করে ছুটে বেড়াতে থাকেন। কোথাও তাঁর সাথে তাঁদের সংঘর্ষ বাধেনি। অবশেষে তিনি মারসিয়ার সেই প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হন যেখানে এই মাত্র কিছুদিন আগে শাহযাদারূপে হাকাম সুলায়মানকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করেছিলেন। এদিকে সুলায়মানও সেখানে এসে পৌঁছলেন। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। অবশেষে আকস্মিক এক তীরের আঘাতে সুলায়মানের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। সুলায়মানের নিহত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। আবদুল্লাহ্ পলায়ন করে বালানসিয়ায় গিয়ে উপনীত হন এবং সেখান থেকে সুলতান হাকামের কাছে ক্ষমার আবেদন প্রেরণ করেন। হাকাম চাচার এ আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুর করে তাঁর উপর শর্ত আরোপ করলেন যে, আপনি আপনার পুত্রদ্বয় আসবাহ্ ও কাসিমকে মুচলিকা স্বরূপ আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে নিজে অবিলম্বে স্পেন ত্যাগ করে মরক্কোর তাবখিয়ায় গিয়ে বসবাস করুন। হাকাম তাঁর পিতৃব্য তনয়দ্বয়ের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে থাকেন। তাঁদের দু'জনের কনিষ্ঠ জনকে মারীদা শহরের আমিল নিযুক্ত করে জ্যেষ্ঠজনের সাথে আপন কন্যার বিবাহ দিয়ে দেন।

এদিকে সুলতান হাকাম যখন সুলায়মান ও আবদুল্লাহর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন উমর ইব্‌ন ইউসুফ টলেডো শহর দখল এবং উবায়দা ইব্‌ন উমরকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং নিজ পুত্র ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে টলেডোর শাসক নিযুক্ত করেন। নিজে উবায়দার কর্তিত শির নিয়ে সুলতানের খিদমতে উপস্থিত হন। তারপর সারাকসতাতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উমর ইব্‌ন ইউসুফ সেদিকে গমন করে বিদ্রোহ দমন করে বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। এসব ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের ধারা ১৮১ হিজরীতে (৭৯৭ খ্রি.) শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ তিন বছর পর ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি.) তার অবসান ঘটে। সমস্ত স্পেনে আবার শান্তি ফিরে আসে।

খ্রিস্টানদের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব বিদ্রোহের শুরুতে আমীর হাকাম ঈসায়ীদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে ফ্রান্সে পদার্পণ করেন এবং ফরাসীরা তাঁর সম্মুখে টিকতে পারেনি। এ

তিন বছরে গির্জাসমূহে তাদের নিজেদের দৈন্যদশার কথা উপলব্ধি করে মুসলমানদের বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কার্যকর চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হয়। তারা পিরেনীজ পর্বতের পশ্চিম অংশে যেখানে বিস্কে উপসাগর, জালীকিয়া প্রদেশ এবং ফ্রান্সের সীমানা একত্রে মিলিত হয়েছে সেখানে ঈস্টার ইয়াস নামক একটি ঈসায়ী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এ রাজ্যটি আগের তুলনায় প্রসারিত হয়ে জালীকিয়া প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। স্পেন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গথ জাতির নেতারা পিরেনীজ পর্বতের পূর্বাঞ্চলের উত্তর এবং ফ্রান্সের দক্ষিণে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এ রাজ্যটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং একুইটিন রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। এদিকে বিশাল ফ্রান্স দেশে একটি প্রাচীন রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যার সম্রাট ছিলেন শার্লিমেন। তাছাড়াও বার্সেলোনা, আরাগুন, আরবুনিয়া প্রদেশ এবং বিস্কে উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অর্থাৎ জালীকিয়ায় প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী খ্রিস্টানের বাস ছিল। ঐ সব অঞ্চলে কোথাও কোথাও মুসলমানদের বাস ছিল নামেমাত্র। নিতান্ত স্বল্প সংখ্যায় উত্তরে ঐসব অঞ্চলে মুসলিম শাসন সর্বদা সঙ্কটের মুখে থাকতো। ঈসায়ী প্রজারা যখনই মুসলিম শাসকদের একটু দুর্বল দেখতে পেত, তখনই তারা বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্যত হতো বা বিদ্রোহের জন্যে উদ্যত করা হতো।

সুলতান হাকামকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত দেখে ঈসায়ীরা টুলূয শহরে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। উক্ত পরামর্শ সভায় প্রতিটি রাজ্যের সর্দার ও স্পেনের উত্তরাঞ্চলের সমস্ত ঈসায়ী আমীর-উমারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলে। একুইটিন রাজ এবং ফ্রান্সের সম্রাটের মধ্যে সন্ধি হয়। ঈস্টার ইলাস্ট্রিয়াসের ইয়াসের যে ঈসায়ী রাজ্যটি এতকাল সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সেটিও এবার খ্রিস্টান ঐক্যফ্রন্টে যোগদান করে। পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণ এবং স্পেনের উত্তরের যে এলাকাটিতে যুদ্ধবাজ উগ্র খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রচুর সেখানে ঈসায়ী একাধিক রাজ্য গড়ে তোলার প্রস্তাব বিবেচিত হয়। মুসলমানরা অনেক বারই পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্সে আক্রমণ চালিয়েছে এবং সেখানকার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর তাঁদের অশ্ব পদতলে পিষ্ট করেছে। কিন্তু ফরাসীদের জন্য পিরেনীজ অতিক্রম করা সবসময়ই কঠিন এবং ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে।

মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য একটি নতুন খ্রিস্টান রাজ্য গঠন

ফ্রান্স সম্রাট শার্লিমেন পিরেনীজ পর্বত সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে তাঁর রাজ্য থেকে পৃথক করে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র খ্রিস্টান রাজ্যের পত্তন করলেন। জনৈক ফরাসী রঈস বোরেলকে তার শাসক নিযুক্ত করা হয়। এ রাজ্যটির নামকরণ করা হয় 'গথিক মার্চ' বলে। এ শাসককে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করে তার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যেন তিনি পিরেনীজ পর্বতকে মুসলমানদের জন্যে দুর্লঙ্ঘ্য করে তোলেন এবং মুসলমানদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকেন। এ রাজ্যটিকে একুইটিন রাজ্যের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া হয়। পিরেনীজ পর্বতের কোল ঘেঁষে স্থানে স্থানে কতকগুলো দুর্গ নির্মিত হলো। স্পেনের উত্তরাঞ্চলের মুসলিম আমিলদের সাথে তাদেরকে প্রয়োজনে বিদ্রোহী করে তোলার স্বার্থে সখ্যতা গড়ে তোলা হলো। এসব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কথা বাগদাদের

খলীফা রশীদকেও অবহিত করা হলো। হারূনুর রশীদ তাদেরকে উপঢৌকনাদি দিয়ে এবং সখ্যতা স্থাপনের জন্যে হস্ত প্রসারিত করে উৎসাহিত করলেন। নতুন গঠিত গথিক মার্চ রাজ্যটি পিরেনীজ পর্বতের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করে নেয়। উত্তর স্পেনের ঈসায়ীরা সর্বপ্রকারে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। মোটকথা, এই নতুন রাজ্যটি আরেকটি পার্বত্য ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিপূর্বে ইলাস্ট্রিয়া রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্যে পাদ্রীরা যেরূপ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল, এ নতুন রাজ্যটিকে একটি শক্তিশালী রাজ্য রূপে গড়ে তোলাকে তারা তাদের পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব রূপে গ্রহণ করে। যে সব খ্রিস্টান একুইটিন, ইলাস্ট্রিয়াস অথবা ফ্রান্সের সরকার বা সরকার প্রধানদের ওপরে কোন কারণে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা মুসলমানদের রাজ্যে এসে বসত করার পরিবর্তে এ নতুন রাষ্ট্রে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং এভাবে একটি বিরান পাহাড়ী এলাকা একটি আবাদ ও সমৃদ্ধ এলাকা হওয়ার সাথে সাথে একটি শক্তিশালী রাজ্যেও পরিণত হয়।

বিশ্বাসঘাতক মুসলিম আমিলদেরকে ঈসায়ীদের উৎসাহ প্রদান

১৮৪ হিজরীর (৮০০ খ্রি.) শেষ নাগাদ হাকাম একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৫ হিজরীতে (৮০১ খ্রি) ঈসায়ীরা উত্তর স্পেনে আবার হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়। কোন কোন উত্তরাঞ্চলীয় শহরের আমিল শার্লিমেনকে বাগদাদের খলীফা হারূনুর রশীদের বন্ধু ও এজেন্ট মনে করে তার সাহায্য-সহযোগিতাকে জায়েয মনে করে এবং সুলতান হাকামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকেই পুণ্যের কাজ বলে ধারণা করে নেয়। কেননা, সুলতান হাকামের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে জনমনে অনেক সন্দেহ ছিল এবং প্রায়ই তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হতে শোনা যেত। এ সুযোগে বাগদাদের খলীফার স্পেনে নিযুক্ত গোয়েন্দারা সক্রিয় হবার সুযোগ পায়। ফলে ওশকা, গীরুন, লূন, লারীদা ও তারকূনা প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় শহরসমূহের আমিলগণ ফ্রান্সের সম্রাটকে তাদের নিজেদের সম্রাটরূপে গ্রহণ করে সুলতান হাকামের নির্দেশাদি পালনে অস্বীকৃতি এবং শার্লিমেনের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এভাবে রাতারাতি 'গথ মার্চ' রাজ্য স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় সমভূমিতে বিস্তৃত হয় এবং সেখানকার মুসলমানদেরকে অনুগত পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে জালীকিয়া এবং বিস্কে উপকূলের আমিলরা, যাদের মধ্যে সারাকস্তার শাসকও ছিলেন, ঈসায়ী রাজাদের আনুগত্য ও সুলতান হাকামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ নতুন বিপদের মুকাবিলায় হাকাম নিজে কর্ডোভা থেকে এ জন্যে সরতে পারলেন না যে, এখানে রাজধানীর হাওয়ায়ও পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এজন্যে রাজধানীতে অবস্থান করে বিদ্রোহের এ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং স্বয়ং মুসলমানরাও সুলতানের আত্মীয়-স্বজনরাই তাতে শক্তি যোগাচ্ছিল। দেশের উত্তরাঞ্চলকে রক্ষা এবং ঈসায়ীদের কবল থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি সিপাহসালার ইবরাহীমকে প্রেরণ করেন। ইবরাহীম প্রথমে জালীকিয়া ও সারাকস্তার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তক্ষয়ের পর ঈসায়ীদের কবল থেকে এ এলাকা পুনরুদ্ধার করেন।

বিদ্রোহী আমিলরা ঈসায়ী ফৌজ এবং ঈসায়ী বাসিন্দাদের সাথে পালিয়ে ফ্রান্সে শার্লিমেনের কাছে চলে যায়। তাঁরা তাকে স্পেন আক্রমণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। ইবরাহীমও জালীকিয়া ও সারাকস্তা প্রভৃতি শহরের দিকে এমনি ব্যতিব্যস্ত থাকেন যে, স্পেনের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের দিকে তিনি ফিরেও তাকাতে পারেন নি। শার্লিমেনের কাছে পালিয়ে যাওয়া মুসলমান আমিলরা তাঁকে এ মর্মে পরামর্শ দান করে যে, স্পেনের প্রাচীন গথ-রাজধানী আপনি অনায়াসেই দখল করে নিতে পারেন। আমরা এ কাজে আপনাকে পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি। মুসলমান আমিলদের এ উৎসাহ দান ঈসায়ীদের সাহস ও মনোবল অনেকগুণে বৃদ্ধি করে। সেমতে ফ্রান্সে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বার্সেলোনা বন্দরকেও গথিক মার্চ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। বার্সেলোনার আমিল যায়দও শার্লিমেন এবং কোন্ট লুঈর সাথে পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং তাদের পক্ষে থাকার অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন। সেমতে ১৮৮ হিজরীর (৮০৪ খ্রি.) শেষ দিকে ঈসায়ী সৈন্যরা গথিক মার্চের ফৌজদের সাথে মিলিত হয়ে স্পেনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ পদদলিত করে বার্সেলোনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানকার আমিল যায়দ এ ফৌজের আগমনে বার্সেলোনা শহরের ফটক বন্ধ করে দিয়ে তাঁদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দিতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ঈসায়ী বাহিনী বার্সেলোনা শহর অবরোধ করে বসে। তারা বার্সেলোনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অবরোধের কঠোরতা বৃদ্ধি করে। যায়দ কোনদিক থেকেই কোনরূপ সাহায্য পেলেন না। অবশেষে এই শর্তে তাদেরকে বার্সেলোনার দখল দিয়ে দেয়া হয় যে, তারা মুসলমানদেরকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে। মুসলমানরা বার্সেলোনা খালি করে দেয়। ঈসায়ী সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে। একুইটিনের রাজা বার্সেলোনা কেল্লাকে শক্ত করে তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে একজন গভর্নর নিয়োগ করেন। নতুনভাবে বিজিত এ গোটা এলাকাকে গথিক মার্চ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে এখন উত্তর স্পেনে দু'টি যুদ্ধফ্রন্ট কায়েম হয়ে গেল। একটি হলো ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্য ও জালীকিয়া প্রদেশের বিদ্রোহী ঈসায়ীদের ফ্রন্ট, যারা রীতিমত ফ্রান্স থেকে সাহায্য পেয়ে আসছিল। দ্বিতীয় ফ্রন্টটি হলো গথিক মার্চ এবং বার্সেলোনা এলাকার বিদ্রোহী ঈসায়ী প্রজাবৃন্দ, যারা এখন ফ্রান্সের পক্ষ থেকে সাহায্য পাচ্ছিল। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত ছিল এবং মুসলিম ধর্মবেত্তারা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে প্রেরিত বাহিনী কোন একটি ফ্রন্টে ঈসায়ীদের মুকাবিলা করতে পারতো। তাই তারা জালীকিয়া প্রদেশের দিকে গিয়ে ঈসায়ীদেরকে পরাজিত করে। কিন্তু অপর ফ্রন্টটি খোলাই রয়ে গেল। ফলে বার্সেলোনা মুসলমানদের কব্জা থেকে বেরিয়ে গেল। তারা যদি বার্সেলোনার দিকে মনোনিবেশ করতেন তবে সারাকস্তা ও জালীকিয়া অঞ্চল ঈসায়ীদের দখলে থেকে যেত এবং তারা তারপর আরো অগ্রসর হতো।

১৮৯ হিজরীতে (৮০৫ খ্রি.) মুসলমান বিদ্রোহী আমিলরা ঈসায়ীদেরকে উৎসাহ দিয়ে টলেডোতে হামলা করায়। ঈসায়ীরা বার্সেলোনা ও উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে টলেডোতে আক্রমণ চালায়। এদিকে ইউসুফ ইব্‌ন উমর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। অবশেষে

ঈসায়ীরা টলেডো অবরোধ করলো। টলেডো এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঈসায়ী অধিবাসীরা আক্রমণকারীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করায় ইউসুফ ইব্‌ন উমর টলেডোর ঈসায়ীদের হাতে বন্দী হন। তারা টলেডো ঈসায়ী সৈন্যদের দ্বারা দখল করিয়ে নেয়। ঈসায়ীরা ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে কায়েস মরুভূমিতে বন্দী করে এবং স্পেনের প্রাচীন রাজধানী অধিকার করে সীমাহীন উৎফুল্লিত হয়। টলেডোর খবর ইউসুফ ইব্‌ন উমরের পিতা উমর ইব্‌ন ইউসুফের কর্ণগোচর হলে তিনি সারাকস্‌তা থেকে একদল দুর্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে টলেডো অভিমুখে যাত্রা করলেন। এখানে পৌঁছে এক বিরাট যুদ্ধের পর তিনি টলেডো জয় করেন, ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে মুক্ত করেন এবং ঈসায়ীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। টলেডোতে ঈসায়ী দখল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেখানে বসবাসকারী সংখ্যাগুরু ঈসায়ী প্রজারাই কার্যকর সাহায্য করেছিল। তাই টলেডোর ঈসায়ী প্রজারাই সর্বাধিক শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল যারা টলেডোর হুকুমতকে ভীষণ সঙ্কটাপন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু উমর ইব্‌ন ইউসুফ অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে একটি শব্দও বলেন নি। তারা যেসব ওযর পেশ করে তা তিনি গ্রহণ করে নিয়ে বাহ্যত তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেন।

হাকামের বিরোধিকার কারণসমূহ

সুলতান হাকাম ব্যক্তিগতভাবে একজন বীরপুরুষ হলেও তাঁর রাজত্বের সূচনালগ্ন থেকেই যুদ্ধবিগ্রহের সিলসিলা চলতেই থাকে এবং স্পেন দেশের বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত হয়ে একে একে খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাচ্ছিল। ঈসায়ীরা দিন দিন শক্তিশালী এবং মুসলমানগণ দিন দিন হতবল হয়ে চলেছিল। এর সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে স্বয়ং মুসলমানদের আত্মকলহ ও অপরিণামদর্শিতা। হাকামের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর বিরোধিতা এবং তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা লাভের প্রয়াসে তীর-তলোয়ারের আশ্রয় নিতে যেমন একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি, তেমনি তাঁরা গোপন ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতেও একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। এতটুকু করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁরা প্রতিপক্ষ ঈসায়ীদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে দুশমন ঈসায়ীরা, যারা মুসলমানদের অনিষ্ট সাধন এবং আন্দালুসের ইসলামী সালতানাতকে দুর্বল করার জন্যে পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

তৃতীয় শত্রু ছিল আব্বাসীয়রা, যাদের পক্ষ থেকে হাকামের আত্মীয়-স্বজন এবং ঈসায়ীরা উৎসাহ পেয়েছে। খোদ স্পেন দেশে তাদের সমর্থকরা মওজুদ ছিল, যারা হাকামের অনিষ্ট সাধন এবং তাঁর রাজত্ব ধ্বংস করার জন্যে সচেষ্ট ছিল। এ তিন শত্রু ছাড়াও এক চতুর্থ শক্তিশালী শত্রুর উদ্ভব হয়। তাঁরা হচ্ছেন মালিকী মাযহাবের ফকীহ্ ও আলিমগণ– সুলতান হিশামের আমলে সালতানাত ও হুকুমতের ওপর যাঁদের অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরাই ছিলেন সুলতান হিশামের উযীর ও উপদেষ্টা এবং সকল বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক। তাঁরা যেহেতু ধর্মীয় নেতা ছিলেন তাই জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব ছিল আরও বেশি। সুলতান হাকাম সিংহাসনে আরোহণ করেই এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে খর্ব করতে সচেষ্ট হন এবং তাদের সাহায্যকে নিজের জন্যে প্রয়োজনবোধ করেন নি।

সুলতানের এ স্ব-নির্ভরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা তাঁদের অত্যন্ত অপছন্দ হয়। তাঁরা সুলতানের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও তাঁর দোষচর্চায় লিপ্ত হন। ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়াকে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি এবং শায়খুল ইসলাম বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান ও অধিকার খর্ব করে দেয়া হয়েছে, তখন তিনি সুলতানের আরও বেশি সমালোচনায় লিপ্ত হলেন। এ পর্যায়ের সকল প্রধান ও বিখ্যাত মালিকী মাযহাবভুক্ত আলিম, যারা সুলতান হিশামের আমলে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে দখলদার ও অধিকার সম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা ফতওয়াবাজীতে অবতীর্ণ হলেন। স্পেন দেশে এ মাযহাব নতুন প্রবর্তিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে সেখানকার মুসলমানরা ফিকাহভিত্তিক মাযহাবসমূহের কার কি বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কি পার্থক্য তা জানতো না। সুতরাং বিশেষত মালিকী মাযহাবভুক্ত লোকেরা সুলতান হিশামের শত্রু এবং বিরোধী হয়ে যায়। এ চতুর্থ পর্যায়ের শত্রুদের শত্রুতার ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী এবং সবচাইতে মারাত্মক আর এদের জন্যেই সুলতান হিশাম প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর শত্রুদের উচ্ছেদ সাধন এবং তাদেরকে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তিবিধান করে উঠতে পারেন নি। তাই ঈসায়ীরা শক্তিশালী হওয়ার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। মোটকথা, উপরোক্ত চার শ্রেণীর শত্রুরা সম্মিলিত হয়ে খ্রিস্টানদেরকে শক্তিশালী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। এ ব্যাপারে সুলতান হাকামের অসতর্কতা ও উন্নাসিকতাকেও অনেকটা দায়ী করা চলে। তবে তিনি ততটা দায়ী ছিলেন না যতটা দোষী ঐতিহাসিকরা সাধারণত তাকে করে থাকেন।

১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খ্রি.) মৌলভী সম্প্রদায় তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। কাযীউল কুযাত ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া এবং ফকীহ্ তালূত প্রমুখ কর্ডোভার আলিমগণ তাঁদের সমচিন্তার উলামা ও উমারাকে একটি সমাবেশে একত্র করে হাকামের পদচ্যুতির পরামর্শ করেন এবং ইয়াহইয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল হাকামের চাচাত ভাই ও জামাতা কাসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনাকে আমরা স্পেনের শাসন ক্ষমতায় বসাতে চাই। কাসিম বললেন, প্রথমে আমার জানতে হবে, কে কে এই কাজের পক্ষপাতী। যদি তাদের সংঘ ও শক্তি সুলতান হাকামকে পদচ্যুত করার জন্যে যথেষ্ট হয়, তা হলে আমি খুশিমনে আপনাদের পরামর্শে যোগ দেব। সুতরাং আগামীকাল আপনারা সে সব নামের তালিকা আমার কাছে নিয়ে আসুন। কাযী ইয়াহইয়া নামের তালিকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত চলে আসেন। পরদিন কথামত নামের তালিকা নিয়ে তাঁর পৌঁছবার পূর্বেই কাসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সুলতান হাকামকে তাঁর ঘরে আনিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসিয়ে রাখলেন। কাযী ইয়াহইয়া কাসিমের মুনশীকে দিয়ে তাদের নাম লিখাতে শুরু করলেন। এদিকে পর্দার আড়াল থেকে সুলতান হাকামের মুনশীও তাঁর কাছে বসে ঐ নামগুলো লিখতে থাকলেন। হাকামের মুনশীর সন্দেহ হলো যে, পাছে ঐ তালিকায় তার নামও না উচ্চারিত হয়। এই ভেবে তিনি কাগজের ওপর এমনভাবে কলম চালাতে লাগলেন যে, কলমের খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কলমের এ আওয়াজ শুনে কাযী ও তাঁর সঙ্গীদের সন্দেহ হলো যে, কেউ একজন পর্দার আড়াল থেকে ঐ নামগুলো লিখে নিচ্ছে। এ সন্দেহ হতেই তাঁরা সেখান থেকে উঠে পালাতে লাগলো। কেউ কেউ তো

বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলো, অবশিষ্টরা ঐ ঘরেই বন্দী হয়ে নিহত হলো। এদের সংখ্যা ছিল ৭২ জন। তারপর প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা হলো। দক্ষিণ কর্ডোভায় ওয়াদিউল কবীর নদীর তীর ঘেঁষে একটি মহল্লা ছিল। ঐ মহল্লায় প্রধানত উক্ত ধর্মবেত্তাদের ভক্ত-অনুরক্ত ঈসায়ী নওমুসলিমরা বসবাস করতো। তারা সংঘবদ্ধভাবে সুলতান হাকামের প্রাসাদ ঘেরাও করে তাকে অবরোধ করে বসে। সুলতান হাকাম তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং মামুলী রক্তপাতের পর এ হাঙ্গামা প্রশমিত হয়।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯০ হিজরীতে (৮০৬ খি.) সুলতান হাকাম মরক্কোর নবগঠিত স্বাধীন ইদরিসিয়া রাজ্যের সাথে সখ্যতা স্থাপন করেন। মরক্কোর ইদরিসিয়া রাজ্যের বাগদাদের খিলাফত থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করাটা স্পেনের জন্যে বেশ সহায়ক হয়। এভাবে স্পেন রাজ্য আব্বাসীয়দের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা থেকে অনেকটা নিরাপদ হয়ে যায়। স্পেনের সালতানাতের জন্যে মরক্কোর স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। সুলতান হাকামও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মরক্কোর সাথে সখ্যতা স্থাপনে একটুও বিলম্ব করেন নি। ১৯১ হিজরী (৮০৭ খ্রি.) পর্যন্ত কর্ডোভার বিদ্রোহী আলিমদের প্রভাব খর্ব করা এবং মরক্কোর সাথে সখ্যতা স্থাপন করে সুলতান হাকাম অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তারপর তিনি উত্তরের প্রদেশসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করে সে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন।

টলেডোর বিদ্রোহীদের উৎখাত

১৯১ হিজরীতে (৮০৬-৭ খ্রি) হাকাম উদ্ভূত পরিস্থিতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঈসায়ী ষড়যন্ত্রকে সফল করার সর্বাধিক উপাদান রয়েছে টলেডোতে। সেখানকার ঈসায়ীরা অধিক মাত্রায় উপদ্রবপ্রিয়, হাঙ্গামাবাজ এবং শক্তিশালী বিধায় মুসলমান ও ঈসায়ী উভয় সম্প্রদায়ের চক্রান্তকারীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। টলেডোর এ আবর্জনা থেকে মুক্ত করে বিদ্রোহের এ কেন্দ্রটি ভেঙ্গে দিলে উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে যাবে। ঐ ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পাল্টা একটি ষড়যন্ত্র করা হলো।

হাকাম উমর ইব্‌ন ইউসুফকে ডেকে পরামর্শ করলেন এবং সে পরামর্শ অনুসারে তাঁর পুত্র ইউসুফ ইব্‌ন উমরের পরিবর্তে তাঁকেই টলেডোর শাসক নিযুক্ত করা হলো। উমর ইব্‌ন ইউসুফ টলেডো পৌঁছেই সেখানকার অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত বিনম্র ও সহৃদয় আচরণ করতে লাগলেন। তিনি সেখানকার কিছু সংখ্যক আমীর-উমারার কাছে এ মত প্রকাশ করলেন যে, বর্তমান শাসক বংশ অর্থাৎ বনূ উমাইয়াকে উচ্ছেদ করে নতুন শাসনের পত্তন করতে হবে। একথায় টলেডোবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং অচিরেই তাঁরা তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করলো। তাদের মনের কথা অবগত হয়ে উমর ইব্‌ন ইউসুফ বললেন, এজন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন টলেডো উপকণ্ঠে একটি দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলা, যাতে বাহির থেকে এসে কারো পক্ষে টলেডো অবরোধ করাটা সহজসাধ্য না হয়। টলেডোবাসীরা এ দুর্গ নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেরাই বহনের অঙ্গীকার করলো এবং সত্যি সত্যি তাঁরা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে যথেষ্ট অর্থ উমর ইব্‌ন ইউসুফের হাতে তুলে

দিল। দেখতে দেখতে একটি সুদৃঢ় কেল্লা নির্মিত হলো। তারপর পূর্ব পরামর্শ অনুসারে সীমান্তবর্তী আমিল ঈসায়ী হামলার ধুয়া তুলে সুলতান হাকামের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। সুলতান হাকাম তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী সেদিকে প্রেরণ করলেন। এ বাহিনী টলেডোর পথ দিয়ে অগ্রসর হলো। ঐ বাহিনীটি টলেডোর নিকট পৌঁছতেই টলেডোর আমিল উমর ইব্‌ন ইউসুফ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আতিথ্যের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ যথারীতি পালন করলেন। তিনি আবদুর রহমানকে ঐ নবনির্মিত দুর্গে এনে উঠালেন এবং টলেডোবাসীকে বললেন, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহযাদা আবদুর রহমানকে রাজোচিত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য দিয়ে তাঁর মন জয় করে নিতে হবে, যাতে তিনি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক থাকেন। টলেডোবাসীরা তাঁর এ পরামর্শকে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত বলে গ্রহণ করলো। বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনকামী নেতৃস্থানীয় লোকদের সকলেই শাহযাদার খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনের অনুমতি প্রার্থনা করলো। শাহযাদা সানন্দে তাদেরকে সে অনুমতি দান করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সকলকে দরবারে তলব করলেন। এভাবে টলেডো নগরীর গোটা বিদ্রোহী সংঘ দুর্গে সমবেত হলো। এই সুযোগে তাদের সকলকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হলো এবং দুর্গের মধ্যেই একটি বিশাল গর্ত খুঁড়ে তাদের শবদেহসমূহ সেখানে মাটিচাপা দেয়া হলো। এভাবে টলেডোর বিদ্রোহীরা নির্মূল হলো। অবশিষ্টরা তাদের এ শোচনীয় পরিণাম দেখে সংযত হয়ে গেল। তারপর আর কেউ বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়নি।

ঈসায়ীদের সাথে সংঘর্ষ

নিত্যনৈমিত্তিক বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা লক্ষ্য করে টলেডোর বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার পর সুলতান হাকাম উত্তরাঞ্চলের ঈসায়ীদের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ঐ ঈসায়ীরা পিরেনীজ পর্বতের পাদদেশ থেকে বার্সেলোনা পর্যন্ত গোটা উত্তর স্পেন অধিকার করে রেখেছিল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটি মামুলী বাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করা সমীচীনবোধ করলেন না। ফলে উত্তরাঞ্চলে সংঘর্ষ অব্যাহত রইল। কখনো মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করতেন, আবার কখনো তাঁরা খ্রিস্টানদের হাতে পরাস্ত হতেন। সাত-আট বছর পর্যন্ত এরূপই চললো। যেহেতু মুসলমানদের বড় শক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়নি বরং কেবল তাদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তাই সে সব সংঘর্ষের ফলাফল খ্রিস্টানদের জন্য অনেক সহায়ক প্রতিপন্ন হয়। তাদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় তিরোহিত হয়ে যায় এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই তারা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। অন্য কথায় বলা যায়, সুলতান হাকামের সামরিক এ অভিযানগুলো ঈসায়ী রাজ্য গথিক মার্চ, ইলাস্ট্রিয়ান এবং জালীকিয়ার বিদ্রোহীদেরকে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধের অনুশীলন করিয়ে এবং হাতেকলমে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে একটি জবরদস্ত সামরিক শক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু সুলতান হাকামের এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। কেননা, স্পেনবাসীদের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলেন।

নতুন সৈন্য ভর্তি

ঐ সময়টাতে তিনি রাজধানী কর্ডোভায় অবস্থান করে একটি নতুন বাহিনী গঠনের প্রয়াস পান। তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে কেবল ঐ খ্রিস্টানদেরকেই সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন যারা স্পেনের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল এবং কোনভাবেই উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহভাবাপন্ন খ্রিস্টানদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। উপরন্তু তারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং সুখী-সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপন করছিল যেন ঐ ঈসায়ীদেরকে সন্দেহযুক্ত মুসলমানদের তুলনায় তদানীন্তন সরকার অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করছিল। ঈসায়ী সৈনদের দ্বারা গঠিত ঐ বাহিনীটি গোটা স্পেনকে দখলে রাখতে এবং সর্বপ্রকার বিদ্রোহীদেরকে দমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই সুলতান ইথিওপিয়া, মধ্য-আফ্রিকা, এশিয়া-মাইনর এবং এশীয় দেশসমূহের ক্রীতদাস এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে ক্রয় করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর আমলাদের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের দেশসমূহ থেকে গোলাম ক্রয় করে আনাতে লাগলেন। ঐ সব ক্রীতদাস দ্বারা একটি বিরাট বাহিনী গড়ে উঠলো। এরা যেহেতু আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তাই তাদেরকে আযমী বলা হতো এবং আপন মনিব হাকামের হিফাজত করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করা ছাড়া আর কিছুই তারা বুঝতো না বা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারো সাথে সখ্যতা ও হৃদ্যতা স্থাপনও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দাস-বাহিনীকে উচ্চ পর্যায়ের ফৌজী প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। হাকাম নিজে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রকৃতপক্ষে হাকামই এরূপ ক্রীতদাসদের দ্বারা বাহিনী গঠন এবং তাদের সাহায্যে রাজত্ব রক্ষার এ ব্যবস্থার প্রবর্তক। মিসরের আইয়ুবী বংশের সুলতানরা তাঁরই অনুকরণ করেন। ক্রীতদাসদের বাহিনী মিসরে কায়েম হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজত্বের মালিক হয়েছিল।

সুলতান হাকাম যখন তাঁর খ্রিস্টান ও আযমী ফৌজের দ্বারা গঠিত বাহিনী গঠন করে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, তখনই তাঁর উত্তরাঞ্চলীয় ঈসায়ী বিদ্রোহীদেরকে দমন এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সুযোগ আসে। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে তখনো শান্তি লিখিত ছিল না, তাই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসমূহ তখনো তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মারীদার শাসক আসবাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ একটি ভুল বোঝাবুঝির দরুন বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। তাই বাধ্য হয়েই সুলতানকে সেদিকে মনোনিবেশ করতে হয়। আসবাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ছিলেন সুলতান হাকামের চাচাত ভাই এবং ভগ্নিপতি। শেষ পর্যন্ত আসবাহ্ অবরুদ্ধ এবং গ্রেফতার হন। সুলতানের বোন মধ্যস্থতা করে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটান। সুলতান হাকাম আসবাহকে মুক্তি দেন এবং তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁকে রাজধানী কর্ডোভায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে না করতেই এমন এক গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয় যে, তাতে রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়।

মালিকীদের বিরোধিতা

১৯৮ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৮১৩ - অগাস্ট ১৪ খ্রি.) মালিকীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে একবার তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার

যখন ঈসায়ী ও আযমী বাহিনী তৈরি হলো, তখন পুনরায় তারা সুলতানের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজী শুরু করে দিল। তারা আযমীদের অস্তিত্বকে কর্ডোভার জন্যে একটি অভিশাপ বলে আখ্যায়িত করে। বিগত বিদ্রোহী কাযী ইয়াহ্ইয়া ছিলেন সর্বাগ্রে। স্পেনবাসীরা তাঁর বেজায় ভক্ত ছিল এবং তারা তাঁকে একজন কামিল ওলী বলে জ্ঞান করতো। এজন্যে হাকাম তাঁকে অভিযুক্ত করেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি রাজদ্রোহিতামূলক আচরণকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এবারও তাঁরই মাধ্যমে আলিম মহলে এবং তাঁদের ভক্তদের মধ্যে ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে পড়ে। কর্ডোভাবাসীরা এতই বিরূপ হয়ে ওঠে যে, তারা একাকী কোন আযমীকে পেলে তাকে খুন করতো। এজন্যে কখনো একাকী বের হতো না। তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হয়েই শহরে বের হতো, নতুবা ফৌজী ব্যারাকেই অবস্থান করতো।

শাহী প্রাসাদে পর্যন্ত বিরোধিতার অগ্নিশিখা

একদা একজন আযমী এবং জনৈক মালিকী শান-মিস্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ এবং হাতাহাতি হয়ে যায়। নগরবাসীরা বিশেষত নগরের দক্ষিণাংশে ওয়াদিউল কবীর নদীর ওপারের বসতির সকলেই ছিল মালিকী মাযহাবের অনুসারী। তারা সকলে একত্রিত হয়ে শাহী প্রাসাদে এসে হামলা চালালো এবং সুলতান হাকামের পদচ্যুতির ঘোষণা দিল। তাদের সাথে আরো অনেক গোলমেলে লোক এসে যোগ দেয়। এমনকি তারা রাজপ্রাসাদের ফটক ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। প্রাসাদ রক্ষীদেরকে হত্যা করে এবং পিছু-হটিয়ে দিয়ে তারা দ্বিতীয় দেউড়ী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গোটা রাজপ্রাসাদ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুলতান হাকাম তাঁর খিদমতগার ভৃত্য হাসানকে ডেকে বললেন, মাথায় মাখবার সুগন্ধি তেল নিয়ে এসো। খিদমতগার তেল এনে হাযির করলে সুলতান মাথায় তেল মাখলেন। হাসান সাহস করে জিজ্ঞেস করলো, এ সংকটময় মুহূর্তে আপনি সুগন্ধি তেল মাখছেন। অথচ এদিকে বিদ্রোহীরা সুলতানী প্রাসাদের ফটকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তারা আমাদের লোকজনকে হত্যা করে এবং তাদেরকে মারধর করে এগিয়ে আসছে। জবাবে সুলতান বললেন, আহম্মক কোথাকার! আমি যদি মাথায় সুগন্ধি তেল না মাখি, তবে তাঁরা মাথা কাটার সময় কি করে বুঝতে পারবে যে এটা সুলতানেরই মাথা ?

সুলতান হাকামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ঐতিহাসিকরা এ কাহিনীটিকে এ কথার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন যে, যে কোন বিব্রতকর পরিস্থিতিতেও তিনি ঘাবড়ে যেতেন না বা হতবুদ্ধি হতেন না।

তারপর সুলতান তাঁর চাচাত ভাই আসবাহকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, যে কোন প্রকারে তুমি বিদ্রোহীদের এ অবরোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নাও এবং ওয়াদিউল কবীর নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে দক্ষিণের মহল্লায় আগুন ধরিয়ে দাও। আসবাহ্ সে নির্দেশ পালন করল। তিনি একটি গোপন দরজা দিয়ে নিজেকে বিদ্রোহীদের অবরোধ থেকে মুক্ত করে নিতে সমর্থ হন। তারপর কয়েকজন সঙ্গীসহ বের হয়ে কর্ডোভার উপকণ্ঠের এক সেনাছাউনিতে খবর পাঠালেন যে, তারা যেন তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দক্ষিণের মহল্লায় পৌঁছে যায়। তিনি নিজে সেখানে পৌঁছে একাধিক ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

রাজপ্রাসাদ অবরোধকারী বিদ্রোহীরা যখন তাদেরই বাসস্থান দক্ষিণের মহল্লা থেকে আগুনের লেলিহান শিখা এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখলো তখন তারা নিজ বাড়িঘর রক্ষার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটলো। দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদ বিদ্রোহীমুক্ত হয়ে গেল। সুলতান হাকাম উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে একটুও বিলম্ব করলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহীদের পেছনে পেছনে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হলেন। ওদিক থেকে আসবাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আর এদিক থেকে সুলতান হাকাম একযোগে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বিদ্রোহীদের অনেকেই বেঘোরে প্রাণ দিল। তারপর সুলতান হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে বিদ্রোহীদেরকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করলেন। স্বল্পক্ষণের মধ্যে ছাউনি থেকে সৈন্যরাও এসে পৌঁছে গেল এবং হাজার হাজার বিদ্রোহী তাদের হাতে গ্রেফতার হলো।

মালিকীদের দেশান্তরিতকরণ

এবার অনন্যোপায় হয়ে সুলতান হাকাম কর্ডোভা শহরে বসবাসকারী মালিকী মাযহাবের সমস্ত অনুসারীকে দেশান্তরিত করার ফরমান জারি করলেন। অবশ্য, এ ফরমানটি তাদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য ছিল– যারা জ্ঞানী-গুণী ছিলেন না। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ঈসায়ী নওমুসলিম। কাযী ইয়াহ্ইয়া এবং অন্যান্য আলিম-উলামাকে তাঁদের ইল্‌মী মর্যাদার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হলো, যদিও তাঁরাই ছিলেন হাঙ্গামার মূল উৎস। সুলতান হাকাম তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তদেরকে দেশান্তরিত করে তাঁদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়াকেই যথেষ্ট বিবেচনা করলেন। তাঁর নিকট এঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে নিজেদের উপকৃত হওয়াই অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে হলো। এ কথা জেনে বিস্মিত হতে হয় যে, ঐ কাযী ইয়াহ্ইয়াই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সুলতান হাকামের বিশিষ্ট উপদেষ্টা এবং তাঁর মুসাহেব হয়েছিলেন। মালিকীদের দেশান্তরিত করার নির্দেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। এরা যখন স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছল, তখন তাঁদের মধ্যকার আট হাজার যাদের সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনও ছিল– মরক্কো যেতে উদ্যোগী হলো, মরক্কোর শাসক ইদরীস তাদের আগমনকে এই ভেবে স্বাগত জানান যে, এবার তাঁর রাজধানী ফয়েয শহর বা তাবখীরের জনসংখ্যা ও জৌলুস বৃদ্ধি পাবে। তারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সেখানে গিয়ে আবাদ হলো। পনের হাজার মালিকী জাহাজে সওয়ার হয়ে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে উপনীত হলো। তাঁরা সে শহরটি অধিকার করে নিল। অবশেষে তারা সেখান থেকেও বহিষ্কৃত হয়ে অবশেষে তিকরীত দ্বীপে পৌঁছে সে দ্বীপটি দখল করে নেয়। সেখানে তারা নিজেদের রাজত্ব গড়ে তোলে এবং দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ধরে সেখানে তাদের বংশধরদের রাজত্ব স্থায়ী হয়। এ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এর অব্যবহিত পরেই হায্‌ম ইব্‌ন ওহাব বাজা নামক স্থানে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। পরিণামে হাযম সুলতানী বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন। এখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজ্যের অবস্থা এখনো আশঙ্কামুক্ত নয়। বিদ্রোহের জীবাণু বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

ফ্রান্স আক্রমণ

সুলতান হাকামের সিংহাসন আরোহণের পর প্রায় কুড়ি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এ কুড়িটি বছরই তাঁকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং ঈসায়ীদের বহিরাগত হামলার মুকাবিলা করেই কাটাতে হয়। ঈসায়ীদের ওপর আক্রমণ করার সুযোগ তাঁর এতকাল হয়ে ওঠেনি। এখন রাজ্যের অবস্থা অনেকটা শান্ত দেখে হাকাম একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী তৈরি করলেন এবং তাঁর হাজিব আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে তাদেরকে উত্তরে ঈসায়ীদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। হাজিব আবদুল করীম ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের বশ্যতা ও আনুগত্য প্রকাশকেই যথেষ্ট বিবেচনা করে পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে সরাসরি ফ্রান্সে গিয়ে উপনীত হলেন এবং সেখানে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালালেন। এ অভিযানটি ফ্রান্সের দিকে পরিচালিত হয় ২০০ হিজরীতে (৮১৫ খ্রি)। ২০৩ হিজরী (৮১৮-১৯ খ্রি.) পর্যন্ত আবদুল করীম ফ্রান্স দেশে তাঁর যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত রাখেন। সুলতান হাকাম ও তাঁর সেনাপতিদের ভুল ছিল এই যে, তাঁরা কেবল ফরাসী সম্রাট শার্লিমেনকেই তাদের প্রতিপক্ষ ভেবেছেন এবং তাঁর রাজত্বের সীমানায় অবস্থিত শহর বন্দরগুলোই জয় করছিলেন, পিরেজীন পর্বত থেকে দক্ষিণ পশ্চিমের সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত গথিক মার্চ রাজ্যকে তাঁরা হিসাবের মধ্যেই রাখেননি। এ জাতীয় ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে না নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন আর না সেগুলোর আয়তন হ্রাস করতে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা শুধু এতটুকুতেই সন্তুষ্ট রয়েছেন যে, এ ঈসায়ী রাজ্যগুলো আমাদের আনুগত্য করার কথা স্বীকার করে যাবে আর সেখানকার ঈসায়ী অধিবাসীদের উপর তারাই রাজত্ব করবে। ফ্রান্সের উপর তাঁরা এজন্যে আক্রমণ করতেন যে, ঐ রাজ্যের যদি পতন ঘটে, তবে আর কোন সঙ্কটের কারণ থাকবে না, আর ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈসায়ী রাজ্য ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে যোগসাজশ করে আমাদের জন্যে কোন সমস্যার সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। কিন্তু সুলতান হাকাম যদি ঐ দু'টি সীমান্তবর্তী পার্বত্য রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পিরেনীজ পর্বতে সশস্ত্র ফৌজী প্রহরা মোতায়েন করতেন এবং সেখানে রীতিমত শক্তিশালী ফাঁড়িসমূহ নির্মাণ করতেন তা হলে ভবিষ্যতের জন্যে স্পেন রাজ্যটি সমস্ত সঙ্কট থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যেত। এভাবে হয়তো কোন সময় ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যও মুসলমানরা স্থায়িভাবে জয় করে নিতে পারতো। ঐ পার্বত্য সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের যে ক্ষয়ক্ষতি সময় সময় করেছে, তার বর্ণনা পরে আসছে।

সুলতান হাকামেরই শাসনামলে ইলাস্ট্রিয়াসের জনৈক পাদ্রী ঐ রাজ্যে এবং জালীকিয়া প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমানার এক জঙ্গলে সেন্ট জেম্‌স প্রেরিতের কবর রয়েছে। ফেরেশতারা নাকি স্বপ্নে তাকে এ কবরের সন্ধান দিয়েছেন। ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা সেমতে ওখানে একটি গির্জা নির্মাণ করে দেন যা কেবল ইলাস্ট্রিয়াস এবং জালীকিয়ারই নয়, ইউরোপের দূর-দূরান্তের তীর্থযাত্রীরা পর্যন্ত দলে দলে অত্যন্ত পুণ্যজ্ঞানে সে কবর যিয়ারত করতে আসতেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে বিপুল জনপদ গড়ে ওঠে। দেখতে দেখতে তা ঈস্টার ইয়াস রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্বের জন্যে গোটা জালীকিয়া প্রদেশও যেন তার আওতাধীনে চলে আসে।

সিপাহ্‌সালার আবদুল করীম কয়েক বছর পর ২০৩ হিজরীতে (৮১৮-১৯ খ্রি.) নিরাপদে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে ফ্রান্স থেকে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অভিযানটি অত্যন্ত সফল অভিযান বলে গণ্য হয় এ জন্যে যে, ফরাসীদেরকে তাঁদের ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষাই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইলাস্ট্রিয়াস এবং গথিক মার্চ রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলার দিকে তাঁরা একটুও মনোযোগী হলেন না বরং উল্টো ঐ দুটো ঈসায়ী রাজ্যের অস্তিত্বকে এজন্যে বেশ উপাদেয় বলেই গণ্য করা হলো যে, মুসলমানরা যেখানে গিয়ে বসত করতে পর্যন্ত রাযী নয়, সেখানে যে তাঁদের মাধ্যমে হুকুমত চালু রয়েছে এটাই বড় কথা। এমন কি ফরাসী দেশে পর্যন্ত কোন মুসলমান ও আরব সর্দার সম্মত হতেন না। এ জন্যেই মুসলমানরা বার বার ফ্রান্স জয় করলেও তার শীতল আবহাওয়ার জন্যে মুসলমানরা তার মূল্য অনুধাবন করেন নি। সেখান থেকে গনীমতের মাল লাভ এবং তাদের নিকট থেকে খারাজ বা রাজস্ব উশুল করাকেই তাঁরা যথেষ্ট বিবেচনা করতেন। কোন আরব বংশোদ্ভূত সর্দারকে যখন নার্বুন, জালীকিয়া বা পিরেনীজ পর্বত সন্নিহিত শীতল এলাকায় আমিল নিযুক্ত করে পাঠানো হতো, তখন তিনি তাতে মনঃক্ষুণ্নই হতেন। অপর পক্ষে, দক্ষিণের উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ ও সমভূমি এলাকায় বসবাসের সুযোগ পেলে বা তার আমিল নিযুক্ত হতে পারলে তাঁরা একে সৌভাগ্য বলেই গণ্য করতেন।

দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি

২০৩ হিজরীর (৮১৮-১৯ খ্রি.) পরে স্পেন দেশে হাকামের জন্যে শান্তি যুগের সূচনা হয়। কেননা, তখন দেশে না ছিল কোন বিদ্রোহ আর না ছিল কোন ঈসায়ী বহিরাগত হামলার মুকাবিলার ব্যাপার। আর কোন বহিরাক্রমণের আশঙ্কাও তখন ছিল না। কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং ব্যস্ততাপূর্ণ রাজত্বকালই ছিল হাকামের ভাগ্যলিপি। তাই সকল বিদ্রোহের যখন অবসান হলো, তখন স্বয়ং প্রকৃতি তাঁর প্রতি বিরূপ হলো এবং রাজ্যব্যাপী খরা ও দুর্ভিক্ষের হামলা হলো। এ দুর্ভিক্ষ ছিল বড় আকারের, যার ফলে দেশে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। হাকাম এ যাবত যেরূপ দৃঢ়চেতা ও সাহসী বলে সর্বপরিস্থিতিতে নিজের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন, এ মহাদুর্ভিক্ষের সময়ও তিনি সেরূপ সাহসী চরিত্রের পরিচয়ই দিলেন। তিনি মোটেই ভেঙে বা মুষড়ে পড়লেন না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের জন্যে প্রতিটি শহর-জনপদে লঙরখানার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে থেকে শস্য আমদানীর ব্যবস্থা করলেন। স্থানে স্থানে পথঘাট ও জনপদের হিফাযতের জন্যে অতিরিক্ত প্রহরা পুলিশের ব্যবস্থা করলেন। এ অবস্থায় যেখানেই তিনি কোন অরাজকতার সংবাদ পান সেখানেই সসৈন্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শান্তি স্থাপন করেন। মোটকথা, তাঁর প্রজাকুলের দুর্ভিক্ষের অনটনের সময় তাদের এমনি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন যে, সর্বশ্রেণীর নাগরিক তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসতে থাকে এবং এর আগে মৌলভী বা মৌলভী মেযাজের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ছড়িয়েছিলেন, তা দূরীভূত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে যারা স্বাধীনচেতা চরিত্রের জন্যে তাঁর কঠোর সমালোচনা করতেন, এবার তাঁরাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

সুলতান হাকামের ওফাত ও সন্তান-সন্ততি

সুলতান হাকামকে একজন রক্তপিপাসু শাসক বলে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় যে, যদিও তিনি অনেক লোককে হত্যা করিয়েছেন, কিন্তু তারা সত্যি সত্যি হত্যাযোগ্য ছিলেন, নাকি কেবল মনের স্ফূর্তির জন্যে তিনি এ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছিলেন।

সুলতান হাকাম ২০৬ হিজরীর ২৫ যিলকদ (এপ্রিল ৮২২ খ্রি.) বৃহস্পতিবার ৫২ বছর কয়েক মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কুড়িজন পুত্রসন্তান এবং সমসংখ্যক কন্যা সন্তান রেখে যান। সুলতান হাকামের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান পিতার স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হাকামের চরিত্র পর্যালোচনা

সুলতান হাকাম ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বদান্য এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারীদের শত্রু এবং আপন বন্ধুদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও সমব্যথী। তিনি আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্থির বুদ্ধির লোক। যেখানেই ক্ষমার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হবে বলে মনে করতেন সেখানেই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে অপরাধীকে ক্ষমা করতেন। তিনি স্পেনের একজন মহান ও অতি উঁচুদরের শাসক ছিলেন। সুলতান হাকাম যে কীরূপ ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহ্ ওয়ালা চরিত্রের লোক ছিলেন তার প্রমাণ মিলে এ ঘটনা থেকে যে, একদা তিনি কোন এক ভৃত্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। এমন সময় যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নামক একজন আলিমের সেখানে আবির্ভাব ঘটে। তিনি সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, মালিক ইব্ন আনাস (র) মরফু' সনদে রিওয়ায়েত করেন যে, 'যে ব্যক্তি শাস্তিদানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপন ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে অভয় দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।' তাঁর কথা শেষ হওয়া মাত্র বাদশাহর ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং তিনি ভৃত্যটিকে ক্ষমা করে দিলেন।

সুলতান হাকামের ২৭ বছরব্যাপী রাজত্বকালের পুরোটাই অতিবাহিত হয় হাঙ্গামা আর অশান্তির মধ্যে। এ অশান্তি ও হাঙ্গামা তিনি নিজে সৃষ্টি করেন নি বরং এগুলো ছিল স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত। এ সময় যদি তাঁর চাইতে কম ধৈর্যের কোন ব্যক্তি স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই স্পেনে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটতো আর তাতে সেখানকার মুসলমানদের পরিণাম হতো ভয়াবহ। স্বয়ং আল্লাহ্ সুলতান হাকামের পরীক্ষা নিয়েছেন এবং সে পরীক্ষায় বাহ্যত তিনি সাফল্যের সাথেই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আবদুর রহমান ছানী

সুলতান আবদুর রহমান ছানী বা দ্বিতীয় আবদুর রহমান ১৭৬ হিজরীর শাবান (ডিসেম্বর ৭৯২ খ্রি) মাসে টলেডোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৬ হিজরীতে (৮২১-২২ খ্রি.) পিতা হাকামের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়

বাহ্যত শান্তি বিরাজমান ছিল। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সকল ফিতনা তখন দমন করা হয়েছে। কিন্তু এ সুলতানের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে তাঁকে তাঁর নিজ বংশের লোকদের বিদ্রোহের মুকাবিলা করতে হয়।

খান্দানের লোকদের বিরোধিতা

উপরেই বর্ণিত হয়েছে, সুলতান হাকামের চাচা আবদুল্লাহ্ স্পেন থেকে মরক্কোর তাবখীরে বসবাস শুরু করেন। আবদুল্লাহ্ তখন বৃদ্ধ এবং দুর্বল। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান হাকামের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি তাবখীর থেকে রওয়ানা হন এবং স্পেনে উপনীত হয়ে নিজেকে স্পেনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। আবদুল্লাহ্র তিন পুত্র তখন স্পেনে ছিলেন এবং তাঁরা তিনজনই তিনটি প্রদেশের গভর্নররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবদুল্লাহ্র আশা ছিল, তাঁর পুত্ররা নিশ্চয়ই তাঁর বাদশাহ্ হওয়াকে সমর্থন জানাবেন, কিন্তু এটা ছিল আবদুল্লাহ্র নির্বুদ্ধিতা। বলা চলে, বুড়ো বয়সে তাঁকে ভীমরতিতে ধরেছিল। শাহী ফৌজ কাল বিলম্ব না করে তাঁর মুকাবিলা করে এবং তিনি পরাজিত হয়ে বালানসিয়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্ররা পিতার সমর্থন ও সহযোগিতা করে বিদ্রোহে তাঁর সাথে শামিল হওয়ার পরিবর্তে আবদুর রহমান ছানীর প্রতিই তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করে জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁরা তাদের পিতাকে এ খামখেয়ালী থেকে নিবৃত্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং বিদ্রোহের দাবানল ছড়াতে বারণ করেন। ফলে তিনি তাঁর পৌত্র আবদুর রহমান ছানীর কাছে ক্ষমার আবেদন জানান। আবদুর রহমান যে কেবল সে দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন তাই নয়, বরং আবদুল্লাহ্কে তিনি মারসিয়া প্রদেশের ওয়ালী বা গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। সেখানে তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুই-তিন বছর ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ আলী ইব্ন নাফির সমাদর

তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই অর্থাৎ ২০৬ হিজরীতে (৮২১-২২ খ্রি.) ইবরাহীম মুসেলীর শিষ্য আলী ইব্ন নাফি ওরফে ফারিয়ার স্পেনে পদার্পণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের উস্তাদ। প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্যায়ও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। ইরাক ও সিরিয়ায় তিনি তাঁর যোগ্যতানুসারে সম্মান পাননি শুনে সুলতান হাকাম তাঁকে স্পেন দেশে তলব করেন।

কিন্তু তাঁর স্পেন পৌঁছবার পূর্বেই সুলতান হাকাম ইন্তিকাল করেন। সুলতান আবদুর রহমান যখন উক্ত দার্শনিক সঙ্গীতজ্ঞের স্পেনে পৌঁছার সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি প্রত্যেকটি শহরের ওয়ালীর কাছে এ মর্মে ফরমান পাঠালেন যে, আলী ইব্ন নাফির কর্ডোভা পৌঁছবার পথে যে সব শহর পড়বে সেগুলোর আমিলরা যেন তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ তাঁকে ক্রীতদাস ও অশ্বাদি প্রদান করেন। মোটকথা, অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে আলী ইব্ন নাফি কর্ডোভায় উপনীত হন এবং বাদশাহর বিশিষ্ট মুসাহেব ও পারিষদের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হন।

আলী ইব্‌ন নাফির সামাজিক সংস্কারসমূহ

আলী ইব্‌ন নাফি স্পেনে অনেক বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করেন। তিনি সৌন্দর্য ও প্রসাধনের অনেক চমৎকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁরই উদ্যোগে কর্ডোভায় পানির নল লাগানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শীঘ্রই এ পদ্ধতি স্পেনের অন্যান্য শহরেও প্রবর্তিত হয়। নতুন নতুন সুস্বাদু, পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার এবং মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁরই আবিষ্কার। মোটকথা, ঐ একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবিষ্কারসমূহ কেবল স্পেন দেশেই নয়, গোটা ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করে। ছুরি কাঁটা বা কাঁটা চামচ দিয়ে আহার্য গ্রহণের পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। আলী ইব্‌ন নাফি সুলতান আবদুর রহমান ছানীর মেযাজ-মর্জি এবং রুচি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুলতানও তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। কিন্তু তিনি কোনদিন কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে সামান্যতম হস্তক্ষেপও করেন নি বরং নিজের পূর্ণ মেধাকে তিনি সমাজ সংস্কারমূলক কাজেই সর্বদা নিয়োজিত রাখেন। এজন্যে গোটা স্পেনেই তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর কোন শত্রু ছিল না। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। স্পেনবাসীরা যেখানে তাঁর কাছ থেকে পেল খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহ-সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা, সেখানে তারা তাঁরই কাছে পেল সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা। অন্য কথায় বলা যায়, আলী ইব্‌ন নাফি স্পেন দেশে পৌঁছে সেখানকার সৈনিক পেশার মুসলমানদেরকে বিলাসপ্রিয় ও শিল্পকলায় অভ্যস্ত, সূক্ষ্ম মেযাজ সম্পন্ন করে তোলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রসার

কাযী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মালিকীর কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। ঐ কাযী সাহেবেরই নেতৃত্বে সুলতান হাকামের শাসনামলে কর্ডোভায় একটি মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার ফলে কর্ডাভার মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ নদীর অপর তীরের জনপদের সমস্ত অধিবাসী দেশান্তরিত হন। বিশ-পঁচিশ হাজার লোকের একই সময়ে দেশান্তরিত হওয়ায় এ এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত কাযী সাহেব সুলতান হাকামের মুসাহেব ও উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত হন। এবার সুলতান আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি এই নতুন সুলতানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সুলতান আবদুর রহমানের আমলেই কাযীউল কুযাত এবং শায়খুল ইসলাম পদের প্রস্তাব পান, কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি কাযীউল কুযাতেরও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলে গণ্য হন। জনসাধারণ ছিল তাঁর বেজায় ভক্ত। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর ফায়সালাই ছিল চূড়ান্ত। কাযী সাহেব ছিলেন একজন বড় গ্রন্থকার। তিনি ছিলেন ইমাম মালিকের একজন বিশিষ্ট শাগরিদ। দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত ইমাম মালিক (র)-এর খিদমতে অবস্থান করে ইল্‌মে দীনের শিক্ষা হাসিল করেছিলেন। এবার সুলতান আবদুর রহমানের আমলে এসে তিনি তাঁর কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন। এখন থেকে তিনি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন। বিচার বিভাগে তিনি কারো জন্যে সুপারিশ করলে তা কখনো অগ্রাহ্য হতো না। তাই কোন আলিম

কোন শহর বা প্রদেশের কাযীপদ প্রার্থী হলে আগে মালিকী মাযহাব গ্রহণ করে তারপর তাঁর কাছে সুপারিশের জন্যে আসতেন। এভাবে কাযী ইয়াহ্ইয়ার চোখে মর্যাদার অধিকারী হয়ে এবং তাঁর স্নেহভাজন হয়ে অনেকেই কাযী হলেন। দেখা গেল, এভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে এ কার্যপদ্ধতির ফলে গোটা স্পেনেই মালিকী মাযহাবের অনুসারী হয়ে উঠলো। সুলতান আবদুর রহমান ছানী তাঁর পিতার রাজত্বকালেই রাজকার্যে প্রবেশ করেন। সুতরাং তিনি দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলতেন যেন মৌলভী বা মৌলভী গোছের লোকদের তাঁর বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাবার কোন সুযোগ না থাকে।

বিদ্রোহ দমন

আবদুর রহমানের সিংহাসনে আরোহণকালে স্পেনের গোটা উত্তরাঞ্চল যাতে বিস্কে উপসাগরের দক্ষিণ উপকূল এবং পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত শামিল ছিল এবং তা ঈসায়ীদেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু এ সব এলাকার ঈসায়ী রঈসরা মুসলিম খিলাফতের করদরাজ্য ছিল এবং তারা কর্ডোভা দরবারে আধিপত্য স্বীকার করতো। কর্ডোভা দরবারও স্পেনের উত্তরাঞ্চল থেকে এর চাইতে বেশি আর কিছুই প্রত্যাশা করতো না। বার্সেলোনা অঞ্চলও বহু পূর্বেই খ্রিস্টান অধিকারে চলে গিয়েছিল। গথিক মার্চ রাজ্যের পক্ষ থেকে সেখানে একজন শাসক তাদের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত থাকতেন। অনুরূপ স্পেনের পূর্ব ও উত্তর উপকূলের একাংশও ঈসায়ী শাসনাধীনে ছিল। ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্য লিওন ও জালীকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তার নতুন শহর বাস্টিল বা কাস্তিলা তার রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। মুসলমানরা এ উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাদের শক্তি ও দাপটের দ্বারা কেবল এজন্যে এ খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে সন্ত্রস্ত রাখতে চাইতেন যেন এরা তাদের সমধর্মীয় ফ্রান্সের রাজা বা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এবং তাদের সাথে যোগসাজশ করে স্পেনে বহিরাক্রমণের পথ করে না দেয়। এ উদ্দেশ্যেই মাঝে মাঝে তাঁরা বিস্কে উপসাগর পার হয়ে বা পিরেনীজ পর্বত ডিঙিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করতেন যেন উত্তরাঞ্চলের ঈসায়ীরা স্পেনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস দেখাতে না পারে। স্পেনের উত্তর সীমান্তবর্তী শহর ছিল আলবীরা। কর্ডোভা দরবারের পক্ষ থেকে এ শহরে রীতিমত আমিল নিযুক্ত থাকতেন।

উক্ত আলবীরার সীমান্তবর্তী আমিল সেখানকার প্রজাসাধারণের উপর নিপীড়ন চালান এবং ঈসায়ীদের সাথে যোগসাজশ করেন। এ অপরাধে সুলতান হাকাম তাকে হত্যা করিয়ে তার যাবতীয় ধন-সম্পদ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। এর মাত্র কিছুদিন পরেই সুলতান হাকামের ইন্তিকাল হয়। নতুন সুলতানের অভিষেককালে সীমান্তবর্তী ঈসায়ীরা একটা সুযোগ পেল। তারা আলবীরার ফৌজ ও প্রজাসাধারণকে উস্কানি দিয়ে কর্ডোভায় পাঠালো এই বলে যে, নিহত আমিলের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ যেন আলবীরায় ফেরত পাঠানো হয়। কেননা, আসলে এ সম্পদ জনগণেরই। নিহত আমিল তা বলপূর্বক জনগণের নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। এ প্রতিবাদী লোকজন ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি.) কর্ডোভাতে উপনীত

হয়ে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। তাদের শায়েস্তা করার জন্যে সুলতানের রক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হলো। উভয়পক্ষে রীতিমত সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে অনেকে নিহত হয় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। ফলে সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানদের হাতে গোলযোগ সৃষ্টির নতুন সুযোগ আসে।

ঐ বছরই অর্থাৎ ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি.) তাদমীর অঞ্চলে আরবদের মধ্যকার মুদার ও ইয়ামানী গোত্রসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ আত্মকলহ দূর করার উদ্দেশ্যে শাহী ফৌজ পাঠান হলো। ফলে আত্মকলহ থেমে যায়। কিন্তু শাহী ফৌজ চলে আসতেই উক্ত গোত্রগুলো পুনরায় আত্মকলহে লিপ্ত হয়। আবারও শাহী ফৌজ সেখানে যায়। এভাবে দীর্ঘ সাতটি বছর এ আত্মকলহে অতিবাহিত হয় এবং অভ্যন্তরে আরব গোত্রসমূহ আরব জাহিলিয়াতের প্রবণতা ও চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

২০৮ হিজরীতে (৮২৩-২৪ খ্রি.) ঈস্টার ইয়াস অথবা জালীকিয়া রাজ্য রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে শহর–বন্দরে লুটপাট চালায়। এ সংবাদ অবগত হয়ে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি আবদুল করীম ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন মুগীছকে সসৈন্য সেদিকে প্রেরণ করলেন। উক্ত বীর সেনাপতি সেখানে উপনীত হয়ে ২০৮ হিজরীর জুমাদাল উখরা (অক্টোবর ৮২৩ খ্রি) মাসে ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি যুদ্ধে পরাস্ত করে পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। আবদুল করীম ঈসায়ীদের সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহকে ধূলিসাৎ করে ঈসায়ী শাসকদেরকে রাজস্ব আদায় এবং ভবিষ্যতে অনুগত থাকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করেন। এ সকল অভিযান সমাপ্ত করে আবদুল করীম প্রত্যাবর্তন করা মাত্র পুনরায় এ বাহিনীকে উক্ত সেনাপতিরই নেতৃত্বে তাৎক্ষণিকভাবে বার্সেলোনা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। কেননা, সেখান থেকে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ এসেছিল। শাহী ফৌজ বার্সেলোনা পৌঁছেই গোটা এলাকা জয় করে ঈসায়ী সৈন্যদেরকে পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করতে বাধ্য করে। জালীকিয়াবাসীদের মতো তাদের নিকট থেকেও আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে সমস্ত বিজিত এলাকা তাদেরই হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়।

কনসটান্টিনোপলের দূতের আগমন

২০৯ হিজরীতে (মে ৮২৪-২৫ খ্রি.) কনসটান্টিনোপলের রাজ দরবার থেকে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের খিদমতে একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন এবং স্পেনের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাগদাদ দরবার ইতিপূর্বেই ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছিলেন। মূল্যবান উপঢৌকনসামগ্রী রীতিমত ফরাসী দরবারে পৌঁছতো। বাগদাদ দরবার সবসময়ই স্পেন আক্রমণের জন্যে ফরাসীদেরকে উৎসাহিত করতো। কর্ডোভা দরবার তা সম্যক অবগত ছিল।

এদিকে বাগদাদ সর্বদাই কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের ওপর চড়াও হতো। তাই কনসটান্টিনোপল দরবার সর্বদাই নিজেকে সংকটাপন্ন বলে ভাবতো। এবার যখন তাঁরা

দেখলেন যে, স্পেনের সুলতান অত্যন্ত বীরপুরুষ এবং সেখানকার মুসলমানরাও অত্যন্ত শক্তিশালী বলে খ্যাত তখন তাঁরা কর্ডোভা দরবারকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করার প্রয়াস পেলেন। কর্ডোভা বাগদাদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন বিধায় স্পেনের সুলতানের অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কনসটান্টিনোপল সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ার কথা। আবদুর রহমান তাঁর দূতকে পরম সমাদরে বরণ ও আপ্যায়িত করলেন। দূতও সুলতানের দরবারে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি পেশ করলেন এবং কনসটান্টিনোপল সম্রাটের বিপুল শক্তি-সামর্থ্য এবং তাঁর সামরিক বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তির কথা অতিশয়োক্তির সাথে বর্ণনা করে তাঁকে এ মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, আপনি যদি আমাদের কনসটান্টিনোপল সম্রাটের সাথে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহলে অনায়াসেই আপনার পিতৃরাজ্য সিরিয়া, আরব ও ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্রের খিলাফত আব্বাসীয়দের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবেন। আবদুর রহমান এসময় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি শুধু এতটুকু আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত হন যে, যদি আমার দেশের পরিস্থিতি শান্ত হয় তাহলে আমি আপনাদের সম্রাটকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আমার দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছি। তারপর তিনি সম্রাটের উপঢৌকনের জবাবে বহুমূল্য উপঢৌকনসামগ্রী দূতের সাথে দিয়ে তাঁর নিজ দূত ইয়াহ্ইয়া গাযালকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করলেন।

আমীর আবদুর রহমানের ইসলামী চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ

ইয়াহ্ইয়া আল-গাযাল কনসটান্টিনোপলে পদার্পণ করে সর্বপ্রথম সেখানকার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর সম্রাটকে তাঁর সুলতানের বন্ধুত্বের পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সুলতান আবদুর রহমান একজন অমুসলিম ঈসায়ী সম্রাটকে তাঁর শত্রু আব্বাসীয় খলীফা যেহেতু মুসলমান তাই তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ বা সৈন্য সাহায্য দেয়া সমীচীন বোধ করেননি। তাই তিনি মৌখিক আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত হন। নতুবা আবদুর রহমানের সম্রাটের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সম্রাট তাঁর কাছে অর্থ ও সৈন্য সাহায্যই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আবদুর রহমানের পক্ষে এক হাজার বা কয়েক হাজার সৈন্য এবং এক লক্ষ বা কয়েক লক্ষ দীনার সাহায্য সম্রাটের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল একটি মামুলী ব্যাপার। এতে তাঁর সৈন্যবাহিনী বা রাজকোষের ওপর তেমন কোন প্রভাবই পড়তো না। কিন্তু আবদুর রহমানের ইসলামী চেতনাবোধ তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে।

পর্তুগীজদের বিদ্রোহ

আজকাল পর্তুগাল বলে পরিচিত স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিমের এলাকার খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা সেখানকার মারীদাবাসীদের নেতৃত্বে সেই বছর বিদ্রোহ করে। এ ফিতনা দমনের জন্যে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্কে প্রেরণ করা হয়। ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। শহরের বেষ্টনী প্রাচীর ধূলিসাৎ করে ২১০ হিজরীতে (মে ৮২৫ খ্রি-এপ্রিল '২৬ খ্রি) তিনি কর্ডোভায় ফিরে আসেন। কয়েকদিন পর বিদ্রোহীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উবায়দুল্লাহকে আবারও সেখানে যেতে হয়। এবারও বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

এ বিদ্রোহের মূলে ছিল সেইসব পাদ্রী যারা জালীকিয়া এবং কিসতা থেকে ঐ এলাকায় গিয়ে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিল। কেননা উত্তরাঞ্চলীয়, বিশেষত জালীকিয়ার ঈসায়ীরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে যে, মুসলমানদের আত্মকলহ এবং তাদের মধ্যকার বিদ্রোহজনিত ব্যস্ততাই আমাদের উন্নতি ও সফলতার পথ প্রশস্ত করতে পারে। আর যতদিন পর্যন্ত আমরা দক্ষিণাঞ্চলে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে না পারবো, ততদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ সমীচীন হবে না।

মারীদাবাসীদের ঔদ্ধত্যের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে তাদের আমিলকে শহর থেকে বের করে দেয়। তারা দু-দু'বার শাহী ফৌজের সাথে মুকাবিলা করে। তাই ২১০ হিজরীতে (মে ৮২৫ খ্রি-এপ্রিল '২৬ খ্রি) সুলতান আবদুর রহমান মারীদা শহরের ধ্বংসকৃত বেষ্টনী প্রাচীরের পাথর নদীতে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। সে শহরের আমিল যখন এ নির্দেশ কার্যকরী করতে উদ্যত হলেন, তখন শহরবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা আবারও শহর দখল করে নেয়। অগত্যা আমিলকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়। শহরবাসীরা শহরের ভগ্নপ্রাচীরের পাথর দিয়ে পুনরায় প্রাচীর নির্মাণ করে এবং মুকাবিলার জন্যে মযবুত হয়ে বসে। শুনে অবাক হতে হয় যে, এ বিদ্রোহে কেবল ঈসায়ীরাই ছিল না, মুসলমানদের এক বিরাট অংশও তাতে শামিল ছিল এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাহমূদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার নামক একজন মুসলিম সন্তানই। এ মুসলমানরা কেন ঈসায়ীদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করতে উদ্যত হতো, তার কারণ পরে বলা হচ্ছে। মোটকথা, ২১৭ হিজরী (৮৩২ খ্রি.) পর্যন্ত শাহী সিপাহ্‌সালার মারীদাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধলিপ্ত থাকেন কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি।

অবশেষে ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি.) স্বয়ং সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান মারীদায় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এবারও শহর জয় না করেই কোন এক কারণে অবরোধ প্রত্যাহার করে তাঁকে কর্ডোভায় ফিরে যেতে হয়। ২২১ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি.) পুনরায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হামলা করা হলো। দীর্ঘ সাতটি বছর পর্যন্ত মধ্য স্পেনের এ শহরটি স্বাধীন থাকার পর পুনরায় সুলতানের পদানত হলো। সুলতান সেখানে যথারীতি আমিল নিযুক্ত করলেন। মারীদাবাসীদের এ মারাত্মক বিদ্রোহের চাইতে বড় বিদ্রোহ স্পেনে ইতিপূর্বে আর দেখা দেয়নি। শহরবাসীদের কাছে চল্লিশ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য মওজুদ ছিল। ইলাস্ট্রিয়াস এবং জালীকিয়া থেকে তাদের জন্য সর্বপ্রকার গোপন সাহায্য অহরহ পৌঁছে ছিল। অবশেষে ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি) যখন এ শহরটি বিজিত হলো এবং বিদ্রোহের অবসান ঘটলো তখন বিদ্রোহী নেতা মাহমূদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার মারীদা থেকে সোজা ইলাস্ট্রিয়াসে গিয়ে হাযির হলো। সেখানে তাকে একটি দুর্গের দুর্গাধিপতি বানানো হয়। সেখানে সে পাঁচ বছরকাল জীবিত ছিল।

খ্রিস্টানদের পক্ষে মুসলমানদেরকে বিদ্রোহী করে তোলা দু'টি কারণে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। প্রথম কারণ হলো, স্পেনের সর্বত্র মুসলমানদের ঘরে খ্রিস্টান রমণীরা ছিল। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বধূদেরকে তাদের

ধর্মত্যাগে বাধ্য করতেন না। উত্তরের মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র স্পেনের খ্রিস্টানদের মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল। ঐ সব ঈসায়ীর মাধ্যমে উত্তরের ঈসায়ীরা অনায়াসেই মুসলমানদের মধ্যে যে কোন চিন্তা-ধারার প্রসার ঘটাতে পারতো। একবার রটিয়ে দেয়া হলো যে, সুলতান আবদুর রহমান যাকাত ছাড়া অন্য যে কর ধার্য করেছেন তা হলো প্রজাদের সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর অবৈধভাবে কেড়ে নেয়ার জুলুমের সূচনা মাত্র। এটা ছিল এমনি এক প্রচারণা যার কারণে সর্বপ্রথম মুসলমানরা তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়। এ মামুলী বিষয়টা দানা বাঁধতে বাঁধতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় তা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

টলেডোতে বিদ্রোহ

মারীদার বিদ্রোহ যেহেতু শীঘ্রই প্রশমিত হওয়ার ছিল না এবং মুসলিম বিদ্রোহীদের বীরত্ব শাহী ফৌজের জন্যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছিল, তাই দেশের অভ্যন্তরের বিদ্রোহীদের সাহস আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। অধিক সংখ্যক খ্রিস্টান অধিবাসী অধ্যুষিত টলেডো নগরীতে খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে হাশিম দার্রাব নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে সেখানকার আমিলকে বহিষ্কার করে এবং নিজেরা টলেডো নগরীতে মজবুত হয়ে বসে। প্রতিবেশী গথিক মার্চ রাজ্য এবং আশেপাশের লোকেরা হাশিম দার্রাবকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা পৌঁছাতে থাকে। দুষ্ট ও অনাচারী লোকেরা দলে দলে এসে টলেডোতে প্রবেশ করতে এবং বিদ্রোহী দলে ভিড়তে থাকে। টলেডো পূর্ব থেকেই একটা মজবুত এবং দুর্জয় নগরী ছিল। এবার হাশিম প্রতিরোধ সামগ্রী এবং বিপুল সৈন্যসংখ্যা দিয়ে নগরীটিকে আরো মজবুত, অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য করে তুললো। তা দেখে সীমান্তবর্তী আমিল মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াসীমও হাশিমের বিদ্রোহী দলে ভিড়ে পড়লেন।

এদিকে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাঁর পুত্র উমাইয়াকে একটি বিরাট বাহিনীসহ টলেডো অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। উমাইয়া চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। শেষ পর্যন্ত উমাইয়া সসৈন্যে ফিরে এলেন। হাশিম টলেডো থেকে বের হয়ে শাহী ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করলো। শাহী ফৌজ একটি স্থানে ঘাপটি মেরে রইল এবং টলেডোবাসীরা নাগালের মধ্যে আসতেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ হামলায় টলেডোদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু তারা পালিয়ে টলেডো ফিরে যেতে সমর্থ হয়। তারা নগরীতে ফিরে নগরীর ফটক বন্ধ করে দেয়। বার বার এ নগরীটি অবরোধ করার জন্যে সৈন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু নগরীটি অজেয়ই রয়ে যায়। একবার হাশিম টলেডো থেকে বের হয়ে শান্ত বারিয়্যায় লুটপাট চালায় এবং তা দখল করে নেয়। অবশেষে সুলতান আবদুর রহমান তাঁর ভাই ওয়ালীদকে ২২২ হিজরীতে (৮৩৬-৩৭ খ্রি) এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে দিয়ে টলেডো অভিমুখে প্রেরণ করলেন। ওয়ালীদ টলেডোর চতুর্দিকে সৈন্য মোতায়েন করে সবদিক থেকে রসদ আসার পথ কড়াকড়িভাবে বন্ধ করে দেন। তিনি তাঁর প্রচেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যান। ফলে টলেডোবাসীরা নিরুপায় হয়ে পড়ে। ২২৩ হিজরীতে (৮৩৭-৩৮ খ্রি)

ওয়ালীদ টলেডো পুনরুদ্ধার করেন। হাশিম দার্রাব যুদ্ধে নিহত হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসীম সেখান থেকে পালিয়ে সিবন শহরে চলে যায়। সেখানে সে বিদ্রোহীদেরকে সংগঠিত করে এবং কিছুদিন পর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে টলেডো দখল করে নেয়।

২২৪ হিজরীতে (৮৩৯ খ্রি.) সুলতান আবদুর রহমান নিজে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ টলেডো আক্রমণ করে তা পুনরুদ্ধার করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে সেখানে শান্তি স্থাপন করেন। সেখান থেকেই তিনি একদল সৈন্য সাথে দিয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহকে আলবা ও কিলা নামক স্থানের দিকে রওয়ানা করেন। উবায়দুল্লাহ্ সেখানে পৌঁছে বিদ্রোহ উদ্যত ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত করে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

উক্ত বাহিনী উত্তর সীমান্তে তাদের কাজ শেষ করতে না করতেই ফরাসীরা মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সুযোগে সীমান্তে হামলা চালায়। তারা দীর্ঘকাল ধরে স্পেন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে যাচ্ছিল এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। এবার তারা সীমান্তবর্তী শহর সালেমে প্রবেশ করে লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। উবায়দুল্লাহ্ সেখানকার আমিল ইব্‌ন মূসাকে সঙ্গে করে ঈসায়ী ফৌজদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের সেনাপতি ফ্রান্সের রাজা লারযীককে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন।

২২৫ হিজরীতে (৮৪০ খ্রি.) সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান নিজে জালীকিয়ায় হামলা চালিয়ে সেখানকার বিদ্রোহী ঈসায়ীদের শাস্তিবিধান করে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের শাসকের নিকট থেকে খারাজ ও কর উসুল করে তার আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে সে রাজ্যে তাঁর নিজস্ব সেনাছাউনি স্থাপন করেন। তারপর স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ফ্রান্স অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। এ অভিযানের ফলে প্রচুর গনীমত ও যুদ্ধবন্দী মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। সুলতান আবদুর রহমান নিরাপদে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কনসটান্টিনোপল সম্রাটের দ্বিতীয় কূটনৈতিক মিশন

ঐ বছরই কনসটান্টিনোপলের সম্রাট টুকিল্‌স-এর পক্ষ থেকে একটি কূটনৈতিক মিশন কর্ডোভায় আগমন করে যেমন ইতিপূর্বে সেখানকার সম্রাট মীকাঈলের পক্ষ থেকে একটি কূটনৈতিক মিশন কর্ডোভায় এসেছিল। আবদুর রহমান এবারও পূর্বের মতো সম্রাটের দূতকে সাদর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এবার কনসটান্টিনোপল সম্রাট বাগদাদের খলীফার হাতে বড্ড বেশি কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাই পূর্ববর্তী সম্রাটের তুলনায় নতুন সম্রাট আরও বেশি কাকুতি-মিনতির সাথে আবদুর রহমানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং প্রথমবারের তুলনায় এবার বড় বড় আশার কথাও তাঁকে শুনিয়েছিলেন। হয়তো বা বাগদাদের খলীফার বিরোধিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি ফরাসীদের কাছেও বড় বড় উপঢৌকনাদি প্রেরণের ধারাও অব্যাহত রেখেছিলেন। আবার ফরাসীরাও তাদের প্রতিবার স্পেনে হামলার উৎসাহ ও ইঙ্গিত বাগদাদ থেকেই পেত। এবার হয়তো সত্যি সত্যি আবদুর রহমান কনসটান্টিনোপল সম্রাটের সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক ঐ সময়েই

ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় পৌত্তলিক নর্মান জাতি, যারা তখনও খ্রিস্টানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতো, জার্মানী ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে জাহাজে আরোহণ করে ইংলিশ চ্যানেলের পথ ধরে স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করে আকস্মিকভাবে তথাকার গ্রাম ও শহরগুলোতে লুটপাট চালায়। তারা ফাদিস শহরে লুটপাট করে আশবেলিয়ার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা ছিল একটা অজ্ঞাত পরিচয় ও অখ্যাত সম্প্রদায়ের স্পেনের ওপর হামলা যেমনটা মুসলমানদের প্রথম হামলা তারিক ইব্‌ন যিয়াদের নেতৃত্বে হয়েছিল। এ বিব্রতকর সংবাদ পেয়ে আমীর আবদুর রহমান স্থলপথে তাদের মুকাবিলায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। অপরদিকে তিনি স্পেনের পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহে এ মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, সব জাহাজ জিব্রালটার প্রণালীর দিকে পাঠিয়ে দাও যাতে আক্রমণকারীদের জাহাজসমূহ দখল করে নিয়ে তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়া যায়। আক্রমণকারীরা যখন অবগত হলো যে, তাদের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পনেরটি অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ রওয়ানা হয়েছে, তখন তারা দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে তড়িঘড়ি করে উপকূলের দিকে পালিয়ে যায় এবং নিজেদের নৌকায় চড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর বহুকাল পর্যন্ত আর তাদের স্পেনে অতর্কিত হামলা চালাবার দুঃসাহস হয়নি।

সেনাপতি মূসা ইব্‌ন মূসার বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহ দমিত হতে না হতেই উত্তর দিক থেকে খবর পৌঁছল আবদুর রহমান ছানীর মশহুর সিপাহসালার মূসা ইব্‌ন মূসা বিদ্রোহী হয়ে ঈসায়ীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। এই মূসাকেই উত্তর সীমান্ত সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তাকে দমনের জন্য হারিস ইব্‌ন বাদীকে প্রেরণ করা হলো। মূসা তার ঈসায়ী বন্ধুদেরকে নিয়ে মুকাবিলা করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হারিস তাকে পরাজিত করে পালাতে বাধ্য করে। মূসা টলেডোতে অবস্থান করেন আর হারিস সারাকসতায় ফিরে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘকাল ধরে উভয় পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মূসা টলেডো ছেড়ে রাবেত নামক স্থানে চলে যান আর টলেডো হারিসের দখলে আসে। শেষ পর্যন্ত ঈসায়ী রাজা গারসিয়া সৈন্যদল নিয়ে মূসার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। ফলে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। আলবা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে মূসা হারিসকে গ্রেফতার করিয়ে ২১৮ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি.) ফ্রান্সের সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন। আবদুর রহমান এ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাঁর পুত্র মুনযিরকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মূসাকে দমন করার জন্যে প্রেরণ করেন। ততক্ষণে মূসা টলেডো দখল করে নিয়েছিলেন। মুনযির ২১৯ হিজরীতে (৮৩৪ খ্রি) মূসার সাহায্যার্থে আগত নাব্‌বালুনার ওয়ালী গারসিয়াকে এক যুদ্ধে হত্যা করেন। মূসা যিম্মীস্বরূপ তাঁর পুত্রকে মুনযিরের নিকট প্রেরণ করে সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেন। মূসাকে টলেডোর শাসনভার অর্পণ করা হয়।

স্পেনের উত্তর সীমান্তের ঈসায়ীদের বিদ্রোহ

এদিকে উত্তর সীমান্তে যখন এ হাঙ্গামা চলছিল তখন উত্তরপূর্ব দিকের ঈসায়ীরা বিদ্রোহের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তাকে। ২৩০ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৮৪৪-আগস্ট

৮৪৫ খ্রি) বার্সেলোনাবাসীরা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে লুটপাট শুরু করে দেয়। তারা সেখানকার মুসলিম সেনাদেরকে হত্যা করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সুলতান আবদুর রহমান তাঁর মশহুর সিপাহ্সালার আবদুল করীম ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুগীছকে ২৩১ হিজরীতে (৮৪৫ খ্রি) বার্সেলোনার দিকে রওয়ানা করেন। আবদুল করীম বার্সেলোনা ও তার আশেপাশের বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে গথিক মার্চ রাজ্যকে লণ্ডভণ্ড করে দেন। তারপর আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে রাজ্য তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্স সীমানায় প্রবেশ করে ফরাসী শহর জারিন্দা পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যান। ইসলামী সৈন্যরা অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থান করেনি, বরং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও শৌর্যবীর্য দেখিয়ে তারা শীঘ্রই স্বদেশে ফিরে আসে।

ঈসায়ীরা এবং বনু উমাইয়ার শত্রুরা এ পর্যন্ত যত চেষ্টা-চরিত্র ও ষড়যন্ত্র করে তার সব ক'টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যখন সমস্ত হাঙ্গামা শান্ত এবং সকল বিদ্রোহই অবদমিত হলো তখন ফ্রান্স এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের ঈসায়ীরা একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কর্ডোভার সীমান্তে হানা দেয়া থেকে সকলকে বিরত রাখার দায়িত্ব জালীকিয়ার পাদ্রীরা গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ দীর্ঘ সময়টাতে তারা ঈসায়ী শক্তিগুলো সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে এবং নতুন নতুন দুর্গ গড়ে তুলতে পারবে। উত্তরাঞ্চলের আমিলদেরকে তারা নিজেদের সাথে যুক্ত করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর শেষ পর্যন্ত তেমনি এক আঘাত হানবার জন্যে তৈরি হবে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর সেই গথিক রাজত্বের যুগ ফিরে আসবে। এ চেষ্টাকে তারা নিখাদ ধর্মীয় ইবাদত বলে অভিহিত করলো। জালীকিয়ার পাদ্রীরা একজন উদ্যমী ও উৎসাহী পাদ্রীকে শুধু এ উদ্দেশ্যে রাজধানী কর্ডোভার জন্যে দায়িত্ব প্রদান করে যে, তিনি খাস কর্ডোভা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে পাদ্রীদেরকে এবং খ্রিস্টান জনসাধারণকে খ্রিস্ট ধর্মের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করার এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন। স্পেনে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঈসায়ীরা সর্বপ্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। তারা তাদের গির্জায় রীতিমত ঘণ্টা বাজাতো এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন করতো। লেনদেন ও মামলা-মকদ্দমায় সাধারণত ঈসায়ী বিচারকরা রায় দিতেন। গির্জাসূহের ব্যয়নির্বাহের জন্যে রাজসরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হতো। মুসলমান ও ঈসায়ীরা একে অপরের ধর্মীয় উৎসব পর্বে শরীক হতো। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ প্রভৃতিতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করতো। এমন কোন সঙ্গত কারণ ছিল না যাকে কেন্দ্র করে ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতে পারে। বেচারাদের মুসলমানদের আসল চরিত্র অবলোকনের সুযোগও হয়নি। কেননা ঐ সব এলাকায় অধিকাংশই এমন লোক এসে উঠেছিল, যারা ছিল গথ-রাজত্বের আমলা-কর্মচারী আর যারা মুসলমানদের আগমনকে তাদের জন্যে অপমানজনক বলে বিবেচনা করতো। এ জাতীয় পাদ্রীদের বক্তৃতা ও ওয়ায়েজের মাধ্যমে বিরোধিতার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হতো আর মুসলমানরাও বার বার এ এলাকায় আক্রমণ করার এবং লুটপাট ও হাঙ্গামা বাধাবার সুযোগ লাভ করতো।

উত্তর ও দক্ষিণ স্পেনের ঈসায়ীদের নতুন ফিতনা

এ সব সত্ত্বেও উত্তর স্পেনের নিবেদিত ঈসায়ীরা দক্ষিণ স্পেনে ছড়িয়ে পড়ে। তারা এ নীতি গ্রহণ করে যে, প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে ও সমাবেশে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম ধরে গালিগালাজ করতো। কুরআনুল করীমের অবমাননা করতো এবং মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করতো। প্রথমে খ্রিস্টান কুৎসাবাজদের গ্রেফতার করে কাযীর আদালতে সোপর্দ করা হয়। সেখানেও তাঁরা তাদের অশ্রাব্য উক্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি করে। কাযী তাদের প্রাণদণ্ডাদেশ দেন। এভাবে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতেই অপরজন এসে পূর্বের জনের মতো কাযীর দরবারে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে গালি-গালাজ করে। কাযী তাকেও প্রাণদণ্ডাদেশ দেন। এ সমস্ত উগ্র খ্রিস্টান যখন এরূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে একের পর এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করে স্বেচ্ছায় প্রাণদণ্ডাদেশ বরণ করতে লাগলো, তখন কাযী ও সুলতানের পক্ষ থেকে ক্ষমার আচরণ করা হতে লাগলো। সাধারণ খ্রিস্টানদের মধ্যে অনায়াসেই পাদ্রীরা এ ধারণা ছড়িয়ে দিল যে যারা এভাবে প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাঁরা আসলে এক একজন কামেল ওলী ও সাধু পুরুষ। তাই এসব নিহতের সমাধিস্থলকে তীর্থস্থানে পরিণত করা হলো। কর্ডোভা এবং অন্যান্য স্থানের বিরাট সংখ্যক মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈসায়ী এ সব নিহত খ্রিস্টানের সমাধিসমূহকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো। তারা এ সমস্ত সমাধি দর্শনকে পুণ্যকাজ বলে ধারণা করতো।

উত্তর স্পেনের রাজ্যগুলোর ঈসায়ীরা ঐ সব শহীদের সমাধিস্থল দর্শনে আসতো এবং তাদের পথ ধরে নিজেরাও ঐরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে গ্রেফতারীবরণ করতো। যখন ঐ সব দুষ্টের কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডাদেশ দেয়া হতো এবং তাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হতো, তখন হাজার হাজার খ্রিস্টান তাকে সিদ্ধপুরুষ ভেবে অন্তিমবারের মত দর্শনের জন্যে সমবেত হতো। এ ধারা কয়েক বছর পর্যন্ত চালু থাকে। সুলতান এ ঔদ্ধত্য-সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে কর্ডোভা ও আশবেলিয়া প্রভৃতি স্থানের বড় বড় বিবেকবান পাদ্রী-পুরোহিতরা একটি মহাসম্মেলনে মিলিত হয়ে স্পেন দেশের বড় বড় পাদ্রীকে নিয়ে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। ঈসায়ী ধর্মের বিধান মতে ইসলামের নবীকে গালি দেয়া বা কুরআনের অবমাননা করা পুণ্য কাজ কিনা, এসব ঔদ্ধত্যমূলক আচরণের দ্বারা নিহত ব্যক্তিরা প্রকৃতই সাধু পুরুষ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য কিনা, এগুলোই তাদের মহা-সম্মেলনের বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে সমবেত পাদ্রীরা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁরা এ জাতীয় কার্যকলাপকে ঈসায়ী ধর্ম বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করলেন। সাথে সাথে যারা এভাবে অঘোরে প্রাণ দিয়েছে তাদেরকে মহাপাতকী বলেও অভিহিত করলেন। সাথে সাথে তারা একটি অদ্ভুত রায়ও দিলেন যে, যারা এ পর্যন্ত এ পথে প্রাণ দিয়েছেন তাদেরকে শহীদ ও সাধু পুরুষ জ্ঞান করা হবে, কিন্তু এরপরও যারা এ অশোভন পন্থা গ্রহণ করবেন তাদেরকে অনাচারী বদমাশ ও মহাপাতকী বিবেচনা করা হবে। পাদ্রীদের এ কাউন্সিলের মতামত স্পেনীয় ঈসায়ীদের প্রভাবান্বিত করলো। কিন্তু উত্তর স্পেনের পাদ্রীরা, যারা এসব অশোভন কাজের মাধ্যমে সিদ্ধপুরুষ ও

কামেল ওলী বলে জনগণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতো, তারা তারপরও বিরত হলো না। একদিকে মুসলমানরা উক্ত অশোভন উক্তিকারী ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে কুণ্ঠিত-দ্বিধাগ্রস্ত সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে গাফলতির অভিযোগ করতো। অপর দিকে জাহিল খ্রিস্টানরা তাদের পাদ্রীরা কেন তাদের শহীদ পাদ্রীদেরকে অনাচারী বদমাশ বলে আখ্যায়িত করলো তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ন ছিল। মুসলমান ও ঈসায়ীদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিরাজমান সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হতে লাগলো এবং ক্রমেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

ঈসায়ীদের সৃষ্ট এ ফিতনা সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে তাঁর জীবনের অন্তিম পাঁচ-ছয় বছর খুবই বিব্রত রাখে। তাঁর জীবদ্দশায় এ অভূতপূর্ব ফিতনা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি বরং অল্প-বিস্তর তা চলতেই থাকে।

আবদুর রহমানের ওফাত

অবশেষে ২৩৮ হিজরীর রবিউল আখের (অক্টোবর ৮৫২ খ্রি) মাসের শেষদিকে ৩১ বছর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় আবদুর রহমান ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবদুর রহমানে রাজত্বকালের পর্যালোচনা

সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহমুক্ত না থাকলেও তিনি জনকল্যাণমূলক কার্যাদি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ব্যাপারে একটুও উদাসীন ছিলেন না। আবদুর রহমান নিজে একজন উঁচুদরের বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্ম-দর্শনের একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কর্ডোভা জামে মসজিদে তিনি বেশ কটি প্রকোষ্ঠ সংযোজন করেন। নতুন নতুন সড়ক বের করেন। অনেক মসজিদ, সেতু ও দুর্গ নির্মাণ করেন। পথিক ও ব্যবসায়ীদের নানারূপ সুযোগ-সুবিধা বিধান করেন। শিক্ষা বিভাগের প্রতি সর্বদাই তাঁর মনোযোগ ছিল। কোন পল্লী বা গ্রামই তিনি বিদ্যালয়হীন অবস্থায় রাখেননি। প্রত্যেকটি শহরে ও কসবায় আমিল ও ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্যে দফতর ও কাছারিস্বরূপ সুরম্য প্রাসাদাদি নির্মাণ করান। প্রত্যেকটি শহর ও কসবায় হাম্মামখানা ও শৌচাগার নির্মাণ করান।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। তিনি সাজসজ্জা ও শান-শওকত পছন্দ করতেন। প্রজাসাধারণের সম্মুখে কমই আত্মপ্রকাশ করতেন। সাধারণত তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থাকতেন। তাঁর চরিত্রে দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রাবল্য ছিল। কঠোর শাস্তি এবং মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিতে তিনি খুবই চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁর আমলে রাজকোষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি পূর্বের তুলনায় সুদৃশ্য মুদ্রা ঢালাই করান। ওয়াদিউল কবীর নদীর উভয় তীরে সুদৃশ্য ফল বাগান তৈরি করেন এবং সেগুলো জনগণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। তিনি গ্রীক দার্শনিকদের পুস্তকাদি অনুবাদ করান। জ্ঞান-চর্চার মজলিস কায়েম করেন। একবার রাজ্যে পঙ্গপালের আক্রমণে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। অনাবৃষ্টির দরুন বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় তিনি প্রজাসাধারণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তারপর রাজকোষে প্রচুর

শস্য গুদামজাত করে রাখার নিয়ম প্রবর্তন করেন যাতে কখনো এরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তা প্রজাসাধারণের কাজে লাগে।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

সুলতান আবদুর রহমানের একজন প্রিয় মহিষী ছিলেন তারূব। শাহ্যাদা আবদুল্লাহ্ তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারূব মনেপ্রাণে চাইতেন যে, সুলতান যেন তাঁর এই পুত্র আবদুল্লাহকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু শাহ্যাদা মুহাম্মাদ তাঁর ভাই আবদুল্লাহর তুলনায় রাজত্ব পরিচালনায় যোগ্যতর পাত্র ছিলেন। তারূব একবার মুহাম্মাদকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অপচেষ্টা চালান। নসর নামক একজন খোজাকে তিনি এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন। নসর একজন শাহী চিকিৎসককে বড় অংকের অর্থের প্রলোভন দিয়ে তাঁর ঔষধে বিষ মিশ্রিত করতে সম্মত করেন। শাহ্যাদা মুহাম্মাদ তখন কোন এক সামান্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন এবং উক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শাহী চিকিৎসক নসরের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু চুপে চুপে তিনি নসরের এ ষড়যন্ত্রের কথা সুলতানকে অবহিত করলেন। তিনি জানালেন যে, আজ শাহ্যাদার জন্যে ঔষধের যে পেয়ালা তৈরি হয়ে আসবে তাতে হলাহল মিশ্রিত থাকবে। সত্যি সত্যি বিষ মিশ্রিত ঔষধের পেয়ালা শাহ্যাদার সম্মুখে পেশ করা হলো। বাদশাহ নসরকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিলেন আজকের এ ঔষধ তুমিই পান কর। অগত্যা নসরকে তাই পান করতে হলো। সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এভাবে যে কূপ সে শাহ্যাদার জন্যে খনন করেছিল, তাতে সে নিজেই নিক্ষিপ্ত হলো। এর কয়েকদিন পরেই সুলতান আবদুর রহমান ইন্তিকাল করেন। সুলতান হাকামের আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত শাহী রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে শাহ্যাদা মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ও তাঁর মাতা তারূব ব্যর্থ মনোরথ হলেন।

আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া অর্থাৎ আবদুর রহমান আদ-দাখিলের আমলে রাজ্যের রাজস্ব আয় ছিল তিন লক্ষ দীনার। সুলতান হাকামের আমলে তা ছয় লক্ষ দীনারে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর আমলে তা দশ লক্ষ দীনারে উন্নীত হয়। সমস্ত আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হতো। এক অংশ সৈন্যদের বেতন বাবদ, এক অংশ শাসক ও আমলাদের বেতনভাতা বাবদ এবং আরেক অংশ রাজকোষে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হতো। এ অংশ দ্বারাই জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম এবং নির্মাণ কাজ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করা হতো। দ্বিতীয় আবদুর রহমান কোন কোন ব্যবসায়পণ্য এবং অন্যান্য বস্তুর ওপর কর ধার্য করে রাজ্যের সরকারী আয় বৃদ্ধি করেন। এ জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে জনমনে অনায়াসেই অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করা হতো। কার্যত এরূপ অনেক অসন্তুষ্টিই সৃষ্টি করা হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, আবদুর রহমানের সন্তান সংখ্যা শতাধিকে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর পুত্র সংখ্যাই ছিল শতাধিক আর কন্যা সংখ্যা ছিল ৫০ জনের কাছাকাছি। আবদুর রহমানের লোক চেনার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। কারো দৈহিক অবয়ব দেখেই তিনি তার মেযাজমর্জি ও

প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারতেন। প্রজারা তাকে আল-মুযাফ্ফর খিতাব দিয়েছিল। তাঁর দেহের রঙ ছিল ফর্সা, চোখ কোটরাগত, শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং দেহ ছিল বেশ মোটাসোটা মাংসল। দাড়িতে তিনি মেহ্দীর খেযাব ব্যবহার করতেন। মৃত্যুর সময় তাঁর ৪৫ জন পুত্র জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর শাসনামলে খ্রিস্টানদেরকে রাজ্যের বড় বড় পদে আসীন করা হতো। অফিস-আদালতে খ্রিস্টানদেরই আধিপত্য ছিল। তারা সাধারণত আরবীতেই কথা বলতো। মুসলমানরা প্রধানত সামরিক বিভাগের খিদমতের দিকেই মনোযোগী ছিল। অফিস-আদালতের কাজকর্ম তারা খ্রিস্টানদের জন্যেই ছেড়ে দিয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান

অভিষেক

সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান-এর আমলে শাহী দফতরসমূহে ঈসায়ীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলমান আলিম ও ফকীহ্গণ নীরবে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিলেন। সুলতান হাকামের যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁরা একেবারে নির্বাক ছিলেন। কিন্তু ঈসায়ীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তাদের অমার্জিত আচরণ ও ঔদ্ধত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাঁরা অত্যন্ত মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন। এমন অবস্থায় আপন পিতার ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই ২৩৮ হিজরীর রবিউল আখির (৮৫২ খ্রি অক্টোবর) মাসে সুলতান মুহাম্মাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সর্বপ্রথম কাজ

সিংহাসনে বসেই সুলতান মুহাম্মাদ গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় পদসমূহে মুসলমানদেরকে বসালেন এবং যে সমস্ত আমলা-কর্মচারী ইসলামী অনুশাসন পালনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন তাদেরকে পদচ্যুত করলেন। সুলতান মুহাম্মাদের এ প্রথম পদক্ষেপটি আলিম-উলামাগণের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ঐ যুগেই হজ্জ উপলক্ষে আরব ও সিরিয়া ভ্রমণকারী কিছু সংখ্যক আলিমের মাধ্যমে স্পেনে সর্বপ্রথম হাম্বলী মাযহাব প্রবেশ করলো। তারপরই কর্ডোভায় হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবের অনুসারী মৌলভীদের বাহাস-মুনাযারা শুরু হয় এবং মুসলমানরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে রেষারেষিতে লিপ্ত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান নিজে হস্তক্ষেপ করে এসব বাহাছ মুনাযারার ফায়সালা দিয়ে এই নতুন ফিতনাকে প্রশমিত করেন। মুসলমানদের দৃষ্টি পারস্পরিক বিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অন্যদিকে নিবদ্ধ করতে এবং নবোদ্ভূত এ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে তিনি জিহাদের জন্যে সৈন্যবাহিনীতে নতুনভাবে লোকভর্তি শুরু করে দিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে তিনি উত্তরাঞ্চলের ঈসায়ী রাজ্যগুলোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন।

ঐ সময় ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্য অর্থাৎ কাস্তালার শাসক ইসলামী রাষ্ট্রের বেশ ক'টি শহর দখল করে নিয়েছিল এবং একজন ঈসায়ী রঈস চতুর্দিক থেকে মুসলিম শাসিত এলাকাকে চাপের মুখে রেখেছিল। উক্ত বাহিনী সর্বপ্রথম কাস্তালার ওয়ালী শাহ উর্দুনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। সুলতান মুহাম্মাদ এ বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব মূসা ইব্ন মূসার হাতে

অর্পণ করলেন। এই মূসা ছিলেন গথ সম্প্রদায়ভুক্ত নওমুসলিম। তাঁর মত আরো কয়েকজন নওমুসলিম শাহী ফৌজের নেতৃত্বে ও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরের গুরু-দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই অভিযানে তেমন কোন ফলোদয় হয়নি। সামান্য যুদ্ধ-বিগ্রহের পর এ বাহিনী ফেরত আসে। এবার এ বাহিনীকে বার্সেলোনা অভিমুখে প্রেরণ করা হলো। কেননা সেখানকার ঈসায়ীরাও আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল। সেখান থেকেও যৎসামান্য গনীমত নিয়ে বাহিনী ফেরত আসে।

বিদ্রোহ দমন

২৩৯ হিজরীতে (৮৫৩-৫৪ খ্রি.) টলেডোবাসীরা কর্ডোভা দরবারে আলিম ও ফকীহ্গণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে নিজেদেরকে বিপন্ন ভেবে উত্তরের ঈসায়ীদের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলিম রাষ্ট্রকে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পূর্বোক্ত নিবেদিতপ্রাণ ঈসায়ীদের নির্দ্বিধায় হত্যাকাণ্ড চলছে দেখেও হয়তো তারা এতটুকু বিপন্নবোধ করেছিল। উল্লেখ্য, সুলতান মুহাম্মাদ সিংহাসনে বসে যখন ঈসায়ী শহীদদের সংখ্যা নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করতে লাগলেন, তখন ঈসায়ীরা তাদের ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ একেবারেই বন্ধ করে দেয়। তার পরিবর্তে তারা এখন টলেডোতে বিদ্রোহের প্রস্তুতির দিকেই পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে। টলেডোবাসীরা তাদের আরব বংশোদ্ভূত গভর্নরকে বন্দী করে কর্ডোভা দরবারে এ মর্মে বার্তা পাঠালো যে, সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান আমাদের যেসব লোককে জামিনরূপে কর্ডোভায় নিয়ে গিয়ে নিজের যিম্মাদারীতে রেখেছিলেন, তাদেরকে ফেরত পাঠাও, নতুবা আমরা তোমাদের গভর্নরকে হত্যা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করবো।

সুলতান মুহাম্মাদ তাঁদের দাবি অনুসারে বন্ধকরূপে কর্ডোভায় মওজুদ ঈসায়ীদেরকে টলেডোতে পাঠিয়ে দেন। টলেডোবাসীরা তাতে সুপথে ফিরে না এসে উল্টো একে তাঁর দুর্বলতা ভেবে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। তাঁরা কর্ডোভাকে চতুর্দিক থেকে সুদৃঢ় করে উত্তরের ঈসায়ী রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। টলেডোবাসীরা অনেকবারই বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ পর্যন্ত কোন সুলতানই টলেডোর নগরপ্রাচীর বিধ্বস্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এটাও মুসলমানদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে এ কারণেই তারা এ পর্যন্ত উত্তরে সীমান্তবর্তী উগ্র খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের উচ্ছেদ সাধন করেন নি। নতুবা এ কাজটি ছিল তাঁদের জন্যে অত্যন্ত সহজসাধ্য ও মামুলী ব্যাপার।

সুলতান মুহাম্মাদ নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি.) কর্ডোভা থেকে টলেডো অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি টলেডোতে না পৌঁছতেই ইলাস্ট্রিয়াসের দুর্ধর্ষ পার্বত্য সৈন্যরা টলেডোবাসীদের সাহায্যার্থে নগরে প্রবেশ করলো। সুলতান মুহাম্মাদ যখন লক্ষ্য করলেন, টলেডো বিজয় দুঃসাধ্য হবে, তখন তিনি ঠিক করলেন যে, নিজ বাহিনীর সিংহভাগকে পাহাড়, টিলা ও ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে আত্মগোপনরত রেখে একটি ছোট সৈন্যদল নিয়ে তিনি নিজে টিলা ও ঝোঁপঝাড় বেষ্টিত সলীত প্রান্তরে গিয়ে শিবির স্থাপন করবেন। তিনি তাই করলেন। টলেডোবাসীরা যখন লক্ষ্য করলো যে, সুলতান তাঁর সৈন্যবাহিনীর

সংখ্যা স্বল্পতার জন্যে টলেডো অবরোধ করতে সাহসী হননি, তখন তারা নিজেরা নগর থেকে বের হয়ে সুলতানের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো তখন সুলতানের বাহিনীর লোকজন নিজেদের গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে চতুর্দিক থেকে একযোগে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ অতর্কিত আক্রমণে পার্বত্য ঈসায়ী বাহিনী ও টলেডোবাসীরা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে যে যে দিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। কিন্তু যাবে কোথায়? দেখতে দেখতে কুড়ি হাজার ঈসায়ী সৈন্য মুসলিম বীরদের তরবারির নিচে কচুকাটা হলো। এ শোচনীয় পরাজয়ে টলেডোবাসীদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। সুলতান মুহাম্মাদ অনায়াসে টলেডো পুনর্দখল করে সেখানে একটি বাহিনীকে নিয়োগ করলেন।

এ লড়াইয়ে এত বিপুল রক্তক্ষয়ের পর টলেডোবাসীদের আর কোনদিন বিদ্রোহী হওয়ার সাহস বা সম্ভাবনা অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু উত্তরের ঈসায়ীদের রাজার সাথে তাদের স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিকে মুসলিম বাহিনীতে বহু সেনাপতি এবং প্রাদেশিক গভর্নর এমনও ছিল যারা ইলাস্ট্রিয়াস, গথিক মার্চ, জালীকিয়া, নাওয়ার, একুইটিন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাজ্যের রাজাদের এবং ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে গোপন পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। তারা ওদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। যে ভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রে মুসলমানদের আত্মকলহ তাদের রাজ্য হারা হওয়ার কারণ হয়েছিল, তেমনি স্পেনেও তাদের আত্মকলহ তাদের দুর্দিন ডেকে আনে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গৃহযুদ্ধ অন্যান্য দেশের তুলনায় একটু বেশি এবং সাধারণ বলেই মনে হয়। স্পেনের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এমন কোন যুগ ছিল না, যখন মুসলমানরা এ মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্ত ছিল। সে যাই হোক ঈসায়ীদের একতা এবং মুসলমান বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ২৪২ হিজরীর (৮৫৬-৫৭ খ্রি.) শেষ দিকে টলেডোবাসীকে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এবারও সুলতান মুহাম্মাদ টলেডো আক্রমণ করে পুনরায় তাদেরকে অনুগত হতে বাধ্য করেন এবং তাদের শাস্তি বিধান করে কর্ডোভায় ফিরে যান। কিন্তু তিনি ফিরে যেতে না যেতেই টলেডোবাসীরা জনৈক ঈসায়ী সর্দারের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। মোট কথা, টলেডোবাসীরা তাদের দুরাচার থেকে বিরত হলো না। ফলে সুলতান মুহাম্মাদকে পুনঃ পুনঃ তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে এবং ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। অবশেষে ২৪৮ হিজরীতে (৮৬২ খ্রি.) সুলতান মুহাম্মাদ এ শর্তে টলেডোবাসীদেরকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানে সম্মত হন যে, তারা সুলতানের অনুগত থাকবে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এতটুকু অধিকার প্রদানে সম্মত হলেন যে, তারা স্বেচ্ছায় তাদের গভর্নর নির্বাচিত করবে। সে গভর্নর একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের বার্ষিক রাজস্ব প্রতিবছর কর্ডোভায় প্রেরণ করবে। অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

সুলতান মুহাম্মাদ টলেডোবাসীদের এ শর্ত মঞ্জুর করে নিয়ে কেবল যে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নিলেন তাই নয় বরং ঐ পুরনো রাজধানী নগরীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করে দ্বিতীয়বার তিনি সেখানে খ্রিস্টান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে

দিলেন। এভাবে স্পেনের ইসলামী শাসন প্রাসাদের ভিত্তিতে তিনি একটি ছিদ্রের সূচনা করলেন, যে ছিদ্রের কারণে কিছুদিন পর স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যায়।

টলেডোবাসীরা নওমুসলিম মূসা ইব্‌ন মূসার পুত্র লূপকে গভর্নর বানানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। সুলতান মুহাম্মাদ সন্তুষ্টচিত্তে তাতে সম্মতি দিলেন। তারপর উত্তরের ঈসায়ী পার্বত্য রাজ্যসমূহের যুদ্ধবাজ ঈসায়ীরা প্রচুর সংখ্যায় এসে টলেডোতে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে সেখান থেকে বের করতে এবং বেদখল করতে শুরু করে। শুধু টলেডো শহরেই নয়, আশেপাশের গোটা এলাকাই ইলাস্ট্রিয়াসের রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। এদিকে সারাকসতার গভর্নর মূসা ইব্‌ন মূসা ঈসায়ী রাজাদের সাথে গোপনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। মোটকথা, এ বিশ্বাসঘাতক পরিবারটি মুসলমানদের বাহ্যাবরণে ইসলামী রাষ্ট্রকে দুর্বল করার ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

ঐ বছরই নর্মান সম্প্রদায়ের লোকজন স্পেনের পশ্চিম উপকূলে তাদের জাহাজ নিয়ে এসে ঐ উপকূলীয় এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ চালায়। কিন্তু উপকূলে মওজুদ সুলতান মুহাম্মাদের জাহাজসমূহ তাদের পঞ্চাশটি নৌকা আটক করে। সুতরাং কোন গুরুতর ক্ষতিসাধন ছাড়াই তাদেরকে স্পেন থেকে পালিয়ে যেতে হয়।

২৫১ হিজরীর রজব (আগস্ট ৮৬৫ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মাদ তাঁর পুত্র মুনযিরকে উত্তর সীমান্তের দিকে আলবা ও কিলা'র ঈসায়ী বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি নিজেও সৈন্য নিয়ে তাঁর পিছু পিছু জালীকিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই এ অভিযানে জয়যুক্ত হন। কিন্তু ঈসায়ীরা মুসলমানদের এরূপ হামলার ধরন-ধারণ সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই যখনই তারা কোন জবরদস্ত হামলার সম্মুখীন হতো, তখনই নামেমাত্র মুকাবিলা করে পাহাড়ে-পর্বতে আত্মগোপন করতো এবং তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতো। এভাবে আক্রমণকারীদেরকে কোনমতে বিদায় করেই আবার তাদের হৃত রাজ্য দখল করে রাজত্ব করতো। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। শাহী ফৌজ কর্ডোভায় ফিরে যেতেই ঈসায়ীরা আবার অগ্রসর হলো। ইতিপূর্বে ঈসায়ীরা কেবল লুটপাটের উদ্দেশ্যেই ইসলামী শহরসমূহে হামলা চালাতো। কিন্তু এখন তারা মুসলমানদের দুর্বলতা সম্যক টের পেয়েছিল। তাই তারা যে শহরই দখল করতো তাতেই নিজেদের প্রশাসক নিযুক্ত করতো এবং যথারীতি নিজেদের শাসন-শৃঙ্খলা কায়েম করে যথা শীঘ্র সম্ভব তাদের রাজত্বের সীমানা বর্ধন করতে লাগলো। তাই যেভাবে পূর্ব উপকূলে বার্সেলোনা পুনরুদ্ধার করার পর ঈসায়ীরা নিচে অবতরণের ফন্দি-ফিকিরে ছিল ঠিক তেমনি তারা পশ্চিম উপকূলেও তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো এবং পর্তুগাল এলাকা দখল করে নিল। সুলতান মুহাম্মাদ একটি নৌ-বাহিনীকে সুসজ্জিত করে সমুদ্র পথে সৈন্য পাঠালেন যাতে তারা বিস্কে উপসাগরে উপনীত হয়ে জালীকিয়ার উত্তর দিক থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সামুদ্রিক ঝড়ে এ নৌ-অভিযানটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর নৌ-পথে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

টলেডোবাসীদের সাফল্য দর্শনে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্থানে স্থানে বিদ্রোহী দেখা দেয়। ঈসায়ী বসতি প্রধান প্রতিটি শহরেই স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। এসব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সুলতান মুহাম্মাদ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব

বিদ্রোহের উক্ত ধারা অব্যাহত ছিল। এমন সময় মারীদার এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিপূর্বেও সে বিভিন্ন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। সুলতান মুহাম্মাদের অহেতুক আনুকূল্যের বলেই সে মারীদায় একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতান মুহাম্মাদ তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সেদিকে সসৈন্য রওয়ানা হলেন। তিনমাস ব্যাপী উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। তারপর সে তার ওয়াদা অনুযায়ী বাগদাদের দিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে স্পেনেই রয়ে গিয়ে এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটায়। সে ধর্মটি ছিল ঈসায়ী ও ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহের একটি সমন্বিত রূপ। অনেক ভবঘুরে ধরনের মুসলমান ও ঈসায়ী এ ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। যেহেতু গোটা রাজ্য জুড়েই আত্মগরিমার হাওয়া বয়ে চলেছিল, কেউ কাউকে মান্য করতে চাচ্ছিল না, তাই বহু দুষ্ট ধরনের লোক ধর্ম নির্বিশেষে তার চারপাশে এসে সমবেত হতে থাকে। এভাবে জালীকিয়া ও পর্তুগাল প্রদেশের সীমানায় আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ানের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ সে সংকটের কথা অবগত হয়ে আপন উযীর হাশিম ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান হাশিমকে প্রতারিত করে তাঁর সম্মুখ থেকে পালাবার ভান করে তাঁকে তার পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য করে এমন এক স্থানে নিয়ে যায় যেখানে গোপনে তার বাহিনী অবস্থান নিয়ে পূর্ব থেকেই ওতপেতে ছিল। অতর্কিতে তারা গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে হাশিমের গোটা বাহিনীর লোকজনকে হত্যা করে এবং তাকে গ্রেফতার করে। ইতিপূর্বে আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান ইলাস্ট্রিয়াসের শাসক আলফোনসূর সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সখ্যতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এবার স্পেনের প্রধান উযীরকে গ্রেফতার করে সে তার বন্ধু আলফোনসূর কাছে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, এতে আলফোনসূ আবদুর রহমানের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণায় উপনীত হবেন এবং তার বন্ধুত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। ফলে তাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হবে।

সুলতান মুহাম্মাদ যখন তাঁর প্রধান উযীরের এ শোচনীয় পরাজয় ও গ্রেফতারী বরণের সংবাদ অবহিত হলেন, তখন তিনি আবদুর রহমান মারওয়ানের কাছে হাশিমের মুক্তিদানের কথা লিখলেন। ইব্‌ন মারওয়ান এক লক্ষ দীনার মুক্তিপণ দাবি করলো। দীর্ঘ কয়েক মাস পর্যন্ত হাশিম বন্দী অবস্থায়ই রইলেন আর সুলতান মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ানের মধ্যে পত্র বিনিময় চললো। অবশেষে সুলতান এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতিদান করলেন যে, বাৎলিউস শহর এবং তার আশেপাশের এলাকা আবদুর রহমানের দখলে থাকবে আর এজন্যে তার ওপর কোন কর ধার্য হবে না। সাথে সাথে সুলতান হাশিমের

মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন। হাশিম যখন এভাবে মুক্ত হয়ে আসলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁকে গ্রেফতারকারী তাঁর প্রতিপক্ষ একটি সুরক্ষিত এলাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়েছে। সর্বপ্রকার রাজস্ব বা করের বোঝা থেকেও সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইব্‌ন খালদুন বলেন, উযীর হাশিম দীর্ঘ আড়াই বছর বন্দী থাকার পর ২৬৫ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ৮৭৮-আগস্ট ৭৯ খ্রি) মুক্তি লাভ করেছিলেন।

মোটকথা, একজন মামুলী বিদ্রোহী সর্দার আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান এখন নিজেকে সুলতান মুহাম্মাদের সমকক্ষ ভাবতে শুরু করে। সে ইলাস্ট্রিয়াস রাজ্যের সাথে তার বন্ধুত্ব সম্পর্কের উন্নতি সাধন করে। এ অবস্থা লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহীরা উৎসাহিতবোধ করলো। সুলতানের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট একেবারে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।

সান্তবারিয়ার গভর্নর মূসা ইব্‌ন যিননূন বিদ্রোহী হয়ে টলেডো আক্রমণ করলেন। টলেডোতে নিজ রাজত্ব গড়ে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। টলেডোবাসীরা মুকাবিলা করে তাকে পরাস্ত করে। তিনি আবার আক্রমণ করলেন। এভাবে তাঁর শক্তি পরীক্ষার পালা চলতেই থাকে। ওদিকে আসাদ ইব্‌ন হারস ইব্‌ন বাদীও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলেন। সুলতান মুহাম্মাদ শাহযাদা মুনযিরকে সৈন্যদল দিয়ে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। মুনযির কয়েকটি শহর ও দুর্গ জয় করে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। মোটকথা, সুলতান মুহাম্মাদ একদিনের জন্যও বিদ্রোহ দমন ও সৈন্যবাহিনীসহ বিভিন্ন দিকে অভিযান প্রেরণ থেকে অবসর পান নি।

এই নাযুক সময় উমর ইব্‌ন হাফসুন নামক একজন খ্রিস্টান খাস আন্দালুসিয়া প্রদেশে অর্থাৎ স্পেন উপদ্বীপের দক্ষিণ পূর্বের পার্বত্য এলাকায় দস্যু তস্করদের একটি দলকে সংঘবদ্ধ করে। উমর ইব্‌ন হাফসুন ছিল গথ বংশের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এজন্যে সে অনায়াসেই ঈসায়ী এবং দুস্কৃতকারী লোকদের সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। মালকা এলাকায় একটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মিত ছিল। উমর ইব্‌ন হাফসুন ঐ দুর্গটিকেই তার ঘাঁটিরূপে বেছে নেয় এবং সেখান থেকেই লুটপাট চালাতে থাকে। আশেপাশের শহর ও কসবাসমূহের আমিলরা পুনঃপুনঃ তার ওপর হামলা চালান কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা তার হাতে পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে ২৬৭ হিজরীতে (আগস্ট ৮৮০-জুলাই ৮১ খ্রি) রাজধানী কর্ডোভা থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী তাকে দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। উমর ইব্‌ন হাফসুন চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ধির আবেদন জানায়। সাথে সাথে সে ভবিষ্যতে লুটপাট না করে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিও দেয়। এই মর্মে উক্ত পার্বত্য দুর্গটি তার হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়। সত্যি সত্যি এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৬৮ হিজরীতে (আগস্ট ৮৮১-জুলাই ৮২ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ শাহযাদা মুনযিরকে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে রওয়ানা করেন। সে দিকের ঈসায়ী বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করাই ছিল এর লক্ষ্য। উত্তরের রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যে, কোন শক্তিশালী বাহিনীকে আসতে দেখলেই তারা আনুগত্য প্রকাশ করতো। আবার সে বাহিনী ফিরে যেতেই পূর্বের বিদ্রোহী অবস্থায় ফিরে যেত।

শাহযাদা মুনযির সারাকসতায় পৌঁছে সেখানকার বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেন। তারপর তিনি আলবা ও ফেলা প্রভৃতি এলাকার দিকে যাত্রা করেন। তারপর লারীদার বিশৃঙ্খলা দূর করে সেখানে ইসমাঈল ইব্‌ন মূসাকে ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে ফিরে আসেন। মুনযির চলে আসতেই বার্সেলোনার ঈসায়ী শাসক তাঁর ওপর হামলা চালায়। ইসমাঈল পূর্ণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে বার্সেলোনাবাসীদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন।

২৭০ হিজরীতে (৮৮৩-৮৪ খ্রি) উমর ইব্‌ন হাফসুন আবারও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এবার সে পূর্বের চাইতেও বেশি শক্তি সঞ্চয় করে মালকা অঞ্চলকে অশান্ত করে তোলে। কর্ডোভা থেকে উযীর আযম হাশিম ইব্‌ন আবদুল আযীয একটি বাহিনী নিয়ে উমর ইব্‌ন হাফসুনকে দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত হাশিম শান্তির পয়গাম দিয়ে সুপথে আনার চেষ্টা করেন এবং ক্ষমার আশ্বাসে তাকে কর্ডোভায় তাঁর সাথে চলে আসতে সম্মত করেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন হাশিমের সাথে সত্যি সত্যি কর্ডোভায় চলে আসে। উযীর হাশিম তার বীরত্ব দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি সুলতান মুহাম্মাদের কাছে তার জন্যে সুপারিশ করতেই তিনি তাকে সুলতানী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

তারপর ২৭১ হিজরীতে (৮৮৪-৮৫ খ্রি) উযীর হাশিম উমর ইব্‌ন হাফসুনসহ একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তরাঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে সারাকসতাবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ইলাস্ট্রিয়াসের রাজ্যের পক্ষ থেকেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। উমর ইব্‌ন হাফসুন এ সব লড়াইয়ে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। সারাকসতাবাসীদেরকে এবং ইলাস্ট্রিয়াসের ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে এবং তাদের নিকট থেকে খারাজ উসুল করে তাঁরা দুজন ফিরে আসেন। উমর ইব্‌ন হাফসুনের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতির পদটি তেমন মনঃপূত ছিল না। কেননা, এতে তার গথিক রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত হতে পারতো না। তাই সে পথ থেকেই পালিয়ে এবং উযীর হাশিমের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা গিয়ে সেই পুরনো সুরক্ষিত দুর্গে ওঠে এবং সেখানে মযবুত হয়ে বসে। তার পুরনো বন্ধুরা আবার তার চতুষ্পার্শে এসে সমবেত হতে থাকে। এদিকে উমর ইব্‌ন হাফসুন পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে মালকা এলাকায় স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করে বসে। ওদিকে আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান যার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, আশবেলিয়া (সেভিল) ও তার আশেপাশে লুটপাট শুরু করে দেয়। সুলতান মুহাম্মাদ তাঁর পুত্র মুনযির এবং উযীর হাশিমকে সৈন্যবাহিনী সহ প্রেরণ করলেন। এভাবে উমর ইব্‌ন হাফসুনের স্বাধীন রাজত্ব কায়েমের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। আশবেলিয়া এলাকায় দু'বছর যাবত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে ২৭২ হিজরীতে (৮৮৫-৮৬ খ্রি) আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ানকে আরও সামান্য কিছু ভূখণ্ড দিয়ে তার সাথে চুক্তি করা হলো। এভাবে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর উমর ইব্‌ন হাফসুনকে দমনের উদ্দেশ্যে শাহযাদা মুনযিরকে প্রেরণ করা হলো। উমর ইব্‌ন হাফসুন সেনাপতি পদ ছেড়ে আসা অবধি পূর্বের তুলনায় অনেক সভ্য এবং পরিণামদর্শী হয়ে উঠেছিল। সে কর্ডোভা দরবার এবং হাশিমের সাহচর্য থেকে অনেকাংশে উপকৃত হয়। এবার সে দস্যু ও তস্করের পরিবর্তে একজন শাসক ও রাজ্যপতিরূপে

আত্মপ্রকাশ করে। সর্বপ্রথম সে যে কাজটি করে তা হলো তার শাসনাধীন এলাকায় চুরি-ডাকাতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। চোর-ডাকাত ও অত্যাচারীদের জন্য কঠোর ও শিক্ষাপ্রদ শাস্তির ব্যবস্থা করে। বিশেষত সিপাহী ও সেনাপতিদের জন্যে তার রাজত্বে প্রজাপীড়নের বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া হতো না। এটা তার রাজ্যের বিস্তৃতি ও শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। উমর ইব্‌ন হাফসুন কর্ডোভা দরবার থেকে রাজ্য শাসনের এ রহস্যটিই অর্জন করেছিল। তখন সুলতানের ও সালতানাতের সে প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকায় রাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জয়জয়কার চলছিল। আর এ অবস্থায় প্রজাদের জানমালের যে কোন নিরাপত্তা ছিল না তা জানা কথা। কিন্তু উমর ইব্‌ন হাফসুন তার ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমানার মধ্যে যা সে বলপূর্বক ও বিদ্রোহী তৎপরতার মাধ্যমে দখল করে নিয়েছিল, ঈর্ষণীয় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে সেখানকার প্রজাসাধারণ তাকে ভালবাসতো। আশেপাশের লোকজনের মনেও এতে তার প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়।

সুলতান মুহাম্মাদের ওফাত

২৭২ হিজরীর (৮৮৫-৮৬ খ্রি) শেষ দিকে এবং ২৭৩ হিজরীর (৮৮৬-৮৭ খ্রি) প্রারম্ভে ভাবী সুলতান মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ সৈন্যদল নিয়ে উমর ইব্‌ন হাফসুনের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। প্রথম দিকে কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধ হয়। তারপর উমর ইবন হাফসুনের পরাস্ত, নিহত অথবা গ্রেফতার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সে আহত হয়েছিল। তাকে এবং তার ফৌজকে মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ অবরোধ করে এমনি অতিষ্ঠ করে তোলেন যে, তার আত্মসমর্পণের উপক্রম হয়েছিল। এমনি সময় মুনযিরের কাছে তাঁর পিতা সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র একটুও কালবিলম্ব না করে মুনযির কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হন। এভাবে ভাগ্যবলে উমর ইব্‌ন হাফসুন ও তার দলবল নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়।

সুলতান মুহাম্মাদ ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি প্রায় ৬৬ বছর বয়সে ২৭৩ হিরজীর সফর (৮৬৬ খ্রি জুলাই) মাসে ৩৪ বছর কয়েক মাস রাজত্ব করার পর ইন্তিকাল করেন।

সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বকালের পর্যালোচনা

সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বকাল জুড়ে স্পেনে অশান্তি বিরাজ করে। একটি দিনও শান্তির সাথে রাজত্ব করা তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাইরের চক্রান্তের এক অবিশ্রান্ত ধারা সুলতান মুহাম্মাদকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত রাখে। তাঁর শাসনামলে উমাইয়া রাজত্ব অত্যন্ত দুর্বল, শিথিল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন মামুলী পর্যায়ের লোকেরাও বিদ্রোহ ঘোষণার ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। উমাইয়া রাজত্বের এ শৈথিল্য ও দুর্বলতা ঈসায়ীদের জন্যে অত্যন্ত উপাদেয় ও সহায়ক প্রতিপন্ন হয়। তারা নিজেদেরকে শক্তিশালী করে স্পেনে পুনরায় ঈসায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠে।

সুলতান মুহাম্মাদ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত বীরপুরুষ ও উদ্যমী ছিলেন। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্বয়ং মুসলমান সর্দার সেনাপতিদের বিদ্রোহী তৎপরতা রাজ্যের অবস্থাকে এতই শোচনীয় করে তোলে যে, তা মুসলিম রাজত্ব ধ্বংস ও তাদের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হওয়ার হেতু হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু ঈসায়ী রাজ-রাজড়া এবং আব্বাসীয় খলীফাগণও স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু ততদিনে আব্বাসীয়দের বিরোধিতার ধার অনেকটা কমে এসেছিল। তাদের তখন আর স্পেনের সালতানাতের দিকে তাকাবার মত হুঁশ ছিল না।

ঈসায়ীদের বিরোধিতা কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। এবার মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট অনৈক্য ও রেষারেষির সৃষ্টি হয় তা ছিল ফকীহদের সংকীর্ণতার ফলশ্রুতি। স্পেনের আলিম সমাজ ও কাযীদের অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সর্বদাই অনেকগুণ বেশি ছিল। সেই অনুপাতে স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যে সর্বদাই অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে সুলতান মুহাম্মাদের আমলে। ঐ সময় ইসলামের সবচাইতে বড় যে ক্ষতি হয় তা'হলো, এর পূর্ব পর্যন্ত ঈসায়ীরা অহরহ ইসলাম গ্রহণ করে আসছিল। উত্তরের পার্বত্য এলাকায় ঈসায়ীরা নানাভাবে ইসলামের ও মুসলমানদের দুর্নাম রটনা করে খ্রিস্টান সমাজকে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সমঝদার ঈসায়ীরা ঈসায়ী ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রায়ই ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। এভাবে নওমুসলিমদের এক বিরাট দল প্রত্যেক যুগেই মওজুদ ছিল।

সুলতান মুহাম্মাদের আমলে উলামা ও ফকীহগণ এমন সব ফতওয়া ও ধর্মীয় বিধি-বিধান জারি করে যাতে ঈসায়ীদের পুরনো আমল থেকে পেয়ে আসা সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যাহত হয় এবং নওমুসলিমদের মনে নানারূপ অবিশ্বাস ও অনাস্থা দেখা দেয়। ফলে ইসলাম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। মুসলমানদের জন্যে এর চাইতে দুঃখজনক ও শিক্ষাপ্রদ আর কি হতে পারে যে, মৌলভীদের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রশ্রয় লাভ ও প্রভাব বিস্তার করে সুলতান মুহাম্মাদের রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মত্যাগীদের এক বিরাট দল সৃষ্টি করেছিল, যারা উত্তর স্পেনে নয় বরং রাজধানী কর্ডোভাতে জন্মলাভ করে উত্তরাঞ্চলের উগ্র খ্রিস্টানদের চাইতেও অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

পরের কথা বলবো কি আর
ঘরেই আমার শত্রুভরা

সুলতান মুহাম্মাদের শাসনামলের শেষ দিকে স্পেন দেশে বিভিন্ন দল ও মতের উদ্ভব হয়। এদের প্রত্যেক দলের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

১. নির্ভেজাল আরবী বংশোদ্ভূতরা— এদের মধ্যেও একতা ছিল না। এদের কয়েকটি উপদল ছিল। যেমন সিরীয়, ইয়ামানী, হেজাযী, হাদরামী প্রভৃতি।

২. মুওয়াল্লিদীন— অর্থাৎ ঐ সব লোক যাদের পিতারা আরব আর মায়েরা ছিল স্পেন দেশীয় খ্রিস্টান। এদেরকে শংকর আরব বলা যেতে পারে। কিন্তু এদের সকলের দেহে আরব রক্ত প্রবাহিত ছিল না। কেননা এরা অধিকাংশই বার্বার পিতা ও স্পেনীয় মায়েদের সন্তান ছিল।

৩. নওমুসলিম— অর্থাৎ যারা প্রথমে খ্রিস্টান ছিল, পরে মুসলমান। তাদের সন্তানরাও নওমুসলিম বলে আখ্যায়িত হতো। তারা ইসলামী অনুশাসন কঠোরভাবে অনুসরণ করতো।

৪. খালেস বার্বার— এদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

৫. মজুসী বা অগ্নি উপাসক— এরা ছিল ঐসব লোকের সন্তান-সন্ততি যাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীতদাসরূপে কিনে আনা হয়েছিল। এদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না।

৬. ইহুদী— এরাও স্পেনের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। এদের পেশা ছিল প্রধানত ব্যবসায়-বাণিজ্য। এরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকতে চাইত।

৭. ঈসায়ী— এরা তাদের ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতো। স্পেনে এদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

৮. মুরতাদ— এরা ছিল ঐ সমস্ত লোক, যারা সুলতান মুহাম্মাদের শাসনামলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আবার তাদের কুফরী জীবনে ফিরে যায়।

এই মুরতাদদের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ও শামিল ছিল, যারা কোন ধর্মেরই বন্ধন স্বীকার করতো না। লুটপাট ও ডাকাতি-রাহাজানিই ছিল তাদের পেশা।

প্রথমোক্ত চারটি দল ছিল মুসলমান এবং এরাই আসল ইসলামী শক্তি বলে বিবেচিত হতো। বাদশাহ এবং উলামাদের সর্বপ্রথম ফরয ছিল ঐ চারদলের প্রতি সমান আচরণ করা। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মারাত্মক ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। মুওয়াল্লিদীনদের সংখ্যা ও শক্তি প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ দেখা দেয়। উলামা সমাজের দলাদলি এবং মালিকী-হাম্বলী হানাহানি নওমুসলিমদের উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট করে দেয়। বার্বাররাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্য থেকে সামগ্রিকভাবে আত্মিক শক্তি তিরোহিত হয়। তাদের নৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ধর্মীয় জিহাদের প্রতি উৎসাহ উবে যায়। যে সব তলোয়ার একদিন আল্লাহ্‌র রাহে কোষমুক্ত হতো, তা এখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঝলসে উঠতে থাকে। প্রত্যেক দলের নিকট তাদের দলীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থই বড় হয়ে ওঠে। সুলতান ফকীহ ও আলিমদের সম্মান যে পরিমাণ বৃদ্ধি করলেন, জনগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্থা সে পরিমাণ তাদের ওপর থেকে হ্রাস পেল। আলিম সমাজের প্রতি জনগণের আস্থার অভাবে ইসলামের প্রতি জনগণের অনুরাগ তিরোহিত হলো। পার্থিব স্বার্থ পারলৌকিক কল্যাণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসলো।

মুসলমান আর তাদের রাজত্বের অবস্থা তো ছিল এই। ওদিকে ঈসায়ীদের রাজ্যসমূহ শনৈঃ শনৈঃ তাদের আয়তন বৃদ্ধি করতে করতে মুসলিম রাজ্যের প্রায় সমপর্যায়ে চলে আসে। তারা ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল। ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা তৃতীয় আলফোনসূ স্পেনকে মুসলিম শূন্য করার পরিকল্পনা তৈরি করছিল। পর্তুগালের ঈসায়ীরা তাদের স্বতন্ত্র ঈসায়ী রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আশবেলিয়ায় (সেভিলে) ইব্‌ন মারওয়ান এবং মালাগা প্রভৃতি অঞ্চলে ইব্‌ন হাফসুন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল। টলেডো স্বাধীন হয়ে তার সীমানা কর্ডোভার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিয়েছিল। জালীকিয়া ও আরাগুণ প্রভৃতি

পিরেনীজ পর্বত থেকে স্পেনের পশ্চিত উপকূল অর্থাৎ পর্তুগাল ও আশবেলিয়া পর্যন্ত খ্রিস্টানদের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছিল। এ সুদীর্ঘ জনপদের সারির মধ্যে কোন কোন শহরে জনপদে যে মুসলিম আমিলরা নিযুক্ত ছিল তারাও খ্রিস্টানদের প্রতি সহানুভূতির গানই গাইতো। মোটকথা, সুলতান মুনযির একটি সঙ্কটময় যুগসন্ধিক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ

অভিষেক

সুলতান মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ২২৯ হিজরীতে (অক্টোবর ৮৪৩-সেপ্টেম্বর ৪৪ খ্রি) ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুর পর ৪৪ বছর বয়সে ২৭৩ হিজরীর সফর (৮৮৬ খ্রি জুলাই) মাসে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সমগ্র জীবন কাটে যুদ্ধবিগ্রহ ও শক্তি মহড়ার মধ্যে। তাঁর পিতার রাজত্বকালে অনেকবারই তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মুনযিরের কৃতিত্বসমূহ

মুনযির সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর পিতার উযীরে আযম হাশিম ইব্‌ন আবদুল আযীযের প্রাণ দণ্ডাদেশের ব্যাপারে প্রদত্ত আলিম সমাজের ফতওয়া কার্যকরী করেন এবং তাঁকে পরপারে পৌঁছিয়ে দেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন শুধু মালাগায় নয় অন্যান্য অনেক শহরও দখল করে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সুলতান মুনযির হাশিমের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করেই উমর ইব্‌ন হাফসুনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। ইব্‌ন হাফসুন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সাহসী সিপাহসালার হলেও মুনযিরও কোন অংশে কম ছিলেন না। একের পর এক কেল্লা জয় করে ইব্‌ন হাফসুনের বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। অগত্যা ইব্‌ন হাফসুনকে পরিস্থিতির চাপে সুলতানের খিদমতে সন্ধির আবেদন করতে হয়। সুলতান এ প্রস্তাবকে অত্যন্ত সময়োচিত ও সহায়ক বলে বিবেচনা করলেন, কেননা এ প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে শক্তি ক্ষয় করার চাইতে অন্যান্য বিদ্রোহী দমন করাকে তিনি অধিকতর জরুরী বিবেচনা করেন। সুলতান সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে কর্ডোভা ফিরে আসতে না আসতেই তার পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ সেখানে ফিরে গিয়ে তাকে অবরোধ করেন। এবারও ইব্‌ন হাফসুন পূর্বের তুলনায় অধিক কাকুতি-মিনতির সাথে ক্ষমার আবেদন করে এবং কৃতকর্মের জন্যে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করে। সে সুলতানের সাথে কর্ডোভা যেতেও সম্মত হয়। সুলতান এ প্রস্তাবটি লুফে নেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে এই বিদ্রোহী নেতাকে নিজের সাথে নিয়ে তিনি কর্ডোভার দিকে রওয়ানা হন।

সুলতানের ইচ্ছে ছিল, কর্ডোভায় পৌঁছেই কালবিলম্ব না করে টলেডো আক্রমণ করবেন। এই কেন্দ্রীয় শহরটিকে সর্বপ্রথম করায়ত্ত করে তারপর অন্য দিকে মনোযোগ দেবেন। এটা ছিল সুলতান মুনযিরের বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতারই পরিচায়ক। বরং বলা যেতে পারে যে, টলেডোর অবস্থানগত গুরুত্ব এবং এর রাজধানী হওয়ার মত উপযোগিতার কথা ইতিপূর্বে উপলব্ধি না করে মুসলমানরা ভুলই করেছিলেন। তারা যদি আগেই এ শহরটিকে

রাজধানীরূপে গ্রহণ করতেন তাহলে কর্ডোভাকে রাজধানী করায় তারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদেরকে সেগুলোর সম্মুখীন হতে হতো না তা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। টলেডোর অবস্থান ছিল স্পেন দেশের মধ্যভাগে। এটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত ও মযবুত শহর। এখানে রাজধানী হলে উত্তরাঞ্চলের উগ্র খ্রিস্টানদের রাজ্যসমূহের উত্থানের ও শক্তিশালী হওয়ার পথই রুদ্ধ হয়ে থাকতো। সে যাই হোক সুলতান মুনযির টলেডো বিজয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বাহ্যত তিনি উমর ইব্‌ন হাফসুনের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে কেউ একজন তাকে ফকীহদের ফতওয়ায় যে তার কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। অথচ সুলতান তার দ্বারা কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের খিদমত নেবার জন্যে মনেপ্রাণে কামনা করতেন। কিন্তু যখন উমর ইব্‌ন হাফসুনের সে ঘটনার কথা মনে হলো যে, কেবল ফকীহদের বিরোধিতাই তাকে হিশাম ইব্‌ন আবদুল আযীদের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এবং ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য করেছিল এবং যখন সে অবগত হলো যে, হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক নিজেও ঐ হযরতদের ফতওয়ার শিকার হয়ে প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হয়েছেন, তখন সে তার নিজের প্রাণদণ্ডাদেশের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। তাই কর্ডোভায় গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই সে গোপনে কেটে পড়লো এবং সোজা নিজের দুর্গে গিয়ে উঠলো এবং সুদৃঢ় দুর্গাভ্যন্তরে স্বেচ্ছা অবরোধ তথা আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারপর চতুর্দিক থেকে তার লোকজনকে এনে সেখানে জড়ো করলো।

সুলতান মুনযিরের ওফাত

অগত্যা সুলতান মুনযিরকে আবারও সেদিকে অভিযান চালাতে হলো। এবার তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে কেল্লা অবরোধ করলেন। উমর ইব্‌ন হাফসুনও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাঁকে প্রতিরোধ করে। সে অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কেল্লাটি জয় করার পূর্বেই অবরোধ চলা অবস্থায়ই মাত্র দু'বছরেরও কম সময় রাজত্ব করে সুলতান মুনযির প্রায় ৪৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সুলতানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই বাহিনীর আমীর-উমারা মুনযিরের ভাই আবদুল্লাহর হাতে কিল্লার প্রাচীরের ছায়াতলে বায়আত পর্ব সম্পন্ন করলেন। আবদুল্লাহ উমর ইব্‌ন হাফসুনের রাজত্বকেও যথারীতি স্বীকৃতি প্রদান করলেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন একে সুবর্ণ সুযোগরূপে গণ্য করলেন। আবদুল্লাহ মুনযিরের শবদেহ নিয়ে কর্ডোভায় উপনীত হন। পথে আরব সর্দারদের বিরূপ সমালোচনা ও কানাঘুষা সীমা অতিক্রম করে। তারা সুলতান আবদুল্লাহর সমালোচনার এতই বাড়াবাড়ি করে যে, কর্ডোভা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে গোটা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবদুল্লাহ যখন সুলতান মুনযিরের শবদেহ নিয়ে কর্ডোভায় গিয়ে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর বাহিনীতে একশরও কম সৈন্য অবশিষ্ট ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদের প্রথম দুর্বলতা

সুলতান আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেই এ দুর্বলতা প্রদর্শন করলেন যে, তিনি উমর ইব্‌ন হাফসুনের রাজত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে অবরোধ প্রত্যাহার

করে নিলেন। অথচ তাঁর হাতে সুবর্ণ সুযোগ ছিল। তিনি দুর্গটি জয় করে তাঁর রাজত্বের সূচনালগ্নেই একটি সুনামের ও গৌরবের অধিকারী হতে পারতেন। দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ উমর ইব্‌ন হাফসুনকে গ্রেফতার বা হত্যা করে তিনি কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন।

আবদুল্লাহ্‌র আমলে বনূ উমাইয়ার রাজত্বের অবস্থা

আবদুল্লাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণকালে অর্থাৎ ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি) স্পেন সরকার তথা বনূ উমাইয়ার রাজত্বের অবস্থা এতই জরাজীর্ণ ও শোচনীয় ছিল যে, রাজস্ব ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বার্ষিক রাজস্ব আয় যেখানে একদিন দশ লক্ষ দীনারে উপনীত হয়েছিল, সেখানে তা নেমে বার্ষিক এক লক্ষ দীনারে এসে গিয়েছিল। ঈসায়ী রাজ্যগুলোর কথা বাদ দিলেও রাজধানী কর্ডোভার দু'দিকে এমন দুটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যাদের শক্তি কোন অংশেই কর্ডোভার সরকারের চাইতে কম ছিল না। তার একদিকে ছিল ইব্‌ন হাফসুন আর অপরদিকে ইব্‌ন মারওয়ান। ইব্‌ন হাফসুন ছিল অত্যন্ত সমঝদার, বুদ্ধিদীপ্ত এবং পারঙ্গম ব্যক্তি। তার শাসন পদ্ধতিই এমন ছিল যে, লোক তার দিকে আকৃষ্ট হতে এবং তার অধীনে বাস করতে পছন্দ করতো। কিন্তু সে যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিল, তাই অনেক মুসলমান তাকে সহযোগিতা করা পছন্দ করতো না। এর জন্যই তারা তার পরিবর্তে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্‌ন মারওয়ানের শরণাপন্ন হতো। ইব্‌ন হাফসুন নিজেকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করলেও ঈসায়ী রাজ্যগুলোর সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ইব্‌ন মারওয়ান নিজে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইলাস্ট্রিয়াসের খ্রিস্টান রাজা আলফোনসূর সাথে এবং অন্যান্য খ্রিস্টান রাজার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং তাদের সহযোগী বন্ধু ছিলেন। আশবেলিয়ার আশেপাশে কোন কোন আরব সর্দারের জায়গীর ছিল। তাঁরা সেখানেই অবস্থান করতেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে তাদের কেউ কেউ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলেন এবং আশবেলিয়ায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করলেন। ওদিকে ঐ ধরনের জায়গীরদার আরবরা গ্রানাডা এলাকায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে গ্রানাডা দখল করে বসে। অন্য কথায়, ইব্‌ন হাফসুন ও ইব্‌ন মারওয়ানের মুকাবিলায় আরো দুটি শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ঐ চারটি শক্তির মধ্যে ঘুরেফিরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। কর্ডোভা দরবারের এখন আর সে শক্তি ছিল না যে, ঐ সবকে বাধ্য ও পদানত করে রাখবে। বরং এখন সুলতান আবদুল্লাহর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, তিনি কর্ডোভা এলাকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে মাঝে মাঝে ঐ চারটি শক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাদের যুদ্ধকে সন্ধিতে রূপান্তরিত করে দিতেন। ঐ চারটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেহেতু প্রত্যেকেই একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল, তাই তাদের সকলেই কর্ডোভার নেতৃত্ব কর্তৃত্বকে মেনে নিতো এবং সুলতানকে তাদের বাদশাহ বলে অভিহিত করতো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ছিল। তারা সুলতান আবদুল্লাহকে কোন রাজস্ব প্রদান করতো না। উপরোক্ত আরব সর্দারদের আচরণ মুওয়াল্লিদীন ও নওমুসলিমদের সাথে মোটেই ভাল ছিল না। এজন্যে মুওয়াল্লিদীন ও নওমুসলিমদের এক বিরাট অংশ ইব্‌ন মারওয়ানের কাছে চলে যায়।

এ পর্যায়ে উত্তরাঞ্চলীয় শহরসমূহের দু'জন মুসলিম আমিল সারাকসতা ও শান্তবারিয়া এলাকায় ঈসায়ীদের স্পেনকে মুসলিম শূন্য করার পরিকল্পনাকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেন।

ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তারসুনা নামক স্থানের আমিল লুব ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁর স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের একটি বাহিনীর সাহায্যে ঈসায়ী সৈন্যদের উক্ত বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। ওদিকে আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান তাঁর মিত্র ইলাস্ট্রিয়াসের রাজাকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তিনি যদি তাঁর রাজ্যসীমা অতিক্রম করে এক পাও অগ্রসর হন, তাহলে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর মুকাবিলায় অগ্রসর হবেন। এ হুমকি-ধমকিতে কাজ হলো এই যে, খ্রিস্টানরা আরো কিছুদিন চুপ থাকাই সমীচীনবোধ করলো। কেননা, তারা জানতো যে, বহিরাক্রমণ হলে মুসলমানদের আত্মকলহ থেমে যাবে এবং তাদের মধ্যে নতুন করে ঐক্যবোধের সঞ্চার হবে। তাদের মধ্যকার যে পারস্পরিক বৈরী সম্পর্ক তাদেরকে দুর্বল করে তুলছে তা বাধাগ্রস্ত হবে।

ওদিকে ইব্‌ন হাফসুন বুদ্ধি খাটিয়ে আফ্রিকার আগলাবী রাজবংশের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ জানালেন যে, তারা যেন বাগদাদের আব্বাসী খলীফাদের নিকট থেকে তাঁর নামে স্পেন শাসনের সনদ হাসিল করে তাঁকে স্পেনের বৈধ শাসক বলে স্বীকৃতি নিয়ে দেন। এ প্রচেষ্টায় যদিও ইব্‌ন হাফসুন কৃতকার্য হন নি, কিন্তু এ সংবাদ কর্ডোভায় দারুণ চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। সুলতান আবদুল্লাহ্ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে সৈন্য সংগ্রহ করে ইব্‌ন হাফসুনের ওপর কালবিলম্ব না করে হামলা চালালেন। কেননা, আবদুল্লাহ উত্তমরূপে জানতেন যে, উমর ইব্‌ন হাফসুনের কাছে আব্বাসীয় খলীফার সনদ এসে পৌঁছে গেলে সাধারণভাবে লোকজন তার দিকেই ঝুঁকে পড়বে। তারপর স্পেনে উমাইয়া বংশীয়দের অস্তিত্বই আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। সুলতান আবদুল্লাহ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেও চৌদ্দ হাজারের বেশি সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন না, পক্ষান্তরে ইব্‌ন হাফসুনের কাছে তখন ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী ছিল। অবশেষে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। সুলতান আবদুল্লাহ আর তাঁর সহযাত্রীরা এ যাত্রায় অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করলেন। তারা ইব্‌ন হাফসুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে দিলেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের অনেকেই নিহত হলো। সুলতান আবদুল্লাহর রাজ্যসীমা কিছুটা বিস্তৃত হলো। এ জয়ের প্রভাব কর্ডোভা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত শুভ হলো। সালতানাতের যে দাপট ও গৌরব একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে গিয়েছিল তা কতকটা উদ্ধার হলো।

আবদুল্লাহ্‌র বাস্তব উদ্যোগ

ওদিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মারওয়ান ঐ সময়ই আশবেলিয়ার স্বাধীন রঈস ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের সাথে সন্ধি করে আপন শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পেলেন। সুলতান আবদুল্লাহ উপরোক্ত জয়ের প্রভাব লক্ষ্য করে ইব্‌ন মারওয়ানের শক্তি খর্ব ও দর্প চূর্ণ করার জন্যে তার উপর হামলা চালানো জরুরীবোধ করলেন। উযীর আহমদ ইব্‌ন আবী উবায়দাকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে ইব্‌ন মারওয়ানকে দমনের জন্যে প্রেরণ করা হলো। ইব্‌ন মারওয়ান আশবেলিয়ার ওয়ালী ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইবরাহীমও সাহায্য প্রেরণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। উভয়ে সম্মিলিতভাবে আহমদ ইব্‌ন আবী উবায়দার মুকাবিলা

করলেন। এ যুদ্ধেও সুলতান পক্ষের দাপট কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং বিদ্রোহীরা পরাজয় বরণ করে। এ পরাজয়ের পর ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজ আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। সুলতান আবদুল্লাহ তাঁকে আশবেলিয়ার আমিলরূপে নিয়োগ প্রদান করেন। এ যুদ্ধের ফলাফল প্রথম যুদ্ধের ফলাফলের চাইতেও অধিকতর কার্যকর প্রতিপন্ন হয়। ফলে রাজ্যের পরিধির সাথে সাথে তার মানমর্যাদাও প্রথম দফার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরই আবদুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্ররা টলেডো প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করতে শুরু করেন। এদিকে আশবেলিয়ার শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজ তার রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা তাঁর রাজত্বভুক্ত করে নেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন সুলতান আবদুল্লাহর হাতে পরাজয় বরণ করে পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সুলতান রাজধানীতে ফিরে যেতেই উমর ইব্‌ন হাফসুন শনৈঃ শনৈঃ তার শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে থাকে।

ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা আলফোনসূ এবং তার ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আলফোনসূ নিজের সান্ত্বনার জন্যে সুলতান আবদুল্লাহর সাথে পত্র যোগাযোগ করে সন্ধি নবায়নের প্রস্তাব দেন। সুলতান কালবিলম্ব না করে এ মর্মে সন্ধিবদ্ধ হলেন যে, আলফোনসু বা সুলতান কেউই তার বর্তমান রাজ্য সীমানা ছেড়ে একটুও বাইরে পা দেবেন না। এই অনাক্রমণ চুক্তি আলফোনসূর জন্যে সবদিক দিয়ে লাভজনক হয়। কেননা, এতকাল মুসলমানরা তার রাজ্যকে তাদেরই রাজ্য বলে অভিহিত করতেন। এখন সুলতান এ চুক্তির মাধ্যমে যথারীতি তার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। এতে তার সাহস ও মনোবল অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল।

ওদিকে নিত্য-নৈমিত্তিক যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোহে প্রজাসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আর এ অশান্তি যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল তাই লোকজন কর্ডোভা দরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অলাভজনক এবং বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন দানকে পাপ কাজ বলে ভাবতে শুরু করেছিল। তাই নতুন ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত এবং এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে আশবেলিয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়া অবশিষ্ট এলাকা এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকলেই যার যার রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতো এবং কর্ডোভা দরবারকে বাহ্যিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করতো।

ঈসায়ী রাজ্যগুলোর উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিয়ে হঠাৎ করে বিরোধ সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন তাদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করার আর অবকাশ ছিল না।

সন্তান-সন্ততি

সুলতান আবদুল্লাহ্‌র এগার জন পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দু'জন মাতরাফ এবং মুহাম্মাদ শাসনকার্য পরিচালনায় যোগ্যতর পাত্র এবং তাঁরা রাজকার্যে জড়িত ছিলেন। এ দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিরও সৃষ্টি হয়।

রাজ্যের যোগ্যতর লোকেরা আশবেলিয়া (সেভিল) রাজ্যে গিয়ে উঠেছিল। কেননা, সেখানে জ্ঞানী-গুণীদের খুব কদর ছিল। কর্ডোভার রাজকোষ ছিল অর্থশূন্য। আশবেলিয়ার

নবগঠিত রাজ্যের দরবার ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের গুণগ্রাহী চরিত্রের কারণে কর্ডোভার জন্যে ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এখানকার নীচমনা অমাত্য-আমলারা দুই ভাইয়ের বিরোধে ইন্ধন যোগাতে থাকে। মাতরাফ তাঁর ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি তাঁর পিতার মনকে তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার প্রয়াস পান। তাঁর সমর্থক আমীর-উমারাগণ এতে তাঁকে সমর্থন যোগাতে থাকেন। সুলতান আবদুল্লাহ্ পুত্র মুহাম্মাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠেন। অগত্যা মুহাম্মাদ কর্ডোভা থেকে পালিয়ে উমর ইব্‌ন হাফসুনের ওখানে চলে যান। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানের পর কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সেখান থেকে তিনি পিতার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে তাঁর দরবারে তাকে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবদুল্লাহ্ তাঁকে প্রাণ রক্ষার অভয় দিয়ে ডেকে পাঠান। এবার মাতরাফের আরো বেশি অভিযোগের সুযোগ হলো। কয়েক দিন পর আবদুল্লাহ্ তাঁর পুত্র মুহাম্মাদকে রাজপ্রাসাদের একটি অংশে নজরবন্দী করেন। সুলতান আবদুল্লাহ্‌কে কয়েকদিনের জন্যে একটি অভিযান উপলক্ষে রাজধানীর বাইরে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্যের কাজকর্ম চালানোর দায়িত্ব তিনি মাতরাফের উপর ন্যস্ত করে যান। এ সুযোগে মাতরাফ রাজপ্রাসাদে বন্দী তাঁর ভাই মুহাম্মাদকে হত্যা করিয়ে দেন। আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের এ হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি মুহাম্মাদের পুত্র আবদুর রহমানকে অত্যন্ত যত্নসহকারে লালন-পালন করতে থাকেন। তারপর ২৮৩ হিজরীতে (৮৯৬ খ্রি) মাতরাফ কোন এক ব্যাপারে মনোমালিন্য হওয়ায় উযীর আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইয়াকে হত্যা করেন। এবার আবদুল্লাহ্‌র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মুহাম্মাদ ও আবদুল মালিককে হত্যার অপরাধে তিনি মাতরাফকে হত্যা করান।

ওফাত

সুলতান আবদুল্লাহ্ ৩০০ হিজরীর ১ রবিউল আউয়াল (অক্টোবর ৯১২ খ্রি) তারিখে পঁচিশ বছরের কিছু বেশি কাল রাজত্ব করে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সুলতান আবদুল্লাহ্‌র গোটা রাজত্বকাল ফিতনা-ফাসাদ ও রাজ্যের দুর্বলতা অক্ষমতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর আমলে ফকীহগণ একে অপরের পেছনে লেগেই থাকতেন এবং একে অপরকে জব্দ করার চেষ্টা করতেন। তাঁরা অহেতুক বিতর্কে কালক্ষেপণ করতেন। মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের সেই গৌরব পুনরুদ্ধারের কোন উপায়ই আর চোখে পড়ছিল না। এমনি দুর্যোগময় ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে সুলতান আবদুল্লাহ্‌র পর তাঁর কিশোর পৌত্র আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ছানী অর্থাৎ সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের প্রপৌত্র আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় আবদুর রহমান

অভিষেক

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের প্রপৌত্র আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ্‌র পর একত্রিশ বছর বয়সে ১ রবিউল আউয়াল ৩০০ হিজরীতে (অক্টোবর ৯১২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এটা ছিল এমন এক যুগসন্ধিক্ষণ যখন তারিক ও মূসার বিজিত ও আবদুর রহমান আদ-দাখিলের প্রতিষ্ঠিত স্পেন রাজত্ব খণ্ডবিখণ্ড ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাহ্যত তা খ্রিস্টান দখলে চলে যাওয়ার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছিল। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা সর্বশক্তিমানের তখনো তা মঞ্জুর ছিল না। এ তরুণ সুলতানের অভিষেককালে তাঁর এমন অনেক চাচা মওজুদ ছিলেন যারা বয়স ও যোগ্যতার বিচারে তার তুলনায় অগ্রগণ্যই ছিলেন। কিন্তু হয় তাঁদের সততা ও সদিচ্ছার জন্যে নতুবা এমন নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী সালতানাতের শাসনভার হাতে নিয়ে সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে তাঁদের কেউই এ পদ গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসেননি বরং তাদের সকলেই হাসিমুখে এই তরুণকে তাঁদের বাদশাহ্‌রূপে বরণ করে নেন। ফলে, অভিষেককালে কোনরূপ গোলযোগ দেখা দেয়নি।

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান অভিষেককালে এজন্যেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে যে, এ তরুণ সুলতান স্বল্প বয়সেই তাঁর পিতামহের তত্ত্বাবধানে এমন উত্তম ও উঁচুমানের শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করেন এবং তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি ও মেধা এত উঁচুমানের ছিল যে, বড় বড় জ্ঞানীগুণী এবং আলিম-ফকীহ্‌গণও তাঁর প্রতি রীতিমত ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাঁর সুমধুর চরিত্র ও মার্জিত আচরণ কর্ডোভা দরবারের আমলা-অমাত্যদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল। তিনি যে কেবল জ্ঞান-চর্চার মজলিসেরই মধ্যমণি ছিলেন এবং সেখানেই কেবল সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই নয়, বরং সেকালের প্রথানুযায়ী সামরিক বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

প্রথম ফরমান

সিংহাসনে বসেই এ তরুণ সুলতান ফরমান জারি করলেন যে, রাজকোষ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বসূরিরা বিশেষত সুলতান আবদুল্লাহ্‌ যে সব কর প্রজাদের উপর ধার্য করেছিলেন আর যে সব বিধি-বিধান শরীয়তের পরিপন্থী ছিল সে সব কর ও ফরমান বাতিল করা হলো। এ ঘোষণার শুভ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রজাসাধারণ তাঁর গুণগানে মেতে ওঠে এবং সকলের মনে একটি আশার আলো দেখা দেয়।

তারপর সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান এ মর্মে ঘোষণা দান করেন যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে আসবে এবং ভবিষ্যতেও অনুগত থাকার অঙ্গীকার করবে, তার অতীতের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে এ ক্ষমার ঘোষণা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সুলতানের দরবার থেকে ঈসায়ী, ইহুদী ও মুসলমান সকলেই সমান ব্যবহার পাবে। সকলের জন্যই ন্যায়বিচার ও আদল নিশ্চিত থাকবে। লোকজন যেহেতু দীর্ঘ অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধে অতিষ্ঠ ও জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, তাই যে সব ছোট ছোট সর্দার কর্ডোভার নিকটবর্তী এলাকায় ছিলেন এবং নিজেদেরকে কর্ডোভার সুলতানের অধীনতা বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন এ ঘোষণা শোনামাত্র তাঁরা সুলতান আবদুর রহমানের খিদমতে পৌঁছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে লাগলেন। এ ভাবে প্রচুর রাজস্ব রাজকোষে এসে জমা হয় এবং বর্ধিত কর মওকুফের দ্বারা রাজকোষের যেটুকু ঘাটতি পড়েছিল, তা অনায়াসেই পূর্ণ হয়ে যায়।

দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি

এখন কেবল দুটি শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অবশিষ্ট রইল যারা তুলনামূলকভাবে কর্ডোভার নিকট ছিল এবং এদের পক্ষ থেকে অঘটন ঘটবার আশংকা ছিল। প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিটি হচ্ছে উমর ইব্‌ন হাফসুন। সে মালাগা, রায়া, বিশতর প্রভৃতি এলাকায় রাজত্ব করছিল এবং উবায়দীদের সাথে করে কর্ডোভা সালতানাতকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার যোগসাজশে লিপ্ত ছিল। উমর ইব্‌ন হাফসুন এজন্যও বিপজ্জনক ছিল যে, সে একদিকে উবায়দী এবং অপর দিকে উত্তরের ঈসায়ী রাজাদের সাহায্য লাভ করতে পারতো। উবায়দীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বনূ উমাইয়াদের শত্রু ছিল, যেমনটা শত্রু ছিল তারা আব্বাসীদেরও। আর ঈসায়ীদের কাছে এজন্যে প্রিয় ছিল যে, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে পুনরায় ঈসায়ী ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিটি ছিল আশবেলিয়া রাজা। সেখানে আরবদের রাজত্ব ছিল আর শানশওকতের দিক থেকে আশবেলিয়া দরবার কর্ডোভা দরবার থেকে বেশি জৌলুসপূর্ণ মনে হতো। আবদুর রহমান সর্বপ্রথম আশবেলিয়া দরবারের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। আশবেলিয়ার শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজের মৃত্যুর পর সেখানে তার স্থলাভিষিক্তরূপে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিমা। আশবেলিয়ার অনেক সর্দারই সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। আশবেলিয়া দরবারও এ সময় একটি কলহ বাঁধানো সঙ্গত বিবেচনা করলো না।

প্রথম অভিযান

আশবেলিয়ার দিক থেকে সামরিক তৎপরতা চালানো হবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তৃতীয় আবদুর রহমান একটি সৈন্যবাহিনীকে গঠন করে তাঁর আযাদকৃত গোলাম বদরের নেতৃত্বে উমর ইব্‌ন হাফসুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। এ অভিযানটি তিনি তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরই অর্থাৎ ৩০০ হিজরীতে (আগস্ট ৯১২ খ্রি-জুলাই '১৩ খ্রি) প্রেরণ করেন। বদর একের পর এক উমর ইব্‌ন হাফসুনের দুর্গসমূহ দখল করতে লাগলেন। উমর

ইব্‌ন হাফসুন সমভূমিতে তার অনেক দুর্গের পতনের পর পার্বত্য এলাকায় দুর্গে গিয়ে আত্মগোপন করলো। বদর অনেক গনীমত সম্ভার নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসলেন। এবার লোকজন পরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সুলতানী বাহিনীতে এসে ভর্তি হতে লাগলো।

বিদ্রোহসমূহের মূলোৎপাটন

৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি.) সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান ইব্‌ন মুসলিমার পক্ষ থেকে অসঙ্গত আচরণ লক্ষ্য করে এবং আশবেলিয়ার কয়েকজন আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে আশবেলিয়ার ওপর আক্রমণ চালান। ইব্‌ন মুসলিমা উমর ইব্‌ন হাফসুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। উমর ইব্‌ন হাফসুন এটাকে সুবর্ণ সুযোগ ভেবে এভাবে তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে যে, সুলতানী বাহিনী যখন আশবেলিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়, তখন তার বাহিনী পিছন দিক থেকে সুলতান বাহিনীকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়। সুলতান আবদুর রহমান উমর ইব্‌ন হাফসুনের বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। ইব্‌ন মুসলিমাও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইব্‌ন মুসলিমা বন্দী হয়। সুলতান আশবেলিয়ায় তার একজন গভর্নর নিয়োগ করেন। সুলতানকে এজন্যে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। কারণ স্বয়ং ইব্‌ন মুসলিমার আত্মীয়-স্বজন ও তার দরবারের অনেক আমলা-অমাত্যরাও চাইতেন যে, আশবেলিয়া যেন তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। আশবেলিয়া দরবারের একজন মশহুর সর্দার ছিলেন ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ। আশবেলিয়া বিজিত হওয়ার পর তিনি কর্ডোভায় চলে আসেন। তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে সুলতান আবদুর রহমান তাঁকে উযীর পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আহমদ ইব্‌ন ইসহাক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এভাবে সালতানাতের সংহতি ও মর্যাদার উন্নতি সাধিত হলে সুলতান আবদুর রহমান সৈন্যবাহিনী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করে উমর ইব্‌ন হাফসুনকে উৎখাত করা জরুরী মনে করলেন। ৩০৪ হিজরী (৯০৫-৬ খ্রি.) তিনি সেদিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। উমর ইব্‌ন ফাফসুন এ সময় উবায়দীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে যে সব জাহাজ তার সাহায্যার্থে আসে আবদুর রহমান সেগুলোকে তাঁর নৌবাহিনী দিয়ে প্রতিরোধ করেন এবং ইব্‌ন হাফসুনের নিকটে ঘেঁষতেই দেন নি। সাগরবক্ষেই তিনি সেগুলো আটক করেন। ইব্‌ন হাফসুন হতাশ হয়ে পড়ে। সে যখন পার্বত্য অঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে একান্তই নিরূপায় হয়ে পড়লো, তখন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইসহাকের মাধ্যমে সুলতানের কাছে এ মর্মে আবেদন পত্র পাঠালো যে, সে ভবিষ্যতে অনুগত হয়ে থাকবে। তিনি যেন দয়াপরবশ হয়ে সন্ধির প্রস্তাবে রাযী হন। সুলতান তার উর্বর জলসেচের সুবিধাপূর্ণ এলাকাসমূহ নিজ দখলে এনে সামান্য অনুর্বর পাহাড়ী এলাকা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে সেদিক থেকে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

তারপর একটি বাহিনীকে তাঁর উযীর ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদের নেতৃত্বে মারসিয়া ও বালানসিয়ার বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে অনুগত করে কারমূনা আক্রমণ করেন এবং হাবীব ইব্‌ন

সাওয়ারার কবল থেকে তা মুক্ত করে সুলতানের রাজ্যভুক্ত করলেন। ঐ বছরই সুলতানের আযাদকৃত ক্রীতদাস বদর লাবলা আক্রমণ করে সেখানকার বিদ্রোহী সর্দার উসমান ইব্‌ন নসরকে গ্রেফতার করে কর্ডোভায় পাঠিয়ে দিলেন। ৩০৬ হিজরীতে (৯১৮-১৯ খ্রি.) ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ সামবার্না দুর্গ জয় করে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

সুলতানের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত

৩০৮ হিজরীতে (৯২০-২১ খ্রি.) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মাদ এবং কাযী ইব্‌ন সুলতান মুহাম্মাদ সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্তে লিপ্ত হন এবং সিংহাসন অধিকার করার উদ্দেশ্যে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। ঘটনাচক্রে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার একজন সমুদয় বিবরণ সুলতানকে অবহিত করে। সুলতান তাতে অধীর না হয়ে অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে বিষয়াদির তদন্ত করেন এবং তাদের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করলেন।

৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি.) তারসাভী দুর্গ বিজিত হয়। ঐ বছরই আহমদ ইব্‌ন হামদানী যিনি জামা দুর্গ অধিকার করে রেখেছিলেন এবং সুলতানের আনুগত্য বিমুখ ছিলেন পরে তাঁর নিকট স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং জামানত স্বরূপ আপন পুত্রকে কর্ডোভায় পাঠিয়ে দেন। মোদ্দাকথা, যে সব ছোট ছোট সর্দার বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন একের পর এক তাদের সকলেই হয় আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেন অথবা ঘাতকদের হাতে নিহত হন। এভাবে কর্ডোভার শাসনাধীন রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয়ে সুলতান আবদুল্লাহ্‌র সময়কার দুরবস্থা কেটে যায়। অন্য কথায়, যে বিশাল এলাকা শতধা বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তা পুনরায় একীভূত হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

ঈসায়ী অধিকৃত অঞ্চলসমূহের বিবরণ

এবার ঈসায়ী অধিকৃত এলাকাসমূহের বিবরণ শুনুন। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী দক্ষিণ উপকূলের পাশের পার্বত্য অঞ্চলটি ইব্‌ন হাফসুনের অধিকারে ছিল। এ ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টানরাই ছিল তাঁর সঙ্গী-সাথী। তাই এটা ছিল একটা ঈসায়ী রাজ্য। ইব্‌ন হাফসুনের অভিমত নেতৃত্বের কারণে এটাকে একটি মজবুত ঈসায়ী শক্তিরূপে মনে করা হতো। তবে তার সাথে সুলতানের সন্ধি হয়েছিল।

টলেডো ঃ টলেডো ছিল একটি সুরক্ষিত ও দুর্জয় স্থান যা দখল করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। সুলতান আবদুল্লাহ্‌র শাসনামলে এখানে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য গড়ে ওঠে। এখন কর্ডোভার সাথে তার কোন আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না। এ রাজ্যটি স্পেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এবং এটি ছিল একটি মজবুত খ্রিস্টান শক্তি।

বার্সেলোনা ঃ এখানে সুদীর্ঘকাল থেকে ঈসায়ী হুকুমত কায়েম ছিল।

আলবুনিয়া ঃ এখানেও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ঈসায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নওয়ার ঃ আলবুনিয়া সন্নিহিত অঞ্চলে ফরাসীরা একটি শক্তিশালী খ্রিস্টান রাজ্য কায়েম করেছিল।

ইলাস্ট্রিয়াস ঃ এটি একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়ে স্পেনের সমভূমি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাজ করছিল। জালীকিয়া, লবূন এবং কাস্তালার তিন তিনটি শক্তিশালী খ্রিস্টান রাজ্য এর অধীন ছিল।

তাছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য খ্রিস্টানরা গড়ে তুলেছিল। এগুলো জালীকিয়া রাজ্যের অধীন বলে গণ্য হতো। এই ঈসায়ী রাজ্যগুলোর সবক'টিই স্পেন উপদ্বীপের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। অবশিষ্ট দক্ষিণ ও পূর্ব ফ্রান্স এবং উত্তর ফ্রান্সের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ছিল এ সব রাজ্যের অতিরিক্ত- যা স্পেনের ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতায় সর্বক্ষণ লেগে ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তর দিকে নির্গত একটি কোণ ছিল সারাকসতা জেলা। সেখানে যথারীতি মুসলমান আমিল নিযুক্ত থাকতেন। কিন্তু সবসময়ই খ্রিস্টানদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আর তার এ বন্ধুত্বে কারো আপত্তির কারণ ছিল না এ জন্য যে, সুলতান আবদুল্লাহ্ এবং ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা আল-কায়সু তৃতীয় পরস্পর মিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। চুক্তি তখনো পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং কোন পক্ষই তখনো লঙ্ঘন করেনি।

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্রোহীদের ব্যাপারটি সামলে নিয়ে টলেডো আক্রমণ করলেন। আক্রমণের পূর্বে তিনি টলেডোবাসীর প্রতি প্রেরিত এক বার্তায় তাদেরকে বিরোধিতায় ত্যাগ করে সুলতানের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, এতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কিন্তু টলেডোবাসীরা তাঁর সে বার্তা ও আহ্বান অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সাধ্যমত মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা আশেপাশের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো থেকে ঈসায়ী সৈন্যদের সংগ্রহ করে। বার্সেলোনা, নওয়ার এবং ইলাস্ট্রিয়াসের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর সাহায্য প্রার্থনা করে। পাদ্রীরা সর্বত্র খ্রিস্টান জনগণকে টলোডা রক্ষার্থে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অবশেষে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং খুব ভেবেচিন্তে টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। প্রায় এক বছরকাল সংঘর্ষ অব্যাহত থাকার পর সুলতান টলেডো দখল করে নেন। বিজিতদের সাথে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপূর্ণ সদয় ও বিনম্র আচরণ করেন। কয়েক মাসকাল তিনি নিজে টলেডোতে এবং টলেডোর আশেপাশে অবস্থান করে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

টলেডো বিজয়ের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঈসায়ী রাজারা কয়েকটি মুসলিম শহরে আক্রমণ চালিয়ে তা রীতিমত ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। সুলতান তাঁর উযীর আহমদ ইব্ন ইসহাকের নেতৃত্বে সৈন্যদল দিয়ে সে দিকে প্রেরণ করে। তিনি লবূন রাজ্য আক্রমণ করে ঈসায়ীদেরকে উপর্যুপরি পরাস্ত করে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। সুলতান তাঁর ভৃত্য বদরকে সেদিকে পাঠালেন। নওয়ার, লিয়ন প্রভৃতি বিজিত রাজ্যের সৈন্যরা তার মুকাবিলায় অগ্রসর হয়। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়।

বদর তাদেরকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন। এর অব্যবহিত পরেই সুলতান আবদুর রহমান নিজে সসৈন্য সেদিকে অগ্রসর হয়ে ঈসায়ীদেরকে তাদের বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখে ফ্রান্সের সীমানায় প্রবেশ করেন। নওয়ার ও আলবুনিয়া বশ্যতা স্বীকার করে সুলতানকে ফেরত পাঠায়। কিন্তু সুলতান ফিরে যাবার সাথে সাথে উত্তরের সমস্ত খ্রিস্টান সংঘবদ্ধভাবে আবার মুসলিম হত্যার পূর্ব চুক্তিসমূহ নবায়ন করে। এটা ৩১৩ হিজরীর (এপ্রিল ৯২৫-মার্চ ২৬ খ্রি) কথা।

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তরের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধরত থাকা অবস্থায়ই তাঁর কাছে উমর ইব্‌ন হাফসুনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। উমর ইব্‌ন হাফসুন তার দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার জন্য উঁচুদরের লোক বলে গণ্য হয়েছিলেন এবং সর্বদাই তার দিক থেকে যে কোন অঘটন ঘটাবার আশঙ্কা বিরাজমান থাকতো। এহেন শত্রুর মৃত্যুতে সুলতান তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত বোধ করলেন, কিন্তু সরাসরি তার রাজ্য দখল করে তাকে তাঁর নিজ রাজ্য মুক্ত করাকে তিনি সমীচীনবোধ করলেন না। তিনি উমর ইব্‌ন হাফসুনের পুত্র জাফরকে সে রাজ্যের ওয়ালী মনোনীত করলেন। অবশেষে ৩১৫ হিজরীতে (মার্চ ৯২৭-ফেব্রুয়ারী ২৮ খ্রি) এ রাজ্যটি সুলতানের রাজ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

এ দিকে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁর পিতৃরাজ্যের পুরোটাই বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত করে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। অপর দিকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই তাঁর জন্য কল্যাণকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তর দিক থেকে ঈসায়ীদের হামলার আশংকা করতেন। কেননা, ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উপদ্বীপের গোটা উত্তরাঞ্চল জুড়ে তাদেরই দখল ও রাজত্ব ছিল। আর এখন আব্বাসীয়ার স্থলে উবায়দীরা তাদেরকে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিল। এখন তাদের অন্তরে মুসলমানদের সে ভয় আর বিদ্যমান ছিল না– যা তাদের অন্তরে তারিক ও মূসার আগমনকালে ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাও তখন তাদের সেই পূর্ব শৌর্যবীর্য ধরে রাখতে পারেনি। পক্ষান্তরে, ঈসায়ীদের শৌর্যবীর্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দক্ষিণ দিকে উবায়দীদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা আফ্রিকা মহাদেশের গোটা উত্তর এলাকা দখল করে নিয়ে মরক্কোর ইদরীসিয়া রাজত্বের নাম-নিশানা মুছে দিয়ে স্পেন বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিল। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান যুগপৎ উভয় দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়লেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

আল-ফোনসুর বিভক্ত হলো

ইলাস্ট্রিয়াসের রাজা তৃতীয় আলফোনসু তাঁর রাজ্যকে সন্তানদের মধ্যে এভাবে বণ্টন করে দেন।

তিনি লিওন এলাকা গারসিয়াকে দান করেন। জালীকিয়া রাজ্য আর্দুলীর ভাগে পড়ে। উরাইডো এলাকা পান ফার্দীলা। গারসিয়া বিবাহ করেছিলেন নওয়ার রাজের কন্যাকে। এ

জন্য লিওনের সাথে নওয়ারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই লিওন ও নওয়ার যৌথভাবে কয়েকবারই মুসলমানদের মুকাবিলা করে। তিন বছর রাজত্ব করার পর ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি.) গারসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর শাঞ্জা লিওন রাজ্যের শাসকের পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু জালীকিয়ার শাসনকর্তা তাঁর চাচা আর্দুলী শাঞ্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার রাজ্যটি কেড়ে নিয়ে তাকে নিজ রাজ্যভুক্ত করে নেন। ওদিকে নওয়ারের রাজাও মৃত্যুমুখে পতিত হলে শাঞ্জা পলায়ন করে তার নানার রাজ্যে গিয়ে উঠেন। সেখানে তাঁর নানী ছিলেন তূতা রাণী। তিনি নিজ হস্তে নওয়ার রাজ্য শাসনের দায়িত্ব তুলে নেন। ওদিকে কাস্তালা রাজ্য জালীকিয়া ও লিওনের রাজার আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। কাস্তালার শাসক ফার্ডিনাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। মোটকথা, উক্ত ঈসায়ী রাজ্যসমূহের রাজারা কয়েক বছর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তারা ইসলামী এলাকার দিকে ফিরে তাকাবারও অবকাশ পায়নি। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান ঈসায়ীদের এ অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর পেয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সেদিকে সৈন্য প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন। এভাবে তিনি তাদেরকে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতে দেন। ঐ সময় যদি তিনি উত্তর দিকে সৈন্য প্রেরণ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই ঈসায়ীরা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত এবং এভাবে তাদের আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধ হয়ে যেত।

মরক্কো অধিকার

এমনি যুগসন্ধিক্ষণে দক্ষিণ দিক থেকে এক সুসংবাদ এলো যে, মরক্কোর ইদরীসিয়া রাজ বংশের অবসান ঘটিয়ে মরক্কো দখলের জন্য উবায়দীদের প্রচেষ্টার মুখে অতিষ্ঠ ইদরীসী শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ উবায়দীর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের হাতে তাঁর রাজ্য সমর্পণ করতেই উদগ্রীব। এ যাবত কর্ডোভার দরবার ও মরক্কোর মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক সমমর্যাদার ভিত্তিতেই চলে আসছিল। সুলতান আবদুর রহমান এটাকে সাহায্য ও সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সৈন্যদেরকে জাহাজে বোঝাই করে মরক্কোর উপকূলে অবতরণ করালেন। মরক্কো তখন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মরক্কোর প্রত্যেকটি রাজ্যের রঈসরা সুলতান আবদুর রহমানের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে নিজ নিজ দূতকে উপঢৌকনসহ কর্ডোভায় প্রেরণ করেন এবং কোন কোন রঈস সশরীরে কর্ডোভায় হাযির হয়ে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান রহমানের সৈন্যরা উবায়দীর সৈন্যদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে আমীরদেরকে আমীরীর সনদ প্রদানে শাসকরূপে নিযুক্তি প্রদান করেন। এভাবে মরক্কোও কর্ডোভার দরবারে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

যে সময় সুলতান আবদুর রহমান মরক্কো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় উত্তরের ঈসায়ীদের পক্ষ থেকে কোনরূপ হামলার আশঙ্কা ছিল না। কেননা, তারা তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। উবায়দীর পক্ষ থেকে যে সঙ্কট ছিল এবার তার অবসান ঘটলো। কেননা, মরক্কো এখন সুলতান আবদুর রহমানের অধিকারে চলে এসেছে। স্পেন দেশ এখন অনেকটা নিরাপদ হয়ে গিয়েছে।

সারাকসতার গভর্নরের বিদ্রোহ

৩২২ হিজরী (৯৩৪ খ্রি.) নাগাদ খ্রিস্টান রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অবসান ঘটে। আর এ সময়ই সুলতান আবদুর রহমান মরক্কোকে তাঁর সালতানাতভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করেন। এবার ঈসায়ীরা সারাকসতার গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশামকে বিদ্রোহের উসকানি দিয়ে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের পাকা আশ্বাস প্রদান করেন। বার্সিলোনা থেকে জালীকিয়া পর্যন্ত গোটা অঞ্চল সুলতান আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে উঠলো। সারাকসতায় মুসলমান আমিলের বিদ্রোহ সফল করার এবং তার সাহায্যার্থে সকলের উদ্যোগী হওয়ার কারণ ছিল এই যে, মরক্কোর স্পেন রাজ্যভুক্ত হওয়ার সংবাদে খ্রিস্টান-মহলকে রাতারাতি সচেতন করে তুলে। এ জন্য তারা যে কোন মূল্যে অতিসত্বর আবদুর রহমানের শক্তিকে চুরমার করে দেয়াকে জরুরী বিবেচনা করে। তারা উপলব্ধি করে যে, এখন চিন্তা-ভাবনায় কালক্ষেপণ করা সঙ্কটকে ঘনীভূত করারই নামান্তর। তাই কর্ডোভা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এবং ঈসায়ী রাজ্যসমূহের নিকট-প্রতিবেশী সারাকসতার আমিলকে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে আবদুর রহমানের শক্তিকে দুর্বল করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিপদের ঝুঁকি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবদুর রহমান সারাকসতার আমিলের বিদ্রোহী হওয়ার সংবাদ শ্রবণে তাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলের দিকে যখন মনোনিবেশ করলেন তখন গোটা ঈসায়ী অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীসমূহকে সক্রিয় দেখতে পেলেন। ওয়াহ শামা নামক স্থানে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম যুদ্ধে বন্দী হন। খ্রিস্টান সৈন্যরা নিজ নিজ রাজ্যের দিকে পালিয়ে যায়। তারপর সুলতান আবদুর রহমান প্রতিটি খ্রিস্টান রাজ্যের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে হামলা করে প্রত্যেক রাজ্যকেই পদানত করেন। প্রত্যেক রাজ্যই বশ্যতা স্বীকার করে এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। নওয়ার রাজ্যের রাণী তূতাও ভীষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি তাঁর দৌহিত্র শাঞ্জাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তার উপদেষ্টারূপে থাকলেন। খ্রিস্টানদেরকে শায়েস্তা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিমকে উৎখাতের কাজ সম্পন্ন করে সারাকসতায় উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাককে গভর্নররূপে নিয়োগ করে সুলতান কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিখার যুদ্ধ

৩২৭ হিজরীর (৯৩৯ খ্রি.) প্রথম দিকের মাসগুলোতে উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাকের কোন এক ভাই বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র করে। এ অপরাধের শাস্তিতে সুলতান তাকে হত্যা করলেন। সারাকসতার গভর্নর উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক তার ভাইয়ের হত্যার খবরে মর্মাহত হলেন। ঈসায়ী রাজারা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে উমাইয়াকে তাদের সহানুভূতি জানিয়ে অনায়াসেই বিদ্রোহী করে তুলে। জালীকিয়ার ঈসায়ী রাজা রাযমীর ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। উমাইয়া বিদ্রোহী হয়ে সারাকসতা থেকে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও সৈন্য-সামন্ত সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে জালীকিয়ার রাজধানী সামুরাতে রাযমীরের কাছে চলে যায়। সেখানে নওয়ার, লিওন ও কাস্তালা প্রভৃতি স্থানের সৈন্যরাও এসে সমবেত হতে

থাকে। বার্সেলোনা ও তারকুফার সৈন্যরাও এখানে এসে পৌঁছে। ফ্রান্স থেকেও ঈসায়ী ধর্মযোদ্ধারা এসে সেখানে সমবেত হতে থাকে। স্পেনে এটা ছিল ঈসায়ী শক্তির সবচাইতে বড় মহড়া। আর এ মহড়ায় একজন মুসলমান গভর্নরও তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সুলতান আবদুর রহমানকে পরাস্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এই মুসলমান গভর্নর ঈসায়ীদেরকে অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেন এবং অনেক কার্যকর বুদ্ধি ও পরামর্শ দান করেন। নিজেদের মধ্যে উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাকের উপস্থিতি ঈসায়ীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোবলকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলে। এদিকে সুলতান আবদুর রহমান এ মহা ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবগত হবার সাথে সাথে জিহাদ ঘোষণা করলেন। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাথে সাথে অনেক স্বেচ্ছাসেবক এবং বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকও শাহাদাতের উদ্দীপনা নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে শরীক হলো।

এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারেরও বেশি। এদেরকে সাথে নিয়ে সুলতান আবদুর রহমান কর্ডোভা থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু ৫০ সহস্রাধিক সৈন্যের অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ। সুলতানী বাহিনী যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঈসায়ী সৈন্যরা ততই উত্তর দিকে সরে গিয়ে সামুরায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ঈসায়ীদের সংখ্যাগত প্রাবল্যের সাথে সাথে আরেকটি শক্তি ছিল এই যে, সামূরার চতুর্দিকে সাতটি মজবুত বেষ্টনী প্রাচীর ছিল এবং প্রতিটি প্রাচীরের পরেই ছিল সুগভীর পরিখাসমূহ। তাদের প্রধান সিপাহসালার ছিলেন রাযমীর এবং তাঁর সহকারী ও উপদেষ্টা ছিলেন উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক। ইসলামী বাহিনী রণক্ষেত্রে উপনীত হয়ে যুদ্ধ শুরু করে। ঈসায়ী সৈন্যরা ময়দানে বের হয়ে মুকাবিলা করে। রণক্ষেত্রের প্রতিটি সেকটরে মুসলমানরা জয়ী হন। ঈসায়ী সৈন্যদেরকে প্রতি ক্ষেত্রেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়। কয়েকদিনের যুদ্ধের পর ঈসায়ী বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়ে সামরার বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩২৭ হিজরীর ৩০শে শাওয়াল (আগস্ট ৯৩৯ খ্রি) মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দুটি প্রাচীর ভেঙ্গে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তৃতীয়টিও তারা জয় করে নেন। কিন্তু এ পর্যন্ত পৌঁছার পরই চতুর্দিকের গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে খ্রিস্টান সৈন্যরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক বিরাট সংখ্যক মুসলিম সৈন্য তখন না পারছিলেন সম্মুখে অগ্রসর হতে, না পারছিলেন পিছন দিকে সরে আসতে। তাদের অনেকেই পরিখায় পরে ডুবে মারা যায়। মোট কথা, মুসলমানরা এমনি সংকীর্ণ স্থানে এমন নিদারুণভাবে আটকা পড়ে যায় যে, মাত্র ৪৮ জন সৈন্য জীবিত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। জীবিতদের মধ্যে পঞ্চাশতম ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং সুলতান আবদুর রহমান— যাঁকে তার সঙ্গী-সাথীরা অতি কষ্টে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অবশিষ্ট গোটা বাহিনী সামূরার সেই গভীর পরিখার মধ্যে শাহাদাতবরণ করেন। ঐ পঞ্চাশ জনের পিছনে রাযমীর একটি বাহিনীকে পাঠাতে মনস্থ করে, কিন্তু উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক এই বলে তাকে নিবৃত্ত করেন যে, ইসলামী বাহিনীর এক বিরাট অংশ বাইরের ঝোঁপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকাটা বিচিত্র নয়। তারা চতুর্দিক থেকে সমবেত আক্রমণ চালিয়ে আপনার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। সুতরাং এত বড় একটা ঝুঁকি নেয়া সমীচীন হবে না।

মোট কথা, আবদুর রহমান এ যাত্রায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। মুসলমানদের স্পেনে পদার্পণ অবধি কোন যুদ্ধে তাদের এত বিপুল সংখ্যক লোক শহীদ হননি। এ লড়াইটি ইয়াওমুল খন্দক বা খন্দকের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে।

এ যুদ্ধের পর উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক পঞ্চাশ হাজার মুসলমানের শবদেহ প্রত্যক্ষ করে আপন কুকীর্তি সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ পায়। তার বিবেক তাকে মুসলমানদের এ বিপুল রক্তপাতের জন্য দংশন করতে থাকে যে, এত বিপুল সংখ্যক মুসলিমের রক্তপাত করে তুমি অনেক বড় গোনাহ করেছ। সে অনুভব করতে পারে যে, মুসলিম জাতির কী মহাসর্বনাশই না সে সাধন করেছে। সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং যথারীতি সুলতানের দরবারে আবেদন পত্র পাঠিয়ে এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাথে সাথে সে খ্রিস্টানদের সাথে দল ত্যাগ করে সুলতানের শিবিরে ফিরে আসে। সুলতান আবদুর রহমান কর্ডোভায় ফিরে এসে শক্তিশালী সুসজ্জিত বাহিনী ঈসায়ী রাজ্যগুলোর দিকে রওয়ানা করেন। সে সব বাহিনী নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে পৌঁছে ঈসায়ীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। ফলে পরিখার যুদ্ধ জয়ের দ্বারা উপকৃত হওয়াটা আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি। বরং মুসলিম বাহিনী বিজয়ীর বেশে ফ্রান্সের সীমানায় পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং প্রচুর গনীমত সম্ভার নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

আব্বাসীয় খিলাফতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের কাছে আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির ৩২৭ হিজরী (৯৩৯ খ্রি.) নিহত হওয়ায়, আব্বাসীয় খিলাফত নামে মাত্র টিকে থাকা এবং উবায়দীদের খিলাফত দাবির সংবাদ এসে পৌঁছে। এখন আব্বাসীয়দের দিক থেকে কোন আশংকা আর বাকি নেই এবং উবায়দীরা শীআ হওয়ার কারণে তাদের প্রতি স্পেনবাসী মুসলমানদের কোন সহানুভূতি নেই লক্ষ্য করে তিনি (সুলতান) নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন এবং খলীফাতুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করা সঙ্গত মনে করেন। যা হোক তিনি নিজেকে 'আমীরুল মু'মিনীন' ঘোষণা করেন এবং নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাসির লি-দীনিল্লাহ উপাধি। কেউ তাঁর এই উপাধির বিরোধিতা করেনি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী বিশ্বে ঐ সময়ে তিনিই ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন উপাধি পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক। তারপর আমীরুল মু'মিনীন আবদুর রহমান কর্ডোভার জাঁকজমক বৃদ্ধি এবং সেখানে নয়নাভিরাম ইমারতসমূহ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং আট-দশ বছর পর্যন্ত প্রতিবছরই উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ পদানত করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। তিনি খ্রিস্টানদেরকে এমনভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন যে, তারা তাঁর কাছে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশকে নিজেদেরও আত্মরক্ষার একমাত্র পথ বিবেচনা করে। এরই ফলে উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টানদেরও বিদ্রোহ করার এবং মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশংকা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

এ পর্যন্ত স্পেনের যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করলে খলীফা আবদুর রহমানের এ ত্রুটি পরিষ্কার ধরা পড়ে যে, তিনি উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত রাজ্য বিলুপ্ত করার

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি সেগুলোকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত দেখে ৩৩০ হিজরীর (অক্টোবর ৯৪১-সেপ্টেম্বর ৪২ খ্রি) পর মুসলমানরাই অবহেলা ও অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তাদেরই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা খ্রিস্টান সাম্রাজ্যগুলোকে একটি একটি করে নিশ্চিহ্ন করে নিজের অধীনে এনে সেখানে নিজস্ব মুসলিম শাসনকর্তা নিয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহের ন্যায় আপন সাম্রাজ্যেও ঐগুলোর অস্তিত্ব বহাল রাখেন। পরিণামে এঁরা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বিবেচিত হয়। খুব সম্ভব তখন কেউ এ ধারণাও করতে পারেনি যে, পরবর্তী কোন এক সময়ে শাসক মুসলমানদেরও উত্তর পুরুষরা এমনি দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়বে যে, এই সমস্ত খ্রিস্টান নবাব (সামন্তরাজ), যারা আজ পঞ্চমুখে আনুগত্য স্বীকার করছে, তারাই একদিন স্পেন থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে সক্ষম হবে। 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি গ্রহণের পর তৃতীয় আবদুর রহমান কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে নিজ সেনাপতিদের অধিনায়কত্বে সৈন্য পাঠিয়ে তিনি তাঁর দায়িত্ব সেরে নিতেন।

স্থল ও নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

৩২৮ হিজরী (নভেম্বর ৯৩৯ খ্রি.) থেকে সার্বিকভাবে খলীফা নাসিরের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তির যুগ শুরু হয়। তাঁকে বিব্রত করতে পারে বাহ্যত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব তখন ছিল না। এই সুযোগে খলীফা নাসির লি-দীনিল্লাহ্ অর্থাৎ তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁর নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি এবং সেই সাথে স্থল বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। অনেকগুলো সামরিক নৌযান তৈরি করা হয়। ফলে স্পেনের নৌবাহিনী ঐ যুগের সকল নৌবাহিনীর চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রূম (ভূমধ্য) সাগরের উপর খলীফা নাসিরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা পুরাতন শাহী মহল সংলগ্ন 'দারুর-রওযা' নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কর্ডোভা মসজিদের আয়তন ও অঙ্গ-সজ্জায় পরিবর্ধন সাধন করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় এবং স্পেনের বণিকরাও তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে দূর-দূরান্তে যেতে শুরু করে।

খলীফা আবদুর রহমানের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি

খলীফা আবদুর রহমান নাসিরের ভূমিকা ও খ্যাতি খুব দ্রুত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ৩৩৬ হিজরীতে (৮৪৭-৪৮ খ্রি.) কনসটান্টিনোপলের সম্রাট কনসটানটাইন ইব্ন আলিউন অত্যন্ত মূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ উপঢৌকনসহ কর্ডোভায় খলীফা নাসিরের খিদমতে একদল রাজকীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্রাট কনসটানটাইন একদিকে যেমন নিজের শান-শওকত ও প্রাচুর্যের দিকটি তুলে ধরতে চাচ্ছিলেন এবং অন্যদিকে খলীফা নাসিরের বন্ধুত্ব কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন। খলীফা নাসির ঐ প্রতিনিধিদলের আগমন সংবাদ পেয়ে কর্ডোভা শহর সুসজ্জিত করার নির্দেশ দেন। জাঁকজমকপূর্ণ সামরিক পোশাক পরে সৈন্যরা মহড়া দিতে শুরু করে, ঘরের দেওয়াল ও দরজা-জানালা নানা বর্ণে সুসজ্জিত করা হয় এবং তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় নানা রংয়ের পতাকা ও ফেস্টুন। এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও

ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ দেখে কনসটান্টিনোপলের রাজদূতেরা হতচকিত হয়ে পড়েন এবং সাথে করে নিয়ে আসা উপঢৌকনসামগ্রী তাদের নিজেদের কাছেই বেমানান মনে হতে থাকে। মর্মর পাথরের আকর্ষণীয় স্তম্ভসমূহ অতিক্রম করে এবং নানা বর্ণের নকশাদার কার্পেট মাড়িয়ে রাজ প্রতিনিধি-দল শাহী দরবারে গিয়ে পৌছে, যেখানে খলীফা নাসির সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর আশেপাশের আসনগুলো অলংকৃত করেছিলেন নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী আমীর, উজীর, আলিম, কবি এবং সামরিক নেতৃবৃন্দ। তখন কনসটানটাইনের রাজ প্রতিনিধি দলের চোখেমুখে যে ভীতিপূর্ণ বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তা ছিল লক্ষ্য করার মত। যা হোক তারা নিজেদেরকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে, সর্বপ্রকার শিষ্টতা বজায় রেখে কুর্নিশ করতে করতে রাজ সিংহাসনের নিকটবর্তী হয় এবং খলীফার কাছে সম্রাট কনসটান্টিনের পত্রটি হস্তান্তর করে। পত্রটি ছিল একটি আকাশী রঙয়ের কম্বল, যার উপর স্বর্ণাক্ষরে কিছু একটা লিখিত ছিল। ঐ কম্বলে জড়ানো ছিল একটি ছোট বাক্স। বাক্সটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও স্বর্ণপাতে মোড়ানো। তার উপর বসানো ছিল একটি সোনার মোহর, যার ওজন ছিল চার মিসকাল। মোহরের এক পিঠে সম্রাট কনসটান্টিনের ছবি অংকিত ছিল। ঐ বাক্সের ভিতর ছিল স্ফটিকের আর একটি ছোট বাক্স, যা ছিল স্বর্ণের নানারূপ কারুকার্য খচিত। তার ভিতর ছিল একটি অতি সুন্দর রেশমী খাত, যার ভিতরে ছিল অত্যন্ত সুন্দর আসমানী রংয়ের স্বচ্ছ চর্মের উপর সোনালি অক্ষরে লেখা পত্রটি। উক্ত পত্রে খলীফা আবদুর রহমান নাসির লি-দীনিল্লাহকে অত্যন্ত সম্মানসূচক উপাধিতে সম্বোধন করে মূল বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। খলীফা পত্রটি পড়িয়ে শোনেন। যথারীতি আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে সেদিনকার দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অত্যন্ত সম্মান ও জাঁকজমকের সাথে প্রতিনিধিদলের পানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। কিছু দিন পর তারা দেশে ফিরে যায় এবং সেই সাথে খলীফা হিশাম ইব্‌ন হুযায়লকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সম্রাট কনসটান্টিনের কাছে পাঠানো হয়। কনসটান্টিনের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি লিখিয়ে আনার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। হিশাম ইব্‌ন হুযায়ল কনসটান্টিনের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি লিখিয়ে নেন এবং ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি.) তা নিয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। তারপর ইতালী সম্রাট, জার্মান সম্রাট ও ফরাসী সম্রাটের দূতেরা একের পর এক কর্ডোভার রাজদরবারে হাযির হন এবং নিজ নিজ সম্রাটের পক্ষ থেকে খলীফার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের আবেদন জানান। কোন সম্রাটই নিজের প্রতি খলীফা আবদুর রহমান নাসিরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে আবেদন-নিবেদনের ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। তখন ইউরোপের সব সম্রাটই চাচ্ছিলেন খলীফাকে নিজের সাহায্যকারী করে নিতে, যাতে তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেন।

খলীফা আবদুর রহমানের আপন পুত্র হাকামকে 'অলীআহ্‌দ' (স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ নামায-রোযার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী এবং 'যাহিদ' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কর্ডোভার আবদুল বারী নামক জনৈক ফকীহ্

আবদুল্লাহ্‌কে প্ররোচিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য এবং খলীফা আবদুর রহমান ও হাকামকে হত্যা করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফকীহ্ আবদুল বারী ও আবদুল্লাহ্ উভয়ে মিলে খলীফা ও তাঁর অলীআহ্‌দকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেন। এই ষড়যন্ত্রে অন্যান্য লোককেও শরীক করা হয়। কিন্তু ৩৩৯ হিরজীর ১০ই যিলহজ্জ (মে ৯৫১ খ্রি) ঈদুল আযহার দিন ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে খলীফা তাঁর অলীআহ্‌দসহ একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। খলীফা আপন পুত্র আবদুল্লাহ ও ফকীহ আবদুল বারী উভয়কে বন্দী করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন এবং ঐ দিনই আবদুল্লাহ্‌কে জেলখানা থেকে বের করে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেন। ফকীহ্ আবদুল বারী তার মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ পেয়ে জেলখানায় আত্মহত্যা করেন।

৩৪২ হিজরীতে (৯৫৩-৫৪ খ্রি.) জালীকিয়ার সম্রাট রাযমীরের মৃত্যু হলে তার পুত্র চতুর্থ আর্দোনী সিংহাসনে আরোহণ করে একজন দূত মারফত খলীফা আবদুর রহমানকে নিজ পিতার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পিতার স্থলে নিজের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে খলীফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। খলীফা তাতে অনুমোদন দেন। ৩৪৫ হিজরীতে (৯৫৬ খ্রি) কাসতিলের গোত্রপতি ফার্ডিনান্ড চতুর্থ আর্দোনীকে নিজের সুপারিশকারী হিসেবে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন এবং একটি পৃথক রাজ্যের অধিপতি হিসেবে তাকে অনুমোদন দানের জন্য খলীফার কাছে আবেদন জানান। খলীফা ঐ আবেদন মঞ্জুর করে ফার্ডিনাণ্ডকে কাসতিলের স্বাধীন অধিপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। তখন পর্যন্ত ফার্ডিনান্ডকে জালীকিয়া সাম্রাজ্যের অর্থাৎ রাযমীরের অধীনস্থ মনে করা হতো। যেহেতু চতুর্থ আর্দোনীকে সিংহাসনের অধিকারী করার ব্যাপারে ফার্ডিনান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাই চতুর্থ আর্দোনী খলীফার কাছে সুপারিশ করে ফার্নিনান্ডকেও একজন স্বাধীন অধিপতি বানিয়ে দেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শাবখা তার পূর্বপুরুষের রাজ্য লিওন অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর যাবত লিওন রাজ্য জালীকিয়া থেকে পৃথক হয়ে শাবখার শাসনাধীনে চলে গিয়েছিল। আর নওয়ার রাজ্য শাসন করেছিলেন তার মাতামহী তোতা। শাবখার দেহে মেদ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, ঘোড়ায় চড়া তো দূরের কথা, দু'কদম পায়ে হাঁটাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৩৪৬ হিজরীতে (৯৫৭ খ্রি) ফার্ডিনান্ড ও চতুর্থ আর্দোনী একজোট হয়ে শাবখাকে লিওন রাজ্য থেকে বেদখল করে দেন। তখন শাবখা আপন মাতামহী তোতার মামা নওয়ার রাজ্য শাসন করছিলেন। তবে সেখানকার প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল শাবখার মাতামহীর হাতে। নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বলে তিনি নিজ পুত্র নওয়ারের সম্রাটের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক ছিলেন। রাণী তোতা খলীফার কাছে অনেক উপঢৌকন পাঠিয়ে আবেদন করেন, তিনি যেন আর্দোনীর কাছ থেকে শাবখার রাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন এবং শাবখার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য কর্ডোভা থেকে একজন চিকিৎসক পাঠান। খলীফা একজন শাহী চিকিৎসক নওয়ার রাজ্যে প্রেরণ করেন এবং রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন বলে রাণীকে জানিয়ে দেন। শাহী চিকিৎসক নওয়ারা পৌঁছে শাবখার চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং অচিরেই তার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পান।

ফরিয়াদীরূপে খলীফার দরবারে তিনজন খ্রিস্টান রাজার উপস্থিতি

তারপর ৩৪৭ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৫৮-মার্চ ৫৯ খ্রি) খোদ রাণী তোতা সরাসরি খলীফার দরবারে আবেদন পেশ করার জন্য আপন পুত্র (নওয়ারের শাসনকর্তা) এবং আপন নাতি (লিউনের সম্রাট)-কে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হন। বলতে গেলে, তিনজন খ্রিস্টান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ থেকে খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার জন্য প্রায় এই সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে যে সব শহর অথবা বসতিতে তারা অবস্থান করতেন তাদেরকে দেখার জন্য জনসাধারণ সেখানে ভিড় জমাত। তারা অত্যন্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে এমন কয়েকজন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে প্রত্যক্ষ করছিল, যারা ফরিয়াদীরূপে কর্ডোভায় যাচ্ছিলেন। কর্ডোভার সন্নিকটে পৌঁছলে তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যখন তাঁরা খলীফার দরবারে গিয়ে হাযির হন তখন সেখানকার শান-শওকত এবং খলীফার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য তাদেরকে দিশেহারা করে ফেলে এবং তারা অজান্তে তাঁর সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়েন। খলীফা তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ পেশ করার ফলে খলীফা তাদের সাথেই এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে ঐ বাহিনী লিওন ও জালীকিয়া রাজ্যের শাসন ক্ষমতা শাবখার হাতে তুলে দেয়। যেহেতু আমীরুল মু'মিনীন তৃতীয় আবদুর রহমানের সেনাবাহিনী চতুর্থ আর্দোনীকে বিতাড়িত করে শাবখাকে জালীকিয়া ও লিওনের বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছিল তাই আর্দোনী সেখান থেকে পলায়ন করে ফার্ডিনান্ডের কাছে কাসতিলায় চলে যান। অবশ্য সুলতানের সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে তাকে সেরূপ কোন বাধা প্রদান করেনি। আর্দোনীর এই পরিণাম লক্ষ্য করে বার্সেলোনা ও তারকুনার রাজ্যদ্বয় আপন আপন দূত কর্ডোভায় পাঠিয়ে সবিনয় প্রার্থনা জানান ঃ আমরা হচ্ছি দরবারে খিলাফতের গোলাম এবং আমরা আপন আপন রাজ্য সুলতানের দান বলেই মনে করি। সুলতানের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত মেনে নিতে আমরা সদাপ্রস্তুত। অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে রাজ্য শাসনের সনদ পুনরায় প্রদানপূর্বক আমাদের আনুগত্যের নবায়ন করতে মর্জি হয়। খলীফা নাসির আপন সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দিয়ে ঐ খ্রিস্টান রাজাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

তৃতীয় আবদুর রহমান যখনই কোন জ্ঞানী-গুণীর নাম শুনেছেন, যেখানেই তিনি থাকুন না কেন তাঁকে সেখান থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ কারণেই বাগদাদ, কনসটান্টিনোপল, কায়রো, কায়রাওয়ান, দামেশক, মদীনা, মক্কা, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান তথা মুসলিম বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে জ্ঞানী-গুণীরা দলে দলে কর্ডোভায় এসে ভিড় জমিয়েছিলেন। এই জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী এবং বিভিন্ন ধর্ম ও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জ্ঞানী-গুণীর প্রতিই দরবারে খিলাফতের পক্ষ থেকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করা হতো এবং সকলের জন্যই তাদের নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী ভাতাও নির্ধারণ করা হতো।

স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়ন

স্পেনের সুলতানদের মধ্যে খলীফা আবদুর রহমান সেই মর্যাদার অধিকারী, যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হিন্দুস্থানের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহান। কর্ডোভা মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রথম আবদুর রহমানের যুগে শুরু হয়ে তাঁর পুত্র হিশামের যুগে শেষ হয়। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রত্যেক শাসকই সেই মসজিদের শান-শওকত ও জাঁকজমক বৃদ্ধির কাজে সব সময়ই রাজকীয় ভাণ্ডারের মুখ উন্মুক্ত রাখেন। খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানও মসজিদের কাজ চূড়ান্ত করতে গিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচ শ' ফুট। এর সুন্দর ও আকর্ষণীয় মিহরাবসমূহ স্থাপিত ছিল পাথরের নির্মিত। এক হাজার চার শ' সতেরটি স্তম্ভের উপর। মিহরাবের নিকট একটি উচ্চ মিম্বর ছিল, হস্তীদন্ত ও ছত্রিশ হাজার বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন আকারের কাষ্ঠ খণ্ডের তৈরি। সেগুলোর উপর আবার ছিল হরেক প্রকার হীরা-জহরতের কারুকাজ। দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রমে মিম্বরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। খলীফা আবদুর রহমান মসজিদের পুরাতন মিনারসমূহ ভেঙ্গে তদস্থলে এক শ' আট ফুট উঁচু একটি নতুন মিনার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারে উঠা-নামার জন্য নির্মিত দুটি সিঁড়ির ছিল একশ' সাতটি ধাপ। মসজিদের মধ্যে ছোট বড় দশ হাজার ঝাড় বাতি জ্বালানো হতো। তার মধ্যে সর্ব বৃহৎ তিনটি ঝাড় বাতি ছিল রূপার এবং বাকিগুলো পিতলের তৈরি। বড় বড় ঝাড়ের মধ্যে এক হাজার চারশ' আশিটি প্রদ্বীপ জ্বালানো হতো। শুধু তিনটি রূপার ঝাড়ে ছত্রিশ সের তৈল পোড়ানো হতো। তিনশ' কর্মচারী ও খাদিম শুধু এই মসজিদের তদারকিতেই নিয়োজিত ছিল।

খলীফা আবদুর রহমান তাঁর খ্রিস্টান স্ত্রী যুহরার জন্য কর্ডোভা থেকে চার মাইল দূরে আকর্ষণীয় 'জাবালুল আরূম'-এর গা ঘেঁষে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদটি এতই প্রশস্ত ছিল যে, এটাকে যুহরা প্রাসাদ না বলে, যুহরা নগরী বলা হতো। প্রাসাদটির প্রশস্ততা অনুমান করা যেতে পারে এর প্রাচীরের দেওয়ালসমূহে মোট পনের হাজার সুউচ্চ ও বিরাটাকার দরজা ছিল। এটা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল প্রায় বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা। আমাদের বর্তমান যুগের হিসাব অনুযায়ী যুহরা প্রাসাদের নির্মাণ ব্যয় একশ' কোটি টাকার কম হবে না। প্রাসাদটির দৈর্ঘ্য ছিল চার মাইল এবং প্রস্থ আমুনানিক তিন মাইল। ৩২৫ হিজরীতে (৯৩৭ খ্রি) নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি.)। নির্মাণ কাজে দৈনিক দশ হাজার মিস্ত্রী ও চার হাজার উট খচ্চর নিয়োজিত করা হতো। প্রাসাদটি মর্মর ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের চার হাজার তিনশ' টাওয়ার (বুরুজ) ও স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত স্তম্ভের কোন কোনটি ফ্রান্স, কনসটান্টিনোপল প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা দানস্বরূপ আবদুর রহমান নাসিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আলী ইব্‌ন জা'ফর প্রমুখ স্থপতিকে পাঠিয়ে আফ্রিকা থেকেও মর্মর পাথর নিয়ে আসা হয়। একটি বিরাট ফোয়ারা যা সোনার তৈরি বলে মনে হচ্ছিল এবং যার উপর অত্যন্ত আকর্ষণীয় কারুকাজ করা হয়েছিল- তা আহমাদ ইউনানী এবং পাদ্রী বারী কনসটান্টিনোপল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সবুজ পাথরের একটি ফোয়ারা

সিরিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হীরা-হজরত ও সোনার তৈরি বারটি পশু-পাখি ঐ ফোয়ারার গায়ে খোদিত ছিল। প্রতিটি পশু-পাখির মুখ অথবা ঠোঁট থেকে পানির ধারা প্রবাহিত হতো। ঐ ফোয়ারার মধ্যে কারিগররা এমনি কারুকাজ করেছিল যে, ইউরোপের যে সমস্ত পর্যটক সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের মতে এরূপ জিনিস বাস্তবে দেখা তো দূরের কথা, এগুলোর কল্পনা করাও যে মানুষের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

প্রাসাদের 'কাসরুল খুলাফা' নামক অংশটিও ছিল একটি দর্শনীয় বস্তু। এর ছাদ খাঁটি সোনা ও স্বচ্ছ মর্মর পাথরে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, গ্লাসের মত এর বিপরীত দিকের জিনিস অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হতো। ছাদের বাইরের দিক সোনা-রূপার কারুকাজে সজ্জিত ছিল। এর মধ্যস্থলে সোনার পাতে মোড়ানো একটি আকর্ষণীয় ফোয়ারা স্থাপন করা হয়েছিল। ফোয়ারার মাথায় সেই বিখ্যাত মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল, যা গ্রীক সম্রাট উপঢৌকন হিসাবে তৃতীয় আবদুর রহমানের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন। এই ফোয়ারা ছাড়াও প্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলে ফোয়ারা সদৃশ পারদ ভর্তি একটি তশতরী রাখা হয়েছিল। প্রাসাদের চতুর্দিকে হস্তীদন্তের ফ্রেমে আটকিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আয়নাসমূহ রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান কাঠের দরজা মর্মর পাথর ও স্ফটিকের চৌকাঠের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। যখন এই সমস্ত খুলে দেওয়া হতো এবং সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত গৃহকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলত তখন কারো পক্ষে প্রাসাদের ছাদ অথবা দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে তাকানো সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় যখন পারদসমূহকে আন্দোলিত করা হতো তখন মনে হতো যেন সমস্ত গৃহটি আন্দোলিত হচ্ছে। যারা এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনবহিত ছিল তারা প্রাসাদটি এভাবে আন্দোলিত হতে দেখে ভয় পেয়ে যেত।

এই প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তের হাজার সাতশ' কর্মচারী এবং তের হাজার তিন শ' বিরাশি জন খ্রিস্টান দাস মোতায়েন ছিল। প্রাসাদের অন্দর-মহলে ছয় হাজার স্ত্রীলোক সেবা কাজে নিয়োজিত ছিল। বিভিন্ন হাউজের মধ্যে অন্যান্য খাদ্য ছাড়াও বার হাজার রুটি মাছের খাদ্য হিসাবে নিক্ষেপ করা হতো। মাদীনাতুত যুহরা ছিল সেই অত্যাশ্চর্য প্রাসাদ যার প্রশস্ততা, মর্মর পাথরে তৈরি যার ইমারতসমূহ, যার সাধারণ ও বিশেষ দরবারের শান-শওকত, যার মনোরম উপাদানসমূহের হাজার হাজার উত্তাল ফোয়ারা, নদী ও হাউজ দূর-দূরান্তের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আরবরা যেন এই প্রাসাদকে তাদের শিল্প ও কারু-কর্মের একটি প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। আক্ষেপের বিষয়—খ্রিস্টান নরপশুরা পরবর্তী যুগে যখন কর্ডোভা দখল করে তখন কাসরুয-যাহরার নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলে। তারা মসজিদসমূহ ধ্বংস করতে গিয়ে এমন কি মুসলমানদের কবরের চিহ্নসমূহও ধূলিসাৎ করে দেয়।

পবিত্র-চিত্ততা

ইতিপূর্বে প্রধান বিচারপতি মুনযির ইব্‌ন সাঈদ বালুতী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আবদুর রহমান নাসিরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আবদুর রহমান নিজের কোন প্রয়োজনে কর্ডোভায় একটি ঘর খরিদ করতে চাচ্ছিলেন। তা ছিল

কয়েকটি ইয়াতীম শিশুর মালিকানাধীন এবং ওরা ছিল বিচারপতি মুনযিরের তত্ত্বাবধানে। মুনযিরের কাছে এই ঘর খরিদ করার সংবাদ পৌঁছলে তিনি তা বিক্রি করতে অস্বীকার করেন এবং খলীফার খিদমতে বলে পাঠান যে, ইয়াতীমদের সম্পত্তি ঠিক তখনই হস্তান্তর করা যেতে পারে যখন তাতে নিম্নের তিনটি শর্ত পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায়।

১. যখন তা বিক্রি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেবে।

২. যখন তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেবে।

৩. এমন সন্তোষজনক মূল্য পাওয়া যাবে, যার দ্বারা ইয়াতীমরা ভবিষ্যতে অধিকতর লাভবান হতে পারবে। বর্তমানে এই তিন শর্তের কোনটিই বিদ্যমান নেই। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা এর যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তাও পরিমাণে অনেক কম।

খলীফা এই বার্তা পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে যান। তিনি ধারণা করেন যে, মুনযির এই জমির মূল্য বৃদ্ধি না করে ছাড়বে না। অপরদিকে মুনযিরের আশংকা হলো, খলীফা হয়ত এই ঘরটি জবরদস্তিমূলকভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই তিনি অবিলম্বে ঘরটি ধ্বংস করে ফেলেন। তারপর রাজকীয় কর্মচারীরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে এই জায়গাটি খরিদ করে। খলীফা এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে মুনযিরকে ডেকে পাঠান এবং এভাবে তা ধ্বংস করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। মুনযির উত্তরে বলেন, আমি ঘরটির ধ্বংস করার হুকুম দানকালে আমার সামনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ছিল ঃ

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَ فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا .

"তারপর উভয়ে (মূসা ও খিযির) চলতে লাগল। পরে তারা নৌকায় আরোহণ করলে সে (খিযির) তা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বললো, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেবার জন্য এটা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।" (১৮ ঃ ৭১)

খলীফা এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান এবং ঐ দিন থেকে বিচারপতি মুনযিরকে আরো বেশি সম্মানের চোখে দেখতে থাকেন। এই ঘটনা থেকে খলীফা এবং বিচারপতি (কাযী) উভয়েরই পবিত্র-চিত্ততার প্রমাণ মিলে। খলীফা নাসিরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে ৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫-৬৬ খ্রি) কাযী মুনযির ইনতিকাল করেন। আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আবদুর রহমান (তৃতীয়) নাসির লি-দীনিল্লাহ ৩৫০ হিজরীর ২রা রমযান (সেপ্টেম্বর ৯৬১ খ্রি.) ৭২ বছরের কিছু অধিক বয়সে যাহরা প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন।

রাজস্ব আয়

এই খলীফার যুগে বার্ষিক দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ আশি হাজার দীনার শাহী কোষাগারে জমা হতো। এছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দীনার সংগৃহীত হতো। আয়ের সমুদয় অর্থই দেশের এবং প্রজাসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা হতো। এছাড়া যে সব অর্থ খারাজ ও জিযিয়া হিসাবে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের কাছ থেকে আদায় করা হতো তা খাস শাহী কোষাগারে দাখিল করা হতো। এই আয়ের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। এর মধ্য

থেকে এক-তৃতীয়াংশ সুলতানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বাকি সব অর্থ ইমারত, পুল, সড়ক ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হতো।

খলীফার মৃত্যু

এই খলীফার মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর নিজের লেখা একটি নোট পাওয়া যায়। তাতে তিনি তাঁর পঞ্চাশ বছরের শাসনকালের ঐ দিনগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। যেগুলো ছিল তাঁর কাছে চিন্তা-ভাবনামুক্ত। আর এমন দিনের সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দটি। মৃত্যুকালে খলীফার এগারজন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে হাকাম ছিলেন অলীআহ্দ (ভাবী খলীফারূপে মনোনীত)।

তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা

খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল ছিল স্পেনের মুসলিম শাসনের অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সময়পর্ব। তখন সমগ্র দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থাও ছিল খুব জমজমাট। স্পেনবাসীরা তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল আফ্রিকা-এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে। নৌশক্তির ক্ষেত্রেও কোন দেশ বা কোন জাতি স্পেনের সমকক্ষ ছিল না। তাই সমগ্র সাগর-মহাসাগরও মুসলিম স্পেনের অধীনে ছিল। খলীফা আবদুর রহমান সাম্রাজ্যের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন– কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতেন না। ঐ সমস্ত আরব সর্দার ও ফকীহ্, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করে ঐ সমস্ত ব্যক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, যারা ছিল খলীফার প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি আপন ব্যক্তিগত ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে একটি পৃথক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন। তিনি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াদিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না।

এই খলীফা যে বিরাট কাজটি করেছিলেন তা হলো, মুসলমানদের বিভিন্ন জামাআত ও দল-উপদলের মধ্যে যে বিরোধ ও ঘরোয়া যুদ্ধ চলছিল তিনি তা নিশ্চিহ্ন করে দেন। তিনি মুসলমানদের প্রত্যেকটি দলকেই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী অধিকার প্রদান করেছিলেন। তাই একদল অপর দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও তাদের কেউই খলীফার শত্রু ছিল না। আর এর মধ্যেই ছিল খলীফা আবদুর রহমানের সাফল্যের রহস্য নিহিত। আর এটাই ছিল মূল বিষয়, যে কারণে স্পেনীয় মুসলমানদের ভাবমূর্তি সমগ্র বিশ্বের চোখে জাগরূক ছিল।

এই খলীফার যুগে অমুসলিম তথা খ্রিস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে অত্যন্ত বিনম্র ও সদয় আচরণ করা হতো। খলীফা আবদুর রহমানের সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায় খলীফা আবদুর রহমানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিল যে, এক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না।

যে সব মুসলিম ধর্মীয় নেতা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও অমুসলিমদের প্রতি কঠোর আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন খলীফা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঐ সব সদয়

আচরণের প্রতি, যা তিনি অমুসলিমদের সাথে করতেন। তিনি ঐ সমস্ত ধর্মীয় নেতাকে উদ্বুদ্ধ করেন যাতে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত হন এবং শরীয়ত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাঁদের সংকীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করেন। এক্ষেত্রে খলীফা সাফল্য অর্জন করেন এবং এ কারণেই তার যুগকে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ মনে করা হয়।

কাফিরদের মুকাবিলায় স্বয়ং যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই খলীফা কারো চাইতে কম ছিলেন না। তাঁর সামরিক তৎপরতা ছিল বিরাট ও ব্যাপক। তার সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়ন, স্থাপত্যকর্ম এবং শিল্প, বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতির উন্নয়ন সম্পর্কে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে যে কোন লোকের চোখে তার সম্মান ও মর্যাদা অনায়াসে ধরা পড়বে এবং যে কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, তৃতীয় আবদুর রহমান প্রথম আবদুর রহমানের চাইতে কোন অংশেই কম ছিলেন না।

এই খলীফার যুগে শুধু কর্ডোভা নয় বরং সমগ্র স্পেন স্বর্গীয় রূপ ধারণ করেছিল। দেশের কোথাও এমন এক খণ্ড জমিও ছিল না, যেখানে কৃষিকাজ হতো না। উদ্যানাদির প্রাচুর্যের কারণে সমগ্র দেশটিকে একটি বৃহৎ উদ্যান বলেই মনে হতো। কোন শহর বা জনপদ এমন ছিল না, যেখানে মনোরম ও আকাশচুম্বী দালান-কোঠার প্রাচুর্য ছিল না। এই খলীফার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে যে স্পেন ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তির কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তাঁর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার কারণে তা শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্যের চারণভূমিতে পরিণত হয়। তাঁর যুগে কর্ডোভা ও স্পেনের অন্যান্য নগরীর জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম বাগদাদ, দামেশক প্রভৃতি নগরীর চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নত স্পেনের তুলনায় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ছিল যেন একটি মরুভূমি, যেখানে সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। সমগ্র ইউরোপের রাজা-বাদশাদের আয় একসাথে যোগ করলেও তা শুধু তৃতীয় আবদুর রহমানের আয়ের সমতুল্য হতো না। খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের রেজিস্ট্রিভুক্ত নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। প্রয়োজন অনুযায়ী সাময়িকভাবে সেনাবাহিনীতে যেসব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হতো তাদের কোন সীমা-সংখ্যা ছিল না। শুধু খলীফার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীতে ছিল বার হাজার সৈন্য। তন্মধ্যে আট হাজার ছিল অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক।

সমগ্র স্পেন উপদ্বীপের উপর রাজপথ ও জনপথের জাল এমনভাবে বিস্তৃত ছিল যে, দেশের এক প্রান্তের সাথে অপর প্রান্তের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। পথিকদের নিরাপত্তার জন্য কিছুদূর পর পর চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। সৈন্যরা ঐ সমস্ত চৌকিতে অবস্থান করে সমগ্র রাস্তা পাহারা দিত। বার্তাবাহকের মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। ঐ বাহকেরা তেজস্বী ঘোড়া ছুটিয়ে এক স্থানের খবর অন্যস্থানে এত দ্রুত পৌঁছিয়ে দিত যে, অন্যান্য দেশের লোকেরা এটাকে একটি যাদুকরী ব্যবস্থা বলেই মনে করত। পাহারা চৌকির জন্য রাজপথের সর্বত্র অসংখ্য টাওয়ার নিমাণ করা হয়েছিল। সমুদ্র উপকূলেও অনুরূপ টাওয়ার ছিল। এই সমস্ত টাওয়ারের শীর্ষ থেকে উপকূল অতিক্রমকারী জাহাজসমূহের আনাগোনার খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানীতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো পাকা দালান

নির্মাণ করা হয়েছিল। এ কাজের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়মিত একটি বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হতো। স্থপতি ও শ্রমিকদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্যও এ ধরনের কাজ সব সময় জারি রাখা হতো। আর একমাত্র এ কারণেই মুসলিম শাসনাধীন প্রায় সব দেশে অসংখ্য দুর্গ ও পুল নির্মিত হয়েছিল। রোগাক্রান্ত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য এখানে সেখানে সরকারী খরচে ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলোতে সরকারী খরচেই জনসাধারণের সেবা ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইয়াতীমখানা গড়ে উঠেছিল। সেগুলোতে খলীফার নিজস্ব ব্যয়খাত থেকে ইয়াতীমদের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হতো।

কর্ডোভার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। সেখানকার রাস্তাগুলো ছিল পাকা ও অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরবাড়িগুলো ছিল সাধারণত মর্মর পাথরের তৈরি। পানি নিষ্কাশনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর ও পরিকল্পিত ড্রেন ব্যবস্থা ছিল। একটি নির্দিষ্ট সংস্থার উপর শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শহরের অভ্যন্তরেও এখানে সেখানে সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা রচিত হয়েছিল। আর বহির্ভাগে যে সমস্ত উদ্যান রচিত হয়েছিল সেগুলো ছিল যেমন বিরাট তেমনি আকর্ষণীয়। শহরের মধ্যে ছিল এক লক্ষ তের হাজার ঘরবাড়ি। মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমারা ও খলীফার জন্য যে সব মহল ও প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল এই হিসাবের বাইরে। আশি হাজার চারশ' দোকান, সাতশ' মসজিদ, নয়শ' হাম্মাম (গোসলখানা) এবং পণ্যদ্রব্য রাখার জন্য চার হাজার তিনটি গুদাম ঘর ছিল। বিশ্বের প্রত্যেকটি শহরের মানুষ, প্রত্যেকটি দেশের পোশাক এবং প্রত্যেকটি রাজ্য ও সালতানাতের মুদ্রা কর্ডোভায় দৃষ্টিগোচর হতো। কর্ডোভা নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল চব্বিশ মাইল এবং প্রস্থ ছিল ছয় মাইল। প্রাচীর বেষ্টিত মূল নগরীর আয়তন ছিল চৌদ্দ মাইল। রাতের বেলা কোন ব্যক্তি কর্ডোভার বাজারে হাঁটতে থাকলে সে দশ মাইল পর্যন্ত বাজারের প্রজ্বলিত বাতিসমূহের আলোয় চলতে পারত। তখন ভূ-পৃষ্ঠের কোন শহরই কর্ডোভার সমকক্ষতা দাবি করতে পারত না। তখনকার কর্ডোভা শহরে যে বিপুল পরিমাণ হস্ত লিখিত গ্রন্থাদি পাওয়া যেত তা বিশ্বের অন্য কোন শহরেই পাওয়া যেত না। আড়াই মাইল দূরত্ব থেকে বিরাট পাইপের মাধ্যমে শহরে পানি নিয়ে আসা হতো এবং অসংখ্য পাইপের মাধ্যমে তা সমগ্র শহরে সরবরাহ করা হতো। প্রতিটি শিক্ষাগার, প্রতিটি সরাইখানা এবং প্রতিটি মসজিদের দরজায় পানির পাইপ লাগানো হয়েছিল। এসব পাইপ উদ্যানসমূহে নির্মিত ঝর্ণাসমূহেও পানি সরবরাহ করত। শহরে বিরাট বিরাট সাতটি দরজা ছিল, যেগুলোতে নিয়মিত তালা লাগিয়ে রাখা হতো। শহর প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ মোট পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। শাহী প্রাসাদ ছিল এই পাঁচটি অংশের অন্যতম। এই অংশে একটি পৃথক দুর্গ ছিল, যেখানে সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বসবাস করতেন। শুধু কর্ডোভা নগরীতে নয়, বরং সমগ্র স্পেনে কোন ভিক্ষুক দৃষ্টিগোচর হতো না। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁর শাসনকালের শেষদিকে মদীনাতুয যাহরায় (যাহরা নগরী) চলে গিয়েছিলেন। মদীনাতুয যাহরা ছিল কর্ডোভার সন্নিকটে নির্মিত অপর একটি ক্ষুদ্র শহর, যা জাঁকজমকের দিক দিয়ে ছিল কর্ডোভার অনেক

উপরে। তখন স্পেনে হরেক রকমের ফল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো এবং হাটে-বাজারে তা অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রি হতো।

রাজধানী কর্ডোভায় প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায়ই এখানে সেখানে কবিতা পাঠের আসর, বিতর্ক সভা ও জ্ঞানালোচনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। রাজকুমারবৃন্দ, আমীর-উমারা এবং স্বয়ং খলীফা এই সমস্ত বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং নিজেরাও তাতে যোগদান করতেন। তাঁরা আলিম-উলামাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করতেন এবং তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতাও নির্ধারণ করে দিতেন। একারণেই গণিত, চিকিৎসা, দর্শন, ফিকাহ, হাদীস এবং তাফসীরশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্ডোভায় এসে জড়ো হতেন। শিক্ষার্থীদের আহার-বাসস্থান এবং অন্যান্য খরচাদি রাজকীয় কোষাগারই বহন করত। খলীফা আবদুর রহমান শেষ বয়সে তাঁর স্থলাভিষিক্ত (অলী-আহ্‌দ) হাকামের হাতে শাসন পরিচালনার বেশির ভাগ দায়িত্ব অর্পণ করে অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতেই অতিবাহিত করতেন।

মৃত্যু

খলীফা আবদুর রহমান নাসির লি-দীনিল্লাহ তাঁর মৃত্যুকালে স্পেন সাম্রাজ্যকে এমন অবস্থায় রেখে যান যে, খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ, যারা স্পেনের সীমান্ত অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন, বাধ্য হয়ে মুসলিম সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কেননা শত শত বছর অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম সালতানাতের কোনরূপ ক্ষতিসাধনতো দূরের কথা, উল্টো তারা নিজেরাই দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তারা অধীনস্থ দাস-দাসীদের ন্যায় কর্ডোভার শাহী দরবারে আবেদনপত্র পাঠাতেন এবং নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য বাদশার দরবারে করজোড়ে প্রার্থনা করতেন। যে সমস্ত খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ্ দূর-দূরান্তের দেশসমূহে রাজত্ব করছিলেন তারাও স্পেনের খলীফার সন্তুষ্টি অর্জনে সদা তৎপর থাকতেন এবং তাঁর সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। মরক্কো স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, রোম সাগর এবং অন্যান্য সাগরের উপরও স্পেনীয় নৌবহরের আধিপত্য ছিল। স্পেনের নৌশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এমন ক্ষমতা কারো ছিল না। দেশের অভ্যন্তরেও পুরোপুরি শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

খলীফা হাকাম ইব্‌ন আবদুর রহমানের খিলাফত লাভ

পিতার মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ৩৫০ হিজরীর ৫ই রমযান (সেপ্টেম্বর ৯৬১ খ্রি) আটচল্লিশ বছর বয়সে হাকাম ইব্‌ন আবদুর রহমান যাহরা প্রাসাদে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রীবর্গ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, আমীর-উমারা, উলামাবৃন্দ, সালতানাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বায়আত করার জন্য দরবারে হাযির হন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি প্রথমে বায়আত করেন। তারপর বায়আত করেন খলীফার ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য শাহযাদা। তারপর যথাক্রমে বায়আত করেন মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমারা ও ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। যে সব প্রাদেশিক কর্মকর্তা তখন কর্ডোভায় হাযির হতে পেরেছিলেন তারাও

বায়আতে অংশগ্রহণ করেন। দেশের সর্বসাধারণ যাতে বায়আতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রদেশে ও বড় বড় শহরে খলীফা প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শাহী প্রাসাদের চাকর-ভৃত্য এবং দাস-দাসীরাও বায়আতে অংশগ্রহণ করে। তারপর ধুমধাম ও জাঁকজমকের সাথে সিংহাসনে আরোহণের পর্বটি সমাধা করা হয়। খলীফা দ্বিতীয় হাকাম নিজের জন্য 'মুসতানসির বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং জা'ফর মুসহাফীকে নিজের হাজিব (মুখ্য সচিব) নিয়োগ করেন।

প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা

তারপর খলীফা হাকাম সালতানাতের প্রতিটি বিভাগে এবং প্রতিটি দপ্তরে কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখেন। তিনি প্রত্যেক মন্ত্রীর দফতর পরিদর্শন করেন, সামরিক বাহিনীর রেজিস্টারসমূহ যাচাই করেন এবং সেগুলোর পরিসংখ্যান নেন। মোটকথা, তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সালতানাতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হন। অবশ্য প্রথম থেকেই তিনি সালতানাতের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত ছিলেন এবং প্রত্যেকটি বিভাগ দেখাশুনার দায়িত্বও পালন করেছিলেন। যা হোক, সমগ্র প্রশাসন-কাঠামো সম্পর্কে নতুনভাবে পর্যালোচনা করার পর তিনি প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে স্ব-স্ব পদে স্থায়ী নিয়োগপত্র প্রদান করেন। অন্যকথায়, খলীফা প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যেন নতুনভাবে তার চাকরিতে নিয়োগ করেন। আর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার কারণে তার অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ আরো বেশি সজাগ হয়ে ওঠে।

সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজাদের বিদ্রোহ

ছোটবেলা থেকে খলীফা হাকামের মনে বইপত্র পড়া ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল প্রবল। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। বড় বড় জ্ঞানী-গুণী তাঁর সামনে কোন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদানে ছিলেন ভীতিগ্রস্ত। তাঁর মত এত বিপুল জ্ঞানের অধিকারী কোন সম্রাট খুব সম্ভবত কোন দেশের বা কোন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। যেহেতু পূর্ব থেকেই দ্বিতীয় হাকামের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাদি অধ্যয়নের কাহিনী চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর সিংহাসন আরোহণের সংবাদ পেয়ে সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, তিনি তাঁর পিতার ন্যায় নিজেকে একজন অতি কষ্টসহিষ্ণু সামরিক অধিনায়ক হিসাবে প্রমাণ করতে পারবেন না। অতএব, তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন।

কাসতালার সম্রাট ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী শহরসমূহও আক্রমণ করতে শুরু করেন। খলীফা এই অবস্থা লক্ষ্য করে সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরই সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কাসতালার দিকে রওয়ানা হন এবং সেখানকার খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে জালীকিয়া রাজ্যের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং প্রজাসাধারণের কাছ থেকে নতুনভাবে আনুগত্যের শপথ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

তারপর জানা গেল যে, জালীকিয়ার খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা এই হামলাকে খুব একটা আমল দেয়নি। তাই সেখানে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। এবার খলীফা হাকাম তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস গালিবকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করেন এবং জালীকিয়াবাসীদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্যও তাকে জোর তাকীদ দেন। গালীব সেখানে পৌঁছে দেখতে পান যে, খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর সংখ্যা মুসলিম সেনাবাহিনীর চাইতে বহুগুণ বেশি। এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাদের উপর আক্রমণ করেন খ্রিস্টানরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপর গালিব কাসতালা রাজ্যের একটি বিরাট অংশ পদানত এবং সেখানকার দুর্গসমূহ ধ্বংস করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, শানজা (সাঞ্জো) বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং তার সাহায্যার্থে লিওন, নওয়ার, কাসতালা প্রভৃতি রাজ্যের সেনাবাহিনী একত্রিত হয়েছে। খলীফা হাকাম সারাকসতার শাসক ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদকে লিখেন, 'তুমি এই সব বিদ্রোহীকে পরাস্ত কর'। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ অত্যন্ত যোগ্যতা ও বীরত্বের সাথে ঐ সমস্ত বিদ্রোহীর মুকাবিলা করেন এবং তাদের সবাইকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে প্রচুর মালে গনীমতসহ খলীফা হাকামের দরবারে হাযির হন। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ তখনো কর্ডোভায় অবস্থান করছিলেন এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, বার্সিলোনার অধিপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে, কাসতালার অধিপতিও বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খলীফা হাকাম ইয়ালা ইবন মুহাম্মাদকে বার্সিলোনার দিকে প্রেরণ করেন। গালিব এবং হুযায়েল ইব্‌ন হাশিমকে কাসতালা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। উভয় বাহিনী নিজ নিজ গন্তব্য অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং উভয় অঞ্চলেরই বিদ্রোহী খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়ে ফিরে আসেন।

খলীফা হাকামের শাসনামলের একেবারে সূচনাকালে যখন খ্রিস্টানরা ক্রমাগত পরাজয়বরণ করে তখন তাদের সাহস লোপ পায় এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের দিক দিয়ে খলীফা দ্বিতীয় হাকাম তাঁর পিতার চাইতে কোন অংশেই কম নন। ৩৫৪ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রি.) সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানদের মধ্যে পুনরায় বিদ্রোহী মনোভাব জেগে উঠলে ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ এবং কাসিম ইব্‌ন মুতরিফ তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শায়েস্তা করেন। ঐ বছর নর্মানরা স্পেন উপদ্বীপের পশ্চিত উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে বিশুনা (বিস্‌ন) নগরী পর্যুদস্ত করতে শুরু করে। খলীফা এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে নৌবাহিনী প্রধান আবদুর রহমান ইব্‌ন রিবাহিসকে নির্দেশ দেন– এই ডাকাতদের পালিয়ে যেতে দেবে না। তারপর তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে কর্ডোভা থেকে বিস্‌ন অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু খলীফা ও নৌবাহিনী প্রধান আবদুর রহমানের সেখানে পৌঁছার পূর্বেই সেখানকার অধিবাসীরাই জলস্থল উভয় দিক থেকে ঐ ডাকাতদের উপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। অতএব খলীফা সেখানে পৌঁছার পর না স্থলভাগে কোন সৈন্য দেখেন, আর না জলভাগে কোন নৌযান।

খ্রিস্টান রাজন্যবর্গের ভীতিগ্রস্ততা

শানজার (সাঞ্জার) চাচাত ভাই উর্দুনী, কাসতালার শাসক ফার্ডিনান্ডের জামাতা লিওনের শাসনকর্তা ছিলেন। যখন খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের বাহিনী শানজাকে লিওনের সিংহাসনে বসিযে দেয় তখন উর্দুনী তার শ্বশুর ফার্ডিনান্ডের কাছে চলে যান। এবার উর্দুনী জালীকিয়া থেকে বিশজন সঙ্গী নিয়ে খলীফা হাকামের দরবারে হাযির হয়ে সরাসরি ফরিয়াদ পেশ করার সংকল্প করেন। কিন্তু ৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫-৬৬ খ্রি) লিওনের রাজা উর্দুনী যখন সঙ্গী-সাথীসহ সালিম শহরে উপনীত হন তখন তাকে বাধা প্রদান করেন এবং বলেন ঃ তুমি কোনরূপ পূর্ব অনুমতি ছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কিভাবে প্রবেশ করলে? প্রাক্তন রাজা উর্দুনী বলেন, আমি হচ্ছি আমীরুল মু'মিনীনের একজন নগণ্য দাস। আমি আমার প্রভুর কাছে যাচ্ছি। তাই কারো অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করিনি। এতদ্‌সত্ত্বেও গালিব তাকে সেখানে আটকে রেখে দরবারে খিলাফতকে তার সম্পর্কে অবহিত করেন। দরবার থেকে উর্দুনীর জন্য অনুমতি আসল। উপরন্তু তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য দরবার থেকে একজন সর্দারকেও প্রেরণ করা হলো।

উর্দুনী ধীরে ধীরে কর্ডোভা শহরের সন্নিকটে এসে পৌঁছেন এবং শহরে প্রবেশ করে যখন খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের কবরের সামনে এসে দাঁড়ান তখন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনারত থাকেন। তারপর তিনি কবরকে সিজদা করে দরবার অভিমুখে রওয়ানা হন। খলীফা হাকাম উর্দুনীকে শুভ্র বস্ত্র (বনু উমাইয়া যাকে সম্মানের পোশাক বলে মনে করত) পরিধান করে দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেন। টলেডো নগরীর পৌরকর্তা আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসিম এবং কর্ডোভার খ্রিস্টান ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালীদ ইবন খীরূন উর্দুনীর সম্মানার্থে এবং তাকে প্রদর্শনের জন্য তার সাথেই ছিলেন। উর্দুনী যখন খলীফার দরবারে হাযির হন তখন খলীফার সামনে পৌঁছার পূর্বেই দরবারের চাকচিক্য ও জাঁকজমক দেখে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং মাথার টুপী খুলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকেন। সঙ্গীরা তাকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। যখন তিনি সিংহাসনের সামনে গিয়ে হাযির হন তখন একেবারে অলক্ষ্যেই সিজদাবনত হয়ে পড়েন। এভাবে সিজদা (কুর্নিশ) করতে করতে তিনি সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছেন, যে স্থানটি তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনি সেখানে তার জন্য নির্ধারিত আসনে উপবেশন করেন। এবার তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন খিরূনের ইঙ্গিতে বেশ কয়েক বার কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তখন এত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হয়নি। তার এই অবস্থা দেখে খলীফা হাকাম বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, যাতে উর্দুনীর সম্বিত ফিরে আসে। তারপর খলীফা বলেন, হে উর্দুনী! তুমি এখানে আসায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার দরবারের পক্ষ থেকে তোমার মনস্কামনা পূরণ করা হবে। উর্দুনী এই কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যে সিংহাসনের সামনে গিয়ে সিজদাবনত হন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করেন ঃ হে প্রভু! আমি আপনার একজন নগণ্য গোলাম। খলীফা বললেন, যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে তো পেশ কর, আমি তা মঞ্জুর করব। এ কথা শুনে উর্দুনী

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিংহাসনের সামনে সিজদাবনত থাকেন। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেন– আমার চাচাত ভাই সাঞ্জো ইতোপূর্বে প্রাক্তন খলীফার খিদমতে এমতাবস্থায় হাযির হয়েছিল যে, তার কোন বন্ধু-বান্ধব বা সাহায্যকারী ছিল না। এমন কি প্রজাসাধারণও তার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও মরহুম খলীফা তার সবিনয় প্রার্থনা শ্রবণ করে তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেন। আমি মরহুম খলীফার ঐ নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তের কোন বিরোধিতা না করে চুপচাপ দেশ ত্যাগ করি। অথচ প্রজাসাধারণ আমার উপর সন্তুষ্ট ছিল। আমি এবার আন্তরিক আশা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাযির হয়েছি। আমি আশা করি মহানুভব খলীফা আমার অধিকার ও যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে অনুগ্রহপূর্বক আমার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। খলীফা এ কথা শুনে বললেন ঃ আমি তোমার ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরেছি। যদি সাঞ্জোর মুকাবিলায় তোমার অধিকার বেশি হয় তাহলে অবশ্যই তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে। এ কথা শুনে উর্দুনী পুনরায় সিজদাবনত হয়ে পড়েন। খলীফা দরবারের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং উর্দুনীকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার অবস্থান স্থলে পৌঁছিয়ে দেন। উর্দুনীর অবস্থানস্থল হিসাবে প্রাসাদের পশ্চিম অংশের বালাখানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেখানে যাবার পথে তিনি একটি সিংহাসন দেখতে পান, যার উপর খলীফা কখনো কখনো উপবেশন করতেন। ঐ শূন্য সিংহাসনটি দেখে তিনি এমনভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়েন, যেন খলীফা সেটির উপর বসে আছেন। তারপর খলীফার প্রধানমন্ত্রী জা'ফর এসে খলীফার পক্ষ থেকে উর্দুনীকে একট অতি সুন্দর পোশাক জোড়া প্রদান করেন। এভাবে কিছুদিন মেহমানদারীর পর উর্দুনীকে বিদায় জ্ঞাপন করা হয়। কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে তার সাথে পাঠানো হয়, যাতে তারা উর্দুনীকে তার পিতৃরাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আসেন। তারপর সাঞ্জো এবং সামূরা ও জালীকিয়ার সামন্ত রাজারা খলীফার কাছে তাদের আনুগত্য পত্র এবং সেই সাথে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন পাঠান। বার্সিলোনা ও তারকূনার শাসকরাও খলীফার দরবারে মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠান ও কর প্রেরণ করে বশ্যতা স্বীকার করেন।

তারপর ফ্রান্স, ইতালী এবং ইউরোপের অন্যান্য খ্রিস্টান রাজা যারা ইতিপূর্বে খলীফা আবদুর রহমানের কাছে দূত ও উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, খলীফা হাকামের কাছেও প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে পিতার ন্যায় খলীফা হাকামেরও ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। পশ্চিম জালীকিয়ার খ্রিস্টান শাসক, যিনি ঐ সময়ে খুব প্রভাবশালী ছিলেন এবং যার নাম ছিল রডারিক, তার মাকে খলীফা হাকামের দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা রডারিকের মাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দরবারে অভ্যর্থনা জানান এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী তার পুত্রকে লিখিতভাবে রাজ-সনদ এবং শাসনক্ষমতা প্রদান করেন।

মরক্কোর শাসনকর্তার বিদ্রোহ

৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খ্রি.) মরক্কোর ইদরীসী শাসনকর্তা, যিনি কর্ডোভার খলীফার পক্ষ থেকে সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, বার্বারদের মধ্য থেকে বিরাট সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলীফা তখন সারকাতের শাসনকর্তা

ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়াকে মরক্কোর দিকে প্রেরণ করেন। স্পেনীয় বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে মরক্কোর শাসনকর্তা মুসিয়া উবাইদীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁর অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এদিকে আমীর জাওহার সেনাবাহিনী নিয়ে মরক্কোয় গিয়ে পৌঁছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ এতে নিহত হন। ফলে এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

এই সংবাদ শোনার পর কর্ডোভার দরবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। এবার খলীফা তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আমীর গালিবকে মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। গালিব সেখানে পৌঁছার পর জাওহার অবশ্য মিসরে চলে যান, তবে মরক্কোর শাসনকর্তা হাসান তার মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর বাধ্য করেন যে, তিনি (হাসান) বিনা শর্তে তার (গালিবের) কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এবার গালিব মরক্কোর শাসনকর্তাকে কর্ডোভার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। খলীফা হাসানের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন। একজন অতিথি হিসেবে কর্ডোভায় তার অবস্থানের ব্যবস্থা এবং তার জন্য দৈনিক ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। কিছুদিন পর তার ইচ্ছা অনুযায়ী হাসানকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গালিব এক বছর মরক্কোয় অবস্থান করে সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেন এবং ৩৬৩ হিজরীতে (৯৭৩ খ্রি) প্রচুর সংখ্যক বন্দীসহ মরক্কো থেকে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

অলীআহ্‌দী (ভাবী উত্তরাধিকারত্ব)

৩৬৫ হিজরীতে (৯৭৫ খ্রি) খলীফা হাকাম পুত্র হিশামকে তাঁর অলীআহ্‌দ তথা ভাবী উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং এজন্য আমীর-উমারা, মন্ত্রীবর্গ এবং সালতানাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বায়আত গ্রহণ করেন। অধিকৃত সমগ্র রাজ্যের উলামাবৃন্দের কাছ থেকে অলীআহ্‌দীর বায়আত গ্রহণ করা হয়।

মৃত্যু

ষোল বছর রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় খলীফা ৬৪ বছর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৬৬ হিজরীর ২রা সফর (সেপ্টেম্বর ৯৭৬ খ্রি) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে হিশামের বয়স ছিল ১১ বছরের কাছাকাছি। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমিরকে হিশামের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। পরদিন হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা

খলীফা দ্বিতীয় হাকাম স্পেনের প্রখ্যাত উলামাবৃন্দের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর খিলাফতকালে যদি প্রচুর সংখ্যক যুদ্ধাভিযানের সুযোগ থাকত তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি নিজেকে একজন শীর্ষস্থানীয় সমর-নায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারতেন। তাঁর আমলে যুদ্ধবিগ্রহ খুব কম হলেও যা হয়েছে তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোতে সাধারণভাবে স্পেনীয় বাহিনী বিজয়লাভ করেছিল।

এই খলীফা বেশির ভাগ সময় জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত করতেন। তাঁর মন্ত্রী জা'ফরও খলীফা হারূনুর রশীদের মন্ত্রী জা'ফর বারমাকীর চাইতে কম যোগ্য ছিলেন না। খলীফা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জা'ফরের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের জন্য জ্ঞানচর্চার সময় বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই খলীফার যুগে অহেতুক ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ একেবারেই লোপ পেয়েছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেকটি ধর্মের লোকেরা স্পেনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি খলীফা অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। ফলে সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকই খলীফার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল।

খলীফা হাকাম কুরআনের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে পালন করতেন এবং মুসলমানদেরকেও তা পালনে বাধ্য করতেন। ইতিপূর্বে স্পেনের সামরিক বাহিনীর মধ্যে মদ্যপান আসক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। খলীফা মদ তৈরি, বিক্রি এবং তা ব্যবহার করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে এই কলুষতা থেকে দেশকে মুক্ত করেন। খলীফার পক্ষ থেকে একটি বিরাট অংকের অর্থ প্রতিদিন দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো। দেশের বড় বড় শহরের এখানে সেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছোট ছোট জনপদ এবং পল্লীতেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্রদের বেশির ভাগ খরচাদি রাজকোষ থেকে নির্বাহ করা হতো। যে সব ছাত্র বাইরে থেকে আসত তারা ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফার সম্মানিত মেহমান হিসাবে গণ্য হতো, যতক্ষণ ব্যাপৃত থাকত শিক্ষার্জনে। খলীফা তাঁর ভাই মুনযিরকে শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন অফিসার নিয়োগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হাকামের বিদ্যানুরাগ

প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় খলীফা হাকামের পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন গ্রন্থপ্রেমিক। দামেশক, বাগদাদ, কনসটান্টিনোপল, কায়রো, কায়রোয়ান, কূফা, বসরা যেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল সেখানেই খলীফা দ্বিতীয় হাকামের নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োজিত থাকত। তাদের কাজ ছিল যেখানে ভাল বা দুষ্প্রাপ্য কোন গ্রন্থ পাবে সঙ্গে সঙ্গে তা খরিদ করে খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারা গ্রন্থকারদেরকে অনুপ্রাণিত করত, যেন তারা তাদের গ্রন্থের প্রথম কপিটি খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেন। তারা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবৃন্দকে কর্ডোভায় চলে আসার জন্য উৎসাহিত করত। কোন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি কর্ডোভায় চলে এলে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করা হতো এবং তার জন্য প্রচুর বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করা হতো। কোন নতুন গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেলে তা হস্তগত করতে যত বাধাবিপত্তিই আসুক, বা তার মূল্য যত বেশিই হোক, হাকামের লাইব্রেরীর জন্য সে গ্রন্থ অবশ্যই খরিদ করা হতো। প্রতিটি শহরে হাকামের লোকেরা শুধু এ জন্য মোতায়েন ছিল যাতে তারা নতুন নতুন গ্রন্থ নকল করে কর্ডোভায় পাঠাতে পারে। তখনকার বিশ্বের সমগ্র রাজা-বাদশাহর সাথে খলীফা হাকামের সুসম্পর্ক ছিল এবং তাদের সকলের লাইব্রেরীতেই খলীফা হাকামের পক্ষ থেকে একজন নকলনবীশ নিয়োজিত থাকত, যাতে তারা প্রতিটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নকল করে হাকামের কাছে পাঠাতে পারে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি শহরে একথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, কর্ডোভার খলীফা লেখক ও গ্রন্থকারদেরকে অত্যন্ত সম্মান করেন। এ কারণেই এমন অনেক গ্রন্থকার ছিলেন যাঁরা বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি শহরে অবস্থান করতেন, কিন্তু তাঁদের লেখা গ্রন্থাদি খলীফা হাকামের নামে উৎসর্গ করে তা কর্ডোভায় পাঠিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় হাকাম গ্রীক এবং ইবরানী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি আরবীতে অনুবাদ করার জন্য শত শত, এমনকি হাজার হাজার উলামা সমন্বয়ে একটি অনুবাদ বোর্ড গঠন করেছিলেন। স্পেন বিশেষ করে কর্ডোভার প্রতিটি লোকই গ্রন্থাদির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে প্রতিটি ঘরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ একটি গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল। শুধু কর্ডোভায়ই নয়, বরং স্পেনের প্রতিটি শহরেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি পাবলিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। যে কোন ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের আনুকূল্য বা অনুগ্রহপ্রার্থী হলে আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন একটি দুষ্প্রাপ্য ও উপকারী পুস্তক সংগ্রহ করে তা উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করার জন্য আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে এসে হাযির হতো।

হাকামের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী

খলীফা হাকামের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি শাহী প্রাসাদের চাইতে কম প্রশস্ত বা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তা ছিল সুন্দর মর্মর পাথরে তৈরি। মেঝেও ছিল মর্মর ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরে নকশা করা। তাতে ছিল সন্দুল, আবনূস এবং অন্যান্য মুল্যবান কাঠের তৈরি সারি সারি আলমারি। আলমারির ভিতরে কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি পুস্তকাদি রয়েছে তা আলমারির উপরিভাগে সোনালি অক্ষরে লেখা থাকত। ঐ গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বাঁধাইকারী এবং নকলনবীস সর্বক্ষণ কর্মরত থাকত। হাকামের লাইব্রেরীতে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ছয় লাখের কাছাকাছি।

গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা

যে তালিকায় শুধু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিপিবদ্ধ ছিল তা ছিল ৪৪ খণ্ডে বিভক্ত। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থ ছিল, যেগুলো অধ্যয়ন করার সুযোগ (ফুরসত) খলীফা হাকাম পাননি। এগুলো ছাড়া প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যে খলীফা নিজ হাতে টীকা লিখেছিলেন। এছাড়াও প্রতিটি গ্রন্থের প্রথম পাতায় খলীফা নিজ হাতে গ্রন্থের নাম এবং গ্রন্থকার ও তার বংশ পরিচয় লিখে রেখেছিলেন। খলীফা হাকামের স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সেই সাথে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ। তিনি অনায়াসে যে কোন ধরনের পদ্য বা গদ্য রচনা করতে পারতেন।

হাকামের রচনা

ইতিহাসের প্রতি খলীফা হাকামের অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। তিনি নিজেই স্পেনের একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে পড়ে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখনকার বিশ্বের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবৃন্দ চাই তারা যে কোন সম্প্রদায়ের, যে কোন ধর্মের বা যে কোন বিষয়ের হোন– দলে দলে কর্ডোভায় এসে জড় হয়েছিলেন। মোটকথা, খলীফা হাকামের যুগে কর্ডোভা সব রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অতুলনীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

'কিতাবুল আমালী'-এর গ্রন্থকার আবূ আলী কা-লী বাগদাদী তৃতীয় আবদুর রহমানের খিলাফত আমলে স্পেনে পদার্পণ করেন। সুলতান হাকাম এই প্রখ্যাত আলিমকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কাছছাড়া করতেন না। আবূ বকর আল-আরযাক, যিনি ছিলেন ঐ যুগের একজন বিখ্যাত আলিম এবং সালামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর অধঃস্তন পুরুষ। ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭০ খ্রি.) কর্ডোভায় এসে উপনীত হন এবং ৫৮ বছর বয়সে ৩৮৫ হিজরীর যিলকদ (ডিসেম্বর ৯৯৫ খ্রি) মাসে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং সমাধিস্থ হন। খলীফা হাকাম তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আলী, যিনি ইবন যামা-এর বংশের লোক ছিলেন— কায়রো থেকে স্পেনে আসেন এবং খলীফা হাকাম-এর উলামা মজলিসের অন্তর্ভুক্ত হন। সাকার আল বাগদাদী এবং ইব্ন আমর প্রমুখ বিখ্যাত কাতিব ছিলেন। খলীফা হাকাম তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। আবুল ফারাহ ইসফাহানী এবং আবূ বকর মালিকীর কাছে খলীফা উপহারস্বরূপ এক হাজার দীনার করে পাঠিয়েছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আযরী কর্ডোভার রাজ-দরবারের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন মুফার্রিজ ছিলেন ফিকাহ ও হাদীসের বিখ্যাত আলিম। ইব্ন মুগীছ আহমদ ইবন আবদুল মালিক, ইবন হিশাম আল-কাভী, ইউসুফ ইব্ন হারূন, আবুল ওয়ালীদ ইউনুস এবং আহমদ ইব্ন সাঈদ হামদানী ছিলেন স্পেনের বিখ্যাত কবি। খলীফা হাকামের নির্দেশে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ দুররানী মানচিত্র সহকারে আফ্রিকার ইতিহাস লিখেছিলেন। ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ, আবূ উমর আহমদ ইব্ন ফারাজ এবং ইয়াঈশ ইব্ন সাঈদ ছিলেন খলীফা হাকামের যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। এরা সকলেই কর্ডোভা রাজ দরবারের শোভা বর্ধন করেছিলেন।

জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্ত

খলীফা হাকাম জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রতি যে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একদা আবূ ইবরাহীম নামীয় একজন ফকীহ্ মসজিদে আবূ উসমানে ওয়ায করছিলেন। এমন সময় শাহী দূত (দণ্ডধারী) এসে তাঁকে বললো, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে এখনই ডেকেছেন এবং তিনি আপনার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। আবূ ইবরাহীম উত্তর দেন, তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে গিয়ে বল, আমি এখন আল্লাহ্র কাজে ব্যস্ত আছি। যতক্ষণ না এই কাজ থেকে অবসর নেব ততক্ষণ আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। রাজদূত এই উত্তর শুনে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করে এবং খলীফার কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ইবরাহীমের এই উক্তি সম্পর্কে অবহিত করে। খলীফা হাকাম তা শুনে দূতকে বলেন, তুমি ইবরাহীমকে গিয়ে বল, আমি এ কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আপনি আল্লাহ্র কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। যখন এই কাজ থেকে অবসর নেবেন তখনি আসবেন। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত দরবারে আপনার অপেক্ষায় থাকব। দূত আবূ ইবরাহীমের কাছে এসে খলীফার পয়গাম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এবার আবূ ইবরাহীম বললেন, তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে গিয়ে বল, বার্ধক্যের কারণে না আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি, আর না হাঁটতে পারি।

রাজপ্রাসাদের বাবুস সাদ্দাহ এখান থেকে বেশ দূরে এবং বাবুস্ সানআ অপেক্ষাকৃত নিকটে। যদি আমিরুল মু'মিনীন বাবুস্ সান্আ খুলে দেওয়ার অনুমতি দেন তাহলে আমি সহজেই এই দরজা দিয়ে দরবারে হাযির হতে পারি। রাজপ্রাসাদের বাবুস সান্আ সব সময় বন্ধ থাকত এবং শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তা খোলার অনুমতি দেওয়া হতো। যা হোক আবূ ইবরাহীম পুনরায় বক্তৃতায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। দূত এই বার্তাটি খলীফার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে খলীফার নির্দেশে পুনরায় মসজিদে এসে বসে পড়ে। যখন ইবরাহীম তাঁর ওয়ায শেষ করেন তখন দূত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁকে বলেন ঃ হুযূর, সান্আ আপনার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং আমীরুল মু'মিনীন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আবূ ইবরাহীম যখন বাবুস আনআয় পৌঁছেন তখন দেখতে পান যে, সেখানে আমীর-উমারা এবং মন্ত্রীবর্গ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। যাহোক তিনি দরবারে যান এবং খলীফার সাথে কথাবার্তা বলে ঐ দরজা দিয়েই সসম্মানে বেরিয়ে আসেন।

হাকামের খিলাফত আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

দ্বিতীয় হাকামকে অত্যন্ত নির্দ্বিধায় স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা বলা যেতে পারে। কেননা তাঁর যুগে সালতানাতের পরাক্রম, দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জাঁকজমক, ঐশ্বর্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি চরম উন্নতি লাভ করে। আর সবচেয়ে বেশি উন্নতি পরিলক্ষিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এটি এমন একটি কৃতিত্ব, যা অর্জন করা হারূন, মামূন ও মানসূরের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। একজন প্রতাপশালী সুলতান ও জ্ঞানানুসারী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে খলীফা হাকাম ছিলেন সবার শীর্ষে। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। আর তা হলো, এই অনন্য জ্ঞানী-গুণী সুলতানও পিতৃস্নেহের কাছে চরমভাবে হার মেনেছিলেন। তিনি তাঁর সেই ছেলেকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন যার বয়স ছিল তার (খলীফার) মৃত্যুকালে মাত্র এগার বছর। খিলাফত ও সালতানাতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের অভিশাপ থেকে তাঁর মত জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করাটা ছিল অতীব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তিনি এ ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন এবং মামূনুর রশীদ আব্বাসীর কাছে আর কোন ক্ষেত্রে না হলেও এক্ষেত্রে তাঁকে চরম পরাজয় বরণ করতে হয়। কেননা সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে মামূন তাঁর বংশধরদের পরওয়া করেন নি। তিনি নির্দ্বিধায় একজন আলাভীকেই আপন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন। কিন্তু যখন ঐ উত্তরাধিকারী মামূনের জীবিতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন একমাত্র তখনই মামূনের ভাই মুতাসিম পরবর্তী খলীফা মনোনীত হবার সুযোগ পান।

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের ভাই মুগীরা হুকুমত পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হাকাম অত্যন্ত ন্যায্যভাবে তাঁকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি মুগীরাকে বঞ্চিত করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকেই অলীআহ্দ নিয়োগ করেন। আর প্রধানত একারণেই স্পেনের আকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা– শুরু হয় উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের যুগ।

দ্বিতীয় হিশাম ইব্‌ন হাকাম দ্বিতীয় এবং মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির

৩৬৬ হিজরীতে (৯৭৬ খ্রি) যখন খলীফা দ্বিতীয় হাকাম মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হিশাম এগার বছর বয়সে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

১. হাজিবুস্ সুলতানাত প্রধানমন্ত্রী জা'ফর ইব্‌ন উসমান মুসহাফী। তিনি হাকামের শাসনামল থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে একজন জ্ঞানী, জ্ঞানানুরাগী এবং অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে করা হতো।

২. সম্রাজ্ঞী সুবাহ্ ছিলেন দ্বিতীয় হাকামের সহধর্মিণী এবং হিশাম ইব্‌ন হাকামের মা। খলীফা দ্বিতীয় হাকামের শাসনামলেও তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। খলীফা হাকামও তাঁর মন যুগিয়ে চলতেন। এর একটি কারণ এই ছিল যে, এই রমণী ছিলেন অলীআহ্‌দের মা। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মহিলা

৩. স্পেন সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি গালিব। ইনি ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় হাকামের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। তাছাড়া সেনাবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়।

৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমীর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক মুআফিরী– তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ আবদুল মালিক মুআফিরী প্রথম স্পেন বিজয়ী তারিক ইবন যিয়াদের সাথে স্পেনে পদার্পণ করেছিলেন।

৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির ছিলেন হিশাম ইব্‌ন হাকামের গৃহশিক্ষক (প্রশিক্ষক)। সম্রাজ্ঞী সুবাহ্‌ও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। খাজাসারা (অন্দর মহলের কর্মাধ্যক্ষ) ফায়িক। ইনি রাজপ্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অধ্যক্ষ এবং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন।

৬. খাজাসারা জুযার। ইনি ছিলেন কর্ডোভা নগরীর বাজারসমূহের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বা পুলিশ প্রধান। শেষোক্ত দু'জন খাজাসারা এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, বড় বড় আমীররাও তাদেরকে ভয় করতেন এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে সদাসচেষ্ট থাকেন।

সালতানাতের অধিকারী সদস্যবর্গের পরামর্শ

খলীফা দ্বিতীয় হাকাম যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ফায়িক এবং জাওয়ার ছাড়া অন্য কেউ রাজধানীতে ছিলেন না। খলীফার মৃত্যুর পর পরস্পর সলাপরামর্শ করে তারা উভয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেন যে, শাহযাদা হিশামকে সিংহাসনে বসালে ইসলামী রাষ্ট্রে সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে। অতএব খলীফা হাকামের ভাই মুগীরাকেই সিংহাসনে বসানো উচিত। কেননা খিলাফতের দায়িত্ব বহন করার মত যোগ্যতা তার রয়েছে। জাওযারের অভিমত ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী জা'ফর মাসহাফীকে সর্বপ্রথম হত্যা করা উচিত, যাতে মুগীরার সিংহাসনে

আরোহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ফায়িক বললেন, আমার মনে হয়, প্রথম প্রধানমন্ত্রী মাসহাফীর সামনে প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাকে আমাদের স্বপক্ষে নিয়ে আসা উচিত। কেননা তিনি যে আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন তার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে। আর তিনি যদি একান্তই আমাদের পক্ষ সমর্থন না করেন তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। যা হোক, মন্ত্রী জা'ফরকে তলব করা হয়। তিনি যখন আসেন তখন তার কাছে খলীফার মৃত্যু সংবাদ এবং সেই সাথে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথাও ব্যক্ত করা হয়। মন্ত্রী পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, আমি আপনাদের উভয়ের মতানুযায়ী কাজ করব। তবে সালতানাতের অন্য সদস্যদের সাথেও এ ব্যাপারে পরামর্শ করা উচিত। এভাবে জা'ফর তাদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নিজের ঘরে পৌঁছেই সুলতানের অধিকার সদস্যবর্গকে একত্র করে তাদেরকে খলীফার মৃত্যু এবং ফায়িক ও জাওয়ারের অভিমত সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, আমার অভিমত এই যে, সম্ভাব্য ফিতনা প্রতিরোধের জন্য এই মুহূর্তেই মুগীরা এবং হাকামকে হত্যা করা উচিত। উপস্থিত সকলেই তার এ অভিমত পছন্দ করেন, কিন্তু এ নিরপরাধ লোকগুলোকে হত্যা করার সাহস পান নি। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির বলেন, আমিই ঐ কাজ সম্পাদন করবো। যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির মুগীরার ঘরে গিয়ে পৌঁছেন তখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। আপন ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তখন পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছেনি। ঘুম থেকে জেগে যখন তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের কাছ থেকে এই দুঃসংবাদ পান তখন অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপন ভাতিজা হিশামের আনুগত্য স্বীকার এবং তার হাতে বায়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং মুগীরাকে একেবারে নিরীহ ও নির্দোষ লক্ষ্য করে জা'ফর মাসহাফীর কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠান যে, মুগীরা হিশামের আনুগত্য স্বীকারে সদা প্রস্তুত এবং অবাধ্যতার কোন ইচ্ছা তার নেই। এমতাবস্থায় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুগীরাকে বন্দীশালায় আটকে রাখাই যথেষ্ট। তাকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মন্ত্রী জা'ফর সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম পাঠান– তুমি যদি এই কাজ করতে না পার তাহলে আমি এমন কাউকে পাঠাচ্ছি, যে নির্দ্বিধায় এ কাজ সমাধা করতে পারে। এই পয়গাম প্রাপ্তির সাথে সাথে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির নির্দোষ মুগীরাকে হত্যা করে ফেলেন এবং যে কক্ষে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তা প্রাচীর বেষ্টিত করে ফেলা হয়।

সিংহাসনে আরোহণ

তারপর খলীফা হিশামের সিংহাসন-আরোহণ উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। ফায়িক ও জাওযারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারপর তারা অল্পবয়স্ক খলীফার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান এবং বিনা অপরাধে মুগীরাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেদিকেও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে মানুষের মধ্যে এক সাংঘাতিক ধরনের অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয় এবং কিছুদিন পরই রাজধানী কর্ডোভায় সংবাদ পৌঁছে যে, উত্তর সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান করদ রাজ্যের অধিপতিরা মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে লুটপাট

শুরু করে দিয়েছে এবং অল্পবয়স্ক একজন খলীফা সিংহাসনে আরোহণ করায় তারা অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী জা'ফর যোগ্যতার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারেন নি বরং অন্তর্বিরোধ ও আত্মকলহের কারণে তিনি কিছুটা দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

একজন উপদেষ্টা হিসাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির

শেষ পর্যন্ত রাণী সুবাহের নির্দেশে ও ইঙ্গিতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমিরকে মন্ত্রী জা'ফরের কাজ-কর্মে তার সহযোগী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির জা'ফরের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে নিজেই রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্মের হর্তাকর্তায় পরিণত হন। তারপর স্পেনের মুসলিম রাষ্ট্রের যে অবস্থাদি বর্ণনা করা হবে তা প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন আবী আমিরেরই কর্মতৎপরতার প্রতিচ্ছবি। তাই এই বর্ণনায় হিশামের সাথে ইব্‌ন আমিরের নামও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের জীবন-বৃত্তান্ত

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির স্পেনের তারকশ নামক স্থানে ৩৫৭ হিজরীতে (৯৬৮ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর বংশের লোকেরা বসবাস করলেও তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আবদুল মালিক মুআফিরী ছিলেন একজন ইয়ামানী। তিনি ছিলেন একজন পেশাদার সিপাহী। অবশ্য পরবর্তীকালে তার বংশধরদের মধ্যে বহুল পরিমাণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। ফলে সিহাপীগিরির দিকে তাদের খুব একটা আকর্ষণ থাকেনি। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই তাঁর পিতা হজ্জ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চিম ত্রিপোলী অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির অতি অল্প বয়সে কর্ডোভায় এসে তখনকার সরকারী মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করতে থাকেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে শাহী দরবার সংলগ্ন একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে বসে দরখাস্ত লেখার পেশা গ্রহণ করেন। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের চিঠিপত্র এবং কোর্ট-কাছারিতে পেশ করা হবে এমন সব দরখাস্ত লিখে দিতেন। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র পেশা। ঘটনাচক্রে সুবাহের অর্থাৎ হিশামের মাতার এমন একজন লেখকের (কেরানী) প্রয়োজন পড়ে, যে তার বিষয়-সম্পত্তির হিসাব রাখবে। শাহী মহলের কোন একজন ভৃত্য সে পদের জন্য মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের ব্যাপারে রাণীর কাছে সুপারিশ করে। ফলে তিনি রাণীর ওখানে লেখক হিসাবে নিযুক্ত হন। আপন কর্মদক্ষতার খ্যাতি এবং রাণীর সুপারিশের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি লাভ করে ইব্‌ন আমির সেভিলে কর আদায় বিভাগের অফিসার নিযুক্ত হন। এই পদে চাকরিকালে যেহেতু তাঁকে কর্ডোভার বাইরে অবস্থান করতে হতো তাই তিনি রাণী সুবাহের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করে তাকে এই মর্মে সম্মত করতে সক্ষম হন যে, তিনি খলীফা হাকামের কাছে সুপারিশ করে তাকে (ইব্‌ন আমিরকে) কর্ডোভায় ঐ ধরনেরই কোন পদ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। শেষ পর্যন্ত তাকে টাকশাল বিভাগের কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমির সবিশেষ

যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি রাণী সুবাহকেও মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখেন। তিনি মন্ত্রী মাসহাফী এবং অন্যান্য সভাসদকেও নিজের বন্ধু ও কল্যাণকামীতে পরিণত করেন। এভাবে তিনি নিজেকে রাতারাতি এতই বিশ্বস্ত করে তুলেন যে, খলীফা হাকাম মৃত্যুর পূর্বে তাঁকেই শাহযাদা হিশামের আতালীক (গৃহশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগ করে যান।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমিরের কৃতিত্ব

খলীফা হাকামের মৃত্যু এবং মুগীরার নিহত হওয়ার পর যখনই হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন সাম্রাজ্যের যাবতীয় কর্তৃত্ব মন্ত্রী জা'ফর মাসহাফীর হাতে চলে আসে। সেনাপতি গালিবকে বাহ্যত মন্ত্রী জা'ফরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হতো। রাণী সুবাহ রাজকীয় কাজকর্মে পূর্বের চাইতেও অধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তাকে সবাই সমীহ করত এবং তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমিরের প্রতি অধিকতর উদার ও দয়াশীল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির মন্ত্রী জা'ফর এবং সেনাপতি গালিবকে পরামর্শ দিয়ে সর্ব প্রথম প্রাসাদ কর্মচারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করেন। ফায়িককে মেওর্কায় নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানে সে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। জাওযারকে তার পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয় এবং তার সঙ্গী-সমর্থকদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় উত্তর সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানদের মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ ও খলীফাকে করদানে অস্বীকৃতির খবর আসতে থাকে। মন্ত্রী জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমিরকে খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির উত্তর সীমান্তে পৌঁছে খ্রিস্টানদের পরাজিত ও পর্দুদস্ত করে বিজয়ী বেশে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। এই সমস্ত বিজয়ের সংবাদ প্রথমই কর্ডোভায় এসে পৌঁছেছিল। ফলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমিরের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদাও অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছিল। কর্ডোভাবাসীরা তাকে জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জানায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই শাহী দরবারে তাঁর অধিকার ও কর্তৃত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এবার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির গালিবকে স্বমতে টেনে এনে মাসহাফীকে মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত এবং নানাভাবে অপদস্থ করেন। এমন কি তাকে বন্দী করে ফেলেন এবং এই অবস্থায়ই মাসহাফীর দুঃখজনক মৃত্যু ঘটে।

যেহেতু গালিব স্পেনের সমগ্র সেনাবাহিনীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তাই তার উপর হস্তক্ষেপ করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আমির সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি শুরু করেন এবং যাদেরকে ভর্তি করেন তারা ছিল উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী খ্রিস্টান এবং মরক্কো ও পশ্চিম ত্রিপোলীর বার্বার। ইব্‌ন আবী আমির এখন একক প্রধানমন্ত্রী। তিনি গালিবের প্রতি এবার সীমাহীন ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকেন। গালিবের দিক থেকে তার আশংকার কোন কারণ বাকি ছিল না। যেহেতু তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখতেন এবং নিজের মর্জিমত স্পেন শাসন করতে পারছিলেন না, তাই অত্যন্ত কৌশলের সাথে পুরাতন সেনাবাহিনীর একটি অংশকে বাতিল করে দেন এবং বাকি সবাই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক পদে নিয়োগ করে সেনাবাহিনীর জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে

চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অপর দিকে তিনি নতুনভাবে ভর্তিকৃত বাহিনীকে অত্যন্ত সুসংগঠিত করে তোলেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে গালিবের শক্তিকে দুর্বল করে দেন। তারপর এক সময়ে গালিবকেও তিনি অত্যন্ত সহজে তাঁর পথ থেকে হটিয়ে দেন। সাম্রাজ্যের কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি দেখা দেয়নি। একদা গালিব ও ইব্‌ন আমিরের মধ্যে কোন একটি বিষয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় এবং অবস্থা শেষ পর্যন্ত তরবারি যুদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে ইব্‌ন আবী আমির কিছুটা আহত হন এবং গালিব কর্ডোভা থেকে পালিয়ে খ্রিস্টান সম্রাট লিউনের কাছে চলে যান। এভাবে এক এক করে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পর্যুদস্ত করে ইব্‌ন আবী আমির শেষ পর্যন্ত রাণী সুবাহের যাবতীয় ক্ষমতাও খর্ব করে ফেলেন এবং দ্বিতীয় হিশামকে শাহী প্রাসাদের অভ্যন্তরে আপন নিয়োগকৃত ভৃত্যদের মধ্যে বলতে গেলে, নজর বন্দী করে ফেলেন।

হিশাম শাহী প্রাসাদ থেকে বের হতে পারতেন না। মহলের অভ্যন্তরেই তার জন্য যাবতীয় খেলাধুলা ও আরাম সামগ্রীর যোগান দেওয়া হতো এবং এই নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ইব্‌ন আমিরের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি হিশামের সাথে সাক্ষাত করতে পারত না। ইব্‌ন আমির সব দিক থেকে স্বস্তি লাভের পর সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং অতি সত্বরই একটি সুসংগঠিত বীরত্বপূর্ণ বাহিনীর অধিকারী হন। তারপর তিনি আপন বাহিনীর মধ্যে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

তারপর ইব্‌ন আবূ আমির খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান রাজ্যকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বাকি খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। ফলে তার নাম শোনামাত্র খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। এরই ফলশ্রুতিতে স্বয়ং খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ এবং গোত্রপতিরা ইবন আমিরের বাহিনীতে শরীক হয়ে অনেক খ্রিস্টান রাজাকে পর্যুদস্ত করছে— এমনকি, স্বয়ং খ্রিস্টানরা মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গির্জা ধ্বংস করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ইব্‌ন আবূ আমির খ্রিস্টানদেরকে তাদের উপাসনালয় ধ্বংস কিংবা সেগুলোর অমর্যাদা করা থেকে বিরত রাখেন। তারপর তিনি আফ্রিকার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেদিকেও স্পেন সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। মোটকথা, তিনি তাঁর যুগে মোট ৫৬টি যুদ্ধ করেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয়লাভ করেন। তিনি তার শাসনামলের শেষ দিকে নিজের জন্য 'মানসূর' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু শুধু 'মানসূর' নয় বরং মহান 'মানসূর' (মানসূরে আযম) উপাধিতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মৃত্যু

ইব্‌ন আবূ আমির মোট ২৭ বছর শাসন পরিচালনার পর কাস্তালার সর্বশেষ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনা-ই-সালিম তথা মিডনিয়াসিলিতে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির মানসূরের শাসনকাল সম্বন্ধে পর্যালোচনা

মানসূরে আযমের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন খিলাফতে বাগদাদের দায়লামী, সালজুকী প্রমুখ সুলতান তাদের সময়ে আব্বাসীয় খলীফার নামেমাত্র খলীফা ছিলেন। শাসনক্ষমতা ছিল প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত সুলতানেরই হাতে। অনুরূপভাবে মানসূরের আযম নিজেকে 'হাজিব' তথা মুখ্য সচিব উপাধিতে আখ্যায়িত করলেও স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল। তিনি কর্ডোভা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে 'মদীনা-ই-যাহির' নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা ছিল একটি দুর্গেরই অনুরূপ। ঐ প্রাসাদে তিনি তাঁর যাবতীয় দফতর ও মাল-ভাণ্ডার স্থানান্তরিত করে নিয়েছিলেন। জুমুআর খুতবায় হিশামের সাথে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আমিরের নামও উল্লেখ করা হতো। মুদ্রায়ও তাঁর নাম অংকিত হতো। সরকারী কর্মকর্তারা তাঁকে সেরূপ সম্মান ও মর্যাদা দিত, যেরূপ সম্মান ও মর্যাদা দিত স্পেনের উমাইয়া খলীফাদেরকে।

ইব্‌ন আবূ আমির অর্থাৎ মানসূরে আযমের অস্তিত্ব ছিল স্পেন এবং স্পেনের ইসলামী সালতানাতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি লিওন এবং তার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে সরাসরি ইসলামী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করেন। বার্সিলোনা, কাসতালা এবং নওয়ার রাজ্যকে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। একদা কোন একটি প্রয়োজনে মানসূরে আযমের একজন দূত রাজা গার্সিয়ার লাশকাম্বিস রাজ্যে গিয়েছিল। গার্সিয়া তাকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং রাজ্যব্যাপী তার পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। ঐ পরিভ্রমণকালে দূত জানতে পারে যে, কোন একটি গির্জায় একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঐ গির্জার পুরোহিতরা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। দূত কর্ডোভায় ফিরে এসে গার্সিয়ার রাজ্যের অবস্থাদি এবং সেই সাথে সেখানে বন্দী ঐ মহিলার কথা বর্ণনা করে। মানসূরে আযম সঙ্গে সঙ্গে লাশকাম্বিস আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন তিনি লাশকাম্বিসের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন গার্সিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে তার খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন ঃ আমি তো আপনার বা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন অশিষ্ট আচরণ করি নি। মানসূর বলেন, তুমি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, তোমার দেশে কোন মুসলমানকে বন্দী করে রাখবে না। এতদসত্ত্বেও অমুক গির্জায় একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। গার্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুসলিম মহিলাকে মানসূরের কাছে হস্তান্তর করে ঐ গির্জাটি ধ্বংস করে ফেলেন।

৩৭৮ হিজরীর ২৪শে জমাদিউস সানী (অক্টোবর ৯৮৮ খ্রি) মানসূর কর্ডোভা থেকে কুরিয়া নগরীর উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তা পদানত করে জালীকিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। খ্রিস্টান নেতৃস্থানীয় লোকেরা সেখানে এসে মানসূরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে এবং ঐ অভিযানে তাঁর সাথে যোগ দেয়। তাদের সকলকে নিয়ে মানসূরে আযম সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত সমগ্র এলাকার বিদ্রোহী লোকদেরকে শাস্তি প্রদান করেন এবং সেখানকার যে সমস্ত গির্জা ষড়যন্ত্রের আবাসে পরিণত হয়েছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে আটলান্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহও জয় করেন এবং যে সমস্ত পলাতক বিদ্রোহী সেগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল

তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তিনি ফ্রান্সের উপকূলবর্তী শহরসমূহও জয় করেন এবং সেখানকার যে সমস্ত দুর্গকে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হয়েছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। এটা ছিল মানসূরের ৪৮তম অভিযান।

মানসূরে আযম জ্ঞানী-গুণীদের মর্যাদা দিতেন

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের মত মানসূরে আযম জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করতেন। তিনি নিজেও ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও যারা ছাত্রজীবনে তাঁর সতীর্থ ছিলেন তাদের কেউ কেউ তাঁর এই বিরাট সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যক্ষ করে ঈর্ষার আগুনে একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল। তারা সুযোগ বুঝে মানসূরের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, দর্শনশাস্ত্র এবং নাস্তিকতার প্রতি তাঁর ঝোঁক রয়েছে। মানসূর সঙ্গে সঙ্গে এই গুজব রটনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তিনি উলামার একটি বিরাট বৈঠক আহ্বান করে এই গুজব যে একেবারে অমূলক ও ভিত্তিহীন তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মানসূর অনেকগুলো সেতু নির্মাণ করেন এবং কর্ডোভা জামে মসজিদের আয়তনও বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য পূর্বের চাইতে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি এমন সব অঞ্চলেও সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন, যেখানে ইতিপূর্বে মুসলমানরা কখনো পৌঁছতে পারেনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানসূরের শাসনকাল ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক জাঁকজমকপূর্ণ। মানসূরে আযমের নাম শুনলে খ্রিস্টান রাজাগণ একেবারে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ত। কোন উমাইয়া খলীফাকেও তারা এরূপ ভয় করত না। মানসূর অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতি করে স্পেন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি বিশ্বের দুঃসাহসী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রথম সারিতে আপন স্থান দখল করে নিয়েছেন। ৩৯৪ হিজরীতে (নভেম্বর ১০০৩-অক্টোবর ১০০৪ খ্রি) যখন তার মৃত্যু হয় তখন দ্বিতীয় হিশামের অযোগ্যতার কারণে যদিও খিলাফতে বনূ উমাইয়া তার পতনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, এতদসত্ত্বেও সেখানকার ইসলামী মর্যাদা ও পরাক্রম ছিল তখনো উন্নতির একেবারে শীর্ষ পর্যায়ে।

মানসূরে আযমের মৃত্যু সংবাদ যখন কর্ডোভায় পৌঁছল তখন বনূ উমাইয়া খিলাফতের সভাসদরা এই ভেবে সন্তুষ্ট হলো যে, এবার দাবাড়ু দ্বিতীয় হিশামের চোখে ধূলা দিয়ে তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই দেশ চালাতে সক্ষম হবে। যা হোক, হিশাম মানসূরের মৃত্যু সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী মন্ত্রী কে হবে তখন সে সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেন নি। যখন মানসূরে আযমের পুত্র আবদুল মালিক আপন পিতাকে সালিম শহরে দাফন করার পর কর্ডোভায় ফিরে আসেন তখন দ্বিতীয় হিশাম তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে আপন মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এখন থেকে মানসূরের মতই আবদুল মালিকও স্পেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র প্রশাসকে পরিণত হন। খলীফা হিশাম তাকে 'সায়ফুদ্দৌলা' ও 'মুযাফফর' উপাধি প্রদান করেন। মুযাফফর তার পিতার নীতি অবলম্বনে ছয় বছর দেশ শাসন করে ৩৯৯ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১০০৮-আগস্ট ১০০৯ খ্রি) ইনতিকাল করেন। মুযাফফর তাঁর শাসনামলে মোট আট বার খ্রিস্টান দেশসমূহের উপর সামরিক অভিযান

পরিচালনা করেন এবং প্রতিবারই বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। তাঁর শাসনামলেও দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তার পিতা মানসূর হুকুমতে ইসলামিয়া সম্পর্কে যে ভাবমূর্তির সৃষ্টি করেছিলেন তাতে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দেয়নি।

মুযাফ্ফরের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইব্ন মানসূর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। আবদুর রহমান 'নাসির' উপাধি গ্রহণ করেন। যদিও নাসিরের ভাই মুযাফ্ফর এবং তার পিতা মানসূর স্পেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি 'হাজিবুস সালতানাত' বা প্রধানমন্ত্রী বলেই নিজের পরিচয় প্রদান করতেন। কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, সুলতানী দরবারের সভাসদবৃন্দ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও প্রশাসকবৃন্দ সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তার পিতার প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতির প্রতি অনুগত তখন তিনি নির্ভয়ে নিজেকে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত করেন এবং খলীফা হিশামের প্রতি যথার্থ সম্মান, এমনকি বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নির্লিপ্ততার পরিচয় দিতে থাকেন।

তারপর নাসির তাকে 'অলীআহ্দ' নিয়োগ করার জন্য হিশামের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। যার ফলে হিশাম বাধ্য হয়ে একটি পত্র লিখে তাতে স্বাক্ষর করেন এবং সাম্রাজ্যের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট তার অনুলিপি পাঠিয়ে দেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ আমার পর আবদুর রহমান নাসিরকে যেন খলীফা মনোনীত করা হয় এবং এখন থেকে প্রত্যেকটি লোক যেন তাকে খিলাফতের 'অলীআহ্দ' (ভাবী উত্তরাধিকারী) জ্ঞান করে। ঐ পত্রে নাসিরের উচ্চবংশ মর্যাদা এবং যোগ্যতার প্রভূত প্রশংসা করা হয়। খলীফার এই ফরমান তথা অলীআহ্দীর সনদে খিলাফতে এই ফরমান তথা অলীআহ্দীর সনদে খিলাফতের সম্ভাব্য সকল দাবিকারীর সম্মতি ও সত্যায়ন স্বাক্ষর নেওয়া হয়। তারপর কর্ডোভার জামে মসজিদে তা ঘোষণা করা হয়। নাসির তার এই সাফল্যের জন্য যারপর নাই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু পরিণামে এই অলীআহ্দীর সনদই তার ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়।

হিশামের পদচ্যুতি

নাসির তার শাসনামলের প্রথম বছরেই আপন ভাই এবং পিতার রীতি অনুযায়ী খ্রিস্টানদের পদানত করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হন। কর্ডোভার কুরায়শী এবং উমাইয়ারা এই দেখে যারপর নাই মর্মাহত হয় যে, স্পেনের হুকুমত ও খিলাফত বনূ উমাইয়ার দখল থেকে আর একটি খান্দানের দখলে চলে যাচ্ছে। অতএব তারা তাদের খান্দানের খিলাফতের পক্ষে গোপনীয়ভাবে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। এবার যখন নাসির সেনাবাহিনীসহ উত্তর সীমান্তের দিকে চলে যান তখন কর্ডোভাবাসীরা কর্ডোভায় অবস্থানকারী অবশিষ্ট সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত অফিসারকে হত্যা করে ফেলে, যারা নাসিরের সমর্থক ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তারপর তারা দ্বিতীয় হিশামকে পদচ্যুত করে তার স্থলে তৃতীয় আবদুর রহমানের দৌহিত্র মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ইবন আবদুল জব্বার ইব্ন খলীফা আবদুর রহমানকে 'মাহ্দী বিল্লাহ্' উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। নাসির আবদুর রহমান এই সংবাদ শুনে অবিলম্বে কর্ডোভার দিকে রওয়ানা হন। যখন তিনি

কর্ডোভার নিকটবর্তী হন তখন তার বাহিনীর বেশির ভাগ অফিসার এবং বার্বার সৈন্যরা খলীফা মাহ্দীর কাছে গিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করে। নাসির যখন তার সামান্য কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তখন তারই জনৈক সাথী তাকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক খলীফা মাহ্দীর দরবারে নিয়ে আসে। এখানেই বনী আমিরের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সেই সাথে স্পেনে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রেরও সূত্রপাত হয়।

মাহ্দী ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল জাব্বার

হিশাম যখন জানতে পারেন যে, জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে চলে গেছে তখন তিনি কোনরূপ ইতস্তত না করে লিখিতভাবে খলীফা পদে ইস্তফা দেন। মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ওরফে মাহ্দী বিল্লাহ তাকে রাজপ্রাসাদের একটি অংশে নজরবন্দী করে রাখেন। তারপর আপন এক চাচাত ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন মুগীরাকে হাজিব এবং অপর চাচাত ভাই উমাইয়া ইব্ন আলহাফকে কর্ডোভার পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। তারপর মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম মানসূরে আযমের শহর ও যাহ্রা প্রাসাদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। সেখানকার অধিবাসীরা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই শহরের সিংহদ্বার খুলে দেয়। তারপর খলীফা মাহ্দীর সমগ্র বাহিনী সেখানকার ধন-সম্পদ লুট করে এবং যাবতীয় প্রাসাদ ও দালান-কোঠা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ৩৯৯, ৪০০ হিজরী (১০০৮, ১০০৯ খ্রি) এই ঘটনা ঘটে। তারপর নাসির হত্যা এবং ইব্ন আমির বংশের শাসনক্ষমতা হারানোর ঘটনা ঘটে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের ইসলামী হুকুমতের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং সেখানে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

সেনাবাহিনীর ক্ষমতা

খলীফা দ্বিতীয় হিশামের পদচ্যুতি, খলীফা মাহ্দীর সিংহাসন লাভ এবং সুলতান নাসিরের বিরুদ্ধে কুরায়শ ও উমাইয়াদের রাতারাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে বার্বার সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খলীফা মাহ্দীর হুকুমত ও খিলাফতে বার্বার সৈন্যদের দাপট অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সত্যি কথা বলতে গেলে, খিলাফতের লাগাম সামরিক বাহিনীর হাতেই চলে যায়। তারা প্রজাসাধারণের উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে। শেষ পর্যন্ত প্রজারা বাধ্য হয়ে খলীফা মাহ্দীর কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু মাহ্দী তাদের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করেননি এই ভেবে যে, এই মুহূর্তে বার্বারদের অসন্তুষ্ট করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এর ফলে যে সব কর্ডোভাবাসী মাহ্দীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তার এ যন্ত্রণাদায়ক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত বার্বারদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে শহরবাসীরা বেশ কয়েকজন বার্বারকে হত্যা করে ফেলে। তখন খলীফা মাহ্দী ঐ হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। এভাবে দিনের পর দিন জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

খলীফা মাহ্‌দীও ক্রমে ক্রমে বার্বারদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সামরিক বাহিনীর এই ক্ষমতাকে সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে কিভাবে তা হ্রাস করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ঘটনাচক্রে সেনাবাহিনীর লোকেরা তথা বার্বাররা একথা বুঝে ফেলে যে, খলীফা তাদেরকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে খলীফা পরিবারেরই জনৈক শাহযাদা হিশাম ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান সালিমকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠানের এবং মাহ্‌দীকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। মাহ্‌দী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পূর্বেই হিশাম ইব্‌ন সুলায়মান এবং তার ভাই আবূ বকরকে বন্দী করে নিজ হাতেই তাদেরকে হত্যা করেন।

সুলায়মান ইব্‌ন হাকামের মৃত্যু

সুলায়মান এবং তার ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সুলায়মান ইব্‌ন হাকাম নামক অপর একজন উমাইয়া শাহযাদা কর্ডোভা থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। বার্বাররা কর্ডোভার বাইরে একত্রিত হচ্ছিল এবং অপর কোন উমাইয়া শাহযাদাকে খলীফা নির্বাচনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান ইব্‌ন হাকামকে আসতে দেখে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং তাকেই খলীফা মনোনীত করে। তারা তাকে 'মুসতাঈন বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে কর্ডোভা আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সুলায়মান ইব্‌ন হাকাম তখন বলেন, আমার এত ক্ষমতাও নেই যে, কর্ডোভা জয় করতে পারব। প্রথমে ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তা সুসংহত করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসতাঈন বিল্লাহ্ বার্বারদের নিয়ে টলেডোয় গিয়ে পৌঁছেন এবং আহমদ ইব্‌ন নাসীবকে আপন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তারপর মুসতাঈন সালিম নগরীর শাসক ওয়াযিহ আমিরীর নিকট পত্র পাঠিয়ে তাকে নিজের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওয়াযিহ্ আমিরী ইতিপূর্বে যেহেতু খলীফা মাহ্‌দীর হাতে বায়আত করে ফেলেছিলেন তাই তিনি মুসতাঈন বিল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন।

গৃহযুদ্ধ

মুসতাঈন বার্বার বাহিনী নিয়ে টলেডো থেকে সালিম নগরী অভিমুখে রওয়ানা হন। মাহ্‌দী যখন শুনতে পান যে, মুসতাঈন সালিম নগরী আক্রমণ করেছেন তখন তিনি আপন ক্রীতদাস কায়সারকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ ওয়াযিহ আমিরীর সাহায্যার্থে পাঠান। সালিম নগরীর উপকণ্ঠে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কায়সার নিহত হন এবং ওয়াযিহ সালিম নগরীতে দুর্গবন্দী হয়ে বসে থাকেন।

খ্রিস্টান সম্রাট ইব্‌ন আওফুনুশ-এর কাছে সুলায়মান ও মাহ্‌দীর সাহায্য প্রার্থনা

মুসতাঈন যখন দেখতে পান যে, সালিম নগরী জয় করা কঠিন হয়ে উঠেছে এমনকি এখানে সৈন্যদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী রসদ সরবরাহ করাই সম্ভব হচ্ছে না তখন তিনি

খ্রিস্টান সম্রাট ইব্‌ন আওফুনুশ-এর কাছে দূত পাঠিয়ে আবেদন জানান– আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রসদসামগ্রী ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করুন, যাতে আমি কর্ডোভার উপর আক্রমণ চালিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারি। দূত প্রেরণের এই সংবাদ যখন মাহ্‌দীর কাছে কর্ডোভায় গিয়ে পৌঁছে তখন তিনিও খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে নিজের পক্ষে টেনে আনার অভিপ্রায়ে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমি সীমান্ত অঞ্চলের সবগুলো দুর্গ এবং শহর আপনার হাতে সমর্পণ করবো। উভয়ের পয়গাম লাভ করার পর খ্রিস্টান সম্রাট মুসতাঈনের পক্ষাবলম্বনকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং এক হাজার ষাঁড়, পনের হাজার বকরী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরদ-সামগ্রী মুসতাঈনের কাছে প্রেরণ করেন। তারপর তার সাহায্যার্থে সৈন্যও পাঠান। এবার মুসতাঈন ওয়াযিহকে সালিম নগরীতে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে কর্ডোভার দিকে চলে যান। তার বাহিনীতে বার্বার, খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। মুসতাঈনকে কর্ডোভার দিকে যেতে দেখে ওয়াযিহও আপন বাহিনী নিয়ে তার পিছনে পিছনে চলতে থাকেন। কিন্তু তার একটি ভুল এই হয়ে গিয়েছিল যে, কর্ডোভা পৌঁছার পূর্বেই তিনি মুসতাঈনের উপর হামলা চালান। এই যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং নিজের অনেক সঙ্গী-সাথীকে ধ্বংস করে শুধু চারশ' লোক নিয়ে কর্ডোভার দিকে পলায়ন করেন। ওয়াযিহ যখন কর্ডোভায় পৌঁছেন এবং মাহ্‌দী যখন মুসতাঈনের এই হামলার কথা জানতে পারেন তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে মুসতাঈনের মুকাবিলার জন্য কর্ডোভা থেকে বহির্গত হন। সারদিক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে নিয়ে মাহ্‌দী টলেডোর দিকে পলায়ন করেন। মুসতাঈন বিজয়ীবেশে কর্ডোভায় প্রবেশ করে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মুসতাঈন যেহেতু এই বিজয় খ্রিস্টানদের সহায়তায় লাভ করেছিলেন তাই খ্রিস্টানদের প্রতি তিনি যারপর নাই বিনয়ী হয়ে উঠেন এবং এই সুযোগে খ্রিস্টান নরপশুরা আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশকে হত্যা করে। খলীফা মাহ্‌দী টলোডোয় পৌঁছে খ্রিস্টান সম্রাট আওফুনুশের কাছে পুনরায় চিঠিপত্র লিখে নিজের সাহায্যের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। খ্রিস্টান সম্রাট এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ভালভাবে জানতেন, মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে তাদেরকে দুর্বল করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। অতএব তিনি অবিলম্বে মাহ্‌দীর কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিয়ে তার সাহায্যার্থে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী পাঠান। এমন কি তিনি এ কথারও কোন পরওয়া করেন নি যে, যে সেনাবাহিনী তিনি মুসতাঈনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তারা এখনো ফিরে আসেনি। মাহ্‌দী খ্রিস্টানদের সাহায্য নিয়ে কর্ডোভা আক্রমণ করেন। 'আকাবাতুল বকর' নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুসতাঈনের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মাহ্‌দী পুরনায় বিজয়ী বেশে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। খ্রিস্টানদের ঐ বাহিনী সাথে যোগ দেয়। এই যুদ্ধেও বেশির ভাগ মুসলমান এবং কর্ডোভাবাসী নিহত হন। মুসতাঈন কর্ডোভা থেকে বের হয়ে দেশব্যাপী লুটপাট, হত্যা ও রাহাজানি শুরু করেন। অপর দিকে মাহ্‌দী কর্ডোভায় প্রবেশ করার পর খ্রিস্টান বাহিনী রাজধানীর বাসিন্দাদের উপর লুটপাট চালিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর

অবস্থার সৃষ্টি করে। মাহ্‌দী কর্ডোভায় প্রবেশ করে আয়েশ-আরামের মধ্যে গা-ভাসিয়ে দেন। ফলে এতদিন যে স্পেন শান্তি ও নিরাপত্তার লালনক্ষেত্র ছিল তা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের পক্ষে জানমাল নিয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাহ্‌দীর অপসারণ

ওয়াযিহ্ আমিরী মাহ্‌দীর সাথে ছিলেন। তিনি যখন এভাবে দেশকে তথা হুকুমতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস হতে দেখেন তখন কর্ডোভা নগরীর অধিবাসীদের সাথে সলা-পরামর্শ করে মাহ্‌দীকে অপসারণ এবং খলীফা হিশামকে পুনরায় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। ফলে ৪০০ হিজরীর ১১ যিলহজ্জ (আগস্ট ১০১০ খ্রি) হিশাম পুনরায় বন্দীশালা থেকে বের হয়ে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। মাহ্‌দীকে দিন-দুপুরে হিশামের সামনেই গীয়ার নামক জনৈক ক্রীতদাস হত্যা করে।

হিশামের পুনরায় সিংহাসন লাভ

দ্বিতীয় হিশাম পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ওয়াযিহ আমিরী, যিনি মানসূর ইব্‌ন আবী আমিরের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন, হিজাবত তথা প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ওয়াযিহ মাহ্‌দীর কর্তিত মস্তক মুসতাঈনের কাছে শুস নামক স্থানে প্রেরণ করেন এবং লিখেন ঃ খলীফা হিশাম পুনরায় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং মাহ্‌দীকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব এখন তোমার উচিত বর্তমান খলীফার বশ্যতা স্বীকার করা এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা। যেহেতু ঐ লুটপাটের মধ্যে মুসতাঈনের সাথে খ্রিস্টান সম্রাট ইব্‌ন আওফুনুশও অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন তাই মুসতাঈন ওয়াযিহ আমিরীর ঐ আহ্বানে মোটেই সাড়া দেন নি বরং কিছুদিনের মধ্যেই ইব্‌ন আওফুনুশ এবং মুসতাঈন এক জোট হয়ে কর্ডোভা আক্রমণ করেন এবং কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী সমগ্র এলাকা ধ্বংস করে কর্ডোভা ঘেরাও করে রাখেন।

দুশ'টি দুর্গের বিনিময়ে খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে আপোস

কর্ডোভা নগরী দীর্ঘদিন ঘেরাও থাকার ফলে দ্বিতীয় হিশাম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং খ্রিস্টান সম্রাটকে মুসতাঈনের কাছ থেকে পৃথক করার ফন্দি আঁটতে থাকেন। তিনি খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান শুরু করেন এবং তারই দাবি অনুযায়ী তার সাম্রাজ্য সংলগ্ন দুশটি দুর্গ এবং কয়েকটি শহর তাকে দান করেন। উপরোক্ত মর্মে একটি সনদপত্রও তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আওফুনুশ এই সনদপত্র বলে নতুন এলাকাসমূহ দখল করে মুসতাঈনের পক্ষ ত্যাগ করেন। মুসতাঈন এবং তার সঙ্গী বার্বাররা বরাবরই ঘেরাও অবস্থায় থাকেন। কিন্তু যেহেতু ঘেরাও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তাই এখন সংঘর্ষ এই অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, কখনো শহরবাসী বার্বারদেরকে তাড়াতে তাড়াতে অনেক দূর পর্যন্ত পিছনে হটিয়ে দিত, আবার কখনো কখনো বার্বাররা শহরবাসীদেরকে পরাজিত করে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ত। এই অবস্থা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই মধ্যবর্তী সময়ে

আরো কয়েকজন খ্রিস্টান রাজা বিদ্রোহ ঘোষণার ভান করেন এবং মুসতাঈনকে সাহায্য করবেন– এই ভয় দেখিয়ে কর্ডোভার দরবার থেকে ইব্‌ন আওফুনুশের মত বিভিন্ন অঞ্চল দান হিসাবে লাভ করেন। ফলে অনেক রাজ্যই খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়।

হিশামের পরিণাম

শেষ পর্যন্ত ৪০৩ হিজরীর ৩রা শাওয়াল (এপ্রিল ১০১২ খ্রি) মুসতাঈন অস্ত্রবলে কর্ডোভা দখল করে নেন। দ্বিতীয় হিশাম এই দাঙ্গায় হয় নিহত হন, নয়ত অন্য কোথাও এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যান যে, তারপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ওয়াযিহ আমিরী এর কিছু দিন পূর্বেই নিহত হয়েছিলেন। যাহোক মুসতাঈন কর্ডোভায় প্রবেশ করে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

মুসতাঈন বিল্লাহ্

ইতিপূর্বে মুসতাঈনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক এবার তিনি পুরোপুরিভাবে কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইত্যবসরে বিভিন্ন প্রদেশের শাসকরা এক একজন স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। ইব্‌ন ইবাদ আশবেলিয়ায়, ইব্‌ন আকতাস বাতলিউসে, ইব্‌ন আবী আমির ভ্যালেন্সিয়ার ও মার্সিয়ায়, ইব্‌ন হুদ সারাকসতায় এবং মুজাহিদ আমিরী রানীয়া এবং জাযায়রে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহরাও এই সময় ও সুযোগকে কাজে লাগাতে কসুর করেনি। প্রত্যেক খ্রিস্টান রাজাই আপন আশেপাশের এলাকা দখল করে নিজ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। মোটকথা, স্পেনে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধের যুগ শুরু হয় এবং ইসলামী হুকুমত টুকরা টুকরা হয়ে যারপর নাই দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুসতাঈন নিহত

৪০৭ হিজরীর মুহাররম (জুন ১০১৬ খ্রি) পর্যন্ত মুসতাঈন কর্ডোভা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর হুকুমত চালান এবং তিন বছর কয়েক মাস 'নাম কাওয়াস্তে' খলীফা থাকার পর আশবেলিয়া-সংলগ্ন তালিকার রণক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন হামুদের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী ও নিহত হন। আর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে স্পেনে উমাইয়া হুকুমতের। প্রকৃতপক্ষে বনূ উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল যখন দ্বিতীয় হাকামের মৃত্যু হয় এবং দ্বিতীয় হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য দ্বিতীয় হিশামের সময়েও খলীফার বংশ হিসাবে বনূ উমাইয়াদের সম্মান ও মর্যাদা অব্যাহত ছিল।

উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তি

মুসতাঈন নিহত হওয়ার পর ৪০৭ হিজরী (১০১৬-১০১৭ খ্রি.) থেকে উমাইয়া বংশের চিহ্নসমূহ স্পেনের মাটি থেকে মুছে যেতে শুরু করে। অবশ্য ৪২৮ হিজরী (১০৩৭ খ্রি) পর্যন্ত উমাইয়া বংশের কোন কোন ব্যক্তি পুনরায় হুকুমত লাভের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ সাময়িকভাবে কিছুটা সফলও হন। কিন্তু ৪২৮ হিজরীর (১০৩৬-৩৭ খ্রি) পর এই ধারারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, ৪০৭ হিজরীতে (১০১৬-১৭ খ্রি.) আলী ইবন হামুদ মুসতাঈনকে হত্যা করে কর্ডোভা দখল করেন এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হিজরী ৪১৩ পর্যন্ত (এপ্রিল ১০২২-মার্চ '২৩ খ্রি) তিনি এবং তার ভাই কাসিম কর্ডোভা শাসন করেন। হিজরী ৪১৩ সনের (১০২২-২৩ খ্রি) শেষ দিকে ইব্ন হামুদের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং কর্ডোভাবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল জব্বার (মাহ্দীর ভাই) হিজরী ৪১৩ সনের রমযান (ডিসেম্বর ১০২২ খ্রি.) মাসে কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'মুসতাযহির' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'মাস শাসন পরিচালনার পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান কর্ডোভার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু হিজরী ৪১৬ সনে (মার্চ ১০২৫-ফেব্রুয়ারী. '২৬ খ্রি.) ইয়াহইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামুদ তাকে পরাজিত করে কর্ডোভার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। পরাজিত মুহাম্মাদ কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে পালিয়ে যান এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইয়াহইয়া ইবন আলী ইব্ন হামূদ ৪১৭ হিজরী (মার্চ ১০২৬ - ফেব্রুয়ারী '২৭ খ্রি) পর্যন্ত কর্ডোভা শাসন করতে থাকেন। তারপর ওযীরুস্ সুলতানাত (প্রধানমন্ত্রী) আবূ মুহাম্মাদ জামহুর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জামহুর, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ উমুভীর হাতে গায়েবানা বায়আত করেন। ঐ সময়ে হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ লারীদা নামক স্থানে ইব্ন হুদের কাছে অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি শুনতে পান যে, তার নামে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছে তখন তিনি লারীদা থেকে বারান্ত নামক স্থানে চলে আসেন। তিনি সেখানে তিন বছর অবস্থান করেন এবং নিজের জন্য 'মু'তামিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। কর্ডোভার দুই নেতা (ইয়াহইয়া ও আবূ মুহাম্মাদ) পরস্পর মিলেমিশে কর্ডোভার শাসন পরিচালনা এবং হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদকে নিজেদের খলীফা হিসাবে মান্য করতে থাকেন। যখন তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয় তখন ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খ্রি.) তারা হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ উমুভীকে বারান্ত থেকে কর্ডোভায় নিয়ে আসেন এবং তার হাতে যথারীতি বায়আত করেন। কিন্তু ৪২২ হিজরী (১০৩১ খ্রি.) সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদকে পদচ্যুত করে। এবার হিশাম কর্ডোভা থেকে লরীদায় চলে যান এবং ৪২৮ হিজরীতে (১০৩৭ খ্রি.) সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদের মৃত্যুর সাথে এতদিন বনূ উমাইয়া বংশের নামমাত্র খিলাফতের যে ধারা অব্যাহত ছিল তাও ছিন্ন হয়ে যায়।

উমাইয়া শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা

প্রথম আবদুর রহমান ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫-৫৬ খ্রি.) স্পেনে প্রবেশ করে উমাইয়া হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে হিশাম মুহাম্মদের মৃত্যুর সাথে সাথে, ৪২৮ হিজরী (১০৩৭ খ্রি.) মোট ২৯০ বছর পর স্পেন থেকে উমাইয়া হুকুমতের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রথম আবদুর রহমানের বংশধরদের মধ্যে এমন কিছু বিদ্যোৎসাহী ও সুযোগ্য শাসকের আবির্ভাব ঘটে যারা স্পেনকে একটি গর্বিত সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁরা দেশকে শুধু চিত্রভাস্কর্যে ও ফলে-ফুলেই সুশোভিত করে তুলেন নি, সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও এত

উন্নতি সাধন করেন যে, আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ বিদ্যানুরাগী উমাইয়া শাসকদের কাছে চির ঋণী। স্পেনের খলীফারা কর্ডোভায় এমনভাবে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে তা সমগ্র ইউরোপকে উজ্জ্বল করে তোলে। স্পেনের খলীফাদেরই উদ্যোগ-আয়োজনের ফলশ্রুতিতে আজ ইউরোপ সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে। স্পেনের খলীফারা এমনি ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী ছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপের রাজা-বাদশাহরা তাদের ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপতেন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে কোন অপমান ও লাঞ্ছনা নির্বিবাদে সহ্য করে নিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ হুকুমত ধ্বংস হলো কেন? এর প্রধান এবং একমাত্র কারণ এই যে, সেখানকার মুসলমানরা ইসলামী শরীয়ত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের হুকুমত ও সালতানাত কোন একটি বিশেষ বংশ বা গোত্রের কুক্ষিগত থাকবে ইসলাম একথা স্বীকার করে না। মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে খিলাফতের ক্ষেত্রে 'ওরাছাত' তথা উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থাৎ পিতার পর তার পুত্র চাই সে যতই অযোগ্য থেকে থাকুক, খিলাফতের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই রীতিকে চিরতরে মুছে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের কিছুকাল পরই মুসলমানরা পুনরায় এই অভিশাপকে নিজেদের গলার মালা করে নেয়। ফলে অযোগ্য ও অথর্ব লোকেরাও খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেতে থাকে। কুরআন করীম এবং ইসলামী শরীয়তের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের প্রতিফল এই দাঁড়ায় যে, একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। তাদের এই পরস্পর বিরোধিতা শত্রুদেরকে শক্তিশালী করে তোলে। ফলে তারা একদিন স্পেন থেকে নির্মমভাবে বিতাড়িত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনূ হামূদের শাসনামল

ইতোপূর্বে ইদরীসী সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আব্বাসী খলীফা হারূন রশীদের আমলেই মরক্কোয় স্বাধীন ইদরীসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তখন কিন্তু মরক্কোয় আর ঐ ইদরীসী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। মানসূরে আযম কিংবা ইব্ন আবী আমিরের মন্ত্রীত্বে তথা শাসনামলে মরক্কো থেকে যে সমস্ত বার্বার লোক স্পেনে এসেছিল তাদের সঙ্গে এসেছিল ইদরীসী বংশের দুই সহোদর। তাদের নাম ছিল আলী এবং কাসিম। তারা ছিল হামূদ ইব্ন মায়মুন ইব্ন আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর। হামূদ মানসূরে আযমের সেনাদলে ভর্তি হয়ে যান। মানসূর ইব্ন আমিরের সাথে খ্রিস্টানদের যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই দুই ভাই অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। ইব্ন আমির তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের উভয়কে সেনাধ্যক্ষ পদে উন্নীত করেন। বার্বাররা তাদেরকে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। কেননা তাদের বংশ দীর্ঘদিন পর্যন্ত মরক্কো শাসন করেছে। এই দুই ভাই-ই বার্বার সৈন্যদের নিয়ে ইব্ন আমির বংশের ধ্বংস সাধন করেন এবং উমাইয়া বংশের মুসতাঈনকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। মুসতাঈন কর্ডোভায় খিলাফতের আসনে বসে আলী ইব্ন হামূদকে তাঞ্জা এবং আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

আলী ইব্ন হামূদ

মুসতাঈনের মাত্র কয়েক দিনের শাসনামলে স্পেনের সবগুলো প্রদেশই স্বাধীন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আলী ইব্ন হামূদও তাঞ্জায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং নিজেকে মুসতাঈনের অধীনতা থেকে মুক্ত করে নেন। আলমিরা-এর শাসক খায়রানকে আপন সহযোগী করে নিয়ে আলী ইব্ন হামূদ সমুদ্রযানের মাধ্যমে আপন সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেন উপকূলে অবতরণ করেন। তাঞ্জায় নিজ পুত্র ইয়াহইয়াকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যান। যা হোক তিনি তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সর্বত্র প্রচার করেন ঃ আমি খলীফা হিশামের রক্তের প্রতিশোধ নিতে এসেছি। শেষ পর্যন্ত মুসতাঈন তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য কর্ডোভা থেকে মালাগা পর্যন্ত আসেন এবং সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুসতাঈন শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করেন। এটা হচ্ছে ৪০৭ হিজরীর মুহাররম (১০১৬ খ্রি জুন) মাসের ঘটনা। এবার আলী দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে কর্ডোভা দখল করেন এবং মুসতাঈনকে বন্দী করে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তারপর তিনি 'নাসির লি-দীনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে স্বয়ং কর্ডোভা শাসন করতে থাকেন। যেহেতু বার্বাররা আলী ইব্ন হামূদের উপর সন্তুষ্ট ছিল, তাই মালাগা যুদ্ধের পর আলী ইব্ন হামূদকে কোনরূপ বিরোধিতা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে

হয়নি। আলী ইব্‌ন হামূদের প্রাথমিক শাসনকাল খুবই মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়। ন্যায় ও সত্যের প্রতি তাঁর বেশ ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বার্বারদেরকেও নারাজ করে ফেলেন এবং প্রজাসাধারণের উপর নতুন নতুন ট্যাক্স আরোপ করেন। যার ফলে সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণ উভয়ই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে আলমেরিয়ার শাসনকর্তা খায়রান সাকলাবী, যার কথা উপরে উল্লিখিত হয়েছে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদকে 'বাদশাহ' বলে প্রচার করেন।

আলী ইব্‌ন হামূদকে হত্যা

আলী ইব্‌ন হামূদের বিশেষ ভৃত্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাকলাবীও ছিল। খায়রান সাকলাবী ষড়যন্ত্র করে তাদেরই মাধ্যমে ৪০৮ হিজরী যিলকদ (এপ্রিল ১০১৮ খ্রি.) মাসে হাম্মাম (গোসল খানা)-এর মধ্যে আলী ইব্‌ন হামূদকে হত্যা করে।

কাসিম ইব্‌ন হামূদ

আলী ইব্‌ন হামূদের হত্যার সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকেরা খুশিই হয়। তবে বার্বাররা আলী ইব্‌ন হামূদের ভাই কাসিম ইব্‌ন হামূদকে, যিনি মুসতাঈনের যুগ থেকে খাযরা দ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন, কর্ডোভায় ডেকে নিয়ে এসে আলী ইব্‌ন হামূদের স্থলে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। কাসিম যেহেতু কর্ডোভার নিকটবর্তী ছিলেন তাই উপস্থিত সময়ে তাকেই সিংহাসনে বসানো হয়। অন্যথায় বেশির ভাগ বার্বার সৈন্য তাঞ্জা থেকে আলী ইব্‌ন হামূদের পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আলীকে ডেকে নিয়ে এসে তাকেই সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা পোষণ করছিল। অপরদিকে খায়রান সাকলাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদকে সঙ্গে নিয়ে সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। ফলে সাধারণ লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পর গ্রানাডার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে— যিনি একজন বার্বার গোত্রপতি ছিলেন, খায়রান সাকলাবীর এক যুদ্ধ সংঘটিত হলে ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে প্রতারণা করে তিনি (খায়রান) আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদকে হত্যা করেন।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলীর এক ভাই ইদরীস ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হামূদ মালাগার শাসনকর্তা ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইদরীসকে আপন সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং স্বয়ং তাঞ্জা থেকে জাহাজযোগে রওয়ানা হয়ে স্পেনে এসে অবতরণ করেন এবং আপন চাচা কাসিমের বিরুদ্ধে সিংহাসনের দাবি উত্থাপন করেন। খায়রান সাকলাবীও ইয়াহ্‌ইয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। ইয়াহ্‌ইয়াকে তার ভাই ইদরীস, খায়রান সম্পর্কে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, সে অত্যন্ত ধূর্ত এবং ফ্যাসাদী। কিন্তু ইয়াহ্‌ইয়া উত্তরে বলেন, তার সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে আমাদের উপকৃত হওয়া উচিত। ইয়াহ্‌ইয়া তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কাসিম এই আক্রমণ সংবাদ শুনে কর্ডোভা থেকে আশবেলিয়ায় পালিয়ে গিয়ে কাযী ইব্‌ন ইবাদের আশ্রয়প্রার্থী হন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হামূদ

কাসিম ৪১০ হিজরীর ১লা জমাদিউল আউয়াল (সেপ্টেম্বর ১০১৯ খ্রি) কর্ডোভা থেকে পলায়ন করেন এবং এর এক মাস পরে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আলী বিনা বাধায় কর্ডোভায় প্রবেশ

করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'মুতাআলী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শুধু কর্ডোভা শহর দখল করে নিজেকে সমগ্র স্পেনের সম্রাট বলে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, কর্ডোভা শহরের বাইরে কেউই তার হুকুমত স্বীকার করত না। এই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করছিলেন। ইয়াহ্ইয়ার অন্যমনস্কতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতিতে দেশের মধ্যে পুনরায় ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কর্ডোভারই সেনাবাহিনীর অনেক অধিনায়ক সেভিলে গিয়ে কাসিমের সাথে সাক্ষাত করে তাকে কর্ডোভা আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইয়াহ্ইয়া এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে এতই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, আদ্যোপান্ত পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই কর্ডোভা থেকে পালিয়ে মালাগায় চলে যান।

কাসিম ইবন হামূদের দ্বিতীয়বার শাসন ক্ষমতা দখল

ইয়াহ্ইয়ার পলায়ন সংবাদ শুনে ৪১৩ হিজরীতে (এপ্রিল ১০২২-মার্চ '২৩ খ্রি) কাসিম কর্ডোভায় এসে পুনরায় শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। এদিকে ইয়াহ্ইয়া মালাগায় গিয়ে সে অঞ্চলটি নিজ দখলে নিয়ে নেন এবং একজন স্বাধীন শাসকে পরিণত হন। ইদরীস যখন দেখলেন যে, ইয়াহ্ইয়া মালাগার শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন তখন তিনি ভাইয়ের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে মালাগা থেকে তাঞ্জায় গিয়ে সে অঞ্চলটি নিজ দখলে নিয়ে নেন। এভাবে কাসিম কর্ডোভায়, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী মালাগায় এবং ইদরীস ইব্ন আলী তাঞ্জায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন।

উমাইয়াদের পাইকারী হত্যা

কিছু দিন পর বার্বার নেতারা কাসিমের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এদিকে কর্ডোভার অধিবাসীরা পুনরায় কোন উমাইয়া রাজকুমারকে স্পেনের সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। কাসিম এই সংবাদ পেয়ে উমাইয়াদেরকে খুঁজে বের করে কাউকে বন্দী, আবার কাউকে হত্যা করতে থাকেন। এই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করে জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শরহবাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য কাসিম বার্বার বাহিনীকে ব্যবহার করেন। শহরবাসীরা একত্রিত হয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে এবং শেষ পর্যন্ত কাসিম এবং তার বাহিনীকে পরাস্ত করে শহর থেকে বের করে দেয়। বার্বার বাহিনী পরাজিত হয়ে ইয়াহ্ইয়ার কাছে মালাগায় চলে যায় এবং কাসিম কর্ডোভা থেকে বের হয়ে আশবেলিয়ার দিকে চলে আসেন। কাসিম তার পুত্রকে আশবেলিয়ার শাসক নিয়োগ করে মুহাম্মাদ ইব্ন যায়রী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইবাদকে তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। এবার এই দুই কর্মকর্তা যখন জানতে পারলেন যে, কাসিম কর্ডোভা থেকে পরাজিত হয়ে আসছেন তখন তারা আশবেলিয়ার ফটক বন্ধ করে দেয় এবং তার সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কাসিম শহরের বাইরে অবস্থান নিয়ে ঐ কর্মকর্তাদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠায় ঃ তোমরা আমার পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাব। ফলে এরা কাসিমের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কাসিম তার পরিবার-পরিজন এবং হাবশী ক্রীতদাসদের নিয়ে সারীশ দুর্গে

অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু ৪১৫ হিজরীতে (মার্চ ১০২৪- ফেব্রুয়ারী '২৫খ্রি) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী সারীশ দুর্গ দখল করে কাসিমকে বন্দী করেন। ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রি.) ইয়াহ্ইয়ারই নির্দেশে কাসিমকে হত্যা করা হয়।

আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম

কাসিম যখন কর্ডোভা থেকে আশবেলিয়ার দিকে পালিয়ে যান তখন কিছুদিন পর্যন্ত কর্ডোভায় কোন সুলতান বা শাসক ছিলেন না। কর্ডোভাবাসীরা উমাইয়া বংশের কোন ব্যক্তিকে খিলাফতের আসনে বসাতে চাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত উমাইয়া বংশের তিনজন রাজকুমার সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের দাবিদার হন। ৪১৪ হিজরীর ১৫ই রমযান (নভেম্বর ১০২৩ খ্রি.) কর্ডোভাবাসীরা একটি সাধারণ সভায় ঐ তিন রাজকুমারের মধ্য থেকে আবদুর রহমান ইব্ন হিশাম নামীয় একজন রাজকুমারকে খলীফা পদে নির্বাচিত করেন। আবদুর রহমান মুসতাযহির উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে আপন মন্ত্রীদের মতামতকে উপেক্ষা করে আবূ ইমরান নামীয় একজন বার্বার সর্দারকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে দেন। উপরন্তু তিনি তাকে অধিনায়কত্ব দান করেন। এই আবূ ইমরানেরই ষড়যন্ত্রে ৪১৪ হিজরীর ৩রা যিলকদ (জানুয়ারি ১০২৪ খ্রি.) মুসতাযহির নিহত হন।

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ মুসতাকফী

তারপর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ 'মুসতাকফী' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৪১৬ হিজরী (১০২৫ খ্রি.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ, যিনি আপন পিতৃব্য আবদুল কাসিমকে বন্দী করে সারীশ, মালাগা এবং জাযীরা নিজ দখলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুসতাকফী ইয়াহ্ইয়ার এই আগমন সংবাদ শুনে এমনি কিংকতব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন যে, সঙ্গে সঙ্গে কর্ডোভা থেকে উত্তর সীমান্তের দিকে পালিয়ে যান এবং সেখানেই ৪১৬ হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল (মে ১০২৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইয়াহ্ইয়া কর্ডোভায় প্রবেশ করে ইব্ন আত্তাফ নামক একজন অধিনায়ককে কর্ডোভার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং নিজে মালাগার দিকে চলে যান। তিনি মালাগায় পৌঁছে আশবেলিয়ার শাসক আবুল কাসিম ইব্ন ইবাদের মুকাবিলা করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেন। কিছুদিন পর কর্ডোভাবাসীরা ইব্ন আত্তাফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে কর্ডোভা থেকে বের করে দেয়।

কর্ডোভাবাসীদের মধ্যে তখন আবূ মুহাম্মাদ জামহুর ইব্ন মুহাম্মাদ নামীয় একজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তারই পরামর্শে কর্ডোভাবাসীরা উমাইয়া বংশের হিশাম নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে, যিনি তখন লারীদায় অবস্থান করছিলেন, নিজেদের খলীফা বলে স্বীকার করে নেয়। হিশাম তিন বছর পর্যন্ত কর্ডোভায় আসতে পারেন নি। তারপর ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খ্রি.) তিনি কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং 'মুতামিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু দু'বছর পর ৪২২ হিজরীতে (১০৩১ খ্রি) সেনাবাহিনী এবং প্রজাসাধারণ একজোট হয়ে তাকে পদচ্যুত করে এবং কর্ডোভা থেকে বের করে দেয়। তিনি

লাবীদায় ফিরে আসেন এবং সেখানে ৪২৮ হিজরী (নভেম্বর ১০৩৬-অক্টোবর '৩৭ খ্রি) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী সেভিল ঘেরাও করে নিয়েছিলেন এবং কর্ডোভাবাসীদেরকেও ধমকাচ্ছিলেন। কর্ডোভা থেকে হিশামের চলে যাওয়ার পর কর্ডোভাবাসীরা ইয়াহ্ইয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ইয়াহ্ইয়া ৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খ্রি.) সেভিল দখল করে নেন। কিন্তু ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রি.) সেভিলবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদের সাথে এক সংঘর্ষে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী নিহত হন। ইয়াহ্ইয়া নিহত হওয়ার পর তার সঙ্গী-সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা মালাগা চলে যায়। সেখানে ইয়াহ্ইয়ার স্থায়ী হুকুমত ছিল। তারা ইয়াহ্ইয়ার ভাই ইদরীস ইব্ন আলীকে সিউটা থেকে ডেকে পাঠিয়ে তাকেই সিংহাসনে বসান। সিউটার শাসনক্ষমতা হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইদরীস ইব্ন আলী মালাগার সিংহাসনে বসে 'মুতাআইয়িদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। আবূ মুহাম্মাদ জামহুর কর্ডোভায় জামহুরী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। কাউন্সিল সদস্যরা আবূ মুহাম্মাদ জামহুরকে নিজেদের 'সদর' বা সভাপতি নির্বাচিত করে। এভাবে কর্ডোভা শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইদরীস ইব্ন আলী কারমুনা এবং আলমেরিয়ার শাসকদ্বয়কে নিজের পক্ষে টেনে এনে সেভিলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিন-চার বছর পর্যন্ত সেভিলের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৪৩১ হিজরীতে (অক্টোবর ১০৩৯- সেপ্টেম্ব '৪০ খ্রি.) ইদরীস ইব্ন আলী মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন সর্দার তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইদরীসকে মালাগার সিংহাসনে বসাতে চান। কারো কারো মতে সিউটার শাসনকর্তা হুসায়ন ইব্ন ইয়াহ্ইয়াই হচ্ছেন সিংহাসনের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া সিউটা থেকে এসে মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য 'মুসতানসির' উপাধি গ্রহণ করেন। ৪৩৮ হিজরীতে (১০৪৬-৪৭ খ্রি.) হাসানের চাচাত বোন অর্থাৎ ইদরীসের কন্যা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তারপর তিন-চার বছর পর্যন্ত এই বংশের দাস ভৃত্যরা একের পর এক মালাগা শাসন করে।

ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হামূদী

শেষ পর্যন্ত ৪৪৩ হিজরীতে (১০৫১ -৫২ খ্রি.) ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রানাডা এবং কারমুনার শাসকরা তার বশ্যতা স্বীকার করে। ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নিজের জন্য 'আ-লী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং সিউটার শাসন ক্ষমতা পিতার ক্রীতদাস সাকূত এবং যারকুল্লাহকে প্রদান করেন। ৪৪৮ হিজরীতে (এপ্রিল ১০৫৬ খ্রি-৫৭ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হামূদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তার হাতে পরাজিত হয়ে কামারুশ চলে যান। মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করে নিজের জন্য 'মাহ্দী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং আপন ভ্রাতা সানালীকে নিজের 'অলীআহ্দ' নিয়োগ করেন। ৪৪৯ হিজরী (মার্চ ১০৫৭-ফেব্রুয়ারী ৫৮ খ্রি) সনে মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে ইদরীস ইব্ন ইয়াহ্ইয়া পুনরায় মালাগায় এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তারপর ৪৫০ হিজরীতে (মার্চ ১০৫৮- ফেব্রুয়ারী ৫৯ খ্রি.) ইদরীস ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হামূদ বংশের শেষ সম্রাট মুহাম্মাদ আসগর

তারপর মুহাম্মাদ আসগর ইব্‌ন ইদরীস ইবন আলী ইব্‌ন হামূদ মালাগার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৫১ হিজরীতে (১০৫৯ খ্রি.) গ্রানাডার রাজা বাদীস ইব্‌ন হাকূস মালাগা আক্রমণ করে মুহাম্মাদ আসগরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। মুহাম্মাদ আসগর মালাগা থেকে আলমেরিয়ায় চলে আসেন। ৪৫৬ হিজরী (১০৬৪ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি এখানে অশান্তির মধ্যে কালাতিপাত করেন। ৪৫৬ হিজরী (১০৬৪ খ্রি) মালীলা (আফ্রিকা)বাসীদের আবেদন মতে তিনি আফ্রিকা চলে যান এবং সেখানকার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। ৪৬০ হিজরী (১০৬৮ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি সেখানকার বাদশাহ ছিলেন। মুহাম্মাদ আসগর হচ্ছেন হামূদ বংশের সর্বশেষ সুলতান। অবশ্য 'ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণকারী কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ নামীয় অপর এক ব্যক্তি ৪৫০ হিজরী (১০৫৮ খ্রি.) সন পর্যন্ত জাযীরা প্রদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আশবেলিয়ার বাদশাহ মুতাযিদ ইব্‌ন আবুল কাসিম ইব্‌ন ইবাদ ৪৫০ হিজরী (১০৫৮ খ্রি.) জাযীরা আক্রমণ করে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদকে বন্দী করে ফেলেন। এভাবে স্পেন থেকে হামূদ বংশের শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সপ্তম অধ্যায়

বনূ ইবাদ, বনূ যুন্নুন, বনূ হূদ প্রভৃতি

স্বাধীন রাজবংশ

উপরে বনূ হামূদ বংশের শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। উমাইয়া বংশের শাসনকাল হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনূ হামূদ বংশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা ৪০৫ হিজরী (১০১৪-১৫ খ্রি.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, স্পেন ভূখণ্ডের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের উপর হামূদরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সমসাময়িক আরো কয়েকটি বংশ পৃথক পৃথক প্রদেশগুলোর উপর নিজেদেরই শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করার অবকাশ এখানে নেই। তাই অতি সংক্ষেপে সে সমস্ত শাসক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

সেভিল ও পশ্চিম স্পেন (বনূ ইবাদ)

বনূ ইবাদ বংশের মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন কুরায়শ তাশানা মহল্লার সাহিবুস সালাত তথা ইমাম ছিলেন। তাঁর পুত্র ইসমাঈল ৪১৩ হিজরীতে (এপ্রিল ১০২২-মার্চ '২৩ খ্রি) সেভিল রাজদরবারে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ৪১৪ হিজরী (এপ্রিল ১০২৩-মার্চ ২৪ খ্রি) ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদের পুত্র আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সেভিলের কাযী (বিচারক) ও মন্ত্রী নিযুক্ত হন। যখন কাসিম ইব্‌ন হামূদ সেভিলের দিকে আসেন তখন কাসিম মুহাম্মাদ (সেভিলের কাযী) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুবায়রী সেভিল দখল করে নেন এবং কাসিম ইব্‌ন হামূদকে সেখানে প্রবেশ করতে দেন নি।

আবুল কাসিম মুহাম্মাদ

তারপর আবুল কাসিম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুবায়রীকেও সেভিল থেকে বের করে দেন এবং নিজেই সেভিলের শাসক হয়ে বসেন। কাসিম ইব্‌ন হামূদ কারমুনার দিকে চলে গিয়েছিলেন সেখানে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ বায়যালী ৪০৪ হিজরী (১০১৩-১৪ খ্রি) থেকে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাসিম ইব্‌ন হামূদ সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে সারীশ দুর্গের দিকে চলে আসেন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ যথারীতি কারমুনা শাসন করতে থাকেন।

আবূ উমর ইবাদ

আবুল কাসিম মুহাম্মাদের পর তার পুত্র আবূ উমর ইবাদ সেভিলের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য 'মুতাদিদ' উপাধি গ্রহণ করেন। মুতাদিদ এবং কারমুনার রাজা

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৪৩৪ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১০৪২-আগস্ট '৪৩ খ্রি) ইসমাঈল ইব্‌ন কাসিম হামূদ, কারমুনার শাসক মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করে কারমুনা দখল করে নেন। কিছুদিন পর ইসমাঈল কারমুনা থেকে জাযীরার দিকে চলে যান এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর পুত্র আযীয মুসতাযহির কারমুনা দখল করে নেন। কিছু দিন পর মুতাদিদ কারমুনা, সারীশ, আরকাশ, রিনদাহ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে সেগুলোকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আবদুল আযীয বাকরী স্বাধীনভাবে আদীনাহ্ ও সালতীশ শাসন করছিলেন। সেভিলের শাসক মুতাদিদ তার উপর হামলা পরিচালনা করেন। প্রথমত কর্ডোভার 'ওয়াযিরুস সুলতানাত' (প্রধানমন্ত্রী) ইব্‌ন জামহুরের হস্তক্ষেপের ফলে মুতাদিদ ও আবদুল আযীযের মধ্যে একটা আপোস মীমাংসা হয়। কিন্তু ইব্‌ন জামহুরের মৃত্যুর পর ৪৪৩ হিজরী (মে ১০৫১-এপ্রিল '৫২ খ্রি) মুতাদিদ আদীনাহ এবং শালতীশ জয় করে সেগুলোকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং আপন পুত্র মুতামিদকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাল্‌ব-এর শাসক মুযাফফর ৪২২ হিজরী (১০৩১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার পুত্রকে সেখান থেকে হটিয়ে মুতাদিদ শাল্‌ব অঞ্চলকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং এর শাসন ক্ষমতাও আপন পুত্র মুতামিদের হাতে অর্পণ করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ৪১৪ হিজরী (এপ্রিল ১০২৩-মার্চ '২৪ খ্রি) লাবনায় নিজের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ৪৩৩ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১০৪১-আগস্ট '৪২ খ্রি) ইনতিকাল করলে তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সেখানকার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। মুতাদিদ সুযোগ বুঝে লাবলা আক্রমণ করেন। বেশ অনেকগুলো যুদ্ধের পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া লাবলা পরিত্যাগ করে আপন ভাতিজা ফাতহা ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার কাছে কর্ডোভায় চলে যান। মুতাদিদ ৪৪৫ হিজরীতে (মে ১০৫৩-এপ্রিল '৫৪ খ্রি) কর্ডোভাও দখল করে নেন। এভাবে তিনি ইব্‌ন রাশীকের কাছ থেকে আলমেরিয়া এবং ইব্‌ন তাইগুরের কাছ থেকে মারতালা ছিনিয়ে নেন এবং ক্রমান্বয়ে আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বহুলভাবে বৃদ্ধি করেন। এভাবে তিনি বনূ ইবাদের একটি সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বাদীস ইব্‌ন হাবুস এবং মুতাদিদের মধ্যে বেশ কিছু দিন যাবত যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই হিজরী ৪৬১ (নভেম্বর ১০৬৮-অক্টোবর '৬৯ খ্রি) মুতাদিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুতামিদ ইব্‌ন মুতাদিদ ইব্‌ন ইসমাঈল

মুতাদিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুতামিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুতামিদও আপন পিতার ন্যায় সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকেন। বাদীস ইব্‌ন হাবূসও মুতামিদের নেতৃত্ব মেনে নেন। ৪৪৭ হিজরী (এপ্রিল ১০৫৫-মার্চ '৫৬ খ্রি) ক্যাস্টিল ও লিউনের খ্রিস্টান সম্রাট প্রথম ফার্ডিনান্ড মুসলমানদেরকে আপোসে যুদ্ধরত দেখে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে সেভিল রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে মুসলমান সামন্ত শাসকরা আপন মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মুকাবিলায় ফার্ডিনান্ডকে কর প্রদানে সম্মত হন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুতাদিদও এই হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। তার পুত্র আলফোনসূ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

আলফোনসূ ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক ও অহংকারী। ৪৬৮ হিজরী (১০৭৫ -'৭৬ খ্রি) মুতামিদ নিজের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত করে খ্রিস্টান সম্রাটকে কর দান বন্ধ করে দেন।

চতুর্থ আলফোনসূ কর্তৃক মুসলমান অধ্যুষিত শহরসমূহ লুণ্ঠন

পশ্চিম স্পেনে বনূ ইবাদ ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত অধিপতি স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করছিলেন। তারা বনূ ইবাদের অধীনে ছিলেন না। তাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান সম্রাটের কর্তৃত্বাধীন চলে গিয়েছিলেন। চতুর্থ আলফোনসূ মুসলমান অধ্যুষিত শহরসমূহ লুণ্ঠন এবং মুসলমান সামন্ত শাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের একটি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে ৪৭৮ হিজরী (মে ১০৮৫-এপ্রিল '৮৬ খ্রি) সনে বনী যুন্নুন বংশের শেষ সুলতান কাদিরের কাছ থেকে টলেডো ছিনিয়ে নেন। তারপর সমগ্র মুসলমান সুলতানকেই ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে থাকেন।

আলফোনসূ কর্তৃক মুতামিদের কাছ থেকে কর তলব

চতুর্থ আলফোনসূর ইব্‌ন শালিব নামীয় জনৈক ইহুদী দূত মুতামিদের কাছে এসে তার কাছ থেকে কর তলব করে। মুতামিদ বিনাদ্বিধায় ঐ ইহুদী দূতের কাছে কর পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দূত ঐ অর্থ মুতামিদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলে ঃ এটা তো রৌপ্যমুদ্রা, আমি রৌপ্য মুদ্রা নেব না, বরং এর পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ আশরাফী নেব। উপরোক্ত পয়গামসহ যখন করের অর্থ মুতামিদের হাতে এসে পৌঁছে তখন তিনি নিজের কয়েকজন সৈন্যের মাধ্যমে ঐ দূতকে ডেকে পাঠান এবং তার ঐ বেআদবী ও অশিষ্টতার শাস্তিস্বরূপ তাকে একটি কাঠের তক্তার উপর শুইয়ে তার হাত এবং পায়ের মধ্যে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেন। ইহুদী দূত ইব্‌ন শালিব নিজেকে এরূপ ধ্বংসের মুখোমুখি দেখতে পেয়ে মুতামিদের কাছে আবেদন জানায় ঃ যদি আপনি আমাকে রেহাই দেন তাহলে আমি আমার ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ আপনার খিদমতে হাযির করবো। কিন্তু মুতামিদ তাকে হত্যা করে তার সঙ্গীদেরকে বন্দী করে ফেলেন। মুতামিদ জানতেন, এবার চতুর্থ আলফোনসূ যে তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন। আলফোনসূ এই সংবাদ শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। বাহ্যত তখন মুসলমানদের নামমাত্র কর্তৃত্ব একেবারে নিভু নিভু অবস্থায় ছিল এবং প্রায় সমগ্র দেশ খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের কারণে মুসলমানরা এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, খ্রিস্টানদের সাথে মুকাবিলা করার মত শক্তি, সাহস কোনটাই তাদের ছিল না

মুতামিদ কর্তৃক ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে সাহায্যের আবেদন

মুতামিদ বিষয়টির পরিণামের দিক বিবেচনা করে মরক্কোর বাদশাহ্ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন-এর কাছে এই মর্মে এক অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন য, এই মুহূর্তে আমার সাহায্যের অতীব প্রয়োজন। অন্যথায় স্পেন থেকে ইসলামের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে যাবে। মুরাবিতীন বংশের ইউসুফ ইবন তাশুফীন মাত্র কিছু দিন পূর্বে আফ্রিকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট। মুতামিদ ইবাদীর পত্র পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেভিলে এসে পৌঁছেন। অপর দিকে চতুর্থ আলফোনসূ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সেভিলের দিকে অগ্রসর হন।

যালাকা রণক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

৪৮০ হিজরী মুতাবিক ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে যালাকার যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের মুখোমুখি হয়। ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন এবং মুতামিদের সম্মিলিত ইসলামী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অপর দিকে খ্রিস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এটা স্পেনের বিখ্যাত যুদ্ধসমূহের অন্যতম। কেননা এই যুদ্ধের ফলেই মুসলমানরা আরো কয়েকশ বছরের জন্য স্পেনে নিজেদেরকে সুদৃঢ় করার এবং খ্রিস্টানদের অন্তরে নিজেদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ কিভাবে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করেছিল তা ইব্‌ন আসীরের একটি উক্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে চতুর্থ আলফোনসূ তার মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং বাকি সবাই মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারায়। এই বিরাট বিজয়ের পর মুসলমানরা তাদের শক্তিকে সুসংহত করার আরেকটি সুযোগ পায়। কিন্তু ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন মরক্কোয় প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানরা পুনরায় গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুতামিদ ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জ্ঞানী-গুণীদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু যালাকা বিজয়ের পর মুতামিদের চালচলন আপত্তির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন পুনরায় স্পেনে আসেন এবং বেশির ভাগ আমীর ও সুলতানের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে পুনরায় আফ্রিকায় যান। অবশ্য ফিরে যাবার সময় পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি নিজের একজন গভর্নরকে রেখে যান। ঐ সমস্ত সুলতানের অসংযত আচার-আচরণ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে সরাসরি স্পেনের উপর হস্তক্ষেপ করার এবং এটাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খ্রি.) ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন, মুতামিদকে বন্দী করে নিয়ে যান এবং মরক্কোর 'আগমাত' নামক স্থানে আটকে রাখেন। চার বছর পর ৪৮৮ হিজরীতে (১০৯৫ খ্রি.) মুতামিদ সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন। এভাবে বনী ইবাদ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বনী ইবাদ ছাড়াও আরো কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য স্পেনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এখানে সেগুলোর বর্ণনা পরিত্যাজ্য হলো।

বাতলিউস (পশ্চিম স্পেন) প্রদেশে বনূ আফতাসের শাসন প্রতিষ্ঠা

স্পেনে যখন ইসলামী খিলাফত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তখন আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসালামাহ ওরফে ইব্‌ন আফতাস পশ্চিম স্পেনের বাতলিউস প্রদেশ দখল করে সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আবূ বকর মুযাফ্‌ফর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দেশ শাসন করেন। বনূ যুনূন বনূ ইবাদের সাথে তার বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। কিন্তু ৪৪৩ হিজরী (১০৫১-৫২ খ্রি.) মুযাফ্‌ফর বাতলিউসের কেল্লায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ইবন জামহূরের চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয়। ৪৬০ হিজরী (১০৬৮ খ্রি.) সনে মুযাফ্‌ফর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার পুত্র আবূ হাফস উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ওরফে সাজাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'মুতাওয়াক্কিল' উপাধি গ্রহণ করেন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন কর্তৃক বাতলিউস দখল

৪৮৯ হিজরীতে (১০৯৬ খ্রি.) ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন বাতলিউস দখল করে ঈদুল আযহার দিনে মুতাওয়াক্কিল এবং তার সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করেন। মুতাওয়াক্কিলকে এই কঠোর শাস্তি এ জন্য দেওয়া হয় যে, তিনি খ্রিস্টানদের সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করে এই চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, যাতে খ্রিস্টানরা মুসলিম এলাকাগুলোর উপর আক্রমণ চালায় এবং স্পেন থেকে ইউসূফ ইব্‌ন তাশুফীনের প্রভাব মুছে ফেলে। তার এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন তাকে উপরোক্ত শাস্তি দিয়ে তার নাম-নিশানা মুছে ফেলার উদ্যোগ নেন, যাতে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

কর্ডোভায় ইব্‌ন জাহূর-এর শাসন প্রতিষ্ঠা

জাহূর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবিল গাফির ইব্‌ন আবী উবায়দা কালাবী ওরফে ইব্‌ন হাযমকে ৪২২ হিজরী (১০৩১ খ্রি.) কর্ডোভাবাসীদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সকলেরই পরামর্শ অনুযায়ী দেশ শাসন করতে থাকেন। তিনি আরেকটি সতর্কতা এভাবে অবলম্বন করেন যে, রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে নিজের বাসস্থানেই দরবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে বাদশাহ্ বা সুলতান আখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও পবিত্রচেতা লোক ছিলেন। তার শাসন সব দিক দিয়েই প্রশংসনীয় ছিল। তিনি রোগীদের দেখতে যেতেন এবং সাধারণ বৈঠক-সভা-সমিতিতে নির্দ্বিধায় যোগদান করতেন। তিনি ৪৩৫ হিজরী (১০৪৩-৪৪ খ্রি.) সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং নিজের বাসস্থানেই সমাধিস্থ হন।

আবুল ওয়ালীদ ইব্‌ন জাহূর আবদুল মালিক

জাহূরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুল ওয়ালীদ ইব্‌ন জাহূর আবদুল মালিককে কর্ডোভার অধিবাসীরা সর্বসম্মতিক্রমে স্পেনের শাসক নিয়োগ করে। তিনিও তার পিতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সামন্ত রাজ-রাজড়াদের মধ্যে তার শাসনকালই ছিল সবচাইতে প্রশংসনীয়। আবুল ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক কর্ডোভার শাসক হন। কিন্তু কর্ডোভাবাসীরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে।

ইব্‌ন আত্তাশা

বনূ যুন্নুন যখন কর্ডোভা আক্রমণ করে তখন আবদুল মালিক বনূ ইবাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইবাদী সেনাবাহিনী বনূ যুন্নুনকে তাড়িয়ে দেয় বটে, তবে নিজেরা কর্ডোভা দখল করে আবদুল মালিককে বন্দী করে ফেলে। এভাবে ৪৬১ হিজরীতে (১০৬৯ খ্রি.) জাহূর বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুতাযিদ ইবাদী তার পুত্র সিরাজুদ্দৌলাকে কর্ডোভায় আসার কিছুদিন পরই কে বা কারা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তারপর ইব্‌ন আত্তাশা কর্ডোভা দখল করে নেন।

গ্রানাডায় ইব্‌ন হাবূসের শাসন

যে সময় বনূ হামূদ মালাগায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক সে সময়ে যাদী ইব্‌ন যায়রী মানাদ নামীয় জনৈক বার্বার সর্দার গ্রানাডায় আপন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যখন স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন অর্থাৎ ৪১০ হিজরী (মে ১০১৯-এপ্রিল১০২০ খ্রি) সনে যাদী তার পুত্রকে গ্রানাডায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং কায়রোয়ানের সম্রাটের কাছে আফ্রিকায় চলে যান। কিন্তু যাদীর অনুপস্থিতিতে তার ভাই মাকিস ইব্‌ন যায়রী গ্রানাডা দখল করে তার ভাতিজাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন এবং নিজেই সেখানকার বাদশাহ হয়ে বসেন। ৪২৯ হিজরীতে (অক্টোবর ১০৩৭-সেপ্টেম্বর ১০৩৮ খ্রি) মাকিস ইব্‌ন যায়রীর মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র বাদীস ওরফে ইব্‌ন হাবূস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্‌ন যূন্নুন ও ইব্‌ন ইবাদের সাথে বাদীসের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। ইব্‌ন হাবূসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইসমাঈল নামীয় জনৈক ইহুদী। ৪৬৭ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১০৭৪-আগস্ট ১০৭৫ খ্রি) ইব্‌ন হাবূসের মৃত্যু হয়। তারপর তার প্রপৌত্র আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুলুকীন ইব্‌ন বাদীস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার ভাই তামীমের কাছে আপন পিতামহের ওসীয়ত অনুযায়ী মালাগার শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করেন। ৪৮৩ হিজরী (মার্চ ১০৯০-ফেব্রুয়ারি ১০৯১ খ্রি) সনে মুরাবিতীনরা এই দুই ভাইকে পদচ্যুত ও দেশান্তরিত করে আগামাতের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

তালীতলায় বনূ যূন্নুনের শাসন

যখন স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৪১৯ হিজরীতে (১০২৮ খ্রি.) ইসমাঈল ইব্‌ন যাফির ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন যূন্নুন আকলাতীন দুর্গ দখল করে নেন। টলেডোর শাসনকর্তা ইয়াঈশ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াঈশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে টলেডোয় স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রি) যখন তার মৃত্যু হয় তখন টলেডোর সেনা অধিনায়ক আকলাতীন দুর্গ থেকে ইসমাঈলকে এই মর্মে তলব করেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে এসে টলেডো দখল করে নেন। অতএব ইসমাঈল বিনা সংঘর্ষে টলেডোর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দেশ শাসন করতে থাকেন। ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭-৪৮ খ্রি.) ইসমাঈল ইব্‌ন যাফিরের মৃত্যু হলে তার পুত্র আবুল হাসান ইয়াহইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য মামূন উপাধি গ্রহণ করেন। মামূন প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করেন। সামন্ত শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচাইতে বেশি পরাক্রমশীল। সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান রাজাদের সাথে তার অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মানসূর আযম ইব্‌ন আবী আমির-এর বংশধরদের মধ্যে মুযাফ্‌ফর নামীয় জনৈক ব্যক্তি ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল। মামূন ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৩ খ্রি) তাকে ভ্যালেন্সিয়া থেকে বেদখল করে সে প্রদেশটিও নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর মামূন কর্ডোভা আক্রমণ করেন এবং সেটাকে বনূ ইবাদের দখল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। তারপর তার পুত্র আবূ উমারকে কর্ডোভাবাসীরা হত্যা করে ফেলে। ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৪-৭৫ খ্রি) মামূনকেও কে বা কারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তারপর টলেডোর শাসন ক্ষমতা তার পৌত্র কাদির ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইসমাঈলের দখলে চলে আসে। ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খ্রি) কিস্টালের খ্রিস্টান সম্রাট টলেডো আক্রমণ করেন। কাদির ইব্‌ন ইয়াহইয়া টলেডো মুক্ত করে দেন এবং চতুর্থ আল-ফোনসূর সাথে এই শর্ত

আরোপ করেন যে, তিনি তাকে (কাদিরকে) ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশ দখল করার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তখন ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশের শাসক ছিলেন কাযী উসমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল আযীয। ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসীরা যখন জানতে পারে যে, চতুর্থ আলফোনসূ ভ্যালেন্সিয়া দখলের ব্যাপারে কাদিরকে সাহায্য করবেন তখন তারা নিজেরাই উসমান ইব্‌ন আবূ বকরকে পদচ্যুত করে কাদির ইব্‌ন ইয়াহইয়াকে আহ্বান জানায় এবং তার হাতেই ভ্যালেন্সিয়ার শাসন কর্তৃত্ব তুলে দেয়। ৪৮১ হিজরীতে (১০৮৮ খ্রি) কাদিরের মৃত্যু হয়।

সারাকাস্তায় বনূ হূদের শাসন

আবূ আইয়ূব সুলায়মান, আহমদ মুকতাদির বিল্লাহ, ইউসুফ মু'তামিন ও আহমদ মূসতাঈন

যখন স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে তখন সারাকাস্তার শাসনকর্তা ছিলেন মুনযির ইবন মুতরিফ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ। মুনযির প্রথম প্রথম মুসতাঈনের পক্ষাবলম্বন করলেও পরে তাকে পরিত্যাগ করেন। কিছুদিন পর মুনযির সারাকাস্তা প্রদেশ স্বাধীনভাবে শাসন করতে শুরু করেন। তারপর প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও বার্সিলোনার খ্রিস্টান রাজাদের সাথে আপোস চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ৪১৪ হিজরীতে (১০২৩ খ্রি.) যখন মানসূরের মৃত্যু হয় তখন তার পুত্র মুযাফ্‌ফর সারাকাস্তার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে আবূ হুযায়ফার মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস আবূ আইয়ূব ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন সালিম ছিলেন তালীতলা নগরীর দখলকার ও শাসক।

৪৩১ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১০৩৯-আগস্ট ১০৪০ খ্রি) সুলায়মান, মুযাফ্‌ফরকে বন্দী ও হত্যা করেন এবং সারাকাস্তা দখল করে নেন। তখন মুযাফফরের পুত্র ইউসুফ লারীদাহ শাসন করতে থাকেন এবং মুযাফ্‌ফরের সাথে তার একটির পর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে।

কিছুদিন পর ৪৩৭ হিজরীতে (১০৪৫-৪৬ খ্রি) সুলায়মানের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র আহমদ 'মুকতাদির বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুকতাদির বিল্লাহ্ ইউসুফের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও বাশকান্সের রাজাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তারা মুকতাদিরের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইউসুফ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মিত্রবাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং মুকতাদির ও খ্রিস্টান রাজাদেরকে সারাকাস্তায় অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এটা হচ্ছে ৪৪৩ হিজরীর (মে ১০৫১-এপ্রিল ৫২ খ্রি) ঘটনা। এতে ইউসুফ পরাজিত ও বিপর্যস্ত হন এবং খ্রিস্টান রাজারা নিজেদের দেশে ফিরে যান। মুকতাদির ৪৭৪ হিজরী (১০৮১-৮২ খ্রি) পর্যন্ত সারাকাস্তা শাসন করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুকতাদিরের পর তার পুত্র ইউসুফ সারাকাস্তার শাসনভার গ্রহণ করে নিজের জন্য মুতামিন উপাধি গ্রহণ করেন। ইউসুফ মুতামিন গণিত শাস্ত্রে খুব পরদর্শী ছিলেন। এই বিষয়ের উপর তিনি 'আল-ইসতেহলাল', 'আল-মানাযির' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। হিজরী ৪৭৮ (মে ১০৮৫-৮৬ খ্রি) সনে ইউসুফ মুতামিনের মৃত্যু হয়। এই বছর খ্রিস্টানরা কাদির যিন্নুনের কাছ থেকে টলেডো ছিনিয়ে নেয়।

ইউসুফ মুতামিনের পর তার পুত্র আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য মুসতাঈন উপাধি গ্রহণ করেন। তার আমলে খ্রিস্টানরা ওয়াশকাহ্ আরোপ করেন। আহমদ মুসতাঈন সেটাকে মুক্ত করার জন্য সারাকাস্তা থেকে রওয়ানা হন। ৪৮৯ হিজরী

(১০৯৫-৯৬ খ্রি) সনে ওয়াশকায় খ্রিস্টানদের সাথে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি পরাজিত হন এবং সে যুদ্ধে দশ হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। আহমদ মুসতাঈন সারাকাস্তায় ফিরে এসে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু যেহেতু ওয়াশকায় বিজয় লাভ করে খ্রিস্টানরা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল তাই তিনি পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর ৫০৩ হিজরীতে (১১০৯-১০ খ্রি.) সারাকাস্তা আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আহমদ মুসতাঈন শাহাদাতবরণ করেন।

এবার আহমদ মুসতাঈনের পুত্র আবদুল মালিক সারকাস্তার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য ইমাদুদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু ৫১২ হিজরীতে (মে ১১১৮-এপ্রিল '১৯ খি) খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা সারাকাস্তা দখল করে ইমাদুদ্দৌলাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। ইমাদুদ্দৌলা সারাকাস্তা রাজ্যে 'রাওতা' নামক একটি দুর্গে আশ্রয় নেন এবং পরিপূর্ণ এক বছর অবস্থানের পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার পুত্র আহমদ সাইফুদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করে রাওতা দুর্গে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে তার পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি রাওতা দুর্গ খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করে পরিবার-পরিজনসহ তালীতলায় এসে বসবাস করতে থাকেন এবং এখানেই ৫৩৬ হিজরীতে (১১৪১-৪২ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপ মেজর্কা, মেয়র্কা, সার্দানিয়া ইত্যাদি

২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খ্রি.) ইসাম খাওলানী মেয়র্কা দ্বীপ জয় করেছিলেন এবং স্পেনের সুলতানের পক্ষ থেকে তিনি সেখানকার গভর্নরও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইসামের পর তার সেখানকার গভর্নর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর খলীফা নাসীর পুত্র মুয়াফফিককে উক্ত দ্বীপের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুয়াফফিক ফ্রান্স রাজ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেন। ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭০ খ্রি.) মুয়াফফিক মৃত্যুবরণ করেন। তারপর কাওসার নামীয় তার এক ভৃত্য মেয়র্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। মানসূর, মুকাতিল নামীয় তার এক ভৃত্যকে মেয়র্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৪০৩ হিজরীতে (১০১২-১৩ খ্রি.) মুকাতিল মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর মুজাহিদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আলী আমিরী মেয়র্কার গভর্নর নিযুক্ত হন। তারপর সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন আবদুল্লাহ্। তিনি ৪১৩ হিজরীতে (এপ্রিল ১০২২-মার্চ ১০২৩ খ্রি) সাদানিয়া জয় করে সেটাকে আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৫-৭৬ খ্রি) মুবাশশির নামীয় এক ব্যক্তি মেয়র্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত মেয়র্কা, মেনর্কা এবং সার্দানিয়া দ্বীপসমূহ কোন না কোন স্বাধীন রাজার অধীনে রয়েছে বলে মনে করা হতো। মুবাশশির সবগুলো দ্বীপকে নিজের অধীনে নিয়ে আসেন এবং ফ্রান্স উপকূলে অবতরণ করে বরাবর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। ফলে বার্সিলোনা ও ফ্রান্সের খ্রিস্টান রাজারা একজোট হয়ে মেয়র্কা দ্বীপকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। মুবাশশির আলী ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলীর সামরিক জাহাজসমূহ খ্রিস্টানদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। এরপর এ সমস্ত দ্বীপের শাসনক্ষমতা মুরাবিতীনদের হাতে চলে যায়। এরপর মুওয়াহহিদীনরা তা দখল করে নেয়। তাদের পর এই সমস্ত দ্বীপের শাসন ক্ষমতা খ্রিস্টানদের হাতে চলে যায়।

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টানদের দুঃসাহসিকতা ও বাড়বাড়ি এবং মুরাবিতীনদের শাসন

আদ্যোপান্ত ঘটনাসমূহের ক্রমধারায় একটা সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আমরা এখন কিছুটা পিছনে চলে যাচ্ছি। স্পেন উপদ্বীপের ইসলামী সাম্রাজ্যে যখন পতন দেখা দিল তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটলো। স্পেনের উত্তর সীমান্তের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ, যেগুলোর অস্তিত্ব মুসলমানদের দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করত, এবার নিজেদের উন্নতির ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি এবং মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ জিইয়ে রাখার ব্যাপারে খ্রিস্টানরা ছিল খুবই তৎপর। এ ক্ষেত্রে তারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি। চতুর্থ আলফোনসূ ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৪-৭৫ খ্রি) মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য স্বয়ং রণ প্রস্তুতি শুরু করেন। স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত খ্রিস্টান রাজ্য ছিল তাদেরকেও তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকেন এবং সমগ্র খ্রিস্টান রাজন্যকে নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। তিনি ৪৭৪ হিজরী (১০৮১ খ্রি) আল-কাদির বিল্লাহ-এর হাত থেকে টলেডো ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। টলেডোয় তিনি প্রথম প্রথম মুসলমানদেরকে পাদ্রীদের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু যখন তার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় অর্থাৎ একজন মুসলমানও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি তখন তিনি মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করেন। এমনকি তিনি মসজিদসমূহ ধ্বংস করে বড় বড় মসজিদগুলোকে গির্জায় রূপান্তর করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

অপরদিকে আরাগনের খ্রিস্টান সম্রাট ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে মুসলমান সৈন্যদের কাছ থেকে সারাকাস্তা ছিনিয়ে নেন এবং অবাধে সেখানকার মসজিদসমূহ ধ্বংস করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে মুসলমানরা বার বার খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করেছে, বিজয়ীবেশে তাদের শহরসমূহে প্রবেশ করেছে, কিন্তু একটি বারও তারা পাষাণের মত খ্রিস্টান মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করেনি। কিন্তু খ্রিস্টানরা এবার যখন মুসলমানদের শহরসমূহ জয় করল তখন তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শান্তিপ্রিয় প্রজা-সাধারণকে তাদের সন্তান, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধসহ পাইকারীভাবে হত্যা করল। এরপরও মুসলমানরা যখন কোথাও কোথাও খ্রিস্টানদের উপর জয়লাভ করেছে তখনও তারা খ্রিস্টানদের শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের উপর মোটেই হাত তোলেনি।

চতুর্থ আলফোনসূ টলেডো দখল করার পর সেভিল রাজ্যের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার দুঃসাহস দেখান। সেভিলের বাদশাহ মুতামিদ ইব্‌ন মুতাদিদ ইবাদী আলমেরিয়ার বাদশাহর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তাই তিনি অবিলম্বে করের অর্থ চতুর্থ আলফোনসূর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্যোগ নেন। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ আলফোনসূ মুতামিদের কাছে পয়গাম পাঠান : আমার স্ত্রী বর্তমানে গর্ভবতী। সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে কর্ডোভা মসজিদে রাখতে চাই যাতে সেখানেই সে সন্তান প্রসব করে। তুমি সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা কর এবং যুহরা প্রাসাদও তার জন্য খুলে দাও। ঐ সময়ে কর্ডোভা ছিল মুতামিদের শাসনাধীন। মুতামিদ আলফোনসূর ঐ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু যে ইহুদী দূত আলফোনসূর ঐ পয়গাম নিয়ে এসেছিল তিনি তাকে হত্যা করেন। চতুর্থ আলফোনসূ এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে ওয়াদিউল কবীর নদীর তীর ধরে অগ্রসর হন এবং সেভিলের উপকণ্ঠে তাঁবু স্থাপন করেন।

সেখানে থেকে তিনি মুতামিদকে লিখেন ঃ আমার জন্য শহর এবং মহল্লাসমূহ খালি করে দাও। মুতামিদ ঐ চিঠির উল্টো পৃষ্ঠায় এই মর্মে উত্তর দেন– আল্লাহ্ চাহেতো শীঘ্রই তোমাকে তোমার এই অশিষ্টতার স্বাদ ভোগ করতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়ে আল-ফোনসূর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি সেভিল আক্রমণ করার সাহস আর পাননি। তবে আপন গুপ্তচরদের মাধ্যমে সমগ্র স্পেন জুড়ে এই সংবাদ রটিয়ে দেন যে, মুতামিদ ইবাদী তার সাহায্যের জন্য ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে মরক্কো থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই সংবাদ রটানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, স্পেনের প্রধান কর্মকর্তারা তাদের দেশে মরক্কোর বাদশাহর আগমনকে মোটেই পছন্দ করতেন না বরং এটাকে তারা নিজেদের জন্য অপমানকর বলেই বিবেচনা করতেন। অথচ খ্রিস্টান বাদশাহদের সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদন, এমন কি খ্রিস্টানদেরকে কর প্রদান করতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন না। যাহোক উপরোক্ত সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সুলতানরা সেভিলের অধিপতি মুতামিদ ইব্‌ন মুতাদিদ ইবাদীর কাছে তিরস্কারমূলক ভাষায় পত্র লিখে তার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন, কেন ও কি উদ্দেশ্যে তিনি ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে স্পেনে ডেকে পাঠিয়েছেন? মুতামিদ সবার কাছে অতি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত উত্তর পাঠালেন :

"শূকরের দল পাহারা দেওয়ার চাইতে
উটের রাখালীই আমার কাছে পছন্দনীয়।"

তাঁর এ কথার মর্মার্থ ছিল এই যে, আলফোনসূ আমাকে বন্দী করে নিয়ে শূকর চরানোর কাজে নিয়োজিত করবেন। আর ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন স্পেনে এসে যদি স্বয়ং তা দখল করে নেন এবং আমাকে বন্দী করে মরক্কো নিয়ে যান তাহলে সেখানে আমাকে উট চরানোর কাজই দেওয়া হবে। অর্থাৎ ইউসুফের কাছে বন্দী হওয়াটা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু আলফোনসূর কাছে বন্দী হওয়াটা সহ্য করতে পারি না। তারপর মুতামিদ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে এসে পৌঁছেন। আলফোনসূ এই পরাক্রমশালী শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি চতুর্দিক

থেকে দক্ষ ও দুঃসাহসী বীর যোদ্ধাদের সংগ্রহ করে ষাট হাজার সৈন্যর একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। নিজের এই বিরাট বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করে আলফোনসূ গর্বভরে বলেছিলেন : যদি আমার মুকাবিলায় আসমান থেকে ফেরেশতারাও নাযিল হয় তাহলে তাদেরকেও আমার এই বাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করতে হবে। তারপর আলফোনসূ সেভিলে অবস্থানরত ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তিনি তার বিরাট সেনাবাহিনী ও অসাধারণ শক্তির উল্লেখ করে ইউসুফকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। ইউসুফ তার জনৈক কর্মকর্তা আবূ বকর ইব্‌ন কাসীরকে এই পত্রের উত্তর লেখার নির্দেশ দেন। আবূ বকর একটি অতি প্রামাণিক ও লম্বা-চওড়া পত্রের মুসাবিদা তৈরি করে ইউসুফের কাছে পেশ করেন। ইউসুফ তা দেখে বলেন, এত বেশি লেখার কি প্রয়োজন ছিল ? তারপর তিনি ঐ পত্রের পৃষ্ঠদেশে স্বহস্তে লিখে দেন ঃ

"যে জীবিত থাকবে সে দেখবে।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তর পড়ে আলফোনসূ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত যালাকা প্রান্তরে উভয় বাহিনী অবতরণ করে। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অপর দিকে খ্রিস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার।

৪৭৯ হিজরীর রজব (অক্টোবর ১০৮৬ খ্রি) মাসের কোন এক বুধবার যখন মুসলিম বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয় তখন আলফোনসূর এই মর্মে পয়গাম প্রেরণ করেন, আমি শনিবার দিন মুখোমুখি হবো। ইউসুফ ও মুতামিদ আলফোনসূর ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু আল-ফোনসূ ঐ পয়গাম পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতারণা করেছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর অজ্ঞাতেই শুক্রবার দিন হামলা করে বসেন। এতে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক ধরনের হতাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সামলে নিয়ে খ্রিস্টানদের হামলা প্রতিহত করে এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যায়। মুতামিদের পর পর তিনটি ঘোড়া নিহত হয়। কিন্তু তিনি অবিরাম লড়ে যেতে থাকেন। ইউসুফ যখন পূর্ণোধ্যমে হামলা করেন তখন খ্রিস্টানদের কাছে তা অসহ্যকর হয়ে ওঠে। আলফোনসূ এই যুদ্ধে আহত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি মাত্র কয়েকশ' সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যালাকা প্রান্তর থেকে পলায়ন করেন। এটা ৪৭৯ হিজরীর ২০শে রজব (অক্টোবর ১০৮৬ খ্রি) রোজ শুক্রবারের ঘটনা। এই বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী চারদিন অর্থাৎ ২৪শে রজব পর্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করে। মুতামিদ মালে গনীমতের হিসাব ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের খিদমতে পেশ করে নিবেদন করেন– বলুন কিভাবে এগুলোকে বণ্টন করা হবে। ইউসুফ উত্তর দেন– আমি তোমার সাহায্য করতে এসেছি, মালে গনীমত পাওয়ার জন্য আসিনি। যাহোক ইউসুফ ও মুতামিদ সেভিলে ফিরে আসেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর ইউসুফ আফ্রিকায় ফিরে যান। এই পরাজয়ের পর আলফোনসূ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কিন্তু মুসলিম শাসকরা খ্রিস্টানদের এই বিরাট পরাজয় থেকে মোটেই উপকৃত হয়নি। তারা পুনরায় গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা পুনরায় সাহসী হয়ে ওঠে এবং সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলমানদের দখল থেকে একটির পর একটি শহর ছিনিয়ে নিতে থাকে। তারা সেভিলের কিছু দুর্গ দখল করে নেয়।

৪৮১ হিজরীর রবিউল আউয়াল (জুন ১০৮৮ খ্রি) মাসে স্পেনের শাসকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের পুনরায় স্পেনে আসতে হয়। কিন্তু এবার স্পেনের মুসলমানরা অপমান ও দুর্ভাগ্যের সেই স্তরে নেমে যায় যে, ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের সাথে থেকেই ক্যাম্পে অবস্থান করেও পারস্পরিক বিরোধ ও হানাহানির কথা ভুলে থাকতে পারেনি। ইউসুফ তাদের এই অবস্থা লক্ষ্য করে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মরক্কো চলে যান।

দু'বছর পর অর্থাৎ ৪৮৩ হিজরী (মার্চ ১০৯০-ফেব্রুয়ারি ১০৯১ খ্রি) সনে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পুনরায় স্পেনে আসেন। কেননা স্পেনের শাসকরা তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বলেই মনে করত এবং খ্রিস্টানদেরকে তাদের রাজ্যে হামলা করার সম্ভাবনা দেখলেই ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনে সাহায্য প্রার্থনা করত। এবার ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতে করতে টলেডো শহরের সম্মুখে গিয়ে পৌঁছেন এবং শহরকে অবরোধ করে ফেলেন। চতুর্থ আলফোনসূ টলেডো শহরকে রাজধানী করে নিয়েছিলেন এবং তখন তিনি সেখানেই বিদ্যমান ছিলেন। ইউসুফ টলেডো ঘেরাও করে স্পেনের শাসকদের সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু তাদের কেউই তাকে সাহায্য করেনি। বিশেষ করে গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ্ ইবন বুলুক্কীন– যার এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালনের কথা, ইউসুফের ডাকে মোটেই সাড়া দেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ইউসুফ অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে টলেডো থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার তিনি স্পেনের শাসকদের কিছুটা শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে এটা তাঁর জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল। তিনি গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই মালাগার শাসক তামীমকে বন্দী করে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন।

তারপর ৪৮৩ হিজরীর রমযান (নভেম্বর ১০৯০ খ্রি) মাসে ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন আপন ভাতিজা ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কসহ সায়র ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন তাশুফীনকে তার বাহিনীসহ স্পেনে রেখে আফ্রিকায় ফিরে যান। সায়র আলফোনসূর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং বেশ কয়েকটি অঞ্চল তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। এই যুদ্ধে সায়র ইব্‌ন আবী বকরের সাহায্য করা মুসলমান শাসকদের জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা খ্রিস্টানদেরকে দমনের জন্যই ইউসুফ সায়রকে স্পেনে রেখে গিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও স্পেনের হতভাগ্য শাসকরা সায়রকে সাহায্য করতে বা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সায়র ইব্‌ন আবী বকর স্পেনের শাসকদের এই নির্বুদ্ধিতার প্রতি দৃকপাত না করে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আপন বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে এবং পর্তুগাল প্রদেশসহ স্পেনের একটি বিরাট অংশ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। কোন কোন খ্রিস্টান শাসক তাঁর বশ্যতাও স্বীকার করে। যখন এই সেনানায়কের দখলে দেশের একটি বিরাট অঞ্চল এসে গেল এবং তিনি স্পেনে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হলেন তখন তিনি ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের কাছে লিখেন– স্পেন উপদ্বীপের একটি বিরাট অংশ আমরা খ্রিস্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। কিন্তু স্পেনের মুসলমান শাসকরা এ ক্ষেত্রে আমাকে মোটেই সাহায্য করেনি। তারা আমাদের পরিবর্তে খ্রিস্টানদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদের এই আচরণ ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করেছে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন সায়র ইব্‌ন আবী বকরকে লিখলেন– তুমি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং স্পেনের শাসকদের কাছে পুনরায় সাহায্য চাও। যদি তারা তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসে তাহলে ওদের সাহায্য গ্রহণ কর। আর যদি খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় ওরা তোমার সাহায্য না করে এবং তোমার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতিও না দেখায় তাহলে তুমি ওদের রাজ্য ছিনিয়ে নাও। কিন্তু একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। প্রথমত তুমি ঐসব মুসলমান শাসকের রাজ্যসমূহ দখল করবে, যেগুলো খ্রিস্টান রাজ্যের সীমান্তে রয়েছে, যাতে করে কোন অঞ্চল মুসলমানদের দখল থেকে বের হয়ে পুনরায় আবার খ্রিস্টানদের দখলে চলে না যায়। সায়র ইব্‌ন আবী বকর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি সর্ব প্রথম সারাকাস্তার বাদশাহ ইব্‌ন হূদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এটা ছিল ঐ সময়, যখন সারাকাস্তা ইতিমধ্যেই খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। সারাকাস্তার মুসলমান বাদশাহ রাওতা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং শুধু এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলই তার দখলে ছিল। সায়র অতি সহজেই রাওতা জয় করেন। তারপর ৪৮৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে (ডিসেম্বর ১০৯১ খ্রি) তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন তাহিরের কাছ থেকে মার্সিয়া ছিনিয়ে নেন এবং তাকে গ্রেফতার করে আফ্রিকার দিকে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি আলমেরিয়া এবং বাতলিউস জয় করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে কার্মুনা, বিজাহ, বালাত, মালাগা, কর্ডোভা প্রভৃতি স্থান দখল করা হয়। সেভিলের বাদশাহ মুতামিদ মুরাবিতীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। স্পেনের তৎকালীন বাদশাহদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশীল। মুতামিদ চতুর্থ আলফোনসূর কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং আলফোনসূ তার সাহায্যার্থে একটি বাহিনীও প্রেরণ করেন। এই সাহায্যকারী বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে সেনাপতি সায়র ইব্‌ন আবী বকর একদিকে সেভিল অবরোধ করেন এবং অন্যদিকে খ্রিস্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য একজন অধিনায়ক পাঠিয়ে দেন। ঐ অধিনায়ক খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে সায়র ইব্‌ন আবী বকর সেভিল জয় করে মুতামিদকে তার পরিবার-পরিজনসহ বন্দী করে আফ্রিকা পাঠিয়ে দেন। মুতামিদ সেখানে নজরবন্দী অবস্থায় থেকে ৪৮৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মার্চ ১০৯৫ খ্রি) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন কর্তৃক স্পেন দখল

৪৮৫ হিজরীতে (১০৯২ খ্রি.) সমগ্র মুসলিম স্পেন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের দখলে চলে আসে। তাই স্পেনে সামন্ত শাসনেরও অবসান ঘটে। ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন মুরাবিতীন সম্রাটের ভাইসরয় ও গভর্নর হিসাবে স্পেন শাসন করতে থাকেন। এভাবে যে দেশটি টুকরা টুকরা হয়ে খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাবার উপক্রম হয়েছিল, মরক্কোর মুসলমান বাদশাহের দখলে এসে তা রক্ষা পায়। ফলে খ্রিস্টানদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখনও স্পেনের উত্তরাঞ্চল খ্রিস্টানদের দখলে ছিল। তবে এর সিংহভাগ তথা উর্বর দক্ষিণাঞ্চল মুসলমানদেরই অধিকারে ছিল। ৪৭৯ হিজরীতে (এপ্রিল ১০৮৬-মার্চ '৮৭ খ্রি) বাগদাদের খলীফা মুকতাদী বিআমবিল্লাহ ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য পতাকা ও রাজকীয় পদক উপহার দেন।

ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের মৃত্যু

স্পেনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন ১৫ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ৫০০ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১১০৬-আগস্ট ১১০৭ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়। এই যুগে স্পেনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। যদিও স্পেনের আরব বংশীয় মুসলমানদের মুরাবিতীনদের শাসনের প্রতি কিছুটা অনীহা ছিল এই কারণে যে, বার্বাররা আরব বংশোদ্ভূতদের উপর শাসন পরিচালনা করুক এটা তারা সহজে মেনে নিতে রাজী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। কেননা বার্বার মুসলমানরা তাদের শাসক না হলে তাদেরকে খ্রিস্টানদেরই দাসত্ব করতে হতো।

আবুল হাসান আলী ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন

আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আবুল হাসান আলী ইব্‌ন ইউসুফ তেত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫০৩ হিজরীতে (১১০৯-১০ খ্রি) আলী ইব্‌ন ইউসুফ টলেডো ঘেরাও করেন। কিন্তু সুদৃঢ় প্রাচীর ও বিচিত্র ধরনের অবস্থান হেতু দুর্গটি জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আলী ইব্‌ন ইউসুফ ওয়াদিউল হিজারাহ এবং তার পার্শ্ববর্তী বেশির ভাগ শহরই জয় করেন। ঐ বছরই বাশূনা (লাসীন) এবং পর্তুগালের অবশিষ্ট শহরসমূহও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আলী ইব্‌ন ইউসুফ তাঁর ভাই তামীম ইব্‌ন ইউসুফকে স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেছিলেন। বার্সিলোনার সম্রাট ও রূমেরের পুত্র প্রথম আলফোনসূর যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে তামীম তার উপর হামলা চালান। ফলে তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। তারপর তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে সারাকাস্তা ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি করেন। বার্সিলোনার সম্রাট ফ্রান্সের সম্রাটকে তার সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ৫১২ হিজরীতে (মে ১১১৮-এপ্রিল '১৯ খ্রি.) সারাকাস্তা অবরোধ করেন। সমরাস্ত্রের পরিমাণ ও সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে খ্রিস্টান বাহিনী এতই শক্তিশালী ছিল যে, সারাকাস্তার মুসলমানরা তাদের মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারেনি। রসদ-সামগ্রীর অভাবের দরুন যখন তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো তখন বাধ্য হয়ে নগরীর দরজা খুলে দেয়। এভাবে সারাকাস্তা খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। তারপর খ্রিস্টানরা ঐ প্রদেশের অন্যান্য শহর ও দুর্গ জয় করে ফেলে।

আলী ইব্‌ন ইউসুফের কাছে যখন এই দুঃখজনক সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি ৫১৩ হিজরী (এপ্রিল ১১১৯-মার্চ '২০ খ্রি) স্পেনে আসেন এবং সেভিল ও কর্ডোভা হয়ে সারাকাস্তায় গিয়ে পৌঁছেন। তারপর তিনি খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালিয়ে যে সমস্ত অঞ্চল তারা ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছিল তা মুক্ত করেন। তিনি খ্রিস্টানদের সমুচিত শিক্ষা দেন এবং তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে ৫১৫ হিজরীতে (মার্চ ১১২১-ফেব্রুয়ারী ১১২২ খ্রি) মরক্কোয় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বার্সিলোনার সম্রাট প্রথম আলফোনসূ তখনো জীবিত ছিলেন। ইতোমধ্যে তাকে ইব্‌ন 'রূমীর' বলে উল্লেখ করা হয়। আলী ইব্‌ন ইউসুফ স্পেন থেকে মরক্কোয় প্রত্যাবর্তনের সাথে ইব্‌ন রূমীর মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তার এই আক্রমণের কারণ ছিল এই যে, গ্রানাডার খ্রিস্টান অধিবাসীরা তাকে লিখেছিল– তুমি গ্রানাডা আক্রমণ করো, আমরা তোমার এই আক্রমণকে ফলপ্রসূ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। অতএব ইব্‌ন রূমীর একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা পর্যন্ত

পৌঁছেন। মূলত ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীন খ্রিস্টানদের বিজয়াকাঙ্ক্ষাকে একেবারে অবদমিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তারা মুরাবিতীনদেরকে খুব ভয় করত। কিন্তু স্বয়ং স্পেনের কিছু সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী মুরাবিতীনদের সাথে শত্রুতা এবং খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করত। ওদের এই হীনমনা আচরণের কারণে খ্রিস্টানদের সাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা সেনাবাহিনী নিয়ে মুরাবিতীনদের মুকাবিলা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। ইব্‌ন রূমীর আক্রমণও ছিল এ পটভূমিতেই। কিন্তু ৫১৫ হিজরীর যিলহজ্জ (ফেব্রুয়ারী ১১২২ খ্রি) মাসে তামীম ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের নেতৃত্বে মুসলমানরা তাকে এমনভাবে পরাজিত করে যে, তিনি তার অর্ধেক সৈন্য ধ্বংস করে বার্সিলোনার দিকে পালিয়ে যান। গ্রানাডা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় অধিকসংখ্যক খ্রিস্টান বসবাস করত এবং তারা সব সময়ই মুসলমানদের বিরোধিতা করত এবং খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহদের পক্ষে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করত। এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ইব্‌ন ইউসুফ ৫১৬ হিজরীতে (মার্চ ১১২২-ফেব্রুয়ারী ১১২৩ খ্রি) স্বয়ং স্পেনে আসেন এবং গ্রানাডা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বহু খ্রিস্টানকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন। কিছুসংখ্যক খ্রিস্টানকে স্পেনের অপরাপর অঞ্চলেও স্থানান্তর করা হয়।

৫২০ হিজরীতে (১১২৬ খ্রি.) আবূ তাহির তামীম ইব্‌ন ইউসুফ তার পুত্র তাশুফীন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন তাশুফীনকে স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেন। ছত্রিশ বছর সাত মাস মরক্কো ও স্পেনের উপর শাসন পরিচালনা করার পর ৫৩৭ হিজরীর রজব (ফেব্রুয়ারী ১১৪৩ খ্রি) মাসে আলী ইব্‌ন ইউসুফ ইনতিকাল করেন।

আবূ মুহাম্মাদ তাশুফীন

ইউসুফের ইন্তিকালের পর তার পুত্র আবূ মুহাম্মাদ তাশুফীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫১৬ হিজরীতে (মার্চ ১১২২-ফেব্রুয়ারী ১১২৩ খ্রি) আলী ইব্‌ন ইউসুফ শেষ বারের মত স্পেনে এসেছিলেন। তারপর তিনি আর স্পেনে আসতে পারেননি। বরং তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ওরফে মাহ্‌দী মাওউদ (প্রতিশ্রুতি মাহ্‌দী)-এর ঝগড়ায় ব্যাপৃত থাকেন। মুসলমানদের এই একটি নতুন শত্রু মরক্কোয় জন্মগ্রহণ করেছিল। তার সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সে দিন দিন প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, আলীর পুত্র আবূ মুহাম্মদ তাশুফীনও পিতার পর সিংহাসনে আরোহণ করতেই মরক্কোর অভ্যন্তরীণ ফিতনা-হাঙ্গামায় এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন যে, স্পেনের দিকে লক্ষ্য করার কোন অবকাশই পাননি।

তাশুফীন ইব্‌ন আলী

৫৩৭ হিজরীতে (১১৪২-৪৩ খ্রি.) তাশুফীন ইব্‌ন আলী স্পেন থেকে মরক্কোয় গিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন গালিয়াহকে স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেন। ইয়াহইয়া যথাসম্ভব স্পেনকে রক্ষা করেন এবং খ্রিস্টানদের শক্তি অবদমনে ব্যাপৃত থাকেন। এদিকে দিন দিন মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের মধ্যে অধঃপতনের চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ৫৩৯ হিজরীর ২৭শে রমযান (মার্চ ১১৪৫ খ্রি.) তাশুফীন ইব্‌ন আলী আবদুল মু'মিনের কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

ইবরাহীম ইব্‌ন তাশুফীন

তাশুফীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন তাশুফীন মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে মুরাবিতীন শাসনের অবসান ঘটে। স্পেনে যখন আবদুল মু'মিনের দুঃসাহসিকতা এবং মুরাবিতীনদের পরাজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছে তখন খ্রিস্টানরা পুনরায় অত্যন্ত জোরেশোরে মুসলিম অধিকৃত এলাকাসমূহের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে শুরু করে।

৫২৮ হিজরীতে (১১৩৪ খ্রি.) ইব্‌ন রূমীর কিছুসংখ্যক শহর দখল করলে ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলী তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ান এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইব্‌ন রূমীরকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি পুনরায় ইসলামী সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

স্পেনের উপর মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের পতনের প্রতিক্রিয়া

মুরাবিতীন সাম্রাজ্য ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার সংবাদ শুনে স্পেনের শাসকরা এখানে সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। খিলাফতে বনূ উমাইয়া ধ্বংস হওয়ার পর যেমন স্পেনে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল ঠিক তেমনি মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের পতনের পরও স্পেনের প্রত্যেকটি শহর এবং প্রত্যেকটি দুর্গের শাসনকর্তা বা অধিপতিরা নিজ নিজ এলাকার স্বাধীন শাসকে পরিণত হন– এবং দেশব্যাপী প্রচুর স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। বলতে গেলে প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি জনবসতি এক একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় এবং সেখানকার শাসকরা আপন আপন মর্জিমাফিক বিভিন্ন উপাধিও গ্রহণ করেন। আর সবচেয়ে আক্ষেপের ব্যাপার হলো, তারা একে অন্য থেকে শুধু পৃথক হয়ে যাননি বরং একে অন্যের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। ফলে সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিস্টানদের জন্য এটাই ছিল সমগ্র স্পেন দখল করার একটি মোক্ষম মুহূর্ত। স্পেনের ভাইসরয় খোদ ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলীও কর্ডোভা দখল করে নিজেকে স্বাধীন রাজাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাই স্বাভাবিকভাবে তিনিও অন্য রাজাদের চাইতে শক্তিশালী ছিলেন না। এই অবস্থায় মুওয়াহহিদীন নেতা আবদুল মু'মিন মুরাবিতীন সেনাপতিকে স্পেনের দিকে প্রেরণ করেন এবং ৫৪২ হিজরীতে (১১৪৭-৪৮ খ্রি) স্পেনের উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাধীন রাজ্যসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং স্পেন ধীরে ধীরে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

মুরাবিতীনদের শাসনামলে ফকীহ্‌দের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ইউসুফ এবং আলী উভয়েই মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা ফকীহ্‌দেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী শাসক। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁরা দর্শন ও ইল্‌মে কালামের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ান। কাযী আয়ায ইমাম গায্‌যালীর বিরুদ্ধে শাহী দরবারে এমনভাবে অভিযোগ পেশ করেন, যার ফলে শাহী দরবার থেকে সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে এক নির্দেশ জারি করা হয় যে, এখন থেকে যার কাছেই ইমাম গায্‌যালীর লেখা কোন পুস্তক-পুস্তিকা পাওয়া যাবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।

নবম অধ্যায়

স্পেনে মুওয়াহ্হিদীন শাসন

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তুমার্ত

মুহাম্মাদ ইব্ন আবুদল্লাহ্ ইব্ন তুমার্ত, যিনি ইব্ন তুমার্ত নামে বিখ্যাত ছিলেন, মরক্কোর সূস এলাকার একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বার্বার গোত্র 'মাসমূদাহ'-এর লোক ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি দাবি করেন যে, তিনি আলী ইব্ন আবী তালিবের বংশধর। তিনি হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিব পর্যন্ত তাঁর একটি বংশ তালিকাও তৈরি করেন।

৫০১ হিজরীতে (আগস্ট ১১০৭-জুলাই ১১০৮ খ্রি) ইব্ন তুমার্ত আপন জন্মভূমি সূস থেকে প্রাচ্যের দেশসমূহে চলে যান এবং বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে চৌদ্দবছর পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থান করেন। তিনি আবূ বকর শাশীর কাছ থেকে উসূলে ফিকাহ ও ধর্মীয় বিষয় এবং মুবারক ইব্ন আবদুল জব্বার ও অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীর কাছ থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন।

ইমাম গায্যালী (র)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন তুমার্ত হযরত ইমাম গায্যালীর সান্নিধ্য লাভেও ধন্য হন। ইব্ন তুমার্ত ইমাম গায্যালীর খিদমতে উপস্থিত ছিলেন এমন সময়ে একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম গায্যালীর কাছে নিবেদন করে— মরক্কো ও স্পেনের শাসক আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীন আপনার কিতাবসমূহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন ইমাম গায্যালী বলেন, তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমার ধরণা এই ধ্বংসকার্য যে ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হবে তিনি এখন আমার এই মজলিসে উপস্থিত রয়েছেন। ইমাম গায্যালী এই কথা বলার সময় ইব্ন তুমার্তের দিকে ইঙ্গিত করেন। সেই দিন থেকেই ইব্ন তুমার্তের অন্তরে এই ইচ্ছা জন্ম নিল যে, তিনি মুরাবিতীনদের ঐ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবেন, যারা গোঁড়ামির অনুসারী এবং ঔদার্যের শত্রু। তিনি তখনি তাঁর জন্মভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানেও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় প্রতিরোধের কাজ চালিয়ে যান। এই অপরাধে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক তাঁকে শহর থেকে বের করে দেন। মোটকথা ইব্ন তুমার্তের এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি জনসাধারণকে সত্যের উপদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সব সময়ই ছিলেন আপোসহীন। তিনি ইবাদতগুযার, সংসারবিমুখ ও একজন আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। ইব্ন তুমার্তের আকীদা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আশাইরা, মুতাকাল্লিমীন এবং

ইমামিয়াদের মিলন ক্ষেত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী পরহিযগার ব্যক্তি। তাঁর পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। তাঁকে সব সময়ই প্রফুল্ল দেখা যেত। তিনি ছিলেন রিয়াযত ও সাধনার প্রতি অনুরাগী। ইব্ন তুমার্ত অলংকার সমৃদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। মরক্কোর ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষা। ৫১৫ হিজরীতে (এপ্রিল ১১২১-মার্চ '২২ খ্রি) তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং জনসাধারণকে ওয়ায-নসীহত করতে থাকেন।

ইব্ন তুমার্তের বিশিষ্ট শিষ্য আবদুল মু'মিন

ঐ সময়ে বার্বার গোত্রের আবদুল মু'মিন নামীয় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ও শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাভাবিক আচার-আচরণ এবং ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে ইব্ন তুমার্তের সাথে আবদুল মু'মিনের অপূর্ব মিল ছিল। ধীরে ধীরে প্রচুর সংখ্যক লোক ইব্ন তুমার্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমীরুল মু'মিনীনের ফকীহরা ইব্ন তুমার্তকে হত্যা করার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু আলী ইব্ন ইউসুফ উত্তরে বলেন,আমি তো তাঁকে হত্যা করার কোন কারণ দেখি না। শেষ পর্যন্ত ফকীহদের চাপ সৃষ্টির ফলে আবদুল মু'মিনকে মরক্কো শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়। ইব্ন তুমার্ত তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এটলাস পর্বতমালার একটি পল্লীতে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে বার্বার গোত্রের লোকেরা দলে দলে তাঁর জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

ইব্ন তুমার্তের মাহ্দী হওয়ার দাবি

কিছুদিন পর ইব্ন তুমার্ত নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহ্দী বলে দাবি করেন এবং আপন শিষ্যদের মধ্যে স্তর বিন্যাস করেন। তিনি প্রথম স্তরের লোকদেরকে 'মুহাজিরীন' এবং দ্বিতীয় স্তরের লোকদেরকে 'মু'মিনীন' উপাধি দেন। এভাবে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাত কিংবা আটটি স্তরে বিভক্ত করেন। যখন দল ভারী হলো তখন তিনি আবদুল মু'মিনকে সেনাপতি নিয়োগ করে মুরাবিতীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেন। প্রথম সংঘর্ষে মু'মিনীনের দল পরাজিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালেও তারা শক্তি পরীক্ষার ধারা অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, মরক্কোর একটি অংশ ইব্ন তুমার্তের দখলে চলে আসে। ইব্ন তুমার্ত ৫১৭ হিজরীতে (মার্চ ১১২৩-ফেব্রুয়ারী '২৪ খ্রি) যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিলেন। সাত বছর যুদ্ধ পরিচালনার পর তিনি ৫২৪ হিজরীতে (১১৩০ খ্রি.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মু'মিনকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধি দিয়ে আপন অলীআহদ ও স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন মুরাবিতীনের মুকাবিলায় ইব্ন তুমার্তের হুকুমত বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

আবদুল মু'মিন

আবদুল মু'মিনের পিতার নাম ছিল আলী। আলী ছিলেন মাসমূদাহ গোত্রসমূহের অন্তর্গত কুমিয়াহ গোত্রের অধঃস্তন পুরুষ। আবদুল মু'মিন ৪৮৭ হিজরীতে (১০৯৪ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। ৫৩৭ হিজরীতে (১১৪২-৪৩ খ্রি) আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশুফীনের মৃত্যু হলে আবদুল মু'মিনের হুকুমত পুরোপুরিভাবে সমগ্র মরক্কোয় স্বীকৃতি লাভ করে। যেহেতু ইব্ন

তুমার্‌তের শিক্ষার সারকথা ছিল পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র তাওহীদকে স্বীকার করা এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে তাঁর সত্তা থেকে পৃথক জ্ঞান না করা– তাই সমগ্র শিষ্যকে সাধারণভাবে মুওয়াহহিদীন (একাত্ববাদী) নামে অভিহিত করা হতো।

আবদুল মু'মিন কর্তৃক স্পেন দখলের বিশদ বিবরণ

মরক্কোর শাসন ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে করায়ত্ত করার পর ৫৩৬ হিজরীতে (১১৪১-৪২ খি) আবদুল মু'মিন, আবূ ইমরান মূসা ইব্‌ন সাঈদ নামীয় তাঁর এক অধিনায়ককে স্পেনের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি সর্ব প্রথম 'তারীফ' দ্বীপ দখল করেন। ৫৪১ হিজরীতে (১১৪৬-৪৭ খ্রি) স্বয়ং আবদুল মু'মিন স্পেনে আগমনের সংকল্প নেন। কিন্তু ঠিক রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মরক্কোর পূর্ব সীমান্তে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সংবাদ শুনে যাত্রা বিরতি করেন। অবশ্য তাঁর পুত্রদেরকে তিনি স্পেন অভিমুখে রওয়ানা করান। আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন আসসীরাহ জয় করেছিলেন। ৫৪৫ হিজরীতে (মে ১১৫০-এপ্রিল ১১৫১ খ্রি) যখন খ্রিস্টানরা কর্ডোভা অবরোধ করে রেখেছিল তখন আবদুল মু'মিনের জনৈক অধিনায়ক ইয়াহইয়া ইব্‌ন মায়মূন খ্রিস্টানদের তাড়িয়ে দিয়ে তা জয় করে নিয়েছিলেন। ৫৪৮ হিজরীতে (এপ্রিল ১১৫৩-৫৪ খ্রি) আবদুল মু'মিন জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে এসে উপনীত হন এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। শহরটির নামকরণ করা হয় আল-ফতেহ্। সেখানে স্পেনের সকল শাসক এবং অধিনায়করা আবদুল মু'মিনের খিদমতে এসে হাযির হয় এবং তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে সমগ্র মুসলিম স্পেন পুনরায় একটি একক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রি.) আবদুল মু'মিন তাঁর পুত্র আবূ সাঈদকে গ্রানাডার শাসক এবং সমগ্র মুসলিম স্পেনের ভাইসরয় নিয়োগ করেন। ৫৫৬ হিজরীতে (১১৬১ খ্রি.) আবূ সাঈদকে পিতার কাছে মরক্কোয় চলে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ইবরাহীম নামীয় জনৈক ব্যক্তি গ্রানাডা দখল করে নেয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সংবাদ শুনে আবূ সাঈদ আপন ভাই আবূ হিফসসহ স্পেনে আগমন করেন। ইবরাহীম গ্রানাডা থেকে বের হয়ে আবূ সাঈদের মুকাবিলা করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আবূ হিফস নিহত হন এবং আবূ সাঈদ পরাজিত হয়ে মালাগায় গিয়ে অবস্থান নেন। ইবরাহীমের জামাতা মারদীনশ মুর্সিয়া ও জিয়ানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইবরাহীমের পক্ষাবলম্বন করেন। ফলে সমগ্র স্পেন সাম্রাজ্যে পুনরায় অব্যবস্থা ও অশান্তি দেখা দেয়। ৫৫৭ হিজরীতে (১১৬২ খ্রি) আবদুল মু'মিন তাঁর তৃতীয় পুত্র আবূ ইয়াকূব এবং সামরিক অধিনায়ক শায়খ আবূ ইউসুফ ইব্‌ন সুলায়মানকে আবূ সাঈদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এ দিকে আবূ সাঈদও মালাগায় যথেষ্ট সংখ্যক সৈন সংগ্রহ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গ্রানাডার সন্নিকটে পুনরায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুওয়াহহিদীন বাহিনী জয়লাভ করে। মারদীনশ জিয়ানের দিকে পালিয়ে যান। ইবরাহীম ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। এই বিদ্রোহ দমনের পর আবদুল মু'মিনের জন্য দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ বাকি ছিল না। এবার তিনি আফ্রিকা ও স্পেনে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। মরক্কোয় তিন লক্ষ সৈন্য আবদুল মু'মিনের পতাকা তলে সমবেত হয় এবং স্পেনে প্রায় দু' লক্ষ মুসলমান জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আবদুল মু'মিন এই পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে স্পেনের উত্তর

সীমান্তের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ জয় করে তারপর সমগ্র ইউরোপকে পদানত করার সংকল্প নেন। আবদুল মু'মিনের আয়ু তাঁর অনুকূলে থাকলে তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই জিহাদে অবশ্যই সাফল্য লাভ করতেন। কিন্তু তিনি তার এই বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে ৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রি.) শেষ জুমুআর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবূ ইয়াকূব

আবদুল মু'মিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবূ ইয়াকূব ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবদুল মু'মিন তাঁর যে অভিযানটি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছিলেন কোন কোন অভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এদিকে জিয়ান ও মার্সিয়ার শাসনকর্তা মারদীনশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে খ্রিস্টানদের হাতকে মজবুত করেন। আবূ ইয়াকূব মরক্কো থেকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেভিলে আসার পরই মার্সিয়া ও জিয়ানের শাসক মারদীনশ মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্ররা এসে তাদের পিতার সমগ্র এলাকা আবূ ইয়াকূব ইউসুফের হাতে অর্পণ করে। তারা আবূ ইয়াকূবের আনুগত্য এবং বশ্যতাও স্বীকার করে।

আবূ ইয়াকূব ইউসুফও তাদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন এবং তাদেরকেই তাদের পিতার অধিকৃত এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তারপর আবূ ইয়াকূব পশ্চিমাঞ্চলীয় খ্রিস্টানদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং যে সমস্ত মুসলিম এলাকা তারা ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছিল তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনেন। এরপর তিনি টলেডো অবরোধ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর অনিবার্য কারণবশত অবরোধ উঠিয়ে মরক্কোয় চলে যান। ৫৮০ হিজরীতে (এপ্রিল ১১৮৪-মার্চ ১১৮৫ খ্রি) শান্তারীন শহরের খ্রিস্টানরা পুনরায় বিদ্রোহ করে। আমীরুল মু'মিনীন আবূ ইয়াকূব ইউসুফ স্পেনে এসে শান্তারীন অবরোধ করেন। এই অবস্থায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমীরুল মু'মিনীন ইউসুফ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৫৮০ হিজরীর ৭ই রজব (অক্টোবর ১১৮৪ খ্রি) শনিবার দিন ইনতিকাল করেন। তাঁর মরদেহ প্রথমে সেভিলে তারপর সেখান থেকে মরক্কোয় নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

আবূ ইয়াকূবের শাসনকাল সম্পর্কে পর্যালোচনা

আবূ ইয়াকূবের পর তাঁর পুত্র আবূ ইউসুফ 'মানসূর বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবূ ইয়াকূব ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবান, জ্ঞানানুরাগী এবং উদারচিত্ত। আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন তুফায়ল, যাঁকে দর্শন ও ইল্মে কালামের ইমাম মনে করা হতো, আবূ ইয়াকূবের সভাসদ ও বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন আলিম আবূ বকর ইব্ন সানি, ওরফে ইব্ন মাজাহও ছিলেন আবূ ইয়াকূবের উপদেষ্টাদের অন্যতম। এছাড়াও আরো অনেক বড় বড় আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি আবূ ইয়াকূবের দরবারকে অলংকৃত করতেন। আবূ তুফায়লের পরামর্শে আমীরুল মু'মিনীন আবূ ইয়াকূব আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন রুশদকে কর্ডোভা থেকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সভাসদ নিয়োগ করেন। ইনি হচ্ছেন সেই ইব্ন রুশদ, যিনি ছিলেন দর্শনের প্রখ্যাত ইমাম এবং এরিস্টটলের রচনাসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ও নিখুঁত পর্যালোচনাকারী। এখনো সমগ্র বিশ্বে ইব্ন রুশদ

একটি অতি পরিচিত নাম। আবূ ইয়াকূবের শাসনকালে মরক্কো থেকে ত্রিপোলী পর্যন্ত আফ্রিকার দেশসমূহ, সমগ্র স্পেন ভূখণ্ড, সিসিলী দ্বীপ এবং রোম সাগরের অন্যান্য দ্বীপ মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মুওয়াহহিদীন সুলতান তখন বিশ্বের বিখ্যাত সুলতানদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

আবূ ইউসুফ মানসূর

আবূ ইয়াকূবের পর তাঁর পুত্র আবূ ইউসুফ মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। তিনি সাহিরাহ নামীয় জনৈক খ্রিস্টান মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মানসূরের শাসনামলে মুসলমানরা স্পেনের সর্বত্রই অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল। মানসূর সব দিক দিয়েই তাঁর পিতার মত ছিলেন। তিনি উলামা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। বইপত্রের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল অসাধারণ। যেভাবে ইয়াকূব কখনো স্পেনে, আবার কখনো মরক্কো থাকতেন, মানসূরও তেমনি উভয় জায়গায়ই থাকতেন তবে তিনি তাঁর শাসনামলের বেশির ভাগ সময় স্পেনেই অতিবাহিত করেন। ৫৮৫ হিজরীতে (১১৮৯ খ্রি.) মানসূর স্পেনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে খ্রিস্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মুছে ফেলেন। টলেডোর সম্রাট দ্বিতীয় আলফোনসূ মানসূরের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন খ্রিস্টানরা ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ থেকে জোট বেঁধে এসে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন আক্রমণ করছিল। টলেডোর সম্রাট দ্বিতীয় আলফোনসূ এই আশঙ্কায় যে, মানসূর তার নাম-নিশানা মুছে ফেলবেন, তাঁর (মানসূরের সাথে) কাছে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানান, যাতে করে এই সময়কালের মধ্যে ক্রুসেড যোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ শেষ করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। কেননা স্বয়ং স্পেনেরও অনেক খ্রিস্টান সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের ক্রুসেড যুদ্ধে তখন অংশগ্রহণ করছিল।

মানসূরের নৌশক্তিও ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। এ জন্য সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী মানসূরের কাছে আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুনকিদ নামীয় উচ্চপর্যায়ের একজন কবিকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। দূতের সাথে প্রেরিত একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন– খ্রিস্টানবাহিনী ফিলিস্তীন আক্রমণ করেছে। এ সময় যদি আপনি আপনার যুদ্ধ জাহাজসমূহ মুসলমানদের সাহায্যার্থে পাঠান এবং ফিলিস্তীন উপকূল রক্ষার্থে সাহায্য করেন, তাহলে অতি সহজেই খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করা যেতে পারে। ঐ চিঠিতে সুলতান সালাহউদ্দীন মানসূরকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে সম্বোধন করেননি। কেননা সুলতান সালাহউদ্দীন শুধু বাগদাদের খলীফাকেই খলীফাতুল মুসলিমীন বলে মনে করতেন। যা হোক এতে মানসূর কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। অবশ্য ইব্‌ন মুনকিদকে তিনি বেশ আদর-আপ্যায়ন করেন এবং একটি কাসীদার বদলে তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেন। কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর কাছে যে সাহায্য চেয়েছিলেন সে ব্যাপারে তিনি খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। টলেডোর সম্রাট দ্বিতীয় আলফোনসূ পঞ্চবার্ষিকী চুক্তির মেয়াদকালে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। কেননা তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কখনো আক্রমণ করবে না। এই অবসর সময়ে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অন্যান্য খ্রিস্টান রাজাকেও তার জন্য অনুপ্রাণিত

করেন এবং নিজের এই রণপ্রস্তুতিকে ক্রুসেড যুদ্ধের ন্যায় ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহায়তা লাভ করেন। সন্ধি চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে পর ৫৯১ হিজরীর রজব (জুন ১২৯৫ খ্রি) মাসে তিনি কয়েকজন খ্রিস্টান রাজা এবং তাদের সেনাবাহিনীসহ বাতলিউস এলাকার মালার নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। এদিকে মানসূরও তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য সেখানে গিয়ে পৌঁছান। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিস্টান বাহিনীর এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার লোক নিহত এবং ৩০ হাজার লোক বন্দী হয়। বাকিরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা পায়। এটা ছিল মুসলমানদের একটা বিরাট বিজয় যা মানসূরের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। এতে ঈসায়ীরা অত্যন্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা গনীমত হিসাবে লাভ করে দেড় লক্ষ তাঁবু, ৮০ হাজার ঘোড়া, এক লক্ষ খচ্চর, চার লক্ষ ভারবাহী গাধা এবং ৬০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বর্ম ও যুদ্ধ সামগ্রী। খ্রিস্টানদের এবারকার যুদ্ধ প্রস্তুতি কত বিরাট ও কত পরিপূর্ণ ছিল উপরিউক্ত গনীমত সামগ্রী থেকে তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। মানসূর যাবতীয় মালে গনীমত, যার মধ্যে অনেক সোনাদানা ও হীরা-জহরত ছিল; তার সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

দ্বিতীয় আলফোনসূ এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে অবশিষ্ট সৈন্যসহ 'রিবাহ' দুর্গে আশ্রয় নেন। মানসূর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ঐ দুর্গ অবরোধ করেন। আলফোনসূ সেখান থেকে পালিয়ে টলেডোয় আসেন এবং ঐ লজ্জাকর পরাজয়ের গ্লানিতে তার চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলেন এবং (ক্রুশ) উঠিয়ে শপথ নেন যতদিন আমি এই লক্ষ লক্ষ নিহত খ্রিস্টানের হত্যার বদলা না নেব ততদিন নিজের আয়েশ-আরামকে হারাম বলেই মনে করব। মানসূর যখন জানতে পারেন যে, আলফোনসূ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিনি অবিলম্বে টলেডো আক্রমণ করেন। তিনি শহর অবরোধ করে দুর্গ ধ্বংসী কামানের সাহায্যে শহর প্রাচীর এবং দুর্গকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেন। যখন শহর এবং আলফোনসূ উভয়ই মানসূরের কবজায় আসার উপক্রম হলো ঠিক তখনি দ্বিতীয় আলফোনসূ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বের যে যে খেলা দেখান তা হলো তিনি তার মাতা-পিতা এবং স্ত্রী-কন্যাকে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন। ঐ স্ত্রী লোকেরা খালি মাথা ও খালি পায়ে ক্রন্দন করতে করতে মানসূরের সামনে এসে হাযির হয়। আলফোনসূর মাতা আপন পুত্রের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে গিয়ে এমন ভাবে কাঁদতে শুরু করেন যে, মানসূর সে করুণ দৃশ্য সহ্য করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অশ্রুই রক্তের উপর জয়লাভ করে এবং করুণা পরাজিত করে ক্রোধকে। মানসূর আল-ফোনসূকে শুধু মার্জনাই করেননি বরং তার মা, স্ত্রী ও কন্যাদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন এবং বহু মূল্যবান অলংকারাদি এবং নানা ধরনের উপহার-উপঢৌকনসহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদেরকে শহরের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেন। তারপর সেই মুহূর্তেই তিনি টলেডো থেকে কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। মানসূর সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আলফোনসূ তার আনুগত্যের অঙ্গীকার চুক্তি সম্পাদনের জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, যারা কর্ডোভার দরবারে এসে হাযির হয়। মানসূরের কাছে যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বন্দী খ্রিস্টান ছিল তিনি তাদেরকে মরক্কোয় পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। মানসূর অত্যন্ত পুণ্যবান, আবিদ, যাহিদ ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে জাহরী নামাযসমূহে (যে নামাযসমূহে কিরাত উচ্চকণ্ঠে পড়া হয়) ইমামগণ 'আলহামদু'-এর পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমও উচ্চকণ্ঠে পড়তেন। আবুল ওয়ালীদ

ইব্‌ন রুশদ ৫৯৪ হিজরীর (১১৯৮ খ্রি.) শেষ দিকে মানসূরের শাসনামলে ইনতিকাল করেন। ৫৯৫ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১১৯৮ খ্রি) মাসে আনুমানিক ১৫ বছর রাজ্য শাসন করার পর মানসূরের মৃত্যু হয়। ঐ বছরই ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ

মানসূরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ৫৯৫ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১১৯৮ খ্রি) মাসে ১৭ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের জন্য 'নাসির লিদীনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট নাসিরের শাসনামলে মরক্কোর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং মুরাবিতীন সাম্রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সৈন্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশ দখল করতে শুরু করে। নাসির এই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য মরক্কোয় অবস্থান করতে থাকেন। ঐ দিকে সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে যে সব খ্রিস্টান সৈন্য ইউরোপের দেশসমূহে ফিরে এসেছিল তারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পেন ও মরক্কোর ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর থেকে গ্রহণ করতে চায়।

ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ থেকে খ্রিস্টান যোদ্ধারা বার্সিলোনা, ক্যাটালনিয়া, লিওন প্রভৃতি রাজ্যের খ্রিস্টান রাজাদের কাছে সমবেত হতে থাকে। রোমের পোপ মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সামন্ত রাজারা সেখানকার সম্রাট জনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। পোপ তৃতীয় অ্যানুসেন্ট সম্রাট জনকে খ্রিস্ট ধর্ম থেকে খারিজ বলে ঘোষণা করেন। তখন জন তাঁহার তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল নাসির লিদীনিল্লাহ-এর কাছে মরক্কো প্রেরণ করেন। ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন টমাস, হাডিংটন, র‍্যালফ ফ্রাংকোলিস এবং লন্ডনের পাদ্রী রবার্ট। প্রতিনিধি দলটি ৬০৬ হিজরীতে (১২০৯-১০ খ্রি) মরক্কোয় পৌঁছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বৈঠকখানা ও দেউড়ীসমূহ অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকে। তখন দুই দিকে রাজকীয় ভৃত্যরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা নাসির লিদীনিল্লাহর সম্মুখে গিয়ে হাযির হয়। ঐ সময় নাসির অধ্যয়নরত ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ইংল্যান্ডের সম্রাটের পত্র পেশ করে। ঐ পত্রে সম্রাট লিখেছিলেন– আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার দেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি এও লিখেছিলেন– আমি খ্রিস্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি। পাদ্রী রবার্ট ঐ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। তিনি আমীর নাসিরের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলেন, তাতে আমীর নাসিরের এই সন্দেহ হয় যে, এই সমস্ত লোক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য উৎকোচ হিসাবে ধর্ম পরিবর্তনের লোভ দেখাচ্ছে। এ কারণে তিনি এই প্রতিনিধি দলকে খুব একটা মর্যাদা দেন নি, বরং বাহ্যিকভাবে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করে তাদেরকে বিদায় দেন। তবে পরবর্তী সময়ে এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, ইংল্যান্ডের সম্রাট যদি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নেয় তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার এই অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবে এবং ঠিক তখনি তাঁর সাহায্যের জন্য সামরিক নৌবহর প্রেরণ করা হবে।

আমীর নাসির অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি তার কোন ঝোঁক ছিল না। আমীর নাসিরের এই অন্যমনস্কতার কারণেই যে সেনাবাহিনী তার পিতার যুগে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিদ্যোৎসাহী ছিল, তার অধিনায়করা তাঁর (নাসিরের) প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। তাছাড়া প্রাক্তন আমীরের শাসনামলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈন্য তার নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা ছাড়াও প্রতি তিন মাস অন্তর বাদশাহর পক্ষ থেকে যে সব পুরস্কার পেত আমীর নাসির তাও বন্ধ করে দেন। ফলে সাধারণ সৈন্যরাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ৬০৮ হিজরীতে (১২১১-১২ খ্রি.) আমীর নাসির আফ্রিকা অভিযান শেষ করে স্পেনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। অপর দিকে টলেডোয় কাস্টাইল সম্রাট আলফোনসূর চতুর্দিকে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাজ্য এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে খ্রিস্টানরা দলে দলে এসে সমবেত হচ্ছিল। অন্য কথায় বলা যায়, মুসলমানদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের রাজন্যবর্গের যাবতীয় সামরিক ক্ষমতা ও যুদ্ধসামগ্রী তখন স্পেন ইউরোপে এসে সংগৃহীত হয়েছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের অনুপাতে স্পেন ছিল ইউরোপের অধিক নিকটে এবং স্পেনের সমতল ভূমি পর্যন্ত খ্রিস্টান রাজ্যসমূহের সীমান্ত বিস্তৃত ছিল। এ কারণেই মধ্য স্পেনের খ্রিস্টান শক্তির এই বৃহৎ সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল।

নাসির লিদীনিল্লাহ্ খ্রিস্টানদের এই বিরাট প্রস্তুতি এবং ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এই সংবাদ শুনে মরক্কো ও স্পেন থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। ফলে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্যের একটি সুবিন্যস্ত বাহিনী সেভিলে এসে সমবেত হয়। এই বাহিনী নিয়ে আমীর নাসির জিয়ান শহরের দিকে রওয়ানা হন।

অপরদিকে আলফোনসূ তার বিরাট বাহিনী নিয়ে সালিম শহরের নিকটবর্তী আল-ইকাব নামক স্থানে এসে তাঁবু স্থাপন করেন। তখন মুসলিম বাহিনীও জিয়ান শহর থেকে চলে আসে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর থেকে সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একেবারে পাগলপারা হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ছিল এর বিপরীত। নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যরা, যারা সুষ্ঠুভাবে শত্রুর মুকাবিলা করার যোগ্যতা রাখত, তারা ছিল তাদের অধিনায়কদের প্রতি অসন্তুষ্ট। কেননা বেশ কয়েক মাস যাবৎ তারা কোন বেতন পায় নি। এই অবস্থা এবং আরো কিছু অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড দেখে পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, মুসলিম বাহিনীর অধিনায়করা তাদেরই বাদশাহর পরাজয় কামনা করছে। কেননা যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন কোন কোন অধিনায়ক তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। কোন কোন অধিনায়ক এবং তাদের অধীনস্থ সৈন্যরা শত্রুদের বক্ষ লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপের পরিবর্তে তা মাটিতে গেড়ে রাখল এবং নিজেদের তরবারিসমূহও শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে মারল। এছাড়া তারা আরো অনেক হাস্যকর আচরণ শুরু করে দিল। তারা আমীর নাসিরের নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল। একটি নিয়মিত বিরাট বাহিনীর এই অকল্পনীয় অশিষ্ট আচরণ প্রত্যক্ষ করে যারা মুজাহিদ তারাও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। আমীর নাসিরের কার্পণ্যের এই ভয়ংকর পরিণাম এবং মরক্কোর বার্বার বাহিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতা ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ সাধন করল। স্পেনের কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এরূপ বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটেনি। ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর

একটি বিরাট অংশ যদি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে ইউরোপের মিত্র বাহিনী নিঃসন্দেহে মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হতো এবং পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের দুঃসাহস পেত না। কেননা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের যুদ্ধে ইতোপূর্বে তাদের যে পরিণাম হয়েছিল তার চাইতে ভয়াবহ পরিণাম হতো স্পেনের এই যুদ্ধে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এখানে ছয় লক্ষ মুসলিম বাহিনীর এমন দুঃখজনক পরিণাম হলো যে, তারা তাদের আমীরের নির্দেশ অমান্য করে সকলেই খ্রিস্টানদের হাতে নিহত হলো। আমীর নাসির তরবারি চালনায় মোটেই অবহেলা করেননি। অধিকাংশ মুজাহিদও তার সাথে আপ্রাণ যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র এক হাজার লোক প্রাণে রক্ষা পায় এবং তারাই কোন মতে আমীর নাসিরকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। বাকি সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে লড়তে শাহাদাতবরণ করে, নয়ত খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীরা আশা করেছিল যে, তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা হবে। কিন্তু খ্রিস্টানরা এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাদের সবাইকে যবাই করে ফেলে। ৬০৯ হিজরীতে (১২১২-১৩ খ্রি.) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আমীর নাসির পরাজিত হয়ে সেভিলে ফিরে এলেন। অপর দিকে খ্রিস্টানরা স্পেনের মুসলিম অধ্যুষিত শহরসমূহ লুটপাট এবং মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করল। তারা জিয়ান শহরের সকল মুসলমানকে বন্দী করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করল। আলফোনসূ যখন লক্ষ্য করলেন যে, খ্রিস্টান যোদ্ধারা সমগ্র দেশে হত্যাকাণ্ড চালাতে এবং মাল-আসবাব লুটপাট করতে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তখন তিনি তাদেরকে সংযত করে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার চেষ্টা করেন। এতে খ্রিস্টান যোদ্ধারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে শুরু করে। এতে আল-ফোনসূও বেশ স্বস্তিবোধ করেন। আল-ইকাব যুদ্ধ স্পেনে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলে। এতে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যসহ পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম হুকুমতসমূহের দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। যুদ্ধের কারণে সাকিশের অনেক জনবসতি এবং গ্রাম-পল্লী একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা ওখানকার সব অধিবাসীই ঐ যুদ্ধে নিহত হয়।

আমীর নাসির কিছুদিন সেভিলে অবস্থান করে মরক্কোয় ফিরে আসেন এবং ৬১০ হিজরীর ১০ই শাবান (ডিসেম্বর ১২১৩ খ্রি) বুধবার মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁকে দাফন করা হয়।

ইউসুফ মুসতানসির

আমীর নাসিরের মৃত্যুর পর ৬১০ হিজরীর ১১ই শাবান (ডিসেম্বর ১২১৩ খ্রি) তাঁর পুত্র ইউসুফ মুসতানসির উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫৯৪ হিজরীর ১লা শাওয়াল (আগস্ট ১১৯৮ খ্রি)। দশ বছর ক্ষমতায় থেকে ৬২০ হিজরীর শাওয়াল (নভেম্বর ১২২৩ খ্রি) মাসে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও ভীরু প্রকৃতির। তাঁর আমলে খ্রিস্টানরা স্পেনের বেশির ভাগ অঞ্চলই দখল করে নেয়। অবশ্য কোন কোন প্রদেশের শাসকরা অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে নিজ নিজ অঞ্চল খ্রিস্টানদের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু মুসতানসির বাদশাহ হওয়ার পর কখনো স্পেন কিংবা বাইরের কোন অঞ্চলে যান নি।

আবদুল ওয়াহিদ

মুসতানসিরের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুল ওয়াহিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয় মাস পর মুওয়াহহিদীন অধিনায়ক ও কর্মকর্তারা তাঁকে প্রথমে পদচ্যুত, তারপর নির্মমভাবে হত্যা করে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে।

আবদুল ওয়াহিদ আদিল

তখন আমীর মানসূরের এক পুত্র অর্থাৎ আমীর নাসিরের ভাই আবদুল ওয়াহিদ স্পেনের মার্সিয়া প্রদেশের শাসক ছিলেন। আবদুল ওয়াহিদ নাসিরের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি নিজেকে আমীর বলে দাবি করেন এবং নিজের জন্য 'আদিল' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মরক্কোয় নয় বরং মার্সিয়াই আমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বছর অর্থাৎ ৬২১ হিজরীতে (১২২৪ খ্রি.) খ্রিস্টানরা তার উপর আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে আদিল পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর আদিল তাঁর ভাই ইদরীসকে সেভিলে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে স্বয়ং মরক্কোয় চলে যান। ওদিকে মরক্কোবাসীরা ইয়াহইয়া ইব্ন নাসির নামীয় এক কিশোরকে নিজেদের সম্রাট বানিয়ে আদিলের সাথে যুদ্ধ করে।

এ যুদ্ধে আদিল বন্দী হন। এই অবস্থা দেখে ইদরীস সেভিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের জন্য মামূন উপাধি গ্রহণ করেন। এটা হচ্ছে ঐ সময়ের কথা যখন মুওয়াহ্হিদীনের ভাবমূর্তি স্পেন মরক্কো উভয় দেশেই একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মরক্কোয় বনী মারীন ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করছিল। এদিকে স্পেনের মুসলমান শাসকরা ভাবতে শুরু করল, মরক্কোর অধিবাসী তথা বার্বাররা আমাদের দেশ শাসন করবে কেন? আমাদেরই উচিত নিজেদের মাধ্যমে একজন আমীর নির্বাচিত করা যাতে আমরা খ্রিস্টানদের অধীনতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। যদি আমরা আরো কিছুদিন মরক্কোয় এরূপ দুর্বল আমীরের অধীনে থাকি তাহলে খ্রিস্টানরা সমগ্র স্পেন দখল করে আমাদেরকে তাদের দাসে পরিণত করবে। অতএব সারাকাস্তার শাসক বনী হূদ বংশের মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ নামীয় জনৈক ব্যক্তি মামূনকে স্পেন থেকে বের করে দিয়ে সেখানে নিজস্ব হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন।

মুওয়াহ্হিদীন শাসনের অবসান

এভাবে ৬২৫ হিজরীতে (১২২৮ খ্রি.) স্পেন থেকে মুওয়াহ্হিদীন শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মামূন স্পেন পরিত্যাগ করে মরক্কোয় সাবতাহ বন্দরে চলে আসেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর পুত্র রশীদ সাবতাহ বন্দরেই আমীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বনী মারীন দিনের পর দিন মরক্কোয় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, মুওয়াহহিদীনের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে যায় এবং মরক্কোয় পুরোপুরিভাবে বনী মারীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশম অধ্যায়

মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনে পুনরায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, স্পেনে বনূ উমাইয়া বংশের খিলাফত ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপে পৃথক পৃথক অনেকগুলো স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে এবং তারা একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আর খ্রিস্টান বাদশাহরা এই সুযোগে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করে নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে। তারপর স্পেনের মুরাবিতীনরা স্পেন দখল করে এবং পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো এই মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দেশে অরাজকতা চলাকালে যে পরিমাণ ভূখণ্ড খ্রিস্টান রাজাদের দখলে চলে গিয়েছিল তা আর ফিরে আসেনি।

মুরাবিতীন সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে গেল এবং তার স্থলে মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো তখন অর্থাৎ এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগসন্ধিক্ষণে খ্রিস্টানরা স্পেনের আরো কিছু অংশ দখল করে নেয়। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন আরো হ্রাস পায়। এবার এমন এক মুহূর্তে মুওয়াহহিদীনের সাম্রাজ্যে দুর্বলতা ও পতন দেখা দেয় যখন সমগ্র ইউরোপের গোটা খ্রিস্টান জাতি মুসলমানদেরকে বিতাড়ন ও পাইকারীভাবে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। আল-ইকাব যুদ্ধ শুধু মুওয়াহহিদীন সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়নি, বরং স্পেনে খ্রিস্টানদের দখলাধীন ভূমির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে। ঐ সময়ে স্পেন থেকে মুসলমানদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু ইউরোপের খ্রিস্টান যোদ্ধাদের অনুপযুক্ততা ও অসদাচরণ স্পেনের খ্রিস্টানদের কিছুটা ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে স্পেনের খ্রিস্টানদের কারণেই তখনকার মত মুসলিম বিতাড়ন অভিযান স্থগিত থাকে। স্পেন থেকে যখন মুওয়াহ্হিদীন সাম্রাজ্য লোপ পায় তখন স্পেনের উত্তরাংশের অর্ধেকের চাইতে বেশি এবং পশ্চিমের সবগুলো প্রদেশই খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। আর মুসলমানরা পিছনে হটতে হটতে এবং নিজেদের সামলাতে সামলাতে একবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে এসেছিল। মুওয়াহ্হিদীন সাম্রাজ্যের পতনের পর স্পেনে পুনরায় অরাজকতা দেখা দেয়— যেমন অরাজকতা দেখা দিয়েছিল বনূ উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর। পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিল যে, প্রথম অরাজকতার সময় মুসলিম রাজ্যগুলোর আয়তন ছিল বেশি এবং প্রত্যেক শাসকের অধীনস্থ প্রদেশগুলোও ছিল বড় বড়। কিন্তু পরবর্তী অরাজকতা মুসলিম স্পেনের আয়তনকে অত্যন্ত সীমিত ও সংকীর্ণ করে দেয়। ফলে এক একজন মুসলিম শাসকের অধীনে থাকে এক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল। অধিকন্তু প্রথম অরাজকতার সময় যেমন মুসলিম শাসকরা ছিল পরস্পরের শত্রু ও রক্তপিয়াসী ঠিক তেমনি এবারও তারা একে অন্যের প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু এবার আর একটি বিপদ এই দেখা দেয় যে, প্রত্যেক মুসলমান

শাসক একে অন্যের ধ্বংস করার জন্য সাধারণত খ্রিস্টান সম্রাটকে ডেকে নিয়ে আসত এবং এই ভ্রাতৃহত্যার কাজ সমাপনান্তে আপন রাজ্যের কিছু শহর ও দুর্গ খ্রিস্টান সম্রাটের হাতে (তার মুসলিম নিধনের পুরস্কার স্বরূপ) তুলে দিত। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এই আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। এভাবে যে তাদের মুসলিম নিধনের লক্ষ্য খোদ মুসলিমদের মাধ্যমে আপনা-আপনি অর্জিত হয়ে যাচ্ছে।

বনূ হূদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের শাসনকাল

৫০৩ হিজরীতে (১১০৯-১০ খ্রি.) আহমদ মুসতাঈন ইব্‌ন আবূ আমির ইউসুফ মুতামিন ইব্‌ন আবূ জা'ফর ইব্‌ন হূদ খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সারাকাস্তার সামনে শাহাদাতবরণ করেন। সারকাস্তার সম্রাটদের মধ্যে ইনি ছিলেন চতুর্থ। তার বংশধরদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ নামীয় এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মুওয়াহ্‌হিদীন শাসনের শেষ সময়ে স্পেনে অত্যন্ত শান-শওকতের জীবন-যাপন করছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, সাম্রাজ্যের অবস্থা একেবারে ডুবু ডুবু তখন একটি দস্যুদলে ভর্তি হন এবং সে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তিনি তার দস্যুদলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে একদিন তাদেরই সাহায্যে মার্সিয়া দখল কর নেন। তখন মার্সিয়ার শাসক ছিলেন আবুল আব্বাস। মার্সিয়া দখল করার পর কিছু দিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ গ্রানাডা, মালাকা, আলমেরিয়া প্রভৃতি স্থানও দখল করে নেন। এরপর ৬২৫ হিজরীতে (১২২৮ খ্রি.) মুওয়াহ্‌হিদীন সম্রাট মালূনকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করে কর্ডোভাও দখল করে নেন। ৬২৬ হিজরীতে (১২২৯ খ্রি.) প্রায় সমগ্র মুসলিম স্পেন তার অধীনে চলে আসে। ঐ বছরই বার্সিলোনার খ্রিস্টান সম্রাট মেযর্কা ও মেনর্কা দখল করে সেখান থেকে মুসলিম কর্মকর্তাদের বের করে দেন। এদিকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্পেনের আরো কিছু সংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অধিনায়ক নিজেদের জন্য এক একটি পৃথক রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ যখন দেখলেন যে, সকল অধিনায়কের উপর জয়ী হওয়া এবং প্রজা-সাধারণকেও এ ব্যাপারে রাযী করানো সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয় তখন তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার কাছে একটি দরখাস্ত পাঠান। তাতে তিনি লিখেন, আমি আপনার নামে সমগ্র স্পেন জয় করে নিয়েছি এবং এখানে আমার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমাকে অনুগ্রহপূর্বক এই দেশের ওয়ালী (শাসনকর্তা) নিয়োগ এবং এখানকার শাসন পরিচালনার সনদ প্রদান করুন। বাগদাদের খলীফা এই দরখাস্তকে একটি গায়েবী সাহায্য মনে করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের কাছে জোড়া পোশাকসহ স্পেন শাসনের সনদপত্র প্রেরণ করে। যখন বাগদাদের খলীফা মুসতানসিরের কাছে থেকে সনদপত্র পৌঁছল তখন ইব্‌ন হূদ তথা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ জনসাধারণকে গ্রানাডার জামে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং আব্বাসীয় খলীফার জোড়া পোশাক পরে কালো পতাকা হাতে নিয়ে সেখানে আসেন। তিনি সকলকে খলীফা মুসতানসির আব্বাসীর ফরমান পড়ে শুনান এবং সমগ্র মুসলমানকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এই বলে যে, খলীফা আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার

পৃষ্ঠপোষকতার দায়-দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। যা হোক তার এ কৌশল অবলম্বনের ফল এই দাঁড়ায় যে, কিছুদিনের জন্য নাসর ইব্‌ন ইউসুফ ওরফে ইবনুল আহমার, আবূ জামীল যায়ন ইব্‌ন মরদেনেশ প্রমুখ শাসক, যারা ইব্‌ন হূদ তথা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের বিরুদ্ধাচরণের সংকল্প নিয়েছিলেন, কিছু দিনের জন্য নিশ্চুপ বসে থাকেন। এমন কি বাহ্যিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের হাতে বায়আতও করেন। কিন্তু কিছু দিন পরই তারা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পুনরায় গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। খ্রিস্টানরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের শহরসমূহ দখল করতে শুরু করে। তারা ৬২৭ হিজরীতে (১২৩০ খ্রি.) কর্ডোভার পর স্পেনের সর্ব বৃহৎ শহর মারীদাহ দখল করে নেয়। মারীদাহবাসীরা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফকে এই সংবাদ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারীদায়ে উপনীত হয়ে নবম আলফোনসূ সম্রাট লিওনের উপর নির্দ্বিধায় হামলা চালান। অবশ্য এ যুদ্ধে তিনি খ্রিস্টানদের হাতে পরাজিত হয়ে মার্সিয়ায় ফিরে আসেন এবং মার্সিয়াকেই রাজধানী করে দেশ শাসন করতে থাকেন। ৬২৯ হিজরীতে (১২৩২ খ্রি.) ইবনুল আহমার নিজেকে স্পেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে শ্রীস, জিয়ান প্রভৃতি নগরী দখল করে নেন। ঐ সময়ে আবূ মারওয়ান নামক জনৈক সর্দার সেভিলের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল আহমার আবূ মারওয়ানের সাথে ঐক্য ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। ৬৩২ হিজরীতে (১২৩৪-৩৫ খ্রি) ইবনুল আহমার বন্ধুরূপে সেভিলে প্রবেশ করেন এবং আবূ মারওয়ানকে হত্যা করে তার দখলীকৃত সমগ্র এলাকা দখল করে নেন। কিন্তু সেভিলের লোকেরা কিছুদিন পর অসন্তুষ্ট হয়ে ইবনুল আহমারকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইবনুর রামীমী নামক জনৈক ব্যক্তিকে আপন মন্ত্রী নিয়োগ করে তার হাতে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ বিষয়াদি সমর্পণ করে রেখেছিলেন। এরপর তিনি তাকে আলমেরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ইবনুর রামীমী আলমেরিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ তাকে দমন করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি পথিমধ্যেই ছিলেন এমন সময় ইবনুর রামীমীর গোয়েন্দারা রাতের বেলা সুযোগ পেয়ে তাকে তাঁবুর মধ্যেই গলা টিপে হত্যা করে। এই ঘটনা ঘটে ৬২৫ হিজরীর ২৪ জমাদিউস সানী (ফেব্রুয়ারী ১২৩৮ খ্রি) এরপর ইবনুর রামীমী আলমেরিয়ার স্বাধীন সম্রাটে পরিণত হয়। মার্সিয়ার শাসনক্ষমতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফের সন্তানদের দখলে থাকে, যারা ইতোমধ্যে ইবনুল আহমারের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। ৬৫৮ হিজরীতে (১২৬০ খ্রি) এই বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বনূ হূদ ছাড়াও ইবনুল আহমার, ইব্‌ন মারওয়ান, ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন মরাদেনেশ প্রমুখ অনেক ছোট ছোট সর্দার নিজেদের পৃথক পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল আহমার ক্যাস্টাইল ও টলেডোর সম্রাট ফার্ডিনান্ডের সাথে প্রথম প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং অন্যান্য ছোট ছোট মুসলমান শাসককে ধ্বংস সাধনে ফার্ডিনান্ডের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। অপর দিকে বার্সিলোনার সম্রাট পৃথকভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করেছিলেন। খ্রিস্টানরা এই কৌশল অবলম্বন করেছিল যে, তারা প্রথমে দু'জন মুসলমানের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত। এরপর একজনের পক্ষাবলম্বন করে অপরজনকে ধ্বংস

করত। এরপর যে জয়ী হতো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করত এবং অন্যান্য মুসলমানকে তার বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিত। এভাবে তারা একের পর এক মুসলমানদের শহর ও দুর্গসমূহ দখল করতে থাকে। তখনি ক্যাস্টাইল (কাস্তা লাহ্)-এর সম্রাট ফার্ডিনান্ড ৬৩৬ হিজরীর ২৩ শাওয়াল (জুন ১২৩৯ খ্রি) রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শহরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বকে ধূলিসাৎ করে স্পেনে স্থায়িভাবে খ্রিস্টান সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ তারিখেই স্পেনে ইসলামী শান-শওকতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবনুল আহমার এই বিচক্ষণতার পরিচয় দেন যে, তিনি তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে আপোস করে এবং কিছু শহর ও দুর্গ তাকে ভেট দিয়ে বেশ কিছুদিন নিজেকে নিরাপদ রাখেন এবং এই অবকাশে গ্রানাডা, মালাক্কা, লারকা, আলমেরিয়া, জিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর নিজের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্পেন উপদ্বীপের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলের উপর এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা আড়াইশ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। এখন থেকে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপের পরিবর্তে শুধু এর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্য সীমবদ্ধ থাকে এবং কর্ডোভার পরিবর্তে গ্রানাডা মুসলিম স্পেনের রাজধানীতে পরিণত হয়। এ ক্ষুদ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র উপদ্বীপের এক-চতুর্থাংশ। এখন আমরা গ্রানাডা সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করবো। আর এখানেই শেষ হয়ে যাবে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

একাদশ অধ্যায়

গ্রানাডা সাম্রাজ্য

ইবনুল আহমার

নাসর ইব্‌ন ইউসুফ যিনি ইবনুল আহমার নামে বিখ্যাত ছিলেন, ইতোপূর্বে তার আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ৬৩২ হিজরীতে (অক্টোবর ১২৩৪-সেপ্টেম্বর '৩৫ খ্রি) সেভিলের শাসক ইব্‌ন খালিদকে আপন বন্ধু ও খলীফা বানিয়ে গ্রানাডা ও মালাগা দখল করেছিলেন। ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫-৪৬ খ্রি.) আলমেরিয়ার শাসক তার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং ৬৬৩ হিজরীতে (নভেম্বর ১২৬৪-অক্টোবর '৬৫ খ্রি) লারকায় প্রজাবর্গও তাকে নিজেদের বাদশাহ বলে মেনে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত ফার্ডিনান্ডের সাথে তার সদ্ভাব ছিল। কিন্তু যখন এক এক করে মুসলিম রাজ্যসমূহ ধ্বংস হয়ে গেল তখন খ্রিস্টানরা ইবনুল আহমারের রাজ্যও হজম করে নিতে চাইল। ইবনুল আহমার একটি বুদ্ধির কাজ করেছিলেন যে, তিনি বনী মারীনের বাদশাহ্ ইয়াকুব আবদুল হকের সাথে, যিনি মুওয়াহহিদীনের পর আফ্রিকা ও মরক্কোর শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতএব যখন ইবনুল আহমারের খ্রিস্টানদের সাথে মুকাবিলার প্রয়োজন হতো তখনি ইয়াকূব মারীনীর পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য পাওয়া যেত। এভাবে ইবনুল আহমার বার বার খ্রিস্টানদের পরাজিত করেন এবং নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। ইবনুল আহমার গ্রানাডায় কাসরুল হামরায় (লাল প্রাসাদ) ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা স্পেনে ইসলামের শান-শওকত বিলুপ্তিকালীন সময়কার একটি বিরাট কীর্তি বলে মনে করা হয়। কারো কারো মতে, এটা বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম অথচ কর্ডোভার কাসরে যাহরার সাথে এর কোন তুলনাই হয় না, যা খ্রিস্টান অমানুষরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। ইবনুল আহমার একটি যুদ্ধে খ্রিস্টানদের পরাজিত করে গ্রানাডায় ফিরে আসছিলেন। রাজকীয় প্রাসাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর তার ঘোড়াটি হঠাৎ হোঁচট খেলে তিনি তার উপর থেকে নিচে পড়ে যান। তাতে তার দেহে বাহ্যিকভাবে মারাত্মক কোন ক্ষত দেখা দেয় নি। অথচ এ কারণেই তিনি উক্ত দুর্ঘটনার ১৫ দিন পর ৬৭১ হিজরীর ২৯ জমাদিউস সানী (জানুয়ারী ১২৭৩ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ

ইবনুল আহমারের পর তাঁর পুত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর। তিনি তাঁর পিতার ওসীয়ত অনুযায়ী বনী মারীনের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অব্যাহত রাখেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে সাম্রাজ্য শাসন

করতে থাকেন। ৬৭৩ হিজরীতে (১২৭৪-৭৫ খ্রি.) খ্রিস্টানদের গ্রানাডা রাজ্য আক্রমণ করে। মুহাম্মাদ, ইয়াকূব ইব্‌ন মুহাম্মাদ মারীনীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইয়াকূব সঙ্গে সঙ্গে আপন পুত্রকে একটি বাহিনীসহ স্পেন অভিমুখে প্রেরণ করেন। এরপর নিজেও রওয়ানা হন এবং একজন বিদ্রোহী আমীরের কাছ থকে আল খারো দ্বীপ দখল করে সেটাকে তার নিজস্ব বাহিনীর ঘাঁটিতে পরিণত করেন। মুহাম্মাদও নিজের পক্ষ থেকে যারীদার দুর্গটি ইয়াকূবের হাতে সমার্পণ করেন, যাতে তিনি সেটাকে তার সৈন্যদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এবার সুলতান মুহাম্মাদ ও সুলতান ইয়াকূব উভয়ে মিলে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এটা হচ্ছে ৬৭২ হিজরীর ১৫ রবিউল আউয়ালের (সেপ্টেম্বর ১২৭৬ খ্রি) ঘটনা। এই পরাজয়ের পর খ্রিস্টানরা পুনরায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। কিন্তু এবারও তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এরপর ৬৯৫ হিজরী সনের মুহাররম মাসে (নভেম্বর ১২৯৫ খ্রি) কাসতালার (কাস্টাইলের) সম্রাট গ্রানাডা সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকেন। সুলতান মুহাম্মাদ এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং কাজাতাহ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যা খ্রিস্টানদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, দখল করে নেন। ৬৯৯ হিজরী (অক্টোবর ১২৯৯ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক সীমান্তবর্তী দুর্গ দখল করে নেন। আনুমানিক ত্রিশ বছর শাসন পরিচালনার পর ৭০১ হিজরীর ৮ শাবান (এপ্রিল ১৩০২ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সুলতান মুহাম্মাদ 'ফাকীহ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। কেননা পুস্তক অধ্যয়নের প্রতি তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল।

মুহাম্মাদ ফাকীহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মাখলূ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মুহাম্মাদ ফাকীহের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি এই হয়েছিল যে, তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন আবদুল হকের খাদ্‌রা দ্বীপস্থ সামরিক ঘাঁটিকে নিজের জন্য 'আশংকার কারণ' মনে করে ইয়াকুবের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের প্ররোচিত করেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্যও দেন। খ্রিস্টানরা ইয়াকূবের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে উক্ত ঘাঁটিটি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। ফলে খ্রিস্টানরা এমন একটি ঘাঁটির অধিকারী হয়, যার কারণে গ্রানাডা রাজ্যের কাছে সামুদ্রিক পথে বাইরে থেকে কোনরূপ সাহায্য আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

মুহাম্মাদ মাখলূ

মুহাম্মাদ ফাকীহের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মাখলূ সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাকাম লাখমীর হাতে দেশ শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করেন। ৭০০ হিজরীতে (১৩০০-১৩০১ খ্রি) 'ওয়াদীয়ে আশ'-এর শাসনকর্তা আবুল হাজ্জ ইব্‌ন নাসর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে বন্দী ও নিহত হন। ৭০৫ হিজরীতে (১৩০৫-০৬ খ্রি.) মুহাম্মাদ মাখলূ আফ্রিকার সৌতা দুর্গ দখল করে নেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সাধারণ প্রজারা অসন্তুষ্ট ছিল। তাই তারা মুহাম্মাদ মাখলূ-এর ভাই নাসর ইব্‌ন মুহাম্মাদকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করে। তারা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লুট করে। এরপর শাহী প্রাসাদ ঘেরাও করে মুহাম্মাদ মাখলূকে গ্রেফতার করে এবং নাসর ইব্‌ন মুহাম্মাদকে সিংহাসনে বসায়।

সুলতান নাস্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ

সুলতান নাস্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ফাকীহ সিংহাসনে আরোহণ করে উল্লিখিত নিহত আবূ হাজ্জের পুত্র নাস্‌রকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ মাখলূ-এর পদচ্যুতি এবং নাস্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদের ক্ষমতালাভের ঘটনা ৭০৮ হিজরীতে (১৩০৯ খ্রি.) ঈদুল ফিতরের দিন ঘটে। ৭০৯ হিজরী (১৩০৯ খ্রি) কাসতালার সম্রাট আল-আলজেরিয়া জাযায়ের আক্রমণ করেন। এই শহর বিজিত হয় নি, তবে জিব্রাল্টারও কাসতালা সম্রাটের দখলে চলে আসে। এই বছরই বার্সিলোনার সম্রাট আলমেরিয়া আক্রমণ করেন। সুলতান নাস্‌র আলমেরিয়া রক্ষার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। আলমেরিয়ায় যুদ্ধ অব্যাহত ছিল, এমনি সময়ে ইবনুল আহমারের ভাতিজা এবং মালাগার শাসনকর্তা আবূ সাঈদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবুল ওয়ালীদ আলমেরিয়া এবং সেই সাথে বেলীশও জয় করেন। এভাবে গ্রানাডা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে রাজ্যটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির একটা সুরাহা হওয়ার পূর্বেই ৭১০ হিজরীর জমাদিউস সানী (নভেম্বর ১৩১০ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মাদ মাখলূকে সুলতান নাস্‌রের স্থলাভিষিক্ত করতে চাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে সুলতান নাস্‌র সুস্থ হয়ে উঠেন এবং সুলতান মুহাম্মাদ মাখলূকে যিনি তখন পর্যন্ত বন্দী ছিলেন, হত্যা করেন। আবূ সাঈদ এবং তার পুত্র আবুল ওয়ালীদ মালাগাকে রাজধানী করে নিজেদের দখলীকৃত ভূখণ্ডের উপর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিল। ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩-১৪ খ্রি.) আবুল ওয়ালীদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে গ্রানাডার নিকটস্থ (কারইয়াতুল আতশায়) জনপদে তাঁবু স্থাপন করেন। সুলতান নাস্‌রও গ্রানাডা থেকে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে বের হন। যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সুলতান নাস্‌র আবুল ওয়ালীদের কাছে পরাজিত হয়ে গ্রানাডায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটা হচ্ছে ৭১৩ হিজরী সনের ১৩ই মুহাররমের (মে ১৩১৩ খ্রি) ঘটনা। সুলতান নাস্‌র গ্রানাডায় পৌঁছে আপোস-মীমাংসার প্রচেষ্টা চালান। আপোস চুক্তি তখনো সম্পাদিত হয় নি এমনি সময় গ্রানাডার কিছু অধিবাসী আবুল ওয়ালীদের কাছে গিয়ে (যিনি মালাগায় চলে গিয়েছিলেন) তাকে আপোস-চুক্তি থেকে বিরত রাখে এবং তাকে গ্রানাডার উপর হামলা চালানোর জন্য অনুপ্রাণিত করে। আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডার কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখে সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডা আক্রমণে রাযী হয়ে যান। শাদূনার নিকটবর্তী একটি স্থানে মালাগা ও গ্রানাডা বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আবুল ওয়ালীদ জয়ী হন এবং তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে গ্রানাডায় প্রবেশ করেন। সুলতান আল-হামরা প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ৭১৩ হিজরীর ২১শে শাওয়াল (ফেব্রুয়ারী ১৩১৪ খ্রি) সুলতান পদত্যাগ করে যাবতীয় শাসনক্ষমতা লিখিতভাবে আবুল ওয়ালীদের হাতে অর্পণ করেন।

আবুল ওয়ালীদ

আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নাসিরকে 'ওয়াদিয়ে আশ' (আশ উপত্যকায়) গিয়ে বসবাস করার অনুমতি দেন। আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডায় শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। খ্রিস্টানরা, যারা নীরবে মুসলমানদের এই গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল— যখন দেখল যে, এবার

পূর্বের চাইতে অধিক যোগ্য ও অধিক বীরত্বের অধিকারী একজন বাদশাহ গ্রানাডার সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তখন তারা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ৭১৬ হিজরীতে (এপ্রিল ১৩১৬-মার্চ ১৩১৭ খ্রি) কাসতালার সম্রাট গ্রানাডা রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলা চালিয়ে সেখানকার বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেন। আবুল ওয়ালীদও ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত ৭১৯ হিজরীর মুহাররম (মার্চ ১৩১৯ খ্রি) মাসে খ্রিস্টানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তার সমগ্র এলাকা মুক্ত করে নেন।

আবুল ওয়ালীদের এই দুঃসাহস প্রত্যক্ষ করে খ্রিস্টানরা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সমগ্র খ্রিস্টান নৃপতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। খ্রিস্টান পাদ্রী এবং পুরোহিতরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে খ্রিস্টান রাজ্যসমূহে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্পেনের মহান পোপও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। টলেডো শহরে খ্রিস্টান বাহিনী সমবেত হয়। গ্রানাডা রাজ্যকে ধ্বংস করে স্পেন উপদ্বীপ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য দু'লক্ষাধিক খ্রিস্টান সৈন্য টলেডো এসে একত্রিত হয়। ঐ বিরাট বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয় কাসতালা সাম্রাজ্যের 'অলীআহ্দ' বাতরাদাহকে। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় পাঁচশ খ্রিস্টান রাজা ঐ বাহিনীতে যোগদান করেন। মহান পোপ প্রত্যেক অধিনায়কের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের শুভেচ্ছা কামনা করেন। এছাড়াও ইউরোপ মহাদেশের সকল পাদ্রী গির্জায় গির্জায় এই মর্মে প্রার্থনা করে যে, খ্রিস্টান সৈন্যরা যেন স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়।

আল-বাসীরা যুদ্ধ

খ্রিস্টানদের বিরাট বাহিনী এবং তাদের বিস্ময়কর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা শুনে গ্রানাডার মুসলমানরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। আবুল ওয়ালীদ মরক্কোর বাদশাহ আবূ সাঈদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু আবূ সাঈদ কোনরূপ সাহায্য প্রদান করতে অস্বীকার করেন। কিংবা এও হতে পারে যে, সাহায্য প্রদান করার মত ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়ায়, তখন গ্রানাডার মুসলমানরা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে। তাদের সামনে নিশ্চিত ধ্বংসের চিহ্ন ফুটে উঠে। গ্রানাডার সুলতান আবুল ওয়ালীদ যে সৈন্য সংগ্রহ করেন তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার। তার মধ্যে চার হাজার পদাতিক এবং দেড় হাজার অশ্বারোহী। খ্রিস্টানদের কয়েক লক্ষ সৈন্যের মুকাবিলায় এটা ছিল যেন সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য। তবু আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এই সামান্য সৈন্য নিয়েই গ্রানাডার সুলতান ৭১৯ হিজরী ২০শে রবিউল আউয়াল (মে ১৩১৯ খ্রি) গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হন। সুলতান অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে 'শায়খুল গথওয়া নামীয় তার এক অধিনায়কের নেতৃত্বে পাঁচশ সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে স্বয়ং রওয়ানা হন। কিভাবে খ্রিস্টানদের উপর বিজয় অর্জন করা যায় সমস্ত রাস্তা জুড়ে অধিনায়করা তাই নিয়ে সলাপরামর্শ করতে থাকে। মুসলিম অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে খ্রিস্টান অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এরপর সুলতান আবুল ওয়ালীদ তার এক অধিনায়ক আবুল জুয়ূশের নেতৃত্বে এক হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী আল-বাসীরার নিকটবর্তী একটি ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। তিনি পাঁচশ সৈন্যসহ শায়খুল গাযওয়াকে অগ্রে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ তুমি খ্রিস্টান বাহিনীর সম্মুখবর্তী হয়ে পিছনে হটতে থাকবে এবং তাদেরকে

তোমার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যাপৃত রাখবে। এদিকে আবুল জুয়ূশকে নির্দেশ দেন ঃ যখন খ্রিস্টানরা তোমাকে অতিক্রম করে যাবে তখন তুমি ঝোঁপ থেকে বের হয়ে পিছন দিক থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুধু তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে আবুল ওয়ালীদ একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নেন এবং অপর একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে বাকি সৈন্যকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। শায়খুল গাযওয়া ৭১৯ হিজরীর ৬ই জমাদিউল আউয়াল (জুন ১৩১৯ খ্রি) ভোর বেলা খ্রিস্টান বাহিনীর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীর উপর সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালায়। শায়খুল গাযওয়া পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পিছনে হটতে শুরু করেন। কিন্তু বিরাট সমুদ্রতুল্য খ্রিস্টান বাহিনী মুসলমানদেরকে কচু কাটা করার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। শায়খুল গাযওয়া ক্রমাগত পিছনে হটছিলেন এবং খ্রিস্টান বাহিনী দ্বিগুণ উদ্যমে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। এভাবে খ্রিস্টান বাহিনী যখন আবুল জুয়ূশকে অতিক্রম করে চলে গেল তখন তিনি তার এক হাজার সঙ্গীকে নিয়ে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঝোঁপ থেকে বের হয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঠিক ঐ মুহূর্তে সুলতান আবুল ওয়ালীদও অপর দিক থেকে তার তিনশ অশ্বারোহীকে নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর হামলা চালান। এরপর বাকি সৈন্যরাও অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাহ্যত এই হামলা কয়েক লক্ষ খ্রিস্টান বাহিনীর উপর কোন দিক দিয়েই মারাত্মক হবার কথা ছিল না, কিন্তু মুসলমানরা উপস্থিত পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা পূর্বক প্রাণের বাজি ধরে এবং শাহাদাত লাভের ঐকান্তিক কামনা নিয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর তিন দিক থেকে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে ঐ বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্য কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এই অকল্পনীয় হামলার সামনে টিকতে না পেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। একলক্ষ খ্রিস্টান সৈন্যের অধিকাংশই মুসলমানদের হাতে প্রাণ দেয় এবং বাকিরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচে। খুব সম্ভবত এই আল্-বাসীরা যুদ্ধ আপন ধরন-ধারণের দিক দিয়ে ছিল অনন্য। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই যুদ্ধে শুধু তেরজন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এক পক্ষে মাত্র তের জনের এবং অপর পক্ষে এক লক্ষের নিহত হওয়াটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি বাতরাদাহ্ এবং তার পঁচিশজন প্রধান সহযোগীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। বাতরাদাহর স্ত্রী এবং ছেলেরাও সাত হাজার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাতরাদাহর মৃতদেহ একটি সিন্দুকে ভরে সে সিন্দুকটি গ্রানাডা শহরের সিংহ দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে খ্রিস্টানদের মেরুদণ্ড ভেংগে পড়ে। তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে, স্পেন থেকে গ্রানাডা রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলাটা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই বিজয়ের জন্য সুলতান আবুল ওয়ালীদ আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এবং খ্রিস্টানদের আবেদন অনুযায়ী তাদের সাথে আপোসচুক্তি সম্পাদন করে আপন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। ৭২৫ হিজরীতে (১৩২৫ খ্রি) যখন আবুল ওয়ালীদ মারতাশ দুর্গ দখল করে গ্রানাডায় ফিরে আসেন তখন অর্থাৎ ৭২৫ হিজরীর ২৭শে রজব (জুন ১৩২৫ খ্রি) তারই জনৈক ভাতিজা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাকে হত্যা করে। সাম্রাজ্যের সভাসদ ও কর্মকর্তারা হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড প্রদান করে। এরপর সুলতানের পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান মুহাম্মাদ

সুলতান মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করে আবুল আলা উসমানকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। মন্ত্রী উসমান যখন সীমাহীন ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে ফেলেন এবং তা সালতানাতের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে লাগল তখন সুলতান মুহাম্মাদ ৭২৯ হিজরীতে (১৩২৯ খ্রি) তাকে হত্যা করেন। ৭৩৩ হিজরীতে (অক্টোবর ১৩৩২-সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জিব্রাল্টার ছিনিয়ে নেন। খ্রিস্টানরা সেটাকে রক্ষা করার জন্য স্থল ও নৌবাহিনী নিয়ে হামলা চালায়। কিন্তু সফলকাম হতে পারে নি। সুলতান মুহাম্মাদ জিব্রাল্টার থেকে গ্রানাডা প্রত্যাবর্তন করছিলেন এমন সময় আবুল আলা উসমানের পুত্রগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সুযোগ পেয়ে তার উপর হামলা চালায় এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সুলতানের সঙ্গীরা তার লাশ মালাগায় নিয়ে এসে সমাধিস্থ করে।

সুলতান ইউসুফ

সুলতান মুহাম্মাদ নিহত হওয়ার পর তার ভাই ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আল্লাহ্‌ভীরু ও সিংহহৃদয় ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সালতানাতের হাল ধরেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। খ্রিস্টানরা জিব্রাল্টার এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুনরায় হামলা চালায় এবং নানা ধরনের উৎপাত শুরু করে। সুলতান ইউসুফ এ অবস্থার প্রতি মরক্কোর বাদশাহ আবুল হাসান মারীনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। আবুল হাসান মারীনী তাঁর পুত্রের নেতৃত্বে জিব্রাল্টারের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অপর দিক থেকে সুলতান ইউসুফও সেখানে পৌঁছে যান। যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং খ্রিস্টানরা পরাজয়বরণ করে। যখন মরক্কোর বাহিনী ফিরে যেতে লাগল তখন খ্রিস্টানরা ধোঁকা দিয়ে তাদের উপর একটি শক্ত হামলা চালায়। এতে মুসলমানরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৭৪০ হিজরীতে (১৩৩৯-৪০ খ্রি) সুলতান আবুল হাসান স্বয়ং ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে আসেন। অপর দিকে সুলতান ইউসুফও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। খ্রিস্টান বাহিনী মুসলমানদের এই আক্রমণের খবর পেয়ে পূর্বাহ্নেই যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যারীফের নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে এই ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খ্রিস্টানরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। তাদের যুদ্ধাস্ত্রও ছিল প্রচুর। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য শাহাদাতবরণ করে। তখন খ্রিস্টানরা গ্রানাডার একটি অংশ দখল করে নেয়। সুলতান আবুল হাসান মরক্কোয় ফিরে আসেন এবং ইউসুফ গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক বড় বড় আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি শাহাদাতবরণ করেন। লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবের পিতা আবদুল্লাহ্ সালমান ছিলেন এ শহীদদের অন্যতম।

৭৪৯ হিজরীতে (এপ্রিল ১৩৪৮—মার্চ ১৩৪৯ খ্রি) সুলতান ইউসূফ লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং খ্রিস্টানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি চালান। হিজরী ৭৫৫ হিজরীতে (১৩৫৪ খ্রি.) জিহাদের জন্য তিনি পুরোপুরি তৈরি

হয়ে যান। কিন্তু ঈদের নামায আদায়কালে সিজদারত অবস্থায় জনৈক অখ্যাত অচেনা ব্যক্তি বর্শার আঘাতে তাঁকে হত্যা করে। আল-হামরা প্রাসাদে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ গনী বিল্লাহ্

ইউসুফের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ 'গনী বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবকে মরক্কোর বাদশাহ আবূ সালিম ইব্ন আবুল হাসান মারীনীর কাছে পাঠান, যাতে তিনি বাদশাহকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য দানে উদ্বুদ্ধ করেন। মরক্কোর বাদশাহ একদল সৈন্য পাঠান এবং খ্রিস্টানদের সাথে মামুলি ধরনের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য কোন সুফল পাওয়া যায়নি। রেযওয়ান নামক প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে পুরোপুরি শাসন ক্ষমতা কবজা করে। এতে কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সুযোগে সুলতান মুহাম্মাদের সৎভাই ইসমাঈল, ৭৬০ হিজরী ২৮শে রমযান (আগস্ট ১৩৫৯ খ্রি) গ্রানাডা দুর্গ দখল করে নেন। সুলতান তখন শহরের বাইরে জান্নাতুল আরীফে অবস্থান করছিলেন। ২৯শে রমযান ভোরে যখন তিনি এই সংবাদ পান তখন সোজা 'ওয়াদিয়ে আশ'-এর আশ উপত্যকার দিকে চলে যান এবং সেখানে অবস্থানপূর্বক সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তিনি কাস্তালার সম্রাটের সাথেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে তাকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করেন। তখনও খ্রিস্টান বাদশাহর দিক থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি এমনি সময়ে মরক্কোর বাদশাহ্ সুলতান আবূ সালিম ইব্ন আবুল হাসান মারীনীর পক্ষ থেকে আবুল কাসিম ইব্ন শরীফ নামক জনৈক দূত ৭৬০ হিজরীর ১০ই যিলহজ্জ (নভেম্বর ১৩৫৯ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করে এবং বলে ঃ মরক্কোর বাদশাহর সাথে আপনার প্রাচীন বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি খুবই আগ্রহী যে, আপনি এই মুহূর্তে তার ওখানে গিয়ে একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে অবস্থান করেন। তিনি আপনাকে সবরকম সাহায্য দানেও প্রস্তুত আছেন। অতএব সুলতান মুহাম্মাদ ১১ই যিলহজ্জ 'ওয়াদিয়ে আশ' থেকে মরক্কো অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আবূ সালিমের অতিথি হিসাবে অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে গ্রানাডায় শুরু হয় সুলতান ইসমাঈলের শাসনামল।

সুলতান ইসমাঈল

সিংহাসনে আরোহণ করার পর সুলতান ইসমাঈল ও কাসতালার খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটা আপোস চুক্তিতে উপনীত হন। ঐ সময়ে কাসতালার সম্রাট যেহেতু বার্সিলোনার সম্রাটের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তাই তিনি এই আপোস চুক্তিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ বলেই মনে করেন। কিন্তু ৭৬১ হিজরীর ৪ঠা শাবান (জুন ১৩৬০ খ্রি) সুলতান ইসমাঈলের ভাই আবূ ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ্, সুলতান এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এদিকে ২১ মাস নির্বাসিত জীবন যাপনের পর ৭৬২ হিজরীর ২৭শে শাওয়াল (আগস্ট ১৩৬১ খ্রি) মরক্কোর সুলতানের সাহায্য নিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ স্পেনে ফিরে আসেন এবং গ্রানাডা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করতে শুরু করেন। তখন আবূ ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ্ নিজের দুর্বলতার দিক লক্ষ্য করে

সাহায্য প্রার্থনার জন্য স্বয়ং কাসতালার সম্রাটের কাছে যান। কিন্তু কাসতালার সম্রাট তার কাছে সাহায্য ও আশ্রয়প্রার্থী এই মুসলিম শাসক এবং তার সকল সঙ্গী-সাথীকে সেভিলের সন্নিকটে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেন।

এদিকে সুলতান মুহাম্মাদ মাখলূ ৭৬৩ হিজরীর ২০শে জমাদিউস্ সানী (এপ্রিল ১৩৬২ খ্রি) গ্রানাডা দখল করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এটা হলো সেই সময়কার কথা যখন জিব্রাল্টার মরক্কো সাম্রাজ্যের দখলাধীন ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রানাডা রাজ্য খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের করদরাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সুলতান মুহাম্মাদ এবার গ্রানাডা দখল করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে অবস্থা শুধরানোর চেষ্টা চালান। ঘটনাচক্রে মরক্কোর বাদশাহ আবূ সালিম ইনতিকাল করায় তার সন্তানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এদিকে কাসতালায় সম্রাট ও তার ভাইয়ের মধ্যেও একটার পর একটা যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। এ থেকে সুলতান মুহাম্মাদ বেশ কিছুটা উপকৃত হন। একদিকে তিনি জিব্রাল্টার দখল করে নেন এবং অন্যদিকে কাসতালার সম্রাটকে কর দিতে অস্বীকার করেন। এতদসত্ত্বেও কাসতালার সম্রাট মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস পান নি। মোটকথা, এই সুলতানের শাসনামলে গ্রানাডা রাজ্যের পরাক্রম খুব বৃদ্ধি পায় এবং খ্রিস্টানরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সুলতান ইউসুফ (দ্বিতীয়)

৭৯৩ হিজরীতে (১৩৯১ খ্রি.) সুলতান মুহাম্মাদ ইনতিকাল করলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন আপোসকামী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কাস্তালার সম্রাটের সাথে তিনি একটি পরিপূর্ণ আপোসচুক্তি সম্পাদন করেন। ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আলী ও আহমদ নামে দ্বিতীয় ইউসুফের চারপুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে মুহাম্মাদ ছিলেন সবচাইতে চতুর ও বিচক্ষণ।

সুলতান মুহাম্মাদ (সপ্তম)

৭৯৮ হিজরীতে (অক্টোবর ১৩৯৫-সেপ্টেবর ১৩৯৬ খ্রি) দ্বিতীয় ইউসুফের মৃত্যু হলে মুহাম্মাদ তার বড় ভাই ইউসুফকে বঞ্চিত করে নিজেই সিংহাসন দখল করে নেন। এই বংশে মুহাম্মাদ নামের অনেক ব্যক্তি ছিলেন। তাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (দ্বিতীয়)-কে সপ্তম মুহাম্মাদ নামে উল্লেখ করা হয়। সপ্তম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করার কিছু দিন পর খ্রিস্টানদের সাথে তার পুনরায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে কাস্তালা সাম্রাজ্যের কিছু জায়গা দখল করে নেয়। ঐ সময়ে কাস্তালার সম্রাট জন নামীয় একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান রেখে মারা যান। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকেই সিংহাসনে বসিয়ে তার চাচা ফার্ডিনান্ড দেশ শাসন করতে থাকেন। ফার্ডিনান্ডও যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। যেহেতু খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল তাই সুলতান সপ্তম মুহাম্মাদ খ্রিস্টান বাহিনীকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখে নিজের বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে জিয়ান শহরের উপর হামলা চালান। এই কৌশল অবলম্বন করার কারণে খ্রিস্টানরা রাতারাতি তাদের বাহিনীকে ঐদিকে স্থানান্তরিত করে, যার ফলে তাদের হাত-পা

ফুলে উঠে। ফার্ডিনান্ড বাধ্য হয়ে আপোস চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানান, যা সুলতান সপ্তম মুহাম্মাদ সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করেন। এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের একটা পরিসমাপ্তি ঘটে। ৮০৩ হিজরীতে (আগস্ট ১৪০০-জুলাই ১৪০১ খ্রি) খ্রিস্টান এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পুনরায় একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কে জয়ী আর কে পরাজিত তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে এবং আট মাসের জন্য একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সুলতান সপ্তম মুহাম্মাদ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তার বড় ভাই তৃতীয় ইউসুফ, যিনি এতদিন নজরবন্দী ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান ইউসুফ (তৃতীয়)

তৃতীয় ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেই আবদুল্লাহ্ নামক তার এক কর্মকর্তাকে ফার্ডিনান্ডের কাছে পাঠিয়ে উল্লিখিত সন্ধিচুক্তির মেয়াদ আরো দু'বছর বৃদ্ধি করেন। এই দু'বছর শেষ হওয়ার পর সুলতান তৃতীয় ইউসুফ তার ভাই আলীকে দূত হিসাবে কাসতালার সম্রাটের কাছে পাঠান এবং সন্ধি চুক্তির মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। খ্রিস্টানরা সুলতানের ভাই আলীকে বলে— যদি তোমার সুলতান আমাদেরকে কর দানে সম্মত হন তাহলে আমরা তার আবেদন মঞ্জুর করতে পারি। আলী খ্রিস্টানদের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে গ্রানাডায় ফিরে যান। এরপর ফার্ডিনান্ড একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে গ্রানাডা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে হামলা চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং খ্রিস্টানরা গ্রানাডা রাজ্যের একটি অংশ দখল করে নেয়। এই যুদ্ধ শেষ হয়নি এমনি সময়ে 'ফাশ' (মরক্কো) সাম্রাজ্যের শাহযাদা আবূ সাঈদের অধিনায়কত্বে একটি সেনাবাহিনী জিব্রাল্টার দুর্গ আক্রমণ করে। সেখানে উভয় শাহযাদার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং আবূ সাঈদ শাহযাদা আহমদের সাথে একজন সম্মানিত মেহমান হিসাবে গ্রানাডায় চলে আসেন। তখন মরক্কোর বাদশাহ্, যিনি আবূ সাঈদের বড় ভাই ছিলেন, তৃতীয় ইউসুফকে লিখেন ঃ তুমি কোন না কোন ভাবে আবূ সাঈদকে হত্যা করে ফেল। কিন্তু তৃতীয় ইউসুফ আবূ সাঈদকে পত্রটি দেখিয়ে বলেন ঃ দেখ, 'তোমার ভাই তোমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যেই জিব্রাল্টার আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব আবূ সাঈদ ৮২০ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রি.) সুলতান তৃতীয় ইউসুফের সাহায্য নিয়ে এবং স্পেনেই সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে মরক্কোর উপর হামলা চালান এবং তার ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বয়ং মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ উপলক্ষে তিনি তৃতীয় ইউসুফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এই বছরই অর্থাৎ ৮২০ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রি.) কাসতালার সম্রাট জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তার চাচা ফার্ডিনান্ডকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি তার মাতার পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় ইউসুফের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ইউসুফ এতই ন্যায়বিচারক ছিলেন যে, বেশির ভাগ খ্রিস্টান সামন্ত রাজা তাদের আপোসের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য তৃতীয় ইউসুফকেই বিচারক নিয়োগ করতেন এবং নির্দ্বিধায় তার সিদ্ধান্তই মনে নিতেন। সুলতান তৃতীয় ইউসুফ ৮২২ হিজরীতে (১৪১৯ খ্রি.) পরলোক গমন করেন। তারপর তাঁর পুত্র অষ্টম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেই কাসতালা, মরক্কো উভয় সাম্রাজ্যের সাথেই বন্ধুত্ব ও সন্ধি চুক্তি নবায়ন করেন এবং আমীর ইউসুফকে যার পূর্ব পুরুষরা গ্রানাডার কাযী (বিচারক) পদে নিযুক্ত ছিলেন, আপন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। আমীর ইউসুফ ছিলেন অত্যন্ত যোগ্যব্যক্তি। কিন্তু অষ্টম মুহাম্মাদ অযোগ্য লোকদের সাথে মেলামেশা এবং তাদের কুপরামর্শ গ্রহণের কারণে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত নবম মুহাম্মাদ সুযোগ পেয়ে গ্রানাডা দখল করে নেন। অষ্টম মুহাম্মাদ একজন নাবিকের ছদ্মবেশে গ্রানাডা থেকে পালিয়ে তিউনিসের বাদশাহ আবুল ফারিসের কাছে চলে যান। আবুল ফারিস তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানেরও প্রতিশ্রুতি দেন।

সুলতান মুহাম্মাদ (নবম)

সুলতান মুহাম্মাদ (নবম) সিংহাসনে আরোহণ করে সভাসদ ও কর্মকর্তাদের নিজের পক্ষে টেনে নেন। কিন্তু তিনি একটি ভুল করেন যে, মন্ত্রী ইউসুফকে আপন শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হন। অগত্যা ইউসুফ পনেরশ' লোক সঙ্গে নিয়ে মার্সিয়ায় পালিয়ে আসেন এবং এখান থেকে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কাস্তালার সম্রাটের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তার কাছে চলে যান। তিনি সেখানে গিয়ে কাস্তালার সম্রাট জনকে অষ্টম মুহাম্মাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে ঐ খ্রিস্টান সম্রাট মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পান। তিনি ইউসুফকে বলেন ঃ তুমি তোমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কিছু প্রভাবশালী লোকের একটা প্রতিনিধি দল তিউনিসিয়ার বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে তাকেও সাহায্য করার জন্য বলো। যা হোক, প্রতিনিধিদল সেখানে যায় এবং তাদের অনুরোধক্রমে তিউনিসের বাদশাহ আবুল ফারিস পাঁচশ' অশ্বারোহী এবং বেশ কিছু অর্থ কয়েকটি জাহাজে করে অষ্টম মুহাম্মাদের কাছে স্পেনে প্রেরণ করেন। যখন সুলতান মুহাম্মাদ (অষ্টম) স্পেন উপকূলে অবতরণ করেন তখন মন্ত্রী ইউসুফের চেষ্টায় আলমেরিয়া প্রদেশের অধিবাসীরা তাকে সাহায্য প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। নবম মুহাম্মাদ যখন অষ্টম মুহাম্মাদের আগমন সংবাদ পান তখন তার মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন ইউসুফের চেষ্টায় নবম মুহাম্মাদ বাহিনীর একটা বিরাট অংশ অষ্টম মুহাম্মাদের বাহিনীর সাথে এসে যোগ দেয়। অবশিষ্টরা অবস্থা বেগতিক দেখে সেখান থেকে পালিয়ে গ্রানাডা চলে আসে। এবার অষ্টম মুহাম্মাদ গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি ৮৩৩ হিজরীতে (অক্টোবর ১৪২৯-সেপ্টেম্বর ১৪৩০ খ্রি) গ্রানাডা জয় করেন এবং মুহাম্মাদকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অষ্টম মুহাম্মাদ পুনরায় সাম্রাজ্য লাভ করে মন্ত্রী ইউসুফের পরামর্শ অনুযায়ী তার পূর্বের কর্মধারা পরিবর্তন করেন এবং প্রজাকুলের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত হন। এবার খ্রিস্টান বাদশাহর দিক থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে অষ্টম মুহাম্মাদ তার সাথে একটি স্থায়ী আপোসচুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু খ্রিস্টান বাদশাহ প্রত্যুত্তরে বলেন, যদি তুমি আমাকে কর দিতে রাযী হও তাহলে এই আপোসচুক্তি হতে পারে। কিন্তু অষ্টম মুহাম্মাদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যেহেতু তখন কাস্তালা সাম্রাজ্যে কিছুটা আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল তাই সম্রাট জন সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডা আক্রমণ করেন নি। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ

কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কখনো মুসলমানরা, আবার কখনো খ্রিস্টানরা জয়ী হয়। এই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল এমনি সময়ে অষ্টম মুহাম্মাদের, ইউসুফ ইবনুল আহমার নামক জনৈক আত্মীয় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজের কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে নিজেকে গ্রানাডা সাম্রাজ্যের অধিকারী দাবি করে আলবীরায় অবস্থান করতে থাকেন। তিনি চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কাস্তালার সম্রাটের কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন ঃ যদি আপনার সাহায্যে আমি গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করতে পারি তাহলে বিনাদ্বিধায় আপনাকে বার্ষিক কর প্রদান করব এবং প্রয়োজনবোধে আমার সেনাবাহিনী দিয়েও আপনাকে সাহায্য করবো। খ্রিস্টানরা এটাকে একটা দৈব আশীর্বাদ বলে মনে করে। কাস্তালা সম্রাট ইউসুফের সাহায্যার্থে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার বাহিনী আলবীরায় পাঠিয়ে দেন। এবার অষ্টম মুহাম্মাদ গ্রানাডা আক্রমণ করেন। কাস্তালা সম্রাটও তার সাহায্যার্থে সেখানে এসে হাযির হন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে দুই পক্ষের অনেক লোক নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত জয় পরাজয়ের একটা ফায়সালা হওয়ার পূর্বেই কাস্তালার সম্রাট ইউসুফ ইবনুল আহমারকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার দিকে এবং অষ্টম মুহাম্মাদ গ্রানাডার দিকে চলে যান।

কাস্তালার সম্রাট একটি গণদরবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউসুফ ইবনুল আহমারকে গ্রানাডার বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর তিনি ইউসুফকে একদল সৈন্য দিয়ে এই বলে বিদায় করেন যে, তুমি অবিলম্বে গ্রানাডা দখল কর। ইউসুফ পরিপূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দেন এবং সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গ্রানাডা সীমান্তে গিয়ে খ্রিস্টানদের সাহায্যে লুটপাট শুরু করেন। খ্রিস্টানরা এবার দুই দল মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত এই সংঘর্ষ বেশ তৃপ্তির সাথেই লক্ষ্য করছিল। সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদ তার মন্ত্রী ইউসুফকে, ইউসুফ ইবনুল আহমার-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ৮৩৯ হিজরী (১৪৩৫-৩৬ খ্রি.) মন্ত্রী ইউসুফ এক সংঘর্ষে ইউসুফ ইবনুল আহমারের হাতে নিহত হন। এই সংবাদ যখন গ্রানাডায় গিয়ে পৌঁছে তখন সেখানকার প্রজাদের মধ্যে ভয়ানক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। তারা মুহাম্মাদেরও সমালোচনা করতে থাকে। অষ্টম মুহাম্মাদ অবস্থা বেগতিক দেখে আল-হামরা প্রাসাদের সমগ্র ভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে গ্রানাডা থেকে মালাক্কায় চলে যান।

ইউসুফ ইব্‌ন আল-আহ্‌মার

এরপর ইউসুফ ইব্‌ন আল-আহ্‌মার গ্রানাডা দখল করে নেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি তার আনুগত্য স্বীকারের জন্য কাস্তালা সম্রাটের কাছে পত্র পাঠান এবং অষ্টম মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করার জন্য মালাগা অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু মালাগা অভিমুখে সৈন্য প্রেরণের পূর্বেই মোট ছয় মাস রাজত্ব করে ইউসুফ ইব্‌ন আল-আহ্‌মার মৃত্যুবরণ করেন।

অষ্টম মুহাম্মাদ ইউসুফের মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তৃতীয় বারের মত গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবার আমীর আবদুল হককে তার মন্ত্রী এবং আমীর আবদুল বারকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। খ্রিস্টানরা পুনরায় গ্রানাডা আক্রমণ করে। তবে মুসলিম সেনাপতি তাদেরকে পরাজিত করে গ্রানাডা থেকে

পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। এই আক্রমণের কারণে খ্রিস্টানরা তাদের সাহস হারিয়ে ফেলে এবং মুসলিম সৈন্যরা আরো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই মুহূর্তে, যখন মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের অবস্থা শুধরিয়ে নেবার সুবর্ণ সুযোগ ঠিক তখনি মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদের ইব্‌ন উসমান নামীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র আলমেরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তার চাচার বিরুদ্ধে গ্রানাডার প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। যখন তার বিশ্বাস হলো যে, এখন গ্রানাডার লোকেরা তারই পক্ষ নেবে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ দখল করে নেন এবং অষ্টম মুহাম্মাদকে তৃতীয়বারের মত সিংহাসনচ্যুত করে বন্দী করে রাখেন। তখন সেনাপতি আমীর আবদুল বার গ্রানাডা থেকে পালিয়ে গিয়ে সুলতান অষ্টম মুহাম্মাদকে মুক্ত করার ব্যাপারে চেষ্টা-তদবীর করতে থাকেন। তিনি চিন্তা করেন, যদি আমি এখন অষ্টম মুহাম্মাদের মুক্তি দাবি করি তাহলে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইব্‌ন উসমান, যিনি সম্প্রতি গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, অষ্টম মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলবেন। অতএব তিনি (আমীর আবদুল বার) সে পথে না গিয়ে অষ্টম মুহাম্মাদের অপর ভাতিজা ইব্‌ন ইসমাঈলকে তার সহযোগী করে নিয়ে তাকেই সুলতানের দাবি উত্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইব্‌ন ইসমাঈল এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে যান। তিনি কাস্তালার সম্রাটের কাছে চিঠিপত্রাদি লিখে এবং তার অনুমতি নিয়ে আবদুল বারের সাথে এসে মিলিত হন। খ্রিস্টানরা এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। অতএব একদিকে ইব্‌ন ইসমাঈল এবং অপর দিকে কাস্তালার সম্রাট ইব্‌ন উসমানের সীমান্ত আক্রমণ করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু ৮৫২ হিজরীতে (মার্চ ১৪৪৮-ফেব্রুয়ারী ১৪৪৯ খ্রি) আরাগন ও আরবুনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাটগণ কাস্তালা-সম্রাটের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটালে কাস্তালা-সম্রাট এমন এক নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়েন যে, তখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করার মত সঙ্গতি বা পরিবেশ কোনটাই তার ছিল না। আর এর ফল দাঁড়ায় এই যে, ইব্‌ন ইসমাইলও তার প্রতিপক্ষ কাস্তালা সম্রাটের গৃহযুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকেন। সুলতান ইব্‌ন উসমান যখন জানতে পারেন যে, আরাগন ও আরবুনিয়ার সম্রাটদ্বয় কাস্তালা সম্রাটের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছেন তখন তিনি এ দুই খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন, যখন তোমরা ওদিক থেকে কাস্তালা আক্রমণ করবে তখন আমিও এদিক থেকে তা-ই করব, যাতে তোমরা অনায়াসে তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারো। সুতরাং ৮৫৪ হিজরীতে (১৪৫০ খ্রি.) সুলতান ইব্‌ন উসমান কাস্তালা সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং মার্সিয়া প্রদেশ দখল করেন এবং কাস্তালা বাহিনীকে অনেক দূর তাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর মালে গনীমতসহ গ্রানাডায় ফিরে আসেন। পরবর্তী বছর সুলতান ইব্‌ন উসমান আন্দালুসিয়া প্রদেশের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং মার্সিয়ার ন্যায় এই প্রদেশটিকে একেবারে তছনছ করতে থাকেন। সুলতান ইব্‌ন উসমান তখন চাইলে কর্ডোভা দখল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কর্ডোভার দিকে ফিরেও তাকান নি। ৮৫৮ হিজরী (১৪৫৪ খ্রি.) পর্যন্ত কাস্তালা সাম্রাজ্যের সাথে আরবুনিয়া ও আরাগণের বিরোধ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে ইব্‌ন উসমান ও উল্লিখিত দু'টি খ্রিস্টান সাম্রাজ্যকে সাহায্য করতে থাকেন। কাস্তালা সম্রাট যখন

তার প্রতিপক্ষের সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদন করেন তখন তিনি ইব্‌ন ইসমাঈলকে, যিনি ঐ সময়ে কাস্তালা সীমান্তে চুপচাপ অপেক্ষমাণ ছিলেন, সেনাবাহিনী দিয়ে ৮৫৯ হিজরী (১৪৫৫ খ্রি.) সনে ইব্‌ন উসমানের উপর হামলা পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেন। যেহেতু ইব্‌ন ইসমাঈলের প্রতি অধিকাংশ মুসলিম শাসকের সহানুভূতি ছিল তাই ইব্‌ন উসমান তার হাতে পরাজিত হন। ইব্‌ন উসমান তার গুটি কয়েক সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে গ্রানাডা থেকে পালিয়ে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। আর এই সুযোগে ইব্‌ন ইসমাঈল গ্রানাডা সিংহাসন দখল করে নেন।

সুলতান ইব্‌ন ইসমাঈল

ইব্‌ন ইসমাঈলের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিন পরই জন নামীয় কাস্তালা-সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এবার জনের পুত্র এবং পৌত্ররা ইব্‌ন ইসমাঈলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। ৮৭০ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১৪৬৫-আগস্ট ১৪৬৬ খ্রি) পর্যন্ত খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই সমস্ত যুদ্ধে সুলতান ইব্‌ন ইসমাঈলের পুত্র আবুল হাসান অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ৮৭০ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ১৪৬৫-আগস্ট ৬৬ খ্রি) ইব্‌ন ইসমাঈল মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার পুত্র আবুল হাসান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান আবুল হাসান

সুলতান আবুল হাসান যেহেতু একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিলেন তাই সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি খ্রিস্টানদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু এর কিছু দিন পর কাস্তালার রাজকুমার ফার্ডিনান্ড আরাগন সাম্রাজ্যের রাজকুমারী ইসাবেলাকে বিবাহ করেন এবং তখন থেকে আরাগন ও কাস্তালা সাম্রাজ্য একজোট হয়ে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা উভয়েই অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ও মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। তারা এক সাথে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, স্পেন উপদ্বীপ থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে হবে এবং মুসলিম নামধারী একটি ব্যক্তিকেও এখানে জীবিত রাখা হবে না। একদিকে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছিল এবং অপর দিকে সুলতান আবুল হাসান উপস্থিত পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৮৮০ হিজরীতে (১৪৭৫ খ্রি) ফার্ডিনান্ড সুলতান আবুল হাসানকে লিখেন ঃ যদি তুমি সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হও তাহলে কোনরূপ ওযর-আপত্তি ছাড়াই আমাকে করদানে রাযী হয়ে যাও। কিন্তু আবুল হাসান এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে ফার্ডিনান্ডকে লিখেন ঃ তোমার জেনে রাখা উচিত যে, খ্রিস্টানদের নিপাত করার জন্য গ্রানাডার টাকশালে এখন স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে লৌহ তরবারি তৈরি হচ্ছে। এই দুঃসাহসিক উত্তর পেয়ে ফার্ডিনান্ড কিছুদিন পর্যন্ত ভীতিগ্রস্ত এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় থাকেন। তাই কয়েক বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধ মুলতবি থাকে। সুলতান আবুল হাসান এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তিনি স্পেনে একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবেই থাকবেন এবং খ্রিস্টানদের বশ্যতা স্বীকারের চাইতে মৃত্যুকেই বরং বেছে নেবেন। এদিকে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা যৌথভাবে দেশ শাসন করছিলেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতিও গ্রহণ করছিলেন।

আবুল হাসান খ্রিস্টানদের যুদ্ধ পরিস্থিতির সংবাদ শুনে ৮৮৬ হিজরীতে (১৪৮১ খ্রি.) কাস্তালা সাম্রাজ্যের দখলাধীন সাখরাহ্ নামক দুর্গটি আক্রমণ করেন এবং একটি মাত্র রাত্র অবরোধ করে রাখার পর খ্রিস্টানদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেন। ওয়াদিউল কবীরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাখরাহ্ দুর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং সুদৃঢ়। ফার্ডিনান্ডের পিতামহ একদা এই দ্বীপটি মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুলতান আবুল হাসান যখন গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গ্রানাডা সামাজ্যের আয়তন ছিল চার হাজার বর্গমাইলের চেয়েও কম। আর কাস্তালা সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল সোয়া লক্ষ বর্গমাইলের চেয়েও বেশি। কেননা, আরাগন ও কাস্তালা একজোট হয়ে একটিমাত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সাখরাহ্ দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে ফার্ডিনান্ড যারপর নাই মর্মাহত হন এবং প্রতারণার মাধ্যমে গ্রানাডা সাম্রাজ্যের আলহামাহ্ দুর্গ আক্রমণ করেন। যেহেতু ঐ দুর্গ রক্ষার জন্য তখন কোন সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল না তাই সামান্য চেষ্টার পরই খ্রিস্টানরা ঐ দুর্গটি দখল করে নেয়। মুসলমানরা সাখরাহ্ দুর্গ অধিকার করার পর সেখানকার নিরপেক্ষ খ্রিস্টানরা আলহামাহ্ দুর্গ দখল করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সেখানকার সকল মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। ফার্ডিনান্ড আলহামায় দশ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য রেখে রাজধানীতে ফিরে যান। গ্রানাডায় যখন আলহামার পাইকারী হত্যার সংবাদ পৌঁছে তখন সমগ্র শহরে দারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আবুল হাসান ঐ দুর্গ পুনঃদখলের জন্য একজন আরব অধিনায়ককে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। তখন ফার্ডিনান্ড আলহামাহ্ দুর্গ রক্ষার জন্য তার একজন অধিনায়ককে প্রেরণ করেন। আরব অধিনায়ক এই সংবাদ পেয়ে তার বাহিনীর একটি অংশ দুর্গ অবরোধে নিয়োজিত রেখে অপর অংশ খ্রিস্টান অধিনায়কের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং খ্রিস্টান অধিনায়ক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে অপর দিক থেকে আশবীলিয়ার শাসক তথা অপর একজন খ্রিস্টান অধিনায়ক একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। যেহেতু দুর্গ অবরোধে অতি অল্প সংখ্যক মুসলিম সৈন্য রয়ে গিয়েছিল তাই মুসলমানরা উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে অবরোধ তুলে নিয়ে গ্রানাডায় ফিরে যায়। ফলে দুর্গটি মুসলমানদের দখলে আসতে পারে নি। আলহামাহ্ দুর্গটি ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং গ্রানাডার সন্নিকটে। তাই এই দুর্গটি খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাওয়াটা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

৮৮৬ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ১৪৮১ খ্রি) মাসে সুলতান আবুল হাসানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, ফার্ডিনান্ড তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছে। অতএব সুলতান আবুল হাসানও তার বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হন। গ্রানাডা সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী লুশার সন্নিকটে ৮৮৭ হিজরীর ২৭শে জমাদিউল আউয়াল (জুন ১৪৮২ খ্রি) একটি ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে ফার্ডিনান্ড শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং মুসলিম সেনাবাহিনী প্রচুর মালে গনীমত লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিকে সুলতান আবুল হাসান তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্ডিনান্ডকে লুশার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন এবং অন্যদিকে সুলতানের পুত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ তার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

এই বিজয় লাভের পর খ্রিস্টানদেরকে মেরে তাড়িয়ে তার সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি কাজে আবুল হাসানের নিয়োজিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক তখনি তার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, শাহযাদা আবূ আবদুল্লাহ্ আলমেরিয়া, বাস্তাহ এবং গ্রানাডা দখল করে আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সুলতান বাধ্য হয়ে মালাগায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। এভাবে গ্রানাডা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব অর্ধাংশে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মালাগা তথা পশ্চিম অর্ধাংশ সুলতান আবুল হাসানের অধীনে থাকে। এই ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রকে দু'ভাগে বিভক্ত হতে দেখে একদিকে খ্রিস্টানদের লালসা বৃদ্ধি পায় এবং অপর দিকে বিদ্রোহী শাহযাদা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ পিতার কাছ থেকে বাকি অর্ধেক সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। যা হোক সর্ব প্রথম সেভিল, ইস্তিজাহ এবং সারীশের খ্রিস্টান শাসকরা সেনাবাহিনী গঠন করে মালাগায় সুলতান আবুল হাসানের উপর হামলা চালায়। ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে সেভিল এবং সারীশের শাসকদ্বয় তাদের দু'হাজার অশ্বারোহীসহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। খ্রিস্টান বাহিনীর অন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় নতুবা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। একদিকে সুলতান আবুল হাসান এই খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মালাগা থেকে বের হয়েছিলেন এবং অন্যদিকে তার পুত্র মালাগা দখল করার জন্য সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। সুলতান যখন বিজয়ী বেশে মালাগায় ফিরে আসেন তখন আপন পুত্রের সাথেই তার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও সুলতান বিজয়ী হন এবং আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ পরাজিত হয়ে গ্রানাডার দিকে পালিয়ে আসেন। সুলতান আবুল হাসান আপন পুত্র আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে তাড়িয়ে দিয়ে মালাগায় প্রবেশ করার পর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এদিকে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ তার পিতার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নতুনভাবে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং খ্রিস্টান এলাকার উপর হামলা চালান। তিনি লুশনীয়ায় পৌঁছে তার বাহিনীকে লুটপাটে নিয়োজিত করেন। সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীর অধিনায়ক এই অনভিজ্ঞ নৃপতিকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার বাহিনীকে নিয়ে একটি পৃথক ঘাঁটিতে অপেক্ষমাণ থাকেন। যখন আবূ আবদুল্লাহ্ প্রচুর মালে গনীমত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন ঠিক তখনি খ্রিস্টান অধিনায়ক ঐ গিরিপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আবূ আবদুল্লাহর বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন। এতে সমগ্র মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের হাতে নিহত এবং আবূ আবদুল্লাহ্ বন্দী হন। আবূ আবদুল্লাহ্কে কাস্তালার সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সংবাদ শুনে গ্রানাডার অধিবাসীরা মালাগায় গিয়ে সুলতান আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করে এবং তাকে গ্রানাডায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। সুলতান অসুস্থতা ও অক্ষমতার কারণে ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার ভাই আবূ আবদুল্লাহ্ যাগালকে গ্রানাডা সিংহাসনে আরোহণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি সংসার ত্যাগ করে নির্জনবাসে চলে যান।

সুলতান আবূ আবদুল্লাহ যাগাল

সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ যাগাল সিংহাসনে আরোহণ করে শাসন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করতে শুরু করেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মালাগা প্রদেশ আক্রমণ করে এবং সেখানকার যে সমস্ত দুর্গ অরক্ষিত ছিল সেগুলোকে অতি সহজেই দখল করে নেয়। শেষ

পর্যন্ত তারা বাকওয়ান দুর্গ অবরোধ করে এবং প্রচুর গোলাবর্ষণ করে একটি প্রাচীর ধ্বংস করে ফেলে। মুসলমানদের অতি ক্ষুদ্র যে বাহিনীটি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলা করে তাদের বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত এক এক করে মুসলিম বাহিনীর সকলেই নিহত হয় এবং ঐ দুর্গটি খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। ৮৯০ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (মে ১৪৮৫ খ্রি) মাসে খ্রিস্টানরা রিনদা দুর্গটিও দখল করে নেয়। সেটি তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ৮৯০ হিজরীর ১৯শে শাবান (আগস্ট ১৪৮৫ খ্রি) সুলতান যাগাল সীমান্ত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হন। তিনি গ্রানাডার নিকটবর্তী মাসলীন দুর্গের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং দুর্গের বাইরের একটি মাঠে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন এমন সময়ে খ্রিস্টানরা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে একেবারে অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালায় এবং মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। যেহেতু এই হামলাটি ছিল একেবারে ধারণাতীত তাই মুসলিম বাহিনী একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। খ্রিস্টানরা অবিরাম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি, সুলতান যাগালের তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের সুলতানকে এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় দেখে দ্রুত নিজেদের সামলিয়ে নেয় এবং সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালায়। শীঘ্রই যুদ্ধের রূপ বদলে যায় এবং খ্রিস্টানরা তাদের হাজার হাজার সহযোগীর লাশ যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। ফলে খ্রিস্টানদের সম্পূর্ণ তোপখানাটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। সম্রাট ফার্ডিনান্ড একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ঐ আক্রমণকারী খ্রিস্টান বাহিনীর পিছনে পিছনে আসছিলেন। তিনি ঐ পলায়নপর সৈন্যদের কাছে থেকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প নেন তখন জানতে পারেন যে, সুলতান যাগাল খ্রিস্টানদের কাছ থেকে যে সমস্ত কামান কেড়ে নিয়েছিলেন তা মাসলীন দুর্গে স্থাপন করে দুর্গটিকে সুদৃঢ় করে নিয়েছেন এবং খ্রিস্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছেন। এই সংবাদ শুনে ফার্ডিনান্ড সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং সেখান থেকেই ফিরে যান। তিনি এবার অরক্ষিত দুর্গসমূহের উপর আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদেরকে ত্যক্ত বিরক্ত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

ফার্ডিনান্ড বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও তার এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে, মুসলিম সাম্রাজ্যকে নির্মূল করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তিনি একথাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, যদি মুসলমানরা পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে তরবারি হাতে নেয় তাহলে এদের পক্ষেও তারিক ও মূসার মত খ্রিস্টান সাম্রাজ্যসমূহকে ধ্বংস করে সমগ্র স্পেন উপদ্বীপ দখল করে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ফার্ডিনান্ডের এই চিন্তাধারা কিছুদিনের জন্য তাকে প্রকাশ্য যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত রাখে।

ফার্ডিনান্ড এবার প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করে প্রতারণার আশ্রয় নেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল হাসান, যিনি নূশীলা যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন, ফার্ডিনান্ড তাকে নিজের সামনে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বলেন ঃ গ্রানাডা সাম্রাজ্যের আসল উত্তরাধিকারী তো তুমিই। তোমার চাচা যাগাল জবরদস্তিমূলকভাবে তোমাকে সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত

করেছেন। আমি চাই যে, আমার প্রতিবেশী মুসলিম সাম্রাজ্যটি ভাল অবস্থায়ই থাক এবং আমাদের মধ্যে যেন কোন প্রকার সংঘর্ষই সৃষ্টি না হয়। মোটকথা, তিনি আবূ আবদুল্লাহ্‌কে সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, যে সমস্ত শহর তোমার দখলে আসবে আমি সেগুলোর কোন ক্ষতি করবো না, কিন্তু যাগালের দখলে যে সমস্ত শহর রয়েছে আমি তার থেকে সেগুলো ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করবো। কেননা যাগালের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ফার্ডিনান্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা মালাগায় চলে আসেন এবং এখানকার লোকদের কাছে ফার্ডিনাড়ের প্রতিশ্রুতির কথা বলে তাদেরকে তার আনুগত্য স্বীকারের প্রতি আহবান জানান। মালাগাবাসীরা এই মনে করে যে, আমরা যদি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে নিজেদের সুলতান বলে মেনে নেই তাহলে খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকব। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাকে নিজেদের সুলতান বলে স্বীকার করে নেয়। এরপর আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ তার অধিকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকেন। যাগাল এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ সমস্ত খ্রিস্টান, যারা বেযীন নামক স্থানে বসবাস করছিল, অত্যন্ত জোরেশোরে আবূ আবদুল্লাহ্ সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তাই যাগালের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। শেষ পর্যন্ত আবূ আবদুল্লাহ্ তার চাচা যাগালের কাছে লূশা নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করে বসেন। অবশ্য তিনি যাগালকে বলেন, যদি আপনি লূশার শাসনক্ষমতা আমার হাতে অর্পণ করেন তাহলে আমি আপনার সাথে মিলে ফার্ডিনান্ডের উপর হামলা চালাব। যাগাল যখন লক্ষ্য করেন যে, তার অধিকাংশ প্রজা এবং কোন কোন অধিনায়ক ও আবূ আবদুল্লাহ্‌র ঐ প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী তখন তিনি আবূ আবদুল্লাহ্‌র হাতে লূশার শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। এবার একদিকে আবূ আবদুল্লাহ্ লূশা দখল করেন এবং অন্যদিকে ফার্ডিনান্ড তার বাহিনী নিয়ে লূশা অভিমুখে রওয়ানা হন। আবূ আবদুল্লাহ্ ফার্ডিনান্ডকে স্বাগত জানান এবং লূশার শাসনক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে ৮৯১ হিজরীর জমাদিউস সানী (জুন ১৪৮৬ খ্রি) মাসে আলবীরা, মাসলীন এবং সাখরাহ্ দুর্গ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। খ্রিস্টান সৈন্যদের সহায়তায় আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ এই দুর্গগুলোও দখল করে ফার্ডিনান্ডের হাতে অর্পণ করেন। এভাবে গ্রানাডা রাজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড, যা দখল করা ফার্ডিনান্ডের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের কারণে অনায়াসে তার দখলে চলে আসে। কেননা বেশির ভাগ প্রজা আবূ আবদুল্লাহ্‌কে নিজেদেরই রাজকুমার ও রাজসিংহাসনের অধিকারী মনে করে তার বিরোধিতা থেকে নিরস্ত্র থাকে। কিন্তু যখন এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান ফার্ডিনান্ডের হাতে চলে যায় তখন মুসলমানরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ খ্রিস্টান সম্রাটের একজন এজেন্ট ছাড়া কিছু নন। তিনি নিজের জন্য নয়, বরং কাস্তালার সম্রাটের জন্যই বিভিন্ন শহর ও দুর্গ দখল করছেন। নাবীরীন নামক স্থানটি ছিল গ্রানাডা শহরের একেবারে সন্নিকটে। সেখানে শুধু খ্রিস্টানরা বসবাস করত। তাই আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ নাবীরীনে অবস্থান করে গ্রানাডাবাসীদেরকে নিজের পক্ষে টেনে আনার প্রচেষ্টা চালান। এখানে যখন এই টানাপড়েন অবস্থা তখন মালাগাবাসীরা সুলতান যাগালের আনুগত্য স্বীকার করে সেখান থেকে খ্রিস্টানদের যাবতীয় চিহ্নাদি একেবারে মুছে ফেলে। স্বয়ং ফার্ডিনান্ড

৮৯২ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মার্চ ১৪৮৬ খ্রি) মাসে একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মালাগা আক্রমণ করেন। তার কিছু যুদ্ধ জাহাজও মালাগা উপকূলে গিয়ে পৌঁছে। ফার্ডিনান্ডের এই আক্রমণ সংবাদ শুনে সুলতান যাগাল গ্রানাডা থেকে একটি বাহিনীসহ মালাগা অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে গ্রানাডাকে খালি দেখতে পেয়ে ৮৯২ হিজরীর ১৫ই জমাদিউল আউয়াল (মে ১৪৮৬ খ্রি) আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ অতি সহজেই তা দখল করে নেন। যাগাল যখন জানতে পারেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ গ্রানাডা দখল করে নিয়েছেন তখন তিনি মালাগাকে ফার্ডিনান্ডের অবরোধ রেখেই স্বয়ং গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে যখন তিনি জানতে পারেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ গ্রানাডার উপর পরিপূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন তখন তিনি 'ওয়াদিয়ে আশ'-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। মালাগা-বাসীরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সেই সাথে তারা মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিসর এবং তুরস্কের সুলতানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ তাদের আবেদনে সাড়া দেয়নি। মালাগাবাসীরা যখন দেখতে পেল যে, এ পৃথিবীতে তাদের কোন পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারী নেই তখন তারা নিরাশ হয়ে ৮৯২ হিজরীর শাবান মাসে (১৪৮৬-৮৭ খ্রি) মালাগাকে ফার্ডিনান্ডের হাতে অর্পণ করে। যখন তারা ফার্ডিনান্ডের কাছে আপোসচুক্তির আবেদন জানায় তখন ফার্ডিনান্ড তাদেরকে বলেন– এখন তোমাদের যাবতীয় রসদসামগ্রী শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া তোমরা সবদিক থেকেই নিরাশ হয়ে পড়েছ। অতএব তোমরা শর্তহীনভাবে নগরীর চাবিসমূহ আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং শুধু আমার দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করে থাক। শেষ পর্যন্ত ফার্ডিনান্ড যখন মালাগা দখল করেন তখন আপন সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন, তোমরা প্রত্যেকটি মুসলমানকে বন্দী কর এবং তাদের যাবতীয় বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নাও। অতএব খ্রিস্টানরা ১৫ হাজার মুসলমানকে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং অবশিষ্ট সকল অধিবাসীকে নিঃস্ব অবস্থায় মালাগা থেকে বের করে দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় পথিমধ্যে মারা যায়। কিছু সংখ্যক লোক আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং সেখানেই অধিবাস গ্রহণ করে। মালাগা দখল করার পর ফার্ডিনান্ড এর পার্শ্ববর্তী সমগ্র শহর ও দুর্গ জয় করে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদেরকে হয় হত্যা করেন, নয়ত দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি একের পর এক শহর ও দুর্গ দখল করে সেখান থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে শুরু করেন। তিনি 'ওয়াদিয়ে আশ'-এ উপনীত হয়ে সেখানে অবস্থানরত সুলতান যাগালকে নিজের সহযোগী করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ গ্রানাডা দখল করে নেওয়ার পর ফার্ডিনান্ডের এই বিজয় অভিযানকে মোটেই সুনজরে দেখছিলেন না এবং গ্রানাডা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখতে চাচ্ছিলেন। উপরন্তু গ্রানাডাবাসীরাও তার পক্ষ নিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ্রহ ব্যক্ত করছিলেন। এমতাবস্থায় ফার্ডিনান্ড কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে যাগালের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন এবং তার হাতে পুনরায় গ্রানাডার শাসন কর্তৃত্ব তুলে দেবার প্রলোভন দেখান। শেষ পর্যন্ত অসহায়ত্বের কারণেই হোক কিংবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে ধ্বংস করার কারণেই হোক, সুলতান যাগাল 'ওয়াদিয়ে আশ'

ফার্ডিনান্ডের হাতে অর্পণ করে তার সঙ্গে মিশে যান। মোটকথা এই খ্রিস্টান সম্রাট একেবারে অন্তিম মুহূর্তেও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদেরই সাহায্য গ্রহণকে অপরিহার্য মনে করেন। সুলতান যাগাল তার পক্ষে চলে আসায় অতি সহজেই আলমেরিয়া ফার্ডিনান্ডের দখলে চলে আসে। আর আলমেরিয়া ও ওয়াদিয়ে আশ দখল করা ছিল স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলারই শামিল। এখন শুধু গ্রানাডা শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী সামান্য কিছু অঞ্চল ছিল মুসলমানদের দখলে। ফার্ডিনান্ড ৮৯৫ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১৪৮৯ খ্রি) মাসে ওয়াদিয়ে আশ এবং আলমেরিয়া দখল করে সুলতান যাগালকে তার সহযোগী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনি সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ আল-হামরা প্রাসাদে বসে তার চাচা যাগালের এই অশুভ পরিণতি দেখে এই ভেবে সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন যে, এবার তার (যাগালের) দখল থেকে গোটা দেশটাই বেরিয়ে গেছে। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ এবার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছিলেন যে, এবার গ্রানাডায় শুধু তার কর্তৃত্বই বহাল থাকবে। কেননা, ফার্ডিনান্ড কখনো গ্রানাডা দখলের দুঃসাহস করবেন না। কিন্তু ফার্ডিনান্ড আবূ আবদুল্লাহ্‌কে লিখেন– যেভাবে তোমার চাচা যাগাল তার দখলাধীন সমগ্র এলাকা আমার হাতে অর্পণ করেন ঠিক সে ভাবে তুমিও আল-হামরা প্রাসাদ এবং গ্রানাডা আমার হাতে অর্পণ কর। এই চিঠি পেয়ে আবূ আবদুল্লাহ্ গ্রানাডার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করে ফার্ডিনান্ডের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন এবং বলেন, যাগালই ফার্ডিনান্ডকে গ্রানাডা দখলের জন্য উৎসাহিত করেছেন। এখন আমাদের সামনে শুধু দু'টি পথ খোলা আছে হয় আমরা গ্রানাডা ও আল-হামরা প্রাসাদ ফার্ডিনান্ডের হাতে তুলে দেব, নয়ত তার সাথে যুদ্ধ করব। গ্রানাডাবাসীরা আবূ আবদুল্লাহ্‌র অবিশ্বস্ততা ও অনুপযুক্ততা সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত পরিস্থিতিতে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সমীচীন ছিল না। অতএব তারা সকলে যুদ্ধের পক্ষেই রায় দেয়। আবদুল্লাহর মনের ইচ্ছা যাই থাকুক না কেন, সকলকে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে থেকে তিনিও নির্দ্বিধায় সে মত গ্রহণ করেন। এখানে যখন এই পরামর্শ হচ্ছিল ঠিক তখনি কাস্তালার সম্রাট ফার্ডিনান্ড একটি দুরন্ত খ্রিস্টান বাহিনী নিয়ে আসেন এবং ৮৯৫ হিজরীর রজব (জুন ১৪৯০ খ্রি) মাসে গ্রানাডা অবরোধ করে ফেলেন। শহরবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাকে প্রতিরোধ করে। ফলে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলতে থাকে। খ্রিস্টানরা গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেয়। কিন্তু মুসলমানরা এত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের হাত থেকে তাদের সদ্য দখলীকৃত এলাকাসমূহ ছিনিয়ে নিয়ে আসে। ফার্ডিনান্ড এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আপাতত গ্রানাডা জয়ের সিদ্ধান্ত মুলতবি রেখে অবরোধ তুলে নিয়ে আপন রাজধানীতে ফিরে যান। সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং গ্রানাডাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সমস্ত এলাকার দিকে অগ্রসর হন, যে সমস্ত এলাকা খ্রিস্টানরা ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছিল। তিনি কোন কোন দুর্গ দখল করে সেখানকার খ্রিস্টান বাহিনীকে হত্যা করেন এবং তাদের স্থলে খ্রিস্টান বাহিনী মোতায়েন করেন। এরপর তিনি গ্রানাডায় ফিরে এসে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন এবং একটি বাহিনী নিয়ে বাশরাত-এর

দিকে রওয়ানা হন। তিনি সেখানকার কিছু অঞ্চল দখল করেন এবং আন্দরশ দুর্গ দখল করে সেখানে খ্রিস্টান পতাকার স্থলে ইসলামী পতাকা উত্তোলন করেন। বাশরাতের সমগ্র অধিবাসীরা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করে। ফলে ঐ দেশে নতুনভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘটনাক্রমে বাশরাতেই কোন একটি পল্লীতে আবূ আবদুল্লাহর চাচা যাগাল অবস্থান করছিলেন। তিনি আবদুল্লাহকে এভাবে বিজয়ী বেশে দেখে হিংসায় জ্বলে ওঠেন এবং তার মুকাবিলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সেখান থেকে আলমেরিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টানদেরকে তার পক্ষে টেনে আনার প্রচেষ্টা চালান। তিনি আবূ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়ে ফার্ডিনান্ডকে এই মর্মে প্ররোচনা দেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ এই পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, যদি আরো কিছুদিন তাকে এভাবে বাড়তে দেওয়া হয় তাহলে তাকে প্রতিরোধ করা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে। যাগালের এই ধারণা অমূলক ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই আবূ আবদুল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবং তার বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করে আবূ আবদুল্লাহ্ এবং গ্রানাডাবাসীদের এমনভাবে স্তব্ধ করে দেন, যা ছিল খ্রিস্টানদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এই মুহূর্তে যাগালের উচিত ছিল মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা এবং ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মুসলিম ঐক্যকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়া। কিন্তু এটা মুসলমানদেরই দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের পরস্পর শত্রুতা ও অনৈক্য তাদেরকে দিনের পর দিন দুর্বল করে তুলতে থাকে। যা হোক, ৮৯৫ হিজরীর রমযান (আগস্ট ১৪৯০ খ্রি) মাসে যাগাল খ্রিস্টান বাহিনীকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে আন্দরশ দুর্গটি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। অবশ্য ঐ মাসেই আবূ আবদুল্লাহ্ গ্রানাডাবাসীদের বল-বিক্রম কাজে লাগিয়ে হামাদান, মানকাব এবং শালূবানিয়া জয় করেন। শালূবানিয়া দুর্গ তখনো দখলে আসেনি এমন সময় সংবাদ আসে যে, কাস্তালার সম্রাট ফার্ডিনান্ড একটি বিরাট বাহিনীসহ গ্রানাডার সন্নিকটে এসে পৌঁছেছেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আবূ আবদুল্লাহ্ শালূবানিয়া দুর্গ থেকে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ৮৯৫ হিজরীর ৩রা শাওয়াল (সেপ্টেম্বর ১৪৯০ খ্রি) গ্রানাডায় এসে পৌঁছেন। খ্রিস্টান বাহিনী মালাহ দুর্গ ধ্বংস করে ফেলেছিল। অষ্টম দিনে তাঁরা গ্রানাডা ত্যাগ করে 'ওয়াদিয়ে আশ'-এর পথে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌঁছে মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে এবং যারা জীবিত রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত একজন মুসলমানও সেখানে আর অবশিষ্ট ছিল না। খ্রিস্টানরা আন্দরশ দুর্গকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয়। এভাবে হত্যা ও লুটপাট চালানোর পর খ্রিস্টানবাহিনী তাদের রাজধানী অভিমুখে ফিরে যায়।

ফার্ডিনান্ড কাস্তালা অভিমুখে ফিরে যাবার সময় যাগালকে যিনি ফার্ডিনান্ডের পক্ষাবলম্বন করে আবূ আবদুল্লাহ্র চরম বিরোধিতা করেছিলেন ডেকে নির্দেশ দেন—এখন এদেশে আপনার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি আপনার উপর শুধু এতটুকু অনুগ্রহ করতে পারি যে, যদি আপনি এই দেশ অর্থাৎ স্পেন উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে অন্য কোন দেশে চলে যেতে চান তাহলে আমি আপনার সামনে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করব না। যাগাল এই নির্দেশ শোনামাত্র স্পেন থেকে রওয়ানা হয়ে আফ্রিকা গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে

তিলমিসান নামক স্থানে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেন। এখানে কাস্তালা সম্রাট ফার্ডিনান্ডের দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তিনি যেহেতু স্পেন থেকে চিরদিনের জন্য মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চাচ্ছিলেন তাই তার প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতা ছিল পরিস্ফুট। তিনি তাড়াহুড়াকে কখনো প্রশ্রয় দেন নি। যা হোক এবারও ফার্ডিনান্ড ফিরে যাবার পর আবূ আবদুল্লাহ্ বার্সিলোনার দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করে জয় করেন। কিন্তু এর কিছু দিন পরই যুলকাদা মাসের শেষ পক্ষে খ্রিস্টানরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ঐ শহরটি ছিনিয়ে নেয় এবং সেখানে একজন মুসলমানকেও জীবিত রাখেনি। এবার গ্রানাডাবাসীরা নিজেদের সংখ্যাল্পতা এবং অত্যধিক কর্মব্যস্ততার কারণে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই ক্লান্তির একটি কারণ এও ছিল যে, তারা স্পেনের এখানে সেখানে থেকে মুসলমানদের হত্যা ও বিতাড়নের সংবাদ পাচ্ছিল এবং তাদের অন্তরে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, তারা বাইরে থেকে কোন সাহায্য আর পাবে না।

স্পেনে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসমাপ্তি

৮৯৬ হিজরীর ১২ই জমাদিউস সানী (এপ্রিল ১৪৯১ খ্রি) কাস্তালার সম্রাট ফার্ডিনান্ড রাণী ইসাবেলাসহ দুর্গবিধ্বংসী তোপ-কামান এবং অসংখ্য সৈন্য নিয়ে গ্রানাডার সন্নিকটে এসে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছেই তিনি সবুজ-শ্যামল উদ্যানরাজি, শস্যক্ষেত ও ঘরদরজা ধ্বংস এবং মুসলিম অধিবাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করেন। গ্রানাডার সম্মুখে পৌঁছে তিনি তাঁবু স্থাপন করেন এবং সাথে সাথে শহরও অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ শহরবাসীরা অনন্যোপায় হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শহরের একটি অংশ যেহেতু শালীর পর্বতের সাথে সংযুক্ত ছিল তাই খ্রিস্টান বাহিনী শহরকে পুরোপুরি অবরোধ করতে পারেনি। আনুমানিক ৮ মাস পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। স্পেন উপদ্বীপে এই একটি অবরুদ্ধ শহর ছাড়া মুসলিম অধিকৃত আর কোন ভূখণ্ড ছিল না। যখন শীত মওসুম শুরু হলো এবং তুষারপাতের ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল তখন শালীর পর্বত দিয়ে শহরবাসীদের কাছে যে রসদ পৌঁছাত তা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ৮৯৭ হিজরীর সফর (ডিসেম্বর ১৪৯১ খ্রি) মাসে শহরবাসীরা সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে আবেদন জানাল— "যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব। দুর্গের মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরার চেয়ে আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেব।

প্রথম স্পেন বিজয়ী সেনাপতি তারিক ইব্‌ন যিয়াদের সেই অপূর্ব বীরত্বের কথা আমরা ভুলে যাইনি। তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে এক লক্ষ খ্রিস্টান যোদ্ধার সাথে লড়েছিলেন। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় আমাদের সৈন্য সংখ্যা বিশ হাজারের চাইতে সামান্য কম। কিন্তু যেহেতু আমরা মুসলমান তাই এক লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের ভীতিগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।" সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন, শহরবাসীদের মধ্যে যেভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অবিলম্বে যুদ্ধ অথবা চুক্তির সিদ্ধান্ত না নিলে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, তাই তিনি মন্ত্রী ও অধিনায়কবৃন্দকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের নিয়ে আল-হামরা প্রাসাদে একটি পরামর্শ সভার

আয়োজন করেন। শহরের উলামা ও শায়খবৃন্দ উক্ত সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, খ্রিস্টানরা শহর দখল না করা পর্যন্ত অবরোধ তুলে নেবে না। অতএব এই সংকটময় মুহূর্তে কি করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্‌র সাহস এতই হ্রাস পেয়েছিল যে, এই কয়েকটি শব্দ ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর একটি বাক্যও বের হয়নি। এর জবাবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলেন, কাস্তালার সম্রাটের সাথে সন্ধি স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বীর সেনাপতি মূসা ইব্‌ন আবীল গাস্‌সানী এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখনো আমাদের জয়লাভের আশা আছে। অতএব নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা খ্রিস্টানদের অবরোধ তুলে দিয়ে তাদেরকে এ শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হব। গ্রানাডার অধিবাসীদের অভিমতও ছিল তাই। কিন্তু যারা উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই মূসাকে সমর্থন করেন নি। অতএব এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেহেতু খ্রিস্টানরা যুদ্ধে জয়লাভ করলে একজন মুসলমানকেও জীবিত রাখবে না, তাই এমন কিছু শর্তের উপর সন্ধি স্থাপন করা উচিত যাতে সাধারণ লোকের জানমালের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু যেহেতু সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণ যুদ্ধের পক্ষে ছিল তাই আবূ আবদুল্লাহ্ তার মন্ত্রী আবুল কাসিম আবদুল মালিককে গোপনে ফার্ডিনান্ডের কাছে পাঠিয়ে উক্ত সন্ধি-প্রস্তাব পেশ করেন। শহর এবং দুর্গের অবস্থা সম্পর্কে খ্রিস্টানরা অনবহিত ছিল বিধায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে পারছিল না। ফলে তারা কিছুটা বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। অতএব মন্ত্রী আবুল কাসিম সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে ফার্ডিনান্ডের দরবারে পৌঁছার পর তারা সকলেই আনন্দিত হয়। কাস্তালা সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে আবূ আবদুল্লাহ্‌র আবেদন মঞ্জুর করেন। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রী আবুল কাসিম রাতের বেলা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের সাথে সাক্ষাত করতেন এবং পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালাতেন। অনেক দর কষাকষির পর চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারিত হয় এবং আবূ আবদুল্লাহ্ ও ফার্ডিনান্ড চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র

খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলমানদের এই স্বাধীনতা থাকবে যে, তারা ইচ্ছা করলে শহরের ভিতরে থাকতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে বাইরে চলে যেতে পারবে। কোন মুসলমানের জানমালের কোন ক্ষতি করা হবে না।
২. খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. কোন খ্রিস্টান মুসলমানদের মসজিদে ঢুকতে পারবে না।
৪. মসজিদ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকবে।
৫. মুসলমানদের মামলা-মকদ্দমার ফায়সালা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমান বিচারকরাই করবেন।
৬. উভয় পক্ষের বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে।
৭. কোন মুসলমান স্পেন থেকে আফ্রিকা যেতে চাইলে তাকে সরকারী জাহাজেই সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

৮. যে সব খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করা হবে না।
৯. এই যুদ্ধে যে মালে গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে তা যথারীতি তাদের কাছেই থাকবে।
১০. প্রচলিত ট্যাক্স ছাড়া নতুন কোন ট্যাক্স মুসলমানদের উপর ধার্য করা হবে না।
১১. তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের কাছ থেকে কোন ট্যাক্স আদায় করা হবে না। যে ট্যাক্স এখন তারা দিচ্ছে তাও তিন বছরের জন্য মাফ করে দেওয়া হবে।
১২. আল-বাশরাতের শাসনক্ষমতা সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্‌র হাতে অর্পণ করা হবে।
১৩. আজ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দুর্গ, আল-হামরা প্রাসাদ, তোপখানা এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী, যা এখন দুর্গের মধ্যে রয়েছে তা খ্রিস্টানদের হাতে অর্পণ করা হবে।
১৪. আজ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।
১৫. গ্রানাডা শহরকে এক বছর পর্যন্ত স্বাধীন রাখা হবে এবং এক বছর পূর্ণ হবার সময় উপরোক্ত শর্তানুযায়ী তা খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাবে।

এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয় ৮৯৭ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী। শহরবাসী এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে এটা গোপন থাকেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই দুর্গের সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এই শ্লোগানও উঠে যে, সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ অনর্থক মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেছেন। এতে সুলতান খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। শহরবাসীরা বিদ্রোহ করে আবার সবকিছু ওলট-পালট করে দেয় এই ভয়ে তিনি ৬০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ৮৯৭ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (১৪ জানুয়ারী ১৪৯২ খ্রি) আল-হামরা প্রাসাদ খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন। ফার্ডিনান্ড স্পেনের প্রধান পুরোহিত মানযূরাকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি সেনাবাহিনীসহ সর্বপ্রথম শহরে প্রবেশ করেন এবং আল-হামরা প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজ থেকে ইসলামী পতাকা নামিয়ে দিয়ে সেখানে ক্রুশ স্থাপন করেন যাতে করে এই পুণ্য কর্মটি প্রত্যক্ষ করতে করতে সম্রাট ফার্ডিনান্ড এবং রাণী ইসাবেলা শহরে প্রবেশ করতে পারেন। যখন সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ মানযুরাকে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখেন তখন তিনি পঞ্চাশজন আমীর ও সভাসদকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বাইরে চলে আসেন। ঐ মুহূর্তে সমগ্র শহর কিভাবে নৈরাশ্যের আঁধারে ডুবে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা কিরূপ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা যে কেউ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। আর ঐ দিন খ্রিস্টানদের তো আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। খ্রিস্টান সম্রাট এবং তার রাণী সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে আপন সেনাবাহিনীসহ ক্রুশ উত্তোলনের অপেক্ষা করছিলেন। সকলেরই দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল আল-হামরা প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজের উপর। এমনি মুহূর্তে আবূ আবদুল্লাহ্ কাস্তালার সম্রাটের নিকটে এসে তার হাতে শহরের চাবিসমূহ অর্পণ করেন এবং বলেন, "হে মহাপরাক্রমশালী সম্রাট, আমরা এখন আপনার প্রজা। এই শহর এবং সমগ্র রাজ্য আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। কেননা এটাই ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সর্বদা প্রজাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবেন। ফার্ডিনান্ড চাচ্ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্‌কে কিছু সান্ত্বনাদায়ক কথা বলতে। কিন্তু এর পূর্বেই আবূ আবদুল্লাহ্ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে রাণী ইসাবেলার সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর সোজা আল-বাশারাত অভিমুখে

রওয়ানা হন, যেখানে তার ধন-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজনকে ইতিপূর্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শীঘ্রই রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ আল-হামরা প্রাসাদের সুউচ্চ গম্বুজে স্থাপন করা হয় এবং রৌদ্রের কিরণে তা ঝলমল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্রাট বিজয়ী বেশে আল-হামরা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। অপর দিকে আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বাশারাতের পাহাড়ের একটি চূড়ায় যখন উপনীত হন তখন তিনি অলক্ষ্যে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রানাডার দিকে তাকান এবং আপন বংশের অতীত কীর্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করে অঝোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। আবূ আবদুল্লাহ্র মাতা, যিনি তখন তার সাথেই ছিলেন বলে উঠেন, পেশাগতভাবে একজন সিপাহী হওয়া সত্ত্বেও যখন তুমি নিজের রাজ্যকে রক্ষা করতে পারলে না তখন মেয়ে মানুষের মত হারিয়ে যাওয়া একটি জিনিসের উপর এরূপ ক্রন্দন করে কী লাভ বলো ?

স্পেনের মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের জুলুম-অত্যাচার

খ্রিস্টানরা আল-হামরা প্রাসাদ দখল করার সাথে সাথে চুক্তির শর্তাবলী বেমালুম ভুলে বসে। তারা গ্রানাডা নগরীও দখল করে ফেলে। তারা সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্কে আল-বাশারাতেও থাকতে দেয়নি। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তারা আবূ আবদুল্লাহ্র কাছ থেকে আল-বাশারাতও কিনে নেয়। সেখান থেকে আবূ আবদুল্লাহ্ মরক্কোর বাদশাহর চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন সেখানে থাকার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদিকে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সমগ্র দেশে ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলমানকে বন্দী করে ঐ সমস্ত আদালতে নিয়ে আসা হতো এবং শুধু এই অপরাধে যে, তারা মুসলমান—তাদেরকে নানা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হতো। এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের ধর্মের উপর কায়েম ছিল। ফলে এত জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও স্পেন উপদ্বীপ থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব একেবারে মুছে যায়নি।

৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খ্রি.) এই মর্মে একটি সাধারণ নির্দেশ জারি করা হয় যে, স্পেনে বসবাসরত প্রত্যেকটি মুসলমানকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে। মুসলমানরা এই অবস্থায় শহর প্রান্তর ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেয়, সব রকমের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে, কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করেনি। কোন কোন মুসলমানকে খ্রিস্টানরা জোর করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। ঐ সমস্ত লোক আরব কিংবা বার্বার বংশীয় ছিল না বরং তাদের বাপ-দাদারা ছিল ঐ দেশেরই প্রাচীন বাসিন্দা এবং তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ঐ সমস্ত নওমুসলিম গোত্রাদির মধ্যেও কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করেনি। তাই তারা লুকিয়ে লুকিয়ে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ত।

কিছুসংখ্যক মুসলমানের উপর খ্রিস্টানরা এই অনুগ্রহ করে যে, তাদেরকে আফ্রিকা চলে যাবার অনুমতি প্রদান করে। এমনকি তারা তাদের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করে দেয়। ঐ সব মুসলমান নিজেদের স্ত্রী-পুত্র বাদে সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিসটি জাহাজে বোঝাই করে তা ছিল অতি মূল্যবান কিতাবাদি এবং কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। কিন্তু খ্রিস্টানরা আফ্রিকা উপকূলে পৌঁছার পূর্বেই ঐ সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এভাবে শুধু জ্ঞানী মুসলমানরা নয়, বরং তাদের জ্ঞানভর্তি গ্রন্থাগারসমূহও গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যায়। স্পেনের মুসলমানদেরকে

যেভাবে বেছে বেছে হত্যা করা হয় তার দৃষ্টান্ত কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঐ ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর স্পেন ভূখণ্ডে একজন মুসলমানের অস্তিত্বও বাকি ছিল না। খ্রিস্টানরা তাদের কাউকে হত্যা করে, কাউকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়, আবার কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করে। আজকালকার মুসলমানরা যদি চায় তাহলে স্পেনের ঐ হৃদয়বিদারক ইতিহাস পাঠ করে নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করে নিতে পারে এবং এরই আলোকে সংশোধন করে নিতে পারে নিজেদেরকে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা স্মর্তব্য যে, গ্রানাডার মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ফার্ডিনান্ড কর্তৃক সেখানকার শাসনক্ষমতা গ্রহণের পরও স্পেন উপদ্বীপের শহরে, পল্লীতে এবং পাহাড়ে-পর্বতে মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিল। অতএব তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার কাজ বরাবরই অব্যাহত থাকে। কখনো দশ-বিশ জন মুসলমান একত্রিত হয়ে খ্রিস্টানদের সাথে লড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কেউ কেউ আবার স্পেনের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে গেছে এবং নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কেউ কেউ স্পেন থেকে পালিয়ে গিয়ে ইউরোপের দেশসমূহ অতিক্রম করে সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। ঈসায়ীরা কোন কোন মৃত ব্যক্তির শিশু সন্তানকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে গিয়ে তাকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছে। এভাবে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলের আরব বংশোদ্ভূত কিছু কিছু গোত্রের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। এ কারণেই কারো কারো মতে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ছিলেন আরব-বংশোদ্ভূত। স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হলো। এখন আমাদেরকে অন্যান্য দেশের দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু স্পেনের ইতিহাস শেষ করার সাথে সাথে একটি বিষয়ের আলোচনা অবশ্যই করতে হবে। আর তা হলো, মুসলমানরা স্পেন শাসন করে ইউরোপ মহাদেশকে কি পরিমাণ উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

প্রথম যুগের আরবের অন্যান্য সাম্রাজ্যের মত স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যটি বাহ্যত ব্যক্তিশাসিত মনে হলেও সেখানকার শাসনব্যবস্থা ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক। খলীফার নির্দেশ এবং শরীয়তের আইন প্রত্যেকটি লোককে সমভাবে মানতে হতো। ঐ সাম্রাজ্যে মৌরুসী কোন জায়গীরদার বা আমীর-উমারা ছিলেন না। একদা জনৈক খ্রিস্টান উমাইয়া সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে কাযীর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করলে সুলতানকে বাদ্য হয়ে একজন ক্রীতদাসের মত কাযীর হুকুম পালন করতে হয়। ঐ সাম্রাজ্যে শরীয়তের আইন অনুযায়ী কাযী খলীফাকেও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখতেন। পুলিশ বিভাগের ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের। প্রত্যেক বাজারে একজন পরিদর্শক থাকতেন, যিনি ব্যবসায়ীদের লেনদেনের উপর কড়া নজর রাখতেন। প্রত্যেক শহরে ও পল্লীতে চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছিল। মুসলমানরা সমগ্র দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খননের ব্যবস্থা করেছিল। খলীফা হিশাম ওয়াদিউল কবীর নদীর উপর একটি অতি মনোরম

ও বিরাট পুল নির্মাণ করেছিলেন। এভাবে অন্যান্য অনেক নদীর উপর পুল নির্মাণ করা হয়েছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তখন মুসলমানরা ছিল সবচাইতে পারদর্শী। স্পেনের মুসলমানরা দুর্গ বিধ্বংসী হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল। ইউরোপের অসভ্য লোকেরা শত্রুর উপর জয়লাভ করার সাথে সাথে তাদের শহর-বন্দর ও ঘর-দরজা ভস্মীভূত করে ফেলত এবং তাদের শিশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদেরকেও অবাধে হত্যা করত। মুসলমানরা আটশ' বছর পর্যন্ত ঐ অসভ্য লোকদেরকে এই শিক্ষা দিতে থাকে যে, জয়লাভ করার পর নিরপরাধ প্রজাকে কোন ধরনের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। মুসলমানরা কৃষির এতই উন্নতি সাধন করে যে, তা একটি পৃথক শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়। মুসলমানরা প্রত্যেকটি ফলবান বৃক্ষ এবং ভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। স্পেনের যে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা অনাবাদ পড়েছিল মুসলমানরা সেগুলোকে ফলবান বৃক্ষের উদ্যান ও ঢেউ খেলানো শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে। ধান, আখ, তুলা, জাফরান, আনার, আলু ইত্যাদি যা আজকাল স্পেনে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তার উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি মুসলমানদের মাধ্যমেই স্পেন তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম আমলে আন্দালুসিয়া, সেভিল প্রভৃতি প্রদেশে যায়তুন ও খেজুর এবং সিরীশ, গ্রানাডা, মালাগা প্রভৃতি অঞ্চলে আংগুরের উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চাষাবাদের সাথে সাথে স্পেনের মুসলমানরা খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের প্রতিও মনোনিবেশ করে। তারা স্পেনের বিভিন্ন জায়গায় সোনা, রূপা, লোহা, ইস্পাত, পারদ, তামা, ইয়াকূত প্রভৃতির খনি আবিষ্কার করে। গ্রানাডা রাজ্য ছিল স্পেনে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিও স্থাপত্য বিদ্যায় ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। মুসলমানরা এমন বিস্ময়কর সিমেন্ট আবিষ্কার করে যে, আল-হামরা প্রাসাদ, যা গ্রানাডা সাম্রাজ্যের সাক্ষীরূপে এখনো দণ্ডায়মান আছে, তাতে অতি মজবুত ধরনের মসল্লার যে প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি পর্যটকরা এখনো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গ্রানাডার সুলতান প্রচুর অর্থ ব্যয় করে শহরের নিকটবর্তী একটি অতি উচ্চ টিলার উপর, শালীর পর্বতের বরফে ঢাকা শৃঙ্গসমূহের ছায়ায় আল-হামরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তার ঘেরা প্রাচীরের অভ্যন্তরে সুন্দর ও শস্য-শ্যামল উদ্যান ও স্বচ্ছ পানির নহর তৈরি করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত উদ্যানে ফলবান বৃক্ষ সারি এমনভাবে লাগান হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত তখনকার বিশ্বে ছিল বিরল। আল-হামরা প্রাসাদের প্রত্যেকটি জিনিস এতই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় যে, আজো বিশ্বের বিখ্যাত কারু শিল্পীরা তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। চুন-সুরকির তৈরি এর সুউচ্চ দেওয়ালসমূহ মর্মর পাথরের চাইতে অধিক চকচকে এবং লোহার চাইতে অধিক মজবুত। জালিদার দেওয়াল সমূহে নানা ধরনের সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং এর নতুন আকৃতির মিহরাবসমূহ থেকে ঝুলন্ত কলাম, এর সূক্ষ্ম কারুকার্যেরই নিদর্শন। মুসলমানরা স্পেনের শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে সমগ্র দেশে স্কুল, কলেজ, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং বিরাট বিরাট লাইব্রেরী স্থাপন করে। প্রতিটি শহরেই কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জনবসতিতে প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্ডোভা, সেভিল মালাগা, সারাকাস্তা, বেশূনা, জিয়ান, টলেডো প্রভৃতি বড় বড় শহরে যে সব কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ছাত্র ও

বিদ্যানুরাগীরা দলে দলে আসত এবং বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা অর্জন করত। আরবরা গ্রীক, ল্যাটিন, স্পেনীশ প্রভৃতি ভাষা অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে আয়ত্ত করে এবং ঐ সমস্ত ভাষায় অনেকগুলো আরবী অভিধান রচনা করে। খলীফা দ্বিতীয় হাকামের যুগে শুধু কর্ডোভার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ছয় লক্ষ গ্রন্থ ছিল এবং প্রতিটি গ্রন্থের উপর স্বয়ং খলীফার হস্ত লিখিত টীকা ছিল। মুসলমানরা গ্রীক দর্শনের যাবতীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছিল। ইব্‌ন রুশ্‌দ, যিনি এরিস্টটলের চাইতেও বড় পণ্ডিত ছিলেন, স্পেনেরই একজন মুসলমান ছিলেন। স্পেনের মুসলমানরা জ্যোতিষশাস্ত্রে এতই উন্নতি করেছিল যে, এ ক্ষেত্রে সমগ্র ইউরোপ তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সার্জারিতে মুসলমানরা এতই উন্নতি করেছিল যে, এই কিছুদিন আগেও সমগ্র ইউরোপ এ বিষয়ে তাদেরই বই-পুস্তক অধ্যয়ন করত। প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিদ্যায়ও মুসলমানরা ছিল অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা দানের জন্য কর্ডোভা ও গ্রানাডায় বিশেষ ধরনের উদ্যান ও গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল। শণ এবং তূলা থেকে স্পেনের মুসলমানরাই সর্বপ্রথম কাগজ তৈরি করে। আলফান (একাদশ)-এর ইতিহাসে আছে ঃ

"শহরের মুসলমানরা নাশপাতির ন্যায় ভয়ংকর আওয়াজের গোলাসমূহ নিক্ষেপ করত। এই সমস্ত গোলা এতদূর পর্যন্ত যেত যে, কোন কোনটি শত্রুবাহিনীকে ছাড়িয়ে অপর প্রান্তে এবং কোন কোনটি শত্রু বাহিনীর মধ্যেই পতিত হতো।"

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা যে কামান ও বারূদ ব্যবহার করত খ্রিস্টানরা ছিল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'সানীনুল ইসলাম'-এর গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ ৪৪১ হিজরীতে (১০৪৯-৫০ খ্রি) স্পেনের কিছু সংখ্যক মুসলমান আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাদের আবিষ্কারের কথা তেমন জানাজানি হয়নি। কলম্বাসই হচ্ছেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি এর অনেক দিন পর আমেরিকা আবিষ্কার করে তার আবিষ্কারকর্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের অত্যধিক কৌতূহল ও আগ্রহ সমগ্র ইউরোপের সামনে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য তথা সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। আটশ' বছর পর্যন্ত মুসলমানরা ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ে ইউরোপবাসীদের শিক্ষকতুল্য। খ্রিস্টান আমীর-উমারারা চলনে-বলনে তথা প্রত্যেকটি বিষয়ে মুসলমানদের অনুসরণ করাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন। এমন কি তারা আরবী ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনার চেষ্টা করতেন। এটা হচ্ছে তৎকালীন মুসলমানদেরই প্রভাব যে, ফরাসী ও ইতালী ভাষায় জাহাজ নির্মাণ এবং সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে সমস্ত শব্দ রয়েছে তার বেশিরভাগই আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ সমস্ত দেশের লোকেরা মুসলমানদের কাছ থেকেই জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পরিচালনা বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। ঐ সমস্ত দেশের পর্যটনশাস্ত্র, শিকার কৌশল, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত বেশির ভাগ শব্দও আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত। মোটকথা, স্পেনের মুসলমানরাই হচ্ছে সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরু। আজ ইউরোপ নিজের এমন

একটি কৃতিত্বপূর্ণ জিনিসও পেশ করতে পারবে না যার উন্নয়ন বা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা কোন না কোন ভাবে মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়। আর এই ঋণের কি প্রতিদান ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে দিয়েছে তা তো উপরে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে পুনরায় এ কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে যে, মুসলমানরা যখন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে স্পেন জয় করেছিল তখন জবরদস্তিমূলকভাবে কোন খ্রিস্টানকেই ইসলামে দীক্ষিত করেনি বরং খ্রিস্টানরা ইসলামের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু যখন খ্রিস্টানরা শক্তি অর্জন করল এবং পরাজিত মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে ফিরাতে পারল না তখন তারা স্পেনে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করল, আগুনে নিক্ষেপ করল অথবা পানিতে ডুবিয়ে মারল। এরই ফলশ্রুতিতে ঐ স্পেন, যা মুসলমানদের শাসনামলে অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল ও উর্বর দেশ হিসাবে সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেছিল, মুসলমানদের পতনের পর তা এমনি পতিত, অনাবাদ ও অনুর্বর হয়ে পড়ে যে, আজ পর্যন্ত তা সেই পূর্বের অবস্থায় পৌছতে পারেনি। মুসলমানদের শাসনামলে স্পেনের পাহাড়সমূহের উপর চাষাবাদ হতো এবং এক ইঞ্চি জায়গাও অনুর্বর বা পতিত ছিল না। কিন্তু সেই স্পেনেরই হাজার হাজার বর্গমাইল জমি আজো অনুর্বর ও পতিত পড়ে আছে। যে স্পেন মুসলমানদের আমলে বিশ্বের সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল আজ তা ইউরোপের সবচাইতে অপয়া ও উপেক্ষিত দেশ।

স্পেনের মুসলমানদের উপর ঐ দুর্যোগ নেমে এসেছিল এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে উপেক্ষা করেছিল যার ফলে তাদের মধ্যে স্বাথপরতা ও অনৈক্য দেখা দেয়। ইসলামী আইনের আনুগত্য ছেড়ে দেওয়ার কারণেই একজন মুসলিম অধিনায়ক অপর একজন মুসলিম অধিনায়কের মুকাবিলা করতে গিয়েই খ্রিস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করতেও ইতস্তত করত না। খোদ মুসলমানরাই খ্রিস্টানদের হাতে আপন মুসলমান ভাইদের যবাই করিয়েছে এবং এভাবে তারা খ্রিস্টানদের অন্তর থেকে ইসলামের পরাক্রম ও ভাবমূর্তি মুছে ফেলেছে। স্পেনের মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদেরই কর্মদোষে একটি অভিশপ্ত মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। এ কারণে তারা বিপদের সময় বিশ্বের কোন অঞ্চল থেকেই কোন সাহায্য পায়নি। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের হাতেই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। মুসলমানরা যেখানেই দীন ইসলাম থেকে গাফিল হয়েছে এবং কুরআনে করীমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে সেখানেই এভাবে তাদের উপর বিপদ নেমে এসেছে। আগামীতেও বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানরা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে তা এই কুরআনকে উপেক্ষা করার কারণেই হবে। এখন স্পেনের মুসলমানদের পতন ও ধ্বংসের উপর মাতম করার পরিবর্তে আমাদের উচিত, ঐ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। আমরা যেন প্রকৃত মুসলমান হয়ে পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করি, একতাবদ্ধ হয়ে ও আলস্য ছেড়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ হই সে ব্যাপারে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এর নামই জীবন এবং এটাকেই বলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মারাকিশ (মরক্কো) ও আফ্রিকা

স্পেন উপদ্বীপের দক্ষিণে এবং আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে দেশটি অবস্থিত তাকে মরক্কো, মারাকিশ অথবা মৌরিতানিয়া বলা হয়। এই দেশে মরক্কো নামের একটি শহরও আছে। মারাকিশের বিশেষ বিশেষ প্রদেশ হচ্ছে সূসুল আদনা, সূসুল আকসা, রালফ, সূ-তা প্রভৃতি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে মারাকিশের প্রদেশসমূহের সীমারেখা এবং নামও সর্বদা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আরবের লোকেরা মরক্কোকে মাগরিবুল আকসা বলত। অনুরূপভাবে তারা আলজিরিয়াকে বলত মাগরিবুল আওসাত। কখনো কখনো আলজিরিয়াকে এবং তিউনিস পর্যন্ত এলাকাসমূহকে মারাকিশ বলা হতো। আরবের ন্যায় মারাকিশেও বার্বার জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক পৃথক বসবাস করত এবং ঐ সম্প্রদায়সমূহের নামে বিভিন্ন প্রদেশের নামকরণ করা হতো। উপরন্তু তাদের বসতির প্রেক্ষিতে প্রদেশসমূহের আয়তনও নির্ধারিত হতো। তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো এই তিন দেশে প্রধানত বার্বার সম্প্রদায় বসবাস করত। এ কারণে মিসর ছাড়া সমগ্র উত্তর আফ্রিকাকে 'বার্বারদের দেশ' বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের আগমনকালে মারাকিশ দেশে যানাতা, মাসমুদা, সানহাজাহ্, কাতামাহ্, হাওয়ারাহ্ প্রভৃতি বার্বার সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত। বার্বার এলাকা অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকায় এসে কোন কোন ইরানী সম্প্রদায়ের লোক বসতি স্থাপন করে এবং তাদের মাধ্যমে মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চলে অগ্নি উপাসনার রীতি প্রচলিত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর অর্থাৎ বনী ইসরাঈলও এই অঞ্চলে এসে বসিত স্থাপন করে। অতএব ইহুদী মাযহাবও কোন না কোন যুগে এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে থাকবে। রোমান এবং গ্রীকদের হাতেও একদা এই অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা ছিল। কারতাজিনার বিখ্যাত সম্প্রদায় এই বার্বার এলাকা কিংবা তিউনিস কিংবা আফ্রিকার অধিবাসী ছিল। তাদেরকে ফিনিশিয়ার অধিবাসী কানআনীদের একটি শাখা মনে করা হয়। শেষ পর্যন্ত গথ জাতিও এই অঞ্চল শাসন করেছে। মুসলমানরা এই দেশ জয় করা পর্যন্ত তা পূর্ব রোম অর্থাৎ কনসটান্টিনোপলের শাসনাধীন ছিল। মোটকথা, বার্বার জাতি মারাকিশ এবং তৎসংলগ্ন প্রাচ্য অঞ্চলসমূহে বসবাস করত। তারা শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই জাতিকে আরব, সিরীয়, মিসরীয়, গ্রীক, ইরানী, রোমান প্রভৃতি জাতির একটি মিশ্রিত মানবগোষ্ঠীই বলা চলে। দেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবে এই মিশ্রিত জাতির একটি বিশেষ মেযাজ, বিশেষ চরিত্র ও বিশেষ সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তাই বার্বাররা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একটি বিশেষ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এখানে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়। আর তা এই যে, কিছু কিছু সভ্য ও উন্নত জাতি উত্তর আফ্রিকা শাসন করা সত্ত্বেও বার্বার জাতির বর্বরতা ও হিংস্রতা, যা ছিল ঐ পরিবেশ ও আবহাওয়ার ফলশ্রুতি তাদের থেকে দূর হয়নি। হ্যাঁ, যদি দূর হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছিল মুসলমান কর্তৃক এই দেশ জয় এবং এখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পর। এখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুসলমানদের অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বার্বার সম্প্রদায়ের লোকেরা বার বার বিদ্রোহ করেছে এবং বার বার তাদেরকে পরাজিত ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা বার্বার জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় না নিয়েছে ততক্ষণ তাদের মধ্যে এই বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্যমান ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা নিজেদেরকে আরবদের মত বীর বাহাদুর এবং সভ্যভব্য প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, যখনই তাদের মধ্যে ইসলামী অনুশাসন মান্য করার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে তখনি তাদের মধ্যে সেই পুরাতন বর্বরতা, পাশবিকতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ফিরে এসেছে।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, উকবা ইব্‌ন নাফি সমগ্র মারাকিশ জয় করে নিয়েছিলেন। মারাকিশের কোন কোন প্রদেশের শাসনকর্তারা সানন্দে উকবার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। তারপর বেশ কয়েকবারই সেখানে বিদ্রোহ হয়েছে এবং প্রতিবারই তা দমন করা হয়েছে। আফ্রিকা ও মারাকিশের গভর্নর মূসা ইব্‌ন নুসায়র নিজের পক্ষ থেকে তারিক ইব্‌ন যিয়াদকে মরক্কোর শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তাই তারিক ইব্‌ন যিয়াদ স্পেন জয় করেন। স্পেন অভিযানকালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বার্বারদেরকে কাজে লাগানো হয়। অতএব এ কথা বললে ভুল হবে না যে, মারাকিশের অধিবাসীরা স্পেন জয় করে তা ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্পেন জয় করার পরও বার্বাররা মারাকিশ ও স্পেনে বার বার বিদ্রোহ করে। স্পেনে তো তাদের বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু বার্বার দেশে অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকায় তাদের বিদ্রোহ এমন প্রকৃতির ছিল যে, তা দমন করতে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। বনূ উমাইয়ার পতন এবং খিলাফতে আব্বাসীয়ার পরিপূর্ণ উত্থানের পরও বার্বার সম্প্রদায় তাদের বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। মুসলমানরা প্রতিবারই তাদেরকে দমন করেছে। কিন্তু যখনই শাসকদের মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তখনই বার্বাররা পুনরায় বিদ্রোহ করে বসেছে। বার্বার জাতির এই অবস্থা এবং এই মেযাজ লক্ষ্য করে যারাই খিলাফতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তারাই মারাকিশ এবং আফ্রিকার ঐ অঞ্চলকে তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত করেছে, যেখানে বার্বার সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। আলাভীরা, যারা বার বার আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের সবারই ভরসা স্থল ছিল এই বার্বারভূমি। তাই আলাভীরা যখন সুযোগ পেয়েছে তখন ইরাক, সিরিয়া এবং আরব থেকে পলায়ন করে এই দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমানরা এই দেশ জয় করার পর থেকেই তারা ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয় এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের ঐ বিদ্রোহ স্বভাব কাটেনি। যখনই ধর্মীয় পোশাকে কোন আন্দোলন শুরু হতো তখনি বার্বাররা তাতে অংশগ্রহণ করে পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিত।

ইদরীসী সালতানাত

খুলাফায়ে আব্বাসীয়ার অবস্থান বর্ণনাকালে মক্কায় ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং তার বংশের পরাজয় ও ধ্বংসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই বংশেরই ইদরীস নামীয় জনৈক ব্যক্তি রাশীদ নামীয় তার এক ভৃত্যসহ হিজায থেকে পালিয়ে মিসর ও আফ্রিকা হয়ে মারাকিশে গিয়ে পৌছেন। বুলিয়া নামক স্থানে ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ নামীয় জনৈক কর্মকর্তা বা গোত্রপতি ইদরীসকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে যাওয়াগাহ্, লাওয়াতাহ্, যানাতাহ্, মাদরাতাহ্, মকনাসাহ্, গামায প্রভৃতি বার্বার সম্প্রদায় ইদরীসের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়। কোন কোন বার্বার সম্প্রদায় তখনো শালাহ্, মাদালাহ্ প্রভৃতি স্থানে বসবাস করত। ১৭২ হিজরীতে (৭৮৮-৮৯ খ্রি) ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল হামীদের চেষ্টায় বেশির ভাগ মুসলিম বার্বার সম্প্রদায় ইদরীসের হাতে খিলাফতের বায়আত করে এবং ইদরীস ঐ সব সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে ঐ সমস্ত বার্বার সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যারা তখন পর্যন্ত মুসলমান হয়নি। তিনি ঐ সমস্ত লোককে পরাজিত করে তাদের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য তুলে ধরেন, যার ফলে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে ইদরীসকে তাদের সুলতান ও খলীফা বলে মেনে নেয়।

১৭৩ হিজরীতে (৭৮৯-৯০ খ্রি) ইদরীস তিলমিসান আক্রমণ করেন এবং তিলমিসানের শাসনকর্তা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি তিলমিসানকেই তাঁর রাজধানী করে সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। ইদরীস দ্রুত তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং কিছু দিন পর তিলমিসান থেকে বূলিয়া বা বূলীলী নামক স্থানে চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। ইদরীসের এই ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং আল-মাগরিবে মরক্কো (আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে) তাঁর শাসনক্ষমতা গ্রহণের এই সংবাদ যখন আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদের কাছে গিয়ে পৌছে তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য সুলায়মান ইব্‌ন জারীর ওরফে শাম্মাখকে আল-মাগরিবে পাঠান, যাতে সে ছলে-বলে-কৌশলে ইদরীসকে উৎখাত করে। শাম্মাখ ইদরীসের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে—আমি হারূনুর রশীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাম্রাজ্য ছেড়ে আপনার কাছে চলে এসেছি। এ কথা শুনে ইদরীস তাকে তাঁর সভাসদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

ইদরীসের মৃত্যু

শাম্মাখ ইদরীসকে একটি দাঁতের মাজন দেয়, যা ব্যবহার করার সাথে সাথে ইদরীসের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় এবং তিনি ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১-৯২ খ্রি) পরলোক গমন করেন। শাম্মাখ সেখান থেকে পলায়ন করে। ইদরীসের ভৃত্য রাশীদ তার পশ্চাদ্ধাবন করে। দু'জনের মধ্যে মুকাবিলা হয়। শাম্মাখ তাতে আহত হয় বটে, তবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ইদরীস বূলীলী নামক স্থানে সমাধিস্থ হন।

দ্বিতীয় ইদরীস

ইদরীসের মৃত্যুর পর তাঁর ভৃত্য রাশীদ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কানীযাহ্ নামীয় জনৈক বার্বার ক্রীতদাসীর গর্ভে ইদরীসের ঔরসজাত সন্তান রয়েছে। সন্তানটি ভূমিষ্ঠ না

হলেও তারই পক্ষে সকলকে বায়আত করতে হবে। অতএব বার্বাররা ঐ সন্তানের পক্ষেই বায়আত করে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল, যা ইদরীসের হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেগুলোর উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। শেষ পর্যন্ত বার্বার দাসীর গর্ভ থেকে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। রাশীদ সবাইকে নির্দেশ দেন-- তোমরা এই ছেলের হাতেই বায়আত কর। অতএব সবাই আনুগত্যের বায়আত করল। রাশীদ এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিনিধি হিসাবে দেশ শাসন করছিলেন। এই রাশীদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণেই ইদরীসের মৃত্যুর পরও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েনি। রাশীদ বার্বারদের মন-মেযাজ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন বলে তাদেরকে শাসন পরিচালনার কাজে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করেন। যখন ঐ শিশু সন্তানের দুধ ছাড়ানো হলো তখন পুনরায় তার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়। ১৮৮ হিজরীতে (৮০৪ খ্রি) যখন ছেলেটির বয়স এগারো থেকে বারো বছর তখন বূলীলী জামে মসজিদে পুনরায় তার হাতে বায়আত করা হয়। এই বছরই আফ্রিকার শাসনকর্তা ইব্‌ন আগ্‌লাব রাশীদের বিরুদ্ধে বার্বারদেরকে উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে বার্বাররা রাশীদকে হত্যা করে। কিন্তু তারা ইদরীসের ঐ কিশোর পুত্রের আনুগত্য অস্বীকার করেনি। এই পুত্রের নাম ইদরীস রাখা হয় এবং তিনি দ্বিতীয় ইদরীস বা ইদরীস আসগার নামে খ্যাতি লাভ করেন। রাশীদের মৃত্যুর পর আবূ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ইলিয়াস আবদী ইদরীস আসগারের গৃহশিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হন।

রাজ্য বিস্তার

ইদরীস আসগার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ পরিচালনার কলাকৌশল আয়ত্ত করে মুসআব ইব্‌ন ঈসা আযদীকে তাঁর মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে প্রায় সমগ্র মারাকিশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশ শাসন করতে থাকেন। অনেক আরববাসী স্পেন, আফ্রিকা, মিসর ও সিরিয়া থেকে দ্বিতীয় ইদরীসের কাছে এসে সমবেত হতে থাকে এবং তাদের কারণে হুকুমত ও সালতানাতের জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সালতানাতে ইদরীসীয়ার একজন শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তি। তারই প্রাথমিক সাহায্য-সহযোগিতায় প্রথম ইদরীস অতি সহজে নিজস্ব হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২ হিজরীতে (৮০৭-৮ খ্রি) তাকে এই অভিযোগে হত্যা করা হয় যে, ইবরাহীম আগলাবের সাথে তার দহরম-মহরম রয়েছে এবং তারই ইঙ্গিতে রাশীদ নিহত হয়েছেন। বূলীলী বা বুলিয়া, যেখানে ইদরীসী সালতানাতের রাজধানী ছিল তা ছিল একটি ক্ষুদ্র স্থান। ১৯৩ হিজরীতে (৮০৮-৯ খ্রি) দ্বিতীয় ইদরীস বূলীলী থেকে 'ফাস্' নামক স্থানে চলে আসেন এবং তারই সন্নিকটে একটি নতুন শহর নির্মাণ করে সেটাকেই তাঁর রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন। ঐ সময়ে তিলমিসান অঞ্চল তাঁর দখল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি ১৯৭ হিজরীতে (৮১২-১৩ খ্রি) তিলমিসান জয় করেন এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ দখল করে ১৯৯ হিজরী (৮১৪-১৫ খ্রি) পর্যন্ত তিলমিসানেই অবস্থান করেন। তারপর যখন তিনি ফাস-এ চলে যান তখন বার্বাররা তাদের জন্মগত স্বভাববশে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইবরাহীম আগলাবের আনুগত্য স্বীকার করে

নেয়। এভাবে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব এবং দ্বিতীয় ইদরীসের মধ্যে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ইদরীস আসগার এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের মধ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং মারাকিশ অঞ্চল আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন ও পৃথক ইদরীসী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস

২১৩ হিজরীতে (৮২৮-২৯ খ্রি) দ্বিতীয় ইদরীস মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন প্রথম ইদরীসের সহোদর ভাই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান মুসান্না ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিব মিসর ও আফ্রিকা হয়ে তিলমিসানে এসে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি যখন নিজেকে প্রথম ইদরীসের সহোদর ভাই বলে প্রকাশ করেন তখন সেখানকার বার্বার গোত্রসমূহ তার হাতে সানন্দে বায়আত করে। ফলে তিলমিসানে সুলায়মানের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে দ্বিতীয় ইদরীসের মা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের দাদী কানীযা বললেন, শুধু মুহাম্মাদকে সমগ্র সাম্রাজ্য না দিয়ে তার অন্যান্য ভাইকেও এক একটি অংশ দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত কানীযারই প্রস্তাব মতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস (দ্বিতীয়)-কে ফাস এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের শাসনক্ষমতা প্রদান করা হয়। দাউদের ভাগে পড়ে বিলাদ, হাওয়ারাহ্ মাতলাসুল, তাযী এবং মীক্‌নাসাহ্ ও গীয়াসার শাসন কর্তৃত্ব। আবদুল্লাহ্‌কে দেওয়া হয় বাগমাত, নাফীস জিবাল, মাসামীদাহ্, বিলাদে লুমতাহ্ এবং সূসুল আক্‌সাহ। ইয়াহইয়ার ভাগে পড়ে বাসীলা, আরাঈশ এবং বিলাদে রওগাহ্। ঈসাকে দেওয়া হয় শালাহ্, সালা, আযমূর এবং তামাসনার শাসন ক্ষমতা। হামযার হাতে অর্পণ করা হয় বূলীলী এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। অন্যান্য অল্প বয়স্ক ছেলেরা তাদের দাদী কানীযার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকে। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তো ইতিপূর্বেই তিলমিসান দখল করে নিয়েছিলেন। তারপর একজন স্ত্রীলোকের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মারাকিশের মত একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ করে ফেলেন। কিছুদিন পর ঈসা, আযমূর থেকে তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ তার ভাই কাসিমকে এই আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কাসিম সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে। তখন মুহাম্মাদ উমরকে ঈসার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। উমর ঈসাকে পরাজিত করে তার দখলাধীন সমগ্র এলাকা তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। আর মুহাম্মাদও সন্তুষ্ট চিত্তে উমরকে তা করতে দেন। তারপর মুহাম্মাদ কাসিমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উমরকে নির্দেশ দেন। কেননা মুহাম্মাদ তার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

উমর কাসিমের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাসিম উমরের কাছে পরাজিত হয়ে সংসার ত্যাগী হয়ে যান এবং এই অবস্থায়ই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। উমর কাসিমের রাজ্যও নিজের দখলাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। এভাবে উমরের রাজ্য বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু তিনি সর্বদা

তার ভাই মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করতে থাকেন। ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি) উমরের মৃত্যু হলে মুহাম্মাদ তার পুত্র আলী ইব্‌ন উমরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসের মৃত্যু

উমরের মৃত্যুর সাত মাস পর ২২১ হিজরীতে (৮৩৬ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীসেরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর নয় বছর বয়স্ক পুত্র আলীকে তার স্থলাভিষিক্ত ও 'আলীআহ্‌দ' নিয়োগ করেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ

মুহাম্মাদের পর রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও সভাসদবৃন্দ সন্তুষ্টচিত্তে আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদের হাতে বায়আত করেন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সালতানাতের কাজকর্ম পরিচালনা করতে থাকেন। আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদের আমলে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। তের বছর হুকুমত পরিচালনার পর ২৩৪ হিজরী (৮৪৯-৫০ খ্রি) সনে আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ভাই ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার অসদাচরণ ও অনুপযুক্ততা প্রজাসাধারণকে অসন্তুষ্ট করে তোলে এবং তারা আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী সাহলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়াকে পদচ্যুত করে ফাস থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই অপমান ও লাঞ্ছনার কারণে কিছুদিন পর ইয়াহ্‌ইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আলী ইব্‌ন উমর তখন পর্যন্ত তার রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার উপরিউক্ত পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আলী ইব্‌ন উমর ফাস্‌-এ এসে সিংহাসনে বসেন এবং এভাবে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই আবদুর রায্‌যাক খারিজী বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজ্যের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেন। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইদরীসী বংশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও দুর্বল থাকে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন উমর

২৯২ হিজরীতে (৯০৫ খ্রি) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইদরীস উমর ইব্‌ন ইদরীস (দ্বিতীয়) ক্ষমতা সঞ্চয় করে সমগ্র মারাকিশ রাজ্য দখল করে নেন এবং ইদরীসী সালতানাতের পুনরায় উত্থান-পতনের যুগ আসে। তিনি অত্যন্ত শৌর্যবীর্য ও সাফল্যের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁকে ইদরীসী বংশের সর্ববৃহৎ বাদশাহ মনে করা হয়। এটা হচ্ছে সে যুগের কথা, যখন আফ্রিকায় উবায়দী বংশের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইয়াহ্‌ইয়া পরাজিত হয়ে ফাস-এ ফিরে আসেন এবং উবায়দীদের সাথে আপোসচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইদরীস উবায়দী সালতানাতের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তার নিদর্শন

স্বরূপ প্রতি বছর কিছু নগদ অর্থ প্রদান করবেন। ৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি) যখন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইদরীসের পুত্র তালহা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইদরীস ফাস-এর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনি উবায়দী বাহিনীর হাতে বন্দী হন। দু'বছর বন্দী জীবন যাপনের পর ইয়াহ্ইয়া মুক্তিলাভ করে মাহদিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ৩৩১ হিজরীতে (৯৪২-৪৩ খ্রি) মৃত্যু মুখে পতিত হন।

৩০৯ হিজরীতে (৯২১-২২ খ্রি) মারাকিশ ও ফাসে উবায়দী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩১৩ হিজরীতে (৯২৫ খ্রি) হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম ইব্ন ইদরীস ফাস্-এর উবায়দী গভর্নর রায়হান কিতামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর ইদরীসী বংশের আরো কয়েক ব্যক্তি বন্দী ও নিহত হন। ফাস্-এ উবায়দী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলেও মারাকিশের অধিকাংশ জেলায় ইদরীসী বংশের কিছু কিছু লোক এক একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপর দখলদার থাকেন। আর এরা সবাই ছিলেন দ্বিতীয় ইদরীসের সন্তান উমর ও মুহাম্মাদের বংশধর। শেষ পর্যন্ত তারা স্পেনের সুলতানের সাথে যোগাযোগ করে তার আনুগত্য স্বীকার করেন। ফলে স্পেনের উমাইয়া সুলতান অবিলম্বে মারাকিশ দখল করে সেখান থেকে উবায়দীদেরকে তাড়িয়ে দেন। অবশেষে মারাকিশ কর্ডোভা সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। স্পেনের ইতিহাস বর্ণনাকালে যে বনূ হামূদ বংশের উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল এই ইদরীসী বংশেরই একটি শাখা।

ইদরীসী হুকুমতের পরিসমাপ্তি

ইতোপূর্বে সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রথম ইদরীসের ভাই। তিনি তিলমিসান এবং তাহারত এলাকায় তার হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান মাগরিব আল-আওসাত-এর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তারপর বনূ সুলায়মান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র রাজ্য এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উশকূল অঞ্চল ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান এবং জাল্লাওয়ার শাসন ক্ষমতা ইদরীস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান দখল করে নেন। ইদরীস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানের পুত্র আবুল আইশ ঈসা তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর তার পুত্র ইবরাহীম ইব্ন ঈসা, তারপর তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইবরাহীম, তারপর তার ভাই ইদরীস ইব্ন ইবরাহীম শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। শেষ পর্যন্ত এই বংশের সকল সদস্যকে কর্ডোভার খলীফা আবদুর রহমান নাসিরের সেনাপতিরা বন্দী করে ফেলে। ৩৪২ হিজরী (৯৫৩-৫৪ খ্রি) পর্যন্ত আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান তানস্ প্রদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপরও বনূ সুলায়মানের বেশির ভাগ সদস্য মাগরিব আল-আওসাতের বেশির ভাগ অঞ্চলে নামেমাত্র দখলদার থাকেন। তারপর ক্রমে ক্রমে এই বংশের শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটে।

আফ্রিকার আগলাবী সাম্রাজ্য

দ্বিতীয় খণ্ডে আব্বাসীয় খিলাফতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্পেন দেশ আব্বাসীয় খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল এবং

সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বনূ উমাইয়া বংশের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের কথাও ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। স্পেনের পর মারাকিশও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সেখানে স্বাধীন সার্বভৌম ইদরীসী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইদরীসী হুকুমতের কথাও ইতোপূর্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মারাকিশের পর আফ্রিকা কিংবা তিউনিস কিংবা পশ্চিম তারাবলিস (ত্রিপোলি) খিলাফতে আব্বাসীয়া থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আগলাবী হুকুমত। এই আগলাবী হুকুমতের কথা এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। আফ্রিকিয়া দেশ ও বার্বার অঞ্চল তথা উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের শাসনকর্তা ও ভাইসরয় এই আফ্রিকিয়া অঞ্চলের ত্রিপোলির কায়রোয়ানে অবস্থান করতেন। মারাকিশ ও স্পেনের গভর্নর এই কায়রোয়ানের ভাইসরয়েরই পরামর্শ অনুযায়ী নিযুক্ত হতেন। আব্বাসীয় খিলাফত আমলে যখন স্পেন ও মারাকিশ আব্বাসীয় সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন কায়রোয়ানের ভাইসরয়ের মর্যাদা একজন মামুলী সুবাদার বা গভর্নরের পর্যায়ে চলে আসে। প্রজাসাধারণ এবং আবহাওয়ার দিক দিয়ে এই দেশ মারাকিশের সাথে সামঞ্জস্য রাখত এবং এখানেও বার্বাররা অধিক পরিমাণে বসবাস করত। তাই এই প্রদেশও সর্বদা বিপন্ন অবস্থায়ই থাকত এবং এখানকার কর্মকর্তা বা গভর্নরকেও তড়িঘড়ি বদলী করা হতো। এখানে সব সময়ই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল।

ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব

কর্মকর্তাদের বার বার বদলী করার কারণে যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিল দ্বিতীয়বার এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন জনসাধারণ তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে, যিনি দরবারে খিলাফতে অবস্থান করছিলেন, এই মর্মে পত্র লেখে ঃ আপনি খলীফাকে বলে এই প্রদেশের শাসনভার আপনার হাতে গ্রহণ করুন। এই পত্র পেয়ে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব খলীফা হারূনুর রশীদের খিদমতে নিবেদন করেন– আপনি মিসরের আমদানী থেকে এক লক্ষ দীনার আফ্রিকিয়া দেশের শাসন পরিচালনার কাজে ব্যয় করছেন। ঐ দেশ থেকে তো আপনার কোন আমদানী হয় না। আপনি আমাকে ঐ দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠিয়ে দেন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, মিসরের কোষাগার থেকে বার্ষিক ঐ এক লক্ষ দীনার তো আমি নেব না, বরং আফ্রিকিয়া থেকে কর হিসেবে বার্ষিক চল্লিশ হাজার দীনার দরবারে খিলাফতে প্রেরণ করতে থাকব। ইবরাহীম্ ইব্‌ন আগলাবের এই আবেদন সম্পর্কে খলীফা হারূনুর রশীদ হারসামা ইব্‌ন আইউনের সাথে পরামর্শ করেন। হারসামা বলেন, আপনি ইবরাহীমের এই আবেদন অবশ্যই মঞ্জুর করুন এবং আফ্রিকিয়া দেশ শাসন করার সনদ তাকে প্রদান করুন। অতএব হারূনুর রশীদ ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে সনদ প্রদান করেন। এটা এক ধরনের ঠিকা, যা ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে প্রদান করা হয়েছিল। যাহোক, ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিলের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আর যেহেতু প্রজাসাধারণ ইবরাহীমের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল তাই সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ১৮৪ হিজরীতে (৮০০ খ্রি) আফ্রিকিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং কায়রোয়ানের সন্নিকটে একটি নতুন শহর নির্মাণ এবং তার নাম 'আব্বাসীয়া' রাখেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ

১৮৬ হিজরীতে (৮০২ খ্রি) হামদীস নামক জনৈক ব্যক্তি আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইবরাহীম ইমরান ইব্‌ন মুজাহিদকে একটি বাহিনীসহ হামদীসের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। এ ঘোরতর যুদ্ধের পর হামদীস পরাজিত হয় এবং তার দশ হাজার সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। তারপর ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব তার পরিপূর্ণ শক্তি মাগরিবুল আকসার দিকে নিয়োজিত রাখেন। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন প্রথম ইদরীস ইতিমধ্যে মারাকিশে দেহ ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর রাশীদ নামক ভৃত্যটি 'ইদরীসে আসগর' নাম ধারণ করে মারাকিশে হুকুমত করছেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব বার্বারদেরকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নেন। আর ঐ বার্বারদেরই একটি দল রাশীদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কাছে কায়রোয়ানে পাঠিয়ে দেয়। এরপরও ইবরাহীম আগলাব বার্বারদের প্রতি তার দানের হস্ত প্রসারিত রাখেন। ফলে ইদরীসে আসগরের বেশির ভাগ কর্মকর্তা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু এর একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়ার পূর্বেই ১৭৯ হিজরীতে (৭৯৫ খ্রি) তারাবুলিস (ত্রিপোলী)-এর অধিবাসীরা ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের কর্মকর্তা সুফইয়ান ইব্‌ন মুহাজিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে ত্রিপোলী থেকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। ইবরাহীম ত্রিপোলী অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে যিলহজ্জ (নভেম্বর ৮০৫ খ্রি) মাসে পুনরায় ত্রিপোলীর কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৯৫ হিজরীতে (৮১০-১১ খ্রি) ইমরান ইব্‌ন মুজাহিদ রাবয়ী তিউনিসিয়া থেকে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি একটি বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ানের দিকে অগ্রসর হন এবং কায়রোয়ান দখল করে নেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আব্বাসীয়ার নিকটে গভীর পরিখা খনন করেন এবং আব্বাসীয়ার নিকট অবরুদ্ধ হয়ে বসে থাকেন। ইমরান এক বছর পর্যন্ত ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবকে অবরোধ করে রাখে। অবশ্য এই সময়ে অবরুদ্ধ ও অবরোধকারী পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে প্রধানত ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাবই জয়লাভ করেন। কিন্তু বিষয়টির কোন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। এই সময়ে ইমরান আসাদ ইব্‌ন ফুরাত কাযীকেও বদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু আসাদ তা করতে অস্বীকার করেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব খলীফা হারূনুর রশীদকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন। খলীফা হারূনুর রশীদ সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ প্রেরণ করেন। এই অর্থ এসে পৌঁছার সাথে সাথে ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব পুনরায় দান-দক্ষিণা শুরু করেন। যার ফলে ইমরানের বাহিনীর বেশির ভাগ লোক ইবরাহীমের কাছে চলে আসে। ইমরান এই অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সেখান থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে যাব-এর দিকে চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব এই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৬ হিজরীতে (৮১১-১২ খ্রি) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ সেখানে পৌঁছার কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রিপোলীর সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজধানী ঘেরাও করে ফেলে। তারা আবদুল্লাহ্‌কে নিরাপত্তা প্রদান করে এই শর্তে যে, তিনি ত্রিপোলী ছেড়ে চলে যাবেন। আবদুল্লাহ্ ত্রিপোলী থেকে বেরিয়ে যান সত্য, তবে ঐ

এলাকায় অবস্থান করে বার্বারদেরকে নিজের দলে টানতে থাকেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রচুর অর্থ দান করেন। এভাবে আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে ওঠে এবং তারা জোর আক্রমণ চালিয়ে ত্রিপোলী দখল করে নেয়। এর কিছু দিন পর ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আবদুল্লাহ্‌কে পদচ্যুত করে সুফইয়ান ইব্‌ন মুযায়কে ত্রিপোলীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু ত্রিপোলীবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহ করে সুফইয়ানকে সেখান থেকে বের করে দেয়। সুফইয়ান ইবরাহীমের কাছে আব্বাসীয়া চলে যান। এবার ইবরাহীম সুফইয়ানের সাথে তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে প্রেরণ করেন এবং তারা উভয়ে ত্রিপোলী গিয়ে পৌঁছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর ত্রিপোলীতে কিছুদিন শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু শীঘ্রই আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুল ওহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুর রহমান ত্রিপোলী আক্রমণ করে। ফলে পুনরায় সেখানে রক্তারক্তি শুরু হয়।

মৃত্যু

১৯৬ হিজরীতে (৮১১-১২ খ্রি) ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব আব্বাসীয়ায় ইনতিকার করেন। এই সংবাদ যখন ত্রিপোলীতে আবদুল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি আবদুল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি ত্রিপোলীর পার্শ্ববর্তী এলাকা আবদুল্লাহ্‌কে দিয়ে ত্রিপোলী শহরটি নিজের দখলে রাখেন এবং আপোসচুক্তি সম্পাদনের পর ত্রিপোলী থেকে কায়রোয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম

ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব মৃত্যুকালে পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তার অলীআহ্‌দ (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করেন এবং অপর পুত্র যিয়াদাতুল্লাহ্‌কে উপদেশ দেন, যেন সে তার ভাইয়ের অনুগত থাকে। অতএব পিতার মৃত্যুর পর যিয়াদাতুল্লাহ্ তার ভাই আবদুল্লাহ্‌র জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব ১৯৭ হিজরীর সফর (৮১২ খ্রি অক্টোবর) মাসে কায়রোয়ানে উপনীত হন এবং শাসনক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। আনুমানিক পাঁচ বছর হুকুমত করার পর ২০১ হিজরীর যিলহজ্জ (৮১৭ খ্রি জুন) মাসে কর্ণরোগে আক্রান্ত হয়ে আবদুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন। আবদুল্লাহ্‌র পর তার ভাই যিয়াদাতুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যিয়াদাতুল্লাহ্

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম আগলাব ঠিকা ভিত্তিতে এই দেশের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই খুতবায় আব্বাসীয় খলীফার নাম উল্লেখ করা হতো। তবে হুকুমত ছিল স্বায়ত্তশাসিত। যিয়াদাতুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর কাছে মামূনুর রশীদ আব্বাসীর পক্ষ থেকে হুকুমতের সনদ এসে পৌঁছে। সেই সাথে এই হুকুমও আসে যে, মিম্বরের উপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের জন্য যেন দু'আ করা হয়। যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে এই হুকুমটি অপছন্দনীয় ঠেকে। তাই তিনি আব্বাসীয় খলীফার দূতকে বিদায় দানকালে হাদিয়া ও উপঢৌকনের সাথে ইদরীসী হুকুমতের টাকশালে তৈরি কয়েকটি

দীনার পাঠিয়ে দেন। এর দ্বারা আব্বাসীয় খলীফাকে এটাই বুঝানো হচ্ছিল যে, আমরা আপনার স্থলে ইদরীসী হুকুমতের সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারি।

বিদ্রোহ

কিছুদিন পর যিয়াদ ইব্‌ন সাহ্‌ল নামক জনৈক অধিনায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাজাহ্ শহর অবরোধ করে ফেলেন। যিয়াদাতুল্লাহ্ এই সংবাদ পেয়ে ২০৭ হিজরীতে (৮২২-২৩ খ্রি) একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা যিয়াদের বাহিনীকে পরাজিত করে। খোদ যিয়াদও তাদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। তারপর মানসূর তিরমিযী তান্‌বাহ্ নামক স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনী গঠন করে তিউনিসের উপর হামলা চালান। তিউনিসের গভর্নর মানসূরের সাথে এক সংঘর্ষে নিহত হন। ফলে তিউনিসের উপর মানসূরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যিয়াদাতুল্লাহ্ তার চাচাত ভাই এবং উযীর আগলাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আগলাবকে মানসূরের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা মানসূরের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে আস তাহলে তোমাদের সাবইকে আমি হত্যা করব। যাহোক, দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মানসূর তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। আগলাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় কায়রোয়ানের দিকে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় সৈন্যরা তাদের প্রাণের ভয়ে আগলাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করে এবং নিজেরা মানসূরের কাছে চলে যায়। এবার মানসূর ভীষণ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং অতি সহজেই কায়রোয়ান দখল করে নেন। যিয়াদাতুল্লাহ্ আব্বাসীয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তারপর উভয়পক্ষের মধ্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত যিয়াদাতুল্লাহ্ জয়ী হন এবং মানসূর সেখান থেকে পালিয়ে তিউনিসে চলে যান। এমতাবস্থায় সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ সুবিধামত দেশের এক একটি অংশ দখল করে নেয়। আমির ইব্‌ন নাফি আরযাক ছিলেন তাদেরই একজন, যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যিয়াদাতুল্লাহ্ একটি বাহিনী দিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আগলাবকে আমিরের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। আমির এই বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। মোটকথা, ঐ সময় যিয়াদাতুল্লাহ্‌র দখলে খুব কম বাকি জায়গায় থাকে। অবশিষ্টটুকু বিভিন্ন অধিনায়ক দখল করে ফেলে। কিন্তু কিছু দিন পরই মানসূর ও আমিরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সুযোগে যিয়াদাতুল্লাহ্ তার অবস্থাকে চাঙ্গা করে নেন এবং পুনরায় নিজেকে সুসংগঠিত করে তোলেন। এদিকে মানসূর আমিরের হাতে নিহত হন এবং আমির তিউনিসে নিজের একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ২১৮ হিজরীতে (৮৩৩ খ্রি) যিয়াদাতুল্লাহ্ তিউনিসও দখল করে নেন। তারপর অন্যান্য অধিনায়ককেও পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন।

সিসিলী দ্বীপ জয়

সাকলিয়া (সিসিলী) দ্বীপ তখন কনসটান্টিনোপলের কায়সারের অধীনে ছিল। সেখানে কায়সারের পক্ষ থেকে একজন গভর্নর নিয়োজিত হতেন এবং তিনিই দেশ শাসন করতেন। ২১১ হিজরীতে (৮২৬ খ্রি) কায়সার কাসানতিল নামক একজন পুরোহিতকে সিসিলীর শাসক

নিয়োগ করেন। তিনি ফীমী নামক একজন রোমান অধিনায়ককে নৌ-সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। ফীমী আফ্রিকা উপকূলে লুটপাট শুরু করে এবং সমুদ্রের মধ্যে পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই কায়সার সিসিলীর গভর্নরকে লেখেন– তুমি তোমার নৌ-সেনাধ্যক্ষকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। নৌ-সেনাধ্যক্ষের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি সিসিলী দ্বীপে প্রবেশ করে সারতূসা শহর দখল করে নেন। তারপর গভর্নর ও নৌ-সেনাধ্যক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে গভর্নর নিহত হন এবং ঐ নৌ-সেনাধ্যক্ষ ফীমী সমগ্র দ্বীপ দখল করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। দ্বীপের এই রাজা বালাতা নামক জনৈক ব্যক্তিকে দ্বীপের একটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বালাতার এক চাচাত ভাই মীখাইলও এই দ্বীপের একটি অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দুই চাচাত ভাই একত্রিত হয়ে ফীমীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ সারকাসা দখল করে নেন। ফীমী পরাজিত হয়ে ঐ দ্বীপ ছেড়ে চলে আসেন। তারপর যিয়াদাতুল্লাহ্ কায়রোয়ানের কাযী আসাদ ইব্ন ফুরাতকে একটি বাহিনীসহ সিসিলীর বাদশাহ্ ফীমীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

মুসলমানরা সর্বপ্রথম হযরত মুআবিয়ার খিলাফত আমলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ফাযারীর নেতৃত্বে সিসিলী দ্বীপ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু রোমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা ছাড়া ঐ আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছিল ৩৩ হিজরীতে (৬৫৩-৫৪ খ্রি)। তারপর ৮৫ হিজরীতে (৭০৪ খ্রি) আফ্রিকার ভাইসরয় মূসা ইব্ন নুসায়রও ঐ একই উদ্দেশ্যে সিসিলী দ্বীপের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। তারপর ১০২ হিজরীতে (৭২০-২১ খ্রি) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ ইদরীস নামক খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের জনৈক অধিনায়ক সিসিলী দ্বীপ আক্রমণ করেন। এই সবগুলো হামলাতে মুসলমানরা জয়লাভ করে এবং সেখান থেকে অনেক কয়েদী ও গনীমতের মাল নিয়ে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১১০ হিজরীতে (৭২৮ খ্রি) আফ্রিকিয়ার ভাইসরয় উবায়দা ইব্ন আবদুর রহমান কায়সী-এর মুসতানীর ইব্ন হারস নামক জনৈক অধিনায়ক একদল সৈন্য নিয়ে সিসিলী অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু সমুদ্রে ঝড় ওঠার ফলে অনেকগুলো জাহাজ ডুবে যাওয়ায় ঐ অভিযান ব্যর্থ হয়। মুসতানীর রাস্তা থেকেই কোন মতে ত্রিপোলী ফিরে আসেন। তারপর ১২২ হিজরীতে (৭৪০ খ্রি) আফ্রিকার গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন হিজাব হাবীব ইব্ন মুহাম্মাদকে তার পুত্র আবদুর রহমান ইব্ন হাবীবসহ সিসিলীর উদ্দেশে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব উপকূলে উঠে অভিযান শুরু করেন এবং অগ্রসর হতে হতে দ্বীপের অভ্যন্তরে রাজধানী সারাগোসা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। সিসিলীর শাসক আবদুর রহমান ইব্ন হাবীবকে জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হন এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। এভাবে আবদুর রহমান বিজয়ী বেশে প্রচুর মালে গনীমত নিয়ে পিতা হাবীব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র কাছে সমুদ্র উপকূলে ফিরে আসেন। কিন্তু আবদুর রহমান ও তার পিতা সিসিলী থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পর ঐ দ্বীপটি পুনরায় মুসলমানদের দখল থেকে বেরিয়ে যায়। তবে এই বের হওয়াটাও ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার। ১৩৫ হিজরীতে (৭৫২-৫৩ খ্রি) আফ্রিকার হাকিম পুনরায় এই দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারপর ২১২ হিজরী (৮২৭-২৮ খ্রি)পর্যন্ত মুসলমানরা এই দ্বীপের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ আর পায়নি।

যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে ফীমী এসে ঐ দ্বীপ জয় করার জন্য যখন তাকে উদ্বুদ্ধ করল তখন যিয়াদাতুল্লাহ্ কায়রোয়ানের কাযী আসাদ ইব্‌ন ফুরাতকে ফীমীর জাহাজগুলো ছাড়াও আরো একশ' জাহাজ দিয়ে সিসিলীর দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যেন সিসিলী জয় করে সেখানে পৃথকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখান থেকে রোমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলা হয়। ২১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি (৮২৭ খ্রি জুলাই) সময়ে ঐ নৌবহর সিসিলী অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং তিন দিনের মাথায় সিসিলী উপকূলে গিয়ে পৌঁছে। বালাতাহ্, যিনি তখন দ্বীপে বাদশাহর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ করেন। বালাতাহ্ কায়সারের দরবারে আনুগত্যের দরখাস্ত পেশ করে যথারীতি হুকুমতের সনদ লাভ করেছিলেন এবং কায়সারের কাছে সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। যা হোক, উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রতিটি ফ্রন্টেই খ্রিস্টান সেনাপতিকে পরাজিত করে মুসলমানরা অগ্রসর হচ্ছিল। উল্লিখিত ফীমীও মুসলমান সেনাবাহিনীর সাথে ছিল। কিন্তু সে মুসলমানদের হাতে খ্রিস্টানদের পরাজয়ের পর পরাজয় দেখে কিছুটা বিচলিত এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন কি শেষ পর্যন্ত গোপনে গোপনে সে খ্রিস্টানদের কাছে মুসলমানদের সংবাদ পৌঁছাতে থাকে এবং উপস্থিত পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শও দিতে থাকে। যার ফলে মুসলিম বাহিনী কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন একটি যুদ্ধে বালাতাহ্ নিহত হন এবং খোদ খ্রিস্টানরাই প্রতারণার মাধ্যমে ফীমীকে মুসলিম বাহিনী থেকে পৃথক করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। বালাতাহ্‌র স্থলে খ্রিস্টানরা সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন মনোনীত করে এবং সারকূসাকে সবরকম প্রস্তুতির মাধ্যমে সুদৃঢ় করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে থাকে। কাযী আসাদ ইব্‌ন ফুরাত সারকূসা অবরোধ করেন। কিন্তু এই অবরোধ চলাকালেই তিনি ২১৩ হিজরী শাবান (৮২৮ খ্রি নভেম্বর) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাযী আসাদ ইব্‌ন ফুরাতের মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল জাওয়ারীকে তাদের নেতা মনোনীত করে। এরপরই খ্রিস্টানদের সাহায্য এবং মুসলমানদের মুকাবিলায় কনসটান্টিনোপল থেকে জাহাজে চড়ে সেনাবাহিনী এসে পড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী ঐ নবাগত খ্রিস্টান বাহিনীকে তাড়িয়ে দেয় এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অবরোধ অব্যাহত রাখে। কিন্তু এরপরই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের জন্য ঐ মহামারীর আক্রমণ খ্রিস্টান বাহিনীর আক্রমণের চাইতেও ছিল ভয়ংকর ও মারাত্মক। এতে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। এবার মুসলমানরা সারকূসা থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিজেদের অধিকৃত শহরসমূহে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে আফ্রিকায় চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় ফিরে এসে ঐ দ্বীপটি দখল করে নিতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যেই কনসটান্টিনোপলের নৌ-বহর তাকে ঘিরে ফেলেছে। এবার প্রচুর সংখ্যক খ্রিস্টান সৈন্য স্থল ও জলপথে এসে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে ও ঘাঁটির মধ্যেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা দখলীকৃত শহরসমূহের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিল, এই সংবাদ

পেয়ে অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে, কিন্তু খ্রিস্টানদের অবরোধ ভাংতে না পেরে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত অবস্থায় এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই অবরুদ্ধ অবস্থায়ই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল জাওয়ারী ইনতিকাল করেন।

মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে যুহায়র ইব্‌ন আউফকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে। কিন্তু মাযর নামক স্থানে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। ঘটনাচক্রে স্পেনের একটি নৌবহর জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল এবং রোম সাগরে ঘোরাফেরা করছিল। সিসিলীর যে সব মুসলমান অবরোধের বাহিরে ছিল তারা কোন না কোন ভাবে স্পেনের ঐ নৌবহরের কাছে গিয়ে তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর এই নাজুক অবস্থার কথা জানায়। তখন ঐ বহর থেকে তিনশ'টি নৌকা সিসিলী উপকূলে প্রেরণ করা হয়। স্পেনের মুসলিম বাহিনী নৌকা থেকে বের হয়ে খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খ্রিস্টানরা এই আকস্মিক হামলা প্রতিরোধ করতে না পেরে অবরোধ তুলে পালিয়ে যায়। এটা হচ্ছে ২১৫ হিজরীর জমাদিউস্ সানীর (৮৩০ খ্রি সেপ্টেম্বর) ঘটনা। মুসলমানরা এই অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় বিজয় অভিযান পরিচালনা করে। স্পেনের নৌবহর এই কাজ সেরে ফিরে যায় বটে, তবে আফ্রিকী মুসলিম বাহিনী পালার্মো ঘেরাও করে ফেলে এবং অন্যান্য দখলীকৃত শহরের উপরও নতুনভাবে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে আফ্রিকা থেকেও নৌযোগে সাহায্য এসে পৌঁছে। এর পূর্বে যে বাহিনী আসাদ ইব্‌ন ফুরাতের সঙ্গে এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার সাতশ'। তন্মধ্যে দশ হাজার ছিল পদাতিক এবং সাতশ অশ্বারোহী। পালার্মো তখনও বিজিত হয়নি এমনি সময়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আগলাব অর্থাৎ যিয়াদাতুল্লাহ্‌র চাচাত ভাই সিসিলীর গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি ২২০ হিজরীতে (৮৩৫ খ্রি) পালার্মো, কাসীরমানা প্রভৃতি শহর রোমানদের কাছ থেকে দখল করে নেন। দ্বীপের দক্ষিণ অর্ধাংশ মুসলমানদের দখলে ছিল এবং উত্তর অর্ধাংশ ছিল তখন খ্রিস্টানদের দখলে। খ্রিস্টানরা কায়সারের কাছ থেকে অনবরত সাহায্য পাচ্ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের দখলীকৃত এলাকার আয়তন দিনের পর দিন বাড়িয়েই যাচ্ছিল। পালার্মো বিজয়ের পর সিসিলী দ্বীপ আগলবী সুলতানদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সেখানে কায়রোয়ান থেকে একের পর এক গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন এবং সে প্রদেশ শাসন করতেন। যিয়াদাতুল্লাহ্‌র শাসনামলের সর্ববৃহৎ কীর্তি হচ্ছে সিসিলী দ্বীপকে ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্তকরণ। আনুমানিক পৌনে তিনশ' বছর পর্যন্ত মুসলমানরা এই দ্বীপটি শাসন করে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় এবং এই সুযোগে খ্রিস্টানরা দ্বীপটি পুনরায় নিজেদের দখলে নিয়ে যায়। তারপর তারা সেখান থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা এমনভাবে মুছে ফেলে যেমনভাবে মুছে ফেলেছিল স্পেন থেকে।

যিয়াদাতুল্লাহ্‌র মৃত্যু

২২৩ হিজরীতে (৮৩৮ খ্রি) যিয়াদাতুল্লাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর ভাই আগলাব ইব্‌ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল আবূ ইকাল।

আগলাব ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ ইকাল

আবূ ইকালের শাসনাধীনে জনসাধারণ সাধারণভাবে সন্তুষ্ট ছিল। সেনাবাহিনীও ছিল তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তখন কেউ বিদ্রোহ করলে তা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দমন করা হতো। দু'বছর সাত মাস শাসন ক্ষমতা পরিচালনার পর আবূ ইকাল ২২৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল (৮৪১ খ্রি জানুয়ারী) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন আগলাব ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আগলাব।

আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ

আবুল আব্বাস মুহাম্মাদের শাসনব্যবস্থা ছিল তাঁর পিতারই অনুরূপ। ২৪০ হিজরীতে (৮৫৪-৫৫ খ্রি) আবুল আব্বাসের ভাই আবূ জা'ফর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তার ভাইকে পদচ্যুত করে নিজেই শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আবুল আব্বাস বিভিন্ন সুযোগে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন এবং দেড় বছর পর ২৪২ হিজরীতে (৮৫৬ খ্রি) পুনরায় সিংহাসন দখল করে আবূ জা'ফরকে মিসরের দিকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু এ বছরই আবুল আব্বাস ইনতিকাল করেন এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র আবূ ইবরাহীম আহমদ ইব্‌ন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবূ ইবরাহীম আহমদ

আবূ ইবরাহীম আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাবাহিনীর বেতন বাড়িয়ে দেন। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। তখন সিসিলী দ্বীপের রোমান বাহিনীর সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। আবূ ইবরাহীমের যুগে ২৪৭ হিজরী সনের শাওয়াল (৮৬২ খ্রি জানুয়ারী) মাসে মুসলমানরা রোমানদের উপর একটি বিরাট বিজয় লাভ করে এবং অনেক রোমান যুদ্ধবন্দী আফ্রিকায় নিয়ে আসে। ইবরাহীম তখন এই বিজয় সংবাদসহ রোমান বন্দীদেরকে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের কাছে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। আগলাব বংশের শাসকরা আফ্রিকিয়া প্রদেশে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করলে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাগদাদের নেতৃত্ব স্বীকার করতেন এবং কোন না কোনভাবে অবশ্যই দরবারে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। ২৪৯ হিজরীতে (৮৬৩ খ্রি) আবূ ইবরাহীম আহমদ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র যিয়াদতুল্লাহ্ যিনি যিয়াদাতুল্লাহ্ আসগর নামে খ্যাত ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যিয়াদাতুল্লাহ্

যিয়াদাতুল্লাহ্ আসগরের শাসনকাল তাঁর পূর্বপুরুষদেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু তিনি এক বছরের বেশি সাম্রাজ্য শাসনের সুযোগ পান নি। তারপর তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ ইবরাহীম আহমদ ওরফে আবুল গারানীক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবুল গারানীক

আবুল গারানীক তাঁর ভাই যিয়াদাতুল্লাহ্ আসগরের মৃত্যুর পর ২৫০ হিজরীতে (৮৬৪ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খেলাধুলার প্রতি অধিক অনুরাগী। তাঁর

শাসনকালে সিসিলী দ্বীপের একটি অংশ রোমানরা মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানরা পুনরায় তা রোমানদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। আবুল গারানীক মরক্কো সীমান্তে এবং সমুদ্র উপকূলে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এগার বছর শাসন পরিচালনার পর আবুল গারানীক ২৪১ হিজরীর জমাদিউস সানী (৮৫৫ খ্রি নভেম্বর) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন আবূ ইবরাহীম আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ

ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে শাসন পরিচালনা শুরু করেন এবং দেশের শাসন কাঠামোকে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে তুলেন। তিনি বিদ্রোহের যাবতীয় সম্ভাবনাকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। ২৬৭ হিজরীতে (৮৮০-৮১ খ্রি) মিসরীয় বাহিনী আফ্রিকার উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু ইবরাহীমের বাহিনী তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। ২৬৯ হিজরীতে (৮৮২-৮৩ খ্রি) দেশের মধ্যে একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়, যে কারণে অনেক লোক নিহত হয়। ২৮০ হিজরীতে (৮৯৩ খ্রি) খারিজীরা বিদ্রোহ করে এবং সমগ্র দেশে সেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ইবরাহীম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খারিজীদের সে বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তারপর ইবরাহীম সুদানী লোকদেরকে তার সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন। ঐ সমস্ত সুদানী যুবক, যাদেরকে অশ্বারোহী হিসাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছে। ২৮১ হিজরীতে (৮৯৪ খ্রি) ইবরাহীম কায়রোয়ান থেকে তিউনিস নগরীতে চলে আসেন এবং সেখানেই প্রাসাদ তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। তিনি ২৮৩ হিজরীতে (৮৯৬ খ্রি) ইব্‌ন তূলূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে একটি বিদ্রোহ সংবাদ শুনে সেদিকে রওয়ানা হন এবং সে বিদ্রোহ দমন করেন।

২৮৭ হিজরীতে (৯০০ খ্রি) সিসিলী দ্বীপ থেকে সংবাদ আসে যে, পালার্মোর অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তখন ইবরাহীম তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্‌কে ১৬০টি নৌকার একটি নৌবহর দিয়ে সিসিলী অভিমুখে প্রেরণ করেন। আবুল আব্বাস সিসিলীতে উপনীত হয়ে খ্রিস্টান বিদ্রোহীদেরকে একের পর এক পরাজিত করে সমগ্র দ্বীপে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে সিসিলীর নৌযানসমূহে আরোহণ করেন এবং ফ্রান্স উপকূলে হামলা পরিচালনা করেন। এভাবে দেড় বছর পর সেখান থেকে নিরাপদে ও বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। তাঁর ফিরে আসার সাথে সাথে খোদ ইবরাহীম সিসিলী অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখান থেকে ফ্রান্স উপকূলেও হামলা চালান। ফরাসীরা তাঁকে অত্যন্ত ভয় করত। তিনি সেখানকার কিছু অঞ্চল ঘেরাও করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় ২৮৯ হিজরীর যিলহজ্জ (৯০২ খ্রি ডিসেম্বর) মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লাশ (শবদেহ) সেখান থেকে পালার্মো নিয়ে এসে দাফন করা হয়।

এই ইবরাহীমের শাসনামলে শীআ মতাবলম্বী আবূ আবদুল্লাহ্ হুমায়ূন ইব্ন মুহাম্মাদ মরক্কো ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সীমান্তে আটলাস পর্বতের দক্ষিণে কাতামা শহরে আবির্ভূত হন এবং বার্বার সম্প্রদায়সমূহকে আহলে বায়তের মুহাব্বতের দোহাই দিয়ে নিজের পক্ষাবলম্বী করে নেন এবং এভাবে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি কাতামা শহর দখল করে আগলাবী সাম্রাজ্যের সীমান্তকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে আগলাবী মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবুল আব্বাস

আবুল আব্বাস সিংহাসনে আরোহণ করে তিউনিসে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁর পুত্র আবুল খাওলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্র অনুসারীদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করেন। শীআরা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে আবূ খাওলের উপর আক্রমণ চালায়। চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধের পর আবূ খাওল পরাজিত হন এবং তিউনিসে ফিরে আসেন। তিনি সেখান থেকে পুনরায় নৈন্য সংগ্রহ করে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় রওয়ানা হন। আবূ আবদুল্লাহ্ প্রতারণার মাধ্যমে তাঁর সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালান। এই অতর্কিত হামলার ফলশ্রুতিতে আবুল খাওলের বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। আবুল খাওল 'সাতীফ' নামক স্থানে অবস্থান করে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় রওয়ানা হন। এদিকে আবুল খাওলের অপর ভাই যিয়াদাতুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আব্বাস তাঁর পিতার কিছু সংখ্যক চাকর ভৃত্যের সাথে ষড়যন্ত্র করে আবুল আব্বাসকে হত্যা করেন এবং স্বয়ং ২৯০ হিজরীর শাবান (৯০২ খ্রি জুলাই) মাসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আবুল খাওলের কাছে এই সংবাদ পৌঁছার পর তিনি তিউনিসে ফিরে আসেন এবং সাথে সাথে বন্দী ও নিহত হন। আবুল খাওল ছাড়াও যিয়াদাতুল্লাহ্ তার ভ্রাতা ও পিতৃব্যদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এ কারণেই যিয়াদাতুল্লাহ্র ডাক নাম ছিল আবূ মুযির বা ক্ষতিকারকের বাবা।

আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্

আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্র সিংহাসনে আরোহণের পর শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাতীফ শহর দখল করে নেন এবং তার ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পায়। আবূ মুযির ছিলেন আরামপ্রিয় এবং কাপুরুষ। তিনি তিউনিস ত্যাগ করে বাকাদা নামক স্থানে বসবাস স্থাপন করেন এবং তার এক অধিনায়ক ইবরাহীম ইব্ন জায়শকে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। ইবরাহীম ইব্ন জায়শ চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ রওয়ানা হন এবং কাস্তিলায় পৌঁছে সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তিনি চতুর্দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। এই বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি কাতামা অভিমুখে রওয়ানা হন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনাচক্রে ইবরাহীম ইব্ন জায়শই পরাজিত হন এবং তিনি সেখান থেকে কায়রোয়ানে পালিয়ে আসেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ তুনবাহ শহর জয় করে সেখানকার কর্মকর্তা ফাতহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করেন। আবূ আবদুল্লাহ্র এই সমস্ত বিজয় সংবাদ শুনে কায়রোয়ান এবং অন্যান্য শহরে চাঞ্চল্য ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্য যিয়াদাতুল্লাহ্ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি তার বাহিনীতে অনবরত সৈন্য ভর্তি করতে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় বাহিনীর পর বাহিনী পাঠাতে থাকেন। এতদ্সত্ত্বেও আবূ আবদুল্লাহ্র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং একটির পর একটি শহর তার দখলে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ আবদুল্লাহ্ কামূদাহ্ শহরও দখল করে নেয়।

আগলাবী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি

কামূদাহ্ শহরের পতন সংবাদ শুনে আবূ মুযির যিয়াদাতুল্লাহ্ তার যাবতীয় ধন-সম্পদ জাহাজে ভর্তি করে 'রাকাদা' থেকে পূর্ব দিকে চলে যান। প্রথমে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তারই অধীনস্থ সেখানকার শাসক তাকে সেখানে অবতরণ করতে দেন নি। অতএব তিনি বাধ্য হয়ে সিরিয়া উপকূলে অবতরণ করেন এবং রাক্কাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তার মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে আগলাবী শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। ২৯৬ হিজরীতে (৯০৮-৯ খ্রি) শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ সম্পূর্ণ আগলাবী সাম্রাজ্য দখল করে জনসাধারণের কাছ থেকে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর পক্ষে বায়আত নেন। আর এভাবেই আগলাবী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উবায়দিয়্যিন সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। এ বছরই রাকাদাহ্, কায়রোয়ান প্রভৃতি দখল করে আবূ আবদুল্লাহ্ ২৯৭ হিজরীতে (৯০৯-১০ খ্রি) হাসান ইব্ন খাযীর কাতামীকে সিসিলী দ্বীপের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠন। কিন্তু ২৯৯ হিজরীতে (৯১১-১২ খ্রি) সিসিলীবাসীরা হাসান ইব্ন খাযীরের অসদাচরণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তাকে বন্দী করে ফেলে এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে এই সংবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে নিজেদের এলাকার জন্য অপর একজন গভর্নর নিয়োগ-এর অনুমোদন লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মিসর ও আফ্রিকায় উবায়দী সাম্রাজ্য

আবূ আবদুল্লাহ্

আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হওয়ার সাথে সাথে আলীপন্থীরা তার বিরোধিতা করতে থাকে (এ সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। তারা বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যদিও প্রতিবারই তাদেরকে বিফলতার মুখ দেখতে হয়। আহ্‌লে বায়তের সাথে তাদের ভালবাসার এবং আব্বাসীয়দের সাথে বৈরিতার সম্পর্ক রয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে আলাভীরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আত্মপ্রচারণা (আলীপন্থীরা) শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু আব্বাসীয়দের দৃঢ়তা এবং তাদের অনুসারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের চেষ্টার ফলে আলীপন্থীরা তাদের মিশনে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা এই গোপন ষড়যন্ত্রের সূচনা করেছিল। তাকেই এই ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার গুরু এবং উদ্ভাবক আখ্যা দেওয়া উচিত। এই কাজে মাজূসী (অগ্নিউপাসক) ইহুদী এবং বার্বাররাও নওমুসলিমের ছদ্মবেশে আলীপন্থীদের সহায়তা করে। যখন বিরাট আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় শৈথিল্য দেখা দিতে শুরু করে তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী এবং মাজূসী বংশের লোক নিজেদেরকে আলাভী পরিচয় দিয়ে এ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। যেহেতু বার্বার এলাকা ছিল বাগদাদ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে এবং বার্বারদের প্রকৃতিগত অস্থিরচিত্ততা থেকে ফায়দা উঠানো ছিল খুবই সহজ, তাই তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে মুহাম্মাদ হাবীব নামক জনৈক ব্যক্তি যিনি হেম্‌স এলাকার সালমিয়ায় অবস্থান করছিলেন নিজেকে ইমাম জাফর সাদিক (র)-এর পুত্র ইসমাঈলের বংশধর হিসেবে প্রকাশ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন। ইমাম জা'ফর সাদিক (র)-এর যুগ থেকে তার 'দাঈ' (প্রচারক)-রা ইয়ামান, আফ্রিকার এবং মারাকিশে প্রচার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারা জনসাধারণের দৃষ্টি এই বলে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করছিলেন যে, শীঘ্রই ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভূত হবেন এবং তিনি হবেন (আলীপন্থী) আলাভী ফাতিমী। মুহাম্মাদ হাবীব তার একান্ত অনুসারীদের মধ্য থেকে রুস্তম ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাওশাব নামক জনৈক ব্যক্তিকে ইয়ামানের দিকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, তিনি সেখানে গিয়ে জনসাধারণকে এই মর্মে তালিম দেবেন যে, ইমাম মাহ্‌দী শীঘ্রই আবিভূর্ত হবেন। রুস্তয় ইয়ামানে গিয়ে অত্যন্ত সুচারুরূপে নিজের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানে তার মতানুসারী বেশ বড় একটি দল গঠন করতে সক্ষম হন।

তারপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীবের কাছে আবূ আবদুল্লাহ্ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাকারিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি আসে। এই আবূ আবদুল্লাহ্ শীআ মতাবলম্বী ছিল এবং সর্বদা আলাভীদের পক্ষাবলম্বন করত। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব তাকে একজন যোগ্য লোক হিসাবে পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বলেন– তুমি প্রথম ইয়ামানে গিয়ে রুস্তম ইব্‌ন হাসানের সংস্পর্শে কিছু দিন থেকে তার কাছ থেকে দাওয়াত ও প্রচারের কায়দা-কানূন রপ্ত কর, তারপর সেখান থেকে বার্বার এলাকায় নিজের কাজ শুরু কর। সেখানে ক্ষেত্র তৈরি আছে, তুমি বীজ বপন করতে শুরু কর, অবশ্যই সফলকাম হবে। আবূ আবদুল্লাহ্‌কে মুহাম্মাদ হাবীব এও বলে দিয়েছিলেন, আমার পুত্র উবায়দুল্লাহ্ হচ্ছে ইমাম মাহ্‌দী এবং তোমাকে তারই 'দাঈ' (প্রচারক) করে পাঠানো হচ্ছে। আবূ আবদুল্লাহ্ প্রথমে ইয়ামানে যায়। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে রুস্তম ইব্‌ন হাসান ও অন্যান্য দাঈর কাছ থেকে দাওয়াত ও প্রচারের কৌশল রপ্ত করে। এরপর হজ্জ উপলক্ষে আগত কাতামার সরদার ও দলপতিদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ওদের সাথেই কাতামায় চলে যায়। সেখানে পৌঁছে সে দাওয়াত ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং বাহ্যিকভাবে তার সংসার-বিমুখতাও জনসাধারণের অন্তরে নিজের একটি স্থান করে নেয়। আবূ আবদুল্লাহ্ ২৮৮ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৯০১ খ্রি ১২ মার্চ) কাতামাহ্ শহরে উপনীত হয় এবং অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরে ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাবার প্রয়াস চালায়। যেহেতু আবূ আবদুল্লাহ্‌র পূর্বেই সে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক আলাভী প্রচারক ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সম্পর্কে প্রচারের কাজ চালিয়ে ছিলেন, তাই আবূ আবদুল্লাহ্‌কে এ ক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। কাতামাহ্‌বাসীরা 'ফাজ্জুল আখইয়ার' নামক স্থানে আবূ আবদুল্লাহ্‌র জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেয়। সে সেখানে অবস্থান করে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে তালীম দিতে থাকে। সে কাতামাহ্‌বাসীদেরকে বলে– ইমাম মাহ্‌দী যে স্থানে এসে অবস্থান করবেন সে স্থানের নাম 'কিত্‌মান' ধাতু থেকে নির্গত। অতএব আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস এই যে, কাতামাহ্‌ই হবে সেই স্থান। ইমাম মাহ্‌দীর অনুসারী ও সাহায্যকারীরা হবে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অতএব তোমাদের উচিত তার অপেক্ষায় থাকা এবং তার সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা। আফ্রিকার সুলতান ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আগলাব যখন আবূ আবদুল্লাহ্‌র আগমন এবং তার এ ধরনের তালীম দেওয়ার সংবাদ পান তখন তিনি তার কাছে কড়া নির্দেশ পাঠান ঃ তুমি তোমার এই ভ্রষ্টতাপূর্ণ তালীম বন্ধ কর, অন্যথায় তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এটা ছিল সেই সময় যখন সমগ্র কাতামাহ্‌বাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহ আবূ আবদুল্লাহ্‌র একান্ত ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে আবূ আবদুল্লাহ্ নিজেকে শক্তিশালী জ্ঞান করে সুলতানের দূতকে একটি শক্ত জবাব দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। কাতামাহ্‌বাসীরা এই সংবাদ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে যে, আফ্রিকার শাসক এজন্য তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। অতএব তারা একটি পরামর্শ সভা ডেকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হয় আবদুল্লাহ্‌কে তারা কাতামাহ্ থেকে বের করে দেবে নয়ত আফ্রিকার শাসক ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। যেহেতু কাতামাহ্‌র অনেক ধর্মীয় নেতাও আবূ

আবদুল্লাহ্‌র ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তাই তারা জনসাধারণের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌কে সাহায্য করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানায়। এই সমস্ত লোকেরই প্রচেষ্টার ফলে ঐ এলাকারই হাসান ইব্‌ন হারূন গাস্‌সানী নামক জনৈক কর্মকর্তা আবূ আবদুল্লাহ্‌কে আশ্রয় দিয়ে তাযরূত শহরে নিয়ে যান। এদিকে কাতামাহ্‌বাসীরাও আবূ আবদুল্লাহ্‌কে সাহায্য-সহায়তার আশ্বাস দেয়। ফলে আবূ আবদুল্লাহ্‌র ক্ষমতা পূর্বের চাইতে অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং পরিস্থিতি যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। মাহ্‌দী ইব্‌ন আবী কুমারাহ-এর এক ভাই আবূ আবদুল্লাহ্‌র ভক্ত ছিল। সে আবূ আবদুল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে তার ভাই মাহ্‌দীকে হত্যা করে। এভাবে আবূ আবদুল্লাহ্‌র প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায় এবং হাসান ইব্‌ন হারূন তাকে তার মনিব বলে ভাবতে শুরু করে। ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদের একজন অতি পরাক্রমশালী অধিনায়ক ফাতাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তার বাহিনী নিয়ে আবূ আবদুল্লাহ্‌র উপর হামলা চালান এবং পরাজিত হয়ে কায়রোয়ানের দিকে পালিয়ে যান। তারপর আবূ আবদুল্লাহ্ এখানে সেখানে আপন দাঈদের পাঠাতে থাকেন এবং জনসাধারণকে বাধ্য হয়ে আবূ আবদুল্লাহ্‌র শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের একটি ভূ-খণ্ডের উপর অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবূ আবদুল্লাহ্‌র হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত ঘটনা শুধু এক অথবা দেড় বছর সময়কালের মধ্যে সংঘটিত হয়।

২৮৯ হিজরীতে (৯০২ খ্রি) সুলতান ইবরাহীম আগলাবীর পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর পুত্র আবুল খাওলকে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্‌র মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। (আগলাবী সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। আবুল খাওলের মুকাবিলায় আবূ আবদুল্লাহ্ প্রথম প্রথম পরাজিত হলেও ঘটনাচক্রে পরবর্তী সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার কারণে আবুল খাওল নিহত হন। ফলে আবূ আবদুল্লাহ্‌র হৃদয় থেকে আবুল খাওলের ভীতি আপনা আপনি দূর হয়ে যায়। আবূ আবদুল্লাহ্ কাতামাহ্‌র নিকটবর্তী আনকাজান নামক স্থানে দারুল হিজরত নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। যখন যিয়াদাতুল্লাহ্ আগলাবী-এর বংশের সর্বশেষ শাসক সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আবূ আবদুল্লাহ্‌র মনে বিভিন্ন শহর জয় করে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি প্রচার করতে শুরু করেন যে, অতি শীঘ্রই ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভূত হবেন। এই সাথে তিনি তার কিছু সংখ্যক অনুসারীকে হিম্‌স এলাকার সালমিয়ায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাবীবের কাছে প্রেরণ করেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন মুহাম্মাদ হাবীবের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং এই মৃত্যু সংবাদ আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে গেছে।

আবূ আবদুল্লাহ্‌র দূতেরা উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে নিবেদন করলো ঃ পশ্চিমাঞ্চলে আপনার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অতএব আপনি সেখানে গমন করুন। এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে উবায়দুল্লাহ্ ওরফে উবায়েদ আল-মাহ্‌দী সালমিয়ার ঐ সমস্ত লোকের সাথে রওয়ানা হয়ে যান। সঙ্গে তার পুত্র আবুল কাসিম এবং এক গোলামও রওয়ানা হয়। এরা সবাই নিজেদেরকে বাহ্যত একটি বণিক কাফেলায় রূপায়িত করে এবং সোজা রাস্তার পরিবর্তে বাঁকা রাস্তা ধরে লক্ষ্য স্থলের দিকে এগোতে থাকে। গুপ্তচরেরা আব্বাসীয় খলীফা মুকতাফীর কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছায় যে, অমুক ব্যক্তি সালমিয়া থেকে পশ্চিমাঞ্চলের

রাস্তা দিয়ে রওয়ানা হয়েছে। খলীফা মুকতাফী আবূ আবদুল্লাহ্‌র বিজয় অভিযান এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাবীবের এভাবে রওয়ানা হওয়ার খবর শুনে মিসরের গভর্নর ঈসা নুশতারীর কাছে এই মর্মে একটি নির্দেশ পাঠান ঃ অমুক আকার-আকৃতির এক ব্যক্তি মিসর হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে যাবে। একে যেখানে পাও অবিলম্বে বন্দী কর। এই নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে গভর্নর ঈসা উবায়দুল্লাহ্‌র কাফেলাকে বন্দী করে ফেলেন। কিন্তু সাথে সাথে প্রতারিত হন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে, এই ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ্ নয়। যা হোক তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। উবায়দুল্লাহ্ ত্রিপোলী গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে কাতামায় আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে তার আগমন সংবাদ পাঠান। কিন্তু তখনো উবায়দুল্লাহ্ এবং আবূ আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে আফ্রিকার শাসক যিয়াদাতুল্লাহ্ আগলাবী প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজ করছিলেন। যিয়াদাতুল্লাহ্‌র কাছে মিসর থেকে এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল যে, উবায়দুল্লাহ্ আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে যাচেছন। অতএব তিনি এখানে সেখানে উবায়দুল্লাহকে বন্দী করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ যে ব্যক্তির মাধ্যমে আবূ আবদুল্লাহ্‌র কাছে তার আগমন সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্‌রই ভাই আবুল আব্বাস। আবূ আবদুল্লাহ্ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সঙ্গী-সাথীসহ উবায়দুল্লাহ্‌কে নিয়ে আসার জন্য আবুল আব্বাসকেই প্রেরণ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবুল আব্বাস পথিমধ্যে কায়রোয়ানে বন্দী হন। যিয়াদাতুল্লাহ্ তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর কাছে যখন আবুল আব্বাসের কায়রোয়ানে গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাস্তিলায় চলে যান। কিন্তু সেখানে অবস্থানও নিরাপদ মনে না করায় সিজিলমাসা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। সিজিলমাসার শাসনকর্তা ছিলেন যিয়াদাতুল্লাহ্ আগলাবীর ভৃত্য আল ইয়াসা ইব্‌ন মাদার। প্রথমত তিনি উবায়দুল্লাহ্‌কে একজন নবাগত বণিক মনে করে তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন যিয়াদাতুল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌঁছে তখন তিনি উবায়দুল্লাহ্‌কে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করেন। যাহোক, আবুল আব্বাস কায়রোয়ানের জেলখানায় এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহদী সিজিলমাসার জেলখানায় তিন-চার বছর পর্যন্ত অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। অবশ্য এই সময়কালে আবূ আবদুল্লাহ্ তার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। এমনকি তিনি ২৯৬ হিজরী সনের প্রথম দিকে (৯০৮ খ্রি) দু'লাখ সৈন্য সংগ্রহ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ২৯৬ হিজরীর রজব (৯০৯ খ্রি এপ্রিল) মাসে কায়রোয়ান শহর দখল করে তার ভাই আবুল আব্বাসকে জেলখানা থেকে মুক্ত করেন এবং গোপনীয়ভাবে তার এই সমস্ত বিজয়-সংবাদ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর কাছে সিজিলমাসার বন্দীশালায় পৌঁছিয়ে দেন। আবূ আবদুল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীতে কাতামাহ্‌র দু'জন অধিনায়ক ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হচ্ছেন আরূবা ইব্‌ন ইউসুফ এবং অপরজন হচ্ছেন হাসান ইব্‌ন আবী খাবীর। আবূ আবদুল্লাহ্ কায়রোয়ান দখল করার পর সেখানকার ঘর-বাড়ি ও দালান-কোঠা কাতামাহ্‌বাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। শহরটি বিজিত হওয়ার পর জামে মসজিদের খতীব আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, খুতবায় কার নাম নেব? তিনি উত্তরে বলেন, আপাতত কারো নামই নিবেন না। তারপর তিনি তার ভাই আবুল

আব্বাসকে কায়রোয়ানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে সিজিলমাসার দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে যে সমস্ত গোত্রের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তারা সকলেই আনন্দে তার আনুগত্য স্বীকার করে। অবশ্য কেউ কেউ তার রাস্তা থেকে সরে যায়। সিজিলমাসার নিকটবর্তী হওয়ার পর আবূ আবদুল্লাহ্ সেখানকার শাসনকর্তা আল-ইয়াসা ইব্ন আদরারের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপোসচুক্তির আহবান জানান। এই অনুনয়-বিনয়ের কারণ হলো, উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তখনো আল-ইয়াসার কাছে বন্দী ছিলেন এবং আশংকা ছিল রূঢ় আচরণ করলে হয়ত তিনি উবায়দুল্লাহকে হত্যা করে ফেলবেন। আবূ আবদুল্লাহ্র দূত চিঠি নিয়ে যখন আল-ইয়াসা ইব্ন মাদরারের কাছে পৌঁছেন তখন তিনি সে দূতকে হত্যা করে আবূ আবদুল্লাহ্র পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করে আবূ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় বহির্গত হন। দুই পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আল-ইয়াসার বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। আবদুল্লাহ্ ত্বরিত গতিতে শহরে প্রবেশ করেন এবং সর্বপ্রথম জেলখানায় গিয়ে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী এবং তার পুত্র আবুল কাসিমকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে ঘোড়ার পিঠে বসান। বাহিনীর সকল অধিনায়কই তার সাথে ছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি তখন কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, 'হাযা মাওলাকুম' 'হাযা মাওলাকুম' (ইনিই তোমাদের ইমাম, ইনিই তোমাদের নেতা)। এভাবে তিনি উবায়দুল্লাহ্কে আপন তাঁবুতে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসান। প্রথমে নিজে তার হাতে বায়আত করেন। তারপর অন্যদেরকেও বায়আত করতে বলেন। এই মুহূর্তেই আল-ইয়াসা ইব্ন মাদরারকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেখানে হাযির করা হয়। আবূ আবদুল্লাহ্ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সে নির্দেশ কার্যকর করা হয়।

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী

আবূ আবদুল্লাহ্ এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী চল্লিশ দিন সিজিলমাসায় অবস্থান করার পর পশ্চিম দিকে রওয়ানা হন। তারা ২৯৭ হিজরী সনের রবিউস সানী (৯১০ খ্রি জানুয়ারী) মাসে রূকাদাহ্ এবং কায়রোয়ানে গিয়ে পৌঁছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ এ যাবত যে সমস্ত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তা আবদুল্লাহ্র খিদমতে পেশ করেন। সেখানে যথারীতি উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয়। এখন থেকে খুতবাসমূহে উবায়দুল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হতে থাকে এবং সমগ্র বার্বার অঞ্চলে মুবাল্লিগ ও প্রতিনিধি পাঠানো হয়। প্রদেশসমূহেও শাসনকর্তা ও রাজকীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। কাতামাহ্বাসীরা প্রথম থেকেই আবূ আবদুল্লাহকে সাহায্য করেছিল। তাই সেনাবাহিনীর পদমর্যাদায় ও দেশ ক্ষেত্রে তারা ছিল অগ্রণী। আবূ আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই আবুল আব্বাস ছিলেন সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। আর প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের প্রাপ্যও। কেননা আবূ আবদুল্লাহ্রই বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কারণে এই বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তিনিই তো আগলাবী বংশকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছিলেন এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

উবায়দুল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজেকে একজন প্রভাবশালী শাসনকর্তা হিসাবেই দেখতে পান। এতদসত্ত্বেও তিনি আবদুল্লাহ্ এবং তার ভাই আবুল আব্বাসের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করতে শুরু করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ যখন লক্ষ্য করেন যে, তারই আশ্রিত ব্যক্তি তাকে ঠেংগাতে চাচ্ছে তখন তিনি সাবধান হয়ে যান। কাতামাহ্বাসীরা ছিল আবূ আবদুল্লাহ্র বিশেষ ভক্ত। আবূ আবদুল্লাহ্ই তাদেরকে নিষ্পাপ ইমামের খোঁজ দিয়েছিলেন। অন্য কথায় আবূ আবদুল্লাহ্রই কথায় কাতামাহ্বাসীরা উবায়দুল্লাহকে মাহ্দী ও ইমাম মাসূম (নিষ্পাপ) হিসাবে মেনে নিয়েছিল। এবার আবূ আবদুল্লাহ্ গোপনীয়ভাবে কাতামাহ্বাসীদের বোঝাতে শুরু করলেন যে, ইমাম মাসূমকে চিনতে গিয়ে আমি ধোঁকায় পতিত হয়েছি। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি (উবায়দুল্লাহ্) ইমাম মাসূম নয়, বরং একজন লুণ্ঠনকারী ও অবৈধ মাল ভক্ষণকারী । প্রকৃত ইমাম মাসূম আরো পরে আসবেন। কাতামাহ্বাসীরা এসব কথা বিশ্বাস করে আবূ আবদুল্লাহ্র পক্ষে চলে যায়। উবায়দুল্লাহ্ যখন এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি ষড়যন্ত্রকারীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত কাতামাহ্বাসী এবং আবূ আবদুল্লাহ্র পরামর্শে কাতামাহ্র একজন অতি পুণ্যবান ব্যক্তিকে যিনি তার ধর্মপরায়ণতা ও সংসার বিমুখতার কারণে সকলের কাছে 'শায়খুল-মাশায়িখ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন— উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর কাছে পাঠানো হয়। মাহ্দীর খিদমতে হাযির হয়ে 'শায়খুল-মাশায়িখ' নিবেদন করেন— আপনি ইমাম মাসূম কিনা সে ব্যাপারে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। অতএব আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে নিজের ইমামতের কোন চিহ্ন দেখান। এ কথা শুনে উবায়দুল্লাহ্ পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, এবার নির্ঘাত ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তিনি তার গোলামের প্রতি একটি বিশেষ ইঙ্গিত করেন এবং সে সাথে সাথে তরবারির এক কোপে শায়খুল মাশায়িখের মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কাতামাহ্বাসীরা উবায়দুল্লাহকে হত্যা করার দৃঢ়-সংকল্প গ্রহণ করে।

আবূ আবদুল্লাহ্কে হত্যা

উবায়দুল্লাহ্ অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করতে পেরে কাতামাহ্র সবচেয়ে বড় নেতা আরূবা ইব্ন ইউসুফ ও তার ভাই হাবাসা ইব্ন ইউসুফকে তার নির্জন কক্ষে ডেকে পাঠান। তাদের সাথে অত্যন্ত মধুময় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা করেন। তারপর নির্দেশ দেন আবূ আবদুল্লাহ্ ও তার ভাইকে হত্যা করতে। সুতরাং তার নির্দেশ পালনার্থে দু'ভাই আবূ আবদুল্লাহ্র বাড়ির পাশে একটি স্থানে গোপনভাবে অবস্থান নেয়। আবূ আবদুল্লাহ্ যখন বের হয়ে আসে তখন আরুবা আক্রমণ করে। আবূ আবদুল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কার নির্দেশে এ কাজ করছ? সে উত্তর দেয় যে, তুমি যাকে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তিনিই তোমাদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন, এ কথা বলে আবূ আবদুল্লাহ্কে অন্য কোন কথা বলার পূর্বেই হত্যা করে ফেলে। অনুরূপভাবে আবুল আব্বাসকে হত্যা করা হয়। ২৯৮ হিজরীর ১৫ই জমাদিউস সানিতে (৯১১ খ্রি মার্চ) এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

বিদ্রোহ

এই ঘটনার পর আবূ আবদুল্লাহ্‌র সমর্থকরা বিদ্রোহ ঘোষণার সংকল্প নেয়। উবায়দুল্লাহ্ তাদের মুকাবিলা করে সে বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর কাতামাহ্‌বাসীরা পুনরায় উবায়দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উবায়দুল্লাহ্ শক্তিবলে পুনরায় তা দমন করেন। এবার দেশের আবহাওয়া নিজের প্রতিকূলে দেখে উবায়দুল্লাহ্ শীআ মাযহাবের দাওয়াত ও প্রচারের কাজ বন্ধ করে দেন। তিনি সকল 'দাঈ' ও প্রচারকের কাছে নির্দেশ পাঠান ঃ তোমরা শীআ মতবাদের প্রতি মানুষকে আর আহ্বান করবে না। কেননা অনুরূপ করলে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সমূহ আশংকা রয়েছে। তারপর উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী আরূবাকে বানমায়া এবং হাবাসাকে বারকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তার পুত্র আবুল কাসিম ওরফে আবুল কাসিম নায্‌যারকে নিজের 'অলীআহ্‌দ' বলে ঘোষণা করেন।

কিছুদিন পর কাতামাহ্‌বাসীদের মনে আর একটি নতুন চিন্তার উদয় হয়। তারা একটি যুবককে নিজেদের আমীর মনোনীত করে এবং তাকে 'মাহ্‌দী' আখ্যা দিয়ে উবায়দুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। তারা ঐ যুবককে 'নবী' বলেও ঘোষণা করে। উবায়দুল্লাহ্ তার পুত্র আবুল কাসিম নায্‌যারকে একটি বাহিনীসহ কাতামাহ্‌বাসীদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সে যুদ্ধে আবুল কাসিম কাতামাহ্‌বাসীদেরকে পরাজিত করে তাদের ঘরবাড়ি একেবারে তছনছ করে ফেলেন। 'মাহ্‌দী' ও 'নবী' বলে খ্যাত ঐ যুবককেও ধরে এনে হত্যা করা হয়। ৩০০ হিজরী সনে (৯১২-১৩ খ্রি) ত্রিপোলীবাসীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উবায়দুল্লাহ্ আবুল কাসিমকে সেদিকে প্রেরণ করেন। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর আবুল কাসিম ত্রিপোলী জয় করেন এবং ত্রিপোলীবাসীদের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন লক্ষ দীনার আদায় করেন।

৩০১ হিজরীতে (৯১৩-১৪ খ্রি) আবুল কাসিম কিছু যুদ্ধজাহাজ এবং একটি সুদক্ষ বাহিনী সংগ্রহ করে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ঐ অভিযানে হাবাসা ইব্‌ন ইউসুফও তার সাথে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আবুল কাসিম আলেকজান্দ্রিয়াও দখল করে নেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদিরের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি সবুক্তগীন এবং মুনিস খাদিমকে এক বাহিনীসহ আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর আবুল কাসিম ও হাবাসা বাধ্য হয়ে মিসর সীমান্ত ছেড়ে কায়রোয়ানের দিকে ফিরে আসেন। ৩০২ হিজরীতে (৯১৪-১৫ খ্রি) হাবাসা পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। এবারও বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর মুনিস খাদিম হাবাসাকে তাড়িয়ে দেন। এবার হাবাসার সাত হাজার সৈন্য নিহত হয়, হাবাসা নিজে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী ঐ বছরই হাবাসাকে হত্যা করেন। হাবাসার ভাই আরূবা এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে কাতামাহ্‌বাসীরা আরূবার পক্ষাবলম্বন করে।

উবায়দুল্লাহ্ আরূবাকে শায়েস্তা করার জন্য তার খাদিম গালিবকে প্রেরণ করেন। গালিব এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আরূবার উপর হামলা চালায়। এতে আরূবা পরাজিত ও নিহত হন। আরূবার চাচাত ভাই ও তার সঙ্গী-সাথীদের একটি বিরাট দলকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর সিসিলী দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সিসিলীবাসীরা তাদের শাসনকর্তা আলী ইবন আমরকে (যিনি হুসাইন ইব্ন খুযায়রের পর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন) সিসিলী থেকে বের করে দেয়। তারপর আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদিরের কাছে আবেদন জানায়– আমরা আপনারই আনুগত্য স্বীকার করছি। এই সংবাদ পেয়ে ৩০৪ হিজরীতে (৯১৬-১৭ খ্রি) উবায়দুল্লাহ্ একটি সামরিক নৌবহর দিয়ে হাসান ইব্ন খুযায়রকে সিসিলীবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সিসিলীবাসীদের নেতা আহমদ ইব্ন কুহরাব হাসান ইব্ন খুযায়রকে পরাজিত করেন এবং তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু এরপরই সিসিলীবাসীদের অন্তরে এই মর্মে আশংকার সৃষ্টি হয় যে, এভাবে উবায়দুল্লাহ্র বিরোধিতা করলে আমাদের টিকে থাকাটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এই দুশ্চিন্তারই ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের নেতা আহমদ ইব্ন কুহরাবকে বন্দী করে উবায়দুল্লাহ্র কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। উবায়দুল্লাহ্ আহমদ ইব্ন কুহরাবকে হত্যা করেন এবং আলী ইব্ন মূসা ইব্ন আহমদকে গভর্নর নিয়োগ করে সিসিলীতে পাঠিয়ে দেন।

মাহ্দীয়া নগরী নির্মাণ

উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী যেহেতু ইসমাঈলী শীআ ছিলেন এবং নিজেকে ইমাম মাহ্দী বলে দাবি করেছিলেন তাই সব সময়ই তার আশংকা হতো, না জানি লোকেরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। কেননা আফ্রিকা ও কায়রোয়ানের সমগ্র লোক তার সমমতাবলম্বী ছিল না। তাই তিনি কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে একটি শহর নির্মাণ করে সেটাকে নিজের রাজধানী করতে চাচ্ছিলেন। আর এই প্রেক্ষিতে তিনি ৩০৩ হিজরীতে (৯১৫-১৬ খ্রি) উপকূলীয় এক দ্বীপে একটি পৃথক শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার নাম রাখেন মাহদীয়া। তিনি মাহ্দীয়া শহরের নগর প্রাচীর অত্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ করেন এবং সদর দরজাসমূহে লোহার গ্রীল লাগান। ৩০৬ হিজরীতে (৯১৮-১৯ খ্রি) ঐ শহরের নির্মাণ কাজ শেষ হলে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, বনী ফাতিমার ব্যাপারে আমি এখন নিরুদ্বিগ্ন। কেননা এখন তারা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। ঐ বছরই উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী একটি জাহাজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন এবং প্রথম বছরই নয় শ' জাহাজ তৈরি করে একটি বিরাট সামরিক নৌবহর গড়ে তোলেন। ৩০৭ হিজরীতে (৯১৯-২০ খ্রি) তিনি তার পুত্র আবুল কাসিমকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। আবুল কাসিম সেখানে পৌঁছেই আলেকজান্দ্রিয়া ও নীলনদের বদ্বীপ এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হন। এই সংবাদ যখন বাগদাদে গিয়ে পৌঁছে তখন আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির পুনরায় মুনিস খাদিমকে এক বাহিনী দিয়ে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর মুনিসের হাতে আবুল কাসিম পরাজিত হন। আবুল কাসিম মিসরে

যুদ্ধরত ছিলেন এমন অবস্থায় উবায়দুল্লাহ্ তার সাহায্যের জন্য আশিটি জাহাজ সম্বলিত একটি নৌবহর মাহদীয়া থেকে প্রেরণ করেন। ঐ নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন সুলায়মান খাদিম এবং ইয়াকুব কাত্তামী। কিন্তু নৌবহরটি সেখানে পৌঁছার আগেই আবুল কাসিম পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। কিন্তু নৌবহরটি তা জানতে পারেনি। তাই আবুল কাসিম একদিকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অন্যদিকে সাহায্যকারী নৌবহরটি সেদিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মুনিসের নৌবহরের সাথে এই নৌবহরের সংঘর্ষ হয়। মুনিসের নৌবহরে ছিল মাত্র ২৫টি জাহাজ। এতদসত্ত্বেও উবায়দী নৌবহর পরাজিত হয় এবং সুলায়মান ও ইয়াকুব উভয়েই বন্দী হন। মুনিসের সৈন্যরা আগুন লাগিয়ে সমগ্র উবায়দী নৌবহর পুড়িয়ে দেয় এবং তাতে আরোহী সকল সৈন্যকে হত্যা করে।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৩০৮ হিজরীতে (৯২০-২১ খ্রি) উবায়দুল্লাহ্ মাহদী মাযালা ইব্ন হাবূসকে মরক্কোর উপর হামলা পরিচালনার জন্য পশ্চিম দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে মাযালা ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইদরীস ইব্ন আমরের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ইয়াহ্ইয়া উবায়দুল্লাহ্ মাহদীর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং উবায়দুল্লাহ্ মূসা ইব্ন আবিল আফিয়া মাকনাসীকে মরক্কোর বিজিত প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৩০৯ হিজরী (৯২১-২২ খ্রি) সনে মরক্কোর অন্য প্রদেশগুলোকেও উবায়দী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। ফাস-এর শাসন ক্ষমতা ছিল ইয়াহইয়া-এর হাতে। তবে তিনি করদানে স্বীকৃত হয়ে উবায়দুল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ঐ বছরই মূসা ইব্ন আবিল আফিয়া ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং উবায়দুল্লাহ্র নির্দেশে ইয়াহ্ইয়াকে পদচ্যুত করে দেশের ঐ অঞ্চলটিও উবায়দী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এভাবে যখন ইদরীসী সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে গেল তখন ইদরীসী বংশের লোকেরা রীফ ও গামারা অঞ্চলে গিয়ে সেখানে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বনূ হামূদ বংশ ছিল এদেরই একটি শাখা। কর্ডোভায় উমাইয়া হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বনূ হামূদরাই সেখানকার কাযী ও শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন— এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মাযালা মরক্কো বিজয় সমাপ্ত করে সিজিলমাসা আক্রমণ করেন এবং সেখানে মুদরার মাকনাসীর পরিবারকে যারা সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন, হত্যা করে সিজিলমাসার শাসন ক্ষমতা তার চাচাত ভাইয়ের হাতে অর্পণ করেন। মাযালা ছিলেন একজন প্রখ্যাত সেনাপতি। মরক্কোয় উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর হুকুমত প্রতিষ্ঠায় তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারই যুদ্ধাভিযান এবং হত্যা ও বাড়াবাড়ির কারণে বার্বারদের অন্যতম গোত্র যানাতাহ্ বিগড়ে বসে। ফলে যানাতাহ্ ও মাযালার মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র মরক্কো রাজ্যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সমগ্র দেশটি উবায়দীদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

উবায়দুল্লাহ্ ২১৫ হিজরীতে (৮৩০ খ্রি) কাত্তামা বাহিনীর সাথে তার পুত্র আবুল কাসিমকে মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। যানাতাহ্ গোত্রের নেতা মুহাম্মাদ ইব্ন খাযার আবুল কাসিমকে এগিয়ে আসতে দেখে তার বাহিনীসহ দক্ষিণ দিকের মরু অঞ্চলে পালিয়ে

যান। আবুল কাসিম শহরের পর শহর দখল করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং হাসান ইব্‌ন আবিল আইশকে জারাদহে শহরে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। হাসান ইদরীসী বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এই অবরোধ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে এই শহর জয় করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আবুল কাসিমকে সেখান থেকে ফিরে যেতে হয়। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি মাসীলা শহরের শাসনকর্তা বনূ কামলানকে বন্দী করে কায়রোয়ানের দিকে দেশান্তরিত করেন এবং মাসীলা শহরটি পুনঃনির্মাণ করে তার নাম দেন মুহাম্মাদিয়া। তিনি সেখানকার শাসনভার আলী ইব্‌ন হামদূনের হাতে ন্যস্ত করেন। যার শহরের শাসন ক্ষমতা তারই হাতে অর্পণ করা হয়। আর মরক্কোর সামগ্রিক শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হয় মূসা ইব্‌ন আবিল আফিয়ার হাতে। কিন্তু এর কিছুদিন পর মূসা ইব্‌ন আবিল আফিয়া উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্যের অনুগত বলে ঘোষণা করেন। ফলে সমগ্র মরক্কোয় জুমুআর খুতবায় স্পেনের খলীফার নাম পঠিত হতে থাকে।

এই সংবাদ পেয়ে উবায়দুল্লাহ্ আহমদ মাকনাসীকে এক বিরাট বাহিনীসহ মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত মূসা ইব্‌ন আবিল আফিয়া মরক্কো থেকে স্পেনের দিকে পালিয়ে যান এবং আহমদ ইব্‌ন বাসলীন মাকনাসী মরক্কোকে পদানত ও পর্যুদস্ত করে মাহ্‌দীয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মৃত্যু

৩২২ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৩৪ খ্রি মার্চ) মাসে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্‌দী সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থলে তার পুত্র আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'কাসিম বিআমরিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন। এই আবুল কাসিম বিআমরিল্লাহ্ আবুল কাসিম নায্‌যার নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ।

আবুল কাসিম নায্‌যার

আবুল কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করে, ইতিমধ্যে উবায়দুল্লাহ্‌র মৃত্যু সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা দমন করেন। তারপর মরক্কোর প্রতি মনোনিবেশ করেন। মূসা ইব্‌ন আফিয়া পুনরায় মরক্কো দখল করে নিয়েছিলেন। ৩২৪ হিজরীতে (৯৩৬ খ্রি) ফাস্ ব্যতীত সমগ্র মরক্কো রাজ্য আবুল কাসিমের দখলে চলে আসে। তারপর আবুল কাসিম রোম সাগরের উপকূলীয় দেশসমূহ পদানত করার জন্য ইব্‌ন ইসহাক নামীয় একজন অধিনায়ককে একটি বিরাট নৌবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। ইব্‌ন ইসহাক উপকূলে অবতরণ করে জিনওয়া পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল পর্যুদস্ত করে শেষ পর্যন্ত জিনওয়া দখল করে নেন। তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মার্দিনিয়া জয় করেন। তিনি সেখান থেকে সিরিয়া উপকূলের দিকে রওয়ানা হন এবং উপকূলবর্তী সমগ্র এলাকার অধিবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সিরিয়া উপকূলে যে কয়টি জাহাজ পাওয়া গিয়েছিল তিনি সেগুলোকে পুড়িয়ে দেন। তারপর ইব্‌ন ইসহাক যীরান নামীয় আপন এক ভৃত্যকে এক বাহিনী দিয়ে মিসর উপকূলে প্রেরণ করেন। যীরান আলেকজান্দ্রিয়া জয়

করেন। তারপর মিসর থেকে আখশীদের বাহিনী আসে। তারা যীরানের বাহিনীকে পশ্চিমদিকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত ঘটনার পর আবুল কাসিম আবূ ইয়াযীদ-সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করার অবকাশ পান নি।

আবূ ইয়াযীদের সাথে সংঘর্ষ

আবূ ইয়াযীদ মুখাল্লাদ ইব্‌ন কীরাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, কাসতিলা শহরের অধিবাসী কীরাদ নামক জনৈক ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যাপদেশে প্রায়ই সুদান অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। সেখানেই তার পুত্র আবূ ইয়াযীদের জন্ম হয়। আবূ ইয়াযীদ সুদানেই প্রতিপালিত হন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। সুদানবাসীরা সাধারণত শীআ বিরোধী এবং খারিজী সমর্থক ছিল। আবূ ইয়াযীদও তাদের ঐ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। তিনি তাহারাত নামক স্থানে আসেন এবং শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ বার্বার অঞ্চলে এসে তার আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। আবূ ইয়াযীদ জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের মধ্যে তার আকীদা-বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। তিনি শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহর ক্রমবর্ধমান সাফল্য নীরবে অবলোকন করছিলেন এবং তার অনুসারীদের নীরব একটি দল গঠন করে সেটাকে মজবুত ও শক্তিশালী করে নিচ্ছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে আবূ ইয়াযীদের কথা অবিদিত ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এই শিক্ষকটির বিরোধপূর্ণ ধ্যান-ধারণা প্রতিরোধ করার প্রতি মনোনিবেশ করার মত অবকাশ তাদের ছিল না। যখন উবায়দুল্লাহ্ মাহদীর মৃত্যু হয় এবং দেশের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে তখন আবূ ইয়াযীদ তার ধ্যান-ধারণার প্রচার এবং আবুল কাসিমের দখল থেকে একটির পর একটি শহর মুক্ত হয়ে তার অধীনে যেতে থাকে। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় প্রতিরোধের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেকে 'শায়খুল মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত করেন। লোকেরা দলে দলে এসে তার মুরীদ হতে থাকে এবং তিনি এই মুরীদদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। বাগায়া নগরীর শাসনকর্তা যখন আবূ ইয়াযীদের এই রণপ্রস্তুতির অবস্থা জানতে পারেন তখন তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু আবূ ইয়াযীদ বাগায়ার শাসনকর্তাকে পরাজিত করে বাগায়া অবরোধ করে ফেলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন আবূ ইয়াযীদ বাগায়া জয় করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন তখন সেখান থেকে ফিরে আসেন। এবার বার্বার গোত্রের লোকেরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং আবূ ইয়াযীদ জুমুআর খুতবায় স্পেনের খলীফা নাসিরের নাম পাঠ করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত যানাতার গোত্রসমূহ তার আনুগত্য স্বীকার করে। মোটকথা, দিনের পর দিন আবূ ইয়াযীদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আবুল কাসিমের দখল থেকে একটির পর একটি শহর মুক্ত হয়ে তার অধীনে যেতে থাকে। আবুল কাসিম অনেক বড় বড় দলপতি এবং অধিনায়ককে আবূ ইয়াযীদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকলেই আবূ ইয়াযীদের কাছে পরাস্ত হন। শেষ পর্যন্ত ৩৩৩ হিজরীর সফর (৯৪৪ খ্রি সেপ্টেম্বর/অক্টোবর) মাসে আবূ ইয়াযীদের বাহিনী কায়রোয়ান দখল করে নেয় এবং আবুল কাসিম মাহদীয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এবার আবূ ইয়াযীদ সমগ্র আফ্রিকিয়া দেশে তার

সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেন এবং সর্বত্র হত্যা ও লুটপাট শুরু হয়। আবুল কাসিমের কোন কোন গভর্নরের দখলে তখন পর্যন্ত যে সমস্ত শহর বা এলাকা ছিল আবুল কাসিম তাদের কাছে সাহায্যের জন্য লেখেন। কাতামাহ্‌বাসীরাও আবুল কাসিমকে সাহায্য করার সংকল্প নেয়। কিন্তু ৩৩৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (৯৪৫ খ্রি জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী) মাসে আবূ ইয়াযীদ কাতামাহ্‌বাসীদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। আবুল কাসিমের পক্ষ নিয়ে আরো কয়েকটি বাহিনী আবূ ইয়াযীদের মুকাবিলায় আসে। কিন্তু তাদের সকলকেই পরাজয়বরণ করতে হয়। আবুল কাসিম মাহ্‌দীয়াকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। প্রচুর রসদসামগ্রী সেখানে সংগৃহীত হয়েছিল। আবূ ইয়াযীদের বাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করে মাহদীয়ার নগর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কিন্তু মাহদীয়া জয় করতে পারেনি। অতএব ৩৪৪ হিজরীতে (৯৫৫-৫৬ খ্রি) আবূ ইয়াযীদ বাধ্য হয়ে কায়রোয়ানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন আবুল কাসিমের বাহিনী মাহদীয়া থেকে বের হয়ে ইয়াযীদের বাহিনীর উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

মৃত্যু

৩৩৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৪৫ খ্রি নভেম্বর) মাসে আবূ ইয়াযীদের পুত্র মাহদীয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে তা অবরোধ করে ফেলেন। এই অবরোধ চলাকালনী সময়ে ৩৩৪ হিজরীর জমাদিউস সানী (৯৪৬ খ্রি ফেব্রুয়ারী) মাসে আবুল কাসিম মাহদীয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। এটা হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখন ইয়াযীদ মূসা শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম

আপন পিতার মৃত্যুর পর ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম 'আল-মানসূর' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসমাঈল, আইয়ুব ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদের অবরোধ ভেঙে ফেলেন এবং জাহাজযোগে একটি বাহিনী মূসার সাহায্যার্থে এবং আবূ ইয়াযীদের অবরোধ ভেঙে ফেলার জন্য প্রেরণ করেন। সে নৌবহর যাতে উপকূলে ভিড়তে না পারে, আবূ ইয়াযীদ সে চেষ্টাই করেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ সাহায্যকারী বাহিনী উপকূলে অবতরণ করে সুসাবাসীদের সাথে মিলিত হয় এবং একযোগে আবূ ইয়াযীদের উপর আক্রমণ চালায়। এতে আবূ ইয়াযীদ পরাজিত হন এবং তার সমগ্র সামরিক ঘাঁটি লুণ্ঠন করা হয়। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় কায়রোয়ানের দিকে আসেন। কায়রোয়ানবাসীরা তার এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে তার শাসনকর্তাকে কায়রোয়ান থেকে বের করে দেয়। তারা আবূ ইয়াযীদকে শহরে প্রবেশ করতে দেয় নি। উপরন্তু তারা আবুল কাসিমের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। আবূ ইয়াযীদ বাধ্য হয়ে সাবীহের দিকে চলে যান। এটা হচ্ছে ৩৩৪ হিজরীর শাওয়াল (৯৪৬ খ্রি জুন) মাসের ঘটনা। তারপর ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম কায়রোয়ানে আসেন এবং শহরবাসীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ৩৩৪ হিজরীর যিলকদ (৯৪৬ খ্রি জুলাই) মাসে আবূ ইয়াযীদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কায়রোয়ানের উপর হামলা পরিচালনা করেন। ইসমাঈল সে বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর ৩৩৫ হিজরীর

মুহাররম (৯৪৬ খ্রি আগস্ট) মাসে ইসমাঈল পরাজিত হন। কিন্তু তিনি তার পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় একত্রিত ও সংগঠিত করে ৩৩৫ হিজরীর ১৫ই মুহাররম (৯৪৬ খ্রি ১৬ আগস্ট) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আবূ ইয়াযীদকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের কারণে আবূ ইয়াযীদের যাবতীয় পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে যায় এবং তিনি পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় বাগায়ার দিকে চলে যান। কিন্তু বাগায়াবাসীরা তাদের নগরীর দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে আবূ ইয়াযীদ সেখানে প্রবেশ করতে না পেরে শহর অবরোধ করেন।

এই সংবাদ শুনে ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিম তার বাহিনী নিয়ে বাগায়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এটা হচ্ছে ৩৩৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৪৬ খ্রি নভেম্বর) মাসের ঘটনা। আবূ ইয়াযীদ ইসমাঈলের আগমন-সংবাদ পেয়ে বাগায়ার অবরোধ তুলে নিয়ে অপর একটি দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি সফলকাম হতে পারেন নি। ইসমাঈল সেখানেও তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। মোটকথা, এভাবে আবূ ইয়াযীদ এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কুতামা পাহাড়ের নিকটে আবূ ইয়াযীদ ও ইসমাঈলের মধ্যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩৩৫ হিজরীর ১০ই শাবানে (৯৪৭ খ্রি এপ্রিল) সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আবূ ইয়াযীদ আহত হলেও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার দশ হাজার সঙ্গী এই যুদ্ধে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয়। তারপর আবূ ইয়াযীদ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অবস্থা তখন এই দাঁড়িয়েছিল যে, আবূ ইয়াযীদের কর্মকর্তা ও পক্ষাবলম্বী গোত্রসমূহ একের পর এক নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে ইসমাঈল ইব্‌ন আবুল কাসিমের দলভুক্ত হতে শুরু করেছিল। ফলে আবূ ইয়াযীদের দখলাধীন সমগ্র অঞ্চল আপনা-আপনি ইসমাঈলের দখলে এসে যায়।

আবূ ইয়াযীদের বন্দী ও মৃত্যু

৩৩৬ হিজরীর মুহাররম (৯৪৭ খ্রি জুলাই/আগস্ট) মাসে সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আবূ ইয়াযীদ পরাজিত ও মারাত্মক আহত অবস্থায় বন্দী হন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ইসমাঈল তার দেহ থেকে চামড়া খুলে নিয়ে তাতে ভূষি ভরে রাখার নির্দেশ দেন। এই সমস্ত ঘটনার পর ইসমাঈল কায়রোয়ানের দিকে আসেন। কিন্তু তখনই তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মাগরিব প্রদেশের শাসনকর্তা হামীদ ইব্‌ন বাসলীন উবায়দিয়া সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্পেনের উমাইয়া খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসমাঈল সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং তাহারাত নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে হামীদ পরাজিত হন। এই অবস্থায়ই এই মর্মে একটি সংবাদ আসে যে, ফযল ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে বাগায়া অবরোধ করে ফেলেছেন। অতএব ইসমাঈল সেদিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ফযলেরই জনৈক সঙ্গী তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসমাঈলের খিদমতে পেশ করে। এটা হচ্ছে ৩৩৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল (৯৪৭ খ্রি অক্টোবর/নভেম্বর) মাসের ঘটনা। ইসমাঈল এবার কিছু দিনের জন্য স্বস্তি লাভ

করেন। তিনি ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫০-৫১ খ্রি) খলীল ইব্‌ন ইসহাককে পদচ্যুত করে তার স্থলে হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবুল হুসাইনকে সিসিলী দ্বীপের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তারপর হুসাইন ইব্‌ন আলীর বংশধররা স্বাধীনভাবে সে দ্বীপ শাসন করতে থাকে।

ইসমাঈলের মৃত্যু

৩৪০ হিজরীতে (৯৫১-৫২ খ্রি) ইসমাঈল এক বিরাট নৌবহর তৈরি করেন এবং সিসিলীর শাসনকর্তা হুসাইন ইব্‌ন আলীকে লেখেন, তুমিও এই রাজকীয় নৌবহরের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাক। শেষ পর্যন্ত এই নৌবহরই ৩৪২ হিজরীতে (৯৫৩-৫৪ খ্রি) ইতালীর দক্ষিণাঞ্চল জয় করে প্রচুর মালে গনীমতসহ কায়রোয়ান ও মাহদীয়ায় ফিরে আসে। কিন্তু এর আগেই ৩৪১ হিজরীর রমযান (৯৫৩ খ্রি ফেব্রুয়ারী/মার্চ) মাসে ইসমাঈল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুইয্য ইব্‌ন ইসমাঈল

ইসমাঈলের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুইয্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরই মরক্কোর কোন কোন গোত্র তার বশ্যতা স্বীকার করে। ৩৪২ হিজরীতে (৯৫৩-৫৪ খ্রি) মুইয্য সিসিলীর গভর্নর হুসাইন ইব্‌ন আলীর কাছে নির্দেশ পাঠান ঃ তুমি তোমার নৌবহর নিয়ে স্পেনের উপকূলস্থ মারিয়া আক্রমণ কর। হুসাইন সে নির্দেশ পালন করেন এবং সেখান থেকে প্রচুর মালে গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে সিসিলীতে ফিরে আসেন। এর প্রত্যুত্তরে, স্পেনের খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ্ তার ভৃত্য গালিবকে এক সামরিক নৌবহর দিয়ে নির্দেশ দেন— তুমি আফ্রিকা উপকূল আক্রমণ কর। কিন্তু মুইয্যের বাহিনী এবং সামরিক নৌবহর প্রথম থেকেই এই আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ফলে গালিবকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অবশ্য ৩৪৭ হিজরীতে (৯৫৮-৫৯ খ্রি) স্পেনীয় নৌবহর আফ্রিকা উপকূলে সফল হামলা চালায় এবং উপকূলবর্তী সমগ্র শহর ও জনবসতি একেবারে পর্যুদস্ত ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তারপর অনেক যুদ্ধবন্দী ও মালে গনীমত নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

তারপর মুইয্য তার সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত ও শাসনব্যবস্থা সুসংহত করে তার অধিকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করেন। মুইয্যের অধিকৃত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত গভর্নরগণ নিয়োজিত ছিলেন ঃ

১. ইফকান	ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ
২. আশীর	যায়রী ইব্‌ন মুনাদ সানহাজী
৩. মাসীলাহ্	জা'ফর ইব্‌ন আলী আন্দুলুসী
৪. বাগায়া	কায়সার সাকলী
৫. ফাস ও তাহারাত	আহমদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবী সাহ্‌ল
৬. সিজিলমাসা	মুহাম্মদ ইব্‌ন দাসূল মীকানাসী

৩৪৭ হিজরীতে (৯৫৮-৫৯ খ্রি) মুইয্যের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদ স্পেনের উমাইয়া খলীফার সাথে যোগসাজশ করে উবায়দিয়া সালতানাতের

আনুগত্য অস্বীকার করে নিয়েছেন। তখন তিনি (মুইয্য) তার কাতিব জাওহার সাকলীকে ইয়ালার মুকাবিলায় প্রেরণ করেন এবং মাসীলার গভর্নর জা'ফর ইব্‌ন আলী ও আশীরের গভর্নর যায়রী ইব্‌ন মুনাদকে তার সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। ইয়ালা ইব্‌ন মুহাম্মাদও এই মুকাবিলার জন্য তৈরি ছিলেন। এই সাথে ফাস ও সিজিলমাসা প্রদেশদ্বয়ের গভর্নররাও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ৩৪৮ হিজরীতে (৯৫৯-৬০ খ্রি) ইয়ালা পরাজিত ও বন্দী হন। ফাস ও সিজিলমাসা প্রদেশের উপরও মুইয্যের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারাত প্রদেশকে যায়রী ইব্‌ন মুনাদের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। আহমদ ইব্‌ন বকর এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাসূল বন্দী হয়ে কায়রোয়ানে আসেন। ৩৪৯ হিজরীতে (৯৬০-৬১ খ্রি) মুইয্য তার খাদিম কায়সার এবং মুযাফ্‌ফরকে অবাধ্যতার কারণে হত্যা করেন।

ইতোপূর্বে আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। স্পেন থেকে যারা দেশান্তরিত হয়েছিল তাদের একটি দল মিসর উপকূলে অবতরণ করে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নিয়েছিল। তখন মিসরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ওদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন এবং এই শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন যে, তারা মিসর সীমান্তের বাইরে অন্য কোথাও চলে যাবে। তারপর ঐ দেশান্তরিত লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে চলে যায় এবং কারিতাস (ক্রীট) দ্বীপ দখল করে আবূ হাফ্‌স বালূতীকে নিজেদের বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। আবূ হাফ্‌সের বংশের লোকেরা ঐ দ্বীপ শাসন করছিল এমনি সময়ে ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি) খ্রিস্টানরা সাতশ যুদ্ধ জাহাজের একটি বহর নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। ৩৫৪ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রি) কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং মুইয্যের নৌবহরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে খ্রিস্টান সৈন্যদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে জিযিয়া এবং কর প্রদানেও বাধ্য করে। এর কিছুদিন পর মুইয্যের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের শাসনকর্তা কাফূর আখশিদীর মৃত্যুর কারণে মিসরে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিয়েছে এবং বাগদাদের খলীফা আদুদুদ্দৌলা এবং বখতিয়ার ইব্‌ন মুইযুদ্দৌলা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে মিসরের দিকে দৃষ্টি দিতে পারছেন না। এই সুযোগে মুইয্য মিসরে সৈন্য প্রেরণের সংকল্প নেন।

মিসর দখল

৩৫৫ হিজরীতে (৯৬৫-৬৬ খ্রি) মুইয্য তার মন্ত্রী জাওহারকে এক বিরাট সেনাবাহিনী দিয়ে মিসরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। জাওহার পথিমধ্যে যত জায়গা পড়েছিল সেগুলোর শাসনব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করে ধীরে ধীরে মিসরের দিকে অগ্রসর হন। আখশিদী বাহিনী জাওহারের বাহিনীর সামনে টিকে থাকতে পারে নি। ফলে তিনি ৩৫৯ হিজরীর ১৫ই শাবান (৯৭০ খ্রি জুলাই) মিসরে প্রবেশ করে জামে মসজিদে মুইয্যের নামে খুতবা পাঠ করেন। ৩৫৯ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (৯৭০ খ্রি এপ্রিল/মে) মাসে জাওহার 'জামি ইব্‌ন তুলূন'-এ গিয়ে নামায আদায় করেন এবং আযানের মধ্যে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমল'

(পুণ্য কাজের দিকে আস) এ বাক্যটি বাড়াবার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল মিসরে প্রথম আযান, যাতে উপরোক্ত বাক্যটি বাড়ানো হয়েছিল। জাওহার সমগ্র মিসর দেশ দখল করে এবং আখশিদী বংশের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন ধরনের তুহফা ও উপঢৌকনসহ তাদেরকে মুইয্যের দরবারে প্রেরণ করেন। মুইয্য আখশিদী বংশের সদস্যদেরকে মাহদীয়া জেলে বন্দী করে রাখেন। তারপর জাওহার মুইয্যকে মিসরে আগমনের আহবান জানান এবং তার অধিনায়ক জাফর ইব্‌ন ফালাহ্ কুত্তামীকে একটি দুর্বার বাহিনী দিয়ে ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। যে সময়ে জাওহার সেনাবাহিনী নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন ঠিক তখনি আবূ জা'ফর যানাতী নামক জনৈক ব্যক্তি মুইয্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু মুইয্য নিজেই অতি সহজে ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। এবার মুইয্যের কাছে এই মর্মে জাওহারের একটি চিঠি পৌঁছে যে, সমগ্র মিসর উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, এখানে আপনার আসা একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুইয্য অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে একটি দরবার আহবান করে প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এদিকে ৩৬০ হিজরীর মুহাররম (৯৭০ খ্রি নভেম্বর) মাসে জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ্ কুত্তামী দামেশক দখল করে নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে সে দেশ শাসন করছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে মুইয্য আরো বেশি সন্তুষ্ট হন। তিনি এবার কায়রোকে রাজধানী করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বুলুক্কীন ইব্‌ন যায়রী মুনাদকে আফ্রিকিয়া এবং পশ্চিমের দেশগুলোর ভাইসরয় নিযুক্ত করে কায়রোয় অবস্থানের নির্দেশ দেন। তিনি বুলুক্কীনকে 'আবুল ফুতূহ্' (বিজয়ীদের পিতা) উপাধি দান করেন এবং তার অধীনে সুযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে ৩৬১ হিজরীর শাওয়াল (৯৭২ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসের শেষদিকে রাজধানী মাহদীয়া থেকে বের হয়ে কায়রোর সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেন।

কায়রোয় রাজধানী স্থানান্তর

কিছুদিন সওয়ারী পরিবহনের মাধ্যমে সমগ্র ধন-ভাণ্ডার ও আসবাব-সামগ্রী কায়রোর সন্নিকটে নিয়ে আসা হয় এবং মুইয্য ঐ ধন-সম্পদ এবং তার লোক-লশকর নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। বুলুক্কীন ইব্‌ন যায়রীও তাকে অনুসরণ করেন। এক-দুই মনযিল অগ্রসর হওয়ার পর মুইয্য বুলুক্কীনকে কায়রোর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বারকাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি ৩৬২ হিজরীর শাবান ((৯৭৩ খ্রি জুন) মাসে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছেন। শহরবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে শহরের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। তারপর মুইয্য সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ৩৬৩ হিজরীর ৫ই রমযান (৯৭৪ খ্রি জুলাই) কায়রোয় প্রবেশ করেন। কায়রোয়ান থেকে রওয়ানা হওয়ার আনুমানিক এক বছর পর তিনি কায়রোয় এসে পৌঁছেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ্ কাত্তামী দামেশক জয় করে সেটাকে তার শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। এর পূর্বে দামেশক বনী তাবাখের শাসনাধীনে ছিল। ওরা কারামতীয়দেরকে কর প্রদান করত। জা'ফর ইব্‌ন ফারাহ্ যখন দামেশক দখল করেন তখন তিনি কারামতীয়দেরকে কর প্রদান করতে অস্বীকার করেন। ফলে ওদের সম্রাট আসাম দামেশকের উপর হামলা চালান। কিন্তু জা'ফরের কাছে

তিনি পরাজিত হন। তারপর ৩৬১ হিজরীতে (৯৭১-৭২ খ্রি) কারামতীয়রা পুনরায় দামেশক আক্রমণ করে। এবার জা'ফর তাদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে কারামতীয়রা দামেশক দখল করে নেয়। দামেশকের পর তারা রামলার উপর হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেয় এবং মিসরের উপর হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সফরকালীন অবস্থায়ই মুইয্য এই সমস্ত অবস্থার কথা জানতে পারেন। কায়রোয় পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, কারামতীয়রা ইয়াফা অবরোধ করে রেখেছে এবং মিসর-সীমান্তে তার সেনাবাহিনী এসে জড়ো হয়েছে।

মিসরে কারামতীয়দের হামলা

মুইয্য কায়রো পৌঁছামাত্র কারমাতীয় সম্রাট আসামকে একটি পত্র লিখেন। আসাম তখন তার রাজধানী ইহসায় ছিলেন। মুইয্য তার পত্রে লিখেন– তোমরা প্রথমে আমাদেরই বাপ-দাদার মুনাদ (প্রচারক) রূপে দেশে ঘুরে বেড়াতে এবং আমাদের ভালবাস বলে দাবি করতে। এখন এটাই সঙ্গত যে, তোমরা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নাও এবং আমাদের বিরোধিতা থেকে বিরত থাক। যাহোক, এ ধরনের আদেশ-উপদেশে ভরপুর একটি দীর্ঘপত্র পাঠানো হলো এবং ঐ পত্র যখন আসামের কাছে ইহ্সায় গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তার উত্তরে মুইয্যকে লিখেন ঃ

"তোমার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। এতে কাজের কথা কম এবং অকাজের কথা বেশি। যাহোক, আমি তোমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছি। আমার সালাম রইল।"

আসাম মিসরের দিকে এই উত্তর পাঠিয়ে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি মিসরে প্রবেশ করে 'আইনে শাম্স' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে সকল কারামতীয় সৈন্য এসে একত্রিত হয়। আরবের গোত্রপতি হাসসান ইব্ন জাররাহ্ তায়ী 'তাই' গোত্রের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবার আসাম ও হাসসান পরস্পর সলাপরামর্শ করে মিসরের বসতিসমূহ লুটপাট ও দখল করার জন্য তাদের বাহিনীকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। ফলে মিসরের সর্বত্র হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তারক্তি শুরু হয়। মুইয্য কারামতীয়দের বিপুল সংখ্যক সৈন্য দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে কারামতীয়রা অতি শীঘ্রই কায়রোর উপর হামলা চালায়। মুইয্য কারামতীয়দের এই অকল্পনীয় উন্নতি লক্ষ্য করে এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তিনি হাসসান ইব্ন জাররাহ্র সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে কিছুটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং তাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন– আমি তোমাকে এক লক্ষ দীনার দিতে রাযি আছি, কিন্তু এই শর্তে যে, তুমি আসামকে একাকী ফেলে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমার সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে যাবে। হাসসান মুইয্যের এই শর্ত মেনে নেন এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যখন মুইয্য তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং কারামতীয়দের উপর হামলা চালান ঠিক তখনই হাসসান তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। হাসসান এবং তার বাহিনীকে এভাবে পলায়ন করতে দেখে আসাম এবং তার বাহিনী কিছুটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে

পড়ে। এতদসত্ত্বেও তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুইয্যের মুকাবিলা করে, যদিও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়। মুইয্য সঙ্গে সঙ্গে তার সেনাপতি আবূ মুহাম্মাদকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কারামতীয়দের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। আবূ মুহাম্মাদ তাদেরকে কোথাও বিশ্রামের সুযোগ দেন নি। ফলে তারা মিসর সীমান্ত থেকে বের হয়ে ইহসার দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

দামেশ্ক অধিকার

এই বিজয় লাভের পর মুইয্য কারামতীয় বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলেন এবং জালিম ইব্ন মাওহুর আকিলীকে দামেশকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জালিম দামেশকে পৌঁছে কারামতীয় শাসনকর্তাকে বন্দী করে মিসরে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাকে জেলখানায় আটকে রাখা হয়। ৩৬৪ হিজরী (৯৭৪-৭৫ খ্রি) পর্যন্ত দামেশকে উবায়দী সাম্রাজ্যের পতাকা উড্ডীন থাকে। ঐ বছর হজ্জের মওসুমে মক্কা-মদীনার লোকেরা মুইয্যের হুকুমত মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং তার নামে খুতবাও পঠিত হয়। দামেশকবাসীরা উবায়দীদের হুকুমত মেনে নিতে পারে নি। তাই ৩৬৪ হিজরীর (৯৭৫ খ্রি শেষ) শেষ দিকে এবং ৩৬৫ সনের (৯৭৫ খ্রি প্রথম) প্রথম দিকে ইযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়াইয়া-এর অন্যতম খাদিম উফতোগীন দামেশক দখল করে মুইয্যের শাসনকর্তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। দামেশকবাসীরা উফতাগীনের আগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। মুইয্যের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি উফতোগীনকে লিখেন– তুমি দামেশক শাসন করতে থাক। আমি তোমার কাছে ইমারতের সনদ (শাসনকর্তার নিয়োগপত্র) পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমার নামে খুতবা পাঠ কর এবং বাগদাদের খলীফার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রেখ না। উফতোগীন মুইয্যের এই কূটনীতি ব্যর্থ করে দেন এবং দামেশকে খুতবার মধ্যে বাগদাদের খলীফার নাম যথারীতি পাঠ করতে থাকেন। উপরন্তু তিনি দামেশক থেকে মুইয্যের হুকুমতের যাবতীয় চিহ্ন মুছে ফেলেন। মুইয্য এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কায়রো থেকে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন।

মুইয্যের মৃত্যু

মুইয্য কায়রো থেকে রওয়ানা হয়ে বালবীসে পৌঁছার পরই ৩৬৫ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (৯৭৫ খ্রি ডিসেম্বর) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর ৬ মাস। তিনি মোট ২৩ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। মুইয্য ছিলেন উবায়দীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি মিসর জয় করে কায়রোকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ৩১৯ হিজরীর ১১ই রমযান (৯৩১ খ্রি অক্টোবর) মাহদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তার পুত্র নায্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'আযীযবিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত পিতার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন। শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ হিজরীর ঈদুল আযহার দিনে (৯৭৬ খ্রি জুলাই) তার পিতার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আযীয ইব্‌ন উবায়দী

উফতোগীনের সৈন্য সমাবেশ

মুইয্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উফতোগীন মিসর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটান এবং সায়দা অবরোধ করে ফেলেন। সায়দায় জালিম ইব্‌ন মাওহুব এবং অন্যান্য উবায়দী অধিনায়ক বিদ্যমান ছিলেন। তারা উফতোগীনের মুকাবিলা করেন, কিন্তু তার হাতে পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। উফতোগীন আরো অগ্রসর হয়ে আক্কা জয় করেন। তারপর তিনি তাবারিয়ার উপর চড়াও হন এবং তাও দখল করে নেন। তারপর তিনি দামেশকের দিকে ফিরে যান। আযীয ইব্‌ন মুইয্য তার মন্ত্রী ইয়াকূব ইব্‌ন মাকসের পরামর্শ অনুযায়ী জাওহার কাতিবকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে উফতোগীনের মুকাবিলা এবং দামেশক জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। জাওহার ৩৬৫ হিজরীর যিলকদ (৯৭৬ খ্রি জুন) মাসে দামেশক অবরোধ করেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবরোধের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে অনন্যোপায় হয়ে আসাম কারামতীয় সম্রাটকে আদ্যোপান্ত ঘটনা লিখে জানান এবং তার কাছে বাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি দামেশকের অবরোধ তুলে সেখান থেকে চলে যান। তখন উফতোগীন ও আসাম একজোট হয়ে জাওহারের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং রামলা নামক স্থানে তাকে ঘিরে ফেলেন। জাওহার রামলাকে সুদৃঢ় দেখতে পেয়ে আসকালান চলে যান। এবার উফতোগীন ও আসাম আসকালানে গিয়ে জাওহারকে ঘেরাও করে ফেলেন। জাওহার অনন্যোপায় হয়ে উফতোগীনের সাথে পত্রালাপ শুরু করেন। তিনি উফতোগীনকে লিখেন ঃ তুমি অবরোধ তুলে নিয়ে আমাকে মিসরে যেতে দাও। আমি আমার বাদশাহ্ আযীয ইব্‌ন মুইয্যকে বলে তোমাকে এর যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবো। উফতোগীন জাওহারকে ছেড়ে দিতে উদ্যত হন। আসাম বিষয়টি জানতে পেরে উফতোগীনকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন– তুমি জাওহারের ধোঁকায় পড়বে না। কেননা সে মিসরে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই আপন বাদশাহসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের উভয়কেই পিষে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু উফতোগীন আসামের কথায় কান দেন নি। তিনি শেষ পর্যন্ত উফতোগীনকে আসকালান থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ করে দেন। জাওহার আযীযের কাছে পৌঁছে তাকে আশু বিপদাপদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং অবিলম্বে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন। আযীয তার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করে অবিলম্বে শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় রওয়ানা হন এবং জাওহারকে তার সম্মুখ বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন।

উফতোগীনকে বন্দী করে মন্ত্রীত্ব প্রদান

৩৬৭ হিজরীতে (৯৭৭-৭৮ খ্রি) আযীয আসাম ও উফতোগীনের বিরুদ্ধে রামলায় সৈন্য সমাবেশ ঘটান। তারপর উফতোগীনের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান– তুমি আসাম থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাকে আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করবো এবং তুমি আমার সাম্রাজ্যের যে অঞ্চলটি পছন্দ করবে আমি তোমাকে সে অঞ্চলেরই

শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করবো। উফতোগীন আযীযের ঐ পয়গামে সাড়া দেন নি, বরং সেনাবাহিনী নিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে বসেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যথারীতি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আযীযের পরাজয়ের আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু আযীয নিজেকে এবং নিজের বাহিনীকে সামলে নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে উফতোগীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক ভয়ানক সংঘর্ষের পর আসাম ও উফতোগীনের বাহিনী পরাজিত হয়। ওদের বাহিনীর বিশ হাজার যোদ্ধা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। বিজয় লাভ করার পর আযীয ঘোষণা দেন– যে ব্যক্তি উফতোগীনকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে বন্দী করে নিয়ে আসবে আমি তাকে একলক্ষ দীনার পুরস্কার দেব। ঐ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে জনৈক ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে উফতোগীনকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং আযীযের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ এক লক্ষ দীনার লাভ করে। আযীযের সামনে যখন উফতোগীনকে পেশ করা হয় তখন তিনি উফতোগীনের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে তার বিশিষ্ট সভাসদ এমন কি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি কারামতীয় সম্রাট আসামের কাছে জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর আসাম তখন তাবারিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি আসামের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান– তুমি আমার কাছে এসে আমার সাথে যোগ দাও। কিন্তু আসাম তাতে স্বীকৃত হন নি। তখন আযীয তার কাছে বিশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন– প্রতি বছর তুমি আমার কাছ থেকে এই পরিমাণ অর্থ পেতে থাকবে। এতদসত্ত্বেও আসাম মিসর যেতে অস্বীকার করেন এবং তাবারিয়া থেকে বিদায় নিয়ে ইহসায় চলে আসেন। তারপর আযীয উফতোগীনকে সঙ্গে নিয়ে কায়রো চলে যান। যেহেতু উফতোগীনের প্রতি আযীয অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন তাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়াকূব ইব্‌ন মাক্‌স উফতোগীনের শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। আযীয যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি ইয়াকূবকে বন্দী করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখেন। তারপর তার কাছ থেকে জরিমানাস্বরূপ পাঁচ লক্ষ দীনার আদায় করেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় ইয়াকূবকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছিলেন।

উফতোগীন যখন দামেশক থেকে জাওহারের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন তিনি কাস্‌সাম নামক জনৈক ব্যক্তিকে দামেশকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছিলেন। তারপর উফতোগীন তো দামেশকে যাবার সুযোগই পান নি। ফলে কাস্‌সামের শাসন ক্ষমতা সেখানে খুব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। যখন কাসসাম উফতোগীনের মিসরে চলে যাবার সংবাদ পান তখন তিনি দামেশকে আযীযের নামে খুতবা পাঠ করতে শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হওয়ার পর আযীয আবূ মাহমূদ ইব্‌ন ইবরাহীম নামক জনৈক ব্যক্তিকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করে সেখানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কাস্‌সাম আবূ মাহমূদকে দামেশকে প্রবেশ করতে দেন নি। এবার আযীয কাসসামকে উচিত শিক্ষাদানের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সায়ফুদ্দৌলার খাদিম বাকচুর, যিনি হিম্‌সের দখলদার ও শাসনকর্তা ছিলেন, মিসরীয় বাহিনীকে রসদ সরবরাহ করেন। এদিকে তাই গোত্রের সরদার মুফাররাজ ইব্‌ন জাররাহ্ একটি আরব বাহিনী নিয়ে এসে আযীযের বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলে। শেষ পর্যন্ত আযীয নিজের পক্ষ থেকে বাকচুরকে দামেশকের

শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বাকচুর দামেশকের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথে ইয়াকূব ইব্‌ন মাক্‌স কর্তৃক নিয়োগকৃত যাবতীয় কর্মকর্তাকে দামেশক থেকে বের করে দেন। কেননা বাকচুরকে দামেশকের শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে ইয়াকূব বাধা প্রদান করেছিলেন। কিছুদিন পর ইয়াকূব নানা অভিযোগ উত্থাপন করে বাকচুরের বিরুদ্ধে আযীযকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। ফলে আযীয বাকচুরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বাকচুর তাতে পরাজিত হন। এদিকে সায়ফুদ্দৌলা সিরিয়া আক্রমণ করেন। অপর দিক থেকে কনসটান্টিনোপলের বাদশাহ সৈন্য সমাবেশ ঘটান। মোটকথা, দামেশক অঞ্চল ৩৮৫ হিজরী (৯৯৫ খ্রি) পর্যন্ত যেন যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

আযীযের মৃত্যু

দামেশকের দিকে রোমান বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে শুনে আযীয ৩৮৫ হিজরীতে (৯৯৫ খ্রি) সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং কায়রো থেকে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বালবীস নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কী বিস্ময়কর এই যোগসূত্র যে, তার পিতাও যখন দামেশকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন তখন তিনিও মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মোটকথা, আযীয বেশ কয়েক মাস অসুস্থ থাকার পর ৩৮৬ হিজরীর রমযান মাসের শেষ দিকে (৯৯৬ খ্রি অক্টোবর) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র আবূ মানসূর 'হাকিম বিআমরিল্লাহ্' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবূ মানসূর হাকিম ইব্‌ন আযীয উবায়দী

হাকিম উপাধিধারী আবূ মানসুর সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হাসান ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন কাত্তামীর হাতে অর্পণ করেন। কাত্তামী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জনসাধারণের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। এদিকে পূর্বাঞ্চল থেকে দায়লামী বংশের কিছু লোকও শীআপন্থী হওয়ার কারণে মিসরে এসে পৌঁছেছিল। অপর দিকে উবায়দী সাম্রাজ্যের আনুগত্য প্রকাশের জন্য মাশরিকী (পূর্বাঞ্চলীয়)–দের একটি বিরাট দল মিসরে বিদ্যমান ছিল। শেষ পর্যন্ত মাশরিকী ও মাগরিবী (পশ্চিমাঞ্চলীয়) দলসমূহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দামেশক, হিজায প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহ লেগে থাকে। দামেশক কখনো আরবদের দখলে চলে যেত, আবার কখনো চলে যেত তুর্কী ক্রীতদাস অথবা মিসরীয় অধিনায়কের দখলে। মোটকথা, মিসর, সিরিয়া, হিজায ও আফ্রিকায় তখন অত্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।

ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের বিদ্রোহ এবং তাকে হত্যা

ঐ সময়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশাম ওরফে আরকূহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, মানসূর ইব্‌ন আবূ আমির যখন স্পেনের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে উমাইয়া বংশের শাহ্‌যাদাদেরকে বন্দী ও হত্যা করেছিলেন তখন শেষ খলীফার পুত্র ওয়ালীদ প্রাণের ভয়ে

স্পেন থেকে কায়রোয়ানে চলে আসেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি ইয়ামান, মক্কা প্রভৃতি শহর সফর করে সিরিয়ায় চলে আসেন। তখন এখানে দারুণ অশান্তি বিরাজ করছিল। তাই এই সুযোগে ওয়ালীদ বনূ উমাইয়া খিলাফতের পক্ষে জনসাধারণকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিছু লোক তাকে সমর্থন করে। কিন্তু তিনি এখানে সাফল্যের কোন সন্তোষজনক আলামত দেখতে না পেয়ে মিসরের দিকে চলে যান। সেখান থেকে বারকা এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। বারকায় তিনি বেশ সাফল্য লাভ করেন। হাকিম উবায়দী যখন এই সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি প্রথম প্রথম বিষয়টিকে কোন গুরুত্বই দেন নি। কিন্তু হাকিম উবায়দীর হুকুমতের প্রতি যেহেতু জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল তাই আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের চারপাশে এসে জড় হতে থাকে। ফলে ওয়ালীদ এক বাহিনী গঠন করে বারকা দখল করে নেন; তারপর মিসর আক্রমণ করেন। এবার হাকিম উবায়দীর চোখ খুলে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে উবায়দীর বাহিনী পরাজয়বরণ করে। তারপর উবায়দী বার বার সৈন্য পাঠাতে থাকেন এবং প্রতিবারই তাকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র আফ্রিকায় ও মিসরের উপর ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এবার উবায়দী কূটকৌশলের আশ্রয় নেন এবং ওয়ালীদের কিছু সংখ্যক অধিনায়ককে অর্থের লোভ দেখিয়ে নিজের পক্ষে আনেন। ফলে অধিনায়করা ধোঁকা দিয়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামকে বন্দী করে ফেলে। যখন ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামকে বন্দী অবস্থায় হাকিম উবায়দীর সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করেন। তারপর ওয়ালীদের লাশটি সাধারণ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ৩৯৭ হিজরীতে (১০০৬-৭ খ্রি) ওয়ালীদ সৃষ্ট হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটে। হাকিম উবায়দী শীআপন্থী হওয়ার কারণে জনসাধারণ উবায়দী হুকুমতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত বিধায় হাকিম উবায়দী ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশামের হাঙ্গামা চলাকালে জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং সুন্নীদের অন্তরে তার প্রতি যে ঘৃণা বিরাজ করছে তা দূর করার উদ্দেশ্যে একটি ফরমান জারি করেন। তাতে বলা হয়, যে ব্যক্তির ইচ্ছা সে সুন্নী অথবা শীআ যে কোন মাযহাব গ্রহণ করতে পারবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির ইচ্ছা, সে আযানের মধ্যে 'হাইয়া আলা খায়রিল আমল' বলতে পারবে অথবা তা বলা থেকে বিরতও থাকতে পারবে। মোটকথা, মাযহাবের ব্যাপারে কারো উপর কোন জোরজবরদস্তি করা হবে না।

হাকিমের মৃত্যু

হাকিম উবায়দী জগত ও জগদ্বাসীর উপর আকাশের জ্যোতিষ্কেরও প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তার ভয়ানক আকর্ষণ ছিল। তিনি কায়রোর নিকটবর্তী মাকতাম পাহাড়ের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী থেকে 'রূহানিয়াত' তথা 'আধ্যাত্মিক শক্তি' সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে একাকী যাতায়াত করতেন। ৪১১ হিজরীর ২১শে শাওয়াল (১০২১ খ্রি ফেব্রুয়ারী) তিনি যথারীতি

তার গাধার উপর আরোহণ করে মাকতাম পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হন। সঙ্গে দু'জন আরোহীও ছিল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং একাকী পাহাড়ের দিকে চলে যান। তারপর বেশ কিছুদিন তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন নি। সরকারী কর্মকর্তা ও সভাসদবৃন্দ প্রথম প্রথম তার অপেক্ষায় থাকেন। তারপর অধৈর্য হয়ে তার সন্ধানে বের হন। মাকতাম পাহাড়ে আরোহণ করতেই তারা প্রথমে হাকিমের গাধাটি মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তারপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখতে পান, হাকিমের পরিধেয় বস্ত্র এখানে সেখানে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাকে যে ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা করা হয়েছে তা ঐ পরিধেয় বস্ত্র দেখে অনায়াসে বোঝা যায়। কিন্তু সেখানে হাকিমের লাশ পাওয়া যায় নি। হাকিম উবায়দীর হত্যা সম্পর্কে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। আর তা এই যে, হাকিমের বোনের সাথে কিছু কিছু লোকের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একথা জানতে পেরে হাকিম তার বোনকে তিরস্কার করেন এবং তিরস্কারের জবাবে তার বোন কিছু সংখ্যক কাত্তামী অধিনায়ককে ডেকে পাঠিয়ে হাকিমের বিরুদ্ধে বদ্-আকীদা ও অধার্মিকতার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং হাকিমকে হত্যা করার জন্য তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে। শেষ পর্যন্ত কাত্তামী অধিনায়করা হাকিমের একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে মাকতাম পাহাড়ে হত্যা করে। হাকিমের জন্ম হয়েছিল ৩৭৫ হিজরীর ২৩শে রবিউল আউয়াল (৯৮৫ খ্রি সেপ্টেম্বর)। তিনি ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হাকিমের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর সভাসদ ও কর্মকর্তাবৃন্দ হাকিমের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আলীকে সিংহাসনে বসান। আলীকে 'যাহির লিদীনিল্লাহ্' উপাধি প্রদান করা হয়। মূলত শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন যাহিরের ফুফু অর্থাৎ হাকিমের বোন। হাকিম ছিলেন অস্থিরচিত্ত ও পাষাণ প্রকৃতির লোক।

যাহির ইব্ন হাকিম উবায়দী

চার বছর পর যাহিরের ফুফু মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবার যাহির সালতানাতের কর্মকর্তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ৪২০ হিজরী সনে (১০২৯ খ্রি) সালিহ্ ইব্ন মারদাস সিরিয়া ও দামেশক দখল করে সেখান থেকে উবায়দী শাসনের নাম-নিশানা মুছে ফেলেন। যাহির ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা যাবীরীকে সেদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। যাবীরী দামেশক ও সিরিয়া দখল করেন বটে, তবে সিরিয়ায় অনবরত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ চলতে থাকে।

মৃত্যু

৪২৭ হিজরীর ১৫ই শাবান (১০৩৬ খ্রি জুলাই) যাহির মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর তার পুত্র আবূ তামীম সা'দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাকে 'মুসতানসির' উপাধি প্রদান করা হয়। যাহিরের যুগে আবুল কাসিম আলী ইব্ন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মুসতানসির সিংহাসনে আরোহণ করার পর আবুল কাসিম আরো ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুসতানসির ইব্‌ন যাহির উবায়দী

মুসতানসিরের শাসনামলে ৪৩৩ হিজরীতে (১০৪১-৪২ খ্রি) বিভিন্ন আরব গোত্রের লোকেরা সিরিয়া ও দামেশক দখল করে নেয়। ফলে ঐ দেশ উবায়দী সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে যায়। ৪৪০ হিজরীতে (১০৪৮-৪৯ খ্রি) মুইয্য ইব্‌ন বারীস আফ্রিকিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেখানে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ করতে থাকেন। ইতোমধ্যে মুনতানসির প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসিমকে অপসারিত করে তার স্থলে হুসাইন ইব্‌ন আলী তায়ুরীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং আরবের রুবা, রিবাহ, বুতুন, হিলাল প্রভৃতি গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে এক বাহিনী গঠন করে আফ্রিকিয়া অভিমুখে পাঠান। এই সমস্ত লোক বারকা অঞ্চলে গিয়ে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে এবং আফ্রিকা আক্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। মুসতানসির এই অবস্থা দেখে দাস ক্রয় করতে শুরু করেন এবং অনতিবিলম্বে ২৩ হাজার দাস ক্রয় করে ফেলেন। ওদিকে আরব গোত্রের লোকেরা বারকায় অবস্থান গ্রহণের পর নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগে বেড়ে ৪৪৬ হিজরীতে (১০৫৪-৫৫ খ্রি) ত্রিপোলী দখল করে নেয় এবং বনূ রুবা সেখানে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বনূ রিবাহ আতীজ নামক স্থানে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আর বনূ আদী সমগ্র আফ্রিকায় হত্যা ও লুটপাট শুরু করে। তারপর ঐ আরব সর্দারগণ মুইয্য ইব্‌ন বারীসের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মুইয্য ঐ প্রতিনিধি দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এবার তিনি আশান্বিত হন যে, হয়তো এরা এখন থেকে হত্যা, রাহাজানি ও লুটপাট থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তারা তাদের ঐ স্বভাব পরিত্যাগ করেনি। শেষ পর্যন্ত মুইয্য ইব্‌ন বারীস সানহাজা প্রভৃতি বার্বার গোত্রের ৩০ হাজার লোক নিয়ে ঐ আরবদের দমন করার সংকল্প নেন। তার মুকাবিলায় আরব যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। এতদসত্ত্বেও মুইয্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কায়রোয়ানে আশ্রয় নেন। তারপর মুইয্য পুনরায় বার্বার গোত্রসমূহ থেকে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে ৪৪৬ হিজরীর ১০ যিলহাজ্জ (১০৫৫ খ্রি মার্চ) ঈদুল আযহার দিন আরবদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু এবারও তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। পুনরায় তৃতীয় বারের মত তিনি আরবদের উপর হামলা চালান এবং এবারও তিনি পরাজিত হন। আরবরা কায়রোয়ান পর্যন্ত মুইয্যের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং বাজাহ নগরীর উপর আরব সর্দার ইউনুস ইব্‌ন ইয়াহইয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, ৪৪৯ হিজরীতে (১০৫৭-৫৮ খ্রি) মুইয্য ইব্‌ন বারীস কায়রোয়ান ত্যাগ করে মাহদীয়ায় চলে যান। ফলে ইউনুস ইব্‌ন ইয়াহইয়া কায়রোয়ানও দখল করে নেন।

গৃহযুদ্ধ

এদিকে কায়রোর অবস্থা এই ছিল যে, মুসতানসিরের মা তার পুত্রকে দিয়ে যে ফরমান ইচ্ছা জারি করতেন। এভাবে তার প্রভাব ও ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অপর দিকে সুলতানের মন্ত্রীবৃন্দ নিজেদের হিফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেনাবাহিনীতে শুধু তুর্কীদের ভর্তি করতেন। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে একসাথে তিনটি বিরাট শক্তির উদ্ভব

ঘটে। ক্রীতদাসরা ছিল একটি শক্তি। এরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয় শক্তি ছিল কাত্তামী ও বার্বার যোদ্ধারা। আর তৃতীয় শক্তি ছিল তুর্কীরা। এরা সংখ্যায় ক্রীতদাসের চাইতে কম হলেও যুদ্ধবিদ্যায় ছিল পারদর্শী। ঘটনাচক্রে নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামদান সুদানী নামক জনৈক ক্রীতদাস রাজকীয় সভাসদ ও কর্মকর্তাদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে সামরিক অধিনায়কের পদমর্যাদায় উন্নীত হন। তুর্কীরা তাকে নিজেদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের এক একটি অঞ্চল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর কায়রোর অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ, মুসতানসিরের মা এবং মুসতানসির সকলেই একে অন্যের ক্ষমতা হ্রাস করার লক্ষ্যে পরস্পর রশি টানাটানিতে ছিলেন নিমগ্ন। ফলে ক্রীতদাস ও তুর্কীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মুসতানসিরের সেনাবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। তুর্কীদের হাতে হাজার হাজার ক্রীতদাস নিহত হয় এবং এই সুযোগে তুর্কীদের সর্দার নাসিরুদ্দৌলা অত্যধিক ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি মুসতানসিরের উপর প্রভাব বিস্তার করে আপন ইচ্ছানুযায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। মুসতানসির তার এই অসহায় অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত আপন ক্রীতদাস বদর জামালীর সহায়তা কামনা করেন। বদর জামালী তখন আক্কার শাসনকর্তা ছিলেন। মুসতানসিরের সাহায্যার্থে তিনি সেখানে আর্মেনীয় লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই জাহাজযোগে এক বিরাট আর্মেনীয় বাহিনী নিয়ে মিসরে এসে পৌঁছেন। তিনি মুসতানসিরের দরবারে হাযির হলে মুসতানসির তাকে মন্ত্রীত্বের পদ প্রদান করেন এবং কিছু সংখ্যক তুর্কীকে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন যে, নাসিরুদ্দৌলা তোমাদেরকে অযথা যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তুর্কীরা খলীফার এই ইঙ্গিত পেয়ে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রেখে প্রতারণার মাধ্যমে নাসিরুদ্দৌলাকে হত্যা করে ফেলে। এবার বদর জামালী তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। তিনি পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন এবং সাম্রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করার পর সাম্রাজ্যের সম্মান ও ভাবমূর্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি করেন। তিনি বিদ্রোহী অধিনায়কদেরকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন এবং যে সমস্ত শহর ইতিমধ্যে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেগুলো পুনরায় দখল করার চেষ্টা-তদবীর করতে থাকেন। তিনি ত্রিপোলীকেও আরবদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। ফিলিস্তীনের সমগ্র এলাকাও তার দখলাধীনে চলে আসে। আর দামেশকের অবস্থা এই ছিল যে, সেখানে যেই সুযোগ পেত সেই আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু খুতবা মিসর সম্রাট উবায়দীর নামেই পাঠ করা হতো। আর কায়রোর রাজদরবার এটাকেই তাদের সৌভাগ্য বলে মনে করত। ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৫-৭৬ খ্রি) যখন বদর জামালী মুসতানসিরের বিগড়ে যাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে কিছুটা সংগঠিত করে তোলেন ঠিক তখনি আমীর আকদাস দামেশকের উপর হামলা চালিয়ে সেখানে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিসরের বাদশাহর পরিবর্তে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ জারি করেন। ৪৬৯ হিজরীতে (১০৭৬-৭৭ খ্রি) ইব্‌ন উফুক নামক সালজুকী সেনাবাহিনীর জনৈক অধিনায়ক দামেশক আক্রমণ করেন। এই

সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বদর জামালী দামেশক অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। দামেশকবাসীরা ইব্‌ন উফুকের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এমনি মুহূর্তে মিসরীয়রা দামেশক অবরোধ করে ফেলে। ৪৭০ হিজরীতে (১০৭৭-৭৮ খ্রি) সুলতান মালিক শাহ সালজুকী তুতুশ সালজুকীর হাতে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে তাকে নির্দেশ দেন– তুমি সিরিয়ার যে অংশটুকু দখল করবে তা তোমারই রাজ্য বলে বিবেচিত হবে। এই নির্দেশ পাওয়ার পর তুতুশ সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করে হলব আক্রমণ করেন। হলববাসীরা তাকে রুখে দাঁড়ায়। ফলে তুতুশ আলেপ্পো অবরোধ করে ফেলেন। ওদিকে ইব্‌ন উফুক তখন পর্যন্ত মিসরীয় বাহিনীর অবরোধের মধ্যে ছিলেন। তিনি তুতুশের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান ঃ মিসরীয় বাহিনী আমাকে ঘেরাও করে রেখেছে। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদের হাতে দামেশক তুলে দিতে আমি বাধ্য হব। তুতুশ সঙ্গে সঙ্গে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন। তুতুশের আগমন সংবাদ শুনে মিসরীয় বাহিনী দামেশক থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে মিসর অভিমুখে পালিয়ে যায়। তুতুশ মিসরে পৌঁছে ইব্‌ন উফুককে হত্যা করেন এবং মিসরের সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৪৭১ হিজরীতে (১০৭৮-৭৯ খ্রি)। তারপর তুতুশ আলেপ্পো দখল করে নেন। ধীরে ধীরে সমগ্র সিরিয়াও তার দখলে চলে আসে। এই সংবাদ শুনে বদর জামালী মিসরে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে দামেশ্‌ক আক্রমণ করেন। কিন্তু তুতুশের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান। এরপরও বেশ কয়েকবার মিসরীয় বাহিনী সিরিয়ার উপর হামলা চালায়, কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খ্রি) খ্রিস্টানরা সিসিলী দ্বীপ মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ৪৮৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল (১০৯৪ খ্রি এপ্রিল) মাসে বদর জামালী ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর ৪৮৭ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ (১০৯৫ খ্রি ডিসেম্বর) মুসতানসির উবায়দী পরলোক গমন করেন। মুসতানসিরের প্রাথমিক যুগ ছিল খুবই সঙ্কটজনক। তখন উবায়দী সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত বদর জামালী স্বীয় দূরদর্শিতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা সেটাকে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আহমদ, নায্‌যার ও আবুল কাসিম নামে মুসতানসিরের তিন পুত্র ছিলেন। মুসতানসির নায্‌যারকে তার অলীআহ্‌দ নিয়োগ করেন।

মুসতানসিরের হাতে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্‌-এর বায়আত গ্রহণ

বলা হয়ে থাকে যে, মুসতানসিরের শাসনামলে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইরাক থেকে বণিকের বেশে মিসরে আসেন এবং মুসতানসিরের খিদমতে হাযির হয়ে তার হাতে বায়আত করেন। তারপর নিবেদন করেন– আমি আপনার পর কাকে ইমাম বানাব ? মুসতানসির বলেন, আমার পর আমার পুত্র নায্‌যার তোমাদের ইমাম হবে। তারপর হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইরাকে মুসতানসিরের খিলাফত ও ইমামতের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবার জন্য তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। মুসতানসির তাকে অনুমতি প্রদান করেন। উপরন্তু তাকে তার 'দাঈ' (প্রচারক) নিয়োগ করে ইরাকে পাঠিয়ে দেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইরাকে পৌঁছে পুরোদমে

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা অর্জন করে আলামুত দুর্গ দখল করে নেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ এবং তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অবস্থা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে। মুসতানসির বদর জামালীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ মালিককে মন্ত্রীত্বের পদ প্রদান করেছিলেন। যেহেতু মুহাম্মদ মালিক এবং নায্‌যারের মধ্যে কিছুটা শত্রুতা ছিল তাই মুসতানসিরের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ মালিক মুসতানসিরের বোনকে একথার উপর রাযী করিয়ে নেন যে, মুসতানসিরের পর আবুল কাসিমকে সিংহাসনে বসানো হবে। আর এই বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে মুহাম্মদ মালিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসতানসিরের বোন সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের সামনে একথার সাক্ষ্য দেন যে, মুসতানসির আবুল কাসিমকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন। এই প্রেক্ষিতে জনসাধারণ আবুল কাসিমের হাতে বায়আত করে এবং তিনি 'মুসতালা বিল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবুল কাসিম মুসতালা উবায়দী

মুসতালা সিংহাসনে আরোহণ করার তিন দিন পর নায্‌যার কায়রো থেকে রওয়ানা হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যান। তখন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক ছিলেন নাসীরুদ্দৌলা উফতোগীনের গোলাম বদর জামালী। আবুল কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করেছেন শুনে বদর জামালী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নায্‌যারকে উপযুক্ত শাসক মনে করে তার সাহায্যকারীতে পরিণত হন। নাসীরুদ্দৌলা আলেকজান্দ্রিয়ায় নায্‌যারকে সিংহাসনে বসিয়ে তার হাতে বায়আত করেন এবং তাকে 'মুসতালা লিদীনিল্লাহ' উপাধি দেন। এই সংবাদ কায়রোয় পৌঁছামাত্র প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ মালিক সেনাবাহিনী নিয়ে নায্‌যারকে দমন করার জন্য রওয়ানা হন এবং সোজা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে শহরটি অবরোধ করে ফেলেন। আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা এই শক্ত অবরোধ সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ মালিকের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানায় এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে তার হাতে সমর্পণ করে। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ নায্‌যারকে বন্দী করে কায়রোয় পাঠিয়ে দেন। মুসতালা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে নায্‌যারকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর মুহাম্মদ মালিক নাসীরুদ্দৌলা উফতোগীনকে সঙ্গে নিয়ে কায়রোয় পৌঁছেন। মুসতালা উফতোগীনকেও হত্যা করে ফেলেন। তারপর 'সূর' শহরের শাসনকর্তা কাসীলাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাকে দমনের জন্য রাজকীয় বাহিনী রওয়ানা হয় এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কাসীলাহকে বন্দী করে কায়রোয় নিয়ে আসে। মুসতালার নির্দেশে কাসীলাহকেও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সমগ্র সিরিয়া তাজুদ্দৌলা তুতুশ সালজুকীর দখলে এসে গিয়েছিল। তাজুদ্দৌলা তুতুশের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র ভিকাক ও রিযওয়ানের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভিকাক দামেশক এবং রিযওয়ান হলব (আলেপ্পো) দখল করে নিয়েছিল। ভিকাকের পক্ষ থেকে সুলায়মান ইব্‌ন আরতাককে বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। ৪৯০ হিজরীতে (১০৯৭ খ্রি) ইউরোপের খ্রিস্টানরা, যাদের মধ্যে অনেক বড় বড় সম্রাটও ছিলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের হাত থেকে

ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তারা প্রথমে আনতাকিয়া অবরোধ করেন। ঐ সময়ে বাগীসান নামক এক সালজুকী আনতাকিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে আনতাকিয়া থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে জনৈক আর্মেনীয় তাকে হত্যা করে এবং তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে তা খ্রিস্টান বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। বাগীসানের হত্যা এবং আনতাকিয়া হাতছাড়া হওয়ার সংবাদ সিরিয়ায় পৌঁছালে সেখানে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুসেলের শাসনকর্তা কারলুকা নামক জনৈক সালজুকী অধিনায়ক খ্রিস্টান হামলাকারীদের দিকে অগ্রসর হন এবং মারজে ওয়াবিকে পৌঁছে সেখানে অবস্থান নেন। এই সংবাদ শুনে ভিকাক ইব্‌ন তুতুশ ও হিম্‌সের শাসক সুলায়মান ইব্‌ন রাতিক তুগতাগীনও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে বূকার নিকট এসে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে সবাই একজোট হয়ে খ্রিস্টানদের মুকাবিলার জন্য আনতাকিয়ার দিকে অগ্রসর হন। খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলায় এই সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় এবং হাজার হাজার মুসলমান এতে শাহাদাতবরণ করেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সেনা ছাউনিও লুট করে নিয়ে যায়। তারপর খ্রিস্টানরা হিম্‌স দখল করে। তারপর আরো অগ্রসর হয়ে আক্কা অবরোধ করে। আক্কায় অবস্থানকারী তুর্কী-সালজুকী বাহিনী অনেক কষ্ট-যাতনা সহ্য করে খ্রিস্টানদের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। খ্রিস্টানরা আক্কা অবরোধ করে রেখেছিল এবং সিরিয়ার সমগ্র মুসলমানের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে মুসতালার মন্ত্রী মুহাম্মদ মালিক মিসরীয় বাহিনী নিয়ে এসে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে বসেন। শীআদের এই আক্রমণ খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়। কেননা সিরিয়ার মুসলিম বাহিনী একই সময়ে এই দুই শক্তিশালী আক্রমণকারীর মুকাবিলা করতে পারত না। সুলায়মান এবং এলগাযী বায়তুল মুকাদ্দাসে মিসরীয় শীআ বাহিনীর মুকাবিলায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। ফলে আক্কায় খ্রিস্টানদের হামলা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ সাহায্য প্রদান করতে পারেননি। অপরদিকে যে সমস্ত লোক খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের কাছে কোন সাহায্য পাঠাতে পারেনি। ফলে বায়তুল মুকাদ্দাস মিসরের প্রধানমন্ত্রীর দখলে চলে যায় এবং সুলায়মান ও এলগাযী সেখান থেকে পূর্বদিকে চলে যান। শেষ পর্যন্ত মিসরীয়দের পক্ষেও বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে রাখা সম্ভব হয়নি।

৪৯২ হিজরীর ২৩শে শাবান (১০৯৯ খ্রি জুলাই) ৪০ দিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে। বিজয়ী খ্রিস্টানরা শহরের মধ্যে প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা দাউদ (আ)-এর মিহরাবে আশ্রয় নেয় এই আশায় যে, সেখানে খ্রিস্টানরা হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু খ্রিস্টানরা অবিরাম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। শুধু মসজিদে আকসা এবং সাখরা-ই-সুলায়মানে ৭০ হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। মসজিদে আকসার অভ্যন্তরস্থ রূপা ও সোনার তৈরি ঝাড়বাতিসহ যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ খ্রিস্টানরা লুট করে নিয়ে যায়। এই হাঙ্গামায় অসংখ্য মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যে

সমস্ত মুসলমান কোন না কোনভাবে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল তারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় বাগদাদে পৌঁছে এবং খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক জুলুম করেছে, বাগদাদের খলীফার কাছে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ দেয়। খলীফা তখন বারকিয়ারুক, মুহাম্মদ, সানজার প্রমুখ সালজুকী সুলতানদের কাছে পয়গাম পাঠান যেন তারা সিরিয়া রক্ষায় এগিয়ে যান। কিন্তু তারা পরস্পরের বিরোধিতায় এমনি নিমগ্ন ছিল যে, সিরিয়ার দিকে তাকাবার মত অবসর তাদের মোটেই ছিল না। আর এই সুযোগে খ্রিস্টানরা সিরিয়াকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মিসরের প্রধানমন্ত্রী যিনি মুসলমানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস কেড়ে নিয়ে বলতে গেলে তা খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন যখন এই সংবাদ পান তখন খ্রিস্টানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য মিসরীয় বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু খ্রিস্টানরা তার আগমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আগে বেড়ে মিসরীয় বাহিনীকে পরাস্ত করে। তখন যে সমস্ত মুসলমান পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের কাউকেই খ্রিস্টানরা রেহাই দেয়নি। মাত্র কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিসরে এসে পৌঁছেন। তারপর খ্রিস্টানরা আসকালান অবরোধ করে এবং এক হাজার দীনার জরিমানা আদায় করে সেখান থেকে ফিরে আসে।

মুসতালার মৃত্যু

৪৯৫ হিজরীর ১৫ই সফর (১১০১ খ্রি ১০ ডিসেম্বর) মুসতালার মৃত্যু হয়। তখন তার পুত্র আবূ আলীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। রাজকীয় সভাসদ ও কর্মকর্তাবৃন্দ 'আমির বিআহকামিল্লাহ' উপাধি দিয়ে তাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

আবূ আলী আমির উবায়দী

আবূ আলী সিংহাসনে আরোহণ করার পর সাম্রাজ্যের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে আসে। অবশ্য তিনি প্রথম থেকেই অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে মুসতালা তার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না। যাহোক ৪৯৬ হিজরীতে (১১০২-৩ খ্রি) প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনী সুসংগঠিত করে তা তার পিতা বদর জামালীর গোলাম সা'দুদ্দৌলার অধিনায়কত্বে খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। রামলা ও ইয়াফার মধ্যবর্তী স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মিসরীয়দের সেনাছাউনি লুণ্ঠন করা হয় এবং অনেক মিসরীয় সৈন্যকে বন্দী করা হয়। প্রধানমন্ত্রী যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি তার পুত্র শারফুল মাআলীকে এক দুর্বার বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। রামলার সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়। শারফুল মাআলী এবার আগে বেড়ে রামলা অবরোধ করে ফেলেন। ১৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর রামলা বিজিত হয়। সংঘর্ষে চারশ খ্রিস্টান নিহত এবং তিনশ' বন্দী হয়। খ্রিস্টান অধিনায়করা রামলা থেকে ইয়াফায় চলে যান এবং বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করার জন্য যেসব খ্রিস্টান ইউরোপ থেকে সেখানে এসে পৌঁছেছিল তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, শারফুল মাআলীর দিকে অগ্রসর হন। শারফুল মাআলী খ্রিস্টানদের হামলার খবর শুনে যুদ্ধ না করেই মিসরের দিকে চলে যান। ফলে খ্রিস্টানরা আগে বেড়ে বিনাযুদ্ধে আসকালান দখল করে নেয়। তারপর মিসরীয় বাহিনী পুনরায়

আসকালান আক্রমণ করে এবং খ্রিস্টানদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। এটা হচ্ছে ৪৯৬ হিজরীর যিলহজ্জ (১১০৩ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসের ঘটনা।

তারপর ৪৯৮ হিজরীতে (১১০৪-৫ খ্রি) মিসরীয় বাহিনী পুনরায় খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালায়। দামেশকের তুর্কী বাহিনীও মিসরীয় বাহিনীকে সহায়তা করে। কিন্তু সে যুদ্ধে কোন সুফল পাওয়া যায়নি। সিরিয়া উপকূলের শহরগুলোর মধ্যে ত্রিপোলী, সূর, সায়দা ও বৈরুত মিসরীয় রাষ্ট্রের শাসনাধীনে ছিল। ৫০৩ হিজরী (১১০৯-১০ খ্রি) সনে খ্রিস্টানদের সামরিক নৌবহর সেখানে আসে এবং একের পর এক সবগুলো শহর জয় করে সমগ্র সিরীয় উপকূল পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে সেখানে নিজেদের একজন বাদশাহ মনোনীত করে এবং সিরিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল তারা জয় করেছিল সেগুলোকে বায়তুল মুকাদ্দাসের এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে সিরিয়ার অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাম্রাজ্যটি ক্ষুদ্র হলেও তার দাপট ছিল অনেক বেশি। কেননা সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অনবরত সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভ করত। এই খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় মিসরের উবায়দী সাম্রাজ্য কিছুই করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানরা প্রধানত ঐ সমস্ত শহর এবং ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিল যেগুলো ছিল মিসরীয় সাম্রাজ্যের শাসনাধীন। সালজুকী অধিনায়কদের শাসনাধীন দামেশক ভূখণ্ড খ্রিস্টানরা জয় করতে পারেনি। এমনকি সিরিয়ার পূর্বাংশের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত দুঃসাহসও খ্রিস্টানদের হয়নি। সালজুকী অধিনায়ক এবং সালজুকী সুলতানরা তখন গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। যদি তারা তাদের গৃহযুদ্ধ মুলতবি রেখে খ্রিস্টানদের প্রতি মনোনিবেশ করত তাহলে অতি সহজেই খ্রিটানদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিতে পারত। ফলে খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই পেত না। মোটকথা সিরিয়ার পশ্চিম উপকূলে খ্রিস্টানদের একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে শুধু এ জন্য যে, তখন সালজুকী অধিনায়করা পরপর গৃহযুদ্ধে নিমগ্ন ছিল এবং অদূরদর্শিতার কারণে খ্রিস্টানদেরকে অনুরূপ বাড়াবাড়ি করার সুযোগ দিয়ে রেখেছিল।

৫১৫ হিজরীতে (১১২১-২২ খ্রি) আমির উবায়দী তার মন্ত্রীকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেখে তার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। তারপর তিনি অপর এক ব্যক্তিকে 'জালালুল ইসলাম' উপাধি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। চার বছর পর আমির উবায়দী জালালুল ইসলামের প্রতিও রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং ৫১৯ হিজরীতে (১১২৫ খ্রি) তিনি জালালুল ইসলাম, তার ভাই মুতামিন এবং শুভাকাঙ্ক্ষী নাজীবুদ্দৌলাকেও নির্মমভাবে হত্যা করেন।

আমির উবায়দীকে হত্যা

শেষ পর্যন্ত ৫২৪ হিজরীতে (১১৩০ খ্রি) কারামতীয় কিংবা ফিদায়ীদের একটি দল সওয়ারীতে আরোহণ করার মুহূর্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমির উবায়দীকে হত্যা করে। যেহেতু আমির উবায়দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই তার মৃত্যুর পর তার চাচাত ভাই আবদুল মজীদ 'হাফিজ লিদীনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জনসাধারণ হাফিজ লিদীনিল্লাহ-এর হাতে এই শর্তে বায়আত করে যে, যদি আমীরের গর্ভবতী স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকেই এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে হবে।

হাফিজ উবায়দী

হাফিজ উবায়দী সিংহাসনে আরোহণ করে অনেক মন্ত্রীকেই হত্যা করেন। প্রত্যেক মন্ত্রীই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর সুযোগ বুঝে বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করতো বলে তিনি তাদেরকে হত্যা করতেন। শেষ পর্যন্ত হাফিজ উবায়দী তার পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সেও সুযোগ বুঝে তার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণের প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত হাফিজ উবায়দী রেযওয়ান নামক জনৈক সুন্নী মতাবলম্বীকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর শীআ ও ইমামীদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে রেযওয়ানকেও মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হয়। এটা হচ্ছে ৫৪৩ হিজরীর (১১৪৮-৪৯ খ্রি) ঘটনা। তারপর হাফিজ উবায়দী আর কাউকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেননি।

মৃত্যু

শেষ পর্যন্ত হাফিজ লিদীনিল্লাহ্ সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে তার পুত্র আবূ মানসূর ইসমাঈল 'যাফির বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যাফির ইব্‌ন হাফিজ উবায়দী

যাফির সিংহাসনে আরোহণ করে আদিল নামক জনৈক ব্যক্তিকে তার মন্ত্রী নিয়োগ করেন। আদিল সাম্রাজ্যের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম নিজের হাতে তুলে নিয়ে যাফিরকে রাতদিন দাবা খেলায় নিমগ্ন থাকার ব্যবস্থা করেন। ৫৪৮ হিজরীতে (১১৫৩-৫৪ খ্রি) খ্রিস্টানরা আসকালান অবরোধ করে। আসকালানবাসীরা অবরুদ্ধ হয়ে সাহায্য-সহায়তার জন্য কায়রো দরবারের কাছে আবেদন জানায়। এখান থেকে প্রধানমন্ত্রী আদিল আসকালান থেকে খ্রিস্টানদের অবরোধ ভেংগে ফেলার উদ্দেশ্যে আপন মন্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তান আব্বাস ইব্‌ন আবুল ফুতুহকে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানে যাফির ও আব্বাসের মধ্যে এই ষড়যন্ত্র পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল যে, আদিলকে অবিলম্বে হত্যা করা হবে। অতএব আব্বাস স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে বালবীসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিকে আব্বাসের কিশোর পুত্র নাসীর আদিলকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে ফেলে। আদিলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আব্বাস কায়রোয় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। আসকালানবাসীদের খোঁজ-খবর আর কেউ নিল না। অতএব তারা বাধ্য হয়ে নিজেদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে সমর্পণ করল। খ্রিস্টানরা আসকালান দখল করে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার রহস্য আরো ভালোভাবে ফাঁস করে দিল। নাসীর ইব্‌ন আব্বাস, যার নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যাফির উবায়দীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দিবারাত্রির সঙ্গী ছিল। তার এবং যাফিরের মধ্যকার সম্পর্ককে উপলক্ষ করে জনসাধারণ নানা ধরনের আপত্তিকর ধারণা পোষণ করত।

যাফিরকে হত্যা

৫৪৯ হিজরীর মুহাররম (১১৫৪ খ্রি মার্চ/এপ্রিল) মাসে একদা নাসীর যাফিরকে নিমন্ত্রণ করে। যাফির নাসিরের ঘরে আসে। নাসির তখন যাফির এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে সেই ঘরেই দাফন করে ফেলে। পরদিন প্রধানমন্ত্রী আব্বাস ইব্ন আবুল ফুতূহ্ যথারীতি রাজপ্রাসাদে গমন করে এবং চাকর-ভৃত্যদের কাছে বাদশাহ যাফিরের খবরা-খবর জানতে চায়। তারা এ ব্যাপারে কিছু জানে না বলে জানায়। তারপর আব্বাস সেখান থেকে চলে আসে। আব্বাস চলে যাবার পর চাকর-ভৃত্যরা যাফিরের ভাই জিবরীল ও ইউসুফের কাছে গিয়ে যাফিরের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জানায় এবং এও জানায় যে, যাফির নাসিরের ঘরে গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে আর ফিরে আসেন নি। ইউসুফ ও জিবরীল বললেন, তোমরা প্রধানমন্ত্রী আব্বাসকে এ সম্পর্কে অবহিত কর। ভৃত্যরা আব্বাসকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, মনে হচ্ছে ইউসুফ ও জিবরীলের ষড়যন্ত্রে বাদশাহ যাফিরকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে যাফিরের ঐ দুই ভাইকে বন্দী করে এনে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই সাথে হাসান ইব্ন হাফিজের দুই পুত্রকেও হত্যা করা হয়। তারপর আব্বাস রাজপ্রাসাদে গিয়ে যাফিরের পুত্র ঈসা আবুল কাসিমকে জবরদস্তিমূলক কোলে করে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। তিনি তাকে 'ফায়িয বিনাসরিল্লাহ্' উপাধি দেন এবং তার নামে জনসাধারণের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। রাজপরিবারের পাঁচজন লোককে এভাবে নিহত হতে দেখে প্রাসাদের বেগমগণ অনন্যোপায় হয়ে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সালিহ্ ইব্ন যুরায়কের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে তাকে পূর্বাপর পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আব্বাসকে শায়েস্তা করার জন্য তার কাছে আবেদন জানান। সালিহ্ ইব্ন যুরায়ক তখন আসমূনীন ও নাবাসার শাসনকর্তা ছিলেন। যাহোক, সালিহ্ ইব্ন যুরায়ক সৈন্য সংগ্রহ করে কায়রো অভিমুখে রওয়ানা হন। আব্বাস যখন লক্ষ্য করলেন যে, কায়রোবাসীরাও তার বিরুদ্ধে চলে গেছে তখন তিনি তার পুত্র নাসীর, বন্ধু উসামা ইব্ন মুনকিদ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ লোককে নিয়ে বলতে গেলে, দলবলসহ সিরিয়া ও ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খ্রিস্টানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে আব্বাস নিহত এবং নাসীর বন্দী হন। উসামা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান এবং সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। আব্বাস কায়রো থেকে বের হয়ে যাবার পর ৫৫৯ হিজরীর রবিউস সানী (১১৬৪ খ্রি মার্চ) মাসে সালিহ্ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। নাসীরের ঘর থেকে মাটি খুঁড়ে যাফিরের লাশ উদ্ধার করে তা শাহী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তারপর যাফিরের পুত্র ফায়িযের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। ফায়িয সালিহকে 'আলমালিকুস সালিহ্' উপাধি দেন।

ফায়িয ইব্ন যাফির উবায়দী

সালিহ্ প্রধানমন্ত্রী হয়ে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করতে থাকেন। তারপর খ্রিস্টানদের সাথে পত্রালাপ করে নগদ মুদ্রার বিনিময়ে নাসীরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসেন। খ্রিস্টানরা যখন অর্থের বিনিময়ে নাসীরকে কায়রোয় পৌঁছিয়ে দেন তখন সালিহ্

তাকে হত্যা করে তার লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখেন। সালিহ্ ছিলেন ইমামিয়া মাযহাবের কঠোর অনুসারী এবং উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের একজন সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী। নাসীরকে হত্যা করার পর সালিহ্ ঐ সমস্ত বিদ্রোহী সর্দারের প্রতি মনোনিবেশ করেন, যাদের দিক থেকে বিদ্রোহ বা বিরোধিতার আশংকা ছিল। ঐ সর্দারদের মধ্যে দুজন ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হচ্ছেন তাজুল মুলূক কাইমায এবং অন্যজন হচ্ছেন ইব্ন গালিব। ঐ দুজনকে বন্দী করার জন্য সালিহ্ তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা উভয়ে পূর্বাহ্নে বিষয়টি জানতে পেরে মিসর থেকে পালিয়ে যান। তাদের ঘরবাড়ি লুট করা হয়। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে অন্য সর্দাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং উবায়দী সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত দাসে পরিণত হন। সালিহ্ রাজপ্রাসাদের দারোয়ান, খাদিম তথা সকল কর্মচারীকে হটিয়ে দিয়ে তাদের স্থলে নিজস্ব লোক নিয়োগ করেন। এভাবে তিনি যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করে রাজপ্রাসাদের মূল্যবান সব আসবাব-সামগ্রী নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। ফায়িয উবায়দীর ফুফু সালিহের ক্ষমতা এভাবে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে দমন তথা হত্যা করার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

সালিহ্ উক্ত ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে স্বয়ং রাজপ্রাসাদে গিয়ে সালিহের ফুফুকে হত্যা করেন। যে বছর ফায়িযকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় সেই বছর আল-মালিকুল আদিল সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী, বনূ তুতুশের কাছ থেকে দামেশক দখল করে নিয়েছেন এবং খ্রিস্টানদেরকে শায়েস্তা করার ব্যাপারেও গভীর চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ফায়িয উবায়দীর মৃত্যু

নাম কা ওয়াস্তে ছয় মাস হুকুমত করার পর বাদশাহ ফায়িয উবায়দী ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রধানমন্ত্রী সালিহ্ ইব্ন যুরায়ক রাজপ্রাসাদের খাদিমদেরকে নির্দেশ দেন, রাজপরিবারের যে সমস্ত ছেলেরা রয়েছে তাদেরকে তার সামনে পেশ করতে, যাতে তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে সিংহাসনের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন হাফিজ উবায়দীকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে তাকে 'আদিদ লিদীনিল্লাহ' উপাধি প্রদান করা হয়। আদিদ তখন বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই প্রধানমন্ত্রী সালিহ্ আদিদকে সিংহাসনে বসিয়ে তার সাথে তার কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেন।

আদিদ ইব্ন ইউসুফ উবায়দী

আদিদ ছিলেন সালিহের হাতের পুতুল এবং নাম কা ওয়াস্তে বাদশাহ। প্রকৃত বাদশাহী ছিল প্রধানমন্ত্রী সালিহের হাতে। এটা শাহী অমাত্যবর্গের কাছে ছিল খুবই অপছন্দনীয়। আদিদের ছোট ফুফু তার নিহত বোনের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাকে (সালিহ্কে) হত্যা করার পরিকল্পনা নেন। তিনি সোভানিয়ার অধিনায়কদেরকে সালিহ্কে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন। জনৈক অধিনায়ক সুযোগ পেয়ে সালিহকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপর কোনমতে নিজের ঘরে পৌঁছে কিছুক্ষণ পর

মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে আদিদ উবায়দীকে ওসীয়ত করে যান, যেন তিনি তার পরে তার পুত্র যুরায়রকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। আদিদ সে ওসীয়ত অনুযায়ী সালিহের পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে তাকে 'আদিল' উপাধি দেন। আদিল প্রধানমন্ত্রী হয়ে আদিদের অনুমতি ক্রমে তার পিতৃ হত্যার বদলা স্বরূপ প্রথমে আদিদের ফুফু ও সুদানী অধিনায়ককে হত্যা করেন। তারপর শাসন পরিচালনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সায়ীদ নামক স্থানের শাসনকর্তা শাবির সা'দীকে অপসারিত করে তার স্থলে আমীর ইব্‌ন রুকআকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাবির এই সংবাদ শুনে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বে সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোয় এসে উপস্থিত হন। আদিল শাবিরের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে কায়রো থেকে পলায়ন করেন। ৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রি) শাবির বিজয়ী বেশে কায়রোয় প্রবেশ করেন। যুরায়ক আদিল বন্দী হয়ে আসেন এবং এক বছর মন্ত্রীত্বের পর নিহত হন। এবার শাবির প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদিদও সন্তুষ্টচিত্তে তাকে সে পদে বরণ করে নেন। নয় মাস পর দিরগাম নামক রাজপ্রাসাদের জনৈক দারোগা ক্ষমতা অর্জন করে শাবিরকে কায়রো থেকে বের করে দেন এবং নিজেই মন্ত্রীপদ দখল করে নেন। শাবির মিসর থেকে বের হয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন। দিরগাম, শাবিরের পুত্র আলীকে, যিনি কায়রোয় অবস্থান করছিলেন, বন্দী করে এনে হত্যা করেন। এছাড়াও এমন অনেক আমীর-উমারাকে তিনি হত্যা করেন যাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ বিদ্রোহ বা বিরোধিতার আশংকা ছিল।

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গীর মিসরের প্রতি মনোনিবেশ

শাবর সিরিয়ায় গিয়ে 'মালিকে আদিল' নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গীর দরবারে হাযির হন। তিনি তার কাছে মিসরের সামগ্রিক অবস্থা বর্ণনা করে তার সাহায্য কামনা করেন এবং এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, যদি তাকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে পুনরায় বহাল করে দেওয়া হয় তাহলে তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়কদেরকে জায়গীর প্রদান ছাড়াও মিসরের একটি অংশের উপর নুরিয়া সাম্রাজ্যের দখল প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। সুলতান নূরুদ্দীন অনেক চিন্তাভাবনার পর তার সেনাপতি আসাদুদ্দীন শেরকূহকে ৫৫৯ হিজরীর জমাদিউস সানী (১১৬৪ খ্রি মে) মাসে শাবিরের সাথে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। আসাদুদ্দীনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তিনি মিসরে পৌঁছে দিরগামকে পদচ্যুত করে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল করেন এবং যে একাজে বাধা দেবে তার সাথে যেন যুদ্ধ করেন। শাবির ও শেরকূহকে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করে সুলতান নূরুদ্দীন খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করার জন্য স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন, যাতে করে খ্রিস্টানরা তাদের সীমান্তের নিকটে শেরকূহের বাহিনীর উপর হামলা করে না বসে। শেরকূহ ও শাবির বালবীস পর্যন্ত এগিয়ে যান। সেখানে দিরগামের ভাই নাসিরুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন মিসরী তাদের উপর হামলা চালান। শেরকূহ উভয়কে পরাজিত ও বন্দী করে এবং বিজয়ী বেশে কায়রোয় প্রবেশ করেন। দিরগাম মন্ত্রীত্ব ছেড়ে পলায়ন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে বন্দী হয়ে নিহত হন। এভাবে নাসিরুদ্দীন ও ফখরুদ্দীনকেও হত্যা করা হয়।

শাবির পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি শেরকূহের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। অতএব শেরকূহ বাধ্য হয়ে মিসর থেকে সিরিয়ায় ফিরে যান। তারপর শাবির সুলতান নূরুদ্দীনকে তার এই বিরাট উপকারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন তো দূরের কথা, উল্টো তার সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য খ্রিস্টানদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে শেরকূহ সুলতান নূরুদ্দীনের অনুমতি নিয়ে ৫৬২ হিজরীতে (১১৬৬-৬৭ খ্রি) মিসরের উপর আকমণ পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে মিসর আক্রমণ করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা পথিমধ্যে খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলসমূহ অতিক্রম করে যেতে হতো। এতদসত্ত্বেও শেরকূহ অত্যন্ত কৌশলের সাথে তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানকার বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেন।

খ্রিস্টানদের কাছে মিসরীয়দের সাহায্য প্রার্থনা

শাবির সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। খ্রিস্টানরা তো এ ধরনের সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে শাবিরের সাহায্যার্থে সেখানে সেনাবাহিনী নিয়ে হাযির হয়। খ্রিস্টান এবং শাবিরের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে শেরকূহ বাহিনীকে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় মনে হচ্ছিল। কেননা সে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই হাজারের চাইতেও কম। কিন্তু শেরকূহ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে উভয় বাহিনীর উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে পরাজিত করে পলায়নে বাধ্য করেন। মিসরে পূর্ব থেকেই শেরকূহের ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। তিনি তার দখলীকৃত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন ব্যবস্থা সংগঠিত করে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী সঙ্গে সঙ্গে তাদের শহর শেরকূহের হাতে সমর্পণ করে। শেরকূহ তার ভাতিজা সালাহুদ্দীন ইব্‌ন নাজমুদ্দীন আইয়ুবকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং নিজে সাঈদের দিকে অগ্রসর হন। পরাজিত ঐ মিসরীয় বাহিনী কায়রোয় একত্রিত হচ্ছিল। শেরকূহ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সাঈদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন শুনেই মিসরীয় বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় এবং কায়রো থেকে যাত্রা করে। শেরকূহ যখন জানতে পারেন যে, মিসরীয় বাহিনী এবং খ্রিস্টান বাহিনী সম্মিলিতভাবে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেছে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার ভাতিজা সালাহুদ্দীনের সাহায্যার্থে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে শাবির একটি বিশেষ ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে শেরকূহের বাহিনীর কিছুসংখ্যক সেনা অধিনায়ককে নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন। ফলে ঐ অধিনায়করা যুদ্ধ চলাকালে ঔদার্য প্রদর্শন করতে থাকে। শেরকূহ এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। এদিকে শাবিরের পক্ষ থেকে শেরকূহের কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম এসে পৌঁছে যে, তুমি আমাদের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নগদ বুঝে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে চলে যাও। পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর শেরকূহ শাবিরের ঐ আবেদন মঞ্জুর করাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। অতএব তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে সিরিয়ায় ফিরে যান।

অদূরদর্শিতার পরিণাম

খ্রিস্টানদেরকে মিসরে ডেকে এনে শাবির যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল তার অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখা দেয়। এ ঘটনা ঘটেছিল ৫৬২ হিজরীর যিলকাদ (১১৬৬ খ্রি আগস্ট) মাসে। শেরকূহ ফিরে যাবার পর খ্রিস্টান বাহিনীর মিসরে স্থায়ী অবস্থান গ্রহণের এবং তাদের দ্বারা মিসর দখলের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারা শাবিরের কাছে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পেশ করে এবং শাবির ও সুলতান আবিদ উবায়দীকে তা বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। শর্তগুলো হলো ঃ

১. খ্রিস্টান বাহিনী কায়রোয় অবস্থান করবে।

২. খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে একজন ব্যবস্থাপক কায়রোয় থাকবেন।

৩. নগর প্রাচীরের দ্বারসমূহ খ্রিস্টানদের দখলে থাকবে এবং

৪. মিসর সরকার বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান বাদশাহকে প্রতি বছর এক লক্ষ দীনার প্রদান করবেন।

এভাবে খ্রিস্টানরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর মিসর সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। তারা বালবীসকে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারপর তারা রাজধানী কায়রো দখলের প্রস্তুতি নেয়। তারা শাবিরকে নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়ে বিরাট সংখ্যক খ্রিস্টান সৈন্য তলব করে। তারা এক লক্ষ দীনারের পরিবর্তে দুলক্ষ দীনার এবং সেই সাথে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য দাবি করে। মিসরের বাদশাহ আদিদ উবায়দী এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন।

আদিদ কর্তৃক সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

আদিদ সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের কাছে একজন দূত পাঠান এবং নিবেদন করেন ঃ যে সমস্ত খ্রিস্টান মিসরের উপর চেপে বসেছে তাদেরকে বিতাড়নের জন্য আপনার সাহায্য কামনা করি। আপনি অনতিবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করুন। শাবির যখন জানতে পারলেন যে, আদিদ সুলতান নূরুদ্দীনের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন তখন তিনি আদিদকে নানাভাবে বুঝিয়ে উক্ত সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি আদিদকে বলেন, তুর্কীদের চাইতে খ্রিস্টানদেরই করদাতা হওয়া ভাল। কিন্তু আদিদ তার ঐ সব কথার কোন উত্তর দেন নি। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ তার সেনাপতি শেরকূহকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং তার সাথে তার ভাতিজা সালাহুদ্দীন এবং অন্যান্য অধিনায়ককেও মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। আসাদুদ্দীন শেরকূহ তার সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি খ্রিস্টানদের সামরিক ছাউনি লুট করেন এবং অনেক মাল-আসবাব নিয়ে বাদশাহ আদিদের দরবারে হাযির হন। আদিদ শেরকূহকে জোড়া উপহার দেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন। তিনি শেরকূহ ও তাঁর বাহিনীকে বিশেষ মেহমান হিসাবে আপ্যায়িত করতে থাকেন। একদা সুযোগ বুঝে তিনি শেরকূহকে বলেন, শাবির হচ্ছে খ্রিস্টানদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের শত্রু। তুমি ওকে হত্যা করে ফেল। শাবিরকে হত্যা করার জন্য শেরকূহ তাদের অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে শাবিরের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা

আদিদের খিদমতে হাযির করা হয়। এবার আদিদ শেরকূহকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাকে 'আমীরুল জুয়ূশ' ও 'মানসূর' উপাধি দেন। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের সাথেও শেরকূহের সম্পর্ক যথারীতি অব্যাহত থাকে এবং তিনি সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদের অনুমতি নিয়েই মিসরে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এর কয়েক মাস পর ৫৬৫ হিজরীতে (১১৬৯-৭০ খ্রি) শেরকূহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মিসরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সালাহুদ্দীন আইয়ূবী

আদিদ তার ভাতিজা সালাহুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সালাহুদ্দীনও নূরুদ্দীন মাহমূদের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সর্বদা বহাল রাখেন। শেরকূহের মন্ত্রীত্বের প্রতি আদিদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে সালাহুদ্দীনও সর্বপ্রকার প্রশাসনিক অধিকার লাভ করেছিলেন। শেরকূহ এবং সালাহুদ্দীন উভয়েই ইমাম শাফিঈ (র)-এর খাঁটি ভক্ত ছিলেন। সালাহুদ্দীন আইয়ূব শীআপন্থী কাযীদেরকে অপসারিত করে শাফিঈ পন্থী কাযী নিয়োগ করেন। তিনি মাদরাসা-ই-শাফিঈ ও মাদরাসা-ই-মালিকী এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ৫৬৫ হিজরীতে (১১৬৯-৭০ খ্রি) যখন শেরকূহ খ্রিস্টান বাহিনীকে মিসর থেকে বের করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দাযিত্ব গ্রহণ করেন তখন খ্রিস্টানরা ঐ কর থেকে বঞ্চিত হয়, যা তারা এতদিন যাবত মিসর থেকে পাচ্ছিল। খ্রিস্টানদের মনে এই চিন্তারও উদয় হয় যে, দামেশক ও কায়রোর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যখন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকেও খ্রিস্টানদের দখলে রাখা কঠিন হবে। এই সব ভেবেচিন্তে সারা সিসিলী ও স্পেনের পাদ্রীদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠায় যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা এবং এখানে খ্রিস্টান সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন। এই পয়গাম পেয়ে ঐ সমস্ত দেশের পাদ্রীরা ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে। ফলে স্পেন ও অন্যান্য দেশ থেকে খ্রিস্টানরা দলে দলে এসে সিরিয়া উপকূলে অবতরণ করতে থাকে। খ্রিস্টানরা ইউরোপ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ৫৬৫ সনে (১১৬৯-৭০ খ্রি) দিমইয়াত অবরোধ করে ফেলে। দিমইয়াতের কর্মকর্তা শামসুল খাওয়াস মানকূর সালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। এদিকে মিসরের শীআপন্থীরা প্রধানমন্ত্রী সালাহুদ্দীন আইয়ূবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। সালাহুদ্দীন বাহাউদ্দীন কারাকূশ নামক জনৈক অধিনায়ককে এক বাহিনী দিয়ে দিমইয়াতের দিকে প্রেরণ করেন এবং সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদকে লিখেন– আমি শীআ ও সুদানীদের কারণে মিসর ছাড়তে পারছি না। তাই নিজে দিমইয়াতের দিকে যেতে পারলাম না। আপনি দিমইয়াতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ সঙ্গে সঙ্গে দিমইয়াতের দিকে সামান্য সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন এবং খ্রিস্টানদেরকে দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সিরিয়া উপকূলের খ্রিস্টান এলাকাসমূহের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে শুরু করেন। ফলে খ্রিস্টান যোদ্ধারা ৫০ দিন অবরোধ করে রাখার পর যখন দিমইয়াত ছেড়ে নিজ নিজ শহরের দিকে ফিরে আসে তখন দেখতে পায় যে, সুলতান নূরুদ্দীনের আক্রমণের ফলে তাদের ঘর-বাড়ি একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন তার

ভাই নাজমুদ্দীন আইয়ূবকে সিরিয়া থেকে মিসরে ডেকে পাঠান। স্বয়ং বাদশাহ আদিদ নাজমুদ্দীন আইয়ূবের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। বাদশাহ্ আদিদ সর্বদা সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবের কাজকর্মের প্রশংসা করতেন। উপরন্তু তিনি নিজেকে শাসন পরিচালনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন বলা চলে। মিসরের শীআদের কাছে সালাহুদ্দীনের এই সম্মান, প্রতিপত্তি ও সীমাহীন ক্ষমতা খুবই অপছন্দনীয় ঠেকত। তাছাড়া সালাহুদ্দীনের কারণে মিসরে দিনের পর দিন শীআ মাযহাবের অবনতি ও সুন্নী মাযহাবের উন্নতি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সালাহুদ্দীন বিদ্বেষী অধিনায়ক, সভাসদ ও প্রাসাদ কর্মকর্তারা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তারা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মিসরকে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং খ্রিস্টান রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে বাদশাহ আদিদের সাথে তার গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হবে। যাহোক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা একদিকে আদিদকে স্বমতে আনার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে খ্রিস্টানদের সাথে পত্রালাপ করে তাদের রাষ্ট্রদূতকে গোপনে ডেকে পাঠায়। ঘটনাচক্রে তাদের একটি পত্র, যা গোপনে খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে পাঠানো হচ্ছিল, পথিমধ্যে ধরা পড়ে এবং তা সালাহুদ্দীনের সামনে পেশ করা হয়। সালাহুদ্দীন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অপরাধীদের নামধাম সংগ্রহ করেন এবং তাদের সকলকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে যখন তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয় তখন তাদেরকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়। তারপর সালাহুদ্দীন বাহাউদ্দীন কাররাশকে রাজ-প্রাসাদের দারোগা নিয়োগ করেন।

সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ প্রথম থেকেই সালাহুদ্দীন আইয়ূবকে লিখে আসছিলেন ঃ তুমি মিসরে বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা কর। কিন্তু সালাহুদ্দীন এই ওযর পেশ করে তা থেকে বিরত ছিলেন যে, যদি আদিদ উবায়দীর নাম খুতবা থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে মিসরে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে। সালাহুদ্দীনের ঐ আশংকা অমূলক ছিল না। কেননা মিসরে বিরাট সংখ্যক সুদানী লোক ছিল, যারা সব সময় তুর্কীদের বিরুদ্ধে এবং শীআদের পক্ষে থাকতো। উপরে উল্লিখিত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে যখন সালাহুদ্দীন হত্যা করেন তখন এই সুদানীরা, যারা সংখ্যায় ছিল ৫০ হাজার, সালাহুদ্দীন এবং তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রাজকীয় অফিস ও প্রধানমন্ত্রীর অফিসকে কেন্দ্র করে তুর্কী ও সুদানীদের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে তুর্কীরা জয়লাভ করে। সালাহুদ্দীন সুদানীদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এতে তাদের প্রাণ রক্ষা পায় বটে, তবে ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। যাহোক সুলতান নূরুদ্দীন পুনরায় সালাহুদ্দীনকে লিখেন ঃ তুমি আদিদের নাম স্থগিত রেখে আব্বাসীয় খলীফা মুসতাযীর নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা কর। এটা ছিল সেই সময়, যখন বাদশাহ আদিদ মরণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। যাহোক উপরোক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে ৫৬৭ হিজরী সনের মুহাররম (১১৭১ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে কায়রোর জামে মসজিদের মিম্বরে প্রথম বারের মত আব্বাসীয় খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং কেউই তা অপছন্দ করেনি। পরবর্তী জুমআ থেকে সালাহুদ্দীনের মৌখিক নির্দেশে মিসরের সকল মসজিদেই বাগদাদের খলীফার নামে খুতবা পাঠ হতে থাকে।

আদিদের মৃত্যু

ঐ সময়ে অর্থাৎ ৫৬৭ হিজরীর ১০ই মুহাররম (১১৭১ খ্রি ১৩ সেপ্টেম্বর) আদিদ উবায়দী ইনতিকাল করেন। এই উপলক্ষে সালাহুদ্দীন শোকসভার আয়োজন করেন এবং সুলতানী প্রাসাদে কি কি মাল-আসবাব রয়েছে তার একটা হিসাব নেন। আদিদের মৃত্যুর সাথে সাথে উবায়দী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মিসর পুনরায় বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাগদাদের খলীফার পক্ষ থেকে সালাহুদ্দীন আইয়ূব মিসরের সুলতানী সনদ, জোড়া উপহার ও পতাকা লাভ করেন। ফলে মিসরে উবায়দী শাসনের পরিবর্তে আইয়ূবী শাসনের সূচনা হয়।

একনজরে উবায়দী শাসনামল

উবায়দী শাসন দু'শ সত্তর বছর পর্যন্ত টিকেছিল। এর সূচনা হয় আফ্রিকায় তথা আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে, তারপর মিসরে। উবায়দীরা মিসর জয় করার পর কায়রোকে তাদের রাজধানীতে রূপান্তর করে। মরক্কোর ইদরীসী সালতানাতকেও সাধারণভাবে আলাভী ও শীআদের সালতানাত মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইদরীসী সালতানাত বংশগত দিক দিয়ে বার্বারী ছিল বলে সেটা আধা শীআ বা শুধু নামেমাত্র শীআ সালতানাত ছিল। ইদরীসীদের আমল-আখলাক ও ইবাদত-আকায়িদের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যেটাকে সুন্নীদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ইদরীসীদের সাথে সুন্নীদের না কোন শত্রুতা ছিল, আর না ছিল তাদের আকায়িদ ও ইবাদতের মধ্যে কোন পার্থক্য। ইদরীসী সালতানাতের সূচনা হয় প্রথম ইদরীস থেকে, যিনি আহলে বায়ত-প্রীতির বিখ্যাত হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তারপর ইদরীসীদের মধ্যে আর কোন শীআ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়নি। তবে উবায়দী হুকুমত অবশ্যই শীআপন্থী হুকুমত ছিল। কিন্তু বংশগত দিক দিয়ে সেটা আলাভী হুকুমত কখনো ছিল না।

সুয়ূতী প্রণীত 'তারীখুল খুলাফা'-এর বর্ণনা অনুযায়ী উবায়দুল্লাহর দাদা ধর্মগত দিক দিয়ে মাজুসী (অগ্নি উপাসক) এবং পেশাগত দিক দিয়ে কর্মকার ও তীর প্রস্তুতকারক ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী পশ্চিম দেশে গিয়ে নিজেকে ফাতিমী বলে দাবি করেন। কিন্তু বংশ তালিকা বিশেষজ্ঞরা তার এই দাবিকে মেনে নিতে পারেন নি। একদা আযীয উবায়দী স্পেনের উমাইয়া খলীফার নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে বনূ উমাইয়াকে বিশ্রী গালিগালাজ করা হয়েছিল। উমাইয়া খলীফা এর উত্তরে আযীয উবায়দীকে লিখেন, আমাদের বংশ তালিকা যেহেতু তোমার জানা ছিল তাই তুমি আমাদের বংশের নাম ধরে গালিগালাজ করতে পেরেছ। তোমার বংশ তালিকা যদি আমাদের জানা থাকত তা হলে আমরাও তোমার মত তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নাম ধরে গালিগালাজ করতে পারতাম। আযীযের কাছে উমাইয়া খলীফার এই উক্তি খুবই অপমানকর ঠেকে। কিন্তু এর কোন উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। উবায়দীদেরকে সাধারণভাবে ফাতিমী নামে স্মরণ করা হয়।

উবায়দীরা সাধারণভাবে ইসমাঈলী শীআ ছিল। ওদেরকে বাতিনীও বলা হয়ে থাকে। তাদেরই একটি শাখা ছিল পারস্যের ঐ সালতানাত যা হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ হুকুমতের রাজধানী ছিল 'আলামূত দুর্গ'। ওটাকে ফিদায়ীদের হুকুমতও বলা হয়ে থাকে। ফিদায়ীরাও আলাভী ছিল না।

উবায়দীদের রাষ্ট্রে হাজার হাজার পুণ্যবান ও ধর্মপ্রাণ লোক শুধু এজন্য নিহত হন যে, তারা সাহাবা কিরামকে মন্দ বলতেন না। উবায়দীদের দ্বারা ইসলামের কোন উপকার হয় নি। সামরিক, জ্ঞানগত এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে তাদের এমন কোন কীর্তি নেই, যার উপর গর্ববোধ করা যেতে পারে। কোন কোন আলীম উবায়দীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত ও মুরতাদ আখ্যা দিয়েছেন। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আযীয উবায়দী নিজেকে 'আলিমুল গায়ব' (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা) বলে দাবি করতেন। আর উবায়দী মাত্রই মনে করত যে, মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বৈধ। উবায়দী সাম্রাজ্যের এ ধরনের আরো কিছু ইতিকাদ-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল, যার কারণে উলামা সমাজ তাদেরকে 'ইসলামের কলংক' বলে মনে করেন। উবায়দী সালতানাত সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হলো। এবার আমরা কারামতীয় এবং তাদের হুকুমত সম্পর্কে আলোচনা করব।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাহরাইনের কারামতীয় সম্প্রদায়

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারজ কারমাত

বাহরাইন একটি ক্ষুদ্র দেশ। এর পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে উমান, পশ্চিমে ইয়ামামা এবং উত্তরে বসরা অবস্থিত। এই দেশ বাহরাইন নামে পরিচিত। এই দেশে হিজর নামক আর একটি শহর আছে। এ কারণে বাহরাইনকে কখনো কখনো হিজর নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই দেশে হাফীর নামক তৃতীয় আর একটি শহর ছিল, সেটাকে কারামতীয়রা ধ্বংস করে তার স্থলে ইহসা নামক শহর গড়ে তুলেছে। তাই এই দেশকে ইহসাও বলা হয়ে থাকে। ইহসা শহরই ছিল কারামতীয়দের কেন্দ্র ও উৎস স্থল। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে কারামতীয়দের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একই সময়ে উবায়দী ও কারামতীয়দের আবির্ভাব হয়েছিল। এরা উভয়েই ছিল ইসমাঈলী শীআ এবং একই আকীদা আমলের অনুসারী। ২৭৫ হিজরীতে (৮৮৮-৮৯ খ্রি) কূফা এলাকায় ইয়াহইয়া ইব্ন ফারজ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি বলতেন যে, তার নাম কারমাত এবং তিনি প্রতিশ্রুত মাহ্দীর দূত। তিনি তার অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন এবং পার্থিব আয়েশ-আরাম থেকে দূরে থাকতেন। ফলে তার প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তিনি তার প্রত্যেক মুরীদ এবং ভক্তের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর জন্য এক দীনার করে চাঁদা আদায় করতেন। যখন তার শিষ্যদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা জনসাধারণকে তার দিকে প্রলুব্ধ করে। কূফার গভর্নর একথা জানতে পেরে কারমাতকে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কিছুদিন পর কারারক্ষীদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কারমাত জেলখানা থেকে পালিয়ে যান। তখন কেউ জানতে পারেনি তিনি কোথায় গেছেন বা তার কি হয়েছে? এভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার মুরীদ এবং শিষ্যরা তার প্রতি আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তিনি অবশ্যই ইমাম মাহ্দীর দূত।

কারমাত তার অনুসারীদেরকে যে সমস্ত আকীদা ও আমলের শিক্ষা দিতেন তা ছিল বিস্ময়কর এবং অভিনব। তার নামাযও ছিল অন্য রকমের। তিনি রমযান মাসে নয় বরং কয়েকটি বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে রোযা পালন করতেন। তিনি মদ্যপানকে হালাল এবং নিদ্রাকে হারাম বলতেন। তার মতে 'জানাবত' (স্ত্রী সহবাস)-এর গোসলের জন্য ওযূই যথেষ্ট ছিল। লেজওয়ালা ও পাঁচ আংগুল বিশিষ্ট জন্তুকে তিনি হারাম বলে মনে করতেন।

কিছুদিন পর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারজ অর্থাৎ কারমাত পুনরায় আবির্ভূত হন এবং নিজেকে 'কায়িম বিলহাক' উপাধিতে ভূষিত করে জনসাধারণকে পুনরায় নিজের আশেপাশে জড়ো করতে থাকেন। তখন কূফার শাসনকর্তা আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ তায়ীর অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য তার উপর আক্রমণ চালায় এবং তার সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। তারপর কিছু কিছু আরব গোত্র তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং একজোট হয়ে ২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খ্রি) দামেশকের শাসনকর্তা বলখ বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা এবং তার দলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন।

হুসাইন মাহ্দী

ইয়াহ্ইয়ার পর তার ভাই হুসাইন, 'মাহ্দী আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি গ্রহণ করে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বেদুঈন আরবদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন এবং দামেশক ও সিরিয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে লুটপাট চালান। শেষ পর্যন্ত তাকে দমন করার জন্য আব্বাসীয় খিলাফতের অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং এতে স্বয়ং 'মাহ্দী আমীরুল মু'মিনীন' বন্দী হয়ে নিহত হন। অবশ্য তার পুত্র আবুল কাসিম কোন মতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এটা হচ্ছে ২৯১ হিজরী (৯০৩-৪ খ্রি) সনের ঘটনা। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেদুঈনদের একটি বাহিনী গঠন করে তাবারিয়ায় লুটপাট শুরু করে দেন। যখন তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় তখন তিনি ইয়ামানের দিকে পালিয়ে যান এবং ইয়ামানের একটি এলাকা দখল করে নেন। তারপর তিনি সানআ শহরে লুটপাট চালান। আবূ গালিব নামক জনৈক কারামতীয় তাবারিয়ার আশেপাশেও লুটপাট শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ২৯৩ হিজরীতে (৯০৫-৬ খ্রি) আবূ গালিবও নিহত হন। এদিকে ইয়ামান, হিজায এবং সিরিয়ায়ও কারামতীয়রা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রেখেছিল।

দ্বিতীয় ইয়াহ্ইয়া

যখন কারমত তথা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারজ জেলখানা থেকে অদৃশ্য হয়ে যান তখন ইয়াহ্ইয়া নামেরই অন্য এক ব্যক্তি বাহরাইন শহরের নিকটবর্তী কাতীফ নামক স্থানে আবির্ভূত হয়ে ২৮১ হিজরীতে (৮৯৪ খ্রি) নিজেকে প্রতিশ্রুত 'ইমাম মাহ্দীর দূত' বলে দাবি করেন। তিনি এও দাবি করেন যে, ইমাম মাহ্দী শীঘ্রই আবির্ভূত হবেন এবং আমি তাঁর একটি পত্র নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে 'খালী' শীআপন্থী আলী ইব্ন মুআল্লা ইব্ন হামদান কাতীফের সকল শীআকে একত্র করে ইমাম মাহ্দীর ঐ চিঠি পড়ে শুনান যা ইয়াহ্ইয়ার কাছে ছিল। এটা শুনে শীআরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং বাহরাইনের আশেপাশে এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এবার জনসাধারণ ইমাম মাহ্দীর পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবূ সাঈদ হাসান ইব্ন বাহরাম জানাবীও এতে অংশগ্রহণ করেন। আবূ সাঈদ ছিলেন একজন অতি সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন পর ইয়াহ্ইয়া অদৃশ্য হয়ে যান এবং মাহ্দীর অপর একটি পত্র নিয়ে আসেন। এই পত্রে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা প্রত্যেকে ইয়াহ্ইয়াকে ছত্রিশ দীনার করে চাঁদা প্রদান করে। সকলেই

সন্তুষ্টচিত্তে এই নির্দেশ মেনে নেয়। ইয়াহ্ইয়া এই অর্থ আদায় করে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যান এবং কিছু দিন পর আর একটি পত্র নিয়ে ফিরে আসেন। এই তৃতীয় পত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি যুগের ইমামের জন্য নিজ নিজ সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ ইয়াহ্ইয়ার কাছে সমর্পণ করে। জনসাধারণ এই নির্দেশও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।

আবূ সাঈদ জানাবী

আবূ সাঈদ জানাবী ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি বাহরাইন শহরে গিয়েও তাবলীগ ও প্রচারের কাজ শুরু করেন। তার কথায় প্রভাবিত হয়ে জনসাধারণ যুগের ইমামের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকে। ধীরে ধীরে বিপুল সংখ্যক আরব বেদুঈন আবূ সাঈদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐসব কারামতীয়, যারা ইয়াহ্ইয়া কারামতীর দলের সাথে সম্পর্ক রাখত তারাও ইয়াহ্ইয়ার চারপাশে জড়ো হতে থাকে। আবূ সাঈদ এই সমস্ত লোককে নিয়ে একটি নিয়মিত বাহিনী গঠন করেন এবং বাহিনী নিয়ে কাতীফ থেকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। বসরার শাসনকর্তা আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়ার এই সমস্ত প্রস্তুতির সংবাদ শুনে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এ সম্পর্কে দরবারে খিলাফতকে অবহিত করেন। দরবারে খিলাফতের পক্ষ থেকে ফারিসের শাসনকর্তা আব্বাস ইব্ন উমর গানাবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়– তুমি বসরাকে রক্ষা কর। আব্বাস ইব্ন গানাবী অবিলম্বে দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আবূ সাঈদ আব্বাসকে বন্দী করেন এবং তার সেনাছাউনিও লুণ্ঠন করেন। কিছু দিন পর আব্বাসকে মুক্ত করে দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু তার যে সব সঙ্গী-সাথী বন্দী হয়েছিল তাদের সকলকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই সাফল্য আবূ সাঈদকে অত্যন্ত সাহসী করে তুলে। তিনি এবার হিজর আক্রমণ করে বসেন এবং তা জয় করে সেখানে নিজের একটি স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আবূ সাঈদ এবং তার দলের আকীদা-বিশ্বাস ছিল কারমাত ইয়াহ্ইয়ার অনুরূপ। তাই এরাও কারামতীয় নামে অভিহিত হয়ে থাকে। আবূ সাঈদ তার হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করে তার পুত্র সাঈদকে 'অলীআহদ' নিয়োগ করেন। এ বিষয়টি আবূ সাঈদের ছোট ভাই আবূ তাহির সুলায়মানের কাছে খুবই অপছন্দনীয় ঠেকে। তাই তিনি আবূ সাঈদকে হত্যা করে স্বয়ং কারামতীয়দের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

আবূ তাহির

আবূ তাহির শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর ২৮৭ হিজরীতে (৯০০ খ্রি) বসরা আক্রমণ করেন এবং সেখানে প্রচুর ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে বাহরাইনে ফিরে আসেন। বাগদাদের খলীফা মুকতাদির এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বসরার নগর প্রাচীর মজবুত ও সুদৃঢ় করার নির্দেশ দেন। আবূ তাহির বেশ সাফল্যের সাথে বাহরাইন এলাকা শাসন করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীর সাথেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন। উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী আবূ তাহিরের হুকুমতকে সম্মতিসূচক দৃষ্টিতেই দেখেন। ৩১১ হিজরীতে (৯২৩-২৪ খ্রি) আবূ তাহির পুনরায় বসরার উপর আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার হাট-বাজার লুট করে সমগ্র শহরকে একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করে দেন। এমন কি বসরার জামে মসজিদও তার এই ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়নি।

আবূ তাহিরের দস্যুবৃত্তি

৩১২ হিজরী (৯২৪-২৫ খ্রি) সনে আবূ তাহির হাজীদের কাফিলা লুণ্ঠন করার জন্য বহির্গত হন। তিনি কাফিলা থেকে রাজকীয় অশ্বারোহী আবুল হায়জা ইব্‌ন হামদূনকে গ্রেফতার করেন এবং হাজীদের সমগ্র ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে হিজরে প্রত্যাবর্তন করেন। ৩১৪ হিজরী (৯২৬-২৭ খ্রি) আবূ তাহির ইরাকের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং বসরার ন্যায় কূফা অঞ্চলেও হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালান। তারপর সেখান থেকে বাহরাইনে গিয়ে ইহসা শহরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য বিরাট বিরাট মহল ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং ইহসাকে তার রাজধানী বলে ঘোষণা করেন। ৩১৫ হিজরীতে (৯২৭-২৮ খ্রি) আবূ তাহির ওমান আক্রমণ করেন। ওমানের শাসনকর্তা সেখান থেকে পলায়ন করে সমুদ্র পথে ফারিসে চলে যান। এই সুযোগে আবূ তাহির ওমান প্রদেশকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ৩১৬ হিজরী (৯২৮ খ্রি) আবূ তাহির উত্তরাঞ্চলে আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। এবার খলীফা মুকতাদির আব্বাসী ইউসুফ ইব্‌ন আবিস সাজকে আযারবায়জান থেকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে ওয়াসিতের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং আবূ তাহিরের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। কূফার বাইরে ইউসুফ ও আবূ তাহিরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং তাতে ইউসুফ পরাজিত ও বন্দী হন। এই সংবাদ বাগদাদে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আবূ তাহির কূফা থেকে 'আনবার' অভিমুখে রওয়ানা হন। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য দরবারে খিলাফতের পক্ষ থেকে মুনিস খাদিম, মুযাফ্‌ফর, হারূন প্রমুখ অধিনায়ককে নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু এরা সকলেই আবূ তাহিরের কাছে পরাজিত হয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। এবার আবূ তাহির রাহবা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি সেখানে ক্রমাগত লুটপাট চালিয়ে তারপর জাযীরা প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং বিজয় লাভের মাধ্যমে সেখানকার বেশির ভাগ গোত্রের উপর বার্ষিক কর নির্ধারণ করে ইহসায় ফিরে যান। তার এই অসাধারণ পরাক্রম লক্ষ্য করে অনেক লোকই কারামতীয় মাযহাব গ্রহণ করে।

পবিত্র মক্কা আক্রমণ

৩১৭ হিজরীতে (৯২৯ খ্রি) আবূ তাহির পবিত্র মক্কা আক্রমণ করেন। তিনি সেখানে বহু সংখ্যক হাজীকে হত্যা করেন,মক্কা শহরে লুটপাট চালান, কা'বা ঘরের দরজার চৌকাঠ উপড়ে ফেলেন, কাবার গিলাফ খুলে তার বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং 'হাজরে আসওয়াদ' খুলে নিয়ে হিজরে চলে আসেন। আসার সময় তিনি ঘোষণা করেন– পরবর্তী হজ্জ আমার ওখানেই হবে। হাজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেবার জন্য অনেকেই আবূ তাহিরের সাথে পত্রালাপ করে। কোন কোন সর্দার ওটাকে ফিরিয়ে দেবার বিনিময়ে আবূ তাহিরকে পঞ্চাশ হাজার দীনার প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবূ তাহির তা ফিরিয়ে দেননি। তারপর আবূ তাহির ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে ইরাক ও সিরিয়াকে বার বার পর্যুদস্ত করতে থাকেন– এমনকি দামেশকবাসীদের উপরও তিনি বার্ষিক কর ধার্য করেন।

আবুল মানসূর

তারপর আবূ তাহিরের বড় ভাই আহমদ কারামতীয়দের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাকে আবুল মানসূর উপাধিতে স্মরণ করা হয়। কারামতীয়দের একটি দল আবুল মানসূরের

হুকুমতকে অস্বীকার করে আবূ তাহিরের জ্যেষ্ঠপুত্র সাবূরকে তাদের নেতা বলে ঘোষণা করে। এই আভ্যন্তরীণ ঝগড়ার একটি মীমাংসা করার জন্য কারামতীয়রা আবুল কাসিম উবায়দীর শরণাপন্ন হয় এবং তার কাছে আফ্রিকিয়ায় একজন দূত প্রেরণ করে। আবুল কাসিম উবায়দী লিখিতভাবে বিষয়টির মীমাংসা এভাবে করেন যে, আবুল মানসূর আহমদকে আপাতত বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। অবশ্য তার পরে সাবূর ইব্ন আবূ তাহির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। কারামতীয়রা যেহেতু নিজেদেরকে মাহ্দীর দূত ও তার পক্ষাবলম্বী বলত এবং উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দীকে, তার দাবি অনুযায়ী ইমাম ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর সাদিকের বংশধর মনে করে অত্যন্ত সম্মান করত তাই উবায়দীরা করামতীয়দেরকে নিজেদের বন্ধু এবং কারামতীয়রা উবায়দীদেরকে খিলাফতের যোগ্য মনে করত। আর এ কারণেই কারামতীয়রা আবুল কাসিমের ফায়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং আহমদ মানসূর সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর ৩৩৪ হিজরীতে (৯৪৫-৪৬ খ্রি) যখন আবুল কাসিম উবায়দীর মৃত্যু হয় এবং তার স্থলে ইসমাঈল উবায়দী আফ্রিকার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আবূ মানসূর আহমদ কারামতী তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আফ্রিকায় একজন দূত প্রেরণ করেন। ৩৩৯ হিজরী (৯৫০-৫১ খ্রি) সনে ইসমাঈল উবায়দী কায়রোয়ান থেকে বার বার আবূ মানসূরকে লিখেন– তুমি হাজরে আসওয়াদটি কা'বায় ফিরিয়ে দাও। এর ফলেই আবূ মানসূর আহমদ কারামতী হাজরে আসওয়াদটি কা'বায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। আবূ মানসূরের শাসনামলে কারামতীয়রা বহির্দেশ আক্রমণ করে খুব কম। ঐ সময় তারা প্রধানত আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকে।

সাবূরকে হত্যা

৩৫৮ হিজরী (৯৬৯ খ্রি) সনে সাবূর ইব্ন আবূ তাহির তার ভাই-বেরাদার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য নিয়ে আবূ মানসূরকে বন্দী করে ফেলেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু সাবূরের ভাইরা সাবূরেরও বিরোধিতা করে এবং জেলখানার উপর হামলা চালিয়ে চাচাত ভাই আবূ মানসূরকে সেখান থেকে যুক্ত করে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করে সাবূরকে হত্যা করেন এবং তার শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে আদাল দ্বীপে নির্বাসিত করেন। ৩৫৯ হিজরী (৯৭০ খ্রি) সনে আবূ মানসূরের মৃত্যু হয়। আবূ মানসূরের পর তার পুত্র আবূ আলী হাসান ইব্ন আহমদ 'আযম' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই আবূ তাহিরের সকল পুত্রকেই আদাল দ্বীপে নির্বাসন দেন।

হাসান আযম কারামতী

হাসান আযম কারামতী তার আকাঈদ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ছিলেন উদার ও মধ্যপন্থী। উবায়দীদের সাথে যেমন তার কোন হৃদ্যতা ছিল না, তেমনি ছিল না খিলাফতে আব্বাসীয়ার সাথে তার কোন শত্রুতা। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ তাহির দামেশকের উপর বার্ষিক কর ধার্য করেছিলেন। অতএব যে ব্যক্তিই দামেশকের শাসক হতো তাকেই ঐ কর কারামতীয় বাদশাহর কাছে প্রেরণ করতে হতো। কেননা কারামতীয়দের লুটপাট, হত্যা ও দস্যুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার এটাই ছিল একমাত্র উপায়। আযমের সিংহাসনে আরোহণকালে জা'ফর ইব্ন ফালাহ কাত্তামী তাগাজের কাছ থেকে দামেশক জয় করে সেখানে তার হুকুমত

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আযম দামেশকের শাসকের কাছে যথারীতি কর তলব করেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত কারামতীয় ও উবায়দী হুকুমতের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসা ছিল তাই এটাই সমীচীন ছিল যে, দামেশক যখন উবায়দী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তখন কারামতীয় বাদশাহ উবায়দী সরদার জা'ফর ইব্‌ন ফালাহের কাছ থেকে কর তলব করবেন না। কিন্তু ঘটনা দাঁড়ালো তার ঠিক উল্টো। আযম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কর তলব করলেন এবং জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ্ তা প্রদানে অস্বীকার করে বসলেন। ফলে আযম দামেশকের দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। অপর দিকে মুইয্য উবায়দী, যিনি কায়রোয়ান থেকে কায়রোর দিকে আসছিলেন, এই অবস্থা জানতে পেরে কারামতীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের কাছে চিঠি লিখলেন– তোমরা আযমকে বুঝাও, সে যেন দামেশকের সাথে এরূপ বাড়াবাড়ি না করে। অন্যথায় আমরা আবূ তাহিরের বংশধরকে কারামতীয় সালতানাতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে আযমের পদচ্যুতি ঘোষণা করব। আযম যখন এই অবস্থা জানতে পারেন তখন তিনি বিনাদ্বিধায় উবায়দীদের খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অধিকৃত দেশসমূহে আব্বাসীয় খলীফার খুতবা পাঠ করতে শুরু করেন। প্রথম বাহিনী, যেটাকে দামেশকের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, ৩৬০ হিজরী (৯৭০-৭১ খ্রি) সনে জা'ফর কাত্তামীর কাছে পরাজিত হয়। তারপর ৩৬১ হিজরী সনে (৯৭১-৭২ খ্রি) স্বয়ং আযম সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই জা'ফর কাত্তামীকে হত্যা করে দামেশক দখল করে নেন। তিনি দামেশকবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করে দেশের প্রশাসন–কাঠামো গড়ে তোলেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে মিসর সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন। পরবর্তী সময়ে মিসর সীমান্তে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল এবং মুইয্য উবায়দীর সাথে আযমের যে পত্রালাপ হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যে সময়ে আযম কারামতী সিরিয়া ও মিসর অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন তখন মুইয্য উবায়দী আদাল দ্বীপে নজরবন্দী আবূ তাহিরের পুত্রদের সাথে পত্রালাপ করে তাদেরকে প্ররোচনা দেন যেন তারা বাহরাইনে এসে ইহসা দখল করে নেয় এবং নিজেরাই সিংহাসনে আরোহণ করে। উপরন্তু তিনি নিজে বাহরাইনে এই মর্মে একটি ঘোষণা দেন যে, আমি আযমকে পদচ্যুত করে আবূ তাহিরের পুত্রদেরকে বাহরাইনের হুকুমত প্রদান করলাম। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, আবূ তাহিরের পুত্ররা ইহসায় এসে তা পর্যুদস্ত করে দিল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে বাগদাদের খলীফা তায়ী' আব্বাসী আবূ তাহিরের পুত্রদের কাছে পত্র লিখেন– তোমরা আপোসের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, আমার নির্দেশাবলী পালন কর এবং এই বিদ্রোহ থেকে বিরত থাক। কিন্তু তাহিরের পুত্রদের উপর এর কোন প্রভাবই পড়ল না। শেষ পর্যন্ত আযম ইহসার দিকে ফিরে এসে সবাইকে শায়েস্তা করেন। উপরন্তু খলীফা তায়ী আব্বাসীর দূতেরা এসে ওদের মধ্যে একটা আপোস মীমাংসা করে দেয়। ৩৬৩ হিজরীতে (৯৭৩-৭৪ খ্রি) মুইয্য উবায়দীর বাহিনী সমগ্র সিরিয়া দখল করে নেয়। আযম কারামতী তার সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে সিরিয়ার দিকে আসেন এবং সমগ্র সিরিয়া থেকে উবায়দী বাহিনীকে তাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি মিসরের বালবীস নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন। মুইয্য উবায়দী আযম কারামতীর সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ এবং কিছু আরব অধিনায়ককে অর্থের লোভ দেখিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নেন। ফলে হাসান আযম পরাজিত হয়ে ইহসায় ফিরে আসেন। আরব সর্দাররা সিরিয়া দখল করে নেয়। কিছু সংখ্যক তুর্কী সরদার তখন দামেশক দখলের চেষ্টা করেছিলেন। যা হোক, মুইয্য

উবায়দী ৩৬৬ হি. সনে (৯৭৬-৭৭ খ্রি) স্বয়ং দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যেই হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। আযম কারামতী ৩৬৬ হি. সনে (৯৭৬-৭৭ খ্রি) হামলা চালিয়ে পুনরায় সিরিয়া দখল করে নেন। এই হামলায় তুর্কী অধিনায়ক উফতোগীনও তার সঙ্গে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আযীয উবায়দীর সাথে মিসর সীমান্তে সংঘর্ষ বাধে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে উফতোগীন বন্দী হন এবং আযম আপন রাজধানী ইহসা অভিমুখে যাত্রা করেন। যেহেতু আযম আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং উবায়দীদেরকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন তাই কারামতীয়রা তার প্রতি বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ন ছিল। এদিকে উবায়দীদের পক্ষ থেকে কারামতীয় জনসাধারণের মধ্যে আযমের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান অব্যাহত ছিল। ফলে কারামতীয়রা আযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। আর এই বিদ্রোহ বহুলভাবে সাফল্য লাভ করে এ কারণে যে, তখন আযম তার রাজধানী থেকে অনেক দূরে, সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রাজধানী ছেড়ে না গেলে তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহই সাফল্য লাভ করতে পারত না। যা হোক যখন আযম সিরিয়া থেকে ইহসায় ফিরে আসেন তখন সমগ্র শহরবাসীকে তিনি বিদ্রোহী ও অবাধ্য দেখতে পান। তার অশ্বারোহী বাহিনীও বিদ্রোহীদের সাথে মিশে গিয়েছিল। তারা আযমকে বন্দী করে আবূ সাঈদ জানাবীর সমগ্র খান্দানকে হুকুমত ও সালতানাত থেকে বঞ্চিত করে নিজেদেরই দল থেকে জা'ফর ও ইসহাক নামীয় দু'ব্যক্তিকে যৌথভাবে সিংহাসনে বসায়। তারা আযম, তার পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনকে আদাল দ্বীপে নির্বাসন দেয়। এই দ্বীপে আবূ তাহিরের পুত্ররা প্রথম থেকেই নির্বাসিত অবস্থায় বন্দী ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই এই নির্বাসিতরা দ্বীপে পা রাখতেই তাহিরের পুত্ররা আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করে ফেলেন।

জা'ফর ও ইসহাক

জা'ফর ও ইসহাক যৌথভাবে কারামতীয়দের উপর হুকুমত চালাতে থাকেন। তারা নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেদের সাম্রাজ্যে উবায়দী সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ করতে থাকেন। তারপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে তারা কূফা দখল করে নেন। সামসামুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়াইয়া কারামতীয়দেরকে দমন করার জন্য একটি বাহিনী কূফার দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কারামতীয়রা ঐ বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয় এবং কাদিসিয়া পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অতএব জা'ফর ও ইসহাকের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং তারা প্রত্যেকেই একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে এককভাবে বাদশাহী করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ফলে কারামতীয়দের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য কারামতীয় অধিনায়কের মধ্যেও বাদশাহী করার কামনা জাগে এবং এরই ফলশ্রুতিতে আসগর ইব্ন আবুল হাসান তাগলবী বাহ্‌রাইনের উপর এবং বনী মুকাররম আম্মানের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তারা খিলাফতে আব্বাসীয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং ৩৭৫ হিজরী (৯৮৫-৮৬ খ্রি) নাগাদ তাগলবী খান্দান বাহ্‌রাইন থেকে কারামতীয়দের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফারিসের (পারস্য) কারামতীয় ও বাতিনী সাম্রাজ্য

বাহরাইনের কারামতীয়দের অবস্থা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কারামতীয়দের সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর তাদের আমল ও আকীদায় একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। যদিও বাহরাইনের কারামতীয়দের বাদশাহ আযমের আমল ও আকীদা অন্যান্য কারামতীয়র থেকে পৃথক ছিল এবং তিনি মিসরের উবায়দী বাদশাহকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। যদিও সাধারণ কারামতীয়রা মিসরের উবায়দী শাসককে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখত এবং তাকে নিজেদেরই খলীফা বলে মনে করত। এবার যখন বাহরাইনের হুকুমত তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকল না তখন তারা গোপনে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলে এবং বাহ্যত সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে কালাতিপাত করতে লাগল। ঐ সমস্ত গোপন সংগঠনের মাধ্যমে তারা তাদের জামাআতের প্রচার ও উন্নয়নে মনোনিবেশ করল। উবায়দীদের মত তারাও এখানে সেখানে নিজেদের তৎপরতাকে কঠোরভাবে গোপন রাখত। তারা সংসারত্যাগী পীর-ফকীরের বেশ ধরে জনসাধারণের সাথে মেলামেশা করত এবং তাদেরকে নিজেদের শিষ্য তালিকাভুক্ত করত। ঐ সমস্ত মুরীদের মধ্যে যাকে তারা নিজেদের পছন্দমত পেত তাকে 'রফীক' উপাধি প্রদান করত এবং তাকেই নিজেদের বিশেষ আকীদাসমূহ শিক্ষা দিত। এভাবে তাদের মধ্যে দুই স্তরের লোক ছিল। এক স্তর দাঈদের এবং অন্য স্তর রফীকদের। সিরিয়া, ইরাক, ফারিস, খুরাসান সর্বত্রই দাঈরা ছড়িয়ে পড়ল। মিসরের উবায়দী সম্রাট তাদেরকে সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এই সমস্ত দাঈর কাছে গোপনে গোপনে মিসর থেকে সব ধরনের সাহায্য এসে পৌঁছাত। এভাবে উবায়দীরা ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কারামতীয় দাঈদের একটি বিরাট জাল ছড়িয়ে দেয়। এদিকে সালজুকী বংশ ইসলামী দেশসমূহ দখল করে যাচ্ছিল এবং এই গোপন শত্রুদের সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। বাহরাইনে কারামতীয়দের হুকুমত ধ্বংস হওয়ার পর সমগ্র শিক্ষিত ও বিচক্ষণ কারামতীয়রা এক একজন কর্মচাঞ্চল্য দাঈতে পরিণত হয়। ফলে মিসর থেকে ইরাক ও খুরাসানের দিকে লোক পাঠাবার কোন প্রয়োজন উবায়দী সালতানাতের হয়নি। যেহেতু এই সব লোক একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের জন্য মাতম করে যাচ্ছিল। তাই সুযোগ পেলেই তারা ডাকাতি ও লুটপাট করত এবং নির্বিবাদে হত্যাকাণ্ড চালাত। ঐ সমস্ত দাঈ ও পীরেরা তাদের বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্তদেরকে এই শিক্ষাই দিত যে, যে ব্যক্তি আমাদের আকীদা পোষণ করে না তাকে হত্যা করা কোন অপরাধ নয়। ফলে কারামতীয়দের অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্য খুবই

ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যেহেতু সূচনাকালে তাদেরকে শায়েস্তা করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তাই তাদের দুঃসাহস বেশি রকম বেড়ে গিয়েছিল। এখন মুসলমান সর্দার ও অধিনায়কদেরকে গোপনে হত্যা করা তাদের একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়। যেখানে খুব কঠোর ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা থাকতেন সেখানে কারামতীয়রা একদম চুপচাপ থাকত। কিন্তু যেখানেই তারা প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটু ঢিলেমী লক্ষ্য করত সেখানেই নির্বিবাদে লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড চালাত। যেহেতু কারামতীয়রা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল এবং মুসলমানদের প্রতারণা করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল তাই তারা কখনো কখনো বিভিন্ন সালতানাত ও হুকুমতের বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুযোগও পেয়ে যেত। তাদেরই জনৈক ব্যক্তিকে হামাদানের একটি দুর্গের অধিপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। কারামতীয়রা ঐ দুর্গকে তাদের আশ্রয়স্থল করে নিয়ে চতুর্দিকে অত্যন্ত জোরেশোরে ডাকাতি ও লুটপাট শুরু করে। যেহেতু ঐ দলটি অত্যন্ত গোপনে তাদের কাজ আঞ্জাম দিত, তাই তাদেরকে বাতিনী ফিরকা বলা হতে থাকে। এই বাতিনীরা ধীরে ধীরে উন্নতি করে ইসপাহানের শাহ্দার দুর্গ দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, বাতিনী দাঈদের মধ্যে একজন অতি বিচক্ষণ ও বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ছিল আত্তাশ। তিনি ছিলেন প্রখর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অধিকারী। তিনি হাসান ইব্ন সাব্বাহকে তার আকাঈদ শিক্ষা দেন এবং আপন বিশেষ শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আহমদ ইব্ন আত্তাশ

আত্তাশের এক পুত্রের নাম ছিল আহমদ। তাকে তার পিতার জায়গায় এবং গোটা জামাআতের মধ্যে অত্যন্ত মান্যবর ব্যক্তি বলে মনে করা হতো। আহমদ তার দল থেকে বিদায় নিয়ে একজন আমীরযাদার বেশ ধরে শাহদার দুর্গের অধিনায়কের খিদমতে হাযির হন এবং তার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর তিনি এমন পারদর্শিতার সাথে আপন দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অধিনায়ক তাকে তার নায়েব নিয়োগ করেন এবং তার হাতেই যাবতীয় শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। কিছুদিন পর ঐ অধিনায়ক মৃত্যুমুখে পতিত হলে আহমদ স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন শাসকের কাছ থেকে দুর্গের অধিকার ও শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। এবার তিনি বাতিনী দলের যে সমস্ত লোক তার শাসনের আওতাধীনে বন্দী ছিল তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন এবং তারা মুক্তি লাভ করেই ইসপাহান এলাকায় লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয়। এদিকে যখন আহমদ ইসপাহানের শাহ্দার দুর্গের ক্ষমতা লাভ করেন তখন আহমদ ইব্ন সাব্বাহ তালিকান ও কাযভীন এলাকায় তার ষড়যন্ত্র বিস্তার করে যাচ্ছিলেন।

হাসান ইব্ন সাব্বাহ

হাসান ইব্ন সাব্বাহ এককালে মালিক শাহ ইব্ন আলপ-আরসালান সালজুকীর প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুল্ক তূসীর সহপাঠী ছিলেন। তিনি নিযামুল মুল্কের মাধ্যমে সুলতানের দরবারে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে সেখানে থাকাটা সমীচীন মনে না করে নিযামুল মুল্কের জনৈক আত্মীয় রাই দুর্গের অধিনায়ক আবূ মুসলিমের কাছে চলে

আসেন এবং তার সংসর্গে থেকে আপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। ঘটনাচক্রে আবূ মুসলিম জানতে পারেন যে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহর কাছে মিসরের উবায়দী সাম্রাজ্যের গুপ্তচরেরা আসা-যাওয়া করে থাকে। তিনি এ ব্যাপারে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ যখন বুঝতে পারেন যে, তার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেছে তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে মুসতানসির উবায়দীর কাছে মিসরে চলে যান। মুসতানসির উবায়দী হাসান ইব্‌ন সাব্বাহকে সাদরে গ্রহণ করেন। হাসান মুসতানসিরের হাতে বায়আত করার পর তিনি তাকে তার প্রধান 'দাঈ' নিয়োগ করেন এবং তার ইমামত ও খিলাফতের দাওয়াত প্রদানের জন্য হাসানকে পারস্য ও ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। আহমদ নাযযার ও আবুল কাসিম নামে মুসতানসির উবায়দীর তিন পুত্র ছিলেন। বিদায়কালে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মুসতানসিরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার পরে আমার ইমাম কে হবেন? মুসতানসির উত্তর দেন, আমার পুত্র নায্‌যারই তোমার ইমাম হবে। শেষ পর্যন্ত মুসতানসির নায্‌যারকেই আপন 'অলীআহ্‌দ' নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার প্রধানমন্ত্রী ও তার বোন ষড়যন্ত্র করে আবুল কাসিমকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। কিন্তু হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ আবুল কাসিমের ইমামত স্বীকার করে নেননি, বরং নায্‌যারকেই তিনি ইমামতের যোগ্য মনে করতে থাকেন। এ জন্য হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের ইমামতকে নায্‌যারিয়া নামে অভিহিত করা হয়। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মিসর থেকে বিদায় নিয়ে এশিয়া মাইনর এবং মুসিল হয়ে খুরাসানে এসে পৌঁছান। এখানে তালিকান ও কোহিস্তানের যে শাসনকর্তা ছিলেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে 'আলামূত' দুর্গের জনৈক আলাভীর হাতে অর্পণ করেছিলেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ঐ আলাভীর কাছে যান। তিনি হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে নিজের সাথে রাখেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ একজন অতি সম্মানিত মেহমান হিসাবে এবং একজন সংসার ত্যাগী আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির ছদ্মবেশে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলামূত দুর্গে অবস্থান করে তলে তলে ঐ দুর্গ নিজের দখলে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং তিনি আলাভীকে দুর্গ থেকে বের করে দিয়ে নিজেই তার দখলকার বনে বসেন। এটা ছিল মালিক শাহ সালজুকীর শাসনামল। মালিক শাহের মন্ত্রী নিযামুল মুল্‌ক তূসী এই সংবাদ শুনে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহকে দমন এবং আলামূত দুর্গ অবরোধ করার জন্য এক বাহিনী প্রেরণ করেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ স্বমতাবলম্বী অনেক লোক সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধ ক্রমাগত চলতে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ নিযামুল মুল্‌ককে হত্যা করার জন্য বাতিনিয়া ফিরকার একদল লোক নিয়োগ করেন। ওরা সুযোগ পেয়ে নিয়ামুল মুল্‌ককে হত্যা করে ফেলে। ফলে হাসানের বিরুদ্ধে প্রেরিত নিযামুল মুল্‌কের বাহিনী আলামূতের অবরোধ তুলে নিজেদের রাজধানীতে ফিরে যায়। এই সাফল্যের পর হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ও তার সঙ্গী-সাথীদের সাহস অনেক বেড়ে যায় এবং তারা বিনাদ্বিধায় আশেপাশের এলাকা দখল করতে শুরু করে। ঐ সময়েই সামানী বংশোদ্ভূত মুনাওয়ার নামীয় জনৈক ব্যক্তির সাথে, যিনি কোহিস্তানের গভর্নর বা নাযির ছিলেন, সালজুকী ভাইসরয়ের বিরোধ সৃষ্টি হয়। উভয়ের মধ্যকার এই বিরোধ এতই দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে যে, শেষ পর্যন্ত মুনাওয়ার হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করেন। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ অনতিবিলম্বে তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে কোহিস্তান দখল করে নেন। এভাবে দিনের পর দিন হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদিকে মালিক শাহের মৃত্যুর পর সালজুকী অধিনায়কদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হাসান ইব্‌ন সাব্বাহকে শায়েস্তা করা তো দূরের কথা, তারা একে অপরকে পরাস্ত করার জন্য হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। এভাবে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের হুকুমত ও সালতানাত দিন দিন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। সুলতান বারকিয়ারুক তার ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এই বাতিনীদের সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন। অবশ্য কিছু দিন পরই এই বাতিনীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করার জন্য বারকিয়ারুককে একটি জরুরী ফরমান জারি করতে হয়।

এদিকে আহমদ ইব্‌ন আত্তাশ 'শাহ দুর্গ' দখল করে নিজের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সালজুকীরা আহমদ ইব্‌ন আত্তাশ এবং তার সংগীদের চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেলে। তখন অনেক বাতিনী সালজুকী সুলতানের কাছে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে যে, তারা ইসপাহান এলাকা একেবারে খালি করে দিয়ে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের কাছে আলামূত দুর্গে চলে যাবে। অতএব এই শর্তে তাদেরকে হাসান ইবন সাব্বাহের কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আহমদ ইব্‌ন আত্তাশকে বন্দী করে হত্যা করা হয় এবং তার দেহ থেকে চামড়া তুলে নিয়ে তাতে ভূষি ভরে দেওয়া হয়। আহমদের স্ত্রী আত্মহত্যা করে। এভাবে ইসপাহানের বাতিনীরা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের ক্ষমতা পূর্বের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পায়। কেননা এখন তিনিই সমগ্র বাতিনীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে টিকে আছেন। বাতিনীর হাজার হাজার লোক 'দাঈ' হিসাবে সিরিয়া, ইরাক এবং পারস্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোথাও কোথাও তারা প্রকাশ্যে নিজেদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। কোন কোন দুর্গও তাদের দখলে এসে গিয়েছিল। পরে মুসলমানরা ধীরে ধীরে চতুর্দিক থেকে তাদের উপর হামলা চালায় এবং সব দুর্গই তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আলামূত দুর্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা বরাবরই হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের দখলে থাকে। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের নাম ও বংশতালিকা হচ্ছে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ আল-হামীরী। সালজুকীদের গৃহযুদ্ধ, দুর্বলতা ও লক্ষ্যভ্রষ্টতা বাতিনীদের হুকুমত স্থায়ী ও সুদৃঢ় করে দেয়। পরবর্তীকালে বাতিনীদের এই হুকুমতকে সালতানাতে ফিদায়ীন, সালতানাতে ইসমাঈলীয়া, সালতানাতে হাশশাশীন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ যেমন এই সালতানাত ও হুকুমতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তেমনি তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তার ফিরকা ও মাযহাবেরও। তিনি সাধারণ বাতিনীদের বিপরীত কিছু কিছু নতুন আমল ও ইবাদতের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তার শিষ্যরা তাকে 'সাইয়িদুনা' বলত। সাধারণভাবে তাকে 'শায়খুল জাবাল' নামে স্মরণ করা হয়। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আলামূত দুর্গের দখলদার ও শাসনকর্তা ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে এক দিনের জন্যও তিনি দুর্গ থেকে বের হননি।

হাসান ইব্‌নে সাব্বাহর মৃত্যু

৫১৮ হিজরী সনের ২৮শে রবিউল আখির (১১২৪ খ্রি জুন) নব্বই বছর বয়সে হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বর্বর পাহাড়িয়া লোকদের নিয়ে এমন একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন, যারা তার (হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের) ইঙ্গিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে

তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করত। ওদেরকে বলা হতো 'জামাআতে ফিদায়ীন'। এই ফিদায়ীদের মাধ্যমেই হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ তার বিরুদ্ধবাদী বিশ্বের বড় বড় বাদশাহ ও সেনাপতিকে তাদের ঘরের মধ্যেই হত্যা করিয়েছিলেন। আর এ কারণেই সকলের অন্তরে ফিদায়ীদের ভয়ভীতি এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে, বড় বড় রাজা-বাদশাহও তাদের রাজধানীতে, এমনকি আপন রাজপ্রাসাদেও শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন না। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ও তার জামাআতকে সাধারণভাবে মুসলমান বলে গণ্য করা হয় না। আর প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, এটা হচ্ছে মুলহিদ তথা কাফিরদেরই একটি দল। দীন ইসলামের সাথে এদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমাদেরই যুগের এক পণ্ডিত মূর্খ, যাকে ইসলামের দুশমন একটি ফিরকার নেতা মনে করা হয়, তিনি হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ এবং তার অনুসারীদের কার্যকলাপকে ইসলামী কার্যকলাপ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এ বিষয়ের উপর পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধও প্রকাশ করে থাকেন। অপর দিকে মুসলমানরাও এমনি গাফিল যে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নায্‌যারিয়া ফিরকা সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না। ফলে তারা ঐ পণ্ডিত মূর্খ ব্যক্তির প্রবন্ধাদি পড়ে বাহ বাহ দেয় এবং হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ও তার অনুসারীদেরকে মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ এবং তার অনুসারীরা ছিল মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রু। তারা গোপনে, ছদ্মবেশে কিংবা যে করে হোক প্রসিদ্ধ লোকদেরকে হত্যা করত। আজকালও আমরা কখনো কখনো পত্র-পত্রিকায় ইউরোপের এনার্কিস্টদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ লক্ষ্য করি। এক কথায় বলতে গেলে, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত সালতানাতকে এনার্কিস্টদেরই একটি সালতানাত মনে করতে হবে।

কারা বুযুর্গ উমীদ

হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের মৃত্যুর পর কারা বুযুর্গ উমীদ নামক তার একজন শিষ্য আলামূত দুর্গের শাসক এবং হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হন। কারা বুযুর্গ উমীদের বংশে এই হুকুমত ৬৫৫ হিজরী সাল (১২৫৭ খ্রি) পর্যন্ত টিকে থাকে। কারা বুযুর্গ উমীদের পর তার পুত্র হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, তারপর তার পুত্র মুহাম্মাদ ছানী ইবন হাসান, তারপর জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ছানী ওরফে হাসান ছালিছ, তারপর আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ, তারপর রুকনুদ্দীন খুরশাহ ইব্‌ন আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রুকনুদ্দীন খুরশাহ

রুকনুদ্দীন খুরশাহ ছিলেন ফিদায়ীদের সর্বশেষ বাদশাহ। হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করার এক বছর পূর্বে, ৬৫৪ হিজরী সনে (১২৫৬ খ্রি) খুরশাহকে বন্দী করে ফিদায়ী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের পর আলামূত দুর্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ফিদায়ীদের হুকুমত অব্যাহত থাকে। কিন্তু একশ' বছরেও তারা তাদের সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি করতে পারেনি বা এর বিস্তৃতি ঘটাতে পারেনি। যখন চেঙ্গিয খান বর্বর তাতারীদের নিয়ে একের পর এক ইসলামী সাম্রাজ্যের ধ্বংস করেছিলেন ঠিক তখনি

এই ফিদায়ী নিজেদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে তৎপর হয়। কিন্তু তাদের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বেই জালালুদ্দীন ইব্‌ন আলাউদ্দীন খারিযম শাহ একটি আকস্মিক হামলার মাধ্যমে তাদের শক্তিকে খর্ব করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত আলমূত দুর্গে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখে তাদের অন্য দুর্গগুলো দখল করে সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ করে ফেলেন। এতে ফিদায়ীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত হালাকু খান তাদেরকে ধ্বংস করে এই পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে ফেলেন।

ফিদায়ীদের হাতে নিহত ব্যক্তিবৃন্দ

ফিদায়ীদের হাতে যাঁরা নিহত হন তাঁরা হচ্ছেন, সুলতান আল্‌প-আরসালান ও মালিক শাহ সালজুকীর প্রধানমন্ত্রী খাজা নিযামুল মুল্‌ক তুসী, ফখরুল মালিক ইব্‌ন খাজা নিযামুল মুল্‌ক, জনাব শামসে তাবরিযী পীরে তরীকত মওলভী রূমী, খারিয্‌ম শাহাবুদ্দীন ঘুরী এবং ইউরোপের কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান সম্রাট। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী এবং হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকেও ফিদায়ীরা হত্যার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পান।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

চেঙ্গিযী মুঘল

হালাকু খানের আক্রমণ এবং বাগদাদ ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। স্পেনের ইসলামী সুলতানদের অবস্থাদিও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মিসরের আব্বাসীয় খলীফাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মিসরের উবায়দীরাও খিলাফত ও ইমামতের দাবি করত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাদের সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফা সুলতান সালীম উসমানীর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর তখন থেকেই উসমানী বংশের সুলতানদেরকে খুলাফায়ে ইসলাম আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। একজন ঐতিহাসিকের জন্য এটা অসমীচীন নয় যে, তিনি ইসলামী খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইসলামী হুকুমতসমূহের কথা বাদ দিয়ে শুধু উসমানীয় খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং এভাবে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক বর্ণনাকে টেনে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আমি সুলতান সালীম উসমানী পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের অবস্থাদি বর্ণনা করার পর অতীত যুগের দিকে ফিরে গিয়ে ঐ ধরনের কিছু সংখ্যক মধ্যবর্তী ইসলামী হুকুমত সম্পর্কেও জরুরী ভিত্তিতে আলোচনা করছি, যে সমস্ত হুকুমত কোন না কোন দিক দিয়ে লক্ষণীয় এবং ইতিহাস পাঠকদের জন্যও তা অধ্যয়ন করা জরুরী। যাহোক আমরা প্রথমে উসমানী হুকুমতের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর আলোচনা করব সালতানাতে উসমানিয়া-ই-রূম এবং তার সমকালীন সালতানাতসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে।

এ প্রসঙ্গে আমরা নিবেদন করতে চাই যে, হিন্দুস্থানের ইসলামী হুকুমতের অবস্থাদি সম্পর্কে এই গ্রন্থে কোন আলোচনা করা হবে না। কেননা হিন্দুস্থানের একটি পৃথক ইতহাস রচনার ইচ্ছা আমাদের আছে। তাতে হিন্দুস্থানের ইসলামী হুকুমতের বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমে মুঘলদের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তারপর সিরিয়া ও ইরানের কিছু সংখ্যক ইসলামী সালতানাতের অবস্থাদি বর্ণিত হবে। তারপর আলোচনা করা হবে উসমানীয় সালতানাত সম্পর্কে।

তুর্ক, মুঘল ও তাতার

একটি সন্দেহ নিরসন

ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই তুর্ক, মুঘল, তাতার, তুর্কমান, কারা-তাতার প্রভৃতি জাতির মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না বা এই সমস্ত জাতির উৎস কি তাও জানতে

পারে না। তারা কখনো ইতিহাসগ্রন্থ পড়ে, সালজুকী লোক—যেমন আলপ-আরসালান, তুগ্রিল বেগ তুর্ক ছিলেন। তারপর তারা চেঙ্গিয খান সম্পর্কে অপর একটি ইতিহাস গ্রন্থে পড়ে যে, তিনি মুঘল ছিলেন। আবার অন্য একটি ইতিহাস গ্রন্থে পড়ে যে, তিনি তুর্কী ছিলেন। তারপর তারা যখন দেখে যে, চেঙ্গিয খানের ফিতনাকে তাতারের ফিতনা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে যখন তারা অনুমান করে যে, মুঘল, তুর্ক ও তাতার একই জাতির নাম। তারপর তখন তারা মুঘল ও তুর্কদের যুদ্ধ ও সংঘর্ষের বিবরণ পড়ে তখন তাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, মুঘল ও তুর্ক দু'টি আলাদা জাতি। তারা হিন্দুস্থানের মুঘলদের ইতিহাস পড়ে এবং তাতে দেখে যে, কোন কোন অধিনায়ককে তুর্ক বলা হয়, অথচ মুঘল সুলতানদের সাথেই তার বংশগত সম্পর্ক রয়েছে। তারা আরও দেখে যে, মুঘলদের মির্যা বলা হচ্ছে এবং তাদের নামের সাথে বেগ উপাধি অবশ্যই জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার যখন তারা ইতিহাস গ্রন্থে ইরানের বাদশাহদের নাম পড়ে তখন দেখে যে, তাদের নামের সাথেও মির্যা শব্দ যুক্ত রয়েছে। তারা উসমানী তুর্কদের নামের সাথে বেক, বে অথবা বেগ দেখতে পায়। তারা এও দেখতে পায় যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা কখনো কখনো হিন্দুস্থানের মুঘল সাম্রাজ্যকে তুর্কী সাম্রাজ্য নামে উল্লেখ করে থাকেন। অতএব ইতিহাসের ছাত্রদের সুবিধার্থে তুর্ক ও মুঘলদের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

'তুর্ক' শব্দের প্রয়োগ

দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিলেন। তাদের নাম ছিল হাম, সাম এবং ইয়াফিস। ইয়াফিসের বংশধররা চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়াফিসের বংশধরদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল তুর্ক। তার বংশধররা চীন ও তুর্কিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ওরাই তুর্ক নামে পরিচিত। কেউ কেউ ভুলবশত আফ্রাসিয়াবকেও তুর্ক মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ইরানের শাহী বংশ 'কায়ানী'-এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং ফারীদূন-এর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের বাদশাহ, তাই ভুলবশত লোকেরা তাকে তুর্কী জাতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধররা যখন চীন, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশে খুব বিস্তার লাভ করল তখন তারা শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য এক ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা মনোনীত করা অপরিহার্য বলে মনে করল। ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে অনেক গোত্র ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলো। প্রত্যেক গোত্র এবং গোষ্ঠী নিজেদের এক একজন সর্দার বা নেতা মনোনীত করল। এই সর্দাররা আবার একজন প্রধান সর্দারের অধীনস্থ থাকতেন। এই প্রেক্ষিতে তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধরদের প্রত্যেকটি গোত্রের উপর তুর্ক শব্দ প্রয়োগ করা হতো এবং সমগ্র চীন ও তুর্কিস্তানের অধিবাসীদেরকে তুর্ক বলা হতো।

গায তুর্ক

উপরে উল্লিখিত তুর্ক গোত্রগুলোর কোন কোন গোত্র ইসলামী যুগে জায়হূন নদী অতিক্রম করে পারস্য, খুরাসান প্রভৃতি দেশে ডাকাতি ও লুটপাট চালাতে থাকে। ঐ সমস্ত গোত্রকে

গায তুর্ক নামে অভিহিত করা হয়। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মরক্কো পর্যন্ত এই সব তুর্কের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে।

সালজুকী

ঐ সব তুর্ক গোত্রসমূহের একটি গোত্রকে সালজুকী বলা হয়। খুব সম্ভবত ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধরদের মধ্যে এই গোত্রই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। এই গোত্রে তুগ্রিল, আলপ-আরসালান প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সুলতানরা জন্মগ্রহণ করেছেন।

মুঘল ও তাতার

সালজুকীরা ইসলাম গ্রহণ করে খুরাসানের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে তুর্কদের মধ্যে আরো দু'টি নতুন গোত্রের উদ্ভব হয়েছিল। দুই সহোদর ভাইয়ের নামে ঐ দু'টি গোত্রের নামকরণ করা হয়েছিল মুঘল ও তাতার। সালজুকীদের ইসলাম গ্রহণ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জনকালে এই দুই গোত্র উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল না। ধীরে ধীরে মুঘল ও তাতারের বংশধরদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তারা পৃথক পৃথক প্রদেশ বা ভূখণ্ডে বসবাস করতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক নেতৃত্বও সৃষ্টি হয়। তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধর তথা তুর্কদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল আলানজা খান। তার ঘরে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয় এবং তিনি তাদের নাম রাখেন মুঘল ও তাতার। পরবর্তীকালে এই দুই পুত্র থেকেই উদ্ভব হয় মুঘল ও তাতার জাতির। মুঘল খানের পুত্রের নাম ছিল কারাখান আর কারাখানের পুত্রের নাম ছিল আরগুন খান। আরগুন খানকে তার গোত্রের সর্দার মনে করা হতো। এই আরগুন খানেরই যুগে তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি গাড়ি আবিষ্কার করে, যা মালামাল বহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। আরগুন খান এই আবিষ্কারকে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং এর আবিষ্কারককে 'কানকালী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তুর্কী ভাষায় গাড়িকে 'কানকালী' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি কানকালী আবিষ্কার করেছিল তার বংশকে কানকালী বংশ বলা হয়। আরগুন খানের অনেক পুত্র ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল চেঙ্গিয খান। চেঙ্গিয খানের পুত্রের নাম ছিল মাঙ্গলী খান, মাঙ্গলী খানের পুত্রের নাম ছিল ঈল খান এবং ঈল খানের পুত্রের নাম কায়ান। কায়ান খানের বংশধর থেকে মুঘল বংশ কায়াত নাম ধারণ করে। কায়ান খানের পুত্র তাইমূর তাশ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তাইমূর তাশের পুত্রের নাম ছিল মাঙ্গলী খান এবং মাঙ্গলী খানের পুত্রের নাম ছিল ইয়ালদুয খান জুনিয়া বাহাদুর। জুনিয়া বাহাদুরের ঘরে এক কন্যার জন্ম হয়, যার নাম রাখা হয় আলান কাওয়া। আলান কাওয়ার বিবাহ হয় তার চাচাত ভাই দূবূবিয়ানের সাথে। দূবূবিয়ানের ঔরসে ও আলান কাওয়ার গর্ভে এলকাদায়ী ও এলকজাদায়ী নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। আলান কাওয়ার স্বামী দূবূবিয়ান ছিলেন তার গোত্রের সর্দার ও অধিনায়ক। দূবূবিয়ান তার দুই পুত্রকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় রেখে মারা যান। তার মৃত্যুর পর মুঘল গোত্র তার বিধবা স্ত্রী আলান কাওয়াকেই তাদের নেত্রী হিসাবে বরণ করে নেয়।

একদা রাত্রিবেলা আলান কাওয়া আপন কক্ষে শুয়েছিল। তখনো ঘুম আসেনি এমন সময় দেখতে পেল তার জানালা অথবা ভেন্টিলেটর দিয়ে আলো প্রবেশ করেছে। আলো সূর্যের থালার আকারে কক্ষে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে আলান কাওয়ার মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। আলান কাওয়া ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করে তার মা এবং সখীদেরকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। কিছুদিন পর আলান কাওয়ার গর্ভধারণের চিহ্ন ফুটে উঠল। লোকেরা যখন এ বিষয়টি জানতে পারল তখন তারা আলান কাওয়াকে দোষারোপ ও গালিগালাজ করতে শুরু করল। তখন রাণী আলান কাওয়া তার গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে একত্র করে বলল, তোমরা কয়েকদিন রাতের বেলা যদি আমার কক্ষের কাছে অবস্থান কর তাহলে তোমাদের কাছে সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তারা তাই করল এবং দেখতে পেল যে, এক জ্যোতি আসমান থেকে নেমে এসে রাণীর কক্ষে প্রবেশ করে, তারপর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসমানে উঠে যায়। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই স্বীকার করল যে, রাণী 'রূহুল কুদ্দুস' দ্বারাই গর্ভবতী হয়েছেন। গর্ভকাল শেষ হওয়ার পর আলান কাওয়ার গর্ভে তিনটি ছেলের জন্ম হয়। তাদের নাম রাখা হয় বূকূন কায়মী, ইউসফীন সালজী এবং বুযুবখর কাযান। এ ভাবে আল-কাওয়ার পুত্রদের সংখ্যা পাঁচে গিয়ে পৌছাল। এই পাঁচজনের মধ্যে দু'জনের জন্ম দূবূবিয়ার ঔরসে এবং বাকি তিনজনের জন্ম বিনা বাপে। এলকাদায়ী ও এলকজাদায়ীর বংশধররা দারলেকীন বংশ নামে খ্যাতি লাভ করে। অনুরূপভাবে বূকূন কায়কীর বংশধররা কায়কীন বংশ এবং ইউসফীন সালজীর বংশধররা সালজিউত বংশ নামে অভিহিত হয়। আর বূযখর কাআনের বংশধররা বুযুবখরী নামে খ্যাতি লাভ করে। আলান কাওয়ার মৃত্যুর পর বুযুবখর আপন মাতার স্থলাভিষিক্ত এবং মুঘল বংশের শাসক মনোনীত হন। বুযুবখর নিজেকে 'সূর্যের সন্তান' বলতেন। এই বুযুব খরের বংশেই চেঙ্গিয খান, তাইমূর এবং অন্যান্য বিখ্যাত মুঘল ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন। চেঙ্গিয খান এবং তাইমূরের বংশগত সম্পর্ক জানতে নিচের বংশ তালিকা দেখুন।

মাআতুল আনকাওয়া

↓

জুযানজার অর্থাৎ বিনা বাপের সন্তান

↓

বুকা খান

↓

তুমীন খান

↓

কাইদূ খান

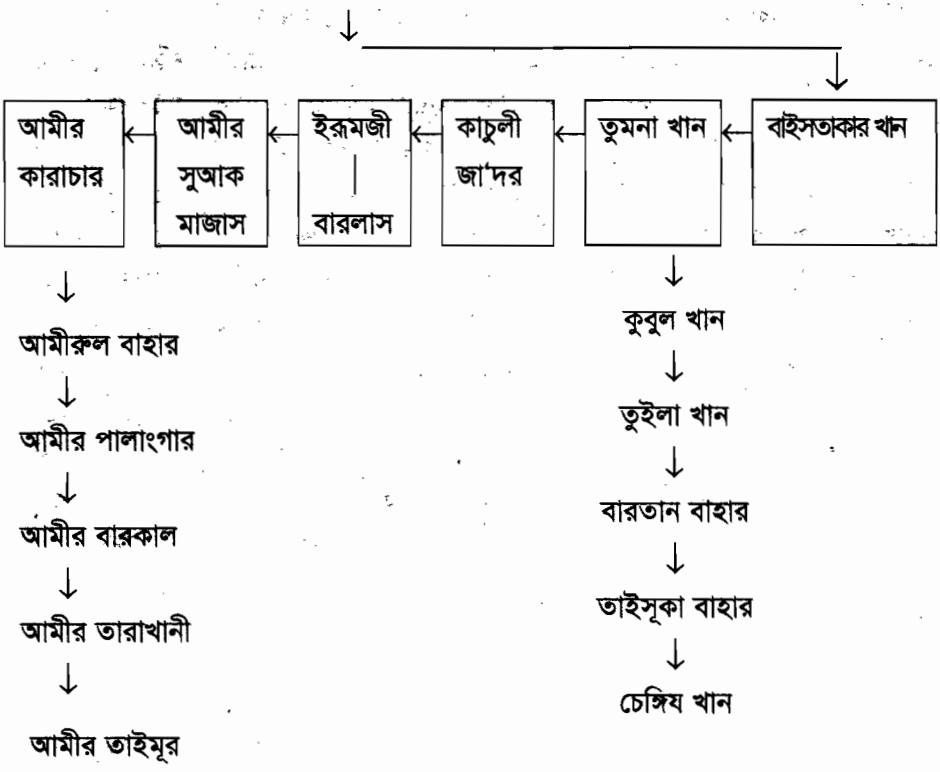

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তুর্কী ইব্‌ন ইয়াফিসের সন্তানদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল আলানজা খান।

তার ঘরে মুঘল খান ও তাতার খান নামক দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। এই দুই ভাইয়ের বংশধররা মুঘল, তাতার এই দুই বংশে বিভক্ত হয়েছে। উপরে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই দুই বংশের লোকেরা পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মুঘল বংশের লোকেরা চীন দেশে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের নাম থেকেই ঐ দেশ মুঘলিস্তান বা মঙ্গোলিয়া নামে খ্যাত। তাতার বংশ জাইহূন নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। আর তাদের নাম থেকেই ঐ দেশ তাতার কিংবা তুর্কিস্তান নামে খ্যাত। ঐ দেশে একদা ফরীদূনের পুত্র তূরের হুকুমত ছিল বলে তা তুরান নামেও পরিচিত।

এই কায়ানী শাসক বংশের মধ্যে ইফরাস ইয়া অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ফেরদৌসীর শাহনামার মধ্যে তার উল্লেখ রয়েছে। কায়ানী বংশের এই শাখা অর্থাৎ ইফরাস ইয়াবের বংশধরও এই তুর্কিস্তান বা তুরানে বসবাস করে তাতার বংশের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে। যেহেতু তুর্কিস্তান ইসলামী দেশসমূহের অধিক নিকটবর্তী ছিল এবং ইসলামী বিজয় অভিযানও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল তাই তুর্কদের যে গোত্রটি সর্বপ্রথম ইসলামী সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেটা ছিল এই তাতার গোত্র। তাতার গোত্র ছিল অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের সমষ্টি। আর এই গোত্রগুলোর মধ্যে প্রধানত ইফরাস ইয়াবের বংশধর ঐ কায়ানী

গোত্রকে মনে করা হতো সব চাইতে বেশি সম্পদশালী ও সম্মানিত। কেননা তারা ছিল একটি বিরাট সাম্রাজ্যের স্মৃতি চিহ্ন। অতএব মহান সালজুকের ঐ উক্তিটি সঠিক বলেই মনে করা হয় যাতে তিনি বলেছিলেন, আমরা হচ্ছি ইফরাস ইয়াবের বংশধর। সর্বপ্রথম সালজূক নামীয় এক ব্যক্তি আপন গোত্রের লোকসহ বুখারায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সালজুকের বংশধরকে 'তুর্কীদের সালজুক গোত্র' বলা হয়। সালজুকের ছিল পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল ইসরাঈল এবং অপর একজনের নাম ছিল ইসমাঈল। ইসমাঈলকে সুলতান মাহমূদ গযনভী কালিঞ্জর দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। মাহমূদ গযনভীর পুত্র সুলতান মাসউদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইসরাঈল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আপন গোত্রে ফিরে যান। মিকাঈলের পুত্র ছিলেন সুলতান তুগ্রিল। আর সুলতান আলপ-আরসালান সালজুকী ছিলেন তুগ্রিলের অপর ভাই চাঘযী বেগের পুত্র। এভাবে সালজুকী গোত্রকে যদি ইফরাস ইয়াবের বংশধর বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে তারা তুর্ক ছিল না, বরং ছিল কায়ানী গোত্রের লোক। তুর্কিস্তানে বসবাসকারী তুর্করা অর্থাৎ তাতারীরা বার বার ইরান ও খুরাসানে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। তাদের মধ্যেই একটি গোত্র ছিল যারা উসমানীয় সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করে। উসমানী তুর্ক নামে খ্যাত এই বংশের অবস্থাদি আগামীতে বর্ণিত হবে।

মুঘল শব্দের ব্যাখ্যা

মুঘল খানের বংশধরকে মুঘল গোত্র বলা হয়। মুঘল হচ্ছে মুঘুল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যারা মুঘলকে মুঘুল-এর এক বচন মনে করেন তারা ভ্রান্তিতে রয়েছেন, কেননা মুঘুল বহুবচন নয় বরং এক বচন।

ফারাতাতার

মুঘল ও তাতাররা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারপর পৃথক পৃথক দেশে বসতি স্থাপন করে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কায়ানী বংশ তুরান দেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিল। কায়ানীরা তাতারীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে মুঘলরা সর্বদা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয় এবং তাতারীদের উপর বাড়াবাড়ি করার কোন সুযোগ পায়নি। ঐ সমস্ত যুদ্ধে মুঘলদের বেশিরভাগ স্ত্রীলোক তাতারীদের দখলে এসে যেত। আর এই স্ত্রীলোকদের গর্ভে যে সব সন্তান জন্ম নিত তাদেরকে তাতারীরা দাসীপুত্র মনে করত। এই দাসীপুত্ররা তাতারীদের সম্পত্তির অধিকারী হতো না। ধীরে ধীরে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তাদের বিবাহ-শাদীও তাদেরই বর্ণের লোকদের সাথে হতে লাগল। আর এর ফলে তৃতীয় আর একটি জাতির উদ্ভব হয়, যাদের উপাধি দেওয়া হয় ফারাতাতার। কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, এই সমস্ত লোককে তুর্কমান বলা হয়ে থাকে। মুঘলদের প্রতি তাতারীদের ঘৃণা পোষণের কারণেই তারা মুঘল স্ত্রীলোকদের সন্তানদের সন্তানকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করত না। অন্যথায় মুঘল এবং তাতার তো একই পিতার বংশধর।

একটি ভুল ধারণা ও তার অপনোদন

কেউ কেউ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে উযবেক জাতিকে তাতারী জাতি বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে উযবেকরা হচ্ছে চেঙ্গিয খানের বংশধরদের একটি গোত্রের নাম। খুব সম্ভবত এই ভুল ধারণা এই জন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, হিন্দুস্থানের মুঘল বাদশাহদের সাথে বেশ কয়েকজন উযবেক শাসকের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। ঐ উযবেকরা তখন তুর্কিস্তানে বাদশাহী করত। আর ওদেরকে তুর্কিস্তানে বাদশাহী করতে দেখে আজকালকার ঐতিহাসিকরা ধরে নিয়েছেন যে, ওরা ছিল তাতারী। হ্যাঁ, তাতারীদের সুলতানতো হচ্ছে উসমানীয় সুলতান। মুঘল গোত্রগুলোর কাচাক, ঈগুর, খিল্জ, কাচার, ইফশার, জালায়ির, আরলাত, দুগলাত, কালতারাও, সালদূয, আরগুন, কুচীন, তারখানী, তুগায়ী, কাকশান প্রভৃতি অনেক শাখা রয়েছে। এই সমস্ত শাখার বিস্তারিত বিবরণ দানের প্রয়োজন এখানে নেই।

অতএব একথা এখন ভালভাবে বোঝা গেল যে, তুর্ক হচ্ছে এমন একটি সাধারণ শব্দ, যা মুঘল তাতার উভয় গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, তাতার এবং মুঘলরা হচ্ছে একই তুর্ক গোত্রের দু'টি শাখা। মুঘলদের মূল বাসস্থান ছিল চীন এবং মঙ্গোলিয়ায় আর তাতারীদের বাসস্থান ছিল তুর্কিস্তানে। পরবর্তীকালে তাতারীদেরকে তুর্ক বলা হতো এবং ধীরে ধীরে তুর্ক শব্দের ব্যাপকতা হ্রাস পেয়ে তা তাতারের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ তাতার শব্দের প্রচলিত অর্থও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তুর্ক, মুঘল উভয় জাতির নামই বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মূল উৎসের প্রেক্ষিতে তুর্ক নামে মুঘলদের উল্লেখও করে থাকেন। কেননা, তারা হচ্ছে মূলত তুর্ক ইব্‌ন ইয়াফিসের বংশধর। কেউ কেউ সালজুকীদেরকেও তুর্ক বলে থাকেন। এ কারণেই কেউ কেউ আবার উসমানীয় সুলতানদেরকেও মুঘলদের স্বগোত্রীয় আখ্যা দিয়ে থাকেন। যা হোক উপরের বর্ণনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ে নিলে ইতিহাস পাঠকদের অনেক সন্দেহেরই নিরসন হয়ে যাবে। এবার আমরা চেঙ্গিযী মুঘলদের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করবো। তবে এর পূর্বে আর একটি কথা হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে যে, তাতারী জাতি ছিল অধিক ক্ষমতাশালী। তারা মুঘলদেরকে তাদের এলাকার বাইরে পা রাখার কোন সুযোগই দিত না। ফলে মুঘলরা তুর্কিস্তান থেকে বের হয়ে খুরাসান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে এই জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর বাহাদুর লোকেরা ইসলামী সাম্রাজ্যসমূহে বড় বড় পদ লাভ করে তাদের প্রাচীন বাসভূমি তুর্কিস্তানের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে হরেক ধরনের সভ্যতা সংস্কৃতির উদ্ভবও ঘটেছিল। তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুরাও তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। অতএব স্বাভাবিকভাবে সেই মুহূর্তটি এসে গিয়েছিল, যখন এই জাতিও তাদের চূড়ান্ত মূর্খতা, অশিষ্টতা, পাশবিকতা ও দুর্দান্ত স্বভাব নিয়ে নিজেদের প্রাচীন পাহাড়িয়া জন্মভূমি ছেড়ে সভ্য দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়বে এবং যারা অলস ও অকর্মণ্য তাদের আতংক ও ত্রাসে পরিণত হবে।

চেঙ্গিয খান

মুঘলদের আকার-আকৃতি

ঐতিহাসিকরা এই মুঘলদের যে আকার-আকৃতি বর্ণনা করেছেন তা হলো, এদের আকার-আকৃতির সাথে তুর্কদের অনেক মিল রয়েছে। এরা হচ্ছে প্রশস্ত বক্ষ, খোলামেলা চেহারা, অপেক্ষাকৃত ছোট উরু ও পিঙ্গল বর্ণের অধিকারী। এরা খুবই চটপটে এবং বিচক্ষণ। যখন কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে তখন সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না। শত্রুদের জন্য অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তীর বেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষার কোন সুযোগই তাদেরকে দেয় না। তারা নানা ধরনের কলাকৌশল জানে এবং শত্রুর পালিয়ে যাবার সব পথ বন্ধ করে দেয়। এদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে এবং অস্ত্র চালনায় বলতে গেলে, তারা পুরুষদেরই সমকক্ষ। এরা যে কোন জন্তুর গোশত ভক্ষণ করে। কোন জিনিসেরই বাছ-বিচার করে না। কোন ব্যক্তি গুপ্তচররূপে তাদের দেশে যেতে পারে না। কেননা, আকার-আকৃতি দ্বারা তারা তাকে চিনে ফেলে। বিজয়ী হলে ওরা প্রতিপক্ষের স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই নির্বিবাদে হত্যা করে। ওদের হত্যাকাণ্ড দেখে পাইকারী হত্যা কাকে বলে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। ওরা যখন আক্রমণ করে তখন জনবসতি একদম ধ্বংস করে দেয়। ওদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে মনে হয়, ধন-সম্পদ নয়,বরং ধ্বংসই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য।

মুঘলদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা

মুঘলদের দেশ ছয়টি প্রদেশ বা অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশেরই ছিলেন এক একজন শাসক বা রাজা। আর এই সমস্ত শাসক বা রাজা ছিলেন একজন সম্রাটের অধীন। ঐ সম্রাট থাকতেন তামগা আচে। বুযবাখরা উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশের একটিকে শাসন করত। তুমনাহ খান ইব্‌ন বাইসুনকুর খানের আমল পর্যন্ত তাদের শাসনের এই ধারা অব্যাহত থাকে। তুমনাহ খানের ছিল এগার পুত্র। তন্মধ্যে নয়জন এক স্ত্রীর গর্ভে এবং অপর দু'জন অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মলাভ করেছিল। পরবর্তী দু'পুত্র ছিল যমজ। তুমনাহ খান এদের দু'জনের নাম রাখল কুবুল খান ও কাচূলী বাহাদুর।

কাচূলীর স্বপ্ন

একদা রাতের বেলা কাচূলী বাহাদুর স্বপ্ন দেখল, একটি তারা তার ভাই কুবুল খানের গলাবন্ধ থেকে বের হয়ে আকাশে গিয়ে পৌঁছাল এবং সেখান থেকে পৃথিবীর উপর আলো ছড়াতে শুরু করল। অল্প কিছুক্ষণ পর ঐ তারা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার স্থলে অন্য একটি তারার অভ্যুদয় ঘটল। অল্প কিছুক্ষণ পর এটাও অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এর স্থলে তৃতীয় আর একটি তারার অভ্যুদয় ঘটল। এই তৃতীয় তারা অদৃশ্য হওয়ার পর যে চতুর্থ তারাটির অভ্যুদয় ঘটল তা এত প্রকাণ্ড ও উজ্জ্বল ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব তার আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। এই প্রকাণ্ড তারাটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার আকাশে উদিত হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো

উজ্জ্বল তারা। এই দৃশ্য দেখে কাচূলী বাহাদুরের চোখ খুলে গেল। সে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল এবং চিন্তা করতে করতে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ল। এবার সে স্বপ্নে দেখল, স্বয়ং তার গলাবন্ধ থেকে একটি তারা বের হলো এবং আসমানে গিয়ে আলো বিকিরণ করতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় তারা, তারপর তৃতীয় তারা। মোটকথা, একের পর এক সাতটি তারা বের হলো। সপ্তম তারার পর একটি প্রকাণ্ড এবং উজ্জ্বল তারা উদিত হলো, যার আলোয় সমগ্র বিশ্ব ঝলমলিয়ে উঠল। এই প্রকাণ্ড ও উজ্জ্বল তারা অদৃশ্য হওয়ার পর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা উদিত হলো। তারপর কাচূলী বাহাদুরের চোখ খুলে গেল। পরদিন ভোর বেলা সে এ দু'টি স্বপ্নই তার পিতার কাছে বর্ণনা করল।

তুমনাহ্ খানের ব্যাখ্যা

তুমনাহ্ খান স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, কুবুল খানের বংশধরদের চতুর্থ স্তরে একজন বিরাট বাদশাহর জন্ম হবে এবং তোমার বংশধরদের অষ্টম স্তরে জন্ম হবে আর একজন বিরাট বাদশাহর। তারপর তুমনাহ্ খান কুবুল খান এবং কাচূলী বাহুদুরকে আপোসে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দেন। তিনি উভয় পুত্রের মধ্যে একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নিয়ে তাতে উভয়ের স্বাক্ষর নেন এবং নিজের ও মুহর লাগিয়ে তা খাজাঞ্চীর হাতে অর্পণ করেন এবং উপদেশ দেন, যেন এই অঙ্গীকারনামা বংশ-পরম্পরায় অক্ষত ও সংরক্ষিত থাকে। উক্ত অঙ্গীকারনামায় লেখা হয়েছিল, হুকুমত ও বাদশাহী কুবুল খানের বংশধরদের মধ্যে থাকবে এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব থাকবে কাচূলী বহাদুরের বংশধরদের মধ্যে। তুমনাহ্ খানের মৃত্যুর পর কুবুল খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুবুল খানের পর যথাক্রমে কুভায়লা খান, বরতান বাহাদুর এবং মাইসূকা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চেঙ্গিয খানের জন্ম

৫৪১ হিজরীর ২০শে যিলকাদ (১১৪৭ খ্রি মে) মাইসূকা বাহাদুরের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐ বছরই মুঘলিস্তানের কাআন আকবর তথা মহান বাদশাহর মৃত্যু হয়। তার নাম ছিল তামূচীন। তাই মাইসূকা বাহাদুর তার এই পুত্রের নাম রাখলেন তামূচীন। পরবর্তীকালে সে চেঙ্গিয খান নামে খ্যাতি লাভ করে। ৫৬২ হিজরী সনে (১১৬৬-৬৭ খ্রি) যখন মাইসূকা বাহাদুরের মৃত্যু হয় তখন তামূচীনের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। মাইসূকা বাহাদুরের পর তামূচীন আপন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মনোনীত হন। কিন্তু অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ দেখে জনসাধারণ তার নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে দেশে বিদ্রোহের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

চেঙ্গিয খানের স্বপ্ন

এই পরিস্থিতিতে তামূচীন স্বপ্নে দেখেন, তার উভয় হাতে তরবারি রয়েছে। তিনি যখন তার দুই হাত পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রসারিত করলেন তখন তরবারির অগ্রভাগ পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি এই স্বপ্নটি তার মায়ের কাছে বর্ণনা করেন। এতে তার মায়ের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তার এই ছেলেটি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমগ্র লোককে

কাঁপিয়ে তুলবে এবং তার হাতে প্রচুর রক্ত ঝরবে। এ কথাটি তার মায়ের পূর্ব থেকেই জানা ছিল। কেননা তামূচীন যখন তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। মা এই মুঠি খুলে দেখতে পান যে, তাতে থোকা থোকা জমাট বাঁধা রক্ত রয়েছে। এই জমাট রক্ত দেখে উপস্থিত সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই ছেলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত রক্তপিপাসু হবে। যাহোক, বিদ্রোহ এমনি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে,একমাত্র আমীর কারাচা ছাড়া কাচূলী বাহাদুরের বংশের সকলেই তামূচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় তামূচীন তার সংলগ্ন রাজ্যের অধিপতি আভাঙ্গ খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং নিজে তারই আশ্রয়ে চলে যান। আভাঙ্গ-খান তামূচীনকে সাদরে গ্রহণ করেন, তাকে সান্ত্বনা দেন এবং আপন পুত্রের ন্যায় তার যত্ন-আত্তি করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পর একটি বাহিনী গঠন করে চেঙ্গিয খান আপন আশ্রয়দাতা আভাঙ্গ খানের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা শুরু করেন। এমনকি আপন সঙ্গীদের নিয়ে একটি গিরিগর্তে অবস্থান নিয়ে আভাঙ্গ খানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং তাতে ঘটনাচক্রে আমীর কারাচের তীরের আঘাতে ভীষণভাবে আহত হয়ে আভাঙ্গ খান পলায়ন করেন এবং ইয়াঙ্গ খান নামক অপর একজন অধিনায়কের হাতে পলায়নকালে নিহত হন। এবার এই সম্ভাবনা ছিল যে, ইয়াঙ্গ খান ও তামূচীনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকবে। কেননা আভাঙ্গ খানকে হত্যা করে ইয়াঙ্গ খান তামূচীনকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এই বিজয়ের পর চেঙ্গিয খান তার চারপাশে অনেক উপজাতিকে একত্র করেন। জনসাধারণও তার বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে। সন্তুষ্টচিত্তে তাকে নেতা বলে মেনে নিতে শুরু করে। এমতাবস্থায় চেঙ্গিয খান একটি সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে ইয়াঙ্গ খানের এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটান। যুদ্ধে ইয়াঙ্গ খানও নিহত হন। ফলে চেঙ্গিয খান একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। এই সমস্ত বিজয়ের পর হঠাৎ করে তামূচীন মুঘল গোত্রসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তার ক্ষমতা মুঘলিস্তানের মহান কাআনের সমপর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

নামের পরিবর্তন

ইতোমধ্যে তানকীরী নামীয় জনৈক ব্যক্তি চেঙ্গিয খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তানকীরীকে মুঘলরা একজন সংসার ত্যাগী সাধু এবং অত্যন্ত সম্মানিত লোক বলে মনে করত। তানকীরী চেঙ্গিয খানকে বলেন, আমি লাল বর্ণের জনৈক ব্যক্তিকে লাল পোশাকে একটি লাল ঘোড়ার পিঠের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পাই। সে আমাকে বলল, তুমি মহিসূকা বাহাদুরের পুত্রকে গিয়ে বল, সে যেন আজ থেকে তার নাম তামূচীনের পরিবর্তে চেঙ্গিয খান রাখে। চেঙ্গিয খানকে অনেক দেশের শাহানশাহ করাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। তানকীরীর এই কথা শুনে চেঙ্গিয খান তাকে একজন প্রতারক বলে ধারণা করে; তবে তার কথাটি মনমত হওয়ায় তা মেনে নিয়ে নিজেকে চেঙ্গিয খান নামে সাধারণ্যে পরিচিত করে তুলে। তুর্কী ভাষায় চেঙ্গিয খান অর্থ শাহানশাহ। কিংবা এও হতে পারে যে, চেঙ্গিয খানের পর এই নাম শাহানশাহের সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন পর তানকীরীর কোন একটি কথাকে উপলক্ষ করে চেঙ্গিয খানের জনৈক সভাসদের সাথে তার ঝগড়া বাঁধে। সে

তানকীরীর ঘাড় ধরে শূন্যে উঠিয়ে এমন ভাবে তাকে ছুঁড়ে মারে যে, সে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র মুঘল গোত্রে এবং মুঘলিস্তানে চেঙ্গিয খানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কাআনে আকবর তার সাথে মুকাবিলা করে নিহত হন। তারপর চেঙ্গিয খানকেই সকলে কাআনে আকবর হিসাবে মেনে নেয়। এবার চেঙ্গিয খান তাতার গোত্রসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাতারীদের সম্রাট চেঙ্গিয খানের মুকাবিলায় নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল দেখতে পান এবং চেঙ্গিয খানের কাছে আপন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তার সাথে একটি আপোস-চুক্তি সম্পাদন করেন। তারপর তাতারী অধিনায়করা নিজেদের বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাদশাহ বাধ্য হয়ে চেঙ্গিয খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাতারী বাদশাহ বিষপানে আত্মহত্যা করেন এবং সেই সাথে চেঙ্গিয খান আপন শ্বশুরের সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেন। প্রকৃতপক্ষে চেঙ্গিয খান মুঘলদের মধ্যে অত্যন্ত সজাগ মস্তিষ্ক ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি তার জীবনে যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছেন তাতে তার বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার স্বাক্ষর মিলে। তিনি তার হত্যাকাণ্ডের কারণে অত্যন্ত কুখ্যাতি অর্জন করেন। তবে ঐ যুগে দুনিয়ার অবস্থা ও পরিবেশ এমনি ছিল যে, তিনি তাতে ইচ্ছা করলেও নিজেকে রক্তারক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

মুঘলদের ধর্ম

মুঘলদের ধর্মের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ওরা অবশ্য অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা ও ক্ষমতাশীল সত্তার ধারণা পোষণ করত। অর্থাৎ ওরা আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস করত। তবে ওদের ইবাদত-বন্দেগী ছিল অনেকটা হিন্দুস্থানের অনার্য তথা প্রাচীন অধিবাসীদের ইবাদত-বন্দেগীর মত। মুঘলদের ঐ দেশে কোন না কোন নবী অবশ্যই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে হিদায়াতনামাও নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মুঘলরা তাদের নবী ও আসমানী হিদায়াতনামার কথা ভুলে বসেছিল। তাদের মধ্যে হারাম-হালালের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারা যা পেত তাই খেত এবং যা ইচ্ছা তাই করত। তাদের দেশের আবহাওয়া, তাদের মধ্যে বিরাজিত গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা এসব কিছুর প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকরা মুঘলদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন যে, তাদের ধর্মই ছিল মানুষকে হত্যা করা। তাদের মধ্যে জ্যোতিষ্ক পূজা এবং বিভিন্ন জড় বস্তুর পূজাও প্রচলিত ছিল। তাদেরকে অগ্নিপূজারী আখ্যায়িত করা না গেলেও তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু অগ্নিপূজার অস্তিত্বও ছিল। ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে এত পশ্চাৎপদ একটি গণ্ডমূর্খ জাতির মধ্যে চেঙ্গিয খানের আবির্ভাব ছিল একজন সংস্কারকেরই আবির্ভাবতুল্য। তিনি সর্বপ্রথম সমগ্র মুঘলিস্তানে, বলতে গেলে একেবারে রাতারাতি নিজের একটি সুদৃঢ় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন মুঘলদের চারিত্রিক ও সামাজিক সংস্কার সাধনে।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ

এটা ছিল সেই যুগ, যখন সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ ইরান, খুরাসান, কাবুল, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশ দখল করে বাগদাদ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার কথা চিন্তা করছিলেন। তখন তাকে এশিয়া মহাদেশে সর্বাধিক শক্তিশালী মুসলমান বাদশাহ মনে করা হতো। আব্বাসীয় খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ এবং মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের মধ্যে মনোমালিন্য এত চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, খাওয়ারিযম শাহ বাগদাদ আক্রমণের সংকল্প নেন। তখন আব্বাসীয় খলীফা, হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র)-কে দূত হিসাবে খাওয়ারিযম শাহের কাছে পাঠান। শায়খ সুলতানের দরবারে পৌঁছে যথাযোগ্য বক্তৃতার মাধ্যমে তাকে বাগদাদ আক্রমণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তখন খাওয়ারিযম শাহ বলেন, শায়খ সাহেব, আপনি আব্বাসীয়দের বড় বেশি প্রশংসাকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব আপনি বাগদাদে ফিরে যান। আমিতো আলাভীদেরকে আব্বাসীয়দের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তাই আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংস করে আলাভীদেরকে সাহায্য করতে চাই। আমি অবশ্যই বাগদাদ আক্রমণ করব।

খাওয়ারিযমের জন্য তিনজন মহাপুরুষের বদদু'আ

শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী বিফল হয়ে খাওয়ারিযম শাহের নিকট থেকে ফিরে আসেন। তখন তিনি তার জন্য এই বদ দু'আ করেন– হে আল্লাহ্! এর উপর জালিমদেরকে জয়ী কর। খাওয়ারিযম শাহ সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে এত তুষারপাত হয় যে, তাঁর চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি বাধ্য হেয় পরবর্তী বছরের জন্য তাঁর বিজয় অভিযান স্থগিত রাখেন এবং রাস্তা থেকেই আপন রাজধানীতে ফিরে আসেন। ঘটনাচক্রে একদিন নেশার ঘোরে তিনি নির্দেশ দেন ঃ হযরত শায়খ মাজদুদ্দীনকে হত্যা কর। তাঁর এই নির্দেশ অনুযায়ী শায়খ সাহেবকে হত্যাও করা হয়। পরদিন যখন তার চৈতন্য ফিরে আসে তখন তিনি আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে হযরত শায়খ মাজদুদ্দীনের রক্তমূল্য হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরার খিদমতে প্রেরন করেন। শায়খ কুবরা তখন বলেন, শায়খ মাজদুদ্দীনের রক্তমূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে হাজার হাজার মুসলমানের মস্তক কাটা যাবে। লোকের ধারণা, শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী, শায়খ মাজদুদ্দীন ও শায়খ নাজমুদ্দীনের বদদু'আর কারণে শাহের উপর বিপদ নেমে আসে।

চেঙ্গিয খান কর্তৃক সুলতান খাওয়ারিযম শাহের সাথে আপোসচুক্তির উদ্যোগ

চেঙ্গিয খান যখন মুঘলিস্তানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো নিচিহ্ন করে নিজের একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি আপন প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা উভয়ের সাম্রাজ্যের সীমান্ত রেখা ছিল অভিন্ন। চেঙ্গিয খান আপন দূতের

মাধ্যমে মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন--আমি এত বিরাট সংখ্যক দেশ জয় করেছি এবং আমার অধীনে এত বিরাট সংখ্যক যুদ্ধাভিজ্ঞ গোত্র রয়েছে যে, এখন আর অন্য কোন দেশ জয় করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। অনুরূপভাবে তুমি বিরাট সংখ্যক দেশের দখলকার ও একচ্ছত্র শাসনক্ষমতার অধিকারী এক মহান সম্রাট। অতএব এটাই সমীচীন যে, আমি এবং তুমি উভয়ে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভালবাসার অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকব, যাতে আমরা একে অন্যের দিক থেকে নিশ্চিত থেকে মানব জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। ঐ পত্রে চেঙ্গিয খান আরো লিখেন– আমি তোমাকে আপন পুত্রের মতই স্নেহাস্পদ মনে করব। পত্র পাঠ করে মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ বাহ্যত চেঙ্গিয খানের দূতদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বন্ধুত্বের একটি অঙ্গীকারপত্র লিখে তাদের হাতে দেন। কিন্তু চেঙ্গিয খানের পত্রের একবারে শেষ লাইনটি 'আমি তোমাকে আপন পুত্রের মতই স্নেহাস্পদ মনে করব' তার পছন্দ হয়নি। তিনি এটাকে বরং নিজের জন্য কিছুটা অপমানজনক বলেই মনে করেন। অঙ্গীকার পত্রে উভয়েই অবাধ বাণিজ্যের কথা স্বীকার করেন এবং সে অনুযায়ী এক দেশের বণিক অন্যদেশে যাতায়াত করতে শুরু করে। চেঙ্গিয খান যদিও কাফির ছিলেন তা সত্ত্বেও তার বিচার-বুদ্ধির কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কেননা একজন বিরাট বাদশাহের দিক থেকে আশংকামুক্ত থাকার জন্যই তিনি তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটাও তার বুদ্ধিমত্তার একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি আপোস চুক্তিতে বণিকদের অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। বাহ্যত মনে হয়, তখন পর্যন্ত ইসলামী দেশসমূহকে পর্যুদস্ত করার কোন ইচ্ছা চেঙ্গিয খানের ছিল না।

কথিত আছে, উপরোক্ত আপোস চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আব্বাসীয় খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ এক ব্যক্তির মাথা নেড়া করে তার উপর তরবারির আগা দিয়ে ক্ষত করে একটি চিঠি লিখেন। তারপর ক্ষতস্থানসমূহের মধ্যে সুরমা ভরে দেন। ঐ অভিনব চিঠিতে লেখা হয়েছিল– তুমি সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহকে আক্রমণ কর এবং আমাকে নিজের একজন সহানুভূতিশীল বন্ধু মনে কর। এভাবে নেড়া মাথার উপর চিঠি লেখার পর কিছুদিন অপেক্ষা করা হলো। যখন মাথায় চুল গজালো তখন লোকটিকে চেঙ্গিয খানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। লোকটি চেঙ্গিয খানের দরবারে পৌঁছে নিবেদন করে– আমি আব্বাসীয় খলীফার দূত। আপনার প্রতি খলীফার একটি পয়গাম আমার মাথার উপর অংকিত রয়েছে। আমার মাথা মুড়িয়ে ফেলুন এবং খলীফার পয়গাম পড়ুন। যাহোক ঐ ব্যক্তির মাথা মুড়িয়ে চেঙ্গিয খান খলীফার পত্র পাঠ করলেন। তারপর তিনি দূতের কাছে ওযর পেশ করে বললেন : আমি তো খাওয়ারিযম শাহের সাথে আপোসচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি। অতএব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে আক্রমণ করতে পারি না। খলীফার দূত শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে নেড়া মাথায় দেশে ফিরে গেল। এবার চেঙ্গিয খান খাওয়ারিযম শাহের যে মৈত্রী ও ভালবাসার চুক্তি ইতিপূর্বে সম্পাদিত হয়েছিল সেটাকে আরো স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার জন্য তার কাছে আরো একটি পত্র লেখেন। উক্ত চিঠিতে তিনি খাওয়ারিযম শাহের প্রতি আপন ভালবাসাকে আরো ফুটিয়ে তুলেন। এর কারণ ছিল এই যে, খাওয়ারিযম শাহ ছিলেন তার নিকট-প্রতিবেশী।

দুজনের সাম্রাজ্যের সীমারেখা ছিল অভিন্ন। একমাত্র এ কারণেই চেঙ্গিয খান খাওয়ারিযম শাহ সম্পর্কে সব সময়ই ভীতিগ্রস্ত থাকতেন। চেঙ্গিয খান এ কথাও জানতেন যে, বাগদাদের খলীফা খাওয়ারিযম শাহের চাইতে অধিক প্রতিপত্তিশালী। তবে তাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। কেননা তার সাম্রাজ্যের সীমারেখা এখান থেকে অনেক দূরে।

খাওয়ারিযম শাহের ভ্রান্তি

এটা খাওয়ারিযম শাহের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, চেঙ্গিয খান জনৈক দূত মারফত তার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ দূতকে সাড়ে চারশ' মুসলমান সওদাগরের একটি কাফেলার সাথে পাঠানো হয়। ঐ সওদাগররা বাণিজ্য ব্যাপদেশে মুঘলিস্তানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিল। সওদাগরদের ঐ পুরো কাফেলাটিকে চেঙ্গিয খান নিজেরই প্রতিনিধিদল বলে ঘোষণা করেন। কেননা তাতে এমন কিছু লোক ছিলেন,যারা বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও সমঝদার। যখন কাফেলাটি আনযার নামক স্থানে পৌঁছে তখন খাওয়ারিযম শাহের নায়েবে সালতানাত, যিনি ওখানে বিদ্যমান ছিলেন, কাফেলার সব সদস্যকে বন্দী করে ফেলেন। কাফেলার লোকেরা অনেক করে বলল ঃ আমরা মুসলমান। শুধু বাণিজ্য ব্যাপদেশে মুঘলিস্তানে গিয়েছিলাম। এখন দেশে ফিরে আসছি এবং মুঘলিস্তানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসছি। কিন্তু খাওয়ারিযম শাহের ঐ শাসক এ সব কথায় কান দেননি। তিনি বরং খাওয়ারিযম শাহকে লিখেন– মুঘলিস্তান থেকে কিছু গুপ্তচর সওদাগর রাজপ্রতিনিধির বেশ ধরে এসেছে। আমি তাদেরকে বন্দী করে ফেলেছি। এখন তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো সে সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কামনা করি। সুলতান খাওয়ারিযম শাহ উত্তর দেন– ওদেরকে হত্যা করে ফেল। অতএব আনযারের শাসক ঐ সাড়ে চারশ সওদাগরকে হত্যা করে তাদের মালপত্র দখল করে নিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায এবং চেঙ্গিয খানের কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ কাফেলার নিহত হওয়ার ঘটনা ব্যক্ত করেন।

তারপর চেঙ্গিয খান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাওয়ারিযম শাহের কাছে আর একটি পত্র পাঠান। তিনি তাতে লিখেন– আনযারের শাসক অত্যন্ত অযোগ্যের মত একটি কাজ করেছে। সে নিষ্পাপ লোকদেরকে হত্যা করে জঘন্য অপরাধ করেছে। এটাই সমীচীন যে, হয় তাকে আমার কাছে সমর্পণ করুন অথবা আপনি নিজে তাকে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। চেঙ্গিয খান এই পত্র যে দূতের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন তাকে হত্যা করে ফেলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, চেঙ্গিয খান এরপরও জনৈক দূত মারফত খাওয়ারিযম শাহের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন ঃ দূতকে হত্যা করা কোন বাদশাহর কাজ নয়। উপরন্তু সওদাগরদের নিরাপত্তা দান বাদশাহের জন্য ফরজ। আমার এই দাবি সম্পর্কে আপনি পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে দূত এই পত্রটি নিয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিযম শাহ তাকেও হত্যা করে ফেলেন। এই সব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে চেঙ্গিয খান মুঘলিস্তান ও তুর্কিস্তানের যুদ্ধ পারদর্শী বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তারপর তিনি খাওয়ারিযম শাহকে বাদশাহ বলেও সম্বোধন করতেন না বরং তার সামনে যখন খাওয়ারিযম শাহের প্রসংগ উঠত তখন তিনি বলতেন, সে বাদশাহ

নয় বরং একজন চোর। কেননা যারা বাদশাহ তারা কখনও দূতকে হত্যা করে না। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে তূকতাগান নামীয় জনৈক সীমান্ত সর্দারের মধ্যে বিদ্রোহের কিছু আলামত প্রত্যক্ষ করে তাকে শায়েস্তা করার জন্য চেঙ্গিয খান আপন পুত্র জূজী খানকে প্রেরণ করেন। তূকতাগান তখন মাওরাউন নাহর এলাকায় চলে আসেন যেখানে খাওয়ারিযম শাহও কোন না কোন কারণে অবস্থান করছিলেন। জূজী খান তূকতাগানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বন্দী করে ফেলেন। এটা দেখে খাওয়ারিযম শাহ আপন বাহিনীসহ জূজী খানের দিকে অগ্রসর হন। তখন জূজীখান খাওয়ারিযম শাহের কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন– আপনি আমাকে আক্রমণ করবেন না। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হইনি। আমি শুধু আপন বিদ্রোহীকে বন্দী করতে এসেছিলাম। আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু খাওয়ারিযম শাহ জূজী খানের ঐ সব কথায় কর্ণপাত না করে তার উপর হামলা চালান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে, কিন্তু কোন ফায়সালা হয়নি। রাতের বেলা জূজী খান আপন সেনা শিবিরে আগুন লাগিয়ে মুঘলিস্তানের দিকে ফিরে যান এবং পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে চেঙ্গিয খানকে অবহিত করেন। চেঙ্গিয খান এই সমস্ত সংবাদ শোনার সাথে সাথে মুঘলদের বিরাট বাহিনী নিয়ে ইরান ও অন্যান্য ইসলামী সাম্রাজ্যাভিমুখে রওয়ানা হন। এখানে অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত, একজন মুসলমান বাদশাহ বার বার কিরূপ অধমের মত আচরণ করেছেন এবং একজন কাফির বাদশাহ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী দেশসমূহের উপর হামলা করেছেন। যদি সত্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে চেঙ্গিয খানকে অপরাধী সাব্যস্ত করা মোটেই সম্ভব হবে না।

ইসলামী দেশসমূহের উদ্দেশে চেঙ্গিয খানের অভিযান

৬১৫ হিজরীতে (১২৬৬-৬৭ খ্রি) চেঙ্গিয খান ইসলামী দেশসমূহের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি আনযারের নিকটবর্তী হয়ে তার তিন পুত্র জূজী খান, উকতাই খান ও চুগতাই খানকে আনযার অবরোধে মোতায়েন করেন। তারপর আলাক নূইয়া ও মননকূ বূকাকে এক এক বাহিনী দিয়ে খোজান্দ ও নাবাকত অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং আপন কনিষ্ঠ পুত্র তূলীখানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং বুখারা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুঘলদের এই হামলার খবর পেয়ে খাওয়ারিযম শাহ ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী আনযারের দিকে এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী বুখারার দিকে প্রেরণ করেন। তারপর দুই লক্ষ দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে সমরকন্দের হিফাযতের জন্য এবং ষাট হাজার লোককে বুরুজ ও দুর্গ মেরামতের জন্য মোতায়েন করে স্বয়ং সমরকন্দ থেকে খুরাসানের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

খাওয়ারিযম শাহের কাপুরুষতা

এক্ষেত্রে খাওয়ারিযম শাহের যে বিরাট ভ্রান্তি বা কাপুরুষতা লক্ষ্য করা গেছে তা হলো, এত বিরাট এক সেনাবাহিনীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা

করেননি, বরং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে আসেন। নিজেদের বাদশাহকে সমরকন্দ ছেড়ে খুরাসানের দিকে যেতে দেখে নিশ্চয়ই খাওয়ারিযম শাহের সৈন্যদের অন্তরে কিছু না কিছু হতাশার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এর চাইতেও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, যখন তিনি সমরকন্দ ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি পরিখার পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের উপর এত বিরাট এক জাতি হামলা করেছে যে, যদি তারা শুধু নিজেদের চাবুকগুলো একত্র করে ফেলে দেয় তাহলে সমরকন্দের এই পরিখা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সমরকন্দের হিফাজতে নিয়োজিত সৈন্যরা মুঘলদের সম্পর্কে আরো বেশি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খাওয়ারিযম শাহ সমরকন্দ থেকে বলখে গিয়ে পৌছেন এবং আপন পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ মাযেন্দানে পাঠিয়ে দেন। বলখে পৌছে তিনি মুঘলদের মুকাবিলায় কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে সে সম্পর্কে আপন আমীর-উমারা ও অধিনায়কদের সাথে পরামর্শ করেন। খাওয়ারিযম শাহের ছিল সাত পুত্র। তন্মধ্যে জালালুদ্দীন নামক পুত্র পিতাকে ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখে বলল ঃ আপনি যদি ইরাকের দিকে যেতে চান তাহলে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব আমার হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। আল্লাহ্ চাহে তো আমি শত্রুদের উপর হামলা চালাবো এবং জাইহূন নদীর ওপারে গিয়ে আমার তাঁবু স্থাপন করব। মাওরাউন নাহ্র আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন এবং আপনি শুধু ইরাক ও খুরাসান সামলান। কিন্তু খাওয়ারিযম শাহ তার পুত্রের একথা পছন্দ করলেন না। তিনি বলখ থেকে হিরাত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ এসে পৌছল যে, মুঘলরা বুখারা জয় করে সেখানকার সমগ্র অধিবাসীকে হত্যা করে ফেলেছে। এ সংবাদ শুনে খাওয়ারিযম শাহ আরো বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং হিরাত থেকে নিশাপুর চলে যান। মুঘলরা তখন পর্যন্ত জাইহুন নদী অতিক্রম করার সাহস পায়নি বরং মাওরাউন নাহরেই লুটপাট চালাতে থাকে। এদিকে খাওয়ারিযম শাহ নিশাপুরে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকেন।

৬১৭ হিজরীর সফর (১২২০ খ্রি মে) মাসে চেঙ্গিয খানের জনৈক অধিনায়ক ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাইহূন নদী অতিক্রম করেন। এই সংবাদ শুনে খাওয়ারিযম শাহ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পরিবার-পরিজন ও ধনভাণ্ডার কারূন দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং নিশাপুর থেকে ইসফারাইনে চলে যান। মুঘলরা যখন লক্ষ্য করল যে, খাওয়ারিযম শাহ তাদের মুকাবিলায় আসছেন না বরং তাদের ভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন তাদের সাহস আরো বৃদ্ধি পায়। তারা এবার আগে বেড়ে খাওয়ারিযম শাহের পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করে। খাওয়ারিযম শাহ মুঘলদের থেকে পালাতে পালাতে কারূনে গিয়ে পৌছেন, যেখানে তার পরিবার-পরিজন ও ধনভাণ্ডার ছিল। কিন্তু তার সেখানে পৌছার পূর্বেই মুঘলরা অপর দিক থেকে এসে কারূন দুর্গ অবরোধ করে ফেলেছিল। তারপর খাওয়ারিযম শাহ সেখান থেকে পালিয়ে আস্তারাবাদ, তারপর আস্তারাবাদ থেকে আমল গিয়ে পৌঁছেন।

খাওয়ারিযম শাহের মৃত্যু

শেষ পর্যন্ত খাওয়ারিযম শাহ একটি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তার কাছে সংবাদ পৌছে যে, মুঘলরা কারূন দুর্গ জয় করে তার সমগ্র ধনভাণ্ডার এবং পরিবার-পরিজনের উপর

নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। এই সংবাদ শুনে তিনি এতই দুঃখিত ও মর্মাহত হন যে, সেই দুঃখেই তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়। তিনি যে পোশাক পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই পোশাকেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। কোন কাফন তার ভাগ্যে জুটেনি। এবার মুঘলরা সমগ্র খুরাসান ও ইরানে লুটপাট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ক্ষমতায় নিয়োজিত খাওয়ারিযম শাহের পুত্ররা মুঘলদের হাতে নিহত হন। শুধু একজন পুত্র অবশিষ্ট থাকেন। তার নাম ছিল জালালুদ্দীন। তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে অধিকতর বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ও বীর পুরুষ ছিলেন।

এই সময়ে বুখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে মুঘলরা সমগ্র খুরাসানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ৬১৭ হিজরীর রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে (১২২০ খ্রি জুনের প্রথম দিকে) চেঙ্গিয খান জাইহূন নদী অতিক্রম করে বলখ ও হিরাতে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালান। যখন খাওয়ারিযম শাহের পরিবার-পরিজন বন্দী হয়ে চেঙ্গিয খানের সামনে নীত হন তখন ঐ পাষাণ ব্যক্তিটি স্ত্রীলোক এবং শিশুদের প্রতিও কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করেননি, বরং সকলকে হত্যার নির্দেশ দেন। বলখ ও হিরাতের পর মুঘলরা নিশাপুর, মায়েন্দাস্নান, আমল, রাই, হামদান, কুম, কাযভীন, তাবরীয, তিফলীস, মারাগাহ্ প্রভৃতি স্থানে এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালায় যে, তাদের হাত থেকে শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি। যেহেতু আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি তাই জনসাধারণ মুঘলদের সম্পর্কে এতই ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, একজন মুঘল স্ত্রীলোকও কোন ঘরে ঢুকে লুটপাট শুরু করে দিলে তাকে বাধা দান তো দূরের কথা, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত সাহসও কারো হতো না। হামদানবাসীরা, যারা মুঘলদের পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল, একত্রিত হয় এবং মুঘলদের স্থানীয় শাসনকর্তাকে দুর্বল পেয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর মুঘলরা হামদানবাসীদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তারপর মুঘলদের মুকাবিলা করার দুঃসাহস আর কারো হয়নি।

জালালুদ্দীন ইব্‌ন খাওয়ারিযম

জালালুদ্দীন ইব্‌ন খাওয়ারিযম শাহ আপন পিতার মৃত্যুর পর কাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ থেকে রওয়ানা হয়ে তাবরীয শহরে আসেন। এখানে এসে তিনি তার কিছু সংখ্যক দুঃসাহসী বন্ধু-বান্ধবকে একত্র করেন। মুঘলরা তাকে বন্দী করার জন্য ঘেরাও করে। কিন্তু তিনি আপন সঙ্গী-সাথীসহ মুঘলদের ঘেরাও থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি গাযনীনে যান। সেখানে তার চারপাশে বেশ কিছুসংখ্যক সহানুভূতিশীল ও সমব্যথী বন্ধু এসে জোটে। জালালুদ্দীন কিছুটা দুঃসাহস করে ঐ অঞ্চলে যে মুঘল বাহিনী ছিল তাদের উপর হামলা চালান এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। খুব সম্ভবত এই প্রথম বারের মত মুঘলবাহিনী জালালুদ্দীনের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করে। এই সংবাদ শুনে চেঙ্গিয খান তাইফান দুর্গ থেকে রওয়ানা হয়ে বামিয়ান এসে পৌছেন। সেখানে তার এক নাতি অর্থাৎ দুঘতাই খানের পুত্র তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। চেঙ্গিয খান বামিয়ানের স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে হত্যা করার এমনি কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে হত্যা করা হলে তার গর্ভ থেকে

বাচ্চা বের করে সে বাচ্চারও গর্দান মারা হতো। সুলতান জালালুদ্দীন মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করার পর অনতিবিলম্বে আপন অবস্থাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেন এবং চেঙ্গিয খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। যদি খাওয়ারিযম শাহের পরিবর্তে জালালুদ্দীন বাদশাহ হতেন তাহলে মুঘলরা এরূপ বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নিশ্চয়ই পেত না। খাওয়ারিযম শাহেরই ভীরুতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তার বিরাট সেনাবাহিনী কোন কাজে লাগেনি। তিনি তার অধীনস্থ শহর, বন্দর ও বসতিসমূহকে মুঘলদের সহজ শিকারে পরিণত করে এখান থেকে সেখানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। যাহোক, সুলতান জালালুদ্দীন এক বাহিনী গঠন করে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলায় উদ্যত হয়েছেন ঠিক এমনি মুহূর্তে বাহিনীর কিছু সংখ্যক অধিনায়ক ধোঁকা দিয়ে মুঘলদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ফলে জালালুদ্দীনের কাছে শুধু সাতশ লোক থাকে। ওদেরকে নিয়েই লড়তে লড়তে সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধু নদের উপকূল অভিমুখে রওয়ানা হন। চেঙ্গিয খানও আপন বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌছেন। জালালুদ্দীন সিন্ধুনদকে পটভূমিতে রেখে মুঘল বাহিনীর মুকাবিলা করেন। মুঘলরা ধনুক আকারে ঘেরাও করে জালালুদ্দীনের উপর হামলা চালায়। এতদসত্ত্বেও জালালুদ্দীন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুঘলদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। সুলতান জালালুদ্দীন যখন বিপুল বিক্রমে মুঘলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন তখন তারা অনেক দূর পিছনে হটে যেত। কিন্তু প্রচুর জনবল থাকায় তারা পুনরায় এগিয়ে এসে হামলা করত। নিজের জনবলের স্বল্পতার কারণে এই যুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীন জয়ী হতে পারেননি সত্য, তবে এর মাধ্যমে তাঁর বীরত্ব, তেজস্বিতা ও দুঃসাহসিকতার যে ছবি চেঙ্গিয খানের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল তা বোধ করি তিনি কোনদিন বিস্মৃত হতে পারেননি। জালালুদ্দীন বাহিনীর এই সাতশ বীর যোদ্ধার মধ্যে মাত্র একশ জনের মত যখন অবশিষ্ট থাকে তখন জালালুদ্দীন আপন দেহ থেকে বর্ম খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং নিজের মুকুটটি হাতে নিয়ে সিন্ধু নদে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। বাকি সঙ্গীরাও তাদের নেতাকে অনুসরণ করে। চেঙ্গিয খান চেয়েছিলেন মুঘলবাহিনীও যেন ওদেরকে অনুসরণ করে এবং জালালুদ্দীনকে বন্দী করে নিয়ে আসে। কিন্তু ঐ উত্তাল সমুদ্রে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া যে যার তার কাজ নয়। যাহোক, চেঙ্গিয খান এবং মুঘল বাহিনী সিন্ধু নদের তীরে দাঁড়িয়ে ঐ সামান্য কয়েকজন সৈন্যের উপর অবিরাম তীর বর্ষণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীনসহ মাত্র সাত ব্যক্তি সাঁতরিয়ে তীরে উঠতে সক্ষম হন। বাকি সবাই মুঘলদের তীরের আঘাতে নিহত হয়। সুলতান জালালুদ্দীন এপারে পৌছে দেহ থেকে কাপড় খুলে তা শুকাবার জন্য ঝোঁপের উপর দেন। তারপর নিজের বর্শাটি ভূমির উপর গেড়ে তার উপর মুকুটটি রাখেন এবং তার নিচে বসে বিশ্রাম নিতে থাকেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটিও খুলেন এবং তা শুকাবার জন্য সামনে রেখে দেন।

চেঙ্গিয খান অপর পারে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে জালালুদ্দীনের এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেন। এক সময় তিনি তার সকল পুত্র এবং অধিনায়কদেরকে, যারা সেখানে তার সাথে ছিল, সম্মুখে ডেকে এনে বলেন– আমি আজ পর্যন্ত এমন একজন বাহাদুর ও দুঃসাহসী ব্যক্তি দেখিনি। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁরই মত অতুলনীয় বীর। এত বিরাট নদী এভাবে সাঁতরিয়ে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষেই সাজে। যদি এই ব্যক্তি জীবিত থাকে তাহলে আমার আশঙ্কা

হচ্ছে, সে একদিন দুনিয়া থেকে মুঘলদের নাম-নিশানা মুছে তবে ক্ষান্ত হবে। অতএব একে হত্যার ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু চেঙ্গিয খানের পক্ষে সেদিন সিন্ধু নদের তীরে দাঁড়িয়ে শুধু আক্ষেপ করাটাই সার হলো। সিন্ধু নদ অতিক্রম করা তার বা তার বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হলো না। এটা হচ্ছে ৬২০ হিজরীর (১২২৩ খ্রি) ঘটনা।

তারপর সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুর কিছু অঞ্চল জয় করেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা সেখানে এসে তাঁর সাথে মিলিত হতে থাকে। কিছুদিন পর সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধু নদ অতিক্রম করে কিরমানে এসে পৌছেন। সেখান থেকে শীরাযে যান। ঐ সময়ে তিনি ফিদায়ীদেরকে একের পর এক পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে আলামূত দুর্গ ছাড়া তাদের প্রায় সবগুলো দুর্গই ধ্বংস করে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফিদায়ী বা বাতিনী সম্প্রদায় ইতিপূর্বে বর্ণিত মুঘলদের হামলা চলাকালে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিল। মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে, এ খবর শুনে তারা আনন্দ প্রকাশ করছিল। যেহেতু মুঘলদের মত ওরাও মুসলমানদের কট্টর শত্রু ছিল। তাঁদের মুঘলদের দিক থেকে তাদের কোন আশঙ্কা ছিল না। তারা মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের দখলাধীন ভূখণ্ড অনেক বিস্তৃত করে নিয়েছিল। কারামতীয়দের মুকাবিলার ক্ষেত্রে সুলতান জালালুদ্দীনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তখন ছিল ঐ যুগ যখন মুঘলদের অভিযাত্রা উত্তরমুখী হয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন সেটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, মুঘলদেরকে ইসলামী দেশ থেকে বিতাড়ন এবং তাদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ্-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। জালালুদ্দীনের পিতার সাথে যেহেতু খলীফার বিদ্বেষ ছিল তাই তিনি জালালুদ্দীনকেও ঘৃণার চোখে দেখেন এবং তাঁকে অবিলম্বে বাগদাদ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তাঁর উমাবা ও অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন। এই তামাশা দেখে সুলতান জালালুদ্দীন মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন এবং বাগদাদের উমারা ও অধিনায়কদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি বাগদাদে না এসে সেখান থেকে তাবরীয অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তাবরীয দখল করে গারাজিস্তানের দিকে যাত্রা করেন। গারাজিস্তানের আমীর-উমারা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং সেখানে তাঁর আগমনকে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে অভিমত প্রকাশ করে।

এবার সুলতান জালালুদ্দীনের অবস্থা বেশ আশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে এবং তা দেখে বিরাট মুঘলবাহিনী তার মুকাবিলায় ধেয়ে আসে। ইসপাহানের সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে সুলতান জালালুদ্দীন মুঘলদেরকে পরাজিত করে পলায়নে বাধ্য করেন এবং এই বিরাট বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র গারাজিস্তান ও তার আশেপাশের এলাকা দখল করে নেন। তারপর মুঘলরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে সুলতান জালালুদ্দীনের উপর হামলা চালায়। পূর্বাহ্নে এই হামলার প্রস্তুতি-সংবাদ শুনে সুলতান জালালুদ্দীন বাগদাদ এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে দূত মারফত আবেদন জানান– এই মুহূর্তে আমাদের সাধারণ শত্রুকে ধ্বংসের ব্যাপারে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। কিন্তু যেহেতু জালালুদ্দীনের বীরত্ব বাহাদুরীর খ্যাতি তখন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই ঈর্ষাবশত কোন রাষ্ট্রনায়কই

জালালুদ্দীনের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি একাই মুঘলদের মুকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যান। ঐ মুহূর্তে জালালুদ্দীন হয়ত মুঘলদের পরাজিত করে মুঘলদের মনে এমনি ভীতির সঞ্চার করতেন যে, তারা পরবর্তী সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যসমূহ আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল না। তাই দেখা যায়, মুঘল বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য জালালুদ্দীন যে সমস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন তারা তাকে এই সংবাদ দিল যে, মুঘল বাহিনী এখনও অনেক দূরে অবস্থান করছে। অথচ মুঘল বাহিনী তখন একেবারে সন্নিকটে এসে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুঘলরা ঠিক অর্ধেক রাতে অকস্মাৎ এমনভাবে হামলা চালাল যে, তখন শত্রুদের এভাবে আগমনের কথা জালালুদ্দীন কল্পনাও করতে পারেননি। এভাবে তিনি হঠাৎ নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখে বাধ্য হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু যখন জয়ের কোনই সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না তখন প্রবল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর ঘেরাও থেকে বের হয়ে গেলেন। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ। তাঁর সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

সুলতান জালালুদ্দীনের পরিণাম

সুলতান জালালুদ্দীনের পরিণাম সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা খুবই বিখ্যাত। একটি বর্ননা এই যে, পলায়নরত অবস্থায় যখন তিনি পাহাড়ের কোন একটি জায়গায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন তখন তার ঘোড়া ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে কোন একটি পাহাড়ী লোকের ভয়ানক লোভ হয় এবং সে তাঁকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করে ফেলে। অপর বর্ণনা এই যে, তিনি তাঁর পোশাক পরিবর্তন করে অলী-আল্লাহ্দের খিদমতে গিয়ে হাযির হন এবং একজন সূফী ও আবিদ হিসাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ঐ সময়ে তিনি দূর-দূরান্তের দেশসমূহ সফর করেন। এই সংসার ত্যাগী অবস্থায় তিনি নাকি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন।

ইসলাম সম্পর্কে চেঙ্গিষ খানের চিন্তা-গবেষণা

চেঙ্গিয খান সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমীর হাঙ্গামা মিটিয়ে এবং তার পুত্র চুঘতাই খানকে মাকরানে রেখে স্বয়ংং তুর্কীস্তান হয়ে ৬২১ সনের যিলহজ্জ (১২২৪ খ্রি জানুয়ারী) মাসে দীর্ঘ সাত বছর পর আপন জন্মভূমি মুঘলিস্তানে ফিরে যান। পথিমধ্যে বুখারা পৌঁছে তিনি নির্দেশ দেন– মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আলিম এবং যিনি ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁকে আমার সামনে নিয়ে আস। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলামধর্মের হাকীকত ও মূল তত্ত্ব জানতে চাই। গত সাত বছর অনেক রক্তারক্তি করে এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশ পরিভ্রমণ করে চেঙ্গিয খান এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, যদিও মুসলমানরা এখন দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কোন মামুলী ধর্ম নয় বরং এটা হচ্ছে একটি সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা এবং উন্নত চারিত্রিক সংগঠন। যা হোক তার নির্দেশ অনুযায়ী কাযী আশরাফ এবং আর একজন সুবিজ্ঞ আলিমকে তার দরবারে হাযির করা হয়। চেঙ্গিয খানের

জিজ্ঞাসার উত্তরে ঐ দু'জন আলিম সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ ও একত্ব সম্পর্কিত আকীদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। চেঙ্গিয খান তখন বলেন, আমি এ আকীদাকে স্বীকার করে নিচ্ছি।

তারপর আলিমদ্বয় রিসালত সম্পর্কিত আকীদার ব্যাখ্যা দেন। চেঙ্গিয খান বলেন, আমি এই আকীদাকেও গ্রহণীয় বলে মনে করি যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য দুনিয়ায় আপন দূত বা পয়গাম্বর পাঠিয়ে থাকেন। তারপর আলিমদ্বয় নামায ও রোযা কেন অবশ্য পালনীয় তার ব্যাখ্যা দেন। চেঙ্গিয খান বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদত করা এবং এগারো মাস পর একমাস রোযা রাখা খুবই বিবেকসম্মত। তারপর আলিমদ্বয় বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয হওয়ার যুক্তি পেশ করেন। চেঙ্গিয খান বলেন, হজ্জের প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করছি। এই পটভূমিতে কাযী আশরাফ চেঙ্গিয খান সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন।

তারপর চেঙ্গিয খান সমরকন্দে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানকার মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। এখানে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সাত বছর পর যে বিজয়ী বীরপুরুষ অনেকগুলো ইসলামী দেশ দখল করে এবং লক্ষ কোটি মুসলমানের রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে আপন জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে ইসলামের আকীদাকে মেনে নেওয়ার কারণে তিনি (ধর্মের দিক দিয়ে) বিজয়ী হিসাবে নন বরং বিজিত বেশেই দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। চেঙ্গিয খানের পৌত্র এবং তূলি খানের পুত্র ঈলা খান ও ইলাকূ খানের বয়স তখন ছিল যথাক্রমে দশ ও এগারো বছর। চেঙ্গিয খানের এই দুই পৌত্র দাদার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসে। রাস্তায় তারা একটি খরগোশ ও একটি ভালুক শিকার করে। যেহেতু এটাই ছিল এই ছেলেদের প্রথম শিকার, তাই চেঙ্গিয খান সে খুশিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আপন সেনাবাহিনীকে ভুঁরিভোজে আপ্যায়িত করেন। চেঙ্গিয খানের মুঘলিস্তানে ফিরে আসার একটি কারণ এও ছিল যে, সেখানে কিছু সংখ্যক মুঘল আমীর তার সম্পর্কে বিদ্রোহ ভাব প্রকাশ করেছিলেন। চেঙ্গিয খান মুঘলিস্তানে পৌঁছেই বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধবাদী মুঘলদেরকে খুব ভালভাবে শায়েস্তা করেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

সমস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলার পর চেঙ্গিয খান আপন পুত্র, পৌত্র ও অধিনায়কদের একত্র করে বললেন, খুব সম্ভবত আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। আমি তোমাদের জন্য একটি বিরাট দেশ জয় করে দিয়েছি। এখন বলো, আমি এমন কাকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন করব, যাকে তোমরা সবাই সানন্দচিত্তে মেনে নেবে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে। সবাই এক বাক্যে বলে ওঠে, আমরা আপনার অনুগত। আপনি যাকেই আপনার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবেন আমরা তারই আনুগত্য স্বীকার করে নেব। চেঙ্গিয খান বলেন, যদি তোমরা এ বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিয়ে থাক তাহলে আমি উকতাই খানকেই

আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করছি। এখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য তার আনুগত্য স্বীকার করা। তারপর তিনি নির্দেশ দেন, কুবুল খান ও কাচূলী বাহাদুরের ঐ অঙ্গীকার পত্র বের কর, যার উপর তূমনাহ খানের মুহর রয়েছে। যা হোক অঙ্গীকার পত্রটি বের করে তিনি সবাইকে দেখান এবং তার উপর সকলের স্বাক্ষর নেন। তারপর তিনি নির্দেশ দেন, কারচান, দাশতে খাযর, আলান, রুশ এবং বালগারের (বুলগেরিয়ার) উপর জূজী খানের এবং মাওরাউন নাহর, খাওয়ারিযম, কাশগড়, বাদাখশান, বল্খ, গযনী ও সিন্ধুনদের উপকূল এলাকার উপর চুঘতাই খানের হুকুমত থাকবে। আর কারাচার চুঘতাই খান ও আমীর কারাচারের মধ্যে সেই সম্পর্ক বহাল থাকবে, যে সম্পর্ক আমার এ কারাচারের মধ্যে ছিল। অর্থাৎ চুঘতাই খান বাদশাহ এবং আমীর কারাচার তার সেনাপতি থাকবে এবং তারা একে অপরের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলবে। তিনি কারাচার ও তুঘতাই খানের মধ্যে এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র লেখিয়ে নিয়ে তার উপর নিজেও স্বাক্ষর করেন। আমীর কারাচার ছিলেন কাচূলী বাহাদুরের প্রপৌত্র। তিনি মুঘলিস্তানের একটি অংশ তুলি খানের হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, উকতাই খানের সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও অধিনায়কত্ব তুলি খানের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। তিনি আরো নির্দেশ দেন, তোমরা সকলে তোমাদের বড় ভাই উকতাই খানকে নিজেদের বাদশাহ মনে করবে এবং সর্বদা তার বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে। এভাবে আপন পুত্রদের সম্পর্কে ওসীয়ত করার পর তিনি আপন ভাই উতাগীন, মাগূজীন, আদাল জানকীন এবং অন্যান্যকে তৎকালীন 'খাতা' অঞ্চলটি দান করেন।

চেঙ্গিয খানের মৃত্যু

তারপর ৬২৪ হিজরীর রমযান (৬২৭ খ্রি সেপ্টেম্বর) মাসে চেঙ্গিয খান পঁচিশ বছর হুকুমত করার পর তিহাত্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তার অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী তাকে একটি গাছের নীচে সমাধিস্থ করা হয়। তার কবরের পার্শ্ববর্তী সমগ্র ভূখণ্ডে প্রথম বছরই এত গাছ জন্মায় যে, তা একটি অনতিক্রম্য জঙ্গলে পরিণত হয়। তারপর কেউই বলতে পারত না, তার কবরটি ঠিক কোথায় রয়েছে। উল্লিখিত চার পুত্র ছাড়া চেঙ্গিয খানের আরো পুত্র ছিল। তারা ঐ চারপুত্রের কারো না কারো কাছে প্রতিপালিত হয়। চেঙ্গিয খান রাশিয়া, মস্কো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশও জয় করেছিলেন। যেহেতু ইসলামী ইতিহাসের সাথে ঐ সমস্ত দেশের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই তাই ঐ বিজয় অভিযানের বর্ণনা এর সাথে সংযুক্ত করা হলো না।

চেঙ্গিয খানের শাসনামল সম্পর্কে একটি সমীক্ষা

চেঙ্গিয খান মুঘল বংশের একজন অতি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। তার কারণেই মুঘল বংশ সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। তিনি দেশ শাসনের অত্যন্ত সুন্দর ও সুদৃঢ় বিধানাবলী রচনা করেন। তিনি এটা ভালভাবে জানতেন যে, মুঘল বংশের মত একটি বর্বর ও মূর্খ জাতিকে কখনো অকর্মণ্য করে রাখা উচিত নয়। অন্যথায় তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-

বিগ্রহ করে আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব কথা চিন্তা করে তিনি একদিকে মুঘলদেরকে অত্যন্ত যত্নসহকারে একতার ঐক্যের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে এমন সব আইন-কানুন চালু করেন, যাতে মুঘলবাহিনী কখনো বেকার বসে না থাকে। তিনি একটি সার্বিক আইন গ্রন্থও রচনা করেন, যার নাম হচ্ছে 'তাওরায়ে চেঙ্গিযী তাযীরাতে চেঙ্গিযী'। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুঘলদের কাছে তাওরায়ে চেঙ্গিযীর মর্যাদা ছিল একটি ধর্মীয় তথা আসমানী কিতাবের মত। তাওরায়ে চেঙ্গিযীর মধ্যে শিকারের আইন-কানুনও লিপিবদ্ধ আছে। তাই মুঘল বাদশাহদের জন্য এটা অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যখন বিজয় অভিযান ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে অবসর পাবে তখন যেন অবশ্যই আপন সেনাবাহিনীসহ শিকারে বহির্গত হয়।

চেঙ্গিয খানের নির্বিবাধ খুনখারাবীর সাথে যখন এ বিষয়টির উপরও চিন্তা-ভাবনা করা হয় যে, তিনি খুব কমই দাম্ভিকের মত কথাবার্তা বলতেন তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। চেঙ্গিয খান যখন কোন বাদশাহের কাছে চিঠি লিখতেন তখন প্রথমত তাকে আনুগত্য স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করতেন। পরিশেষে লিখতেন, যদি তুমি আনুগত্য স্বীকার না কর তাহলে এর পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই জানেন। তিনি কখনো একথা লিখতেন না যে, আমি একটি দুর্বার বাহিনীর অধিকারী, তোমাকে ধ্বংস করে ফেলব ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তিনি দেশ জয়কেও নিজের বা নিজের বাহিনীর দিকে সম্পর্কিত করতেন না বরং বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দিয়েছেন এবং তিনিই আমাকে বাদশাহ বানিয়েছেন। তিনি তার নামের সাথে লম্বা চওড়া উপাধি ও উচ্চ প্রশংসা সম্বলিত শব্দাদি ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দিতেন না। অন্যান্য সিপাহীর মত তিনি নিজেও সব কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি স্বয়ং ঘোড়ার পিঠে চড়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতেন এবং আপন সঙ্গী অশ্বারোহীদেরকে দূর-দূরান্তের মনযিলসমূহ অতিক্রম করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, আমাদেরকে সব সময়ই কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত থাকতে হবে। কেননা এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসল রহস্য।

চেঙ্গিয খান নিজে ছিলেন দীর্ঘ ও মজবুত দেহের অধিকারী। যুদ্ধ চলাকালে তাকে সব সময়ই সম্মুখ সারিতে দেখা যেত। তিনি যেভাবে হামলা করতেন তাতে প্রতিপক্ষের সারিসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তার অসাধারণ বিজয় লাভের রহস্য একথার মধ্যেও নিহিত ছিল যে, তার পুত্রও তারই মত বীরযোদ্ধা ছিলেন। তার বিজয় লাভের একটি বড় কারণ এও ছিল যে, তিনি মুঘল গোত্রগুলোর মধ্যে যারা তার প্রধান সাহায্যকারী ছিল তাদের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পর ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

চেঙ্গিয খান পাঁচটি বিবাহ করেছিলেন। তার পাঁচজন স্ত্রী ছিলেন পাঁচটি গোত্র ও পাঁচটি বংশের সাথে সম্পর্কিত। তাই স্বাভাবিকভাবে তার পাঁচটি শ্বশুর বংশ তাকে নিজেদের আপন লোক বলে মনে করত এবং সব সময় তার সাহায্যে এগিয়ে আসত। 'তাওরায়ে চেঙ্গিযী'-এর মধ্যে একটি কানুন বা বিধান এও ছিল যে, বাদশাহ যখন কোন শহর জয় করবেন তখন প্রথমে সেখানে পাইকারী হত্যা চালাবেন। যখন সেনাবাহিনী অবাধে হত্যাকাণ্ড চালাবার

সুযোগ পেয়ে যায় এবং অনেক লোক তাদের হাতে নিহত হয় তখন শান্তি ও নিরাপত্তার ফরমান জারি করে সেখানে যথারীতি শাসনকর্তা নিয়োগ করা উচিত। এর পিছনে খুব সম্ভবত এই যুক্তি রয়েছে যে, সেখানকার প্রজারা বিজয়ীদের সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতে কখনো বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার চিন্তাও করবে না। চেঙ্গিয খান তার এই নীতি সব সময়ই কার্যকর করেছেন। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ যুগের সভ্য দুনিয়ায় অবাধ্যতা ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এমনি একটি সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন বাদশাহই বিদ্রোহীদের ফিতনা থেকে রক্ষা পেতেন না। ফলে সব দেশেই, বলতে গেলে রাত-দিন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ লেগে থাকত। আলাভী, ইরানী, শীআ ও ফাতিমীদের বিদ্রোহী তৎপরতা কোন যুগেই বন্ধ হয়নি। ইসলামী বিশ্বের এই পরিস্থিতি এবং বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী থেকেও চেঙ্গিয খান এই শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ভীতিগ্রস্ত রাখতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে চেঙ্গিয খান যথেষ্ট সুফলও পেয়েছিলেন।

মুঘলরা বাগদা, ইরাক এবং আরব ও হিন্দুস্থান ছাড়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপ মহাদেশেরও কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিলেন। মুঘলদের হাতে ইসলামী সাম্রাজ্যই বেশি ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের তরবারির তলে মুসলমানরাই বেশি শাহাদাতবরণ করেছে। তখন বাহ্যত মনে হচ্ছিল যে, মুঘলদের হাতে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। কিন্তু ইসলামের রক্ষক যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং শরীয়তে ইসলামও এমন বস্তু নয় যে, কোন জড়শক্তি তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই দুষ্কৃতিকারী মুসলমানরা মুঘলদের হাতে ধ্বংস হয়েছে এবং মুঘলদের তরবারি তাদেরকে অলস নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোন ক্ষতি মুঘলরা করতে পারেনি, বরং কিছু দিন পর স্বয়ং তারাই ইসলামের গোলাম ও খাদিমরূপে প্রতিভাত হয়েছে। মুঘলদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তি ও পরাক্রম দেখে খ্রিস্টানরাও এই চেষ্টা করেছিল যে, যেন মুঘলরা খ্রিস্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সেই আকর্ষণ শক্তি কোথায় যে, সে বিজয়ী ও বীরযোদ্ধা জাতিকে নিজের খাদিম ও দাসে পরিণত করার এবং তাকে নিজের মধ্যে একাত্ম করে নেবে? প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে মুঘলরা ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। তাদের পিতৃপুরুষ– যাদের বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের জানা নেই– কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা অযথা শত্রুতা পোষণ করত না। এই জাতিকে আল্লাহ তা'আলা মুঘলিস্তানের পাহাড় থেকে এ জন্য বের করে এনেছিলেন যাতে তারা বিজয়ী বেশে এশিয়া মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে তারপর দীন ইসলামের আলোকে নিজেদের আলোকিত করার সুযোগ পায়। চেঙ্গিয খান এবং তার জাতির অস্তিত্বও ইসলামের সত্যতার একটি বিরাট দলীল। ইসলাম যেমন একটি বিজিত জাতির উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে ঠিক সেরূপ প্রভাব বিস্তার করে একটি বিজয়ী জাতির উপর। আরবরা বলতে গেলে সমগ্র সভ্য জগত জয় করে এবং প্রত্যেক দেশেই বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে ইসলামের এক একজন শিক্ষকে পরিণত হয়। কিন্তু

মুঘলরা মুসলমানদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ইসলামের ঐ প্রভাবকে গ্রহণ করে এবং ইসলামের সামনে পরাজিতের ন্যায় নিজেদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উকতাই খান

চেঙ্গিয খানের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র উকতাই খানকে মুঘলদের শাহানশাহ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর তার ভাই ঐ সমস্ত এলাকা বা দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, যা চেঙ্গিয খান তার জন্য চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। দু'বছর পর উকতাই খান তার সকল ভাইকে তলব করেন এবং সে উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। যখন সকলে এসে উপস্থিত হন তখন তিনি তার ভাইদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আমি কাআন তথা শাহানশাহের পদে ইস্তফা দিচ্ছি। তোমরা যাকে ভাল মনে কর তাকেই নিজেদের শাহানশাহ মনোনীত কর। কিন্তু চুঘতাই খান এবং অন্যান্য ভাই ও সর্দাররা তাকে জোর করে সিংহাসনের উপর বসিয়ে দেন এবং সে উপলক্ষে (মুঘলদের প্রচলিত প্রথামতে) সূর্যের পূজা করেন। তারপর জূজী খানের পুত্র হাতু খান, পৌত্র কুয়ূক খান এবং তুলি খানের পুত্র মালূক খানের অধিনায়কত্বে রুশ, চারকাস ও বুলগেরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। এই রাজকুমাররা হিজরী ৬৩৩ সনে (১১৩৫-৩৬ খ্রি) সাত বছর অবিরাম চেষ্টার পর ঐ সমস্ত দেশ জয় করেন। সেনাপতি আরগুন খানকে খুরাসানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তিনি ঐ সমস্ত শহর পুনরায় গড়ে তোলেন যেগুলো মুঘলদের আক্রমণের ফলে জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে।

চেঙ্গিয খানের পুত্র উকতাই খান অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও পুণ্যবান লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। মুসলমানদের সাথে উকতাই খানের অত্যন্ত ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি মুসলমানদেরকে সম্মানের পাত্র মনে করতেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। কথিত আছে, একদা উকতাই খান ও চুঘতাই খান একসাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা দেখতে পান যে, একজন মুসলমান ডুব দিয়ে নদীতে গোসল করছে। চুঘতাই সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুসলমানকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। (কেননা মুঘলদের প্রচলিত প্রথা মতে ডুব দিয়ে গোসল করা মহাপাপ)। কিন্তু উকতাই খান তখন বললেন, ওকে বন্দী করে নিয়ে চল। এখানে একাকী নয়, বরং সাধারণ্যে তাকে হত্যা করা হবে। পথিমধ্যে উকতাই খান চুঘতাই খান থেকে পৃথক হয়ে ঐ মুসলমান বন্দীকে বললেন, তুমি এ কথা বলবে যে, আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে ছিল। ডাকাতদের ভয়ে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্য আমি নদীতে ডুব দিয়েছিলাম। যা হোক ঐ মুসলমানকে বিচারের জন্য যখন সর্বসমক্ষে হাযির করা হয় তখন সে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে সে কথাই বলে, যা উকতাই খান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে চুঘতাই খান ঐ স্বর্ণ মুদ্রার থলে খুঁজে বের করার জন্য সেখানে লোক পাঠান। কিন্তু যেহেতু উকতাই খান পূর্ব থেকেই সেখানে একটি থলে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাই সন্ধানীরা সত্যি সত্যি সেখান থেকে একটি থলে

বের করে নিয়ে আসে, যার ফলে মুসলিম বন্দীর জবানবন্দী সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আর এই সূত্র ধরে উকতাই খান ঐ স্বর্ণমুদ্রার থলে এবং পুরস্কার স্বরূপ সেই সাথে আরো কয়েকটি থলে দিয়ে ঐ মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করে দেন। এভাবে তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই মুসলমানদের উপকার সাধন করতেন। কিন্তু অন্য মুঘলরা ছিল মুসলমানদের শত্রু এবং যে কোন ছলছুঁতায় তাদের ক্ষতিসাধনে আগ্রহী।

একদা জনৈক ব্যক্তি উকতাই খানের কাছে এসে বলল, আমি রাতের বেলা মহান কাআন চেঙ্গিয খানকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র উকতাই খানকে আমার এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও যে, আমার একান্ত ইচ্ছা, দুনিয়া থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা যেন মুছে ফেলা হয় এবং তাদের হত্যার ব্যাপারে যেন কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা না হয়। উকতাই খান তখন বলে উঠেন, তুমি কি মুঘলাই ভাষা জান? সে উত্তর দিল— জানি না, আমি শুধু ফারসী ভাষা বুঝি এবং ফারসী ভাষায় কথা বলতে পারি। উকতাই খান তখন বললেন, চেঙ্গিয খান তো মুঘলাই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। আর ফারসী ভাষায় তো তিনি মোটেই কথা বলতে পারতেন না। তাহলে তুমি তার কথা বুঝলে কি করে ? এই বলেই তিনি নির্দেশ দেন, একে হত্যা করে ফেল। কেননা সে একজন মিথ্যাবাদী এবং চেঙ্গিয খানের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী। অতএব ঐ লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

উকতাই খান সম্পর্কে সাধারণভাবে এই ধারণা করা হয় যে, তিনি প্রকাশ্যে মুসলমান না হলেও গোপনীয়ভাবে ইসলামকে একটি সত্য মাযহাব বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তার রাজধানী ছিল কারাকোরাম। সমগ্র বিশ্বের ধনসম্পদ নিয়ে কারাকোরামে একত্র করা হয়েছিল। তাই কারাকোরামের ধন-ভাণ্ডার ছিল হীরা-জহরতে একেবারে টইটম্বুর। উকতাই খানের বদান্যতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, সুদূর খুরাসান এবং সিরিয়ার লোকও তার বদান্যতার খ্যাতি শুনে কারাকোরামে চলে আসত এবং উকতাই খানের নিকট থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে খুশি মনে দেশে ফিরে যেত। পিতা যেভাবে জুলুম ও রক্তারক্তির মাধ্যমে ধন-দওলত সংগ্রহ করেছিলেন পুত্র তেমনি প্রেম-ভালবাসা ও আল্লাহভীরুতার পথে তা জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং ফলশ্রুতিতে মুঘলদের বাড়াবাড়ি ও পাষাণ হৃদয়তার কারণে জনসাধারণ তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেও উকতাই খানের বদান্যতা ও ঔদার্যের কারণে পুনরায় তাদেরকে ভালবাসতে শুরু করে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিয খান হলেও সেটার ভিত্তি স্থায়ী ও সুদৃঢ় করছিলেন উকতাই খান।

কুয়ূক খান

যখন উকতাই খানের মৃত্যু হয় তখন তার পুত্র কুয়ূক খান কারাকোরামে ছিলেন না। মুঘলরা তাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উকতাই খানের স্ত্রী তূরকীনা খাতুনকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করে, যাতে কুয়ূক খান রাজধানীতে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি না হয়। কুয়ূক খান যখন কারাকোরামে আসেন তখন মুঘলদের

প্রচলিত রীতি এবং তাওরায়ে চেঙ্গিযীর বিধান অনুযায়ী রাজসিংহাসন সম্পর্কে কিছু বলেননি, বরং সাধারণভাবে কালযাপন করতে থাকেন। স্বয়ং সুলতানা তূরকীনা খাতুন সব দেশে দাওয়াতনামা পাঠান এবং তৎকালীন বিশ্বের সকল সুলতানকেই আমন্ত্রণ জানান। অতএব খুরাসান, ইরান, কাবচাক, রোম, বাগদাদ, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সুলতানের দূতেরা কারাকোরামে আসেন। চেঙ্গিয খানের সন্তান-সন্ততিরা তো সকলেই রাজধানীতে বিদ্যমান ছিলেন। বাগদাদের খলীফা ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য নিজের পক্ষ থেকে 'কাযিউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) ফখরুদ্দীনকে পাঠান। খুরাসান থেকে আমীর আরগূন, রোম থেকে সুলতান নূরুদ্দীন সালজুকী, আলামূত ও কুহিস্তান থেকে শিহাবুদ্দীন উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইউরোপের খ্রিস্টান বাদশাহদের পক্ষ থেকেও দূতেরা আসে। মুসলমান অধিনায়কদের জন্য দু'হাজার তাঁবু স্থাপন করা হয়। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে,উক্ত অনুষ্ঠানটি কত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তারপর মজলিস বসে এবং বাদশাহ নির্বাচনের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। সবাই কুয়ূক খানকে নির্বাচন করেন। তুলি খানের পুত্র মানকূ খান কুয়ূক খানকে হাত ধরে সিংহাসনে বসান এবং তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। কুয়ূক খানের স্ত্রী ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা। এ কারণে ইউরোপের খ্রিস্টান দূতদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বাতিনীদের দূতদের প্রতি কুয়ূক খান অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে মজলিস থেকে বের করে দেন।

মুসলমানদেরকেও আদর-আপ্যায়ন করা হয়। কিন্তু খ্রিস্টানরা কুয়ূক খানকে মুসলিম বিদ্বেষী করে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয় যে, তারা একদা কুয়ূক খানের হাত দিয়ে এই মর্মে একটি ফরমান লিখিয়ে নেয় যে, মুসলমানদেরকে হত্যা এবং দুনিয়া থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য যেন সকল সর্দার ও অধিনায়ক নিজেদের প্রস্তুত করে নেয়। কিন্তু এই নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে যখন তিনি বাইরে বের হন তখন তার শিকারী কুকুর অকস্মাৎ তার উপর হামলা করে বসে এবং তার দু'টি অণ্ডকোষই কামড়িয়ে দেয়। কুয়ূক খান কুকুরের এই আক্রমণে মরেন নি, বরং মারাত্মকভাবে আহত হন। তারপর খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলার দুঃসাহস করেনি।

কুয়ূক খানের মৃত্যু

কিছু দিন পর কুয়ূক খান সমরকন্দে গিয়ে মারা যান। যে সময়ে উকতাই খান জীবিত ছিলেন তখন তার ছোট ভাই তুলি খান (যিনি চেঙ্গিয খানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন) তার সাথে থাকতেন এবং তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন। তুলি খানের সাথে উকতাই খানের অত্যন্ত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। একদা উকতাই মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লে তুলি খান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানান– হে প্রভূ! আমার ভাইকে বাঁচিয়ে তোল। যদি তার মৃত্যুর সময় এসে গিয়ে থাকে তাহলে তার জায়গায় আমাকে উঠিয়ে নাও। আশ্চর্যের বিষয়, ঐদিন থেকে উকতাই খান ক্রমশ আরোগ্য লাভ করতে থাকেন এবং একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। অপরদিকে তুলি খান রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং রোগ

ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তুলি খানের চারপুত্র ছিল। যথা–মানকূ খান, কুবালাঈ খান, আরতাক বুকা এবং হালাকূ খান। উকতাই খান তার এই চার ভাতিজাকে খুবই স্নেহ করতেন। তারপর কুয়ূক খানও আপন এই চাচাত ভাইদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কুয়ূক খানের মৃত্যুর পর চেঙ্গিযী বংশের মধ্যে বাতূখান ইব্‌ন জূজী খান বাদশাহ কাবচাক সর্বাধিক শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সবাই বাতূখানকে বলল, এখন বলুন, কাকে সিংহাসনে বসানো হবে। বাতূখান এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কুয়ূক খানের পর মানকূ খানের চাইতে রাজসিংহাসনের যোগ্য আর কেউ নেই। বেশির ভাগ অধিনায়কই তার এই সিদ্ধান্তকে পছন্দ করেন। কিন্তু কেউ কেউ এর বিরোধিতা করে। পরে অবশ্য কিছুটা তর্ক-বিতর্কের পর মানকূ খানকেই সিংহাসনে বসানো হয়।

মানকূ খান

মানকূ খান আপন ভাই কুবলাঈ খানকে 'খাতা' অঞ্চলের হুকুমত প্রদান করেন। আর অপর ভাই হালাকূ খানকে এক বাহিনী দিয়ে ইরান অভিমুখে প্রেরণ করেন। মানকূ খানের সিংহাসন আরোহণ অনুষ্ঠান পালিত হয় ৬৪৮ হি. (১২৫০ খ্রি) সনে। মানকূ খান মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলন এবং তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

মানকূ খানের মৃত্যু

সাত বছর রাজত্ব করার পর মানকূ খান ৬৫৫ হি. (১২৫৭ খ্রি) মৃত্যু মুখে পতিত হন। মানকূ খান তার শাসনামলের শেষ বছরে চীন সম্রাটকে লিখেন– তুমি আমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার কর। কিন্তু চীন-সম্রাট তা অস্বীকার করেন। ফলে মানকূ খান চীনদেশ আক্রমণ করেন।

কুবলাঈ খান

এই সফরেই চানকান্দ নামক স্থানে মানকূ খানের মৃত্যু হয়। তার ভাই কুবলাঈ খান সঙ্গে ছিলেন। সেনা-অধিনায়করা সর্বসম্মতিক্রমে চানকান্দ নামক স্থানে তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই খবর পৌঁছার পর আরতাকী বুকা রাজধানী কারাকোরামে রাজমুকুট আপন মস্তকে ধারণ করেন। কুবলাঈ খান যখন কারাকোরাম অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আরতাক বুকা কারাকোরাম থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন। কালূরাম নামক স্থানে দুই ভাইয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে আরতাক বুকা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কুবলাঈ খান বিজয় বেশে কারাকোরামে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরতাক বুকা 'খাতায়' গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পুনরায় ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে আসেন। এবারও তিনি পরাজিত হন এবং কাশগড়ের দিকে পলায়ন করেন। সেখান থেকে পুনরায় নিজের অবস্থাকে শুধরিয়ে আসেন। মোট কথা, চার বছর পর্যন্ত আরতাক বুকা এবং কুবলাঈ খানের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আরতাক বুকা বন্দী হন এবং এই বন্দী অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

কুবলাঈ খান ৬৫৫ হিজরীতে (১২৫৬ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে হালাকূ খানের কাছে নির্দেশ পাঠান– জাইহূন নদী থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তোমার এবং এই এলাকা তোমার কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হলো। আরতাক বুকা এবং কুবলাঈ খানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মুঘলদের কেন্দ্রীয় হুকুমত ও কারাকোরাম দরবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত সর্দার বা অধিনায়ককে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল তারা নিজেদেরকে আপন আপন এলাকার স্বাধীন বাদশাহ বলে ভাবতে শুরু করে। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন চেঙ্গিযী বংশের কয়েকজন শাহযাদা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ মুঘলদের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে।

আরতাক বুকার হাঙ্গামা শেষ হওয়ার পর কুবলাঈ খান চীনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং কয়েক বছর যুদ্ধ করার পর সমগ্র চীন দেশ জয় করে সেখানে 'খান বালীগ' নামক একটি শহরের পত্তন করেন এবং কারাকোরাম থেকে সেখানেই আপন রাজধানী স্থানান্তর করেন। তারপর তিনি মাইল্যান্ড, বার্মা, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে কর আদায় করেন।

কুবলাঈ খান চারটি ধর্ম ও চারটি জাতি থেকে চারজন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। তন্মধ্যে আমীল আহমদ বানাকতী নামীয় একজন মুসলমান মন্ত্রীও ছিলেন। সব সুলতানই কুবলাঈ খানের হুকুমত ও সাম্রাজ্যকে স্বীকার করতেন। মুঘলদের সালতানাত চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন ইসলামী সালতানাত খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিল। তাই খ্রিস্টান, মাজুসী ও ইহুদীরা মুঘল দরবারে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতাসীন মুঘলদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। সম্ভবত এ কারণেই একদা হালাকূ খানের পুত্র আবা খান খুরাসান থেকে কুবলাঈ খানের খিদমতে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান যে, আমাকে ইহুদী ও মাজুসীরা বলেছে, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে নাকি লেখা আছে, মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। কুরআনের এই শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? অর্থাৎ মুসলমানদের বিশ্বাস যদি এই হয় যে, তারা আমাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে তাহলে তো মুসলিম জাতিকে দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। কুবলাঈ খান ঐ স্মারক পত্রটি পড়ে কিছু সংখ্যক উলামাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন– কুরআনে কি সত্যি সত্যি এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে? তারা উত্তর দেন, হ্যাঁ এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে। কুবলাঈ খান তখন জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তোমরা হত্যা করছ না কেন ? তারা উত্তর দেন, আমাদের সে শক্তি নেই। যখন শক্তি অর্জন করতে পারব তখন তোমাদেরকে হত্যা করব। কুবলাঈ খান বলেন, এখানে যেহেতু আমাদের শক্তি রয়েছে অতএব আমাদের উচিত তোমাদেরকে হত্যা করা। এই বলে কুবলাঈ খান ঐ উলামাবৃন্দকে হত্যা করেন এবং সেই সাথে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন– মুসলমানদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। এই খবর পেয়ে মাওলানা বদরুদ্দীন বায়হাকী এবং মাওলানা হাকীমুদ্দীন সমরকন্দী কুবলাঈ খানের দরবারে যান এবং তাকে বলেন, আপনি মুসলমানদের পাইকারী হত্যার নির্দেশ জারি করেছেন কেন? কুবলাঈ খান উত্তর দেন, 'উকতুলুল মুশরিকীন'

(মুশরিকদের হত্যা কর) কুরআনের এই আয়াতের অর্থ কি? উভয় উলামাই উত্তরে বলেন, আরবের মূর্তি পূজারীরা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকত, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ওদেরকে হত্যা কর। আল্লাহ্র এই নির্দেশ তো তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তোমরা আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়াত তথা একত্বে বিশ্বাসী এবং তোমরা তোমাদের ফরমানসমূহের শিরোনামে সর্বদা আল্লাহ্র নাম লিখে থাক। তাদের এ কথা শুনে কুবলাঈ খান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তখনি সর্বত্র এ নির্দেশ জারি করেন ঃ আমার প্রথম নির্দেশ, যা মুসলমানদের সম্পর্কে জারি করেছিলাম তা এতদ্দ্বারা রহিত বলে মনে করবে।

এই ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, ধর্মের মুকাবিলায় মুঘলদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক ও ভয়ংকর। তাদের মধ্যে সভ্যতা ও মনন শক্তি যতই উন্নতি লাভ করতে থাকে তারা ইসলামকে জানার প্রতি ততই আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং দলে দলে তা গ্রহণও করতে থাকে। মুঘলদেরকে ইসলাম থেকে রুখে রাখার জন্য অন্য সকল ধর্মের পুরোহিতরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু মুঘলরা যেহেতু খোলা মনের অধিকারী ছিল এবং তাদের চোখে সকল ধর্মেরই মর্যাদা ছিল সমান, তাই যে কোন ধর্মকে খতিয়ে দেখার ব্যাপারে তাদের প্রবঞ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। আর এ কারণেই দেখা যায়, তাদের মধ্যে যারা ছিল বুদ্ধিমান ও অভিজাত শ্রেণীর তারা ইসলামকেই একটি গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

কুবলাঈ খানের মৃত্যু

কুবলাঈ খান পঁয়ত্রিশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করার পর তিহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থলে তার পৌত্র তাইমূর খান চীন দেশের সম্রাট হন। তার যুগে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা একবারে ভেঙ্গে পড়ে। ৭০০ হিজরী (১৩০০-০১ খ্রি) সনে কাআন তাইমূর খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার পরেও এই বংশের কয়েক ব্যক্তি নামকা ওয়াস্তে হুকুমতের অধিকারী হন। প্রকৃতপক্ষে তাইমূর কাআনের যুগ থেকেই কুবলাঈ খানের বংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। এবার আমরা তুলি খানের পুত্র হালাকূ খান সম্পর্কে আলোচনা করব। হালাকূ খান ছিলেন ইরান ও খুরাসানের শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং তার হাতেই বাগদাদ ধ্বংস হয়।

হালাকূ খান

যখন কারাকোরামে মানকূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার কাছে এই অভিযোগ পৌঁছে যে, বাতিনী ইসমাঈলী ফিরকার দুষ্কর্ম একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ ধরনের প্রতিটি ব্যক্তিরই শত্রু, যিনি কোন রাজত্ব বা সিংহাসনের মালিক কিংবা যিনি সফল নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্বের কারণে বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত। ফলে আমীর-উমারা ও সামরিক অধিনায়করা এসব ফিদায়ী তথা বাতিনীদের ভয়ে সদা-সন্ত্রস্ত। এই সাথে মানকূ খানের কাছে এই সংবাদও পৌঁছে যে, বাগদাদের খলীফাকে যদিও বাহ্যত দুর্বল মনে হয়, কিন্তু তাঁর সম্মান ও ক্ষমতা এই পর্যায়ের যে, যদি তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান তাহলে তাকে দমন করা মুঘলদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব মানকূ

কাআন আপন ভাই হালাকূ খানকে এক লক্ষ বিশ হাজার মুঘল সৈন্যের এক চৌকস বাহিনীসহ প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন— জাইহূন নদী থেকে মিসর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড তোমার অধীনে দেওয়া হচ্ছে। যদি বাগদাদের খলীফা আপোস চুক্তির উপর কায়েম থাকেন তবে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে না। আর যদি তার মতিগতি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার মূলোৎপাটনে তুমি মোটেই ইতস্তত করবে না। আর হ্যাঁ, ইসমাঈলীদের বাদশাহ আলামূত দুর্গে অবস্থান করছেন। তুমি তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই ইসমাঈলীদেরকে খুব ভালভাবে শায়েস্তা করা দরকার। হালাকূ খানের সাথে সেনাধিনায়ক আমীর কারাচারের পুত্র আমীর ঈচলকে পাঠানো হয়।

হালাকূ খান ৬৫১ হি. সনে (১২৫৩ খ্রি) খুরাসান ও ইরানে এসে পৌঁছেন। সেখানে আযারবায়জান, গার্জিস্তান প্রভৃতি দেশের সুলতানরা তার খিদমতে হাযির হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। হালাকূ খান খুরাসান পৌঁছে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রথমে বেদীন ইসমাঈলীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং একের পর এক তাদের দুর্গগুলো দখল করতে শুরু করেন। তখন ইসমাঈলীদের বাদশাহ রুকনুদ্দীন খুরশাহকে বন্দী করে হালাকূ খানের সামনে হাযির করা হয়। হালাকূ খান খুরশাহকে কারাকোরামে মানকূ খানের খিদমতে প্রেরণ করেন। তবে যে সব লোকের হিফাযতে তাকে প্রেরণ করা হয় তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তারা রাস্তায়ই তাকে খতম করে ফেলে। বাস্তবেও তাই ঘটল। রুকনুদ্দীন খুরশাহের পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীদের সবাইকে পথিমধ্যেই হত্যা করে ফেলা হয়। কিন্তু খাজা নাসীরুদ্দীন তুসী, যিনি খুরশাহের অন্যতম মুসাহিব ছিলেন, আপন কথার মারপ্যাচে এবং কুটচালের মাধ্যমে হালাকূ খানের মুসাহিবদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইসমাঈলীদের সমগ্র ধনভাণ্ডার মুঘলরা হাতিয়ে নেয় এবং তাদের সাম্রাজ্যও ধ্বংস করে ফেলে। তারপর নাসীরুদ্দীন তুসী হালাকূ খানকে বাগদাদ আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন এবং বাগদাদের খলীফার মন্ত্রী আলকামীও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাসীরুদ্দীনের মাধ্যমে হালাকূ খানের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলে বাগদাদ অচিরেই একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে তারীখ-ই-ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে ঐ হৃদয় বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। হালাকূ খান বাগদাদ থেকে কল্পনাতীত ধন-সম্পদ নিয়ে মারাগা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি সেখান থেকে প্রচুর সোনাদানা ও হীরা-জহরত এবং অসংখ্য দাসী-বাঁদী মানকূ খানের খিদমতে কারাকোরামে প্রেরণ করেন। তখন পারস্যের শাসনকর্তা আতাবেক সাদ ইব্‌ন আবূ বকর, মুসিলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লূলূ এবং রূমের শাসনকর্তা সুলতান আযীযুদ্দীন সালজুকী হালাকূ খানের খিদমতে হাযির হয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ৬৫৭ হি. সনের ২০শে রমযান (সেপ্টেম্বর ১২৫৯ খ্রি) জুমুআর দিন হালাকূ খান কয়েকজন বিখ্যাত অধিনায়কের নেতৃত্বে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে সিরিয়ার দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। ঐ দলটি নাসীবীন, হার্রান, আলেপ্পো প্রভৃতি শহর জয় এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে দামেশকে গিয়ে পৌঁছে। তারা দামেশক জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করে।

তারপর সমগ্র সিরিয়া দখল করে। হালাকূ খান কাসূকা নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে খুরাসানে ফিরে আসেন। মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ করে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। ঐ সংবাদ শুনে হালাকূ খান অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সিরিয়া আক্রমণ করে মিসরীয়দেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেন। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে তার কাছে মানকূ খানের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছে। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। আর তা এই যে, বাদশাহ কাবচাক বারাকাহ খান ইব্‌ন জূজী খান এবং হালাকূ খানের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হালাকূ খানের কাছে বারাকাহ খানের জনৈক নিকটাত্মীয় ছিল। হালাকূ খান তাকে হত্যা করে ফেলেন। বারাকাহ খান এই সংবাদ শুনে বললেন, হালাকূ খান বাগদাদের খলীফাকে হত্যা করেছেন এবং বিনা কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকেও হত্যা করেছেন। আমি তার উপর থেকে ঐ সমস্ত নিরপরাধ লোকের প্রতিশোধ নেব। এই বলে তিনি হালাকূ খানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ৬৬০ হি. (১২৬১-৬২ খ্রি) সনে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হালাকূ খান তাতে পরাজিত হন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬৬১ সনে (১২৬২-৬৩ খ্রি) স্বয়ং হালাকূ খান বারাকাহ্ খানের মুকাবিলা করতে আসেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বারাকাহ খানের বাহিনী পরাজিত হয়। হালাকূ খান জয়ী হন বটে, কিন্তু এর কিছুদিন পরই বারাকাহ্ খান হালাকূ খানের উপর হামলা চালিয়ে তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের কারণে হালাকূ খান মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ঐ সময়ে আমীর ঈচল মারাগায় মৃত্যুবরণ করেন। মুঘলরা সিরিয়া জয় করে সেখানে কারামাতার সম্প্রদায়সমূহের বসতি গড়ে তোলে।

হালাকূ খানের মৃত্যু

এবার বারাকাহ্ খান পরাজিত হওয়ার পর হালাকূ খান তার একজন অধিনায়ককে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সেখান থেকে কারামাতার গোত্রসমূহের লোকদেরকে সাথে করে নিয়ে আসেন। ঐ লোকদেরকে বারাকাহ খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। যাহোক, ঐ অধিনায়ক সিরিয়ায় গিয়ে কারামাতার গোত্রসমূহের লোকদেরকে নিজের পক্ষে টেনে নেন এবং খোদ হালাকূ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সংবাদ হালাকূ খানের কাছে যখন মারাগায় গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি এতই দুঃখিত ও মর্মাহত হন যে, একেবারে মৃত্যু ব্যাধিতেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ৬৬৩ হি. সনের রবিউল আউয়াল (জানুয়ারী ১২৬৫ খ্রি) মাসের শেষ দিকে, মোট আট বছর সাম্রাজ্য শাসন করে আটচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মারাগাহ নগরী ছিল তার রাজধানী। তিনি সেখানে নাসীরুদ্দীন তুসী এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীর সাহায্যে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। হালাকূ খান আপন পুত্র আবাকা খানকে ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি দেশের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তিনি তার অপর পুত্রকে আযারবায়জানের, সালদূযকে দিয়ারে বকর ও দিয়ারে রাবীআর শাসনকর্তা পদে এবং খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ জুইনীকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি শামসুদ্দীনের ভাই আতাউল মুল্‌ক আলাউদ্দীনকে

বাগদাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। হালাকূ খানের মৃত্যুর পর তার দাফন কার্য মুঘলদের রীতি অনুযায়ী অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সম্পন্ন করা হয়। আর তা এইভাবে যে, কবরের পরিবর্তে একটি পাতাল কক্ষ নির্মাণ করে তাতে হালাকূ খানের লাশ রাখা হয়। তারপর তাকে সঙ্গদানের জন্য বেশ কয়েকজন যুবতী মেয়েকে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলংকারে সুসজ্জিত করে ঐ কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর খুব শক্তভাবে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি লাশের সাথে এভাবে বেশ কয়েকটি নিষ্পাপ যুবতীকে একটি কক্ষের মধ্যে আটকিয়ে দেওয়া এমন একটি পাশবিক রীতি, যার কথা চিন্তা করলেও শরীর শিউরে ওঠে। হালাকূ খানের সমসাময়িককালে হিন্দুস্থানে ছিল সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের হুকুমত। হালাকূ খান সর্বদা সুলতান বলবনের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। কিন্তু হিন্দুস্থান আক্রমণ করার সাহস তার হয়নি। কোন কোন মুঘল অধিনায়ক হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছেন বটে, তবে এটা হিন্দুস্থানের দাসবংশের সম্রাটদের কৃতিত্ব যে, তারা প্রতিবারই মুঘলদের পরাজিত করে হিন্দুস্থান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এমন মুহূর্তও আসে যে, মুঘলরা হিন্দুস্থানের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কিন্তু সেখানে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা হচ্ছে সেই যুগ, যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। যখন সর্বত্রই ছিল মুঘলদের দুর্বার আক্রমণ, অমানুষিক নির্যাতন ও জয়জয়কার অবস্থা, তখন শুধু হিন্দুস্থানই ছিল এমন একটি দেশ, যেখানে একটি অতি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এবং যা মুঘলদের হস্তক্ষেপ থেকে বলতে গেলে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অক্ষত ছিল।

হালাকূ খানের মন্ত্রী ও সভাসদদের মধ্যে খাজা নাসীরুদ্দীন তুসী ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন ইসমাঈলী ও বাতিনীদের দ্বারা প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষিত। তার এক গ্রন্থের নাম 'আখলাকে নাসিরী'। আলামূতের বাদশাহ নাসিরুদ্দীনের নামে তিনি এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাহবাতী'ও তারই রচিত।

আবাকা খান

হালাকূ খান মারাগায় মৃত্যুবরণ করার পর আমীর ও সভাসদরা সেখানে একটি বিরাট মজলিসের আয়োজন করে হালাকূ খানের পুত্র আবাকা খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আবাকা খান সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করেন এবং বলেন– মুঘলদের শাহানশাহ কুবলাঈ খান যতক্ষণ অনুমতি না দেন ততক্ষণ আমি সিংহাসনে আরোহণ করতে পারি না। কিন্তু সর্দাররা তার এই আপত্তি গ্রহণ করেনি। তারা জোর করেই তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। আবাকা খান হিজরী ৬৬৩ সনের ২রা রমযান (জুলাই ১২৬৫ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাধিনায়ক ও সাধারণ সৈন্যদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং আপন ভাই বাশমূতকে শেরওয়ানীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি তার অপর ভাই তাশীনকে মাযিন্দারান ও খুরাসানের এবং তূরান বাহাদুর ইব্‌ন সানজাককে রূমের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি তূরান ইব্‌ন এলাকানকেও রূমেরই একটি অঞ্চলের

শাসনকর্তা করে পাঠান। আবাকা খান আরগূন আকাকে আপন অর্থমন্ত্রী এবং খাজা শামসুদ্দীন জুইনীকে আপন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি আপন পুত্র আরগূন খানের 'আতালিকী' তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানসে মেহেরতাক নূইয়া বারলাস-এর হাতে ন্যস্ত করেন। আবাকা খান সিংহাসনে আরোহণ করার পর বারাকাহ্ খানের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। এভাবে যুদ্ধ চলাকালেই বারাকাহ খানের মৃত্যু হয়। তারপর আবাকা খানের অধিনায়ক ও আত্মীয়-স্বজনরা চতুর্দিক থেকে তার দেশের উপর হামলা চালায়। বুরাক খান চুঘতাঈ খুরাসান দখল করে নেন। এ কারণে তার সাথে কয়েকটি যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত আবাকা খান জয়ী হন এবং ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই তিনি মিসরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন তখনই তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মিসর এবং হিন্দুস্থান আবহাওয়া ও অধিবাসীদের দিক দিয়ে বীরত্বের ক্ষেত্রে খুব একটা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী না হলেও এবং উভয় দেশই দাস বংশের দ্বারা শাসিত হলেও দুর্বার মুঘল বাহিনীকে আর কোন দেশে নয় বরং শুধু এ দু'টি দেশেই বার বার পরাজয়বরণ করতে হয়েছিল।

আবাকা খানের মৃত্যু

সতর বছর রাজত্ব করার পর আবাকা খান ৬৮০ হি. সনে (১২৮১ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন শায়খ সাদী সিরাজী এবং মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর অত্যন্ত ভক্ত। তিনি স্বয়ং ঐ দুই ব্যক্তির দরবারে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন। আবাকা খানের পর তার পুত্র তেকূদার আগলান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তেকূদার আগলান ওরফে আহমদ খান

তেকূদার আগলান শাহযাদা থাকাকালে ইসলামী চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নিজের জন্য আহমদ খান উপাধি গ্রহণ করেন এবং শায়খ কামালুদ্দীন আবদুর রহমান রাফিয়ীকে নিজের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সুলতান আহমদ খান মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বড় বড় পদ দান করেন। তাছাড়া তিনি মুঘলদের কুফরী রীতি পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধন করে তার পরিবর্তে ইসলামী আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। সুলতান আহমদ খানের কারণে অন্য মুঘলরাও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। মুঘল অধিনায়করা বিশেষ করে সুলতান আহমদ খানের ভাই আরগূন খান যখন লক্ষ্য করলেন যে, সুলতান আহমদ খানের কারণে মুঘলদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্র শুরু করে।

তেকূদার আগলানের শাহাদাত

আবাকা খানের পুত্র আরগূন খান ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর সকল অধিনায়ককে নিজের পক্ষে এনে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে সুলতান আহমদ খান তিন বছর হুকুমত করার পর নিজের পুত্রের হাতে বন্দী ও শহীদ হন।

আরগূন খান

আরগূন খান সিংহাসনে আরোহণ করে সা'দুল্লাহ নামীয় জনৈক ইহুদীকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শে প্রত্যেক শহরে মুসলিম উলামাবৃন্দকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এভাবে হাজার হাজার উলামা অত্যন্ত নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। আরগূন খান একজন হিন্দু যোগীর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। ঐ হিন্দু যোগী আরগূন খানকে এক প্রকার ওষুধ খাওয়ান এবং বলেন, এর প্রভাবে তোমার আয়ু বেড়ে যাবে। কিন্তু ঐ ওষুধে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আরগূন খান একের পর এক বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬৯০ সনে (১২৯১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরগূন খানের পুত্র কীখাতূ খান

আরগূন খানের পর তার পুত্র কীখাতূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, তিনি ৬৯৩ হি. সনে (১২৯৪ খ্রি) টাকার নোট আবিষ্কার করেন যাকে মুঘলরা 'ইউত' বলত। এটা ছিল একটা কাগজ যার উভয় পিঠে কালিমা-ই-তাইয়িবাহ্ লেখা থাকত। কালিমার নিচে লেখা থাকত বাদশাহর নাম ও নোটের মূল্য। এ ভাবে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার কারণে সমগ্র দেশে দারুণ হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। মানুষ অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে এই কাগজ দেখত এবং বলত, আমি স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে এটাকে কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? যা হোক, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কীখাতূ খান বাজার থেকে এই সমস্ত কাগজী মুদ্রা তুলে নেন।

কীখাতূ খানের মৃত্যু

৬৯৪ হি. সনে (১২৯৪-৯৫ খ্রি) মুঘল আমীর-উমারা কীখাতূ খানকে হত্যা করে ফেলে। তারা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে, তিনি সব সময় ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব করেন।

বায়দূ খান ইব্ন কারাকায়ী ইব্ন হালাকূ খান

কীখাতূ খানের পর তার চাচাত ভাই বায়দূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৯৬ হি. (১২৯৬-৯৭ খ্রি) আরগূন আকা আভীরাত, যিনি আনুমানিক ত্রিশ বছর ধরে মুঘল বাদশাহদের পক্ষ থেকে খুরাসান প্রভৃতি এলাকা শাসন করছিলেন, মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র আমীর নওরোয বেগ, শাহযাদা গাযান খান ইব্ন আরগূন খান ইব্ন আবাকা খান–এর কাছে চলে যান এবং তার পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। গাযান খান ঐ সময়ে খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। বায়দূ খান ও গাযান খানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এ জন্য যে, গাযান খান নিজেকে সালতানাতের জন্য অধিক যোগ্য মনে করতেন। গাযান খান আত্মীয় নওরোয বেগের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শায়খ সদরুদ্দীন হামূভীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ইসলামী নাম মাহমূদ

খান রাখেন। গাযান খান ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে অনেক মুঘল অধিনায়কও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর বায়দূ খান এবং সুলতান মাহমূদ খান (গাযান খান)-এর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

বায়দূ খানকে হত্যা

সুলতান মাহমূদ খান এক যুদ্ধে জয়লাভ করে বায়দূ খানকে হত্যা করেন এবং হিজরী ৬৯৪ সনের যিলহজ্জ (অক্টোবর ১২৯৫) মাসে স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সুলতান মাহমূদ গাযান খান

সুলতান মাহমূদ খান সিংহাসনে আরোহণ করে আমীর নওরোয বেগ আভীরাতকে আপন মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি মুদ্রার উপরে কালিমা তাইয়িবাহ খোদাই করার এবং মহর ও সরকারী ফরমান সমূহের শিরোনামে 'আল্লাহ্ তা'আলা' লেখার নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর তিনি নওরোয বেগকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে সেখানে প্রেরণ করেন। ঈসতাহিমূর ও আরসালান নামীয় দু'জন মুঘল অধিনায়ক আপোসে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, তাদের একজন সুলতান মাহমূদ খানকে এবং অন্যজন আমীর খানকে এবং নওরোয বেগকে একই তারিখে হত্যা করবেন। তারা নিজেদের অঙ্গীকার পালনে যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, তবে সফলকাম হতে পারেননি বরং উল্টো নিজেরাই সুলতান মাহমূদ খান এবং আমীর নওরোয বেগের হাতে নিহত হন। এর কিছুদিন পর কিছু সংখ্যক আমীর ও মন্ত্রী সুলতান মাহমূদ খানের কাছে আমীর নওরোয বেগের নিন্দাবাদ করেন। তারা সুলতানের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে যে, আমীর নওরোয বেগ খুরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে সুলতান মাহমূদ গাযান খান আমীর নওরোযের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে সমগ্র পরিবার-পরিজনসহ তাকে হত্যা করেন। অনুরূপ পদ্ধতিতে মন্ত্রী খাজা সদরুদ্দীনও সুলতান মাহমূদ গাযান খানের হাতে নিহত হন এবং তার স্থলে 'জামী রাশীদী'-এর লেখক খাজা রাশীদুদ্দীন মন্ত্রী হন। এটা ৬৯৯ হিজরীর (১২৯৯-১৩০০ খ্রি) ঘটনা।

তারপর সুলতান মাহমূদ গাযান খান মিসরের সুলতানকে লিখেন : আমার পূর্ব পুরুষরা সিরিয়া জয় করেছিলেন। তাই এটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি। মিসরীয় সৈন্যরা অন্যায়ভাবে তা দখল করে রেখেছে। আমার পূর্ব পুরুষরা যেহেতু কাফির ছিলেন এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতেন না তাই তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে অপরাধ করেছেন তা ক্ষমারযোগ্য। আল্লাহ্র ফযলে আমি মুসলমান এবং মুসলমান হওয়ার কারণে তোমাদেরকে আপন ভাই মনে করি। অতএব তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা সিরিয়া অঞ্চল আমার জন্য খালি করে দাও এবং মিসর থেকে এই পয়গামের যে উত্তর আসে তা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না বরং এই পত্রালাপের ফল এই দাঁড়ায় যে, মিসরীয়রা তাদের সীমান্ত অতিক্রম করে সুলতান মাহমূদ গাযান খানের অধিকৃত অঞ্চলে হামলা

চালায়। এমন কি তারা মসজিদসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। এই সংবাদ পেয়ে সুলতান মাহমূদ গাযান খান ৬৯৯ হিজরীতে (১২৯৯-১৩০০ খ্রি) নব্বই হাজার মোঙ্গল সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করেন। তার মুকাবিলার জন্য মিসরের সুলতানও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসেন। হিমসের নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে গাযান খান মিসরীয়দেরকে পরাজিত করেন। তিনি সিরিয়ার বড় বড় শহরে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে এক-একজন আমীর নিয়োগ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। মিসরের সুলতান নাসির সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে পুনরায় সিরিয়া আক্রমণ করেন। সিরিয়ার মোঙ্গল অধিনায়করা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার মুকাবিলা করে। কিন্তু জয়লাভ করতে পারেনি। আমীর তীতাক যুদ্ধক্ষেত্রে তার অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে মিসরীয়দের হাতে বন্দী হন। এই সংবাদ শুনে গাযান খান পুনরায় সিরিয়া আক্রমণের সংকল্প নেন। কিন্তু তিনি এই মর্মে আর একটি সংবাদ পান যে, জুজী খানের বংশধর, যিনি কাবচাকের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতায় রয়েছেন, তিনি দাবি করেছেন, হালাকূ খান এবং তার বংশধরদের ইরান, খুরাসান প্রভৃতি দেশে স্বাধীনভাবে শাসন করার কোন অধিকার নেই।

"এটা হচ্ছে আমাদের অধিকার এবং আমরা গাযান খানকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে ছাড়বো।" যা হোক মুঘলদের এই আত্মবিরোধের কারণে গাযান খান সিরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ আর পাননি।

সুলতান মাহমূদ গাযানের মৃত্যু

৭০৩ হিজরীর ১১ই শাওয়াল রোববার (১৩০৩-০৪ খ্রি) সুলতান মাহমূদ গাযান খান কাযবীন অঞ্চলে ইনতিকাল করেন। এই সুলতানের যুগে অনেক মুঘল ইসলাম গ্রহণ করে। সাধারণ মুসলমানরাও তা থেকে বহুলভাবে উপকৃত হয়। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করে যান ঃ আমার পরে আমার ভাই উলজাইতূ ওরফে সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দা সিংহাসনের অধিকারী হবে।

সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ উলজায়তূ

সুলতান মাহমূদ খানের মৃত্যুর পর উলজায়তূর প্রতি অসন্তুষ্ট আমীর মারকাদাক অন্য একজন শাহযাদা আল-আফরাঈকে সিংহাসনে বসাবার উদ্যোগ নেন। আমীর ইসমাঈল তুরখান বিষয়টি জানতে পেরে এ সম্পর্কে উলজায়তূকে অবহিত করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল-আফরাঈও মারকাদাককে বন্দী করে হত্যা করেন এবং ৭০৩ হিজরীর যিলহজ্জ (আগস্ট ১৩০৪ খ্রি) মাসে সুলতান মুহাম্মদ 'খোদাবান্দাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বড় বড় আমীর-উমারা যেমন আমীর বাতলাক শাহ, আমীর চুপান সালাদূয, আমীর ফুলাদ, আমীর হুসাইন বেগ, আমীর সুনজ, আমীর মালোয়ী, আমীর সুলতান, আমীর রমাযান, আমীর লাঘূ প্রমুখ সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেন। সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ সিংহাসনে আরোহণ করেই এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, সমগ্র

দেশে ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শরীয়ত বিরোধী যাবতীয় রীতি-নীতির উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। শীঘ্রই সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর হুকুমত ও সালতানাত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং রাশিয়া, খাওয়ারিযম, বুলগেরিয়া, রূম ও সিরিয়া থেকে কারাকোরাম, সিন্ধু ও ইরাক পর্যন্ত সমগ্র দেশ তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর শাসনামলে মুঘল সালতানাত উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে। তাঁর সালতানাতের বিরোধিতা করার মত কেউ ছিল না।

সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহর মৃত্যু

মোট তের বছর হুকুমত করার পর সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দাহ ৭১৬ হিজরীতে (১৩১৬ খ্রি) ঈদুল ফিতরের রাতে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি 'শহরে সুলতানিয়া' নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করে সেখানে আপন রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। মৃত্যুর পর ঐ শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়। তারপর তাঁর পুত্র সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান

সিংহাসনে আরোহণকালে সুলতান আবূ সাঈদের বয়স ছিল ১৪ বছর। মুঘলদের আমীরদের মধ্যে প্রথম প্রথম অনৈক্যের সৃষ্টি হলেও পরবর্তী সময়ে এর ক্ষতিকারক দিকটা বিবেচনা করে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যান। সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান আমীর চূবানকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ দান করে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আমীর চূবানের পুত্র আমীর হাসান জালায়িরের বিবাহ হয় বাগদাদ খাতুনের সাথে। সুলতান আবূ সাঈদ এই স্ত্রীলোকটির প্রেমে মত্ত হয়ে পড়েন। তিনি চান যেন আমীর হাসান বাগদাদ খাতুনকে তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু আমীর চূবান তা মেনে নিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি এই পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় যে, আমীর চূবান বিদ্রোহ ঘোষণা করে খুরাসান দখলের সংকল্প করেন। হিরাতে ছিল চুঘতাই বংশের সালতানাত। হালাকূ খানের বংশের সাথে এই চুঘতাই বংশের লোকদের মনোমালিন্য ছিল। যদিও তারা বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করত। এই চুঘতাই অধিনায়কদের একজন ছিলেন তুরমাহ শীরীন খান। আমীর চূবান তাকে সহায়তা করার জন্য শীরীন খানকে উদ্বুদ্ধ করেন। সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খান যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আমীর চূবান খান বন্দী হন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। এবার আমীর হাসান জালায়ির বাগদাদ খাতুনকে তালাক দিয়ে আবূ সাঈদকে তার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেন। ৭৩৫ হিজরীতে (১৩৩৪-৩৫ খ্রি) বাদশাহ দাশতে কিবচাকের উযবেক খান এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ইরান আক্রমণ করেন।

আবূ সাঈদের মৃত্যু

এদিক থেকে সুলতান আবূ সাঈদ সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু শিরওয়ান নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৭৩৬

হিজরীর ১৩ই রবিউল আখির (ডিসেম্বর ১৩৩৫ খ্রি) তাঁর ইনতিকাল হয়। যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন তাই তাঁর ইনতিকালের পর মুঘল সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

আরতাক বূকা ইব্‌ন তুলি খানের উত্তর পুরুষ আরপা খান

সুলতান আবূ সাঈদের ইনতিকালের পর কিছু সংখ্যক আমীরের ঐকমত্য অনুযায়ী আরপা খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর তিনি ঘোষণা করেন ঃ রাজকীয় আরাম-আয়েশ ও জাঁকজমকের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আহারের জন্য সামান্য ডালরুটি এবং পরনের জন্য সাধারণ দু-একটি বস্ত্রই আমার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু উযবেক খান তার সেনাবাহিনী নিয়ে ইরান পর্যন্ত এসে গিয়েছেন। তাই আরপা খান তাঁর মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য স্থানে স্থানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেন। ঠিক এমনি সময়ে উযবেক খানের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, দাশতে কিবচাকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এই ভয়ংকর সংবাদ শোনার সাথে সাথে উযবেক খান রাজধানীতে ফিরে যান। এদিকে আমীর আলী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাতে তিনি জয়লাভ করেন এ জন্য যে, আরপা খান হালাকূ খানের বংশধরদের যত্রতত্র হত্যা করার কারণে বেশিরভাগ আমীর তার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন।

আরপা খানের হত্যা

শেষ পর্যন্ত ৭৩৬ হিজরীর রমযান (মে ১৩৩৬ খ্রি) মাসে মারাগা নামক স্থানে আমীর আলীর সাথে আরপা খানের যুদ্ধ হয় এবং তাতে শেষোক্তজন বন্দী ও নিহত হন। আমীর আলী জয়লাভ করে মূসা খান ইব্‌ন বায়ূদ খান ইব্‌ন তারকাঈ খান ইব্‌ন হালাকূ খানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

মূসা খান ইব্‌ন বায়দূ খান

মূসা খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমীর আলী এবং ক্ষমতাবলম্বী আমীরগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি আমীর হাসান জালায়ীর মূসা খানকে আক্রমণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেন এবং আমীর আলীকে হত্যা করেন। মূসা খান পালিয়ে হাযারা জেলায় চলে আসেন এবং এখানে বন্দী হয়ে নিহত হন। তার পরে সুলতান মুহাম্মদ খান ইব্‌ন কুতলুক খান ইব্‌ন তাইমূর ইব্‌ন আনবারজী ইব্‌ন মানকূর তাইমূর ইব্‌ন আনবারজী ইব্‌ন মানকূয তাইমূর ইব্‌ন হালাকূ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার হুকুমতও মূসা খানের ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল ছিল। তারপর শুধু নামেমাত্র হালাকূ খানের বংশের আরো বেশ কয়েক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৪৪ হিজরী (১৩৪৩ খ্রি) নাগাদ হালাকূ খানের বংশধরদের নাম-নিশানা মুছে যায় এবং তিনি যে সমস্ত দেশ জয় করেছিলেন তাতে অনেকগুলো স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চেঙ্গিয খানের পুত্র জূজী খানের বংশধর

চেঙ্গিয খানের পুত্রদের মধ্যে জূজী খান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। খাওয়ারিযম জয়ের পর জূজী খান দাশতে কিবচাক জয় করে সেখানে আবাস স্থাপন করেছিলেন। তার সাথে চেঙ্গিয খানের অবশিষ্ট পুত্রদের কোন মিল-মহব্বত ছিল না। তিনি সব সময় অন্য ভাইদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকতেন। এই প্রেক্ষিতে তার রাজ্যও ছিল পৃথক এবং সবার থেকে দূরে। জূজী খানের বংশধরকে প্রধানত উযবেক নামে সম্বোধন করা হয়। জূজী খান চেঙ্গিযের সামনেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই তিনি জূজী খানের রাজ্য তার পুত্র বাতূ খানকে দান করেন। জূজীর ছিল সাত পুত্র। তন্মধ্যে বাতূ খান ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

বাতূ খান ইব্‌ন জূজী খান

বাতূ খান দাশতে কিবচাক থেকে রুশ চারকাস, ফারঙ্গ প্রভৃতি দেশে সেনা প্রেরণ করেন তখন চেঙ্গিয খানের পুত্র উকতাই খান নিজ পুত্র কুয়ূক খান, তুলি খানের পুত্র মানকূ খান এবং চুঘতাই খানের এক পুত্রকে নির্দেশ দেন যেন তারা বাতূ খানের সাথে অবস্থান করে দেশ জয়ে তাকে সাহায্য করে।

বাতূ খান সমগ্র রাশিয়া জয় করে মস্কোর উপর হামলা চালান এবং তা জয় করে পোল্যান্ডও নিজের দখলে নিয়ে আসেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে সমগ্র ইউরোপের রাজন্যবর্গ একে অন্যের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং একটি যৌথবাহিনী গঠন করে বাতূ খানের মুকাবিলার উদ্যোগ নেন। বাতূ খানের বাহিনীতে অনেক মুসলমান সৈন্যও ছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, খ্রিস্টান সৈন্যদের সংখ্যা তার সৈন্যদের চাইতে বহুগুণ বেশি তখন তিনি নির্দেশ দেন— আমার বাহিনীর সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে যেন আমাদের জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করে। তারপর যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাতে খ্রিস্টানরা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। বাতূ খান সমগ্র হাঙ্গেরী দখল করে নেন। তিনি ইউরোপে একটি শহর নির্মাণ করেন, যার নাম ছিল সরায়ে। তার সমগ্র শাসনামল ফিরিঙ্গি দেশ জয় এবং সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠায় কেটে যায়। তিনি ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন।

বারাকাহ্ খান ইব্‌ন জূজী খান

বাতূ খানের মৃত্যুর পর তার ভাই বারাকাহ্ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাতূ খান তো চেঙ্গিয খানের মত নামেমাত্র মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বারাকাহ্ খান প্রকৃতই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে মুসলমানরা মুঘলদের সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে নিরাপদ থাকে। বারাকাহ্ খান রাগান্বিত হয়ে বুকা খানের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী হালাকূ খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হালাকূ খান বুকা খানের মুকাবিলায় একজন অধিনায়ককে পাঠান। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে হালাকূ খান পরাজিত হন। ৬৬১ হিজরীতে (১২৬৩ খ্রি) স্বয়ং হালাকূ খান এক বাহিনী নিয়ে বুকা খানের রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে প্রথমে হালাকূ খান পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত বারাকাহ্ খানের বাহিনী পলায়ন করে।

বারাকাহ্ খানের পর জূজী খানের বংশধরদের মধ্যে বত্রিশ ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বারাকাহ্ খানের পর তাঁর পুত্র মানকূর তাইমূর খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তুকতাঈ খান। ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩-০৪ খ্রি) তুকতাঈ খান ও তূকাই খানের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে তুকতাঈ খান বেশ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করতে থাকে। তিনি গাযান খানকে লিখেন : হালাকূ খান এবং তার বংশধর জবরদস্তিমূলকভাবে আযারবায়জানকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, অথচ চেঙ্গিযের বন্টন অনুযায়ী এটা হচ্ছে জূজী খানের বংশধরদের প্রাপ্য। এখন আপনার উচিত আযারবায়জানকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা। অন্যথায় আপনার তো জানা থাকার কথা যে, আমরাতো অস্ত্রবলে দখল করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি। গাযান খান এর নেতিবাচক উত্তর দেন এবং তুকতাঈ খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ হয়নি এবং ধীরে ধীরে তুকতাঈ খান আযারবায়জানের দাবি ভুলে যান।

তুকতাঈ খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র তুগরিল খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর তুগরিল খানের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তার পুত্র উযবেক খান। উযবেক খান অত্যন্ত বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল জূজী খানের বংশধরদের সাতটি গোত্রের মধ্যেই বিস্তৃত। তাঁর নামেই উযবেক জাতির নামকরণ হয়েছে। উযবেক খানের অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল এবং তারা উযবেক জাতি নামে পরিচিত। ৭১৮ হিজরীতে (১৩১৮ খ্রি) উযবেক ইরানের বাদশাহ সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। বাহাদুর খানও মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু উযবেক খান শুধু লুটপাট করে ঝটপট দেশে ফিরে যান। ৭৩৫ হিজরীতে (১৩৩৪-৩৫ খ্রি) উযবেক খান পুনরায় ইরানে সৈন্য সমাবেশ ঘটান।

সুলতান আবূ সাঈদ এই সংবাদ শুনে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসেন। এই সফরেই সুলতান আবূ সাঈদ বাহাদুর খানের মৃত্যু হয় এবং আরপা খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আরপা খান সিংহাসনে আরোহণ করেই উযবেক খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয়নি। উযবেক খান সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং দীর্ঘদিন সাম্রাজ্য পরিচালনার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারপর জানী বেগ খান উযবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে জূজী খানের বংশধর তথা উযবেক গোত্রের বেশ কয়েক ব্যক্তি নিজেদের পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। জানী বেগের পর তার পুত্র ইযদী বেগ খান উযবেক নামক জনৈক বাদশাহ তিবরিয শাসন করতেন। অনুরূপভাবে তাইমূর সাহিবকারানের যুগে উরুস খান উযবেক বিদ্যমান ছিলেন। উরুস খান উযবেকের পুত্র ছিলেন তাইমূর মালিক খান। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তুকতামিশ খান উযবেক। এই তুকতামিশের হুকুমত ছিল দাশতে কিবচাক। তিনি কারানের সম্রাট আমীর তাইমূরের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিলেন। ৮১৫ হিজরীতে (১৪১২ খ্রি) ফুলাদ খান উযবেক ছিলেন তুর্কিস্তানের দখলদার ও হাকিম। সুলতান সাঈদ মির্যা শাহরুখ এই বংশেরই এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। ফুলাদ খানের পর মুহাম্মদ খান উযবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বুরাক খান উযবেক, যিনি উরুস খানের বংশধর ছিলেন। মির্যা উলূগ বেগ তাইমূরীর সাহায্য নিয়ে মুহাম্মদ খান উযবেকের উপর হামলা চালান এবং ৮২৮ হিজরীতে (১৪২৫ খ্রি) জয়লাভ করে তুর্কিস্তান নিজের দখলে নিয়ে

যান এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর উলূগ বেগ তাইমূরী এবং বূরাক খানের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনাচক্রে উলূগ বেগ প্রেরিত বাহিনী পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে সুলতান সাঈদ মির্যা শাহরুখ আত্মহত্যা করেন। মির্যা শাহরুখের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ শুনে বূরাক খান সমরকন্দ থেকে ফিরে যান এবং শাহরুখের মুকাবিলা করা সমীচীন মনে করেননি। ৮৩২ হিজরীতে (১৪২৯ খ্রি) সুলতান মাহমূদ খান ও বূরাক খান নিহত হন এবং এখানেই উযবেক সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ৮৫৫ হিজরীতে (১৪৫১ খ্রি) আবুল খায়ের খান এবং বাদাক খান উযবেক সমরকন্দ দখল করে সেখানে নিজ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল খায়ের খানের পুত্র ছিলেন বাদাক খান এবং বাদাক খানের পুত্র ছিলেন সুলতান আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ খান। এই মুহাম্মদ খান ছিলেন যহীরুদ্দীন বাবরের সমসাময়িক। এই সুলতান আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ খান উযবেককে শায়বানী খান উযবেক নামে স্মরণ করা হয়। ইনি ইসমাঈল সাফাভীর সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে নিহত হন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং দুঃসাহসী ছিলেন। এই আবুল ফাত্হই বাবরকে তুর্কিস্তান ও ফারগানা থেকে বেদখল করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তারই মাথার খুলি সোনার পাতে মুড়িয়ে ইসমাঈল সাফাভী সেটাকে মদ্যপানের পাত্রে পরিণত করেন। তাকে শায়য়াবানী খান এ জন্য বলা হতো যে, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির নাম শায়বানী খান ছিলেন। সুলতান আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ খান উযবেক ৯১৭ হিজরীতে (১৫১১ খ্রি) নিহত হন। তারপর তার পুত্র তাইমূর সুলতানকে উযবেকরা নিজেদের বাদশাহ মনোনীত করে। ৯৩৫ হিজরীতে (১৫২৮-২৯ খ্রি) উযবেকরা তাহমাসপ সাফাভীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। কিন্তু জয়লাভ করেই তারা এমন ভাবে লুটপাটে মেতে উঠে যে, তাহমাসপ সুযোগ বুঝে অকস্মাৎ প্রতিআক্রমণ চালিয়ে উযবেকদের বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করেন।

জানী বেগ খানের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পুত্র ছিলেন ইসকান্দার খান। আর ইসকান্দার খানের পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ্ খান। আবদুল্লাহ্ খান উযবেক ইরানীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানের বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক। আকবরের সাথে তাঁর প্রায়ই পত্রালাপ হতো। আবদুল্লাহ খান ১০০৬ হিজরীতে (১৫৯৭-৯৮ খ্রি) ইনতিকাল করেন। তারপর তার পুত্র আবদুল মু'মিন খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি আপন চাচা রুস্তাম সুলতানের হাতে নিহত হন। তারপর উযবেকী সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। আবদুল্লাহ্ খানের ভাগ্নে ওয়ালী মুহাম্মদ খান আবদুল মু'মিন তুর্কিস্তান দখল করে ইমাম কুলী খানকে মাওরাউন নাহর-এর এবং আপন ভাগ্নে নযর মুহাম্মদ খানকে বাদখ্শান প্রভৃতি এলাকার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। কিছুদিন পর নযর মুহাম্মদ খান ওয়ালী মুহাম্মদ খানকে উৎখাত করেন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ইরানে শাহ্ আব্বাসের কাছে আশ্রয় নেন। এখানে খাওয়ারিযমেও উযবেকদের একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা কোনদিনই খুব একটা উল্লেখযোগ্য বা শক্তিশালী হয়নি। চেঙ্গিয খানের পুত্র জূজী খানের বংশধরদের অবস্থা ঐতিহাসিকগণ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেননি।

এখানে উযবেকদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, পরবর্তীতে যখন সমসাময়িক সুলতানদের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের নামও আসবে তখন তা বুঝে নেওয়াটা খুব সহজ হবে। জূজী খানের বংশধরদের মধ্যে উযবেক গোত্র ছাড়াও কাযাক নামে আর একটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। কাযাক গোত্রের কোন কোন ব্যক্তি দাশতে কিবচাক কিংবা তার কোন কোন অংশের উপর হুকুমত করেছে। এই গোত্রেরই এক বাদশাহ কায়িম সুলতান কাযাকের সাথে শায়াবানী খান অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মদ খান উযবেকের যুদ্ধ হয়েছিল। এখন আমরা চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের বংশধরদের সম্পর্কে আলোচনা করবো।

চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের বংশধর

চেঙ্গিয খান তুর্কিস্তান, খুরাসান, বল্‌খ ও গযনী থেকে আরম্ভ করে সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আপন পুত্র চুঘতাই খানকে দান করেছিলেন এবং আমীর কারাচার বারসালকে প্রধান সভাসদ নিয়োগ করে তার সঙ্গী করে দিয়েছিলেন। চেঙ্গিয খানের মৃত্যুর পর চুঘতাই খান সবসময়ই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উকতাই খানের আনুগত্য স্বীকার করে চলতেন। চুঘতাই খান অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ৬৪০ হিজরীতে (১২৪২-৪৩ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর আমীরুল উমারা কারাচার চুঘতাই খানের পৌত্র কারাবালাকূ খানকে সিংহাসনে বসান। এ খবর শুনে কুয়ূক খান ইব্‌ন উকতাই খান বলেন, চুঘতাই খানের পুত্র মহিসূ মানকূ খান বর্তমান থাকতে তার পুত্রকে কেন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হলো ? যেহেতু কারাকোরামের শাহী দরবারের হাতে সমগ্র মুঘলের শাসন কর্তৃত্ব ছিল তাই কুয়ূক খানের নির্দেশ মুতাবেক কারাবালাকূ খানকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে মহিসূ মানকূ খানকে তাতে বসানো হয়। ৬৫২ হিজরীতে (১২৫৪ খ্রি) আমীর কারাচারও মৃত্যুবরণ করেন। এর কিছুদিন পর যখন কারাবালাকূ খান মৃত্যুবরণ করেন তখন মুঘলরা তার স্ত্রী ওরমানা খাতুনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। তারপর আলঘূ খানকে চুঘতাই গোত্রের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু একবছর হুকুমত করার পর তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র মুবারক শাহ চুঘতাই গোত্রের নেতা নির্বাচিত হন।

রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে চুঘতাই গোত্র তুলি খানের বংশধরদের সাথে শরীক থাকে। প্রথম প্রথম এই দুই গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকে। হালাকূ খানের কারণে চেঙ্গিয খানের পুত্র তুলি খানের বংশধররা বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। ফলে চুঘতাই খানের বংশধররা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে টিকে থাকতে পারেনি। চুঘতাইরা হিরাত ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর সর্বদা নিজেদের অধিকার বহাল রাখে। কিন্তু তিনি কখনো হালাকূ খান ও তার বংশধরদের নেতৃত্ব স্বীকার করতেন এবং নিজেকে নায়েবে সুলতান বলতেন। আবার কখনো নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। মুবারক শাহের পর এদের মধ্যে সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মদ বুরাক খান ইব্‌ন মইসুন তাওয়ান খান ইব্‌ন মুওয়াতূ খান বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মদ বুরাক খান আবাকা খানের সাথে খুরাসানে এক ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীনের পুত্র দাওয়া খান, দাওয়া খানের পুত্র আলসীনূ খান এবং আলসীনূ খানের পুত্র কীক খানও অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রান্তশালী সুলতান ছিলেন। দাওয়া খানের দুই পুত্র তাইমূর খান এবং তুরমা শীরীন খানও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তুরমা শীরীন খান কান্দাহার আক্রমণ করেন এবং ৭১৬

হিজরীতে (১৩১৬ খ্রি) আমীর হাসান সালাদুয এবং তুরমা শীরীন খানের মধ্যে গযনী এলাকায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে তুরমা শীরীন খান পরাজিত হন। তুরমা শীরীন খান হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিলেন। তুরমা শীরীন খানের পর তার ভাই ফুলাদ খান চুঘতাই গোত্রসমূহের সুলতান হন। তিনি ৭৩৫ হিজরীতে (১৩৩৪-৩৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফুলাদ খানের পর গাযান ইব্‌ন মাহসূর আগলান ইব্‌ন দাওয়া খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর দানিশমন্দ আগালান, তারপর কুলীখান ইব্‌ন সূরুগদূ ইব্‌ন দাওয়া খান ইব্‌ন বুরাক খান চুঘতাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর তুগলক তাইমূর খান ইব্‌ন আলসূনূর খান ইব্‌ন দাওয়া খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তারপর সাম্রাজ্যের অধিকারী হন ইলীয়াস খাজা খান ইব্‌ন তুগলক তাইমূর খান। এরপর সিংহাসন লাভ করেন খিয্‌র খাজা খান তুগলক তাইমূর খান। তার দখল থেকে সমগ্র খুরাসান চলে গেলেও মুঘলিস্তানের বেশির ভাগ অংশ তারই দখলে ছিল।

তারই শাসনামলে কারানের অধিকারী আমীর তাইমূর খুরাসানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ পর্যন্ত খিয্‌র খাজা আমীর তাইমূরের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে তার সাথে আপন কন্যা তুগল খানমের বিবাহ দেন। ফলে আমীর তাইমূরের সাথে তার আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিবাহের কারণে আমীর তাইমূরকে গুরকান বলা হতে থাকে। অর্থাৎ চেঙ্গিযী বংশের সাথে আমীর তাইমূরের জামাই-শ্বশুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘলদের ভাষায় জামাতাকে গুরকান বলা হয়। খিযর খাজা খানের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ খান মুঘলিস্তানের বাদশাহ হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ভাই জাহান আগলান ইব্‌ন খিয্‌র খাজা খান। জাহান আগলান খানের পর শহর মুহাম্মদ খান ইব্‌ন খিযর খাজা খান বাদশাহ হন। মুঘলিস্তানের বাদশাহ শের মুহাম্মদ খান এবং খুরাসান ও মাওরাউন নাহর-এর বাদশাহ উলুগ বেগ তাইমূরীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে শের মুহাম্মদ খান পরাজিত হন। শের মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র উওয়ায়স খান, তারপর উওয়ায়স খানের পুত্র ইউনুস খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইউনুস খানের পর তার পুত্র মাহমূদ খান ও আহমদ উলজাই খান মুঘলিস্তানের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। শায়বানী খান উযবেকের মুকাবিলায় যহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারা বাবরকে সাহায্য করেন। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে দুই ভাইই প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হন। শায়বানী খানের সামনে তাদেরকে উপস্থিত করা হলে তিনি তাদের উভয়কেই মুক্ত করে দেন। কিন্তু মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে লজ্জাবশত দুই ভাইই আত্মহত্যা করেন এবং চুঘতাই বংশের সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপরও মানসূর খান ইব্‌ন সুলতান আহমদ উলজাঈ খান নামমাত্র মুঘলিস্তানের বাদশাহ হন। প্রকৃত পক্ষে মুঘলিস্তান তখন ছিল শায়বানী খানের হুকুমতের অধীন। মুঘলদের হুকুমতকে দুটি ভাগে বা দুটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে চেঙ্গিযী মুঘল এবং অপরটি হচ্ছে তাইমূরী মুঘল। চেঙ্গিযী মুঘলদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এবার মুঘলদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে তাইমূরী মুঘলদের আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা চেঙ্গিযী বংশের বংশতালিকা পেশ করার প্রয়োজনবোধ করছি, যাতে পাঠকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন, মোট কয়টি বংশস্তর অতিক্রম করার পর চেঙ্গিয খান এবং আমীর তাইমূর একত্রে গিয়ে মিলিত হয়েছেন।

জূজী খান ইবন চেঙ্গিয খান অর্থাৎ উযবেক জাতির বংশ লতিকা

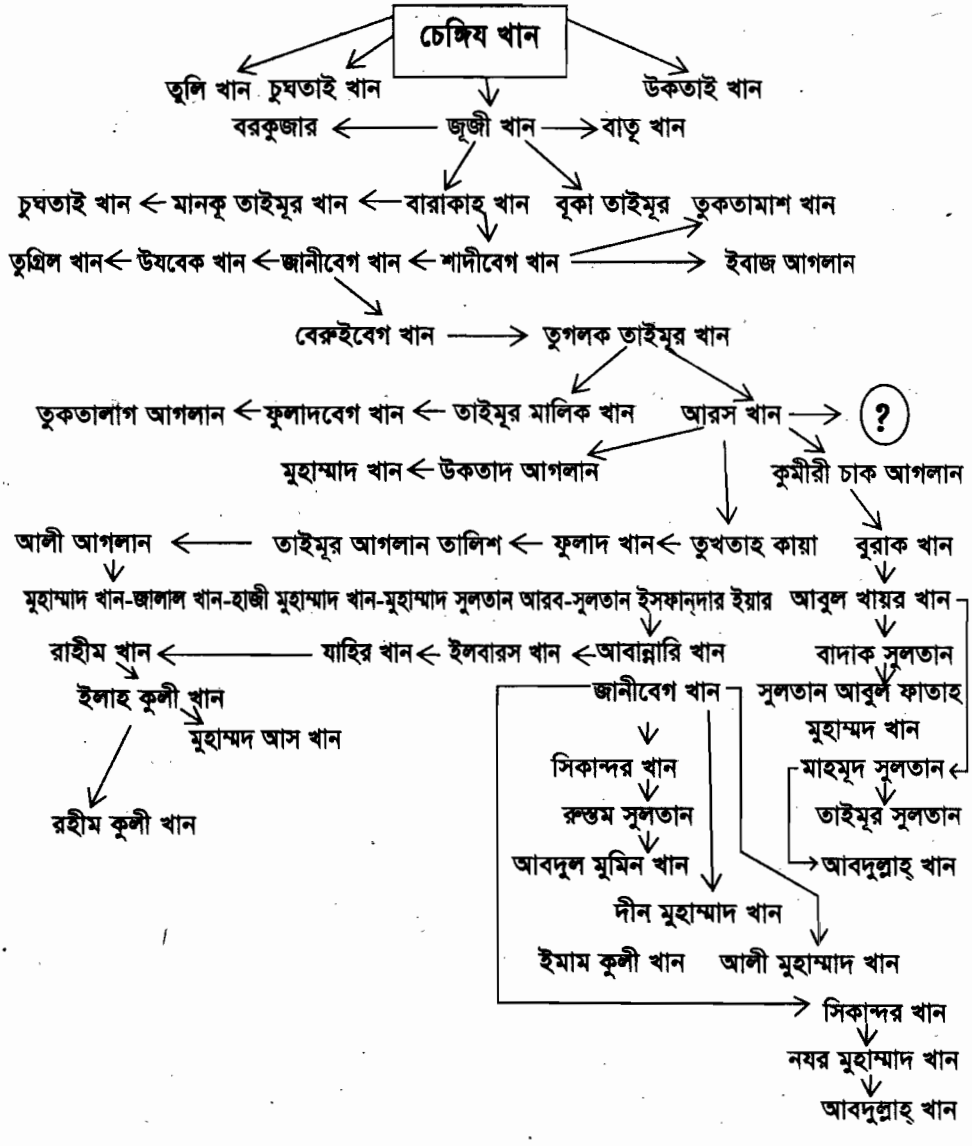

চুঘতাই খান ইব্‌ন চেঙ্গিয খানের বংশ লতিকা

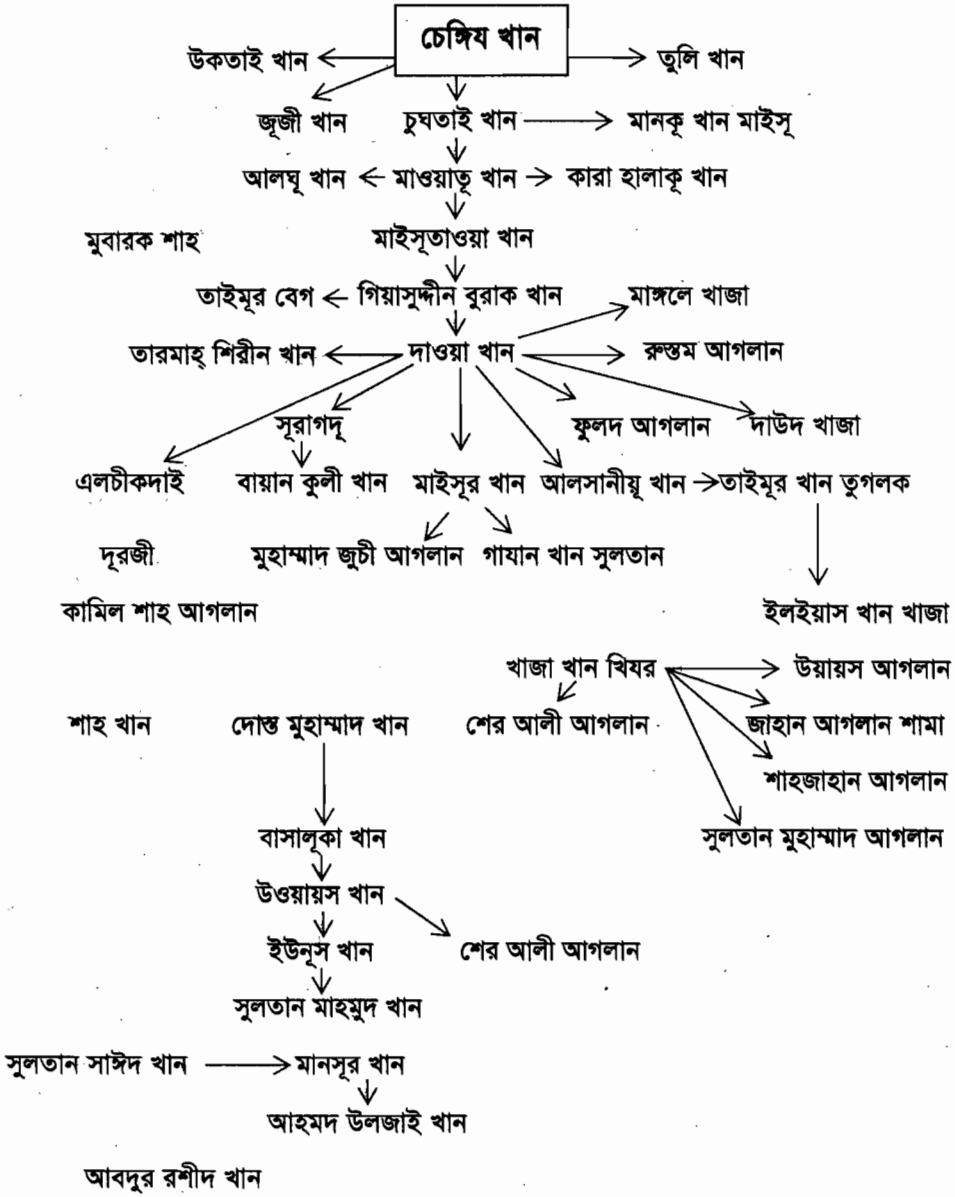

তুলি খান ইব্‌ন চেঙ্গিয খানের বংশ লতিকা

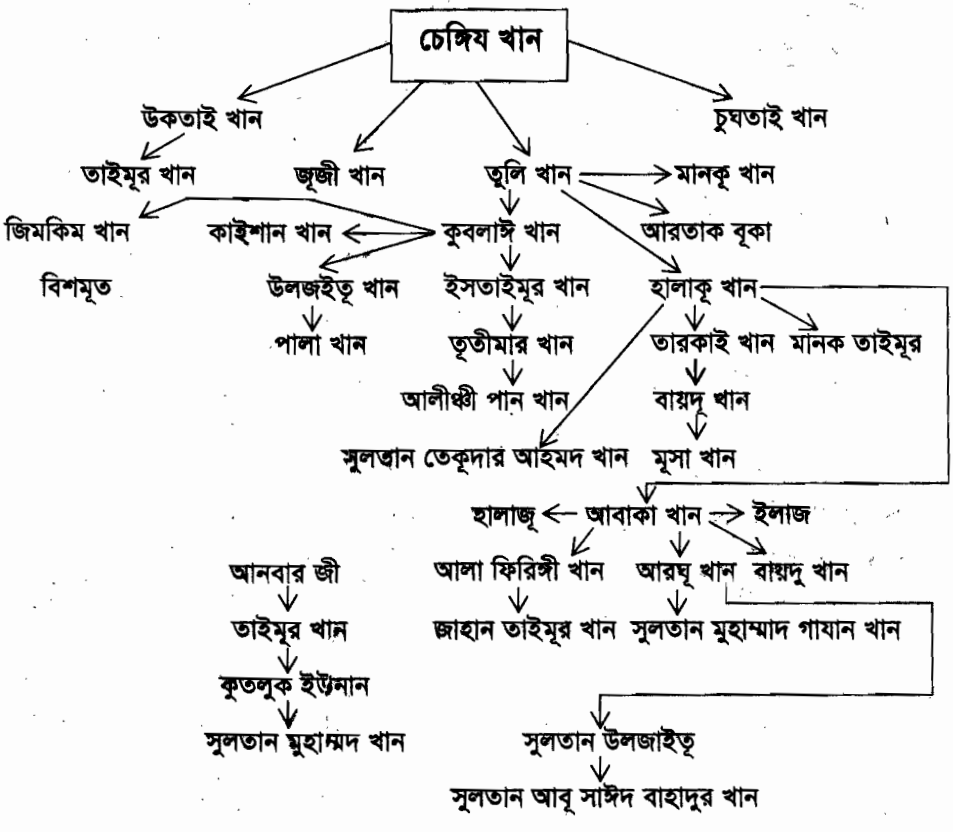

চেঙ্গিযী মোঙ্গলদের সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

বাগদাদের ধ্বংস ইসলামী বিশ্বের সবচাইতে ভয়ংকর ও মর্মান্তিক ঘটনা। আর এর নায়ক ছিলেন হালাকূ খান। ইতিপূর্বে হালাকূ খানের পিতামহ চেঙ্গিয খানও ইসলামী বিশ্বে বিশেষ করে ইরান ও খুরাসানে মুসলমানদের রক্ত বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট সাধারণভাবে চেঙ্গিযী মুঘলকে মুসলমানদের চোখে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত করে রেখেছে। তবে আমরা এ পর্যন্ত মুসলমানদের ইতিহাস যতটুকু অধ্যয়ন করেছি তাতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামী হুকুমতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্ব ও বংশগত অধিকারের বিষয়টি যেদিন থেকে গুরুত্ব লাভ করেছে সেদিন থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যেও সিংহাসনে এমন সব অযোগ্য ও অশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাসীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যাদের মধ্যে ইসলামী হুকুমত পরিচালনার মত জ্ঞান, যোগ্যতা, দূরদৃষ্টি কিংবা মন-মানসিকতা কোনটিই ছিল না। এই অযোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে মুসলিম জাতির মধ্যে নানা ধরনের চারিত্রিক ব্যাধি ঢুকে পড়ে। তারপর তা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তখনকার বিরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে এর প্রতিকারার্থে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন, বলতে গেলে সম্ভবই ছিল না।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম সাম্রাজ্য, বিশেষ করে খিলাফতে বাগদাদের অবস্থা নিশ্চিতভাবে সংশোধন-বহির্ভূত হয়ে গিয়েছিল। দায়লামী, সালজূকী প্রভৃতি সালতানাত প্রচুর ক্ষমতা ও শান-শওকতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আব্বাসী বংশের খিলাফত গ্রাস করার মত মনোবল বা দুঃসাহস তাদের ছিল না। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে এই কুবিশ্বাস, বলতে গেলে ধর্মেরই একটি অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, আব্বাসী বংশ ছাড়া অন্য কোন বংশের লোক মুসলমানদের খলীফা বা শাহানশাহ হতে পারে না। এই কু-বিশ্বাস মুসলমানদেরকে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কেননা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আব্বাসী বংশে এভাবে হুকুমত কায়েম থাকার ফলে তাদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে বীরত্ব, দৃঢ়তা, দুঃসাহসিকতা প্রভৃতি জাতিগত গুণাবলী থেকে মুসলমানরা একেবারে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এমনি মুহূর্তে মুসলমানদের এই ভয়ংকর ও নাজুকতার অবস্থা সংশোধনের দায়িত্ব যেন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন। চেঙ্গিয খান ও চেঙ্গিযী মুঘলরা এমন একটি দেশ ও এমন একটি পরিবেশে বসবাস করত যে, তাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করত না। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে তাদেরকে সভ্যভব্য মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। এ ধরনের মূর্খ ও অসভ্য লোকদের সম্পর্কে কখনও কি এ ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, এরাই তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য ও উন্নত ইসলামী সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত এবং তার অধিবাসীদেরকে একেবারে কচুকাটা করে ছাড়বে। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আপন মর্জিমত এই বর্বর ও অসভ্য মুঘলদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করে এনে তাদেরই মাধ্যমে পাপিষ্ঠ ও দুষ্কৃতিকারী মুসলমানদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের রক্তক্ষয়ী আক্রমণ ঠিক যেন ঐ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের রক্ত মোক্ষনের মত, যিনি রোগীর দেহে অস্ত্র চালিয়ে ক্ষতিকারক উপাদান বের করে ফেলে রোগীকে সুস্থ-সবল করে তোলার প্রয়াস

পান। চেঙ্গিযী মুঘলরা খিলাফতে বাগদাদের ধ্বংস সাধন করে এবং সেখানে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে ঐ সমস্ত কুবিশ্বাস পোষণকারী মুসলমানদেরকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়, যারা কোনরূপ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনাকে নিছক বংশগত উত্তরাধিকার বলে মনে করত। ইসলাম হচ্ছে ঐ শক্তি এবং ঐ শাসন ব্যবস্থার নাম, যা আরবের নিঃস্ব ও অসভ্য বেদুঈনদেরকে কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং সমগ্র বিশ্বের শিক্ষকে পরিণত করেছিল। মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি তারা তখন নামেমাত্রও মুসলমান ছিল না। এর চাইতে মুসলমানদের বড় অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা আর কি হতে পারে যে, তারা মুঘলদের হাতেই পর্যুদস্ত হলো। চেঙ্গিয খান এবং তার বাহিনী কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা কি কারণে মুসলমানদের উপর জয়লাভ করতে পারল ? জয়লাভ করতে পারল শুধু এ কারণে যে, ঐ যুগের মুসলমানরা তাদের আসল শক্তি তথা ইসলামী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছিল। মুঘলরা তাদের কোন অসাধারণ যোগ্যতা বলে জয়লাভ করেনি, বরং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে জয়ী করে দিয়ে মুসলমানদেরকে তাদের অকর্মণ্যতার প্রতিফল দান করেছিলেন। মুঘলরা খিলাফতে বাগদাদকে ধ্বংস করে দেওদয়ায় মুসলমানরা বাধ্য হয়ে বুঝতে শিখেছিল যে, এ বিশ্বে মান-সম্মান নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মাযহাবে ইসলামের সাথে মুঘলদের যেমন কোন অন্তরঙ্গতা ছিল না তেমনি ছিল না কোন শত্রুতাও। মুঘল বাদশাহরা যখন তাদের অধীনস্থ মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে চাইল তখন এর যে কথা বা যে বিষয়টি তাদের বোধগম্য হলো না সে সম্পর্কে তারা আপত্তি উত্থাপন করল, আর যেটি তাদের বোধগম্য হলো তারা তার প্রশংসা করল। মুঘলদের এই আপত্তি উত্থাপন বা অস্বীকার, তাদের জন্য তাদের প্রজাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারত না। অথচ মুসলমানদের কোন কোন কুবিশ্বাস ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে যদি কোন মুসলমান বাদশাহ এভাবে আপত্তি উত্তাপন করতেন তাহলে তাকে তার মুসলমান প্রজাদের দিক থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু মুঘল বাদশাহদের এ ধরনের কোন আশঙ্কাই ছিল না। অপর দিকে এই পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়ে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা নিজেদের হীন মানসিকতার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা থেকে পবিত্র হয়ে ইসলামের সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সবার সামনে পেশ করার সুযোগ পান, যে আদর্শ কুরআন মানবজাতির সামনে পেশ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে যে আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। এই বিশুদ্ধ ইসলামের উপর গ্রহণযোগ্য আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। আর যখন এই বিশুদ্ধ ইসলাম কোন নিরপেক্ষ ও সরলপ্রাণ ব্যক্তি বা জাতির সামনে পেশ করা হবে তখন তাকে ইসলামের সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যাহোক মুঘলদের বাড়াবাড়ির কারণে খোদ মুসলমানদের চোখের সামনে ইসলামের আসল রঙ ভেসে ওঠে।

অতএব অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই একথা বলা যেতে পারে যে, চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের মাধ্যমে মুসলমানরা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিক সে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে ইসলাম ও মুসলমানরা। ক্ষতি যা হয়েছে তা দৈহিক ও বস্তুগত, আর উপকার যা হয়েছে তা আত্মিক ও

ধর্মীয়। যদি মুঘলদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইসলামী হুকুমতের নাম-নিশানা মুছে যেত তাহলে নিঃসন্দেহে এর চাইতে বড় আত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষতি আর কিছুই ছিল না। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো, কিছুদিন পরই মুঘলরা মুসলমান হয়ে স্বয়ং ইসলামের সেবকে পরিণত হয় এবং বিশ্ববাসী দেখতে পায় যে, যে মুঘলরা খিলাফতে বাগদাদকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল সেই তারাই ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামের জন্য নির্দ্বিধায় নিজেদের গর্দান কেটে ফেলছে।

অনেক কম ঐতিহাসিক এ বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মুঘলিস্তান, চীন ও তুর্কিস্তানে ইসলাম তার প্রচার ও প্রসারের সুযোগ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি। সিরিয়া, রোম, ত্রিপোলী, মরক্কো, চীন, ইরান, খুরাসান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা নিজেদের মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে পদে পদে মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছে এবং তাদের মুকাবিলা করেছে। প্রথম প্রথম প্রায় প্রতিটি দেশেই রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তারপর লোকেরা ইসলামকে বোঝার বা ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু চীন ও তুর্কিস্তানে যখনই ইসলাম পৌঁছেছে তখনই সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগিয়েছে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশি। হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফত আমলে মাওরাউন নাহর-এর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব তুর্কিস্তান এবং তিব্বত পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল। এরই নিকটবর্তী যুগে আরবরা বণিক ও সৈনিক হিসাবে চীনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল এবং তাদের মাধ্যমে চীনে ইসলাম প্রচারও শুরু হয়ে গিয়েছিল। চীন ও তুর্কিস্তানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রচারিত হয়ে ইসলাম হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই সমস্ত দেশের সমগ্র অধিবাসীকে নিজের ছায়াতলে টেনে নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু আলভীদের ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন এবং বনূ উমাইয়াদেরকে ধ্বংস করার তাদের অবিরাম প্রচেষ্টা ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া উলামা সমাজের স্বার্থপরতা, মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ ইসলাম প্রচারকে বিঘ্নিত করে এবং অমুসলিমকে অমুসলিম থাকারই অনুপ্রেরণা যোগায়। অন্যথায় চীন ও তুর্কিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের সাধারণ যোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। সালজূকীদের দুঃসাহসী গোত্রসমূহ কোনরূপ ভয়ভীতি বা লোভ-লালসার বশবর্তী না হয়েই সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারা প্রত্যেকেই ইসলামের এক একজন বড় সেবকে পরিণত হয়। গযনীর তুর্কীরাও, যারা ডাকাত ও লুটেরা হিসাবে মুসলিম দেশসমূহে প্রবেশ করেছিল, সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে ইসলামের সেবক হিসাবে প্রতিপন্ন করে। আজো চীনাদের একটি বিরাট অংশ মুসলমান। এই চীনারা কিন্তু কোন যুদ্ধাভিযানের ফলশ্রুতি নয়। তারা সকলেই চীনের প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর। চেঙ্গিয খান এবং তার সঙ্গীরা বিজয়ীবেশে মুসলিম দেশসমূহে প্রবেশ করে। এই মুঘলরা কিন্তু প্রথম থেকেই ইসলামকে বোঝা এবং তার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়ার প্রতি নিজেদের আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং কিছুদিন পরই চেঙ্গিয খানের বংশধররা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামেরই খাদিমে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি বিরাট

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, পশ্চিমের শেষ প্রান্তের দেশগুলোতে পর্যন্ত (অর্থাৎ মরক্কো ও স্পেনে) ইসলাম যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে পৌঁছেছে, অথচ প্রাচ্যের শেষ প্রান্তের দেশগুলোতে (অর্থাৎ চীনে) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তা পৌঁছেছে বণিক অথবা ওয়ারিয ও মুবাল্লিগদের মাধ্যমে। মুসলমানরা একদিকে যেমন বিজয়ী হয়ে আপন বিজিতদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি বিজিত হয়ে আপন বিজয়ীদেরকে ইসলামের খাদেমে পরিণত করেছে। যদি চেঙ্গিয খান ও হালাকূ খানের দেশ-আক্রমণ ও পাইকারী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা না ঘটত তাহলে ইসলাম যে শুধু তার সত্যতা ও মাহাত্ম্য দ্বারা আপন বিজয়ীকেও বিজিতে পরিণত করতে পারে এ সত্য ও তথ্য এত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত না। অতএব মুঘলদের বাড়াবাড়িকে যেমন ইসলামী বিশ্বের একটি 'মহা-বিপদ' আখ্যা দেওয়া চলে তেমনি আখ্যা দেওয়া চলে এটা একটি 'মহা-রহমতও'।

এটি মানব জাতির স্বভাব যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে মূর্খতা ও অজ্ঞতার দিকটি প্রবল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যক্তি শাসনের মাধ্যমেই সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। তাই তো দেখা যায়, ব্যক্তি শাসনের ধারণা মানুষের আদি যুগ তথা জাহিলিয়া যুগের সাথে ওতপ্রোত। জাহিলিয়া যুগে গণতন্ত্রের অর্থ ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। মুঘলরাও চীন, তিব্বত ও তুর্কিস্তানের পাহাড়ে-পর্বতে জংলী ও অসভ্য জীবন যাপন করত। ওদের কাছে গোত্রের নেতা ও বাদশাহর ধারণা ছিল অত্যন্ত বিরাট ও জাঁকজমকপূর্ণ। গোত্রপতির অধিকার এবং তার প্রতিপত্তি ও পরাক্রম এত উপরে ছিল যে, গোত্রের লোকেরা তাকে রূপকখোদা মনে করত। হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজার মর্যাদা ছিল ঐ একই রূপ বরং একথাও বলা চলে যে, রাজন্যপূজা হচ্ছে প্রাচ্য দেশসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুঘলরা যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহের মুকুট-সিংহাসন দখল করে নিয়েছিল তাই তাদের শাসনামলের রাজন্য পূজার প্রাথমিক ধারণা যথারীতি বিদ্যমান ছিল। ইসলাম এবং মানুষের স্বভাবধর্ম রাজন্য পূজার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকে মনুষত্বের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে বটে, তবে মুঘলদের রাজন্যপূজা ইসলামের এই বিরাট উপকার সাধন করে যে, মুঘলদের শুধু কয়েকজন বাদশাহর ইসলাম গ্রহণ সমগ্র মুঘল জাতির ইসলাম গ্রহণের কারণে পরিণত হয়। এমনকি ঐতিহাসিকরা প্রথম প্রথম শুধু দু'তিন জন মুঘল সুলতানের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর দেখা যায় প্রত্যেক মুঘল বাদশাহ এবং তার আমীর-উমারা মুসলমান। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কে কখন ইসলাম গ্রহণ করল, ঐতিহাসিকরা সে কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। কেননা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল জূজী খানের বংশধররা কিছুটা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করে। আর তা এ কারণে যে, তারা ইসলামী দেশসমূহ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমগ্র উযবেক জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কোন ঘটনা থেকেই এটা প্রমাণিত হয়নি যে, মুঘলরা ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং শুধু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যদি মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে বাদশাহর

বিরোধিতা করে কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তবে তা ছিল শুধু বৈষয়িক ও পার্থিব কারণে, ধর্ম পরিবর্তনের কারণে নয়। মুঘলরা যেহেতু শাসক ও বিজেতা হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাই হুকুমত ও নেতৃত্ব তাদেরকে যথাযথভাবে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। ফলে দেখা যায় কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা সেই অবস্থায়ই রয়েছে। মুঘলদের মধ্যে সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি। যার মাধ্যমে তারা অন্যান্য জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে। এ বিষয়টিও অনস্বীকার্য যে, মুঘলদের বেশির ভাগ গোষ্ঠী ও সর্দার দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুফরীর অবস্থায় ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কখনো ঐ সমস্ত গোত্র বা সর্দারের সাথে অবস্থান করতে বা তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে অস্বীকার করেনি, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু মুঘলদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি, তাই তাদের শাসনামলে অমুসলিম গোত্রগুলো নয় বরং প্রাচীন মুসলমান এবং তাদের মুসলিম প্রজারাই ইসলামের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে হিন্দুস্থানের বাদশাহ আকবরের কিছু কিছু ধর্মীয় দুষ্কৃতিতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। মুঘলদের অনুপাতে তাতারীরা ইসলামকে খুব ভালভাবে বুঝত। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতি কোন সময়েই এত নিম্নমানের ছিল না যেমন ছিল মুঘলদের ইসলামের ছায়াতলে তাদের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও। এ কারণেই তাতারী ও সালজূকীরা ইসলাম প্রচারে এমনি চেষ্টা করেছে এবং ইসলামের জন্য এমনি আত্মদান করেছে যার সামান্য দৃষ্টান্তই মুঘলদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুর্কী তাতারী ও মুঘলদের মধ্যে কি মিল ও কি অমিল রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মুঘলদের মধ্যে মুসাম্মৎ আল আলকাওয়া পুত্রদের বংশধর থেকে পৃথক পৃথক জাতি সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে বুয়ানজার ইব্‌ন আল-আনকাওয়া-এর বংশধররা বুযানজারী নামে পরিচিত। এরা অন্যান্য জাতির চাইতে বিখ্যাত এবং সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। এই বুযানজারী গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল তুমনাহ খান। তুমনাহ খানের ছিল দুই পুত্র। একজন কুবলাঈ খান এবং অন্যজন কাচুলী বাহাদুর। চেঙ্গিয খান ছিলেন কুবলাঈ খানের বংশধর। চেঙ্গিয খানের বংশধরকে চেঙ্গিযী মুঘল বলা হয়। এদের সম্পর্কেও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অপর পুত্র কাচূলী বাহাদুরের পুত্রের নাম ছিল ঈরুমজী বারলাস। এই ঈরুমজী বারলাসের বংশধরদের বারশাম জাতি বলা হয়। ঈরুমজী বারলাসের পৌত্র হচ্ছেন আমীর কারাচার। এর সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই কারাচার ছিলেন চেঙ্গিয খানের পুত্র চুঘতাই খানের প্রধান সভাসদ ও সেনাপতি। কারামের শাসনকর্তা আমীর তাইমূর গুরকান এই আমীর কারাচারের বংশধর। অতএব আমীর তাইমূর ছিলেন বারলাস জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমীর তাইমূরের উপাধি যেহেতু গুরকান ছিল, তাই তাঁর বংশধরকে গুরকানিয়া বলা হয় এবং তাদেরকে একটি পৃথক জাতি গণ্য করা হয়। বুখানজারী মুঘলদের মধ্যে প্রথমত কুবলাঈ খানের বংশধর জ্ঞানবুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সিংহাসনের অধিকারী ছিল। যখন তাদের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হলো তখন কাবলী বাহাদুরের বংশধর অর্থাৎ বারলাস মুঘলদের উন্নতির যুগ এল। এই বংশেরই আমীর তাইমূর গুরকান

চেঙ্গিয খানের বিজয়কে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, চেঙ্গিয খান ছিলেন একজন অমুসলিম পিতার অমুসলিম সন্তান। আর আমীর তাইমূর ছিলেন এক মুসলমান আল্লাহ-ওয়ালা পিতার মুসলমান সন্তান। চেঙ্গিয খান যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং যাদের হত্যা করেছেন তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চেঙ্গিয খানের অনুরূপ ছিলেন না। কিন্তু আমীর তাইমূরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারই মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। চেঙ্গিয খানের মৃত্যুর পর এশিয়ার একটি বিরাট অংশ যেমন তাঁর বংশধরদের শাসনাধীন ছিল তেমনি এশিয়ার বেশির ভাগ দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল আমীর তাইমূরের বংশধর। অতএব অত্যন্ত সঙ্গতভাবে বলা চলে যে, তুমনাহ খানের সন্তানরা একাধারে প্রায় ছয়শ বছর এশিয়া মহাদেশের একটি বিরাট অঞ্চল শাসন করেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইরানের ইসলামী ইতিহাসের পরিশিষ্ট

ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলী এ যাবত যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে ইরানের ইতিহাসের একটি বিরাট ও অপরিহার্য অংশ আমাদের আলোচনায় এসে গেছে। কিন্তু যে সব ঐতিহাসিক শুধু ইরানের ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা অন্য ধারা অবলম্বন করেছেন। আর এটা তাদের জন্য সঙ্গতও ছিল। অন্যান্য ইসলামী দেশের তুলনায় ইরানের ইতিহাসের সাথে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ যাবত বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে বিন্যাসগত বিভিন্নতার কারণে যে ঘাটতি রয়ে গেছে নিম্নে অতি সংক্ষেপে হলেও আমরা তা পূরণের প্রয়াস পাব।

সাফ্‌ফারিয়া সাম্রাজ্য

ইরানের ইতিহাসসমূহে খলীফাদের সরাসরি হুকুমতের পর সর্বপ্রথম সাফ্‌ফারিয়া বংশের স্বাধীন সাম্রাজ্য পরিচালনার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এই বংশের শাসকদের অবস্থা ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এখানে আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে একটি কথা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আব্বাসীয় বংশ তাদের খিলাফত লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু ইরানীদের কাছ থেকে সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিল তাই ইরানীদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি এবং আরবদের উপর তাদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেদিকে আব্বাসীয়দের কোন দৃষ্টি ছিল না। এর ফলে বিজিত ইরানীদের মনে পুনরায় বিজয়ী হওয়ার এবং নিজেদের স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আব্বাসীয় বংশের মধ্যে বিজয়ী ও বীরসুলভ মনোবৃত্তি অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ইরানীরা পুরোপুরিভাবে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হতে পারেনি। তারপর আব্বাসীয় খলীফাদের ভোগবিলাস দুর্বলতা ইরানীদের জন্য তাদের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দিলে সর্বপ্রথম ইয়াকুব ইব্‌ন লায়ছ আপন স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হন। তাঁর বংশগত পেশা ছিল লোহার পাত্র তৈরি করা। তাই তাকে সাফ্‌ফার (লোহার পাত্র প্রস্তুতকারী) নামে সম্বোধন করা হতো। ইয়াকুব শুধু নিজের বীরোচিত স্বভাব-প্রকৃতি ও উদ্যম-উৎসাহের কারণে নিজের একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বদান্য ও সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আর এই সমস্ত গুণ ও আচরণ ছিল তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর কাছে যাই থাকত তিনি আপন বন্ধুদের মধ্যে তা অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। তিনি নিজে কষ্টের মধ্যে থেকেও বন্ধুদের আরাম-আয়েশের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এ

কারণেই নিজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ একদল সাথী সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি বাদশাহ হওয়ার পরও ছোট কালের বন্ধুদের কথা ভুলে যাননি বরং সকলকেই উচ্চ মর্যাদাদান করেছেন। বাদশাহ হওয়ার পরও তাঁকে একজন সাধারণ সিপাহীর পোশাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। মাটিতে শয়ন করতেও তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁর এবং একজন সাধারণ সিপাহীর তাঁবুর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আরামপ্রিয়তা ও অসদাচরণকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর প্রত্যেকটি তৎপরতা ও প্রত্যেকটি উদ্যোগে দৃঢ়তা ও বিদ্যোৎসাহিতা পরিদৃষ্ট হতো। আর এসব কারণেই তিনি অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতি করে ইরানের একটি বিরাট ভূখণ্ডের স্বাধীন নরপতি হতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে প্রতিরোধ বা তাঁর মূলোৎপাটন করা বাগদাদের খলীফাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

ইয়াকুব ইব্‌ন লায়ছের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরই আপন ভাই আমর ইবন লায়ছ। আমর সাফ্‌ফারিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন আরো বৃদ্ধি করেন। বিবেক-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে আমর তাঁর ভাইয়ের চাইতে কিঞ্চিৎ অগ্রণী হলেও সাদাসিধা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের ঢের পিছনে। খলীফা মুতামিদের ভাই মুওয়াফ্‌ফাক তো তাঁকে একবার পরাজিতই করেছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আপন অবস্থা শুধরে নেন এবং বাগদাদের দরবারে খিলাফতের জন্য আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত বাগদাদের খলীফা মাওরাউন নাহরের শাসনকর্তা ইসমাঈল সামানীকে আমর ইবন লায়ছের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। আমর ইব্‌ন লায়ছ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইসমাঈল সামানীর মূলোৎপাটনে অগ্রসর হন এবং জায়হূন নদী অতিক্রম করে শত্রুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ান। ইসমাঈল সামানী শুধু বিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আমরের মুকাবিলায় এসেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে দুর্ভাগ্যবশত আমরের বাধাদান সত্ত্বেও তাঁর ঘোড়াটি তাকে নিয়ে ঈসমাঈল সামানীর সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ফলে অতি সহজেই তিনি বন্দী হন।

ইসমাঈল সামানী আমরকে বন্দী করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। বলতে গেলে দৈব-দুর্বিপাকে সাফ্‌ফারিয়া সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি এভাবে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছে। ইয়াকুব এবং আমরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল এই যে, ইয়াকুব ছিলেন একজন অতি পরিশ্রমী, শুকনো রুটি খেতে অভ্যস্ত, সহজ-সরল জীবনের অধিকারী একজন সৈনিক। আর আমর ছিলেন আরামপ্রিয় ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত একজন শাহানশাহ। এ প্রসংগে একটি রসালো কাহিনীর উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে।

যেদিন আমর ইব্‌ন লায়ছ বন্দী হন সেদিন সকালবেলা তাঁর বাবুর্চি তাঁর কাছে নিবেদন করেছিল ঃ হুযূর, বাবুর্চি খানায় যাবতীয় আসবাবপত্র বহন করার জন্য তিনশ' উট যথেষ্ট নয়। অতএব এ কাজের জন্য আমাকে আরো কিছু উট দেওয়া হোক। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যায়ই যখন আমর বন্দী অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন তখন তাঁর বাবুর্চি সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ঘোড়ার খাবার সিদ্ধ করার একটি পাত্র পেয়ে তাতে সামান্য পানির সাথে কিছু নিকৃষ্টমানের

মটরদানা ঢেলে দিয়ে সেটাই সিদ্ধ করার প্রয়াস চালায়। এ ছাড়া কোন জিনিসই তো তার নাগালের মধ্যে ছিল না। আমর অত্যন্ত অধৈর্যের সাথে মটরদানা সিদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। বাবুর্চি এক সময় হাঁড়িটি চুলা থেকে নামিয়ে রাখে এবং কোন প্রয়োজনে অন্যদিকে মনোনিবেশ করতেই একটি কুকুর এসে হাঁড়ির পার্শ্ব কামড়ে ধরে তা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। আমর কুকুরকে হাঁড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে বাবুর্চিকে চিৎকার দিয়ে বলেন, সকালবেলা তো অভিযোগ করছিলে যে, বাবুর্চিখানার আসবাবপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনশ' উট যথেষ্ট নয়, এখন দেখ শুধু একটি কুকুরই আমার সমগ্র বাবুর্চিখানা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমর ইব্‌ন লায়ছের পর তার বংশধররা কয়েক বছর পর্যন্ত সীস্তান এলাকার কয়েকটি সীমিত ভূখণ্ডে নামমাত্র নিজ নিজ শাসন কায়েম রাখেন। ইয়াকুব ইব্‌ন লায়ছের প্রপৌত্র খালাফ মাহমূদ গাযনাবীর যুগ পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। খালাফের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পিতা পুত্রের মুকাবিলায় নিজেকে দুর্বল দেখতে পেয়ে প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন। সীস্তানের অধিবাসীরা সুলতান মাহমূদ গাযনাবীর খিদমতে হাযির হয়ে তার কাছে খালাফের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে এবং তার জুলুম-অত্যাচার বন্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁর কাছে বিনীত আবেদন জানায়। সুলতান মাহমূদ গাযনাবী খালাফের উপর আক্রমণ চালান। খালাফ যখন দেখতে পেলেন যে, তিনি নির্ঘাত পরাজিত হয়ে গেছেন এবং তার দুর্গও সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে তখন তিনি সোজা সুলতান মাহমূদের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর ঘোড়ার জিনের পাদানীতে চুমু খান এবং তাঁর পায়ে আপন দাড়ি ঘষতে ঘষতে নিবেদন করেন : হে সুলতান, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। মাহমূদ গাযনাবী নিজের সম্পর্কে খালাফের মুখ দিয়ে 'সুলতান' উপাধি উচ্চারিত হতে শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং সেদিন থেকে এটাকেই নিজের উপাধি হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি খালাফকেও কোন শাস্তি দেননি। তবে তাকে সঙ্গে করে গযনীতে নিয়ে যান। চার বছর পর খালাফ গযনীতেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে সাফ্‌ফারী সাম্রাজ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সামানী সাম্রাজ্য

আসাদ ইব্‌ন সামান নিজেকে বাহরাম চূবীনের বংশধর দাবি করতেন। একদা তিনি আপন চার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মার্ভে মামূনুর রশীদ আব্বাসীর খিদমতে হাযির হন। মামূন তখন মার্ভে অবস্থান করছিলেন। মামূন আপন ভাই আমীনের কাছ থেকে সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাতে ইরানীদের সাহায্য-সহযোগিতা সব চাইতে বেশি। অতএব আসাদ ইব্‌ন সামান এবং তার বংশধরদের প্রতি মামূনুর রশীদের সদয় থাকাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ফলে ঐ সময়ে সামানীদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এই পরিবারটি ছিল ইরানের একটি বিখ্যাত সর্দারের বংশধর, তাই মাওরাউন নাহর ও খুরাসানে এদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা দিন দিন

একেবারে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আসাদ ইব্‌ন সামানের পৌত্র ইসমাঈল সামানী আমর ইব্‌ন লায়ছের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর খুব শীঘ্রই বাদশাহর মর্যাদায় উপনীত হন। পার্থক্য শুধু এই ছিল যে, সাফ্‌ফারী বংশ খিলাফতে বাগদাদের প্রতিপক্ষ থেকে যায় আর ইসমাঈল এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তরা শুধু নামমাত্র খিলাফতে বাগদাদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে থাকে।

ইসমাঈল সামানী সাত-আট বছর মাওরাউন নাহ্‌র ও খুরাসানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। খলীফা মুতাদিদ বিল্লাহ আব্বাসী তাঁকে খুরাসান রাজ্যের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। ইসমাঈলের মৃত্যুর পর আবূ নাযীর আহমদ ইব্‌ন ইসমাঈল সামানী আপন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইসমাঈল সামানী অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং আল্লাহর উপর সদা নির্ভরশীল ছিলেন। সমর কৌশল ও শাসন পরিচালনা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। প্রজারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তিনি তাঁর আচার-আচরণ দ্বারা সকলকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইরানের একটি অত্যন্ত অভিজাত নেতৃস্থানীয় বংশের সাথে তাঁর রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।

আহমাদ ইব্‌ন ইসমাঈল সিংহাসনে আরোহণ করার পর তার অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহারের কারণে তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল। ছয়-সাত বছর পর্যন্ত তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বলতে গেলে এই সমগ্র সময়টুকু তিনি দরবারে খিলাফতের বিরুদ্ধাচরণ এবং আপন আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে ব্যয় করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের মামার হাতেই নিহত হন।

তারপর তার পুত্র নাস্‌র ইব্‌ন আহমাদ সামানী মাত্র আট বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অবিকল আপন দাদা ইসমাঈলের মত। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আপন সালতানাতের আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং ত্রিশ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর দরবারে রূদ-এর কবি, যিনি অন্ধ ছিলেন, অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করছিলেন। নাস্‌র ইব্‌ন আহমাদ আপন রাজধানী বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

তারপর তাঁর পুত্র নূহ ইব্‌ন নাস্‌র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তের বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ৩৪৩ হিজরীতে (৯৫৪ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নূহের পর তাঁর পুত্র আবদুল মালিক ইব্‌ন নূহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ খুরাসান প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব আপন এক অধিনায়ক আলপ্তগীনের হাতে অর্পণ করেছিলেন। তিনি সাত বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর পোলো খেলার সময় ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে মারা যান।

আবদুল মালিকের পর তাঁর ভাই মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রুকনুদ দাওলা দায়লামীর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই ইরাক এবং পারস্যেও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। মানসূরের মন্ত্রী আবূ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ফারসী ভাষায় তারীখে তাবারীর অনুবাদ করেছিলেন। মানসূর ইব্‌ন নূহ পনের বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন।

মানসূরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুল কাসিম নূহ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে সালতানাতে বুখারা তথা সামানী সাম্রাজ্যের পতন

শুরু হয়। তাঁর সভাসদরা তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়। তাঁরাই মুঘলিস্তানের বাদশাহ বুগরা খানকে আবুল কাসিমের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। বুখারার সন্নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বুগরা খান দ্বিতীয় নূহকে পরাজিত করে বুখারা দখল করেন। কিন্তু এই বিজয় লাভের পর পরই বুগরা আকস্মিকভাবে বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাঁর সৈন্যরা নিজেদের দেশে ফিরে যায়। দ্বিতীয় নূহ পুনরায় বুখারায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আপন সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করে গড়ে তোলেন। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন সবুক্তগীন গযনীতে নিজের একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় নূহের সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পরই আলপ্তগীনের মৃত্যু হয়েছিল। সবুক্তগীন বুগরা খানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নূহকে যে সাহায্য করেছিলেন তার বিনিময়ে দ্বিতীয় নূহ তাকে নাসিরুদ্দীন উপাধি প্রদান করেছিলেন। কবি ওয়াফিকী, যিনি গুশতাস্প উপাখ্যানের একশটি কবিতা লিখেছিলেন, নাসিরুদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। বুগরা খানের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি লাভের পর দ্বিতীয় নূহ তাঁর বিদ্রোহী ও অবিশ্বস্ত আমীর ও সভাসদকে শাস্তি প্রদানের সংকল্প নেন যারা সমগ্র দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে রেখেছিল। ঐ সব বিদ্রোহী আমীর তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ফখরুদ্দৌলা দায়লামীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁর সাহায্য নিয়ে বুখারা সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় নূহ পুনরায় সবুক্তগীনের সাহায্য তলব করেন। সবুক্তগীন হিরাতের সন্নিকটে বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করেন এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে সবুক্তগীনের পুত্র মাহমূদ গাযনাবী অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। ফলে দ্বিতীয় নূহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাইফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই যুদ্ধে সবুক্তগীন 'নাসিরুদ্দৌলা' উপাধি পেয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পরই দ্বিতীয় নূহের দরবার থেকে তাঁকে খুরাসান রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। দ্বিতীয় নূহ বাইশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামলের বেশির ভাগ সময় যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয় এবং একের পর এক প্রদেশ তাঁর দখলচ্যুত হতে থাকে।

দ্বিতীয় নূহের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে সমস্ত আমীর ও সভাসদ তাঁর পিতাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল, তারা তাঁকেও ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, এমন কি তাঁকে বুখারা থেকে বেদখল করে দেয়। তারপর তারাই আবার তাঁকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে। তবে শাসনকার্য নিজেদের হাতে নিয়ে তারা খুরাসানে একজন নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করে। কিন্তু মাহমুদ গাযনাবী শীঘ্রই ঐ নতুন শাসনকর্তাকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করে সেখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ সময়ে আমীর ও সভাসদরা মানসূরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর চোখ উপড়ে ফেলে এবং তাঁর স্থলে তাঁর ভাই দ্বিতীয় আবদুল মালিক ইব্‌ন দ্বিতীয় নূহকে সিংহাসনে বসায়। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে তারা মাহমূদ গাযনাবীর উপর হামলা চালায়। মাহমূদ গাযনাবী দ্বিতীয় আবদুল মালিক ও তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে বুখারার দিকে তাড়িয়ে দেন। এদিকে কাশগড়ের শাসনকর্তা এলজ খান খাওয়ারিযম দখল করে বুখারার উপর হামলা করেন এবং দ্বিতীয় আবদুল মালিকের তৃতীয় ভাই মুনতাসির ছদ্মবেশ ধারণ করে বুখারা

থেকে পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর্যন্ত লক্ষ্যহীনভাবে একদল ডাকাতের সাথে ঘুরাফেরা করে তাদেরই কারো হাতে নিহত হয়। আর এখানেই সমাপ্তি ঘটে সামানী শাসনামলের।

দায়লামী শাসনামল

আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে নবম অধ্যায়ে দায়লামী রাজত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, দায়লামীদের সম্পর্কে অবগতির জন্য তাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, দায়লামী ও সামানীয় রাজত্ব ছিল সমসাময়িক এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সামানীয়রা ছিল মাওরাউন নাহ্‌র, খুরাসান প্রভৃতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহের অধিকারী। অপর দিকে দায়লামীদের দখলে ছিল পারস্য, ইরাক, আযারবায়জান প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহ। এভাবে সমগ্র ইরান কিছুদিন পর্যন্ত এই দুই বংশের মধ্যে বণ্টিত ছিল। সামানীয়দের পতনের পরও দায়লামী রাজত্ব দুর্বল অবস্থায় হলেও বেশ কিছুদিন টিকেছিল। তখন সামানীয় সাম্রাজ্যের স্থলে পূর্বে ইরানে গাযনাবীদের মহাশক্তিশালী এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গাযনাবী সাম্রাজ্য

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন নূহ আলপ্তগীনকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল মালিকের পর যখন তাঁর ভাই মানসূর ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আলপ্তগীন, যিনি মানসূরের সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করেছিলেন, রাজধানী খুরাসান থেকে গযনীতে চলে আসেন, যা ঐ যুগে একটি নগণ্য লোকবসতি ছাড়া কিছু ছিল না। আলপ্তগীন এখানে এসে সুদৃঢ় হয়ে বসেন এবং নিজের একটি পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৬৭ হিজরীতে (৯৭৭-৭৮ খ্রি) আলপ্তগীনের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র ইসহাক গযনীর শাসনকর্তা হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অযোগ্যতা সকলের চোখে ধরা পড়ে। ফলে সামরিক অধিনায়করা তাঁকে পদচ্যুত করে আলপ্তগীনের সেনাপতি ও জামাতা সবুক্তগীনকে গযনীর সম্রাট ঘোষণা করে।

সবুক্তগীন সম্পর্কে একটি কথা বহুলভাবে প্রচারিত যে, তিনি আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দাসত্ব একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিছুসংখ্যক ডাকাত তাঁকে রাস্তায় একাকী পেয়ে বন্দী করে এবং বুখারায় নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করে। সবুক্তগীনের বংশতালিকা ইরানের বাদশাহ ইয়ায্‌দর্গিদ পর্যন্ত পৌঁছে। যেমন সবুক্তগীন ইবন জাওক কারাইয়াহকাম ইব্‌ন কারা আরসালান ইব্‌ন কারা মিল্লাত ইব্‌ন কারা মূমান ইব্‌ন ফীরুয ইব্‌ন ইয়ায্‌দর্গিদ। কিন্তু এই বংশ-লতিকার বিশুদ্ধতার প্রমাণ পেশ করা কঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সবুক্তগীন ছিলেন তুর্কী। আবার কারো কারো মতে তিনি পিতার দিক থেকে ছিলেন তুর্কী এবং মাতার দিক থেকে ইরানী। যাহোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বংশগত দিক দিয়ে তিনি একজন অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। এশীয় দেশসমূহের প্রথানুযায়ী কোন বাদশাহর আমীর, সর্দার এবং শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের পক্ষে নিজেদেরকে বাদশাহর

গোলাম আখ্যা দেওয়ার মধ্যে অসম্মানের কিছু ছিল না। অতএব এটাও সম্ভব যে, আলপ্তগীনের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হওয়ার কারণে সবুক্তগীন নিজেকে আলপ্তগীনের গোলাম আখ্যায়িত করে থাকবেন (ম্যালকম এই অভিমতই ব্যক্তি করেছেন)। সবুক্তগীন আনুমানিক বিশ বছর গযনী শাসন করেন। তিনিই সেই বাস্ত নগরী জয় করেন, যা গযনী থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে হেলেমন্দ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। সবুক্তগীন হিরাত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর রাজা জয়পাল তার রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি তাকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি দেন। জয়পাল তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং পুনরায় তিন লক্ষ সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সবুক্তগীনের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সবুক্তগীন মাত্র কয়েক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে জয়পালের মুকাবিলা করেন এবং এবারও তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বন্দী করেন। তারপর জয়পাল আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে এ যাত্রাও নিজেকে মুক্ত করে নেয়। (জয়পালের বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)। নূহ ইব্‌ন মানসূর সবুক্তগীনকে নাসিরুদ্দীন এবং তাঁর পুত্র মাহমূদকে সাইফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। সবুক্তগীন গযনী সাম্রাজ্যের আয়তন বহুলভাবে বৃদ্ধি করেন এবং ৩৮৭ হিজরীতে (৯৯৭ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। সবুক্তগীনের পর তাঁর পুত্র আমীর ইসমাঈল বল্‌খের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র ছয়মাস পর আপন ভাই মাহমূদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন।

৩৮৭ হিজরীতে (৯৯৭ খ্রি) মাহমূদ ইব্‌ন সবুক্তগীন গযনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আব্বাসীয় খলীফা কাদির বিল্লাহ তাঁকে ইয়ামীনুদ্দৌলা এবং আমীনুল মিল্লাত উপাধি প্রদান করেছিলেন। মাহমূদ গাযনাবী সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। জনসাধারণ বুখারার বাদশাহ আবদুল মালিক সামানীকে মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করে। মাহমূদ বাধ্য হয়ে আবদুল মালিকের মুকাবিলা করেন এবং তাকে পরাজিত করে বুখারার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। কাশগড়ের বাদশাহ ইলিজ খান অথবা ইলেক খান বুখারা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন এবং আবদুল মালিক সামানী তার হাতে বন্দী হন। অবশ্য মাহমূদ গাযনাবী ইলিজ খান ইব্‌ন বুগরা খানের উপর হামলা চালিয়ে তাকে বুখারা থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তা নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর সুলতান মাহমূদ মোঙ্গল সর্দার তাঘা খান ইবন আলতু খানকে পরাজিত করে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত আপন সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন। তিনি খারিযম সাম্রাজ্যও দখল করেন। সীস্তান ও খুরাসান অঞ্চল সবুক্তগীনের যুগ থেকে গযনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবার সুলতান মাহমূদ মাজদুদ্দৌলা দায়লামীকে পরাজিত ও বন্দী করে রায় ও ইসপাহানের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে সুলতান মাহমূদকে বাধ্য হয়ে বার বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে হয়। এ সম্পর্কে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। মোটকথা মাহমূদ গাযনাবী শতদ্রু নদী থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এবং মাওরাউন নাহর থেকে বেলুচিস্তান ও ইরাক পর্যন্ত একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন এশিয়া মহাদেশের একজন পরাক্রমশালী ও বিখ্যাত শাহানশাহ। তাঁর যুগে ফারসী ভাষার প্রচলন ও প্রচারে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন সুলতান মাহমূদ সেই ভূমিকা পালন করেছিলেন ফারসী ভাষার প্রচলন, প্রচার ও উন্নয়নে। মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও বিদগ্ধজনের পৃষ্ঠপোষক এবং অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে যে, ঈর্ষা, পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থান্ধতার বশবর্তী হয়ে একটি বিশেষ মহল আজ তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট, জালিম, রক্তপিপাসু এবং হিন্দুদের প্রাণঘাতী শত্রু প্রমাণিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই সমস্ত অমূলক কথাবার্তার আসল রহস্য হিন্দুস্থানের ইতিহাসে উদঘাটন করা হবে ইনশাআল্লাহ। সুলতান মাহমূদের যুগেই কবি ফিরদাউসী বিশ্বসাহিত্যের অমর কাব্য 'শাহনামা' রচনা করেন। মাহমূদ গাযনাবী ৪২১ হিজরীতে (১০৩০ খ্রি) ইনতিকাল করেন। সামানী রাজদরবারের পক্ষ থেকে সবুক্তগীন ও মাহমূদ গাযনাবী আমীরুল উমারা উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু ৩৮৯ হিজরীতে (৯৯৯ খ্রি) সুলতান মাহমূদ নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন এবং আবদুল মালিক সামানীর নাম খুতবা থেকে বাদ দেন। ঐ বছরই আব্বাসীয় খলীফা কাদির বিল্লাহ সুলতান মাহমূদকে ইয়ামীনুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেছিলেন। মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন স্বীয় যুগের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী মুসলিম বাদশাহ। তিনি তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ঠিক সেইভাবে নিজ পুত্রদের হাতে অর্পণ করেছিলেন যেভাবে অর্পণ করেছিলেন খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁর সাম্রাজ্য আপন দুই পুত্র মামূন ও আমীনের হাতে। মাহমূদ গাযনাবীর দুই পুত্রও ঠিক সেভাবে আপোসে লড়েছিলেন যেভাবে লড়েছিলেন হারূনের দুইপুত্র আমীন ও মামূন। কিন্তু মামূনুর রশীদ যেভাবে আপন ভাই আমীনুর রশীদের উপর জয়লাভ করে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শান-শওকত বহাল রাখতে পেরেছিলেন, মাহমূদের পুত্র মাসউদ আপন ভাই মুহাম্মদের উপর জয়লাভ করে ঠিক সেভাবে গযনী সাম্রাজ্যের শান-শওকত টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। মাহমূদ গাযনাবী মাওরাউন নাহর, খুরাসান, গযনী, পাঞ্জাব প্রভৃতি এলাকা আপন কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদকে দিয়েছিলেন আর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাসউদকে দিয়েছিলেন খাওয়ারিযম, ইরাক, পারস্য, ইস্পাহান প্রভৃতি এলাকা। মাহমূদের মৃত্যুর সাথে সাথে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। মুহাম্মাদ বসেন গযনীর সিংহাসনে, আর মাসউদ বসেন রায়ের সিংহাসনে। প্রথম ঝগড়ার সূত্রপাত এভাবে হয় যে, মাসউদ বয়সে বড় হওয়ার কারণে চাচ্ছিলেন যেন খুতবায় তাঁর নাম মুহাম্মাদের আগে পঠিত হয়। কিন্তু মুহাম্মাদ বলছিলেন, যেহেতু আমি পিতারই সিংহাসনে (গযনীতে) বসেছি, অতএব দেশের সর্বত্র জুমুআর খুতবায় মাসউদের পূর্বে আমার নামই পঠিত হতে হবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই একটা বাহানা মাত্র। আসলে এক ভাই অন্য ভাইকে পরাস্ত করে সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে চাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, মাসউদ এক হামলার মাধ্যমে গযনী জয় করে আপন ভাই মুহাম্মাদকে বন্দী করেন এবং তার দুই চোখ উপড়ে ফেলা হয়। গযনীর সিংহাসনে আরোহণ করে মাসউদ বেলুচিস্তান ও মাকরানের উপর হামলা চালিয়ে ঐ সমস্ত এলাকা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কোন সাম্রাজ্যে দুই রাজকুমার সিংহাসন দখলের জন্য পরস্পর যুদ্ধে

লিপ্ত হলে সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশেই বিদ্রোহী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুহাম্মাদকে অন্ধ করে দেওয়ার পর সুলতান মাসউদের পক্ষে বিরাট গযনী সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সালজুকী তুর্কীরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে খাওয়ারিয্‌ম এলাকায় লুটপাট শুরু করে দেয়। এদিকে হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাব ও কোন কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণার সংকল্প নেন। ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যের ভীত একসাথে নড়বড়ে হয়ে ওঠে। সুলতান মাসউদ অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন। তিনি খাওয়ারিয্‌ম ও খুরাসানে সালজুকীদেরকে একের পর এক পরাজিত করেন এবং মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে হিন্দুস্থানের উপরও হামলা চালান। তিনি সরস্বতী ও হাঁসির সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দখল করে সেগুলোকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেন। তারপর দ্রুতবেগে হিন্দুস্থান থেকে গযনী ফিরে এসে দেখতে পান যে, সালজুকীরা প্রথম বারের চাইতেও অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর মুকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে আছে। মাসউদ প্রতিবারই তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তারাও প্রতিবার নিজেদের পুনর্গঠিত করে মাসউদের মুকাবিলা করতে থাকে। সুলতান মাসউদের সেনাবাহিনীতে বিরাট সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকজন হিন্দু তার বাহিনীতে অধিনায়কের পদেও অধিষ্ঠিত ছিল। ঐ সমস্ত অধিনায়কের অধীনে ছিল অনেকগুলো হিন্দু প্লাটুন ও পার্শ্ব বাহিনী। মাসউদ হিন্দুদের বাহিনী গঠন এবং তাদেরকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকজন হিন্দু অধিনায়ককে শুধু এইজন্য হিন্দুস্থানে পাঠান, যাতে তারা সেখান থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য গযনীতে এসে পৌঁছলে মাসউদ তাদের জন্য ইরানী ও আফগান সৈন্যদের চাইতে অধিক ভাতা নির্ধারণ করেন। এমনকি তিলক নামীয় জনৈক হিন্দুকে তিনি মহারাজা উপাধি দিয়ে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন। এই মহারাজা তিলক ছিলেন একজন হিন্দু নাপিতের সন্তান। অতএব তার মর্যাদা সকলের উপরে দেখে বেশির ভাগ আমীর ও সভাসদ সুলতান মাসউদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁর সমালোচনা করতে শুরু করে। সুলতান মাসউদের এই হিন্দু-তোষণনীতি সবাইকে এজন্য বিস্মিত করে যে, মাকরানের যুদ্ধে হিন্দুরা যে ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছিল তাতে কোন মানুষ কল্পনা করতে পারে নি যে, সুলতান মাসউদ তারপর হিন্দু-প্রেমে এভাবে মত্ত হবেন। শেষ পর্যন্ত খুরাসানের এক জঙ্গলে সালজুকীদের সাথে সুলতান মাসউদের বাহিনীর মুকাবিলা হলে এই হিন্দু সৈন্যরাই সর্বাগ্রে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে সুলতান মাসউদ এবং তার আফগান বাহিনীকে দারুণ সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কয়েকজন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মুসলিম সৈন্যের অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের কারণে সুলতান মাসউদ কোন মতে প্রাণে বেঁচে গেলে তাঁকে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে হয়। এই পরাজয়ের পর সুলতান মাসউদের মনে এমনি অবিশ্বাস ও হীনম্মন্যতা ঢুকে পড়ে যে, তিনি আপন মন্ত্রী এবং আপন পুত্র মাওদূদকে গযনীতে রেখে যাবতীয় ধনরত্ন উট, হাতি ও ঘোড়ার পিঠে ও শ্রমিকদের মাথায় উঠিয়ে হিন্দু সর্দারদের সাথে নিয়ে হিন্দুস্থান অভিমুখে এজন্য রওয়ানা হন যাতে লাহোরকে রাজধানী করে সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারেন। যেহেতু সুলতান মাসউদ তাঁর এই সংকল্পের কথা প্রথমেই গযনীতে প্রকাশ

করে দিয়েছিলেন তাই সেখানকার অধিনায়ক ও আমীর-উমারা তাকে তাঁর এই সংকল্প থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তারা তাঁকে বলেন, আপনি আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরুন। আমরা শীঘ্রই আমাদের গত পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব এবং সালজুকীদের খুরাসান থেকে মেরে তাড়িয়ে তবে ক্ষান্ত হব। আপনি আপনার পিতার রাজধানী ত্যাগ করবেন না। কিন্তু মাসউদের উপর ঐসব কথার কোনই প্রভাব পড়ল না। তিনি গযনীর ধনভাণ্ডারের যাবতীয় হীরা-জহরত, সোনা-দানা, নগদ মুদ্রা, কাপড়-চোপড়, এমনকি যাবতীয় আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে গযনী থেকে রওয়ানা হন এবং আপন পুত্র মাওদূদের কাছে, যিনি তখন বল্‌খ ও বাদাখশানে অবস্থান করছিলেন, একটি পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছিলেন– আমি তোমাকে গযনী, খুরাসান এবং এতদসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করলাম। এখন থেকে তোমার নামে আমার আদেশ-নির্দেশ আসতে থাকবে। তুমি যে অনুযায়ী কাজ করবে এবং তুর্কীদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে সদা-সচেষ্ট থাকবে। যা হোক মাসউদ হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু সিন্ধু নদ অতিক্রম করার সাথে সাথে হিন্দু সর্দার ও সাধারণ সৈন্যরা, যারা মাসউদের সাথেই ছিল, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত শাহী ধনভাণ্ডারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ সমস্ত ধনরত্ন, যা সবুক্তগীন ও মাহমূদ গাযনাবী দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে সংগ্রহ করেছিলেন, তা বলতে গেলে এক নিমিষেই হিন্দু লুটেরারা হজম করে ফেলে। আর তখন সুলতান মাহমূদের উত্তরাধিকারী সুলতান মাসউদকে আপন কিছু মুসলিম সাঙ্গপাঙ্গসহ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সে মর্মন্তুদ দৃশ্য অবলোকন করতে হয়।

এই করুণদৃশ্য সুলতান মাসউদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানা না গেলেও তার সঙ্গের মুসলমানরা সুলতান মাসউদকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে পদচ্যুত করে তাঁর অন্ধ ভাই মুহাম্মাদকে, যিনি বন্দী অবস্থায় ঐ সফরে সুলতান মাসউদের সাথে ছিলেন, তাঁকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। মুহাম্মাদ বাদশাহ মনোনীত হয়েছেন শুনে হিন্দু-বাহিনীর অনেক যোদ্ধা পুনরায় মুহাম্মাদের আশেপাশে ভিড় জমায়। কেননা এখন তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ক্ষমতা মাসউদের ছিল না। মাসউদকে বন্দী করে যখন তার ভাই মুহাম্মাদের সামনে হাযির করা হয় তখন মুহাম্মাদ তার চোখ উপড়ে ফেলার বদলা মাসউদের উপর থেকে নেন নি বরং তাকে শুধু জিজ্ঞেস করেন, এখন তুমি নিজের জন্য কি পছন্দ কর? মাসউদ উত্তরে বলেন, আমাকে ক্রীট দুর্গে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হোক। মুহাম্মাদ তখন তাকে সপরিবারে ক্রীট দুর্গে পাঠিয়ে দেন। তারপর পাঞ্জাব ও সীমান্ত এলাকায় নিজের নামে মুদ্রা ও খুতবা জারি করেন। মুহাম্মাদের পুত্র আহমদ পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে এবং তাকে কোন কিছু না জানিয়ে ক্রীট দুর্গে গিয়ে আপন চাচা মাসউদকে হত্যা করে আপন পিতার চোখ উপড়ে ফেলার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই সংবাদ শুনে মুহাম্মাদ অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং বল্‌খে আপন ভাতিজা মাওদূদের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, আমি তোমার পিতা মাসউদকে হত্যা করাই নি, বরং আহমদ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই জঘন্য কাজ করেছে। মাওদূদ তখন বলখে সালজুকীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে সিন্ধু নদের তীরে মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে মাওদূদের অপেক্ষা

করছিলেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মাওদূদ তাতে জয়লাভ করেন। মাওদূদ মুহাম্মাদকে বন্দী করে এনে আপন পিতার খুনের বদলে তাদের সবাইকে হত্যা করেন। তারপর মাওদূদ গযনীতে ফিরে গিয়ে ৪৩৫ হিরজীতে (১০৪৩-৪৪ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মাওদূদও আপন পিতা মাসউদের মত সালজুকীদের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মাওরাউন নাহ্‌র, গযনী এবং হিন্দুস্থানের মধ্যেই নিজের সাম্রাজ্য গুটিয়ে ফেলেন। অন্যান্য সব দেশ, যেমন খুরাসান, খওয়ারিযম, ইরাক প্রভৃতি চিরদিনের জন্য গযনী সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং সালজুকীরা সেগুলোকে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়।

৪৪০ হিজরীতে (১০৪৮-৪৯ খ্রি) মাওদূদ ইব্‌ন মাসউদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৪৩ হিজরীতে (১০৫১-৫২ খ্রি) আলীর পর আবদুর রশীদ ইব্‌ন মাওদূদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই তুগ্রিল নামীয় জনৈক অধিনায়ক আবদুর রশীদকে হত্যা করে শাহী মুকুট আপন শিরে ধারণ করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা শীঘ্রই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তুগ্রিলকে হত্যা করে এবং ৪৪৪ হিজরীতে (১০৫২-৫৩ খ্রি) ফররুখ যাদ ইব্‌ন মাসউদকে গযনীর সিংহাসনে বসায়।

ফররুখ যাদ সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত যোগ্যতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে সালজুকীদের হাত থেকে খুরাসান রাজ্য মুক্ত করার চেষ্টা চালান। প্রথম প্রথম বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ফররুখ যাদ সালজুকীদের উপর জয়লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আলপ-আরসালান সালজুকীর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়, তখন গযনী বাহিনী পরাজয় বরণ করে। ফলে খুরাসানের উপর ফররুখ যাদ তাঁর অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

৪৫০ হিজরীতে (১০৫৮ খ্রি) ফররুখ যাদের পর তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন মাসউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান ইবরাহীম গাযনাবী অত্যন্ত পুণ্যবান, বিচক্ষণ ও বীর পুরুষ ছিলেন। সিংহাসনে বসার পর তিনি সালজুকীদের সাথে আপোস করাকেই সমীচীন মনে করলেন। সালজুকীরাও অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির পর তিনি নিজেকে খুরাসানের বৈধ শাসক মনে করতে থাকেন। উপরন্তু ভবিষ্যতের জন্য গযনী ও সালজুকীদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। এই দিক থেকে নিশ্চিন্ত হবার পর সুলতান ইবরাহীম হিন্দুস্থানের দিকে মনোনিবেশ করেন। কেননা আপোসের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এবং সালজুকীদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলার কারণে দীর্ঘদিন থেকে হিন্দুস্থানের দিকে মনোনিবেশ করা গযনীর সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সেখানকার অধিকাংশ সর্দার এবং রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করে গযনীর সুলতানকে করদানে বিরত ছিল। সুলতান ইবরাহীম হিন্দুস্থানের এই অবাধ্য শাসকদের উপর হামলা চালান এবং ধীরে ধীরে নিজের সাম্রাজ্যকে খুব মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলেন। সুলতান ইবরাহীম বেয়াল্লিশ অথবা তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ৪৯৩ হিজরীতে (১১০০ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপর মাসউদ ইব্‌ন ইবরাহীম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ষোল বছর সাম্রাজ্য শাসন করে ৫০৯ হিজরীতে (১১১৫-১৬ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। মাসউদ ইব্‌ন ইবরাহীম কিছু দিনের জন্য লাহোরকেও নিজের রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন।

মাসউদের পর তাঁর পুত্র আরসালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট তিন বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। ৫১২ হিজরীতে (১১১৮-১৯ খ্রি) সুলতান সাঞ্জার সালজুকী গযনী জয় করে আরসালানের ভাই বাহরাম ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন ইবরাহীমকে গযনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

বাহরাম পঁয়ত্রিশ বছরের অধিককাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য বেশ কয়েকবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন এবং বেশির ভাগ সময় লাহোরেই কাটান। তাঁরই শাসনামলে 'কালীলা দিমনা' লিখিত হয়। 'খামসা নিযামী'ও তাঁরই শাসনামলের গ্রন্থনা। সুলতান বাহরামের শাসনামলের শেষভাগে ঘুরীরা গযনীর উপর হামলা চালিয়ে বাহরামকে গযনী থেকে বেদখল করে দেয়। বাহরাম সেখান থেকে পালিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে চলে আসেন এবং ৫৪৭ হিজরীতে (১১৫২-৫৩ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। এখন গযনীদের দখলে শুধু হিন্দুস্থান তথা পাঞ্জাব রয়ে গিয়েছিল এবং গযনী প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরীদের হাতে চলে গিয়েছিল।

বাহরামের মৃত্যুর পর লাহোরে তার পুত্র খসরু শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গযনীকে ঘুরীদের হাত থেকে পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আট বছর পাঞ্জাবে হুকুমত করার পর তিনি লাহোরে পরলোকগমন করেন।

তারপর তার পুত্র খসরু মালিক ইব্‌ন খসরু শাহ ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রি) লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঘুরীরা খসরু মালিককে বন্দী করে পাঞ্জাব অধিকার করে নেয়। আর এখানেই গযনী সাম্রাজ্যের চির বিলুপ্তি ঘটে।

সালজুক সাম্রাজ্য

আব্বাসীয় খলীফাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে সালজুকদের অবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল বিধায় এখানে তাদের সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। তুর্কী বংশোদ্ভূত জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল ভিকাক এবং তার উপাধি ছিল তাইমূর তালীনা। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তান তথা দাশতে কাবচাকের বাদশাহ পেঘূর অন্যতম সভাসদ। তাঁর পুত্রের নাম ছিল সালজুক। সালজুক নিজেকে ইফরাসইয়াবের ৩৪তম অধঃস্তন পুরুষ বলে দাবি করতেন। তিনিও তার পিতার পর পেঘূর রাজদরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। একদা কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সালজুক আপন পিতার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে নিজ পুত্রদের নিয়ে সমরকন্দ ও বুখারার দিকে চলে আসেন। তার এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি জুনদের নিকটে অবস্থান গ্রহণ করে। জুনদ ছিল তুর্কিস্তানের বাদ্‌শাহ পেঘূর একটি করদ রাজ্য। কিছুদিন পর পেঘূর কর্মচারীরা যখন কর আদায় করার জন্য জুনদে আসে তখন সালজুক সেখানকার শাসনকর্তাকে বলেন, কাফিররা মুসলমানদের কাছ থেকে কর আদায় করুক এটা আমার কাছে খুবই অসহনীয় ঠেকছে। সালজুকের এই সাহস প্রত্যক্ষ করে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরাও তাকে সমর্থন করে

এবং সালজুকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পেঘূর কর্মচারীদের উপর আক্রমণ চালায়। এই হামলায় সালজুক বিজয় লাভ করেন। ফলে তাঁর বীরত্বের কাহিনী দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর গোত্রের লোকেরাও তাঁর সাথে এসে মিলিত হতে থাকে। যখন ঈলক খান দ্বিতীয় নূহকে আক্রমণ করেন তখন সালজুক দ্বিতীয় নূহের পক্ষ নিয়ে ঈলক খানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধেই সালজুকের পুত্র মীকাঈল নিহত হন। মীকাঈলের দুই পুত্র তুগ্রিল বেগ এবং চাগার বেগ তাদের পিতামহ সালজুকের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হতে থাকে। সালজুকের আরো চার পুত্র ছিলেন। তারা হচ্ছেন— ইসরাঈল, ইউনুস, ইয়ানাল ও মূসা। তুর্ক ও মুঘল গোত্রসমূহে কোন ব্যক্তি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারলে তিনি অনায়াসে আপন গোত্রের নেতা হতে পারতেন। এই প্রেক্ষিতে সালজুক এবং তাঁর পুত্ররাও শীঘ্রই নেতৃত্ব পদ লাভ করেন এবং তাঁদের চারপাশে তুর্কীরা এসে ভিড় জমায়। ঈলক খান এবং পেঘূর একত্রে সালজুক নামে খ্যাত এই নতুন গোত্রটির ধ্বংস সাধন করতে চান। ঐ সময়েই সালজুক মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পৌত্র চাগার বেগ বাহিনী নিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আর্মেনিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মাহমূদ গাযনাবীর এলাকা তথা তূস প্রদেশ পড়ে। তূসের কর্মকর্তা আল্লাহর পথে জিহাদকারী হিসাবে চাগার বেগকে তার শাসনাধীন এলাকা অতিক্রম করার অনুমতি দেন। সুলতান মাহমূদ গাযনাবী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী বাদশাহ। সালজুক বাহিনী তার এলাকা দিয়েই অতিক্রম করছে জানতে পেরে তিনি তূসের কর্মকর্তার কাছে এর কৈফিয়ত তলব করেন। তাঁর ভয় ছিল হয়ত এই লুটেরার দল তাঁর সাম্রাজ্যেও লুটপাট শুরু করে দেবে। চাগার বেগ আর্মেনিয়া থেকে অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর সালজুকদের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পেল। এবার তারা বল্‌খ প্রান্তরে নিজেদের মেষপাল চরাতে শুরু করল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করল। মাহমূদ গাযনাবী এই সব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর স্থানীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে সালজুকদের নেতাকে আপন দরবারে তলব করেন। তখন সালজুকদের মধ্যে সালজুকের পুত্র ইসরাঈলই ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সব চাইতে দূরদর্শী। অতএব তাঁকেই মাহমূদের দরবারে পাঠানো হলো। মাহমূদ গাযনাবী অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইসরাঈলকে আপন দরবারে গ্রহণ করেন। অনেক কথাবার্তার পর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমার সৈন্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তুমি কত লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে ? ইসরাঈল তাঁর তীরটি সামনে রেখে দিয়ে বললেন, আপনি এই তীরটি আমাদের পার্বত্য গোত্রসমূহে পাঠিয়ে দিন। দেখবেন, দুই লক্ষ লোক এসে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছে। এই উত্তর শুনে সুলতান মাহমূদ তাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে অবহিত হন এবং নিজের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইসরাঈলকে নিরাপত্তার যামানতস্বরূপ হিন্দুস্থানের কালিঞ্জর দুর্গে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ইসরাঈল সাত বছর পর্যন্ত নজরবন্দী অবস্থায় কাটান। ইসরাঈলের অবর্তমানে তুগ্রিল বেগ ও চাগার বেগ সালজুকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দুই ভাই পরস্পর ঐক্য সহযোগিতার সাথে নিজেদের সাথে সংশ্লিষ্ট গোত্রসমূহের উপর হুকুমত চালাতে থাকেন। মাহমূদ গাযনাবী প্রথম প্রথম সালজুকদেরকে চারণভূমি হিসাবে মাওরাউন নাহরে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। তারপর তিনি তাদেরকে এই অনুমতিও দেন যে, তারা জায়হূন নদী অতিক্রম করে খুরাসানে এসেও

বসবাস করতে পারবে। তূস ও বল্‌খের শাসনকর্তা আরসালান জাদিব এতে আপত্তি উত্থাপন করে মাহমূদের কাছে নিবেদন করেন ঃ এরা হলো যোদ্ধা জাতি। তাই যে কোন সময় তারা আমাদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি কেন এদেরকে জায়হূন নদীর এপারে আসার অনুমতি দিচ্ছেন ? কিন্তু মাহমূদ তো নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাছাড়া তিনি এটাও জানতেন যে, এদেরকে মাঝে-মধ্যে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিয়ে জরুরী প্রযোজন মেটানো সম্ভব হবে। ইসরাঈল তো যামানতস্বরূপ নজরবন্দী আছেই। মাহমূদ গাযনাবীর মৃত্যু হলে সুলতান মাসঊদ ইসরাঈলকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কালিঞ্জর দুর্গ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইসরাঈল ভাতিজাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তার পৌঁছার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই সালজুকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ওদিকে সুলতান মাসঊদ সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিজের আওতাধীনে আনতে পারেন নি এমনি সময়ে চাগার বেগ মার্ভ ও হিরাত অধিকার করেন এবং তুগ্রিল বেগ নিশাপুর দখল করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। মাসঊদ গাযনাবী এদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলে দুই ভাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে এমনি ব্যতিব্যস্ত রাখেন যে, বাধ্য হয়ে সুলতান মাসঊদকে সমগ্র খুরাসান থেকে তাঁর অধিকার গুটিয়ে নিতে হয়।

তারপর তুগ্রিল বেগ রায়-এ আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তুগ্রিল বেগ মার্ভেই অবস্থান করতে থাকেন। জুমুআর খুতবায় উভয় ভ্রাতার নামই পঠিত হতে থাকে। তুগ্রিল বেগ খুরাসানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর খাওয়ারিযমকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর তিনি রোমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং সেখান থেকে বিজয়ীবেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি বাগদাদে গিয়ে দায়লামী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং বাগদাদের খলীফার 'মাদারুল মুহাম' ও 'হামীয়ে খিলাফত' নিযুক্ত হন। এই উপলক্ষে খলীফার দরবার থেকে তাঁকে খেতাব ও উপঢৌকন দেওয়া হয়। ৪৪৭ হিজরীতে (১০৫৫ খ্রি) বাগদাদের অভ্যন্তরে তুগ্রিল বেগের নামে খুতবা পঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত তুগ্রিল বেগ খান্দানে খিলাফতের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪৫৫ হিজরীর ৮ই রমযান (অক্টোবর ১০৬৩ খ্রি) শুক্রবার ৭০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। চাগার বেগ এর চার বছর পূর্বেই ৪৫১ হিজরীর ১৮ই রজব (সেপ্টেম্বর ১০৫৯ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তুগ্রিল বেগ ছিলেন নিঃসন্তান। অতএব তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজা সুলতান আল্‌প আরসালান ইব্‌ন চাগার বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৯৫ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ১১০১ খ্রি) সুলতান আল্‌প-আরসালান নয় বছর আড়াই মাস হুকুমত করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুলতান আল্‌প-আরসালান ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, পরাক্রমশালী এবং তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ। একদা আল্‌প-আরসালান শুধু বার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে খ্রিস্টানদের তিন লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রোমের কায়সারকেও বন্দী করেন। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্‌প-আরসালানের পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ সালজুকী সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল্‌প-আরসালানের ভাই কাদির বেগ (কাদরূ) আপন ভাতিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দী হয়ে নিহত হন। এই কাদির বেগের বংশধররাই কিরমানে সালজুক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। মালিক শাহ সিরিয়া এবং মিসরকেও আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ওদিকে জায়হূন নদীর অপর তীর পর্যন্ত তাঁর নামে খুতবা পঠিত হতে থাকে। মালিক শাহের সাম্রাজ্যের আয়তন আল্প-আরসালানের চাইতেও অধিক প্রশস্ত ছিল। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে চীনের প্রাচীর থেকে শুরু করে লোহিত সাগর পর্যন্ত মালিক শাহের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সর্বত্রই তাঁর নামে খুতবা পঠিত হত। ৪৪৪ হিজরীতে (১০৫২-৫৩ খ্রি) মালিক শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মালিক শাহের পর তাঁর পুত্র বারকিয়ারূক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এখান থেকে সালজুকীদের পতন শুরু হয়। বারকিয়ারূকের পর তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন শাহ ৪৯৬ হিজরীতে (১১০২-৩ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তারপর সাঞ্জার ইব্ন মালিক শাহ ৫০৯ হিজরীতে (১১১৫-১৬ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে 'সুলতানুস সালাতীন' উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান বাহরাম গাযনাবী-এর কাছেই পরাস্ত হয়ে করদানে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সুলতান আলাউদ্দীন ঘূরী বাহরামকে তাড়িয়ে দিয়ে গযনী দখল করেন তখন সুলতান সাঞ্জার সালজুকী সেখানে পৌঁছে আলাউদ্দীন ঘূরীকে বন্দী করেন। একবার 'ঘায'-এর তুর্কীরা সুযোগ পেয়ে বলখের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুলতান সাঞ্জারকে বন্দী করে ফেলেছিল। সুলতানকে ওদের ওখানে চার বছর পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়। এই সময়কালে 'ঘায'-এর তুর্কীরা অনবরত লুটপাট চালিয়ে সমগ্র খুরাসানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে সুলতান সাঞ্জার পুনরায় সমগ্র খুরাসান দখল করে নিয়েছিলেন।

তারপর খাওয়ারিযম নামক তাঁর এক ভৃত্য ও কর্মচারী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং খাওয়ারিযমে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই সাম্রাজ্যকে খাওয়ারিযম শাহী নামে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, খাওয়ারিযম শাহী সাম্রাজ্য ও ঘূরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল একেবারে নিকটবর্তী। সুলতান সাঞ্জারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগ্নে মাহমূদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান সাঞ্জার ৫৫০ হিজরীতে (১১৫৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ বছরই মাহমূদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়কালে খুরাসানের এক অংশের উপর ঘূরীরা এবং অপর অংশের উপর খাওয়ারিযম শাহীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র খুরাসান থেকে সালজুকীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে। মালিক শাহ সালজুকীর বংশধর, যারা 'ইরাকে আরব'-এর শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং খিলাফতে বাগদাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল, 'খুলাফায়ে বাগদাদ' অধ্যায়ে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে পুনরায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

কাদির বেগের বংশধরদের মধ্যে একের পর এক দশজন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হামাদান ছিল তাদের রাজধানী। তাদেরকে কিরমানী সালজুকী বলা হতো। কাদির বেগকে ৪৬৫ হিজরীতে (১০৭২-৭৩ খ্রি) বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তারপর মালিক শাহ ইব্ন আল্প-আরসালানের নির্দেশে তাঁর পুত্র সুলতান শাহ্ কিরমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বার বছর হুকুমত করার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর পুত্র তূরান শাহ

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তূরান শাহ্ তের বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তাঁর পুত্র ইরান শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট বিয়াল্লিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। এরপর তাঁর পুত্র মুগীসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট চৌদ্দ বছর হুকুমত পরিচালনার পর তার পুত্র তুগ্রিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোট বার বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র বাহরাম শাহ, তারপর আরসালান শাহ্, তারপর তুরান শাহ্, তারপর মুহাম্মাদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। খাওয়ারিযম শাহী সম্রাটদের উত্থানকালে এরা কিরমানে হুকুমত পরিচালনা করেন; এরপর চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান।

সুলতান আল্প-আরসালান সালজুকী সুলায়মান কাতলামুশ ইব্ন ইসরাঈল ইব্ন সালজুককে এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সুলায়মান সেখানে গিয়ে নিজের একটি পৃথক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে একের পর এক চৌদ্দজন বাদশাহ হন। তারা রোমান সালজুকী নামে প্রসিদ্ধ। কূনিয়া শহর ছিল তাদের রাজধানী। তারা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর (১৩০০-১৩০০১ খ্রি) শেষ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোমানদের সাথে যুদ্ধরত থাকতেন। তাদের পরই উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

সালজুকী এবং গাযনাবীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে খাওয়ারিযম শাহী ও ঘূরীদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে বিধায় এখানে তাদের সম্পর্কে কিছুটা খোলামেলা আলোচনা করতে চাই।

খাওয়ারিয্ম শাহী সালতানাত

মালিক শাহ সালজুকীর নুশতাগীন নামীয় একজন ক্রীতদাস ছিল। তারই পুত্র কুতুবুদ্দীন ইব্ন নুশতাগীন সুলতান সাঞ্জারের দরবারে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। সুলতান সাঞ্জার সালজুকী তার এই ভৃত্য কুতুবুদ্দীনকে খারিযমের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এতদসত্ত্বেও কুতুবুদ্দীন যখন সুলতান সাঞ্জারের দরবারে হাযির হতেন তখন শাহী পোশাক পরিহিত অবস্থায় সুলতানের সেরূপ খিদমতই করতেন, যেরূপ খিদমত করতেন ভৃত্য থাকাকালীন সময়ে। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাওয়ারিযমের শাসনকর্তা ছিলেন। তাই খাওয়ারিযম নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি খাওয়ারিযম শাহ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তারপর তার বংশধরদের মধ্যে যারা শাসক নিযুক্ত হন তারাও খাওয়ারিযম শাহী শাসক বলে পরিচিত হন। কুতুবুদ্দীন প্রথম প্রথম সুলতান সাঞ্জারের একান্ত অনুগতই ছিলেন। কিন্তু যখন সুলতানের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয় এবং তিনি ঘায-এর তুর্কীদের হাতে বন্দী হন তখন কুতুবুদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করে মাওরাউন নাহ্র আক্রমণ করেন। সুলতান সাঞ্জারের দরবারে যেমন কবি আন্ওয়ারী অবস্থান করতেন, তেমনি কুতুবুদ্দীনের দরবারে অবস্থান করতেন প্রসিদ্ধ কবি রশীদুদ্দীন ওয়াত্ওয়াত।

কুতুবুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র আতসায খাওয়ারিযম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রশীদুদ্দীন ওয়াত্ ওয়াতকে আপন 'দারুল ইনশা'-এর হাকিমে আলা নিয়োগ করেছিলেন।

৫৪০ হিজরীর (১১৪৫-৪৬ খ্রি) দিকে আতসাযের মৃত্যু হলে তার স্থলে তাঁর পুত্র আরসালান শাহ ৫৫৭ হিজরীতে (১১৬২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এবং তাঁর

ভাই তাকাশ খানের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকাশ খান বিজয় লাভ করে ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খ্রি) আপন শিরে রাজমুকুট ধারণ করেন। 'যাখীরা-ই-খাওয়ারিযম শাহ'-এর গ্রন্থকার ইসমাঈল ইব্‌ন হাসান এবং কবি খাকানী তাঁরই যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাকাশ খান তৃতীয় তুগ্রিলকে হত্যা করেন এবং খুরাসান ও ইরাক দখল করে আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

তাকাশ খানের মৃত্যু হলে তার স্থলে তাঁর পুত্র সলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ ৫৯০ হিজরীতে (১১৯৪ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আনুমানিক একুশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন এবং আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। তাঁর এবং খলীফায়ে বাগদাদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। শিহাবুদ্দীন ঘুরীর মৃত্যুর পর গযনী পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পারস্যের বাদশাহ আতাবেক সাদ এবং আযারবায়জানের বাদশাহ আতাবেক উযবেককেও পরাজিত করেন। তিনি বাগদাদের খলীফাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার স্থলে আপন পীর সাইয়িদ আলাউল মুল্‌ক তিরমিযীকে বসাবার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। খলীফা তখন হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীকে খাওয়ারিযম শাহের কাছে এই উদ্দেশ্যে পাঠান, যাতে তিনি উপদেশ দিয়ে তাকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখেন এবং তাদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এই দূতালীতে কোন কাজ হয় নি। সুলতান খাওয়ারিযম শাহ তাঁর সংকল্প থেকে বিরত হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈবক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অবিরাম তুষারপাত হতে থাকে। যার ফলে খাওয়ারিযম শাহ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ইরাক থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি তখন ইরাকেই ছিলেন এমন সময়ে চেঙ্গিয খান তাঁর দেশ আক্রমণ করে বসেন। চেঙ্গিয খানের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এর আগে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ তাঁর যুগে সব চাইতে পরাক্রমশালী বাদশাহ ছিলেন। দূর-দূরান্তের রাজা-বাদশাহরাও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উপরিউক্ত তুষারপাতের ঘটনা থেকে তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য দ্রুত ঢলে পড়তে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তিনি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন যে, তাঁর লাশের জন্য একটু খানি কাফনও জুটেনি।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের সাত পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে রুকুনুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন ও জালালুদ্দীন পৃথক পৃথক প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যু এবং পতনের পর তিন ভাই সম্মিলিতভাবে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। তাদের মধ্যে পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান ছিল বিধায় তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা করেন এবং তারা প্রত্যেকেই পরাজিত হন।

সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের পুত্রদের মধ্যে জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহ ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি সিন্ধুনদের তীরে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে চেঙ্গিয খানের মুকাবিলা করেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। তিনি হিন্দুস্থান সীমান্তে প্রবেশ করে কিছুদিন সিন্ধুতে ছিলেন। তারপর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি আলামূত দুর্গের ধর্মদ্রোহী ফিদায়ীদের ক্ষমতা অনেকখানি খর্ব করেন। তিনি একাধারে মুঘল ও

ফিরিঙ্গীদের (রোমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ইরাকেও তিনি বিজয় লাভ করেন। তবে কিছু কিছু পরিস্থিতি এমনি প্রতিকূল হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁর হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি ফকিরী পোশাকে অদৃশ্য হয়ে যান এবং অজ্ঞাত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের উল্লেখ এজন্য করেন যে, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন বীরপুরুষ ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি সবার শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের পরই খাওয়ারিযম শাহী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঘূরী সাম্রাজ্য

হিরাতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকায় ঘূর নামক একটি প্রশস্ত ভূখণ্ড রয়েছে। মাহমূদ গাযনাবী এই এলাকা জয় করে একটি প্রদেশ হিসাবে এটাকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। ঘূরের অধিবাসীরা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখানে আফগানী গোত্রসমূহ বসবাস করত। মাহমূদ গাযনাবী ঘূর প্রদেশের সুবেদার হিসাবে ঐ সমস্ত আফগানের মধ্য থেকেই জনৈক অভিজাত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। তারপর ঐ ব্যক্তির বংশধররাই ঘূরের সুবেদারী তথা শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। ঘটনাচক্রে সুলতান বাহরাম গাযনাবী এবং ঘূরের গভর্নর কুত্‌বুদ্দীনের মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধ ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঐ যুদ্ধে কুত্‌বুদ্দীন নিহত হন। কুত্‌বুদ্দীন ঘূরীর ভাই সাইফুদ্দীন আপন ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে গযনী আক্রমণ করে বাহরাম আযনাবীকে সেখান থেকে বের করে দেন এবং নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এবার বাহরাম গাযনাবী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্য লাভ করে গযনী আক্রমণ করেন এবং সাইফুদ্দীনকে বন্দী করে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

যখন তৃতীয় ভাই আলাউদ্দীন ঘূরীর কাছে আপন দুই ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে গযনী আক্রমণ করেন। আলাউদ্দীন ঘূরী এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা যখন অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সাথে গাযনাবীর দিকে অগ্রসর হয় তখন বাহরাম গাযনাবী তাদেরকে মনি-মাণিক্যের লোভ দেখিয়ে সে অভিযান থেকে বিরত রাখতে চান। তিনি একটি আপোস-চুক্তিরও প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তখন আলাউদ্দীন ঘূরী ও তাঁর সঙ্গীদের চোখে ঐ দৃশ্যটি ভেসে উঠতে থাকে, যখন সাইফুদ্দীনকে একটি ষাঁড়ের উপর বসিয়ে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় গযনীর অলিতে গলিতে ঘোরানো হচ্ছিল। তারপর অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। অতএব তারা রাগে-ক্রোধে এবং প্রতিশোধ-স্পৃহায় একেবারে পাগলপারা হয়ে ওঠে। ফলে বাহরামের কোন কূটকৌশলই আর কাজে লাগেনি। যা হোক আলাউদ্দীন গযনী জয় করেন এবং বাহরাম গাযনাবী হিন্দুস্থানের দিকে পালিয়ে আসেন। আলাউদ্দীন ঘূরী আপন ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে গযনীর অধিবাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। তিনি গযনীর সুলতানদের কোন কোন কবরও ধ্বংস করে ফেলেন, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলেন এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত

হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। আর এ কারণেই তিনি 'আলাউদ্দীন জাহাঁসূয' নামে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়া তিনি গযনীর বহুলোককে বন্দী করে আপন রাজধানীতে নিয়ে যান, তাদেরকে হত্যা করে রক্তকাদা তৈরি করেন এবং সে কাদা ব্যবহার করেন নগর প্রাচীর নির্মাণে। এটা হচ্ছে ৫৪৭ হিজরীর (১১৫২ খ্রি) ঘটনা। আলাউদ্দীন জাহাঁসূয ঘূরী গযনী জয় করার পর সেখানে একজন 'নায়িবুস্-সালতানাত' নিয়োগ করেন এবং নিজ রাজধানী ফিরূযকুহের উদ্দেশে ঘূর অভিমুখে চলে যান। এভাবে গযনী ঘূর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। বাহরাম গাযনাবী যেহেতু সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাই তিনি হিন্দুস্থান থেকে সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর কাছে ফরিয়াদনামা প্রেরণ করেন। সুলতান সাঞ্জার সালজুকী পরবর্তী বছর হামলা চালিয়ে ঘূর ও গযনী জয় করে বাহরাম গাযনাবীকে সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং আলাউদ্দীন জাঁহাসূয ঘূরীকে বন্দী করে নিজের সাথে নিয়ে যান। আলাউদ্দীন ঘূরী গযনী ধ্বংস করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছিলেন তা একান্ত প্রতিশোধ বশেই করেছিলেন। অন্যথায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং যোগ্য ব্যক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান সাঞ্জার আলাউদ্দীনের এই সমস্ত গুণ ও যোগ্যতার পরিচয় পান এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাকে মুক্ত করে দেন। তারপর আলাউদ্দীন ঘূরে ফিরে এসে পুনরায় হুকুমত চালাতে থাকেন। এর পর পরই 'ঘায'-এর তুর্করা সুলতান সাঞ্জারকে বন্দী করে ফেলে। ফলে সালজুকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও হ্রাস পায়। সুলতান সাঞ্জার চার বছর পর্যন্ত তুর্কীদের হাতে বন্দী থাকেন। তবে ঠিক সে রকম বন্দী ছিলেন, যে রকম বন্দী ছিলেন হিন্দুস্থানের বাদশাহ জাহাঙ্গীর মহাব্বত খানের হাতে। অর্থাৎ ঘায-এর তুর্করা দিনের বেলা সুলতান সাঞ্জারকে সিংহাসনে বসিয়ে অনুগত প্রজার মত তাঁর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াত, আর রাতের বেলা আটকিয়ে রাখত তাকে একটি লোহার খাঁচায়। তারা মূলত সাঞ্জারকেই নিজেদের বাদশাহ ও সুলতান বলে মান্য করত এবং যেখানে ইচ্ছা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করত। সুলতান সাঞ্জার বন্দী হওয়ার পর আলাউদ্দীন ঘূরী বাহরাম গাযনাবীকে তাড়িয়ে দিয়ে গযনী দখল করে নেন এবং এর কিছু দিন পরই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলাউদ্দীন ঘূরী হচেছন ঘূরী সাম্রাজ্যের প্রথম স্বাধীন বাদশাহ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় সাইফুদ্দীন ঘুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দেড় বছর হুকুমত পরিচালনার পর ঘায-এর তুর্কদের সাথে একটি যুদ্ধে নিজেরই এক অধিনায়কের হাতে নিহত হন।

আলাউদ্দীন ঘূরীর দুই ভাতিজা গিয়াসুদ্দীন ঘূরী ও শিহাবুদ্দীন ঘূরী ঠিক সেরূপ যৌথভাবে হুকুমত পরিচালনা করেছিলেন যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন তুগ্রিল বেগ সালজুকী ও চাঘার বেগ সালজুকী ভ্রাতৃদ্বয়। গিয়াসুদ্দীন ও শিহাবুদ্দীনের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালবাসা ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। তাঁদের উভয়কেই বাদশাহ মনে করা হতো।

শিহাবুদ্দীন ঘূরী আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীন ঘূরীকে নিজের মনিবের মতই সম্মান করতেন। তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করাকে তিনি সব সময় নিজের কর্তব্য বলেই মনে করতেন। খুরাসানের বেশির ভাগ অংশ নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর ঘূরীরা হিন্দুস্থানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কেননা তারা নিজেদেরকে গযনবী সালতানাতের প্রতিনিধি মনে করতেন। সেই হিসাবে যে সমস্ত দেশ সুলতান গযনবীর দখলে ছিল সেগুলো

পুনর্দখল করাকেও তাঁরা নিজেদের বৈধ অধিকার বলে মনে করতেন। তখন পাঞ্জাবের শাসনক্ষমতা ছিল সুলতান গযনবীর সুলতানদের হাতে। ঘূরীরা ওদের কাছ থেকে পাঞ্জাব ছিনিয়ে নেওয়াটা নিজেদের জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন। হিজরী ৫৮২ সনে (১১৮৬ খ্রি) শিহাবুদ্দীন ঘূরী খসরু মালিক গাযনাবীকে লাহোর থেকে বন্দী করে আপন ভাই গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর কাছে ঘূরে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে রাজধানী লাহোরে শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

৫৯৯ হিজরীতে (১২০২-৩ খ্রি) গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলে তার ভাই শিহাবুদ্দীন ঘূরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর জীবনকালেই শিহাবুদ্দীন ঘূরী হিন্দুস্থানের রাজা পৃথ্বী রাজকে পরাজিত ও বন্দী করে হত্যা করেছিলেন। এবার যখন তিনি ফিরূযকূহে ঘূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর পক্ষ থেকে হিন্দুস্থানের শাসনকর্তা ছিলেন তারই দাস কুত্‌বুদ্দীন আইবেক। আপন বাদশাহী আমলে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘূরী একবার হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। এখান থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে ৬০২ হিজরীতে (১২০৫-৬ খ্রি) ফিদায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে তার তাঁবুর মধ্যেই হত্যা করেছিল। শিহাবুদ্দীন ঘূরীর মৃত্যুর পর ঘূরী সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। হিন্দুস্থানে কুত্‌বুদ্দীন আইবেক একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি হলেন হিন্দুস্থানের দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তখন ফিরূযকূহের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁরই ভাতিজা সুলতান মাহমূদ ঘূরী ইব্‌ন গিয়াসুদ্দীন ঘূরী।

৬০৭ হিজরীতে (১২১০-১১ খ্রি) মাহমূদ ঘূরীও নিহত হন। এরপর তাঁর পুত্র বাহাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। খাওয়ারিযম শাহ বাহাউদ্দীনকে বন্দী করে ফেলেন। তারপর এই বংশের লোকেরা ঘূর সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করে বটে, তবে তা শুধু নামকাওয়াস্তে। কেননা শীঘ্রই তাঁদের শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শীরাযের আতাবেকবৃন্দ

সালজুকী সুলতানরা জ্ঞান, শিষ্টাচার ও সদাচরণ শিক্ষার জন্য শাহ্‌যাদাদেরকে যে সমস্ত শিক্ষকের কাছে পাঠাতেন তাদেরকে আতাবেক বলা হতো। ধীরে ধীরে এই শিক্ষক বা আতাবেকবৃন্দ সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্ব ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। আর সালজুকী বংশ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন এই আতাবেকরা বিভিন্ন দেশে অথবা প্রদেশে নিজেদের স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। এই আতাবেকদেরই অনেকগুলো বংশ সিরিয়া, ইরাক, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো ইসলামী বিশ্বে অত্যন্ত খ্যাতির অধিকারী হয়। সিরীয় আতাবেকদের সম্পর্কে আগামীতে আলোচনা করা হবে। এখানে শীরাযের আতাবেকদের সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এদের সাম্রাজ্যকে সালমারিয়া সাম্রাজ্য বলা হয় এবং এরা হচ্ছে ইরানের ইতিহাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর শাসনামলে মুযাফ্‌ফর উদ্দীন সুনকুর ইব্‌ন মাওদূদ সালমারী ছিলেন পারস্যের শাসনকর্তা। সুলতান সাঞ্জারের মৃত্যুর পর তিনি নিজের জন্য আতাবেক উপাধি গ্রহণ করেন এবং পারস্যের উপর স্বাধীনভাবে হুকুমত পরিচালনা করতে থাকেন। মুযাফ্‌ফর উদ্দীন ৫৫৬ হিজরীতে (১১৬১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুযাফ্ফর উদ্দীন সুনকুরের পর তার ভাই মুযাফ্ফর উদ্দীন আতাবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫৭১ হিজরীতে (১১৭৫-৭৬ খ্রি) তার মৃত্যু হলে তার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারপর আতাবেক সা'দ ইব্ন যঙ্গী আটাশ বছর পর্যন্ত সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ৬২২ হিজরীতে (১২২৫ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। আতাবেক সা'দের নাম থেকেই শায়খ মুসলিহুদ্দীন সিরাযী নিজে 'সাদী' উপাধি গ্রহণ করেন।

সা'দের মৃত্যুর পর তার পুত্র আতাবেক আবূ বকর ইব্ন সা'দ যঙ্গী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁরই শাসনামলে হালাকূ খানের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হয়। তিনি মুঘলদেরকে কর দানে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আবূ বকরের পর তাঁর পৌত্র আতাবেক মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোট কথা হিজরী ৬৬৩ সন (১২৬৪-৬৫ খ্রি) পর্যন্ত এই বংশ শীরায ও পারস্যের শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিল। তবে মুঘলদেরকে তারা কর প্রদান করত। তারপর মুঘলদের পক্ষ থেকে তারা ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে শীরাযের শাসনকার্য পরিচালনা করত। অবশ্য যখন মুঘলদের সাম্রাজ্যে দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে ওঠে তখন আতাবেকরা পুনরায় কিছুদিনের জন্য শীরাযে নিজেদের স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে। তারপর শুরু হয় তাইমূরী আমল।

সীস্তানের রাজন্যবর্গ

সীস্তান দেশকে নীমরূযও বলা হয়। সুলতান সাঞ্জার সালজুকী আবুল ফযল তাজুদ্দীন নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে এই দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। সালজুকী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর তার পুত্র শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার জুলুম-অত্যাচারে সীস্তানের প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সবাই একজোট হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর এই বংশেরই তাজুদ্দীন হরব ইব্ন ইয্যুল মুল্ক নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইনি একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তাঁর শাসনামলে খুরাসান ঘূর সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়ামীনুদ্দীন বাহরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই মুলহিদদের হাতে তিনি নিহত হন। তারপর তাঁর পুত্র নুসরাতুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অপর পুত্র রুকনুদ্দীন আপন ভাইয়ের বিরোধিতা করে নিজেই রাজসিংহাসনের দাবি করে বসেন। শেষ পর্যন্ত উভয় ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং নুসরাতুদ্দীন আপন ভাই রুকনুদ্দীনের হাতে মারা যান। তারপর তাজুদ্দীন হারবের পুত্র শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দু'বছর মুঘলদের হাতে অবরুদ্ধ থাকার পর নিহত হন এবং এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে সীস্তানের রাজন্যবর্গের শাসনামলের।

কুরত বংশের রাজন্যবর্গ

কথিত আছে যে, গিয়াসুদ্দীন ঘূরীর মন্ত্রী ইয্যুদ্দীন উমর সালজুকী বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন ঘূরী তাকে হিরাতের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তারই তত্ত্বাবধানে অনেক শাহী ইমারত ও মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি ইয্যুদ্দীন কুরত নামে

পরিচিত ছিলেন। তারপর ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫-৪৬ খ্রি) রুকনুদ্দীন কুরত হিরাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ঘূরী সাম্রাজ্যের পতনের পর তাকে হিরাতের স্বাধীন বাদশাহ মনে করা হতো। মালিক রুকনুদ্দীন কুরতের মৃত্যুর পর শামসুদ্দীন কুরত হিরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবং তাঁর পিতাও শীরাযের আতাবেকদের মত মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ কারণে মুঘলরা তার সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করে নি, বরং তারা তাকে 'নায়িবুস সালতানাত' হিসাবে হিরাতের শাসনকর্তা পদে বহাল রাখে।

শামসুদ্দীন কুরতের মৃত্যুর পর তার পুত্র রুকনুদ্দীন হিরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুঘল সম্রাট আবাকা খান তাকে 'শামসুদ্দীন কুহীন' উপাধি দান করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসুদ্দীন ৭২৯ হিজরীতে (১৩২৯ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। শামসুদ্দীনের পর তার ভাই মালিক হাফিয, তার পর অপর ভাই মুয়িযুদ্দীন হুসাইন ৭২৯ হিজরীতে হিরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুয়িযুদ্দীন হুসাইন ৭৭১ হিজরীতে (১৩৬৯-৭০ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাবর আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার যুগে তাইমূর হিরাতে এসে পৌঁছলে তিনি তার সাথে আপন মেয়ের বিবাহ দেন।

ইরানের অপরাপর অংশেও এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন আতাবেকদের লুরিস্তান রাজ্য ইত্যাদি। তবে এই সমস্ত রাজ্য খুব একটা খ্যাতিলাভ করতে পারেনি।

আযারবায়জানের আতাবেকবৃন্দ

সুলতান মাসউদ সালজুকীর ঈলাকয নামীয় তুর্ক বংশীয় একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম অতি সাধারণ ধরনের সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আতাবেকীর মর্যাদায় উন্নীত হন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় তুগ্রিলের বিধবা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি আযারবায়জানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তারপর তিনি সালজুকী সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন এবং ইরানের শাসনক্ষমতাও তাঁর হাতে চলে আসে। হামাদানে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আতাবেক পিতার স্থলে প্রধানমন্ত্রী এবং তৃতীয় তুগ্রিল (যার বয়স তখন সাত বছর ছিল)-এর মুরব্বি ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। আতাবেক তের বছর পর্যন্ত ইরান শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কিযিল আরসালান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিযিল আরসালান তৃতীয় তুগ্রিলকে হত্যা করে নিজেই রাজমুকুট পরিধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন ইহা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেদিনই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তারপর তাঁর পুত্র আতাবেগ আবূ বকর হুকুমত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আযারবায়জানের মধ্যেই আপন সাম্রাজ্যকে সীমাবদ্ধ রেখে তা সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত করে তোলেন এবং বেশ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দেশ শাসন করতে থাকেন। তখন এই হুকুমতের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর ভাই কুতলুগ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কুতলুগ পরাজিত হয়ে খাওয়ারিযম শাহের নিকট পালিয়ে যান এবং তার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেখানে

অবস্থানকালে কুতলুগ খাওয়ারিযম শাহকে আযারবায়জান আক্রমণের জন্য প্রলুব্ধ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনি খাওয়ারিযম শাহের জনৈক সর্দারের হাতে কুতলুগ নিহত হন। কিছুদিন পর আতাবেগ আবূ বকরের মৃত্যু হলে তাঁর অপর ভাই আতাবেগ মুযাফ্ফর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইরাকের একটি অংশও নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি মোট পনের বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারপর খাওয়ারিযম শাহ হামলা চালিয়ে আযারবায়জান দখল করে নেন।

আলামূতের ধর্মদ্রোহী সাম্রাজ্য

হাসান ইব্ন সাবাহ কোহিস্তান অঞ্চলের আলামূত, কাযভীন প্রভৃতি দুর্গ দখল করে সালজুকী সাম্রাজ্যের ঠিক যৌবনকালে সেখানে একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হাসান ইব্ন সাব্বাহ এবং তার ধর্মদ্রোহী সাম্রাজ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা অনেক কথাই বর্ণনা করেছেন। তিনি কিরূপ শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন তা নিচের একটি ঘটনা থেকে অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে। ঘটনাটি হলো, একদা তার দুই পুত্র কোন ব্যাপারে তার অবাধ্য হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের প্রত্যেককে মাত্র এক একটি থাপ্পড় মারেন, যার ফলে তাদের উভয়েরই মৃত্যু হয়।

সালজুকীদের আক্রমণ এবং অবরোধ চলাকালে একবার হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ আপন স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সতর্কতামূলক অপর একটি দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন। কিন্তু ঐ দুর্গের হাকিমকে কড়া নির্দেশ দেন ঃ আমার স্ত্রী নিজেই সূতা কেটে তার জীবিকার ব্যবস্থা করবে। তুমি তার প্রতি কোনরূপ আতিথ্য প্রদর্শন করবে না। এ থেকে অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে, হাসান ইব্ন সাব্বাহ শুধু নিজেই সরল জীবন যাপন করতেন না, বরং নিজের পরিবার-পরিজনকেও আরামপ্রিয়তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

হাসান ইব্ন সাব্বাহের মৃত্যুর পর কারাবুযুর্গ উমীদ আলামূতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মুহাম্মাদ সালজুকীর মৃত্যু পর্যন্ত তার এবং কারা বুযুর্গ উমীদের মধ্যে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলতে থাকে। মুহাম্মাদ সালজুকীর মৃত্যুর পর কারা বুযুর্গ উমীদ সালজুকীদের বেশ কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। গীলানেও বার বার লুটপাট চালান।

কারা বুযুর্গ উমীদের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনামলে ফিদায়ীরা এখানে সেখানে রাজা-বাদশাহ এবং বিখ্যাত লোকদের হত্যা করতে শুরু করে। যখন এসব হত্যাকাণ্ড ঘন ঘন সংঘটিত হতে থাকে তখন ইরানের জনসাধারণ সুলতান সাঞ্জার সালজুকীর কাছে এর ফরিয়াদ জানায়। উলামা সমাজও এই ফিদায়ীদেরকে হত্যা করার ফতওয়া দেন। কিন্তু সুলতান সাঞ্জার ফিদায়ীদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক জানার জন্য সেখানে একদল প্রতিনিধি পাঠান। দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। মুলহিদরা নিজেদেরকে নিরপরাধ প্রমাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত এই বোঝাবুঝির ব্যাপারটি কোন ফল বয়ে আনতে পারে নি। সুলতান সাঞ্জার ফিদায়ীদেরকে হত্যা করার সাধারণ নির্দেশ প্রদানে সতর্কতা অবলম্বনকেই জরুরী মনে করেন।

তিন বছর পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন কারা বুযুর্গ উমীদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার স্থানে হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদীনীর অত্যন্ত প্রসার ঘটান। ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৬ খ্রি) হাসানের মৃত্যু হলে তার পুত্র আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী আযারবায়জান থেকে রাই-এ এসে শিক্ষা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাদান মজলিসে প্রায়ই ফিদায়ীদের সমালোচনা করতেন, যাতে জনসাধারণ তাদের খপ্পরে না পড়ে। ফিদায়ীরা রাই-এ গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকে হত্যার হুমকি দেয়। তারা তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয় ঃ যদি তুমি আমাদের বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তারপর ইমাম সাহেব রাই থেকে 'ঘূর'-এ গিয়াসুদ্দীন ঘূরী এবং তার ভাই শিহাবুদ্দীন ঘূরীর কাছে চলে আসেন। তারপর তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘূরীর সাথে হিন্দুস্থান সফরেও যান। তখন তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীনের সেনাবাহিনীতে নামাযের ইমামতি করতেন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৬০২ সনে (১২০৫-০৬ খ্রি) সুলতান শিহাবুদ্দীন ফিদায়ীদের হাতে নিহত হলে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী খাওয়ারিযম শাহের কাছে চলে যান।

আলাউদ্দীন মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র জালালুদ্দীন হাসান আলামূতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার পিতা ও পিতামহের আকাঈদ থেকে তাওবা করেন এবং একথা সমস্ত মুসলিম সুলতানকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। এ কারণে জালালুদ্দীন হাসান মুসলিম বিশ্বে 'নওমুসলিম' নামে খ্যাতি লাভ করেন। খলীফা নাসির আব্বাসীও জালালুদ্দীনের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ফলে যখন জালালুদ্দীন হাসানের হজ্জ করার জন্য কা'বা শরীফে যান তখন খলীফার নির্দেশে সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের পতাকা জালালুদ্দীন হাসানের মায়ের পতাকার পিছনে রাখা হয়। এভাবে খলীফা জালালুদ্দীন হাসানের মন জয় করেন বটে, তবে সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। আর একারণেই তিনি বাগদাদের খলীফার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নেন। জালালুদ্দীন হাসানের মৃত্যুর পর তার নয় বছর বয়স্ক পুত্র আলাউদ্দীন ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্ক, তাই তার সময়ে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। নাসীরুদ্দীন তূসী এই যুগেরই লোক ছিলেন। ৬৫৩ হিজরীতে (১২৫৫ খ্রি) তার মৃত্যু হয়। তারপর তার পুত্র রুকনুদ্দীন খুরশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। হালাকূ খান হামলা চালিয়ে রুকনুদ্দীন খুরশাহকে বন্দী করেন এবং তার দুর্গসমূহ ধ্বংস করে দেন। আর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে ফিদায়ী সাম্রাজ্যের। বলা হয়ে থাকে, বর্তমান যুগে স্যার আগা খান, যাকে বোম্বে ও অন্যান্য এলাকায় বোহরা সম্প্রদায় নিজেদের পীর বলে মনে করে, এই বংশেরই সাক্ষাত উত্তর পুরুষ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মিসর ও সিরিয়ার ইসলামী ইতিহাসের পরিশিষ্ট

সালজুকী সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার পর স্বয়ং সালজুকী বংশও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং তারা পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে আতাবেকদের অনেকগুলো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ইরান, খুরাসান, ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে মুসলমানদের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত সাম্রাজ্যেরই একটি ছিল এশিয়া মাইনর। সালজুকী বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কূনিয়া শহরে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে 'রোমান সালজুকী' বলা হতো। তুর্কীদের উসমানীয় সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অনুরূপভাবে সিরিয়ায় আতাবেকদের একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে 'সিরীয় আতাবেক' বলা হতো।

সিরীয় আতাবেক

৫২১ হিজরীতে (১১২৭ খ্রি) আতাবেক ইমাদুদ্দীন যঙ্গী সিরিয়ায় স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইমাদুদ্দীন যঙ্গী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ৫৪৪ হিজরীতে (১১৪৯-৫০ খ্রি) যখন ইমাদুদ্দীন যঙ্গী ইনতিকাল করেন তখন তাঁর তিনপুত্র বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন নূরুদ্দীন যঙ্গী, সাইফুদ্দীন যঙ্গী ও কুতবুদ্দীন যঙ্গী। এই তিন ভাই সিরিয়ায় পৃথক পৃথক শহরে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তবে নূরুদ্দীন যঙ্গী তাদের নেতা ও সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এশিয়া মাইনরের রোমান সালজুকরা যেমন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধরত ছিল তেমনি সিরীয় আতাবেকরাও খ্রিস্টানদের হামলা প্রতিরোধের জন্য ছিল সদা প্রস্তুত। বিশেষ করে সুলতান নূরুদ্দীন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন। হলব, মুসিল ও দামেশক ছিল এই বংশের অধিকারভুক্ত। সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী অত্যন্ত বীরপুরুষ, আল্লাহভীরু ও পুণ্য স্বভাবের লোক ছিলেন। হিজরী ৪৯০ (১০৯৭ খ্রি) সন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের দখলে ছিল এবং সেখানে তারা তাদের নিজস্ব একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিভাবে খ্রিস্টানদের দখল থেকে মুক্ত করা যায় সুলতান নূরুদ্দীন তাঁর যাবতীয় শক্তি ও উদ্যম এই প্রচেষ্টায়ই নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনকালে বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করে যেতে পারেন নি।

তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সম্পন্ন করেন। বাগদাদের আব্বাসী খলীফা নূরুদ্দীনকে 'সুলতান' উপাধি এবং যথারীতি সিরিয়ার 'সনদে হুকুমত' প্রদান করেছিলেন। এই সুলতানেরই শাসনামলে ফিরিঙ্গীরা মিসরের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায়। তখন সেখানকার শাসক ছিলেন উবায়দী বংশের শেষ সুলতান আদিদ। আদিদ সুলতান নূরুদ্দীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে নূরুদ্দীন নিজ সেনাপতি শেরকূহ এবং ভাতিজা সালাহুদ্দীনকে মিসরে পাঠান। কয়েকদিন পর মিসরের উবায়দী শাসক মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে সালাহুদ্দীনের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছুদিন পর সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন দামেশকের সিংহাসনে আরোহণ করেন নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক সালিহ। কিছুদিন পর সাইফুদ্দীন ইবন কুত্‌বুদ্দীন মুসিলে পৃথক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সিরিয়ার উপরও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীরই দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। সালাহুদ্দীন আইয়ূবী সুলতান নূরুদ্দীনের বংশধরদের সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং হালাকূ খানের হামলা পর্যন্ত সিরিয়ার শাসনক্ষমতা এদের হাতে থাকে। তবে তা ছিল একেবারে নামকা ওয়াস্তে। প্রকৃতপক্ষে সুলতান নূরুদ্দীনের পর হুকুমত ও সালতানাত সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে।

মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ূবী সাম্রাজ্য

নাজমুদ্দীন আইয়ূব জাতিগতভাবে ছিলেন কুর্দী। তিনি ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর সেনাবাহিনীতে অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাজমুদ্দীন আইয়ূবের পুত্র সালাহুদ্দীনকে ইমাদুদ্দীন যঙ্গী অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সালাহুদ্দীনের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যুর পর সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী নাজমুদ্দীন আইয়ূবকে দামেশকের দুর্গাধিপতি ও কোতোয়াল নিযুক্ত করেন এবং তার পুত্র সালাহুদ্দীনকে নিযুক্ত করেন তারই সহকারী। নাজমুদ্দীন আইয়ূবের মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন যঙ্গী তার ভাই শেরকূহকে নিজ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং সালাহুদ্দীনকে দামেশকের দুর্গাধিপতি রাখেন। আদিদ উবায়দীর প্রার্থনা অনুযায়ী যখন মিসরের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় তখন শেরকূহের সাথে নূরুদ্দীন তার ভাতিজা সালাহুদ্দীনকেও প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭১-৭২ খ্রি) সালাহুদ্দীন ইব্‌ন নাজমুদ্দীন আইয়ূব, আদিদ উবায়দীর পর মিসরের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। ৫৬৯ হিজরীতে (১১৭৩-৭৪ খ্রি) যখন সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয় তখন কাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হবে সে ব্যাপারে সেখানকার রাজকীয় কর্মকর্তা ও সভাসদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সালাহুদ্দীন তখন মিসর থেকে দামেশকে এসে সুলতান নূরুদ্দীনের পুত্র মালিক সালিহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই দিন থেকে সিরিয়ার সালতানাতও সুলতান সালাহুদ্দীনের অধিকারে চলে আসে। ঐ বছর ইয়ামান এবং হিজাযেও সুলতান সালাহুদ্দীনের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। কেননা ইউরোপের খ্রিস্টানরা তখন সম্মিলিতভাবে সিরিয়া ও মিসরের উপর হামলা চালায়। এই হামলা প্রতিরোধে

সালাহুদ্দীন পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অপর দিকে আলামূতের মুলহিদ তথা ফিদায়ীরা, যারা গুপ্তভাবে হামলা চালাত এবং বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করত—একটি বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে রেখেছিল। এই ফিদায়ীদের কারণে জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। এই জালিমরা সুলতান সালাহুদ্দীনকেও হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর অসীম কৃপায় তিনি রক্ষা পান।

শেষ পর্যন্ত মুসলিম সর্দাররা সর্বসম্মতিক্রমে সালাহুদ্দীনকে সিরিয়ার বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেয়। এবার সুলতান সালাহুদ্দীন ঈসায়ীদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার চেষ্টা শুরু করেন। ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খ্রি) একটি বিরাট যুদ্ধের পর সুলতান সালাহুদ্দীন বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান সম্রাটকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করে ফেলেন। তারপর সুলতানের বিরুদ্ধে আর কখনো যুদ্ধ করবেন না— এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন। তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন আক্কা এবং ৫৮৮ হিজরীতে (১১৯২ খ্রি) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। ৪৯০ হিজরী (১০৯৭ খ্রি) থেকে ৫৮৮ হিজরী (১১৯২ খ্রি) পর্যন্ত প্রায় ৯৮ বছর বায়তুল মুকাদ্দাস ঈসায়ীদের দখলে থাকে। খ্রিস্টানরা যখন মুসলমানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছিল তখন মুসলমানদের রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ূবী যখন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করলেন তখন সেখানকার খ্রিস্টান বাসিন্দাদের কোন ক্ষতিই করলেন না। বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের হাতছাড়া হয়ে গেছে শুনে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুনরায় ঘরে ঘরে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ, বৃটেনের সম্রাট রিচার্ড, জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-মহারাজা সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জয় করে সেখান থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়। খ্রিস্টান বাহিনীর এই তরঙ্গায়িত জনসমুদ্র এমনি জাঁকজমকের সাথে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয় যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এশিয়া মহাদেশ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুলতান সালাহুদ্দীন একাধারে চার বছর কয়েকশত লড়াই লড়ে খ্রিস্টানদের এই বিরাট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্রাটরা বায়তুল মুকাদ্দাসের ধারেকাছেও যেতে পারেন নি বরং লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান। এতদসত্ত্বেও সুলতান সালাহুদ্দীন খ্রিস্টানদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন যে, শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসলে তাদেরকে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না।

উল্লিখিত যুদ্ধসমূহে সালাহুদ্দীন খ্রিস্টানদের সাথে যে ভদ্রজনোচিত ও মানবিক আচরণ করেন এবং যে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দেন তাতে খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে এবং এরই ফলশ্রুতিতে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ সুলতান সালাহুদ্দীনকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করে থাকে। ৫৮৯ হিজরীতে (১১৯৩ খ্রি) সুলতান সালাহুদ্দীন ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর ঐকান্তিক তাক্ওয়া ও আল্লাহ্ভীতির কারণে মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর অন্যতম ওলী হিসাবে পরিচিত হয়ে আছেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উসমান ওরফে 'আল-মালিকুল আযীয' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছয় বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ৫৯৫ হিজরীতে (১১৯৯ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর পুত্র মালিক মানসূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এক বছর পরই তিনি পদচ্যুত হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান সালাহুদ্দীনর ভাই মালিক আদিল। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও সুযোগ্য সুলতান ছিলেন। তিনি ৬১৫ হিজরীতে (১২১৮ খ্রি) ইনতিকাল করেন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র মালিক কামিল। তিনিও অত্যন্ত পুণ্যবান বাদশাহ ছিলেন। ৬৩৫ হিজরীতে (১২৩৭ খ্রি) তিনি ইনতিকাল করেন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর পুত্র মালিক আদিল আবূ বকর। কিন্তু দু'বছর পর মিসরের আমীর-উমারা তাকে বন্দী করে তার ভাই মালিক সালিহ্ ইব্ন মালিককে মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। দশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পর খ্রিস্টানদের সাথে একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তারপর ৬৪৭ হিজরীতে (১২৪৯ খ্রি) মালিক মুয়ায্যম তূরান শাহ ইব্ন মালিক সালিহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস হুকুমত করার পর তিনি নিহত হন। তারপর ৬৪৮ হিজরীতে (১২৫০ খ্রি) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মালিক আশরাফ। কিন্তু ৬৫২ হিজরীতে (১২৫৪ খ্রি) এই বংশেরই দাসরা তাঁকে পদচ্যুত করে। আর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে কুর্দী আইয়ূবী বংশের শাসনামলের।

সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁর সমগ্র শাসনামল সিরিয়া সাম্রাজ্য, দামেশক নগরী অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্তরা মিসরকেই তাদের রাজধানী করে নেয়। ফলে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লে সিরিয়া সাম্রাজ্য আইয়ূবীদের অধিকার থেকে চলে যায় এবং আইয়ূবীরা শুধু মিসরের উপরই দখলদার থাকে। এই সাম্রাজ্যের শেষ সুলতানরা এই কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তারা খারজিয়া ও আর্মেনিয়া থেকে অনবরত দাস খরিদ করে এনে তাদের দ্বারা একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এদেরই কারণে, কোন অধিনায়ক ভবিষ্যতে যেন বিদ্রোহ করার দুঃসাহস না পান আর করলেও এই দাসবাহিনী দ্বারা যেন তাদেরকে দমন করা সম্ভব হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দাসরা, যাদেরকে মামলুক বলা হতো, এতই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত মিসর সাম্রাজ্য তাদেরই করতলগত হয়ে পড়ে।

মিসরের মামলূক সাম্রাজ্য ঃ প্রথম স্তর

যখন আইয়ূবী বংশের পতন দেখা দেয় এবং দাসদের হাতে সাম্রাজ্যের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা চলে আসে তখন তারা নিজেদেরই মধ্য থেকে মালিক মুয়িয্য আযীযুদ্দীন আইবেক নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে বাদশাহ নির্বাচিত করে। মালিক মুয়িয্য মালিকা শাজারাতুত দূর-এর সাথে, যিনি সালিহ্ আইয়ূবীর দাসী ছিলেন এবং কয়েকমাস শাসনক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত ছিলেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু হিজরী ৬৫৫ সনে (১২৫৭ খ্রি) মালিক মুয়িয্য নিহত হন।

তারপর সাম্রাজ্যের উমারাবৃন্দ মালিক মুয়িয্যের পুত্র মালিক মানসূরকে বাদশাহ নির্বাচিত করে। তিনি দু'বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার স্থলে মালিক মুযাফ্ফরকে বাদশাহ

নির্বাচিত করা হয়। তিনি প্রায় এগারো মাস শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারই শাসনামলে হালাকূ খানের বাহিনী মিসরের উপর হামলা চালায়, কিন্তু মিসরীয় বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মালিক মুযাফ্ফরকে হত্যা করে ৬৫৮ হিজরীতে (১২৬০ খ্রি) মালিক আযযাহির রুকনুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সতেরো বছর পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সাম্রাজ্য শাসন করেন। ৬৭৬ হিজরীতে (১২৭৭-৭৮ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হলে মালিক সাঈদ নাসীরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বছর পর তাকেও পদচ্যুত করা হয়। তারপর মালিক আদিল বদরুদ্দীনকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু মাত্র চার মাস পর তিনি পদচ্যুত হন। এভাবে ৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯-৮০ খ্রি) মিসরের মামলূক সাম্রাজ্যের প্রথম স্তরের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাদের শাসনকাল ছিল সর্বমোট ২৬ বছর। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য এই সংক্ষিপ্ত সময়কালও উল্লেখযোগ্য। প্রথমত তারা নির্বাচন পদ্ধতি চালু করে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তারা তাদের বাদশাহ নির্বাচন করত। দ্বিতীয়ত তারাই ঐ সমস্ত মুঘলকে, যারা সমগ্র সভ্য দুনিয়াকে তছনছ করে দিয়েছিল, বার বার পরাজিত করে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা যুদ্ধে পরাজিত মুঘল বাহিনীর অনেক লোককে বন্দী করে এনে নিজেদের দাসে পরিণত করে এবং ওরাই আইয়ূবী দাস নামে পরিচিত হয়।

মামলূক সাম্রাজ্য ঃ দ্বিতীয় স্তর বা কালাউনী সাম্রাজ্য

মালিক আদিল বদরুদ্দীনের পর আবুল মাআনী মালিক মানসূর কালাউন মিসরের বাদশাহ নির্বাচিত হন। কিন্তু তারপর যেহেতু তারই বংশধরদেরকে জনসাধারণ মিসরের বাদশাহ পদে নির্বাচিত করতে থাকে তাই তাকে এই মামলূকদের দ্বিতীয় স্তরের প্রথম বাদশাহ মনে করা হয়। তিনি ৬৭৮ হিজরী (১২৭৯ খ্রি) থেকে ৬৮৯ হিজরী (১২৯০ খ্রি) পর্যন্ত মোট এগারো বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে মিসর সাম্রাজ্যের আয়তন কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তারপর মালিক আশরাফ সালাহুদ্দীন খলীল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি নিজে থেকে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। জনসাধারণ তাঁকে জবরদস্তিমূলকভাবে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। তারপর চুয়াল্লিশ বছর হুকুমত পরিচালনার পর তিনি ৭৩৭ হিজরীতে (১৩৩৬-৩৭ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর বাদশাহ হিসাবে নির্বাচিত হন মালিক আদিল কুতবুঘা মানসূরী। কিন্তু তিনি এক মাসও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেন নি। তারপর মালিক মানসূর হিশামুদ্দীনকে বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়। দু'বছর পর তিনিও নিহত হন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউন। নাসিরের পর মালিক মুযাফ্ফর রুকনুদ্দীন এক বছরের জন্য বাদশাহ নির্বাচিত হন। তারপর ৭৪১ হিজরীতে (১৩৪০-৪১ খ্রি) মালিক মানসূর আবূ বকরকে বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু মাত্র দু'মাস পর তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়। তারপর মালিক আশরাফ বাদশাহ নির্বাচিত হন। কিন্তু আটমাস পর তাকেও নির্বাসন দেওয়া হয়। তারপর ৭৪২ হিজরীতে (১৩৪১-৪২ খ্রি) মালিক নাসির আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭৪৫ হিজরীতে (১৩৪৪-৪৫ খ্রি) তিনি নিহত হলে আবুল ফিদা মালিক সালিহ্

ইসমাঈল বাদশাহ নির্বাচিত হন। তিনি মাত্র এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ইনিই হচ্ছেন সেই আবুল ফিদা, যিনি 'তারীখ-ই-আবুল ফিদা' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। তাঁর এই গ্রন্থটি একটি অতি প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। ৭৪৬ হিজরীতে (১৩৪৫-৪৬ খ্রি) মালিক কামিল শাবানী সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র কয়েক মাস পর পদচ্যুত হন। ৭৪৭ হিজরীতে (১৩৪৬-৪৭ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক মুযাফ্ফর হাজী। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ৭৪৮ হিজরীতে (১৩৪৭-৪৮ খ্রি) নাসির হাসান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় চৌদ্দ বছর ক্ষমতায় থাকার পর শেষ পযন্ত তিনিও নিহত হন। তারপর ৭৬২ হিজরীতে (১৩৬১ খ্রি) বাদশাহ নির্বাচিত হন মালিক সালিহ। ৭৬৫ হিজরীতে (১৩৬৩-৬৪ খ্রি) তাঁকে পদচ্যুত করে তার স্থলে মানসূর ইব্ন হাজীকে বাদশাহ নির্বাচন করা হয়। দু'বছর পর তিনিও পদচ্যুত হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক আশরাফ শাবান। এগারো বছর পর তিনি নিহত হন এবং তাঁর স্থলে ৭৭৮ হিজরীতে (১৩৭৬-৭৭ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক মানসূর আলী। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ৭৮৩ হিজরীতে (১৩৮১ খ্রি) বাদশাহ নির্বাচিত হন সালিহ্ হাজী। আট-নয় বছর পর তিনি নিজে থেকেই সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে কালাউনী সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্য আনুমানিক ১১৪ বছর পর্যন্ত টিকেছিল। হুকুমত ও সালতানাতের ক্ষেত্রে এই স্তর এবং প্রথম স্তরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

মিসরের মামলূক সাম্রাজ্য ঃ তৃতীয় স্তর বা চারকাসী সাম্রাজ্য

মালিক সালিহ্ হাজীর পর মালিক তাহির বারকুক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন চারকাস গোত্রের লোক এবং আইয়ূবী দাসদের অন্যতম। যেহেতু পরবর্তী সময়ে এই গোত্রেরই লোক মিসরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাই মালিক তাহির বারকুককে আইয়ূবী মামলূক সাম্রাজ্যের তৃতীয় স্তরের বাদশাহ মনে করা হয়। তিনি ৭৯২ হিজরী (১৩৯০ খ্রি) থেকে ৮০১ হিজরী (১৩৯৮-৯৯ খ্রি) পর্যন্ত নয় বছর মিসরীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তারপর মালিক নাসির সিংহাসনে আরোহণ করে চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তারই শাসনামলে তাইমূর মিসরে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়, কিন্তু মামলূক সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। এই মালিক নাসিরই খানায়ে কাবায় হানাফী, নাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী— এই চারটি মুসাল্লা স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম উলামায়ে ইসলাম তাঁর এই কাজকে বিদআত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটাকে নিয়ে আর খুব একটা উচ্চবাচ্য করা হয়নি। কেননা এর দ্বারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন ফিতনা বা ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হয়নি। তারপর যথাক্রমে মালিক মানসূর, আবুন্নাস্র শায়খ, মালিক মুযাফ্ফর আহমদ, মালিক আয-যাহির আবুল ফাত্হ এবং মালিক সালিহ্ মুহাম্মাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক সালিহ্ ৮২২ হিজরীতে (১৪১৯ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র চার মাস পর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। তারপর মালিক আশরাফ আবূ নাস্রকে বাদশাহ মনোনীত করা হয়। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহ্ভীরু ছিলেন। কুরআন মজীদের প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত

আসক্তি। বেশির ভাগ সময়ই তিনি কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ৮৪১ হিজরী (১৪৩৭-৩৮ খ্রি) পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবুল মাহাসিন আবদুল আযীয সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই তিনি পদচ্যুত হন। তারপর মালিক আবূ সাঈদ ওরফে মালিক আয-যাহির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং পনেরো বছর সাম্রাজ্য শাসনের পর ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন গরীবের বন্ধু এবং অত্যন্ত পুণ্যবান বাদশাহ। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক মানসূর উসমান। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পর ৮৫৭ হিজরীতে (১৪৫৩ খ্রি) তিনি পদচ্যুত হন।

তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন মালিক আশরাফ আবূ নাস্‌র। তিনি ৮৬৫ হিজরী (১৪৬০-৬১ খ্রি) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মালিক মুয়াইয়িদ আহমদ কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। এরপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ খোশকদম ৮৬৫ হিজরী (১৪৬০ খ্রি) থেকে ৮৯৩ হিজরী (১৪৮৭-৮৮ খ্রি) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ মিলাইয়ায়ী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরই নির্বাসিত হন। তারপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ তামরীমা সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তাঁকে বন্দী করা হয়। তারপর মালিক আশরাফ আবূ নাস্‌রকে বাদশাহ মনোনীত করা হয়। তিনি ৯০২ হিজরী (১৪৯৬-৯৭ খ্রি) পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। তারপর মালিক আবুস-সা'দাত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আড়াই বছর হুকুমত পরিচালনার পর নিহত হন। এরপর ৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খ্রি) মালিক আশরাফ কালযূহ সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র এগারো দিন পর নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর মালিক যাহির আবূ সাঈদ কালযূহ ৯০৬ হিজরী (১৫০০-০১ খ্রি) পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর মালিক আদিল ৯০৭ হিজরীতে (১৫০১-০২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চার মাস পর নিহত হন। তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মালিক আশরাফ আবূ নাস্‌র কালযূহ। তিনি ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি) পর্যন্ত পনেরো বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন।

সুলতান সালীম উসমানী (প্রথম) ৯২২ হিজরীতে (১৫১৬ খ্রি) মিসর আক্রমণ করেন এবং মালিক আশরাফ তুখনেকে, যিনি ঐ বছরই হিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, পরাজিত করে চারকাসী সাম্রাজ্যের ইতি টানেন এবং মিসর উসমানী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের সেই ধারাও, যা শুধু নামকা ওয়াস্তে মিসরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, রুদ্ধ হয়ে যায়। আইয়ূবী মামলূকী শাসনের এই তৃতীয় স্তর যা চারকাসী সাম্রাজ্য নামে খ্যাত, মোট একশ' ত্রিশ বছর অব্যাহত ছিল। আইয়ূবী বংশের পর মিসরে মামলূকদের তিন স্তরের শাসনকাল ছিল মোট দুশ' সত্তর বছর। এই মামলূকদের প্রারম্ভিক যুগে হালাকূ খান বাগদাদ ধ্বংস করে সেখানকার আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এই মামলূকদের মাধ্যমে মিসরে আব্বাসীয় খিলাফতের একটি নতুন ধারার সূচনা হয় এবং তা মামলূকদের পতন তথা ৯২২ হিজরী (১৫১৬ খ্রি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশ্য মিসরে আব্বাসীয় খলীফাদের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু যেহেতু সমগ্র

মুসলিম বিশ্বে আব্বাসীয় খলীফাদের ধর্মীয় মর্যাদা ছিল সর্বজনস্বীকৃত এবং তাদেরকে 'মাযহাবী ইমাম' মনে করা হতো, তাই তাদের অস্তিত্ব মামলূকদের জন্যও ছিল উপকারী। কেননা এই অবস্থায় সমগ্র মুসলিম সুলতান মামলূকদেরকে আব্বাসীয় খলীফাদের খাদিম মনে করার কারণে তাদের বিরোধিতা করার সাহস পেত না। অপরদিকে আব্বাসীয় খলীফাদের জন্যও মামলূকদের অস্তিত্ব ছিল বেশ মূল্যবান। কেননা তাঁরা মামলূকদের সাম্রাজ্যে অত্যন্ত আয়েশ-আরামের সাথে কালাতিপাত করছিলেন।

মিসরের খলীফাদের সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হলো। নিচে তাঁদের একটি তালিকাও পেশ করা হচ্ছে, যাতে মিসরের কোন বাদশাহের যুগে কোন আব্বাসীয় খলীফা সেখানে বিদ্যমান ছিলেন তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মিসরে এক বাদশাহের পর অপর বাদশাহকে যেমন আব্বাসীয় খলীফাদের কাছ থেকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সনদ লাভ করতে হতো তেমনি এক খলীফার মৃত্যুর পর যখন অপর খলীফা সিংহাসনে আরোহণ করতেন তখন তাঁকেও মিসরের বাদশাহর অনুমোদন নিতে হতো। কেননা এক্ষেত্রে বাদশাহ বেশ কিছুটা ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখতেন। এতদসত্ত্বেও কখনো কখনো আব্বাসীয় খলীফারা এমনি গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে যেতেন যে, মিসরের বাদশাহ তাঁর বিরোধিতা করার সাহস পেতেন না। মিসরের খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে কখনো কখনো অসন্তোষেরও সৃষ্টি হতো। খলীফারা সাধারণ মুসলমানের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জনকে যেমন নিজেদের গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন, তেমনি বাদশাহরাও রাজকীয় ক্ষমতা ও পরাক্রমকে মনে করতেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দলীল। শেষ পর্যন্ত সালীম উসমানী খিলাফত ও সালতানাতকে নিজের মধ্যে একত্রিত করে উপরোক্ত দু'মুখী মানসিকতা সৃষ্টির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেন। ফলে পৌনে তিনশ' বছর ধরে একজন পীর বা গদ্দীনশীন হিসাবে খলীফা-ই-ইসলামের যে মর্যাদা ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে শাহানশাহী রূপ ধারণ করে।

মিসরের আব্বাসী খলীফাবৃন্দ

ক্রমিক নং	খলীফার নাম	যে সনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন	
১	মুসতানসির বিল্লাহ ইব্‌ন যাহির বি-আমরিল্লাহ্ ইব্‌ন নাসির লি দী-নিল্লাহ	হিজরী	৬৫৯ সন (১২৬১ খ্রি)
২	হাকিম বিআমরিল্লাহ্ ইব্‌ন মুসতারশিদ বিল্লাহ্	"	৬৬০ (১২৬২ খ্রি)
৩	মুসতাকফী বিল্লাহ ইব্‌ন হাকিম বি আমরিল্লাহ্	"	৭০১ (১৩০১-০২ খ্রি)
৪	ওয়াছিক বিল্লাহ	"	৭০২ (১৩০২-০৩ খ্রি)
৫	হাকিম বিআমরিল্লাহ্ ইব্‌ন মুসতাকফী বিল্লাহ্	"	৭৪২ (১৩৪২-৪৩ খ্রি)
৬	মুসতানসির বিল্লাহ	"	৭৫৩ (১৩৫২ খ্রি)
৭	মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্	"	৭৬২ (১৩৬১ খ্রি)

৮	মুতাসিম বিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবরাহীম	"	৭৭৮ (১৩৭৬-৭৭ খ্রি)
৯	মুসতাঈন বিল্লাহ	"	৮০৮ (১৪০৫-০৬ খ্রি)
১০	মু'তাদিদ বিল্লাহ	"	৮১৫ (১৪১২-১৩ খ্রি)
১১	মুসতাকফী বিল্লাহ	"	৮৪৫ (১৪৪১-৪২ খ্রি)
১২	কাসিম বি আমরিল্লাহ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল	"	৮৫৮ (১৪৫৪ খ্রি)
১৩	মুসতায়িদ বিল্লাহ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল	"	৮৫৮ (১৪৫৪ খ্রি)
১৪	মুতাওয়াক্কিল আলী ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল	"	৮৭২ (১৪৬৭-৬৮ খ্রি)
১৫	মুসতাসির বিল্লাহ	"	৯০৩ (১৪৯৭-৯৮ খ্রি)

সুলতান সালীম উসমানী যখন মিসর জয় করেন তখন খলীফা মুসতাসির ষষ্টি, চাদর এবং অন্যান্য যেসব তবাররূক খিলাফতের নিদর্শন স্বরূপ তার হাতে ছিল তার সব কিছুই সুলতান সালীমের কাছে অর্পণ করেন এবং নিজেও তার হাতে খিলাফতের বায়আত নেন। সুলতান সালীম উসমানী মুসতাসিরকে নিজের সঙ্গে করে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে যান এবং সেখানেই মুসতাসিরের মৃত্যু হয়।

উনবিংশ অধ্যায়

উসমানীয় সাম্রাজ্য

উপরের অধ্যায়ে আমরা হিজরী দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিষয়বস্তুর ক্রমধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমরা পুনরায় এশিয়া মাইনরের প্রান্তরসমূহে এবং হিজরী সপ্তম শতাব্দীর সেই প্রারম্ভিক যুগে ফিরে আসতে চাই, যখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম তিনশ' বছরের ইতিহাস বর্ণনা করার পর অর্থাৎ হিজরী দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে খুব সম্ভবত আমাদেরকে পুনরায় পিছনে ফিরে আসতে হবে, যাতে তাইমূর এবং ইরানের সাফাভী বংশের ইতিহাস শেষ করে পুনরায় হিজরী দশম শতাব্দীতে প্রবেশ করতে পারি। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট তিনশ' বছরের ইতিহাস পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে শেষ করার প্রতিশ্রুতি রইল।

লুটপাটকারী তুর্কী সম্প্রদায়সমূহ, যারা 'গায বা গাযানের তুর্ক' নামে পরিচিত, একদা খুরাসান ও ইরানে প্রবেশ করে সালজুকী সাম্রাজ্যের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর আঘাত হানে। এই তুর্কীদের দস্যুপনার কথা চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত সব দেশের ইতিহাসেই বর্ণিত হয়েছে। ওরা সুলতান সাঞ্জার সালজুকীকে বন্দী করে নিজেদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে দারুণ আতংকের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যখন চেঙ্গিষ খানের আবির্ভাব হয় তখন ওদের বলবিক্রম অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে যায়। আর চেঙ্গিষ খান যখন রক্ত বন্যা বহাতে শুরু করে তখন তো ওদের পরাক্রমের কথা সবাই বিস্মৃতই হয়ে যায়। এই সমস্ত লোক প্রথম থেকেই বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। যখন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে তখন তারা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের কোন কোন গোত্র মিসরের দিকে গিয়ে সেখানকার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। কোন কোন গোত্র সিরিয়ায় এবং কোন কোন গোত্র আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। যেহেতু তাদের মধ্যে কোন পরাক্রমশালী সম্রাটের আবির্ভাব হয় নি, তাই এই সমস্ত লোকের অবস্থা ইতিহাস গ্রন্থাদিতে যথাযথভাবে স্থান পায় নি। তবে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিজয়ীর বেশে খুরাসান ও ইরানে অবস্থান করার কারণে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ অবশ্যই ঘটেছিল। তাদের প্রত্যেকটি গোত্র ও পরিবার ছিল বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার প্রতীক। বিজেতা ও শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও তারা তাদের পশুপালের কথা বিস্মৃত হয়ে যায় নি। তাই চেঙ্গিয খানের আবির্ভাব ঘটলে তাদের কিছু লোক চেঙ্গিষ খানের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় এবং বেশির ভাগ লোক খুরাসান, ইরান এবং অন্যান্য দেশের সবুজ-শ্যামল বন-জঙ্গল ও চারণ ভূমিতে বসবাস করতে থাকে। তাদেরই একটি গোত্র খুরাসানে বসতি স্থাপন করেছিল।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে, যখন চেঙ্গিযী মুঘলরা খুরাসান আক্রমণ করতে শুরু করে তখন গায তুর্কদের ঐ সমস্ত লোক, যারা খুরাসানে বসতি স্থাপন করেছিল, খুরাসান ছেড়ে আর্মেনিয়া অঞ্চলে চলে যায় এবং বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। ঐ গোত্রের নেতার নাম ছিল সুলায়মান খান। সুলায়মান খানের সঙ্গী-সাথীরা ছিল সালজুকীদের মতই খাঁটি মুসলমান। সুলায়মান খানের যোগ্যতা লক্ষ্য করে আর্মেনিয়ায় অবস্থানকারী গায তুর্কদের ঐ সমস্ত লোকও তার চারপাশে একত্রিত হতে থাকে, যারা এতদিন বিভ্রান্তের মত এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। এভাবে দিনের পর দিন তাদের দল ভারী হতে থাকে। এটা ছিল ঐ যুগ, যখন চেঙ্গিয খানের দস্যুপনার কারণে বিভিন্ন দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের সহায়-সম্পদ রক্ষার জন্য নিজেরই বাহুবলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। তখন অত্যাসন্ন বিপদ-আপদের মুকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল অপরিহার্য। তাই সুলায়মানের লোকেরা যারা আর্মেনিয়ার পাহাড়সমূহে অবস্থান করছিল, নিজেদের শক্তি ও প্রভাব সমুন্নত রাখার প্রতি ছিল যত্নশীল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আর্মেনিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে, যখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল, সুলায়মান খান সুষ্ঠুভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং আপন জনগোষ্ঠী যাতে বিনা প্রয়োজনে কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। খাওয়ারিযম সাম্রাজ্যের পতন সুলায়মান খানের সামনে আর একটি সুন্দর সুযোগ এনে দেয়। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা ও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

চেঙ্গিষ খান তার মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে ৬২১ হিজরীতে (১২২৪ খ্রি) সালজুকীদের একটি বিরাট বাহিনী ঐ সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন, যার রাজধানী ছিল কূনিয়া। কূনিয়ার শাসনক্ষমতার অধিকারী ছিলেন আলাউদ্দীন কায়কুবাদ সালজুকী। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এই সালজুকী রাষ্ট্রের শাসক তথা রোমান সালজুকীদেরকে সর্বদা রোমান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকতে হতো। কালের পরিক্রমায় এই সাম্রাজ্য অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলায়মান খানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছল যে, মোঙ্গলরা আলাউদ্দীন কায়কুবাদের উপর হামলা চালিয়েছে তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। কেননা কূনিয়ার সুলতান ছিলেন মুসলমান, আর মোঙ্গলরা ছিল কাফির। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং মোঙ্গলরা মুসলিম বিশ্বকে ইতিমধ্যে ধ্বংস করে ফেলেছিল। সুলায়মান খান আলাউদ্দীন কায়কুবাদকে সাহায্য প্রদান এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে শাহাদাত লাভের শ্রেষ্ঠ সুযোগ মনে করে আপন গোত্রকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলায়মান খানের এই বাহিনীর সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি, তবে সুলায়মান খান এই বাহিনীর যে অংশটিকে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আপন পুত্র আর তুগ্রিলের নেতৃত্বে রওয়ানা করেছিলেন তার সংখ্যা ছিল চারশ চুয়াল্লিশ। দুনিয়ার বড় বড় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো যেমন প্রায় ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে, তেমনি সুলায়মান খানের এই ঘটনাও আকস্মিক ঘটেছিল। এদিকে আর্মেনিয়ার দিক থেকে যখন এই মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক তখন মোঙ্গল

বাহিনী আলাউদ্দীন কায়কুবাদ সালজুকীর বাহিনীর একেবারে সম্মুখে গিয়ে পৌঁছেছিল। যখন সালজুক বাহিনী ও মোঙ্গল বাহিনীর মধ্যে জোর লড়াই চলছিল এবং মোঙ্গলরা অতি শীঘ্রই আলাউদ্দীনের বাহিনীকে পরাস্ত করতে চাচ্ছিল ঠিক তখন সুলায়মানের পুত্র আর তুগ্রিল আপন বাহিনীসহ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি দেখতে পান, দু'টি বাহিনী যুদ্ধরত রয়েছে এবং মনে হচ্ছে এক বাহিনী অতি শীঘ্রই পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে। আর তুগ্রিল জানতেন না, এই দুই পক্ষের যোদ্ধারা কারা, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন যে, তিনি দুর্বল পক্ষকেই সমর্থন করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন চারশ চুয়াল্লিশ জন সঙ্গী নিয়ে দুর্বল পক্ষের দিক থেকে সবল পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এত দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতার সাথে এই আকস্মিক হামলা চালানো হয় যে, মোঙ্গলরা শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে তাদের অসংখ্য লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে পলায়ন করে। আলাউদ্দীন কায়কুবাদ সালজুকী খানিকক্ষণ পূর্বেই আপন পরাজয় ও ধ্বংসকে একেবারে নিশ্চিত মনে করেছিলেন। হঠাৎ এই অকল্পনীয় সাহায্য এবং বিজয় প্রত্যক্ষ করে তিনি যারপর নাই উল্লসিত হন এবং যে আর তুগ্রিল রহমতের ফেরেশতারূপে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। সেখানে ঠিক সময়মত পৌঁছতে পেরেছেন বলে আর তুগ্রিলও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি আরো বেশি সন্তুষ্ট হন এই ভেবে যে, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন তা পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। আর তুগ্রিল এবং আলাউদ্দীন কায়কুবাদ বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে মত্ত ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান খানও আপন বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পৌঁছেন। আলাউদ্দীন সালজুকী, সুলায়মান খান এবং তার পুত্র আর তুগ্রিলকে মূল্যবান পরিধেয় উপহার দেন। তিনি আর তুগ্রিলকে আংকারা শহরের নিকটে একটি জায়গীর প্রদান করেন এবং সুলায়মান খানকে আপন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন।

এখানে আলাউদ্দীন সালজুকীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি আর তুগ্রিলকে জায়গীর হিসাবে প্রদানের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এলাকাটি নির্বাচন করেন। কূনিয়া সাম্রাজ্য প্রথমে অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম এলাকা রোমানরা দখল করে নিয়েছিল এবং তারা এই সালজুক সাম্রাজ্য পুরোপুরি গ্রাস করার জন্য ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। অপর দিকে দক্ষিণপূর্ব এলাকাসমূহ মোঙ্গলদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং বাকি এলাকা দখলের জন্য তারা তৎপর ছিল। মোট কথা, এভাবে দু'দিক থেকে দু'টি শক্তিশালী শত্রুর চাপে পড়ে কূনিয়ার একেবারে চিড়া চেপ্টা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং চৌহদ্দি ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে তা এমনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের আকার ধারণ করেছিল যার অস্তিত্ব যে কোন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যেতে পারত। যা হোক, এই দুর্দান্ত বাহিনীর অধিনায়কদের দুঃসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করে আলাউদ্দীন সুলায়মানের পুত্রকে এমন একটি অঞ্চলে জায়গীর প্রদান করেন, যার অবস্থান ছিল একেবারে রোমান সীমান্তে। অপর দিকে পিতা সুলায়মানকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তিনি পশ্চিম দিক থেকে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরই আর তুগ্রিল একটি রোমান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রোমান

এলাকার দিকে আপন জায়গীরের আয়তন বৃদ্ধি করেন। তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আলাউদ্দীন সালজুকীও নিজের সাম্রাজ্য থেকে ঐ অঞ্চল সংলগ্ন আরো কিছু এলাকা আর তুগ্রিলের জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর শক্তি ও উদ্যম উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন। ফলে আর তুগ্রিল শক্তিশালী হয়ে ওঠায় রোমানদের দিক থেকে যে আশংকা ছিল তা একেবারে লোপ পায়। কিন্তু কিছুদিন পর সুলায়মান খান, যিনি ফুরাত নদীর তীর দিয়ে আপন বাহিনীসহ সফর করছিলেন এবং মোঙ্গলদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, ফুরাত অতিক্রমকালে পানিতে ডুবে মারা যান। আর তুগ্রিল আপন এলাকা শাসন করে যাচ্ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজের শক্তিও বৃদ্ধি করছিলেন। যেহেতু আর তুগ্রিল খ্রিস্টানদের সাথে বরাবর যুদ্ধরত ছিলেন এবং একের পর এক তাদের এলাকা ছিনিয়ে এনে নিজের রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করছিলেন, তাই তার ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী হওয়াটা ছিল কূনিয়া সম্রাটের জন্য কিছুটা শান্তি ও স্বস্তির কারণ। কাজেই আর তুগ্রিলের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রত্যক্ষ করে আলাউদ্দীন সালজুকী আত্মতৃপ্তি লাভ করছিলেন।

৬৩৪ হিজরীতে (১২৩৬-৩৭ খ্রি) আলাউদ্দীন কায়কুবাদের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূ কূনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোঙ্গলরা বার বার আক্রমণ করে কায়খসরূকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। ফলে তিনি ৬৪১ হিজরীতে (১২৪৩-৪৪ খ্রি) মোঙ্গলদেরকে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। কূনিয়ার এভাবে করদ রাজ্যে পরিণত হওয়াটা আর তুগ্রিলের জন্য খুব একটা মাথাব্যথার কারণ ছিল না। কেননা তিনি এমন একটি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, যা বাহ্যত মোঙ্গলদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। তারপর মোঙ্গলদের এশিয়া মাইনরের দিকে মনোনিবেশ করার অবকাশ ছিল না। ৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খ্রি) চেঙ্গিয খানের পৌত্র হালাকূ খান বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য মুছে ফেলেন।

৬৫৭ হিজরীতে (১২৫৯ খ্রি) আংকারার জায়গীরদার আর তুগ্রিলের ঘরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং তাঁর নাম রাখা হয় উসমান খান। ইনি হচ্ছেন সেই উসমান খান, যাঁর নামানুসারে তুর্কী বাদশাহদেরকে সালাতীনে উসমানিয়া বা উসমানী সম্রাট বলা হয়। ৬৮৭ হিজরীতে (১২৮৮ খ্রি) যখন উসমানের বয়স ত্রিশ বছর তখন তুগ্রিলের মৃত্যু হয়। এ সময় কূনিয়া-সম্রাট আর তুগ্রিলের সমগ্র এলাকার শাসনক্ষমতা উসমান খানকে প্রদান করেন এবং এই মর্মে একটি সনদও লিখে দেন। উসমান খানের যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে কূনিয়ার বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূ ঐ বছরই তাঁকে আপন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করে তাঁর সাথে আপন কন্যার বিবাহ দেন। এবার উসমান খান কূনিয়া শহরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন। এমনকি জুমুআর দিন কূনিয়ার জামে মসজিদে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূর স্থলে উসমান খানই খুতবা পাঠ করতে থাকেন।

উসমান খান

৬৯৯ হিজরীতে (১২৯৯-১৩০০ খ্রি) মোঙ্গলদের সাথে একটি সংঘর্ষে গিয়াসুদ্দীন কায়খসরূ নিহত হন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, মাত্র একটি কন্যা সন্তান ছিল। তার সাথেই উসমান খান পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কাজেই সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ

কর্মকর্তারা সর্বসম্মতিক্রমে উসমান খানকে কূনিয়ার সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এভাবে ইসরাঈল ইব্‌ন সালজুকের বংশধররা যেই সাম্রাজ্য ৪৭০ হিজরীতে (১০৭৭-৭৮ খ্রি) কায়েম করেছিল তার বিলুপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অস্তিত্ব এই শতাব্দীর প্রথমভাগেও ছিল। ইসরাঈল ইব্‌ন সালজুক ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে সুলতান মাহমূদের নির্দেশে হিন্দুস্থানের কালিঞ্জর দুর্গে একদা বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

উসমান খানের সিংহাসনে আরোহণের সময় কূনিয়া সাম্রাজ্য ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাই রোমান ও মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যটির অস্তিত্ব মুছে যাওয়াটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু উসমান খান সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে মৃতপ্রায় এই সাম্রাজ্যটি পুনরায় সজীব হয়ে উঠতে শুরু করে। তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, উসমানের প্রতি তাঁর সঙ্গী-সাথী, সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সৈন্যসামন্ত, প্রজাসাধারণ সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। তাঁর মার্জিত ব্যবহারের কারণে তাঁকে সকলেই ভালবাসত। উসমান খানের মধ্যে ছিল যেমন নিষ্কলুষ ধর্মপরায়ণতা, তেমনি ছিল অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতা। উসমান খান সর্বপ্রথম রোমানদের কাছ থেকে 'কারা হিসার' শহর জয় করেন এবং সেখানেই আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন সাম্রাজ্যের এই নতুন রাজধানী সৌভাগ্যের একটি আলামত হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। সিংহাসনে আরোহণ করার পর উসমান খান হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করেন এবং তাতে জয়ী হন। ফলে হিংসুটেদের বিষদাঁত ভেংগে যায়। এতদসত্ত্বেও সালজুকীদের পুরাতন খান্দানের লোকেরা উসমান খানকে তাদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই দেখত। অবশ্য এজন্য বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। তবে উসমান খান যদি কোন না কোন মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা কিংবা বিপদাশংকার কথা প্রকাশ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াত। কিন্তু উসমান খান প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে নিজেকে নির্ভীক ও নিঃশংকচিত্ত প্রমাণ করেছেন। তাই দেখা যায়, যখন খ্রিস্টানরা একেবারে সূচনাকালে কূনিয়া আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী পাঠায় তখন উসমান খান সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের একত্র করে তাদের সাথে পরামর্শ সভায় বসেন। ঐ সভায় উসমান খানের চাচা তথা আর তুগ্রিলের ভাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় এই মুহূর্তে সৈন্য প্রেরণ সঙ্গত হবে না। যতদূর সম্ভব আপোসের মাধ্যমে এই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই হবে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে এই আশংকা রয়েছে যে, মোঙ্গল এবং অন্যান্য তুর্কী অধিনায়কও খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সফল করে তোলার জন্য একযোগে আমাদের দেশের উপর হামলা চালাবে। তখন একসাথে সকল শত্রুর মুকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। উসমান খান আপন চাচার মুখে এই কাপুরুষোচিত কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর জুড়ে তাকে লক্ষ্য করেই সজোরে তা নিক্ষেপ করেন। ফলে চিরদিনের জন্য তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান কিংবা সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার মত দুঃসাহস আর কারো হয় নি। যা হোক, উসমান খান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে 'কারা হিসার' দখল করেন, তারপর কূনিয়ার পরিবর্তে এখানেই আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি

অনবরত খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালাতে থাকেন এবং একের পর এক শহর দখল করে খ্রিস্টানদেরকে এশিয়া মাইনর থেকে তাড়িয়ে দিতে থাকেন। খ্রিস্টান সম্রাট কাইজার কনস্টানটিন যখন উসমান খানকে প্রবল বন্যার আকারে তাদের দিকে ধাবিত হতে দেখলেন তখন তিনি উপস্থিত কূটকৌশল হিসাবে মোঙ্গলদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দিলেন এবং তাদেরকে অনবরত প্ররোচিত করতে থাকলেন, যেন তারা পূর্ব দিক থেকে উসমান খানের উপর হামলা চালায়। কেননা মোঙ্গলরা এরূপ করলে উসমান খানের দৃষ্টি খ্রিস্টানদের উপর থেকে স্বভাবতই মোঙ্গলদের উপর গিয়ে পড়বে। কনস্টানটাইনের এই প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। কেননা তারই প্ররোচনায় মোঙ্গলরা উসমান খানের সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসে। যেহেতু উসমান খান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একের পর এক জয়লাভ করছিলেন তাই তাঁর বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যই সিংহ হৃদয় হয়ে উঠেছিল। আর বিজয় হচ্ছে এমন বস্তু, যা প্রতিটি যুদ্ধপ্রিয় জাতির মধ্যে সাহসিকতার সৃষ্টি করে। উসমান খান আপন পুত্র আরখানকে মোঙ্গলদের মুকাবিলায় পাঠান। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবেষ্টনী ভেদ করার ক্ষেত্রে আরখানের কোন জুড়ি ছিল না। তারপর স্বয়ং উসমান খান আপন বাহিনীর বাকি সৈন্যদের নিয়ে পূর্বের চাইতে অধিক তীব্রতার সাথে রোমানদের উপর হামলা চালাতে থাকেন। আরখান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোঙ্গলদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয়ী হন। শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলরা ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে আরখানের মুকাবিলা করা থেকে সরে দাঁড়ায়। যাহোক, আরখান তাঁর মিশন সফল করে পিতার সাথে গিয়ে মিলিত হন। এবার পিতাপুত্র উভয়ই খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালান এবং বিজয়ী বেশে ক্রমাগত এগিয়ে চলেন। একদিকে উসমান খান এশিয়া মাইনর জয় করে উত্তর দিকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছেন, অপর দিকে আরখান খ্রিস্টানদেরকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং বারূসা জয় করেন। বারূসা হচ্ছে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্তী রোম সম্রাটের একটি অতি সমৃদ্ধিশালী শহর। আরখান যখন এই শহরটি জয় করেন তখন উসমান খান কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছেন এবং অনেক মালে গনীমত লাভ করে 'কারা হিসারে' ফেলে এসেছেন। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু বারূসা বিজয়ের সংবাদ শুনে অবিলম্বে সেদিকে রওয়ানা হন এবং আপন অধিনায়কদেরকে নির্দেশ দেন ঃ যদি আমি বারূসায় পৌঁছার পূর্বে রাস্তায় মারা যাই তাহলে তোমরা আমার লাশ বারূসায় নিয়ে গিয়ে দাফন করবে এবং সেখানেই আমার সমাধি রচনা করবে। ভবিষ্যতে আমার পুত্র আরখানও যেন বারূসায় বসবাস করে এবং সেই শহরকেই আপন রাজধানীতে রূপান্তরিত করে। শেষ পর্যন্ত উসমান খান বারূসায় পৌঁছার বেশ কয়েকদিন পর মারা যান এবং সেখানেই তাঁর সমাধি রচনা করা হয়। এটা হচ্ছে হিজরী ৭২৭ সনের (১৩২৭ খ্রি) ঘটনা। উসমান খান মৃত্যুকালে আপন পুত্রকে ওসীয়ত করতে গিয়ে বলেন ঃ আজ আমার দুঃখ নেই এজন্য যে, তোমার মত একটি উপযুক্ত ছেলেকে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছি। তুমি কখনো ধর্মপরায়ণতা, পুণ্যকামিতা, সহৃদয়তা, করুণা ও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। তুমি প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং শরীয়তের বিধান জারি করবে। তুমি বারূসাকেই আপন রাজধানী করবে। উসমান খান যে অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন এই ওসীয়ত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জানতেন, কূনিয়ায় এমন সব লোক

রয়েছে যারা কোন না কোন সময় তাঁর বংশের ক্ষতি সাধন করতে পারে। তিনি এও জানতেন, মোঙ্গলরা শুধু ইসলামের কারণে মুঘলদের শত্রু নয়। কেননা তারাও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব কূনিয়ায় যদি রাজধানী থাকে তাহলে আমার বংশধরদের সাথে মোঙ্গল এবং অন্যান্য সর্দারের মধ্যে সব সময় সংঘাত লেগে থাকবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য খ্রিস্টান দেশসমূহই হচ্ছে উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র। এই প্রেক্ষিতে যদি বারূসাকে রাজধানী করা হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে, খ্রিস্টানরা এশিয়া মাইনর থেকে চিরদিনের জন্য হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে এবং দানিয়াল উপত্যকা থেকে কখনো অগ্রসর হওয়ার সাহস পাবে না। উপরন্তু বারূসার বাদশাহরা অতি সহজে ইউরোপ আক্রমণ ও বলকান জয়ের সুযোগ পাবে। উসমানের এই ধারণা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত। উসমানের এই আদর্শের প্রতি তাঁর বংশধরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং এই আদর্শ বাস্তবায়নের ফলেই কিছুদিন পর উরনা তথা আদরিয়ানোপলে তাঁরা তাঁদের রাজধানী স্থানান্তর এবং কনসটান্টিনোপল জয় করতে সক্ষম হয়।

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উসমান খান ছিলেন অনন্যসাধারণ বীর পুরুষ। তাঁর একটি প্রমাণ এই যে, যখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখন তাঁর হাত হাঁটু পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছত। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার। তাঁর আকার-আকৃতিও ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল অপূর্ব। অত্যন্ত জটিল বিষয় সম্পর্কেও তিনি ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন এবং পরিণামে তাঁর সিদ্ধান্তই হতো সঠিক। তিনি ছিলেন প্রখর প্রতিভার অধিকারী। দয়া ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল অনেক উপরে।

কূনিয়ার সালজুক বাদশাহদের পতাকায় অর্ধচন্দ্র অংকিত ছিল। এটাকে উসমান খানও যথারীতি তাঁর পতাকায় বহাল রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত এটাই উসমানী সাম্রাজ্যের জাতীয় প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। উসমান খান ঊনসত্তর বছর কয়েক মাস বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মোট সাতাশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যে কত ধর্মপরায়ণ, সংসার বিরাগী ও মুত্তাকী ছিলেন তার একটি প্রমাণ এই যে, মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে একটি বর্ম, একটি তরবারি এবং একটি পাগড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এটাই হচ্ছে সেই তরবারি, যা প্রত্যেক উসমানীয় সুলতান সিংহাসনে আরোহণের সময় আপন কটিদেশে বাঁধতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উসমান খান যখন কূনিয়া ত্যাগ করেন তখন তিনি পুরাতন সালজুক বংশের লোকদেরকে সেখানকার শাসনকর্তা ও কর্মকর্তা নিয়োগ করে ঐ সমস্ত সম্মানসূচক পদবীর ব্যবহারও তাদের জন্য বৈধ করে দেন, যা সালজুক বংশের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, উসমান খান কূনিয়ায়, কেন্দ্রের অধীন একটি সাম্রাজ্যের অধীন পুরাতন রোমান সালজুকদের বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। এই কর্মধারা থেকেও উসমান খানের দূরদর্শিতা ও কৌশলের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিংশ অধ্যায়

রোমান সাম্রাজ্য

উসমান খানের পর তাঁর পুত্র আরখান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় উসমানীয় সুলতান। আরখান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। এতে আরখানের যুগে যে সমস্ত বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা অনুধাবন করা সহজ হবে।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পৌনে চয়শ বছর পূর্বে ইতালীতে সেলূইয়া নামীয় এক কুমারী মেয়ের গর্ভে দু'টি যমজ পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের একজনের নাম রূমূলিস এবং অন্যজনের নাম রীমূস রাখা হয়। কথিত আছে যে, এই দু'টি সন্তান মিররীখ (Mars) দেবতার ঔরসে জন্মলাভ করেছিল। সেলূইয়া নামীয় কুমারী মেয়েটি ছিল ভেস্টা দেবীর মন্দিরের পূজারিণী। সেখানেই মিররীখ দেবতা দ্বারা সে গর্ভবতী হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রূমূলিস এবং রীমূসকে কোন একটি নৌকায় কিংবা টুকরীতে রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং সমুদ্রের ঢেউ তাদেরকে কোন একটি জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী উপকূলে নিয়ে নিক্ষেপ করে। সেখানে একটি বাঘিনী তাদেরকে স্তন্য দান করে এবং তাদের যত্নও নিতে থাকে। এভাবে বাঘিনীর দুধ পান করে শিশু দু'টি প্রতিপালিত হয়। বড় হওয়ার পর দুই ভাই মিলে একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে এই শহরই রোম বা রোমা নামে পরিচিত হয়। এই দুই ভাইয়ের বংশধররা এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বিরাট ও পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। রোম নগরী আজো ইতালীর রাজধানী। কিন্তু রূমূলিস ও রীমূসের প্রতিষ্ঠিত সেই রোমান সাম্রাজ্যের কোন নাম-নিশানা এখন অবশিষ্ট নেই।

এই সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষে গিয়ে পৌঁছে তখন তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর এক ভাগকে বলা হতো পূর্ব রোম এবং অপর ভাগকে বলা হতো পশ্চিম রোম। সেই রোম বা রোমাই পশ্চিম রোমের রাজধানী হিসাবে বহাল থাকে। আর পূর্ব রোমের রাজধানী হয় কনসটান্টিনোপল। উত্তর ইউরোপ এবং রাশিয়ার বর্বর জাতিসমূহ বার বার আক্রমণ চালিয়ে একদা পশ্চিম রোমকে একেবারে দুর্বল ও অকেজো করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য সীমিত আকার ধারণ করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জেনেভা এবং ভেনিসে দু'টি পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সেগুলো বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। কালক্রমে ঐ দুই সাম্রাজ্যের স্থলে নতুন নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ব রোমের উপর উত্তরাঞ্চলীয় আক্রমণকারীদের সৃষ্ট বিপদ খুব কমই পতিত হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, ইউরোপীয় বর্বরদের হাতে তাদেরকে খুব একটা

ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় নি। অবশ্য এক যুগ এমনও আসে যখন কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের শহর রোমও বেদখল হয়ে যায়। আরব ও ইরানের অধিবাসীরা সেই পশ্চিম রোম সম্পর্কে অনবহিত ছিল, যার নামে রোমান সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপ অর্থাৎ কনসটান্টিনোপলের শাসকরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে যখন ইউরোপে তা প্রচার করতে শুরু করে তখন ইউরোপের ঐ সমস্ত রাজন্য, যারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করত তারা কনসটান্টিনোপলের সম্রাটকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ খ্রিস্ট ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং ইউরোপবাসী মাত্রেই রোমের কায়সারকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। যখন কনসটান্টিনোপল দরবারে সভাসদরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাদের অধিকৃত এলাকাসমূহেও খ্রিস্ট ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে তখন আরব ও ইরানের লোকেরা প্রত্যেকটি খ্রিস্টানকে রোমীয় বা রোমান নামে অভিহিত করতে থাকে। কনসটান্টিনোপলের কায়সারের সাম্রাজ্য যেহেতু গ্রীক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছিল এবং তিনি রোমের কায়সার মহান আলেকজান্ডারের অধিকৃত দেশসমূহেরও মালিক ছিলেন তাই কনসটান্টিনোপল সাম্রাজ্যকে ইউনানী তথা গ্রীক সাম্রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। একারণেই ঐতিহাসিকগণ রোমান এবং গ্রীক উভয় শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেহেতু এশিয়া মাইনর এবং সিরিয়াও কনসটান্টিনোপলের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে এশিয়া মাইনরকেও রোম দেশ বলা হতো। শীঘ্রই সিরিয়া থেকে খ্রিস্টান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এশিয়া মাইনর মুসলিম শাসনামলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত রোমান সম্রাটের শাসনাধীন থাকে। একারণে এশিয়া মাইনরকেও সাধারণভাবে রোম দেশ বলা হয়ে থাকে। যখন এশিয়া মাইনরের একটি অংশে সালজুকদের একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেটাকে রোম দেশের সালজুক সাম্রাজ্য বলা হতো। আর ঐ সাম্রাজ্যের সুলতানদের বলা হতো রোমান সালজুক সুলতান। এই রোমান সালজুকদের পর প্রথম উসমান খান এশিয়া মাইনরে আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রায় সমগ্র এশিয়া মাইনরে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকেও রোমান সুলতান বলা হতো। পরবর্তীকালেও উসমানীয় সুলতান-দেরকে রোমান সুলতান বলা হতে থাকে।

কনসটান্টিনোপলের কায়সার যখন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন তখন খ্রিস্টান সাম্রাজ্য ও ইরানের মাজূসী (অগ্নিউপাসক) সাম্রাজ্যের মধ্যে বার বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সব যুদ্ধ ও সংঘাত অব্যাহত থাকাকালে আরবে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যা মাজূসী এবং খৃস্টান উভয় রাজশক্তিকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে। মাজূসী সাম্রাজ্য তো অতি অল্প কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কনসটান্টিনোপলের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। আমরা যে কালের ইতিহাস বর্ণনা করছি সে কালেও এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর থেকে রোম তথা খ্রিস্টান সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে রোম-সম্রাটের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। মুসিলম খলীফাদের বর্ণনা প্রসংগে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এশিয়া মাইনর একাধারে প্রায়

সাতশ বছর মুসলমান ও খ্রিস্টানদের রণক্ষেত্র রূপে বিরাজ করে। কখনো কখনো মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে তাড়াতে তাড়াতে দানিয়াল উপত্যকা পর্যন্ত নিয়ে যেত, আবার কখনো খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে ঠেলতে ঠেলতে ইরান ও কুর্দিস্তান পর্যন্ত নিয়ে আসত। মুসলমানদের মুকাবিলায় এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকার সুযোগ পায় এজন্য যে, মুসলমানরা আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধনের অবকাশই পায় নি।

এই অবশিষ্ট কাজটি উসমানীয় তুর্করা সম্পন্ন করে। এ কারণে তাদেরই ইসলামী বিশ্বের নেতারূপে মান্য করা হতে থাকে। আমরা যে যুগের কথা বলছি সেটা ছিল ঐ যুগ, যখন ইউরোপের ক্রুসেড যুদ্ধের বন্যা দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন প্রান্তর বার বার প্লাবিত হয়ে গেছে এবং খ্রিস্টান যোদ্ধারা মুসলমানদের মুকাবিলায় বারবার পরাজিত হয়ে এবং তাদের জ্ঞানগত ও চারিত্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার খ্রিস্টান সাম্রাজ্যসমূহকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে এবং মুসলমানদের এই অভাবিত উন্নতির প্রতি খ্রিস্টান জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ যুগ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের একথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে, রোমান সাম্রাজ্য তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রকৃত পক্ষে তখন মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্য খ্রিস্টানদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আর ইতোপূর্বে ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্য কনসটান্টিনোপলকে তার সামরিক শক্তির কারণে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখলেও ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ধর্মীয় ও জাতিগত স্বার্থ রক্ষার্থে সমগ্র ইউরোপ কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল।

কনসটান্টিনোপলের সম্রাট তখন শুধু ইউরোপের সম্রাটদের সাথেই যোগসূত্র স্থাপন করেন নি, বরং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদের সম্ভাব্য প্রতিটি শত্রুর সাথেও ভালবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেন। চেঙ্গিয খান এবং তার বংশধরদেরকে বিজয়ী এবং অমুসলিম দেখে কনসটান্টিনোপলের সম্রাট কারাকোরাম এবং চীন পর্যন্ত মুঘলদের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। পরবর্তী ঘটনাবলী এটাও প্রমাণ করবে যে, কনসটান্টিনোপলের সম্রাট আপন বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের পক্ষে টানতে গিয়ে এবং তার দিক থেকে আশংকামুক্ত হতে গিয়ে তার হাতে আপন কন্যাকে তুলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি এবং তাদেরকে দুর্বল ও ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন শুধু বর্তমান যুগের খ্রিস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং কনসটান্টিনোপলের খ্রিস্টান সম্রাটও বার বার এই কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং প্রত্যেক যুগের খ্রিস্টানদেরকেও এভাবে সদাসতর্ক দেখা গেছে। যদি মুসলমানরা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বিশ্বের কোন শক্তিই মুসলমানদের সামনে টিকে থাকতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত শত্রুদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত হতেই হবে। উসমান খান এবং তাঁর বংশধররা এই গূঢ় রহস্যটি বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সব সময়ই নিজেদের দূরে রেখেছেন। তাঁরা খ্রিস্টানদের

মুকাবিলায় ছিলেন সদাপ্রস্তুত। তাই তো তাঁরা এমন সব কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে পেরেছিলেন, যা তাঁদের পূর্ববর্তী কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এবার উসমান খানের পুত্র আরখানের আলোচনায় আসা যাক।

আরখান

উসমান খানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আলাউদ্দীন এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আরখান। জ্ঞান, বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলাউদ্দীন অনন্য হলেও আরখানের সামরিক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী উসমান খানকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিল যে, আরখানই হবেন তাঁর যোগ্যতম উত্তরসূরি। তাই তিনি এ ব্যাপারে একটি ওসীয়ত লিপিবদ্ধ করে যান। উসমান খানের মৃত্যুর পর পুরোপুরি এ আশংকা ছিল যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি সংঘর্ষ পর্যন্ত দেখা দেবে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন, যিনি সব দিক দিয়েই সিংহাসনের যোগ্য ছিলেন, আপন বয়ঃজ্যেষ্ঠতার অধিকারকে পিতার ওসীয়তের সামনে ত্যাগ করে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হাতে সর্বাগ্রে নিজেই বায়আত করেন। তিনি নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য জায়গীর হিসাবে বারূসা সংলগ্ন একটি গ্রাম ছাড়া আপন ভাইয়ের কাছে আর কিছুই চান নি। আরখানও ভাইয়ের যোগ্যতা ও পবিত্রচিত্ততা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে তাঁকে রাযী করানোর জন্য সভাসদদেরকেও তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে বলেন। আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করা আলাউদ্দীনের জন্য মর্যাদার কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু বার বার অনুরোধের কারণে তিনি তাতেও রাযী হয়ে যান। তারপর তিনি মন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠতা ও মঙ্গল-কামিতার সাথে যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ আনজাম দেন তাতে তিনি বিশ্বের পবিত্রচেতা, বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ মন্ত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থান পাবার যোগ্য।

সুলতান আরখান সিংহাসনে আরোহণ করেই এক বছরের মধ্যে সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করে দানিয়াল উপত্যকা পর্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তারপর তিনি তাঁর ভাই প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীনের পরামর্শ অনুযায়ী আপন সাম্রাজ্যের মধ্যে এমনভাবে আইন-কানুন জারি করেন যার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত এই নিয়মই চলে আসছিল যে, খ্যাতিমান বাহিনীর অধিনায়কদেরকে দেশের মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র এলাকা জায়গীর হিসাবে দেওয়া হতো। এর বিনিময় হিসাবে ঐ সমস্ত জায়গীরদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এই যে, প্রয়োজনের সময় তলব করা মাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যসহ তাদেরকে বাদশাহর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাযির হতে হতো। তাই যে অধিনায়ককে একদা জমিদার বা জায়গীরদার রূপে দেখা যেত তাকেই পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যেত একজন সেনাধ্যক্ষরূপে। এশিয়া মাইনরে প্রথম থেকেই মুসলমানদের অনেক বসতি ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল তুর্ক বংশোদ্ভূত। কেননা আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর যুগ থেকে এশিয়া মাইনরের সীমান্ত শহরসমূহে তুর্কদের বসতি স্থাপনের ধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সালজুকদের শাসনামলে অনেক সম্প্রদায় তুর্কিস্তান থেকে এসে এশিয়া মাইনরে বসতি

স্থাপন করে। রোমান সালজুকদের সাম্রাজ্যও তাদের অনেক জ্ঞাতিগোষ্ঠী তথা তুর্ককে এশিয়া মাইনরের দিকে টেনে নিয়ে এসেছিল। গায-এর তুর্কদের লুটপাট এবং মোঙ্গলদের অনবরত আক্রমণও তুর্কদেরকে খুরাসান, ইরান ও ইরাকের দিক থেকে এদিকে ঠেলে দিয়েছিল। এভাবে এশিয়া মাইনরের সমগ্র পূর্বাংশ, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের দখলে ছিল, তুর্ক সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা ছিল পূর্ণ। অতএব শুধু উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এশিয়া মাইনরেই ছিল খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নেগচারী বাহিনী

এবার যখন উত্তর-পশ্চিমাংশও খ্রিস্টান সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে গেল তখন উসমানীয় তুর্কদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের সংগীরা উল্লিখিত জায়গীরদারদের মাধ্যমে সমগ্র এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উসমানীয় তুর্করা এমন এক সময়ে এশিয়া মাইনরে তাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে যখন ঐ দেশে তাদের জন্য সীমাহীন আনুকূল্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দী হয়ে অনেক খ্রিস্টান সেখানে এসেছিল এবং অনেক খ্রিস্টান যিম্মী হিসাবে এশিয়া মাইনরে বসবাস করতে শুরু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন তাঁর ভাইকে বুঝিয়ে বলেন যে, বড় বড় জায়গীরদার, যাদের অধীনে বিরাট বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে, তারা হয়ত এক সময়ে আশংকার কারণও হতে পারে। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্ররোচনার শিকার হয়ে আমাদের জায়গীরদার খ্রিস্টান প্রজাদের তো আমাদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। তাই এটাই যুক্তিযুক্ত যে, আমরা খ্রিস্টান বন্দী ও খ্রিস্টান প্রজাদের মধ্য থেকে শুধু কিশোর ও যুবকদেরকে বাছাই করে আমাদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসব। তারপর স্বয়ং রাষ্ট্র ওদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করবে। ওদেরকে মুসলমান বানিয়ে যথাযথভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হবে এবং যথাযথভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দ্বারা একটি পৃথক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। আর এই বাহিনীকেই আখ্যা দেওয়া হবে রাজকীয় তথা সরকারী বাহিনী হিসেবে। কেননা এদের দিক থেকে বিদ্রোহের কোন আশংকা থাকবে না। আর এদের আত্মীয়-স্বজনরাও কখনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার মত সাহস পাবে না বরং তারা তাদের ছেলেদের মাধ্যমে নিজেরাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। যখন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দেওয়া হয় এবং কয়েকশ খ্রিস্টান ছেলেকে রাষ্ট্রীয় হিফাযতে এনে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হয় তখন এদের সম্মান, মর্যাদা ও শানশওকত প্রত্যক্ষ করে খ্রিস্টানরা নিজ থেকে তাদের ছেলেদেরকে এই বাহিনীতে ভর্তি করার জন্য জোর চেষ্টা-তদবীর শুরু করে। কেননা তারা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, এই সেদিনও যেই খ্রিস্টান ছেলেদের মান-মর্যাদা বলতে কিছু ছিল না; অথচ রাজকীয় বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর আজ তাদের সাথে উসমানীয় সুলতানের পুত্রতুল্য আচরণ করা হচ্ছে। প্রথম প্রথম যখন আনুমানিক দুই হাজার নওজোয়ানকে যথাযোগ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের পর সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ করা হয় তখন সুলতান তাদেরকে নিয়ে একজন মহান সূফীর দরবারে গিয়ে হাযির হন এবং তাঁর কাছে দু'আ চান। ঐ আল্লাহওয়ালা সূফী একজন যুবকের কাঁধের উপর আপন হাত রেখে তাদের সকলের কল্যাণ কামনা করেন। আর সুলতান এটাকেই ঐ

বাহিনীর ভবিষ্যৎ সাফল্যের একটি শুভ ইঙ্গিত বলে ধরে নেন। এই যুবকদের সকলেই ছিল খাঁটি মুসলমান। তাদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিল সর্বাধিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা। সর্বোপরি 'শাহী সন্তান' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছিল। এই বাহিনীটি নেগচারী বাহিনী নামে খ্যাত ছিল। এই বাহিনীর লোকেরা পরবর্তীকালে আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে, বলতে গেলে কোন সম্পর্কই রাখত না বরং সকলেই সত্যিকার অর্থে ইসলামের এক একজন খাঁটি সেবকে পরিণত হয়েছিল। এভাবে প্রতি বছর খ্রিস্টান কয়েদী ও যিম্মীদের মধ্য থেকে এক হাজার যুবককে নির্বাচিত করে বিশেষ বাহিনীতে ভর্তি করা হতো এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের পর তাদেরকে সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হতো। অভিনব ধরনের এই বাহিনী, সামরিক অধিনায়ক ও জায়গীরদারদের দিক থেকে তুর্কী সুলতানদের জন্য যে বিপদাশংকা ছিল, তা চিরতরে মুছে ফেলে। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন সমগ্র দেশে এখানে সেখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টানদেরকে মোটামুটিভাবে ঐ সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়, যা মুসলমানরা ভোগ করত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, গির্জাসমূহের জন্য নানা ধরনের রেয়াত ও জায়গীর প্রদান করা হয় এবং সর্বাবস্থায় প্রজাসাধাণের আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এর ফলে খ্রিস্টানরা সন্তুষ্টচিত্তে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। কেননা উক্ত পরিবেশে তারা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিল। আজকাল নেগচারী বাহিনী সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, এটা ছিল খ্রিস্টানদের উপর একটি অত্যাচারমূলক আচরণ। তাদের শিশুদেরকে তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমান বানানো হতো। তারপর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেই তাদেরকে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, নেগচারী বাহিনী যেরূপ জাঁকজমকের সাথে থাকত, যেভাবে তাদের প্রতি সুলতানের শুভদৃষ্টি ছিল তা লক্ষ্য করে খোদ খ্রিস্টানদের মনেই এই আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল যে, যে করে হোক তারা তাদের সন্তানদেরকে রাজকীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করাবে। কেননা সেখানে ভর্তি হওয়ার পর তারা উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী হবে, আয়েশ-আরামে থাকবে এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের কোন আশংকা বা দুশ্চিন্তা থাকবে না। এ কারণেই প্রতি বছর ভর্তির সময় আপনা-আপনি বাৎসরিক কোটা পূর্ণ হয়ে যেত, এমন কি ভর্তির সুযোগ না পেয়ে কাউকে নিরাশ হয়ে ফিরেও যেতে হতো।

নেগচারী বাহিনী ছিল একটি আধুনিক বাহিনী। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিয়ম-কানুনও এখানে বিদ্যমান ছিল। প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন এই বাহিনীর মধ্যে অনেক সংস্কার সাধন করেন। তিনি সৈন্যদের ইউনিফরম নির্ধারণ করেন। সংখ্যানুপাতে তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে তদনুযায়ী আইন-কানুনও বেঁধে দেন। একশ, পাঁচশ, হাজার প্রভৃতি মনসবধারী অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়, পদাতিক ও অশ্বারোহীদের পৃথক বাহিনী গঠন করা হয় এবং স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য পৃথক আইন রচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন সরকারী সম্পদ বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন এবং শহরে এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশ বিভাগ এবং পৌরবিভাগের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। দেশের ঐ সমস্ত সম্প্রদায়, যারা লক্ষ্যহীনভাবে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করত এবং

চুরিডাকাতিও করত, প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন তাদেরকে এমন ধরনের কাজে নিয়োগ করেন যা তাদের কাছে ছিল খুবই পছন্দসই। অর্থাৎ তিনি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন শুধু তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী ও সেনাপল্টন গঠন করেন, যাদের কাজ ছিল, যে দেশের উপর সরকারী বাহিনী হামলা চালাবে, এই সমস্ত ক্ষুদ্র বাহিনী ও সেনাপল্টন যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে এবং সেসব শত্রু রাজ্যের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে প্রতিপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

প্রধানমন্ত্রী আলাউদ্দীন পূর্তবিভাগের কাজকর্মের প্রতিও বিশেষভবে নজর দেন। ফলে শহরে, গ্রামে, পল্লীতে সর্বত্র মসজিদ, মেহমান ও মুসাফির খানা, মাদরাসা এবং চিকিৎসালয় গড়ে ওঠে। বড় বড় শহরে নির্মিত হয় বিরাট বিরাট প্রাসাদ, নদীসমূহের উপর নির্মিত হয় সেতু এবং রাস্তাসমূহের উপর পাহারা-চৌকি। পণ্যদ্রব্য পরিবহন এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের সুবিধার জন্য নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়। মোটকথা, এশিয়া মাইনরের জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা এবং ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি সর্বোপরি সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্য যত ধরনের প্রচেষ্টার দরকার তার সবই করা হয়। এর ফলে আজ সে দেশ তুর্কদের স্থায়ী আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে এবং সুদীর্ঘ ছয়শ' বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন জাতি বা কোন সাম্রাজ্য সেখান থেকে ইসলাম বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কদের তাড়িয়ে দিতে পারে নি।

আলাউদ্দীন যেহেতু আরখানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং স্বনামধন্য প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন, তাই আরখানের শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলাউদ্দীন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এবার আরখান সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আরখান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন কনসটান্টিনোপলের কায়সার (সম্রাট) ছিলেন এন্ডোনিকাস। যখন তার কাছ থেকে তার অধিকৃত এশিয়ার সব কয়টি দেশই ছিনিয়ে নেওয়া হলো তখন তিনি আশংকা করছিলেন, না জানি মুসলমানরা আবার কোন দিন তুর্ক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একেবারে ইউরোপ উপকূল আক্রমণ করে বসে। কিন্তু আরখান ইউরোপ আক্রমণের চাইতে আপন ভাই আলাউদ্দীনের সংস্কারমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এশিয়া মাইনরকে আরো সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করার প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বছর আপন দেশ ও সাম্রাজ্যের সংস্কারমূলক কার্যে নিয়োজিত থাকেন। যদি পরবর্তী তুর্কী সুলতানরাও তাদের নব অধিকৃত দেশগুলোকে গড়ে তোলার জন্য আরখান এবং তাঁর ভাই আলাউদ্দীনের মত সচেষ্ট হতেন তাহলে এশিয়া মাইনর যেমন আজ পর্যন্ত তুর্কীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে বিরাজ করছে তেমনি মিসর, বলকান, হিজায, ত্রিপোলী প্রভৃতি দেশও আজ পর্যন্ত তাদের আশ্রয়স্থল হিসাবেই বিরাজ করত।

৭৩৯ হিজরীতে (১৩৩৮-৩৯ খ্রি) কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের পৌত্র রাজকুমার কেন্টা কুজিনস তার (সম্রাটের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খ্রিস্টানদের এই গৃহযুদ্ধের কারণে স্বাভাবিকভাবেই উসমানীয়দের সামনে তাদের সাফল্যের একটি চমৎকার সুযোগ আসে। বিদ্রোহীরা ইদন প্রদেশের তুর্কী গভর্নর শাহযাদা উমর বে-র কাছে সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি ৩৮০টি জাহাজের একটি নৌবহর ও আটাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেন এবং ইউরোপে প্রবেশ করে প্রথমে ডিসোটিকা শহরের অবরোধ ভেংগে ফেলেন। তারপর তিনি দুই হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী নিয়ে সার্দিয়া আক্রমণ করে। কায়সার

(রোম সম্রাট) প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে উমরকে বা উমর পাশাকে বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখেন। ফলে তিনি (উমর পাশা) ইউরোপ থেকে নিজের প্রদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু তার এই আক্রমণের ফল এই দাঁড়াল যে, সম্রাট এন্ডোনিকাসের পৌত্র বেপরোয়া হয়ে আপন পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বয়ং তাতে আরোহণ করেন। ৭৪২ হিজরীতে (১৩৪১-৪২ খ্রি) তার মৃত্যু হলে জন প্লালোগস কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ৭৪৮ হিজরীতে (১৩৪৭-৪৮ খ্রি) কেন্টা কুজিন্স জন প্লালোগসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৯৪ হিজরী (১৩৯১ খ্রি) পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকেন। তারপর আরো দু'জন সম্রাট ৮৫৭ হিজরী (১৪৫৩ খ্রি) পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। তারপর কনসটান্টিনোপল তুর্কীদের দখলে চলে আসে। সম্রাট কেন্টাকুজিন্স (কেন্টকোজিনী) সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে সুলতান আরখানকে এশিয়া মাইনরের মহান সুলতান বলে স্বীকৃতি দেন এবং তুর্কদের আক্রমণ থেকে ইউরোপীয় এলাকাসমূহ রক্ষার জন্য সুলতানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সুলতান আরখানের কাছে প্রস্তাব পাঠান ঃ আমি আমার অতি সুন্দরী কন্যা থিউডোরাকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই। কায়সার জানতেন যে, সুলতান ষাট বছরের বৃদ্ধ এবং তার কন্যা উঠতি বয়সের যুবতী। তাছাড়া এখানে ধর্মের বিভিন্নতার প্রশ্নও রয়েছে। যা হোক, সুলতান কায়সারের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং কনসটান্টিনোপলে গিয়ে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে রাণী থিউডোরাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই বিবাহের পর কায়সার নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে, এখন আর তুর্করা তার দেশ আক্রমণ করবে না। অতএব তিনি নিজেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। কিন্তু এর আট বছর পর এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তুর্কদের হাতে ইউরোপে প্রবেশের একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। অর্থাৎ ৭৫৬ হিজরীতে (১৩৫৫ খ্রি) উপকূলীয় এলাকা এবং বন্দরসমূহকে উপলক্ষ করে ভেনিস এবং জেনেভা রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে একটি ভয়ানক বিরোধ দেখা দেয়। উভয় রাষ্ট্রই ছিল বিরাট নৌ-শক্তির অধিকারী। তারা সমগ্র রোম সাগরের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। জেনেভাবাসীদের এলাকা ছিল কনসটান্টিনোপলের কায়সার অধিকৃত সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত। তাই স্বভাবতই কনসটান্টিনোপলের কায়সার জেনেভাবাসীদেরকে একান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ কারণে তিনি ভেনিসবাসীদের সাফল্যই কামনা করছিলেন। ভেনিসবাসীরাও ছিল কনসটান্টিনোপলের কায়সারের শুভাকাঙ্ক্ষী। এদিকে আরখান ভেনিসবাসীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন এজন্য যে, ওরা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূলে প্রায়ই মুসলমানদের নানা অসুবিধার কারণ হতো। তাছাড়া তারা আরখানের সাম্রাজ্যকেও হেয় নজরে দেখত। ফলে এই পরিস্থিতিতে আরখান স্বাভাবিকভাবেই জেনেভাবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাছাড়া জেনেভাবাসীরা আরখানের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখত।

হঠাৎ বসফোরাস উপত্যকার সন্নিকটে ভেনিস এবং জেনেভাবাসীদের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। এদিককার উপত্যকা সংলগ্ন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আরখানের পুত্র সুলায়মান খান।

একদিন সুলায়মান খান জেনেভাবাসীদের একটি নৌকায় শুধু চল্লিশজন লোক সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা দানিয়াল খাড়ি অতিক্রম করে ইউরোপীয় উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং

সেখানকার দুর্গটি, যা ভেনিসবাসীদের শক্তির উৎস হিসাবে পরিগণিত হতো, অধিকার করেন। তারপর ত্বরিতগতিতে কয়েক হাজার তুর্ক ঐ দুর্গে গিয়ে তাদের শাহযাদার সাথে মিলিত হয়। এতে জেনেভাবাসীরা অত্যন্ত উপকৃত হয়। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কনসটান্টিনোপলের কায়সার অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি চিন্তা করছিলেন, সুলতান আরখানকে লিখবেন, যেন তিনি সুলায়মানকে ঐ দুর্গটি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বয়ং কায়সারের রাজধানীতে তার অপর জামাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে কায়সারের পক্ষে আপন রাজধানী রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব তিনি অবিলম্বে সুলতান আরখানের সাহায্য কামনা করেন। সুলতান আরখান তখন আপন পুত্র সুলায়মান খানকে লিখেন, তুমি অর্থ আদায় কর এবং ঐ দুর্গ ছেড়ে দিয়ে চলে এসো। সুলায়মান খান পিতার নির্দেশ পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ফলে গ্যালিপোলী শহরের প্রাচীর ভেংগে পড়ে এবং শহরবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটে পালাতে থাকে। কিন্তু এই ভূমিকম্পেরই সুযোগ নিয়ে সুলায়মান খানের দুই অধিনায়ক আযদী বেগ ও গাযী ফাযিল ভগ্ন প্রাচীর অতিক্রম করে গ্যালিপোলী শহর দখল করেন। শহর দখল করার সাথে সাথে সুলায়মান খান প্রাচীর মেরামত করে সেখানে একটি শক্তিশালী তুর্কী বাহিনী মোতায়েন করেন। কায়সারের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি আরখানের কাছে এ সম্পর্কে একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। আরখান উত্তরে লিখেন, আমার পুত্র গ্যালিপোলী শহর অস্ত্রবলে জয় করেনি, বরং আকস্মিক ভূমিকম্পই তার জন্য ঐ শহর দখল করার সুযোগ এনে দিয়েছে। যা হোক আমি তাকে সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য লিখবো এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কেও তদন্ত করে দেখব। যেহেতু কায়সারের বার বার আরখানের সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল এবং ঘরোয়া বিবাদের কারণে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার প্রতিই তাকে অধিক মনোযোগী হতে হচ্ছিল তাই তিনি গ্যালিপোলী শহর ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঐ সময়ে আরখানের উপর আর কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করেননি। ফলে সুলায়মান খানও গ্যালিপোলী শহর ছেড়ে আসেননি। তাছাড়া সুলায়মানের জন্য গ্যালিপোলী শহর নিজের দখলে রাখারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা ভেনিসবাসীদের হস্তক্ষেপ থেকে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল রক্ষা করতে হলে গ্যালিপোলীর উপর মুসলমানদের দখল থাকা অপরিহার্য। এটা হচ্ছে ৭৫৭ হিজরীর (১৩৫৬ খ্রি) ঘটনা। এর দু'বছর পর ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৮ খ্রি) আরখানের পুত্র সুলায়মান খান ঈগল শিকার করতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। সুলায়মান খান ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অসম সাহসী শাহযাদা। তাঁর মৃত্যুতে আরখান অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই আরখানের পর সিংহাসনে আরোহণ করতেন। পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে আরখান একেবারে মুষড়ে পড়েন এবং আটত্রিশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করে ৭৬১ হিজরীতে (১৩৬০ খ্রি) পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরখান তাঁর পিতার ওসীয়ত ও কৌশলসমূহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করেন। তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে ইউরোপ উপকূল পর্যন্ত তা বিস্তৃত করেন। আরখানের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল ইউরোপের উপর নিবদ্ধ। নিম্নোক্ত ঘটনা এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যখন তাঁর পুত্র সুলায়মান খান বারূসার সন্নিকটে ঈগল শিকার করতে

গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান তখন আরখান তাকে বারূসায় দাফন করেন নি, বরং তাঁর লাশ দানিয়াল খাড়ির অপরদিকে ইউরোপ উপকূলে নিয়ে যান, যা ছিল সুলায়মান কর্তৃক বিজিত ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত এলাকা এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করেন যাতে তুর্করা ইউরোপ উপত্যকা ছেড়ে আসার কথা কখনো চিন্তা না করে।

মুরাদ খান (প্রথম)

জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান খানের মৃত্যুর পর আরখান আপন কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ খানকে 'অলীআহ্‌দ' (পরবর্তী উত্তরাধিকারী) নিয়োগ করেন। অতএব আরখানের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর বয়স্ক মুরাদ খান ৭৬১ হিজরীতে (১৩৬০ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুরাদ খানের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইউরোপে আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করার। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই তাঁকে এশিয়া মাইনরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কিরমানের তুর্কী সালজুক রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর ৭৬২ হিজরীতে (১৩৬১ খ্রি) তিনি আপন সেনাবাহিনী নিয়ে ইউরোপ উপকূলে অবতরণ করেন এবং আড্রিয়ানোপল জয় করে সেখানেই আপন রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অর্থাৎ ৭৬৩ হিজরী (১৩৬১-৬২ খ্রি) থেকে কনসটান্টিনোপল জয় পর্যন্ত অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মাদ খানের যুগ পর্যন্ত আড্রিয়ানোপলই থাকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। মুসলিম বাহিনী কর্তৃক আড্রিয়ানোপল বিজিত হওয়ার সংবাদ শুনে বুলগেরিয়া এবং সার্দিয়াবাসীরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। তখন কনসটান্টিনোপলের কায়সার (সম্রাট) রোমের পোপের কাছে পয়গাম পাঠান ঃ আপনি ধর্মযুদ্ধের জন্য খ্রিস্টান জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করুন এবং মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। তখন পোপ একের পর এক সেনাবাহিনী পাঠাতে থাকেন। অপর দিকে হাঙ্গেরী, বসনিয়া প্রভৃতি রাজ্যের খ্রিস্টান রাজারাও সার্দিয়া ও বুলগেরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এই সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী ৭৬৫ হিজরীতে (১৩৬৩-৬৪ খ্রি) আড্রিয়ানোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। মুরাদ খান আপন সেনাপতি লালা শাহীনের নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। আড্রিয়ানোপলের দুই মনযিল আগে প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের বিরাট খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা হয়। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার সময় হাজার হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত অথবা বন্দী হয়। লালা শাহীন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আরো অনেক দেশ জয় করেন। তিনি থারিস, দারুমিলিয়া প্রভৃতি প্রদেশে সামরিক জায়গীরদারীর প্রাচীন প্রথানুযায়ী আপন তুর্ক সম্প্রদায় এবং মুসলিম অধিনায়কদের অনেককেই জায়গীর প্রদান করেন। ঐ দেশকে সুসংগঠিত এবং আপন ক্ষমতা সেখানে সুদৃঢ় করার কাজে সুলতান মুরাদ খান বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। যুদ্ধবন্দী এবং খ্রিস্টান প্রজাদের নওজোয়ান ছেলেদের মাধ্যমে নেগচারী বাহিনীর আকারও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খ্রিস্টানরা যখন লক্ষ্য করল যে, তুর্কী সুলতান তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে আড্রিয়ানোপলে পরিপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তখন ৭৭৮ হিজরীতে (১৩৭৬-৭৭ খ্রি) তারা পুনরায় ইউরোপের সমগ্র শক্তিকে সুলতান মুরাদ খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে এবার সার্দিয়া, বুলগেরিয়া হাঙ্গেরী, বসনিয়া, পোল্যান্ড, কনসটান্টিনোপল এবং রোমের পোপের বাহিনী সুলতান মুরাদ খান এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে

দেওয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এবারও খ্রিস্টান বাহিনীর অনুপাতে এক-ষষ্ঠাংশ অথবা পঞ্চমাংশের চাইতে বেশি ছিল না। এই যুদ্ধেও খ্রিস্টানরা পূর্বের ন্যায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তখন সার্দিয়ার সম্রাট সুলতানকে বার্ষিক বারো মন বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রদান এবং তলব করা মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সম্বলিত একটি সাহায্য বাহিনী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন। বুলগেরিয়ার সম্রাট সুলতানের খিদমতে আপন কন্যাকে পেশ করেন এবং ভবিষ্যতে সুলতানের অনুগত থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার আপন তিনটি কন্যাকে এই আশা নিয়ে সুলতানের খিদমতে পেশ করেন যাতে তিনি স্বয়ং এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং অপর দুই কন্যাকে আপন দুই পুত্রের সাথে বিবাহ দেন। এই দুই যুদ্ধের পর কনসটান্টিনোপলের কায়সার যখন দেখলেন যে, মুরাদ খানকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করা মোটেই সম্ভব নয় তখন তিনি একটা আপোস-রফার মাধ্যমে তার সাথে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি একদিকে মুরাদ খানকে তাঁর অধিকৃত ইউরোপীয় ভূখণ্ডসহ কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে দিয়ে নানাভাবে তার তোষামোদ করতে থাকেন, আবার অন্যদিকে গোপনে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও আঁটতে থাকেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার ৭৮২ হিজরীতে (১৩৮০-৮১ খ্রি) তাঁর যাবতীয় আভিজাত্য ও মানমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে রোম শহরে পোপের দরবারে গিয়ে হাযির হন এবং তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি সমগ্র ইউরোপের খ্রিস্টানদেরকে ধর্মযুদ্ধের নামে এক পতাকাতলে সমবেত করে সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করাবেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সফল না হলে তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং সুলতানের রোষানল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপন পুত্র থিউডোরাসকে সুলতানের খিদমতে পাঠিয়ে আবেদন জানান, যেন ওকে (থিউডোরাসকে) নেগচারী বাহিনীতে ভর্তি করে সম্মানিত করা হয়। তিনি তাঁর এই কূটকৌশলের মাধ্যমে নিজের দিক থেকে সুলতানকে পুরোপুরি আশ্বস্ত রাখতে সক্ষম হন।

ঐ সময়ে এশিয়া মাইনরে সংঘটিত কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান মুরাদ খানকে সেখানে যেতে হয়। তখন তিনি তাঁর দখলকৃত ইউরোপ ভূখণ্ডের শাসন ক্ষমতা আড্রিয়ানোপলে আপন পুত্র সাওজীর হাতে অর্পণ করেন। সুলতানের এই অনুপস্থিতির সুযোগে কনসটান্টিনোপলের কায়সারের অপর পুত্র এন্ডোনিকাস আড্রিয়ানোপলে আসেন এবং মুরাদ খানের পুত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু সেজে তাকে তার পিতা মুরাদ খানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি একদিন অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে শাহযাদাকে বলেন, আমার পিতা সাম্রাজ্য পরিচালনার কোন যোগ্যতা রাখেন না এবং আমাকে নানাভাবে নির্যাতন করে থাকেন। অনুরূপভাবে আপনার পিতাও আপনার অন্যান্য ভাইয়ের অনুপাতে আপনার সাথে যথার্থ ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন না। আজ এর প্রতিবিধানের একটা সুবর্ণ সুযোগ আপনার হাতে এসেছে। আমিও আমার বাহিনীর একটি বিরাট অংশকে আমার পক্ষে টেনে নিয়েছি। আসুন এবার আমরা উভয়ে মিলে কনসটান্টিনোপল জয় করে সেখানকার বর্তমান কায়সারকে বন্দী করি। এভাবে যখন কনসটান্টিনোপলের সিংহাসন আমার অধিকারে এসে যাবে তখন আমরা উভয়ে মিলে সুলতান মুরাদ খানের মুকাবিলা করতে সক্ষম হব। ফলে আপনি অতি সহজেই আড্রিয়ানোপলের সিংহাসন অধিকার করে তুর্কীদের সুলতান হয়ে বসবেন। খ্রিস্টান

রাজকুমারের এই যাদুকরী প্রলোভন মুসলিম শাহযাদাকে পথভ্রষ্ট করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপন সেনাবাহিনী নিয়ে খ্রিস্টান রাজকুমারের সাথে কনসটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তা অবরোধ করেন। তারপর উভয়ে নিজ নিজ স্বাধিকার ঘোষণা করেন। মুরাদ খান এই বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কথা জানতে পেরে অনতিবিলম্বে এশিয়া মাইনর থেকে আড্রিয়ানোপলে চলে আসেন। উভয় শাহযাদা কনসটান্টিনোপল ছেড়ে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটি নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সুলতান মুরাদ খানের মুকাবিলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মুরাদ খান আড্রিয়ানোপল পৌঁছেই কায়সার প্লেলোগাসকে লিখেন ঃ তুমি অবিলম্বে আমার দরবারে এসে হাযির হও এবং জবাব দাও, কেন এরূপ ঘটনা ঘটল এবং তুমি তোমার পুত্রকে আমার পুত্রের কাছে পাঠিয়ে কেনই বা এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে? কায়সার সুলতানের এই লেখা পেয়ে একেবারে আতংকিত হন। তিনি উত্তর দেন, মহান সুলতান! আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আপনি উভয় শাহযাদাকেই বন্দী করুন এবং তাদেরকে এই দুষ্কর্মের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি দিন। আমিও এ ব্যাপারে আপনার সাথে রয়েছি। আমি চাই যেন এই বিদ্রোহীদেরকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এই উত্তর পেয়ে সুলতান স্বয়ং ঐ বিদ্রোহীদের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তারা নদীর যে তীরে অবস্থান করছিল তিনি তার অপর তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর রাতের বেলা একাকী অপর তীরে গিয়ে পৌঁছেন এবং বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে ঢুকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সঙ্গ ছেড়ে এখনো আমার সাথে যোগ দেবে তার সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেওয়া হবে। সুলতানের এই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সকল সৈন্য এবং পুঁজিপতি, যারা শাহযাদাদের সঙ্গে ছিল, সুলতানের চারপাশে এসে সমবেত হয়। এই অবস্থা দেখে উভয় শাহযাদা সামান্য কয়েকজন তুর্ক এবং খ্রিস্টানকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং কিছুদূর যেতে না যেতেই উভয়ে সুলতানের সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। তাদেরকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলে সুলতান মুরাদ খান আপন পুত্রকে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ করে ফেলেন; তারপর তাকে হত্যারও নির্দেশ দেন। এবার তিনি কায়সারের পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন— তুমি নিজ হাতেই আপন পুত্রকে শাস্তি দাও যেমন আমি আমার পুত্রকে দিয়েছি। কায়সারের জন্য এটি ছিল একটি অতি কঠিন পরীক্ষা। তিনি কি করে নিজ হাতে আপন পুত্রকে শাস্তি দিবেন? আর শাস্তি না দিলে সুলতানের রোষানল থেকে কিভাবে রক্ষা পাবেন ? শেষ পর্যন্ত তিনি আপন পুত্রের চোখে এসিড ঢেলে দিয়ে তাকে অন্ধ করেন, তবে প্রাণে বধ করেন নি। সুলতান যখন শুনতে পান য, কায়সার তাঁর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তার পুত্রকে অন্ধ করে ফেলেছেন তখন তিনি আনন্দিত হন। তবে তিনি কেন তার পুত্রকে জীবিত রাখলেন সে ব্যাপারে আর কোন আপত্তি তুললেন না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে, কায়সার তার পুত্রকে সম্পূর্ণ অন্ধ করেন নি, বরং তার দৃষ্টিশক্তি বাকি ছিল এবং কিছুদিন পর ঘা শুকিয়ে গিয়ে দুই চোখই সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

৭৮৯ হিজরীতে (১৩৮৭ খ্রি) কারাকয়ূনলু কামানুন এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং সুলতান মুরাদ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কূনিয়ার নিকটে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সুলতান মুরাদ খানের পুত্র বায়াযীদ খান অত্যন্ত

ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালিয়ে প্রতিপক্ষকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। বায়াযীদ খানের এই বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার জন্য সুলতান তাকে বায়াযীদ ইয়ালদিরিম (বিদ্যুৎ) উপাধি প্রদান করেন। ঐ দিন থেকে বায়াযীদ 'ইয়ালদিরিম' নামেই খ্যাতি লাভ করেন। তুর্কমানীদের অধিনায়কদের মধ্যে সুলতান মুরাদ খানের জামাতাও ছিলেন। কিন্তু জামাতার স্ত্রী তথা মুরাদ খানের কন্যা আপন পিতার কাছে সুপারিশ করলে তিনি জামাতাকে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই দেন। তারপর ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের সাথে পুনরায় মুরাদ খানের সুসম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। যা হোক এবার সুলতান কিছুদিন বারূসায় অবস্থান করে এশিয়া মাইনরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এদিকে ইউরোপে মুসলমানদের বিরোধিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করার উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্বের মতই বিদ্যমান ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ এবং পাদ্রীদের উত্তেজনাকর ধর্মীয় বক্তৃতামালা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে মুসলমানদের একটি ভয়ংকর ও ঘৃণিত ছবি উপস্থাপন করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুন। এবার যখন খারীস দারূমিলিয়া এবং তারও সম্মুখবর্তী দেশ সুলতান মুরাদ খানের দখলে আসল এবং সেখানে মুসলমানদের নতুন বসতি গড়ে উঠতে লাগল তখন স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র ইউরোপে একটি বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। এদিকে সার্বিয়ার সম্রাট কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং রোমের পোপ ইউরোপের সব দেশেই তুর্কদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য রাষ্ট্রদূত, প্রতিনিধি এবং প্রচারক দল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিল ঠিক সে ধরনেরই তৎপরতা, যা একদা মুসলমানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নেওয়া এবং সমগ্র সিরিয়ায় ক্রুসেড যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছিল। তুর্করা বলকানে পৌঁছার পর খ্রিস্টানরা সিরিয়ার কথা ভুলে যায়। এবার তারা নিজেদের দেশকে বাঁচাবার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সুলতান মুরাদ খান এশিয়া মাইনরে এমন এক পরিবেশে ছিলেন যে, খ্রিস্টানদের এসব অপতৎপরতার কোন খোঁজই তিনি রাখতেন না। কেননা ঐ যুগে সংবাদ আদান-প্রদানের এমন কোন মাধ্যম ছিল না, যার দ্বারা জানা যেতে পারত যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোথায় এবং কিভাবে ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। ৭৯১ হিজরীতে (১৩৮৯ খ্রি) সুলতান মুরাদ খান বারূসায় অবস্থান করছিলেন। এই বছরই খাজা হাফিজ শিরাযী এবং হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র) ইনতিকাল করেন। এদিকে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রিশিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালী, বসনিয়া প্রভৃতি দেশ ও জাতি একজোট হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্য উৎখাত করার ব্যাপারে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। ৭৯১ হিজরীতে (১৩৮৯ খ্রি) বারূসায় সুলতান মুরাদ খানের কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছে যে, তার চব্বিশ হাজার সৈন্যের যে তুর্কী বাহিনী রূমেলিয়ায় অবস্থান করছিল, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার খ্রিস্টান বাহিনীর হামলায় তা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বর্তমানে রাজধানী আড্রিয়ানোপলসহ মুসলিম অধিকৃত সমগ্র ইউরোপ এলাকার অধিবাসীরা দারুণ আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সুলতান মুরাদ খান বারূসা থেকে রওয়ানা হন এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আড্রিয়ানোপলে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখান থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আপন সেনাপতি

আলী পাশার নেতৃত্বে অগ্রে প্রেরণ করেন যাতে তারা শত্রুদের অগ্রযাত্রায় বাধা প্রদান করে এবং নিজে আড্রিয়ানোপলে অবস্থান করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। ৭৯২ হিজরীতে (১৩৯০ খ্রি) আলী পাশা বুলগেরিয়ার সম্রাট সাসওয়ালকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে পুনরায় সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সার্দিয়ার সম্রাট খ্রিস্টান দেশসমূহের সম্মিলিত বাহিনীকে সার্দিয়া ও বসনিয়ার সীমান্তবর্তী কাসূদা নামক স্থানে একত্র করেন। ইউরোপের এই বিশাল বাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে আগে ভাগেই সুলতান মুরাদ খানের কাছে যুদ্ধের পয়গাম পাঠায়। মুরাদ খানও তখন একটি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। এবার তিনি নিজেরই অধিনায়কত্বে সমগ্র বাহিনী নিয়ে আড্রিয়ানোপল থেকে রওয়ানা হন এবং দুর্গম পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে কাসূদার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সানতাজা নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। ঐ নদীর উত্তর পার্শ্বে খ্রিস্টান বাহিনী পূর্ব থেকে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ৭৯২ হিজরীতে (১৩৯০ খ্রি) সুলতান মুরাদ আপন বাহিনী নিয়ে নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানরা যখন লক্ষ্য করল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যা ও রসদপত্রের দিক দিয়ে তাদের বাহিনীর এক-চতুর্থাংশের সমান তখন তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। তাছাড়া সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থান করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্টান সৈন্যরা ছিল সুস্থ-সজীব। আর মুসলমানরা দুর্গম ও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সদ্য সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল বলে তারা তখন ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত। তাছাড়া খ্রিস্টানদের কাছে ঐ এলাকা নতুন বা অপরিচিত কোন ভূখণ্ড ছিল না। কেননা ঐ এলাকার অধিবাসীরা ছিল তাদের বন্ধু, স্বজাতীয় ও স্বধর্মাবলম্বী। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ঐ দেশটি ছিল একটি ভিন্ন দেশ। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল তাদের কাছে অপরিচিত এবং স্বাভাবিকভাবে শত্রুভাবাপন্ন। সুলতানী বাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছার দিন রাতের বেলা উভয় বাহিনীই নিজ নিজ কর্মপন্থা সম্পর্কে সলাপরামর্শ করতে বসে। কোন কোন খ্রিস্টান অধিনায়ক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখন এই রাতের বেলায়ই আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু যেহেতু খ্রিস্টানরা তাদের বিজয় সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থাশীল ছিল, তাই তাদের অধিকাংশ অধিনায়ক উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করেন এই বলে যে, এই সময়ে হামলা করলে মুসলিম বাহিনীর একটি বিরাট অংশ অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। অথচ এবার আমরা তাদের একটি প্রাণও জীবিত রাখতে চাই না। আর আমাদের এই লক্ষ্য একমাত্র দিনের বেলায়ই অর্জিত হতে পারে।

এদিকে খ্রিস্টান বাহিনীর আধিক্য লক্ষ্য করে মুসলমানদের মধ্যেও কিছুটা ভীতি পরিলক্ষিত হয়। সুলতান যে পরামর্শ সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে কোন কোন অধিনায়ক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মালবহনকারী উটসমূহকে সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের দ্বারাই একটি জীবন্ত প্রাচীর গড়ে তোলা হোক। এতে একটি বড় উপকার এই হবে যে, শত্রুরা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসলে তাদের অশ্বসমূহ এই সমস্ত উট দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক পালাতে থাকবে। ফলে শত্রুদের

সম্মুখসারি তথা রক্ষাব্যূহ ভেঙে পড়বে। কিন্তু সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াযীদ ইয়ালদিরিম এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন, এটা হচ্ছে দুর্বলতা ও ভীতিগ্রস্ততার চিহ্ন। আমাদের জন্য সেরূপ কোন কর্মকৌশল অবলম্বন করা মোটেই বাঞ্ছনীয় হবে না, যা শত্রুদের কাছে আমাদেরকে দুর্বল ও ভীতিগ্রস্ত প্রতিপন্ন করে। এদিকে সুলতান হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, অত্যন্ত প্রবল বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং তা শত্রুদের পিছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছে এবং তাদের চেহারা প্রথমে ধূলিতে ধূসরিত, তারপর বৃষ্টির পানিতে জবুথবু করে দিচ্ছে। এটা ছিল মুসলমানদের সর্বনাশেরই একটি আলামত। আপন বাহিনীর সংখ্যাল্পতা এবং দুর্বলতা লক্ষ্য করে সুলতান মুরাদ খান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত কামনা করতে থাকেন। তিনি ভোর পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে শুধু এই দু'আই করতে থাকেন– প্রভু! আজ ইসলাম ও কুফরের মুকাবিলা হচ্ছে। তুমি আমাদের ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের দিকে তাকিয়ো না, বরং আপন রাসূল ও দীনে হকের সম্ভ্রম রক্ষা কর। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যি সত্যি সুলতানের এই দু'আয় সাড়া দিলেন। তাই দেখা গেল ভোর হওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ধূলোবালি কেটে গিয়ে একটি আনন্দদায়ক ও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি ও বাতাস বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে উভয় পক্ষ সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হলো। সুলতান মুরাদ খান আপন ইউরোপীয় এলাকার জায়গীরদারদের সরবরাহকৃত সৈন্যদেরকে ডান পাশের বাহিনীতে মোতায়েন করেন এবং শাহযাদা বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের হাতে সেই বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করেন। বাম পাশের বাহিনীতে মোতায়েন করা হয় এশীয় অঞ্চলের সৈন্যদেরকে এবং সেই বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় শাহযাদা ইয়াকূবকে। সুলতান মুরাদ খান আপন দেহরক্ষীদের নিয়ে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি অনিয়মিত অশ্বারোহী, পদাতিক ও বিদ্যোৎসাহী যোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য সামনে বাড়িয়ে দেন। অপরদিকে খ্রিস্টানদের মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সম্রাট লাযরাস। তাদের ডানপাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন লাযরাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন বসনিয়ার সম্রাট স্বয়ং। উভয় পক্ষের সৈন্যরাই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অগ্রসর হয় এবং একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুপুর পর্যন্ত উভয় বাহিনীই অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। তখনও জয়-পরাজয়ের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুলতানের পুত্র ইয়াকূবের বাহিনীতে অস্থিরতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি মধ্যবর্তী বাহিনীর দিকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে স্বয়ং মুরাদ খান সেদিকে মনোনিবেশ করেন এবং বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত সারিগুলোকে পুনরায় সংগঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে দেন। ঐ দিন সুলতান মুরাদ খানের হাতে ছিল একটি বিরাট লৌহদণ্ড। শত্রুপক্ষের কেউ তার সামনে আসা মাত্র তিনি ঐ লৌহদণ্ডের আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। অত্যন্ত জোরেশোরে যুদ্ধ চলছিল। লাশে ভরে উঠেছিল সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র। হঠাৎ খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। খ্রিস্টান যোদ্ধারা পিছন দিকে পালাতে শুরু করে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে মুসলিম যোদ্ধারা আরো মারমুখী হয়ে ওঠে এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালিয়ে খ্রিস্টানদের

সর্বাধিনায়ক সার্বিয়া সম্রাটকে বন্দী করে। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয় এবং তাদের প্রায় সকল সেরা অধিনায়ক মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। সার্বিয়া সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় সুলতানের সামনে হাযির করা হলে তিনি তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আটক রাখার নির্দেশ দেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন খ্রিস্টান যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়ে গিয়েছিল তখন খ্রিস্টানদের রূবাহ নামীয় জনৈক অধিনায়ক মুসলমানদের এই বিরাট বিজয়ানন্দকে একেবারে বিষাদে পরিণত করে দেয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সার্বিয়ার এই অধিনায়ক পলায়নকারী খ্রিস্টান যোদ্ধাদের মধ্য থেকে হঠাৎ আপন ঘোড়ার মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলমানদের প্রতি বিনীত আহ্বান জানায় ঃ তোমরা আমাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে তোমাদের বাদশাহের কাছে নিয়ে চলো। আমি খ্রিস্টানদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই নিজেকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমি এ সম্পর্কে সুলতানের কাছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই এবং সেই সাথে ইসলামও গ্রহণ করতে চাই। অতএব মুসলমানরা তাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে নিয়ে আসে। বিজয় ঘোষিত হওয়ার পর সুলতানের সামনে বিশিষ্ট বন্দীদের পেশ করা কালে এই অধিনায়ককেও পেশ করা হয়। তারপর তার বন্দী হওয়ার কারণ ও অবস্থা সম্পর্কেও সুলতানকে অবহিত করা হয়। সুলতান তার কথাবার্তা শুনে আনন্দিত হন এবং তাকে আপন সান্নিধ্য লাভেরও সুযোগ দেন। তখন ঐ সার্বীয় অধিনায়ক অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সুলতানের পায়ের উপর আপন মাথা রাখে। ফলে সুলতান ও তার সভাসদরা তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আরো বেশি আশ্বস্ত হন। কিছুক্ষণ পর অধিনায়ক সুলতানের পায়ের উপর থেকে আপন মাথা উঠায় এবং ত্বরিত বেগে আপন কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি ছোরা বের করে তার দ্বারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সুলতানের বুকে আঘাত করে। এতে সুলতান ভীষণভাবে আহত হন এবং উপস্থিত সৈন্যরা রূবাহকে একেবারে টুকরা টুকরা করে ফেলে। সুলতান পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি অবিলম্বে সার্বিয়া-সম্রাটকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হয়। কিছুক্ষণ পর সুলতান মুরাদ খানও এই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। এটা ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্টের ঘটনা। সুলতান মুরাদ খানের মৃত্যুর পর বাহিনী অধিনায়করা পরবর্তী সুলতান হিসাবে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের হাতে বায়আত করেন। কসোভা যুদ্ধকে বিশ্বের অন্যতম বিরাট যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, সমগ্র ইউরোপ একত্র হয়েও উসমানীয়দেরকে ইউরোপ থেকে বের করতে পারবে না। মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর খ্রিস্টানদের ধর্মীয় যুদ্ধের উন্মাদনা হ্রাস পায়। এবার তারা নিজেদের ঘর নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সিরিয়া জয়ের আকাঙ্ক্ষাও তাদের অন্তর থেকে মুছে যায়। এই যুদ্ধ এটাও প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টান বাহিনীর সংখ্যাধিক্য মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে কখনো দমাতে পারবে না। খ্রিস্টানদের এই পরাজয় বিশ্বের বিরাট পরাজয়সমূহের অন্যতম। উসমানীয় সালতানাতের এই বিজয় ইউরোপের মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে আরো

সুদৃঢ় করে। এদিকে স্পেন ও ফ্রান্সের খ্রিস্টানরা, যারা গ্রানাডার মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য বলতে গেলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুসলমানদের এই বিজয়ের কারণে কিছুটা দমে যায়। ফলে সাময়িকভাবে হলেও গ্রানাডার মুসলমানদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে।

সুলতান মুরাদ খান পঁয়তাল্লিশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম পিতার লাশ বারূসায় নিয়ে এসে সমাধিস্থ করেন। সুলতান মুরাদ খান অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ, সূফী হৃদয় ও আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন।

সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম

বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম সিংহাসনে আরোহণ করার পর পিতার লাশ বারূসায় দাফন করে কিছুদিন পর্যন্ত মাইনরে অবস্থান করেন। তখন তিনি তুর্কমানের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতার প্রতিবিধান করতে থাকেন। এটা ছিল সেই যুগ, যখন চেঙ্গিযী মুঘলদের পতনের পর এশিয়ার আর একজন বিজয়ীর অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং তার নাম ছিল তাইমূর। পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তার সিংহাসন আরোহণ করার দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ৭৯৩ হিজরীতে (১৩৯১ খ্রি) বায়াযীদ ইয়ালদিরিম শুনতে পান যে, ইউরোপে তুর্কদের বিরুদ্ধে পুনরায় ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে এবং সার্বিয়া ও বসনিয়া অঞ্চলে পুনরায় বিদ্রোহের অবস্থা দেখা দিয়েছে। অতএব, বায়াযীদ খান ঝড়ের বেগে ইউরোপে এসে আবির্ভূত হন এবং বসনিয়া থেকে শুরু করে দানিয়ূব নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফুরাত নদী থেকে দানিয়ূব নদী পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করেন। ওয়াল্লাশিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি ছিল সুলতান বায়াযীদের করদরাজ্য। এদিকে এশিয়া তথা ইরানে চেঙ্গিযী মুঘলদের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পর যেভাবে এখানে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল তাতে তাইমূরের বিজয় অভিযানের পথ অত্যন্ত সুগম হয়। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের এই শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে কনসটান্টিনোপলের কায়সার বায়াযীদ খানের কাছে আবেদন জানান : কনসটান্টিনোপল, মেসিডোনিয়া প্রদেশ এবং সেই সাথে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের মাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আমার অধীনে রয়েছে। আপনি এই সামান্য ভূখণ্ডটুকু অনুগ্রহপূর্বক আমারই অধিকারে থাকতে দিন এবং আমার সাথে আপনার আপোস চুক্তি বহাল রাখুন। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম একান্ত দয়াপরবশ হয়ে কায়সারের ঐ প্রার্থনা মনযুর করেন এবং তাঁকে তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ড স্বাধীনভাবে শাসন করার অধিকার দিয়ে নিজে মধ্য ইউরোপের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কায়সার নিজের দিক থেকে বায়াযীদকে এভাবে আশ্বস্ত করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। তিনি গোপনীয়ভাবে ইরান, খুরাসান, পারস্য, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে নিজের দূত পাঠাতে থাকেন। এশিয়ার মুসলিম সুলতানদের সাথেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। আমাদের এই যুগে তো এ ধরনের ষড়যন্ত্র প্রায় সাথে সাথেই ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু ঐ যুগে তখনকার অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে বায়াযীদ খানের অনবহিত থাকাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। যা হোক, কনসটান্টিনোপলের কায়সার একদিকে অনুরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং অপর দিকে

আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও আযারবায়জানের মুসলিম শাসকরা সম্ভবত ঐ যুগের পরিস্থিতিতে এক-তরফাভাবে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিল। এসব কার্যকারণ একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত এমনি এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তুর্কমানরা বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের এশীয় এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বায়াযীদ খান যদি চাইতেন তাহলে ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি এলাকার প্রতি মনোনিবেশ করে আপন এশিয়া মাইনরের সাম্রাজ্যটি আরো অনেক বিস্তৃত করতে পারতেন। কিন্তু উসমান খান ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে কিংবা মুসলিম অধিকৃত এলাকা দখল করাকে মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না। প্রথম থেকেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের পলিসি ছিল, যতদূর সম্ভব খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং খ্রিস্টান অধিকৃত এলাকা জয় করা, যাতে খ্রিস্টান অধিকৃত সমগ্র ইউরোপে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমও তাঁর পূর্বপুরুষদের এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি তাঁর কোনই আগ্রহ ছিল না। এবার যখন তুর্কমানরা একতরফাভাবে আক্রমণ চালিয়ে বারূসা ও আংকারার মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে মোতায়েনকৃত বায়াযীদের আঞ্চলিক এশীয় বাহিনীকে পরাজিত করে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তখন বায়াযীদ খান বাধ্য হয়ে ইউরোপের খ্রিস্টানদের মুকাবিলা ছেড়ে দিয়ে ৭৯৫ হিজরীতে (১৩৯৩ খ্রি) এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হন এবং এখানে এসে পৌছার সাথে সাথে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। তাদের অনেকেই তাঁর হাতে বন্দী হয়। যেহেতু এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই বায়াযীদ ঐ দিকের রাজ্যগুলোকে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে যথারীতি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই তিনি মিসরের আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবরাহীমের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে 'সুলতান' উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বেকার উসমানীয় শাসকদেরকে ঐতিহাসিকরা 'সুলতান' উপাধিতে স্মরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে 'আমীর' বলা হতো। যেমন আমীর উসমান খান, আমীর আরখান, আমীর মুরাদ খান ইত্যাদি।

৭৯৫ হিজরীতে (১৩৯৩ খ্রি) আব্বাসীয় খলীফাদের ধর্মীয় মর্যাদা, যা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত ছিল, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বায়াযীদ খান আব্বাসীয় খলীফার কাছ থেকে 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করাটা নিজের জন্য জরুরী মনে করেন। অথচ তিনি জানতেন যে, আব্বাসীয় খলীফা মিসরের মামলূক শাসকদের আশ্রয়েই কালাতিপাত করছেন। মোট কথা, বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমকে সর্বপ্রথম উসমানীয় সুলতান বলা যেতে পারে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা, সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম একজন বীরযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলতান, যিনি ইউরোপের দুরাচার-দুষ্কর্ম এবং নিজের কিছুসংখ্যক অসৎ উপদেষ্টার প্রভাবে পড়ে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এই বর্ণনা যদি সত্য হয় তাহলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের শেষ কীর্তিকাণ্ড তথা আংকারা যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর অদূরদর্শিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তাতে তাঁর মদ্যপানের কিছু আলামত এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইউরোপীয়

ঐতিহাসিকগণ সুলতান বায়াযীদকে আরামপ্রিয় ও বদস্বভাবী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এর মধ্যেও আমরা আশ্চর্যের কিছু দেখি না। কেননা যেখানে মদ্যপান থাকবে সেখানে আরামপ্রিয়তা ও বদস্বভাবের অস্তিত্ব থাকবে। এতদসত্ত্বেও আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, একজন দিগ্বিজয়ী সুলতান হিসাবে বায়াযীদ খান ছিলেন অনন্য। তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় বীরপুরুষ। ফলে শত্রুরা তাঁর ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের মধ্যে যদি মদ্যপানের অভ্যাস ও আরাম-প্রিয়তা ঢুকেই থাকে তাহলে এটাও ছিল খ্রিস্টান সম্রাটদের কূটকৌশল ও গোপন তৎপরতার ফল। কেননা প্রথম থেকেই খ্রিস্টান সম্রাটরা তাদের কন্যাদেরকে বলতে গেলে উপঢৌকনস্বরূপ উসমানীয় সুলতানদের প্রাসাদে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। অতএব মদ্যপানের প্রতি প্ররোচনাদানকারিণী খ্রিস্টান রাজকুমারীরা বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের রাজপ্রাসাদে বিদ্যমান ছিল। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা তাদের ঈমানী শক্তি ও ধর্মপরায়ণতার কারণে খ্রিস্টান শয়তানদের প্ররোচনা থেকে নিজেদের পবিত্র রাখতে সক্ষম হলেও যে বায়াযীদ খান যুদ্ধক্ষেত্রে আপন প্রবল থেকে প্রবলতর শত্রুকেও কোন পাত্তা দিতেন না, তিনি দুর্ভাগ্যবশত আপন প্রাসাদের অবলাদের কাছে এ ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেছিলেন।

বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম ৭৯৫ হিজরী (১৩৯৩ খ্রি) থেকে ৭৯৯ হিজরী (১৩৯৭ খ্রি) পর্যন্ত আপন রাজধানী আড্রিয়ানোপল এবং ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকেন। এই পুরো সময়টাই তিনি এশিয়া মাইনরে কাটান। ৭৯৯ হিজরীতে (১৩৯৭ খ্রি) তিনি শুনতে পান যে, হাঙ্গেরীর সম্রাট সাজান্ড-এর অনবরত প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপের সমগ্র রাজশক্তি একত্রিত হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলেছে এবং ইতিমধ্যে তাদের সেনাবাহিনীর আনাগোনাও শুরু হয়ে গেছে। এবার ফ্রান্স এবং বৃটেনও তাদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ ও জাতিপুঞ্জের সাথে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ ইতালী, ফ্রান্স, বৃটেন, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, জার্মানী, এশীয় বসনিয়া প্রভৃতি দেশ ও জাতি গত কয়েক বছরের অবকাশে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। কনসটান্টিনোপলের কায়সার তাদের সাথে প্রকাশ্যে যোগ দেননি এ কারণে যে, তাঁকে সব সময়ই সুলতান বায়াযীদের শ্যেনদৃষ্টির আওতায় কালাতিপাত করতে হচ্ছিল। তবে গোপনভাবে এবং আদর্শগত দিক দিয়ে তিনিই ছিলেন এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মূল হোতা। কেননা একমাত্র তিনিই ছিলেন তুর্কী সুলতানদের প্রতি সর্বাধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন। অথচ বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম ছিলেন কায়সারের দিক থেকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত এবং তাঁর প্রতি সর্বাধিক উদারভাবাপন্ন। যাহোক খ্রিস্টানদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম বিদ্যুৎগতিতে ইউরোপ ভূখণ্ডে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, রোমান পোপ ইউনিফাস ইউরোপের দেশসমূহে এই মর্মে একটি ফতওয়া (ধর্মীয় বিধান) জারি করেছেন যে, যে খ্রিস্টান হাঙ্গেরীতে পৌঁছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে সে সমস্ত গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এর কিছু পূর্বে যখন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল তখন পোপ ও অন্যান্য প্রভাবশালী খ্রিস্টান উভয় দেশের সম্রাটদেরকে বুঝিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত ঐ যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। অতএব কাউন্ট দি নিউবাস ডিউক অব

বারগান্ডী-এর অধীনে বারগান্ডী এলাকার বীরযোদ্ধাদের একটি বিরাট বাহিনী হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ডের সাহায্যের জন্য হাঙ্গেরী অভিমুখে পাঠানো হয়। ফরাসী সম্রাটের তিন পিতৃব্য জেম্‌স, ফিলিপ ও হেনরীর নেতৃত্বে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীও হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। জার্মানীর টিউটাংক রাজকুমারবৃন্দ এবং বড় বড় কাউন্ট আপন আপন বাহিনী নিয়ে হাঙ্গেরী এসে পৌছেন। বুমেরিয়ার একটি বিরাট বাহিনী এন্টর পিলটন এবং কাউন্ট অব মিঙ্গপাল গ্রেডের অধিনায়কত্বে হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। অস্ট্রিয়ার একটি অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কাউন্ট দি সিলী। অনুরূপভাবে ইতালী এবং দূর-দূরান্তের দ্বীপসমূহ থেকেও অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীসমূহ হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেন্টজন জেরুজালেমের অধীনেও খ্রিস্টানদের একটি বিরাট বাহিনী হাঙ্গেরীতে আসে। এভাবে হাঙ্গেরীতে যখন খ্রিস্টান বাহিনীসমূহের বিরাট সমাবেশ ঘটে তখন হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ড আপন সাম্রাজ্যের সব দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন, তারপর তিনি ওয়াল্লাশিয়ার খ্রিস্টান বাদশাহকে যিনি সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, লিখেন– এখন তোমার জন্য এটাই সমীচীন যে, তুমি বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের আনুগত্য অস্বীকার করে তোমার সম্পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে আমাদের সাথে যোগদান কর। ওয়াল্লাশিয়ার সম্রাট অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপরোক্ত আহ্বানে সাড়া দেন। তারপর সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর বাঁধভাঙ্গা বন্যা যখন তার দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন তিনিও তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাতে একাত্ম হয়ে যান। কিন্তু সার্বিয়ার সম্রাট, যিনি তার পূর্ববর্তী সম্রাটের বন্দী ও নিহত হওয়ার পর বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে করদানে স্বীকৃত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সার্বিয়ার সম্রাট, কাসূদার যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে বন্দী, তারপর নিহত হয়েছিলেন। যাহোক সার্বিয়ার সম্রাট ছাড়া ইউরোপের সকল রাজা-বাদশাহই মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হন। এই সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে বিভিন্ন দেশের যে খ্রিস্টান যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছিল, সাধারণ যোদ্ধা থেকে শুরু করে অধিনায়ক পর্যন্ত তাদের সকলেই ছিলেন বীর পুরুষ এবং সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এক কথায় বলতে গেলে, এই বাহিনীর সকল অধিনায়ক এবং যোদ্ধারা ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এবং বাছাইকৃত বীরসেনানী। তাদের অধিনায়করা বলতেন, যদি আসমানও আমাদের উপর ভেংগে পড়ে তাহলে আমরা আমাদের বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা তাও ঠেকিয়ে রাখতে পারব। এই খ্রিস্টান বাহিনী ওয়াল্লাশিয়া ও সার্বিয়ার দু'টি পৃথক পৃথক পথে উসমানী সাম্রাজ্যের সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ড, যিনি ঐ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন,উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে পৌছে আপন বাহিনীকে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন।

খ্রিস্টান যোদ্ধারা একের পর এক মুসলিম অধিকৃত শহরসমূহ দখল করতে থাকে। তারা যে শহর বা গ্রাম দখল করত সেটাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলত। সেখানকার মুসলিম অধিবাসী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করত। নিরাপত্তার আবেদন এমনকি আনুগত্যের অঙ্গীকারও খ্রিস্টানদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারত না। এই পাইকারী হত্যায় স্ত্রী-পুরুষ কিংবা শিশু-বৃদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। বিরাট

খ্রিস্টান বাহিনী এক সর্বনাশী ধ্বংসের রূপ ধরে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে একেবারে ওলট-পালট করে দেওয়ার জন্য যখন এগিয়ে আসছিল তখন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম এশিয়া মাইনরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে আড্রিয়ানোপল এসে পৌছেন। সাজান্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি দানিয়াল উপত্যকার অপর পাড়ে পৌছে এশিয়া মাইনর জয় করবেন। তারপর সিরিয়ায় গিয়ে পৌছবেন। এদিকে কনসটান্টিনোপলের কায়সার এই ভেবে আনন্দিত হচ্ছিলেন যে, কসোভার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তার যে মহান লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবার তা অতি সহজেই অর্জিত হবে। ফলে উসমানীয়দের আশঙ্কা থেকে খ্রিস্টানরা চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে। ঐ মুহূর্তে এই সম্ভাবনাই প্রবল ছিল যে, সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম আড্রিয়ানোপল পৌছার সাথে সাথে অপর দিক থেকে সাজান্ডও আপন বিরাট বাহিনীসহ আড্রিয়ানোপলে এসে উপনীত হবেন এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত মুসলিম বাহিনীকে বিশ্রামের কোনরূপ সুযোগ না দিয়েই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এরূপ করা হলে বায়াযীদ খানের দুর্গতির সীমা থাকত না। কিন্তু খ্রিস্টান বাহিনী পাইকারী হত্যা ও লুটপাট চালাতে চালাতে যখন নিকোপোলিস শহরের সামনে গিয়ে পৌছে তখন সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বৃগলন বেগ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে তাদের মুকাবিলা করেন এবং পূর্বপরিকল্পিত কূটকৌশলের অধীনে নিজেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। খ্রিস্টান বাহিনী নিকোপোলিস অবরোধ করে রাখে এবং এটাকে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের একটা সুযোগ বলেই মনে করে। এভাবে খ্রিস্টানবাহিনী নিকোপোলিস অবরোধ করে বসে থাকার ফলে সুলতান বায়াযীদ খান আড্রিয়ানোপলে পৌছতে সক্ষম হন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিকোপোলিসের দিকে এগিয়ে আসারও সুযোগ পান। খ্রিস্টানরা কিন্তু তখনো এই ধারণা করে বসেছিল যে,সুলতান বায়াযীদ খান এশিয়া মাইনরে বসে আছেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এবার বায়াযীদ খান ইউরোপে অবতরণের সাহসই পাবেন না। কিন্তু ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর (৭৯৯ হিজরী) 'কাউন্ড দি নিউরাস ডিউক অব বারগান্ডী' যখন আপন তাঁবুতে খাবার খাচ্ছিলেন তখন কিছু সংখ্যক গুপ্তচর তার কাছে এই সংবাদ পৌছায় যে, তুর্কী বাহিনী একেবারে নিকটে এসে পৌছে গেছে। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে উল্লিখিত ডিউক এবং অন্যান্য ফরাসী অধিনায়ক নিজেদের তাঁবু ছেড়ে সাজান্ডের কাছে যান এবং নিজেদের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেন ঃ তুর্কীদের মুকাবিলায় তাদের বাহিনীকেই যেন সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী ঘোষণা করা হয়, যাতে তারা সর্বপ্রথম বায়াযীদের বাহিনীর উপর তরবারি চালনার গৌরব অর্জন করতে পারে। তুর্কীদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী সাজান্ড বলেন, সর্বপ্রথম তুর্কীদের অনিয়মিত ও স্বল্প অস্ত্রধারী খণ্ডবাহিনী এগিয়ে আসবে। আপনারা যেহেতু খ্রিস্টান বাহিনীর গৌরব তাই আপনাদেরকে সেই বাহিনীর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যারা সুলতান বায়াযীদ খানের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং তুর্কী বাহিনীর মধ্যে সর্বাধিক বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার অধিকারী। অগ্রবর্তী বাহিনীর হামলার পরই তারা হামলা চালাবে। 'ডিউক অব বারগান্ডী' এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান। কিন্তু ফরাসী অধিনায়করা (যেমন লর্ড দি কূরসী, নৌ সেনাধ্যক্ষ মার্শাল বূসী প্রমুখ) প্রায় এক সাথে বলে উঠেন, আমরা কখনো এ কথা বরদাশত করতে পারব না যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হাঙ্গেরীবাসীরা ফ্রান্সবাসীদের অগ্রে থাকবে। এই

উত্তেজনাকর ও উচ্ছ্বাসভরা কথা শুনে সাধারণ সৈন্যরাও সাড়া দেয় এবং যে সমস্ত তুর্কী বন্দীকে তারা তখনো হত্যা করেনি তাদেরকে সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাদের উপর একটি সাংঘাতিক বিপদ যে নেমে আসছে তা তারা তখনো ঠাহর করতে পারেনি।

সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম খ্রিস্টান বাহিনীর নিকটে পৌঁছে একটি উঁচু বাঁধের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে বাঁধের অপরদিকে অবস্থানকারী খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছিল না। সুলতান তাঁর বাছাইকৃত ও সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত চল্লিশ হাজার সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে বাকি সব (অনিয়মিত) সৈন্যকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করে সম্মুখে বাড়িয়ে দেন। ওদিক থেকে ফরাসী অশ্বারোহীরা অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে এগিয়ে আসে এবং সাজান্ড বাকি সৈন্যদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন। ফরাসী বাহিনী তুর্কী অনিয়মিত দল-উপদলগুলোকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সেই বাঁধের উপর এসে পৌঁছে, যেখানে সুলতান বায়াযীদ খানের নেতৃত্বে সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা অবস্থান করছিল। অনিয়মিত তুর্কী সৈন্যরা, যারা ফরাসীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে নিজেদের কিছুসংখ্যক সৈন্যের লাশ ফেলে রেখে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। অর্থাৎ তারা ক্ষিপ্র গতিতে একত্র হয়ে সারিবদ্ধভাবে ঐ অগ্রবর্তী ফরাসী বাহিনীকে তাদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে, যারা সুলতানের মূল বাহিনীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে খ্রিস্টানদের অগ্রবর্তী বাহিনী, যারা সাজান্ডের মূল বাহিনী থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিল, ইসলামী সৈন্যদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যায় এবং তাদের অধিকাংশই নিহত অথবা বন্দী হয়। অবশ্য সামান্য সংখ্যক লোক কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা যখন মূল ফরাসী বাহিনীর কাছে তাদের এই ধ্বংসের কাহিনী ব্যক্ত করে, তখন সমগ্র খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। এমতাবস্থায় সুলতান বায়াযীদ খান মূল খ্রিস্টান বাহিনীর উপর হামলা চালান। সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্য খ্রিস্টানদের সেনা-সমুদ্রের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত্যার ন্যায় এভাবে আছড়ে পড়বে তা ছিল খ্রিস্টানদের কল্পনাতীত। কথিত আছে যে, সেদিন বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের বাহিনী এমন একটি লৌহদণ্ডে পরিণত হয়, যা বালু প্রাচীরের ন্যায় মাইলের পর মাইল বিস্তৃত খ্রিস্টান বাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। বুওয়াইরিয়া,অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বাহিনীসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এভাবে যে দেশের যে বাহিনীই মুসলমানদের মুখোমুখি হয়েছে তারা হয় মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে, নয়তো প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে অথবা পালাতে গিয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে। মোটকথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায় এবং সুলতান বায়াযীদ খান নিকোপোলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের এমন একটি বিশাল বাহিনীকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, যে বাহিনীর মত সবদিক দিয়ে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাহিনী ইতিপূর্বে কখনো কোন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেনি। হাঙ্গেরী সম্রাট সাজান্ড কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের বড় বড় শাহযাদা, নবাব ও অধিনায়কগণ হয় বন্দী হন, নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।

ডিউক অব বারগান্ডীও ছিলেন ঐসব বন্দীর অন্যতম। উপরে যে সমস্ত খ্রিস্টান অধিনায়কের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। নিকোপোলিসের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়। বিজয় লাভের পর সুলতান স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি অংশ পরিদর্শন করেন। সেখানে খ্রিস্টান সৈন্যদের লাশের সাথে কিছু কিছু মুসলিম সৈন্যের লাশও পড়েছিল। সুলতান সে দৃশ্য দেখে আক্ষেপের সুরে বলেন, হায়! এই বিজয় রাভ করতে গিয়ে আমাদেরকে কী বিরাট মূল্যই না দিতে হয়েছে। আমি আমার এই বীর বাহাদুরদের প্রতিশোধ হাঙ্গেরীবাসীদের কাছ থেকেই নেব। এই বলে সুলতান নির্দেশ দেন, বন্দীদেরকে আমার সামনে পেশ কর। ঐ বন্দীদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যাদেরকে সাধারণ সিপাহী বলে মনে হলো তাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিছুসংখ্যককে হত্যার জন্য জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। যারা ছিল অধিনায়ক তাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে বড় বড় শহরে ঘোরানো হলো, যাতে সাধারণ মানুষ মুসলমানদের এই বিরাট বিজয়ের চিহ্ন স্বচক্ষে দেখতে পায়। খ্রিস্টান শাহযাদা, নবাব এবং স্বাধীন নরপতিদেরকে একটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। ডিউক অব বারগান্ডীও ছিলেন তাদের অন্যতম। সুলতান ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ থেকে নিজের এশীয় রাজধানী বারূসায় চলে আসেন। এখানে আসার পর তিনি ঐ পঁচিশ ব্যক্তিকে সামনে ডেকে এনে বলেন : তোমরা অন্যায়ভাবে আমার দেশের উপর হামলা করেছ। আমি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি যে, আমি নিজেই হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইতালী জয় করব। আমি এ সিদ্ধান্তও নিয়েছি যে, রোম শহরে পৌঁছে সেন্ট পিটারের কুরবান গাছে (পশু বলি দেওয়ার স্থানে) আমার ঘোড়াকে দানা খাওয়াব। তাই তোমাদের সাথে তোমাদের দেশেই পুনরায় আমার সাক্ষাত হবে। আর আমি খুবই খুশি হব যদি তোমরা পূর্বের চাইতেও অধিক সৈন্য ও অধিক প্রস্তুতি নিয়ে আমার মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আস। তোমাদের দিক থেকে যদি আমার সামান্য ভয়ভীতিও থাকত তাহলে আমি এখন তোমাদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করতাম যে, তোমরা ভবিষ্যতে কখনো আমার মুকাবিলায় আসবে না। তোমরা নিজ নিজ দেশে পৌঁছেই নিজ নিজ সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত কর এবং আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত থাক। এই বলে সুলতান বায়াযীদ খান সকল শাহযাদা ও অধিনায়ককে মুক্ত করে দেন।

তারপর সুলতান বায়াযীদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ইউরোপ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং আপন সংকল্প বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যা হোক, সুলতান বায়াযীদ সর্বপ্রথম গ্রীস অভিমুখে রওয়ানা হন। কেননা গ্রীসের নিকোপোলিসের যুদ্ধে খ্রিস্টান যোদ্ধারা কনসটান্টিনোপলের কায়সারের ইঙ্গিতে নিজে থেকেই খ্রিস্টান বাহিনীতে যোগদান করেছিল। সুলতান বায়াযীদ খান থার্মোপলী উপত্যকা থেকে বিজয়ী বেশে অগ্রসর হয়ে একেবারে এথেন্সের দোরগোড়ায় গিয়ে উপনীত হন। তিনি ৮০০ হিজরীতে (১৩৯৭-৯৮ খ্রি) এথেন্স জয় করে ত্রিশ হাজার গ্রীককে এশিয়ায় বসত করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। সুলতান স্বয়ং থ্রেসলী জয় করে যখন এথেন্স অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন তাঁর অধিনায়কদের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর দিকে পৃথক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। অধিনায়করা ঐ সমস্ত দেশের বেশির ভাগ অংশই জয় করে

নিয়েছিলেন। সুলতান বায়াযীদ খানের চোখে ইতিমধ্যে কনসটান্টিনোপলের কায়সারের প্রকৃত চেহারা ফুটে উঠেছিল। অতএব এথেন্স জয় করার পর তিনি এই কপট সম্রাটকেও সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প নেন। কিন্তু এবারও কায়সার সুলতানকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেন– আমি আপনাকে প্রতিবছর দশ হাজার ডুকাট (তৎকালীন মুদ্রা) কর দেব। তাছাড়া কনসটান্টিনোপলে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদও নির্মাণ করে দেব এবং একজন কাযীও নিয়োগ করব, যিনি মুসলমানদের যাবতীয় মামলা-মকদ্দমার ফায়সালা করবেন। তাছাড়া মুসলিম বণিকদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় আমি সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখব। সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম কায়সারের উপরোক্ত আবেদন মঞ্জুর করে তার হাতেই কনসটান্টিনোপলের শাসনভার অর্পণ করেন। অন্যথায় যে কাজ সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর হাতে পরবর্তীকালে সম্পন্ন হয়েছিল তা ৮০০ হিজরীতে (১৩৯৭-৯৮ খ্রি) বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের হাতে সম্পন্ন হয়ে যেত। এটা ছিল ঐ যুগ যখন তাইমূর খুরাসান ও ইরানে আপন সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন, তুর্কমানদের পর্যুদস্ত করেন এবং আপন অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা সুলতান বায়াযীদের অধিকৃত অঞ্চলের সীমারেখা পর্যন্ত টেনে এনে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছেন। আর কনসটান্টিনোপলের কায়সার যিনি ইউরোপে নিজের ধূর্তামি এবং খ্রিস্টানদের শক্তি পরীক্ষার ফলাফল কসোভা এবং নিকোপোলিস যুদ্ধক্ষেত্রে ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বর্তমান অপমান ও লাঞ্ছনার প্রেক্ষিতে তা ভুলে গিয়ে পুনরায় সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম যখন গ্রীক ও এথেন্স জয় করেন এবং কায়সারের অবস্থা অনেক হীন হতে শুরু করে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের একজন দূতকে তাইমূরের কাছে পাঠান। তাইমূরের কাছে প্রেরিত এক পত্রে তিনি লিখেন– আমার সাম্রাজ্য অনেক পুরাতন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও কনসটান্টিনোপলে আমাদের সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তারপর বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসের যুগেও খলীফাদের সাথে বার বার আমাদের সন্ধি হয়। তাদের কেউই কনসটান্টিনোপল দখল করেননি। কিন্তু বর্তমানে উসমানীয় সাম্রাজ্য আমার বেশির ভাগ এলাকাই দখল করে নিয়েছে এবং রাজধানী কনসটান্টিনোপলেও তার দাঁত বসিয়েছে। এমতাবস্থায় নেহাত বাধ্য হয়ে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়েছি। আর এটা জানা কথা যে, আপনি ছাড়া আমি অন্য কারো সাহায্যপ্রার্থী হতেও পারি না। বায়াযীদ খান মুসলমান এবং আমরা খ্রিস্টান। যদি আপনি এ বিষয়টি চিন্তা করেন তাহলে আপনার অবগতির জন্য বলছি যে, বায়াযীদ খান এদিকে ইউরোপে ক্রমাগত জয়লাভ করছেন এবং দিন দিন তার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। তিনি এদিককার কাজ সম্পন্ন করে শীঘ্রই আপনার অধিকৃত সাম্রাজ্যে হামলা পরিচালনা করবেন। তখন তাঁকে দমন করতে গিয়ে আপনাকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সুলতান আহমাদ জালায়ির এবং কারা ইউসুফ তুর্কমান, যারা আপনার কাছ থেকে পলায়নকারী বিদ্রোহী, তাদেরকে বায়াযীদ খান জামাতা আদরে নিজের মেহমান করে রেখেছেন। এ দু'জন বিদ্রোহীই বায়াযীদ খানকে সব সময় আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিচ্ছে। এটা আপনার জন্য কিছু কম অসম্মানের কথা নয় যে, আপনারই বিদ্রোহী সুলতান বায়াযীদ খানের কাছে এভাবে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদেরকে বায়াযীদ খানের কাছে ফেরত চাইতে পারবেন

না। অতএব সবদিক দিয়ে এটাই যুক্তিসম্মত মনে হচ্ছে যে, আপনি এশিয়া মাইনর আক্রমণ করুন। প্রকৃতিগত দিক দিয়েও এদেশটি আপনারই দখলে থাকা উচিত। সর্বোপরি আপনি বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যথাসম্ভব আপনাকে সাহায্য করব। কায়সারের এই পত্র তার একান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লিখেছিলেন এবং তাইমূরও এত নির্বোধ ছিলেন না যে, অতি সহজেই কায়সারের ফাঁদে ধরা পড়ে যাবেন, কিন্তু ঐ পত্রে কায়সার বায়াযীদ খান কর্তৃক তাইমূরের বিদ্রোহীদেরকে আশ্রয়দানের ব্যাপারটি এমন এক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাতে তাইমূরের মনে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কায়সারের পত্র তাইমূরের কাছে এমন এক সময়ে গিয়ে পৌঁছে, যখন তিনি গঙ্গার তীরবর্তী হরিদ্বারে অবস্থান করছেন এবং হিন্দুস্থানের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ জয় করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। তিনি কায়সারের ঐ পত্র পড়ে দূতের কাছে তার সন্তোষজনক কোন উত্তর দেননি এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেন। কিন্তু পত্রের বিষয়বস্তু অতি সঙ্গোপনে হলেও তাঁর অন্তরে এমনি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, হিন্দুস্থানের প্রতি তার কোন আগ্রহই আর বাকি থাকে নি। এমন কি তিনি হিন্দুস্থানের নব বিজিত রাজ্যসমূহের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না করেই রাতারাতি তল্পিতল্পা গুটিয়ে হরিদ্বার থেকে পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাব থেকে সমরকন্দ অভিমুখে রওয়ানা হন। হিন্দুস্থানের এক লক্ষ বন্দী, যারা তাঁর সাথে ছিল এবং সফরের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল তিনি তাদেরকে পথিমধ্যে হত্যা করেন। সমরকন্দ পৌঁছে তিনি সব সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, উসমানীয় সালতানাতের সাথে একটা বোঝাপড়া করে বিশ্ববাসীকে বাস্তবে দেখিয়ে দেবেন, কে বিশ্ববিজয়ী হতে চায়, বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম, না তিনি ? এই সময়ে তাইমূরের কাছে ইয়ালদিরিমের একটার পর একটা বিজয় সংবাদ আসতে থাকে এবং তিনি তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়ার জন্য আরো বেশি প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ দিকে বায়াযীদ ইয়ালদিরিম কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে আপন করদাতা বানিয়ে এবং হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়া বিজয় শেষ করে রোম শহরের দিকে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন সময় তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কনসটান্টিনোপলের কায়সার উসমানী সাম্রাজ্য আক্রমণের উস্কানি দিয়ে তাইমূরের কাছে দূত পাঠিয়েছেন এবং সুলতান বায়াযীদ খানকে কর দেওয়া নিজের জন্য অপমানজনক মনে করছেন। আর এই অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাইমূরের শরণাপন্ন হয়েছেন। সুলতান বায়াযীদ খান কখনো কল্পনাও করেননি যে, কায়সারের উস্কানিতে এবং তারই সাহায্যার্থে তাইমূর এভাবে তাঁর (বায়াযীদের) সাথে লড়তে আসবেন। তাছাড়া তাইমূর সম্পর্কে তিনি কোনদিন ভীতিগ্রস্তও ছিলেন না। যা হোক উপস্থিত পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, সর্বপ্রথম কায়সারের ব্যাপারটি রফাদফা করবেন, তারপর ইতালীর উপর হামলা চালাবেন। তিনি প্রথমে কায়সারের কাছে উপরোক্ত ব্যাপারে একটা উত্তর চান এবং কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

এদিকে তাইমূর সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হয়ে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সীমান্তে এসে পৌঁছেন। তিনি রক্তবন্যা বইয়ে দিয়ে আযারবায়জান ও আর্মেনিয়া দখল করেন। এ দু'টি দেশ দখলের পর তিনি সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ

পেয়ে যান। কেননা, এখন তাঁরও উসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে আর কোন বাঁধা ছিল না। আযারবায়জান, যা একটি বাফার স্টেট হিসাবে বিদ্যমান ছিল, তাইমূর তা দখল করেছেন। এখন আযারবায়জানের শাসকরা যে পলিসি গ্রহণ করেছিল, তা দুই মুসলিম সম্রাটকে, তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেওয়ার ইন্ধন যোগাচ্ছিল। সীমান্তবর্তী ঐ শাসকরা যখন উসমানী সাম্রাজ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তখন তাইমূরের কাছে, আর যখন তাইমূরের প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তখন উসমানীয় সম্রাটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। এই পটভূমিতেই আযারবায়জানের শাসক কারা ইউসুফ তুর্কমান তাইমূরের দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তিনি এই আশা পোষণ করছিলেন যে, উসমানীয় সুলতান তাইমূরের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবেন এবং তিনি পুনরায় তার হৃত সিংহাসন ফিরে পাবেন। তাইমূর যখন আযারবায়জান জয় করেন তখন বায়াযীদ একটি সংক্ষিপ্ত বাহিনীসহ আপন পুত্র তুগ্রিলকে নিজেরাই সীমান্ত শহর সিউয়াসে প্রেরণ করেন, যাতে তাইমূর এদিকে এগিয়ে আসলে তাকে বাধা প্রদান করা হয়। তাইমূর উসমানীয় সুলতানের সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাড়াহুড়া না করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি তার সমগ্র অধিকৃত এলাকায় ফরমান পাঠিয়ে অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও বাছাই করা সেনাবাহিনী তলব করেন। এদিকে ফকীর, দরবেশ, সূফী, ওয়ায়িয, বণিক ও পর্যটকের ছদ্মবেশে তিনি বিপুল সংখ্যক গুপ্তচর উসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেন। তিনি একদল অতি অভিজ্ঞ গুপ্তচর সুলতান বায়াযীদ খানের সেনাবাহিনীর মধ্যেও ঢুকিয়ে দেন, যাতে তারা ঐ সমস্ত মোঙ্গলকে, যারা এশিয়া মাইনরে বসবাস করার কারণে সুলতান বায়াযীদ খানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যারা এশিয়া মাইনরে বসবাস করার কারণে সুলতান বায়াযীদ খানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং যারা বায়াযীদের এশীয় বাহিনীর একটি বিরাট অংশ, তাদেরকে এই বলে পথভ্রষ্ট করে যে, মোঙ্গলদের জাতীয় নেতা ও একমাত্র শাসক হচ্ছেন তাইমূর। অতএব তাইমূরের মুকাবিলায় তুর্কী সুলতান বায়াযীদের পক্ষাবলম্বন, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। তাইমূরের এই গোপন হামলা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়। বায়াযীদের সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায় এবং বিদ্রোহের পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। তাইমূরের গুপ্তচররা সুলতানী বাহিনীর মধ্যে একথাও ছড়িয়ে দেয় যে, সুলতান তাঁর বাহিনীকে বড় অংকের বেতন-ভাতা এবং প্রচুর পরিমাণ মালে গনীমত প্রদানে কার্পণ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন, অথচ তাইমূর তাঁর সেনাবাহিনীকে সর্বদা প্রাচুর্যের মধ্যে রাখেন।

এইসব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে তাইমূর প্রথমে সিরিয়া ও মিসর জয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তিনি জানতেন যে, মিসরের চারকাসী বাদশাহ ফারাজ ইব্‌ন বারকূক হচ্ছেন বায়াযীদ খানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারপর সিরিয়ার উপর হামলা করা হলে তিনি দামেশক রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই সিরিয়ায় চলে আসবেন। আর যেহেতু তিনি একাকী অবস্থায় দুর্বল হবেন তাই তাঁকে পরাজিত করা খুবই সহজ হবে। অন্ততপক্ষে দামেশক ও সিরিয়া যদি দখল করা যায় তাহলে বায়াযীদ খানের কাছে মিসরীয় ও সিরীয়দের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পৌঁছতে পারবে না। অতএব তিনি একদিকে বায়াযীদ খানকে পত্র লিখলেন ঃ আপনি আপনার কাছে অবস্থানরত

আমার বিদ্রোহী কারা ইউসুফ তুর্কমানকে অতি শীঘ্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, অন্যথায় আমি আপনার সাম্রাজ্য আক্রমণ করব এবং অন্যদিকে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে ৮০৩ হিজরীতে (১৪০০-১৪০১ খ্রি) হালাবের পথ ধরে সিরিয়ার উপর আক্রমণ চালালেন। তাইমূরের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো। তিনি সবেমাত্র হালাবে গিয়ে পৌঁছেছেন এমন সময় মিসর সম্রাট দ্রুতগতিতে দামেশকে এসে পৌঁছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মিসরের চারকাসী শাসক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মিসরীয় বাহিনী তাইমূরী বাহিনীর দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাইমূরও সিরিয়ার প্রতিটি শহরে পাইকারী হত্যা চালান এবং এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন মস্তকের স্তূপ তৈরি করে মানুষের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। এভাবে আপন উদ্দেশ্য সফল করে তাইমূর বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। তরবারির জোরে তিনি বাগদাদও জয় করেন। এখানেই তিনি সুলতান বায়াযীদের কাছ থেকে তাঁর পত্রের উত্তর পান। তাতে দেখা যায়, বায়াযীদ তাইমূরের আবেদনকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিম কি উত্তর দেবেন তা তাইমূর প্রথম থেকেই জানতেন। তাই তিনি যথাসাধ্য এর প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা করছিলেন। এই উত্তর পেয়ে তিনি বাগদাদেও বেশিক্ষণ অবস্থান করাটা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি সোজা আযারবায়জান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে আপন অধিকৃত দেশসমূহ থেকে জরুরী সাহায্য তলব করেন। তিনি সেখানে অবস্থান করেই অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে রসদ সরবরাহ, তথ্য সংগ্রহ, গুপ্তচরবৃত্তি প্রভৃতি বিভাগকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুযোগ্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এটা হচ্ছে সেই সময়, যখন বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম কনসটান্টিনোপল ঘেরাও করে রেখেছেন এবং যে কোন মুহূর্তে কনসটান্টিনোপলের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তিনি তাইমূর কর্তৃক সিরিয়া বিজয় এবং মিসর সম্রাট ফারাজ ইব্‌ন বারকূককে পরাজিত করার খবর শুনে কারা ইউসুফ তুর্কমানকে একটি বাহিনীসহ সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তুমি তাইমূর কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তাকে হত্যা অথবা বন্দী করে সিরিয়ার উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। তারপর তিনি স্বয়ং তাইমূরের মুকাবিলায় রওয়ানা হন। কনসটান্টিনোপল জয়ের ব্যাপারটি তিনি সাময়িকভাবে মুলতবি রাখেন। তখন এই সম্ভাবনা ছিল যে, বায়াযীদ সিরিয়া অধিকার করেই থেমে যাবেন এবং তাইমূরের সাথে যুদ্ধ করা অথবা তাকে একতরফা আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকবেন। কেননা মুসলমান সম্রাটদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর কোনই আগ্রহ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইউরোপের অবশিষ্ট দেশসমূহ জয় করা, খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করা এবং হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়া জয়ের পর কনসটান্টিনোপল ও রোম অধিকার করা। কিন্তু তাইমূর বায়াযীদের মুকাবিলা এবং তাঁকে পরাস্ত করার জন্য বেশ কয়েক বছর থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। অন্য কথায়, বায়াযীদ ছিলেন পৃথিবী থেকে খ্রিস্টান শক্তিকে মুছে ফেলার কাজে সদা তৎপর, আর তাইমূর ছিলেন বায়াযীদকে ধ্বংস করে খ্রিস্টানদেরকে রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত।

তাইমূর নিজের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর বায়াযীদের সীমান্ত শহর সিভাস আক্রমণ করেন। বায়াযীদের পুত্র আর তুগ্রিল ছিলেন সেখানকার দুর্গাধিপতি। তিনি দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাইমূরকে প্রতিরোধ করেন। তাইমূর সর্বপ্রথম এই দুর্গের উপরই আপন দুর্গবিধ্বংসী অস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন। তিনি দুর্গ অবরোধ করে বাইরের দিক থেকে দুর্গের ভিত্তিমূল খুঁড়তে শুরু করেন। তিনি প্রথমে সামান্য দূরত্বে গভীর গর্ত খুঁড়ে এবং প্রাচীর ভিত্তির নিচ থেকে মাটি সরিয়ে শক্ত কাঠের খুঁটির উপর প্রাচীরকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তারপর সবগুলো কাঠের খুঁটিতে একসাথে আগুন লাগিয়ে দেন। খুঁটিগুলো পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে গোটা প্রাচীর এক সাথে ধসে পড়ে। এভাবে হঠাৎ নিজেদেরকে অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে অবরুদ্ধ বাহিনী তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে এবং চার হাজার সৈন্যের সকলেই প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হয়। তাইমূর যেমন সিভাস দুর্গ ধূলিসাৎ করতে গিয়ে একটি বিস্ময়কর পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন তেমনি ঐ তুর্কী বন্দীদের সাথে তিনি যে নির্দয়তা ও পাশবিক আচরণ করেছিলেন তাও ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ও লোমহর্ষক। প্রচলিত যুদ্ধরীতি অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী হিসাবে বন্দীদেরকে নিরাপত্তা দান তো দূরের কথা, তাদের মাথা পেঁচিয়ে বেঁধে বাহ্যত তাদেরকে এক একটি বোচকায় পরিণত করা হয়। তারপর অনেকগুলো গভীর গর্ত খুঁড়ে সেগুলোতে তাদেরকে নিক্ষেপ করে তার উপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তক্তার উপর মাটিচাপা দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তাদের সমাধিস্থ করা হয়। এই নৃশংস ঘটনার কথা চিন্তা করলে আজো মানুষ মাত্রেরই অন্তর শিউরে ওঠে।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিম আপন পুত্র এবং স্বজাতীয় চার হাজার তুর্কের নৃশংস মৃত্যুর এই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা জানতে পেরে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সিভাস অভিমুখে পাগলপারা হয়ে ছুটে আসেন। খুব সম্ভব তাইমূরের ইচ্ছাও ছিল তাই এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি উপরোক্ত লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বায়াযীদের দিক থেকে তারপর যে সব অসতর্কতা ও অদূরদর্শিতামূলক ঘটনা ঘটতে থাকে তা ছিল তাঁর বাঁধভাঙ্গা ক্রোধেরই ফল। কিংবা এও হতে পারে যে, এটা ছিল তাঁর উপর আরোপিত মদ্যপান সম্পর্কিত অভিযোগেরই বাস্তব প্রতিফলন। যা হোক, এরপর থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, তাইমূর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এবং ধীরস্থির মস্তিষ্কে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, আর বায়াযীদ পদে পদে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইতিপূর্বে বায়াযীদ সামরিক ব্যাপারে কখনো কোন ভুল পদক্ষেপ নেননি। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য অধিনায়ক হিসাবে প্রমাণ করেছেন। বায়াযীদ তাইমূরের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, উনসত্তর বছর বয়স্ক এই বৃদ্ধ তার সারাটি জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে এ সংবাদও পৌঁছেছিল যে, তাইমূরের কাছে পাঁচ লক্ষেরও অধিক বাছাইকৃত বীরযোদ্ধা রয়েছে। যা হোক বায়াযীদ তাড়াহুড়ার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করে সিভাস অভিমুখে, যেখানে তার পুত্রকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল এবং যেখানে তার প্রতিপক্ষ অবস্থান করছিল, দ্রুতগতিতে ছুটে যান। এ অভিযানে তাঁর খ্রিস্টান

স্ত্রীর ভাই সার্বিয়া সম্রাট, অপর বর্ণনামতে বিশ হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক তাঁর ফরাসী স্ত্রীর ভাইও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বায়াযীদ দ্রুতবেগে আসছেন, এ সংবাদ পেয়ে তাইমূর তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত একটি মোক্ষম সামরিক চাল চালেন। বায়াযীদ আপন বাহিনীর কিছু অংশ প্রথমেই সিভাস অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজেও সর্বপ্রকার যুদ্ধসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করেন। বায়াযীদের বাহিনী সিভাসের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তাইমূর নিজ অবস্থাতেই অনড় থাকেন। যখন তিনি জানতে পারেন যে, বায়াযীদ তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে এতদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন যে, এখন আর রাস্তা পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক তখন তিনি সিভাস পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে চলে যান এবং কিছুদূর যাওয়ার পর পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরিয়ে সোজা আংকারা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছেই আংকারা শহর অবরোধ করেন। বায়াযীদ ইয়ালদিরিম যখন সিভাসে গিয়ে পৌঁছেন তখন আপন পুত্রের হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর অবস্থা জেনে এবং রাগে ও দুঃখে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাইমূর ও তার বাহিনীকে তিনি সেখানে পাননি বরং তিনি জানতে পারেন যে, তাইমূর আপন বাহিনী নিয়ে সিভাস থেকে দুশ পঞ্চাশ মাইল পশ্চিম দিকে তাঁরই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আংকারা শহরে ঢুকে পড়েছেন। আংকারা ধ্বংসের ব্যাপারটি ছিল বায়াযীদের কাছে সিভাস ধ্বংসের চাইতেও অধিকতর দুঃখজনক। তাছাড়া তাইমূরের এভাবে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়াটাও তাঁর জন্য অসহ্যকর ঠেকে। এমতাবস্থায় তাঁর উচিত ছিল ধৈর্যহারা না হওয়া এবং বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন দূতদের মাধ্যমে কারা ইউসুফ তুর্কমান এবং সিরীয় ও মিসরীয় অধিনায়কদেরকে তাদের অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিয়ে তাইমূরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য জরুরী নির্দেশ প্রদান করা। যদি অনুরূপ করা হতো এবং তাইমূরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে তার সেনাবাহিনীর রসদ বন্ধ করে দেওয়া হতো তাহলে তাইমূর ও বায়াযীদের ইতিহাসের এই অধ্যায় নিশ্চয় অন্যভাবে লেখা হতো। তখন তাইমূর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে শহরের পর শহর ধ্বংস করতে থাকলেও তাতে বায়াযীদের খুব একটা ক্ষতি হতো না। কেননা তাঁর চতুর্দিকে তখন ঐ সমস্ত এলাকা পড়ত যেখানে প্রচুর সংখ্যক উসমানীয় জায়গীরদার এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী তুর্ক বসবাস করছিল। এমতাবস্থায় চতুর্দিক থেকে তাঁরই অনুসারী বহু সংখ্যক সেনাবাহিনী অনায়াসে তাইমূরের বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে পারত। তখন তাইমূরকে তারই স্বরচিত ফাঁদে ফেলে বন্দী করাটাও বায়াযীদের জন্য কোন কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তাইমূর বায়াযীদের মেযাজ সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষ কখনো অনুরূপ বিচক্ষণতার সাথে উপস্থিত পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারবেন না। বাস্তবেও ঘটল তাই।

বায়াযীদ যেখানে অতি সহজে সিভাসের প্রান্তরে চার লক্ষ সৈন্য একত্র করতে পেরেছিলেন এবং যেখানে তাইমূরের হাতে পরাজিত হওয়ার মত কোনরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি মোটেই পতিত হননি, সেখানে তিনি কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই দুই মনযিল তিন মনযিল করে এত দ্রুত বেগে সিভাস থেকে আংকারা অভিমুখে ছুটতে থাকেন যে, রাস্তায় এক মুহূর্তও বিশ্রাম গ্রহণ করেননি। ফলে শুধু এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য তাঁর

সাথে আংকারা গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। বাকি সৈন্যরা পশ্চাতে পড়ে থাকে। বায়াযীদের এটা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি যখন তাঁর শ্রান্ত-ক্লান্ত এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আংকারার সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন তাইমূর তার সজীব সতেজ পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে একটি পছন্দসই স্থানে তাঁবু গেঁড়ে বায়াযীদের মুকাবিলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাইমূর তাঁর বাহিনীর জন্য আংকারা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি সুন্দর স্থান নির্বাচন করেছিলেন। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি এখানে সেখানে পরিখা খনন করেও রেখেছিলেন। বায়াযীদ সেখানে পৌঁছেই তাইমূরী বাহিনীকে একথা বুঝাতে গিয়ে যে, তিনি তাদেরকে মোটেই পাত্তা দেন না, তাদের অবস্থান স্থলের উত্তর দিকের একটি সুউচ্চ পাহাড়ী এলাকায় নিজের সমগ্র সেনাবাহিনী নিয়ে বন্য পশু শিকারে মত্ত হন। সমগ্র জঙ্গল বেষ্টন করে তারপর চেঙ্গিযী পদ্ধতিতে বেষ্টনীর আয়তন ক্রমশ হ্রাস করে বন্য পশুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন। যেখানে তার শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈন্যদের পানাহার ও বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা শিকারের পিছনে ছুটতে থাকে। ফলে তাদের অবস্থা এমন কাহিল হয়ে পড়ে যে, শুধু তৃষ্ণার কারণে পাঁচ হাজার সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শিকার অভিযান শেষ করে যখন বায়াযীদ আপন ক্যাম্প অভিমুখে রওয়ানা হন তখন জানতে পারেন যে, ইতিমধ্যে শত্রুরা তার মূল ক্যাম্পই দখল করে নিয়েছে। তিনি আরো দেখতে পান যে, যে ঝরনার মাধ্যমে তাঁর সৈন্যদের পানীয় জলের অভাব মিটত, ইতিমধ্যে একটি বাঁধ তৈরি করে তাইমূর সে ঝরনার প্রবাহও বন্ধ করে দিয়েছেন। বায়াযীদ তাইমূরের মুকাবিলায় আর সময় ক্ষেপণ করতে চাইতেন না সত্য, তবে ক্যাম্পে পৌঁছে এবং কমপক্ষে নিজের সৈন্যদেরকে পানি পানের অবকাশ দিয়ে তবেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করা তাঁর জন্য ছিল একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু তাইমূরের বিচক্ষণতা ও কৌশলের কারণে সে সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত হন এবং বাধ্য হন এই শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায়ই একটি অতি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে।

আংকারা যুদ্ধ

৮০৪ হিজরীর ১৯ যিলহাজ্জ মুতাবিক ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই বায়াযীদ ও তাইমূরের মধ্যে এ ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঠিক ভোর বেলা সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। বায়াযীদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। আর তাইমূরের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের অধিক। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সংখ্যা ছিল আট লক্ষ। মোটকথা তাইমূরের বাহিনীর সর্বনিম্ন সংখ্যাটি মেনে নিলেও অবশ্যই তা ছিল বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের বাহিনীর চারগুণ। যদি এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয় যে, তাইমূরের বাহিনী ছিল একদম সবল, সতেজ, আর বায়াযীদের বাহিনী ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দারুণভাবে জর্জরিত তাহলে তো উভয় পক্ষের শক্তির মধ্যে আরো বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। উপরন্তু বায়াযীদের বাহিনীর মোঙ্গল খণ্ডবাহিনীগুলো ঠিক যুদ্ধ চলার সময় বিশ্বাসঘাতকতার যে পরিচয় দেয় এবং খ্রিস্টান অধিনায়কদের দিক থেকে যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় সে দিকটিও যদি বিবেচনায় রাখা হয়

তাহলে বায়াযীদ ও তাইমূরের মুকাবিলা বাঘ ও ছাগলের মুকাবিলার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু এসব কিছুকেই বায়াযীদের অদূরদর্শিতার ফল মনে করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, আংকারা যুদ্ধে বায়াযীদের মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার দিকটি বার বার ফুটে উঠেছে, আর প্রায় সর্বত্রই তাইমূর তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ পৃথক কথা যে, আমরা বায়াযীদের পরাজয় দেখে আক্ষেপ করি এবং তাইমূরকে এই যুদ্ধের কারণে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। এই যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের জন্য অভাবনীয় ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। কেননা যে ইউরোপ শীঘ্রই একটি ইসলামী মহাদেশ হতে যাচ্ছিল, এই যুদ্ধের কারণে তা খ্রিস্টান মহাদেশ হিসাবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে।

আমীর তাইমূর যেভাবে তার গোটা বাহনীকে বিন্যস্ত করেছিলেন তা হলো, ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল শাহযাদা মির্যা শাহরুখকে। যে সব অধিনায়কের খণ্ডবাহিনী ডান পাশের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তারা হচ্ছেন আমীরযাদা খলীল সুলতান, আমীর সুলায়মান শাহ, আমীর রুস্তম বারলাস, সানজাক বাহাদুর, মূসা, তূইবূঘা, আমীর ইয়াদগার প্রমুখ। আমীর যাদা মির্যা সুলতান হুসাইনকে ডান পাশের বাহিনীর সাহায্যকারী পল্টনের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল।

আমীর নূরুদ্দীন জালায়ির, আমীর বারামযাক, বারলাস, আলী কূজীন, আমীর মুবাশ্বির, সুলতান সাঞ্জার বারলাস, উমার ইব্‌ন তাবান প্রমুখ অধিনায়ককে তাদের নিজ নিজ বাহিনীসহ বাম পাশের বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। বাম পাশের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয় শাহযাদা মীরান শাহকে। আমীর যাদা বারলূমের হাতে বাম পাশের বাহিনীর সাহায্যকারী পল্টনের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়।

মধ্যবর্তী বাহিনীর ডান দিকের অংশে ছিলেন তাশ তিমূর আগলান উযবেক, আমীর যাদা আহমদ, জালাল বাভারচী ইউসুফ, বাবা হাজী সূজী, ইসকান্দারে হিন্দ ও বূঘা, খাজা আলী ঈরাবী, দুলান তিমূর, মুহাম্মাদ কূজীন, ইদরীস কূরচী প্রমুখ। এই অধিনায়কদের পৃষ্ঠদেশে সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন বেগ আলী, ইলচক দাঈ হারী মালিক, আরগূন মালিক, সূফী খলীল, আইসান তিমূর, শায়খ তাযূর, নেকরূযের পুত্রত্রয় সাঞ্জার ও হুসাইন, উমার বেগ, জূন আর বানী, বেরী বেগ কূজীন, আমীর যীরাক বারলাস প্রমুখ।

মধ্যবর্তী বাহিনীর বাম অংশের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়, আমীর তাওয়াককুল কারাকরো, আলী মাহমূদ, শাহ আলী, আমীর সানজাক তানকিরী, বেযিশ খাজা, মুহাম্মদ খলীল, আমীর লুকমান, সুনতার বারলাস, মীরক ইলচী, পীর মুহাম্মদ, সংকরম, শায়খ আসলান ইলইয়াস, কপকখানী, দাওলাত খাজা বারলাস, ইউসুফ বারলাস, আলী কিবচাক প্রমুখ অধিনায়কের হাতে। এই অধিনায়কদের সাহায্যকারী পল্টনে আমীরযাদা মুহাম্মদ সুলতান, আমীরযাদা পীর মুহাম্মদ, ইসকান্দার, শাহ মালিক, ইলইয়াস খাজা, আমীর শামসুদ্দীন প্রমুখ অধিনায়ককে তাদের নিজ নিজ বাহিনীসহ মোতায়েন করা হয়েছিল।

উপরোক্ত বিন্যাস ছাড়াও তাইমূর পৃথক পৃথক ভাবে চল্লিশ পল্টন সৈন্য নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখেন, যাতে যুদ্ধ চলাকালে গোটা বাহিনীর যে অংশেই জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানেই এদেরকে পাঠানো যায়। এই পাঁচ লক্ষ, বরং আট লক্ষ সৈন্য ছাড়াও তাইমূরের হাতে ছিল পর্বতসদৃশ বিরাট বিরাট হাতির একটি বাহিনী। যুদ্ধের

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই হস্তী বাহিনীকে একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড় করানো হয়। অপর দিকে বায়াযীদের কাছে কোন জঙ্গী হাতি ছিল না।

সুলতান বায়াযীদ বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করেন সুলায়মান চিলপীর হাতে। আর ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন আপন খ্রিস্টান স্ত্রীর সহোদরকে। মধ্যবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাৎভাগে মোতায়েন করেন আপন তিন পুত্র মূসা, ঈসা ও মুস্তফাকে।

উভয়পক্ষ থেকেই প্রায় এক সাথে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশ্চাৎ দিকের সৈন্যদের সমবেত ধ্বনিতে পাহাড় জঙ্গল কেঁপে ওঠে, অশ্বের খুরের আঘাতে আকাশ ধূলি-ধূসরিত হয়ে সূর্যরশ্মির দীপ্তি কমিয়ে দেয়। কিন্তু তরবারি, বর্ম ও বর্শার আঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ উত্থিত হতে থাকে। পাহাড়ে-প্রান্তরে ছুটে চলে রক্তের স্রোতধারা। সম্মুখ সারির বীরসেনানীরা চোখের পলকে মূলোৎপাটিত বৃক্ষরাজির ন্যায় ভূমিতে আছড়ে পড়তে থাকে, আর পিছনের সৈন্যরা তাদের অগ্রবর্তী সহযোগীদের লাশ মাড়িয়ে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং অন্যকে লাশ বানিয়ে বা নিজেই লাশে পরিণত হয়ে এক মর্মান্তিক কাহিনী রচনা করে চলে। তীরের শোঁ শোঁ, ধনুকের বোঁ বোঁ, তরবারির খচ খচ, বর্ম-বর্শার টুংটাং, তরবারি ও বর্শার বিদ্যুৎঝিলিক, জমির উপর রক্ত বন্যা, পলে পলে লাশ পতিত হওয়ার আওয়াজ, আহতদের হাহাকার, হস্তী বাহিনীর গগনবিদারী চিৎকার, অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি— এসব কিছু মিলে সেদিন এমন এক লোমহর্ষক দৃশ্যের অবতারণা হয়, যার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

আংকারার মাঠে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। আবূ বকর তাইমূরের বাহিনীর শাহযাদা আবূ বকর অগ্রসর হয়ে সুলায়মান চিলপীর উপর এক সাংঘাতিক আঘাত হানেন। ফলে তুর্কীদের সারিসমূহ ভেংগে খান খান হয়ে যায়। আবূ বকরের পর পরই সুলতান হুসাইন দ্বিতীয় হামলা চালান, তারপর তৃতীয় হামলা চালান মুহাম্মাদ সুলতান। ফলে সুলতান বায়াযীদের বাম পাশের বাহিনীর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। এটা লক্ষ্য করে বায়াযীদের অন্যতম অধিনায়ক মুহাম্মদ খান চিলপী সুলায়মানের সাহায্যে অগ্রসর হন। তাইমূরী বাহিনীর এই মর্মান্তিক হামলাসমূহ শেষ পর্যন্ত তুর্কী বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ করে। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় একটা ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। সুলতান বায়াযীদের বামপাশের বাহিনীর উপর যখন ঐ দুর্যোগ নেমে এসেছিল তখন তিনি তার মধ্যবর্তী বাহিনীর জঙ্গী হাতিরা বায়াযীদের উপর হামলা চালিয়েছিল। বায়াযীদ ঐ দিন তাঁর সীমাহীন উত্তেজনাবশত একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। অতএব তাঁকে সম্মুখযুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি অংশের উপর সর্বক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বায়াযীদ তা না করে একজন দুঃসাহসী সাধারণ সৈন্যের আগে বেড়ে শত্রুদের সম্মুখ সারি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ হামলা চালাতে থাকেন। তাঁর সৈন্যরাও নিজেদের অধিনায়কের অনুসরণে শত্রুসারি চূর্ণবিচূর্ণ করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত বায়াযীদ মোঙ্গলদের মধ্যবর্তী বাহিনীকে তাঁর সামনে থেকে হটিয়ে দিতে

সক্ষম হন এবং তাইমূরী অধিনায়কদেরকেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এবার বায়াযীদের অবশ্যকরণীয় ছিল ডান ও বাম পাশের বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে মধ্যবর্তী বাহিনীকে শৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তিনি তাঁর সম্মুখবর্তী বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সোজা উচ্চভূমির উপর হামলা চালান, যেখানে আবূ বকর, সুলতান হুসাইন প্রমুখ ফিরে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাইমূরী শাহযাদা এবং অধিনায়কবৃন্দ বায়াযীদের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন নি। বায়াযীদ চোখের পলকে প্রতিপক্ষের ছয়জন অধিনায়ককে তার অবস্থান থেকে হটিয়ে দিয়ে ঐ টিলা দখল করেন। তাইমূর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যেক প্রান্তের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি একজন দক্ষ দাবাড়ুর মত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে রণক্ষেত্রের দাবাবোর্ডে আপন গুটিগুলো কখনো ডানে, কখনো বামে, কখনো সামনে, আবার কখনো পিছনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সুকৌশলে এমনভাবে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা তাঁরই অনুকূলে চলে আসে। বায়াযীদকে এভাবে বিজয়ী বেশে আগে বাড়তে দেখে তাইমূর তার সজীব সতেজ প্লাটুনগুলোর সাহায্যে বায়াযীদের ডান পাশ ও বাম পাশের বাহিনীর উপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে বায়াযীদকে তাঁর সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে অনেকগুলো মোঙ্গল প্লাটুন, যেগুলো বায়াযীদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাইমূরী বাহিনীতে এসে যোগ দেয়। এতে বায়াযীদের বাহিনী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এবার তাইমূর তার বিরাট বাহিনী নিয়ে এক সাথে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বায়াযীদের ডান পাশের ও বাম পাশের বাহিনী মোঙ্গলদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে প্রথমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রতিপক্ষের এই নতুন হামলায় এবার তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। বায়াযীদের পুত্র মুস্তাফা নিহত হন এবং তার শ্যালক অর্থাৎ খ্রিস্টান অধিনায়ক বিপর্যস্ত অবস্থায় পলায়ন করেন। এতদসত্ত্বেও বায়াযীদ এবং তাঁর উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সৈন্যরা এমন অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন, যা একমাত্র তাঁদের পক্ষেই ছিল সম্ভব। বায়াযীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি যে দিকেই হামলা চালাতেন, মোঙ্গল সৈন্যরা সেদিক থেকে পিছনে হটে যেতে বাধ্য হতো। কয়েক বার তো এমন মুহূর্ত এসেছিল যে, বায়াযীদ মোঙ্গলবাহিনীর সারিসমূহ বিচূর্ণ করে সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে তাইমূর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন বাহিনীকে হামলার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এতকিছু সত্ত্বেও সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল তখন বায়াযীদের প্রায় সকল সৈন্যই শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আপন ঘোড়ার ঠোকর খাওয়ার কারণে বায়াযীদ তাঁর পিঠ থেকে পড়ে যান এবং অন্যান্য কিছু অধিনায়কের সাথে নিজেও মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হন। এই আংকারা যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয় যা ছিল বায়াযীদের সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

যদি জন্মগত স্বভাব একেবারে বিগড়ে না যায় তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা বীরত্বকে মর্যাদা দেয় এবং বীরপুরুষকে ভালবাসে। এ কারণেই বিশ্বের সর্বত্র মানুষের হত্যাকারী বাঘকেও সম্মানের চোখে দেখা হয় এবং যে কোন বীরপুরুষ আশা করে, যেন

তাকে বাঘের সাথে তুলনা করা হয়। অথচ গরু-ঘোড়া মানুষের অনেক উপকারে আসা সত্ত্বেও কেউ এটা পছন্দ করে না যে, তাকে গরু অথবা ঘোড়া নামে আখ্যায়িত করা হোক। বিশ্বে রুস্তম যে খ্যাতি এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যে কারণে মর্যাদা লাভ করেছেন তা তাঁদের বীরত্ব ছাড়া কিছু নয়। এই বীরত্বের কারণেই সুলতান সালাহুদ্দীন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, উসমান পাশা প্রমুখ ব্যক্তিকে আজ সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি জাতিই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর 'এমডন' নামক একটি ক্ষুদ্র জাহাজ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মিত্র বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং তাতে মিত্র বাহিনী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু যখন ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে গ্রেফতার করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাকে এক নজর দেখার জন্য দলে দলে ছুটে আসে। জনতা সেদিন তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে নয়, বরং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখেছিল। এভাবে বীরপুরুষদের বীরত্ব যেমন যুগে যুগে মানুষকে চমৎকৃত করেছে তেমনি তাদের ধ্বংস এবং পতন তাদের বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। আংকারা যুদ্ধে বায়াযীদের পরাজয়ও ছিল সে ধরনেরই একটি ঘটনা।

আংকারার যুদ্ধে তাইমূর পরাজিত হলে নিশ্চয়ই তিনি এবং তাঁর বংশধররা ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। কিন্তু তাতে ইসলামী বিশ্বের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা ছিল না। কেননা প্রাচ্যের দেশসমূহ, যেগুলো তাইমূরের দখলে ছিল, তিনি পরাজিত হলেও সেগুলো মুসলমানদেরই দখলে থাকত। ফলে তাইমূরের পরাজয়ে মুসলিম জাতি খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। কিন্তু বায়াযীদের পরাজয়ে মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। কেননা, তাঁর পরাজয়ের কারণে ইউরোপ অভিমুখে মুসলিম অভিযান বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃতপ্রায় ইউরোপ পুনরায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে। বায়াযীদ ও তাইমূরের মধ্যকার এই যুদ্ধে যদি বায়াযীদ বিজয় লাভ করতেন তাহলে তাঁর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যেহেতু প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল, সে প্রেক্ষিতে এ যুদ্ধকে ৪৬৩ হিজরীর (১০৭০-৭১ খ্রি) ঐ যুদ্ধের মতই মনে করা হতো, যে যুদ্ধ এশিয়া মাইনরেই সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে সুলতান আলপ-আরসালান সালজুকী শুধু বার হাজার সৈন্য দ্বারা খ্রিস্টানদের দুই-তিন লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন। কিংবা এই যুদ্ধের তুলনা করা হতো পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সাথে যা ১১৭৪ হিজরীতে (১৭৬০-৬১ খ্রি) সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে মুসলমানদের আশি নব্বই হাজার সৈন্য হিন্দুদের পাঁচ-ছয় লক্ষ সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। কিংবা এই যুদ্ধ স্থান পেত কসোভা যুদ্ধ ও নিকোপলিস যুদ্ধের তালিকায়। কেননা ঐ সমস্ত যুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বিরাট বিরাট বাহিনীকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করেছিল। খুব সম্ভব নিকোপলিস যুদ্ধের উপর অনুমান করেই বায়াযীদ নিজের সংখ্যাল্পতার উপর তাইমূরের যে বিরাট সংখ্যাধিক্য ছিল সেই বিষয়টি ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এটাও লক্ষ্য করেন নি যে, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল মুসলমান। যে সমস্ত যুদ্ধে বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য পরাজিত করেছিল সে সব যুদ্ধ তো মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে কাফিরদের বিরাট বাহিনী

মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল। কিন্তু আংকারা যুদ্ধে তো উভয়পক্ষই ছিল মুসলমান। এতে সংখ্যা গরিষ্ঠেরই বিজয় লাভের কথা। আর বাস্তবেও ঘটেছিল তাই।

তাইমূর যদিও চেঙ্গিযী জাতির সাথে রক্ত সম্পর্ক রাখতেন এবং দিগ্বিজয়ের ক্ষেত্রে তিনি চেঙ্গীয খানের মত, বরং তার চাইতেও অধিক সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেহেতু মুসলমান ছিলেন, তাই তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর বিজয়গাথা, যদিও তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়েছিলেন, খুব একটা নিন্দনীয় ছিল না। কেননা সে যুগে মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একটি বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত হতে যাচ্ছিল। তবে মুসলমানদের জন্য এর চাইতে অধিক আনন্দের ব্যাপার আর কিছুই হতো না, যদি তাদের একজন শাহানশাহ্ যিনি পশ্চিমাঞ্চলে এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলো একের পর এক জয় করে একেবারে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছতেন। আর অপর শাহানশাহ, যিনি পূর্বাঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, দিগ্বিজয়ী বেশে একেবারে চীন ও জাপান উপকূলে গিয়ে পৌঁছতেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেভাবে পূর্বাঞ্চলে তাইমূরের কোন জুড়ি ছিল না, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলে কোন জুড়ি ছিল না বায়াযীদেরও। অতএব তখন সমগ্র বিশ্ব ইসলামের ছায়াতলে এসে যেত। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আংকারার যুদ্ধক্ষেত্র ঐ দুই শাহানশাহকে একে অন্যের প্রতিপক্ষরূপে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এল এবং তাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হলো সেটাকে শুধু ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন উন্মুক্ত সমুদ্রের দ্রুত গতিসম্পন্ন দু'টি বিরাট জাহাজের সংঘর্ষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কিংবা তুলনা করা যেতে পারে দ্রুতগতিসম্পন্ন দু'টি বিপরীতমুখী রেলগাড়ির সংঘর্ষের সাথে। দু'টি পাগলা হাতির মধ্যে কিংবা দু'টি হিংস্র বাঘের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হলে যেমন এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তার চাইতেও ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আংকারার যুদ্ধে, যখন বিশ্বের প্রখ্যাত দুই মুসলিম শাহানশাহ্, দুই বিশ্ববিখ্যাত বীরপুরুষ সর্বশক্তি নিয়ে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন দু'টি বিশালকায় পর্বত যেন পরস্পরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য অথবা দু'টি সমুদ্র পরস্পরকে গ্রাস করে ফেলার জন্য যেন আংকারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়েছিল। মোটকথা, আংকারা যুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের একটি বিরাট ও অতুলনীয় ঘটনা।

এই যুদ্ধে বায়াযীদের পুত্র মূসাও পিতার সাথে বন্দী হয়েছিলেন। শাহযাদা মুহাম্মদ এবং শাহযাদা ঈসা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাইমূর সুলতান বায়াযীদকে একটি লোহার খাঁচায় আটকে রাখেন এবং যুদ্ধের পর এই আটক অবস্থায়ই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফর করতে থাকেন। সুলতান বায়াযীদের মত একজন বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন শাহানশাহকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাটা তাইমূরের ভদ্রতা ও মনুষ্যত্বের জন্য নিঃসন্দেহে একটি কলংকজনক ব্যাপার। বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অভিজাত বীরপুরুষরা যখন নিজের শত্রুর উপর পুরোপুরি প্রাধান্য লাভ করেন তখন তারা সব সময় তাদের ঐ পরাজিত প্রতিপক্ষের সাথে ভদ্র ও শালীন ব্যবহার করেন। সুলতান আলপ-আরসালান সালজুকী যখন কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করেন

তখন তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুক্ত করে দেন এবং কিছু শর্তাধীনে তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যও ফিরিয়ে দেন। মহান আলেকজান্ডারের কাছে যখন পাঞ্জাবের রাজা বন্দী হয়ে আসেন তখন তিনি তাকে শুধু তার পাঞ্জাব রাজ্যই ফিরিয়ে দেন নি, নিজের পক্ষ থেকে আরো কিছু দেশ ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বয়ং বায়াযীদও নিকোপোলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে পঁচিশ জন খ্রিস্টান শাহযাদাকে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেন ঃ এখন তোমরা নিজ নিজ দেশে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আক্ষেপের বিষয়, এমন একজন অতুলনীয় বীরপুরুষ ও মুজাহিদ-ই-ইসলামের উপর জয়লাভ করে তাইমূর তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেন তা তাঁর মত একজন দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষের জন্য একটি কলংকজনক ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। তাইমূর বায়াযীদকে ঠিক সেইরকম লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যেমন আবদ্ধ করে রাখা হয় একটি হিংস্র বাঘ অথবা সিংহকে। এ সম্পর্কে জনৈক কবির মন্তব্য, তাইমূর বায়াযীদকে সব সময় সিংহই মনে করতেন, তাই তাঁকে স্থায়িভাবে সিংহের খাঁচায় আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে আংকারা যুদ্ধে যে সাংঘাতিক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তাতে তিনি আট মাসের বেশি বাঁচেন নি। মানুষ বায়াযীদকে সিংহের খাঁচায়ই মৃত্যুবরণ করতে হয়। অবশ্য বায়াযীদের মৃত্যুর পর, তাইমূর তার প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেন যে, তাঁর লাশটি তাঁর পুত্র মূসার হাতে অর্পণ করেন এবং বন্দী মূসাকে মুক্ত করে দিয়ে বলেন– তোমার পিতার লাশটি বারূসায় নিয়ে গিয়ে দাফন করার অনুমতি আমি তোমাকে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে তাইমূরের যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিজয় অভিযান মুসলমান সুলতানদেরকে পরাস্ত এবং মুসলিম শহরসমূহে গণহত্যা চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা কিংবা অমুসলিম এলাকাসমূহে ইসলাম প্রচারের সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের মৃত্যুর পর তাইমূরও বেশিদিন জীবিত থাকেন নি। তিনি চীনদেশ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরকন্দ থেকে রওয়ানা হন। আর এটাই ছিল একমাত্র যুদ্ধাভিযান, যা তিনি অমুসলিম এলাকায় পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করার কারণে তাঁর এ অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

স্বয়ং তাইমূর তাঁর 'তুযুক'-এ আংকারা যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, তবে তা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে। এ থেকে অনুমান করা যায়, বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের মৃত্যুর পর তাইমূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এই ভেবে যে, এভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করা তার পক্ষে উচিত হয় নি। 'তুযুকে তাইমূরী' গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এটাও বোঝা যায় যে, বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে বন্দী করার ব্যাপারটি ঐ যুগের সকল মুসলমানের কাছেই একটি অতি ঘৃণ্য ও দুঃখজনক ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। মনে হয়, এ কারণেই তাইমূর আংকারা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি, কিংবা তার উপর কোন আনন্দ বা গর্ব প্রকাশও করেননি। খুব সম্ভব এই বিরাট অপরাধের ক্ষতি পূরণার্থে তিনি চীন দেশ জয় করার সংকল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের পুত্রদের আত্মকলহ

আংকারা যুদ্ধের পর মনে হচ্ছিল, উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে আর বাকি নেই। কেননা, তাইমূর এশিয়া মাইনরের অনেক এলাকাই ঐ সমস্ত সালজুকী বংশের নেতৃবৃন্দকে দান করেন, যারা উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এশিয়া মাইনরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কোন কোন এলাকায় তাইমূর নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন। বায়াযীদ ইয়ালদিরিম তাইমূরের মুকাবিলা করার জন্য যখন এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হন তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মানকে আড্রিয়ানোপলে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে আসেন। আংকারা যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর খ্রিস্টানরা এই সুযোগে তাদের নিজ নিজ এলাকা পুনর্দখলের চেষ্টা চালায় এবং শুধু আড্রিয়ানোপল এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ছাড়া ইতিপূর্বে দখলকৃত সমগ্র ইউরোপীয় ভূভাগ উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কনসটান্টিনোপলের কায়সার, যিনি অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে এই যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষা করছিলেন, সুযোগ বুঝে তিনিও তাঁর অধিকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই যুদ্ধের কারণে ইউরোপের খ্রিস্টানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের যুদ্ধে উসমানীয় সুলতানরা খ্রিস্টানদের মনে যে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন তাতে তারা তখন পর্যন্ত উসমানীয়দের হাত থেকে আড্রিয়ানোপল ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস পায় নি। শেষ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্যের আয়তন এতই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, শুধু ইউরোপ ও এশিয়ার কর্তৃত্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'টি ভূখণ্ডই তার কর্তৃত্বাধীনে রয়ে গিয়েছিল। তখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর সবচেয়ে বড় যে বিপদটি নেমে এসেছিল তা হলো বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের পুত্ররা অন্তর্ঘাতী বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের সাত অথবা আটজন পুত্র ছিলেন। তাঁর মধ্যে পাঁচ অথবা ছয়জন আংকারা যুদ্ধের পরও জীবিত ছিলেন। তাদের নাম : (১) সুলায়মান খান, যিনি আড্রিয়ানোপলে পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। (২) মূসা, যিনি পিতার সাথে বন্দী ছিলেন। (৩) ঈসা, যিনি আংকারার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বারূসার দিকে পালিয়ে গিয়ে সেখানকার শাসনকর্তৃত্ব হস্তগত করেছিলেন। (৪) মুহাম্মাদ, যিনি বায়াযীদের সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বাধিক যোগ্য পুত্র ছিলেন। তিনি এশিয়া মাইনরেরই অপর একটি শহরে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। (৫) কাসিম, যার কোন যোগ্যতা ছিল না। তিনি মুহাম্মাদ অথবা ঈসার সাথে বসবাস করছিলেন। যা হোক, বায়াযীদ বন্দী হওয়ার পর এশিয়া অবশিষ্ট উসমানীয় এলাকায় মুহাম্মাদ এবং ঈসা পৃথক পৃথকভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। আর ইউরোপীয় এলাকার উপর সুলায়মান তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়া মাইনরের উসমানীয় অধিকৃত এলাকা কার শাসনাধীনে থাকবে, এ নিয়ে ঈসা ও মুহাম্মাদের মধ্যে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে মুহাম্মাদ ঈসাকে পরাজিত করে বারূসা দখল করেন। ঈসা এশিয়া মাইনর থেকে পলায়ন করে আপন ভাই সুলায়মানের কাছে আড্রিয়ানোপলে চলে যান এবং এশিয়া মাইনরে মুহাম্মাদের উপর হামলা পরিচালনার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করেন। সুলায়মান তার বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনরে আসেন এবং বারূসা ও আংকারা জয় করেন।

এর চেয়ে বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় ঘটনা আর কী হতে পারে যে, একদিকে বায়াযীদ ইয়ালদিরিম তাইমূরের কয়েদখানায় অকথ্য জুলুম-নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করছেন, আর অপর দিকে তাঁর পুত্ররা অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটির উপর কার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে সে নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে চলেছে। তাদের মধ্যে যখন রক্তাক্ত সংঘর্ষ চলছিল তখন নিশ্চয়ই নিজেদের মহান পিতার দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার কথা তারা একেবারেই ভুলে বসেছিল। অন্যথায় এ মুহূর্তে ক্ষমতা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার মানসিকতা তাদের থাকত না। যখন সুলায়মান এশিয়া মাইনরে এসে আপন ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন ঠিক তখনই তাদের পিতা বায়াযীদ ইয়ালদিরিম তাইমূরের কয়েদখানায় মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাইমূর বায়াযীদের অপর পুত্র মূসাকে মুক্ত করে দেন এবং আপন পিতার লাশ নিয়ে আসার অনুমতিও তাকে প্রদান করেন। মূসা পিতার লাশ নিয়ে আসছিলেন এমন সময়ে কুরমানিয়ার সালজুক শাসক তাঁকে পথিমধ্যে বন্দী করেন। মুহাম্মাদ, যিনি সুলায়মানের কাছে পরাজিত হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিলেন এবং সুলায়মানের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিলেন। মূসার বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনে কুরমানিয়ার শাসককে লিখেন, আপনি অনুগ্রহ করে আমার ভাই মূসাকে মুক্ত করে দিন, যাতে সে এবং আমি উভয় মিলে সুলায়মানকে শায়েস্তা করতে পারি। কুরমানিয়ার শাসকও চাচ্ছিলেন সুলায়মান এবং তার ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকুক, যাতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের যে ক্ষমতাটুকু বাকি রয়েছে এর মাধ্যমে তারও পরিসমাপ্তি ঘটে। অতএব তিনি মুহাম্মাদের সুপারিশ অনুযায়ী মূসাকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেন। মূসা পিতার দাফন-কাফন সম্পন্ন করেই আপন ভাই মুহাম্মাদের সাথে মিলিত হন। মূসা যেহেতু আপন পিতার সাথে বন্দী ছিলেন তাই স্বভাবতই উসমানী উমারা ও সাধারণ সৈন্যদের কাছে তিনি ছিলেন অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর অংশগ্রহণের সাথে সাথে মুহাম্মাদ খানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত জোরেশোরে এশিয়া মাইনরের প্রান্তরে প্রান্তরে যুদ্ধাগ্নি জ্বলে ওঠে। এক পক্ষে ছিলেন মুহাম্মাদ ও মূসা এবং অন্যপক্ষে ছিলেন সুলায়মান ও ঈসা। শেষ পর্যন্ত ঈসা এক সংঘর্ষে নিহত হন। এতদসত্ত্বেও সুলায়মান আপন প্রতিপক্ষ দুই ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কয়েকবার মুহাম্মাদ ও মূসা পরাজিতও হন। শেষ পর্যন্ত মূসা আপন ভাইকে বলেন ঃ আপনি আমাকে সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে ইউরোপীয় এলাকায় পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানে গিয়ে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করব। ফলে সুলায়মান বাধ্য হয়ে এশিয়া মাইনর ছেড়ে সেদিকে মনোনিবেশ করবে। মুহাম্মাদের কাছে এই প্রস্তাব খুবই পছন্দনীয় ছিল। অতএব মূসা একটি বাহিনী নিয়ে আড্রিয়ানোপল গিয়ে পৌঁছেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সুলায়মানও সেদিকে অগ্রসর হন। ফলে মূসা ও সুলায়মানের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলায়মান যেহেতু আপন পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং তিনি নিজেকে সমগ্র উসমানীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক বলে মনে করতেন তাই সামরিক অধিনায়কদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান কিংবা তাদেরকে সব সময় সন্তুষ্ট রাখার প্রতি তিনি খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু মূসা ও মুহাম্মাদ যেহেতু সুলায়মানের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন এবং বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন তাই

নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা সেনাবাহিনীর সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করতেন। কিভাবে তাঁরা নিজেদের অধিনায়কদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন, কিভাবে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন সেদিকে সব সময় তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ফলে সামরিক অধিনায়কবৃন্দ স্বভাবতই সুলায়মানের উপর মূসাকে প্রাধান্য দেন।

ফলে সুলায়মান মূসার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরাজিত ও পর্যুদস্ত সুলায়মান দেশ থেকে পালিয়ে কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের কাছে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে ৮১৩ হিজরীতে (১৪১০-১১ খ্রি) পথিমধ্যে বন্দী ও নিহত হন। তখন শুধু দু'ভাই মুহাম্মাদ ও মূসা অবশিষ্ট ছিলেন। মূসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশের উপর, আর এশীয় অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো মুহাম্মাদের অধিকার।

মূসা এটা জানতেন যে, কনসটান্টিনোপলের শাসক কায়সার মিনুটাল প্লীলূগাস সুলায়মানের পক্ষপাতিত্ব করতেন বলেই সুলায়মান তাঁর কাছে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। অতএব তিনি কনসটান্টিনোপলের কায়সারকেও শাস্তি প্রদানের সংকল্প নেন। কিন্তু এর আগেই সার্বিয়ার শাসককে শাস্তি প্রদান করা তাঁর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কেননা সার্বিয়ার শাসক স্টিফেন প্রকাশ্যেই সুলায়মানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। অতএব তিনি প্রথমে সার্বিয়া আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সার্বীয় বাহিনীকে এমনভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন যে, তারা সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর সীমান্তবর্তী জেলাগুলাতে পুনরায় উসমানীয়দের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টানরাও তাদের সম্পর্কে সজাগ, এমন কি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সার্বিয়ার উপর মূসার এই আক্রমণ উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়। কেননা, ইতিমধ্যে ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানগণ অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে যে ধারণা করছিল তা তাদের অন্তর থেকে তিরোহিত হয়। তারপর মূসা কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করেন এবং তা অবরোধ করে কায়সারকে শাস্তি প্রদানের সংকল্প নেন। কিন্তু কায়সার মিনুটালও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি এই অবসরে মুহাম্মদ খানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ তখন এশিয়া মাইনরের স্বাধীন শাসক ছিলেন এবং নিজের ক্ষমতাকে যথেষ্ট সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। তিনি তখন ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করছিলেন, যেগুলো তাইমূর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিল, মূসা ও মুহাম্মাদ দুই ভাই এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে গিয়েছেন যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় এলাকা মূসার দখলে থাকবে এবং এশীয় এলাকার উপর দখল থাকবে মুহাম্মাদের। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয় নি। আর এটাকে উপলক্ষ করেই সুচতুর কায়সার তাঁদের মধ্যে একটি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেন। যখন মূসা কনসটান্টিনোপল অবরোধ করেন তখন কায়সার মুহাম্মাদ খানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুহাম্মাদ খান বিষয়টির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ঐ অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ইউরোপ উপকূলে গিয়ে পৌঁছেন। ফলে কনসটান্টিনোপলের যুদ্ধক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও এশীয় তুর্করা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এখানেই দুই ভাইয়ের মধ্যকার বিরোধ সাধারণ্যে প্রকাশ পায়। মূসার অবরোধ তখনো বহাল ছিল এমন সময় মুহাম্মাদ খানের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে,

এশীয় এলাকায় তার অধীনস্থ জনৈক রঈস বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মুহাম্মাদ খান সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিদ্রোহ মূসা খানের ইঙ্গিতেই হয়েছিল, যাতে মুহাম্মাদ খান একজন খ্রিস্টান বাদশাহর সাহায্য করতে না পারেন। যাহোক মুহাম্মাদ খান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। ওদিকে মুহাম্মাদের অনুপস্থিতিতে মূসা অবরোধের ক্ষেত্রে আরো কঠোরতা অবলম্বন করেন। ফলে কনসটান্টিনোপলের কায়সারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য মুহাম্মাদ খান বিদ্রোহ দমন করে পুনরায় কনসটান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছেন। উপরন্তু তিনি সার্বিয়ার সম্রাট স্টিফেনকেও লিখেন ঃ তুমি মূসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব। সার্বিয়ার সম্রাট প্রথম থেকেই মূসার মাধ্যমে নানা অসুবিধা ভোগ করছিলেন। এবার মুহাম্মাদ খানের প্রশ্রয় পেয়ে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মূসা যখন সার্বিয়া সম্রাটের বিদ্রোহের কথা জানতে পারেন তখন কনসটান্টিনোপলের অবরোধ উঠিয়ে সার্বিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিক থেকে মুহাম্মাদ খানও আপন বাহিনী নিয়ে মূসার পিছনে পিছনে সার্বিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। সার্বিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে জারলী নামক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মূসা নিহত হন। তারপর মুহাম্মাদ খান ইব্‌ন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম বিজয়ী বেশে আড্রিয়ানোপল পৌঁছে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবার তাকেই সমগ্র উসমানীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। যেহেতু বায়াযীদের সন্তানদের মধ্যে হুকুমত পরিচালনার যোগ্য একমাত্র তিনিই রয়ে গিয়েছিলেন তাই এখন থেকে গৃহযুদ্ধেরও অবসান হয়। মুহাম্মাদ খান আড্রিয়ানোপলের সিংহাসনে আরোহণ করে আপন বাহিনী, বাহিনী অধিনায়ক এবং প্রজাসাধারণের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নেন। তারপর তিনি বারূসায় অবস্থানরত আপন ভাই কাসিমকে আড্রিয়ানোপলে ডেকে পাঠান। সুলায়মানের পুত্রকেও ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তারা যাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাদের উভয়কেই অন্ধ করে ফেলা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে এই অন্ধ অবস্থায়ই তাদেরকে অত্যন্ত আয়েশ–আরামের মধ্যে রাখা হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটে ৮১৬ হিজরীতে (১৪১৩-১৪ খ্রি)। এভাবে আংকারা যুদ্ধের পর একাধারে এগারো বছর উসমানী বংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের পরও উসমানীয় সাম্রাজ্যের টিকে থাকা, তারপর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পুনরায় গড়ে ওঠা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এত বিরাট ধাক্কা সহ্য করে এবং এত ভয়ংকর পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে কোন বংশের কোন জাতির পক্ষে নিজের অবস্থাকে পুনরায় শুধরিয়ে নেওয়ার অনুরূপ ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (প্রথম)

সুলতান মুহাম্মাদ খান ইব্‌ন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম ৮১৬ হিজরীতে (১৪১৩-১৪ খ্রি) রাজধানীতে আড্রিয়ানোপলে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং সার্বিয়ার সম্রাটের সাথে তাঁর পূর্ব থেকেই সন্ধি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে

উভয় সম্রাটই তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং অনেক মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনও পাঠান। উত্তরে মুহাম্মাদ খান তাঁর বন্ধুত্বের যে প্রমাণ পেশ করেন তা হলো সার্বিয়া সম্রাটকে তিনি বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেন এবং কনসটান্টিনোপলের কায়সারকে থেসলীর ঐ দুর্গ, যা তুর্কদের দখলে চলে এসেছিল এবং কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী কিছু কিছু জায়গা যেগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে কনসটান্টিনোপলের কায়সার অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন, সেগুলো উপহারস্বরূপ তাকে প্রদান করেন। ভেনিসের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা একটি বিরাট নৌবাহিনীর অধিকারী ছিল এবং তুর্কদের মুকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকত, সুলতান মুহাম্মাদ খানের শান্তিপ্রিয়তা ও আপোসকামিতার খ্যাতি শুনতে পেয়ে সেও সন্ধি স্থাপনের আবেদন জানায় এবং সুলতান মুহাম্মাদ খান নির্দ্বিধায় তার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। আল্লাশিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি তুর্কী প্রদেশ আংকারা যুদ্ধের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে স্বাধিকার ঘোষণা করেছিল। তাছাড়া প্রত্যেক দেশেই খ্রিস্টানরা নিজ নিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেই এই ভেবে শংকিত ছিল যে, উসমানীয় সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করার পর ধীরে ধীরে একদা আপন পিতা কর্তৃক অধিকৃত প্রদেশসমূহ আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন এবং আমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন। তারা যখন সুলতান মুহাম্মাদ খানের সাফল্যের সংবাদ পায় তখন ভয়ে ভয়ে নিজ নিজ দূত সুলতানের দরবারে পাঠিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানায়। সুলতান মুহাম্মাদ খান এতে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং ঐ দূতদেরকে বিদায় জানাতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের শাসকদের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে একথা অবশ্যই বলবে যে, আমি তোমাদের সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি এবং সকলের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি ও নিরাপত্তা পছন্দ করেন এবং বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না। সুলতান মুহাম্মাদ খানের এই কার্যধারার ফল দাঁড়াল এই যে, সমগ্র ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য যে একটি ভয়ানক ব্যাধি থেকে অতি সম্প্রতি সেরে উঠেছিল, তার জন্য এই মুহূর্তে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি তথা শারীরিক কসরত ছিল খুবই ক্ষতিকারক। এখন তার প্রয়োজন ছিল পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও বাছাইকৃত খাদ্য গ্রহণের। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, শেষ পর্যন্ত একজন যোগ্য সুলতানই উসমানীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রতিটি কর্মধারাই সব দিক দিয়ে সাম্রাজ্যের জন্য মংগলজনক প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সুলতান মুহাম্মাদ খান ইউরোপীয় অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন বটে, তবে এশিয়া মাইনরে তখনও বিদ্রোহের স্রোতধারা অব্যাহত থাকে। অতএব বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজ সেনাবাহিনীসহ এশিয়া মাইনর অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। তিনি প্রথমে স্মার্নার বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর কারমানিয়ার বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করে তাদেরকেও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, এশিয়া মাইনরে পূর্ব-সীমান্তের আশেপাশে তাইমূরের মৃত্যুর পর যে সমস্ত রাজ্য বা সালতানাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তিনি তাদের সবগুলোর সাথেই

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সমগ্র এশিয়া মাইনরকে নিজের দখলে নিয়ে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন যে, তারপর তাইমূরী আক্রমণের মত আর একটি আক্রমণ উসমানীয় সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিতে পারবে না।

৮২০ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রি) যখন সুলতান মুহাম্মাদ খান এশিয়া মাইনর থেকে আড্রিয়ানোপলে ফিরে এসেছেন, তখন দানিয়াল উপত্যকার নিকটবর্তী ঈজিয়ান সাগর বক্ষে ভেনিসের নৌবহরের সাথে সুলতানের নৌবহরের একটি ভয়ানক সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে তুর্কী নৌবহর ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সংঘর্ষের কারণ ছিল এই যে, ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপসমূহে বসবাসকারীরা শুধু নামমাত্র ভেনিস গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনস্থ ছিল। এই সমস্ত লোক সুলতানের উপকূলীয় এলাকা, যেমন গ্যালিপোলী প্রভৃতির উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাত।

সুলতান তাদেরকে দমন করার জন্য আপন নৌবহরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভেনিসের নৌবহরের সাথে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। যেহেতু ঐ নৌবহরটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী তাই স্বাভাবিকভাবেই সুলতানের নৌবাহিনীকে তাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। অবশ্য এই সংঘর্ষের পরপরই পুনরায় ভেনিসের সাথে সুলতানের সন্ধি স্থাপিত হয়। ভেনিস ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যা গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও রোম সাগরে ভেনিসের নৌশক্তি ছিল সবার উপরে। যা হোক, এরপর থেকে সুলতানের সামনে আর কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষের আশংকা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তিনি তখন আপন সাম্রাজ্যকে প্রশস্ত করার চাইতে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তখন শহর পল্লী সর্বত্রই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, উলামা ও পণ্ডিতবর্গের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবসায়ীদেরকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, ফলে শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রজারা তাঁকে 'চিলপী' (ধীর মেজাজের বীরপুরুষ) উপাধি প্রদান করে এবং সব দেশেই তিনি আপোসকামী সুলতান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থায় একটি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তার মূল হোতা ছিলেন সেনাবাহিনীর কাযী বদরুদ্দীন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, একজন নওমুসলিম ইহুদী মুরতাদ হয়ে এই মর্মে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করে যে, সুলতানকে পদচ্যুত করে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কাযী বদরুদ্দীন তাকে সমর্থন করেন এবং তারা উভয়ে মিলে মুস্তাফা নামীয় জনৈক নিরক্ষর ব্যক্তিকে তাদের ধর্মীয় নেতা মনোনীত করে। তারা ইউরোপ-এশিয়ার সর্বত্র তাদের এই মতাদর্শ প্রচার করে জনসাধারণকে নিজেদের স্বমতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন একটি ভয়ানক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে এবং সুলতান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। এই বিদ্রোহ ভিতরে ভিতরে প্রজাসাধারণকেও প্রভাবান্বিত করতে থাকে। এই বিদ্রোহ আর একটি বিশেষ কারণে দ্রুত সাফল্য লাভ করে। তা এই যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান আপোস চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সাধারণভাবে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় মুসলমান প্রজারা তাঁর উপর

অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা একথা বুঝতে পারেনি যে, ঐ সময়ে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য ছিল খুবই উপকারী। যাহোক উল্লিখিত বিদোহীরা যখন জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পায় তখন সাধারণ মুসলমানরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মাদ খান ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা দমন করতে সক্ষমও হন। মুরতাদ নওমুসলিম, কাযী বদরুদ্দীন, ধর্মীয় নেতা মুস্তাফা এই তিনজনই সুলতান মুহাম্মাদ খানের হাতে নিহত হয়। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সুলতান মুহাম্মাদ খানকে আর একজন ভয়ংকর বিদ্রোহীর মুকাবিলা করতে হয়। আংকারা যুদ্ধে সুলতান বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিমের মুস্তাফা নামীয় একজন পুত্র নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর তার লাশের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তাইমূরও যুদ্ধশেষে মুস্তাফার লাশ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তাতে সফল হন নি। এ কারণে মুস্তাফার নিহত হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহজনকই রয়ে গিয়েছিল। এবার সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামলের শেষদিকে জনৈক ব্যক্তি এশিয়া মাইনরে এই দাবি উত্থাপন করে যে, আমিই বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের পুত্র মুস্তাফা। যেহেতু আকার আকৃতিতে মুস্তাফার সাথে তার অনেক মিল ছিল তাই অনেক তুর্কই তার দাবি স্বীকার করে নেয়। স্মার্ণার শাসনকর্তা জুনায়দ এবং ওয়াল্লাশিয়ার শাসনকর্তা তার এই দাবিকে আগে বেড়ে এজন্য সমর্থন করেন যে, তারা মুহাম্মাদ খানের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অতএব উল্লিখিত মুস্তাফা এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহায্যে গ্যালিপোলী পৌঁছে থেসলীর নিকটবর্তী এলাকাসমূহ দখল করেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আপন সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। স্যালোনিকার সন্নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মুস্তাফা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং কনসটান্টিনোপলের কায়সারের দরবারে পৌঁছে তার আশ্রয়প্রার্থী হয়। সুলতান মুহাম্মাদ খান কায়সারকে লিখেন, মুস্তাফা হচ্ছে আমার বিদ্রোহী। অতএব তুমি তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কায়সার তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন এবং মুহাম্মাদ খানকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমি তাকে (মুস্তাফাকে) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নজরবন্দী করে রাখব। তবে এই শর্তে যে, আপনি তার থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচাদি বাবদ কিছু অর্থ আমার কাছে পাঠাতে থাকবেন। যেহেতু ঐ সময়ে ক্রমাগত বিদ্রোহের ফলে সুলতান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত ছিলেন তাই তিনি ঐ মুহূর্তে কায়সার কিংবা অন্য কোন খ্রিস্টান সম্রাটের সাথে আর একটি সংঘর্ষ বাঁধুক, তা চাচ্ছিলেন না। অতএব তিনি কায়সারের ঐ প্রস্তাব মেনে নেন এবং বিদ্রোহী মুস্তাফার খরচাদি বাবদ কিছু অর্থ কায়সারের কাছে পাঠাতে স্বীকৃত হন। এই বিদ্রোহ দমনের পরও বিদ্রোহী মুস্তাফার প্রতি সুলতান মুহাম্মাদ খানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং তিনি কনসটান্টিনোপলের কায়সারের সাথে আপন সম্পর্ক আরো সুন্দর, আরো মধুর করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কনসটান্টিনোপল গমনের সংকল্প নেন। যখন তিনি এশিয়া মাইনর থেকে দানিয়াল উপত্যকা অতিক্রম করে গ্যালিপোলী হয়ে আড্রিয়ানোপলের দিকে আসছিলেন তখন কায়সার তার আগমন সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত

জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। সেখানে সুলতান ও কায়সার পুনরায় তাঁদের আপোসচুক্তি নবায়ন করেন। তারপর সুলতান গ্যালিপোলির দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে ৮২৫ হিজরীতে (১৪২২ খ্রি) সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল : একটি পর্যালোচনা

আংকারা যুদ্ধের সময় সুলতান মুহাম্মাদ খানের বয়স ছিল সাতাইশ বছর। আংকারা যুদ্ধের পর তিনি এশিয়া মাইনরের আমাসিয়া এলাকার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তারপর আপন ভাইদের সাথে তাঁর সংঘর্ষের ধারা অব্যাহত থাকে। একাধারে এগারো বছর শক্তি পরীক্ষার পর তিনি সবাইকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সুলতানে পরিণত হন। তিনি আট বছর সুলতান রূপে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তিনি এমন মধ্যপন্থা এবং কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে মৃতপ্রায় উসমানীয় সাম্রাজ্য পুনরায় সুস্থ-সবল ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এ কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে 'নূহ' উপাধি প্রদান করেছেন। কেননা তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের ডুবন্ত তরীকে রক্ষা করে তীরে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (প্রথম) হচ্ছেন সর্বপ্রথম উসমানীয় সুলতান, যিনি আপন রাজকীয় কোষাগার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ কাবাঘর ও মক্কার অধিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন, যা প্রতি বছর নিয়মিত মক্কায় গিয়ে পৌঁছত এবং যার একটি অংশ অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হতো এবং অপর অংশ কা'বাঘরের হিফাযত ও তত্ত্বাবধানে ব্যয় করা হতো। এ কারণেই মিসরের আব্বাসীয় খলীফা মুতাদিদ বিল্লাহ্ সুলতান মুহাম্মাদ খানকে 'খাদিমুল হারামাইন শারীফাইন' উপাধি দান করেন। সুলতান এই উপাধিকে নিজের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক মনে করেন। শেষ পর্যন্ত এই উপাধি ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে একদিন উসমানীয়দেরকে 'খলীফাতুল মুসলিমীন'-এর আসনে অধিষ্ঠিত করে।

মৃত্যুকালে সুলতান মুহাম্মাদ খানের বয়স ছিল সাতচল্লিশ বছর। তখন আঠার বছর বয়স্ক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ছিলেন এশিয়া মাইনরের একটি বাহিনীর অধিনায়কত্বে নিয়োজিত। সালতানাতের মন্ত্রীবর্গ চল্লিশ দিন পর্যন্ত সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুরাদ খানের কাছে এই মর্মে জরুরী সংবাদ পাঠান– আপনি অবিলম্বে রাজধানীতে এসে সিংহাসনে আরোহণ করুন। এভাবে পূর্ণ চল্লিশ দিন পর সুলতানের লাশ গ্যালিপোলী থেকে বারূসায় নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়)

সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ৮০৬ হিজরীতে (১৪০৩-০৪ খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আঠার বছর বয়সে রাজধানী আড্রিয়ানোপলে (এদিরনে) যথারীতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেন। এই যুবক সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে নানারূপ কঠিন সমস্যায় সম্মুখীন হন।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র কনসটান্টিনোপলের খ্রিস্টান সম্রাট বন্দী মুস্তাফাকে নিজের সামনে ডেকে এনে এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নেন যে, তিনি (মুস্তাফা) যদি উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হন তাহলে অনেকগুলো সুদৃঢ় দুর্গ এবং অনেকগুলো প্রদেশ (অঙ্গীকার পত্রে যার বিস্তারিত বিবরণ ছিল) কায়সারের হাতে সমর্পণ করবেন এবং সর্বদা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবেন। তারপর কনসটান্টিনোপলের কায়সার মুস্তাফাকে একটি সেনাবাহিনী দেন এবং মুস্তাফা কায়সারেরই একটি নৌবহরে আরোহণ করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের ইউরোপীয় এলাকায় গিয়ে পৌছেন। এবার তার কাজ হলো, সুলতান মুরাদের কাছ থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া। যেহেতু মুস্তাফা নিজেকে সুলতান মুহাম্মাদ খানের ভাই এবং বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের পুত্র বলে পরিচয় দিত এবং তার এই দাবি সত্য না মিথ্যা সে ব্যাপারে তুর্করা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিল না, তাই অনেক উসমানী সৈন্যই তার সাথে এসে যোগ দেয়। ফলে তার (মুস্তাফার) ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তিনি একের পর এক শহর জয় করতে থাকেন। মুরাদ খান যে বাহিনীকে মুস্তাফার মুকাবিলায় পাঠিয়েছিলেন তার অধিকাংশই মুস্তাফার সাথে যোগ দেয় এবং অবশিষ্টরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসে। তারপর সুলতান মুরাদ ঐ বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করার জন্য নিজ সেনাপতি বায়াযীদ পাশার নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। কোন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে বায়াযীদ পাশা নিহত হন এবং মুরাদের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই বিজয় লাভের ফলে মুস্তাফার সাহস আরো বেড়ে যায়। তিনি এবার সিদ্ধান্ত নেন, প্রথমে সমগ্র এশিয়া মাইনর দখল করে নেবেন। কেননা ইউরোপীয় এলাকা সম্পর্কে তার এই ধারণা ছিল যে, কনসটান্টিনোপলের কায়সার এবং পশ্চিম সীমান্তের খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহরা তাকে মুরাদ খানের বিরুদ্ধে জরুরী সাহায্য প্রদান করবেন। তাই এশিয়া দখল করার পর ইউরোপীয় এলাকা থেকে মুরাদ খানকে তাড়িয়ে দেওয়া তার জন্য হবে খুবই সহজ। অতএব তিনি সমুদ্র খাড়ি অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে হামলা চালান। দ্বিতীয় মুরাদ খান এই ভয়ংকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং মুস্তাফার মুকাবিলায় রওয়ানা হন এবং এশিয়া মাইনরে পৌছে তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। মুরাদ খান যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছার সাথে সাথে তুর্কী সিপাহীদের মনে মুস্তাফার দাবি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই তারা মুস্তাফার দল ত্যাগ করে মুরাদ খানের দলে এসে যোগ দেয়। মুস্তাফা নিজের এই নাজুক অবস্থা লক্ষ্য করে এশিয়া মাইনর থেকে পালিয়ে যান এবং গ্যালিপোলীতে এসে থেসনী প্রভৃতি এলাকা দখল করে নেন। মুরাদ খানও মুস্তাফার পশ্চাদ্ধাবন করে গ্যালিপোলীতে এসে পৌছেন। সেখানেও উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মুস্তাফা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আড্রিয়ানোপলের দিকে পলায়ন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আড্রিয়ানোপল দখল করা। কিন্তু সেখানে পৌছা মাত্র তাকে বন্দী করা হয় এবং ফাঁসি দিয়ে তার লাশ একটি টাওয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

তারপর সুলতান মুরাদ খান কনসটান্টিনোপলের কায়সারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন জেনেভা রাষ্ট্রের সাথে একটি আপোস চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কনসটান্টিনোপলের কায়সারই বিদ্রোহী মুস্তাফার মাধ্যমে উল্লিখিত ফিতনার সৃষ্টি করেছিলেন। কনসটান্টিনোপলের কায়সার

প্লিউলিগুস যখন শুনতে পান যে, সুলতান মুরাদ খান কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং এই বিপদ কিভাবে টলানো যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া এবং কুটকৌশলের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর চমৎকার দক্ষতা ছিল এবং এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যকে বার বার বিপদের মধ্যে ফেলে এ যাবত নিজের সাম্রাজ্যকে টিকিয়েও রেখেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি নিজের একদল প্রতিনিধি সুলতানের দরবারে পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। যাতে তারা সুলতানের কাছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতের জন্য একটি আপোস চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সুলতান মুরাদ খান এবার ঐ প্রতিনিধি দলকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, এমন কি তাদের আপন দরবারে প্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত দেননি।

তারপর ১৪২২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে ৮২৫ হিজরীতে বিশ হাজার বাছাইকৃত সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে সুলতান মুরাদ খান কনসটান্টিনোপলের সামনে এসে হাযির হন এবং অত্যন্ত কঠোরতার সাথে তা অবরোধ করেন। তিনি সমুদ্র খাড়ির উপর একটি কাঠের পুল নির্মাণ করে ঐ অবরোধকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেন। কনসটান্টিনোপল শহর জয় করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সুলতান মুরাদ খান এমনি দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে ঐ কাজ শুরু করেন এবং অবরোধ কাজে মিনজানীক ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাদি এমনভাবে ব্যবহার করেন এবং চারপাশের মিনার ও টাওয়ারগুলোকে এমনি কৌশলে কাজে লাগান যে, শেষ পর্যন্ত কনসটান্টিনোপলের জয়ের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। অবরোধ চলাকালে কায়সারও নিষ্কর্মা হয়ে বসেছিলেন না। তিনি একদিকে প্রতিপক্ষের হামলা প্রতিরোধের এবং অপর দিকে এশিয়া মাইনরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুরাদ খানের সামনে এর চাইতেও কঠিন সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাস্তবেও দেখা গেল, মুরাদ খানের সামনে এর চাইতেও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যার কারণে কনসটান্টিনোপল জয় করতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি এমনি এক মুহূর্তে মুরাদ খান অবরোধ তুলে এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেন, ঠিক যেমনি তার পিতামহ বায়াযীদ খান ইয়ালদিরিম কনসটান্টিনোপলের অবরোধ তুলে তাইমূরের মুকাবিলা করার জন্য একদা এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান চার পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল একেবারে শিশু এবং দু'জন ছিল মোটামুটি যুবা বয়সী। মুরাদ খান ছিলেন সবার বড়। তাঁর বয়স তখন ছিল আঠারো বছর। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মুস্তাফা। পিতার মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল পনেরো বছর। দ্বিতীয় মুরাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপন ছোট দুই ভাইকে তাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বারুসায় পাঠিয়ে দেন এবং তৃতীয় ভাই মুস্তাফাকে এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিন ভাইই বেশ আরাম-আয়েশ ও মর্যাদার সাথে কালাতিপাত করছিলেন। দ্বিতীয় মুরাদ খান তার তথাকথিত চাচা মুস্তাফার ফিতনা দমন করে ফেলেছেন এবং আড্রিয়ানোপলে মুস্তাফার ফাঁসিও হয়ে গেছে। তখন কায়সার প্লিলোগাস এই দ্বিতীয় মুস্তাফার উপরও তাঁর

ষড়যন্ত্র বিস্তারের প্রয়াস পান। তিনি তার গুপ্তচর ও সুযোগ্য দূতদের মাধ্যমে দ্বিতীয় মুরাদের ভাই মুস্তাফাকে এই বলে অনবরত উস্কানি দিতে থাকেন যে, আমি তোমাকেই সালতানাতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। যদি তুমি সিংহাসনের দাবি কর তাহলে আমি তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবো। এদিকে তিনি এশিয়া মাইনরের ঐ সমস্ত সর্দারকেও যারা এখন পর্যন্ত কুনিয়া ও অন্যান্য শহরে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জায়গীরদার হিসাবে ছিল এবং শাহী পরিবারের সাথে আত্মীয়তা বন্ধনেও আবদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় মুরাদ খানের বিরুদ্ধে এবং তার ভাই মুস্তাফা খানের পক্ষে টেনে আনার গোপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার প্রচেষ্টায় সফলও হন।

মুস্তাফা খান সালজুকী আমীরদের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তা করেন ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন মুরাদ খানের কনসটান্টিনোপল জয় করতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। যা হোক মুস্তাফা খান এশিয়া মাইনরের অনেক শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখল করে বারূসা অবরোধ করে ফেলেন।

দ্বিতীয় মুরাদ খান সংবাদ পান যে, এশিয়া মাইনরের সৈন্যরা বিদ্রোহ করে মুস্তাফার সাথে যোগ দিয়েছে এবং এশিয়া মাইনর তার (মুরাদ খান) দখল থেকে চলে যাচ্ছে তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে কনসটান্টিনোপলের অবরোধ তুলে মুস্তাফা খানকে দমনের জন্য এশিয়া মাইনর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি এশিয়া মাইনরে পৌঁছতেই বেশির ভাগ সৈন্য মুস্তাফাকে ত্যাগ করে মুরাদ খানের বাহিনীতে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মুরাদ খান মুস্তাফা খানকে পরাজিত করে হত্যা করেন। এভাবে ভালোয় ভালোয় অতি শীঘ্রই এশিয়া মাইনরের কর্তৃত্ব মুরাদ খানের আয়ত্তে চলে আসে। তারপর আনুমানিক এক বছর মুরাদ খান এশিয়া মাইনরে অবস্থান করে সেখানকার অবিশ্বস্ত আমীরদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে নিজের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে তুলেন। ৮২৮ হিজরীতে (১৪২৫ খ্রি) সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ খান এশিয়া মাইনর থেকে ইউরোপের দিকে আসেন। তখন কনসটান্টিনোপলের সম্রাট কর হিসাবে বার্ষিক ত্রিশ হাজার ডাকেট প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দখল ছেড়ে দিয়ে মুরাদ খানের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ফলে মুরাদ খান পুনরায় কনসটান্টিনোপল আক্রমণ করেননি। তারপর মুরাদ খান আপন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রজাসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তাই কোন খ্রিস্টান বা অখ্রিস্টান রাজ্যের উপর তিনি আর হামলা চালাননি। তবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র তার সাথে যে সমস্ত সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছিল সেগুলো যাতে পুরোপুরিভাবে মেনে চলা হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

সার্বিয়া সম্রাট স্টিফেন, যিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের করদাতা ও অনুগত ছিলেন, ৮৩১ হিজরীতে (১৪২৭-২৮ খ্রি) মারা যান। তার স্থলে সিংহাসনে আরোহণ করেন জর্জ বার্নিক ভিচ। যেহেতু এই নয়া সম্রাট তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটের ন্যায় ততটা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন না, তাই কনসটান্টিনোপলের কায়সার তাঁর উপর আপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করার সুযোগ পান। তিনি ভেতরে ভেতরে জর্জ ও হাঙ্গেরীবাসীদেরকে সুলতান মুরাদ খানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন। যেহেতু হাঙ্গেরীবাসীরাও এতদিন নিকোপোলিসের শোচনীয়

পরাজয়ের দৃশ্য বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরাও উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং তাদের এই প্রচেষ্টা কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৮৩৪ হিজরীতে (১৪৩০-৩১ খ্রি) সুলতান মুরাদ খান যান্টি দ্বীপ, গ্রীসের দক্ষিণাংশ এবং স্যালূনিকা অঞ্চল জয় করে ভেনিসবাসীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত ভেনিসবাসীরা বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানকর শর্তের অধীনে সুলতানের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে। ভেনিস যেহেতু কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের পক্ষে ছিল, তাই ভেনিসের অপমানে তিনি নিজেকে অপমানিতবোধ করেন এবং আগের চেয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে আপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে থাকেন। এদিকে সুলতান মুরাদ ইউরোপে ক্রমান্বয়ে আপন দখলীকৃত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। আলবেনিয়া এবং বোসনিয়াবাসীরাও সার্বিয়া ও হাঙ্গেরীর ন্যায় সুলতানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে। সার্বিয়া ও রুমানিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ট্রান্সলোনিয়া প্রদেশের খ্রিস্টানরা ৮৪২ হিজরীতে (১৪৩৮-৩৯ খ্রি) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান তাদের উপর হামলা চালিয়ে সত্তর হাজার খ্রিস্টানকে যুদ্ধক্ষেত্রেই বন্দী করেন এবং সেখানে আপন পরাক্রম ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। ওরা ছিল তুর্কদের বিরোধী এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। মুরাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করার পর ঐ খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়েই 'জন হানী ডিজিয়া জন হানীদাস' নামক জনৈক ব্যক্তি পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জনের পর হাঙ্গেরী ফিরে আসে। সে ছিল সম্রাট সিজমান্ডের অবৈধ সন্তান। তার মা ছিল এলিজাবেথ মারসী নামীয় জনৈকা সুন্দরী বেশ্যা। হানীদাস হাঙ্গেরীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয় এবং তুর্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সে প্রথমে ট্রান্সলুনিয়া থেকে তুর্কদের বহিষ্কার করে। হানীদাসের সাথে সংঘর্ষে তুর্কী জেনারেল মুজীদ বেগ, যিনি ঐ অঞ্চলের কর্মকর্তা ছিলেন, আপন পুত্রসহ নিহত হন এবং ত্রিশ হাজার তুর্ক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। যারা বন্দী হয় তাদের সাথে হানীদাস নির্মম আচরণ করেন। বিজয়ের খুশিতে হাঙ্গেরীতে যে সমস্ত ভোজসভার আয়োজন করা হতো সেখানে সমস্ত বন্দীর একটি দলকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে তাদেরকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হতো। এভাবে আনন্দের জলসায় তুর্কী কয়েদীদের হত্যা করা যেন খ্রিস্টানদের একটি আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান মুরাদ খানের কাছে একদিকে এই পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে। অপরদিকে এশিয়া মাইনর থেকে সংবাদ আসে কুনিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। সুলতানের জন্য এই সমস্ত সংবাদ ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যা হোক, তিনি হানীদাস ও হাঙ্গেরীবাসীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে আশি হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং তিনি এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হন। এটা হচ্ছে ৮৪৭ হিজরীর (১৪৪৩-৪৪ খ্রি) ঘটনা।

তুর্কীদের এই বাহিনীকে পরাজিত করা এবং সমস্ত তুর্ক জাতিকে ইউরোপ মহাদেশ থেকে বিতাড়নের জন্য এবার খ্রিস্টানদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা ইতিপূর্বে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। হাঙ্গেরী সম্রাট লেভ সেলস এবং হাঙ্গেরী সেনাপতি হানীদাস ইতিমধ্যে এতই বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাদের বাহাদুরি ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে

ইউরোপের প্রত্যেক দেশের খ্রিস্টান যোদ্ধারা তাদের বাহিনীতে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং এটাকে তাদের জন্য একটি গর্বের বিষয় বলে মনে করে। রোমের পোপ জন এবং তার প্রতিনিধিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে খ্রিস্টান যোদ্ধাদেরকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, ওয়াল্লেশিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, বোসনিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশের খ্রিস্টান যোদ্ধারা দলে দলে এসে হানীদাসের পতাকাতলে সমবেত হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন খ্রিস্টানদের বিরাট বাহিনীর কাছে উসমানীয় বাহিনী পরাজয়বরণ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার তুর্ক বন্দী হয় এবং অনেকেই শাহাদাতবরণ করেন। হানীদাস পরাজিত উসমানীয় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে সোফিয়া নগরী দখল করে নেন। তারপর সমগ্র রুমানিয়া পর্যুদস্ত করে বিরাট সংখ্যক কয়েদী এবং পর্বতপ্রমাণ মালে গনীমত নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময়ে আড্রিয়ানোপল দখল করা খুবই সহজ ছিল, কিন্তু তিনি সে দুঃসাহস করেননি। সুলতান মুরাদ খান এই পরাজয় এবং আপন অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদ এশিয়া মাইনর থেকে পান। তিনি অতিশীঘ্রই এশিয়া মাইনরের বিদ্রোহ দমন করে আড্রিয়ানোপলে চলে আসেন এবং খ্রিস্টানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এটা হচ্ছে ৮৪৭ হিজরীর (১৪৪৩-৪৪ খ্রি) ঘটনা। এই সময়েই সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। এতে সুলতান এতই বিচলিত ও মর্মাহত হন যে, সালতানাত ও হুকুমতের প্রতি তাঁর আর কোন আগ্রহই বাকি থাকেনি। গত যুদ্ধে সুলতানের ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ চিলপী হানীডেজ ওরফে হানীদাসের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যেভাবে পারেন মুহাম্মাদ চিলপীকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য সুলতানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুলতান হাঙ্গেরীবাসীদের সাথে পত্রালাপ শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে সেখানকার সম্রাট জর্জের হাতে সাম্রাজ্যের যাবতীয় অধিকার অর্পণ করেন। তিনি ওয়াল্লেশিয়া প্রদেশ ও হাঙ্গেরীকে দিয়ে দেন এবং ফিদিয়া স্বরূপ দশ হাজার ডাকেট প্রেরণ করে মুহাম্মাদ চিলপীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এই অঙ্গীকারপত্র হাঙ্গেরী এবং তুর্কী উভয় ভাষায়ই লেখা হয়। তাতে সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) এবং হাঙ্গেরীর সম্রাট লেভ সেলাস স্বাক্ষর প্রদান করেন। উভয় সম্রাটই এই মর্মে শপথ নেন যে, এই অঙ্গীকারপত্রকে ধর্মীয় নির্দেশাবলীর মতই মান্য করা হবে। এই অঙ্গীকার-পত্র অনুযায়ী দানিয়ূব নদীকে সুলতানের অধিকারভুক্ত এলাকার সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই (মুতাবিক ৮৪৮ হিজরীতে) দশ বছরের জন্য সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এই আপোস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই আপোস চুক্তি সম্পাদনের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সুলতান মুরাদ খান শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করার সংকল্প নেন। প্রধানত এর দু'টি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, ধারণা করেছিলেন, চুক্তি সম্পাদনের পর অন্তত দশ বছর দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকবে। দ্বিতীয় কারণ তাঁর পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি অনেকটা ভেংগে পড়েছিলেন। যা হোক তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মাদ খানকে আড্রিয়ানোপল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মাদ খান যেহেতু

অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাই মুরাদ খান অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং অধিনায়কদেরকে তাঁর উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তিনি এশিয়া মাইনরে গিয়ে দরবেশ ও সংসারত্যাগীদের দলে ভর্তি হয়ে নির্জন জীবন যাপন করতে থাকেন।

সুলতান মুরাদ খানের সিংহাসন ত্যাগ এবং কিশোর মুহাম্মাদ খানের সিংহাসন আরোহণের কথা শুনে খ্রিস্টানদের লোভাতুর জিহ্বা পানিতে ভরে ওঠে। তারা এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মুরাদ খানের সাথে সম্পাদিত যাবতীয় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে তুর্ক বংশকে ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সংকল্প নেয়। হাঙ্গেরীর সম্রাট লেভ সেলাস– যিনি এই কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে শপথ নিয়েছিলেন যে, মুরাদ খানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ধারাসমূহ ধর্মীয় নির্দেশাবলীর ন্যায়ই মান্য করবেন। তিনি চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু পোপ এবং তাঁর সহকারী কার্ডিনাল জুলিয়ান সম্রাটকে এই বলে অঙ্গীকার ভঙ্গে উদ্বুদ্ধ করেন যে, মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার মেনে চললে বরং পাপ হবে এবং তা ভেঙ্গে ফেললে পুণ্য হবে। অনুরূপভাবে হাঙ্গেরীর সেনাপতি হানীদাসও এত তাড়াতাড়ি এই চুক্তি ভঙ্গ করাকে নিজের জন্য অপমানকর মনে করতেন। কিন্তু তাকে হাঙ্গেরীর রাজদরবারের পক্ষ থেকে এই প্রলোভন দেখানো হয় যে,বুলগেরিয়া জয় করে তোমাকে সেখানকার বাদশাহ করা হবে। এতে তিনিও চুক্তি ভংগ করতে সম্মত হয়ে যান। মোটকথা, ঐ আপোস চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এক মাস যেতে না যেতেই খ্রিস্টানরা তা ভেংগে ফেলতে ঐকমত্যে পৌঁছে। সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী তুর্ক সৈন্যরা সার্বিয়া ছেড়ে যাচ্ছিল। ফলে সমগ্র সার্বিয়া এলাকা তুর্কীশূন্য হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টানরা কিছুদিন এ জন্য অপেক্ষা করে। তারপর চুক্তি সম্পাদনের ঠিক পঞ্চাশ দিন পর, ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর, (৮৪৮ হিজরীতে) হাঙ্গেরী বাহিনী আগে বেড়ে তুর্কী সীমান্ত চৌকিতে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। তারপর বুলগেরিয়ার পথ ধরে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে পৌঁছে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে দারনা শহর জয় করে। ইতিপূর্বে পথিমধ্যে যেখানেই তুর্কীবাহিনী অবরোধ সৃষ্টি করেছে সেখানেই তাদেরকে পরাজিত ও নিহত হতে হয়েছে। তাছাড়া খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলমানদেরকে যেখানেই পেয়েছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে তাদের সকলকেই পাইকারীভাবে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও আকস্মিক আক্রমণের কথা সংসার ত্যাগী নির্জনবাসী সুলতান মুরাদের কাছে বর্ণনা করা হয় এবং তাঁর কাছে বিনীত অনুরোধ জানান হয়, যেন তিনি নির্জন খানকাহ থেকে বের হয়ে এসে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই অবস্থা জানার পর সুলতান মুরাদ খান সঙ্গে সঙ্গে আড্রিয়ানোপলে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে দারনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বিজয়ী খ্রিস্টান বাহিনী দারনার নিকটবর্তী প্রান্তরে অবস্থান করছিল। এমনি সময়ে হানীদাসের গোয়েন্দারা এসে সংবাদ দেয় যে, সুলতান মুরাদ খান নির্জন বাস পরিত্যাগ করে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে স্বয়ং খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলায় এসেছেন এবং এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করেছেন। এই সংবাদ পেয়েই হানীদাস ও হাঙ্গেরী-সম্রাট একটি পরামর্শসভা আহ্বান করেন এবং সে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। খ্রিস্টান বাহিনীর বাম

পার্শ্বে ওয়াল্লেশিয়ার বাহিনী এবং ডান পার্শ্বে হাঙ্গেরীর বাছাইকৃত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কার্ডিনাল জুলিয়ানের অধীনেও খ্রিস্টানদের একটি বিরাট বাহিনী ছিল। হাঙ্গেরীর সম্রাট তার দেশের সর্দার ও বীর অশ্বারোহীদের নিয়ে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান নেন। পোল্যান্ডের সৈন্যরা একজন বিখ্যাত বিশপের অধিনায়কত্বে অবস্থান নেয় পশ্চাৎবর্তী বাহিনীতে। হানীদাস ছিলেন খ্রিস্টান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সুলতান মুরাদ খানও তাঁর ডান ও বাম পার্শ্বের বাহিনীর বিন্যাস সাধন করেন। তিনি ঐ সন্ধি চুক্তিকে নকল করে তাঁর বর্শার অগ্রভাগে স্থাপন করেন, যে চুক্তিটি স্বয়ং হাঙ্গেরীর সম্রাট সুলতান মুরাদ খানকে লিখে দিয়েছিলেন। ১০ নভেম্বর দারনার প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। খ্রিস্টানরা এর দু'মাস দশ দিন পূর্বেই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইতিমধ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অনেক শহরও ধ্বংস করেছে। যা হোক, হানীদাস খ্রিস্টান বাহিনীর ডান পার্শ্ব থেকে উসমানী বাহিনীর এশীয় প্লাটুনগুলোর উপর এত জোরদার হামলা চালান যে, তুর্কী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। অপরদিক থেকে ওয়াল্লেশা বাহিনী তুর্কী বাহিনীর উপর জোরদার হামলা চালায়। ফলে উসমানীয় বাহিনীর অপর পার্শ্বের অবস্থাও টলটলায়মান হয়ে ওঠে।

সুলতান মুরাদ খান নিজ বাহিনীর এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ঠিক ঐ মুহূর্তে হাঙ্গেরী সম্রাট লেভ সেলাস উসমানীয় বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশের উপর অত্যন্ত জোরদার হামলা চালান এবং শত্রুব্যূহ ভেদ করে সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যান, যেখানে সুলতান মুরাদ খান হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আপন বাহিনীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলেন। সুলতান তার শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এবার ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবেন, না শত্রুবাহিনীর উপর বেপরোয়া হামলা চালিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। ঠিক তখনি হাঙ্গেরী সম্রাট লেভ সেলাস চিৎকার দিয়ে অত্যন্ত দম্ভভরে সেখানে আবির্ভূত হন এবং সুলতানকে মুকাবিলার আহ্বান জানান। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর জুড়ে সজোরে লেভ সেলাসের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং তা তার ঘোড়ার উপর গিয়ে পড়ে। এতে ঘোড়াটি ভীষণভাবে আহত হয় এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঠিক তখনি নেগচারী বাহিনীর খাজা খায়রী নামীয় জনৈক বৃদ্ধ অধিনায়ক আগে বেড়ে লেভ সেলাসের দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং একটি বর্শায় তা গেঁথে ঐ অঙ্গীকারপত্রসহ (যা সম্রাট ও সুলতানের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল এবং সম্রাট তা একতরফাভাবে ভঙ্গ করেছিলেন) উর্ধ্বে তুলে ধরেন। হাঙ্গেরী সম্রাটের এই ছিন্ন মস্তক দেখে খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে যে সমস্ত তুর্ক পশ্চাদপসরণ করছিল তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় এবং তারা নব-উদ্যমে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর হামলা চালায়। হানীদাস ঐ ছিন্ন মস্তকটি দেখার সাথে সাথে তা ছিনিয়ে আনার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা চালান। কিন্তু প্রতিবারই তিনি বিফল হন। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান বাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে পোপের সহকারী এবং খ্রিস্টান বাহিনীর সেনাপতি কার্ডিনাল জুলিয়ান, বিশপ এবং অন্য সকল অধিনায়ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হন। শুধু হানীদাস পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। হাঙ্গেরীর গোটা বাহিনীই তুর্কদের হাতে নিহত হয়।

এই বিরাট বিজয়ের পর উসমানীয় বাহিনী সার্বিয়া জয় করে সেটাকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে বোসনিয়াও বিজিত হয় এবং সেখানকার রাজপরিবারও ধ্বংস হয়ে যায়। কোন কোন খ্রিস্টান পরিবারের উপর খ্রিস্টান রাজরাজড়াদের এবারকার এই অঙ্গীকার ভঙ্গের এমনি প্রভাব পড়ে যে,সার্বিয়া ও বোসনিয়ার অনেক খ্রিস্টান নিজে থেকেই মুসলমান হয়ে যায়। সুলতান মুরাদ খান ধর্মের ব্যাপারে নিজের দিক থেকে কারো উপর কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেননি, বরং তিনি তাঁর সমগ্র খ্রিস্টান প্রজাকে অন্যান্য সম্রাটের মত সেইসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছিলেন, যা মুসলমানরা ভোগ করত। কয়েক মাস অনবরত চেষ্টা চালিয়ে সুলতান মুরাদ খান খ্রিস্টান বিদ্রোহীদেরকে সমুচিত শাস্তি দেন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে পূর্বের চাইতেও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করেন। তারপর পুত্র মুহাম্মাদ খানকে পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে নির্জনবাসে চলে যান। মুহাম্মাদ খান পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করার পর নেগচারী বাহিনী তাঁর কাছে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানায় এবং যখন দেখে যে, সুলতান এ ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন তখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণার হুমকি দেয় ও এখানে-সেখানে লুটপাট করতে শুরু করে। এভাবে সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দেয়ায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে পুনরায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে পুনরায় সুলতান মুরাদ খানের খিদমতে হাযির হন এবং নিবেদন করেন : মহামান্য সুলতান! পুনরায় আপনি দৃষ্টি না দিলে এই বিশৃঙ্খলা দূর করা যাবে না। অতএব বাধ্য হয়ে সুলতান মুরাদ খানকে নির্জনবাস ছেড়ে এশিয়া মাইনর থেকে আড্রিয়ানোপলে আসতে হলো। এটা হচ্ছে হিজরী ৮৪৯ সনের (১৪৪৫ খ্রি) ঘটনা। যখন সুলতান মুরাদ আড্রিয়ানোপলে পৌঁছেন তখন সেনাবাহিনী ও প্রজাবৃন্দ তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। এবার সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপন পুত্র মুহাম্মাদ খানকে, যিনি গত এক বছরে দু'বার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দেন, যাতে তিনি সেখানে অবস্থান করে শাসন পরিচালনা সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর মুরাদ খান, যারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার নায়ক, তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, তৃতীয়বারের মত সিংহাসন ত্যাগ করাকে আর সমীচীন মনে করেননি। এবার শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর দ্বিতীয় মুরাদ খ্রিস্টানদেরকে পুনরায় মাথা উঠাবার অবকাশ দেননি। অবশ্য বিনা কারণে তিনি কোন অমুসলিমকে কোন কষ্টও দেননি। কনসটান্টিনোপলের সম্রাট যদিও আপন দুষ্টামি ও ফিতনাবাজির কারণে উসমানীয়দের জঘন্যতম শত্রু ছিলেন এবং যদিও তাঁকে একেবারে শেষ করে দেওয়া মুরাদ খানের জন্য তেমন কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না, তবুও তিনি তাঁকে কোনভাবে বিরক্ত না করে আপন অবস্থার উপরই থাকতে দেন। ৮৫২ হিজরীতে (১৪৪৮ খ্রি) উল্লিখিত হানীদাস তুর্কদের মূলোৎপাটনের জন্য পুনরায় খ্রিস্টান বাহিনী পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং শীঘ্রই অন্যান্যবারের মত এবারও তুর্কদের মুকাবিলায় বিরাট খ্রিস্টান বাহিনী গড়ে তোলেন। এবার কসোভা নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তিন দিন যুদ্ধ চলার পর সুলতান মুরাদ তার এই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং ইউরোপের আরো অনেক এলাকা দখল করে আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

তারপর আলবেনিয়ার বিশৃঙ্খলা দমন করতে গিয়ে সুলতান মুরাদ খান তাঁর অনেক সময় ব্যয় করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তার মৃত্যুকাল তথা হিজরী ৮৫৫ সন (১৪৫১ খ্রি) পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঐ বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন করতে পারেননি। তুর্করা যদিও অনেক পূর্বেই আলবেনিয়া জয় করেছিল, কিন্তু ঐ প্রদেশ শাসন করত সেখানকার প্রাচীন শাসকবংশ। তারা তুর্কী সুলতানকে কর দিত এবং সব ক্ষেত্রেই তাদের অধীনতা স্বীকার করত। আলবেনিয়ার শাসক জন কেসট্রাইট সুলতান মুরাদ খানের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছে আপন অল্প বয়স্ক পুত্রকেই পাঠিয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, যেন সুলতান এদেরকে জামিনস্বরূপ তাঁর কাছে রেখে দেন এবং নেগচারী বাহিনীতে ভর্তি করার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আড্রিয়ানোপলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থানকালে এই চারটি ছেলের তিনটিই অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই সংবাদ শুনে আলবেনিয়ার শাসক জন কেসট্রাইট আপন পুত্রদের মৃত্যুর ব্যাপারটি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি সুলতানকে লিখেন, আমার পুত্রদেরকে সম্ভবত আমার কোন শত্রুই বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। এতে সুলতান মুরাদ খানও দুঃখিত হন এবং আলবেনিয়া শাসকের জীবিত পুত্র (এবং সর্বজ্যেষ্ঠও) জর্জ কেসট্রাইটকে অত্যন্ত যত্নের সাথে শাহী মহলেই প্রতিপালন করতে থাকেন। ঐ ছেলেটির প্রতি সুলতানের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যখন ঐ ছেলেটির বয়স আঠারো বছর হলো তখন সুলতান তাকে একটি সেনা প্লাটুনের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। ছেলেটিও অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে আপন দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

সুলতান ছেলেটির নাম রাখেন সিকান্দার বেগ। শেষ পর্যন্ত ইনি লর্ড সিকান্দার বেগ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ৮৩৬ হিজরীতে (১৪৩২-৩৩ খ্রি) যখন আলবেনিয়া শাসকের মৃত্যু হয় তখন সিকান্দার বেগ, উসমানীয় সাম্রাজ্যের কয়েকটি জেলার প্রশাসক। সুলতান সিকান্দারকে তার পিতার স্থলে আলবেনিয়ার শাসক নিযুক্ত করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। প্রকৃতপক্ষে সিকান্দারের মধ্যে আলবেনিয়া শাসকের যোগ্যতা পুরামাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সুলতান তাকে নিজের পুত্র বলেই মনে করতেন এবং তার উপর বিরাট বিরাট প্রদেশের শাসন কর্তৃত্বও ন্যস্ত করতেন। এই সিকান্দার বেগ এক সময়ে বিদ্রোহ করতে পারে, এ চিন্তা মুরাদ খানের অন্তরে কখনো উদিত হয়নি। কিন্তু হিজরী ৮৪৭ সনে (১৪৪৩ খ্রি) তুর্কী বাহিনী যখন হানীদাসের কাছে পরাজিত হয় তখন সিকান্দার বেগ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আপন পৈতৃক রাজ্য আলবেনিয়া দখলের সংকল্প নেন। তিনি হঠাৎ একদিন সুলতানী মীর মুনশীর তাঁবুতে ঢুকে তার গলার উপর তরবারি ধরে আলবেনিয়ার সুবেদারের নামে একটি ফরমান লিখিয়ে নেন। উক্ত ফরমানে সুবেদারকে বলা হয়েছিল– সিকান্দার বেগ, যিনি সুলতানের পক্ষ থেকে ভাইসরয় হিসাবে তোমার কাছে যাচ্ছেন, তুমি তাকে আলবেনিয়ার রাজধানী এবং সমগ্র এলাকার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দাও। এই ফরমান লেখা এবং তাতে সুলতানী মহর মারার পর সিকান্দার মীর মুনশীকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর তিনি সোজা আলবেনিয়ার রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছেন। সুলতানী ফরমান পেয়ে আলবেনিয়ার সুবেদার সিকান্দারকে যাবতীয় দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। সেখানকার প্রজারাও সিকান্দারকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। এভাবে আলবেনিয়া দখল করে নেওয়ার পর সিকান্দার আলবেনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন– আমি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি ভবিষ্যতে যে

কোন মূল্যে আপন দেশকে তুর্কদের অধীনতা থেকে মুক্ত রাখব। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে খ্রিস্টানদের মধ্যে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা আলবেনিয়ায় যে সমস্ত মুসলমান রয়েছে তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সেখানকার সকল মুসলমানই খ্রিস্টানদের হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয় এবং সিকান্দার বেগ আলবেনিয়ার স্বাধীন সম্রাট হয়ে বসেন। সিকান্দার বেগ সুলতানের খাসমহলে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সুলতানের নৈকট্য তাকে এতই দুঃসাহসী করে দিয়েছিল যে, শাহযাদাদের ন্যায় জীবন যাপন করার ফলে তিনি তুর্কদেরকেও বড় একটা পরোয়া করতেন না। তিনি জন্মগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী, ধীশক্তিসম্পন্ন ও সাহসী। উপরন্তু আলবেনিয়া একটি পার্বত্য দেশ হওয়ার কারণে সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল দুর্গম। তাই বাইরের কোন হামলাকারীর সেখানে প্রবেশ করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। উপরোক্ত পরিস্থিতি এবং পরিবেশই সিকান্দার বেগকে আলবেনিয়ার স্বাধীন শাসকে পরিণত করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। এদিকে সুলতান মুরাদ খান অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে সিকান্দার বেগের প্রতি মনোনিবেশ করার মত সময় ও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। বেশ কয়েকবারই আলবেনিয়া আক্রমণ করা হলো। কিন্তু সিকান্দার বেগের অসাধারণ বীরত্ব ও সামরিক যোগ্যতার কাছে প্রতিবারই তুর্কীদের হার মানতে হলো। সিকান্দার বেগ আলবেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানী বাহিনীর মুকাবিলায় এমন অভূতপূর্ব বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন যে, খোদ তুর্কীরা একজন সুযোগ্য জেনারেল হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দান করে। সুলতান মুরাদ খান তাঁর শাসনামলে সিকান্দার বেগকে পরাজিত বা বন্দী করতে পারেননি। অবশ্য আলবেনিয়ার পাহাড়ী পরিবেশও এ ব্যাপারে তাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু ৮৭২ হিজরীতে (১৪৬৭-৬৮ খ্রি) তিনি ভেনিসের কোন একটি এলাকায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তার মৃত্যুর পর তুর্কী সিপাহীরা তার সমাধি খনন করে সেখান থেকে তার হাড়ের টুকরোগুলো খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালায় যাতে সেগুলো 'গলার তাবীয' হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাদের ধারণা মতে, ঐ হাড়ের প্রভাবে তাদের ঘরেও সিকান্দার বেগের মত বীর বাহাদুর ও যুদ্ধবিশারদ সন্তান জন্ম নেবে। সুলতান মুরাদ খান যেহেতু সিকান্দার বেগকে আপন পুত্রের মত প্রতিপালন করেছিলেন, তাই তিনি কখনো সিকান্দার বেগের মৃত্যু বা ধ্বংস কামনা করতেন না। তাঁর আশা ছিল, সে কোন এক সময়ে সঠিক পথে চলে আসবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবে। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও সিকান্দার বেগকে আপন ভাইয়ের মতই ভালবাসতেন এবং এ কারণেই তিনি সিকান্দার বেগের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাকে আলবেনিয়ার স্বাধীন শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এতদসত্ত্বেও সিকান্দার বেগ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) হামলা চালিয়ে আলবেনিয়া দখল করে নেন। সিকান্দার নিরুপায় হয়ে ভেনিসের দিকে চলে যান এবং সেখানেই ৮৭২ হিজরীতে (১৪৬৭-৬৮ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর থেকে আলবেনিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

সিকান্দার বেগ সম্পর্কিত আলোচনার ইতি এখানেই টানা হলো। সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়) ৮৫৫ হিজরীতে (১৪৫১ খ্রি) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লাশ বারূসায় নিয়ে গিয়ে

দাফন করা হয়। এই সুলতান মোট ত্রিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামলে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি পূর্বের চাইতে অনেকখানি সুদৃঢ় করে তোলেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান, আল্লাহ্‌ভীরু ও হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন।

কনসটান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)

সুলতান মুরাদ খানের মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ খান এশিয়া মাইনরে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর কয়েক মাস। পিতা জীবিত থাকাকালে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আরো দু'বার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। তখন তাঁর বয়স ছিল পনের-ষোল বছর। মুরাদ খান (দ্বিতীয়)-এর মৃত্যুর পর শাহী কর্মকর্তারা এশিয়া মাইনরে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর কাছে সংবাদ পাঠান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রওয়ানা হন এবং দানিয়াল উপত্যকা পার হয়ে আড্রিয়ানোপলে এসে পৌঁছেন। সেখানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। সার্বিয়া-সম্রাটের কন্যার দিক থেকে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের আর একজন পুত্র ছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট মাস। যখন মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর সিংহাসন আরোহণের অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছিল এবং সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আনুগত্যের বায়আত করছিলেন তখন নেগচারী বাহিনীর জনৈক অধিনায়ক এক অতি অমানুষিক আচরণ করে। সে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-কে কোন কিছু না জানিয়ে ঐ আট মাসের শাহযাদাকে হাম্মাম খানায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। খুব সম্ভবত ঐ নওমুসলিম অধিনায়ক মুহাম্মাদ খানের স্বার্থেই উপরোক্ত কাজটি করেছিল এবং তার মতে এটা ছিল মুহাম্মাদ খানের জন্য একটি বিরাট খিদমত। কেননা এই শাহযাদা হয়ত তার যৌবনকালে আপন মা তথা সার্বীয় রাজকুমারীর কারণে সার্বিয়াবাসী ও অন্যান্য খ্রিস্টানের সাহায্য নিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ খানের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে নেগচারী অধিনায়কের ঐ পৈশাচিক কাণ্ডটি মোটেই পছন্দ হয়নি। যেহেতু ছয় বছর পূর্বে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আপন পিতার জীবিতাবস্থায় অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দু'-দু'বার সিংহাসনে আরোহণ করে কোন যোগ্যতা বা দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিতে পারেন নি, তাই জনসাধারণের ধারণা ছিল, এবারও তিনি একজন দুর্বলমনা সুলতান হিসাবেই নিজেকে প্রমাণ করবেন। অথচ এ ধরনের অনুমান মোটেই যুক্তিভিত্তিক ছিল না। কেননা, ঐ সময়ে তিনি ছিলেন মাত্র পনের বছরের এক কিশোর এবং এখন একুশ-বাইশ বছরের এক মস্ত যুবক। তাছাড়া মধ্যবর্তী এ ছয় বছর তিনি খেলাধুলা করে কাটাননি, বরং নিজের প্রশাসনিক যোগ্যতা বৃদ্ধির কাজেই ব্যয় করেছেন এবং আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে বরাবরই নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সাধারভাবে মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-কেই তাঁর সৎ ভাইয়ের হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের এ অভিযোগ কোন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু মুহাম্মাদ খান পরবর্তীকালে কনসটান্টিনোপল জয় করেছিলেন, তাই গোটা খ্রিস্টান জাতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। সুলতান মুহাম্মাদ খানের (দ্বিতীয়) উপর তাদের উপরোক্ত অভিযোগ উত্থাপনও এই বিদ্বেষেরই ফলশ্রুতি। কেননা এ

ব্যাপারে সকলেই একমত যে, নেগচারী বাহিনীর অধিনায়কই ঐ শিশুকে হত্যা করেছিল। আর এটাও সবাই স্বীকার করেন যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান ঐ অধিনায়ককে এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তারা বলছেন, আপন ভাইকে হত্যা করার জন্য মুহাম্মাদ খানই এই অধিনায়ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে ভেবে দেখার বিষয়, ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন মুহাম্মাদ খান সিংহাসনে আরোহণ করছিলেন, ঐ ছোট্ট শিশুটির দিক থেকে কোনরূপ বিপদের আশংকা আদৌ ছিল না। সিংহাসন-আরোহণের অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করার পরও তিনি কোন না কোনভাবে ঐ শিশুটির প্রাণ হরণ করতে পারতেন। তাছাড়া তখন ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে সিংহাসনে বসাবার কথা কেউ চিন্তাও করেনি, বরং তখন সকলেই আড্রিয়ানোপলে মুহাম্মাদ খানের অপেক্ষা করছিলেন। এছাড়া অভিযুক্ত নেগচারী অধিনায়ক এশিয়া মাইনর থেকে সুলতান মুহাম্মাদ খানের সাথে আসে নি, বরং সে প্রথম থেকেই আড্রিয়ানোপলে ছিল। যদি সুলতান মুহাম্মাদ খান একান্তই ঐ কাজটি করাতে চাইতেন তা হলে তা ঐ সমস্ত অধিনায়কেরই কাউকে না কাউকে দিয়ে করাতেন, যারা এশিয়া মাইনর থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিল এবং যারা ছিল যে কোন ব্যাপারে তাঁর কাছে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। আড্রিয়ানোপল পৌঁছার সাথে সাথে এমন একজন অধিনায়কের উপর, যে তাঁর কাছে পরিচিত নয়, অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিরাট দায়িত্ব অর্পণ সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া সুলতান মুহাম্মাদের হুকুমেই যদি নেগচারী অধিনায়ক এই পাশবিক কাজটি করত তাহলে যখন তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তখন সে নিশ্চয়ই এই গোমর ফাঁক করে দিত। এখানে লক্ষণীয় যে,সার্বীয় রাজকুমারী তথা মুহাম্মাদ খানের সৎ-মাও ঐ সব ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা সুলতান মুহাম্মাদ খানের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য স্বয়ং রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। আরো লক্ষণীয় যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর পরবর্তী জীবনে এ ধরনের অমানুষিক একটি ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত বিজ্ঞ, করুণা হৃদয়, আল্লাহভীরু ও সৎসাহসী ব্যক্তি অনুরূপ মূর্খতাপূর্ণ ও অমানুষিক আচরণ করবেন এমনটি বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নেগচারী বাহিনীকে যেহেতু উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অতি প্রিয় বাহিনী বলে মনে করা হতো, তাই সাধারণভাবে ঐ বাহিনীর অধিনায়কদের মনে এক ধরনের বেপরোয়া মানসিকতার উদ্ভব হতে চলেছিল। সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়)-এর যুগেও তাদের মধ্যে এ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। খুব সম্ভবত এই যুবক সুলতানকে নিজের কবজায় রাখার অভিপ্রায়ে ঐ নেগচারী অধিনায়ক উক্ত দুষ্কর্মটি করেছিল। কনসটান্টিনোপলের কায়সার কনসটান্টিন এই ধোঁকায়ই পড়েছিলেন, যার কারণে তাকে একাধারে আপন রাষ্ট্র ও প্রাণ হারাতে হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

সুলতান মুরাদ (দ্বিতীয়)-এর তিন বছর পূর্বে ৮৫২ হিজরীতে (১৪৪৮ খ্রি) কায়সার জন প্লিলোগিসের মৃত্যু হলে কায়সার কনসটান্টিন (দ্বাদশ) কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনসটান্টিনও তার পূর্ববর্তী সম্রাটের মত অত্যন্ত চালাক ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে তিনি সুলতানের প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন এশিয়া মাইনরের কিছু সর্দার ও আমীরের

মাধ্যমে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেন। ফলে সুলতান মুহাম্মাদ খানকে এশিয়া মাইনরে গিয়ে উক্ত বিদ্রোহ দমন করত সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে হয়। সুলতান মুহাম্মাদ খান তখনও ঐ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেননি এমনি সময়ে কায়সার কনসটান্টিন তার কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে বলা হয় ঃ সুলতান মুরাদ খান (দ্বতীয়)-এর যুগ থেকে উসমানী বংশের আরখান নামীয় একজন শাহযাদা আমাদের এখানে নজরবন্দী অবস্থায় আছেন। তাঁর প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহের জন্য যে অর্থ সুলতানী কোষাগার থেকে আসে তার পরিমাণ আপনি বাড়িয়ে দিন। অন্যথায় আমরা ঐ শাহযাদাকে মুক্ত করে দেব এবং তিনি মুক্ত হয়ে আপনার কাছ থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে নিবেন। কায়সার যেহেতু সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-কে একজন দুর্বলচিত্ত সুলতান বলে মনে করতেন, তাই তিনি এই হুমকি প্রদানের মাধ্যমে সুলতানের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান যদি প্রকৃতই অনুরূপ দুর্বল ও ভীরু হৃদয়ের হতেন যেমনটি কায়সার ধারণা করেছিলেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই হুমকিতে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং কায়সার কনসটান্টিনের শুধু এই দাবি নয় বরং ভবিষ্যতের দাবিসমূহও পূরণ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আসল অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলত সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন গ্রীক-সম্রাট সিকান্দার (আলেকজান্ডার) এবং ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের চাইতেও অধিকতর শক্ত হৃদয় ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে,এভাবে কাজ হবে না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের বিষ দাঁত ভেংগে দেয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি বরাবর বিপন্নই থেকে যাবে। যাহোক, সুলতান উক্ত পয়গামের পরিষ্কার কোন জবাব না দিয়ে তখনকার মত কনসটান্টিনের দূতকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

এশিয়া মাইনর থেকে ফিরে এসে সুলতান মুহাম্মাদ খান সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, তিনি হানীদাস বা হানী ডেজের সাথে তিন বছরের জন্য একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই সন্ধি চুক্তির ফলে সুলতান আপন সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। এই সময়ে তিনি নেগচারী বাহিনীর যেসব সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষের মধ্যে অশিষ্টতা ও বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করেছিলেন তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নেগচারী বাহিনীর সংস্কার সাধন করেন। কায়সার কনসটান্টিন দ্বিতীয়বারের মত সুলতানের কাছে আড্রিয়ানোপলে আপন দূত পাঠান এবং সুলতানকে শাহযাদা আরখানের খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে বলেন, অন্যথায় শাহযাদাকে মুক্ত করে দেবেন বলে হুমকি প্রদান করেন। কায়সারের ঐ পয়গামের ভাষা ছিল শিষ্টতা-বর্জিত। অতএব সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) ঐ পয়গামের উত্তর দেন এভাবে যে, তিনি আরখানের খরচাদি একদম বন্ধ করে দেন এবং কায়সারের দূতদেরকে অপমান করে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই মুহূর্ত থেকেই কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এবার কায়সারের চোখ খুলে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি যাকে শেয়াল মনে করেছিলেন সে আসলে সিংহ। অতএব তিনিও আর কোনরূপ ইতস্তত না করে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এটাকে কনসটান্টিনের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতাই বলতে হবে যে, তিনি খ্রিস্টানদের দু'টি বিরাট বিরাট গ্রুপের মধ্যে

ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তখন পর্যন্ত খ্রিস্টানদের প্রটেস্ট্যান্ট ফিরকার সৃষ্টি হয়নি। প্রটেস্ট্যান্টদের সাথে খ্রিস্টানদের রোমান ক্যাথলিক ফিরকার ঘোরতর বিরোধ রয়েছে। যা হোক, ঐ যুগে সমগ্র খ্রিস্টান জগত আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল রোম শহরের পোপকে ধর্মগুরু এবং নিজেদেরকে রোমান চার্চের অধীন বলে মনে করত। অপর দল ছিল গ্রীক চার্চের অনুসারী। তারা কনসটান্টিনোপলের মহান বিশপকে নিজেদের ধর্মগুরু মনে করত। কনসটান্টিনোপলের কায়সার ছিলেন শেষোক্ত দলের পৃষ্ঠপোষক। এই দুই দলের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। যে সামান্য পার্থক্য ছিল তা হলো, রোমান তরীকার অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় উৎসবে মদের সাথে খামিরহীন রুটি ব্যবহার করত। আর কনসটান্টিনোপলের অনুসারীরা খামিরহীন রুটির পরিবর্তে খামিরযুক্ত রুটি ব্যবহার করাকে অপরিহার্য মনে করত। তবে এই খামিরহীন ও খামিরযুক্ত রুটি ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই উভয় দলের পাদ্রীদের মধ্যে দা-কুমড়ার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যেমন আজকাল নামাযে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা না বলা, রুকূর পর হাত উঠানো-না উঠানো প্রভৃতি ছোটখাট বিষয়কে কেন্দ্র করে এক ধরনের মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ভীষণ তর্কবিতর্ক, এমন কি মারামারি, কাটাকাটি হতেও দেখা যায়। যা হোক, উপরোক্ত দু'টি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি অভিপ্রায়ে কনসটান্টিনোপলের কায়সার রোমের পোপকে লিখেন ঃ আমাদের ধর্মীয় মতভেদ ভুলে যাবার সময় এসে গেছে। আমাদের উচিত মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার আকীদাসমূহ মেনে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে কনসটান্টিনোপলের গির্জাও আপনার অধীনে থাকবে। অতএব যেভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া জয় করার জন্য আপনি সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে ধর্মীয় যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছিলেন এখনও তেমনি কনসটান্টিনোপলকে রক্ষা এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য ইউরোপের সর্বত্র ধর্মীয় যুদ্ধ ঘোষণা করুন। কনসটান্টিনোপলের কায়সারের এই প্রস্তাব অত্যন্ত ফলদায়ক প্রমাণিত হয়। পোপ, যার নাম ছিল নিকলসন (পঞ্চম), অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খ্রিস্টানদেরকে ধর্মীয় যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ আরাগূন, কাস্তালা প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞ দুঃসাহসী খ্রিস্টান যোদ্ধাদের অনেকগুলো বাহিনী কনসটান্টিনোপল এসে পৌঁছে। অনুরূপভাবে স্বয়ং পোপ ডাম্বিল নামক তার একজন প্রতিনিধির অধিনায়কত্বে একটি বিরাট রোমকবাহিনী জাহাজযোগে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে প্রেরণ করেন। ভেনিস এবং জেনেভার স্থল ও নৌবাহিনীসমূহও কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হয়। এদিকে কনসটান্টিন কনসটান্টিনোপলের নগর প্রচীর সুদৃঢ় করে সমুদ্র বন্দরে প্রতিরক্ষা সামগ্রী জড় করতে থাকেন। মূল কনসটান্টিনোপলের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষের চেয়েও বেশি। কায়সার তাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। তিনি সাধারভাবে খ্রিস্টানদেরকে উৎসাহিত করেন, যেন তারা ব্যক্তিগত আয়েশ-আরাম ত্যাগ করে শহর প্রতিরক্ষা এবং শত্রুদের হামলা প্রতিরোধের জন্য তাদের শক্তি নিয়োগ করে। ইউরোপের তাবৎ খ্রিস্টান ঐতিহাসিক এমনকি এডমন্ড উইলিয়াম এবং এ.সি. ক্রেসির মত নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও কনসটান্টিনোপল বিজয়ের অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় তথা

খ্রিস্টানদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এ ক্ষেত্রে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর সত্তাকে কিভাবে কলুষিত করা যায় তারা আগাগোড়া সে চেষ্টাই করেছেন। পাছে সুলতান মুহাম্মাদ খানের অসাধারণ বীরত্ব ও বিস্ময়কর দৃঢ়তা সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায় এ কারণে তারা কনসটান্টিনোপল বাহিনী এবং তাদের জোর প্রস্তুতির কথা বর্ণনা করতে ইতস্তত করেছেন। তবু ফাঁকফোঁকরে কখনো কখনো তাঁদের কলম থেকে এমন কথাও বেরিয়ে পড়েছে, যার দ্বারা সুলতান মুহাম্মাদ খানের অনেক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী দিব্যলোকের মত উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

সুলতান মুহাম্মাদ খান আরবান নামীয় একজন নওমুসলিম বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দেন, যেন সে অবিলম্বে বৃহৎ আকৃতির কামান তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত আরবান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কনসটান্টিনের কর্মচারী হিসাবে কর্মরত ছিল। যা হোক আরবান বৃহদাকারের বেশ কয়েকটি কামান তৈরি করে। এর কোন কোনটির মাধ্যমে বরাট ওজনের গোলা নিক্ষেপ করা যেত। কয়েক বছর পূর্বেই অর্থাৎ সুলতান মুরাদ খান (দ্বিতীয়)-এর শাসনামলে উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের যুদ্ধাভিযানে কামান ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তা খুব একটা কার্যকর যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। যে সমস্ত কামান সুলতান মুহাম্মাদ খান আরবানের হাতে তৈরি করিয়েছিলেন সেগুলো স্থানান্তরের সময় খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। ঐ কামানগুলো এমনি ছিল যে, অবরোধ চলাকালীন সময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেগুলো থেকে মাত্র সাত-আটবার গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব হতো, এই সমস্ত কারণে উপরোক্ত কামানগুলো কনসটান্টিনোপল অবরোধের সময় খুব একটা মোক্ষম প্রমাণিত হয়নি। এভাবে কনসটান্টিন তার তোপখানাটি মজবুত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছিলেন। কনসটান্টিনোপল জয়ের মাত্র কিছুদিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই ইউরোপের খ্রিস্টান সম্রাটগণ এবং উসমানীয় সুলতানও যুদ্ধের মধ্যে কামান ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন, ফলে তা যুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) সর্বপ্রথম আপন সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। যখন এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যান তখন কনসটান্টিনোপল আক্রমণের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের একটি দুর্বার বাহিনী গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিক ক্রেসির মতে, সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর ঐ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তাঁর উক্তির মধ্যে যে বাড়াবাড়ি রয়েছে তা সুনিশ্চিত। কেননা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল থেকে ২৯ মে পর্যন্ত এই সাত সপ্তাহ অবরোধ চলাকালে সত্তর হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর জন্য রসদ সামগ্রীর যোগান দেওয়া উপরোক্ত অবস্থায় কোন সহজ ব্যাপার ছিল না।

৮৫৬ হিজরীতে (১৪৫২ খ্রি) উভয়পক্ষই প্রকাশ্য যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। সম্রাট কনসটান্টিন কনসটান্টিনোপলের অভ্যন্তরে সীমাতিরিক্ত রসদ-সামগ্রী একত্র করেছিলেন। তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শুধু সৈন্যবাহী নৌবহরই আসছিল না, রসদ ও অস্ত্রসামগ্রী বোঝাই ছোট-বড় জাহাজসমূহও একের পর এক কনসটান্টিনোপলের সমুদ্র বন্দরে এসে ভিড়ছিল। ইতালী এবং অন্যান্য দেশের স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার এবং অভিজ্ঞ

সামরিক অধিনায়করা কনসটান্টিনোপল শহরকে সবদিক দিয়ে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য সেখানে এসে হাযির হয়েছিলেন। সমুদ্র বন্দরের মোহনায় একটি বিরাট লৌহশিকল দুদিক থেকে এমন শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে, যে কোন জাহাজের বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। শহরবাসীরা কোন জাহাজকে অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে চাইলে ঐ শিকলটি ঢিলা করে সমুদ্রের গভীরে ছেড়ে দিত এবং জাহাজটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে পুনরায় শিকলটি এমনভাবে টেনে দেওয়া হতো যে, তখন অন্য জাহাজের ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। চৌদ্দ মাইল ব্যাসার্ধের নগর প্রাচীর অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা হয়েছিল। বন্দরের দিককার প্রাচীর কিছুটা নীচু এবং দুর্বল ছিল। কেননা এই দিক থেকে কোনরূপ হামলা বা অবরোধের আশংকা ছিল না। প্রাচীরের চারদিকে অনতিক্রম্য গভীর পরিখা খনন করা হয়েছিল। পরিখা ও প্রাচীর রক্ষার জন্য সুদৃঢ় টাওয়ারের মাধ্যমে প্রাচীরের বাইরে ও এখানে-সেখানে কামান ও তীরন্দাজ প্লাটুনসমূহ মোতায়েন করা হয়েছিল। পুরাতন টাওয়ার এবং প্রাচীরের ঐ সমস্ত অংশ যা কামান স্থাপন ও কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের কারণে ভেংগে যাওয়ার আশংকা ছিল তা মেরামতের মাধ্যমে সুদৃঢ় করে তোলা হয়। এভাবে কনসটান্টিনোপলের হিফাজত ও নিরাপত্তার ব্যাপারে যা কিছু করা সম্ভব, তার সবই করা হয়েছিল।

সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিম বসফোরাস প্রণালীর সংকীর্ণতম স্থানের এশীয় উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) যখন কনসটান্টিনোপল জয়ের সংকল্প নেন তখন উপরোক্ত দুর্গের বিপরীতে ইউরোপীয় উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেন। সম্ভবত এটাই হচ্ছে যুদ্ধের জন্য তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রস্তুতি। এই দুর্গটি রাতারাতি নির্মাণ করে তাতে কামানসমূহ স্থাপন করা হয়, যেমন এর বিপরীত দুর্গে কামানসমূহ স্থাপিত ছিল। এভাবে সুলতান মুহাম্মাদ খান বসফোরাস প্রণালীর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেন। অন্য কথায়, তিনি কৃষ্ণসাগরকে মর্মূরা সাগর থেকে পৃথক করে কায়সারের জাহাজসমূহের কৃষ্ণসাগরে অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেন। কিন্তু এতে কনসটান্টিনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। কেননা দানিয়ালের পথ দিয়ে ইতালী, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে তার কাছে সাহায্য এসে পৌঁছেছিল। সুলতান মুহাম্মাদের কাছে সর্বমোট তিনশ'টি নৌকা ছিল এবং এর প্রায় সবটিই ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। কনসটান্টিনের বৃহদাকারের চৌদ্দটি যুদ্ধ জাহাজের ক্ষুদ্রতমটির সমতুল্য একটি বড় নৌকাও সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে ছিল না।

কনসটান্টিনোপল বিজয়

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল (৮৫৭ হিজরীর ২৬ রবিউল আউয়াল) সুলতান মুহাম্মাদ খান স্থলপথে নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের সামনে গিয়ে উপনীত হন। অপর দিকে উসমানীয় জাহাজসমূহ মর্মূরা সাগরে অবস্থান নিয়ে কনসটান্টি-নোপলের সমুদ্র বন্দর তথা গোল্ডেন হর্ণের সম্মুখে সামুদ্রিক অবরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। সুলতানী নৌবহরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বালূত আগলান নামীয় জনৈক অধিনায়ক। সুলতান নগর প্রাচীর অবরোধ করে এখানে-সেখানে খণ্ডবাহিনী মোতায়েন করেন এবং অগ্রবর্তী

বাহিনীকে নির্দেশ দেন যেন তারা সুড়ঙ্গ তৈরি করতে শুরু করে এবং অতি শীঘ্রই সুড়ঙ্গসমূহ নগর প্রাচীরের সন্নিকটে নিয়ে যায়। তারপর বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন করা হয় এবং স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমে ঐ পরিখাসমূহে তীরন্দাজদের মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়, শত্রুবাহিনীর কাউকে নগর প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি মারতে দেখা মাত্র তাকে সঙ্গে সঙ্গে তীরের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করত। এই অবরোধ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় দেন। অবরোধকারীরা যত শীঘ্র সম্ভব অবরোধ বেষ্টনী সংকীর্ণ করে শহর প্রাচীরের সন্নিকটে পৌছার চেষ্টা করে। মিনজানীক এবং কামান-সমূহ উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে নগর প্রাচীরের এখানে-সেখানে গোলা ও প্রস্তর বর্ষণ করা হয়।

এদিকে অবরুদ্ধরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সবদিক দিয়েই তৈরি ছিল। জেনেভার অধিনায়ক জন অগস্টাস এবং গ্রীক অধিনায়ক ডিউক নোতারিস অত্যন্ত যোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার সাথে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আনজাম দেন। পোপ নিকলসন (পঞ্চম)-এর সহকারী কার্ডিনেল এ ক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব ও বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। এসব অধিনায়ক এবং সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব কায়সার কনসটান্টিন নিজহাতে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং রাতের বেলায়ও অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে খুব কমই অবতরণ করতেন। তিনি স্বয়ং প্রত্যেকটি সৈন্যকে উৎসাহ যোগাতেন এবং অধিনায়কদেরকে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বাহবা দিতেন। অবরোধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে নগরের বাসিন্দা এবং খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বড় বড় পাদ্রী এবং বিশপরা ধর্মের বরাত দিয়ে যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করার প্রকৃষ্টতা বর্ণনা করে রাত-দিন মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তাতে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান নগরীর সেন্ট রুমানূস গেটের সামনে আপন তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। অবরোধকারীরা এই গেট দিয়েই অধিকতর তৎপরতা শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম অবরুদ্ধরা নগর প্রাচীর এবং পরিখা থেকে বের হয়ে অবরোধকারীদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে। কিন্তু এভাবে যখন তারা উসমানীয় বাহিনীর হাতে নিহত হতে থাকে তখন কনসটান্টিন নির্দেশ দেন, কোন ব্যক্তি যেন নগর প্রাচীরের বাইরে যাবার চেষ্টা না করে। এবার দুর্গ, নগর প্রাচীর এবং টাওয়ারসমূহ থেকে কামান ও মিনজানীকের সাহায্যে অবরুদ্ধরা অবরোধকারীদের হামলার প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করে। কয়েক দিন পর নগর প্রাচীরের জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অবরুদ্ধরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে সঙ্গে সঙ্গে গর্তগুলো মেরামত করে প্রাচীরকে পূর্বের চাইতেও অধিক মজবুত করে তোলে।

সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আপন বাহিনীকে পরিখার নিকটে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় খন্দর ভরাট করে নিজেদের পায়ে চলার পথ তৈরি করে নেন। এভাবে উসমানীয় বাহিনী প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। কিন্তু প্রাচীরের উপর আরোহণ করার কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। উপরন্তু খ্রিস্টানরা তেল গরম করে প্রাচীরের উপর থেকে সুলতানী বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। অতএব বাধ্য হয়ে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়। এবার সুলতান আরেকটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রাচীরের সমান উঁচু কাঠের অনেকগুলো মিনার তৈরি করে সেগুলোর নিচে চাকা সংযোজন করেন। তারপর

ঠেলতে ঠেলতে মিনারগুলোকে প্রাচীরের কাছে নিয়ে দাঁড় করান। মিনারগুলোর সাথে একটি করে দীর্ঘ সিঁড়ি শীর্ষ দিক থেকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মিনারগুলো প্রাচীরের নিকটবর্তী হতেই সৈন্যরা সিঁড়িটির নিচের দিক উঠিয়ে লম্বালম্বিভাবে সে দিকটি দুর্গ-প্রাচীরে স্থাপন করে। ফলে খন্দকের উপর আপনা-আপনি একটি সেতু তৈরি হয়ে যায়। এবার উসমানীয় সৈন্যরা ঐ মিনারের উপর উঠে সিঁড়ি বেয়ে নগর প্রাচীরের উপর পৌছার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু অবরুদ্ধরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঐ সমস্ত মিনারের উপর জ্বলন্ত রজনের গোলা নিক্ষেপ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে মিনার এবং সিঁড়িসমূহ পুড়ে যাওয়ায় দুর্গ ধ্বংসের এই কৌশলও সফল হতে পারেনি।

১৫ এপ্রিল অর্থাৎ অবরোধ শুরু হওয়ার ৯ম দিনে এই সংবাদ এসে পৌছে যে, জেনেভার চারটি জাহাজ তুর্কী জাহাজসমূহের ব্যূহ ভেদ করে খাদ্য এবং সমরাস্ত্র নিয়ে গোল্ডেন হর্ণ অর্থাৎ কনসটান্টিনোপলের বন্দরে প্রবেশ করে শহরবাসীদের কাছে তা (খাদ্য) পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুলতান স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্র তীরে পৌছেন এবং দেখেন, অনুরূপভাবে আরো পাঁচটি শত্রু জাহাজ মর্মূরা সাগরে আসছে। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে আপন নৌ-সেনাধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন এ জাহাজগুলোকে বাধা প্রদান করতে এবং কোন মতেই বন্দরে প্রবেশ করতে না দিতে। একদিকে সুলতান এবং উসমানীয় স্থলবাহিনী সমুদ্র কিনারে দাঁড়িয়ে ঐ জাহাজগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, অপর দিকে খ্রিস্টানরাও নগর প্রাচীরের উপর চড়ে ঐ তামাশা দেখছিল। উসমানীয় জাহাজগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালিয়ে ঐ জাহাজগুলোর দীর্ঘ লাইন ভেংগে দেয়। ফলে সেগুলো বাধ্য হয়ে আগে-পিছে এবং পাশাপাশি একত্রে জড়ো হয়ে যায়। এবার উসমানীয় জাহাজগুলো সেগুলোর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং চড়াও হয়ে খ্রিস্টান মাল্লাদেরকে হত্যা ও জাহাজগুলোকে কবজা করার সব রকম প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ঐ জাহাজগুলো এত প্রকাণ্ড ও উঁচু ছিল যে, উসমানীয় সৈন্যরা নিজেদের ক্ষুদ্র ও নিচু জাহাজগুলো থেকে সেগুলোতে চড়তে পারেনি। প্রথমে যখন উসমানীয় জাহাজগুলো খ্রিস্টান জাহাজগুলোকে ঘেরাও করেছিল তখন দর্শকদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ পাঁচটি জাহাজ উসমানীয় সৈন্যদের হাতে অবশ্যই আটকা পড়বে। কিন্তু ঐ টানা-হেচড়ার মধ্যে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, সেগুলো উসমানীয় নৌকাসমূহের ঘেরাও থেকে বের হয়ে বন্দরের দিকে চলে যাচ্ছে। বন্দরে পৌছতেই অবরুদ্ধরা সঙ্গে সঙ্গে লৌহশিকলটি নিচু করে দিল এবং জাহাজগুলো অনায়াসে গোল্ডেন হর্ণে ঢুকে পড়ল। তারপর লৌহশিকলটি পুনরায় টেনে দেওয়া হলো। ফলে উসমানীয় জাহাজ-সমূহের হামলার আর কোন আশংকা রইল না। সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন নৌবাহিনীর এই ব্যর্থতা নিজ চোখে দেখে যারপরনাই দুঃখিত হন। তিনি আপন নৌ-সেনাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান এবং তাকে কঠোরভাবে শাসন করে আরো বেশি তৎপর থাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নৌ-সেনাধ্যক্ষের কোন ত্রুটি ছিল না। সে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলো দিয়ে কী করেই বা দৈত্যরূপী শত্রু জাহাজগুলোকে কবজা করবে ? কিন্তু সুলতানের সতর্ক করে দেওয়ার কারণে এবং সে অনুযায়ী নৌ-সেনাধ্যক্ষের অত্যধিক তৎপরতার ফলে তারপর কোন শত্রু-জাহাজই দানিয়াল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে মর্মূরা সাগরে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখায়নি। ঐ পাঁচটি জাহাজে চড়ে যে সেনাবাহিনী এসেছিল তারা যেন ছিল কনসটান্টিনোপলের জন্য

বাইরে থেকে আগত সর্বশেষ সাহায্যবাহিনী। সুলতান অবরোধের ক্ষেত্রে কল্পনাতীত তৎপরতা প্রদর্শন করেন। বার বার তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হন। বার বার তাঁর আক্রমণ বিফল হয়। আর অবরুদ্ধরা তাদের সাফল্য প্রত্যক্ষ করে আরো বেশি সাহসী হয়ে ওঠে। শহরের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্যের কোনই ঘাটতি ছিল না। তারা বছরের পর বছর অবরুদ্ধ থেকেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, হাঙ্গেরীর সম্রাট হানীদাস আপন সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে অবশ্যই উত্তর দিক থেকে সুলতানী বাহিনীর উপর হামলা চালাবেন। ফলে কনসটান্টিনোপলের অবরোধ আপনা-আপনি উঠে যাবে। সুলতান মুহাম্মাদ খানের স্থলে যদি অন্য কোন ব্যক্তি থাকত তাহলে এই সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করার পর নিশ্চয়ই সে অবরোধ তুলে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করত। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন তাঁর সংকল্পে অটল এবং সাহসে সুদৃঢ়। এত সব ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে কোনরূপ দুর্বলতা স্থান পায়নি বরং তাঁর প্রত্যেকটি ব্যর্থতা যেন তাঁর সংকল্পকে আরো মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিচ্ছিল।

সুলতান মুহাম্মাদ খান যখন আপন বাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হন তখন সাথে একদল আলিম, আবিদ ও যাহিদকেও নিয়ে যান। এই আল্লাহওয়ালাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রবল বাসনা তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। তিনি তাঁর পিতার জীবনের শেষ ছয় বছর ঐ সমস্ত লোকেরই সংসর্গে ছিলেন। আর ওদেরই ভালবাসার পরশে তাঁর সংকল্পের মধ্যে দৃঢ়তা এবং তাঁর কর্মতৎপরতার মধ্যে সুস্থতা ও পরিপূর্ণতা এসেছিল। কনসটান্টিনোপলের অবরোধ চলাকালেও তিনি এই সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির পরামর্শকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। ধীরে ধীরে যখন অবরোধের সময়কাল বৃদ্ধি পেল তখন এই যুবাবয়সী সুলতানের মনে এমন একটি বুদ্ধি খেলে গেল, যার কথা ইতিপূর্বে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। শহরের যে দিকে সমুদ্র ছিল (অর্থাৎ গোল্ডেন হর্ণ) সে দিকটিও সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তা অবরোধের আওতায় আসত না। অবরোধকারীরা স্থলভাগের দিকেই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল। বিশেষ করে সেন্ট রোমান্স গেটের দিকে বেশির ভাগ দুর্গবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। অতএব শহরবাসীরাও অন্যান্য দিক থেকে নিশ্চিন্ত থেকে শুধু এদিকেই তাদের যাবতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়োজিত করে রেখেছিল। সুলতান ভাবলেন, যদি গোল্ডেন হর্ণের দিক থেকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিক থেকে শহরের উপর হামলা চালানো যায় তাহলে শত্রুপক্ষের মনোযোগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তখনি নগর প্রাচীর ধ্বংস করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে তখনি হামলা চালানো সম্ভব যখন গোল্ডেন হর্ণের মোহনায় লৌহশিকল থাকবে না। কেননা এটা না সরালে ভেতরে জাহাজ প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। গোল্ডেন হর্ণের পূর্ব দিকে আনুমানিক দশ মাইল চওড়া একটি স্থলভূমি ছিল, যার অপর দিকে ছিল বসফোরাস প্রণালীর সমুদ্রভাগ, যেখানে সুলতানী জাহাজগুলো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। সুলতান জমাদিউল আউয়ালের চৌদ্দ তারিখ রাত্রে, যখন চন্দ্র কিরণে আকাশ ঝলমল করছিল ঠিক তখনি বসফোরাস থেকে আরম্ভ করে গোল্ডেন হর্ণ সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত সর্বত্রই কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। তারপর আশিটি জাহাজ বসফোরাসের কিনারে ভিড়িয়ে সেগুলোকে পাড়ে টেনে তুলেন। তারপর তাতে মাঝিমাল্লা ও সৈন্যদেরকে চড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ সেগুলোকে

ধাক্কাতে শুরু করে। ঐ সময়ে ঐ দিককার বায়ুও ছিল অনুকূল। তখন জাহাজগুলোতে পাল তুলে দেওয়া হয়। ফলে জনতা খুব একটা ধাক্কা না লাগানো সত্ত্বেও জাহাজগুলো পিচ্ছল কাঠের তক্তার উপর দিয়ে আপনা-আপনি চলতে শুরু করে। ঐ চাঁদনী রাতে শহরবাসীরা হাজার হাজার মানুষের হৈ চৈ, আনন্দ-উল্লাস, সমর-সঙ্গীত এবং নানা ধরনের বাজনার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু উসমানীয় বাহিনীর মধ্যে এটা কি হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ভোর হওয়ার পূর্বেই দশ মাইল স্থলপথের দূরত্ব অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর লোকেরা ঐ জাহাজগুলোকে ঠেলে ঠেলে গোল্ডেন হর্ণ বন্দরের পানিতে নিয়ে ছাড়ে। কনসটান্টিনের যে সমস্ত জাহাজ গোল্ডেন হর্ণে ছিল সেগুলো মোহনার মধ্যে লৌহ শিকলের ধার ঘেঁষেই সারিবদ্ধভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে তা বাইরের যে কোন জাহাজের অনুপ্রবেশ রুখে রাখে। শহরের ধার ঘেঁষে বন্দরের সম্মুখভাগে সেগুলো রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভোর হওয়ার সাথে সাথে শহরবাসীরা দেখতে পেল যে, উসমানীয় জাহাজসমূহ নগরীর নীচে একটি পুল তৈরি করে ফেলেছে এবং কামানসমূহ যথোপযুক্ত স্থানে রেখে এদিকের নগর প্রাচীরের দুর্বল অংশের উপর গোলা নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা তাদের জাহাজগুলো গোল্ডেন হর্ণের মোহনার দিক থেকে অভ্যন্তর ভাগে নিয়ে এসে উসমানীয় জাহাজগুলোর উপর হামলা চালাতে চায়, কিন্তু সুলতান পূর্ব থেকে উভয় কিনারে যে সমস্ত কামান বসিয়ে রেখেছিলেন সেগুলো খ্রিস্টান জাহাজগুলোর উপর অনবরত গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে দেখা যায়, যে জাহাজই আগে বাড়ছে সেটাই গোলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত ঐ মুহূর্তে সুলতান মুহাম্মাদ খানের কামানগুলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে হামলা পরিচালনা করায় খ্রিস্টানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে শহরের অভ্যন্তর ভাগেও তাদেরকে একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন করতে হয়।

ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ মে সম্রাট কনসটান্টিন সুলতানের কাছে একটি পয়গাম পাঠান, তাতে বলা হয়েছিল ঃ আপনি আমার উপর যে পরিমাণ কর নির্ধারণ করবেন আমি তা পরিশোধ করতে রাযী আছি। আপনি আমাকে করদাতা করে কনসটান্টিনোপলের শাসন ক্ষমতা আমার হাতেই থাকতে দিন। শহর যখন পদানত হওয়ার উপক্রম হয়েছে ঠিক তখনি সুলতান উক্ত পয়গামের যে জবাব পাঠান তা হলো, 'যদি তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে তোমাকে গ্রীসের দক্ষিণাংশ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কনসটান্টিনোপলকে আমি আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করে ছাড়ব না। সুলতান মুহাম্মাদ খান ভালভাবেই জানতেন, কনসটান্টিনোপলের এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্য যতদিন পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আশংকা থেকেই যাবে। তিনি এও জানতেন, কনসটান্টিনোপলের উসমানীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম রাজধানী হতে পারে। তিনি কনসটান্টিন এবং তাঁর পূর্ববর্তী কায়সারদের দুষ্টামিপনা সম্পর্কেও ভালভাবে অবহিত ছিলেন। তাছাড়া দীর্ঘদিনের অবরোধ এবং অনেক কষ্ট সহ্য করার পর তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, এমনি অবস্থায় কনসটান্টাইনের আবেদনক্রমে তাকে গ্রীসের দক্ষিণাংশ প্রদান করতে রাযী হওয়াও একটি রাজসিক বদান্যতা বটে। কিন্তু কনসটান্টিনের

ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল যে, তিনি হবেন পূর্বরোমের এই বিরাট এবং সুপ্রাচীন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ অধিপতি। তাই তিনি সুলতানের এই বদান্যতা থেকে উপকৃত হতে চাননি; বরং পূর্বের চাইতেও চতুর্গুণ ক্ষমতা নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

৮৫৭ হিজরীর ১৯ জমাদিউল আউয়াল (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে) সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) আপন সেনাবাহিনীর মধ্যে এই ঘোষণা দেন যে, আগামীকাল ভোরবেলা চতুর্দিক থেকে শহরের উপর আক্রমণ চালানো হবে। তখন সৈন্যদেরকে শহরের অভ্যন্তরে লুটপাট চালানোর অনুমতিও দেওয়া হবে। কিন্তু এই শর্তে যে, তারা সরকারী ইমারতগুলোর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাছাড়া যেসব নিরপেক্ষ প্রজা আনুগত্য স্বীকার করে নিরাপত্তা চাইবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে এবং দুর্বল, শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা হবে না। এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এদিকে কনসটান্টিন শহরের অভ্যন্তরে তার শাহী মহলে সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, উমারা ও সরকারী কর্মকর্তাদের একটি সভা আহ্বান করেন। তিনি জানতেন, ভোরবেলা শহরের উপর একটি চূড়ান্ত হামলা হতে যাচ্ছে। অতএব তিনি শহরবাসীদেরকে আমৃত্যু লড়ে যাবার আহ্বান জানান এবং নিজেও এই মর্মে শপথ নেন। সভা শেষে অধিনায়করা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে চলে যান এবং কায়সার সেন্ট আয়া সুফিয়া গির্জায় গিয়ে শেষবারের মত পূজা-অর্চণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গির্জা থেকে যখন প্রাসাদে ফিরে আসেন তখন সেখানে দারুণ হতাশা বিরাজ করছিল। তিনি সেখানে মাত্র কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সেন্ট রোমান্সের দিকে আসেন, যেখানে অবরোধকারীরা জোর আক্রমণ চালাচ্ছিল।

এদিকে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) ফজরের সালাত সমাপনান্তে আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের কাছে দু'আর আবেদন জানান এবং আপন বিশেষ বাহিনীতে দশ হাজার বাছাইকৃত অশ্বারোহী নিয়ে নিজেও সরাসরি হামলা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতানের পীর ও মুরশিদ, যিনি সুলতানের সঙ্গী উলামা দলের সাথেই ছিলেন, ঐ দিন নিজের জন্য একটি পৃথক তাঁবু স্থাপন করেন। তাঁবুর দরজায় তিনি একজন দারোয়ান বসিয়ে রাখেন, যাতে সে কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়। তারপর তিনি অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। যাহোক চতুর্দিক থেকে হামলা শুরু হলো। কামান ও মিনজানীকগুলো নগর প্রাচীরের এখানে সেখানে গর্তের সৃষ্টি করল এবং সুলতানী বাহিনীর সৈন্যরা ঐ সমস্ত গর্ত দিয়ে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হলো। কয়েক বারই উসমানীয় বাহিনীর বীর সিপাহীরা টাওয়ার এবং প্রাচীরের ভগ্ন অংশের উপর আরোহণ করতে সক্ষম হলো। কিন্তু ভিতরের দিক থেকে খ্রিস্টান সৈন্য, সাধারণ অধিবাসী এবং তাদের মহিলা ও শিশুরা পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে সুলতানী সৈন্যদেরকে বাধা প্রদান করে যাচ্ছিল। প্রত্যেক দিকেই ছিল এই একই অবস্থা। স্থল, পানি সব দিকেই অত্যন্ত উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সাথে হামলা অব্যাহত ছিল। চতুর্দিকে শুধু সংঘর্ষ আর সংঘর্ষ। যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই লাশের

স্তূপ। কিন্তু অবরোধকারী বা অবরুদ্ধ কোন পক্ষই যেন হার মানতে রাযী ছিল না। দুপুর বেলা এই সংঘর্ষ এক ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তখন সুলতান একজন মন্ত্রী ও সভাসদকে আপন পীর ও মুরশিদের কাছে পাঠিয়ে নিবেদন করেন : এই মুহূর্তে আমি আপনার বিশেষ দু'আর ও রূহানী সাহায্য কামনা করি। অবরুদ্ধদের সাহস ও অসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে অবরোধকারীরা যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সুলতান আশংকা করছিলেন, আজ এবং এখনি সম্ভব না হলে এই শহর দখল করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কেননা হামলাকারীরা তাদের পরিপূর্ণ সাহস ও ক্ষমতা ইতিমধ্যে প্রয়োগ করে ফেলেছে। বাদশাহের দূত যখন তার মুরশিদের তাঁবুর নিকটে গিয়ে পৌছে তখন দারোয়ান তাকে বাধা প্রদান করে। তখন ঐ দূত দারোয়ানকে শক্তভাবে এক ধমক দেয় এবং বলে, আমি হুযূরের কাছে বাদশাহের পয়গাম অবশ্যই পৌছাব। কেননা এটা হচ্ছে অত্যন্ত নাজুক ও বিপজ্জনক মুহূর্ত। এই বলে সুলতানের দূত দ্রুত দরবেশের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। সে তখন দেখে যে, ঐ আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে অবিরাম মুনাজাত করে চলেছেন। দূত ভিতরে প্রবেশ করার পর তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠান এবং বলেন, কনসটান্টিনোপল নগরী বিজিত হয়ে গেছে। দূত এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সে দেখতে পেল, সত্যি সত্যি নগর প্রাচীরের উপর সুলতানী পতাকা উড়ছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখন সুলতান দু'আর আবেদন জানিয়ে আপন মন্ত্রীকে তাঁর মুরশিদের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন তখনকার মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। আর ঠিক ঐ সময়েই সুলতানের সম্মুখবর্তী নগর প্রাচীরের অংশটি হঠাৎ আপনা-আপনি ভেংগে পড়ে এবং তা ভেংগে পড়ার সাথে সাথে গর্তের মোহনা প্রশস্ত আকার ধারণ করায় সুলতানী সৈন্যদের জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। এদিকে প্রাচীরের একটি অংশ ভেংগে পড়ল, অপর দিকে সুলতানের নৌবাহিনী ওদিককার একটি টাওয়ার দখল করে সেখানে সুলতানী পতাকা উড়িয়ে দিল। সুলতানের সাহায্যকারী রিজার্ভ বাহিনী যখন দেখতে পেল যে, টাওয়ারের উপর সুলতানী পতাকা উড়ছে এবং সম্মুখ ভাগের নগর-প্রাচীরও ভেংগে পড়েছে তখন তারাও নিজেদের অবস্থান ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুলতানী বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। এবার আক্রমণকারীরা চতুর্দিক থেকে শহরে প্রবেশের সংকল্প নেয় এবং প্রাচীরের দরজাসমূহ ভেংগে চুরমার করে সাফল্য অর্জন করে। এরপর নিমিষের মধ্যে নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে খ্রিস্টানদের লাশের স্তূপ জমে ওঠে। সুলতান আপন ঘোড়ায় চড়ে প্রাচীরের ঐ ভগ্ন অংশ দিয়েই সোজা সেন্ট আয়া সুফিয়া গির্জায় যান। গির্জায় পৌছেই তিনি আযান দেন। আর সেখানে এটাই হচ্ছে প্রথম বারের মত উত্থিত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। সুলতান এবং তাঁর সঙ্গীরা সেখানে যুহরের সালাত আদায় করে কায়মনো বাক্যে আল্লাহ্র শুকর আদায় করেন। এরপর সুলতান কনসটান্টিনের তালাশে লোক পাঠান। সেন্ট রোমান্সের নিকটে, যেখানে প্রাচীর ধ্বংস হয়েছিল সেখানে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত নির্ভীকভাবে সুলতানী বাহিনীর

মুকাবিলা করে। ওখানকার সংঘর্ষেই সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয়েছিল। ওখানেই একটি লাশের স্তূপে কনসটান্টিনের লাশও পাওয়া যায়। তাঁর দেহের মধ্যে মাত্র দু'টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। কনসটান্টিনের দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে সুলতানের খেদমতে পেশ করা হয়। এভাবেই কনসটান্টিনোপলের বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর সুলতান রাজপ্রাসাদে যান। কিন্তু সেখানে তখন এক দারুণ নীরবতা বিরাজ করছিল।

এটা হচ্ছে হিজরী ৮৫৭ সনের ২০শে জমাদিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মের ঘটনা। সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, সুলতানের পীর-মুরশিদের দু'আর ফলেই কনসটান্টিনোপলের প্রাচীর ধ্বংস হয়েছিল। এ কারণেই একটি বিষয় বহুলভাবে প্রচারিত যে, কনসটান্টিনোপল দু'আর মাধ্যমেই বিজিত হয়েছিল। যহোক ঐ দিন থেকে সুলতান মুহাম্মাদ খান 'সুলতানে ফাতিহ' (বিজয়ী সুলতান) উপাধিতে ভূষিত হন। মুসলমানদের হাতে চল্লিশ হাজার খ্রিস্টান নিহত এবং ষাট হাজার বন্দী হয়। অতি সামান্য সংখ্যক খ্রিস্টান যোদ্ধাই সেদিন স্থল অথবা জলপথে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পলায়নকারীদের বেশির ভাগই ইতালীতে এবং অতি অল্প সংখ্যকই অন্যান্য স্থানে গিয়ে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয় অথবা স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে। কায়সারের এক পৌত্র কিছুদিন পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর অতি শীঘ্রই এই বংশের নাম-নিশানা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মুছে যায়।

বিজয়ী সুলতান কনসটান্টিনোপলের অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। যে সমস্ত লোক আপন ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির দখলদার থেকে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের ঘরবাড়ি কিংবা সহায়-সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা হয়নি। খ্রিস্টানদের উপাসনাগার এবং গির্জাসমূহকে (আয়া সুফিয়া ছাড়া) পূর্বাবস্থায়ই বহাল রাখা হয়।

কনসটান্টিনোপলের প্রধান বিশপকে সুলতান তাঁর দরবারে ডেকে পাঠিয়ে তাকে এই মর্মে সুসংবাদ দেন যে, তিনি (বিশপ) যথারীতি গ্রীক-চার্চের প্রধান পুরোহিত হিসাবেই বহাল থাকবেন এবং তাঁর ধর্মীয় অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) স্বয়ং গ্রীক চার্চের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। তিনি প্রধান বিশপ এবং পাদ্রীদেরকে সেই সমস্ত ধর্মীয় অধিকারও প্রদান করেন যা তারা খ্রিস্টান সাম্রাজ্যেও ভোগ করতে পারেনি। সাধারণ খ্রিস্টানদেরকেও পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। গির্জাসমূহ এবং চার্চের প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহের জন্য বিরাট বিরাট জায়গীর প্রদান করা হয়। যে সমস্ত বন্দীকে বিজয়ী সুলতানী বাহিনী নিজেদের দাসে পরিণত করেছিল, বিজয়ী সুলতান ব্যক্তিগতভাবে নিজের সিপাহীদের কাছ থেকে তাদেরকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন এবং তাদেরকে কনসটান্টিনোপল শহরের একটি নির্দিষ্ট মহল্লায় বসবাসের সুযোগ করে দেন। যুদ্ধশেষে সুলতান লক্ষ্য করেন যে, কনসটান্টিনোপল শহরের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি হয় ধ্বংস, না হয় জনমানবহীন হয়ে পড়েছে। তখন সুলতান শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং এর অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এশিয়া মাইনর থেকে পাঁচ হাজার মুসলিম পরিবারকে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন এবং হিজরী ৮৫৭ সনের রমযান (অক্টোবর, ১৪৫৩ খ্রি) পর্যন্ত এই পাঁচ হাজার মুসলিম পরিবার কনসটান্টিনোপলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে কনসটান্টিনোপল পূর্বের চাইতেও অধিক জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

কনসটান্টিনোপল শহরের ইতিহাস

উপরোক্ত কনসটান্টিনোপল বিজয়কে বিশ্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট ঘটনা বলে মনে করা হয়। এই বিজয়ের সাথে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এরপর শুরু হয়েছে আলোর তথা আধুনিক যুগ। এই সুযোগে কনসটান্টিনোপলের ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন মনে করি। যে জায়গায় কনসটান্টিনোপল শহর নির্মিত হয়েছে সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৭ অব্দে কোন একটি বেদুঈন বংশ বাইজেন্টাস নামক একটি শহর গড়ে তুলেছিল। ঐ শহরে নানা ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে এবং তা ঐ এলাকার কেন্দ্রীয় শহর ও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। গ্রীক আলেকজান্ডারের পিতা ফিলিপস এই শহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নিতে চান, ফিলিপস অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে আপন লক্ষ্য অর্জন করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রাতের আঁধারে যখন তার বাহিনী নগর-প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল ঠিক তখনই উত্তর দিক থেকে একটি আলো প্রকাশিত হয় এবং সে আলোতে শহরবাসীরা আক্রমণকারীদের দেখে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফিলিপস শহরবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য এরূপ প্রস্তুত দেখতে পেয়ে যুদ্ধ না করেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে শহরটি রক্ষা পায়। শহরবাসীরা এই আকস্মিক ও অতর্কিত বিপদ চলে যাওয়াকে ডায়না দেবীর কৃপা বলে মনে করে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একটি মন্দির নির্মাণ করে। তারা অর্ধচন্দ্রকে নিজেদের শহরের প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করে।

এর কিছুদিন পরই আলেকজান্ডার এই শহর জয় করে আপন পিতার ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আলেকজান্ডারের পর আরো অনেক জাতি বাইজেন্টাইনকে তাদের লুটপাটের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে। এরপর কায়সার কনসটান্টিন (প্রথম) বাইজেন্টাস শহর দখল করেন। তিনি এর মনোরম প্রাসাদসমূহ ও চমৎকার অবস্থানস্থল লক্ষ্য করে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এই শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ নিয়ে একটি বিরাট শহর গড়ে তোলেন। তিনি এই নতুন শহরকে নিজের রাজধানীতে রূপান্তর করেন এবং এর নাম দেন আধুনিক রোম। কিন্তু পরবর্তীকালে কনসটান্টিনের নাম থেকে ঐ শহরটিও কনসটান্টিনোপল নামে সর্বত্র পরিচিত হয়ে ওঠে।

কনসটান্টিন (প্রথম) হিজরী ৩২৭ সনে (৯৩৮ খ্রি) কনসটান্টিনোপল শহর নির্মাণ করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত কনসটান্টিন এবং তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন মূর্তিপূজারী। কিন্তু কনসটান্টিন নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কনসটান্টিনোপল নির্মাণের তিন বছর পর তা মেরীর নামে উৎসর্গ করেন। এ উপলক্ষে বিরাট আনন্দ-উৎসব পালন করা হয়। অতএব হিজরী ৩৩০ সন (৯৪১-৪২ খ্রি) থেকে কনসটান্টিনোপলকে খ্রিস্টানদের বিশেষ শহর বলে মনে করা হতে থাকে। এরপর রোমান সাম্রাজ্য যখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন কনসটান্টিনোপল পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। এই পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্য কায়সার হেস্টিনের শাসনামলে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। তিনি কনসটান্টি-নোপলে অসংখ্য ইমারত নির্মাণ করে তার শ্রীবৃদ্ধি করেন। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে এই

শহরের উপর হামলা চালায়। এতদসত্ত্বেও তা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। মুসলমানরা সর্বপ্রথম বনূ উমাইয়ার যুগে এই শহর আক্রমণ করে। সংঘর্ষ চলাকালে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) শহীদ হন এবং তাঁকে নগর প্রাচীরের নিচেই দাফন করা হয়। সেবার মুসলমানরা সামান্যের জন্য শহরটি জয় করতে পারেনি। খ্রিস্টানরা বেশ কয়েকবারই হযরত আবূ আইয়ুব আনসারীর কবরটি নগর প্রাচীরের নিচে থেকে উঠিয়ে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তারা তাদের সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি। বিজেতা মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপল জয়ের পর হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর সমাধিপার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা 'জামি আইয়ূব' নামে খ্যাত।

আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামলে বেশ কয়েকবারই কনসটান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি চলে, কিন্তু প্রতিবারই এমন কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর হিজরী ৬০০ সনে (১২০৩-০৪ খ্রি) যখন অত্যন্ত জোরেশোরে সালীবী যুদ্ধ চলছিল তখন ভেনিসের একটি বাহিনী কনসটান্টিনোপাল জয় করে সেখানে ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ওরা রোমের পোপকে তাদের ধর্মীয় গুরু বলে মানত। ষাট বছর পর্যন্ত উক্ত সাম্রাজ্য বহাল থাকে। এরপর হিজরী ৬৬০ সনে(১২৬২ খ্রি) গ্রীক তথা পূর্বাঞ্চলীয় রোমানরা পুনরায় কনসটান্টিনোপল জয় করে সেখানে তাদের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের সেই চিরাচরিত আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রোমান পোপের আনুগত্য থেকে মুক্ত ছিল।

দু'শ' বছর পর বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ খান কনসটান্টিনোপল সাম্রাজ্যের ইতি টানেন এবং আড্রিয়ানোপলের পরিবর্তে কনসটান্টিনোপল উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। পৌনে পাঁচশ বছরেরও অধিককাল ইসলামী হুকুমত ও খিলাফতের রাজধানী থাকার পর ঐ যুগে, যখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তিতে আংকারা তুর্কীদের মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হয় তখন কনসটান্টিনোপল রাজধানী হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এতদসত্ত্বেও তা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী এবং মুসলমানদের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে সুপরিচিত।

বিজয়ী সুলতানের অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী

কনসটান্টিনোপল জয় করার পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) কয়েকদিন পর্যন্ত কনসটান্টিনোপলের নির্মাণ ও শোভা বর্ধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। সাথে সাথে তিনি এ চিন্তাও করতে থাকেন, গ্রীসের দক্ষিণাংশ, যা একটি দ্বীপের আকারে রোম সাগরে চলে গেছে, তার পুরোটাই উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ হলে ভবিষ্যতে ইতালী ও অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশসমূহের পক্ষ থেকে লুটতরাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে আশংকা রয়েছে তা অনেকাংশে লোপ পাবে। অতএব কনসটান্টিনোপল জয়ের পরবর্তী বছর সুলতান মুহাম্মাদ খান দক্ষিণ গ্রীসের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যসমূহ জয় করে সেগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। কায়সার কনসটান্টিনের বংশধররা কনসটান্টিনোপল থেকে পালিয়ে আসার পর এই দক্ষিণ গ্রীসে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই জয়ের পর কায়সার কনসটান্টাইনের পরিবারের কিছু সদস্য, যারা এখানে বিদ্যমান ছিল, ইসলাম গ্রহণ করে। যখন মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপল জয় করেছিল এবং বিজয়ানন্দে মত্ত হয়ে মাল্লারা যখন নিজেদের নৌকা থেকে নেমে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল তখন ঐ শহরের যে সমস্ত খ্রিস্টান বাইরে বেরোতে পেরেছিল তারা বন্দরে গিয়ে সেখানে দণ্ডায়মান উসমানীয় নৌকাগুলোতে চড়ে দানিয়াল উপকূলের রাস্তা ধরে দক্ষিণ গ্রীস এবং ইতালীর দিকে পালিয়ে যায়। দক্ষিণ গ্রীস জয় করে সুলতান ভেনিস রাজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ঐ রাজ্যের লোকেরা সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করে একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। হিজরী ৬০১ সনে (১২০৪-০৫ খ্রি) কনসটান্টি-নোপলের রাজ পরিবারের কূম নিনী নামক জনৈক ব্যক্তিকে ক্রুসেড যোদ্ধাদের হাঙ্গামার মধ্যে যখন কনসটান্টিনোপল থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন তিনি কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী তারাবুযূন্দ নামক স্থানে গমন করে সেখানে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপকূলীয় রাজ্যের দিকে কেউ বড় একটা লক্ষ্য দেয়নি। তাই আড়াই শ বছর পর্যন্ত সেখানে তা বহাল থাকে। যখন কোন একজন মুসলিম শাসক সেই রাজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন তখন সেখানকার খ্রিস্টান অধিপতি কোনরূপ ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুসলিম শাসকের আনুগত্য স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলে সেখানকার শাসক করদানে অস্বীকৃতি স্থাপন করেন। এশিয়া মাইনরের উপর তুর্কীদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তারাবুযূন্দকে তার অবস্থার উপরেই থাকতে দেয়, যার অবস্থান ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে। এবার কনসটান্টিনোপল জয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) এশিয়া মাইনর থেকে ঐ খ্রিস্টান রাষ্ট্রটিকে মুছে ফেলার সংকল্প নেন। কেননা কনসটান্টিনোপল বিজয় এমন ঘটনা ছিল না যে, তারাবুযূন্দের খ্রিস্টান শাসকের উপর তার কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা, তিনি ছিলেন কায়সার কনসটান্টাইনের আত্মীয় এবং তার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতিশীল। তারাবুযূন্দের এই খ্রিস্টান হাসান তাভীলের শ্বশুর ছিলেন। হাসান তাভীল সমগ্র ইরান ও আর্মেনিয়ার উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে একজন প্রতাপশালী সম্রাট বলে মনে করা হতো। অতএব ইরানের তুর্কমান সাম্রাজ্য কোন কোন সময়ে এশিয়া মাইনরের উসমানীয় সাম্রাজ্যের আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত। তাছাড়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য যে কোন হুমকি সৃষ্টির পরিপূর্ণ সুযোগ তারাবুযূন্দ রাজ্যের ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান খ্রিস্টান সম্রাটের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি এখনি এ ঝামেলার সমাপ্তি টানতে চান। অতএব তিনি গ্রীস ও ভেনিস জয় করে হিজরী ৮৬০ সনে (১৪৫৬ খ্রি) তারাবুযূন্দর উপর হামলা চালান এবং তা দখল করে আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারাবুযূন্দর রাজ্য যদিও স্বাধীন ছিল, কিন্তু সেটাকে ইরানেরই একটি অংশ মনে করা হতো। এ কারণে তারাবুযূন্দ রাজ্যের উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীলের কাছে খুব অপ্রীতিকর ঠেকে। কিন্তু সুলতান যেহেতু তারাবুযূন্দ রাজ্যকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর ইরান-সম্রাট হাসান তাভীলের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি, তাই তখন ইরান সাম্রাজ্যের সাথে তা কোন বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টিও হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে হাসান তাভীলের অন্তরের জ্বালা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে।

মোট কথা, গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের অভিযান শেষ করে সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপলে ফিরে আসেন এবং এখানে পৌঁছেই সার্বিয়া, তারপর বোসনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই এলাকা ইতিপূর্বেও উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ঐ সমস্ত এলাকার শাসকরা করদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে নিজেদের অবাধ্যতা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। তাই সুলতান মুহাম্মাদ খান এই সমস্ত ঝামেলার একটি চূড়ান্ত মীমাংসা করতে চান। তিনি সার্বিয়া এবং বোসনিয়া জয় করে সেগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের এক একটি প্রদেশ ঘোষণা করে সেখানে আপন কর্মচারী নিয়োগ করেন। যেহেতু হাঙ্গেরীর সম্রাট হানীদাসের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং হানীদাস উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং ইউরোপের অন্যান্য খ্রিস্টান শক্তির কাছে এ জন্য সাহায্য প্রার্থনাও করেছিলেন তাই সুলতান মুহাম্মাদ খান স্বয়ং হাঙ্গেরীর উপর হামলা পরিচালনার সংকল্প নেন। হিজরী ৮৬১ সনে (১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই) উসমানী বাহিনী হাঙ্গেরী অভিমুখে রওয়ানা হয়। কনসটান্টিনোপল জয়ের পর সমগ্র খ্রিস্টান রাজন্য তথা সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্ব উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া তাদের সকলেরই ধারণা ছিল, যদি সুলতান মুহাম্মাদ খান হাঙ্গেরীর রাজধানী বেলগ্রেডও কনসটান্টিনোপলের মত জয় করে ফেলেন তাহলে পশ্চিম ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত সংগীন হয়ে উঠবে। অতএব বেলগ্রেডকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক দেশ থেকেই খ্রিস্টান সৈন্যরা দলে দলে এসে সমবেত হতে থাকে। সুলতান মুহাম্মাদ খান বিভিন্ন শহর ও জনবসতি জয় করতে করতে আপন বাহিনী নিয়ে বেলগ্রেডে গিয়ে পৌঁছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরটি অবরোধ করে ফেলেন। ওদিকে হানীদাস বা হানীডেজও ছিলেন একজন অতি অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সাথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক সংঘর্ষ ও অনেক রক্তারক্তির পর উসমানীয় বাহিনী শহরের একটি অংশে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এটা ছিল শহরের নিম্নাংশ। এতদসত্ত্বেও খ্রিস্টান অধিনায়করা সাহস হারা না হয়ে শহরের উর্ধ্বাংশে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রভূত করে মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। শহরে প্রবেশকারী ইসলামী খণ্ডবাহিনী শহরের অভ্যন্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করে এবং অনবরত ছয় ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে নিজেদেরকে শহরের অভ্যন্তরে বিপজ্জনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে পশ্চাদপসরণ করে এবং শহরের বাইরে অবস্থিত নিজেদের ছাউনিতে ফিরে আসে। খ্রিস্টানরা সঙ্গে সঙ্গে শহরের ঐ অংশ (নিম্নাংশ) দখল করে সেখানে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ঘটনা ঘটে ২১শে জুলাই তারিখে। এরপর আরো বেশ কয়েকবার মুসলমানরা নগরপ্রাচীর ডিঙিয়ে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় লুটপাট চালায়, কিন্তু অবরুদ্ধদের নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞতার কারণে মুসলমানরা শহরটিকে পরিপূর্ণভাবে দখল করতে পারেনি। তাদেরকে প্রত্যেকবারই শহরের দখলকৃত এলাকাসমূহ ছেড়ে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত ৬ই আগস্ট স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) শহরের উপর চূড়ান্ত হামলা চালান। এই দিন শহরটি বিজিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ তরবারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে অনেক খ্রিস্টান অধিনায়কের মস্তক তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন, এমন কি হাঙ্গেরী-সম্রাট হানীদাসও তাঁর

তরবারির আঘাতে আহত হয়ে পিছন দিকে পালিয়ে গেছেন ঠিক সেই সময়ে সুলতান একজন খ্রিস্টান সৈন্যের হাতে আহত হন। তার উরুর উপর তরবারির ভীষণ আঘাত লাগে যে, ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব তাঁকে পালকিতে করে অকুস্থল থেকে নিয়ে আসা হয়। সুলতানের এভাবে আহত হয়ে পালকিতে চড়ে তাঁবুতে ফিরে আসার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান যে ভীষণভাবে আহত হয়েছেন সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত থাকেনি। যে উসমানীয় সৈন্যরা খ্রিস্টানদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে শহরের অভ্যন্তরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবার নিজেরাই পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে খ্রিস্টানদের সাহস বৃদ্ধি পায়। তারা এবার অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হামলা চালাতে শুরু করে। খ্রিস্টান সমাট হানীদাস যদিও সুলতানের হাতে আহত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার আহত হওয়ার সংবাদ খ্রিস্টান বাহিনীর সকলে জানতে পারেনি। তাছাড়া হানীদাস ব্যতীত খ্রিস্টানদের মধ্যে আরো অনেক অভিজ্ঞ অধিনায়ক ছিলেন, যারা বহিরাগত সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সত্য, তবে এই যুদ্ধের সামগ্রিক দায়িত্ব পালনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। এদিকে সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন তাঁর সমগ্র বাহিনীর একচ্ছত্র অধিনায়ক। অতএব তাঁর আহত হওয়ার সংবাদে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এবার খ্রিস্টানদের আক্রমণ এতই ভীষণ ছিল যে, মুসলমানরা শহর থেকে বের হয়েও নিজের তাঁবুতে টিকে থাকতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আহত সুলতানকে নিয়ে তখন তখনই কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত অনেক দূর এগিয়েও বেলগ্রেড শহর দখল করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উসমানীয় বাহিনীর এই পশ্চাদপসরণ বা পরাজয় ইউরোপকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। সমগ্র খ্রিস্টান দেশে এ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু এই ঘটনার বিশ দিন পর যুদ্ধাহত হানীদাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। অপর দিকে যুদ্ধাহত সুলতানের ক্ষত শুকাতে থাকে এবং তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিকান্দার বেগ আলবেনিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। সিকান্দার বেগ রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তার সাথে সুলতান মুহাম্মাদ খানের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই তিনি সিংহাসন আরোহণ করার পর সিকান্দার বেগের হুকুমতকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এরপর তাকে (সিকান্দার বেগকে) কোনরূপ কষ্ট দেওয়ার বা আলবেনিয়া থেকে তাকে বেদখল করার কোনরূপ চিন্তা সুলতান মুহাম্মাদ খানের অন্তরে উদিত হয়নি। কিন্তু বেলগ্রেডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর যে কারণে অন্যান্য খ্রিস্টান রাজ-রাজড়াদের সাহস কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল ঠিক সে কারণে সিকান্দার বেগের মধ্যেও অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের চিহ্নাদি ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান প্রথম প্রথম তাকে কিছুটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখেন। কিন্তু সিকান্দার বেগ যখন ভয়ানক আকারের বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন সুলতান আলবেনিয়া অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। সিকান্দার বেগ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি। আর আলবেনিয়া যেহেতু একটি পার্বত্য দেশ ও সিকান্দার বেগের জন্মভূমি ছিল এবং সেখানকার

অধিবাসীরা ছিল তার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাই উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এবং তখনকার মত আলবেনিয়া জয় করা সুলতানী সৈন্যদের জন্য সম্ভব হয়ে উঠেনি।

শেষ পর্যন্ত হিজরী ৮৬৬ সনে (১৪৬১-৬২ খ্রি) স্বয়ং সিকান্দার বেগ সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেন এবং ভবিষ্যতে সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন বলেও অঙ্গীকার করেন। সুলতান, সিকান্দার বেগের আবেদনে সাড়া দিয়ে আলবেনিয়া থেকে আপন সেনাবাহিনী হটিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু এরপরই সিকান্দার বেগ পুনরায় বিরোধিতা করতে শুরু করেন। ফলে স্বয়ং সুলতানকে পুনরায় সেনাবাহিনী নিয়ে আলবেনিয়ায় যেতে হয়। এইবার কিন্তু সিকান্দার বেগ সুলতানী হামলার ধাক্কা সামলাতে পারেননি। তাই তাকে বাধ্য হয়ে সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র ভেনিসে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য সেখানে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। সিকান্দার বেগ ভেনিসেই মারা যান এবং আলবেনিয়া পরিপূর্ণভাবে সুলতানের অধিকারে চলে আসে। বেলগ্রেড হামলার বিফলতা এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিকান্দার বেগের মত একজন ক্ষুদ্র রাজার সাথে যুদ্ধরত থাকার কারণে খ্রিস্টানদের অন্তরে কনসটান্টিনোপল বিজয়ী সুলতানের যে ভয় ঢুকেছিল তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং তারা পুনরায় সুলতানের সাথে মুকাবিলা করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে থাকে। ভেনিস রাষ্ট্র, যা মাত্র কিছুদিন পূর্বে সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেছিল, সেও পুনরায় শক্তি প্রদর্শনে উদ্যত হয়। অতএব সুলতান ভেনিস রাষ্ট্র পদানত করাকেও নিজের জন্য জরুরী মনে করেন এবং একটি অভিযান চালিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ভেনিসের অনেক শহর দখল করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত ভেনিস রাষ্ট্র তার সাকুতরী নগরী স্বয়ং সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ফলে আড্রিয়াটিক সাগরেও সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮৭৮ হিজরীতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন সেনাপতি আহমদ কাইন্দুককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং গ্রীক সাগরের দ্বীপসমূহ জয় করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। এই অবকাশে ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীল তুর্কমানও আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি ৮৭৩ হিজরীতে (১৪৬৮-৬৯ খ্রি) সুলতান আবূ সাঈদ মির্যা তাইমূরীকে হত্যা করেছিলেন। এবার তিনি এশিয়া মাইনরে সুলতান মুহাম্মাদ খানের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পান এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর তারাবুযূন্দ জয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়া মাইনরে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং প্রত্যেক বারই সুলতান মুহাম্মদ খানের অধিনায়করা তা দমন করে। সুলতান মুহাম্মাদ খান ইরানের মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে যেতে চাইতেন না। তাঁর যাবতীয় মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের ঐ মনোষ্কামনা পূরণে, যা তিনি ইতালীর রোম শহর জয় করার ব্যাপারে প্রকাশ করেছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ধীরচিত্তে এবং দৃঢ়তার সাথে ইতালী সাম্রাজ্যের দিকে আপন সাম্রাজ্য সীমা বর্ধিত করতে থাকেন এবং অন্যান্য দিক সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকেন। তিনি বেলগ্রেড অভিযানের পর দানিয়ুব সাগরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেলগ্রেডের বিজয় অভিযান আপাতত মুলতবি রেখে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ, ভেনিস প্রভৃতি এলাকা জয় করেন। এশিয়া মাইনর ও ইরানের দিকে সুলতান কখনো চোখ তুলে তাকাননি, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এর একটা কারণ

সৃষ্টি হয়ে যায়। হিজরী ৮৭৯ সনে (১৪৭৪-৭৫ খ্রি) সুলতান আপন প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূককে কারিমিয়া জয়ের জন্য কৃষ্ণসাগরের দিকে প্রেরণ করেন। কারিমিয়া উপদ্বীপ দীর্ঘদিন থেকে চেঙ্গিযী বংশের খানদের অধীন ছিল। কিছু দিন থেকে জেনেভাবাসীরা কারিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলের ইয়াফা বন্দর নিজেদের দখলে রেখেছিল। ইয়াফার উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে তারা তাদের যুদ্ধ জাহাজের সাহায্যে কারিমিয়ার খানের উপর নানা ধরনের উৎপাত সৃষ্টি করছিল। তাই কারিমিয়ার খান বাধ্য হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি অনুরোধ করেন, যেন সুলতান জেনেভাবাসীদেরকে ইয়াফা থেকে বেদখল করে সেখানে নিজেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান কারিমিয়ার খানের আবেদনে সাড়া দেন এবং আহমদ কায়দূককে একটি শক্তিশালী নৌবহর দিয়ে ইয়াফার দিকে প্রেরণ করেন। আহমদ কায়দূক চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছে চারদিন অবরোধ করে রাখার পর ইয়াফা জয় করেন এবং সেখান থেকে চল্লিশ হাজার জেনেভাবাসীকে বন্দী করেন। ইয়াফার বিরাট পরিমাণ মালে গনীমত এবং জেনেভাবাসীদের অনেকগুলো যুদ্ধজাহাজ আহমদ কায়দূকের হস্তগত হয়। কারামিয়ার খান উসমানীয় সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং ঐ তারিখ থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারিমিয়ার খানেরা কনসটান্টিনোপলের সুলতানের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকে। ইয়াফা বন্দরকে দ্বিতীয় কনসটান্টিনোপল মনে করা হতো। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ এবং কৃষ্ণসাগরের উপর উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখতে হলে ইয়াফা বন্দরের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরী ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ বছর অর্থাৎ হিজরী ৮৭৯ সনে (১৪৭৪-৭৫ খ্রি) রাশিয়ায় ঐ জার বংশই ক্ষমতাশীল ছিল, যারা আমাদের যুগের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অত্যন্ত দাপটের সাথে রাশিয়ার উপর নিজেদের শাসন পরিচালনা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে সর্বশেষ জার ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হন। তারপর রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কারিমিয়া এবং ইয়াফার উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীলের কাছে খুবই অপ্রীতিকর ঠেকে। এবার তিনি প্রকাশ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন।

৮৮০ হিজরীতে (১৪৭৫-৭৬ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খান নিজ পুত্র বায়াযীদকে এশিয়া মাইনরের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন, যাতে তিনি ওদিককার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতে পারেন। সুলতান স্বয়ং ইউরোপীয় এলাকার প্রতি মনোনিবেশ করেন। আলবেনিয়া এবং হারযেগুভিনার উপর পূর্বেই সুলতানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এবার তিনি রোম সাগরের দ্বীপগুলো একের পর এক জেনেভা ও ভেনিসের দখল থেকে কেড়ে নিতে থাকেন। এরপর হিজরী ৮৮২ সনে (১৪৭৭ খ্রি) সুলতান মুহাম্মাদ খানের সেনাপতি উমর পাশা স্বীয় দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে ভেনিসের রাজধানী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার পার্লামেন্ট তুর্কী বাহিনীকে নিজেদের নগর প্রাচীরের নিচে অবস্থানরত দেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। তারা এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, সুলতানের যখনই প্রয়োজন হবে তখন তারা তাদের সামরিক নৌবহর দিয়ে সুলতানী বাহিনীকে সাহায্য করবে। শেষ পর্যন্ত উমর পাশা নিজের ইচ্ছানুযায়ী শর্তের উপর ভেনিস-পার্লামেন্টের সাথে সন্ধি করে বিজয়ীর বেশে ভেনিস থেকে ফিরে আসেন।

৭১১ হিজরীতে (১৩১১-১২ খ্রি) ক্রুসেড যোদ্ধাদের একটি দল রোডস দ্বীপ দখল করে সেখানে একটি স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। আনুমানিক দেড়শ' বছর থেকে ঐ সমস্ত লোক উক্ত দ্বীপের উপর দখলদার ছিল। তারা আশেপাশের দ্বীপসমূহে এবং সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের বন্দরসমূহে ডাকাতি ও রাহাজানি করত। ভেনিস এবং জেনেভাবাসীরা এদেরকে কখনো ক্ষেপাত না বরং ক্রুসেড যোদ্ধা হিসাবে তাদেরকে সম্মানের নজরে দেখত। তাছাড়া ওরা খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে সাধারণত মুসলমানদের উপরই অত্যাচার-নিপীড়ন চালাত। এবার যখন সিরিয়া উপকূল থেকে শুরু করে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত সুলতানের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং প্রায় সব দ্বীপই সুলতানের দখলে এসে গেল তখন রোডসের খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব, মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য ভয়ানক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সুলতান ৮৮৫ হিজরীতে (১৪৮০ খ্রি) এই দ্বীপটি অধিকার করার জন্য একটি সামুদ্রিক নৌবহর প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এরপর সুলতান মুহাম্মাদ খান দ্বিতীয় বারের মত সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সমগ্র দ্বীপ এলাকা দখল করার পর রাজধানী অবরোধ করা হয়। শহর বিজিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সুলতানী বাহিনী শহরে প্রবেশ করে লুটপাট করতে চাচ্ছিল, সেনাপতি এই মর্মে কড়া নির্দেশ জারি করেন যে, কোন ব্যক্তি এক তিল পরিমাণ বস্তুর উপরও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এই নির্দেশ শ্রবণ করার পর সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে। এরই ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সুলতানী বাহিনীকে প্রায় বিজিত দ্বীপটি ছেড়ে চলে আসতে হয়।

যখন রোডস অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল তখন সুলতান ইতালী বিজয়ের জন্যও আপন প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূকের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী জাহাজযোগে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করেছিলেন। আহমদ কায়দূক ইতালীতে অবতরণ করে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন এবং ইতালীর 'বিজয় দ্বার' বলে কথিত আরটিন্টো শহর অবরোধ করেন। এই শহর দখল করার পর ইতালী দেশ ও রোম সাম্রাজ্য জয় করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৮৮৫ হিজরীতে (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট) আহমদ কাইদুক অস্ত্র বলে উক্ত শহর জয় করেন এবং প্রায় বিশ হাজার অবরুদ্ধ নগরবাসীকে হত্যা অথবা বন্দী করেন। এই সুদৃঢ় স্থানটি দখলে আসার পর রোম শহর জয় করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। তাই সমগ্র ইতালী রাজ্যে এক মহা আতংকের সৃষ্টি হয়। এমনকি রোমের পোপও ইতালী থেকে পালাবার আয়োজন করতে থাকেন। আরটিন্টো (তখন টরেন্টো) জয় এবং রোডস অভিযান ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ যখন সুলতান মুহাম্মাদ খানের কাছে পৌঁছে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য ও রসদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। বাহ্যত সুলতান ইয়ালদিরিমের সেই অন্তিম ইচ্ছা যে, উসমানীয় সুলতান বিজয়ী বেশে রোম শহরে প্রবেশ করে বৃহত্তম গির্জায় আপন ঘোড়াকে দানা খাওয়াবেন, পূরণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই আর বাকি ছিল না। এবার সুলতান মুহাম্মাদ খান অত্যন্ত যত্নের সাথে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং বসফোরাস প্রণালীর সমুদ্রের তীরে সামরিক পতাকা উড়িয়ে দেন। এটা ছিল সে কথারই ইঙ্গিত যে, সুলতান আপন দুর্দান্ত বাহিনী নিয়ে শীঘ্রই রওয়ানা হবেন।

ঐ সময় সুলতানের সামনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এক. ইরানের বাদশাহ হাসান তাভীলকে শাস্তি প্রদান। কেননা তিনি শাহযাদা বায়াযীদের মুকাবিলায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, এমন কি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুই. রোডস দ্বীপ দখল করা। তিন. ইতালী দেশ পরিপূর্ণভাবে জয় করে রোম নগরীতে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করা। সুলতান এগুলোর মধ্যে কোন্ কাজটি প্রথমে করবেন তা কাউকে বলেননি। সুলতান মুহাম্মাদ খানের স্বভাবই ছিল যখন তিনি স্বয়ং কোন অভিযানে বের হতেন তখন সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক, এমনকি তাঁর প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত জানতে পারতেন না, তার আসল লক্ষ্যস্থল কোথায়। একদা কোন একজন অধিনায়ক সুলতানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কোন্দিকে যাবেন এবং আপনার উদ্দেশ্য কি? তখন সুলতান এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি আমি একথা জানতে পারি যে, আমাকে একটি দাড়িও আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে তাহলে আমি সেটাকেও সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে ফেলে আগুনে নিক্ষেপ করব। সুলতান যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে কি পরিমাণ সতর্ক থাকতেন তা উপরোক্ত ঘটনা থেকে অনায়াসে বোঝা যায়। যা হোক, সব দিক থেকে সৈন্যরা কনসটান্টিনোপলে এসে জড় হচ্ছিল এবং সুলতান প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ-সামগ্রী রাতারাতি সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি এতই বিরাট ও অভূতপূর্ব ছিল যে, এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, অতি শীঘ্রই ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জয় জয়কার পড়ে যাবে। এই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ৮৮৬ হিজরীতে (১৪৮১ খ্রি)। শেষ পর্যন্ত সুলতান কনসটান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি প্রথমে ইরানের বাদশাহকে শাস্তি দিয়ে অতি শীঘ্রই সেখান থেকে ফিরে এসে রোডস দ্বীপ জয় করবেন। এরপর তিনি পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে ইতালীতে প্রবেশ করবেন। সেখানে তাঁর বীর সেনাপতি আহমদ কায়দূক টরেন্টো দখল করে আপন সুলতানের অপেক্ষায় ছিলেন। স্কটস্ (চতুর্থ)ও পলায়নের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মনস্থির করে রেখেছিলেন, সুলতানের ইতালীতে প্রবেশের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে রোম থেকে পলায়ন করবেন। কিন্তু বিধিলিপির উপর কারো হাত নেই। আল্লাহ্র ইচ্ছা এটা ছিল না যে, ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে খ্রিস্টানদের নাম-নিশানা মুছে যাক। তাই কনসটান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে মারাত্মক নুকরাস রোগে (গেঁটে বাতের কারণে পা তরঙ্গাকারে ফুলে ওঠা) আক্রান্ত হয়ে হিজরী ৮৮৬ সনের ৩রা রবিউল আউয়াল রোজ বৃহস্পতিবার (১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে তাঁর ঐ বিরাট সামরিক অভিযান মুলতবি হয়ে যায়। সুলতানের লাশ কনসটান্টিনোপল নিয়ে এসে দাফন করা হয়। তিনি মোট বায়ান্ন অথবা তেপ্পান্ন বছর জীবিত ছিলেন এবং মোট একত্রিশ বছর সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। সুলতান মুহাম্মাদ খান যে বছর আড্রিয়ানোপলে আপন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বছর হিন্দুস্থানে বাহলূল লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব বাহলূল লোদী এবং সুলতান মুহাম্মাদ খান ছিলেন সমসাময়িক। কিন্তু বাহলূল লোদী সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর হিন্দুস্থানে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের বিখ্যাত সম্রাট যায়নুল আবিদীনও ছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ খানের সমসাময়িক। কিন্তু তিনিও কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই বছরই অর্থাৎ ৮৮৬ হিজরীর ৫ই সফর (এপ্রিল ১৪৮১ খ্রি)

দাক্ষিণাত্যে সুলতান মুহাম্মাদ শাহ্ বাহমনির মন্ত্রী মালিকুত তুজ্জার খাজা জাহান মাহমুদ গাওয়ান নিহত হন। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর ঠিক এগারো বছর পর অর্থাৎ ৮৯৭ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল (জানুয়ারী ১৪৯২ খ্রি) স্পেনে ইসলামী হুকুমতের দীপ নির্বাপিত হয় এবং খ্রিস্টানরা সমগ্র গ্রানাডা দখল করে নেয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু হয় তখন স্পেনে ইসলামী হুকুমতের শেষ নিঃশ্বাস উঠানামা করছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান যদি আরো কয়েক বছর জীবিত থাকতেন এবং ইতালী বিজিত হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত তাহলে খ্রিস্টানরা গ্রানাডা থেকে ইসলামী হুকুমতের নাম-নিশানা কখনো মুছে ফেলতে পারত না। বরং গ্রানাডার তৎকালীন দুর্বল ইসলামী সাম্রাজ্যটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করে দ্রুত সমগ্র স্পেন উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ত। এরপর সমগ্র ইউরোপই ইসলামী পতাকাতলে চলে আসত। মোটকথা, সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি বিরাট বিপদ রূপে পরিগণিত হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল : একটি পর্যালোচনা

কনসটান্টিনোপল বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামল ছিল যুদ্ধবিগ্রহ এবং নানা ধরনের দাঙ্গাহাঙ্গামায় পূর্ণ। তিনি তাঁর শাসনামলে বারটি রাজ্য এবং দু'শ'র চাইতে বেশি শহর ও দুর্গ জয় করে সেগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুলতান মুহাম্মাদ খানের শাসনামলে আট লক্ষ মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তার বাহিনীর নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা সোয়া লাখের চাইতে বেশি ছিল না। তিনি নেগচারী (উৎসর্গীকৃত প্রাণ) সেনাবাহিনীর গঠন ও বিন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। ঐ নেগচারী বাহিনীকে গার্ড রেজিমেন্ট বলা হতো। ঐ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল বার হাজারের মত। তিনি এমন সব আইনকানুন জারি করেন, যার ফলে সর্বপ্রকার সামরিক ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হয় এবং দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমন একজন সুলতান, যিনি তাঁর সমগ্র শাসনামল যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যে কাটিয়েছেন। তিনি একজন উঁচু ধরনের আইনপ্রণেতাও হবেন এমনটি কখনো আশা করা যায় না। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ খানের ক্ষেত্রে তা-ই সম্ভব হয়েছিল। তিনি শুধু একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটই ছিলেন না, সেই সাথে উঁচু ধরনের একজন আইনপ্রণেতাও ছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে মন্ত্রীবর্গ, অধিনায়কবর্গ, পেশকার প্রভৃতি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে উলামায়ে দীনের একটি দলকেও স্থান দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য কর্মকর্তার চাইতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।

তিনি তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহরে এবং প্রতিটি গ্রাম ও পল্লীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমস্ত মাদ্রাসার যাবতীয় খরচাদি সরকারী কোষাগারই বহন করত। এই সমস্ত মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি স্বয়ং সুলতানই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক মাদ্রাসায় যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে সনদ প্রদান করা হতো। এই সমস্ত সনদের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যেত এবং সে যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে চাকুরী কিংবা জায়গীর প্রদান করা হতো। দীন ও দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য প্রত্যেকটি বিদ্যাই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ খান স্বয়ং

একজন যোগ্য আলিম ছিলেন। কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এ জন্যই তিনি মাদ্রাসাসমূহে শ্রেষ্ঠতম পাঠ্যসূচি চালু করতে পেরেছিলেন। আরবী, ফারসী, তুর্কী, ল্যাটিন, গ্রীক, বুলগেরীয় প্রভৃতি অনেক ভাষায়ই সুলতান শুদ্ধভাবে অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

সুলতান মুহাম্মাদ খান তাঁর সাম্রাজ্যে যে আইন জারি করেছিলেন তার সারাংশ হচ্ছে– সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের উপর আমল করতে হবে। এরপর সহীহ ও প্রামাণিক হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। এরপর চার ইমামের শরণাপন্ন হতে হবে। এই তিন স্তরের পর চতুর্থ স্তর হচ্ছে সুলতান কর্তৃক জারিকৃত হুকুম-আহকাম। সুলতান কর্তৃক জারিকৃত কোন হুকুম শরীয়ত বিরোধী হলে উলামাবৃন্দের এই অধিকার ছিল যে, তাঁরা ঐ হুকুম যে শরীয়ত বিরোধী তার প্রমাণ পেশ করবেন, যাতে সুলতান তা সঙ্গে সঙ্গে রহিত করে নিতে পারেন।

সুলতান মুহাম্মাদ খান তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, বিভাগ এবং জেলায় বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। জেলার কালেক্টরকে বেইলার বেগ, বিভাগীয় প্রধানকে সালজাক এবং সুবাদারকে পাশা উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। এই সুলতানই কনসটান্টিনোপল তথা দরবারে সালতানাতকে 'বাবেআ-লী' নাম দিয়েছিলেন, যা আমাদের যুগ পর্যন্ত ঐ নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে। বিস্মিত হতে হয় এই দেখে যে, এমন একজন সদা-যুদ্ধরত ও দিগ্বিজয়ী সুলতান কেমন করে এত দীর্ঘ সময় জ্ঞান চর্চার জন্য বের করে নিতে পারতেন। সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি রক্ষার প্রতি এতই যত্নবান ছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সাথেও কখনো রসালাপ করতেন না। একান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি কখনো দরবার বা মজলিস আহবান করতেন না। তিনি তাঁর অবসর মুহূর্তগুলো নির্জনে কাটিয়ে দিতেই পছন্দ করতেন। তাঁর কোন কথাই অনর্থক বা অহেতুক ছিল না। তিনি যোগ্য উলামাবৃন্দকে যেমন অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন, তেমনি উলামা নামধারী মূর্খ ও কাঠমোল্লাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। তিনি নামায-রোযার অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন এবং সব সময় জামাআতে নামায আদায় করতেন। কুরআন মজীদের প্রতি তার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। খ্রিস্টান এবং অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত নম্র ও বন্ধুসুলভ। শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি অযথা বাড়াবাড়ি বা কঠোরতা পছন্দ করতেন না। তাঁর আকীদা-বিশ্বাসের মর্মকথা ছিল 'আদদীনু ইউসরুন' অর্থাৎ ধর্ম সহজ-সরল ও স্বাভাবিক।

এই রহস্য সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবহিত ছিলেন যে, কাঠমোল্লা তথা গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতারা ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করে অর্থাৎ ছোট-খাট বিষয়ের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে দীন ইসলামকে মানুষের জন্য একটি আতংকের বস্তুতে পরিণত করেছে। তাই তিনি ইসলামের প্রত্যেকটি 'রুখসত' (ঔদার্য) থেকে উপকৃত হওয়াকে বৈধ মনে করতেন। একদা তাঁর দরবারে ভেনিসের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আসেন এবং নিজের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশের জন্য সুলতানের দরবারের বেশ কয়েকটি ছবি আঁকেন। সুলতান এ জন্য তাকে অনুমতিও প্রদান করেন। ছবি আঁকা শেষ হলে সুলতান প্রতিটি ছবি মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং তাতে কি কি ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা শিল্পীকে দেখিয়ে দেন। সুলতানের এ ধরনের সাধারণ ঔদার্য ও মুক্তচিন্তাকে উপলক্ষ করে ঐ যুগের কিছু সংখ্যক

ফতওয়াবাজ গোড়া মোল্লা তাঁকে কাফির, ধর্মত্যাগী ও নাস্তিক বলে ফতওয়া দেয়। কিন্তু সুলতান তাতে ঘাবড়ে যাননি। তিনি জানতেন, এ ধরনের পেশাদার কিছু মৌলভী মাওলানা সব যুগেই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা যত চেষ্টাই করুক, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং কালের অগ্রগতিকে কখনো রুখে রাখতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। সাম্রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের প্রতি সুলতান মুহাম্মাদ খানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ছিলেন কঠোর এবং দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের প্রতি উদার। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ খান আপন ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি রক্ষার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান এবং তিনি নির্জনে থাকতে খুবই পছন্দ করতেন। তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি তাঁর সাধারণ সৈন্যদের সাহায্যার্থে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদের সাথে মিলেমিশে যে কোন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তখন মনে হতো, যেন তিনি সেই মহাপ্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী সুলতান নন বরং একজন সাধারণ সিপাহী মাত্র। এ কারণেই তাঁর প্রত্যেকটি সৈন্য সুলতান মুহাম্মাদ খানকে নিজেদের স্নেহময় পিতা বলেই মনে করত। তারা যেকোন মুহূর্তে তাঁর জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধান্বিত ছিল না।

সুলতান মুহাম্মাদ খানের দেহাকৃতি ছিল মাঝামাঝি ধরনের এবং রং ছিল কটা। তাঁর চেহারায় সাধারণভাবে উদাস উদাস ভাব পরিলক্ষিত হতো। রাগান্বিত হলে তাঁকে অত্যন্ত ভয়ংকর দেখাত। তাঁর কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠার বিরোধী কোন আচরণ করলে তিনি তাকে শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করতেন। অপরাধীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ফলে তাঁর অধিকৃত সাম্রাজ্যে চুরি,ডাকাতি ও রাহাজানির নাম-নিশানাও ছিল না। এত বিরাট একটি সাম্রাজ্যকে ফিতনা, ফাসাদ, বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা দিগ্বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খানের প্রশাসনিক যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ বহন করে। আর সবচেয়ে বেশি বিস্ময় লাগে, যখন জানা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রের এই সুযোগ্য সেনাপতি কাব্যচর্চায়ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় অনায়াসে উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করতে পারতেন।

একবিংশ অধ্যায়

সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ এবং জামশীদের বিস্ময়কর কাহিনী

সুলতান মুহাম্মাদ খান মৃত্যুকালে বায়াযীদ ও জামশীদ নামীয় দুই পুত্র রেখে যান। বায়াযীদ এশিয়া মাইনর প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তিনি আমাসিয়া নামক স্থানে অবস্থান করতেন। আর জামশীদ ছিলেন কারিমিয়া প্রদেশের গভর্নর। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুকালে বায়াযীদের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর এবং জামশীদের বয়স ছিল বাইশ বছর। বায়াযীদের মেযাজ ছিল কিছুটা ভারী ও ঢিলেঢালা। অপর দিকে জামশীদ ছিলেন অত্যন্ত চালাক, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। সুলতানের মৃত্যুর সময় উভয় শাহযাদার কেউই কনসটান্টিনোপলে উপস্থিত ছিলেন না। সুলতান মুহাম্মাদ খান কারিমিয়া বিজয়ী ও আপন প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূককে ইতালী অভিযানে পাঠাবার পূর্বে সেনাপতি পদে নিয়োগ করে তার স্থলে মুহাম্মাদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ পাশা সুলতান মুহাম্মাদ খানের পর শাহযাদা জামশীদকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি সুলতানের মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখার চেষ্টা করেন এবং জামশীদের কাছে সংবাদ পাঠান ঃ তুমি শীঘ্রই কনসটান্টিনোপল চলে আস। কিন্তু এই সংবাদ গোপন থাকে নি। উৎসর্গীকৃত প্রাণ সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে প্রধানমন্ত্রী পাশাকে হত্যা করে এবং তার স্থলে ইসহাক পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসায়। তারা বায়াযীদের কাছে সংবাদ পাঠায়—সুলতান মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হও। এই নেগচারী তথা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সৈন্যরা যথেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নিয়ে কনসটান্টিনোপলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারা বণিক এবং সম্পদশালী লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায় করে এবং সবগুলো সরকারী দফতর নিজেদের কব্জায় নিয়ে যায়। এদিকে সেনাপতি আহমদ কায়দূক ইতালীর উট্রান্টো শহর দখল করে পরবর্তী বসন্ত-মওসুমে রোমের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি উট্রান্টোকে সবদিক দিয়ে প্রাচীর বেষ্টিত ও সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন, যাতে পরবর্তী যুদ্ধাভিযান চলাকালে এই শহরটি একটি পৃথক ও সুদৃঢ় কেন্দ্রের কাজ দেয়। আহমদ কায়দূক সুলতানের মৃত্যু সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উট্রান্টোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে আপন অধীনস্থ একজন অধিনায়ককে সেখানকার শাসনকর্তা ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে স্বয়ং কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নতুন সুলতানের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর সামনে ইতালীর বিজয় অভিযান সম্পর্কিত তথ্যাদি তুলে ধরা এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে পুনরায় উট্রান্টোয় প্রত্যাবর্তন করা অথবা স্বয়ং সুলতানকে ইতালীতে নিয়ে আসা। সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ বায়াযীদ পূর্বেই আমাসিয়াহ থেকে জানিতে পেরেছিলেন। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি

সেখান থেকে চার হাজার সৈন্য নিয়ে দৈনিক দু-তিন মনযিল পথ অতিক্রম করে দ্রুত কনসটান্টিনোপল এসে পৌঁছেন। তিনি এখানে পৌঁছেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নেগচারী বাহিনী তাঁর সামনেই নিজেদের শক্তির মহড়া চালায়। তাদের অধিনায়করা নতুন সুলতানের কাছে দাবি জানায় ঃ আমাদের বেতন-ভাতা এবং জায়গীরের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন, আমাদেরকে বেশি করে উপহার-উপঢৌকন দিন, অন্যথায় আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলব। বায়াযীদ নেগচারী বাহিনীর এই স্বেচ্ছাচারিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে এই নতুন রীতি প্রবর্তন করেন যে, যখনই কোন নতুন সুলতান সিংহাসন আরোহণ করবেন তখনি সেনাবাহিনীকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান বাবদ শাহী কোষাগার থেকে একটি বিরাট অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বায়াযীদের এই প্রথম দুর্বলতা একথাই প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর পিতার মত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী কোন সুলতান নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তার ভাই জামশীদের চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইসহাক পাশা এবং নেগচারী বাহিনীও তাঁকে সমর্থন করেছিল, তাই রাজকীয় কর্মকর্তারা একথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনি দৃঢ়চিত্তের অধিকারী কোন সুলতান নন, তবুও তাঁর বিরুদ্ধাচরণের সাহস পায়নি। কিছুদিন পরই প্রধানমন্ত্রী আহমদ কায়দূকও ইতালী থেকে কনসটান্টিনোপলে এসে পৌঁছেন। যেহেতু তার প্রতিদ্বন্দ্বী আহমদ পাশা (প্রধানমন্ত্রী) বায়াযীদের বিরুদ্ধে এবং জামশীদের পক্ষে ছিলেন তাই আহমদ কায়দূকও কোনরূপ ইতস্তত না করে বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর হাতে বায়আত করেন।

জামশীদের কাছে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ কিছুটা দেরিতে পৌঁছে। যখন তিনি এই সংবাদ পান তখন বায়াযীদ (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপলে এসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। তাই তিনি কনসটান্টিনোপলে না এসে এশিয়া মাইনরের শহরসমূহ দখল করতে শুরু করেন। বারুসা শহরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তিনি আপন ভাই বায়াযীদকে লিখেন ঃ পিতা সুলতান মুহাম্মাদ খান আপনাকে তাঁর 'অলীআহদ' নিয়োগ করে যান নি। অতএব আপনি একাকী সমগ্র সালতানাতের মালিক ও শাসক হতে পারেন না। এটাই সমীচীন যে, এশিয়া অঞ্চল আমার অধীনে থাক এবং আপনি ইউরোপীয় অঞ্চল শাসন করুন। বায়াযীদ জামশীদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং উত্তরে বলেন, একটি খাপে দু'টি তরবারি থাকতে পারে না। কনসটান্টিনোপলে সুলতান মুহাম্মাদ খানের বোন তথা বায়াযীদ ও জামশীদের ফুফু অবস্থান করছিলেন। তিনি আপন ভাতিজা সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর কাছে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা দুই ভাই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়বে, এটা তোমাদের কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয়। অতএব তোমার উচিত, জামশীদের হাতে এশিয়া মাইনরের সমগ্র এলাকা সমর্পণ করা। কিন্তু বায়াযীদ ফুফুর কথায় খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব দেন যে, জামশীদ যদি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে বসবাস করতে রাযী থাকে তাহলে আমি তাঁকে ক্রিমিয়া প্রদেশের আয়ের একটি অংশ তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য নিয়মিত প্রদান করবো। মোটকথা শেষ পর্যন্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন আপোস-মীমাংসা হয়নি। জামশীদ একথা ভালভাবে জানতেন যে, যদি তিনি সিংহাসন লাভ করতে না পারেন তাহলে বায়াযীদ তাকে জীবিত ছাড়বেন না। অতএব তিনি নিজের প্রাণ

রক্ষার খাতিরেই বায়াযীদের মুকাবিলায় দাঁড়ান এবং এজন্য সবরকমের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এদিকে সুলতান বায়াযীদ আপন সেনাপতি আহমদ কায়দূকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান এবং জামশীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। ৮৮৬ হিজরী মুতাবিক ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুন উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে জামশীদের বাহিনীর বেশির ভাগ অধিনায়ক নিজ নিজ অধীনস্থ বাহিনীসহ বায়াযীদের পক্ষে চলে আসে। তাই জামশীদকে বাধ্য হয়েই বায়াযীদের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

এদিকে দুই ভাই এশিয়া মাইনর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন আর অপরদিকে রোমের পোপ যিনি ইতিমধ্যে রোম থেকে পলায়নের সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন, সুলতান মুহাম্মাদ খানের মৃত্যু সংবাদ শুনে রোমেই থেকে যান এবং সমগ্র খ্রিস্টান জগতের ক্রুসেড যোদ্ধাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান ঃ তোমরা ইতালীকে বাঁচাও এবং এই সুযোগকে (সুলতানের মৃত্যু পরবর্তী বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে) কাজে লাগিয়ে অট্রান্টো থেকে তুর্কীদের বের করে দাও। পোপের এই আহ্বান খ্রিস্টান জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া পর্যন্ত প্রায় সবদেশের খ্রিস্টানরা একজোট হয়ে অট্রান্টো অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং তা অবরোধ করে ফেলে। এশিয়া মাইনরে যখন বায়াযীদ ও জামশীদের বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তখনি খ্রিস্টানরা অট্রান্টো মুসলিম বাহিনী কনসটান্টিনোপল থেকে কোন সামরিক সাহায্য পায়নি। এতদসত্ত্বেও তুর্কীরা খুব দৃঢ়তার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করে। কিন্তু পরে যখন তারা কনসটান্টিনোপলের দিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে তখন খ্রিস্টানদের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠায়, "যেহেতু প্রতিরোধের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আমাদের রয়েছে, অতএব আমাদেরকে পরাজিত করা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থেকে রক্তারক্তি করার ইচ্ছা আমাদের আর নেই। অতএব তোমরা যদি সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এই শহরটি নিয়ে নিতে চাও তাহলে আমরা তা তোমাদের হাতে সমর্পণ করতে রাযী আছি। কিন্তু এই শর্তে যে, তোমরা আমাদেরকে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে কনসটান্টিনোপলের দিকে চলে যাবার অনুমতি দেবে। খ্রিস্টানরা সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব মেনে নেয় এবং উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে একটি সন্ধিপত্র লিখে তুর্কী অধিনায়কের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে উসমানীয় বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আপন জানমালের নিরাপত্তা লাভ করে। এভাবে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তুর্কীরা শহরের দরজা খুলে দেয় এবং খ্রিস্টানদের হাতে শহরের অধিকার অর্পণ করে সেখান থেকে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টান অধনায়করা বিশ্বাসঘাতকতা করে উসমানীয় বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। এবার শহরের প্রতিটি গলি এক একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা প্রায় সমগ্র তুর্কী সৈন্যকে হত্যা করে এবং অট্রান্টোর অলিগলি তুর্কীদের রক্তে লালে লাল হয়ে ওঠে।

বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর সিংহাসনে আরোহণের পর পরই উসমানীয় সাম্রাজ্যের যে মারাত্মক ক্ষতি হয় তা এই যে, দীর্ঘদিন অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে উসমানীয়রা ইতালী জয়ের যে দরজাটি উন্মুক্ত করে নিয়েছিল তা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়, তাদের অগ্রাভিযানের কারণে

রোমের গির্জায় যে চরম হতাশা বিরাজ করছিল তা দূরীভূত হয়,— সর্বোপরি স্পেনের মুসলমানদের কাছে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য পৌঁছার যে সম্ভাবনা ছিল তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। এমনকি, আহমদ কায়দূক খ্রিস্টানদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আপন সৈন্যদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বায়াযীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইতালী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার মত অবসরই পান নি।

জামশীদ আপন ভাইয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার পর এশিয়া মাইনরে অবস্থান করাটা নিজের জন্য মোটেই নিরাপদ মনে করেননি। নিজের সঙ্গীদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করার পর কোন তুর্কী অধিনায়ক বা সুবেদারের উপর তিনি আর ভরসা করতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আপাতত নিজের আত্মরক্ষা এবং ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষের যথাযথ মুকাবিলার জন্য একমাত্র মিসর সাম্রাজ্যের উপরই ভরসা করা যেতে পারে। তখন মিসরে ছিল মামলূকীদের হুকুমত। সেখানকার বাদশাহ ছিলেন আবূ সাঈদ কায়িদ বেগ। যেহেতু মিসরে তখন আব্বাসীয় খলীফাও থাকতেন। তাই ইসলামী বিশ্ব স্বাভাবিকভাবেই মিসর সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। বায়াযীদের কাছে পরাজিত হয়ে জামশীদ মাত্র কয়েকজন আস্থাভাজন সঙ্গী, আপন মা এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি তখনো উসমানীয় সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি থেকে বের হতেই পারেন নি, এমনি সময়ে জনৈক তুর্কী অধিনায়ক আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের যাবতীয় মালপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জামশীদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যতশীঘ্র সম্ভব উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে যান। এদিকে ঐ তুর্কী অধিনায়ক জামশীদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মালপত্রাদিসহ কনসটান্টিনোপলে গিয়ে বায়াযীদের সাথে দেখা করে। তার ধারণা ছিল, জামশীদকে হয়রানি করার কারণে বায়াযীদ তার উপর খুব সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সে যখন বায়াযীদের সামনে উক্ত মালপত্র পেশ করে তখন বায়াযীদ একটি পরাজিত ও পর্যুদস্ত কাফেলার উপর লুটপাট চালানোর অপরাধে ঐ অধিনায়ককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মিসরের চারকাসী সুলতান যখন জামশীদের আগমন সংবাদ পান তখন তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং অন্যান্য বাদশাহের ন্যায় একজন রাজকীয় মেহমান হিসাবে মিসরে দিন কাটান। এরপর হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় হজ্জ পালন এবং মদীনাতুর রাসূল (সা)-এর পবিত্র মাযার যিয়ারত করে তিনি পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে বায়াযীদ এবং মিসর সম্রাটের মধ্যে পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। মিসর সম্রাট আপন সম্মানিত মেহমান শাহযাদা জামশীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মোটেই রাযী হননি বরং তিনি জামশীদকে তাঁর এই বিপদকালে সাহায্য প্রদান করাকেই নিজের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। জামশীদ মক্কা থেকে মিসরে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেন। মিসর তাঁকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। মোটামুটিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের পর জামশীদ বায়াযীদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অবশ্য তিনি তার মা ও স্ত্রীকে মিসরেই রেখে যান। তিনি ফিলিস্তীন ও সিরিয়া হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেন। বায়াযীদ এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপন অভিজ্ঞ সেনাপতি

আহমদ কায়দূককে সঙ্গে নিয়ে জামশীদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয় এবং এবারও জামশীদ পরাজিত হন। এটা হচ্ছে হিজরী ৮৮৭ সন, মুতাবিক ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ঘটনা। এশিয়া মাইনরের কিছু সংখ্যক অধিনায়কের কারণে এবারও জামশীদকে পরাজিত হতে হয়। ঐ সমস্ত লোক বায়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জামশীদকে মিসর থেকে ডেকে এনেছিল এবং তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেও এসেছিল। কিন্তু ঠিক যুদ্ধ চলাকালে তারা জামশীদকে ছেড়ে বায়াযীদের বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেয়। ফলে জামশীদের বাকি সৈন্যদের মধ্যেও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত হতে হয়। এবার পরাজয়ের পর জামশীদ মিসরের দিকে ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করেন। এমন কি তিনি বলেন ঃ এই অবস্থায় আমি আমার স্ত্রী, মা বিশেষ করে মিসরের সুলতানকে মুখ দেখাতে পারবো না। অথচ তিনি যদি মিসরে চলে যেতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে কিছুদিন পরই এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক অধিনায়করা সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মিসর থেকে কনসটান্টিনোপলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন এবং তাকেই সিংহাসনে বসাতেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরকম। তাই জামশীদ মিসরের পরিবর্তে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে গিয়ে সেখানকার অধিনায়কবৃন্দ এবং সেই সাথে খ্রিস্টান সম্রাটদের সাহায্য নিয়ে বায়াযীদের মুকাবিলা করার সংকল্প নেন। এই পরাজয়ের পর জামশীদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে এবার মাত্র ত্রিশ-চল্লিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, কিছুদিন কোথাও বিশ্রাম নিয়ে নিজের অবস্থাকে সুসংহত করতে। এজন্য মিসরই ছিল উপযুক্ত স্থান। কেননা মিসর সম্রাট তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জামশীদ মিসরের দিকে না তাকিয়ে রোডসের খ্রিস্টান পার্লামেন্টকে লিখলেন ঃ

তোমরা কি আমাকে এই অনুমতি দেবে যে, আমি তোমাদের দ্বীপে কিছুদিন অবস্থান করব ? এরপর গ্রীক ও আলবেনিয়ার দিকে চলে যাব এবং নিজের সাম্রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাব। এই পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে রোডসের শাসকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তারা জামশীদের এই সংকল্পকে কেন্দ্র করে একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনাও তৈরি করে নেয়। এটা সম্ভব ছিল যে, জামশীদ রোডস যাত্রার ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া না করে কিছুদিন সিরিয়ায়ই অবস্থান করতেন এবং পূর্বাপর বিষয়টি আরো গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখতেন। ইত্যবসরে মিসর সম্রাট নিশ্চয়ই তাঁকে মিসরে ফিরে যাবার আহ্বান জানাতেন এবং আপন মা ও স্ত্রীর ভালবাসা নিশ্চয়ই তাঁকে সে আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য করত। যাহোক উক্ত পয়গাম পেয়েই রোডস পার্লামেন্টের সভাপতি ডি. আবসান জামশীদকে লিখেন— আমরা আপনাকেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান বলে স্বীকার করি। যদি আপনি আমাদের এখানে আসেন তাহলে আমরা এটাকে নিজের জন্য একটি গর্বের বিষয় বলেই মনে করবো। আমি আপনাকে পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনি অবশ্যই রোডসে পদার্পণ করে আমাদেরকে ধন্য করুন। আমরা আমাদের সমগ্র শক্তি আপনার সেবা ও সাহায্যার্থে উৎসর্গ করলাম। আপনার যা কিছু প্রয়োজন তার সবই আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করে দেব। এই

উত্তর পেয়ে তো জামশীদ আর ইতস্তত করতে পারেন না। সুতরাং তিনি মাত্র ত্রিশজন লোককে সঙ্গে নিয়ে রোডস অভিমুখে যাত্রা করেন। দ্বীপ-উপকূলে অবতরণ করার পর তিনি দেখতে পান যে, সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একদল লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে সেখান থেকে রাজধানীতে পৌঁছিয়ে দেয়। ডি. আবসান তথা ডাবসন, যিনি পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন একদল সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং একজন রাজকীয় মেহমান হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই শাহযাদা জামশীদ বুঝতে পারেন যে, তিনি সেখানে মেহমান নন বরং একজন বন্দী। সর্বপ্রথম ডাবসন জামশীদের কাছ থেকে এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়ে নেন যে, যদি তিনি (জামশীদ) উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান হন তাহলে নাইটস্ সম্প্রদায় তথা রোডসের শাসকদেরকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। এরপর ডি. আবসান সুলতান বায়াযীদের কাছে লিখেন ঃ জামশীদ তো আমাদের কবজায় রয়েছে। যদি আপনি আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখতে চান তাহলে আমাদেরকে আপনার সবগুলো বন্দরে যাতায়াত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য করার স্বাধীনতা দিন এবং আমাদেরকে সব রকমের কর হতে অব্যাহতি দিন। এরপর আপনার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী আমাদের কাছে কোন রকমের কর বা মাশুল দাবি করতে পারবে না। আর হ্যাঁ, জামশীদকে বন্দী করে রাখার খরচাদি বাবদ আপনি অবশ্যই আমাদের কাছে বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ হাজার করে উসমানী মুদ্রা পাঠাবেন। যদি আপনি এই সমস্ত শর্ত না মানেন তাহলে আমরা জামশীদকে মুক্ত করে দেব, যাতে সে আপনার কাছে থেকে উসমানীয় সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চালায়।

বায়াযীদ বিনা দ্বিধায় ডি. আবসানের সবগুলো শর্তই মেনে নেন। তিনি পঁয়তাল্লিশ হাজার ডাকেট (তিন লক্ষ টাকার বেশি) প্রতি বছর রোডসবাসীদের কাছে পাঠাতে থাকেন। এদিকে ডি. আবসান মিসরে জামশীদের দুঃখিনী মায়ের কাছে পয়গাম পাঠান ঃ যদি তুমি বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করে আমাদের কাছে পাঠাতে থাক তাহলে আমরা তোমার পুত্র জামশীদকে বায়াযীদের হাতে তুলে দেব না, বরং তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবো। অন্যথায় সুলতান বায়াযীদ আমাদেরকে এর চাইতেও অধিক অর্থ দিতে চাচ্ছেন। অতএব আপনি আমাদের শর্ত না মানলে আমরা জামশীদকে বায়াযীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব, যাতে তিনি তাকে হত্যা করে সুলতানের ব্যাপারে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। এই পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে জামশীদের মা যে করে হোক দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ডি. আবসানের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে লিখেন ঃ আমি সর্বদা এই পরিমাণ অর্থ পাঠাতে থাকবো। মোটকথা, রোডসবাসীরা জামশীদকে তাদের বহুমুখী মুনাফা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যমে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিতে তাদের বিবেকে মোটেই বাঁধেনি। পরবর্তী সময়ে রোডসবাসীদের অন্তরে এই চিন্তার উদয় হয় যে, জামশীদকে হস্তগত করার জন্য সুলতান বায়াযীদ বা মিসর সম্রাট যে কোন সময়ে আমাদের দেশের উপর আক্রমণ চালাতে পারেন। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে আমাদের মুনাফা অর্জনের মাধ্যম তথা জামশীদ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অতএব তাকে রোডসে

রাখা ঠিক হবে না। এইসব ভেবে-চিন্তে তারা জামশীদকে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী নাইস শহরে পাঠিয়ে দেয় এবং তাকে দেখাশুনার জন্য একদল পাহারাদার নিয়োগ করে। এরপর তারা জামশীদকে নাইস থেকে অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত করতে থাকে এবং এই সময়ে শাহযাদার সঙ্গীদেরকে একের পর এক তার থেকে পৃথক করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জামশীদ একেবারে সঙ্গীহারা হয়ে যান। একটি শহরে যখন জামশীদকে রাখা হয় তখন ঘটনাক্রমে সেখানকার শাসনকর্তার কন্যা ফিল্‌পাইন হানলিয়া তার প্রেমে পড়ে। কিছুদিন পর ঐ শহর থেকেও তাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়, যে ঘরটি তারই জন্য ফ্রান্সের সম্রাট বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। হাবভাব দেখে মনে হলো এবার বুঝি শাহযাদা ফ্রান্সের সম্রাটের কবজায় চলে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন এমন একটি মহামূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, যার উপর প্রতিটি লোক আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। যে ঘরটিতে শাহযাদাকে আটকে রাখা হয় তা ছিল বহুতল বিশিষ্ট। নীচের ও উপরের তলায় নিরাপত্তা ও চৌকিদাররা থাকত। আর মধ্যতলায় রাখা হতো শাহযাদাকে। ইত্যবসরে ফ্রান্সের সম্রাট রোমের পোপ এবং অন্যান্য খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ ডি. আবসানের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই শাহযাদা জামশীদকে নিজেরই কবজায় নিয়ে যাবার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালান। শাহযাদা যেন একটি নিলামী বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটি লোক যেন এক একটি প্রতিযোগিতামূলক দর হেঁকে যাচ্ছিল। ডি. আবসান যেহেতু শাহযাদার মাধ্যমে বিশেষভাবে লাভবান হচ্ছিলেন তাই তিনি শাহযাদাকে নিজের কবজায় রাখার গুরুত্ব খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে তো বিগড়ানো চলে না। অতএব তিনি এক্ষেত্রেও একটি কূটকৌশল অবলম্বন করে। কারো পত্রেরই কোন স্পষ্ট জবাব না দিয়ে অন্য কথায় জামশীদকে কারো হাতে তুলে দেবেন, কি দেবেন না সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু না বলে তিনি একটার পর একটা শর্ত আরোপের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। হিজরী ৮৯৫ সন (১৪৯০ খ্রি) পর্যন্ত শাহযাদা জামশীদ ফ্রান্সে নজরবন্দী থাকেন এবং তাকে উপলক্ষ করে রোডসবাসীরা সুলতান বায়াযীদের কাছ থেকে যথারীতি অর্থ আদায় করতে থাকে। যখন ডি. আবসানের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, খ্রিস্টান সম্রাটগণ বিশেষ করে ফ্রান্সের সম্রাট জামশীদকে পুরোপুরি নিজেরই কবজায় নিয়ে যাবেন (যেহেতু জামশীদ সেখানেই অবস্থান করছেন) তখন তিনি তাকে নিজেরই কাছে নিয়ে আসার কৌশল অবলম্বন করেন। অপর দিকে তিনি জামশীদের মাকে লিখেন ঃ যদি তুমি ভ্রমণ-খরচা বাবদ আমার কাছে দেড় লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি তোমার পুত্রকে ফ্রান্স থেকে ফেরত এনে তোমার কাছে মিসরে পাঠিয়ে দেব। অসহায় মা সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত অর্থ পাঠিয়ে দেন। এবার ডি. আবসান তার লোকদের কাছে লিখলেন, যেন তারা জামশীদকে এখনি ফ্রান্স থেকে ইতালীতে নিয়ে আসে। ফ্রান্সের সম্রাট চার্লস সপ্তম যখন এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি জামশীদকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করে বলেন, আমি জামশীদকে কখনো আমার প্রাসাদের চৌহদ্দি থেকে বের হতে দেব না। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা-তদবীরের পর চার্লস এই শর্তে জামশীদকে ইতালী যাবার অনুমতি দেন যে, পোপ তার কাছে দশ হাজার

টাকা জামানতস্বরূপ রাখবেন। এরপর যদি তার অনুমতি ছাড়া জামশীদকে ইতালী থেকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে এই দশ হাজার টাকা আপনা-আপনি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এদিকে পোপ রোডসের শাসকদের কাছেও একটি জামানত রাখেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, জামশীদের মাধ্যমে রোডস সরকার যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা যদি জামশীদের ইতালী আসার কারণে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে স্বয়ং পোপ সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন।

যা হোক, হিজরী ৮৯৫ সনে (১৪৯০ খ্রি) শাহযাদা জামশীদ রোম নগরীতে প্রবেশ করেন। এখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং শাহী মহলেই তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ফরাসী রাষ্ট্রদূত শাহযাদার সাথে ছিলেন। যখন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও শাহযাদা পোপের সাথে দেখা করতে যান তখন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য খ্রিস্টান সর্দারের ন্যায় মাথা নুইয়ে পোপের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দরবারের কর্মকর্তারা শাহযাদাকে বার বার আহ্বান জানান। কিন্তু দিগ্বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ খানের পুত্র শাহযাদা জামশীদ তাদের সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বিজয়ী সুলভ ভঙ্গিতে মাথা উঁচু রেখেই সোজা পোপের কাছে গিয়ে বসেন এবং অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে তার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। এক ফাঁকে তিনি তাকে বলেন, আমি আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাই। পোপ তাতে সম্মত হন। তিনি নির্জনে পোপের কাছে খ্রিস্টান সর্দারদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বর্বর আচরণের একটি ফিরিস্তি দেন। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে আপন দুঃখের কাহিনী এবং মা ও স্ত্রীর বিরহ ব্যথার একটি করুণ দৃশ্য পোপের সামনে তুলে ধরেন। এই সমস্ত হৃদয় বিদারক কাহিনী পোপকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে এবং তার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তবে তিনি কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে সহানুভূতির সুরেই শাহযাদাকে বলেন, এখন মিসরে যাওয়া তোমার জন্য লাভজনক হবে না এবং তুমি তোমার পিতার সিংহাসনও উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে হাঙ্গেরী সম্রাটও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদি তুমি সে অনুযায়ী হাঙ্গেরীতে চলে যাও তাহলে অতি সহজেই তোমার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। আর এই মুহূর্তে তোমার জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে দীন ইসলাম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা। কেননা এরূপ করলে সমগ্র ইউরোপ তোমার পক্ষে দাঁড়াবে এবং তুমি অতি সহজেই কনসটান্টিনোপলের সিংহাসন দখল করে নিতে পারবে। পোপ একথা বলার সাথে সাথে জামশীদ তাকে বাধা দিয়ে বলেন ঃ শুধু উসমানীয় সাম্রাজ্য কেন, সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যও যদি আমার পদচুম্বন করে তাহলেও আমি আপনার এই প্রস্তাবে লাথি মারব। আমি দীন ইসলাম ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতে পারি না। পোপ শাহযাদার একথা শুনে তার কথার প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন এবং সাধারণভাবে কিছুটা সহানুভূতি দেখিয়ে জামশীদকে সেদিনকার মত আপন দরবার থেকে বিদায় দেন। শাহযাদা ফ্রান্সে যেমন ছিলেন, এখানেও (রোমেও) তেমনি বন্দী জীবনযাপন করতে থাকেন। জামশীদ রোমে এসেছেন শুনে মিসর সম্রাট রোমে নিজের একজন দূত পাঠান। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, এখন জামশীদকে রোম থেকে মিসরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সেজন্য জামশীদকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্যই তিনি ঐ দূতকে রোমে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) যখন শুনতে পেলেন যে, জামশীদ ইতালীতে এসেছেন তখন তিনি অনেক উপহার

উপঢৌকনসহ নিজের একজন দূতকে পোপের কাছে প্রেরণ করেন, যাতে সে পূর্বাপর বিষয়টি পোপের সাথেই মীমাংসা করে নিতে পারেন। কেননা পোপ সম্পর্কে তার এই ধারণা ছিল যে, তিনি (পোপ) নিজের ইচ্ছানুযায়ী জামশীদকে যেখানে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন।

তাছাড়া রোড্সবাসীদের ইচ্ছা পূরণ করা পোপের জন্য জরুরী নয়। মিসরের সম্রাটের দূত রোমে প্রবেশ করে প্রথমে জামশীদকে অনুসন্ধান করে এবং যখন তার সামনে গিয়ে পৌঁছে তখন তার প্রতি ঠিক সেরূপ সম্মানই প্রদর্শন করে যেরূপ কনসটান্টিনোপলের সম্রাটের প্রতি করা হয়। ঐ দূত জামশীদকে এও বলে যে, ডি. আবসান কিছু পরিমাণ অর্থ আপনার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছেন, যাতে আপনি তা খরচ করে ইতালী থেকে মিসরে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। একথা শুনে জামশীদ ঐ দূতসহ পোপের খিদমতে গিয়ে হাযির হন এবং তার কাছে এই প্রতারণার সুবিচার প্রার্থনা করেন। পোপ সামান্য কিছু অর্থ ডি. আবসানের উকিলের কাছ থেকে নিয়ে জামশীদকে দিয়ে এখানেই ঐ কাহিনীর ইতি টানেন। শেষ পর্যন্ত মিসরের দূত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মিসরে ফিরে যায়। বায়াযীদের দূত পোপের সাথে সাক্ষাত করে প্রায় সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে ফেলে, যে পরিমাণ অর্থ বায়াযীদ ডি. আবসানকে প্রদান করতেন। এরপর এদিক থেকে মোটামুটি আশ্বস্ত হয়ে বায়াযীদের দূত কনসটান্টিনোপলে ফিরে যায়। এবার পোপ জামশীদের দেখাশুনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং রোমেই বন্দী অবস্থায় জামশীদ তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত করতে থাকেন। এর তিন বছর পর পোপ (যার নাম ছিল শানিয়ূস) মারা যান এবং আলেকজাণ্ডার নামীয় জনৈক পুরোহিত তার স্থলাভিষিক্ত হন। এই নতুন পোপ দুষ্টামির ক্ষেত্রে পূর্বেকার পোপের চাইতেও অগ্রণী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই সুলতান বায়াযীদের দরবারে দূত পাঠিয়ে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ চল্লিশ হাজার ডাকেট, যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত আছে, তা আপনি আমার কাছে নিয়মিত পাঠাতে থাকুন। আর হ্যাঁ, অতিরিক্ত তিন লাখ ডাকেটও যদি একই কিস্তিতে পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি চিরদিনের জন্য জামশীদের আশংকা থেকে আপনাকে রেহাই দিতে পারি অর্থাৎ তাকে হত্যা করে ফেলতে পারি। পোপ আলেকজাণ্ডারের ঐ দূতের নাম ছিল জর্জ। সে কনসটান্টিনোপলের রাজ দরবারে হাযির হয়ে এমন যোগ্যতার সাথে ও এমন সুন্দরভাবে আপন বক্তব্য পেশ করে যে, সুলতান বায়াযীদ তাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং পোপের কাছে এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, আপনি এই সুযোগ্য দূতকে আপনার সহকারী পদে নিয়োগ করুন। পোপের দূত তখনো কনসটান্টিনোপলেই ছিল, এমনি সময়ে অর্থাৎ হিজরী ৯০১ সনে (১৪৯৫-৯৬ খ্রি) ফ্রান্স সম্রাট চার্লস (সপ্তম) ইতালী আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, ফ্রান্স সম্রাট শাহযাদা জামশীদকে এই নতুন পোপের কাছ থেকে নিজের কাছেই নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। সপ্তম চার্লসের ইতালী আক্রমণের সাথে সাথে পোপ আলেকজান্ডার রোম থেকে পালিয়ে গিয়ে সেন্ট এঞ্জেলো দুর্গে আশ্রয় নেন। যাওয়ার সময় তিনি শাহযাদা জামশীদের মত অতি মূল্যবান সম্পদটিও সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলেন নি। এগারো দিন পর পোপ এবং ফ্রান্স সম্রাটের মধ্যে একটি আপোসচুক্তি সম্পাদনের শর্তাদি নিরূপণের জন্য এক বৈঠক বসে। তখন

সর্বপ্রথম যে শর্তটি চার্লস পেশ করেন তা হলো, শাহযাদা জামশীদ আমার কবজায় থাকবেন। শেষ পর্যন্ত পোপ, চার্লস এবং জামশীদ এই তিন ব্যক্তি একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। তখন পোপ জামশীদকে সম্বোধন করে বলেন ঃ শাহযাদা, আপনি কি এখানে থাকতে চান, না ফ্রান্স সম্রাটের কাছে? তখন জামশীদ বলেন, আমি তো এখন শাহযাদা নই, বরং একজন বন্দী মাত্র। আপনারা আমাকে যেখানে চান সেখানেই রাখুন। এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই। যা হোক শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স-সম্রাট জামশীদকে নেপলসে এনে রাখেন এবং সেখানে তাঁকে দেখাশুনার জন্য জনৈক সরদারের নেতৃত্বে একদল পাহারাদার নিয়োগ করেন। এখন থেকে জামশীদকে উপলক্ষ করে বায়াযীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের যে পরিকল্পনা পোপ করেছিলেন তা মাঠে মারা যায়। অথচ সুলতান বায়াযীদ তাকে তিন লক্ষ ডাকেট প্রদান করতে ইতিমধ্যে তৈরিই হয়ে গিয়েছিলেন এবং পোপের দূতের সাথে বিষয়টির একটি নিষ্পত্তিও হয়ে গিয়েছিল। পোপ যেহেতু অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন তাই তিনি সুলতান বায়াযীদকে লিখেন ঃ জামশীদ যদিও এখান থেকে চলে গেছেন, তবু আমি যে করে হোক তাকে খতম করে আপনার কাছ থেকে সে অর্থ অবশ্যই লাভ করবো, যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছেন। এরপর পোপ আলেকজাণ্ডার এই কাজের জন্য একজন গ্রীক নাপিতকে মনোনীত করেন। ইতিপূর্বে ঐ গ্রীক নাপিত ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তখন তার নাম রাখা হয়েছিল মুস্তাফা। পরবর্তী সময়ে সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইতালীতে এসে বসবাস করতে থাকে। সে আপন পেশার সুবাদেই পোপের সংসর্গে আসার সুযোগ পায়। যাহোক পোপ ঐ নাপিতকে নেপলসে পাঠান এবং তার সাথে একটি বিষের বড়ি দিয়ে বলেন, তুমি যে করে হোক, জামশীদকে এটা খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে। ঐ বিষের প্রভাব এরূপ ছিল যে, তা খেলে কোন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত না, বরং একটার পর একটা অসুখে ভুগতে থাকত এবং কোন ওষুধেই কাজ দিত না। ফলে কিছুদিন পরই সে মারা যেত। নাপিতটি নেপলসে যায় এবং নিজের পেশার সুবাদে আস্তে আস্তে শাহযাদা জামশীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। শাহযাদার মত একজন ভদ্র-কয়েদীর কাছে নাপিতকে একাকী যেতে রক্ষীরা কোন আপত্তি করত না। কেননা এর দিক থেকে তো আশংকার কোন কারণ ছিল না এবং থাকতেও পারে না। শেষ পর্যন্ত নাপিত কোন এক সুযোগে জামশীদকে বিষের বড়িটি খাইয়ে দেয়। ফলে শাহযাদা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন তিনি তার মায়ের কাছ থেকে একটি পত্র পান। কিন্তু সে পত্রটি খুলে পড়ার মত শক্তিও তাঁর দেহে ছিল না। তখন আপনা-আপনি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঃ প্রভো, যদি এই কাফিররা আমাকে উপলক্ষ করে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় তাহলে আমাকে এখনি উঠিয়ে নিন এবং মুসলমানদেরকে এই ক্ষতি থেকে বাঁচান। নাপিতটি যদিও অজ্ঞাত পন্থায় শাহযাদাকে বিষ খাইয়েছিল, কিন্তু সে এটাকে যথেষ্ট মনে না করে ঐ বিষে সিক্ত ক্ষুর দ্বারা জামশীদের মাথাও কামিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে জামশীদের চামড়ার মধ্যেও বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

যাহোক, যেদিন জামশীদ উপরোক্ত দু'আ করেন সেদিনই তাঁর প্রাণপাখী দেহ ছেড়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। এটা হচ্ছে হিজরী ৯০১ সনের (১৪৯৫-৯৬ খ্রি) ঘটনা। জামশীদ মোট তের

বছর খ্রিস্টানদের বন্দীশালায় অমানষিক নির্যাতন ভোগ করে ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বায়াযীদের আবেদনক্রমে খ্রিস্টানরা তাঁর লাশটি বায়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং বায়াযীদ সেটিকে বারুসায় দাফন করেন। সুলতান বায়াযীদ আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পোপ ইস্কান্দরের প্রাপ্যও পরিশোধ করে দেন। তিনি মুস্তাফা নামীয় ঐ নাপিতকেও নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং উপহার স্বরূপ তাকে নিজের মন্ত্রী পদ দান করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে বায়াযীদ তাঁর প্রাথমিক দিনগুলোতে একজন তুর্কী অধিনায়ককে হত্যা করেছিলেন এই অপরাধে যে, সে পথিমধ্যে জামশীদের মালপত্র লুটপাট করেছিল,— সেই বায়াযীদই বারো-তের বছর একজন নাপিতকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেন এই প্রেক্ষাপটে যে, সে জামশীদকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল এবং ঐ তুর্কী অধিনায়কের অনুপাতে অনেক গুণ বেশি অপরাধ করেছিল। উসমানীয় সুলতানদের আলোচনা প্রসংগে শাহযাদা জামশীদের ঐ হৃদয়বিদারক কাহিনী এখানে সবিস্তারে এজন্য তুলে ধরা হলো, যাতে পাঠক ঐ যুগের খ্রিস্টান সম্রাটদের চরিত্র সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারেন। ঐ খ্রিস্টান শাসকরা কিভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সুলতান জামশীদকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিভাবে তাঁকে উপলক্ষ করে নানা ধরনের ফায়দা লুটেছিলেন, কিভাবে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন এবং নিজেদের উপর থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিজয় অভিযান ঠেকাবার জন্য তারা শাহযাদা জামশীদকে 'চাঁই' বানিয়ে কিভাবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চক্রান্ত করেছিলেন পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন।

সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)

সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) তাঁর পিতা সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়)-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৮৮৬ হিজরীতে ((১৪৮১ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে হিজরী ৯১৮ সন (১৫১২ খ্রি) পর্যন্ত মোট বত্রিশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরই তাঁকে আপন ভাই জামশীদের মুকাবিলায় নামতে হয়। তাদের মধ্যে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় যুদ্ধেই বায়াযীদ জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর এই বিজয় উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। জামশীদ খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী হওয়ার কারণে বায়াযীদ (দ্বিতীয়) ইতালী ও রোডসের উপর হামলা চালানোর সাহস পাননি। এদিকে মিসরের মামলূকী সাম্রাজ্যের সাথে তাঁর সম্বন্ধ তিক্ত হয়ে ওঠে। শাহযাদা জামশীদ যেহেতু প্রথমে মিসরেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং জামশীদের পরিবার ও সঙ্গী-সাথীরা যেহেতু মিসরেই বিদ্যমান ছিলেন তাই মামলূকী সুলতানরা এশিয়া মাইনর দক্ষিণ ও পূর্বাংশে অনবরত আক্রমণ চালাতে থাকে এবং ৮৯০ হিজরীতে (১৪৮৫ খ্রি) বায়াযীদের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সীমান্তবর্তী বেশ কিছু জায়গা দখল করে নেয়। মামলূকীদের হাতে বার বার পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বায়াযীদ তাদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ পর্যন্ত মামলূকীরা যে সমস্ত শহর দখল করেছিল সেগুলো তাদেরই অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়। তবে তারা এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে যে, এই নব অধিকৃত এলাকাসমূহের সমগ্র আয় শুধু মক্কা-মদীনার সেবা কার্যে ব্যয় করা হবে। বায়াযীদের প্রধানমন্ত্রী

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার স্থল ও নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করুন। বায়াযীদ তখন ইচ্ছা করলে স্পেনের মুসলমানদের আবেদন অনুযায়ী তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি শুধু এই আশংকায় যে, হয়ত এই সুযোগে পোপ ও অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাট জামশীদকে মুক্ত করে দিয়ে তার মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিবে। আপন দায়িত্ব পালনে বায়াযীদের এই অবহেলা প্রদর্শন আক্ষেপজনক ছিল বটে; তবে একথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ক্ষুদ্রাকার হলেও তিনি তার নৌসেনাধ্যক্ষ কামালের নেতৃত্বে একটি নৌবহর স্পেন অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এই নৌবহর স্পেন উপকূলে পৌঁছে খ্রিস্টানদের কম-বেশি ক্ষতিসাধন করেছিল বটে, কিন্তু এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি যার দ্বারা স্পেনের মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে কিছুটা উপকৃত হতে পারত। যখন শাহযাদা জামশীদকে খতম করে দেওয়া হলো এবং তার দিক থেকে বায়াযীদের আর কোন আশংকা বাকি থাকল না তখন তিনি ঐ সমস্ত দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা অধিকার করার প্রচেষ্টা চালান, যা গ্রীক ও ইতালীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভেনিসের দখলে ছিল। অতএব ভেনিসের সাথে তার নৌযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। হিজরী ৯০৫ সনে (১৪৯৯-১৫০০ খ্রি) তুর্কী নৌবহর ভেনিসের নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং যে সমস্ত দ্বীপ ভেনিসের দখলে ছিল তার সবগুলোই ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হিজরী ৯০৬ (১৫০০-০১ খ্রি) সনে ভেনিস, রোমের পোপ এবং স্পেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবহর উসমানীয় নৌবহরের সাথে মুকাবিলা করে। ঐ সমস্ত খ্রিস্টান শক্তি ক্রমোন্নতিশীল তুর্কী তথা উসমানীয় নৌশক্তিকে বিধ্বস্ত করে রোম সাগর থেকে তার প্রভাব চিরদিনের জন্য খতম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর সলাপরামর্শ করে সম্মিলিতভাবে ঐ যুদ্ধে নেমেছিল। তুর্কী নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন কামাল। তিনি প্রথমে বায়াযীদের ক্রীতদাস ছিলেন। যা হোক কামাল ঐ যুদ্ধে এমনি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন যে, সম্মিলিত খ্রিস্টান নৌবহরের অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেন এবং কিছু জাহাজ আটকও করেন। বাকি জাহাজগুলো পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই নৌ অভিযানের ফলে কামাল খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেন এবং রোম সাগরে তুর্কী নৌবহরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তুর্কী নৌবহরের এই বিরাট বিজয় লাভের কয়েক বছর পূর্বেই অর্থাৎ হিজরী ৮৯৭ সনে (১৪৯২ খ্রি) স্পেন থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছিল। হাঙ্গেরী এবং পোল্যান্ডবাসীদের সাথেও বায়াযীদের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলো খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, ঐ সমস্ত যুদ্ধের কারণেই পোল্যান্ডবাসীরা সুলতানের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী কিছু শহরও তুর্কীদের দখলে এসেগিয়েছিল। যেহেতু সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) স্বভাবত আপোসকামী ছিলেন তাই তাঁর আমলে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা আয়তন ততটা বৃদ্ধি পায়নি। সুলতান মুহাম্মাদ খানের যুগে খ্রিস্টানদের মনে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভয়ভীতি এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যে, তারা বায়াযীদের এই আপোসমূলক আচরণকে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বলে মনে করে। কেননা নিজেদের দিক থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস তারা তখনো সঞ্চয় করতে পারেনি। সুলতান বায়াযীদকে আমরা খুব একটা দোষারোপও করতে পারি না।

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার স্থল ও নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করুন। বায়াযীদ তখন ইচ্ছা করলে স্পেনের মুসলমানদের আবেদন অনুযায়ী তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি শুধু এই আশংকায় যে, হয়ত এই সুযোগে পোপ ও অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাট জামশীদকে মুক্ত করে দিয়ে তার মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিবে। আপন দায়িত্ব পালনে বায়াযীদের এই অবহেলা প্রদর্শন আক্ষেপজনক ছিল বটে; তবে একথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ক্ষুদ্রাকার হলেও তিনি তার নৌসেনাধ্যক্ষ কামালের নেতৃত্বে একটি নৌবহর স্পেন অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এই নৌবহর স্পেন উপকূলে পৌঁছে খ্রিস্টানদের কম-বেশি ক্ষতিসাধন করেছিল বটে, কিন্তু এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি যার দ্বারা স্পেনের মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে কিছুটা উপকৃত হতে পারত। যখন শাহযাদা জামশীদকে খতম করে দেওয়া হলো এবং তার দিক থেকে বায়াযীদের আর কোন আশংকা বাকি থাকল না তখন তিনি ঐ সমস্ত দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা অধিকার করার প্রচেষ্টা চালান, যা গ্রীক ও ইতালীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভেনিসের দখলে ছিল। অতএব ভেনিসের সাথে তার নৌযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। হিজরী ৯০৫ সনে (১৪৯৯-১৫০০ খ্রি) তুর্কী নৌবহর ভেনিসের নৌবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং যে সমস্ত দ্বীপ ভেনিসের দখলে ছিল তার সবগুলোই ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হিজরী ৯০৬ (১৫০০-০১ খ্রি) সনে ভেনিস, রোমের পোপ এবং স্পেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবহর উসমানীয় নৌবহরের সাথে মুকাবিলা করে। ঐ সমস্ত খ্রিস্টান শক্তি ক্রমোন্নতিশীল তুর্কী তথা উসমানীয় নৌশক্তিকে বিধ্বস্ত করে রোম সাগর থেকে তার প্রভাব চিরদিনের জন্য খতম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর সলাপরামর্শ করে সম্মিলিতভাবে ঐ যুদ্ধে নেমেছিল। তুর্কী নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন কামাল। তিনি প্রথমে বায়াযীদের ক্রীতদাস ছিলেন। যা হোক কামাল ঐ যুদ্ধে এমনি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন যে, সম্মিলিত খ্রিস্টান নৌবহরের অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেন এবং কিছু জাহাজ আটকও করেন। বাকি জাহাজগুলো পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই নৌ অভিযানের ফলে কামাল খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেন এবং রোম সাগরে তুর্কী নৌবহরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তুর্কী নৌবহরের এই বিরাট বিজয় লাভের কয়েক বছর পূর্বেই অর্থাৎ হিজরী ৮৯৭ সনে (১৪৯২ খ্রি) স্পেন থেকে ইসলামী সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছিল। হাঙ্গেরী এবং পোল্যান্ডবাসীদের সাথেও বায়াযীদের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলো খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, ঐ সমস্ত যুদ্ধের কারণেই পোল্যান্ডবাসীরা সুলতানের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী কিছু শহরও তুর্কীদের দখলে এসেগিয়েছিল। যেহেতু সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) স্বভাবত আপোসকামী ছিলেন তাই তাঁর আমলে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা আয়তন ততটা বৃদ্ধি পায়নি। সুলতান মুহাম্মাদ খানের যুগে খ্রিস্টানদের মনে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভয়ভীতি এমনভাবে ঢুকে পড়েছিল যে, তারা বায়াযীদের এই আপোসমূলক আচরণকে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বলে মনে করে। কেননা নিজেদের দিক থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস তারা তখনো সঞ্চয় করতে পারেনি। সুলতান বায়াযীদকে আমরা খুব একটা দোষারোপও করতে পারি না।

কেননা তাঁর আমলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের নৌশক্তি অনেক উন্নতি লাভ করেছিল এবং কিছু কিছু দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা তিনি দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটাকে তাঁর স্থল বাহিনীর অকর্মণ্যতা ও বিফলতার 'কিছুটা ক্ষতিপূরণ' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

যে বছর সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বছরই মাওলানা আবদুর রহমান জামী তাঁর 'সিলসিলাতুয্ যাহ্ব' গ্রন্থটি প্রণয়ন করে সুলতান বায়াযীদের নামে তা উৎসর্গ করেন। মাওলানা জামী এই বাদশাহ্র যুগেই হিজরী ৮৯৮ সনের ১৮ই মুহাররম (৯ নভেম্বর ১৪৯২ খ্রি) ইন্তিকাল করেন। তাঁকে হিরাতে সমাধিস্থ করেন। ঐ বছরই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। অথচ এর পূর্বেই স্পেনের মুসলমানরা আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এটাকে ভাগ্যেরই পরিহাস বলতে হবে যে, আজ কলম্বাসই আমেরিকা আবিষ্কারের যাবতীয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে বসেছেন। ৯০২ হিজরীতে (১৪৯৬-৯৭ খ্রি) বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর যুগে পর্তুগালের সম্রাট ভাস্কো ডা গামাকে তিনটি জাহাজ দিয়ে ভারত অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। ভাস্কো ডা গামা ৯০৩ হিজরীর ২০শে রমযান (মে ১৪৯৮ খ্রি) মালাবার উপকূলের কান্দরীনা এলাকার কালিকটে এসে পৌঁছেন। এই সুলতানেরই শাসনামলে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরীতে (১৫০০-০১ খ্রি) সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইমাঈল সাফাভী চৌদ্দ বছর বয়সে ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দুস্থানের সিকান্দার লোদী ছিলেন সুলতান বায়াযীদ খানের সমসাময়িক। কিন্তু সুলতান সিকান্দার লোদী বায়াযীদের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ ৯১৫ হিজরীতে (১৫০৯ খ্রি) ইনতিকাল করেন। ৯১৬ হিজরীর ২৯শে শাবান (ডিসেম্বর ১৫১০ খ্রি) তুর্কিস্তানের বাদশাহ শায়বানী খান ইরানের বাদশাহ ইসমাঈল সাফাভীর সাথে এক সংঘর্ষে মারা যান। আর এর এক মাস পর গুজরাটের বাদশাহ সুলতান মাহমূদ বেকর আহমদাবাদে মারা যান। সুলতান বায়াযীদ খান (দ্বিতীয়)-এর শাসনামল যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহল উদ্দীপক কোন ঘটনা ঘটেনি, তাই পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য ঐ সমস্ত ঘটনা এখানে সংযোজিত করা হয়েছে, যা তাঁর সাম্রাজ্যে বা তার জীবনে না ঘটলেও তাঁরই শাসনামলে অন্যান্য দেশে বা অন্যান্য সাম্রাজ্যে ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর যুগের আর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা দ্বারা ঐ যুগের খ্রিস্টানদের নির্দয়তা ও কাপুরুষতার একটি পরিষ্কার ছবি ভেসে ওঠে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাঙ্গেরীর সাথেও বায়াযীদের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষ চলাকালে সুলতান বায়াযীদের গাযী মুস্তাফা নামক জনৈক সেনানায়ক এবং তাঁর সহোদর হাঙ্গেরী বাহিনীর হাতে বন্দী হন। হাঙ্গেরীর সেনানায়ক এই দুই তুর্কী বীর যোদ্ধার সাথে যে অমানুষিক আচরণ করেছিলেন তা হলো, গাযী মুস্তাফার ভাইকে জীবন্ত অবস্থায়ই লোহার শিকে গেঁথে আগুনে কাবাবের ন্যায় ভাজা করে এবং এই কাজে অর্থাৎ আপন সহোদরকে ভাজা করার কাজে প্রত্যক্ষ সাহায্য করার জন্য গাযী মুস্তাফাকে বাধ্য করে। তারপর এক এক করে গাযী মুস্তাফার সবগুলো দাঁতই উপড়ে ফেলে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নির্যাতন চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিদিয়ার (মুক্তি মূল্যের) বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। এর কয়েক বছর পর সেই হাঙ্গেরী সেনানায়কই গাযী মুস্তাফার হাতে বন্দী হয়। গাযী মুস্তাফা তাকে হত্যা করেন বটে,

কিন্তু তার উপর অন্য কোন ধরনের নির্যাতন চালান নি। এর দ্বারা অনায়াসে বোঝা যায়, খ্রিস্টানরা কি পরিমাণ নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয় ছিল, আর তুর্কীরা ছিল কি পরিমাণ ভদ্র ও উদার হৃদয়।

সুলতান বায়াযীদের শাসনামলের শেষ দিকে কিছুটা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল দেখা দেয় এবং এটা দেখা দিয়েছিল 'অলীআহ্দী' (স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন)-কে কেন্দ্র করে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সুলতান বায়াযীদের ছিল আট পুত্র। তন্মধ্যে পাঁচজনই অল্প বয়সে মারা যায়। যে তিনজন যুবা বয়সে উপনীত হয় তাদের নাম ছিল আহমদ, কারকূদ এবং সালীম। কারকূদ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সালীম সর্বকনিষ্ঠ। সুলতান বায়াযীদের ঝোঁক ছিল মধ্যম পুত্র আহমদের প্রতি। তিনি তাকেই 'অলীআহদ' করতে চাচ্ছিলেন। আহমদ, কারকূদ এবং তাদের পুত্ররা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা বা কর্মকর্তা ছিলেন। তারাবুযূন্দ এলাকার শাসনক্ষমতা ছিল সালীমের হাতে। সালীম তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের চাইতে অধিক সাহসী, কষ্ট-সহিষ্ণু ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। তাঁর এই বীরত্ব ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার কারণে সমগ্র বাহিনী ও বাহিনী অধিনায়করা তাঁকে অন্য দুই ভাইয়ের উপর প্রাধান্য দিতেন। ইরানের সম্রাট ইসমাঈল সাফাভী ইরানের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এশিয়া মাইনরের সর্বত্র শীআদেরকে দলে দলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণকে শীআ মতবাদে দীক্ষিত করে তাদেরকে ইরান-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি-শীল করে তোলা। কিছুদিনের মধ্যেই এর যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা হলো, সুযোগ সন্ধানী লোকেরা ইরানের সম্রাটের দিক থেকে প্রশ্রয় পেয়ে এখানে-সেখানে ডাকাতি ও লুটপাট শুরু করে দেয়। এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করার জন্য কারকূদ ও আহমদ যারা এশিয়া মাইনরের বেশির ভাগ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, নিজেদের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন।

দস্কৃতিকারীদের সাথে তাদের বার বার সংঘর্ষ হয়। ক্রমে ক্রমে উসমানীয় সুলতানের অন্যমনস্কতা এবং শাহযাদাদের অকর্মণ্যতা ও ভ্রান্তনীতির সুযোগ গ্রহণ করে শাহকুলী নামক জনৈক ব্যক্তি এই সমস্ত ডাকাত ও বিদ্রোহীদের একত্রিত ও সংগঠিত করে একটি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। শাহকুলী ছিল ইরান-সম্রাট ইসমাঈল সাফাভীর মুরীদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। সে উসমানীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। শেষ পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলার সংবাদ যখন কনসটান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছল তখন সুলতান বায়াযীদ বাধ্য হয়ে এর প্রতিবিধানের জন্য আপন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে শ্রী মাশ্ক নামক স্থানে শাহকুলীর (যাকে তুর্কীরা শয়তান কুলী বলত) মুকাবিলা করেন। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তুর্কী প্রধানমন্ত্রী এবং শাহকুলী উভয়েই নিহত হন। এটা হচ্ছে ৯১৭ হিজরীর (১৫১১ খ্রি) ঘটনা। কারকূদ ও আহমদের অধীনস্থ এলাকায় এই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

সালীম যে প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন সেই তারাবুযূন্দ প্রদেশে বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খলা ছড়াবার কোন সুযোগ পায়নি। এ থেকে সালীমের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ মিলে। সালীম আপন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ভর্তি

করে নিয়েছিলেন। যখন তিনি বিদ্রোহীদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান তখন তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে সারকিশিয়া এলাকার উপর হামলা চালান এবং বিজয় লাভ করেন। এই সংবাদ পেয়ে বায়াযীদ (দ্বিতীয়) কনসটান্টিনোপল থেকে সালীমের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাতে বলা হয় তুমি অন্য এলাকায় হামলা চালিয়ে আপন হুকুমতের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারবে না। সালীম উত্তরে লিখেন ঃ যদি এই দিকে আমাকে বিজয় অভিযান পরিচালনায় অনুমতি না দেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এখান থেকে বদলী করে কোন ইউরোপীয় প্রদেশে পাঠিয়ে দিন যাতে আমি সেখানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ লাভ করতে পারি। যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পৃথক হয়ে চুপচাপ বসে থাকাকে আমি পছন্দ করি না। এটা হলো সেই মুহূর্ত যখন বায়াযীদ (দ্বিতীয়) আহমদকে আপন 'অলীআহদ' তথা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুলতানের ঐ সংকল্পের কথা শুনে নেগচারী বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর অধিনায়কদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাদের কেউ কেউ কারকূদকে এ জন্য প্রাধান্য দেয়। কেননা তিনি হচ্ছেন সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র। কেউ কেউ সালীমকে অলীআহদীর যোগ্য মনে করে। কেননা তিনি একজন বীরপুরুষ ও দূরদর্শী। আহমদ ও কারকূদ যখন এই রশি টানাটানির ব্যাপারটি জানতে পারেন তখন তারা নিজেরা কিভাবে সিংহাসনটি করায়ত্ত করবেন সে চিন্তায় নিমগ্ন হন। এর ফলে দাঁড়ায় এই যে, এবার তিন ভাইই পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের শক্তি বর্ধনে এবং পরস্পর বিরোধিতায় নিমগ্ন হন।

এদিকে এশিয়া মাইনরে আহমদ সৈন্য সংগ্রহ করত কনসটান্টিনোপল দখল এবং সুলতান বায়াযীদকে সভাসদদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং খোদ সালীমের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাঁকে সুমাত্রা নামক একটি ইউরোপীয় প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। যেহেতু সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সুলতান বায়াযীদের পুত্রদের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই সুলতান সালীমও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকাকে সমীচীন মনে করেন নি। তিনি রাজকীয় কর্মকর্তা ও সামরিক অধিনায়কের ইংগিতে ইউরোপে প্রবেশ করে আড্রিয়ানোপল দখল করে নেন। সালীম আড্রিয়ানোপলে এসেছেন শুনে বায়াযীদ তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন সুলতান বায়াযীদ সালীমের মুখোমুখি হন তখন সালীমের পক্ষের অনেক সৈন্য তার পক্ষ ত্যাগ করে সুলতানের বাহিনীতে যোগ দেয়। অতএব বায়াযীদ অতি সহজেই সালীমকে পরাজিত করেন। সালীম কোন মতে প্রাণ বাঁচিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌছেন এবং একটি জাহাজে করে আপন শ্বশুর ক্রিমিয়ার খানের কাছে চলে যান এবং সেখানে পৌছেই তাতারী ও তুর্কীদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

সুলতান বায়াযীদকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রস্তুতি নেন। সুলতান বায়াযীদ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সালীমকে আড্রিয়ানোপল থেকে তাড়িয়ে কনসটান্টিনোপল এসে জানতে পারেন যে, আহমদ তাঁর উপর হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করে বায়াযীদ অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এতে রাজকীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে এই কানাঘুষা শুরু হয় যে, সুলতান প্রকৃতই সিংহাসনে টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। এবার রাজকীয় কর্মকর্তাদের পরামর্শ হোক কিংবা নিজে থেকেই হোক, বায়াযীদ সালীমের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন, তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপলে চলে আস এবং আহমদের

হামলা প্রতিরোধের জন্য সুলতানী বাহিনীতে যোগ দাও। সালীম এই পয়গাম পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিন হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে পাহাড়-প্রান্তরের অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে (কৃষ্ণ) সাগরের তীর ধরে আড্রিয়ানোপলে পৌছেন। তারপর সেখান থেকে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হন। সালীমের এভাবে পৌছার সংবাদ শুনে বায়াযীদ তাকে বলে পাঠান : এখন তোমার আসার আর প্রয়োজন নেই। তুমি যে পর্যন্ত এসেছ সেখান থেকে সোজা সুমাত্রা প্রদেশে ফিরে যাও। তোমাকে সেখানকারই শাসনকর্তা নিয়োগ করা হলো। এদিকে রাজকীয় কর্মকর্তা এবং সামরিক অধিনায়কদের কাছ থেকে সালীমের কাছে অপর একটি পয়গাম পৌছে। তাতে বলা হয় ঃ আপনি কখনো ফিরে যাবেন না,বরং সোজা কনসটান্টিনোপলে চলে আসুন। কেননা এর চাইতে ভাল সুযোগ আপনি কখনো পাবেন না। অতএব সালীম সোজা কনসটান্টিনোপল এসে পৌছেন। এখানে পৌছতেই তাঁকে সমগ্র প্রজা, রাজকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সামরিক অধিনায়কবৃন্দ সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সুলতানী প্রাসাদের সিংহদ্বারে পৌছে সকলে সম্মিলিতভাবে বায়াযীদের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে বলা হয়, আপনি সাধারণ দরবার আহ্বান করে আমাদের আবেদন শ্রবণ করুন। বায়াযীদ অনন্যোপায় হয়ে আম দরবার আহ্বান করেন। তখন রাজকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, উলামা, ফুকাহা ও সাধারণ প্রজাদের উকীলবৃন্দ সম্মিলিতভাবে নিবেদন করেন ঃ আমাদের সুলতান এখন বৃদ্ধ, দুর্বল এবং শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সকলের ইচ্ছা এই যে, সুলতান আপন পুত্র সালীমের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করুন। বায়াযীদ এই আবেদন শ্রবণ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় বলে উঠেন : আমি তোমাদের সকলের আবেদন মনজুর করে সালীমের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করলাম। এ কথা বলেই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে আসেন। এবার সালীম দ্রুত আগে বেড়ে সুলতানের কাঁধে চুমো খান। বায়াযীদ তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে পালকীতে চড়ে রওয়ানা হন। সালীম পালকীর পায়া ধরে কিছুক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করেন। এবার বায়াযীদ তাঁর বাকি জীবন নির্জনে ও ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে কনসটান্টিনোপল ছেড়ে ডেমোটিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সালীম শহরের সিংহদ্বার পর্যন্ত পিতার অনুগমন করেন এবং তাঁকে বিদায় জানিয়ে প্রাসাদে ফিরে এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়াযীদ ডেমোটিকা শহরে পৌছার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান বায়াযীদ মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও নয় পৌত্র রেখে যান। সালীমের একমাত্র পুত্র সুলায়মান ছিল এই পৌত্রদের অন্যতম। বায়াযীদ ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মুতাবিক ৯১০ হিজরীতে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবার কনসটান্টিনোপলের সুলতানী সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান সালীম ইব্‌ন বায়াযীদ (দ্বিতীয়)।

সুলতান সালীম উসমানী

সুলতান সালীম (সেনাবাহিনী ও প্রজাসাধারণের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী) কনসটান্টি-নোপলের উসমানী সিংহাসনে আরোহণ করার কারণে তাঁর দুই ভাই, যারা এশিয়া মাইনরে ক্ষমতাসীন ছিল, বিরোধিতার আর সাহস পাননি। তারা বাহ্যত সালীমকে সমর্থন এবং তাঁর

আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু আড়ালে আবডালে তাঁর বিরোধিতা তথা তাঁর সাথে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সালীমও তেমন বোকা ছিলেন না যে, আপন ভাইদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারা আঁচ করতে পারেননি। তবে তিনি আগেভাগে তাদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা নেননি। এদিকে আহমদ আমাসায় নিজের সেনাবাহিনী ঢেলে সাজান এবং প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে একটি বিরাট তহবিলও সংগ্রহ করেন। অপর দিকে তার পুত্র আলাউদ্দীন আপন পিতার ইঙ্গিতে বারূসায়ও একটি বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান সালীম এই অবস্থা জানতে পেরে উল্লিখিত অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী নিয়ে বসফোরাস প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে উপনীত হন। সামুদ্রিক তীর ধরে কিছু সংখ্যক জাহাজও তাকে অনুসরণ করে। বারূসায় পৌঁছে তিনি আলাউদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করে বারূসা দখল করে নেন এবং আলাউদ্দীন ও তার ভাইকে হত্যা করেন। এখানে আরো কয়েকজন শাহযাদা (সুলতান সালীমের ভাতিজা) অবস্থান করছিল। তিনি ওদেরকে বন্দী করে হত্যা করেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আহমদ তাঁর বাহিনী নিয়ে সালীমের মুকাবিলায় আসেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আহমদ সালীমের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এই পরাজয়ের পর আহমদ আপন দুই পুত্রকে ইরানের বাদশাহ ইসমাঈল সাফাভীর কাছে পাঠিয়ে দেন যাতে তারা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। তারপর নিজে এশিয়া মাইনরের এখানে-সেখানে উদভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করতে থাকেন। আহমদ এবং তাঁর পুত্রদের এই পরিণাম লক্ষ্য করে তার বড় ভাই কারকূদও, যিনি এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, বেশ সতর্ক হয়ে যান। এদিকে সুলতান সালীমও আহমদকে পরাজিত করার পর দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কারকূদের উপর আকস্মিক হামলা চালান। এক মামুলী সংঘর্ষের পর কারকূদ বন্দী হন। সুলতান সালীম সিংহাসনের এ দাবিদারকে জীবন্ত রাখা সমীচীন মনে করেন নি। তাই তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু আপন ভাইয়ের এই ধরনের মৃত্যুতে তিনি অন্তরে খুব আঘাত পান। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি এমনভাবে শোকাভিভূত থাকেন যে, পানাহার পর্যন্ত করেন নি।

উসমানীয় শাহযাদাদের এভাবে নিহত হওয়ার কারণে লোকেরা তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং সেই সুযোগে আহমদ একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে সালীমের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন ও বেশ কয়েকবার তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু সালীম তো তাঁর ভাইদের মত এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর বাহিনীতে নতুনভাবে সৈন্য ভর্তি করেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিজয় লাভের সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে আহমদের উপর জোর হামলা চালিয়ে তাঁকে বন্দী করেন। যে চূড়ান্ত যুদ্ধে আহমদ পরাজিত ও বন্দী হন তা সালীমের সিংহাসন-আরোহণের এক বছর পর অর্থাৎ ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল, মুতাবিক ৯১৯ হিজরীতে হয়। আহমদকেও বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

সুলতান সালীমের স্বভাব চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর পিতার চাইতেও অধিকতর বীরত্বের অধিকারী এবং আপন পিতামহের ন্যায় একজন

দুঃসাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর পুরুষ ছিলেন। খ্রিস্টান সম্রাটগণ প্রথম প্রথম একেবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, না জানি এই নতুন সুলতান আবার তাদের উপরও কোন বিপদ ডেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন যে, সুলতান সালীম খ্রিস্টানদের অনুপাতে আপন স্বজাতি মুসলমানদের প্রতিই অধিক মনোযোগী, তখন তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আপন সন্ধিচুক্তির শর্তাবলী পালন করে যেতে থাকেন। ফলে সুলতান সালীমের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কোনরূপ অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা আর দেখা দেয়নি। আপন ভাইদের প্রতিহত করার পর সুলতান সালীমকে ইরান সাম্রাজ্য এবং এশিয়া মাইনরের বিদ্রোহীদের প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সুলতান সালীম যদি ইরান সাম্রাজ্যের প্রতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করতেন তাহলে উসমানীয় সাম্রাজ্য নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যেত। ইসমাঈল সাফাভী নিজেকে হযরত ইমাম জা'ফর সাদিকের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন। তাই ইরানের জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরে ইতিমধ্যে অনেক শীআ-সুন্নী দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সেখানেও শীআ মাযহাব গ্রহণের একটা পটভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া অনেক শীআও ঐ সমস্ত দেশে বসবাস করত। ইসমাঈল সাফাভীর মাতামহী তারাবুযূন্দের খ্রিস্টান সম্রাটের কন্যা এবং হাসান তাভীলের স্ত্রী ছিলেন। তাই ইসমাঈল সাফাভীর আকঙ্ক্ষা ছিল, যেন তারাবুযূন্দ তারই অধিকারে চলে আসে। অথচ দীর্ঘদিন থেকে সেটা ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যেরই একটি প্রদেশ। যেহেতু ইসমাঈল সাফাভী এই শীআ মাযহাবেরই বাহানায় একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন এবং তিনি জানতেন, কিভাবে শীআরা বাগদান সাম্রাজ্যকে মুঘলদের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়েছে, তাই তার মত একজন বিদ্যোৎসাহী ও পরাক্রমশালী বাদশাহর উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। তিনি ইরানের সিংহাসন লাভ করার পর বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর শাসনামলে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং শীআ মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। বায়াযীদ এই সমস্ত অপতৎপরতা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেননি। তাঁর দুই পুত্রও, যারা এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা ছিলেন, এই গোপন প্রচারণায় যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তা আদৌ বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু সালীম তারাবুযূন্দের শাসনকর্তা থাকাকালে ইসমাঈল সাফাভীর এই সমস্ত অপতৎপরতার গূঢ় রহস্য খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর অধীনস্থ প্রদেশে ইসমাঈল সাফাভীর ঐ সমস্ত অপতৎপরতা সফল হতে দেননি। ইসমাঈল সাফাভী সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর শাসনামলে কিছু সীমান্ত এলাকা নিজের দখলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক কর্মকর্তারা যখন ঐ সমস্ত এলাকা ফেরত নিতে পারেনি তখন বায়াযীদও আর এ বিষয়টির উপর খুব একটা গুরুত্ব দেননি। যখন সুলতান সালীম আপন ভাই ও ভাতিজাদের সাথে এশিয়া মাইনরে যুদ্ধরত ছিলেন তখন শাহ ইসমাঈল সাফাভী অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে ঐ গৃহযুদ্ধের প্রতি তাকিয়েছিলেন। তিনি তখন সুলতান সালীমের বিরুদ্ধে আপন 'দাঈ' ও প্রচারকদের মাধ্যমে শাহযাদা আহমদকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করেছিলেন। এ

কারণেই আহমদ সুলতান সালীমকে কয়েকবার পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবার সুলতান দেখলেন, সুলতান সাফাভীর কাছে শাহযাদা আহমদের পুত্র তথা তাঁর ভাতিজা মুরাদ অবস্থান করছে এবং ইসমাঈল মুরাদকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে এশিয়া মাইনরে আক্রমণ পরিচালনা এবং স্বয়ং তার সাথে যোগ দিয়ে তাকে (মুরাদকে) কনসটান্টিনোপলের সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করছেন তখন তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি আরো দেখলেন, এশিয়া মাইনরের গ্রাম শহর সর্বত্র শীআ ও সুন্নীদের মধ্যে অবিরাম ঝগড়া-বিবাদ চলছে, যার প্রধান হোতা হচ্ছেন ইসমাঈল সাফাভী। যা হোক তিনি (সালীম) আপন ভাইদের হত্যা করার পর কনসটান্টিনোপলে ফিরে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, এশিয়া মাইনরে একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে ঐ সমস্ত লোকের একটি সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেন, যারা ইসমাঈল সাফাভীর প্রচারকদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের পুরাতন আকীদা ত্যাগ করে শীআ মাযহাবের অনুসারী হয়ে পড়েছে, ইসমাঈল সাফাভীকে নিজেদের ধর্মগুরু বলে মানছে এবং তার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে তৈরি হয়ে রয়েছে। অতি শীঘ্র এই তালিকা তৈরি করে যখন সুলতানের খিদমতে পেশ করা হয় তখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, এশিয়া মাইনরের সত্তর হাজার লোক রয়েছে, যারা ইসমাঈল সাফাভীর হামলা পরিচালনার সাথে সাথে উসমানীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে মোটেই দ্বিধা করবে না। যখন সুলতান সালীম এই বিরাট ষড়যন্ত্র এবং এর ভয়ংকর পরিণতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন তখন তাঁর পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যায়। তবু তিনি নিজেকে সামলে নেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় তালিকাভুক্ত বিদ্রোহীদের সমসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন যেখানে তাদের প্রাধান্য রয়েছে। তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিদ্রোহীদের এক একটি তালিকা দিয়ে তাঁর অধিনায়কদের নির্দেশ দেন : অমুক তারিখে প্রত্যেকটি বিদ্রোহীর জন্য এক একজন সৈন্য মোতায়েন কর এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দাও, যেন তারা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহীকে অবশ্যই হত্যা করে। এ নির্দেশ পালন করা তাদের জন্য অপরিহার্য। এই সাথে তিনি তাঁর অধিনায়কদেরকে কঠোর নির্দেশ দেন যে, এ পরিকল্পনার কথা পূর্বাহ্নে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে এবং সে দিকে সকলেই যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর এ নির্দেশ পালন করা হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এশিয়া মাইনরের দৈর্ঘ প্রস্থ জুড়ে চল্লিশ হাজারের মত বিদ্রোহীকে এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তা করতে গিয়ে কোন উসমানী সৈন্যের নিহত হওয়া দূরের কথা, তাদের কারো চোখেও একটি আঘাত পর্যন্ত লাগেনি। এতগুলো লোকের একই সময়ে এভাবে ধ্বংস হওয়াটা শীআদের জন্য ছিল একটি অতি ভয়ংকর ঘটনা। ঘটনার পর যে সমস্ত বিদ্রোহী অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বাতিল বিশ্বাস থেকে আপনা-আপনি তাওবা করে ফেলে। ইসমাঈল সাফাভীর ষড়যন্ত্রকে এভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া সুলতান সালীমের জন্য ছিল একটি বিরাট বিজয়। ইসমাঈল সাফাভী এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন, কিন্তু বাহ্যত তিনি সালীমকে এ জন্য কোন দোষারোপ করেননি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে

পারেননি। তাই সেনাবাহিনী ও রসদ সামগ্রী সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সাধারণ নির্দেশ জারি করেন। তিনি ঘোষণা দেন, এখন এশিয়া মাইনরে আমাদের হামলা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাহযাদা মুরাদ আহমদ উসমানীকে তার পৈতৃক সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া এবং সালীম উসমানীকে বন্দী করে পদচ্যুত করা। এই সংবাদ শুনে সালীম উসমানী একটি আম দরবার আহ্বান করে রাজকীয় কর্মকর্তা এবং সামরিক অধিনায়কদের সামনে ঘোষণা দেন ঃ আমরা ইরান আক্রমণ করতে চাই। অতএব সবাই তৈরি হয়ে যাও। ঐ সময়ে যেহেতু ইসমাঈল সাফাভীর শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রূপকথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং খোদ তুর্কী বাহিনী তার কাছে একদা পরাজয়বরণ করেছিল, তাছাড়া তুর্কিস্তানের বাদশাহ শায়বানী খানকে ইসমাঈল সাফাভীই হত্যা করেছিলেন, তাই উপস্থিত সবাই সালীমের ঐ ঘোষণাকে একটি মারাত্মক পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করে এবং সালীমের আহ্বানে কোনরূপ সাড়া না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সুলতান সালীম পর পর তিন বার ঐ একই ঘোষণা দেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রোতারা নীরব থাকে। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ নামক জনৈক দারওয়ান যে সুলতান সালীমের খিদমতে নিয়োজিত ছিল এবং তাঁর সামনেই হাযির ছিল, এই নীরবতা ভঙ্গ করে। সে আগে বেড়ে ঠিক সুলতান সালীমের সামনে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে নিবেদন করে ঃ আমি এবং আমার সঙ্গীরা সুলতানী পতাকা তলে ইরান সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়ব এবং অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে হয় ইরানীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করব, নয়ত প্রাণ বিসর্জন দেব। সুলতান আবদুল্লাহর এই কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে দারোয়ানের পদ থেকে একটি জেলার কালেক্টর পদে উন্নীত করেন। এতে অন্য অধিনায়কের মনেও সাহসের সঞ্চার হয় এবং তারাও যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। শাহ ইসমাঈল সাফাভী এবং সুলতান সালীম উসমানীর যুদ্ধের বিবরণ পেশ করার পূর্বে ইসমাঈল সাফাভী কিভাবে একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

ইসমাঈল সাফাভী

ইসমাঈল সাফাভীর বংশ তালিকা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ ইসমাঈল ইব্‌ন জুনায়দ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন খাজা আলী ইব্‌ন সদরুদ্দীন ইব্‌ন শায়খ সফীউদ্দীন ইব্‌ন জিবরাঈল। এই বংশে যিনি সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ করেন তিনি হচ্ছেন শায়খ সফীউদ্দীন। তিনি আরদাবীলে বসবাস করতেন এবং তাঁর পেশা ছিল পীর-মুরীদী। তাঁর নাম থেকেই এই বংশ সাফাভী বংশ নামে পরিচিত। যখন শায়খ সফীউদ্দীনের মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুত্র সদরুদ্দীন পিতার 'খিরকা' (ফকীরী বেশ) পরিধান করেন। ফলে তাঁর পিতার মুরীদ ও ভক্তরা তাঁকেই পীর বলে মেনে নেয়। শায়খ সদরুদ্দীন ছিলেন বায়াযীদ ইয়ালদিরিম এবং তাইমূরের সমসাময়িক। তাইমূর হিজরী ৮০ সনে (৬৯৯ খ্রি) যখন সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমকে পরাজিত ও বন্দী করেন তখন তার সাথে আরো অনেক তুর্কী সৈন্য বন্দী হয়। তাইমূর এই বিজয় লাভের পর যখন আরদাবীলে গিয়ে পৌঁছেন তখন ভক্তির সাথে হোক অথবা কূটনীতির কারণে হোক,

সদরুদ্দীনের খানকায় যান এবং শায়খকে বলেন, 'যদি আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় কিংবা আমার মাধ্যমে কোন কাজ করাতে চান তাহলে বলুন, আমি অবশ্যই তা করে দেব।' তখন শায়খ সদরুদ্দীন বলেন, তুমি আংকারা যুদ্ধে যে সমস্ত তুর্কী সৈন্য বন্দী করেছ তাদেরকে মুক্ত করে দাও। ঐ তুর্কী বন্দীরা মুক্তি লাভ করার সাথে সাথে শায়খের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয় এবং আরদাবীলেই বসবাস স্থাপন করে পীরের খিদমতে নিজেদের নিয়োজিত করে। শায়খ সদরুদ্দীন তাদের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন বলেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তারা তারই সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারপর সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ঐ তুর্কিদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চললো। সেই সাথে শায়খ এবং শায়খের বংশধরদের সাথে তাদের ভক্তি ও আনুগত্যও বৃদ্ধি পেল। তাইমুরের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য আপন সন্তানদের মধ্যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। কাযভীন ও কৃষ্ণ-সাগরের মধ্যবর্তী এলাকা অর্থাৎ আযারবায়জানে, তাইমূরের মৃত্যুর পর পরই কারাকোয়ুনলূ নামক তুর্কমান গোত্র পুনরায় নিজেদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করল। এভাবে কুর্দিস্তান তথা ইরাকের উত্তরাঞ্চল আককোয়ুনলূ নামক অপর তুর্কমান গোত্রের অধীনে চলে গেল। আককোয়ুনলূ নামক তুর্কমান গোত্র তাইমুরের যুগ থেকেই কুর্দিস্তানের করদাতা শাসক ছিল। কারাকোয়ুনলূ গোত্রের সর্দার ইউসুফ তুর্কমান তাইমূরের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি তাইমূরের শাসনামলে মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়নরত থাকেন। তাইমূরের মৃত্যুর পর পর তিনিও মিসর থেকে ফিরে এসে অতি সহজেই আযারবায়জানের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে নেন। আরদাবীল ছিল আযারবায়জানের শাসনকর্তার অবস্থান স্থল। আর কুর্দিস্তানের রাজধানী ছিল দিয়ারেবকর। শায়খ সদরুদ্দীনের প্রপৌত্র ছিলেন শায়খ জুনায়দ। শায়খ জুনায়দের যুগে তাদের মুরীদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তা লক্ষ্য করে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার খাতিরে আযারবায়জানের তুর্কমান বাদশাহ জাহানশাহ ইব্‌ন কারা ইউসূফ শায়খ জুনায়দকে বলেন, আপনি অবিলম্বে আরদাবীল ছেড়ে চলে যান। এই হুকুম পালনার্থে শায়খ জুনায়দ আপন ভক্ত ও মুরীদদের নিয়ে, যারা প্রধানত ঐ তুর্কী বন্দীদেরই বংশধর ছিল, আরদাবীল থেকে বিদায় নিয়ে দিয়ারেবকর অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন দিয়ারেবকর তথা কুর্দিস্তানের বাদশাহ ছিলেন হাসান তাভীল আককোয়ুনলূ। তিনি শায়খ জুনায়দের এভাবে আগমনের সংবাদ শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে শায়খকে অভ্যর্থনা জানান এবং সেখানে তাঁর ও তাঁর মুরীদদের বসবাসের সুব্যবস্থাও করে দেন।

কিছুদিন পর হাসান তাভীল শায়খ জুনায়দের সাথে আপন বোনের বিবাহ দেন। তখন আককোয়ুনলূ এবং কারাকোয়ুনলূ এই দুই তুর্কমান গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। যেহেতু শায়খ জুনায়দ নির্জনবাসী দরবেশ থেকে শাহীবংশের একজন নিকটাত্মীয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সূত্র ধরে তাঁর ঘরে হুকুমতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তাই তিনি আপন মুরীদদেরকে, যারা তুর্কী সৈন্যদের বংশধর ছিল, দরবেশ থেকে সিপাহীতে রূপান্তর করেন এবং তাদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করে হাসান তাভীলের পরামর্শ অনুযায়ী আরদাবীলের সম্রাট, যিনি শায়খকে আরদাবীল থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাই এই

হামলাকে সাধারণভাবে তারই 'প্রতিশোধ' বলে মনে করা হলো এবং এই প্রেক্ষাপটে দরবেশের এই হামলা তার মুরীদ বা অন্যান্য লোকের চোখে খুব একটা বিস্ময়কর ঠেকল না। শায়খের বাহিনী গঠিত হয়েছিল নতুন লোকদের নিয়ে এবং বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে শায়খও ছিলেন একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই জাহানশাহের সাথে মুকাবিলায় তিনি টিকতে পারেননি। তবে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি শেরওয়ান শাসকের ওপর চড়াও হয়। শেরওয়ানের শাসক ছিলেন জাহানশাহের মিত্র। শায়খকে শেরওয়ান শাহের কাছেও পরাজয়বরণ করতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি পালাবার ফিকিরে ছিলেন এমন সময় তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং তাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ জুনায়দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হায়দার, যিনি সুলতান হাসান তাভীলের ভাগ্নে ছিলেন, পিতার গদীতে বসেন এবং একজন দরবেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। হায়দার মাতার দিক থেকে শাহযাদা এবং পিতার দিক থেকে দরবেশ ছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে আমীরী ফকিরী উভয় গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর খানকায় জুনায়দের চাইতেও অধিক লোকের আনাগোনা ছিল। শায়খ জুনায়দের মৃত্যুর পর আমীর হাসান তাভীল জাহানশাহের সাথে সাময়িকভাবে আপোস করে নেন এবং মির্যা আবূ সাঈদ তাইমূরীকে হত্যা করে খুরাসানকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এর পরপরই তিনি জাহান শাহের কাছ থেকেও আযারবায়জান ছিনিয়ে নেন এবং সমগ্র ইরান সাম্রাজ্যের একজন প্রতাপশালী বাদশাহ হয়ে বসেন। তারপর তিনি আপন কন্যাকে আপন ভাগ্নে শায়ক হায়দারের সাথে বিবাহ দেন। ফলে শায়খ হায়দার ইরানের শাহানশাহের ভাগ্নে থেকে জামাইয়ে পরিণত হন। হাসান তাভীল তারাবুযূন্দের খ্রিস্টান সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তারাবুযূন্দ সাম্রাজ্যের কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কনসটান্টিনোপল বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ খান (দ্বিতীয়) হিজরী ৮৬৬ সনে (১৪৬১-৬২ খ্রি) এই সাম্রাজ্যটি জয় করে নিজের অধীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসান তাভীল তারাবুযূন্দের খ্রিস্টান স্ত্রীর গর্ভে ঐ কন্যাটি (শায়খ হায়দারের স্ত্রী) জন্মগ্রহণ করেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল পারসা এবং কারো কারো মতে শাহ বেগম। এই পারসা বেগমের গর্ভে শায়খ হায়দারের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম ছিল আলী, ইবরাহীম ও ইসমাঈল। হাসান তাভীল জীবিত থাকাকালে শায়খ হায়দার সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। কিন্তু হাসান তাভীলের মৃত্যুর পর যখন তার পুত্র আমীর ইয়াকূব ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন শায়খ হায়দার আপন শিষ্যদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। অন্য লোকদেরকেও এই বাহিনীতে যোগদানের জন্য তিনি উৎসাহিত করেন, যাতে শেরওয়ানের শাহের উপর থেকে আপন পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। হাসান তাভীলের জীবনকালে শায়খ হায়দারের নীরবতা পালনের কারণ ছিল এই যে, শায়খ জুনায়দ নিহত হওয়ার পর হাসান তাভীল যেভাবে জাহান শাহের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক সেভাবে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন শেরওয়ানের শাসকের সাথেও। শেরওয়ানের শাসক আবূ সাঈদ মির্যা তাইমূরীকে হত্যার ব্যাপারে হাসান তাভীলকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তাই হাসান তাভীল জীবিত থাকা পর্যন্ত শেরওয়ানের বাদশাহর সাথে তাঁর সন্ধি অটুট থাকে। আর এ কারণেই শায়খ

হায়দার শেরওয়ান শাহের বিরুদ্ধে কোনরূপ তৎপরতা চালাবার সুযোগ পাননি। এবার শায়খ হায়দার শেরওয়ান আক্রমণ করে বসেন। শেরওয়ানে কয়েকশ' বছর ধরে একটি ইরানী বংশের হুকুমত চলে আসছিল। এই বংশের লোকেরা নিজেদেরকে বাহরাম চুবীনের বংশধর বলত। শেরওয়ানের বাদশাহর নাম ছিল ফাররুখ ইয়াসার। ফাররুখ ইয়াসার যখন শুনতে পান যে, শায়খ হায়দার আপন পিতার খুনের প্রতিশোধ নিতে আসছেন তখন তিনি মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন। ৮৯৩ হিজরীতে (১৪৮৮ খ্রি) উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে শায়খ হায়দারও আপন পিতার ন্যায় লাঞ্ছিত অবস্থায় মারা যান। লোকেরা তাঁর লাশ আরদাবীলে নিয়ে গিয়ে দাফন করেন।

শায়খ হায়দারের মৃত্যুর পর তাঁর মুরীদরা তার পুত্র আলীকে নিজেদের পীর মনোনীত করে। আলী তখন যুবক। তার আশেপাশেও মুরীদদের ভিড় জমে ওঠে। আমীর ইয়াকূব, যিনি হাসান তাভীলের পর ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, যখন বুঝতে পারলেন যে, আলী ও তার পিতা ও পিতামহের ন্যায় শেরওয়ানের উপর হামলা চালাবার প্রস্তুতি নেবেন এবং এতে করে দেশের মধ্যে অযথা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে (অথচ তিনি শেরওয়ানের শাহ ফাররুখ ইয়াসারের শাহে হাসান তাভীলের যুগে সম্পাদিত সন্ধিযুক্তি বহাল রাখাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করতেন) তখন তিনি আলী এবং তার ভাইদেরকে আসতাখার এলাকার একটি দুর্গে নজরবন্দী করে ফেলেন। এই তিন ভাই চার বছরের চাইতেও অধিককাল ঐ দুর্গে আটক থাকেন। যখন ইরানের শাসক আমীর ইয়াকূব বেগ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তার স্থলে তার পুত্র আলূন্দ বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আলী আপন ভাইদের নিয়ে কয়েদখানা থেকে পলায়ন করেন এবং আরদাবীলে গিয়ে মুরীদদেরকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আলূন্দ বেগ এই সংবাদ শুনে এবং আলীর বিদ্রোহী তৎপরতা লক্ষ্য করে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আলী ঐ বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও পরাজিত ও নিহত হন।

আলীর দুই ভাই ইবরাহীম ও ইসমাঈল ছদ্মবেশ ধারণ করে আরদাবীল থেকে গীলানের দিকে পলায়ন করেন। গীলানে পৌছার পর ইবরাহীম মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন শুধু সর্বকনিষ্ঠ ভাই ইসমাঈলই জীবিত থাকেন। তখন তিনি ছিলেন একজন শিশু। আলূন্দ বেগ ইসমাঈলের বয়সের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন। এবার ইসমাঈলের চারপাশেও তার বংশের বিশ্বস্ত মুরীদরা পুনরায় এসে ভিড় জমায়। হিজরী ৯০৬ (১৫০০-০১ খ্রি) পর্যন্ত যখন ইসমাঈলের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর, তখন তিনি তার মুরীদদের নিয়ে, যারা সব সময় সশস্ত্র অবস্থায় তাকে ঘিরে রাখত, একটি সংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলেন এবং ঐ বাহিনী নিয়ে তিনি অতর্কিতে শেরওয়ানের উপর হামলা চালান। ঘটনাচক্রে ঐ হামলায় শেরওয়ানের শাসক ফাররুখ ইয়াসার নিহত হন। ইসমাঈল এবং তার সঙ্গীদের সাহস এবার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আলূন্দ বেগ যখন ইসমাঈলের এই বিজয় সংবাদ পান তখন একেবারে চমকে ওঠেন এবং ইসমাঈলের দিককার এই আশঙ্কা যত শীঘ্র সম্ভব দূর করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েই

রওয়ানা হন। তখন আলূন্দ বেগের দিক থেকে একটি বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল এই যে, তিনি ইসমাঈলের শক্তির পরিমাপ করে নিজের শক্তিকে সুসংগঠিত করার দিকে মোটেই দৃকপাত করেননি। তার এই তাড়াহুড়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, ইসমাঈলের সাথে তার মুকাবিলা হয় এবং তাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। তারপর আককোয়ুনলূর মুরাদ বেগ নামক অপর একজন অধিনায়ক হামাদানের নিকটে ইসমাঈলের সাথে মুকাবিলা করেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই অনবরত বিজয় লাভের ফলে সমগ্র ইরাক, ইরান, আযারবায়জান প্রভৃতি অঞ্চল ইসমাঈলের দখলে চলে আসে। চার বছর পূর্বে, হিজরী ৯০৩ সনে (১৪৯৭-৯৮ খ্রি) যে ব্যক্তি গীলানে একজন সর্বহারা ফকীরের জীবন-যাপন করছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজ বিরাট সাম্রাজ্য ও একটি প্রবল পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়ে বসেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্যদের সন্তানরা বিরাট ভূমিকা পালন করে। তারা তাদের পূর্ব পুরুষের ত্রাণকর্তা সদরুদ্দীন আরদাবীলীর সন্তানদেরকে বাদশাহ বানিয়ে তবে ছাড়ে। এটা একটা বিস্ময়েরই ব্যাপার যে, যে সমস্ত লোকের অনবরত চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে ইসমাঈল বিন হায়দার সাফাভী ইরানের সিংহাসন লাভ করেন তাদেরই উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বজাতীয়দের বিনা কারণে শত্রুতে পরিণত হন। ইসমাঈল সাফাভী যেহেতু প্রথম থেকেই একটার পর একটা বিজয় অর্জন করছিলেন তাই পরবর্তী বিজয় অভিযান এবং যুদ্ধসমূহে তার এই খ্যাতি অত্যন্ত কাজে লাগে। কেননা সাধারণভাবে সকলেই তার সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যদি ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীম (দ্বিতীয়)-এর দেশে আপন গোপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার না করতেন এবং সুলতান উসমান (দ্বিতীয়)-এর সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখাকে জরুরী মনে করতেন তাহলে সালীম নিশ্চিতভাবেই ইউরোপের প্রতি মনোনিবেশ করতেন এবং মধ্যবর্তীকালীন এই দীর্ঘ সময়ে সমগ্র ইউরোপ জয় করে একেবারে স্পেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতেন। কিন্তু ইসমাঈল সাফাভী, সালীমকে ইউরোপবাসীদের প্রতি মনোনিবেশ করতে দেননি। ফলে সালীম খ্রিস্টান সম্রাটদের সাথে তাঁর সন্ধিচুক্তি নবায়ন করে তাদের দিক থেকে আশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেন। ফলে ইউরোপবাসীরা আরো আট-দশ বছরের অবকাশ পায় এবং এই সুযোগে তারা নিজেদেরকে আরো শক্তিশালী এবং আরো সংগঠিত করে তোলে।

খালদারান যুদ্ধ

ইসমাঈল সাফাভীর যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে সুলতান সালীম ৯২০ হিজরীর রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার এনী শহর থেকে, যেখানে তাঁর সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল, রওয়ানা হন। এনী শহর দানিয়াল উপত্যকার ইউরোপীয় উপকূলে অবস্থিত। এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করার এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল সুলতান সালীমের গুপ্ত পুলিশ শাহ ইসমাঈল সাফাভীর একজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে। ঐ গুপ্তচরকে সালীমের খিদমতে পেশ করা হলে তিনি তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, বরং শাহ ইসমাঈলের নামে একটি চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে বলেন, তুমি এই চিঠিটি তোমার বাদশাহের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। সেই সাথে তিনি নিজের একজন দূতকেও শাহ

ইসমাঈলের কাছে প্রেরণ করেন। সুলতান সালীম উল্লিখিত চিঠিটি আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তির পর লিখেন ঃ

"আমি, উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান, বীরপুরুষদের নেতা, পৌত্তলিক ও সত্যধর্মের শত্রুদের ধ্বংসকারী সালীম খান ইব্ন সুলতান বায়াযীদ খান ইব্ন সুলতান মুহাম্মাদ খান ইব্ন সুলতান মুরাদ খান, তুমি ইরানী বাহিনীর অধিনায়ক আমীর ইসমাঈলকে বলছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কালাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং যাবতীয় মূঢ়তা থেকে মুক্ত। তবে এর মধ্যে এমন অনেক ভেদের কথাও রয়েছে, যা মানুষের বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। কেননা মানুষের মধ্যেই আত্মিক ও দৈহিক শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। মানুষই হচ্ছে সেই প্রাণী, যে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী উপলব্ধি করতে পারে এবং সেগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য লক্ষ্য করে তাঁর উপাসনা করে। এখন মানুষ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম থেকে সত্য ও সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া কখনো সাফল্যের পথ পাওয়া যায় না। হে আমীর ইসমাঈল! জেনে রেখ, তুমি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। কেননা তুমি নাজাতের পথ ছেড়ে এবং শরীয়তের আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের পবিত্র আদর্শকে অপবিত্র করে দিয়েছ। তুমি ইবাদতগাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ। তুমি অবৈধ ও শরীয়ত বিরোধী পন্থায় পূর্বাঞ্চলে সিংহাসন লাভ করেছ। তুমি শুধু প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে অত্যন্ত হেয় অবস্থা থেকে এই উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছ। তুমি মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্দয়তার দরজা খুলে দিয়েছ। তুমি শুধু একজন মিথ্যাবাদী, নির্দয় ও মুরতাদ নও, বরং একজন অবিবেচক বিদআতী এবং আল্লাহর কালামের অমর্যাদাকারীও বটে। তুমি আল্লাহ্র কালামের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের মধ্যে কপটতা ও দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছ। তুমি রিয়াকারীর (লোক দেখানো কাজকর্মের) আড়ালে চারদিকে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপদের বীজ বপন করেছ এবং অধর্মের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছ। তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বশবর্তী হয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করেছ এবং অনেক দূষণীয় কথা বলেছ। তুমি মহান খলীফাবৃন্দ হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-কে তিরস্কার করার অনুমতি দিয়েছ। আমাদের দীনী উলামাবৃন্দ তোমাকে হত্যার ব্যাপারে ফতওয়া দিয়েছেন। কেননা তুমি কুফরী কথাবার্তা বল এবং কুফরী কাজকর্ম কর। উলামাবৃন্দ এ ফতওয়াও দিয়েছেন যে, দীনের হিফাযতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং তোমার ভক্ত অনুসারীদের নাপাকী ও অপবিত্রতার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। কুরআন অনুযায়ী উলামায়ে দীনের এই নির্দেশ পালন, দীন ইসলামকে সুদৃঢ়করণ এবং যে সমস্ত লোক তোমাদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তাদেরকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে আমি এই সংকল্প নিয়েছি যে, শাহী পোশাক ছেড়ে বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধপোশাক পরব, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সেই পতাকা উত্তোলন করব, যা কোনদিন পরাজয়ের মুখ দেখেনি, ক্রোধ ও উষ্মার খাপ থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণকারী তরবারি টেনে বের করব এবং বের হব আমার সেই সৈন্যদের নিয়ে, যাদের তরবারি শত্রুর দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং যাদের বর্শা শত্রুর কলিজা বিদীর্ণ করে এপার ওপার হয়ে যায়, তারপর তোমার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমি সমুদ্র প্রণালী অতিক্রম করে এসেছি এবং দৃঢ় আশা রাখছি যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে শীঘ্রই তোমার জুলুম অত্যাচারের মূলোৎপাটন করব এবং গর্ব ও দাম্ভিকতার যে গন্ধ তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে এবং যার কারণে তুমি লক্ষ্যহীনতায় ভুগছ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ, তা বের করে দেব। আমি তোমার ভীত-সন্ত্রস্ত প্রজাকুলকে তোমার জুলুম থেকে রক্ষা করব এবং তোমারই সৃষ্ট ফিতনা-ফাসাদের ধূম্রকুণ্ডে তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবো। কিন্তু যেহেতু আমরা আহকামে শরীআর বাধ্য, অনুগত, তাই যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তোমার সামনে কুরআন মজীদ পেশ করতে চাই এবং সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য তোমাকে উপদেশ দিতে চাই। একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে এ চিঠি লিখছি। পাপাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো, মানুষ নিজ থেকে তার কাজকর্মের পর্যালোচনা করে আন্তরিকভাবে তাওবা করবে এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকবে। অতএব যে সমস্ত অঞ্চল তুমি আমার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছ তা আমার সুবাদারদের হাতে প্রত্যর্পণ কর। যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করতে চাও, যদি আয়েশ-আরামে জীবন-যাপন করতে চাও তাহলে আমার এ নির্দেশগুলো মেনে নিতে মোটেই গড়িমসি করবে না। যদি তুমি তোমার অপরাধ প্রবণতার কারণে আপন পিতা ও পিতামহের মত আপন দুষ্কর্ম ও ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ না কর, আপন বাহাদুরী ও ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত না হও তাহলে তুমি দেখতে পাবে, কিছু দিনের মধ্যেই তোমার দেশের প্রান্তরসমূহ আমাদের তাঁবুতে ছেয়ে গেছে। তারপর আমরা তোমাকে আমাদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কিছু নমুনা দেখাব। তখন দেখা যাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা কি ফায়সালা করেন।"

যেমন সুলতান সালীমের উপরোক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শাহ ইসমাঈল এই অতি গর্হিত কাজটিও করেছিলেন যে, তিনি তার সুন্নী প্রজাদের কবর ও মসজিদসমূহ ধ্বংস করে তাদেরকে যারপর নাই বিচলিত ও উত্ত্যক্ত করে তুলেছিলেন। খোদ ইসমাঈলের বাপ-দাদারা শীআ ছিলেন না বরং তারা ছিলেন উসমানীয়দের মতই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতপন্থী এবং সূফী মতবাদের অনুসারী। তারা শায়খ জুনায়দের যুগ থেকে, যখন তাদের মধ্যে সামরিক তৎপরতার সূচনা হয়, জনসাধারণকে আহলে বায়তের মুহাব্বত ও ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। কেননা এর মাধ্যমেই তাদের ক্ষমতা লাভের সুযোগ ছিল অধিক। তারপর তারা ধীরে ধীরে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই শীআ পন্থা অনুসরণ করেন যেটাকে তাদের পূর্ববর্তী শীআরা নিজেদের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ইসমাঈল সাফাভী এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন। তিনি বাদশাহ হয়ে তার যাবতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র শীআ মাযহাবের প্রচারকার্যে নিয়োজিত করেন। যেহেতু ইরানীদের মধ্যে প্রথম থেকেই শীআ মাযহাব গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল তাই ইসমাঈল সাফাভী আপন লক্ষ্য অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। তখন যে সমস্ত দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলিম শী'আ মাযহাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তারপর শীআ মাযহাবের প্রচারাভিযান উসমানীয় সাম্রাজ্যেও প্রসারিত হয়। সুলতান বায়াযীদ এর কোন প্রতিবিধান না করলেও সুলতান সালীম

ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই ফিতনার মূলোৎপাটন করে দিয়েছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান সালীম উসমানী উপরোক্ত পত্রের সাথে নিজের একজন দূতকেও পাঠান এবং তাকে বুঝিয়ে দেন, যদি শাহ ইসমাঈল সোজাপথে চলে আসেন এবং আমার কথাগুলো মেনে নেন তাহলে তাকে বলবে, তিনি যেন শাহযাদা মুরাদকে, যে তারই আশ্রয়ে রয়েছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। ইসমাঈল সাফাভী এই চিঠি পড়ে সুলতান সালীমের দূতকে তৎক্ষণাৎই শাহযাদা মুরাদের হাতে তুলে দেন এবং সে (ইসমাঈল সাফাভীরই ইঙ্গিতে) তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলে। ইসমাঈল সাফাভীর এই কাজটি ছিল অত্যন্ত অত্যাচারমূলক এবং রাজকীয় নিয়মনীতি বিরুদ্ধ। তারপর ইসমাঈল নিজের একজন দূত মারফত সুলতান সালীমের চিঠির উত্তর দেন। তাতে ইসমাঈল সাফাভী লিখেছিলেন ঃ

"আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন এত নাখোশ ও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। মনে হচ্ছে, আপনি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে এই পত্র লিখেছেন। যদি আপনার লড়বার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমিও সে জন্য সবদিক দিয়ে তৈরি আছি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কি, তা শীঘ্রই বোঝা যাবে। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুকাবিলা হবে তখনই আপনার সামনে ভেসে উঠবে আপনার এই বাগাড়ম্বরতার আসল চেহারা।"

এই চিঠির সাথে ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীমের কাছে আফিমের একটি কৌটাও পাঠিয়ে দেন। এতে ইঙ্গিত ছিল, তুমি যেহেতু আফিম সেবনে অভ্যস্ত তাই এ ধরনের উল্টাসিধা কথা বলছ। অতএব উপঢৌকন হিসেবে আফিমের এই কৌটাটিই তোমার প্রাপ্য। সালীম এই চিঠি এবং সেই সাথে আফিমের কৌটাটি পেয়ে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন। তিনি আপন দূতের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে ইসমাঈল সাফাভীর এই দূতকে হত্যা করেন। তারপর আপন বাহিনীকে খুব সুবিন্যস্ত করে তাবরীয (ইসমাঈল সাফাভীর রাজধানী) অভিমুখে রওয়ানা হন। সিওয়াস নগরীতে পৌঁছে সালীম যখন আপন বাহিনীর সৈন্যদের গণনা করেন তখন দেখা যায়, তাতে আশি হাজার অশ্বারোহী এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য রয়েছে। তিনি চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্যকে বিভিন্ন পল্টনে বিভক্ত করে সিওয়াম থেকে কায়সারিয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি মনযিলে এক একটি পল্টন মোতায়েন করেন এবং নির্দেশ দেন : যখন সুলতানী বাহিনী কায়সারিয়া থেকে এক মনযিল অগ্রসর হবে তখন প্রত্যেকটি মনযিলে মোতায়েন সৈন্যরা যেন এক মনযিল করে সামনে অগ্রসর হয় এবং সর্বপশ্চাতে যে প্লাটুনটি মোতায়েন আছে তারা যেন সিওয়াস ত্যাগ করে সম্মুখবর্তী মনযিলে গিয়ে অবস্থান নেন। এই ব্যবস্থা তিনি এ জন্য করেছিলেন যাতে রসদসামগ্রী পৌঁছাতে সুবিধা হয়। কিন্তু সালীম ইরানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার পর দেখতে পান যে, ইসমাঈল সাফাভীর নির্দেশে ইরানীরা সমগ্র এলাকার শস্যক্ষেত একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসমাঈল সাফাভী অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনাধীন আপন এলাকার যাবতীয় শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করতে শুরু করেছিলেন যাতে উসমানীয় বাহিনী ঘাসের একটি টুকরা কিংবা খাদ্যশস্যের একটি দানাও সেখানে না পায়। সবুজ গাছপালা এবং সব রকমের শস্যগুল্ম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার জন্য তিনি একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। ঐ বাহিনীর একমাত্র কাজ ছিল উসমানীয়

বাহিনীর অগ্রভাগ থেকে সমস্ত দেশকে ধ্বংস করে ফেলা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পূর্ব থেকেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে, সেখানকার সমস্ত অধিবাসী যেন নিজ নিজ মালপত্র ও খাদ্যসামগ্রী যে পরিমাণ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব, তা নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে চলে যায় এবং বাকি যা পড়ে থাকে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অন্যথায় শাহীফৌজ শাস্তি হিসাবে তাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে এবং তাদের যাবতীয় আসবাবও পুড়িয়ে দেবে। ইসমাঈল সাফাভীর উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার ফল এই দেখা দেয় যে, সুলতান সালীম উসমানীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে সাময়িকভাবে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হন। অবশ্য তিনি প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে, শত শত জাহাজ কনসটান্টিনোপল এবং ইউরোপীয় প্রদেশসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণ রসদসামগ্রী নিয়ে এসে তারাবুযূন্দ বন্দরে ভিড়বে এবং সেখান থেকে খচ্চর ও উটের কাফেলা ঐসব সামগ্রী বয়ে এনে সুলতানী বাহিনীর হাতে পৌঁছিয়ে দেবে। এ কাজের জন্য তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য এবং অনেকগুলো উট ও খচ্চর মোতায়েন করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও যে সব এলাকা দিয়ে তিনি সফর করছেন সে এলাকায় যদি কোন জিনিসই না মিলে তাহলে তো ভয়ানক অসুবিধার কথা। শাহ ইসমাঈল সাফাভী সেনাবাহিনীর সাথে সাথে নিজেও ঐ ধ্বংসকার্যে লিপ্ত ছিলেন। সালীম উসমানী ভেবেছিলেন যে, ইসমাঈল সাফাভী আপন সাম্রাজ্য সীমান্তেই তাকে (সালীমকে) বাধা প্রদান করবেন। কিন্তু ইসমাঈল সাফাভী ধরে নিয়েছিলেন যে, অনুরূপ অসুবিধার মধ্যে সালীম উসমানী আপন বিরাট বাহিনী নিয়ে এতদূর আসতে না পেরে আপনা-আপনি দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসমাঈল সাফাভীর উপরোক্ত অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অবশ্য সুলতান সালীমের বাহিনী এক পর্যায়ে আগে বাড়তে অস্বীকার করেছিল। বাহিনীর অধিনায়করা সুলতানের কাছে এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, যেহেতু ইসমাঈল সাফাভী মুকাবিলায় না এসে পিছন দিকে পালিয়ে যাচ্ছেন এমতাবস্থায় আমাদেরও দেশে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। কিন্তু সুলতান সালীম কারো কথায় কর্ণপাত না করে অনবরত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশ্য এই অবস্থায় সেনাবাহিনীর রসদ-সামগ্রী সরবরাহের ব্যাপারে সুলতান অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। যাহোক, সুলতান সালীম দিয়ারে বকর হয়ে আযারবায়জান এলাকায় প্রবেশ করেন। কোন একটি মনযিলে পৌঁছার পর সুলতানের সেনাপতি হামাদান পাশা, যিনি সুলতানের বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ ছিলেন, অন্যান্য অধিনায়কের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই, সুলতানের খিদমতে নিবেদন করেন, 'জাঁহাপনা'! আপনি আপনার সেনাবাহিনীকে আর অধিক রুষ্ট করবেন না। এই যুদ্ধাভিযানের যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে আমাদের এখান থেকেই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। এক মনযিলে তো নেগচারী বাহিনী যাদেরকে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বাহিনী মনে করা হতো, সম্মিলিতভাবে স্লোগান তুলে ঃ আমরা এক পাও অগ্রসর হব না। এখান থেকেই আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। সুলতান সালীম যখন দেখলেন, সমগ্র বাহিনীই তাঁর অবাধ্য হয়ে উঠেছে তখন তিনি পরের দিন ভোর বেলা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে নেগচারী বাহিনীর একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়ান এবং সমগ্র বাহিনীকে নিজের চারপাশে রেখে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাবার জন্য এখানে আসিনি। যারা সত্যিকার বীর, যারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে নিজেদের জন্য লজ্জাজনক বস্তু বলে মনে করে, যারা তীর ও তরবারির আঘাতকে ভয় পায় না তারা অবশ্যই আমার সঙ্গ দেবে। কিন্তু যারা ভীরু, যারা নিজেদের প্রাণকে নিজের সম্মান ও মর্যাদার চাইতেও অধিকতর মূল্যবান মনে করে, যারা শুধু নিজেদের ঘরে ফিরে যেতেই অভ্যস্ত, যারা বিজয়ের পথে কষ্ট-যাতনা সহ্য করার সাহস রাখে না– আমি অনুমতি দিচ্ছি তারা এখনই যেন বীর বাহাদুরদের সারি থেকে পৃথক হয়ে নিজ ঘরে ফিরে যায়। তোমাদের একটি লোকও যদি আমার সঙ্গে না থাকে এবং সকলেই কাপুরুষদের দলে ভিড়ে যাও তাহলে আমি একাই সম্মুখে অগ্রসর হব এবং যুদ্ধ না করে কখনো ফিরবো না।"

এই পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে সুলতান সালীম উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন ঃ যারা কাপুরুষ তারা অবিলম্বে আমার সঙ্গ ত্যাগ কর এবং যারা বীরপুরুষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তারা এখনি আমার সাথে রওয়ানা হও। তারপর দেখা গেল সমগ্র বাহিনীই সুলতানের পিছনে পিছনে চলতে শুরু করেছে। এটা ছিল সুলতানের পৌরুষোচিত দুঃসাহসিকতারই প্রতিদান যে, তাঁর বাহিনী যখন পরবর্তী মনযিলে গিয়ে পৌছে তখন গার্জিস্তান তথা ককেশিয়ার একজন খ্রিস্টান সরদারের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ রসদসামগ্রী তাঁর কাছে এসে পৌছে। সুলতানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আতিথ্যের নিদর্শন স্বরূপ ঐ রসদসামগ্রী জনৈক খ্রিস্টান সরদার তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইসমাঈল সাফাভীর রাজধানী তাবরীয আর বেশি দূরে ছিল না। সুলতান সালীম অনবরত সফর করে খালদারান উপত্যকায় গিয়ে পৌছান। ঐ উপত্যকার পশ্চিম দিকের একটি টিলায় চড়ে তিনি দেখতে পান, একেবারে সম্মুখেই ইরানী বাহিনী অবস্থান করছে। এতে তিনি আনন্দ ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তাঁর এই দীর্ঘ সফরকালীন সময়ে সুলতান সালীম গদ্যে অথবা পদ্যে বেশ কয়েকটি পত্র ইসমাঈল নাফাভীর নামে পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি পত্রেই তিনি এমন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, যাতে ইসমাঈল লজ্জায় পড়ে হলেও তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন এতদসত্ত্বেও শাহ সাফাভী তার মুকাবিলায় না আসায় সুলতান সালীম অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েন এবং সে নৈরাশ্য কাটাতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে একটির পর একটি মনযিল অতিক্রম করে এগোতে থাকেন, যাতে ইসমাঈল সাফাভীর রাজধানীতে পৌছে হলেও তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতে পারেন। এমতাবস্থায় ইসমাঈল সাফাভী যদি আপন রাজধানী ছেড়ে পিছনে চলে যেতেন তাহলে তার সে কূটচাল হয়তো সফল হয়ে যেত। কেননা সুলতান সালীম সম্ভবত তাবরীয থেকে আর সম্মুখে অগ্রসর হতেন না। কিন্তু শাহ সাফাভী সুলতান সালীমের অগ্রযাত্রাকে আর বরদাশত করতে পারেননি। খালদারান উপত্যকা ছিল তাবরীয থেকে বিশ ক্রোশ দূরে। আর ইসমাঈল সাফাভী সালীমের সাথে মুকাবিলার জন্য এই স্থানটিকেই নিজের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। যাহোক ইসমাঈল সাফাভীর সৈন্যসংখ্যা সুলতান সালীমেরই অনুরূপ ছিল। তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, মাইলের পর মাইল অনবরত সফর করার ফলে সুলতান সালীমের সৈন্যরা ছিল শ্রান্তক্লান্ত। অপর দিকে ইসমাঈল সাফাভীর সৈন্যরা ছিল সুস্থ, সতেজ এবং হরেক রকম যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত। ইসমাঈল সাফাভী এবং তার বাহিনীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা সালীম উসমানী

এবং তাঁর বাহিনীকে অবশ্যই পরাজিত করবেন। ইসমাঈল সাফাভী মুকাবিলায় আসতে দেরি করাটা তার একটি সামরিক চাল ছাড়া কিছু ছিল না। এই চালের মাধ্যমে তিনি উসমানীয় বাহিনীকে সফরের পর সফর করিয়ে একেবারে দুর্বল ও নিঃশক্তি বানিয়ে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, যেখানে সাফাভী বাহিনীর হাতে সর্বতোভাবে ধ্বংস হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। এখানে পৌছার পর সুলতান সালীমের কর্তব্য ছিল অন্তত একদিন কিংবা কয়েকটি ঘণ্টাই আপন বাহিনীর বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ করা। কিন্তু তিনি যেহেতু ইসমাঈল সাফাভীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য একেবারে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তাই খালদারানের প্রান্তরে পৌছে যখন ইসমাঈল সাফাভী এবং তার বাহিনীকে একেবারে সামনেই দেখতে পেলেন তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। এদিকে ইসমাঈল সাফাভী তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে জেনে নিয়েছিলেন যে, শীঘ্রই উসমানীয় বাহিনী খালদারানের দিকে এগিয়ে আসছে। অতএব, তিনি আগেভাগেই প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত উসমানীয় বাহিনীকে বিশ্রাম গ্রহণের কোন সুযোগ না দিয়েই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ইসমাঈল সাফাভী এটাও জেনে নিয়েছিলেন যে, সুলতান সালীমের সাথে একটি হাল্কা তোপখানাও রয়েছে। সুলতানী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত এবং তার কোন্ অংশের অবস্থা কিরূপ সে তথ্যাদিও ছিল তার নখদর্পণে। ইমাঈল সাফাভী আপন আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে দুভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগকে নিজের অধীনে রাখেন এবং অন্য ভাগকে আপন সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করেন। তার পরিকল্পনা ছিল, উসমানীয় বাহিনী যখন যুদ্ধ শুরু করবে তখন ইরানের সম্মুখবর্তী বাহিনী তাদের মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। আর এই সুযোগে চল্লিশ হাজার সৈন্যের দু'টি অশ্বারোহী বাহিনী ডান ও বাম দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে তারপর যথাক্রমে বাম ও ডান দিকে মোড় ঘুরিয়ে উসমানীয় বাহিনীর একেবারে পিছনে পৌছে যাবে এবং পিছন দিক থেকে একসাথে হামলা চালিয়ে উসমানীয় বাহিনীকে তুলোধোনা করে ছাড়বে। এদিকে সুলতান সালীম ইরানী বাহিনীকে সামনে একেবারে প্রস্তুত দেখতে পেয়ে এশিয়া মাইনরের সমগ্র বাহিনীকে আপন সেনাপতি সিনান পাশার অধীনে ন্যস্ত করেন এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের বাহিনীকে ন্যস্ত করেন হুসাইন পাশার অধীনে। তিনি সিনান পাশাকে ডানপাশে এবং হুসাইন পাশাকে বাম পাশে মোতায়েন করেন। তিনি স্বয়ং নেগচারী বাহিনী নিয়ে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেন। তারপর জায়গীরদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের খণ্ড বাহিনীগুলোকে সম্মুখভাগে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যথাযোগ্য স্থানে তোপখানাও স্থাপন করা হয়। ইসমাঈল সাফাভী যেহেতু তোপখানার কথা জানতেন এবং তিনি এও জানতেন যে, লড়াই শুরু হওয়ার পর কামানের মুখ সহজে ঘোরানো যায় না তাই তিনি তুর্কীদের কামানগুলোকে বেকার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মাধ্যমে পিছন দিক থেকেই হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন (যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে)। ইসমাঈল সাফাভীর এই যুদ্ধকৌশল অত্যন্ত বুদ্ধিসম্মত ও প্রশংসনীয় ছিল। যাহোক দুই বাহিনীর মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইসমাঈল সাফাভী তার চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর বাম দিকে মোড় ঘুরিয়ে

পিছন দিক থেকে উসামানীয় বাহিনীর উপর হামলা চালান। অপরদিকে আবূ আলী বাম পাশের পিছন থেকে অনুরূপভাবে উসমানীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। লড়াই শুরু হওয়ার সাথে সাথে উসমানীয় বাহিনী থেকে তাকবীর ধ্বনি উত্থিত হয়। অপরদিকে ইরানী বাহিনী থেকে উঠে 'শাহ শাহ' ধ্বনি। অর্থাৎ ইরানীদের যুদ্ধের স্লোগানে বাদশাহ সাফাভীর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল আর উসমানীয় বাহিনীর স্লোগানে উচ্চারিত হচ্ছিল শুধু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। উভয় বাহিনীর এই স্লোগান থেকেই যে কেউ বলে দিতে পারত, এদের মধ্যে কে তাওহীদ পন্থী আর কে মুশরিক। যাহোক ইসমাঈল সাফাভী কামানের লক্ষ্যস্থল থেকে বেঁচে গিয়ে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য লাভ করেন– অর্থাৎ তিনি পিছন থেকে হুসায়ন পাশার বাহিনীর উপর শক্ত হামলা চালান। ফলে ইউরোপীয় পল্টুনগুলোর বেশির ভাগ অধিনায়ক ও সৈন্য নিহত হয়। অপর দিকে আবূ আলী সিনান পাশার বাহিনীর উপর হামলা চালান, কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। বরং তার বাহিনীর একটি অংশ তোপখানার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয় এবং সে কারণে স্বয়ং আবূ আলীও নিহত হন। এবার মিযান পাশা অতি সহজেই আবূ আলীর বাহিনীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু হুসাইন পাশার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। কেননা এ দিকে ইরানীরা খুব জোর হামলা চালাচ্ছিল। সুলতান সালীম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। তিনি সুলতান বায়াযীদ ইয়ালদিরিমের মত আপন অধিনায়কত্বের কথা ভুলে গিয়ে একজন সক্রিয় তরবারি চালনাকারী যোদ্ধায় নিজেকে রূপান্তরিত করেননি। যখন সুলতান সালীমের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, সিনান পাশাকে সাহায্য করার কোন প্রয়োজনই আর নেই, কেননা সে আপন প্রতিপক্ষকে ইতিমধ্যে কাবু করে ফেলেছে তখন তিনি আপন সংরক্ষিত বাহিনী নিয়ে বিদ্যুৎবেগে হুসাইন পাশার সাহায্যে এগিয়ে যান এবং ইরানীদের উপর এমন ভয়ানক হামলা চালান যে, তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ইসমাঈল সাফাভীও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ঊর্ধ্বমুখে পালাতে শুরু করেন।

ইসমাঈল সাফাভীকে উসমানীয় সৈন্যরা বন্দী করে ফেলেছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মির্যা সুলতান আলী নামক ইসমাঈলের জনৈক সঙ্গী বলে ওঠে, আমিই শাহ ইসমাঈল। তখন উসমানীয় সৈন্যরা আসল ইসমাঈলের পরিবর্তে নকল ইসমাঈল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে আসল ইসমাঈল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। যাহোক কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র ইরানী শূন্য হয়ে পড়ে। সুলতান সালীম যখন আগে বেড়ে ইসমাঈল সাফাভীর সেনাছাউনি দখল করেন তখন জানতে পারেন যে, ইসমাঈল এমনি হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করেছেন যে, ছাউনির মধ্যে নিজের যাবতীয় অর্থকড়ি, এমনকি নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে রেখে চলে গেছেন। সুলতান সালীম স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকে বন্দী করে রাখেন এবং সকল যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে ফেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের পর জানা যায়, এই যুদ্ধে চৌদ্দজন উসমানীয় এবং চৌদ্দজন ইরানী পতাকাবাহী অধিনায়ক নিহত হয়েছেন। নিজের অধিনায়কদের মৃত্যুতে সুলতান সালীম অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা সহকারে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করে তাবরীয অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় খালদারান নামক স্থানে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে আগস্ট, মুতাবিক ৯২০ হিজরীর ২০শে রজব। যুদ্ধের তের দিন

পর সুলতান সালীম ইরানের রাজধানী তাবরীযে প্রবেশ করেন। ইসমাঈল সাফাভী খালদারান থেকে পলায়ন করে তাবরীযে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, সুলতান সালীম তারবীযের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন তিনি তাবরীয থেকে খুরাসানের দিকে পালিয়ে যান এবং সাম্রাজ্যের পূর্বাংশেই নিজের দখল কায়েম রাখেন।

সুলতান সালীম তাবরীযে আটদিন অবস্থান করেন। তারপর কুররা বাগের দিকে অগ্রসর হন। সুলতান সালীম যখন তাবরীযে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর সাথে মির্যা বদীউযযামান সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি ছিলেন তাইমূরী বংশের একজন শাহযাদা। সুলতান তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। সুলতান সালীমের ইচ্ছা ছিল কুররাবাগ থেকে আগে বেড়ে আযারবায়জানেরই প্রান্তরে শীতকাল কাটিয়ে দেবেন এবং বসন্ত ঋতু শুরু হওয়ার সাথে সাথে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে বিজয়াভিযান পরিচালনা করবেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা পুনরায় অবাধ্যতার মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তিনি দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এখন থেকে সুলতানের প্রত্যাবর্তন ছিল ঠিক সেরূপ, যেরূপ প্রত্যাবর্তন ছিল আলেকজান্ডারের শতদ্রু নদীর তীর থেকে। কেননা আলেকজান্ডারকেও তাঁর বাহিনী সেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। তবে সুলতান সালীম কুররাবাগ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেও সোজা কনসটান্টিনোপলে ফিরে যাননি, বরং সেখান থেকে এশিয়া মাইনরের আসাসিয়া শহরে উপনীত হন এবং সমগ্র শীতকাল সেখানেই কাটিয়ে দেন। তারপর বসন্ত ঋতু শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিজয়াভিযান চালিয়ে আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও কুহেকাফ এলাকা আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আযারবায়জান প্রদেশ তো ইতিপূর্বেই তাঁর দখলে এসে গিয়েছিল। সুলতানের ইচ্ছা ছিল কুর্দিস্তান এবং ইরাক অর্থাৎ দজলা ও ফোরাতের দুআব অঞ্চলও আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। কেননা ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপর তখনো ইসমাঈল সাফাভীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তখন সুলতান সংবাদ পান যে, কনসটান্টিনোপলের বাহিনীর মধ্যে এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে যে,সেখানকার ভাইসরয়ও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। অতএব সুলতান সালীম বাধ্য হয়ে আপন রাজধানী কনসটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তবে রওয়ানা হওয়ার আগে আপন পরিকল্পিত বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখার জন্য কয়েকজন অধিনায়ক নিয়োগ করে যান। ঐ অধিনায়করা কিছুদিনের মধ্যেই কুর্দিস্তান, ইরাক এবং পারস্য উপসাগরের উপকূল অঞ্চল দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে ইসমাঈল সাফাভীর প্রায় অর্ধেক সাম্রাজ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইসমাঈল সাফাভী বার বার তাঁর হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে সুলতান সালীমের অধিনায়কদের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

খালদারান বিজয়ের পর সুলতান সালীম যখন তাবরীযে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানকার এক হাজার স্থপতি ও কারিগরকে প্রচুর পারিশ্রমিক এবং জায়গীরের বিনিময়ে স্থায়িভাবে কনসটান্টিনোপলে চলে আসতে রাযী করান। ঐ যুগে তাবরীযের স্থপতিরা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। স্থাপত্যবিদ্যায় তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব সুলতান সালীম তাদেরকে কনসটান্টিনোপলে পাঠিয়ে সেখানকার একটি বিরাট অভাব পূরণ করেন। উল্লিখিত পরাজয়ের

পর শাহ ইসমাঈল সাফাভী বেশ কয়েকবারই সুলতান সালীমের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করেন এবং কোন না কোনভাবে সুলতান সালীমের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু সুলতান সালীম ইসমাঈল সাফাভীর প্রতি এতই রুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর এই সমস্ত প্রস্তাবে মোটেই সাড়া দেননি, বরং তাঁর সাথে যুদ্ধাবস্থা অব্যাহত রাখাকেই সমীচীন মনে করেন। তারপর সুলতান সালীমকে যদি সিরিয়া ও মিসরের দিকে মনোনিবেশ করতে না হতো তাহলে তিনি অবশ্যই আর একবার ইরান আক্রমণ করে ইসমাঈল সাফাভীর হাত থেকে তাঁর বাকি সাম্রাজ্যটুকুও ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তাঁর বিজয়াভিযান তুর্কিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছত। কিন্তু সালীম পুনরায় ইরানে আসার অবকাশ পাননি। তবে তাঁর অধিনায়করা অধিকৃত অঞ্চলগুলো নিজেদের কবজায় ধরে রাখে। এই আক্রমণ ও যুদ্ধের ফলশ্রুতি দাঁড়ায় এই যে, ধীরে ধীরে পূর্বদিকেও উসমানীয় সাম্রাজ্যের আয়তন বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অনেক উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। এ কারণে পূর্বদিক থেকে কোনরূপ হামলার আশঙ্কাও আর বাকি থাকেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খালদারান যুদ্ধে ইসমাঈল সাফাভীর স্ত্রী সুলতান সালীমের কবজায় চলে আসার পর শাহ ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীমের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, তাঁর স্ত্রীকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটা ছিল ঐ সময় যখন শাহ সালীম এশিয়া মাইনরের আসাসিয়া শহরে অবস্থান করছিলেন। ধারণা করা হচ্ছিল যে, সুলতান সালীম শাহ সাফাভীর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু শাহ সাফাভী যেহেতু মুতরাদ, ধর্মদ্রোহী ও অনেক দুষ্কর্মের হোতা ছিলেন তাই সুলতান তার সাথে কোনরূপ সদয় আচরণ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তখন পর্যন্ত শাহ সাফাভীর স্ত্রী অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথেই নজরবন্দী ছিলেন। সুলতান তাকে ফেরত পাঠাতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। অবশ্য খালদারান যুদ্ধের পাঁচ-ছয় মাস পর শাহ সাফাভীর স্ত্রী জাফর চিলপী নামক সুলতান সালীমের জনৈক সিপাহীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসমাঈল সাফাভী এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার প্রিয়তমা স্ত্রী একজন তুর্কী সিপাহীর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বেশ আনন্দের মধ্য দিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করবে এটা ছিল তার ধারণারও অতীত। তাই যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন এই মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে জর্জরিত করে রাখে।

মিসর ও সিরিয়া বিজয়

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, আইয়ূবী বংশের সপ্তম বাদশাহ মালিক সালিহ মিসরে মামলূকী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ বাহিনীকে 'দাস বাহিনী' বলাই অধিক সঙ্গত। শীঘ্রই ঐ দাসরা মিসরের সিংহাসন দখল করে নেয়। ঐ যুগেরই নিকটবর্তী সময়ে হিন্দুস্থানের দাস বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে দাস বংশের শুধু দুজন বাদশাহ দাস ছিলেন। অবশিষ্টরা ছিলেন ঐ সমস্ত দাসেরই পরম্পরাগত বংশধর, কিন্তু মিসরের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। সেখানে একজন শাসকের মৃত্যু হওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে দাসদের মধ্য থেকেই অপর কাউকে সিংহাসনে বসানো হতো। আর নির্বাচিত ঐ ব্যক্তিকে বলা হতো মামলূক

বাদশাহ। সালীমের যুগ পর্যন্ত মিসরে ঐ সমস্ত দাস সম্রাটেরই হিফাযতে আব্বাসীয় খলীফারা মিসরের অভ্যন্তরে বসবাস করতেন। মিসরের ঐ মামলূকী সাম্রাজ্যও ছিল বেশ শক্তিশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ। ঐ সমস্ত মামলূকী ইসলামী বিশ্বের দু'টি অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দেন। এক. তারা ফিলিস্তীন ও সিরিয়াকে ইসলাম বিরোধী হামলাসমূহ থেকে রক্ষা করেন এবং সেখান থেকে চিরদিনের জন্য ক্রুসেড আক্রমণের মূলোৎপাটন করেন। দুই. তারা মুঘলদের দুর্বার আক্রমণকেও প্রতিহত করেন এবং চেঙ্গীয, হালাকূ প্রমুখের বাহিনীসমূহকে পরাজিত করে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দিগ্বিজয়ী মুঘলরা মিসরের দাসবংশ তথা মামলূকীদের হাতে যেভাবে মার খেয়েছিল ঠিক সেভাবে মার খেয়েছিল হিন্দুস্থানের দাসবংশের হাতেও। তাদের ভাগ্যেই এটা লেখা ছিল যে,তারা মুসলমানদের অতি সম্মানিত ও উচ্চ বংশসমূহ ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু দাসবংশীয় মুসলমানদের হাতে তাড়া খেয়ে পলায়ন করবে।

মিসরের মামলূকী সাম্রাজ্যের সাথে মিসর, সিরিয়া ও হিজাযের শাসকবর্গের কোন বিরোধ বা শত্রুতা ছিল না। সুলতান মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর যখন সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাহযাদা জামশীদ তার কাছে পরাজিত হয়ে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন তখন প্রথমবারের মত কনসটান্টিনোপলের দরবারের সাথে কায়রো দরবারের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ঐ তিক্ততা যুদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে এবং তাতে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে মামলূকীদের হাতে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এ সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুলতান সালীম সিংহাসনে আরোহণ করার পর অন্যান্য সম্রাটের মত মামলূকীরাও এই নতুন সুলতানের গতিবিধি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতে থাকেন। তারা যখন ইসমাঈল সাফাভীর পরাজয় ও সালীমের জয়লাভের কথা জানতে পারেন তখন এই ভেবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন যে,সালীম এবার তাদেরকে হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। কেননা দিয়ারে বকর ইত্যাদি প্রদেশ উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় মামলূকীদের দখলকৃত দেশ সিরিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের আরো নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। তারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে,সুলতান সালীম অবশ্যই ঐ সমস্ত শহর ও দুর্গ ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করবেন,যা মামলূকীরা সুলতান বায়াযীদ (দ্বিতীয়)-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এদিকে শাহ ইসমাঈল সাফাভী সুলতান সালীমের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করার পর মিসরের সুলতান কালযূ গাযীর কাছে দূত পাঠিয়ে তার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চান। মামলূকী আমীর ইসমাঈল সাফাভীর দূতকে সাদরে গ্রহণ করতে এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতে মোটেই ইতস্তত করেননি। ইসমাঈলের দূত কালযূ গাযীর দৃষ্টি ঐ সমস্ত সম্ভাব্য বিপদের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, যা সুলতান সালীমের দিক থেকে মিসর সাম্রাজ্যের উপর আপতিত হতে পারে। উল্লিখিত অজুহাতের প্রেক্ষিতে হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক, আমীর কবীর কালযূ গাযী তথা মিসরের সুলতান স্বয়ং হলব শহরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সিরিয়া সীমান্তে প্রয়োজনীয় বাহিনী মোতায়েন করেন। এর পিছনে সম্ভবত দুটি লক্ষ্য ছিল। এক. সুলতান সালীম যাতে সিরিয়া আক্রমণ না করতে পারেন তার

প্রতিবিধান করা। দুই. এশিয়া মাইনরের পূর্বাংশে আক্রমণ চালানো। খুব সম্ভব মামলূকী সাম্রাজ্যের উপর হামলা পরিচালনার ইচ্ছা সুলতান সালীমের ছিল না। কেননা মামলূকীরা ছিল শরীয়তের খাঁটি অনুসারী এবং সুলতান সালীমের স্বধর্মী ও স্বমাযহাবী, কিন্তু ইসমাঈল সাফাভীর গোপন কূটকৌশল পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে ফেলে এবং বেচারা মামলূকীরা ইরান সম্রাটের প্ররোচনায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তাদের সবকিছু খুইয়ে বসে।

সুলতান সালীম ইরান থেকে ফিরে এসে কনসটান্টিনোপলে অবস্থান করছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি পশ্চিম সীমান্ত এবং খ্রিস্টান সাম্রাজ্যসমূহ ছাড়া অন্য কোন দিকে ছিল না। তাঁর পিতা ও পিতামহরা দীর্ঘদিন থেকে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করে আসছিলেন। তাই ইউরোপীয় দেশসমূহ ছাড়া আর কোন দেশের প্রতিই সালীমের লোভ ছিল না। হিজরী ৯২২ সনে (১৫১৬ খ্রি) সুলতান সালীমের নিকট তাঁর এশিয়া মাইনরের পশ্চিম এলাকার প্রশাসক ও সেনাপতির কাছ থেকে হঠাৎ একটি চিঠি আসে। তাতে বলা হয়, আমি আপনার নির্দেশ পালনার্থে ফোরাত উপত্যকার দিকে সেনাবাহিনী নিয়ে যেতে পারছি না। কেননা সিরিয়া সীমান্তে মামলূকীরা সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং আমি আশঙ্কা করছি, আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ওরা হয়তো এশিয়া মাইনরের পূর্বাংশে হামলা চালাবে। এই চিঠি পড়ে সুলতান সালীম আপন সমগ্র অধিনায়ক, উলামা ও মন্ত্রীদের একটি পরামর্শসভা আহ্বান করেন। মামলূকীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে এই ছিল ঐ সভার আলোচ্য বিষয়। বিষয়টির উপর দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর মীর মুনশী মুহাম্মাদ পাশা একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তিনি তার বক্তৃতায়— তার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে হবে। তাছাড়া উসমানীয় সুলতান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মামলূকীরা কখনো হারমাইন শরীফাইন (মক্কা মদীনা)-এর খাদিম হতে পারে না। মূলকে হিজায উসমানীয় সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং উপরোক্ত দায়িত্ব উসমানীয় সুলতানেরই গ্রহণ করা উচিত। এটাকে ইসলামেরই একটি খিদমত বলে গণ্য করতে হবে এবং এই প্রেক্ষিতে মামলূকীদের সাথে যুদ্ধ করা শুধু বৈধ নয় বরং প্রশংসার্হ। সুলতান মীর মুনশীর এই অভিমতকে এতই পছন্দ করেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মীর মুনশী পদ থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত করেন।

সুলতান সালীম মিসরের মামলূকী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প নেন। তবে তিনি প্রথমে আমীর কালযূ গাযীর কাছে দূত মারফত একটি পয়গাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার করে তার নিদর্শন স্বরূপ আমার কাছে কর প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দাও, অন্যথায় আমি হামলা চালিয়ে তোমার সাম্রাজ্য দখল করে নেব। সুলতানের দূতেরা যখন হলবে কালযূ খানের কাছে গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি অত্যন্ত রেগে যান এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলেন। ব্যস, এতটুকু ঘটনাই সুলতানের সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়ে কনসটান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হন। উসমানীয় বাহিনী যখন নিকটবর্তী হয় তখন মামলূকী সুলতান ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এই অবস্থায় আপোস মীমাংসাকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তিনি উসমানীয় দূতদেরকে সঙ্গে

সঙ্গে মুক্ত করে দিয়ে তাদের মাধ্যমেই সুলতান সালীমের কাছে সন্ধির পয়গাম পাঠান। কিন্তু সুলতান সে পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে অনবরত সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। হলবের নিকটস্থ 'মারজে ওয়াবিক' প্রান্তরে, যেখানে হযরত দাউদ (আ)-এর কবর রয়েছে, উভয় পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট, মুতাবিক ৯২২ হিজরীতে খালদারান যুদ্ধের পুরো দু'বছর পর। মামলূকীরা বীরত্ব ও সাহসিকতায় উসমানীয়দের চাইতে মোটেও কম ছিল না। কিন্তু ঐ সময়ে তারা আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় আশানুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। ফলে সুলতান সালীমের বিরাট বাহিনীর সামনে মামলূকীদের পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মামলূকী সুলতান, যিনি তখন অতিবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে লড়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মামলূকী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে এবং সুলতান সালীম আগে বেড়ে সহজেই হলব দখল করে নেন।

এই পরাজয় মামলূকীদেরকে মোটেই দমাতে পারেনি। কেননা তারা নিজেদেরকে উসমানীয়দের সমতুল্য বীর বলেই মনে করত। কালযূ গাযীর নিহত হওয়ার পর বাহিনীর সমগ্র অধিনায়ক একজন নতুন সুলতান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কায়রোর দিকে চলে যায়। মামলূকীদের মধ্যে চব্বিশজন সর্দার ছিলেন। একজন সুলতানের মৃত্যু হলে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন করে সুলতান নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতেন ঐ চব্বিশ জন সর্দারই। আর ঐ নির্বাচনে চব্বিশ জনের সকলেরই উপস্থিত থাকা ছিল অপরিহার্য। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব নতুন সুলতান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মামলূকীদের ঐ পর্যায়ের বড় বড় সর্দারকে অবিলম্বে কায়রোয় পৌঁছার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ঐ মুহূর্তে সিরিয়ার শীর্ষ পর্যায়ের কোন সর্দার ছিলেন না। বরং সকলেই কায়রো চলে গিয়েছিলেন। ঠিক সে সময়ই সুলতান সালীম সিরিয়া জয়ের একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। ফলে অতি সহজেই দামেশক ও বায়তুল মুকাদ্দাসসহ সমগ্র সিরিয়া তার দখলে চলে আসে। হলব যুদ্ধের পর সিরিয়ায় মামলূকীরা বিরাট আকারের আর কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি।

এদিকে কায়রোয় মামলূকী সর্দাররা সর্বসম্মতিক্রমে তূমান বেকে তাদের সুলতান নির্বাচন করে। তূমান বে সিংহাসনে আরোহণ করেই সালীমের মিসর অভিমুখী অগ্রাভিযানে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বিরাট বাহিনী মিসর ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত গাযা দুর্গ অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং বাকি বাহিনীকে ঢেলে সাজাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান সালীমের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ঐ সময়ে দামেশক মিসরীয় সাম্রাজ্যের যে বিরাট ধনভাণ্ডার ছিল তা তার হস্তগত হয়। তাতে পাওয়া যায় সত্তর লক্ষ টাকা। এ ছাড়া অন্যান্য শহর থেকেও প্রচুর মালে গনীমত তাঁর হস্তগত হয়। সুলতানের ভবিষ্যৎ বিজয় অভিযানে এই অর্থ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই অর্থ দ্বারা সুলতান সিরিয়াবাসীদের মন জয়েরও একটা সুবর্ণ সুযোগ পান। তিনি সেখানকার আলিম, খতীব, দরবেশ এবং কারীদেরকে অনেক আকর্ষণীয় উপহার-উপঢৌকন দেন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও পুল মেরামত করেন, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং মিসরের উপর হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিবহন

কাজে ব্যবহারের জন্য অনেক উট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করেন। মিসরীয় বাহিনী মিসরের সীমান্তবর্তী গাযার দুর্গে এসে পৌঁছে। এদিকে সুলতান সালীম তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার সবুজ সতেজ অঞ্চলসমূহ অতিক্রম করে যখন মরু অঞ্চলে প্রবেশ করেন তখন অত্যন্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে উষ্ট্রকাফেলার মাধ্যমে প্রচুর পানি সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি ঐ সময়ে সৈন্যদেরকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বাড়িয়ে দেন। তিনি বাহিনীর একটি বিরাট অংশ এবং তোপখানাটি সিনান পাশার অধীনে ন্যস্ত করে তাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং স্বয়ং তিনি বাকি বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সিনান পাশাকে অনুসরণ করতে থাকেন। ঐ মরু এলাকা অতিক্রম করতে তার দশ দিন লাগে। সিনান পাশা গাযাহ নামক স্থানে পৌঁছেই অধিনায়ক গায্যালীর অধীনে সেখানে মামলূকীদের যে বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল তাদের মুকাবিলা করেন। মামলূকী সৈন্যরা অত্যন্ত নির্ভীকভাবে উসমানীয় বাহিনীর উপর হামলা চালায়, কিন্তু সিনান পাশা আপন তোপখানা থেকে তাদের উপর এমন মারাত্মকভাবে গোলাবর্ষণ করেন যে, উসমানীয় বাহিনীর ধারেকাছে পৌঁছার আগেই সমগ্র মামলূক বাহিনী বলতে গেলে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মামলূকীদের কোন তোপখানা ছিল না। তাই দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত উসমানীয়দের বারুদের ক্ষমতা, মামলূকীদের হৃদয়ের ক্ষমতা তথা মনোবল একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। কাজে কাজেই উসমানীয়রা অতি সহজেই জয়লাভ করে। এতে শুধু তাদের সাহসই বৃদ্ধি পায়নি, বরং এতদিন যাবত তাদের অন্তরে মামলূকী বাহিনীর যে ভয়ভীতি বিরাজ করছিল তাও দূর হয়ে যায়।

মিসরে মামলূকী ও উসমানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ

গাযার সংঘর্ষে গায্যালী পরাজিত হয়ে কায়রোর দিকে ফিরে আসেন। তূমান বে যখন তুর্কী তোপখানার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সংবাদ পান তখন তাঁর সাহস ও বীরত্ব হ্রাস না পেয়ে বরং আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি কায়রো সংলগ্ন সিরিয়ামুখী রাস্তার পার্শ্ববর্তী রেযওয়ানিয়া নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ ঘটান এবং সালীমের বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকেন। সুলতান তূমান বে ছিলেন একজন উচ্চস্তরের বীর ও অভিজাত পুরুষ। তবে কোন কোন সময় অত্যন্ত ভদ্র ও পুণ্যবান ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করা হয় আর ভাললোকের পিছনে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণকারী দুষ্ট লোকদের একটি দল তো সব সময়ই লেগে থাকে। তূমান বে একজন অতি যোগ্য, পবিত্রমনা ও সব দিক দিয়ে প্রশংসনীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যখন মিসরের সুলতান নির্বাচিত হন তখন মামলূকী সর্দারের মধ্য থেকেই কিছু লোকের সে নির্বাচন মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তূমান বে-র পক্ষে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে তারা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, তবে মনে মনে ফুসতে থাকে। যদি তূমান বে নির্বাচিত হওয়ার পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেতেন তাহলে তিনি তাঁর সুন্দর চরিত্র ও আচার-আচরণ দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত লোকের অন্তরের জ্বালা নিবারণ করতে পারতেন। কিন্তু সে অবকাশ তিনি পাননি। কেননা ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হয়।

ঐ বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হচ্ছেন গায্যালী বে এবং অপরজন হচ্ছে খায়রী বে। তারা যখন দেখলেন যে, তূমান বে মিসরকে রক্ষা এবং উসমানীয় বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তখন তারা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করে বরং তার প্রচেষ্টা যাতে বিফল হয় সে ব্যাপারে গোপন তৎপরতা শুরু করে দেয়। ঐ বিশ্বাসঘাতকরা সুলতান সালীমের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাকে তূমান বের যাবতীয় যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও কৌশলাদি সম্পর্কেও অবহিত করে। তূমান বে সালীমের তোপখানাকে বেকার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে, যখন সালীমের বাহিনী মার্চ করে মিসরীয় বাহিনীর আওতায় এসে যাবে তখন তাদেরকে বিশ্রামের কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে ডান ও বাম পার্শ্ব থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হবে এবং সুলতানের তোপখানাকে বেকার করে দিয়ে তার বাহিনীর সাথে তরবারি ও বর্শার সাহায্যে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করা হবে। ঐ বিশ্বাসঘাতকরা তূমান বের এই পরিকল্পনা সম্পর্কেও সালীমকে পূর্বাহ্নে অবহিত করে দেয়ার ফলে এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এটাও সুলতান সালীম উসমানীর একটি সৌভাগ্য যে, একেবারে উপযুক্ত সময়ে খোদ মামলূকীদের শীর্ষস্থানীয় কিছু সর্দার তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়েছিল।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি, (মুতাবিক ৯২২ হিজরীতে) রিযওয়ানিয়ার সন্নিকটে, যেখানে মিসরীয় বাহিনী অবস্থান করছিল, উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেহেতু সুলতান সালীম তূমান বে-র পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন তাই তূমান বে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি, বরং তাকে তোপখানার মুখোমুখি হয়েই যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে খায়রী বে, গাযযালী বে— এই দুই মামলূকী বিশ্বাসঘাতক সুলতান সালীমের কাছে চলে আসে। উসমানীয়দের কামান ও বন্দুকের অবিরাম গুলিবর্ষণের মধ্যে মামলূকীরা যেভাবে তাদের প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করে এবং নিজেদের অসমসাহসিক বীরত্বের পরিচয় দেয়, যুদ্ধের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত কমই পাওয়া যাবে। তূমান বে আপন মামলূক অশ্বারোহীদের এক বাহিনী নিয়ে, যারা আপাদমস্তক বর্ম, ঢাল ইত্যাদি লৌহ পোশাকে সজ্জিত ছিল, উসমানীয় বাহিনীর একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়ল। সুলতান তূমান বের সাথে আরো দু'জন দুঃসাহসী মামলূকী সর্দার ছিলেন। তাদের নাম ছিল আলান বে ও কুরত বে। ঐ দুই সর্দার এই মর্মে শপথ নিয়েছিলেন যে, হয় তারা সুলতান সালীমকে জীবন্ত বন্দী করবেন, নয়তো হত্যা করবেন।

মামলূকীদের এই খণ্ড বাহিনীর হামলা ছিল ভূমিকম্প সদৃশ, যা সমগ্র উসমানীয় বাহিনীকে কাঁপিয়ে তোলে। সুলতান তুমান বে এবং তার সামান্য সংখ্যক সঙ্গীরা যেন ছিল ঐ সমস্ত ব্যাঘ্রসদৃশ, যারা একটি মেষ পালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। উসমানীয় বাহিনীর একেবারে মধ্যস্থলে ঢোকা পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কোন শক্তিই তাদেরকে রুখে রাখতে পারেনি। তারা শত্রুব্যূহ ভেদ করে সারির পর সারি বিদীর্ণ করে ঝড়ের বেগে ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছে, যেখানে সালীম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন বাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুনের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তূমান বে সিনান পাশাকে, যিনি সুলতান সালীমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সালীম মনে করে তাকেই মুকাবিলার জন্য আহ্বান জানান এবং তাকে লক্ষ্য করে এমন জোরে বর্শা নিক্ষেপ করেন যে, তা সিনান পাশার দেহ ভেদ করে একেবারে বেরিয়ে

যায়। ফলে তিনি অসার হয়ে চিরদিনের জন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ ভাবে আলান বে এবং কুরাত বেও দুজন উসমানী অধিনায়ককে হত্যা করেন। কিন্তু সুলতান সালীমকে তারা কেউই চিনতে পারেননি। এভাবে এই তিনজন মামলূকী সর্দার সুলতান সালীমের একেবারে চোখের সামনে তিনজন উসমানী অধিনায়ককে হত্যা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদেরকে বাধা দেয় এমন দুঃসাহস কারো হয়নি। তূমান বে-র ধারণা অনুযায়ী তিনি সুলতান সালীমকে খতম করে ফেলেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সুলতান সালীম বেঁচেছিলেন। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধও পুরোদমে অব্যাহত ছিল। এই হামলায় আলান বের পায়ের মধ্যে বন্দুকের একটি গুলী লেগেছিল এবং এতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন।

সুলতান সালীম মামলূকীদের এই পৌরুষ ও বীরত্ব লক্ষ্য করে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে মনে বলছিলেন, যদি আজ আমার কাছে তোপখানা ও বন্দুকসজ্জিত প্লাটুন না থাকত তাহলে মামলূকীদের মুকাবিলায় আমার এই বিরাট বাহিনী কোন কাজেই আসত না। সুলতান সালীম অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে আপন বরকন্দায প্লাটুন এবং কামানসমূহ সক্রিয় রাখেন। মামলূকীদের অবস্থা ছিল এই যে,তাদের এক একজন সর্দার তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাত এবং গোলাগুলি অবিরাম বর্ষণ ভেদ করে উসমানীয় বাহিনীর প্রথম সারিতে পৌঁছার আগে তাদের সকলেই শেষ হয়ে যেত। বিশ্ব ইতিহাসে এই যুদ্ধ অতুলনীয় ছিল এ জন্য যে, এতে মামলূকীরা শুধু নিজেদের বাহাদুরীর পরিচয় দিতে গিয়ে একেবারে জেনেশুনে নিজেদেরকে তোপ ও বন্দুক তথা আজরাঈলের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পঁচিশ হাজার মামলূকী সৈন্য রেযওয়ানিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়। তাদের মাত্র কয়েকজনই জীবিত ছিল, যারা তূমান বে-কে বলতে গেলে, জোর করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আয়ূবিয়ার দিকে নিয়ে যায়। এই যুদ্ধে মামলূকী সৈন্যরা শুধু গোলা-বারুদের আঘাতেই নিহত হয়েছিল। অপর দিকে উসমানীয় সৈন্যরা নিহত হয়েছিল শুধু তরবারি ও বর্শার আঘাতে। কেননা মামলূকীদের কাছে বন্দুক ছিল না। তাছাড়া বন্দুক হাতে নেওয়াকে তারা কাপুরুষতার লক্ষণ বলেই মনে করত। যেহেতু সুলতান তূমান বে রেযওয়ানিয়া থেকে আয়ূবিয়ার দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং কায়রো শূন্য হয়ে পড়েছিল তাই রেযওয়ানিয়া যুদ্ধের সপ্তম দিবসে সুলতান সালীম কায়রো দখল করেন। এই অবকাশে যে সমস্ত মামলূকী সৈন্য এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল তারা তূমান বের কাছে আয়ূবিয়ায় এসে সমবেত হয়। ফলে তূমান বে-এর অধীনে একটি ছোটখাট বাহিনী গড়ে ওঠে।

তূমান বে যখন শুনতে পেলেন যে, সুলতান সালীম কায়রো দখল করে নিয়েছেন তখন তিনি তাঁর ঐ সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়েই কায়রো আক্রমণ করেন। সালীম তখন সতর্কতামূলকভাবে শহরের বাইরে আপন সেনাছাউনিতে অবস্থান করছিলেন। তূমান বে অপর দিক থেকে হঠাৎ শহরে প্রবেশ করে বিজয়ী তুর্কীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে যে সমস্ত তুর্কী শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল একে একে তাদের সকলেই তূমান বের হাতে নিহত হয়। তূমান বে শহর পুনর্দখল করে অলিগলি ও বাসগৃহের মাধ্যমে মোর্চা তৈরি করে নেন। কায়রো শহরে কোন প্রাচীর ছিল না যে, তার মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিরোধ করা যেত। সুলতান সালীম যখন যান তখন দেখতে পান যে, এর প্রতিটি অলি-গলিতে মোর্চা তৈরি করে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। সালীম এবার বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাছাড়া এমন একটি শহর, যার কোন প্রাচীর নেই, সেটা জয় করতে না পারাটা তার জন্য

একটি বিরাট অপমানের বিষয়ই বটে। অপরদিকে কায়রোকে এই অবস্থায় রেখে চলে গেলে তার সুখ্যাতিতে বিরাট আঘাত হানবে। সালীমের জন্য এটা ছিল সেই গরম দুধতুল্য, যা তিনি গিলতেও পারছিলেন না, আবার উগলে ফেলতেও পারছিলেন না। তিনদিন পর্যন্ত কায়রোর অলি-গলিতে তথা বাইরের দালান-কোঠার মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। এতদসত্ত্বেও সালীম কায়রোর কোন একটি মহল্লায়ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। সুলতান সালীম যখন দেখলেন, তূমান বে-কে কায়রো থেকে বেদখল করা কঠিন এবং দিন দিন তার অসুবিধা বেড়েই চলেছে তখন তিনি মামলূকী সর্দার খায়রী বে-কে যিনি রেযওয়ানা যুদ্ধ চলাকালেই তার কাছে চলে গিয়েছিলেন, ডেকে পাঠান এবং বলেন, এখন তুমিই আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা কৌশল বাতলে দাও। খায়রী বেগ তখন বলেন, আপনি এখন ঘোষণা প্রদান করুন যে, যে মামলূকী হাতিয়ার রেখে দেবে এবং আমার কাছে চলে আসবে তার জানমালের কোন ক্ষতি করা হবে না এবং তার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করা হবে। এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং সালীমও আপন বাহিনীকে শহরের আশপাশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কোন কোন মামলূকী এই ক্ষমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে নিজ থেকে সালীমের সেনাবাহিনীর সামনে এসে হাযির হয়। আবার কাউকে কাউকে শহরবাসীরা জবরদস্তিমূলকভাবে সুলতানী সেনাবাহিনীর সামনে হাযির হতে বাধ্য করে। এভাবে আটশ' মামলূকী যোদ্ধা সুলতান সালীমের সেনাদলের সামনে হাযির হয়ে আপনা থেকে বন্দীত্ববরণ করে। তাদের আশা ছিল যে, সুলতান তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে, গত যুদ্ধে এই আটশ মামলূকী সর্দারই ছিল কায়রোর সবচেয়ে বড় শক্তি, তখন খায়রীর পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান সালীম তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর তিনি কায়রো শহরে পাইকারী হত্যা চালাবার নির্দেশ দেন।

তূমান বে যখন দেখলেন যে, এখন আর শত্রুকে প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা তার নেই তখন তিনি কায়রো থেকে বের হয়ে মরু অঞ্চলের আরব বেদুঈনদের কাছে চলে যান। এদিকে সুলতানী সৈন্য সমগ্র শহরে পাইকারী হত্যা শুরু করে। এতে পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয়। কুরত বে, যিনি তূমান-বের ডান হাত এবং অত্যন্ত বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন, কায়রোর অভ্যন্তরে কোন একটি ঘরে লুকিয়ে থাকেন। শহরবাসীদেরকে দুর্বল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার পর সুলতান সালীম পাইকারী হত্যা বন্ধ করেন এবং তূমান বে ও কুরত-বেকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, তূমান বে কায়রো থেকে বেরিয়ে গেছেন, তবে কুরত বে এখনো কায়রোর অভ্যন্তরে কোন একটি জায়গায় লুকিয়ে রয়েছেন। সুলতান সালীম তখন কুরত বের কাছে একটি পয়গাম পাঠান। তাতে বলা হয়, তুমি আমার কাছে নির্দ্বিধায় চলে আস। আমি তোমার প্রাণের নিরাপত্তা দিচ্ছি। কুরত বে ভেবে দেখলেন,এবার যদি সালীমের এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ তিনি গ্রহণ না করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় তার সামনে তাকে হাযির হতে হবে। অতএব তিনি আর দ্বিধা না করে সোজা সালীমের দরবারে গিয়ে হাযির হন।

সালীম তাকে দেখে বললেন, রেযওয়ানিয়ার যুদ্ধের দিন তো দেখেছিলাম, তুমি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছ, কিন্তু আজ তোমাকে বড় চুপচাপ দেখাচ্ছে। কুরত বে উত্তরে বলেন, আমি এখনো সে রকম বাহাদুরই আছি। কিন্তু

তোমরা উসমানীয়রা অত্যন্ত ভীরু এবং কাপুরুষ। তোমাদের যাবতীয় বীরত্ব ও বিজয়াভিযান শুধু তোমাদের বন্দুকের কারণেই। আমাদের সুলতান কালযূ গাযীর যুগে জনৈক ফিরিঙ্গি একটি বন্দুক নিয়ে তার দরবারে হাযির হয়ে নিবেদন করেছিল, আপনি চাইলে আমি সমগ্র মামলূকী বাহিনীকে বন্দুক সরবরাহ করতে পারি। তখন আমাদের সুলতান এবং রাজকীয় কর্মকর্তারা বলেছিলেন, যুদ্ধে বন্দুক ব্যবহার করা একটি কাপুরুষতার লক্ষণ। অতএব আমরা এটাকে স্পর্শ করতে চাই না। তখন ঐ ফিরিঙ্গি ভরা দরবারেই বলেছিল, 'দেখবে, একদিন এই বন্দুকের কারণেই মিসর সাম্রাজ্য তোমাদের কবজা থেকে চলে গেছে। আজ আমরা তাই স্বচক্ষে দেখলাম। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, পৌরুষ ও বীরত্বের মাধ্যমে নয় বরং শুধু এই বন্দুকের সাহায্যেই তুমি আমাদের উপর জয়লাভ করেছ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বন্দুক কখনো জয়-পরাজয়ের আসল কারণ হতে পারে না। আমরা পরাজিত হয়েছি এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাম্রাজ্যকে আর অধিক দিন টিকিয়ে রাখতে চান না। এভাবে তোমাদের সাম্রাজ্যও একদিন অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যেভাবে মানুষের আয়ু সীমিত, ঠিক সেভাবে সালতানাত ও হুকুমতের সময়কালও সীমিত। একদিন না একদিন তা অবশ্যই শেষ হয়ে যায়। তুমি কখনো এ কথা ভাববে না যে,আমাদের চাইতে অধিকতর বাহাদুর হওয়ার কারণে তুমি বিজয় লাভ করেছ। সুলতান সালীম বলেন, তুমি যদি এতই বাহাদুর হয়ে থাক তাহলে এখন আমার সামনে এভাবে বন্দীদশায় হাযির হয়েছ কেন ? কুরত বে উত্তরে বলেন, খোদার কসম, আমি নিজেকে তোমার বন্দী মনে করি না। আমি তো তোমার প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস করে এখানে স্বেচ্ছায় এসে হাযির হয়েছি। অতএব আমি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনই মনে করছি। সুলতান সালীম এবং কুরত বের কথোপকথন এ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ কুরত বে-র দৃষ্টি খায়রী বে-র উপরে পড়ে। খায়রী বে তখন রীতিমত সুলতান সালীমের সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কুরত বে তখন খায়রী বে-র দিকে মুখ করে তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। এতে খায়রী-বে ভরা মজলিসে খুব অসম্মান বোধ করেন। তারপর কুরত বে সুলতান সালীমকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার উচিত এই প্রতারক ধোঁকাবাজের (খায়রী বে-র) মাথা উড়িয়ে দেয়া এবং এই প্রতারণার জন্য তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। অন্যথায় সে তোমাকেও জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ কথা শুনে সুলতান সালীম অত্যন্ত রাগত ভিঙ্গতে উত্তর দেন, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে মুক্তি দিয়ে একটি বড় সামরিক পদে নিয়োগ করব। কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত আমার সাথে অত্যন্ত অভদ্রের মত কথা বলছ এবং সুলতানী দরবারের আদব-কায়দা মোটেই মানছ না। সুলতানী দরবারে যে বেআদবী করে তাকে যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয় তা কি তুমি জান না? কুরত বে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে জবাব দেন, খোদা এমন না করুন যে, আমিও তোমার নওকর ও মুসাহিবদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি। এ কথা শোনার সাথে সাথে সুলতান যারপর নাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং জল্লাদদেরকে ডাকেন। কুরত-বে তখন বলেন, আমার একার মাথা কাটিয়ে তোমার কি লাভ হবে ? আমার মত আরো হাজার হাজার বীর বাহাদুর যে তোমার মাথার সন্ধানে রয়েছে। তুমান-বে ও তো এখনো জীবিত আছেন এবং তোমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টায়ই নিয়োজিত রয়েছেন। যা হোক জল্লাদরা কুরত বে-র দেহ থেকে তার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে হামলা চালায়। তখন কুরত-বে খায়রী বে-কে

সম্বোধন করে বলেন, লও, এবার আমার ছিন্ন মস্তকটি তোমার স্ত্রীর কোলে নিয়ে রাখ। এ কথা বলতে না বলতেই জল্লাদরা কুরত-বের দেহ থেকে তাঁর মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

কায়রো দ্বিতীয় বারের মত বিজিত হওয়ার পর তূমান বে কায়রো থেকে বের হয়ে যান এবং আরব গোত্রের লোকদেরকে আপন সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করেন। এভাবে মোটামুটি একটি বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তিনি সালীমের বাহিনীর উপর হামলা চালাতে শুরু করেন। সালীম তার মুকাবিলার জন্য যে সমস্ত খণ্ডবাহিনী পাঠান তূমান বে একের পর এক তাদের সকলকেই পরাজিত করে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। তূমান বের বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি হচ্ছে মামলূকী বাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং অপরটি হচ্ছে নতুনভাবে ভর্তিকৃত আরব গোত্রসমূহের লোকজন। মামলূকী এবং আরব উভয়েই তাদের নতুন বিজেতাদেরকে সমভাবে ঘৃণা করত। আর এ কারণেই তারা সম্মিলিতভাবে উসমানী খণ্ড বাহিনীসমূহকে বার বার পরাজিতও করে। তবে খোদ আরব এবং মামলূকীদের মধ্যেও পরস্পর শত্রুতা ছিল। আর এটা ছিল তূমান বের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ।

তূমান বের ঘন ঘন আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সুলতান সালীম তার কাছে পয়গাম পাঠান ঃ যদি তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে আমি তোমাকে মিসরের বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব এবং এ দেশের শাসন ক্ষমতা তোমার হাতেই থাকবে। কিন্তু সুলতান সালীম যেহেতু মামলূকীদের অত্যন্ত প্রিয় সরদার কুরত বেকে হত্যা করিয়েছিলেন এবং কায়রো শহরেও পাইকারী হত্যা চালিয়েছিলেন তাই সুলতান সালীমের দূত মুস্তাফা পাশা উপরোক্ত পয়গাম নিয়ে তূমান বে-র কাছে পৌছা মাত্র মামলূকীরা ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সুলতানের কাছে যখন এই খবর পৌছে তখন তিনি এর বদলে তিন হাজার মামলূকী বন্দীকে হত্যা করেন এবং তূমান বে-র মুকাবিলায় তোপখানাসহ একটি দুর্বার বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে মিসরের পিরামিডের নিকটে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ চলাকালেই মামলূকী এবং আরব সৈন্যরা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অতএব অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, একদিকে মামলূকীরা আরবদেরকে এবং আরবরা মামলূকীদেরকে হত্যা করছিল, আর অপরদিকে উসমানী তোপখানা তাদের উভয়কে একই সাথে নিধন করছিল। এমতাবস্থায় তূমান বে-র বাহিনী নির্মূল হতে আর বেশি সময় লাগেনি। এভাবে তার সমগ্র বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলে পর তূমান বে সেখান থেকে তার একজন সর্দারের কাছে চলে যান। তূমান বে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্নভাবে ঐ আরব সর্দারের অনেক উপকার করেছিলেন। কিন্তু সে কৃতঘ্ন সরদার এই বীর-শ্রেষ্ঠ বদান্য সুলতানকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে সোজা সুলতান সালীমের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

যখন সুলতান সালীম জানতে পারেন যে, তূমান বে-কে বন্দী করা হয়েছে তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, এবার মিসর বিজিত হলো। যখন তূমান বে সুলতান সালীমের নিকটবর্তী হন তখন তিনি তাকে একজন বাদশাহর ন্যায়ই অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে একজন অতি মর্যাদাশীল অতিথি হিসাবেও গ্রহণ করেন। তূমান বের প্রতি সুলতান সালীমের এই মার্জিত ব্যবহার লক্ষ্য করে খায়রী বে ও গায্যালী বে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। এই দুইজন গাদ্দার তূমান-বের প্রাণের শত্রু ছিল। এদিকে সুলতান সালীমের ইচ্ছা ছিল, তূমান বে-কে মিসরের নিয়মিত সম্রাট বানিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবেন এবং ঐ দেশের শাসন ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করে স্বয়ং কনসটান্টিনোপলে ফিরে যাবেন। এই পরিস্থিতিতে গায্যালী বে এবং

খায়রী বে নিষ্কর্মা বসে থাকেনি। তারা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে সুলতানের কানে এ জাতীয় তথ্যাদি পৌঁছাতে শুরু করে যে, তূমান বেকে মুক্ত করে পুনরায় মিসরের সুলতান বানানোর জন্য অবিরাম ষড়যন্ত্র চলছে। ফলে তূমান বে শীঘ্রই মুক্ত হয়ে সুলতান সালীমের ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। সুলতান সালীম এ যাবত তূমান বে-র কারণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে উপরোক্ত গুজব তূমান বে-র বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে উত্তপ্ত বারুদের ন্যায় কাজ করে। তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে তূমান বে-কে হত্যার নির্দেশ দেন। এ ভাবে ১৫১৭ সনের ১৭ই এপ্রিল মুতাবিক ৯২২ হিজরীতে মামলূকীদের এই সর্বশেষ সুলতান অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন।

তূমান বে নিহত হওয়ার পর মিসর সাম্রাজ্যের দিক থেকে সুলতান সালীমের আর কোন আশঙ্কা বাকি রইল না। কিন্তু তিনি জানতেন, মিসর জয় করার পর সেটাকে দখলে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। কয়েকশ' বছর যাবত মামলূকীরা মিসর শাসন করে আসছিল। তারা মিসরের মূল অধিবাসী ছিল না। তবে শাসক জাতি হিসাবে মিসরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। তারা প্রায়ই সার্কেশিয়া ও কূহেকাফ অঞ্চল থেকে গোলামদের খরিদ করে নিয়ে আসত এবং ওদের দ্বারাই নিজেদের জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করত। অবশ্য মিসরে তাদের বংশধররাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মিসরে বিপুল সংখ্যক আরব বাস করত। সে কারণে মিসরকে একটি আরব দেশ বলেই মনে হতো। ধর্মীয় দিক দিয়ে আরবদের সম্মান ও নেতৃত্ব সাধারভাবে স্বীকৃত ছিল। আর মিসরের অধিবাসীরা সিরিয়া ও হিজাযের আরবদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে একটি বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী ছিল। মিসরের প্রাচীন অধিবাসী তথা কিবতী জাতি এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাও একাধারে কৃষি এবং সরকারী দফতরের হিসাব-নিকাশের কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন মিসরের সমাজ জীবনে তাদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অপরদিকে মিসরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ ও এলাকাসমূহের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও মিসর আক্রমণ ও তা দখল করার ক্ষমতা রাখত। এমতাবস্থায় সুলতান সালীম যদি মিসরে কোন গভর্নর নিয়োগ করতেন তাহলে এই আশঙ্কা ছিল যে, সে সিরিয়া, হিজায এবং পশ্চিম এলাকার গোত্রসমূহকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসত। আর যদি এমন শাসক নিয়োগ করতেন, যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিদ্যোৎসাহী নয় এবং বিদ্রোহের মনোবৃত্তিও পোষণ করে না তাহলে তার দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হতো না। সুলতান সালীম যদি মিসর বিজয়ের পর অবিলম্বে আপন রাজধানীতে ফিরে যেতেন তাহলে এখানে সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হতো এবং পুনরায় সুলতানকে আগের মতই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। সুলতান সালীম মিসর জয় করার পর দীর্ঘদিন মিসরে অবস্থান করেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এখানকার অবস্থাদি পর্যালোচনা করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ত্রিপোলী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। যদি তিনি তাই করতেন তাহলে খুবই ভাল হতো। কেননা এই অবস্থায় স্পেন জয় করা তার জন্য কঠিন হতো না। কিন্তু তাঁর বাহিনী আর সম্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অতএব সুলতান সালীমকে বাধ্য হয়ে কনসটান্টিনোপলের দিকে ফিরে যেতে হয়।

মামলূকীদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর মিসর থেকে চিরতরে তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলাটা সুলতান সালীমের জন্য অত্যন্ত সহজ ছিল। কিন্তু তিনি বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে

মামলূকীদের ক্ষমতা ও অস্তিত্ব বজায় রাখেন এবং নিজের পক্ষ থেকে মামলূকীদের সর্দার তথা বিশ্বাসঘাতক খায়রী বেকে মিসরের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন এবং চব্বিশ সদস্যবিশিষ্ট মামলূকী সর্দারদের যে কাউন্সিল বা পার্লামেন্ট ছিল তাও পুনর্গঠনের অনুমতি দেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মামলূকীদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, মিসরের কোন সুলতান মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত বা পদচ্যুত হলে তাদের শীর্ষস্থানীয় চৌদ্দজন সর্দার সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরই মধ্যকার কোন একজন সর্দারকে সুলতান পদে নির্বাচন করতেন। সুলতান সালীম ঐ সর্দারদের সংখ্যা এবং ক্ষমতা যথারীতি বহাল রাখেন। তবে এই নীতি নির্ধারণ করলেন যে,নতুন সর্দার নিয়োগের ক্ষেত্রে উসমানীয় সর্দারের অনুমোদন অবশ্যই নিতে হবে। সেই সাথে তিনি এই রীতিও প্রবর্তন করলেন যে, এখন থেকে প্রধান বিচারপতি, মুফতী প্রভৃতি ধর্মীয় পদে শুধু আরব সর্দারদেরকে নিয়োগ করা হবে। আর অর্থ সংক্রান্ত পদসমূহ নিয়োগ করা হবে কিবতী এবং ইহুদীদেরকে। এভাবে দ্বিকক্ষ, বরং ত্রিকক্ষ বিশিষ্ট শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে সুলতান সালীম নিজস্ব বাহিনী থেকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচশ' পদাতিক সৈন্যের এক বাহিনী কায়রোয় মোতায়েন করেন এবং খায়রুদ্দীন নামীয় জনৈক সর্দারকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে নির্দেশ দেন ঃ কায়রো নগরী এবং কেন্দ্রীয় দুর্গসমূহের উপর তোমার দখল বহাল রাখবে এবং তুমি কোন অবস্থায়ই শহর কিংবা দুর্গ থেকে বাইরে যেতে পারবে না।

কায়রো জয় করার পর যখন জুমুআর দিন এল তখন সুলতান সালীম মিসরের জামি মসজিদে গিয়ে জুমুআর নামায আদায় করেন। সুলতানের জন্য প্রথম থেকেই অত্যন্ত মূল্যবান একটি কার্পেট বিছানো হয়েছিল। কিন্তু সুলতান সালীম মসজিদে প্রবেশ করেই অসাম্য সৃষ্টিকারী ঐ বিশেষ মুসাল্লাটি মসজিদ থেকে উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সাধারণ মুসল্লীদের সারিতে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর নামায আদায় করেন। নামাযরত অবস্থায় সুলতানের মনে এমনি বিনয়ের ভাব জাগ্রত হয় যে, তাঁর চোখের পানিতে যমীন সিক্ত হয়ে ওঠে। মিসর জয়ের পর সুলতান মিসরের শ্রেষ্ঠতম স্থপতি ও কারিগরদের একটি দলকে জাহাজযোগে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে,তাবরীয জয়ের পর তিনি সেখান থেকেও বহু সংখ্যক সুদক্ষ স্থপতি ও কারিগর কনসটান্টিনোপল অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ থেকে অনায়াসে বোঝা যায়, সুলতানের মানসিকতা কত উচ্চ ছিল এবং তিনি তাঁর রাজধানীর সৌন্দর্য ও জাঁকজমক বৃদ্ধির জন্য কতই না উদগ্রীব ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এত দীর্ঘ সময় মিসরে অবস্থান করা সত্ত্বেও সুলতান সালীম মিসরের পিরামিডগুলোর দিকে একবার ফিরেও তাকাননি। তবে হ্যাঁ, মিসরের মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহের প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন এবং সেখানকার আলিমদের মর্যাদা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন। মিসরে অবস্থানকালে সুলতান এ কথাও চিন্তা করেছিলেন যে, আরব দেশসমূহের উপরও তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরী। আরবদের পবিত্র শহরসমূহ– যেমন, মক্কা, মদীনা প্রভৃতির উপর আরব সর্দারদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সমস্ত শহরে কোন সামরিক প্রদর্শনী কিংবা যুদ্ধ তৎপরতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বরং সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ঐ সমস্ত শহরের অধিবাসীদেরকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তাদের মন জয় করা। সুলতান সালীম তাঁর ঐ লক্ষ্য অর্জনেও সফলকাম হন। তিনি তাঁর বদান্যতা ও প্রচুর দান-দক্ষিণার মাধ্যমে আরব সর্দারদের অন্তর, বলতে গেলে আপন হাতের

মুঠোয় নিয়ে নেন। এতদিন পর্যন্ত মামলূকীদেরকেই আরব তথা হিজাযের বাদশাহ মনে করা হতো। এখন তাদের সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটায় সুলতান সালীমকেই হিজাযের বাদশাহ মনে করা হতে থাকে। অবশ্য আরব সর্দাররা যদি চাইত তাহলে তাকে নিজেদের বাদশাহ বলে স্বীকার করত না, বরং তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সুলতান সালীমকে নিজেদের প্রতি অতিশয় সদয় দেখে আরব-সর্দাররা আপনা-আপনি তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে পয়গাম পাঠায় এবং তাকে 'খাদিমুল হারমাইন আশ্-শারীফাইন' উপাধিতে ভূষিত করে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, আব্বাসীয় খলীফা মামলূকীদের কাছে মিসরে ঠিক সেরূপ শানশওকত ও মর্যাদার সাথে থাকতেন যেরূপ রোমে থাকতেন পোপ কিংবা দিল্লীতে থাকতেন মুঘল বংশের শেষ সুলতান দ্বিতীয় আকবর এবং বাহাদুর শাহ। ঐ সমস্ত আব্বাসীয় খলীফার না কোন হুকুমত ছিল, আর না ছিল কোন দেশের উপর দখলাধিকার। কোন সেনাবাহিনীও তাদের অধীনে ছিল না। এতদসত্ত্বেও শুধু মিসরের মামলূকী সুলতানরাই নয়, বরং অন্যান্য ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসকরাও তাদের কাছে 'হুকুমতের সনদ' ও খেতাবাদি লাভ করাকে নিজেদের জন্য গৌরবজনক বলে মনে করতেন। ঐ আব্বাসীয় খলীফাদেরকে ধর্মীয় পেশওয়া তথা ইমাম বলেও মনে করা হতো।

সুলতান সালীম আব্বাসীয় খলীফাদের এই গুরুত্ব এবং তাদের খিলাফত পদের 'আছর' তথা কার্যকারিতা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি মিসরে অবস্থানকারী শেষ আব্বাসীয় খলীফাকে এ ব্যাপারে রাযী করিয়ে নিতে সক্ষম হন যে, তিনি (আব্বাসীয় খলীফা) নিজে থেকেই 'খিলাফত' পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং ঐ সমস্ত 'তাবাররুকাত' (কল্যাণ প্রতীক), যা খিলাফতের চিহ্ন হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর দখলে রয়েছে, তা সুলতান সালীমের হাতে অর্পণ করবেন। উপরন্তু সুলতান সালীমকে তিনিও খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন। আব্বাসীয় খলীফা ঐ সমস্ত জিনিস সুলতান সালীমকে দিয়ে স্বয়ং তাঁর হাতে বায়আত করেন। এ ভাবে মুসলিম জগতে শুধু 'নাম কা ওয়াস্তে' খলীফার পরিবর্তে প্রকৃত খলীফারই আবির্ভাব ঘটলো। 'খলীফা' অর্থ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বাদশাহ তথা রাষ্ট্রপ্রধান। এই অর্থে সুলতান সালীম ছাড়া তখনকার বিশ্বে খলীফা হবার যোগ্য অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না। ৯২৩ হিজরীর (১৫১৭ খ্রি) শেষের দিকে সুলতান সালীম এক হাজার উটভর্তি স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে কনসটান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হয়। সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফাকেও তিনি সাথে করে নিয়ে যান। কায়রো থেকে রওয়ানা হয়ে মাত্র কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর সুলতান সালীম আপন প্রধানমন্ত্রী ইউনুসকে যিনি তখন ঘোড়ায় চড়ে সুলতানের সাথে আলাপ করতে করতে যাচ্ছিলেন— বলেন, 'আমরা শীঘ্রই সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছে যাচ্ছি।' মন্ত্রী তখন কথায় কথায় বলে ফেললেন, আমরা এই সফরে আমাদের অর্ধেক বাহিনীই শেষ করে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি। যাদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে মিসর জয় করলাম তাদের হাতেই পুনরায় তা ছেড়ে দিয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছি না, মিসর আক্রমণ করে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কি লাভ হলো। এ কথা শোনার সাথে সাথে সুলতান তাঁর সঙ্গী অশ্বারোহীদের নির্দেশ দেন ঃ এখনি এর মাথা উড়িয়ে দাও। অতএব সাথে সাথে ইউনুস পাশার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হলো। এভাবে সুলতান সালীম আপন মন্ত্রী ও মুসাহিবদের প্রতি

অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু তিনি আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভুল-ভ্রান্তি, এমনকি কঠোর ব্যবহারকেও হাসিমুখে সহ্য করে নিতেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইউনুস প্রথম থেকেই মিসর জয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তার অভিমতও ব্যক্ত করছিলেন। এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরও তিনি তার পূর্বের সেই গোঁ-ই ধরে রেখেছিলেন। অথচ সুলতান সালীম মিসর জয় করে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিজয় অভিযান পরিচালনা এবং মিসর থেকে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সুলতানের প্রায় দু'বছর সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই তিনি সিরিয়া, আরব, মিসর এই তিনটি দেশকেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া আর একটি বিরাট লাভ এই হয়েছিল যে, সুলতান সালীম মিসরে আক্রমণ পরিচালনার সময় শুধু 'সুলতান সালীম' ছিলেন, অথচ এখন তিনি আপন রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছেন 'খলীফাতুল মুসলিমীন সুলতান সালীম'রূপে। এর চেয়ে বড় গৌরবের কথা আর কি হতে পারে যে, খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার কারণে তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইমাম ও পেশওয়ায় পরিণত হয়েছিলেন। মিসর থেকে ফিরে এসে সুলতান সালীম কয়েক মাস দামেশকে অবস্থান করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে, তিনি দামেশ্‌ক থেকে হজ্জে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হিজাযে যান। কিন্তু সাধারণভাবে এই খ্যাতি রয়েছে যে, সুলতান সালীম কিংবা অন্য কোন উসমানীয় সুলতান হজ্জে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে কখনো হিজাযে যাননি। দামেশকে অবস্থান করে সুলতান সালীম আরব সর্দারদের কাছ থেকে আনুগত্যের স্বীকৃতি নেন এবং তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি দামেশক থেকে রওয়ানা হয়ে হলবে আসেন এবং সেখানেও কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সফরকালে তিনি আপন সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজায ও সিরিয়ার প্রশাসনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি কমিশনারী বা জেলায় পৃথক পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ফলে কোথাও ভয়ানক কোন বিদ্রোহের আশঙ্কা বাকি থাকেনি। এই সমস্ত কাজ সেরে সুলতান সালীম হিজরী ৯২৪ সনে (১৫১৮ খ্রি) কনসটান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুলতান সালীম কনসটান্টিনোপল ফিরে এসে ভেনিস রাষ্ট্রের কাছ থেকে জাযীরা-ই-কাররাস তথা সাইপ্রাসের কর আদায় করেন। ভেনিসবাসীরা ইতিপূর্বে মামলূকী সুলতানদেরকে এই কর প্রদান করত। এবার যখন মিসর উসমানীয় সুলতানের অধীনে এসে গেল তখন মিসরের সব প্রাপ্যেরও তিনি অধিকারী হয়ে গেলেন। ভেনিসবাসীরাও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা সব সময়ই উসমানীয় সুলতানের দরবারে এই কর পাঠাতে থাকবে।

স্পেনের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য, সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়ে এই মর্মে আবেদন করেন যে, যে সমস্ত খ্রিস্টান সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত করতে যাবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। সুলতান সালীম সঙ্গে সঙ্গে ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তার সাম্রাজ্য সীমার মধ্যে কোন খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীকে কেউ কোনরূপ কষ্ট দিতে পারবে না। হাঙ্গেরী-সম্রাটের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় হাঙ্গেরী-সম্রাট তা নবায়নের আবেদন জানান এবং সুলতান সালীম নির্দ্বিধায় সে আবেদন মঞ্জুর করেন। সুলতান সালীম এশিয়া ও আফ্রিকায় যে বিজয় অর্জন করেছিলেন তার প্রভাব

প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ইউরোপবাসীদের উপর পড়েছিল। সুলতান সালীম একদিকে আপন সাম্রাজ্য-সীমা বর্ধিত করেন এবং অন্য দিকে খলীফাতুল মুসলিমীন পদ লাভ করার কারণে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের সকল সম্রাটই কম্পবান ছিলেন এই ভয়ে যে, না জানি সুলতান সালীম হয়তো তাদের দেশ আক্রমণ করে বসবেন। সুলতান সালীম মিসর থেকে ফিরে আসার পরই খ্রিস্টান সম্রাটরা তাঁর কাছে সন্ধির পয়গাম পাঠাতে শুরু করেন। সুলতান অত্যন্ত কঠোর মেযাজের লোক ছিলেন বটে, তবে সেই সাথে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদর্শীও ছিলেন। তিনি এমন বেকুব ছিলেন না যে, মানুষের তোষামোদে পড়ে নিজের কাজকর্মের পরিণামের দিকটি ভুলে বসবেন। তিনি খ্রিস্টানদের দুষ্টামি ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক এবং পশ্চিম ইরানকে আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করে এমন একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন, যে সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এ তিনটি মহাদেশেই বিস্তৃত ছিল। এখন তার জন্য শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল ইউরোপীয় খ্রিস্টান দেশসমূহ, যেগুলো জয় করার জন্য তার পূর্ব পুরুষরা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। স্বভাবত তিনিও এ ব্যাপারে গাফিল থাকতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সুলতান সালীমের পূর্বপুরুষরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান সম্রাটদের সাথেই শক্তি পরীক্ষায় নেমেছেন। সকল ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে একমত যে, সুলতান সালীম একজন উচ্চস্তরের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল ধর্মীয় ভাবাবেগে পূর্ণ। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এখন পর্যন্ত তিনি শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়েছেন এবং মুসলমানদের দেশই দখল করেছেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, সালীম এ কথা ভালভাবে বুঝে নিয়েছিলেন— মুসলমানদের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্মীয় ভাবাবেগ একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সাধারণভাবে তাদের চরিত্রের মধ্যে অধঃপতন দেখা দিয়েছে। তাইমূর ও বায়াযীদের মধ্যকার যুদ্ধও ছিল এ কথারই স্পষ্ট স্বাক্ষর। কনসটান্টিনোপল জয় করে এবং সেখান থেকে খ্রিস্টান সাম্রাজ্য মুছে ফেলে বেশ কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এশিয়া মাইনরের পর পর বিদ্রোহ উসমানীয় সুলতানদেরকে বিচলিত করে রাখত। ইসমাঈল সাফাভীর কূটচাল এবং দুষ্টামিপনা সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথেই সুলতান সালীম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই তিনি সর্বপ্রথম ইরানের ঐ শীআ সাম্রাজ্যকে শায়েস্তা করে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলো নিজের দখলে নিয়ে আসেন। ইরানীদের আক্রমণের কোন আশংকা আর বাকি থাকেনি। এশিয়া মাইনর থেকে শীআদের হত্যা করার ফলে তাদের দিক থেকে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রেরও আর কোন সম্ভাবনা বাকি থাকেনি। মিসরের ইসলামী সালতানাত যেহেতু শাহযাদা মুস্তফার ব্যাপারে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল তাই সুলতান সালীমের কাছে মিসরের আশঙ্কাও ইরানী আশঙ্কার চাইতে খুব একটা খাটো ছিল না। অতএব সুলতান সালীম মিসরীয়দেরকে পর্যুদস্ত না করে খ্রিস্টান দেশসমূহের উপর হামলা চালানোকে যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। কেননা অনুরূপ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান সম্রাটরা মিসরের সুলতানদেরকে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা চালাতে পারত। মিসর জয়ের পর এবার সুলতান সালীমের আসল যে কাজটি বাকি ছিল তা হলো ইউরোপ জয় করা। সুলতান সালীমের

বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা যারপর নাই প্রশংসাযোগ্য এ জন্য যে, তিনি মিসর থেকে ফিরে এসে খ্রিস্টান দেশসমূহের উপর হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেননি বরং সালতানাতের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানোর সাথে সাথে সামরিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে থাকেন। এই অবস্থায় যে সমস্ত খ্রিস্টান সম্রাট সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধ প্রস্তুতি তলে তলে পুরোদমেই জারি ছিল। এমনভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তাঁকে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। মিসর থেকে ফিরে এসে তিনি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দেন। জাহাজ তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি কারখানা স্থাপন করা হয়। এগুলোতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেড়শ যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হয়ে যায়। এ জাহাজগুলোর প্রতিটির ওজন ছিল সাতশ' টন। এ ছাড়াও অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ তৈরি করা হয়। সুলতান তাঁর এই যুদ্ধ প্রস্তুতির তথ্যাদি গোপন রাখার জন্য জাহাজগুলো তৈরি হওয়ার পর তা সমুদ্রে না ভাসিয়ে কারখানার মধ্যেই বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। একদা সুলতান কনসটান্টিনোপলের নিকটবর্তী সমুদ্রে তাঁর একটি যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা দেখতে পান। এতে তিনি এতই রাগান্বিত হন যে, সে অপরাধে আপন নৌ-সেনাধ্যক্ষকে হত্যার নির্দেশ দেন আর কি। কিন্তু অন্যান্য অধিনায়ক এবং মন্ত্রীরা অনেক চেষ্টা চালানোর পর এই বলে সুলতানের রাগ দমনে সক্ষম হন যে, এই জাহাজ এই মাত্র তৈরি হয়েছে এবং যে কোন জাহাজ তৈরি হওয়ার পর রীতি অনুযায়ী সেটাকে পানিতে ভাসিয়ে তার গতি ও ভারবহন ক্ষমতা নির্ধারণ করা খুবই জরুরী।

জাহাজ নির্মাণ ছাড়াও সুলতান সালীম কামান-বন্দুক তৈরির অনেকগুলো কারখানা স্থাপন করেন। বারুদ তৈরির কারখানাগুলোও রাতদিন কর্মব্যস্ত থাকে। সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তির কাজও অব্যাহত রাখা হয়। এশিয়া মাইনরে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনীও সর্বক্ষণ তৈরি থাকে, যাতে নির্দেশ পাওয়া মাত্র মুহূর্তও বিলম্ব না করে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারে। সুলতান সালীমের মন্ত্রীবর্গ নৌ ও স্থলশক্তির এই রাতারাতি উন্নয়ন লক্ষ্য করে শীঘ্রই কোন একটি বিরাট অভিযান যে শুরু হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু কি ধরনের এই অভিযান, কি জন্য এই প্রস্তুতি তা কারোরই জানা ছিল না। সুলতান সালীম আপন মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে সলাপরামর্শ করতেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাউকে পরিষ্কার কিছু বলতেন না। তিনি তাড়াহুড়া করে কখনো কোন পদক্ষেপ নিতেন না। কিন্তু যখন তিনি কোন ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেন তখন আর কিছুতেই পিছনে হঠতেন না। তিনি তাঁর সংকল্পে ছিলেন অটল এবং সাহসিকতায় দুর্বার। যদি কেউ তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করত তিনি তার প্রাণ সংহারেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এই বিদ্যোৎসাহী বীরপুরুষ মুসলমান সম্রাটদেরকে পর্যুদস্ত এবং তাদের দিককার যাবতীয় আশঙ্কা মুছে ফেলার পর নিশ্চয়ই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন এবং তাঁর মতে এই প্রস্তুতি তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। কেননা তিনি ইউরোপের উপর এমন একটি হামলা চালাতে যাচ্ছিলেন যার মধ্যে পরাজয় ও ব্যর্থতার নামগন্ধও থাকবে না।

সুলতান সালীম অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এমনি সময়ে ৯২৬ হিজরীর ৬ই শাওয়াল মুতাবিক ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর জুমুআর দিন তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি হিজরী ৯২৬ সনের ১লা শাওয়াল কনসটান্টিনোপল থেকে আড্রিয়ানোপলের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তিনি তখনো আড্রিয়ানোপলে পৌঁছেননি, বরং পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন (ঐ জায়গায়ই একদা তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন) এমনি সময়ে এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন যে, সেখান থেকে আর অগ্রসর হতে পারেননি, বরং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সুলতান সালীমের উরুতে একটি ফোঁড়া হয়েছিল, যার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে নিষেধ করেছিল কিন্তু তিনি সে নিষেধ অমান্য করে নিয়মিত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। ফলে ঐ ফোঁড়া দিন দিন ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং সুলতানের মৃত্যুর কারণে পরিণত হয়।

সুলতান সালীমের শাসনামল ঃ একটি পর্যালোচনা

সুলতান সালীম মাত্র আট বছর আট মাস আট দিন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সামান্য সময়কালে তিনি যে পরিমাণ বিজয় অর্জন করেন, তা অনেক বড় বড় সুলতান দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও করতে পারেননি। সুলতান সালীমের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত বা বিচলিত অবস্থায়ও উলামা-ই-দীনের মর্যাদা রক্ষার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তিনি তাঁর মন্ত্রী এবং অধিনায়কদেরকে অনায়াসে হত্যা করতে পারতেন। তাই রাজকীয় কর্মকর্তারা তাঁর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। কিন্তু দীনী উলামাবৃন্দ ছিলেন এ ব্যাপারে একেবারে নিঃশংক। সুলতান সালীমের ধারণা ছিল, একমাত্র কঠোরতা ও কূটকৌশলের মাধ্যমেই দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা যায়। একদিক দিয়ে তাঁর ধারণা সঠিকই ছিল। তবে যেহেতু তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, তাই উলামায়ে দীনের প্রতি তিনি কখনো কঠোর হতে পারতেন না। একবার সুলতান সালীম তাঁর অর্থ বিভাগের দেড় শ' কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন এবং তাদের সকলের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। কনসটান্টিনোপলের কাযী জামালী এই হুকুমের কথা জানতে পেরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলতানকে বলেন, আপনি ভুলবশত এই নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব অবিলম্বে আপনার নির্দেশ রহিত করুন। কেননা ঐ লোকেরা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধ করেনি। সুলতান তখন বলেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। কাযী তখন বলেন, আপনি শুধু এই পার্থিব রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতি নজর রাখেন, কিন্তু আমি আপনার পারলৌকিক জগতের কল্যাণও চাই। মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা দয়াশীলকে পুরস্কৃত করেন এবং অত্যাচারীকে কঠোর শাস্তি দেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, কাযী জামালীর পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান উল্লিখিত সকল কর্মচারীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তাদেরকে মুক্তি দেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ পদে পুনর্বহালও করেন।

অনুরূপভাবে একবার সুলতান ঘোষণা দেন, আমাদের দেশ থেকে ইরানে রেশম রফতানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো। ঐ ঘোষণার পর পরই তিনি ঐ সমস্ত বণিককে গ্রেফতার করে

ফেলেন যারা ইরানে রেশম নিয়ে যাওয়ার জন্য কনসটান্টিনোপলে অবস্থান করছিল। ঐ বণিকদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক চারশ'। সুলতান তাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আটক এবং তাদেরকে হত্যা করারও নির্দেশ দেন। এটা ছিল সেই মুহূর্ত, যখন সুলতান সালীম আড্রিয়ানোপলের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলেন এবং কাযী জামালীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কাযী জামালী ঐ বণিকদের সম্পর্কে সুলতানের কাছে সুপারিশ করেন। সুলতান তখন বলেন, দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ লোকের মঙ্গলের জন্য এর এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা বৈধ। কাযী বলেন, এটা তখন যখন ঐ এক-তৃতীয়াংশ লোক দুনিয়ায় ফিতনা-ফাসাদের কারণ হয়। সুলতান বলেন, এর চাইতে বড় ফাসাদ আর কী হতে পারে যে, তারা (বণিকরা) তাদের সুলতানের হুকুম অমান্য করেছে ? কাযী বলেন, তাদের কাছে সুলতানী হুকুম পৌঁছেনি, তাই তারা অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারে না। যা হোক, কোন প্রধানমন্ত্রী যদি সুলতান সালীমের সাথে অনুরূপ কথা কাটাকাটি করতেন তাহলে তিনি নির্ঘাত তাকে হত্যার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু সুলতান এ ক্ষেত্রে তা করলেন না। শুধু কিছুটা রাগত স্বরে বললেন, তুমি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করবে না। কাযী এই জবাব শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং সুলতানের প্রতি কোনরূপ শিষ্টতা না দেখিয়ে এমন কি তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সেখান থেকে উঠে চলে যান। সুলতান সালীম আশ্চর্যান্বিত হয়ে চুপচাপ নিজের ঘোড়ার উপর বসে থাকেন। তারপর মাথা নত করে কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে নির্দেশ দেন ঃ হ্যাঁ, বণিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক এবং তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তারপর তিনি কাযীর কাছে পয়গাম পাঠান ঃ আমি তোমাকে সমগ্র রাষ্ট্রের তথা এশিয়া ও ইউরোপ এলাকার প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করলাম। কিন্তু কাযী সে পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এতদসত্ত্বেও সুলতান তাঁর সাথে সব সময়ই নম্র ব্যবহার করতেন।

সুলতান সালীমের যুগ ছিল মাযহাবসমূহের জন্যও একটি বিশেষ যুগ। এই যুগে ইসলামী খিলাফত আব্বাসী বংশ থেকে উসমানী বংশে চলে আসে এবং ভাগ্যাহত দুর্বল খলীফাদের স্থান গ্রহণ করেন বিরাট সাম্রাজ্য ও বিরাট বাহিনীর অধিকারী সুলতানগণ। এই যুগেই মার্টিন লুথার খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কার কাজ শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল উসমানীয়দের ইউরোপে প্রবেশেরই ফলশ্রুতি। ঐ যুগে হিন্দুস্থানে কবীর নামক জনৈক ব্যক্তিও নতুন একটি ধর্মমতের প্রচলন করেন। কবীর গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী মঘর নামক স্থানে ৯২৪ হিজরীতে (১৫১৮ খ্রি) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সুলতান সিকান্দর লোধীর সমসাময়িক। এই সুলতানের যুগেই অর্থাৎ হিজরী ৯২২ সনে (১৫১৬ খ্রি) পকেট ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়।

সুলতান সালীম সংকল্প নিয়েছিলেন, খ্রিস্টানদের দেশসমূহের উপর হামলা পরিচালনার পূর্বে নিজের সাম্রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে যে সমস্ত খ্রিস্টান রয়েছে তাদেরকে প্রথমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সমগ্র দেশ ভিনদেশীদের সব রকমের প্রভাব থেকে পুরোপুরি পবিত্র করে নেবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে খ্রিস্টানদের গির্জাসমূহ মসজিদে রূপান্তর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যখন খ্রিস্টানরা এই সংবাদ পায় তখন সুলতানের খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করে ঃ সুলতান মুহাম্মাদ খান যখন কনসটান্টিনোপল জয় করেন তখন আমাদেরকে সর্বপ্রথম ধর্মীয়

স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমাদের গির্জাসমূহ সংরক্ষণ করা হবে এবং আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। খ্রিস্টানদের এই কথাকে রাজকীয় দরবারের উলামাবৃন্দ সমর্থন করেন এবং কাযী জামালীও তাদের সুপারিশকারী হন। কাজেই সুলতানকে বাধ্য হয়ে ঐ সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। তবু খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদেরকে সুলতান সালীমের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট দেখা যায়। তারা সুলতানের নিজস্ব ধর্মীয় উদ্দীপনাকে পর্যন্ত দূষণীয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এটা তাদের একদেশদর্শিতা এবং হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। সুলতান সালীম যে একজন খোদাভীরু ও পুণ্যমনা লোক ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সুলতান সালীম যে সমস্ত দেশ দখল করে নিয়েছিলেন তা একেবারে শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের দখলে কিংবা অন্ততপক্ষে তাদেরই নেতৃত্বাধীনে থাকে। কিন্তু এই সুলতান বেশি দিন হুকুমত করার সুযোগ পাননি। মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি যদি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন তবে নিশ্চিতভাবে সমগ্র ইউরোপ জয় করে তবে ছাড়তেন। 'খলিফাতুল মুসলিমীন' উপাধি লাভ করায় সুলতান সালীম হচ্ছেন উসমানিয়া বংশের সর্বপ্রথম খলীফা।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অঃসঃ/৫০১০-৩২৫০

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ